সাপ্তাহিক বসুমতী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লঙ্কাকাণ্ড : বোমার আঘাতে যুবনেতা কৃষ্ণ রায় নিহত

শোকসভা ও শোকমিছিল

...সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ই চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 39, 20th March, 1969

CALCUTTA UNIVERSITY GENERAL LIBRARY

271168

CMK-40 [illegible] 62-25-27/1/68

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৪৩৫
আজকের মানুষ		২৪৩৬
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৪৩৭
রঙ্গদর্শন		২৪৪২
ভাবতদর্শন		২৪৪৬
আন্তর্জাতিক		২৪৪৯
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	২৪৫২
শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি	শ্রীসওদাগর	২৪৫৪
কাকতাড়ানি মা (কবিতা)	মনোরঞ্জন হাজরা	২৪৫৫
নির্বাচনের পরে	সাগর বিশ্বাস	২৪৫৬
মন্ত্রীরা কি বলেন		২৪৫৯
যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	২৪৬২
পাঠকমন		২৪৬৪
কথায় কথায়	নিবারণ মনশী	২৪৬৫

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যান্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. ভি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স
৭১/১এ রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত ॥ শপথ, হতাশা এবং বিভিন্নতার সমস্যা (প্রবন্ধ)	— ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৪৬৭
অফিসে স্বীকারোক্তি (কবিতা)	— জয়ন্তী সেন	২৪৬৯
আজকের বিজ্ঞান	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২৪৭০
ঋতু পরিবর্তনের পালা (কবিতা)	— অনিলকুমার মোদক	২৪৭১
সোনার হরিণ (গল্প)	— মিহির পাল	২৪৭২
অবহেলিত কাকদ্বীপ	— নরোত্তম হালদার	২৪৭৮
লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল ?	— মুরশিদ	২৪৮০
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	২৪৮৪
গ্রন্থমেলা		২৪৮৭
রূপজগৎ		২৪৮৮
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	২৪৯২

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ-যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

ভক্তসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পূর্ণজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে ঃ—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৬·

দ্বিতীয় ভাগে ঃ—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। ৬·

তৃতীয় ভাগে ঃ—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৮·০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—
রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চৌরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, ঘেড়েভেড়ের কৌতুক, ফর্দরুফৎ, হিন্দী কবিতা, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী নানা ভাষায় কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী
সম্পাদিকা জয়ন্তী সেন

৭৩ বর্ষ ঃ ৩৯শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ৬ই চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ Thursday, 20th March, 1969

সপ্তম বর্ষে

নবপর্যায় সাপ্তাহিক বসুমতী সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করলো। বাংলা ভাষায় পত্র-পত্রিকার জগতে এই পত্রিকা যখন নব পর্যায় আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন অনেকেই এর স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা ‍কাশ করেছিলেন। সেই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ঐ রকম আশঙ্কার কারণ ছিল কি?

ঐ আশঙ্কার কারণ ছিল এই যে, নব পর্যায় সাপ্তাহিক বসুমতী বৈশিষ্ট্যের ‍ক দিয়ে ছিল সম্পূর্ণ নতুন জাতের, ‍ভিনব ভাবের ও নব স্বাদের। বিরাট ‍ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা 'রিস্কে'র দ্বারা ‍কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হোল যে, বাংলাদেশের পাঠক গতানুতিকতা বর্জিত পত্রিকাকে গ্রহণ করতে জানে।

সাপ্তাহিক বসুমতী শুধুমাত্র যে ‍ানুগতিকতাকেই বর্জন করেছে তা ‍য়; এই পত্রিকা রাজনৈতিক সংকট-‍হূর্তে যে পথ-নির্দেশ করেছে তাও ‍জস্র পাঠকের সমর্থন লাভ করেছে। ‍ মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে সম্পূর্ণ ‍রপেক্ষভাবে জনসাধারণের কথা প্রকা-‍ত হওয়ায় নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল ‍কমাত্র এই পত্রিকাই পাঠকদের কাছে ‍লে ধরতে পেরেছিল।

বাংলাদেশে নিরপেক্ষভাবে কোনো ‍ত্রিকা কিছু বলবে—এ যেন প্রায় অভাব-‍য় ব্যাপার। আমরা জানতাম, বাংলা-দেশের কোটি কোটি মানুষের পক্ষে কথা ‍লাই নিরপেক্ষতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ‍প্তাহিক বসুমতী এক্ষেত্রে যে অযাচিত ‍ভিনন্দন লাভ করেছে, তার বিনিময়ে ‍মরা বলতে পারি, আগামী দিনেও ‍মরা সংগ্রামী বাংলার ভাষা অবিকৃত-‍ প্রকশ করবো। আর দেশের জন-‍্যাণের কাজে আমরা সত্যের পথ থেকে চ্যুত হবো না।

আমাদের দেশ এখন এক বিশেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। দেশ গঠনের বাণী আজো দায়িত্বশীল নেতাদের কণ্ঠে ঘোষিত হলেও—এ দেশের মানুষের চরিত্র গঠনের কোনো চেষ্টাই হয় নি। তারা বিশেষ-ভাবে উপেক্ষিত তাই বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোয়, একদিকে ক'টি মানুষ কোটি কোটি টাকার মালিক, অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ কটিতটে পায় না সামান্য প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্র এবং কালানু-ক্রমে তারা বুভুক্ষু ও বিষাদগ্রস্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক পালাবদল ছিল অবশ্যম্ভাবী—যদিও বিলাসী মানুষ দেওয়ালের লিখন দর্শনে অপারগ।

সাপ্তাহিক বসুমতী পুরো ছ' বছরে পালাবদলের ইংগিত দিয়ে শাসকদলকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছে। জনসাধা-রণের নানান সমস্যা তুলে ধরে দেখানো হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতের আসল চিত্র কি। 'আন্তর্জাতিক' শুধু বিশ্বের সংবাদই বহন করে নি। ঐ সংবাদের মূল্যায়নে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দের অনেক কিছু শিক্ষা করারও ছিল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, আমাদের কথায় শাসকদল কর্ণপাত করেন নি। বরং যারা সংবাদ বিকৃত করে প্রকাশ করেছে, সাহিত্যের নামে বিকৃত রুচির লেখা প্রকাশ করে ভ্রান্তি উৎপাদনের দ্বারা শাসকদলের মোহ সৃষ্টি করেছে—আজ তাদের আসল চরিত্র জনসাধারণের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে। এবং সেই আসল চরিত্রটিকে এখন ভোল বদলের দ্বারা কিভাবে ঢাকা দেওয়া হচ্ছে বাংলা-দেশের অগণিত পাঠকের তা অজানা নেই।

আমরা সানন্দে বলতে পারি, সাপ্তা-হিক বসুমতী আগে যা ছিল, এখনো তাই আছে। এই পত্রিকা পূর্বে যেভাবে সক্রিয় সমালোচনার সাহায্যে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরেছে, এখনো সেই-ভাবে করবে এবং জনকল্যাণকর কাজে এই পত্রিকার সমর্থন থাকবে সুস্পষ্ট। এই নীতি আমাদের বরাবরের, এ নীতি থাকবে আগামী দিনেও।

আমাদের পত্রিকায় মননশীল যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে সেক্ষেত্রেও আমরা এমন কিছু প্রকাশ করি নি যার দ্বারা বাংলাদেশের মানুষ আরো হতাশ হয়ে পড়বে বা তারা বলিষ্ঠ চিন্তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে বিকৃতি ঘটাবে। আমরা জানতাম, এদেশের মানুষ যতোই অভাবগ্রস্ত হয়েছে ততোই তারা বিকৃত রুচির দাস হয়ে পড়ে নি, বরং তাদের সংগ্রামী মনোবল আরো দৃঢ় হয়েছে। আর এতোদিন ধরে চরিত্র হিসেবে তাদের খাড়া করে যা লেখা হয়েছে বা মাঠে-ময়দানে প্রকাশ করা হয়েছে, বর্তমান নির্বাচনে তারা তার সমুচিত জবাব দিয়েছে। সেই জবাব সত্ত্বেও বিকৃতি যদি বন্ধ না হয়, তাহলে হয়তো প্রয়োজন হবে আরো কঠিন জবাবের। এই জবাব দরকার বিভ্রান্তি রোধের জন্য। সাপ্তাহিক বসুমতী ইতিপূর্বে একথা ঘোষণা করেছে এবং দেশের কল্যাণের জন্য এখনো তার পুনরুক্তি করছে।

বলা বাহুল্য, পত্রিকা-জগতে সাপ্তাহিক বসুমতী কতদূর কী করতে পেরেছে—তার বিচারের ভার সম্পূর্ণ জনসাধারণের। তাদের সমর্থন ও সহ-যোগিতার ওপর নির্ভর করে আমরা বলিষ্ঠ চিন্তা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। এই কঠিন-কঠোর ও লোভবিষণ্ণ পথ-পরিক্রমায় আমরা সকলের সদিচ্ছা প্রার্থনা করি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরকে ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত দেখা গিয়েছিল যখন তিনি শুনলেন যে, ফিরিঙ্গি ফস্টার তাঁর স্ত্রী শৈবলিনীকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে-ক্রোধ নিজের ওপর যতটা প্রকাশ পেয়েছিল, ফস্টার বা শৈবলিনীর ওপর ততটা নয়। স্ত্রীর পুনরুদ্ধারের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর কল্পনাই করতে পারেন নি, তিনি ঈশ্বর এবং পরোপকারের চিন্তায় মগ্ন হয়ে শৈবলিনীকে ভুলতে চেয়েছিলেন; শৈবলিনীকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন তাঁরই অনুগৃহীত প্রতাপ রায়। এমন কি চন্দ্রশেখর স্ত্রীধন অপহরণকারী ফস্টারকে ক্ষমাও করেছিলেন। আধুনিক চন্দ্রশেখরও ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত।- কিন্তু যাঁকে অপরাধী বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন, তাঁকে ক্ষমা করতে তিনি নারাজ। যে-অভিযোগ আজকের চন্দ্রশেখর এনেছেন আগে তার ফয়সলা চান, পরে ভগবৎচিন্তা, পরোপকার ইত্যাদির কথা ভাবা যাবে। উপ-প্রধান ও অর্থমন্ত্রী কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় কয়েকটি মারাত্মক অভিযোগ তুলে চন্দ্রশেখর কংগ্রেস দলের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। চাঞ্চল্যই শুধু নয়, চন্দ্রশেখর দলীয় নেতৃত্বের মৌচাকে এমন সজোরে ঢিল মেরেছেন যে, আজ নেতৃত্বের সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। অথচ তিনি কোন বিক্ষুব্ধ দলীয় নন, চন্দ্রশেখর একজন খাঁটি, নির্ভেজাল কংগ্রেসী। একদিন তিনি দলের সেক্রেটারীর পদও অলংকৃত করেছিলেন।

চন্দ্রশেখর কংগ্রেসী, তবে হাত-তোলা কংগ্রেস সদস্য তিনি নন, তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ নিয়েছিলেন তাঁর প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জন্যে। কংগ্রেসের মধ্যে তিনি 'তরুণ তুর্কী' গ্রুপের অন্যতম নায়ক হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। চন্দ্রশেখর রাজ্যসভায় এ-অভিযোগ এনেছিলেন যে, উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই এবং তাঁর পরিবারের কোন কোন লোক বিড়লার কারবারের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কযুক্ত বলেই বিড়লা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তদন্ত করার সংসদসদস্যদের দাবি সরকার মেনে নিচ্ছেন না। এ-অভিযোগকে শ্রীদেশাই তাঁর প্রতি অসম্মানজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী এ-হুমকিও দিয়েছেন যে, যদি শ্রীচন্দ্রশেখর ক্ষমাপ্রার্থনা না করেন, তবে তাঁকে অবসর নেবার কথা ভাবতে হবে। শ্রীচন্দ্রশেখর মাপ চান নি, উল্টে তাঁর অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণের চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেছেন।

চন্দ্রশেখর

চন্দ্রশেখরকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা জানেন মানুষটি ইস্পাতে তৈরি। রাজনীতিতে এসেছেন এমন এক সময়ে যখন বিপ্লবের আগুন জ্বলছিল দেশের দিকে দিকে। আবার উত্তরপ্রদেশের এমন এক জেলায় তাঁর জন্ম এবং রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়, যে-জেলাকে বিপ্লবীরা সাময়িককালের জন্যে হলেও বিদেশী শাসনমুক্ত করেছিলেন। হ্যাঁ, বালিয়া জেলায় জন্মেছিলেন, তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়িও রক্তাক্ত আগস্ট বিপ্লবের সময়ে।

মতাদর্শের দিক থেকে চন্দ্রশেখর, মোহন ধারিয়া প্রমুখ নবনায়কেরা উগ্র বলে এঁদের নামকরণ করা হয়েছে 'তরুণ তুর্কী'। রাজনীতিতে চন্দ্রশেখর প্রথম পাঠই নেন সমাজতন্ত্রের আদর্শে। সোজা আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস কংগ্রেস নেতাদের সান্নিধ্যে আসা সুযোগ ঘটেছিল বলেই চন্দ্রশেখরে রাজনীতি শিক্ষার বনিয়াদটা শক্ত হতে পেরেছে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে চন্দ্রশেখ বালিয়া জেলা ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি হন। সেই তরুণ বয়সেই তিনি সপ্রমাণ করেছেন তাঁর সাংগঠনিক শক্তি কতখানি। ১৯৫০ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়তে এসে তিনি সমাজবাদী যুবসভা গঠন করেন এবং তার সেক্রেটারী হন। পরে এলাহাবাদ শহর সমাজবাদী যুব সংগঠনের সম্পাদ দায়িত্ব নেন চন্দ্রশেখর। এ সময়েই তি জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ রামমনোহ লোহিয়া প্রমুখ সোস্যালিস্ট নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এঁরা যখন কংগ্রেস ছেড়ে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন, তরুণ চিন্তাশীল চন্দ্রশেখরও সেদিকে আকৃষ্ট হন। '৫২ সনে তিনি বালিয়া জেলা পি-এস-পি'র সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। এর তিন বছর বাদে তিনি দলের জাতীয় পরিষদের সদস্যপদ পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে দলের মুখপত্র 'সংঘর্ষ'-এ তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধও প্রকাশিত হতে থাকল।

কিন্তু '৫৬ সনে যখন কংগ্রেস আবাদী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা ঘোষণা করেন তখন চন্দ্রশেখর আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন। সোস্যালিস্ট নেতা বুদ্ধিজীবী শ্রীঅশোক মেটা সেদিন কংগ্রেসে থেকেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে রূপায়ণের আহবান জানালে চন্দ্রশে তাতে সাড়া দেন।

অবশ্য '৬২ সনে তিনি রাজ্যসভা সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন পি-এস-পি'র টিকিটেই। তবুও কংগ্রেসে যোগদান করার পর থেকেই চন্দ্রশেখ একটার-পর-একটা বিস্ফোরণ ঘট লাগলেন। ইতিপূর্বে ভুবনেশ্বর অধিবেশনে গৃহীত ১০-দফা কর্মসূচি রূপায়ণের জন্যে তিনি হাই কম্যান্ ওপর চাপ দিতে থাকেন। চাপ ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসা জাতীয়করণের জন্যে, হুঙ্কার ছাড়লেন একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে।

স্ত্রী ও এক পুত্রের ছোট্ট পরিবার নিয়ে চন্দ্রশেখরের সংসার সুখেরই হত, যদি অন্যায়ের সঙ্গে দলীয় নেতৃত্বের আপোষ তিনি চোখ বুজে হজম করতে রাজী হতেন। তিনি আজ কংগ্রেসের প্রব্লেম চাইল্ড।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"ভয়ঙ্কর লোকটি"র লণ্ডন-সংবর্ধনা

কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনের সংবাদ শোনামাত্র লিবার‍্যাল ইংরেজ এগিয়ে এসে তাঁর করমর্দন করল। ইংরেজ জাতি সত্যই রাজনীতি বোঝে। ইংলণ্ডের অভিজ্ঞ মহলে "ভারতের সবচেয়ে মারাত্মক মানুষ" হিসেবে যে সুভাষচন্দ্র বসু পরিচিত, তাঁর হাতে নিশ্চয় হাত দেওয়া যায় না, কংগ্রেস সভাপতি হবার পরে তাঁর চেহারা বদলে গেল, তখন অন্য কিছু না হোন, শত্রুদলের অন্যতম সেনাপতি তো বটেন। যুদ্ধে চুক্তির স্থান আছে, দুপক্ষ সে সময়ে যখন হাত মেলায় তখন গ্লাভসের তলায় চাপা থাকে রক্তের ছাপ। তখন দুপক্ষই হাসে, সে হাসি যতখানি প্রকাশ করে, গোপন করে অনেক বেশি।

কংগ্রেসের সভাপতিপদে নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ-চন্দ্র আন্তর্জাতিক চরিত্র হয়ে উঠলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা পূর্ব থেকেই বর্তমান, পণ্ডিত জহরলাল ছাড়া এ-ব্যাপারে তাঁর সমতুল কেউ নেই কংগ্রেসে। এমন কি বলা যায়, ভারতের জাতীয় প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে নির্দিষ্টভাবে অনুধাবনের ও ব্যবহারের সামর্থ্য জহরলালের চেয়েও তাঁর বেশি। কিন্তু তা বলেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তাঁর ছিল না, যা পেলেন কংগ্রেস-সভাপতি হয়ে।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডে যে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, তা তাঁর আশার অতীত ছিল। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শত্রু ইংরাজদের রাজধানীতে অতিমাত্রায় সংবর্ধনা পাচ্ছেন, অদৃষ্টের একি লীলা, নিশ্চয় সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন। সুভাষচন্দ্র নিজেকে কখনো ধর্মনেতা, কি [illegible]ন্তিবাদী, কি শত্রুর প্রতি পরম প্রেমে পুলকিত কোনো [illegible]ণ ব্যক্তিরূপে তুলে ধরেন নি। শত্রুর স্পষ্ট শত্রু [illegible] তার ফলে শত্রুপক্ষ কোনো ভালবাসা তাঁর প্রতি দেখায় নি। কারাগারে জীবনের বড় অংশ কাটাতে হয়েছে, তথাকথিত মুক্ত জীবনেও গুপ্তচরের সদাজাগ্রত চোখ অলক্ষ্যে পাহারা দিয়েছে। এর আগে, ১৯৩৩ সালে যখন ইংলণ্ডে যেতে চেয়েছেন, তাঁকে যেতে দেওয়া হয় নি। এবার অকস্মাৎ দ্বার খুলে গেল—মনে হল, কিছু কিছু ইংরাজের হৃদয়ের দ্বার পর্যন্ত যেন খুলে গেছে। সেই দ্বারপথে সুভাষচন্দ্র দেখতে চাইলেন ভিতরে কী লেখা আছে,—'স্বাধীনতা' শব্দটি লেখা আছে কি?

তিনি কী দেখেছিলেন সেকথা পরে আলোচ্য, এখন সুভাষচন্দ্রের লণ্ডন-সংবর্ধনার একটা খসড়া বিবরণ দেওয়া যাক। এই বিবরণের মধ্যে পাঠক বহু আকর্ষণযোগ্য সংবাদ পাবেন, বহু পরিচিত ঐতিহাসিক নাম ঘোরাফেরা করবে, ঐসব বিখ্যাত ইংরাজরা মুখোমুখি হয়ে ভারতের মুখ্য বিপ্লবীকে দেখবেন, তাঁরা পরস্পরকে চিনবেন, বোধহয় বুঝবেন পরস্পর পরস্পরকে কী দিতে পারেন, তদনুযায়ী নিজেদের ভাবী কর্তব্য তাঁরা স্থির করে ফেলবেন।১

অস্ট্রিয়ার প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস বাডগাস্টিনে পৌঁছবার পর থেকে সুভাষচন্দ্র চিকিৎসার ব্যাপারে এতটুকু কালক্ষেপ করেন নি। অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৫ জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত বিশেষ সংবাদদাতার চমৎকার বিবরণে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিকিৎসাকে নিয়েছেন, সেইসঙ্গে আত্মজীবনী রচনাকেও। ভরতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ চার বছর আগে লিখিত হয়েছে, এবার অন্তর্জীবনের কথা বলতে কলম তুলে নিয়েছেন, যার ফলে সম্পূর্ণ মানুষটিকে পাবার সম্ভাবনা। পরবর্তী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সুভাষচন্দ্র বোধহয় নিজের কথা বলে যেতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন, তাঁর মত মানুষের জীবন নিত্যই অনিশ্চিত। কিন্তু তিনি নিজের কথা শেষ করতে পারেন নি,২ তার আগেই পরের

---

১ এই সংবর্ধনা-বিবরণ প্রধানত অমৃতবাজার পত্রিকা এবং কিয়দংশে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান থেকে সংগৃহীত।

২ সংবাদটি এই—

"Then what is perhaps now already known in India, Mr. Bose has undertaken to write a new book to be brought out by a well-known London Publisher. The Publisher was anxious to have the manuscript soon and Mr. Bose was apprehensive about finding time for writing the book once public activities again closely spread their grip over him.

ভাবনায় তাঁকে স্বাস্থ্যনিবাসের সানন্দ আশ্রয় ত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছিল।

গ্রেট ব্রিটেনের বিশিষ্ট ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রকে ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সেখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ইংলণ্ডে প্রবেশের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা শিথিল করে দেওয়া হল পরিবর্তিত অবস্থায়। সহানুভূতিশীল লর্ড কিনোউল্লের জিজ্ঞাসার উত্তরে মার্কুইস অব জেটল্যান্ড জানিয়েছিলেন "সুভাষ বসু যদি ইংলণ্ডে আসতে চান তাহলে কোনো বাধা সৃষ্টি করা হবে না।" সুতরাং "সেই বিশেষ দিনটি এল গ্রেট ব্রিটেনের ভারতীয় সম্প্রদায়, যার জন্য এত প্রতীক্ষা করেছে।" ১০ই জানুয়ারী বিকালে সুভাষচন্দ্র ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে নামলেন। আবহাওয়া খারাপ ছিল, ট্রেন এক ঘণ্টা লেট, তবু সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী ভারতীয় ও ইংরাজরা ভিড় করে অপেক্ষা করছিল স্টেশনে। "সর্ব মতের ভারতীয়রাই উপস্থিত, অনেকেই এসেছেন জাতীয় পোষাকে। কয়েকজনের সযত্ন তত্ত্বাবধানে রয়েছে একটি বিরাট ত্রিবর্ণ পতাকা,—বাইরের লোকজনকে যা ভারতীয় নেতার আগমনের কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ইঞ্জিন স্টেশনে ঢোকা মাত্র জয়ধ্বনি উঠল—সুভাষবাবু কি জয়।' মহাত্মা গান্ধী কি জয়! ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"

সুভাষচন্দ্র অবতরণ করা মাত্র ভারতীয় রীতিতে সজ্জিত বাঙালী মহিলা শ্রীমতী ভট্টাচার্য ভারতীয় রীতিতে তাঁকে মাল্যদান করে বাংলায় কুশল প্রশ্ন করলেন। "তারপরেই অভিনন্দন জানালেন মিস ইন্দিরা নেহরু।" অল্পদিন আগে ইন্দিরার পিতামহী স্বরূপরাণী নেহরুর দেহান্ত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র ইন্দিরাকে সমবেদনা জানালেন। এই মৃত্যু সুভাষচন্দ্রকে বেজেছিল। তাঁকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। জাতীয় সংগ্রামে নেহরু পরিবারের দানের বিষয়ে বললেন, "ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানাতে "যে জনতার সমাবেশ হয়েছিল তার তুল্য জনতা মাত্র দেখা গেছে গান্ধী ও নেহরুর সংবর্ধনায়।" প্রচুর মালা, প্রচুর ছবি, প্রচুর অনুরাগবাক্য —তার মধ্য দিয়ে স্টেশন-কর্মীদের সহায়তায় দ্রুত বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র গাড়িতে উঠলেন, কারণ ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় তিনি ডরচেস্টার হোটেলে আন্তর্জাতিক সংবাদ-প্রতিনিধিদের সম্মুখীন হবেন। ডরচেস্টার হোটেলের দিকে যে-গাড়িতে ছুটলেন, তার সামনে লাগানো ছিল কংগ্রেস পতাকা, চালাচ্ছিলেন ভারতীয় ট্যাক্সি-মালিক মিঃ চাপেকর।

ডরচেস্টার হোটেলে সুভাষচন্দ্র শ্রীযুক্ত পি বি শীলের আতিথ্য নিলেন। শ্রীযুক্ত শীল সংবাদপত্রের কাজ ছেড়ে দিয়ে একটি ইণ্ডিয়ান ট্রাভেল এজেন্সীর ডিরেক্টার। সাড়ে ছটায় শুরু হল সাংবাদিক সম্মেলন। ঘর-ঠাসা সাংবাদিক; "কার্যত লণ্ডনের এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানের প্রায় সকল সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংবাদদাতারা উপস্থিত; কন্টিনেন্ট ও আমেরিকান সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও উপযুক্ত সংখ্যায়; ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের একজন প্রতিনিধিও অনুপস্থিত নয়।" লর্ড কিনোউল্লের নেতৃত্বে সাংবাদিকরা সমবেত। বহু-আলোচিত বা সমালোচিত মানুষটিকে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার জন্য তাঁরা অধীর। দীর্ঘাকার, সুদর্শন, মর্যাদাগম্ভীর মানুষটির উপরে তাঁরা প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগলেন অজস্রধারে। সুভাষচন্দ্র শান্তভাবে, দক্ষতার সঙ্গে, প্রসন্ন হাসির মেজাজে উত্তর দিয়ে চললেন। ভারতে সদ্য-প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সম্বন্ধেই বেশি প্রশ্ন করা হল। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ঔচিত্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত মনোভাব যাই হোক না কেন, 'বেসরকারী রাষ্ট্রদূত' হিসাবে বাইরের মানুষের কাছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির কৃতিত্বের কথাই বললেন। প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থেকে, প্রাদেশিক গভর্নরদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ-চেষ্টার মধ্যে তারা কাজ ভালই চালাচ্ছে, আমলারা অনুগত না হলেও মোটামুটি মানিয়ে নিচ্ছে; তবে এই ব্যবস্থা থেকে খুব বেশি কিছু আশা না করাই ভাল, যদি না শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। কংগ্রেসী শাসনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেড়েছে এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করলেন। সেই সঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার করে তুললেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে অংশ নেওয়া মানে প্রস্তাবিত ফেডারেশন পরিকল্পনাকে মেনে নেওয়া নয়। কদাপি নয়। কংগ্রেস ফেডারেশন পরিকল্পনার সঙ্গে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়বে।৩

এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি লণ্ডনের কোনো কোনো কাগজের রিপোর্টের দিকে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ

This meant his devoting good time to the writing of the book much in nature of an autographical study. The volume is expected to reveal Mr. Bose not merely or one might even possibly say not so much as a chronicler, as a close student and careful observ[er] of events of an important and interesting period and a capable critic of a wide r[ange] of topics in association with a comprehensive view of the movement for India's nat[ional] regeneration."

অসমাপ্ত গ্রন্থটি 'অ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম' নামে পরে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থপরিকল্পনা সম্বন্ধে যে সব কথা পা[ই] তাতে গ্রন্থটি সমাপ্ত না হওয়ার জন্য আমরা ক্ষোভ বোধ না করে পারছি না।

৩ ২৫ জানুয়ারী তারিখে অমৃতবাজার লণ্ডনের নিউজ ক্রনিকলে প্রকাশিত সুভাষচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করে। ঐ প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কৃতিত্বের ফিরিস্তি দিয়েছেন; সেই সঙ্গে রয়েছে ফেডারেশনের দুষ্ট রূপের বর্ণনা। তাঁর মতে, প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বে সংকট ঘনাবেই গভর্নর ও আমলাদের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য।

আপনি শুনেছেন কি সেই চাষীর কথা যার সঞ্চয় ছিল ১০,০০০ টাকা কিন্তু প্রতি বছর লোকসান করত ৬০০ টাকা?

ব্যাঙ্কের কর্মচারী তাঁর প্রচারকার্য্যের গাড়ী নিয়ে কয়েকবার যাতায়াত করার পর এবং অনেক বোঝাবার পর চাষীটি বুঝতে পারলো যে তার টাকা ব্যাঙ্কে রাখা অনেক বেশী নিরাপদ এবং তাতে সুদ পেয়ে টাকা বেশ বেড়ে ওঠে।

সে তখন কর্মচারীটিকে তার ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে মাটি খুঁড়ে ১০,০০০টাকার নোটের বাণ্ডিল বের ক'রে স্টেট ব্যাঙ্কে গিয়ে এক সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলল।—পি. টি. আই.

তার লোকসান হ'ল ৬০০ টাকা, যেটা সে ওই ১০,০০০ টাকার ওপর সুদ হিসেবে পেত, যদি সে ওই টাকাটা স্টেট ব্যাঙ্কে রাখত। হয়ত তার ওই ১০,০০০ টাকাই লোকসান হয়ে যেত, কেননা উই বা অন্য কোন পোকামাকড় টাকার ওই নোটগুলিকে দিব্যি সাবড়ে ফেলতে পারত। আপনার ভাগ্যটা হয়ত ওই চাষীর মতন নাও হতে পারে। আপনার টাকাটা স্টেট ব্যাঙ্কেই রেখে দিন।

প্রত্যেকের সুবিধেমত কাছাকাছি দেশময় ছড়ানো রয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী শাখাপ্রশাখার ২৩০০টিরও বেশী অফিস।

স্টেট ব্যাঙ্কের কিন্তু কর্মচারীরা সুদূর গ্রামে গিয়েও গ্রামের অধিবাসীদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং তদারকি ক'রে থাকেন। স্টেট ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় রাখুন।

উপদেশঃ আপনার টাকা লুকিয়ে রাখবেন না।

স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা নিরাপদে রেখে টাকা বাড়তে দিন। তাতে আপনি নিজেরও সাহায্য করবেন, দেশেরও সাহায্য করবেন।

সকলের সেবায় স্টেট ব্যাঙ্ক

করলেন—সুভাষচন্দ্র নাকি কন্টিনেন্টে তাঁর সাম্প্রতিক অবস্থানকালে সিনর মুসোলিনি ও ডিউক অব উইন্ডসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শুনে তিনি স্তম্ভিত। বললেন—"নেপলসে বিমান থেকে নেমে প্রথমেই যে ট্রেন পেয়েছি তাতে ব্যাডগাস্টিন গেছি, একজন ইটালিয়ানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় নি, মুসোলিনি তো দূরের কথা। আর ডিউক অব উইন্ডসরের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটি এতই মজার যে, তার একমাত্র তুলনা ৬ মাস আগে লন্ডনের এক সংবাদপত্রের এই রিপোর্টটি—"ইংলন্ডের এক ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ভারতে গিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরবেন উলঙ্গ হয়ে।"

ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বললেন, সেখানে যদিও সংকট অবস্থা, যুদ্ধপ্রস্তুতি চলেছে, তবু মনে হয় না যুদ্ধ এখনি বাধবে। সবাই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ভয়ঙ্করতায় ভীত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যেখানে বিপন্ন সেখানে কংগ্রেসের মনোভাব কী, স্পষ্টভাষায় সুভাষচন্দ্র খুলে বললেন। চীনে তখন জাপানের আক্রমণ চলেছে এবং স্পেনে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান। সুভাষচন্দ্র জানালেন—"সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য যারা সংগ্রাম করছে, আমাদের সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি তাদের জন্য, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে।" উপদ্রুত চীন ও স্পেনের জন্য কংগ্রেসের মমত্বের কথা জানিয়ে বললেন, জাপানের আচরণের নিন্দা কংগ্রেস করেছে। ইংলন্ডের ভারতীয়রা চীন ও স্পেনের জন্য যা করেছে, তাতে গভীর সন্তোষ জানালেন : "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার দেশবাসীদের এই কাজ পৃথিবীর প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ভারতকে নিকটতর বন্ধনে আবদ্ধ করবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামশীল পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ভাগ্যের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য স্বতঃই যুক্ত।"৪

১১ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে সেন্ট প্যাংক্রাস টাউন হলে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হল। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত সভাপতিত্ব করেন। "অতীতে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি উদারভাবে সুভাষবাবুকে প্রশস্তি জানাতে কুণ্ঠিত হন নি।" সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বলেন—

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী, সেই সঙ্গে মহান ভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে সম্মান জানানোর জন্য, তাঁর প্রতি আনুগত্য জানানোর জন্য আমরা সমবেত হয়েছি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম, ও সেজন্য তাঁর পীড়ন-লাঞ্ছনার ইতিহাস আমরা শ্রদ্ধা ও প্রশংসার সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছি। গত দুই দশকে তাঁর বন্দিত্বের ইতিহাসই তাঁর উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ ঘোষিত শ্রদ্ধা।"

বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন

"আমরা আশা করি, ইংলন্ডবাসী ভারতীয়রা সুভাষকে পরবর্তী অভ্যর্থনা জানাবেন কংগ্রেস সভাপতিরূপেই।"৫

ভারতীয়দের বিপুল সংবর্ধনায় সুভাষচন্দ্র অভিভূত

৪ উদারনৈতিক ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের লন্ডন গমন, ভারতীয়দের সংবর্ধনা এবং সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের ছবিও বেরিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানাতে বহুশত ভারতীয় ছাড়াও যে বহু ইংরাজ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, তা সেখানে পাই, এবং ইউরোপে চিকিৎসার জন্য এলেও বর্তমানে তাঁকে 'চমৎকার দেখাচ্ছে', ও কংগ্রেস সভাপতিত্বভার নেওয়ার উপযুক্ত মনে হচ্ছে, তাও লেখা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের আচরণের মর্যাদা এবং বাচনভঙ্গির প্রশংসা পাই—

"English people who met him for the first time were impressed alike by his pleasant, quiet manner and the decisiveness with which he discussed Indian affairs. That was at a reception held an hour later at the Dorchester Hotel, which was attended by a large number of Indians as well as English journalists.

মন্ত্রীদের দায়িত্বপালনে বাধা, বন্দীমুক্তি সমস্যা, মন্ত্রিসভার অর্থসমস্যা, তাদের সাফল্য, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়ে কি বলেছিলেন তার বিবরণ দেওয়ার পরে ফেডারেশন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের কঠোর অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত হয়—

"We are opposed to federation ; we will fight it tooth and nail", Mr. Bose declared. "We are going to use every legislative means to oppose its introduction. Federation as it is now drawn up would be a setback. We think the Princes of the Native States would be a definitely reactionary force. In the last resort we would rather have the status quo than federation."

রাজনৈতিক কারণে ইংলন্ডে আসেন নি, এসেছেন বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে, সুভাষচন্দ্র জানিয়েছিলেন। ইন্ডিয়া অফিসে যাচ্ছেন কি না তার উত্তরে বলেন—"If his friends wished him to meet anyone he was willing to do so. 'From the Congress point of view we do not approach anyone'."

৫ রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণী ডেইলী ওয়ার্কার পত্রিকায় বেরোয় ২৪ জানুয়ারী, ১৯৩৮। 'ক্রশরোডস' গ্রন্থে তা উদ্ধৃত আছে। ঐ আলোচনার উল্লেখ আমরা পরে করব।

হয়ে পড়েছিলেন। বহুভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার পরে বললেন—

"আপনারা এই যে এত ভালবাসা আমাকে জানালেন, অবশ্যই তা জনজীবনে আমার ভূমিকার জন্য। হাঁ, আমার সে জীবন ঝঞ্ঝাময়, কিন্তু তার মধ্যে প্রচুর রোমান্সও রয়েছে। এখানে আমার চেয়ে অল্পবয়সী যারা উপস্থিত রয়েছো, তোমাদের আমি আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, বিদেশী শাসনের অন্ধকার দিক আছে সত্য, কিন্তু যে সব তরুণ-তরুণী দুঃসাহসের জীবন চায় তারা অ্যাডভেঞ্চারের রোমান্স এখানে যথেষ্টই পাবে। আরও আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, শুধু প্রভূত রোমান্সই পাবে না, সেইসঙ্গে প্রচুর স্নেহ-ভালবাসাও পাবে—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা যত পীড়ন করবে, তোমার দেশবাসী তত ভালবাসাই তোমাকে ফিরিয়ে দেবে।"

এর পরে সুভাষচন্দ্র যে-কথা বলেছিলেন, তা সুভাষচন্দ্রই বলতে পারেন—

"আমার পরম গৌরব ও সৌভাগ্য আমি একথা বলতে পারছি—আমার উপর দিয়ে এত কিছু বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমার মেরুদণ্ড এখনো সোজা আছে; ভরসা করি চিরদিন তা সোজাই থাকবে।"

ঐ বক্তৃতার মধ্যে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ স্বভাবতই উত্থাপন করেছিলেন। বক্তব্য পূর্ববৎ—"ভারতের ভাগ্য পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে জড়িত। কংগ্রেস বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য ভারতের সংগ্রাম পৃথিবীর সংগ্রামেরই অংশ, যে-সংগ্রাম চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে—চীনে, স্পেনে, আবিসিনিয়ায়। ভারত আর বিচ্ছিন্ন থাকবে না।" ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র ও কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিষয়ে একই-ভাবে বলেন, যতদিন প্রয়োজন ততদিনই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব রাখবে, স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস অবিলম্বে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবে। মন্ত্রিত্বের ব্যাপারে যদি কোনো কংগ্রেসী বেয়াড়াপনা দেখায় কংগ্রেস-কর্তারা তাদের স্বস্থানে পাঠিয়ে দেবেন। ফেডারেশনের ব্যাপারে বলেন, "এখানে এসে শুনছি, কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের ব্যাপারে যেমন গড়িমসি করে রাজী হয়েছে, তেমনি ফেডারেশনের ব্যাপারেও হবে। তা মোটেই ঠিক নয়। প্রাদেশিক ব্যাপারে মন্ত্রীদের কিছুটা ক্ষমতা আছে বলেই কংগ্রেস রাজী হয়েছে, কিন্তু কোনো একজন কংগ্রেস প্রতিনিধিও পাওয়া যাবে না যিনি বিশ্বাস করেন ফেডারেশন থেকে কিছু পাওয়া যাবে।"

অথচ ফেডারেশনের বেশি ইংরাজ সরকার কিছু ভাবতেও অসমর্থ। সুতরাং—চিরসংগ্রামী পুরাতন বক্তব্য—

"সকল দিক দেখে মনে হয় ভারতকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আর একটি ভয়ঙ্কর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কংগ্রেস তার জন্য প্রস্তুত।"

তারপরেই সুভাষচন্দ্রের অন্তর্লোকের দ্বার কিছুটা খুলে গিয়েছিল—

"যদি পরবর্তী আন্দোলন ব্যর্থ হয়, ভারতের জনগণের মধ্য থেকে নবীন ও উত্তম নেতৃত্ব আসবে।"৬ [ক্রমশঃ]

---

৬ সুভাষচন্দ্রের লণ্ডন সংবর্ধনা ও ভাষণের কতখানি বিবরণ বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে বেরিয়েছিল ঠিক বলতে পারব না। কিছু কিছু অবশ্যই বেরিয়েছিল, বিশেষত বামপন্থী কাগজগুলিতে। ২৫ জানুয়ারীর অমৃতবাজারে তার কিছু কিছু উদ্ধৃত হয়। 'স্টার' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের অনেকখানি বিবরণ ওখানে পাই; দেখি যে, সুভাষচন্দ্র ঐ প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ভালমন্দ বাছার কিছু নেই। ডেইলী ওয়ার্কার কাগজে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা হয়েছিল—

"The people of this country will welcome Subhas Chandra Bose on the occasion of his visit here, as the ambassador of the Indian people. Prospective President of the Indian National Congress, whose candidates won twenty millions out of the thirty million votes at the recent elections, he can speak with authority on behalf of the Indian national movement.

In the speech of the reception meeting in his honour at the St. Pancras Town Hall, he dwelt with special emphasis on the unity of India's national struggle with the struggle in China, in Spain, in Abyssinia, with the world struggle against Imperialism and Fascism.

These words convey also a sharp lesson for us in Britain. We have our duty to the Indian people's fight for freedom as part of our common fight. We have still much to do to see that British labour movement shall range itself unequivocally behind the demand of the Indian people, expressed in the Indian National Congress programme, for a freely elected Constituent Assembly to choose their own Constinution."

২৪ জানুয়ারী তারিখে এই কাগজেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রজনী পাম দত্তের প্রশ্নোত্তর-বিবরণ প্রকাশিত হয়। সুভাষচন্দ্র প্রশ্নের উত্তরে জানান, মন্ত্রিত্ব নিলেও নতুন শাসনতন্ত্রকে কংগ্রেস মেনে নেয় নি, ফেডারেশন কংগ্রেস স্বীকার করবে না ইত্যাদি। অন্যান্য বিষয়ে সুভাষচন্দ্র যা বলেন, তার আলোচনা পরে করব।

বঙ্গদর্শন

মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে চলেছেন। পাশে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।

পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার স্থাপিত হবার পর থেকেই সেই পুরোনো প্রশ্নটি নতুন করে তোলার দরকার হয়ে পড়েছে: প্রশ্নটি হচ্ছে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার এই একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন. বক্তব্যটি হচ্ছে কেন্দ্রের কাছ থেকে অধিকতর অর্থ ও ক্ষমতা ছিনিয়ে না আনা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জন্য নামমাত্র কাজ করাও সম্ভবপর হবে না। তাঁর বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় দ্ব্যর্থহীন-ভাবে ঘোষণা করেছেন যে কেন্দ্রের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্দেশ্যেই নয়াদিল্লী যাত্রা করেছিলেন, যদিও কেন্দ্রের দাক্ষিণ্য এজন্য তাঁদের প্রতি প্রসারিত হয় নি। ফিরে এসে তাঁরা বলেছেন যে, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে বাঁকা আঙুলকেই ব্যবহার করতে হবে। এবং প্রয়োজন হলে অকংগ্রেসী অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে বিশেষ করে কেরলের সঙ্গে একযোগে কেন্দ্রবিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। তা না হলে সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ আজ কেন্দ্রের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদী লড়াই-এর সম্মুখীন হতে চলেছে এবং তাতে জয়লাভ না করা পর্যন্ত কার্যত পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যস্ত অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটবে না। প্রাথমিক সমস্যাগুলিরও সমাধান করা সম্ভব হবে না। এখন অনেকেই এই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, ঠিক এই মুহূর্তে কেন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজন কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি অকংগ্রেসী রাজ্যগুলির সঙ্গে সহ-যোগিতামূলক মনোভাব প্রকাশ করতেন তা হলে হয়ত বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করা যেত। দুর্ভাগ্যক্রমে অকংগ্রেসী রাজ্যগুলিকে হাতে মারতে না পেরে ভাতে মারার নীতি, কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘকাল ধরেই গ্রহণ করেছেন। পাঠক-পাঠিকার সম্ভবত স্মরণে আছে যে, বিগত যুক্তফ্রণ্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের শোচনীয় অপ্রতুলতায় ১৯৬৭ সালে যখন কেন্দ্রের কাছে খাদ্যের প্রার্থনা জানিয়ে ধর্ণা দিয়ে-ছিলেন, তখন পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না। কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য টাকার দাবি জানিয়ে ওই টাকায় অন্য উদ্বৃত্ত রাজ্য থেকে খাদ্য আমদানীর কথা যুক্তফ্রণ্টের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, সে অনুরোধও রক্ষিত হয় নি। এমন কি নিজস্ব প্রচেষ্টাতে অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্য কেনবার অনুমতি মেলে নি। অথচ সেই যুক্তফ্রণ্ট সরকার উৎখাত হয়ে যাবার পর পি ডি এফ আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে খাদ্য সরবরাহে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে টান পড়ে নি। কেরল সরকারকে কিভাবে ভাতে মারার চেষ্টা চলছে তাও কারো অবিদিত নয়। স্মরণ করা যেতে পারে উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এর প্রাক-নির্বাচনী বক্তৃতা, কেন্দ্রে রাজ্যে একই দলের সরকার হওয়া দরকার, নতুবা—। ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট, এখানে কংগ্রেস সরকার না হলে তোমাদের ভাতে মারবো। উপ-প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য বঙ্গ-দর্শনে সমালোচিত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার বিপুল সংখ্যাধিক্যে পুনরায় আসীন হবার পর কেন্দ্রের একদেশদর্শী নীতির সুস্পষ্ট পরিচয় পুনরায় পাওয়া যাচ্ছে। যদিও প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কার্যত কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে তার প্রতিফলন ঘটে নি, উল্টো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্ররোচনামূলক মন্তব্যসমূহ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে। ধর্মবীরকে অপ-সারণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কারণ ব্যতিরেকে এমন আচরণ করলেন যা রীতিমত প্ররোচনামূলক, যাকে বাংলায়

হলে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা। ধর্মবীরের অপসারণ প্রস্তাব যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল এতে কোন সন্দেহই নেই, এবং তাঁকে অপসারণ করার যথেষ্ট সময় ছিল নির্বাচনের পর, কিন্তু এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণ আগাগোড়াই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মত, এবং তা করে পশ্চিমবঙ্গকে শত্রুশিবির বলেই যেন গণ্য করা হল। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে নয়াদিল্লীতে দরবার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু গিয়েছিলেন, তাঁদের দাবি এমন কিছু আহামরি ছিল না। কেন্দ্রের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে আর্থিক পাওনা রয়েছে তার অর্ধেকমাত্র দাবি করা হয়েছিল, কিন্তু সে দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। এ ছাড়া বলা হয়েছিল যে রাজ্যপাল আমলে চতুর্থ যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দের ব্যাপক সংকোচন ঘটানো হয়েছে, এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে; কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে সাড়া মেলে নি। খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারেও কেন্দ্র এবারেও বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। কাজেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভিন্ন আর কোন উপায় নেই।

অথচ এ রাজ্যে যে জমিতে পাট ও চা চাষ করা হয় তাতে ধান চাষ করা হলে অনেক খাদ্যশস্য পাওয়া যেত। সেই হিসাবে কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গকে অতিরিক্ত চাল দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয় একদিকে উদ্বাস্তু এবং অন্য দিকে অন্য রাজ্য থেকে বহু অধিবাসী এ রাজ্যে আসায় খাদ্যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত, কিন্তু কার্যত হয় তার বিপরীত। আন্তঃরাজ্য বিধি-নিষেধের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে প্রায় ছয় লক্ষ টন চাল আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আশু অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়াও কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস হবার বিশেষ প্রয়োজন। অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবু প্রস্তাব করেছেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনা এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হোক। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার সবদিক চিন্তা করে একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং এই এক বছরের জন্য একটা বার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলেই চলবে। বলা বাহুল্য রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাব কেন্দ্রের মনোযোগ আকর্ষণ করে নি, এবং পশ্চিমবঙ্গের এই সঙ্গত দাবিগুলির প্রতি এই উপেক্ষার কারণ বুঝে ওঠা মোটেই কঠিন নয়।

সংঘাত যে অনিবার্য তার কারণ বুঝে ওঠা মোটেই কঠিন নয়। ভারতে সংবিধান ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও কার্যত তা এককেন্দ্রিক। 'দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ মোর ইউনিটারি দ্যান ফেডারেল'। এই লাইনটি প্রশ্নপত্রে তুলে দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। বস্তুত সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রই সকল ক্ষমতার অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তুলনায় একটি মিউনিসিপ্যালিটির যে ক্ষমতা ও মর্যাদা, কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা ও মর্যাদা তার চেয়ে বেশি নয়। গত বিশ বছর কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেস দল একনাগাড়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কোন সংকট দেখা দেয় নি, তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকারের ক্লীবতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবিগুলি চিরদিনই উপেক্ষিত হয়েছে এবং সেগুলি কোনদিনই জোর করে তোলা হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে বিপুল রাজস্ব আদায় করে থাকেন, অপর কোন রাজ্য থেকে তা অনেক বেশি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এমনভাবে বিভিন্ন রাজ্যে অর্থবণ্টন করেন যে আনুপাতিক হারে পশ্চিমবঙ্গের বরাতেই সবচেয়ে কম জোটে। পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানার কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সর্বাপেক্ষা উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গে ধাতুভিত্তিক ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের সংখ্যাই সর্বাধিক। এই শিল্পের জন্য প্রচুর লৌহেতর ধাতু প্রয়োজনের ভিত্তিতে বণ্টন না করে রাজ্যের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করেন। তার ফলে বাংলার কলকারখানা মার খায় এবং এই সুযোগে অন্যান্য রাজ্য লাল হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী কোন একটি বিশেষ শিল্পের কারখানা পশ্চিমবঙ্গে একশোটি থাকলে এবং উত্তর প্রদেশে দশটি থাকলে কাঁচামালের বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় দ্বিগুণ হবে, কেন না উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা বেশি। অর্থাৎ উত্তর প্রদেশের ওই দশটি কারখানা যে পরিমাণ কাঁচামাল পাবে পশ্চিমবঙ্গের একশোটি কারখানা তার অর্ধেক পাবে।

কলকাতা ভারতের বৃহত্তম রপ্তানী বন্দর, এবং পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ রপ্তানীযোগ্য পণ্য উৎপন্ন হয়, অপর কোন রাজ্যে তত হয় না, অথচ ভারতের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কেন্দ্র কলকাতার অবস্থা প্রতিদিন খারাপ হয়ে পড়ছে, তা নিয়ে জগতের সর্বত্র উদ্বেগের কারণ ঘটছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিকার। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় নীতিই দায়ী, অথচ তার ফল ভোগ করতে হয় রাজ্যগুলিকে। পশ্চিমবঙ্গের চা, পাট, লাক্ষা, কয়লা ও অন্যান্য দ্রব্য বিদেশের বাজারে বিক্রি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় সারা ভারতবর্ষের লোকই তার সুফল ভোগ করে, অথচ পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিকার থাকেন।

কাজেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের নীতি নতুন করে নির্ধারিত হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে এ দাবি আমরাও করি। যুক্তফ্রন্ট সরকার সঙ্গত কারণেই কেন্দ্রের নিকট থেকে অধিকতর ক্ষমতা ও অর্থ দাবি করেছেন। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য অধিকতর জল ঘোলা না করে, দেশের পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য ও কেন্দ্রের দায়িত্ব ও অধিকার সুস্পষ্টভাবে ভাগাভাগি করে নেওয়া। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘদিন দেশের পরিপূর্ণ কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে কেন্দ্রীয় নেতারা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছেন না। সত্যিকারের ফেডারেল শাসনতন্ত্র চালাতে গেলে রাজ্যগুলির হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন একথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও বলেন। দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় নেতারা সরল কথাটা সোজাভাবে বুঝতে চান না এবং নিজেদের জিদ ও একগুঁয়েমি বজায় রাখার জন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় সংঘাত ডেকে আনছেন।

অন্তর্বর্তী বাজেট

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৬৯-৭০ আর্থিক বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গের যে আনুমানিক বাজেট বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন তাতে রাজস্ব খাতে ১৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি এবং গত বছরের দায় ২২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা প্রারম্ভিক ঘাটতি তহবিলের হিসাব ধরে মোট বৎসরান্তিক ঘাটতি তহবিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। শ্রীমুখোপাধ্যায় বাজেট বরাদ্দ উপস্থাপনকালে তাঁর ভাষণে বলেছেন যে ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ায় পূর্ববর্তী সরকারের তৈরি বাজেট তিনি উপস্থাপিত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বরাদ্দের প্রতিটি অনুদানের দাবি নিয়ে ভোট গ্রহণের সময় নেই বলে প্রায় চার মাস কাজ চালানো সম্ভব করে তোলার জন্য 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' গ্রহণ করা হবে। এই বাজেট আপাতত কাজ চালিয়ে যাবার জন্য। চার মাস পরে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিজস্ব বাজেট পেশ করা হবে।

কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসন এবং এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘকালের বঞ্চনা নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেছে। অজয়বাবু তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে, কলকাতা ও আর সন্নিহিত কিছু এলাকা বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অংশের মাথাপিছু আয় অন্যান্য রাজ্যের সবচেয়ে অনগ্রসর অংশের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গে

পুরো সম্পদের বৃদ্ধ কেন্দ্র পুরোপুরি পায় এবং পশ্চিমবঙ্গ শুকিয়ে মরে। যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা খাতে রাজ্য-গুলিকে সাহায্য করেন, তাতে রাজ্যগুলির ঋণের বোঝা ক্রমাগত বেড়ে চলছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন এই রাজ্যের জন্য ২২০ কোটি টাকা সাহায্য দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ এই সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে ঋণের আসল ও সুদ বাবদ পশ্চিমবঙ্গকে ফেরত দিতে হবে ২৩৪ কোটি টাকা. তার কারণ কেন্দ্রীয় সাহায্যের বেশিরভাগই আসে ঋণ হিসাবে। অর্থাৎ যে টাকা রাজ্যগুলির নিকট থেকে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করছেন, সেই টাকারই একটা অংশ ধার হিসাবে দিয়ে সেই ধারের উপর বাড়তি সুদ আদায় করছেন। বিচিত্র ব্যবস্থাই বটে! কাজেই কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করা ভিন্ন পথ কোথায়? কেন্দ্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে না পারলে এই ৩৫ কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ হবার নয়। শুধুমাত্র কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করেই পশ্চিমবঙ্গ বাঁচতে পারে।

পাওয়ারলুম তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

গত সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে কুটির ও শিল্পদপ্তরের মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষের সঙ্গে সাপ্তাহিক বসুমতীর বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের যে বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে শ্রীঘোষের একটি বিশেষ বক্তব্যই ছিল এই যে কো-অপারে-টিভগুলির দুর্নীতির অবসান ঘটাবেন এবং তিনি বলেছিলেন যে তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও বর্তমান অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করবেন।

শ্রীশম্ভু ঘোষকে ধন্যবাদ, তিনি ইতি-মধ্যেই সরকারিভাবে পাওয়ারলুম তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, পাওয়ারলুম সোসাইটি গড়ার ব্যাপারে বিরাট দুর্নীতির গন্ধ পেয়ে ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্টের তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র এই তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিশন ঐ বছরের ৩১শে ডিসেম্বর রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে ঐ রিপোর্ট ধামাচাপা দেওয়া হয়। সেই রিপোর্ট শম্ভুবাবু প্রকাশ করেছেন, এবং তা ছাড়া দুর্নীতির বিরাট ফিরিস্তি দিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান পৃথকভাবে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাও প্রকাশিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে কমিশন সরকারিভাবে পদস্থ অফিসারদের যোগসাজসে সমাজের উচ্চস্তরের নামজাদা ও প্রভাবশালী কিছু কিছু লোক কিভাবে গরীব তাঁতীদের সাহায্যের নামে গত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পাওয়ারলুম কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে দুর্নীতি ও কেলেংকারীর এক বিরাট ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তা তথ্য-প্রমাণ সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুর্নীতি ও কেলেংকারীর নায়কদের মধ্যে বিধানসভার ও বিধান পরিষদের সদস্য, মন্ত্রীদের আত্মীয় রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং সরকারী অফিসারদের আসল চেহারা। কমিশন তাঁদের নামধাম দিয়ে দুর্নীতির চেহারা প্রকাশ করেছেন। সমাজের উচ্চস্তরের এই সব প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গরীব তাঁতীদের সাহায্য করার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটেছে বলে কমিশন মনে করেন।

এখন আমাদের দেখতে হবে শুধুমাত্র রিপোর্ট প্রকাশের মধ্যেই যেন এই গুরুতর বিষয়টির নিষ্পত্তি না ঘটে। কো-অপারে-টিভের দৌলতে কংগ্রেসী আমলে যারা লাল হয়েছে তাদের ফিকে করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সরকারী অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগে এদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে করতে হবে। আশা করি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয় এ-বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

পরিবার পরিকল্পনা পক্ষের "উপহার"

চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতাল জনৈকা ভদ্রমহিলাকে পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ উপলক্ষে একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছেন, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। ভদ্রমহিলার নাম সন্ধ্যারাণী বিশ্বাস, স্বামী সুধীরকুমার বিশ্বাস, গ্রাম সেনেট, থানা দাদপুর, ডাকঘর সেনেট, জেলা হুগলী। বর্তমানে তিনি তিনটি সন্তানের জননী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারের গুণেই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক এই

অপারেশনের জন্য সন্ধ্যারাণী বিশ্বাসকে হাসপাতাল থেকে যে 'ডিসচার্জ সার্টিফিকেট' দেওয়া হয়েছিল, তার ফটোস্ট্যাট কপি।

ভদ্রমহিলার পরিবার পরিকল্পনা করার দুরাশা জেগে উঠেছিল এবং প্রত্যন্তবাসী গ্রাম্যবধূ হওয়া সত্ত্বেও নানা অসুবিধা ভোগ করেও তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৬৬ সালে। তাঁকে অপারেশন করেন ডাঃ কেতকী চ্যাটার্জী, যিনি এখন সুখলাল করনানী হাসপাতালে উচ্চতর পদে নিযুক্ত আছেন। অতঃপর অপারেশন অন্তে ভদ্রমহিলা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

কিন্তু তাঁকে কি আদৌ অপারেশন করা হয়েছিল? করা হয়ে থাকলে সেটা কি রকম অপারেশন? সন্দেহ করার যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে যে, যিনি অপারেশন করেছিলেন, তিনি সেই অপারেশনের পদ্ধতি জানেন না। গ্রাম্য বধূটিকে সহজেই বোঝান হয়েছিল যে, অপারেশন হয়ে গেছে এবং তাঁর আর সন্তানাদি হবে না এবং সেই বিশ্বাস নিয়েই বধূটি তাঁর গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন এবং এ অঘটন কেন ঘটল তা জানবার জন্য পুনরায় চুঁচুড়া হাসপাতালে ছুটেছেন। ভাগ্যের পরিহাস যে, চুঁচুড়া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ এখন পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ উদ্‌যাপনে ব্যস্ত, সেই কারণে ভদ্রমহিলাকে দেখবার সময় কারোরই হল না, রূঢ়ভাবে তিনি হাসপাতাল থেকে প্রত্যাখ্যাত হলেন। ভদ্রমহিলাকে স্টাইলেশন করা হয়েছিল ২৯।৫।৬৬ তারিখে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আমাদের নিকটে আছে।

চিকিৎসকের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার আরও বহু উদাহরণ আমরা ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনে দিয়েছি। এটা সম্ভব যে, চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হতে পারে এবং অনেকক্ষেত্রে তার পরিণতিও গুরুতর হয়। কিন্তু এটা সে ধরণের কেস নয়, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য একথাই প্রমাণ করে যে, এটি একটি চরম দায়িত্বহীনতার নিদর্শন। দায়িত্বহীনতার সঙ্গে সম্ভবত অজ্ঞানতাও এই ক্ষেত্রে রয়েছে। আমরা জানতে চাই এই ভদ্রমহিলার অপারেশন-বিভ্রাটের ব্যাপারে যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কি না।

অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে (১)

১। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেলস্-ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টে (বিক্রয়কর বিভাগে) গ্রেড ওয়ান ও গ্রেড টু অফিসারদের মধ্যে যে গ্রেড প্রথা চলে আসছে, তাকে বিলোপ করে ৬-১১-৬৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এক আদেশ দিয়েছিলেন। বিগত যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য সে-আদেশনামা উপস্থাপিত করা হয় নি কেন?

২। জ্যোতি বসুর সেই আদেশকে অমান্য করে রাজ্যপালের প্রশাসনে তেইশ জন গ্রেড টু অফিসারের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাও নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে তাড়াহুড়ো করে। অনেকে মনে করেন এর পেছনে অর্থদপ্তরের একজন বড় কর্তা ও বিক্রয়কর বিভাগের একজন পদস্থ আমলার চক্রান্ত আছে। অনেকগুলি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে কিছু জানেন কি?

৩। শুধু অফিসার নয়, সেলস্‌ট্যাক্স ইন্সপেক্টরদের প্রায় ২৫ জনের যে প্রমোশন নির্বাচনের মাত্র ৪।৫ দিন আগে হয়, তাও যে এই চক্রান্তের একটা অংশ এ খবরও অনেক কাগজে বেরিয়েছে। এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী কোন অনুসন্ধান করেছেন কি?

৪। সাধারণত যখন কোন ডিরেক্টরেটের সর্বোচ্চ পদে একজন অফিসার তিন বছরের বেশি থাকেন না, তখন বিক্রয়কর বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার দীর্ঘ ছ'বছর রয়েছেন কী করে? বিশেষ করে তিনি যখন একজন আই-এ-এস নন। ঐ বিভাগের সর্বস্তরের কর্মচারীদের এ পদস্থ আমলার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে বিক্রয়কর অফিসে নানা রকম দুর্নীতির বাসা বেঁধে উঠেছে। কর্মচারীদের দাবিঃ ঐ বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে এখনই একটি তদন্ত কমিশন বসানো হোক। ঐ দপ্তর থেকেই বছরে প্রায় ষাট কোটি টাকা আদায় হয়। এবং এটাই এ রাজ্যের রাজস্ব আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস।

আশা করি, মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখবেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে (২)

ইতিপূর্বে আমরা বহুবার স্বাস্থ্যদপ্তরের এবং জনজীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত বিভিন্ন হাসপাতালের নানা দুর্নীতির কথা অক্লান্তভাবে প্রকাশ করে এসেছি। স্মরণ থাকতে পারে, বিগত সংখ্যায় কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতাল প্রসঙ্গে আমরা জনৈক স্বাস্থ্যদপ্তরের পদস্থ আমলার কথা উল্লেখ করেছিলাম, যিনি একসময়ে কার্যত স্বাস্থ্য-অধিকর্তা হয়ে বসেছিলেন এবং দুর্নীতির একচ্ছত্র সাম্রাজ্য চালিয়েছিলেন। যে-কোন কারণেই হোক এই ভদ্রলোক সম্প্রতি আবার পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন এবং মনে হচ্ছে তিনি পুরাতন প্রভুত্ব ফিরে পেতে চলেছেন। কল্যাণী হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে (বর্তমানে যাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যাঁর দুর্নীতির প্রমাণপত্র বর্তমানে ভিজিল্যান্স কমিশনের পরীক্ষাধীন) ইনি ও তাঁর পেটোয়া জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টর কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্ত করছেন তার পরিচয় বিগত সপ্তাহে দেওয়া হয়েছে। এবার তাঁর আর একটি দুর্নীতির উল্লেখ করছি।

গোবরা মানসিক হাসপাতালের জনৈক ক্লার্ক দুর্নীতি এবং অসদাচরণের অভিযোগে স্বাস্থ্য অধিকর্তা কর্তৃক অন্যত্র বদলি হন। কিন্তু তিনি তাঁর নতুন কর্মস্থলে যোগ না দিয়ে অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি নেন ৮ই মার্চ পর্যন্ত এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার একটি হাসপাতালের একটি আউটডোর টিকিট করিয়ে রাখেন। তাঁর জায়গায় যিনি নিযুক্ত হন, তিনি ৫ই মার্চ জয়েন করেন এবং যথাবিহিতভাবে জয়েনিং রিপোর্ট দেন। কিন্তু একদিন পরেই, অর্থাৎ ৭ই মার্চ তারিখে তিনি কাজে যোগ দিতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর জয়েনিং রিপোর্ট গৃহীত হয় নি। আমাদের উপরোক্ত ক্লার্কবাবুকে দেখা গেল যথাস্থানে বহালতবিয়তে কাজ করতে এবং তাঁকে পূর্বতন এই পদে পুনর্বহাল করেছেন উক্ত পদস্থ আমলা টেলিফোনে আদেশ দিয়ে।

এখন কথা হচ্ছে স্বাস্থ্য-অধিকর্তার দেওয়া আদেশ তাঁর অধস্তন জনৈক আমলা কিভাবে নাকচ করতে পারলেন? এই জোর তাঁর কিভাবে এল? দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে ছুটি নিয়েছে, সে কিভাবে ফিট সার্টিফিকেট না দেখিয়ে পুনরায় যোগদান করল? তৃতীয়ত, রাত না পোহাতেই যদি অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে কি এটাই বোঝায় না যে প্রকৃত মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটি মিথ্যা? কিন্তু জোর যে আছে, সে খুঁটির জোরে আছে—এ তো জানা কথা। উক্ত ক্লার্ক মহাশয়ের খুঁটি উক্ত পদস্থ আমলা। এখন প্রশ্ন, উক্ত পদস্থ আমলা মহাশয়ের খুঁটি কে, যার জোরে তিনি খোদ স্বাস্থ্য অধিকর্তার আদেশকে পদদলিত করতে পারেন? স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি।

আমরা জোরের সঙ্গেই বলতে চাই যে, স্বাস্থ্যদপ্তরে বিরাজিত ওই পদস্থ কর্মচারীটিকে সরিয়ে দিলেই চিকিৎসা জগতের দুর্নীতির অর্ধাংশ বিদূরিত হবে। এক্ষেত্রে আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কঠোর নীতি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করব। কোন চাপের নিকট তিনি যেন নতি স্বীকার না করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এম-ডি পরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব কাগজপত্র আমরা তাঁর নিকট পাঠিয়েছি, সেগুলির ভিত্তিতে যেন তিনি উক্ত পরীক্ষা-রীতির বিষয়ে একটি ব্যাপক তদন্ত করেন। এক্ষেত্রেও তাঁর ওপর বহু চাপ আসবে, বহু ডাক্তার হয়ত তাঁকে ঘেরাও করে বসবে, কিন্তু তিনি দৃঢ় থাকলে শেষ পর্যন্ত তাদের নকশালপন্থীদের মতই বিবরে আশ্রয় খুঁজতে হবে।

ভারত দর্শন

কেন্দ্রীয় কর্মীদের ওপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার

চ্যবন সাহেবের শক্ত হাত ক্রমেই নরম হচ্ছে। টাঙিয়ে-রাখা কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের কেসটি এতোকালে ফয়সালা হওয়ার পথ নিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ভি সি শুক্লার ঘোষণানুসারে শাস্তিপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা অতঃপর সরকারী ক্ষমা লাভ করতে যাচ্ছেন। শ্রীশুক্লা এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আশা প্রকাশ করেছেন যে, সরকারের এহেন উদার মনোভাবে সাড়া দিয়ে কর্মচারীরাও এবার নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে কাজ শুরু করবেন। ঘোষণায় বলা হয়েছে, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘটে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের আচরণ ক্ষমার্হ বিবেচিত হবে। যে সব অস্থায়ী কর্মচারীর অনুপস্থিতির দরুণ চাকরী খোওয়া গেছল তাঁরা ফিরে পাবেন তাঁদের পুরনো চাকরী। যাঁরা সাসপেন্ড হয়েছিলেন তাঁরাও যোগ দিতে পারবেন তাঁদের স্ব স্ব কাজে। কিছু কর্মচারী, যাঁদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাব, তাঁদের ক্ষেত্রে ঝুলন্ত মামলাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

ওপর ওপর শুনতে ভালই লাগে, এমন কি মনে আশা জাগতে থাকে, কেন্দ্রীয় সরকারও বুঝি হাওয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণ-দরদী হয়ে উঠছেন, শ্রমিক কর্মচারীদের মর্মবেদনা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। একটা পরিবর্তন অন্তঃসলিলা হয়েছে। কিন্তু ঘটনাদি বিশ্লেষণে কৈ বিমর্ষতা তো কাটল না। মনে হল, বাস্তবিকই কি সরকার এই ঘোষণার দ্বারা কোনও উদার-নৈতিক মনোভাব প্রকাশ করলেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশুক্লা অবশ্য তেমনিই দাবি করেছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অমন জলবৎ তরলম নয়।

এখনো সেই সমুদয় কর্মচারী গারদেই থাকছেন যাঁদের বিরুদ্ধে কোন রকম বল-প্রয়োগ, উত্তেজনা সৃজন ও প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ আছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আন্দোলনকারীরা জানেন, সব সময় অভিযোগের পেছনে যথার্থ সত্য থাকবেই এমন কোন দায়দায়িত্ব অভিযোগ উত্থাপকরা স্বীকার করে নিয়ে অভিযোগ আনেন না। অর্থাৎ বহু ক্ষেত্রেই অভিযোগের সত্যাসত্যে রীতিমত সন্দেহ থাকে। দ্বিতীয়ত সারা ভারত একটি কর্মী ধর্মঘট সফল হবে অথচ সর্বত্রই ব্যাপারটা থাকবে গঙ্গাজলে-ধোওয়া নিরামিষ শ্রাদ্ধবাসরের মতো এমনটা কল্পনাও করা যায় না। মারাত্মক না হক, দু-এক ক্ষেত্রে বসচাও হতে পারে, কেন না শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রমিক, ছাত্র স্বার্থবিরোধী ছাত্র, গণ স্বার্থবিরোধী মানুষজনের অভাব নেই। ধানি পটকা অনেক সময় বিপক্ষ দল থেকেও নিক্ষিপ্ত হয় সুস্থ আন্দোলনকে কলঙ্কিত করার জন্য। এই সব কারণেই আজ যাঁরা গারদে পচবেন তাঁদের মধ্যে কতজন প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাবান কর্মচারী, কতজনই বা গুন্ডা এই 'পাজল'-এর চুল-চেরা সমাধান কে করে দেবেন। যখন তা করা অসম্ভব তখন উদারনীতি সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যাঁরা কাজে পুনর্বহাল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন তাঁরাই বা কোন হাসিমুখে চেয়ারে ফিরে যেতে পারছেন। পাঁচ বছরের বন্ড তাঁদের ওপর নতন দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য সংগ্রামী মানুষও একই সঙ্গে জানেন এ সমস্তই কল্প আঁটুনি। কিন্তু এই সমুদয় চোখ-রাঙানী যে কর্মীদের মনোবল ভাঙচুর করে নি এমনও বলা যায় না। কর্মচারী দমনকারী নীতির শক্ত হাত মচকেছে কিন্তু ভাঙে নি।

কংগ্রেসী পতনের আর এক কারণ : মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি অবহেলা

প্রসঙ্গত একটি কথা আজ স্মরণ করা যেতে পারে যে, দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনের কালে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি নিদারুণ অবহেলা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। সরকারী কর্মচারীদের প্রতি কংগ্রেস সরকারের নিষ্ঠুর নীতি সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের ওপর নিষ্পেষণের আকারে নেমে আসছিল। কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা ঊর্ধ্বগতি মূল্যমানের সঙ্গে তবুও যতটুকু যুঝতে পেরেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিচিত্র রাজনীতির দরুণ রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা তা পারেন নি। ফলত যে রাজ্যের গণ-রাজনীতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রভাবে অনেকাংশে প্রভাবিত সে রাজ্যে কংগ্রেস প্রচণ্ডভাবে মার খেয়েছে। সংসদীয় রাজনীতিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে বাদ দিয়ে গদি রক্ষা করা খুব কঠিন ব্যাপার। নির্বাচনী তৎপরতা এবং সংগঠন প্রধানত এঁদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই শ্রেণীকে নিষ্পেষিত করে সংসদীয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে কেউ একাদিক্রমে লাঠি ঘুরিয়ে যাবেন এমনটা সম্ভব নয়।

ছাত্রদের ওপর পান থেকে চুণ খসলেই পুলিশী হাঙ্গামা, দেশব্যাপী মধ্যবিত্ত বেকার সৃষ্টি, শিক্ষক সাধারণের প্রতি অবিচার এবং অসংখ্য রাজ্য-কর্মচারীদের মধ্যে স্থায়ী অসন্তোষ সৃষ্টি কংগ্রেসকে বেকায়দা করেছে। জনসংযোগহীন এই দল যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও হাতে রাখতে পারতেন, তবে প্রচারদীন এই দলের অমন আকাশ থেকে পপাত ধরণীতলে চিৎপাত হয়ে পড়তে হত না। এ দলের না ছিল শ্রমিক কৃষিজীবীদের ওপর কোনও প্রভাব, না কাড়তে পেরেছিলেন এঁরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন। নির্বাচনের পর (পরে অস্বীকার করলেও) কোন কোন কংগ্রেস নেতার মুখ থেকে সরকারী আমলাদের কংগ্রেসবিরোধী তৎপরতার যে অভিযোগ শোনা গেছল বলে প্রকাশ, তার মধ্যে বাস্তব যুক্তির অভাব ততখানিই যতখানির সঙ্গে সরকারী আমলার ভূমিকা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষভাবে আমলারা নির্বাচনে কোন পক্ষাবলম্বন করেছেন এমন অপবাদ কেউ চাপাতে পারেন না। কিন্তু যেখানে যে কোন আমলা তাঁর কর্মক্ষেত্র নিরপেক্ষ স্বাধীন নাগরিক, সেখানে সে আমলা অবশ্যই তাঁর কংগ্রেসবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নিজস্ব মতামত সাধারণ্যে প্রচার করে এবং পরিচিত অপরিচিত জনসমাজে তাঁর বক্তব্য রেখে প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকালের বঞ্চনা সরকারী কর্মী ও সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজকে কংগ্রেসবিমুখ করে তুলেছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সমাজের প্রভাব মধ্যবিত্ত সমাজ তথা সমগ্র জনগণের ওপর বিস্তার লাভ করেছে কংগ্রেস মার খেয়েছে। সংসদীয় রাজনীতি করব অথচ সমাজের মস্তিষ্ক-

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য
অতি আধুনিক অবদান
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা, কলিকাতা

স্বরূপ মধ্যবিত্ত সমাজকে দারিদ্র্যের ও অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে বলি দেব এই পরস্পরবিরোধী রাজনীতি কংগ্রেসকে সেখানেই কোণঠাসা করবে যেখানে জনগণের ওপর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রভাব সর্বাধিক।

কেন্দ্রের ভ্রান্ত রাজনীতি এবং রাজ্য সরকারগুলির ন্যাসিকায় সর্ষপ তৈল মর্দনের বিচিত্র রাজসুখ-লালিত মসনদী জীবন এইভাবে আপন নীতির দ্বারা আপনার কবরের মাটি আপন হাতে কুপিয়েছে। এর দ্বারা একথা অবশ্যই বলা হচ্ছে না যে, কংগ্রেসী পতনের এটিই একমাত্র কারণ। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, মধ্যবিত্তবিমুখ নীতি কংগ্রেসী পতনের মূলে বেশ শক্তিশালী কারণরূপেই দেখা দিয়েছে।

এর জন্য দায়ী বৎসরান্তিক গরীবমারা সরকারী বাজেট, কেন্দ্রের নীতি এবং রাজ্যের আত্মতুষ্ট কেন্দ্রনির্ভর সরকার।

কোনও নন্দ সাহেবের সামগ্রিক ক্ষমতা চব্বিশটা এ্যাড হক সৃষ্টি করলেও এই অসন্তোষের কপোলে ঠাণ্ডা প্রলেপ সৃষ্টি করতে পারত না।

যতদিন সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলে একটি সুচিহ্নিত শ্রেণী বর্তমান এবং সংসদীয় গণতন্ত্র সজীব, ততকাল এই শ্রেণীকে বঞ্চিত করে মসনদ রক্ষার চিন্তা বাতুলতামাত্র।

কেন্দ্রের বজ্র আঁটুনি এতো কাণ্ডের পরেও শিথিল হচ্ছে না দেখে সন্দেহ হয়, মধ্যবিত্ত সমাজের বিরাট প্রভাব ও শক্তিকে কেন্দ্রীয় নেতারা আদপে গণনাই করেন না।

কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মেরে, সরকারী নীতির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অধিকতর বেকারী চাপিয়ে দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোটনির্ভর গদি টিকিয়ে রাখা কষ্টকর। সেইদিকে তাকিয়ে সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের প্রতি সরকারী নীতি প্রণয়নের সময় সাবধানে ভাবতে হবে।

সম্ভবত এই বিশেষ চরিত্রটি অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে সচেতন করেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি উন্নাসিক মনোভাব অনেক দল ত্যাগ করেছেন। দোলায়মান শ্রেণীরূপে সে সব দলের বিদ্রূপও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সহ্য করতে হয়েছে এককালে।

বস্তুতপক্ষে সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ যে শ্রেণী, তাকে উপেক্ষা করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিনির্ভর কোন দলই সফল হতে পারেন না।

সবসে বড়া রুপাইয়া

বিড়লা বাড়ি নিয়ে জোর বিতণ্ডা বেশ কিছুকাল সংসদকক্ষ আলোড়িত করে রেখেছে, যার বিস্তৃত সংবাদ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বিড়লা বাড়িকে উদ্ব্যস্ত করার জন্য কংগ্রেস সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর এমন সব গুহ্য তত্ত্ব ফাঁস করে দিয়েছেন, যার ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতব্যাপী বিড়লাজীর প্রতিপত্তি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে পরিপাক-অযোগ্য সংবাদটি উপস্থাপিত করে শ্রীমোহন ধারিয়া (কং)। তিনি বলেন: উচ্চপদস্থ অফিসাররা অবসর গ্রহণের পর মোটা টাকা মাইনের চাকরি পেয়েই যে শুধু বিড়লা বাড়ির অনুগ্রহপুষ্ট হচ্ছেন তাই নয়, শ্রীধারিয়া উল্লেখ করেছেন যে, ছয়জন বিভিন্ন রাজ্যের এ্যাডভোকেট জেনারেল সি বি আই'র পক্ষের সওয়াল করতে গররাজি হয়েছিলেন। কয়েকজন উল্টে বিড়লা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই অবতীর্ণ হন। শ্রীধারিয়ার মন্তব্য বিড়লা প্রতিষ্ঠান মোটা টাকা দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত যে সব অফিসরকে পুষছেন, সরকারী প্রসাদ বিতরণের অধিকারে থাকাকালীন তাঁরা তাহলে বিড়লা প্রতিষ্ঠানকে কী পরিমাণ সরকারী বদান্যতা প্রদর্শন করে এসেছেন তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

এ্যাডভোকেট জেনেরালদেরও প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান তাহলে কী পরিমাণ ব্যয় করে থাকেন, তাও বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর বলেন: এতদ্‌সত্ত্বেও মোরারজী দেশাই বলে থাকেন, সব ঠিক হ্যায়! ধারিয়া বলেন, এ পর্যন্ত অতি সামন্যাই জানা গেছে। যদি তদন্ত কমিশন বসে তবে ঢের গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়বে।

সি-পি-এম-এর শ্রী এ পি চ্যাটার্জী বলেছেন, অক্টোপাশের মতো বিড়লা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বাণিজ্য গ্রাস করেছে। সেই সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আকাশেও তার ছায়াপাত হচ্ছে। সি-পি-আই'এর দামোদরন আরও একটু অগ্রসর হয়ে অভিযোগ তুলেছেন: দেশে এখন দুটি সরকার। একটি প্রত্যক্ষ, অপরটি অদৃশ্য। অদৃশ্য সরকারের পরিচালক বিড়লা বাড়ি। উচ্চপদস্থ বেতনভোগী কর্মচারীরা সেই অদৃশ্য সরকারকে তুষ্ট করাই অধিকতর লাভজনক মনে করেন।

বিড়লা প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে যিনি উঠে দাঁড়ান তিনি হলেন কংগ্রেসের বি কে পি সিনহা। শ্রীসিনহার বক্তব্য, ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধান চালিয়ে কর্তব্যের অপব্যবহার করেছেন, কেন না ভারতের বিভিন্ন হাই কোর্টে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নাকচ হয়ে গেছে।

অন্যপক্ষে কংগ্রেস সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর সরকারকে তদন্ত কমিশন গঠন না-করার জন্যই কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন।

অবশ্য এই সব দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন উপপ্রধান তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই ও মন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলি আমেদ সাহেব। তাঁদের বক্তব্য, কমিশন আর কতটুকু করবেন সরকার ইতিমধ্যে করণীয় যা তা করেছেন।

কিন্তু চন্দ্রশেখর যে মারাত্মক প্রশ্ন তুলেছেন তা নিয়ে এখন বা ভবিষ্যতে কী করা হবে? চন্দ্রশেখর বলছেন, জনৈক অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি বিড়লা প্রতিষ্ঠানের আয়কর হিসাব করার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি সাড়ে বারো দশমিক ছয় কোটি টাকার আয়করে ছাড় দিয়ে কেসটা রফা করে নিয়েছিলেন মাত্র ছত্রিশ লক্ষ টাকায়। পুরস্কারস্বরূপ বর্তমানে তিনি বিড়লা প্রতিষ্ঠানে মোটা মাইনের চাকরি পেয়েছেন। অথচ এ-ব্যাপারটা সংসদের সামনে রাখাই হয় নি।

শ্রীদেশাই জবাবী ভাষণে বলেছেন, আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল অন্যরকম। স্পেসাল অফিসার একটা ১২·০৬ কোটি টাকার এস্টিমেট দিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু অনুসন্ধানের পর অঙ্কটি দাঁড়ায় ছয় দশমিক সাত কোটিতে, আর সে টাকা তো আদায়ও করা হয়েছে। এখন পুনরায় সেই কেস বিবেচনার জন্য টেনে আনা আইনত অসম্ভব।

কংগ্রেসের শ্রী এম পি ভার্গবও একটি তদন্ত কমিশন গঠনের পক্ষে। তিনি বলেন, সরকার এমন কতকগুলি লোককে অনুসন্ধানের কাজে লাগিয়েছেন ও লাগিয়ে রাখতে চাইছেন যাঁরা অভিযুক্ত পক্ষের অনুগ্রহ শিকারীরূপে নিজেরাই অভিযুক্ত। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কিছু না করলে ভবিষ্যৎ বংশধররা ক্ষমা করবেন না।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

"ন্যাশন্যাল ডিল্যুক্স"

১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

Music & Sound (B.W.C.—10)

Post Box 1576, Delhi—6.

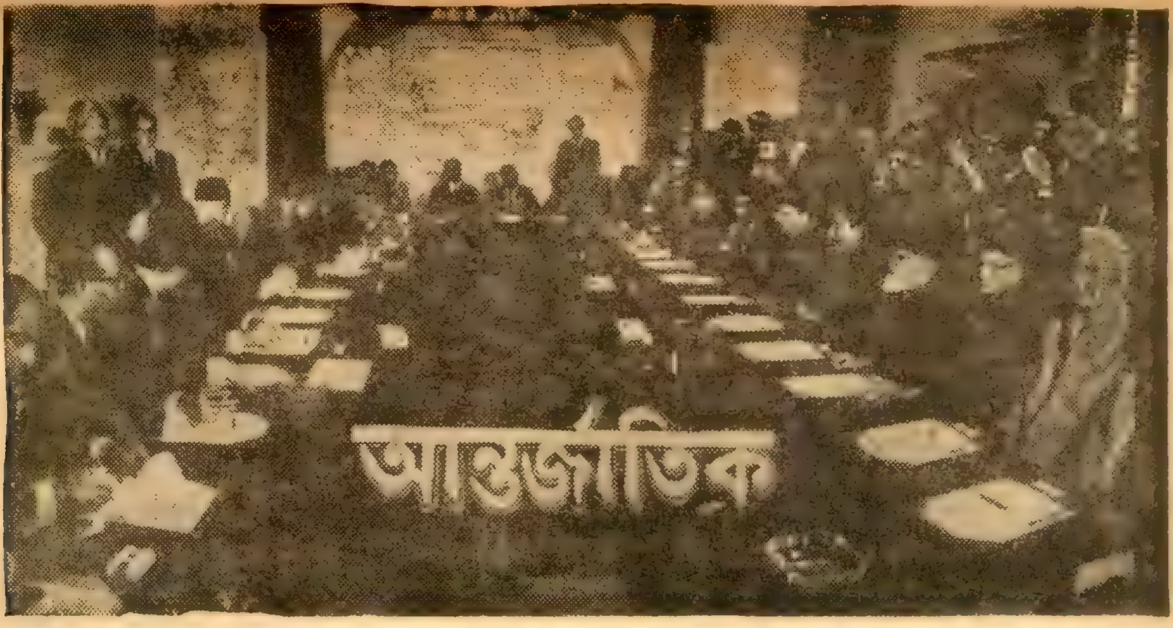

বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে আয়ুবের গোলটেবিল বৈঠক

পাকিস্তানঃ

শেষ পর্যন্ত আয়ুব খাঁ নতি স্বীকার করেছেন। বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে ১৩ই মার্চ আয়ুব খাঁ ঘোষণা করেছেন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। তবে ক্ষমতা বণ্টন সম্পর্কে বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে তার কোন নড়চড় হবে না। অন্যান্য দাবিগুলি সম্পর্কে আয়ুব খাঁ বলেছেন, পরে পারস্পরিক আলোচনার ভেতর দিয়ে সে-সবের মীমাংসা করতে হবে। নির্বাচনের পর গঠিত নতুন আইনসভাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এখন এই পর্যন্ত, এর বেশি নয়।

আয়ুবের ঘোষণায় গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত অধিকাংশ নেতাই সন্তুষ্ট হয়েছেন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং সংসদীয় গণতন্ত্র, এই দু'টিই তাঁদের কাছে প্রধান দাবি ছিল। এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ, ডেমোক্র্যাটিক মুভমেণ্ট নেতা মহম্মদ আলি, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লা খাঁ প্রভৃতি প্রকাশ্যে আয়ুবের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

কিন্তু খুশি হতে পারেন নি জাতীয় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান। আয়ুবের সঙ্গে আপোষের প্রতিবাদে তাঁর দল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাতন্ত্র্য বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সংসদে পাকিস্তানের উভয় অংশের প্রতিনিধিত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রথার বিলোপ—এই তিনটি প্রধান দাবিতে তিনি অটল রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, সব সমস্যার সমাধান একবারে এখনই করতে হবে—কিস্তিতে কিস্তিতে করা চলবে না। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাতন্ত্র্য চেয়েছে; পাকিস্তানের শতকরা ৬৮ জন অধিবাসী যে পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে তারা সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনতা স্বীকার করে কোন ব্যবস্থায় রাজী হবে না।

আসগর খাঁ

শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেছেন, তিনি তাঁর দাবি নিয়ে নতুন করে আন্দোলন শুরু করবেন—গোলটেবিল বৈঠকে গৃহীত আপোষ প্রস্তাব মানবেন না। ইতিমধ্যেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, এখন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রগতিশীল মানুষও পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের দাবি সমর্থন করে।

মুজিবর রহমানকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ। তারা আগেই নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করে দিয়েছিল, তাদের মূল দাবি না মেনে কোন আপোষ করা হলে ছাত্রসমাজ তা মানবে না। ঢাকায় ছাত্রদের এক বিরাট সমাবেশে শেখ মুজিবর রহমানের বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে তারা যে-কোন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত।

শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের

জুলফিকার আলি ভুট্টো

দেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যদি তাঁরা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে চান, তবে যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের দাবি মেনে নিন। তাঁরা পাকিস্তানের মধ্যেই থাকতে চান। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা যদি কিছুতেই তাঁদের দাবি না মানেন, তবে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন জোরদার হবে। কেউ আটকাতে পারবে না। সম্প্রতি পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এক পশ্চিমী সাংবাদিক আশংকা প্রকাশ করেছেন, পাকিস্তানের রাজনীতি যে পথে যাচ্ছে, অন্তত পূর্ব পাকিস্তানে শীঘ্রই ভিয়েতনাম বা বায়াফ্রার মত অবস্থার সৃষ্টি হবে।

ক্ষুব্ধ জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো ও মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানীও। ভুট্টো শেষ দিন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন নি। তাঁর দাবি ঃ এখনই আয়ুব খাঁকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে এবং একটি তদারকি জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। ভাসানী প্রথম থেকেই বৈঠক বর্জন করেছিলেন। তাঁর দাবি ঐস্লামিক সমাজতন্ত্র।

ভুট্টোর পিপলস পার্টি ও ভাসানীর জাতীয় আওয়ামী পার্টি একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভুট্টো ও ভাসানী দুজনেই চীনের অনুরাগী এবং ভারতের বিরোধী।

শেখ মুজিবর রহমান ভুট্টো-ভাসানী চক্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ হতে আহবান জানিয়েছেন। ঢাকায় ফিরে তিনি বলেছেন, ভাসানীর বয়স তো ৮৭ হল, এবার তিনি অবসর গ্রহণ করুন!

আয়ুব খাঁ অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিরোধী নেতাদের কিছু দাবি মেনে নিয়ে অন্য মূল দাবিগুলি নস্যাৎ করার চেষ্টায় আছেন। বিরোধী নেতাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর এই উদ্দেশ্য কিছুটা সফলও হয়েছে। অনেক নেতাই তাঁর আপোষ প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া আয়ুবের নিজস্ব দল

মৌলানা ভাসানী

ছাড়া বলতে গেলে দেশের বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী সবাই আয়ুবশাহী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের জন্য এগিয়েছিল। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠক শেষ হতে না হতেই শুরু হয়েছে নিজেদের মধ্যে বিবাদ।

জমিয়েতের পক্ষ থেকে করাচীতে কয়েক হাজার মানুষের এক মিছিল বের হয়েছিল। লাহোরে না কি বামপন্থীরা কোরাণ পুড়িয়েছে। তার প্রতিবাদেই তাদের বিক্ষোভ। জমিয়েতের নেতা আবদুল আলা মাউদুদ বলেছেন, পাকিস্তানে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকেদের স্থান নেই। যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে তাদের জিভ উপড়ে ফেলে দেবার জন্য মাউদুদ সাচ্চা মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রসমাজের অভিযোগ, কায়েমী স্বার্থের লোকেরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্যই দেশব্যাপী হিংসাত্মক কার্যকলাপে উসকানি দিচ্ছে। গত দশ দিনে হিংসাত্মক ঘটনায় ১৬৭ জন নিহত হয়েছে এবং দশ হাজারেরও বেশি বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা এবং গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবার মত বীভৎস ঘটনাও ঘটছে।

সব দেখে মনে হচ্ছে, গোলটেবিল বৈঠকের ফলে কোন মীমাংসা তো হলই না, বরং নতুন করে পাকিস্তানে গোলযোগ বৃদ্ধির আশংকা দেখা দিল।

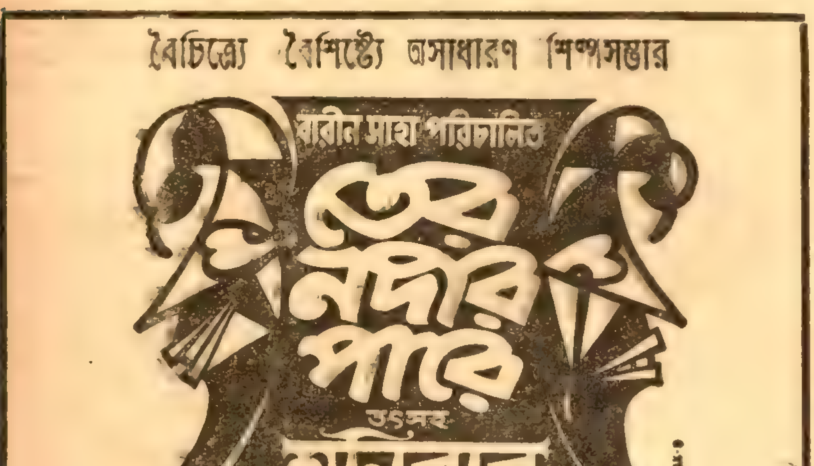

সোভিয়েট য়ুনিয়নঃ

আবার চীনা সৈন্য সোভিয়েট সীমান্ত ঘাঁটির ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছে। মস্কো বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ১৫ই মার্চ বহু চীনা সৈন্য আবার উসুরি নদীর মুখে দমনস্কি দ্বীপে ঢুকে সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীদের মারধর করেছে।

এবারের হামলার গুরুত্ব বিবেচনায় সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল গ্রেচকো তাঁর পাকিস্তান সফর অসমাপ্ত রেখে দ্রুত মস্কো ফিরে গিয়েছেন।

ক'দিন ধরেই অবশ্য চীনের ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির খবর পাওয়া যাচ্ছিল। চীন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে চার হাজার মাইল দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্তে চীন প্রায় ৫০ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করেছে। হংকং থেকে প্রাপ্ত ও লণ্ডনে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও স্বয়ং এই সীমান্তে সফর করে সৈন্য সমাবেশের তদারক করেছেন।

সিংকিয়াং প্রদেশে নিয়মিত সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবক মিলিয়ে ২৫ লক্ষ লোক সম্ভাব্য সোভিয়েট আক্রমণের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। সিংকিয়াং-এর মোট জনসংখ্যার অর্ধেককেই প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সিংকিয়াং বিপ্লবী কমিটির সহকারী সভাপতি সইফুদ্দিন বলেছেন, সোভিয়েট য়ুনিয়নের অনুচরেরা সিংকিয়াং-এ ঢুকে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে।

মস্কো রেডিওতে বলা হয়েছে, সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষ থেকে আক্রমণকারী চীনকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এখনও যদি তারা সংযত না হয়, তবে তাদের 'সমুচিত শিক্ষা' দেয়া হবে। সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রিকা 'ক্রাস্নাভাজভেজোয়া'-তে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, চীন-সোভিয়েট সীমান্তে সোভিয়েট য়ুনিয়ন দূরপাল্লার রকেট প্রস্তুত রেখেছে।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা' চীনের বিরুদ্ধে মন্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছে, সোভিয়েট য়ুনিয়নের নেতৃত্বে মে মাসে মস্কোতে যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে, তা বানচাল করাই চীনের এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। মজা হল, পিকিং থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপলস ডেইলি'ও এই একই কথা বলেছে। তার বক্তব্য ঃ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে চীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য সোভিয়েট য়ুনিয়ন চীনা ভূখণ্ডের চেনপাও দ্বীপ আক্রমণ করেছে এবং এখন সুকৌশলে চীনের ওপর এই আক্রমণের দায়িত্ব চাপাতে চাইছে।

ভিয়েতনামঃ

প্যারিসে শান্তি আলোচনা চলা সত্ত্বেও ভিয়েতনামে নতুন করে আবার সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দীর্ঘদিন বিরতির পর মার্কিন সেনাবাহিনী আবার উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য, উত্তর ভিয়েতনাম নতুন করে প্ররোচনামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করছে, তাই তাদেরও 'আত্মরক্ষার তাগিদে' বোমাবর্ষণ শুরু করতে হয়েছে। পালটা ব্যবস্থা হিসাবে ভিয়েতকং গেরিলাদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেয়েছে। খাস সায়গনে অনেকগুলি সংঘর্ষ হয়ে গেছে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন উচ্চ পর্যায়ে আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পেন্টাগনের কর্তারা বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁকে এই পরামর্শ দিচ্ছিল।

নতুন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব মেলভিন লেয়ার্ড এক সপ্তাহের জন্য ভিয়েতনামের যুদ্ধঘাঁটিগুলি স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। ৯ই মার্চ দানাং-এর মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে বসে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য মার্কিন বাজেটে আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হবে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্যই এই অর্থের প্রয়োজন।

মেলভিন লেয়ার্ড সায়গনে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নুয়েন ভান থিউ এবং উপরাষ্ট্রপতি নুয়েন কাও কি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

(১৬-৩-৬৯)

যা দেখেছি যা পেয়েছি

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

পুরাতন দিনের অনেক কথাই এবং অনেক ঘটনাই অবলুপ্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে থেকে যতটুকু ধরে রাখা যায় তাই হয়ে দাঁড়ায় সম্পদ।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস শান্তিনিকেতনের প্রথম-যুগের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্যে তিনি এসেছেন। উত্তরকালে তিনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তিনি ভারতের প্রধান বিচারপতি হন, এবং সেই পদ থেকে অবসর নেবার পরে বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদে বৃত হন।

সেই সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন এই গ্রন্থে। প্রাচীন বিক্রমপুরের ও সেই সূত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা যেমন লিপিবদ্ধ হয়েছে, তেমনিই আছে অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী এবং অনেক জ্ঞাত-অজ্ঞাত ব্যক্তির অনেক মনোজ্ঞ বিবরণ।

এই প্রথম খণ্ডে লেখকের কৈশোরকাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত কাহিনী মুদ্রিত হয়েছে।

অনেকগুলি চিত্র সম্বলিত। মূল্য ১৪·০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

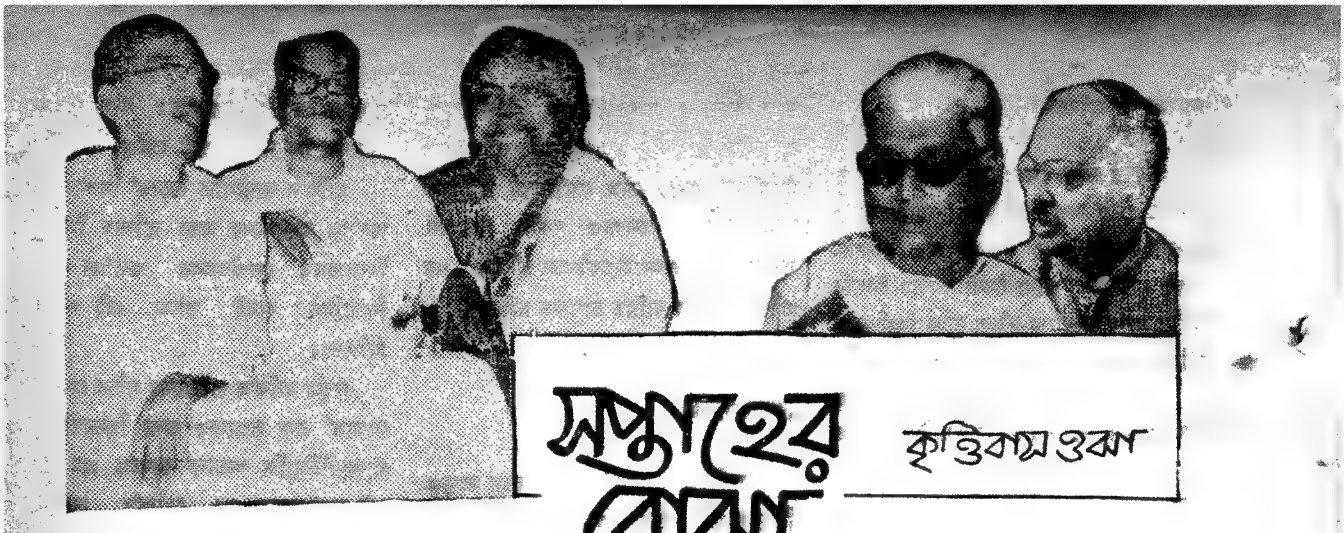

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

শাবক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

সমুদ্রতীরে গভীর জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন নবকুমার ললনাকণ্ঠের এই ধ্বনিতে চমকে উঠেছিল। কপালকুণ্ডলার সহায়তায় নবকুমার পথের সন্ধান পেল বটে, কিন্তু ততক্ষণে তার সহযাত্রীরা নবকুমারকে তীরে ফেলেই চলে গেছে। কারণ তারা ততক্ষণ ধরে নিয়েছে নবকুমার বাঘের পেটে চলে গেছে, কাজেই যঃ পলায়তি স জীবতি আপ্তবাক্য শরণ করে নবকুমারের সহযাত্রীরা তীর থেকে নৌকা খুলে জোয়ারের টানে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে। নবকুমারের সহযাত্রীরা কাঠ কাটবার সময়ও যেমন নিজেরা তীরে নামে নি—এগিয়ে দিয়েছে নবকুমারকে, আবার নবকুমারের জন্য একটু বেশি সময় অপেক্ষাও তারা করে নি—দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, নবকুমার বাঘের পেটে গেছে। আর নবকুমার কপালকুণ্ডলা বনবালার সহায়তায় পথ পেল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবনের পথ খুঁজতে গিয়ে পৌঁছে গেল কাপালিকের বধ্যভূমিতে। যাক এই পর্যন্তই আপাতত এসেছি, পরের কথা পরে হবে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এই একশত বৎসর আগে অমর সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারকে না হয় কপালকুণ্ডলা পথ দেখিয়েছিল, কিন্তু আজকের পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নবকুমারদের কে পথ দেখাবে? চারিদিকে শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল—বাঙালী চরিত্রের প্রতীক সহযাত্রীরা কেটে পড়েছে—সামনে কাপালিকের খড়্গ—অপরের জন্য কাঠ কাটার ব্রতে ব্রতী নবকুমার এখন কোথায় যাবে?

সাপ্তাহিক বসুমতীর নির্বাচনী সংখ্যায় "এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে"—লেখাটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নির্বাচনের পর অনেকেই যখন বলছেন—নির্বাচনে এমন ফল হবে একথা কারো জানা ছিল না, কেউ বুঝতে পারে নি—যা হয়ে গেল সে অতি অঘটন। আমি কিন্তু শুধু বলতে চাই সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকরা নিশ্চয়ই এটা বলবেন না। কারণ শুধু নির্বাচনী ফলাফল নয়—নির্বাচনের পরে কি হতে পারে তার আভাস পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে উক্ত লেখাটিতে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী পরাজয় হলে কংগ্রেস ভবনের ভিত নড়ে যাবে, আবার এ্যাড হকের কথা, নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা—সবই মাথাচাড়া দেবে তীব্র আকারে আর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিপর্যয় শুধু রাজ্য কংগ্রেসে নয়—দিল্লীতেও ভূমিকম্প সৃষ্টি করবে। কোন গল্পকথা নয়—ছাপার অক্ষরগুলি মিলিয়ে নিলেই চক্ষুর বিপদভঞ্জন হবে। যা হোক অতীতের কথা অতীত হোক—বর্তমানের কথায় আসা যাক। গত পক্ষকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের বিপর্যয়োত্তর পরিস্থিতি নিয়ে নানা গবেষণা চলছে—সকলেই পথ হাতড়াচ্ছেন কোন্ পথে গেলে আবার রাজ্য কংগ্রেসকে চাঙ্গা করা যায়। কারো মতে নেতৃত্ব বদল করে নতুনদের হাতে রাজ্য কংগ্রেস পরিচালনার ভার দিলেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস আবার টাট্টু ঘোড়ার মত সব চড়াই-উৎরাই-এর পথ অতিক্রম করে অভীষ্ট স্থানে পৌঁছে যাবে। কেউ বলছেন শুধু নেতৃত্ব বদল হলে হবে না, কংগ্রেস ভবনটা পর্যন্ত বদল করতে হবে, কারণ ঐ বাড়িটা কোন রাজনৈতিক দপ্তরের উপযোগী নয়। তাছাড়া ঐ বাড়িটা অপয়াও বটে, ঐ বাড়িতে আসবার পরেই কংগ্রেসের ভাঙন শুরু হয়েছে। অজয় মুখার্জীর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি ঐ বাড়ি থেকে—দুটো নির্বাচনে পরাজয় সেও ঐ বাড়ি থেকে—ঐ বাড়িতে অনেকের অভিশাপ জমা হয়েছে, অতএব ঐ অভিশপ্ত বাড়ি ত্যাগ করতে হবে। অপর একদল বলছেন—বোতল পরিবর্তনে মদের মান পরিবর্তন হবে না, বোতল ও মদ দুইয়েরই পরিবর্তন চাই। একদল বলছেন—যাই কর আর কর—নিয়মতন্ত্র-গঠনতন্ত্র মেনে কর—আপোষ-আলোচনার ভিত্তিতে কর। অপর দল বলছেন—ওরে বাবা, ও নিয়মতন্ত্র আর গঠনতন্ত্র মানেই হল গ্যাড়াকল, আপোষ-আলোচনা মানেই হল বস্তুবিশেষের এপিঠ-ওপিঠ—ও সবে হবে না—খোল নলচে সব বদল করতে হবে—মণ্ডল থেকে রাজ্য পর্যন্ত সব ঢেলে সাজাতে হবে—ঘুঘুর বাসা যেখানে আছে সব ভাঙতে হবে—সংস্কার নয়, চাই পরিবর্তন—ধামাচাপা দেওয়া নয়, চাই পূর্ণ নিরাময়।

দাবি উঠছে নেতৃত্বের পরিবর্তনের, কিন্তু নেতৃত্বের পরিবর্তন আর নেতার পরিবর্তন আজ সমার্থক হয়ে উঠেছে। নেতৃত্ব বলতে যা বোঝায়, সেখানে রামের জায়গায় রহিমকে বসানো মানে কি নেতার পরিবর্তন? এই প্রসঙ্গে অনেকে বলছেন নতুন রক্ত আমদানী করতে হবে। কিন্তু সেই নতুন রক্ত বীজাণুমুক্ত, না নতুন রক্তের নামে নতুন বীজাণু আমদানী করা হবে। নতুন রক্ত বা আমূল পরিবর্তনের নামে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের কি কংগ্রেস সংগঠনের আমূল পরিবর্তনের কোন কথা বলার এক্তিয়ার বা অধিকার আছে? এই পরিবর্তনকামীদের রাজনৈতিক জীবন কি যাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, তাঁদের চেয়ে কোন অংশে মালিন্যমুক্ত? রাজ্য কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ বলে যাঁরা ঝাণ্ডা উঁচু করেছেন, তাঁরা কি বেশির ভাগ কংগ্রেসের মঙ্গল কামনায় অস্থির হয়েছেন, না মন্ত্রিত্ব হারাবার যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন সেটা বোঝা গেছে। শ্রীঅতুল্য ঘোষের চেয়ে বেশিদিন যিনি কোন একটা অঞ্চলে গদি দখল করে আছেন, তিনি যদি আজ অপরকে গদি ছাড়বার জন্য বিদ্রোহ করেন—তবে সেই বিদ্রোহকে সংস্কারকামী বিদ্রোহ বলা হবে, না নতুন গদি দখলের জন্য

বিদ্রোহ বলা হবে। এইসব প্রশ্ন আজ নানাভাবে উঠেছে—উঠছে। এবং সব প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়—জবাবও সহজে পাওয়া যায় না। তবে গত কয়েকদিন কংগ্রেস ভবনের টালমাটাল দেখে কোনক্রমেই বোঝার উপায় নেই সমস্যার জট কোথায়? কোন্ জট খুলে কংগ্রেস নিজেকে নিরাময় করতে চায়। নির্বাচনে হেরে যাবার প্রশ্ন আলোচনার অবকাশ আছে, পরাজয়ের মূলে কারণ খোঁজবারও অধিকার আছে, কিন্তু শুধু পরাজয় হয়েছে বলেই কি এই আত্মানুসন্ধান? যদি কংগ্রেস কোনক্রমে জয়ী হতো অথবা রাজ্যে যদি যুক্তফ্রন্ট না হয়ে আলাদা আলাদা দলে লড়াই করে কংগ্রেসকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবার সুযোগ দিত, তখনও কি এইভাবে নেতৃত্ব বদলা অথবা নেতা বদলের প্রশ্ন উঠতো? ১৯৫২ সাল থেকে কংগ্রেস জয়ী হয়ে এসেছে বলে কোন তদন্তের বা কোন রোগ নিরাময়ের প্রশ্ন ওঠে নি। আর যেহেতু এবার হেরে গেছে—অমনি সব রোগ আবিষ্কারের উৎসাহ দেখা দিল, তবে কি রাজ্য কংগ্রেসের রোগ ১৯৬৯ সালেই দেখা দিয়েছে—আর ১৯৬৯ সালের রোগ ধরা পড়লেই সব নিরাময় হয়ে যাবে?

আচ্ছা, পশ্চিমবঙ্গে না হয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের অনেক দোষ, কিন্তু মাদ্রাজ—সেখানে শ্রীকামরাজ একটা ছাত্রের কাছে হারলো কেন, মাদ্রাজে কংগ্রেসের ভরাডুবি হল কেন? উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এমন কি কদিন আগে পন্ডিচেরী—সেখানে কি হল?

প্রশ্ন মনে আসে নির্বাচনের ফলাফলই কি একটি দলের উত্থান-পতনের মাপকাঠি হতে পারে? আর ফলাফল যদি মাপকাঠি হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ফল কি খুব খারাপ করেছে? ভোট পাওয়া আর আসন পাওয়া কি এক কথা? ১৯৫১ সালে বৃটিশ লেবার পার্টির সেক্রেটারী জেমস মিড্লটন সখেদে বলেছিলেন—বৃটেনের নির্বাচনের মত বড় জুয়া খেলা আর নেই—এই একই কথা কি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? আর পশ্চিমবঙ্গে যা হয়ে গেল, সেটা কি ভূভারতে প্রথম—যার জন্য এত তোলপাড়? আমরা তো পরিষদীয় গণতন্ত্র ধার করেছি বৃটিশদের কাছ থেকে, তাদের দেশে এই রকম পরিস্থিতিতে কি হয়—কখনও বিচার করা হয়েছে কি?

১৯০৬ সালে বৃটেনের কনজারভেটিভরা ভোট পেল ২৪,৬৩,৬০৮; কিন্তু আসন পেল ১৫৭টি। লেবার পার্টি ভোট পেল ৩১,১১,৯২৯; কিন্তু আসন পেল ৪৩০টি। ১৯৫১ সালে লেবার পার্টি ভোট পেল ১,৩৯,৪৮,৩৮৫, আসন পেল ২৯৫টি—আর কনজারভেটিভ ভোট পেল ১৩,৯২,৪৪,৪১৮, কিন্তু আসন পেল ৩২১টি। কাজেই ভোট পাওয়া আর আসন পাওয়া সব সময় এক হতে পারে না, এটা বৃটেনের নজীর। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় কি এই একই অবস্থা নয়? ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শতকরা ৩৮টি ভোট পেয়েছিল, কিন্তু আসন পেয়েছিল শতকরা ৬০টি। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভোট পেয়েছে প্রায় শতকরা ৪২টি, কিন্তু আসন পেয়েছে শতকরা ১৯টি। কাজেই এই যে ভোটের জুয়া—এই জুয়া দিয়ে কোন দলের নীতি নির্ধারণ হওয়া বা ভাগ্য নির্ধারণ হওয়া কি উচিত? আচ্ছা, পঃ বঃ কংগ্রেসের বিপর্যয় কি এই প্রথম? আর কখনও কি কংগ্রেস পরাজিত হয় নি? কখনও কি এমন বিপর্যয়ে পড়ে নি? যদি প্রশ্ন করি—১৯৩৬ সালে কি হয়েছিল, তখন কংগ্রেস মানে গান্ধীজী-নেহরু-সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস। ভারতে নয়, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে তখন কারা নেতা ছিলেন সেই কথা বলবার দরকার নেই—কিন্তু সেই ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস রাজ্যের নির্বাচনে ২৫০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫২টি আসন পেয়েছিল। শুধু পশ্চিমবাংলায় নয় তৎকালীন বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—সর্বত্রই প্রায় একই অবস্থা হয়েছিল। কই তখন তো এমন করে কংগ্রেসদপ্তরের ইঁট নিয়ে টানাটানি হয় নি। কারণ মূল প্রশ্ন হল—একটা দলের পরাজয় কোন ব্যক্তি বা কোন একটা কারণে হয় না—এটা যেমন সত্য, তেমনি নির্বাচনে জয়ী আসন-সংখ্যা দিয়েও জয়-পরাজয় বিচার করা হয় না। মূল কথা হল নীতির, মূল কথা কৌশলের—১৯৩৬ সালে সারা ভারতে কংগ্রেসের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী পরাজয়ই কংগ্রেসকে ১৯৩৮ সাল থেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বিপ্লবের পথে। নেতাজী এই বিপ্লবকে আরো ত্বরান্বিত করবার জন্য এবং গান্ধীজী-নেহরুজী প্রমুখ দিয়ে বিপ্লব হবে না বা তাঁরা বিপ্লব করবেন না জেনে দেশত্যাগ করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করলেন। আর গান্ধীজীকেও ১৯৪২ সালে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আওয়াজে আগস্ট বিপ্লব শুরু করতে হল। ১৯৩৬ সালের পরাজয় কংগ্রেসকে নীতি ও কৌশলের পরিবর্তন করতে পথ দেখাল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নীতি পথ কৌশলের কথা বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তি নিয়ে পড়ে আছেন। ব্যক্তির প্রশ্নও প্রয়োজন নেই তা নয়, কিন্তু একটি সজীব রাজনৈতিক দলে কোন একজন ব্যক্তি বা দুই চারজন ব্যক্তি সব নয়। নীতি যদি সজীব হয়, নীতি যদি সংগ্রামী হয়, তবে যাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তারা পিছিয়ে পড়বে—আঁস্তাকুড়ে চলে যাবে—নইলে নীতি বাদ দিয়ে ব্যক্তিকে সরাবার চেষ্টা করলে ফল বিপরীত হবে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস একজন শ্রীঅজয় মুখার্জীকে অতি হীনবল ভেবে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিল, কিন্তু একজন শ্রীঅজয় মুখার্জী কি ২১৮ জনে পরিণত হয় নি। তাই প্রশ্ন—ব্যক্তির নয়, প্রশ্ন নীতির। প্রশ্ন শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বা শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমতী পূরবী মুখার্জীকে নিয়ে নয়, প্রশ্ন এই ব্যক্তিগণ কোন নীতি নিয়ে চলবেন, কোন আদর্শ নিয়ে চলবেন। নীতি বা আদর্শের বিচার বিশ্লেষণ না করে ব্যক্তির বিচার করলে শ্রীঅতুল্য ঘোষ অথবা শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী বা শ্রীমতী আভা মাইতি ইতিহাসের বিচারে সবাই তো বার্ডস অফ দি সেম ফেদার। এই সব নেতৃবৃন্দ যদি একে অপরের বিচার করতে বসে, তবে সেটা বিচার হবে না—বিচারের প্রহসন হবে অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারের পথ হারাবার দৃশ্য হবে।

সপ্তম বর্ষ
প্রথম সংখ্যা

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

মাঘ—চৈত্র
১৩৭৫

সম্পাদক : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

লেখকসূচী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্র), সুকুমার সেন (রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসখা ও প্রমথনাথ চৌধুরী), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব), সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (তিন উর্বশী), শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (উপমা মধুসূদনস্য), রবিলোচন দে (বড়ু চণ্ডীদাসের দেশকাল ও বিদ্যাপতি), অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (প্রাচীন কোচবিহার: ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা), শীতাংশু মৈত্র (মনোমোহন ঘোষ স্মরণে); রাজ্যেশ্বর মিত্র (বিষ্ণুপুর ঘরানা ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), রামেশ্বর শ (পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ), রমা চৌধুরী (প্রতিমা দেবী ও রবীন্দ্রভারতী), উমা রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও অজিতকুমার ঘোষ (গ্রন্থসমালোচনা)।

চিত্রসূচী। রবীন্দ্রভারতীতে প্রতিমা ঠাকুর।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।
বার্ষিক চাঁদা চার টাকা (সাধারণ ডাকে) ও সাত টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকে)।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন; কলিকাতা—৭

শিল্প • বাণিজ্য • অর্থনীতি

কলকাতা ও মফস্বল

বিশ-পঁচিশ বছর আগে কলকাতা ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর। কলকাতার তুলনায় মফস্বলের শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় বরাবরই অনেক কম পড়ত। কিন্তু গত কিছুকাল যাবৎ এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আজকাল অধিকাংশ মফস্বল শহরের জীবনযাত্রার ব্যয় কলকাতার সমান সমান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বাজেটের সঙ্গে যে সমস্ত অর্থনৈতিক তথ্যাবলী পেশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে বর্ধমান, বসিরহাট, কৃষ্ণনগর এবং বহরমপুরে জীবনযাত্রার ব্যয় কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৬৭ সালে কলকাতায় জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক যখন ছিল ১৭৮ পয়েন্ট (১৯৫০=১০০), তখন বর্ধমানে ছিল ২৪২ পয়েন্ট, বসিরহাটে ২৭২, কৃষ্ণনগরে ১৯১ এবং বহরমপুরে ২০৭। জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের দ্রব্যের (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) মূল্যমানের ভিত্তিতে এই হিসাব প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই খুব গরীব। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পান—এমন লোকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। গরীব মানুষের আয়ের বৃহত্তর অংশ ব্যয় করতে হয় খাদ্যদ্রব্যে। তার অর্থ এই নয় যে, তারা খুব পেটুক বা ভোজনরসিক। প্রকৃতপক্ষে তাদের রোজগার এত কম যে, স্রেফ নুন-ভাত খেতেই তার রোজগারের প্রায় পুরোটা বেরিয়ে যায়। আর গরীব মানুষ যে রোজ কোর্মা কালিয়া কোপ্তা পোলাও খায় না, সে কথা বলাই বাহুল্য। ডাল-ভাত শাক-সব্জীই গরীবের নিত্য আহার। তার ভাগ্যে ওর বেশি আর কিছু বড় একটা জোটে না। একথা কারও অজানা নেই যে, কলকাতা শহরে চাল-ডাল- শাক-সব্জী উৎপন্ন হয় না। (কলকাতার অনেক লোকের ধারণা, ধানগাছের তক্তায় ভাল ভাল টেবিল চেয়ার তৈরি হয়।) এই দ্রব্যগুলো মফস্বলের সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে নানা যানবাহনে করে কলকাতার বাজারে আমদানী করতে হয়। কিন্তু মফস্বল শহরের অবস্থা ঠিক সে রকম নয়। মফস্বল শহর গ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। সুতরাং আশপাশের গ্রামাঞ্চলের কৃষিজাত পণ্য সেখানে অনেক সহজলভ্য হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, অনেকক্ষেত্রেই তেমনটা ঘটে না। কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কলকাতা এবং মফস্বল শহরগুলোয় মোটামুটি এক। কোন কোন শহরে কলকাতার চেয়ে বেশি এবং কোন কোন শহরে কলকাতার চেয়ে সামান্য কম।

গ্রাম-শহর একাকারের এই সংবাদ ধাঁধার মত শোনালেও, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত রূপান্তরের উপর যাঁরা নজর রেখেছেন, তাঁরাই জানেন, এটা কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়। গত ২০ বছরে ব্যাপক সড়ক নির্মাণের কার্যক্রমের ফলে কলকাতা মহানগরী তার অসংখ্য শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে একেবারে গ্রামের বাজারে গিয়ে হাজির হয়েছে। আগে গ্রামের উৎপন্ন পণ্যের ক্রেতা ছিল মুষ্টিমেয় স্থানীয় লোক। এখন তার ক্রেতা অধিকতর ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী কলকাতার সাহেবরা। শুধু কলকাতার নয়, সারা ভারতের বাবু ভায়ারা। যানবাহনের অসাধারণ উন্নতির ফলে গ্রাম থেকে কলকাতায় এবং কলকাতা থেকে বোম্বাইতে মাল পাঠাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার সময় লাগে। আগে ধান-চাল পাট-তামাক জাতীয় কৃষিজ পণ্যে পুঁজিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইদানীং গ্রামাঞ্চলের সকল পণ্যেই পুঁজিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাক-সব্জী, তরি-তরকারী মাছ-দুধ-ডিম সবই এখন বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এসব ব্যবসায় এখন প্রচুর মূলধন লগ্নী করা হয়েছে। সারা ভারতের চাহিদার ভিত্তিতে এইসব জিনিস ক্রয়-বিক্রয় এবং আমদানী-রপ্তানী হয়ে থাকে। ফাল্গুনের গোড়ায় নদীয়ার গ্রামে যে কৃষকের ক্ষেত্রে দশ কিলো পটল উৎপন্ন হয়েছে, তিনি জানেন যে, সেই পটল কলকাতায় ৬।৮ টাকা কিলো দরে বিক্রি হবে। অথচ স্থানীয় বাজারে অত দাম দিয়ে পটল কিনে খাবার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় কলকাতার ফড়ের কাছেই যে মালটা বেচে দেওয়া তাঁর পক্ষে লাভজনক, সেকথা বলাই বাহুল্য। স্থানীয় লোককে পটল খেতে হলে কলকাতার বাজার দরেই তাকে পটল কিনতে হবে। আগে পচনশীল কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বেশি হলে সস্তা দরে তাড়াতাড়ি বেচে দেওয়া ছাড়া কৃষকের গত্যন্তর ছিল না। এখন শহরের পুঁজিপতিরা বিভিন্ন এলাকায় ঠাণ্ডা গুদাম খুলে সেগুলো ধরে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। কাজেই শহর এবং গ্রামে কৃষিজাত পণ্যের মূল্যে বিশেষ তারতম্য ঘটবার কোন অবকাশই থাকছে না। বরং যে সমস্ত কৃষিজ পণ্য ভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানী করতে হয়, সেই সব পণ্যের দাম কলকাতার চেয়ে মফস্বলে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ঐ ধরণের অধিকাংশ জিনিস আগে কলকাতায় আসে (পাইকারদের কাছে) এবং কলকাতা থেকে মফস্বলের খুচরো ব্যবসায়ীরা সেগুলো কিনে নিয়ে যান।

খাদ্যদ্রব্যের পর আসছে বাসস্থানের প্রশ্ন। উদ্বাস্তু আগমন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহর সর্বত্রই লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই অতিরিক্ত লোক-

বসুমতীর সাহিত্য প্রচার

সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী

(চার খণ্ডে সমাপ্ত)

১ম ভাগ : হুতোম প্যাঁচার নক্সা : : আলালের ঘরের দুলাল : : ভ্রান্তি-বিলাস

মূল্য : চার টাকা

২য় ভাগ : বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ : : শকুন্তলা : : বেতাল পঞ্চ-বিংশতি : : বাসবদত্তা : : কাদম্বরী : : পারিজাতবিকাশ

মূল্য : চার টাকা

৩য় ভাগ : ধর্মপাল : : ময়ূখ : : পাষাণের কথা

মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

৪র্থ ভাগ : স্তবক (দশটি কাহিনী) : রসির ডায়েরী (ছয়টি কাহিনী)

মূল্য : তিন টাকা

॥ সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলীর লেখকবৃন্দ ॥

হুতোম প্যাঁচা। টেকচাঁদ ঠাকুর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তারাশঙ্কর কবিরত্ন। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঞ্চনমালা দেবী।

ঘরে ঘরে রাখবার মত
বাঙলার অমূল্য সম্পদ

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলি-১২

কাকতাড়ানি মা

মনোরঞ্জন হাজরা

তুমি কি আমার সেই বাংলাদেশ—
যে তুমি তেরশো পঞ্চাশে
হন্যে হয়ে খুঁজেছিলে নর্দমায় ফ্যান
যে তুমি কাটিয়ে এলে দীর্ঘদিন
চালের লাইনে
আর খড়কে-ঝাড়া খয়রাতির উৎস খুঁজে খুঁজে
তুমি কি আমার সেই বাংলাদেশ—
যার গ্রামে ও গঞ্জে
নিভে গেল কামারের জ্বলন্ত হাপর
কুমোরের স্বপ্নভঙ্গ শুন্য সংক্রান্তির
তাঁতী-বৌ শূন্য পেটে ভাত দিলে
মহাজনী সুতোর বাণ্ডিলে—
আহা, লজ্জাবতী লজ্জা পেল কৌরব শাসনে।
এরই পাশে মজা নদী ছেঁড়া জালে গৌরবে নিশ্চিন্ত,
ঘুমুলো ঘরের দাওয়ায়
জেলেনীর অভুক্ত সন্তান
কে জানে সে ঘুম তার শেষ ঘুম কি না।
গ্রামগুলো উঠে গেল উত্তমর্ণ ঘরে
খিড়কি দিয়ে পলাতক শস্যভরা জমি
যাযাবর বলরাম পৃথিবীর পথে
বার বার ফিরে দ্যাখে,
ফিরে দ্যাখে দুর্নিবার টানে—
অদৃশ্য চুম্বক তার লাঙলের ফলা!
নগর সীমান্ত তোমার কলংকে আবিল
যন্ত্রের যন্ত্রণা আঁকে বলীরেখা মুখে
তাই ওরা নতশির ধুক্ ধুক্ প্রাণের জোনাকি
ভিতরে কাঠামো যেন উইধরা চালের বাখারি।
আধুনিক দাস ওরা শিল্প নগরীর।

তুমি কি আমার সেই বাংলাদেশ
যে তুমি আমার চিরদিনের কাকতাড়ানি মা!
তোমার বুকের মাঝে দিনপঞ্জী লেখা
ছত্রে ছত্রে দণ্ডবিধি, উদ্ধৃত প্রয়োগ
একশো চুয়াল্লিশ কত, কত না কারফিউ
পবিত্র ভারতরক্ষা, নিরাপত্তা শংকা!
জানি নাকো নিরাপত্তা কার প্রয়োজন—
শুধু জানি জলঘোলা অজুহাত সর্বত্র উদ্যত।
তোমার কোলের ছেলে মূর্ছিত লাঠিতে
চারিদিকে বুলেটের বসন্ত-প্রকোপ
দুশ্চর তপস্যামগ্ন অহিংসার বিড়ালতপস্বী
যুক্তগঙ্গা আনে।
শ্বাসরোধী কাঁদানে গ্যাসের বিষ
বাতাস দুর্লভ।
তবুও প্রত্যহ গান-ঘরের চৌকাঠে
বিহ্বল খোলস ছেড়ে নবীনা বৈষ্ণবী
হাতে তার ডলারের খঞ্জনী প্রলাপ—
পীনোন্নতা, জেনেসে যায় প্রত্যুষেই
প্রজাপতি চিতা।

হঠাৎ কি হল কোথা, গভীর বিস্ময়।
মাটি ফুঁড়ে পাতালের অন্ধকার কালো
অশান্ত সূর্যের পানে মেলে দিলে হাত।
নতুন আলোয় ভোর দুরন্ত সকাল
দিগন্তের রামধনু নেমে এল ঘাসের শিশিরে।
অভিযাত্রী রাজপথে কোলাহল করে
আজ হবে অভিষেক তোমার ছেলের
এমন মুহূর্তে আমি ভুলি নি তোমার
তুমি আমার চিরদিনের সেই কাকতাড়ানি মা।

সংখ্যার বসবাসের জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয় নি। কলকাতা এবং তার আশ-পাশে সি-আই-টি এবং বাংলা গভর্নমেন্ট কিছু ফ্ল্যাট তৈরি করেছেন বটে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই নগণ্য। আর মফস্বল শহরগুলোয় সরকারী উদ্যোগে কোন গৃহই নির্মিত হয় নি। অপর দিকে মফস্বল এলাকায় সরকারের তরফ থেকে বহু নতুন নতুন অফিস খোলা হয়েছে। সামান্য দু-চারখানা খালি বাড়ি-ঘর যা ছিল, তা সরকারী অফিসে পরিণত হয়েছে। স্বভাবতই বাড়তি লোকের বাসোপযোগী ঘর-বাড়ির একান্ত অভাব। তাই বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারেও মফস্বলের অনেক শহর কলকাতাকে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ প্রচলিত অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেশি থাকলে মূল্যমান ফেঁপে উঠতে বাধ্য।

তৃতীয়ত শিল্পজাত পণ্য। কলকারখানায় তৈরি জিনিস মফস্বলের লোকদের চিরকালই কলকাতার চেয়ে একটু বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়। কারণ আনা-নেওয়ার খরচটাও দামের সঙ্গে জুড়ে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবনযাত্রার ব্যয়ের দিক দিয়ে কলকাতা মফস্বল একাকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ গ্রামের অর্থনীতিও বৃহৎ লগ্নীকারকদের কব্জায় চলে গেছে। এতে গ্রামের উৎপাদকের আপাতত লাভই হয়েছে বেশি, কারণ সে তার পণ্য বৃহত্তর বাজারে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছে এবং তার ফলে উৎপাদকের বৈষয়িক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু এর ফলে বিব্রত হয়ে পড়েছেন মফস্বল শহরের নির্দিষ্ট আয়ের সাধারণ মানুষরা। সরকারী কর্মচারীরা কলকাতা বা আশপাশে নিযুক্ত থাকলে যেসব অতিরিক্ত ভাতা পান, মফস্বলে নিযুক্ত কর্মচারীরা সেই সব ভাতা থেকে বঞ্চিত। অথচ তাঁদের সংসার খরচ কলকাতার চেয়ে কম তো নয়-ই বরং অনেকক্ষেত্রে বেশি-ই মজুর আমলা শিক্ষক অধ্যাপক সকলের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

সমাজ-জীবনে এই গুরুতর পরিবর্তন কিন্তু সাধারণ মানুষের চেতনায় এখনও পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়ে নি। তাই বহু লোক এখনও এই ধারণা নিয়ে বসে আছেন যে, গ্রামে অথবা মফস্বল শহরে যারা বাস করে, তারা কলকাতার লোকের চেয়ে অনেক কম খরচে সংসার চালায়। বর্তমানে এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। পথ-ঘাট যানবাহন এবং বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের ফলে গ্রামাঞ্চলের একটা বড় অংশই শহরমুখী হয়ে উঠছে এবং মানুষ ও পণ্যের গতিও বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিপণ্যের চাহিদা এবং মূল্যবৃদ্ধির ফলে শহরের সম্পদের একটা মোটা অংশ গ্রামের ধনীদের হাতে গিয়ে পড়ছে। তাতে তাদের কাঁচামাল ধরে রাখার এবং নিজেদের মনের মত মূল্য আদায় করার অনেক সুবিধা হয়ে গেছে। লগ্নী এবং আমানতের লোভে ব্যাঙ্কগুলোও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে শাখা অফিস খুলছে এবং এইসব আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে গ্রাম-মফস্বলের চেহারাও পাল্টে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রের আকস্মিক সুদিন দেখে শহরের বড় বড় শিল্পপতিরাও স্বনামে-বেনামে বড় বড় ক্ষেত-খামার খুলে বসছেন। অর্থাৎ শহরের মত গ্রামেও পুঁজিবাদ বেশ দানা বেঁধে উঠছে। সেটা সমাজতন্ত্রের পথকে কতখানি মসৃণ করবে, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

—শ্রীসওদাগর

নির্বাচনের পরে

সাগর বিশ্বাস

বাস থেকে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই ভিড়টা চোখে পড়লো। ভিড় দেখে অপরিচিতদের হয়তো হঠাৎ মনে হতে পারে কোন এ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। কিন্তু যাঁরা নিত্যদিন এই পথে যাতায়াত করেন, তাঁরা জানেন এই রোগীর ভিড় প্রতিদিনের ব্যাপার। ডাঃ সাধন সেন এই অঞ্চলের জনপ্রিয় চিকিৎসক। চিকিৎসাকে শুধু পেশা হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন নি—এ তাঁর জীবনের একটি 'ছবি'। দুঃস্থ এবং দরিদ্র রোগীদের তিনি শুধু আশা-ভরসাই নন—তিনি তাঁদের অবলম্বন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি নবাগত নন। চিকিৎসার সাথে সাথেই তাঁর জীবনবাদী রাজনীতি চলেছে হাত ধরাধরি করে। মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনা করবার কালেই এসেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯৫২ সালে মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারীতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করবার দু' বছর পরে ১৯৫৪ সালে অশোকনগরে স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তখন থেকেই নানা প্রগতিশীল আন্দোলনের সামিল করেন নিজেকে। অশোকনগরের মানুষ জানে দৈনন্দিন জীবনের তাগিদে কৃষক, শ্রমিকের বাঁচার দাবিতে সকলপ্রকার আন্দোলনের পুরোভাগ যে ব্যক্তি বারবার এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি সাধন সেন। পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আন্দোলনে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাও সকলের মনে আছে। মেহনতী মানুষের বাঁচার লড়াই-এর নেতৃত্ব দিতে গেলে কারাগার কখনো এদেশের কাউকে ক্ষমা করে না। তাই ডাঃ সাধন সেনকেও জেলে যেতে হয়েছে বারবার। ১৯৬২-৬৩ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় বৎসরাধিক কাল তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছিলো। ১৯৬৭ সালে অশোকনগর কেন্দ্রে ত্রিকোণ লড়াইয়ের মধ্যেও বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি জয়লাভ করে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। এবারেও তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীর সংগে ভোটের ব্যবধান প্রায় চোদ্দ হাজার।

রাস্তা থেকেই ভিড়টা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। অসংখ্য অপেক্ষমাণ পান্ডুর মুখগুলির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিলো নিজেকে। তবু বিরক্ত না করলেই নয়। এমনি লক্ষ লক্ষ পান্ডুর মুখই ত' আজ তাদের বিবর্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের দিকে। দীর্ঘ বিশ বছরে যে না পাওয়ার বঞ্চনা পুঞ্জীভূত হয়েছে—তারই অবসানের আশায় তারা

শ্রীসাধন সেন

প্রহর গুণছে নীরবে। তাদের প্রতিনিধিদের কাছে তাই তাদের দাবি সীমাহীন। সেই দাবি প্রতিনিধিদের প্রাণে কেমন প্রতিধ্বনি তোলে তার সংগেও আজ তারা পরিচিত হতে চায়।

খবর পাঠালাম। অল্পক্ষণ পরেই উনি এলেন। প্রশান্ত চেহারার একটি মানুষ।

প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি ত' ডাক্তার। আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগ তথা চিকিৎসা-জগতের সংগে, সাধারণ মানুষের যোগাযোগ খুবই সীমিত। এর উন্নতির জন্য সরকারের আশু কোন্ কোন্ দিকে নজর দেওয়া দরকার বলে আপনার মনে হয়?

উত্তরে শ্রীসেন বললেন, স্বাস্থ্যবিভাগ জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে স্বাস্থ্য পরিষদ গঠন করার কথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। আমার মনে হয়, এই ব্যবস্থায় যোগাযোগের উন্নতি হবে। এ বিষয়ে সম্প্রতিকালে আই· এম· এ-ও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন হাসপাতাল এবং হেলথ-সেন্টারগুলি দুর্নীতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুর্নীতি বন্ধ করতে সরকারের কিভাবে, কোন্ দিক থেকে অগ্রসর হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

—বিভিন্ন হাসপাতালের দুর্নীতি দূর করতে হলে তিনটি কাজ করতে হবে : (১) চিকিৎসা বিভাগে যে কায়েমী স্বার্থের চক্র গড়ে উঠেছে, তাকে ভাঙতে হবে; (২) কৃতী চিকিৎসকদের উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে, চিকিৎসক ও নার্সদের অভিযোগগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের অভিজ্ঞতার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে (৩) স্বাস্থ্য পরিষদ ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

—ডিপ্লোমাহীন প্রাক্টিশনারদের একসময় রেজিস্ট্রেশন দেবার কথা উঠেছিলো, এটা কি উচিত বলে আপনার মনে হয়?

—ডিপ্লোমাহীন প্রাক্টিশনারদের কয়েক বছর ট্রেনিং দিয়ে হেল্থ এ্যাসিস্ট্যান্ট তৈরি করা উচিত বলে মনে হয়।

—আপনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। বাম কমিউনিস্ট পার্টি বলছেন,- কেন্দ্রের সংগে রাজ্য সরকারের সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিৰ্জীব

(lifeless)? এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য শুনতে চাই।

—কেন্দ্রের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। ১৯৬৭ সালের বিধানসভায় আমাদের পার্টির এম-এল-এ'রা এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন। বিধানসভার বাইরের সংগ্রামেও আমাদের পার্টি প্রথম সারিতে রয়েছে। রাজ্যপাল ধরমবীরের নিয়োগের পরে প্রথম প্রতিবাদ মিছিলের উদ্যোগ আমাদের পার্টিই নিয়েছিলো। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বে-আইনীভাবে উচ্ছেদের পরে যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম হয়, তাতে আমাদের পার্টিই সবচেয়ে বেশি volunteers দিয়েছিলো একথা বাম কমিউনিস্ট পার্টি জানেন। বস্তুত আমাদের পার্টি কেন্দ্রের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

—পি-ডি-এফ সরকারের আমলে ময়দানে যেদিন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন, সেদিন বিশ্বনাথ মুখার্জী বলেছিলেন জেনে রাখো, আমরা আবার আসবো, সে কথা সত্য হয়েছে। আজ সরকারের কি সেই সব সংশ্লিষ্ট পুলিশ কিংবা পুলিশ অফিসারদের প্রতি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন?

—স্বেচ্ছাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ এবং অন্যান্য অফিসারদের সম্পর্কে অবশ্যই যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে তা' প্রতিশোধমূলক কোনো দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়, জনতার স্বার্থের দিকে তাকিয়েই তা' করতে হবে।

—ওয়াই· বি· চ্যবন বলেছেন যে, বাংলাদেশে বাম কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রন্টের অন্যান্য পার্টিকে গ্রাস করে ফেলবে। এ সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?

—স্পষ্টতঃই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ ধরণের উক্তি করেছেন। যে কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার প্রতি জনসমর্থনের ওপরে। সে জনসমর্থন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অন্য কোনো পার্টি তাকে গ্রাস করতে পারে না। যুক্তফ্রন্টের প্রত্যেকটি দলই নিজস্ব রাজনীতি এবং জনসমর্থনের ওপর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই গ্রাস করবার আশঙ্কা তাদের কারুর মধ্যেই নেই।

এরপর উঠলাম। বললাম, আপনার যথেষ্ট সময় নষ্ট করলাম।

—না না। এতো অধিকার আর কর্তব্যের আওতায় পড়লো। আমাদের প্রত্যেককেই কর্তব্য করতে হবে। আজ এই নিরঙ্কুশ কাজের কথার মধ্যে অকাজের কথার আর সময় হলো না। আবার বিধানসভা আছে। আসবেন আর একদিন বিনা কাজে।

বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার অপূর্ববাবুর সংগে যখন দেখা হলো তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। তখনো বিধানসভার অধিবেশন শেষ হয় নি। অপূর্বলাল মজুমদার। বাংলাদেশের একজন প্রথম সারির বক্তা। বাংলাদেশে ফরোয়ার্ড ব্লক বলতে যে কয়জন মানুষের নাম প্রথমে মনে পড়ে শ্রীমজুমদার তাঁদের অন্যতম। অথচ ফরোয়ার্ড ব্লকের কোনো নেতৃস্থানীয় পদাধিকারী তিনি নন। অসাধারণ বাগ্মিতা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির জোরে তিনি বহুবার বিধানসভায় বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করে বিতর্কের ঝড় তুলেছেন।

১৯২৫ সালে ফরিদপুর জেলায় শ্রীমজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। বরিশাল জেলাস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। বি-এ পাশ করেন পশ্চিমবাংলায় আসার পর—কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে। কলেজজীবনে বিভিন্ন ছাত্র-আন্দোলনে তিনি ছিলেন সামনের সারির মানুষ। বিশেষ করে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে তিনি সংগঠন গড়ে তুলে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় তপশীল ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি। ১৯৪৫ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় বোম্বাই-এ নিখিল ভারত তপশীল ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়—তিনি হন তার সহ-সভাপতি। দীর্ঘকাল তিনি বাংলাদেশের ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম-এ পাশ করেন। এবং পরের বৎসর আইন পাশ করেন। ১৯৫০ সাল থেকে হাওড়া জজ কোর্টে শ্রীমজুমদার একজন খ্যাতিমান এ্যাড্‌ভোকেট।

১৯৫০ সালে ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যপদ গ্রহণ করবার পর বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বহুবার তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছে। বেরুবাড়ি আন্দোলনের তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। আসামের বাঙালী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার ফলে দিল্লীতে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়।

১৯৫৭ সালে শ্রীমজুমদার সাঁকরাইল কেন্দ্রে কংগ্রেস এম-এল-এ'কে পরাজিত করে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। '৬২ সালের নির্বাচনেও তিনি জয়লাভ করেন পাঁচলা কেন্দ্র থেকে। তারপর '৬৭ সাল। উত্তর উলুবেড়িয়া এবং বাগদা দুটি কেন্দ্র থেকেই শ্রীমজুমদার বিপুল ভোটে জয়লাভ করছেন। বাগদার তদানীন্তন কংগ্রেস এম-এল-এ অধ্যাপক শশিভূষণ বিশ্বাসকে বিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন (শ্রীবিশ্বাস ১০,০০০ শ্রীমজুমদার ৩০,০০০)। এবার মধ্যবর্তী নির্বাচনেও তিনি বাগদা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর জয়লাভের সম্ভাবনার কথা আমরা প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষাতেই ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলাম—তেরো আর তেত্রিশের ব্যবধান সহজে লুপ্ত হতে পারে না (৩০।১।৬৯)।

১৯৬৪ সালে পূর্ববাংলার দাঙ্গার পর শ্রীমজুমদারকে দেখেছি এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটোছুটি করতে—সংখ্যালঘু বাঁচাও কমিটির তিনি তখন এক বিরাট স্তম্ভবিশেষ। তাঁর ওজস্বী আহ্বানে দেখেছি ট্রেনের চাকা বন্ধ হয়ে যেতে।

বর্তমানে শ্রীমজুমদার সারা বাংলা অগ্রগামী কৃষাণসভার সভাপতি, কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং নব-নির্বাচিত বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার।

জিজ্ঞেস করলাম, সংবাদপত্রে দেখেছিলাম, আপনি ডেপুটি স্পীকারের পদ গ্রহণ করতে অসম্মত ছিলেন। কারণস্বরূপ বলেছিলেন, আপনার নির্বাচকমণ্ডলী এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আপত্তির কারণ কি ছিলো?

—তাঁরা ভেবেছিলেন, এতে তাঁরা বিধানসভার একজন শক্তিশালী বক্তাকে হারাবেন। কিন্তু আমি যখন জানালাম যে আমি বিধানসভার বিতর্কেও অংশগ্রহণ করবো তখন আর তাঁরা আপত্তি জানান নি।

—যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে সংবিধান পরিবর্তনের প্রশ্ন রাখা হয়েছে। কিন্তু এটা কি আদৌ সম্ভব হবে?

—অনেক অসুবিধা আছে। কিন্তু কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাতে হবে। রাজ্যসরকার সংবিধান পরিবর্তন করতে

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

পারে না—কিন্তু তার পশ্চাৎপট তৈরি করতে ত' পারে।

—কেন্দ্র স্বভাবতই রাজ্য সরকারের দাবির প্রতি কর্ণপাত করতে চাইবে না। তখন আপনারা কি করবেন?

—জনতার সামনে তাহলে কেন্দ্রের মুখোশ খুব তাড়াতাড়ি খুলে যাবে। জনগণকে আমরা সর্বদাই সচেতন রাখবো, প্রয়োজন হলে কেন্দ্রের সংগে দাবি আদায়ের সংগ্রামে নামতে হবে। আমাদের হাতে যতটুকু ক্ষমতা থাকবে আমরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাই। আমরা রাজ্য বিধান পরিষদের অবলুপ্তির প্রস্তাব তুলেছি। এবং এটা করা সম্ভব—without amending the Constitution.

মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রশ্নে ফরোয়ার্ড ব্লক এবং বাম কমিউনিস্ট পার্টির মত-বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাম কমিউনিস্ট পার্টি সি-পি-আই'কে দোষারোপ করেছিলেন এই বলে যে, আসলে তাঁরাই (সি-পি-আই) ফরোয়ার্ড ব্লককে দিয়ে ওসব বলাচ্ছেন। একথা কতদূর সত্য?

—দেখুন, এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার।

—কিন্তু ঘরোয়া ব্যাপার সময়মত ঘরোয়া থাকে নি। মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেবার আগে সাংবাদিকদের কিছু বলা হবে না বলেও ত' অনেক কিছু বলা হয়েছে।

—হ্যাঁ, কোনো কোনো দল তা' হয়তো করেছেন। অনেকক্ষেত্রে বন্ধুদের মাধ্যমেও অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। সি-পি-এম-এর অভিযোগের উত্তরে একটা কথা স্পষ্ট বলা দরকার। ফরোয়ার্ড ব্লক রাজনৈতিক দল হিসাবে একটি স্বাধীন সত্তার অধিকারী। সে কারো নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে পারে না।

—কায়েমী স্বার্থের প্রতিকূলতার মধ্যে যুক্তফ্রন্টের 'ইমেজ' রক্ষা করতে পারবেন বলে কি আপনারা মনে করেন?

—কায়েমী স্বার্থ বিনা বাধায় আমাদের পথ প্রস্তুত করে দেবে না আমরা জানি। তবুও আমার মনে হয় আমরা সকল বাধাকে অতিক্রম করতে পারবো।

—বিভিন্ন স্থান থেকে ক্ষেত-মজুর এবং শ্রমিকের প্রতি জোতদার ও

অপূর্ব মজুমদার

মালিকদের দমনমূলক ক্রিয়াকলাপের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আপনার নির্বাচনী কেন্দ্রের জনৈক বাস্ কণ্ডাক্টরের (বাস রুট নং ৯, আড়ংঘাটা—কৃষ্ণনগর) অতি অবৈধভাবে চাকরি চলে গেছে বলে এইমাত্র খবর-পাওয়া গেলো। এই ধরণের দমনমূলক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?

—এর প্রতিকার শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের মাধ্যমেই করা সম্ভব। এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার সেই সংগঠনের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র ভূমি-সংস্কার আইনের পরিবর্তন এনে কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ করবার প্রচেষ্টা চালাবে।

দেখা হলো গোপাল ভট্টাচার্যের সংগে। পানিহাটি কেন্দ্র থেকে এবারের নির্বাচনে সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৩৪ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ম্যেট্রিক পাশ করেন। ছাত্র অবস্থাতেই জীবনে রাজনীতির সূত্রপাত হয়। ১৯৫৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করবার পর পার্টির বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। সংগঠন গড়ে তোলেন কৃষকসমাজের মধ্যে। শ্রীভট্টাচার্য ছিলেন খড়দহ থানার কৃষকসভার সহকারী সম্পাদক (১৯৫৪—১৯৫৭)। ১৯৬৫ সালে অনেকদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে। '৬৩ সালের খাদ্য-আন্দোলনের ফলে প্রথম কারাবাস হয়। নির্বাচনে বাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন ১৯৬৭ সালে এবং পঞ্চমুখী প্রতিযোগিতায় ১১ হাজার ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হন। এবছরে মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনিই সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী বিধানসভা সদস্য। বাম কমিউনিস্ট পার্টির তিনি সারাক্ষণের কর্মী। শ্রীভট্টাচার্যের বর্তমান বয়স ৩৫ বছর।

শ্রীভট্টাচার্যের সংগে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারি নি। তবুও স্বল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু কথা হলো তাতে বুঝলাম শ্রীভট্টাচার্য ইজমকে শুধু গ্রহণ করেন নি—ইজম তাঁর জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন্দ্র যদি খাদ্য সরবরাহে গাফিলতি করে, তাহলে কি বাংলাদেশে পাটের চাষ কমিয়ে দিয়ে ধানের ফসল বাড়ানো দরকার বলে আপনি মনে করেন?

—না, তা নয়। পাট বাংলাদেশের একটি জাতীয় সম্পদ বলা যায়। এর দ্বারা প্রচুর বিদেশী অর্থাগম হয়। অবশ্য কেন্দ্রের উচিত তার ন্যায়সংগত অংশ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া। তাছাড়া পাটের চাষ কম হলে আবার শিল্প সংকট এসে যাবে। ঘেরাও-এর প্রশ্নে শ্রীভট্টাচার্যের মত হলো 'ঘেরাও' একটা spontaneous movement. Working class-এর movement-এর সর্বোচ্চ form হলো 'continuous strike' দিয়েই শ্রমিক তাঁর দাবি-দাওয়ার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন করেছিলাম—যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে গ্রামীণ সম্পদের তুলনায় শহরের সম্পত্তি সম্পর্কিত বক্তব্য অস্পষ্ট বলে বিভিন্ন মহল মনে করছেন। এটা একটু স্পষ্ট করবেন?

প্রত্যুত্তরে তিনি একটু হেসে জানালেন, একসংগে সমস্ত অস্পষ্টতা দূরীভূত হতে পারে না। আজকের আসল সমস্যা ত' বাংলাদেশের দুই কোটি ভূমিহীন কৃষককে নিয়ে। একদিকে জোতদার এবং বেশি জমির মালিকেরা ক্ষুব্ধ। এই ক্ষুব্ধতার ক্ষেত্রে একই সংগে দিগন্তবিস্তৃত করে লাভ কি?

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি,

বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

মন্ত্রীরা কী বললেন

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আবাস রিপন স্ট্রীটে ক্রান্তি প্রেসের ছোট্ট একটি ঘরে। অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র-সজ্জন মানুষ হিসাবে ননীবাবুর খ্যাতি আছে। একটি অতি-সাধারণ তক্তপোশের ওপর বসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য দীর্ঘ সময় ধরে আমার বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন। তাঁর মুখে সামান্যতম বিরক্তি বা ক্লান্তির ছাপ ছিল না। এত সহজ ও সাধারণ জীবন যে মন্ত্রীদের হতে পারে—তা না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত। দীর্ঘ ২০ বছর মন্ত্রীদের 'ড্রয়িংরুম' দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। চাকর-বাকর, চাপরাসী, বেয়ারা এসব না হলে কি আর মন্ত্রীর বাড়ি মানায়? ননীবাবুর 'ড্রয়িংরুম' নেই। নেই কোনও আসবাব-পত্র বা বেয়ারা, চাপরাসী। সর্বসাকুল্যে ঐ একটি ঘরেই তিনি খুশি। জনগণের যদি কিছু মঙ্গল করতে পারেন—এই তাঁর একমাত্র কামনা।

কথা সুরু করলাম। ওঁর দপ্তরে কায়েমী স্বার্থ ও দুর্নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে কথা চলল বেশ কিছুক্ষণ। স্বাস্থ্যদপ্তরে দুর্নীতি অপরিসীম। ননীবাবু নিজেও মৃদু হেসে বললেন—"আমি তো দুর্নীতির মধ্যেই বসে আছি। যতদূর সম্ভব দুর্নীতি বন্ধ করতে চেষ্টা করে যাব।" কথাগুলির মধ্যে বলিষ্ঠতা আছে। তাঁকে যে দুর্নীতি দূর করতে হলে যথেষ্ট দৃঢ় হতে হবে—তার পূর্বাভাষ ফুটে উঠেছিল তাঁর ঐ কথাগুলির মধ্যে। বিগত ১০ই অক্টোবর আমাদের পত্রিকার বঙ্গদর্শন বিভাগে 'এদের চাবকানো হোক' শিরোনামায় সরকারী হাসপাতালে ভেজাল ওষুধ সরবরাহের চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রকাশ করা হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় কিছু কিছু অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার প্রয়োজন বোধ করছি।

"সম্প্রতি 'ভিজিলেন্স কমিশন' এ রকম (জাল ওষুধের) একটি বড় 'কেস' ধরে ফেলেছেন। কমিশন ৭ মাস আগে কোনও একটি সূত্র থেকে খবর পান যে, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরস্ থেকে সরকারী হাসপাতালগুলিতে ভেজাল এবং নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। বহু হাসপাতালের ডাক্তার ভেজাল ওষুধ দেওয়া হচ্ছে বুঝতে পেরে স্বাস্থ্যদপ্তরকে তা জানান। কিন্তু প্রাক্তন স্বাস্থ্য-অধিকর্তার আমলে কার্যত যে আমলাটি সর্বেসর্বা ছিলেন, যাঁর কীর্তির কথা লিখতে আমরা কোনও দিন ক্লান্ত হই নি, সেই আমলা মহোদয়ের কারসাজিতে ব্যাপারটি চাপা পড়ে যায়।

স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে উপরে উল্লিখিত ডাক্তাররা বিষয়টি 'ভিজিলেন্স কমিশনের' নিকট উপস্থিত করেন এবং কমিশন ঐ ব্যাপারে বিশেষ তদন্ত করে একটি দীর্ঘ রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, যারা হাজার হাজার রোগীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে—তাদের কঠোর সাজা হওয়া উচিত, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারদেরও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

'সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরস্' ওষুধ তৈরি করে না। বিভিন্ন কন্ট্রাকটরের কাছ থেকে টেণ্ডার আহ্বান করা হয় এবং সেখানে একটি বিশেষ কোম্পানী এই 'কন্ট্রাক্ট' পায়, এর পিছনে কার হাত আছে—সে কথাও 'ভিজিলেন্স কমিশন' উল্লেখ করেছেন।"

এই রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য-অধিকর্তা সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে ওষুধ নেওয়া বন্ধ করেন।

কিন্তু "এতে সংশ্লিষ্ট অফিসাররা, যাঁরা 'সুহৃদ ভাণ্ডারের' সভ্য হিসেবেই বেশি পরিচিত, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং যাতে উক্ত কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে পুনরায় ওষুধপত্র কেনা হয়—তার জন্য প্রাক্তন স্বাস্থ্য-অধিকর্তার আমলের কার্যত সর্বেসর্বা আমলাটির নেতৃত্বে বর্তমান অধিকর্তার ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। সেখানে সুবিধা করতে না পেরে বাঁকা পথে তাঁরা রাজ্যপালকে আশ্রয় করার চেষ্টা করেছেন।"

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট খুনীদের চাবকানো ছাড়া যে অন্য কোনও শাস্তিই যথার্থ নয়—একথা আমরা ঘোষণা করতে ছাড়ি নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এ-সম্পর্কিত কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হলে স্বাস্থ্য-দপ্তরে যে 'সুহৃদ ভাণ্ডারের' অদৃশ্য হস্ত সমস্ত অপকর্মের পিছনে কাজ করছে—তার খোঁজ অবশ্যই মিলবে। মন্ত্রীমহোদয় আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবেন এবং প্রয়োজনবোধে তদন্তের ব্যবস্থাও করবেন। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, স্বাস্থ্য-দপ্তরের কায়েমী স্বার্থ দূর করতে হলে এই বিষয়টি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন আছে। বিভাগীয় তদন্ত এ-ক্ষেত্রে কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ যে-সব আমলারা এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত; তাদের হাতে তদন্তের ভার দিয়ে কোনও মতে দায়িত্ব এড়ানো চলতে পারে—কিন্তু তাতে জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে পদদলিত হতে বাধ্য।

অর্থের জন্য "মানুষের জীবন নিয়ে যারা এভাবে ছিনিমিনি খেলতে পারে—তাদের নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে না কেন?"—এ প্রশ্ন আমরা অক্টোবর মাসেও রেখেছিলাম। যুক্তফ্রন্ট সরকার যেহেতু দুর্নীতি দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই রাজ্য-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—সেইহেতু জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধে আমরা মনে করি যে, যে-সব অফিসাররা নিছক অর্থের লোভে ঠাণ্ডা মাথায় এতগুলি রোগীকে ভেজাল ওষুধ খেতে বাধ্য করেছে এবং কারো কারো মৃত্যু ঘটিয়েছে—তাদের প্রতি সামান্যতম করুণা প্রদর্শন করাও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সমান।

নিরপেক্ষ তদন্তের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, শুধু তাই নয়—অবিলম্বে

এ-কাজটি হওয়া দরকার। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যকে সাক্ষাতের সময় আমরা বার বার এ-কথা বলেছি। আমরা এ-কথাও বলেছি যে, সরকারকে এ-বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে আমরা চেষ্টা করব।

গোবরা হাসপাতালের জনৈক করণিকের বিষয়, নদীয়া 'সি-এম-ও-এইচ্' অফিসের অন্য আর একজন করণিকের দুর্নীতি সম্পর্কিত বিষয়, কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের কেলেঙ্কারী, চব্বিশ পরগনার সি-এম-ও-এইচ-এর ব্যাপার, জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টরের অসাধুতা ও আত্মীয় পোষণের কথা (এসব বিষয়ে বহু তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ ইতিপূর্বে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে) প্রভৃতি বিভিন্ন দুর্নীতির তালিকা আমরা শ্রীভট্টাচার্যকে দিয়েছি। আমরা অতীতেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে, স্বাস্থ্য-দপ্তরের সমস্ত দুর্নীতির মূল হলেন স্বাস্থ্য অধিকারের (হেলথ ডিরেক্টরেট) জনৈক পদস্থ আমলা। নিরপেক্ষ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিত কীর্তিকর্মা চাটুকার, পরিপূর্ণ অসৎ ব্যক্তিটিকে (যিনি বর্তমানে প্রায়ই মন্ত্রীর ঘরে আনাগোনা করেন।) মন্ত্রীমহোদয় পরিহার করে চলুন—এই আমাদের অনুরোধ। যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা অনেক। সব না হলেও দুর্নীতি যদি কিছু পরিমাণে না কমানো যায়, তবে বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্টের প্রতি মানুষের যে আস্থা আজ আছে—তা থাকবে না—থাকতে পারে না। কাজেই দায়িত্বশীল পত্রিকা হিসাবে প্রতিটি দপ্তরের মন্ত্রীকেই প্রয়োজনবোধে আমরা বিভিন্ন সময়ে নানারকম খবর দিতে চেষ্টা করব এবং আশা করব, আমাদের দেওয়া সংবাদ যদি সত্য হয়—তবে তাঁরা অবশ্যই যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এ-প্রসঙ্গে এ-কথাটি বলা হয়ত অসংগত নয় যে, সাপ্তাহিক বসুমতী সম্ভবত একমাত্র সংবাদ-সাপ্তাহিক—যা বাংলাদেশের আরও পাঁচটা এই শ্রেণীর কাগজের ন্যায় মিথ্যার বেসাতী অতীতেও করে নি, এখনও করবে না। ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এ-কথার সত্যতা মেনে নেবেন বলেই আশা করি।

ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিভিন্ন কারণে (যার মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ অন্যতম) যে-সব কর্মচারীদের বদলী করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে অনেককেই পুরনো জায়গায় কাজ করতে দেখা যাচ্ছে কেন? —এর উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন, "নন্ গেজেটেড্ কর্মচারীদের বদলী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রেখেছি। গেজেটেড্ আমলাদের বদলীর আদেশও এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ আছে। ইচ্ছা সব কাগজপত্র দেখে এ-বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেব। নতুন নিয়োগও বন্ধ রেখেছি। ভাল করে দেখেশুনে না-নিয়ে এ-বিষয়ে এগুতে চাই না।"

এরপর স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি বন্ধের জন্য শ্রীভট্টাচার্য কী ভাবছেন—সেই কথা জিজ্ঞাসা করি।

উত্তরে শ্রীভট্টাচার্য বললেন, 'ডিরেক্টরেট ডিসেন্ট্রালাইজ' করার জন্য চেষ্টা করব। তাহলে অসাধু কাজকর্ম অনেক বন্ধ হবে আশা করছি। মাঝে মাঝে কর্মচারীদের বদলী করে, প্রয়োজনবোধে কঠোর শাস্তি দিয়ে দুর্নীতি রুখতে হবে। তাছাড়া আমাদের সকলকেই এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

স্বাস্থ্যদপ্তরের একজন ডেপুটি ডিরেক্টর প্রকৃতপক্ষে স্বজন পোষণের মূর্ত প্রতীক। কিছুদিন আগেও তিনি অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাঁর আত্মীয়ার চাকুরির ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর আপনজনরা সকলেই খুব ভাল 'পোস্টিং' পান। এদিকে শ্রীভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বললেন, "বিষয়টি অবশ্যই দেখব।"

রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় স্বাস্থ্যদপ্তরে কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত লোককে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। এবং এঁদের মধ্যে একজন ডেপুটি সেক্রেটারী পদেরও। এই ভদ্রলোক দপ্তরে এখন কী কাজ করছেন—শ্রীভট্টাচার্যের নিকট সে-কথা জিজ্ঞাসা করলাম। শ্রীভট্টাচার্য বললেন, "তিনি হেলথ সার্ভিসের ম্যানুয়াল রিভাইজ' করছেন। ম্যানুয়াল রিভাইজ করার কথা গতবার আমিই বলেছিলাম। ভদ্রলোক এখন ঐ কাজ করছেন—গতকাল তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তবে বিশেষ কোনও কাজের কথা হয় নি।" স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে জানছি—এই ডেপুটি সেক্রেটারী ভদ্রলোক ম্যানুয়াল রিভিশনের কাজে নিযুক্ত আছেন। দুই-একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। দীর্ঘকাল একটি বিশেষ ধাঁচে যাঁরা কর্ম ও চিন্তা করতে অভ্যস্ত, তাঁদের পক্ষে বর্তমান যুগের উপযুক্ত করে কোনও সার্ভিস ম্যানুয়াল তৈরি করা কি সম্ভব? প্রশ্ন উঠতে পারে, ম্যানুয়াল রিভিশনের কাজে অভিজ্ঞতার দরকার। আমরা সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, এই কাজের জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ডেকে না আনলেও চলত। এ কাজের জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব স্বাস্থ্যদপ্তরের আছে বলে মনে করি না। তাছাড়া যে-দেশে এত বেকার—সেখানে অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগ কি অন্যায় নয়?

নার্সিং সার্ভিসের জন্য দরখাস্তকারিণীদের প্রসঙ্গেও কথা হল। কিভাবে এই কাজে লোক নিয়োগ করা হয়—সে কথা জানতে চাইলে শ্রীভট্টাচার্য জানালেন, "১৯৬৭ সালে আমরা ঠিক করেছিলাম যে প্রতি বছরের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন লোককে দরখাস্ত আহবান করে বাছাই করে নেওয়া হবে। কোনও প্যানেল বা তালিকা রাখা হবে না। এবার এখনও এ সম্বন্ধে কাগজ-পত্র দেখে উঠতে পারি নি। '৬৭ সালের নিয়ম এখন মানা হয় কি না জানি না।" হাসপাতালের ডাক্তারদের ৮ ঘণ্টা কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ডাক্তাররাই সে-নিয়ম মেনে চলেন না। এ-বিষয়ে শ্রীভট্টাচার্যের অভিমত চাইলে, তিনি বললেন, "সেই নির্দেশ পরিবর্তিত হয়েছে দেখলাম। এখন ডাক্তারদের কাজের সময় কমে গেছে। এ-ব্যাপারে সবকিছু দেখতে হবে। এবং যতদিন না কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি—ততদিন বর্তমানের প্রচলিত নিয়ম, যাতে সকলে যথাযথ ভাবে পালন করেন তার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।"

সুপারনিউমারারি ডিউটিতে মহাকরণে অনেক বড় বড় ডাক্তার আছেন। এঁদের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়োগ করছেন না কেন?

সংবাদ-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য
কৃতিত্বের জন্য
সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে
এবার শ্রীগোপাল হালদারকে সম্বর্ধনা
জানানো হবে

বিচার ও আইনমন্ত্রী

শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল

শ্রীভট্টাচার্য ঃ গতবার এদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলাম। এবার এই বিষয় সম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্র চেয়ে পাঠিয়েছি।

মহাকরণের ডিস্পেনসারী একজন ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ভদ্রলোককে মহাকরণের বড় বড় কর্তাদের 'প্রেসার' মাপতেই সদা ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এর কিছু প্রতিকার করা সম্ভব কি?

শ্রীভট্টাচার্য ঃ মহাকরণের 'ইউনিট'টিকে শক্ত করতে হবে।

এর পর এম-ডি পরীক্ষা সম্পর্কে যে সব দুর্নীতির অভিযোগ আমাদের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে—সেদিকে শ্রীভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শ্রীভট্টাচার্য বললেন ঃ তিনি বিষয়টি দেখে উঠতে পারেন নি। এ-প্রসঙ্গে আমরা শ্রীভট্টাচার্যকে সমস্ত রকম কাগজপত্র দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।

বর্তমানে 'প্রমোশন' প্রভৃতি বিষয়ে সরকারকে উপদেশদানের জন্য যে 'অ্যাডভাইসারী কমিটি (একাডেমিক কাউন্সিল) আছে—তাতেও যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, সে-কথা শ্রীভট্টাচার্যকে জানালে তিনি বলেন, 'অ্যাডভাইসারী কমিটি' ভেঙে সাজার কথা আমি ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম এই কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি থাকলে মঙ্গল হবে। তখন একটা নীতিও ঠিক করা হয়েছিল। বর্তমানে এই কমিটির কাজকর্ম আমরা পরীক্ষা করে দেখছি। এই কমিটির কোনও সুপারিশই এখন কার্যকর করা হবে না। মনে হচ্ছে, হয়তো বা এর মধ্যে নানা স্বার্থ কাজ করছে।"

প্রঃ বিচার বিভাগের দুর্নীতি দূর করতে কি করবেন?

উঃ পুলিশ দ্বারা কখনও 'পাবলিক প্রসিকিউটরে'র কাজ করানো যায় না। এদের আইন সম্বন্ধেও কোনও জ্ঞান নেই। পাবলিক প্রসিকিউটরদের কাজ প্যানেলভুক্ত ব্যবহারজীবীদের দ্বারা করাতে চাই। ফৌজদারী বিচারালয়ের দুর্নীতি তাহলে অনেক কমবে—এ-কথা আমি পে-কমিশনের নিকটে বলেছি।

দেওয়ানী আদালতের দুর্নীতি দূর করতে হলে যাঁরা মামলা করেন—তাঁদের অনেক সংযত হতে হবে। সরকারী বিভাগের গাফিলাতি দূর করার জন্য আদালতের রেজিস্টারকে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে।

প্রঃ হাইকোর্টের 'অরিজিন্যাল সাইড' তুলে দিতে চাইছেন কেন?

উঃ (১) হাইকোর্টের এই বিভাগে কোনও কোর্ট ফি লাগে না—যার ফলে লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিচ্ছে। অন্যান্য আদালতে কোর্ট ফি লাগে। বড়লোকেরাই সাধারণত হাইকোর্টের এই বিশেষ সুযোগ লাভ করেন। কাজেই এটা বন্ধ করতে চাই।

(২) ব্যারিস্টার ও অ্যাডভোকেটদের মধ্যে তফাৎ কোনও মতেই থাকা উচিত নয় বলে মনে করি।

(৩) আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের স্নাতকগণ বিলেতে আইন ব্যবসায় যোগ দিতে পারেন না। কিন্তু বিলেতে পাশ করা লোক ওদেশে এবং এদেশে দুই দেশেই আইন ব্যবসায়ে যোগ দিতে পারেন। স্বদেশের মর্যাদা রক্ষার জন্যই এ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

প্রঃ বিচারের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কি করবেন?

উঃ 'অরিজিন্যাল সুট'-এর ব্যাপারে কিছু বিলম্ব হলেও আপীলের ক্ষেত্রে যাতে সত্বর বিচার হয়—তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

প্রঃ সরকারী উকিলরা সাধারণত যোগ্যতার দিক থেকে কিছু নিম্নমানের। এ-অবস্থার অবসান হওয়া উচিত নয় কি?

উঃ সমস্ত রকম খোঁজ খবর নিয়ে আমি যোগ্য ব্যক্তিদেরই এ-কাজে নিয়োগ করতে চাই। এবং তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

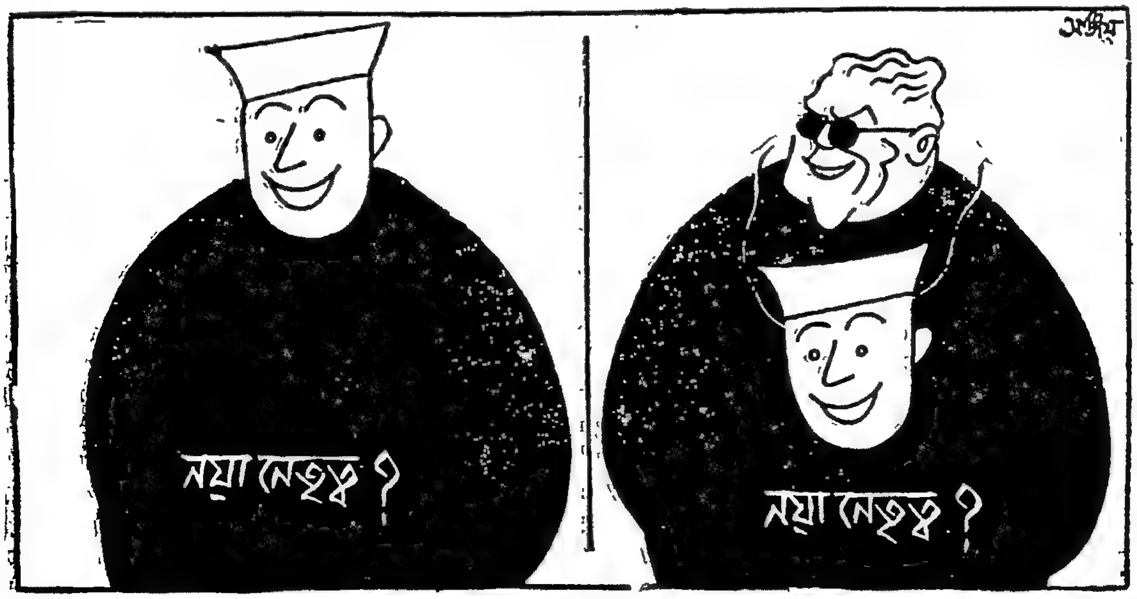

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রণ্টের ৩২-দফা কর্মসূচীর দ্বিতীয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম। এই দফাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার পরিবেশ রচনার ব্যবস্থা আছে। কর্মসূচীর এই দফাতে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত করার জন্য ট্রাইবুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে।

কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করবে। গত ২০ বৎসরের কংগ্রেস শাসনের আমলে এবং পি ডি এফ-কংগ্রেস শাসনের আমলে মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতির যে-সব অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে সে-সব সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করা হবে। যুক্তফ্রন্টের আমলে কোন মন্ত্রী বা পদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধেও যদি কোন অভিযোগ পাওয়া যায় সেগুলো সম্পর্কেও তদন্ত করা হবে। এই সম্পর্কে জনগণের কাছ থেকে যে-সব অভিযোগ পাওয়া যাবে সেগুলো সম্পর্কেও দৃষ্টি দেওয়া হবে।

এই দফার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রাজ্যের জনগণের মধ্যে নতুন উদ্যোগ সঞ্চার করতে হলে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে হবে। বর্তমান সমাজব্যবস্থার গলদের ফলে সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে। কর ফাঁকি দেওয়া থেকে শুরু করে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ, খাদ্যশস্যের চোরাকারবার, অফিসে চাকুরি দেওয়া, প্রমোশন ও বদলির ব্যাপারে দুর্নীতি, ঠিকাদারদের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ প্রভৃতির অজস্র অভিযোগ গত বিশ বছরে জমা হয়ে আছে। এই দুর্নীতি ধীরে ধীরে সর্বনিম্ন পর্যায়ে প্রসারিত হয়ে সমাজদেহকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

আজ মানুষের বদ্ধমূল ধারণা যে, স্বাভাবিক সহজ পথে কোন কাজ সম্পন্ন করা যায় না। ঠিকাদারীর জন্য টেন্ডার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তাব্যক্তিদের বরাদ্দের টাকা দিয়ে আসতে হয়—সরকারী দপ্তর থেকে টাকা আদায়ের জন্যও ভাগ দিতে হয় নিয়মিতভাবে। তার ফলে ঠিকাদারের তৈরি বাঁধে সিমেন্ট থাকে না। শুধু নজরানার দৌলতে বালির বাঁধ অনুমোদন পায়। বর্ষার সামান্য একটু ধাক্কাতেই সে বাঁধ ভাঙে।

পুলিশ বিভাগে দুর্নীতি উপকথার কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। থানায় সেলামী না দিয়ে রাজপথ দিয়ে লরী চলতে পারে না। পরীক্ষা পাশের ব্যাপারে দুর্নীতি, চাকুরিলাভের জন্য ঘুষ, বাসের পারমিটের জন্য ঘুষ, ঘুষ দিয়ে ভেজাল ওষুধ ও খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের অধিকার লাভ।

সমাজের উচ্চস্তরের দুর্নীতি এমনভাবে সর্বস্তরে প্রসারিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী মন্তব্য করেছেন যে, ২০ বছরের কংগ্রেস আমলে সর্বাপেক্ষা যে ক্ষতি হয়েছে তা হল জাতির নৈতিক মানের অবলুপ্তি।

প্রগতির পথে, অগ্রগতির পথে পদক্ষেপ করতে হলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

একথা সত্য, বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন না ঘটানো পর্যন্ত দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা যাবে না। অথচ জাতিকে বিশেষ করে যুবসমাজকে নতুন প্রেরণায় সঞ্জীবিত করতে হলে তাদের নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে।

বর্তমান সীমিত সুযোগের মধ্যেও অনেকখানি করা সম্ভব। যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে তাই এই দুর্নীতি দূর করার ব্যাপারে তদন্ত করার কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গত ২০ বছরে সংবাদপত্রের অনেক দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সব তথ্য অসম্পূর্ণ। সেই সব সংবাদের সাহায্যে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তিদান সম্ভব নয়।

দুর্নীতির যথোপযুক্ত তদন্ত হয় না—যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা অত্যন্ত প্রভাবশালী। ফলে যে অভিযোগ করে তাকেই নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। কংগ্রেস সরকারের আমলে ভিজিলেন্স কমিশন বসানো হয়েছে, কিন্তু ভিজিলেন্স কমিশনারের ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যে, তার পক্ষে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হয় নি। এমন কি অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিজিলেন্স কমিশনার যে-সব সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করতে হলে, নতুন কর্মপ্রেরণায় তাঁদের সঞ্জীবিত করতে হলে, নিচুতলা থেকে দুর্নীতির গ্লানিকে দূর করতে হলে প্রথমেই বেছে বেছে কয়েকটি রুই-কাৎলাকে পাকড়াও করা প্রয়োজন।

আয়কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে তদন্ত করার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের নেই, কিন্তু বিক্রয়কর ফাঁকি দেওয়ার আওতাভুক্ত বলে বিক্রয়কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার তদন্ত করাতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন বিশেষ শিল্পপতির বিরুদ্ধে তদন্তের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন। উক্ত শিল্পপতির বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলায় বিক্রয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ কয়েক বছর আগে সংবাদের জগতে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সে ব্যাপারে অনেক ফাইলপত্র হয়ত এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা সত্ত্বেও ফ্রন্ট সরকার এ-ব্যাপারে তদন্ত করালে আরও অনেক নতুন রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। এমন কি সরকারের পক্ষে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনার দরজাও মুক্ত হতে পারে।

১৯৬৭ সালে ক্ষমতায় এসে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরিবহনমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, ঐ বছর সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে প্রাইভেট বাসের পারমিট দেওয়ার ব্যাপারে অনেক কেলেঙ্কারীর খবর তাঁর নজরে এসেছে। কিন্তু তারপর যুক্তফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে তদন্ত করে কাউকেও দোষী সাব্যস্ত করার সুযোগ পান নি। এবার দ্রুত এই সম্পর্কে তাঁরা তদন্তের ব্যবস্থা করলে অতীতের গ্লানি থেকেই যে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে তাই নয়; ভবিষ্যতে রাজ্য-স্তরে এবং জেলা-স্তরে আর টি এ-র সব রকমের দুর্নীতির পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে।

তেমনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্পত্তি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাজ্যের কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে গত কয় বছর ধরে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে। এইগুলোর তদন্ত করলে ভবিষ্যতের রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে সব দপ্তরের বিশেষ করে উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন, পুলিশ, পূর্তবিভাগ, স্বাস্থ্যদপ্তর

প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন পদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করলে ভবিষ্যতে রাইটার্স বিল্ডিংসের চোরা-পথে কাটা পড়বে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রন্টের এই কর্মসূচীতে যুক্তফ্রন্টের আমলের ঘটনাকেও বাদ দেওয়া হয় নি। যুক্ত-ফ্রন্টের কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তাও তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তদন্তের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে জনসাধারণের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নির্ভয়ে মানুষ এসে যাতে সব রকমের দুর্নীতির অভিযোগ উপ-স্থাপিত করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হলে এবং সেইসব অভিযোগের ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মেসিনারি চালু করা হলে যুক্তফ্রন্ট তাঁদের কর্ম-সূচীর মর্যাদাই শুধু রাখবেন তা নয়—সমগ্র সমাজদেহে নতুন প্রাণবায়ুর সঞ্চারও তাঁদের পক্ষে করা সম্ভব হবে।

—শ্রীসর্বদর্শী

পাঠক মন

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে সাপ্তাহিক বসুমতী'র 'পাঠকমনে' 'রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে' অংশটুকু পাঠ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। মনে হলো যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা কত নামতে শুরু করেছি। ১৯৬২ সালের ৮ই মে তারিখে কবির বাসভবনে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়টি নবজন্ম লাভ করে। সেদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে বলা হয়, And a large part of man can never find its expression in the mere languages,—lines and colours, sounds and movement. It is the duty of every human being to master, at least to some extent, not only the language of intellect, but also that of personality which is the language of Art. It is a great world of reality for man—vast and profound—the growing world of his creative nature. This is the world of Art. এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'Its aims and objects were to provide for intensive study and research of the creative contributions that the versatile genius of the poet Rabindranath Tagore has made to the country and to humanity at large and also to provide facilities for such studies including research.' কিন্তু জন্মের অব্যবহিত পরে যদি সেই বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ দুর্নীতিমূলক একটি ফল প্রসব করেন, তাহলে সেই ফলকে ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ কি হাসিমুখে গ্রহণ করবেন? কবি রবীন্দ্র-নাথ ছিলেন সত্যের পূজারী, কিন্তু তাঁরই বাসভবনে তাঁরই নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যা-লয়ে যদি অসত্যের ও দুর্নীতির প্রভাব ঘটে, তাহলে পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কি মুখ বুজে সহ্য করবেন? প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হলো বিদ্যার্থী-দের জীবনকে 'আলোয় আলোকময় করে তোলা', বিদ্যায়তনের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্র আবদ্ধ, কিন্তু সেই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যদি একটি সুমহৎ প্রতিষ্ঠান এরূপ কলঙ্কজনক কাজ করে তাহলে এই বিষয়টি বিশেষভাবে লজ্জাজনক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি নন-ম্যাট্রিক ছাত্রীটিকে একাডেমিক-কোর্সে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমরা এই সুযোগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করব। কারণ কর্তৃপক্ষ যদি সুপরিচালিত ও সুদৃঢ় মনোভাবাপন্ন হন, তাহলে কোনদিনই এরূপ দুর্নীতি প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা নেই। দিনের পর দিন যদি ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সত্যের অপলাপ ঘটে, তাহলে ভারতবর্ষের শিক্ষার কাঠামো একে-বারে ভেঙে পড়বে এবং শিক্ষার কাঠামো ভেঙে পড়ার সুযোগ নিয়ে সকল অভি-ভাবকই তাঁদের সন্তানকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি না করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লেজ ধরে স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি করবেন—এতে একাধারে পয়সার অপ-ব্যয় ঘটবে না, অপরধারে সময়ের সংক্ষেপ সাধিত হবে, এমত অবস্থায় রবীন্দ্র-বাসভবনে, তাঁরই নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যা-লয় প্রাঙ্গণে এ-জাতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত সত্যের নামে অসত্যের অপলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য দেশের শিক্ষানু-রাগী ও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়,
গুসকরা, বর্ধমান

•

'আমার ইউরোপ ভ্রমণ' প্রসঙ্গে

'কঙ্কাবতী'র লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখো-পাধ্যায় একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক। কিন্তু সকলেই জানি আমরা, সর্বজন-শ্রদ্ধেয়রাও সময় সময় এমন কিছু লিখে থাকেন, যা শাশ্বত বা কালজয়ী হয় না। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত ত্রৈলোক্যনাথ-এর 'My Visit to Europe' ঠিক এই ধরণের একটি রচনা। দীর্ঘদিন আগে এ-রচনায় গুরুত্ব নিশ্চয়ই ছিল; কেন না ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিককার পাশ্চাত্ত্য সমাজের চিত্র স্থান পেয়েছিল এতে। কিন্তু আজকের দিনে এর গুরুত্ব কত-টুকু? এছাড়া অনুবাদ যেখানে প্রাণহীন ও আক্ষরিক সেখানে ত্রৈলোক্যনাথ-এর আসল রচনার মর্যাদা কতটুকু বজায় থাকছে? বাংলাদেশের ক'জন পাঠক আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগেকার লণ্ডনের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী? অনু-বাদক পরিমল গোস্বামী মহাশয়কে এবং সাপ্তাহিক বসুমতীর কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
কলকাতা—৫০

•

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল? প্রসঙ্গে

আমি একজন লোকসঙ্গীতের অনু-রাগী। যদিও বর্তমানে কলকাতায় থাকি তবুও অনেকেরই মতো—পূর্ব পাকিস্তানে পরিত্যক্ত গ্রামটিকে ভুলতে পারি না। লোক-সঙ্গীতকে সেই গ্রামটির সাথে আমার মানসিক যোগাযোগের অদৃশ্য যোগসূত্র হিসাবে আমি দেখি এবং ভালবাসি। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ শহরের অনুষ্ঠানে বিশেষত আকাশবাণীতে লোকসঙ্গীতের প্রোগ্রাম এই যোগসূত্রটিকে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। ভাবতাম, বাংলাদেশে আজ শিক্ষিত শ্রেণী কি এতোই গ্রাম-বিমুখ যে, এই এতবড় ভেজালের ব্যবসার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ তুলছেন না। এমন সময় আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় মুর-শিদের লেখা "লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?" এক আশার বাণী বহন করে আনল।

আকাশবাণীর জঞ্জাল পরিষ্কারেই তিনি মন দিয়েছেন বেশি এবং এটা ভাল কথাও বটে। কারণ সবচেয়ে নিত্য-নতুন লোক-গীতি গায়ক আকাশবাণী তৈরি করেছেন বা করছেন এবং সাপ্লাই করছেন; তার মধ্যে কয়েকটি যেমন খাঁটি গলা মাঝে মাঝে শুনতে পাই, তেমনি পাই তার চেয়ে অনেক বেশি ভেজাল।

গত সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীতে আকাশবাণীর মিউজিক তৈরির কার-খানাটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুরশিদ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

আশা করি, সাপ্তাহিক বসুমতীতে মুরশিদ একইভাবে বাংলাদেশে লোক-সঙ্গীত বিকৃতির বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবেন।

—শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত
কলকাতা—২৯

কথায় কথায়

নিষাদ মুনশী

পার্ক স্ট্রীট ও ওয়েলেসলির মোড়ে একটা বিশাল বাড়ি আছে—এই বাড়িটাই সম্ভবত কলকাতা শহরের ভূতুড়ে বাড়িগুলির মধ্যে সবচেয়ে উপদ্রুত। আমি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দপ্তরের বাড়িটার কথা বলছিলাম।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যতগুলি জগদ্দল পাথর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় জগদ্দল হচ্ছে এই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত অপদেবতাদের শিক্ষার ঘাড় থেকে যতদিন না নামাতে পারা যাবে ততদিনে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য হা হুতাশ করে কোন লাভ আছে বলে মনে হয় না।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আরম্ভ হতে আর মাত্র দিনকয়েক বাকি। পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই ক'দিন প্রাণ হাতে করে অপেক্ষা করতে হবে। কে জানে এবারেও আবার কার রোল নম্বর কার ঘাড়ে চাপে, কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কোন দিনের ঘাড়ে চেপে বসে, কার খাতা কোথায় চলে যায়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছর এ-ধরণের একটা-না-একটা ভণ্ডুল একটা না একটা কেলেঙ্কারী ঘটছেই এবং ঘটবেও।

কিন্তু ঘটছে বলেই যে ঘটবেও এমন কথা কি জোর করে বলা যায়? হ্যাঁ, বলা যায়। বাজি ফেলে বলা যায় যতদিন এই পর্ষদকে খোল-নলচে সমেত পাল্টানো না যাবে, যতদিন পার্ক স্ট্রীট ওয়েলেসলির ঐ বাড়িটার সব কটি অপদেবতাকে সর্ষেপড়া দিয়ে তাড়ান না যাবে ততদিন মাধ্যমিক শিক্ষায় ভণ্ডুলের অবসান হবে না।

আপনারা ক'জন কতবার কি কাজ উপলক্ষে এই ভূতুড়ে বাড়িতে গিয়েছেন জানি না। আমি বহুবার এই দপ্তরে বিভিন্ন কাজের তাগিদে পদার্পণ করেছি। প্রত্যেকবারই কাজ অসমাপ্ত রেখে, প্রতিবারই আর একদিন আসতে হবে এই নির্দেশ অথবা অনুরোধ শুনে ফিরে আসতে হয়েছে।

এই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসে প্রতিদিন নিকট ও দূরে বিদ্যালয়গুলি থেকে যে-সব শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাওয়া-আসা করেন তাঁদের সঙ্গে যদি কেউ কোনদিন সাক্ষাৎ করেন তাহলে শুনতে পাবেন পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের দীর্ঘ অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতার বিচিত্র কাহিনী। শুনতে পাবেন শিক্ষকদের জীবনের করুণ অভিজ্ঞতার কথা।

কোন বিদ্যালয় কোন একটি সামান্য বিষয়ে প্রয়োজন হলে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদকে একবার চিঠি লিখে তার জবাব পায় না। বাংলাদেশের কোন স্কুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আছে বলে আমার জানা নেই।

কলকাতা শহরেই একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষিকাকে প্রায় পর পর পাঁচদিন আমি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করে জানতে পারি যে, তাঁদের স্কুলের এ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত একটা সামান্য চিঠির জবাব পেতে এসে তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব পেয়েছেন, "ফাইল হারিয়ে গেছে আবার নতুন করে চিঠি লিখে পাঠান।" একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিনবার সেই স্কুলের ফাইল পর্ষদের অফিস থেকে হারিয়ে গেছে। এ কেমন করে সম্ভব হয়। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে তিন তিনবার একই স্কুলের ফাইল হারিয়ে ফেলার পর সেই নির্লজ্জ কর্তাব্যক্তিটি কি করে মাথা উঁচু করে তাঁর চেয়ারে বসে থাকেন —এই সমস্তই আমার কাছে ধাঁধার মত মনে হয়।

"আপনাদের কোন ধরার লোক নেই বুঝি?" পর্ষদের এক তরুণ কেরানি ঐ স্কুলের শিক্ষিকাদেরই একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। "ধরার লোক থাকলে আপনাদের স্কুলের ফাইল ঠিকই খুঁজে পাওয়া যেত। দরকার হ'লে কর্তা নিজে উঠে খুঁজে আনতেন"। এই কথা বলে সেই তরুণ কেরানি নিজেই তাঁর প্রশ্নসূচক বাক্যের জবাব দিয়ে দিলেন।

একটি নয়, একাধিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি জেনেছি বিদ্যালয়গুলির জীবনে এই অপদার্থ মধ্যশিক্ষা পর্ষদটি কি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবাংলায় আজ যুক্তফ্রন্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত। বাংলাকে নতুন করে গড়ার জন্য এই সরকারের সামনে আজ যতগুলি কর্তব্য আছে তার মধ্যে অন্যতম হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রের পরিমার্জন। বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং শুধু শিক্ষক আন্দোলনের নেতাই নন নিজেও অভিজ্ঞ শিক্ষক। বিশেষ করে তাঁর এবং সামগ্রিকভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদই বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র সমস্যা নয়। অনেক মৌলিক সমস্যা শিক্ষার রয়েছে এবং তার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন হয়তো দ্রুত মিটবে না, সংস্কার হয়তো রাতারাতি করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষাই হোক অথবা অন্য যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক অপদার্থতা এবং গাফিলতির কোন ক্ষমা থাকতে পারে না। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হয়রানি করা, দপ্তরের অপরিহার্য ফাইল বার বার হারিয়ে ফেলা এবং সর্বোপরি কোন কাজ না করে মাইনে নেওয়ার মধ্যে যারা কোন অপরাধ বা অন্যায় খুঁজে পায় না তাদের খুবই ভাল করে মালুম করে দেওয়া বোধ হয় প্রয়োজন হয়েছে যে, এই ধরণের অপরাধ আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন ও শিক্ষাকে কিভাবে এবং কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শুধু বোঝানই নয়, এই জগদ্দল আপদদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে হয় দূরে করা হোক অন্যথায় এদের শেষবারের মত জানিয়ে দেওয়া হোক আমরা আর জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতার বোঝা টেনে বেড়াতে পারব না।

আমাদের দেশ দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য বিক্ষোভের ধোঁয়ায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। এই বিক্ষোভের স্তূপের

পিছনে অনেক মৌলিক কারণ রয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্তব্যবোধের অভাব, দায়িত্বপালনে ব্যর্থতা, এককথায় নিছক গাফিলতির জন্য যে বিক্ষোভ ও যে ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষ জেগে থাকে তার নিষ্পত্তি করতে সরকারের নিশ্চয়ই সময় লাগার কারণ নেই।

অনেক ব্যাপারেই অনেকক্ষেত্রে সরকার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য তদন্ত কমিশন বসিয়ে থাকেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার করজোড়ে অনুরোধ—পার্ক স্ট্রীট ও ওয়েলেসলির মোড়ের ঐ ভূতুড়ে বাড়িটার অপদেবতাদের অকর্মণ্যতার ও গাফিলতির একবার অন্তত তদন্ত হোক। তাহলে বাংলাদেশের দূর-দূরান্তের গ্রাম ও শহর থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা দলে দলে এসে যে সাক্ষ্য দেবেন তাতে সারা দেশ চমকে উঠতে পারে। সেদিন আমিও আমার সামান্য অভিজ্ঞতা তথ্য সহ উপস্থিত করব।

অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মের ঝুঁকি না নিয়ে......
বিবাহিত জীবনের সমস্ত সুখ উপভোগ করুন।

আজকাল সব পুরুষই, জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটা নিরাপদ ও সন্তোষজনক উপায় "নিরোধ" কিনে নিতে পারেন।

নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্য

৩টির মূল্য ১৫ পয়সা, ১টি ৫পয়সা

(সরকারি সাহায্যে হ্রাসমূল্যে)

বর্তমানে মাত্র কয়েকটি জেলায় পাওয়া যায়।

আগামী ৩৮ বছরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি থেকে বেড়ে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০ কোটি হয়ে যাবে।
আর তখন—বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির মতো মৌলিক সুযোগ সুবিধে এবং খাদ্য বস্ত্রের মতো মূল প্রয়োজনগুলির যে বিপুল চাহিদা দেখা দেবে তা যোগানো মোটেই সহজ হবেনা। এখনকার শিশুরা—আপনাদের সন্তানেরাই কষ্ট পাবে। কাজেই এখনই নিরোধ ব্যবহার করতে শুরু করুন। আপনার পরিবার সীমিত রাখুন।
জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আপনার হাতেই রয়েছে।
"নিরোধ" ব্যবহার করুন।

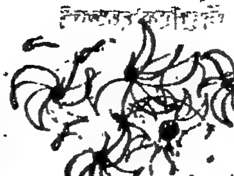

পশ্চিমবাংলার শপথ, বুদ্ধিজীবী হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্যা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসকে স্মরণ করার অনেক বিপদ; কখনো বা কঠিন সত্যের আঘাত এমনভাবে আমাদের ওপর নেমে আসে যে নিজেদের কাঁধ পর্যন্ত ভেঙে যায়। স্বাধীন সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমাকে প্রথমেই নিজের একটি পাপ স্বীকার করে নিতে হবে; কেন না, যে ভারত-চীন সংঘর্ষকে সামনে রেখে স্বাধীন সাহিত্য সমাজ গড়ে উঠেছিল, তখন সামান্য কয়েক দিনের জন্য হলেও আমিও স্বাধীনদের মতই বড় বেশি দেশপ্রেমিক হয়ে পড়েছিলাম। ফলে সমস্ত ব্যাপারটার দোষ শুধু চীনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বেশ একটা স্বাদেশিকতার সুখ অনুভব করা গিয়েছিল। এখন, বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে মনে হচ্ছে, সেদিন আমি চীনকে আক্রমণকারী মেনে নিয়ে যে স্বদেশপ্রেমের বুলেটিনগুলি কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রকাশ করেছি, তা আমার জীবনের প্রচণ্ডতম পাপ। তবু, কোথাও আমার নিজের ভিতরে সেদিন কিছুটা শুভবুদ্ধি থেকে গিয়েছিল; স্বাধীন সাহিত্য সমাজকে আমি সেকালেও অস্পৃশ্য বলে চেতনায় গ্রহণ করেছি, এবং প্রথম থেকেই এই সমাজকে ধিক্কার জানিয়ে এসেছি। সেদিনকার 'দর্পণ' এবং 'নাউ' পত্রিকায় আমাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রতিবাদ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমরা যুদ্ধে জিততে পারি নি; কেন না, যাঁদের বিরুদ্ধে স্বাধীন সাহিত্যিকরা সেদিন দানবীয় আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সেদিন পলাতক; তাঁরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিলেন।

আমার সাম্যবাদী বন্ধুদের সেদিনকার ক্লৈব্য সত্যিই বড় পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল; কেন না, বাজারের গোলামেরা তখন স্বদেশপ্রেমিক হয়ে তাঁদের ওপর চোখ রাঙাচ্ছেন আর তাঁরা ঐ চোখ-রাঙানীকে ভয় পাচ্ছেন। বাজারের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য সেদিন সমর সেন, অরবিন্দ পোদ্দার, অরুণ ভট্টাচার্য কলম ধরেছেন; অথচ সবচেয়ে আগে যাঁদের এই ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের শরিক হওয়ার কথা, তাঁরা কেউ সঙ্গে নেই। এ এক অসহ্য অবস্থা।১

এই অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ, যে-কথা আমি আগেই বলেছি, স্বাধীন সাহিত্য সমাজ নিয়েছিল। এতদিন যাঁরা প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁদেরও কেউ কেউ সমাজের ইস্তাহারগুলিতে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিচক্ষণ মানুষ সেদিন নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। বামপন্থী ও মানবধর্মী বলে পরিচিত আমাদেরই আরেকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি দিনেশ দাস সমাজে নাম লেখালেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র যদিও প্রায় সূচনা থেকে সমাজের আসল চেহারাটা টের পেয়েছিলেন এবং লজ্জায় ও ঘৃণায় দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, তবু তিনিই স্বাধীন সাহিত্য সমাজের সর্বপ্রথম শিকার। যে মেনিফেস্টো-কে সামনে রেখে এই সমাজ গড়ে ওঠে, তিনি তার অন্যতম রচয়িতা। এমন কি, সমাজের মোড়লেরা যাঁদের মোটেই পাত্তা দেন নি তাঁরাও এই সময় বাজারের পত্রিকায় একটি করে বিবৃতি দিয়ে, তাঁরা যে কমিউনিস্ট নন, কস্মিনকালে কমিউনিস্ট ছিলেন না, এই কথাটি-ই বার বার ঘোষণা করলেন। শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে আমরা একজন সাম্যবাদী এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বলেই মনে করতাম। এবার জানা গেল তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মিথ্যা। অন্য একজন শীর্ষস্থানীয় সাম্যবাদী কবি অধিকতর নিরাপদ রাস্তা ধ'রে অগ্রসর হ'লেন। তিনি স্বাধীন দৈনিক পত্রিকার গভীর দেশপ্রেমের প্রশংসা করে একটি পত্র পাঠালেন, যা ঐ পত্রিকায় মুদ্রিত হলো।

সমাজের মোড়লদের সে কি উৎসব ও আনন্দের দিন। বোধহয় এইবার বাংলাদেশের সাম্যবাদীরা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাঁদের উস্কানিতে উত্তর কলকাতায় কমিউনিস্ট পরিচালিত একটি লাইব্রেরী গুণ্ডারা আক্রমণ করলো: মহা উল্লাসে তারা সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী আগুনে নিক্ষেপ করে সেই অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে বিজয় উৎসব পালন করল। পত্রিকায় পত্রিকায় তার খবর বেরুতে লাগল।২

---

(১) চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদার, এই চারজন প্রগতিশীল সাহিত্যিক অবশ্য স্বাধীন সাহিত্য সমাজের দানবীয় রূপটি প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষ করে, 'শুভবুদ্ধির আহ্বান' নাম দিয়ে একটি বুলেটিন বের করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা উপযুক্ত গোষ্ঠীবদ্ধ সমর্থনের অভাবে বেশিদূর এগুতে পারে নি।

(২) এই গুণ্ডামীর আরেক শিকার মনোজ বসু। স্বাধীনদের হামলার ফলে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং 'চীন দেখে এলাম' বইটিকে বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিলেন। ভয় পাওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল। যেখানে সাম্যবাদী কবি-সাহিত্যিকরা

আর গোলামেরা কমিউনিস্ট মারো, যখনই 'পেট্রিও' বজে দেশভক্তের চরম শ্লোকে ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলেন। আমাদের সাম্যবাদী বন্ধুরা যতই গর্তে লুকোন, তাঁরা ততই এখানে-ওখানে ভাল-কুত্তার-মত গন্ধ শুঁকে বেড়ান। সে এক রকম প্রহসন।

বেশ কিছুদিন ধরে স্বাধীন সাহিত্য সমাজের ঐ দৌরাত্ম্য বাংলাদেশ সহ্য করলো। তারপর এক সময় চীন-ভারত সীমান্তের সংঘর্ষ থেমে এলো। জওয়ানদের জন্য স্বাধীনরা কে কয় ফোঁটা রক্ত দিয়েছিলেন, আমার জানা নেই। কিন্তু কমিউনিস্টদের রক্তে বাংলার মাটি রাঙানো গেল না বলে তাঁদের মনে নিশ্চয় ক্ষোভ রয়ে গেল। কেউ কেউ মনের দুঃখে বঙ্গ-সংস্কৃতির মাঠে মদ খেয়ে বমি করতে শুরু করলেন; কেন না, ঢের স্বদেশী করা হয়েছে এবার একটু অন্য রকম অভ্যাস করা যাক। বাকিরা কে যে কোথায় ছিটকে পড়লেন, আজ পর্যন্ত তার হদিশ পাওয়া গেল না। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনফুলেরা অবশ্য তাঁদের কলম থামান নি; কেন না একবার স্বদেশ পত্রিকায় কবিতা লেখা শুরু করলে, আর ঘন ঘন কবিতা না লিখে উপায় থাকে না। বৃদ্ধ বয়েসের নেশা মস্ত নেশা। তরুণ কথাসাহিত্যিকরা সমস্ত অবস্থাটা খুব সহজে বুঝে নিলেন। দেশপ্রেমের বাজার যতই মন্দা হতে শুরু করলো, তাঁরা অশ্লীল সাহিত্য রচনা করতে লাগলেন। এবং বুদ্ধদেব বসু তাঁদের সঙ্গী হলেন। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো তখন থেকেই ভবিষ্যতের সেই রঙীন স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন কবে কলকাতার মাঠে তাঁরা মুক্ত মেলার অনুষ্ঠান করতে পারবেন। দেশপ্রেম তো নানাভাবেই করা যায়। পাশবিকতাও এক ধরনের প্রেম।

অঙ্গার ধুলেও যেমন ময়লা যায় না, স্বাধীন সাহিত্য সমাজের কুকীর্তিগুলি তেমনি বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের এককালের গভীর কলঙ্ক হয়েই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় থেকে যাবে। এদের মুছে দেওয়ার কোনো উপায় নেই। তবু এই গভীর অন্ধকারের সময়েও ছিটেফোঁটা আলো এদিকে-ওদিকে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়েছিল। স্বাধীনদের ইস্তাহারে সমরেশ বসু স্বাক্ষর দেন নি, যদিও বাজারের ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর সে সময় থেকেই বেজায় দহরম-মহরম। তিনি স্বাধীনদের পিচকিরির রঙে নিজেকে রাঙাতে ভোলেন নি; কোথাও স্বাধীনদের মতোই নিজের সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণই বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। ভবিষ্যতে স্বাধীন সাহিত্য সমাজের বুড়ো থেকে ছোকরাদের তিনি নাচাবেন এবং নিজেও নাচবেন, তার পটভূমি ইতিমধ্যেই রচিত হয়ে গেছে। কিন্তু, কী আশ্চর্য, তিনি স্বাধীনদের ইস্তাহারে কিছুতেই স্বাক্ষর দিলেন না। আর, সেদিন বাজারের আমন্ত্রণ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন তরুণ কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়; প্রমাণ করলেন, অর্থ আর প্রচারের ঘুষ দেখিয়ে বাংলাদেশের সব সাহিত্যিককে কেনা যায় না।

স্বাধীন সাহিত্য সমাজ প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের গোলাম করতে চেয়েছিল। তা সে পারে নি। কিন্তু তার একটি উদ্দেশ্য কিছু-দিনের জন্যও অন্তত সফল হয়েছে। স্বাধীনরা সাম্যবাদীদের সংগ্রামী ঐক্যকে তছনছ করে দিয়েছিলেন, তাদের ভয় দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে তাঁদের এই বেপরোয়া গুণ্ডামী আরো প্রশ্রয় পেয়েছে, যাঁরা এতদিন প্রগতিশীল-দের মাথার মণি ছিলেন, কবি বিষ্ণু দে, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তাঁরা বেশ কিছুদিন স্বাধীনদের পত্রিকায় বর্জিত ছিলেন, কেন না তাঁরা কমিউনিস্ট। কিন্তু সেই পত্রিকার দপ্তর থেকে তাঁদের প্রতি আবার পাতা পেতে বসে খাওয়ার আমন্ত্রণ এলো, তাঁরা ভুলেই গেলেন এ কোনো ক্ষমা প্রার্থনা নয়, এমন কি এই নিমন্ত্রণ সকল সাম্যবাদী কবি-সাহিত্যিক-দের জন্যও নয়, কেবলমাত্র প্রগতিশীল সাহিত্যের শিবিরকে আরো অন্ধকার করে দেওয়ার জন্য, তাঁদের ভেতরকার ভাঙনকে আরো এগিয়ে দেবার জন্য।

স্বাধীন সাহিত্য সমাজ আজ জীবিত অথবা মৃত আমার জানা নেই। সমাজ-দরদীদের মধ্যে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডেকেছিল; তাঁরা কিন্তু এখনো বেঁচে আছেন, পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র তথা স্বাধীন ভারতের সংহতিকে বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করার জন্য। বুকের রক্ত অবশ্যই কথার কথা; গোলামদের বুকের রক্ত কোনদিনই তেমন টাটকা থাকে না, যা দিয়ে কোনো মহৎ কার্য সাধন করা যায়। কিন্তু তাঁরা একদিন প্রকাশ্যেই বাংলাদেশের মনুষ্যত্ব, তার সংগ্রামী প্রাণশক্তিকে টুঁটি টিপে মারতে চেষ্টা করেছিলেন; ছদ্মবেশে এবং মঞ্চের অন্তরালে থেকে আজও তাই করে যাচ্ছেন। বিদেশী ডলারের মহিমায় এবং বাজারের দালালদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা দস্তুরমত সঙ্ঘবদ্ধ। অথচ চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় থেকেই পশ্চিমবাংলার মানবধর্মী, সংগ্রামী সাহিত্যিকরা সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন- হতোদ্যম, নিরুৎসাহ। তাঁদের এইভাবে বিধ্বস্ত করার [illegible] অবশ্যই স্বাধীনদের।

পশ্চিমবাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা যে দীর্ঘকাল তাঁদের পথ ভুলেছিলেন, ক্রমেই তাঁরা যে এক গভীর হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলেন, তাঁদের এককালীন সংগ্রাম ও শৌর্য যে পরবর্তী-কালে সহাবস্থান ও কাপুরুষতায় পরিবর্তিত হয়েছিল, তার অন্য কারণও আছে। সেজন্য আমাদের আরো অতীতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আমি অতি সংক্ষেপে আমার গোলাম কাহিনী শেষ করবো। এবার যাঁদের কথা বলবো, তাঁরা কেউ স্বাধীন সাহিত্য সমাজের মার্কামারা নন। এঁরা স্বাধীন-দের চেয়েও বেশি ধূর্ত এবং অনেক বেশি কাপুরুষ। স্বাধীনদের সহজেই চেনা যায়, এঁদের চেনা যায় না। এঁরা কেউ কেউ এককালে কমিউনিস্ট পার্টি করতেন, এখন কী করেন তা খুলে বলতে আমাদেরই লজ্জা বোধ হয়। এঁরা একবার আমেরিকা, আরেকবার রাশিয়ার দুয়ারে এজন্যই ঘোরাফেরা করেন যে কোথা থেকে আসল লভ্যাংশ আসবে, ঠিক নিজেরাই বুঝতে পারছেন না। এর ওপর আছে বাজারের মনিবদের তোষণ; ফলে এঁরা সর্বদিক ব্যালেন্স রাখার যে আশ্চর্য কুশলতা অর্জন করেছেন তা সার্কাসের দক্ষ ক্লাউনদেরও হার মানায়।

এঁদের একজনের কথা আমি জানি, যিনি একটি পত্রিকার সহ-সম্পাদক। জনৈক কবির কাছ থেকে তাঁর পত্রিকার জন্য কবিতা চেয়ে নিয়েছিলেন। ঐ কবি যখন প্রফুল্ল ঘোষ-এর বে-আইনী আইন ভেঙে জেলে গেলেন, তাঁর কবিতা তখন কম্পোজ হয়ে মেক্-আপের জন্য গেছে। কবি যখন জেল থেকে ফিরে এলেন, তখন ঐ মেক্-আপ করা কবিতা ডাস্টবিনে।

আরেকজনের কথা জানি, যিনি অন্য জীবিত কবি-সাহিত্যিকদের ভ্রষ্ট ও চরিত্র-হীন মনে করেন; নিজে কিন্তু কোনো পত্রিকায় অশ্লীল গল্প লেখার জন্য অর্ডার এলে, ঐ অর্ডারী গল্পও লেখেন। আমার তরুণ কবিবন্ধু একবার একটি আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। তিনি একটি সনেট লিখেছিলেন, যার বক্তব্য ছিল, জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর (দুজনেই মৃত) বাংলাদেশে কোনো সৎ লেখক নেই। সংকলন গ্রন্থের জন্য তাঁর কাছ থেকে একটি কবিতা চাওয়া হয়; অথবা এই সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ হবে জেনে তিনি নিজেই উৎসাহী হন। কিন্তু ঠিক মত কবিতা মাথায় আসছে না। তখন তিনি এক আশ্চর্য উপায় বের করলেন।

ভয় পাচ্ছেন, তাঁদের পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হবে, সেখানে মনোজ বসুর আতঙ্ককে আমরা কিছুটা অনুধাবন করতে পারি।

মেমফিসে স্বীকারোক্তি

অনুঃ জয়ন্তী সেন

অব্যর্থ হাতের লক্ষ্য, গুলী ছুঁড়ে
আমিই তোমার হৃদয়কে,
হৃদয়ের মোড়কে ঢাকা দয়া, ক্ষমা, প্রেম আর অশ্রুকে
মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে,
সাদাকালোর নিচে টকটকে লাল রক্ত
যার অসামান্য ধমনীতে
সেই নিষ্পাপ, করুণ পবিত্র নায়ককে
হত্যা করেছি।

হ্যাঁ, আমিই সেই প্রচণ্ডতম খুনী
আজীবন ঘৃণার অস্ত্র শাণিত করে,
প্রতিহিংসার ফলায় আগুন জেবলে
মৃত্যুর উদ্ধত হাতে জীবনের ফুলকে ম্লান করে
ভালোবাসাকে নিঃশেষ করতে চেয়েছি।
যুগে যুগে আমার চির রুদ্ধ তপস্যা ঃ
অম্লান অজেয় আলো
রাত্রির আড়ালে ঢাকবো—
প্রেমকে ঘৃণার তীব্র বিষের নীলে
জারিত করবো ;
অসত্যের তীক্ষ্ণ ছুরি উপলব্ধির বুকে বিঁধিয়ে
পবিত্রতার স্বচ্ছ শুভ্রতায়
কালো অঙ্গারের বিবর্ণ স্পর্শ ঢেলে
আমার রক্তমাখা আঙুলে হবে
এক নতুন ইতিহাসের সূচনা।

তোমার বিধ্বস্ত দেহে চোখ রেখে
সদর্পে সেই কথাই বলতে চেয়েছি।
আর সে মুহূর্তে সেই মৃত স্থির রক্তহীন মুখে
আলোর সুদীপ্ত শিখা
উজ্জ্বলতম হয়ে উঠেছে,
স্পন্দনহীন চোখের তারায় প্রেমের পরিপূর্ণতা দেখে
আমার উন্মুখ দৃষ্টি মর্মাহত।
মেমফিসের ধূসর নীল আকাশের নিচে
আমি তোমাকে হত্যা করেছি
তবুও আশ্চর্য, তুমি সূর্যের জীবন্ত প্রতীক।

সনেট কবিতাটির সঙ্গে আরো দু লাইন যোগ করেলেন। পরবর্তী দু লাইনের বক্তব্য অনেকটা এইরকম,—'এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য ও আরেকজন সৎ লেখক।' সুকান্ত যে সত্যিই সৎ কবি ছিলেন, এই ব্যাপারটা বোধহয় তাঁর মনেই ছিল না। ভাগ্যি কবিতার সংকলন প্রকাশিত হলে আরেকজন মৃত লেখক সৎ বলে প্রমাণিত হলেন।(৩)

কথায় কথা বাড়ে। বাংলাদেশে কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা কম নয়; ভেজালও ততোধিক। আমরা কমিউনিস্ট কবি বুঝি, স্বাধীন কবি বুঝি, জীবনানন্দ দাশ-এর মত আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন কবিদের বুঝি(৪), কিন্তু নিজেদের মানবধর্মী বলে পরিচয় দেন, অথচ সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সুবিধাবাদের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন মিতালী রেখে চলেন, এমন কবি-সাহিত্যিকদের বুঝি না। ভিয়েতনামে মার্কিনী বর্বরতা দেখে মূর্ছা যান, আবার সি-আই-এ ঘেঁসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমেরিকা যাওয়ার নিমন্ত্রণ এলে অমনি পোঁটলা-পুটলী গুছিয়ে সাগর পাড়ি দেন অথবা ঘন ঘন পশ্চিম জার্মানীর ভবনে খানা খেতে যান,(এ ধরণের কবি-সাহিত্যিকদের সংখ্যা যেন ক্রমেই বাড়ছে। এঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানের গোলাম না হতে পারেন, কিন্তু দালাল বলে একটা কথাও তো অভিধানে আছে।

অথচ, এঁরা সকলেই নাকি কোনো না কোনো সময়ে সাম্যবাদী অথবা সাম্যবাদের সমর্থক ছিলেন। আজ কারা, কোথায়, কত পয়সা দিয়ে এঁদের কিনে নিচ্ছেন, তার বিচার উপযুক্ত লোকেরা করবেন। এঁরা কিন্তু ক্রমে প্রতিক্রিয়াশীল মানববিরোধীদের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন; জানি না সে বোধ এঁদের আছে কি না। প্রগতিশীলের মুখোস পরে গোপন অন্ধকারে সেই প্রগতিকেই ছুরি মারার চেষ্টা গুণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ মজা এই, প্রগতিশীলদের বিভিন্ন শিবির থেকে এঁরা দীর্ঘকাল বাহবা পেয়ে এসেছেন, এবং আজও বাহবা পাচ্ছেন। ফলে প্রগতিশীল সাহিত্যিকের শিবির ক্রমেই অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকার হয়ে আসছে।

কেউ যদি আমাদের এই বলে সাবধান করে দেন যে, এইভাবে ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে; তার উত্তরে বলবো, সত্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কিন্তু তাকে এড়িয়ে চলা অধিকতর পাপ। যদি আমাদের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচণ্ড লোভ, কাপুরুষতা, ক্রীতদাসের প্রবৃত্তি না থাকতো, বিভিন্ন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণগুলিতে তাঁরা যে-যাঁর কর্তব্য পালন করতেন। তাঁরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

কিন্তু আমার এও দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকরা যদিও সংগ্রাম-বিমুখ বলে আজ নিজেদের প্রমাণ করেছেন এবং সহাবস্থানকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে কেউ কেউ চরিত্রহীনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক নতুন করে নির্মাণ করছেন, তথাপি পশ্চিমবাংলায় সৎ কবি ও সাহিত্যিকরা একেবারে ধুয়ে মুছে যান নি। আমাদের প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকরা আজ অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পান; কিন্তু তাঁদের অনেকের ভেতরেই মানবপ্রেমিক, ভালবাসার মানুষটি এখনো স্থির আছে। আবার, সমর সেন ও নারায়ণ চৌধুরীর মত সর্বস্ব বাজী রেখে লড়ে যাওয়ার মানুষও আমাদের মধ্যে আছেন। আছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং অমিতাভ দাশগুপ্ত, যাঁরা মাঝেমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্তু মিছিলের দিনগুলিতে ঠিকই রাস্তায় নেমে আসেন। আছেন চল্লিশের, পঞ্চাশের, ষাটের বেশকিছু কবি-সাহিত্যিক, যাঁরা হয়তো ঠিকমত লড়তে জানেন না, কিন্তু ডাকলে সাড়া দেন। আর আছেন অজস্র তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিক যাঁরা একদিন এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার সমাজটাকে ভেঙেচুরে দিয়ে মানুষের জন্য নতুন সমাজ গড়বেন।

সেইদিন আমাদের নানারঙের গোলামেরাও যদি তাঁদের দাসত্বের পোষাকগুলিকে ছুড়ে ফেলতে চান, নিশ্চয় তরুণেরা তাঁদের বুকে টেনে নেবেন। প্রচণ্ড বীর্যের সঙ্গেই তো সত্যিকারের ক্ষমা রয়েছে। আমরা এখনো ততটা ক্ষমতা অর্জন করি নি।

[চলবে]

(৩) এই কবির উল্লেখ গোলাম কাহিনীতে ঠিক উপযুক্ত হয় না। কিন্তু এইখানেও কোথাও একটা সততার অভাব রয়েছে, যা শিল্পীর স্বাধীন মনের পরিপন্থী।

(৪) অথচ এই জীবনানন্দ দাশ-ই সময়ে মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য কত বেশি বিচলিত হতেন। তিনি সচরাচর আর দশজনের কথা ভাবতেন না ; কিন্তু যখন ভাবতেন, সেই ভাবনায় কোনো খাদ থাকতো না।

আজকের বিজ্ঞান

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

হৃদয়-ঘটিত

হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার মাত্রেই গোলমেলে। তা' সে হৃদয় যেমন করেই দেওয়া-নেওয়া হোক। আড়ালে রামধনু-আঁকা আকাশে হোক, অথবা হোক সামনে ছুরি-কাঁচিঘেরা টেবিলে।

সম্প্রতি হৃদয়-ঘটিত এই শেষের ব্যাপারটি নিয়ে ভাবনা ধরেছে আমাদের। আমরা কোনো কোনো মুমূর্ষুকে হৃদয়-হীন করে দ্বিতীয়-হৃদয় লাভের সুযোগ দিচ্ছি। অর্থাৎ, তার প্রায়-অকেজো হৃৎপিণ্ডকে বাতিল করে নতুন হৃৎপিণ্ড প্রতিরোপণ করছি তার দেহে।

অঙ্গ-প্রতিরোপণের ক্ষেত্রে মানুষের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর এনেছে এরই মধ্যে। এরই মধ্যে অর্থাৎ এই ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী নাগাদ আমরা খবর পেয়েছি যে, আজ অবধি প্রায় ১০০টি মুমূর্ষুর দেহে নতুন হৃৎপিণ্ড প্রতিরোপণ করা হয়েছে এবং বিস্ময়ের কথা, নতুন হৃদয়বানদের এক-তৃতীয়াংশ বেঁচে আছে এখনও।

এছাড়া এখন অবধি খবর, কম করে বারোটি দেশ এই 'দ্বিতীয়-হৃদয়' নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে এবং এ দেশগুলোর মধ্যে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

রসিকজনেরা ফোড়ন কাটছেন এইখানে। বলছেন, টেক্কা তো দেবেই! হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার এক নম্বর 'ট্যাক'-এই কি সে পিছিয়ে আছে যে এই দু'-নম্বরে এসে থমকে দাঁড়াবে?

আমরা বলি, ঠিক কথা। থমকে যে সে দাঁড়ায় নি, তার প্রমাণ তো হাতে-নাতেই পাচ্ছি। খবরে দেখছি, নতুন হৃদয় যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশই হলেন মার্কিন নাগরিক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য যে দেশগুলো এ-ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, ক্যানাডা, চিলি, ভারতবর্ষ এবং ভেনিজুয়েলা।

এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিকা বিশিষ্টেরই নয় শুধু, পথিকৃৎ-এরও বটে। ওই দেশেরই এক চিকিৎসক ডঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড ১৯৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর কেপটাউন শহরে হৃৎপিণ্ড-প্রতিরোপণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করেন। অবিশ্যি তাঁর এই সাফল্যের পেছনে দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ নরম্যান্ সাম্ওয়ে এবং ডঃ রিচার্ড লোয়ার-এর অবদানও বড় কম নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই দু'জন বিজ্ঞানী বিগত দশ-বারো বছর ধরে জীবজন্তুর দেহে অঙ্গ-প্রতিরোপণ নিয়ে গবেষণা করছেন। এঁদের গবেষণা এবং এঁদের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণা ডঃ বার্নার্ডকে যে অনেকখানি সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সন্দেহ নেই ডঃ বার্নার্ড-এর উত্তরসূরীদের সাফল্য সম্পর্কেও। কেন না বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি আমরা, নতুন হৃদয় যারা লাভ করছে, তারা ওই হৃদয়টিকে মূলধন করে সংজ্ঞা ফিরে পাচ্ছে আবার; আবার শোনা যাচ্ছে তাদের দেহে। অর্থাৎ, দেখতে দেখতে শল্যচিকিৎসার বিজয়-নিশান ওড়াচ্ছে তারা; চিকিৎসা ও শারীরবিজ্ঞানের বিজয়বেদীটিকে তারা মজবুত ও মনোরম করে গড়ে তুলছে।

এইখানে তর্ক জুড়ে দেন অনেকেই। বলেন, ওই মজবুত কথাটাতে আমাদের আপত্তি। কারণ, বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি আমরা, নতুন হৃদয় যারা লাভ করল, তাদের মধ্যে প্রায় কেউই আর দশজনের মতো হেসে-খেলে বেড়াতে পারল না; এবং কেউ কেউ এমন কি মুখের কোণে মৃদু-ম্লান হাসিটিও ফুটিয়ে তুলতে পারল না শেষ অবধি; তার আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

দুঃখবাদীদের এই আর্তনাদগুলো যে একেবারেই অকারণে, তা' বলবো না; বরং বলবো, এদের পেছনে প্রকৃত কিছু কারণ আছে। প্রকৃতই লক্ষ্য করেছি আমরা, দেহ নতুন হৃদয়টিকে কোনো-মতেই যেন গ্রহণ করতে চায় না; বরং তাকে আগন্তুক বলে ভাবতে সুরু করে। তার সঙ্গে ব্যবহার করতে সুরু করে বাইরের থেকে আগত শত্রুর মতো।

এই শত্রুতা মৃত্যু অবধি গড়ায় শেষ অবধি; এবং শেষ অবধি দেহ তার জৈবিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ওই দ্বিতীয় হৃদয়টিকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে তার নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে।

কিন্তু কেন এই মৃত্যু? আত্ম-হননের জন্যে দেহ এইভাবে মেতে ওঠে কেন?

বিশেষজ্ঞরা বলেন, দেহের স্বাভাবিক-প্রতিরোধ-ক্ষমতার জন্যে। আদ্যিকাল থেকে পুরুষানুপরম্পরায় দেহ বাইরের বস্তুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে যে প্রতিরোধ-শক্তি লাভ করেছে, অন্ধ সংস্কারবশে সেই শক্তির প্রতি মর্যাদা দেখাতে গিয়ে এক্ষেত্রে সে নির্বোধের মতো নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনে।

এখন উপায় কী তবে?—বিজ্ঞানীরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। দেহের প্রতিরোধ-শক্তির কবল থেকে 'দ্বিতীয়-হৃদয়'কে বাঁচাবার চিন্তা ওঁদের পেয়ে বসল।

ফলে, ১৯৬৮ সাল থেকে সুরু হ'ল নতুন গবেষণা। দেহের প্রতিরোধ-শক্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা নতুন উদ্যমে ভাবতে সুরু করলেন আবার। ওঁরা খুঁজে বের করতে চাইলেন এমন কোনো ওষুধ যা' দিয়ে ওই একগুঁয়ে প্রতিরোধ-শক্তিকে অন্তত সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখা যায়।

ওদিকে স্বাভাবিককে দমাতে গিয়ে নতুন এক বিপদ দেখা গেল আবার। দেখা গেল, জীবাণুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার যে ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই দেহের আছে, নতুন ওষুধ প্রয়োগের ফলে ক্রমেই যেন তা' লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, দেহ যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে ক্রমেই; ক্রমেই যেন বাইরের শত্রুর কাছে অরক্ষিত ও অসহায় হয়ে পড়ছে।

দেহের এই অসহায়তা হাতে-কলমে প্রমাণিত হল দ্বিতীয় হৃদয়ের অধিকারী কয়েকজন রোগীর ক্ষেত্রে। স্পষ্টই দেখা গেল, হৃদয় ওদের ঠিক কাজ করছে; কিন্তু বাইরের জীবাণুর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কাজ করতে পারছে না দেহটা।

দেহের এই অকর্মণ্যতা দূর করার জন্যে অচিরেই 'সিরাম' তৈরি হল এক-প্রকার এবং এই 'সিরাম'-এর নাম দেওয়া হল 'অ্যান্টিলিম্ফোসাইট্ গ্লোবিউলিন্'। ১৯৬৮ সালে অনেক রোগীর ওপর এর ব্যবহারও হল। 'দ্বিতীয়-হৃদয়'-এর অধিকারী এ থেকে উপকার পেলেন কিছু কিছু এবং বিজ্ঞানীরাও লক্ষ্য করলেন, এই বিশেষ রাসায়নিক পদার্থটির দৌলতে দেহ 'দ্বিতীয়-হৃদয়'টির প্রতি ঠিক আগন্তুক শত্রুর মতো ব্যবহার করছে না; সাময়িকভাবে হলেও ব্যবহার করছে প্রায় বন্ধুর মতো।

এদিকে 'প্রায়' এবং 'সাময়িক'কে নিয়ে সমস্যা দেখা দিল আবার। বিশেষজ্ঞরা বললেন, আগন্তুক হৃদয়ের

ঋতু-পরিবর্তনের পালা

অনিলকুমার মোদক

সদরে শীতার্ত রাত নির্জীবন আঁধারের মুখ
নীরবে লুকায়। আর হাতে দীর্ঘ-দিবসের মালা
বসন্ত ঘনিষ্ঠ তাপে আমাদের ভরে দেয় বুক—
তাহ'লে সূচিত হয় ঋতু-পরিবর্তনের পালা।

চূড়ান্ত মুহূর্তে এসে আমাদের হৃদয়ে আকাশ
তাই তো শত্রুর শেষ-আক্রোশের ঝড়ে ক্লান্তি পায়—
বাঁচার ভূখণ্ড জুড়ে ক্লান্ততর সংগ্রামী আবাস
তাই তো দুর্বার-বেগ যন্ত্রণার ধূলিতে হারায়।

তবুও আপোষ ঘৃণ্য দুর্বলতা! রে অরাতি, তোর
চতুর চাবুকে আজ জীবন-বৃক্ষের সব পাতা
না-হয় ঝরেই যাক। মৃত্যুধ্বংসে রক্ষণার ঘোর
সহজে বিনষ্ট হলে জীবনের অন্য এক গাথা
তবেই-তো মুক্তি পাবে অনন্তকালের ইতিহাসে।

দেখিস, তখনই তোর রথচক্র স্তব্ধ হ'য়ে আসে।

প্রতি দেহকে প্রায় বন্ধু' হলে চলবে না; বন্ধুত্বটা হতে হবে পুরোপুরি। আবার 'পুরোপুরি বন্ধুত্ব'ও সাময়িক হলে ফ্যাসাদ, পাকাপাকি হলে নিশ্চিন্ত।

এখন প্রশ্ন, দেহের সঙ্গে 'দ্বিতীয়-হৃদয়'-এর এই পাকাপাকি এবং পুরো বন্ধুত্বটা কবে নাগাদ গড়ে উঠবে? বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আলো-আঁধারির মায়াজাল সৃষ্টি করেন। বলেন, বন্ধুত্ব হয়তো গড়ে উঠবে শীগগিরই; তবে এখনও অবধি যে এই বহু-প্রত্যাশিত জিনিসটি গড়ে ওঠে নি, তা' তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। এখন অবধি তো স্পষ্টই দেখছি আমরা 'দ্বিতীয়-হৃদয়'-এর সঙ্গে দেহের শত্রুতা সাময়িকভাবে দূর করা সম্ভব; পাকাপাকিভাবে নয়। ফলে, আপাতত স্মরণে রাখতে হবে আমাদের যে, হৃদয়-প্রতিরোপণের ব্যাপারটা চিকিৎসার পর্যায়ে এসে ঠিক পৌঁছয় নি; পৌঁচেছে মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচিয়ে তুলবার এক শেষ প্রচেষ্টার পর্যায়ে।

এদিকে হৃদয়-দাতাদের নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে; এবং সমস্যাটা আবর্তিত হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন ও বিবেক-বুদ্ধিকে ঘিরে।

এতকাল আমাদের ধারণা ছিল, কারও হৃদয় ধুক্ ধুক্ করা মানে, তাঁর বেঁচে থাকা। আর ওই ধুক্ ধুক্ শব্দটি বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে, তাঁর মৃত্যু।

বাঁচা-মরা সম্পর্কে এই চিরাচরিত ধারণার বশবর্তী হয়েই কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন আজ, যার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করছে এখনও এবং এখনও যার হৃদয়টি অন্য কোনো জীবনকে টিকিয়ে রাখতে পারে, প্রয়োজনের খাতিরে তাকে হৃদয়-হীন করা উচিত কি?

এই উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন নিয়ে '১৯৬৮ সালের পৃথিবী অনেক মাথা ঘামিয়েছে। মাথা ঘামানোর বিরাম এমন কি ১৯৬৯ সালেও নেই। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে, আইন-সভায় এবং ধর্মগুরুদের মুখে মুখে এখনও উচ্চারিত হচ্ছে ওই একই প্রশ্ন,—উচিত কি?

এদিকে শারীরবিজ্ঞানীরা এই জিজ্ঞাসার নতুন উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন সম্প্রতি। ওঁরা বলছেন, এমন অনেক রোগী আছে, হৃদয়ের ধুক্ ধুক্ শব্দটি বন্ধ হয়ে যাবার পরেও যাদের বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। কখনও মালিশ করে, কখনও আবার ওষুধ দিয়ে বা বিদ্যুৎশক্তির সাহায্য নিয়ে বাঁচানো হয়েছে ওদের; আবার ওদের হৃদয়কে কর্মক্ষম করা হয়েছে।

কর্মক্ষমতা ফিরে-পাওয়া এ-ধরণের একটি হৃদয়ের অধিকারী হলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আইসেন-হাওয়ার। শুধুমাত্র ১৯৬৮ সালেই পাঁচবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি এবং বেশ কয়েকবারই তাঁর হৃদয়টি কাজ বন্ধ করেছে বা বন্ধ করার উপক্রম করেছে। কিন্তু বিস্ময়করই বলতে হবে, বার-কয়েক তাঁর অচল হৃদয়কে সচল করা হয় বিদ্যুৎশক্তির সাহায্য নিয়ে; অর্থাৎ, বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অবসর-গ্রহণে-ইচ্ছুক তাঁর হৃদয়ের মাংসপেশীগুলোকে কাজ করতে বাধ্য করা হয় আবার।

কিন্তু এ তো গেল একটি দিক,—দেহ ঠিক থাকা সত্ত্বেও হৃদয় বেঠিক হওয়া। এ ছাড়া আরও একটি দিক এ সম্পর্কে বিবেচ্য; এবং সে দিকটি হল, হৃদয় ঠিক থাকা সত্ত্বেও দেহ বেঠিক হওয়া। 'দেহ বেঠিক' বলতে এখানে মস্তিষ্কের মৃত্যুকে বোঝানো হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে সেই 'ব্রেইন্ ডেথ্'কে' যার ফলে 'ব্রেইন্' বা মস্তিষ্ক তার গুরুত্ব-পূর্ণ কাজগুলো করার সব রকম ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলে।

মস্তিষ্কের এই পরিপূর্ণ অসার-তাকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মৃত্যু বলছেন আজ। ওঁরা বলছেন, হৃদয়ের ধুক্ ধুক্ শব্দ বন্ধ হওয়া নয়, মস্তিষ্ক অসার হওয়ার নামই মৃত্যু।

মস্তিষ্কের এই মৃত্যুর খবর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ঠিক ধরতে পারেন; এবং পারেন বলেই হৃদয় অকেজো হয়েছে বলে কাউকে মরতে দিতে ওঁরা আজ নারাজ।

ওঁরা বলছেন, কৃত্রিম হৃদয়ের সাহায্য নিশ্চয়ই নিতে হবে আজ। এবং এমন কি সম্ভব হলে জীবজন্তুর হৃদয়ের সাহায্য নিয়েও মানুষকে আজ বাঁচাতে হবে।

ওদিকে পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে এখন কৃত্রিম হৃদয়-তৈরির গবেষণা চলছে।

আমরা বলি, চলুক গবেষণা। হৃদয়-রহস্যের সন্ধানে বেরিয়ে হৃদয়-বান মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে নতুন করে পাঞ্জা লড়ুক।

সোনার হরিণ

মিহির পাল

—এই সত্যেন! কি ভাবতে ভাবতে চলেছিস?—পেছন থেকে বিকাশ এসে ওকে ধরে ফেলল।

—এটেন্ডেন্স দেবতার স্তব করছিলাম। মুখার্জি তো দোয়াতে কলম ডুবিয়ে বসে রয়েছে।

—উঁহু কথাটা এড়িয়ে গেলি। তোকে আমি মার্টিন বার্ন স্টপ থেকে ফলো করছি, তোর পেছনের বাসটা থেকে আমি নেমেছি।

সত্যেন ফিনকি দিয়ে ঝরে-পড়া বৃষ্টির মত ঝিরঝির করে হাসল। এবং লজ্জায় ওর ফর্সা মুখখানা লাল হল।

—ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস বাবা, ভাবছিস কাকপক্ষীটিও টের পাবে না। হু হু। বিকাশ হাসল। আবিষ্কারের গর্বে।—তোকে ভিড়ের মধ্যে প্রথমটা লক্ষ্য করি নি। ল্যাবোর্ন রোডে জোর ব্রেক কষার শব্দ কানে যেতেই চকিতে তাকিয়ে দেখি আমাদের শ্রীমান এক একসিডেন্টের সামিল হতে গিয়ে অন্য এক একসিডেন্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কিন্তু তারপরও কি তোর চৈতন্য হয়। তখন চেতনার কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কার করলাম তোর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে।

বিকাশের দিকে সত্যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। চেহারাটা কেমন করুণ মনে হল। বলল—ভাই, আমরা আজ এক বাসে এলাম। গড়পারে বাসে উঠে দেখি বাসের মধ্যে নমিতা বসে।

—তাই নাকি! ভেরি ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা পরে বিশদ শুনব। এ গেটটায় লিফট দিয়ে উঠে যাই। তোর গেট দিয়ে ঘুরে গেলে লেট হয়ে যাব। তা মক্ষিরাণী এতক্ষণে বোধ হয় ভেতরে ঢুকে পড়েছেন।

জবাবের অপেক্ষা না রেখে বিকাশ সাঁ করে বাঁদিকের গেটে ঢুকে পড়ল। সত্যেন পশ্চিম গেটের দিকে এগোল।

মুখার্জির টেবিলে সই করে দাঁড়াতেই —সত্যেনবাবু আপনার পার্চেজের ফাইলটা নিয়ে আসুন তো! টেন্ডার কমিটির মিটিং আছে ১টায়।

সত্যেন দাঁতে দাঁত চেপে 'শালা' কথাটা খুব মানসিক শক্তিসহ উচ্চারণ করল।

—দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ফাইল। কোথায় একটু মনস্থির করে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবব—তা নয়। সাতসকালে টাকা-পয়সার হিসেব কর, নোট লেখ। মনটাকে নিয়ে যে একটু খেলব—সে অবকাশও নেই। 'মন' তুমি কেন রইলে। তোমাকে বাতিল করতে পারছি নে কেন। মুখার্জিবাবুর মত মেশিনে পরিণত হচ্ছি নে কেন। মাঝে মাঝে তেল দিলেই মেশিন চলে। মেশিনের কোন যন্ত্রণা নেই। তাই মুখার্জিবাবু ফাইলের মাঝে-মুখ গুঁজে তৃপ্তি পান।

—এই সত্যেনবাবু! বিড়বিড় করে কি বকছেন। আর কাগজের মধ্যে ওভাবে আঁকিবুঁকি দিয়ে যাচ্ছেন কেন?

কি হল। ঘোড়ামুখ আঁকা বই থেকে হঠাৎ মুখ তুলে পাশের চেয়ারে বসা রাজীব প্রশ্ন ছুড়ে মারল।

সত্যেন সচকিত হল। আমতা আমতা করে বলল—এই দেখুন না, অফিসে পা দিতে না দিতেই বড়বাবু ফাইল তলব করেছেন।

—শালা বড়বাবুকে নিয়ে একবার মাঠে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখিয়ে আনুন। দেখবেন আর কখনও অফিসে এসেই ফাইলের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না।

মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে সত্যেন ছাড়া পেল সেই বেলা বারটার পর।

বাথরুম থেকে ঘুরে এল সত্যেন। চোখেমুখে জল দিল। যেন অফিসের ফাইলপত্র কাগজ হিসেব মুখার্জিবাবু—সব কিছুর গন্ধ ধুয়ে এল।

ফিরে এসে এক গ্লাস জল খেতে খেতে ঈষৎ থমকে গিয়ে ভাবল, নমিতার সাথে আজ তার দেখা হতে পারে কখন। ভাবনার সাথে সাথে বুকের মাঝে ত্রিশ বছর বয়স যেন সুর তুলে কাঁদল।

সত্যেন হঠাৎ উঠে পড়ল। তেওয়ারীর দোকানের কড়া চা খেতে ইচ্ছে হল। পাশ থেকে রাজীব বলল—আবার কোথায় চললেন!

—এই আসছি। সত্যেন পাশ কাটাল। চায়ের কথা চেপে গেল। না হলে রাজীবও হয়ত পিছু নিতে চাইবে। সে আর একা হতে পারবে না। তার মাঝে এখন একা থাকার ইচ্ছেটা প্রবল হতে প্রবলতর হচ্ছে।

কাজে—ব্যস্ত মুখার্জিবাবুর কাছে গিয়ে 'একটু চা খেতে যাচ্ছি' বলতে তিনি সাথে সাথে দ্রুত ঘাড় নাড়লেন। যেন ঘাড় নাড়ার সময়টুকু ব্যয় করাটাকে তিনি অপচয় মনে করেন।

পাশের গলিতে ঢুকে সত্যেন একভাঁড় চা নিয়ে সোজা দীঘিটার ধারে চলে গেল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খেতে থাকলে একক থাকা যাবে না, পরিচিত কেউ এসে হয়ত তার চিন্তার একাগ্রতা নানা কথার আঘাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে থাকবে।

নমিতাকে বাসের মধ্যে বসে থাকতে দেখে সে সত্যিই চমকে উঠেছিল। সে মনোভাবকে বিস্ময় বলাই বোধ হয় সঙ্গত। কোন এক কবি নাকি কোথায় লিখেছেন—বিস্ময় কথাটার সাথে আনন্দের যোগ রয়েছে। তার সাহিত্য-প্রেমিক বন্ধু সরোজ তাকে একদিন বিস্ময়ের সংজ্ঞা অনেক ভাষা দিয়ে বোঝাচ্ছিল। কিন্তু আসলে সরোজ বোধ হয় জানে না বিস্ময়ের প্রকৃত স্বাদ কেমনতর। নমিতা তার অজান্তে আজ সত্যেনকে এক বিচিত্র অনুভূতির আনন্দ জড়ান বিস্ময় উপহার দিয়েছে। অন্যান্য দিন চলন্ত বাসে ভিড়ের শরীরের গন্ধ, দাঁড়াবার অস্বাচ্ছন্দ্যতা তাকে ক্রমাগত বিরক্ত, রুষ্ট, ক্রুদ্ধ করে তুলতে থাকত। অথচ সূর্যের আতপে দগ্ধ ঘর্মাক্ত জ্যৈষ্ঠের দিনটিতে, বাসের শ্বাসরুদ্ধ স্বল্প-পরিসরের মাঝে দাঁড়িয়ে সত্যেনের কাছে সময়টুকু আজ অত্যন্ত রমণীয় বলে বোধ হয়েছে। অলংকার বর্জিত সুডৌল হাত দুখানা যেন কি এক সজীব ব্যাকুলতার প্রতীক। সে হাত দুখানা স্পর্শ করতে পারলে এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের স্বাদে সে মগ্ন হতে পারত—এমনি এক ভাবনার বশবর্তী হয়ে সত্যেন স্বেদসিক্ত মানুষগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। নমিতার গলা আর কানেও কোন অলঙ্কার ছিল না। তা দেখে সত্যেন আরও মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নিরাভরণ তরুণী যেন সুন্দর যৌবনের দীপ্ত প্রতীক, যৌবনের দীপ্তি যেন তাদের মাঝে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে বিকশিত হয়—এমনি এক ধারণা সত্যেনের মাঝে আমূল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার ছোট্ট কপাল, কপাল ঘিরে কাল চুলের ঢল নামা, চোখের মেদুর চাহনি—সত্যেনকে উন্মনা করে তুলছিল। একই বিল্ডিং-এতে পাশা-পাশি অফিসে কাজ করার সান্নিধ্যতাটুকুর দরুণ মেয়েটিকে তার পরম আত্মীয়, অত্যন্ত কাছের মানুষ বলে বোধ হতে লাগল। তাকে চোখে চোখে রাখবার লোভ সে সংবরণ করে উঠতে পারছিল না।

বিকাশই নমিতার খোঁজ তাকে প্রথম দিয়েছিল। দিন পনের আগে টিফিনের সময় দু বন্ধু মিলে অফিসের সামনে ফুটপাথে আম কিনছিল। তখনই বিকাশ বলেছিল—এই, আমাদের বিল্ডিং-এ একটা সোনার হরিণ এসেছে দেখেছিস।

সত্যেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে-ছিল।

—দেখিস নি, সে কিরে! নতুন আমদানী। নীল সিল্কের শাড়ি পড়ে এসে-ছিল গতকাল। সোনার হরিণ বলব—না নীলকণ্ঠ পাখি! কদাচিৎ মেলে। বিয়ে করে ফেলেছি। নইলে শালা আমিই ঝুলে পড়তাম।

—সে কিরে! সত্যেন ঈষৎ চমকাল। তোর স্ত্রী রীতা আর বাচ্চাটার কি হবে।

চিরকালীন প্রাণচঞ্চল ছটফটে বিকাশ কেমন যেন গম্ভীর বিষাদগ্রস্ত।—কার কি হবে—আমি কি করে জানব। কেন জানিনে মাঝে মাঝে সমস্ত কিছু অর্থহীন মনে হয়, ভয়ানক ক্লান্তি বোধ করি। তবে অন্য কোন তরণীতে সমুদ্রে পাড়ি জমালে যে আমি দারুচিনি দ্বীপে নোঙর করতে পারব—তারও কোন স্থিরতা নেই। মাঝে মাঝে ছাদে দাঁড়িয়ে রাত্রির আকাশের অগণন তারার মাঝে আমার সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম ভালবাসাকে খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে পড়ি।

সত্যেন বিকাশের এক নতুন পরিচয় আবিষ্কার করে অবাক হল। কেমন এক দুঃখের স্বাদে মগ্ন হল।

সত্যেন পরে একদিন নমিতাকে দেখে-ছিল। বিকাশের কথা তার ঠিক বলেই মনে হয়েছিল—নীলকণ্ঠ পাখিও বটে, সোনার হরিণও বটে। কে যেন অলক্ষ্যে সত্যেনকে ইসারা করল আর সাথে সাথে সত্যেন সোনার হরিণের পেছনে ক্লান্তিহীন ছুটতে লাগল।

বোশেখ জ্যৈষ্ঠের বর্ষণহীন দিনগুলো কলকাতার রাস্তায় গলন্ত পীচের স্রোত বইয়ে দিয়ে, গৃহস্থ বাড়ি বাড়ি বস্তির পথে পথে লবণাক্ত পানীয় জল সরবরাহ করে এক সময় বিদায় নিল। আষাঢ় মাসের দু তারিখে বর্ষণ নামল। কলকাতা জলে ভাসল। জলময় রাস্তাগুলোকে অকেজো বাস ও প্রাইভেট কার ট্যাক্সির ইতস্তত স্থিতিশীলতার দরুণ কেমন দ্বীপময় সাগর বলে ভ্রম হতে লাগল।

রাণীধূপ
রূপকার প্রডাক্টস

এমনি এক বৃষ্টিভেজা অপরাহ্নে সত্যেন অফিস থেকে বেরিয়ে টেলিফোন ভবনের উল্টোদিকে অপেক্ষা করছিল বাসের প্রত্যাশায়। ট্রাম বন্ধ হয়ে রয়েছে দুপুর থেকে। ২।৩ খানা বাস পর পর চলে গেল সামনে দিয়ে আগেই পূর্ণ হয়ে। অবশেষে শ্লেট রং আকাশ ভেঙে আবার বর্ষা নামল। ছুটে গিয়ে সত্যেন টেলিফোন ভবনের চত্বরে দাঁড়াল। একটু পরেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সত্যেনদের অফিসের সরকারী বৌদি আর নমিতা এক-ছুটে টেলিফোন ভবনের চত্বরে ঢুকে পড়ল। চমকে সত্যেনের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কি একটা আশা, আনন্দ ও প্রাপ্তিতে সত্যেন ছটফট করছিল।

সত্যেনদের অফিসের এই বৌদিটির নাম রমলা সেন। মধ্যবয়সী হাসিখুশি ভদ্রমহিলা; খানিকটা স্থূলকায়। যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ সবারই তিনি বৌদি। সবার সাথে স্বাভাবিকভাবে ও নিঃসংকোচে মিশবার মত দুর্লভ ক্ষমতার তিনি অধিকারিণী। প্রত্যেকটি সহকর্মীর বাড়ির অবস্থা ও পরিচয়াদি তাঁর নখদর্পণে।

অপ্রত্যাশিতভাবে সত্যেনকে দেখতে পেয়ে রমলা দূর থেকে একগাল হাসল। তারপর নমিতা সহ সত্যেনের দিকে এগোল।—কি ভাই তুমিও যে আটকে পড়েছ। যাক্ বাবা, এ দুর্যোগের সন্ধ্যায় একটা বেটাছেলে জুটে গেল কপালে, আর ভয় নেই—কি বল নমিতা?

নমিতা আরক্ত হয়ে মুখ নামাল।

—আঃ বৌদি। চারপাশে লোকজন—থাম দেখি। তোমার মুখের কোন লাগাম নেই।

—কি করব ভাই। আজও যখন অপাপ-বিদ্ধা কোন মেয়ের পাণিগ্রহণে তো তোমার সাহস হল না। অগত্যা—।

—আবার সুরু করলে। নমিতার সামনে সত্যেন লজ্জাই পেল। নমিতাকে দেখিয়ে বলে—তোমার এ সমস্ত কথা শুনে উনি কি ভাবছেন বল তো।

—কি আবার ভাববে। সেদিনের পুঁচকে মেয়ে। ও হো, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি। এ নমিতা গাঙ্গুলী—মাস দুই হল আমাদের পাশের অফিস ছেড়ে জয়েন করেছে। আর এ হচ্ছে সত্যেন রায়—আমাদের অফিসের সবচেয়ে শান্ত প্রিয়ভাষণ ছেলে। খুব ভাল রিসাইট করে।

রমলার কথা শেষ হবার আগেই তারা পরস্পর প্রতিনমস্কার করেছিল। সত্যেনের চোখে নমিতার তারা দুটো যেন সহস্রশিখা হয়ে জ্বলছিল। যাকে প্রচণ্ড আবেগে দূরে থেকে এতদিন কামনা করে এসেছে, তাকে এত কাছাকাছি দেখতে পেয়ে সত্যেন ভেতরে ভেতরে কেমন এক উত্তেজনা ও বেদনা বোধের কম্পনের দংশন অনুভব করছিল।

রমলা বৌদিই যেন সত্যেনকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিল। পরিচয়ের পালা শেষ হবার পর রমলা সত্যেনকে জিজ্ঞেস করল—তোমাকে আজ সারাদিন দেখি নি কেন।

—আমি তো আর আড্ডা দিয়ে বেড়াই নে। কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—তবে রে ছেলে! আমি বুঝি আড্ডা দিয়ে বেড়াই। আর তোমাদের মাইনের বিল, টি-এ বিল—এসব বুঝি এমনিতেই হয়ে যায়। আরে ভাল কথা, তোমার বোন মিনতিকে সেই যে যাদবপুর থেকে দেখে গেল—সম্বন্ধটা ঠিক হয়ে গেছে?

—না বৌদি, কোন খবর পাই নি। তবে মনে হচ্ছে—হবে না। সত্যেনের মুখে একরাশ মেঘের রং লেগে গেল।

—দেখ, এখনও যখন খবর দেয় নি—বলা যায় না কিছু। রমলা বৌদি যেন সান্ত্বনা দিতে চাইল। প্রণতিকে ভর্তি করে দিয়েছ? কোথায় করলে?

—না বৌদি, এখনও ভর্তি করা হয় নি। আগামী পরশু ভর্তি করব ভাবছি। সিটি মরনিং-এ দেব। বাড়ির কাছে আছে।

এ সমস্ত পারিবারিক কথাবার্তার মাঝে নমিতা বোধ হয় অস্বস্তিরোধ করছিল। একটু সুযোগ পেয়ে সে বলল—বৌদি, বৃষ্টিটা সম্ভবত ধরে এসেছে।

সত্যেন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল, স্ট্রীট লাইটের নিয়ন আলোর মধ্য দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে যে রজতধারা এতক্ষণ ধরে ঝরছিল—তা কার আদেশবলে যেন বন্ধ হয়ে গেছে। আর প্রতীক্ষমাণ লোকগুলো যেন জোট বেঁধে প্রেক্ষাগৃহ হতে নির্গত হচ্ছিল।

রমলা বৌদি ও নমিতার পিছু পিছু সত্যেন রাস্তায় নামল। একঝলক ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস কোথা থেকে ছুটে এসে সত্যেনকে কেমন এলোমেলো করে দিল। ওরা সবাই রাস্তা পেরোল। রাস্তাটাকে নিকষ কালো দেখাচ্ছে। সত্যেন আর নিজের মাঝে খানিক আগের উত্তেজনা, আবেগ ও বেদনাবোধের সঞ্চরণ খুঁজে পাচ্ছিল না।

সত্যেনের মনে পড়ল—পৌনে সাতটা বাজে। টিউশনিটা বোধ হয় কামাই হয়ে গেল। আজ মাইনের কিছুটা এডভান্স চাইবে কিনা সত্যেন ভাবছিল। চাইলেই পেয়ে যাবে সে জানত। কিন্তু ছাত্রের বাবার কাছে এডভান্স চাওয়াটা কেমন সম্মানহানিকর মনে হয়। এখনও বাস পাওয়া গেলে টিউশনিটা এটেণ্ড করা যায়। আবার কামাই হলে এডভান্স চাইবার হাত হতে রেহাই পাওয়া যায়।

সত্যেন বুকের মধ্যে একটা শাঁখের করাতের চলাফেরা টের পাচ্ছিল।

অথচ প্রণতির কলেজে ভর্তির টাকাটা এখনও সংগ্রহ করতে পারে নি সে। রিকাশ সপ্তাহ তিনেকের ছুটিতে আছে। ওর কাছ থেকে টাকাটা নেওয়া যেত। ওর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। গোটা তিনেক বাড়ি কলকাতায়। হাজার টাকার মত বাড়িভাড়া পায়। তা ছাড়া নিজেও চাকরি করছে। পরিবারের লোকসংখ্যাও কম। স্ত্রী ও শিশুকে নিয়ে মাত্র তিনজন। কিন্তু শুধু টাকার জন্যে, ওর বাড়ি অবধি যাওয়া ভাল দেখায় না।

কাল সকালে মণিদার কাছে ওকে ছুটতে হবে। গ্রামের ছেলে মণিদা। কাছা-কাছি আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই। বিয়ে করে নি। মেসে থাকে। বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে। দরকার পড়লেই সত্যেন ওর কাছে হাত পাতে। কেমন যেন একটা দাবি জন্মে গেছে মণিদার' পরে। কিছুদিন দেখাশোনা না হলেই মণিদার খোঁজ নিতে আসবে। সাথে করে সত্যেনের মায়ের জন্যে এক কৌটো জর্দা আনতে ভুলবে না।

রমলা এতক্ষণ হাঁ করে মানুষ উপচে-পড়া খানকয়েক বাসের এগিয়ে আসা ও না থেমে তাদের অতিক্রম করে যাওয়া দেখ-ছিল। বাস ক'খানা বেরিয়ে যেতেই রমলার খেয়াল হল যে তার সাথীরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে।

রমলা তাড়া দিল। আ রে কি হল! তোমরা সব চুপচাপ কেন। সত্যেন কি ভাবছ।

নমিতা কোন জবাব দিল না। শুধু একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল। আর অফিস ব্যাগটা কাঁধান্তরিত করল।

সত্যেন যা ভাবছিল সে সমস্ত উঞ্ছবৃত্তির কথা নমিতার সামনে বৌদিকে বলা যায় না। তাই সে প্রসঙ্গান্তরে গেল—এবার বাড়ি ফেরার কথা ভাবুন বৌদি। আমার মনে হচ্ছে—এখানে দাঁড়িয়ে কোন আশা নেই। একে বাস ভর্তি হয়ে আসছে তার পরে এত লোক অপেক্ষা করছে। বরং চলুন হেঁটে এসপ্লানেড যাই। ওখান থেকে ষ্টি সি ধরা যাবে।

—তা মন্দ নয়। রমলা বলল। ওতে আমাদের সবারই কাজ হবে। নমিতার পরেশনাথে ও তোমার মাণিকতলায় নামা চলবে। তারপর তুমি একটু পথ হেঁটে পড়পারে চলে যাবে আর আমি হ্যারিসন রোডে নেমে পড়ব। ওরা তিনজন তখন এসপ্লানেডের দিকে আলোছায়ার মধ্য দিয়ে হাঁটা সুরু করল। সত্যেন ওদের সাথে পাশাপাশি না হেঁটে বার বার পেছনে পড়ে যাচ্ছিল। আসলে সত্যেন এইক্ষণে কতক-গুলো কথা চিন্তা করে নিতে চাচ্ছিল।

সত্যেনের মনটা কেমন জঙ্গল হয়ে

জানো, রাস্তাঘাটে
আমার দিকে
তাকিয়ে কারো
পলক পড়েনা...
তোমার দিকে না হাতি,
তোমার পোশাকের দিকে।
নির্মল বার সাবানে কাচা জামাকাপড়
নিখুঁত নতুনের মতো ধবধবে দেখায়
আর তাইতেই সবার তাক লেগে যায়।
আসলে, কেরামতি তোমার নয়—
নির্মল আর আমার।
নির্মল
Nirmal
BAR SOAP
পূর্ব ভারতে বার সাবান হিসেবে
কাটতিতে সবার উপরে—সবার সেরা বলেই।
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১
KPN 4622

গেছে। জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সূর্যা-লোক দেখা যায় না। সূর্যালোকে অবগাহন সম্ভব নয়। সেখানে কেবল অন্ধকার, ভয়, ভীতি জন্তুজানোয়ার পোকা-মাকড়। এখন নমিতার সামনে থেকেও সে নমিতা-ভাবনায ভাবিত হতে পারছে না। তার মস্ত বড আবেগের বেলুন কখন চুপসে গেল। মনেব মাঝে বিশ্রী কতকগুলো চিন্তা যেন প্রাচীন বটের ঝুরির মত নামছে। সেগুলো যেন শিবপুর বোটানি-ক্যাল গার্ডেনের প্রাচীন বটগাছটির মত একদিন সব কাণ্ডে পরিণত হবে। সে আর কোনদিন তাব হাত হতে অব্যাহতি পাবে না।

রাজভবনের পাশ দিয়ে ওরা হাঁটছে। রমলা আর নমিতা নিম্নস্বরে কি নিয়ে যেন আলোচনায় রত। বৃষ্টিভেজা রাস্তায় মাঝে মাঝে ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের আলো ঠিকরে পড়ছে। তাতে রাস্তা কেমন কাল চক্‌চক্‌ করছে।

সাত ঘর বাসিন্দের ভাগাভাগি করে বাস করা অনেক বাড়ির জটলার মধ্যে মাথা গুঁজে থাকা সত্যেনদের একতলা ভাড়াটে বাসাটার কথা পথ চলতে চলতে বিদ্যুৎ ঝলকেব মত তার মনে আনাগোনা করছিল। সে বাড়ির ঘরগুলোতে বা তাদের আঙিনাতে কোনদিন রোদের স্পর্শ পড়ে নি। এই সুন্দর মুখ মিষ্টি হাসির মেয়ে-টিকে নিয়ে সে-বাড়িটিতে হঠাৎ প্রবেশ করে সবাইকে অবাক করে দেবার ছবিটুকু দেখার সাধে সে মগ্ন হয়ে পড়তে চাইল। কিন্তু বার বার সে ছবিটুকু ভেঙে কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

—সত্যেন! রমলা ডাকল। কার্জন পার্কের মধ্যে ট্রামগুলো নড়ছে বলে মনে হচ্ছে।

সত্যেন তাকিয়ে দেখল ঘুম শেষে মস্ত অজগর যেন আড়ামোড়া ভাঙছে।

সত্যেন বলল—তাড়াতাড়ি পা চালান যাক্‌ বৌদি। একটা বার নম্বর ট্রামে উঠে পড়তে পারলে নিশ্চিন্ত।

ওরা তিনজনে কার্জন পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

রবিবারের সকাল। মণিদার কাছ থেকে পাওয়া একটা সূত্র ধরে সত্যেন টালিগঞ্জ যাচ্ছে এক পাত্রপক্ষের সাথে যোগাযোগের জন্যে। মিনতিকে সম্প্রদান না করতে পারলে আর চলছে না। পড়াশুনো নিয়ে থাকলে এতটা চিন্তা হত না। আর সম্প্রদান করবাব টাকাই বা কোথায়! কেবল অফিসের কো-অপারেটিভ লোনের ভরসা। এ সমস্ত ভাবনাব শরীর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হলেও, তার মন এইক্ষণে সমস্ত চিন্তা, যন্ত্রণা, অস্থিরতার ঊর্ণনাভ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে। ভাদ্রের ভরা দীঘির মত তার মনটা এখন টলটল করছে। তাকে জড়িয়ে কেমন এক নির্লিপ্তব পরশ। হয়ত সদ্যস্নাত কলকাতার আকাশে জলভরা মেঘের সঞ্চরমাণতা, ভিড়হীন চলন্ত বাস-টির চাকায় ছর্‌ছর্‌ ঘুমের মত উত্থিত শব্দ, বাতাসেব ঠান্ডা গন্ধ প্রভৃতি যে পরিবেশকে মুক্তি দিয়েছিল—তার মাঝে সমস্ত সমস্যাকে গচ্ছিত রেখে সত্যেনের মত ছেলের নিজেকে হারিয়ে ফেলাটা খুবই সম্ভব।।

দোতলা বাসের একাকোণে এমনি একটা আবেশের মাঝে বসে থেকে সত্যেন সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পেরেছে যে, গত পরশু মাইনে পেয়ে বাড়িওয়ালা, মুদি, স্কুল-কলেজের মাইনে ইত্যাদি মিটিয়ে দেবাব পর মাত্র পঞ্চাশ টাকা সে মায়ের হাতে বাজার ও রেশন খরচ বাবদ তুলে দিতে পেরেছে। এখনও তাকে সাংসারিক খরচ বাবদ শখানেক টাকা জোগাড় করতে হবে। তবুও প্রাত্যহিকতার ধূলিমলিন স্পর্শ তাকে যেন এইক্ষণে রেহাই দিয়ে গেল। তাব মন বোধ বুদ্ধি এমনি একটা জাযগায় তাকে পৌঁছে দিল, যেখানে বোধ হয় বসে সাধক সাধনার উঁচু স্তবে পদক্ষেপ করে, শিল্পী তার শিল্পকর্মেব মধ্যে সমাহিত হয়। তাদেব অফিসের বৃদ্ধ মধুসূদনবাবু মাঝে মাঝে বলেন—সংসারের সাথে এটাচমেন্টের যেমন প্রযোজন রয়েছে, তেমনি ডিটাচমেন্টের মূল্য কম নয় ভাই। নিরাসক্তি মানুষকে শুদ্ধ করে, পবিত্র করে, তাকে এক অসীম আনন্দলোকেব দ্বারে পৌঁছে দেয়!

অফিসের অনেকেই মধুসূদনবাবুর কথা শুনে হাসে, ঠাট্টাতামাসা করে। বলে—গ্রামে জমিজমা আর কলকাতায় বাড়ি থাকলে, অনেকেই ওরকম বোল তুলতে পারে। আমাদের মত হাড়ভাঙা খাটুনী

দাঁত, উজ্জ্বল, সুন্দর, সুদৃঢ় এবং মাঢ়ী সুস্থ নীরোগ রাখতে
ব্যবহার করুন
বেঙ্গল কেমিক্যালের
কার্বলিক টুথ পাউডার

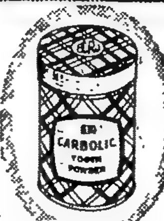

কার্বলিক অ্যাসিড উপাদানে বিশেষ শক্তিশালী

বীজানুনাশক, দুর্গন্ধ-নিবারক কার্বলিক অ্যাসিড থাকার দরুণ এই টুথ পাউডার ব্যবহার করলে আপনার দাঁত হবে উজ্জ্বল, সুদৃঢ় এবং মাঢ়ী সুস্থ নীরোগ থাকবে। প্রতিবার দাঁত মাজার পর আপনার মুখ আরো বেশি তাজা, পরিষ্কার, ঝরঝরে মনে হবে।

কসমেটিকস্ ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা•বোম্বাই•কানপুর•দিল্লী•মাদ্রাজ

খাটতে হলে ডিটাচজড থাকা সম্ভব হত না।

শেয়ালদা স্টপে দাঁড়িয়ে-থাকা বাস হতে আসবাবপত্রের দোকানগুলো, নর্থ-স্টেশনের প্ল্যাটফরম ঢাকা শেডগুলোর দিকে তাকিয়ে সত্যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মধুসূদনবাবুর বক্তব্যের মাঝে খানিকটা সত্যের অস্তিত্বের উপলব্ধিতে সে পরম প্রশান্তির মাঝে মগ্ন হয়ে পড়ল।

—কি সোনার হরিণের ধ্যানে মগ্ন নাকি! কানের কাছে ফিসফিস করে কথা-কটি উচ্চারিত হতে সত্যেন চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। দেখল বিকাশ দাঁত বের করে হাসছে। বাসের পরিবর্তে বাড়ি হলে বোধ হয় সে এতক্ষণে হাসিতে আসবাবপত্র দাড়িয়ে দিত।

অপ্রস্তুত হয়ে সত্যেন হাসল। আ রে তুই কখন এসে বসলি। কোথায় যাচ্ছিস।

—এর পর বলবি, কে হাতে গাঁজা খেয়ে গেছে খেয়াল করি নি। একেবারে অতটা বিভোর হওয়া কি ঠিক হচ্ছে। যাকগে, চল এলিটে সিনেমা দেখে আসি। 'ফর হুম দ্য বেল টোলস' বইটা এসেছে অজ মর্নিং শোতে। পুরোন দিনের একট্রেস ইনগ্রিড বার্গম্যানকে দেখতে পাবি। কি ফিগার আর কি এপিলিং। মুখ-চোখের একটা ভঙ্গি করে বিকাশ থামল।

সত্যেন মৃদু মৃদু হাসল।—না ভাই, আমার যাওয়া হবে না। মিনতির একটা সম্বন্ধের ব্যাপারে আমি টালিগঞ্জ যাচ্ছি। হাজরা নেমে বাস চেঞ্জ করব।

বিকাশ চুপ করে গেল। একটু পরে হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠে স্থানকাল-পরিবেশ ভুলে সত্যেনের পিঠে চাপড় মেরে বসল। —আরে আসল কথাই তো বলা হয় নি। কি খাওয়াবি বল।

—থাম্ থাম্। অত উত্তেজিত হোস না বাসের মধ্যে। তা ছাড়া আমার আবার উত্তেজনা সয় না। কি খবর—ধীরেসুস্থে বল। সত্যেন ওকে শান্ত করতে চাইল।

—এ কি ধীরেসুস্থে বলবার মত। এ হচ্ছে সূর্যের রশ্মির মত ধাবমান। সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছোটে। তোকে আর সোনার হরিণ খুঁজে হয়রান হতে হবে না। এবার সোনার হরিণ তোর কাছে ধরা দিতে আসছে। বিকাশ মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

—হেঁয়ালী রাখ। পরিষ্কার করে বল। বাস মৌলালীতে মোড় ঘোরার দরুণ কাত হতে সামলে নিতে নিতে সত্যেন বলল।

—তাহলে বলি। তোকে আর ভুগিয়ে কাজ নেই। গত রববার সালকেতে পিসীমার বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে পিসীমার এক সম্পর্কিত ননদ এসেছিলেন। তাঁর সাথে দেখা হল প্রায় বছর-দশেক পরে। কথায় কথায় আবিষ্কৃত হল তাঁর বড় মেয়ে আমাদের পাশের অফিসে সম্প্রতি যোগদান করেছে। এবং তার নাম—। একটু থেমে বিকাশ যোগ করল—অনুমান কর দেখি।

সত্যেন অবলীলাক্রমে বলল—নমিতা গাঙ্গুলী।

—রাইট ইউ আর। শুধু তাই নয়—তিনি আমাকে তার তনয়ার জন্যে পাত্র খুঁজে দিতে বলেছেন। কাজেই কাল অফিসে জয়েন করেই বাকী কাজটুকুর জন্যে উদ্যোগী—

বাধা দিয়ে সত্যেন বলল—না ভাই, সোনার হরিণ ধরা এত সহজ কর্ম নয়। মানুষকে চিরটাকালই তার পেছনে ছুটতে হয়। কখন বা তাকে কাছাকাছি পাওয়া যায়, কখনও বা সে চোখের আড়ালে চলে যাবে। কিন্তু মানুষকে চিরকাল ছুটে যেতে হবে।

—রাখ তো তোর ওসব ফিলসফি। আমার' পরে ব্যাপারটা ছেড়ে দে। বিকাশ যেন বিষয়টিকে একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছে দিতে চাইল।

—না রে, ছেড়ে দিলে চলবে না। আসল কথা কি জানিস—আমিও ব্যাপারটাতে আর কোন উৎসাহ বোধ করছি নে।

—সে কি রে! অষ্টম আশ্চর্য দেখার মত অবাক হয়ে সত্যেনের শান্ত মুখের দিকে বিকাশ তাকিয়ে রইল।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার পেরিয়ে বাস তখন ধীরে ধীরে একটানা ক্লান্ত সুর তুলে ধর্মতলার দিকে এগোচ্ছিল। সেদিকে চোখ রেখে সত্যেন তখন ধীরে ধীরে তার নবলব্ধ অনুভূতিকে বিকাশের সামনে মেলে ধরল। প্রসঙ্গত মধুসূদনবাবুর কথা বলতেও সে ভুলল না।

সত্যেন যতক্ষণ গভীরতার সাথে কথা বলে যাচ্ছিল—বিকাশ স্বভাববিরুদ্ধ শান্ত হয়ে শুনছিল। যেন সত্যেনের সেন্টিমেন্টকে আহত না করার সঙ্কল্পে সে অবিচল। কিন্তু সত্যেনের বক্তব্য শেষ হবার সাথে সাথে জবাব দেবার জন্যে সে ভেতরে ভেতরে এক প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করছিল। অবশেষে বিকাশ এক সময়ে বলল—আমার কথা শুনবি। যে অনুভূতি তোর 'পরে বর্তমানে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে—সেটা একটা কুহেলিকা মাত্র. সেটা সরে যাওয়া মাত্র আবার নমিতার জন্যে তোর মন কষ্ট, কান্না আর বেদনায় মাখামাখি হবে। এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

—তর্কের খাতিরে না হয় তোর কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু নমিতা লাভ হলেই যে সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে, সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আর্তিতে ছেদ পড়বে—সে কথা কে বলবে বিকাশ। বরং সেটা যে সত্যি নয়. তার জীবন্ত প্রমাণ তুই। অফিসের নিচে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে উচ্চারিত তোর ব্যথিত কথাগুলো এখনো আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে রয়েছে।

বিকাশ কুলকুল করে হেসে ফেলল। বাসটা ধর্মতলা টার্মিনাসে এসে দাঁড়িয়েছে। বিকাশ উঠতে উঠতে বলল—দেখ্ সত্যেন। যন্ত্রণা, অসন্তুষ্টি, ক্ষোভ এ-সমস্তগুলো তো থাকবেই। না হলে তো পৃথিবীর অগ্রগতিই রুদ্ধ হয়ে থাকত। আসলে এদের সমষ্টিগত শক্তিই তো পৃথিবীকে সামনের দিকে অনবরত ঠেলছে।

বিকাশকে নামিয়ে দিয়ে বাস তখন গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে ছুটছে। সত্যেন এক সময় মিউজিয়াম বিল্ডিংটাকে পেছন পানে হটে যেতে দেখল। এই উন্মুক্ত প্রকৃতি গাছগাছালি জলাশয় মাঠের বুকে সবুজের সমারোহ প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে বিকাশের কথার মাঝে একটা প্রচণ্ড সত্যের ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। আসলে আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা সুখ-শান্তি-ভাল-বাসা বিক্ষোভ-অসন্তুষ্টি যন্ত্রণা-বেদনা দিয়ে তিল তিল করে আমরা নিজেরাই সোনার হরিণ গড়ে তুলি। তারপর থেকে অবিশ্রান্ত তার পেছনে ছুটতে থাকি। কিন্তু সে সোনার হরিণ চিরকালই অজেয় থেকে যায়। তাই বিকাশ এখনও অন্ধকার রাতে আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে তারার মাঝে সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম ভালবাসাকে খুঁজে বেড়ায়।

আর আমি সত্যেন বিকাশ কথিত পৃথিবীর অগ্রগতি ইত্যাকার কথাগুলো নিয়ে মাথায় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি ব্যতিরেকেই এটা কেমন অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছি যে নমিতার প্রতি আকর্ষিত হওয়া ছাড়া আমার আপাতত আর অন্য কিছু করণীয় নেই। নিয়তি যেন আমাকে প্রবলবেগে নমিতার দিকেই ঠেলছে, ঠেলবে।

বাস তখন মলিন আকাশের তলায় অনেক হাওয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে দক্ষিণমুখো ছুটছিল।

অবহেলিত কাকদ্বীপ

"উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত কাকদ্বীপ; একদা ছিল ব-দ্বীপ—এখন আর দ্বীপ নয়। কালনাগিনী নদী নামে পরিচিত আদিগঙ্গার একাংশ এবং তার একটি শাখা মৃতবতী নদী মজে গিয়ে শীর্ণ খালের আকার ধারণ করায় কাকদ্বীপ এখন মূল ভূমিখণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয়েছে। সুন্দরবনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র কাকদ্বীপ এখন মফস্বল শহরে রূপান্তরিত হতে চলেছে। ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্রসৈকতে যেতে হলে এই কাকদ্বীপের ওপর থেকেই যেতে হয়। ছুটির দিনগুলোতে শহরবাসীরা পিকনিক করতে আসে এ অঞ্চলে। কলকাতা থেকে ট্রেন চলে ডায়মণ্ডহারবার এবং লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত; সেখান থেকে বাসে, অথবা কলকাতা থেকে সরাসরি বাসযোগে তিন ঘণ্টায় কাকদ্বীপ পৌঁছনো যায়। এ অঞ্চলে এখন স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছে, গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসেছে, গড়ে উঠেছে হাট-বাজার ডাক্তারখানা অফিস-আদালত।

এখানে কোন কিছুর অভাব নেই, সব পাওয়া যায়—কিন্তু যারা এখানকার পুরনো বাসিন্দা, সবকিছুই তাদের নাগালের বাইরে। ভয়ঙ্কর বাঘ, সাপ বন্য-বরাহ, হায়েনা আর হাঙর-কুমীরের সঙ্গে মোকাবিলা করে যারা এখানকার জঙ্গল হাসিল করল, বন্যা-মন্বন্তর আর ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া কলেরা-বসন্ত মহামারীর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই করে যারা এখানকার নোনামাটিতে সোনা ফলাল, বনভূমিকে রূপান্তরিত করল জনপদে—তাদের বংশধরেরা আজ সহায়-সম্বলহারা দিনমজুর, পথের ভিক্ষুক। এক-একটা গ্রামে একঘর-দুঘর পুঁজিপতি অর্থাৎ তথাকথিত বড়লোকের বাস—সারা গ্রাম তাদের হাতের মুঠোয়। কর্জ আর সুদের বাবদ সব চাষীর ধান তাদের ঘরেই জমা হয়; দেনা তবু শোধ হয় না—ধীরে ধীরে সামান্য চাষের জমি থেকে সুরু করে বাস্তুভিটাটুকুও দেনার খাতেই চলে যায়। পূর্বপুরুষেরা যেমন খালি হাতে এসেছিল জঙ্গল কাটতে, এখন তাদের বংশধরদেরও সেই নিঃসম্বল অবস্থা। কিন্তু তখন তারা এখানকার অসংখ্য নদী-নালা-খাল-বিল থেকে প্রচুর মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ এবং বনভূমি থেকে মধু ও মৃগমাংসের আস্বাদলাভে রসনা তৃপ্ত করেছে—দূরবর্তী হাটে-বাজারে বিক্রয় করে রসদ সংগ্রহ করেছে। মোম মধু মাছ কাঠ লবণ দুধ বাইরে চালান দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। অতর্কিতে যারা হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণে প্রাণ দিয়েছে অথবা চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে তাদের কথা বাদ দিলে, বিজয়লক্ষ্মীর অকৃপণ দানে সেদিনকার জীবনযুদ্ধের সৈনিকদের অভাব ছিল না কিছুরই—ছিল না অভাববোধ।

ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে সম্ভবত ১৭৭০ সাল থেকে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ার কাজ সুরু হয়েছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, অর্থ ও বাসস্থানের অভাবে—প্রাণের দায়ে প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আশেপাশের মানুষ এগিয়ে এসেছিল সেই দক্ষিণরায়ের রাজত্বে। এখানকার বসতি স্থাপন বর্তমান দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার মত সরকারী সাহায্যপুষ্ট ছিল না; তাই পথ-ঘাট, পানীয়, চিকিৎসা, শিক্ষা—যাবতীয় অব্যবস্থায় সভ্যতার আলো প্রবেশ করতে পারত না এ অঞ্চলে; কিন্তু অপরিসীম শক্তি ও সাহসের অধিকারী এখানকার মানুষ দুবেলা খেতে পেত পেট ভরে।

আর আজ? এ অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, ডাক্তারখানা, অফিস-আদালতের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে কারা? শতকরা নব্বইজনেরও বেশি মানুষের গাড়ি চড়ার পয়সা নেই, ছেলে-মেয়েদের কিছু খাইয়ে স্কুলে পাঠানোর সামর্থ্য নেই, রোগে ওষুধ কিনবার সাধ্য নেই—কেবলমাত্র চাষ আর ধানকাটার কাজ ছাড়া শরীর খাটিয়ে সংসার চালাবার মত কোন কাজই পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। কিছুসংখ্যক অন্ধ-আতুর আর নিরুপায় মেয়েমানুষদের জন্য সামান্য কিছু রিলিফ, মাঝে মাঝে দু-চারদিনের মত টেস্ট রিলিফের কাজ, নামমাত্র বেতনে দিনমজুরী আর মাছ বিক্রি করে এবং অধিক সুদে দেনার বোঝা বয়ে বয়ে বাকী দিনগুলো কোনরকমে কাটে। পেটের দায়ে কাকদ্বীপের জঙ্গলকাটাই বাসিন্দারা আর যাবে কোথায়? পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু অপেক্ষা কোন অংশে কম না হলেও এদের পুনর্বাসনের জন্য কোন সাহায্য নেই। আশ্বিন-কার্তিক মাসে এ বছর ধান-চালের দর কমল, গম-আটাও পাওয়া গেল দরকারমত; কিন্তু তা কিনবার মত পয়সা এদের কই? আবার সেই মহাজনদের যাঁতাকলে—মাঘ মাসের মধ্যে শোধ করার প্রতিশ্রুতিতে প্রতি বস্তা ধান একশ টাকা হিসাবে কর্জ না নিয়ে উপায় কি যথাসময়ে শোধ করতে না পারলে পূর্বপুরুষদের রক্তঢালা মাটির অবশিষ্টাংশ এগ্রিমেন্ট দলিলের বলে বে-দখল হয়ে যাবে। ধানের দর কম—ফুস-মন্তরে বড়লোকদের টাকা উধাও; জমি কিনবে কে? জমিটুকু ছিল যাদের, রাঘববোয়ালদের কাছে সিকি মূল্যে চিরদিনের মত বাঁধা দিয়ে তারা তবু এযাত্রা বাঁচল; কিন্তু জমিজমার বালাই যারা আগেই চুকিয়ে রেখেছে, তারা কেবল ভিড় করছে রাস্তায়-রাস্তায় গাড়িতে-গাড়িতে আর বাড়িতে-বাড়িতে। পিকনিক পার্টির ধারে-কাছেও অনেককেই ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়—ভুক্তাবশিষ্ট খাবারটুকুও যদি ভাগ্যে জোটে! খাদ্যশস্যের দর কমল, কিন্তু এ বছর ভিখিরীর সংখ্যা বাড়ল অত্যধিক।

মানুষের মত প্রাণধারণ করার অধিকার যাদের নেই, চালের নিচের মাটিটুকুও যাদের বে-দখল হয়েছে বা হতে চলেছে, যাদের ঝি-বউ ও মা-বোনেরা পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করছে কিংবা দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে—কাকদ্বীপের জঙ্গলকাটাই প্রজাদের দশ ভাগের নয় ভাগ কি তারও বেশি পড়ে সেই দলে।

বিগত কুড়ি বছরের কংগ্রেসী কুশাসনের ফলে এখানকার জঙ্গলকাটাই প্রজারা আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। মাথাই যাদের নেই, তাদের আবার মাথা-ব্যথা! মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ও সমাজবিরোধী পুঁজিপতির প্রাণ, ঘর, দোকান, চাকুরি, জমি, ধান, ইজ্জত ও অধিকার বাঁচিয়ে আজ গণতন্ত্র ও দেশকে রক্ষা করতে অবতীর্ণ হয়েছে গান্ধী-সুভাষ-নেহরুর কংগ্রেস। কিন্তু এখানকার অসংখ্য ভূমিহীনদের জন্য কি প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে সে? ভাগচাষ আইন বলবৎ হল, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হল—আর সঙ্গে সঙ্গে পাইকারীহারে ভাগ-চাষী উচ্ছেদ এবং ভিটেমাটি বিক্রয়ের

হাউক লেগে গেল। তে-ভাগা আন্দোলনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে পুলিশের বলি হয়েও তে-ভাগা তো পেলই না, ভাগের জমিটুকুও খোয়াল; উপরন্তু 'কাকদ্বীপের শিশু-তেলেঙ্গানা' নামে অখ্যাত হয়ে রইল—এই কংগ্রেসেরই অবদানে। অথচ এতদিনে এখানে সরকারী প্রচেষ্টায় হতে পারত অনেক-কিছুই—বেনামী জমি উদ্ধার, খাস জমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে পুনর্বণ্টন, সমবায় কৃষিব্যবস্থার প্রচলন, জমিগুলোকে দো-ফসলা করার জন্য উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থা, খেজুরগুড়, তালগুড় ও লবণ উৎপাদনের ব্যাপক আয়োজন, প্রতি বাড়িতে মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু সংগ্রহের সুব্যবস্থা, স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে অসংখ্য নদী-খাল ও গভীর জলে মৎস্যশিকারের আয়োজন ও বরফ সরবরাহের ব্যবস্থা, গো-মহিষ ও হাঁস-মুরগী পালনে সাহায্য ও উৎসাহদান, এখানকার তাঁতী, মাদুরশিল্পী, ছুতোর, কুমার, কামার, চামার প্রভৃতি কুটির-শিল্পীদের জন্য কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা এবং তালপাতা, খেজুরপাতা, নারকেল-ছোবড়া প্রভৃতির লুপ্তপ্রায় শিল্পকাজে উৎসাহদানের ব্যবস্থা—করা যেত আরো অনেক কিছু; তাহলে আজ আর এ দুর্দশা হত না। এমনও করতে পারলে এখানকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কাকদ্বীপ সহ সারা সুন্দরবনের উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত করার ভার আছে 'সুন্দরবন ডেভালপমেণ্ট বোর্ডের' ওপর; কিন্তু এই বোর্ডের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 'সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতি'—গালভরা নাম কিন্তু কাকদ্বীপে তার কোন কাজই নেই। বি-ডি-ও অফিসের কাজ ও সাহায্য যাদের কিছু আছে কেবল তাদের জন্য; গ্রামসেবক-গ্রামসেবিকাদের দেখতে পাওয়া যায় না গ্রামের আশেপাশে—নিঃস্ব জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই। যেভাবে এখানকার লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে—সেভাবে কৃষি-শিল্পের উন্নতির কোন চেষ্টা পর্যন্ত হয় নি। তার ওপর এখানকার কৃষি, বন ও জলসম্পদের ওপর স্থানীয় জনসাধারণের কোন অধিকার নেই; বিরাট ব্যবসায়-চক্রের মধ্যে সে-সবের লভ্যাংশ নিকটে ও দূরের স্বল্পসংখ্যক লোকের কাছে যাচ্ছে। তাই আজ এখানকার পুরনো বাসিন্দারা সব খুইয়ে কেউ চলেছে উড়িষ্যার দিকে অনিশ্চিত নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে; কেউ চলেছে কাজ খুঁজতে কলকাতার দিকে—কেউ বা ভিক্ষার জন্যে; আর কেউ কেউ শত লাঞ্ছনা সহ্য করেও মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে এখানেই। তাদের কাছে 'জমি-ধান-অধিকার আর গণতন্ত্র' বাঁচাবার লোভ দেখানো কি পরিহাসের বিষয় নয়?

—নরোত্তম হালদার

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর
গ্রন্থাবলী
আবার একখণ্ড
প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প
১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন
৩। দুর্নিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প
মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড
গ্রন্থাবলী
১। জহুরী ২। অনির্বাণ
৩। সোনালী দিনের মন
৪। এক গুচ্ছ গল্প
মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

আজকের লোকসংগীতের বিকৃতির দুটি প্রধান আখড়া—আকাশবাণী ও হিজ-মাস্টারস ভয়েস, গ্রামোফোন কোম্পানী। এই দু' আখড়ার মনোপলি মোহন্তরাই মুরশিদের আসল লক্ষ্য—শিল্পীরা নন। একথা মুরশিদ তাঁর প্রস্তাবনা প্রবন্ধেই বলেছেন। কিন্তু শুধু তত্ত্বগত আলোচনায় কোন জিনিষ পরিষ্কার হয় না, তাই মাঝে মাঝে দৃষ্টান্ত টানতেই হবে। জানি এজন্য কারও কারও কাছে আমি অপ্রিয় হব। কিন্তু লোকসংগীতের স্বার্থে আমি এঁদের নিক্ষিপ্ত ধুলোকাদা গায়ে মাখতে রাজী আছি। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আমার নেই, থাকবার কারণও নেই।

মুরশিদ পরবর্তী প্রবন্ধে আজকের অর্থনৈতিক-সামাজিক সঙ্কটের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে শহরের হুল্লোড়বাজ, 'হাফ-হিপি' দর্শকের সামনে শিল্পীদের অসহায়তার কথাও বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে কিভাবে শিল্পীরা ক্রমশ "জনপ্রিয়তা" ও "আর্থিক সাফল্যের" জন্য বিকৃতির পথে অগ্রসর হন সেকথাও বলা হয়েছে। আকাশবাণীর পরেই এবার গ্রামোফোন কোম্পানীর সেকাল ও একালের তুলনামূলক আলোচনা করব ভেবেছিলাম। কিন্তু দু-একজন লোক-শিল্পী ও তাঁদের অনুরাগী মুরশিদকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড পত্র-শর নিক্ষেপ করেছেন। তার সাথে সাথে পত্রপুষ্পও অবশ্য পেয়েছি। সব চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, তবে লিখিত জবাব না দিলেও পত্র-প্রেরকদের প্রশংসা ও গালাগালি থেকে আমি সমানভাবে লাভবান এবং সেজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

গত ৭৩ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সাপ্তাহিক বসুমতীতে এক পত্রে শ্রীবুদ্ধদেব রায় আমাকে আক্রমণ করেছেন। ভালো কথা। দ্বন্দ্ব-প্রগতিবাদী। দার্শনিকরা বলেন দুটি মতের সংঘাতেই আসল সত্য বের হয়ে আসে। আজ সেই পত্রের সামান্য আলোচনা করব। যেখানে পত্রপ্রেরক কেবল কাদা ছুঁড়েছেন সেটা গায়ে মেখে নিয়ে—যেখানে সত্যিকার প্রশ্ন তুলেছেন সেখানেই মুরশিদ আসরে নামতে চান।

প্রথমেই আকাশবাণীর বাদ্যযন্ত্রের গোঁজামিল সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি তাতে তিনি আকাশবাণীর কোনো গলতি পান নি বরঞ্চ আমার জ্ঞানের মধ্যেই গোঁজামিল খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আমি যা বলি নি আমাকে দিয়ে তা বলিয়ে তাঁর মামলা খাড়া করতে চেয়েছেন। আমি লিখেছিলাম "আকাশবাণীর কোনো ওস্তাদ যাঁর লোকসংগীত সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, যদি তিনি দোতারার কাজ স্বরোদে করতে যান তবে শিল্পীর গলাতে প্রতিমুহূর্তে ফাঁস লাগাবেন, কারণ দোতারার "ড্যাম্প" হলো আমাদের লোকসংগীতের ছন্দ ও লয়ের প্রথম পথ-প্রদর্শক।" এর থেকে এই মানে কখনো দাঁড়ায় না কিছুতেই যে, বাংলার সব লোকসংগীতেই দোতারার ব্যবহার হয় বলে আমি বলতে চেয়েছি। যে সব গানে দোতারার ব্যবহার হয় আমি সে সব গানের কথা বলেছি। লোকসংগীতের অ, আ, ক, খ যিনি জানেন তিনিও একথা জানেন যে, দোতারাটা সব গানে ব্যবহৃত হয় না। মুরশিদ তা জানেন না বলে পত্রপ্রেরকের সগর্ব আত্মপ্রসাদ রীতিমত হাস্যকর। আমি বাদ্যযন্ত্রের আঞ্চলিক মেজাজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববঙ্গের ঢোল ও ঢোলকের মেজাজের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের ঢোল বা ঢোলকের মেজাজের পার্থক্যের কথাই বলতে চেয়েছিলাম। আমার গত প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যই ছিল তাই। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু আবিষ্কার করলেন আমি নাকি বলেছি ঢোল ও ঢোলক পূর্ববঙ্গের বাদ্যযন্ত্র এবং আমার 'থিওরির' তথ্যপ্রকাশে অবাঞ্ছিত ত্রুটিবিচ্যুতি' ধরে ফেলে মুরশিদের 'সীমিত জ্ঞান' প্রমাণ করে ফেলেছেন। লোকসংগীতের জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না যে-কোন চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিই জানেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও ঢোল ও ঢোলক আছে। যাঁরা প্রথম থেকেই আমার লেখাগুলি পড়েছেন, তাঁরাই জানেন আমি শহুরে শ্রোতা ও শিল্পী বিশেষত কলকাতার শ্রোতা ও শিল্পীর সমস্যা নিয়েই আলোচনা করছি। কাজেই মুড এবং পরিবেশসৃষ্টিতে তারযন্ত্রের ওপর জোর দিয়েছিলাম—এখানে পত্রপ্রেরক "প্রাকৃতিক পরিবেশই ঐ বিশেষ ধরণের 'মুড' সৃষ্টির সহায়ক" বলে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতে চেয়েছেন তা সত্যি আমোদ-প্রদ। মোটকথা পত্রপ্রেরক হয় ভালো করে আমার প্রবন্ধটি পড়েন নি, না হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আকাশ-বাণীর সঙ্গীতসালসার পাচকদের মোক্তারী করতে নেমেছেন।

দ্বিতীয়ত বুদ্ধদেববাবু নিজের গান সম্বন্ধে আমার মন্তব্য নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। আমি কথার চেয়ে পরিবেশনের গায়কীকে লক্ষ্য করেই বলেছিলাম তাঁর দলের গান পরিমার্জিত শহুরে। সে কথার এখানে আবার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। রেডিওতে তাঁর গানের বাণী যতটা শুনতে পেয়েছিলাম, তাতেই লিখেছিলাম, "মনে হয় তিনি নিজেই অধিকাংশ গান রচনা করেন।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলেছি "তাতে আপত্তি নেই—যদি সার্থক হয়।" লোক-সঙ্গীতে আধুনিক রচয়িতার যোগ্যতার মাপকাঠি কি হবে, আধুনিক রচনার প্রকৃত কি হবে—কতদূর তা সমর্থনযোগ্য এ নিয়ে বিতর্ক আছে। স্বীকৃত রীতিগুলি আয়ত্ত করে আধুনিক লোকসঙ্গীত রচনা করার অধিকার নিশ্চয়ই বুদ্ধদেববাবুর আছে। সেদিক দিয়ে আমার কোনো গোঁড়ামী নেই। কিন্তু তা যাচাই করার অধিকারও অন্যদের আছে। এমন কি জসিমুদ্দিন এবং গিরিন চক্রবর্তীর দু'একটি গান সম্বন্ধেও সে প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে গ্রহণের প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে আছে বর্জনের প্রশ্নও: সে বিক্রমপুর থেকেই আসুক বা বরিশাল থেকেই আসুক। বুদ্ধদেববাবু যদি তাঁর গাওয়া গান দুটি দয়া করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন তবে খুবই উপকৃত হ'ব। এবং তার ভিত্তিতেই এ-ব্যাপারে আলোচনা করলে আলোচনাটা সজীব ও ফলপ্রসূ হবে।

আজ কেবল বর্তমান কালের লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি যে "বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব" হাজির করেছেন সে সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করতে চাই। কিছুদিন আগে

সুখদেববাবু "বাংলা লোকসঙ্গীতের রূপ-রেখা" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে একটি অধ্যায় ছিল—"বাংলা লোকসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ।" তাতে এবং আমার গত লেখায় উল্লেখ করা যুগান্তরে ২৬-১-৬৮ প্রকাশিত তাঁর লেখা "লোক-সঙ্গীতের ঘরবদল"-এ তিনি যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তুলে ধরেছেন, সেই দুটি লেখার উদ্ধৃতি থেকেই তার সারমর্মটি পাঠকদের কাছে হাজির করছি। জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হতে হলে তার প্রয়োজনীয় সর্বাঙ্গীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রেই উন্নত হতে হবে। তাই সরকারের তরফ থেকে আজ ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা চলেছে। এর ফলে শহর ও তার সন্নিহিত অঞ্চল ছাড়াও বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে নানারকম শিল্পসংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সব কলকারখানায়

নিশ্চিন্ত

হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যদি আপনার ব্যক্তিগত বিষয়গুলি যেমন জীবন বীমার প্রিমিয়াম, বাড়ী ভাড়া, ছেলেমেয়েদের স্কুলের ফি, ক্লাবের বিল ইত্যাদি পি এন বি-র নির্ভরযোগ্য হাতে ছেড়ে দেন।

আমাদের ব্যাঙ্কে একটা সেভিংস অথবা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং ব্যক্তিগত বিষয়গুলির জন্য স্থায়ী নির্দেশ দিন। বাকি সব আপনার জন্য আমরাই করব।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

চেয়ারম্যান : এস. সি. মিত্র

আবার বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের সমাবেশ ঘটছে। অদূর ভবিষ্যতে যখন এই শিল্পায়নের ফলে বিভিন্ন পল্লীগ্রামের সঙ্গে এই শিল্পাঞ্চলগুলোর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠবে, তখন লোকসঙ্গীতের মধ্যে যে আঞ্চলিক ভাষার ছাপ পুরোপুরি বজায় থাকবে একথা জোর করে বলা যায় না।... সুরের দিক থেকেও তার পরিবর্তনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।......আজকাল সুদূর পল্লী অঞ্চলেও বেতার যন্ত্রের অভাব নেই। তার ফলে বিভিন্ন দেশের সুর তাঁরা নিয়মিতই শুনছেন। ভবিষ্যতে যে লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হবে তার মধ্যে অন্যান্য দেশী-বিদেশী সুরও যে আসবে না একথা জোর করে বলা চলে না।"

("বাংলা লোকসঙ্গীতের রূপরেখা"—বুদ্ধদেব রায়)

..."ইউরোপের মত আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। আমাদের দেশের গ্রামগুলি আজ সব দিক থেকেই যথেষ্ট উন্নত হতে চলেছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা প্রায় দূর হতে চলেছে। তাই শহর ও গ্রামের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান—শহুরে আদব-কায়দার বিনিময় ঘটছে। এখন আর শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা শহরকেন্দ্রিক নেই, ক্রমশই তা ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তার উপর আবার শিক্ষার সম্প্রসারণ। গ্রামবাসীর নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষা-সম্প্রসারণের এই মূল পরিকল্পনাটি দ্রুতগতিতে সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে। তাই বিশ-পঁচিশ বৎসর আগেও বাংলার লোকসঙ্গীতের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গী যে ধরনের ছিল, আজকে তার কিছুটা পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে।...সমালোচকরা তাঁদের রক্ষণশীল মনোভাব দিয়ে হয়তো বলে উঠবেন "উঁহু এ তো লোকসঙ্গীত নয়, এতে কেমন যেন শহুরে শহুরে ভাব।" কিন্তু এই তো লোকসঙ্গীতের যুগোপযোগী স্বাভাবিক গতি। একে ঠেকানো যাবে কি করে?..."

("লোকসঙ্গীতের ধারাবদল"—বুদ্ধদেব রায়, যুগান্তর, ২৬ জানুয়ারী, ১৯৬৮)

মধ্যবর্তী নির্বাচনোত্তর সাপ্তাহিক বসুমতীর উল্লসিত পাঠক-পাঠিকা হয়ত হঠাৎ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করবেন—এ কার কণ্ঠস্বর? শিল্পায়ন, গ্রামের উন্নতি, শিক্ষা সম্প্রসারণ সবই যদি ঘটে থাকে তবে কার বিরুদ্ধে তাঁরা ভোট দিলেন? তাঁরা কি গোলকধাঁধার দেশের নাগর-দোলার বাসিন্দা এতো বড়ো অগ্রগতিতে দেখলেন নিম্নগতি?"

বুদ্ধদেববাবুর "বৈজ্ঞানিক চিন্তার" বিছানাতেই গলদ। ইউরোপের শিল্পায়নের সঙ্গে আমাদের দেশের অকালে পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিল্পায়নের তুলনা টেনেছেন। ইউরোপে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের মূলকথা ছিল, সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস সমাজে, গিল্ডবদ্ধ উৎপাদনে "মুক্ত" শ্রমিক ও মালিক সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক 'ফ্রি' মার্কেট সৃষ্টি করা। মধ্যযুগীয় ধর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে, তার প্রতিফলন সেদিনের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী। সেই শিল্পবিপ্লবের ফলে আসে শিল্পে দ্রুত যন্ত্রীকরণ ও উৎপাদনের প্রসার—মুনাফার প্রেরণায় দূরদূরান্তরে বাজার লাভের প্রতিযোগিতা ও উপনিবেশ বিস্তার। শ্রমিকের শোষণ সত্ত্বেও সে যুগটা ছিল প্রসার ও বিস্তারের যুগ। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে ধনিকতন্ত্রের একচেটিয়া মূলধনের অধ্যায় শুরু হয়। উৎপাদনের প্রসার রুদ্ধ হয়। লেনিনের ভাষায় ধনিকতন্ত্র রূপান্তরিত হয় তার শেষ পর্যায় সাম্রাজ্যবাদে। এ হল ধনিকতন্ত্রের চিরসঙ্কট, চির অবক্ষয়ের যুগ। সে যুগের ধনিকতন্ত্রের কায়দায় আর শিল্পায়ন সম্ভব নয়। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পথেই শিল্পায়ন সম্ভব।

আজ ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকার সমাজতন্ত্রের ধাঁচের নামে যে অকালপক্ব মনোপলি গড়ে তুলেছে—অধ্যাপক মহলানবীশ থেকে ডঃ হাজারী পর্যন্ত সবাই তা অকাট্য তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। মাত্র ২০টি রাঘব বোয়ালের পেটে দেশের সমগ্র কৈ, পুঁটি, মাগুরের অবস্থান। সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য-পুষ্ট এই মনোপলির নেতৃত্বে আজ আর ভারতে উন্নতিশীল শিল্পায়ন সম্ভব নয়।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে সামন্ত ভূমি-ব্যবস্থায় আগে যা ছিল আজো তাই আছে—নামী জমিদারের জায়গায় এসেছে বেনামী জমিদার আর মহাজনী ও কালোটাকা। আর বিভিন্ন কৃষিপরিকল্পনার দৌলতে গ্রাম্য-জীবনে এসেছে কিছু নতুন বিত্তবান কৃষক। কিন্তু কৃষক সাধারণের অবস্থা হয়েছে আরো শোচনীয়। 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চে'র এক সমীক্ষা অনুসারে গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে নিচেকার ৫০ শতাংশ গৃহস্থের কোনই বিত্ত নেই। তার পরবর্তী ৫০ শতাংশ গ্রামীণ সম্পদের মাত্র ৭ শতাংশ ভোগ করে থাকে। গ্রামের মানুষের দৈনিক গড়পড়তা আয় হলো:—

সর্বনিম্ন	১ কোটি মানুষ	২৭ পয়সা
পরবর্তী	৫ কোটি মানুষ	৩২ পয়সা
পরবর্তী	৫ কোটি মানুষ	৪২ পয়সা

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার তথ্য অনুসারে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ১৩ ভাগ পরিবার—(যাদের সম্পত্তির মূল্য ১০ হাজার টাকা বা তার বেশি) গ্রামাঞ্চলে মোট সম্পত্তির শতকরা ৫৮ ভাগের মালিক।

"ভারত সরকারের ১৯৬৭ সালের বর্ষপঞ্জী অনুসারে ১৯৬২ সালের হিসাব মতো দেশের কৃষকদের মোট দেনার পরিমাণ ২,৩৮০ কোটি টাকা। শতকরা ৬৩ ভাগ কৃষক পরিবারই ঋণগ্রস্ত। আর এই দেনার প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে চাষী মহাজনদের কাছে আর এজন্য তাদের শতকরা ২৫-৩৭ হারে পর্যন্ত সুদ দিতে হয়।

আর শিক্ষা সম্প্রসারণ?

"৩ কোটি ৬০ লক্ষ অক্ষর পরিচয়হীন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯৫১ সাল অপেক্ষা ১৯৬১ সালে ভারতে অশিক্ষিতের সংখ্যা আরও বেশি ছিল। ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে আরও ২ কোটি লোক বেশি অশিক্ষিত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং অনেক শিক্ষা অভিযান সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটেছে।"

(এডুকেশন কমিশনের রিপোর্ট)

কিন্তু শিক্ষিতের হার, স্কুলের সংখ্যা, বই-খাতা, কলম-পেন্সিল বাড়লে কি শিক্ষা বাড়ে? এ কোন শিক্ষা? মেকলের নির্দেশিত পথেই তো দেশের শিক্ষা অনুগামী। বাংলা মাধ্যমের চেয়ে ইংরাজী মাধ্যমের সম্মান ও প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে চতুর্গুণ।

সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকারা হয়ত বলবেন, মুরশিদ রাজনীতি করতে শুরু করেছেন। কিন্তু মাপ করবেন, দেশের উন্নতি হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা মূলত রাজনীতির কথা। বুদ্ধদেববাবু রাস্তাঘাট, রেলপথ, স্কুল, সিনেমা দেখছেন কিন্তু মানুষকে দেখছেন না। বাউলদের ভাষায়ই বলতে ইচ্ছা হয় "কেউ সহজ মানুষ চিনতে পারে না।" দেশের উন্নতি হচ্ছে কি হচ্ছে না—একথাটা প্রমাণ করতে তথ্যের চেয়ে মানুষের মানদণ্ডে জীবনসত্যই বড় কথা। শহরের কালচার, আদব-কায়দা গ্রাম-গ্রামান্তরেও ছড়িয়ে পড়ছে, গ্রাম-শহরের আদান-প্রদান ইত্যাদি দ্রুত বেড়ে গেছে—ইত্যাদি উন্নতির লক্ষণ হিসাবে বুদ্ধদেববাবু বলছেন। অবক্ষয়ের উপসর্গ হচ্ছে তাঁর কাছে উন্নতির লক্ষণ। জনসাধারণের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন শহরের বুদ্ধিজীবীর গলিত 'কালচার' বাজারী বিবর সাহিত্য, হুল্লোড়ী সঙ্গীত, চোঙাপ্যান্টের আদব-কায়দা গ্রামে গ্রামে ছড়াচ্ছে—সংস্কৃতির কী 'বিকাশ!' আর এই বিকাশের সাথে পা ফেলে লোকসঙ্গীতেরও 'যুগান্তর' ঘটছে—মুরশিদ যদি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তবে মুরশিদ রক্ষণশীল, অবৈজ্ঞানিক ও সেকেলে।

অবশ্য জাতীয় জীবনের এই ভাঙনটাই একমাত্র সত্য নয়। তার বিপরীত ধারা হিসাবে সংগ্রামী বৈপ্লবিক চেতনাও ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—এবং সেই নবচেতনাই নবসংস্কৃতির যেমন ভিত্তি

রচনা করছে, লোকসঙ্গীতেরও রূপান্তরের মাটি তৈরি করছে। লোকসঙ্গীতে তার প্রভাব কিভাবে সক্রিয় হচ্ছে—সে আলোচনাও পরে মুরশিদ করবে। কিন্তু পত্রপ্রেরক এই নবসংস্কৃতির কথা বলছেন না—বিকৃতিই তাঁর কাছে সুকৃতি।

ইউরোপের মেট্রোপলিটান দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নে সত্যি লোকসঙ্গীতের বিকাশ অবরুদ্ধ, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়েছিল। ইউরোপের 'ফক্‌লোর' আন্দোলন সেই হারানো পথের অনুসন্ধানে প্রথমে অগ্রসর হয়। কিন্তু এর কারণ ধনতান্ত্রিক শিল্পবিকাশ, জাতিগঠন ও ভাষানীতি দায়ী। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রাশিয়াতে আমরা দেখি একদিকে দ্রুত শিল্পবিকাশ কিন্ত অন্যদিকে নাম-না-জানা—প্রায়লুপ্ত জাতিগুলির এবং বিশেষত মধ্য এশিয়ার অবজ্ঞাত জাতিগুলির নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর বিকাশ। সঙ্গে লোকসঙ্গীতের ও লোকনৃত্যের ছয়লাপ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটা বিপরীত কিন্তু সমাজতন্ত্রী শিল্পায়নের এই ধারা—বহু জাতি বহু ভাষার মুক্তির সাথে সাথে লোকসঙ্গীত 'ঘরবদল করে না' বরঞ্চ হারানো ঘরে ফিরে আসে। তাই অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বৎসর পরেও কলকাতার ময়দানে এসে আজারবাইজানের মাদাম মুলাজানোভা বা রশিদ বেবুটভ যখন গলা ছাড়েন—তখন আমাদের কানে সে দেশের লোকসঙ্গীতের খাঁটি প্রকৃতির প্রতিধ্বনি এসে লাগে। সমাজতান্ত্রিক বিকাশে যন্ত্রশিল্পের রূপটা যতই হবে আন্তর্জাতিক, সংস্কৃতির বিকাশের রূপটি ততই হবে জাতিমুখীন—লোকসংস্কৃতির বেলায় এটি আরো সত্য।

আমাদের দেশে কি ঘটেছিল? বৃটিশ উপনিবেশবাদের দৌলতে সেদিন পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর কাছে লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত ছিল অপাংক্তেয়। অনেক সম্পদ এভাবে আমরা হারালেও আমাদের দেশের লৌকিক সম্পদ এমনি ঐশ্বর্যশালী যে তা বিলুপ্ত হয় নি—যদিও অনেক ছোট ছোট উপজাতির গান আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাথে সাথে দেশের সাধারণ লোকের দিকে আমাদের নজর পড়লো। সেই আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি হিসাবে লোকসঙ্গীতের পুনরুদ্ধার আরম্ভ হলো। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে পুরোধা হলেও ৩০ সনের পর থেকেই নির্ভেজাল গ্রাম্য ভাষায় গ্রামগীতি আমরা শহরে শুনতে পেলাম। সেটাও কি সহজে হয়েছে? আব্বাসউদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—কি করে উত্তরবঙ্গের খাঁটি ভাষার ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড কোম্পানী করতে অস্বীকার করায় সেই গানটির ভাষা পরিমার্জিত করে তাকে গাইতে হয়েছিল এবং খাঁটি ভাওয়াইয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে কী প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছিল। ক্ষেত্র ছিল তখন প্রস্তুত তাই প্রথম খাঁটি লোকসঙ্গীতের রেকর্ড বের হওয়া মাত্র প্রচুর বিক্রি হয়ে যায়। তারপর কোম্পানী নাম-না-জানা অখ্যাত গ্রাম্য গায়কদের দিয়ে আনকোরা গ্রামগীতি রেকর্ড করাতে লাগলেন। টেপু মিঞা বা অনন্তবালা বৈষ্ণবীদের আমরা এভাবেই পেয়েছিলাম। এ সবেরই ক্ষেত্র তৈরি করেছিল সেদিনের ত্রিশোত্তর গণজাগরণ। কিন্তু তারপর বিশেষত গত মহাযুদ্ধের পর থেকে এলো স্টার মার্কা কমার্শিয়াল আর্টের যুগ। লোকসঙ্গীতেও স্টারমার্কায় ভদ্রপরিবেশন এলো। এসব সঙ্গীত হলো অর্ডার করা তৈরি পণ্য (ম্যানুফ্যাকচারড মিউজিক)। গ্রামোফোন, ছায়াছবি, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে পাবলিসিটির জোলুষে তা বাজারে হাজির করা হচ্ছে। এটা উপর থেকে সচেতনভাবে সংগঠিত। আজকের বিকৃতি বুঝতে হলে আমাদের এ কথাটা বুঝতে হবে। 'শিল্পায়নে' 'যানবাহনের বিস্তৃতিতে' কিংবা 'শিক্ষা সম্প্রসারণে' এ 'পরিবর্তন' আসে নি। এ 'ঘরবদল' নয় 'ঘর থেকে উচ্ছেদ'।

একটি সর্বভারতীয় সেমিনারে 'শ্রমিকশ্রেণী ও সংস্কৃতি' নিয়ে মুরশিদকেও অংশ নিতে হয়েছিল—সেখানে আলোচনায় এই দাঁড়ালো যে—বিষয়বস্তুতে নতুন চেতনা এলেও লোকসংস্কৃতির খাঁটি রূপটা শ্রমিকদের মধ্যে অটুট রয়েছে। মারাঠী, গুজরাটী, বিহারী প্রভৃতি জাতি অধ্যুষিত কারখানার অঞ্চলগুলিতে এদের আঞ্চলিক রূপটি অক্ষুন্ন রয়েছে। "শিল্পায়নে" তার রূপটি বদলায় নি। এদের মধ্যে ছায়াছবির গান স্বতন্ত্রভাবে জনপ্রিয় হয়েছে সত্যি কিন্তু কোনো পরব বা অনুষ্ঠান উৎসবে ওদের ট্র্যাডিশনাল গানের গায়ে তা আঁচড় কাটতে পারে নি। তবে কি ট্র্যাডিশন এক জায়গারই আটকে আছে? মোটেই নয়। আগেই বলেছি শ্রেণীসংগ্রাম-গণচেতনার ঢেউয়ে সে পরিবর্তন নিচু থেকে আসছে। এমনি এক স্বাভাবিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আনতে পেরেছিল ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলন। পরবর্তী এক প্রবন্ধে লোকসংস্কৃতির সেই পর্যায় সম্পদ আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

আজকে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অসুস্থ বিকৃত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আর এক সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের সময় এসেছে। আর সেই আন্দোলনের নমুনা ভারতের চারদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন আদিজাতি, উপজাতি, খণ্ডজাতি, তাদের ভাষার ও সংস্কৃতির স্বাধিকার নিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে অনাদৃত আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসঙ্গীতের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে ওরা। এটা সঙ্কীর্ণতা নয়—এটাই লোকসংস্কৃতির উদ্ধারের ও বিকাশের পথ। বারোবাজারী মিশ্রণ নয়—এই আঞ্চলিকতাই আজ লোকসঙ্গীতের অগ্রগতির ধারার পথ নির্দেশ করছে।

এখানে কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন সুদূর ভবিষ্যতে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে যখন গ্রাম ও নগরের পার্থক্য আর থাকবে না তখন লোকসঙ্গীতের কি অবস্থা হবে? এটা নিশ্চয়ই একটা আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু কি সেই সুদূর ভবিষ্যতের কথা বলছেন? মোটেই না। তাঁর লেখার উপরের উদ্ধৃতি থেকে যে কোন পাঠক বুঝতে পারবেন—আজকের কমার্শিয়াল বিকৃতির নর্দমাতেই "গতিশীল জীবননদীর তরঙ্গ" তিনি দেখছেন। তিনি যে এযুগের কথাই বলছেন তার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল, যুগান্তরের প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি নির্মলেন্দু চৌধুরীর প্রশস্তি গেয়েছেন। বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রচারে নির্মলেন্দু চৌধুরীর প্রথম দিকের অবদান মুরশিদ প্রস্তাবনা প্রবন্ধেই স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু কিভাবে তিনি হুল্লোড়বাজী শহুরে সংস্কৃতির বলি হন তারও ইঙ্গিত করেছিলেন। আমি কোনো বিশেষ শিল্পীকে দায়ী করতে চাই না বলেই—সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রেডিও, রেকর্ড ও শহুরে অনুষ্ঠানগুলি নিয়েই আলোচনা বেশি করেছি। কিন্তু তথাপি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যক্তিবিশেষকে টানতেই হয়। বিশেষ করে নির্মলেন্দু চৌধুরী আজ বাংলা লোকসঙ্গীতের বিকৃতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেটাই তাঁর আর্থিক সাফল্যেরও কারণ। তাঁর করা গ্রামোফোন রেকর্ডের অধিকাংশই ভবিষ্যৎ গবেষকের কাছে এ যুগে বাংলা লোকসঙ্গীতের বিকৃতির রেকর্ড হয়ে থাকবে। বুদ্ধদেববাবু যে সেই বিকৃতির একজন দার্শনিক তা থেকেই প্রমাণ পাই। অবশ্য বুদ্ধদেববাবু তাকে বিকৃতি বলছেন না—বলছেন "যুগ বদলের স্বাভাবিক রূপান্তর।" দুই মত—দুই শিবির—দুই লড়াই, এর মধ্যে সমঝোতার সুযোগ কোথায়? তবে বুদ্ধদেববাবু নিশ্চয়ই একথা এবার স্বীকার করবেন, মুরশিদ "ছদ্মনামের আড়ালে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে" নামেন নি। নেমেছেন লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক বড়ো নীতির লড়াইয়ে।

রঙ্গমঞ্চে ওদেশে ✻ শিল্পালি এবং এদেশে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ইংলিশ থিয়েটারঃ তাঁর নিজের ওপর অসম্ভব কাজের চাপ পড়াতে ১৯৩২-৩৩ সালের সিজনে পিটার গডফ্রে কেমব্রিজ ফেস্টিভ্যাল থিয়েটারের সঙ্গে গেইট থিয়েটারের একত্রীকরণ করলেন। কিন্তু এই যৌথ প্রচেষ্টা সাফল্য অর্জন করতে পারলো না। প্রথম নাটক এ্যাসলে ডিউকস্-এর 'ওয়ান মোর রিভার' দর্শকেরা নিল না। ডিসেম্বরে দর্শকসংখ্যা এত কম হতে লাগলো যে এই যুগ্ম প্রচেষ্টার ব্যবস্থাকে বাতিল করতে হোল। ঐ সময়ের সব ক'টি প্রডাকসনই আমি দেখেছিলাম—লিখেছেন নর্মান মার্শাল। এর ভেতর একটি নাটকই ভাল লেগেছিল—সেটি হচ্ছে ইবসেনের 'পিয়ার জিন্ট'—নাম ভূমিকায় ছিলেন গডফ্রে নিজে। এরপর উল্লেখযোগ্য প্রডাকসন হয়েছিল 'আঙ্কল টম্‌স ক্যাবিন'। কিন্তু ততদিনে পুরানো দর্শকশ্রেণীর গেইট থিয়েটার সম্পর্কে সব আগ্রহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সভ্য সংখ্যাও আগের একতৃতীয়াংশে নেমে এসেছিল।

থিয়েটারের এই ক্রমাবনতির জন্য গডফ্রেকে দোষ দেওয়া যায় না। নানারকম প্রতিকূল অবস্থার ভেতর ন' বছর ধরে তিনি গেইট থিয়েটারে নাটক ডাইরেক্ট করে এসেছিলেন। ক্রমাগত প্রোগ্রাম বদল করতে হোত তাঁকে—এইজন্য একটি বই মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে পরের নাটক মহলায় আনতে হোত। সুতরাং বিশ্রামের কোন অবকাশ তিনি পেতেন না—ছোট থিয়েটারে রোজগারও হোত না—সুতরাং লণ্ডনের দু'-একটি প্রডাকসনের পরিচালনার কাজ নিয়ে তিনি নিজের সংসার চালাবার টাকা রোজগার করতেন—মাঝে মাঝে ছবির স্ক্রিপ্ট লিখতেন এবং ছবির পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হোত অর্থোপার্জনের আশায়। তাছাড়া অভিব্যক্তিবাদী (এক্সপ্রেসেনিস্টিক) নাটকের প্রতিই তাঁর অন্তরের টান ছিল এবং এ-জাতীয় নাটক প্রডিউস করার ব্যাপারেই তাঁর সত্যিকার দক্ষতা ছিল। জীবনীমূলক, ঐতিহাসিক বা সূক্ষ্ম ভাবাবেগ সম্বলিত নাটক বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহ বিশেষ ছিল না। এ্যাব্-নরম্যাল নাটক তিনি যতোটা ভালভাবে বুঝতেন এবং দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করতে পারতেন, নর্ম্যাল নাটকের বেলায় সেভাবে প্রডাকসনে প্রাণসঞ্চার করতে পারতেন না। অভিব্যক্তিবাদী নাটক দেখবার আগ্রহও ইউরোপের লোকেদের কমে এসেছিল—লোকের মনের গতি বুঝতে পেরে যাঁরা এ-জাতীয় নাটক রচনা করতেন তাঁরাও লেখার মোড় ফেরালেন আবার বাস্তবধর্মী নাটক রচনার দিকে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝে পড়ে গডফ্রে যখন অস্থির হয়ে উঠেছেন, সেই সময়েই একদিন হঠাৎ আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়—সেই কাহিনীই এবার বলবো।

এরপর নর্ম্যান মার্শাল লিখেছেন—১৯৩৪ সালের বসন্তকালে একদিন বেশ বিষণ্ণ মনে আমি চেয়ারিং ক্রশ আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। একটা ফার্সের স্ক্রিপ্ট ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম—এটির ভেতর কোন হাস্যরসের খোরাক আমি খুঁজে পাই নি। অথচ আমাকে ভার দেওয়া হয়েছিল এটিকে প্রডিউস করবার। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা ছিল একজন বিশ্ববিখ্যাত টেনিশ খেলোয়াড়ের। আমি সেই সময় স্টোল ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গে এক বছরের চাকরির চুক্তি শেষ করেছি। এর মধ্যে ও'দের হয়ে এলাম্ব্রাতে 'এ কিস ইন স্প্রিং' নামে একটি ভিয়ানিজ মিউজিক্যাল কমেডী প্রডিউস করেছিলাম। যদিও এটি বিশেষ সাফল্য অর্জন করে নি, তবুও অনেকেই ধরে নিল

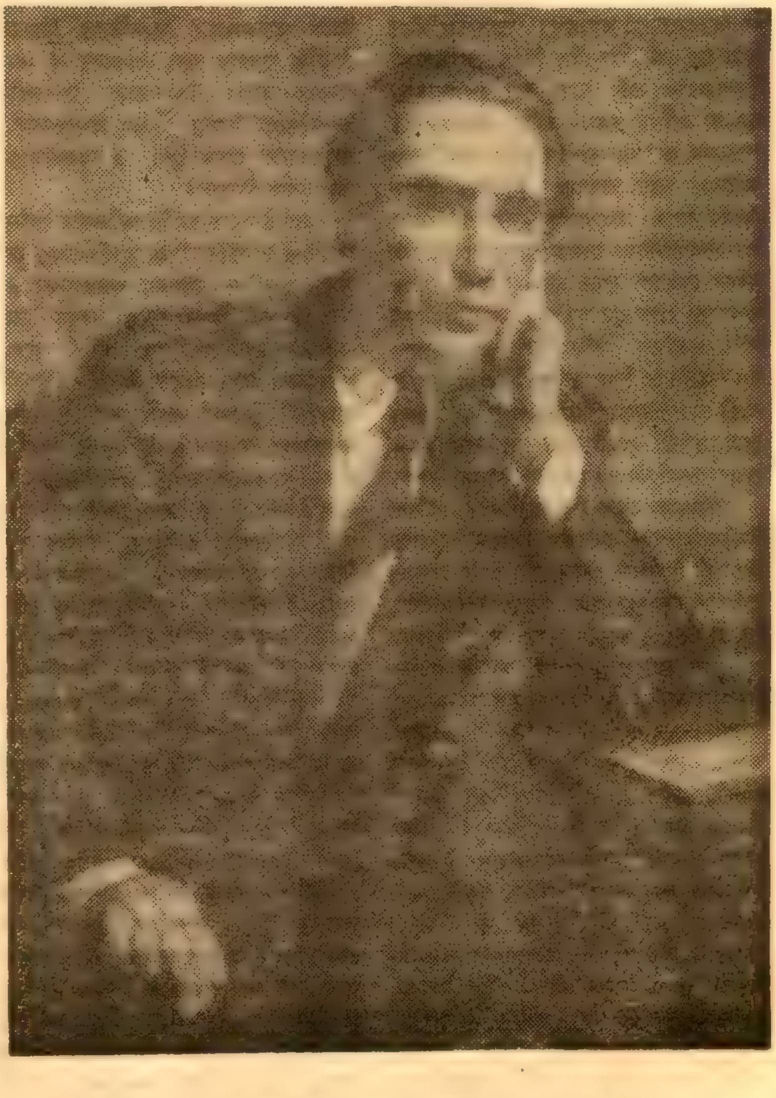

বিখ্যাত অভিনেতা ডোনাল্ড উলফিট্

জন আমি হচ্ছি ফার্স এবং কমেডীর প্রডিউসার। এ-জাতীয় প্লে ছাড়া অন্য কোনরকমের নাটক মঞ্চস্থ করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হোত না। এমন কি সানডে সোসাইটিগুলো পর্যন্ত আমাকে আসল নাটক পরিচালনা করবার জন্য ডাকতো না। তারা বলতো তারা যে শ্রেণীর নাটক মঞ্চস্থ করে সেগুলো ঠিক আমার লাইনের নয়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়েই দেখা হয়ে গেল পিটার গডফ্রে-র সঙ্গে। তিনি গেইট থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনিও আমার মতই বিষাদাচ্ছন্ন। তাঁর মুখে সে সময় সামান্যরকম উৎসাহের ভাব দেখলেও আমি মাথা নুইয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের গন্তব্যপথে চলে যেতাম। কিন্তু নিজের মনটা খারাপ থাকলে আরেকজন লোককে বিষাদমগ্ন দেখলে স্বভাবতই বোধহয় ইচ্ছা হয় ওঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলি। সুতরাং গডফ্রে-র সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম এবং কথায় কথায় নিজের মনের দুঃখের কারণটাও ব্যক্ত করলাম। আমার বক্তব্য শেষ হলে দেখলাম তিনি চিন্তিতভাবে আমার দিকে চেয়ে আছেন। শেষে বললেন—তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা আশার আলো যেন জ্বল-জ্বল করছিল—তুমি এই গেইটে থিয়েটারটা কিনে ফেল না কেন তাহলেই নিজের ইচ্ছামত যে-কোনও নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবে। গডফ্রে পকেট থেকে দুটি টাইপ করা কাগজ বের করে আমার হাতে দিলেন—তাতে গেইট থিয়েটারের নানাবিধ গুণাবলী এবং নাটক প্রডিউস করবার সুযোগ-সুবিধার কথা লেখা ছিল। এ থিয়েটারের মালিক হতে পারলে কত সহজে অল্প মুনাফা অর্জন করা যায় সেকথাও বিশদভাবে লেখা ছিল। কাগজ দুটি নিয়ে আমি চলে এলাম।

আমার অবশ্য বেশ ভালই জানা ছিল যে, এ সময় গেইট থিয়েটারে বেশ মন্দার ভাব চলছে। আগেকার গৌরব এবং সুনাম আর নেই—বাড়িটির অবস্থাও বেশ জরাজীর্ণ। অপরদিকে আবার একথাও সত্যি যে, পরের ভাড়াটে প্রডিউসার হিসাবে কাজ করে কোনদিনই আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো না। গডফ্রে যা বলেছেন অর্থাৎ গেইট থিয়েটার কিনে নিলে সেখানে আমি নিজের পছন্দমত নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবো। আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে না অন্যের ইচ্ছামত নিম্নশ্রেণীর নাটক প্রডিউস করবার জন্য—অর্থাৎ যেসব নাটক প্রতিষ্ঠিত পরিচালকেরা মঞ্চস্থ করতে রাজী হন নি। আমি ঠিক করে ফেললাম গেইট থিয়েটার লিজ নেব, তার তথাকথিত গুডউইল সহ।

থিয়েটার কেনবার খরচ, এটিকে পুনঃসংস্কৃত করা, সাজ-সরঞ্জাম কেনা এবং এক বছর চালিয়ে নতুন দর্শকদল তৈরি করতে মোটামুটি আড়াই হাজার পাউন্ড খরচা লাগবে বলে আমার মনে হল। অবশ্য এই টাকার অঙ্কটা খুব বেশি নয়—একটি সাদাসিধে ধরণের ওয়েস্ট এন্ড থিয়েটারের প্রডাকসনে এর থেকে বেশি ছাড়া কম খরচ হয় না। কিন্তু নিজস্ব টাকা বলতে আমার কাছে ছিল মাত্র দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড। আমার ভাই ইয়ান আমাকে আরও দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড দিল এবং তাকে আমি আমার 'গেইট থিয়েটার লিমিটেডের' অপর পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত করলাম।

বাকী দু' হাজার পাউন্ড কোথা থেকে যোগাড় করবো সে বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না। লন্ডনে থিয়েটারের লোকেদের এবং যারা টাকা দিতে পারে, সে জাতীয় কারোর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় ছিল না। যাদের কাছে গেলাম তারা বুঝিয়ে দিলেন গেইট থিয়েটারে টাকা খাটানোতে যথেষ্ট রিস্ক আছে।

কিভাবে টাকাটা পেতে পারি এ-বিষয়ে নানারকম উদ্ভট চিন্তা করতে করতে মনে পড়লো এবারডীনশিয়ারে আমার দুজন কাজিন থাকেন। তাঁরা আমাকে গেইট থিয়েটারের কাজের ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করবেন কি কারণে তা অবশ্য ভেবে ঠিক করতে পারলাম না—আমার মায়ের বিয়ের সময় এঁরা দুজন ব্রাইড্সমেইড ছিলেন একথা সত্যি—কিন্তু তার জন্য তাঁরা আমার থিয়েটারে টাকা ঢালবেন এটা তো আর কোন যুক্তি নয়। যাই হোক এক দীর্ঘ চিঠি তাঁদের লিখলাম—পরিষ্কারভাবে জানালাম যে, আমার থিয়েটারে টাকা ইনভেস্ট করলে সে টাকা লোকসান হবারই সম্ভাবনা বেশি। চিঠি পেয়েই তাঁরা উত্তর দিলেন এ ব্যাপারে তাঁরা খুবই উৎসাহী এবং দু-একদিনের ভেতরেই চেক পাঠিয়ে দিচ্ছেন—ওঁদের ওখানে রডোডেনড্রন ফুলগুলো এবার কত সুন্দরভাবে ফুটেছে চিঠিতে সে বর্ণনাও ছিল।

এই দুই মহিলাকে পরে গেইটের লোকেরা আদর করে ডাকতো "দি লিট্ল্ মিস্ গেইট থিয়েটার্স"। এঁরা ছিলেন গেইটের আদর্শ পৃষ্ঠপোষক। উভয়েই হাজার পাউন্ড করে চেক পাঠিয়ে দিয়ে গেইটের সঙ্গে তাঁদের মধুর সম্পর্ক স্থাপন করলেন। কখনও কোন উপদেশ দিয়ে তাঁরা আমাকে বিব্রত করতেন না, বিরূপ সমালোচনা করা দূরের কথা, নিজেদের টাকার কোনও রিটার্নও তাঁরা নিতে চাইতেন না। গেইটের সভ্য হিসাবে জোর করে চাঁদা পাঠিয়ে দিতেন। লন্ডনে এলে থিয়েটার দেখবার জন্য টিকেট কিনতে চাইতেন এবং অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে তবে তাঁদের একাজে নিরস্ত করতে পারতাম।

এরপর ভাবনার বিষয় হল কিভাবে সুযোগ্য বিজনেস ম্যানেজার, স্টেজ-ডিরেক্টার এবং স্টেজ ম্যানেজার যোগাড় করি। এই থিয়েটারে সত্যিকার কয়েকজন অভিজ্ঞ লোক ঐসব পদের জন্য পাওয়া মুস্কিল—কারণ এখানে কাজ কম নয়, অথচ সেই অনুপাতে মাইনে কম। এদিক দিয়েও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। কেমব্রিজ ফেস্টিভাল থিয়েটারের তিনজন লোক, যাঁদের সঙ্গে আমি আগে বেশ সৌহার্দ্যের সঙ্গে কিছুকাল কাজ করেছিলাম, প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা গেইটে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। এঁদের নাম হল এনিড কার্টার, স্কোবি ম্যাকেঞ্জি এবং মাইকেল মোরিস। গেইটের ভবিষ্যৎ খুব আলোকোজ্জ্বল নয়, একথা আমি তাঁদের আগেই বলেছিলাম। তাছাড়া এই সময়ে গেইট থিয়েটার যে তাঁদের বড় অঙ্কের বেতনও দিতে পারবে না, সেকথাও তাঁরা বুঝেছিলেন—কিন্তু এসব বাধাকে তাঁরা গ্রাহ্য করেন নি। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই আমার বিজনেস ম্যানেজার, স্টেজ ডিরেক্টর এবং স্টেজ ম্যানেজারের কাজ গ্রহণ করলেন। আমাদের চারজনে মিলে একটি চমৎকার দল তৈরি হল। ভাড়াটে অর্থাৎ যাঁরা হায়ারড হয়ে প্রডিউসারের কাজ করেন, তাঁদের নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়—

হিটলার-এর ১৫০তম অভিনয় উৎসব

সভানেত্রী— রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী

প্রধান অতিথি—মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য

বিশেষ অতিথি—মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাই ভট্টাচার্য

উৎসব উদ্বোধন করিবেন—প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

অভিনয়ে—"তরুণ অপেরার শিল্পীবৃন্দ"

মহাজাতিসদনে শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় অনুষ্ঠান ও সাড়ে ছয় ঘটিকায় অভিনয়।

ফোন : ৫৫-৭১২১

আজ এই থিয়েটারে, কাল অন্য থিয়েটারে, এইভাবে তাঁদের নাট্যপরিচালনা করে বেড়াতে হয় বিভিন্ন ম্যানেজমেন্টের অধীনে। প্রত্যেক নতুন জায়গায় নতুন স্টেজ ডিরেক্টর এবং স্টেজ ম্যানেজারের সংগে নিজেকে যে-করেই হোক খাপ খাইয়ে নিতেই হয়। অনেক সময়ের অপব্যয় হয় বৃথা প্রশ্নোত্তরে, আলোচনার আসরে এবং কি করা হয়েছে, কি হয় নি এই সবের খবরদারিতে। গেইটে আমরা চারজন পরস্পরের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এত ওয়াকিবহাল ছিলাম এবং পরস্পরকে এতোটা বিশ্বাস করতাম, যে-কোন প্রডাকসন করবার আগে অল্প কথাবার্তা এবং আলোচনা করলেই সুচারুভাবে কাজ সম্পন্ন হয়ে যেত। এ নিয়ে বৃথা সময়ের অপব্যয়ের কোন দরকারই হোত না।

যখন সবাই জানলো যে আমি গেইটের মালিকানা নিতে যাচ্ছি, কেউই আমাকে কোন উৎসাহ দেখান নি। বরং এই কথাই সবাই বলতেন যে গেইট শেষ হয়ে গেছে—যে উদ্দেশ্য নিয়ে এর সৃষ্টি, সেই উদ্দেশ্যটাই এখন অন্তর্হিত হয়েছে—সুতরাং এ থিয়েটারের আর দরকারটা কি! আমি যখন থিয়েটারের উদ্বোধন করলাম প্রথম সিজনের জন্য, তখন গেইটের সভ্যসংখ্যা কমতে কমতে ১২০০-তে দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু থিয়েটার খুলতেই ৫০০ জন চাঁদা দেওয়া বন্ধ করলো।

আমার প্রথম নাটক ছিল ম্যারী বেকার এডীর ওপর লেখা আরনেস্ট টোলারের 'মিরাকাল্ ইন আমেরিকা'—প্রধান ভূমিকায় ছিল জবোথী হোমস গোর। আমি যেমনটা ভেবেছিলাম আসলেও তাই প্রমাণিত হল—অর্থাৎ টোলারের নাটকের নির্বাচন সাফল্য লাভ করলো। এর কারণও ছিল—টোলারের নাটকের সংগে গেইট থিয়েটারের দর্শকদের আগে থেকেই যথেষ্ট পরিচয় ছিল—তাছাড়া এই নাটকটি যথেষ্ট তর্ক এবং আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। এই সিজনের দ্বিতীয় নাটকটির নির্বাচন বিষয়ে প্রত্যেকেই আমাকে বিরূপ মন্তব্য শোনালো। এটি ছিল জাঁ জাক্স বার্নার্ডের 'দি সাল্কী ফায়ার'। আমাকে অনেকে সাবধান করে দিয়ে বললো যে, গেইটের দর্শকদের পক্ষে এ নাটক অত্যন্ত বেশি সূক্ষ্ম এবং আলোড়নহীন। তাছাড়া বার্নার্ডের 'মার্টিন' নাটকের প্রডাকসন আগেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, গেইটের দর্শকেরা ঐ লেখকের নাটক মোটেই পছন্দ করে না। অথচ নাটকটি আমার নিজের খুব ভাল লেগেছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম নিজে থিয়েটারের মালিক হয়ে, যদি নিজের পছন্দমাফিক নাটক না স্টেজ করি, তাহলে থিয়েটার রাখার কোন মানেই হয় না। ঐ নাটকটিই মঞ্চস্থ করবার জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য ডোনাল্ড উলফিট্‌কে নিলাম। এবার আমার শুভানুধ্যায়ীরাও আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন আবার আমি আর একটি ভুল করে বসেছি। তাঁদের মতে উলফিটের অভিনয়ের স্টাইল এবং ব্যক্তিত্ব গেইটের মত ইন্টিমেট থিয়েটারের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপযোগী। তাছাড়া বার্নার্ডের লেখা সূক্ষ্ম শ্রেণীর নাটকের অভিনয়ও উলফিটের দ্বারা সম্ভব নয় বলেই এঁরা মনে করেছিলেন। কিন্তু উল্‌ফিট্ যথেষ্ট দক্ষতা এবং অনুভূতির সংগে গেইটের সংগে তাঁর অভিনয়ভঙ্গিকে খাপ খাইয়ে নিলেন। তাঁর চরিত্রাভিনয় হয়েছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সংযত। সবাই ভেবেছিল এ-নাটক জমবে না—কিন্তু 'দি সাল্কী ফায়ারের' বেশির ভাগ প্রদর্শনীতে প্রেক্ষাগার দর্শকে ভরে থাকতো।

[কোন্ নাটক কখন মঞ্চ-সাফল্য লাভ করবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। সাধারণ দর্শকদের শিক্ষার মান এবং কল্পনার বিস্তারের ওপরও অনেকটাই নির্ভর করে। সত্যিকার পেশাদারী থিয়েটারে এজন্যই রবীন্দ্রনাথের ভাল ভাল নাটক সু-অভিনয় সত্ত্বেও বেশিদিন চলে নি। সত্যিকার পেশাদারী থিয়েটার বলতে তাদের কথাই বলছি যাঁরা নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে শনি-রবিবার অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের হাল্কা নাটকগুলোই—যথা 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা'—পেশাদারী থিয়েটারে সাফল্য অর্জন করেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবার সংগে সংগে 'বিসর্জন', 'তপতী' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের ভাল ভাল স্ট্রেইট ট্র্যাজেডীগুলো নাট্যামোদীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং তখন পেশাদারী মঞ্চে এসব নাটকের নিত্য-নিয়মিতভাবে অভিনয় হবে।

আজকাল আর একটা মজা দেখছি—আমাদের পৌরাণিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে যেসব ট্র্যাজেডী একসময় বাংলা স্টেজে অভিনীত হোত সেগুলো যেন কিছুকাল ধরে মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। অথচ তার স্থান নিয়েছে ঈডিপাস, এ্যান্টিগোন প্রভৃতি গ্রীক ট্র্যাজেডী। এগুলোর অভিনয়ের কথা না-ই আলোচনা করলাম—কিন্তু সত্যিই কি এসব নাটক আমাদের দর্শক উপভোগ করে? এই প্রসংগে জুলিয়াস সিজার নাটকের নিম্নোক্ত সংলাপটি মনে পড়েঃ

Cassius—Did Cicero say anything?

Casca—Ay, he spoke Greek.

Cassius—To what effect?

Casca—Nay, an I tell you that, I'll never look you in the face again; but those that understood him smiled at one another and shook their heads; but for mine own part, it was Greek to me.

শুধু দর্শকদের কাছেই নয়, আমার তো বাংলায় গ্রীক ট্র্যাজেডী দেখে মনে হয়েছে নট-নটী, প্রডিউসার থেকে শুরু করে সবার কাছেই গ্রীক নাটক গ্রীক হিসাবেই অত্যন্ত বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। আজকাল নাকি পিরানদেল্লোর নাটকের অনুবাদ বা ভাবানুবাদও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে বোঝা মুস্কিল ঐ সব নাটকের নাট্যরস আমাদের মুগ্ধ করছে, না ম্যাজিকের দিকটা চুম্বকের মত আমাদের মনকে টানছে।]

[ক্রমশঃ]

রিস্ট ওয়াচ
মাত্র ৬, টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬, টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেটের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

গ্রন্থমেলা

ভারতীয় সাধনার ধারা : কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক ৩২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক—সংস্কৃত কলেজ; ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : দশ টাকা।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ সেই বিরলদৃষ্ট গবেষকদের অন্যতম যাঁরা সুদীর্ঘকালব্যাপী মূল্যবান গবেষণার মাধ্যমে একদিকে যেমন ভারতীয় সাধনার বহু বিস্মৃতপ্রায় দিক্-চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন, অপরদিকে তেমনি নতুন যুগের গবেষকদের জন্যে সাধনার নতুন নতুন ভিত গড়ে তুলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি গোপীনাথবাবুর এই উভয় প্রকার কৃতিত্বেরই এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। এখানে বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শনকে আলোচনার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্বে বৈষ্ণব সাধনা ও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের মর্ম ও বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত। পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের অনুসরণশীল ভারতবর্ষের চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়কেই আলোচনায় নেওয়া হয়েছে এখানে। একদিকে যেমন বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী শ্রীসম্প্রদায় ও দ্বৈতাদ্বৈত মতাবলম্বী হংস সম্প্রদায় স্থান পেয়েছে এখানে, অপরদিকে তেমনি দ্বৈতমতাবলম্বী ব্রহ্ম সম্প্রদায়ও শুদ্ধাদ্বৈত মতাবলম্বী রুদ্রসম্প্রদায়ও যথাযোগ্য গুরুত্ব লাভ করেছে। দ্বিতীয় পর্বে 'সহজযান ও সিদ্ধমার্গ' বিষয়ক আলোচনায় দেখান হয়েছে, সাধনা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে তান্ত্রিক মহাযান মতের স্থিতি কোথায় এবং তার সঙ্গে অন্যান্য মার্গের সম্বন্ধ কোথায়। আমাদের মনে হয়, এ-ধরণের আলোচনা ছাড়া ভারতীয় দর্শন ও ধর্মমতের বিকাশ—বিশেষত মধ্যযুগের সাধনা ও চিন্তার ইতিহাস—বোধগম্য হতে পারে না। প্রাচীন মহাযান থেকে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান প্রভৃতি যা কিছু উদ্ভূত হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকটির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কী এবং অন্যান্য ভারতীয় সাধনমার্গের সঙ্গে তাদের মিল ও অমিল কতখানি, তা জানা আজকের দিনের ঐতিহাসিকদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সুখের কথা, এই আবশ্যকতার দিকে লক্ষ্য রেখেই 'সহজযান ও সিদ্ধমার্গ' সম্পর্কে আলোচনায় এগিয়েছেন গোপীনাথবাবু এবং এই আলোচনার চারটি মাত্র অধ্যায়ে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য তিনি সরবরাহ করেছেন, এক কথায় তাকে রত্নগর্ভা চারটি মহাসমুদ্র আখ্যা দেওয়া যায়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, শুধুমাত্র তথ্য-সরবরাহ বা ঐতিহাসিক বিকাশ আলোচনাতেই লেখক তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখেন নি; তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ঐতিহাসিক বিকাশ আলোচনা করার পূর্বে তাদের তত্ত্ব-বিচার করেছেন, তত্ত্ববিষয়ক সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মূল সূত্রের ভেদাভেদ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তাদের ঐতিহাসিক উপাদান, বহিরঙ্গ অবয়বের ক্রমবিকাশ ও সমাজের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অংশের ওপর তাদের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তিনি।

এ-ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থটির তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ 'শাঙ্কর বেদান্ত ও অদ্বৈত প্রস্থান' পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের ক্রমিক বিবরণ-সহ শঙ্করাচার্যের সময় থেকে বর্তমানকালের নিকটবর্তী কাল পর্যন্ত অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থান লাভ করেছে। এই বিবরণী-প্রণয়ন এবং ইতিহাস-উদ্ধারেও গোপীনাথবাবুর অনন্যসাধারণ মনীষার পরিচয় সুস্পষ্ট। কী 'ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবকাল' বিষয়ক আলোচনায়, আবার কী শঙ্করাচার্যশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য বিষয়ক আলোচনায় সর্বত্রই অসাধারণ প্রতিভাধর মনীষী গোপীনাথবাবুকে খুঁজে পেয়েছি আমরা; এবং সব দিক মিলিয়ে দেখে আমাদের মনে হয়েছে, 'ভারতীয় সাধনার ধারা' এ-যুগের গবেষণা-সাহিত্যের এক স্মরণীয় নিদর্শন।

আরণ্য প্রেমকথা—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। কথাশিল্প, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৪·৫০।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ভারতের আদিম জাতি ও উপজাতির ওপর ইতিপূর্বে কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। নলিনীবাবুর গবেষণার মধ্যে বিশেষভাবে যে অঞ্চলটি পড়ে, সেটি পূর্ব ভারতে বিস্তারিত। তাঁর লেখা থেকে ইতিপূর্বে আমরা পূর্ব ভারতের আদিম জাতিদের আচার, আচরণ, সংস্কার প্রভৃতি জ্ঞাত হয়েছি। তবে একথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আদিম জাতিদের সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় আরো কিছু গ্রন্থ থাকলেও এবং সে ক্ষেত্রে নলিনীবাবুর গবেষণা নতুন আলোকপাত করলেও—বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের আগে অন্য কেউ আর আদিম জাতির প্রণয়কাহিনী উপহার দিতে পারেন নি। এ ব্যাপারে নলিনীবাবুর কৃতিত্ব প্রথম হিসেবে সগৌরবে উজ্জীবিত হবে।

পূর্ব ভারতের আদিম জাতির শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধেও কেউ কেউ ভুল ধারণা পোষণ করেন। তাই নলিনীবাবুর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, পূর্ব ভারতের সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে একমাত্র মণিপুরীদের নিজস্ব লিপি ও বর্ণমালা আছে। পূর্ব ভারতের অন্য কোনো আদিম জাতি নিজস্ব লিপি উদ্ভাবন করতে পারেন নি বলে এদের কোনো লিখিত সাহিত্য গড়ে ওঠে নি; কিন্তু এই সকল আদিম সমাজে লোকের মুখে মুখে যে সব রূপকথা ও প্রেমকথা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কোনো কোনোটি শ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত হবার দাবি রাখে।

'আম্বা ও থইবি', 'পঁচন সানাবা ও ইটিভেন', 'শাংকক ও লিকুনা', 'নারা ও খার্জীর', 'উ মানিক রাইটং ও মহাদেই', 'আদ্দিক ও গানেই' প্রভৃতি কাহিনীগুলির নির্বাচনের দ্বারা নলিনীবাবু প্রমাণ করেছেন যে সত্যিই এগুলি শ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত হবার দাবি রাখে। এবং বিশাল ভারতের সমগ্র সাহিত্যের পরস্পর পরিচয়দানের জন্য এগুলির অনুবাদ ও প্রচার করা উচিত। সাহিত্য অকাদেমিও এই কাজে সাহায্য দানে এগিয়ে আসতে পারেন।

সভ্যসমাজের সাহিত্যে প্রতিফলিত সভ্য মানুষের সংস্কার ও প্রচলিত ধারণার সঙ্গে হয়তো আরণ্য প্রেমকথার মিল নেই। কিন্তু হৃদয়ের ক্ষেত্রে, জিজ্ঞাসার জগতে এবং প্রকৃতির ভেতরে তারা যে বিশ্বাস বহন করে তা সভ্য মানুষকেও গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এই কারণে আমরা মনে করি, আরণ্য প্রেমকথা যথাযথ মর্যাদা লাভ করবে।

রঙ্গজগৎ

সংবাদচিত্র

খবরের কাগজের লেখায় ও ছবিতে দেশের মানুষ জানতে পারছে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভে জনগণের আনন্দের সংবাদ। সারা বাংলাদেশ এই আনন্দ-উৎসবে কিভাবে যোগ দিয়েছে তা কেবল ময়দানের সভাগুলিতে জনসমাগম ও বাজী পোড়ানোয় প্রকাশ হচ্ছে না; পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে মানুষের মধ্যে আশ্চর্য এক ধরনের আনন্দ দেখা যাচ্ছে। এমন আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, যা কয়েকদিন আগে দেখা যেত না। জনজীবনের এই নতুন রূপ ও আনন্দ-উৎসবের খবর পরিবেশনের দায়িত্ব কেবল সংবাদপত্রের নয়; সিনেমারও দায়িত্ব আছে। খবরের কাগজে মানুষ পড়ে জানতে পারে, সিনেমার চোখে দেখতে পায়। চোখের সামনে সারা বাংলাদেশের চেহারা ফুটে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে কিভাবে মানুষ নিজেদের প্রকাশ করছে তার প্রত্যক্ষ দৃশ্য দেখা যেতে পারে সিনেমায়; ময়দানের বড় বড় সভাগুলিতে যাঁরা যোগ দিতে পারেন নি—তাঁরাও অবস্থাটা বুঝতে পারেন যদি সিনেমায় সেই ছবি দেখান হয়, এসেম্বলির ভিতরের ব্যাপার দেখবার আগ্রহ সকলেরই আছে, কিন্তু একজন এম এল এ-কে ধরে পাশ সংগ্রহ করার সুযোগ এবং ধৈর্য কজনের আছে! কিন্তু সকলে এসেম্বলির মধ্যেকার ঘটনা দেখতে পারেন যদি চলচ্চিত্রে তা পরিবেশিত হয়। এসেম্বলির ভিতরে ছবি তোলার নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিশেষ বিশেষ সময়ে সে বাধা অপসারিত হতে পারে। কারণ আইন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য। ইউরোপ আমেরিকায় এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মানুষ ঘরে বসেই দেশের বৃহত্তর ঘটনাগুলি স্বচক্ষে দেখতে পারে টেলিভিশনের সাহায্যে। সেসব দেশে টেলিভিশনের ছড়াছড়ি। আমাদের গরীব দেশে টেলিভিশন এখনো চালু হয় নি। সুতরাং সে আশা করা যায় না। কিন্তু ভারত সরকারের এবং রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংবাদচিত্র বিভাগ রয়েছে। দেশের সভাসমিতি এবং নানা খবর এই বিভাগগুলি চলচ্চিত্রে পরিবেশন করে থাকে। প্রতিটি সিনেমায় তথ্য ও সংবাদচিত্র দেখান বাধ্যতামূলক। সিনেমাতে তথ্য ও সংবাদচিত্রগুলি দর্শকরা দেখে থাকেন, তবে খেলার সংবাদচিত্র ছাড়া অন্য ছবি-গুলি দর্শকদের তেমন উৎসাহিত করে না। এ কারণে অনেকে বাইরে সময় কাটিয়ে মূল কাহিনীচিত্র শুরু হবার সময় হলে ঢোকেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি তথ্য ও সংবাদচিত্র বিভাগ আছে। জানি না, ময়দানের সভা দুটির ছবি এই বিভাগ তুলেছে কি না, সারা পশ্চিমবঙ্গের গত এক মাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা, মিছিল ইত্যাদির ছবি কি এই তথ্য বিভাগ গ্রহণ করেছে, তবে এমনভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত যাতে সারা পশ্চিমবঙ্গের একটা নিবিড় ছবি অনুভব করা যায়। কেবলমাত্র মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ আর রাইটার্স বিল্ডিংসে দপ্তর গ্রহণ যথেষ্ট নয়, মানুষে চায় যথার্থ সংবাদচিত্র। সংবাদপত্রে ভাষার সীমাবদ্ধতায় যা সম্ভব নয়, মানুষ চায় তাকে চোখে দেখতে। এখানেই ভিসুয়াল মিডিয়ামের যথার্থতা; এবং রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংবাদচিত্র বিভাগ রাখার সার্থকতা। কলকাতাতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও এক তথ্য ও সংবাদচিত্র বিভাগ রয়েছে। তাঁরা চিত্র গ্রহণ করে সে চিত্র কেন্দ্রে পাঠান; সেখান থেকে সারা ভারতে পরিবেশিত হয়। এই বিভাগ যদি যথার্থভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং সকল রাজ্যের সিনেমাতে পরিবেশনের সম্মতি কেন্দ্রীয় দপ্তরের হয়ে থাকে তা হলে সারা ভারতের মানুষ দেখতে পাবে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলী। কিন্তু কার্যত দেখা যায় ফিল্ম ডিভিশনের ছবিগুলিতে কেবলমাত্র কংগ্রেস সরকারের প্রচারমূলক সংবাদ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কাজেই ওদিক থেকে বেশি আশা করা না গেলেও, রাজ্য সরকারের সংবাদচিত্র বিভাগের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যথার্থ সংবাদচিত্র পরিবেশন আশা করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান ঘটনাবলী মানুষ নিজ চোখে দেখতে চায়; কেবল টুকরো টুকরো ঘটনা নয়, ভালভাবে সম্পাদিত এমন ছবি যাতে ঘটনার ধারাটি বোঝা যায়। তথ্য ও সংবাদচিত্র বিভাগ এভাবে যথার্থ তথ্য পরিবেশন করতে সমর্থ হলে সকলে খুশি হবে।

—সুজন।

সুচিত্রা মিত্র

সঙ্গীতকথা

সুরসভার বসন্তোৎসব

গত ৯ই মার্চ বিড়লা একাডেমীতে দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা সুরসভার বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হল। রথীন চৌধুরীর পরিচালনায় "ফাগুনের হাওয়ায় রঙে রঙে" গানটি দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল সুচিত্রা মিত্রের একক সঙ্গীত। তিনি পর পর কয়েকটি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর আনন্দ বর্ধন করেন। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন পূর্বা সিংহ, সুমিত্রা বসু, অপর্ণা সরকার, মিলা দে শীল, আরতি দত্ত, পলি ভট্টাচার্য, রত্না রায়চৌধুরী, রমা ভট্টাচার্য, প্রগতি রায়, শিপ্রা ঘোষ, জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, মমতা ঘোষ, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, শ্যামলী বেদজ্ঞ, রঞ্জিতা চক্রবর্তী, সবিতা হালদার, পুতুল বসাক, নন্দ গুপ্তরায়, ইন্দ্রাণী দে, শিবানী সেন, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু চক্রবর্তী, রবীন মুখোপাধ্যায়, বাণী বসু, চন্দনা সেনগুপ্ত, আলোক বসু ও তপন রায়চৌধুরী।

চৌধুরী।

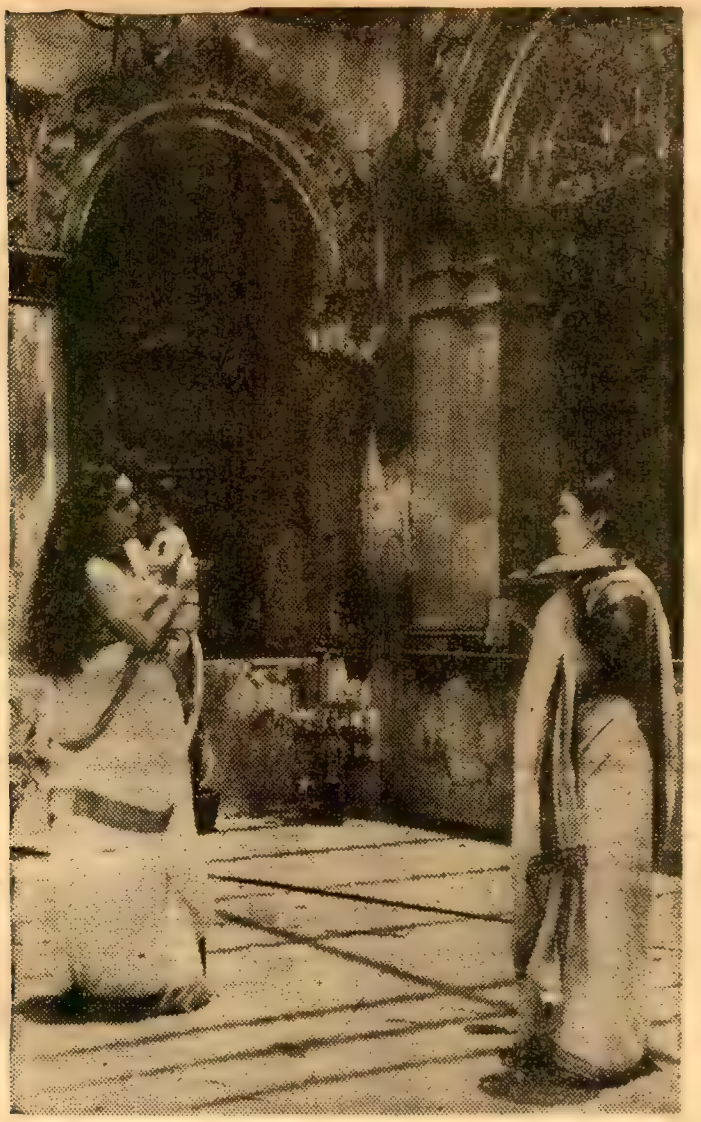

[illegible]র চৌধুরী পরিচালিত 'মৌসুমী মন' ছবিতে শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শোভা দাস।

সিনেমার মুক্তি প্রতীক্ষায়। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যকাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। পরিচালনা করেছেন 'চিত্র সাথী' নাম নিয়ে একদল টেকনিশিয়ান। সংগীত পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচী ও নচিকেতা ঘোষ। চিত্র গ্রহণ করেছেন রামানন্দ সেন। চরিত্র রূপায়ণে অংশ গ্রহণ করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, সবিতাব্রত দত্ত, মণি শ্রীমানী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সমরকুমার, মাঃ শঙ্কর, বিদ্যুৎ রাও, লতিকা দাশগুপ্ত, তপতী বর্মণ প্রমুখ।

অরণ্যের দিনরাত্রি

সত্যজিৎ রায়ের গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর কাজ শেষ হয়েছে। তিনি আর একটি নতুন ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। এবার তাঁর নতুন ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' অবলম্বনে। বহির্দৃশ্যপ্রধান ছবির দৃশ্য গ্রহণের জন্য শ্রীরায় ডাল্টনগঞ্জ গিয়েছিলেন। আগামী মাসের ১৫ই থেকে একনাগাড়ে দেড় মাস চিত্র গ্রহণের কাজ হবার কথা। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে থাকছেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শমিত ভঞ্জ, শর্মিলা ঠাকুর, সিমি (বোম্বাই)। সঙ্গীত পরিচালনা শ্রীরায় নিজেই করবেন।

স্টুডিও খবর

মধুমিতা

পরার প্রোডাকসনের প্রথম ছবি। মধুমিতার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ছবিখানি পরিচালনা করছে 'অগ্নিমিত্র' নামের আড়ালে কয়েকজন টেকনিশিয়ান। সম্প্রতি এ'রা রাঁচী থেকে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, আরতি ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, জহর রায়, রবি ঘোষ, শিপ্রা মিত্র, অপর্ণা দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবাগত শক্তিপদ কর্মকার।

শেষ থেকে শুরু

শেষ থেকে শুরু'র চিত্ররূপদানের কাজ শেষ হয়েছে। ছবিটি এখন রাধা ও পূর্ণ

বৃহ, শনি ৬॥
রবি, ছুটিতে
৩ ও ৬॥
বিশ্বরূপা
নতুন নাটক
ঘর
রূপায়ণে : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, কালী ব্যানার্জী, কণিকা মজুমদার, সর্বেন্দু, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, সুলেখা দে, সমরেশ ব্যানার্জী, অনুপকুমার ও আরো অনেকে।

বারীন সাহার 'তের নদীর পারে' ছবির নায়িকা প্রিয়ম হাজারিকা

যাদু ছবিতে বিকাশ রায় ও সন্ধ্যা রায়

নাটকের কথা

তরুণ অপেরার নতুন নাটক

তরুণ অপেরার 'হিটলার' পালার অভাবনীয় সাফল্যের পর আরো কয়েকটি জীবনী নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরবর্তী দুটি পালা নাটক 'রাজা রামমোহন' এবং 'নেপোলিয়ান'। প্রথমটির নাট্যরূপ দিয়েছেন সৌরেন চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়টির নাট্যরূপ দিয়েছেন শম্ভু বাগ।

জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ

গত ৮ই মার্চ বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে মনোজ মিত্রের জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ অভিনীত হয়েছে মাইসেসিস-এর উদ্যোগে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছে উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, মঞ্জুলা সেন, শক্তি বিশ্বাস, সিদ্ধার্থ দত্ত, অশোক সরকার প্রমুখ,

সংবাদকণা

শিশু স্বর্গ

শিশু স্বর্গের নিয়মিত আসরের অনুষ্ঠান বসবে মহাজাতি সদনে রবিবার (২৩শে মার্চ) সকাল ন'টায়। এদিন চলচ্চিত্রে "বাঘা যতীন" দেখান হবে।

পূর্ব-জার্মান ছবি

সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ও ইন্দো-জি ডি আর ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এ মাসের ১৯ থেকে ২১ ও ৩০ তারিখে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ও ম্যাজেস্টিক প্রেক্ষাগৃহে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চারটি ছবি দেখানো হবে। ছবি চারটি হল 'ম্যারেজ অফ ফিগারো', 'স্টারস', 'সাইলেণ্ট প্ল্যানেট' ও 'নেকেড অ্যামিডস্ট উলভস'। এ ছাড়া সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা এ মাসের ৩১ তারিখে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে চার্লি চ্যাপলিন কৃত চারটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখাবে

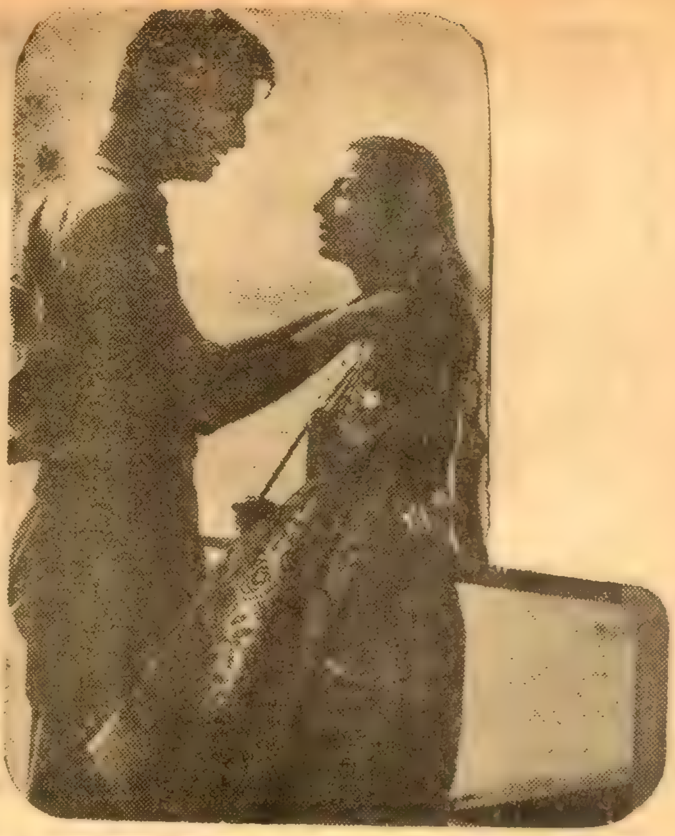

'তিন ভুবনের পারে' ছবির একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চ্যাটার্জী ও তনুজা

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

আগামী ২৩শে মার্চ ছায়া সিনেমায় সকাল ৯॥টায় নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের ছবি 'স্টার' দেখান হবে। কেবলমাত্র সদস্যদের প্রবেশাধিকার আছে।

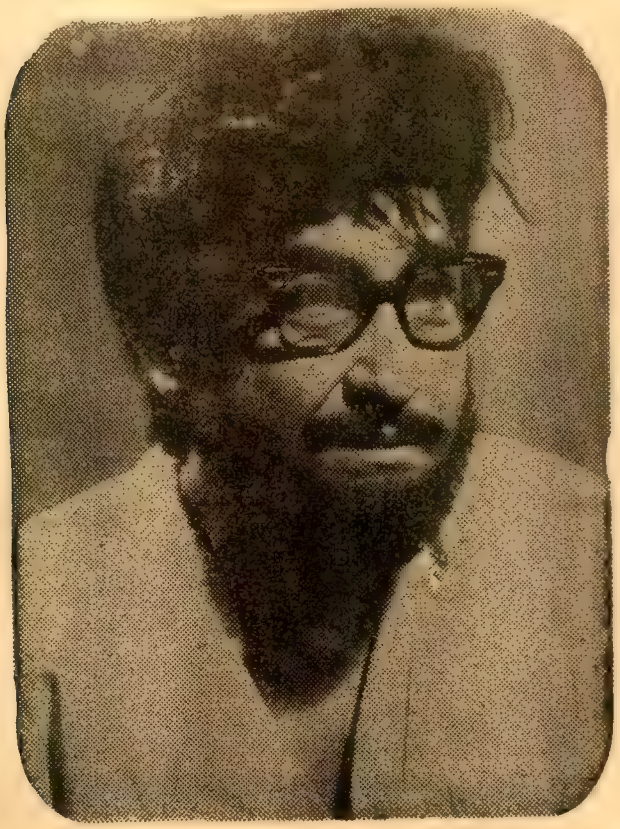

হৃষীকেশ মুখার্জীর 'আশীর্বাদ' ছবিতে অশোককুমার

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবলিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল-

গুরুগণ—ইংরেজ? একবার পেলে হর-মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড :

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অভিনন্দন ॥ ডিউক আর পিনাকী এখন অভিনন্দনের ঠেলায় অস্থির। অভিনন্দন আর অভিনন্দন। সমুদ্রের ঢেউ পেরিয়ে এখন যে ওরা এসে হাজির হয়েছে উদ্বেলিত জনসমুদ্রের ঢেউ-এর মাঝখানে। সে ঢেউ-এ নেই আভিজাত্যের ছাপ, নেই আন্তরিকতার আতিশয্য। জনগণের চোখে ডিউক আর পিনাকী আজ 'হিরো'। আর সেই হিরোদের অভিনন্দন জানাতে, হিরোদের দেখতে আর সেই হিরোদের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করতে শুধু শহর কলকাতাই নয়, সমস্ত বাংলাদেশই আজ গুলজার। অবশ্য ঐ হিরোদের একজন ইতিমধ্যেই বলে বসেছেন, কলকাতাটা বোগাস... তা তো বটেই। কলকাতা তথা বাংলাদেশের লোক যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনই শুধু জানাতে চেয়েছেন। প্রতিদানে কিছুই চান নি, বড় জোর হিরোদের একটু দেখতে। কিন্তু ঐ দেখতে চাওয়া আর অভিনন্দন জানাবার ঠেলায় অস্থির হয়ে ডিউক কি সত্যি সত্যি ভুল বুঝলেন আমাদের? আন্তরিকভাবেই তিনি যদি বলে থাকেন 'কলকাতাটা বোগাস' তাহলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। ডিউক আর পিনাকী এর পর অনেক রাষ্ট্রীয় খেতাব, অনেক পদবী, অনেক অভিনন্দন পাবেন। হয়তো বা দেশ-বিদেশে ভি আই পি হয়ে যাবার সুযোগও খুব শীঘ্রই আসবে। কিন্তু জনতার এই আন্তরিক আনন্দাভিনন্দনের কাছে সত্যিই সে-সব কিছু নয়। যাক সে কথা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের সমালোচনা না করে আমরা পারছি না। ডিউক আর পিনাকীর দমদম বিমান বন্দরে আসার খবর প্রচারে প্রচারে ছয়লাপ হওয়ায় শহর ভেঙে, স্কুল-কলেজ ছেড়ে লোক আর ছাত্র-ছাত্রীরা সেদিন গিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিমানবন্দরে। উদ্দাম যৌবনে দুরন্ত ছেলেরা কোন বাধা না মেনে ঢুকে পড়েছিলেন বিমানবন্দরের মধ্যে। রানওয়ের ওপর হাজার হাজার মানুষ করেছিলেন ছুটোছুটি। সিগারেট-বিড়িও বাদ যায় নি! কিন্তু ঐ সামান্য কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে কতো বড় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারতো, কতো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো—তা বোধহয় কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। আমাদের ভাগ্য ভালো যে বিশেষ কিছু হয় নি। শুধু গেছে একটি কিশোরের প্রাণ। আজ এই আনন্দের দিনে এই নিরানন্দ খবরে সকলেরই মন চঞ্চল। ঐ কিশোরের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? কটি সংবাদপত্রের প্রচণ্ড প্রচার আর......। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কি বলেন। যাই হোক ডিউক আর পিনাকীকে আমরা এর আগেও অভিনন্দন জানিয়েছি—এবারও সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে তাঁদের জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক বিজয়াভিনন্দন। ডিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ...! শান্তিপ্রিয় ॥

খুশীবলে-খুশীবলী

এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির খেলায় বাংলা যে খুব একটা ভালো খেলবে একথা আজ আর যাই হোক হলপ করে কিছুতেই বলা যায় না। বাংলা দলের খেলার ফলাফল কিম্বা খেলার ধারা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়াই বাতুলতা। কারণ যে দলের জন্য ম্যানেজার খুঁজে পান না কর্তৃপক্ষ, কিম্বা যে দলের অধিনায়ক সময়ের ভুলের জন্যে দলের সঙ্গে যেতে পারেন না—সেই দলের সাফল্য সম্বন্ধে বেশি কিছু আশা না করাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ।

সত্যি কথা বলতে কি, বাংলা এবার তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে যেতে পারে নি। অনেক নামী আর দামী খেলোয়াড়রা এবার দলের সঙ্গে যেতে পারেন নি, যেতে চান নি আবার, কেউ যাবার সুযোগ পান নি নিয়ম-শৃঙ্খলা না মানার জন্যে।

বাংলার এই দুরবস্থার কথা চিন্তাও করা যায় না। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে বাংলার খেলোয়াড় আর ফুটবল কর্তৃপক্ষের এমন শোচনীয় হাল হলো কি করে! বাংলা দেশের ফুটবল কর্তৃপক্ষের কৃপায় ফুটবল খেলা কি এবার সত্যি-সত্যিই চরম অবহেলার পর্যায়ে পৌঁছুতে চলেছে?

গত কয়েক বছর সন্তোষ ট্রফি জিততে না পারলেও ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের কথা অনস্বীকার্য। ক্রিকেটে যেমন বম্বে, ফুটবল খেলায় আজো তেমনি বাংলার স্থান ভারতীয় ক্রীড়াজগতে সবার ওপর।

আর আজ সেই ফুটবল খেলা নিয়েই বাংলাদেশে হচ্ছে ছেলেখেলা। এই বিষয়ে দেখা যাচ্ছে খেলোয়াড় আর কর্তৃপক্ষরা একই সূত্রে বেঁধেছেন প্রাণ। কি করলে বাংলাদেশের খেলার মান আরো উন্নত হয়, কি করলে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলার সম্মান অম্লান থাকে, সেদিকে নজর নেই কারো। কেউ ফিরেও তাকান না সেদিকে। ক্লাবসর্বস্ব স্বার্থেভরা কর্তৃপক্ষ আর খেলোয়াড়দের কৃপায় ফুটবল খেলায় বাংলার স্থান দিন দিন নেমে যাচ্ছে—সব জানা সত্ত্বেও সে-দিকে নজর দেবার প্রয়োজন আজ আর কেউ বোধ করেন না। এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে।

আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের সবার ওপরে থাকে দেশ. তারপর রাজ্য আর সব শেষে নিজের ক্লাব। কিন্তু আমাদের দেশে সব উল্টো। খেলোয়াড় আর কর্তৃপক্ষের কাছে ক্লাবের স্থানই সবার ওপরে।

তাই যা হবার হয়ও ঠিক সেইরকমই। ক্লাবের স্বার্থ দেখতে গিয়ে খেলোয়াড়রা ভুলেই যান নিজের রাজ্যের কথা, নিজের দেশের কথা। দল বদলের খাতায় নাম লেখাবার জন্যে তাই খেলোয়াড়রা শারীরিক অসুস্থতা কিম্বা অন্য কোনরকমের অজুহাত দেখাতে এতোটুকুও ইতস্তত করেন না।

করবেনই বা কেন! দল ত্যাগের পেছনে যে থাকে অনেক বড় প্রলোভন......!

যাক সে কথা। এবারের সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা কেমন খেলছে আর বাংলা কি রকম খেলবে সেইটাই প্রশ্ন। তবে যতোদূর মনে হয় যে ভাগ্য যদি খুব একটা খারাপ না হয় তাহলে বাংলা অন্তত ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠতে পারবে। তবে শেষ পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফি জিততে পারবে কি না কে জানে। আর আজ এই মুহূর্তে সে প্রশ্ন বোধহয় না তোলাই ভালো। তবে বাংলা যদি এবার সন্তোষ ট্রফি ফিরে পায় তাহলে আনন্দের বিষয় আর কিছুই হবে না!

এখন শুধু আন্দামানেই নয়—ডিউক আর পিনাকী এখন পৌঁছে গেছেন শহর কলকাতাতেই। . নিঃসঙ্গ সাগরের দুরন্ত ঢেউ-এর ওপর দিয়ে আজ তাঁরা এসে হাজির হয়েছেন জনসমুদ্রের ঢেউ-এর মাঝখানে। শুধু অভিনন্দন আর অভিনন্দন—অভিনন্দনের ঠেলায় অস্থির ডিউক আর অভিনন্দনের আন্তরিকতায় হতবাক পিনাকী......!

ইংলণ্ডের পাকিস্তান ভ্রমণ শেষ পর্যন্ত বা নচাল হয়ে গেছে। অগ্নিগর্ভ পাকিস্তানে খেলার মাঠও বাদ যায় নি জেহাদের হাত থেকে। ফলে খেলার মাঠে প্রতি দিনই ঢুকে পড়ছিলেন হাজার হাজার দর্শক। কখনো তাঁরা হানিফ আর সইদের সেই পুরোন মন কষাকষি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন একে অপরকে। আবার কখনো তাঁরা খেলা চলতে দেবেন না বলে পীচ নষ্ট করেছেন, আগুন লাগিয়েছেন। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা দেশে ফিরে গিয়ে বলেছেন, পাকিস্তান ভ্রমণের কথা তাঁরা কোন দিনই ভুলতে পারবেন না।

ক্রিকেটের খবর

অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩—১ টেস্টে পরাজিত হয়ে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি হারানোর পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবার হারলো নিউজিল্যাণ্ডের কাছে। ওয়েলিংটনের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে নিউজিল্যাণ্ড ৬ উইকেটে হারিয়ে দিলো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

প্রথম টেস্টে অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজই [illegible]লো। তাই খেলার ফলাফল এখনো সমানই রইলো। তবে নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এটি দ্বিতীয় পরাজয়। এর আগে ১৯৫৬ সালের অকল্যাণ্ড টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড হারিয়ে দিয়েছিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই পরাজয় নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। এমনটি যে হতে পারে—তা কল্পনাও করা যায় নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নামকরা সব ব্যাট্‌সম্যানরা যে এমন অসহায়ের মতো আউট হয়ে যাবেন তা কে ভেবেছিলো?

শুধু তাই নয়, বিশ্বের অন্যতম দুর্বল দল নিউজিল্যাণ্ড খেলা শেষ হবার ১৯৪ মিনিট আগেই মাত্র ৪টি উইকেট হারিয়ে জয়লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় রান তুলে ফেললো। অথচ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাঘা বাঘা বোলাররা অসহায়ের মতো নিজেদের হারতে দেখলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার মান যে কোথায় নেমে যাচ্ছে বা নেমে গেছে তার কিছুটা আঁচ পাওয়া গেলো নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে করেছিল ২৯৭ রান। এর উত্তরে নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হলো ২৮২ রানের মাথায়। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাট্‌সম্যানরা দিলেন চরম ব্যর্থতার পরিচয়। মাত্র ১৪৮ রানে শেষ হয়ে গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস।

মাত্র ১৬৪ রান করতে পারলেই নিউজিল্যাণ্ড জিতবে এমন অবস্থায় খেলা শুরু করে খেলার শেষ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির ৪৫ মিনিট পরে নিউজিল্যাণ্ড ৪টি উইকেট হারিয়ে তুলে ফেললো প্রয়োজনীয় রান—১৬৬ রান করলো তারা দ্বিতীয় ইনিংসে। ফলে ৬ উইকেটে হেরে গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ।

তবে এই টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্পিন বোলার ল্যান্স গিবস দু'শ' উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের কিছু আগে বি, ইউল, গিবসের বলে এল. বি. ডব্লিউ হয়ে আউট হয়ে যাওয়ায় গিবস লাভ করেন তাঁর দু'শততম উইকেট।

যাই হোক ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই পরাজয় ক্রিকেট-রসিকদের বিস্ময়ে হতবাক করেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ খুঁজতেই আজ তাঁরা হয়রান। কি হলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের? কেন তাদের এই পরাজয়...?

সমাচারদর্পণ

এবারের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব লাভ করে চ্যাম্পিয়ানশীপ। গত তিন বছরের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে দলের সংগে প্রথম দিনের খেলা ১—১ গোলে শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় সেন্টার ফরোয়ার্ড বলদেব

সোবার্সের সংগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের একটু যেন মতবিরোধ হয়েছে বলে মনে হয়। মতভেদের কারণ, আগামী ইংলণ্ড সফরের জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড় নির্বাচন। সোবার্স ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই সফরে যেতে পারবেন কি না, কিম্বা গেলেও ক্যাপ্টেন হবেন কি না সে বিষয়ে এখন দেখা দিয়েছে ঘোরতর সন্দেহ। সোবার্স ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এখন একেবারেই কানা—একথা আজ সবাই জানেন। জানেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কর্তৃপক্ষ, জানেন খেলোয়াড়রাও। তাই শেষ পর্যন্ত এই মতবিরোধের শেষ পরিণতি কি হয় তা দেখার জন্যে সমস্ত বিশ্বের ক্রিকেট রসিকরা উন্মুখ হয়ে আছেন।

সিং-এর দেওয়া একমাত্র গোলে পাঞ্জাব লাভ করে বিজয়ীর সম্মান। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ৪০ বছরের ইতিহাসে পাঞ্জাব ফাইন্যালে উঠেছে ১৩ বার. এর মধ্যে ১০ বার তারা লাভ করেছে চ্যাম্পিয়ান হবার সম্মান।

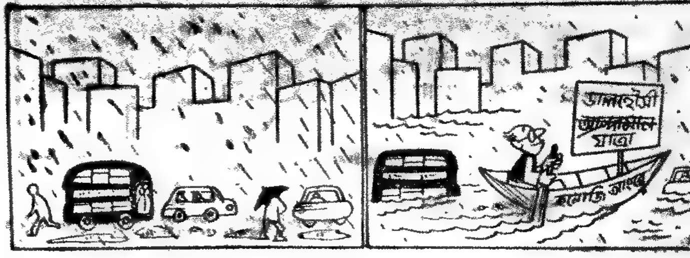

* * *

ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশন ছ'জন সাঁতারুর নাম ঘোষণা করেছেন, যাঁরা আগামী ২৮শে মার্চ দ্বিতীয় পক প্রণালী সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন। ১৬ জন প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে ছ'জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সিংহলের টালাইমাননার থেকে সাঁতার আরম্ভ হবে ৩৬·৮ কিলো মিটার দূরে মাদ্রাজের ধনুস্কোটিতে শেষ হবে তবে সামুদ্রিক অসুবিধার জন্যে সাঁতারুদের ৪৫ কিঃ মিঃ অতিক্রম করতে হবে। গত বছর বৈদ্যনাথ নাথ এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এবারের প্রতিযোগী ছ'জন সাঁতারু হলেন—এন ভৌমিক (২৮ বছর), এ· বি সারাংগ (২৫ বছর), বৈদ্যনাথ নাথ (২৪ বছর) সকলেই রেলওয়ে। ভি· জে· জন (২২ বছর) সার্ভিসেস। আর আর ধর (২০ বছর) ত্রিপুরা ও ভি· এম· মার্চেণ্ট (২৪ বছর) মহারাষ্ট্র।

* * *

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় ভারত মিলিত হবে সিংহলের সংগে। আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭শে মার্চ কলোম্বতে অনুষ্ঠিত হবে এই খেলা। কলকাতার সুব্রত বসু ভারতীয় দলের ম্যানেজার ও নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন মনোনীত হয়েছেন। ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়রা হলেন—আর কৃষ্ণান, এস· পি· মিশ্র, গৌরব মিশ্র ও আনন্দ অমৃতরাজ।

* * *

গত অক্টোবর মাসে মেক্সিকো অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সময় সব থেকে সুন্দরভাবে খবর পরিবেশন ও মনোজ্ঞ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার জন্যে কেনিয়ার দৈনিক পত্রিকা ইস্ট আফ্রিকান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক মেনেথ বলটন অলিম্পিক রৌপ্যপদক লাভ করেছেন। পত্রিকাটি নাইরোবী থেকে প্রকাশিত হয়। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের পত্রিকাগুলোর অলিম্পিক সংবাদ পরীক্ষা করে দেখার পর বিচারকগণ কেনিয়ার পত্রিকাটিকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন।

গল্প হলেও সত্যি

১৯০৯ সালের কথা।

জ্যাক হবস তখন ইংলণ্ডের টেস্ট দলের নতুন খেলোয়াড়। ইংলণ্ড দলের নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে হবসের স্থান তখনও হয় নি।

সেবার অস্ট্রেলিয়া এসেছে ইংলণ্ড ভ্রমণে। লীডসের তৃতীয় টেস্টে চান্স পেলেন হবস। ঐ টেস্টের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছিলো তাঁর ভবিষ্যৎ। কিন্তু হবস তখনও ছিলেন গ্রেটেস্ট স্পোর্টসম্যান। আর তারই পরিচয় পাওয়া গেলো এই খেলায়।

ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করে হবস একটা বল মারলেন। কিন্তু পিছিয়ে খেলতে যাওয়ায় হবসের প্যাডে লেগে উইকেট থেকে পড়ে গেল বেল। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা চীৎকার করে জানালেন আবেদন। কিন্তু আম্পায়ার ভাবলেন যে উইকেট কীপারই ফেলে দিয়েছে বেল। কারণ উইকেট কীপার তখন হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন উইকেটের ওপরে।

হবস কিন্তু বুঝেছিলেন যে তিনি আউট হয়ে গেছেন। তার পরের বলটাই খেলার ভান করে ছেড়ে দিলেন না খেলে। ফলে বোল্ড হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলেন।

অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা অবাক হয়ে ভাবলেন, এ আবার কি ধরণের খেলোয়াড় রে বাবা। আম্পায়ার আউট দেন নি বলে নিজেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন উইকেট...!

সত্যিই তাই। হবসের মতো খেলোয়াড় সুলভ মনোভাবাপন্ন খেলোয়াড় এ-যুগে আর জন্মান নি।...।

[illegible] (জি. আই. রোড, মাণিকতলা, কলকাতা—৫৪)

উত্তর : তোমাদের স্কুলের স্পোর্টসের আমন্ত্রণলিপি পেয়েছি। আশা করি স্পোর্টসে তোমরা খুব মজা করেছো।

অসীমকুমার বসু (হাউসিং এস্টেট, বেহালা, কলকাতা—৩৮)

উত্তর : কয়েকটি সংখ্যা আগে কোচ অমল দত্তের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি ওঁর সংগে যোগাযোগ করেন তাহলে মনে হয় আপনার উপকার হবে। চিঠিতে আপনি আমাদের কথাও ওঁকে লিখতে পারেন—মানে আমরাই যে আপনাকে বলেছি ওঁর সংগে যোগাযোগ করতে একথা অমলবাবুকে লিখতে পারেন।

মণিলাল হাজরা (বাহিরী, বীরভূম, বোলপুর)

প্রশ্ন : আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় ফুটবল দল কি ত্রিমুকুট লাভ করেছে? যদি লাভ করে থাকে তবে কোন্ সালে এবং কোন্ ক্লাব জানাবেন।

উত্তর : আই. এফ. এ শীল্ড, রোভার্স আর ডুরাণ্ড কাপ একই বছরে লাভ করে আজ পর্যন্ত কোন দলই 'ত্রিমুকুট' লাভ করতে পারে নি।

অরুণকুমার গুহ ও গৌরী গুহ-মজুমদার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রাজা মুখার্জী কি এখনো স্কুলের ছাত্র? কোন্ স্কুলের? রাজার বর্তমান বয়স কতো? খেলা থেকে অবসর গ্রহণের কি কোন নির্দিষ্ট বয়েস আছে?

উত্তর : হ্যাঁ। জগবন্ধু স্কুলের। বয়স কতো তা তো জানি না...! খেলাধুলো থেকে অবসর গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর।

শক্তিসাধন ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চক্রবর্তী, সিরাজুল হক ও সুভাষ পাল (রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আশা করি গত সংখ্যাতেই পেয়েছেন।

প্রশ্ন উত্তর

মনীশ মুখোপাধ্যায় (কলকাতা—২৯)

প্রশ্ন : বিশ্বের সেরা ক্রিকেট টিম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিপর্যয়ের কারণ কি? কি করলে এই ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যর্থতার কারণ নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। আমার মনে হয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের উচিত এখনই নতুন ও উঠতি খেলোয়াড়দের দলে নেওয়া, খেলোয়াড়দের নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলার দিকে কঠোর নজর দেওয়া আর বোলিং ও ব্যাটিং-এ শক্তিবৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া।

সুভাষরঞ্জন দত্ত (ট্রাম্পুলার কলোনী, পাণ্ডু, গৌহাটি, আসাম)

প্রশ্ন : ১৯৫২ সালের পর বাংলা কতবার সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে? কোন্ কোন্ সালে? আপনি কোন্ ক্লাবের সমর্থক?

উত্তর : ১৯৫৩, ১৯৫৫, ১৯৫৮, ১৯৫৯ ১৯৬২ সালে বাংলা সন্তোষ ট্রফি লাভ করেছিলো।
সাংবাদিকরা যে ভাই নিরপেক্ষ...!

জীবনকুমার সরকার (বারাসত, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : পলি উমরিগড়ের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর : টেস্ট — ইনিংস — নঃ আঃ —
৫৯ — ৯৪ — ৮ —

সর্বোচ্চ	শতরান সংখ্যা	রান	গড়
২২৩	১২	৩৬৩১	৪২.২২

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচমুড়া কলেজ)

প্রশ্ন : প্রতি বছর ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের এতো হিড়িক পড়ে যায় কেন? কোন ক্লাবের সদস্য হতে গেলে কি করতে হবে?

উত্তর : এই সময়টা আই-এফ-এ অফিসে গিয়ে সই করে খেলোয়াড়রা দল বদলাতে পারেন বলে আর ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই সময় দলের শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দেন বলে। মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গল ছাড়া অন্য কোন ক্লাবের সদস্য হতে গেলে আবেদন করতে হবে ক্লাব সম্পাদকের কাছে।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বের কোন্ খেলোয়াড় সব থেকে তাড়াতাড়ি ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন? কোন সালে এবং কোন্ দলের বিরুদ্ধে?

উত্তর : এস. জে ম্যাকেব (অস্ট্রেলিয়া) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, ১৯৩৮ সালের নটিংহাম টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরী করেছিলেন ২২৫ মিনিটে। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার টাম্পার ১৯১০-১১ সালে দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে করেছিলেন ২২৬ মিনিটে এ ডি লেড টেস্টে। হ্যামণ্ড (ইংলণ্ড) নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অকল্যাণ্ড টেস্টে ১৯৩২-৩৩ সালে ডাবল সেঞ্চুরী করেছিলেন ২৪০ মিনিটে। কম্পটন (ইংলণ্ড) পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালে নটিংহাম টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরী করেছিলেন ২৪৫ মিনিটে।

মুকুলকান্তি দে (নামবাড়ি কলোনী, গৌহাটি, আসাম)

প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলার প্রথম টেস্ট ম্যাচ কোথায় এবং কতো খৃস্টাব্দে হয়? কোন্ কোন্ দলের বিরুদ্ধে কেউ কি সেঞ্চুরী করেছিলেন?

উত্তর : ১৮৮০ সালে প্রথম টেস্ট ম্যাচ হয় ইংলণ্ডে। সেই খেলায় ইংলণ্ড ৫ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। সে খেলায় সেঞ্চুরী করেছিলেন ডব্লিউ জি. গ্রেস (১৫২ রান) ও ডব্লিউ. এল. মারডচ (অপরাজিত থেকে ১৫৩ রান)।

রবীন্দ্রচন্দ্র বণিক (কৃষ্ণনগর, কের-চৌমুহনী, আগরতলা)

প্রশ্ন : প্রথম শ্রেণীর এমন কোন খেলোয়াড় আছেন কি যিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় কোন ৪ কিম্বা ৬ না মেরে সেঞ্চুরী করেছেন?

উত্তর : মনে হয় এমন কোন খেলোয়াড় নেই।

সম্পাদিকা—[illegible] সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত,

দুইটি বা তিনটি
সন্তানের পরিবারই
আদর্শ পরিবার

জেনে রাখুন :

- পরিবারকল্যাণেই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

21 MAR 1969

ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ
কোথাও কাঁচা গোটা মশলা চলে
কোথাও চলে বাটা মশলা
আরো দেবো ঠাকুমা?
কোথাও অতিরিক্ত
ডাইলে কয় গণ্ডা লঙ্কা দিছ?
কোথাও বা নামমাত্র
ছালন কো পকায়া কে পকায়া কে-বস, ইত্তি মসালা!
কিন্তু সবার রুচিকেই কুকমী পরিতৃপ্ত করে!
Cookme
গ্রাম : 'স্পাইসমার্ট'
শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

বিধান পরিষদ বিলোপে
পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায়
সর্বসম্মত প্রস্তাব

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৭৩ বর্ষ: ৪০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA | 73 year, No. 40, 27th March, 19

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২৪৯৯
আজকের মানুষ	...	২৫০০
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৫০১
ডিপ, লিং ক্লাস (কবিতা)	— সুশীলকুমার গুপ্ত	২৫০৪
রঙ্গদর্শন	...	২৫০৫
ভারতদর্শন	...	২৫০৮
আন্তর্জাতিক	...	২৫১১
মন্ত্রীরা কি বলেন	...	২৫১৩
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২৫১৫
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	২৫১৮
নির্বাচনের পরে	— সাগর বিশ্বাস	২৫১৯

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে ।।—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ ।····· এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় ।····· বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ।····· নবীনবাবুর যখন স্বদেশ বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না ।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ।। কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮ ।

মূল্য মাত্র সাত টাকা ।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শহরে	— শ্রীসাংবাদিক	২৫২২
পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী ও শপথ, হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্যা (প্রবন্ধ)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৫২৫
তিমির প্রান্ত ভ্রমার্ত	— অগ্নিবর্ণ	২৫২৯
কংগ্রেস-কোয়ালিশন :		
বিহার ও উত্তরপ্রদেশ	— তুষার চট্টোপাধ্যায়	২৫৩২
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	২৫৩৫
মাটির গন্ধ (গল্প)	— কুমার মিত্র	২৫৪১
চিত্রলেখা	— দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	২৫৪৬
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিল্পালি	২৫৪৮
রঙ্গজগৎ		২৫৫১
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	২৫৫৬

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান
ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক
শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস-গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস
বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব
বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা
শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা
পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন
মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার
হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য ঃ ৬·৫০

বসুমতীর সাহিত্য প্রচার

সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী
(চার খণ্ডে সমাপ্ত)
১ম ভাগ ঃ হুতোম প্যাঁচার নক্সা ঃ ঃ আলালের ঘরের দুলাল ঃ ঃ ভ্রান্তি-বিলাস
মূল্য ঃ চার টাকা

৩য় ভাগ ঃ ধর্মশালা ঃ ঃ ময়ূখ ঃ ঃ পাষাণের কথা
মূল্য ঃ চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

৪র্থ ভাগ ঃ স্তবক (দশটি কাহিনী) ঃ রসির ডায়েরী (ছয়টি কাহিনী)
মূল্য ঃ তিন টাকা

॥ সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলীর লেখকবৃন্দ ॥
হুতোম প্যাঁচা। টেকচাঁদ ঠাকুর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তারাশঙ্কর তর্করত্ন। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঞ্চনমালা দেবী।

ঘরে ঘরে রাখবার মত
বাঙলার অমূল্য সম্পদ

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭৩ বর্ষ ঃ ৪০শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
PRICE : 30 Paise
Thursday, 27th March, 1969

পরীক্ষা ঃ অশান্তি ঃ সময়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনার অন্ত নেই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোনো পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে চলবে—সে আশা সুদূরপরাহত। আনন্দের কথা, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে সব পরীক্ষা নিচ্ছেন, সেগুলি শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে এবং পরীক্ষা গ্রহণের বাকি দিনগুলি ভালোভাবে কাটবে বলেই আমরা মনে করি।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষার সময় পরীক্ষা 'হলে' কিছু ছাত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। সেই কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রী সে সব বিষয়ের পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হয়েছে।

পরীক্ষার 'হলে' বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি নতুন ব্যাপার নয়,—কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে। বিশৃঙ্খলার কারণ হিসেবে যে সব অভিযোগ উঠেছে—উক্ত অভিযোগসমূহ যদি যথার্থ হয়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছেন। তবু এক শ্রেণীর ছাত্র (এদের মধ্যে অনেকেই নকলবিদও আছে) ন্যায্য কথায় কর্ণপাত করা হয়তো দূষ্য বিবেচনা করে বলেই এখনো পর্যন্ত পরীক্ষার 'হলে' বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়; ফলে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের তার ফলভোগ করতে হয়। এ বছর কোন একটি পরীক্ষা-কেন্দ্রের কতিপয় ছাত্র প্রশ্নপত্র কঠিন—এই ধুয়া তুলে সেই কেন্দ্রের অন্যান্য ছাত্রদের ওপর উৎপীড়ন চালিয়ে 'পরীক্ষা-হল' থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে; উপরন্তু মুহূর্তের মধ্যে একদল বিশৃঙ্খলাপরায়ণ ছাত্র সেই কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে গিয়ে হামলা চালায়। অবশ্য দু'-একটি কেন্দ্রে গিয়ে তারা সুবিধা করতে পারে নি। সে সব কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকমতোই পরীক্ষা দিয়েছে।

আমরা এমন খবরও পেয়েছি যে, দক্ষিণ কলকাতায় কোনো একটি কেন্দ্রে বি, কম-এর 'বিজিনেস অরগ্যানিজেশন'-এর প্রশ্নপত্র দেবার আগেই মুষ্টিমেয় একদল ছাত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং প্রশ্নপত্র দেওয়া মাত্রই তারা পরিকল্পনা কার্যকরী করে। পরীক্ষাদানে আগ্রহী ছাত্ররা সেই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান পরিচালকের কাছে কিছু পরে তাদের আগ্রহের কথা সবিনয়ে নিবেদন করলেও, তাঁর পক্ষে কোনো রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি এবং সম্ভবও হয়তো ছিল না।

কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরাই। একদিকে নতুন করে অর্থ ব্যয় হয় আবার নতুন করে পরীক্ষা দেবার জন্য, অন্যদিকে আসে উৎসাহে নৈরাশ্য এবং মূল্যবান সময়ের অপব্যয়জনিত ভবিষ্যতে নানারকম বাধা-বিঘ্ন। এমন কি কারো কারো পক্ষে পুনরায় পরীক্ষা দেওয়াই অসম্ভব হয়ে ওঠে। এসব কারণে স্বভাবতই আমাদের মনে হয়, সাধারণ ঘরের ছাত্ররা (যারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি) পরীক্ষার সময় বাধা বা বিঘ্নকে আমন্ত্রণ জানায় না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের জটিলতা বা অন্য কারণ সম্পর্কে তাদের অভিযোগ থাকলে—তারা ন্যায্য পথেই তার সমাধান প্রত্যাশা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একথা আমরা জানি।

বর্তমানে আমরা একটি ব্যাপার বিবেচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, বর্তমানে যে সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়—তার কিছুটা পরিবর্তন করা যায় কি না। প্রচন্ড গরমে পরীক্ষা গ্রহণ করা অপেক্ষা তা পৌষ বা মাঘ মাসের মধ্যে গ্রহণ করাই উচিত। এই গরমকালে নানারকম ছোঁয়াচে ব্যাধির কবলে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই পরীক্ষাদানে অসমর্থ হয় অথবা পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারে না। তাছাড়া এই কলকাতা শহরে ছোঁয়াচে রোগীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াও এক দুষ্কর ব্যাপার। কারণ না মেলে শত ডাকে এ্যাম্বুলেন্স; আর ট্যাক্সি তো এমনিতেই ন'টা-পাঁচটায় পাওয়া কঠিন, তারপর ছোঁয়াচে ব্যাধির পরীক্ষার্থীকে ট্যাক্সির সাহায্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব এবং উচিতও নয়।

এছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিও গরমকালে বহুক্ষেত্রে পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষে যথোপযুক্ত নয়। আর মফস্বলে পরীক্ষা-কেন্দ্রগুলির অবস্থা আরো সংকটাপন্ন। বিজলীপাখা ও যথেষ্ট পানীয় জলের অভাব ছাড়াও বহুক্ষেত্রে টিনের ঘরে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে হয়। আর, এদেশে গরম এমন দুর্ধর্ষ বলেই গ্রীষ্মকালীন ছুটির ব্যবস্থা আছে। অথচ এমনই আশ্চর্য ব্যাপার যে, দুরন্ত গরমেই ছাত্র-ছাত্রীদের শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এই কারণে আমরা মনে করি, এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্দের মতামত গ্রহণ করে পরীক্ষা গ্রহণের সময় সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং শিক্ষাবিদ্। এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাও কম মূল্যবান নয়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

শান্তিকামী দেশ ভারত। কিন্তু বিশ্বশান্তি তো দূরস্থান, আঞ্চলিক শান্তিরক্ষাও কোন দেশের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। উত্তেজনা, ঠাণ্ডাযুদ্ধ দুনিয়ার এখানে-সেখানে বেড়েই চলেছে। বাইরের কোনো যুদ্ধে ভারত কখনই অংশ নেবে না, নিজেও পররাজ্য কখনো আক্রমণ করবে না। কিন্তু আক্রমণ প্রতিহত করার মত শক্তি তাকে ধরতেই হবে। কারণ তাকে ঠেকে শিখতে হয়েছে—পর পর দু'বার, একবার '৬২ সনে আরেকবার '৬৫ সনে। তার দুর্বল সীমান্তগুলির সবল প্রহরা দরকার এবং এ প্রয়োজন মেটাতে জেনারেল মানেকশর মত অভিজ্ঞ পোড়-খাওয়া সামরিক পুরুষকেই আজ চাই। আগামী ৮ই জুন থেকে লেঃ জেঃ এস এইচ এফ জে মানেকশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হচ্ছেন বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধু মহলে 'সাম' নামে পরিচিত এই পার্শী সৈনিক বর্তমানে ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ হিসাবে কলকাতায় অবস্থান করছেন। নতুন পদপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি লেঃ জেনারেল থেকে জেনারেল পদে উন্নীত হবেন। ভারতীয় কমিশন্ড অফিসারদের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ হতে চলেছেন। তাঁর আগে পর্যন্ত এই পদটি অলঙ্কৃত করেছেন কিংস কমিশন্ড অফিসাররা। ৫৫ বৎসর বয়স্ক এই দক্ষ এবং কুশলী সেনাপতির জন্ম ১৯১৪ সালের ৩রা এপ্রিল। ১৯৩৪ সালে তিনি পদাতিক বাহিনীর অফিসার হিসাবে প্রথম কমিশন লাভ করেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই নিজের কর্মকুশলতায় পদস্থ অফিসারদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ক্যাপ্টেন হিসাবে তিনি বর্মায় জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান এবং বহু সংগ্রামে তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে হয়। সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সেনাবাহিনী পরিচালনা করে কয়েকটি সংগ্রামে তিনি পরাক্রান্ত জাপবাহিনীকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু সেই লড়াইয়ে তিনি নিজেও গুরুতরভাবে জখম হয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ বীরত্বের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে এম সি (মিলিটারী ক্রস) পদক দেওয়া হয়। জখম হয়ে চিকিৎসার জন্য কিছুকাল তাঁকে ভারতে থাকতে হয়েছিল। আরোগ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানেকশ উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য কোয়েটা স্টাফ কলেজে যোগদান করেন। সেখান থেকে ব্রিগেড মেজর হয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি ব্রিগেডে যোগদান করেন। অতঃপর আবার তিনি

মানেকশ

বর্মায় গিয়ে তাঁর পুরনো ইউনিট দ্বাদশ ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রাইফেলস-এ যোগ দেন। তখন মিত্রশক্তির জয়লাভের সূচনা হয়েছে। মানেকশর বাহিনী তখন জেনারেল স্লিমের চতুর্দশ আর্মির অঙ্গ। পশ্চাদপসরণশীল জাপানী ফৌজের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করতে করতে মানেকশ আবার আহত হলেন এবং তাঁকে আবার ফিরে আসতে হল ভারতে। যুদ্ধের শেষ দিকে তিনি জেঃ ডেইজীর স্টাফ অফিসার হিসাবে গেলেন ইন্দোচীনে। তারপরেই জাপানীরা আত্মসমর্পণ করল। মানেকশ তখন ১০ হাজার যুদ্ধবন্দীর পুনর্বসতির ভার পেলেন এবং সেই কাজ তিনি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেন। দেশ বিভাগের আগে মানেকশ ছিলেন ফৌজী সদরদপ্তরে সামরিক কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের স্টাফ অফিসার। দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ সালে তিনি সেই মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টর পদে উন্নীত হন। পরে জেঃ মানেকশ দু' বছরের জন্য একটি পদাতিক ব্রিগেডের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেখান থেকে তিনি হন মৌস্থিত ফৌজী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। জম্মু ও কাশ্মীরে একটি ডিভিসনের সেনাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি কাশ্মীর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের নভেম্বরে তিনি পূর্ব সীমান্তে একটি কোরের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে ইস্টার্ন কমান্ডের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হবার আগে তিনি ছিলেন ওয়েস্টার্ন কমান্ডের সর্বাধিনায়ক। ১৯৬৮ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেওয়া হয়।

প্রায় পাঁচ বছর একনাগাড়ে কলকাতায় কাটিয়ে জেঃ মানেকশ কলকাতার প্রেমে মুগ্ধ। তিনি বলেছেন, কলকাতা ছেড়ে গেলেও মাঝে মাঝে কলকাতায় না এসে পারবেন না, কারণ কলকাতাকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন। এখানকার নাগরিকরা তাঁর সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করেছে, তা তিনি কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। তিনি আরও বলেছেন যে, রাজ্য সরকার অশান্তি দমনের জন্য একাধিকবার সেনাবাহিনী তলব করলেও, সেনাবাহিনী তাঁর আমলে অসামরিক অধিবাসীদের ওপর কখনও গুলীবর্ষণ করে নি। ইস্টার্ন কমান্ডের সর্বাধিনায়ক হিসাবে নাগা ও মিজো বিদ্রোহ দমনের ভার ছিল জেঃ মানেকশর ওপর। বিদ্রোহী নাগা নেতাদের সাম্প্রতিক হালচাল দেখে মনে হয়, নাগা রাজ্যে শান্তি ফিরে আসতে আর বিলম্ব নেই। নাগা পরিস্থিতির এই উন্নতির মূলে মানেকশর অবদান একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই মানেকশ কিছুটা সাফল্যের গৌরব নিয়েই নতুন পদে গিয়ে বসতে পারবেন। সেটা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই শুভসূচনা হিসাবে কাজ করবে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"ভয়ঙ্কর লোকটি"র লণ্ডন-সংবর্ধনা—(২)

সুভাষচন্দ্র বসু কিছুই গোপন করতে ভালবাসেন না। শরদণ্ড খাড়া রেখেই তিনি চলবেন, সেই তাঁর ভবিতব্য। সুতরাং পরদিন ১২ জানুয়ারী অপরাহ্নে ক্যাক্সটন হাউসে ইণ্ডিয়া লীগের পার্লামেণ্টারী কমিটির সদস্যদের সম্মুখীন হয়ে সরাসরি বললেন,

"যে-মুহূর্তে ভারতে ফেডারেশন পরিকল্পনা চালু করা হবে, তখনি চরম সঙ্কট ঘনাবে; কংগ্রেস ফেডারেশনের প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু বিখ্যাত ভারতবন্ধু ইংরাজ, যথা, স্যার জন মেনার্ড, লর্ড ফ্যারিংডন, মিঃ রেজিন্যাল্ড সোরেনসেন, এম পি, মিঃ হেনরি পোলক, মিং বেন ব্রাডলি, মিঃ রোনাল্ড কিড, মিঃ রেজিন্যাল্ড রিজম্যান।

এইদিন সকালেই "মেজর এটলি, লর্ড স্নেল এবং আর্ল অব কিনোউলের সঙ্গে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর দীর্ঘ একান্ত আলোচনা হয়েছে।"

সকালের ঐ আলোচনা সত্ত্বেও (অথবা ঐ আলোচনার জন্যই) অপরাহ্নের আলোচ্য সভায় সুভাষচন্দ্রের বলতে বাধল না-

"বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের প্রয়াসে কোনো বৃটিশ রাজনৈতিক দলের সাহায্য পাওয়া যাবে, এহেন চিন্তার দিন একেবারেই গেছে। সংগ্রাম আমাদেরই—সে সংগ্রামের সম্মুখীন আমরাই হব। ইংরাজ শ্রমিকদলের কার্যকলাপ দেখে ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। বৃটেনে যাঁরা সমাজতন্ত্রের কথা বিশ্বাস করেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, ভারত স্বাধীন না হলে বৃটেন কদাপি সমাজতন্ত্রী দেশ হবে না।"

নির্মম সাহসী মানুষ। একইদিনে রয়টারের প্রতিনিধিকে বললেন—

"আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করি; ভারতীয় জনগণই ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। সংঘর্ষের জন্যই সংঘর্ষ কেউ চায় না: যদি আমাদের দাবি পূরণ করে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করা হয়, আমরা অবশ্যই তাতে সাড়া দেব।"

প্রত্যাশিত সংবাদটি এসে গেল ১৪ই জানুয়ারীর সংবাদপত্রে—সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ঐদিন কনওয়ে হলে ইণ্ডিয়া লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় সংবাদটি ঘোষিত হলে সভাগৃহ হর্ষে উদ্দীপনায় ফেটে পড়ল। সভা রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণ; রয়টারের বিবরণমত এই সভা ইংলণ্ডে সুভাষচন্দ্রের এযাবৎ সর্ববৃহৎ জনসভা। এই স্মরণীয় সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা মিঃ জর্জ লনসবেরী। শ্রমিকদল ও উদারনৈতিক দলের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যাঁরা অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ আর্থার গ্রীনউড, এম পি, লর্ড লিস্টোরেল, মিঃ লরেন্স হাউসম্যান, মিঃ বেসিল ম্যাথুস, মিঃ আর্নেস্ট থার্টল।

সভাপতি জর্জ লনসবেরী তাঁর ভাষণে দ্বিধাহীন স্পষ্টোক্তি করেন। "যাঁরা মনে করেন মিঃ বসু ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন নন, কিংবা তিনি অতীব ভয়ঙ্কর মানুষ, কংগ্রেস সভাপতিরূপে তাঁর এই নির্বাচন তাঁদের প্রতি যোগ্য উত্তর। আশা করা যায়, মিঃ বসুর সভাপতিত্বকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে দ্রুততর পদক্ষেপ করবে।"

এই সভায় সর্বোত্তম বক্তৃতা করেছিলেন শ্রমিকদলের ডেপুটি লীডার মিঃ আর্থার গ্রীনউড। "পার্টিতে নিজ পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন থেকে, অর্থাৎ তিনি যে হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেণ্টে বিরোধী দলের সহ-নেতা সে বিষয়ে অবহিত থেকে, প্রতিটি শব্দ ওজন করে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন।"

বক্তৃতা করতে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি সুভাষচন্দ্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "মিঃ বসু, এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাকে গভীর সমাদরপূর্ণ অভ্যর্থনা জানানো আজ রাত্রির এই সভায় আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় এবং কর্তব্যের কাজ।" তারপর বলেন—

"ইনি ভারতের গ্রেট ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বলেই এঁকে আমরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছি না, ৭ ইনি এমন একজন মানুষ যাঁর উপরে অতি বিরাট দায়িত্ব আসছে। (সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করে) মহাশয়, আমি

৭ এই সংবাদটি সন্দেহজনক। সুভাষচন্দ্র গ্রেট ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছেন, কিন্তু প্রথম সভাপতি নন।

আপনাকে মহান ভারতীয় নেতারূপে অভিনন্দিত করি। শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে তা করছি। আমি নিজে গাঁটে-গাঁটে ইংরেজ। তার জন্য লজ্জিত নই। কিন্তু আমি সর্বদা উত্তম আন্তর্জাতিক হতেও চেষ্টা করেছি। অন্য জাতি বা দেশের মানুষের কাছ থেকে আমি শিক্ষা নিয়েছি।

কমরেড বসু বুঝেছেন যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন সত্যকার স্বাধীনতা হয় না। তিনি উপলব্ধি করেছেন, অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ এখন জনসাধারণের জীবনকে নিষ্পিষ্ট করছে। তিনি আবিষ্কার করেছেন —সে তাঁরই কৃতিত্ব—মানবজাতির সুখের পথই মানবজাতির স্বাধীনতার পথ।

আমি দেখেছি, গত দশ বছরে এদেশের মানুষের মনোভাব বদলেছে। আগে অভিযোগ করতাম, এদেশে গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার নেই। গত কয়েক বছরে দেখছি, স্বাধীনতা সংরক্ষণে ও বিস্তারে এখানে জনগণের মধ্যে ইচ্ছা জেগেছে। যে-মানুষেরা তাতে বিশ্বাস করে, তারা ভারতের মানুষের স্বাধীনতার অধিকার অগ্রাহ্য করতে পারে না। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চীন সম্বন্ধে জাপানের সাফাইয়ের অনুরূপ। না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের ইতিহাসের সাফাই আমি গাইছি না। আমি তা করি না। আমাদের সম্পর্ক এখন ভারতের অগণিত মানুষের সঙ্গে, অতীতে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী মৃগয়ার ফলে যাদের বলি দেওয়া হয়েছে।

ফ্যাসিজমকে নিন্দা করতে আমার দ্বিধা নেই। ফ্যাসিজমকে আমি ঘৃণা করি। অপর মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার নিয়ে কেউ এসেছে একথা আমার পক্ষে কখনো বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তবে এ-দেশ থেকে ভারতীয় জনগণকে আমরা কেবল নৈতিক সমর্থনই জানাতে পারব। আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু বলতে পারি, সমস্ত মন দিয়ে সে সমর্থন আমরা করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতের সংগ্রাম তো ভারতেরই সংগ্রাম। স্বাধীনতার পথ সহজ পথ নয়। সুভাষবাবু তাঁর জীবনে সেই কণ্টকাকীর্ণ পথে হেঁটেছেন। কঠিন সেই পথ। ভারতে যে সংগ্রাম চলেছে, তার কণ্ঠে কঠিন সাঁড়াশি। সংগ্রাম এখন বাস্তব। সত্যই পথ এখন কঠিন। দীর্ঘ, সুদীর্ঘ হবে তার ইতিহাস।

বেসিল ম্যাথুসের সঙ্গে আমিও একমত, বিমানে যাওয়ার পরিবর্তে সুভাষবাবুর জাহাজে দেশে ফেরা উচিত, যাতে করে ফেরার পথে তিনি গভীরভাবে ভাবার ও লেখার জন্য কিছু সময় পান, কেন না তাঁর জন্য দারুণ দায়িত্ব অপেক্ষা করে আছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধারের উপরে যে দায়িত্ব ন্যস্ত তার থেকে গুরুভার দায়িত্ব আর কারো উপরে ন্যস্ত নয়। ভরসা করি, তাঁর স্বপ্নের সফল সমাপ্তি নিকটতর হবে। আমরা সকলেই আশা করি, অতীতে যে-আদর্শের জন্য তিনি পীড়ন সহ্য করেছেন, দীর্ঘজীবন পেয়ে সেই আদর্শের পক্ষে সংগ্রাম করবেন। বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের সম্মিলিত শুভেচ্ছা তিনি ভারতীয় জনগণের কাছে বহন করে নিয়ে যাবেন; সে শুভেচ্ছা তাঁর জীবনাদর্শের সার্থকতার জন্য, ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য।"

নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ বক্তৃতা। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে এমন জোরালো ধারালো সমর্থন ইংলণ্ডে দায়িত্বশীল মহলে তখন অতি অল্পই দেখা গেছে। নিঃসন্দেহে সুভাষচন্দ্রের সংবর্ধনাসভায় উপযুক্ত ভাষণ। ভারতবর্ষকে যে লড়ে স্বাধীনতা নিতে হবে, বৃটিশ শ্রমিকদলের ডেপুটি লীডারের কাছ থেকে প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্র তা শুনলেন। দীর্ঘ, সুদীর্ঘ হবে সংগ্রাম, তাও জানলেন। এঁর কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র যে প্রকাশ্য প্রশংসা লাভ করলেন, কোনো বিশিষ্ট ইংরেজ রাজনৈতিক সে-ভাষায় তাঁর প্রশংসা করেছেন কি না সন্দেহ। মনে রাখতে হবে, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অথচ ভারতের পরাধীনতায় বস্তুগতভাবে লাভবান, ইংরাজ শ্রমিকদলের কঠোর সমালোচক ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ক্যাক্সটন হাউসের সমাবেশে ঠিক দু'দিন আগে সুভাষচন্দ্র সেকথা বলেছেন।

সুভাষচন্দ্র উত্তর দিতে উঠে তাঁর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত প্রশংসাবাক্যাদির জন্য ধন্যবাদ জানান। কিন্তু সেই সঙ্গে নির্দয় সরলতার সঙ্গে বলেন—শ্রমিকদল ভারতকে বাস্তবিক কোনো সাহায্য করবে, এ সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। তবে তিনি সব সময়েই বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী, কারণ ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে পারে না।

কনওয়ে হলের এই প্রতিনিধিমূলক বিরাট সভা সুভাষচন্দ্রকে বলাই বাহুল্য খুশি করেছিল, কিন্তু তাঁর সেই আনন্দ তাঁকে শাসকদের সম্বন্ধে মধুরসাশ্রিত করে তোলে নি। তিনি বুঝেছিলেন, এ হোল উপযুক্ত শত্রুর প্রতি ক্ষত্রিয়ের সম্ভ্রম। শস্ত্রপাণি বীর ঐ শ্রদ্ধা লাভ করে। কংগ্রেস-সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হয়েছেন, কনওয়ে হলের সভা শেষে সেজন্য তাঁকে সাংবাদিক অভিনন্দিত করলে তিনি বললেন—

> "যে সম্মান পেলাম, তার জন্য নিতান্তই কৃতজ্ঞ। আমি জানি আমি এর যোগ্য নই। কেবল আশা করি, আমার দেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্যের দ্বারা আমাদের সকলেরই সামনে যে-কঠিন দায়িত্ব অপেক্ষা করছে, তার সম্মুখীন হতে পারব।

সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ নিয়ে রয়টারের প্রতিনিধি যখন সুভাষচন্দ্রের কাছে গেলেন, অন্যান্য কথার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—"আমাকে যে মহাসম্মান দেওয়া হল, আমি কোনোভাবে তার উপযুক্ত একথা ভাবার মত দাম্ভিক আমি নই। একে আমি ভারতের তরুণদের প্রতি প্রদত্ত সম্মান বলেই গ্রহণ করছি, যারা স্বাধীনতার সংগ্রামের গুরুভার বহন করেছে।"

এই তরুণেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল পরদিনই। ১৫ জানুয়ারী, শুক্রবার, রাত্রে 'ভারতীয় স্টুডেন্টস ইউনিয়ন', 'সিলোন স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন', 'লন্ডন মজলিস', 'ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস সোসাইটিজ ইন গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড' মিলিত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে ১১২ নং গাওয়ার স্ট্রীট, লণ্ডনে অভ্যর্থনা জানায়। "শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু উপস্থিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকে সভা ঠাসা-ভর্তি, ছাত্রদের মধ্যে সর্বক্ষণ ঠেলে এগিয়ে যাবার জন্য লড়াই, যাতে পিছনের ছাত্ররা ভারতের ছাত্রদের অন্যতম নেতার কথা শুনবার সুযোগ পায়।"

সভায় যখন ঘোষিত হল পরবর্তী কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন তিনি, তখন পুরো দশ মিনিট ধরে হর্ষধ্বনি। সভাপতি মিঃ হ্যারাল্ডের বিপুল-প্রশস্তিকথার শেষ বাক্য ছিল—"আমরা যেন উপলব্ধি করি, কমরেড বোস ভারতকে নতুনভাবে গঠন করতে চেষ্টা করছেন ; এই কাজে তাঁকে অবশ্যই আমাদের যথাশক্তি সাহায্য করতে হবে।"

ছাত্রদের সভা বলে সুভাষচন্দ্র অনেকখানি অন্তরঙ্গ সুরে, ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে কথা বলেছিলেন। ভাবী লেখকদের তিনি জেলে যেতে প্রলুব্ধ করেন।—"তোমাদের মধ্যে যারা লেখক বা গ্রন্থকার বা কবি হতে চাও, তারা কারাজীবনকে শিল্পের উপাদান বিবেচনা করে আমার মত জেলে যাবার চেষ্টা করো।" অতঃপর, কারাজীবনের কয়েকটি আকর্ষণীয় কাহিনী বলেছিলেন। মানুষ যে অবস্থার চাপে অপরাধী হয়, দেশবন্ধুর জীবনের একটি ঘটনার দ্বারা তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। জেলে থাকাকালে দেশবন্ধু একজন আসামীকে বলেন, মুক্ত হয়ে সে যেন তাঁর কাছে গিয়ে চাকরি করে। সে লোকটি কয়েক মাস ভালভাবে চাকরি করেছিল। পরে দেশবন্ধু দার্জিলিঙ গেলে সে কিছু রুপোর জিনিসপত্র নিয়ে পালায়। অথচ লোকটি ছিল দয়ালু, যা চুরি করত বিলিয়ে দিত।

মজার গল্পও বলেছিলেন। তাঁর প্রথম কারাবাস; অন্য কংগ্রেসীদের সঙ্গে আছেন। এক চীনে আসামী কয়েদী হিসেবে এতগুলি ভদ্রলোককে দেখে অবাক। এঁরা কী অপরাধ করতে পারেন—ভেবে পায় না। অনেক চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করে একজনের কাছে গিয়ে ভাঙা ইংরেজীতে শুধোল—

আফিম, আফিম? ??

না।

কোকেন, কোকেন? ??

না।

তখন চীনেম্যান বেশ খানিক ভাবল, তারপর বলল—

গ্যান্ডি, গ্যান্ডি ???

হাঁ।

কিন্তু জেল ব্যাপারটা সত্যই এতখানি হাসি-তামাসার ব্যাপার নয়। সাহিত্যের উপাদান খুঁজতে জেলে যেতেও সাধারণত কেউ রাজী হবে না। সাহিত্যিকেরা উপাদানের বহু উর্বরক্ষেত্র অন্যত্র আবিষ্কার করে বসে আছেন। সুভাষচন্দ্র তা জানতেন, জানতেন যে, দেশকে, দেশবাসীকে ভালবাসার মত অপরাধ করেই মনুষ্যত্বশালী মানুষের পক্ষে জেলে যাওয়া সম্ভব। তেমন মানুষদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন—

"তোমাদের সকলকে একটা কথা বলি, যে মুহূর্তে তোমরা জীবনে কোনো একটা আদর্শকে বরণ করে নেবে, তখনি জেলের জীবনকে তৃপ্তি ও আনন্দের হেতু বলে গ্রহণ করতে পারবে, এবং ঐ অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে শ্রেষ্ঠতর মানুষ এবং বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব হিসাবে বেরিয়ে আসবে।"

স্বাধীনতার স্বরূপ কী, সেই স্বাধীনতার শত্রু কে, ও কিভাবে তাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে, সে সম্পর্কে এই আপোষহীন যোদ্ধা বললেন—

"এদেশে তোমরা যারা রয়েছ, তোমাদের ভাবতে হবে, দেশের মানুষকে কিভাবে মুক্তি দিতে পারো। সর্ববিষয়ে তাদের মুক্তি দিতে হবে—দিতে হবে রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তার অর্থ যদি হয় জমিদার, পুঁজিপতি, অভিজাতশ্রেণী বা তথাকথিত উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তার জন্য তৈরী থেকো।......

ভারতীয় জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ফলেই ভারতে বৃটিশ আধিপত্য সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ তার বন্ধু পায় জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্য থেকে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ঐসব স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে জোটবদ্ধ করা।"

নিছক স্বাধীনতা-সংগ্রামীরূপে যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে দেখতে বা দেখাতে চান, তাঁদের কাছে সুভাষচন্দ্রের এ এক অন্যাবশ্যক ও অপরিচিত রূপ। কিন্তু আসল সুভাষচন্দ্রকে এখানেই পাব, যিনি স্বাধীনতার কোনো সংকীর্ণ অর্থের জন্য নিজের বিরাট জীবনকে উৎসর্গ করার কথা ভাবতে পারেন নি। ইংলন্ড-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানতেন বলে এইসব কথা তিনি বেশি করে বলেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানেই তিনি থামেন নি। ঐসব ছাত্রদের প্রগতিশীল চিন্তা যে অনেক সময়েই শুধু কথার চাতুরীতে পর্যবসিত হয়, ভেতরে থাকে স্বার্থসিদ্ধির লোভ—তা তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। ছাত্রদের তিনি তিলকের উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিলক ১৯১৯ সালে কেম্ব্রিজে ছাত্রদের সরকারী চাকরি নিতে নিষেধ করেছিলেন। জনৈক ইংরাজ অধ্যাপকের কথাও সুভাষচন্দ্র বলেন। ঐ অধ্যাপক তাঁকে বলেছেন, ছাত্ররা এখন দেশের কথা ভাবে না; সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়ে কিভাবে চাকরি জোটাবে সেই চিন্তায় ব্যস্ত। সুভাষচন্দ্র বললেন, "এর থেকে ট্রাজিক কি হতে পারে!"

না, চির আশাবাদী সুভাষচন্দ্র এতে হতাশ হতে পারেন না। অবশ্যই তা হন নি। দেশের আসল শক্তি গণজীবনের মধ্যে। সেখানে এত বেশি জাগরণ এসেছে যে, এখন সমস্যা

ডিপ, লিব, ক্লাস

সুশীলকুমার গুপ্ত

ডিপ. লিব. ক্লাসে আসি অফিসের পরে প্রতিদিন।
চারতলায় দু-নম্বর রুমে
বেকন হ্যারিস কিংবা ডিউই রীতিতে
নলেজকে ভাগ করি ; নানা স্কিম নিয়ে
তর্ক হয়, প্রফেসর বোঝান দৃষ্টান্ত সহযোগে
কোলন ডিউই ব্লিস ব্রাউনের স্কিমে
গুণাগুণ কি মাত্রায়, ক্যাটালগ ক'রে
সাজাই বইয়ের থাক, চিরে চিরে দেখি
তাদের শরীরমন ; রঙ্গনাথনের
ফাইভ লজ-এর চিন্তা ঘুরে ঘুরে ওঠে ঊর্ধ্বপথে
পেঁচানো সিঁড়ির মতো ; এরই ফাঁকে ফাঁকে
হৃদয় হরিণ হ'য়ে খেলা করে প্রসাধিত বনে,—
চাকরি পাওয়া যাবে কিনা পাশ ক'রে, পেলেও কোথায় ;
পিকনিকে কোথায় যাব, প্রেসে গেলে বিবলিওগ্রাফির
কিছু তথ্য স্পষ্ট হবে ; যাওয়া যাক টুরে কোনোখানে
দিল্লী, আগ্রা, চণ্ডীগড়, তা না হলে টাকার অভাবে
বোলপুরেও মন্দ নয়, ফার্স্ট ক্লাস পাবে কয় জন।

বেঞ্চির কোণায় বসে নোট করি, চারিদিকে ভাসে
উৎসুক মুখের নৌকো, হঠাৎ কখন
জানালার ফাঁক দিয়ে চোখ পড়ে বিশাল আঁধারে ;
মেঘে-মেঘে তারায়-তারায়
বিচিত্র বইয়ের মতো ফুটে ওঠে অজস্র জীবন ;
সময়ের গ্রন্থাগারে এরা সব যেন পেনিলোপী
দিন গোনে সহৃদয় স্পর্শ কামনায়।
আমরাও শেষে একদিন
স্মৃতি হব, বই হব, মহাকাল-গ্রন্থাগারিকের
হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে তার গ্রন্থাগারে কোনো
স্থান পাব যে যা করি সেই মতো ঠিক।
কেউ কেউ দেখবে না কোনোদিন আকাঙ্ক্ষিত মুখ
আর কেউ ঘুরবে ফিরবে নানা পথে হৃদয়বন্দরে।
কি হবে আমার ? এই প্রশ্ন-কাঁপে চাঁদের সমুদ্রে।
ক্লাস শেষ, সবাই দাঁড়াই উঠে, প্রফেসর রায়
ধীরে ধীরে চ'লে যান ; আমরাও যাব একদিন
গ্রন্থাগারিকের কাজ শেষ ক'রে বই হ'য়ে মহাগ্রন্থাগারে।

কিভাবে সেই জাগরণকে ঠিক পথে চালিত করা যায়। রক্ষণশীল, গতিহীন, প্রবীণ নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য করে, তরুণদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তরুণদের নেতা নিয়তিকঠিন কণ্ঠে বললেন—

"যদি আজ নেতারা জনগণের অভিপ্রায়কে যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করতে অসমর্থ হন, তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ঐসব নেতাদের সরিয়ে জনগণ নতুন নেতা বেছে নেবে।"

নেতা, হাঁ উপযুক্ত নেতৃত্ব চাই। জনগণ শক্তির উৎস সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই শক্তিধারাকে লক্ষ্যপথে চালিত করতে পারেন উপযুক্ত নেতা।—

"সাফল্য শুধু জনগণের শক্তির উপরে নয়, যোগ্য নেতৃত্বের উপরও নির্ভর করে। লেনিনের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন রাশিয়ার কি হত জানি না। লেনিন যে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, যদি আমরাও তা যেতে পারি, তাহলে আমার বিশ্বাস আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।"

ছাত্রদের সভায় দাঁড়িয়ে সেদিন সুভাষচন্দ্র আসলে নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন, কোনই সন্দেহ নেই।

শুধু ভারতীয় ছাত্ররাই নয়, ইংরেজ ছাত্ররাও তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ১৪ জানুয়ারী সংবর্ধিত হয়েছিলেন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের পক্ষ থেকে। সভাপতিত্ব করেছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক টনী। তারপরে ইউনিভার্সিটি লেবার ফেডারেশনের ভবনে অন্য অনেক শিক্ষাবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

"রবিবার সারাদিন তিনি কেম্ব্রিজে কাটাবেন। তাঁর সেই পুরাতন শিক্ষানিকেতনের ছাত্ররা তাঁর জন্য অনেক কিছু রাজকর্মের বরাদ্দ করে রেখেছে। অক্সফোর্ডও সম্ভবতঃ ঐই ধরণের সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করবে।"

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী লেখকদের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্র মিলিত হলেন। "সোসিয়ালিস্ট লীগের অগ্রণী সদস্য মিঃ হোরাবিন মিঃ বসুর সম্মানে এক বিশেষ অভ্যর্থনাসভার আয়োজন করেন। সেই সভায় মিঃ বসু বিখ্যাত বামপন্থী লেখক ও মনস্বী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হন। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন, স্ট্র্যাচী, গোলানৎস, রিকওয়ার্ড, মরিস, ব্রাউন এবং মিসেস নাওমিচিকান। আমি আরও শুনেছি যে, মেজর এটলী সুভাষচন্দ্র বসুর কথাবার্তায় এমনই আকৃষ্ট হয়েছেন যে, তিনি আরও সাক্ষাৎকার কামনা করেছেন"—সাংবাদিক লিখলেন।

সে সাক্ষাৎকারের সুযোগ মেজর এটলী পেয়েছিলেন। শ্রমিকদলের সম্পাদক মিঃ মিডলটনের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজে সুভাষচন্দ্র শ্রমিকদলের রাজনৈতিক ও শিল্প সংশ্লিষ্ট যেসব নেতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ এলুইন, মেজর এটলী, মিঃ গ্রীনউড, মিঃ আর্নেস্ট বেভিন, মিসেস গুন্ত সুশান লরেন্স।

এই ঘরোয়া সভায় সুভাষচন্দ্র সরাসরি শ্রমিক নেতাদের প্রশ্ন করে বসেন, শ্রমিকদলের কার্যসূচীর মধ্যে ভারত-প্রসঙ্গ নেই কেন? তাঁর এই ধরণের খোলা কথাকে তখনকার মত খোলামনেই শ্রমিক নেতারা গ্রহণ করেন। মেজর এটলী অবশ্য একবার উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ঐ অনুচ্ছেদের মানে নয় শ্রমিকদল ভারত-ব্যাপারে কিছু করতে চায় না। মিঃ এলুইন মেজর এটলীর কথার সূত্রে বলেন, সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে উচ্চারিত মেজর এটলীর আশ্বাসকে মিঃ বসু ভারতে বয়ে নিয়ে যাবেন, তিনি এই আশাই করেন।

এই ঘরোয়া সভায় সুভাষচন্দ্র না কি শ্রমিক নেতাদের মধে উত্তম ধারণা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আসলে কিন্তু মনে হয়, শ্রমিক নেতারা বুঝেছিলেন, সুভাষচন্দ্র কী পদার্থ। "তাঁদের পক্ষ থেকে পণ্ডিত জহরলাল সম্বন্ধে বহু অনুরাগপূর্ণ বাক্য কথিত হয়েছিল।" [ক্রমশ]

বাম দক্ষিণ

নবগঠিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হতে চলল অনেক নাটকীয় ঘটনার ভেতর দিয়ে। ঘটনাগুলিই বড় নয়, আসল কথা এবারকার বিধানসভার অধিবেশনে এমন কতকগুলি প্রশ্ন উঠেছে যেগুলি এড়িয়ে যাবার নয়। এই প্রশ্নগুলির মুখোমুখি কেন্দ্রীয় সরকারকে হতেই হবে, আজ না হোক কাল। রাজ্যপালের প্রকৃত সাংবিধানিক ভূমিকা কি হওয়া উচিত, বর্তমানে রাজ্যপালেরা যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন সেভাবে চললে ভবিষ্যতে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে ভিন্নাদর্শাবলম্বী সরকার গড়ে উঠলে বর্তমান সংবিধান কার্যকর করা কতদূর সম্ভবপর হবে, ইত্যাদি বিষয়ের মূল্যায়নের সূত্রপাত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতেই ঘটল। এ কথা সত্য যে, ভারতের আগামী দিনের চিত্রটি খুবই পরিষ্কার, সর্বভারতীয় কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে একই সঙ্গে ক্ষমতায় থাকার কল্পনা এখন আকাশকুসুম। কেন্দ্রেও কংগ্রেস সরকারের দিন ফুরিয়ে আসছে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির যেরকম দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত টিকে থাকাই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একটি সমস্যা।

এই দুর্দিন যে আসতে পারে সংবিধান প্রণেতারা ভেবে দেখেন নি, যখন সংবিধান তৈরি হয়েছিল তখন কংগ্রেসের গ্ল্যামার ছিল। কংগ্রেসের যে এই হাল হবে তা ছিল কল্পনার বাইরে। ধরেই নেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই দল রাজত্ব করবে। এবং সেই কারণেই সংবিধানে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী কেন্দ্রকেই করা হয়েছে। যদিও সংবিধানের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্যত তা এককেন্দ্রিক, প্রতিটি রাজ্য কার্যত কেন্দ্রের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। রাজ্যগুলি সম্পদ উৎপন্ন করে এবং সেগুলিকে ভোগ করে কেন্দ্র। বিলিব্যবস্থা কেন্দ্রেরই হাতে, কাজেই প্রতিটি রাজ্যকেই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। তবুও এ অবস্থাটা কোনগতিকে চলত যখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দল ক্ষমতাসীন ছিল। এখন যেহেতু কেন্দ্রে কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল, স্বাভাবিক নিয়মেই কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে হাতে মারতে না পেরে ভাতে মারবে। এ তো সোজা কথা।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে শাসনরত দুটি দল কেন পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে পারবে না? উত্তরে বলা যায় যে, তা সম্ভব নয়। যুদ্ধে ও প্রেমে অন্যায় বলে কিছু নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাই। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আর্থিক ও অপরাপর বিষয়ে সহযোগিতা করে কেন্দ্র কি নিজের কবর নিজে খুঁড়বে না?-বরং কেন্দ্রের এই মনোভাব হবে যে, পশ্চিমবঙ্গকে তার প্রাপ্য দিতে বিরত থাক, যাতে পশ্চিমবঙ্গ ভাতে মারা পড়ে, এবং এইভাবে যুক্তফ্রন্টকে বেকায়দায় ফেলে জনসাধারণকে তার প্রতি বিমুখ করে তোল। বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্র এইরকম মনোভাবই নিতে বাধ্য এবং কার্যতও তাই ঘটছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, এইরকম মনোভাব গ্রহণ করে কেন্দ্র কদিন চলতে পারবে? হয়ত চলতে পারত যদি কেন্দ্রের পায়ের তলায় সত্যই মাটি থাকত। ১৯৫৯ সালে যখন কেন্দ্র তদানীন্তন কেরলের কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করে, তখন তার পায়ের তলায় মাটি ছিল, তখনো কংগ্রেসে ভাঙন আসে নি। কিন্তু সেদিন চলে গেছে, ১৯৫৯ আর ১৯৬৯-এ তফাৎ অনেক। কাজেই আজ কেন্দ্র যে অসহযোগিতার মনোভাব দেখাচ্ছে কয়েকজন অদূরদর্শী নেতার বুদ্ধির দোষে, এই মনোভাবই পাল্টা বুমেরাং হয়ে কেন্দ্রের শূন্যগর্ভ বেলুনটিকেই ফাটিয়ে দেবে।

যে কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য যে, ১৯৭২ সালের নির্বাচনোত্তর কেন্দ্রীয় সরকার কোয়ালিশন সরকার হতে বাধ্য, এবং সেই অবস্থায় কেন্দ্রের পক্ষে তার প্রতি সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতাগুলির ব্যবহার ও প্রয়োগ করাও অসম্ভব। কংগ্রেস এখন অতি বৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত, মৃত্যুর কাল গোনা ছাড়া আর কিছু তার করার নেই। এটা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটেছে, কোন সঞ্জীবনী মন্ত্র আর কংগ্রেসকে যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তার লক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্তও যে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এমতাবস্থায় কেন্দ্রের দায়িত্ব ও ক্ষমতা আরও অনেক লঘু হওয়া প্রয়োজন এবং সেই কারণেই দেশের স্বার্থে প্রয়োজন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

এমন কিছু অন্যায় দাবি করা হচ্ছে না। ফেডারাল রাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি যে ক্ষমতা ভোগ করে সেইটুকুই মাত্র চাওয়া হচ্ছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্যই নয়, ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য। পশ্চিমবঙ্গ নিজে যে সম্পদ অর্জন করে তার ওপর পশ্চিমবঙ্গেরই অধিকার বর্তাক, শাসনকার্য, পরিকল্পনা সমস্ত কিছুই তার নিজের ইচ্ছামতই হোক। তার অর্জিত সম্পদের একটা অংশ সে কেন্দ্রকে দিক। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকেই যদি এই অধিকার দেওয়া যায়, তাহলে কেন্দ্রের দায়িত্ব অনেক হাল্কা হয়ে যায়, প্রতিটি রাজ্য থেকে প্রদত্ত অর্জিত সম্পদের কিছু কিছু যে অংশ কেন্দ্রকে দেওয়া হবে তা দিয়ে কেন্দ্র দেশরক্ষার ব্যয় নির্বাহ করুক, এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগুলিকে সাহায্য দিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার কথাও আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সোভিয়েট রাশিয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলির এত ক্ষমতা আছে যে সেগুলি ইচ্ছা করলে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ বেরিয়ে যায় নি। মনে রাখতে হবে সোভিয়েট ইউনিয়ন পনেরটি রিপাবলিকের ইউনিয়ন, ভারত [illegible] ষোলটি রিপাবলিকের ইউনিয়ন হবে না। শুধু তাই নয়, যে পনেরটি রিপাবলিক নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন রচিত, সেগুলির মধ্যে বড়গুলি যুক্তরাষ্ট্রীয়, সেগুলিকে বলে ফেডারেটেড রিপাবলিক, যেগুলি ছোট সেগুলি এককেন্দ্রিক।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম ব্যবস্থা থাকলে উত্তরপ্রদেশ হত ফেডারেটেড রিপাবলিক, পশ্চিমবঙ্গ হত ইউনিটারি রিপাবলিক। আসামের মত বহু সংস্কৃতি-সম্পন্ন রাজ্যগুলিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি রিপাবলিকের মধ্যেই কয়েকটি অটোনোমাস ওব্লাস্টে ভাগ করা হয়েছে; এগুলিও স্বয়ংশাসিত। এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার ফলেই জাতীয় সংহতি নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নকে মাথা ঘামাতে হয় নি, সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলন আহ্বান করে তাদের মদের খরচ জুগিয়ে জাতীয় সংহতি রক্ষার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় নি, নাগা-কুকী, মিজো নিয়ে হিমসিম খেতে হয় নি।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার এর কিছুই দাবি করছে না, শুধু পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কিছু অর্থ চাইছেন, আর বলছেন তোমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য আমরা খাদ্যশস্যের চাষ কমিয়ে অন্য জিনিসের চাষ করছি এবং সেই হিসাবে আমাদের খাদ্যের ঘাটতিটুকু তোমরা পূরণ করে দিও। আমার সব দুগ্ধ তোমরা দোহন করে নিয়ে যাচ্ছ, আমার বাছুরগুলির জন্য যৎসামান্যও কিছু রেখ। কিন্তু কেন্দ্রের বধির কর্ণে এইটুকুও প্রবেশ করছে না। অতএব মুখ্যমন্ত্রী এ-কথাটা না বলে পারছেন না যে, খামোকা অশান্তি করতে কেউই চায় না। কিন্তু তোমাদের যা হালচাল দেখছি তাতে তোমরাই আমাদের সেদিকে ঠেলে দিচ্ছ। এর ফল মারাত্মক, সে দায়িত্ব তোমাদেরই আমাদের নয়।

পাওয়ার লুম তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

শ্রীশম্ভু ঘোষকে ধন্যবাদ। পাওয়ার লুম তদন্ত কমিটির রিপোর্ট তিনি প্রকাশ করেছেন। গরীব তাঁতিদের মেরে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। জনসেবার নাম করে কিভাবে কংগ্রেসের রাজত্বে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে বিধানমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য, মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদ পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরী স্থাপন ক'রে যে অবৈধ কার্যকলাপ চালিয়েছেন তার চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট গত ২০শে মার্চ রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। জনৈক সন্ন্যাসী, কয়েকজন সরকারী অফিসার এবং পাওয়ার লুম উপদেষ্টা, অনাদি ব্যানার্জী সহ প্রাক্তন উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী, প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ, শ্রীমতী অণিমা হোড়, হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও এম এল সি শ্রীবিশ্বরতন গাঙ্গুলী, প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ শ্রীসন্তোষ রায়, কংগ্রেস এম এল সি শ্রীসুধীর নিয়োগী ও শ্রীদুর্গা সিংহ, প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ শ্রীনরেন সরকার, কানাইলাল দাস, কিশোরীমোহন মান্না, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ার তারাপদ চৌধুরী প্রমুখের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। তাছাড়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ ব্যানার্জী এবং মেয়র গোবিন্দ দের বিরুদ্ধেও রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে।

দুর্নীতির বহু অভিযোগ পাওয়ায় পূর্বতন যুক্তফ্রন্টের আমলে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ১৯৬৭ সালের জুন মাসে শ্রী এন সি রায়কে চেয়ারম্যান করে এক পাওয়ার লুম তদন্ত কমিশন বসান। কমিশন ছয় মাস তদন্ত করে গত ১৯৬৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পি-ডি-এফ-কংগ্রেস সরকারের আমলে রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু তার পর থেকে ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যায়।

বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ ঐ রিপোর্ট উপস্থাপিত করেন। ৫৩ পাতার এই রিপোর্টে গরীব তাঁতিদের সাহায্য করার নামে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দুর্নীতির মাধ্যমে যে পয়সা লুটেছেন তারই একটি ব্যাপক ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে প্রকৃতপক্ষে এঁরা নিজেদের পরিবারবর্গ, বন্ধুবান্ধব এবং স্তাবকদেরই সেবা করেছেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেণ্ট এবং ভূতপূর্ব অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস ট্যাক্স কমিশনার শ্রী এন সি রায় ছাড়া কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজির অধ্যক্ষ এন. এন ব্যানার্জী এবং রাজ্য সরকারের জয়েন্ট ডিরেক্টর (হ্যান্ডলুমস) শ্রী এস পি দে সদস্য হিসাবে উক্ত কমিশনে ছিলেন।

এটি সাধারণ তদন্ত কমিটি নয়। কমিশন অফ এনকোয়ারী অ্যাক্ট অনুসারে আদালতের ক্ষমতা দিয়ে এই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়।

শ্রীরায় তাঁর রিপোর্টে অনেক ধনী মাড়োয়ারীর নামোল্লেখ করেছেন, তাঁরা নানা পদ্ধতিতে কতকগুলো সোসাইটির অধিকাংশ শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করছেন। কয়েকজন মহাজনের নাম আছে, এঁরা সন্দেহজনকভাবে সোসাইটিগুলো দখল করে গরীব তাঁতিদের শোষণ করে যাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের পাওয়ার লুম অ্যাডভাইসারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর পরিবারবর্গ বে-আইনীভাবে নৈহাটি, নারায়ণী এবং দীনবন্ধু পাওয়ার লুম সোসাইটির গরীব তাঁতিদের বঞ্চিত করে নিজেরাই এগুলোর সম্পত্তি ভোগ করে চলেছেন এবং এগুলোতেও দুর্নীতি আছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিভিন্ন জেলায় পাওয়ার লুম সোসাইটি বসানো হবে স্থির হয়েছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেগুলো কলকাতার আশেপাশের কারখানায় বসানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জন্য আটটা পাওয়ার লুম কারখানা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু সেখানে না বসে ওগুলো কলকাতার আশেপাশে বসানো হয়েছে। তাজ্জব ব্যাপার।

দুর্নীতির অভিযোগে যেসব কো-অপারেটিভ সোসাইটির বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়:—

১। কাকদ্বীপ পি-এল-সি-এস লিমিটেড। ২। জিয়াগঞ্জ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পি-এল-এস। ৩। কোচবিহার কো-অপঃ টেক্সটাইল এস লিমিটেড। ৪। অনন্তপুর তাঁত শিল্প এস-এস-লিমিটেড। ৫। দি বোলপুর কো-অপারেটিভ-ফ্যাক্টস লিমিটেড। ৬। পূর্বাঞ্চল উইভিং। ৭। নৈহাটী পি-এল-সি-এস লিমিটেড। ৮। নারায়ণ টেক্সটাইলস। ৯। দীনবন্ধু টেক্সটাইলস। ১০ অ্যামপ্রোস। ১১। সুবার্বান পি-এল-সি-এস লিমিটেড। ১২। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এ্যাপেক্স পি-এল-সি-এস লিমিটেড। ১৩। ভদ্রকালী কো-অপারেটিভ। ১৪। বারাসত ইন্ড সি-এস লিঃ ১৫। টাকী পি-এল-সি-এস লিমিটেড প্রভৃতি।

যেসমস্ত অফিসার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐসব কো-অপারেটিভ সোসাইটির সঙ্গে জড়িত তাঁদের নাম: পাওয়ার লুম অ্যাডভাইসার শ্রীঅনাদিনাথ মুখার্জী, চীফ অডিটর অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ—ডি এন দাশগুপ্ত, এম এন গাঙ্গুলী, ডেপুটি ডিরেক্টর ইন্ডাস্ট্রীজ (হ্যান্ডলুম), এন এন সরকার, ডেপুটি ডিরেক্টর ইন্ডাস্ট্রীজ (স্টীল) প্রমুখ।

কয়েকজন বিশিষ্ট ধনকুবের মাড়োয়ারী যেসব সোসাইটির শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করছেন:—

১। সুবার্বান পাওয়ার লুম সি-এস, লিঃ, ২। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা পাওয়ার লুম সি-এস লিঃ ৩। লিলুয়া কো-অপারেটিভ উইভিং ফ্যাক্টরী। ৪। বেলুড় উইভার্স সি-এস লিঃ এই গ্রুপের হাতে আরও কয়েকটি সোসাইটি আছে।

যে কয়েকজন ধনী বাঙালী বিভিন্ন সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত।

মেসার্স প্রণতি টেক্সটাইল, যার অংশীদার মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে। এর সঙ্গে আছে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট পাওয়ার লুম এ্যাপেক্স সোসাইটি। এছাড়া চারটি নাম রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

শ্রীরায় তাঁর রিপোর্টে কো-অপা-

বেটিভ সোসাইটির দু-জন রেজিস্ট্রার যথাক্রমে শ্রীশ্যামসুন্দর দত্ত আই এ-এস ও সুশীলস্বরূপ ভার্মা, আই-এ-এস-এর বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে।

এই রিপোর্ট হাউসে পেশ করে শ্রীশম্ভু ঘোষ বলেন, পি-ডি-এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার এবং রাজ্যপাল ধরমবীরের আমলে ঐ রিপোর্ট কোল্ড স্টোরেজে আবদ্ধ ছিল। মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূর্বে যদি এই রিপোর্টগুলি প্রকাশিত হোত—তবে বিরোধীপক্ষ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, তাঁদের সংখ্যা ৫৫'র বদলে পাঁচ হোত কি-না সন্দেহ।

মিঃ এন সি রায়ের রিপোর্টে বহু রথী-মহারথীর নাম উল্লেখ আছে যাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একটি শ্লোক মনে পড়ে, "মহাভারতের কথা অমৃত সমান—যুক্তফ্রন্ট সরকার কথা শুনে পুণ্যবান।"

এইসব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কেমনভাবে পাওয়ার অফ সোসাইটিগুলিকে আত্মসেবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া এক শ্রেণীর ধনিকগোষ্ঠী ও আমলা অফিসারদেরও নাম উল্লেখ আছে। তাঁদের শ্রেণী-চরিত্র পরিষ্কার। বুর্জোয়া রাজনৈতিক কাঠামোতে বুর্জোয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থার আনুকূল্যে শোষণ করাই তাঁদের কাজ। কিন্ত যাঁরা দেশসেবার মুখোস পরে জনসাধারণকে বঞ্চনা করেন, তাঁরা ভন্ড, বিশ্বাসঘাতক।

এই রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য শ্রীশম্ভু ঘোষকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক রাঘব বোয়াল এবার জালে ধরা পড়েছে। এদের যদি সত্যই সকঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে একটা আদর্শ স্থাপন করা হবে এবং তার ফলে যুক্তফ্রন্টের ওপর জনগণের আস্থাও বাড়বে।

বিধান পরিষদের বিলুপ্তি

যুক্তফ্রন্ট সরকার যে তাঁদের বত্রিশ দফা কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণ ধীরে ধীরে ঘটাতে চলেছেন তার আরও একটি পরিচয় পাওয়া গেল তাঁদের বিধান পরিষদ তুলে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণায়। বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, বিধান পরিষদ তুলে দেওয়া হোক। প্রস্তাবক শ্রীযতীন চক্রবর্তীর ভাষায় বিধান পরিষদ একটি শ্বেতহস্তী বিশেষ, অনাবশ্যক অর্থের অপচয় করা ভিন্ন যা রাখার কোন অর্থ হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই জানেন আইনসভার উচ্চ কক্ষের কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই। যদি উচ্চ কক্ষ নিম্ন কক্ষের সঙ্গে একমত হয় তাহলে তার অস্তিত্ব বাহুল্যমাত্র এবং যদি একমত না হয়, তাহলে তার অস্তিত্ব ক্ষতিকর—একথা বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাই বলে গেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র ইংলন্ডের অন্ধ অনুকরণে ভারতবর্ষের বেশির ভাগ রাজ্যে এবং কেন্দ্রে উচ্চ কক্ষের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি করা, নির্বাচনে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি খয়ের খাঁ গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা। বলা বাহুল্য এই বিধান পরিষদের পিছনে ব্যয় বড় কম হয় না, যা আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে একান্তই অসঙ্গত। যুক্তফ্রন্টকে ধন্যবাদ এই অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করে একটি কাজের কাজ করেছেন এবং প্রতি বছর ওই শ্বেতহস্তীকে পোষার জন্য যে ব্যয় হয়, তা দিয়ে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ে তোলা যায়। প্রসঙ্গত এ-ও বলা যেতে পারে যে, ভারতের অপরাপর রাজ্যগুলিতে অবস্থিত বিধান পরিষদগুলিও তুলে দেওয়া উচিত এবং কেন্দ্রের রাজ্যসভাও। এতে অবশ্য কিছু পেশাদার ও অপেশাদার রাজনীতিক মাসিক ভাতা থেকে বঞ্চিত হবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের মঙ্গল হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে (১)

কেয়াতলা লেনে অবস্থিত গভর্নমেন্ট-স্পনসর্ড সঙ্গীতের শিক্ষিকা-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের (ইনস্টিটিউশন ফর দি ট্রেনিং অফ মিউজিক টিচার্স—উম্যান) পরিচালন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা অভিযোগ আমাদের নিকট আসছে। রাষ্ট্রপতির শাসনকালে আমরা এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কতকগুলি অভিযোগ প্রকাশ করে অভিযোগসমূহ যথার্থ কি না সে বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগকে অনুরোধ করেছিলাম, যদিও আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, প্রতিষ্ঠানের সংগে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দারুণ কারিৎকর্মা এক ব্যক্তির তৎপরতায় এবং সরকারী লাল ফিতার মাহাত্ম্যে অভিযোগগুলি যথারীতি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে স্থান পাবে। জানি না, আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল কি না। তবে কোনোরকম তদন্তের ব্যবস্থা যে হয় নি এ সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত।

কিছু কিছু অভিযোগ আমরা পুনঃ প্রকাশ করছি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের জরুরী দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে আমরা সুখী হব।

উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগকালে যে-সময়ের জন্য যে বেতন তখন ধার্য হয়েছিল, দশ বছর পরেও, শিক্ষকতার সময় বৃদ্ধি পেলেও, তাঁদের বেতন বৃদ্ধি হয় নি আজও। অথচ যথাসম্ভব বেতন বৃদ্ধির আশ্বাস তাঁদের দেওয়া হয়েছিল। একটি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজের সঙ্গে অপর একটি গভর্নমেন্ট-স্পনসর্ড কলেজের বেতনক্রমের আকাশ-পাতাল পার্থক্য হবে, এর পিছনে কি যুক্তি আছে বোঝা যায় না। প্রত্যেকেই আজও তাঁদের প্রারম্ভিক বেতনে আছেন, এবং তা-ও নিয়মিত দেওয়া হয় না। গত নভেম্বর মাস থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের বেতন পাচ্ছেন না। (সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার এই যে, এ সম্পর্কে আবেদন-নিবেদন করতে গিয়ে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই নাকি চোখ রাঙানীর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইনস্টিটিউশন তুলে দেওয়া হবে, পারিবারিক সোসাইটির হাতে দিয়ে দেওয়া হবে ইত্যাদি হুমকি নাকি সব সময়ই দেওয়া হচ্ছে।) অপর গভর্নমেন্ট-স্পনসর্ড কলেজের মত তাদের কোন প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, ইনক্রিমেন্ট, দুর্মূল্যভাতা কিছুই নেই।

আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, একাধিক মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করে থাকেন। ফলে অনেক সময় নাকি তাঁকে আলোচ্য সংস্থায় অনুপস্থিত থাকতে হয়। একটি গভর্নমেন্ট-স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠানে কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না তা দেখার দায়িত্ব কি সরকারের নয়?

উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য কলকাতার গোলপার্কের কাছে অনেকটা জমি কেনা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তর সহ। সরকারী সাহায্যরূপে এই জমি ও গৃহনির্মাণের জন্য এককালীন প্রায় দুই লক্ষ টাকা ওই মহাবিদ্যালয় লাভ করে। আজও কোন গৃহনির্মাণ হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবে কি না বলা যায় না। অথচ এগারোশো টাকা মাসিক ভাড়ায় নাকি মহাবিদ্যালয়ের কাজ নির্বাহ হচ্ছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওই টাকাটা নাকি ব্যাঙ্কে পড়ে আছে কারেন্ট একাউন্টে, সুদবিহীন অবস্থায়।

শোনা যায়, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ছাত্রীদের মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেবার একটি ব্যবস্থা ওখানে আছে। অনেক দুস্থা ছাত্রী এই স্টাইপেন্ডের আশায় ওখানে ভর্তি হয়েছিলেন। অথচ আজও পর্যন্ত কোন বিদ্যার্থী এই স্টাইপেন্ডের সুযোগ কেন পেলেন না সে-ও এক রহস্য।

ভারত দর্শন

শিল্প লাইসেন্সিং কমিটিতে দুর্নীতির অভিযোগ এবং দুর্নীতিরোধের — কয়েকটি উপায়

রাজ্যসভায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এস-এস-পির নেতা রাজনারায়ণ বলেন, স্কুটার উৎপাদনকারী যে সংস্থার প্রতিনিধির কাছে গিয়ে শিল্পোন্নয়ন দপ্তরের উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব কিছু "খরচ খরচা" করার প্রস্তাব রাখেন, সেই প্রতিনিধি ও একান্ত সচিবের বাক্যালাপের টেপ রেকর্ড পর্যন্ত রাজনারায়ণের আয়রন-সেফে আছে। অর্থাৎ তিনি শুধু অভিযোগই হাজির করেন নি, দোষীকে প্রায় বামালসুদ্ধ পাকড়াও করেছেন। এবং বামাল সম্পর্কিত প্রমাণাদি যখন বিরোধী নেতার হাতে, তখন তাল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়েছে। ফকরুদ্দীন সাহেব জানিয়েছেন, একান্ত সচিব ও স্টেনোগ্রাফারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তা ছাড়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, লাইসেন্সের ব্যাপারে, তা প্রাপক যত বড় কেউ-কেটাই হোন না কেন, মন্ত্রীমহোদয় স্বয়ং আবেদন বিচার করে দেখেন, কোন প্রভাব বিস্তার তাই অসম্ভব। ফকরুদ্দীন সাহেবের এবম্বিধ বিবৃতি প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই, কিন্তু সন্দেহ অবশ্যই আছে একটি প্রশ্নে, তা হল, বস্তুতই কি লাইসেন্স ইত্যাদির ব্যাপারে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটে না। শ্রীচন্দ্রশেখর এবং তাঁর আনীত অভিযোগের আলোকে এসব কথা কিন্তু আজ স্বয়ং ঈশ্বরের মুখেও অবিশ্বাস্য শোনাবে। তাই বলে ফকরুদ্দীন সাহেব স্তোক দিচ্ছেন এমন কথাও বলছি না। আলোচ্য বিশেষ ক্ষেত্রে মন্ত্রীবর লৌহাদপি কঠোর হলেও হতে পারেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রে কি সেই কঠোরতা সম্ভবপর।

এ ব্যাপারে খরচ খরচায় ডিলটা খুবই শুকনো। মাত্র ছয় শত টাকা উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ। প্রতিশ্রুত দেয় অর্থের পরিমাণ সাকুল্যে তিনটি হাজার মুদ্রা। আদায়ে স্কুটার কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স মিলবে বলে পার্টিকে একান্ত সচিব ভরসা দিয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ শিল্পোন্নয়ন দপ্তরের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছেন। সে সম্পর্কে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সংবাদে তার উল্লেখ নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও আমেদ সাহেব আবার এক সঙ্গে কাজ করেছেন আসামে তাঁর মুখ্যমন্ত্রিরূপে অবস্থানকালে। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও সংবাদ চোখে না পড়ায় ফকরুদ্দীন সাহেবের তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের কৃতিত্বটা পূর্ণকায় রূপ পেতে পারে নি। সাধারণের জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে।

ঘুষের দেশে সমাজতন্ত্র

দুর্নীতি জিনিসটা প্রশাসনের একটা কোন বিশেষ জায়গায় দড়কচা ধরিয়ে চাক বেঁধে নেই। দুর্নীতির একটা লম্বা চেন আগামুড়োয় লম্বালম্বি টানা আছে। উচ্চপদে ঘুষের বহর স্ফীততর, নিম্নপদে নামমাত্র। উচ্চপদস্থ ঘুষুড়ে ঘুষকে বহু ক্ষেত্রে নজরানারূপে রয়্যাল তবিয়তে গ্রহণ করে থাকেন, নিম্নপদস্থ ঘুষ বাঁ হাতে নিয়ে আপাত-দীন জামার আস্তিনে কুড়িয়ে রাখেন। নিম্নপদস্থ ঘুষের আংশিক টাকায় সংসার চালান, উচ্চপদস্থ 'বার'-বিলাসী হন। ঘুষের যদি কতকাংশেও সামাজিক মূল্য থেকে থাকে, তবে নিম্নপদস্থের প্রতি প্রদত্ত ঘুষের মধ্যে তবু ন্যাশনাল ইনকাম খানিকটা গরীবের সংসারে বণ্টিত হওয়ার মধ্যে তা আছে। কিন্তু উচ্চপদস্থের ঘুষ যায় 'বার', 'নাইট ক্লাব' আর রেসের ময়দানে। ঘুষের ব্যাপারেও (যখন ও জিনিসটা চলছে এবং আরও কিছুকাল চলবে) একটা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যায় না কি?

অর্থাৎ ঘুষ চেনের আগে মাথা ধর, পরে ল্যাজ কোপাও। অর্থাৎ আজ দণ্ডের যে ব্যবস্থা আছে তাকে ঠিক সেই অনুপাতে উল্টে ধর। এবং তা হলেই ঘুষের আয়ু অনেক তাড়াতাড়ি কমে যাবে। কর্তা যদি কঠিন হন, করণিক কতদূর এগোবেন! প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই কর্তা-ধরা চোখটিকে নিরপেক্ষ করতে হবে। না হলে নিচতলায় পাঁচ সিকে ঘুষ বন্ধ হলেও, ওপরতলার পাঁচ হাজারি ঘুষুড়ে যথারীতি বার বার 'বারে বারে' বীর-মাতুনী করে বেড়াবে। তাতে ঘুষতান্ত্রিক সমাজের ঘুণে-ধরা অবস্থাকে বাঘে ধরবে। নবাবী নজরানার দাপটে চতুর্দিক আরও অন্ধকার হয়ে উঠবে। বড় বড় ঘুষুড়েরা হাত লম্বা করে নিচতলায়ও লোলুপ বাহু বাড়িয়ে ধরবেন নিজেদের মঙ্গলচণ্ডীর বরপুত্র জেনে। ফলে লাখোপতি থেকে চুনোপুঁটি প্রত্যেকের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়বে।

প্রশাসনিক কর্তারা নিজেরা দুর্নীতিমুক্ত হলে ঘুষের আয়ুষ্কাল কমে আসবেই। সাধারণের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিচতলায় কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ক্ষমতা নেই। সুতরাং সেখানে বৃথা পয়সা ছড়ানোর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোনও কাজ হয় না। নিচতলার চাকুরিয়া ভোগ দিয়ে দু' পয়সা রোজগার করেন। সাধারণের মনে ধারণা সৃষ্টি করতে চান যেন ফাইল চালনার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা অসীম। বস্তুত তাঁর হাতে ক্ষমতা এইটুকুই যে, পরের কাজ তিনি আগে করতে পারেন। অর্থাৎ ওপরতলার মার্কা-করা 'আর্জেন্ট' 'ইমিডিয়েটে'র মধ্যে তিনি তাঁর পার্টির ফাইলকেও 'আর্জেন্ট' 'ইমিডিয়েট' করে সবার আগে ওপরওয়ালার সিদ্ধান্তের জন্য বাড়িয়ে ধরতে পারেন মাত্র। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও তাঁর নেই, যদি ওপরওয়ালা পরিশ্রমী হন ও নিজে ফাইল বিচার করে দেখেন, অ্যাসিস্টান্ট-নির্ভর না হয়ে পড়েন।

একটা হতাশ-কথা প্রায়ই শোনা যায়, ঘুণধরা সমাজে ঘুণের রেওয়াজ বন্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। অন্তত প্রশাসনকে ঢেলে না সাজালে তা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ও শুধু এসকেপিস্ট হতাশা। বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও এই নোংরা নীতি খতম করার জন্য কয়েকটি

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে কয়েক ক্ষেত্রে হয়ত কিছু অসুবিধা দেখা দেবে। কিন্তু সেটুকু সহ্য করে না নিলে এই ঘুষতন্ত্র বন্ধ করা সম্ভব নয়।

কেন্দ্রে বা রাজ্যে সরকারগুলি সত্যিই যদি আবহমানের এই ঘুষতন্ত্র বন্ধ করতে চান, তবে কয়েক ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ফরমুলা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তাতে ঘুষ বন্ধের প্রাথমিক আবহাওয়া অবশ্যই সৃষ্টি হবে।

ঘুষ বন্ধের ফরমুলা

প্রথম ও প্রধান কাজ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ক্ষমতাকে গুরুত্বানুসারে ধাপে ধাপে বন্টন করে দেওয়া এবং তার পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপরই সীমাবদ্ধ করা। এর ফলে কাজ দ্রুত হবে এবং লাল ফিতের ফাঁস পরে ইতিকর্তব্য হাঁসফাঁস করবে না। সর্বোচ্চ ক্ষমতাও চেন তৈরি করে -'বার'-বিলাসী হওয়ার সুযোগ কম পাবেন। কোনও বদনাম হলে আমলারা দোষ একে অপরের ঘাড়ে চাপাবার সুযোগও পাবেন কম।

কোন ক্ষেত্রেই এইভাবে বণ্টিত বিভাগে কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নাক গলাতে পারবেন না।

প্রতি বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। এবং বিষয়ের জটিলতার অনুপাতে ফাইল 'ডিজপোজ' করার সংখ্যা অর্থাৎ কোটা বেঁধে দিতে হবে। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক কর্মীকে ঐ কোটা সম্পূর্ণ করতে হবে। কোন কর্মী ছুটিতে গেলে তৎক্ষণাৎ সে জায়গা অন্যতর কর্মীর দ্বারা পূরণ করতে হবে। যেহেতু কোটার ভিত্তিতে কাজ হবে, সে কারণ একই ধরনের কাজের এক-একটি 'য়ুনিভার্সাল কোটা' অর্থাৎ দেশব্যাপী একই ধরনের কোটা চালু করতে হবে। যাতে কোথাও কোনও কর্তৃপক্ষ কোটা নির্ণয়ের ব্যাপারে খুশিমত চাপ সৃষ্টি অথবা ফাঁক সৃষ্টি করতে না পারেন। এই কোটা পূরণ করেও কর্মীরা যত বেশি কাজ দিতে পারবেন ঠিক তারই ভিত্তিতে ওভারটাইম (অর্থাৎ এখানে ওভার প্রোডাকশন বা বাড়তি কাজ) হিসেব করা হবে। সময়ের ভিত্তিতে নয়, কেন না সময় দিয়ে কাজ হয় না। হয় বিস্তৃত ফাঁকির ব্যবস্থা। কোটাবদ্ধ কাজের অপর সুবিধা হচ্ছে, লেট এ্যাটেন্ডান্স ও 'আর্লি লিভ'-ও কাজের ওপর কোনও ছায়াপাত করতে পারবে না। কর্মচারীদের বাৎসরিক পাওনা ছুটির দরুণ কত পরিমাণ 'ম্যান আওয়ার' কম হচ্ছে কোটা নির্ণয়ের সময়ই তারও হিসেব কষে নিতে হবে, যার দ্বারা কোনও কর্মচারী ছুটিতে গেলেও ছুটিতে যাবার আগে ও পরে যাতে ঐ কোটা পূর্ণ হয় তার ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর দপ্তরে কাজ পড়ে থাকতে পারে না, সে জন্য তাঁর বদলীতে অপরে সেই কোটা তুলে দেওয়ার দরুণ, ছুটি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেই হিসেব অনুসারে বিনা উপরি পরিশ্রমকে বাড়তি কাজ বা 'ওভার প্রডাকসন' দিয়ে ছুটিতে অবস্থানকালীন বাদ যাওয়া কাজ তুলে দিতে বাধ্য থাকবেন। 'কোটা' সিস্টেম চালু বলেই কেউ কোটা সম্পূর্ণ করার পর ছুটি পাবেন না। পাবেন কাজের ভিত্তিতে উপরি পারিশ্রমিক এবং সেই পারিশ্রমিক দশটা-পাঁচটার মধ্যেই গণনা করা হবে কাজের সংখ্যার ভিত্তিতে। এর ফলে 'এফিসিয়েন্সি'র দরুণ পুরস্কৃত হওয়ারও সুযোগ মিলবে। 'কোটা'র হিসেব পূর্ণ কাজের সুচারু সম্পাদনার ভিত্তিতেই করতে হবে। অর্থাৎ ফাঁকি রেখে ফাইল সাফ করে কোটা ধরা চলবে না।

আর যেহেতু কাজ 'কোটা'র ভিত্তিতে গুণে তোলা হবে সেজন্য কাজের সংখ্যানুসারে কর্মীর সংখ্যার অনুপাত নির্ধারণও সহজ হবে ও তারই ভিত্তিতে কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। কারও ওপর ওভার টাইম বাধ্যতামূলক করে কর্মীসংখ্যা হ্রাস করা যাবে না।

আর এই সব ব্যবস্থা গৃহীত হলে, জমার তারিখ অনুসারে প্রতিটি কেস 'ডিল' করতে বাধ্য থাকবেন নিম্ন মহল থেকে উচ্চতম কর্তৃপক্ষ সকলেই সমানভাবে। আর্জেন্ট ইমিডিয়েট এবং প্রায়রিটিব খুশিমত মার্কা মেরে কোন উচ্চপদস্থ আমলা কোনভাবে স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ পাবেন না। নিম্নস্তরের আমলারাও তারিখের ক্রম ব্যতীত ফাইল নাড়ালে অপরাধী বলে গণ্য হবেন। একইভাবে অপরাধী চিহ্নিত হবেন উচ্চপদস্থ অফিসারও। ফলে লাল ফিতের ফাঁস পরিয়ে ঘুষের রাজ্য কায়েম করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু এমন অনেক বিভাগ থাকবেই যেখানে 'আর্জেন্ট' এবং প্রায়রিটি এড়ানো যায় না, যেমন স্বাস্থ্য বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, বিচার বিভাগ ইঃ। সে ক্ষেত্রে ইমারজেন্সী বিভাগ সৃষ্টি করে সেই বিভাগে এই কেসগুলির প্রাথমিক ডিলিং হতে পারে।

প্রতিটি কাজ যদি দ্রুত হাতে সমাপ্ত হয় তখন জরুরী কাজের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এক সপ্তাহের আগে যে কেসগুলি না ডিল করলেই নয়, সেগুলিই একমাত্র প্রায়রিটি পেতে পারবে, কোন উচ্চপদস্থ কর্মী, এম-এল-এ অথবা মন্ত্রীবরের রেকমেন্ডেশনে নয়। আর্জেন্টের মেয়াদ পনের দিন এবং ইমিডিয়েটের মেয়াদ হবে এক মাসের মধ্যে যে কেসগুলি ডিল না করলেই নয়। বাকি তারিখ অনুসারে দ্রুতভাবে কাজ এগোবে। জরুরী কাজের চরিত্র নির্ণিত হবে কাজের জরুরী গুরুত্বের ওপর, কারও খেয়াল-খুশির ওপর নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কোন কাজে জরুরী ছাপ পড়ে, তবে যেখান থেকেই সে ছাপ আসুক না কেন, যে কোন কর্মচারীর তা তুলে দিতে অস্বীকার করার লিখিত অধিকার থাকবে এবং সে জন্য কারও ওপর কোন দোষারোপ আনয়ন করা চলবে না। বিভাগীয় দায়িত্বের বোঝা যেমন থাকবে ছোট ছোট য়ুনিটের ওপর, তেমনি সেখানে কারও নাসিকা প্রবেশও চলবে না। সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারীর কাজ হবে য়ুনিট তার যথার্থ দায়িত্ব আইনানুসারে পালন করেছেন কি না।

এ গেলো প্রশাসনিক বিভাগে লাল ফিতের উচ্ছেদের একটি তাৎক্ষণিক উপায় যা এখনই গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্রমশ বিভিন্ন দপ্তরে এবং লাইসেন্স পারমিটের অর্ডার প্রদান ও অর্ডার ধরার ক্ষেত্রে ঘুষতন্ত্র উচ্ছেদের প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা চলতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সমাজসচেতন কর্মীরা সাপ্তাহিক বসুমতীর 'ভারতদর্শন' বিভাগের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন রাজ্য থেকে উৎসাহী সমাজসচেতন ব্যক্তির প্রস্তাব উপযুক্ত বিবেচনায় 'ভারতদর্শন' বিভাগে প্রকাশিত হবে।

দেশাই উবাচ

অতএব দেশাই সাহেব সম্মুখ সমরে নেমে পড়লেন। দুর্যোধন বলেছিলেন, না ছাড়িব সূচ্যগ্র মেদিনী। দেশাই ফতোয়া জারি করেছেন, নাহি দিব কণামাত্র রাজ্যের ভাণ্ডারে। দুর্বিনীত দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত ভয়ানকভাবে টসকে গেছলেন।

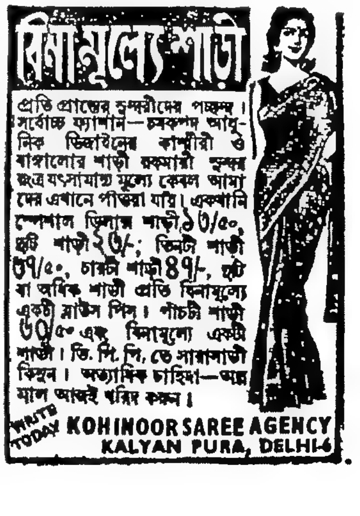

দেশাই সাহেবের দাপট আর কতদিন দুরন্ত দাপাদাপির সুযোগ পাবে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাতেও যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। তবে কিনা দেশাই সাহেব একজন শক্ত মানুষ। উনি তাই বলছেন, দেখি যদি সাধ্য থাকে সংবিধান সংশোধনের কারো। একথা তিনি বলতে পারেন বটে। এখনো ভোটের জোর কেন্দ্রে ওঁদেরই দিকে। কিন্তু সে জোরও যে কতকাল টেকসই ক্ষয়িষ্ণু রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়ে তাতেও কি সন্দেহ কম হচ্ছে? কিন্তু শ্রীদেশাই এবং শ্রীযুত বলবন্ত রাও চাবন সাহেবের একটি গুণ, তাঁরা সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ দেখেও তরণীর গতিমুখ ফিরিয়ে ধরেন না। তবে মুস্কিল হল লড়াইটা কার সঙ্গে এই কথাটা সম্যক চিন্তা করে দেখার অবকাশ ওঁরা কমই পান। পূর্ববর্তী সংখ্যায় চাবন সাহেবের লড়িয়ে নীতির ফলে তাঁর দলের মহতী বিপত্তির আলোচনা আমরা রেখেছিলাম। বলেছিলাম, দেশের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিয়ন্ত্রিত রাজনীতির ঘায়ে কংগ্রেস হালে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে কুপোকাৎ হয়েছে সেই পতনের দায়িত্ব সর্বাংশে না হলেও বেশ খানিকটাই চ্যাবনিক নীতির ফল। এবার বলতে হচ্ছে, মোরারজী সাহেবের লড়িয়ে চ্যালেঞ্জ কংগ্রেসকে আবার জোর আঘাত করতে চলেছে। কারণ মোরারজী সাহেব তাঁর চ্যালেঞ্জ কোন রাজ্যের যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে রাখছেন না, রাখছেন আশায় উদ্দীপ্ত রাজ্যবাসী সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। যাঁরা মোরারজীকে মোরারজী বানান, আবার যাঁদের ভোটের জোরে যে কোনও মোরারজী সাহেব নিতান্ত বেমানান হয়ে যেতেও পারেন হঠাৎই। কিন্তু একা মোরারজী সাহেবরাই তো নয়, গোটা কংগ্রেসেরও একটা ভবিষ্যৎ আছে। সেই দলকে ক্রমাগত গণস্বার্থবিরোধী দল হিসেবে প্রতিপন্ন করে সাধারণের সামনে তুলে ধরলে দেশাই সাহেবরা কি আরও কিছুকাল পর ঠিক এইভাবে আস্ফালনের সুযোগ পাবেন।

রাজ্যের হাতে তার প্রাপ্য সম্পদ তুলে না দিয়ে কোন যুক্তফ্রন্ট সরকার অথবা কংগ্রেসবিরোধী সরকারকে যত না বিপাকে ফেলা হবে, রাজ্যবাসীকে সে তুলনায় অদ্যাবধি ঢের বেশি বঞ্চনার মধ্যে নিমজ্জিত রাখা হবে। এতোকাল রাজ্যগুলি কংগ্রেস কবলিত থাকায় রাজ্যবাসীর আর্ত কণ্ঠস্বর মুষ্টিমেয় বিরোধীকণ্ঠের চীৎকার মাত্র হয়ে আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোথাও কোথাও জনপ্রিয় সরকার জনপ্রিয় দাবি তুলে আজ সেই প্রত্যাখ্যাত দাবির পেছনে বহুগুণ শক্তি নিয়োজিত করেছেন। যে মোরারজী দেশাই কংগ্রেসী রাজ্যের দাবি নির্বেধে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন আজ কিন্তু সে মোরারজী আর নেই, তাঁকে শুধরে ভাবতে হবেই।

রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতার দাবি তুলেছেন বাংলার অজয়-জ্যোতি সরকার: যে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল কেরালায়। সে দাবি আজ মদত পাবে অন্যান্য অকংগ্রেসী রাজ্য থেকেও। সুতরাং সে রাম সে রাজত্ব নেই। আর নেই বলেই অতীতের সহনশীলতাও আজ একইভাবে জনগণের কাছ থেকেও আশা করা দিবাস্বপ্নে পরিণত হবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক হাওয়ার গতিও বেগতিক। এই সব কারণাদির পরেও রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করে কেন্দ্রে ক্ষমতা ও সম্পদ পুঞ্জীভূত করার দুঃস্বপ্ন জিইয়ে রাখা আজ বস্তুতই কঠিন।

মোরারজী দেশাই যেমনভাবে বলেছেন তা প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জের রূপে উত্থাপিত হয়েছে। কাজটা ভালো হয় নি। একজন গণতন্ত্রী নেতার পক্ষে গণস্বার্থের বিরুদ্ধে এমন উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ রাখা ভালো হয় নি।

বলা বাহুল্য শ্রীদেশাই সেটা যে একেবারে না বোঝেন এমনও নয়। তিনি বলেছেন, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিলে দেশের ঐক্য বিনষ্ট হবে। বিভিন্ন অবস্থায় কেন্দ্র যখনই বেকায়দায় পড়েছেন তখনই ঐক্যের জুজু তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। দেশের লোকও শুধুমাত্র পুতুলনাচের দর্শক নন। ঐক্যের জুজু-নর্তনে তাঁরা আর তেমন আমোদ পাচ্ছেন না। কারণ তাঁরা বুঝে ফেলেছেন, কয়েকটি পক্ষপাতপুষ্ট রাজ্য অপরাপর রাজ্যের সম্পদ হরণ করবার সুযোগ পাচ্ছে কেন্দ্রীয় আগ্রাসী নীতির ফলে। বলা বাহুল্য কোন রাজ্যই নিজের পেট মেরে ঐক্যের পরাকাষ্ঠা তুলে ধরতে আবহমানকাল রাজী থাকবে এমনটা তো আর হতে পারে না। সুতরাং বঞ্চিত ও শোষিত রাজ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধবেই।

দেশাই সাহেবের বাণী মর্মবিদ্ধ হওয়ার পরেও তাই দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ কিম্বা জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিরা কেউই সংহতির প্রশ্নে কপালে রেখা ফেলে দুশ্চিন্তায় চুপসে যান নি। ঐক্যের বাকা পুরোনো হয়ে গেছে, আর তাই মোরারজী দেশাই উবাচ বাণীকেই শেষ কথা বলে মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। কোন কোন রাজ্য-নেতা বলছেন, অধিকার কোনও বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা প্রদেয় বস্তু নয় যে, তাঁর খেয়ালখুশির ওপর তা পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করবে।

অধিকার অর্জন করতে হয়। রাজ্যে রাজ্যে সেই ঐক্যমত গড়ে উঠলে সে অধিকার অর্জিতও হবে।

সহযোগিতার মাধ্যমে ফেডারেল কাঠামো !

একদিকে উপপ্রধানের চ্যালেঞ্জ, সংবিধান সংশোধন নয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বা স্টেট ব্যাঙ্কের সাহায্য নয়, কেন্দ্রের অতিরিক্ত সাহায্য নয়; অর্থাৎ রাজ্যের বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানোর ব্যবস্থাকেই চালু রাখার হুমকী। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতার আগ্রহ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলেছে।

জাতীয় সংহতি পরিষদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠকে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরুর আগ্রহও প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি মনে করেন, ফেডারেল কাঠামোতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক মধুর করে তোলাই প্রথম কথা। এ ব্যাপাবে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণেরও তিনি পক্ষপাতী। বাজেট অধিবেশনের পর সংহতি পরিষদের একটি পূর্ণ বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। এ ব্যাপারে আলোচনার খসড়া আগে তৈরি করা ও প্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট টেবলে রাখারও প্রয়োজনীয়তাব ওপর জোর দেওয়া হযেছে।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ এ ব্যাপারে একটি মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। কামরাজও ফেডারেল আবহাওয়া রচনার অনুকূলে চিন্তা করছেন বলে ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দুটি পদ্ধতিই পরখ করতে চান,—(১) আলোচনার মাধ্যমে রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধি (২) সংবিধান সংশোধন।

আলোচনার ভিত্তিতে কনভেনশন তৈরি করে ক্ষমতার্পণ জিনিসটা যদি মেনে নেওয়াই হয়, তবে ব্যাপারটা কিন্তু কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকছে। ক্ষমতায় থাকলে সংবিধানেরই নানান ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যখন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তখন কনভেনশন সৃষ্টি করে আর কতখানি ঔদার্য প্রদর্শিত হবে। আইনের বাঁধনই শ্রেয়। ভুক্তভোগী রাজ্যগুলি কেবলমাত্র আলোচনার মাধ্যমে এতোবড় একটি অধিকারগত প্রশ্নকে মিটিয়ে নেবেন, এমত আশা করা ঠিক কতদূর স্বাভাবিক তাও ভেবে দেখতে হবে। প্রশ্নটা সর্বৈবভাবেই সাংবিধানিক। রফা বন্দোবস্তের ব্যাপার নয়। বিশেষ কতিপয় কেন্দ্রীয় নেতার ভূমিকা যে-ক্ষেত্রে মোটেও রাজ্যগুলির প্রতি শুভেচ্ছাসম্পন্ন নয়। প্রশ্নটিকে তাই সংবিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা ফয়সালা করাই ভালো এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা পূর্ণ সহযোগিতা করলে সেটাই হবে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল। (২৩।৩।৬৯)

একদল চীনা সৈন্য দমনস্কি দ্বীপের ওপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করছে।

পাকিস্তান ঃ

পাকিস্তান এখন গৃহযুদ্ধের কিনারায় এসে পৌঁছেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ব্যাপক বিক্ষোভ দমনেরা জন্য করাচী থেকে দুই জাহাজ ভর্তি সৈন্য, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক জিনিষ পাঠানো হয়েছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ যতই বলুন না কেন যে, 'ওসেন এনডুওরেন্স' ও 'ওসেন এনার্জি' জাহাজে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে তা সাধারণ সৈন্যচলাচলের অন্তর্ভুক্ত, এ-কথা সবাই বুঝবেন যে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ দমনের জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সৈন্য প্রেরণের সংবাদ পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এর প্রতিবাদে ঢাকায় ক্ষুব্ধ মানুষ বন্দুক নিয়ে সরকারী অফিসার ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের তাড়া করেছে। তাদের ধারণা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরাই আরও সৈন্য পাঠাবার পরামর্শ দিয়েছে। খবরে প্রকাশ, ঢাকার অস্ত্রাগারগুলি বিক্ষুব্ধ জনতা লুঠ করে নিয়েছে। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর অস্ত্রাগারও লুঠ হয়েছে।

ক'মাস ধরেই পূর্ব পাকিস্তানে গোলমাল চলছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বলে এখন এখানে কিছু নেই। গোলটেবিল বৈঠক শেষ হবার পর অবস্থার উন্নতি না হয়ে আরও অবনতি ঘটেছে। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্তেও জনসাধারণ শান্ত হয় নি। বরং, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদে পূর্ব পাকিস্তানের যোগ্য প্রতিনিধিত্বের দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় মানুষ আরও ক্ষেপে গেছে। নতুন করে বিক্ষোভ সুরু হবার এই কারণ। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাইস-অ্যাডমিরাল এ. আর খাঁ স্বীকার করেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে আইন ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষোভের আরও দুটি লক্ষণীয় বিষয় হল ঃ (১) পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াই, আর (২) হিংসাত্মক কার্যকলাপের পেছনে কায়েমী স্বার্থের হাত। ভাসানীপন্থীদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের সম্মুখসমর পার্বতীপুরের পথে পথে চরম আকার ধারণ করেছে। উভয় পক্ষের লোকেরাই বন্দুক নিয়ে লড়েছে। এরকম ঘটনা আরও নানা জায়গায় ঘটেছে। প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ বিক্ষোভকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে চান, কিন্তু এবারের বিক্ষোভ যেরূপে হিংস্র আকার ধারণ করেছে তা তাঁরা চান নি। এই কথাই আবার বলেছেন শেখ মুজিবর রহমান। তিনি বলেছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্যই কায়েমী স্বার্থের লোকেরা হিংসাত্মক কার্যকলাপে উস্কানি দিচ্ছে। পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন।

এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার তথা আয়ুব খাঁর মতলব কি? তাঁরা তো সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবি মেনে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সৈয়দ এস এম জাফর বলেছেন, আর কয়েক দিনের মধ্যেই সংবিধান সংশোধনের বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করা হবে। সংশোধনী বিলের মূল বিষয়গুলিও প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানরূপে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকবেন। তিনি আইনসভাগুলির সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। আইনসভার সদস্যদের কাছে দায়ী একটি মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। প্রধানমন্ত্রীই হবেন প্রকৃত শাসন-প্রধান। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হবে। প্রাদেশিক আইনসভার কাজে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করবে না।'

এই সব দাবি মেনে নিয়ে নতুন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেবার পর হঠাৎ আয়ুব সরকার চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন কেন? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। তিনি বলেছেন, যাবার আগে পাকিস্তানের কর্তৃত্ব আয়ুব দেশের শিল্পপতিদের হাতে দিয়ে যেতে চান। তারই জন্য এই কাণ্ড। এমন আশংকা করা হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে শেষ পর্যন্ত আর এক সামরিক চক্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। আয়ুব গেলেও তাঁর জায়গায় আর এক আয়ুব আসবেন—

জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা আসবে না।

কিন্তু আমলাশাহীর পক্ষে কি তা করা সম্ভব হবে? জনসাধারণের বিক্ষোভ যেভাবে ফেটে পড়েছে, তাতে চাকা উল্টে দেওয়া শক্ত। পশ্চিম পাকিস্তানেও আজ চরম বিক্ষোভ। ভাসানীর গায়ে হাত দেবার প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। শ্রমিকরা কলে-কারখানায় ধর্মঘট করেছে। অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

তবে পাকিস্তানের রাজনীতির চেহারা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে একে একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের লড়াই কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের লড়াই বলে থেমে গেলে অতিসরলীকরণের ভুল করা হবে। দক্ষিণপন্থার সঙ্গে বামপন্থার বিবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামীর সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিপন্থার বিরোধ, চীন, সোভিয়েট ও মার্কিনপন্থীদের পারস্পরিক প্রভাববৃদ্ধির চেষ্টা, সব মিলিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতি এখন জট পাকিয়ে গেছে। রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়েই সমাধান আসবে কি না, ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে।

ফ্রান্স ঃ

গত বছর দেশব্যাপী যে প্রায়-বিপ্লব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তারপর সাধারণ নির্বাচনে দ্য-গল-পন্থীদের বিরাট সাফল্য দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন, ফ্রান্সে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল, এবং দ্য গলের কর্তৃত্ব দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা নির্বাচনে যে মার খেয়েছে, তাতে তাদের আর উঠে দাঁড়াতে হবে না।

কিন্তু এই ধারণা যে কত ভুল, গত সপ্তাহে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সারা ফ্রান্স জুড়ে শ্রমিকরা সরকারী নীতির বিরুদ্ধে চব্বিশ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করেছে। ধর্মঘটের ফলে ফ্রান্সের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় ট্রেড য়ুনিয়ন সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই প্রতীক ধর্মঘট বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি মাত্র। তাঁরা সরকারকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, এখনও যদি সরকার তাঁদের দাবি মেনে না নেন, তবে সারা দেশে আগুন জ্বলবে।

গত বছরের বিক্ষোভের সময় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জর্জ পম্পিদু শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের মজুরী বৃদ্ধির দাবি কিছুটা মেনে নিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মার্চ, ১৯৬৯-তে আবার তাঁদের মজুরী বৃদ্ধির দাবি বিবেচনা করা হবে। সেই কথা মত মার্চ মাস এলে শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা সুরু হল। শ্রমিকদের দাবি ঃ জিনিষপত্রের দাম যেমন বেড়েছে তাতে তাদের মজুরী অন্ততঃ শতকরা বারো ভাগ বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মরিস কুভ্‌ দ্য মারভিল এই দাবিকে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও গ্রহণের অযোগ্য বলে বাতিল করেছেন। এর জবাবে ক্রুদ্ধ শ্রমিক নেতারা প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ত্যাগ করে চলে আসেন এবং কমিউনিস্ট অ-কমিউনিস্ট সব ট্রেড য়ুনিয়ন সংগঠন একযোগে ধর্মঘটের আহ্বান জানান।

ধর্মঘট মোটামুটি শান্তিপূর্ণ হয়েছে। প্যারিসের মিছিলে এক লক্ষেরও বেশি শ্রমিক যোগ দিয়েছে। অবশ্য কিছু মাওপন্থী ছাত্র এই সুযোগে গোলমাল বাধানোর চেষ্টা করেছে। প্যারিস পুলিশের সঙ্গে কয়েক জায়গায় তাদের সংঘর্ষও হয়েছে।

চার্লস দ্য গল ঠিক এই জিনিষটাই চাইছিলেন। ধর্মঘটের দিন জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক টেলিভিশন ভাষণে তিনি 'ধ্বংস ও নাশকতার বিরুদ্ধে' দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শ্রমিক আন্দোলনের নামে ফ্রান্সের শত্রুরা দেশকে ধ্বংস করতে চায়। যদি দেশবাসী অশান্তি ও নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়, তবে দ্য গলের পেছনে তাদের দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে।

আগামী মাসে আরও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের যে প্রস্তাব গণভোটে পেশ করা হবে, তা সমর্থন করার জন্য দ্য গল দেশবাসীকে অনুরোধ করেন। এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক আইনসভার হাতে বেশি ক্ষমতা দেবার কথা আছে।

দ্য গলের হুমকী সত্ত্বেও শ্রমিক সংগঠনগুলি আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংকট যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে বড় রকমের একটা বিক্ষোভ অনিবার্য বলেই মনে হচ্ছে।

দ্য গলের বিরাট ব্যক্তিত্ব কি এবারও বিক্ষোভ দমন করতে সক্ষম হবে? যতক্ষণ না দ্য গলের যোগ্য বিকল্পের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ দ্য গলের প্রভাব অতিক্রম করা শক্ত। তবে অনেকের ধারণা, জর্জ পম্পিদু এবার ফ্রান্সের রাজনীতিতে দ্য গলের বিকল্পরূপে উপস্থিত হবেন।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন ঃ

দমনস্কি দ্বীপের ওপর চীনা আক্রমণের বিরতি হয় নি। মস্কো রেডিও থেকে বলা হয়েছে, ১৮ই মার্চ মঙ্গলবার আবার উসুরি নদীর মুখে বরফজমা এক মাইল দীর্ঘ এই সোভিয়েট দ্বীপে চীনা হানাদাররা আক্রমণ করেছে। সন্ধ্যাবেলায় এই আক্রমণ সুরু হয় এবং কয়েক ঘণ্টা ধরে একটানা গুলীবর্ষণ চলে।

চীন সহজে সোভিয়েট য়ুনিয়নকে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। 'চেনা-পাও দ্বীপের ওপর সোভিয়েট শোধনবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে' কেবল বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সীমান্ত বরাবর সৈন্যসমাবেশই নয়, চীনা নেতারা সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী থেকে বলা হয়েছে (১৬ই মার্চ), সোভিয়েট শোধনবাদীরা যদি এখনও ক্ষান্ত না হয়, তাহলে সত্তর কোটি চীনা জনগণ তাদের 'নিশ্চিহ্ন' করবে।

চীনা হামলার মোকাবিলা করার জন্য সোভিয়েট য়ুনিয়ন দমনস্কি ও সীমান্তের সর্বত্র ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করেছে। কিন্তু তার চেয়েও তারা জোর দিয়েছে কূটনৈতিক তৎপরতার ওপর। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতেরা প্রতি দেশে সরকারী কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চীনের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য সবিস্তারে রাখছেন। লণ্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন, অটোয়া সর্বত্র। এমন কি পশ্চিম জার্মানী সরকার, যার অস্তিত্বই সোভিয়েট য়ুনিয়ন স্বীকার করতে চান না, তাদের কাছেও হাজির হয়ে তাঁরা চীনাদের গালমন্দ করেছেন। বনে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার কুর্ট জর্জ কিসিংগারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত সারাপৎকিন দীর্ঘ সময় ধরে চীনা হামলার বর্ণনা দিয়েছেন।

কূটনীতির ইতিহাসে, চীন-সোভিয়েট সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ-ব্যাপার সম্পূর্ণ নতুন। চীন-সোভিয়েট মতবিরোধ অনেক দিন ধরেই চলছে। কিন্তু পশ্চিমীদের দরজায় গিয়ে চীনের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে এভাবে দরবার করা সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষেও এই প্রথম।

'পুঁজিবাদী' দেশগুলির কাছে ব্যাপারটি উপভোগ্য, সন্দেহ নেই।

(২৩।৩।৬৯)

মন্ত্রীরা কী বলেন

পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন। আপনি নিজেকে রাস্তার মন্ত্রী বলেছেন। এতে কি বুঝব যে, আপনি কিছুটা অখুশি?

উত্তর। সত্য বলতে কি P.W.D. একটি মস্ত বিভাগ। এর মধ্যে কতকগুলি পি, ডব্লু, ডি, ওয়ার্কস-এর কাজ সরকারী বাড়ি তৈরি করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং কোনও কোনও স্কীম-এর অধীনে কিছু কিছু রাস্তা করা। দ্বিতীয়ত পি, ডব্লু, ডি রোডস এবং পি. ডব্লু, ডি রোডস্ স্পেশাল। এরাই প্রধানত পরিকল্পনার ভিত্তিতে রাস্তা-ঘাট তৈরি করে থাকেন। এর রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়; এবং শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জে'-ই আছেন। সুতরাং মূলত রাস্তার মন্ত্রী হলেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়।

আমি কোনও কোনও রাস্তার মন্ত্রী। আর বড়জোর বলতে পারেন সরকারী বাড়ি চুনকাম করার মন্ত্রী। সুতরাং আমি যে নিজেকে আগে রাস্তার মন্ত্রী বলেছিলাম—তা এই লিমিটেড অর্থেই বলেছিলাম।

এছাড়া আছে পি, ডব্লু, ডি কনস্ট্রাকশন বোর্ড। বিশেষ বিশেষ কিছু কনস্ট্রাকশন-এর কাজ বা কনস্ট্রাকশন ইন্সপেকশন করার কাজ এই বোর্ডের। সর্বশেষ আর্কিওলজিক্যাল ডিরেক্টরেট পি, ডব্লু, ডি-এর অধীন।

ব্যক্তিগতভাবে খুশি-অখুশির প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমাকে অর্থাৎ এস-ইউ-সিকে পূর্তবিভাগ দেওয়ায় এস-ইউ-সি দলের পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য আছে। সে বক্তব্যটি সংবাদপত্রে রাজ্য কমিটির সম্পাদকের বিবৃতি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। আপনাকে সেই বিবৃতি দেখে নিতে ও প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি।

প্রঃ। আপনার বিভাগের দুর্নীতি দূর করতে কি করবেন?

উঃ। আমি জানি, পি, ডব্লু, ডি বিভাগের বহু দুর্নাম। এবং সে দুর্নাম দুর্নীতি সংক্রান্ত। কেবলমাত্র আমলাতন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে দুর্নীতি দূর করা যাবে না। দুর্নীতি দূর করতে হলে জনসাধারণের সক্রিয় ভূমিকা থাকা চাই। এবং তার জন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলনও গড়ে তোলা দরকার। আশা করব, যুক্তফ্রন্ট এবিষয়ে 'কংক্রীট মেজার' গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে এই কারণে যে, কেবলমাত্র পি, ডব্লু, ডি বিভাগই নয়, প্রশাসনের সর্বস্তরেই দুর্নীতি বিদ্যমান। এবং প্রশাসনকে পরিচ্ছন্ন করার কথা যুক্তফ্রন্ট তার কর্মসূচীতে বলেছে। এ ব্যাপারে রাজ্য-সরকারের স্বরাষ্ট্র তথা পুলিশ বিভাগের ভূমিকার ওপর দুর্নীতি দূর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের পন্থাগুলি অনেকখানি নির্ভরশীল।

আমি তিনটি দিক থেকে এই সমস্যাটিকে 'ট্যাকেল' করার কথা ভাবছি। প্রথমত দুর্নীতি দূর করার ক্ষেত্রে সকল স্তরের কর্মচারী তথা তাদের 'ট্রেড ইউনিয়ন' বা 'এ্যাসোসিয়েশন'-গুলির সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে আমি কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি। তাঁদের এ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। এবং দুর্নীতি দূর করার জন্য তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। দুর্নীতির যেসব ঘটনা তাঁরা জানেন, সেই সব ঘটনা যদি তাঁরা আমাদের জানান—তাহলে সেই সব বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে। দ্বিতীয়ত পি, ডব্লু, ডি বিভাগের দৈনন্দিন কাজ-কারবার 'কনট্রাক্টর'-দের সাথে। আমি শুনেছি ঘুষ দিয়ে তাদের কনট্রাক্ট পেতে হয়, বিলের টাকা পেতে হয়। এবং কন্ট্রাক্টর হিসেবে নাম লেখাবার সময় টাকা দিতে হয়—এটা অপমানকর অবস্থা। কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এই অপমানকর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাই তাঁদের কাছেও আমার আবেদন দুর্নীতি দূর করার ব্যাপারে তাঁরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। দুর্নীতির ঘটনা কারো জানা থাকলে তিনি আমাদের সে-ঘটনা জানান—এই আমার অনুরোধ।

তৃতীয়ত জনসাধারণ সংগঠিত হয়ে সরকারের কাজকর্মের ওপরে যদি নজর রাখেন—তাহলে দুর্নীতি দমনের কাজে সাহায্য হবে। 'স্পেসিফিকেশন' অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না—উপযুক্ত মাল-মশলা দেওয়া হচ্ছে কি না—কোনও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে কি না ইত্যাদি তাঁরা দেখলে এবং দুর্নীতির কাজ বন্ধ করার জন্য জনমত ও জনবিক্ষোভের চাপ সৃষ্টি করলে দুর্নীতি কমতে পারে। জনসাধারণের কাছে সে আবেদনও আমি করেছি। আমাদের দল এস-ইউ-সি দুর্নীতি সম্পর্কে উপরোক্ত তিনদফা কাজের কথা ভেবেছেন। এছাড়া অন্য সব পন্থার 'কংক্রীট মেজার' যুক্তফ্রন্টকে গ্রহণ করতে হবে। যুক্তফ্রন্ট এই সব 'কংক্রীট মেজার' গ্রহণ করলে তাকে রূপায়িত করার দায়িত্ব আমার আছে।

প্রঃ। আপনার বিভাগের হাতে নতুন কোনও কাজের পরিকল্পনা আছে কি?

উঃ। প্রথম কথা পি, ডব্লু, ডি বিভাগের অবস্থাটা হল আধ পয়সা দিয়ে 'অক্রূর সংবাদ' শোনার মত। কাজ অনেক করার আছে, কিন্তু টাকা আদৌ নেই। বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দ যা ধরা হয়েছে—তাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গৃহীত রাস্তাগুলি কমপ্লিট করা যাবে না—নতুন রাস্তা তৈরি বা মেরামত করার কথা দূরে থাক।

প্রঃ। হুগলী নদীর ওপর যে নতুন পুল তৈরি হচ্ছে—তার দায়িত্ব পোর্ট কমিশনার্স নিচ্ছেন। আপনার বিভাগের ওপর এ-পুল তৈরির দায়িত্ব থাকলে কেমন হত?

উঃ। পি. ডব্লু, ডি পুল তৈরি করে। পরিকল্পনা সঙ্কুচিত হওয়ায় এই বিভাগের অনেক কাজ কমে গেছে। পি, ডব্লু, ডি-র স্টাফদের উপযুক্ত কাজ নেই—'টেকনিক্যালি সারপ্লাস'। যদিও এঁদের ছাঁটাই করার কথা হচ্ছে না—তবে এঁদের যথাযথভাবে ব্যবহার

করা যেত—যদি নতুন হাওড়া পুল তৈরির কাজ আমাদের হাতে দেওয়া হত। আমাদের হাতে থাকলে হয়ত ব্যয়ও কিছু কমত। কারণ 'পোর্টকমিশনার্স'-দের বহু নতুন লোক লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে, যা করতে হলে পি, ডব্লু, ডি-র করতে হত না।

'ব্রিজ' তৈরি করার কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও'দের আছে কি না—তা আমার জানা নেই।

সড়ক বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়

প্রঃ আপনি এবারই তো প্রথম বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন। রাষ্ট্রমন্ত্রীও হয়েছেন। মন্ত্রিত্ব কেমন লাগছে?

উঃ একজন বিপ্লবীর যেমন লাগা উচিত। বাইরের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যই আসা। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু পারি—তা 'সিন্‌সিয়ারলি' করব।

প্রঃ প্রধানত আপনার বিভাগের কাজ কি কি?

উঃ রাস্তা তৈরি করা, মেরামত করা ইত্যাদি। বিশ বছর ধরে কাজ খুবই কম হয়েছে। রাস্তা দিয়ে রাজনীতি হয়েছে। কংগ্রেসীরা অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় ভাল ভাল রাস্তা তৈরি করেছেন। তৎকালীন বিরোধীপক্ষের সদস্যদের এলাকায় কাজ প্রকৃতপক্ষে কিছুই হয় নি।

প্রঃ দুর্নীতি দূর করার জন্য কি করবেন?

উঃ আমাদের চিন্তায় আছে যে; যদি সম্ভব হয় তবে কন্ট্রাক্টারী সিস্টেম তুলে দিয়ে সরাসরি সরকার ঐসব কাজের দায়িত্ব নিলে ভাল হবে। এটা শুধু চিন্তাই। যুক্তফ্রন্টের মত, মন্ত্রিসভার মত পেলে তবে এই চিন্তাকে কার্যে পরিণত করা যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে ছোট ছোট ঠিকেদারদের কথা একটু আলাদা করে ভাবতে হবে। কারণ তাদের জীবিকা এরই ওপর নির্ভরশীল।

এই বিভাগের উঁচু পদগুলো বিভাগের যোগ্য ব্যক্তিকে প্রমোশন দিয়ে পূরণ করতে চাই। নতুন যা লোক নেওয়া হবে—সেটা নিচুর দিকে হওয়াই ভাল।

প্রঃ আপনার বিভাগে নতুন কোনও কাজের পরিকল্পনা আছে কি?

উঃ সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারদের ডেকেছি। ২১শে মার্চ ওঁদের সঙ্গে বসব। রোড ডিস্ট্রিবিউশন যাতে ঠিকমত হয়—তা দেখব। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে গৃহীত কাজগুলো—(যা এখনও শেষ হয় নি) আগে শেষ করতে হবে। প্রতি জেলার প্রতি যাতে সুবিচার হয়—তা দেখতে হবে। কংগ্রেসের আমলের মত অন্যায় কিছুতেই হতে দেব না। গোটা রাজ্য নিয়ে যে বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা করতে চাইছি।

প্রঃ টাকা যথেষ্ট না পেলে আপনার বিভাগে নতুন কাজ করা সম্ভব নয়। বহু কর্মচারী হয়তো 'সারপ্লাস' হবে। তাঁদের কি করবেন?

উঃ 'সারপ্লাস' হবে হয়তো। তবে ছাঁটাই করার প্রস্তাব আমার নেই।

প্রঃ 'হাইওয়েজ' তৈরি করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি?

উঃ না কিছু নেই। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে কিছু হবে না।

—১৯শে মার্চ, '৬৯

ভানুমতীর খেলা—

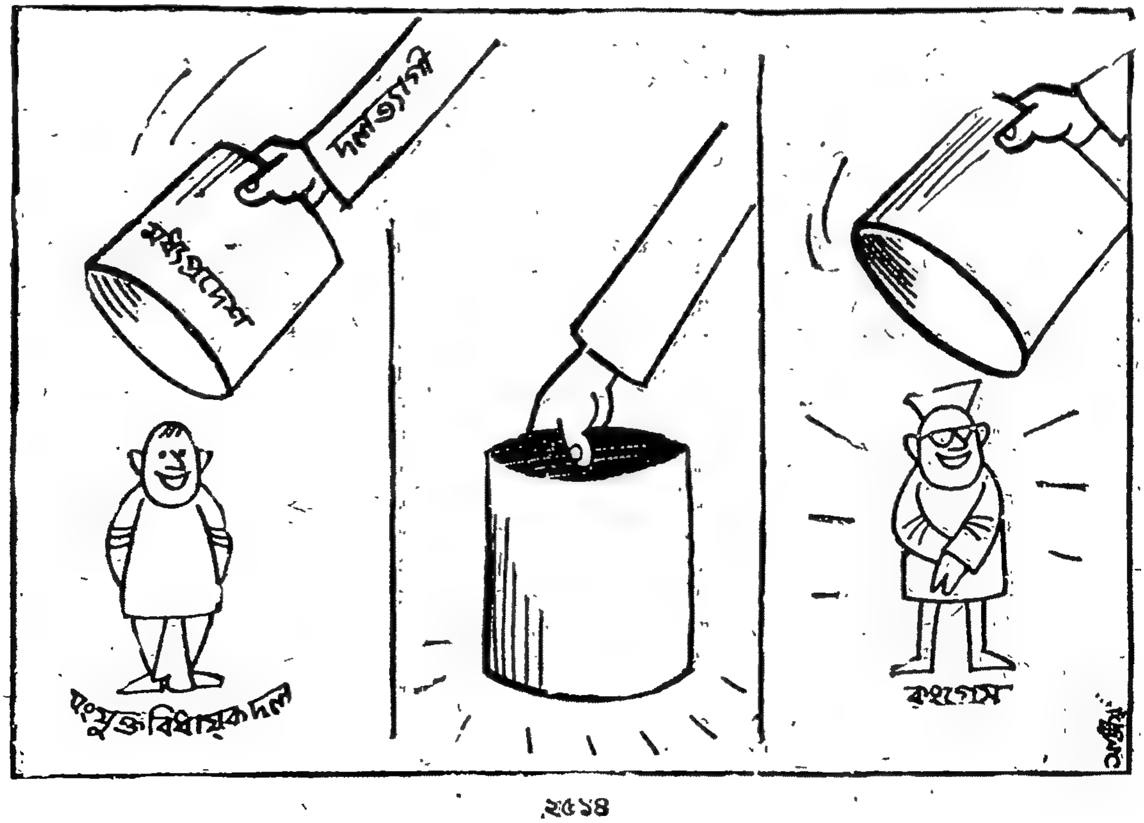

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!"

তারপর—

"রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে।
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?"

যে যে কথাই বলুক—কাব্য পাঠের মত সুখ নেই, চিরায়ত সাহিত্য যে সুখ দিতে পারে, সেই সুখের তুলনা নেই। সুখ শুধু সাহিত্য পাঠে নয়—বাংলার বরেণ্য সাহিত্যিকগণ যে অমূল্য রত্নরাজি রেখে গেছেন তার মধ্যে সব আছে। আপনি যখনই কোন সমস্যায় পড়বেন—অথবা বুদ্ধি দিয়ে যখন বড় কোন সমস্যার জট খুলতে পারবেন না, তখন খুলে বসুন রামায়ণ মহাভারত, না হয় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দেখবেন—আপনার মনের সব ভাবনা দূর করে দিয়েছে, আপনার সমস্যার সব জট খুলে দিয়েছে। আমিও সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পি-এস-পি দলের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ঘটনা দেখে বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু যেই মাইকেল রচনাসম্ভারখানি হাতে নিয়ে বসলাম, তখন দেখলাম বেশ মিলে যাচ্ছে একেবারে—ছন্দে, লয়ে, বাক্যে, আচরণে।

"পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!"

তাই তো দুঃখ করবার কি থাকতে পারে সুর্পণখার কারণে যদি সোনার লঙ্কা কালসলিলে ডুবতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গ পি-এস-পি দল অনেকগুলি সুর্পণখার কারণে ডুববে এতে বিস্ময়ের কি আছে! সব দেখে শুধু রাবণের মত বলতে হয়—

"এক লক্ষ পুত্র মোর—
সোয়া লক্ষ নাতি
কেহ না রহিল মোর
বংশে দিতে বাতি।"

তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, বংশে বাতি দিতে এখনও কেউ কেউ আছে। কিন্তু রাম, রাবণ, বিভীষণ, মেঘনাদ থাক, এবার বরং শ্রীসুনীল দাস, শ্রীসমর গুহ, শ্রীবিদ্যুৎ বসু, শ্রীঅশোক দাশগুপ্তের কথায় আসা যাক। গত ১৬ই মার্চ কলকাতায় পশ্চিমবাংলার প্রায় আড়াই হাজার পি-এস-পি কর্মী, সদস্য ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রকৃতপক্ষে রাজ্যে এক নতুন পি-এস-পি দলের জন্ম হল। রায়গঞ্জ সম্মেলনে যে অঙ্কুরের জন্ম হল—সেই অঙ্কুরই এক বৎসর পরে পত্রে-পুষ্পে-ফলে শোভাময় রূপে জনসমক্ষে প্রকাশিত হল। রায়গঞ্জ সম্মেলনে সামান্য ভোটে যুক্তফ্রন্টে যুক্ত থাকার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হবার পরিণতিতে আজ প্রকৃতপক্ষে সারা রাজ্যের পি-এস-পি দল পি-এস-পি-র যুক্তফ্রন্ট বিরোধীদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, তাদের সর্বপ্রকার বাধা-বন্ধন শাসানী-ধমকানী অগ্রাহ্য করে নিজেদের যুক্তফ্রন্টে মিলিয়ে দিল। রায়গঞ্জ সম্মেলনে সর্বক্ষণ বসে সম্মেলনের প্রতিটি প্রস্তাব, প্রতিটি বাক্য শুনেছিলাম—আর কলকাতায় বসে আর একবার নতুন পি-এস-পি দলের সব নেতার সব বক্তব্য আর সব প্রস্তাব শুনলাম। রায়গঞ্জ সম্মেলনে যে নেতৃত্ব সেই দিন রাজ্য বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুলিংকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে পরোক্ষে রাজ্যপালের কাজের প্রশংসা করেছিলেন, কলকাতার সম্মেলনে সেই রাজ্যপালকে নিন্দা করা তো হলই আর রাজ্যপালের সমর্থনকারীদের সোজা বলে দেওয়া হল—এঁরা হলেন কংগ্রেসের অনুচর। কলকাতার সম্মেলনে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু শ্রীভজন দাশগুপ্ত, শ্রীবিদ্যুৎ বসু, শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত, শ্রীগৌরপদ মজুমদার, শ্রীবলাইদাস মহাপাত্র, শ্রীসুধীর দাস, শ্রীবিভূতি পাহাড়ী, শ্রীসুবোধ গুছাইত থেকে সুরু করে অতি সাধারণ কর্মী শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীনিরাপদ কর, শ্রীবিপিন বেরা সকলে একটি কথা বলেছেন। সেই কথা হল—রাজ্যের ক্ষমতাসীনগোষ্ঠী অর্থাৎ শ্রীসুনীল দাস, শ্রীসমর গুহ পার্টিকে কংগ্রেসের লেজুড় করতে চায়। একদা কেরলের শ্রীথানু পিল্লাই বা শ্রীঅশোক মেহতা যেভাবে পার্টিকে কংগ্রেসে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এঁরাও সেই পথে পার্টিকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। বক্তারা সকলেই এই প্রচেষ্টার নানা নজির তুলে ধরে এই কথাই বলেন যে, তাদের কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই যে, এই রাজ্যে কংগ্রেস যেমন ডুবেছে, সরকারী পি-এস-পি দলও সেইভাবে ডুবেছে। কংগ্রেস তবু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামান্য ভোটে হেরেছে, কিন্তু

সরকারী পি-এস-পি প্রার্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জামানত হারিয়েছে। কংগ্রেসের লেজুড় বৃত্তি করতে গিয়ে যারা পার্টিকে ডুবিয়েছে—তারাই আজ আবার যুক্তফ্রন্টে যোগদানের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পরোক্ষে বিধানসভায় দলকে কংগ্রেসের পিছনেই বসিয়ে রাখতে চায়। অথচ পার্টির যে অংশ যুক্তফ্রন্টের মনোভাব নিয়ে কাজ করেছে, তাদের সব কয়জন শুধু জয়ী হয় নি—কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছে। শেষ এইখানে নয়—শ্রীসুধীর দাস বা শ্রীবিভূতি পাহাড়ী স্পষ্ট অভিযোগ করলেন জনৈক নেতার নাম করে যে, তিনি বহুক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টপন্থী পি-এস-পি প্রার্থীদের ভোট দিতে না বলে কংগ্রেসীকে ভোট দিতে বলেছেন।

যা হোক সম্মেলন হয়ে গেছে। রাজ্যে এখন দুই পি-এস-পি বর্তমান। কিন্তু দুই পার্টি থাকা সম্পর্কে কোন সমস্যা হতে পারে না, পশ্চিমবঙ্গে ২৫টি রাজনৈতিক দল আছে—না হয় আর একটি বৃদ্ধি পেল, কিন্তু আকর্ষণীয় হলো এই দুই পার্টির একের সম্পর্কে অপরের মনোভাব ও নীতি নিয়ে। ১৯৬৪ সালে দুই কম্যুনিস্ট পার্টি হল। মূল কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে ৩২ জন সদস্য বেরিয়ে গেলেন—কিন্তু তাঁরা আগাপাস্তল্যায় পার্টির সম্বন্ধ ত্যাগ করলেন। অর্থাৎ—কি দিল্লী, কি কেরল, কি পশ্চিমবঙ্গ সর্বস্তরে আলাদা হয়ে গেলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অভিনব হল—দুই পার্টি কিন্তু কেন্দ্রীয় পি-এস-পি'র নেতৃত্ব মেনে নিয়ে, কর্মসূচী মেনে নিয়ে এমন কি মূল পার্টির অংশ হিসাবে নিজেদের ঘোষণা করে গৌরব অনুভব করছেন। কম্যুনিস্ট পার্টি আলাদা হবার সময় শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ, শ্রীরামমূর্তি, শ্রীবাসব পুন্নিয়া কিন্তু তাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ করেছিলেন শ্রীডাঙ্গের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে—এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি কোন ক্ষোভ বা অনাস্থা নেই। তবে সেদিন মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি গড়তে গিয়ে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট নেতারা যে অভিযোগ এনেছিলেন, সেই অভিযোগ ছিল—শ্রীডাঙ্গে কংগ্রেসের চর; এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার নতুন পি-এস-পি-এর অভিযোগ হল রাজ্যের সরকারী পি-এস-পি কংগ্রেসের স্বার্থবাহী। অভিযোগ অবশ্য একতরফা নয়—দুই পক্ষ থেকেই এবং উভয়পক্ষেরই লক্ষ্য হল পার্টি কর্মীদের জানানো—কোন নেতৃত্ব কি করছে। গত ৯ই মার্চ শ্রীসুনীল দাস পার্টি সদস্যদের এক গোপন সার্কুলার দিয়ে সব জেলা ও কেন্দ্র-সম্পাদকদের জানালেন যে, "প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নীতি, নিয়ম, নেতৃত্ব ও সংবিধানকে সম্পূর্ণরূপে অমান্য ও অগ্রাহ্য করে কাঁথি থেকে নির্বাচিত চারজন এম এল এ এবং তাদের কয়েকজন সহযোগী পার্টিকে লোকচক্ষে হেয় করে পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও পার্টিকে ভাঙবার চক্রান্তে উদ্যত হয়েছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জেলা পার্টি, রাজ্য কমিটি ও সর্বভারতীয় জাতীয় কমিটি কোন স্তরে কোন নেতৃত্বের সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করে অথবা কোনরূপ অনুমতি না নিয়ে পার্টির সর্বস্তরের নীতি ও নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে কাঁথির চারজন এম এল এ কয়েকজন পি-এস-পি সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি যুক্তফ্রন্ট নেতাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন ও জাতীয় পরিষদের নীতি অগ্রাহ্য করে যুক্তফ্রন্টে যোগদান ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে মত জানিয়ে এসেছেন। তার পর থেকে নিয়মিত পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী এই সদস্যরা পার্টির বিনা অনুমতিতে যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে যোগ দিতে ও বিধানসভায় যুক্তফ্রন্টের বেঞ্চে বসতে আরম্ভ করেছেন। মন্ত্রিত্ব লাভের উগ্র আকাঙ্ক্ষায় এই চারজন এম এল এ এবং তাঁদের সহযোগীরা শুধু জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেন নি, আজ পি-এস-পি'কে ভাঙতে উদ্যত হয়ে একটি তথাকথিত সংগঠন কমিটি গঠন করে ১৬ই মার্চ পি-এস-পি'র নামে একটি সম্মেলন আহ্বান করেছেন। এই যুগসন্ধিক্ষণে মন্ত্রিত্বের লোভে একদল দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি শুধু দলীয় নীতির বিরোধিতা নয়, পি-এস-পি'কে বিভক্ত করার চক্রান্তে অগ্রসর, বাংলার সমাজবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। দলত্যাগে উদ্যত মন্ত্রিত্বকামীদের এই চক্রান্তকে আজ সর্বশক্তিতে প্রতিরোধ করে সর্বভারতীয় পি-এস-পি'র আদর্শ, নেতৃত্ব, নিয়মশৃঙ্খলা ও নিজেদের পতাকা নির্ভীকভাবে রক্ষা করতে হবে। ১৬ই মার্চের তথাকথিত পি-এস-পি সম্মেলনে যাতে পি-এস-পি সদস্যরা যোগদান না করে সেইজন্য প্রতিটি পার্টিকর্মীকে সচেতন করে তুলুন।"

শ্রীসুনীল দাসের এই সতর্কবাণী, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ সবকিছু অস্বীকার করে ১৬ই মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সম্মেলন হয়। দার্জিলিং থেকে পুরুলিয়া—সব জেলা থেকে আগত পি-এস-পি প্রতিনিধি সম্মেলনে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয় সেটা হল: শ্রীদাসের গোপনপত্রেরই জবাব। প্রস্তাবে বলা হয় যে "জনসাধারণের সচেতনতা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রেখেই রায়গঞ্জ সম্মেলনে তদানীন্তন প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতি যুক্তফ্রন্টের অংশীদার হিসাবে দলকে রেখে শক্তিবৃদ্ধির সুযোগকে অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি সামান্য ভোটের ব্যবধানে তৎকালীন রাজ্য কমিটির প্রস্তাবকে নাকচ করে বর্তমান রাজ্য কমিটি বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত বিচ্ছিন্নতাকামী এক ভ্রান্ত নির্বাচনী নীতি গ্রহণ করলেন। ফলে পার্টি একদিকে জনসাধারণ থেকে বহু দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে, অপরদিকে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে পরিচালিত অকংগ্রেসী স্থায়ী প্রগতিশীল সরকারের অংশীদার হিসাবে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতো, তার সম্ভাবনাকেও বিঘ্নিত করে তোলা হয়েছে। বর্তমান রাজ্য কমিটি কর্তৃক গৃহীত অন্ধ গোঁড়ামি ও বিচ্ছিন্নতাকামী নীতি বস্তুতপক্ষে পার্টির ভাবমূর্তিকে জনমানসে হেয় করে তুলে পার্টির সক্রিয় ও প্রগতিশীল সদস্যরা আশা করেছিলেন যে, নির্বাচনের শোচনীয় ব্যর্থতা থেকে বর্তমান রাজ্য কমিটি শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে যোগ্যতর নেতৃত্বের হাতে পার্টির দায়িত্বভার অর্পণ করবেন। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে পরিচালিত স্থায়ী অকংগ্রেসী সরকারের অংশীদারত্ব গ্রহণ করে পার্টিকে পুনরায় জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হবার সুযোগ করে দেবেন। নিজেদের ব্যর্থতা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার জন্য পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপরাধ স্খালনের কোন চেষ্টা না করে এই নেতৃত্ব অন্ধ আক্রোশে পার্টির সক্রিয় ও প্রগতিশীল অংশকে পার্টি থেকে বিতাড়িত করার চক্রান্ত সুরু করেছে। এই জঘন্য পার্টি-স্বার্থ-বিরোধী কাজে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটি অংশকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অবস্থায় পার্টির স্বার্থেই পার্টি কর্মীদের এই বিপথগামী নেতৃত্বকে অপসারিত করে সবল নেতৃত্ব গ্রহণের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতে হবে।

এই হল দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব। এক পক্ষ বলছেন—একদল বিভেদপন্থী, মন্ত্রিত্বকামী পার্টিকে ভাঙছে। আর এক দল বলছেন—একদল বিচ্ছিন্নতাকামী, পার্টি-স্বার্থ-বিরোধী বিপথগামী নেতৃত্বকে অপসারণ করে পার্টিকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিতে হবে। যেন একজন বলছেন

"নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।"

আর একজন বলছেন—

"রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে

কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মারিনু যে আজি.
পামর: এ চির দুঃখ রহিল রে মনে।"

পি-এস-পি দলনেতা শ্রীসমর গুহ তাওয়ান-মাকাও থেকে সুরু করে তিব্বত পর্যন্ত সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রয়াসী ; আর তিনি কি না আজ আহত হবেন শ্রীবিদ্যুৎ বসু, শ্রীসুধীর দাসের কাছে। রাজ্যে দুই পি-এস-পি হল—এটা ইতিহাসের চাহিদা পূরণেই হল. কিন্তু তার চেয়ে বড় ট্রাজেডী হল এই যে, শ্রীবিভূতি পাহাড়ী, শ্রীসুবোধগোপাল গুছাইত মল্লযুদ্ধে আহবান করছেন শ্রীসমর গুহ, শ্রীসুনীল দাসকে আর শ্রীসুনীল দাস ও শ্রীসমর গুহ সেই যুদ্ধের মোকাবিলা করতে শুধুমাত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের কায়দায় বিবৃতি দিয়ে চলেছেন।

তবে শেষ কথা হল—ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে একটা বড় সভাতেও যেমন একটা পার্টি ভাঙে না বা একটা পার্টি গড়ে উঠে বেঁচে থাকে না, তেমনি শুধু খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েও একটি পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তাই এই দুইয়ের মধ্যে কে বাঁচবে তার বিচার হবে কালের বিচারে, আমরা সেই কালের দর্শক বই অন্য কিছু নয়।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রণ্টের কর্মসূচীর তৃতীয় দফা তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই দফায় রাজ্যের খাদ্য উৎপাদন, কৃষি এবং সেচের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে।

কর্মসূচীতে বলা হয়েছে (ক) যুক্তফ্রণ্ট সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, চেষ্টা করবে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য। এজন্য কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ এবং উন্নত জাতের পশু বিতরণ করে সাহায্য করবে। কৃষিঋণ বেশি করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেবে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কগুলোকে জাতীয়করণ করতে বাধ্য হয়। কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম এবং বাজার সৃষ্টির চেষ্টা করবে। পাট উৎপাদকদের লাভজনক দাম দেওয়া এবং রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীনে পাটের বাজার স্টক রাখার ব্যবস্থা করা হবে। কৃষিযোগ্য সমস্ত পতিত জমি উদ্ধার করা হবে এবং অকৃষি কাজে কৃষিজমি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। ভূমি ক্ষয় নিবারণের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কৃষির ব্যাপারে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ এবং জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হবে।

(খ) যুক্তফ্রণ্ট সরকার আরও বেশি জমি সেচের অন্তর্ভুক্ত করার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এজন্য ছোট, মাঝারি এবং লিফট সেচের ব্যবস্থা করা হবে। মজাডোবা পুকুর পুনঃসংস্কার করে কাজে লাগানো হবে। এ ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) যুক্তফ্রণ্ট সরকার বন সংরক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে। বন এলাকায় যাঁরা বাস করেন এবং বনসম্পদের ওপর যাঁদের নির্ভর করে তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) যুক্তফ্রণ্ট সরকার পশুপালন এবং পোল্ট্রী-ফার্মিং-এর ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে।

বৃহত্তর কলকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনাকে পুনর্গঠন করা হবে এবং রাজ্যের অন্যত্রও অনুরূপ পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যবস্থা হবে।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

'ন্যাশন্যাল ডিলাক্স"

১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন :

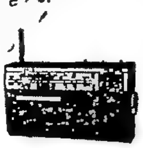

Music & Sound (B.W.C.—10)
. Post Box 1576, Delhi—6.

ফ্রণ্টের এই কর্মসূচীতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটা প্রাথমিক কাঠামো আছে মাত্র। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে একটা ব্যাপক, সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেমন দরকার তেমনি সমস্ত কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন বর্তমান ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের ব্যাপারে ফ্রণ্টের কর্মসূচীতে একটি পৃথক দফা আছে। পরে আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা করবো। তবে এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ইতোমধ্যেই যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার এই ব্যাপারে সরকারী নীতির আভাস দিয়েছেন। জমিতে কৃষকের স্বত্ব সাব্যস্ত করা, বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ, বেনামী জমি উদ্ধার এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণের কথা বলা হয়েছে। কৃষিকাজে কৃষককে উৎসাহিত করতে হলে এগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন।

এছাড়া ফ্রণ্টের কর্মসূচীতে যে সব কথা বলা হয়েছে তাতে নতুন কথা কিছু নেই। এমন কি কংগ্রেস সরকারও বারংবার এই ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রথম কথা এই কাজগুলো যদি সত্যসত্যই রাজ্য সরকাব করতে চান তাহলে কৃষিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কৃষিসেচ ও পশুপালন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা না করলে কোন একটি কর্মসূচীও রূপায়ণ সম্ভব নয়। নিচু স্তরে বি ডি ও-র ওপর সমস্ত কাজের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত থাকলে কোন কাজই সম্ভবপর নয়।

প্রত্যেকেই জানেন রাজ্যের আয় কত সীমিত। ব্যাপক কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নয় অর্থাভাবে। সাধারণ কৃষকদের সর্বপ্রকারে সাহায্যের কথা বলা হয়েছে কিন্তু রাজ্যের অর্থভান্ডারের যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে এবং অনতিবিলম্বে যার পরিবর্তন হওয়ার কোন আশা নেই সেখানে বিরাট কিছু আশা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের হাতে যে পরিমাণ টাকা থাকতো তারও সদ্ব্যবহার হোত না। লাল ফিতাব বাঁধনের ফলে বহু প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয় নি। কৃষকদের হাতে সার বা কৃষিঋণ যখন গিয়ে পৌঁছোয় তখন চাষের মরশুম শেষ। তারপর এই ব্যাপারে দুর্নীতি এখন প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত। যাদের মাধ্যমে বীজ, সার বা অন্যান্য জিনিস বিতরণ করা হত তাদের সততা সম্পর্কে সন্দেহাতীত প্রশ্ন উঠেছে।

কৃষিমন্ত্রীকে তাই প্রথম থেকে সজাগ থাকতে হবে। গ্রামাঞ্চলে যত দ্রুত সম্ভব বিশ্বাসভাজন সৎ কর্মীদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে উক্ত জিনিসসমূহ বিতরণের ব্যবস্থা করলে অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সেচের প্রয়োজন সর্বজনস্বীকৃত। সেখানেও সেই সীমিত অর্থভান্ডারের প্রশ্ন উঠবে। আপাতত বৃহৎ পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে ক্ষুদ্র সেচের ওপর নজর দিয়েছেন। তিনি প্রথমেই নির্দেশ দিয়েছেন বহু-ফসলী বোবো জমিতে জল সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য। এ ছাড়া যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে ১৯৬৭ সালে সেচমন্ত্রী সাধারণ কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে কোন কোন এলাকায় সেচের জন্য খাল সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন।

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের এবং যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত দলসমূহের জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ আছে। কাজেই তাঁরা কোন কাজে হাত দিলে জনসাধারণের সহযোগিতা পাবেন। এই সহযোগিতাকে আরো নিশ্চিত করার জন্য আমলাতন্ত্রের পুরাতন মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

আমলাতন্ত্রেব মনোভাবের পরিবর্তন, কৃষি, সেচ ও পশুপালন দপ্তরেব মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং সরকার নির্দিষ্ট দ্রব্যাদি যথোপযুক্ত বিতরণের ব্যবস্থা কবলেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলেও আশু পরিবর্তন সম্ভব।

যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে তাই আর একবার তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। —শ্রীসর্বদর্শী

[চলবে]

নির্বাচনের পরে

সাগর বিশ্বাস

১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের WBCUTA (West Bengal College and University Teachers Association), ABTA এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি যখন সম্মিলিতভাবে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন পাঠিয়েছিলেন, তখন আমিও দিল্লীতে ছিলাম। 'ওবকিউটা' নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বক্তব্য শুনে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা গলদের পরিচয় লাভ করবার সুযোগ তখন হয়েছিলো। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এবং এ বি টি এ-র সাধারণ সম্পাদিকা অনিলা দেবীর সঙ্গে তখন এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করবার অবকাশ পেয়েছিলাম। আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে শ্রীরায় বাংলার নতুন শিক্ষামন্ত্রী হয়ে এসেছেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশের শিক্ষানুরাগী সর্বস্তরের মানুষ শিক্ষামন্ত্রীর কার্যকলাপের প্রতি অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। মন্ত্রিসভায় এসেই শ্রীরায় শিক্ষাকে র‍্যাশনালাইজ করবার যে ঘোষণা করেছেন, তাকে শিক্ষানুরাগী সকল মানুষ সাধুবাদ জানাবেন। কিন্তু এই র‍্যাশনালাইজেশন অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সেটা অপ্রাসঙ্গিক। আমরা বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও দুর্নীতিরোধ প্রসঙ্গে বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের বিশেষ করে শিক্ষক সদস্যদের ধারণার কথা ইতিপূর্বেও জানতে চেয়েছি, এখনো সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। তাঁদের বক্তব্য যথাযথভাবে সকলের সামনে তুলে ধরছি।

সেদিন যখন বিধানসভার কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীযামিনী সেনের সঙ্গে দেখা হলো—তখন এ বিষয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পরিচয় হয়েছিলো শ্রীসেনের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে শ্রীসেনের জন্ম। স্কুলজীবনেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩০ সালে পুলিশের হাতে বন্দী হয়ে '৩৭ সাল পর্যন্ত ডিটেনশনে থাকেন। বি এ পাশ করেন জেলে থেকেই। জেলে থাকতেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। মুক্তির পর 'যুগান্তর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে লেখনী চালান '৩৯ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত। এই সময়ে পার্টির সারাক্ষণের কর্মী হিসাবে তাঁকে নোয়াখালীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ বছরেই নবেম্বর মাসে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তবে এবারে বাড়িতেই নজরবন্দী করে রাখা হয়। ১৯৪০ সালে বার্মায় চলে যান। '৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে হাঁটাপথে বার্মা থেকে সীতাকুণ্ডে ফিরে আসেন এবং সে স্কুলে তিনি স্কুল-শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন, সেখানেই শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার মুখে ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমায় চলে আসেন। এখানে এসে কাটিয়াহাটে তিনি একটি স্কুল গড়ে তোলেন। বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁর ছিলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ১৯৫০ সালে তাঁকে ২৪ পরগনা জেলা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। '৬৭ সালের নির্বাচনেই প্রথম বিধানসভায় আসেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনেও স্বরূপনগর কেন্দ্র থেকে তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত। শিক্ষাজগতের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সংযোগ। স্কুল বোর্ডের দুর্নীতি সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বললেন। প্রাইমারী পাঠ্য-পুস্তক নিয়ে বললেন। প্রাইমারী পাঠ্য-পুস্তক নিয়ে ন্যক্কারজনক কালোবাজারীর কথাও বললেন। বললেন অবিলম্বে এর বিহিত হওয়া আবশ্যক। কোনো ordinance-এর মাধ্যমে স্কুল বোর্ডকে করায়ত্ত করা সম্ভব হলে অবিলম্বে করা উচিত। তবে খুব সম্ভব তা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বিধানসভায় প্রয়োজনীয় বিল আনতে দেরি করা ঠিক নয়। এ সম্পর্কে প্রাথমিক কাজ হিসাবে অবশ্য সকল রকম নিয়োগ এবং বদলী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সেকেন্ডারী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সম্পর্কে শ্রীসেনের বক্তব্য: অধিকাংশক্ষেত্রেই এই কমিটিগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত। এর অবলুপ্তি হয়তো এই মুহূর্তেই সম্ভব নয়। তবে উপযুক্ত reformation-এর মাধ্যমে একে advisory committee হিসাবে অনুমোদন করা যায়।

হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে ১২শ শ্রেণীর প্রচলন সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিবৃতির প্রতি শ্রীসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি জানালেন বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এ পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন না। হলে সে ব্যবস্থার হাল বর্তমান একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির মতোই হবে। কেন না এর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন রাজ্য সরকার তা কোনমতেই জোগাড় করতে পারবেন না বলে তাঁর ধারণা। বর্তমান ১১শ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের হাজারো রকম সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী অনবহিত নন। তবে শ্রীসেনের মতে, স্কুল-শিক্ষার মান স্বাদশই হোক আর দশমই হোক, একাদশ কোনক্রমেই বরদাস্ত করা যায় না। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে।

দেখা হয়েছিলো বিধানসভার বাম কমিউনিস্ট সদস্য আব্দুস সাঈদের সঙ্গে। শ্রীসাঈদ বাদুড়িয়া কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে কলেজজীবন থেকেই ছাত্র-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য সুভাষচন্দ্র যে গণসংগ্রাম গড়ে তোলেন, শ্রীসাঈদ তাতে অংশ গ্রহণ করে ইংরেজ শাসকদের হাতে পীড়ন ভোগ করেন। শ্রীসাঈদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ১৯৪৬ সালে বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং পরে কার্যকরী সভাপতি হন। ১৯৪৬, '৫০ এবং '৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার

সময়ে জীবন বিপন্ন করেও, শান্তিসেনা হিসাবে বিপন্ন হিন্দু-মুসলমানের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৫০ সালে গৃহহীন হিন্দু-মুসলমান উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের আন্দোলনে তিনি ছিলেন ইউ সি আর সি-র সহ-সভাপতি। '৫১ সালে কলকাতা বন্দরের হাজার হাজার জাহাজী শ্রমিকের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের এবং অন্যান্য মালিকদের পক্ষ থেকে যে জুলুম চালানো হয়েছিলো, তার বিরুদ্ধে শ্রীসাঈদকে ধর্মঘট সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে। বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত থেকে বারবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৫৬ সালের কলকাতা বস্তি উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সংগঠিত হয় তিনি তার পুরোভাগে ছিলেন। ১৯৬৬ সালে Statesman-কর্মচারীদের এবং পরবর্তী কালে সমস্ত সংবাদপত্র কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।

শ্রীসাঈদ ১৯৫২ সালের First Trade Union Delegate হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে চীন পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৯ সালে বিশ্ব কমার্সিয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্মেলনে যোগদানের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যান। শ্রীসাঈদ বিধানসভার ব্যস্ত সদস্যদের অন্যতম। সদাচঞ্চল ছটফটে স্বভাবের খর্বকায় একটি কালো মানুষ। প্রশ্ন করেছিলাম,

—কেন্দ্র যদি খাদ্য সরবরাহে গাফিলতি করে, তাহলে বাংলাদেশে পাটের চাষ কমিয়ে ধানের ফলন বাড়ানো প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন কি?

—না। কারণ পাট আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান কৃষিপণ্য। কোনমতেই আমরা এর উৎপাদন কমাতে পারি না।

—কিন্তু পাট থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ন্যায়সঙ্গত অংশ পশ্চিমবঙ্গকে যদি কেন্দ্রীয় সরকার না দেন তাহলে?

—তাহলে আমাদের প্রয়োজন পড়বে কেন্দ্রকে আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য দিতে বাধ্য করার।

—সেটা কিভাবে হবে?

—গণ-আন্দোলন আর সাংবিধানিক উপায়ে।

—কিন্তু তাতে খাদ্য-ঘাটতির প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে।

—ধানের ফলন বাড়াবার জন্য আমরা অনাবাদী এবং সরকারী খাস জমি ব্যবহার করবার চেষ্টা করবো।

—আপনি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। কলকারখানায় ঘেরাও-এর ব্যাপারে যুক্তফ্রন্টের নীতির পরিবর্তন হয় নি কি?

—ঠিক পরিবর্তন বলা যায় না। তবে আমরা গায়ে পড়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাতে চাই না। তবে মালিকদের একথা মনে রাখতে হবে যে, সরকার সর্বদাই শ্রমিকস্বার্থের পক্ষে।

—স্বভাবতই মালিকপক্ষ শ্রমিকের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে চাইবে না। সেক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়ন কিভাবে তাদের কর্মসূচী প্রস্তুত করবে?

—শ্রমিককে তার জন্য ব্যাপক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সরকার শ্রমিক ইউনিয়নের ন্যায্য দাবির সংগ্রামে সর্বদাই সাহায্য করে যাবে।

নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বাম কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীযামিনী সাহা অবশ্য ব্যস্তবাগীশ মানুষ নন। চেহারার মধ্যে যেমন একটা শান্ত সৌজন্যতা দেখা যায়,

শ্রীসাঈদ

চলনে-বলনেও তেমনি একটি প্রশান্ত ভাব। দেখা হবার পর দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা হলো। সারাক্ষণ স্বভাব-সুলভ প্রশান্তির সঙ্গেই আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অবশ্য শান্ত-স্বভাবের এই মানুষটির মধ্যে যে একটা বিপ্লবী সত্তা লুকিয়ে আছে সে কথা বাইরে থেকে আন্দাজ করা কঠিন। শ্রীসাহা স্কুল-জীবনেই অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪২ সালে যখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র তখনই পাঠ্যপুস্তক ফেলে রেখে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে জেল হয়ে গেলো। জেলে বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী এবং গণেশ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। জেল থেকে ছাড়া পেলেন '৪৩ সালের জুলাই মাসে। '৪৩ থেকে '৪৮ সাল পর্যন্ত ইছাপুর অর্ডনান্স ফ্যাক্টরী, মহালক্ষ্মী কটন মিল, ডানবার কটন মিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখলেন। '৪৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার ফলে আত্মগোপন করতে হলো। ছ'মাস পরে ধরা পড়ে গেলেন। একনাগাড়ে ৪ বছর জেল খাটবার পর '৫২ সালে গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনে যোগদান করলেন। '৬২ সালে World Peace Conference-এ যোগদান করতে মস্কো যাত্রা করেন। ফিরে আসার পর চীন-ভারত যুদ্ধের সময় আবার বন্দী হন। '৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে আলিপুর জজ কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় অন্তরীণ থাকতে হয় কয়েকমাস। '৬৪ সালে আবার ডি-আই রুলে আটক হন। '৬৬ সালে মুক্তি পান। '৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে নোয়াপাড়া কেন্দ্রে মাত্র ২৯ ভোটে পরাজিত হন। '৬৭—'৬৮ সালে গৌরীশঙ্কর জুট মিল, অন্নপূর্ণা কটন মিল এবং বেঙ্গল এনামেলের শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হয়ে থাকেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে নোয়াপাড়া থেকে নির্বাচিত বিধানসভার বাম কমিউনিস্ট সদস্য। শিক্ষাজীবন সেই '৪২ সালে দশম শ্রেণীতেই শেষ—রাজনৈতিক জীবন পুষ্ট হয়েছে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে।

সব শুনে ওঁকেও জিজ্ঞেস করলাম—আপনি তো বহুকাল ধরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কলকারখানায় ঘেরাও-এর ব্যাপারে যুক্তফ্রন্টের নীতির পরিবর্তন হয়েছে বলে কি আপনার মনে হয়?

—ঘেরাও হলো একটি ক্ষণস্থায়ী আন্দোলনবিশেষ। পরিবর্তন এই অর্থে হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার এই spontanious movement-এর মাধ্যমে শিল্পে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না। শ্রমিক আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো continuous strike. নিরবচ্ছিন্ন ধর্মঘটের মাধ্যমেই শ্রমিককে সংগঠিত হতে হবে।

—স্বভাবতই মালিকপক্ষ তাঁদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করতে চাইবেন না। তখনো কি শ্রমিক ইউনিয়ন কেবল ধর্মঘট চালিয়েই তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে পারবেন?

—মালিকপক্ষ কর্ণপাত করবেই না—বলা যায় না। নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, শিল্পপতিরা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, শ্রমিকের সমস্যা মিটে গেল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনের ফর্ম বদলাবে।

—অটোমেশন সম্পর্কে সরকারের নীতি পরিবর্তিত হতে পারে বলে কি আপনার মনে হয়?

—মোটেই না।

—অটোমেশন কেরালায় কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছে কি?

—না।

বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীহাজারীলাল মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করলাম। শ্রীমণ্ডল একজন মাধ্যমিক শিক্ষক। বাংলা ১৩২২ সালে খুলনা জেলায় এক স্বল্পবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম। ছাত্রজীবন থেকেই ছাত্র-সংগঠন এবং জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে নিয়োজিত থাকতে ভালবাসতেন। অবহেলিত সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষি পল্লীতে শিক্ষার অনগ্রসর জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারতার জন্য আজও তাঁর চেষ্টার অবসান হয় নি। এতদঞ্চলে কয়েকটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি পরিচিত। দেশ-বিভাগের পরে তিনি খুলনার ভেটখালি বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়ে ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত গোবিন্দকাটি শিক্ষা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক হয়ে পড়েন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষা আন্দোলন এবং স্থানীয় মানুষের জমির আন্দোলনে নিজেকেও সামিল করেন। ১৯৫৭ সালের পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং পার্টির মনোনীত প্রার্থিরূপে তিনি এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কুখ্যাত ভোলানাথ ব্রহ্মচারীকে পরাজিত করে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীমণ্ডল শিক্ষক। প্রশ্ন করলাম—

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সমস্যা। এদের মধ্যে আশু কোন্ কোন্ দিকে নজর দেওয়া দরকার বলে আপনার মনে হয়?

—আমার মনে হয়, প্রাথমিক শিক্ষা যখন শিক্ষার প্রথম ধাপ, তখন প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটি এবং দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করাই প্রথমে দরকার।

—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি তুলে দেওয়া সম্ভব বলে আপনার মনে হয় কি?

শ্রীমণ্ডল একটি পাল্টা প্রশ্ন করে তাকিয়ে রইলেন—তুলে দিয়ে?

আমি বললাম—কেন, এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা যেতে পা— ... পরিচালনের জন্য।

—না এ্যাডমিনিস্ট্রেটর একনায়ক হয়ে যেতে পারেন। অসৎ এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের স্বৈরাচারী হতেও কোনো বাধা থাকবে না। —বরং বর্তমান পরিস্থিতিতে ম্যানেজিং কমিটিকে আরো গণতান্ত্রিক করা যেতে পারে। ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা হ্রাস করবারও দরকার বলে মনে হয়।

—বিদ্যালয়-শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হবার কথা শোনা গেছিলো। এ সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-ব্যবস্থা চালু করলে খুব ক্ষতি হবে যেমন হয়েছে একাদশ শ্রেণী করার পর। সারা রাজ্যে ১১শ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির আভ্যন্তরীণ চেহারা দেখলে মনে হয় অগ্রগতির নামে এক বিরাট প্রহসন চলছে। আমাদের নিজেদের স্কুলই Deficit-granted. কিন্তু কি হয়েছে? আমরা পারি নি শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দিতে। পারি নি ছাত্রদের সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে। বিজ্ঞান বিভাগে নেই প্রয়োজনীয় গবেষণাগার—নেই উপযুক্ত যন্ত্রপাতি। আর এ চিত্র তো সারা রাজ্যের হাসপিটালের স্কুলের চিত্র।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মণ্ডল

রাজারহাট কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বাম কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীরবীন্দ্রনাথ মণ্ডল পার্টির সারাক্ষণের কর্মী। ৩০ বছর বয়স্ক তরুণ শ্রীমণ্ডল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ১৯৫৬ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছেন। পার্টি ভাগ হয়ে যাবার পর তিনি বাম কমিউনিস্ট পার্টিতে স্থান গ্রহণ করেন। শ্রীমণ্ডলের জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে পারি নি। দিনকয়েক আগে যখন দেখা হয়েছিলো তখন বলেছিলেন যে, সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা উনি পরে আমাকে জানিয়ে দেবেন। পরে উনি আমাকে যে পরিচিতি দিয়েছিলেন তা মাত্র পাঁচটি অনাড়ম্বর লাইনের মধ্যে লেখা (উনি বলেছিলেন, পার্টি-অফিস থেকে ওটুকুই দিয়েছে)।

প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা করতে গিয়ে অবশ্য শ্রীমণ্ডল সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছিলাম।

শ্রীমণ্ডল কৃষি এবং কৃষক জীবনের সঙ্গে এখনো সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম,

আমাদের দেশে জমিতে Sub-Division এবং fragmentation একটা বিরাট সমস্যা। যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে এ রীতির উচ্ছেদই তো যুক্তফ্রন্টের কাম্য। এ ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়?

—Fragmentation খুবই ক্ষতিকর সন্দেহ নেই। তবে যতক্ষণ না যৌথ খামার ব্যবস্থা করা যায়, ততক্ষণ এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আপাতত গ্রাম্য ভূমি-সমবায়ের মাধ্যমে সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে।

—খাদ্যে স্বয়ংভর হবার জন্যে কিংবা খাদ্য সরবরাহে কেন্দ্রীয় শিথিলতার প্রতিশোধকল্পে পশ্চিমবাংলায় পাটের চাষ কমিয়ে দিয়ে ধানের ফলন বাড়ানো উচিত বলে কি আপনি মনে করেন?

—নিশ্চয়ই। এ ব্যাপারে কেরালার আদর্শই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রকে শুধু আমরা দেবো—কেন্দ্র আমাদের দেবে না এ তো চলতে পারে না।

কিন্তু তাহলে কি পাটশিল্পে সঙ্কট সৃষ্টি হবে না? একেই তো জনসংখ্যার ভিত্তিতে যে কাঁচামাল পাওয়া যায় তা বাংলাদেশের কলকারখানার তুলনায় খুবই কম।

—পাটশিল্পে সঙ্কট তো এমনিতেই আছে। বাংলাদেশের অগণিত ক্ষুধার্ত মানুষের প্রথম এবং প্রধান সমস্যাই হলো খাদ্য। যে-কোন মূল্যে এই সমস্যার সমাধান করা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য সরবরাহে তাঁদের দায়িত্ব পালন না করলে অতি স্বাভাবিকভাবেই এ রাজ্যে ধানের ফলন বেড়ে যাবে। তবে কেন্দ্রকে খাদ্য এবং কলকারখানার জন্য প্রয়োজনভিত্তিক কাঁচামাল সরবরাহের জন্য চাপ দিতে হবে।

শহরে

শ্রীসাংবাদিক

আমি যে শহরে বাস করি তার বুকের কাছে কান পাতলে এখনো শোনা যায় কল-ধ্বনি। বড় দুরন্ত এখনো দক্ষিণ বাতাস।

সেই লাল স্কার্ফ-পরা যুবকদের উৎসব শেষের মত্ততা, আবিরের রক্তিম উচ্ছ্বাস আর লাল কাগজ মোড়া আলোর অস্পষ্ট উজ্জ্বলতা চৈত্রের এই অবাধ আকাশের নিচে জীবনটাকে যেন আগের চেয়ে অনেক বড়ো করে গেছে। সিংহের হুঙ্কারে মানুষেরা জেগে উঠেছে। নির্বাচনের দমকা বাতাসের এক এক ঝাপ্‌টায় পুরনো, মৃত শহর বেলুনের মত উড়ে গেছে। রাত্রির আকাশের পটে জীবন্ত নক্ষত্রগুলি দপ-দপ জ্বলছে। বিরাট, রোমশ উচ্ছ্বাসে স্পন্দিত দিনরাত্রি এখন। যারা কাগজ কখনো ছুঁতো না তারাও নিবিষ্টচিত্তে সংবাদ পাঠ করে। লাইব্রেরীতে আগের চেয়ে এখন বেশি ভিড় হয়। রেডিওর ধারে চাক-বাঁধা যে ভিড় দেখা যায় ক্রিকেটের মরশুমে, এখন নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তেমনি করে চাক বাঁধছে রাজনীতির বিষামৃত পান করবার জন্যে।

নিজেদের চিতার গন্ধ নাকে আসা মাত্র মাতব্বররা, যেমন ধরুন কো-অপারেটিভের সেক্রেটারী, ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার এবং বড় বড় অফিসারের দল, কিছু কিছু বিত্তশালী কণ্ট্রাক্টর, চিন্তার দিক থেকে পেছিয়ে পড়া ঝানু অধ্যাপক, বাড়ি বাড়ি গুরুগিরি করা যাঁদের পেশা এমন কিছু ফোঁটা-তিলকধারী, বড় বড় রুটের বাসের মালিক, অনেক টাকার থইওলা বাজখাঁই অ্যাডভোকেট এ'রা হঠাৎ কেমন হয়ে গেছেন। মুখে আর আগেকার সে জেল্লা নেই। নাকের দুপাশের মাংস ঝুলে পড়েছে। কথা বলতে পারছেন না যাঁরা টেবিল না চাপড়ে তাঁরা বেলো-ফাঁসা হারমোনিয়মের মত ফ্যাস-ফ্যাস করছেন। কথাবার্তা খুবই পরিমিত। যেন অশৌচ পালন করছেন এমন নিষ্প্রভ, দীন ভাব। চোখের কোণে জমাট কালি। মুখে মহেশযোগীর দাড়ি। হাফ-গেরস্থ আর হাফ-সন্ন্যাসীর এক নয়া সংস্করণ।

ইংরেজ আমলে এ'দেরই অধিকাংশ বাড়িতে ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াতেন। এ'দেরই বৈঠকখানায় একদা পঞ্চম জর্জের তৈলচিত্র শোভা পেত। যেখানে সুবিধে জুটতো সেখানে কংগ্রেসীদের ধরিয়ে দিতেন। বিপ্লবীদের ব্যঙ্গ করতেন, বলতেন, 'ওয়ান ফাইন মর্নিং আই থ্রু এ স্টোন টুয়ার্ডস এ হেল্পলেস ইংলিশ লেডি এ্যান্ড আই বিকেম এ রেভুলিউশনারি দেন এ্যান্ড দেয়ার', বলতেন আর বৈঠকখানার ফরাসে বোতলের মত হেসে হেসে গড়াতেন, ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্টের পর এ'রাই আবার চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে নতুন জুতোয় পা গলিয়ে ফেললেন, পায়ে ফোস্কা পড়ছে অনভ্যাসের দরুণ কিন্তু তাতে কি, গরজ বড় বালাই, পঞ্চম জর্জের তৈলচিত্র সরিয়ে সেখানে গান্ধীজীর তৈলচিত্র স্থাপন করলেন, রাতারাতি ঘোরতর স্বদেশপ্রেমিক হয়ে পড়লেন, টাক-ঢাকা খাদি টুপি মাথায় চড়িয়ে কংগ্রেসীদের থেকেও বড়ো কংগ্রেসী হয়ে দাঁড়ালেন, সমস্ত বড় বড় পোস্টগুলি নিজেদের পকেটে পুরে ফেললেন, একদিন যেমন ইংরেজ যুগে কংগ্রেসীদের গালমন্দ করতেন, তেমনি ঠিক একই কায়দায় কংগ্রেসী যুগে বামপন্থীদের গালমন্দ করতে লাগলেন, '৪২-এর আন্দোলনের সময় যেমন কংগ্রেসীদের বলতেন যতসব 'রেল লাইন ওপড়ানোর দল', কংগ্রেসীদের আমলে তেমনি বামপন্থীদের বলতে লাগলেন যতসব 'ট্রাম-পোড়ানো বাস-জ্বালানোর দল', সেই একই কায়দা, একই কৌশল, সেই একই রণধ্বনি, এ'দের হয়তো এবারেও মুস্কিল হবে না। এ'দের একটা গতি ঠিক হয়েই যাবে। অজয় মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতি বসুর তৈলচিত্র বাজারে বেরুতে যা দেরি, ও'রা সঙ্গে সঙ্গে ও'দের দেয়াল থেকে গান্ধীজী সরিয়ে রাতারাতি অজয়-জ্যোতির তৈলচিত্র টাঙিয়ে দেবেন, পুরনো জুতো ফেলে দেবেন, নতুন জুতোয় পা গলাবেন, যেমন এতোদিন করে এসেছেন এইসব দু'কান কাটার দল, তেমনিই করবেন আর কী, সেই পুরনো চালেই চলবেন, হাজার হোক পুরনো চাল ভাতে বাড়ে বৈ কমে না। কিন্তু হিসেবে এবার একটু বোধহয় ভুল হয়েছে।

মাঝখানে একটু চানাকে উঠেছিলেন ভদ্রলোকেরা, একটু উসখুস উসখুস করে উঠেছিলেন, হঠাৎ একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে হবেন এই প্রশ্নে যখন যুক্তফ্রন্ট কিঞ্চিৎ দোলায়িত চিত্ত।

একজন বড় ওজনের কণ্ট্রাক্টর ভদ্রলোক যিনি এই নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীকে চার-চারটি লরী জুগিয়েছিলেন, নিজের জীপখানি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি সেদিন দেখা হলে আমাকে বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এটা কিন্তু জ্যোতি বসুর দলের ভারি অন্যায়। স্বরাষ্ট্র না হলে আর মুখ্যমন্ত্রীর কি রইলো? লোকে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে, কোন বিশেষ দলকে তো ভোট দেয় নি।'

আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে কৌতুকের উপকরণ জোগাবেনই।

'কি ব্যাপার?' বলতেই হল আমাকে, গলা কুটকুট করে উঠলো, 'হঠাৎ আপনিও যে অজয় মুখোপাধ্যায়ের বেজায় ভক্ত হয়ে উঠলেন! যতদূর জানি আপনার লরী আর জীপ আপনি এখানের বাংলা কংগ্রেস প্রার্থীকে দেন নি, দিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থীকে!'

'দিয়েছি তো বেশ করেছি', ভদ্রলোক রেগে একেবারে মুক্তকচ্ছ হয়ে গেলেন। তারপর তার হঠাৎ কি একটা কাজ, খুবই দরকারী নিশ্চয়, মনে পড়ে গেল, কাছাটির কাণ্ড সেইভাবে ধরে মুখখানাকে খুবই গম্ভীর করে, কি সব বিড়-বিড় করে বকতে বকতে, পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

সেদিন বাজারে দেখা হল, আমি হেসে ওনাকে আপ্যায়িত করতে গেলাম, উনি রেগে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন।

না। শেষ আশাটিও ছিন্ন হল। লাগল না। লাগ লাগ করেও যুক্তফ্রন্টের ঝগড়াটি লাগল না। বেশ পাকিয়ে উঠেছিলো গো, কিন্তু তীরে এসে তরী ডুবে গেল। বরাত একে বলে।

সেই সব মস্তানেরা, নামকরা গুণ্ডারা বেগুন পোড়ার মত মুখখানাকে করে যুক্ত-

ফ্রন্টের সঙ্গে যাদের-ই একটু যোগাযোগ আছে তাদের-ই একধারসে স্যালুট বাজিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে খিস্তির ফোয়ারা ছোটাবার সেই সব সুন্দর দিনগুলি হায়, সোনার খাঁচায় রইলো না। কথায় কথায় যারা অন্যের মুখে নিজেদের রিস্টের জোর-পরখ করে নিত, সেই সব দামী ও নামী রিস্টগুলি আজ আর ভাড়া পাওয়া যায় না। চন্দননগরের তেলেনীপাড়ার মন চাঙ্গা করা দাঙ্গাতেও ভাড়া পাওয়া যায় নি। চায়ের দোকানে দোকানে খোলাখুলি চোলাইমদের মহোৎসবও চলছে না আর, ওদের দিনগুলি রাতগুলি ইস্ত্রী না পড়া জামা-কাপড়ের মত ম্যাড়-ম্যাড় করছে এমন যে, আমি যে আমি, আমারও মায়া হয়, দুঃখ হয়, আমিরদের এ কি ফকিরী দশা। হায় যুক্তফ্রন্ট, কংগ্রেসের হাত ভাঙতে হয়, মাথা ভাঙতে হয়, ভাঙলে ভাঙলে শেষ পর্যন্ত হাঁটুই ভেঙে দিলে। মস্তানদের দুর্দশার কথাটা একবারও চিন্তা করলে না, ছিঃ!

ওদের ভারি দুর্দশা, কিন্তু আমাদের শহর ঠিক আমাদের শহরই আছে। ভেবেছিলাম অনেকদিন আর মিছিল দেখব না, দেখব না শূন্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত, মোড়ে মোড়ে মিটিং শুনব না, হ্যান্ডবিল ঘুরবে না হাতে হাতে, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়বে না। মানুষ অনেক উত্তেজনার ভেতর দিয়ে গেছে, এবার জুড়োবে, শান্ত হবে, শান্ত হবে কলেজ, শান্ত হবে স্কুল, ধর্মঘটের প্লাবনে ডুবে যাবে না কারখানাগুলি, কিন্তু আমাদের শহর ঠিক আমাদের শহরই আছে। তেমনি তরুণ, তেমনি প্রাণবন্ত।

মিছিল বার হয়েছে। একজন গলায় ঝুলিয়েছে মাও সে-তুংয়ের ফটো, তার পাশে একজনের শক্ত হাতে ঝান্ডা, জন-ত্রিশেক ছাত্র, সবই স্থানীয় কলেজের, কিছু স্কুলের ছাত্রও জুটেছে, দু-একজন চেনা সমাজবিরোধী, কিছু কিছু পুরোন মার্কা-মারা গুন্ডা শহর পরিক্রমায় বেরিয়েছে, হাতে আন্তর্জাতিক রক্তনিশান, মুখে শ্লোগান, 'আমেরিকার দালাল জ্যোতি বসুর সাদা পুলিশ, সাবধান, সাবধান', 'নয়া শোধনবাদীদের পুড়িয়ে ফেল, ছিঁড়ে ফেল', ঠ্যাঙাড়ে প্রমোদের ফ্যাসিস্ট বাহিনী নিপাত যাক, নিপাত যাক'......

সুন্দর! রগড় বেশ জমে উঠেছে।

'কলকাতার মহাবিদ্যালয়ে কি যেন গন্ডগোল, আমি ঘুরে ঘুরে আগের দিন দেখলাম স্কুল আর কলেজের গায়ে গায়ে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের পোস্টার। ও'রা 'রুশ সাম্রাজ্যবাদের চীনভূমি আক্রমণের জন্যে', 'সি-আই-এ'র এজেন্ট সত্যেন সেনের বেয়াদপির জন্যে', আরো সব কি কি জন্যে যেন, তখন মনে ছিল, এখন মনে করতে পারছি না, ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

শুনেছি এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি চায়ের দোকান ওদের নাকি দখলে। প্রত্যেকটি দেয়াল রক্তরঞ্জিত করার অধিকার কেবলমাত্র ও'দেরই। প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ তাত্ত্বিক। মাও-এর 'কোটেশন' একেবারে গোড়া থেকে শেষ প্রতিটি অক্ষর মুখস্থ। ও'দের কলেজের পড়াশুনো ছাড়াও নিজেদের 'ক্লাস' বসে প্রত্যেকদিন। মুখে সকলেরই দাড়ি গজানো চাই কম্পালসারী। পরস্পরকে 'কমরেড' ছাড়া সম্ভাষণ নেই। বাদামভাজা-ওলাকেও ও'রা অননুকরণীয় ভঙ্গিতে 'কমরেড' সম্বোধন করেন। ও'রা ভীষণ-ভাবে বুর্জোয়া-বিদ্বেষী বলেই শ্রমিক-কৃষকদের লোক ও'দের দলে থাকতে নেই। মার্ক্সবাদের 'Contradiction'-কে নিভুল লক্ষ্যে ও'রা এইভাবেই বেঁধেছেন। যদিও পি-ডি-এফ সরকারের সময় প্রত্যেক-দিন চায়ের দোকানে গেঁজিয়েছেন, রাজ্য-পালের শাসনের দিনগুলিতে ঐ একই কাজ করে গেছেন। সেই একই চায়ের দোকান গ্যাঁজানো অবশ্যই বিপ্লবী কায়দায়, কত বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটে গেল, কত মানুষ গুলী খেল, লাঠি খেল, জেল ভরিয়ে ফেলল, ও'দের বিপ্লবীরক্ত এতই খাঁটি আর বনেদী যে সে রক্ত এত কান্ডেও চীৎকার করে উঠলো না, মাঝে মাঝে শুধু আল-কাতরায় বিপ্লব করতে লাগলেন দেয়ালে দেয়ালে। পাবলিক তখন ও'দের নাম দিয়েছিলো মানে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের 'আল-কাতরা-বিপ্লবী', তাতে ও'রা বিলক্ষণ চটেছিলেন। কেউ কিছু জিগ্যেস করলেই বলতেন, 'আমাদের সব কাজ গোপনে। সব কাজ গ্রামে। এখানে কি কাজ করবো? এ মধ্যবিত্ত এলাকা। এই পরগাছা শ্রেণীর মধ্যে আমাদের কোন কাজ নেই। এসব করবে নয়া-শোধনবাদীরা।'

এতবড় বিপ্লবীরা যখন শহরে শহরে স্কুল-কলেজগুলিতে ধর্মঘটের ডাক দিলেন, সকলেই ভাবলো, না জানি কি হয়, বিপ্লবে বিপ্লবে দেশটা বোধ হয় একদিনেই পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যাবে, খুবই শঙ্কা সকলের। বেলা দশটা নাগাদ একটা স্কুলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম ব্যাপার-স্যাপার দেখবার জন্যে। দেখলাম ও'রা ছাত্রদের মধ্যে হ্যান্ডবিল বিলি করছেন আর বলছেন, 'অনেক মিথ্যে প্রচার শুনেছেন আমাদের নামে। কাগজ-গুলো সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে। আমাদের হ্যান্ডবিল পড়ুন তাহলেই ছাত্র পরিষদের সঙ্গে আমাদের কোথায় অমিল ঠিকই বুঝতে পারবেন। ধর্মঘটে যোগ দিন। বিপ্লব সফল করুন।'

কিছু কিছু ছেলেও জুটতে লাগলো।

কিছু কিছু লোকও জুটে গেল। কে একজন বললেন, 'এসে গেছে ভোট বয়কট-ওয়ালারা? বাঃ বাঃ।' সে ভদ্রলোক জীবনানন্দের বনলতা সেনের স্টাইলে পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে বললেন, 'এ্যাত্তোদিন কোথায় ছিলেন? আমরা জানতাম যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা পেলেই আপনারা জুটবেন। তার আগে পি ডি এফ বা রাজ্যপালের সময় আপনাদের দেখা যাবে কেন? তখন চায়ের দোকান আলো করে বসে থাকবেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবেন, এখানে আমাদের কাজ নয়, চেয়ারম্যান মাও বলিয়াছেন কাজ আমাদের গ্রামে। তা' এখন আবার শহরে ভিড়েছেন কেন? গ্রামেই যান না। চেয়ারম্যান মাও কি তাঁর কথা উইথড্র করিয়া লইয়াছেন?'

'আপনি আজেবাজে বকছেন।' একজন ভোট বয়কটওয়ালা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, 'সত্যেন সেন সি-আই-এ'র এজেন্ট। নয়া শোধনবাদীরা সেদিন তাকে নিন্দে করে আজ মাথায় নিয়ে নাচছে।'

'আপনাদের মতে ত' অনেক কিছুই

হিটলার-এর ১৫০তম অভিনয় উৎসব

মহাজাতিসদনে শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় অভিনয়।

ফোন : ৫৫-৭১২১

সভানেত্রী—রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী

প্রধান অতিথি—মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য

বিশেষ অতিথি—মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাই ভট্টাচার্য

উদ্বোধন করিবেন—প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

পুরস্কার বিতরণ—নাট্যকার মন্মথ রায়

অভিনয়ে—তরুণ অপেরার শিল্পিবৃন্দ

সি-আই-এ'র দুর্গ। আত্তাজ্ঞায় খাতে। যেমন খবরের কাগজ। বাংলাদেশের কতিপয় লেখকদের বই। হিন্দী ফিল্ম। এগুলো দখল নিচ্ছেন না কেন? আপনাদের একদা প্রিয় বিপ্লবী নাট্যকার উৎপল দত্ত, তাঁকে ছেড়ে দিচ্ছেন যে বড়ো? স্কুল-কলেজেই বা পড়ছেন কেন? এসব ত' বুর্জোয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।' ভদ্রলোক বললেন।

এসব প্রশ্নের ত' জবাব নেই তাই ওঁরা শ্লোগান তুললেন, ঠ্যাঙাড়ে প্রমোদের নয়া ফ্যাসিস্ট বাহিনী, গো ব্যাক ব্যাক', ওঁরা শ্লোগান তুললেন, মার্কিন এজেন্ট জ্যোতির শাদা পোষাকের পুলিশ, হুঁশিয়ার', মানুষ আশেপাশে ভিড় বাড়াতে থাকলো। তারপর অনেকক্ষণ—প্রায় আধ ঘন্টা বক বক করে বিপ্লবী কায়দায় মার্চ করতে করতে সেই ত্রিশজন যুবক চলে গেলেন। যাবার সময় ধর্মঘটের অমন জোরালো ডাক দিয়ে গেলেন, নয়া শোধনবাদী, শোধনবাদী অন্যান্য গণতন্ত্রীদের দুর্গে কামান দেগে গেলেন। কিন্তু হায়, কেউ সাড়া দিলো না। দু-একটা স্কুল, একটা কলেজ বন্ধ হল মাত্র, যেখানে যেখানে বন্ধ হয় নি সেখানে ওঁরা দল বেঁধে গিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আলটিমেটাম দিলাম। আধ ঘণ্টা পর আমরা আবার আসছি বোম নিয়ে। এ জায়গায় আমরা দখল নোব।'

'যা যা।' আই টি আই-এর ছাত্ররা চীৎকার করে উঠলো, 'তোদের মুরোদ জানা গেছে। নিয়ে আয় বোম। আমরাও তৈরি। তোরা ত' বাংলার মানুষকে 'কল' দিয়েছিলি ভোট বয়কট করতে। লোকে তোদের আবর্জনায় ফেলে দিলো। রাজনীতি গেছে। এখন গুণ্ডামী আছে। ফিরে আয়। এটুকুও খতম করে দোব।'

আশ্চর্য, সেই ত্রিশজন বিপ্লবী যুবক, বারুদ দিয়ে যাঁরা তৈরি, তাঁরা পালালেন। বোম নিয়ে আর আসেন নি, যতোদূর জানি।

এই রকমই পালাতে আমি ওঁদের আর একবার দেখেছি। সম্ভবত এরকমই একটা রাস্তায়। তখন বেশ রাত হয়েছে। অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে পথে। দু' পাশে জমজমাট দোকানপাট। অদূরে মাঠে নয়া শোধনবাদীদের মিটিং হচ্ছে। প্রমোদ দাশ-গুপ্ত বক্তৃতা করতে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে চায়ের দোকান থেকে বিপ্লবী যুবক-বৃন্দ, সেই ত্রিশজন, উঠে এসে বসলেন মিটিং-এ আর নানাভাবে ডিসটার্ব করতে লাগলেন।

সেই ত্রিশজন, সেই একই চেহারা, কেউ কেউ দিনে নকশাল, রাতে কংগ্রেস, এই সংখ্যা বাড়তেও কখনো দেখি নি, কমতেও দেখি নি, সেই একই ত্রিশজন; মূর্তিমান বিপ্লব, নানা রকম শ্লোগান দিতে লাগলেন।

শহরের মানুষ এঁদের, এতোদিন এখানে এ্যাতো কংগ্রেসের মিটিং হয়ে গেল, সে সব সভায় ডিসটার্ব করতে দেখেন নি। চ্যবন এলেন। ইন্দিরাজী এলেন। বিপ্লবী যুবকেরা নির্বিকার। কিন্তু যেই যুক্তফ্রন্টের নেতা এলেন অমনি ওঁদের মধ্যে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। মিটিং বসবার কিছু আগে থেকে রাস্তার সব মোড়ে দুজন করে ওঁরা ছড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যেকের হাতে হ্যাণ্ডবিল।

একটা হ্যাণ্ডবিল আমার হাতে গুঁজে দিলেন। তাতে দেখলুম লেখা, 'নয়া শোধনবাদীরা কি জবাব দেবেন?' বলে বিরাট এক ফর্দ।

আমি বললাম, 'এ ত' বেশ ভালোই হয়েছে। নয়া শোধনবাদীরা নিশ্চয় ওঁদের কৃতকর্মের জন্যে জবাব দেবেন। কিন্তু কংগ্রেসকে কেন প্রশ্ন করেন নি? কংগ্রেস কেন কোন প্রশ্নের জবাব দেবে না?'

ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'কংগ্রেস ত' শেষ হয়ে গেছে। ওদের আর বলবার কি আছে? এখন বুর্জোয়া ওদের কাঁধ বদল করে নয়া শোধনবাদীদের কাঁধ আশ্রয় করেছে। সুতরাং'...

সে যাই হোক, প্রমোদবাবুর মিটিং যখন ওঁরা পণ্ড করতে চলেছেন, তখন নয়া শোধনবাদীরা ভদ্রভাষায় ওঁদের যেতে বললেন। ওঁরা বিপ্লবী, ওঁরা বন্ধমুষ্টি দেখালেন। সুতরাং যা' হবার তা' হল, ওঁরা যেমন প্রত্যেক জায়গায় করেন, তেমনিই করলেন, ভন ভন ছুট, সেই ত্রিশজন, সেই একই চেহারা, সংখ্যা কখনো বাড়েও না, কমেও না, কেউ কেউ দিনে নকশাল, রাতে কংগ্রেস, ভন ভন ছুট,...

আমি ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসি, দু-একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, পাশে রিকসা দাঁড়িয়েছিলো, ডাকলাম, তখনো দেখি ওঁরা পালাচ্ছেন বিপ্লবী কায়দায়, আন্তর্জাতিক ঝাণ্ডা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, খালি পায়ের দিকে নজর. চেঁচিয়ে বললাম—ঝাণ্ডা ফেলে দিয়ে পালাচ্ছেন কমরেডগণ। এ কি রকম বিপ্লবী আপনারা : মাও সে-তুঙ বলেছেন যাঁরা ঝাণ্ডা ফেলে দিয়ে পালায়...'

কোন কাজ হোল না। ওঁরা পালালেন ভন ভন। আজো দেখলাম সেই একই পালানো। সেই একই ভন ভন ছুট। সেই ত্রিশজন। সংখ্যা বাড়েও না। কমেও না। 'সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব' সফল করার একটা স্তর হিসেবে ওঁরা ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে-ছিলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে সেই ডাক শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবার পরও, খোদ নকশালবাড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ার পরও কোন জিজ্ঞাসা নেই, কোন প্রশ্ন নেই, কোন আত্মবিশ্লেষণ নেই, এ কিরকম মার্ক্সবাদী!' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বললেন, আমার দিকে চেয়ে। আমি কি জবাব দোব? আমি এখন চোখের ওপর দেখছি শহরের মানুষদের, অবাক, ওরা তাড়া করলো না, ওঁদের ত্যাদড়ামি ভেঙে দিলো না, ওদেরকে আমলই দিলো না, দু-একটা টিকা-টিপ্পনী কেটে ছেড়ে দিলো শুধু। কিন্তু তাতেই কাজ হল, আশেপাশে মানুষ বাড়তে দেখে ওঁরা নিজেরাই আতঙ্কিত হলেন। তারপর আর কী, যা করেন, পালালেন, সেই ত্রিশজন, বারুদ দিয়ে যাঁরা তৈরি, ছুট ছুট, ভন ভন ছুট, বিপ্লব থেকে, ছুট ছুট, ভন ভন ছুট নকশালবাড়ি থেকে, ছুট ছুট, ভন ভন ছুট রাজনীতি থেকে, সেই নিঃসঙ্গ ত্রিশজন, কেউ কেউ কলেজের, কেউ স্কুলের, শ্রমিক না, কৃষকও না, সব পেটি বুর্জোয়ার বাচ্চা, দিনে নকশাল, রাতে কংগ্রেস, ছুট ছুট, ভন ভন ছুট। ছোটার সময় ওঁদের পায়ের কাজ দেখে সেই ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'যেভাবে ওরা ছুটছে তাতে একদিন ওরা আমেরিকাতে না পৌঁছে যায়। জানেন ত' ট্রটস্কি একদিন মেক্সিকো গিয়েছিলেন?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'জানি।'

সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-মালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধ-রাজি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী দুই ভাগ একত্রে পাঁচ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পশ্চিমবাংলার শপথ, বুদ্ধিজীবী হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্যা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যাঁরাই বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাকে ভালবাসেন, ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটি তাঁদের কাছে স্মরণীয়। ঐদিন পূর্ব-বাংলার মাটি এমন সব মানুষের রক্তে লাল হয়েছে, যাঁরা মুখের ভাষার জন্য সব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই তারিখটি পশ্চিম-বাংলার রাজধানী কলকাতা শহরেও পালন করা হয়। বিভিন্ন বক্তার মুখে পূর্বদেশের ভাষা আন্দোলন এবং সেখানকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক নতুন কথা শোনা যায়। সে-সব ভাষণে অনেক সময় এমন সব চওড়া রংয়ের ব্যবহার করা হয়, যা ঐদিনকার সভায় বেশ মানায়। এ বছরেও ২১শে ফেব্রুয়ারী এমন একটি ভাষণ শুনেছিলাম যা শুনতে ভাল লাগছিল। পূর্ববাংলার কবিতায় না কি এখন জীবনানন্দ দাশের উত্তরাধিকার এবং পশ্চিমবাংলার কবিরা যদিও এই মহৎ কবির কবিতার আঙ্গিকটুকু আত্মসাৎ করতে পেরেছেন, পূর্ববাংলার কবিরা তাঁকে নিজেদের চৈতন্যের সঙ্গে একাকার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অ-কবি সমালোচক আধুনিক বাংলা কবিতার যে সমালোচনা করে থাকেন, তা থেকে পৃথক কোনো আশ্চর্য উক্তি বক্তা এখানে করেন নি। তবে তাঁর মননশীলতায় একটি ত্রুটি ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, এই তুলনায় পূর্ব-বাংলার কবিদের অনেক বড় করে দেখিয়েছেন, ঐদিনকার সভায় যা শোভন এবং সঙ্গত।

কিন্তু আমাদের মাননীয় ভাষ্যকার যদি সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতেন, এত সহজে এমন একটি ছেলেভুলানো ভাষণ দিতেন না। একজন কবির কণ্ঠস্বর হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাকে কতভাবে প্রকাশ করতে পারে, জীবনানন্দ দাশের কবিতা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যিনি প্রসববেদনায় কাতর নারীদের কণ্ঠে শত শত শূকরীর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলেন, এবং 'লাস-কাটা-ঘর'-এর মত কবিতা লিখে তাঁর কনিষ্ঠ কবিদের এককালে সম্পূর্ণই আচ্ছন্ন করতে পেরেছিলেন, তিনি যে আমাদের পশ্চিমবাংলার কবিদেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর, এটা কোনো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকেই পূর্ববাংলার কবিরা এই ধরণের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাকে রক্তে নেন নি। দেশ ভাগ তাঁদের কাছে ছিল অন্য রকম; এবং ঠিক যে সময়টিতে তাঁদের চৈতন্যকে হতাশার অন্ধকার ও বিচ্ছিন্নতা গ্রাস করতে পারতো, তখনই এলো ভাষার আন্দোলন। রক্তস্নানের মাধ্যমে সেখানকার বুদ্ধিজীবী সমাজ হতাশার নরক ছুঁয়ে পুনরায় তাঁদের শুভ্র সীমান্তের দিকে ফিরে এলেন। তাঁদের কবিসভায় তাই এমন দিনে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রভাব; জীবনানন্দ তাঁদের স্পর্শ করেছেন, এইমাত্র।

পশ্চিমবাংলার কনিষ্ঠ কবিরা কিন্তু জীবনানন্দর এই সর্বনাশা প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।২ এর ঐতিহাসিক কারণ আছে। জীবনানন্দ দাশ অসামান্য কবি এবং সমস্ত জীবন ধরে তাঁর আত্মার শপথে ও শপথ ভঙ্গের আর্তনাদে তুলনাহীন সৎ কবি ছিলেন। কিন্তু তিনি মূলত বিচ্ছিন্নতা ও গভীরতম হতাশাকেই রক্তে নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ সকল সৎ কবিকেই এক সময় এই হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা আক্রমণ করেছিল, আমি তাঁদের কথাই বলছি, যাঁরা দেশভাগের পর

১ এই সময়ে স্বাধীন পাকিস্তানের আসল চেহারাটি তাঁদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। দেশ বিভাগের পর অন্তত অর্থ-নৈতিক দিক থেকে পূর্ববাংলার বুদ্ধি-জীবীরা পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় অনেক ভাল ছিলেন। জীবনানন্দ দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষের মত কবিদেরও এই সময়ে মুখের গ্রাসটুকুর জন্য ভবিতব্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে। পূর্ববাংলার কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক-দের অবস্থা ঠিক এই রকম ছিল না। কিন্তু অতি দ্রুত তাঁদের অর্থনৈতিক সর্বনাশও ঘনিয়ে এসেছিল। তাঁরা তখন আমাদের মত ভবিতব্যের জন্য অপেক্ষা করেন নি; প্রত্যক্ষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একথা মনে রাখতেই হবে, পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলন মুখ্যত সেখানকার কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের লড়াই।

২ জীবনানন্দ দাশ 'রূপসী বাংলা'রও কবি। এখানে তাঁর পায়ের নিচে মাটি ছিল; এবং এই তর্ক বাক্যকেও তুলতে পারেন, তাহলে তাকে বিচ্ছিন্নতা ও হতাশার কবি বলা হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের সহজ জবাব, 'রূপসী বাংলা' তাঁর সমস্ত জীবনের কবিকর্মের সামান্য অংশ জুড়ে রয়েছে। সম্ভবত এই কবিতাগুচ্ছের রচনাকাল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'মহাপৃথিবী'-র মাঝামাঝি কোনো সময়ের এবং দেশ বিভাগ হয়ে গেলেও, তখনো কবি পূর্ববাংলা ছেড়ে পশ্চিমে পাড়ি দেন নি। আমার এই ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক সত্য নাও থাকতে পারে, তবু

পশ্চিমবাংলায় রয়ে গেছেন, এবং যাদের মাতৃভাষা বাংলা। যদি এইসব কবির সামনে কোনো পবিত্র শপথ মন্ত্রের মত উজ্জ্বল থাকতো, যদি পশ্চিমবাংলার কবি ও সাহিত্যিকদের সামনে এমন কোনো সংগ্রামের অস্তিত্ব এখনো অম্লান থাকতো যা কবিকে পরিশুদ্ধ করতে পারে, পথ দেখাতে পারে, তাহলে জীবনানন্দ দাশ আর আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর থাকতেন না; কেন না তাঁর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এবং পরেও তিনিই জ্যেষ্ঠ সহোদর থাকবেন। বাংলা কবিতায় গত দুই দশক কিন্তু আমাদের এই পশ্চিম ভূখণ্ডে অন্য রকম কথা বলে। সর্বত্রই বিচ্ছিন্নতা এবং হতাশা। এমন কি এক দশক আগে পর্যন্ত আমাদের সমকালীন যে কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের সংগ্রামী ঐতিহ্য অটুট রেখেছিলেন, আজ তাঁরাও অনেকেই ভগ্ন জানু; এখন স্ফটিক-স্তম্ভের আড়ালে নিজেদের অস্তিত্ব ও আশ্রয় খুঁজছেন।

তাহলে কি এমন কথাই মেনে নিতে হবে, পশ্চিমবাংলার কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সকলেই আজ আমরা শপথ ভুলেছি? সমস্যাটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করার। শপথ আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু যখন তার তুলনায় হতাশা বড় হয়ে ওঠে, তখন এক রকম বোবা অন্ধকারের সৃষ্টি হয়; যখন মন্ত্রগুলো বুকের মধ্যে থেকে যায় কিন্তু মুখের ভাষায় উচ্চারিত হয় না। এ রকম কুয়াসার মধ্যে কোনো শিল্পীরই সাধ্য নেই দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখেন। পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীরা দীর্ঘকাল ধরে এই হতাশার রোগে ভুগছেন, যেদিন থেকে আমাদের দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে এবং স্বাধীনতার নামে আমাদের মাথার ওপরের অর্ধেক আশ্রয়, পায়ের নিচের অর্ধেক মাটি চলে গেছে। অস্বীকার করে লাভ নেই বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার পর এই রাজ্যের জনসংখ্যা এমনভাবে বেড়ে গেছে এবং তার অর্থনৈতিক সমস্যা এমন পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে যে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছে।৩ পূর্ববাংলা থেকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসে যে অসংখ্য মানুষ এখানকার মাটিতে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তাঁরা এখনও স্থির হয়ে এই দেশকেই তাঁদের সত্যিকারের স্বদেশ বলে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁদের পায়ের নিচের মাটি বা আশ্রয় এখনো আগুনের মত গরম। এই রাজ্যের মুসলমান বাসিন্দারা দেশভাগ হওয়ার পর থেকে এবং এখন পর্যন্ত, নিজ বাসভূমে পরবাসী। বাইশ বছর হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে, অথচ এই স্বাধীন রাজ্যের হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশী আজও পরস্পরকে বিশ্বাস করেন না। ঐক্য এখনো এ মাটির রক্তে মিশে নেই; সেজন্য এখনো আমাদের সভা ডাকতে হয়, মিছিল বের করতে হয়।

এ ছাড়া, পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের বোবা ও বধির করে দেওয়ার মত অন্যান্য সমস্যা আছে। আমরা স্বাধীন হয়েছি, সত্যি কথা; কিন্তু স্বাধীনতা কি, সে সম্পর্কে এখনো আমাদের প্রশ্ন আছে। মাত্র কয়েক ঘর বেনিয়া এখন এই স্বাধীন দেশের প্রকৃত মালিক; তাঁরা সমস্ত ভারতবর্ষকে শাসন করেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষদেরও। এই সব পর্বতশিখরের মানুষেরা খাদ্য ও ওষুধে বিষ মেশান; তামাম দেশ জুড়ে কালোবাজার, বেশ্যা, দালাল ও ভিক্ষুকে সৃষ্টি করেন; নিজেরা কোটি কোটি টাকা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেন অথচ এই দেশের শাসকগোষ্ঠীকে চোখ রাঙিয়ে হুকুম করেন, সাধারণ মানুষের কাঁধে পাহাড়প্রমাণ ট্যাক্স বসিয়ে তাঁদের কুঁজো ও পঙ্গু করে দিতে। এর ওপর রয়েছে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত রণহুঙ্কার। আমাদের মুখের ভাষাকে পর্যন্ত বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদীরা দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই করে আসছেন, তার প্রতিরোধের জন্য সামান্য প্রস্তুতিও এই রাজ্যে নেই। পূর্ববাংলায় এই ভাষার আন্দোলনই সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিকে টেনে এনেছে। আমাদের দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি পর্যন্ত পার্লামেন্টে তাঁদের ভাষণ দেবার অধিকার বজায় রাখার জন্য, অথবা সর্বভারতীয় দল হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই কি না জানি না, আজ দেশের অখণ্ডতার নামে মুখের ভাষাকে পর্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত।৪

এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হবার একটিমাত্র পথ, রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের সত্যিকারের সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা, তার ছিটেফোঁটা ইঙ্গিতও স্বাধীন ভারতে নেই। সর্বত্র প্রচণ্ড দারিদ্র্য ও অশিক্ষা এবং তার যা অশুভ পরিণাম, সর্বত্র সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় বিবাদ, চরিত্রহীনতা এবং অমানুষিকতা।

এই চরম সঙ্কটের মধ্যে শিল্পী ও সাহিত্যিকরাই শুধু স্থির থেকে পবিত্র মানবধর্ম পালন করে যাবেন, তা সম্ভব নয়। তাঁরাও মানুষ; আশেপাশের ছোঁয়াচে রোগগুলো তাঁদেরও আক্রমণ করে। যদিও বুকের ভেতরকার মন্ত্র কখনো মুছে ফেলা যায় না, কিন্তু বুকের বাইরের বাস্তব বীভৎস পৃথিবী তাঁদের অন্য দৃশ্য দেখায়।

কিন্তু তবু, এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী মানুষ লড়াই করে চলেছেন;৫ তেমনি কিছু সংগ্রামী কবি

এটাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়। 'রূপসী বাংলা' সম্পর্কে এ ছাড়াও প্রশ্ন আছে। বাংলা কবিতার যে-কোনো পাঠক একটু পরিশ্রম করলেই এই আশ্চর্য সত্য অনুভব করতে পারবেন যে, পশ্চিম বা পূর্ববাংলার কোনো কবির কবিতাতেই 'রূপসী বাংলা'-র সার্থক প্রভাব নেই। থাকা সম্ভব নয়। জীবনানন্দর যে দুটি কাব্যগ্রন্থ পশ্চিমবাংলার কনিষ্ঠ কবিদের প্রচণ্ডভাবে আচ্ছন্ন করেছে, তাদের নাম 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির'। পূর্ববাংলায়, আগেই বলেছি, এই কবির প্রভাব রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের সঙ্গে তুলনীয় নয়। যদি তাঁরা এই কবির কাছ থেকে কিছু ধার নিয়ে থাকেন, তা হলো জীবনানন্দর বক্তব্য প্রকাশের আংগিক বা প্যাটার্ন, আমাদের মনীষী সমালোচকেরা যতই অন্যরকম কথা বলুন।

৩ এই প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ কবির নাম ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। শুধু অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে পশ্চিমবাংলায় বহু বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিককে এই সময়ে চরিত্রহীনতার রাস্তায় নেমে আসতে হয়েছে। যদি তাঁদের চোখের সামনে শিল্পীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ বা সংগ্রামের চিহ্ন থাকতো, হয়তো তাঁদের কেউ কেউ এই বিভীষিকাকে অতিক্রম করতেন। কিন্তু তা ছিল না।

৪ এর পরিণাম শুধু বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেই নয়, শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারাদের পার্টিগুলির দিক থেকেও ভয়াবহ। উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তেরাই এই পার্টিগুলোর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব দখল করে থাকেন যেটা সর্বহারা পার্টির চলমান অগ্রগতিকে বহু সময়েই নানাভাবে বিঘ্নিত করে। এই বিশেষ শিক্ষিতেরা সর্বহারা পার্টির মধ্যে একটি পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি করেন এবং আদর্শ নিয়ে নয়, নিজেদের নেতৃত্ব নিয়েও একসময় কুৎসিত লড়াইয়ে মেতে ওঠেন।

৫ প্রফুল্ল সেনের আমলে খাদ্যের দাবিতে গণ-অভ্যুত্থান, প্রফুল্ল ঘোষের রাজত্বে আইন অমান্য আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান, শিক্ষক আন্দোলন, বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলন, ঘেরাও ও শ্রমিক ধর্মঘট, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারিগণের ধর্মঘট ও দাবি আদায়ের লড়াই, ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে মনে রাখলেই এই সংগ্রামের একটি স্পষ্ট চেহারা পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে আমাদের অধিকাংশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামকেই শেষ পর্যন্ত হটে আসতে হয়েছে, বাদবাকী লড়াই এখন পর্যন্ত অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেছে।

ও সাহিত্যিক এই লড়াইয়ে তাঁদের কণ্ঠস্বর মেলাবেন, চারদিকের দুঃস্বপ্নকে তাঁরা অতিক্রম করবেন, এমন প্রত্যাশাও একেবারে অহেতুক হতে পারে না। এই প্রত্যাশার কিছু পূরণও হয়তো হতে পারতো, যদি গত বাইশ বছরে পশ্চিমবাংলায় কবি-সাহিত্যিকদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো নেতৃত্ব থাকতো।

পশ্চিমবাংলায় এই নেতৃত্ব ছিল না। মনে হয়েছিল আমাদের সাম্যবাদী বন্ধুদের কাছ থেকে একদিন এই নেতৃত্ব আসতে পারে। ফ্যাসিবিরোধী ও প্রগতিশীল লেখক একদা যেন কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা যে লেখকসমাজ গড়ে তুলেছেন, তাতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে-র মতো বামপন্থী লোকেরাই শুধু নন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসুরাও কণ্ঠ মেলালেন। ব্যাপারটা খুবই সুখের হয়েছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু একেবারে বিপরীত শিবিরের বহু কবি-সাহিত্যিককে হঠাৎ ফ্যাসিবিরোধী হয়ে যেতে দেখে সেদিন যদি এই সমাজের কর্মকর্তারা সমস্ত বিষয়টা তলিয়ে দেখতেন, বুঝতে পারতেন কোনও একটা ভুল থেকে গেছে। ভুলটা ছিল একেবারে গোড়ায়; নেতৃত্বটা এদেশের মাটি থেকে আসে নি। তাই আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা যেদিন 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'—এই ধ্বনিকে বর্জন করে রাতারাতি 'বজ্রকণ্ঠে তোল আওয়াজ/রুখবো জাপানী দস্যু আজ'—এই ধ্বনি দিতে শুরু করলেন, তখন তাঁদের দল ভারী হলো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের বজ্রকণ্ঠের হাঁকডাকগুলো যেন তালপাতার সেপাইদের হাঁকডাক বলে মনে হতে লাগলো। ভারতবর্ষের মাটিতে সেদিন একটি যুদ্ধই কবি-সাহিত্যিকরা করতে পারতেন, তা হলো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু ফ্যাসিবিরোধীরা যুদ্ধ করবেন কি, তাঁরা যে ইতিমধ্যেই হাত মিলিয়েছেন! ততদিনে তাঁরা আগস্ট বিপ্লবের শহীদদের পঞ্চমবাহিনী বলে আখ্যা দিতে শিখেছেন। আমাদের শিল্পী সেদিন একটি গাধা এঁকে তার মুখটা সুভাষচন্দ্রের করে দিচ্ছেন এই ভেবে যে, তাঁরা, অর্থাৎ ফ্যাসিবিরোধীরা ভীষণ বুদ্ধিমান।

সমস্ত ব্যাপারটাতেই যে কৃত্রিমতা রয়ে গেল, সে সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ঐ সঙ্কটকালে একবারও দৃষ্টিপাত করলেন না। কলকাতায় ফ্যাসিবিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে গলা চিরে রক্ত বেরুলেও সেদিন পুলিশের মারের ভয় ছিল না; বরং পুরস্কৃত হবার নানা সম্ভাবনা ছিল। তরুণ কবি চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় যদিও হাওয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সলজ্জভাবে একটি কবিতা লিখে ফেললেন : 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে কর গৃহযুদ্ধের গান'—লেনিনের এই শ্লোগানটি সামনে রেখে; কিন্তু একজন অনামী কবির এই সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করার মত সময় বা মন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষ করে আমাদের প্রগতিশীল বন্ধুদের সেদিন ছিল না।

এর ফলাফল, যা ভবিষ্যতের লিখন ছিল, তাই হলো। ফ্যাসিবিরোধী মুখবাসী হতে না হতে আমাদের কবি সাহিত্যিকরা পুনরায় রজনী পাম দত্ত অথবা আরো ঊর্ধ্বের নেতাদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, 'এবার কী করতে হবে?' নির্দেশ এলো, 'এবার শান্তির পায়রা ওড়ানো হোক।'...পায়রা উড়লো।৬

ইতিমধ্যে আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি; অর্থাৎ আমাদের জন্মভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে হিন্দু-মুসলমানের রক্তে ভাসছে। নেহরু এবং রাজাগোপালাচারীর মতই আমাদের সাম্যবাদী নেতারাও সেদিন মহা খুশি। নেহরু যা মুহূর্তের হঠকারিতায় করেছেন, রাজাজী এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সেই ভারতবিভাগের জন্য দীর্ঘকাল ধরে ওকালতী করছিলেন। এই পরামর্শ কোথা থেকে এসেছিল জানি না; কিন্তু দেশ দুখণ্ড হলো; এবং স্বাধীন দুই দেশের মাটিতে ধর্মের খুন যাতে মাঝেমধ্যেই গাঢ় লাল রঙের ছোপ লাগায়, তার পাকাপাকি ব্যবস্থা হলো। অবশ্যই এই লাল সংগ্রামী হিন্দু-মুসলমানের হাতে শক্ত করে ধরে থাকা কোনো রক্তপতাকার লাল নয়। কিন্তু আমাদের সাম্যবাদী নেতাদের কিছু আসে যায় নি। তাঁরা শান্তির মিছিল বের করলেন, এবং আজও বের করছেন। দেশ দু-আধখানা হবার সময় বাংলাদেশের ফ্যাসিবিরোধী কবি-সাহিত্যিকরা মুখ বন্ধ করে রইলেন। অবশ্য এই যন্ত্রণা বেশিদিন বুক চেপে সহ্য করা যায় না। তাঁদের কবিতাতেও এই যন্ত্রণার ছাপ লেগেছিল। তবে বড় দেরিতে।৭

কিন্তু প্রহসনের এখানেই শেষ নয়। আমরা দাঙ্গা রুখতে পারলাম না; আমাদের চোখের সামনেই জন্মভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক দীর্ঘকালীন রণক্ষেত্রে পরিণত হলো, আর আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা আকাশের দিকে মুখ করে শান্তির পারাবত ওড়াতে লাগলেন, পরস্পরের সঙ্গে বাজি ধরে। ভিনদেশের রাজনৈতিক নেতারা সেদিন চাইছেন নেহরুর সঙ্গে বন্ধুত্ব, পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। বাংলাদেশের প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিকেরা তাই মহান শান্তির গানে সেদিনকার আকাশ-বাতাস মুখরিত করতে লাগলেন। তাঁদের হাতে স্বাভাবিক দিন বদলের পথ ধরেই যে নতুন রেনেসাঁর নেতৃত্ব এসেছিল, তাঁরা অপরের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তা হাওয়ায় ছুড়ে দিলেন। সম্পূর্ণ বিপরীত হাওয়া থেকেই 'স্বাধীনরা' একদিন সে নেতৃত্ব কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, এ সত্য আজ আর ঢাকবার কোনো উপায় নেই।

৬ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষময় ফল আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে কী ক্রিয়া করেছে, এখনই তার কিছুটা চেহারা পাওয়া যায়। ইতিমধ্যেই আমাদের প্রগতিশীল কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে, কে আগে একটি সরকারী পেনসন অথবা সরকারী/বেসরকারী পুরস্কার লাভ করবেন। দারিদ্র্য ও দিনের পর দিন অনাহারেই যে এ-ধরণের ক্লৈব্য আসে, তা ঠিক নয়। প্রচণ্ড হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাই এর মূল কারণ এবং বিশেষ করে সংগ্রামী নেতৃত্বই যখন সুবিধাবাদকে আশ্রয় করে, তখন এমনই হয়।

৭ এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অজস্র কবিতার উল্লেখ করা যায়। গদ্য সাহিত্যেও এই বেদনার ছাপ নানাভাবে পড়েছে। অতি-সম্প্রতি অমলেন্দু চক্রবর্তী 'শারদীয় পরিচয়' পত্রিকায় একটি আশ্চর্য গল্প লিখেছেন; কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে আজ থেকে বাইশ বছর আগে।

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ

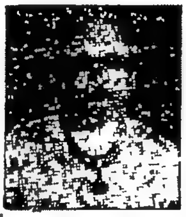

ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ : আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

ফ্যাসিবিরোধী প্রগতিশীলরা একটির-পর-একটি ভুল করতে করতে ভবিষ্যতে একসময় সম্পূর্ণই ধ্বংস হয়ে গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁরা কয়েকটি ঐতিহাসিক কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে তাঁরাই প্রথম মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি সচেতনভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রমিক, কৃষক এবং সর্বহারা মানুষদের দিকে বাংলাদেশের সমস্ত বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁরাই। বিশেষ করে, তেলেঙ্গানার অভ্যুত্থান এবং সেদিনকার রক্তস্নানে ভারতীয় কমিউনিস্ট সংগ্রামীদের অভূতপূর্ব আত্মদান যেন কিছুদিনের জন্যও আমাদের বুদ্ধিজীবী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রেরণা এনে দিয়েছিল।৮

আবার, এই বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টিকে, শিল্পীর সংগ্রামী ভূমিকাকে, নিজেদের কাপুরুষতা ও ভ্রান্তি দিয়ে ঢেকে রাখবার কৌশলও ক্রমে প্রগতিশীলরাই আমাদের শেখালেন। আর শেখালেন, অমানুষদের সঙ্গে সহাবস্থান কী করে করতে হয় তার সমস্ত রকম নির্ভুল নিয়মকানুন।

যার ফলে আজ থেকে অন্তত এক দশক আগেই আমাদের দেশে প্রগতিশীল সাহিত্যের তাঁবু শত জোড়াতালি দেওয়া সত্ত্বেও সামান্য বৃষ্টি বা ঝড় উঠলেই থরথর করে কেঁপেছে। যার ফলে হীন, স্বার্থান্বেষী বহু সমাজবিরোধী ব্যক্তি একসময় নির্ভয়ে এই তাঁবুতে দিনের-পর-দিন ভিড় করেছিলেন এবং আজ যদিও তাঁরা এই শিবির থেকে দীর্ঘদিন পলাতক তথাপি প্রগতিশীল, ফ্যাসিবিরোধীরা খ্যাপা যেভাবে পরশপাথর খুঁজে বেড়ায় সেইভাবে এখনো প্রত্যাশা করেন এই বর্ণচোরা মালিকেরা তাঁদের লেখনশৈলীর কিছুটা অন্তত আন্তর্জাতিক মানবতার কারণে ব্যবহার করবেন এবং ভিয়েতনাম অথবা নভেম্বর বিপ্লবের ওপর ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের দু-এক কলম পদ্য বা গদ্য রচনা করে বাংলাদেশের তাবৎ সংগ্রামী মানুষদের কৃতার্থ করবেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় অরুণ সেনদের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে) থেকে আমরা আরো আশ্চর্য প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় পাই। যাঁরা স্পষ্টই মানবতার এবং প্রগতির বিরোধী, সেইসব কবিদের স্তুতিতেও মুখর ঐ আলোচনায় 'পরিচয়' পত্রিকারই নিয়মিত লেখক চিত্ত ঘোষ বা মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি অক্ষরও ব্যয়িত হয় নি। ঐ আলোচনার ছয় পৃষ্ঠা খরচ হয়েছে সেই বছর শঙ্খ ঘোষ এবং সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার বই প্রকাশিত না হওয়ার জন্য লেখকের ব্যক্তিগত বিলাপে এবং উপসংহারে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিবেদিত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি কবির প্রশস্তিতে।৯ এর অর্থ, প্রগতিশীল পত্রিকার সম্পাদক এবং লেখক নিজেরাই জানেন না তাঁরা কোন্ পথে চলছেন। কিছুকাল আগে 'কালিকলম' পত্রিকায় প্রবীণ কথাসাহিত্যিক গোপাল হালদার সমকালীন বাংলা কবিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন; সেখানেও একই কুয়াশা।

একবার সংগ্রামের জন্য পাঁয়তারা কষে পরমুহূর্তে শান্তির পায়রা উড়িয়ে, খোদ ফ্যাসিবিরোধী নেতারা কোনদিনই মন্দ ছিলেন না; আজও তাঁরা ভালই আছেন। শুধু মার খেলেন, যেসব যুবক-যুবতী কবি-সাহিত্যিক শিল্পী-অধ্যাপক ও সাংবাদিক ফ্যাসিবিরোধীদের যুদ্ধের হুঙ্কারকে একদিন রক্তে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের নেতৃত্বকেও পরম নির্ভরতার সঙ্গে বিশ্বাস করেছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, মতি নন্দীর অথবা অন্যভাবে অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ মণীন্দ্র রায়ের বিচ্ছিন্নতা এর সামান্য উদাহরণ মাত্র। যে সাম্যবাদীরা একদিন স্বাধীনদের শিবিরে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করেছেন, তাঁরা সকলেই সুযোগসন্ধানী ও ব্যভিচারী নন। যেখানে নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত, সংগ্রাম থেকে পলাতক, সেখানে কতদিন মারখাওয়া, বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের কবি বা সাহিত্যিক একাকী তাঁদের সংগ্রামী চরিত্র রক্ষা করবেন? আর এই সংগ্রামবিমুখতা যে গভীর হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার নিয়ে আসে, তা থেকে আত্মরক্ষাই বা তাঁরা করবেন কীভাবে?১০

তবু, এই ভয়াবহ সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশের কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পী সাহিত্যিক এখনো লড়াই করে চলেছেন। তাঁদের এই সংগ্রাম অবশ্যই সমাজবিরোধীদের প্রতি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ নয়, বরং বহু ক্ষেত্রেই তা আত্মরক্ষার সংগ্রাম; যা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, কিন্তু ভবিষ্যতের সেই অমল দিনটির জন্য শিল্পীর প্রতীক্ষাকে ধৈর্য ও অভয় দেয়, যেদিন সত্যিকারের নেতৃত্ব আসবে পশ্চিমবাংলার শিল্পে এবং সাহিত্যে, কবিতায়, শিক্ষক এবং ছাত্রদের আত্মদানে, সৎ সাংবাদিকতায়, মুক্তিকামী শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারার মিছিলে। যেদিন আমাদের মার-খাওয়া ভেঙে-যাওয়া হাতের মুঠোয় আমরা নতুন রেনেসাঁর রক্তাক্ত পতাকাটাকে ঠিকই ঊর্ধ্বে তুলে ধরবো। সেদিন না আসা পর্যন্ত আমাদের কবি, শিল্পী এবং পশ্চিমবাংলার সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। ততদিন আমাদের ভুলে যাওয়া শপথগুলি হতাশার অন্ধকারে ভাসতে থাকবে এবং আমাদের বিচ্ছিন্নতার সমস্যা ততদিন আত্মহত্যার নরকের মতই মনে হতে থাকবে।১১

(শেষ)

---

৮ এই প্রেরণা অদৃশ্য ফল্গুধারার মত আজও আছে। আছে বলেই বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ক্লান্ত শপথগুলিকে হিঁচড়ে টেনে এনে এখনো মানুষের জন্য কিছু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখেন। একথা মনে রাখতে হবে, ফ্যাসিবিরোধী প্রগতিশীলদের এককালের নেতৃবৃন্দ আজ যদিও ক্ষীণকণ্ঠ এবং সংগ্রামবিমুখ, তথাপি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাই একই রকম হতাশাকে অনিবার্য বলে মেনে নেন নি। এমন অনেক সাম্যবাদী, মানবধর্মী কবি ও সাহিত্যিক এখনো কলম ধরছেন, যাঁরা সধর্মে অচল, কিন্তু উপযুক্ত পত্রিকা ও প্রচারের অভাবে তাঁদের কণ্ঠস্বর বেশিদূর পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

৯ সম্প্রতি 'পরিচয়' পত্রিকায় ইনি বাংলা কবিতার ওপর আরেকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই। অবশ্য আলোচনার বিষয় ছিল, এ বছরের শারদীয় পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত কবিতা এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত এসময়ে একটি কবিতাও লেখেন নি। কিন্তু আলোচনাটি দৃষ্টিকটু লাগে এই জন্যই যে, ইতিপূর্বে অরুণবাবু শঙ্খ ঘোষ ও সিদ্ধেশ্বর সেনের অপ্রকাশিত কবিতার বইয়ের ওপর (এবং যে বইয়ের পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত অরুণ সেন দেখেন নি) 'পরিচয়' পত্রিকায় কয়েক পৃষ্ঠা ধরে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে সমকালীন বাংলা কবিতার আলোচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সম্পূর্ণই ব্রাত্য করে রাখার অর্থ কি? তিনি যে কোনো কবিতা লেখেন নি, এটাও তো অরুণবাবুর আলোচনার বিষয় হ'তে পারতো।

১০ হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার আরো গভীরে যেতে পারে, যখন আমাদের সাধারণ ন্যায়-অন্যায় বোধ পর্যন্ত বোবা এবং বধির হয়ে যায়। আমাদের আমেরিকা-প্রীতি যেভাবে দিনের-পর-দিন বেড়ে যাচ্ছে, এবং সহাবস্থানের নামে আমাদের সহোদরপ্রতিম কবি ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে দিনের-পর-দিন বাজারের ফড়ে ও দালালদের সঙ্গে টুইস্ট-নাচন শুরু করে দিয়েছেন, তাতে মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি এত কঠিন রোগ সারবে না।

১১ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম 'বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন' ও মুক্তমেলা সম্পর্কে কিছু লিখবো। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলেই এই প্রতিশ্রুতি পালন করবো।

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ দশ ॥

গোড়ায় যা বলি নি, এইবারে তা বলে নিতে চাই।

১৯৬৯-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূর্ববর্তীকাল থেকে আমার বক্তব্য সুরু করেছি। এই নির্বাচনের পর থেকে জাতীয় জীবনের নানাদিকে এক অফুরন্ত আগ্রহ ও চেতনার সৃষ্টি। নির্বাচনের পরের ডুয়ার্স সম্পর্কেই আমার আগ্রহ। এখানকার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আলো এসে পড়েছিল আগেই। কিন্তু স্পষ্ট-ভাবে সাধারণ মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ-চেতনা, রুচি-প্রকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, খানাপিনা, তাদের অধিকার-বোধ, সংগ্রামী চেতনা, তাদের নৈরাশ্য, অভাব, জীবনের নানা সমস্যাগুলিকে আমি নতুনকালের চোখে তুলে ধরতে চাই। মানুষের হিংসা, স্বার্থপরতা, লোভ, চক্রান্ত, কাপট্য যেমন এখানে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে, তেমনি চোখে পড়ে তীব্র আবেগময় ঝোরা-ঝর্ণা বা পার্বত্য নদীগুলির স্রোতোধারারই মত ভয়ঙ্কর মানুষের ভালোবাসা, প্রেম—এককথায় সজীব জীবনবোধ। কথায়-কথায় সে তুলে ধরে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও বল্লম, তেমনি অকারণে হাসে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত। দুটি হাতে মুঠো-মুঠো করে বেগবান জীবনপ্রবাহ সে ছিটিয়ে দেয়।

তার বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে; অতএব অতীতও একটা নিশ্চয় আছে। বর্তমানের ও ভবিষ্যতের আলোচনায় অতীতের একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা থাকা চাই। সেই অতীত থেকে তার সূচনা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানটুকু স্পষ্ট হবে। সেই প্রয়োজনেই মাঝে মাঝে টেনে আনতে হয়েছে অতীতকে। এবং সেজন্যেই বর্তমান পরিচ্ছেদে ডুয়ার্সের অতীত ইতিহাসটুকু শেষ করে নিতে চাই।

আরেকটি কথা, ১৯৬৯-এর মধ্য-বর্তী নির্বাচনের কাল পর্যন্ত ডুয়ার্স তার সৃষ্টির পর একশ বছর পেরিয়ে আরো কয়েক বছর চলে এসেছে। কাজেই তার গণচেতনারও খানিকটা ছবি এতে ফুটিয়ে তুলতে চাই।

লিখতে আরম্ভ করে থেমে যাচ্ছি বারে বারে।

বাইরে অন্ধকার রাত্রে একটা মিছিল চলেছে। জানালার ধারে টেবিল সাজিয়ে লিখতে বসেছি। লিখতে গিয়ে কলম থেমে-থেমে যাচ্ছে। টেবিলের আলোটা সরিয়ে উঠে এসে জানালা খুলতে যেতেই একঝলক হাওয়ায় নিভে গেল। তীব্র ঠাণ্ডার চাবুক একরাশ মুখে-চোখে। চেয়ে দেখি মিছিল চলেছে রাজপথে।

চেয়ে দেখি চলেছে রাজপথে।

যুক্তফ্রণ্ট লাল সেলাম।

যুক্তফ্রণ্ট লাল সেলাম।

ধর্মবীর বাংলা ছোড়ো—আভি ছোড়ো। আভি ছোড়ো।

বজ্রগর্জনে ফেটে পড়ছে মিছিল। দু-একটা মশাল জ্বলছে। রাত্রির অন্ধকারকে পুড়িয়ে।

জানালা বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে ইতিহাস নিয়ে বসি।

আমাদের ছোটবেলা কেটে গেল একরকম করে। দিনগুলোর কথা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। নির্দিষ্ট চৌহদ্দির একটি ঘেরাও এলাকার মধ্যে সুখে-দুঃখে আনন্দে-বেদনায়। সেদিন-গুলোকে কিছুতেই ভোলা যায় না।

তখন আরেক কাল আরেক যুগ। আমরা জন্মেছি যে-যুগে, তার অনেক আগেই বাংলাদেশে, সারা ভারতবর্ষেই বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হয়ে গেছে। তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগের কথা আমরা বইতে পড়েছি, চোখে দেখি নি। দেখবার কথাও নয়। কারণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দেড়শ-বছরেরও বেশি পার হয়ে গেছে যখন আমরা জন্মালাম। সে-কাল ইংরাজের প্রভাব-প্রতিপত্তির কালও নয়। ফলত তখন সারা ভারতবর্ষই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় সোচ্চার। তার বেশ কিছুদিন আগেই রামমোহন এসে গেছেন। নবজাগরণের আলোকস্তম্ভ। সারা দেশ তাঁর প্রজ্বলিত মশাল থেকে আলো জেলে নিচ্ছে। অন্ধকারটা তখন বেশ গাঢ়। তাই মশালের আলো জ্বালিয়ে রাখতে তখন আরো অনেকেই এসেছিলেন পরে-পরে। রঙ্গলালের দৃপ্ত গান শুনলাম, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।" এলেন বংকিমচন্দ্র বন্দেমাতরম গান নিয়ে। গান না বলে বলি মন্ত্র। মন্ত্র ছাড়া কী মায়ের বোধন হতে পারে। প্রায় প্রাণহীন ভারতবর্ষের শবদেহে নবপ্রাণস্পন্দন জাগাবার মত জেগে উঠছে দেশ। অনেককালের পরে। মাতৃমন্ত্রের বন্দনায় ছেয়ে গেছে দেশ। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের জোরালো কণ্ঠ-ধ্বনিতে ভরে উঠেছিল দেশের অঙ্গন। এই মন্ত্র ঠোঁটে নিয়ে ঘর ছেড়েছে পরবর্তীকালের বন্ধন-মোচনের উদ্গাতারা। ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে। বুকের মধ্যেকার জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিয়েছে রক্তজবার মত। বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে শুনতে পাওয়া গেল, "হে ভারত, ভুলিও না— তোমার নারী-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের—জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত

হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী..."

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় স্থাপিত হয়েছিল হিন্দুমেলা। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল কংগ্রেস। ধীরে ধীরে এলেন দেশবন্ধু, গান্ধী, মোতিলাল, লালা লাজপত, বিপিন পালের দল। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন, "ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি"। রবীন্দ্রনাথের বাংলা প্রকৃতপক্ষে সারা দেশ। দেশমাতৃকার বন্দনায় মানুষের দুরন্ত প্রাণে আবেগ সৃষ্টি করলেন তিনি। কত মানুষ হাসিমুখে এগিয়ে এলেন মরণ-যন্ত্রণাকে বরণ করতে। কত দুঃখ-কষ্ট বরণ, কত ত্যাগ-স্বীকার। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কত দুর্জয় ফুঁসে-ওঠা! উত্তাল প্রাণের উদ্দাম উল্লাসে। নজরুলের বজ্রদীপ্ত কণ্ঠ, বন্দীশালা ভাঙার গান। আদর্শে দৃঢ়ব্রত নতুনযুগের রাজপুত্র এলেন বীর সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্র: Give me blood and I will give you freedom. বন্ধনের বিরুদ্ধে আপোষহীন তীব্রকণ্ঠ ঝংকৃত হল তাঁর।

শুধু কি তাই? মৃত্যুহীন প্রাণের ফসলকে ছিঁড়ে আনবার জন্য ভাবতীয় আত্মার সদাজাগ্রত উদ্দীপনা তখন ঘরে-ঘরে, দিকে-দিকে। আমাদের শৈশবে দেখেছি এই আন্দোলন বাংলাদেশের জেলায়-জেলায়, গ্রামে-গ্রামে, ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। রাত্রে-দিনে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সৌধ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য শাসক ইংরাজেরা খুব সজাগ। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনা হল বানচাল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তখন চঞ্চল। দেশের জনারণ্য দোদুল্যমান স্বাধীনতার উদ্বেগ শ্লোগানে। দেখেছি, ঘরে ঘরে ধেয়ে আসছে পুলিশ। ধরে নিয়ে যাচ্ছে যাকে খুশি তাকে। সন্দেহ করছে যত্রতত্র। সভা-সমিতিও দমন করা হচ্ছে প্রাণপণে। দেশের অলিতে-গলিতে ছেয়ে গেছে পুলিশ-স্পাই-ওয়াচার। অত্যাচার যত বেশি হচ্ছে, জনচেতনা ফুঁসে উঠছে ততই। সেইসব দিনগুলো কী আশ্চর্য!

বিংশ শতাব্দীতে তাদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল উত্তরবাংলাও। নানা নেতা, নানা মানুষ এ অঞ্চলে দেশপ্রেমের বাণীকে পবিত্র আগুনের ফুলকির মত করে ছড়িয়েছেন। তাঁদের পিছনে পিছনে ফিরেছে পুলিশ। বনে-জঙ্গলে-অরণ্যে চাষীর কুটিরে গা-ঢাকা দিয়ে লোকালয়ে থেকে এ অঞ্চলের নেতারা নিজ-নিজ কর্তব্য করেছেন। অত্যাচারিত নিগৃহীত হয়েছেন পুলিশের লাঠিতে-গুলীতে-ব্যাটনের আঘাতে। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু প্রমুখদের বাণী উদ্দীপিত করেছিল এ-দেশেরও মাটি, এই দেশের মনকে। দরিদ্র মানুষ তাই হাসিমুখে নিজ কর্তব্য করছে। আন্দোলনেও নেমেছে। স্বাধীনতার আন্দোলনে তাঁদের সংগ্রামী ভূমিকার কথা ইতিহাসে নিশ্চয় লেখা হবে। ডুয়ার্সও সেই মুক্তিসংগ্রামে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছিল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণের বাণী জাতীয় জীবনে এসেছিল, ডুয়ার্সকে তখনই তা স্পর্শ করে নি। কারণ তার কিছুদিন আগে মাত্র জন্ম হয়েছে ডুয়ার্সের। ইংরাজ ও ভুটানের রক্তক্ষয়কারী যুদ্ধের স্মৃতি তার সর্বাঙ্গে। ১৮৬৭-তে বাংলাদেশে স্থাপিত হয়ে গেছে হিন্দুমেলা। জাতীয় শিল্পপ্রসার, জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংগীত সৃষ্টি—এককথায় সামগ্রিক জাতীয় কল্যাণের আদর্শ ছিল তার। ঠিক তার কিছুদিন আগে মাত্র, দেখতে পেয়েছি ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে Ashley Eden-কে ইংরাজের প্রতিনিধিরূপে পাঠানো হয়েছে ভুটানে। সে ঘোর শীতকাল। বাতাসে প্রচণ্ড শৈত্য। তার সঙ্গে দিয়েছে হাওয়া। ঝড়ো হাওয়া বনে-প্রান্তরে দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ঝরিয়ে দিচ্ছে অজস্র শুকনো পাতা। চারদিকে অরণ্যে বুনো প্রান্তরে ওত্ পেতে বসে আছে হিংস্র জীবজন্তু। নিশ্চিত মরণের হাতছানি দিকে-দিকে।

ফিরে এলেন সাহেব ব্যর্থ হয়ে। তাঁর দৌত্য নিষ্ফল হল। সেটা ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাস। না-আনতে পারলেন তিনি এ-অঞ্চলের মানুষদের জন্য নিরাপত্তার কোন সংবাদ, না পারলেন ভুটানের কবলিত ধনরত্ন ও মানুষজনকে মুক্ত করতে। অবশেষে যুদ্ধ ও সন্ধি। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের এগারোই নভেম্বর। তারিখটি স্মরণযোগ্য। ইংরাজ গভর্নর জেনারেলের ঘোষণা দেখতে পাচ্ছি, ডুয়ার্সের এলাকাভুক্ত প্রধান, জমিদার, মণ্ডল, বসত-প্রজা সকলকেই নিরাপদ বসবাসের শান্তি, আরাম ও অধিকারের জন্য বৃটিশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। এ অঞ্চলের শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কমিশনার ও তার সৈন্যদলকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে সকলের প্রতি। ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা সুপবিত্র কর্তব্য বলে গণ্য হবে। জমি-জমা সম্পর্কে উদার বিবেচনা ও সর্বপ্রকার অত্যাচারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সরকার তার পরিবর্তে।

সন্ধির ভিত্তিতে, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে ধীরে-ধীরে সময় এগিয়ে চলেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। ১৮৮৬—৮৭ খৃস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে ভুটান সরকার বক্সাদুয়ারের পূর্বে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল তাঁদের দেওস্থান বা পবিত্র ভূমি হিসাবে ফিরিয়ে চেয়ে চিঠি দিচ্ছেন তদানীন্তন রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনারকে। উভয় সরকারের প্রতিনিধি মিলছেন বক্সায়। অবশেষে উভয়ের সম্মতিক্রমে দেওস্থান ফিরিয়ে দেওয়া হল ভুটানকে, সঙ্গে দশ হাজার টাকাও, বিনিময়ে তাঁরাও বৃটিশ সরকারকে অর্পণ করলেন জৈন্তি এলাকা। ১৮৮৯ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে এইভাবে। জলপাইগুড়ি-ভুটান এবং কুচবিহার-জলপাইগুড়ির সীমান্ত বিন্যাসের কাজ ইতিমধ্যে এগিয়ে চলতে থাকল।

বাইরের দিকে ডুয়ার্সের যখন এই চেহারা, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও তখন শাসনরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার কাজ চলেছে নানা ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধই চলেছে ভাঙা-গড়ায়। ১৮৬৪-র নভেম্বরে ময়নাগুড়িতে অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার নিযুক্ত হলেন F. A. Donogh. ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে তাঁর জায়গায় এলেন নতুন সাহেব। পুরাতন নথীপত্রে দেখা যাচ্ছে, তাঁর নাম Mr. J. Tweedie তিনি পরে ডুয়ার্সের প্রথম ডেপুটি কমিশনার হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলার সূচনা হল। এতদিন পর্যন্ত ময়নাগুড়িই ছিল ডেপুটি কমিশনারের বাসস্থান। জলপাইগুড়িতে বদলি করা হল তার আবাস।

বক্সা ছিল সাবডিভিশন। সেখানেই থাকতেন মহকুমা শাসনকর্তা। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়িতে ডেপুটি কমিশনারের আবাস স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বক্সা থেকে মহকুমা পরিবর্তিত হল ফালাকাটায়। পরবর্তীকালে ১৮৭৪-৭৫ খৃস্টাব্দ নাগাদ বক্সার এই গৌরব আবার ফিরে আসে। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের শেষাশেষি দেখা যাচ্ছে মহকুমা-শহর স্থাপিত হচ্ছে আলিপুর-দুয়ারে। কিন্তু আলিপুরদুয়ার তখনও অনুন্নত এক অঞ্চল। অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্যে তাঁকে তিন মাস করে বৎসরে বক্সায় কাটাবার হুকুমনামাও ছিল এই সঙ্গে।

ঊনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত দেখছি ডেপুটি কমিশনারের পদে ডুয়ার্সের যাঁরা ইংরেজ প্রতিনিধি ছিলেন তাঁরা কেউই ভারতবাসী নন। ডুয়ার্সে তখন ঘোর প্রতাপে ইংরাজের শাসনকাল চলেছে। শুধু যাঁর ধমনীতে আছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের শ্বেতকায় জাতির রক্ত, তাঁদেরই ছিল শাসনের অধিকার। অন্য অঞ্চলে মুষ্টিমেয় অশ্বেতকায়দের শাসকপদে দেখা যেত হয়ত, কিন্তু ডুয়ার্সে তাঁদের অবস্থান ছিল না বৃটিশ রাজ্যের কাম্য। বোধ করি, সীমান্তনীতি ও এ অঞ্চলে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে তাঁরা নিজেরাই এই পদগুলিতে আসীন থাকবার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। এঁদের অনেকেরই নাম সেদিন পর্যন্ত এ অঞ্চলের লোকের মুখে-মুখে ফিরেছে। শাসক হিসেবে তাঁরা মোটামুটি ছিলেন সৎ ও দক্ষ। ডুয়ার্সের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন তাঁরা। ছিলেন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। সর্বোপরি, তাঁদের অনেকের মধ্যেই ছিল সুপ্ত সৃষ্টিকারী ক্ষমতার উদ্দীপনা। অনিশ্চয়ের মুখে ভাসতে-ভাসতে বাণিজ্যের তরী সম্বল করে এসে পৌঁছেছিল ভারতবর্ষে। এদেশের মানুষদের সঙ্গে ছিল না তাঁদের আত্মিক কোন বন্ধন, ছিল না ভৌগোলিক কোন সম্পর্ক। তবু এই সব অঞ্চলে বসে বসে তাঁরা দিনের পর দিন ভাবীযুগের স্বপ্ন দেখেছেন, এই সব কথা মনে করে মন স্বতঃই আনন্দিত হয়। Suders সাহেবের রিপোর্টে এঁদের অনেকের কথাই শুনতে পাই। ডেপুটি কমিশনার কর্নেল মানি সাহেবের নাম ছিল দক্ষ সুশাসক হিসাবে। ডুয়ার্সের অশিষ্ট ও অভদ্র একশ্রেণীর লোককে তিনি শায়েস্তা করেছিলেন। কর্নেল মর্টন সাহেবকে এ অঞ্চলের লোকেরা বলত, বুড়া সাহেব। জোতদারদের রাজস্বের পরিমাণ প্রায় পঁচিশ শতাংশ কমিয়ে দিয়ে তিনি তাদের মনে আগ্রহ ও সন্তোষের সৃষ্টি করেছিলেন। শাসক হিসেবে দক্ষ রেনী সাহেবের কথাও পাওয়া যাচ্ছে। কর্নেল হেদায়েৎ আলির নাম পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে বক্সার মহকুমা শাসকপদে ছিলেন তিনি। ইংরাজের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন হেদায়েৎ আলি। কর্নেল সাহেব নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন লোকের মুখে-মুখে। বক্সার প্রথম বাঙালী মহকুমা শাসক হিসাবে নাম পাওয়া যাচ্ছে বাবু অমূল্যচরণ মল্লিকের। ১৮৮২-তে অল্প কদিনের জন্য তিনি ছিলেন এই পদে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত দেখছি ডুয়ার্সের এই শাসনতান্ত্রিক চেহারা। ডুয়ার্স তখন অনুন্নত। নানা শ্রেণীর আদিবাসী, কোচ, মেচ, গারো, ভুটিয়া তো ছিলেনই, ছিলেন রাজবংশীরা, এসে পড়েছিলেন ছোটনাগপুর অঞ্চলের মানুষ। বিহার ও উড়িষ্যার লোক। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরাও ছিলেন। বাংলাদেশের নানা জেলা—জেলার লোক ভাগ্যের সন্ধানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এখানে। ডুয়ার্সের পতিত জমিতে বসতি, অল্প আয়াসে ফসল উৎপাদন, চা-বাগানের কাজ—এইসব নানা জিনিস আকর্ষণ করে এনেছিল তাঁদের। নানা বৃত্তি ও শ্রেণীর সুযোগ অনাবৃত হয়েছিল তাঁদের সামনে। বেনিয়া, ভুঁইমালি, মুচি, গোয়ালা, যোগী সম্প্রদায়, জেলে, কাহার, কৈবর্ত্য, কামার কাপালি, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুম্ভকার কোচ, মেচ, মুন্ডা, কুম্ভর, ওঁরাও রাজপুত, সাঁওতাল, শেখ, পাঠান প্রভৃতি অধ্যুষিত এক আশ্চর্য জনপদের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাচ্ছে এই যুগে। বিশ শতকে পা দেবার আগে-আগেই মিলিত মানুষ ও মানবতার এক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে ডুয়ার্স। এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যৎ ডুয়ার্স—সর্বজাতি পরিবৃত আজকের ডুয়ার্সের চেহারাটি। স্পষ্ট হয়ে উঠছে রূপটি। নানা সংস্কৃতি, নানা সমাজ, নানা ধর্মমত, নানা উত্তরাধিকারের মিলিত ফলশ্রুতি বহন করে জাগছে নতুনকাল। সেই কাল পেরিয়ে আমরা এসে পড়েছি বর্তমান কালের ডুয়ার্সে।

ডুয়ার্স। নতুন কালের ডুয়ার্স।

অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা, সে ঘটনা হবে হবে। সে পুরান কালের মধ্যে ইতিহাস-বিধাতার ইঙ্গিতে জন্ম নিয়ে দেখা দিয়েছে নতুন কালের ডুয়ার্স। নবধাত্রীদেবতার কোলে শুয়ে হাসছে।

আজকের ডুয়ার্সের নব গণ-চেতনার রূপটিই আমার আলোচ্য। নতুনকালের মানুষ ও তার সমাজ। সে সমাজ আজ আর নির্লিপ্ত নয়। সারা পৃথিবীর আশা-আনন্দ-উল্লাসের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে তার হৃদয় আবেগে দোলে। সারা দুনিয়ার বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ তারও ললাটে। সুদূর সমুদ্রপারের জীবনের নৈরাশ্য ও হতাশাও যেমন এখানে কান পেতে শোনবার, তেমনি চাষী-প্রজার, শ্রমজীবী মানুষের, ছাত্রের, মধ্যবিত্তের, শ্রমিকের উদ্দীপিত বজ্রমুষ্টিও এখানে দেখা যাবে। ডুয়ার্সের সেই অগণিত সাধারণ মানুষদের কথাই আজ সবাইকে শোনাবার, নিজে শোনবার।

একটু আগেকার মিছিলের গর্জন এখনও যেন কানে শুনছি।

[ক্রমশঃ]

কংগ্রেস-কোয়ালিশন: বিহার ও উত্তরপ্রদেশ

[redacted]

তুষার চট্টোপাধ্যায়

বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর যদি কেউ মনে করেন যে, এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল আধাআধি কংগ্রেসের পক্ষে গিয়েছে, তাহলে সেটা মস্তবড় একটা ভুল হবে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফিরে আসা কিভাবে এবং সে-সরকারের স্থায়িত্বও বা কতটা, সেটা দেখেই আসল পরিস্থিতি বিচার করতে হবে।

এবার কংগ্রেসের প্রধান আহবান ছিল stable Govt. করার। সেই আহবানের মধ্য দিয়েই কংগ্রেস-নেতারা জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, গত-বারের স্থিতিশীলতার অভাবটাই দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে। তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, ভাঙা-গড়ার এই অবস্থা হয়েছে বিরোধী দল-গুলির মধ্যেকার অনৈক্যের ফলেই এবং তাই যদি স্থিতিশীল গভর্নমেণ্ট করতেই হয়, তাহলে সর্ববৃহৎ দল হিসাবে-কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কংগ্রেসের এ-আহবানের জবাব জন-সাধারণ দিয়েছে উল্টো দিক থেকে stable Govt. করার ব্যবস্থা করেই। পঃ বাংলায় যুক্তফ্রণ্টের stable Govt.-এর ব্যবস্থা হয়েছে। পাঞ্জাবে বামপন্থীরা এগোতে না পারলেও, আকালী-জন-সংঘের হাতেই এসেছে প্রায় stable Govt. করার ক্ষমতা। আকালী-জনসংঘ গভর্নমেণ্টের নীতি কতটা প্রগতিশীল হবে সে-বিষয়ে বামপন্থীদের সন্দেহ আছে, তাই এই গভর্নমেণ্টে তারা যোগ দেয় নি। কিন্তু তবু তারা এই গভর্নমেণ্টকে সমর্থন জানিয়েছে এইজন্য যে, কংগ্রেসের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়াটাই এমন একটা ঘটনা যাকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে আরো পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

বিহার ও উত্তরপ্রদেশে পরিবর্তনটা নতুন কিছু না হলেও, কংগ্রেসের stable Govt. করার আহবান যে ব্যর্থ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিহারে কংগ্রেস গতবারের চেয়ে কম আসন পেয়েছে; উঃ প্রদেশে গতবারের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি আসন লাভ করলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় নি। এই পরিস্থিতিতেই এই দুটো রাজ্যের তথাকথিত কংগ্রেস-সরকার গঠনকে বিচার করতে হবে।

প্রথমেই উঃ প্রদেশের অবস্থাটা একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। আমার বেশ মনে পড়ছে, নির্বাচন-ফল একটু একটু করে প্রকাশ হবার সময় থেকেই উঃ প্রদেশ সম্বন্ধে রেডিওর প্রচার ছিল যে, এখানে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে চলেছে। যখন ৪২৫-এর মধ্যে ৪২০টির ফলাফল প্রকাশ হল, তখন তো রেডিওতে এই কথাই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, উঃ প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে; কেন না ইতিমধ্যেই কংগ্রেস পেয়েছে ২০৮টি আসন, আর বাকী ৫টিতেও নিশ্চিত-ভাবেই কংগ্রেসের দখল আসবে। এই প্রচারের পিছনে কংগ্রেসের নষ্ট 'মরাল' (morale) ফিরিয়ে আনার কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি-না জানি না। কিন্তু সাধারণ অঙ্কের হিসাব করে তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, এই প্রচারটার মধ্যেও একটা ফাঁকি আছে। কেন না, যদি বাকী ৫টি আসন কংগ্রেস পেয়েও যায়, তবু মোট ২১৩টি আসন নিয়ে ৪২৫-এর বিধানসভায় প্রকৃতপক্ষে নির-ঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় না। প্রকৃত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হলে বিধানসভার স্পীকার হিসাবে এক-জনকে বাদ দিয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার হয়। তা না হলে প্রতি পদে বিরোধীদের সঙ্গে সম-সংখ্যক ভোটের সম্মুখীন হয়ে শুধুমাত্র স্পীকারের 'কাস্টিং ভোটের' জোরে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখতে হয়। এটাকে কি ঠিক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরকম অবস্থাও হল না কংগ্রেসের। বহু-প্রচারিত সম্ভাবনা সত্ত্বেও ৫টির মধ্যে ২টি আসন কংগ্রেস হারাল। অর্থাৎ, তার মোট আসন-সংখ্যা হল ২১১। নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা না হওয়া মানে কংগ্রেসের stable Govt.-এর আশাতেই ছাই পড়া।

কংগ্রেস-নেতৃত্ব বলেন উঃ প্রদেশে কংগ্রেস-গভর্নমেণ্ট হয়েছে। কিন্তু, কংগ্রেসের বাইরে থেকে লোক নিয়ে তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন যেখানে হয়েছে, সেখানে কংগ্রেস-গভর্নমেণ্ট বলব কি করে? নির্দলীয়ই হোক আর অন্য কোনো দলই হোক, অন্যদের উপর নির্ভর করেই কংগ্রেসের এই গভর্নমেণ্ট গঠন—এটা কংগ্রেস-কোয়ালিশন গভর্ন-মেণ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া, এই গভর্নমেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বা কতটুকু? মাত্র ২।৩টির ব্যবধান বিরোধীদের সংখ্যা থেকে। রাজনীতির টানা-পোড়েনের মধ্যে এই ব্যবধান বরা-বর যে থাকবে তার কোনো গ্যারাণ্টি আছে কি? ২৮শে ফেব্রুয়ারীর খবরে প্রকাশ, উঃ প্রদেশে অ-কংগ্রেসীরা মিলিত হচ্ছে অ-কংগ্রেসী ফ্রণ্টকে আবার গড়ে তুলে কংগ্রেস-গভর্নমেণ্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করতে। আগে বি-কে-ডি নেতা চরণ সিং সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনিও এ-উদ্যোগের অংশীদার। বি-কে-ডি সম্বন্ধে সমালোচনা করেও এস-এস-পি প্রস্তাব করেছে যে, অ-কংগ্রেসী কোয়ালিশনের চেষ্টা করা দরকার। কমিউনিস্ট পার্টিও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে ভবিষ্যতের কর্মনীতি ঠিক করার জন্য। মোটের উপর কংগ্রেস-কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের ভবি-ষ্যৎ নিশ্চিত নয়। মাত্র কয়েকজনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দেশের আজকের আবহাওয়ায় বিরোধীপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ নয়।

এটাও অবশ্য ঠিক যে, বি-কে-ডি'র উপর বামপন্থী দলগুলি আস্থা রাখতে পারে না। উঃ প্রদেশে বি-কে-ডি আগে বামপন্থীদের চেয়ে জনসংঘের দিকেই বেশি ঝুঁকেছে এবং এবারে প্রথম থেকেই কংগ্রেসের প্রতি তার দুর্বলতা দেখা গিয়েছে। তা না হলে ৯৮টি আসনের অধিকারী হয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠনের উদ্যোগ বি-কে-ডি'ই প্রথম থেকে নিত এবং সে-উদ্যোগ নিলে নির্দলীয়দের কয়েকজনকে কংগ্রেস টেনে নিতে পারত কি না সন্দেহ। এবং

তা, হলে কংগ্রেস-কোয়ালিশনের বদলে অ-কংগ্রেসী কোয়ালিশনই হয়ত হয়ে যেত উঃ প্রদেশে। বি-কে-ডি'র এই দোদুল্যমান মনোভাবই উঃ প্রদেশের রাজনীতিকে প্রগতির পথ থেকে আটকে রেখেছে। অবশ্য, বি-কে-ডি'র এই ভূমিকা শুধু উঃ প্রদেশেই নয়, বিহারেও। সর্বভারতীয় বি-কে-ডি'ই অনেকদিন থেকে 'তৃতীয় শিবিরের' মারাত্মক নীতি নিয়ে চলেছে। একদিকে বি-কে-ডি'র এই নীতি, অন্যদিকে জনসংঘ—এই দুই-য়ের জন্যই উঃ প্রদেশের রাজনীতির গতি নির্ধারণে বামপন্থীরা বাধা পাচ্ছে।

এবারে বিহারের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা যাক্। বিহারে কংগ্রেস-কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠনের সূত্র-পাতেই যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা থেকেই সন্দেহ হয় এ-গভর্নমেণ্টের শেষরক্ষা আদৌ হবে কি না। কংগ্রেস-কোয়ালিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়ে আলোচনার আগে মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস-নেতৃত্বের মধ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে সেটা কীরকম তাই দেখা যাক। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের মধ্যে এরকম সংকট আগে কখনও দেখা গিয়েছে কী? জনতা-পার্টির নেতা রামগড়ের রাজাকে বিহার-মন্ত্রিসভায় না নিলে সমগ্র জনতা-পার্টিই হাতছাড়া হয়ে যায়, আর তা হলে বিহারে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বই আর থাকে না। সুতরাং কংগ্রেস-সভাপতি নিজলিংগাপ্পা কংগ্রেস-কোয়ালিশনের স্বার্থে রাজার আব্দার স্বীকার করে নিলেন। অন্যদিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সভ্য সুব্রহ্মনিয়ম পদত্যাগ করলেন রামগড়ের রাজার মতো কুখ্যাত ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়ে কোয়ালিশন করার প্রতিবাদে। আবার নিজলিংগাপ্পা পাল্টা পদত্যাগের হুমকী দিলেন যদি সুব্রহ্মনিয়মের কথা শুনে রাজাকে বাদ দেওয়া হয় মন্ত্রিত্ব থেকে। একজন কুখ্যাত দুর্নীতিপরায়ণ রাজাকে নেওয়া-না-নেওয়ার জন্য খাস কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এই যে প্রকাশ্য মল্লযুদ্ধ হচ্ছে, এ দৃশ্য দেখে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভরসা কোনো কংগ্রেস-সমর্থকও কি আর করতে পারে? এই মল্লযুদ্ধে কংগ্রেস-সভাপতিই নিশ্চয় জিতবেন, অর্থাৎ রামগড়ের রাজার অনুগ্রহেই বিহারের কংগ্রেস-কোয়ালিশন সরকার থাকবে। কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস-কোয়ালিশনের নীতির প্রকৃত রূপটি এমন নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, অনেক কংগ্রেস-সমর্থকের কাছেও তা অপ্রত্যাশিত ছিল। এইরকমভাবে যে-কোয়ালিশন-সরকারের সৃষ্টি, তা কতদিন টিক্‌তে পারবে তার কোনো গ্যারাণ্টি আছে কি? একদিকে কোয়ালিশন-রক্ষার জন্য প্রত্যেক সুযোগ-বাদী ব্যক্তির ও দলের আব্দারের কাছে মাথা নিচু করতে হবে এই মন্ত্রিত্বকে; অন্যদিকে কংগ্রেসের মধ্যকার বিক্ষুব্ধ ও বিরোধী অংশের প্রতিবাদ বাড়তে থাকবে। এই টানাটানির ফলে অবস্থাটা ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে উঠবে এই কোয়া-লিশন-সরকারের।

কিন্তু এ তো হল কংগ্রেস তথা কংগ্রেস-কোয়ালিশনের আভ্যন্তরীণ সংকটের দিক। বিহারে কংগ্রেস-কোয়ালিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যাপার-টাও এখন পর্যন্ত খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। যখন হরিহর সিং গভর্নরের কাছ থেকে কংগ্রেস-কোয়ালিশন গভর্ন-মেণ্ট গঠনের আমন্ত্রণ পেলেন, তখন হরিহর সিং-এর দাবি ছিল ১৬২ জনের সমর্থন তাঁর পিছনে আছে। এর মধ্য থেকে ৪ জন বি-কে-ডি সদস্য সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন পরে। এই ৪ জনকে বাদ দিলে হরিহর সিং-এর পক্ষে থাকে মাত্র ১৫৮ জনের সমর্থন, অর্থাৎ সংখ্যালঘু। কিন্তু সেই অবস্থা-তেই তো হরিহর সিং-এর মন্ত্রিত্ব ক্ষমতায় এলো ও শপথ গ্রহণও করলো। সাংবিধা-নিক রীতিতে এরকম ঘটনা আগে কখনও দেখা যায় নি। অবশ্য কংগ্রেস-নেতারা তখন বলেছিলেন যে, আরো কিছু লোক তাঁদের হাতে আছে। কিন্তু সংবিধানের দিক থেকে সে-কথার কোনো মূল্য আছে কি? প্রত্যক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ছাড়া কাউকে মন্ত্রিত্ব গঠন করতে আহবান করা যায় কি? এরকম তো হতে পারে, হরিহর সিং গোষ্ঠীর মতলব ছিল এই যে, মন্ত্রিত্ব গঠন হয়ে গেলে ক্ষমতার আকর্ষণে আরো কিছু লোককে পরে টানা যেতে পারবে। গভর্নর কি সেই সুযোগই করে দিয়েছেন পূর্বাহ্ণেই মন্ত্রিত্ব গঠনের অনুমতি দিয়ে? ১১ই মার্চ স্পীকার নির্বাচনের সময় অবস্থা-টার একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এদিনও কংগ্রেসের জয় হয়েছে মাত্র ১৫৫ ভোটে, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরীক্ষা এখনও হয় নি। সে-পরীক্ষা হবে বিধানসভার অধিবেশন ঠিকমতো বসলে।

মোটের উপর, বিহারে কংগ্রেস-কোয়ালিশন-সরকার গঠিত হলেও, একটা অনিশ্চিত অবস্থা নিয়েই তাকে চলতে হবে। কিন্তু অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেও কংগ্রেস-নেতাদের এবার উদ্যম বেশি, কেন না বিরোধীপক্ষের সংহতের অভাব এবার তাদের একটা বড় ভরসা। গতবারের অ-কংগ্রেসী ফ্রণ্টের মধ্যকার দলগুলির এখনকার শক্তি হিসাব করলে কংগ্রেস-কোয়ালিশনের প্রায় সমান সমান অথবা কিছুটা বেশি দাঁড়ায়। ক্রান্তি-কংগ্রেসের নেতা ভোলা পাশোয়ান গভর্নরকে জানিয়েছিলেন তাঁর সমর্থক হচ্ছে ১৬৫। কিন্তু এই হিসাব মতো বিরোধীপক্ষের সংহতি আছে কি? থাকলে গভর্নরকে তাঁরা বাধ্য করতে পারতেন তাঁদেরই মন্ত্রিসভা গঠনে আমন্ত্রণ করতে। সে-সংহতি নেই। এবং তার চেয়ে বড় কথা, ৩৪টি আসনের অধিকারী যে জনসংঘ, তার মনোভাব কি সর্বাংশে বিরোধীপক্ষের অনুকূল? মোটেই না। নির্বাচনের পরই জনসংঘ-নেতা বাজপেয়ী ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা হয় কংগ্রেসের পক্ষে আর না হয় এস-এস-পি'র সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার করবেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়া-লিশনেও জনসংঘের আপত্তি নেই। জনসংঘের এই মনোভাব যদি থাকে তাহলে আর কিছু না হোক অন্তত বিরোধীপক্ষের চ্যালেঞ্জের ধারটা ভোঁতা হয়ে যায়। পি-এস-পি তীব্র কমিউনিস্ট-বিরোধিতার কথা বললেও কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের কোনো ইঙ্গিত দেয় নি কখনও, বরং উল্টো কথাই বলেছে। কাজেই জনসংঘকে অন্য বিরোধী দলের থেকে একটু আলাদা-ভাবে দেখা কংগ্রেসের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এখনও জনসংঘের সঙ্গে কোয়ালিশন করার নীতিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থন নেই। কিন্তু কোয়ালিশন-রক্ষার জন্য দিনে দিনে কংগ্রেস কতদূর নিচে নেমে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করলে এ কথা অবিশ্বাস্য মনে হয় না যে, একদিন জনসংঘের সঙ্গেও কোয়ালিশন হয়ত হয়ে যাবে। ১লা মার্চের এক খবরে দেখা যায় যে, স্বতন্ত্র পার্টিকে কোয়ালিশনে নেওয়া সম্পর্কে

কংগ্রেস-সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা বলেছিলেন, "স্বতন্ত্র পার্টি যদি আমাদের সমর্থন করে তবে আমরা তো না বলতে পারি না।" একদিন এই যুক্তি জনসংঘ সম্বন্ধেও দিতে পারে কংগ্রেস। ১২ই মার্চের খবরে প্রকাশ কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটি এরকম প্রস্তাব নিচ্ছে যে, কর্মসূচীর ভিত্তিতে যে কোনো পার্টির সঙ্গেই কংগ্রেস দরকার হলে কোয়ালিশন করতে পারে।

অবশ্য জনসংঘও চলেছে দু'কূল রক্ষার কৌশল নিয়ে। কংগ্রেসের দিক থেকে উদ্যোগ যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ জনসংঘ বিরোধীপক্ষকেও ত্যাগ করবে না; কেন না জনসংঘের শক্তি নিয়েই তবে বিরোধীপক্ষ কংগ্রেস-কোয়ালিশনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। ভোলা পাশোয়ান জানিয়েছিলেন যে, জনসংঘের ও কমিউনিস্টদের সমর্থন তাঁর পিছনে আছে। স্পীকার নির্বাচনের সময়েও জনসংঘ যে বিরোধীপক্ষের দিকেই ভোট দিয়েছিল তাও দেখা গিয়েছে। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে থেকে জনসংঘ দেখাচ্ছে যে, ক্ষমতার পাল্লা ভারী করতে গেলে তাদের সমর্থন চাই-ই। এইভাবেই জনসংঘ যেন বিহারের রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণের চাবিকাঠিটি হাতে নিয়ে বসে আছে। গতবারেও জনসংঘের ভূমিকা ছিল অনেকটা এইরকম, এবার বর্ধিত শক্তি হয়ে আরো ভাল করে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সুতরাং বিহারের সামগ্রিক পরিস্থিতিটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্থিতিশীল। শুধু কংগ্রেসের দিক থেকেই স্থিতিশীলতার অভাব হয়, কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির দিক থেকেও তাই। অথচ কংগ্রেসের আসন-সংখ্যা গতবারের চেয়েও কমেছে এবার এবং মোট আসন-সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। কংগ্রেসের ক্ষমতা হ্রাস হয়েও কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির হাতে রাজনীতির গতি-নির্ধারণের ক্ষমতা এল না—এটাই বিহারের পরিস্থিতির 'ট্রাজেডী'।

কিন্তু শুধু জনসংঘের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেই কি এই 'ট্রাজেডী'র ব্যাখ্যা হয়? মোটেই নয়। জনসংঘের শক্তি যতই হোক না কেন, যদি সত্যিকারের একটা গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট তৈরি হতে পারত লোকতান্ত্রিক দল থেকে আরম্ভ করে কমিউনিস্ট পার্টি পর্যন্ত সকলকে নিয়ে, তাহলে অবস্থা অন্যরকম হত। ভোটের হিসাব থেকেই দেখা যায় যে যদি এইরকম যুক্তফ্রন্ট হত, তাহলে আরো ১০।১৫টা আসন কংগ্রেসের হাত থেকে নিশ্চয় নেওয়া যেত। আর, এইরকম যুক্তফ্রন্ট হলে শুধু ভোটের ভাগাভাগিই বন্ধ হয় না, জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ সৃষ্টি হয় তাতে আরো অনেক বাড়তি ভোট আসে। সেই হিসাবে দেখলে অন্তত ৩০।৪০টি আসন আরো নিশ্চয়ই পাওয়া যেত এবং তাহলে জনসংঘকে বাদ দিয়েই প্রায় ১৫০টি আসন লাভ করতে পারত এই যুক্তফ্রন্ট। আর তার ফলে নির্দলীয়দেরও অধিকাংশকে টানা যেত এইদিকে। পঃ বাংলার মতো এত বড়ো বিজয় না হলেও, অন্তত গতবারের চেয়ে বড় বিজয় বিহারে নিশ্চয়ই হত। যুক্তফ্রন্ট না হওয়ায় এই সম্ভাবনাই হারাতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এইরকম যুক্তফ্রন্ট হলে উত্তরপ্রদেশেও কংগ্রেসের পরাজয় হত আরো অনেক বেশি।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এইরকম যুক্তফ্রন্ট না হওয়ার মূল কারণ কী? মূল রাজনৈতিক কারণ হিসাবে নিশ্চয়ই বলতে হয় যে, এক বছর আগে থেকেই 'তৃতীয় শিবির' গঠনের যে ঝোঁক দেখা গিয়েছে, সেটাই একটা সুসংবদ্ধ কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা হয়েছে। আজকের পরিস্থিতিতে এইরকম যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠতে পারে দুই শক্তির সমন্বয়ে, কমিউনিস্ট তথা কমিউনিস্টদের কাছাকাছি বামপন্থী শক্তি এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাসির শক্তি, যার মধ্যে ধরা যেতে পারে এস-এস-পি ও পি-এস-পি থেকে বি-কে-ডি পর্যন্ত। জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টিকে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি বলে বাদ দিতেই হয় এই ফ্রন্ট থেকে। এই দ্বি-শক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্টই পঃ বঙ্গে বিপুল শক্তির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এই দ্বি-শক্তির মধ্যে এক শক্তির প্রধান অংশ বি-কে-ডি ও পি-এস-পি এক বছর আগে থেকেই তৃতীয় শিবিরের দিকে ঝুঁকেছে। কমিউনিস্ট-সংস্রব ত্যাগ বা কমিউনিস্ট-বিরোধিতাই এই তৃতীয় শিবিরের মূল উদ্দেশ্য, তাই কংগ্রেস-বিরোধিতার কথা বললেও কার্যত কংগ্রেস-বিরোধী শিবির দুর্বল করাই এর কাজ। এর উপর উত্তরপ্রদেশের বি-কে-ডি কোনো সময়ে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছে, কোনো সময়ে জনসংঘের দিকে ঝুঁকেছে, অর্থাৎ সর্বদাই বামপন্থী শক্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকছে। এই সমস্ত কারণেই কমিউনিস্ট পার্টির আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে নি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে। তৃতীয় শিবিরের এই ঝোঁকের ফলেই বিহারে 'ট্রিপ্‌ল এ্যালায়েন্স' হয়েও যুক্তফ্রন্ট হল না। পঃ বাংলায় বামপন্থী শক্তির প্রাধান্যের জন্যই এই ঝোঁক কার্যকরী হতে পারে নি তো বটেই, উপরন্তু মূল সংগঠন হিসাবে বি-কে-ডি ও পি-এস-পি'ই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের পুরনো অনুগামীদের কাছ থেকে।

এইরকম প্রকৃত যুক্তফ্রন্ট না হলেও, যদি একটা বামপন্থী ফ্রন্টও গঠিত হত কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের নিয়ে, তাহলেও তার একটা প্রভাব পড়ত অন্যদের উপর এবং জনসাধারণের মধ্যেও তাতে উৎসাহ আসত। তার ফলে বামপন্থীদের হাতে আসন অনেক বেশি আসত। পি-এস-পি'র কথা ছেড়ে দিলেও, যদি বড় দল হিসাবে শুধু এস-এস-পি'ই বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলিত ফ্রন্ট করত, তারও প্রভাব পড়ত যথেষ্ট এবং ফলও হত অনেক ভাল। কিন্তু 'তৃতীয় শিবির' ঝোঁকের অংশীদার না হয়েও, কার্যত এস-এস-পি সুবিধাবাদীর মতো এই ঝোঁককেই সুযোগ দিয়েছে।

কিন্তু তবু শুভলক্ষণ এই যে, বাস্তব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে সকলে। উত্তরপ্রদেশে বি-কে-ডিও এখন একটা অ-কংগ্রেসী মোর্চা গঠনে সম্মত। আর বিহারে যথেষ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠতা নিয়েও যে কংগ্রেস কোয়ালিশন-সরকার গঠন করে ফেলল, তার প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী দলগুলির মধ্যে এসেছে একটা নতুন উদ্যোগ একজোট হয়ে কংগ্রেসকে বাধা দেওয়ার। এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত বিহারের পরিস্থিতি যা জানা গিয়েছে, তাতে এর চেয়ে বেশি নিশ্চিত কথা বলা যায় না। বিধানসভা অধিবেশনের মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই বিহারের অবস্থা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল্‌স রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্যঃ আমাদের মধুচাঁদ্রমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

এ নতুন কাল—নতুন বংশধারা।

তবু এ চরের আকাশে-বাতাসে মাটিতে পুরাতন এখনও তার বিশ্বাস আর অবিশ্বাস, পাপ আর সংশয় অদৃশ্য একটা মোহজালের মতো ছড়িয়ে রেখেছে জীবনে জীবনে। হঠাৎ তা যেন এক-একটা বিস্ফোরণের মত—অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার মত প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মুকুন্দের বউ নয়নের ব্যাপারটা তেমনি একটা হতভম্ব করা ঘটনা।

সময়টা ছিল শীতকাল।

শীতের বিষণ্ণ অপরাহ্ন সেদিন তখন সূর্যাস্তের মলিন আলোয় মরে মরে আসছিল। পূবে সাগর অভিমুখী ভাগীরথী—তার দিগন্ত বিস্তৃত গৈরিক জলধারা পাৎলা অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দক্ষিণে নদীর গা ঘেঁষে অনাবাদী বে-হাসিল বাদাবন—বাবলা আর বনঝাটের জঙ্গল। গাছ-গাছালির ছায়ায় অন্ধকার ঘনতর—ধোঁয়ার মত জমাট বেঁধে উঠেছে সেখানে গাঢ় কুয়াশার আবরণ।

ফসল উঠে গেছে। খাঁ খাঁ করছে চরের শূন্য মাঠ। তার অপর্যাপ্ত শূন্যতার মাঝখানে দূরে দূরে—ছাড়া ছাড়া চাষীদের কুঁড়ে। তাদের ছোট ছোট খামারে শেষ হয়ে এল দিনের কাজ—নিঃসাড় হয়ে এল ঝাড়াই-মাড়াইয়ের শব্দ। গোয়ালে গোয়ালে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে মশা তাড়ানো ধোঁয়ার তাল—কন্‌কনে ঠাণ্ডার চাপে উঠতে পারছে না ওপরে, তলায় তলায় ছড়িয়ে আসন্ন সন্ধ্যাকে যেন ভারী করে তুলছে।

মুকুন্দের কাজ তখনো থামে নি। তাকে যেন নেশায় পেয়েছে। একটু একটু করে মাথা তুলছে তার নতুন ঘরের দেওয়াল। দু'কোদাল মাটি—আবার একটু উঁচু। আবার দু'কোদাল—

নয়ন এসে খপ্ করে হাত থেকে কোদাল কেড়ে নিলে—সামনে দাঁড়াল রুখে।

মুকুন্দ হাসল—বলল, "তবে রইল তোর নতুন ঘর।"

নয়ন বলল, "মাথায় থাক মোর পুরাতন।"

"ধ্যুৎ—ঝুপ্‌ড়ি টঙ্। ওকে কি ঘর বলে! শুধু মাথা গুঁজে থাকা।" মুকুন্দ মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "আর নয়—নতুন ঘর আর না হলে নয়।"

"কেন গো!"

"নয়ন বউয়ের জন্যে।"

মুকুন্দ চেয়ে রইল নয়নের দিকে।

বত্রিশ বছরের একটা যোয়ান ছোকরার মুগ্ধ—লুব্ধ দৃষ্টির সামনে জীবনের নতুন এক দুয়ার খুলে দেয় বছর আঠারোর একটা শ্যামলা ছিপ্‌ছিপে মেয়ে—রং যার এ চরের নতুন জমা স্নিগ্ধ পলিমাটির মতো চিকন, দেহ যেন নদী-মোহনার ভরা জোয়ার, আর ডাগর ডাগর চোখ দুটো ছায়াঘেরা ঠাণ্ডা ডোবার মত। মুকুন্দ চেয়ে রইল তো রইলই।

নয়ন বললে, "কি দেখ!"

মুকুন্দ বললে, "নয়ন বৌকে।"

"তার আগে হেই দ্যাখ।" ছেঁড়া দড়ি নয়ন তুলে ধরলে মুকুন্দের মুখের সামনে। বললে, "গরু ছিঁড়ে পালিয়েছে কোথায় না কোথায়!"

"যাবে আর কোথায়—দ্যাখ না খুঁজে, আমি ততক্ষণ দেয়ালে চাপাই আরও দু'কোদাল।" তারপর খপ্ করে নয়নের একটা হাত ধরে টানতে টানতে বলল, "এই—ইদিকে আয়, ইদিকে আয়, দেখে যা—"

টানতে টানতে নয়নকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে তার নতুন ঘরের এক বুক দেয়ালের সামনে। তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বললে মুকুন্দ, "এই তোর একখানা ঘর—আর উঁদিকে একখানা। পাশে রান্নাঘর—আর হোই উঁদিকে রইল গোয়াল।"

"তার আগে এই গরু!" বলে মুকুন্দের মুখের সামনে ফের ছেঁড়া দড়িটা ঝোলাতে ঝোলাতে নয়ন খিল খিল করে হেসে উঠল।

মুকুন্দ বললে, "সে তুই খুঁজে দ্যাখ—গেছে হযতো কোন বনে-বাদাড়ে।"

নয়ন চলে গেল গরুর তল্লাসে। মুকুন্দ আবার তার কোদাল তুলে নিলে।

এমন সময় কে ডাকল, "মুকুন্দ!"

বলতে বলতে সামনে ঠেলে এল মহেশ মণ্ডল—পেছনে আরও জনা দুই-তিন। সবাই এসে দাঁড়াল একেবারে নতুন ঘরের দেওয়ালের সামনে।

মুকুন্দ সসম্ভ্রমে বলে উঠল, "ছোট মণ্ডল!"

চরের মাতব্বর এখন মহেশ—সবাই ডাকে ছোট মণ্ডল বলে।

"আরে বাপ্‌রে—এরই মধ্যে হয়ে

গেল এক বুক।" তারিফ করে বললে মহেশ, "এই তো মরদের কাম। সাবাস্ ব্যাটা।"

মুকুন্দ সবিনয়ে বললে, "মোর কিছু বাঁশের দরকার হবে ছোট মণ্ডল।"

"পাবি।.. বাঁশ খড় দড়ি।" ছোট মণ্ডল বললে, "যা অভাব পড়বে—দোব তোকে। পোক্ত করে ঘর বাঁধ এবার—ঝুপড়ি টঙ্ আর লয় এ চরে। তার দিন শেষ হয়ে গেছে। আর ভয়-ডর নাই ভাঙনের। বালি আর পলি জমছে বাদাবনের বাঁকে। সুখে ঘর-সংসার কর।"

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল মুকুন্দের মা। বলে উঠল, "সেই আশীর্ব্বাদ করে যাও মোর ব্যাটাকে ছোট মণ্ডল। তোমার অন্ন-জলে ও মানুষ, হাতে ধরে ওকে কাজ শিখালে, ভাগে জমিন্ করে দিলে—শেষ-মেস বউ এনে দিলে। তোমার ঋণ শোধ হবার লয়।"

"কার ঋণ কে শোধ করে মুকুন্দের মা।" ছোট মণ্ডল বললে, "মুকুন্দের বাপ যে মোকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল এই চরে এনে। আজ সেই লোক পড়ে আছে কোথায় না কোথায়।"

মুকুন্দের মা চুপ করে যায়। কথা বলতে গিয়েও হঠাৎ বেধে যায় যেন গলায়। ক্ষাণিক চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললে, "আচ্ছা ছোট মণ্ডল—তার কোনো খবর কি পাওয়া যায় না?"

'কেউ বলে দ্বীপান্তর—কেউ বলে জেলে।"

মুকুন্দের মা আরও কি যেন জিজ্ঞেস করবার জন্য উসখুস করে। মহেশ সব চাপা দিয়ে বললে, "সময় হলেই সে আসবে মুকুন্দের মা। ততদিন মনের আনন্দে বৌ-ব্যাটা নিয়ে ঘর কর।"

"হ্যাঁ।" সায় দিলে মহেশের দু'জন সঙ্গী একসঙ্গে।

নিতাই বললে, "খুব পয়মন্ত বউ পেয়ে গেছে মুকুন্দ।"

গোপী বললে, "নতুন বউ—নতুন ঘর। আবার দেখ—জমিনে ধান যেন ঢেলে দিয়েছে। আবার নতুন গাইও বিয়োলো।"

"এবার ওর বউও বিয়োবে।" বলে ছোট মণ্ডল হা-হা করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে সঙ্গীদের ঠেলে নিয়ে বাঁধের দিকে এগিয়ে গেল।

ওদিকে নয়ন গরু খুঁজে খুঁজে হয়রাক। খুঁজতে খুঁজতে চলে গেছে সেই জঙ্গলের ধারে।

নোনাপড়া মাঠে ঘাস নেই—যেটুকু ছিল এরই মধ্যে জ্বলে হলদে হয়ে গেছে। কে জানে হয়তো গরুটা এসে ঢুকেছে বনে।

"মঙ্গ—লা।..."

এদিক-ওদিক দুটো ডাক দিয়েছে কি বাস্—হঠাৎ কি যেন এক ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটে গেল। পেছনে লতাপাতার একটা সরসর সরসর শব্দ শোনা গেল। চমকে ফিরে তাকাল নয়ন। কালো মত লম্বা পাকাটে একটা কি লতাপাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তীর বেগে। ভালো করে দেখবার আগে চোখে এসে পড়ল যেন ধুলো-বালির বৃষ্টি। তবু হাওয়া নেই—গাছের পাতাটিও নড়ে না। ধুলো-বালি-পড়া চোখে হাত চাপা দিলে নয়ন। কিন্তু দুলন্তে আবার দেখবার আগেই কে যেন তাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে মাটিতে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। তবু জোয়ান মেয়ে—অত সহজে হার মানবে কেন, শেষ চেষ্টায় ঝট্‌কা মেরে ঠেলে উঠতে চাইল। ঘাড়ে আবার একটা প্রচণ্ড ঘা খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। প্রাণপণে একেবারেই সে শুধু চেঁচাতে পারলে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা পাকাটে আঙুলে তার মুখ চেয়ে ধরল। গলা দিয়ে আর শব্দ বেরুলো না। ভয়ে জ্ঞানবুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন হয়ে এল।

॥ দুই ॥

নিতাই বললে, "মুকুন্দের মাকে তখন তুমি কথাটা একটু বাড়িয়ে বলেছ ছোট মণ্ডল।"

তামাকের একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মহেশ বললে, "কোন্ কথাটা গো?"

"ওই যে—মুকুন্দের বাপ গোবিন্দ জেলে না দ্বীপান্তরে।" নিতাই বললে, "আমি একবার শুনেছিলাম—হাজত ভেঙে পালিয়েছে।"

গোপী বললে, "উঁহু। পালিয়েছিল ঠিক—তারপর পুলিশের গুলী খেয়ে গাঙে পড়ে যায়। আর উঠে নি। আমি আবার শুনেছিলম এই রকম।"

"হবে। লাও—তামুক খাও।"—

তামাকের নেশায় মশগুল হয়ে গল্প করছিল ওরা মহেশ মণ্ডলের দাওয়ায় বসে বসে।

মজলিসী মানুষ মণ্ডল—এমন বৈঠক তার নিত্য সন্ধ্যায়। সারা দিনের কাজের শেষে দু-পাঁচজন সঙ্গী না হলে তার চলে না। কেউ না এলেও—নিজে গিয়ে লোক ডেকে আনবে। কথা শোনাবে—এ চরের প্রথম দিককার নানা কথা। যদিও এ চরের প্রথম দলের লোক নয় সে—তবু ছুঁয়ে আছে সে আদিপত্তনের কাল—যে কালের বড় একটা আর কেউ বেঁচে নেই। পাক ধরেছে চুলে। বুক-চওড়া কাঠামোর মানুষ, বড় চোয়াল—চৌকো চিবুক। ঠোঁট দুটো চাপা। সবটা মিলে আকর্ষণ করে সে এ চরের সাধারণ চাষাভুষোর বিশ্বাস—নির্ভরতা। ওরা বলে বাড়ুয্যা—মাতব্বর, এ চরের ছোট মণ্ডল।

গোপী বললে, "রসুলপুরের মোহনায় একটা লাস না কি ভেসে উঠেছিল কদিন বাদে।"

"হতে পারে—হলে কিছু অবাক হবার নাই।" ছোট মণ্ডল সেই সব পুরাতন কথা হাতড়ে হাতড়ে বললে, "কোনো কিছু হলে ওর বৌ হরিদাসী কেঁদে ককিয়ে বলতো—উ মরবে, অপঘাতে মরবে কুনদিন—ওকে আমি কেমন করে সামলাই তোমরা বলো।"

"উল্টো-পাল্টা ঝড়—মেয়েমানুষের কাজ লয়।" বলে নিতাই হি-হি করে হাসল। বললে, "তাঁতী ধরে এনে একবার নতুন কাপড় বিলি করেছিল—মনে পড়ে মোর।"

"তবে বোঝ।"

বাঁধ দিয়ে যাচ্ছিল হাটুরে তাঁতী—গঞ্জের হাটে। ধরে আনলে তাকে। তারপর চরের মেয়ে-মদ্দ ডেকে আনলে—যার কাপড়ের দরকার। একে বললে,—হেই তুই লে। ওকে বললে—হোই তুই লে। দেখতে দেখতে তাঁতীর গাঁটরী ফাঁক।

তাঁতী বললে, "দাম?"

তাকে দেখিয়ে দিলে চরের ফসল ভরা ক্ষেত। সবে কার্তিক মাস—ধানে পাকার রং ধরেছে মাত্র। বললে, "এক মাস—বড় জোর। তখন দাম দোব। হেই দ্যাখ মোর চরের মা বৌগুলোর ছিরি—অঙ্গ ঢাকা পড়ে না।"

প্রথমে চোটপাট—তারপর তাঁতীর কান্নাকাটি। গোবিন্দ বিরক্ত হয়ে শেষকালে বউয়ের বাউটি-জোড়া তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, "লে—যা—পালা। আর চেঁচালে চরের পলিতে পুঁতে দিব—শালার কেউ পাত্তা পাবে নি।"

কথা সিধে—ফয়সালা সিধে।

ছোট মণ্ডল বললে, "এই করে বাঁচিয়ে দিলে মোকে একদিন।" তখন ও চলে এসেছে এই চরে—জঙ্গল মহালে। আমি থাকি দশ কোশ দূরে—গ্রামে দেশে। থাকলে হবে কি—তখন মোর চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। বাপ মোর ধার করেছিল মহাজনের কাছে—তার সুদের সুদ

—তস্য সুদে মহাজন মোর বলদজোড়া দখল করে নিলে। সাজা বিলি প্রজা—হাজা শুকায় খাজনা শোধ করতে পারলাম নি—জমিদারের নগদী একদিন হুমকি দিয়ে গেল। ছুটে এলাম গোবিন্দের কাছে—বললাম, কিছু টাকা ধার দাও মোকে।"

শুনে গোবিন্দের সেই ডাকাতে হাসি—আজও ভুলতে পারে নি মহেশ মণ্ডল। বলেছিল, "আমি কি মহাজন।"

"না দিলে আজ মোকে কাছারিতে কয়েদ করবে—খবর পেয়েছি।"

কি একটু ভেবে—হেসে গোবিন্দ বলেছিল, "তা উল্টে ওদের কয়েদ করো না।"

"সে কী!"

"যাব আমি। যাব মোর ঢ্যালা-চামড়া নিয়ে।"

কথার খেলাপ করে নি গোবিন্দ। রাতারাতি সেই বিশ মাইল ছুটে গিয়ে শুনলে, কাছারিতে কয়েদ করেছে মহেশকে. বউ কাঁদছে বেটা কোলে নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে। তকে তুলে বার করে দিলে পথে—সঙ্গে লোক দিয়ে বললে, "কাঁদবে পরে—এখন চলে যাও জোর পা চালিয়ে।"

তারপর আগুন। একেবারে খোদ নগদী মহল্লার চালায়। হৈ-হল্লা—ঘটি ঘড়া বালতি নিয়ে ছুটোছুটি। সেই ফাঁকে দড়াম করে লাথি পড়লো কয়েদ-ঘরে। হলো না। পড়লো কুড়ুল। দেখতে দেখতে দরোজা চৌচির। আগুন তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাছারি বাড়ির চালায়।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। একবার গেল ঠেকায় পড়ে। চরে এসে ঘর ঘেরাও করলে পুলিশে—নিয়ে গেল ধরে। পরের দিন অমন তড়পা জোয়ান—ফিরে এল টলতে টলতে। শুয়ে রইল পুরো দুটো দিন। মুখে কিছু দিলে না—কারুর সঙ্গে কথাও কইলে না ঃ কি বৃত্তান্ত।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়—সামান্য যাত্রা দেখা নিয়ে কাণ্ড ঘটে গেল অন্য রকম।

আখেরী—চৈত্র মাস। গঞ্জের বাজারে বাজার-ওয়ালাদের হাল খাতার উৎসব—যাত্রা পাঁচালি হয় প্রতি বছর। সে-বছর বাইরে থেকে এসেছিল কোন এক দল।

ক'দিন জ্বরে পড়েছিল বিছানায়। কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলা এসে বললে, "চলো মহেশ—যাত্রা শুনে আসি, কি নতুন যাত্রাগান বলে।"

"তোমার জ্বর—চোখ তো রাঙা জবা"—

"হা ভোর জ্বর। মেয়েলোকের মত কত শুয়ে থাকব! চল—যাত্রা শুনলে মোর জ্বর ছেড়ে যাবে।"

কোথাও যাত্রা হচ্ছে শুনলে একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা। সে কি পাঁচ ক্রোশ আর কি সাত ক্রোশ। গঞ্জের বাজার আর কতদূর—জোর ক্রোশ দুই হবে। চরের আরও জনাদুই যেন ছিল সঙ্গে। সবাই মিলে যাত্রা শুনতে গেল।

হ্যাঁ—পালা গান নতুনই বটে। এত-দিন শুনে এসেছে যেমন পুরাণ কাহিনী, এ তেমন নয়। এ এক অন্য ঢং। এর চাষী চাষী-বৌ, তাঁতী তাঁতিনী—গ্রামের মানুষ, দেখতে দেখতে গোবিন্দ তন্ময়। আর ছিল একজন না দু'জন সাহেব। সেই প্রথম ওদের সাহেব দেখা।

পালায় সাহেবের অত্যাচার বেড়েই চলেছে। এই তাঁতীর তাঁত ভাঙছে, কাটুনীর চরকা ভাঙছে, চাষীর ধান লুঠ হচ্ছে—টেনে নিয়ে যাচ্ছে চাষী বৌকে। শেষমেস সাহেবের বলি।

কিন্তু শেষটা আর দেখা হলো না। হঠাৎ হৈ-হৈ কাণ্ড—ঠেলা-ঠেলি, দৌড়ো-দৌড়ি, চীৎকার। সদলবলে থানার দারোগা এসে হাজির। ঠকাঠক লাঠি চলতে লাগল সেই সাগর-ভাঙা ভিড়ে।

মানুষজন কে কোথায় পালাল ঠিক নেই। ওরা ফিরে এল চরে। সবাই কেমন চনমনে—গোবিন্দ গুম্।

পরের দিন চৌকিদারের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল হিড়হিড় করে চরে। বললে, "বাকীটা দেখা।"

"হাই দ্যাখো গা।" চৌকিদার বললে, "আমি কোথায় পাব!"

"তবে শেষ না হতে ভাঙলি কেন? —তোকে দেখেছি, লাঠি চালাচ্ছিলি।"

"তা বলে সাহেবের বলি দেখবে?"

"সে কি তোর বাপের বলি? দেখতে নাই?" এবার গলায় গামছা জড়ালে চৌকিদারের। বললে দাঁতে দাঁত চেপে—ঝাঁকুনি দিতে দিতে. "চাষীর ধান লুঠ করবে—দেখতে আছে। তাঁতীর তাঁত ভাঙবে—দেখতে আছে। মোদের বউঝের হাত ধরে টানাটানি করবে—দেখতে আছে। আর সায়েবের বলি দেখতে নাই?"

"হেই—দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—

সবাই ছুটে গেল ছাড়াবার জন্য। হরিদাসী ডাক পেড়ে কাঁদতে লাগল—মাথা কুটতে লাগল। কে শোনে কার কথা!

"দে আও শালা বাকীটা"—তার ওই এক কথা।

"মরে যাব—ইঃ"

"যাঃ শালা—শেষটা মোর দেখা বাকী রয়ে গেল।" গামছা খুলে ঝট্‌কা মেরে ফেলে দিলে।

তারপর থানায় গিয়ে চৌকিদার কি লাগালে না-লাগালে, পরের দিন পুলিশ এল।

চরে এই প্রথম পুলিশ।

কিন্তু শেষ নয়—সুরু।

উত্তরে হলদিয়া—দক্ষিণে রসুলপুর, খরস্রোতা দুই নদী। মাঝখানে জেলার শেষ মাটির চিহ্নটুকু হারিয়ে গেছে সাগরগামিনী ভাগীরথীর অগাধ জল-রাশির তলায়। সামনে সমুদ্র। মাটি তো নয়—নুন। বর্ষার জল শুকোতে না শুকোতে মাটির মেটে রং ছাপিয়ে ফুটে ওঠে নুনের দাগ। মেটে চামড়ায় শ্বেতীর মত। সে মাটির খোঁজেও কেউ জেলা মহকুমা থেকে ছুটে আসে—এ চরের মানুষ সেই প্রথম দেখল।

প্রথম দিন জনাদুই দেখে গেল ঘুরে ঘুরে। শহরের মানুষ—ভদ্রসন্তান। মাথায় শাদা টুপী—পরনে খদ্দর। বয়স তিরিশের বেশি নয়। চরের মানুষের সঙ্গে সেধে আলাপ করে গেল।

জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা নুন তৈরি করো না ভাই?"

গোবিন্দ আগ্‌বেড়ে কি বলতে যাচ্ছিল—মহেশ চোখ ইসারায় থামিয়ে দিলে।

উত্তর দিয়েছিল মহেশই, "মোরা সব নুন কিনে খাই বাবু।"

"অথচ তোমার দেশের মাটিতে এত নুন!" ওদের একজন বলেছিল, "জান—এই নুন থেকে সাহেবরা কত টাকা লাভ করে?"

"কেমনে জানবো বাবু।"

"আমরা এসে নুন তৈরি করবো সায়েবদের আইন ভাঙবো।"

ওরা চলে যাওয়ার পর গোবিন্দ শুধু বলেছিল, "আবার সেই সায়েব গো!

আর সবাই হি-হি করে হেসেছিল—খুব বানিয়ে বলে দিয়েছে কথাটা মহেশ মণ্ডল।

"না বলে করি কি বলো। যদি নিমকি দারোগার লোক হয়!"

গোবিন্দ বলেছিল, "তা হলে সঙ্গে চৌকিদার থাকতো। শালা মোদের হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যেত।"

সকলের ঘরেই নুন-জল তৈরির হাঁড়ি বসানো—এ চরের মানুষ কেউ নুন কিনে খায় না। ঘরেই তৈরি করে চিরকাল।

গোবিন্দ বলেছিল, "মোর মনে হয়—বাবুরা নুনের কারখানা খুলবে।"

কয়েকদিন বাদে পুলিশ এল, দারোগা এল. চৌকিদাররা এল—মায় পাল্কী করে এল চরের দশআনি শরিক বড়ো বরদা চৌধুরী।

দারোগা এসে খোঁজ করলে, "কে—মাতব্বর কে?"

হরি মণ্ডল তখনো বেঁচে। এগিয়ে এসে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করল।

চরের মানুষ কৌতূহলে ভিড় করে এল।

দারোগা গোঁফের একপাশ পাকাতে পাকাতে বললে, "দেখুন চৌধুরীবাবু, উকীলবাবু আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন—তাঁরা এইখানে আসবেন।"

বুড়ো চৌধুরী বললে, "চিঠি একটা আমিও পেয়েছি।"

"হুঁ!" দারোগা বললে, "জানিয়ে-শুনিয়ে অতবড় লোক একটা গোলমাল পাকাতে চাচ্ছেন। এখন আমাদের কর্তব্য—আমাদের করতে হবে।"

হরি মণ্ডল সব কথাতেই মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিচ্ছিল—এবার সে মাথা বেশি করে নেড়ে উঠল—বললে, "যথার্থ—যথার্থ।"

কিন্তু বুড়ো চৌধুরী কিছু বললে না—মাংস খুলে পড়া কুতকুতে দুটো চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দারোগা বললে, "সরকারবাহাদুর শান্তি চান।—আপনার চরে কোনো গোলমাল ঘটুক—এ চান না।"

বুড়ো চৌধুরী বললে, "আমিও চাই না। তার জন্যে যা করবার, যা দরকার—আপনারা করুন।"

"আমার কাজ আমি করবো। আপনি বলুন আপনার চাষীদের—আপনার চরের বাড়ুয়াকে।"

"বলতে হবে নি—কিছু বলতে হবে নি হুজুর।" হরি মণ্ডল হেসে বললে, "নুন করা সহজ লয় হুজুর। নুনমাটি চেঁছে আনা, তার জল তৈয়ারি করা, কড়াইতে জ্বাল দেওয়া—জ্বালানি ......সে ঢের ঢের ঝঞ্ঝাট। শহরের লোক কদিন পারবে বাবু?"

মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিল দারোগা একটি একটি করে।

বললে, "তাহলে তোমরা মাটি চেঁছে দেবে না?"

"না হুজুর।"

"হাঁড়ি দেবে না।"

"একদম না।"

"কড়াই দেবে না।"

"কখখনো না।"

"জ্বালানি দেবে না।"

"একটা কাঠিও না হুজুর।"

"আর—কারুকে আশ্রয় দেবে না।"

"আরি ব্বাপ!" হরি মণ্ডল চোখ বড় বড় করে বার বার জোড় হাত কপালে ঠুকতে লাগল। চরের বোবা প্রায়, কৌতূহলী উৎকণ্ঠিত—উৎকর্ণ মানুষগুলোর দিকে চেয়ে বললে, "শুনে রাখলে সব—আমি জবান দিলাম।"

গট গট করে চলে গেল দারোগা। যাওয়ার সময় বলে গেল, "কথার খেলাপ হলে শালা আগুন জ্বালিয়ে দেবো। তিন দিন পরেই ওরা আসছে।"

দারোগা তার দলবল নিয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরি মণ্ডল চরের সকলকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললে, "খবর্দার—খবর্দার। নুনের পাৎনা এখনি মোদের তুলে দে যার যা আছে। বলে গেল তিন দিন। বাপ রে বাপ—হাঁড়ি তুলে দে, কড়াই লুকো—নুনের হাঁড়ি পুঁতে দে মাটিতে।"

বাকি আর তিন দিন।...শহরের মানুষেরা আসছে।...

চরের মানুষেরা ঠিক বুঝতে পারে না—কি হবে।

মহকুমা শহর বিশ ক্রোশ—জেলা শহর অনুমানের সীমায়। রাজধানী? তার পথ বন-বাদড়, খানা-খন্দ, খাল-নদীতে মুছে যাওয়া পোকায় কাটা মানচিত্রের মত। এ চরের মানুষ তার সন্ধানও জানে না।

দলে দলে আসছে অচিন মানুষ—ছোকরা—ভলান্টিয়ার। খেয়া পেরিয়ে সোজা ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চওড়া রাস্তা। চলে গেছে চরের পশ্চিম সীমা ছুঁয়ে—মহকুমা তমলুক থেকে মহকুমা কাঁথি। সেই পথের দুপাশে কোথাও খুঁটি পুঁতছে ভলান্টিয়াররা—কোথাও তোরণ। চরে এসে দল বেঁধে কেউ খুঁড়েছে বড় বড় উনুন। কোথাও বাঁধা হচ্ছে হোগলার চালা। আসছে বড় বড় হাঁড়ি-কড়াই। আগে থেকে যেন মেলার আয়োজন।

চরের কৌতূহলী মানুষ দেখে ভিড় করে।

হরি মণ্ডল তেড়ে যায়, "খবর্দার! সরে যা—সরে যা। শালা দারোগা না কসাই। মোর মুণ্ডু কেটে লেবে। কি দুর্দিন—কি দুর্দিন এসে পড়ল মোদের চরে! ও দেখতে হবে নি—বরং ঝাড়াই-মাড়াই যার যা বাকী আছে শেষ করে ফ্যাল। কখন আগুন লেগে যাবে। পয়মাল হয়ে যাবে মোদের সারা বছরের খোরাক—দুঃখের ধন।"

এর মধ্যে হরি মণ্ডল একদিন শুনলে—গোবিন্দ তার অত বড় তেঁতুলগাছটা ভলান্টিয়ারদের দিয়েছে জ্বালানির জন্যে। শুধু তাই নয়—কাঠ চিরে জ্বালানিও করে দিয়েছে।

ছুটে গেল হরি মণ্ডল। মাতব্বর—বাড়ুয্যে—তার দায় ঢের। মাথা চাপড়াতে লাগল, "শালার কি পাপ করেছিলাম মাতব্বর হয়ে!" গোবিন্দকে বললে, "দিয়েছিস?"

গোবিন্দের সরল জবাব, "টাকা দিয়ে বেচলম।"

"বেচলম!" হরি মণ্ডল হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কাঠ চিরে জ্বালানি করে দিলি?"

"রোজ লিয়ে খাটলম।" তেমনি ঠাণ্ডা জবাব।

কিন্তু জ্বলে উঠল হরি মণ্ডল, ভেঙিয়ে বললে, "রোজ লিয়ে খাটলম!—আর আমি শালা যে মরলম?" দাঁতে দাঁত চেপে বলে হরি মণ্ডল, "তোকে—তোকে আমি চরের পাঁলতে পুঁতে দোব শালা—উপড়ে তুলে দোব চর থেকে। ফের যদি দেখি"—

কিন্তু কাকে ঠেকাবে মাতব্বর!

দল বেঁধে মেয়ে-মদ্দ আসছে আশ-পাশের চর থেকে—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পশ্চিমে দূরে দূরে গ্রাম থেকে। তিন দিন পরে চেহারা পাল্টে গেল মানচিত্র অজানা-অচেনা জায়গাটার। রাস্তার তোরণগুলো লতায়-পাতায়-ফুলে সজ্জিত হয়ে উঠল, বাঁশের খুঁটিগুলোতে পৎ পৎ করে উড়তে লাগল জাতীয় পতাকা। বোর্ডের রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে ভিড়। কৌতূহলী ভিড়। দূর থেকে হঠাৎ একটা গর্জন শোনা যায়: বন্দেমাতরম!...

শঙ্খধ্বনি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে গ্রাম-দেশের শব্দহীন শূন্য আকাশের তলায়।

"আসছে—আসছে!"—

মহকুমা শহর থেকে—পথের পাশের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মিছিলে যেন মানুষ জুড়ে গেছে। বিরাট মিছিল। আসছে—এগিয়ে আসছে। অজানা-অচেনা—শহরের ঢেউ।

চরের খালের মুখে বুক চেতানো পতিত জায়গাটায় পাড়া হয়েছে উনুন। সেখানে মোতায়েন ভলান্টিয়ারের দল। একটু দূরে দারোগাও হাজির তার দলবল নিয়ে। দারোগার ইঙ্গিতে একজন চৌকিদার ঢোল শহরৎ করে সেই পতিত জায়গাটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ১৪৪ ধারা জারী করে দিলে। একটা নোটিশ বেঁধে দিলে ঝাণ্ডা ওড়ানো খুঁটিতে। ভলান্টিয়াররা অচঞ্চল। যেন গ্রাহ্যই করলে না।

সড়ক ছেড়ে মিছিল নামল মাঠে। আগে আগে উকীলবাবু, বেঁটে খাটো মানুষ। মাথা ভরা টাক। বয়স বোধ করি ষাটের কাছাকাছি। পাশে পাশে আসছে ভারী শরীরের এক মহিলা—তাঁর স্ত্রী। পেছনে আরও কয়েকটি মহিলা, আরও কয়েকটি বুড়ো। একটি রাঙা টুকটুকে ছিপছিপে বৌ—কোলে ছেলে।

মিছিলের চারপাশের কৌতূহলী ভিড় এবার ছড়িয়ে পড়ল সারা মাঠে—খালের মুখ ঘিরে। দারোগার নির্দেশে সার বেঁধে খাড়া হয়ে দাঁড়াল পুলিশের দল—কুতকুতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মিছিলের সামনের দিকে।

পবন শেখের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি শুধু পুলিশগুলোর দিকে। পাশে গোবিন্দকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বললে, "দেখছ—দেখছ মামু, শালাদেব গোঁপ নাই—দাড়ি নাই।—চোখগুলো কেমন কেমন। কুন দেশের লোক গো।"

গোবিন্দ বললে, "নতুন এসেছে। আগে ছিল নি।"

"এবার কি হবে বলো দেখি?"—

"চোপ।"

সংঘাতের শেষ মুহূর্তটি এগিয়ে আসছে যতো—ভিড় শংকায় অধীর হয়ে উঠছে।

নুন তৈরির নির্দিষ্ট জায়গাটার কাছাকাছি এসে মিছিল দাঁড়াল। এগিয়ে গেল শুধু বৃদ্ধ উকীলবাবু। সার বেঁধে দাঁড়াল ভলান্টিয়াররা। হঠাৎ যেন সমস্ত মানুষের সাড়াশব্দ থেমে গেল।

উকীলবাবু ধীর অবিচলিত পায়ে এগিয়ে গেল একটা নুনমাটি-ভর্তি ঝুড়ির দিকে। তুলে নিলে মাটি একমুঠো—ফিরে দাঁড়াল মিছিলের দিকে মুখ করে। চীৎকার করে বললে, "ভাই—এ নুন আমার দেশের মাটি। এ মাটি আমার মায়ের অঙ্গ।

সানলাইটে

প্রতিবার
আপনার জামাকাপড়
আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

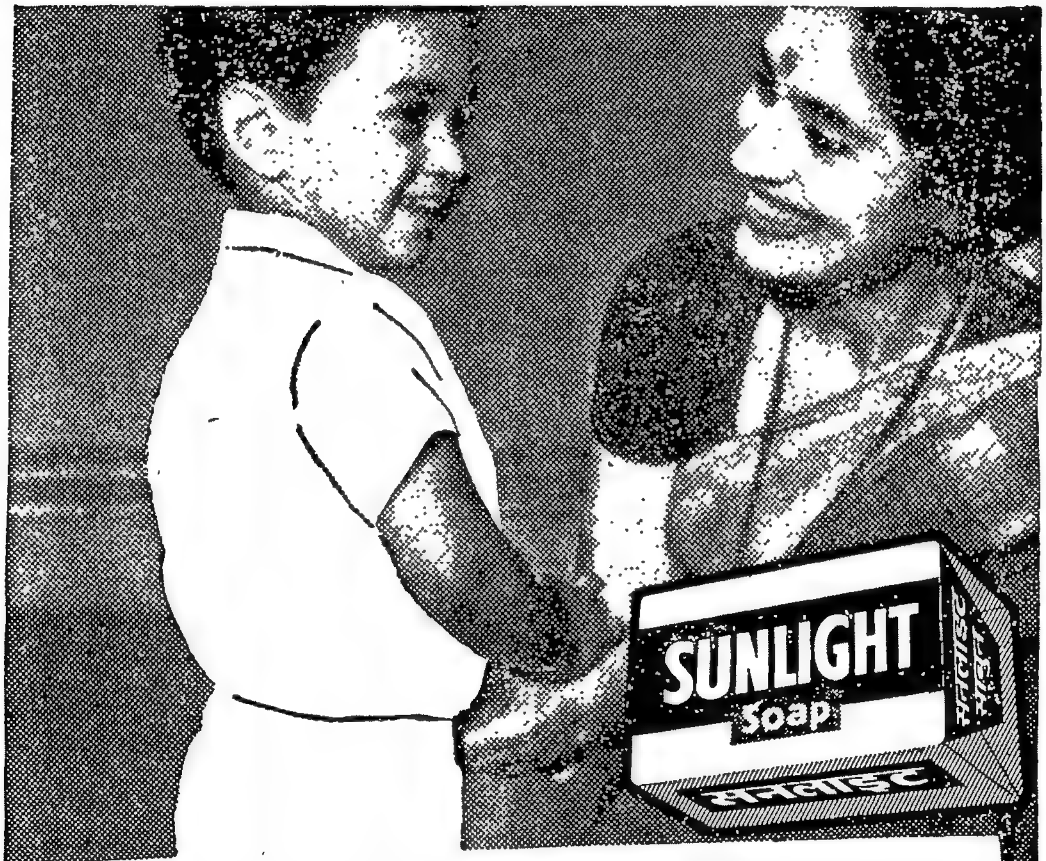

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন···কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার
প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

লিনটাস-S. 62-140 BG (R)

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

এতে আমাদের সকলের অধিকার। সে অধিকার বাধা দেয় যে আইন—আজ থেকে তাকে আমরা ভাঙবো। বন্দেমাতরম্।"

মিছিলের মানুষ ধ্বনিতে গর্জ্জন করে উঠল।

দারোগা এগিয়ে এল দুজন পুলিশ নিয়ে উকীলবাবুর দিকে। বললে, "আমি আপনাকে এ্যারেস্ট করলাম সরকার বাহাদুরের নামে।"

হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিলে উকীলবাবু, "করুন। কিন্তু কতজনকে ধরবেন? জেলখানা আছে তো?"

দারোগা মিছিলের দিকে তাকিয়ে বললে, "আপনাদের নেতাকে এ্যারেস্ট করেছি—আপনারা চলে যান। এখানে ১৪৪ ধারা জারী আছে। চলে যান।"—ভয় দেখালেন, "না হলে সবাইকে চালান দেবো।"

কোথায় ভয়! এগিয়ে এল উকীলবাবুর স্ত্রী—উত্তেজনায় মুখ লাল হয়ে উঠেছে। গলা উঁচু করে বললে, "আমাকেও ধরুন আমার স্বামীর পথ—আমার পথ।"

দারোগা যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বললে, "আপনি এখান থেকে চলে যান।"

"স্বামীকে ফেলে?" মহিলা টিটকারী দিয়ে হেসে উঠল। তারপর ভলান্টিয়ারদের দিকে চেয়ে বললে, "ছেলেরা—দেশলাই দাও। আমার স্বামীর শুরু-করা-কাজ এগিয়ে নিতে হবে। দাও—দাও।"

নুনজলের কড়াই চাপানো উনুনে আগুন জ্বললো।

"আপনি উঠুন।" দারোগা এগিয়ে এল, "আপনাকেও এ্যারেস্ট করলাম।"

"হাত-কড়া বের করুন।" হাসতে হাসতে এগিয়ে দিলে দুটো হাত।

গ্রামের মানুষ চঞ্চল।

এবার এগিয়ে এল সেই রাঙা ছিপছিপে বৌটি—কোলে বছর দেড়েকের ছেলে। সকলের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার শাশুড়ীর জ্বালানো আগুন নিভতে দেবো না।"

"সরে যান—চলে যান।"

"না।"

বউটি এগিয়ে গেল উনুনের দিকে।

দারোগা সরে গিয়ে দাঁড়াল তার পুলিশের সারিতে। উৎকণ্ঠিত কৌতূহলী জনতা—চেয়ে আছে স্থিরদৃষ্টিতে। চোখে ভয়-বিস্ময়-উত্তেজনা।

দারোগা চীৎকার করে বললে, "সরে যাও—শেষ বার বলছি।"

মিছিল থেকে বেরিয়ে এল আর এক বৃদ্ধ—রোগাপানা মানুষটি। মাথার চুলগুলি সব শাদা, একগাল পাকা দাড়ি। চীৎকার করে ডাক দিলে, "আমি তোদের মাস্টারমশাই বলছি—ছুটে আয় ছেলেরা। মরে যেতে বলছে রে।"

একপাল ছাত্র-ভলান্টিয়ার ছুটে এসে রাঙা বউটিকে ঘিরে দাঁড়াল। উনুন নেভে নি—উনুন জ্বলছে।

দারোগা হুঙ্কার দিয়ে হুকুম দিলে, "চার্জ।"

ইঙ্গিতে ছুটল যেন হন্যে কুকুরের দল। ধপাধপ পড়তে লাগল লাঠি। কেউ নড়ল না। পড়ল মাটিতে একজন তো ছুটে গিয়ে দাঁড়াল আরও পাঁচজন।

বুড়ো মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে। মুখে এক কথা, "মার—মার—কত তোদের জোর আছে। আরও লাঠি—আরও মার—আরও।"

মাথায় লাগল। রাঙা হয়ে গেল শাদা চুল—শাদা দাড়ি। পড়ে গেল। তখনো বিড় বিড় করছে—"মার—মা...র...মা...র।"

পবন শেখ গোবিন্দের রাগ চাপা ভয়ঙ্কর মুখটার দিকে চেয়ে বললে, "আর কত সইবে গো!"

চঞ্চল হয়ে উঠেছে চরের মানুষ। এমন দাঁড়িয়ে মার খাওয়া কখনো তারা দেখে নি। রক্ত ওদের গরম হয়ে ওঠে—হাত নিসপিস করছে গোবিন্দের। মুঠো করে চেপে ধরেছে পবনার হাত। নখ বসে যাচ্ছে। বিড় বিড় করছে চারদিকের উচ্চকিত ধ্বনির সঙ্গে—ব—ন্দে — বন্দেমাত...বন্দেমাতং... বন্দে।...মানে কী কথাটার? উচ্চারণ করতে পারছে না ঠিক ঠিক—বিড় বিড় করছে বার বার। কী কথা—যাতে ভয় নেই—ভাবনা নেই! বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একের পর এক।

পিটিয়ে সব কটা ভলান্টিয়ারকে শুইয়ে দিলে—ঘিরে-থাকা ভিড়ের ভেতর থেকে এবার বেরিয়ে পড়ল ছেলে কোলে রাঙা বউটি। মাথার ওপরে উঠেছে একাধিক লম্বা মোটা লাঠি। পড়ল।

"মা গো।"—পড়ে গেল। কচি বাচ্চাটা চেঁচিয়ে উঠল মায়ের বুকের চাপে।

"এ্যাইও! পবনা।" হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দিলে গোবিন্দ। নীরব দর্শক হয়ে আর থাকতে পারলে না। এ চরের বুনো রক্তে সে অচঞ্চল স্থিরতা নেই। বোবার মুখ ফুটল—পাগলার মত লাফ দিয়ে চীৎকার করে উঠল, "বন্দেমাতরং।" বুনো ভঁইসের মতো গোঁ ধরে ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ল উদ্যত লাঠির সামনে—কচি বাচ্চাটা কিলবিল করছে যেখানে মায়ের গায়ে গায়ে। পেছনে পেছনে পবন শেখ—রুখে দাঁড়াল, হঠাৎ টান মেরে একটা লাঠি ছিনিয়ে নিলে। সব ক'টা লাঠি এবার তার মাথার ওপরে। গোবিন্দ সেই ফাঁকে ছোঁ মেরে কচি বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পবনা রুখে দাঁড়িয়ে বললে, "অব আও শালা—লাঠি শিখাই—দো চার প্যাঁচ। জোর...একটাকে লেবো।"

লাঠিতে লাঠিতে শব্দ উঠছে ঠকাঠক্ ঠকাঠক্।

মাঠে ছড়ানো দর্শকের ভিড়—তার চাপা উৎকণ্ঠা হতাশা হঠাৎ যেন একটা পথ পেয়ে বেরিয়ে এল। কোথা থেকে একটা সশব্দ উৎসাহের তরঙ্গ যেন ছড়িয়ে পড়ল মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে। একটা চাপা হিস-হিসানীর মত ছড়িয়ে পড়ল নাম।

"পব্‌না—চরের পবন শেখ।"...

দেখতে দেখতে ঘটনা অন্য গতি নিলে। পিছু হটছে—একজন—দুজন—তিনজন।... একটা খাকি পোষাক লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দারোগা ছুটে আসছে তার আরও দলবল নিয়ে।

"বাঃ শালা—আজ এই থাক। মাদীর বাচ্চা শালারা—গোঁপ দাড়ি নাই।"—

লাঠি ফেলে ছুটে পালাল পব্‌না—যেদিকে গোবিন্দ গেছে।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—গ্রামের মানুষ, চরের মানুষ মিশে গেল শহরের মানুষের সঙ্গে। ইতর ভদ্র।

জগৎ ডাক্তার কাছাকাছি এক গাঁয়ের ডাক্তার। দেখতে এসেছিল। মধ্যবয়সী গোলগাল মানুষটি। ছড়ানো ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ছুটতে ছুটতে—থপ্ থপ্ করে। গলায় স্টেথিসকোপ জড়ানো। সার্টের ওপরে ধুতি পরা—মাথায় সোলার হ্যাট। গিয়ে ঝুঁকে পড়ল বুড়ো মাস্টারের মুখের ওপরে। নাড়ি টিপলে। তারপর গাঁয়ের মানুষের দিকে জোরে জোরে হাত নেড়ে বললে চীৎকার করে, "এই—জল—জল। তাড়াতাড়ি"—

দারোগা ক্ষেপে গেছে। রুখে এল, "সরে যান আপনি—নইলে আমি এ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।"

জগৎ ডাক্তার বললে, "আমি নুন তৈরি করতে আমি নি—চিকিৎসা করতে এসেছি।"

"সে ওদের ডাক্তার আছে—দেখবে।"

জগৎ ডাক্তার কয়েক পলক চেয়ে রইল দারোগার দিকে—কঠিন স্থির দৃষ্টিতে। বললে কেটে কেটে, "আমি কাকে চিকিৎসা করবো না-করবো—সে কি আপনি বলে দেবেন! যান—সরুন, রোগী দেখতে দিন।"

"এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না।" দারোগা একরোখা। ডাক্তারের হাত ধরলে।

হৈ হৈ করে উঠল ভিড়ের জনতা—"হাই দ্যাখ—মোদের ডাক্তারবাবুকে টানা-টানি করছে।"...

মাঠের ছড়ানো জনতা এগিয়ে আসছে হৈ হৈ করে। দমে গেল দারোগা। চাপা ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে বললে, "আ-চ্ছা।"—ছেড়ে দিলে ডাক্তারের হাত।

ডাক্তার বললে, "ভুলবেন না—আমি আপনারও চিকিৎসা করেছি।"

পুলিশ কম। দারোগা সেদিন পিছু হটলে। [ক্রমশঃ]

অপরাহ্ণবেলার মাজা তকতকে নীল আকাশ। নিকোনো ঝাঁটি-দেওয়া উঠোনের মতো, একবিন্দু মেঘ নেই কোথাও। যেন কোন গৃহবধূ ঘন নীল প্রাঙ্গণটা থেকে মেঘের জঞ্জালগুলোকে ঝেঁটিয়ে দিয়ে পরিচ্ছন্ন করে রেখে গেছে।

বলাই অনেকক্ষণ ধরে আকাশ দেখল। দৃষ্টিটাকে সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতম করে দূরবীণের মতো মেলে ধরে আকাশের সমস্ত কোণ তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু সমস্ত দিকেরই শূন্যতার কাছে ধাক্কা খেয়ে ওর চোখ নিজের কাছে ফিরে এল। আকাশের দশ-দশটা দিক যেন চীৎকার করে বলে উঠল—নেই, নেই, নেই। শূন্যতার এই ধ্বনিহীন, ভাষাহীন বিস্তীর্ণ চীৎকার সমগ্র প্রান্তর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। অবশেষে একটি একক শব্দে সংহত হয়ে বলাইয়ের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর তার কঠোর দাঁত আর ধারালো নখর দিয়ে ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতে লাগল। বলাইয়ের চওড়া কপাটের মতো শক্ত বুকখানা হাওয়া-দোলা পল্লবের মতো থরথর করে কাঁপতে থাকল।

এখন রোদ্দুরের রঙ কি চমৎকার সোনালী! রৌদ্রের এই স্পর্শসুন্দর স্বর্ণালী স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে আকাশটা কি চমৎকার আরামেই না ঝিমোচ্ছে! শেষবেলার অপরূপ আবহাওয়ায় অকূল যোজন-বিস্তীর্ণ প্রান্তর কেমন মায়াময় হয়ে উঠেছে! এতক্ষণ রোদ্দুর ছিল কাঠফাটা। প্রচণ্ড তাতে গা পুড়ে যাচ্ছিল। এখন হাওয়া উঠেছে। শরীর যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে।

কিন্তু বলাইয়ের ভেতরটা জ্বলছিল। এখন সেখানে একটা আঁচের উনোন দগদগ করছে যেন। মাথার চুলগুলোকে বুনো শুয়োরের উন্মত্ততায় ছিঁড়ে উপড়ে নিতে কিংবা ইস্পাত-শক্ত আঙুলগুলো দিয়ে বুকের মাংসগুলোকে খাবলে খুবলে ছড়িয়ে তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করছে। পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

দূরের আকাশে সূর্য ঢলে পড়ল। শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিভে-যাওয়া

ছাইয়ের মতো বিবর্ণতা নেমে আসছে চারদিকে। মাঠের প্রান্তগুলো ক্রমশ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। ভীষণ নিঃশব্দ। সমস্ত মাঠ জুড়ে কোন জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। বলাইয়ের কিরকম গা ছমছম করতে লাগল। মনে হতে লাগল দুরান্তের ওই কালো-হয়ে-আসা জায়গাগুলো থেকে অসংখ্য বিকটাকৃতি অদ্ভুত ঘন কালো জীব থপথপ করে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। সারা রাত ধরে তারা মাঠটায় বীভৎস উৎসব করবে। মাঠের বুক চিরে রক্তপান করবে। তার মেদ-মাংস-মজ্জা চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে চেটে-পুছে। সকালের উজ্জ্বল অমল আলোয় কেউ কল্পনাও করতে পারবে না কাল রাত্রে এখানে এমন ভয়ানক আমোদ-উৎসব হয়ে গেছে। বলাই জানে, রোজ রাতে তারা আসে। সারা রাত ধরে উৎসব-উল্লাস করে। সকালের আলো ফুটে ওঠার অনেক আগেই ঘরে ফিরে যায়। তাদের নিশ্বাসে বিষ ঝরে। তাদের লালায় দূষিত ক্ষতের সৃষ্টি হয় মাটির শরীরে। দিনের পর দিন তারা আসে, বিষাক্ত নিশ্বাস আর দূষিত লালায় মাটির হৃৎপিণ্ডে দুরারোগ্য অনুর্বরতা ব্যাধির বীজ বুনে দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। সন্ধ্যার মুখ-আঁধারিতে তারা আসে। তারা আসছে। গোধূলি-মলিন দিগন্তের ছায়াচ্ছন্নতা থেকে উৎসবের বাজনার গম্ভীর দ্রিম দ্রিম শব্দ আবছা ভেসে আসছে, বলাই শুনতে পাচ্ছে যেন।

বলাই জানে এমনভাবে আর কিছুদিন চলতে থাকলে তাদের গ্রাম ছারখার হয়ে যাবে। মানুষগুলো না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাবে। তাদের এমন সোনার গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে। বলাইয়ের বুক ফুঁড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

গোধূলির মলিন আলোয় বলাই চারদিকে তাকাল। কোথাও একফোঁটা সবুজের আভাস নেই। ঘাসগুলো পর্যন্ত জ্বলে গেছে। মাটি শুকনো, খটখটে, ধূসর। ফাটলগুলো তৃষিত মুখের মতো হাঁ হয়ে আছে। দগদগে ঘায়ের মতো। কান পেতে থাকলে কি ওদের আর্তনাদ শোনা যাবে? ধরিত্রী কি তৃষ্ণায় বুক-ফাটা কান্না কাঁদছে?

কিছু দূর দিয়ে একদল পাখী কিরকম চীৎকার তুলে সবেগে উড়ে চলে গেল। কেমন গোঙানীর মতো মনে হল চীৎকারটা। বলাই ভয় পেল। ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মাথা নেড়ে মনেমনে বলল, 'এ সব ভাল লক্ষণ নয়। পাখীদের গলা থেকে এমন কান্না বেরোলে দেশে মড়ক লাগে, দুর্ভিক্ষ হয়।' পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের কথা এখনও তার কিছু কিছু মনে আছে।

বলাই আর একবার আকাশের প্রান্তের দিকে তাকাল। দিকচক্রবাল ভাল করে লক্ষ্য করা গেল না। প্রথম সন্ধ্যার হাল্কা আঁধার দিগন্ত আকাশ অদৃশ্য করে দিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলাই বাড়ির পথ ধরল।

শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে এল। অথচ একফোঁটা বৃষ্টি নেই। আকাশ কোন সাড়াশব্দ করছে না। মুখ বুজে বোবা হয়ে বসে আছে। চাষীরা মাঠে লাঙল নামাতে পর্যন্ত ভরসা পাচ্ছে না। আর কিছুদিন আকাশ এমনি চুপ মেরে থাকলে এবছর চাষই বন্ধ হয়ে যাবে। একদানা শস্য হবে না মাঠে। অথচ না হলে—না হলে যে কি হবে ভাবতেও বুকের ধুকপুকুনি থেমে আসতে চায়।

অন্যান্য বছরের কথা মনে পড়ল বলাইয়ের। এ সময় অন্যান্য বছর মাঠে কত জল! আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। শ্রাবণ মেঘ ক্যাপার মতো জল ঢালে। ফণার মতো ঢেউ। অসংখ্য অগুণতি, লাখো লাখো অর্বুদ অর্বুদ। ফকফক করে, ফোঁসে। ছোবল মারে উঁচু আলের গায়ে। আর এবছর? খরার বিষ নীল করে দিল মাঠ, ঝলসে দিল মাঠের সবুজ। বলাই যে দেখেছে খরা-দৈত্য কেমন করে দিনের পর দিন মাঠের সবুজগুলোকে গলা টিপে হত্যা করেছে। বলাই ভাবল, আকাশ কেন এত খেয়ালী? মানুষের প্রাণের কোন দামই নেই কি তার কাছে?

গত বছর খুব ভাল ফসল হয়েছিল। গ্রীষ্ম সুরু হতে-না-হতেই বৃষ্টি নেমেছিল। সমস্ত মাঠ সমুদ্দুর হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ভেসে উঠেছিল আর এক সমুদ্র। সবুজের সমুদ্র। নধর পুষ্ট ধানগাছের অথৈ সবুজে সারা প্রান্তর আলো হয়ে উঠেছিল। তার তুলনায় এবছর? একই প্রশ্ন বলাইয়ের মনে চীৎকার করে ফিরতে থাকল, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর?

চারদিকে ঘন অন্ধকার নেমেছে। বাঁধা কোন রাস্তা না থাকাতে সাবধানে পথ ঠাওর করে চলতে হচ্ছে। মেঠো রাস্তা ক্রমশ শেষ হয়ে এল। মাঠ ছেড়ে সড়কে উঠতে গিয়ে অসাবধানতাবশত একটা ঝোপে হোঁচট খেল বলাই। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সারা শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। মাথাটা যেন শূন্যে দুলতে থাকল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল বলাই। কেমন দুর্বল বোধ হল। শরীরে তার অসুরের মতো শক্তি। অসুখ-বিসুখ আদপে করে না। অসুস্থতা কাকে বলে জানে না। তাহলে অসহায় আর দুর্বল বোধ হচ্ছে কেন? বলাই প্রশ্ন করল নিজেকে। আর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ল বেশ কিছুদিন ভাল করে খাওয়া জুটছে না। খোরাকীতে ইতিমধ্যে টান পড়ে গেছে। মস্তো জোয়ান সে, তিন-চারজন সাধারণ মানুষের খাবার একাই খেয়ে নিতে পারে। বিয়ে-থার বাড়িতে অসুরের খাওয়া খেয়ে কতজনকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সে। কিন্তু সেভাবে এখন খেতে গেলে সংসারের আর সকলের অন্ন কেড়ে খেতে হয়। বলাই ততখানি অবিবেচক নয়। তাই একটু সমঝে চলতে হচ্ছে। কিন্তু এভাবে চলতে গিয়ে শরীর যে বেশ কমজোরী হয়ে গেছে তা বুঝতে পারা গেল। না হলে সামান্য হোঁচট খাওয়ায় শরীর ঝিমঝিম করে উঠত না।

একা হলে তেমন ভাবত না বলাই। কিন্তু সে একা নয়। একটা সংসারের ভার তার মাথায়। খুব বড় না হলে, সংসারটা ছোটও নয়। বাবা, মা, ভাই, বোন, সে নিজে আর তার স্ত্রী। মোট ছজন। সে নতুন বিয়ে করেছে। বয়স পেরিয়ে যেতে বসলেও সংসারের অবস্থা দেখে তার বিয়ে করবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। তারা তো কষ্ট পাচ্ছেই, আরও একজনকে শুধুশুধু কষ্ট দেওয়া কেন? কিন্তু বাবা-মা'র উপরোধে বিয়ের মন্তর পড়তেই হল। অবশ্য রান্নাবান্নার অসুবিধেও এর একটা কারণ। মা বুড়ো, বোনটির সবে এগারো বছর। এতগুলো লোকের রান্না, ঘরের কাজ করতে তাদের কষ্টই হত। এইজন্যেই বিশেষ করে বলাইয়ের বিয়ে করা। কিন্তু বউকে তেমন সুখী করতে পারছে না সে। বউ মুখ ফুটে কিছু বলে না যদিও, বলাই তো বোঝে। বউয়ের মুখ দেখে মনের খবর সব টের পায় সে। বউয়ের জন্যেও কষ্ট পায় বৈ কি বলাই।

বাড়ি ফিরে বলাই সোজা নিজের ঘরে গিয়ে নড়বড়ে তক্তাপোষটার ওপর শুয়ে পড়ল। খুব ক্লান্ত লাগছে। শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। ঘরের এককোণে পিদিম জ্বলছে। বোধহয় তেল নেই তেমন পিদিমটায়। সলতেটা পুড়তে পুড়তে শেষ হয়ে এসেছে। পিদিমের গর্ভে জ্বলছে। ধোঁয়াটে মলিন আলো লম্বা-চওড়া ঘরটার বিপুলতায় হারিয়ে গিয়ে সর্বত্র কেমন রহস্য বিস্তার করে দিয়েছে। বলাই শান্তভাবে চোখ বুজল।

কতক্ষণ এমনিভাবে কেটেছে খেয়াল নেই, চোখের ওপর হঠাৎ আলো পড়তে বলাই চোখ মেলে তাকাল।

কে?'

তখন সোনা এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা লম্ফ জ্বলছে।

'ওঃ, তুমি!' বলাই আস্তে আস্তে উঠে বসল।

'এসেই শুয়ে পড়েছ যে? শরীর খারাপ নাকি?'

'না।'

'কই, দেখি তোমার গা।' বলাইয়ের কপালে হাত রাখল সোনা। কিছুক্ষণ রেখেই দিল। বলাই ভাবল, সোনার হাতটা বেশ ঠান্ডা। মেয়েদের হাত বোধহয় অমনই হয়। শরীরটার তাপ যেন অর্ধেক জুড়িয়ে গেল। এমনি করে কিছুক্ষণ ওর ঠান্ডা হাতের ছোঁয়াটা কপালে জড়িয়ে থাকলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যেত। সোনা স্বামীর মনোভাব বোধহয় বুঝল না। হাত সরিয়ে নিল।

'না, গা বেশ ঠান্ডা। আমার অসুখ-বিসুখকে বড় ভয় করে।' বলাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে সোনা নরম গলায় বলল। বলাই পলকহীন চোখে সোনার দিকে চেয়ে রইল।

'তোমার ফিরতে এত দেরি হল যে? সন্ধ্যে তো কখন উৎরে গেছে!'

'মাঠের দিকে গিয়েছিলুম একটু। ঘুরতে ঘুরতে দেরি হয়ে গেল।'

'মাঠে তো এখন কোন কাজ নেই। রোজ রোজ যাও কেন?'

'যাই কেন?' বলাই আপনমনে উচ্চারণ করল। যেন নিজেকেই শুধোল সে। তারপর আবছা চাপা গলায় বলে উঠল: 'সে তুই বুঝবি না।'

'তা না-ই বুঝি। আমার বুঝে কাজ নেই। কিন্তু রোজ একটু সকাল সকাল ফিরো। অতো রাত কোরো না। তোমার ফিরতে রাত হলে আমার খারাপ লাগে।'

'এবার থেকে তাই হবে।' বলাই নিরুত্তাপ গলায় বলল।

সোনার হাতে তখনও লম্ফটা জ্বলছিল। লম্ফের জোরালো লালচে আলোয় সোনার মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ভরাট টসটসে মুখ। পানের মতো আকার। চমৎকার ছুঁচলো চিবুক। ডাগর ডাগর চোখ। স্বচ্ছ জলের দীঘির মতো শীতল এবং রহস্যময়। আঝারি কপালের ওপর মস্তো একটা গোল টিপ। পরনে সস্তা ছাপা শাড়ি। বেশ দেখাচ্ছে সোনাকে। বলাই নিস্পৃহ চোখে সোনার দিকে তাকিয়ে রইল।

সোনার মুখটা কাচের মতো মসৃণ আর ধাবালো দেখাল। যেন ভেতরের একটা চাপা আবেগ ওর ত্বককে স্ফীত ও তরল করে তুলছে। বলাই জানে, সোনা এখন কি চাইছে। কাজ থেকে ফিরে রোজই এমন সময় ও সোনাকে একটু আদর-সোহাগ করে। সোনা এখন একটু আদর চায়। কিন্তু বলাইয়ের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা সমস্ত মাথা জুড়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

'তোমার কি হল বল তো? অমন গোমড়ামুখ করে আছ কেন?' সোনার গলাটা রুক্ষ শোনাল। বলাই কোন উত্তর দিল না। একভাবে সোনার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'কি হল গো? কথা বলছ না কেন?' সোনা সহাস্যমুখে বলাইয়ের মাথা ধরে আলতোভাবে নাড়া দিল।

'ছাড়। আমার এখন ভাল লাগছে না কিছু।' বলাই আস্তে আস্তে ঠেলে দিল সোনার হাতটা।

সোনা কি রাগ করল? মুখ ভার করল? কিন্তু সোনার মুখে তো কোন রাগের ঘোষণা নেই। নির্বোধ শিশুর মতো সরল দেখাচ্ছে ওকে। বলাইয়ের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে। যেন বলাইকে বোঝবার চেষ্টা করছে।

একবার যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ধীর গলায় বলল, ক'দিনই তোমাকে অন্য-রকম দেখছি। মুখে হাসি নেই, ভাল করে কথা বল না, পেট ভরে খাও না, রাত্তিরবেলা ঘুমোও না। কি হয়েছে বল তো?'

সোনার এমন আদরভরা কথাতেও বলাইয়ের কাছ থেকে সাড়া এল না। আগের মতোই নির্বাক হয়ে বসে থাকল সে।

'আমাকে বলবে না? রাগ হয়েছে?' সোনা শাপলার ডাঁটার মতো সুবৃত্ত বাহু দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। বলাইয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'কি গো, বল না।'

'আমার মন ভাল নেই, সোনা!' বলাই শূন্যচোখে সোনার দিকে তাকাল।

'কেন?'

'আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।'

'কি জন্যে?'

'বুঝতে পারছ না? শ্রাবণ মাস ফুরিয়ে এল, এখনও মাঠে একফোঁটা বৃষ্টি নামল না। এমন করে কিছুদিন গেলে এবছর চাষবাসই বন্ধ হয়ে যাবে। কি যে হবে!' বলাইয়ের গলাটা ধরে এল।

'ও নিয়ে তুমি এত ভাবছ কেন?' সোনা সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'বৃষ্টি হবে, হবে। দু'-একদিনের ভেতরই হবে। আমি বলছি, হবে। দেখে নিও।'

বলাই কোন সান্ত্বনা পেল বলে মনে হয় না। ওকে খুব বিষণ্ণ এবং চিন্তিত দেখাল।

'কিছুদিন ধরে দেখছি মাঠ ছাড়া আর চিন্তা নেই তোমার। এত ভেবে কি হবে বাপু!'

'ভাবব না? মাঠ ছাড়া আর আমা-দের কি আছে সোনা? মাঠই তো আমাদের বাপ-মা। মাঠ ফসল না দিলে কি খেয়ে বাঁচব?'

সোনার মুখে কথা সরল না। বলাইয়ের ভারী আবেগপূর্ণ স্বর ওর মনকে নাড়া দিয়েছে। বিষণ্ণস্বরে বলল, 'দেবতা বিমুখ হলে কি করবে বল?'

'দেবতা!' বলাই উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'দেবতা আজকাল আছে নাকি? দেবতা সেকালে ছিল। যখন আকাশে বৃষ্টি থাকত, মাঠে ফসল ফলত। তখন মানুষের দুঃখ তারা দেখতে পেত। এখন দেবতা নেই।' একটু থেমে ধরা-গলায় বলল, 'মাঠের কি হাল হয়েছে তুই দেখিস নি সোনা। চোখ দিয়ে সে অবস্থা দেখা যায় না। মস্তো মাঠটা খাঁ খাঁ করছে। ফাটলগুলো হাঙরের গরাসের মতো হাঁ করে আছে। এক-দানা ঘাস পর্যন্ত নেই। দেখতে দেখতে মনে হয় মাঠটা জলের তেষ্টায় ছটফট করছে, কাঁদছে।'

'ও নিয়ে তুমি আর মন খারাপ কোরো না। সবই দেবতার হাত। চল, এখন খাবে চল।'

বলাই আর কথা বাড়াল না। খিদেও পেয়েছিল খুব। সেই তো দুপুরবেলা কখন খেয়েছিল। তাও ভরপেট নয়। মাঠের হাওয়ায় সে কখন হজম হয়ে গেছে।

সোনা ভাত-তরকারি ধরে দিল। বলাই তালপাতার চাটাইয়ের ওপর জুৎ করে বসল। ভাতের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'আর সবাই খেয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

ভাত মাখতে মাখতে হাত থামিয়ে বলাই সোনার দিকে তাকাল। সোনা হাঁটুর ওপর মুখ রেখে কি যেন ভাব-ছিল। বলাইকে থামতে দেখে শুধোল, 'কি হল?'

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

'না, কিছু না।' গ্রাস তুলল বলাই। পর পর কয়েক গ্রাস খেল। খেতে থাকলেও ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল খাওয়ায় মন নেই। কি যেন ভাবছে।

'হ্যাঁ রে সোনা।'

'কি ?'

'তোর এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?'

'কেন ?' সোনার স্বরে বিস্ময়।

'তুই তো বড়লোকের মেয়ে। তোর বাপের অবস্থা তো খুব ভাল।'

'তাতে কি হয়েছে ?'

'এখানে তোর ভাল করে খাওয়া পর্যন্ত জোটে না, পরার কথা তো বাদই দিচ্ছি। আমার সঙ্গে তোর বিয়ে হওয়া বোধহয় ঠিক হয় নি।'

'তোমার হল কি ? কি যা তা সব বকছ ? আমি কি কোনদিন তা বলেছি ?'

'বলিস নি। কিন্তু মুখ দেখে তো বোঝা যায়।'

'কিছু বুঝতে পারো নি তুমি। যত সব আজগুবি ভাবনা ভেবে শরীর-মন খারাপ করে ফেলছ। নাও, এখন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ কর দিকি। আমার খিদে পাচ্ছে।'

বলাই আপনমনে খেতে লাগল। ওর রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন মুখটা কি এক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রাত্রে বলাই স্বপ্ন দেখল।

...মেঘে আকাশ কালো হয়ে গেছে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। চিকন কালো জল ক্রমশ বেড়ে বেড়ে আল ছাপিয়ে গেল। সিক্ত মাঠের গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছে। অবশেষে পরস্পরের জমির সীমানাগুলো একাকার হয়ে গিয়ে জেগে থাকল নিঃসীম জলরাশি।

বলাই ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির বিরামহীন ঝম-ঝম শব্দ শুনতে পেল। সারা মাঠ জুড়ে আকুল পাগল হয়ে বৃষ্টি নামছে। মাঠের ওপর কালো মহিষবর্ণ আকাশটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এই ছবিটা পরিষ্কার বলাইয়ের চোখে ভেসে উঠল।

এমন সময় ঘরে থাকার কোন মানে হয় না। জল মাটি বৃষ্টির শব্দ ব্যাঙের ডাক তাকে ডাকছে। ঘুমের মধ্যে চীৎকার করে বলাই যেন সে ডাকের সাড়া দিল। তারপর হুড়মুড় করে উঠে পড়বার চেষ্টা করল।

ঘুম ভেঙে গেল বলাইয়ের। বৃষ্টির শব্দ, ব্যাঙের ডাক, জল, কিছুই নেই। বুঝতে পারল এতক্ষণ ও ঘুমোচ্ছিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। মনটা বিরক্তায় ছেয়ে গেল।

মাথার কাছে জানলা খোলা। শিয়রে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। এখন বোধহয় মাঝ-রাত। হাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারা-ছিটানো আকাশের একাংশ দেখা যায়। পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ অমল আকাশ। বলাই উঠে বসল। জানলার বাইরে চোখ মেলে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

'কি গো, ঘুম আসছে না ?'

বলাই চমকে উঠল। সোনার গলা। কখন জেগে উঠেছে।

'এতক্ষণ তো ঘুমোচ্ছিলুম। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল।'

'না, তুমি দেখছি একটা শক্ত অসুখ না বাধিয়ে ছাড়বে না।'

বলাই উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

মস্তো একটা দাঁতাল বঁটিতে খড় কাটছিল সোনা। বলাই ছুটতে ছুটতে এল। এক-গা ঘাম, হাঁপাচ্ছে, জোরে-জোরে শ্বাস নিচ্ছে।

'বউ-বউ।'

'কি হয়েছে গো ? এত হাঁপাচ্ছ কেন ?'

'দেখবি আয়।'

'কি দেখব ?'

'আয় না। বাইরে আয়।' বলাই হিড়হিড় করে টানতে শুরু করে দিল। টানের চোটে সোনার বে-আব্রু হবার যোগাড়। স্খলিত বসন যথাস্থানে ন্যস্ত করতে করতে কৃত্রিম রাগত গলায় সোনা বলল, 'আঃ, কি হচ্ছে। বাবা-মা আছে না ? দেখে ফেললে কি ভাববে বল তো ?'

'কিছু ভাববে না।' সোনাকে টানতে টানতে বলাই পাঁচিলের বাইরে আনল। তারপর সুদূর দিগন্তের দিকে আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওই দেখ বউ, কি রকম মেঘ করেছে। কি ঘন কালো মেঘ দেখ !'

সোনা দূরে চোখ ছড়িয়ে দিল। সত্যিই দিগ্বলয়ের দিকে সমস্ত পশ্চিম আকাশ অরণ্যের মতো ঘন কালো দেখাচ্ছে। এক-দল দুর্বার ঘোড়সওয়ার যেন দুরন্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। তাদের পায়ের ক্ষুর-নিক্ষিপ্ত ধুলোয় আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। একটা স্নিগ্ধ আর্দ্রতা ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

'কেমন আলকাতরার মতো কালো মেঘ দেখ বউ। আঁধারের মতন কুচকুচে। এ মেঘে বিষ্টি না হয়ে যায় না।'

'তাই যেন হয়।' প্রার্থনার মতো নিবিড় গলায় বলল সোনা। তারপর মুহূর্তের মধ্যে স্বর বদল করে গলায় আদুরে ঢঙ এনে বলল, 'বাব্বা ! খালি মাঠ আর মেঘ ! মাঠের কথা ভেবে ভেবে আমার কথা ভুলতে বসেছ।'

'তোর রাগ হচ্ছে, সোনা ?' কোমল গলায় শুধোল বলাই।

'হবে না ? মাঠকে তুমি আমার সতীন করে তুলেছ। আমি যেন তোমার আগের বউ, মাঠ এ-পক্ষের।'

'তুই তো বেশ কথা বলিস রে সোনা।' খুশি খুশি গলায় বলল বলাই, তারপর দুটো আঙুলের ডগা দিয়ে সোনার চিবুক নেড়ে দিল। স্বামীর আদর চোখ বুজে গ্রহণ করে সোনা পরিতৃপ্ত গলায় বলল, 'দেখো, আজ রাতেই বৃষ্টি হবে।'

'তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

আশ্চর্য ! সেই রাতেই বৃষ্টি নামল। আকাশ ছেঁদা করে বৃষ্টি নামল। টোপা-কুলের মতো বড় বড় বৃষ্টি নেমে এল। জলের কলস্বরে ছেয়ে গেল চারদিক। ঘুম ভেঙে যেতেই বলাই শুনতে পেল চতুর্দিক থেকে হল্লা করতে করতে কারা যেন ছুটে আসছে। বলাই চমকে উঠে বসল। ও কিসের শব্দ ?

জানলা খোলা ছিল মাথার সামনে। বৃষ্টির খবর নিয়ে এক-ঝলক ভিজে হাওয়া ঝাপ্টা হানল বলাইয়ের মুখে। বলাই বাইরে চোখ মেলল। পর্দার মতো বৃষ্টির অব-রোধের সামনে দৃষ্টি আটকে গেল। বাদুড়-বর্ণ অন্ধকার। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল। আকাশপাড়ায় একদল ঢাকী যেন সবলে ঢাকে কাঠি দিল।

গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ছাট এসে মুখে লাগছে। ভিজে যাচ্ছে চুল। বলাই মুখ সরাল না। সূক্ষ্ম বিন্দুগুলো সোহাগের মতো মুখে এসে লাগছে। বৃষ্টির আর্দ্র ঘ্রাণ পাচ্ছিল যেন বলাই। আঃ, কি আরাম। বলাই চোখ বুজল আবেশে।

বিদ্যুৎ চমকাল। তার দলছুট কিছু আলোককণা ঘরের ভেতর ঢুকল। সোনার ঘুমন্ত মুখখানাকে একবার উদ্ভাসিত করে দিয়ে গেল। বলাই আস্তে আস্তে ঠেলা দিল, 'বউ, এই বউ।'

'কি ?' সোনা ধড়মড় করে উঠে বসল।

'বৃষ্টি হচ্ছে।'

'কি হচ্ছে ?'

'বৃষ্টি, বৃষ্টি।'

'বৃষ্টি !' সোনা উঠে বসল। ওর গলায় বিস্ময়ের ছোঁয়া। ঘুমের ঘোর তখনও ভাল করে কাটে নি। কিন্তু সামান্যক্ষণের নীরবতা ধারাপাতের অনবচ্ছিন্ন শব্দকে ঘরের মধ্যে স্পষ্ট করে তুলতে সোনা কল-কলিয়ে উঠল, 'ওঃ, বৃষ্টি। বৃষ্টি হচ্ছে !' সোনা জানলার সামনে মুখ বাড়িয়ে দিল। রেণু রেণু বৃষ্টি ওর চুল মুখ গলা সিক্ত করে দিল। ঠাণ্ডা বাদলা হাওয়া নাক দিয়ে টেনে নিতে নিতে স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় বলল, 'আঃ, বৃষ্টি ! বৃষ্টি ! কতদিন পরে বৃষ্টি !'

কিছুক্ষণ তারা কোন কথা বলল না, বলতে পারল না বোধহয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়-গুলোকে একটি শব্দের অভিমুখী করে সেই দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য বৃষ্টিকে অন্তর

করতে থাকল। শব্দ হাওয়া বৃষ্টি উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছিল। সমস্ত পৃথিবী ওদের কানে একটি শব্দকেই বাজাতে লাগল, সমগ্র সত্তার মধ্যে কেবল একটি ধ্বনিই মুখর হয়ে উঠল।

এমন একাগ্রতায় কতক্ষণ কাটল খেয়াল নেই। হঠাৎ বলাই তার গলায় পিঠে চাপ অনুভব করল। বিদ্যুৎ চমকাল বাইরে। কিছু আলোর ভগ্নাংশ ঘরে ছিটকে এল। সেই আলোয় বলাই দেখল সোনা অদ্ভুত চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'বৃষ্টির শব্দ কি মিষ্টি!' সোনার স্বরে মুগ্ধতা।

বলাই উত্তর দিল না। গলায় সোনার হাত যেন আরো চেপে বসেছে।

'কি ঠাণ্ডা! আঃ, আজ সারা রাত ধরে শুধু ঘুম।' সোনার আবিষ্ট মুগ্ধ স্বর ভাসতে-থাকল ঘরের হাওয়ায়। গলাটা শিরশির করে উঠল বলাইয়ের। সোনার নরম সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা আঙুলগুলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে গলায়।

'ব্যাঙ ডাকছে। বৃষ্টি পড়ার সময় ব্যাঙের ডাকও কেমন ভাল লাগে।'

'সমস্ত মাঠ এখন জলে থই-থই করছে।' স্বগতোক্তির মতো শোনাল বলাইয়ের গলা।

'প্রাণ ভরে জল শুষে নিচ্ছে মাটি। কতকাল পরে জল পেয়েছে।' বলাই তন্ময় গলায় বলল। তৃষার্ত মাটির পরিতৃপ্ত মুখ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে যেন সে।

'আঃ, তুমি কি!' সোনার স্বরে প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতা।

'মাঠ এখনই সমুদ্দুর হয়ে যাবে। জলে জলে একাকার হয়ে যাবে সব। জল এখন ফোঁস ফোঁস করে ঘা মারছে আলের গায়ে। কিছুক্ষণ পরে আল ছাপিয়ে যাবে।' বলাই যেন ঘোরের মধ্যে বলছে কথাগুলো, কোনদিকে হুঁশ নেই তার।

'মাঠে আমার অনেক কাজ এখন। কিন্তু বৃষ্টি যে ভীষণভাবে পড়ছে।' সেই আত্মগত সুর বলাইয়ের কণ্ঠে।

'পড়ুক বৃষ্টি, আমি ডরাই না।' বেপরোয়া গলায় বলাই বলে উঠল।

'আমাকে যেতে হবে।' বলাই ফিসফিস করে বলল। তারপর গলা বুক থেকে সোনার সাপের মতো পেঁচিয়ে-ধরা দুটো হাতকে সবলে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল নিষ্ঠুরভাবে: উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমায় যেতেই হবে।'

'কোথায়?' সোনা যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল।

'মাঠে।'

'মাঠে? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

'না। তুমি জানো না, মাঠে না গেলেই নয়। অনেক কাজ আছে।'

'কিন্তু এই রাত্তিরবেলা, এমন ঝড়-বৃষ্টি নিয়ে, কেউ মাঠে যায়?'

'যাওয়া না যাওয়া লোকের ইচ্ছে। আমাকে যেতেই হবে।'

'সকালে যাবে।'

'না। মাঠের আলগুলোকে রক্ষে করতে না পারলে সব জল বেরিয়ে যাবে।'

'যেতে পাবে না তুমি এখন।' সোনা রীতিমতো উত্তেজিত।

'আঃ সোনা!' বলাই প্রচণ্ড অসহিষ্ণু গলায় ধমকে উঠল।

'এই অন্ধকারে কেউ বেরোয়!' সোনা স্বামীর ধমকানি গ্রাহ্যে আনল না, 'বিপদ-আপদ একটা ঘটে যেতে পারো তো!'

'হোক বিপদ, আমি যাবো।' বলাই যেন নেশার উত্তেজনায় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একরকম সোনার শরীর ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়ল।

'যেও না।' সোনা চেঁচিয়ে উঠল। সে-ও নেমে এল। দরজার সামনে হাত দিয়ে রুখে দাঁড়াল।

'ছেলেমানুষী করিস না, সরে যা!' বলাই তিক্তগলায় উচ্চারণ করল।

'না, যেতে দোব না।'

'আঃ!' অসহ্য অসহিষ্ণুতায় উচ্চারণ করল বলাই।

আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। বজ্রপাত হল কোথাও। কপাটের শেকলটা আওয়াজের ধাক্কায় একরকম ধাতব প্রতিবাদ তুলল।

'ওই শোন, বাজ পড়ল।' সোনার সভয় কণ্ঠস্বর।

'পড়ুক।' দাঁতে দাঁত চেপে বলাই বলল।

'সাপ বেরিয়েছে মাঠে। সাপে সাপে ছেয়ে গেছে মাঠ। নতুন বর্ষার জল পেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে ওরা। মানুষকে ডরাবে না।'

'সাপ আমার কিছু করবে না। না হয় কামড়াবেই। তখন আমার মরামুখ দেখে যতো ইচ্ছে শোক করিস।'

'বিরক্ত করছিস বড্ড তুই।' বলাই কঠিন হাতে সোনাকে টান দিল। সেই আকর্ষণ সোনার পলকা দেহটা সহ্য করতে পারলো না। ছিটকে সরে গেল একপাশে। বলাই বাইরে পা দিল।

'যেও না।' সোনার গলা আর্তনাদে চিরে গেল। বলাই ফিরল না। বাইরে অন্ধকার এবং বৃষ্টির মধ্যে একাকার হয়ে গেল তার শরীর

সংস্কৃতি-বিষয়ক

গ্রন্থমালা

বৈষ্ণব পদাবলী	সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সঙ্কলিত প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ। [২৫·০০]
ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]
রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত	সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত যুগোপযোগী প্রকাশনায় সৌষ্ঠবমণ্ডিত। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা। সূর্য রায় অঙ্কিত বহু রঙীন ছবি। [৯·০০]
বাঁকুড়ার মন্দির	শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৬৭টি আর্ট প্লেট। [১৫·০০]
উপনিষদের দর্শন	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপনিষদ-সমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·০০]
রবীন্দ্র-দর্শন	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদের সরল ব্যাখ্যা। [২·৫০]
ঠাকুরবাড়ীর কথা	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের সুষ্ঠু আলোচনা। [১২·০০]
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি	ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার গবেষণামূলক সরল আলোচনা। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [১০·৫০]
ভোটনিউ	অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ভূমিকা। [৩·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯

রেখচিত্র

রেখচিত্রকে পাশ্চাত্য ভাষায় গ্রাফিক আর্ট বলে। বর্তমানে এ গ্রাফিক আর্ট কথাটি আমাদের কাছে যত ঘনিষ্ঠ রেখচিত্র ততটাই দুর্বোধ্য। অথচ এ পদ্ধতিতে শিল্পরচনা আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কলাপদ্ধতিগুলির অন্যতম। প্রাচীন যুগের বস্ত্র অলংকরণের জন্য কাঠের ছাপ নির্মাণ প্রয়োজন হত। সেই অলংকৃত কাষ্ঠখণ্ড এবং তার থেকে ছাপ গ্রহণের পদ্ধতি রেখচিত্র পদ্ধতিরই আর এক রূপ।

প্রাচীন পুঁথি অলংকরণে বা লিখনের জন্য ভূর্জপত্রের ব্যবহার যেমন হিমালয় সান্নিধ্যের জনপদগুলিতে প্রচলিত ছিল, পূর্ব এবং দক্ষিণ দেশে তেমনি শোধিত তালপত্রের ব্যবহার সুপ্রাচীন ব্যবস্থা। শিলালেখ নির্মাণে যেমন খোদাই পদ্ধতির ব্যবহার হত, তাম্রলেখ রচনায় যেমনি খোদাই করা বা খোদকারী করার প্রথা প্রচলিত ছিল তেমনি দক্ষিণ দেশে তালপত্রের পুঁথি রচনায় শলাকা লিখন বা তীক্ষ্ণাগ্র সূক্ষ্ম বিন্দু সংযুক্ত ধাতু শলাকার দ্বারা শোধিত তালপত্রের মসৃণ অঙ্গ খোদাই করে চিত্র বা লিপি রচনার প্রথা প্রচলিত ছিল। পরে এই তালপত্রগুলির মসৃণ জমিতে বর্ণ প্রয়োগ করার ফলে খোদিত অংশগুলির শুভ্রতা অমলিন থেকে এবং অতি সুস্পষ্ট সূক্ষ্ম রেখচিত্র বা মুক্তাক্ষরা লিপিমালায় পরিণত হয়। রেখচিত্র নির্মাণের পদ্ধতিগুলির অন্যতম এ ব্যবস্থা।

মধ্যযুগের অস্ত্র বা তৈজস অলংকরণে অথবা বিচিত্র সৌধমালা অলংকরণের জন্য মীনাগারী বা কফতগারী পদ্ধতিও রেখচিত্র নির্মাণ পদ্ধতির আর এক রূপ। আগ্রা দেহেলির মর্মর সৌধাবলীতে এমন বিচিত্র মীনাগারী আজও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সংগ্রহশালা বা শীলেখানায় সংগৃহীত দামাস্কানী বা কফতগারী চিত্রিত অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্রের বিচিত্র সংগ্রহ দেশীয় রেখচিত্র পরম্পরার হদিশ দেবে। ধাতু অঙ্গ খোদাই-এর জন্য যেমন অনেক ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণাগ্র ছেনি বা ছুরিকার ব্যবহার করা হয়েছে এই সব বস্তু নির্মাণে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে অম্লজারিত রেখা নির্মাণ (এচিং) পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে বহু ক্ষেত্রে।

বৌদ্ধ পুঁথি রচনা ও তাংখা কিংবা বৈজন্ত অলংকরণের জন্য হিমালয়ের সানুদেশের জনপদগুলিতে বৌদ্ধ মন্ত্র বা চিত্র রচনার ব্যবস্থা আছে। বৈজন্ত বা তাংখার বহু সংখ্যায় নির্মাণের প্রয়োজনকে সহজ করার জন্য কাঠের ছাপ নির্মাণ ও তার থেকে মুদ্রণ আজও প্রচলিত পদ্ধতি। এমন কি তিব্বতী বৌদ্ধ পুরাণ-যুগল তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর-এর সম্পূর্ণ গ্রন্থটি কাঠের ছাপে মুদ্রণ ব্যবস্থা বহু হিমালয়স্থ বৌদ্ধ বিহারে এখনও প্রচলিত আছে। এ পদ্ধতি ও এমন পুস্তক রচনা বা বস্ত্র অলংকরণ পদ্ধতি ভারতীয় রেখচিত্র নির্মাণ পরম্পরার হদিশ দেয়।

কোম্পানীর আমলে কলকাতার এবং দিনেমার ডাঙ্গা শ্রীরামপুরের গীর্জার আওতায় নতুন করে এ শিল্প নির্মাণ পদ্ধতির প্রচলন হয় এদেশে। প্রখ্যাত কারিগর পঞ্চানন কর্মকার সাহেবদের সহযোগিতায় বঙ্গাক্ষরের নতুন ছাপ নির্মাণ করে এদেশে মুদ্রণ পদ্ধতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। তারপর বটতলার কল্যাণে বাংলাদেশে এই রেখচিত্র পদ্ধতির দ্বারা মুদ্রিত ও শোভিত বহু পুস্তকাবলী আমাদের নাগালে আজও আছে। তবু কোম্পানীর আমলের এই রেখচিত্র ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের নব আবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলির মত ঘনিষ্ঠ দেশজ রেখচিত্র পরম্পরার সঙ্গে ততটা নয়।

অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক নব্য ভারতীয় চিত্র-আন্দোলনের সময় আবার নতুন করে ভারতীয় শিল্প-পরম্পরার হদিশ খোঁজা শুরু হয়; তখন থেকেই চীন ও জাপানের কাঠখোদাই—মুদ্রিত চিত্রাবলীর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা রচিত হল। পশ্চিম থেকে অম্লজারিত রেখচিত্র পদ্ধতি শিখে এলেন শিল্পী মুকুল দে। আচার্য নন্দলাল রচনা করলেন তাঁর বিচিত্র কাঠখোদাই, লিনোখোদাই এবং অম্লজারিত চিত্রাবলী। রামেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরেন্দ্রনাথ দাস, সোমনাথ হোড়, একের-পর-এক শিল্পিবৃন্দ দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন রেখচিত্র নির্মাণ পদ্ধতিতে বিচিত্রতম কাজ করেছিলেন ও করছেন আজ পর্যন্ত।

সম্প্রতি কলকাতায় জার্মানীর প্রখ্যাত রেখাচিত্রশিল্পী কেথে কোলভিৎস-এর যে প্রদর্শনী হয়ে গেল তার যথাযথ রসগ্রহণের প্রয়োজনে এবং এ-পদ্ধতির সম্ভাবনা ও সুযোগ সম্বন্ধে অবগত হবার জন্য এদেশে রেখচিত্র নির্মাণের কাল, পরিবেশ এবং কার্যকারণ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হলো।

—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শিল্প ও জনচেতনা : কেথে কোলভিৎস

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামী শিল্পীদের মধ্যে কেথে কোলভিৎস এক বিশিষ্ট নাম। আজকের শিল্পরসিক জগৎ এ নামটির সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ এবং সেজন্য ভারতবর্ষেও তিনি সমান পরিচিতি পেয়েছেন। দেশের গণ্ডী পেরিয়ে, জার্মান সীমান্ত ছাড়িয়ে দিগ্বিজয়ী এ নাম আজ প্রতিটি যুযুধান মানুষের সাথী—সহমর্মী।

জার্মানীর প্রগতিশীল উচ্চ-মধ্যবিত্ত পারিবারিক পরিবেশে তাঁর শৈশব কেটেছিল। পিতা, পিতামহের উত্তরাধিকারীরূপে তিনি সংবেদনশীল মানবিকতার প্রতি সুতীক্ষ্ম আগ্রহ লাভ করেছিলেন। জন্মকাল ১৮৬৭ সালের ইউরোপের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের পটভূমিতে শিল্পী কেথে কোলভিৎস-এর মানসিকতা শোধিত হয়েছিল।

কেথে কোলভিৎস-এর এই সহমর্মী শিল্প রচনার প্রেরণা খুঁজতে গেলে তাই আমাদের ফিরে যেতে হবে সেদিনের সেই সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের উত্তরণের যুগ-

জনন. শিল্পী : কেথে কোলভিৎস

মধ্যকক্ষণে। সেদিনের সেই সংবেদনশীল মহাশিল্পীগোষ্ঠী যাঁদের প্রেরণা সদাজাগ্রত ছিল কেথে কোলভিৎস-এর সৃষ্টির মধ্যে তাঁদের কয়েকটি নাম হঠাৎ মনে পড়েছিল (গত ২২শে—২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) কলকাতার আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত কোলভিৎস-এর প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে। যেমন—ডাচ শিল্পী রেমব্রাণ্ট, স্পেনীয় শিল্পী গোয়া, ফরাসী শিল্পী দেলাক্রোয়া, কুর্বে, দমুয়ের, ভ্যানগগ, ল্যুতরেক, সমকালীন জার্মান শিল্পী স্টাইনলেন, বেলজিয়ান শিল্পী মিউনিয়ের প্রমুখ শিল্পিবর্গের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রেরণা প্রতিফলিত হয়েছিল সেদিন এ শিল্পীর শিল্পসম্ভারের মাঝে, বিষয়বস্তু, রেখা ও অনুস্থাপনের মধ্য দিয়ে। এ মহান শিল্পধারার অনুরণন সত্ত্বেও কোলভিৎস তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে এক নিজস্ব বিশিষ্টতা প্রকাশ করতে পেরে জগতের মহৎ শিল্পীসমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন এইটেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

গোয়ার "শহীদের মৃত্যু", দেলাক্রোয়ার "সেনামুখে স্বাধীনতা দেবী", কুর্বের "পাথর ভাঙা শ্রমিক" দমুয়ের-এর "মোপানী" বা "বুর্জোয়া", ভ্যানগগের "আলুখেকো পরিবার", ল্যুতরেকের নিচুতলার মেয়েদের নিয়ে রচনা, এসব মহৎ শিল্পবস্তুগুলিকে বার বার মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল—কোলভিৎস-এর রচনাসম্ভারগুলি।

শ্রমজীবী জনসাধারণের সহগামী শিল্পী তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে সংগ্রামরত দরিদ্র পরিবার বা শ্রমজীবীদের ঐতিহাসিক জীবন-সংগ্রাম বা মুক্তি আন্দোলনকে জীবন্ত করে রেখেছিলেন তাঁর মানবিকতায় সমুজ্জ্বল প্রতিটি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। একদিকে যেমন তাঁর ছবিতে দারিদ্র্য প্রতিভাত অন্যদিকে তেমনি মুক্তি-সংগ্রাম। দারিদ্র্য ও মুক্তি-সংগ্রামকে সহগামী করেও তাঁর রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে বহুক্ষেত্রে। যেমন—তাঁতীদের বিদ্রোহ চিত্রমালায় বা কৃষকদের যুদ্ধ চিত্রমালায়।

১৮৯৮ সালে যখন কোলভিৎস তাঁর তাঁতীবিদ্রোহ চিত্রমালা শেষ করেন তখনই জার্মানীর রসিক প্রগতিশীল এবং শিল্পসচেতন মানুষেরা এই শিল্পীর বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯০৮ সালে তিনি শেষ করেন কৃষকবিদ্রোহ চিত্রমালা। এ-রেখচিত্রমালা স্বভাবতই আরও পরিণত শিল্পকর্মের নিদর্শন হয়ে ওঠে, এবং শিল্পীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে তবুও সেদিনের স্থানীয় রাজতন্ত্রী সরকার তাঁকে কোনরকমই স্বীকৃতি দেন নি, তারপর ১৯১৮ সালে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পর কোলভিৎস যখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তখন তাঁর কিঞ্চিৎ দেশজ স্বীকৃতি লাভ সম্ভব হয়। এরপর ফ্যাসিবাদীদের অভ্যুত্থানে হিটলারী জার্মানী শিল্পীকে যত বেশি প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়েছিল এ সংগ্রামী শিল্পী ততই উজ্জীবিত হয়ে আপন সৃষ্টি দিয়ে ব্যাহত করেছিলেন সেই বিধ্বংসী প্রতিহিংসাবৃত্তিকে।

কলকাতায় কোলভিৎস-এর এটি দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান এমন এক বিচিত্র সময়ে আয়োজিত হলো যখন বাংলার নবীন শিল্পিকুল আত্মজিজ্ঞাসায় চিন্তামগ্ন। একদিকে যেমন পাশ্চাত্যের বিধ্বংসী ধনতান্ত্রিক কলুষে প্লাবিত দেশের সৃজনশীল মানসিকতা মোহগ্রস্ত; অন্যদিকে তেমনি সমাজতান্ত্রিক নবজাগরণে উদ্ভাসিত নবীন চেতনা এই ধনতান্ত্রিক কলুষমুক্ত হবার সাধনায় যখন বিক্ষুব্ধ-মানস, ঠিক তখনই এমন পথনির্দেশী বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারের সমাবেশ স্বভাবতই এক কার্যকরী প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারবে বলেই মনে হয়।

এ প্রদর্শনীতে মোট ৭৩টি রেখচিত্র ও ভাস্কর্যের চিত্র প্রদর্শিত হয়। তার মধ্যে ছিল কয়েকটি তাঁতীদের বিদ্রোহ চিত্রমালা ও কৃষকবিদ্রোহ চিত্রমালার ছবি। শ্রমজীবী জনমানসের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত "কার্ললীবক্নেখট স্মরণে" ১৯১৯, ১৯২০ (৩৫ ও ৩৬) অম্লজারিত রেখচিত্র (এচিং) এবং কাঠখোদাই ছবি দুটি বিষয়-বৈচিত্র্যে ও শিল্পগুণে মহৎ সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত যখন অবরোধকারীদের দ্বারা বিপন্ন হয়েছিল শিল্পীর তখনকার রচনা "রাশিয়াকে সাহায্য কর" (৩৯) লিথোছাপটি বিপন্ন প্রতিবেশীর সংগ্রামে সামিল শিল্পীর সহমর্মিতার নিরিখ। ভিয়েনার বুভুক্ষা অবলম্বনে মর্মস্পর্শী "ভিয়েনা মরছে" লিথোছাপের দেওয়ালচিত্রটি সমব্যথী শিল্পীর সমবেদনার প্রতীক। যুদ্ধ আর নয় বলো (শ্লোগানকে) হাতিয়ার করে লিথোছাপের সাহায্যে এঁকেছেন এক বিচিত্র শান্তি সংগ্রামের ছবি। মিছিল (৬৪), মৃত্যুর দিকে স্ত্রীলোকের প্রসারিত হাত (৬৫), ঝড় (১০), রুটি (৫০) প্রভৃতি সৃষ্টিগুলি শিল্পীর সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ।

জননীকে কেন্দ্র করে আর এক বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে শিল্পিমানসের। "জননী" (৩৪) লিথোছাপ, "মা" (৪৬) অম্লজারিত চিত্র, "মা তার শিশুদের রক্ষা করছে" (৬৮) লিথোছাপ, ভাস্কর্যের ছবি—"মা তার শিশুদের রক্ষা করছে" (৭৩) সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী কল্যাণী জননীর আত্মবিস্মৃত সৃষ্টি রক্ষা প্রয়াসের অপরূপ ব্যঞ্জনা। রেমব্রাণ্টের বা ভ্যানগগের আত্মপ্রতিকৃতি রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন তাদের এ ধরণের রচনাগুলিকে মহৎ শিল্পের সম্মান দিয়েছে, কোলভিৎস-এর আত্মপ্রতিকৃতি (৬৬ ও ৬৭)-ও তাঁকে তেমনি বিশিষ্ট শিল্পীরূপে চিহ্নিত করেছে সমকালের কাছে।

কোলভিৎস নামটি আজ সংগ্রামী জনগণের অন্যতম সুতীক্ষ্ন হাতিয়ার। সেদিনের বিদ্রোহে, অভিযানে, অবরোধে, এই শিল্পীর ভূমিকা যেমন অনন্য ছিল, আজকের সমাজে তেমনি দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে—প্যারীতে, কলকাতায়, ঢাকায়, ভিয়েতনামে কোলভিৎস বা তাঁর উত্তরসূরী শিল্পীরা সর্বদাই সামিল থেকে জনগণের হাতে অস্ত্র ও সামর্থ্যরূপে অনন্য হয়ে উঠছে ও উঠবে। কোলভিৎস বা তাঁর উত্তরসূরী শিল্পীদের কাছে দেশ সমাজ ও সময়ের চাহিদা বা কামনা তাই প্রায় অফুরন্ত—যতদিন না সুবণ্টন, সুশিক্ষা, ও সুন্দর জীবনে রচিত হবে নতুন পৃথিবী।

—শিলাদিত্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নরম্যান মার্শাল ও গেইট থিয়েটার ঃ নরম্যান মার্শাল এরপর লিখেছেন—সবার মতের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছায় 'দি সাল্কি ফায়ার' মঞ্চস্থ করেছিলাম। এর পরের নাটক ছিল সারা সলটের 'স্ট্রেইঞ্জ কম্বার্ট' উপন্যাসের নাট্যরূপ—প্রত্যেকেই আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে এইটিই হচ্ছে ঠিক গেইটের দর্শকদের উপযোগী নাটক। একজন বেকার মুষ্টিযোদ্ধা এবং এক মহিলা সাংবাদিককে নিয়ে কাহিনী—নাটকের ভাষা এবং পরিবেশ আমার নিজের কিন্তু খুব কদর্য লেগেছিল। নাটকটি একেবারেই চলে নি—দশ দিনের পর বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হলো। এত অল্প সময়ে নতুন প্রডাকসন তৈরি করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। ফ্র্যাঙ্ক বার্চ এসে আমার ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করলেন—কেমব্রিজ ফেস্টিভ্যাল থিয়েটারে একটি নাটক তিনি আগেই প্রডিউস করেছিলেন—আমার কাছে প্রস্তাব করলেন এই নাটকটি গেইটে মঞ্চস্থ করবেন—নাটকটির নাম 'নিচেভো'—স্কোবী ম্যাকেঞ্জী এবং ক্লিনটন ব্যাডেলীর দ্বারা রচিত। বেশ মনোমুগ্ধকর মজাদার নাটক—সাধারণ থিয়েটারের উপযোগী। গেইটের দর্শকেরা কিন্তু এর প্রদর্শনী দেখতে এল না—গেইটের পরিকল্পিত নাট্যপ্রয়োগ পদ্ধতির সঙ্গে যে এ শ্রেণীর নাটকের কোন ভাবগত সাদৃশ্য নেই এবং সেজন্য তারা বিরক্ত হয়েছে এই কথাটাই দর্শকেরা আমাকে বুঝিয়ে দিল তাদের প্রদর্শনীতে অনুপস্থিতির দ্বারা। একটি শোতে মাত্র তিন পাউন্ডের টিকিট বিক্রি হয়েছিল এবং কদাচিৎ কোন পারফরমেন্সে টিকেট বিক্রির টাকা দুই অঙ্কে পৌঁচেছে।

এতাবৎ মঞ্চস্থ চারটি নাটকের ভেতর একমাত্র 'দি সাল্কি ফায়ার'-ই আমাকে টাকা এনে দিয়েছিল। অন্য তিনটি নাটকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়। 'মিরাকাল ইন আমেরিকা'-তে প্রেক্ষাগার লোকে ভর্তি হয়ে উঠতো বটে, কিন্তু গেইট থিয়েটারের পক্ষে প্রডাকসনটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। নাটকটির ভূমিকালিপি ছিল বিরাট—অনেক অভিনেতার দরকার হোত, তেমনি দরকার হোত বার বার দৃশ্য এবং পোষাক বদলের—ফলে খরচের অঙ্কও হয়েছিল বিরাট। এসবের ফলে আর্থিক দিক দিয়ে থিয়েটার খুব সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল—কিন্তু এর থেকে আমি নিজে একটি মূল্যবান শিক্ষালাভ করেছিলাম। সেটি হল এই—নিজের রুচি অনুসারেই প্রডাকসন পদ্ধতি ঠিক করাটা অনেক বেশি নিরাপদজনক—দর্শকদের তথাকথিত রুচি অনুসারে কার্যক্রম নির্ধারিত করতে গেলে অসাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি। সুতরাং এরপর থেকে আমি নিজের রুচি-মতই প্লে বাছাই করতাম—আমার এই রীতিটি সাফল্যলাভ করলো। কারণ আমার সৌভাগ্যবশত সেই সময় লণ্ডনে কয়েক হাজার লোক দেখা গিয়েছিল যাদের মনের রুচির দিকটা আমারই মত ছিল। তারা এসে আমার থিয়েটারে ভিড় জমাতে লাগলো—আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সব কিছুই নির্ভর করছিল পরের প্রডাকসনটির অর্থাৎ গেইট রেভ্যুজের প্রথম নাটক 'দিস্ ইয়ার, নেক্সট ইয়ার'-এর দর্শক টানবার ক্ষমতার ওপর। ইন্টিমেট্ রেভ্যুজের দিন এই সময় চলে গিয়েছিল। সার্লট এবং আর্চি দ্য বেয়ারের দ্বারা প্রযোজিত প্রচণ্ড সাফল্যমণ্ডিত রেভ্যুজ-গুলো তাদের দর্শক-আকর্ষণী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল—লণ্ডন প্যাভিলিয়নে কক্রান ইন্টিমেট রেভ্যুর বদলে জাঁকজমক-পূর্ণ শো মঞ্চস্থ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এইসব জাঁদরেল প্রডিউসারের অনুসরণে গেইটে তাঁদের রেভ্যুর মত নতুন রেভ্যুর সৃষ্টি করা একটা অসাধ্যসাধন ব্যাপার বলেই আমার মনে হয়েছিল। প্রথমত আমাদের স্টেজে ছিল জায়গার অভাব, দ্বিতীয়ত ক্রমাগত দৃশ্য বদলাবার মত সঙ্গতি আমার কোথায়? ছোট সংখ্যার কোরাস স্টেজের ওপর আনলেও বার বার দৃশ্য বদলানোর দরকারটা একরকম অপরিহার্য—সেটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একজন বা দুজন স্টার পারসোন্যালিটি এনে তাদের ওপর নির্ভর করে শো গড়ে তোলার মত সামর্থ্যও নেই যে, আর পাঁচটা থিয়েটারের মত সেই পথ বেছে নেব।

সেক্ষেত্রে আমাদের করবার কি ছিল? আমরা যা করতে পারতাম তা হচ্ছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। বিদ্রূপাত্মক বা হাল্কা হাস্যরসাত্মক রেভ্যুর মঞ্চরূপায়ণ করা। এ সময়ের [illegible] গভীরত্বেরই প্রাধান্য ছিল—এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল হার্বার্ট ফারজিয়নের রচনা—আমি তাঁর তীক্ষ্ণভঙ্গিতে লেখা নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য পেয়েছিলাম—আর একটি রেভ্যু তিনি বিশেষভাবে আমারই জন্য লিখে দিয়েছিলেন। যে ধরণের তীক্ষ্ণ আঘাতকারী রেভ্যু মঞ্চস্থ করবার পরিকল্পনা আমি করেছিলাম কারণ ফারজিয়ন ছাড়া আর কোন লেখক সে সময়ে ও জাতীয় রচনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি। এর বছরখানেক আগে কেমব্রিজ ফেস্টিভ্যাল থিয়েটারে আমি একটি রেভ্যু প্রডিউস করি। কয়েকজন অল্পবয়স্ক লেখক এবং সুরকার এটি রচনা করেছিলেন। এঁদের ভেতর থেকে যাঁরা সেরা তাঁদের ডেকে এনে ভার দিলাম গেইটের জন্য রেভ্যুজ লিখতে। এই লেখকদলে ছিলেন ডায়না মরগ্যান, রবার্ট ম্যাকডারমট্, রনি হিল্, জিওফ্রে রাইট এবং ওয়াল্টার লি। লি তাঁর পেশাদার বৃত্তি শুরু করেন ফেস্টিভ্যাল থিয়েটারের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে। তাঁর রচিত দুটি ওপ্রেটো লণ্ডনে প্রডিউস্ড হয়েছিল—একটি স্যাভয়তে এবং একটি সেইন্ট মার্টিন-এ। লি বাদে আর যাঁদের এনেছিলাম তাঁদের সবাই তখন লণ্ডনের থিয়েটার জগতে ছিলেন অপরিচিত। পরবর্তীকালে অবশ্য লণ্ডনের যে-কোন রেভ্যুতে এঁদের কেউ-না-কেউ অংশ গ্রহণ করতেন। বিখ্যাত ফারজিয়ন রেভ্যুজের কথা আজ সবাই জানেন—লিট্ল থিয়েটারে এগুলো প্রডিউস করতেন হেডলে ব্রিগ্স। তিনিই মঞ্চসজ্জা, নৃত্য এবং সমবেত অভিনয়ের দিকগুলোও দেখতেন—রচনার ভার থাকতো যৌথভাবে ফারজিয়ন এবং ওয়াল্টার লি-র ওপর। কিন্তু এঁদের তিন জনের টিম-ওয়ার্কের সূত্রপাত হয়েছিল আমারই গেইট থিয়েটারে। পূর্ব আফ্রিকায় যুদ্ধরত অবস্থায় ওয়াল্টার লি মারা যান—এই ভাবেই রঙ্গজগৎ একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞকে হারালো। স্টেজের জন্য কিভাবে সুরসৃষ্টি করতে হয় সে সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান এবং উপলব্ধিগত অভিজ্ঞতা ছিল লি'র। একই সঙ্গে হাল্কা হাস্যরস এবং সুরতরঙ্গের পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন লি। ওপরেটো এবং ইন্টিমেট রেভ্যুজের স্কোরস্ তৈরি করা ছাড়াও, নরম্যান ও'নীলের পর লি'র মত ইন্সিডেন্ট্যাল মিউজিকের স্রষ্টা আর আমাদের চোখে পড়ে নি।

গেইট রেভ্যুজের ভূমিকালিপিতে প্রধান ভূমিকায় থাকতেন হারমিওন জিনগোল্ড—সে সময় রঙ্গজগতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁকে তাঁর বন্ধুরা সব সময়েই উপদেশ দিত যে নামটি না পাল্টিয়ে ফেললে তিনি কোনদিনই যশস্বী হতে পারবেন না।

গেইটের 'দিস্ ইয়ার, নেক্সট ইয়ার'-এর মহলার সময় সবাই বেশ হতাশই হয়ে

পড়েছিল। দু'জন শিল্পী তো মনমরা হয়ে দল ছেড়েই চলে গেল। আমি একাই ছিলাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি বরং মনে করেছিলাম আমার রেভ্যুটি ভালই হচ্ছে এবং যাচাই করে দেখা দরকার আমার যা ভাল লাগছে, তাকে দর্শকরা কিভাবে নেয়।

প্রথম শোর রাত্রিতে দলের সবাইকে অবাক করে দিয়ে রেভ্যুটি প্রচণ্ড সাফল্য অর্জন করলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড, দ্বিতীয় রাত্রিতে মাত্র সাত পাউন্ডের টিকেট বিক্রি হল—তৃতীয় রাতে আরও কম। মনে হচ্ছিল দর্শকেরা গেইটের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তারপর থেকে ক্রমশ রেভ্যুটি শহরের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকেই ভাল ব্যবসা হতে লাগল। চতুর্থ সপ্তাহ থেকে প্যাক্‌ড্ হাউস—এইভাবেই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আট সপ্তাহের জন্য রেভ্যুটি দেখানো হয়েছিল, একটি সিটও খালি থাকতো না।

ঠিক এই রকমটাই ঘটেছিল শিশিরকুমার যখন প্রথম নাট্যমন্দিরে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রথম পনের রাত্রি 'ষোড়শী' দেখতে বিশেষ দর্শক সমাগম হোত না। কিন্তু শিশিরকুমারের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে 'ষোড়শী' জনপ্রিয় হবে। সেই জন্যই তিনি নাটক চালিয়ে গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগল। তারপরের ইতিহাস তো সবারই জানা। নাট্যমন্দির, নবনাট্যমন্দির এবং শ্রীরঙ্গম অর্থাৎ যে তিনটি মঞ্চে শিশিরকুমার নিয়মিতভাবে অভিনয় করেছেন—সেখানে প্রতি বছরেই 'ষোড়শী'-র অভিনয় হোত প্রায়-ই। আসল কথা, ভাল নাটক ধরতে মাঝে মাঝে খানিকটা সময় লাগে। কিছু কিছু ভাল দর্শক আসবার পর মুখের কথায় নাটকের উৎকর্ষের দিকটা আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়—তারপরেই নাট্যরসিকের দল নাটকটি দেখবার জন্য ভিড় জমান।

আর একটা কথা। দলে স্টার এ্যাক্টর বা এ্যাকট্রেস থাকলেই যে থিয়েটার জমবে এ-ধারণাটাও সম্পূর্ণ ভুল। শিশিরকুমার যখন নিজের পেশাদারী থিয়েটার খোলেন তখন বিগত দিনের কোন নামকরা অভিনেতাই তাঁর দলে ছিল না। তিনিই সবাইকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন—অবশ্য যাঁদের নিয়ে শুরু করেছিলেন, যেমন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রবি রায়, ভূমেন রায়, শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জীবন গাঙ্গুলী প্রমুখ সবাই পরে স্টার পর্যায়ে উঠেছিলেন। প্রভা তো ব্যালে গার্ল থেকে একেবারে সীতার ভূমিকায় প্রমোশন পেয়েছিলেন।

এর পরের রেভ্যু ছিল হিউ রস্ উইলিয়ামসনের 'দি সেভন্ ডেডলি ভারচুজ' —এটিও যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল।

অফেনবাখের 'লা বেল হেলেন প্রডাকসন: সি, বি, কক্‌রান।' মঞ্চসজ্জা: অলিভার মেসেল।

তারপর হয় দুটি প্লে, মরিস ওয়াটকিনসের 'শিকাগো' এবং রিচার্ড হিউজেসের 'এ কমেডি অভ গুড এণ্ড ইভিল'—বক্স অফিসের দিক থেকে এগুলোর সাফল্য হয়েছিল মাঝামাঝি রকমের। এরপর মঞ্চস্থ করা হয়েছিল 'ভিক্টোরিয়া রেজিনা'।

পরে ভিক্টোরিয়া রেজিনা' নিউ ইয়র্কে অভিনীত হয় এবং সেখানে এর বিরাট সাফল্যের ফলে নাট্যকার বহু টাকা আয় করেছিলেন পালাটি থেকে—লণ্ডন এবং প্যারিসেও এই পালাটি অনেক টাকা এনে দিয়েছিল লেখককে। কিন্তু গেইটের প্রফিট হয়েছিল মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। সমালোচকরা খুব উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন অভিনয় দেখে। কিন্তু গেইটের দর্শকদল নাটকটি দেখতে আসে নি। সেই সময়টায় রাণী ভিক্টোরিয়া সম্বন্ধে দর্শকদের তেমন উৎসাহ বা কৌতূহল ছিল না। যারা আসতো তাদের বেশির ভাগই ছিল বয়সে বৃদ্ধ, অর্থাৎ যাদের মনে তখন পর্যন্ত ভিক্টোরিয়ান আমলের কিছুটা আমেজ ছিল। আমার মতে এ-নাটকের সেরা প্রডাকসন হয়েছিল এই গেইট থিয়েটারে। এ-নাটকটি সত্যিই ছিল চেম্বার-প্লে। গেইটের মত থিয়েটার, অর্থাৎ যে থিয়েটারে দর্শকদের সঙ্গে মঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাটা সহজেই সম্ভব হয়। সেখানকার জন্যই যেন নাটকটি রচিত হয়েছিল। ছোট আকারের রঙ্গমঞ্চ হওয়া সত্ত্বেও রেক্স হুইসলার চমৎকার ইঙ্গিতবাহী সেটিং তৈরি করেছিলেন এই নাটকের জন্য।

রাণীর ভূমিকাটি প্রথমে জেন ফ্র্যাঙ্কস ডেভিসকে নেবার জন্য অনুরোধ করি—কিন্তু তিনি সে সময় অন্য কাজে নিযুক্ত থাকায় আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না। রোল্‌টিতে রাণী চরিত্রকে শুধু যে যৌবনে এবং বার্ধক্যে দর্শকদের কাছে আনা হয়েছে তাই নয়, মধ্যবয়সের ভিক্টোরিয়ারও পার্টও এ নাটকে আছে এবং সেই দিকটার অভিনয় করাই সব থেকে শক্ত ব্যাপার—অনেকদিন পর্যন্ত কাকে দিয়ে এ চরিত্রের অভিনয় করাবো তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। আরও একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল—এমন কাউকে এ চরিত্র দিতে পারি না যে রাণী ভিক্টোরিয়ার থেকে খুব বেশি লম্বা। শেষে ভাগ্যবশত আমার পামেলা স্ট্যানলীর কথা মনে হল—এ-সময় পামেলা ছিল মঞ্চরসিকদের কাছে অপরিচিত একজন যুবতী অভিনেত্রী।

প্রিন্স কনসর্টের ভূমিকায় কাস্ট করতে গিয়েও বেশ মুস্কিলে পড়লাম। এ-ব্যাপারেও দৈহিক আকৃতির দিকটা একটা প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করলো। প্রিন্স ছিলেন অত্যন্ত বেশি লম্বা। শেষ পর্যন্ত একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমেরিকান যুবককে এই ভূমিকাটি দিলাম—তার নাম ছিল ভিন্‌সেন্ট প্রাইস। প্রিন্স কনসর্টের সঙ্গে শুধু চেহারার সাদৃশ্যই প্রাইসের ছিল না—সে বেশ জার্মান এ্যাক্‌সেন্ট দিয়ে সংলাপ বলতে পারতো। এই যুবকটি আর একবার মাত্র ইংলণ্ডের পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করেছিল। সেবার সে এই গেইটেই 'শিকাগো' নাটকে একজন আমেরিকান পুলিশম্যানের চরিত্রে নামে—তার সংলাপ ছিল বার লাইনের। ছ'মাস বাদে সে নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে গিল্‌বার্ট মিলারের 'ভিক্টোরিয়া রেজিনা' প্রডাকসনে হেলেন হেইজের বিপরীতে অভিনয় করতে শুরু করে।

[ক্রমশ]

অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মের ঝুঁকি না নিয়ে......
বিবাহিত জীবনের সমস্ত সুখ উপভোগ করুন।

আজকাল সব পুরুষই, জন্ম নিয়ন্ত্রণের কেটা নিরাপদ ও সন্তোষজনক উপায় "নিরোধ" কিনে নিতে পারেন।

নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্য

৩টির মূল্য ১৫ পয়সা, ১টি ৫পয়সা

(সরকারি সাহায্যে হ্রাসমূল্যে)

বর্তমানে মাত্র কয়েকটি জেলায় পাওয়া যায়।

আগামী ২৮ বছরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি থেকে বেড়ে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০ কোটি হয়ে যাবে।

আর তখন—বাসগৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির মতো মৌলিক সুযোগ সুবিধে এবং খাদ্য বস্ত্রের মতো মূল প্রয়োজনগুলির যে বিপুল চাহিদা দেখা দেবে তা জোগানো মোটেই সহজ হবেনা। এখনকার শিশুরা—আপনাদের সন্তানেরাই কষ্ট পাবে।

কাজেই এখনই নিরোধ ব্যবহার করতে সুরু করুন।

আপনার পরিবার সীমিত রাখুন।

জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আপনার হাতেই রয়েছে।

'নিরোধ' ব্যবহার করুন।

রঙ্গজগৎ

সাম্প্রতিক বাংলাছবি

অনেকদিন পরে কয়েকটি বাংলা ছবি বেশ সপ্রতিভ ভাব নিয়ে মুক্তিলাভ করেছে। বিষয়বস্তুর গভীরতার কথা নয়, আঙ্গিক ও পরিবেশন রীতিতে ছবিগুলিতে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই ছবিগুলি হিন্দী ছবির প্রতিরূপ নয় এটাই আশার কথা। বেশ কিছু-কাল বাংলা ছবির রূপ দেখে মনে হচ্ছিল হিন্দী ছবির অনুকরণ ছাড়া বেশি কিছু নয়, তাও ব্যর্থ।

এই বন্ধ জলা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সর্বাধিক অভিনন্দনযোগ্য বারীন সাহা। তাঁর 'তের নদীর পারে' ছবিতে নতুন কিছু বক্তব্য আছে। আঙ্গিকের দিক থেকেও নতুনত্ব আছে। আর আছে অভিনয়-রীতির বৈশিষ্ট্য এবং সাহসের পরিচয়। পল্লীগ্রামের এক সার্কাসের সঙ্গে থেকে, সার্কাসের খেলোয়াড় আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একেবারে মিশে গিয়ে যেভাবে ছবিটাতে অংশ গ্রহণ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে খুব কম। বক্তব্যের দিক থেকেও ছবিটি বলিষ্ঠ। পরীক্ষামূলক ছবি বলতে যা বোঝায় এই ছবিটি তার যথার্থ রূপ। ক্যামেরার কাজের যে নৈপুণ্য এখানে দেখা যায় কয়েক বছর আগে মুক্তি পেলে এই ছবিটি নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যেত। চলচ্চিত্রে নতুন চিন্তার নিদর্শন হিসাবে ছবিটি খুব উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। সাহস এবং চিন্তাশক্তি এবং প্রগতিশীল দৃষ্টি-ভঙ্গি থাকলে—এই ধরণের ছবির ঝুঁকি নেওয়া যায়: এবং এই কাজগুলি পণ্য-চিত্রের ব্যবসায়ীদের দ্বারা হয় না।

আর একটি ছবি 'নতুন পাতা'; যদিও 'তের নদীর পারে'র সঙ্গে তুল-নীয় নয় কিন্তু শুভবুদ্ধি থাকলে যে ভাল পণ্যচিত্র করা যায় এই ছবিটি তার নিদর্শন। বাঙালী জীবনের পরিবেশে ছোট একটা সমবেদনামূলক কাহিনী, প্রধান চরিত্রগুলিতে নতুন মুখ এবং পল্লীজীবনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি মুহূর্ত, কয়েকটি মুড ছবিটিকে সক-লের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছে। অথচ তথাকথিত স্টারদের পেছনে মোটা টাকা খরচ করা হয় নি। মোট ব্যয়ও তেমন বেশি নয়। বাংলা ছবির সংকটের দিনে এমন ছবিই চাই। কালো টাকার স্টারদের বাদ দিয়ে ছবি করলে সে ছবিও যে চলে 'নতুন পাতা' তার একটি দৃষ্টান্ত। সারা ছবিটি একটা মিষ্টি মেজাজে উপভোগ্য।

তপন সিংহের 'আপনজন' টিকেট ঘরের আনুকূল্য লাভ করেছে সব চেয়ে বেশি। 'তের নদীর পারে'র মত এই ছবি কোন উপন্যাসের ছবি নয়। এখানে সমসাময়িক কিছু সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে। অবশ্য সমস্যার উপস্থাপনা-রীতি ও বক্তব্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কাহিনীর দিক থেকে সম-সাময়িকতা দর্শক আকর্ষণের প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

'দুরন্ত চড়াই' ছবিতে পরিচালকের আঙ্গিক কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। যদিও বক্তব্যকে বলিষ্ঠ করার দিক থেকে পরিচালক দুর্বল এবং যৌন মাদকতা পরিবেশনে মাত্রা ঠিক রাখতে পারেন নি।

সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর জন্য দর্শকরা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাঁর হাতে এই ছবি হয়ত ভালই উৎরাবে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের কাছে বাঙালী দর্শকদের প্রত্যাশা অনেক। সমসাময়িক সমস্যার বা জীবনের প্রতিফলন তাঁর ছবিতে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কেন? সে প্রশ্ন অনেকের; আমারও। —সুজন।

চিত্রসমালোচনা

দাদু

পারিবারিক চিত্র।

বাংলা চলচ্চিত্রজগতে যে সময় নতুন পথ প্রদর্শনের জন্য অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন পরিচালক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ও সার্থকও হচ্ছেন, সে সময় বাংলা দেশের সাধারণ দর্শকদের চিত্ত জয় করার জন্যই হয়তো মেজদিদির পর রুপোলি পর্দায় বৌদি বা দাদু শীর্ষক চলচ্চিত্রগুলিকে হাজির করা হচ্ছে।

'দাদু'র কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শ্রীঅজিত গাঙ্গুলী; তিনিই পরিচালক।

আগেই বলেছি, কাহিনীটি পারি-বারিক। অবসরপ্রাপ্ত বিখ্যাত আইনজীবী সত্যপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। নিজস্ব বাড়িটি এখনো তাঁর আছে; কিন্তু জমানো অর্থ এখন আর নেই। ছেলে আর ছেলের বউ সংসার চালান। ছেলে সামান্য একজন চাকুরিয়া। তবে তারা নিঃসন্তান।

'তিন ভুবনের পারে' ছবিতে তনুজা

সোভিয়েট ছবি 'আই লাভ ইউ'-এর একটি দৃশ্য

দাদু সত্যপ্রসন্নর নয়নের মণি হচ্ছে তাঁর মৃত কন্যা ও জামাতার একমাত্র মেয়ে আরতি। মৃত জামাতার কোনো বিষয়-সম্পত্তি ছিল কি না বোঝা মুস্কিল, তবে দাদুর অসীম স্নেহ তার শ্রেষ্ঠ মূলধন। তাছাড়া নিঃসন্তান মামা-মামীও খুব ভালোবাসেন।

কিন্তু প্রথমে মামী পরে মামার স্নেহে ভাঁটা পড়ে। কারণ মামীর ভ্রাতুষ্পুত্রী রেখাকে এদের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে বি এ পরীক্ষা দেবার জন্য আসতে হয়। আরতিও বি এ পরীক্ষা দেবে। দুই মেয়ে দুই জাতের। রেখা অতি মডার্ন প্যাটার্নের মেয়ে। নাচে গানে কথায় তার বিদেশী অনুকরণ, পড়াশুনায় অমনোযোগী। অথচ আরতি পড়াশুনায় খুব ভালো। এই দুই মেয়েকে কেন্দ্র করেই দাদুর সংসারে নেমে আসে দারুণ আর্থিক সমস্যা, পিতা পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব—যদিও পুত্র পিতার সততা সত্যবাদিতা স্বীকার করেন তবু তিনি স্ত্রীর শিকার।

'দাদু'র পরিবার ছাড়া কাহিনীতে আরেকটি পরিবার আকর্ষণ করে এবং এই দুই পরিবারকে নিয়েই নাটকীয় গতিবেগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিবার-টিতে রয়েছে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হারান মুখুজ্জে, তাঁর স্ত্রী এবং সুদর্শন ও যশস্বী ডাক্তার তাঁদের পুত্র মনোজ।

আরতি, রেখা ও মনোজ। মনোজের সঙ্গে ওদের পরিচয় বান্ধবী মনোজের বোনের মাধ্যমে। রেখা মনোজকে বিয়ে করার জন্য চেষ্টা করে, ব্যর্থ চিঠিও দেয়—যে চিঠির উত্তর দেখে দাদুর পুত্রবধূ এবং পুত্র প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, ওটা ঘৃণ্যভাবে মনোজই আরতিকে লিখেছে। মনোজের প্রত্যাখ্যানের চিঠি কাকে দেওয়া হচ্ছে তার উল্লেখ ছিল না। সে উল্লেখ থাকলে তো নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করা যায় না। অবশ্য এককালের যশস্বী উকিল সত্যপ্রসন্ন বুঝতে পারেন যে, নাতনি আরতি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং যে হারান মুখুজ্জে একটা 'কেসে' উকিল হিসেবে নামাবার জন্যে বহু চেষ্টা করেছে সেই সত্যপ্রসন্নই একদিন সেই 'কেস' নেবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত। তারপর 'কেস' ওঠার আগেই দাদুর ভয়ানক অসুখ। সেই অসুখের চিকিৎসক নিযুক্ত হয় পিতা

'সুহাগ রাত' হিন্দী ছবিতে রাজশ্রী ও জিতেন্দ্র

রামধন, পিকচার্সের 'তের নদীর পারে' ছবিতে জ্ঞানেশ মুখার্জী

হারান মুখুজ্জের নির্দেশে মনোজ। দাদু, নামেও সত্যপ্রসন্ন, কাজেও সং কিন্তু বৃদ্ধ বয়স বলেই হয়তো তাঁকে ছলনার পথ ধরতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, নিজের ছেলে-বউ রেখার সঙ্গে মনোজের বিয়ে দেবার জন্য ফাঁদ পেতেছে, সেক্ষেত্রে দাদুর পক্ষে ছলনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতান্তর নেই, এটাই হয়তো কাহিনীকার ভেবেছেন। যা হোক নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনার মধ্যে এক চরম মুহূর্তে আরতি আর মনোজের বিয়ে হয়। এ বিয়েতে দাদু প্রচুর টাকা ব্যয় করেন। ছেলে ও বউ-এর সন্দেহ—বাবা গোপনে টাকা জমিয়ে রেখেছিলেন। তিনি টাকা জমান নি। মামলায় জিতিয়ে দিয়ে হারান মুখুজ্জের টাকা নেন নি, তাঁর ছেলেকে নাত-জামাই করে নিতেই চেয়েছিলেন। তবে যে টাকা তিনি দেন তা স্বোপার্জিত, এও তিনি বিস্ময়করভাবে প্রমাণ করে দেন। দাদুর শেষ প্রার্থিত পথ তীর্থক্ষেত্র। দাদুর চরিত্র রূপায়ণে বিকাশ রায় ব্যক্তিত্বপূর্ণ অথচ প্রয়োজনানুযায়ী ছলনাময়। পুত্রবধূর চরিত্রে অনুভা গুপ্তা আর নাতনির ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় দর্শকদের একদিকে যেমন উত্তেজিত করবে, তেমনি পাশাপাশি গভীর সহানুভূতি আকর্ষণ করবে। অন্যান্য চরিত্র তথা পার্শ্বচরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন অজয় গাঙ্গুলী, সত্য ব্যানার্জী, সবিতা চ্যাটার্জী (বোম্বে), প্রসাদ মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ। অনুপ, ভানু ব্যানার্জি ও জহর রায় টাইপ চরিত্রের মর্যাদা পেলেও, এঁরা কখনোই দর্শকদের ব্যর্থ করেন না। এখানেও করেন নি। মোট চারটি গান। গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও উষা মঙ্গেশকর। গানগুলি সুগীত। সব দিক দিয়ে বিচার করলে 'দাদু' শুধু নয়নমোহনই নয়, মনোহরণও করবে।

নাটকের কথা

দ্বীপের রাজা

লোকায়নের 'দ্বীপের রাজা' মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে দ্বিতীয় রজনী অভিনীত হয়েছে। দর্শকদের ভিড় দেখে মনে হল এই নাটকটি সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। চমকপ্রদ মঞ্চসজ্জা ও রূপসজ্জা, আলোর কাজ এবং অভিনয়ে নাটকটি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয়।

আজকাল অ্যাবসার্ড নাটকের প্রতি কয়েকটি নাট্যসংস্থার বেশ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের পরিবেশে অ্যাবসার্ড নাটকের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধির কারণ আমার বোধগম্য নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় যে কারণে অ্যাবসার্ড নাটকের সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের দেশে সে কারণ বর্তমান নয়। এখানে সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা নেই; সৃষ্টি ও চিন্তার শক্তিও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে নি। তবু একদল নাট্যকার অ্যাবসার্ড রীতিকেই তাঁদের নাট্যচিন্তার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এরূপ নাট্যকারদের মধ্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অন্যতম অগ্রগামী। মোহিত চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'দ্বীপের রাজা'—অ্যাবসার্ড ও রূপক মিশ্রিত রীতির নাটক। নাটকের বক্তব্য-

সুরঙ্গমার প্রযোজনায়

শান্তিনিকেতন সংগীতভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের পরিচালনায়

রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-গীতাভিনয়

'নবীন'

রবীন্দ্র সদনে

১৩ এপ্রিল '৬৯ রবিবার সকাল ১০।।

দর্শনী: ১০০, ৫০, ২৫, ১০, ৫, ৩ ও ২,

টিকিট প্রাপ্তিস্থান :

'সুরঙ্গমা' ১১৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ (রবিবার সকাল ৭টা থেকে ১২টা ও অন্যান্য দিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা)

'জিজ্ঞাসা' ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভন্যু, কলিকাতা-২৯ (ফোন : ৪৬-৬৬৬২)

ঐ শাখা ১এ, কলেজ রোড, কলিকাতা-৯ (ফোন : ৩৪-৫৬৭৪)

'ইলেকট্রো কনসার্ন' ৩এ, ভূপেন বসু অ্যাভন্যু, কলিকাতা-৪ (ফোন : ৫৫-৬৯৬৩) ও

রবীন্দ্রসদন (১ এপ্রিল থেকে) ফোন: ৪৭-৩৩৬৪

'শেষ থেকে শুরু' ছবিতে সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীর মজুমদার

বিষয় বালন্ত। কালোপযোগী চিন্তা এই নাটকের অবলম্বন। তেজস্ক্রিয় শক্তিকে মারণ কাজে ব্যবহার; হাইড্রোজেন বোমার বিষক্রিয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ এই নাটকে ধ্বনিত হয়েছে। একদল সহজ সরল দ্বীপবাসীর আনন্দে দিন চলছিল; হঠাৎ এক তেজস্ক্রিয় শক্তি তাদের জীবনকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলল। তাদের মধ্যে সাহসী লোকটি সেই তেজস্ক্রিয়তাকে সরাতে গিয়ে নিজে আক্রান্ত হয়। দ্বীপবাসী যখন তার সাহসের জন্য উৎসব আয়োজন করছে তখন তারা জানতে পারে দ্বীপটি ধ্বংসের মুখোমুখি। যে কোন সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। গ্রামবাসীরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়। কেবল পড়ে থাকে সেই সাহসী মানুষ ও তার জীবনসঙ্গিনী আর দ্বীপের চৌকিদার।

নাটকের বক্তব্য—আজকের পৃথিবী ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়েছে বাঁচার তীব্র আকাংক্ষা. পৃথিবীকে সুন্দর ও শান্তিময় করে তোলার স্বপ্ন। কিন্তু কালের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে পৃথিবী যে কোন সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে যে কথাটা প্রচারিত হয়—আসলে তার মধ্যেও রয়েছে একরকম হুমকী। অর্থাৎ যে যেখানে অবস্থান করছ কর; নড়লে যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধে পরিণত হবে। হাইড্রোজেন বোমার ধারকদের এই হুমকীর কথা জানা থাকলেও, এই তেজস্ক্রিয় শক্তিকে মারণ কাণ্ডে ব্যবহার না করে শান্তির কাজে ব্যবহারের দাবিটা আজ সোচ্চার। যদিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশ থেকে দেশান্তরে হাইড্রোজেন বোমা চালান দিয়ে হুমকীকে বজায় রাখছে এবং দুর্বল দেশ-গুলিকে ভীত করে রেখেছে। এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হঠকারিতায় মাঝে মাঝে কয়েকটি দেশে তেজস্ক্রিয় বিপদের কথাও জানা গেছে। কিন্তু নাট্যকার যদি পজিটিভ দিককে বড় করে তুলতে না পারেন, তবে মানুষের মনে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করার বিশ্বাস জাগাবেন কি করে? মানুষের কল্যাণময় ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা মহৎ নাট্যকারের কাজ। 'দ্বীপের রাজা' নাটকে যত যন্ত্রণা আছে তত বিশ্বাস নেই। যত ভয় আছে তত অভয় নেই। তাই মানুষগুলোর যন্ত্রণা দর্শকদের মনে কোন বাণী নিয়ে পৌঁছিয়েছে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। রূপসজ্জা আর মঞ্চসজ্জার আবরণ ভেদ করে দর্শকরা নাট্যকারের বক্তব্যকে কতদূর গ্রহণ করতে পেরেছেন, সে বিষয়েও আমি নিঃসংশয় নই। তাই নাটক দেখতে দেখতে বার বার প্রশ্ন জেগেছে তেজস্ক্রিয় শক্তির বিরুদ্ধ বক্তব্যকে আরো সহজ সরল করে বললে শিল্পরীতি কি দুর্বল হতো? বিশেষ করে পজিটিভ বক্তব্য স্পষ্টতর হয়ে উঠতে না পারায় দর্শকরা যত রূপ দেখেছেন তত মর্ম গ্রহণ করেছেন কি না সে প্রশ্নের অবকাশ আছে।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন অরুণ রায়। অরুণ রায় লিটল থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে দীর্ঘদিন অভিনয় করেছেন এবং অভিনেতা হিসাবে তাঁর সুনাম আছে। 'দ্বীপের রাজা' নাটকেও তিনি সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন মূল চরিত্র অভিনয়ে। তাঁর সহ-চরিত্র রঞ্জনার ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন সীমা দাস। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন মায়া দাস, দীপক চক্রবর্তী, বাদল সেন, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, মাণিক চক্রবর্তী, অজয় দে, দিলীপ দাস, তুষার মিত্র, রতন মুখার্জী দেবনাথ অধিকারী, সুভাশিষ মুখার্জী, ধীরেন দাস, অমল ঘোষ, অজয় ভট্টাচার্য, শান্তিরঞ্জন সিন্‌হা প্রমুখ।

'দ্বীপের রাজা' নাটকের আঙ্গিক সৌন্দর্যে সহায়তা করেছেন তিনজন শক্তিশালী শিল্পী। পরিচালনায় ভূপেন হাজারিকা, মঞ্চনির্দেশনায় রাজেন তরফদার এবং নৃত্য পরিকল্পনায় শক্তি নাগ। আলোর কাজ, শব্দ প্রক্ষেপণ ইত্যাদি কাজগুলি প্রশংসনীয়।

স্টুডিও খবর

মৌসুমী মন

নন্দিতা চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে চৌধুরী প্রোডাক্‌সন্সের 'মৌসুমী মন' চিত্রের চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়।

ছবিটি সংগীত, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে অনিল দত্ত ও সমর চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় গণেশ বোস ও অনিল সরকার।

ইন্দর সেন পরিচালিত 'প্রথম কদম ফুল' ছবিতে শুভেন্দু ও সৌমিত্র

প্রধান কয়েকটি চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন—সর্বেন্দু ও মিতা চৌধুরী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতা দে, মণি শ্রীমানি, রত্না ঘোষাল, সৌরভ মুখার্জী, লতিকা দাশগুপ্তা, বেবী সুচিত্রা ও সিনে আর্টিস্টের শিল্পিবৃন্দ।

একটি বিশিষ্ট চরিত্রে বম্বের এক নৃত্যশিল্পীকে দেখা যাবে। ছবিটির গান রচনা করেছেন—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদকণী

সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব

ভারত সোভিয়েট সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী অনুযায়ী গত ২১শে মার্চ ওরিয়েণ্ট সিনেমা হলে সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। ২৭শে মার্চ পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর। উৎসব উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল কলকাতায় এসেছেন। সাত দিনে নিম্নোক্ত ছবিগুলি দেখান হচ্ছে—স্যাডোজ অব এ ফরগটেন এনচেস্টার, আই লাভ ইউ, সিক্স অব জুলাই, ওয়াটার ফায়ার এণ্ড ড্রাম, অব রাস টেণ্ডারনেস, হ্যামলেট এবং ওয়াল্স এগেইন এবাউট লাভ।

এই উৎসবের উদ্যোক্তা কেন্দ্রীয় ফিল্ম ডিভিশন। সংবাদপত্রের চিত্র পর্যালোচকদের আমন্ত্রণপত্র দেবার ব্যাপারে এবারও অব্যবস্থা করেছেন। অনেকে কার্ড পান নি বলে অভিযোগ করছেন।

নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় 'ক' ও 'খ' দুটি বিভাগ থাকবে। 'ক' বিভাগ ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের মহিলা ও পুরুষদের জন্য; 'খ' বিভাগ ১০ থেকে ১৮ বছরের নিম্ন বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য। উভয় বিভাগে নজরুলের আধুনিক, গজল, রাগপ্রধান, পল্লী ও ধর্মসঙ্গীত এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিষয়রূপে নির্ধারিত। প্রতিযোগীরা একাধিক বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। প্রতিযোগীদের দু'টাকা ভর্তি ফি দিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে ৭ই মে'র মধ্যে।

নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে : সম্পাদক, নজরুল একাডেমি। ৬, এণ্টনীবাগান লেন, কলকাতা—৯। অথবা ৬০, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলকাতা—১৯।

পূর্ব জার্মান চলচ্চিত্র সেসন

সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে গত ১৯শে মার্চ একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের এক চলচ্চিত্র সেসন উদ্বোধন করেছেন মিঃ আন্দ্রে রেডার। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীমধু বসু। এই সেসনে দেখান হয়েছে বিখ্যাত ছবি 'স্টার', 'ম্যারেজ অব ফিগারো', 'দি সাইলেণ্ট প্লানেট'। আগামী ৩০শে মার্চ সকালে ম্যাজেস্টিক সিনেমায় দেখান হবে 'ন্যাকেড এ্যামোং উলভস্'।

মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি

বাংলা : তের নদীর পারে : পরিচালক বারীন সাহা। তিন ভুবনের পারে : পরিচালক—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দী : সুহাগ রাত : পরিচালক—আর. ভট্টাচার্য। হায় মেরা দিল : পরিচালক—বেদমদন।

ইংরেজী : দি নাইট অব দি জেনারেলস রু। রঙ বক্স।

একটা টেস্ট ম্যাচ ছাড়া কলকাতার শীতটা যেন ঠিক জমতে চায় না। কি রকম যেন খ্যাঁস-খালি মনে হয়। সব ফাঁকা-ফাঁকা। কারণ শীতের কলকাতায় ময়দানী-ক্রিকেট আর যাই পারুক না কেন, বাজার একদমই গরম করতে পারে না। তাই হা-পিত্যেশে আমরা সকলে বসে থাকি একটা টেস্ট ম্যাচের জন্যে। টেস্ট ম্যাচের ঐ পাঁচ-ছটা দিন কলকাতাকে মোটে চেনাই যায় না। আনন্দ-হাসি-গানে ভরে ওঠে মন-প্রাণ। আকাশে-বাতাসে ক্রিকেটের মধুর কলতান। রেডিওর গান-বাজনার আসরের দিকে থাকে আর কারো নজর, সকলেরই কান ঐ ধারা-বিবরণীর দিকে। অভাবনীয় ক্রিকেটানন্দে ভরে ওঠে ঐ সময়টা। তখন আর কেউ কিছুই চান না। সবার মুখেই এক কথা—ক্রি কে ট.. ক্রি কে ট...আর টিকিট... টিকিট। ধন নয়, মান নয়—শুধু একখানি টিকিট। আবার আসছে সেই দিন, আসছে সেই মুহূর্ত। আগামী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি অস্ট্রেলিয়া আসছে ভারত সফরে। পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ সহ তারা অংশ গ্রহণ করবে মোট দশটি খেলায়। অস্ট্রেলিয়ার ভারত ভ্রমণ নিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া পড়ে গেছে আমাদের দেশে। দু' বছর পরে আবার যে সুযোগ হবে টেস্ট খেলা দেখার।

কিন্তু সে সুযোগ সত্যি-সত্যিই হবে কি না সে বিষয়ে এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিষয়টি বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে। তবে অস্ট্রেলিয়ার প্রাপ্য টাকার বিষয়ে নয়—ভারতে খেলাগুলো থেকে যে লভ্যাংশ অস্ট্রেলিয়া দল পাবে সেই টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় ভারত দেবে কি না। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে ভারত এখন চরম অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই সময়ে অনেকটা পেট খেঁচিয়ে ঘা করে টাকা আদায় করার ব্যাপারে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক রাজী হবেন কি না কে জানে। কারণ রাজী না হবার যে যথেষ্ট এবং সংগত কারণও আছে। তাই অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ নিয়ে ইতিমধ্যেই জল-ঘোলা হতে শুরু হয়েছে। তবে মনে হয় এই ব্যাপারে দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণভাবেই অস্ট্রেলিয়ার ওপরে। অস্ট্রেলিয়া যদি ভারত সফরে আসতে না চায় তাহলে তারা এই টাকার বিষয়টি নিয়ে অনেক দর কষাকষি করবে। কারণ ভারত ভ্রমণে না এলে তারা হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকাকে সংক্ষিপ্তর স্থানে পূর্ণাঙ্গ সফরের প্রস্তাব দেবে। তাই আজ এই মুহূর্তে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না যে আগামী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল সত্যি-সত্যিই ভারত ভ্রমণে আসবে কি না। এই সফর শেষ পর্যন্ত বাতিলও হয়ে যেতে পারে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়......।

—শান্তিপ্রিয় ॥

॥ চিত্র পরিচয় ॥

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক গ্যারি সোবার্সকে ব্যাটিং করতে দেখা যাচ্ছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সময়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংলণ্ড ভ্রমণে সোবার্স অধিনায়ক হবেন কি হবেন না এই নিয়ে এখন দেখা দিয়েছে সমস্যা।

*

মুকুলবীথির স্পোর্টসে আমাদের ছোট ছোট ভাইবোনেরা মুখে মুখোস লাগিয়ে ছুটছে মনের আনন্দে।

*

ইংলণ্ডের পাকিস্তান ভ্রমণ বানচাল হয়ে গেলো দর্শকদের দৌরাত্ম্যে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে করাচি টেস্ট ভণ্ডুল হয়ে যাবার সময়কার অবস্থা।

খুঁটিবলী–খুঁটাবলী

ব্যাঙ্গালোরের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর এখন শেষ পর্বে উপনীত। আর এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পড়বে তখন এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির ফাইন্যাল খেলাও শেষ হয়ে যাবে।

তাই এই সংখ্যায় সন্তোষ ট্রফির খেলা সম্বন্ধে বেশি কিছু আলোচনা না করাই ভালো। তবে বাংলা এবার তাজা দল নিয়ে গিয়েছিল ব্যাঙ্গালোরে। বাংলা দলের এবার এমনই হল যে, একজন ম্যানেজারও খুঁজে পাওয়া গেলো না দলের সংগে যাবার জন্যে। আর যাঁদের পাওয়া গিয়েছিলো তাঁরা দলের সংগে যেতে রাজী হলেন না।

হায় কপাল, বাংলা ফুটবল দলের এ হাল হলো কবে থেকে? তবে আর যাই হোক ব্যাঙ্গালোরে বেড়াতে যাওয়া তো হতো—কিন্তু তাতেও কেউ রাজী হলেন না। কিন্তু কেন—তা কেউ জানেন না। আর জানলেও মুখ যে খুলবেন না, সে বিষয়ে এতোটুকুও সন্দেহ নেই।

কিন্তু বাংলা দেশের সাধারণ ফুটবল-রসিকদের কাছে এর চেয়ে দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় কি হতে পারে। যে বাংলাদেশ আজও ভারতীয় ফুটবল জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করে আছে, আজও ভারতবর্ষে ফুটবল খেলা বলতে যখন বাংলাদেশের কথাই বোঝায়—তখন নিজভূমে পরবাসের মতো বাংলাদেশের ফুটবলের এই শোচনীয় পরিস্থিতির কথা সত্যি চিন্তাও করা যায় না।

কিন্তু বাংলাদেশের হলোটা কি? বাংলাদেশের ফুটবল কর্তৃপক্ষের মতো খেলোয়াড়রাও দিন দিন অবিবেচক হয়ে পড়ছেন। তাই যদি না হবে, তাহলে একজন খেলোয়াড় কোন্ সাহসে বলতে পারেন, কোচিং ক্যাম্পে যাচ্ছি না, দেশে যাবো—সেখান থেকেই যাবো ব্যাঙ্গালোরে।

অর্থাৎ খেলোয়াড়টি ছাড়া বাংলা দল গঠন অসম্ভব, এই কথাই বোধহয় ছলে-বলে-কৌশলে বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে দল থেকে। খুব ভালো হয়েছে। এর থেকে যদি একটু শিক্ষা হয় আত্মগর্বী খেলোয়াড়দের।

তাই বা হবে কি করে—কলকাতার নামী দলগুলো যে মাথায় তুলে রেখে অজস্র টাকা খরচ করছেন এঁদের পেছনে। থাকা, খাওয়া, পরা, হাতখরচ আরো কতো কি। অথচ এঁদের পাশে, এঁদেরই সমান স্টাণ্ডার্ডের স্থানীয় খেলোয়াড়রা বিশ্রীভাবে অবহেলিত হচ্ছেন। আশ্চর্য। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে।

যাক সে কথা। থাক জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার কথাও। আগামী সংখ্যায় সন্তোষ ট্রফির খেলা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

এদিকে কলকাতার ফুটবল মরশুমের দিন এগিয়ে আসছে। আর তার জন্যে এখন প্রস্তুত কলকাতার দলগুলোও। দল বদলের পালা এবারের মতো শেষ হয়ে গেছে। এবার বসবে প্রশিক্ষণের আসর। এবারের দল বদলের পালায় সব থেকে লাভবান হয়েছে বোধহয় ইস্টবেঙ্গলই। সামনে তাদের বড় উৎসব। সেই উৎসব উপলক্ষে বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখার জন্যেই তারা এবার এতো সচেষ্ট।

ছোট দলগুলোর মধ্যে পোর্ট কমিশনার্সের সংগ্রহ এবার খুব খারাপ নয়। মনে হয় এবার তারা বেশ ভালোই খেলবে। মোহনবাগানের ক্ষতি এবার যথেষ্ট হলেও দল তাদেরও খুব খারাপ হবে না বলেই মনে হয়। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিষয়ও এবার ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

তবে যাই হোক গত দুই মরশুমের ভণ্ডুল খেলার স্মৃতিই এখন আমাদের মনে চেপে বসে আছে। অনেককেই এর

কলকাতা ময়দানের হকি মরশুম এখন জমজমাট। নামকরা দলগুলো নেমেছে মাঠে। ছবিতে মোহনবাগানের মুখোপাধ্যায়কে খালসা স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে গোল করতে দেখা যাচ্ছে।

মধ্যে বলতে শুনেছি, দূরে, দূরে কি হবে—আবার কেউ ইনজাংশান দেবে, তার খেলাও যাবে বন্ধ হয়ে।

সত্যি এ এক অরাজক ব্যাপার। কোর্টকে খেলার মাঠে টেনে আনায় কলকাতার ফুটবল মরশুমের যে নাভিশ্বাস উঠছে—এ কথাটা কেউ চিন্তা করেও দেখছেন না। খেলায় জয়-পরাজয় আছেই, সংগঠন থাকলে মনোমালিন্য হবেই। কিন্তু তাই বলে যে,

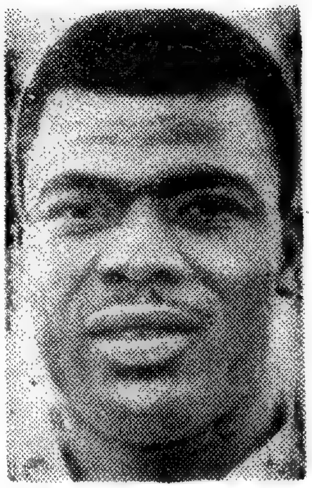

॥ সেমুর নার্স ॥

ওয়েস্ট ইন্ডিজের এখন বরাত খারাপ। নার্সও শেষ পর্যন্ত অবসর গ্রহণের তালিকায় নাম লেখালেন।

বার বার আইন-আদালতের আঙিনায় যাওয়া করতে হবে—এমন কোন কথা নেই। তাই আমরা এবার আর আইন-আদালত চাই না—চাই খেলার মাঠের গোলমাল মাঠেই মিটুক...!

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮্ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯্ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপনাকে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ বসুমতী

এযুগের ফুটবলঃ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসংগে

সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী

বর্তমানে, বাংলার তথা ভারতের ফুটবল খেলা নিয়ে বেশ সাড়া পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। সাড়া জেগেছে দু'টি মতামতের মাধ্যমে। একটি মত দাবি করছে "বর্তমান খেলার পদ্ধতি এক উন্নত বিজ্ঞান ধারায় গঠিত। এই পদ্ধতিতে ফুটবল খেলায় নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে চলেছে। তবে, যে কোন নতুন পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে সময় লাগবে বৈ কি?" আবার, অপর একটি মত দাবি করছে "বর্তমান ফুটবল খেলায় অনেক অবনতি ঘটেছে এবং দিন দিন অবনতির দিকেই চলেছে। বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে খেলার দাবি এ'রা করছেন তারই বা প্রত্যক্ষ নিদর্শন কোথায়? শুধু তাই নয়—এরা না পারে বল সঠিকভাবে মারতে না পারে ভালভাবে ধরতে। অথচ এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চলেছে আজ প্রায় ১৬।১৭ বছর ধরে, সরকারী এবং বে-সরকারী উভয় পর্যায়ে। এ পর্যন্ত তিনজন বিদেশীকে আনা হয়েছে শিক্ষা দানের জন্য। সর্বভারতীয় শিক্ষা সংস্থার মাধ্যমে গড়া হয়েছে অনেক শিক্ষক। তাঁরা আবার ছড়িয়ে পড়েছেন নানান শিক্ষাকেন্দ্রে, খেলোয়াড় গড়ার কাজে। এক কথায়, বাংলা ও ভারতের প্রায় সব ক'টি ছোট ও বড় শহরে এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চলেছে।"

আগে এই প্রকার ডিগ্রিধারী শিক্ষক কোন জায়গায় ছিলেন কি না আমার সঠিক জানা নেই। আমি জানতাম শ্রদ্ধেয় 'দুখীরাম মজুমদার এবং 'শরৎ সিংহ মহাশয়দের। তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতি আমি দেখেছি। (দেখেছি তাঁদের শিক্ষাদানের অপূর্ব পদ্ধতিগুলি)। ক্ষেত্র বিশেষে এবং খেলোয়াড় বিশেষে তাঁরা সেই সব পদ্ধতিগুলিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতেন নানা ভাবে। তাঁদের মধ্যে কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব দোষ ছিল না। যেমন ছিল শাসন তেমনি ছিল দরদ ও স্নেহ। নির্বাচিত কোন ছাত্রকে সঠিকভাবে গড়তে না পারলে তাঁরা নিজেদেরই দায়ী করতেন এবং দুঃখ পেতেন। সেদিনের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁদের হাতে গড়া অনেক ফুটবল খেলোয়াড় বাংলার এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের মর্যাদা পেয়েছেন। সেই সব ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁরা, ইচ্ছামত নির্দিষ্ট স্থানে বলকে দেওয়া-নেওয়া করতে পারতেন।

বিদেশী শিক্ষাধারায় শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় বোধহয় ১৯৫১-৫২ সাল থেকে। অনেকের বিশ্বাস ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই ফুটবল খেলার মান অবনতির দিকে চলেছে। অনেকের ধারণা যে, সঠিক শিক্ষাদানের অভাবেই এরূপ ঘটেছে। আবার অনেকে মনে করেন শিক্ষার্থীদের ঐকান্তিকতার অভাবেই এর জন্য দায়ী। আমার বিশ্বাস দুই-ই ঠিক। শিক্ষায়, শরীর-চর্চায়, ব্যায়াম পদ্ধতির মধ্যে দোষ-ত্রুটি তো আছেই শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ঐকান্তিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যথায় অন্তত দু'-চারটিও কৃতী খেলোয়াড় দেখা যেত। অতএব, বৈজ্ঞানিক ধারার উল্লেখ করে কর্ণধাররা এতদিন সকলকে যে কথা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন তাও ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ এই ত্রুটির কথা স্বীকার করেছেন বটে—তবে, কর্ণধারদের এ বিষয়ে বলার সাহস করেন নি। এদিকে কর্ণধাররা নিজ নিজ ধারণায় এত মোহগ্রস্ত যে, বিজ্ঞান-সম্মত কোন মতামতকেও তাঁরা গ্রহণ করতে রাজী নন। এই প্রকার গোঁড়ামী ক্রীড়ামানের উন্নতির পরিপন্থী। অবশ্য, মারডেকা প্রতিযোগিতার শোচনীয় ফলাফল ওপর মহলেও মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। গত বছর, নির্বাচকমণ্ডলীর দু'জন সভ্য প্রকাশ্যে প্রচার করেছেন যে, সারা ভারতে উপযুক্ত খেলোয়াড়ের একান্ত

অভাব। একটি খেলোয়াড়ও সঠিকভাবে বল মারতে পারে না বলে তাঁদের ধারণা। এই উক্তিকে সমর্থন করেছিলেন বাংলার তিনজন ক্রীড়া শিক্ষক। কাগজের পাতায় এইরূপই পড়েছি। উক্ত উক্তির সত্যাসত্য বিচার হয় নি, এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদও হয় নি। এমন কি, প্রখ্যাত খেলোয়াড় রহিম সাহেব যে বলেছিলেন "এ কি খেলা হচ্ছে? এরা না পারে মারতে—না পারে ধরতে" এই উক্তিরও কোন প্রতিবাদ হয় নি। প্রতিবাদ করা উচিত ছিল বর্তমান শিক্ষকদের এবং শিক্ষা সংস্থার কর্ণধারদের। কিন্তু প্রতিবাদ তাঁরা করেন নি। এর থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান পদ্ধতির ওপর তাঁদেরও বিশেষ আস্থা নেই। এও মনে হয় যে, এই শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃত গলদ কোথায় তাও তাঁদের সঠিক জানা নেই। যদি থাকত তবে, নিশ্চয় সংশোধনের প্রচেষ্টা হত? সে যাই হোক, শিক্ষকদের পক্ষে উক্তরূপ সমর্থন যুক্তিযুক্ত হয় নি। কারণ, খেলোয়াড় গড়ার দায়িত্ব একান্তভাবে শিক্ষকদের। যদি উপযুক্ত খেলোয়াড়ের অভাব হয় তবে, তারও দায়-দায়িত্ব শিক্ষকদের। অথচ, উক্ত তিনজন শিক্ষক প্রায় ১৪।১৫ বছর যাবৎ কলকাতার তিনটি প্রখ্যাত ক্লাবে শিক্ষকতা করছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশ শিক্ষকদের এরূপ উক্তিকে প্রশ্রয় দিতেন না। বরং যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মারডেকা প্রতিযোগিতার সাথে দেশের জাতীয় সম্মানের প্রশ্নটি একান্তভাবে জড়িত। অতএব, ক্রীড়ামোদী মাত্রেরই দাবি আছে এই দুরবস্থার প্রতিকারের প্রচেষ্টা করবার। কর্ণধারদের অনুরোধ করব যথাসত্বর ক্রীড়ার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

সবিনয় নিবেদন

প্রতিদিন আমাদের দপ্তরে অনেকগুলি করে চিঠি আসে। কিন্তু জায়গা কম বলে সবগুলোর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই অনেক চিঠি জমে গেছে আমাদের কাছে। আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, আপনারা একটার বেশি প্রশ্ন করবেন না। আর ব্যক্তিগতভাবে উত্তর পেতে হলে চিঠির সংগে সব সময় খাম-পোস্টকার্ড কিম্বা স্টাম্প থাকা বাঞ্ছনীয়। আশা করি আমাদের এই অসুবিধাটুকু আপনারা বুঝবেন।

—ক্রীড়া সম্পাদক

বর্তমান শিক্ষায় সুফল না পাওয়ার কারণ হিসাবে আমি যা মনে করি তার কিছু উপস্থাপিত করছি। ফুটবল খেলায় শিক্ষণীয় প্রধান ধারা দুটি। শরীরচর্চা এবং ক্রীড়াকুশলতা। একে অপরের সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত। অতএব, যেমন প্রয়োজন শরীরকে সুপটু করে গঠন করা তেমনি প্রয়োজন ক্রীড়াপদ্ধতিগুলি কুশলতার সংগে পরিবেশন করা। এই শরীরচর্চা এবং ক্রীড়াকুশলতার মধ্যে যথেষ্ট বিজ্ঞান নিহিত আছে। শরীরচর্চা নিহিত আছে। এনাটমি, ফিজিওলজি, ডায়েটি, সোশ্যোলজি ও ফিলজফি। আর আছে, দেশ-বিশেষে, প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের বিচার দ্বারা উপযুক্তভাবে চর্চা করা। আর ক্রীড়াকুশলতার মধ্যে নিহিত আছে উচ্চতর গণিত বিজ্ঞান। উক্ত বিজ্ঞানগুলি সম্বন্ধে অন্তত মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে এই শিক্ষা সুষ্ঠুরূপে হওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া শুধু সাধারণ জ্ঞান থাকলেই চলবে না। প্রয়োজন উপযুক্ত প্রয়োগ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানের। শরীরচর্চার ব্যায়ামগুলি অনুশীলনের সময় বৈজ্ঞানিক ধারাগুলি বিশেষভাবে মানা দরকার। ক্রীড়াপদ্ধতিগুলি কুশলতার সংগে সঠিক পরিবেশন না করতে পারলে সেই ক্রীড়াপদ্ধতি স্বার্থকতা লাভ করবে না। প্রতিটি পদ্ধতিই ভাল। কারণ, পদ্ধতিগুলি বিশেষ বিশেষ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত। অতএব, একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ উভয়ই সমধিক কঠিন। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষাদানের যোগ্যতা এবং উপযুক্ত চর্চার দ্বারা কুশলী ক্রীড়াবিদ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত এদেশে যে তিনজন বৈদেশিক শিক্ষাদানের জন্য এসেছিলেন তাঁরা কেউ উপযুক্ত প্রকৃত শিক্ষক নন। ভাল খেলোয়াড় মাত্র। ভাল খেলোয়াড় হলেই শিক্ষক হতে পারেন না। তা হলে, সামাদ সাহেব একজন ভাল শিক্ষক হতে পারতেন। কাজে কাজেই, শিক্ষাপদ্ধতিগুলির বিশেষ করে শরীরচর্চার পদ্ধতিগুলির মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। আছেও তাই। এই সব দোষ-ত্রুটির জন্যই এত অর্থ ও সামর্থ্যের অপচয় হয়েছে। প্রকৃত উন্নতির জন্য অনুকরণ করা ভাল। তবে, অন্ধ অনুকরণ আদৌ ভাল নয়। বিচার ও বিবেচনার দ্বারা, তুলনামূলক সমন্বয়ের মাধ্যমে, অনুকরণ করাই শ্রেয়। তা ছাড়া, জাতীয়তাবোধ না থাকলে আত্মোন্নতি সম্ভব নয়। পৃথিবীর সব দেশবাসীই স্বদেশপ্রেমিক। বিগত প্রায় ৩৪ বছরের ক্রীড়া-শিক্ষকতার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা সফলতা লাভ অবশ্যম্ভাবী।

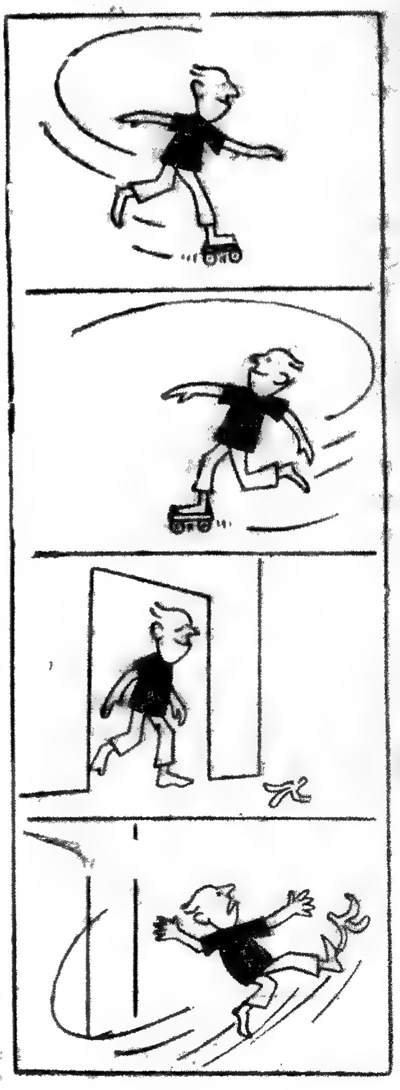

প্রশ্ন উত্তর

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (স্ভাবপল্লী, শিলিগ্ড়ি)

প্রশ্ন : ভারতীয় ক্রিকেট দল সর্বপ্রথম কবে ও কোথায় বিদেশে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলতে যায় এবং ফলাফল কি হয়েছিল এবং ভারতীয় দলের অধিনায়ক কে ছিলেন ?

উত্তর : ১৯৩২ সালে ভারত সর্বপ্রথম তার বিদেশ ভ্রমণে ইংলন্ড যায়। সেবার ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন সি কে নাইড্। একটি মাত্র টেস্ট খেলা হয়েছিল সেবার এবং সেই টেস্টে ইংলন্ডই জিতেছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : অনেকে বোরদের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চেয়েছিলেন, উত্তর দিয়েছিলেন আপ-ট্-ডেট করে জানাবো। তাই আপনার স্বিধার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম—

টেস্ট — ইনিংস — অঃ পঃ —
বোরদে — ৫৪ — ৯৫ — ১১ —

উত্তর : ধন্যবাদ।

মিজবাউদ্দীন আহম্মদ, আব্দ্ল মজিদ ও আব্দ্ল ওহাব (বারাসাত, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : নিউজিল্যান্ডের জন রীড ও বার্ট সাটক্লিফের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই। সেলিম দ্রানীর বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর : টেস্ট — ইনিংস — নঃ আঃ —
জন রীড—৪৫ — ৮৪ — ৫ —
বি সাটক্লিক—৩৪ — ৬২ — ৫ —

সেলিম দ্রানীর বোলিং এ্যাভারেজ দ্'-চার সংখ্যা আগেই প্রকাশিত হয়েছে।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমীরকুমার বল ও খগেন বিশ্বাস (হালিসহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনার চিঠির কিছ্ অংশ তুলে দিলাম :

"গত ৩৭ সংখ্যার 'সাপ্তাহিক বস্মতী'তে স্কুমার সরকার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে যে পার্টনারশীপ রেকর্ড জানিয়েছেন তাতে নবম উইকেট পার্টনারশীপের বিশ্ব রেকর্ড কাউড্রে ও এ· সি· স্মিথের পরিবর্তে পাকিস্তানের আসিক ইকবাল ও ইন্তিখাব আলম কৃত (১৯৬৭ সালে ১৯৩ রান, ইংলন্ডের বিরুদ্ধে) রানই বর্তমান বিশ্ব রেকর্ড বলে গণ্য হবে।"

স্খময় কুন্ডু (হাসপাতাল রোড, টাংলা, দরং, আসাম)

প্রশ্ন : মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও বিশ্ব মিতালী সঙ্ঘের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর : মহামেডান স্পোর্টিং টেন্ট, কলকাতা ময়দান, কলকাতা; বিশ্ব মিতালী সঙ্ঘের ঠিকানা জানি না।

সর্বোচ্চ — শতরান সংখ্যা — মোট — গড়
—১৭৭* — ৫ — ২০৪২ — ২৪·৩১

কবি দত্ত (গৌহাটি, নামবাড়ি রেলওয়ে কলোনী)

প্রশ্ন : বর্তমানে আপনার মতে ভারতীয় ক্রিকেটে সবচেয়ে ভালো ব্যাটিং কে করেন ও তাঁর সব চেয়ে বেশি স্কোর কত ও কোন্ খেলায় !

উত্তর : আমার মনে হয় পতৌদির

রান — সর্বোচ্চ — শত রান — গড়
২৫৬০ — ১৪২ — ৫ — ৩২·৪০
২৩৩৫ — ২৩০* — ৪ — ৪০·৯৬

নবাবই। দিল্লী টেস্টে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ২০৩ রানই তাঁর সর্বোচ্চ।

অরবিন্দ দাশগ্প্ত (সিউড়ী, বীরভূম)

প্রশ্ন : কুশলকুমার এ বছর কোন্ দলে খেলছেন ?

উত্তর : বি· এন· আর দলে।

আপনি ও ব্যাপারে সরাসরি আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ কর্ন।

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাসত, চন্দননগর, হ্গলী)

প্রশ্ন : মনে কর্ন কেউ ব্যাট করছে আর কেউ বল করছে। তখন ব্যাটসম্যান একটা বল ফরোয়ার্ড খেলার পর বলটা তার পায়ের কাছেই পড়লো। ব্যাটসম্যান তখন বলটা হাত দিয়ে তুলে নিয়ে কোন ফিল্ডারকে দিলো। তখন ফিল্ডাররা 'হাউজ দ্যাট' বলে আবেদন জানালে আম্পায়ার কি আউটের নির্দেশ দেবেন ?

উত্তর : হ্যাঁ, দেবেন। 'হ্যাণ্ডলড্ দি বল' নিয়ম অন্সারে ব্যাটসম্যান আউট হবেন। একমাত্র প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের অর্থাৎ ফিল্ডারদের অন্রোধ ছাড়া ব্যাটসম্যান কোন মতেই বলে হাত দেবেন না।

(* অপরাজিত)

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাসত, সরোজিনীপল্লী) ও **হিমাদ্রীকান্ত ব্যানার্জী** (আনন্দচন্দ্র কলেজ হোস্টেল, জলপাইগ্ড়ি)

উত্তর : আপনাদের চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। আগেই ভুলটা ঠিক করে নেওয়া ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, টেস্ট খেলায় ৯ম উইকেটে ইংলন্ডের বির্দ্ধে পাকিস্তানের আসিফ ইকবাল ও ইন্তিখাব আলম ১৯৩ রান করে ১৯৬৬-৬৭ সালে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

প্রবীরকুমার ঘোষ (বসিরহাট, ২৪ পরগনা)

উত্তর : তোমার চিঠি পেয়েছি। পরে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

প্রকাশকুমার গ্প্ত (টিপ্ক চা বাগান, টালাপ)

প্রশ্ন : একটা ম্যাচ চলার সময় উইকেটরক্ষক পরিবর্তন করার দরকার হলে সেই দলের ক্যাপ্টেন কি করবে ?

উত্তর : সেই দলের অন্য কেউ যদি উইকেটরক্ষকের সাজ করতে পারেন তাহলে তাঁর ওপর তিনি সেই দায়িত্ব দেবেন। আর তা' যদি না থাকে তাহলে প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়ক রাজী থাকলে অতিরিক্ত খেলোয়াড়কে দিয়েও উইকেট রক্ষকের কাজ করাতে পারবেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বস্মতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গ্লী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বস্মতী প্রেস হইতে শ্রীস্কুমার গ্হমজ্মদার কর্তৃক ম্দ্রিত ও প্রকাশিত।

জেনে রাখুন ঃ

- পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রেই বিনামূল্যে নিরোধ এবং যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি যে সব দোকানে বিক্রী হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে নিরোধ কিনতে পাওয়া যায়
- তিনটি সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত নিরোধ ব্যবহার করে দুই সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান সম্ভব
- তিনটি সন্তানলাভের পর স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের জন্যে অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

দুইটি বা তিনটি সন্তানের পরিবারই আদর্শ পরিবার

আজই আপনার নিকটবর্তী যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

Price: 30 Paise   Gram: "..."   Phone: 34—7771, 72, 73, 74

28 MAR 1969

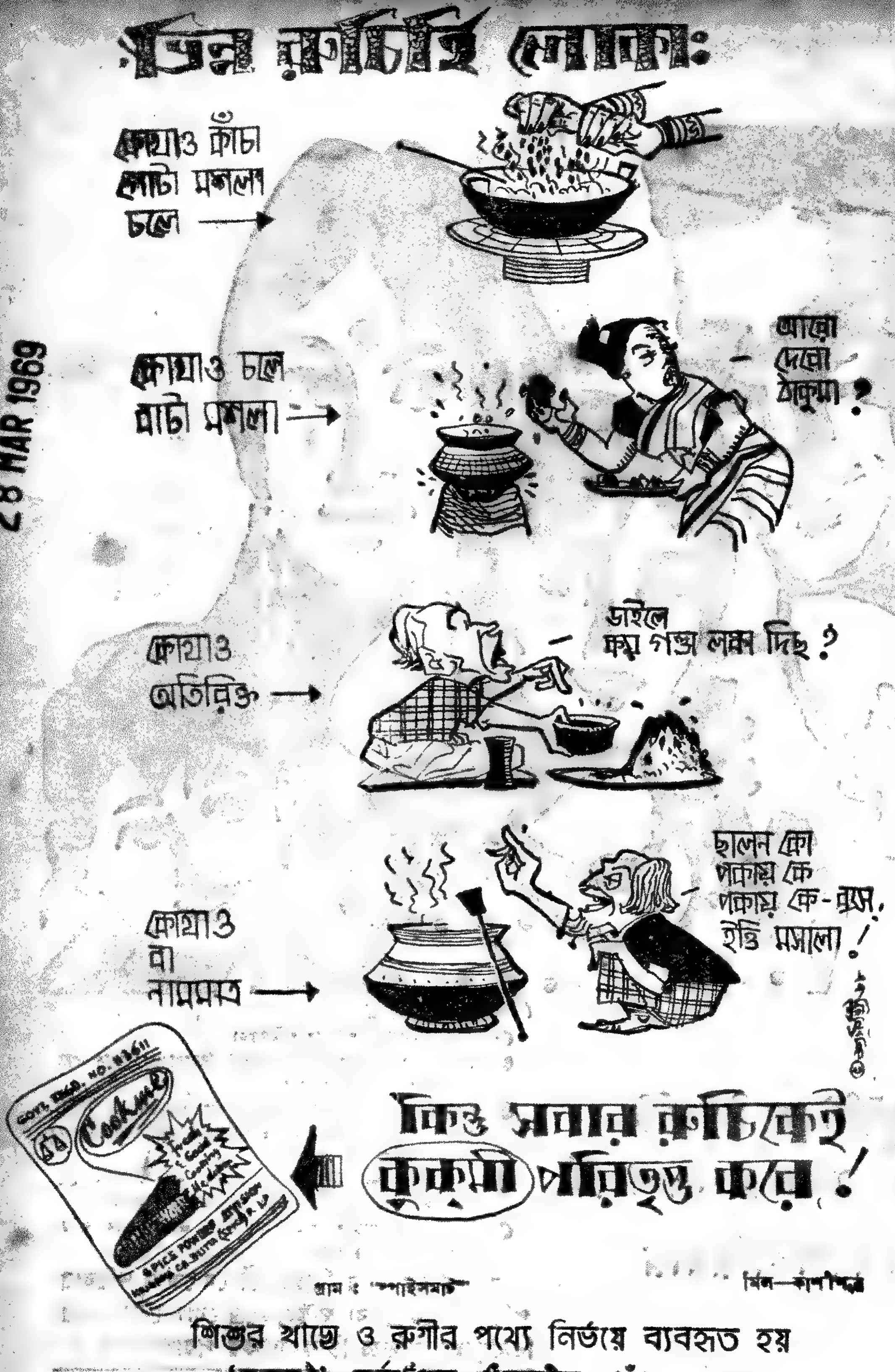

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট"

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২০৫ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থানে বেসামাল আয়ুবের বিদায়

পাকিস্তানে আবার জঙ্গী শাসন ঃ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ

৭৩ বর্ষ ঃ ৪১শ সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ২০শে চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 41, 3rd April, 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৫৬৩
আজকের মানুষ		২৫৬৪
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৫৬৫
বঙ্গদর্শন		২৫৬৯
ভারতদর্শন		২৫৭২
আন্তর্জাতিক		২৫৭৫
সপ্তাহের বোকা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২৫৭৭
পুলিশ-প্রসঙ্গ	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২৫৭৯
মন্ত্রীরা কি বলেন		২৫৮৩
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	২৫৮৫
স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুন	— মনোরঞ্জন হাজরা	২৫৮৭
শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতি	— শ্রীসওদাগর	২৫৯০
রবীন্দ্রনাথের গান (কবিতা)	— রাণী দেবী	২৫৯১

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বনমানুষের নাচ : চলছে, চলবে	— উদ্ভেড়	২৫৯২
অহংকার (গল্প)	— দেবদাস ফণী	২৫৯৪
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	২৫৯৭
কারবালার অশ্রু	— খায়রুল বাসার	২৬০২
একমুঠো কবিতা (কবিতা)	— অতুলরঞ্জন দেব	২৬০৩
যারাই বাস করে (কবিতা)	— ক্ষিতীশদেব সিকদার	২৬০৩
গ্রন্থমেলা		২৬০৪
তিমিরপ্রান্ত তরঙ্গ	— অভিমন্যু	২৬০৬
পাঠকমন		২৬১০
চলচ্চিত্র ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাদিত্য	২৬১৩
রঙ্গজগৎ		২৬১৫
মুখরা বলো	— শান্তিপ্রিয়	২৬২০

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক) মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

সাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ভক্তিমাধুরী-মণ্ডিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—সারস্বতকুঞ্জের পূর্ণজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৬·০০

দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। ৬·০০

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৮·০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, খেড়েভেড়ের কৌতুক, ফর্দরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, 'সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী' নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৩ বর্ষ : ৪১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২০শে চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | Thursday, 3rd April, 1969

বিদ্রোহী কবি নজরুল ও সরকারের দায়িত্ব

দলমত নির্বিশেষে যোলজন সংসদ সদস্য বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

ভারতের পরাধীনতার যুগে সুউচ্চ এবং অকপট কণ্ঠে বৃটিশ রাজশক্তির দুর্ভেদ্য কারার লৌহকপাট ভেঙে ফেলার জন্য ঘোষণা জানিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম-ই।

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে সাহিত্যের নবযুগ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত হয়েছিল, তাকে তীব্রতা দান করেছিলেন নজরুল। এই বিদ্রোহী কবি শুধু পরাধীনতার অভিশাপ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর অবিস্মরণীয় কবিতার মাধ্যমে পরিবেশন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। ইনি যেমন ছিলেন জাতীয়তার উদ্বুদ্ধ, তেমনি আন্তর্জাতিক ভাব-ভাবনার প্রগাঢ় পোষাক। স্বভাবতই কবি নজরুল ইসলাম বিগত দিনের জাতীয়তাবাদী কবিদের সুপ্ত চিন্তাকে প্রসারিত করে জনগণের সার্বিক স্বাধীনতার জন্যে সুস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। এবং এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহান সাহিত্যিকদের সঙ্গে একই সারিতে জনমনে স্থায়ী আসন লাভ করলেন।

তবু এমনই দুর্ভাগ্যের কথা যে, প্রায় দু' দশকে কবি নজরুল সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেতন হন নি। এই কারণে মনে হয়, একালে দেশের গুণী সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও শিল্পীরা সমাজের প্রায়-নগণ্য জীব হিসেবেই গণ্য এবং একমাত্র যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরাই সরকারী ন্যায়চক্ষুতে মর্যাদা-সম্পন্ন। এর প্রমাণ রয়েছে ভূরি-ভূরি।

যা হোক, এই অবস্থায় যোলজন সংসদ সদস্য যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁরা দলমত নির্বিশেষে নজরুলের কাব্য ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের জন্য যে আবেদন জানিয়েছেন, তা দেশের বর্তমান আবহাওয়ায় সুলক্ষণের অন্যতম প্রকাশ বলে আমরা মনে করি।

প্রসঙ্গত আমরা একথা বলতে চাই, পূর্ববঙ্গে ইতিপূর্বে নজরুলের সমস্ত কাব্য ও সাহিত্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া নজরুলের কাব্যগ্রন্থ রুশ ভাষায় প্রকাশ করে সোভিয়েট সরকার সে দেশের অগণিত পাঠকের কাছে যেভাবে সাড়া পেয়েছিলেন, সে-সংবাদ এদেশের নজরুলানুরাগীদেরও অভিভূত করেছিল। আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে নজরুলের বহু কবিতা ও গানের বিক্রীত গ্রন্থস্বত্ব সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমস্ত নজরুল কাব্য ও সাহিত্য সংগ্রহ অন্তত প্রথমে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। দুঃখের কথা, কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেন নি। অবশ্য এই বাংলাদেশেই নজরুল নির্বাক হবার পর কবি সম্বন্ধে সবাই প্রায় নির্বাক হয়েছিলেন। এদিকে আমাদের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি। নজরুলের মত কবি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য লজ্জার কথা। তবে সেই ঔদাসীনতাকে সবলে আঘাত করে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি উচ্চাদর্শেরই কাজ করেছিলেন। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রচারের মাধ্যম হিসেবেই শুধু কবির জন্মদিনই পালন করেন নি। ঐ প্রতিষ্ঠানটি চেয়েছিল নজরুল সাহিত্যের সুলভ প্রচার, নজরুল সঙ্গীত শিক্ষাদানের নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলেই পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির আবেদনে কবির সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সঙ্গীত প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ভবন প্রতিষ্ঠাকল্পে কয়েক কাঠা জমি দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। এছাড়া কবির ব্যয় নির্বাহের জন্য ঐ সরকার আরও একশ' টাকা মঞ্জুর করেন। এসব খবর সংবাদপত্র মারফৎ আমরা পেয়েছিলাম।

এরপর অনেক ঘটনাই ঘটে যায়। যুক্তফ্রন্টকে গদিচ্যুত করে পি ডি এফ মন্ত্রিসভা ও পরে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা হয়। এরই মধ্যে কলকাতা নগরীতে গড়ে ওঠে এমন সব প্রতিষ্ঠান, যারা মহান কবি নজরুলকে ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগাতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করছে না। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যেভাবে নজরুল নামাঙ্কিত জমি বিলি করেন, তা যথার্থ উদ্দেশ্যের পথেও বাধাস্বরূপ। কারণ ঐ জমি কে পেল—তা অনেকের অজ্ঞাত। অথচ ঐ জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনোনীত কোনো ট্রাস্টী বোর্ডের হাতে যাওয়াই উচিত ছিল। আমরা আশা করি, এই ঘটনার ওপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্যক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে জনসাধারণের আবেগ জড়িত। ব্যাপারটি তাই নগণ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবি নজরুল ইসলামকে সর্বসমেত মাসিক সাড়ে সাতশ' টাকা ভরণ-পোষণের জন্য দেওয়া হয়। দেশের সাধারণ মানুষের অর্থই সরকার দিচ্ছেন বলে যেমন তার একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার, তেমনি কবির টাকা কিভাবে খরচ হয়, জনগণের অবগতির জন্য পাকা হিসেব সরকারী দপ্তরে রাখা উচিত। সরকারী হিসেবে সূচ গলে না, কিন্তু অহেতুক ভাবাবেগে যেন উট গলে না যায়। এতদিন সরকার কোনো ব্যাপারেই সচেতন দৃষ্টি দেয় নি বলেই কবির সমগ্র কাব্য-সাহিত্য বের হয় নি। আশা করি, যুক্তফ্রন্ট সরকার সেদিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখবেন। অধিকন্তু যোলজন সংসদ সদস্য যে আবেদন করেছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার তাকে আগামী ২৫শে মে-র আগেই আরও জোরদার করবেন আমরা এটাই দেখতে চাই।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ঘড়ির কাঁটার মত ইতিহাসের চাকাও স্বাভাবিক গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু বিপুল বিশ্বে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নিজেদের 'স্ট্রং ম্যান' বা শক্ত মানব বলে জাহির করেন। তাঁরা সেই ঘড়ির কাঁটাকে জবরদস্তিতে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মজা পান, ঐতিহাসিককে নির্দেশ দেন বাস্তব ঘটনা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে কর্তার মর্জি মতন ইতিহাস রচনা করতে। পাকিস্তানে এমনি এক কাণ্ড ঘটেছিল ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে যেদিন আয়ুব খাঁ ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এবার সে-ক্ষমতা জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর হাতে তুলে দেবার মধ্যে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল।

আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁ. একে জাতে পাঠান তায় সেনাবাহিনীর শীর্ষে: শক্ত, জবরদস্ত লোক হবেন নাই বা কেন? গত দু' বছর ধরে বড় কর্তা তাঁকে তো তালিম দিয়ে শক্ত করে গড়ে তুলছিলেন যাতে একদিন চাবুকটা হাতে তুলে নিতে পারেন। সত্যি বটে, অসম্মান এবং অপমানের বোঝা নিয়ে আয়ুব খাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে, কিন্তু ডিক্টেটররা এর চেয়ে বেশি কবে কোথায় কী পেয়েছেন?

ইয়াহিয়া খাঁর শীর্ষারোহণ খুব দ্রুত, খানিকটা অস্বাভাবিক তড়িদ্বেগে ঘটেছে। অবিভক্ত ভারতের পেশোয়ারের বিখ্যাত কাজিলবাশ পরিবারে ১৯১৭ সালে ইয়াহিয়ার জন্ম। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে ইয়াহিয়া যোগ দেন দেরাদুনের সামরিক বিদ্যালয়ে। কমিশন পেলেন ১৯৩৯ সালে, উরচেস্টার রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যুক্ত হলেন ইয়াহিয়া। পরের বছর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বালুচ রেজিমেন্টের তৃতীয় ব্যাটালিয়নে ডাক পড়ল তাঁর। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অবশ্যই লাভ করেছেন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র-

আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁ

বাহিনীর পক্ষে ইতালি এবং মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে তাঁকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়েছে।

দেশ বিভাগের পর ইয়াহিয়া খাঁ স্বভাবতই যেভাগে পেশোয়ার পড়েছে সেদিকে যাবার পক্ষেই মত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার উপযুক্ত পুরস্কারও জুটে গেল—লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হলেন ইয়াহিয়া। নতুন রাষ্ট্র, নতুন এবং ছোট সেনাবাহিনী। বয়সেও ইয়াহিয়া তরুণ, তার সঙ্গে রয়েছে তাঁর প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সামরিক পুরুষের গুণাবলী তাঁর রয়েছে, তার ওপর কর্তৃপক্ষের নেকনজর। কাজেই ধাপ ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে তাঁর বাধা কোথায়? যেদিন তিনি ব্রিগেডিয়ার পদ পেলেন সেদিন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৪। ব্রিগেডিয়ারের দায়িত্বপূর্ণ র‍্যাঙ্কে সেদিন ইয়াহিয়া খাঁ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু তাতে কী? ছ' বছর বাদে ৪০ বছর বয়সে যেদিন, তিনি সেনাবাহিনীর জেনারেল হলেন সেদিনও তো তিনি বয়সে সবার ছোট।

আয়ুব খাঁ ক্ষমতা দখল করলে সাধারণ লোকের সর্বনাশ ঘটলেও ইয়াহিয়া খাঁর কপাল তাতে খুলেই গিয়েছিল। বস্তুত ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুষ্টিমেয় যে-ক'জনের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিলেন, ইয়াহিয়া খাঁ তাঁদের মধ্যে প্রধান। ১৯৬৬ সালে যখন ইয়াহিয়া খাঁকেই অনেককে পেছনে ফেলে সেনাবাহিনীর প্রধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদটি দেওয়া হল, তখন পর্যবেক্ষকদের বুঝতে কষ্ট হয় নি যে, প্রেসিডেন্ট আয়ুবের উত্তরাধিকারী হবেন কে। আজ সেই অনুমান অভ্রান্ত প্রমাণিত হল। সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি মস্কো, পিকিঙ, ওয়াশিংটন ঘুরে এসেছেন।

কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁর কি প্রতিদ্বন্দ্বী নেই? অবশ্যই আছে, অজাতশত্রু তিনি নন। বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ নুর খাঁকে আজ তাঁরই আদেশ নতশিরে পালন করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু ইয়াহিয়াকে আঘাত করার কোন সুযোগ এলে তা তিনি ছাড়বেন বলে মনে হয় না। তেমনি রয়েছেন জেনারেল মুসা, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর। আর রয়েছেন প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ আর খাঁ। অর্থাৎ আয়ুব খাঁ তাঁর শিষ্য ইয়াহিয়াকে দিয়ে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আপাতত দমাতে পরবেন বটে, কিন্তু ইয়াহিয়ার নিজেরই গদিটা অত্যন্ত নড়বড়ে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"ভয়ঙ্কর লোকটি"র লণ্ডন-সংবর্ধনা—(৩)

বারট্রান্ড রাসেলের লেখার বিশেষ ভক্ত সুভাষচন্দ্র রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে পারেন নি। "লণ্ডনের সংবাদসূত্রে প্রকাশ মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু আর একটি শেষরাত্রির আলোচনায় বসেছিলেন, এবার সে আলোচনা মিঃ বারট্রান্ড রাসেলের সঙ্গে। মিঃ বসু কেম্ব্রিজ থেকে শেষরাত্রির আগে ফেরেন নি।"

হ্যারল্ড ল্যাস্কি ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গেও কথালাপ বাদ যেতে পারে না। কৃষ্ণমেননকে সঙ্গে নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন।৮ অধ্যাপক হলডেন এবং ডাঃ আইভরের সঙ্গেও কথাবার্তা হল, ১৮ জানুয়ারী রাত্রে।

সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে পৌঁছেছিলেন ১০ জানুয়ারী অপরাহ্নে, লণ্ডনের ক্রয়ডন বিমানবন্দর থেকে বিমানে ভারত-যাত্রা করেন ১৯ জানুয়ারী সকাল সাড়ে আটটায়। মধ্যে ৯ দিনের মত সময়। এই ৯ দিন আক্ষরিকভাবে তাঁর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। দিনে বিশ্রাম না থাকা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সামান্য কথা। রাত্রের বিশ্রামকেও তিনি অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার করে তুলেছিলেন। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে সবিস্ময়ে সাংবাদিক লিখেছিলেন—

> "ভারতের এই অতিথি সারাক্ষণই ব্যস্ত। জনসভায় বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার, একান্ত আলোচনা, ছাত্রদের নির্দেশ-দান—সবকিছু তার মধ্যে আছে। ইতিমধ্যে সুভাষ বহুসংখ্যক ইংরেজ রাজনীতিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বামপন্থী লেখক, বুদ্ধিজীবী, এবং কমিউনিস্ট দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। গড়ে দিনে তিনটি করে সভায় বক্তৃতা করেছেন। তাই দেখা হলে বলতে ইচ্ছে হল, "ছোকরা, বড় ব্যস্ত তোমার দিন কেটেছে"; কিন্তু কথাটা মুখে আটকে গেল, বলতে সাহস হল না, ইতিমধ্যেই সংবাদ ঘোষিত হয়েছে, তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি।
>
> তিনি যে খাটো কোন মানুষ নন তা স্পষ্টই বোঝা গেল যখন দেখা গেল, মিঃ এটলীর স্তরের বৃটিশ রাজনীতিক, মিঃ আর্নেস্ট বেভিনের স্তরের বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের স্তরের বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক, এবং মিঃ হ্যারি পলিটের স্তরের বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতা তাঁর সঙ্গে ভারতীয় পরি-স্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ও তা থেকে বৃটিশ জনগণের পক্ষে দরকারী তথ্য সংগ্রহ করেছেন।"
>
> "মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যেসব বিশিষ্ট ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনাদি করেছেন, তাঁদের মধ্যে এঁরাও আছেন......মিঃ জর্জ লনসবেরী, মিঃ গ্রীনউড, মিঃ প্রিট, মিস এলেন উইলকিনসন, মিঃ পাম দত্ত, মিঃ রাডলি, এবং মিঃ ব্রিজম্যান। তিনি লরেন্স, হাউসম্যান, হোরেস এবং আলেকজাণ্ডার প্রমুখ নাম-করা শান্তিবাদী নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন।"৯

---

৮ এই বৎসরই লণ্ডনে ২৬ জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবসে ভাষণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের তুলনায় জহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীল দৃষ্টি ভঙ্গির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—

"It would be folly on my part to say to you, the Indians, that there are elements in the Congress movement interested in sending out British Imperialism but not fighting for the emancipation of the masses of India. Of course there are elements in the Congress movement which are striving for Socialism and economic emancipation. I am glad to have had the pleasure to meet and discuss with the illustrious leaders, Jawaharlal Nehru and Subhas Bose. They are the elements that need support and encouragement. But I must say that there are elements in the Indian National Congress against whom one day I hope myself to be stoutly arrayed."

(অমৃতবাজার, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)

৯ বৃটিশ মন্ত্রিসভার লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও লর্ড জেট ল্যাণ্ডের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। লর্ড অ্যালেনের

সুভাষচন্দ্র এই দিনগুলিতে এতই কর্মব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে লণ্ডনত্যাগের আগে ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ নিতে অমৃতবাজারের লণ্ডন প্রতিনিধিকে অধ্যাপক হলডেনের গৃহমুখী সুভাষচন্দ্রের গাড়িতে উঠে বসতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁকে বললেন, "যত শীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরে যেতে চাই, সেখানে অনেক কাজ।" আরও বললেন, "এবারের ইংলণ্ড ভ্রমণের মধুরতম স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেকেই কত সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, কত না সাহায্য করেছেন।"

ভারতীয় রাজনীতিকরা যখন 'শত্রুপক্ষের' সহৃদয়তায় ও সহায়তায় অভিভূত হন, তখনই আমরা আতঙ্ক বোধ করি। ভয় হয়, এই বুঝি তাঁরা নিজের প্রাপ্তি ও দেশের প্রাপ্তিকে এক করে ফেললেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যতখানি পান, সমষ্টিস্বার্থ থেকে দিয়ে আসেন অনেক বেশি। শান্তিবাদী ইংরেজ ও গুপ্তচর ইংরেজের দ্বারা পরিবৃত থেকে গোল-টেবিল বৈঠকের সময়ে গান্ধীজী যে রাজনৈতিক বুদ্ধি-হীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের সমালোচনার কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে সুভাষচন্দ্র অনুরূপক্ষেত্রে আইরিশদের আচরণের উল্লেখ করেছিলেন। ইংরেজ উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিকেরা জহরলালকে কিভাবে গ্রাস করে ফেলেছিলেন, সেকথাও সুভাষচন্দ্রের রচনা মারফৎ আগে দেখেছি। সেই সকল উদারচরিত কিন্তু জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন ইংরেজেরাই তো লণ্ডনে সুভাষচন্দ্রকে ঘিরে ধরেছিলেন, প্রশংসাও করেছিলেন, এবং লণ্ডনের সুমধুর স্মৃতির কথাও সুভাষচন্দ্র বলেছেন। সাফল্যের হাসিও তাঁর মুখে এবং মনে। সুভাষচন্দ্র কি নমনীয় হন নি, যিনি উচ্চাঙ্গের গর্ব করে বলেছেন, মেরুদণ্ড তাঁর সোজা আছে, থাকবে।

হাঁ, তাই ঠিক। সুভাষচন্দ্র সেই একই মানুষ চিরদিন, একই উদ্দেশ্যে ধাবিত কেবল পথিমধ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন পথের বাধার সঙ্গে উপযুক্তভাবে লড়াই করার জন্য। শ্রমিক নেতাদের সকল পিঠ চাপড়ানির মধ্যে এই সুভাষচন্দ্র পিছন ফিরে বলতে কুণ্ঠিত হন না, লেবার পার্টি ভারতের জন্য কিছুই করে নি, করবে ভবিষ্যতে এমন আশাও রাখি না। যাঁরা সুভাষচন্দ্রের পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন, তাঁরা বুঝলেন, ভারতের সকল উত্তাপ লণ্ডনের শৈত্যে জমে যায় না, এবং চাপড়ানির আদরে সকল পিঠ নুয়ে পড়ে না। ভারতে বৃটিশ স্বার্থের নির্ভরযোগ্য অছি যে ইনি হতে পারেন না, তাঁরা বুঝেছিলেন।

বুঝবার আরও কারণ ঘটেছিল। আমি ইচ্ছে করেই আগে তার উল্লেখ করি নি। লণ্ডনে বহু আতিথ্যে এবং সংবর্ধনায় রসায়িত সুভাষচন্দ্র ইংরাজদের জাতশত্রু ডি ভ্যালেরার সঙ্গে গোপন আলোচনা করেছিলেন এরই মধ্যে এক রাত্রে—মধ্যরাত্রে। কী আলোচনা হয়েছিল, তা জানতে ইংরেজ সাংবাদিকদের মনে কৌতূহলের অবধি ছিল না। এত আলো ও মালার মধ্যেও লোকটি তার সঙ্গে গোপনে কথা বলে এল, ইংরেজকে ইংরেজেরই অস্ত্র যে ফিরিয়ে দিয়েছে—অনেকের মনের মধ্যেই কাঁটার মত বিঁধেছিল ব্যাপারটা। মনে হয়েছিল, সহাস্য, সুন্দর, মর্যাদাবান লোকটি আসলে 'সত্যই ভয়ঙ্কর'।

স্বাধীন আয়ারের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরাধীন ভারতের কংগ্রেস-সভাপতির সাক্ষাৎকার-ঘটনা যথেষ্টই নাটকীয়। প্রকাশিত বিবরণে দেখি, ব্যাপারটি পূর্ব-নির্ধারিত ছিল না। ঘটনাচক্রে উভয়েই তখন লণ্ডনে; এবং ডি ভ্যালেরা ও সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে আছেন অথচ পরস্পর করমর্দন করবেন না, হতেই পারে না।

"শনিবার রাত্রে ঐ প্রকার সংবর্ধনার পরে মিঃ ডি

সঙ্গেও। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র তা লিখেছেন। ফেরার পথে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট বেনেসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। লর্ড জেটল্যাণ্ড ও প্রেসিডেন্ট বেনেসের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে বেরোয় ২০ জানুয়ারী। আর্থার গ্রীনউডের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাতের কথাও।—

"London, Jan. 19....Mr. Bose received several visitors until 2 A.M. this morning. At Prague to-day at four he has an appointment with President Benes. Yesterday Mr. Bose was busy receiving callers from Indian community all of whom had schemes for foreign propaganda for Mr. Bose's approval.

During the weekend I understood Mr. Bose had an occasion to meet Lord Zetland at the Liberal Peer's private residence and had long conversations with the Secretary of State for India regarding the Congress attitude towards federation....

Rt. Hon. Arthur Greenwood, Deputy Labour Leader, called once again on Mr. Bose yesterday to discuss a closer collaboration between the Labour Party and India. I understand, both Mr. Greenwood and Mr. Bose although realising the occasional conflicts between the Labour Party and the Indian National Congress still think that quite a lot of useful purpose can be served by constant communications.

A later message says that Mr. Bose was received by President Benes who showed keen interest in Indian affairs and urged for closer cultural and economic contacts between the two countries."

ভ্যালেরা তাঁর মন্ত্রী-সহকর্মীদের সঙ্গে অস্থায়ী আবাস পিকাডিলি হোটেলে প্রত্যাবর্তন করেন। লণ্ডনে আসার পর থেকেই সুভাষচন্দ্র বসুকে যেমন তাঁর বহু গুণগ্রাহীর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সাক্ষাৎ ও আলোচনাদি করে যেতে হয়েছে, মিঃ ডি ভ্যালেরাও সেইভাবে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন।

এক আইরিশ ভদ্রলোক মিঃ ডি ভ্যালেরার সঙ্গে বিশ্বব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তিনিই তাঁকে জানান যে, সুভাষবাবু লণ্ডনে আছেন। আয়ারের প্রেসিডেন্ট তৎক্ষণাৎ তাঁর কর্মচারীদের ডেকে ভারতীয় নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত—সুভাষচন্দ্র বসু পিকাডিলি হোটেলে পদার্পণ করলেন। আয়ারের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রাত্রি দুটো পর্যন্ত একান্ত আলোচনায় মগ্ন রইলেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জোটবন্ধ এই দুই নেতার দীর্ঘ গোপন আলোচনা স্বভাবতঃই প্রেস-রিপোর্টারদের মধ্যে সবিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল, হোটেলের নীচের অলিন্দে তারা ভিড় করে বসে রইল। সুভাষবাবু নেমে এলে সংবাদ-শিকারীর দল তাঁকে ছেঁকে ধরে তাঁর কাছ থেকে খবর নিংড়ে বার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ সব চেষ্টা। অবশেষে একজন শুধোল, "দয়া করে এটুকু কি বলবেন— এই সমস্ত সময়টা আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গেই কাটিয়েছেন কি না?" তাঁকে এবং সাংবাদিক-জনতাকে সুভাষবাবু স্বীকার করে বাধিত করলেন—হাঁ, তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গেই ছিলেন।"

আসল আলোচনা কি হয়েছিল সুভাষচন্দ্র সে বিষয়ে কিছু বলেন নি। উপর উপর যা বলেছিলেন, সেগুলি সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনে ডি ভ্যালেরা আনন্দ ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "আপনাদের সামনে বিরাট লড়াই; ভারতকে স্বাধীন করার মহান উদ্দেশ্য সফল হোক।" মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে ডি ভ্যালেরা গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রদ্ধা জানাতে বলেন। আরও জানা গিয়েছিল, "ভারত ও আয়ারের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। আয়ারকে কিভাবে বর্তমান অবস্থায় এনে হাজির করেছিলেন, তার ইতিহাস ডি ভ্যালেরা বলেন, এবং সুভাষচন্দ্র ভারতের সর্বশেষ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। আলোচনায় দু' ঘণ্টা কেটে যায়।"

রয়টারের প্রতিনিধির কাছে এহেন মারাত্মক দুই বিপ্লবীর দু' ঘণ্টা গোপন আলোচনাকে কুটিল কৌতূহলের বিষয় না হয়ে পারে নি। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র শুধু জানিয়েছিলেন, "এটা একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ। ডি ভ্যালেরা ও আমি পুরনো বন্ধু। যেহেতু শীঘ্রই ভারতে ফিরে যাব, তাই ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিলাম। হাঁ, ইনটারেসটিং কিছু কথাবার্তা হয়েছে, তবে তার মধ্যে রাজনীতি ছিল কি না আমি বলতে অসমর্থ।"

কোন্ সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন,

ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের প্রীতিবচন থেকে ভারতে অহিংসার মধুর আশ্রমের মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত সুভাষচন্দ্র যে অপরিবর্তিত, অপরিবর্তনীয় আপোষহীন বিপ্লবী তা অবিলম্বে দেখা গেল। আমি তাঁর দুটি বক্তৃতার উল্লেখ করব, বক্তৃতা দুটি পারিপার্শ্বিক বিচারে অতীব উল্লেখযোগ্য; একটি দেওয়া হয় হরিপুরায় সভাপতিত্ব করার কিছু আগে, অন্যটি হরিপুরা অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ জানুয়ারী, ১৯৩৮, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসভা হয়। সমবেত হাজার হাজার লোক "৪৫ মিনিট একেবারে স্তব্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শোনে।" কলিকাতাবাসীর দেখা সে এক অতি মহান বিরল দৃশ্য। নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে অনুসরণ করে ২০ হাজার প্রাণ একসঙ্গে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করল—যে-স্বাধীনতা এখনো দূরে।"

তারকাখচিত রাত্রির নিচে, কুড়ি হাজার মানুষের সামনে উচ্চারিত সুভাষচন্দ্রের ভাষণে ছিল মহাকালের কণ্ঠধ্বনি। অহঙ্কৃত সাম্রাজ্যের উপরে যাঁর উদ্যত মুষ্টি শেষ মুষল নিক্ষেপ করবে, তাঁর কঠিন সতর্কবাণী শোনা গেল একদিকে, অন্যদিকে পরম আশ্বাস বাজল অধর্মলাঞ্ছিত দুর্গত মানবের জন্য। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—

> "যে অবধি আমরা আমাদের মাতৃভূমির চারি সীমান্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকি, সে অবধি আমাদের অনেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির চেহারা দেখে অভিভূত। এক ধরনের পরাজয়ের মনোভাব মনে প্রবেশ করে। কিন্তু যদি একবার বৃহত্তর বিশ্ব-পরিস্থিতিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে স্থাপন করে দেখি, তাহলে তার বিরাট শক্তি সম্বন্ধে সম্ভ্রম ও আতঙ্কের ভাব অদৃশ্য হয়ে যায়। আজকের বৃটিশ সাম্রাজ্য বাইরে থেকে যতখানি দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী মনে হয়, যথার্থত শক্তিপূর্ণ ও দুর্ভেদ্য তা নয়। কয়েক যুগ বা কয়েক শতাব্দী ধরে বেড়ে উঠেছিল, এমন অনেক সাম্রাজ্যের পতনের কথা ইতিহাসে আমরা পাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে কি সেই প্রকৃতির অভ্রান্ত বিধান বদলে যাবে? এই সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই বিস্তারের শেষ সীমায় পৌঁছেছে, এবার সংকোচের কাল। বাইরে থেকে তার চেহারা দেখে যতই ভীতিকর মনে হোক না কেন, পৃথিবীর ইতিহাসের উত্থান পতন লক্ষ্য করলে ভারতবাসী বুঝবে তারা নিজেদের যত দুর্বল মনে করে তত দুর্বল তারা নয়, এবং ইংরেজ নিজেকে যত শক্তিশালী মনে করে, ততখানি শক্তিশালীও সে নয়।"

মোহাচ্ছন্ন মনে আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলতে সুভাষচন্দ্রকে বারবার ইতিহাসের বৃহৎ সভাতলে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে হয়েছে—

> "গ্রীস ও রোমের সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য এবং রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের

ইতিহাস পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখি কত সাম্রাজ্যই উঠল আর পড়ল। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, বিধাতাপুরুষ কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভাগ্য স্থির করে ফেলেছেন! তা কখনো সম্ভব নয়। অনুমান করে একথা বলছি না। আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখুন। আয়ারল্যান্ড একদা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল; সেই ইংলন্ডের প্রতাপ এখন আলস্টারেই সীমাবদ্ধ। কেউ জানে না, সে প্রভাবও কখন মুছে যাবে। মিশরের কথা ভাবুন। (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে সে দেশ দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। তখন বৃটিশ, ফরাসী, ইতালীয় সেনাবাহিনীতে মিশরের মাটি ভর্তি। এবার গিয়ে দেখলুম, অন্য মিশর। সাদা চামড়া প্রায় চোখে পড়ে না। সব কর্মচারীই মিশরীয়। মিশর এখনই স্বাধীন, সেকথা বলছি না; কিছু বাধা তাকে এখনও পেরোতে হবে; কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলা যায়, ১৯১৯-এর মিশর ও ১৯৩৮-এর মিশরে আকাশপাতাল তফাত। ভারতেও ১৯১৯ ও ১৯৩৮-এর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ।

ইংলন্ডের ভিতরে বাইরেও যথেষ্ট পরিবর্তন। একদিন ছিল যখন ইংলন্ড সম্বন্ধে কেবল অধীনস্থ দেশগুলিতেই নয় পৃথিবীর অন্যত্রও ভীতি ও সম্ভ্রমের মনোভাব। কোথায় আজ তার চিহ্ন? ইংলন্ডের ভিতরেও পরিবর্তনের লক্ষণ। সেখানকার তরুণেরা বুঝতে পেরেছে সাম্রাজ্যবাদ মোটেই জাতির স্বার্থের সহায়ক নয়। তাদের সাম্রাজ্যের উত্থানের দিন শেষ হয়ে গেছে, এবার পড়ার পালা।

জারদের সাম্রাজ্য অদৃশ্য, কিন্তু রুশ জাতি এখনো জীবিত। সেই বিশাল রাজ্যে বহু জাতির বসবাস। নিপীড়িত জাতিগুলি, পদদলিত মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বয়ংশাসিত রুশ সাধারণতন্ত্র গঠন করেছে। ইংলন্ডেও যারা স্বাধীনতা-প্রিয়, তারা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ঐ ধরনের সাধারণতন্ত্রসমূহের মিলনভূমিতে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন।

একদিন ছিল যখন ইংলন্ডের শ্রমিকদল ভারতবাসীর কানে মন্ত্র পড়ত—ভারতীয় জনগণের নিপীড়িত অংশের স্বার্থের কথা ভেবেই তারা ভারত ছেড়ে আসতে পারছে না, কারণ যদি তা করে তাহলে সাদা আমলাতন্ত্রের জায়গায় জেঁকে বসবে তামাটে আমলাতন্ত্র, এবং গরীব লোকগুলি তাদের হাতের শিকার হবে। কিন্তু কয়েকদিন আগে যখন ইংলন্ডে ছিলাম, এবার আমি প্রকাশ্য সভায় কিংবা ঘরোয়া আলোচনায় সে ধরনের কথা ইংরেজদের মুখ থেকে শুনি নি। কারণ দুর্বোধ্য নয়। অবশেষে ইংরেজরা বুঝতে পেরেছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যে-আন্দোলন চালাচ্ছে তা মূলে জনগণেরই আন্দোলন। তারা বুঝেছে, ভারতীয়রা কেবল রাজনৈতিক মুক্তিই চায় না, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিও চায়।১০ তাহলে আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটিতে বেশি জোর কেন? তা এই কারণে যে, যদি রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করা যায়, একই প্রবাহে জনগণের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি এসে যাবে।...

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন চিন্তানায়ক একবার বলেছিলেন, পৃথিবীতে গণতন্ত্র কখনই আসবে না যতক্ষণ না বৃটিশ শাসনাধীন দেশগুলি মুক্ত হচ্ছে। ঐসব দেশকে শোষণ করেই বৃটিশ অভিজাততন্ত্র বেঁচে আছে। যতদিন পর্যন্ত সেই শোষণ-রস ইংলন্ডের দিকে প্রবাহিত হবে, ততদিন পৃথিবীতে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। "বহু জাতির পরাধীনতার মূল্যে গ্রেট বৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পুষ্ট ও বর্ধিত"—১৯১৪ সালে লেনিন বলেছিলেন। আর পরাধীন ভারতই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি। ভারত স্বাধীন হলেই বৃটিশ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। ইংলন্ডের সামনে এখন মাত্র দুটি বিকল্প—হয়ত সাম্রাজ্যভুক্ত প্রতিটি দেশকে স্বাধীনতা দিতে হবে, নয় সাম্রাজ্যকে সাধারণতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে হবে।"

[ক্রমশঃ]

১০ কলকাতায় ফেরার পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাতে সুভাষচন্দ্র বহুবিধ সমস্যার সম্বন্ধে তাঁর মত জানান। এক শ্রেণীর ইংরেজের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি থাকলেও শাসকদের উপরে তাদের কোনো প্রভাবই নেই। এ বিষয়ে বলেন—

"I found a great deal of ignorance in Great Britain about Indian affairs. Nevertheless, I found among a section of the public interest in and sympathy for India's struggle for independence. But it did not appear to me that they had much influence with the ruling classes. I had the impression that even the outstanding politicians were not well-informed about our affairs. The information that they had usually came from official sources or from correspondents of the British newspapers in India, who did not always represent the true facts of the situation here."

ফেডারেশনের বিষয়ে বলেন, ইংলন্ডে লোকজনের ধারণা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরে ভারতের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে; ক্রমে সেখানে ফেডারেশন চালু হয়ে যাবে। সুভাষচন্দ্র বললেন, আমি সর্বত্র তার প্রতিবাদ করে এসেছি—

"I am not opposed to the idea of federation on principle, because I believe that the constitution of India will ultimately be that of a Federal Republic, but I am opposed to the scheme of federation as enviseged in the Government of India Act."

(অমৃতবাজার, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৩৮)

বঙ্গদর্শন

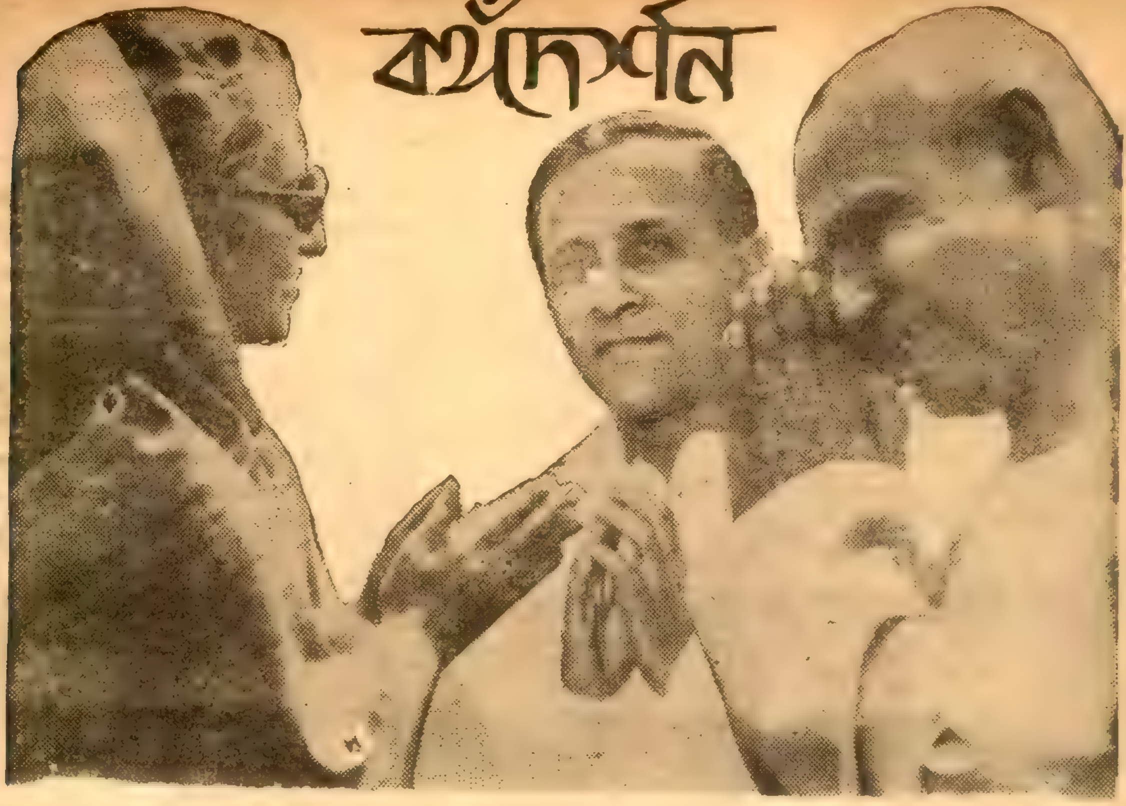

দমদম বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু

• দুর্গাপুরে সম্প্রতি যে ঘটনাটি ঘটেছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য যাদের রাখা হয়েছে তারা নিজেরাই নিরাপত্তার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানায় গত ২৪শে মার্চ তারিখে যে গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে সেই প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন জানিয়েছেন যে ওই ঘটনার সঙ্গে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ কোনভাবেই জড়িত ছিল না। তাঁর মতে ওই গুলী ছুঁড়েছিল উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিক সশস্ত্র বাহিনীর লোক, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের লোক নয়। তাহলে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠবে, দুর্গাপুরের ঘটনার সঙ্গে যদি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের সংস্রব না থাকে তাহলে উত্তর প্রদেশের সশস্ত্র পুলিশ সেদিন ঘটনাস্থলে গিয়েছিল কার হুকুমে? পশ্চিমবঙ্গে উত্তর প্রদেশের যে পুলিশবাহিনী রয়েছে তারা কি এই রাজ্যের পুলিশবাহিনীর হয়ে কাজ করছে? না কি তারা কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর অংশ হিসাবে কাজ করছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর স্বাভাবিকভাবেই আমরা দাবি করতে পারি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে রাজ্যে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনী থাকার যৌক্তিকতা নিয়ে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিটা কি সেটা আমরা কেউই জানি না, বোধ হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাবনও জানেন না। গত বছর যখন কেরলে কেন্দ্রীয় পুলিশ নিয়োগের প্রশ্নে সেখানকার যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন লোকসভায় বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস প্রভৃতি ও তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য তাঁরা দেশের যে-কোন স্থানে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ মোতায়েন করতে পারেন। এখন আবার তিনি উল্টো সুর গাইছেন। এখন বলছেন যে রাজ্য সরকার না চাইলে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ নিয়োগ করা হবে না। এই দুটি বিবরণের মধ্যে কোন্‌টি সত্য? ২৭শে মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রেঙ্গুন যাবার পথে দমদমে বলেছেন যে রিজার্ভ পুলিশ থাকবে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপ রাজ্য সরকারের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ এই সকল বিবৃতি থেকে যে বক্তব্যটি পরিষ্কার হচ্ছে তা হচ্ছে এই যে, এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সুস্পষ্ট নীতি নেই।

বস্তুত এখন এমন একটা সময় এসেছে যখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষমতার সীমারেখাগুলি সুস্পষ্টভাবে টানতে হবে। কেন্দ্রের পক্ষে এখন স্থিরমস্তিষ্কে অনেক কিছুই সিদ্ধান্ত করার সময় এসেছে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ না-ও হতে পারে। এককভাবে অধিকাংশ আসন দখল করার মত ক্ষমতা অন্য কোন দলেরও নেই। যদি কোয়ালিশন সরকার হয় তা কখনোই সবল হবে না। এমতাবস্থায় রাজ্যগুলি যাতে অধিকতর স্বাবলম্বী হতে পারে, কেন্দ্রের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা যাতে বহুলাংশে কমে যায়, সে রকম ব্যবস্থা এখন থেকেই করা প্রয়োজন এবং তা করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে রাজ্যগুলির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এ না করলে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এম-ডি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

এম-ডি ডিগ্রী চিকিৎসাবিদ্যায় বড় ডিগ্রী, কিন্তু গত এক দশক ধরে এই এম-ডি পরীক্ষার মধ্যে নানাপ্রকার গলদ প্রবেশ করে এই অন্যতম সর্বোচ্চ পরীক্ষাটিকে প্রহসনের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। এম-ডি পরীক্ষার গলদের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকায় আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে (১৪।৪।৬২; ২৪।৫।৬২) এবং আনন্দবাজার পত্রিকাতেও তা তখন প্রকাশিত হয় (৪।৫।৬২)। কিন্তু সেগুলি আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারে নি। গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শন বিভাগে এম-ডি পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়: (১) বলা হয় যে উক্ত ডিগ্রী বিতরণ করা হয় জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে এবং পাশ করানো

সচরাচর পরীক্ষার্থীর অধীত বিদ্যার ওপর নির্ভর করে না; (২) পরীক্ষার্থীদের ওই প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্রের কোচিং ক্লাসে যোগদান করতে হয়; (৩) পরীক্ষার্থীদের উক্ত পুত্রের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী যোগাতে হয় এবং (৪) যাতে এঁদের কাজ সুষ্ঠুভাবে হয় সেজন্য পরীক্ষা নেওয়া হয় বরাবরই একটি কেন্দ্রে। এই অভিযোগগুলি প্রকাশিত হবার পর রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং মাসের পর মাস ধরে সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠক-মন বিভাগে এই বিষয়ে অনেকগুলি চিঠি-পত্র প্রকাশিত হয়। এইগুলি থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয় তা হচ্ছে এই যে, এম-ডি পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির মধ্যে রীতিমত অব্যবস্থা বর্তমান এবং সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিটির সততায় সন্দেহ করার সন্তোষজনক কারণ আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, না রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন সরকার কেউই এ-বিষয়ে এগিয়ে এলেন না এবং তাঁরা নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। প্রশাসক-মহল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর উক্ত ব্যক্তিটির প্রচণ্ড প্রভাব আছে, কাজেই বিষয়টির ওপর রীতিমত গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সর্বোচ্চ পরীক্ষাকে আমরা প্রহসন বলতে সাহসী হয়েছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই নির্বিচারে তা হজম করছেন, এ দৃশ্যটাও খুব সুখাবহ নয়। আর যদি আমাদের উপেক্ষা করাই বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বাস্থ্য-দপ্তরের নীতি হয় সেটা আরও বিপজ্জনক, বিশেষ করে চিকিৎসা যখন এমন একটি বিষয় যা জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এম-ডি ছাত্র, চিকিৎসক ও জনসাধারণ এ বিষয়ে যেসকল তথ্য দিয়েছেন সেগুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করছিঃ

পরীক্ষা পদ্ধতি

এটা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে, কিভাবে একটি পরীক্ষা একটি বিশেষ ব্যক্তির করায়ত্ত হতে পারে: কিন্তু সত্যই তা ঘটেছে। সচরাচর অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজন বহিরাগত সহ চারজন পরীক্ষক নিযুক্ত হন। যে ব্যক্তি পেডিয়াট্রিক্স বিভাগের প্রধান, তিনি এম-ডি পরীক্ষার কনভেনার হন এবং মেডিসিন বিভাগের প্রধান সহ-পরীক্ষক হন। পরীক্ষকগণ পোস্ট গ্রাজুয়েট বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং সেখানে ওই প্রভাবশালী ব্যক্তিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ নেই এবং সেই নিযুক্তি যথারীতি সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। একই ব্যক্তিরা (সকলেই এম-ডি নন) বছরের পর বছর নিযুক্ত হয়ে যান। স্বাধীন এবং অতাঁবেদার চরিত্রদের ইচ্ছা করেই নাকি এর থেকে বাদ দেওয়া হয় মতভেদ এড়ানোর জন্য (একবার যা হওয়ার ফলে বাইশজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একত্রিশজনই অকৃতকার্য হয়)। বহিরাগত পরীক্ষকদের মধ্যে একই ব্যক্তিদেরই বার বার আহ্বান করা হয়। কেউ কেউ হালচাল দেখে বিরক্ত হয়ে আসতে অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁদের নাম তালিকায় রেখে দেওয়া হয় শেষ মুহূর্তের কারচুপির জন্য। তা ছাড়া বহিরাগতরা সম্মানিত অতিথি হিসাবেই আসেন এবং তাঁরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। পরীক্ষার নম্বর দেবার পদ্ধতিটিও অদ্ভুত। নম্বর দেওয়া হয় লিখিত উত্তর পড়ে নয়, সার্বিক ইমপ্রেসনের ওপর, এ, বি, সি এইভাবে। যদি কোন পরীক্ষার্থী একজন পরীক্ষকের কাছ থেকে সি-মাইনাস বা ক্রশ পায়, অপরজনের কাছ থেকে এ পেলেও ব্যালান্স হয় না। মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এই রীতি। চব্বিশটি আইটেম থাকে এবং পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রত্যেকটিতে সাফল্য দাবি করা হয়, যা কার্যত অমানুষিক ব্যাপার এবং এক্ষেত্রে পছন্দসই ক্যান্ডিডেটদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। বিশদভাবে এই প্রসঙ্গটি আলোচনার পূর্বে পুত্রের ভূমিকাটি উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন।

পুত্র

উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিটির পুত্র আণ্ডার-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে মিডিওকার ছাত্র ছিলেন, তবে পরবর্তীকালে বিলাত থেকে এম-আর-সি-পি হয়ে এসেছেন। পিতার প্রভাবে তিনি সুখলাল করনানী হাসপাতালের অনারারী ভিজিটিং হয়ে আসেন এবং সেখানে কোচিং ক্লাস খোলেন। তাঁর এই কোচিং খোলাটা অনুমোদিত হয় নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাঁকে ওখান থেকে চলে আসতে হয়। অতঃপর তিনি পিতার চেষ্টায় মেডিক্যাল কলেজে আসেন। এবং সেখানেও তিনি নাকি অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হন এবং সেই মর্মে সরকারী আদেশ আসে। তখন ছাত্রদের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেবার টোপ ফেলে তাদের দিয়ে একটি বিক্ষোভ ঘটানো হয় এবং তলে তলে তাঁর পিতার চেষ্টা ও প্রভাবে নাকি পুত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত সরকারী আদেশটি প্রত্যাহৃত হয়। এদিকে পুত্রও কোচিং যথারীতি চালিয়ে যান: তিনি নাকি কার্ডিওলজিস্ট—যে বিষয়টি এম-ডি কোর্সের একটি ভগ্নাংশ মাত্র, কিন্তু তিনি সকল বিষয়ের জন্য নাকি ছাত্রদের তাঁর কোচিং-এ আসতে বাধ্য করেন।

দয়াধর্মের (?) পীঠস্থান

পরীক্ষায় পাশ করতে গেলে পরীক্ষার্থীদের উক্ত পুত্রের তালিকাভুক্ত হতে হবে, তাঁর এবং তাঁর পিতার ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি দেখতে হবে এবং উভয়ের নজরে থাকতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কোচিং-এ এইজন্য ছাত্রের ভিড় হয়, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, পাশ করার বিষয়ে নিশ্চয়তা পাবার জন্য। অবশ্য সকলেই এই কোচিং-এ আসতে পারে না, বা সকলেই এ কোচিং-এ গেলে কৃতকার্য হবে তা নয়, শুধুমাত্র কোচিং-এ হাজির দিলেই পাশ করা যায় না, আনুষঙ্গিকও নাকি কিছু দরকার। আরও অনেক যোগ্য শিক্ষক আছেন, যাঁরা এম-ডি ছাত্রদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁদের কাছে কেউই যেতে সাহস করেন না। কারণটা সহজেই অনুমেয়।

পুত্রের তালিকা

পরীক্ষার বহু পূর্বেই পছন্দসই পরীক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি হয়ে যায়। প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার সময় যে রোগ নিরূপণ করতে বলা হয় সেখানে এই প্রিয়পাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করা হয়। যেসব কন্ডাক্টরদের দিয়ে এগুলি করানো হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরাও পছন্দসই লোক। এমন কি যদি কোন পরীক্ষার্থী পছন্দসই না হন, রোগ নিরূপণের ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিচয় দিলেও মৌখিক পরীক্ষায় তাঁদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়। শোনা যায় প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার দিনশেষে পিতাপুত্র একসঙ্গে বসে কাদের পাশ করানো হবে তা নাকি স্থির করে ফেলেন। এবং তদনুযায়ী সব ঠিক হয়ে যায়। এই চক্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করতে পারলে ডিগ্রী পাবার কোন আশাই নেই এবং পাবার পরেও এই চক্রের অনুগত না থাকলে অন্যান্য দিকেও মুস্কিল, আর, এম-ডি হতে হলে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এই চক্রে প্রবেশ করতেই হবে।

কয়েকটি জিজ্ঞাসা ও জবাব

কেন একটি কেন্দ্রই প্রতি বছর পরীক্ষার জন্য স্থির করা হয়? জবাবে এঁরা বলবেন যে, যেহেতু মেডিক্যাল কলেজই শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেই হেতু। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে সমতুল্য অপর দুটি পরীক্ষা কেন অন্যত্র হয়?

কেন পরীক্ষক হিসাবে শুধুমাত্র মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকরাই নিযুক্ত হন? উত্তরে বলা হয় তার কারণ তাঁরাই নাকি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। উত্তরটা কি হাস্যকর নয়।

কেন মেধাবী ছাত্ররা বছরের পর বছর এম-ডিতে অকৃতকার্য হয়? উত্তরে বলা হয়ে থাকে যে উচ্চতর মেডিক্যাল পরীক্ষায় মেধার মূল্য সর্বদাই নেই এবং পরীক্ষায় পাশ-ফেল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সত্যই কি তাই? যেখানে ছাত্ররা প্রত্যেকেই গ্রাজুয়েট, যেখানে সর্বোত্তম শিক্ষকেরা রয়েছেন, যেখানে শিক্ষার ও গবেষণার সর্বাধিক সুযোগ রয়েছে, সেখানে মেধাবী ছাত্রের পক্ষে অকৃতকার্য হবার তো কথাই ওঠে না। অথচ মজা এই মেধাবী ছাত্র, কৃতী শিক্ষক, পাকা গবেষক এম-ডি'তে ফেল করছেন অথচ বাইরের লোক, প্রাইভেট প্রাকটিশনার, বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত মেডিক্যাল অফিসারেরা দিব্যি পাশ করে যাচ্ছেন, শেষোক্ত শ্রেণী স্বাভাবিক নিয়মেই

পিতা-পুত্রকে কেস জোগাতে পারে, তাৎপর্য পরিষ্কার।

যাঁদের বিলাত যাবার সঙ্গতি ও উপায় আছে, তাঁরা ওখান থেকে এম-আর-সি-পি হয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই পুনরায় এম-ডি দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এটাও বিস্ময়কর যে, এম-আর-সি-পি হাওয়া ছাত্ররা ফেল করলেন এবং এই রকমই এক-জন এম-আর-সি-পি (পুত্র), এম-ডি'র কোচিং-এ অনেককেই আবার ডিগ্রী বিতরণ করছেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রভাবশালী পিতা পিছনে থাকলে অসাধ্যও সাধন করা যায়।

ভাগ্যান্বেষীর ভেল্কী

এই যে এম-ডি পরীক্ষার পিছনের নেপথ্য ক্রিয়াকলাপ, এর উদ্দেশ্যটা কি? কেন পুত্রবর তাঁর মূল্যবান সময় ও শক্তি নষ্ট করছেন এম-ডি ছাত্রদের কোচিং দিতে গিয়ে? এটা কি স্বার্থহীন দয়াধর্ম? এটা ঠিক যে পুত্রবর কোচিং করে নগদ পয়সা নেন না। কিন্তু কৃতজ্ঞ ছাত্রদের কাছ থেকে যেসব কেস তাঁরা পান, তার আর্থিক মূল্য কত? অনেক পরীক্ষার্থী—যাঁরা ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা কেস পাঠান। এছাড়া পরীক্ষার্থীর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমন কি অধীনস্থ হাসপাতালের রোগীদেরও কেস হিসাবে পাঠাতে কোন অসুবিধা নেই এবং যাঁরা প্রাইভেট প্রাকটিশ করেন তাঁদের তো এ বিষয়ে কোনই অসুবিধা নেই। পিতা-পুত্রের সামনে রোগীদের লাইন লাগিয়ে দিতে কোন অসুবিধা নেই। পুত্র অল্প সময়ে ভাল পসার করেছেন এবং পিতা তাঁর দক্ষিণা নাকি ৬৪ টাকা থেকে ১২৮ টাকায় তুলে-ছেন। তদুপরি ক্ষমতার লোভটাও বড় কম কথা নয়।

এটা মনে রাখতে হবে যে, একজন ব্যক্তি তাঁর বিশেষ পজিসনের দৌলতে মেডিক্যাল শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরীক্ষকদের নিয়োগ করছেন, রিসার্চ গাইডদের মনোনয়ন করছেন, রাজ্য সরকারের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে প্রভুত্ব করছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসকেও পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করছেন, চিকিৎসা জগতের তিনিই মুকুটবান সম্রাট, কাজেই তাঁকে চটাতে কেউই সাহসী হন না, সকলেই তাঁর সেবা করতে ইচ্ছুক।

জনসাধারণের দাবি

১। এই সকল অভিযোগের ভিত্তিতে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত হোক।

২। পিতা-পুত্রকে তাঁদের বর্তমান পদ-গুলি থেকে সরানো হোক, যাতে তদন্তের সময় তাঁরা ব্যক্তিগত প্রভাব না খাটাতে পারেন।

৩। অভিযোগগুলি সত্য প্রমাণিত হলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হোক।

শেষ অধ্যায়

সংবাদ পাওয়া গেছে এই সকল কীর্তি ফাঁস হবার পর ভীত হয়ে, নিজেদের পায়ের তলার মাটি নরম হয়ে যেতে দেখে তাঁরা এবারে নিজেদের প্রিয়পাত্রদের ডিগ্রী উপহার দানের ব্যাপারটা নাকি তড়িঘড়ি মিটিয়ে নিতে চাইছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে আগস্ট-সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার দিন এগিয়ে এনে ৮ই এপ্রিল তারিখে নির্দিষ্ট করেছেন। এত কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও পিতা নাকি এবারেও নিজে এম-ডি'র পরীক্ষক হয়েছেন এবং তাঁর পুরানো সঙ্গীদেরই আবার নিয়েছেন।

আমরা আশা করি যে, যুক্তফ্রণ্ট সরকার এই ব্যাপারে এখনই এগিয়ে আসবেন এবং বর্তমান পরীক্ষক বোর্ডকে বাতিল করে যাতে সত্যই নিরপেক্ষ, পরিশ্রমী এবং সৎ লোকেদের নিয়ে পরীক্ষকমণ্ডলী গঠিত হয় সেই ব্যবস্থা যেন করেন। প্রয়োজন হলে কিছুকালের জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এম-ডি ছাত্র, চিকিৎসক এবং জনসাধারণের মধ্যে এই আশার সঞ্চার হয়েছে যে, এবারে হয়ত এতদিনের পুরনো খেলা বন্ধ হবে! বস্তুত ছাত্রমেধ যজ্ঞের এরকম একটি ব্যাপারে সরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না।

রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন—মাত্র দু' বছরের বহু তিক্ত স্মৃতিকে মূলধন করে।

ভারত দর্শন

জাতীয় আয়ের ফাঁকি

ইতিপূর্বে তো বহুবার বলেইছি ফের পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে যে, দফাওয়ারী জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সম্পর্কে যে ফলাও বিবৃতি দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকি থেকে যায়। হিসেব তুলে দেখানো হয় অত শতাংশ থেকে তত শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। শুনে সাধারণ মানুষ হতবাক হন, কৈ সাধারণের পকেট তো ভারী ঠেকছে না! তবে সেই বৃদ্ধিটা যায় কোথায়? কার পকেটে?

এ প্রশ্নের উত্তরও সহজ। যায় কতকগুলি সুবিধাভোগী পরিবারের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বৃদ্ধি করতে। সুতরাং জাতীয় আয় বৃদ্ধির সংবাদ ছাপা হলে সাধারণ্যে হতাশ মুখব্যাদান লক্ষিত হয়, ...বেল পাকলে কাকের কি?

সম্প্রতি একটি সংবাদ, ১৯৬৩-৬৪ সালের জাতীয় সমীক্ষায় প্রকাশ, মোট ৪৬·৫ কোটি লোকের মধ্যে ৩৬·৩ কোটি লোক গড়ে দৈনিক এক টাকারও কম খরচ করার যোগ্যতা রাখেন। অর্থাৎ ভারতের মেজরিটি মানুষই দারিদ্র্যের অন্ধকূপে নিমজ্জিত, যদিও জাতীয় আয় বৃদ্ধির উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরে প্রায়ই লোক ঠকানো হয়ে থাকে। আর ঐ যে ৩৬·৩ কোটি মানুষ, ওদের সংখ্যাও তো চক্রাকারে বেড়েছে, যার হিসেবই এ পর্যন্ত কষা হয় নি। তাহলে পুরো টাকা খরচের অধিকারী নন, এমন মানুষের বাস্তবিক সংখ্যা যথার্থ কত? স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী লোকসভায় বলেছেন, পরবর্তীকালের সংখ্যাতত্ত্ব জানা নেই। জানা গেলেও সেই বিরাট জনসংখ্যা হিসেবের বাইরেই থাকবে যে জনসংখ্যা সমাজে কোনও উৎপাদনশীল কর্ম করে না; থাকে পথে; গ্রাসাচ্ছাদন চালায় ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা। জনসংখ্যায় এরা যুক্ত নন। এদের রোজগার ও খরচেরও কোন হিসেব নেই সঠিকভাবে।

সুতরাং জাতীয় আয়ের হিসেবে একটা চিরস্থায়ী ফাঁক এ ফাঁকি থেকে যায়। ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সংবাদ তাই কোন উৎসাহ সঞ্চার করে না সাধারণের মধ্যে।

তবে হাঁ, একদিন মাথাপিছু আয়ের হিসেব হত গড়ে ছ' আনা। আজ খরচের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে টাকা ছুই-ছুঁই। সুতরাং উৎসাহ?

কিন্তু না, আরো কথা আছে। ওদিকে বাজারদর যে হু হু করে চড়ে গেছে। তাহলে আগের থেকে আয় কি আরও পড়ল!

পড়ছেই। দরিদ্রের দারিদ্র্য বাড়ছে, কারণ ধনীর ধন বৃদ্ধি হচ্ছে। দেশের অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খলে অধিকতর আবদ্ধ হচ্ছেন। এবং তাই হল তাঁদের স্বাধীনতা স্বাদ!

ঘুষতন্ত্র এবং ফড়িয়া বাজারের উচ্ছেদ

কর্মীদের ওপর অনাস্থা ও অবিশ্বাস থেকে সরকারী অফিস ও পাইকারী বাজারের মধ্যে এক ধরনের ফালতু ফড়িয়ার সৃষ্টি হয়েছে, যাদের জন্য সরকারী অফিসে ক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক রকম স্ফীতকায় আকার ধারণ করে। পাইকারী দরের ওপর মধ্যবর্তী কোটেশনদাতা ফড়িয়ার মোটা লভ্যাংশ এবং কোটেশন স্যাংশন-কারী কর্মকর্তাদের দেয় ঘুষ যুক্ত হয়ে স্বাভাবিক বাজারদরের অনেক ওপরে সরকারী আধাসরকারী অফিসের 'পারচেজ' বা ক্রীত সামগ্রীর দর চাপে। মধ্যস্বত্বভোগী কিছু ফড়িয়া ব্যবসায়ী, যাদের কাজ এক হাটে কেনা ও তার ওপর পারসেন্টেজ চাপিয়ে (যার মধ্যে কর্ম-কর্তাদের দেয় ঘুষও ধরা থাকে) সরকারী আধাসরকারী অফিসে তা বিক্রয় করা, একটি ঘর ও একটি টেলিফোন নিয়েই হাজার হাজার টাকার লেনদেন চালিয়ে যেতে পারেন। ফলত একটি নকল বাজারের সৃষ্টি হয় ও অকারণ অর্থের অপচয় হয়ে থাকে। আর তারই ফাঁকে বিরাট ষড়যন্ত্রের পরিপোষণাও চলে।

গত সংখ্যায় আমরা লাল ফিতের ফাঁস ও তজ্জনিত দুর্নীতির আলোচনা করে ঘুষ বন্ধের কয়েকটি সম্ভাব্য পন্থার উল্লেখ করেছি। এবার স্টোরস পারচেজ সম্পর্কে দু-একটি বিষয় উল্লেখ করব।

স্টোরস পারচেজে ঘুষ বন্ধের কয়েকটি উপায়

আগেই বলা হয়েছে স্টোরস পারচেজে ঘুষ ও অপচয়ের মূল কারণ নিহিত আছে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ওপর অবিশ্বাসী মনোভাবের মধ্যে। এই মনোভাব দূরীভূত করার বলিষ্ঠ ইচ্ছা প্রশাসনিক কর্তাদের কখনো জাগ্রত হয় নি হয়ত এই কারণেই যে, কোটেশন এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া ব্যবস্থা চালু থাকলে অর্থাগমের একটি স্থায়িবন্ধ 'চেন' সম্বৎসর বজায় থাকে। যে কারণ এক গাছি সুতো কিনতেও কোটেশন ডাকা হয় এবং বাজারদরের তিন গুণ দামে সেই সুতো কিনে দেখানো হয়ে থাকে ভয়ঙ্কর একটা ন্যায়নিষ্ঠ সাধুতা বজায় রাখা হয়েছে কেনাকাটার ব্যাপারে। তা ছাড়া 'বারগেন'ও করা হয়েছে কোটেশন ডেকে। কিন্তু আদৌ ব্যাপারটা সাধু তো নয়ই। আভালাভ কিম্বা 'বারগেনও' এর ফলে হয়ে ওঠে না। ঐ সুতো যে কোনো অফিসকর্মী পাইকারী বাজারে গিয়ে সরাসরি কিনে আনলে দেখা যেত খরচ ঢের কম পড়েছে, সময় খরচ হয়েছে অল্প, চিঠি-চাপাটি ফাইল-দস্তাবেজের প্রয়োজন হয় নি এবং কোনও ফড়িয়ার লভ্যাংশ যুক্ত হয়ে আসল দামও দ্বিগুণ হয় নি। এ ক্ষেত্রে কর্মীকে সরাসরি বাজারে না পাঠানোর পক্ষে যুক্তি ঐ কর্মী সওদাকালীন কিছু পকেটে পুরতে পারেন। অবশ্যই সে সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ক্রয়কারী অফিস তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন না। কোনও কর্মী প্রচলিত বাজারদরের ওপরে দাম চাপাতে পারেন না, চাপালে সময়কালে হাতে-নাতে তাকে ধরে ফেলারও উপায় আছে। কারণ বাজারদর সামান্য উনিশ-বিশ হলেও খরিদকারী কর্মী অস্বাভাবিক কোনও দরে তাঁর অফিসকে কোন বাজারচালু দ্রব্য বেচতে পারেন না, যিনি পারেন তিনি চোরদায়ে ধরা পড়তে পারেন যে কোনো মুহূর্তেই। তাহলে কর্মীর টাঁকে পয়সা আসবে কেমন করে? যদি আসেই, তবে সেই পয়সা হবে বিক্রয়কারীর লভ্যাংশের একটা শতাংশ যে পয়সা ক্রয়কারী অফিসকে প্রদত্ত হবে না, যে লভ্যাংশ ব্যবসায়ীর স্বেচ্ছাকৃত ছাড় যা সাধারণত অফিস পেত না। কিন্তু যা বাজার সরকারের পকেটে আসবে পাইকারী ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের জমা থেকে। এটুকু যদি

ব্যবসায়ী সরাসরি কেনাকাটায় দেন, কোটেশনের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু তা কখনই দিতে পারেন না। কারণ কোটেশনে বিক্রয়মূল্য এমনিতেই কিছুটা ওপরে বাঁধতে হয়। কোটেশন ও প্রকৃত খরিদের মধ্যে যে সময়কালের ব্যবধান থাকে তাতে বাজারদরের উঠতি পড়তির রিস্ক থেকে যায়। তাছাড়া নগদ মূল্যে সরাসরি বিক্রয়ে বিক্রেতা যে ছাড় দিতে পারেন, কোটেশনে তা পারেন না বিলড এ্যামাউন্ট ক্রয়কারী অফিসের শেষতম বিলবাবুর কাছ থেকে বার করে আনার স্তর পর্যায় ভেদ করে আসার দরুণ, তাগাদা ও ঘুষ বাবদ খরচ খরচা এবং কোটেশন ধরানোর জন্য খরচাদি এ সমস্তই কোটেশনে-ফেলা দরের ওপর চাপিয়ে নিতে হয়। কোন ব্যবসায়ীই তো লোকসানের কড়ি গোণার জন্য ব্যবসা ফেঁদে বসেন না, সুতরাং কোটেশন করার সময় আনুষঙ্গিক খরচাদির সঙ্গে সময়ের হিসেবে একটা পারসেন্টেজ ও বাজারদর চড়ে গেলে সাপ্লাই-এর কালে বা যোগানের সময় যাতে লোকসানের ভাগী না হতে হয়, এজন্যও একটা পারসেন্টেজ কোটেশনে ধরে রাখতে হয়। তাই কোটেশনড এ্যামাউন্ট সব সময়ই নগদ পাইকারী বাজারদর অপেক্ষা ঢের বেশিই হয়ে থাকে। সব চেয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে দেয় ঘুষ ও ফড়িয়ার পারসেন্টেজও কোটেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় বলেই। অন্য পক্ষে ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের অতি নগণ্য একটি অংশ যদি নগদ ক্রয়ের সময় কর্মচারী পারিতোষিকরূপে পেয়েই যান তাতে অফিসের এক পয়সা ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, অফিসের বাজার সরকারের দু'পয়সা ইনকাম আছে কমিশনরূপে ব্যবসায়ীর ট্যাঁক থেকে। প্রশাসনিক কর্তারা কোনও কর্মীকে এই সুযোগ ভোগ করতে দিতে নারাজ, কারণ তার দ্বারা কর্তার পকেটে কপর্দকটি আসারও উপায় নেই। অবশ্য চেন বজায় থাকলে তাতেই বা বাদ সাধছে কে। বাজার সরকারের সঙ্গে পারসেন্টেজ তো থাকতেই পারে। বাজার করতে গেলে সাধারণ সংসারীর ঘরের পরিচারকটিও দু' পয়সা পেয়ে থাকে, আর অফিসের বাবু পাবেন এতে আর বিচিত্র কি। ঈর্ষারই বা কী কারণ! কিন্ত সরকারী অফিসে কোনও বাবুর এহেন সুবিধা ভোগও সম্ভব না হতে পারে, যদি সওদা কোনও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়। এবং এমন প্রতিষ্ঠানরূপে সরকারী স্টোরস-ই তো আছে। সরকারী স্টোরস যদি বাজার চালু সব রকম দরই রাখা হয়, যদি কেবলমাত্র বিশেষ নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্বল্পমূল্যের দ্রব্য ছাড়াও উৎকৃষ্ট দ্রব্য এই দপ্তরের মাধ্যমেই কেনাবেচা করা হয়, তবে মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া ও কোটেশন গ্রহণকারী আমলাচক্রের ফালতু রোজগারে ইতি টানা যেতে পারে। নিয়মবন্ধভাবে সমস্ত সরকারী ও আধাসরকারী অফিস তার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঐ স্টোরের মারফৎ ক্রয় করতে বাধ্য থাকলে, সকল দ্রব্যের উৎপাদনকারীদের ওপর পাইকারী দরে যখন যেমন প্রয়োজন ঐ স্টোরে মাল যোগান দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে। ঐ দর যেহেতু উৎপাদকের ঘরে বাঁধা পাইকারী দর হবে, সে কারণ ঐ সমুদয় জিনিস নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও দু' পয়সা কামাবার সুযোগ থেকে অব্যাহতি পাবেন। একমাত্র সুযোগই ভদ্র কর্মচারীকে ঘুষুড়ে বানায়। একেবারে আনকোরা ঘুষুড়ে হয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্টোরস আছে, প্রেসও আছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের এ জাতীয় স্টোরসের আয়তন বৃদ্ধি এবং প্রেসেরও আয়তন বৃদ্ধি করে, অন্তত কোটেশনরাজ যথাসম্ভব ছাঁটাই করে অফিস-প্রয়োজনীয় মজুত ও প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা যায়। জাতীয় গ্রন্থাগারে যেমন যাবতীয় বই ও কাগজ প্রদান করা বাধ্যতামূলক, ঐ সব স্টোরসের চাহিদায় সাড়া দিয়ে সেই স্টোরসে পাইকারী দরে অদেশমাত্র দ্রব্যাদি সরবরাহ করাও ব্যবসায়ীদের ওপর বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। ক্রমে সরকার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন অফিস ও স্কুল-কলেজের চাহিদাও মেটাতে পারেন; এ সব ক্ষেত্রে সব সময় নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় বাঞ্ছনীয়। সমবায়িকা জাতীয় পাইকারী দরের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসও অফিস-পারচেজের ব্যাপারে সম্ভব করে তোলা হলে সরকারী আধাসরকারী অফিসের বিল ডিপার্টমেন্ট এবং কোটেশন গ্রহণকারী আমলাদের হয়ে রামরাজত্ব বন্ধ হয়, কতকগুলি ধনবান লোকেরও মহাজনী এবং ফড়িয়া কারবারের ফালতু মুনাফায় হাত গুটিয়ে আসে।

ঐ সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসের সব সময়ই যে মস্ত গুদাম রাখতে হবে তারও কারণ নেই। অফিস রিকুইজিসন লিখিত নির্দেশ বলে সরাসরি উৎপাদকের ঘর থেকেই অফিসে অফিসে যোগান চলে যেতে পারে। মূল্য বাবদ অর্থ কেবলমাত্র ছাপা মূল্যতালিকা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্কে জমা ফেলা যায় এবং তারই রিটার্ন দাখিল করে রয়েছে, অফিস মাল ঘরে তুলে নিয়ে যেতে পারেন, না হলে চাহিদানুসারে সেই ঘরে মাল চালান হয়ে যাবে এমন নির্দেশ উৎপাদনকারীর ওপর স্টোরস কর্তৃপক্ষ জারি করতে পারেন।

প্রস্তাবটি কার্যকরী করা হলে অনেকতর দুর্নীতির অবসান হবে। বিশেষ ঘুষ ও কেবলমাত্র কাগজ-কলমে খরিদের দুর্নীতি অবশ্যই রোধ করা যাবে, যদি প্রত্যেক কেনাকাটাই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস মারফৎ করাটাই বাধ্যতামূলক করা হয়।

সরকারী স্টোরের সুবিধা যে কোন রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানও গ্রহণ করলে ট্রানজাকশন বাড়বে ও সেক্ষেত্রে উৎপাদকরা খুশি হয়েই দ্রব্যাদি সরবরাহের দায়িত্ব নেবেন বলে বিশ্বাস। ঠিক এইভাবে স্টোরের সংখ্যা বাড়িয়ে গেলে অচিরে খুচরো বাজারের দরও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্রমশ এসে পড়বে। সাধারণেও যদি সরকারী স্টোরসের সাহায্য পেতে থাকেন, তবে খুচরো বাজারে ইচ্ছামত দর হাঁকা ও দর বৃদ্ধি ক্রমে বন্ধ হতে থাকবে।

সরকারের বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি রোধ করার আদৌ কোন সদিচ্ছা থেকে থাকলে ক্রমশ এই সব পথে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি অগ্রসর হতে পারেন। ফল তাতে ভালই হবে।

রঘুরামাইয়ার পদত্যাগ

সংসদীয় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রঘুরামাইয়ার পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস দলের মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতায় ঘুণ ধরেছে, তাকেই আরও প্রকাশ্য স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হলেন। বস্তুতপক্ষে শ্রীরঘুরামাইয়ার পদত্যাগ গৃহীত হলে রামের হয়ে শ্যামের বনবাস যাত্রাকেই বেছে নিতে হত। প্রধানমন্ত্রী তা না করে যথেষ্ট বিচক্ষণতারই পরিচয় রাখলেন। রঘুরামাইয়ার সঙ্গে আর যে দুজন ডেপুটি চীফ পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন কংগ্রেস দলের সংসদীয় কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে রঘুরামাইয়ার মতই তাঁদেরও পদত্যাগ গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী। বাস্তবিক ওঁরা ওঁদের যথাকর্তব্য পালন করেও আসাম রাজ্য পুনর্গঠন বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে আনীত বিলের ওপর ভোটাভুটির সময় যদি অদৃশ্য কোনও হুইপের প্রভাবে কংগ্রেস সদস্যগণ সংসদে উপস্থিত না হয়ে বিল গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেন, তবে সর্বশ্রী রঘুরামাইয়া, পার্থসারথি এবং ডি সেন করবেন কী! তাঁদের যথাকর্তব্য পালন করেও তাঁরা যে অসহায়ের মতো অন্যান্যদের সঙ্গে ঘটনাবলী লক্ষ্য করতে বাধ্য হয়েছেন এই ব্যাপারটা পরিষ্কার। তাই কংগ্রেস সংসদীয় দল পারেন নি ঐ তিন ব্যক্তির

পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে। কেন্দ্রে কংগ্রেসের এহেন পরাজয়ে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কেন্দ্রে যখন দলীয় মেজরিটি খুবই সামান্য, তখন সদস্যদের সমস্ত দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়াই উচিত। ভবিষ্যতের জন্য আলোচ্য ঘটনা এই শিক্ষাই দেয়।

সংবিধান সংশোধন বিলটি জনসংঘ ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী দলেরও সমর্থনপুষ্ট হয়েও গৃহীত হতে পারল না কংগ্রেসী সদস্যগণের ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির দরুণ। আসাম রাজ্যের সমতলবাসী রাজনীতির প্রচন্ড প্রভাবই এর দ্বারা প্রমাণিত হল। প্রমাণিত হল শুধু সাধারণ সভ্যরাই নন, তেমন তেমন প্রশ্নে কংগ্রেস সরকারকে মুখে চুনকালি মেখে বিমূঢ় বেদনায় চুল এলিয়ে বসে থাকতে দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও সহবতে বাধে না। সংবিধান সংশোধনী বিল ভোটে যাওয়ার সময় সত্তর জনের মতো কংগ্রেস সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও বাদ যান নি। অথচ এঁরা তখন রাজধানীতেই অবস্থান করছেন, কেউ কেউ আবার রাজ্যসভায় বসে আছেন।

দল থেকে দায়িত্বহীন সদস্যদের ওপর কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, এজন্য অনেক জল্পনা-কল্পনাও হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা গোলমেলে। দু'-একজনের ব্যাপার নয় যে তাৎক্ষণিক কোনও ব্যবস্থা হতে পারে। যাঁরা অনুপস্থিতির দরুণ একদিনের এ্যালাওয়েন্স কর্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁদের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ব্যাপারটা ভবিষ্যতে প্রয়োগ করার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। শ্রীজয়পাল সিং-এর পরামর্শ ছিল, এঁদের ফাইন করুন যাঁরা রাজধানীতে বসে থেকেও উপস্থিত হন নি। ফোঁস করে প্রতিবাদ করেছেন শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ, না তা হতে পারে না।– তা অবশ্য হওয়াটাও ভালো দেখায় না। সেক্ষেত্রে 'ফাইন' করতে হত একজন সিনিয়র মন্ত্রীকেও।

জগজীবন রাম ভূপালে থাকার দরুণ আসেন নি। জরুরী তারবার্তা অবশ্য ছাড়া হয়েছিল। নিজের অনুপস্থিতির দ্বারা সকলকে বিস্মিত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং। রাজ্যসভায় উপস্থিত থেকেও আসতে পারলেন না খাদ্য ও কৃষিদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীসিন্ধে। উপ-আইনমন্ত্রীবর অবশ্য বলেছেন তিনি যথাযথ উপস্থিত ছিলেন।

—ই তোক সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দ্বারা কংগ্রেসী ঘরে নিয়ম-শৃংখলার অবনতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হল।

বিহার :

রাজা বিদায়

রাজা কামাখ্যানারায়ণ সিংকে নিয়ে কম হ্যাঁচড়াহেঁচড়ি হল না। এ ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতির পর্যন্ত টানাপোড়েন গেছে। অবশেষে জনতা পার্টির নেতা রাজা কামাখ্যানারায়ণ বিহার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। জানা গেছে রাজাকে এইভাবে বিদায় গ্রহণ করতে হলেও, তাঁর দল সর্দার হরিহর সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানিয়ে যাবে। রাজা এইভাবে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে একটি জটিল সমস্যার জাল থেকে মুক্ত করলেন।

রাজার ভাই ডাঃ বসন্তনারায়ণ সিং অবশ্য এখনও রয়েই গেলেন।

রামগড়রাজ দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, কেবলমাত্র আত্মমর্যাদার খাতিরেই তাঁকে পদত্যাগ করতে হল। ভালই হল, নচেৎ বিপদে পড়তেন মুখ্যমন্ত্রী হরিহর সিং। বিহার মন্ত্রিসভা যে রাজাকে ইতিপূর্বে হাই কমান্ডের নির্দেশানুসারে গলধঃকরণ করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী জবরদস্তি তাঁকে ওগরাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, রাজা স্বেচ্ছায় না গেলে হরিহর সিং তাঁকে সরাতে যাবেন না। প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় কেউ গোটা মন্ত্রিসভাই ঢেলে সাজাবেন।

রাজা সরে গিয়ে হরিহর সিংকে বহাল রেখে গেলেন, সুতরাং।

বাস্তবিকপক্ষে সর্দার হরিহর সিং-ই এতদ্দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে একটি জটিল আবর্ত থেকে উদ্ধার পেলেন। রাজার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল খুবই, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডেলিকেট'। রাজার দ্বারাই একরকম তিনি বিধান পরিষদে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। সুতরাং হরিহর সিং-এর পক্ষে রাজার কাছে, তিনি সরে দাঁড়ান— এই মর্মে প্রস্তাব রাখাও সম্ভব হয় নি।

রাজা সরে দাঁড়ানোয় সব থেকে বড় করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলেন তাই মুখ্যমন্ত্রী সর্দার হরিহর সিং।

মধ্যপ্রদেশ :

পুনশ্চ বিশ মাস পরে

বিশ মাস পর মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে এলো। ফিরে এলেন না শুধু ডি পি মিশ্র মুখ্যমন্ত্রিরূপে। মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রীশ্যামচরণ শুক্লা ব্যালেট ভোটে নির্বাচিত হয়ে পরিষদীয় দলনেতার আসন অধিকারের পর। শুক্লা মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মাসকয়েকের শাসনেরও অবসান ঘটল।

বর্তমানে বিধানসভায় কংগ্রেস পক্ষে ভোটের জোর বাড়ল দলছুট গোবিন্দনারায়ণ সিং এ্যান্ড কোম্পানীর কংগ্রেস প্যাভিলিয়নে প্রত্যাবর্তনের ফলে। সুতরাং, সুবিধাবাদী এক শ্রেণীর দলত্যাগীর ভরসায় শ্রীশুক্লার পক্ষে নিরুদ্বেগে ক্ষমতা পরিচালনা করা কতদিন সম্ভব হবে তা কেউ বলতে পারেন না। ক্ষমতার ম্যাগনেটে পার্শ্ব-পরিবর্তনের ঢেউ যে ফের শুরু হবে না, এমন গ্যারান্টি মধ্যপ্রদেশের মতো রাজন্যবর্গ-প্রধান রাজ্যে কে দেবেন? রাজ্যের সেই দীনহীন অশিক্ষিত জনগণ আজ নিশ্চয় হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন যে, যাঁদের তাঁরা জনপ্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা আসলে ব্যক্তিস্বার্থ এবং তাঁদের বিশেষ গোষ্ঠীস্বার্থেরই রক্ষক। এই উপলব্ধির পর মধ্যপ্রদেশে এস ভি ডি মন্ত্রিসভার পতনের পর একটি অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলে রাজ্যের জনগণ হয়ত অপেক্ষাকৃত সুচিন্তিত নির্বাচন করার সুযোগ পেতেন পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে।

কিন্তু রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য মন্ত্রণা গৃহীত হয় নি। অথচ কংগ্রেসও যে এই মুহূর্তে ক্ষমতায় ফিরে এসে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছেন এমন নয়। আবার সেজন্যই কংগ্রেসকে আজ প্রগতিশীল বিধায়ক দলের সঙ্গে কোয়ালিশনের কথাও ভাবতে হচ্ছে।

মন্ত্রিত্ব যায়-যায়, মন্ত্রিত্ব হয়-হয় এই উদ্বেগকে সাথে নিয়ে বাস্তবিক রাজ্য পরিচালনা কতদূর সম্ভব! আসলে একদল ক্ষমতা কাড়াকাড়ির খেলায় ব্যস্ত থাকুন আর রাজ্যবাসী কৃতকর্মের দুর্ভোগ ভুগুন। কিন্তু এমন সদিচ্ছা ও দেশহিতৈষণা আজ ক্ষমতাধীশ মানুষগুলির মধ্যে নেই যা সাধারণের স্বার্থে দলীয় লোভের প্রাসাদ ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঝুঁকি গ্রহণ করাতে পারে। কিন্তু আখেরে এই নীতির দ্বারা দলের যে চিত্র সাধারণের সামনে ধরা পড়ছে তাতে দূরাগত ক্ষতির কথা অস্বীকার করা যায় কি? অথচ, আজ কেউ সেকথা ভাবছেন না, এটাও কম ভাবনার কথা নয়। স্বজন দেশ চুলোয় যাক, দলের ভবিষ্যৎও যে শিকেয় উঠছে, এই উপলব্ধি ক্ষমতাবানদের মস্তিষ্কে কবে প্রবেশ করবে কে জানে!

(২৯।৩।৬৮)

পাকিস্তান ঃ

যে আশংকা হচ্ছিল, তাই সত্য হ'ল। আয়ুব খাঁ গণতন্ত্রের দাবি মেনে নিয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের অনুষ্ঠান ও সংসদীয় গণ-তন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করলেন না, আর একজন সামরিক একনায়কের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিলেন।

২৫শে মার্চ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খাঁ ঘোষণা করলেন, "জাতির স্বার্থে ও পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য" তিনি রাষ্ট্রপতিপদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছেন এবং সকল ক্ষমতা সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মহম্মদ ইয়াইয়া খাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। দশ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণে আয়ুব খাঁ স্বীকার করেন, দেশে আইন-শৃংখলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, এবং তাঁর সরকারের পক্ষে অবস্থা আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়।

আয়ুব খাঁর বিদায়-ভাষণ

ইয়াইয়া খাঁ ক্ষমতা হাতে নিয়ে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন (মার্শাল ল) জারি করেছেন। ইয়াইয়া খাঁ হয়েছেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। সামরিক আইন জারি করার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান বাতিল করা হয়েছে, মন্ত্রীদের কর্মচ্যুত করা হয়েছে, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভাগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোন রকম রাজনৈতিক কাজ করা চলবে না, জনসভা ও মিছিল বের করা চলবে না, সংবাদপত্র বা অন্য কোথাও সরকারের সমালোচনা করে কিংবা বিতর্কমূলক কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে বক্তব্য রাখা চলবে না। সামরিক আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য সামরিক আদালত স্থাপন করা হয়েছে। যারা 'বিদ্রোহ' করার চেষ্টা করবে, কিংবা 'শত্রুর চর' হিসাবে, অথবা শত্রুর চরের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারীরূপে কাজ করবে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন অপরাধের জন্য ১৪ বছর পর্যন্ত জেল, প্রকাশ্য ৩০ বার বেত মারা, সম্পত্তি ক্রোক প্রভৃতি রয়েছে।

জেনারেল ইয়াইয়া খাঁ তাঁর অধীনে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর তিন প্রধানকে সহকারী সামরিক আইন প্রশাসকরূপে নিয়োগ করেছেন। এই তিন বাহিনীর পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি তিনি পেয়েছেন। তাছাড়া দেশের দুই অংশের জন্য তিনি দু'জন প্রশাসক নিয়োগ করেছেন—এ'রা হলেন ঃ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য লেফটেনান্ট জেনারেল মোহম্মদ আতাকর রহমান, আর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মেজর জেনারেল মুজাফ্ফরউদ্দীন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

সব রাজনৈতিক দলের কাজ তো বন্ধ করা হয়েছেই, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংগ্রাম সমিতিকেও বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। মৌলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবর রহমানকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়েছে—বাইরের কারও সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

সামরিক আইন জারি করার পর থেকে যে-সব খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জানা যায়, পাকিস্তানের দুই অংশেই দ্রুত 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরে আসছে। দীর্ঘদিন পরে স্কুল-কলেজে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে, কল-কারখানা খুলছে, রাস্তা-ঘাটে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হচ্ছে। সবাই নিজের নিজের কাজ করছে।

ইয়াইয়া খাঁ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে বলেছেন, "তিনি এবং সৈন্য-বাহিনীর লোকেরা নীরবে বসে থেকে পাকিস্তানের ধ্বংস দেখতে পারেন না", তাই দায়িত্বপালনের জন্য তিনি এগিয়ে এসেছেন। তবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ক্ষমতায় থাকবেন না। যত শীঘ্র সম্ভব, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা তিনি করবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বসে নতুন সংবিধান রচনা করবেন।

পাকিস্তানে সামরিক আইন জারির ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, আয়ুবশাহীর পতন। আয়ুব খাঁ ভেবেছিলেন, তাঁর একনায়ক-তন্ত্রী শাসন চিরকালের জন্য থাকবে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতা দখলের পর থেকে জনমতকে অগ্রাহ্য করে তিনি নিতান্ত বলপ্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এবং গত চার মাসে সারা দেশে যে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে, তা প্রতিরোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। আয়ুবকে যেতেই হত। তবে নিজে যাবার আগে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করছেন, যাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে বাধা দেওয়া যায়। তাই আর একজন সেনানায়কের হাতে তিনি ক্ষমতা তুলে দিলেন।

দ্বিতীয়, একনায়কতন্ত্রে সামরিক নেতাদের মধ্যে বিরোধ থেকে একনায়কের পতন হয়, অপর একজনের আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন দেশে একই ইতিহাস। পাকিস্তানেও বোধ হয় আবার তারই পুনরাবৃত্তি হল। ইস্কান্দার মির্জার হাত থেকে একদিন আয়ুব খাঁ ক্ষমতা দখল করেছিলেন। আজ কি ইয়াইয়া খাঁ আয়ুবকে বাধ্য করলেন ক্ষমতা ত্যাগে? কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল আয়ুব খাঁ সৈন্যদের পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছেন না। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর গোল-টেবিল বৈঠকে বসার কারণও না কি তাই। আপোষ করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। শেষে তিনি সেনানায়কদের চাপেই সরে দাঁড়ালেন এবং ইয়াইয়া খাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, গোলটেবিল বৈঠক, ঐ

সবই ছিল লোক দেখানো 'ভাঁওতা'। নেতাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়তো ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা যে কিছুতেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজী হবেন না, এই সত্যটাই প্রমাণিত হল সামরিক আইন জারি করার মধ্য দিয়ে।

চতুর্থত, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের যে অবাধ শোষণ রয়েছে, তা অব্যাহত রাখার জন্যই সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হবার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের লোকেরা বিচলিত হয়ে পড়েছে। তাই পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তারা সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে এই কাজ করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল : বেয়োনেটের জোরে কি গণতন্ত্রের সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবে? এই মুহূর্তে সবাই চুপ করে আছেন। হয়তো অনেককে জেলে পুরে রাখাও হবে। কিন্তু গণতন্ত্রের দাবিতে জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের লড়াই কিছুতেই বন্ধ হবে না। বরং সামরিক শাসনের কড়াকড়ি তাদের সংগ্রামী মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

ইতিহাস বারে বারে প্রমাণ করেছে, সামরিক শাসকরা কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেন না—গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি তাঁরা অল্প দিনের মধ্যেই ভুলে যান। জোর করে তাঁদের তাড়াতে হয়। ইতিহাস এ কথাও প্রমাণ করেছে, একনায়কতন্ত্রী কর্তৃত্ব, সামরিক শাসন টেকে না, শেষ পর্যন্ত জনগণের জয় হয়। পাকিস্তানেও তার ব্যতিক্রম হবে না। এত জবরদস্ত আয়ুবশাহীরও তো পতন হল।

আঙ্গুইলা :

ব্রিটিশ সিংহ গলিতনখদন্ত হলেও এখনও যে তার দংশনের ক্ষমতা আছে, গত সপ্তাহে তার প্রমাণ পাওয়া গেল আঙ্গুইলায়।

ক্যারিবিয়ান সাগরের অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ এই আঙ্গুইলা। ৩৫ বর্গমাইলের এই ক্ষুদ্র দ্বীপে মাত্র সাড়ে ছ' হাজার লোকের বাস। দ্বীপবাসীরা অত্যন্ত গরীব। নুন বেচে, গলদা চিংড়ি ধরে, আর বিদেশে চাকরি করা আঙ্গুইলাবাসীদের পাঠানো টাকায় কোনরকমে এদের দিন চলে। এদের শায়েস্তা করার জন্য বৃটিশ সরকার এখানে দুই ফ্রিগেট ভর্তি নৌ-সৈন্য এবং আরও কিছু ছত্রী-সৈন্য ও পুলিশ পাঠিয়েছে। ৩০০ সৈন্য এসেছে, আর এসেছে 'রেড ডেভিলস'-এর লোকেরা।

আঙ্গুইলার লোকেদের অপরাধ কি? তারা স্বাধীনতা চেয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের যুগ শেষ হলে কি হবে, বৃটেনে 'উদারনৈতিক, প্রগতিশীল' শ্রমিক সরকার থাকলে কি হবে, সাম্রাজ্যের অংশ কি সহজে ছাড়া যায়? ১৬৫০ সাল থেকে এই দ্বীপ ইংরেজদের দখলে। দ্বীপ থেকে শোষণ পুরোমাত্রায় করেছে, কিন্তু এখানকার উন্নতির জন্য বৃটিশ সরকার বিশেষ কিছুই করে নি। রাস্তাঘাট ঠিকমত নেই, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই, পানীয় জল নেই, অধিবাসীদের উপার্জনের কোন ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার কোন আয়োজন নেই।

বেকায়দায় পড়ে উইলসন আপোষের পথ খুঁজছেন

দু' বছর আগে বৃটিশ সরকার স্থির করে, ক্যারিবিয়ানের আর দুটি দ্বীপ সেণ্ট কিট্‌স্ ও নেভিসের সঙ্গে আঙ্গুইলাকে যুক্ত করে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। আঙ্গুইলার লোকেদের এই প্রস্তাব পছন্দ হয় নি। সেণ্ট কিট্‌সের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের চিরকালের ঝগড়া। তবু ইংরেজরা জোর করে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে—অবশ্য সাম্রাজ্যের অংগরূপেই। কিন্তু দু' মাসের মধ্যে আঙ্গুইলা এই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী কিট্‌সবাসী রবার্ট ব্রাড্‌শ'র বিরুদ্ধে তারা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে। দ্বীপ থেকে কিট্‌সবাসী পনেরজন পুলিশকেও তারা তাড়িয়ে দেয়। এই সময় আঙ্গুইলায় যে গণভোট গ্রহণ করা হয়, তাতে ১৮১৩ জন লোক যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে মত প্রকাশ করে, মাত্র পাঁচজন বিরুদ্ধে ভোট দেয়। এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীয় গণভোটে আঙ্গুইলাবাসীরা ১৭৩৯—৪ ভোটে আঙ্গুইলার জন্য একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে, আঙ্গুইলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে, দ্বীপটিকে প্রজাতন্ত্ররূপে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত করে। রোনাল্ড ওয়েবস্টার হন আঙ্গুইলার রাষ্ট্রপতি।

ক্যারিবিয়ান যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বৃটিশ কমিশনার এনথনী লী হালে পানি না পাওয়ায় লণ্ডন থেকে রাণীর বিশেষ প্রতিনিধি উইলিয়ামস হুইটলক মার্চের প্রথমে আঙ্গুইলায় আসেন। কিন্তু হুইটলক ওয়েবস্টারের সঙ্গে কোন আপোষের চেষ্টা না করে তাঁকে ধমকাতে শুরু করেন। ক্রুদ্ধ দ্বীপবাসীরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হুইটলককে আঙ্গুইলা ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

এরপরই শুরু হয় বৃটিশ সৈন্য অবতরণ। লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল স্টুয়ার্ট সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ইংরেজরা ভেবেছিল, আঙ্গুইলার লোকেরা বুঝি তাদের বাধা দেবে। কিন্তু ক্রুদ্ধ দ্বীপবাসী কোন বাধা দেয় নি। তারা স্বাধীনতার ওপর এই ঘৃণ্য হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছে এক অভিনব উপায়ে। ইংরেজ সৈন্যরা যখন দ্বীপে নামল, তখন তারা দেখল দু'-চারজন শিশু ছাড়া রাস্তাঘাটে কেউ কোথাও নেই। সবাই প্রতিবাদে ঘরের ভেতরে। পরে অবশ্য দ্বীপবাসীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে—'পদচ্যুত' রাষ্ট্রপতি ওয়েবস্টার নিজে বিক্ষোভের নেতৃত্ব করেছেন।

দ্বীপবাসীরা বাধা না দিলেও, সারা বিশ্বে এমন কি খাস বৃটেনেও এই 'অভিযানের' জন্য বৃটিশ সরকার তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।' রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপনিবেশবাদবিরোধী কমিটিতেও বিষয়টি উঠেছে।

এখন বেকায়দায় পড়ে উইলসন সরকার আপোষের পথ খুঁজছেন!

আঙ্গুইলার অধিবাসীরা বৃটিশ শাসনকে অগ্রাহ্য করে নিজেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, তাই ইংরেজ প্রভুর এত রাগ? কিন্তু রোডেশিয়া? সেখানেও তো একই ব্যাপার—'একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা'। সারা বিশ্ব দাবি জানিয়েছে—রোডেশিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করো। তবু ইংরেজ প্রভুর হাত ওঠে নি। আঙ্গুইলার বিদ্রোহী সাড়ে ছ' হাজার লোক কৃষ্ণকায়, আর রোডেশিয়ার দু' লক্ষ বিদ্রোহী শ্বেতকায়—বৈষম্যের এই তো কারণ!

(৩০-৩-৬৯)

ব্রুটাস তুমিও!

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

মঙ্গলবার রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন কমিটির মৃত্যু ঘোষণার পর, রাজ্য কংগ্রেস পরিষদ দলনেতা শ্রীসিদ্ধার্থ রায় যখন তিন পৃষ্ঠার একখানি টাইপ করা কাগজ সাংবাদিকদের হাতে দিয়ে বললেন—তিনি রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিবর্তন তথা এ্যাড হক চান, তখন শুধু সেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজারের সেই দৃশ্যের কথা মনে হচ্ছিল—যেখানে সিজার ব্রুটাসের হাতে ছুরি আর ব্রুটাসকে দেখে বলছেন "ব্রুটাস তুমিও"। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সেই টাইপ করা কাগজখানি বুঝি ব্রুটাসের ছুরি অপেক্ষা তীক্ষ্ম। বিয়োগান্ত এ্যাড হক কংগ্রেস তো রাজ্যের অনেকেই চাইছেন, নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি প্রায় ক্রনিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের এ্যাড হক পন্থী হওয়া খুবই বিস্ময়কর—আর বিস্ময় যেখানে বেশি, আঘাতও সেখানে বেশি হয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর অন্তর্দ্বন্দ্ব জর্জরিত কংগ্রেসে সংকট দেখা দেয়—সাত সদস্যের পুনরুজ্জীবন কমিটির মৃত্যুতে সেই সংকট আরো তীব্র করে তুললো। একদিকে দলে দলে পদত্যাগ, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হাতাহাতির সংবাদ কংগ্রেস ভবনের বাতাস ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুনরুজ্জীবন কমিটির মৃত্যুর পর থেকেই কংগ্রেস ভবনের লিফট্‌টা অচল হয়ে গেছে, লিফটের চালক শ্রীদেওকির অভিযোগ—পরিমাণের অতিরিক্ত ভার বহনের কারণেই লিফট বিকল হয়েছে। কংগ্রেস ভবনের অচল লিফট-নেতৃত্ব পরিবর্তনের পরিস্থিতির অচলাবস্থা দুই বুঝি আজ একই প্রতীক।

অথচ এমনটা হবার কিন্তু কথা ছিল না, প্রায় পক্ষকাল আগে একটা মীমাংসা হয়ে গেছিল। কোন একদিন প্রায় দুই পক্ষ একমত হয়েছিলেন যে, রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বের পরিবর্তন হবে। আপোষে একদল পদত্যাগ করবেন—আর সেই জায়গায় নতুনরা আসবেন। যেদিন বিধানসভায় শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঘোষণা করলেন যে, কয়েকদিন নয় এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও কংগ্রেসের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে পারে এবং আবার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার পথে এগুতে পারে—এই হল সেই দিনের কথা। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই সম্ভাব্য পরিবর্তনের আভাসই দিয়েছিলেন শ্রীরায়। এই সময় পাকা কথা হয়েছিল অধ্যাপক চন্দ্র সভাপতি থেকে সকলে পদত্যাগ করবেন—'সেখানে নতুনরা আসবেন। কিন্তু বিরোধ হল সম্পাদক পদ নিয়ে—বিক্ষুব্ধরা চাইলেন তরুণকান্তি সম্পাদক হবেন, তাই সব ভেস্তে গেল। দেখা গেল ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে "পরিপূর্ণ সম্মতি ও আপোষের পথে বিপ্লব" প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। তখনই আহ্বান করা হল রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের শীর্ষ সম্মেলন। এই শীর্ষ সম্মেলনের দুই দিনের অধিবেশনেও "রেভ্যুলেশন উইথ কনসেণ্ট" সম্ভব হল না, তখন গঠন করা হল সাতজনের কমিটি। এই সাতজন সদস্যের কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। প্রথম দিন থেকেই তিনি এই সভা বর্জন করলেন। শুধু সভা কেন, প্রায় ১৫ দিন কলকাতায় ছিলেন—তার মধ্যে মাত্র দুই দিন কংগ্রেস ভবনে গেলেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভা বর্জন দেখেই পুনরুজ্জীবন কমিটির ভবিষ্যৎ ভাবা গিয়েছিল— তবু পুনরুজ্জীবন কমিটির চার দিন বৈঠক বসলো। বৈঠকে শেষ পর্যন্ত দুইটি সূত্র নিয়ে আলোচনা চলল। প্রথম সূত্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির তথা সরকারী পক্ষের। অধ্যাপক চন্দ্রের বক্তব্য ও প্রস্তাব হল—রাজ্য কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রসম্মত উপায়ে ও নিয়মিতভাবে গঠিত। নির্বাচনে বিপর্যয়ের জন্য প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে দায়ী করা চলে না, তাই সেটা ভেঙে দেবার প্রশ্ন উঠতে পারে না। তবে পরিবর্তনের একটা দাবি যখন উঠেছে আর সকলে মিলে কাজের জন্য যদি পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, তা করা যেতে পারে। সেইমত পর পর দুইবার যাঁরা রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বের আসনে আছেন বা ১৯৬৩ সালের আগে থাকতে যাঁরা মন্ত্রী বা রাজ্য কংগ্রেসের কর্মকর্তা আছেন, তাঁরা সরে দাঁড়ান—সেখানে নতুনরা আসুন। তাছাড়া এ্যাড হক কংগ্রেস করা বা প্রদেশ কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার কোন বিধিসম্মত কারণও নেই। এ্যাড হক কংগ্রেস হতে পারে দুইটি কারণে—এক, রাজ্য কংগ্রেস যদি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্য করে, দুই, যদি সংবিধান মত কাজ না করে তবেই এ্যাড হক হতে পারে। এইরকম পরিস্থিতিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবেই এ্যাড হক হতে পারে। কিন্তু "অপরাধী জানিল না অপরাধ কিবা

বিচার হইয়া গেল" এ চলতে পারে না। আর যাঁরা বলেন অতুল্যবাবু, বদুবাবু প্রমুখরা বিদায় নিলে কংগ্রেসের ভাল হবে, এই সূত্রে তাঁরা তো বিদায় হবেন—তবে আপত্তি কোথায়?

কিন্তু শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের প্রস্তাব সম্পূর্ণ বিপরীত সুর ও ধর্মের, যুক্তিও আলাদা। শ্রীরায় প্রস্তাব করলেন—সমস্ত রাজ্য কমিটি ভেঙে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা দাও—সকলে পদত্যাগ করো। কেউ কেউ থেকে যাবেন, আর কেউ কেউ চলে যাবেন এমন ব্যবস্থা করলে মনে হবে যাঁরা চলে গেলেন, তাঁরাই বুঝি সব দোষ-ত্রুটির জন্য দায়ী। কাজেই কাউকে দোষী বা দায়ী করে লাভ নেই—দোষ যদি হয়ে থাকে তবে সেটা সকলের, তাই সকলেই চলে যান—নতুনরা আসুন, আর তিন বৎসর শুধু সংগঠন করুন—কোন দলীয় নির্বাচন করে শক্তিক্ষয় করা চলবে না, নতুন শক্তি ও নতুন ইমেজ নিয়ে কংগ্রেসকে এগুতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে দুইটি প্রস্তাব সম্পর্কে কারো কিছু বলার নেই, যুক্তি ও আবেগের দিক থেকে দুইটি প্রস্তাবই খুব আকর্ষণীয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব কোন পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য হল না।

দুই সপ্তাহ আগে কপালকুণ্ডলার নবকুমারের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলাম রাজ্য কংগ্রেস নবকুমারের মত পথ হারিয়েছেন, সেই কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য হল। কিন্তু সমস্যা সেটা নয়—কংগ্রেসকে ভাল করবার কথা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সবচেয়ে ভাল বোঝেন ও বুঝবেন—তাঁদের ভাবনা তাঁদের থাক। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ভূমিকা। স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সম্পর্কে বলেছিলেন "আংগ্রী বয়"। একে রাগলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তার পর যদি তিনি "বয়" হন, তবে তো কথাই নেই। কিন্তু ১০ বৎসর পরেও কি শ্রীরায়কে সেই দিনের মত আংগ্রী বয় বলা যাবে, বা শ্রীঅতুল্য ঘোষ কি সেই কথা বলবেন। আমার মনে হয় তা নয়। শ্রীরায় আজ অনেক বেশি সিরিয়াস এবং কংগ্রেস সম্পর্কে অনেকের চেয়ে সিরিয়াস। তাই দিল্লীতে অতি নিপুণভাবে দরবার করে রাজ্যের জন্য এ্যাড হক কংগ্রেসের সুপারিশ সংগ্রহ করে এনেছিলেন, আবার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে শ্রীনিজলিংগাপ্পার কথা বলিয়ে সেই কথা পাকা করিয়ে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকেও স্বমতে আনতে পেরেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। কারণ শ্রীরায় যে লবী করে এসেছিলেন, শ্রীনির্মলেন্দু দে দিল্লীতে থেকে সেই লবী গোলমাল করে দিলেন। তাই তো মঙ্গলবার সকালে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিংগাপ্পা টেলিফোনে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে বললেন—সকলে যদি এ্যাড হক চায়, আমি আপত্তি করবো না। তখন কিন্তু বোঝা যায় নি সকলে বলতে শ্রীনিজলিংগাপ্পা শতকরা একশ' জনে একশ জন বোঝেন—শতকরা একশ' জনে আশি জন বোঝেন না। সন্ধ্যায় তাই শ্রীনির্মলেন্দু দে দিল্লী থেকে জানালেন, তিনি প্রতাপবাবুর সমর্থক অর্থাৎ ১৯৬৩ সালের আগের থাকতে পদাধিকারীদের পদত্যাগ। এই সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবুকে কিন্তু একটু "অসত্য ক্যামপেনকারী" বলা হল। কারণ শ্রীনিজলিংগাপ্পা বললেন—তাঁকে নাকি বোঝানো হয়েছিল, সকলে এ্যাড হক চাইছেন। কংগ্রেস সভাপতি রাজ্য কংগ্রেসের কার্যকরণ জানেন না, সাত সদস্য কমিটির পরিস্থিতি জানেন না, আর এই সব না জেনে না বুঝে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন—হ্যাঁ এ্যাড হক হোক। তাহলে বুঝতে হবে কংগ্রেস সভাপতিও যেমন, কংগ্রেস সংগঠনও চলছে তেমন। পরে শ্রীনিজলিংগাপ্পা যখন নিজেকে রক্ষার জন্য ব্যস্ত হলেন, তখন তাড়াতাড়ি ফোন করেছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষকে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁকে সোজা বলে দিয়েছিলেন—আমাকে কিছু বলার দরকার নেই, যা বলার শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে বলুন। তাই সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে লক্ষণীয় চরিত্র হল শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আর প্রশ্ন হল এর পর তিনি কোন পথে যাবেন? প্রশ্নটা এই কারণে যে, আজ কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা শ্রীরায় আর সংগঠনের অধ্যাপক চন্দ্র চিন্তার রাজ্যে দুই প্রান্তের অধিবাসী হলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকে পরিষদ দল আর সংগঠন দুই-এর নেতা কখনও একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করেন নি। ডাঃ রায় ছিলেন পরিষদের নেতা তিনি যা ভাল বুঝেছেন করেছেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ ছিলেন সংগঠনের নেতা। ডাঃ রায় কখনও সংগঠনের ব্যাপারে মাথা ঘামান নি। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলেও একই ধারা ছিল—কিন্তু আজকে পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে গেল। কারণ সেই দিন যে যার নিজের এক্তিয়ারে ক্ষমতা দখল ভোগ করে খুশি ছিলেন—কারণ সেই দিন ক্ষমতা ছিল অঢেল—প্রচুর সংগঠন তখন—রাজ্যব্যাপী মজবুত জোরদার, শাসন ক্ষমতায়ও তখন কোন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল না। কিন্তু আজ—শাসন ক্ষমতা যেমন নেই তেমনি সংগঠনও শীর্ণকায়—আর শীর্ণকায় দেহ ও রোগ ভর্তি তথা "রিকেট" রোগী। কাজেই কেউই নিজের সীমিত ক্ষমতায় খুশি থাকবেন না, একে অপরের জমিতে পা দেবেনই। আজকের এই হল সঠিক চিত্রের পূর্বাভাস।

এ ছাড়া আরো একটা ঘটনা লক্ষ্য করবার মত। সেটা হল শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁর কংগ্রেস ভবনের জন্য কয়েকটা লাইন অফ ডিফেন্স গড়ে তুলেছিলেন অতি নিপুণভাবে। এই ডিফেন্স লাইনের প্রথম সারিতে ছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রমুখ। কিন্তু সেই লাইনে ভাঙন ধরলে বা সেই লাইন যদি কখনও বিগড়ে যায়, তখন সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স করেছিলেন এককালের বিজ্ঞ নেতা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও একালের আংগ্রী বয় শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে দিয়ে। তাই গতবার যখন প্রথম লাইন অফ ডিফেন্স ভাঙলো অর্থাৎ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীখগেন দাশগুপ্ত এ্যাড হক চাইলেন, তখন কংগ্রেস ভবন রক্ষা হয়েছিল এই সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স দিয়ে। কিন্তু এইবার দেখা যাচ্ছে সেই সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স-এ ভাঙন। কংগ্রেস ভবনের লিফটম্যান দেওকি বলছিল—লিফট সারাতে মিস্ত্রিকে খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আসছে না। আমার মনে প্রশ্ন—কংগ্রেস ভবনের লিফট সারাবার মিস্ত্রি পাওয়া যাবে তো? আবার একই লিফটে চড়ে সংগঠন নেতা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ও পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীসিদ্ধার্থ রায় তিনতলায় তাঁদের ঘরে বসবেন তো। দুই-কে এক দিয়ে গুণ করলে গুণফল সব সময় দুই-ই হয়—কংগ্রেস ভবনে নেতৃত্ব পরিবর্তনের এই এক দিয়ে গুণ করে গুণফল একের বাইরে যাবার পথ পাওয়া যাবে তো? তবে এই দুইকে এক দিয়ে গুণ করার মধ্যেও যদি কোন ব্যতিক্রম থাকে, তবে সেটা হল—এই সেকেণ্ড লাইন অফ ডি ফে ন্স-এ ভাঙন—শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের দিক পরিবর্তন।

(২৮।৩।৬৯)

[বর্তমান রচনার সমস্ত উদাহরণগুলি রাষ্ট্রপতি-শাসনকালে অনুষ্ঠিত ঘটনা-সমূহ থেকেই নেওয়া হয়েছে]

পুলিশ-প্রসঙ্গ

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

পুলিশকে হেয় প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেন না সেই কাজটি খুবই সহজ। পুলিশ সম্বন্ধে কারো মনোভাবই খুব সশ্রদ্ধ নয়, শুধু আজই নয়, চিরকাল। আমার নিজের অনেক বন্ধুই পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ধরণের পদে নিযুক্ত আছেন, ব্যক্তি হিসাবে তাঁদের বিচার করলে তাঁরা আর পাঁচজন মানুষের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নন। বরং এ কথা বলা যায় যে, অন্যান্য অনেক বিভাগের চেয়ে পুলিশ বিভাগে দক্ষ ও শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেশি। যাঁরা আই-পি-এস হয়ে আসেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কৃতী ছাত্র। ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টর পদে যাঁরা থাকেন, তাঁদেরও শিক্ষাগত ও অপরাপর যোগ্যতা বড় কম নয়, এমন কি কনস্টেবল পদেও আজকাল শিক্ষিত ও সচেতন মানুষেরা যাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ বিভাগে এমন কোন একটি পদার্থ আছে, যা এক বালতি খাঁটি দুধকে মুহূর্তেই পচিয়ে দেয়, জনগণের কাছে শ্রদ্ধেয় হিসাবে গণ্য হবার পরিবর্তে সীমাহীন ঘৃণা ছাড়া তাঁরা আর কিছু আদায় করতে পারেন না। এর রহস্য ভেদ করার প্রয়োজন সর্বাগ্রে

জনৈক আই-পি-এস-এর বক্তব্য

নাম প্রকাশ না করতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, কৃতী ছাত্র, তরুণ এবং সমাজসচেতনও বটেন। এ হল মুদ্রার এক দিক। অপরদিকে এঁর সদ্যঘটিত ও লাম্পট্য দোষ আছে, এবং উৎকোচ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাদ-বিচার নেই। তাঁর নিজের ভাষায়, তাঁর এই দ্বিতীয় চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে পুলিশে চাকরী নেবার পর। "আমাদের গেঁজিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে আসবে সেই গেঁজিয়ে যাবে, যত ভাল ছেলেই হোক না কেন।" তাঁর মুখে একটি কথা শুনে আরও অবাক হলাম "যারা তরুণতর, ঘুষের ব্যাপারে তারাই অধিক দড়।" কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, "প্রথম পুরুষে যা অ্যাকোয়ার্ড হ্যাবিট, দ্বিতীয় পুরুষে তাই হয়ে যায় ইনবর্ন-কোয়ালিটি। আমাদের পূর্বসূরীরা ঘুষ নেওয়া অভ্যাস করেছিলেন, আমাদের জেনারেশনে তা জন্মগত সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু তাঁদের কিছু স্কুপল ছিল, আমাদের তাও নেই।"

তাঁর বক্তব্য : পুলিশ বিভাগটা আজকে এমন একটা দশায় উপস্থিত হয়েছে যেখানে দক্ষতা দেখালে, ভাল কাজ করলে পদোন্নতির পরিবর্তে পদাবনতি সুনিশ্চিত। তার চেয়ে কাজ না করে কর্তারা যা বলেন তাই করে যাও, বেআইনী, দুর্নীতিপূর্ণ, বিবেকবিরুদ্ধ হলেও, অনেক কাঁচা পয়সা মিলবে, আর তা ছাড়া জাগতিক সুখভোগেরও দরাজ বন্দোবস্ত। আবার গত একুশ বছর ধরে কর্তারা, অবশ্য ব্যতিক্রম সব জায়গাতেই থাকে, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সেবা করাকেই নিজেদের কর্তব্য মনে করে এসেছেন, বা মনে করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রতিটি জেলার যাঁরা মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন, তাঁদের ইচ্ছাই সব। দরকার হলে খুনের কেসও হাস আপ করতে হবে।

[এই প্রসঙ্গে আমার আরও একটি কাহিনী মনে পড়ল। এটিও আমায় বলেছিলেন জনৈক আই-পি-এস অফিসার, যিনি কিছুদিন সংবাদপত্রের শিরোনামা হয়েছিলেন। একটি খুনের কেস চাপবার জন্য তাঁকে কি রকম প্রলোভন দেখানো হয়েছিল, সেই কাহিনী।]

আলোচ্য আই-পি-এস বন্ধুর মতে যদি প্রতিমুহূর্তে পুলিশের কার্যে শাসক-দলের হস্তক্ষেপ ঘটে, যদি প্রাতঃমুহূর্তে অনুরোধ আসে যে অমুক সমাজবিরোধীকে ছেড়ে দাও, অমুকের কৃত খুনের কেসটাকে চেপে দাও, অমুক চোরাকারবারীর গায়ে কেন হাত দেওয়া হয়েছে, এবং সে নির্দেশ অস্বীকার করলে যদি নিজেরই চাকরি যাবার সম্ভাবনা থাকে, শুধু চাকরী যাওয়াই নয় আরও অনেক কিছু ফেটাল সম্ভাবনা থাকে, তাহলে হুকুম তামিল করা ভিন্ন রাস্তা কোথায়? এই কারণেই গত একুশ বছরে অপরাধী ও পুলিশ সমার্থক হয়ে গেছে, সমাজবিরোধী ও পুলিশ একই মুদ্রার দুই পিঠে পরিণত হয়েছে। "এই পদ্ধতি কাজ করেছে রেসিপ্রোকাল রিলেশনে, কাজেই আমরা করাপ্টেড দেহে ও মনে, টাকা, মদ ও মেয়েমানুষই আমাদের ধ্যানধারণা হয়ে গেছে। দেশ, সমাজ, অপরাধ ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? বেশ আছি, সুখে আছি।"

বন্ধুর কথাগুলি তুলে দিলাম। আশা করি এর পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পুলিশ ও সমাজবিরোধী

পচনটা সর্বপ্রথম ধরে উপরতলায়, এবং তা থেকেই তা নিম্নস্থ স্তরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। অধস্তন কর্মচারীরাও উপরওয়ালাদের অনুসরণ করেন। বহুক্ষেত্রেই সমাজবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ থাকে এবং তাদের অপকর্মজাত লাভের কড়ির কিছু ভাগ পুলিশ বরাবরই পেয়ে থাকে। যে কোন থানায় গেলেই দেখতে পাবেন শহরের কোন নামজাদা গুণ্ডা দারোগা সাহেবের সামনে বসে বসে সহাস্যে খোসগল্প করছে। এদের গায়ে পুলিশ কদাচ হাত তোলে না, বরং সর্বপ্রকারে এদের রক্ষা করার চেষ্টা করে। এবং সবচেয়ে যা ট্রাজেডি তা হচ্ছে এই পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ পড়লে, অভিযোগকারীকেই বহুক্ষেত্রে নাকালের একশেষ হতে হয়। অনেকক্ষেত্রে ফরিয়াদীকেই আসামী বানিয়ে নেওয়া হয়। আপনি পথে সমাজবিরোধীদের হাতে মার খেলেন, আপনার উপর উৎপীড়ন চলল, তাদের কাউকে হয়ত আপনি চিনতে পারলেন, স্থির করলেন থানায় গিয়ে অভিযোগ করবেন, তার আগেই আপনাকে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করল, আপনাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে গিয়ে দেখলেন যে যারা আপনাকে মারধোর করেছিল তারাই আপনার নামে আগেভাগে থানায় গিয়ে মিথ্যে এজাহার দিয়েছে, আপনার নামে মারপিটের চার্জ আনা হয়েছে, এবং সেই অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপরে কোর্টে গিয়ে বছরখানেক ধরে বিচারের ধাক্কা সামলান, উকিল-মোক্তার মুহুরী-পেশকার এমন কি কোর্টের টিকটিকির পিছনেও টাকা ঢালুন, এবং শেষ পর্যন্ত ওই সমাজবিরোধীদেরই পায়ে গিয়ে পড়ুন যাতে তারা দয়া করে মামলা তুলে নেয়। এই ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে হাজারে হাজারে, কোন প্রতিকার নেই।

এটাই হয়, অন্তত ভারতের পুলিশ-ব্যবস্থা এই ট্রাডিশনটি দীর্ঘকাল ধরেই সৃষ্টি করে রেখেছে। এই কারণেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ দেশের পুলিশ-বাহিনীকে সুসংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী আখ্যা দিয়ে থাকেন। বিচারালয়ের দ্বারস্থ হলে ও যা শেষ পর্যন্ত যদি ঠিকমত মামলা চালানো যায়, অর্থাৎ যদি মামলা চালানোর উপযোগী সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদি হাতের কাছে থাকে, অর্থাৎ যদি এমন লোক সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসেন যিনি সমাজবিরোধীদের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করার মত শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ যাঁর ধন-বল জনবল প্রচুর আছে (কেন না আপনি ছা-পোষা নিরীহ মানুষ, যদি আপনাকে গুণ্ডা এসে শাসিয়ে যায় যে সাক্ষ্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে আপনাকে দেখে নেওয়া হবে, আপনি তৎক্ষণাৎ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য) এবং সর্বোপরি যদি আদালতের বিপুল ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা ফরিয়াদীর থাকে, তবেই সে রেহাই পেতে পারে, কিন্তু সে অবস্থা ক'জনের? কাজেই বেশির ভাগ মানুষকেই বিনা দোষে কিল হজম করতে হয়, সমাজবিরোধীদের দ্বারা নিগৃহীত হবার পরেও তাদেরই পায়ে গিয়ে পড়তে হয়, পুলিশ আপনার নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি দেবে না, বরং আপনি যে থানায় এসে কোন মহাত্মা সমাজবিরোধীর নামে অভিযোগ করেছেন সেই খবরটি তার কানে তুলে দিয়ে তাকে উপদেশ দেবে যে, আপনার এই অভ্যাসটির সমুচিত জবাব যেন সে দেয়।

কয়েকটি উদাহরণ ঃ সংবাদপত্র থেকে

মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের সমাজবিরোধীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে বছরখানেক পূর্বে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট সমাজবিরোধীদের দমন করবার জন্য অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বারংবার আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে। প্রতিকার তো কিছু হয়ই নি, বরং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশ সমাজবিরোধী এই গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিয়েছে, এমন কি থানায় অভিযোগকারী অথবা সংবাদদাতার নাম-ঠিকানা পর্যন্ত পুলিশ এই গুণ্ডাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে। মধ্যমগ্রামের ঘটনাটি কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিনিয়তই সর্বত্র ঘটছে। আবার যদি এই সব সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের সংগে কোন রাজনৈতিক শক্তির যোগাযোগ থাকে তাহলে ব্যাপারটা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। যেমন বেলঘরিয়া, সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য হিসাবে যে স্থানটি সংবাদপত্রের টপ-হেডিং হিসাবে দীর্ঘকাল যাবৎ স্থান পেয়েছে। বেলঘরিয়ার দুঃস্বপ্ন আজও মিলিয়ে যায় নি। বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে খুব সোরগোল তোলা হয়েছিল, কিন্তু আমার যতদূর স্মরণ আছে সে আমলে প্রধান সমস্যা ছিল শ্রম-বিরোধের, ঘেরাও-এর, যেগুলিকে বিরোধীমহল আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা বলে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য তখন কিছুটা কম ছিল, কেন না যুক্তফ্রন্ট সরকার পুলিশ-নির্ভর ছিলেন না এবং দ্বিতীয়ত জনসাধারণ অনেক কিছুই নিজেদের হাতে গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, অনেক সময় তাঁরাই দলবদ্ধভাবে সমাজবিরোধীদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও সেটা আবার অনেকের পছন্দ হয় নি। পি ডি এফ আমলে সমাজবিরোধীদের দমন করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। পুলিশকে সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষকে রাজনৈতিক কারণে বন্দী করে "আইন ও শৃঙ্খলা" বজায় রাখা হয়েছে এইরকম দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই আমলেই বেলঘরিয়ার বুকে এবং দুর্গাপুরে সমাজবিরোধীদের যে নারকীয় ক্রিয়াকলাপ আমরা দেখেছি তার তুলনা মেলা ভার।

পুলিশী অনাচারের কয়েকটি নিদর্শন

সংবাদপত্র থেকে পাওয়া নিম্নের ঘটনাগুলি থেকে বর্তমানের পুলিশী চরিত্র কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে জনৈক পুলিশ কর্তৃক জনৈকা মহিলার শ্লীলতাহানি এবং তারই সমর্থনে পুলিশ-বাহিনী কর্তৃক জনসাধারণের উপর ব্যাপক গুলীবর্ষণ। ঘটনাটি ঘটেছিল গত ১৯৬৮ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে। একটি ভদ্রমহিলা বাসে করে কোথাও যাবেন বলে বাস স্টপেজে অপেক্ষা করছিলেন। ইত্যবসরে জনৈক পুলিশপুঙ্গব তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর শ্লীলতাহানি করে। মহিলাটির চীৎকারে আশেপাশের লোকেরা ছুটে এসে সেই পুলিশপুঙ্গবকে ধরে ফেলে। তখন পুলিশ-ক্যাম্প থেকে একদল সশস্ত্র পুলিশ এসে তাদের প্রাণের বন্ধুকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বেপরোয়াভাবে কয়েকটি লোককে গুলী চালিয়ে আহত ও নিহত করে।

এই প্রসঙ্গে তার আগের বছরের একটি কাহিনী মনে পড়ছে। সে ঘটনাটিও অনুরূপ। স্থান নদীয়া জেলার একটি শহর। সেখানকার থানার জনৈক অফিসারের উপরি-উক্ত পুলিশ-পুঙ্গবের মতই খ্যাতি ছিল। জনসাধারণ সেটা জানতেন, কিন্তু কংগ্রেসী

যে ২৩টি ওষুধ আর ১৩টি উপকরণের নাম তালিকায় দেওয়া হয়েছে তার আনুমানিক মূল্য হচ্ছে দু' লক্ষ টাকা। এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমি হিসাব নিয়ে জেনেছি। এখন এই দু'লক্ষ টাকার জিনিস যেখান থেকে নিতে হবে বলা হয়েছে সেটা কিন্তু কলকাতার অবস্থিত সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স নয়—সেটা হচ্ছে দার্জিলিং-এর সি এম ও-র কাছ থেকে। এখন কথা হচ্ছে স্বাস্থ্য-দপ্তরের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টরের কাছ থেকে দার্জিলিং-এর সি এম ও-র কাছে এতটাকার ওষুধ গেল কেন? তাদের ইনডেণ্ট লিস্টের মধ্যে কি করে এতগুলি টাকার ওষুধ গেল? কেউ কি এর সদুত্তর দিতে পারেন? যদি ইনডেণ্ট লিস্টে এতগুলি টাকার ওষুধ গিয়েও থাকে তবে এভাবে পরবর্তী সময়ে সি এম ও-কে ব্যবহার না করার কৈফিয়ৎ কি? তারপরের কথা আরও বিস্ময়কর। —

উক্ত ওষুধগুলি যাঁরা নেবেন উক্ত সার্কুলারে প্রতি তাঁদের বলা হয়েছে—"The cost of articles will be adjusted against the original indentor."

এ কথার মানে কি? হাসপাতালগুলি দার্জিলিং-এর সি-এম-ও'র কাছ থেকে হাজার হাজার টাকার ওষুধ নেবেন অথচ তাঁদের কোন দায়িত্ব থাকবে না? কিন্তু ফিনানসিয়াল রুলস কি বলে?

এইবার সমস্ত ব্যাপারটা একসঙ্গে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে "In order to utilise the medicines and equipments as well as to save the Govt. money" বলে সেই money কি করে চুরি করা হবে এটা তারই একটা নিখুঁত পরিকল্পনা। প্রথমত দু' লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ওষুধপত্র দার্জিলিং-এ গেল কেন? নিশ্চয়ই এই ভদ্রলোক চক্রের লোক। এঁর ওখানে এগুলি পাঠানো নিরাপদ। এরপর সেখান থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে দেওয়া হল এবং সেখানে কোন রেকর্ড রাখা হল না। অর্থাৎ এখান থেকে সেগুলিকে বিক্রি করা হল এবং টাকা যেখানে যাবার সেখানে চলে গেল। কারণ original indentor-এর (দার্জিলিং-এর সি-এম-ও) কাছেই তো দাম adjusted হবে। বাইরের লোকের এটা জানার কথা নয়। অবশ্য এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টরের কাছে এটা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঘটনার কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যে ওষুধগুলির কথা বলা হয়েছে সে ওষুধগুলির Potency date শেষ হচ্ছে ১৯৬৭ সালের আগস্টে। সার্কুলারে দেওয়া হচ্ছে জুলাইয়ের ৯ তারিখে। আনা নেওয়া করতেই আগস্ট এসে যাবে। অতএব এ ওষুধ আর কি কাজে লাগবে? কিন্তু "In order to save the Govt. money"-র বড় দায়িত্ব রয়ে গেছে। কিন্তু এইখানে যদি প্রশ্ন করি, যে বিভিন্ন সরবরাহকারী ওষুধ কোম্পানীগুলির পুরনো ওষুধের স্টক ক্লীয়ার করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন অফিসার চক্রান্ত করে এইভাবে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তা করছেন, তাহলে কি কোন সদুত্তর পাবো?

একটি ওষুধের কথাই শুধু এই তালিকা থেকে উল্লেখ করছি। ক্লোরোমফেনিকল ২৫০ এম. জি ক্যাপসুলের সংখ্যা হচ্ছে ৭৮০০০ এবং তালিকায় এর কোন potency date উল্লেখ করা হয় নি। এর দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা। যার potency date নেই—এমন ৭৮ হাজার ক্যাপসুলে কিসের প্রয়োজনে দার্জিলিং-এ যায় আর কিসের প্রয়োজনে সেগুলিকে পুরোভাবে কাজে লাগানোর কথা হয়, তা কি বুঝতে কারো বাকি থাকে? এই সব বিষয় আমি জোরের সঙ্গে তুলে ধরছি। আমার বিশ্বাস স্বাস্থ্যদপ্তরের ওপরতলাকে রাইটার্স বিল্ডিংস ও সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স থেকে বিদায় না করলে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি নেই। বারান্তরে আরও কয়েকটি ঘটনা তথ্য সহকারে তুলে ধরব।

স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুন

মনোরঞ্জন হাজরা

পশ্চিমবাংলা সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরে কিভাবে পুকুরচুরি হচ্ছে, কিভাবে ষড়যন্ত্র করে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি হচ্ছে এবং কিভাবে দল পাকিয়ে বছরের পর বছর এগুলিকে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা যদি কেউ ধরতে চান তবে তাঁকে কোনান ডয়াল বা আগাথা খ্রিস্টি, শার্লক হোমস অথবা এরকুল পেয়ারোর শরণাপন্ন হতে হবে না, শুধু একবার ঘুরে আসবেন রাইটার্স বিল্ডিংস। ঘুরে আসবেন সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স আর তার সংগে জেলার সদর ও মহকুমা হাসপাতালগুলি। সেই সংগে একবার আপনি সরকারকে যেসব ওষুধ কোম্পানীগুলি ওষুধ সরবরাহ করে তার চালানগুলিও লক্ষ্য করবেন। কাজটা করতে হয়তো আপনার সাতদিন থেকে দশদিন লাগবে। এই দশদিন পরে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারবেন এ রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর কি ভয়ঙ্করভাবে দুর্নীতির আড়ত।

প্রথমত রাইটার্স বিল্ডিংস আর সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের কথায় আসা যাক্। এখানে যেসব অফিসাররা থাকেন তাঁদের কখনো বদলী হয় না। অবশ্য যে একেবারেই হয় না এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। হ্যাঁ, বদলী হয় রাইটার্স বিল্ডিংস টু সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স আর সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স টু রাইটার্স বিল্ডিংস, এর বেশি আর কিছু হয় না। কারণ মধু এই দুই জায়গাতেই। সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের যদি কাউকে কোন কারণে কোথাও বদলী হতে হয় এবং সে বদলী যদি সাজা দেওয়ার জন্যও হয়, তবে তার স্থান রাইটার্স বিল্ডিংস এবং রাইটার্স বিল্ডিংস-এও অনুরূপ অবস্থা ঘটলে তাঁকেও ঐভাবে নিয়ে আসা হয় সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সে।

দ্বিতীয়ত এখান থেকেই জেলা, মহকুমা, সরকারী হাসপাতালগুলিকে যে পরিচালনা করা হয় সেকথা বলা বাহুল্য। তাই সেটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়—আমার বলার উদ্দেশ্য ঐসব জায়গাগুলিতে ডাক্তারদের পাঠাবার ব্যবস্থাটা কিভাবে করা হয় সেটাই। বেশি কিছু বলব না, এই ডাক্তারদের পোস্টিং-এর ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত কেরানিটির কথাই শুধু বলব। ব্যক্তির বাড়ি আমার বাড়ির কাছেই। এল-ডি থেকে তিনি ইউ-ডি হন, ইউ-ডি থেকে রেজিস্টার হন তারপর এক্স অফিসিও স্পেশ্যাল অফিসার, এই ভদ্রলোক কত বেতন পেতে পারেন ধারণা করুন—তারপর কি করে উত্তরপাড়ার মত শহরে তিনি বিরাট প্রাসাদোপম আধুনিক কণ্ট্রেম্পরারী আর্টের বাড়ি তুলতে পারেন, তা একবার ভাবুন। একথা কে না জানে কি করে এ ব্যাপার ঘটে। আসলে ইনি চক্রের লোক।

তৃতীয়ত এই চক্রটিই পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্যদপ্তরকে গ্রাস করে রেখেছে। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, সরকারী হাসপাতালে সুদূর পল্লীর হেলথ-সেণ্টার পর্যন্ত এ'দের চক্রান্ত বিস্তৃত। এই চক্রের পক্ষে নয় অথবা চক্রের বিরোধী কোন লোককে এ'রা রেহাই দেন না। মফস্বলের কোন হাসপাতালের 'ওয়ার্ড' মাস্টার কিম্বা কিচেন ইনচার্জ পর্যন্ত এ'দের বাহু বিস্তৃত। জেলায় জেলায় এ'দের পেটোয়ারা কথায় কথায় ডাক্তার নার্স, হেলথ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রভৃতিদের ওপর যেভাবে ব্যবহার করেন, তা কোন সভ্য দেশে হয় কি না আমার জানা নেই। অথচ এ'দের পেটোয়ারা ফলস টি-এ নিচ্ছেন, হাসপাতালের ওষুধ সরাচ্ছেন, রোগীদের খাবার পর্যন্ত চুরি করছেন এবং সেগুলি ধরিয়ে দিলেও রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে কোন ব্যবস্থা হয় না। উল্টে যাঁরা এসব বিষয়ে তৎপর হয়ে সরকারকে সাহায্য করতে আসেন তাঁদেরই সাজা পেতে হয়। স্বাস্থ্যদপ্তরে এরকম অন্তত জনৈক অফিসারকে জানি তাঁর ফলস টি-এ বিল ধরিয়ে দিলে তবে তিনি তা স্বীকার করেছেন, তার আগে নয়। অথচ এই ভদ্রলোককে বহাল তবিয়তে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ রাখা হয়েছে। কিন্তু যে ভদ্রলোকটি এটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর চাকরি নেই। আর-জি-কর হাসপাতালের একটি ঘটনাও এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। চক্রের লোক রিটায়ারমেণ্টের পরেও এক্সটেনশন পান, কিন্তু আর-জি-করের অত্যন্ত দুর্দিনে যাঁরা পয়সা না পেয়ে, না খেয়ে দুর্গত মানুষের সেবা করেছিলেন, সম্পূর্ণ কর্মক্ষম থাকার পরেও এমন একজন বিশেষজ্ঞকে এক্সটেনশন দেওয়া হয় নি। চক্রের লোকের বেলায় নিয়ম নেই, নিয়ম দেখানো হয় অন্যের বেলায়। সত্যিই এ এক লজ্জাকর ব্যাপার।

যাই হোক এই চক্রের আসল কীর্তির কথায় আসি। কারো ধারণা হতে পারে, নামকরা কীর্তিমান লোকদের দিয়ে স্ফূর্তি করা ডাইরেক্টরেটের নাকের ওপরে যখন এই সব ঘটছে তখন তাঁরা এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না? আমি ভাসা ভাসা ফাঁকা কথা বলব না। একেবারে স্বাস্থ্যদপ্তরের সার্কুলার উল্লেখ করে বলছি। প্রথমে ধরুন ৯।১১।১৯৬৭ সালের ১৪৭০৪(৫৬)নং সার্কুলার। এটি প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্ট, সাবডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার এবং স্টেট হসপিটালগুলির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের নিকট পাঠানো হয়েছিল—পাঠানো হয়েছিল স্বাস্থ্যদপ্তরের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টরের (ইকুইপমেণ্ট ও স্টোর) বিভাগ থেকে। এতে ২৩টি দামী দামী ওষুধ ও ১৩ রকমের উপকরণাদির কথা বলা হয়েছে। এগুলি সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্যই পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। সার্কুলার থেকে হুবহু ভাষাটি আমি উদ্ধৃত করছি :—

"The medicines and equipments stated in the enclosed statement are reported to have got no scope of being used up by the respective user unit within there period of potency

তারপর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার কেন জানাচ্ছেন সেকথা বলতে গিয়ে বলেছেন, In order to utilise the medicines and equipments as well as to save the Govt. money."

খুব ভাল কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই। এই অত্যন্ত সৎ-উদ্দেশ্যটি ঘটনাসহ বিচার করলেই বোঝা যাবে আসলে ব্যাপারটা কি!

আমলে কিছু করতে পারেন নি। একদা তাঁর জন্য স্টেশন থেকে একজন মহিলাকে হরণ করা হয়। কিন্তু সেটা যুক্তফ্রন্টের আমল। জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে থানা ঘেরাও করে ফেলেন এবং ঐ অফিসারের শাস্তি দাবি করেন (সিভিলাইজড মানুষেরা জনসাধারণের এই রকম কান্ড-কারখানা দেখে ল' এন্ড অর্ডার বিঘ্নিত হয়েছে বলে নাক কোঁচকাতে পারেন। হয়েছে আর কি, রেপ? মডেস্টি আউটরেজড? তার জন্য বিচারালয় আছে, আইন আছে; তোমরা হামলা করছ কেন?)। যুক্তফ্রন্টের একজন মন্ত্রী তখন ঘটনাস্থলে হাজির হন ও উক্ত অফিসারকে ওখানে বরখাস্ত ঘোষণা করে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন। এই নিয়ে পুলিশের বড়কর্তাদের মধ্যে আবার গোঁসা হয়, কেন না ডিপার্টমেন্টকে টপকে কোন মন্ত্রীর কোন কর্মচারীকে তদন্তে বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করার অধিকার কোন মন্ত্রীর আছে কি না তাই নিয়ে আইনগত প্রশ্ন তারা তোলেন। সংবাদপত্রগুলিতেও এই বিষয় উপলক্ষ করে মন্ত্রীমহাশয়ের কাজের নিন্দা করা হয় এবং এটাই বলা হয় যে, কোন কর্মচারীকে সাসপেন্ড বা বরখাস্ত করার মালিক ডিপার্টমেন্টাল প্রধানরা এবং মন্ত্রীমহাশয় জনসাধারণের কথা শুনে পাবলিকলি উক্ত অফিসারকে বরখাস্ত করে অনুচিত কর্ম করেছেন। কিন্তু এ প্রশ্ন একবারও তোলা হল না যে, জনসাধারণের চোখের সামনে যদি কোন পুলিশ কর্মচারী কোন দুষ্কার্য করে, সেক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকাটা কি হওয়া উচিত? অন্যায়টাকে কি মুখ বুজে সহ্য করতে হবে? মনে আছে, থানা ঘেরাওকারী সেই জনতাকে শায়েস্তা করার জন্য পুলিশ সেদিনও গুলী চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তবে ঘটনাস্থলে উক্ত মন্ত্রী দ্রুত হাজির হওয়ায় ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াতে পারে নি। জানি না ঐ কেসটা এখন কি অবস্থায় আছে, উক্ত পুলিশ অফিসারটির পদচ্যুতির পরিবর্তে পদোন্নতি হয়েছে কি না?

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড

রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের অপরাধগুলির জন্য অপরাধীদের চেয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব অনেক বেশি। গত বিশ বছরে এদেশে সার্থক পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস গড়ে তোলা হয় নি। ক্ষমতা পাবার বা তা বজায় রাখার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বনে আমাদের নেতারা কোন দ্বিধাবোধ করেন না। ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যই তারা সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও জাতিবৈরিতাকে উৎসাহ দেন। এ সত্য তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। শাসকদের ক্ষমতা দখল করা বা তা বজায় রাখার এই যে দুর্নীতি, এটিকেই অন্য আকারে গ্রহণ করেছে ভারতীয় শিল্পপতিরা। একটি কারখানায় একাধিক ইউনিয়ন থাকলে মালিকপক্ষেরই লাভ, কারণ একটি ইউনিয়ন ধর্মঘটের আহ্বান জানালে অপরটি তার বিরোধিতা করবে এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য দ্বিধাবিভক্ত থাকলে তার মুনাফা মালিকই নেবে, শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হবে। এই কারণে কারখানাগুলিতেও সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও জাতিবৈরিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। স্মরণে আছে গত বছরে ভাটপাড়া-কাঁকিনাড়া অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে প্রাদেশিক দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল। এবারেও যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার কয়েকদিন পরই টিটাগড় তেলেনীপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানো হয়েছে, ইউনিয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে খুনোখুনির মূলে বহুক্ষেত্রেই মালিকশ্রেণীর উৎসাহ থাকে। বিশেষ করে কোন ধর্মঘটের প্রাক্কালে দেখা যায় যে এক ইউনিয়নের সমর্থক শ্রমিক অপর ইউনিয়নের কোন সমর্থকের দ্বারা নিহত হল, এবং সেটাকে উপলক্ষ করে শ্রমিকদের মধ্যেই লাঠালাঠি লেগে গেল। এই জাতীয় হত্যাকান্ডে মালিকপক্ষের হাত বহুক্ষেত্রেই থাকে। সম্প্রতি যে শিল্পাঞ্চলসমূহে ব্যাপক রাজনৈতিক হত্যাকান্ড শুরু হয়েছে তার মূল রহস্য হয়ত এখানেই। অনেকক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ইচ্ছা করেই পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয় বলে আমার ধারণা।

গ্রামাঞ্চলে অপরাধ-প্রবণতা

এবপর গ্রামাঞ্চলের কথায় আসা যাক। সরকারী খাদ্যনীতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে যে ক্রিমিনাল বাহিনী তৈরি করেছে এবং তারপর থেকে সেই একই ভ্রান্ত নীতি যেভাবে সেই অপরাধীদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলছে তাতে আইন ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারটাই একটা তামাসায় পর্যবসিত হয়েছে। শহরাঞ্চলে যদি খাদ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে রাখা যায় এবং গ্রাম থেকে চাল এনে চড়া দামে মোটা মুনাফার রাস্তা করে দেওয়া যায় তাহলে স্মাগলিং-এ যে প্রত্যেকে উৎসাহিত হবে এ তো স্বাভাবিক কথা। যে চালের স্মাগলারদের ধরার জন্য সরকার ও পুলিশের ব্যস্ততার সীমা নেই, সেই স্মাগলিং-এর পৃষ্ঠপোষক যে সরকার নিজেই এ কথাটাকে কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? ফলে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে? কুলবধূ থেকে আরম্ভ করে স্কুলের বালক-বালিকারা পর্যন্ত স্মাগলিং-এ মেতেছে, গোটা জাতটাকে ক্রিমিনাল করে তোলা হয়েছে। আজ যে কোন ট্রেনে উঠলেই দেখা যায় এক কাঁকালে শিশু অপর হাতে চালের প্যাকেট নিয়ে গ্রামের কুলবধূরা চাল নিয়ে শহরে আসছে, যারা হয়ত আগে ঘর থেকেই বেরুত না। পুলিশ তথা হোমগার্ডরা অত্যন্ত অশোভনভাবে তাদের দেহ তল্লাসী করছে সকলের সামনে। ওইভাবে আপনি আমি কোন মহিলার দেহ তল্লাসী করলে কমসে কম পাঁচ বছর শ্রীঘরবাস নিশ্চিত, এবং পক্ষান্তরে সেই মহিলাটিও অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষায় তাদের গালিগালাজ করছে। এটা নিশ্চয়ই কোন সুদৃশ্য নয়, জীবনের ধারা যদি এইরকম বিকৃত হয়, এই বিকৃতি সৃষ্টির মূলে দায়িত্ব সরকারী নীতির।

রেলে ডাকাতি

"গত ১৭ই মে, ১৯৬৮ তারিখে বেথুয়াডহরী স্টেশনের নিকট লালগোলা প্যাসেঞ্জারে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হয়ে গেল। সংবাদে প্রকাশ যে, ট্রেন থামিয়ে একদল দুর্বৃত্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ট্রেনের বিভিন্ন কামরায় ওঠে এবং গুন্ডামী ও ছিনতাই-এর দ্বারা নগদে ও অলংকারে বহু সহস্র টাকার সম্পত্তি অপহরণ করে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা এই দুর্বৃত্তদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা আহত ও নিগৃহীত হয়েছেন। বলা বাহুল্য রেলে এই জাতীয় অপরাধ আজ নতুন হচ্ছে না, এর আগেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা হয়েছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই পুলিশ অপরাধীদের ধরতে পারে নি, বোধহয় তেমন চেষ্টাও করে নি; কেন

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

হাঁস-মুরগী পালন শিল্পের একমাত্র
বাঙলা মুখপত্র

"ত্রৈমাসিক পোল্ট্রী"

প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা

কার্যালয় ঃ—৫০।এ, সুরি লেন, কলকাতা-১৪, ফোন—২৪-৪২০৪

প্রকাশের সময়ঃ—১লা বৈশাখ, ১লা শ্রাবণ, ১লা কার্তিক ও ১লা মাঘ।

এক বছরের কম গ্রাহক করা হয় না।

গ্রাহক চাঁদা ৪ টাকা ৫০ পয়সা (সডাক)।

বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার পরিমাপ—ডবল ক্রাউন

ফ্রন্ট কভার—২০০ টাকা
ব্যাক কভার—১৭৫ টাকা
অর্ডিনারি ফুল পেজ—১০০ টাকা
সেকেন্ড কভার—১৫০ টাকা
থার্ড কভার—১৫০ টাকা
হাফ পেজ—৬০ টাকা
কোয়ার্টার পেজ—৪০ টাকা।

পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

১। পোল্ট্রী কার্যালয়।

২। কন্টাই হ্যাচারিস্, ১১ পাম এভিনিউ, কলকাতা-১৯।

৩। ওয়েস্ট বেংগল পোল্ট্রী, গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, ৮৬।এ আচার্য, জে সি বোস রোড, কলকাতা-১৪।

৪। ইন্ডিয়ান পোল্ট্রী ফার্ম, ইণ্টালী মার্কেট, কলকাতা-১৪।

৫। 'সুবর্ণগ্রিল', ৬, রাজা প্যারী-মোহন রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী।

৬। এসিয়ান ট্রেডার্স, ২০।১।সি লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১।

৭। 'পুল্টি', ৩ ম্যানগো লেন, কলকাতা-১।

৮। নর্থল্যান্ড পোল্ট্রী, ২০।কিউ পাইকপাড়া রো, কলকাতা।

৯। দি হ্যাপী বার্ড এ্যান্ড কোং, ৬৯, রিজেন্ট কলোনী, কলকাতা-৪০।

১০। 'বনস্পতি ডিস্ট্রিবিউটরস্' ৯৫।এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-১২।

না অপরাধীদের পাকড়াও করার চেয়ে অন্যত্র লাভের সুযোগ অনেক বেশি, তা সাধারণ পুলিশেরই হোক বা রেল পুলিশেরই হোক। বস্তুত নিজ কর্মক্ষেত্রের বাইরে অন্য প্রয়োজনে পুলিশকে নিয়োগ করার যে রীতি গত বিশ বছর ধরে কায়েম রয়েছে তার ফলে অপরাধীদেরই মওকা মিলেছে। সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট বানচাল করার জন্য প্রতি চারজন পিছু একজন করে পুলিশ লাগানো হয়েছে। অথচ চারদিকে যে অপরাধ, গুণ্ডামী, ছিনতাই, চুরি, হত্যা, ধর্ষণ নিয়ত বেড়ে চলেছে সেদিকে দৃষ্টি দেবার মত পুলিশ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী আজ প্রকাশ্য রাস্তায় বুক ফুলিয়ে অপরাধ করে যাচ্ছে, পুলিশ তা দেখেও নির্বিকার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পিছনে পুলিশের সস্নেহ প্রশ্রয় থাকে, তা না হলে কতকগুলি এলাকাকে আমরা সমাজবিরোধীদের ঘাঁটি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারতাম না।

নারী নির্যাতন

"ডানকুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রমের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী রমা কর গত ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে বিদ্যালয় থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তার বাড়ির নিকট থেকেই একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃতা হয়। দুর্বৃত্তেরা তাকে প্রথমে ধর্ষণ করে এবং তারপর তাকে হত্যা করে একটি পুষ্করিণীর জলে ফেলে দেয়। তার পরের দিন মেয়েটিকে নোনাপুকুর নামক স্থানীয় একটি পুষ্করিণীর জলে মৃতাবস্থায় ভাসতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা চণ্ডীতলা থানার ও-সি'কে জানান, ও-সি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসেন এবং মৃতদেহটিকে তোলার ব্যবস্থা করেন। এখন সমগ্র কেসটি পুলিশের হাতে। ঘটনাদৃষ্টে আমাদের মনে হয় যে, এই ব্যাপারে দুষ্কৃতকারী সংখ্যায় বেশ কয়েকজন। দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ ও পরে ধর্ষিতাকে হত্যা আজ পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। আমাদের স্মরণে আছে আমাদেরই জনৈক সাংবাদিক বন্ধুর ভগ্নীর ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে অবশ্য পুলিশ অতি দ্রুত অপরাধীদের ধরতে সক্ষম হয়। এ পোড়া দেশে জঘন্য অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করার মত ভি-আই-পিরও অভাব নেই। ডানকুনির আবগারী বিভাগ থেকে জানা যায় যে সেখানে বিরাট চোলাই মদের ব্যবসায়ী দল আছে. ওয়াগন ভাঙা উঠতি মস্তানেরও দল আছে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে তারা এইসব কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সেই দলের কাজই যে এটা নয় তা কে বলতে পারে?

এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে বন্ধ হয় তার জন্য সরকারেরও কিছু কর্তব্য আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব অপরাধের ক্ষেত্রে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। আমেরিকার মত দেশেও ধর্ষণের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। এদেশে শাস্তির মাত্রা সর্বক্ষেত্রেই অল্প হওয়ার জন্য অপরাধের সংঘটন অধিক হয়। তাছাড়া পুলিশবাহিনীকে অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনে উৎসাহিত করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় করে তোলাই যেন সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশকে নিজ কর্মের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে অন্যত্র নিযুক্ত করা শুধু অন্যায়ই নয়, নীতিবিরুদ্ধও বটে। পুলিশকে অপরাধমূলক কাজ দমন করার পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নিয়োগ করার ট্রাডিশন গত বিশ বছরে গড়ে উঠেছে। ফলে তার স্বাভাবিক কর্মের এলাকা থেকে পুলিশকে সরিয়ে আনার জন্য পুলিশের স্বক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা হ্রাস পেয়েছে, যার পরিণামে অপরাধ ও সমাজবিরোধী কাজকর্ম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

উপসংহার

ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা বর্তমান ব্যাধিযুক্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারই প্রতিফলন, যার কোন অতি-সরলীকৃত সমাধান নেই, একমাত্র যুক্তিশীল বাস্তব ও দেশের মঙ্গলের স্বার্থে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থাই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সরকারের শ্রমনীতি ও খাদ্যনীতির ব্যাপক পরিবর্তন করে বহু অপরাধের সংখ্যা অবশ্য কমানো সম্ভব। তাছাড়া পুলিশকে এই কাজে সার্থকভাবে নিয়োগ করাও বিশেষ প্রয়োজন। সর্বাগ্রে প্রয়োজন পুলিশকে তার অন্যান্য কর্তব্য থেকে সরিয়ে এনে তার আসল কর্তব্যে নিয়োগ করা। ছাত্র আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশ, ধান চাল সংগ্রহ করতে পুলিশ, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করতে পুলিশ—সর্বত্রই পুলিশের অবাধ প্রবেশ পথ, শুধু তার আসল কর্তব্যের ক্ষেত্রটি ছাড়া। গত বিশ বছরে গড়ে-ওঠা এই কুরীতির অবসান ঘটানো এই মুহূর্তে দরকার।

মন্ত্রীরা কী বলেন

শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী
শ্রীসুশীল ধাড়া

প্রঃ—শিল্পোন্নয়নের জন্য আপনার পরিকল্পনা কি?

উঃ—যেসব শিল্প অর্ধমৃত অবস্থায় আছে, সেগুলোকে আবার জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করছি। কার্পাস শিল্প, শর্করা শিল্প প্রভৃতি রুগ্ন শিল্পগুলিকে সুস্থ করে তোলার কথাও ভাবছি। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি যাতে লাভজনক হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এগোচ্ছি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড আজও ক্ষতির ব্যবসাই রয়ে গেল। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। আশঙ্কা করা যাচ্ছে যে, ১৯৬৮-৬৯ সালে ক্ষতির পরিমাণ সম্ভবত ঐ একই রকম হবে।

প্রায় ৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যে দুর্গাপুর কেমিক্যালস তৈরি করা হল তা এখনও পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করতে পারে নি। এই প্রতিষ্ঠানটিকে অনেকে বাংলা দেশের স্বর্ণখনি বলে মনে করেন। এই শিল্পটির ওপর রাসায়নিক শিল্পগুলি নির্ভরশীল। এটিকে ভালভাবে পরিচালনা করা আমার দপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য।

কল্যাণী স্পিনিং মিলস্ বাংলা দেশের চার লক্ষ হ্যান্ডলুমের একটা বিশেষ আশার প্রতীক হয়েছিল। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পটি যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। লাভের দশা থেকে সেটা লোকসানের দশায় হাজির হয়েছে।

ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীটিও আমারই দপ্তরের আওতায়। কিন্তু এখানে শুধু হতাশার ঘন কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই নি।

সুর্যকিরণ এখানেও এনে দিতে হবে।

এইসব বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিক ও কর্মিগণের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে বছরে কয়েক কোটি টাকা কেন আমরা সরকারী তহবিলে দিতে পারব না, তার কোন যুক্তিসংগত কারণ আমি খুঁজে পাই না।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের বিরুদ্ধে বহু নালিশ আছে—পর্ষদ ভালভাবে জনগণকে সেবা করতে পারছে না। এটাকেও ভালভাবে চালাতে হবে। দেখতে হবে যাতে কৃষি, শিল্প ও মানুষের সাধারণ প্রয়োজনে পর্ষদ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এইসব কথা আমি আমার দপ্তরে বলে দিয়েছি এবং নানাভাবে কাজ শুরু হয়েছে।

হলদিয়াতে নতুন প্রকল্প অনুযায়ী শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি।

শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে (আই-টি-আই) আজকের দিনের নতুন প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় নতুন শাখা খোলার কথাও ভাবছি। শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা আরও বর্ধিত করা উচিত বলে মনে করি।

কি করে এই সমস্ত বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের বেদনাদায়ক বেকারিত্বের একটা সুষ্ঠু সমাধান করা যায় সেই জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনার কথা ভাবছি।

দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী কিভাবে সহজে আদান-প্রদান করা যাবে সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করব।

এ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন আমার অন্যতম পোর্টফলিও। এক্ষেত্রে কৃষির প্রয়োজনে শিল্পকে নতুন স্রোতে প্রবাহিত করতে সংকল্প করেছি। এবং এই বিষয় নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। এই শিল্পের সঙ্গে বাংলা দেশের কৃষিব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও শিল্প প্রভৃতি যে কত অংগাংগীভাবে জড়িত হয়ে আছে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করছি। এই শিল্পের যথাযথ উন্নতি হলে হাজার হাজার বেকার কর্মসংস্থানের নতুন পথ পাবে এবং শহরমুখী মন আবার গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। কর্মসংস্থানের অভাব হেতু আজ যারা মহাশূন্যতা দেখছে এবং গ্রামবাংলা ছেড়ে ছোট ছোট শহরে পর্যন্ত ভিড় করছে তারা হয়তো আবার গ্রামে তাদের রুজি-রোজগারের পথ খুঁজে পাবে।

প্রঃ—বন্ধ কারখানাগুলি খোলার জন্য কি করছেন?

উঃ—বন্ধ কারখানাগুলিকে খুলতে চেষ্টা করছি। কারখানাগুলি খুলুক—শ্রমিকদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপিত হোক—এটাই আমরা চাই।

প্রঃ—আপনার দপ্তরের সঙ্গে শ্রমদপ্তরের সহযোগিতা খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উঃ—আমরা দুই মন্ত্রী আমাদের দপ্তরগুলির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি। কো-অর্ডিনেশন খুব ভালই হচ্ছে।

প্রঃ—রাষ্ট্রীয় শিল্পে শ্রমিক সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দিলে আপনার দপ্তরের কিছু করণীয় আছে কি?

উঃ—প্রয়োজনে এসব সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য আমার দপ্তরেও আসে।

প্রঃ—শিল্পের মন্দাবস্থা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। এর মূল কারণ কি?

উঃ—পর পর দু বছর খাদ্যশস্যের উৎপাদন ভাল হওয়ায় শিল্পের মন্দাভাব কেটে যাচ্ছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফ্রন্ট সরকারগুলি কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এবং বর্তমানেও করছে। চীন বা পাকিস্তানের তরফ থেকে

ভারতবর্ষের ওপর হামলা হবার সম্ভাবনা এখন অনেকটা কম। এর প্রভাবও শিল্পের ওপর আছে।

শস্য ভাল হলে শিল্পের অবস্থা ভাল হতে বাধ্য। সরকারের কাজ হবে কৃষক ও শিল্পপতিদের নানাভাবে সাহায্য করে অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলা।

প্রঃ—বড় শিল্পপতিরা নানাভাবে সরকারী সাহায্য পান। ছোট্ট শিল্পের মালিকরা এই সাহায্য পেতে নানারকম বাধার সম্মুখীন হন এবং অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য পান-ও না। এ অবস্থার প্রতিকার কি করে সম্ভব?

উঃ—বড় শিল্পপতিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, তারা সরকারী সাহায্য আদায়ে নানারকম টেকনিক্যালিটিস ভাল জানেন। অন্যদিকে অনেক ছোট শিল্পপতি এইসব কলা-কৌশল জানেন-ই না বা জেনেও কিছু করে উঠতে পারেন না। আমাদের কর্তব্য হবে টেকনিক্যালিটিস সম্পর্কে ছোট শিল্পপতিদের যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল করা। সরকারি শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবার ভাল ব্যবস্থা নেই। এ ধরণের শিল্পগুলি যাতে সাহায্য পায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হবে।

প্রঃ—রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলিতে বঙ্গসন্তানদের চাকরির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় কি?

উঃ—সানস্ অব দি সয়েল চাকুরির ব্যাপারে সব সময়েই অগ্রাধিকার পাবে। শিল্প গড়ে তোলার সময় যাদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল চাকুরির ব্যাপারে তারাও বিশেষ সুযোগ পাবে। গতবার এসব দিকে আমি দৃষ্টি রেখেছিলাম এবারও রাখব।

প্রঃ—শিল্পে ও ব্যবসায়ে সরকার কিভাবে বাঙালীদের সাহায্য করবেন?

উঃ—বাঙালী তরুণরা এসব দিকে যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আমি মনে করি যে তাঁদের সুযোগের অভাব হবে না।

প্রঃ—এ রাজ্যে সওদাগরী অফিসগুলিতে চাকুরির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অবাঙালীরাই বিশেষ সুযোগ পাচ্ছেন। এ অবস্থার পরিবর্তন কি করে সম্ভব?

উঃ—একদিনে করা যাবে না। ধীরে ধীরে করতে হবে।

প্রঃ—বাংলা দেশ থেকে মূলধন কি বাইরে চলে যাচ্ছে?

উঃ—একদম নয়। আমার কাছে যেসব তথ্য আছে তা থেকে আমি বলতে পারি যে বাংলা দেশ থেকে মূলধন মোটেই বাইরে চলে যাচ্ছে না।

সমবায় ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী

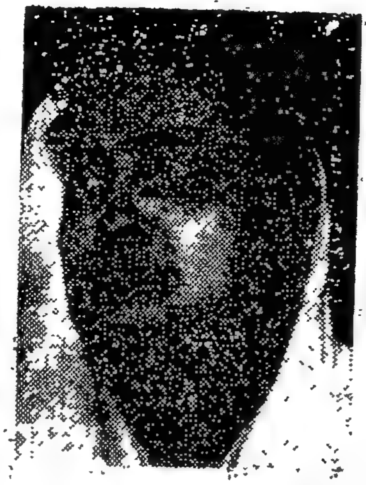

১। প্রঃ—বর্ধমান জেলায় আউশ গ্রাম থানায় সুয়াতা জোনাল কো-অপারেটিভ সোসাইটির কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। তুলা ক্ষেত তৈরি করার জন্য এই সোসাইটি তৈরি করা হয়েছিল। শোনা যায়, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ও হয়েছে, কিন্তু তুলা চাষ হয় নি। এই সোসাইটি বড় বড় বাড়ি তৈরি করেছে, ধান-চালের কারবারও করত, রেশনের দোকানও এদের ছিল। কংগ্রেসী আমলে অনেক মন্ত্রী অবকাশ যাপনের জন্য এখানে আসতেন বলে কথিত আছে, এই সংস্থাটি নাকি দুর্নীতির একটি ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। গত যুক্তফ্রন্ট সরকার এই সোসাইটির বিরুদ্ধে মামলাও করেছিলেন। এবার আপনি এ সম্বন্ধে কি ভাবছেন?

উঃ—চারপাশ থেকে অসংখ্য রিপোর্ট পাচ্ছি। এই সব রিপোর্টের ভিত্তিতে ফাইল কল করছি এবং এই সব বিষয়গুলি সম্পর্কে কি করতে পারি তা দেখছি।

প্রঃ—বর্ধমান জেলার মেমারী কো-অপারেটিভ সোসাইটির বিরুদ্ধে নানা রকম দুর্নীতির অভিযোগ হওয়ায় পি-ডি-এফ সরকারের আমলে বর্ধমানের এস-ডি-ও শ্রীব্রহ্মচারী নাকি ঐ সব দুর্নীতি বন্ধ করার চেষ্টা করেন। পি-ডি-এফ সরকার বর্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রীরণজিৎ ঘোষকে দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করান। দুর্নীতি চাপা দেওয়া হয় এবং এস-ডি-ও শ্রীব্রহ্মচারীকে বর্ধমান থেকে সরিয়ে উত্তরবঙ্গের কোথাও জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আপনি এ সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন কি?

উঃ—কাগজপত্র দেখে আপনাদের জানাবো।

প্রঃ—আপনার দপ্তরে নানা রকম দুর্নীতি আছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণের ঠিক আগেই আপনার বিভাগের কোন পদস্থ আমলা বিভিন্ন দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্তের জন্য বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি?

উঃ—দুটি একটি কেস আমার কাছে এসেছে। আমি এগুলি দেখছি।

প্রঃ—আপনার বিভাগের দুর্নীতি রোধের জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের কথা কিছু ভেবেছেন?

উঃ—ভাবছি।

প্রঃ—কৃষকরা যাতে ঠিক সময় ঋণ পেতে পারে তার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন?

উঃ—রুর‍্যাল ক্রেডিটকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমার দপ্তরে টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেতে পারি। যুক্তফ্রন্ট সরকার গরীব চাষীদের যথাসময়ে ঋণ দিয়ে মহাজনদের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে চেষ্টা করবে এবং কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেও যথাযথ নজর রাখবে। গরীব চাষীরা এতকাল ঋণ খব কম পেত যদিও তারা ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহশীল। বড় চাষীরা যাঁরা বেশি টাকা ধার নিয়েছে, তাদের মধ্যে ঋণ পরিশোধের উৎসাহ অত্যন্ত কম। বড় চাষীদের এই আচরণের ফলে ছোট চাষীদের পক্ষেও অনেক ক্ষেত্রে ঋণ পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। এবার আমরা চেষ্টা করছি যাতে গরীব চাষীরা ঠিক মত ঋণ পেতে পারে।

প্রঃ—কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিতে অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে নানা রকম দুর্নীতির কথা শোনা যায়। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উঃ—ইনভেস্টমেন্ট-এর ব্যাপারে নয় ছয় যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে সব কিছু আমি ভাল করে দেখব।

প্রঃ—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অপারেটিভ ইউনিয়নে দুর্নীতির অন্ত নেই। এই সংস্থার পুঞ্জীভূত জঞ্জাল পরিষ্কার করবেন কেমন করে?

উঃ—এ ক্ষেত্রে ভাবনার কোন অবকাশ নেই—চব্বিশ ঘন্টাই ভাবছি। এঁরা এত বুদ্ধিমান যে কর্মচারীদের বেতন পর্যন্ত বকেয়া রেখেছেন। গত চার-পাঁচ বছর এই সংস্থার কোন নির্বাচন হয় নি। এই সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি এবং আগামী দিনেও করব।

প্রঃ—সমবায় আন্দোলনকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে কি করবেন?

উঃ—কৃষকদের উৎসাহিত করে সমবায় আন্দোলনকে ঠিক পথে চালান সম্ভবত অফিসারদের দ্বারা সম্ভব নয়। নানা কথা ভাবছি। যতদূর পারি চেষ্টা করে দেখছি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীর চতুর্থ দফায় ফ্রন্টের খাদ্যনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মসূচীর এই দফায় বলা হয়েছে ঃ "৪। (ক) যুক্তফ্রন্ট সরকার ধান ও চালের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রাধীন করবে এবং যাবতীয় খাদ্য ব্যবসার উপরই প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবে।

এমন নীতি গ্রহণ করা হবে যাতে বৃহৎ জমির মালিক ও মজুতদাররা মজুত করতে না পারে, যাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্য ক্রয় সম্ভব হয় এবং তার ন্যায্য বিলি-বণ্টন করা হয়। খাদ্যনীতির স্তম্ভ হবে, (ক) বৃহৎ জমির মালিকদের উদ্বৃত্ত খাদ্য কেনা; সেচ অঞ্চলের ৭ একর এবং অসেচ অঞ্চলের ১০ একরের বাড়তি জমির উৎপাদনের উপর লেভি বসানো, (খ) খোলাবাজার থেকে চালকল-মালিকদের ধান কেনা নিষিদ্ধকরণ, মিলগুলি শুধু সরকার সংগৃহীত ধান নিয়েই কাজ করতে পারবে, (গ) হাস্কিং ও চিড়ার মিলগুলির নিয়ন্ত্রণ (ঘ) খাদ্য সংগ্রহের অঞ্চলের মধ্যেই সেই খাদ্যের অংশ মজুত রাখা। (ঙ) সংশোধিত রেশনিং চালু করা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে মডিফায়েড রেশনের সম্প্রসারণ (চ) অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যও ন্যায়সঙ্গত দরে সরবরাহ করা।

জন-নিরাপত্তা এবং জেল ও জরিমানার আইনের মাধ্যমে মুনাফাখোরী, মজুতদারী এবং কালোবাজারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। এসব ক্ষেত্রে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা যুক্তফ্রন্ট দাবি করবে।

রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি মেটাবার জন্য যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

(খ) নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দর নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা নেবে এবং কৃষি ও শিল্পের যাবতীয় পণ্যের দর স্থির করার জন্য একটি বিধিবদ্ধ দর নির্ধারণ কমিশন গঠন করবে।

(গ) খয়রাতি ও টেস্ট রিলিফ সহ গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত রিলিফের ব্যবস্থা যুক্তফ্রন্ট সরকার করবে। দুর্ভিক্ষ ত্রাণ এবং অন্যান্য ত্রাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থায় কেন্দ্র যাতে তার দায়িত্বের অংশ নিতে বাধ্য হয় সেজন্য চলতি আইনের উপযুক্ত সংশোধনও করার চেষ্টা যুক্তফ্রন্ট সরকার করবে।"

ফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতিকে কোন বৈপ্লবিক খাদ্যনীতি বলা চলে না। কিছুটা রাষ্ট্রীয় ব্যবসা, কিছুটা নিয়ন্ত্রণ। মোটামুটিভাবে এটাই ছিল শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের খাদ্যনীতি। খাদ্যশস্যের ব্যবসাকে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয়করণ করা না হলে মুনাফাখোর, মজুতদার ও কালোবাজারের হাত থেকে রাজ্যের জনসাধারণকে বাঁচানো সত্যই সম্ভব কি না তা এখন-ও পরীক্ষাসাপেক্ষ।

ফ্রন্ট সরকারকে সত্য-সত্যই খাদ্য-সংকটের হাত থেকে জনগণকে বাঁচাতে হলে, আজ হোক কাল হোক খাদ্যশস্যের পুরো ব্যবসাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে আনতেই হবে। ব্যক্তিগত ব্যবসা বা খোলাবাজার রেখে দিলে রন্ধ্রপথে শনি ঢুকবেই। রাজ্যের সমস্ত উৎপাদন সরকারী ভান্ডারে নিয়ে আসা এবং প্রত্যেককে সরকারের পক্ষ থেকেই সরবরাহ করা। একমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারাই খাদ্য-সংকটের সমাধান সম্ভব। শুধু ঘাটতি রাজ্য বলেই নয়—রাজ্য যদি খাদ্যশস্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়, এমন কি উদ্বৃত্ত রাজ্যেও পরিণত হয়, তখনো এই ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

অবশ্য এই বিপুল কাজের জন্য যে সুষ্ঠু মেশিনারি স্থাপন করা প্রয়োজন সরকারের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় হয়তো তা সম্ভব নয়। কাজেই নীতিগতভাবে যুক্তফ্রন্ট শ্রীপ্রফুল্ল সেনের খাদ্যনীতিই চালু করতে চাইছেন।

আগামী সংখ্যায়

সাগর বিশ্বাসের নির্বাচনের পরে

স্মরণ রাখা প্রয়োজন শ্রীপ্রফুল্ল সেনের খাদ্যনীতির আমলেই ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। তার প্রধান কারণ ঐ নীতি কার্যকরী করা যায় নি। পুরোপুরি কার্যকরী করা গেলে শ্রীসেনের খাদ্যনীতি সারা রাজ্যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করতো না। তাই ফ্রন্ট মোটামুটিভাবে শ্রীসেনের নীতিকে গ্রহণ করলেও, তার ত্রুটিগুলি দূর করার এবং বিশেষভাবে ঐ নীতি যাতে সত্য-সত্যই কার্যে পরিণত হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেবেন বলে তাঁদের গৃহীত নীতি থেকে আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমত কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের ঘাটতি পূরণের জন্য চেষ্টা করতে হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার সেদিকে সজাগ আছেন। কিন্তু ফ্রন্ট সরকারকে মনে রাখতে হবে শুধু কেন্দ্রের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে জনসাধারণকে শান্ত করা যাবে না। নিজেদের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। কোনো নীতিই সফল হবে না যদি সরকার রাজ্য থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে না পারেন। গরীব কৃষকরা যাতে ন্যায্য দামে সরকারের কাছে ধান-চাল-গম বিক্রি করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তাদের বাধ্য হয়েই মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের শরণাপন্ন হতে হবে। মিলগুলি যাতে খাদ্যশস্য নিয়ে ফাটকাবাজার না চালাতে পারে সেজন্য তাদের সংগৃহীত সমস্ত খাদ্যশস্য সরকারের হাতে নিতে হবে।

গত দীর্ঘ কয় বৎসরের ইতিহাস থেকে জনসাধারণের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে তারা সরকারের এজেন্টদের হাতে খাদ্যশস্য তুলে দিতে চায় না। কারণ তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত খাদ্যশস্য সরকার নিয়ে আসেন, পরে তাদের প্রয়োজন আর মেটানো হয় না। তাই ঘাটতি অঞ্চলে সংগৃহীত খাদ্যশস্য সেই এলাকাতেই রাখতে হবে আর তাদের ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত গম তাদের সরবরাহ করতে হবে। উদ্বৃত্ত এলাকা থেকেও যতটা ধান-চাল শহরের অভাব মেটাবার জন্য নিয়ে আসা হবে, ঠিক ততটা পরিমাণ গম তাদের সরবরাহ করতে হবে। এইভাবে চললেই গ্রামের সাধারণ মানুষ সরকারের হাতে খাদ্যশস্য তুলে দিতে উৎসাহিত হবে। সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি একমাত্র এই পথেই সম্ভব।

কেন্দ্রীয় এজেন্সী ফুড কর্পোরেশনের উপর সংগ্রহের পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দিলে চলবে না। জনসাধারণের কাছে ফ্রন্টের নীতি ব্যাখ্যা করে সংগ্রহের কাজে তাদের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারি স্থাপন করতে হবে। শুধু বিবৃতির মাধ্যমে জনগণের সহযোগিতার আহবান জানালে বিশেষ সুফল পাওয়া যাবে না।

খাদ্যশস্যের ব্যক্তিগত ব্যবসাকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কঠোর শাস্তিদানের উদাহরণ স্থাপন করে মজুতদারী, মুনাফাখোরী ও

কালোবাজার বন্ধ করার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত ফ্রন্ট সরকার তাঁদের ঘোষিত খাদ্যনীতি কার্যকর করার পথে অগ্রসর হন নি। রাজ্যপালের সরকার যে ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এখনো তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। এমন কি চালকলগুলিকে খোলা-বাজার থেকে চাল কিনতে দেয়া হচ্ছে। তাদের পুরো সংগ্রহ লেভি করার আদেশও চালু হয় নি।

একথা সত্য যে, চালের মরশুমের পরে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হাতে তাঁদের যথেষ্ট সময় নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, যাতে এই অবস্থার মধ্যেও যতটা সম্ভব ততটা সংগৃহীত হতে পারে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন জেলার গরীব কৃষকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে যে, সরকারী এজেন্সীর কাছ থেকে কোন সুযোগ না পেয়ে গরীব ও মাঝারী কৃষকেরা সরকার নির্ধারিত দরের চেয়ে অনেক কম দরে ব্যবসায়ী বা বড় জোতদারের কাছে ধান বা চাল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। দ্রুত এর সন্তোষজনক সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৬৯ সালেও নতুন সরকারের নতুন নীতি পুরোপুরি কার্যকরী করার সময় থাকবে না। ১৯৭০ সালে হয়তো ফ্রন্ট সরকারের নীতি কার্যকরী করার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এ বৎসর যতটা উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব তা করা হচ্ছে বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই উদ্বেগের কারণ আছে। শুধু খাদ্যমন্ত্রী নয়, সমস্ত মন্ত্রিসভাকে এখনই কঠোর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর দেরি করলে আশানুরূপ ধান-চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। কাজেই শুধু দিল্লীর কাছে দরবার করলে চলবে না। দিল্লীর উপর চাপ সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের দর নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার যে প্রতিশ্রুতি ফ্রন্ট দিয়েছিলেন; ফ্রন্ট সরকারকে তার কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কৃষি ও শিল্পের যাবতীয় পণ্যের দর স্থির করার জন্য একটা বিধিবদ্ধ কমিশন গঠনের যে আশ্বাস ফ্রন্ট নির্বাচনের আগে দিয়েছিলেন; সেই কমিশন গঠনের কাজ কতটুকু এগিয়ে এনেছেন খাদ্যমন্ত্রী। অবিলম্বে এই ব্যবস্থা না হলে বাজারে সব জিনিসের দাম যেভাবে বাড়তে সুরু করেছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা আর সম্ভব হবে না। খাদ্যমন্ত্রী তথা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে তাই আমরা এখনি তাদের ঘোষিত খাদ্যনীতির কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। [চলবে]

—শ্রীসর্বদর্শী

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর
গ্রন্থাবলী
আবার একখণ্ড
প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প
১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন
৩। দুর্নিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প
মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড
গ্র ন্থা ব লী
১। জহুরী ২। অনির্বাণ
৩। সোনালী দিনের মন
৪। এক গুচ্ছ গল্প
মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

বোর্নভিটার
নতুন ইকনমি টিন কিনে
পয়সা বাঁচান
প্রতি কাপে খরচও কম-প্রতি টিনে বোর্নভিটাও বেশী
বোর্নভিটার নতুন ইকনমি টিনে আরও
বেশী কাপ তৈরী করা যায় এবং কাপ প্রতি
খরচও কম পড়ে। পুষ্টিকর বোর্নভিটা দুধ,
মল্ট, চিনি ও কোকোর সুষম মিশ্রণ—
সারা পরিবারের জন্য পুষ্টিকর পানীয়!
শক্তি, উৎসাহ ও
স্বাদের জন্য—
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা!
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink
for strength and vigour
800g
net
ECONOMY PACK
Bensons/1120 Ben

শিল্প ● বাণিজ্য ● অর্থনীতি

পশ্চিমবঙ্গের বেকার

গত কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গে চাকরি-বাকরির অবস্থা যে অতি শোচনীয় হয়ে উঠেছে, তা সব মানুষই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। রাজ্যের প্রত্যেকটি পরিবারেই এখন নানা বয়সের দু'-চার জন শিক্ষিত, আধা-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার কাজ-কর্মের অভাবে মনমরা হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কাজের জন্য বছরের পর বছর তাঁরা নানা জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছেন, কিন্তু কাজ-কর্মের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। বেকারদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিশিয়ান থেকে সুরু করে ক্ষেত-মজুর পর্যন্ত সব রকম পেশার লোকই আছেন। রাজ্যে বেকারের সংখ্যা প্রতি বছরই হাজার হাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এই বেকারের দল তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উপরই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে জীবনযাত্রার ব্যয় যে রকম গগনচুম্বী তাতে এই অতিরিক্ত বোঝা বহন করা নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়ে উঠছে এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী হতে সুরু করেছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের সর্বত্রই আজ এই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে অবস্থাটা খুব সংকটজনক হয়ে উঠেছে।

অবশ্য বেকার সমস্যা এড়ানো আমাদের পক্ষে কোন সময়ই সম্ভব নয়। বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনায় দেশে যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই অপ্রতুল। উপরন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং পরবর্তী পরিকল্পনা-ছুটির ফলে চাকরির বাজার আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। চতুর্থ পরিকল্পনা যেভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতে বেকার সমস্যা হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নেই। বরং পরিকল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই ঘোষণা করা হয়েছে। তাই বলছিলাম, আরও বহুকাল বহু-সংখ্যক বেকার নিয়ে ঘর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

ভারতের সব রাজ্যেই বেকার আছে। কিন্তু তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা সবচেয়ে ভয়াবহ। সরকারী তথ্যে দেখা যাচ্ছে ১৯৫২-৫৭ সালে পশ্চিম-বঙ্গের কল-কারখানায় (রেজিস্টার্ড) নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছিল ৪৪,০০০, ১৯৫৭-৬১ সালে ৪৭,০০০, ১৯৬১-৬৪ সালে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার। কিন্তু ১৯৬৪-৬৬ সালে হঠাৎ এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৯ হাজারে এসে দাঁড়ায়। কয়লা খনিতে চাকরির সংখ্যা ৭ হাজার হ্রাস পায় এবং চা-বাগানে হ্রাস পায় ১১ হাজার। চাকরি বৃদ্ধি পায় শুধু সরকারী ক্ষেত্রে, সদাগরী অফিসে আর দোকান-পশারে। রাজ্য সরকারের কর্মচারী সংখ্যা ১৯৫২ সালে ছিল ১ লক্ষ ৩৩ হাজার। ১৯৬৬ সালে সেটা বেড়ে ২ লক্ষ ৫৫ হাজারে গিয়ে পৌঁছোয়। কেন্দ্রে ১৯৬৪ সালে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৭২ হাজার। ১৯৬৬ সালে সেটা বেড়ে ৪ লক্ষ ১৫ হাজারে গিয়ে পৌঁছোয়।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪১-৫১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৩·৩২ শতাংশ এবং ১৯৫১-৬১ সালে ৩২·৭৯ শতাংশ। এই অস্বাভাবিক জন বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যাও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের তালিকা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো চাকুরিপ্রার্থীর সংখ্যা ১৯৫২ সালে ছিল ৬২ হাজার ৩২১ জন, ১৯৬১ সালে ছিল ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৯১ জন, ১৯৬৫ সালে ছিল ৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৪০৭ জন এবং ১৯৬৬ সালে ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৬৪ জন। গত তিন বছরে এই সংখ্যা যে আরও বেড়ে গেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। সব বেকার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখান না, বা লেখাবার সুযোগ পান না। সুতরাং প্রকৃত বেকার সংখ্যা যে আরও বহুগুণ বেশি তা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়।

দেখা যাচ্ছে ১৯৬৪ সাল থেকে এই রাজ্যে চাকরি-বাকরির সংখ্যা হ্রাস পেতে সুরু করেছে এবং তার নিম্নগতি ক্রমবর্ধমান। রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যের শ্লথ গতিই এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী।

যে কোন এলাকার শিল্প এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে হলে, সেই এলাকার বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের পরিমাণ যাচাই করাই সব চেয়ে সহজপন্থা। সেই নিরিখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে কিন্তু সেই চাহিদা ১৯৬২-৬৩ সালে একেবারেই নেমে যায়। ১৯৬১-৬২ সালে বিদ্যুতের যে চাহিদা ছিল, ৬২-৬৩ সালে সেই চাহিদা অর্ধেকেরও কমে নেমে যায়। তদবধি বিদ্যুতের চাহিদা নামতেই সুরু করেছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী নতুন নতুন কলকারখানা বিশেষ কিছু গড়ে উঠছে না, উপরন্তু অনেক পুরোন কলকারখানায় কাজ কমে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন শিল্পের লাইসেন্স নেওয়ার সংখ্যাও ক্রমশই কমে আসছে। কোন সালে কত লাইসেন্স নেওয়া হয়েছে, তার একটা হিসাব এখানে দেওয়া হচ্ছে: ১৯৬৪—১০৭টি, ১৯৬৫—৬৭টি, ১৯৬৬—৪৯টি, ১৯৬৭—৪১টি। লাইসেন্স না নিয়ে কারও পক্ষে যখন বৃহৎ কলকারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তখন এই হিসাব থেকেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে নতুন শিল্পের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। দ্বিতীয়ত লাইসেন্স পেলেই যে সেই শিল্প চালু হয়ে যাবে তার কোন মানে নেই। লাইসেন্স পাওয়া বহু শিল্পই এই রাজ্যে দিনের আলো দেখবার সুযোগ পায় নি।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যে অধোগতির জন্য মন্দাই দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। কথাটা আংশিক সত্য। তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পই সব চেয়ে ঘায়েল হয়েছে বেশি। যেহেতু এই রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পরিধি সব চেয়ে বড়, সেই হেতু মন্দার সব চেয়ে বড় আঘাতটা এসে পড়েছে এই রাজ্যের উপর। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই প্রধানত দায়ী। নানা ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক কারণে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রসার ঘটেছিল সব চেয়ে বেশি এবং ভারতের সকল-

সর্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন: ৫৫-৩০৮৫

রবীন্দ্রনাথের গান

(পূর্ব বাংলাকে মনে রেখে)

রাণী দেবী

রবীন্দ্রনাথের গান ঘরে ঘরে
আলো করে
দুঃখিনী বাংলার মুখ। পূবে ও পশ্চিমে
নিভু নিভু কান্নার পিদিমে
শুধু ছায়া; নীলকমল লালকমল দুই ভাই জন্ম অবধি
বুকে নিয়ে অন্ধকার নদী
মাটি খোঁজে, মানুষের জন্মভূমি, অনুপরতন—

কবির অমল গানে হেসে ওঠে সমস্ত ভুবন।
ভাগীরথী পদ্মার কল্লোল
দুহাতে সরিয়ে বুকচাপা রাত্রি, আজ উন্মরোল
আলোর উৎসবে...

হবে, মানুষের জয় হবে॥

রাজ্যই পশ্চিমবঙ্গের কাছ থেকে তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতো। কিন্তু বিভিন্ন পরিকল্পনায় স্ফীত চাহিদা অনুমান করে একই ধরণের পণ্য উৎপাদনের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলকারখানা খোলার সুযোগ দেওয়া হয়। নতুন কারখানাগুলো অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত হওয়ায় তাদের উৎপাদন ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন কলকারখানাগুলো প্রতিযোগিতায় মার খেতে আরম্ভ করে এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের বাজার নষ্ট হতে থাকে। ইস্পাত কারখানাগুলো কলকাতার কাছাকাছি অবস্থিত বলে আগে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কলকাতায় ইস্পাতের দাম ছিল সস্তা, কিন্তু ভারত সরকার অন্যান্য রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে চাঙ্গা করবার জন্য ইস্পাতের দর সারা ভারতবর্ষে সমান করে। ধাতব শিল্পের একটা প্রধান উপকরণ হচ্ছে লৌহেতর ধাতু, কিন্তু এদেশে লৌহেতর ধাতুর স্বল্পতাবশত কেন্দ্রীয় সরকার এই ধাতু বণ্টনের ভার নেন। বিড়ালের পিঠা ভাগের মত এমন অপূর্ব কৌশলে লৌহেতর ধাতু বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হয় যে, ঐ দ্রব্যের সর্বাধিক ব্যবহারকারী পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে ছিটেফোঁটা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। অথচ যে-সব রাজ্যে ঐ সব ধাতুর ব্যবহার একেবারেই নেই, তারা মোটা মোটা কোটা বাগিয়ে চোরাবাজারে চড়া দামে বিক্রি করে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গের পাট এবং কয়লা শিল্পের অবস্থাও তথৈবচ। কলকারখানা আধুনিকীকরণের অভাবে এই সব শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে তাদের মার খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকছে না।

যুক্তফ্রন্ট সরকার বেকার সমস্যা সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজেই অবিলম্বে তাঁদের এই সব সমস্যায় মাথা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যাঁরা চাকরি-বাকরি করছেন তাঁদের সর্বনিম্ন স্বার্থরক্ষা করা খুব কঠিন কাজ নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কাজ হচ্ছে বেকারদের জন্য নতুন নতুন চাকরি সৃষ্টি করা। সেই কাজে যুক্তফ্রন্ট সরকার কতখানি দক্ষতা দেখাতে পারবেন, তার উপরই তাঁদের সাফল্য মূলত নির্ভরশীল। সেজন্য এই রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার কাজে তাঁদের অগ্রণী হতে হবে। সরকারী তহবিলে যে রকম অর্থের টানাটানি, তাতে সরকারী ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিল্প যে গড়ে তোলা সম্ভব নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বে-সরকারী পুঁজির সহযোগিতা অপরিহার্য। সহকারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন। এ অবস্থায় কলকাতা, দুর্গাপুর, হলদিয়া এবং রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় কি কি ধরণের শিল্পের সম্ভাবনা উজ্জ্বল তা নিয়ে বিভিন্ন বণিক সমিতির সঙ্গে তাঁদের আলোচনা করা উচিত বলে আমাদের মনে হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলো স্ব-স্ব এলাকার দ্রুত উন্নয়নের জন্য ইদানীং শিল্পপতিদের নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে সুরু করেছেন। রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে, এই রাজ্যেও শিল্পপতিদের সেই ধরণের সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। তার জনস্বার্থ এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কোন সুযোগ-সুবিধা যে কেউ পেতে পারেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া বাংলাদেশে বাঙালী কেন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিমুখ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোথায় তাঁরা অসুবিধা বোধ করছেন তাও তদন্ত করে দেখা দরকার। এই রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর কোন ভূমিকা না থাকায় অবাঙালী বণিক সম্প্রদায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে মূলধন অপসারণের হুমকী দিয়ে থাকেন। সেটা বন্ধ করতে হলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীরও প্রবেশ করা দরকার। যুক্তফ্রন্ট সরকার সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু এখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান না। কারণ দেশের অবস্থা এখনও তার উপযোগী হয় নি। কাজেই দেশের অর্থনীতিতে এখনও সৎ বণিকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি দেশের বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা ন্যায়সঙ্গত বোঝাপড়ায় আসতে পারেন, তাহলে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে বলেই আমরা আশা করি। শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা এবং মালিকের ন্যায্য মুনাফা সুনিশ্চিত করে রাজ্যের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা খুব অসম্ভব কাজ বলে আমাদের মনে হয় না। যুক্তফ্রন্ট সরকার অবিলম্বে সেই পথে অগ্রসর হলে লাভবান হবেন। মনে রাখা দরকার যে, বেকার সমস্যা সমাধানের কোন সক্রিয় চেষ্টা না হলে এবং অবিলম্বেই বেশ কিছু বেকার মানুষের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি না করতে পারলে দেশে অসন্তোষ ঠেকিয়ে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। একথা অবশ্য ঠিকই যে, বেকার সমস্যা সমাধানের প্রকৃত দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের, কারণ দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু যেহেতু বেকারের ঝামেলাটা পোয়াতে হবে রাজ্য সরকারকে, সেই হেতু এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁদেরও অবিলম্বে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। —শ্রীসওদাগর

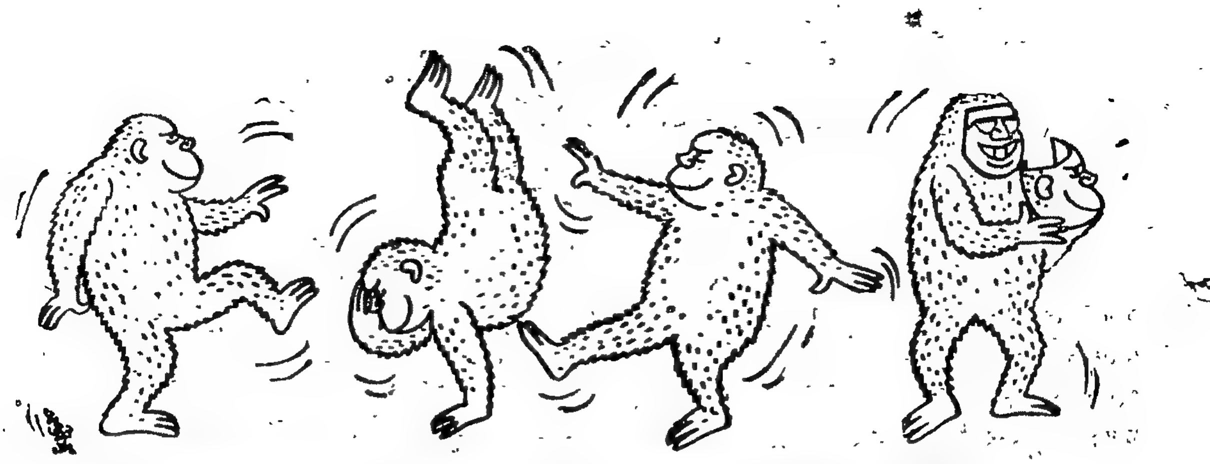

বনমানুষের নাচঃ চলছে, চলবে

।উলুখড়।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে এই কলকাতা শহরেই বনমানুষের নাচ দেখেছিলাম। তারা নাকি মুক্তকচ্ছ স্বাধীনতার উৎসব পালন করছিল। বঙ্গীয় সংস্কৃতির আসরে সেই লাফালাফি, শরীরের রক্ত জল করা রাইবেশে চোখরাঙানীর নাচ দেখার সুযোগ দু'-চারজনেরই হয়েছিল। তাঁরা সবাই মুগ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। অনেকে বিছানায় শুয়ে সারা রাত্তির ঘুমান নি, স্বপ্ন দেখেছিলেন, সমস্ত কলকাতা শহর শিম্পাঞ্জী গরিলা আর ওরাংওটাং-এ ভরে গেছে! সে-কি হুংকার আর হুল্লোড়! নাচতে নাচতে বনমানুষেরা শপথ নিচ্ছে, কমিউনিস্ট দেখলেই তার হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবে। ......'তোমরা তো নিরামিষাশী! শুনেছি বনের ফলমূল খেয়ে থাকো। এ কী ধরণের বাক্য তোমাদের মুখে?' এই প্রশ্নের উত্তরে স্বপ্নের বনমানুষেরা হঠাৎ কেউ হায়েনা, কেউ শকুন হয়ে গেল। 'খাবো, আরো খাবো, মানুষের মাংস খাবো। হাউ মাউ খাউ!'—কিন্তু এ যে দেখছি হায়েনা আর শকুন; তারা তো মড়ার মাংস খায়! কমিউনিস্টরা এখনো মরে যায় নি।......

এইখানেই অনেকের স্বপ্ন ভেঙে গেল। কেউ কেউ আবার দেখলেন, হায়েনার মুখগুলি নেকড়ে হয়ে গেছে, শকুনগুলো এক-একটা রূপকাহিনীর রাক্ষস। অনেকে দেখলেন, বনমানুষদের লেজ খসেছে; তারা বাংলাদেশেরই কবি, সাংবাদিক, এককথায় হরেক রকমের বুদ্ধিজীবী।

এই নাচটা আমার এখনো মনে আছে, যদিও মাঝখানে কয়েক বছর চলে গেছে। ইতিমধ্যে বনমানুষেরা আর লাঠিসোটা নিয়ে রাইবেশে নাচ দেখায় নি, তথাকথিত সংস্কৃতির তামাসেও না। তাদের আসল কাজ ফতে হয়েছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত আগেই লজ্জায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন; মদন বাঁড়ুজ্যে আত্মহত্যা করেছেন। কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে বাজারের সার্কাস পার্টি বাংলাদেশের তামাম সংস্কৃতির পেটেন্ট কিনে নিয়েছে। নাচ দেখাতে হয় তারা অন্যত্র দেখাবে, সংস্কৃতির মঞ্চে এখন থেকে তালা লাগানোর ব্যবস্থা।

অশ্লীল রচনার সপক্ষে

কিন্তু বনমানুষেরা তো আর বাংলাদেশের রাজধানী থেকে চলে যায় নি। অদৃশ্য হবার মন্ত্রও তারা জানে না। তবে কি তারা সার্কাস পার্টি ছেড়ে কলকাতায় চিড়িয়াখানার শোভাবর্ধন করছে? এতসব প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি, ব্যাপারটা একেবারেই অন্য রকম। তারা যেখান থেকে যাত্রাদলের মঞ্চে এসেছিল, সেখানেই ফিরে গেছে, সার্কাস পার্টির সাহিত্যিক হয়ে। তাদের হাতে একটা করে বাঁশের চেয়েও বড় আকারের কলম; কেন না, এবার থেকে অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখে তারা বাংলাদেশের তামাম খোকাখুকুর পিলে চমকে দেবে। হয় তারা ভয় পেয়ে দারুণ চিৎকার করে উঠুক; অথবা, এটা বনমানুষদের একটা মজার নেশা, এমন মনে করে হাততালি দিতে থাকুক। যেভাবেই হোক নাম তো ফাটবে।

নাম ফাটলো। সার্কাস পার্টির মুনিবেরা কিন্তু এতেই তুষ্ট নয়। বিদেশ থেকে হাজার হাজার ডলার আসছে: নাচ দেখাতেই হবে। মুক্তকচ্ছ মানবেতরদের নাচ থেমে গেলে বাংলাদেশকে নাকি ঠিকমত সুসভ্য করে তোলা যাবে না। বিদেশী মহাজনেরা বহু বীট, গাজর, টমেটো এদেশে স্যাম্পল হিসেবে পাঠিয়ে দেখেছেন, তাতে বাংলাদেশের কিচ্ছু হচ্ছে না। এখানে সবকিছুই বেমালুম হজম হয়ে যাচ্ছে। কালচারের চোটে বমি করে রাস্তাঘাট ভাসাবে—হায় রে, বাংলাদেশের মানুষদের এতটুকু কান্ডজ্ঞানও নেই!

তাই নয়া হুকুম এসেছে। রাজধানীর

খোলা মাঠে দেশের কাঁচা ও কচি বন-মানুষদের জড়ো করে, আচ্ছা করে নাচা, গানা, কীর্তন লাগাতে হবে। বুড়োদের দেখলে লোকে চিনে ফেলবে; মুক্তির মেলার ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে না পেরে কেউ কেউ গালমন্দ করবে। সুতরাং সর্দার পোড়োরা কাগজে যে-সব অশ্লীল রচনা লিখে চলেছে, তারা আদাজল খেয়ে সেই কাজেই লেগে থাকুক—এখন তরুণদেরই তো উৎসব।

আমরাও দেখতে পাচ্ছি, কলকাতার গড়ের মাঠে শিম্পাঞ্জী আর ওরাংওটাংরা ঘুরে-ফিরে ডিগবাজী খেয়ে নাচছে। এবার আর কমিউনিস্টদের পিটিয়ে সাবাড় করা নয়, তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে সময় ও সুযোগমত গিলে খাওয়াই হবে নয়া-স্বাধীনদের আসল কেরামতি। তারা ইতি-মধ্যেই গিলতে শুরু করেছে।

কিন্তু বনমানুষেরা শত হলেও নিরামিষাশী। আমরা কি পুনরায় স্বপ্ন দেখছি?

এই তো সময়
ইউবিআইতে সঞ্চয় করার

* সেভিংস অ্যাকাউন্টে বছরে শতকরা ৩½ টাকা সুদ।
* মাত্র ৫৲ টাকা জমা দিয়ে হিসেব খুলতে পারেন।
* চেকবই ব্যবহার করা যায়।
* মাসে পাঁচবার টাকা তোলা চলে।
* মেয়াদী আমানতে মেয়াদ অনুসারে সর্বাধিক শতকরা ৬½ টাকা পর্যন্ত সুদ।
* পৌনঃপুনিক আমানতের (রেকারিং ডিপোজিট) শর্তাদি সুবিধাজনক।

আসুন···আমাদের এখানেই সঞ্চয় করুন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিস্টার্ড ও হেড অফিস : ৪ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

UBI/BEN-7/64

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

অহংকার

দেবাদ্রি ফণী

আনন্দ জীবনভোর এক অহংকারকে খুঁজে বেড়িয়েছে। এবং সেই অহংকারকে অর্জন করার জন্য সে তার ছোটবেলার এক ক্ষুব্ধ মনকে যে প্রতিজ্ঞার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিল বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বাঁধন আরও শক্ত হয়েছিল ; নিষ্কৃতি মেলে নি কিছুতেই।

ছোটবেলার ছোট ছোট স্মৃতিগুলি মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন কতখানি প্রভাবিত করে আনন্দের জীবন তার উজ্জ্বল একটি উদাহরণ।

কত ছোট ছোট কাহিনী আনন্দের মনকে এখনও বেদনাতুর করে তোলে। এই সব ছোট ছোট স্মৃতি আর কাহিনী-গুলি বড় বেশি করে মনে পড়ে যখন আনন্দ একলা থাকে। বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা আনন্দের চিরকালই বড় সীমিত। আঠার-উনিশ বছরের চাকুরি জীবনেও কোন সহকর্মীর সঙ্গে আজও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠে নি। অফিসের পর প্রায়ই আনন্দ একা একা বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে চলে আসে। সেখানে কিছুক্ষণ একা বসে থাকে। বিশ্রাম নয় —এ যেন সারাদিনের কর্মক্লান্ত মনটাকে বিশ্রাম দিয়ে সেই মনের সঙ্গে একান্তে কিছুটা খেলা করা। অনুভূতির আলো জ্বালিয়ে হতাশা আর বিক্ষুব্ধ মনটাকে কিছুটা সজীব করে তোলা। শূন্য বুকটাতে কিছুটা অক্সিজেন ভরে নেওয়া।

এমনি ময়দানে বসে থাকতে থাকতে দূরে আলিপুর-বেহালা-খিদিরপুরের ট্রামগুলি আর রেড রোডের ওপর ঊর্ধ্ব-শ্বাস গাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট-বেলার একটি কিশোরের কথা মনে পড়ে —যে প্রায়ই শীতের দিনে একটা কালো অলেস্টার গায়ে দিয়ে, পায়ে 'নটি বয' সু পরে বাবার হাত ধরে এই ময়দানেই বেড়াতে এসে এইরকমভাবে দূরের ধাব-মান ট্রাম আর অন্যান্য গাড়িগুলির ঊর্ধ্ব-শ্বাস গতি দেখে আশ্চর্য হোত। সে বয়সটা ছিল শুধু আশ্চর্য হবার, অবাক হবার সময়। কী রোমাঞ্চকর সেই বয়স।

আর এই বয়সে আনন্দ সেই সব দৃশ্যগুলি আবার নতুন করে দেখে। চোখের সামনে ময়দানে আঁধার ঘনিয়ে আসে। দূরে ময়দান ঘিরে রাস্তাগুলিতে আর রাস্তার পাশে সারি সারি বাড়ি আর দোকানগুলিতে আলোর রোশনাই জ্বলে ওঠে। আশ্চর্য আনন্দ আর হয় না। শুধু মনে হয় চারিদিকের আলোর রোশনাই নিয়ে ময়দান তার বিরাট বুকের মধ্যে একবুক অন্ধকার আর হতাশা নিয়ে যেন আনন্দের মতই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যেন এক অহংকারকে খুঁজে খুঁজে না পাবার হতাশায় ময়দান আনন্দের মতই মূক আর বধির হয়ে সমস্ত অনুভূতিগুলি হারিয়ে ঘন কালো নিবিড় অন্ধকারে লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে।

এই ময়দানেই সুমিতার সঙ্গে আনন্দ কত বেড়িয়েছে একদিন। সুমিতা— সু—মি—তা। শীতের সন্ধ্যায় যেমন শিহরণ লাগে—তেমনি একরকমের শিহ-রণ আনন্দের চেতনায় আজও লাগে এই নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। ঠোঙা ভর্তি বাদাম আর ঝাল নুন সামনে রেখে কত পরিকল্পনা। কিন্তু। কোন পরি-কল্পনাই রূপান্তরিত হবার কোন চান্স পেল না, সাজানো বাগানের ফুল দিয়ে আর ফুলসজ্জা রচনা করতে পেল না। কারণ, সেখানেও আনন্দের পরাজয়। যে অহংকারকে নিজে অর্জন করে মনে মনে সম্রাট হতে চেয়েছে আনন্দ আশৈশব— সেই অহংকারের কলকাঠি সুমিতার মধ্যে লক্ষ্য করে আনন্দ ওপরের দাঁত দিয়ে

নিচের ঠোঁট কামড়ে ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞায় দীর্ণ হয়ে গিয়েছিল—না, আনন্দ চিরকাল এমন একটি অহংকারের দাসত্ব করতে পারবে না। তারপর যথারীতি সুস্মিতা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। শুনেছিল কোন এক আদিত্য মজুমদারকে বিয়ে করে বরানগরের দিকে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে।

সংসার আনন্দও করছে। বিয়ে করেছে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। তবু কোনদিন সত্যিকারের সংসার করতে পারল না আনন্দ। শুধু সারা জীবন একটি অহংকার খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছে—আর ব্যর্থতার কালি মেখে আনন্দ সংসার থেকে—জীবন থেকে পালিয়ে বার বার এই ময়দানের অন্ধকারে —অথবা অন্য কোনখানে কিংবা অন্য কোন অন্ধকারে হারিয়ে যেতে চেয়েছে।

এমনিভাবে পৃথিবীর বুকে যখন রাত গভীরতার দিকে ঢলে পড়তে থাকে তখন আনন্দ একসময় ক্লান্ত দেহমনে উঠে পড়ে। বাড়ির দিকে চলতে সুরু করে। মনে পড়তে থাকে সেখানে সুস্মিতা না থাক শিপ্রা আছে আর আছে মন্টু, খুকু। এরাও তো আনন্দের আপনার—এরাও চায় আনন্দকে ভালবাসতে, কাছে পেতে।

শিপ্রাকেও বলে নি কোনদিন আনন্দ। আশৈশব যে অহংকারকে অর্জন করার সাধনায় আনন্দ-মগ্ন, সেই অহংকারকে প্রথম উপলব্ধির—প্রথম চেতনার বিস্ফোরণের কথা শিপ্রাকেও বলে নি। শিপ্রা কেন পৃথিবীর কাউকে কী বলা যায় এ কথা, আনন্দকে তাহলে পাগল বলবে। এমনিতেই সবাই 'কবি' 'ভাবুক' ইত্যাদি বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

চিরকাল ভাড়াটে বাড়ির একটেরে ঘরে আনন্দ মানুষ। বাবা ছিলেন কেরানি আর মা ছিলেন রুগ্না। কেরানির জীবনের হতাশা আর রুগ্না মায়ের হাহাকার সেই জন্ম থেকে আনন্দের মনকে দুর্বল করে দিয়েছে। ভীরুতা আনন্দর অস্থিমজ্জায়।

ভাড়াটে বাড়ির মালিক ছিলেন মন্টুবাবু। এই বাড়িতে শৈশবকাল থেকে আনন্দ প্রায় ত্রিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। মন্টুবাবু দোতলায় থাকতেন আর সেই দোতলাটা আনন্দের কাছে আশৈশবের বিস্ময়। কোনদিন মন্টবাবুর সঙ্গে কিংবা তার পরিবারের কারুর সঙ্গে আনন্দের কোন ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠে নি। তার ফলে দোতলায় ওঠারও কোন সুযোগ আনন্দ পায় নি। শুধু শৈশবকালের অবাক হওয়ার সময় থেকেই একমন বিস্ময় নিয়ে মন্টুবাবুদের দোতলাটা লক্ষ্য করে এসেছে। দোতলার সামনে রেলিং ঘেরা একটুকরো বারান্দা। মধ্যে মধ্যে মন্টুবাবু ওই রেলিঙে দাঁড়িয়ে নিচে মাটির ওপর দাঁড়ানো কারুর সঙ্গে যখন কথা বলতেন তখন মন্টুবাবুর চেহারার মধ্যে—তার ওই দোতলার রেলিঙ ঘেরা বারান্দায় দাঁড়ানো ভঙ্গিটুকুর মধ্যে এক অপরূপ আভিজাত্য আর অহংকার আবিষ্কার করে আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। তারপর কত মানুষকে কতভাবে কত দোতলার রেলিঙ ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে—দেখেছে তাদের মধ্যে সেই মন্টুবাবুর মধ্যে দেখা একই আভিজাত্য আর অহংকারের

দৃশ্যকাব্য-পরিচয়

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়

দাম : দশ টাকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিককালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীর তুলাদণ্ডে বিচারিত। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলেছেন : —

"* * তথাকথিত জ্যেষ্ঠতাত জাতীয় অকালপক্ক এবং বিচারশক্তিহীন আত্মহারা ও প্রিয়ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলুম। এতদিন পরে এই বিভাগে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা দৈনিক বসুমতীতে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে * * দ্বিতীয়খানির নাম 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা নাটক নিয়ে এমনভাবে মস্তিষ্কচালনা করবার মানুষ যে আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদীর্ঘকালের সাধনা ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেন না। * * অথচ বাঙালীর সৃষ্ট নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন কেউ রচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন এবং দৃশ্যকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যজীবনবাবু অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। * * যাঁরা জ্যেষ্ঠতাতের ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক নন, এই পুস্তকখানি পাঠ করলে তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া আর কোন লেখকই বাঙালীর নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পারেন নি। এইটিই হ'ল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গৌরব। * * তাঁর সমালোচনাও পরম উপভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী সূক্ষ্ম দৃষ্টি, নিরপেক্ষতা ও যুক্তিযুক্ত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি আমাদের আনন্দিত করেছেন। তিনি কেবল গুণই দেখেন নি, দোষও দেখেছেন। কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় ক'রে বক্তব্য-বিষয়কে ক'রে তোলেন নি ঘোরাটে। * * যাঁরা বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * *"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

"* * বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা জানি না, থাকিলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সমালোচনা-শক্তিরও পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। অন্য সাহিত্য-পিপাসুরাও এই বই হইতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভাষা এই ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী—গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক, নাট্যশালার ইতিহাসলেখক ও নাটকীয় পরিসংখ্যানবিদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :—

"এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। * * সত্যজীবনবাবুর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। * * 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব বিদূরিত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্যামোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।"

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

প্রতিফলন। বার বার দেখে আনন্দর মধ্যে বিস্ময়ের অনুভূতি প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তায় কবে কোন্ লগ্নে রূপান্তরিত হল তা আনন্দের খেয়ালও নেই। শুধু অবচেতন মনের জমিতে যে ভাললাগাটুকু বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল শিশুকালে। জীবনে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাললাগাটুকু অর্জন করার প্রতিজ্ঞায় অনড় হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন।

মাটির স্পর্শে—জমির ওপর একতলার কোন ঘর নয়। মাটি ছাড়িয়ে দোতলা কিংবা তিনতলার যে কোন একটি কিংবা দু'টি কামরা আর তার সঙ্গে রেলিঙ ঘেরা ছোট্ট একটু বারান্দা কিংবা একটি ব্যালকনি—হোক সে মাসিক ভাড়া দিয়ে অর্জন করা—তবু এমনি একটি বাসার সন্ধান আনন্দ জীবনভোর করেছে। শুধু একটু অহংকার আর আভিজাত্যকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার উদগ্র বাসনা—যে অহংকার আর আভিজাত্য দোতলার বারান্দা কিংবা ব্যালকনিতে দাঁড়ানো ভঙ্গিটুকুর মধ্যে অর্জন করা যায়।

ভাড়াটে বাড়ির পরিবর্তন করতে করতে আনন্দ শেষে গড়িয়াতে একতলা বাড়ির প্রায়ান্ধকার দু'টি ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন দেখেছে মাটি ছাড়িয়ে দোতলা কিংবা তিনতলার একটি কি দু'টি কামরার—যার সামনে থাকবে রেলিঙ ঘেরা ছোট একটি বারান্দা কিংবা ব্যালকনি।

জীবনে কত পরিবর্তন এল গেল। কত ঘটনা নতুন করে ঘটল কত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তবু আনন্দ সেই একটি অহংকার আর আভিজাত্যকে অর্জন করার বাসনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে রইল। সেখানে কোন পরিবর্তন হয় নি।

বাবা মারা গেলেন। মা বাবার আগেই গিয়েছিলেন। তারপর যৌবনের কোন এক অমোঘ মুহূর্তে সুমিতা এসেছিল জীবনে। তারপর সুমিতাকে নিয়ে খেলা আর স্বপ্ন—সে-ও কতকাল চলেছিল কে জানে। কিন্তু স্বপ্ন দিয়ে যে জীবনকে সুমিতা গড়তে চেয়েছিল আনন্দকে নায়ক করে তা কবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

সুমিতারা নিম্ন মধ্যবিত্ত। ওর বাবাও একজন কেরানি—তাই সুমিতাকে উপার্জন করতে পথে নামতে হয়েছিল। মাস্টারি করত। কিন্তু মধ্যবিত্ত হলেও সুমিতাদের পৈত্রিক আমলের একটি বাড়ি ছিল। আর আশ্চর্য। সেই বাড়িটি দোতলা এবং সঙ্গে ভাঙা নড়বড়ে রেলিঙ ঘেরা একফালি বারান্দা।

প্রণয় যখন মধ্যগগনে তখন একদিন ছুটির বিকেলে আনন্দ সুমিতাদের বাড়ি গিয়েছিল। আনন্দর সাড়া পেয়ে সুমিতা ওদের দোতলার ভাঙা রেলিঙ ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আনন্দকে হাসিমুখে আহবান জানিয়েছিল। কিন্তু দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো সুমিতাকে দেখে আনন্দ পাথর হয়ে গেল। যে আভিজাত্য আর অহংকারকে অর্জন করে আনন্দ নিজে সম্রাট হতে চেয়েছে সেই আভিজাত্য আর অহংকারের প্রতিফলন সুমিতার মধ্যে লক্ষ্য করে আনন্দ বেদনায় নীল হয়ে গেল। কীরকম যেন মনটা জিঘাংসায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। না, এমন অহংকার আর আভিজাত্যের দাসত্ব আনন্দ কিছুতেই করতে পারবে না, পালিয়ে বাঁচল আনন্দ—সুমিতার জীবন থেকে—ভালবাসার জগৎ থেকে এমনিভাবে আনন্দর পলায়ন ঘটল।

আবার সেই উদ্যম দিয়ে মানসিক বাসনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার একঘেয়ে স্বপ্ন দেখা।

গড়িয়ার বাসায় যখন এল তারও অনেক আগে শিপ্রাকে বিয়ে করেছে। সে নিয়ে কোন প্রণয়ের রাখীবন্ধনে হয় নি। তবু সুখী হতে চেষ্টা করেছে আনন্দ। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে যে অসুখ মনের মধ্যে সব চাওয়া-পাওয়াকে বিফল করে দিয়েছে তাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। আনন্দ সেই অসুখের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে একবুক অন্ধকার নিয়ে মুখ-থুবড়ে পড়ে আছে।

এমন দিনে শিপ্রাই আনন্দের নজরে আনল সংবাদটি সরকারের পরিকল্পনানুযায়ী কলকাতা আর শহরতলীতে হাউসিং স্কীমের বাড়িগুলি মাথা উঁচু করে উঠেছে। আনন্দ গড়িয়ার বাসা থেকেই আবেদন করেছিল নির্দিষ্ট ফরমে। আনন্দ নিজের অফিসের কাজকর্ম মোটামুটি সুনাম চিরকাল পেয়েই এসেছে তাই যথারীতি অফিসের সুপারিশ পেতেও দেরি হয় নি। কিন্তু আড়াই বছর দীর্ঘ প্রতীক্ষাতেও কোন ফল হয় নি। সরকার আনন্দের আবেদনে সাড়া দিয়ে কোন হাউসিং স্কীমে একটি দু'তলা কিংবা তিনতলার ফ্ল্যাট আনন্দকে আশ্রয় দেয় নি দীর্ঘ আড়াই বছরেও। তবু চেষ্টা করে যেতে লাগল আনন্দ। উন্মাদ হয়ে গেল। যেমন করে হোক একটি ফ্ল্যাট পেতেই হবে যে অহংকার আর আভিজাত্যকে অর্জন করার উদগ্র বাসনাকে মনের মধ্যে লালন করে এসেছে তাকে এবার পেতেই হবে। এত সহজে আর হার মানতে পারবে না এবার। এই অমানুষিক চেষ্টা করতে গিয়ে আনন্দের নরক দর্শন হল। মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংকারকে আর স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে কত নোংরা হতে পারে আনন্দের এই নতুন উপলব্ধি হল।

তারপর এল পরিশ্রমের পুরস্কার। সেদিন গড়িয়ার বাসা বাড়িটির একতলার বারান্দাটাতে চিঠির বাক্সটায় একটা রোমাঞ্চকর খবর পৌঁছে গেল আনন্দের জন্য। সরকারী দপ্তরের নির্দিষ্ট খামে করে যে সংবাদ এল তা আনন্দেরই সংবাদ—একান্তই আনন্দের। বেহালার ওল্ড ডগ রেস কোর্সের সরকারী হাউসিং এস্টেটের বাড়িগুলির একটিতে তিনতলায় আনন্দ তার পরম আকাঙ্ক্ষিত ফ্ল্যাটটি পেয়েছে। আনন্দ দেখতে এল ফ্ল্যাটটি। উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে গেল যখন অবাক বিস্ময়ে দেখল তিনতলার ফ্ল্যাটটির সঙ্গে রেলিঙ ঘেরা একটি সুদৃশ্য ব্যালকনি। আনন্দের স্বপ্ন তার উত্তেজনা সব মাখামাখি হয়ে ব্যালকনিটি যেন একটা উদ্ধত গর্ব নিয়ে অপেক্ষা করছে—আনন্দ কখন গিয়ে ওখানে দাঁড়াবে। প্রবল উত্তেজনায় আনন্দ আস্তে আস্তে ব্যালকনিতে এল।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মাটি এখন অনেক নিচে। মাটির ওপরের মানুষগুলিকে আনন্দ করুণা করতে চাইল। নিজেকে বারবার অহংকার আর আভিজাত্যের দীপ্ত ভংগীতে জ্বালিয়ে দিতে চাইল। উত্তেজনায় আকাশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আনন্দ আকাশটাকে ধরতে চাইল যেন। কিন্তু কেমন যেন একধরণের অবসাদবোধ মনটাকে বার বার বিকল করে দিল। নতুন একরকমের পরাজয়ের গ্লানি রোগের বীজাণুর মত দ্রুত বিস্তার শুরু করে মনটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইল। কৈশোরকাল থেকে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মনটাকে এতদিন সযত্নে লালন করে এসেছে আনন্দ তাকে বার বার খুঁজে ব্যর্থ হতে লাগল। এক প্রকার মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বার বার নিভে আর ফুরিয়ে যেতে চাইল। মাটি ছাড়িয়ে ওপরের তলার কোন একটি রেলিঙ ঘেরা বারান্দা অথবা ব্যালকনিতে যে লোভের আর অহংকারের হাতছানি বার বার আনন্দকে লুব্ধ করে এসেছে এতকাল, তা অকারণ মনে হতে লাগল।

ব্যর্থতার গ্লানিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল—আকাশ অনেক ওপরে, এই হাউসিং এস্টেটের বাড়িগুলি মাথা ছাড়িয়ে আরও অনেক ওপরে। আর মাটিও আনন্দের নাগালের বাইরে। অনেক নিচে। আনন্দ আজ আশ্রয়চ্যুত।

[পূর্বানুবৃত্তি]

দেখতে দেখতে লড়াইয়ের ময়দানের রূপ বদলে গেল।

জগৎ ডাক্তার তার গাঁয়ের ছোকরাদের ডেকে বললে, "যে কেউ একজন ছুটে যা আমার ডাক্তারখানায়—তুলো আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আয়। কম্পাউণ্ডারবাবুকে পেলি তো ভালো—না হলে আলমারি ভেঙে আনবি।"

ক্রুদ্ধ জগৎ ডাক্তার কাঁপছে—থর্ থর্ করে কাঁপছে তখনো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল তুলো আর ব্যাণ্ডেজ। সায় কম্পাউণ্ডার। আহতরা কেউ গোঙাচ্ছে—কেউ রক্তের দলার মধ্যে মুখ থুবড়ে অজ্ঞান। জগৎ ডাক্তারের দ্রুত পটু হাতদুটো ক্ষত ধোয়াচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। কৌতূহলী গাঁয়ের মানুষ কখন এগিয়ে এসেছে পায়ে পায়ে—দূর থেকে কাছে, এগিয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত তাদের প্রিয় ডাক্তারবাবুর দিকে। ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে হাতে হাতে আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পে। চারদিকের ছড়ানো গাঁয়ের মানুষ আর শহরের মিছিল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

জনা পনেরোর মত নেতা আর ভলাণ্টিয়ার পাকড়াও করে দারোগা সেদিন পিছু হটলে। ভাঙতে পারল না শিরদাঁড়া—বরং বনস্পতির আশেপাশে যেন নতুন চারার দল মাথা তুলতে চাইছে।

তাকে থেঁৎলে দলে পিষে দিলে পরের দিন। সকালে এসে লণ্ডভণ্ড করে দিলে আইন অমান্যের জায়গাটা। উনুন ভেঙে দিলে—হাঁড়িকড়াই ছুঁড়ে ফেলে দিলে খালের জলে, খুঁটি উপড়ে হোগলা ছিঁড়ে একেবারে তছনছ করে দিলে। মানুষের ওপর মানুষ পড়ে গোঙাতে লাগল—রক্তে স্নান করে উঠল যেন বুক-চেতানো জায়গাটুকু।

পুলিশের সংখ্যা সেদিন ঢের বেশি—বড় দারোগার সঙ্গে দু-দুটো সাব ইন্সপেক্টার। পৈশাচিক উল্লাসে আইন অমান্যের জায়গাটাকে তছনছ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কৌতূহলী জনতার দিকে—তাড়া করলে লাঠি তুলে।

ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক মানুষ দেখছিল। আজ তারা ভূত দেখে যেন ছুটে পালাল।

"হটাও—হটাও—সবকে ভাগাও।"

দারোগা গর্জন করতে লাগল। প্রতিশোধ উল্লাসে চোখ-মুখ বীভৎস—ভয়াবহ।

তারপর সন্ধ্যের মুখোমুখি—চরের সবাই যখন কুঁড়েতে ফিরে এসেছে, তখন বুনো হাতীর পালের মতো এসে দাঁড়াল হতভাগা এই চরে।

প্রথমেই তলব পড়ল মাতব্বর হরি মণ্ডলের।

দারোগা বললে, "ধরে আন সেই দুটো শয়তানকে। শালা আমার পুলিশ চোট করে গেল—এত বুকের পাটা!"

হরি মণ্ডল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "তারা কোথায় পালিয়েছে হুজুর। সেই কচি বাচ্চাটাকে ভলাণ্টিয়ারদের ক্যাম্পে ফেলে দিয়েই ফেরার।"

"ফেরার ?" তেঁতুলে খরিসের মত ফোঁস করে উঠল দারোগা, "ধরে রাখতে পারো নি শালা গিধখোড়!" সবেগে একটা চড় পড়ল হরি মণ্ডলের গালে। তারপর কান ধরে টানতে টানতে বললে, "তুমি হারামজাদা চরের মাতব্বর। যেখান থেকে পারিস ধরে আন।"

হরি মণ্ডল নাচার। বুড়োর ঘোলাটে দুটো চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল। আবার বললে, "ফেরার হয়ে গেল হুজুর।"

নিষ্ফল আক্রোশে ওই কথাটা যেন সহ্য করতে পারছিল না দারোগা সাহেব। অতর্কিতে হরি মণ্ডলের কোমরে এসে পড়ল একটা সবুট লাথি। বুড়ো হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"বল শালা তাদের নাম।"

"গো-গোবিন্দ পাইক। আর পবন শেখ।" হরি মণ্ডল তোৎলাতে লাগল।

"চল—ঘর দেখা।"

হরি মণ্ডল ফাঁসীর আসামীর মত ঘর দেখিয়ে দিতে চলল দলের আগে আগে। সন্ধ্যে তখন পার হয়ে গেছে। চরের মানুষ নিশ্চিন্তে যে যার ঘরে। কোথাও এক-আধটা আলো দেখা যায়, বেশির ভাগ অন্ধকার। গোবিন্দের ঘরের সামনে এসে বললে, "এই গোবিন্দ পাইকের ঘর।—"

"আর পবন শেখ ?"

"বিঘে বিশেক দূরে হুজুর। ওই লাঠিবাজী করে"—পরিণামটা উচ্চারণ করতেও হরি মণ্ডলের আর সাহস হলো না।

সাব ইন্সপেক্টারের সঙ্গে বড় দারোগা গলা নামিয়ে কি যেন সলাপরামর্শ করে নিলে একটু। তারপর দু ভাগে ভাগ হয়ে একটা বড় দল বড় দারোগার সঙ্গে

ঝাঁপিয়ে গেল পবন শেখের ঘরের দিকে। সঙ্গে হবি মণ্ডল।

সাব ইন্সপেক্টার তার দলবল নিয়ে চড়াও হলো গোবিন্দের ঘরেব ওপরে।

ঘর তো নয়—ঝুপড়ি টঙ। তার বাঁশের আগড়ে পড়ল সবুট দমাদ্দম লাথি।

ভয় পেয়ে হরিদাসী চীৎকার করে উঠল, "কে গো—কে!"

"তোর বাবা হারামজাদী—খোল।"

হরিদাসী দরোজা খুলল না—সমানে চেঁচাতে লাগল, সঙ্গে মুকুন্দ।

লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেললে। ঘরের ভেতর অন্ধকার। একসঙ্গে কতকগুলো টর্চ জ্বলে উঠলো। মুকুন্দ আর হরিদাসী হাউমাউ করে উঠল।

চুলের মুঠি ধরে সাব ইন্সপেক্টার ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "চেঁচাবি পরে—তার ঢের সময় পাবি। আগে বল তোর মরদ কোথায?"

"সে নাই। সে আসে নি।"

"কোথায় গেছে?"

"জানি নি। হেই বাবু—"

সাব ইন্সপেক্টারের হান্টার পড়তে লাগল এলোপাথাড়ি। মাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণভয়ে চেঁচাতে লাগল মুকুন্দ। হরিদাসীও দু'হাতে চেপে ধরেছে মুকুন্দকে। যেন তার শেষ অবলম্বন। ছেলেটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল দু'জন পুলিশ—হরিদাসীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল কোণের দিকে। ছেলেটা ঝুলে রইল বাদুড়েব মত। আর ধৈর্য রইল না সাব ইন্সপেক্টারের। তলপেটে প্রচণ্ড একটা লাথি খেয়ে হরিদাসী অঁক করে একটা শব্দ করে ছিটকে পড়ল ঘরের বাইরে। মুকুন্দ ছুটে গিয়ে মাকে আবার জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু হরিদাসী আর হাত বাড়াল না। মুকুন্দ ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে শুধু চেঁচাতে লাগল, "মা—কথা বলছিস না কেন—ওমা—মা!"—

ঘরের ভেতরে তখন ভুতুড়ে কাণ্ড। হাঁড়ি পাতিল ভেঙে, ধান-চাল ছড়িয়ে হরিদাসীর ঘর-সংসার ওরা তছনছ করে দিলে। টর্চের আলো ফেলে খুঁজতে লাগল আর কিছু নষ্ট করবার আছে কি না। হঠাৎ এক জায়গায় একটা টর্চ থমকে গেল। চালার একটা জায়গায় বাতা আর খড় সরানো। একটা মানুষ গলে পালিয়ে যাওয়ার মতো ফাঁক—এদিক-ওদিক সদ্য টেনে সরানো চালার খড়।

পুলিশটা বললে, "ইধার দেখিয়ে সাব।"—

অন্ধকারে চোখ জ্বলে উঠলো সাব ইন্সপেক্টারের।

"দেখো—দেখো বাহার—জলদি।' ছুটে বেরিয়ে সে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলো টর্চের আলো ঝিকিয়ে উঠতে লাগল শূন্য অন্ধকার মাঠে। ঝোপে-ঝাড়ে।

বিঘে বিশেক দূরে তখন অন্ধকার রাঙা করা রোশনাই জ্বলে উঠেছে—দাউ দাউ করে জ্বলছে পবন শেখের কুঁড়ে আর খড়ের গাদা। বাতাসে ধান পোড়ার চাপা গন্ধ।

বুড়ো কলিমদ্দী বুক চাপড়ে আর্তনাদ করছে, "হায় আল্লা—হায় খোদা!"

পবনার দুটো বাচ্চা চেঁচাচ্ছে দাদাজানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আর আসমানী ছুটেছে মাঠের দিকে—পেছনে ভালুকের মত তিনটে পুলিশ। পায়ে শাড়ি জড়িয়ে পড়ে গেল আসমানী। সেই মাঠে তাকে চেপে ধরলে তিন জোড়া পশুর থাবা।

শুধু নিষ্ফল মর্মভেদী একটা আর্তনাদ চরের বোবা আকাশকে বিদীর্ণ করে ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে গেল।

হতচকিত চরের মানুষগুলো—আগুন দেখে ছুটে এসেছিল। যেন পুলিশকে তার নিজের ঘরে ডাকতে এসেছিল। পুলিশ তাড়া করলে তাদের—একেবারে ঘর পর্যন্ত। ধান-চাল-খড় চারদিকে ছড়িয়ে ছত্রখান করে সামনে যা পেল ভেঙে চুরমার করে দিলে। গোটা চরটাকে যেন দলে-পিষে—নতুন জেগে-ওঠা আসনাই মহব্বতীর শিরদাঁড়াকে একেবারে মটকে ভেঙে দিয়ে ওরা চলে গেল।

চরের বোবা গাঢ় অন্ধকার যেন একটা অতিকায় মুমূর্ষু জন্তুর মত মুহূর্তকয়েকের জন্য আর্তনাদ করে উঠে ধীরে ধীরে নীরব-নিথর হয়ে গেল

খবর পেয়ে পব্‌না এসেছিল—রাত তখন গভীর। গা ঢাকা দিয়ে ছিল কোথায়-না-কোথায়। খবর শুনে ভূতের মতো এসে দাঁড়াল চরের প্রান্তে। উদ্বিগ্ন—উৎকর্ণ। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ শুনতে পেল না। চলাচলের বাঁধ রাস্তা ছেড়ে খালের ধার দিয়ে উঁচু পাড়ের আড়ালে আড়ালে এগোতে লাগল সন্তর্পণে খালের মুখের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ছল্‌-ছল্‌ শব্দ উঠেছে জলের—জোয়ার ঢুকছে খালে। এই সময়ে চরের মানুষ জাল পেতে খালের মুখে মাছ ধরে। সেদিন কেউ নেই। একটা কুমীর উঠে এসেছিল—পব্‌নার পায়ের শব্দে সর্‌-সর্‌ করে আবার জলে নেমে গেল। কয়েক হাত জলে নেমে নিঃশব্দে ভেসে রইল—বোধ করি দেখতে লাগল মানুষটাকে। লুব্ধ দুটো চোখ স্থির হয়ে রইল জলের ওপরে।

চারদিক ভালো করে দেখে-শুনে পব্‌না এগোলো তার ভিটের দিকে।

কালো পোড়া খড়ের তলায় বাঁখারির আগুন তখনো গন্‌গন্‌ করছে। ধান-পোড়া ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে ওপরে। এতটু তফাতে বসে আছে বুড়ো কলিমদ্দি—হাঁটুতে মুখ গুঁজে।

পব্‌না চাপা গলায় ডাকল, "বাপজান!"

কলিমদ্দি মুখ তুলে একবার তাকালো বড় বড় চোখ করে। কোনো কথা বললো না। আবার দু' হাঁটুতে হাত রেখে মাথা গুঁজল।

"আসমান!"

কলিমদ্দি কোনো উত্তর দিলে না।

পব্‌না আশপাশে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেল। আসমানীও বসে আছে তার আব্বাজানের মত—দূরে এক গাছতলায়, তেমনি হাঁটুতে মুখ গুঁজে। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে গেছে—মাটিতেই শুয়ে আছে কুকুরের বাচ্চার মত কুঁকড়ে, মায়ের পায়ের কাছে।

পব্‌না ডাকল, "আসমান!"

আসমান মুখ তুলে তাকাল। বোধ করি কেঁদেছিল—শুকনো জলের দাগ লেগে আছে তখনো চোখের কোণে। কালো চুল ভরে মাঠের ধুলো। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে কামড়ে নিজেই রক্তাক্ত করে তুলেছে।

আসমান আস্তে আস্তে বললে, "তোমার জন্যে বসেছিলাম। এই লও তোমার দুটো ছেলে।"

আসমান যেন হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছে।

"কি বকচিস আসমান!" পব্‌না আসমানের মাথায় একটা হাত রাখলে সস্নেহে।

হঠাৎ যেন ছিট্‌কে উঠে দাঁড়াল আসমান। কেমন একটা খ্যাপামি ঝিলিক দিয়ে উঠল তার চোখের তারায়—বলল, "ছুঁবেনি—ছুঁবেনি। আমার ইজ্জৎ গেছে।"

"আসমান!"

"আমাকে তালাক দাও—তালাক দাও।" হিসেব বুঝিয়ে এবং চুকিয়ে দিয়ে পব্‌নার আসমানী এগিয়ে চলল সেই খালের মুখের দিকে।

"আসমান! কি হল!" পায় পায় এগোলো পব্‌না, "শোন—শুনে যা। কোথায় যাচ্ছিস? আসমান!"

অস্পষ্ট অন্ধকার থেকে শুধু কয়েকটা শব্দ ছিট্‌কে এল, "আমার ইজ্জৎ গেছে।"

হতভম্ব পব্‌না। কি হচ্ছে—কি বলছে, সে যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। শুধু দেখতে পাচ্ছে—অস্পষ্ট আসমানীর মূর্তিটা যেন গোঁ ধরে এগিয়ে চলেছে খালের মুখে। হঠাৎ কেমন তার ভয় হলো। ওদিকে কি করতে যাচ্ছে আসমানী?—

পব্‌না কাঁপা গলায় ডাকলে, "আসমান! উদিকে যাস নি। কুমীর উঠেছে!"

কোনো সাড়া আর এল না। পব্‌না ছুটল। ডাকতে লাগল, "আসমান!"—

এবার শব্দ একটা পাওয়া গেল বটে।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

খালের মুখে জোয়ারে ফুলে-ওঠা ভাগীরথীর অগাধ অথৈ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ।

পবনা ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল খালের মুখে—খুঁজতে লাগল। নাঃ, কোনো কিছুই দেখা যায় না। শুধু একটা অন্ধ-দুর্নিবার-ভয়াবহ-ক্ষুরধার গতি অগাধ সেই জলরাশির কোন গভীর থেকে যেন ফুঁসে ফুঁসে উঠছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়েছিল পবন শেখ।

পেছন থেকে মহেশ মণ্ডল ডাকলো, "পবনা!" বললে, "গলা শুনে এলম। এখন পালাও চটপট চর ছেড়ে।"

পবনা কেমন আচ্ছন্নের মত বলল, "মোর আসমান চলে গেল মহেশ।"

"চলে গেল! কোথায় গেল?"

"জলে ঝাঁপ দিল মহেশ।"

"কি বলছ তুমি!"

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না মহেশ। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, "তবু তুমি পালাও শেখ। বড় মণ্ডল জানতে পারলে রক্ষা নাই। ফের পুলিশ আসবে চরে।"

"পালাব?"

"হ্যাঁ। এমনিতে চরের সবাই বলছে—পবনার জন্যেই মোদের এই হাল হলো। এখন কে বলে দেবে।"

"বলে দেবে?"

"কে জানে।"

"মোর লেড়কা-লেড়কী? বুড়া আব্বা?"

"আমি তো রইলম স্যাঙাৎ।" মহেশ বলল, "গোবিন্দও পালাল। তুমিও যাও।"

"মোর আসমানও চলে গেল মহেশ।" বলে হতাশ চোখে একবার তাকাল জলের দিকে, তারপর তার নিশ্চিহ্ন ভিটের দিকে।

তাড়া দিল মহেশ, "যাও। আমি চল্‌লেম। বড় মণ্ডলের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে এসেছি। পালাও।"

কিন্তু পালাবে আর কোথায়। তিন দিন পার হলো না—চরের চেনা-জানা লাঠিয়াল পবন শেখও ধরা পড়ল, গোবিন্দও ধরা পড়ল। নেতা ভলান্টিয়ার-দের মতো সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা শহরে চালান দিলে না—ভরে দিলে থানা হাজতে। চরের এই উদো চাষা দুটোকে জীবনের মতো উচিত শিক্ষা দেওয়ার মতলব ভাঁজতে লাগল দারোগা। এমন সময় পাখী আবার পালাল। হাজতের লোহার গরাদ বেঁকিয়ে একদিন রাত্রে উধাও হয়ে গেল দুজনে।

সকালে ব্যাপারটা জানতে পেরে বড় দারোগা দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল—ছোট দারোগা সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। বাড়ুয়া চৌকি-দারের মুখে মুখে খবর চলে গেল চৌকিতে চৌকিতে—গ্রামে গ্রামে, এক মহকুমার সীমা পেরিয়ে আর এক মহকুমায়। দক্ষিণে রসুলপুরের নদী—উত্তরে হলদিয়া, চেহারার বিবরণ দিয়ে সতর্ক করে দিলে তার ঘাটোয়ালদের। ঘাটে হাটে গঞ্জে হাজত ভাঙার কথা। কেউ না চিনলেও সবাই জেনে গেল দুটো মানুষের কথা।

পলাতক দুটো নিজেদের আড়াল করার আশা কোথাও দেখতে পেল না। দিনের বেলা ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে—পথ চলে রাতের বেলা। ক'দিন খাওয়া নেই—ঘুম নেই। মরিয়া হয়ে একদিন এসে মিশে গেল শেষ পর্যন্ত খেয়াঘাটের ভিড়ে। পালাবে জেলা ছেড়ে—একেবারে সেই সুন্দরবন—মরিচঝাঁপি, ভাগীরথীর ওই পার।

সবে তখন ভোর হয়েছে—প্রথম জোয়ারের উন্মাদতা থিতিয়ে এসেছে। খেয়া ছাড়বে এবার।

দাঁড়িমাঝি খেয়াবোটে উঠল।

"হে—ই মরিচঝাঁপি—ই...পাথর প্রতিমা ...আ..."

বোঁচকা-বুচকি ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল যাত্রীর দল। সবাই ওরা গাঁয়ের চাষাভুষো—এই সময়টা মাটি কাটার কাজের ধান্ধায় দল বেঁধে চলে যায় নতুন আবাদ সুন্দরবনে। গোবিন্দ আর পবনা মিশে গেল সেই রকম একটা দলে। উঠে বসল বোটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল মাথা গুণতি পয়সার হিসাব মেলাবার বেলা। ঘাটোয়াল ধরে ফেললে। পয়সা কম পড়ছে।

পাঁচ-সাত দশ-বিশ জনের এক-একটা দল। তার এক-একজন দফাদার। দুটো মানুষ শুধু দল-ছুট্‌। তাদের না আছে বোঁচকা-বুচকি ঝুড়ি-কোদাল, না আছে বৌ-বাচ্চা।

দফাদাররা কবুল করলে, "ওরা মোদের লোক নয়।"

"তবে?" ঘাটোয়াল এগিয়ে এল। দাঁড়িদের হুকুম দিলে, "ঘাড় ধরে নামা। ফেরেপবাজী শালা।"

কষ্ট করে আর নামাতে হল না। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে ভিড় ঠেলে দুজনে বোট থেকে নেমেই ছুট—পাগলা ঘোড়ার মতো।

কতদূর আর যাবে। সামনে গঞ্জের বাজার। লোকজন মেলা। ধরে ফেললে।

আবার সেই থানা। সেই হাজত।

বড় দারোগা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "দিচ্ছি ব্যাটা—একেবারে ঠেলে বিশ বছর। এবার নুন নয়—স্বদেশী তেল বানাও, ঘানি ঠেল।"

বিশ ক্রোশ দূরে কোথায় না কোথায় একটা বড় ডাকাতি হয়েছিল। দিলে সেই কেসে জুড়ে। অভিযোগ চরম—ডাকাতি, অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা। গাঁয়ের থানা হাজতে আর রাখতে সাহস হলো না—একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও জনাকয়েক সেপাই চৌকিদার

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

দিয়ে পরের দিন পাঠিয়ে দিলে মহকুমা শহরে। কোমরে দড়ি, হাতে হাত-কড়া।

একেবারে খেয়া নৌকোয় তুলে দিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর হাত-কড়া খুলে দিল।

চৌকিদার বললে, "জংলী বরা হুজুর—হাত-কড়া থাকলে হত।"

সাব-ইন্সপেক্টর বললে, "কি আর করা যাবে—আইন।"

কবে হাতে-কড়া লাগানো আসামী জল-ডুবি হয়েছিল—সেই থেকে এই ব্যবস্থা।

সাব-ইন্সপেক্টর পবনার কোঁকায় মৃদু একটা রুলের গুঁতো দিয়ে বললে, "চুপ-চাপ বসে থাক শালা—না হলে এইখানে আজ ভুঁড়ি ফাটিয়ে শেষ করে দেবো।"

কোমরে বাঁধা দড়ি ধরে আছে সেপাইরা। বোবা পশুর মতো একধারে বসে আছে দুজন। ফেরারী আসামী পার করার স্পেশাল নৌকো—সাধারণ খেয়া নৌকোয় নানা যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে পার হতে সাহস পায় নি সাব-ইন্সপেক্টর।

গোবিন্দ হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে—পবনা চেয়ে আছে নদীর দুর-বিসারী জলধারার দিকে। ভাবছিল। অনেক গ্রাম, গঞ্জ খেয়াঘাট পার হয়ে এঁকে-বেঁকে ওই জলধারা তাদের চরকে বাঁয়ে রেখে গিয়ে পড়েছে আরও একটা বড় নদীতে—গাঙে। সেই কথা ভাবছিল। সেখানে এই সকালে চরের মাঠে এখন গরু ছাগল বেরিয়ে পড়েছে। বাবলা বন হলুদ হয়ে গেছে ফুলে ফুলে। আর কাচ্চাবাচ্চাগুলো...আর মেয়েরা...সবাই আছে—যেমন ছিল...আসমান নেই শুধু। আস-মানী বিবি বলে আর কেউ নেই।

জল নয়—জ্বালা করে উঠছে চোখ, বোম করি চৈত্রের নোনা-হাওয়ায়। মোহানার নদী—সমুদ্রের ঝটকা হাওয়া আর উথাল-পাথাল ঢেউ। নৌকোটা নেচে নেচে চলেছে পেছনের দিকটা দুলিয়ে দুলিয়ে পাতি-হাঁসের মতো। নদীর প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়ল। একটু নড়ে-চড়ে বসল পবনা—কনুই লাগল গোবিন্দর গায়।

আর যায় কোথায়! যেন বারুদ-ঘরে আগুন ধরে গেল হঠাৎ।

"শালা!" ক্ষেপে উঠল গোবিন্দ—ধাঁই ধাঁই করে পিটোতে লাগল পবনাকে, "তোর জন্যে মোর এই হাল শালা, তোর জন্যে!"—

রুখে উঠল পবনা, "মোর জন্যে? তুই তো ডাকলি মোকে?"

"তোকে আমি লাঠিবাজী করতে বললাম?"

"শালা বেইমান—তোকে বাঁচালাম না?" পাল্টা ঘা দিলে পবনা।

গোবিন্দ ফুঁসে উঠল।

হ্যা হ্যা করে হাসল সাব-ইন্সপেক্টর। ছোকরা মানুষ। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুনছিল ওদের ঝগড়া। উপভোগ করছিল। চোখের ইঙ্গিতে গোবিন্দকে যেন উসকে দিলে।

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "তোকে মেরে ফেলবো শালা বেইমান।"

"তবে রে"—

হঠাৎ দুই ষণ্ডা জোয়ান নৌকোর ওপরেই ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয়। কোমরে বাঁধা দড়ি একটু ছেড়ে দিয়ে সেপাই, সাব-ইন্সপেক্টর যেন জানোয়ারের খেলা দেখা আমোদ উপভোগ করে। বুনো ভঁইসের লড়াই। ঠেসে ধরেছে পরস্পরকে।

দেখতে দেখতে এক লহমায় যেন ভোজবাজি হয়ে গেল। দুজনে ধস্তাধস্তি করতে করতে হঠাৎ কোমরে বাঁধা দড়িতে প্রচণ্ড এক হেঁচকা টান দিয়ে ঝপাং করে ছিটকে গেল নৌকোর দু' দিকে। জলে পড়েই ডুব। হঠাৎ হাত-ছুট দড়ি ধরবার জন্য দুজন সেপাই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

নৌকো থেকে তখন হৈ হৈ রব উঠেছে—"পাকড়ো পাকড়ো—উহু রশি।"...

কিন্তু কোথায় রশি আর কোথায় ফেরারী। ঝপ্ ঝপ্ করে জলে ঝাঁপ দিলে সেপাইরা।

একটু দূরে ভেসে উঠল দুটো কালো মাথা। দু'দিকে।

সাব-ইন্সপেক্টর চিৎকার করে উঠল, "ফায়ার!"

গর্জে উঠল দুই শান্ত্রীর রাইফেল।

কিন্তু দুটো মাথা আবার ডুবে গেছে।

থানায় খবর গেল—আসামী আবার ফেরার।

বড় দারোগা ছুটে এল পাগলের মত। আরও সেপাই—আরও চৌকিদার। নদীর দুই তীরে পাহারা দিতে লাগল। হুলিয়া দিয়ে দিলে—জ্যান্ত কিংবা মরা, ধরে দিলে নগদ পঞ্চাশ টাকা।

শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল একজন। লুকিয়ে ছিল নদীর কিনার-ঘেঁষা বন-ঝাউয়ের ঝোপে। ধরা পড়ে গোবিন্দ পাইক চালান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা শহরে। উদ্দেশ পাওয়া গেল না আর সেই মাথাটার—যেটা ডুব সাঁতার দিয়ে চলে গেল মোহানার দিকে। বা'র দরিয়ায়।

তারপর মাসের পর মাস, বছর কেটে গেছে। খড়্গের মত নাক, লম্বাটে মুখ—ইয়া তাগড়া জোয়ান, বুকের পাটা তো নয়—কপাটের জোড় পাল্লা, হাতে উল্কি আঁকা বেহেস্তের পরী—তাকে আর কেউ দেখতে পেল না।

কেউ বললে, গুলীতে চাঁদি উড়ে গাঙেই শেষ হয়ে গেছে—কেউ বললে, পুলিশ ধরে লাস গুম করে দিয়েছে। কেউ বললে, পবনা মরে নি—চালান গেছে, মরেছে গোবিন্দ। নগণ্য এ চাষাভুষোর আবাদে খাঁটি খবরটাও কেউ পৌঁছে দেওয়ার নেই। [ক্রমশ]

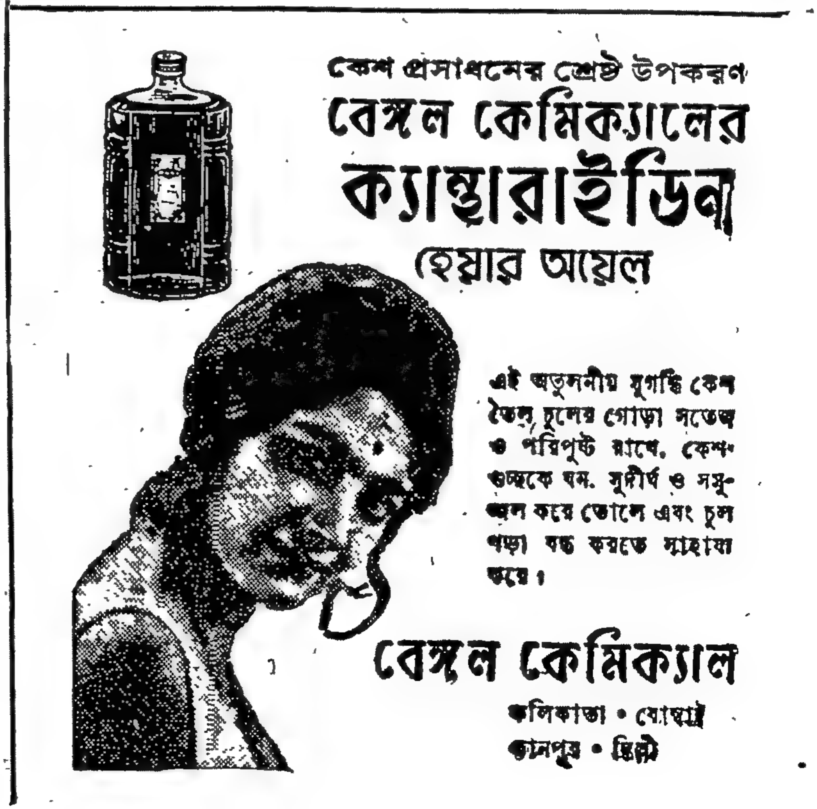

কারবালার অশ্রুস্রোত

খায়রুল বাসার

কারবালার মহাপ্রান্তরে পা দিয়েই হজরত ইমাম হোসেন প্রকৃতির আননে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অনন্ত অশ্রুর সম্ভাবনা, তিনি স্বয়ংই যার উপলক্ষ। অচিরেই রুধিরে অশ্রুতে যে-মাতন শুরু হল তার চরম লগ্ন ১০ই মহরম, হিজরী ৬১ সন। ফোরাত নদীর কূলে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম বৈরিতায় কবলিত হয়ে মহা-শহীদত্ব বরণ করলেন আল্লার প্রিয়তম রসুলের নয়নের মণি হজরত ইমাম হোসেন।

কারবালার প্রান্তরে সেদিন যে বিপুল অশ্রু মুক্তিলাভ করেছিল তার ধারা আজও অব্যাহত। ফোরাতের কূল থেকে গঙ্গার কূলেও তা সঞ্চার লাভ করেছে। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর তাৎপর্য সম্পর্কে শাস্ত্রজ্ঞমহলে রীতিমত মতান্তর থাকা সত্ত্বেও বহুদিন ধরে বাংলাদেশের বহু মুসলমান মহরমে প্রমত্ত কান্নায় ভেঙে পড়েছে, সাহিত্যে-সঙ্গীতে নিজেদের শোকাশ্রুকে অমরত্ব দেবার প্রয়াস পেয়ে এসেছে।

উপলক্ষ বিশেষে শোক প্রকাশের শোভন ও সঙ্গত রীতি কী তা নিয়ে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই মত-পার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়।

কিন্তু যে ঘটনাবলীর স্মরণে মহরমের উদ্‌যাপন তা যে স্বতঃই নিদারুণ শোকাবহ সে বিষয়ে কোন মহলে কোন মতদ্বৈধ নেই। হজরত ইমাম হোসেন যে কেবলমাত্র তৎকালীন মুসলমান জগতের মহামান্য ইমামই ছিলেন তাই নয়, তিনি ইসলামের উদ্গাতা ঈশ্বরের প্রিয়তম প্রতিভূ হজরত মহম্মদ মোস্তাফার অন্যতর দৌহিত্র। তাঁর পরিচয়ের এই বিশিষ্টতাই যে-কোন মুসলমানের অন্তরকে অভিভূত করার পক্ষে যথেষ্ট। উপরন্তু চরিত্রের মহত্ত্বেও তিনি ছিলেন অনন্য। হজরত মহম্মদের নিকটতম বংশধর, অতুলনীয় চারিত্র্য-মাহাত্ম্যের অধিকারী হজরত ইমাম হোসেন কারবালায় মহা-শহীদ হলেন এমন এক সংগ্রামে যা চরম অবৈধ এবং অমানুষিক, যে শত্রুর চক্রান্তে যে-শত্রু চূড়ান্ত ধর্মজ্ঞানহীন, বিবেকহীন, হৃদয়হীন। কারবালার অদূরে প্রবাহিত ফোরাত নদী এজিদের সৈন্যদলের অবরোধে থাকায় হজরত ইমাম হোসেন ধূ-ধূ মরুভূমির বুকে শিশুপুত্রসহ সপরিবারে তৃষ্ণায় হাহাকার করতে থাকেন এবং জলাভাবেই তাঁর পরাজয় ও জীবনহানির মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর স্মৃতি মানুষের মন থেকে সহজে মুছে যাওয়ার কথা নয়। নয় বলেই মুসলমানসমাজে মহরম চান্দ্রমাসের ১০ তারিখকে শোকদিবসরূপে উদ্‌যাপন করা হয়। ১০ তারিখ পর্যন্ত মুসলমানসমাজে বিবাহের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। শোক পালনের অঙ্গ হিসাবে এই তারিখে বিশেষ উপাসনা, দানখয়রাত, কোরানশরীফ পাঠ, রোজা রাখা ইত্যাদির বিধান। মতান্তরে, প্রকাশ্যে শোক পালনের রীতি হিসাবে তাজিয়া সহ শোকমিছিলের আয়োজন, শোক-সঙ্গীত গাওয়া, লাঠি খেলা ইত্যাদি মহরমের পরিচিত অনুষ্ঠানসমূহেরও রেওয়াজ প্রচলিত আছে। শেষোক্ত রীতি অনুযায়ী মহরমের চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকেই শোক পালনের পাঠ সূচিত হয়। চন্দ্রোদয়ের চার-পাঁচ দিন পর থেকে শুরু হয় তাজিয়া নির্মাণের কাজ। ৯ই মহরম দিনগত রাত্রে তাজিয়াসহ শোক-মিছিল গ্রাম ও সন্নিহিত এলাকার পথঘাট পরিক্রম করার পর ১০ই মহরম নিজ নিজ এলাকার কারবালায় তাজিয়ার মঞ্জিল করা হয়। বলা যেতে পারে এই ধরণের অনুষ্ঠান কারবালার ঘটনাবলীর অনুকরণধর্মী স্মৃতিচারণ। বলা বাহুল্য, দুই রীতির প্রবক্তাদের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু উভয় রীতিই যে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে তাতেও যেমন সন্দেহের অবকাশ নেই তেমনি উভয় রীতিরই লক্ষ্য যে অভিন্ন—মহরমের শোককে হৃদয়ে জাগরূক করে তোলা, তাও সুনিশ্চিত।

কিন্তু বাঙালী মুসলমানসমাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যা লক্ষণীয় তা হল, মহরমের স্মৃতি শুধুমাত্র বেদনায় নিঃশেষিত না হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্টিধর্মী হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায় একদিকে যেমন উচ্চতর সাহিত্যক্ষেত্রে 'বিষাদ সিন্ধু'র মত অসাধারণ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে মহরমকে কেন্দ্র করে, তেমনি অপরদিকে লোক সাহিত্যক্ষেত্রে জারি/মরশিয়া গানের বিপুল এক সম্ভারও গড়ে উঠেছে। কারবালার ঘটনাবলীর মহার্ঘ মানবিক দিকগুলি বাঙালী মুসলমানের রসচেতনাকে সৃষ্টি-প্রেরণায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ না করে পারে নি। স্পষ্টত বাঙালীর মানসপ্রকৃতির পটভূমিকায় এটাই ছিল স্বাভাবিক।

বরং বলা যেতে পারে, বাঙালী মুসলমানের মহরম সম্পর্কিত ধারণা বহুলাংশে সাহিত্যবাহিত। যেহেতু এই সাহিত্যের বিপুলতর অংশ লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত, তাই জনচিত্তে এই ধারণার ব্যাপ্তিও বিশাল। নাগরসভ্যতার পরাক্রমে গ্রামজীবন থেকে পর্যাপ্ত অবসর বিদায় নেওয়ার আগে পর্যন্ত মহরমভিত্তিক পুঁথি পাঠের রেওয়াজ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। জারি/মরশিয়া গান আজও মহরম চান্দ্রমাসে যথেষ্ট পরিমাণে গাওয়া হয়। সাহিত্যরসপিপাসুর কাছে 'বিষাদ সিন্ধু'র আবেদন এখনও শেষ হয়ে যায় নি। এই দিক থেকে সৃষ্টিপ্রেরণার একক উপকরণ হিসাবে মহরমের স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য।

শাস্ত্র ও ইতিহাস যেখানে মূক, জীবনানুসন্ধানের সহর্ষ অভিযানে সাহিত্য সেখানে মুখর। সত্য বনাম অসত্য, ন্যায় বনাম অন্যায়, মহত্ত্ব বনাম নিচত্বের চির-আকর্ষণীয় সংগ্রামে ইতিহাস যেখানে কোলাহলমুখর বিভ্রান্তি মাত্র, সাহিত্য সেখানে জীবনমন্ত্রের আধার। সত্যের, ন্যায়ের, মহত্ত্বের আপাত পরাজয় যে অসত্য, অন্যায়, নিচত্বের চরম জয়ের সূচক নয়, মানুষের এই স্পর্ধিত বিশ্বাসকে সাহিত্য ছাড়া আর কে লালন করে? কারবালার মহা প্রান্তরে যে শোক অবতীর্ণ হয়েছিল ১০ই মহরম, হিজরী ৬১ সনে—যে শোকের সামিল হয়ে—

পশু কাঁদে পাখী কাঁদে
কাঁদে জেবন ও এনসান
বেহেস্তেতে মা ফাতেমা
কেঁদে গড়াগড়ি যান ॥

সেই মহাশোকই সবটুকু নয়, আরও অনেক কিছুকে জীবনরসিক শিল্পী খুঁজে পেতে চেয়েছেন যা জীবনের সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসকে পরিপুষ্টি দিতে পারে।

জীবনানুসন্ধানের এই আন্তরিক ব্যাকুলতা কারবালার ঘটনাবলীর সাহিত্যরূপকে মানুষের হৃদয়ের একেবারে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। সাহিত্যে রসসৃষ্টির প্রয়োজনে সমগ্র ঘটনাবলীকে একটি সূত্রোথিত কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়েছে, যে কাহিনীর ভাগ্যবিড়ম্বিত নায়কদ্বয় (হজরত ইমাম হোসেন ও তাঁর অগ্রজ হজরত ইমাম হাসান) ঈশ্বরের অমোঘ বিধানে চরম বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে আশা-নিরাশার মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্বে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেছেন। দুরাত্মা এজিদের নীচ চরিত্রের বিপরীত প্রান্তে হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হোসেন ত্যাগে, শৌর্যে, সংযমে স্বভাবতই অনুপম দ্যুতিময়। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁদের চরিত্রের মানবিক দিকগুলিকেও অপরূপ

একমুঠো কবিতা

অতুলরঞ্জন দেব

(১)

রক্তগত টানে

তোমার মৌলিক চিন্তা উদ্ভাসিত আকাশের নীলে.....
প্রথমে দুর্ভেদ্য ছিলে। কালে কালে সকলেই জানে
বুদ্ধির বিকাশক্ষেত্র। মিশে যাই বিচিত্র মিছিলে...
তোমাকে এখনো খুঁজি প্রতিদিন রক্তগত টানে।

(২)

অলস চিন্তা

সকল অলস চিন্তা একেবারে অর্থহীন নয়,
যদি তা নিষ্পাপ থাকে। জীবনের কিছুটা সময়
এভাবে কাটানো ভালো। তাহলে নিজেকে চেনা যায়।
নির্ভুল হিসাব মেলে : যেতে হবে কখন কোথায়।

(৩)

একই বৃত্তে

কখন কী হয়ে যায়, তা জানার সকল উপায়
আয়ত্ত করেছো তুমি। পেয়েছোও পূর্ণতার স্বাদ।
আমি ঘুরি একই বৃত্তে : পায়ে শুধু জঞ্জাল জড়ায়।
মেটাতে পারি নি কিছু অন্তরের কোনই বিবাদ।

গ্রামেই বাস করে

ক্ষিতীশদেব সিকদার

ইতিহাস সৃষ্টিকারী লোকটি আমার গ্রামেই বাস করে
খেত নেই খামার নেই
চাকরি নেই অনেককাল —
তার উপর বিষফোঁড়া
ওষুধ নেই পথ্য নেই
অথচ কিছুই যেন কিছুই নয়,
তার ভাবনা 'এমন একটি লোক কি করে ইতিহাস হয়'

আমি থাকতাম অনেক দূরে দূরে
সে আমায় সময় পেলেই দূর থেকে ডেকে বলত
'দেখো আমি ইতিহাসের চেহারা পাল্টে দেব'
আমি দেখলাম
গরীবের কথা বাসী হলে ফলে
ইতিহাস সৃষ্টিকারী লোকটি আমার গ্রামেই বাস করে
তার খেত নেই খামার নেই
চাকরি নেই অনেককাল

শুধু স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন আছে সুদিন এলে সকলের
সাথে সুখের সংসার পাতবে।

ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিজ জীবনের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হজরত ইমাম হোসেন নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত ঋজু। নিজ পরিবার-পরিজনের তিনি দায়িত্ব ও মমতাশীল পিতা, স্বামী, ভ্রাতা; আপন প্রজা-অনুরাগীর সুহৃদ, রক্ষক, গুরু। হৃদয়হীন শত্রুর প্রতিও তিনি চরম ক্ষমাশীল। মদিনায় তাঁর জীবন নিরাপদ এ কথা জেনেও তিনি মদিনাবাসী সাধারণ মানুষকে এজিদের রোষ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার মানসে মদিনা ত্যাগের সংকল্প করেছিলেন। মদিনা থেকে কুফার পথে রওনা হয়ে পথ ভুলে ভবিতব্য অনুসারে কারবালার প্রান্তরে পোঁছে সম্মুখীন হলেন সুনিশ্চিত ধ্বংসের, যার মুখ্য কারণ জলাভাব। ফোরাতের জল এজিদ সৈন্যের অবরোধে। কি "বিষাদ-সিন্ধু", কি "শহীদে কারবালা", কি জারি গান—সর্বত্র হজরত হোসেনের জীবনের এই অধ্যায় অপরূপ সার্থকতায় রূপায়িত। নিষ্ঠুরতম বৈরিতার পাশাপাশি অসহায়ের হাহাকার, বীরের শোণিত পাত—মাতনের চূড়ান্ত, অথচ যার শেষ অনন্যসাধারণ ক্ষমায়। ঘাতক সীমার যখন হজরত হোসেনের বুকে বসে গলায় খঞ্জর চালাচ্ছে অথচ ক্ষতসৃষ্টি করতে পারছে না তখন হজরত ইমাম হোসেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, সীমার! মাতামহ জীবিতাবস্থায় অনেক সময় স্নেহ করিয়া আমারই গলদেশে চুম্বন করিয়াছিলেন। সেই পবিত্র ওষ্ঠের চুম্বন মাহাত্ম্যেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমার মস্তক কাটিতে আমি তোমাকে বারণ করিতেছি না: আমার এই প্রার্থনা যে, আমার কণ্ঠের পশ্চাদভাগে খঞ্জর বসাও, অবশ্যই দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে। দুরাত্মা সীমারকে তিনি আশ্বাস দিলেন, 'আমার মাথা কাটিয়া লও। আমি ধর্মত প্রতিজ্ঞা করিতেছি পরকালে তোমাকে অবশ্যই মুক্ত করাইব।... তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে না পারিলে আমি কখনই স্বর্গের দ্বারে পদনিক্ষেপ করিব না।' সীমার তাঁর কথামত অস্ত্রাঘাত করল। হজরত ইমাম হোসেন বলে চললেন, 'জগৎ দেখুক, আমি কি অবস্থায় চলিলাম! নূরনবী মোহাম্মদের দৌহিত্র; মদিনার রাজা, মহাবীর আলীর পুত্র হইয়া শূন্যহস্তে সীমারের অস্ত্রাঘাতে কিভাবে আমি ইহসংসার হইতে বিদায় লইলাম, জগৎ দেখুক।' [বিষাদ-সিন্ধু মহরম পর্ব।]

পল্লী কবির জারি গানে এই অধ্যায়ের রূপ—

সীমার লানতী বসি
ইমাম পাকের বুকেতে
খঞ্জর উঠায় পাপী
ইমাম পাকে মারিতে॥
ইমাম হোসেন কহে
শুন গো সীমার বলি
ছাতি হতে নাম সীমার
নামাজের অক্ত যায় চলি॥
ছাতি হতে নামে সীমার
ইমাম পাক বুঝিরা
ইসারায় আদায় করে
নামাজ আর শুকরিয়া॥

এখানেও মৃত্যু মহিমময় হয়ে উঠেছে। শমনের উদ্যত অস্ত্রের মুখেও হজরত ইমাম হোসেন নামাজ আদায় করছেন ● জগদীশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা পেশ করছেন। এ কেমন মৃত্যু! এ যে প্রকারান্তরে জীবনেরই জয়গান।

সাহিত্যে মহরম পর্বের পরও উদ্ধার-পর্ব রয়েছে যে পর্বে বিশ্বাসী মুসলিম জগতের নৃপতিগণ সম্মিলিতভাবে দামেস্ক অবরোধ করে এজিদের হাতে বন্দী হজরত ইমাম হোসেনের পুরনারী ও একমাত্র বংশধর জয়নাল আবেদীনকে উদ্ধার করবে। এজিদের মুখ্য অনুচররা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু এজিদ ঈশ্বরের শাস্তি পরিপূর্ণভাবে লাভ করবার জন্য উদ্ধারকারী সৈন্যদলের হাত থেকে রহস্যজনকভাবে রক্ষা পেয়ে যাবে।

মহরমের সাহিত্যরূপ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি রাখে, যা বর্তমান প্রবন্ধের এক্তিয়ারের বাইরে, তবু অতি সংক্ষেপে এই দিকটির আলোচনা করার উদ্দেশ্য, কারবালার অব্যয় অশ্রু বাঙালীর হৃদয়শুক্তিতে কীভাবে মুক্তোর রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া।

গ্রন্থমেলা

উপনিষৎ-পঞ্চক : (কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা : গ্রন্থাঙ্ক ৪৯) চিত্রিতা দেবী। প্রকাশক—সংস্কৃত কলেজ: ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : পাঁচ টাকা।

উপনিষৎ-সাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির এক মহিমময় দর্পণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই দর্পণে প্রাচীন ভারতের যে ছায়া পড়ে, প্রাজ্ঞ আচার্যদের ভাষ্যের গুণে অনেক সময় তা' সাধারণের বোধগম্য হয় না।

সাধারণের এই অসুবিধা দূর করার জন্যে সংস্কৃত কলেজের গবেষণা-বিভাগ কয়েকটি উপনিষদের মূল ও অনুবাদসহ এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন এবং প্রকাশ করে যে সত্যিকারের একটি মহৎ কাজ করেছেন ওঁরা, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, এখানে উপনিষৎ-সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন এমন একজন গুণী, যিনি একদিকে মৌলিক বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টিতে এবং অপরদিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মর্মোদ্ধারে পারদর্শী। চিত্রিতা দেবীর কথা বলছি এখানে; এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে বলছি, যে সহজ ও সরল বাংলা ভাষায় পাঁচটি উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দিয়ে এই সংকলনটির তিনি গ্রন্থনা করেছেন, এক কথায় তা' বিস্ময়কর।

তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—মোট এই ক'টি উপনিষদ্ আলোচনার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে এখানে। এদের মধ্যে কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত 'তৈত্তিরীয়' এবং ঋগ্বেদের অন্তর্গত 'ঐতরেয়' উপনিষদ্ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। অবশিষ্ট তিনটি উপনিষদ্ প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য অথর্ববেদের সঙ্গে যুক্ত।

তবে এই যোগ বা প্রাচীনত্ব-প্রমাণ নয়, আলোচ্য এই পাঁচটি উপনিষদেরই যে প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মতত্ত্ব, বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে চিত্রিতা দেবী তা' প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ঋষিদের দ্বারা প্রচারিত উপনিষদ্গুলি একই কথা বলেছে বার বার। বলেছে, জড়জগতের সঙ্গে প্রাণজগতের যে পার্থক্যটাকে আমরা প্রকৃতিগত বলে ভাবি, আসলে তা' হল মায়া। আসলে জড় ও জীবের মধ্যে একই প্রাণের লীলা চলেছে অনাদি-অনন্তকাল ধরে। একই শক্তি পশুপাখি থেকে সুরু করে গিরি-নির্ঝর অবধি সব কিছুকে যুগ যুগ ধরে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

চিত্রিতা দেবীর অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় উপনিষৎ-সাহিত্যের এই ঐক্যবোধ প্রাধান্য পেয়েছে কোথাও; কোথাও আবার এক-একটি উপনিষদ্ নিজ নিজ বিশেষত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথা বলা যায়। ব্রহ্মোপলব্ধির জন্যে প্রথমেই যে মানুষ-গড়তে চেয়েছেন এই উপনিষদ্, গড়তে চেয়েছেন সদ্গৃহস্থ, লেখিকা তা' সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। আবার অদ্বৈততত্ত্বরূপে চির-সত্যকে লাভ করতে গেলে সাধককেও যে কায়মনোবাক্যে সত্য হয়ে উঠতে হবে—মুণ্ডক উপনিষদের এই মূল বক্তব্য সম্পর্কেও তিনি উদাসীন নন। এছাড়া প্রশ্নোপনিষদের মর্মবাণী—প্রাণের মধ্যে সৃষ্টির বিচিত্র বৃহৎ রঙ্গভূমিকে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐতরেয়োপনিষদের মূলকথা—সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনাচ্ছলে অদ্বৈতকে স্বীকার—প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে; এবং এসব কিছুর চেয়েও বড় কথা, চলিত বাংলার স্বাদস্পর্শে প্রাচীন ভারত এখানে কথা বলেছে।

চেনা গণ্ডীর বাইরে—অমিতা রায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। মূল্য : পাঁচ টাকা।

শ্রীমতী অমিতা রায় ইতিমধ্যে কিছু পাঠকের কাছে পরিচিত। পরিচয়ের কারণ এই যে, মাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ ভাষায় বঙ্গানুবাদ পড়তে অভ্যস্ত বাংলাভাষাভাষীরা। সেক্ষেত্রে এই লেখিকা এমন এক ভাষা থেকে গল্প, কবিতা ও নাটকের অনুবাদ করছেন, যে ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বিরল বলা চলে। সেই ভাষাটি হচ্ছে রুমানিয়ান ভাষা। এই লেখিকার একটি রুমানিয়ান গল্পের বাংলা-অনুবাদ পড়ার পর হতভম্ব হয়ে গেছিল এই সমালোচক, যিনি পরে বাংলার এক নামকরা লেখকের অনুরূপ ভাব ও ব্যঞ্জনার একটি মৌলিক গল্প (?) পড়েছিলেন। লেখাটির মূল-বিষয় ছিল—একটি বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য-প্রার্থনা।

বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি অনুবাদ নয়, স্বচ্ছ সরল ভ্রমণকাহিনী। লেখিকা গেছিলেন রুমানিয়ায়, সে দেশের ভাষা শিখতে। ভাষা শিক্ষার স্থল শুধু বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়—প্রতিদিনের কথায় জীবন্ত ভাষাকে যারা বহন করে লেখিকা তাদের কথাও তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। স্বভাবতই সে দেশের মানুষগুলির মনের ও প্রাণের খবর পেয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশ রুমানিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুচারু পরিচয় পেতে কোনো রকম অসুবিধা হয় না। কথায় বলে : নিজের দেশকে ভালোভাবে জানতে হলে বিদেশ দেখা দরকার। শ্রীমতী অমিতা রায় স্বচক্ষে দেখে আমাদের দেশের অবস্থা অনুভব করেছেন, আর এই গ্রন্থের পাঠকদেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ধন-বৈষম্যে উৎপীড়িত আমাদের দেশের চেয়ে সে দেশের মানুষ কেন এতো সুখী। অথচ খানাপিনায় এ দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের মতোই সে দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস—মায় বেগুন পোড়া থেকে সুরু করে মাখন সহ ভাত পর্যন্ত। তবে তফাৎ আছে এইখানে যে, হঠাৎ না জানিয়ে অতিথি গিয়ে পড়লে বাড়িতে তৈরি প্রচুর এবং নানান রকমের সুখাদ্য দেখে অবাক হতে হয়। আর এদেশে ক'জনই বা দু'বেলা ভরপেট খেতে পায় দিবারাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

সে দেশে সমস্ত দোকান রাষ্ট্রাধীন। আর সর্বত্রই একদর। ঠকে যাবার ভয় নেই পরিচয় না জেনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বললে তখনই মনে হয় না, তিনি এতো বড় বিদ্যার জাহাজ। লেখিকা কোনো ভাষার মাধ্যমে নয়, সোজাসুজি কিভাবে রুমানিয়ান ভাষা শিক্ষা করেছিলেন—সে অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে আশ্চর্য হতে হয়। আবার বিপদে পড়তে হয়েছে লেখিকাকে তখনই, যখন তিনি কোনো সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন রুমানিয়ান অধ্যাপকের সম্মুখীন হয়েছেন। একজন রুমানিয়ান অধ্যাপক বেদ অনুবাদ করছেন। তাঁর দরকার কিছু গ্রন্থ। লেখিকা ভেবেছিলেন তাঁর পক্ষে সাহায্য যখন সম্ভব হ... নি, তখন হয়তো আমাদের দেশ থেকে প্রেরিত ভি. আই. পি'টি সাহায্য করবেন। দুর্ভাগ্যের কথা, তিনি তো তা করেন নি, কারণ বেদ তাঁর অজ্ঞাত। তিনি, পরিবর্তে, উপহাসের হাসি হেসেছিলেন। মোটামুটি দু-একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে রুমানিয়ার মৌলিক বৈশিষ্ট্যই এখানে দেখানো হোল। তাছাড়া লেখিকা সেখানের

মানুষ, প্রাচীন বৈশিষ্ট্য, আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে তাদের পার্থক্য, বস্তুবাদ সম্বন্ধে রুমানিয়ার ধারণা, বিদেশীদের প্রতি তাদের ব্যবহার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রাম ও শহর, পশুপালন, ভূতত্ত্ব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদ, মাদুজিয়ম—সেখানের সাহিত্য এবং ছোট-বড় সাহিত্যিকদের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা, সর্বোপরি শ্রমিক পার্টির দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন আলোচনা করেছেন—যাতে বইটি পড়ে মনে হবে যে, পাঠকও রুমানিয়া দেশটা নিজের চোখে দেখে এলেন। অবশ্য আরো বিস্তর জ্ঞাতব্য তথ্য আছে—পরিমিত স্থান সে আলোচনার পক্ষে প্রধান বাধা। মোটকথা, রুমানিয়ানদের মনের সঙ্গে এদেশের মানুষদের মনের এতো বেশি ঐক্য—এর আগে আমাদের প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। সেদিক দিয়ে লেখিকা অনেকের চোখ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। অবশ্য এদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর সঙ্গে সেদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর মিল খোঁজা নিরর্থক। কারণ রুমানিয়া ধনতন্ত্র-মুক্ত দেশ। তাই সে দেশের কাছ থেকে শেখার আছে অনেক কিছুই। 'চেনা শোনার বাইরে' হলেও তাদের কাছে আমাদের যেতে হবে। কয়েকটি ফটো গ্রন্থটির বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে দিয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস মগ্নে স্মৃতিময় (রাখী-পূর্ণিমা, ১৩৭৫) শান্তনু দাস। এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২ : দাম : তিন টাকা।

ক্লান্তি হতাশা যন্ত্রণা বিষাদের মধ্যে দিয়ে একালের অনেক কবির মতই কবি শান্তনু দাস-এর অস্থির বিহ্বল পদ-চারণা আমরা লক্ষ্য করেছি। কখনো পঁচিশ বছর ধরে সারাপথ ধুলো পায়ে হেঁটে "নিঃসঙ্গ নায়ক" তিনি, সেই 'রাজ-পথে অন্ধকার সংক্রামিত করে', দেখেন, 'সিঁড়ির সামনে কিছু প্রাগৈতিহাসিক রক্ত জমা ছিল', বলেন, 'নিজেকে দেখে আর্ত-নাদ করি', বা (গাঢ় অন্ধকারে রক্তাক্ত হৃদয়ে/এখনো জীর্ণ দেহে মুখ ঘষে চলি। হে বিষাদ' (সময়)। এই সবের পাশাপাশি রয়েছে গ্লানি ও অন্ধকার থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা—'দু' হাত ভরে আকাশ ধরবো ব'লে/ছুটিয়ে ছিলেম মনের ঘোড়া প্রচণ্ড রোদ্দুরে' (আলোর অপেক্ষায়), বলেন, 'হয়তো/কোন রামধনু মুহূর্তে/বিশাল পাহাড়ের পাশ দিয়ে/আলোর গান গাইতে গাইতে ...../মাঠ পেরিয়ে সাঁকো পেরিয়ে দিকচক্রবালে মিশে যাবো।' "দীর্ঘদিন মগ্নে স্মৃতিময়" কাব্যে কবি-হৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট। দোলাচল বৃত্তি কবির স্ব-ভাব প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে অন্তরায়-স্বরূপ। কবিকে একটি পথ বেছে নিতেই হবে। হয়তো ভবিষ্যতে আমরা শান্তনু দাসের মধ্যে এই বিবর্তন লক্ষ্য করব। স্ব-ভাব প্রতিষ্ঠায় তাঁকে যত্নশীল দেখবো।

রাতের স্টেশন, ফুলঅলি, সেলাম, চৌরাস্তার রোদ্দুরটাকে, আলোর অপেক্ষায়, আকাশ ধরব বলে, জানোয়ার ইত্যাদি কবিতাগুলি ভাল কবিতা বলে অনায়াসে উল্লেখ করা চলে। অন্যদিকে তেমনই কতকগুলি কবিতা (যেমন,—পাপ, একটু শুনুন মহাশয়, দৃশ্যপট ইত্যাদি) কেমন যেন গতানুগতিক, ক্লান্তিকর। ঈশ্বর, শয়তান, অন্ধকার ইত্যাদি শব্দের বহুল প্রয়োগ আধুনিক কবিতায় ক্লান্তিবহ—বহু আধুনিক কবি কর্তৃক অত্যধিক ব্যবহারে শব্দগুলির ধার ভোঁতা হয়ে এসেছে সন্দেহ নেই।

"দীর্ঘশ্বাস মগ্নে স্মৃতিময়"-এর কবি আমাদের কতকগুলি সুন্দর পংক্তি উপহার দিয়েছেন। 'শহরের গা চুঁইয়ে সকাল জমছে ক্রমাগত/রাত্রিটাকে নিথরাম হোস-পাইপে ধুয়ে গেল (ফুলঅলি)' বা তুমি এলে নিঃসঙ্গ হৃদয়ে/হাজার যোজন পথ হেঁটে যেতে বড় ইচ্ছা হয় (বৃষ্টি সীমা-হীন) প্রভৃতি পংক্তিগুলি প্রত্যয়নিষ্ঠ। প্রেমভাবনায় কবির কণ্ঠে যুগযন্ত্রণার সুর—'সুচাবিতাসু' কবিতাতে তারই প্রতি-ফলন'।

কয়েকটি সুন্দর চিত্রকল্প—'ভোরের আলোয় মুখ কুলকুচো করি' (ইতিহাস) হরিণ পৃথিবীটাকে ইত্যাদি। ধূমায়িত স্মৃতিগুলি বেড়ালের মত/রাতের বারান্দা জুড়ে হেঁটে যায় (ইতিহাস), 'ঘনিষ্ঠ যন্ত্রণাগুলি ভাঙা বাসনের মত/প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে' (আর্তনাদ), 'মেঘগুলি চাবুক ঘোরায়' (মৃত্যুময় দ্বীপ) ইত্যাদি উপমা ও সমাসোক্তি শান্তনু দাস-এর কবি-শক্তির পরিচয় বহন করে। 'বীভৎসতাময়' (গরীবখানায়) প্রয়োগটি খুব সূক্ষ্ম হয় নি।

গ্রন্থটির ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

ধ্রুপদী—সম্পাদক : সুশীল রায়। ৫৯ বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা-১৯।

ওপরেই লক্ষ্য করবেন, আমরা কোনো মূল্য উল্লেখ করি নি। সম্পাদ-কীয় নিবন্ধে বিদায় গ্রহণের ম্লান সম্ভাষণ যার অনিবার্য—তার দামের উল্লেখ করেই বা কি হবে ?

নবম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যাটিই ধ্রুপদীর অন্তিম-সংখ্যা। অবশ্য এটি বের হবার কথা ছিল না। এর আগের সংখ্যাটি ছিল ধ্রুপদীর শততম সংখ্যা। সেটিই ছিল সম্ভাব্য অন্তিম-সংখ্যা। কিন্তু সে সংখ্যাটি যাঁরা দেখেছেন এবং পড়েছেন—তাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, এমন সুন্দরশোভন উচ্চমানের কবিতার এই সংখ্যাটি কি করে অন্তিম-সংখ্যা হতে পারে। আমরা সেটি দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম। অপূর্ব প্রচ্ছদ শুধু নয়—ভেতরের প্রতিটি কবিতা ছিল বাছাই করা, এবং সম্পাদক চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিমূলক একটি কবিতার সংখ্যা বের করতে। ধ্রুপদীর শততম সংখ্যাটি নিশ্চয়ই পাঠকরা সংগ্রহ করেছেন। তবে সেই সংখ্যাটি অন্তিম-সংখ্যা হয় নি এটি আশ্বাসবাণী হলেও পরের সংখ্যাটি অর্থাৎ নবম বছরের পঞ্চম সংখ্যার পর (সম্পাদকের মতে) "আরও একটি সংখ্যা বেরিয়ে যেতে পারে এ রকম সম্ভাবনা আর কিছু নেই।" এ সংখ্যাটি বের হওয়ার পক্ষে আছে এক ইতিহাস। সে আলোচনা থাক। কিন্তু এতোদিন বাংলা কাব্যজগতে ধ্রুপদী যে কাজ করে এসেছে বাংলাদেশে তা বিরল। সম্পাদক আধুনিক ও সনাতনের ভেদাভেদ দূরে করে—যা সত্যই কবিতা—তাই ছেপেছেন। আর চূড়ান্ত বিকৃতরুচির মুর-ব্বিরাও অমনোনয়নের ভয়ে দু'-একটা কবিতা লিখে ফেলেছেন ধ্রুপদীতে। 'ধ্রুপদী' ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল, কিন্তু যে দেশে কবিতার চেয়ে গোচর্মের মূল্য ও মর্যাদা বেশি, সেদেশে ধ্রুপদী কিভাবে বাঁচতে পারে? এতদ্ সত্ত্বেও সম্পাদক সুশীল রায় "ধ্রুপদী"র জন্য যা করেছেন তার জন্য বাংলাদেশ তার কাছে ঋণী হলেও "ধ্রুপদী"র জন্য তাঁর ঋণ কে শোধ করবে?

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

॥ এগারো ॥

ডুয়ার্স। নতুনকালের ডুয়ার্স।

রক্তে প্রতিশ্রুতি জ্বেলে যেন এক ঐশ্বর্যময়ী অরণ্যকুমারী নতুনকালের প্রেমিকের প্রতীক্ষা করছিল। কবে যে আগমন হবে তার। প্রতীক্ষিত প্রহরগুলির উৎকণ্ঠা-বেদনার অবসান হবে। তার উষ্ণ সুখস্পর্শে সব জড়তা কেটে যাবে। দেহের কোষে কোষে জাগবে নতুন যৌবন। হৃৎপিণ্ডের রক্তের দোলায় বাজবে অস্থির তরঙ্গের ঢেউগুলি। সার্থক হবে তার পথ-চেয়ে-থাকা মুহূর্তগুলি।

অবশেষে এসে পড়ল সে। নতুনকালের শিক্ষা ও সভ্যতা।

আজকের ডুয়ার্সের আর সেদিন নেই। রূপবান প্রেমাস্পদের মত পশ্চিম এসে গেছে তার হৃদয়ে। কুণ্ঠিত অনাদরে দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে নি। ডুয়ার্স তাকে সাদরে ডেকে নিয়েছে নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে। আজকের ডুয়ার্সের সঙ্গে তার আর "লাভ য়্যাট ফার্স্ট সাইট" নয়, একেবারেই মাল্যবিনিময় হবে গেছে। পশ্চিমী সভ্যতা সেই রূপবান বর। আর ডুয়ার্স তার মনোমত পাত্রী।

কী ছিল বিধাতার মনে।

রবীন্দ্রনাথের কথায় ভাবতে ইচ্ছে করে। খাঁচার পাখি তো খাঁচাতেই ছিল, বনের পাখি ছিল বনে। কী করে এই অসম্ভব সাধিত হল একমাত্র ইতিহাস-বিধাতাই তা বলতে পারেন। অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখি, ডুয়ার্স চিররাত্রিময় এক অন্ধকার দেশ। এক বিষণ্ণতা-ঘেরা প্রান্তর। ভারত-ইতিহাসের যে-ছাত্র পরীক্ষার প্রয়োজনে রাত জেগে জেগে পড়া মুখস্থ করে সেখানে তো নেই ডুয়ার্সের কথা।

পাশের ঘরে হরিপদবাবু পড়াতে বসেছেন। ছেলে কান্তুর টেস্ট পরীক্ষা এসে পড়েছে। তাই রাত্রি জেগে জেগে তাকে পড়ায় সাহায্য করছেন হরিপদবাবু।

আমি আজ চারদিন এসেছি এ অঞ্চলে। বানারহাটে। হরিপদবাবুর ভায়রার বাড়ি উঠেছি। কাল সকালে চলে যাব কাটালগুড়ি বাগানে। সেখানে কিছু জরুরী কাজ আছে। ব্যক্তিগত।

আজ রাত্রে এ-ঘরে আমি চুপচাপ শুয়ে আছি মশারির মধ্যে। ঘুম আসছে না। মশার একটানা গুনগুন শব্দ কানে আসছে। জানালার বাইরে শেষ মাঘের চাঁদ। দূরে বনান্তরালে মেঘের মত তার আলো-আঁধারি খেলা। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে দ্রুত-ছুটে-যাওয়া ট্রাকের শব্দ কানে আসছে। নানা বাগানের ট্রাক অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছুটোছুটি করে।

ট্রেনের সিটি বাজছে স্টেশনে।

আজ সারাদিন ওই বানারহাটের রাস্তায়-রাস্তায় বাজারে ঘুরেছি। বিস্তর ধুলো। অনেক মাড়োয়ারীর দোকান। বিহারীর পানের দোকান। নেপালীরা চলে যাচ্ছে তাদের নিজস্ব টুপী মাথায় দিয়ে।

সারাদিন পরে আমি আজ একটু ক্লান্ত। বেশিরকম ক্লান্ত। নির্বাচনের ঝামেলা মিটে যেতে এসেছিলাম এ অঞ্চলে। তিনদিন এই বানারহাটকে কেন্দ্র করেই নানা অঞ্চলে ঘুরেছি।

রাতে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না।

শুয়ে শুয়ে আনমনে কি-সব ভাবছিলাম। হঠাৎ কান গেল হরিপদবাবুর কথায়।

হরিপদবাবুর ছেলে কান্তু পড়ছে ইতিহাস।

পরীক্ষার প্রয়োজনে পড়া। পড়ছে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি।

অনুমান করতে পারছি চৌকির উপরে ছেঁড়া গেঞ্জী গায়ে পৈতৃক পৈতেটা কোলের উপর কিছুদূরে পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়ে ছেলের পড়ার টেবিলের কাছে বসে আছেন হরিপদবাবু। আর ছেলে কান্তু বসেছে তিন টাকা দিয়ে কেনা কাঁচা কাঠের ভারী চেয়ারটায়। সামনে কেরোসিন-কাঠের টেবিলে তৈরি বাক্স। তাতে বইপত্র। জ্বলছে লাল কেরোসিনের টেবিললাইট। আজই বিকেলে হরিপদবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বাজার থেকে ফিরতে ফিরতে বলছিলেন, কী কাণ্ড! সাদা কেরোসিন পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাঁর হাতের ঝুলন্ত ছোট টিনটার দিকে তাকাচ্ছিলাম। বললেন, লাল তেল আনতে হল শেষ পর্যন্ত। বুঝলেন কি না—

গলা কেসে পরিষ্কার করে বললেন, ছেলেটার আবার পরীক্ষা। লাল তেলে খুবই অসুবিধে।

বলেছিলাম, কিছু বেশি দিলে হয়ত পেতেন?

বেশি? হরিপদবাবুর চোখে একটু লালের ছোপ লক্ষ্য করছিলাম। হয়ত কোন কারণে। তিনি একটু ঝাঁঝাল গলায় বললেন, বেশি আর এক পয়সাও দেব না। ঢের দিয়েছি এ-পর্যন্ত। ওই যে কাইয়াগুলো ওদের মশায় কামটের ধার দাঁতে। আমাদের চুষে চুষে ত' লাল হয়ে গেল।

একটু থেমে আবার বললেন দৃঢ়কণ্ঠে, বলছি আপনাকে মশায়, আর এক পয়সা দেব না ব্যাটাদের। দিনও ফুরিয়ে গেল মশায়।

আমি হাসছিলাম।

হরিপদবাবুর গা যেন জ্বলে উঠল আমার হাসিতে। বললেন, না, না মশায় হাসির কথা নয়। হাসবেন না আপনি। এই করেই তো গেল বাংলাদেশ। ওদের কর্তারা ধর্মবীরকে পাঠিয়ে দিল। যুক্তফ্রন্টের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিল। কেন? না, তাদের চুরি-জোচ্চুরি ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা হচ্ছিল। এখন বোঝ ব্যাটারা, টের পা মজাটা। পারলি যুক্তফ্রন্টকে ফেরাতে।

তাঁর চোখ-মুখ হাসছিল। কথার টানে টানে তাঁর বুক ফুলছিল নিশ্বাস নেবার সময়। তবু গলাটা শাণিত করে বলেই ফেললেন, ব্যাটারা কম চেষ্টা করেছে নাকি ওদের জেতাতে? এখন খুব হয়েছে। আর এক পয়সা-ও দেব না ওদের মশাই চুরি করতে।

কিন্তু আপনার উত্তরবাংলায় তো তেমন জিত্‌তে পারেন নি।

বলেই ফেলেছিলাম।

সে মশাই আসবেন এক সময় বোঝাব আপনাকে। আছেন তো ক'দিন?

চলে গিয়েছিলেন তিনি খড়ম পায়ে খটখটিয়ে ঘরের মধ্যে। আমি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থেকেছিলাম।

রাত্রিবেলা।

হরিপদবাবু বললেন ছেলেকে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো শেখা হল না এখনো?

ছেলে শব্দ করছে না।

পড়ছিস তো সেই কখন থেকে!

হরিপদবাবুর গলায় বিরক্তি। ঠাস্‌ করে একটা শব্দ হল। না, ছেলের গালে চড়-চাপড় নয়, নিজেরই পিঠে একটা মশা মারলেন তিনি। ছেলেকে খুব ভালোবাসেন হরিপদবাবু। চারদিনে এইটে জেনে গেছি। এর মধ্যে কোন ভুল নেই। ওঁর ভায়রার স্ত্রী, অর্থাৎ যিনি হরিপদবাবুর শ্যালিকা, আমি আপাতত যাঁদের আশ্রয়ে, তাঁদের কাছেই জেনেছি।

হরিপদবাবু বললেন, নাঃ, তোদের মাথায় কিছু নেই। শুধুই গোবর ভরা আছে দেখছি।

আমি চুপ করে পাশের ঘরে বিছানায় পড়ে পড়ে ওঁর কথা শুনছি।

ইস্কুলে কিছু পড়িস নি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আবার একটা মশা মারবার শব্দ। মশা অবশ্য কিছু বেশি হয়েছে এ-বছর। প্রতি বছর কিন্তু এরকম থাকে না। এবার কিছু বেশি হয়েছে। হরিপদবাবু কিন্তু মশারির ভিতরে যাবেন না। ওইরকম বসে থাকবেন। মাঝে মাঝে এক-আধটা মশা মারবেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত। চাপড়ের শব্দ উঠবে।

বুঝলি সব দেশে–সব কালে পতনের কারণ একটাই বিশেষভাবে থাকে। হরিপদবাবুর গলা শুনতে পাচ্ছি, রাজ-শক্তি বা শাসকশক্তির পতন তখনই ঘটে, যখন তারা জনসাধারণের সহানুভূতি হারায়। যখন মানুষ আর তাদের বিশ্বাস করে না।

পড়া থামিয়ে চুপ করে শুনছে ফাল্টু।

হরিপদবাবুর গলা আবারও শুনতে পেলাম, বুঝলি কি না বাবর যে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন আকবরের হাতে পর্যন্ত এসে তার ভিত্তি কম শক্ত হয় নি। কিন্তু সবকিছুই পাল্টে গেল যে-মুহূর্তে আরঙজেব হিন্দুস্থানের প্রজাদের উৎপীড়ন আরম্ভ করলেন। শত অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্যদল কেউ কোন কাজেই লাগল না।

হরিপদবাবু কতদূর পর্যন্ত পড়া-শুনো করেছেন জানি না। কিন্তু তাঁর কথাগুলি শুনতে ভালোই লাগছে।

অতবড় যে ইংরাজ, বলতে আরম্ভ করে আবার একটা চাপড় পড়ল, হরিপদবাবু বলে চললেন, যার সাম্রাজ্যে কোনদিন সূর্য অস্ত যেত না, তাকেও চলে যেতে হল শেষ পর্যন্ত। গান্ধী-কে ভয় পেয়ে চলে গেল তারা? নো, নেভার থিংক সো, মাই বয়। গেল মানুষের বিশ্বাস হারাল বলে। আর সেই মানুষদের হয়ে দাঁড়াতে পারল না বলে আজ কংগ্রেসকেও চলে যেতে হল। আসলে প্রজারাই রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, রাজা নয়।

হরিপদবাবুর কথাগুলি ভালো লাগছিল। শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

সকালে দেখা হরিপদবাবুর সঙ্গে। কাগজ পড়ছিলেন বারান্দায়। বললেন, কী খবর, ভালো তো?

আমি বললাম, ভালো।

কাগজটা দেখছি একটু। দু'দিন এত ব্যস্ত ছিলাম কাগজ দেখা হয় নি। একটু থেমে বললেন, ভেবেছিলাম বুঝি মন্ত্রিসভা হয়েই গেছে। কিন্তু না, মশাই।

হয়ে যাবে।

ঠিক বলেছেন! আমাকে প্রচণ্ড জোরে সমর্থন করে উঠলেন হরিপদবাবু, আমিও বলি হয়ে যাবে। দেশকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের কাছে এ কোন একটা সমস্যাই নয়।

আচ্ছা, ডুয়ার্স সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

তিনি দু-চার সেকেণ্ড চিন্তা করলেন। বললেন, বসুন। বলে আরেকটা বেতের মোড়া দেখিয়ে দিলেন। আমি বসলাম। তিনি বললেন, দেখুন একটা কথা বলি আপনাকে। ডুয়ার্স-সম্পর্কে আপনি আমাকে ঠিক কি জিজ্ঞাসা করছেন, বুঝতে পারলাম না।

বললাম, আপনি কাল রাতে ফাল্টুকে ইতিহাস পড়াচ্ছিলেন, আমি শুনছিলাম। শুনতে শুনতে আমার মনে প্রশ্নটা এল।

বলুন। আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত আপনাকে জবাব দিতে চেষ্টা করব।

তিনি স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকলেন।

আমি বললাম, আমার মনে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

সেটাই স্বাভাবিক। হরিপদবাবু বললেন, দেখুন আমার কাকা ছিলেন ইতিহাসের একজন কৃতবিদ্য অধ্যাপক। তাঁর কাছে ইতিহাস পড়েছি আমি। তবে বি-এটা পাশ দেবার পর আর লেখা-পড়া হয় নি। বাবার কথামত শেষ পর্যন্ত গুরুগিরির বংশগত পেশায় ঢুকে পড়তে হল।

তাঁর মুখখানায় বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগল।

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না, ডুয়ার্সের একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, যা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই নি।

হরিপদবাবু বললেন, দেখুন সত্যি-কার ইতিহাস বলতে আমরা কি বুঝি? মানুষের কথা। মানুষের জীবন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাঁচাবার জন্য তাদের সংগ্রাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা উপেক্ষিত হয়েছে। রাজারাজড়াদের জীবন, তাদের উত্থান-পতন—ধরুন গিয়ে তাদের ব্যক্তিগত কীর্তি এগুলোই আমাদের কাছে ইতিহাস। সেদিক থেকে চিন্তা করলে প্রকৃত ইতিহাস আমাদের লেখাই হয় নি। তাছাড়া, আপনি ডুয়ার্সের কথা বলছেন। সে ত' আরো অগাধ জলে। সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তা-রের জন্য দিনের পর দিন ইংরাজকে এখানে যুদ্ধ করতে হয়েছে দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিগুলির সঙ্গে। কিন্তু সে-ও তো এখন অতীত। ডুয়ার্স তো আর এখন ভারতবর্ষের বাইরে কোন এলাকা নয়, কাজেই মানুষের যথার্থ

আজই সংগ্রহ করুন

সদ্য প্রকাশিত

মনোরঞ্জন রায়ের

কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা

কোন পথে?

শত্রুরা শত বুলেটে যে কমিউনিস্টদের ঘায়েল করতে পারে নি, ধনীরা চিনি-মাখান বুলেটে কি করে তাদের ঘায়েল করে তারই বিবরণ পুস্তিকাখানিতে পাবেন। মূল্য : ৬০ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান :—

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

১/২, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা—১

নিউ বুক সেন্টার

১১৫/১, বিধান সরণী, কলিকাতা—১

ইতিহাস যদি কখনো লেখা হয়, তার কথাও লিখতে হবেই।

একটু থেমে হরিপদবাবু বলেন, আরেকটা কথা বলি আপনাকে। আমাদের ছোটবেলায় যাই শেখানো হোক, একটা কথা আমরা জেনে ফেলেছি, যে-হাত কলে-কারখানায় খাটে, মাঠে লাঙল ধরে, সেই হাতের অধিকারীরাই প্রকৃত ইতিহাসের স্রষ্টা। ডুয়ার্সে তো চাষী-প্রজা কারখানার মজুরের কমতি নেই। একটা গোটা মহাদেশ চলছে এখানে মশাই। না আছে কি? নতুন-যুগের তীর্থ গড়ে উঠছে এখানে। এতগুলি কথা বলে তিনি কাগজের পাতায় ডুবে গেলেন।

হরিপদবাবুর কথাগুলি শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে রোমাঞ্চ হয়। তাঁর কথাগুলি ফাঁকা বুলি-সর্বস্ব কথা নয়। তিনি নির্বাচনে দাঁড়ান নি যে, ভোটারদের মনস্তুষ্টির জন্য সাজানো কথা বলবেন। কথাগুলি গভীর বিশ্বাসের। অথচ বাইরে দেখে তাঁকে সে-রকম মনে হয় না।

হরিপদবাবুর ভায়রার কাছে শুনলাম তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস। ভালো ছাত্র ছিলেন। জলপানি পেয়ে পাশ করেছিলেন। কিন্তু পিতৃভক্ত মানুষ ছিলেন তিনি। তাই বাপের এককথায় সারা জীবনটা গ্রামে বসেই কুলদেবতা রাধামোহনের পূজা করে কাটিয়ে দিলেন। আর শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি গুরুগিরিও করেছেন দীর্ঘদিন। সবাই ভালোবাসতো তাঁকে। এমন সময় দেশ বিভাগ। দেশ ছাড়বার আগে-আগে একদা হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কুলদেবতা বিগ্রহ হল অপহৃত।

হরিপদবাবু কিন্তু দমলেন না এতে। এতটুকু দুঃখ করতেও শোনে নি কেউ তাঁকে। শুধু বাড়ির মহিলাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যে-ঠাকুর নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার এ-দশা হওয়াই ভালো।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
'ক্যাশল্যাস ডিল্যুক্স'
১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

তারপর অবশেষে দেশত্যাগ। মানসিকতারও অদ্ভুত পরিবর্তন। বাড়ি করেছেন সম্প্রতি ময়নাগুড়িতে। কার্যসূত্রে থাকেন বানারহাট। বড় ছেলেটিকেও নিজের কাছে রেখেছেন। ভায়রার বাড়ির একটি অংশে ভাড়াটে হিসেবে থাকেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। কারুর সাথে যোগাযোগ নেই।

চারটে দিন বানারহাটে ঘুরে কাটিয়ে দিলাম।

বাজারে বাজারে ঘুরলাম। নির্বাচনী পোস্টারগুলির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এরই মধ্যে জীর্ণ হয়ে এসেছে কাগজগুলি। বানারহাট আধুনিক ব্যবসার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

কি নেই এখানে? মাড়োয়ারী, ভুটিয়া নেপালী, বিহারী, মদেশিয়া, সাঁওতাল, পাঞ্জাবী, বাঙালী সব জাতির ব্যবসা আছে এ অঞ্চলে। হোটেল, কাপড়ের দোকান, লোহার ও গালামালের দোকান। বড় বড় ট্রাকগুলি দাঁড়িয়ে আছে। চালান হচ্ছে চা-ভর্তি বাক্স ও কাঠ।

আধুনিক ডুয়ার্সের প্রধান ব্যবসা এই চা ও কাঠ।

শুধু বানারহাটেই নয়, চা-বাগানে ব্যবসাসূত্রেই এসেছে বেশির ভাগ লোক। চা-কে কেন্দ্র করেই অন্য ব্যবসা। ডুয়ার্সে বিদেশাগত সকলেরই ওই এক পরিচয়। ব্যবসায়ী। বৈষয়িকতাসূত্রেই তাদের আগমন। যেচে সাধ করে কেউ আসে নি। ডুয়ার্সের সঙ্গে আছে তাদের অর্থগত সম্পর্ক। নেই হৃদয়গত কোন আদান-প্রদান। আসলে টাকাই যে বর্তমানকালের হৃদয়। অর্থমনর্থম্ মুখে যাঁরাই বলুন, আসলে টাকার ঝন-ঝনানিতে শুধু পকেট ভরে না, ভরে হৃদয়ও। যুবতী রমণীর হাসিতেও ফাঁসি যদি সেখানে টাকার অভাব থাকে।

ভক্তবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার দেশ ছেড়ে এখানে এলে কেন?

ভক্তবাহাদুরদের পদবী রাই। বাড়ি নেপালের ভদ্রপুরে।

ছোট ছোট চোখ, মোঙ্গলিয়ানদের ধাঁচের চেহারা। বেঁটে-খাটো। হাফ-প্যান্ট পরণে। দাঁড়িয়েছিল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ঠিক উল্টোদিকে এক পানের দোকানের কাছে। আমার সঙ্গে আলাপ হল।

দেশ ছেড়ে এখানে এলে কেন?

ভক্তবাহাদুর বলল, তাদের দেশে ভীষণ শীত আর জমি-জমা বিশেষ নেই। বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে হঠাৎ একদিন একজনের সঙ্গে দার্জিলিং চলে এসেছিল।

পদমবাহাদুরের সঙ্গে থাকল কদিন তিনধারিয়ায়। তারপর একদিন কে জানে কবে এখানে চলে এসেছে। সেই থেকে আছে এখানেই।

বিড়িতে টান দিলে ভক্তবাহাদুর। তাদের দিশি পদ্ধতির বিড়ি। বিশ্রীরকম কড়া গন্ধটা।

বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এলে?

জী হাঁ।

আর বাড়িই যাও নি?

জী।

আমিও একটা সিগারেট ধরাবার জন্য তাকে নেপালীভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম, মেচিস্ হ?

অর্থাৎ দেশলাই আছে কি না।

সে তার হাফপ্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেশলাই বার করে দিল। সিগারেট ধরিয়ে আবার বললাম, আর বাড়িই যাও নি।

ভক্তবাহাদুর ঘাড় নাড়ল।

তোমার বাবা ভাবে না?

ভক্তবাহাদুর বলল যে, বাবাকে সে অবশ্য তার এখানে থাকবার খবর জানিয়ে দিয়েছে।

কি করে জানালে?

পদমবাহাদুর গিয়েছিল। তার সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছে সে। হাত-চিঠি পাঠিয়েছে। যদিও কি না বাপের কোন জবাবই আসে নি।

এখানে তুমি কতদিন আছ?

ভক্তবাহাদুর হাসল। তারপর যা বলল, তার অর্থ এই যে, সে এখানে সাদি করে ঘর-সংসার পেতে ফেলেছে।

বাবু, এই যে পানের দোকান দেখছ, জেনানা আদমি পান বিকোচ্ছে, ওই মাইজিকে আমি বিয়ে করেছি চার বছর। কোলের কাছে ওই যে ছোট্ট ছেলেটি আমার ছেলে—

চোখ তার বড় বড় হয়ে উঠল।

তুমি তাহলে কি কর? ওই পানের দোকান চালাও?

জী? ভক্তবাহাদুর আমার কথা প্রথমে বুঝতে চাইল। তারপর বলল, বাজারে ওই যে লছমন সিং আছে না, ওর দোকানে কাজ করি। একটু থেমে ভক্তবাহাদুর রাই বলল, আর বছর চাল বেলেক্ করে বহুৎ রূপেয়া কামাই করেছিল। আভি ই সাল ভি রেখেছিল। ভোট হয়ে যেতে সব ধান বাজারে বিকায়ে দিল।

কেন ছেড়ে দিল কেন? সে-প্রশ্ন আর করি নি। তবে একটা কথা মনে হয়, ডুয়ার্স আধুনিককালের ঐশ্বর্য-ক্ষেত্র। রত্নভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে তার দিকে দিগন্তরে। যুগ-যুগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রস্তরপুঞ্জ সবাও পাবে নানা মূল্যবান ধাতু। কোটি কোটি টাকার

রাসায়নিক তৈল, তামার খনি, ডলামাইট, আরও কত মূল্যবান সম্পদ।

অতীতের রেকর্ড দেখছি, Limestone is found in the reserved forest near Buxa. Copper is to be found at Chunabatti, about two miles from Buxa. The mine there used to be worked by Nepalis......ইত্যাদি ইত্যাদি। তামার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছিল সে-যুগের জুওলজিক্যাল সার্ভের কাছে। উত্তরও এসেছিল, The specimen is a fair specimen of barinte, a purple copper ore, marked with thin crusts of green malachite (Carbonate of Copper). It contains 65 per cent of Copper and about 12 of iron, the remainder being the sulphur in combination.

শুধু কি তাই? ডলামাইট আত্মগোপন করে আছে ডুয়ার্সের মাটিতে। এ-যুগের লৌহশিল্পের এক মূল্যবান উপাদান। ময়দানবের পুরী তৈরির কথা পড়েছিলাম মহাভারতে। একালের বিজ্ঞান সেই ময়দানব। সারা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিচ্ছে মুহূর্তে-মুহূর্তে। গোটা ভারতবর্ষ গড়ে উঠছে পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ভারী ভারী শিল্প-কারখানাগুলি গড়ে উঠছে। দুর্গাপুরে, ভিলাইতে, মাইথনে, টাটায়। ব্লাস্ট্-ফার্নেসের আগুনের শিখা রাতের ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে। ডলামাইট সেই লৌহ-শিল্পের সম্ভাবনাকে বহন করছে।

সহসা সুদূর লোক থেকে রবীন্দ্র-নাথের কলি মনে আসে—

ইঁটের পরে ইঁট তাহে মানুষ-কীট
নাইক ভালোবাসা নাইক মায়া।

একটি নম্রশতদল বধূর মূর্তি মনে আসে। ঘোমটা ঢাকা। নগরসভ্যতার প্রাণহীন নির্দয়তার ইঙ্গিত করেছেন কবি। কিন্তু সে তো পাথরে-বাঁধানো নগর। ডুয়ার্স প্রকৃতির শান্ত কোমল স্নেহচ্ছায়ায় সুশ্যামল দেশ। মানুষের জীবনে ভালোবাসা সুখ মায়ামমতার অভাব ছিল না এই কিছুদিন আগেও। সভ্যতার বিস্তারের প্রয়োজনে মানুষকে হাত বাড়াতে হয়েছে এখানেও। পাথরে গাঁইতি চালাতে হচ্ছে। ডিনামাইট জ্বালিয়ে টুকরো করতে হচ্ছে পাঁজর। তার পীচ বাঁধানো রাস্তাগুলো দিয়ে দিনরাত্রি ছুটে চলেছে বনজ ও খনিজ সম্পদে বোঝাই ট্রাক। বাসের চাকায় কালো ফিতের মত চকচকে রাজপথ জড়িয়ে নিচ্ছে। বাড়ি-গাড়ি আর ব্যাংক ব্যালেন্সের স্বপ্নে বিভোর বসে আছেন কোন বাবু। রাত্রি জেগে জেগে হাজিরা খাতায় কুলিদের আঁক কষছে কোন বঙ্গ-সন্তান। নিরীহ এবং গোবেচারী।

কিন্তু তবু তারই মধ্যে মূর্তি ধরে জেগে উঠছে ডুয়ার্স। স্বতন্ত্র স্বকীয় মূর্তিতে। যুগ-ইতিহাস ও তার নিজস্ব হৃদয়ের মিলনে রচিত হচ্ছে নতুনকালের ইতিহাস।

হরিপদবাবুর কথাগুলি মনে হয়, একটা গোটা মহাদেশ চলছে এখানে মশাই। নতুন যুগের তীর্থ গড়ে উঠছে এখানে।

[ক্রমশ]

কলগেট ব্যবহার করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন ও সারাদিন দন্তক্ষয় রোধ করুন!

কারণঃ একবার মাত্র কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই দুর্গন্ধ ও ক্ষয়ের জন্য দায়ী বীজাণুর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং কলগেট প্রক্রিয়ায় খাওয়ার ঠিক পরেই দাঁত ব্রাশ করলে বেশীর ভাগ লোকের দন্তক্ষয় রোধ করা যায়—আজ পর্যন্ত দন্ত-চিকিৎসার ইতিহাসে যেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি! আর একমাত্র কলগেট'এর সেই প্রমাণ আছে।

কী সুন্দর এর পিপারমেন্টের স্বাদ—তাই ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালবাসে!

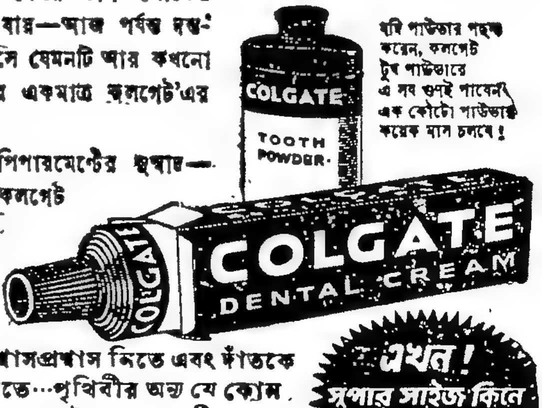

যদি পাউডার পছন্দ করেন, কলগেট টুথ পাউডারে এ সব গুণই পাবেন। এক কৌটো পাউডারে কয়েক মাস চলবে!

পরিচ্ছন্ন নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে এবং দাঁতকে উজ্জ্বল সাদা করতে...পৃথিবীর অন্য যে কোন টুথপেষ্টের চেয়ে কলগেট অনেক বেশী লোক কেনেন।

এখন! সুপার সাইজ কিনে ...পয়সা বাঁচান!

DC.P.18 BN

পাঠক মন

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল ? প্রসঙ্গে

গত ২০শে মার্চের সাপ্তাহিক বসুমতীতে মুরশিদ দীর্ঘ এক প্রবন্ধ বিস্তার করে ২৭শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত আমার পত্রটিকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন। সে পত্রে আমি বলেছিলাম, সঙ্গীত জীবনাশ্রয়ী। জীবন গতিশীল পরিবর্তনধর্মী, সঙ্গীতেরও তাই রূপান্তর ঘটবে। কারণ জীবনের 'ঘট' থেকেই সঙ্গীত তার রস আহরণ করে এবং জীবনের তাগিদেই তা পরিবেশন করে। সংগীত যেখানে জীবনের সঙ্গে যোগ হারায়, সঙ্গীত সেখানে অনেকটা 'সং'-এর পর্যায়ে পড়ে, সেখানে আর সে 'গীত' থাকে না। অর্থাৎ সেখানে সে আমাদের অতীত-চর্চার ক্ষিদে মেটায়, তার রসে-রাগে আমাদের মন ভরায় না।

কাজেই আমি বলতে চেয়েছিলাম 'রূপান্তরই জীবনের ধর্ম'। লোকসঙ্গীতও জীবনাশ্রয়ী। তার রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী।

সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা মানুষের মানসরাজ্যের 'ভাব-মহলে'র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, লোকসঙ্গীতের ভাবে, ভাষায়, এমন কি অনেকক্ষেত্রে তার গায়কীতেও পরিবর্তন দেখা দেবে, আর তা নদীর স্রোতের মতোই সহজ ও স্বাভাবিক। সঙ্গীত, বিশেষ করে লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্র দুনিয়ার কোন দুরন্ত স্বেচ্ছাচারীও 'শ্যামের গন্ডী' এঁকে দিতে পারে না। বলতে পারে না, 'এখানেই থামো, আর এগিয়ো না।'

সে অর্থে 'ট্রাডিশন' কথাটির অর্থ কোন একটি বিশেষ গন্ডীতে লোকসঙ্গীতকে বেঁধে রাখা নয়, মানুষের ভাবনার যে 'ট্রেন' ছুটেছে পেছন থেকে সুমুখের দিকে, সেই অগ্রসরমান ধারাবাহিকতার নামই 'ট্রাডিশন'। সেখানে তার চলমান পা দুটিকে গোঁড়ামির কাস্তে দিয়ে কেটে নিলে, সে 'ট্রেন' লাইনচ্যুত হয়। ট্রাডিশনে সেখানে ছেদ পড়ে। এ প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি। তার আগে বাংলার লোকসঙ্গীতের ইতিহাস এ সম্বন্ধে কি বলে সে দিকটায় একবার তাকানো যাক।

বাংলার লোকসঙ্গীতের আদিরূপ কি ছিল— তা আমাদের জানা নেই। যোগীপালের গানের কথা আমরা শুনেছি, অদ্যাবধি তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। বৌদ্ধধর্মের পড়তির যুগে, আজ থেকে হাজার বছর আগের চর্যাপদের নমুনা আমাদের হাতে আছে। 'কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল'— চর্যাপদের এ ধরণের গানকে বাংলার দেহতত্ত্ব গানের পূর্বরূপ বলে ধরে নেওয়া চলে। কিন্তু এর পরবর্তী যুগেই সাধারণ বাঙালীর ভাবনার ঘরবদল হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও তার পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত-বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সেই ঘর বদলের ছাপ সুস্পষ্ট। 'কানু ছাড়া গীত নাই' 'ধান ভানতে শিবের গাজন'—ইত্যাদি প্রবচনের মধ্যে একটি সত্যই লুকিয়ে আছে যে, বাঙালীর ভাবের ঘরে যখনই যে ভাবনা নাড়া দিয়েছে, লোক-কবিরা তখনই তা নিয়ে গান বেঁধেছেন, সে গান গেয়ে মানুষকে শুনিয়ে আনন্দ পেয়েছেন। পরবর্তী যুগের লোকসঙ্গীতেও এই ভাব বদলের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে জাতির স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা কিভাবে বাংলার লোককবি, তথা লোকসঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছিল, পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলায় প্রচলিত দুটি গানের কলি উদ্ধৃত করলেই তার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

গান দুটি এইরূপ :—

(১)

সাজাইব, শ্যাম সাজাইব,
সাজাইব বাঙালী মেয়ে;
কাপড় দিয়ে সাজাইব,
গান্ধীরাজার নাম লিখিব
...ইত্যাদি,

(২)

সাজোরে ভারতসন্তান
স্বদেশী সাজন,
কাপড়েতে লেইখ্যা দিব
বন্দেমাতরম।......ইত্যাদি

এরও পরবর্তী যুগের বহু লোকসঙ্গীতের কলি উদ্ধৃত করে দেখানো যায় যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর ভাবনার ঘরেও রং বদল হয়েছে। আর তার ছাপ পড়েছে শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে। ওপরে উদ্ধৃত প্রথম বিয়ের গানটি বিশ্লেষণ করলে এই রূপান্তরের পথ-রেখাটি স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায়। শ্যাম সাজাতে গিয়ে তার কাপড়ে 'গান্ধীরাজার' নামটি না লিখলে যেন মন ভরে না। এরই নাম যুগপ্রভাব। এরই নাম স্থিতি (থিসিস) ও প্রতিস্থিতির (এ্যান্টি থিসিস) দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি সংস্থিতি বা সিনথিসিস্।

অবশ্য, আলোচ্য প্রবন্ধে মুরশিদ এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি। অসতর্কতাবশতই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক সেখানে তাঁর গোঁড়ামীর অন্ধকার দুর্গে ফাটল ধরেছে। আর সেই ফাটল দিয়ে দু'-এক ঝলক সূর্যালোক হঠাৎ উপস্থিত হয়ে অন্ধকারের ভূত-প্রেতগুলিকে তাড়াবার চেষ্টা করেছে। কিংবা জানিতভাবেই শেষ পর্যন্ত তিনি মুখ ফিরিয়ে সেই বৈজ্ঞানিক সত্যকে পুজো দিয়েছেন। তবে সে পুজো চাঁদ বেনের মনসা পুজোর মতো অপ্রসন্নমনের বাম হাতের পুজো।

তিনি বলেছেন, "লোকসঙ্গীতে আধুনিক রচয়িতার যোগ্যতার মাপকাঠি কি হবে, আধুনিক রচনার প্রকৃতি কি হবে—কতদূর তা সমর্থনযোগ্য, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। স্বীকৃত রীতিগুলি রচনা করার অধিকার নিশ্চয়ই বুদ্ধদেববাবুর আছে। সে দিক দিয়ে আমার কোন গোঁড়ামী নেই।" (পৃষ্ঠা ২৪৮০, সাপ্তাহিক বসুমতী ২০শে মার্চ)

কিংবা,

"এখানে কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন সুদূর ভবিষ্যতে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে যখন গ্রাম ও নগরের পার্থক্য আর থাকবে না তখন লোকসঙ্গীতের কি অবস্থা হবে? এটা নিশ্চয়ই একটা আলোচ্য বিষয়।" (পৃষ্ঠা ২৪৮৩, সাঃ বসুমতী ২০শে মার্চ)

মুরশিদের এই মন্তব্য থেকে এটা ধরে নিতে হবে যে, অন্তত এখন তিনি বিশ্বাস করেন, অবস্থাভেদে লোকগীতিরও পরিবর্তন ঘটে। এমন কি লোকগীতির 'ফর্ম' ও 'মুড' বজায় রেখে কোন আধুনিক লেখকও লোকগীতি রচনা করতে পারেন। সে গীত কে রচনা করেছেন, সে প্রশ্ন সেখানে গৌণ, যা তিনি রচনা করেছেন সেটি লোকগীতি হয়েছে কি না, লোকগীতির 'ফর্ম' ও 'মুড' সেখানে বজায় আছে কি না, সে প্রশ্নই সেখানে মুখ্য।

জনাব মুরশিদ যেখানে কতকগুলি রাজনৈতিক দলের ইস্তাহার ঘেঁটে, গলদঘর্ম হয়ে, প্রমাণ করতে নেমেছেন, গত বিশ বছরে দেশের কোন উন্নতি হয় নি, সেখান থেকে কি এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না যে, জনাব মুরশিদ

বিশ্বাস করেন, দেশের উন্নতি হলে লোকসঙ্গীতেরও পরিবর্তন ঘটে? তা না হলে সংস্কৃতির আসরে কতকগুলি রাজনৈতিক তর্কের ধুলো উড়িয়ে লাভ কি?

তিনি যদি আজকের আবেগে সুড়-সুড়ি দিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতির সুস্থ আসরে কতকগুলি তথ্যের জঞ্জাল এনে উপস্থাপিত করে থাকেন, তা হলে বলবো তাঁর সে প্রচেষ্টা রীতিমতো হাস্যকর উদ্যোগ। এ অনেকটা যাত্রার ভীমের ন্যায় হয় কথায় নয় কথায় গদা ঘোরানোর কৌতুককর প্রচেষ্টার সামিল।

গত বিশ বছরে দেশের উন্নতি হয়েছে কি হয় নি, সে তর্ক সম্পূর্ণ 'পলিটিক্যাল'—পলিটিক্সের আসরেই তার মীমাংসা হবে। আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকুই—দেশের যা কিছুই পরিবর্তন হয়ে থাক, যতটুকুই তার উন্নতি হয়ে থাক, তাতেই গ্রাম-বাংলার মানুষের ভাবের ঘরে রূপান্তরের ঢেউ লেগেছে। মানুষের রুচি, জীবনবোধ ও বিশ্বাস পাল্টেছে এবং পাল্টাচ্ছে। আর তারই ছাপ পড়েছে লোকসঙ্গীতেও। জনাব মুরশিদ যেখানে বলেছেন 'বিপরীত ধারা হিসাবে সংগ্রামী বৈপ্লবিক চেতনাও ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—এবং সেই নব্য চেতনাই নব সংস্কৃতির যেমন ভিত্তি রচনা করছে, লোক-সঙ্গীতেরও রূপান্তরের মাটি তৈরি করছে।—সেখানে তিনি আমাদের বক্তব্যকে পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। গোঁড়ামীর অন্ধকার খোপ থেকে সত্যের সর্বালোকে এসে দাঁড়ালেই তিনি দেখতে পেতেন, লোক-সঙ্গীতের রূপান্তরের মাটি তৈরি করছে না—সে রূপান্তরের কাজ প্রতি মুহূর্তে চলছে। নদীর স্রোতের মতো সংস্কৃতি তথা লোকসঙ্গীতের ধারাও সম্মুখের দিকে ধাবমান। সে কোথাও থেমে থাকবে না, থেমে থাকে না। এই চল-মানতাই প্রমাণ করে যে সে বেঁচে আছে।

আমাদের গ্রামগুলির উন্নতি হচ্ছে—এ-কথা বলায় মুরশিদ যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছেন। চীৎকার করে তিনি তাই প্রশ্ন তুলেছেন, এ কার কণ্ঠ-স্বর? সেখানে তিনি মধ্যবর্তী নির্বা-চনের কথা বলেছেন, কংগ্রেস দলের কথা বলেছেন। সম্ভবত আমাকে কংগ্রেস দলের উকিল বানিয়ে জনাব মুরশিদ বাংলাদেশের কংগ্রেস বিরোধী মনো-ভাবকে তাঁর নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করেছেন। জনাব মুরশিদের এ প্রচেষ্টা নিন্দার্হ। কারণ তিনি আসল বিচার থেকে দূরে সরে, রাজনৈতিক কূটতর্কের ধুলো ছিটিয়ে পাঠকদের সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিতে চেয়েছেন।

মুরশিদের অবগতির জন্যে জানাই আমি কংগ্রেসী নই, কম্যুনিস্টও নই। আমি একজন সাধারণ সংস্কৃতিকর্মী।

আমি বিশ্বাস করি, বঙ্গ সংস্কৃতি কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়, কোন রাজ-নৈতিক দলের তো নয়ই। লোকসঙ্গীতের রূপান্তরের পথ-রেখাটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যেই আমি গ্রাম বাংলার তথ্যনির্ভর একটি উন্নতির চিত্র তুলে ধরেছিলাম। সেটি হলো বৈজ্ঞানিক সত্যকে তুলে ধরার ইচ্ছা, কোন রাজ-নৈতিক দলের দালালি করা নয়।

মুরশিদ বলেছেন, আমার এ চিন্তা-ধারার 'বিসমিল্লাতে'তেই গলদ। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, দেশের আদৌ কোন উন্নতি হয় নি, গ্রাম বাংলার চেহারার বা সেখানকার মানুষের মানসপ্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

গ্রাম বাংলার উন্নতি হয়েছে কি হয় নি তা মুরশিদ নিজে একবার গ্রাম বাংলা ঘুরে এলেই বুঝতে পারবেন, তবে সে ক্ষেত্রে তাকে তাঁর চোখের বিশেষ মতবাদের লাল ঠুলিটি খুলে যেতে হবে।

মুরশিদ স্বীকার না করলেও তাঁর বর্ণীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার কিন্তু দেশের উন্নতির কথা স্বীকার করে-ছেন। শুধু তাই নয় তিনি বলেছেন, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটছে। শ্রীযুক্ত হালদার বলেছেন 'যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে আজ কিছু গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে। কৃষি উন্নয়নের দিক হইতে সেচের ও বাঁধের যে সব আয়োজন হইয়াছে, এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে চেষ্টা হইয়াছে গত দুই শত বৎসরের ইংরেজ রাজত্বে তাহা অভাবনীয় ছিল।...

শিল্পবুদ্ধি আমাদের প্রয়োজনানু-রূপ নয়, কিন্তু শিল্পের উৎপাদন প্রতি পরিকল্পনাতেই কিছু বাড়িয়াছে।...... সত্য বটে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন করিতে কর্তৃপক্ষ বিলম্ব করিতেছেন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায়ও ইংরেজ আমলে আমরা এই নীতি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে দিয়া স্বীকার করাইতে পারি নাই, তাহা স্মরণীয়।'

[সংস্কৃতির রূপান্তর (সপ্তম সংস্করণ) পৃষ্ঠা ২৬৬ ও ২৬৭]

তিনি লিখেছেন, 'জীবনযাত্রায় মৌলিক পরিবর্তন আসিলে চিন্তায়—কল্পনায়ও তাহার ছাপ পড়ে। কৃষির প্রবর্তনেও তাই সমাজের রূপ বদলাইয়াছে আর চিন্তার গড়নে নূতনত্ব আসিয়াছে। তেমনি বৈজ্ঞানিক জীবনধারার প্রচলনেও সমাজ পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে—তাহাকে বাধা দেওয়া অসাধ্য,—আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তায়ও নূতনত্ব আসি-তেছে। মানুষের সভ্যতা বিজ্ঞানের প্রয়োগে নব কলেবর ধারণ করিতেছে, মানুষের সংস্কৃতিও সঙ্গে সঙ্গে রূপান্ত-রিত হইয়া চলিয়াছে।

[সংস্কৃতির রূপান্তর (সপ্তম সং) পৃষ্ঠা ৩১৮]

মুরশিদের চিন্তাধারা যাঁর জীবন-দর্শনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলে শুনেছি। সেই মার্ক্সও এই একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন:

'It is not consciousness of men that determines their existence, but, on the contrary, their social existence determines their consciousness.'

(A contribution to the critique of Political Economy: Author's Preface.)

অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের ছাপ মানুষের মনের ওপর পড়ে এবং এইভাবেই মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে। কাজেই এই সামাজিক বিবর্তন বা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক ও মেজাজেও যে পরিবর্তন আসবে—সেটা খুবই স্বাভাবিক।

আলোচ্য প্রবন্ধে মুরশিদ একটি স্ববিরোধী উক্তি করেছেন ও এক জায়গায় তিনি বলেছেন,—'শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে যখন গ্রাম আর নগরের পার্থক্য আর থাকবে না তখন লোকসঙ্গীতের কি অবস্থা হবে? এটা নিশ্চয়ই একটা আলোচ্য বিষয়।' অন্য জায়গায় আবার বলেছেন, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রাশিয়াতে আমরা দেখি একদিকে দ্রুত শিল্প বিকাশ কিন্তু অন্যদিকে নাম-না-জানা প্রায়-লুপ্ত জাতিগুলির এবং বিশেষত মধ্য এশিয়ার অবজ্ঞাত জাতিগুলির নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর বিকাশ। সঙ্গে লোকসঙ্গীতের ও লোকনৃত্যের ছয়লাপ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটা বিপরীত, কিন্তু সমাজতন্ত্রী শিল্পায়নের এই ধারা—বহু জাতি বহু ভাষার মুক্তির সাথে সাথে লোকসঙ্গীত ঘর বদল করে না বরং হারানো ঘরে ফিরে আসে।'

মুরশিদের এই দুটি মন্তব্য পাশাপাশি রেখে বিচার করলে তাঁর বক্তব্যের স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় না কি?

দেশের শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন আসে—ওপরের আলোচনায় সেকথাটা আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এই চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক ও মেজাজেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। তাছাড়া একটা জাতির নব জাগৃতির যুগে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের দ্বারের আদান-প্রদানও স্বাভাবিক। আর সেই পথেই একের প্রভাব অন্যের ওপর পড়তে বাধ্য। পৃথিবীতে যুগে যুগে মানুষের রক্তের যেমন সংমিশ্রণ ঘটেছে, তেমনি সংমিশ্রণ ঘটেছে তার সংস্কৃতিতে তথা লোক-সঙ্গীতে। আমাদের বিভাগোত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীতের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখলে সেকথাটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। কাজেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পরেও রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত কি করে পরিবর্তনের ঢেউকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে তা আমরা বুঝতে পারি নে। এটা মানুষের চোখ ঝলসানো প্রচারণা হতে পারে, কিন্তু এটা সত্য নয়। কারণ বিজ্ঞান তার পক্ষে রায় দেয় না।

অনেক কথার পর আমরা আবার আমাদের মূল বক্তব্যে এসে দাঁড়াতে চাই। আমরা বলতে চাই, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের আঙ্গিক ও মেজাজেও পরিবর্তন আসবে। যে রক্ষণশীলের দল নিজেদের ভ্রম ও অহঙ্কারে এই পরি-বর্তনের রথকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইবে, মহাকাল তাদের সে অহঙ্কারকে গুঁড়িয়ে চূর্ণ করে দিয়ে চলে যাবে।

তবে গবেষণার মাধ্যে বা মানুষের অনু-সন্ধিৎসার খোরাক যোগানোর জন্যে বিভিন্ন যুগের লোকসঙ্গীতকে 'রেকর্ডে' বা 'টেপে' ধরে রাখা বাঞ্ছনীয়। সেসব 'রেকর্ড' ও 'টেপ' রক্ষার জন্য সংরক্ষণশালাও চাই। জনাব মুর্শিদ যদি সেই কাজটি করার জন্যে দেশের সরকার ও মানুষের মনে উৎসাহের সঞ্চার করতে পারেন—তাহলে তিনি বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। সেদিক চিন্তা না করে তিনি যদি লোক-সঙ্গীতের রূপান্তরকে বিকৃতি বলে মনে করেন, একালে লোকসঙ্গীতের আকাল হয়েছে বলে অযথা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তাহলে তাঁর সে চেষ্টা সংরক্ষণশীলের গোঁড়ামী ও বিক্ষোভ বলেই ধিকৃত হবে।

—বুদ্ধদেব রায়
উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড,
কলকাতা—৪

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের ওপর প্রতিহিংসা প্রসঙ্গে

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'বঙ্গ-দর্শনে' 'বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের ওপর প্রতিহিংসা' সংবাদটি পাঠ করে বিশেষভাবে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। মনে হচ্ছে আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগে বাস করে সেই আদি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনটাকে ফেলে দিতে পারি নি।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞান জগতে মুখোজ্জ্বলকারী বিশ্বনন্দিত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে প্রথম বলি হতে হবে। বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনা ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম স্মরণ না করলে প্রত্যবায়ভাগী হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। ইনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'খয়রা' অধ্যাপক; কি মানুষ হিসাবে, কি বিজ্ঞানী হিসাবে সত্যেন্দ্র-নাথ বসুর স্থান কোথায় তা সামান্য কয়েকটি শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞানী হিসাবে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে তাঁর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। Bose Einstein Statics বিজ্ঞান সাধনার জগতের এক অতীব অমূল্য সম্পদ। তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। ভারতের যে সকল কৃতী বিজ্ঞানী সন্তান ভারতবর্ষের সম্মানকে বিদেশীদের কাছে তুলে ধরেছেন, যাঁদের গবেষণা জগতের অমূল্য সম্পদরূপে স্বীকৃত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক বসুর নাম পুরোভাগে। তাছাড়া বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে শ্রদ্ধাস্পদ।

এইরূপ একজন মুখোজ্জ্বলকারী কৃতী ভারতমাতার সুসন্তানকে রাজ-নৈতিক যূপকাষ্ঠে বলি প্রদান করার প্রধানতম কারণ হচ্ছে তিনি ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভার কার্যের সমালোচনা করেছিলেন। যার ফলে অধ্যাপক বসুকে জাতীয় অধ্যাপকের পদ থেকে অপসারিত করার জন্য বিশেষ-ভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে, কিন্তু ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় একবার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন, তিনি কোন্ জগতের লোক—বিজ্ঞান জগতের, না রাজনৈতিক জগতের? কিন্তু যাঁরা প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ তাঁরা পদের লোভে অসত্যের কাছে কোনদিনই মাথা অবনমিত করবেন না। অধ্যাপক বসু তাঁদের দলেরই একজন। অথচ আমরাই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করি—'India is a greatest Democratic country in the world'. অথচ সেই গণ-তান্ত্রিক মাটিতে এরূপ অগণতান্ত্রিক কার্যাবলী। গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকটি মানুষেরই মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। যদি সেই মত প্রকাশের অধিকারকে কোন মানুষ কার্যকরী করে; তা হলে তাকে কায়েমী স্বার্থ মানুষের দল হাতে না মেরে ভাতে মারবেন? কিন্তু তাঁরা কি চিন্তা করে দেখেছেন অধ্যাপক বসুকে অপসারিত করা হলে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনা কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলে সেই ক্ষতিকে ভারতবর্ষের মানুষ কি ভালমনে গ্রহণ করবেন? যদি অধ্যাপক বসুকে ন্যায় ও স্পষ্টবাদিতার জন্য জাতীয় অধ্যাপকের পদ থেকে অপসারিত হতে হয়, তাহলে ভারতবর্ষের আরও কত নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ব্যক্তিকে স্পষ্ট-বাদিতার জন্য, আরও কত মূল্যবান পদ থেকে অপসারিত হতে হবে, তা একমাত্র অন্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন।

যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের নির্বাচিত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
গুসকরা, বর্ধমান

'আমার ইউরোপ ভ্রমণ' প্রসঙ্গে

ত্রৈলোক্যনাথের A visit to Europe-এর দুটি অধ্যায় মাত্র সাপ্তাহিক বসুমতীতে (২০-৩-৬৯) প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে এ এক আশ্চর্য ঘটনা। পত্রলেখক মূল বই চোখে দেখেন নি, অনুমান করি, এবং সমস্ত বইতে কি আছে জানেন না। তবু সমস্ত বইতে কি আছে বুঝতে পেরেছেন। তাই আপত্তি। যুক্তিটা এই যে, আইনস্টাইন ইউরোপীয় (ইহুদি) অতএব এককালে তাঁর মনে রিলেটিভিটি বিষয়ে কি চিন্তাধারার প্রকাশ হয়েছিল, তা দিয়ে আমাদের কি কাজ? ইউরোপের ইতিহাস আমাদের পড়া উচিত নয়। ইত্যাদি। হাস্যকর যুক্তি! ইংরেজী সাহিত্যই বা পড়ার দরকার কি?

দ্বিতীয় আপত্তি মূল বই না দেখেও অনুবাদ বিষয়ে মন্তব্য করা। সঠিক অনুবাদে আপত্তি। কায়ানুবাদ হলে বোধহয় তাঁর পছন্দ হত। কিন্তু তাঁর রুচি ও পছন্দের উপর জাগতিক বিষয় নির্ভর করে না।

—পরিমল গোস্বামী
২৫. ৩. ৬৯

রঙ্গমঞ্চে ওয়েস্ট এণ্ড

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গেইট থিয়েটার ও নর্ম্যান মার্শাল: এই সিজনের শেষ প্রডাকসন হিসাবে ঠিক করা হয়েছিল মরিস রসট্যান্ডের 'দি ট্রায়াল অভ্ অস্কার ওয়াইল্ড'। ফ্র্যাঙ্ক পেটিংগেল ওয়াইল্ডের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড অভিমত দিল যে, কয়েক বছরের ভেতর ভূমিকাভিনয়ের ব্যাপারে এমন অসাধারণ নির্বাচন আর কখনও হয় নি। স্ট্যান্ডার্ড লিখলো যে, লণ্ডনের দর্শকেরা পেটিংগেলকে অমার্জিত ভাঁড়ের ভূমিকায় দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কয়েকটি মহলার পরই বোঝা গেল এই সুদক্ষ অভিনেতা এই ভূমিকায় অদ্ভুত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যাবেন।

দিন চোদ্দ রিহার্সালের পর বেশ কয়েক পাতার এক দীর্ঘ টেলিগ্রাম পেলাম লর্ড এ্যালফ্রেড ডগলাসের কাছ থেকে। তিনি তীব্রভাবে এই প্রডাকসনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেন।

[ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন অস্কার ওয়াইল্ডের জীবনের শনিস্বরূপ ছিলেন এই লর্ড এ্যালফ্রেড ডগলাস। ওয়াইল্ড যখন যশ ও খ্যাতির চরম শিখরে উঠেছেন সেই সময়েই এই ডগলাসরূপী কুগ্রহটি তাঁকে প্রায় নরকের দ্বারে এনে হাজির করলো। তারপর শুরু হল আইন-আদালতের ব্যাপার এবং শেষ পর্যন্ত অস্কারকে জেলে যেতে হল। জেলে থাকার সময় তাঁর প্রতি দুঃসহ পীড়ন এবং অত্যাচার চলেছিল। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর এই দুর্দান্ত প্রতিভাধর নাট্যকার যেন সব ক্ষমতাই হারিয়ে ফেললেন। লেডী উইন্ডারমেয়ারস্ ফ্যান, এ ওম্যান অভ্ নো ইম্পরট্যান্স, দি ইম্পরট্যান্স অভ্ বিয়িং আর্নেস্ট শ্রেণীর রচনা দিয়ে যে লেখক তাঁর নাট্যকারের জীবন শুরু করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে রঙ্গমঞ্চ আরও অনেক কিছু আশা করেছিল—কিন্তু অকালে এই মহাপ্রতিভাধর নাট্যকারের সৃষ্টিক্ষমতার অপমৃত্যু ঘটল।]

উপরোক্ত নাটকটির মূল সংস্করণে—এই ফর্মে নাটকটি প্যারিসে প্রদর্শিত হয়েছিল—লর্ড এ্যালফ্রেড ডগলাসকে একটি চরিত্র হিসাবে আনা হয়েছিল। হিউ রস উইলিয়ামসন নাটকটির যে ইংরাজী ভাবানুবাদ করেন তার থেকে ডগলাস চরিত্রকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও লর্ড ডগলাস আপত্তি তুললেন—কারণ হিসাবে দেখালেন যে এ-নাটকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে, যেই অস্কারের নামে কলঙ্ক রটলো, অমনি ডগলাস অস্কারকে বিপদে ফেলে সরে দাঁড়ালেন। আমি হোভে গিয়ে ডগলাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম—তিনি তাঁকে লেখা ওয়াইল্ডের শেষ জীবনের কয়েকটি চিঠি দেখালেন। এসব চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নাটকের বক্তব্য এবিষয়ে ঠিক নির্ভুল নয়। আমি স্বীকৃতি দিয়ে এলাম যে নাটকটির মহলা বন্ধ করে দেব। সুতরাং 'ভিক্টোরিয়া রেজিনা'-র শেষ প্রদর্শনীর সঙ্গেই সিজন শেষ হোল। এই সিজনে সতেরো পাউণ্ড লাভ হোল। এই লাভের মূলে একটা কারণ ছিল। গেইট থিয়েটারের স্থায়ী চকুরেরা—ম্যানেজার, স্টেজ ডিরেক্টর, স্টেজ ম্যানেজার প্রমুখ—দিনে বার ঘণ্টা করে কাজ করতো এবং মাইনে নিত সপ্তাহে মাত্র চার পাউণ্ড করে। প্রথম সিজনে আমি কোন টাকা নিই নি।

পরের সিজন খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল পুরনো গেইটের সভ্যদের অনেকেই চাঁদা পাঠিয়ে মেম্বারশিপ রিনিউ

"দি লিটল মাইকাস"-এ উইলি এডউইন

করলেন না। এ'দের বেশির ভাগই ছিলেন সেনসেশন-হাণ্টারস্—আমার থিয়েটারের প্রোগ্রাম তাঁদের নিশ্চয়ই অত্যন্ত সাদামাটা গোছের মনে হয়েছিল। এ সিজনের নটি নাটকের ভেতর পাঁচটি ছিল নিষিদ্ধ প্লে। পাবলিক শোয়ের অন্তরায় হিসাবে এক স্ট্রেইঞ্জ কম্বাট বাদে অন্য চারটিতে কোন সেক্স-ঘটিত ব্যাপার ছিল না। এগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এই জন্য যে, এসব নাটকের ভেতর এমন সব মানুষ এবং ঘটনাবলীর অবতারণা করা হয়েছিল যাকে সাম্প্রতিক এবং সমসাময়িক বলা চলে।

এর পরের সিজনের প্রথম দুটি নাটক ছিল—লিওনার্ড ফ্র্যাঙ্কের "কার্ল এ্যান্ড আনা' এবং স্নিট্‌জ্‌লারের 'আনাতোল'। এরপর হল জ্যাঁজাক্‌স্ বার্নার্ডের নতুন নাটক 'ন্যাশনাল সিক্স'—একই সময়ে এই নাটকটি প্যারিসের থিয়েটার দ্য লুভর্-এ প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

প্রধান নায়িকার ভূমিকায় অভিনেত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে আমাকে যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়। এই ভূমিকার জন্য দরকার পড়েছিল এমন একজন অভিনেত্রীর যিনি বয়সে যুবতী এবং স্বভাবে সরল—অথচ অপ্রাপ্তবয়স্কার বা ছলাকলাহীনার মত স্থূল মনোবৃত্তিসম্পন্ন নয়। বেশির ভাগ ইংরাজ অভিনেত্রীকে স্টেজে দেখলে মনে হয়, ইনি বয়স আন্দাজে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের, অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের। যৌবনের অকৃত্রিম সারল্য এদের ভেতর দেখা যায় না—কারণ এসব অভিনেত্রীর কেউ কেউ চেষ্টা করে দ্রুতগতিতে দেহের বয়সটা বাড়িয়ে ফেলায়, আবার কেউ কেউ যেন বাড়তেই চায় না। বহু যুবতী অভিনেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর মনে হল স্টেজে কখনও অভিনয় করে নি এমন একজন মেয়েকেই বেছে নিতে পারলে আমার এই নাটকের যোগ্য পাত্রী পাওয়া যাবে। মিস ফগার্টির স্কুলে জিল্ ফার্সকে আবিষ্কার করলাম। সমালোচকেরা অভিমত দিল যে, অভিনেত্রী হিসাবে সত্যিই জিল অসাধারণ এবং সূক্ষ্ম শিল্পপ্রতিভার অধিকারী।

যে সময়ের কথা বলছি তখন লণ্ডনের মঞ্চে যুবক অভিনেতা এবং যুবতী অভিনেত্রীদের ক্রমান্বয়ে অভিনয় করে যাবার সুযোগ মিলতো না। ক্রমাগত নিজেদের পক্ষে উপযোগী ভূমিকা পাবার জন্য তাদের এ-মঞ্চ থেকে ও-মঞ্চে ঘুরে বেড়াতে হোত। প্রডিউসারের পক্ষে ঐ বয়সের শিল্পীদের বছরের পর বছর ধরে নিজের অধীনে পেয়ে শিক্ষা দেওয়া বা তাদের শিল্পপ্রতিভাকে ফুটিয়ে তোলা এইজন্যই সম্ভব ছিল না। আমি কিন্তু এই সুযোগ পেয়েছিলাম জিলকে নিয়ে। তার জীবনে সে সবসুদ্ধ এগারটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিল—তার ভেতর আটটি আমার প্রডাকসনে। তাকে নিয়ে কাজ করবার সময় আমি লক্ষ্য করছিলাম ধীরে ধীরে তার প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠছিল। প্রতিটি নতুন রোলে অভিনয় করার সময় তার যশ এবং খ্যাতি বেড়ে যাচ্ছিল। সে ছিল

আত্মমগ্ন ধাতের মেয়ে—চারপাশের জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন—থিয়েটারের জগতের থেকে তো বটেই। এই বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের অন্তরের জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে, তার অভিনয়ে স্পষ্টভাবে একটা অসাধারণত্বের আমেজ মেশানো থাকতো। এই জন্যই তাকে ঠিক-ভাবে প্রডিউস করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এক্ষেত্রে প্রডিউসারকে দেখতে হত সাহায্য এবং উৎসাহের দ্বারা তাকে দিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে সম্প্রসারিত করতে হবে মঞ্চের ওপর—অথচ সেটা এমনভাবে করতে হবে যাতে তার বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরি-স্ফুটনে কোন কমতি না হয়। আত্মমগ্ন ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ একটা আপাতবিরোধী ব্যাপার বলে মনে হতে পারে, কিন্তু জিলের পক্ষে এই অসম্ভবকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল। তার প্রথম অভিনয় প্রদর্শনী দেখে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন যে, এই অভিনেত্রীটির ভেতর তিনি দেখেছেন—"the true magnetism from which great acting sometimes springs." তার সম্পর্কে সবাই খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতো—কিন্তু ইংলিশ থিয়েটারে তার যোগ্য স্থানে ওঠবার আগেই মৃত্যু এসে তাকে রঙ্গ-মঞ্চ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তার বয়স কুড়ির কোঠা ছাড়িয়ে ওঠবার আগেই ১৯৪৪ সালে তার মৃত্যু হয়।

ন্যাশনাল সিজ্নের পর মঞ্চস্থ হল সারা গার্বট্রুড মিলানের 'নো লণ্ডার মোর্ন'। এর বিভিন্ন প্রধান ভূমিকায় ছিলেন জেন ফ্র্যাঙ্কন ডেভিস, মারতাভানে এবং ওয়াল্টার হাড। এই সময় আমি 'ভিক্টোরিয়া রেজিনা'-র আমেরিকান প্রডাকসনের জন্য নিউ ইয়র্কে ছিলাম। তাই গেইটের নতুন নাটকটির প্রডাকসনের দায়িত্ব পড়েছিল মার্গারেট ওয়েবস্টারের ওপর—ইনি তখন প্রায় অপরিচিত ছিলেন প্রডিউসার হিসাবে, পরে আমেরিকায় গিয়ে সার্থক ডিরেক্টার হিসাবে খুব নাম করেছিলেন। ক্রিশমাসের সময় আর একটি রেভ্যু মঞ্চস্থ করা হোল। গেইটে ট্র্যাডিশন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, বাৎসরিক রেভ্যুতে একজন করে নতুন অথচ তারকাশ্রেণী প্লেয়ারের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া—এ বছরের এই আবিষ্কার ছিল গুগী উইদার্স।

এই রেভ্যুটির পর হিউ রস উইলিয়াম-সনের "ভ্যারিয়াস হেভেনস্" নাটকটি মঞ্চস্থ হোল। বিয়েট্রিক্স লেমান অভিনয়ে অপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন। এর পরের নাটকটিই এই সিজনের সব থেকে সার্থক প্রদর্শনী হয়েছিল। এ্যারিস্টো-ফেনিসের 'লাইসিসট্রাটা' থেকে এ্যাডাপ্ট করে নাটক রচনা করলেন রেজিনেল্ড বেক্-উইথ ও এণ্ড্রু ক্রুইকশ্যাঙ্ক—নামভূমিকায় চমৎকার অভিনয়প্রতিভা দেখালেন জোন সুইনস্টেড। যুদ্ধবিরোধী যত নাটক রচিত হয়েছে এটিই তার ভেতর প্রথম। এর আগেও লণ্ডনে কয়েকবার লাইসিস-ট্রাটার প্রডাকসন হয়েছে—কিন্তু সেসব ভার্সনে সেন্সর এমনভাবে কাঁচি চালিয়ে-ছিলেন যে মূল নাটকের গুণাবলীর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকে নি। আমাদের গেইট থিয়েটারের লাইসিসট্রাটার লেখকদের সম্বন্ধে দি টাইমস কাগজ এইভাবে মন্তব্য করেছিলেন—"এঁরা নাটকটিকে কেটে-কুটে শোধন করবার চেষ্টা করেন নি। যাঁরা পরি-শোধিত অবস্থায় এ্যারিস্টোফেনিশ দেখতে পছন্দ করেন, তাঁরা যেন এখানে নাটকটি দেখতে না আসেন। বাকী, আমাদের মত লোকেরা—অর্থাৎ যারা এ্যারিস্টোফেনিশের উইট্ পছন্দ করি—আমরা মনের আনন্দে এই জ্ঞান নিয়েই নাটকটি উপভোগ করতে পারবো যে, অনুবাদকেরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে নাটকটি ৪১২ বি, সি থেকে বর্তমান সময় অবধি সহজ, স্বাভাবিক গতিতেই এগিয়ে এসেছে এবং এই জন্য এর নীতিগর্ভ বক্তব্যগুলোকে অনর্থক জোর দিয়ে বলা বা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। অনুবাদকেরা খানিকটা স্বাধীনভাবেই অনুবাদ করেছেন—কিন্তু নাটকের স্পিরিটটা সার্থকভাবে বজায় রেখেছেন এই অনুবাদে। The result is a pointed and dashing comedy, and not what might so easily have been thrust upon us—a shabby little revue, masquerading under a great name."

এই সিজনের আগের দিকে যখন আমি 'ভিক্টোরিয়া রেজিনা'-র প্রডাকসনের ব্যাপারে নিউ ইয়র্কে ছিলাম, সে সময় ওখানে এথেল ব্যারিমোর থিয়েটারে মার্গারেট রলিংস 'পারনেল' নাটকে অভিনয় করছিলেন। আগে কথা ছিল নাটকটি প্রথমে ইংলণ্ডে মঞ্চস্থ হবে—কিন্তু সেন্সর নাটকটিকে নিষিদ্ধ করে দেন এই কারণে যে, এতে অতি সাময়িক ঘটনাবলী এবং লোকজনের বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। প্রদর্শনী শেষ হবার পর একদিন মার্গারেট রলিংসের সঙ্গে দেখা করলাম। একটু ইতস্তত করছিলাম—ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে বলি গেইটে এসে কেটী ও'সীর ভূমিকায় অভিনয় করতে। কিন্তু সে আমাকে অবাক করে দিয়ে আগেই জিজ্ঞেস করলো নাটকটি আমার ভাল লেগেছে কি না এবং তাকে প্রধান ভূমিকায় দিয়ে আমি এটি গেইটে মঞ্চস্থ করতে রাজী আছি কি না। নিউ ইয়র্কে শো'টি শেষ হবার পর—এখানে রলিংস হাজার ডলার করে সাপ্তাহিক বেতন পেত—মার্গারেট ইংলণ্ডে চলে এল গেইটে এই নাটকে অভিনয় করতে—for a salary which did not even reach double figures. গেইটে এ নাটকে ওয়াইণ্ডহ্যাম গোল্ডী নিয়েছিলেন পার্নালের রোল—আর্থার ইয়াং গ্ল্যাডস্টোন এবং জেমস্ মেসন উইলি ও'সী—আর আগেই বলা হয়েছে মার্গারেট নিয়েছিল কেটী ও'সীর ভূমিকা। নাটকটি মঞ্চস্থ হবামাত্রই সাফল্য অর্জন করলো। সমা-লোচকেরা একযোগে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন—এঁরা অনেকেই নাটকটি নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানালেন। দি টাইমস্ পত্রিকায় তিন দিনের সম্পাদকীয় আলোচনায় এ নাটকের ওপরের ব্যান্ তুলে দেবার দাবি জানানো হল। প্রেসের বিরাট চাপের ফলে লর্ড চেম্বারলেন আমার সঙ্গে এবং এই নাটকে যেসব লোকের সম্বন্ধে আলোচনা আছে, তাদের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে শেষ পর্যন্ত পেশাদারী প্রদর্শনীর লাইসেন্স দিলেন এবং নাটকটিকে তখন নিয়ে মঞ্চস্থ করা হল নিউ থিয়েটারে।

এই সিজনের শেষ প্রডাকসন ছিল আরনেস্ট টোলারের 'নো মোর পিস্'—এটি স্যাটায়ার—সঙ্গীত পরিচালনা করেন হার্বার্ট মিলার, আর সঙ্গীত রচনা করে-ছিলেন ডব্লিউ, এইচ, অডেন।

সিজন শেষ হলে দেখলাম সভ্যসংখ্যা আগের সিজনের থেকে একটুও বাড়ে নি। কিন্তু দর্শকসংখ্যা প্রতি প্রদর্শনীতেই বেশ ভাল হয়েছিল—আর্থিক অবস্থাও অনেক উন্নত হওয়াতে মনটা বেশ খুশিই ছিল। কিন্তু সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়ে তখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। কিন্তু এর পরেই গেইটে হঠাৎ ভাগ্য পরিবর্তনের উপক্রম দেখা দিল। [ক্রমশ]

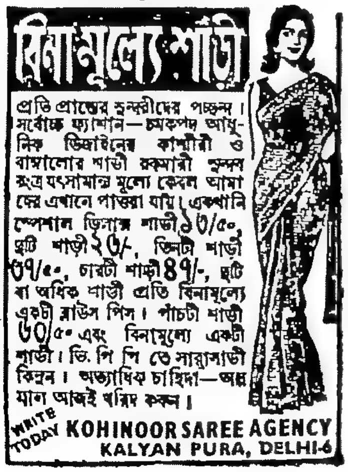

রঙ্গজগৎ

আধুনিক বাউল

সম্প্রতি এক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে বাউল গান শুনেছি। গায়ক বিখ্যাত। তাঁর বাউল গান শোনবার আগ্রহী শ্রোতা যথেষ্ট। বিশেষ করে মেয়েমহলে। এই অনুষ্ঠানে গায়ক একের পর এক তিনটি গান গাইলেন। প্রথম দু-টি বসে বসে: তারপর শ্রোতারা যখন আর একটি গান গাইতে বললেন, তখন গাইলেন নেচে। এবার জমজমাট: পায়ের তালের সঙ্গে শরীরটা যখনই দুলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের হাততালি। আর গান? প্রথম গানটিকে যথার্থ বাউল মনে হল। কিন্তু শ্রোতাদের হাততালির সঙ্গে সুর এত ওঠানামা করছিল যে এবং গলার-কিছু কাজ ও দমের শক্তি দেখাতে গিয়ে বাউল আর বাউল থাকল না, হয়ে উঠলো আধুনিক বাউল। এই আধুনিক বাউল কলকাতার সাম্প্রতিক সৃষ্টি। এবং এই আধুনিক বাউলই এখন জনপ্রিয়। মেয়ে-মহল এবং একশ্রেণীর শ্রোতারা এই বাউলের সমজদার। এই শ্রোতারা যেভাবে বিটলদের গানে গা দোলায় হাততালি দেয়, আধুনিক বাউলেও সেই আনন্দ অনুভব করে। কিছুদিন আগে সুজনের দপ্তরে একটা প্রবন্ধ এসেছিল। প্রবন্ধটির নাম 'বিটনিক গানের পূর্বসূরী বাংলার বাউল'। লেখক আমেরিকা থেকে প্রেরণা নিয়ে সদ্য ফিরে এসে প্রমাণ করতে বসে-ছেন যে, বাংলার বাউল আর বিটনিকদের গান সমগোত্রের। লেখক মার্কিনদের আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বাসে অধীর হয়ে প্রায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। এমন কি নিজের জাতকুলও ভুলতে বসেছেন। তাই বাউল গানের উৎপত্তি, বাউল গানের পরিবেশ, তার আধ্যাত্মিক আবেদন ও দার্শনিক চিন্তার কথা ভুলে গেছেন। লালন ফকির ও বিখ্যাত বাউলদের সাধনা ও জীবনদর্শনের সঙ্গে বিটনিকদের এক জায়গায় আনবার কথা লেখক ভাবতে পেরেছেন এটাই আশ্চর্য! সেদিনের আসরে বাউল শুনতে শুনতে এই প্রবন্ধের কথাই আমার মনে পড়ছিল। এদের মুখের বাউলের সঙ্গে গ্রাম-বাংলায় তত্ত্বসঙ্গীত বাউলের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে চলেছে। শহুরে মানুষের চিত্তবিনোদনের উপায় হয়ে পড়েছে এই বাউল আধুনিক রূপ ধরে। আজও বীরভূম অঞ্চলে, অথবা পূর্ববঙ্গের সুদূর কোন গ্রামে যারা আখড়ায় সন্ধ্যারতির সময় অথবা ভরা দুপুরে পল্লীবাসীকে বাউল শুনিয়ে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করে বিশ্বাস ও ভক্তিতে বাউলের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের সঙ্গে কি এই শহুরে বাউলদের কোন সম্পর্ক আছে। এরা বাউল গাইছে মঞ্চে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে; মাথায় বেঁধেছে সিল্কের পাগড়ী, বাস করে আরামপ্রদ ফ্ল্যাটে। বাউল এদের সাধনা নয়—পেশা, পাগড়ী আলখাল্লা বসন নয়—রূপসজ্জা। সুতরাং এদেরই পক্ষে সম্ভব বাংলার বাউলকে মার্কিন বিটনিকদের পূর্বসূরী বলা। এই আধুনিক বাউলের আজ কত কদর; রেডিওতে শোনা যায়; রেকর্ড বার হয়; আধুনিক বাউল রীতিমত স্বচ্ছন্দ আয়াসে জীবনধারণের উপায় হয়েছে। আর গ্রামে যারা জীবনের সাধনা, প্রাণের প্রাণ মনে করে বাউলকে আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁরা? চৈত্রের রোদে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরছেন, দিনভিক্ষা তনুরক্ষা করছেন। আধুনিক বাউলের প্রাবল্যে তাঁদের সত্যিকার বাউল বুঝি হারিয়ে যাবে।

—সুজন।

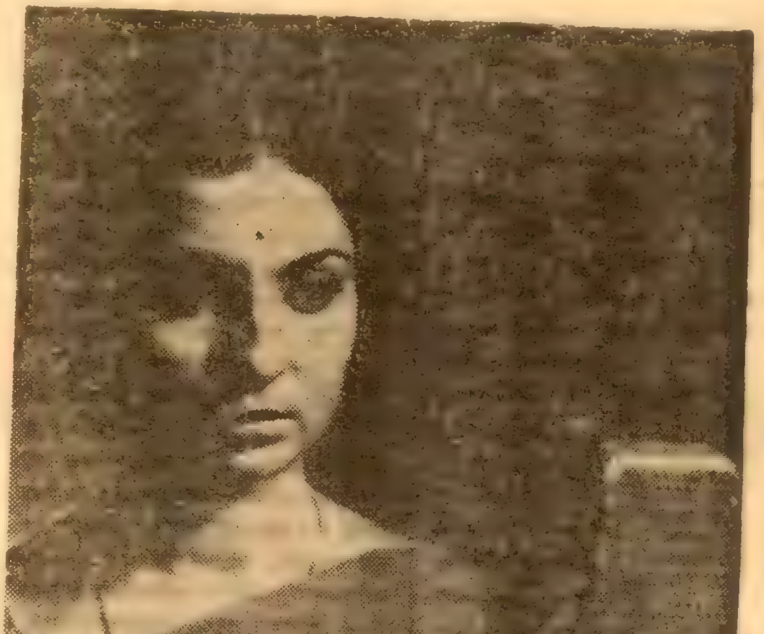

'পিতাপুত্র' ছবিতে তনুজা

চিত্র-আলোচনা

ইন্দর সেন পরিচালিত 'প্রথম কদমফুল' ছবিতে সৌমিত্র ও শুভেন্দু

স্টার

সম্প্রতি কয়েকটি ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের ছবি 'স্টার' দেখান হয়েছে। ছবির পরিচালক বিখ্যাত কনরাড উলফ্। যিনি 'প্রফেসর মামলক' ছবি করে খ্যাতি লাভ করেছেন। পূর্ব জার্মানীর প্রথম সারির পরিচালকরূপে যিনি অভিনন্দিত।

'স্টার' ছবির কাহিনীর পটভূমি বুলগেরিয়ায় নাৎসী বন্দী-শিবির। এক ইহুদী তরুণী আর এক জার্মান সৈনিককে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। শত শত গ্রীক ইহুদীকে বন্দী-শিবিরে আটক রাখা হয়েছে অসউইজের গ্যাস চেম্বারে হত্যা করার জন্য। এ সময় এক ইহুদী মহিলা সন্তান প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লে ইহুদী তরুণী ভারপ্রাপ্ত জার্মান সার্জেন্ট ওয়াল্টারকে ডাক্তার আনতে বললে ওয়াল্টার অস্বীকার করে। এই অমানুষিকতায় ক্রুদ্ধ তরুণী তাকে যা তা বলে গালি দেয়। এতে ওয়াল্টারের বিবেক জেগে ওঠে। সে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে জার্মান অফিসাররা ফুর্তির জন্যে সেই ইহুদী তরুণীকে ধরে আনলে ওয়াল্টার তার সম্মান রক্ষা করে। এভাবে ক্রমে দু-জনার মধ্যে অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়। তারা পরস্পরকে ভালবাসে। এক সময় ওয়াল্টার জানতে পারে, বন্দী-শিবিরের ইহুদীদের অসউইচে নিয়ে যাওয়া হবে দু-এক দিনের মধ্যে। ওয়াল্টার তখন কয়েকজন বুলগেরিয়ানকে অনুরোধ করে ইহুদী তরুণী রাথকে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করার জন্য। তারা রাজী হয়, কিন্তু বিনিময়ে চায় গেরিলাদের জন্যে রাইফেল। ওয়াল্টার তাতে রাজী হয় না। ওদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে দেখে বন্দী-শিবির পরিত্যক্ত। রাথ সহ সব বন্দীদের চালান করে দেওয়া হয়েছে। ওয়াল্টার ট্রেনের পেছনে পেছনে ছুটে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। বুলগেরিয়ানদের সে প্রতিশ্রুতি দেয়, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অস্ত্র সরবরাহ করতে সে রাজী।

একটি প্রণয় উপাখ্যানের রীতিতে এই ছবিতে মানবসমাজের এক অন্ধকার সময়কে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এই অন্ধকারই শেষ নয় : ভালবাসা এবং মানবিক চেতনা মানুষকে এই অন্ধকার থেকে বের করে আনবে। রাথকে হারালেও ওয়াল্টার ফ্যাসিজমকে শেষ করে ভবিষ্যতের রাথদের জীবন নিশ্চিন্ত করার পথে অগ্রসর হয়েছিল গেরিলাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। যত অন্ধকারই আসুক না কেন তার মধ্যেও ভাল মানুষ থাকে। পরিচালক উলফ চমৎকার কাব্যগাথার মেজাজে এই কাহিনীকে উপস্থিত করেছেন। কলা-কৌশলের দিক থেকে বহির্দৃশ্য আর স্টুডিও দৃশ্যের সমন্বয় বিস্ময়কর: এতে চিত্রধারকের যেমন বাহাদুরী তেমনি রয়েছে সম্পাদনায় কৃতিত্ব। শান্ত মেজাজে অথচ ঘৃণা ও ক্রোধে ভরা এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাসে পূর্ণ ছবিটি খুবই হৃদয়গ্রাহী।

রোজ মেরিস বেবি

পোলিস চিত্র-পরিচালক রোমান পোলানস্কির 'নাইফ ইন দি ওয়াটার' আমরা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সেই খ্যাতি পোলানস্কিকে নিজ দেশে রাখতে পারে নি। পোলানস্কি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-বিকাশের পথে বাধা দেখেছেন। তাই নিজ দেশ এবং লক্ষ মানুষের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের দিকে পিছন ফিরে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পীঠস্থান আমেরিকায় এসে উঠেছে। আমেরিকানরা তাকে সাদরে গ্রহণ করে অস্কার পুরস্কার দিয়ে একটি ছবি করার সুযোগ দিয়েছে। এই ছবি 'রোজ মেরিস বেবি' সম্প্রতি কলকাতায় মুক্তি লাভ করেছে।

এক সুখী দম্পতি। যে বাড়িতে তারা এসেছে তার সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল এক তরুণী আত্মহত্যা করেছে। রোজ মেরী অন্তঃসত্ত্বা হবার পর তার মধ্যে মানসিক

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ : আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

চিত্রসাথী পরিচালিত 'শেষ থেকে সুরু' ছবিতে শঙ্কর ঘোষাল, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যা রাও

পরিবর্তন দেখা যায়। এ সময় ডাইনী সম্পর্কিত একটা বই তাকে অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। সে মনে করে তার চারদিকে রয়েছে অশুভ শক্তি। এমন কি স্বামী এবং ডাক্তারকে পর্যন্ত সন্দেহ করে। বাড়িতে গিয়ে সে যখন জীবনকে প্রায় বিপন্ন করে তুলেছে এমন সময় সকলে তাকে জোর করে ধরে রাখে এবং বাড়িতেই প্রসব হয়। কিন্তু তাকে বলা হয় সে মৃত সন্তান প্রসব করেছে। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছোরা হাতে সে প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে আবিষ্কার করে তার জীবিত সন্তান। সন্তান তার মনের মত সুন্দর না হলেও দোলনায় হাত দিয়ে দোলাতে দোলাতে তার মাতৃহৃদয় জেগে ওঠে, সে প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে।

পোলানস্কি মনস্তাত্ত্বিক কাহিনীচিত্রে যে দক্ষতা 'নাইট ইন দি ওয়াল্টার'-এ দেখা গেছে। এখানেও সেই দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে এই ছবিতে কোন সমাজ-জীবনের ছায়া নেই, আছে ব্যক্তিচিন্তার প্রভাব। ছবির সার্থকতায় রোজ মেরীর ভূমিকায় মিয়া ফারেৎ-এর অভিনয় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই অভিনয়-নৈপুণ্য মনে রাখার মত।

স্টুডিও খবর

মুক্তি পথে: কৃষ্ণলীলা

বহু অর্থ ব্যয়ে গৃহীত বলাকা পিকচার্সের গীতিবহুল ধর্মমূলক বাংলা ছবি "কৃষ্ণলীলা" বলাকা পিকচার্সের পরিবেশনায় শহর ও শহরতলীর একাধিক চিত্রগৃহে আসন্ন মুক্তির পথে। এই ছবিতে বহু 'ট্রিক' দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। সংলাপ রচনা করেছেন—মৃণাল ঘোষ। পরিচালনা করেছেন—শ্রীধর ভট্টাচার্য। গীত-রচনা করেছেন—সরল গুহ। সুর দিয়েছেন—বীরেন ভট্টাচার্য ও অনিলকুমার দে। নেপথ্য সংগীতে আছেন—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, শিপ্রা বসু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখার্জী, অঞ্জলি ব্যানার্জী ও সুদাম ব্যানার্জী।

হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা আগামী ৪ঠা থেকে ৯ই এপ্রিল একাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে এক হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবে চারটি সমকালীন ছবি—'আই উইল গো টু দি জিনিস্টার', 'নিউ গিলগেমস', 'কারেন্ট' ও 'টেন গোল্ড মেডালস', প্রদর্শিত হবে।

নজরুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত (দ্বিতীয় বার্ষিক) আবৃত্তি প্রতিযোগিতা মে মাসের ১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগ রয়েছে; এই চার বিভাগ যথাক্রমে (১) সাধারণ (১৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক মহিলা-পুরুষ) সঞ্চিতায় প্রকাশিত 'আমার কৈফিয়ৎ' এবং বিষের বাঁশী বইতে প্রকাশিত 'ঝড়' কবিতার প্রথম চারটি স্তবক—'দিকে ফিরে মারী-মরু রচি' পর্যন্ত। (২) পুরুষ—(১৫ বছরের ঊর্ধ্বে; সঞ্চিতায় প্রকাশিত 'ফরিয়াদ' এবং 'অন্ধ স্বদেশ দেবতা'। (৩) মহিলা বিভাগ (১৫ বছরের ঊর্ধ্ব); বিষের বাঁশীতে প্রকাশিত 'বন্দী-বন্দনা' এবং সঞ্চিতার 'নারী'। (৪) কিশোর-কিশোরী বিভাগ (১০ থেকে ১৫ বছরের নিম্ন-বয়স্ক); সঞ্চিতায় প্রকাশিত 'কুলি-মজুর' এবং অগ্নিবীণার 'রক্তাম্বরধারিণী মা'। সকল বিভাগেই দুটি কবিতা আবৃত্তি করতে হবে।

প্রতি বিভাগের জন্য নাম তালিকা-ভুক্তির ফী ২ টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র দেওয়া হবে। নাম তালিকাভুক্তির ঠিকানা:

নজরুল একাডেমি, ৮, এণ্টনীবাগান লেন, কলকাতা-৯। অথবা ৬০, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলকাতা-১৯।

—ফটো বিউটি স্টুডিও—
সুন্দর ছবি তোলাতে হ'লে
ফটো বিউটিতে আসুন
৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কালী বাবুর বাজার (হাওড়া)
ফোন : ৬৭-৪৫২৬
(ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্কের নীচে)

সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব

সম্প্রতি কলকাতায় এক সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর। উৎসবের ছবিগুলি দেখার জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রের পর্যালোচককে আমন্ত্রণ না করায় পর্যালোচনা প্রকাশ করা সম্ভব হল না। যদিও ঢালাওভাবে আমন্ত্রণপত্র বিলি করা হয়েছে, তবু ফিল্ম ডিভিশনের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যা পি. আই বি. সংবাদপত্রের পর্যালোচকদের বেলায় বিরূপ হলেন কেন তা বোঝা গেল না। তাঁরা কি ওদেশে সোভিয়েত ছবি সম্পর্কে আলোচনার বিরোধী?

'হিটলার' যাত্রার স্মারক উৎসব

মঞ্চে অনেক নাটকের বহু রাত্রি অভিনয়ের স্মারক উৎসব পালন করা হয়। শিল্পী তথা কলাকুশলীদেরও পুরস্কৃত করা হয় নাটকের সঙ্গে আরও একাত্ম হওয়ার জন্য। কিন্তু যাত্রায় বহু শত অভিনয়-রজনী অতিক্রান্ত পালার ক্ষেত্রে সে প্রয়াস এর আগে দেখা যায় নি। এই সর্ব প্রথম তরুণ অপেরা তাঁদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাটকের হিটলারের ১৫০তম রাত্রি অভিনয়ের স্মারক উৎসব পালন করবেন ৪ঠা এপ্রিল সাড়ে পাঁচটায় মহাজাতি সদনে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন—রবীন্দ্র ভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যথাক্রমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য ও ডঃ কানাই ভট্টাচার্য। পুরস্কার বিতরণ করবেন নাট্যকার মন্মথ রায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখার্জী। অনুষ্ঠান পরিচালনায় থাকবেন শিব ভট্টাচার্য। স্মারক উৎসবের পর আসরস্থ হবে তাঁদের নাটক হিটলার।

রবীন্দ্র সদনে ফ্র্যাঙ্ক-জার্মান মূকাভিনেতাদের সঙ্গে মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত

নটতীর্থমের নিয়মিত অভিনয়

'অন্ধকারের রং সাদা' নাটকটি আগামী ৬ই এপ্রিল থেকে বরানগর (বনহুগলী) 'আনন্দম' চিত্রগৃহে প্রতি রবিবার সকাল ১০টায় 'নটতীর্থম' গোষ্ঠী নিয়মিতভাবে অভিনয় করবেন।

নাট্য রচনায় শ্রীআশুতোষ মণ্ডল ও সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে আছেন: অশোক ভাদুড়ী, রবীন মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ সেনগুপ্ত, পরমেশ সেনগুপ্ত, অধীর ঘোষ, মাণিক চট্টোপাধ্যায়, সত্য চট্টোপাধ্যায়, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না রায় ও নাট্যকারদ্বয়।

নাট্য প্রতিযোগিতার দিন পরিবর্তন

হাওড়া মৈত্রী সঙ্ঘ পরিচালিত দ্বিতীয় বার্ষিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনিবার্য কারণবশত ১৬ই মার্চ ও ১৭ই মার্চের পরিবর্তে আগামী ১২ই থেকে ১৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে।

'শুভরূপ'

প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'শুভরূপ'-এর শিল্পী-সদস্যরা তাঁদের প্রথম প্রয়াস হিসাবে প্রকৃত জীবনধর্মী ও যুগোপযোগী তিনটি একাঙ্কিকা বেছে নিয়েছেন অভিনয়ের জন্য।

সোভিয়েত ছবি 'ওয়ান্স এগেইন এবাউট লাভ' ছবির একটি দৃশ্য

নাটক তিনটি হল—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'যযাতি', বনফুল-এর 'শিক্‌কাবাব' এবং দুলেন্দ্র ভৌমিকের 'গুপ্তবিদ্যা'। আগামী ১৮ই এপ্রিল রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে জ্যোতিপ্রকাশের নির্দেশনায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করছেন—সর্বশ্রী পীযূষকান্তি দাশগুপ্ত, বিমল রায়, সুজিত কর, বিমল ব্যানার্জী, পান্নালাল অধিকারী, অরুণ মুখার্জী, দিলীপ দত্ত, গোপেশ ভৌমিক, দিলীপ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা গুহ ও সন্ধ্যা মজুমদার।

অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যে সাতটা পাঁচ-এ।

সঙ্গীতকথা

'আবো আঃ গাঁওতার' সাংস্কৃতিক উৎসব

২৩শে মার্চ শ্রীশিক্ষায়তন ভবনে আদিবাসী সাংস্কৃতিক সংস্থা 'আবো আঃ গাঁওতা' আয়োজিত সাঁওতালী বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মাননীয় শ্রীদেওপ্রকাশ রাই উপস্থিত ছিলেন।

সাঁওতালী বিচিত্রানুষ্ঠানে শহুরে ম্যাজিকের খেলার বিস্তৃত আয়োজন বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করলেও, ঐ বিশেষ অনুষ্ঠানে ম্যাজিককে তালিকাবদ্ধ করার কারণ স্বরূপ বলা হয়, যাদুবিদ্যা আদিবাসী সমাজে এককালে বিশেষভাবে অনুশীলিত হত, সেজন্যই ম্যাজিককে ঐ অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

'আবো আঃ গাঁওতার' সাংস্কৃতিক উৎসবে সাঁওতালী নাচ-গানের আসর কিন্তু যথেষ্ট উপভোগ্য এবং কৌতূহলী দর্শকের তৃপ্তিসাধনের উপযোগী করে জমিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি। কলকাতার স্টেজে উপজাতীয় ভাইবোনদের কলাকুশলতার সঙ্গে কোথায় যেন শহুরে গন্ধ মিশে থেকেছে। তাই এ অনুষ্ঠান শহরতলীর মতোই 'না ইহা না উহা' এবং পীড়াদায়ক মনে হল। ইতিপূর্বেও আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে, কিন্তু সেখানে প্রকৃতিলালিত জনজীবনের সারল্য আমাদের অধিকতর আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

সাঁওতালী গান অবশ্য সাঁওতালী সঙ্গতের সাহায্যে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের আড়ষ্ট শহুরে জীবন থেকে মুক্তি দিতে পেরেছিল।

'আবো আঃ গাঁওতা'র এটি তৃতীয় বার্ষিক উৎসব। এই সংস্থা আদিবাসী সমাজের উন্নতির জন্য সংকল্পবদ্ধ। আশা করি এই সংস্থা আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতির ধারাকে সগর্বে বজায় রাখারই প্রয়াস পাবেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠান

বল্লভপুর (রাণীগঞ্জ) অভিযান সঙ্ঘের পরিবেশনায় গত ১৩ই মার্চ বি পি মিল গ্রাউন্ডে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল। অংশ গ্রহণে হেমন্ত মুখার্জী, শ্যামল মুখার্জী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, শৈলেন লাহা, গৌর বোস, বুবাই বিশ্বাস, ভি বালসারা, সবিতা চৌধুরী, মীরা বিশ্বাস ও প্রার্থনা মুখার্জী এবং আবৃত্তি করেছেন সুরকার সলিল চৌধুরী।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার!

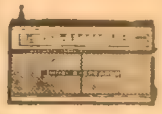

বিশ্वবিখ্যাত 'ন্যাশানাল ডিল্যুক্স' ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে এখন ভারতেও পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরে পাঠানো যায়। আবেদন করুনঃ
GIFT HOUSE
P.B. 1451, (W.B.C.) Delhi—6

খেলাধুলা

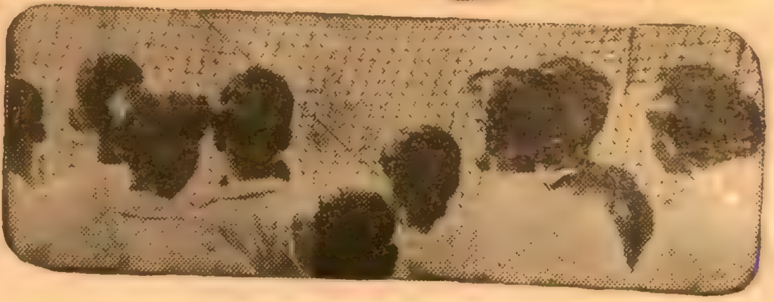

॥ কম্পোজিট স্টেডিয়াম ॥

ছায়াশীতল ইডেন উদ্যানে শুধু মাত্র কলকাতা কিম্বা বাংলা দেশেরই নয়, ছিলো সমস্ত ভারতবর্ষের গর্বের বস্তু পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মাঠটির স্থান ইংলণ্ডের লর্ডসের পরেই। ক্রিকেট বিশ্বে কলকাতার যেটুকু নাম আছে তা ঐ ইডেনকে ঘিরেই। কিন্তু আর তা থাকবে বলে মনে হয় না। ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে—অর্থাৎ ইডেনে আর শুধু ক্রিকেট খেলাই হবে না, সেখানে এবার বসবে ফুটবল, হকি হয়তো বা অ্যাথলেটিকস-এর আসরও। ইডেনের আয়ু তাহলে ফুরোল। আমরা বড় আশা করেছিলাম যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যপালের সময়কার এই একচোখ প্রস্তাবটি বাতিল করে দিয়ে ইডেনের ঐতিহ্য রক্ষা করবেন। কিন্তু আমাদের সে আশা আজ ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে চলেছে। কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্রীড়া দপ্তর ও ক্রীড়ামন্ত্রী ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম বানাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু সরকারের এই কাজ সমর্থন করা যায় না কোন মতেই। বরঞ্চ সুন্দরকে ভেঙে অসুন্দরের প্রতিষ্ঠার মতো নিন্দনীয় এই কাজ। কলকাতায় স্টেডিয়াম নেই। স্টেডিয়াম বাংলা দেশের লোকের একটি অতি পুরোন চাহিদা। কিন্তু তাই বলে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব কেউই সমর্থন করবেন না। কারণ ইডেনের সৃষ্টি শুধু ক্রিকেট খেলার জন্যেই। সে কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। আমরা যতোদূর জানি পৃথিবীর এমন কোন দেশই নেই যেখানে কম্পোজিট স্টেডিয়াম করে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোজা কথা, ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম বানাবার প্রস্তাব একটি হাস্যকর ব্যাপার। ঠিক তেমনি হাসির ব্যাপার হবে যদি ইংলণ্ডের লর্ডস মাঠে ফুটবল খেলার প্রস্তাব কেউ দেন। কলকাতার ইডেনই নয়, দিল্লীর ফিরোজ-শা-কোটলা, বম্বের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম, মাদ্রাজের চীপক, কানপুরের গ্রীন পার্ক প্রভৃতি মাঠে শুধু মাত্র ক্রিকেট খেলাই হয়। সেখানকার কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার ঐতিহ্যপূর্ণ ঐ মাঠগুলোর সর্বনাশ করতে কম্পোজিট স্টেডিয়াম বানান নি, ফুটবল খেলার জন্যে তৈরি করেছেন আলাদা স্টেডিয়াম।

সুতরাং কলকাতাতেই বা আলাদা স্টেডিয়াম তৈরি হবে না কেন? কেন ইডেন উদ্যানে কম্পোজিট স্টেডিয়াম বানিয়ে আমাদের ইডেন উদ্যানের গর্ব খর্ব করা হবে? ইতিমধ্যেই কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মহামেডান স্পোর্টিং মাঠে যখন ফুটবল, ক্রিকেট, হকি—তিনটে খেলাই অনুষ্ঠিত হতে পারে, তখন কেন ইডেনেও হবে না! এ প্রশ্ন তোলা যে কতো বড় বোকামী তার প্রমাণ এক বছর আগের ইডেন উদ্যান। কি দশা হয়েছিলো ইডেনের মাত্র কয়েক দিন ফুটবল খেলার জন্যে—যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরাই জানেন। ফুটবল খেলার পর সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ইডেন দাঁড়িয়েছিল অসহায়ের মতো। ইডেনের আসল রূপ গিয়েছিল হারিয়ে। শ্রীস্নেহাংশু আচার্যর আমলে যখন ইডেনে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা হলো তখন আমরা এই ভয়ই করেছিলাম। যা ভাবা গিয়েছিল হতে চলেছে ঠিক তাই-ই। ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম করে কলকাতা তথা বাংলা দেশের লোকের এতোকালের চাহিদা, একটা আলাদা ফুটবল স্টেডিয়ামের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই যে বলা যায় না। তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই যে, একটু চিন্তা করে দেখুন, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে, ক্রীড়াসাংবাদিক, খেলোয়াড় ও ক্রীড়ারসিকদের মতবাদ নিন তারপর যা করার করুন। কারণ ঢিল হাতে নিয়ে চিন্তা করাই বাঞ্ছনীয়, ঢিল ছোড়ার পরে নয়। আমাদের অতি গর্বের ইডেন উদ্যানকে এইভাবে হত্যা করবেন না। সেই যখন দু' কোটি টাকা খরচ হবে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি করতে, তখন আর কিছু টাকা জোগাড় করে আলাদা স্টেডিয়াম তৈরি করতে দোষ কি? মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে আমরা আবার অনুরোধ জানাই, বিষয়টি নিয়ে আবার আপনি ভেবে দেখুন.....! —শান্তিপ্রিয়

খুশিবল–খুশবল

শেষ পর্যন্ত এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ওপর পড়লো ইতির দাঁড়ি। অতি প্রত্যাশিতভাবেই বাংলা আর মহীশূর উঠেছিলো ফাইন্যালে। তবে দুদলেরই ফাইন্যালে ওঠার পেছনে ছিল ভাগ্যের সমর্থন। টসে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে বাংলা উঠলো ফাইন্যালে। আর প্রতিযোগিতা থেকে মাদ্রাজ নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় মহীশূর হলো বাংলার সম্মুখীন।

আর জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সন্তোষ ট্রফির প্রথম দিনের খেলাটিও শেষ পর্যন্ত শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলায় যে কোন দলই জিততে পারতো।

গল্প হলেও সত্যি

১৭৭১ সালে বিলেতের হ্যাম্বল্ডন ক্লাব আর চারটেসী দলের মধ্যে ক্রিকেট খেলার সময় ঘটলো একটা মজার ঘটনা। চারটেসী দলের ব্যাটিং তখন। ইনিংসের শেষের দিকে হোয়াইট সাহেব এলো ব্যাটিং করতে। সাংঘাতিক চওড়া ছিল তার ব্যাটটা। দেখলে মনে হয় যেন একটা আস্ত দরজাই সে এনেছে ভেঙে। হোয়াইট সাহেবের চওড়া ব্যাটের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেলো উইকেট। হ্যাম্বল্ডন ক্লাবের বোলাররা সারা দিন চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই গেলো বিফলে। একে তো দরজার মতো চওড়া ব্যাট, তার ওপর হোয়াইট সাহেব মোটে ব্যাটই তোলে না। তাই হোয়াইট সাহেবের জন্যে হ্যাম্বল্ডন ক্লাব শেষ পর্যন্ত আর পারলো না জিততে।

এখন যেমন এম. সি. সি তেমন সেকালে হ্যাম্বল্ডন ক্লাবই ছিল ক্রিকেট খেলার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। হোয়াইট সাহেবের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাঁরা তো থ। মহা মুশকিলের ব্যাপার। এমন হলে তো চলবে না। দরজার মতো চওড়া ব্যাট নিয়ে খেলতে নামলে বোলারদের মাথায় পড়বে হাত।

তাই তখন তাঁরা করে দিলেন নতুন নিয়ম। ঠিক হলো যে, ব্যাট কিছুতেই সওয়া চার ইঞ্চির বেশি চওড়া হবে না। ঐ মাপে লোহার একটা ফ্রেমও বানানো হলো। আর তারপর থেকে খেলার আগে প্রত্যেকটা ব্যাট ঐ ফ্রেমে মেপে নিতে হতো খেলার আগে।

(মজার এই ঘটনাটা জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ হোস্টেল থেকে লিখে পাঠিয়েছেন হিমাদ্রিকান্ত ব্যানার্জী)

॥ একঘরে ক্রিকেট ॥

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি হলে ক্রিকেট খেলা হয়ে যাবে একঘরে। ফুটবল আর হকির দাপটে মাঠের অবস্থা হয়তো হবে শোচনীয়। তবু সেখানেই বসবে ক্রিকেটের আসর। ফলে বিশ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠ হিসেবে ইডেনের সুনাম আর থাকবে না। যেমন ছিল সেবার। ছবিতে ক'বছর আগে ভারত ভ্রমণকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ম্যানেজার ও খেলোয়াড়দের ইডেনের পিচ পরীক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে। ছবিতে বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে আছেন গিবস, লয়েড আর হল।

জিততে পারতো বাংলা, জিততে পারতো মহীশূরও। তবু মনে হয় বাংলার চান্সটা যেন একটু বেশীই ছিল। পেনাল্টির সুযোগও পেয়েছিল বাংলা। কিন্তু পি গাঙ্গুলীর পেনাল্টি কিকও বিফলে গেলো।

বাংলা আর মহীশূর পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী। এবার নিয়ে সন্তোষ ট্রফির ফাইন্যালে বাংলা ও মহীশূর দল মোট সাতবার মিলিত হয়েছে। আর ১৯৪১ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলা কুড়িবার ফাইন্যালে উঠেছে—এর মধ্যে সন্তোষ ট্রফি লাভ করেছে এগারোবার। ওদিকে মহীশূর দল ফাইন্যালে উঠেছে মোট ছ'বার। তার মধ্যে তিনবার তারা লাভ করেছে বিজয়ীর সম্মান।

গত বছরও সন্তোষ ট্রফির ফাইন্যালে উঠেছিল মহীশূর আর বাংলাই। কিন্তু গত বছর বাংলাকে হারিয়ে দিয়ে মহীশূর লাভ করেছিল সন্তোষ ট্রফি। এ বছর প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় কে জিতবে—কে জানে।

তবে এ বছর ফাইন্যালে উঠতে বাংলা আর মহীশূরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। বাংলা দল এবার তুলনামূলক বিচারে একটু যেন দুর্বল। বেশ কয়েকজন নামী খেলোয়াড় এবার দলে নেই। তার প্রমাণ অবশ্য আগেই পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি খেলায় বাংলাকে জেতার জন্যে করতে হয়েছে যথেষ্ট পরিশ্রম। তাই শেষ পর্যন্ত যদি ভাঙা দল নিয়েও বাংলা এ বছর সন্তোষ ট্রফি লাভ করতে পারে, তাহলে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আমাদের কাছে আর কিছুই হবে না।

সমাচার দর্পণ

এপ্রিল মাসের ১৭ থেকে ২৭শে পর্যন্ত মিউনিখে বসবে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর। ভারতের চারজন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্যে ১৪ই এপ্রিল মিউনিখের পথে যাত্রা করবেন। ভারতের চারজন প্রতিযোগী হলেন : মীর কাশেম আলি (অন্ধ্র প্রদেশ), ফারুক খোদাইজী (মহারাষ্ট্র), কে জয়ন্ত (মহীশূর) ও জি জগন্নাথন (রেলওয়ে)। অতিরিক্ত খেলোয়াড় তালিকায় আছেন মহীশূরের বি সৈকুমার।

॥ আর কৃষ্ণান ॥
ডেভিস কাপের খেলায় কৃষ্ণানের খেলা দেখতে মাঠ ভেঙে লোক এসেছিল।

* * *

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে ভারতকে খেলতে হবে জাপানের বিরুদ্ধে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পুনায় বসবে ভারত-জাপান টেনিস প্রতিযোগিতার আসর। ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের সেমিফাইন্যাল খেলায় ভারত ৪—১ খেলায় হারিয়ে দিয়েছে সিংহলকে!

* * *

কুড়ি বছরের ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী আর একুশ বছরের অলোক ব্যানার্জী ৩১শে মার্চ যাত্রা করেছেন বিশ্ব পরিক্রমার পথে। দু'চাকার সাইকেলে চেপে তাঁরা দেবেন এক লক্ষ দশ হাজার মাইল পাড়ি। কলকাতা থেকে জি টি রোড ধরে তাঁরা যাবেন দিল্লীতে। সেখান থেকে বোম্বাই। তারপর তেহেরান-বাগদাদ হয়ে গিয়ে হাজির হবেন রাশিয়ায়। তারপর তাঁরা আবার তৈরি করে নেবেন তাঁদের ভ্রমণ-সূচী।

* * *

বোম্বাই-এর গোল্ড কাপ হকি খেলা আরম্ভ হয়েছে এপ্রিল মাসের প্রথম দিনে। ২৬টি দল যোগদান করছে এই প্রতিযোগিতায়। এদের মধ্যে আছে কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবও।

খেলার বই

লাল বল লারউড : শঙ্করীপ্রসাদ বসু

(আনন্দ পাবলিশার্স, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা—৯। দাম—ছ' টাকা)

মনে নেই কার মুখে যেন একবার শুনেছিলাম, বাংলায় রিলে আর শঙ্করীপ্রসাদের লেখা ক্রিকেটকে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে বাঙালীর হেঁসেলের মধ্যে। কথাটা যে কতো সত্যি তার প্রমাণ বোধহয় আজ আর নতুনভাবে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এ কথাও আজ বোধহয় কেউই আর অস্বীকার করবেন না যে, বাংলাভাষায় ক্রীড়া-সাহিত্যকে শঙ্করীপ্রসাদ বসু বড় তাড়াতাড়িই শৈশবাবস্থা থেকে এনে ফেলেছেন যৌবনের সন্ধিক্ষণে।

লাল বল লারউড—শঙ্করীপ্রসাদ বসুর নতুন বই। শুধু নতুন বই বললেই বোধহয় সবটা বলা হবে না, বলতে হবে—বাংলা ক্রীড়া-সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন এই বইটি। খেলার বইও যে গল্প-উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ শঙ্করীপ্রসাদের বইগুলি। খ্যাতনামা ক্রীড়া-সাংবাদিক আরবি টিকই লিখেছেন, "এ যুগের ক্রিকেট খেলা দেখার চেয়ে তাঁর রচনা পাঠে আনন্দ মিলবে অনেক বেশী... !"

লাল বল লারউড বইটি পড়তে পড়তে আরবির ঐ কথাগুলোই মনে পড়েছে বার বার। লারউডকে চিনতাম নামে আর রেকর্ডের পাতায়। কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন মানুষ লারউডকে। লারউডের সুখ-দুঃখ, ত্যাগ, মহিমাকে ছাড়িয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে অবহেলায় জর্জরিত লারউডের বিষাদ মূর্তি। বডি-লাইন বোলার যা কিছু করেছিলেন তা তাঁর দলের জন্যেই, নিজের দেশের জন্যে। লারউডের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালিত হয়েছিলো অধিনায়কের পরিচালনায়। তবু তাঁর ভাগ্যে জুটলো অবহেলা, জুটলো দুর্নাম। বিরূপ সমালোচনায় বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন লারউড।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!' লারউডের ভাগ্যে জুটেছিলো এই সুনামই... ! আশ্চর্য, তবু লারউড চিরকাল ক্রিকেটকে ভালোবেসেছেন, যে ক্রিকেট লারউডের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে—সেই ক্রিকেট-প্রেমেই লারউড ছিলেন বিভোর। লারউডের হাতে লাল বলের যে রূপ ছিলো, সেই রূপই একদিন আঘাতের প্রচণ্ডতায় ক্ষত-বিক্ষত করে দিলো লারউডকে। তবু লারউড হারেন নি—লাল বল লারউডই তার প্রমাণ। শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে ধন্যবাদ—লাল বল লারউড বইটির মাধ্যমে তিনি শুধু বাংলা ক্রীড়া-সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেন নি, আমাদের জানিয়েছেন অজানা অনেক তথ্য—রসে, রোমাঞ্চে যা সত্যিই রমণীয়।

—শান্তিপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংলন্ড ভ্রমণকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল থেকে বাদ পড়ার পরই নার্স বোধহয় নিয়েছিলেন অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত। অথচ এই মুহূর্তে নার্সের অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত বড়ই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হবার বিষয় হলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল থেকে সেমুর নার্সের বাদ পড়া।

বাদ অবশ্য নার্স প্রায়ই পড়তেন। নার্সের দশ বছরের টেস্ট খেলোয়াড়-

পরিচীয়তে

জীবনের ইতিহাসই তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। অবশ্য তার কারণও আছে। নার্স এমন একটা সময়ে লাইম লাইটে এসেছেন যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল রত্নে ভরা। তাই একটানা খেলার সুযোগ নার্স খুব একটা বেশি পান নি। ফাঁকে ফাঁকে পেয়েছেন সুযোগ।

আর সেই সুযোগগুলোই নার্সকে এনে হাজির করেছে তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের শীর্ষে। তবু দশ বছরের খেলোয়াড়-জীবনে নার্স পান নি ২১টির বেশি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ।

১৯৩৪ সালে বার্বাডোজের এক ছুতোরের ঘরে জন্ম সেমুর নার্সের। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় নার্স বেশ নাম করে ফেলেছিলেন।

তবে টেস্ট খেলায় সুযোগ পেলেন ১৯৫৯ সালে কিংসটনের তৃতীয় টেস্টে এম-সি-সি'র বিরুদ্ধে। প্রথম টেস্টে করেছিলেন ৭০ এবং ১১ রান।

মারকুটে খেলোয়াড় হিসেবে নাম থাকলেও পুরো সিরিজ খেলার মতো সুযোগ নার্স খুব কমই পেয়েছেন। কিন্তু যখনই পেয়েছেন তখনই সে সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন নার্স।

তবে এবারের অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণে নার্স দিয়েছেন অভাবনীয় নিপুণতার পরিচয়। নার্সের জীবনের শেষ ছ'টি টেস্ট ইনিংসের খতিয়ান হলো—১৩৭; ৯৫ ও ১৬৮; ২১ ও ১৬; ২৫৮।

নার্স আর টেস্ট খেলবেন না। ২১টি টেস্ট খেলায় যোগ দিয়ে ছ'টি সেঞ্চুরী সহ করেছেন মোট ২৫২৩ রান। ইনিংস প্রতি গড় দাঁড়িয়েছে ৪৭·৬০ রান।

প্রশ্ন উত্তর

কাজলকুমার পান (দিগপার, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন : গত পাঁচ বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী রাজ্যের নাম ও খেলার স্থান জানতে চাই।

উত্তর : ১৯৬৩—বম্বে (মাদ্রাজ)
১৯৬৪—রেলওয়ে (গৌহাটি)
১৯৬৫—অন্ধ্র (কুইলন)
১৯৬৬—রেলওয়ে (হায়দ্রাবাদ)
১৯৬৭—মহীশূর (কটক)

জীতেশরঞ্জন দত্ত (লংকা, নগাঁও, আসাম)

প্রশ্ন : দীপক সোধন কতোগুলি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন? কোন দেশের বিরুদ্ধে খেলেছেন এবং তাঁর সেঞ্চুরী ক'টি?

উত্তর : তিনটে টেস্ট খেলেছেন। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১টি ও ১৯৫২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ২টি।

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কলকাতা টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই দীপক সোধন ১১০ রান করেছিলেন।

রবীন্দ্রচন্দ্র বণিক (কৃষ্ণনগর, কের-চৌমুহনী, আগরতলা)

প্রশ্ন : প্রথম শ্রেণীর এমন কোন খেলোয়াড় আছেন কি যিনি প্রথম শ্রেণীর খেলাতে কোন ৪ কিম্বা ৬-এর মার না মেরে সেঞ্চুরী করেছেন?

উত্তর : আমি জানি না। তবে যতোদূর মনে হয় নেই।

সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলো বিভাগ আপনার ভালো লাগে জেনে উৎসাহিত হয়েছি আমরা।

শুকদেব মুখোপাধ্যায় (মিরহাট, বৈদ্যপুর, বর্ধমান)

উত্তর : আপনার চিঠি পেয়েছি। পুরোন দিনের খেলোয়াড়দের ছবি সংগ্রহ করা এখন বেশ শক্ত। তবু চেষ্টা করুন। ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিয়েছি।

রতনকুমার রায়চৌধুরী (সেণ্ট্রাল গোটানগর, মালিগাঁও, আসাম)

প্রশ্ন : পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন খেলা কি?

উত্তর : এখনকার এ্যাথলেটিক্সকেই বলা চলে। বোধহয় দৌড় প্রতিযোগিতাই সর্ব প্রাচীন।

পূর্ণেন্দু, অর্ধেন্দু ও অর্চনা (পোস্ট বক্স নং ৪, বর্মার, তিলাইয়া)

প্রশ্ন : একই ওভারে কোন বোলার ইচ্ছে মতো একবার বাঁ হাতে, একবার ডান হাতে বল করতে পারে কি?

উত্তর : ক্রিকেট আইনে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখা নেই। তবে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের দিক দিয়ে কেউ বোধহয় অমনভাবে বোলিং করেন না। ছ'বলেই সাধারণত একটা ওভার হয়। তবে যে কোন দু'দেশ যদি নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয় যে, তারা আট বলের ওভারে খেলবে তাহলে সেই মরশুমে সেই দু'টি দেশ সাধারণত আট বলের ওভারে খেলে।

অরিন্দম দাশগুপ্ত (সিউড়ী)

উত্তর : আপনি লেখা পাঠাতে পারেন।

গোপীকৃষ্ণ দত্ত (বর্ধমান)

প্রঃ বাংলার ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্যামসুন্দর মিত্রের ঠিকানা জানতে চাই।

উঃ শ্রীশ্যামসুন্দর মিত্র, ৪৫/এ, বলরাম বোস লেন, কলকাতা-২০

জয়ন্ত ব্যানার্জী (শান্তিপুর)

প্রশ্ন : ভারতে ১ম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বি নিম্বলকার ও ভি ভাণ্ডাকারের রান কি হয় উইকেটে রেকর্ড সংখ্যক রান? কাদের বিরুদ্ধে কত সালে এবং কোথায় তাঁরা করেছিলেন?

উত্তর : ৪৫৫ রান (নিম্বলকার ৪৪৩ (অঃ পঃ) ও ভাণ্ডাকার ২০৫) মহারাষ্ট্রের পক্ষে ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া স্টেটের বিরুদ্ধে ১৯৪৮-৪৯ সালে পুনায়।

দ্বিতীয় উইকেটে এইটাই সর্বোচ্চ রান।

কবি দত্ত (নামবাড়ি, গৌহাটি)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় ভারতীয়দের মধ্যে ক'জন প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী করেছেন?

উত্তর : কে. এস. রণজিৎসিংজী ১৫৪ (অঃ পঃ) ইংলণ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৮৯৬ সালের ম্যানচেস্টার টেস্টে।

পতৌদির নবাব (বড়) ১০২, ইংলণ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৩২-৩৩ সালের সিডনী টেস্টে।

লালা অমরনাথ ১১৮ ভারতের পক্ষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৩-৩৪ সালের বম্বে টেস্টে।

দীপক সোধন ১১০ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫২-৫৩ সালের কলকাতায়।

এ জি কৃপালসিং ১০০ (অঃ পঃ) নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬ সালের হায়দ্রাবাদ টেস্টে।

আব্বাস আলী বেগ ১১২, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালের ম্যানচেস্টারে।

হনুমন্ত সিং ১০৫ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৩-৬৪ সালে দিল্লী টেস্টে।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : ফুটবল খেলা অল্প সময়ের খেলা, কিন্তু ক্রিকেট খেলা চলে বেশ কয়েকদিন ধরে। তার ওপর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ওপর ফুটবলের চেয়ে ক্রিকেট অনেক বেশি নির্ভরশীল। তাই অতিরিক্ত খেলোয়াড়রা ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং বা বোলিং করতে পারেন না। যদি অতিরিক্ত খেলোয়াড়রা ব্যাটিং বা বোলিং করতে পারতেন, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো ভেবে দেখার বিষয়। ব্যাটিং-এর সময় যারা ভালো ব্যাট করতে পারে না তারা অসুস্থ হয়ে পড়তো আর তাদের জায়গায় ভালো ব্যাটসম্যানরা এসে দেদার রান করে যেতেন। বোলিং-এর সময়ও যদি ঐ একই অবস্থা ঘটে তাহলে খেলার অবস্থাটা কি হবে? সেই জন্যে ক্রিকেট খেলায় অতিরিক্ত খেলোয়াড়রা ব্যাটিং বা বোলিং করতে পারেন না।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ঃ

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী ঃ

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর, রাস, শ্রীমদ্‌গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী ঃ

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চূলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নাবদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ ঃ

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন ঃ

মহর্ষি কপিলকৃত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন ঃ

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্‌ ঃ

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পূর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবর স্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্‌ ঃ

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্‌, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

মহানির্বাণতন্ত্র ঃ

(সর্ব দেবদেবীর মন্ত্রকোষ ও শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা-সম্বলিত)

মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, পাদটীকা-সমন্বিত বৃহদায়তন দুর্লভ গ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্রের সার। পঞ্চমকার সাধনার নিগূঢ় মর্ম, তন্ত্রসাধনার গুহ্যতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা ঃ

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

3 APR 1969

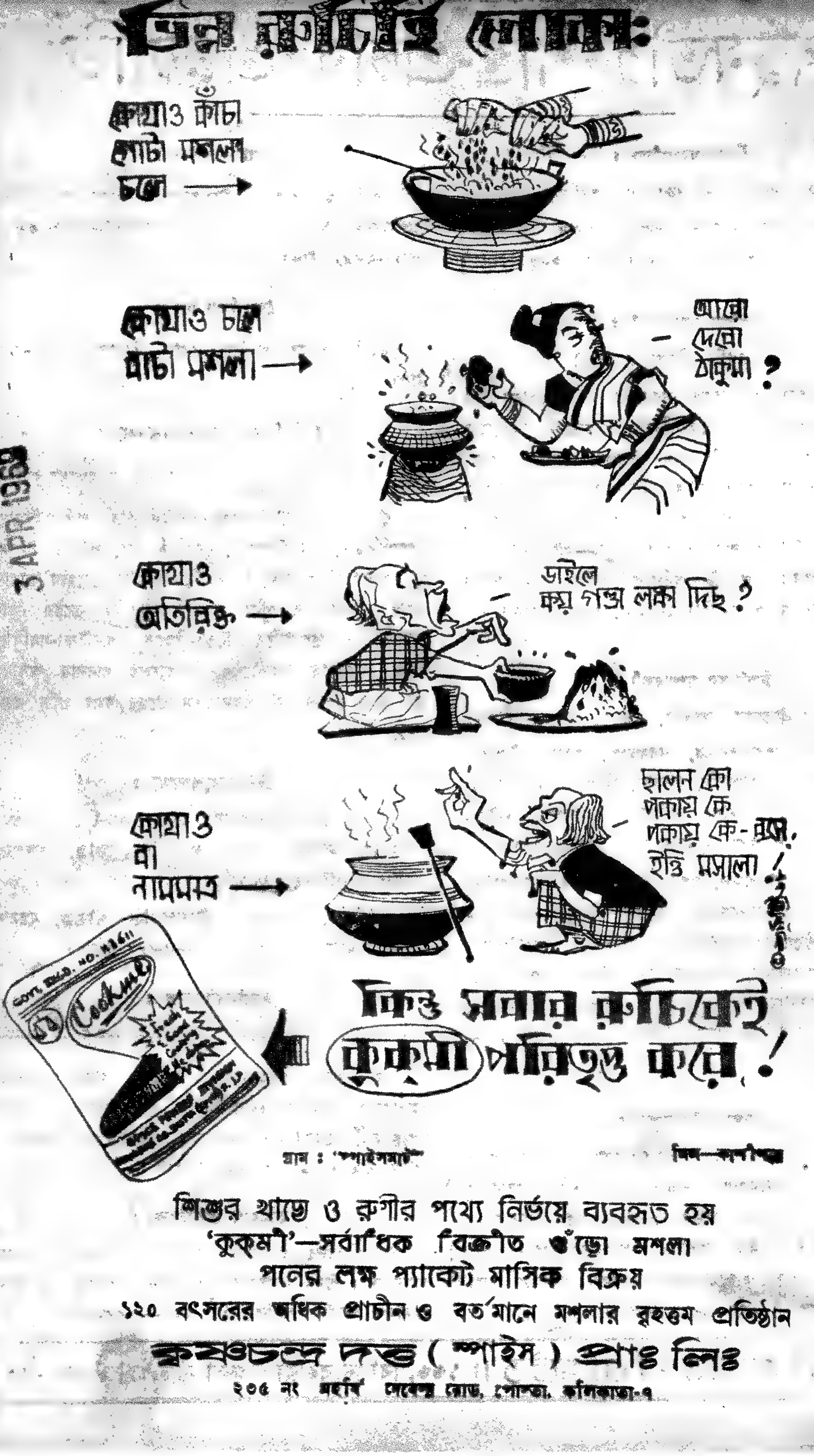
কোথাও কাঁচা
কোটা মশলা
চলে →
কোথাও চলে
বাটা মশলা →
আরো দেবো ঠাকুমা ?
কোথাও
অতিরিক্ত →
ডাইলে কয় গণ্ডা লঙ্কা দিছ ?
কোথাও
বা
নামমাত্র →
ছালন কো পকায় কে পকায় কে-রুসে, ইত্তি মসালা !
Cookme
কিন্তু সবার রুচিকেই
কুকমী পরিতৃপ্ত করে !
শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

...াহিক বসুমতী

কলকাতায়

অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্য সরকারের স্মারকলিপি
রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশ
অস্থায়ী রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান
কংগ্রেস ভবনের বাইরে বিক্ষোভ ও হাতাহাতি

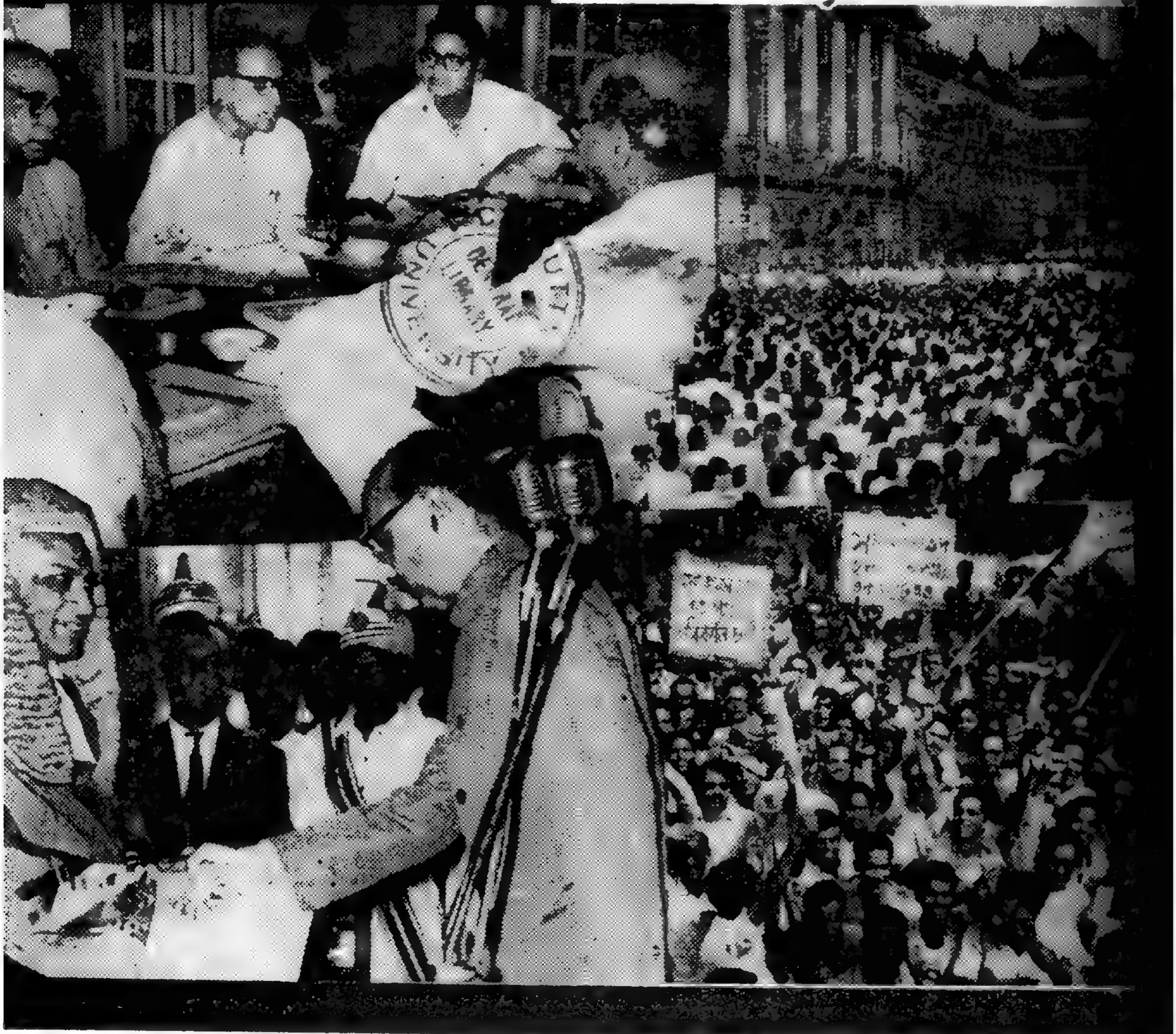

বর্ষ ঃ ৪২শ সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ২৭শে চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 42, 10th April, 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৬২৭
আজকের মানুষ		২৬২৮
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৬২৯
পথিক (কবিতা)	অধীর সরকার	২৬৩১
বঙ্গদর্শন		২৬৩২
ভারতদর্শন		২৬৩৫
আন্তর্জাতিক		২৬৩৯
আমার ইউরোপ ভ্রমণ	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২৬৪১
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	২৬৪৭
মন্ত্রীরা কি বলেন		২৬৫০
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	২৬৫১
কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণ চাই কেন? (প্রবন্ধ)	তুষার চট্টোপাধ্যায়	২৬৫৩

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স
৭৩।১এ রাসবিহারী এভিনিউ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নির্বাচনের পরে	— সাগর বিশ্বাস	২৬৫৭
অগ্নিগর্ভ পূর্ববঙ্গের বাণীবহ কয়েকটি কম্বু কবিকণ্ঠ	—	২৬৬০
মৌলিক অধিকারে মনোবিকার (প্রবন্ধ)	— দন্ডপাণি	২৬৬৩
পটের দুই দিক (গল্প)	— ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক	২৬৬৪
তিমিরপ্রান্ত ভন্মাসং	— অগ্নিবর্ণ	২৬৬৬
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	২৬৬৯
গ্রন্থমেলা		২৬৭৪
পাঠকমন		২৬৭৫
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাদিত্য	২৬৭৬
রূপালজগৎ		২৬৭৯
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	২৬৮৪

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মালা সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত॥

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য ঃ ৬·৫০

বসুমতীর সাহিত্য প্রচার

সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী

(চার খণ্ডে সমাপ্ত)

১ম ভাগ ঃ হুতোম প্যাঁচার নক্সা ঃ ঃ আলালের ঘরের দুলাল ঃ ঃ ভ্রান্তি-বিলাস

মূল্য ঃ চার টাকা

৩য় ভাগ ঃ ধর্মপাল ঃ ঃ ময়ূখ ঃ ঃ পাষাণের কথা

মূল্য ঃ চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

৪র্থ ভাগ ঃ স্তবক (দশটি কাহিনী) ঃ রসির ডায়েরী (ছয়টি কাহিনী)

মূল্য ঃ তিন টাকা

॥ সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলীর লেখকবৃন্দ ॥

হুতোম প্যাঁচা। টেকচাঁদ ঠাকুর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তারাশঙ্কর কবিরত্ন। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঞ্চনমালা দেবী।

ঘরে ঘরে রাখবার মত বাঙলার অমূল্য সম্পদ

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৪৩ বর্ষ : ৪২শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৭শে চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 10th April, 1969

মহার্ঘভাতা বৃদ্ধিতে সরকারী ন্যায়নীতি

বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি কিম্বা সূত্রের চেয়ে ব্যাখ্যা দীর্ঘ—এবম্বিধ প্রবাদ প্রচলিত থাকলেও হাতে-নাতে তাদের প্রমাণ পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এবং ঐ ধরণের প্রবাদ, লোক-ধারণায় যতোটা হাস্যকর ছিল তদপেক্ষা ছিল অবিশ্বাস্য। সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার বাস্তবে অত্যন্ত কৌতুকের সংগে সত্যে পরিণত হয়েছে গত দুই দশকের কংগ্রেসী শাসনে। ঐ শাসনে গরীবের সুদের বোঝা যেমন ঋণের চেয়ে বেশি হয়েছে, তেমনি দর বৃদ্ধির সংগে অঙ্ক কষে সামাল দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময় এমন হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন, যাতে আসল মাইনের চেয়ে মহার্ঘভাতা অনেক ক্ষেত্রে অঙ্কের হিসেবে বেশি হয়েছে—যদিও গরীবের তাতে সুবিধা কিছুই হয় নি। কারণ, জিনিসের দাম কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রুটি-পূর্ণ অর্থনীতির জন্য ক্রমশই ওপরের দিকে এগিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরণের নীতির জন্য সর্বাপেক্ষা আঘাত খেয়েছে রাজ্য সরকারগুলি। ফলে, কেন্দ্র ও রাজ্যে লড়াই সুরু হয়েছে। সেই লড়াই-এর ফলে উলুখড়দেরই প্রাণ যায়-যায়। আসল কথা হচ্ছে এই, সে লড়াই ছিল একদা রাজায়-রাজায় এবং দুই রাজাই তো একই দল থেকে আগত। সুতরাং উলুখড়দের দুঃখ-দুর্দশার কথা হৃদয় দিয়ে কেউ অনুভব করে নি।

এখন কিন্তু উলুখড়দেরই জয়। অতএব তারা অনাহারে মরবে না—এটাই আশা করা স্বাভাবিক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ-ভাতার হারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কর্ম-চারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। দীর্ঘকাল ধরে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা যে দাবির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁরা জয়ী হয়েছেন। এছাড়া আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো, সেটি হচ্ছে এই, রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ভাবতে পারেন নি যে, এতো দ্রুত রাজ্য সরকার তাঁদের ন্যায্য দাবি স্বীকার করে নিতে পারবেন। বিগত দিনগুলিতে সরকারী কর্মচারীরা এই দাবির জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে ব্যর্থই হয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে দুঃস্থ কর্মচারীদের প্রতি ন্যায় বিচারই করলেন। অপরপক্ষে বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য দশ টাকা হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করে রাজ্য সরকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের সম্পর্কে সমতায় দৃষ্টি প্রদর্শন করলেও ঐ হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি যথাযথ নয়, একথাও আমরা বলতে বাধ্য। অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, পে-কমিশনের রিপোর্ট বের হলে তাদের মহার্ঘভাতা রিপোর্টে প্রদত্ত হার অনুযায়ী বৃদ্ধি করা হবে। আমরা যতদূর জানি, সরকারী কর্মচারী এবং বিদ্যা-লয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার হার কি রকম হবে তা পে-কমিশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য কর্ম-চারীদের মহার্ঘভাতা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার হারে বৃদ্ধি করা এখনই সম্ভব হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কর্মচারীদের জন্য এমন ছিটে-ফোঁটার ব্যবস্থা কেন? বিশেষত একথা সবাই জানেন যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী আপিসের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী অপেক্ষা কম হারে বেতন পেয়ে থাকেন। এঁদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য সরকার যদি একটু সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন, তাহলে সরকারী ব্যয় আরো কিছু বাড়লেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের আদর্শ ও নীতিরই জয় হতো। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার তা করেন নি এবং রাজ্য সরকারের যে-সব কর্মচারী এক হাজার ও তদুপরি মাইনে পান, তাঁদেরও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে সরকারের উচিত ছিল, পাঁচশো টাকার ওপরে যাঁরা মাইনে পান, তাঁদের মহার্ঘভাতা এতো তাড়াহুড়ো বৃদ্ধি না করে পরবর্তীকালে বিবেচনা করা। প্রসঙ্গত একথাও মনে রাখা উচিত, বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কর্মচারীরা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ বা সাহায্য থেকেও বঞ্চিত; যেমন মেডিক্যাল সাহায্য হিসেবে তাঁরা কিছুই পান না।

গত বৃহস্পতিবার রাজ্য ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষকদের এক মিছিল রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁদের দাবি পেশ করে-ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষে সেখানে শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি যে রকম আচরণ করা হয়েছে তা সমর্থনযোগ্য নয় এবং কোনো মন্ত্রীর পক্ষে হঠাৎ দেখা হওয়া মাত্রই বলা সম্ভব নয় যে, এই পরিমাণ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করা হোল। তবে, যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলেই তাঁদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করেছেন এবং সেদিন মন্ত্রি-সভার জরুরী বৈঠক থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের সংগে সাক্ষাৎ করেছেন—যা কংগ্রেস আমলে কল্পনার বস্তু ছিল।

আমরা মনে করি, যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন এবং সেই সরকারের অস্তিত্ব যাঁরা বজায় রাখতে চান—প্রথমত তাঁদের উচিত হচ্ছে, সরকারের প্রতি আস্থার মনোভাব গ্রহণ করে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা। আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হলে তখনই অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। প্রাথমিক শিক্ষকগণ কি বিক্ষোভ মিছিল বের করার আগে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কোনোরকম আলাপ-আলোচনা করেছিলেন? করেন নি বলেই জল অনেক দূর গড়িয়েছে এবং তাঁদের দাবি ন্যায্য হলেও তাঁদের গৃহীত পন্থতি সম্বন্ধে অনেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন। তবুও আমরা আশা করবো, রাজ্য সরকার শিক্ষকমণ্ডলীর দাবি স্বীকার করে নেবেন। কারণ জাতির ভবিষ্যৎ তৈরির এরাই দক্ষ কারিগর।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ব্যক্তির জীবনে আট বছর একটা দীর্ঘ সময় বৈকি। বিশেষত ব্যক্তিটি যদি হন্ত কূটনীতিক হন, তবে তো বলতে হয় তাঁর জীবনের একটা মূল্যবান অংশ এই আটটি বছর। মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলজ জীবনের তাঁর সেই মূল্যবান অংশটা কাটিয়ে গেলেন ভারতবর্ষে। এই ক'বছর ধরে বোলজ ভারতবর্ষ এবং তার হাজারো সমস্যা, চারদিক থেকে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এ-দেশ দাঁড়িয়েছে তাকে নিবিড়ভাবে দেখার এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন। সম্পূর্ণ বিপরীত জগতের লোকের পক্ষে এ অভিজ্ঞতার মূল্য যে প্রচুর বিদায়ী রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলজ তারই উল্লেখ করেছেন। তাঁর জায়গায় সেই আলাদা জগৎ থেকে আসছেন কেনেথ কিটিং ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হয়ে।

রিচার্ড নিক্সন প্রেসিডেন্ট হবার পর দু'মাস সময় অতিক্রান্ত হল। এর মধ্যে তিনি অলৌকিক কিছু করেন নি, কেবল রুটিনমাফিক এবং বিচার-বুদ্ধিসম্মতভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিটিংকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোটাও নিক্সনের ওই রুটিনমাফিক কাজের অন্তর্ভুক্ত—চেস্টার বোলজ এখানে এসেছিলেন ডেমোক্রেটিক দলের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে। এখন যখন দেশে রিপাবলিকান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন একজন দলীয় লোক বা তার সমর্থককেই তো খাতির করা হবে।

পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে যাঁর ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন, সেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষে কাকে কী পদে নিযুক্ত করা হবে—এ প্রশ্নটা বলতে গেলে তুচ্ছ। কূটনীতির জগতে নবাগত কিটিংকে ভারতস্থ রাষ্ট্রদূতের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগও তাই নিক্সন নিঃসঙ্কোচে করতে পারলেন। কোন্ প্রেসিডেন্ট না এ ধরণের 'ডার্ক হর্স'কে সামনের সারিতে এনে ফেলেছেন, কোন্ চিত্রপরিচালক রুপালী পর্দায় নতুন মুখের আবির্ভাব না ঘটিয়েছেন? সেদিক থেকে কূটনীতিতে অনভিজ্ঞ কিটিংকে মনোনয়ন দিয়ে নিক্সন তো সাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সামনে চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর বিচার ঠিক হল

কেনেথ কিটিং

কি না কিটিং-এর কাজেই তার প্রমাণ মিলবে।

অবশ্য তাই বলে এ-কথা বলা ঠিক হবে না যে, কূটনীতিতে কিটিং-এর সবেমাত্র হাতে-খড়ি হল। কারণ কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও ইতিপূর্বে তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা দেখানোর সুযোগ হয়েছে। কাউন্সিল অফ ইয়োরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন, আন্তঃপার্লামেন্টারী ইউনিয়নেও তিনি আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

তাছাড়া সক্রিয় রাজনীতিতে রয়েছেন প্রায় দেড় যুগ ধরে। হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি বার ছয়েক। ১৯৫৮ সালে উদারনৈতিক রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেনেটে। রবার্ট কেনেডীর কাছে অবশ্য তাঁকে '৬৪ সালের নির্বাচনে নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে রাজনীতিতে আগ্রহ তাঁর বিন্দুমাত্র কমে নি।

তবে কেনেডীর কাছে হারবার পর কিটিং সক্রিয় রাজনীতি থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছেন। কারণ '৬৫ সনে তিনি নিউইয়র্ক রাজ্যের আপীল কোর্টের সহযোগী বিচারপতির পদ নিয়েছেন এবং এই পদেই গত চার বছর ধরে রয়েছেন। বস্তুত কিটিং আইনেরই লোক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনের স্নাতক হয়েছিলেন।

৬৯ বছর বয়সে কেনেথ কিটিং-এর নতুন জীবন, কূটনীতিকে বিচিত্র জীবন সুরু হল। জোট-নিরপেক্ষ বা অকমিউনিস্ট দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশে তাঁকে প্রথম পাঠানো হল কেন, এ প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তবে কি প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতবর্ষকে তেমন সুনজরে দেখছেন না? গলব্রেথ, বোলজের উত্তরাধিকারী হবার মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি কি কেনেথ কিটিং-এর আছে? তাঁকে সমর্থন করার জন্যে পুরস্কার দেবার প্রশ্ন যদি ছিল, তবে কিটিংকে অন্য কোন ছোট দেশে পাঠিয়েও তো তা করা যেত। এ যেন একজন কেরানিকে রাজদরবারে প্রতিনিধি করে পাঠানো। কিন্তু এভাবে ভারতবাসী বা ভারত সরকারকে হেয় করার ইচ্ছে বোধ হয় নিক্সনের সত্যি ছিল না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিটিং-এর জ্ঞান কিছু কম নয়, সেনেটের সদস্য হিসেবে তার স্বাক্ষর তিনি আগেই রেখেছেন। তাছাড়া আগ্রহ যদি আন্তরিক হয়, তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকও কি একটা দেশে গিয়ে স্বদেশের পক্ষে দূতিয়ালী করতে পারেন না? কিটিং তো আইন, রাজনীতি এবং জনসম্পর্কের বিষয়ে একজন পাকা লোক!

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"ভয়ঙ্কর লোকটি"র লণ্ডন-সংবর্ধনা—(৪)

বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে, তা ভেঙে পড়ার মুখে—এহেন রাজনৈতিক দৈববচনে সমাপ্ত থাকবার পাত্র সুভাষচন্দ্র ছিলেন না। 'দৈব কিংবা পুরুষকার' —পুরুষকারেই তাঁর আকর্ষণ। সুতরাং হরিপুরায় কংগ্রেস সভাপতিত্ব করার পরেই যখন বোম্বাইয়ে গিয়ে হাজির হলেন, সংগ্রামের তূর্য বাজল কণ্ঠে। ডি ভ্যালেরার সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের কিছু প্রকাশ্য ফলশ্রুতি দেখা গেল সেখানে। তিনি খোলা গলায় আয়ারল্যাণ্ডের রক্তাক্ত সংগ্রাম এবং তার সফল নেতার জয়গান করলেন। দেখা গেল অহিংসার স্নিগ্ধ শিশির মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে শুষ্কপ্রায়।

২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ তারিখে বোম্বাইয়ের কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে বোম্বাই কংগ্রেস সোসিয়ালিস্ট পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা করেন। ঐ জনাকীর্ণ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন পণ্ডিত জহরলাল। "১৯১৬ সালের ইস্টার বিপ্লব থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত আইরিশ রাজনীতি ও বৃটেনের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করেন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ-চন্দ্র বসু।" এই সভায় সুভাষচন্দ্র যা বলেছিলেন, তাঁর ভাবী কর্মপন্থার দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সংবাদপত্র থেকে যতটুকু বিবরণ পেয়েছি, প্রথমে তা তুলে ধরা যাক

> "সুভাষচন্দ্র বলেন, স্বাধীনতার জন্য আয়ারল্যাণ্ডের সংগ্রামকালে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলির পর্যালোচনা ভারতের পক্ষে অতীব মূল্যবান হবে; আইরিশ ইতি-হাসের পৃষ্ঠা থেকে ভারতবর্ষ অনেক শিক্ষা নিতে পারবে। মিঃ ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে আয়ারল্যাণ্ড বর্তমানে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তার যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত দেবার জন্য তিনি ১৯১৬ সালের ইস্টার বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেন। ১৯১৬ সালের ইস্টারের সময়ে যে বিপ্লব ঘটেছিল, তাতে বিপ্লবের পক্ষে ছিল প্রায় আটশো বিপ্লবীর একটি দল, অন্যদিকে পঞ্চাশ হাজার বৃটিশ সৈন্য। বিপ্লব যখন বাধল তখন জনগণের পূর্ণ সমর্থন তার পিছনে ছিল না। একদিক থেকে একথা বললেই ঠিক হয়—বিপ্লবীরা মরীয়ার ভাবে চালিত ছিল। তা ছিল পুরোপুরি সজ্ঞান আত্মবলিদান। বিপ্লবীদের অনেকেই ধরা পড়লেন, তাঁদের বহুজনকেই লটকে দেওয়া হল। তাঁদের ধরে যখন হাঁটিয়ে ইংলণ্ড নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ডাবলিনের উপর দিয়ে—পথের ধারে ভিড় করে দাঁড়ানো আইরিশরা কিন্তু কোনো আবেগ দেখায় নি। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাদের ভাবাবেগ জাগল, বিপ্লবীদের প্রতি সহানু-ভূতি ক্রমেই বেড়ে উঠল।
>
> সিন ফিন পার্টি ও তার নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের উল্লেখ করার পরে শ্রীযুক্ত বসু মিঃ ডি ভ্যালেরার সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র দান করেন। ডি ভ্যালেরা এক বৃটিশ কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় হাজির হন: সেখানে থেকে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত প্রচার চালিয়ে যান। ক্রমে তিনি এ ব্যাপারে আমেরিকান জনমতকে এমন জাগিয়ে তুলতে পারেন যে, বৃটিশ সর-কারের উপরে তা যথেষ্ট চাপ দিয়ে আইরিশদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় তাকে আসতে বাধ্য করেছিল। আয়ারল্যাণ্ডের বর্তমান অবস্থা সম্ভব হয়েছে অতীতে তার খ্যাতনামা সন্তানদের জন্যই, যাঁদের আপোষহীন চেতনা জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে উজ্জীবিত রেখেছিল, সেই সঙ্গে ছিল বিভিন্ন আন্দোলনকে, যথা সমবায়মূলক ভূমিসংস্কার এবং আইনসভার কার্যাবলী প্রভৃতিকে, উপযুক্তভাবে ব্যবহার করায় তাঁদের সামর্থ্য। সংগ্রামের সকল পর্যায়ে আইরিশদের একটিই আদর্শ ছিল—"আত্মনির্ভরতা।"
>
> ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তি এবং সেই চুক্তির কার্যকারিতার পর্যালোচনা করার পরে শ্রীযুক্ত বসু মন্তব্য করেন, এই চুক্তির সাহায্যে কতকগুলি সুযোগ আদায়ে মিঃ ডি ভ্যালেরা সমর্থ হয়েছেন। যেমন, আয়ারল্যাণ্ডের গভর্নর জেনারেল তাঁর সুপারিশেই নিযুক্ত হবেন, বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে তা মানতে বাধ্য করেছেন। ঐ চুক্তির সাহায্যেই তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ বাতিল করে দিয়েছেন। ডি ভ্যালেরার রাজনীতির আর একটি দান "এক্সটারন্যাল অ্যাসোসিয়েশন"—নিজ পররাষ্ট্রনীতিকে তিনি যে-নামে চিহ্নিত করেছেন। এই দুই দেশের স্থায়ী বন্ধুতা-নীতির সূত্রেই তিনি তাঁর "এক্সটারন্যাল অ্যাসোসিয়েশন"-নীতির কথা উত্থাপন করেছেন, যার

দ্বারা ইংলন্ডের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণের জন্য আয়ারল্যান্ডকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

আলস্টার সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসু বলেন, আইরিশ ফ্রি স্টেটের পক্ষে এটি একটি মূল সমস্যা। আলস্টারের বেশী লোক প্রোটেস্টান্ট সেইজন্য তারা প্রধানতঃ ক্যাথলিক-অধ্যুষিত আইরিশ ফ্রি স্টেটে যোগদানের বিরোধী—এই মত তিনি মানতে পারেন না। তাঁর মতে, বৃটেনের বিরুদ্ধে লড়েছেন এমন কয়েকজন আইরিশ নেতা ছিলেন প্রোটেস্টান্ট।

শ্রীযুক্ত বসু বলেন, ১৯৩৩ সালে বার্লিনে থাকাকালে তিনি আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু ইংলন্ডে যাওয়া তাঁর নিষিদ্ধ তখন। তিনি বার্লিনের আইরিশ কনসালের স্বারস্থ হন, যাতে তিনি আয়ারল্যান্ড গমনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পারমিট জোগাড় করে দেন। সে পারমিট যথাসময়ে পাওয়া যায়, তবে একটি শর্ত ছিল, আয়ারল্যান্ড থেকে ইংলন্ড যেতে পারবেন না।

মিঃ ডি ভ্যালেরা ভারত সম্বন্ধে অতীব আগ্রহী। মহাত্মা গান্ধী, খাদি আন্দোলন, এবং কংগ্রেসের কার্যাবলী সম্বন্ধে সবকিছু জানতে চান।"

আবার বলতে হচ্ছে—এই বক্তৃতা দেবার সময়েও সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে ইতিহাস ভর করেছিল। সেই সঙ্গে তিনি ভবিষ্যতের আয়নায় নিজের চেহারা দেখবার চেষ্টাও করছিলেন। পাঠক লক্ষ্য করবেন, চার-পাঁচ মাস আগে অহিংসা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের যে-ব্যাকুলতা দেখা গিয়েছিল তা এখন বজায় নেই, তিনি আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত পৃষ্ঠা থেকে ভারতবর্ষকে শিক্ষা নিতে বলছেন। যারা অহিংস পথ নিয়ে চলবে তারাও আইরিশ নেতাদের বুদ্ধিকুশলী নেতৃত্ব থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে, তাও জানাচ্ছেন। কিভাবে সিন ফিন আন্দোলন পার্লামেন্টারী পথকে জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, কিভাবে আইরিশ নেতা চুক্তির কৌশলী ব্যাখ্যার দ্বারা বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন, তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি অহিংসাকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-উপায়ের বেশী একটুও মনে করতে চাইছেন না। অহিংসার আতিনৈতিক মূল্য সম্বন্ধে তাঁর কোনো মমত্বই নেই। তাঁর বক্তব্য, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা কংগ্রেস যে সুযোগ পেয়েছে, তাকে যেন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে প্রয়োগ করে।

সেখানেই তিনি থামছেন না। সশস্ত্র সংগ্রামের যথেষ্ট ইঙ্গিতও তাঁর বক্তৃতায় ছিল। সেই ইঙ্গিত হয়ত শ্রোতাদের সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল না। বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা নয়, যদি সব কিছু ব্যর্থ হয়, কিছুসংখ্যক মানুষের প্রকাশ্য মরীয়া বিদ্রোহ, যার আদর্শ সংস্করণ আয়ারল্যান্ডে ইস্টার বিপ্লবের সময়ে দেখা গিয়েছিল। অতি ক্ষুদ্রাকারে বাংলা দেশে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়েও দেখা গিয়েছে। ঈষৎ ব্যাপক আকারে সেই বিদ্রোহ ভারতেও যদি ঘটে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া সম্ভবপর বলে সুভাষচন্দ্র মনে করেছেন। ইস্টার বিপ্লবের পরে বন্দী বিদ্রোহীদের যখন ডাবলিনের রাজপথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখনো আইরিশ জনগণের যথেষ্ট সহানুভূতি নেই—যা কিন্তু অচিরকালের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্রও হয়ত ভেবেছিলেন, অহিংসাভক্ত এবং ইংরেজ-ভীত ভারতীয় জনতা ঐ ধরণের মরীয়া কোনো বিদ্রোহ হলে হয়ত প্রথমে সহানুভূতি বোধ করবে না, কিন্তু 'বীরের রক্তস্রোত' নাড়া দেবেই চেতনাকে, যখনই হোক।

কথাটা কত সত্য, সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী কীর্তির দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝব। দেশত্যাগ করে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেছিলেন—তাঁর তৎকালীন সেই কার্যকলাপকে মহাযুদ্ধকালে শাসক ইংরাজ এবং শাসিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভারতীয় মহল থেকে যথেষ্ট গ্লানিজনকভাবে আবৃত রাখা হয়েছিল; কিন্তু যুদ্ধান্তে আজাদ হিন্দ সেনানীদের যখন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল, তখনই উদ্বেল হল ভারতবর্ষ—যার তুলনা অল্পই মেলে—এবং সেই প্রচণ্ড প্রাণোচ্ছ্বাসের ভরঙ্গাঘাতই বৃটিশ দুর্গের উপর চরম আঘাত।

এই বক্তৃতা থেকে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। রাশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রগতিশীল ভাবধারাকে গ্রহণ করার পরেও সুভাষচন্দ্র এই পর্যায়ে আইরিশ আন্দোলনের কাছে ঋণ স্বীকার করছেন। ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনাপর্বে আইরিশ আন্দোলনের প্রভাব ছিল। আইরিশ নিবেদিতা নিশ্চয়ই অরবিন্দ ও সিন ফিন আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দল গঠনের পিছনেও ছিল আইরিশ আদর্শ। ১৯৩৮ সালেও আইরিশ আদর্শ। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক চিন্তায় ও কর্মপন্থায় কদাপি মৌলিকতা-অভিমানী ছিলেন না। তিনি জানতেন, নিজের মত তৈরি ও প্রচার করার মূলে অনেক সময়ে ব্যক্তিগত অহমিকাকে সমষ্টিস্বার্থের চেয়ে এগিয়ে দেওয়া হয়, অনেক সময়েই অতীতের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করে নতুন কিছু করার উত্তেজনায় শক্তিশালী প্রতিভাবান মানুষ চালিত হয়। সুভাষচন্দ্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ধাবিত পুরুষ। সুতরাং এই উদ্দেশ্য যাদের, তাদের অতীতে গৃহীত পন্থা ও তার সাফল্য-ব্যর্থতা স্বভাবতই তাঁর সযত্ন পর্যালোচনার বিষয় হয়েছিল। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ডের সংগ্রামের ইতিহাস—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ভারতও তাই করছে। সুতরাং ইংলন্ড-সংলগ্ন আয়ারল্যান্ড যে সকল উপায়ের দ্বারা ইংলন্ডকে নমনীয় করেছে, অধিক ফলপ্রদ অন্য উপায় না পেলে ইংলন্ড থেকে বহু দূরবর্তী ভারতের পক্ষে আয়ারল্যান্ডের পন্থা না নেবার কারণ নেই। সুভাষচন্দ্র অন্তত তাই ভেবেছিলেন।

কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা কোনো একটি রাষ্ট্র থেকেই নিতে হবে, এমন বদ্ধতা সুভাষচন্দ্রের ছিল না। ভারতের আশু প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংলন্ডের কাছ থেকে,

শরিক

অধীর সরকার

এতদিন তো ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে ছিলি
এবারে তুই বাইরে এসে দাঁড়া ;
চোখ-ধাঁধানো শুষ্ক রুক্ষ হাওয়া রে দিক এসে
অস্থিমজ্জায় নাড়া।

এতদিন তো জাল বুনে তোর জীবন গেছে বয়ে
স্বপ্ন-কল্পনাতে—
কোকিল ডাকে আমের ডালে, আকাশ জুড়ে হাসি
অমল জ্যোৎস্নাতে

ফুলে ফুলে প্রজাপতির প্যাখার কাঁপন দেখে
দু'চোখ জুড়ে আসে ;
এবারে তুই চোখ ফিরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়া
সেই মানুষের পাশে

পশুর মতো খাটছে যারা চক্র-বাঁধা পথে
ক্ষেতে—কলে, শরীর ভেজা ঘামে ;
তাদের শ্রমের পথ বেয়ে যে নবীন সভ্যতারই
আলোকধারা উজাড় হয়ে নামে

অথচ তো ওদের ঘরে আঁধার জুড়ে আছে
দুঃখে-শোকে ক্ষুধার হাহাকারে ;
মানুষ ?—ওরা মানুষ না কি! কিসের জন্যে তবে
অকারণের বাষ্পটুকু জমবে মনে—জমবে চোখের ধারে!

এতদিন তো আপন সুখে মগ্ন হয়ে ছিলি
এবারে তুই বাইরে এসে দাঁড়া ;
ছিন্ন জীর্ণ ক্লিষ্ট দীর্ণ, মানুষ এবার তবে
জীবনে দিক নাড়া।

সুতরাং এক্ষেত্রে একই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে সফল আয়ার-ল্যান্ড আদর্শ। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আয়ারল্যান্ডের ভূমিসংস্কার প্রয়াসকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন নি। ভারতের মত অতিবৃহৎ অনগ্রসর দেশের জনগণ সমাজতন্ত্র ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তি কখনো লাভ করবে না। এবং জনগণের সেই সমাজতন্ত্র অন্য কারণে না হলেও দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্যও প্রয়োজন—কৈশোরকাল থেকে সেকথা তিনি জেনেছেন বিবেকানন্দ মারফত। এক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিপ্লবের দৃষ্টান্ত যে-দেশ দেখিয়েছে, তার কাছ থেকেও শিক্ষা নিতে প্রস্তুত। সে দেশের নাম রাশিয়া। অর্থাৎ, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ডি ভ্যালেরা এবং অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার জন্য লেনিন। কিন্তু ভারতবর্ষ কোথায়? ভারতবর্ষ আছে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, যিনি ভারতেরই মাটির ও আত্মার আশ্রয়ে লালিত। সুভাষচন্দ্রের বিশাল শক্তি সব-কিছুকে গ্রহণ করেও নিজ ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারত। ভারতবর্ষ সবকিছুকে নিয়েও তার উপরে নিজের সংস্কৃতির প্রভাবকে জয়ী করতে পারবে, এই ছিল সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস। এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আমাদের ভবিষ্যতে আলোচনা করতে হবে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ধারণার আলোচনাকালে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা হরিপুরা কংগ্রেসের বৃহৎ জয়ধ্বনির মধ্যে প্রবেশ করব। তার আগে ঐ সময়ে ও কিছু পরবর্তীকালে তাঁর মনোভাবের একটা ছক দিতে চাই, যার দ্বারা বিস্তৃত আকারে যেসব ঘটনা অতঃপর উপস্থিত করব, তার ভিতরে মূল সূত্রটি পাঠকের বুঝে নিতে সুবিধা হবে।—

(১) নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অনেকদিনই অচল। গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে;

(২) গান্ধীজী ১৯০২ সাল থেকে অহিংস আন্দোলনের দ্বারা ব্যাপক জাতীয় জাগরণ এনে নতুন পথ দেখিয়েছেন;

(৩) কিন্তু শেষের দিকে জনসাধারণের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দ্রুত সংগ্রামের পথে চালিত করতে তিনি অনিচ্ছুক বা অপারগ; অহিংসা তাঁর কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি অতিশয় রক্ষণশীল;

(৪) কিন্তু স্বাধীনতা (সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তি) চাই, যত দ্রুত সম্ভব—তাই প্রয়োজন বিকল্প নেতৃত্ব;

(৫) সুতরাং পথ :

(ক) গান্ধীজীকে তাগিদ দিয়ে সত্বর সংগ্রামে প্রণোদিত করা (হরিপুরায় সুভাষচন্দ্রের মনোভাব);

(খ) গান্ধীজীকে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ভিতরে বামপন্থী শক্তিসমূহকে সংগঠিত করা (ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব);

(গ) তাও সম্ভব না হলে সংগ্রামীর পুরাতন পথ গ্রহণ—শত্রুর শত্রু-রূপ মিত্রের সাহায্য গ্রহণ (ত্রিপুরী-উত্তরকালে সুভাষচন্দ্রের মনো-ভাব);

যে কোনো ক্ষেত্রেই, বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ ছাড়া চলবে না (সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যুদ্ধকে আসন্ন বলে অনুভব করেছিল), কারণ "যুদ্ধ পরাধীন দেশের পক্ষে অবিমিশ্র মঙ্গল নয়" (রোলাঁর সঙ্গে কথোপকথন)।

[ক্রমশ]

অর্থ দর্শন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু গত ২রা এপ্রিল তারিখে কলকাতায় আগত কেন্দ্রীয় সরকারের ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের কাছে দাবি করেন যে, এ রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, যার পরিমাণ আগামী পাঁচ বছরে ৫৮১ কোটি টাকায় পৌঁছবে, তার সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে পূরণ করে দিতে হবে, কেন না এ রাজ্য কেন্দ্রের কাছ থেকে সুবিচার পায় নি। তাঁরা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের ঘাটতি পড়লে বিদেশের সাহায্য নিতে পারেন, কিংবা নোট ছাপিয়ে তা পূরণ করে নিতে পারেন। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলির সে ক্ষমতা বা অধিকার নেই, কাজেই তাদের ঘাটতি পূরণের নৈতিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সে দায়িত্ব তাঁদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষ থেকে মুখ্য ও উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগীর নেতৃত্বে গঠিত অর্থ কমিশনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে এই রাজ্যের পুঁজির এক বৃহদংশই নিয়ন্ত্রিত হয় অন্য রাজ্যের লোকেদের দ্বারা। রাজ্য সরকার এ-কথা বলতে চান যে, অন্য রাজ্য থেকে উৎসাহী ব্যক্তিরা এ রাজ্যে আসুন তা তাঁদের অনভিপ্রেত নয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটাও দেখতে চান যে, এ রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের পরিবেশ যাতে আরও উন্নত হয়, সে ব্যাপারে এ রাজ্যের জনগণও অংশ গ্রহণ করুন।

অর্থ কমিশনের কাছে এ দাবিও জানানো হয়েছে যে, যদি বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁদের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁরা সংবিধানকে যেন এমনভাবে সংশোধন করার সুপারিশ করেন যার ফলে রাজ্যগুলি তাঁদের বরাদ্দ পেতে পারেন। সংবিধানে কেন্দ্রকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অথচ সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারগুলির উপর। এর ফলে একটা অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করার একটা প্রবণতাও সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আয়কর আইন যেভাবে সংশোধিত করা হয়েছে তার ফলে রাজ্যগুলির পাওনা অনেকখানি কমে গেছে। তাই তাঁরা আয়কর আইনকে সংশোধন করে কোম্পানী-কর যাতে বণ্টনযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানিয়েছেন। আবগারি থেকে যে বিশেষ শুল্ক আদায় করা হয়, তাও বণ্টনের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে এই মত প্রকাশ করা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাগুলির ব্যয়ের জন্য তাঁদের ব্যয়কে সীমাবদ্ধ করা। শিল্প ও কৃষির মতো রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে ব্যয়ের ভার রাজ্য সরকারগুলির হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের পীঠস্থান এই পশ্চিমবঙ্গ তার বাঁচবার জন্য ওই অর্থের যথোচিত অংশ পায়।

রাজ্য সরকারের এই বক্তব্য যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত সেকথা বলাই বাহুল্য। রাজ্যের শিল্প সংস্থাগুলিকে চালু ও নিরাপদ রাখার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, কিন্তু শিল্প থেকে যে রাজস্ব আদায় হয় তার অতি সামান্য পশ্চিমবঙ্গ পেয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে ক্ষুদ্র এবং এর লোকসংখ্যাও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। এই রাজ্যে কৃষিজাত পণ্য অপেক্ষা শিল্পজাত পণ্যেরই প্রাধান্য বেশি, কিন্তু শিল্পোদ্ভূত রাজস্বের উপর রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত দাবি উপেক্ষিত হবার ফলে দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয় ও ব্যয়ের সমতা আনতে পারছেন না। অপর দিকে যে সমস্ত রাজ্য কৃষিপ্রধান তারা কৃষি থেকে উদ্ভূত পুরো রাজস্ব তো ভোগ করছেই, উপরন্তু লোকসংখ্যা ও মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অতিরিক্ত অর্থও পাচ্ছে। এমন কি চতুর্থ পরিকল্পনাতেও এই রাজ্যের জন্য যে বরাদ্দ করা হয়েছে, তাও বর্তমান মূল্যমানের ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা অনেক কম। রাজ্য সরকার তাদের স্মারকলিপিতে বলেছেন যে, আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন খাতে ১৪০৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে, কিন্তু বর্তমান রাজস্বের ভিত্তিতে ৮২৪ কোটি টাকার বেশি সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এই ঘাটতি কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ করতে নীতিগতভাবে বাধ্য। যে নীতির ভিত্তিতে অর্থ বণ্টন করা হয় সেই নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটানো দরকার। প্রধানত আয়কর এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং বণ্টননীতি নির্ধারণ করেন অর্থ কমিশন। কেন্দ্রীয় তহবিল প্রধানত রাজ্যের লোকসংখ্যা এবং মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়ে থাকে যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ চিরকালই বঞ্চিত হয়, অথচ কেন্দ্রীয় তহবিলের একটা মোটা অংশই সংগ্রহ করা হয় পশ্চিমবঙ্গ হতে। এই শোচনীয় অবস্থার অবসান এই মুহূর্তেই হওয়া প্রয়োজন।

তেলেনীপাড়ার হাঙ্গামা

গঙ্গার পশ্চিমকূলে কলকাতা থেকে মাইল কুড়ি দূরে তেলেনীপাড়ায় সম্প্রতি যে হাঙ্গামা ও গোলযোগ হয়ে গেল তার পিছনে প্রভাবশালী কয়েকজন কংগ্রেস নেতা, জনসংঘ ও স্থানীয় চটকলগুলোর কোন কোন কর্মকর্তার হাত ছিল বলে রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তরে না কি অভিযোগ এসেছে। ডি আই জি পর্যায়ের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে তদন্ত করে দেখছেন বলে দৈনিক বসুমতীর ৩রা এপ্রিল সংখ্যায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রদপ্তর যে সব সংবাদ পেয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, বিগত অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে স্থানীয় কংগ্রেসপ্রার্থীর পরাজয়ের পর থেকেই এই অঞ্চলে গোলযোগ সৃষ্টি করার একটা বিশেষ প্রচেষ্টা শুরু হয়। ওই নির্বাচনে তেলেনীপাড়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেওয়ায় তাদের উপর নানা রকমের ভীতি প্রদর্শন চলতে থাকে। কংগ্রেস ও জনসংঘের একটি অংশ স্থানীয় আহির সম্প্রদায়ভুক্ত অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা

ছড়াতে থাকে। এই সংবাদ পাবার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ওই সব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন। আই জি লিখিত নির্দেশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এ নির্দেশ পালিত হয় নি। অথচ ওই সকল ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে প্রচুর আপত্তিজনক জিনিস পাওয়া গেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি ব্যাপারটিকে সহজে ছেড়ে দেন নি, তদ্দণ্ডেই অযোগ্যতার অপরাধে উক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারকে অন্যত্র বদলি করেছেন, এবং যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ডি আই বি বিভাগের যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ওই সকল দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। পদস্থ আমলাগণ গতানুগতিকভাবেই কাজ চালাতে অভ্যস্ত এবং তাঁদের অনেকের মধ্যেই ব্যুরোক্রাসীর ঢিলেঢালা স্বভাব এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, জেলায় জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিলেও তাঁরা তার গুরুত্ব বুঝতে পারেন না। সরকারী নীতি ও আদেশের প্রতি অবহেলা এবং সমাজবিরোধী ও দাঙ্গাবাজদের দমনে ব্যর্থতা জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যপালনে চূড়ান্ত অবহেলা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং হুগলীর এই দুজন অফিসারের দৃষ্টান্ত দেখে আশা করি অনেকেই শিক্ষালাভ করবেন।

যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীরা নিজেরাই হাঙ্গামাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং তাঁদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় দ্রুতগতিতে অবস্থা আয়ত্তে আসে। ক্রীড়াদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জী হাঙ্গামা-পীড়িত তেলেনীপাড়ার একটি গৃহ থেকে গত ২রা এপ্রিল সকালে কয়েকটি বড় বোমা ও প্রচুর অ্যাসিড-বাল্ব উদ্ধার করে একটি নজীর সৃষ্টি করেছেন। স্থানীয় ভিক্টোরিয়া জুট মিল থেকে অনেকগুলি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। মোটামুটি একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে। তা হয়েছে দাঙ্গা বাধে না, বাধানো হয় এবং এই একটি ক্ষেত্রেই দাঙ্গার পিছনকার মোটিভটা ভাল করে বোঝা গেছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার তেলেনীপাড়ার হাঙ্গামা দমনে এবার প্রশংসনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা না বললে অন্যায় হবে। যুক্তফ্রণ্টের বিভিন্ন দলের কর্মীরা শুধু দাঙ্গা রোখাই নয়, আহতদের সেবাকার্য, আতঙ্কিত ব্যক্তিদের অপসারণ প্রভৃতি ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, এবং এখনো করছেন।

দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ

পয়লা এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সমান হারে মহার্ঘভাতা পাবেন, এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যুক্তফ্রণ্ট সরকার অসংখ্য মানুষের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার ফলে রাজ্য সরকারের প্রায় দুলাখ কর্মচারী উপকৃত হবেন। সরকারী কর্মচারী ছাড়াও কলকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌরসংস্থা, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বে-সরকারী ইস্কুল কলেজের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরাও এই দুর্মূল্য ভাতার সুবিধা ভোগ করবেন। গত কয়েক বছর ধরেই সরকারী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে দুর্মূল্যে ভাতার দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। তাঁরা তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা বোঝানোর জন্য ইতিপূর্বে বহুবার কংগ্রেসী সরকারের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁদের দাবি গ্রাহ্য হয় নি। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রথমবার ক্ষমতায় এসে কর্মচারীদের দুর্মূল্য ভাতা বাড়িয়ে দেন, এবারে তা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের প্রাপ্ত দুর্মূল্য ভাতার সঙ্গে সমান করে দেওয়া হয়েছে। এজন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে আমরাও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই দুর্মূল্য ভাতা যোগাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বছরে অতিরিক্ত নয় কোটি টাকা খরচ হবে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এক স্মারকলিপিযোগে অর্থ কমিশনের কাছে এ বাবদে পাঁচ বছরের জন্য ৪৫ কোটি টাকা দাবি করেছেন। প্রধানমন্ত্রীকেও এ বাবদে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গজেন্দ্র গাদকার কমিশন কয়েক বছর আগেই উভয় সরকারের সমহারে দুর্মূল্য ভাতা দেবার সুপারিশ করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা যেন এই জন্য পর্যাপ্ত অর্থভাণ্ডার নিয়ে রাজ্যগুলির পাশে গিয়ে দাঁড়ান। কিন্তু সে প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার বড় একটা কান দেন নি। যাই হোক নিজ নিজ কর্মচারীদের আন্দোলনের চাপে পড়েই হোক বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই হোক কেরালা, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট সরকার গজেন্দ্র গাদকার কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সেই বহুপ্রতীক্ষিত দাবিটা মেনে নিয়ে কর্মচারীদের প্রতি সুবিচার করেছেন।

অতঃপর সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য যে, যুক্তফ্রণ্ট যেমন তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসূচক মনোভাব প্রকাশ করছেন, যুক্তফ্রণ্টকে যাঁরা ক্ষমতায় এনেছেন সেই জনগণের প্রতিও যেন সরকারী কর্মচারীরা সহানুভূতিসূচক ব্যবহার করেন। জনসাধারণ সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে ভদ্র বলা যায় না। এমন কর্মচারী খুব কমই আছেন যাঁরা দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী এবং উৎকোচ ভিন্ন যে কোন কাজই সরকারী অফিসে পাওয়া যায় না এ কথা সর্বজনবিদিত। আশা করি বাঁ হাতের প্র্যাকটিশ এবার তাঁরা সচেতনভাবেই বর্জন করার চেষ্টা করবেন। বোধ হয় কোন সভ্য দেশে একটা সীল দেবার জন্য বেয়ারাকে আট আনা আর পেসকারবাবুকে এক টাকা দিতে হয় না।

বর্গাদার উচ্ছেদ

পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা অবিলম্বে বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধের জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাত্র কয়েকদিন আগে যুক্তফ্রণ্ট কমিটির বৈঠকে এই অর্ডিন্যান্স জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তদনুযায়ী কাজ করার জন্য মন্ত্রিসভাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধের অর্ডিন্যান্সটির নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার অর্ডিন্যান্স। অর্ডিন্যান্স জারি হবার দিন থেকে বর্গাদার উচ্ছেদের জন্য কোর্ট থেকে পাওয়া কোন আদেশ আপাতত বলবৎ করা যাবে না। নতুন করে উচ্ছেদের জন্য কোন আবেদনও করা যাবে না। যতদিন পর্যন্ত এই অর্ডিন্যান্স চালু থাকবে ততদিন পর্যন্ত কোন বর্গাদারকে কোন আদেশবলেই উচ্ছেদ করা যাবে না। সাধারণত প্রতি বছর চৈত্র বৈশাখ মাসেই আইনের সাহায্যে বর্গাদার উচ্ছেদ করা হয়ে থাকে। অন্যান্য বছরের মত এবারও

শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার

সেই উচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার আইনের সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করে উচ্ছেদ বন্ধ করতে চান। কিন্তু এই আইন প্রণয়ন সময় সাপেক্ষ বলে এই অর্ডিনান্স জারি করা হয়েছে। রাজ্যের ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর আইনের সাহায্য নিয়ে বর্গাদার উচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ে নি। তবে যথারীতি বে-আইনী উচ্ছেদ চলছে। এই অর্ডিনান্স জারি করা হলে জমির মালিকরা বুঝতে পারবে যে সরকার আইনের সাহায্যে উচ্ছেদ করতে দিতে চান না, বে-আইনী উচ্ছেদ বরদাস্ত করা হবে না, অন্যদিকে সংগঠিত কৃষকসমাজও বে-আইনী উচ্ছেদ প্রতিরোধ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে পারবে।

এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। যুক্তফ্রন্টের বত্রিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে ভূমিসংস্কার একটি প্রধান বিষয়, এবং বর্তমান অর্ডিনান্সটি ভূমিসংস্কারের পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে আমরা ভূমিরাজস্বমন্ত্রীকে আরও কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কংগ্রেস আমলে জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তৎপূর্বে আইনের দ্বারা ভূমি হস্তান্তর নিষেধ না করার জন্য জোতদাররা অতি সহজেই সেই আইনকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হয়েছিল। যেসব জমিকে তখন বেনামা করা হয়েছে সেগুলিকে উদ্ধার করা বোধ হয় খুব কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু এভাবে যে জমি উদ্ধার করা যাবে তা সকল ভূমিহীনকে বিতরণ করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ভূমিশ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সমস্যা, বছরে যারা ন'মাস বেকার বসে থাকে তাদের বিকল্প জীবিকার উপায় স্থির করে দিতে হবে। প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুতের প্রসার ঘটিয়ে ছোট অথচ আধুনিক ধরণের শিল্পোদ্যোগ গ্রামে ঘটাতে হবে. গ্রামের বেকার সমস্যার সমাধানের উপরেই ভূমিসংস্কারের সাফল্য নির্ভর করছে। বারান্তরে বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে (৩)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, অন্তত একটি ক্ষেত্রে তিনি তৎপরতার সঙ্গে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, ২০শে মার্চের সংখ্যায় আমরা গোবরা মানসিক হাসপাতালের জনৈক ক্লার্কের কথা লিখেছিলাম, যিনি দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগে স্বাস্থ্য অধিকর্তা কর্তৃক অন্যত্র বদলি হয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের বহু আলোচিত হেলথ ডিরেক্টরেটের সেই পদস্থ আমলার বেপরোয়া তদ্বিরের ফলে বদলি এড়িয়ে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে (ক্লার্ককে) জলপাইগুড়িতে বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এই কারণে যে, উক্ত ক্লার্ক তাঁর পূর্ব কর্মস্থলে (গোবরা মানসিক হাসপাতালে) থাকার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেছিলেন এবং তাঁর দরখাস্তে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিজের দলেরই জনৈক এম-এল-এ'র রেকমেন্ডেশন ছিল; তা তিনি অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ে আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিছুকাল আগে আর· জি· কর হাসপাতাল থেকে কয়েকজন বহুকালের বাস্তুঘুঘুকে অন্যত্র বদলির আদেশ দেওয়া হয়। যে কোন কারণেই হোক, সে আদেশ নাকচ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, এঁদের কারো কারো মুরুব্বি ছিলেন নাকি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দলেরই উপরোক্ত এম-এল-এ ভদ্রলোক এবং ঐ বদলির আদেশ প্রত্যাহৃত হবার পর জনৈক চিকিৎসকের উদ্যোগে যে ভোজসভা আয়োজিত হয়, উক্ত এম-এল-এ নাকি সেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর (এবং সেই সঙ্গে অপরাপর মন্ত্রীদেরও) স্মরণে রাখা উচিত যে, দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষেরা রাতারাতি আনুগত্য বদলে ফেলতে পারে এবং আগে এরা কংগ্রেসী দাদাদের যেমন সেবা করত, এখন যুক্তফ্রন্টের দাদাদেরও সেরকম সেবা করতে উদগ্রীব তথা প্রস্তুত। এদের ফাঁদে পা দেওয়া বিপজ্জনক।

* * *

গত ১৩ই মার্চ তারিখের 'বঙ্গদর্শনে' কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগের জনৈক চিকিৎসকের কথা বলেছিলাম, যিনি শ্রীরামপুর থেকে আসা-যাওয়া করেন, যদিও কল্যাণী হাসপাতাল সংলগ্ন কোয়ার্টারে এঁর থাকবার কথা। ইনি সাড়ে এগারোটায় আসেন ও দেড়টায় চলে যান—এইরকমই এঁর দায়িত্বজ্ঞান। এঁর হেলথ ডিরেক্টরেটের উপরোক্ত পদস্থ আমলা ও জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টর এঁর একান্ত আপনজন। শোনা যায়, শ্রীরামপুরে এঁর একটি নার্সিং হোম আছে, যার বেশ ফলাও কারবার। তাই ইনি এখন শ্রীরামপুরের কাছাকাছি চুঁচুড়া হাসপাতালে আসার চেষ্টা করছেন। চুঁচুড়াতে এঁর একটি লবী আছে, আগেও ইনি সেখানে ছিলেন এবং দুষ্কর্মের অভিযোগে প্রহৃত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। এঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত করা প্রয়োজন। আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই।

* * *

নদীয়া জেলার চীফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ (সি-এম-ও-এইচ)-এর অফিসে কর্মরত জনৈক ক্লার্কের গুরুতর দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনে (২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৮ এবং ২রা জানুয়ারী, ১৯৬৯ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতী দ্রষ্টব্য।) আমরা অনেক প্রামাণ্য তথ্য সন্নিবেশিত করেছিলাম। রাইটার্স বিল্ডিংসের হেলথ ডিরেক্টরেটের সেই কীর্তিমান পদস্থ আমলা ও তাঁর যাবতীয় অপকর্মের একান্ত বিশ্বস্ত সাকরেদ জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টর এবং নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের পদস্থ এক অফিসারের বেপরোয়া সাহায্য ও প্রশ্রয়ে আলোচ্য ক্লার্ক ভদ্রলোক নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য বিভাগকে দুর্নীতি ও অনাচারের আখড়ায় পরিণত করেছেন। কিছুদিন পূর্বে এঁকে অন্যত্র বদলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও হেলথ ডিরেক্টরেটের সেই পদস্থ আমলার হস্তক্ষেপে বদলির আদেশ কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবগতির জন্য ক্লার্ক ভদ্রলোকটির কিছু পূর্ব পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইনি পূর্বে স্বাস্থ্য অধিকারের নার্সিং বিভাগে নাকি আট-নয় বছর ধরে কাজ করেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঘুষ নেওয়া ও নার্সের চাকরি দেবার অছিলায় দুঃস্থ ও সহায়সম্বলহীন মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করার অপরাধে নাকি বদলী করেন। চব্বিশ পরগনা জেলার স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন এই ভদ্রলোক নাকি নিজের সার্ভিস বুক কায়দা করে নষ্ট করান। এই সার্ভিস বুকে চব্বিশ পরগনার তদানীন্তন সি-এম-ও-এইচ নাকি তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন এবং যে জন্য তাঁকে জলপাইগুড়িতে বদলি করা হয়। জলপাইগুড়িতেই ইনি নদীয়ার উপরোক্ত পদস্থ ব্যক্তির (এই পদস্থ ব্যক্তি তখন জলপাইগুড়িতে কর্মরত ছিলেন) সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁকে প্রভাবিত করে ওখানে তিনি নতুন করে নিজের সার্ভিস বুক খোলান। অতঃপর জলপাইগুড়ি থেকে তিনি বর্ধমানে, বর্ধমান থেকে হুগলীতে এবং শেষ পর্যন্ত হুগলী থেকে নদীয়ায় এসেছেন এবং আপাতত কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য বিভাগে বীর বিক্রমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভারত দর্শন

চন্দ্রশেখর—ভর্ৎসনার দায়ে

দিন বদল হয়েছে তাই স্পষ্টবাদী কংগ্রেস সদস্য চন্দ্রশেখরকে পার্টি বসের কার্যকলাপ সমালোচনার জন্য কেমনভাবে ভর্ৎসনা করা যেতে পারে তাই নিয়েই এখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ কংগ্রেস হাই কমান্ড, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি সকলকেই ভেবে ভেবে চুল পাকাতে হচ্ছে। এমনটা প্রয়োজনই হত না, যদি কংগ্রেস ১৯৬৭-র আগের অবস্থায় সমাসীন থাকত। আজ কিন্তু অতি দর্পে হত লঙ্কা। বুক ফুলিয়ে 'বেশ করেছি' বলাটা আজ আর অত সহজ ব্যাপার নয়। খুঁটি অশক্ত হয়েছে এবং হয়েছে যাঁদের দীর্ঘকালের আত্মম্ভরিতা ও "আমার ইচ্ছাই কর্ম" মনোভাবের জন্য আজ দলের কতিপয় সদস্য সেই ব্যক্তিপ্রাধান্যকে আঘাত করতে উদ্যত, মুষ্টিমেয় প্রধানরা কংগ্রেসের এই দীপ্ত যৌবন জলতরঙ্গকে রোধ করার কিঞ্চিৎ ক্ষমতাও আর রাখেন না। চন্দ্রশেখরকে নিয়ে, উপপ্রধান তথা অর্থমন্ত্রীকে ফাঁপরে ফেলার তাঁর অকুতোভয় প্রচেষ্টাকে বেষ্টন করে আজ কংগ্রেসী কোনও সপ্তরথী-ব্যূহ সজ্জা করার শক্তি নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত দলের কার্যকরী সমিতির সদস্যরা চন্দ্রশেখরের ওপর 'তিরস্কার' বর্ষণের প্রস্তাব নিয়েছেন বটে, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার ভারটা তাঁদের তুলে দিতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ওপরই। সর্পরূপী কেঁচোর গর্তে কেউ আর হাত ঢোকাতে সাহসী নন। সুতরাং ঢালাও ক্ষমতা শ্রীমতী গান্ধীর ওপর। তিনি যেমন ভালো বুঝবেন আচ্ছা করে তেমনিভাবে তিরস্কার বর্ষণ করবেন ঐ 'উদ্ধত' সদস্যটির ওপর।

বস্তুত সব ব্যাপারখানাই বিসদৃশ। আপন ঘরের দৌর্বল্য প্রকাশের এহেন নজীর কেবলমাত্র কৌতূহলেরই সৃষ্টি করে এবং চন্দ্রশেখরকে ওনারা ধরে বেঁধে তিরস্কার করতে শুরু করলেও সাধারণের সমর্থন তাঁর প্রতিই বর্ষিত হতে থাকে। কিন্তু যাক, কংগ্রেসের মাথা-ওয়ালা বসরা যেমন ভালো বোঝেন, নিজেদের দল চালাবেন অথবা তাকে গোল্লায় পাঠাবেন। আমাদের কাজ সংবাদ নিয়ে, সেখানেই সীমারেখা টানার চেষ্টা করা যাক।

এক্সিকিউটিভদের যখন সভা চলছিল তখন চন্দ্রশেখরের প্রতি কয়েকটি কটাক্ষ-পূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে সভাস্থল পরি-ত্যাগ করে যান চন্দ্রশেখর। ভর্ৎসনার আয়োজন তাই নিয়েই। পার্টি বস ঘটিত ব্যাপারটা এখানে অবশ্যই নেপথ্যচারী।

সভার একটি মূল্যবান প্রাপ্তি এই যে, মোরারজী সাহেব এতোকালে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের অন্তত একটিরও ধার ঘেঁষে স্বীকার পেয়েছেন। দেশাই বলেছেন তিনি তাঁর পুত্রের ব্যবসায়ে নিজের

চন্দ্রশেখর

পুঁজি নিয়োজিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই পুত্রের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে যত জল ঘোলা হয়েছে। দেশাই সাহেবের পুত্রের একটি ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সী আছে। বিড়লা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদির একটি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বণ্টনের পূর্ণ এজেন্সী অধিকারই তাঁর। এবং শ্রীদেশাই স্বীকার পেলেন পুত্রের এই ব্যবসায়ে তিনি তাঁর সঞ্চিত ধন বিনিয়োগ করেছেন।

এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রশেখরের দাবি ছিল, ছেলের ব্যবসায় সূত্র যেহেতু বিড়লা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রন্থীবন্ধ এবং শ্রীযুত দেশাই যেহেতু বিনিয়োগ সূত্রে সেই ব্যবসার সঙ্গে সংযুক্ত, সে কারণ বিড়লা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের মধ্যে শ্রীদেশাইয়ের অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়।

যাই হোক, সত্য এই যে, চন্দ্রশেখরকেই আলোচনাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। তাঁর বাইরে যাওয়ার পর একটি হ্যান্ড আউট প্রচার করা হয়। হ্যান্ড আউটে বলা হয়েছে চন্দ্রশেখর প্রতিবাদ জানাবার জন্য সভাস্থল ত্যাগ করেন। অন্য দিকে চন্দ্রশেখব বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার পর তিনি সভা ত্যাগ করেন, যাতে এক্সিকিউটিভ তাঁর সম্পর্কে তাঁব অনুপস্থিতিতে সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বক্তব্যে সমগ্র ব্যাপারটির অন্তর্নিহিত ভ্রান্তির উল্লেখ করে বলেছেন, দলগত নিয়মানুবর্তিতা মেনে ব্যাপারটা পার্লামেন্টে উত্থাপন না কবাই ছিল সঙ্গত। কিন্তু যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন চন্দ্রশেখরের রফা নিষ্পত্তির জন্য কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, তিনি সদস্যদের জুনিয়র সিনিয়র রূপে বিচার করতে চান না। চন্দ্রশেখরের অভিযোগ-গুলি দলকে মতবিরোধে খণ্ডিত করেছে।

চন্দ্রশেখর তাঁর ভাষণে জানান যে, ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে নি, শ্রীযুত দেশাইকে বহু পত্র লিখেও যখন তিনি কোনো সদুত্তর পান নি বরং পেয়েছেন ভর্ৎসনা, তখন তিনি তাঁর বক্তব্য চীফ হুইপকে জানিয়ে পত্র দেন, কেবলমাত্র ব্যর্থ হওয়ার জন্যই। অতঃপর তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানান কী সম্পর্কে রাজ্যসভায় তিনি বক্তব্য রাখতে চান। প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই ঐ বক্তব্য হাজির না করার জন্য (রাজ্যসভায়) তাঁকে অনুরোধ করেন। জবাবে তিনি জানান, দেশাই তাঁর ভর্ৎসনাপূর্ণ উক্তি প্রত্যাহার না করলে, তিনি নিরুপায়। দেশাই চন্দ্র-শেখরকে "ডিজঅনারেবল ম্যান" বলে তিরস্কৃত করেন।

চন্দ্রশেখর পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। বলেছেন : দেশাই সাহেব উত্থাপিত অভি-

যোগের জবাব দেন নি, না তাঁকে, না বিরোধী সদস্য শ্রীভূপেশ গুপ্তকে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক অন্য কোনো দেশে এমনটা ঘটলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত মন্ত্রী আর তাঁর মন্ত্রিত্ব-পদে বহাল থাকতে পারতেন না।

চন্দ্রশেখর একথাও স্পষ্ট করে জানান যে, তিনি তাঁর আচরণের দ্বারা দলের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কোন নির্দেশই লঙ্ঘন করেন নি। দুর্নীতি ও একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখায় কোথাও দলীয় নিষেধ নেই।

চীফ হুইপ শ্রীযুত রঘুরামাইয়ার বক্তব্যে জানা যাচ্ছে যে, শ্রীদেশাই চীফ হুইপকে বলেছিলেন, চন্দ্রশেখর যদি ব্যাপারটা পার্লামেণ্টেই নিয়ে যান তবে তিনিও চন্দ্রশেখরকে অধিকতর বেকায়দায় ফেলবেন (হি "উইল মেক দি ম্যাটারস ওয়ার্স" ফর মিঃ চন্দ্রশেখর)।

শ্রীদেশাই অস্বীকার করেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে চন্দ্রশেখরকে "ডিজঅনারেবল ম্যান" বলে তিরস্কার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশাই এই বলে সতর্ক করে দেন সভাকে যে, সভা যদি চন্দ্রশেখরকে তিরস্কার করে প্রস্তাব না নেন তাহলে তাঁর অসন্তোষও দূরীভূত হবে না। কারণ বর্তমানে চন্দ্রশেখর আনীত অভিযোগে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

আত্মসমর্থনে দেশাইয়ের বক্তব্যঃ মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি তাঁর পুঁজি নিয়োগ করেছিলেন ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনায়। কামরাজ পরিকল্পনানুসারে মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পর ঐ পুঁজি তুলে নিয়ে তিনি উপরোক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করেন, যে প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ অঞ্চলে বিড়লা প্রতিষ্ঠানে কোনও দ্রব্যের সোল এজেন্সী-ভোগী। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি বিড়লাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে অনুসন্ধানের বিরোধিতা করেন নি এবং প্রধানমন্ত্রী যদি আরও অনুসন্ধান চালান তবে তাও তিনি অবাধেই করতে পারেন।

সমস্যা অতঃপর চন্দ্রশেখরকে উপযুক্ত-ভাবে ভর্ৎসনা করা নিয়ে। দল দায়িত্বটা প্রধানমন্ত্রীর ওপরই ন্যস্ত করে যে যার সেফ সাইডে সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীও সভায় বাদানুবাদের একটা ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করলেও তাঁর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পান নি চন্দ্রশেখর। কিন্তু সে আক্রমণ যে অন্যতরফকে ঠাণ্ডা করার জন্য কিছু নরম ভর্ৎসনামাত্র, তাও বেশ মালুম হয়।

যাই হোক ব্যাপারটাকে এখন পার্লামেণ্ট থেকে টেনে আনা গেছে তবে, যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও বেরিয়ে-পড়া বেড়ালকে ধামাচাপা দেওয়াও কম কৃতিত্ব নয়, যদি তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়।

বনস্কান্ত যাত্রা

কিন্তু যে জলে ঢল নেমেছে তা সহজে রুদ্ধস্রোতা হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। চন্দ্রশেখর স্থির করেছেন তিনি রাজ্যে রাজ্যে একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারকার্য ছড়িয়ে দেবেন। প্রথমেই তিনি যাচ্ছেন গুজরাট। সেখানে মোরারজী দেশাইয়ের নির্বাচনী এলাকায় বক্তৃতা তো করবেনই, এমন কি বহুদিন টিকিটবিহীন শ্রী এস কে প্যাতিলের পার্লামেণ্ট প্রবেশের টিকিট সংগ্রহ প্রচেষ্টায়ও কিছু ছাই ছিটিয়ে আসবেন। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী প্যাতিল বনস্কান্ত থেকে উপনির্বাচনে প্রার্থিরূপে দাঁড়াচ্ছেন। চন্দ্রশেখর সেখানেও যাবেন তাঁর প্রচার চালাতে।

তেলেঙ্গানা

স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবি এবার অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসে ভাঙনের লক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীকে দিল্লী দৌড়াতে হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীযুত রেড্ডী যে পাথর ছুঁড়েছেন এখন তাই-ই বিপরীত মুখে তাঁকে অনুসরণ করতে চাইছে। উদ্বিগ্ন হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডী।

হায়দ্রাবাদের সাতজন কংগ্রেসী আইনসভা সদস্য স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার সমর্থক। এঁদের মধ্যে তেলেঙ্গানা আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এ চোক্কারা অন্যতম। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি এঁদের অভিযোগ

দাঁত, উজ্জ্বল, সুন্দর, সুদৃঢ় এবং
মাঢ়ী সুস্থ নীরোগ রাখতে
ব্যবহার করুন
বেঙ্গল কেমিক্যালের
কার্বলিক টুথ পাউডার
কার্বলিক অ্যাসিড উপাদানে বিশেষ শক্তিশালী

বীজাণুনাশক, দুর্গন্ধ-নিবারক কার্বলিক অ্যাসিড থাকার দরুণ এই টুথ পাউডার ব্যবহার করলে আপনার দাঁত হবে উজ্জ্বল, সুদৃঢ় এবং মাঢ়ী সুস্থ নীরোগ থাকবে। প্রতিবার দাঁত মাজার পর আপনার মুখ আরো বেশি তাজা, পরিষ্কার, ঝরঝরে মনে হবে।

কস্‌মেটিকস্ ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা·বোম্বাই·কানপুর·দিল্লী·মাদ্রাজ

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
বিউটি ক্রীম-এর
সবচেয়ে বড় অবদান
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
আধুনিকারা
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক

একাধিক। মুখ্যমন্ত্রী সুপরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রীয় নেতাদের বোঝাচ্ছেন যে, তেলেঙ্গানা আন্দোলন হয়-আপসে চুপসে যাবে নচেৎ তাকে স্তব্ধ করতে হবে। অভিযোগকারীরা বলছেন মুখ্যমন্ত্রীর এহেন স্বপ্ন কখনোই সার্থক হবে না।

অন্যদিকে এ-পি-সি-সিও চুপ করে বসে নেই। সতর্কীকরণ করা হয়েছে, স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিকে কোন কংগ্রেস সদস্য প্রকাশ্যে সমর্থন জানালে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক-ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

কিন্তু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর এই বজ্র-আঁটুনিতে কংগ্রেস সদস্য সহ বিরোধী দলগুলিও বিক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য তেলেঙ্গানার জন্য যে কয়েকটি রক্ষাকবচ প্রদত্ত ছিল সেগুলিকে প্রাপ্য মর্যাদা তো দেওয়া হয়ই নি, রেড্ডী সরকার তেলেঙ্গানার প্রতি নির্মম অবিচারই প্রদর্শন করে আসছেন। এ বিষয়ে কেন্দ্রের ও রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি অন্ধ্র রাজ্যের রাজ্যপালেরও যতটুকু করণীয় ছিল, তাঁরা তা করেন নি। ফলত রাজ্যে বিস্ফোরক-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সি-পি-আই প্রকাশ্যে রেড্ডী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেছেন। রেড্ডীকে চান না এমন দল ও জনপ্রতিনিধির সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। রাজ্যব্যাপী অসন্তোষ।

হরতাল সবকারী সম্পত্তি নষ্ট, ভারতের এইসব দৈনন্দিন চিত্রগুলি অন্ধ্র প্রদেশে দেখা দিয়েছে।

তেলেঙ্গানা নিয়ে সংসদের আলোচনায় এটা স্পষ্টতই দেখা গেছল, প্রায় সর্বদলীয় মত এই যে, রাজ্য সরকারের ওপর সাধারণে বিশ্বাস হারিয়েছে। অবস্থা এমন কেন্দ্রের আশ্বাসেও এখন আর আস্থা খুঁজে পাচ্ছে না তারা। একটি সংসদীয় দল অন্ধ্রে গিয়ে সমস্ত উত্তাপটা বুঝে এসে যথাশীঘ্র সেই মত অবস্থার হেরফের করাতে ব্যর্থ হ'লে রাজ্যের অবস্থা সঙিন হয়ে উঠছে বলে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীরেড্ডীর ধারণা তিনি যা করেছেন ঠিক করছেন, বাইরে থেকে কেউ যেন নাসিকা প্রবেশ না করান।

কিন্তু সমস্যাটা যদি শুধুমাত্র রাজ্যের ল' এন্ড অর্ডারের প্রশ্ন হত, বাস্তবিক রেড্ডী মশায় ক্ষুব্ধ হতেই পারতেন। তাঁর রাজত্বে অনাচার তিনি দমন করতেন, বলবার কিছু থাকত না। দুঃখের বিষয় সমগ্র ঘটনাবলীকে ল' এন্ড অর্ডারের সহজ মাপকাঠিতে ফেলবার চেষ্টা সক্রিয় হলেও, কারো জানতে বাকি নেই, একটি অনুন্নত এলাকার মানুষের দাবিই আসল আন্দোলন। বাঞ্ছনীয় প্রতিবাদে দাবি আদায়ের আন্দোলন। এই আন্দোলন, ছড়িয়ে পড়লে, অনেক সংসদ সদস্যই মনে করেন, তা অপরাপর অনুন্নত এলাকায় প্রসারিত হবে তখন অবস্থা হবে আরও বেসামাল বিরোধী নেতারা একবাক্যে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর অপসারণ চান যদিও, স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে এঁদের পূর্ণ সমর্থন নেই। তবে কেউ কেউ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান সম্ভব করার জন্য সংবিধান সংশোধনের দাবি উত্থাপন করেছেন। এসব দাবি শেষে সেই আসামের পার্বত্তীয়া সমস্যার মতো আর এক বিস্ফোটকে পরিণত হবে, যদি না শীঘ্র এ বিষয়ে কার্যকরী কোন পথ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সময়ে সুরাহা করার নীতি ভারত সরকার কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেন নি। এক্ষেত্রেও তা যে সম্ভব হবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

তবে প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে একটি বৈঠক ডেকেছেন পরিস্থিতি আলোচনার জন্য। ১০ই এপ্রিল এই বৈঠক বসছে। হোমরা-চোমরা কংগ্রেসী কর্তারা বৈঠকে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মানন্দের উপস্থিতিতে পরবর্তী পর্যায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা করবেন। ল' এন্ড অর্ডারের ধারক বাহক স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী এই বৈঠককে অলংকৃত করবেন। থাকবেন কামরাজ নাদার ও স্পীকার সঞ্জীব রেড্ডী। তেলেঙ্গানা আঞ্চলিক কমিটির ছোকা বাও, বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী নেতা রামচন্দ্র রেড্ডী, চেন্না রেড্ডী (প্রাক্তন মন্ত্রী) এবং রাজ্য খাদ্য ও রাজস্বমন্ত্রীও অংশ গ্রহণ করেছেন।

বৈঠক সম্পর্কে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বৈঠকগুলিতে সাধারণত সমস্যার মূলে না গিয়ে দল ঠিকঠাকেরই ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর প্রাধান্যকেই আজও সমধিক গুরুত্ব দিয়ে সাধারণের সমস্যাকে চেপে রাখলে বিস্ফোটক অবস্থার সৃষ্টি হবে। সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিকে মান্ধাতার আমলের মর্যাদায় আড়াই এবং ল' এন্ড অর্ডারের বাঁধা ছকে না ফেলাই বাঞ্ছনীয়।

মন্ত্রিত্ব গেলে চাকরি মেলে

সম্প্রতি প্রকাশিত পি টি আই-এর একটি সংবাদে নজর পড়তেই চক্ষু চোদ্দ-তলায় জ্বলন্ত চড়কগাছের পাক খেতে শুরু করেছে। দেখলাম মন্ত্রিত্ব গেলেই আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার-ই মুদ্রোর চাকরি বাঁধা থাকে কেন্দ্রীয় এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের জন্য। ১৯৬৭ সালে যাঁরা সাধারণের ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংসদে ফিরে যেতে পারেন নি, কেন্দ্রীয় সরকারের ঢালাও বদান্যতায় তাঁদের নিশ্চিন্ত রিহ্যাবিলিটেশন সম্পূর্ণ হয়েছে অত্যল্পকালের মধ্যেই।

কূটনৈতিক কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন চারজন পরাজিত প্রাক্তন মন্ত্রী। তোফা আছেন। মাস গেলে আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও এ্যালাওয়েন্স ছাড়াই পকেটস্থ হচ্ছে। এঁরা হলেন, রাজ বাহাদুর, আলেগেসান্নি, পি এস নস্কর এবং এ এম টমাস। সেই শা নাওয়াজ খাঁ, যাঁকে নিয়ে একদিন বিরাট শোভাযাত্রা হয়েছিল কলকাতার রাজপথে (তখন নেতাজীকে নিয়ে সেই টাটকা উত্তেজনা), ইনি আড়াই হাজারি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন ফুড কর্পোরেশনে। শ্রীমতী চন্দ্রশেখর পাচ্ছেন বাইশ শ' পঞ্চাশ।

পাবলিক সেক্টরের বিভিন্ন উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়েছেন ডঃ কেসকার, ডঃ মনোমোহন দাস, বিভুদেন্দ্র মিশ্র, মানুভাই শা প্রমুখ। মোটা ডি-এ মনের মতো টি-য়ে আরামপ্রদ এ্যাকোমোডেশন প্রভৃতি প্রাক্তন মন্ত্রিত্বের খাতিরে সবই সহজলভ্য হয়েছে, তার ওপর পেন্সন।

সুব্রহ্মণ্যম যিনি খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ছিলেন, তাঁকেও একটা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তবে মাইনে-পত্তর কম। মাত্র আট শ' পঞ্চাশ, অবশ্য কেবল-মাত্র পকেট খরচা।

এই সব তথ্য রাজ্যসভায়ও পরিবেশিত হয়েছে। কুঁচোকাঁচা মন্ত্রীরা অনেক ঝামেলা পোহান। তাঁর চেয়ে ঢের ভালো নিশ্চিন্ত চেয়ারম্যানী। অতঃপর কেউ কেউ একথা ভাবতে পারেন।

(৫।৪।৬৯)

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা ঃ

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত।

প্রথম খণ্ড—৫'০০ টাকা।
তৃতীয় খণ্ড—৪'০০ টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ঃ

(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সম্বলিত)

আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। পদানুসারে। রাজসংস্করণ। সচিত্র। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নাইজিরিয়ায় উইলসন ও গোওন

নাইজিরিয়া ঃ

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন নাইজিরিয়া ঘুরে গেলেন। তিনি চার দিনের জন্য রাজধানী লাগোসে এসেছিলেন।

নাইজিরিয়ায় একুশ মাস ধরে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলছে। ইবো উপজাতি অধ্যুষিত বায়ফ্রা হাউসা-প্রধান নাইজিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বায়ফ্রা প্রতিষ্ঠা করেছে। ইবোদের নেতা লেফটেনাণ্ট কর্নেল ওদুমেগু ওজুকোওউ। কিন্তু মেজর জেনারেল ইয়াকুবু গোওনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বায়ফ্রার বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করতে রাজী নয়, তারা সৈন্যদলের দ্বারা বিচ্ছিন্নতাকামী বায়ফ্রাকে শায়েস্তা করতে চায়—যেভাবে হোক নাইজিরিয়ার সংহতিকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু বায়ফ্রার অধিবাসীরাও তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। দু পক্ষে চলছে জোর লড়াই। ইতিমধ্যে নাকি কয়েক লক্ষ লোক মারা গেছে এই যুদ্ধে। সবচেয়ে মুসকিল হয়েছে বায়ফ্রার সাধারণ মানুষের। খাদ্যাভাবে, অপুষ্টিজনিত রোগে শিশু ও নারীরা দলে দলে মারা যাচ্ছে। নাইজিরিয়ার সৈন্যদের বেপরোয়া বোমাবর্ষণে বায়ফ্রার গ্রাম-শহর ধ্বংস হচ্ছে।

ব্রিটেন নাইজিরিয়ার পক্ষে। বায়ফ্রার বিচ্ছিন্নতাকে সে স্বীকার করে না। ব্রিটেনের মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারই একমাত্র আইন-সঙ্গত সরকার। নাইজিরিয়াকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে ব্রিটেন। এই ব্যাপারে ব্রিটেনের অধিবাসীদের মধ্যে বেশ বিক্ষোভ আছে। বিশেষ করে বায়ফ্রাবাসীদের দুঃখের কাহিনী প্রচারের ফলে ব্রিটিশ জনমত ক্ষুব্ধ নাইজিরিয়ার সরকারের প্রতি ব্রিটিশ সমর্থনে। খাস লেবার পার্টির সদস্যদের মধ্যেও এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্রিটিশ সরকার নাইজিরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে অস্ত্র সাহায্য করছে। কারণ, তার তা না করে উপায় নেই। এখনই সোভিয়েট য়ুনিয়নের কাছ থেকে নাইজিরিয়া মিগ বিমান ও অন্যান্য সামরিক উপকরণ পাচ্ছে। ব্রিটেন যদি অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে তবে নাইজিরিয়া পুরোপুরি সোভিয়েটের দিকে ঝুঁকবে। ব্রিটেনের তাতে বিশেষ অসুবিধা। নাইজিরিয়ায় প্রচুর ব্রিটিশ পুঁজি রয়েছে। এক তৈলখনিতেই তো রয়েছে ৭২০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড। তাছাড়া উইলসনের যুক্তি, নাইজিরিয়াকে সাহায্য করছে বলে ব্রিটেনের কিছুটা প্রভাব রয়েছে নাইজিরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ওপর। দু পক্ষের মধ্যে মিটমাটের ব্যাপারে এই প্রভাব কাজে লাগানো যাবে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত মিটমাটের জন্য ব্রিটিশ সরকার কি করেছে? অন্তত মানবিকতার দিক থেকে বায়ফ্রার অসামরিক লোকজনকে সাহায্য করার জন্যও তো কিছু করা উচিত।

অনেকটা যেন নিজের দেশবাসীর বিক্ষোভকে চাপা দেবার জন্যই উইলসন নাইজিরিয়া এলেন। উইলসনের ভাষায়, তিনি খোঁজখবর নেবার জন্য এসেছেন। মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে তিনি আসেন নি। ইয়াকুবু গোওন তাঁকে মধ্যস্থের ভূমিকা নিতে দেবেনও না। ওজুকোওউ-ও উইলসনকে নিরপেক্ষ বলে মনে করেন না।

তাই উইলসন এলেন, বেড়ালেন, চলে গেলেন। ওজুকোওউ-এর সঙ্গে তাঁর দেখা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হল না। ওজুকোওউ তাঁকে বায়ফ্রা যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে যাবার সাহস তাঁর হয় নি। তাহলে যদি বায়ফ্রাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে যায়! উইলসন বায়ফ্রার বাইরে, সম্ভব হলে আদ্দিস আবাবায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ওজুকোওউকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ওজুকোওউ রাজী হন নি।

পশ্চিম এশিয়া ঃ

বিশ্বজনমত অগ্রাহ্য করে প্রতিদিন ইজরায়েল আরব ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ইজরায়েলের প্রধান মুরুব্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পর্যন্ত ব্যাপারটা অসহ্য মনে হচ্ছে। ২৯শে মার্চ রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সর্বসম্মত প্রস্তাবে ২৬শে মার্চ জর্ডানের ওপর ইজরায়েলী বিমান আক্রমণ এবং শিশু ও নারী হত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। মার্কিন প্রতিনিধি চার্লস য়সট্‌ও ইজরায়েলী আচরণের সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন।

কিন্তু ইজরায়েলের তাতে ভারি বয়ে গেল। পরদিন অর্থাৎ ৩০শে মার্চ তারিখেই ইজরায়েল নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের জবাব দিল জর্ডানের ভেতরে কুখ্যাত নাপাম বোমা ফেলে, এবং জর্ডানের অভ্যন্তরে ঢুকে ট্যাঙ্ক আক্রমণ করে।

ইজরায়েল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, সে কারও কথা শুনবে না। ভেবে বিস্মিত হতে হয়, ইজরায়েলের এত ঔদ্ধত্যের জোর কোথায়। মার্কিন সমর্থনের জোরে এতদিন সে তড়পাচ্ছিল। কিন্তু এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইজরায়েলকে সংযত হতে বলছে, তখনও সে থামছে না কেন? তবে কি তলে তলে মার্কিন উস্কানি আছে? না, ইজরায়েল এখন আর মার্কিন নিয়ন্ত্রণেও নেই। কারও নিয়ন্ত্রণেই যদি ইজরায়েল না থাকে, তবে এই ক্ষুদে ডাকাতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না কেন?

সম্প্রতি ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বা ইবান ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন। সেখানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্সের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তেল আভিভে ফিরে এসে আব্বা ইবান এই আলোচনার বিবরণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার ও অন্যান্য নেতাদের জানিয়েছেন। তার পরই ইজরায়েলী মন্ত্রিসভার বৈঠক করে ঘোষণা করা হয়েছে, আরব-ইজরায়েল বিরোধে বাইরের কারও মধ্যস্থতা তাঁরা মানবেন না। তাঁরা চান এ ব্যাপারে আরবদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা।

পশ্চিম এশিয়ার সমস্যার সমাধান-সূত্র বের করার জন্য বৃহৎ চতুঃশক্তির যে বৈঠক বসছে, তার বিরুদ্ধে ইজরায়েল সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছে। পরিষ্কার জানিয়ে

দিয়েছে, চতুঃশক্তি বৈঠকের কোন প্রস্তাব তারা মানবে না। মার্কিন নেতাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই তারা এ কথা বলেছে।

দশ সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতার পর ৩রা এপ্রিল নিউ ইয়র্কে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রতিনিধিরা আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনার জন্য বসেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ফ্রান্সের স্থায়ী প্রতিনিধি আরমানড বেরারডের বাসভবনে এই বৈঠক বসে। ফ্রান্সই প্রথম এই রকম একটি বৈঠকের প্রস্তাব করে এবং অন্যান্যরাও এতে সাড়া দেয়। বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থায়ী মার্কিন প্রতিনিধি চার্লস রসট্। সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষে ছিলেন সোভিয়েটের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাকব মালিক, আর ব্রিটেনের দিক থেকে ছিলেন পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী লর্ড ক্যারাডন।

প্রথম বৈঠকের পর যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির যাতে আরও অবনতি না ঘটে, তার জন্য সবাই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিরা স্থির করেছেন, আলোচনার ব্যাপারে সর্বদা তাঁরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন এবং পশ্চিম এশিয়ায় নিরাপত্তা পরিষদের শান্তিদূত গানার জারিং-এর সঙ্গে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করবেন।

জানা গেছে, ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৭ তারিখে গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবকে ভিত্তি করেই প্রধানত চতুঃশক্তি প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ছয় দিনের যুদ্ধে ইজরায়েল যে-সব আরবভূমি দখল করেছে, তা ছেড়ে দিতে হবে। আরবদেরও ইজরায়েলকে মেনে নিতে হবে এবং ইজরায়েলী জাহাজের নিরাপদ যাতায়াতের সুযোগ দিতে হবে।

মঙ্গলবার (৮ই এপ্রিল) আবার চতুঃশক্তি বৈঠক বসবে।

বৈঠক বসার সঙ্গে সঙ্গে আবার ইজরায়েল জানিযে দিয়েছে, চতুঃশক্তির কোন কথা সে মানবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইজরায়েলের স্থাযী প্রতিনিধি যোশেফ তেকোয়া এক বিবৃতি প্রচার করে বলেছেন, এই বৈঠকের ফল ভাল না হয়ে আরও খারাপ হবে।

কেবল বিবৃতি নয়, গুলীবর্ষণের মধ্য দিয়েও ইজরাযেল তার প্রতিবাদ জানিয়েছে। চতুঃশক্তি বৈঠকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইজরায়েলী সৈন্য সুয়েজ খালের দক্ষিণে গুলীবর্ষণ করেছে এবং এর ফলে বেশ কয়েকজন মিশরীয় সৈন্য নিহত হয়েছে।

চীন ঃ

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস শুরু হয়েছে পিকিং-এ ১লা এপ্রিল থেকে। ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর এই দ্বিতীয় বার দলের সম্মেলন বসছে। এর আগের সম্মেলন হয়েছিল ১৯৫৬ সালে।

সম্মেলনে মোট ১৫১২ জন প্রতিনিধি যোগ দিচ্ছেন। মাও সে-তুং সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন। সম্মেলনের সহ-সভাপতি ও দলের নেতৃত্বে মাও সে-তুং-এর উত্তরাধিকারী লিন পিয়াও যে রাজনৈতিক রিপোর্ট রেখেছেন, তার ওপর দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়েছে। এই রিপোর্টে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সংশোধনবাদকে চীন তথা কমিউনিজমের পক্ষে প্রধান বিপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক চীন-সোভিয়েট সীমান্ত সংঘর্ষ প্রসঙ্গে সম্মেলনে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কড়া কড়া কথা বলা হয়েছে।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিকে এই সম্মেলনে সৌভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি প্রেরণ কিংবা শুভেচ্ছাবাণী দেবার জন্য কোন আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনকে ঠাট্টা করে বলেছেন, এটা একটা মস্ত মাওবাদী তামাসা ছাড়া আর কিছু নয়।

এদিকে চীন-সোভিয়েট সীমান্তে নতুন করে আক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছে। শীত শেষ হয়ে এল, শীগগিরই উসুরি নদীর মুখের বরফ গলতে শুরু করবে এবং দমনস্কি (চেনপাও) দ্বীপের চারপাশ জলাভূমিতে পরিণত হবে। অনেকের ধারণা, বরফগলার আগেই চীন আবার আক্রমণ করবে। চীনের পক্ষ থেকে সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। অসামরিক লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন সরকারিভাবে চীনের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব করেছে। ২৯শে মার্চ তারিখে চীনা সরকারের কাছে প্রেরিত এক সরকারী নোটে সোভিয়েট য়ুনিয়ন প্রস্তাব করেছে, দমনস্কি বিরোধ নিযে দুই দেশের মধ্যে অফিসার পর্যায়ে বৈঠক বসুক। শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে এই বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব বলে সোভিয়েট য়ুনিয়ন মনে করে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা চীনকে এই কথাও জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা নিজেদের এলাকায় কারও হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না এবং প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগের মোকাবিলা বলপ্রয়োগের দ্বারাই করবে।

আপোষ-মীমাংসার জন্য সোভিয়েট য়ুনিয়নের এই নির্দিষ্ট প্রস্তাবে কি চীন সাড়া দেবে? চীন আলোচনায় বসবে বলে মনে হয় না। অন্তত এখনও পর্যন্ত তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

চীন-সোভিয়েট সীমান্তের প্রশ্ন নিয়ে চীন দীর্ঘ বিরোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ৪ঠা এপ্রিল লণ্ডনের চীনা দূতাবাস থেকে চীনের যে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সোভিয়েট অধিকৃত বলে দেখানো হয়েছে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের বিখ্যাত বন্দর ভ্লাডিভস্টক ও খাবারভস্কিকে চীনের বলে এই মানচিত্রে দাবি করা হয়েছে।

পাকিস্তান ঃ

কেবল সামরিক প্রশাসক হয়ে থাকতে কি ভাল লাগে। ক্ষমতা যখন হাতে এসেছে, তখন তার সবটাই ব্যবহার করতে হবে। আয়ুব খাঁর হাত থেকে ক্ষমতা গ্রহণের সাত দিনের মধ্যে জেনারেল আগা মহম্মদ ইয়াইয়া খাঁ নিজেকে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ১৯৫৮ সালেও ইস্কান্দার মির্জা আয়ুব খাঁকে সামরিক প্রশাসকের পদে নিয়োগ করেছিলেন। এগারো দিনের মধ্যে মির্জাকে সরিয়ে আয়ুব নিজে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

ইয়াইয়া খাঁর শাসনে আয়ুবের কোন স্থান নেই। আয়ুব রাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগ করে সোয়াইট গিয়েছেন মেয়ে-জামাই-এর কাছে, হয়তো ইস্কান্দার মির্জার মত চিরকালের জন্য পাকিস্তান ত্যাগ করেও যেতে বাধ্য হবেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রকাশ্য স্থান থেকে সর্বত্র আয়ুবের প্রতিকৃতি সরানো হচ্ছে।

এখন যে-সব খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আরও পরিষ্কার জানা যাচ্ছে, আয়ুব স্বেচ্ছায় ক্ষমতাত্যাগে রাজী হন নি—ইয়াইয়া খাঁরা তাঁকে বাধ্য করেছেন চলে যেতে।

কিন্তু চমক লাগাচ্ছেন মৌলানা ভাসানী। ইযাইয়া খাঁ গদিতে বসতে না বসতেই মৌলানা সাহেব ইয়াইয়াকে ভাল সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ইয়াইয়া খাঁকে তিনি 'ভাল সৈনিক' ও 'সৎ নাগরিক' বলে আখ্যাত করেছেন। আরও লক্ষণীয়, ভাসানী সকলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন। সামরিক শাসনে সব রাজনৈতিক আলোচনা যেখানে বন্ধ, সেখানে ভাসানী এই প্রস্তাব করেছেন এবং সামরিক প্রশাসকরাও এতে কোন আপত্তি জানান নি।

(৫।৪।৬৯)

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

প্রদর্শনী ও দর্শকগণ

১৮৮৬ সনের ৪ঠা মে তারিখে ব্রিটিশ কলোনি সমূহের ও ভারতের প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেদিন সকালবেলাটি ছিল 'ভারী চমৎকার—'রানীর আবহাওয়া' বলে ইংল্যান্ডের লোকেরা। সেইদিন আমাদের প্রিয় সম্রাজ্ঞীকে দর্শন করিলাম। ব্রিটিশ প্রজামাত্রেই সম্রাজ্ঞী দর্শনকে মহা গৌরবজনক মনে করিয়া থাকে। সম্রাজ্ঞী-মাতার আমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত সন্তানই ত' বটে। উপস্থিত নানাদেশের সবাই তাঁহার সহিত একে একে পরিচিত হইয়া সরিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মুখে সন্তোষের চিহ্ন, আমাদের প্রতি বিশেষভাবে তাঁহার সন্তোষ-পূর্ণ দৃষ্টি। আমাদের কারুশিল্পীগণ তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার সময় যে দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সবারই অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। আমাদের দেশের নানা প্রদেশের কারুশিল্পীরা ছিলেন—পেশাওয়ারের, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার, তুষারাবৃত ভুটানের, এবং কুমারিকা অন্তরীপের।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় যুবরাজ (তিনি প্রিন্স অভ ওয়েল্স-ও), প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর অভ ওয়েল্স্ (ভিক্টোরিয়ার স্বামী) এবং রাজকুমারী লুইস, ভিক্টোরিয়া এবং মড সহ লাইফ গার্ডের রক্ষণাধীন প্রদর্শনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজপরিবারের অন্য যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যথাক্রমে—ক্রাউন প্রিন্সেস অভ জারমানি, ডাচেস অভ এডিনবরো, ডিউক ও ডাচেস অভ কনট, শ্লেজবিগ হোলস্টাইনের প্রিন্স ও প্রিন্সেস ক্রিস্টিয়ান, লরনের প্রিন্সেস লুইস ও মার্শোনেস, লরনের মারকুইস, বাটেনবের্গের প্রিন্সেস বিয়াট্রিস ও প্রিন্স হেনরি, ডিউক অভ ক্যামব্রিজ, প্রিন্সেস মেরি অ্যাডেলেড, ডিউক অভ টেক, প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া টেক, হানোভারের প্রিন্সেস ফ্রেডেরিকা, ব্যারন ফন পাবেল রামিংগেন, ওল্ডেনবুর্গের লাইনিংগেনের প্রিন্স ও প্রিন্সেস, সাক্স-ভাইমারের প্রিন্সেস এডওয়ার্ড, হোহেনলোহে-লাংগেনবুর্গের প্রিন্স ও প্রিন্স ভিক্টর এবং কাউন্টেস থেয়োডোরে পাইখেন। প্রায় ১২টার সময় রাজকীয় ট্রাম্পেটবাদকেরা ট্রাম্পেট ধ্বনি করিয়া রাজ্ঞীর আগমনবার্তা ঘোষণা করিল। সম্রাজ্ঞী সাধারণ কালো রঙের পোষাক পরিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও রাজচিহ্নাদি ছিল না। তার চলনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে জানিবার উপায় ছিল না যে সম্মুখে বিরাট ভারত সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী সম্মুখে উপস্থিত। তিনি প্রথমে উপস্থিত সবার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, পরে আত্মীয়দের চুম্বন করিলেন। অতঃপর প্রিন্স অভ ওয়েল্সে কর্তৃক ভারতের ও উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিদিগের সহিত একেবারে পরিচিত হইলেন। এই অনুষ্ঠানের পর আমাদিগকে প্রদর্শনীর অন্য একটা অংশে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে ভারতীয়গণ সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশে একটি ভাষণ উপহার দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বিরাট একটি রাজকীয় প্রোসেশন গঠিত হইল।

এই প্রোসেশন প্রদর্শনীর প্রধান প্রবেশ পথ হইতে ঢাকা বারান্দা পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই পথে ভারতীয় নানা জাতীয় সৈন্যদের মৃন্ময় মডেল মূর্তি সারিবধ অবস্থায় সাজান ছিল। খোদাই করা দারুশিল্প-গঠিত ছাতের নিম্নপথে যাইবার সময় দেখা গেল সেখানে 'যতো-ধর্মস্ততোজয়ঃ' ইংরেজীতে খোদাই করা রহিয়াছে—"Where Virtue is, there is Victory". ইহার পর ভারতীয় অঙ্গনে প্রবেশ করা গেল। ওস্তাদ কারু-শিল্পীদের দ্বারা চমৎকার সাজান অঙ্গনটি। অবশেষে প্রোসেশন "ভারতীয় প্রাসাদে" গিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই-খানে প্রিন্স অভ ওয়েল্স আমাদিগকে একে একে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। যেসব ভারতীয় শিল্পী আমাদের বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান ছিল, তাহা-দিগকে "রাম-রাম" বলিয়া অভিবাদন করিতে শেখান হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান ছিল, তাহারা "রাম-রাম" বলিল বটে, কিন্তু অভ্যাস না থাকাতে "রাম-রাম"-এর সঙ্গে "আল-আহমদ-উল-ইল্লা" জুড়িয়া উচ্চারণ করিল। তাহারা ক্রমাগত বলিতে লাগিল "রাম-রাম আল-আহমদ-উল-ইল্লা"—"রাম-রাম, আল-আহমদ-উল-ইল্লা।" এই পর্ব শেষ হইলে অভিভাষণ পাঠ করা হইল, তাহার পর প্রোসেশন চলিতে লাগিল। ইহার পর আমাদের কর্তব্য কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। আমরা অতঃপর অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার অঙ্গন পার হইয়া গেলাম, এবং অ্যালবার্ট হলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা ঠেলিয়া ঠুলিয়া অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় সার কান্লিফ-ওয়েন উদ্বেগের সঙ্গে আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনারা এ কি করিতেছেন?" তখন আমাদের খেয়াল হইল আমরা ভুল করিয়াছি। এখানে অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে আমরা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে রাজ-পরিবারকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহাকে বিভ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কি করিয়া যাইব?" তিনি বলিলেন, "না, যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন।" আমরা আমাদের ভুলের জন্য খুবই দুঃখ প্রকাশ করিলাম, কিন্তু তখন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এবং ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও তখন তাহা আর পারিতাম না, কারণ পিছনের ভিড় তখন দুর্ভেদ্য। অতএব যেখানে ছিলাম, সেইখানেই রহিয়া গেলাম। প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান যেখানে সম্পন্ন হইল সেই রয়্যাল অ্যালবার্ট হলটি বিরাট আকারের এবং চক্রাকার। উপরে কাচের গম্বুজ, এবং হলে ১০০০০ লোক ধরে। ১৮৬৮—৭১ সনে এই হলটি এক কম্পানি কর্তৃক নির্মিত হয়, নির্মাণে ৩০ লক্ষ টাকা (২০০,০০০ পাউন্ড) ব্যয় হইয়াছিল। হলের প্রত্যেকটি ইঞ্চি দর্শকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং আমি সাধারণ দর্শকদের স্থানে যেখানে দাঁড়াইবার জায়গা পাইয়াছিলাম, সে জায়গাটি অনুষ্ঠানের বিপরীত দিক। সেখান হইতে সম্মুখে অর্ধচক্রাকার শুধু দর্শকদের মাথা দেখিতে পাইতেছিলাম। রাজাসন ছিল উচ্চ ভূমিতে ডেইসের উপরে, তাহার সম্মুখে সম্রাজ্ঞী বসিলেন, তাঁহার দক্ষিণ দিকে রহিলেন প্রিন্স অভ ওয়েল্স, এবং পরিবারের

অন্যান্যরা দুই দিকেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও। প্রোসেশন অ্যালবার্ট হলে পৌঁছিলে ইংরেজীতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হইল। গাহিলেন রয়্যাল অ্যালবার্ট হল কোর্যাল সোসাইটি। সম্রাজ্ঞী ডেইসে পৌঁছিলে দ্বিতীয় গানটি সংস্কৃতে গাওয়া হইল। সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার। অনুবাদটি এইরূপ—

রাজ্ঞীং প্রসাদিনীং লোক-প্রথাদিনীং
পাহীশ্বর।

The Queen, the gracious, world-
renowned, Save, O Lord!

লক্ষ্মী প্রভাসিনীং শত্রুপহাসিনীং,
তাং দীর্ঘশাসিনীম্ পাহীশ্বর।

In victory brilliant, at enemies
smiling, her long-ruling
Save, O Lord!

এহি অস্মদীশ্বর, শত্রূন্ প্রতিক্ষিপ্র,
উচ্ছিন্দ্ধি তান্।

Approach, O our Lord, enemies
scatter annihilating them!

অস্তদম্ নাশ্য মায়াশ্চ পাশয়
পাহ্যস্মদ্দাশ্রয় সর্বান্ প্রণান্।

Their fraud confound,
tricks restrain. Protect,
O thou our Refuge, all people!

তদ্‌রত্ন-ভূষিতাং, রাজ্যে চিরোষিতাং,
পাহীশ্বর!

With thy choice gifts adorned,
in the kingdom long-dwelling,
Save, O Lord!

রাজ্য প্রপালিনীং সদ্ধর্মশালিনীং
তাং স্তোত্রমালিনীং পাহীশ্বর।

Her, the realm-protecting,
by good laws abiding, her with
praise wreathed,
Save, O Lord!

এই দ্বিতীয় সঙ্গীত আমরা সংস্কৃতে গাহিবার পর তৃতীয় সঙ্গীত ইংরেজীতে গাওয়া হইল। রাজকবি টেনিসন এ গাড়ায় আলবানি ও কোরাস দল। প্রিন্স অব ওয়েলস ইহার পর সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশে একটি ভাষণ পাঠ করিলেন, এবং প্রদর্শনীর একটি ক্যাটালগ তাঁহাকে উপহার দিলেন। সম্রাজ্ঞী ভাষণের উত্তরে কিছু বলিলেন, এবং লর্ড চেম্বারলেনকে 'প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইল' এই ঘোষণা করিতে আদেশ দিলেন। তাহা শেষ হইলে সর্বসাধারণের কাছে তাহা সম্রাজ্ঞীর ট্রাম্পেট বাদকগণ রাজনার সাহায্যে জানাইয়া দিল। এই সঙ্গে হাইড পার্কে তোপধ্বনির দ্বারা সম্রাজ্ঞীকে অভিবাদন জানান হইল।

এই প্রদর্শনীর মধ্যে ভারতীয় বিভাগটিই অন্য সব অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ঢাকা বারান্দায় পথে প্রধান প্রবেশপথে দর্শকেরা এবারে ভারতীয় সামরিক জাতিগুলির মডেল দেখিবেন। প্রাচ্যদেশে ইহারাই ইংল্যাণ্ডের শক্তি অক্ষত রাখিয়াছে। অতঃপর যেখানে বহুমূল্য হীরে জহরত, ও সোনা ও রূপোর প্লেটের এবং কারুকার্যখচিত দস্তা ও তামার পাত্রগুলির বিভাগ দেখিবেন। আরও দেখিবেন সূক্ষ্ম কাজের দারুশিল্প, ধাতুর উপর মিনার কাজ, পাথর ও কাঠের মধ্যে নক্সা যুক্ত কাজ, চুনি পান্না ও সোনার রং যুক্ত ল্যাকার বার্নিশের কাজ, নিপুণ হাতের বোনা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্ত্র-শিল্প এবং অন্যান্য বহু প্রকার শিল্পদ্রব্য, স্মরণাতীতকাল হইতে যাহা পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় শিল্প ঐশ্বর্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা তাঁহাদের দক্ষিণ দিকে চাহিয়া দেখিবেন বিরাট ভিড় জমিয়াছে ভারতের অরণ্য জীবনের একখানি বেশি উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা ছবির দিকে। অল্প পরিসরের মধ্যেই একটি খাড়া উঁচুনিচু পাহাড়ের অংশ আঁকা হইয়াছে, তাহা উঁচু গাছ ও ঝোপঝাড়ে চারিদিক বেষ্টিত। বাঁশ ও খেজুর গাছও চারিদিকে কাটা-ডালের গোড়া সমেত তাহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এবং হিমালয়ের পাদদেশে যে সমস্ত লম্বা লম্বা ঘাস জন্মে তাহা, এবং অন্যান্য স্থানীয় বহু জিনিস তাহাতে আঁকা আছে। ভারতের সুখকর এই শিকার ক্ষেত্রটিতে শিকারযোগ্য প্রাণীর ছবিতে ভরা। যাঁহারা ভারতে থাকিয়া এককালে তরাই-এর জঙ্গলাজ্বর ও অন্যান্য বহু বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া এই সব স্থানে শিকার করিয়াছেন তাঁহাদের মনে সেদিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠাতে তাঁহারা এ ছবি দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ছবির এক দিকে বিরাট দেহ হাতী শুঁড় উচ্চে তুলিয়া, মুখ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন যে রয়্যাল টাইগারটি তাহার মাথায় বিঁধাইয়া দিয়াছে তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে না পারিয়া বেদনায় কাঁদিতেছে। বাঘের থাবার স্থান হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়া নিচের হলুদ ঘাসকে ছোপ ছোপ রাঙাইয়া তুলিয়াছে। হাতীর ভয়ার্ত চিৎকার এবং বাঘের রুদ্ধ চাপা গর্জনে ভীত হইয়া একদল হরিণ নিশ্চিন্ত তৃণ-ভোজন ফেলিয়া বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। উহাদের ভিতরের একটি সাহসী অ্যান্টেলার মাথা হরিণ দূরে গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া কৌতূহলবশতঃ চাহিয়া দেখিতেছে ব্যাপারটা কি। একটি গাছের মাথায় এক দল ভীত বানর পাতার আড়ালে লুকাইয়াছে, তাহাদের বাচ্চারা গর্জন শুনিয়া মায়েদের বুকে সংলগ্ন হইয়া আছে। ময়ূরের দল সবুজ ঘাসের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু অভিজ্ঞ শকুন ভবিষ্যৎ ভোজের আশায় খুশি হইয়া আকাশে উড়িতেছে। দৃশ্যের অন্য এক ভাগে বেঙ্গল টাইগারকে ঘাসের আড়ালে নিশ্চিন্তে চরা পশুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে। জঙ্গলের দৃশ্যে কিছু বাড়াবাড়ি থাকিলেও মোটের উপর উহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। চিত্রকরকে অল্প জায়গায় সব দেখাইতে হইয়াছে, সে জন্য কিছু আতিশয্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

দর্শকদের বাম দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বিভাগের অঙ্গন। এইখানে নানা আদিবাসীদের মডেল ভারতীয় উৎপন্ন শিল্পাদির মাঝে মাঝে স্থাপন করা হইয়াছে। বেঁটেখাটো আন্দামানবাসী স্ত্রীলোককে দেখা যাইতেছে, কড়ি ও গাছের পাতায় দেহ সজ্জিত, তাহার ঘন কৃষ্ণ বক্ষে একটি নরকপাল দুলিতেছে। এটি কোনও নিকট আত্মীয়ের হইবে। তাহার স্বামী তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হাতে বর্শা, তাহার চুল আধুনিক ফ্যাশানে কোঁকড়ান। যাহার চেহারা হইতে এই মডেলটি প্রস্তুত সে অবশ্যই তাহাদের সমাজের একজন বিলাসী লোক। আন্দামানীরা নেগ্রিটো বংশোদ্ভূত, ইহারা নিকটস্থ নিকোবার দ্বীপের লোকদের মত নহে, তাহাদের মধ্যে মালয় উপাদানের আধিক্য বেশি। বেশ কিছু মঙ্গোল শোণিতও তাহাদের মধ্যে মিশিয়াছে। দর্শকেরা এখান হইতে অগ্রসর হইয়া গেলে দেখিতে পাইবেন ক্রমেই মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য অধিকতর প্রকট। যখন দর্শকগণ আরও একটু সরিয়া যাইবেন, সেখানে ইরাবতী বদ্বীপের বর্মী এবং পাহাড় জঙ্গলের কারেনদের দেখিতে পাইবেন। নৃতাত্ত্বিক মডেলগুলি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের লোকদের দেখিবেন, তাহারা সবাই মঙ্গোলীয় জাতির মানুষ। সেখানে কটা-রঙের সিনফো দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় ভাঁজে ভাঁজে পাকান বেতের টুপি, হাতে তাহার চিরসঙ্গী 'দাও'। এরই সাহায্যে সে লড়াই করে, পরাজিত শত্রুর মুণ্ডটি কাটিয়া ফেলে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, পাহাড়ে শস্যক্ষেতে ব্যবহার করে, এবং ঘরের যাবতীয় কাজ করে। তাহার পরে গর্বিত-ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান নাগা, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, রং করা মানুষের চুল ও ছাগলোম তাহার বুকে ঝুলিতেছে, এক হাতে কারুকার্য করা দীর্ঘ বর্শা, অন্য হাতে বাঘের চামড়ার ঢাল, যৌবনকালের প্রথম শিকারের পারিতোষিক। মানুষের চুল ও ছাগলোমের মালা হইতে জানা যাইতেছে এই পুরস্কার সে তাহার জাতির নিকট হইতে তাহাদের শত্রুদের মুণ্ড-শিকারের বীরত্বের জন্য লাভ করিয়াছে। এটি বিশেষ সম্মানের চিহ্ন, বীর ভিন্ন ইহা অন্য কেহ লাভ করিতে পারে না। মোটের

উপর নাগারা বর্বর। এই জন্যই তাহাদের সম্মানচিহ্ন এমন স্থূল ও আদিযুগের উপযোগী। সভ্যতা প্রাপ্ত হইলে রিবন এবং তারকা শোভা পাইত। তাহার এই খ্যাতি তাহার মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ। যে 'বীর' নির্মমভাবে নরনারীশিশুদের হত্যা করিয়াছে, দুর্বল প্রতিবেশীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, এবং তাহার চলার পথে শুধু মৃত্যু এবং ধ্বংস অনুসরণ করিয়াছে, তাহার গাথা কোনও কবি গাহিবে না। নিজের লোকদের পাইকেরি হিসাবে জবাই করার কথাও কোনও নাগা ঐতিহাসিক সপ্রশংস ভাষায় লিখিবে না। কোনও নীতিবাদীও বংশধরদের কাছে তাহার কথা স্থায়ী গৌরবের কাজ বলিয়া উল্লেখ করিবে না। কাজেই তাহার এ গৌরব তাহাতেই শেষ। অবশ্য সে স্থায়ী গৌরবের আশায় হত্যা করে না, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাতির মতই সে শুধু হত্যার আনন্দে নরহত্যা করে। হিন্দুরা অবশ্য এই রীতি হইতে মুক্ত আছে। পৃথিবীর সব দেশেরই আদিবাসীদের সর্বাপেক্ষা বড় আনন্দ নদীর অথবা পাহাড়ের অপর পারের লোকদের হত্যা করা। ইউরোপের সভ্য মানুষেরা প্রতিবেশীদের গলা কাটার ইচ্ছা দমন করিয়া রাখে বলিয়া তাহারা নিরপরাধ শেয়াল বা হরিণ হত্যা করে, শিকারের জন্য বিশেষভাবে পালিত পায়রাও হত্যা করে। এ সবই "নির্মল" আনন্দ। ধনীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যায় হত্যা করিবার জন্য। নরওয়ের পাইন অরণ্যে তাহাদিগকে হরিণ হত্যা করিতে দেখা যাইবে. সুইস আলপ্‌স পর্বতে শ্যাময হরিণদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখা যাইবে, মৃগনাভি হরিণ হত্যার কাজে লিপ্ত দেখা যাইবে তুষারমৌলি হিমালয়ে, সুন্দরবনে বেঙ্গল টাইগাব হত্যায় দেখা যাইবে, সিংহলের ঘন অরণ্যে হাতী শিকার করিতে দেখা যাইবে। তাহারা অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যে যায় লাফাইয়া-চলা ক্যাঙারু হত্যার জন্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় যায় জিরাফ হত্যাব জন্য সেখানকার পাহাড়ে যায় বন্য ছাগ শিকারের জন্য। খ্রীস্টান ধর্ম তাহাকে এই শিক্ষা দেয় যে, প্রাণীর প্রাণরক্ষার জন্মগত ঐকান্তিক ইচ্ছার দিকে কান দিও না. অতএব সে সুযোগ পাইলেই প্রাণীহত্যা করে. কাজে লাগুক বা না লাগুক। সমস্ত জাতির মধ্যে হিন্দুদিগকে তাহার ধর্ম 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' শিক্ষা দেয়। ইউরোপীয়দিগের মতই নাগা জাতি হত্যাকে উপভোগ করিবার অভ্যাসটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে চতুর্দশ বর্ষীয় এক নাগা বালক এই গৌরবচিহ্ন বুকে ধারণ করিয়াছিল। প্রতিবেশী গ্রামের লোকদের সহিত ইহাদের বিবাদ ছিল। একদিন বালকটি গোপনে শত্রুদের পল্লীতে গিয়া দাও হাতে জঙ্গলে লুকাইয়া রহিল। সেখানে একটা পাহাড়ী ঝরণা ছিল। একটি স্ত্রীলোক সেইখানে জল লইতে আসিবামাত্র সে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া উল্লাসের সহিত সেটিকে তাহাদের গ্রামে লইয়া গেল। গ্রামের সবাই তাহার এই বীরত্বের জন্য তাহার গলায় গৌরবচিহ্ন পরাইয়া দিল।

নাগার পাশে আসামের মিরি পাহাড়ের দৃশ্য। এই উপজাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি অনেক বিষয়ে নিচু বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে মেলে। ব্রাহ্মণদের মত তাহারা ব্যাপকভাবে বহু বিবাহ করে। স্ত্রীকে কিনিয়া আনিতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত টাকা দিয়া নহে, জিনিসের বিনিময়ে। একটি মেয়ের গড় মূল্য তিনটি মহিষ, ত্রিশটি শূকর ও অনেকগুলি মুরগী। পুরুষ সমাজজীবনে যতগুলি সুবিধা ভোগ করে মেয়েদিগকে ততগুলি সুবিধা দেওয়া হয় না। ঠিক হিন্দু বিধবাদের মত। এই অত্যাচার খাদ্য বিষয়েও চলে। নারীদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ব্যাখ্যা একটা দেওয়া হয়। হিন্দুরা যেমন দিয়া থাকে। একটা উচ্চাঙ্গের নীতির কথা বলা হয়। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে চলিতে ভয় হয়, তাই তাহাদের ভীরুতাকে সমর্থন করিয়া বলা হয়, প্রথা মানিয়া চলাই সুবিধাজনক। উহারা বাঘের মাংস খায়। মেয়েদিগকে তাহা দেয় না। পুরুষেরা বাঘের মাংসে শক্তিলাভ করে, উহাতে মনের জোর বাড়ে। কিন্তু বাংলার মেয়েদের অপেক্ষা তাহাদের মেয়েরা অনেক বিষয়ে বেশি ভাগ্যবতী। তাহারা রুচিসঙ্গতভাবে পোষাক পরিতে পারে, ধর্মীয় অনুশাসনের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে অর্ধ উলঙ্গ থাকিতে বাধ্য করা হয় না।

আসামের আবর জাতি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মত পোষাক পরে, গাছের বাকলের একখানি মাত্র কৌপীন সম্বল তাহাদের। তাহারই উপরে বসে. এবং রাত্রে তাহাই গায়ে দেয়। খাম্পটি মডেলে শান জাতির প্রতিনিধি। আসামের আর যাহাদের মডেল আছে তাহারা—মিকির, ডাফলা, খাসিয়া, জয়ন্তীয়া। হিমালয়ের দৈর্ঘ্য বরাবর গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যে সব উপজাতির বাস, তাহারাও আছে, যথা, গারো, মেচ, লিম্‌বো, লেপচা, গোর্খা, এবং গাড়োয়ালী। ইহারা পূর্ব-বর্ণিতদের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক দিক হইতে সম্বন্ধ যুক্ত, ইহাদের নাক চ্যাপটা, গালের হাড় উঁচু, এবং মুখে দাড়ি অত্যন্ত কম। ইহারা যে তাতার বংশ হইতে আগত ইহাতে তাহা প্রমাণ হয়। গাঙ্গেয় উপত্যকার অল্পবিস্তর যাহারা আর্য বংশসম্ভূত, তাহারা উত্তরের মঙ্গোলীয় ও দক্ষিণের দ্রাবিড়দের মধ্যবর্তী স্থানে বাস করিয়া দুই দিককে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সাঁওতাল, পাহাড়ী, ওরাওঁ, কোল এবং গণ্ড, কোলারিয় উপজাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। অন্য দিকে তেলুগু, তামিল, ইরুলা, বাদগার এবং সম্ভবত টোডা এবং কুর্গ দ্রাবিড় জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। পশ্চিম ভারতের তুরানিয়ান বংশোদ্ভূত ঠাকুর কাটকারি এবং শনকলিদের মডেল রহিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ হইতে আ[illegible]ছে ভীল এবং মীনার মডেল, ইহারা তথাকার আদিবাসীদের প্রতিনিধি। পাঠান, জাঠ এবং রাজপুতদের মডেল বিশুদ্ধ আর্যদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে।

অগণিত দর্শক আসিতেছেন প্রতিদিন। ইহা হইতে একটি জিনিস স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় উন্নতির মূলে যে রহস্যময় কারণটি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল। সে তাহাদের অতৃপ্তি। ক্রমাগত নূতন নূতন জ্ঞানলাভের জন্য অনুসন্ধিৎসা এবং যাহা কিছু আরও ভাল, তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিবার প্রস্তুতি। যখনই তাহা তাহারা আবিষ্কার করিবে এবং বুঝিবে, তখনই তাহা তাহারা গ্রহণ করিবে। কোনও জাতিব শক্তি ও সম্পদ নির্ভর করে তাহার আচরিত পন্থা পরিবর্তনের ক্ষমতার উপরে। আবার যখন কোনও জাতির অবনতি ঘটিতে থাকে, তখন তাহার কারণ স্বরূপ ইহা বুঝিতে পারা যায় যে সে তাহার উন্নতির চরমে পৌঁছিয়া তাহার পরে নূতন অন্য কিছু গ্রহণ করিতে ভয় পাইতেছে. পাছে তাহা তাহার উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। উন্নতির সেই উচ্চ শিখর হইতে তখন তাহার ধর্মীয়. নৈতিক এবং সামাজিক রীতিপ্রকৃতি শিলীভূত হইয়া যায়. গতিশক্তি হারাইয়া ফেলে, এবং জীবনীশক্তি এমন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে যে তখন আর সে নূতন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। সমাজের এরূপ অবস্থা হইলে তাহাকে তখন মৃত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তখন অন্ধ দেশপ্রেমিকরা এবং যাহারা সমাজের প্রাচীন মৃতদেহটাকে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তিবশতঃ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা প্রগতির ঘড়ির কাঁটাটাকে কয়েক বছর পিছাইয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করে। বরং পিরামিডের স্রষ্টারা যাহারা কবরস্থ আছে তাহারা বাহির হইয়া রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রচলন করিবে কিন্তু আমাদের দেশে, লোকেরা বৈদিক যুগে ফিরিয়া গিয়া শুধু ভারতীয় গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত হইবে। যাহা অতীত তা মরিয়া গিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, এবং অতীত হওয়া মানে মৃত হওয়া। অতীত বর্তমানকে গড়িয়াছে, এবং বর্তমান ভবিষ্যৎকে গড়িবে। বিশ্বব্যাপী প্রাণের

ইহাই ধর্ম যে সে প্রতি মুহূর্তে ভবিষ্যতের সৌধ গড়িবার জন্য একখণ্ড করিয়া প্রস্তর স্থাপন করিতেছে। প্রতি মানুষের জীবন্ত এবং সমস্ত সৃষ্টি, জীবন্ত অথবা জড়, তাহাদের নিজ নিজ সীমার মধ্যে এই সৃষ্টি কাজে প্রকৃতিকে সাহায্য করিতেছে। যে অতীতকে আঁকড়াইয়া প্রকৃতির অগ্রগতিকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে ধিক্। তাহার ধ্বংস অনিবার্য। এই অমোঘ-বিধানজাত অগ্রসর হইয়া চলার পথে যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে ভাগ্যের হাত সে এড়াইতে পারিবে না, এবং সেই ভাগ্য—ধ্বংস। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতিরই এই দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, শুধু উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তির জন্য হিন্দু এখনও টিকিয়া আছে নহিলে তাহারও ঐ একই অবস্থা হইত। জীবনের বাস্তব দিক ও বুদ্ধিকে কার্যক্ষেত্রে চালাইবার কাজে ইউরোপের বর্তমানই হইবে আমাদের ভবিষ্যৎ, সম্ভবত কয়েক শতাব্দীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই চলমান জগতে আমাদের বিলম্বিত যাত্রায় আমরা যতটা পথ পিছাইয়া পড়িয়াছি, তাহা যদি দ্রুত পদক্ষেপে অতিক্রম করিবার চেষ্টা না করিয়া আরও পিছাইয়া যাইতে চাহি, তাহা হইলে আমাদের জীবনপথের যাত্রা একেবারে থামিয়া যাইবে, কারণ ভবিষ্যৎ কালটা অতীত কাল হইতে বর্তমানের অনেক বেশি কাছে। কিন্তু হায়! বর্তমানে আমাদের জাতির ইহাই ইচ্ছা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঔদার্যবশতঃ যাহা কিছু হিন্দুর তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ হইয়াছে। অতি স্পর্শচেতন এবং গর্বিত জাতি—যে জাতি বহু শতাব্দীর বিদেশী শাসনে দৈহিক এবং মানসিক দুর্বলতা এবং দুর্নীতিগ্রস্ততায় ভুগিতেছে, সে জাতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া দিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা কার্যকর উপায় আর হইতে পারে না। সে জন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের পার্থক্য এত বেশি চোখে পড়ে। প্রথমোক্ত জাতি সর্বদা নূতনত্বের সন্ধানে নিযুক্ত এবং প্রতিনিয়ত তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহার উন্নতি যাহাতে ক্রমে আরও বেশি হয়, তাহার জন্য নূতন নূতন উপায় চিন্তা করিতেছে। ভারতীয়গণ তাহা করে না। জলশক্তি চালিত হাতুড়ির সাহায্যে কোনও নূতন জ্ঞান তাহার কণ্ঠনালিতে ঘা মারিয়া ঢুকাইয়া দিলেও তাহা সে গ্রহণ করিবে না। ভারতীয়েরা সব সময় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো যাহাতে চোখে না লাগে সে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তবু অপ্রতিরোধ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি যদি তাহার দৃঢ় মনোভাবকে কিছু শিথিল করিয়া থাকে, চরিত্রকে আরও কিছু পরিমাণ স্থিতিস্থাপক করিয়া থাকে অথবা পৃথিবী বিষয়ে তাহার ধারণাকে কিছু বিস্তৃত করিয়া দিয়া থাকে তবে ভারতীয়দের দোষ দেওয়া যায় না। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক একা-চালক তাহার গাড়ির চাকায় স্প্রিং লাগাইতে ভয় পায়, এটা অঞ্চলের কৃষকও আলুর চাষ করিবে না। কারণ প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে সমাজে সে জাতিচ্যুত হইবে। প্রকৃতই কিছুকাল আগে আমি একা-চালক ও কৃষককে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহারা কেহই নূতনত্বে রাজি নহে। এ রকম 'উৎসাহ-জনক' অবস্থায় সর্বত্র ভারতীয় স্টিফেনসন ও এডিসনেরা দলে দলে জন্মগ্রহণ করিবে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য!

অতএব আমাদের জাতীয় অথর্ব অবস্থা হইতে দৃষ্টি ইউরোপীয়দের অগ্রগতির গভীর উৎসাহের দিকে ফিরাইলে মনে একটা আনন্দ জাগে। আমরা তাই প্রতিদিনের হাজার হাজার দর্শকের ভারতীয় কাঁচা মাল উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রতি কৌতূহল এবং এ সম্পর্কে নানা তথ্য জানিবার অদম্য আগ্রহ আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। বণিক, উৎপাদনশিল্পী, এবং বিজ্ঞানীরা আমাদের প্রদর্শনীতে আসিয়া ভিড় করিয়াছেন। তাঁহারা সাম্রাজ্যের সুদূর ডমিনিয়ন হইতে, তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা, নূতন নূতন ঐশ্বর্যের এবং মানুষের নূতন সুখ-সুবিধার আকর দেখিতে আসিতেন। এমন কি সুদূর পল্লী হইতে আগত লোকেরা গাছের পাতা, গাছের বাকল প্রভৃতি প্রদর্শিত ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের কি ব্যবহার তাহা শিখিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত দ্রব্যগুলি সম্পর্কে বড়রাও তাঁহাদের সন্তানদের আগ্রহ জাগাইয়া ঐ সবের ব্যবহারিক মূল্য বিষয়ে বুঝাইয়া দিতেন। যুবকেরা তাহাদের প্রণয়িনীদিগকেও এই সব প্রদর্শিত দ্রব্যে কৌতূহল জাগাইতেন। তাঁহারা যে সব মন্তব্য করিতেন তাহা আমাদের বন্ধু রেভারেন্ড মিস্টার লং ও আমি ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াইয়া শুনিতাম।

ভারতবন্ধু মিস্টার লং নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আমার কাছে আসিতেন, এবং তাঁহার ভারত ত্যাগের পর হইতে ভারত কতখানি উন্নতি করিয়াছে তাহা কৌতূহলের সঙ্গে শুনিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার কোনও ক্লান্তি ছিল না, এবং প্রতিদিন তাঁহার নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ছিল। সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া নূতন যাহা ভাবিতেন, তাহা আমার সঙ্গে আলোচনা করিতেন। "বাংলা খবরের কাগজগুলি আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমন কি এখনও পরস্পরের কুৎসা গায়, না প্রকৃতই রাজনীতি লইয়া আলোচনা করে?" আমার দেওয়া "সঞ্জীবনী" কাগজখানি পড়িয়া তিনি এই প্রশ্নটি করিলেন। যখন বলিলাম রাজনীতি লইয়া আলোচনা হয়, তখন তিনি খুব খুশি হইয়া উঠিলেন। আমি তখন অন্য একখানি বাংলা কাগজ তাঁহার হাতে দিলাম। পরের সপ্তাহে যখন দেখা হইল তখন তাঁহাকে বড়ই বিমর্ষ দেখাইল। বোঝা গেল তিনি ঐ বাংলা কাগজখানি পড়িয়াছেন, এবং সে কাগজে হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রার বিপক্ষে মন্তব্য লিখিত ছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বিদেশ ভ্রমণে যে উপকার হয় সে বিষয়ে কেহ লেশমাত্রও সন্দেহ প্রকাশ করে কি করিয়া। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ভারতের রেলপথ কি তাহা প্রমাণ করিতেছে না?" অন্য সময়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ব্রিটিশকে জাতি হিসাবে উঁহারা নিন্দা করে কেন? তাহাদের জানা উচিত যে, আমাদের মধ্যে তাহাদের যথার্থ বন্ধু রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের মঙ্গল কামনা করে, এবং যাহারা অভিভাবকের দরদ লইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিতেছে। লর্ড নর্থব্রুক, জন ব্রাইট, স্যর জর্জ বার্ডউড, মিস ম্যানিং, মিস ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, এবং আরও অনেককে আপনি জানেন। তাঁহারা কি আপনাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন? আপনারা বৃহৎ জাতিতে পরিণত হউন এ ইচ্ছা যে আমার কত আন্তরিক, তাহা কি করিয়া বুঝাইব?" আমি বলিলাম ভাল মন্দ দুই-ই মোটামুটিভাবে আমাদের কাগজগুলি, ভারতে ইংরেজদের চালিত কাগজ হইতে শিখিয়াছে। তিনি আমার নিকট হইতে বাংলা কাগজগুলি, গ্রামের স্কুলগুলি, জাতিভেদ কথা, নীলের চাষ এবং আরও অনেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জানিতে চাহিলেন। তিনি বাংলা বই সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তিনি সংবাদপত্রও পান না। তাই আমি যখন ঐ কাগজগুলি দিলাম, তখন তিনি অপরিসীম আনন্দলাভ করিলেন। প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগে ইংল্যান্ডের নেটিভদের মধ্যে যে কৌতূহল জাগাইয়াছে, যে প্রশংসা তাহাদের নিকট হইতে লাভ করিতেছে তাহার জন্য লং সাহেবকে এক এক সময়ে শিশুসুলভ আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। এই সব সময়ে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এবং যেন বলিতে চাহিতেছেন, "আমার প্রিয় ভারতবর্ষ এই সব প্রস্তুত করিয়াছে!" এক সময়ে আমি ইউজিন রিমেলকে ভারতবর্ষের সুগন্ধ দ্রব্যের নানা আকরের কথা ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, তাহা শুনিয়া লং সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন ভারতে বহু লোক, এখন সেখানকার নানা

কাঁচামাল যাহাতে আরও উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছে কি না। আমি বলিলাম, এ দিকটিতে যে কিছু লাভের প্রত্যাশা আছে, সে বিষয়ে কিছু কিছু লোকের মনে আশা জাগিতেছে। তাহারা বুঝিতে পারিতেছে আগামী কিছুকাল জাতীয় উন্নতি ইহারই উপর নির্ভরশীল থাকিবে। তিনি আরও শুনিয়া খুশি হইলেন যে, ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িতেছেন। "আপনি বলিতেছেন ইহার প্রতিষ্ঠা ও চালাবার জন্য লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা দিতেছে?"—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, ইহা সত্য। অবশ্য লর্ড লিটনের সময়ে পেট্রিয়টিক ফাণ্ডের জন্য যত সহজে এবং যে পরিমাণ অর্থদান করিয়াছিল, এ ব্যাপারে তাহা করে নাই।

আমাকে হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ জানিয়া, রেভারেণ্ড লং আমার সঙ্গে যত বিষয়ে আলাপ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কখনও ধর্মের তর্ক তোলেন নাই। তিনি স্বয়ং মিশনারি হইয়াও ["পাদ্রি লং"] তিনি যে তাহা করেন নাই এজন্য তাঁহাকে আমি প্রশংসা করি। এখন যখন এই বিবরণ লিখিতেছি, তিনি আর জীবিত নাই। তাঁহার উদার সহানুভূতিপূর্ণ মুখখানা আমার সর্বদা মনে পড়িতেছে। দক্ষিণ কেনসিংটন স্টেশনে তাঁহার সহিত শেষ বিদায়ের ক্ষণটিও বেদনার সঙ্গে মনে জাগরূক রহিয়াছে। এ পৃথিবীতে আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না। তাঁহার আত্মাটাই ছিল যেন স্বর্গ, যাহা কিছু সুন্দর এবং গৌরবময় তাহারই আবাস ছিল সেইখানে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম তাঁহাকে সকলের প্রতি প্রেমময় করিয়া তুলিয়াছিল, এবং আমার বিশ্বাস, যে মহানন্দময় অবস্থা সকল দেশের সকল ধর্মের সৎলোক মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার আত্মাও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন মানুষ যে জাতির মধ্যে জন্মিয়াছেন, সেই জাতিকে ভাল না বাসিয়া উপায় নাই। তাঁহার জীবনের মহৎ কাজগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতার ইহাই আমাদের সবিনয় দান।

ভারতের উৎপন্ন যে সব সামগ্রী তাহারা ক্রয় করিতে পারে তাহাতে তাহাদের যথোপযুক্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। যাহারা আঠার ব্যবসা করে তাহারা ভারতীয় আঠা খরিদ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, কারণ সুদানের যুদ্ধের দরুন আফ্রিকা হইতে আঠা আমদানি বন্ধ ছিল। কিন্তু আরবদেশ অথবা আফ্রিকার মত শুষ্ক দেশের আঠার মত আমাদের আঠা তত উৎকৃষ্ট নহে। আমাদের গাম্ অ্যাকাসিয়া, Acacia arabia. Willd. (বাবলা) হইতে প্রস্তুত. Acacia vera-র মত শাদা ও পরিষ্কার নহে। অ্যাকাসিয়া ভেরা এডেন হইতে ভারতে আসে, উহা খুব প্রচুরও নহে। কিন্তু ভারতের নিকৃষ্ট আঠাও শত শত মন জঙ্গলে অথবা পল্লী-প্রদেশে অযথা নষ্ট হয়। কেহ কষ্ট করিয়া উহা সংগ্রহ করিলে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করা সম্ভব হইত। বম্বাই হইতে প্রেরিত Acacia leucophloea Willd.-এর আঠা অথবা উত্তর ভারতের Acacia catechu-র আঠা গাম্ অ্যাকাসিয়ার বিকল্প রূপে ব্যবহার্য বলিয়া ইংল্যাণ্ডে মনে করা হইয়াছে। Odina Wodier, Linn (জিওল) গাছ নিম্নবঙ্গে বেড়া দিবার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার আঠাও যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে পারিলে একই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। আমাদের দেশের নিপুণ হাতে স্মরণাতীত কাল হইতে যে উদ্ভিজ্জ নীল রঞ্জক তৈরি হইয়া আসিতেছে তাহা ইউরোপে অজ্ঞাত। তাই তাহাদের অতি কড়া রকমের উজ্জ্বল নীল রঞ্জক-জাত প্রতিক্রিয়া স্বরূপে তাহারা আমাদের দেশের অতি চমৎকার কোমল নীল রঞ্জক পদার্থের দিকে বেশি আকৃষ্ট হইল। morinda citrifolia, Linn. Oldenlaudia umbrellata, Linn. এবং Rubia-র বিভিন্ন প্রজাতিগুলি প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। রঞ্জন কাজের জন্য এবং ট্যানিং-এর জন্য ইংল্যাণ্ড বৎসরে গাছের বাকল ও নির্যাস কয়েক কোটি টাকার আমদানি করিয়া থাকে। এই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ে ভারতের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতের এমন অরণ্যসম্পদ এবং এমন বিশাল হিমালয় যাহা একই সঙ্গে মেরুর শীতলতা ও গ্রীষ্মমণ্ডলের তাপ ধারণ করিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কি সে কষায় গুণসম্বলিত বাকল ও পাতা হীন হইতে পারে? কখনও নহে। কিন্তু ভারতে কে এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিবে অনুসন্ধান চালাইবে, তথ্য সংগ্রহ করিবে, পরীক্ষা চালাইবে এবং ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগকে অভ্যস্ত পথ হইতে সরাইয়া আনিবে? বহু শতাব্দী পূর্বে আদেশ জারি হইয়াছিল হিন্দু যেখানে জন্মিবে সেইখানেই তাহাকে অনড় হইয়া থাকিতে হইবে। কাজেই তাহাকে সব বিষয়ে বিদেশীদের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। বিদেশীরা ব্যবসায়ের নূতন পথ প্রস্তুত করিবে, দেশের নূতন সম্পদের আকর আবিষ্কার করিবে, জমিতে অধিক লাভজনক ফসল ফলাইবে, পুরাতন পদ্ধতির বদলে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিবে, জাহাজ তৈয়ার করিবে, রেলওয়ে স্থাপন করিবে, এবং অন্যান্য অনেক কিছু করিবে, যাহা জাতীয়তার অহঙ্কার একটু কম থাকলে আমাদের নিজেদেরই আগে করা উচিত ছিল। অফিসে ভারতীয় কেরানি অথবা ইংরেজ পরিচালিত রেল-বিভাগে ভারতীয় গার্ড কেন বেশি নেওয়া হয় নাই বলিয়া চিৎকার করিলেই হিন্দুরা মনে করে তাহাদের কর্তব্য যথাযথ পালন করা হইল। আমি অনেকবার অতি কড়া ভাষায় এ বিষয়ে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু তাহা স্বদেশবাসীর প্রতি সহানুভূতির অভাববশতঃ নহে। ইহার কারণ আমাদের অগ্রগতির পথে আমরা যে নিজেরাই কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছি, সেই লজ্জায়। আমি কঠোর কথা উচ্চারণ করিয়াছি আমাদের ভীরুতার লজ্জায়, আমাদের অতুলনীয় বুদ্ধিবৃত্তির স্বেচ্ছাকৃত অপব্যবহারের লজ্জায়। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিসীম, ইহার যথার্থ ব্যবহার হইলে হাজার হাজার লোকের অন্নসংস্থান হইবে, জীবনের মান উন্নত করা সম্ভব হইবে, এবং সম্পদ যদি শক্তির পরিচয় হয়, তাহা হইলে এদেশের লোক পৃথিবীর লোকের কাছে সম্মানপ্রাপ্ত হইবে। ইংল্যাণ্ডের বহু টাকা বিদেশে খাটিতেছে। সেই টাকা ভারতের উন্নতির কাজে নিয়োগ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নহে। ভারতের প্রতি ইংল্যাণ্ডের বিশেষ একটা টান আছে বিদেশের প্রতি সেরূপ টান তাহার নাই, এবং আমার মনে হয় চেষ্টা করিলে তাহাদের দ্বারা আমাদের দেশের উন্নতি-সাধন সম্ভব। তাহার আরও কারণ তাহাতে উভয়পক্ষই উপকৃত হইবে। এদেশে তাহাদের যে টাকা খাটিবে তাহা ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের শিল্প-কাজের সহায়ক হইবে। ভারতের অর্ধেক মানুষ প্রায় বিবস্ত্র থাকে, কারণ তাহাদের কাপড় কিনিবার সাধ্য নাই। অর্থলাভের উপায় বৃদ্ধি হইলেই সে অর্থের অনেকখানি ল্যাঙ্কাশিয়র, বারমিংহাম, শেফিল্ড এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে বস্ত্র এবং অন্যান্য দরকারী বস্তু উৎপাদনে ব্যয়িত হইবে। লণ্ডনের বাজারে ঘুরিয়া দেখিয়াছি সেখানে পৃথিবীর বহু স্থানের প্রস্তুত দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ের জন্য সাজান আছে। ইহাতে আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, ভারতে বর্তমানে যেটুকু বৈদেশিক বাণিজ্য আছে, তাহা অপেক্ষা অনেকগুণে সে তাহা বাড়াইতে পারে, সে সুযোগ তাহার আছে। কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় করিয়া মাঝে মাঝে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার যেটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহার অভিজ্ঞতা আমার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেজন্য আমি বিশেষ কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই, অতএব আমি ঠিক কোন্ জিনিসটির বাজার এখানে হইলে লাভজনক হইবে তাহা বলিতে

পারিতেছি না। ইহার জন্য আরও অনুসন্ধান, আরও পরীক্ষা দরকার। তাহা ভিন্ন কাজে প্রবৃত্ত না হইয়া সত্য নির্ণয় করা দুরূহ। এখন অবিরাম অনুসন্ধান চালান উচিত, এবং পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কিছু জিনিস পাঠাইয়া বাজার যাচাই করা উচিত। তাহা হইলে সত্য নির্ণয় এবং প্রাথমিক অনেক বাধা দূর হইতে পারে। এই উপায়েই অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা ইংল্যাণ্ডে লাভজনক মাংসের বাজার পাইয়াছে, এবং নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাটকা ফল উৎপাদন করিয়া রপ্তানি করিতেছে। উদ্বৃত্ত মাংস তাহারা আগে নষ্ট করিয়া ফেলিত। গভর্মেণ্ট এ-কাজে উৎসাহ দেখান নাই, সে জন্য আমি গভর্মেণ্টের দোষ দিই না, আমি বরং আমার দেশবাসীকে বলি, তাঁহারা কেহ যদি এ-পথে পরীক্ষা চালাইতে চান, তাহা হইলে আমি যতদূর সম্ভব তথ্য সরবরাহ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে।

[ক্রমশ]

"A Visit to Europe" গ্রন্থের অনুবাদঃ পরিমল গোস্বামী।

লিপটনের
হিমালয়ান
গোল্ডেন ডাস্ট
গুঁড়ো চা

হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট গুঁড়ো চা যে খেয়েছে সেই মজেছে। যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি স্বাদে গন্ধে ভরপুর। চা হবে কাপের পর কাপ। খেয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি।
অন্য সব গুঁড়ো চা-কে টেক্কা দেয় হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট।

LIPTON লিপটন বলতেই ভালো চা

LHGC-8 BEN

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

দ্বার রুদ্ধ করে ভ্রমটারে রুখি,
সত্য বলে- আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।

বৃহস্পতিবার ২রা এপ্রিল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্তদিন যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে বারে বারে এই কবিতাটির লাইন দুইটি মনে পড়ছিল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভা, আর এই ভবনের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। এই বাড়ির ভিত থেকে সুরু করে সুরু স্কীজের ইয়ার কুলার বসানো পর্যন্ত সব কাজই চোখের সামনে দেখেছি। এই বাড়িতে এসেছি প্রায় প্রতি সপ্তাহে, প্রতিদিনে। আর লিপিবদ্ধ করেছি এই বাড়িতে অনুষ্ঠিত শত শত ছোট-বড় সভার কর্মকাণ্ডের বিবরণ। কিন্তু আজ যা দেখলাম, সেই দৃশ্য অভিনব, অভূতপূর্ব। এই বাড়ির দ্বার চিরদিন অবারিত থেকেছে সাংবাদিকদের জন্য—সাংবাদিকরা যে কোন ঘরে পৌঁছনোর পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা-পানের জন্য আহ্বান পেয়েছেন—চায়ের সঙ্গে ভাল-মন্দ মুখরোচক খাবারও জুটেছে প্রায় সব সময়ে—শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন হোন বা অন্য যে কেউ হোন, কোনদিনই এই ভবনে কিছু গ্রহণ করেন নি উপস্থিত সাংবাদিকদের অংশ না দিয়ে। এমন কি মুড়ি আর বাদাম, সেই কাঁচা লঙ্কা—তার অংশও নিতে হয়েছে সাংবাদিকদের, তারপর বদুবাবুর দামী সিগারেট, বীজেশবাবুর পান বা সুহৃদবাবুর জর্দা, সৌরেন মিশ্রের নস্যি—যে যেমন রসিক, পেয়েছেন সমান ভাগে। কিন্তু আজ (২রা এপ্রিল) সকাল বেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে পৌঁছতেই সিঁড়ি আটকে বসে থাকা যুবকরা অভ্যর্থনা করলো প্রায় কাঁচা খিস্তির ভাষায়, জানিয়ে দিল কংগ্রেস ভবনের অঙ্গ স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না সাংবাদিকদের। কেন এবং কার হুকুমে সেই কথা জানতে চেষ্টা করি নি। এতদিন কংগ্রেস ভবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আসুন বলে অভ্যর্থনা যে মেজাজে গ্রহণ করেছি, এই অভ্যর্থনাও সেই মেজাজেই গ্রহণ করলাম—কারণ বিরূপ অথবা সহৃদয় অভ্যর্থনা দুই-ই আমাদের কাছে সমান—বিষ্ঠা আর চন্দনের বাদবিচার করা সাংবাদিকদের কাজ নয়। শুধু সাংবাদিক নয়—সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা পর্যন্ত নিগৃহীত হল নানাভাবে দেখলাম চোখের ওপর। কিন্তু বিস্ময়ের তখনও বুঝি অবশিষ্ট ছিল। আমরা কেউ সাধক বিল্বমঙ্গল নই যে, অশুভ দেখবার হাত থেকে মুক্তি পেতে চিন্তামণির চুলের কাঁটায় চোখ অন্ধ করে বসে থাকবো। সকাল ন'টায় সভা কিন্তু তার বেশ আগে থাকতে এলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রীনির্মলেন্দু দে; তবে নেতৃবৃন্দের বেশির ভাগকেই ভবনে প্রবেশ করতে হল নানা শ্লীল-অশ্লীল-কটূবাক্য শুনে। শুধু কথায় শেষ নয়—এই কংগ্রেস ভবনের প্রবেশপথে গায়ে হাত পড়লো কতজন নেতার, জামা ছিঁড়ে ফাল ফাল হল, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের মত শাড়ির আঁচল ধরে টানাটানি হল, নিক্ষিপ্ত হল ধুতু, নিক্ষিপ্ত হল ইট, দাহ করা হল কুশপুত্তলিকা। দিনের দৃশ্য শেষ হল; নেমে

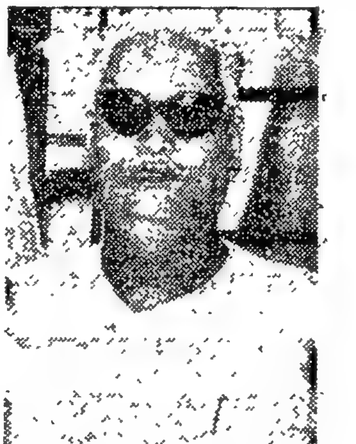

নিজের হাতে গড়া কংগ্রেস ভবনে উচ্ছিংড়ে দলের বীরবিক্রম আর তাণ্ডব দেখতে চান নি বলেই শ্রীঅতুল্য ঘোষ ২রা তারিখের সভায় আসেন নি।

এল রাত—এবার সাংবাদিকরা প্রবেশাধিকার পেলেন তিনতলায়, কিন্তু থাকতে হবে একটি ঘরে—খাঁচাবদ্ধ জীবের মত, ঘরের বাইরে পা দেবার উপায় নেই; পা দিলেই খিস্তি, কিন্তু ঘরে বন্ধ থাকলেই যে রেহাই এমন নয়—ঘরে ঢুকে ক্লাস নিয়ে গেল অনেকে এ্যাথিক অব জার্নালিজম-এর, সেই সঙ্গে বাপান্ত করে গেল সাংবাদিক, সংবাদপত্রের মালিক ও সংবাদকে। বড় অসহায় মনে হচ্ছিল কংগ্রেস ভবনের দীর্ঘদিনের সর্ব সময়ের কর্মীদের। জগুবাবু, নীতিশবাবু, মনোজবাবু, করুবাবু থেকে সুরু করে অন্যান্য কর্মচারীরাও অসহায়ভাবে দেখছিল সব দৃশ্য, বুঝতে পারছিল না—এরা কারা—২৮ বৎসরের যুবক যখন ২০ বৎসর কংগ্রেস করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও কংগ্রেসের জন্য তার ত্যাগ স্বীকার, নির্যাতন ভোগের বর্ণনা শেষ করে সাংবাদিকদের বাপান্ত করছিল—তখন তারা ফ্যালফ্যাল করে তাকানো ছাড়া একটি কথা বলতে পারে নি, সকালবেলা যারা কংগ্রেস ভবনের বাইরে কংগ্রেস নেতাদের কুশপুত্তলিকা দাহ করলো, তারাই বা কোন কংগ্রেসী? আর সন্ধ্যাবেলায় যারা ভবনের তিনতলায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করে হল্লা করছিল, তারাই বা কোন কংগ্রেসী? অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র যদি রেগে গিয়ে কাউকে চড় মারছেন এই দৃশ্য দেখে শুধু রামপ্রসাদের গানের কলি মনে পড়ে—পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।

হ্যাঁ, সত্যি চড় মেরেছিলেন অধ্যাপক চন্দ্র। কিন্তু পারেন নি শান্ত করতে। ২২ বছরের ছোকরাদের ২০ বছর কংগ্রেস করা ও তাদের ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগে গড়ে ওঠা কংগ্রেসের এই অবস্থায় তারা ক্ষিপ্ত, তারা উন্মত্ত, আর তারা বুঝেছে এই সবকিছুর জন্য দায়ী হল—দুই-একটি সংবাদপত্র ও তার সাংবাদিকরা—কেউ তাদের নিবৃত্ত করতে পারে নি। আমার মনে শুধু একটি খেদ রয়ে গেল—এমন দৃশ্যটি শ্রীঅতুল্য ঘোষ দেখলেন না, সাংবাদিকদের কারণে নয়—তাদের জীবনে এই জাতীয় ঘটনা কোন অভিনব নয়। ময়দানের সভায়, বামপন্থী নেতার প্ররোচনামূলক বক্তৃতার পর ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ময়দানে বামপন্থী কর্মীরা সাংবাদিকদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে এগিয়ে এসেছিল, আবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের ১৯৬৫

সালে পতনের পর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের যে পুলিশ বাহিনী ও এস বি'রা সাংবাদিকদের ঠেঙিয়ে ছিল—সেই পুলিশদের ছবিও খবরের কাগজে বেরিয়ে ছিল, এবং আজও লালবাজারে শ্রীদেবী রায়ের ঘরের আশেপাশে তারা আছে। কাজেই এ-সবে কিছু আসে যায় না, মাত্র কয়েক দিন আগে প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক শ্রীঅমর ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে শুনেছিলাম—আমি বা আমার সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অন্য অনেকের পিতা না কি "জীব বিশেষ" ছিলেন, (গালিটা ইংরাজীতে দেওয়া হয়েছিল—কালি-কলম ও কাগজের পবিত্রতা রক্ষায় সবটুকু লেখা হলো না) সেই কথা শুনেও তার পরদিন একইভাবে কংগ্রেস ভবনে গেছি। কারণ সাংবাদিকরা যদিও কেউ কোন মহৎ ব্যক্তি বা পরমপুরুষ নন, বেশির ভাগই কাপুরুষ ও অক্ষম, তবু একটা কথা বোধ হয় তারা বিশ্বাস করে। সেই কথা হ'ল মহামানব যীশুর বাণীতে—হে ঈশ্বর ওরা জানে না ওরা কি বলছে—ওরা কি করছে। যা-হোক আমার শুধু শ্রীঅতুল্য ঘোষের কথা মনে পড়ছিল, মনে পড়ছিল আরো এই কারণে যে, কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় সম্ভবত একমাত্র আমাকেই তিনি বলে গেছিলেন—২রা তারিখের সভায় তিনি আসবেন না। শ্রীঅতুল্য ঘোষ যে অতি দূরদ্রষ্টা, এইদিন তা নতুন করে বিশ্বাস করলাম। নিজের কুশপুত্তলিকা দাহ তিনি দেখতে চান নি, তাঁর নিজের হাতে গড়া পবিত্র কংগ্রেস ভবনে উচ্চিংড়ে দলের বীরবিক্রম আর তাণ্ডব দেখতে চান নি।

কংগ্রেস ভবনের এই দৃশ্য দেখে তুলনামূলকভাবে রাজ্যের অন্য রাজনৈতিক দলগুলির দপ্তরের কথা ভাবছিলাম। রাজ্য কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা ১৯৬৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হবার সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টিতে আরো বেশি উত্তেজনা ছিল। যেদিন এমনি একদল কম্যুনিস্ট কর্মী শ্রী এস এ ডাঙ্গেকে খুঁজে বের করবার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টির একটি প্রধান দপ্তর তোলপাড় করে আলমারীর মধ্যে বা পিছনে লুকিয়ে আছে কি না খুঁজে দেখছিলেন বা যেদিন চীনা আক্রমণের পর কলকাতার পথে পথে কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর কুশপুত্তলিকা দাহ হচ্ছিল এবং খবরের কাগজে পশ্চিমবাংলার অনেক কম্যুনিস্ট নেতাকে চীনাপন্থী বলে সেই সঙ্গে চীনের সঙ্গে নানা লেন-দেনের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনও সাংবাদিকরা এই সব দৃশ্য দেখবার বা ঐ সব দলনেতাদের সম্মুখীন হবার সুযোগ পেয়েছে—কিন্তু কোনদিন কোন সাংবাদিক বলতে পারবে কি না জানি না, বহুবাজার পাড়ায়, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট বা ধর্মতলায় কোন দলের অফিসে নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কোন কর্মী তার দলের প্রতি দরদ দেখাবার উদগ্র আধিক্যে সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে বাপান্ত করেছে—লাঞ্ছিত করেছে—কটূক্তি করেছে। তবে এর মধ্যে সান্ত্বনা এই যে, নেই ঘরে খাই বেশি, ফোঁপরা ঢেঁকির বাদ্যি বেশি—কংগ্রেসের যদি এই অবস্থা হয়, তবে কিছু বলার নেই। যা হোক, কংগ্রেস ভবনের পবিত্রতা না হয় গেল—কিন্তু রাজ্য কংগ্রেসের যে পবিত্রতা রক্ষার আবেষ্টনী শ্রীঅতুল্য ঘোষ রচনা করেছিলেন, সেই পবিত্রতা কি রক্ষা পেয়েছে? এইবার বাইরে থেকে ২রা তারিখে কংগ্রেস ভবনের ভেতরের সভার কথায় আসা যাক।

২রা এপ্রিলের সভায় যে নীরব বিপ্লব রাজ্য কংগ্রেসে ঘটে গেল তার তুলনা করবার মত ঘটনা রাজ্য কংগ্রেসের ইতিহাসে নেই। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ, শ্রীনির্মলেন্দু দে, শ্রীসুহৃদ রুদ্র, শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীবীজেশ সেন, শ্রীমতী আভা মাইতি নেই এই কথা ভাবতে গেলে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বুঝি কংগ্রেস নেই। একবার চোখ বুজে ভাবতে যদি চেষ্টা করি ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কিভাবে গড়ে উঠেছে, কিভাবে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, স্বর্গত ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, শ্রীচারু ভাণ্ডারী থেকে শুরু করে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়-এর মত শত শত কংগ্রেস নেতা ও কর্মী কংগ্রেস ত্যাগ করে গেছেন। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীভূপতি মজুমদার প্রমুখের মত ব্যক্তিরা রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়েছেন। সেই সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী। সেই ইতিহাস খুবই চাঞ্চল্যকর। এই চাঞ্চল্যকর ইতিহাস-স্রষ্টারা ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছেন, এক কথায় কংগ্রেস ভবনের মায়া ত্যাগ করছেন—এই কথা ভাবা যায় না। দিন বদল, পালা বদল আর রং বদলের ইতিহাসে এই দিন লাল অক্ষরে লিখে রাখবার মত। অনেকে বলতে পারেন না, না—ওটা আবার কি পরিবর্তন, এর মধ্যে অভিনবত্ব কি আছে? অথবা বলতে পারেন, ওসবে কিছু হবে না, কংগ্রেস আর বড় হবে না, আর জনগণের আস্থা পাবে না—এমনি আরো অনেক কথা হতে পারে। আমি সেই সব কথার "মেরিট" নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। রাজনীতিতে কে বড় হয় আর বাঁচে সেই কথা অত সহজে বলবার নয়, কিন্তু যে পরিবর্তন হল তার মূল্য কি কম? আর পরিবর্তন হল-কিভাবে? প্রদেশ কংগ্রেসের ৩০ জন সদস্যের মধ্যে কোটারী রুলের কথা বলে হোক অথবা অন্য কথা বলে হোক, বর্তমান নেতৃত্বের পরিবর্তন দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন মাত্র তিনজন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য—শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী আর শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়। এঁদের পিছনে আরো অনেকে ছিলেন, তবে তাঁরা কেউই রাজ্য কমিটির সদস্য নন। এই তিনজনের আবার একজন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সভায় আসেন নি। কাজেই ২রা তারিখের সভায় নেতৃত্বের পরিবর্তনকারীদের মধ্যে মুখর প্রতিনিধিরূপে দুজন ছিলেন শ্রীনাহার ও শ্রীমতী

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রূপান্তরিত

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলি-১২

মুখার্জী। কিন্তু এই দুজনই কি অসাধ্য সাধন করেন নি? নতুন রাজ্য কমিটিতে আজ যাঁরা এলেন, তাঁরা দু'-একজন বাদে সবাই শুধু নতুন নন—তাঁরা অন্তত আর যাই হোন, কেউ কোন কোটারীর চেলা নন। তাঁরা রাজনীতিতে ধড়িবাজ নন, বনিয়াদীও নন—কারো পিছনেই খদ্দর, চরকা, জেল, সমবায়, দুর্নীতি প্রভৃতির সুনাম বা কলঙ্ক বেশি নেই—এই পরিবর্তনই কি কম কথা? যাঁরা গত বিশ বছর কংগ্রেস ভবনকে দেখেছেন, যাঁরা বিশ বছর কংগ্রেস সংগঠনকে দেখেছেন, তাঁদের কাছে এই অভিনবত্ব খুবই চমকপ্রদ লাগবে।

তাৎপর্য আরো আছে। এই কথা দিনের আলোর মত সত্য যে, রাজ্য কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি ও আগামী দিনের সম্পাদক দুইজনই যতটুকু মর্যাদা রাজ্য-রাজনীতিতে পেয়েছেন, সেটা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই পেয়েছেন। আব সেই অতীতের পুণ্যতেই আজ কংগ্রেস ভবনের শীর্ষে এসেছেন। অধ্যাপক প্রতাপ-চন্দ্র চন্দ্র—শুধু জিন্নার গ্রুপের নেতা বলেই তাঁব পরিচিতি ছিল, ১৯৬২ সালে মন্ত্রী তালিকার লেখা নাম কাটা গিয়েছিল। কংগ্রেস ভবনের একজন নেতার নির্দেশে সেই নাম কাটা গিয়েছিল—আজও অধ্যাপক চন্দ্রের ১৯৫৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী লেখা চিঠিখানি দিল্লীতে ৭নং যন্তরমন্তর রোডে রয়েছে। সেই চিঠি লিখেছিলেন ডঃ চন্দ্র-তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। তিনি লিখেছিলেন—

"Most of the present Mandal and District Committees have been constituted without any proper election. The delegates and the members of the W.B.P.C.C. have been elected in a similar manner. The result has been that Congress Committees at various levels have been packed with a person whose loyalty to the State Congress leadership is unquestionable. But who have entered these committees with a motive of personal gain."

আর শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা একদা ওই কংগ্রেস ভবনের দ্বারে অনশন সত্যাগ্রহ করেছিলেন ১৯৬২ সালে—আর ১৯৬৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বিধান সভার সদস্য-পদে ইস্তফা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে পি টি আই-এর মাধ্যমে প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলেছিলেন—কংগ্রেস আজ দলবাজীর আস্তা-খানায় পরিণত হয়েছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, কারো প্রতি কারো আস্থা নেই।

Mr. Krishna Kumar Shukla, a prominent West Bengal Congress MLA, said here today that he had made up his mind to resign his membership of the Assembly before the ensuing Budget Session, scheduled to commence on February 14.

He said that he had already written identical letters to the W.B.P.C.C. President, Dr. P. C. Chandra and Mr. K. N. Das Gupta, Leader of the Congress Assembly party. seeking the permission of the party (Congress) to allow him to resign my assembly membership.

Mr. Shukla in his letters said : In the present uncertain state of affairs in the state it has become very difficult to carry on as a member of the legislature. During my last 17 years of parliamentary life, I have never experienced such a suffocating situation.

He complained of groupism in the West Bengal Congress Organisation and said : Friends, Colleagues and Comrades-in-arms (in the Congress) have been placed in such a peculiar position that a general sense of mistrust has become the order of the day.

He said that although the entrance of the Congress into coalition with the progressive Democratic Front in West Bengal was hailed by everybody, it has given birth to many controversies.

"I, along with others, have burnt my fingers and am prepared to suffer the punishment, if due. But I expect it (punishment) would be proper and justified."

In an interview, Mr. Shukla said that he was not (not) afraid to publicly say that the West Bengal Congress was divided into groups having mistrust against each other. This is indeed an unbearable situation, he added.

ডঃ চন্দ্র ও শ্রীশুক্লার মত দুইজন নাম-করা ফরিয়াদী আজ কংগ্রেসের নেতৃত্বে এলেন—এই তাৎপর্য লঘু করে দেখবার নয়। আর এঁরা হলেন কাদের চাপে—কাদের দাবিতে, যারা ২রা এপ্রিলের দুই দিন সকলে কুমার সিং হলে সভা করে প্রস্তাব গ্রহণ করলো :

"The meeting felt that Congress is the only party which can fight Communist menace in West Bengal. It further felt that to fight the reactionary, anti-national, anti-social forces prevailing in this border state, ultimately a nationalist front compromising all nationalist and democratic forces will have to emerge and Congress will have to take this initiative."

অর্থাৎ ফ্রন্টপন্থী তথা কোয়ালিশন-পন্থীরা এই পরিবর্তন আনলেন। শ্রীঅতুল্য রাজ্য কংগ্রেসের যে শুচিতা রক্ষা করেছেন অনেককে বিদায় দিয়ে, অনেককে প্রবেশাধিকার না দিয়ে—সেই কংগ্রেস ভবনেও যেমন বিচরণ করছে একদল উঠতি যুবক, যাদের লঘু-গুরু জ্ঞান সম্পর্কে তালমাত্রা নেই—তেমনি নেতৃত্বে এলেন তাঁবা, যাঁরা এতদিন শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও তাঁর নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাই কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের প্রবেশ বন্ধ করে যাঁরা ভাবলেন, "দ্বার রুদ্ধ করে ভ্রমটারে রুখি", তাঁরা বুঝতে পারেন নি—সেই বন্ধ দরজার মধ্য দিয়ে অনেকেই ঢুকে গেছেন, আবার ভ্রমের সঙ্গে অনেক সত্যও দ্বারের বাইরে রয়ে গেছে।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার !

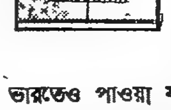

বিশ্ববিখ্যাত 'ন্যাশানাল ডিল্যুক্স' ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে এখন ভারতেও পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরে পাঠানো যায়। আবেদন করুন :

GIFT HOUSE

P.B. 1451, (W.B.C.) Delhi—6

মন্ত্রীরা কী বলেন

কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য

প্রঃ। খাদ্যে বাংলাদেশকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করতে আপনার পরিকল্পনা কি?

উঃ। রাষ্ট্রপতির শাসনকালে কৃষিতে বাংলাদেশকে আত্মনির্ভর করার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এই পরিকল্পনাকে কিছুটা রদবদল করে কার্যে রূপায়িত করতে চেষ্টা করছি। অবাস্তব অনেক কিছু এই পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পেয়েছিল—যেগুলোকে কেটে-ছেঁটে একে বাস্তবধর্মী করে তুলতে হচ্ছে। দশ লক্ষ একর জমিতে বেশি ফসল পাওয়ার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করে বাংলাদেশের খাদ্য-সমস্যা বহুলাংশে মেটাতে চেষ্টা করব। উৎকৃষ্ট এবং পরিমাণে বেশি ফসল পাওয়ার জন্য তাইচুন, আই· আর—আট, এন্ সি বার শ' একাশি প্রভৃতি বীজ সরবরাহ করছি।

প্রঃ। সার বীজ প্রভৃতি কিভাবে চাষীদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন?

উঃ। সার ও বীজ আগে কৃষিদপ্তর থেকেই দেওয়া হত। কিন্তু এতে নানারকম দুর্নীতি দেখা দিতে লাগল। এবার ঠিক করেছি কৃষককে সরাসরি সার বা বীজ না দিয়ে তাঁদের টাকা ধার দেওয়া হবে। এবং ঐ টাকা দিয়ে ওঁরা সার ও বীজ কিনে নেবেন। ১৮ কোটি টাকা এবার কৃষকদের ধার দেওয়া হবে। ভারতীয় ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন বিভিন্ন জায়গায় সার বিক্রির ব্যবস্থা রেখেছে। আমাদের ডিলার'ও আছে। ইণ্ডিয়ান সীড্স্ কর্পোরেশন থেকে পাওয়া বীজ আমাদের ডিলাররা বিক্রি করবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পাট ও আউস ধানের বীজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করছি, কৃষক ভাইরা প্রয়োজনমত বীজ সময়মত পেয়ে যাবেন। আমি নিজে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কৃষি-বিভাগের কাজ কেমন হচ্ছে—তা দেখতে চেষ্টা করব। বি· ডি· ও-দের এখন থেকে কৃষিদপ্তরের কাজ-কর্ম দেখাই প্রধান কর্তব্য হবে। ব্লকের অন্যান্য কাজ-কর্ম দেখার জন্য আরেকজন অফিসার থাকবেন। কিন্তু বি· ডি· ও-কে কৃষিদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত থেকে কৃষিতে কিভাবে প্রতিটি ব্লক উন্নত হতে পারে—সেই চেষ্টাই করতে হবে। ব্লকে সাধারণত ১০ জন গ্রামসেবক থাকেন। এই ১০ জনের মধ্যে ৭ জনকে কৃষিদপ্তরের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

প্রঃ। পাটের চাষ বাড়াবার কথা কিছু ভাবছেন?

উঃ। আমাদের তরফ থেকে পাটের চাষ বাড়াবার চেষ্টা করা হবে এবং আমরা পাটের চাষ বাড়াতে চেষ্টা করছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, চাষী ভাইরা যেন তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হন। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন করে যদি চাষীদের কাছ থেকে পাট কেনা যায়, তবে আশা করা যেতে পারে যে, চাষীরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবেন না। তা হলেই পাট চাষের উৎসাহ বাড়বে। এ সব কথাও ভাবছি।

প্রঃ। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে তো?

উঃ। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি বিভাগের জন্য আমরা ৭২ কোটি টাকা দাবি করেছি। কিন্তু পেয়েছি মাত্র ৪৯ কোটি টাকা। বাকিটার জন্য দাবি রেখেছি। এ-টাকা যদি পাই তাহলে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, এ রাজ্যের কৃষির অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারব।

আমার মনে হয়, বর্গাদারদের জমিতে কিছু অধিকার থাকা দরকার। তাহলে তাঁরা আরও উৎসাহিত হবেন। কৃষিযোগ্য জমির ৬০ থেকে ৭০ ভাগ বর্গাদাররাই চাষ করে থাকেন। তাঁদের যথাযথ উৎসাহিত করতে পারলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারত।

বন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভবতোষ সরেন

প্রঃ। আপনার বিভাগের প্রধানত কাজ কি?

উঃ। অল্প কথায় এ বিভাগের কাজ হল বন-সংরক্ষণ, বন-উন্নয়ন ও বনজ-সম্পদ আহরণ। এই সব কাজ

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা পূর্ণাঙ্গ আইন-সাপেক্ষ একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে আইনের সাহায্যে বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমবাংলার কৃষকদের কাছে বিগত নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রণ্ট যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার অতি সামান্য ভগ্নাংশ এই অর্ডিন্যান্স দ্বারা পূরণ করার চেষ্টা হোল।

দেশের বিপুল সংখ্যক গরীব কৃষক বিগত নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টকে সমর্থন করেছে। এতদিন পর্যন্ত গ্রামের গরীব কৃষকরা গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থের অঙ্গুলি হেলনে চলতো। আর গ্রামের ঐ কায়েমী স্বার্থের ওপর নির্ভর করতো কংগ্রেসের সংগঠন। তাই গত বিশ বৎসর ধরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিজেদের রচিত সংবিধান আর আইনকে অমান্য করে কৃষকদের স্বার্থ নষ্ট করে গ্রামের কায়েমী স্বার্থকে পোষণ করে এসেছেন। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে—গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবেশ করছে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। দিনের-পর দিন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গত ২০ বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কার-নীতি কার্যকরী করার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু গরীব কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটে নি। সব কিছু সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রামের মুষ্টিমেয় জোতদারের কুক্ষিগত। এই অবস্থায় সংশোধিত কৃষক এলাকায় তো বটেই, এমন কি অসংগঠিত কৃষকরাও পুরাতন ব্যবস্থার শিকল ভেঙে যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের ভূমি-সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন করে গরীব কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না ঘটানো পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও গ্রামের অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটানোর আশা নেই। অন্যদিকে পুরাতন সম্পর্ককে ছিন্ন করে যে প্রত্যাশায় গ্রামের কৃষকরা

করতে গিয়ে বনাঞ্চলে সয়েল কনজার্ভেশনের কাজও করতে হয়। গাছ লাগানো এই বিভাগের আর একটি প্রধান কাজ। ইউক্যালিপটাস্, শাল, টিক্, সেগুন, কদম প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়। বন-বিভাগ মধু সংগ্রহ করে এবং মধু পরিশুদ্ধ করে বাজারে বিক্রি করে। কাঠ চেরাই-এর কাজও করা হয় এই বিভাগ থেকে। রেলের স্লিপার আমরা সরবরাহ করে থাকি। দুই-একটা বোটানিক্যাল গার্ডেনও বন-বিভাগের আওতায় আছে।

বন্য-জন্তুর সংরক্ষণের কাজও এই বিভাগের।

প্রঃ। আপনার বিভাগের অফিসারের সংখ্যা কত?

উঃ। প্রায় ৮০ জন। ২ বছর দেরাদুনে থেকে এঁদের ট্রেনিং নিতে হয়। 'ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস' এঁদের নিয়োগ করেন। এঁদের বলে আই· এফ· এস· শ্রেণীর অফিসার।

প্রঃ। আপনার বিভাগের আয় সম্ভবত বেশি—এ-ধারণা কি ঠিক?

উঃ। বন-বিভাগে ব্যয় থেকে আয় বেশি। 'গ্রস্ রেভিন্যু ইন্‌কাম' প্রায় ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা।

প্রঃ। আপনার বিভাগের দুর্নীতি দূর করতে কি করবেন?

উঃ। কেনা ও বিক্রি দুই-ই যখন আছে—তখন সম্ভবত দুর্নীতিও আছে। দুর্নীতি কোথায় আছে এবং কতখানি আছে—তা দেখব। তবে এখনও পর্যন্ত দুর্নীতি-দমনের জন্য কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরি করি নি। আমার দিক থেকে দুর্নীতি দমনের জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না।

প্রঃ। বনজ-সম্পদের উন্নয়নের জন্য কোনও পরিকল্পনা আছে কি?

উঃ। যে-সব পরিকল্পনা আছে—তাই যথাযথভাবে কার্যে রূপায়িত করা কঠিন হয়ে উঠবে। এর একমাত্র কারণ অর্থের অভাব। কাগজের কলগুলোকে আমরা কাঠ সরবরাহ করে থাকি। তাও যথাযথভাবে করা যাবে কি না—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাগজ-কলের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের সরবরাহ ঠিক রাখতে হলে যে হারে গাছ রোপণ করা উচিত—চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অর্থের অভাবে তা হয়ত সম্ভব হবে না।

প্রঃ। বন্য পশু সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাংলা-দেশের কোন্ কোন্ স্থানে আছে?

উঃ। জলপাইগুড়ি জেলায় জলদাপাড়া, গরুমারা ও চাপড়ামারিতে। দার্জিলিং জেলায় মহানদী ও সেঞ্চাল নামক স্থানে। ২৪ পরগনা জেলায় সজনেখালি ও লথিয়ান দ্বীপে।

জলদাপাড়ায় গণ্ডার, হাতী, বাইসন, বাঘ, হরিণ, সম্বর প্রভৃতি জন্তু আছে। মহানদীতে বাইসন, চিতা, বাঘ সংরক্ষিত হয়েছে। সেঞ্চালে হরিণ ও ভাল্লুক উল্লেখ-যোগ্য। গরুমারায় গণ্ডার ও হাতী প্রসিদ্ধ। চাপড়ামারি, সজনেখালি ও লথিয়ান দ্বীপে পাখীই প্রধান।

প্রঃ। এ-সব জায়গায় ভ্রমণকারীদের জন্য কোনও ব্যবস্থা আছে কি?

উঃ। এ-সব ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অন্য বিভাগের। তবে জলদাপাড়ায় একটি 'টু্যরিস্ট লজ' করা হয়েছে।

প্রঃ। বাংলাদেশের বন্যজন্তু সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহ জাগাতে আপনার বিভাগ কি করে থাকে?

উঃ। সজনেখালিতে তিন-চারবার স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয়, জলদাপাড়া সম্পর্কে একটি ছবি আমরা তৈরি করে-ছিলাম। জনসাধারণকে বাংলাদেশের এই সব বিভিন্ন জীবজন্তু সম্পর্কে জানানো দরকার—তা বুঝি। কিন্তু কতখানি করা সম্ভব, তা বলা শক্ত।

প্রঃ। বন-বিভাগ যে সব গাছ লাগায়—তার কত ভাগ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে?

উঃ। শতকরা প্রায় ১৫টা গাছ বাঁচে।

প্রঃ। বন-মহোৎসবে আপনার বিভাগের কিছু করণীয় থাকে কি?

উঃ। জনগণই সাধারণত বন-মহোৎসব করে থাকেন। বন-বিভাগ জন-সাধারণকে রোপণের জন্য চারাগাছ দেন। কৃষিবিভাগ অল্প মূল্যে গাছ বিক্রি করে থাকে।

যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন জানিয়েছে। অবিলম্বে কিছু না করতে পারলে সে সমর্থন চলে যাবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এখন পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবাংলায় সংগঠিত কৃষক আন্দোলন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অবিলম্বে কিছু সংস্কার সাধন না করতে পারলে গরীব কৃষকদের আস্থা অর্জন করতে না পারলে কোন বিপ্লবই সফল হবে না।

এই পটভূমিকার কথা স্মরণে রেখেই যুক্তফ্রন্ট তাঁদের ভূমি সংস্কার নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার আগে যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীর মধ্যে পঞ্চম দফার ভূমি সংস্কার সম্পর্কের বক্তব্যকে মনে রাখা প্রয়োজন।

উক্ত কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ "৫। যুক্তফ্রন্ট সরকার নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে আমূল ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ নেবে ঃ (ক) চলতি জমিদারী দখল আইন এবং ভূমি সংস্কার আইন কৃষকের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে উপযুক্তভাবে সংশোধন করা; (খ) তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া; (গ) জমির উচ্চসীমা সংক্রান্ত আইনের ঊর্ধ্বে সকলী বেনামী জমির খোঁজ করা, উদ্ধার করা ও বিলি করার ব্যবস্থা; (ঘ) চা-বাগানের অব্যবহৃত জমি দখল; মাছ চাষের পুকুর, ফলের বাগান, ডেয়ারী ও পোলট্রি প্রভৃতি বর্তমানে যা জমিদারী দখল আইনের আওতার বাইরে আছে সেসব ক্ষেত্রেও উচ্চসীমা আইনের প্রয়োগ; খাস ও উদ্বৃত্ত জমি জমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে স্থায়িভাবে বিলি; (ঙ) স্বল্পবিত্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের তাড়াতাড়ি ক্ষতিপূরণ দান; (চ) বর্গা চাষের জমিতে ভাগচাষীদের পুরুষানুক্রমে চাষের অধিকার দান; (ছ) পূর্ণাঙ্গ আইনসাপেক্ষে তিন বছরের জন্য ভাগচাষীদের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ বন্ধ; (জ) গ্রামাঞ্চলে গৃহহীনদের জন্য ৫ কাঠা পর্যন্ত জমি বাস্তুর জন্য বিনা মূল্যে দেওয়া; কোনরূপ অধিকার ছাড়া অন্যের জমিতে ঘর করে আছে এবং অন্যত্র তার ঘর নেই এমন পরিবারকে ঐ জমিরই অনূ্ন ৫ কাঠার উপর স্বত্বপ্রদান; জমির উচ্চসীমা, বে-আইনী হস্তান্তর, ন্যস্ত জমি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের অধিকার নাকচ করা এবং ঐ সব ক্ষেত্রের ব্যাপারে 'স্পেশ্যাল ল্যান্ড ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা; (ঝ) অতীতের বহু দুর্নীতির অবসান করে নতুন সেটেলমেন্টের জন্য নতুনভাবে জমির সার্ভে করা; (ঞ) অনূর্ধ্ব তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের নিকট সরকারের প্রাপ্য ৪ বছরের দেনা আদায় স্থগিত করা এবং তাদের বেসরকারী দেনা নিয়েও একটা বিহিত করা এবং (ট) অভাবের কারণে বিক্রিত জমি বিক্রেতাকে প্রত্যর্পণ করা।

যুক্তফ্রন্ট সরকার বেনামী জমির উদ্ধার, দখল ও বিলি-ব্যবস্থার জন্য কৃষকদের সংগ্রামে এবং কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার অন্যান্য সংগ্রামে সাহায্য করবে।

জমি দখল ও ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত আইন-কানুনের ক্ষেত্রে দার্জিলিং জেলার পৃথক অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় সংশোধনী থাকবে।"

যুক্তফ্রন্টের এই কর্মসূচীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা নেই। এই কর্মসূচী যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচী। এমন কি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের যে আদর্শ কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেছে, এই কর্মসূচীতে তার সঙ্গেও বিরোধ নেই। ভারতের সংবিধানের মধ্যে থেকেই এই কর্মসূচী সফল করা যায়—অন্তত আইনগত বিরাট কোন বাধা আসে না। এমন কি কংগ্রেস আমলে যে সব আইন-কানুন রচিত হয়েছিল সেগুলো কার্যকরী করলেও এই কর্মসূচীর অনেকগুলো ধারাই বাস্তবে রূপায়ণ করা যেত।

কিন্তু গত ২০ বৎসরে এই পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। প্রথমেই ধরা যাক জমিদারী উচ্ছেদ আইনের কথা। জমিদারী উচ্ছেদের পর সরকারের হাতে যে পরিমাণ জমি ন্যস্ত হওয়ার কথা তা হয় নি। বেনামী জমি রাখার কথা আজ প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত। আইনের যে সামান্য ত্রুটি আছে তাকে পুরো কাজে লাগিয়েছে বিত্তবানেরা। ফলে হাজার হাজার বিঘা জমি আজো মুষ্টিমেয় লোকের হাতে।

গ্রামের গরীব কৃষকরা ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আজ কিছু বেনামী জমি উদ্ধার করে তাদের হাতে দিলেও ঋণের দায়ে কৃষকরা ঐ সব জমি আবার হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে। কৃষকদের এই ঋণের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। না হলে অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্যই আজ দাবি উঠেছে গরীব কৃষকদের যে সরকারী ঋণ দেওয়া আছে তা মকুব করা প্রয়োজন। এ ছাড়া বেসরকারী ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণসালিশী বোর্ডের মত কোন সংস্থার ব্যবস্থা করে সুদ মকুব ও কিস্তিতে ঋণ শোধের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বে-আইনী ও চড়া সুদ দেখিয়ে যে সব কৃষক জমি হারিয়েছে তাদের সেই সব জমি উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কৃষকদের স্বার্থ দেখতে হলে, বেনামী জমি উদ্ধার করতে হলে পরিবার পিছু জমির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন—জমির ঊর্ধ্বসীমার ক্ষেত্রে আবার সেচ এবং অসেচ এলাকার জন্য পৃথক হার ঠিক করা প্রয়োজন। এই সব কিছু করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সব শেষে কিন্তু সব থেকে বড় কথা হলো শুধু আইন প্রণয়ন করে এতদিনের শোষণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। একদিকে আইনানুসারে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেওয়ার জন্য কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, আর অন্যদিকে দীর্ঘ ২০ বৎসর ধরে আমলাতন্ত্রের যে মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে তাকে বদলাতে হবে। এতদিন পর্যন্ত ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের কর্মচারীরা এবং বিশেষ করে থানার পুলিশ কর্মচারীরা প্রথমেই জোতদার-জমিদারদের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে যেতেন। আইন কৃষকের পক্ষে থাকলেও কৃষকরা সে সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। আজ পরিবর্তিত অবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের কৃষকদের স্বার্থে পরিচালনা করতে হবে।

ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার এই অতি প্রয়োজনীয় দিকটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। সকলেই তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আশা করবেন যে, এতদিনের পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

গোড়ায় বলেছি, যুক্তফ্রন্টের ভূমি সংস্কার নীতি কোন বিপ্লব সাধনের কর্মসূচী নয়। কায়েমী স্বার্থের সব চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য আন্তরিকতা থাকলে ভূমি সংস্কার নীতির অনেকটা কার্যকরী করা সম্ভব হবে। সমাজের সব থেকে লাঞ্ছিত কৃষকেরা যুক্তফ্রন্টের কাছে অনেক প্রত্যাশা রাখে—যুক্তফ্রন্টের দেওয়া প্রতিশ্রুতি দ্রুত পালন করলেই সে প্রত্যাশা পূরণ হবে।

—শ্রীসর্বদর্শী।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণ চাই কেন?

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে আজকের বিরোধটার শুরু কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনাকে উপলক্ষ করেই এবং প্রধানত পঃ বাংলাই হচ্ছে এ-বিরোধের উৎস। গভর্নরের ক্ষমতা নিয়ে পঃ বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার সময় থেকেই। এবারে বিধানমণ্ডলীর সামনে ভাষণ পাঠ করতে গিয়ে দুই পরিচ্ছেদ বাদ দিয়ে সেই বিরোধই গভর্নর আরো বাড়িয়েছেন। কেন্দ্রের অধীন রিজার্ভ পুলিশবাহিনী দুর্গাপুরে যে কাণ্ড করেছে তাতে রাজ্য সরকারের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার এক্তিয়ারকে উপেক্ষা করা হয়েছে। রাজ্যের এলাকাধীন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ওপর থেকে কেন্দ্রের দেওয়া অভিযোগ যে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তুলে নিয়েছে, এর মধ্যেও কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের প্রশ্ন রয়েছে। যদিও এ-ব্যাপারে কেন্দ্র বর্তমানে নীরব, এটা ভুলে যাবার নয় যে কেরালা সরকার প্রথম যখন এ-কাজ করে, তখন কেন্দ্রীয় নেতাদের পক্ষ থেকে কথা উঠেছিল যে এটা বে-আইনী এবং এর জন্য কেরালা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ-প্রশ্নেরও শেষ মীমাংসা হয় নি। কেরালা বা পঃ বাংলার মতো অনমনীয় ও দৃঢ় সরকার না হয়ে অন্য কোনো রাজ্য সরকার এ-কাজ করলে হয়ত সত্যি ব্যবস্থা গ্রহণ করত কেন্দ্র। গতবারে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীর বক্তৃতার ওপর রেডিও কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগের ঘটনাও ঘটেছে। এইসব বিশেষ ঘটনা ছাড়াও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্য দিতে কেন্দ্রের অস্বীকৃতির ফলে। যদিও কেরালা ও অন্যান্য রাজ্য থেকেও এই প্রশ্ন উঠেছে, তবু এই প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ও দাবি অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছে পঃ বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকেই।

কিন্তু শুধু কি এইসব নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির মধ্যেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টি সীমাবদ্ধ? মোটেই না। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টার একটা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত আছে, আছে একটা বৃহত্তর তাৎপর্য, যা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠবেই।

প্রথমেই বলতে হয়, যদিও আমাদের রাষ্ট্রকে 'ফেডারাল' রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়, তবু এর এককেন্দ্রিক (ইউনিটারি) চরিত্রই হচ্ছে প্রধান। এখান থেকেই রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের সমস্ত সমস্যার উদ্ভব। ভারতের মতো বিরাট একটি দেশে, যেখানে ভাষার বিভিন্নতা, আঞ্চলিক সমস্যার বিভিন্নতা এত বেশি, সেখানে আঞ্চলিক অধিকার একটু বেশি না হলে কিছুতেই রাষ্ট্রিক সংহতি রক্ষা হতে পারে না। এটা একটা ঐতিহাসিক শিক্ষা। 'ফেডারাল' রাষ্ট্র মানেই হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের সম্মতির ভিত্তিতে তৈরি 'ইউনিয়ন'। অর্থাৎ 'ফেডারাল' রাষ্ট্রে শক্তির উৎস রাজ্যগুলিই, কেন্দ্রের শক্তি দ্বারা রাজ্যের শক্তি নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো অঙ্গরাজ্যগুলির 'ইউনিয়ন' থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়ত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন ছাড়া অন্য সাধারণ 'ফেডারাল' রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবু রাষ্ট্রের ফেডারাল চরিত্র রাখতে গেলে রাজ্যগুলিকেই প্রধান ভিত্তি হিসাবে না ধরলে ফেডারাল রাষ্ট্রই নিরর্থক হয়ে পড়ে। এইখানেই ভারতীয় সংবিধানের মূল স্ব-বিরোধিতা। ভারতকে বলা হচ্ছে 'ইউনিয়ন' অথচ রাজ্যকে করা হচ্ছে গৌণ, কেন্দ্রকেই করা হয়েছে মুখ্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন সেদিন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্ন উপলক্ষে লোকসভায় বলেছেন যে তাঁরা সত্যই 'ফেডারাল' চরিত্র রাখতে চান, কিন্তু সে-ফেডারাল হবে 'সহযোগিতামূলক ফেডারেশন' এবং এই ফেডারেশনে কেন্দ্র হবে 'একটু শক্তিশালী'। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসল কথাটাই এড়িয়ে গিয়েছেন। ফেডারাল ব্যবস্থা মানেই তো সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা, ফেডারাল ব্যবস্থায় কেন্দ্রও কম শক্তিশালী নয়। কিন্তু সে-শক্তি আসবে রাজ্যের সম্মতি ও সহযোগিতা থেকেই, রাজ্যের প্রয়োজন থেকেই, রাজ্যকে সব-বিষয়ে কেন্দ্রের শক্তির অধীন ক[illegible]া থেকে নয়। উল্টো পথে চ্যবন-গোষ্ঠী চলেছেন বলেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কটা সহযোগিতার না হয়ে বিরোধের হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এমন বিরোধের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে ভাষার প্রশ্নে, আঞ্চলিক উন্নতির প্রয়োজনের প্রশ্নে এবং অন্য আরো অনেক আঞ্চলিক প্রশ্নে বিরোধ, সংঘাত, এমন কি প্রচণ্ড অরাজকতাও প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার বার জাতীয় সংহতির কথা বলেও তো কেন্দ্রীয় নেতারা এ-অবস্থা রোধ করতে পারেন নি। আসল কথা, সহযোগিতামূলক ফেডারেশনের ভিত্তিটাই অস্বীকার করেন, কেন্দ্রের শক্তিটাই তাঁরা বোঝেন এবং তাই আজ রাজ্যের পর রাজ্য তাঁদের হাত থেকে সরে যাওয়ায় ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের নতুন গণতান্ত্রিক দাবির সম্মুখীন হয়ে নিতান্ত বে-সামাল অবস্থায় পড়ে মুখে ফেডারেশনের স্তোকবাক্য শোনাচ্ছেন, যদি তাতেও কেন্দ্রের শক্তিকে ঠিক রাখা যায়।

প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন, বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্নমুখী গতি হচ্ছে, তাই কেন্দ্রের শক্তিকে ঠিক রাখতেই হবে। বিভিন্নমুখী গতি বলতে তিনি যে ইঙ্গিত করেছেন প্রধানত পঃ বঙ্গ ও কেরালার মতো বামপন্থী গণতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধেই, তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না। অন্য ধরণের অ-কংগ্রেসী রাজ্যগুলিকে ভিন্নমুখী মনে করলে অনেকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে একথা শোনা যেত। কংগ্রেসী ক্ষমতার বাইরে হলেও সেসব রাজ্য সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর এরকম উদ্বেগ তো দেখা যায় নি কোনোদিন, যদিও কেন্দ্রের কাছ থেকে বেশি অর্থ-সাহায্যের দাবি আজ প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেরই। আসল কথা, রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে পঃ বাংলা ও কেরালার দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রের থেকে ভিন্ন বলেই এবং সে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্যের সামগ্রিক শক্তিকে সংহত করায় উদ্যোগী বলেই এবং এ-উদ্যোগ অন্য রাজ্যেও উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারে বলেই, ভিন্নমুখী গতি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী এত সন্ত্রস্ত। এই ভিন্নমুখীনতার জন্যই গতবারে পঃ বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গভর্নরকে দিয়ে উৎখাত করা হয়েছিল। বিহারেও এই একই চক্রান্ত হয়েছিল এই ভিন্নমুখীনতার জন্যই। এই ভিন্নমুখীনতার প্রভাব আজ দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বলেই উপ-প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় হুমকী দেন যে কেন্দ্রের ক্ষমতা কিছুতেই কমানো হবে না, সংবিধান সংশোধন কিছুতেই করা হবে না। কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার যদি এই উদ্দেশ্য হয় তবে তা শুধু চ্যবনের তথাকথিত 'সহযোগিতা-

মূলক ফেডারেশনেরই বিরোধী নয়, যে-কোনো সাধারণ সংসদীয় গণতন্ত্রেরই বিরোধী। সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে চলে গণতান্ত্রিক জনতা যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকার গঠন করবে, একমাত্র ইউনিয়ন থেকে সরে যাওয়ার মনোভাব ছাড়া, সেই দৃষ্টিভঙ্গিকেই স্বীকার করে নিতে হবে—তা সে কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন হলেও। তা না হলে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল্য কী? সুতরাং, কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার কথা যত বেশি জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, ততই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুন-র্নির্ধারণের প্রশ্নের গুরুত্বও বেড়ে যাচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষার জন্যই তা দরকার।

'সহযোগিতামূলক ফেডারেশনের' কথায় যদি আসা যায়, তবে সে-নীতিতে তো রাজ্যের হাতে রাজ্যের প্রয়োজনের জন্য যত বেশি অধিকার ও ক্ষমতা দরকার, তা সবই থাকা উচিত। গভর্নরের ক্ষমতার প্রশ্ন তো সেখানে অবান্তর। হয় গভর্নর থাকবে না, আর না হয় রাজ্যের মানুষই তাদের গভর্নর নির্বাচিত করে নেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গভর্নর নির্বাচিত হয়। গভর্নরের অস্তিত্বকে রাজ্য-নির্ভর না করে আজকের মতো কেন্দ্র-নির্ভর করে রাখলে তার একটি অর্থই হয়—যে-অর্থ হচ্ছে এই যে, গভর্নর হচ্ছে কেন্দ্রের গুপ্তচর বা দারোগা। যেখানে গভর্নরের একমাত্র আনুষ্ঠানিক ছাড়া প্রকৃত ভূমিকা কিছুই নেই; সেখানে বিধানসম্মতভাবে এই ধরণের গভর্নর রাখা 'সহযোগিতামূলক ফেডারেশনের' অত্যন্ত প্রাথমিক রীতিরই বিরোধী।

রাজ্যের প্রয়োজন বলতে কি বোঝায়? শুধু কি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা? শুধু কি প্রশাসন চালানো কতকগুলি নির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে? আর্থিক ব্যবস্থার শুধু কি সামান্য অংশ মাত্রেরই দায়িত্ব পালন? মোটেই না। রাজ্যের প্রয়োজন মানে রাজ্যকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সব দিক থেকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা তার সর্বমুখী সম্পদকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে। কেন্দ্রের কর্তব্য এ-কাজে রাজ্যের প্রতিবন্ধকতা করে তাকে সাহায্য করা। তবেই তো শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠবে এবং কেন্দ্র শক্তি আহরণ করবে এই শক্তি থেকে। রাজ্যের রাজনৈতিক গতি-ধারাকে ওপর থেকে বাধা দিলে চলবে না, সংস্কৃতিকে অগ্রসর হতে দিতে হবে এবং অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রকেই উপযুক্ত-ভাবে ব্যবহার করতে দিতে হবে। কেন্দ্র কি এইভাবে রাজ্যকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করছে? রাজনীতির কথা আগেই বলেছি। সাংস্কৃতিক দিক সম্বন্ধে একটা কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট, তা হচ্ছে ভাষা সম্পর্কে কেন্দ্রের মনোভাব। অঞ্চলের সব ক'টি ভাষাকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কেন হিন্দীকে আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় ভাষা হিসাবে সাব্যস্ত করে রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও তা বাধ্যতামূলক করা হল? এ নিয়ে কি প্রবল বিরোধ চলছে তা তো আমরা দেখছি। হিন্দীর পক্ষে এবং হিন্দীর বিপক্ষে এই যে সংঘাত সমস্ত দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রতিক্রিয়া হিন্দী ও অহিন্দী উভয় সংস্কৃতির ওপরও পরোক্ষভাবে এসে পড়ছে না কি? এর ভিতর দিয়ে প্রাদেশিকতার বিষও ছড়িয়ে পড়ছে না কি? কেন্দ্রের এককেন্দ্রিকতার ঝোঁকের ফলেই এটা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্থির না করে, ব্যবহারিক প্রয়োজনের মধ্যেই যদি তা সীমাবদ্ধ রাখা হত, তাহলে হিন্দী-বিরোধিতাও এমন প্রচণ্ড হত না, হিন্দী-অনুরাগীরাও সঙ্কীর্ণমনা হয়ে উঠত না।

সবচেয়ে গুরুতর পরিস্থিতি অর্থ-নীতির প্রশ্নে। রাজ্যকে যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে হয়, তবে আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থার বিষয়ে এমন সুনির্দিষ্ট নীতি রচিত হওয়া উচিত যাতে রাজ্যের প্রয়োজন নির্ধারণে কেন্দ্রের বিবেচনাই চূড়ান্ত না হয়। কেন্দ্রের অর্থ-সংস্থানও সীমাবদ্ধ, এটা ধরে নিয়েও এ-প্রশ্ন আজ উঠেছে যে রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্র কোনো কোনো রাজ্যকে বেশি অর্থ-সাহায্য দিতে অনিচ্ছুক। পঃ বাংলার কথাই ধরা যাক। গত যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে পঃ বঙ্গের সঙ্গে কেন্দ্রের যে প্রথম রাজনৈতিক সংঘাত চলেছে এবং যে-সংঘাতে বার বার পরাজিত হয়ে আজ কেন্দ্র ক্ষিপ্ত, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র যে পঃ বঙ্গকে অসুবিধায় ফেলবার চেষ্টা করবে না, এটা কেউই মনে করতে পারে না। খাদ্য-সাহায্যের বিষয়ে, প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্যের বিষয়ে, ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার বিষয়ে এবং অর্থ-সংক্রান্ত আরো অন্য বিষয়ে কেন্দ্র যে অন্য রাজ্যের তুলনায় পঃ বাংলার প্রতি বেশি কার্পণ্য প্রকাশ করছে তা বার বার শোনা গিয়েছে পঃ বাংলার সরকারী মহল থেকে। যদি কোনো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে লেন-দেন না হয় তাহলে বিরুদ্ধবাদী কেন্দ্র অনবরত পঃ বাংলাকে বিপদে ফেলতে পারে। এরই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্র যদি উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য না করে, তবে অন্তত কেন্দ্রীয় ট্যাক্সের তালিকা থেকে কিছু বিষয় রাজ্যের হাতে দেওয়া হোক এবং তা কার্যকরী করার জন্য সংবিধান সংশোধন করা হোক। একমাত্র কৃষি-সংক্রান্ত কিছু ট্যাক্স ছাড়া, অন্য অধিকাংশ আয়ের ওপর কোনো ট্যাক্স-ধার্য করার ক্ষমতা রাজ্যের নেই।

এ তো গেল অর্থ-সংস্থানের প্রত্যক্ষ দিকটির কথা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি যেখানে, সেখানে হাত ছোঁয়াবার কোনো অধিকার ও ক্ষমতা রাজ্যকে যে একেবারেই দেওয়া হয় নি, কেন্দ্রই যে তা পুরোপুরি নিজের হাতে রেখেছে, এটা আরও মৌলিক গলদ এবং এ গলদ মানে রাজ্যকে চিরকালই কেন্দ্র-নির্ভর করে রাখা। আমি বলতে চাচ্ছি শিল্প-নিয়ন্ত্রণের কথা। শিল্পোন্নতির ভিতর দিয়েই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, দেশ সমৃদ্ধ হয়, কৃষি-অর্থনীতিও শিল্পো-ন্নতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দেশে কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি, মজুরীবৃদ্ধি—অর্থনৈতিক উন্নতির এই দিকটিও জড়িত শিল্পোন্নতির সঙ্গে। কিন্তু এই শিল্প-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সামান্য ক্ষমতাও রাজ্যের হাতে নেই, সবই কেন্দ্রের ক্ষমতা।

ফেডারাল নীতির কথা বাদ দিয়েও, এ-অবস্থা ভারতের বর্তমান সংবিধানের মধ্যেই কিরকম মারাত্মক স্ব-বিরোধিতা সৃষ্টি করেছে তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সংবিধানের নির্দেশক নীতি রাষ্ট্র-পরিচালনার দিক থেকে একটা গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়। সেই নির্দেশক নীতি রাষ্ট্র-বলা হয়েছে? বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন না হয়, সকলের কাজের সংস্থান হয়, জীবনধারণোপযোগী মজুরী সকলে পায় ইত্যাদি। সমগ্র দেশের অর্থনীতির বিকাশ কোন পথে হবে তারই জন্য এই নির্দেশক নীতি। এ-নীতি অনুসরণ করার দায়িত্ব যেমন কেন্দ্রের, তেমনি রাজ্যেরও। কিন্তু রাজ্যকে এ-নীতি অনুসরণের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। শিল্প-নিয়ন্ত্রণ যদি রাজ্য সরকার করতে না পারে, যদি শিল্পপতি-দের মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, শিল্পপতিদের শোষণ যদি নিয়ন্ত্রিত না করতে না পারে, তা হলে অর্থের কেন্দ্রী-ভবন বন্ধ করবে কি করে? আর এই মূল কাজটা করতে না পারলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিই বা কি করে করবে, জীবনধারণোপযোগী মজুরীর সুযোগই বা কি করে দেবে? ছাঁটাই রোধের জন্য, অটোমেশন বন্ধের জন্য আইন রাজ্য সরকার করতে পারছে না এই জন্য যে, শিল্পপতিদের শিল্প-পরিচালনার ওপর রাজ্য সরকারের কোনো এক্তিয়ার নেই, সব এক্তিয়ার কেন্দ্রেরই হাতে। নির্দেশক নীতিতে যে কথা বলা হয়েছে, তা কার্যকরী করার ক্ষমতা সংবিধানের সপ্তম শেডিউলে শুধু কেন্দ্রের হাতেই রাখা হয়েছে, রাজ্যকে সে-ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

নাম্বার টেন সিগারেটের পরম তৃপ্তি-দায়কতার মূলে
মাত্র একটি সমীচীন কারণঃ
নিবিড় স্বাদে ও গন্ধে পরিপূর্ণ নাম্বার টেন
ভারতের সমশ্রেণীয় সিগারেটের মধ্যে
সবচেয়ে বেশী মিঠে আমেজ জোগায়—মধুর আবেশ জাগায়।
তাই তো হওয়ার কথা—
নাম্বার টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া তামাক
—যা সংগ্রহ, পরিপক্ক এবং ব্লেণ্ড করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজ্ঞ তামাক বিশেষজ্ঞরা।
মিঠে আমেজের বিলাসে...
নাম্বার টেনের
পরিচয়
NUMBER TEN
VIRGINIA

সংবিধানের মধ্যকার এই যে স্ব-বিরোধিতা, এর ফলে শুধু যে অর্থনীতি-ব্যবস্থাটাই একান্তভাবে পুঁজিপতি-নির্ভর হয়ে রয়েছে তাই নয়; এর ফলে রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা-প্রয়োগের একটা মস্ত বড় হাতিয়ারও পুঁজিপতিদের, বিশেষ করে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে থেকে গিয়েছে। শিল্পপতিরা জানে, যতই কেন না যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভিন্ন নীতি হোক, তাদের ওপর সত্যিকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষমতা যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেই, সেখানে কেন্দ্রই সর্বময় কর্তা। এবং কেন্দ্র যদি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষক হয়, তা হলে সেই জোরে শিল্পপতিরা দরকার হলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদেরও চক্রান্ত করতে পারে, পুঁজি রাজ্য থেকে সরিয়ে নেবার হুমকীও দিতে পারে, আবার দরকার বুঝলে রাজ্য সরকারের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়ে 'সাধু' সাজতেও পারে। তারা জানে, বড় জোর শ্রমিক-বিক্ষোভ নিয়ে, শ্রমিক-ইউনিয়ন নিয়ে তাদের একটু বে-কায়দায় ফেলতে পারে যুক্তফ্রন্ট সরকার, কিন্তু তাদের আসল জায়গায় ঘা দেবার কোনো ক্ষমতা যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেই। পঃ বাংলায় বিদেশী পুঁজি যথেষ্ট। রাজ্যের ক্ষমতা এইভাবে সীমাবদ্ধ হওয়ার অর্থ বিদেশী পুঁজির স্বার্থই অবাধ হওয়া। আরো অনেক কিছু হতে পারে। সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে যে, ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বোদরা নামক স্থানে একটি তৈল-অনুসন্ধান প্রকল্প কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছিল সোভিয়েতের সাহায্যে। কিন্তু কেন্দ্র মাঝখানে সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ সন্দেহ করেন যে, বিদেশী তৈল-স্বার্থের চাপেই এটা হয়েছে। পঃ বাংলায় এমন একটা সম্পদ গড়ে উঠতে উঠতেও বন্ধ হয়ে গেল। অথচ পঃ বাংলা সরকারের এ-বিষয়ে করার কিছু ক্ষমতা নেই।

সুতরাং রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণের প্রশ্ন শুধু কয়েকটি সাম্প্রতিক বিরোধের ঘটনার জন্যই নয়। এ-বিরোধ অনেক গভীর। যতদিন সারা দেশে কংগ্রেসের একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল, ততদিন শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই এই বিরোধ ধ্বনিত হত, রাজ্য সরকারের ভিত্তিতে তার কোনো প্রকাশের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আজ কংগ্রেসের ক্ষমতা-প্রাধান্য চলে গিয়েছে, পঃ বঙ্গে ও কেরালায় বামপন্থী-গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার প্রভাব অন্য অ-কংগ্রেসী রাজ্যের গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর তো পড়বেই, এমন কি কংগ্রেসী রাজ্যের মধ্যেও তার প্রভাব গিয়ে পড়বে। সুতরাং এ-বিরোধ ক্রমশ সারা দেশের গণতান্ত্রিক শিবিরেরই একটা দাবি হয়ে দাঁড়াবে এবং ছোট প্রশ্ন থেকে ক্রমশ বেশি মৌলিক প্রশ্নে তা প্রকট হয়ে উঠবে। রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণের প্রশ্নটি ক্রমশ এই পর্যায়ের প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবে।

কংগ্রেস-নেতৃত্ব যে এটা বুঝতে পারছে না, তা নয়। বরং বুঝতে পারছে বলেই, সময় থাকতে একটা আলোচনার মধ্যে সকলকে ডেকে অবস্থাটা সামলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মূল জায়গায় তারা অনমনীয়। ছোটখাটো দু-একটা বিষয়ে রাজ্যের অধিকার একটু বেশি দিতে রাজী হলেও, দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার চাবিকাঠিটি তাঁরা কেন্দ্রের হাতে রাখবেনই। তাঁদের কথায় সেই ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং একক শক্তির দ্বারা তা সম্ভব না হলে, স্বতন্ত্র পার্টি, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি শক্তির সঙ্গে একজোট হয়েও তা করতে চেষ্টা করবে কংগ্রেস। অর্থাৎ, রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রেও গণতান্ত্রিক শক্তির আরো বৃদ্ধি দরকার।

এ লড়াই বাঁচার লড়াই—

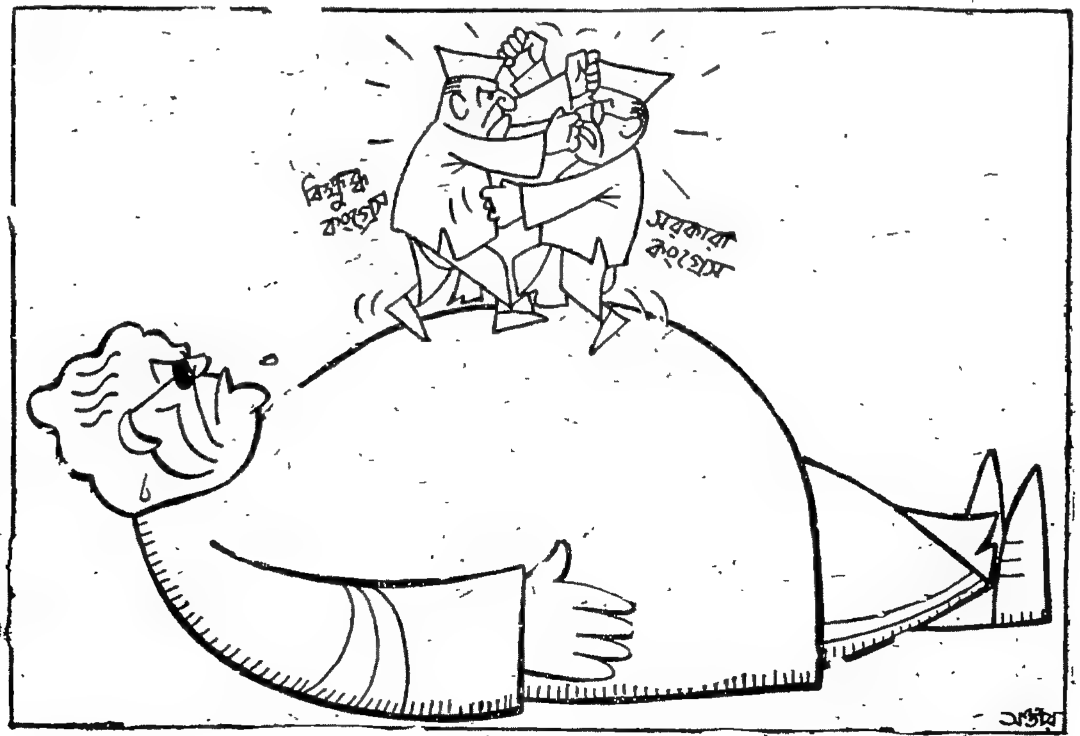

নির্বাচনের পরে

সাগর বিশ্বাস

ফরিদপুর। না, পূর্ববাংলার জেলা নয়। তবে পূর্ববাংলার ঐ জেলাটির সঙ্গে এর কিছু মিল আছে। একটি অবহেলিত অন্ধকার জেলা;—বৃটিশ আমলেও ঢাকা-চট্টগ্রামের যত নাম ছিলো ওর তত ছিলো না; আর একটি সামান্য থানা, স্বাধীনতার পরেও বর্ধমান জেলার এই থানাটি আজো যেমন অবহেলিত তেমনি অনগ্রসর। মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই ফরিদপুর থানা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী (বাংলা কংগ্রেস)। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বর্ধমানের আউশগ্রাম কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি প্রথম বিধানসভায় আসেন। আউশগ্রামে সেই বছরেই শ্রীবক্সী স্থানীয় প্রার্থী দাঁড় করানোর জন্য স্বীয় পার্টি কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন এবং বাইরের প্রার্থী দাঁড় করানোর এতকালের রীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। জেলা কংগ্রেস কমিটি তাঁর মতের সংগে একমত হলেও, কংগ্রেসের প্রাদেশিক উপরমহলের কর্তারা এতে সায় দেন না। ফলে শ্রীবক্সীকে কংগ্রেস থেকে নমিনেশনও দেওয়া হয় না। কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড় করানো হলো শ্রীলাবণ্যগোপাল ঘটককে—যিনি প্রবল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি শুধু নন—প্রদেশ কংগ্রেসের কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বিশেষ অনুগ্রহপুষ্টও বটেন। এ হেন প্রতাপশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মনোরঞ্জন বক্সী দাঁড়ালেন নির্দলীয় প্রার্থিরূপে। কিন্তু আউশগ্রামের তথা বর্ধমানের মানুষ চেনে শ্রীবক্সীকে। তিনি বর্ধমানের ছেলে। দেবশালার এক জঙ্গলী এলাকায় তাঁর জন্ম। জীবন গড়ে উঠেছে এই জঙ্গলী এলাকার ধুলোবালির মধ্যে। কলেজে পড়তে পড়তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে। বি-এ পাশ করেছেন এই বর্ধমানেরই রাজ-কলেজ থেকে। '৪০ সালে আইন পড়বার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন বটে, কিন্তু কলকাতা তাঁকে তখন ধরে রাখতে পারে নি। সারাদেশে তখন স্বাধীনতার বিপুল উত্তেজনা। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন—তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—চেয়েছিলেন শিক্ষায়-দীক্ষায় তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এর প্রায় দশ বছর আগে যখন সুভাষচন্দ্র গ্রাম পর্যটন করছিলেন তখন তিনি সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসেছিলেন—দেখেছিলেন গ্রাম-বাংলার সত্যিকার চেহারা। '৫৬—'৫৭

মনোরঞ্জন বক্সী

সাল থেকে যখন তাঁর শিক্ষকজীবন সুরু হয় তখন থেকেই সর্বস্তরের মানুষের সংগে গড়ে ওঠে গভীর সংযোগ। বর্ধমানের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন বুদ্ধিজীবী সমাজে। এ সবই বর্ধমানের মানুষের নখদর্পণে ছিলো। তাই প্রতাপশালী কংগ্রেসপ্রার্থীর পরাজয় ঘটলো একজন নির্দলীয় প্রার্থীর কাছে। '৬৭ সালে আবার নির্বাচন এলো। লাবণ্য ঘটক আবার দাঁড়ালেন। এবার ফরিদপুরে। বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা ইতিমধ্যে বাংলা কংগ্রেস গঠন করেছেন। শ্রীবক্সী স্বাভাবিকভাবেই বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে এসে পড়েছেন। বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়ালেন ফরিদপুরেই। আবার জয়লাভ। সেখানেই শেষ হলো না। অনিবার্য হলো মধ্যবর্তী নির্বাচন। আবার দাঁড়াতে হলো। এবারেও প্রতিদ্বন্দ্বী সেই লাবণ্য ঘটক। ভোটের ফল হলো—শ্রীমনোরঞ্জন বক্সী—১৯৭৬৭, শ্রীলাবণ্যগোপাল ঘটক—১৭৯১১।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীবক্সীকে ছেলেবেলায় মা-বাপ হারিয়ে সম্পূর্ণ অভিভাবকশূন্য হয়ে নিজের হাতে নিজের ভাগ্যকে গঠন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিলো। বর্ধমানের প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীসরোজরঞ্জন মজুমদারের তিনি জামাতা। শ্রীবক্সী বাংলা কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী পার্টির হুইপ্।

অনেকক্ষণ ধরে শ্রীবক্সীর সংগে কথা বলেছিলাম। শুনেছিলাম তাঁর নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কৃষি ওখানেও বিরাট সংকটের অবর্তে পড়ে আছে। কৃষকের কাছে জলের অভাবটাই সবচেয়ে বড়। ডি ভি সি খাল যদিও পানাগড়ের উপর দিয়ে চলে গেছে তথাপি পার্শ্ববর্তী কৃষকের জলের অভাব মেটে না। ব্যবস্থা এমনই অপ্রচুর। অন্ডাল, ফরিদপুর এবং কাকশা থানায় সেচের কোনোই ব্যবস্থা নেই। প্রথমোক্ত থানা দু'টিতে যে সকল কোলিয়ারী আছে—সেগুলির জল নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এ থেকে কোনো উপকারই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সম্ভাবনা কম ছিলো না। অজয় ও টুংগি নদী থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রামের মজা পুকুরগুলি সংস্কার করেও অনেক কাজ করা যায়। কোলিয়ারীর জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেও উপকার পাওয়া যেতো। আজ আর এই সকল সম্ভাবনাগুলিকে উপেক্ষা করলে চলবে না। কৃষি এবং কৃষকের প্রাথমিক চাহিদাই

যদি পূরণ না করা যায়, তাহলে সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

শ্রীবক্সী জানালেন স্থানীয় displaced লোকেদের অবস্থা কত ভয়াবহ। দুর্গাপুরের পার্শ্ববর্তী এলাকা হলেও—এখানকার বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তেমন চেষ্টা দেখা যায় না। নানারকম 'technical' অসুবিধার জন্য এদের চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখানোও এক বিরক্তিকর ব্যাপার। জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারেও সরকারী উদাসীনতার এক গভীর দৃষ্টান্ত এই সব অঞ্চল। কাকশা, অণ্ডাল এবং ফরিদপুর—এই তিনটি থানার মধ্যে একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র আউদা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তারও যা হাল সে না বলাই ভালো। নাম-কা-ওয়াস্তে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই সব নমুনা অবশ্য সারা বাংলাদেশেই বিদ্যমান। সরকারী টাকায় একজন ডাক্তার পুষ্ট হন বটে, নার্সও থাকে। কিন্তু না থাকে ওষুধপত্র—না থাকে রোগীদের জন্য কোনো সুব্যবস্থা। স্বাধীন দেশের যথেচ্ছ ক্রিয়াকলাপের এক লজ্জাকর পীঠস্থান—দরিদ্র মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ক্রীড়াভূমি।

অণ্ডাল একটি বিরাট গঞ্জ। সেখানকার রাস্তাঘাট এক দারুণ সমস্যা। রেলওয়ের গ্রাসে রাস্তাগুলির পর্যন্ত অপমৃত্যু ঘটেছে। শ্রীরামপুর, প্রসাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গেলেই রাস্তা সমস্যার এই প্রকটরূপ দেখা যায়। বনসংরক্ষণ করবার সরকারী তাগিদে জঙ্গল এলাকার পাশে পাশে যে সকল পরিখা খনন করা হচ্ছে তাতে বিপুলভাবে জমি এবং জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। পানীয় জলও এখানকার এক বিরাট সমস্যা।

অনেকক্ষণ ধরে শ্রীবক্সী তাঁর অঞ্চলের মানুষের দুর্দশা আর সমস্যার কথা বলে গেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এগুলির সমাধানের জন্য কি ভাবছেন? উত্তরে শ্রীবক্সী জানালেন—কিছু একটা করা অবশ্যই দরকার। বিশ বছরের না-পাওয়ার বঞ্চনা বুকে নিয়ে ওরা গভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের দিকে। কিছু করতেই হবে। আমি আপাতত এসব ব্যাপার নিয়ে সরকারী পর্যায়ে যোগাযোগ করছি।

শ্রীবক্সী দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষার মান স্বাদশশ্রেণীতে উন্নীত করবার প্রশ্নটিও তাঁর সামনে তুলে ধরেছিলাম। কিন্তু তাঁর মতে, এই ধরনের ব্যবস্থা কোন মতেই বাংলাদেশে হওয়া ঠিক হবে না। একাদশ শ্রেণীর অঞ্চলগুলির হাল সারা বাংলা দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। এর চেয়ে পুরনো ব্যবস্থাই ছিল ভাল। যদি সম্ভব হয় তবে সেই পুরনো দশম-মানের স্কুল শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন করাই উচিত। সেকালে শিক্ষার মান অবনত ছিল বলে ত শোনা যায় না। অথচ আজকের শিক্ষাব্যবস্থার এই প্রহসন সর্বস্তরের মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একালের শিক্ষাব্যবস্থার মিল খুঁজতে চাওয়া বোকামি। তবু আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই, 'তোতাকাহিনী' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন ইংরেজ আমলে শিক্ষাটা একটা লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরে সেখান থেকে আমরা কি একটি পা-ও এগোতে পেরেছি?

বাংলা কংগ্রেসের আর এক সদস্য শ্রীসুবলচন্দ্র মণ্ডল। নদীয়া জেলার চাকদা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে শ্রীমণ্ডল বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীমণ্ডলের মতে, চাকদায় কংগ্রেসের ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তাই তাঁর এই জয়লাভের পথ প্রশস্ত করেছিল। তবু নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে একমাত্র কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয় নি। এ ছাড়া আর-সি-পি-আই, আই-এন-ডি-এফ এবং প্রাউটিস্ট দলের প্রত্যেকেই জামানত হারিয়েছেন। আর-সি-পি-আই নেতা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামানত হারানোর ঘটনাই সব থেকে চমকপ্রদ। অবশ্য রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে একথা বলা চলে যে, বস্তুত জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা সৌমেন ঠাকুরের ছিল না।

বিধানসভার সদস্য হিসাবে শ্রীমণ্ডল তাঁর এলাকা সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবছেন। চাকদায় একটা কলেজের কথা দীর্ঘকাল তাঁর ভাবনার রাজ্যে বাসা বেঁধে আছে। এখানকার ছেলেমেয়েরা কলেজে পড়বার জন্য কলকাতায় কিংবা কৃষ্ণনগরে যেতে বাধ্য হয়। অথচ চাকদায় কলেজ না হবার পেছনে কোন যুক্তি নেই। চাকদা এবং তার আশ-পাশের গ্রামাঞ্চলে উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এবং এই সব স্কুল থেকে বছরে যত ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসে তাদের নিয়ে অনায়াসে একটি কলেজ খোলা যেতে পারে। হবেও হচ্ছে করেও বহুকাল ধরে কলেজ হলো না। কংগ্রেসী আমলে গোটা চারেক কমিটিও এ ব্যাপারে হয়েছিল। বাগ্‌বিতণ্ডাও কম হয় নি। সবই হলো, হলো না কেবল কলেজ। তাই শ্রীমণ্ডল ওই অচল-চিন্তাকে সচল করবার কথা ভাবছেন।

ভাবছেন সেচের কথা-ও। এই অঞ্চলে প্রচুর হাজামজা বিল পড়ে আছে। সেগুলিকে সংস্কার করতে পারলে অসময়ে চাষের জল পাওয়া যেতো। নদীর সঙ্গে যুক্ত ওইসব বিল দিয়ে বর্ষায় উদ্বৃত্ত জল নদীতে পাঠিয়েও দেওয়া যেতো। এই প্রসঙ্গে 'ভরসার বিল', রাণীনগরের বিল প্রভৃতি কয়েকটি বিলের উল্লেখ করলেন শ্রীমণ্ডল।

নিরক্ষরতার কথা উঠলো। উনি বললেন, প্রাথমিক স্কুলগুলোও টিম-টিম করে জ্বলছে। সলতেটা উসকে না দিলে ছেলেমেয়েরা অন্ধকারেই থাকবে, আর শিক্ষকরাও ধুঁকবে রোগে আর খিদেয়। সলতে বলতে তিনি টাকা আর সুব্যবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন। উঠলো স্বাস্থ্যের কথাও। শ্রীমণ্ডল বললেন,—বাংলাদেশের গাঁ মানেই তো হাসপাতাল, হেন রোগ আর হেন রোগী নেই, যা গাঁয়ে নেই। তবে একটা কথা কি মনে হয় জানেন? হাতুড়ে ডাক্তারদের কাজে লাগাবার উপযুক্ত করতে পারলে অনেক কাজ হতো। সেজন্য ট্রেনিং-এর দরকার। মাঝে মাঝে গ্রামাঞ্চলে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট পাঠাবার ব্যবস্থা করলে এ উদ্দেশ্য অনেকাংশে চরিতার্থ হতে পারে।

হুগলীর ধনিয়াখালি কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি লড়াই-এ জয়লাভ করে বিধানসভায় নির্বাচিত ফরোয়ার্ড ব্লকের কৃপাসিন্ধু সাহার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীবৈদ্যনাথ সাহাকে ছ' হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন (ফরোয়ার্ড ব্লক—২৭,২৭১, কংগ্রেস—২১,২৪৭)। শ্রীসাহা ফরোয়ার্ড ব্লকের তরুণ কর্মী। শিক্ষাজীবন শুরু হয় প্রথমে বরানগরে পরে হুগলীর চুঁচুড়ায়। জীবনে রাজনীতির ছায়াপাত ঘটে স্কুলে থাকতেই। কলেজজীবনে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারাবাস করতে হয়। কলকাতায় পুরুলিয়ার

সুবলচন্দ্র মণ্ডল

কৃপাসিন্ধু সাহা

কৃষকদের আন্দোলনে যোগদান করে বন্দী হন। ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলন, বাংলা-বিহার আন্দোলন, এবং ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের তিনি সক্রিয় অংশীদার। ১৯৬২ সাল থেকে শ্রীসাহা চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। এছাড়া তিনি সারা ভারত যুব লীগের বাংলা শাখার সহকারী সভাপতি, ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য শাখার সদস্য এবং হুগলী জেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক।

রাজনীতিতে একেবারে নবাগত না হলেও শ্রীসাহা রাজ্য বিধানসভায় এই প্রথম এলেন। বিধানসভার জনাকীর্ণ লবী থেকে উপরে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে? উত্তরে শ্রীসাহা একটু হেসে বললেন, ভালো। তবে কি জানেন? এই ভালো লাগা তখনই সার্থক হবে যখন আমরা কয়েক কোটি মানুষের জন্য সত্যিই কিছু করতে পারবো।

—কিন্তু পারবেন কি আপনারা আপনাদের ইউনিটি বজায় রাখতে? অনেকেই তো এ-ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন।

—না, এবারে সে সন্দেহ পোষণ করবার কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। যুক্তফ্রন্টের শরিকদলের মধ্যে কারোরই ফ্রন্টের বাইরে থেকে অস্তিত্ব বজায় রাখা সহজ হবে না। দেখতেই তো পাচ্ছেন রাজ্য পি-এস-পি'র হাল। কাজেই ইউনিটি নষ্ট হবার আশঙ্কা এবার আর নেই।

—কিন্তু বৃহত্তর দলগুলি কি ক্ষুদ্রতর দলগুলিকে ডোমিনেট করবার চেষ্টা করবে না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো ইতিমধ্যেই বলেছেন যে, বাংলাদেশের ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলি বাম কমিউনিস্ট পার্টির কুক্ষিগত হয়ে পড়লো।

—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। রাজনৈতিক চেতনা এবং শক্তিশালী সংগঠনকে কখনো কুক্ষিগত করা যায় না। বাংলাদেশের যে দলগুলিকে ছোট দল বলে ইঙ্গিত করা হয় তারা আকারে ছোট হলেও স্বতন্ত্র এবং বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চিন্তাধারার অধিকারী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিছক মাছ না পেয়ে ছিপ কামড়াতে চাইছেন। অন্য কথায়, বাংলাদেশের সংযুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে যদি বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়—তারই কিছু ফাঁক-ফুকর খুঁজছেন আর কি!

২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত কমিউনিস্ট (মাঃ) সদস্য শ্রীশরৎ সর্দার নিঃসন্দেহে প্রলেটারিয়েট সমাজের যোগ্য প্রতিনিধি। পাতলা গড়নের নাতিদীর্ঘ একটি কালোমানুষ। রাজধানীর বুকে তাঁর পরনের ধুতি হাঁটুর নিচে পড়লেও এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এভাবে কাপড় পরা তাঁর অভ্যাস নয়। পায়ে বাদামী রঙের একজোড়া কাপড়ের জুতো। কথা বলেন আস্তে আস্তে। ইংরেজী সালের খবর তিনি রাখেন না। বাংলা ১৩২১ সালে সন্দেশখালির সুখদুয়ানি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৫৪ বছর বয়স্ক এই ক্ষেত-মজুরের জীবনের সব কথা আজো বেশ মনে আছে। ছেলেবেলায় গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া করতে করতেই এক সময় যে ক্ষেতের কাজে প্রবেশ করেছিলেন আজো সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন নি। জীবনের প্রতিটি বছর—রাজনীতির প্রতিটি ধারণা জন্ম নিয়েছে ক্ষেত আর খামারের ধূলিবালির মধ্য থেকে।—এই রাজনৈতিক ধারণাই তাঁকে ১৩৪৫ সালের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনেছিল। সেই সময় জমিদারদের কারিকু হাতেও সাধারণ চাষীদের যথেষ্ট উৎপীড়ন ভোগ করতে হতো। চাষীকে ফাঁকি দিয়ে বহু জমি জমিদাররা অন্যকে বিক্রি করে দিতেন। জমিদারী খামার প্রথা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানবিধির প্রতিবাদে শ্রীসর্দার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। খাস জমির আন্দোলন এবং তেভাগা আন্দোলনে যোগদান করে নির্যাতিত হয়েছেন। এই সকল আন্দোলনের সময় কতদিন তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে! এই '৫৩ সাল থেকেই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পরেও নির্যাতন শেষ হয় নি। প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের কালাকানুনের বলেই শ্রীসর্দারের জীবনে প্রথম কারাবাস ঘটে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন প্রথম ১৯৬৭ সালে, কিন্তু তিন হাজার ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীর হাতে পরাজিত হন। এবার মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করে বিধানসভার সদস্যপদ লাভ করলেন। প্রাথমিক আলোচনার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম,

—আপনি ছেলেবেলা থেকেই ভূমি সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। ভূমি সংস্কার সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট তার কর্মসূচীতে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে। কিন্তু প্রথমেই কোন্ কোন্ দিক থেকে সরকারের এগোনো দরকার বলে আপনার মনে হয়?

—আমার মনে হয়, প্রথমেই সরকারী খাস জমিতে ভূমিহীন কৃষকদের দখলী স্বত্ব দেওয়া দরকার এবং বেনামী জমি উদ্ধার করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত।

—অনেকের মতো আপনিও কি মনে করেন—খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য পাটের চাষ কমিয়ে ধানের ফলন বাড়ানো উচিত।

—না। আমার মনে হয় পাটের চাষ না কমিয়েও অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করতে পারলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। আমাদের বসিরহাট মহকুমায় প্রচুর অনাবাদী জমি আছে। এগুলিকে দ্রুত আবাদযোগ্য করবার ব্যবস্থার জন্য আমি সরকারকে বলবো।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর.
ন্যাশন্যাল ডিল্যুক্স"
১০৲ মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

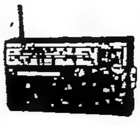

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

অগ্নিগর্ভ পূর্ববঙ্গের বাণীবহ কয়েকটি কম্বু কবিকণ্ঠ

রক্তচক্ষু, জঙ্গী শাসকদের শাসন, শোষণ ও পেষণ মানুষকে কখনও চিরকাল অবদমিত করে রাখতে পারে না। ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘোরে না। স্বাধীনতা-সাম্য-শান্তি ও প্রগতি প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। যারা এ অধিকার হরণ করতে চায়, তারা দুনিয়ার ক্ষমাহীন শত্রু।

এইসব শত্রুর বিরুদ্ধে এবং এদের সহায়তাকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে অগণিত বঞ্চিত-দরিদ্র-নিপীড়িত সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসেন নির্ভীকচেতা কবি শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা। তাঁরা অভয়মন্ত্র শোনান, শক্তি যোগান, জনমানস ও জনচেতনা উদ্বুদ্ধ করেন, জীবন ও যৌবনের জয়গানে সংগ্রামক্ষেত্র ও সংগ্রামের আদ্যপ্রান্ত প্রেরণামুখর করে তোলেন।

পূর্ববঙ্গ আজ অগ্নিগর্ভ। কুশাসন ও দুঃশাসনের বোঝা ভেঙে সে মুক্তি পেতে চাইছে। সেখানকার প্রগতিশীল কবিরা মানুষের বাঁচার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মসী তাঁদের অসি। সে অসি অতি ক্ষুরধার—আণবিক অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী।

উপকরণ সামান্যই সংগ্রহ করতে পেরেছি। প্রতিক্রিয়াশীলতা নিশ্চয়ই রয়েছে। এদেশের একশ্রেণীর অসৎ জীবনবিমুখ ভণ্ড, সাহিত্যিক-ভেকধারী [illegible] মতো ওদেশেও প্রতারক সাহিত্যিক, জাল সাহিত্যিক রয়েছেন। তাঁদের স্থান বর্তমান প্রবন্ধে নেই। পূর্ববঙ্গের প্রগতিবাদী কবিদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।

শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে সেখানকার কবিকণ্ঠের নির্ভীক জেহাদ সাময়িক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কয়েকদিন বা কয়েকমাসের কথা নয়, দীপ্ত কবিকণ্ঠের বাণী দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা বলছেন অত্যাচার-অনাচারের কথা, পণ করছেন তার থেকে মুক্তি পাবার। তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেখাচ্ছেন অন্যায় অবিচারের স্তূপ, ঘুণধরা সমাজব্যবস্থা, অসহায়তা, অন্যায় এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থা। আখতার হোসেন তাই বলেন—

'তুই কি কোনদিন ভাবছিলি
খাইবার না পাইয়া—
বুক কালি কইরা তর সোনার ধন,
চোহের মণি
কাদুসালু কইরা
অকালে কবরে গিয়া হুইয়া থাকবো?

তুই-ই ক করিমন
আমার জেয়হে কি কইরা মুখ দেহাইবো
হাটবাজারে চাইল আর ডাইলের দাম
হু হু কইরা বাড়তাছে
মানুষ কই যাইবো ক?
আর এই সময় মিলের
চাকরীডাও গেল গা,
তারপর কত চাকরী খুঁজলাম
কোনখানে কিছু পাইলাম না।'
('করিমনকে')

আবদুল হুসেনের কণ্ঠে শুনি,—

'আর এমন চমৎকার লোক এরা
নালিশও করবে না, আগাড় ভাগাড়
যাই হোক
তিন হাত চাই মাটি শুকনো হাড়ে
সার দেয়ার
মাটির সাথে একাত্মা, আহা
কী সামান্য প্রয়োজন।
শব্দহীন নির্বিকার জন্তের জীবন।
মৃত্যু আর
জীবন সমান। ইতরের অপূর্ব শাসন।'
('মানপত্র')

শুভ রহমান বলছেন,—

'অথচ কারও ঘরে
সুখ নেই।
সবাই আজ নেড়ে বলছে
জীবনে যা দেখি নি
তারই নাম
সুখ।' ('জীবনে যা দেখি নি')

অপূর্ব ভাষায় দিলওয়ার দেখাচ্ছেন,—

'আমাদের বউ-এর গলায় গজমোতির মালা,
যখন [illegible] তোমার বউ নিচ্ছে
গলায় দড়ি,
শুকতারার মতোই আমার পুত্রকন্যারা—
[illegible] বিদ্যাজয়ী,
যখন তোমার সন্তান 'অমাচ্ছন্ন';
('পড়ো নিজের নামে')

এঁদের মধ্যে অনেকেই এই শোষণ এবং বৈষম্যের মূল কোথায়, জেনেছেন। চেতনা প্রবাহে উদ্দীপ্ত এবং আত্মনিমগ্ন এই সব কবি বলেন—

'আমি দেশকে ভালবাসি,
ভালবাসি দেশের মানুষকে—
তাদের সুখে দুঃখে আমি হাসি ও কাঁদি।
দেশের কথা ও মানুষের ব্যথা আমি ভাবি—
এই তো আমার অপরাধ।
দেশের ভাষা, সাহিত্য ও রণগীত—
ক্ষীণ ও দুর্বল শক্তি নিয়ে
এই কিছু চর্চা আমি করি,
এই সম্বন্ধে ভাবি, চিন্তা করি ও লিখি—
এও নাকি এক মস্ত অপরাধ।'
('অপরাধ'—আবুল ফজল)

আবার—

'ধনপতিদের মনে হয়ত অন্য কোন এষণা—
পুঁজির এষণায় বিদীর্ণ হোক
শ্যামলীর অন্তরাল—'
('পড়ো নিজের নামে'—দিলওয়ার)

কবিকণ্ঠ স্পষ্ট, দৃপ্ত, ভয়হীন। তীক্ষ্ণ জ্বালাময়ী ভাষা। কখনো বিদ্রূপ বা শ্লেষ, কখনো অভিশাপ, কখনো বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়। হেঁয়ালি নেই বক্তব্যে এতটুকু। নিষ্ঠা, সততা এবং দৃঢ়তায় অনন্য। কোন রক্তচক্ষু বা ভ্রূকুটিকে তাঁরা গ্রাহ্য করছেন না। ক্লীবতা নেই, হতাশা নেই। জয়ের আশায় উন্মুখ। জয় যেন তাঁদের হবেই। শৃঙ্খল ভেঙে পড়বেই। নতুন দিনের নতুন যুগের নতুন জীবনের স্বপ্নসূর্য দেখছেন তাঁরা—তারই প্রতিধ্বনি একটি কবিতায়,—

'এ দৃশ্য আজকাল অহরহ ঘটছে, ঘটবে,
এ আগুনে নির্ভীক [illegible]
জ্বলছে, জ্বলবে।
মজদুর সব আজ চঞ্চল ক্ষুব্ধ/
চিৎকার রাস্তায় মিছিলে
মাঠঘাট জনপদ ক্ষুব্ধ/কাঁপছে
কিষাণের আওয়াজে।
এ দৃশ্য আজকাল অহরহ ঘটছে, ঘটবে।'

এবং রহিমা সিদ্দিকীর কবিতায়,—

'আমার রক্তের লোহিত কণিকায়
যদি তোমার মুক্তি লিখা থাকে
ঢেলে দিব রক্তের শেষ বিন্দু—
তোমার প্রসারিত পাত্রে।'

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ঐ সুন্দর কেশ বিন্যাস অতি দীর্ঘকাল সুন্দর থাকবে না - - -

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয়—পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক,- এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যাণ্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

…হে কান্ত !
তোমার আশিস চন্দনের একটি তিলক
(কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী হবে,
আমার যাত্রাপথে)
দাও এ মহাপ্রলয় ক্ষণে
মহাপ্রলয় যজ্ঞের আগে
আমার কপালে।' ('উৎসর্গের আগে')

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায়,—
'জ্বালবো আলো, আলো জ্বালবো,
এখনো যা আছে বিন্দু বিন্দু
প্রাণের ফুলকি
নিংড়ে নিয়ে জ্বালবো আলো ঃ'
('সূর্য জ্বালার সোপান')

অথবা, তরুণ কবি জাহিদুল হক-এর কবিতায়,—
'এই বয়সই মুক্তি আনে
নতুন আলো ছড়িয়ে প্রাণে,
নতুন কথা বলতে জানে।
('বয়স আমার কুড়ি')

আবার, আইনুন নাহারের কবিতায়,—
'প্রতিটি শোণিত কণা মিশে যায়
পলাশের লালে
অগণিত পদচিহ্ন রক্তমাখা সেই রাজপথে
আগামী দিনের স্বপ্ন ভীড় করে
প্রদীপের দীপ্ত অন্তরালে
অসংখ্য জনতা জাগে-পরিপূর্ণ
উজ্জ্বল শপথে।'
('একুশের দাবী')

জীবনকে দূরে থেকে দেখলে এত স্পষ্টতা, এই দার্ঢ্য আসে না। তাঁরা জনজীবনের সংগে যুক্ত—জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। জনতার সংগে তাঁরা তাই আন্দোলনে সামিল হন। পূর্ববঙ্গের গণআন্দোলনে সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা যেন সর্বাগ্রগণ্য।

মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের ইতিহাসে অমর ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ অনির্বাণ অগ্নির উৎস। প্রগতিবাদী কবিদের কাছে এটি যেন একটি মুক্তিতীর্থ—তাঁদের সমস্ত প্রতিজ্ঞা এই একটি দিনকে ঘিরে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। নতুন কবিতা লিখতে শিখছেন, এমন কিশোরও ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে কবিতা লেখেন। আলাউদ্দিন আল আজাদ, আব্দুল লতিফ, আব্দুল গণি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, আইনুন নাহার প্রভৃতি কবিদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এই শপথসার্থক দিনটিকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন মেহবুবা মোঘলেস পারুল, রুবেকা সুলতানা শীলা, কল্পনা মোহরের প্রভৃতি মহিলা কবিবৃন্দও। মেহবুবা মোঘলেস পারুলের খুব কম কবিতাই আমাদের হস্তগত হয়েছে, কিন্তু মনে হয়েছে, ইনি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলছেন,

লোনামাখা এই মনে
যখনি করেছি দৃষ্টিপাত
যখন দিয়েছি মেলে আমার বিষণ্ণ
দুটি হাত;
সে হাতে এসেছে ফিরে রক্তমাখা চিঠি
রাশি রাশি—
দেড় যুগ আগে লেখা সেই সব পত্র
ভালবাসি।'
('একুশে ফেব্রুয়ারী')

এই সব কবি যুগজীবন এবং ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন—সমাজচেতনা থেকে কোনমতেই বিচ্ছিন্ন নন। সুষ্ঠু, সুন্দর, সুস্থ জীবন রচনায় তাঁরা আগ্রহী। অতীতের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ তাঁদের ছিন্ন হয় নি। তাই তাঁরা স্মরণ করছেন প্রতিটি বাঙালীর আত্মার আত্মীয় রবীন্দ্রনাথকে, যিনি জনগণের সঙ্গে কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি; স্মরণ করছেন চিরবিদ্রোহী কবি নজরুলকে। এই স্মরণ মননের মধ্যে দিয়ে তাঁরা তাঁদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। স্মরণের এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য,—
'যদি না জ্বালাতে পারি অন্ধবিশ্বাসের
নাভিমূলে
প্রখর রশ্মির দীপ,
তাহলে পাতালে হোক ঠাঁই,
তাহলে সোনার তরী
আনুক বহন করে ছাই,
অবাধ সমুদ্র বায়ু আমৃত্যু
থাকুক প্রতিকূলে।'
('তোমার স্মৃতির মালা হাতে
(২৫শে বৈশাখে)'—দিলওয়ার)

অথবা,—
কবিতার পংক্তিতে তার রেখেছি হাত
কতবার
সহসা ঈপ্সিত বস্তুর মতো পেয়ে গেছি
কিছু অসহ্য চেনা স্বর
'সে স্বর প্রিয়তম অনন্য এক
কবি কণ্ঠের উপমা যার
অজস্র জাহাজ মথিত লোনাগন্ধ
ভয়ানক সমুদ্রের ঝড়।)
('তিনি' (কবি নজরুলকে)
—সা, ম, হেদায়তুল্লাহ)

এই প্রগতিবাদী কবিদের মধ্যে আরও আছেন জাহানারা বেগম, বেগম সুফিয়া কামাল, লায়লা মজনুর, আবদুর রহমান, সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেদ, সামসুর রাহমান, আনিস চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী প্রভৃতি। নবনী এবং প্রবীণ অনেকেই এগিয়ে এসেছেন, দেশের দুর্দিনে তাঁদের বক্তব্য রাখছেন। কার কবি-প্রতিভা কতখানি তার বিচারের জন্যে এ প্রবন্ধ নয়। বাঁচবার তাগিদ অনুভব করছে মানুষ, এঁরা তার আবেগ এবং অনুভূতি ছড়িয়ে দিচ্ছেন গণমানসের শিরায় শিরায়।

এ সব কবিতা রসোত্তীর্ণ কিনা, সাংবাদিকতা এসেছে কিনা, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। কবিরা তো শুধু ফুল, প্রেম, স্বপ্ন নিয়ে থাকেন না। অনেক সময় বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা যায়—তাঁরা স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা—আঁচ পান বুঝতে পারেন অদূর ভবিষ্যৎ গতি এবং পথ নির্দেশ করেন—জীবনকে সবদিক থেকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেন, জাগিয়ে তোলেন। পূর্ববঙ্গের কবিরা এক অভিনব যুগসন্ধিক্ষণে সেই সর্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। মানুষের চিত্তে বল-বীর্য-বিশ্বাস যোগাচ্ছেন। উপায় কি ? যেখানে দেশের দুর্দিন, সেখানে কবিকে তথাকথিত সাংবাদিকতা গ্রহণ করতেই হবে। তাই বলে সামসুর রহমান, আবুল ফজল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, দিলওয়ার প্রভৃতি কবির কবিপ্রতিভার বিরূপ সমালোচনা করার সাহস কার আছে

অত্যাচারী পুড়ে মরবেই, আগুন জ্বলবেই। পৃথিবীর সমস্ত দেশের দাম্ভিক বলদর্পিত শাসকগোষ্ঠীকে ঘিরেই ধ্বংসের বিষাণ বাজছে আজ। ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, শেখায়। শুধু দেখে না, শেখে না, বোঝে না তারাই যারা শক্তিমদে গর্বিত ও মত্ত। কবিরা যে এরি পরিপ্রেক্ষিতে মানবসভ্যতার সম্পদ ও তার প্রগতির অগ্রদূত—পূর্ববঙ্গে আর একবার তা প্রমাণিত হল।

ওদিকে এখন সামরিক স্তব্ধতা। থমথমে ভাব। সুউচ্চ পর্বতশিখরে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের মধ্যে যে অশনি, যে বিপদ লুকিয়ে থাকে, এ তাই। এ বুঝি সেই ভয়ানক অগ্নিবৃষ্টির পূর্বলক্ষণ।

যেখানকার কবিরা জাগ্রত, সেখানকার মানুষ জাগ্রত, জীবন জাগ্রত। মাহমুদ আল জামান-এর ভাষাতেই বলি, সেখানকার কবিদের,—
'প্রবল গম্ভীর সেই স্বর, সেই ধ্বনি
অণুতে
রক্তস্রোতে
অশ্রুতে
ঘুরে ঘুরে থেকে থেকে বাজছে।'
(সেই স্বর, সেই ধ্বনি)*

---

* উপকরণ সংগ্রহে সহায়তার জন্যে শ্রীগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

মৌলিক অধিকারে মনোবিকার!

দণ্ডপাণি

২৪শে মার্চ তারিখে নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ গত রোববার থেকে এক গোল টেবিল বৈঠকে সম্মিলিত হয়েছেন। সম্মেলনের আহবায়ক হচ্ছেন ইনস্টিটিউট অব কনস্টিটিউশান এ্যাণ্ড পার্লামেন্টারী স্টাডিজ। উদ্দেশ্য—সংবিধানের মৌলিক অধিকার রক্ষা বিষয়ে সংসদ সদস্য শ্রী শ্রীনাথ পাই মশায় যে 'বিল' উত্থাপন করেছেন তার যৌক্তিকতা আলোচনা করা। ভাল কথা। আলোচনার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। তাতে মতভেদ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সবকথা সহজভাবে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনিশ্চয়তার অথৈ জলে দেশবাসীর ভবিষ্যৎকে নিক্ষেপ করে শুধু আলোচনার আবর্ত থেকেই সমস্যার সমাধান হয় না। চাই মীমাংসা।

"Prohibited area" আমরা শুনেছি বা দেখেছি। "Proscribed book"-ও দেখেছি বা পড়েছি। কিন্তু "Censured Chapter"-এর কথা আমরা এই প্রথম শুনলাম—Supreme Court-এর কোন এক মামলার রায়ে। রায়বাহাদুরী বটে। কেন না ঐ রায় গত দশ মাস থেকে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশের উপর Plaster মেরে দিয়েছে। ঐ অংশ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পৃষ্ঠা। অবশ্য এই দশ মাস পূর্বে ঐ অংশের উপর X-Ray করার অধিকারে পরোক্ষভাবে ভারতীয় জনসাধারণের সম্পূর্ণ স্বাধিকার ছিল। লোকসভায় তিন তিনবার ঐ অধ্যায়ের সংশোধন হয়েছে। এবার অষ্টাদশী বিমোচন।

এ বিষয়ে এবারকার প্রজাতন্ত্র দিবসে "দৈনিক বসুমতীর" সম্পাদকীয় মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "সংবিধান পবিত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু পবিত্র বলিয়াই উহার অপূর্ণতা, ত্রুটি বা দুর্বলতা সংশোধনের অতীত, এ-কথাও সত্য নয়। কারণ, মানুষ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই জনগণের ইচ্ছায় সংবিধান রচিত হইয়া থাকে এবং জনগণই ক্ষমতার উৎস। সুতরাং সেই জনগণের নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য সংবিধানের অনিবার্যরূপেই সংশোধনের দাবি উঠিয়া থাকে এবং এভাবে ভারতীয় সংবিধানেরও অনেকবার সংশোধন করা হইয়াছে।"

কিন্তু ১৯৬৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ভারতের সুপ্রীম কোর্ট একটি যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ৩৬৮ নং ধারা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করা চলে বটে, কিন্ত সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত "ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস্" বা মৌলিক অধিকারসমূহে হাত দেওয়ার অধিকার সংসদের নেই। ইতিপূর্বে তাঁরা সেখানে হাত দিয়ে অসঙ্গত কাজ করেছেন। ভবিষ্যতে ওই পাতা কয়টি স্পর্শ করা চলবে না।

সংসদ সদস্য শ্রীনাথ পাই একজন রাজনীতিবিদ ও আইনবিশেষজ্ঞ। তিনি একটি খসড়া "বিল" পেশ করেছেন। তিনি চান ৩৬৮ নং ধারাটিকে সংশোধন করে সেখানে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে রাখা হোক যে, দরকার হলে মৌলিক অধিকারের তালিকায় হাত দেওয়ার অধিকার সংসদের আছে। তাঁর মতে সুপ্রীম কোর্টের রায় মেনে নেওয়ার অর্থ সংসদের ক্ষমতা লোপ। সংবিধান সংশোধনে জনগণের যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা তা সুপ্রীম কোর্ট কেড়ে নিতে পারে না। সংবিধান হল জনগণের ইচ্ছা ও আশার প্রতীক। সংসদ যদি সংবিধানে হাত না দিতে পারে, তবে সংসদই বৃথা।

রাজনীতিবিদ্‌দের মতামত তাদের ধ্যান-ধারণার আলোতে স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু দেশের আইনবিশারদরা এ ব্যাপারে বহুমত ধরেন এটাই আশ্চর্য। যেমন ভারতের ভূতপূর্ব অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীশীতলবাদ জানিয়েছেন—সুপ্রীম কোর্টের রায় অসঙ্গত। সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা একমাত্র সার্বভৌম সংসদেরই আছে। আইনবিদ্ শ্রীমোহনকুমার মঙ্গলমেরও অভিমত এই। তিনি বলেছেন সংসদ জনসাধারণের প্রতিনিধি, প্রতীক, তার সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীত।

সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য শ্রী এন সি চ্যাটার্জির অভিমত। তিনি বলেন ৩৬৮ নং ধারা অনুযায়ী সংবিধানের যে কোন সংশোধনই সংবিধানের ১৩(২) ধারার এক্তিয়ারাধীন হওয়া উচিত নয়। এ বিষয় সুপ্রীম কোর্টের দুজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপাতঞ্জল শাস্ত্রী ও শ্রীগজেন্দ্র গাদকার এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। অপরদিকে শ্রী কে শান্তনম মনে করেন যে, ১৩(২) ধারায় স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্টেট কোন বিষয়ে "আইন" রচনা করতে পারবে না। মৌলিক অধিকার সেখানে রক্ষিত।

আর একটি প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ইণ্টারন্যাশনাল ল' মনে করেন, রাষ্ট্রসংঘের সনদের মতই আদালতের "রায়"-এর আলোতে বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত—সংবিধানের সামাজিক উদ্দেশ্যগুলো পূরণের পথে কোন বাধা দেখা দিচ্ছে কি না।

চমৎকার! কোন দিকে যাওয়ার উপাই নেই। আমরা সোজা কথায় বুঝি সমস্ত সংবিধানই নমনীয় (flexible) থাকা ভাল। পরিবর্তনশীল সংবিধানই সমৃদ্ধিশালী। আইনের পাণ্ডিত্যে বা ভাঁওতায় তাকে স্থিতিশীল করে রাখার অর্থ প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা ও কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা। কারণ আজ সম্পত্তির অধিকারে, ব্যক্তিগত ভোগ্য ব্যাপারে ও উৎপাদীয় উপকরণের মালিকানার চরিত্র ও প্রকৃতি যুগোপযোগী পাল্টাতে বাধ্য। এর অপরিবর্তনীয় অধিকার স্বীকার করা মানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখা। এটা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। সমাজবিপ্লবের গতিপথে আইনজীবী ও আইনবিশারদদের মতের বৈপরীত্যে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা ভেস্তে যেতে দেখা গেছে। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে আইনের বেড়াজাল এমনভাবে প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে যে, মানুষের চলার পথ আজ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হবে আসার উপক্রম হয়ে পড়েছে। একমাত্র "ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটই" যদি আইনের বিচারের বিষয়বস্তু হয়, তবে 'ফাণ্ডামেণ্টাল ডিউটির' সংরক্ষণতা জনসাধারণই করুক। আমরা তাকেই স্বাগত জানাব। আইনজ্ঞদের মতদ্বৈধতা জাতির মনোবিকার ঘটাক তা নিশ্চয়ই কেউ চাইবে না।

মেয়েটির নাম কুমু অর্থাৎ কুমুদিনী। কুমুদের মতো সে শ্রীময়ী। তার রূপের ছটা যে কোন পুরুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। যে বয়সে মেয়েদের রূপ-লাবণ্য কানায় এসে ঠেকে কুমু তার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়ছে। হায়ার সেকেণ্ডরী পরীক্ষা দেবে, তাই উঠে-পড়ে তৈরি হচ্ছে। সরু গলিটার ভেতর ওদের বাড়ি, কুমুর পড়বার টেবিলটা গলি-মুখো জানলা ঘেঁষা। জানলার ফাঁক দিয়ে একটুকরো পাকানো কাগজ ঘরের মধ্যে ছিটকে এসে পড়ল একদিন। বই থেকে মুখ তুলে কুমু একবার দেখলো যেখানে মাটিতে কাগজটা পড়েছে। পরক্ষণে জানলার ওপিঠে বাইরে কেউ রয়েছে কি না তাও দেখে নিল। কাউকে দেখা গেলো না। এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। মোড়কটা তুললো। খুলে পড়ে ফেললো : কুমু, তোমাকে দেখার পর থেকে মন হাহাকার করছে। তোমাকে ভালোবাসি।—খ্যাঁদামামা।

'মরণ কোথাকার!' বলে কুমু চিঠির কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। রাগের চোটে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বিড় বিড় করে। উত্তেজনায় টুকরো কাগজগুলো ধীরে ধীরে নখ দিয়ে টিপে টিপে ছিঁড়ে কুটি কুটি করছে। খ্যাঁদামামা যেন এক বাঘিনীর নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। ঘৃণায় কুমুর ভুরু, ঠোঁটের দুটো কোণ কুঁচকে গেল।

ঘৃণা তো করবেই। খ্যাঁদামামা নামটি এতো সংগত যে তাকে দেখে মনে হবে জন্মাবার সময়ে কি নাকখানা থুয়ে রেখে মাটিতে নেমেছিল। তার মনের ভেতর কি ধন আছে তা কে জানে তবে খ্যাঁদামামার বাইরের রূপে ভুলেও কেউ প্রেমে পড়বে বলে মনে হয় না। মাথাটা বিরাট বড়ো, হাঁড়ি-হাঁড়ি গড়ন। চোখদুটো আকারে এতো ছোট যেন কালির দুটো ফুটকি পিট পিট করছে। তামাটে গায়ের রঙ। একটা কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করে। নতুন ভাড়া এসেছে কুমুদের পাশের বাড়ির একতলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরখানায়। দেয়ালগুলো ভিজে স্যাঁতসেঁতে। কোথাও একরত্তি বালি নেই। এমন মাগ্‌গির দিনেও কখনো কোন ভাড়াটে তিন মাসের বেশি এ-ঘরে থাকতে পারে না। খ্যাঁদা অতি অল্পদিনের মধ্যে পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলের মামা হয়ে গেল। প্রেম করতে গিয়ে উড়ো প্রেম-পত্রেও মামা সম্পর্কের লেবেলটা ফেলে দিতে পারে নি। হয়তো ভেবেছে, কে জানে যদি চিনে নিতে ভুল হয়, কিম্বা মামাডাকের ভেতর দিয়ে পৌরুষ জাহির করার ব্যাপারও বা থাকতে পারে।

ঘন ঘন চিঠির টুকরো কুমুর টেবিলের আশে-পাশে পড়তে থাকে আর রাগে সে চিড়বিড়িয়ে ওঠে। কাগজগুলো কুড়িয়ে টুকরো করে জানলার বাইরে ফেলে দেয়। মজার কথা কুমু

যখন পড়াশুনো করে চিঠিগুলো তখন ঘরে এসে পড়ে আর সে-ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় জানলার ধারে। কোথাও কাউকে দেখা যায় না। মামার তাক এত সুন্দর যে একদিন তো কাগজের মোড়ক কুমুর গালে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। গালটা ঘষে ঘষে ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করলো। গালের কিছু অংশ যেন এখনি কেটে বাদ দিলে ভালো হয়। সুন্দর মুখের খানিকটা সিঁদুরে লাল হয়ে রইলো।

একদিন খ্যাঁদামামা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মাড়ি ছাড়ানো দাঁত বার করে হাসছে হেঁ হেঁ......। দড়াম করে জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। খ্যাঁদা নাকখানা যেন আরও থেঁতো করে চাই কি ভেতর দিকে গুঁজে দেওয়ার ইচ্ছায় কুমু সমস্ত শক্তি দিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল। পাশের ঘর থেকে তার মা চেঁচিয়ে উঠলো ঃ কি রে কুমু, দরজা-জানলা ভাঙবি না কি? বড়ো হচ্ছিস না ধিঙ্গি হচ্ছিস।

ঃ না মা—গলি থেকে কিসের পচা গন্ধ আসছে যে—। বাব্বা, মাথা ধরে গেল।

কুমু সেকেন্ড ইয়রের ছাত্রী। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে। সন্ধ্যে উতরে গেল। কুমুর বাবা বাড়ি ফিরে শুনলো, মেয়ে তখনো ফেরে নি। রাত কেটে ভোর হলো। পুলিশ তল্লাসী চালাচ্ছে। কোথাও কোন পাত্তা নেই। এমনি করে দুটো মাস কেটে গেল। এদিকে খ্যাঁদামামার ঘরেও তালা লাগানো, তাকে দেখা যায় না। খবর পওয়া গেল, সে কারখানাতে যাচ্ছে না। খ্যাঁদামামা নিখোঁজ! পাড়ার ছেলেরা তো রাগে হয়তো আফশোসেও তুবড়ি-ফাটা ফাটছে। হায় হায়, খ্যাঁদামামা শেষে হিরো হলো। লোকটার পেটে পেটে এতো! আজব ঘটনা আজও ঘটে।

ধরা পড়লো বাঙলা দেশের বাইরে। কুমু খ্যাঁদার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতো।

হায়ার সেকেন্ডরী পরীক্ষার পর কুমুর জানলা খুলে গিয়েছিল। চলে যাবার আগে পর্যন্ত লুকিয়ে কোর্টশিপ চালিয়ে ছিল।

দু'জনকে থানায় হাজির করা হলো। জোড়টি যারা দেখেছে তাদের মনে হয়েছে, রূপ আর কুরূপের এমন অপরূপ মিলন তো চোখে পড়ে নি পূর্বে। সত্যিই রূপসাগরে ডুব দিতে পেরেছে. সাবাস খ্যাঁদামামা!

খ্যাঁদামামাকে জেরা করা হচ্ছে, জেরা শেষ হলে তাকে অফিসর-ইন্-চার্জের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। ওকে যখন নিয়ে যাচ্ছে ইন্চার্জ দুড়-দাড়িয়ে চড়-চাপড় শুরু করলো।

অন্য কামরাতে খ্যাঁদামামার পিঠে যে উত্তমমধ্যম পড়ছে অফিসের ঘরে বসে তা মালুম হচ্ছে। কুমু অফিসরের দুটো পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো ঃ ওকে অমন করে মারবেন না। বিশ্বাস করুন, আপনার পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি, ওকে আমি ভালোবাসি। আমি স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে চলে এসেছি। কোন দোষ নেই ওর।

ইন্চার্জ নিজের পা দুটো সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো 'ওর মধ্যে এমন কি পেলে যে ভালোবাসতে ইচ্ছে হ'লো? তুমি সুন্দরী, লেখাপড়া শিখছো, কতো ভালো বিয়ে হবে তোমার। ওটাকে ছেড়ে দাও, বেমালুম ভুলে যাও ওর কথা। ওই তো উল্লুকের মতো চেহারা'—

ঃ 'দেখতে নাই বা ভালো হলো ওর ভেতরটা আমি দেখতে পেয়েছি।'

ঃ 'ও একদিন তোমাকে ফেলে পালাবে।'

ঃ 'কক্ষণো নয়; ও ভালোবাসতে জানে।'

এবার ইন্চার্জ কুমুকে বোঝাতে চাইলেন ঃ 'কোর্টে হাকিমকে বলবে যে লোকটা তোমাকে ফুসলে বাড়ি থেকে বার করে এনেছে। নিজেকে আগে বাঁচাও। ও ব্যাটা তোমার রূপে মজেছে। নেশা কেটে গেলে সরে পড়বে জেনে রাখো।'

কুমু অচল-অটল। তাকে তো কোনমতে খ্যাঁদামামার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো গেল না। তার ওই এক কথা ঃ 'আমি ওকে ভালোবাসি।'

অবশ্য তখনো ওদের আইনত বিয়ে হয় নি। তবে কুমু শাসাতে ছাড়লো না যে, খ্যাঁদামামাকে শাস্তি দিলে সে আত্ম-হত্যা পর্যন্ত করতে পারে।

ইনচার্জ সেকেন্ড অফিসরকে বললো, 'এই বুঝলাম, নারীমন এমন একজনকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছে যে রূপেগুণে তার যোগ্য মোটেই নয়। প্রেমের জন্যে এতো বড়ো ত্যাগ স্বীকার করতে কখনো চাক্ষুষ দেখি নি; বইতে শুধু পড়েছি।'

বছর ঘুরে গেল। পুজোর ছুটিতে বাইরে বেড়াতে গেছি। ওই থানার অফিসর আমার পূর্বপরিচিত। বাজারে দেখা হয়ে গেল। এ-কথা সে-কথার পর কুমুর কথা জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'আচ্ছা শেষ পর্যন্ত কুমুর কী হলো?'

ইনচার্জ অল্প হাসলো, পানের ডিবে থেকে একসঙ্গে যতোগুলো পারলো পান মুখে গুঁজে দিয়ে কচর কচর করে খানেকটা চিবিয়ে নিল, তারপর বললো ঃ 'আর বলবেন না। মেয়েদের মন দেবা ন জানন্তি, স্যার—'

মেদ-থলথলে ঘাড়টা বার দুই নাড়িয়ে আবার শুরু করলো ঃ অল বোগাস। মেয়েটা কোর্টে স্রেফ বলে দিল লোকটা আমাকে গায়ের জোরে টেনে নিয়ে গিয়ে-ছিল। আমি আগে কখনো ওকে চোখে দেখি নি চেনা তো দূরের কথা। তার চোখে-মুখে ঘৃণা উপচে গর গর করে গড়িয়ে পড়ছে। এ তো ঘৃণা যে খ্যাঁদাকে একবার তাকিয়ে দেখলো না পর্যন্ত। একটু থেমে পিচ ফেলে দম নিয়ে শেষ করলো ঃ 'খ্যাঁদারাম এখন শ্রীঘর বাস করছেন।'

আমি বললাম ঃ 'ভালোই তো হয়েছে মশায়, আপনি তো অতো চেষ্টা করে মেয়েটাকে বাগ মানাতে না পেরে রেগে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

একথায় ইন্চার্জ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচূলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

তিমিরপ্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বারো ॥

এক আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে ডুয়ার্সের।

যুগই গেছে পালটে।

প্রকৃতির সবুজ-আস্তরণের ভেতর দিয়ে নানা দিকে চলে গেছে আজ পিচ-চকচকে রাস্তাগুলি। পাশে-পাশে দাঁড়িয়ে আছে নানা শ্রেণীর গাছ। সবুজ শ্যামল চারা। দূরে-দূরে বড় বড় বৃক্ষের আভাস। দাঁড়িয়ে আছে অরণ্য। ওই অরণ্যে যেমন আছে হিংস্র বাঘ-ভালুক, গণ্ডার আর বুনো হাতী, তেমনি ওর কাছে-কাছেই আস্তানা পেতে আছে মানুষ।

সমতল সভ্যতার সন্তান। পৃথিবীতে যে অনেক শক্তিমান জীব-জন্তুদের পরে এসেছে। তার প্রথম আবির্ভাব ছিল ভীতচকিত: ভয়ত্রস্ত। দুরুদুরু বুকে জন্ম নিয়ে দেখেছে প্রতি পদে পদে তার অসহায়তা। লড়তে হয়েছে প্রতি মুহূর্তে বিপদের মুখোমুখি। ঝড়ের সঙ্গে, বন্যার সঙ্গে, বুনো প্রাণীদের সঙ্গে। এমন কি নিজেরাও নিজেদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। খাদ্য ছিল না, পোষাক ছিল না, ছিল না আশ্রয়।

সেই শিশু ক্রমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠল। দুর্জয় সাহস তার বুকে। মস্তিষ্কে ক্ষুরধার বুদ্ধি। প্রাণে তার জীবনাবেগ। উঁচু চূড়া থেকে পাথর খসিয়ে সে হাসে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমীরের সঙ্গে যোঝে। বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি করে। বুনো হাতীর মত দুর্দান্ত পশুকেও পোষ মানায়।

প্রকৃতপক্ষে আদি মানবের কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষেরই এক অবিশ্রাম জয়যাত্রা।

নবজীবনের যাত্রাপথের হে তুমি
অগ্রগামী
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না।
কোথাও যাবে না থামি।

সেদিনের সেই গুহাজীবী মানুষদের কথা ভাবতে কষ্ট হয় আজ। ভাবাই যায় না। বাইরে হিংস্র বরফ-ঝড়, তুষার ঝরছে প্রচণ্ড শৈত্যে। দুর্দান্ত বন্য পশু পদভারে প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড করছে। মানুষ বসেছে গুহার মধ্যে আগুনের আলোকসাক্ষী রেখে। সভ্যতার মন্ত্রোচ্চারণ করছে না, ঠক-ঠকিয়ে কাঁপছে আগুনের কাছে বসেও। পরিচ্ছদ নেই, অলংকার নেই। জঠরানলের উদ্দীপনায় থরথর করে কাঁপে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে সেই মানুষ আজ কোথায়? সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে। দুর্গম এভারেস্টকে মাথা নোয়াতে হল। মরুভূমিতে চলেছে প্রাণের সাধনা। আকাশে ওড়ে পাখি? মানুষের ভাবনা কি শুধু ডানা মেলে আকাশেই? আকাশ পেরিয়ে চন্দ্রলোকের দিকে যান্ত্রিক ডানায় উড়ল মানুষ। দুরন্ত স্বাধীনচারী। চন্দ্রের কক্ষপথে পরিক্রমা করে এল পর্যন্ত।

জানি না রবীন্দ্রনাথ থাকলে আজ কী ভাবতেন। প্রাণের পূজারী ছিলেন কবি। বেদুইন কবিতার লাইনগুলি ঝকঝক করে জ্বলে প্রাণের পটে।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব
বেদুইন
চরণতলে বিশালমরু দিগন্তে
বিলীন,
ছুটেছে ঘোড়া উড়েছে বালি
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
চরণতলে বহ্নি জ্বালি
ছুটেছি নিশিদিন।

ঘোড়ার যুগ পেরিয়ে এসেছি। এ-যুগ গতিমত্ততার। এ-যুগের গতির চাকায় অবশ্য ধুলো ওড়ে না। ঘোড়ার তেজস্বী খুরে খুরে যেমন উড়ত।

আমি চলেছি ল্যান্ড রোভারে। উপস্থিত এক বন্ধুর নতুন কেনা চকচকে গাড়িতে বসে আছে। গাড়ি ছুটছে দুরন্ত গতিতে। আমাকে পৌঁছে দিতে।

ড্রাইভারের হাতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। স্থিরভাবে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে অনুমান করছি তার চোখ কাচের শার্সিতে রাস্তার দিকে নিবদ্ধ। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা কাঁপছে। রাতে ভালো চোখে দেখি না। তাই গতির পরিমাণটা অনুমান করতে পারলাম না।

ঘাড় ফিরিয়ে আমিও বাইরের দিকে চোখ দিচ্ছিলাম।

যতদূর দৃষ্টি যায় পথ চলেছে। পথ। মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে বেঁকে গেছে। কোন কোন জায়গায় পথ গেছে দু'-তিন দিকে। রাস্তা-সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। এ-সব অঞ্চল ড্রাইভারদের ভালোই জানাশোনা থাকবার কথা।

ঘড়িতে রাত বারোটার কাছাকাছি। হাতের জেনীর ঘড়িটায় দেখলাম। ওতে জীবনের স্পন্দন। কানের কাছে নিলে শুনব ছোট্ট টিকটিক শব্দ। যেমন স্পন্দন আমাদের এই বুকে। এই গাড়িটার হৃৎপিণ্ডে। বাইরে একটানা বাতাসের শাঁ-শাঁ শব্দ। হাওয়া উল্টোদিক থেকে তাড়িয়ে আনছে।

মাঝে মাঝে বন-জঙ্গলের গন্ধ।

মনে মনে ভাবি, এখন যদি রাত বারোটা হয়—মোটরের হেড লাইটের আলোকে শুধু রাস্তা চিনতে কষ্ট হয় না। দূরে দূরে জনবসতির ঘুমন্ত চেহারা। মাঝে মাঝে গাড়ির বাঁক ফিরতে বাড়ি-ঘর চা-বাগান শেড-ট্রিগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আদিতে এইখানে ছিল অরণ্য। ঠিক এখন যেখানটিতে আমি বসে বসে চলে যাচ্ছি ধাবমান ল্যান্ড-রোভারে, সেখানে—ঠিক সেইখানে হয়ত বাঘ গর্জন করত, ঘুরে বেড়াত বুনো হাতী। ভালুকের চোখ কৌতুকের নির্মম উজ্জ্বলতায় ঝলসে উঠত সার্চলাইটের আলোর মত।

মানুষের হাতে উৎসন্ন হল বন-জঙ্গল। অরণ্য পালিয়ে গেল পায়-পায়। ওই যে বনের আভাস দেখা যাচ্ছে ওরই মধ্যে এই মুহূর্তে কত না ভয়ংকর হিংস্রতম নাট্য অভিনীত হয়ে যাচ্ছে। জল খেতে নেমেছে বাঘ। ঝিলের কাছা-কাছি। কাদা। শুকনো পাতা নড়ে উঠল। মুহূর্তে দেখতে পেল বাঘ। লেজ মুচড়ে গর্জন করে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই দে ছুট্ হরিণ। ছুট্ ছুট্। মুহূর্তে হাওয়া।

কিছুদিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে। কাঠামবাড়ি ফরেস্টের ভেতরে শিকার করতে গিয়েছিল এক বন্ধু। নদী একটা চলে গেছে ঝিরঝিরে পা-পাতা-ডোবানো জল। সহসা জীপ থেকে টর্চ জ্বলে উঠল। তেজালো টর্চের

আসুন... ইউবিআইতেই সঞ্চয় করুন

- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের বার্ষিক সুদ পাবেন সেভিংস অ্যাকাউণ্টে শতকরা ৩½ টাকা, মেয়াদী আমানতে সর্বোচ্চ শতকরা ৬½ টাকা।
- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে আপনার টাকা খরচ করতে পারবেন।
- ইউবিআইতে আপনার ও আরও অনেকের সঞ্চয় একত্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে, রপ্তানীর জন্যে, আর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্যে সরকারকে আমরা আরও বেশী ঋণ দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করব।

UNITED BANK OF INDIA LTD.

ইউবিআই

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিস্টার্ড ও হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

UBF 84/69

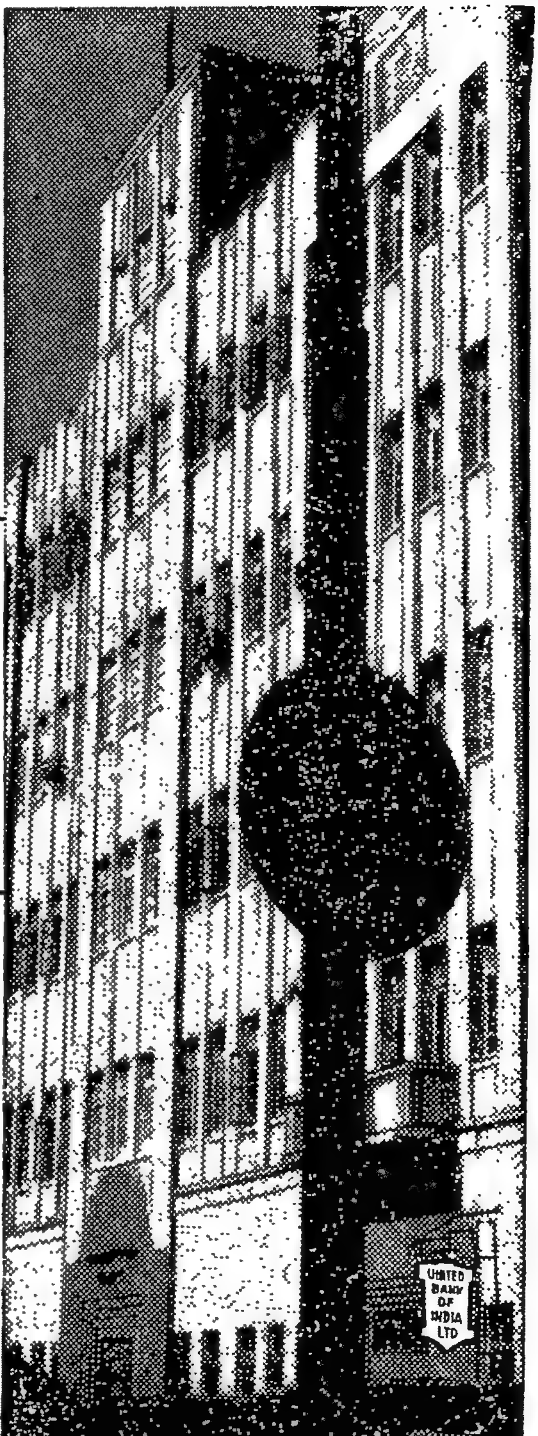

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

আলো। চার-পাঁচ-ছ'টা হরিণ ছিল একপালে। বাকি ক'টা ওরই মধ্যে পালিয়েছে। শুধু দাঁড়িয়ে গেছে একটা হরিণ। তার চোখে তীব্র আলোর রোশনাই অন্ধ করেছে তাকে। স্তম্ভিত হয়ে গেছে। নড়তে পারছে না। পলকের জন্য দেখা গেল হরিণটার চোখে জল। সত্যিই কি জল? আহা, মায়া লাগবার মত দৃশ্য। কিন্তু পাষাণ-প্রাণ শিকারীর হাতে রাইফেল। ট্রিগারে টান পড়ল মুহূর্তে। বুম্, বুম্। অগ্নিগোলক ছুটে গেল মুহূর্তে। রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকার চিরে গেল। তারপর আর শব্দ নেই কিছুক্ষণ পর্যন্ত। আচমকা বজ্রপাতের পর যেমন নিস্তব্ধতা, তাই। তারপর রাইফেল হাতেই সাবধানে এগিয়ে যাওয়া গেল জায়গাটায়। রক্ত-মাখা হরিণের দেহটা পড়ে আছে মাটিতে। ফেটে গেছে মাথাটাই। চোখের পাশ দিয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ে ভেসে যাচ্ছে মাটিতে।

হরিণের মাংস শুনে কণামাসি খুশি হয়েছিল। মলবাজারের কণামাসি। কিন্তু গল্পটা শুনতে শুনতে সেই যে গম্ভীর হয়ে গেল, আর তাকে মাংস দাঁতে কাটানোই গেল না। যত বলি, তুমি আচ্ছা ছেলেমানুষ দেখছি মাসি। হরিণের মাংসে তোমার এত সখ! কতদিন বলেছ আমাকে। আর আজ সামান্য একটা গল্প শুনে সব বেসুরো হয়ে গেল।

কে শোনে কার কথা!

বানারহাট হাইস্কুলের সামনে গাড়ি থামল। স্টার্ট বন্ধ হয় নি। ধক্‌ধক্ করছে।

থ্যাংক্‌য়ু। নামতে নামতে বলি ড্রাইভারকে, তোমার সঙ্গে আলাপই হল না। হবে আবার একদিন।

ততক্ষণে মাটি স্পর্শ করেছি, বলো তোমার সাহেব-কে।

ড্রাইভার একটা চাদর চাপিয়ে আছে গায়। মাথা পর্যন্ত ঢাকা। হঠাৎ তাকে বলতে শুনলাম, আমাকে চিনতে পারলেন না?

সরল সহজ গলা।

কে? কৌতূহলক্রমে কাছে এগিয়ে দেখি আমাদের গজেন। চাদরটা খুলে ফেলে মুখ ফেরাতেই চমকে উঠে বলি, আরে তুমি?

গজেন হাসে।

আমি কিন্তু তোমাকে চিনতেই পারি নি।

না-চিনলেই পারতেন।

তুমি না-চেনালে চিনব কি করে? তুমি যে সেই চাদর-ঢাকা হয়ে বসে রইলে!

কী করব। শরীরটা আজ দিন ভালো নেই।

তার গলাটা থম্‌থমে ঠেকল।

কি হয়েছে?

তেমন কিছু না। ইলেকশান ডিউটিতে যেতে হয়েছিল জানেন তো?

মনে পড়ল, মাঝে ইলেকশানের সরকারী প্রয়োজনে চারদিকের সমস্ত ট্রাক রিকুইজেশন করা হয়েছিল। সময় বিশেষে অন্যান্য গাড়িও। আলিপুর-দুয়ারে দেখেছিলাম ইলেকশানের প্রায় চার-পাঁচ দিন আগে থেকেই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে গাড়িগুলির নাম্বার নির্দেশ করে পার্ক করবার জায়গা করা হয়েছিল। আলোয় আলোময়। মাইক বাজছে। আর মুহূর্তে মুহূর্তে ড্রাইভারদের প্রতি নির্দেশ মাইকযোগে। ভাঙাভাঙা হিন্দীতে শুনিয়ে, শুনিয়ে। ড্রাইভার ভাইলোগোকে লিয়ে। শুনিয়ে। হেড্ লাইট্ থোড়াসে জ্বাল্ দিজিয়ে। অভি হামলোগ একঠো ফটো উঠানা মাংতা হ্যায়।

গজেনকে বললাম, তুমিও ছিলে নাকি? জানতাম না।

আপনি খবর জানবেন এ তো ভাবতেই পারি না। মালবাজারে গেছেন আর? দু-তিন বছরে পিসিমার খবর নিয়েছেন এর মধ্যে?

বলে আর হাসে।

লজ্জিত হই। মালবাজারে আমার এক দূর-সম্পর্কের পিসিমা থাকেন। একবার গিয়ে সাত দিন ছিলাম ওখানে। সেইখানেই গজেনের সঙ্গে দেখা। আমার এক জানাশোনা ভদ্রলোকের শালা। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। পিসিমা বলেছিলেন, ছেলেটা বড়ই ভালো রে। ইস্কুলে বরা-বর ফার্স্ট হয়ে এসেছে। দে না ওকে একটা চাকরি দেখে-শুনে।

আমি বললাম, ভালোই যদি হয়, পড়ালেই হত।

কী হবেই বা পড়িয়ে। তোজাড়া পড়াবার টাকাই বা কোথায়? বিনয় তো সংসার চালাতেই শেষ হয়ে গেল।

সেই গজেন যে এতদিনে মোটর ড্রাইভারিতে ঢুকেছে তা কেমন করে জানব! বললাম, শরীর ভালো না-থাকলে ইলেকশান ডিউটি না-নিলেই পারতে।

গজেন বলল, তবেই হয়েছে আর কী। কিছুই জানেন না আপনি। যাবো না বললে ধরে-বেঁধে নিয়ে যেত।

তুমি তো জীপ চালাও। তবে তোমাকে কেন—

গজেনের মুখে আবার হাসি দেখলাম। বলল, সব চালাতে হয়। জীপের ড্রাইভার কী আর আলাদা? আমরা তিনজন ড্রাইভার আছি। সবাই-কেই সব কাজ করতে হয়।

কী জানি মনের ভেতর কেমন একটা অপরাধবোধ জাগছিল। চুপ করেই থাকলাম। আপনাকে পরিচয় দেবই না ভেবেছিলাম। কী-ই বা হবে দিয়ে। আপনি তো ভুলেই গিয়েছেন। যদি চিনতে না পারেন।

না, না, তা কেন? তোমাদের চিনতে পারব না কেন?

গজেন বলল, কী আর করি। চাকরি-বাকরি কিছুতেই আর পাই না। ওদিকে দাদা আর সংসার চালাতেই পারে না। একা-একা ক'দিকই বা সামলাবে। দেশ থেকে এক কাকীমাও এসে পড়েছেন। তাঁর দু'টি মেয়ে। দেখলাম, আমি আর কী করব। কেই বা দিচ্ছে এখন চাকরি।

তুমি কি ড্রাইভিং জানতে?

না।

প্রথমেই ড্রাইভার হয়ে ঢুকি নি। ঢুকেছিলাম অ্যাসিস্টেণ্ট হয়ে। গাড়িতে হ্যাণ্ডেল মারা। দৌড়ে মবিল কিনে আনা। এইসব আর কি? সেই থেকে শিখতে-শিখতে—। আপনার এই বন্ধুটি ভালোমানুষ। ব্যবহার খারাপ করেন না। তবে কি না, ব্যবসা তো! খাটতেই হয়। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়।

শেষের দিকে এইটুকু বলে গজেন থেমে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

গজেন বলল, আসি তাহলে দাদা। রাতে আবার মালিক নিয়ে যেতে হবে চামুর্চি।

গজেনকে বললাম, পিসিমা কেমন আছেন?

তিনি মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে-ছিলেন। খবর পেয়ে আজ তিন মাস জামাই এসে তাঁকে পূর্ণিয়া নিয়ে গেছে। সীতাদি'র ঘর ছিল না ওখানে। ওঁর ত' পেট্রোলের বিজনেস্ ভালোই চলে।

গজেনের হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। আসি ভাই তাহলে। এই স্কুলে আমার এক বন্ধুর খোঁজ পেয়ে গেছি। বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। দেখা করতে পারি নি। এখন ক্ষমা চেয়ে নিয়ে চলে যাব।

ল্যাণ্ড রোভারটা চলে গেল।

ওদিকে স্টেশনে একটা গাড়ি হুইসল দিচ্ছে। ডিজেলগাড়ির মোটা হুইসল। স্কুলের দরজা পেরিয়ে ভেতরের দিকে চলে যেতে-যেতে রেলওয়ে লাইনের ধারে লাল আলোর পাথর-চোখটাকে জ্বলতে দেখছিলাম।

[ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ তিন ॥

অজ্ঞান হয়ে কতক্ষণ পড়েছিল জানে না নয়ন। জ্ঞান ফিরলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অন্ধকারের আড়ালে—একাই ফিরেছিল ঘরে।

ভয় পেয়ে হাউমাউ করে উঠেছিল মুকুন্দর মা হরিদাসী। যুবতী মেয়ে বউ মানুষ—অন্ধকারে ঘরে এসে ঢুকল ওই অবস্থায়, গায়ে এক চিলতে সুতো পর্যন্ত নেই। যেন ডাকিনী।

হরিদাসী কপাল চাপড়ে, বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে গাইতে লাগল তার দুঃখের পাঁচালি।......সংসার ভাসিয়ে দিয়ে গোবিন্দ চলে গেল। সাধ করে ছেলের বিয়ে দিলে। বউ এল ঘর আলো করে। নতুন ঘরের পাতনা দিলে ছেলে।

তারপর "কার চোখ টাটাল রে... কোন চুলোমুখোর বুকে মড়া-পোড়া আগুন জ্বললো রে।"—ইত্যাদি।

চরের মেয়েরা চেঁচিয়ে—তল্লাট মাথায় করে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে হরিদাসী সেই রাতেই চর জাগিয়ে দিলে।

মুকুন্দ থামাতে এল—পারল না। হরিদাসী আরও ডুকরে উঠল, "তোর মুখের দিকে আর চাইতে পারছি নি রে বাপ।"

মুকুন্দ খেঁকিয়ে উঠল, "বলি ভালো কর বউ-সব মুখে কথাটা তো শুনতে দিবি না-কি?"

"ওরে, ও-পাপকথা কেউ কখনো শোনে নি রে।" হরিদাসীর চেঁচানি এতটুকু থামল না।

"তবে মর।" বলে মুকুন্দ বাতায় গোঁজা লম্বা বাঁটওয়ালা একটা টাঙি নামাল টেনে।

হরিদাসী আঁৎকে সরে গেল দূরে। বউটা ভয়ে জড়সড়। মুকুন্দ তাদের দিকে একবার ফিরেও আর তাকাল না। সোজা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হরিদাসী চেঁচাতে লাগল পেছনে, "গেল রে। মোর সব গেল রে। সে গেছে—ছেলেও গেল।" বাইরে বেরিয়ে ডাক পাড়তে লাগল অন্ধকারে।

একজন দু-জন করে ছুটে এল কাছাকাছি পড়শীরা। শুধোলো: "কি হলো মুকুন্দের মা!"

"সে শুনবে পরে—আগে ওকে ফেরাও।" হরিদাসী মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, "মুকুন্দ টাঙি নিয়ে গেল গো, ওকে ফেরাও।"

"কোথায়—কুন্দিকে গেল!"

"হুই জঙ্গলের দিকে হয়ত।" হরিদাসী পুরুষ পড়শীদের হাত ধরে ধরে কাঁদতে লাগল, "খুন হয়ে যাবে—অপঘাতে মরে যাবে। ওকে ফিরিয়ে আনো তোমরা।"

ব্যাপারটা সব তলিয়ে না বুঝলেও একটা বিপদের গন্ধে ওরা কজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। তারপর লাঠি-সোঁটা নিয়ে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেল অন্ধকারে—যেদিকে মুকুন্দ গেছে।

কিন্তু মুকুন্দকে ওরা দেখতে পেলে না। থমকে দাঁড়াল জঙ্গলের পাশে গিয়ে। ঢুকতে ওদের সাহস হলো না।

একজন বললে, "কোথায় খুঁজবে তাকে এই অন্ধকারে—জঙ্গলে! কি হয়েছে না-হয়েছে, কটাই বা লোক আমরা। তার চেয়ে চল—ছোট মণ্ডলকে বলি। বুদ্ধি বার করে দেবে।"

"ওই শব্দ......শুনছো? ওই..." একজন বলে উঠল।

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল সবাই—ঝোপ-ঝাড় ভাঙা ঝর ঝর মড়মড় শব্দ। জঙ্গলের গভীরে—আরও গভীরে সরে যাচ্ছে যেন। সে-শব্দ অনুসরণ করে ছুটতে ওদের সাহস হলো না।

এ জঙ্গল ওদের অচেনা নয়—রোজই দেখছে চোখের সামনে। দক্ষিণে দূরের সমুদ্র কিনার থেকে ভাগীরথীর ধার ঘেঁষে ঘন জঙ্গল এসে ছুঁয়েছে ওদের চর। জ্বালানি বা কাঠের ধান্দায়—কখনো বা গরু-ছাগল খুঁজতে জঙ্গলে যে ঢোকে নি কেউ কেউ, তাও নয়। তবে সে ওই আশপাশে—বাবলা বন-ঝাউয়ের ঝুপি জঙ্গলে বা বাদায়। সে হলো যেন জঙ্গলের একতলা—পয়লা নম্বর মহল, বার বাড়ি। দোমহলায় মাথা তুলেছে মাঝারি ধরনের গাছ—গরান হাবলি কবঞ্চা, তলায় তলায় কাঁটা ঝোপঝাড়। তারপরে জঙ্গলের তৃতীয় মহল — রাজমহল, যেখানে বড় বড় ঝাউ আর কাজু-বাদামের গাছ মাথা তুলেছে আকাশে—বিশাল বলিষ্ঠ তাদের বাহুর মত

আন্দোলিত হয় দক্ষিণ উপসাগরের উদ্দাম ঝটকায়। এ চরের মানুষের চেনা-জানা জঙ্গলের প্রথম মহলের সঙ্গে। কিন্তু এই অন্ধকারে—শীতে কুয়াশায় নিরবচ্ছিন্ন তার তিন মহল জুড়ে যে-রূপ—তা যেন গিলতে আসছে।

আশপাশে জঙ্গলের বাইরে বাইরে ওরা মুকুন্দকে খুঁজলে খানিক। মুখের দু-পাশে হাতের তালু চোঙের মত করে হাঁক পড়লঃ

"মু-কুন্-দ......"

শুধু মাঠ-ভাঙা প্রতিধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল দিগন্ত থেকে।

কোনো সাড়া পেল না। ঝোপ-ঝাড় ভাঙা মড়মড় সর-সর শব্দটাও আর শোনা যায় না। কেবল শোনা যায় ভাগীরথীর আদিগন্ত বিপুল জলরাশির অবিশ্রান্ত ছল্‌ছল্‌ কলকল শব্দ, শীতের কুয়াশা ঢাকা নিশীথ রাত্রিকে যেন তা আরও নিবিড় রহস্যময় করে তুলেছে।

ওরা ফিরে এল।

ভোর না হতে হতে মুকুন্দের কুঁড়ের সামনে ছোটখাট একটা ভিড় জমে যায়। কেউ বললে—ভূতুড়ে কাণ্ড। কেউ সন্দেহ করলে—অন্য রকম। বললে, "ও ছুঁড়িটার বড্ড সুন্দরীপনা ছিল—ইদিক-উদিক হুট্‌-হাট করে বেড়ানো। তুই বউ মানুষ—অমন করবি কেন লা! মোদের কালে হলে মরদে দিত এক হাঁকাড়ি তো—বাস্‌।"

কালির মা বুড়ি বললে, "হাই মা গো, জঙ্গলে মোরা যাই নি? কতদিন গেছি কাঠ-কুঠো আনতে। মাথার চুল শনের নুড়ি হয়ে গেল। তো বল—এমন কাণ্ড কখনো ঘটেছে আর—অ হারানির মা!"

উল্টে হারানির মা খেঁকরে উঠল, "তুই চুপ কর বুড়ি—তোকে ধরবে কেন লা? অরা সব বয়েস কাল দেখে ধরে।" বলে দূরের সেই জঙ্গলের দিক চেয়ে হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ালে।

"চুপ কর দিকি। খালি ফ্যাচর ফ্যাচর করছে।" ধমকে উঠলে হারানির বাপ্‌।

হারানির মা সকলের দিকে চেয়ে সগর্বে বললে, "হাই শোন—হাঁকাড়ি শোন, তবু বুড়ি হয়ে গেলম!"

পুরুষেরা মুখ গোমড়া করে বসে আছে একপাশে। তারা ব্যাপারটার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। অপেক্ষা করছে ছোট মণ্ডলের জন্যে।

খানিক বাদে এল ছোট মণ্ডল। তাকে দেখে হরিদাসী আবার নতুন করে ডুকরে কেঁদে উঠল।

ছোট মণ্ডল জিজ্ঞেস করলে, "মুকুন্দ কোথায়?"

হরিদাসী কাঁদতে কাঁদতে বললে, "সে সেই কাল রাত থেকে একটা টাঙি হাতে করে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। এখনো ঘরে আসে নি। মোর কি হবে ছোট মণ্ডল?"

"এখনো আসে নি!" কপাল কুঁচকে উঠল ছোট মণ্ডলের। জনা কয়েক যোয়ান ছোকরার দিকে তাকিয়ে বললে, "তোরা জঙ্গলে খুঁজে দ্যাখ—পাগলা কোথায় ঘুরছে। তার বাপকে সামাল দিতে মোর মাথা খারাপ হয়ে যেত—ই ব্যাটাও মোকে জ্বালাবে ঢের মনে হচ্ছে।" তারপর হরিদাসীকে শুধালো, "বউ কোথায়?"

"কাল থেকে সেই যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—ওঠে নি।" হরিদাসী ফের ডুকরে উঠল, "ই বউয়ের সঙ্গে কি করে ঘর করব গো মণ্ডল!"—

ঘরের কথায় ছোট মণ্ডলের চোখ দুটো আপনা-আপনি গিয়ে পড়ে মুকুন্দের একবুক টেনে তোলা নতুন দেয়ালের দিকে। পড়ে আছে। আজ কেউ সেখানে কাজ করছে না।

হরিদাসী আবার বললে, "দুটি হাত এক করলে তুমি—তুমি দিলে মোর নতুন সংসারের পাত্‌না।"

শুনতে শুনতে কপাল কুঁচকে ওঠে ছোট মণ্ডলের। তার হার হয়ে গেল—মার খায় মনে মনে। একগাদা কথা হু-হু করে বয়ে যায় নিঃশব্দে। হ্যাঁ—গোবিন্দকে সে কথা দিয়েছিল, মুকুন্দের সে বিয়ে দিয়েছিল, নতুন ঘরের জন্যে কাল সন্ধ্যাবেলাতেই সে সাহায্যের কথা বলে গেছে। দেখতে দেখতে ছোট মণ্ডলের নোনা-পোড়া মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। মাথার খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুল, মোটা মোটা দুটো ভুরুর তলায় ছোট ছোট দুটো চোখ, চওড়া চোয়াল আর চৌকো চিবুক, —সবটা মিলে কেমন ভয়ঙ্কর দেখায়। পুরু চাপা দুটো ঠোঁটে দাঁত-চাপা ক্রোধ।

ছোট মণ্ডল ডাকল, "সাগর খুড়ি!"

সাগর খুড়ি চুপচাপ এতক্ষণ এক-পাশে থুঁৎনিতে হাত দিয়ে বসেছিল। বিধবা মানুষ। মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করে ছাঁটা—সারা মাথা শাদা হয়ে গেছে। রোগা রোগা মুখটায় বুদ্ধিদার মেয়েলোকের গাম্ভীর্য। ছোট মণ্ডল তাকে একপাশে একটু ডেকে নিল।

জিজ্ঞেস করলে, "বউয়ের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে খুড়ি?"

সাগর বললে, "হয়েছে।"

"কি বুঝলে বল দেখি।"

"কিছু বুঝতে পারলাম নি ছোট মণ্ডল। বউটা যা বলে"—সাগর বললে, "সে তোমার নিজের যেয়ে শোনা ভাল।"

"চল—মোকে নিয়ে চল।" ছোট মণ্ডল বলল, "তুমি থাকবে—তোমার মুখ দিয়ে কটা কথা জানা দরকার।" জমা ভিড়ের দিকে চেয়ে বললে, "তোমাদের কেউ এখন ঘরে এসো নি।"

সকৌতূহলে সবাই অপেক্ষা করতে লাগল—ঘরে ঢুকল সাগর খুড়ি আর ছোট মণ্ডল।

ছোট মণ্ডলকে দেখতে পেয়েই নয়ন ছুটে এসে তার পায়ে মাথা কুটতে লাগল। কোনো কথা বললে না—শুধু একটা চাপা ফোঁপানী ঘরের ভেতরের আধো-আলো আধো-অন্ধকারকে যেন ভারী করে তুললে।

সাগর খুড়ি বললে, "ছোট মণ্ডল কটা কথা জানতে এল বউ—এখন কান্না থামিয়ে সব ঠিক ঠিক বল।"

ছোট মণ্ডল জিজ্ঞেস করল, "লোকটা দেখতে কেমন?"

"চোখে মোর ধুলো-বালি এসে পড়ল।" নয়ন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, "অন্ধকার। ভালো করে দেখতে পাই নি।"

"তবু যেটুকু দেখেছিস?"

"মুসমুসে কালো—লম্বা। মাথায় বড় বড় শাদা চুল-দাড়ি গোঁফ। আর... আর..." থেমে গেল মেয়েটা।

"আর? আর কি?"

"বোধহয় নাঙ্গা—ন্যাংটা।"

অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সাগর খুড়ি আর ছোট মণ্ডল।

"তারপর......তারপর?"—

"মাকে ঘাড়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। মোর মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল। তবু আমি ঠেলে উঠতে চাইলুম।"

"তখন তাকে দেখিস নি? এক-টুনের জন্যে?"

"মুখ গুঁজড়ে পড়েছি আমি মাটিতে।"

"তারপর?"

"মোর কাপড়ে টান পড়ল। ঝটকা-টানে আমি ছিটকে পড়লাম। মোর বসন গেল।...মোর মনে নাই—আর কিছু মনে নাই।" বলে ডুকরে কেঁদে উঠল নয়ন।

যেন দম চেপে শুনছিল মহেশ মণ্ডল—ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললে, "এ কে!"

সাগর খুড়ি চাপা গলায় বললে, "বুঝে দেখ—কাপড়টাও নিয়ে গেল।"

"কি রকম কাপড় ছিল?"

"লাল ডুরে শাড়ি।"

গুম-মেরে দাঁড়িয়ে রইল মহেশ মণ্ডল। সাগর খুড়ি নীরব। বাইরে কার কাছে দুঃখের কাহিনী গাইতে গিয়ে হরিদাসী ডুকরে উঠছে আবার—এ বউ নিয়ে সে ঘর করবে কি করে!

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে থেকে

সারাদিনের আরাম... গরমে চলুন হালকা পায়ে

বাটার স্যাণ্ডাল আর চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া খেলতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ। সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই এরা তৈরি। পরলেই ভালো লেগে যাবে চমৎকার নমনীয় আপার। সুঠাম তালে চলার ছন্দ হালকা ও সাবলীল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয় বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যাণ্ডাল ও চপ্পলের যেন মেলা ব'সে গেছে—এখানে তার মাত্র কয়েকটি নকশাই দেখলেন। আসুন না, একবার পায়ে দেখুন।

থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে নয়ন। তার দিকে চেয়ে সাগর খুড়ি চাপা গলায় বললে, "ক'দিন সরিয়ে দাও ছোট মণ্ডল। পরে ভেবেচিন্তে"—

ঠিক কথা। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মহেশ। সাগর খুড়ি ভাল বুদ্ধি দিয়েছে।

মহেশ খুব নরম গলায় বললে, "তোর মাকে দেখতে যাবি নয়ন?"

তেমনি মুখ গুঁজে মেয়েটা মাথা ঝাঁকি দিলে। যাবে না।

তবু আর একবার টেনে টেনে বললে মহেশ, "মানে—এই দু-চার দিন ঘুরে এলে পারতিস—আর কি।"

হঠাৎ কি হলো মেয়েটার—কি বুঝলে মণ্ডলের কথায় কে জানে—যে-মুখ-লজ্জায় ঢেকে ছিল সে-মুখ তুলে তাকাল। চোখে নীরব জিজ্ঞাসা—দু-চার দিন কি চিরজীবন? ওর জলে-ভেজা ডাগর ডাগর দুটো চোখ ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রইল মহেশের মুখের দিকে। বোধ করি স্বভাব-সুলভ মেয়েলী অভিজ্ঞতায় জীবনের সুরুতেই মেয়েটা তার চরম পরিণামটাকে দেখতে পেয়ে গেল ছোট মণ্ডলের চোখে, কথায়। ধোঁয়ার গন্ধে মেশানো যেন সর্বনাশা আগুনের নিশানা। তাহলে চুকে-বুকে এল তার ক'দিনের ঘরকন্না? আর ছোট মণ্ডলের কড়া স্বভাব ও বিচারের ঢের কথা শুনেছে সে এ চরে বউ হবে এসে।

কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি কুনো দোষ করি নাই ছোট মণ্ডল। তুমি দোষীর বিচার কর।"

"করব।" এ-সব ব্যাপারে লোকটা যেমন ভেতরে ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে—তেমনি করে জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "তাকে আমি ঠিক খুঁজে—টেনে-হিঁচড়ে বার করব।"

বলল তো—কিন্তু সে কে? মনে মনে যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল লোকটা—উত্তরে সোনাডাঙা...বালিচক..হলদিয়া, দক্ষিণে মহম্মদপুর...চর সোনাবালি...ছোট বিষ্টুপুর...হিজলী...সেই রসুলপুরের নদী জঙ্গলের ধারে ধারে যত আবাদী চর—চেনা-অচেনা গ্রামের পর গ্রাম। নাঃ, সব শূন্য—ধোঁয়াটে, তার মধ্যে কোথায় আছে সেই অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব দুষমনটা কে জানে!

চোখে হতাশা — মনে নিরুপায় আক্রোশ।

সাগর খুড়ি বলল, "পেলে ঝাঁটায় তার বিষ ঝেড়ে দোব মা! কিন্তু সে কথা পরে। তুই থাকবি কি করে বউ? পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে—ওই তোর শাউড়ি চেঁচাচ্ছে। কাল থেকে তুই মুখে একটুও জলও দিস নি। তাই বলছিলাম, ক'দিন মায়ের কাছ থেকে"—

কথা শেষ হলো না—নয়ন বলে বসল, "না—ইজ্জৎ মোর যায় নি। চেতন হয়ে দেখলম—মোর বসন গেছে, ইজ্জৎ মোর যায় নি।"

সাগর খুড়ি কেমন যেন ধাঁধা-লাগা-চোখে তাকাল ছোট মণ্ডলের দিকে। মহেশ মাথা নিচু করলে।

নয়ন মরা শুকনো গলায় টেনে টেনে বললে, "তবু...তবু...সে যদি বলে—আমি...আমি চলে যাব।"—

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে।

মহেশ বা সাগর খুড়ি—কেউ আর কোনো কথা বলতে পারলে না। এ চরের ছোট মণ্ডল নয়, বিচক্ষণ বিধবা সাগর খুড়ি নয়, শাশুড়ী নয়—কেউ নয়, বিচার-সংসার-জীবন সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ নহলী জোয়ান ছোকরা একটা শুধু যদি চলে যেতে বলে—তবে সে যাবে, চলে যাবে। সতেরো আঠেরো বছরের যৌবনে উছলে পড়া একটা মেয়ের দেহের মধ্যে কিসে বাঁধা কি মন আছে—কে জানে! তার কাছে ছোট মণ্ডল আর সাগর খুড়ি যেন বোবা হয়ে গেল।

ছোট মণ্ডল বলল, "চল সাগর খুড়ি।"

ওরা বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে মানুষ-জন তখন আরও বেড়েছে।

গোলবদন ঠেলে এগিয়ে এল। উৎসাহটা যেন তার একটু বেশিই। কিছু-দিন আগে তার বিধবা বোনের কেচ্ছার ব্যাপারে মাথা কামিয়ে ষোল আনা জরিমানা দিয়ে খালাস পেয়েছে। বোনটাকে কোন বেনের দোকানে নাকি সন্ধ্যের পর হটর-হটর ধারে জিনিস আনতে পাঠাত। এগিয়ে এসে গোলবদন বললে. "কিছু জানতে পারলে ছোট মণ্ডল—লোকটা কে?"

মুকুন্দের সাঙাৎ হাবু। সে-ও এগিয়ে এসে বলল, "নামটা বল ছোট মণ্ডল। তাকে টেনে এনে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিচ্ছি। মারো লাথ।"

"তাকে বোধ করি মোরা কেউ চিনি না গো।" মহেশ বলল, "তবে খুঁজে বার করতে হবে।"

হাবু বলল, "বেশ বলো—কি রকম দেখতে।"

দূরের সেই জঙ্গলের দিকে পিট পিট করে চেয়ে চেয়ে কথা বলছিল মহেশ। বলল, "মাথা ভরতি বড় বড় শাদা চুল, মুখ ভরা দাড়ি গোঁপ—মুসমুসে কালো, বেশ ঢ্যাঙা...আর...আর নাঙ্গা।"—

শুনতে শুনতে সকলের চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এল। এমন অদ্ভুত মানুষ ওরা কেউ দেখে নি।

হারানির মা চোখ উল্টে বলে উঠল, "হাই দ্যাখ—ই মানুষ লয়।"

হাবু জোয়ান ছোকরা বিরক্ত হয়ে বললে, "ই একদম ভূতুড়ে কথা।"

গোলবদন মিচকি হেসে বলল, "গপ্প। গপ্প বানিয়েছে।" মহেশ কটমট করে তাকাল। গোলবদন চুপ করে গেল। মহেশ বলল, "সামনে মকর-সংক্রান্তি—সাগর মেলা। তাল পাটির খেয়া পার হয়ে ঢের সাধু-সন্ন্যাসী সুন্দরবন দিয়ে সাগর মেলায় যায়। তার মধ্যে নাঙ্গাও থাকে দেখেছি। এখন কার মনে কি আছে বুঝবো কেমন করে! তোকে সেই দিকে যেতে হবে হাবু—পারবি?"

"যাবো ছোট মণ্ডল—এখুনি বেরিয়ে পড়ব।" ছটপট করছে হাবু। বললে, "হাত মোর চুলবুল করছে মণ্ডল।"

"আগে খুঁজে বার কর—ধর। সঙ্গে তোর পছন্দমত দু-চার জনকে নিয়ে যা। আর...আর"...মহেশ একটু ইতস্তত করে বলল, — "মুকুন্দের বউয়ের খোয়া কাপড়টা হলো লাল ডুরে শাড়ি। নজর রাখবি।"

তারপর অন্য কয়েকজনার দিকে চেয়ে বল, "তোমরা ক'জন চলে যাও জঙ্গলের ধার ঘেঁষে যে-সব আবাদী চর—তার ভেতর দিয়ে। খোঁজ করে করে যাও—দু-পাঁচ দিনের মধ্যে ওই চেহারার লোক কেউ দেখেছে কি না।"

গোলবদন ফের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল—বললে, "আর আমি? আমি কোন্ দলে যাব গো মণ্ডল?"

মহেশ ধমকে উঠল, "তই শালা কোনো দলে যাবি নি বলে দিলাম। একগাদা মিছাকথা বলবি।"

গোলবদন আবার দমে গেল।

"বুড়া কলিমুদ্দীর কাছে যাই দেখি একবার—যদি কিছু বলতে পারে। এমন কাণ্ড আমি কখনো দেখিনি এ-চরে। জানি নি—সে জানে কি-না।" বলতে বলতে মহেশ মণ্ডল এগোলো।

কৌতূহলী ভিড় একটা লেগে রইল তার পেছনে পেছনে। চরের স্বাভাবিক জীবন—মাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ-কর্ম সব যেন আজ বিপর্যস্ত।

অনেক কথা ভাবতে ভাবতে চলেছে মহেশ। পুবচরের মাঠের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে—উত্তর সেই খালের মুখের দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ে যায় পাবনা—পবন শেখের কথা। তার

বউটার কথা।...একদিন এই মাঠের মধ্যে কোথায় শেষ চিৎকার করে বলে উঠেছিল—তার ইজ্জৎ চলে গেছে! আজ আবার সেই চরের আর একটা বউ আস্তে দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলে—না, ইজ্জৎ তার যায় নি। কি-ই বা বয়েস, পুঁচকে মেয়েটার কিন্তু কানে বাজে এখনো তার সেই জোর দিয়ে বলা গলা। মনে পড়ে গোবিন্দকে,—যাকে সে ভরসা দিয়ে বিদায় দিয়েছে। তার পরিবারের ভালো-মন্দ নিজেই সে কাঁধে তুলে নিয়েছে। সব মিলে কেমন একটা যন্ত্রণা যেন তার বুকের মধ্যে ছটফট করতে থাকে। সে মাতব্বর—তাকে বিচার করতে হবে। পাপের দণ্ড দিতে হবে।

কুঁচকে ওঠে কপালের রেখাগুলো মহেশ মণ্ডলের—ঝুলে পড়ে থুৎনি। হঠাৎ মনে হয়—যেন খুব বুড়ো হয়ে গেছে চরের ছোট মণ্ডল।

তার চেয়েও বয়সে ঢের বড় কলিমদ্দী।

সে হলো সেই প্রথম বিশজনের দলের শেষ মানুষ—এ চরের বন্ধ্যা মাটিকে একদিন যারা জননীর রূপ দিয়েছিল। সাপে-কুমীরে ঠাসা এর বাবলা বনঝাট আর বাদাবনের অন্ধকারে লুকানো ল্যাংটো দুরন্ত জংলী যুবতী একটাকে যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে শান্ত-শিষ্ট বউটির মত ভাগীথীর অগাধ জলরাশির পাশে বসিয়ে দিয়েছে। কোলে হাওয়ায় কিলবিল করে ছানাপোনার মত ফসল ভরা মাঠ।

বুড়ো হয়ে গেছে কলিমদ্দী। অনেক নোনা বান খাওয়া, অনেক ধস থেকে বাঁচা লম্বা লিকলিকে সেই নোনায় পোড়া পাথুরে কালো প্যাকাটে মানুষটা—বিপদ-আপদের সামনে স্নায়ু আর পেশীগুলোতে একদিন যার বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিত, আজ শিথিল হয়ে গেছে। সিধে কাঠামোটা যেন একটু ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। আসমান মরে যাওয়ার পর—পুনা চলে যাওয়ার পর সে যেন আরও ভেঙে পড়েছে।

কুঁড়ের সামনে রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিল কলিমদ্দী। পুনার বাচ্চা দুটো কিলবিল করছে আশেপাশে। হঠাৎ অতগুলো লোককে আসতে দেখে তারা ভয়ে ভয়ে দাদাজানের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

মহেশ বলল, "তোমার কাছে এলম শেখ। কালকের ব্যাপার শুনেছ?"

কলিমদ্দী মাথা নাড়ল। বলল, "কিছু কিছু শুনেছি।"

"এ চরের হাড়হদ্দ জানো তুমি।" মহেশ বলল, "এমন কাণ্ড আগে কখনো হয়েছে?"

কলিমদ্দী যেন চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর বলল, "নাঃ। তবে আসনাই ছিল—পাপও ছিল, চরের সে আদ্যিকালের কথা ছোট মণ্ডল—কেউ কারোর বশ লয়। যেমন গাঙের হড়পা বান—তেমন ছিল জীবন।"—

সে-জীবন যেন কোন্ অলক্ষ্য সুতো ধরে টান মারে আজ—কলিমদ্দীকে টেনে নিয়ে যায়। পাকা গোঁপ-দাড়িতে ভরা মুখটা থম্ থম্ করে, মোটাসোটা শাদা দুটো ভুরুর তলায় ঘোলাটে বুড়ো চোখ দুটো মনে হয় স্বপ্নাচ্ছন্ন।

"সাত সাত ব্যাটা মোর।" কলিমদ্দী বলে, "একটা একটা করে চলে গেছে সব। এই চরের মাটির তলায় ঢাকা পড়ে আছে তাদের হাড়গোড়। শেষ একটাকে কাঁধে করে লড়াই করেছি বানের সঙ্গে—গাঙের সঙ্গে। সহায় নাই—সম্বল নাই, শুধু এই দুটা হাত মোর। জঙ্গল কেটেছি—বান রুখেছি—মাটি জেড়েছি—আবাদ করেছি, ব্যাটাকে মানুষ করেছি। দ্যাখ দুটা হাত মোর—ঝুট বলি নি।"—

সামনে হাত দুটো মেলে ধরে কলিমদ্দী—চুপসে যাওয়া বুড়ো দুটো হাত—যেন চামড়ায় ঢাকা কংকাল, কড়া পড়া তালু—ফেটে ফেটে গেছে শীতের টানে। ওর কুঁচকে-যাওয়া চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে লুকানো এ চরের আবাদের আদিম ইতিহাস।

"কি পেলম?" কলিমদ্দীর গলা কাঁপে, "সারা জীবন এই লড়াই করে কি পেলম? আজ মোর পুনাও নাই—আর বউটাও নাই। হেই দেখ—গায়ে গায়ে লেপ্টে আছে আবার কচি বাচ্চা দুটা। লতুন কালের লতুন পাপের মুখে পড়ে গেল ওরা। আমি আর কি করব! মোর আর গতর নাই।" ক্লান্ত বিষণ্ণ ভাঙা গলায় আবার আস্তে আস্তে বলল, "আর গতব নাই।"—

বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা এসে জমল চামড়া কোঁচকানো দুই চোখের কোণে। ঝরে পড়ল। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বলল, "খোদা মেহেরবান।"

কাল ভাঙা মানুষ—এসে পড়েছে এক কাল থেকে আর এক কালে। নিজেব যন্ত্রণায় অস্থির। তার সামনে হট্ করে অনোব যন্ত্রণার কথা পাড়তে দ্বিধা হয় মহেশের।

কিন্তু কলিমদ্দী পাড়লে—তার নিজের মত করে। বলল, "মুকুন্দের বউয়ের কথা বলছিলে ছোট মণ্ডল। সে-ও লতুন কালের কোন লতুন পাপের দণ্ড হয়তো।"

"লতুন পাপের দণ্ড!" মহেশ যেন চমকে উঠল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে দণ্ড দিয়ে গেল? কি পাপ?"

"সকলের পাপের খবর মোরা কি জানতে পারি ছোট মণ্ডল?" কেমন রহস্যময় করে কথাটা বলল কলিমদ্দী।

মহেশ মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে, "ও ভাসা ভাসা কথার কাজ নয় শেখ। মোকে সব জানতে হবে। মোকে বিচার করতে হবে। এই দেখ—এরা মোর পিছন ছাড়ে নি, ছেঁকে ধরে আছে।" দেখিয়ে দিলে পেছনে অপেক্ষমাণ কৌতূহলী ভিড়। বললে, "প্রথম আবাদীকালের কথা বাদ দাও। আজ সে জংলী জালপাই মহাল হয়ে উঠেছে গ্রাম। ঘর-সংসার, ছেলে-বৌয়ের আপদ মোদের দূর করে তাড়াতে হবে শেখ, তারা যাতে সুখে-শান্তিতে থাকে।"

"তুমি কে! তুমি কে!" হঠাৎ উত্তেজনায় বুড়ো কলিমদ্দী সবেগে মাথাটা নাড়তে নাড়তে বললে, "দণ্ড যার দেওয়ার—সেই দিয়ে গেছে।"

"কে সে! জানো তুমি!" মহেশ উত্তেজিত। বলে উঠল, "কাল কেউ এসেছিল তা হলে চরে? দেখতে কেমন? মাথায় লম্বা লম্বা পাকা চুল—গোঁফ-দাড়ি—নাঙ্গা"—

"নাঙ্গা কি! নাঙ্গা নয়।"—

"মুকুন্দের বউ বলল"—

"বলেছে! তা হলে তাই হবে—মোর আউলিয়া ফকীর।"

"কি বলছ শেখ! তুমি তা হলে চেন তাকে!" উত্তেজিত মহেশ, দু'পা পেছিয়ে এসেছে—যেন এখুনি ছুটবে। পেছনে কৌতূহলী উৎকণ্ঠিত মানুষগুলোও যেন তৈরি। চঞ্চল।

স্থির অচঞ্চল গলায় কলিমদ্দী বলল, "তাকে চিনবি নি ছোট মণ্ডল! সে যে বড় খান মছন্দালি।" তারপর বিড় বিড় করে উঠল কলিমদ্দী আবার, "খোদা মেহেরবান।"

[ক্রমশ]

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

গ্রন্থমেলা

নকশালবাড়ি ও রাজনৈতিক আবর্ত—কৃত্তিবাস ওঝা ঃ গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২ দাম ঃ ৫·৫০।

সংবাদ একদিনের, সাহিত্য চিরদিনের। আবার এককালের সংবাদ নিয়ে চিরকালের সাহিত্য সৃষ্টি হয়—এমন বাস্তব ঘটনারও অভাব নেই। কিন্তু আগামীকালের কোনো ধুরন্ধর সাহিত্যিক বা নাট্যকার যদি ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পর থেকে পরবর্তী ঘটনা অবলম্বনে কোনো রাজনৈতিক উপন্যাস বা নাটক লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চান—তাহলে তিনি বিগত দিনে প্রকাশিত কোন্ তথ্যের ওপর নির্ভর করবেন? নিঃসন্দেহে বলা যায়, লক্ষাধিক প্রচারিত পত্রিকাগুলির পচা ও পুরাতন পৃষ্ঠাগুলি সত্যানুসন্ধানীকে প্রতারণা করবে। কারণ ঐ সব পত্রিকায় যে সব রাজনৈতিক সংবাদ তথাকথিত ঝানু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা লিখেছেন তা শুধু বিকৃতই নয়, সম্ভবত সত্যের ধারে-পাশেও যায় না। আমরা এই মন্তব্য করতে পারি এই সাহসে যে—তাঁরা যা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলেছেন—পরবর্তী কালই তা নির্মম বিচারে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে।

তবে সব সংবাদদাতা বা স্টাফ রিপোর্টারই অর্থমোহে মিথ্যাচার করেন নি। প্রমাণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি কৃত্তিবাস ওঝার নাম—যিনি সত্যের ফসল কুড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দিনে গণতান্ত্রিক মানুষকে অকপট রাজনৈতিক সংবাদ সপ্তাহের পর সপ্তাহ সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রচার করেছেন। আমরা যারা রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে অনভ্যস্ত, তারা কৃত্তিবাস ওঝা লিখিত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক-রাজনৈতিক সংবাদে বিস্মিত ও হতবাক হয়েছি। চারিদিকেই দেওয়াল, দুয়ার অর্গল বন্ধ। গোপন শলা-পরামর্শ; চক্রচক্রান্ত; বিশ্বাসঘাতকতা। তবু দেওয়ালের নাকি কান আছে, তাই পরদিনই অতি গোপন সংবাদ কৃত্তিবাস ওঝার কলমে পেয়ে জনগণ হতচকিত হয়েছে এবং কিছুটা সতর্কও।

পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকতা যে মুহূর্তে অর্থবান ও ক্ষমতালোভী মানুষের হঠকারিতায় বিভ্রান্ত হচ্ছিল, সে মুহূর্তে মাত্র দু-চারজন সাংবাদিকের মতোই কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর কঠিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং হতে চলেছে। এ সব কারণে অনায়াসে আমরা এখন বলতে পারি কৃত্তিবাস ওঝার যে সব লেখা বর্ধিত ও বিশদ আকারে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে এবং নতুন করে আরো যে-সব রোমাঞ্চকর ঘটনা উপরিউক্ত গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে তা বর্তমানকালের রাজনৈতিক তথা ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

কৃত্তিবাস ওঝা সাংবাদিকতার দ্রুততার জন্যই হয়তো গ্রন্থটি সম্পাদনার কাজে কিছুটা অন্যমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই ৫৪ পৃষ্ঠার ১৬ পঙক্তিতে থেকে গেছে "গত সপ্তাহে উগ্র বামপন্থী......"। সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশের সময় 'গত সপ্তাহে' যা লেখা হয়েছিল, গ্রন্থে তা থাকলো কেন? এরকম ত্রুটির সংখ্যা দু-তিনটি। গ্রন্থটিকে (ক) নকশালবাড়ি রহস্য (খ) আবামবাগ-নকশালবাড়ি ও তারপর (গ) ঘোষ মন্ত্রিসভা (ঘ) অন্তরালে (ঙ) অতঃপর (চ) পাশাখেলা (ছ) হার্ট অপারেশন (জ) নাটক (ঝ) ত্রুটাশ তুমিও! (ঞ) পরিক্রমণ (ট) কানু সান্যাল ও শেষ সংলাপ—প্রভৃতি অংশে ভাগ করে কখনো অস্বস্তিকর, কখনো ভয়ঙ্কর বা ভয়ানক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিন্তু মনে হয়েছে সাংবাদিক হিসেবে কৃত্তিবাস ওঝা কোথাও বিন্দুমাত্র নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করেন নি। ঘটনাগুলি শ্বাসরোধকারী; তবু সত্য ও অবিকৃত এবং স্বাধীন মনোভাবের পরিবেশক। এগুলি যাঁরা পড়বেন তাঁরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। কারণ এই পশ্চিমবঙ্গের সত্যিকারের কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক নেতা জনগণের কল্যাণকামী এবং কারাই বা হীন বিশ্বাসঘাতক এবং ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে জঘন্য চক্রান্তকারী—এই বই পড়লেই স্পষ্টভাবে এবং নামোল্লেখ সহ জানা যাবে। অবশ্য তাদের কার্যাবলীর বিবরণ প্রসঙ্গেই তাদের নামগুলি এসেছে—নেপথ্যাচার উদ্ঘাটনে কৃত্তিবাস ওঝা কোথাও কল্পিত চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। সাংবাদিক সততার ক্ষেত্রে, তাই তিনি প্রায় ধ্রুবতারাবৎ।

Mothers & Sons—Sarat Chandra Chatterjee : Translated by Dilip Kumar Roy, Pearl Publications Private Ltd., 249, Dadabhai Naoroji Road, Bombay 1 : Rs. 3.50

শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' এবং 'রামের সুমতি' কাহিনী দুখানির পরিচয় বাঙালী পাঠকের কাছে নতুন করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। 'নিষ্কৃতি'-তে শিবের মত আপনভোলা গিরিশ এবং তাঁর অন্নপূর্ণার মত পত্নী সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্রদ্বয় আমাদের মনকে যেমন করে স্পর্শ করে, ঠিক তেমনই চমৎকৃত করে 'রামের সুমতি'-র নারায়ণী এবং তাঁর বৈমাত্রেয় দেবর রামলালের চরিত্র দুটি। এ জিনিস বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ হয়েও শরৎচন্দ্রের রচনার প্রসাদগুণে দেশ ও কালের সীমাকে অনায়াসে অতিক্রম করেছে। শরৎচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চারজন শ্রেষ্ঠ রচয়িতার মধ্যে একজন একথা সর্বজনবিদিত। লাঞ্ছিত এবং অপমানিত মানুষের চরমতম আশা এবং পরমতম অধিকারের কথা তাঁর মত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে বোধ করি আর কেউ আমাদের শোনাতে পারেন নি।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার দিলীপকুমার রায় শরৎচন্দ্রের এই দুটি অবিস্মরণীয় কাহিনী ইংরাজী ভাষায় তর্জমা করেছেন। খুব কম সুরকারই সুলেখক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। দিলীপকুমার এঁদের মধ্যে অন্যতম। এই দিক থেকে তাঁর সঙ্গে ভাগনার অথবা সুমানের তুলনা করা যেতে পারে। এঁদেরই মত দিলীপকুমারের প্রতিভা দুটি ধারায় প্রবাহিত। একদিকে তিনি সুরসাধক, অপরদিকে তিনি মহান সাহিত্যিক। তাঁর অনূদিত Deliverance (নিষ্কৃতি) এবং The Complaint Prodigal (রামের সুমতি) পড়ে এই কথাই মনে হয় যে ইংরাজী এবং বাংলা দুটি ভাষাতেই তাঁর দখল অসামান্য। প্রথম রচনাটি শ্রীঅরবিন্দ revise করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি রচনায় Miss Joyace Chadwick দিলীপকুমারের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তিনিই গল্পটির নামকরণ করেছিলেন। বাংলা ভাষার নিজস্ব ইডিয়ামকে যেভাবে ইংরাজীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে তা সত্যিই সুন্দর। অবাঙালী পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের রচনা পরিবেশনের জন্য দিলীপকুমারের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

পাঠক মন

'কথায় কথায়' প্রসঙ্গে

নিবারণবাবু, আপনি সেদিন কথায় কথায় ৭৭।২ পার্ক স্ট্রীটের ভূতুড়ে বাড়িটির ভূতুড়ে কাহিনীর কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন, এ কাহিনী তো অফুরন্ত—একেবারে অমৃত-সমান।

মনে করুন আপনি একটি নাম-করা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিযুক্ত প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার পরীক্ষক। পরীক্ষান্তে পারিশ্রমিক চেয়ে বিল করতে গিয়ে দেখবেন, বিল ফরম পাঠান হয় নি এবং পর্ষদের নির্দিষ্ট ফরম ছাড়া অন্য কিছুতে বিল করা যাবে না নির্দেশ আছে। বার বার ঐ ফরমের জন্য লিখে বা লোক পাঠিয়েও বিল ফরম পাবেন না। এটা ব্যতিক্রমের চাইতে নিয়মে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে Compartmental Practical পরীক্ষার ব্যাপারে। যদি বিল করার সুযোগ ঘটে, এ সামান্য পারিশ্রমিক পেতে এক বছর, দু'বছর এমন কি তিন বছরও কেটে যায়। গত বছর Practical পরীক্ষা তো মার্চ-এপ্রিলে হয়ে গেছে, এক বছর ঘুরে এল, আর কয়দিন পরে এবারের Practical পরীক্ষা হবে—দেখবেন গত পরীক্ষার পারিশ্রমিক এখনও পান নি। আর ১৯৬৮-র Compartmental Practical পরীক্ষার বিলও করতে পারেন নি নির্দেশ্ট ফরম না পাওয়ার দরুণ।

আবার দেখুন, Practical পরীক্ষার Internal assessment-এর marks-এর একপ্রস্থ সীলমোহর করা খামে প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা থাকে, আর একপ্রস্থ পর্ষদের স্বর্গে দেবতাদের কাছে পাঠান হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বের হয় সাধারণত গ্রীষ্মাবকাশের অব্যবহিত পরে। গ্রীষ্মাবকাশের শেষের দিক হয়ত পর্ষদের স্বর্গে কর্তাদের কাছ থেকে এক জরুরী পত্র পেলেন—পত্র পাঠাবার সাতদিনের মধ্যে কতকগুলি Roll No-এর Internal assessment-এর marks স্কুল থেকে না পেলে ধরে নেওয়া হবে ঐ Roll No-এর পরীক্ষার্থীরা 'শূন্য' পেয়েছে। ঐ জরুরী চিঠি যখন বিদ্যালয়ে এসে পৌঁছল তখন হয়ত আর একদিন বা দু'দিন সময় আছে। এদিকে বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধ। যে নম্বর চাওয়া হয়েছে তা তো পর্ষদে অনেক আগেই পরীক্ষার সময় পাঠান হয়েছে। তবু এত হয়রানি পোহাতে হয় এদের কল্যাণে, তাও পর্ষদের দোষে পরীক্ষার্থী কেন 'শূন্য' পাবে? এ অন্যায়ের প্রতিকার কে করবে? আরো কত কাহিনী আছে—যদি চান, তাহলে পরে শোনান যাবে।

নিবারণবাবু, কথায় কথায় বলতে গিয়ে পার্ক স্ট্রীটের ঐ ভূতুড়ে বাড়িটার অপদেবতাদের অকর্মণ্যতা ও গাফিলতির একবার তদন্তের জন্য বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রেখেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি তদন্তের কি আর কোন আবশ্যক আছে। পর্ষদের বহু কেলেঙ্কারীর কথা আগে প্রকাশিত হয়েছে—প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া থেকে শুরু করে tabulator-দের কীর্তি এবং mark-sheet লেখকদের কারসাজি ইত্যাদি। তাই বলি আর তদন্ত কেন? এখন চাই এগুলো শোধরানোর দাওয়াই। পর্ষদের প্রশাসন শক্ত করতে না পারলে এ ক্ষত থেকেই যাবে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী (যাঁর সঙ্গে পনের বছরের ওপর ধরে শিক্ষা ও শিক্ষকসমাজের সেবা করে এসেছি) শিক্ষার বহু সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। পর্ষদের এসব অপদার্থতার কথা তাঁর অজানা নয়। যাই হোক, তাঁকে আপাতত বৃহত্তর সমস্যাগুলির কথা ভাবতে দিয়ে, আমাদেরই এগিয়ে আসা দরকার পর্ষদের এই অপদার্থতা দূরীকরণের উপায় চিন্তা করতে। আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই।

—শ্রীলোকানন্দ মজুমদার
কালনা রোড, বর্ধমান

* * *

"লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল" প্রসঙ্গে

'মুরশিদ'-এর জবাব খুব মনোযোগ দিয়েই পড়েছি। ভোটের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় মনটা ঝলসে যাবার উপক্রম হয়েছে, তাই লিখতে একটু দেরি হল।

সব সময় "সত্যি কথাটা" বড় একটা শ্রুতিমধুর হয় না জানি, তাই "সমঝদার আর অনুরাগী যে এক কথা নয়" একথা আমি অবশ্যই মানি।

বর্তমানে শিল্পীদের মধ্যে ঠুনকো সুরে এবং সহজে আসর মাত করে সুলভে যশ অর্জন করার স্পৃহা দেখা যায়। তার কারণ শ্রোতারা সুরসিক এবং বোদ্ধা নন—তাই বাজারের চাহিদা অনুযায়ীই শিল্পিগণ, গ্রামোফোন কোম্পানী এবং বেতার প্রতিষ্ঠান জেনেশুনেই অনেক অনাচারের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যশের উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে তাই দু'-একজন শিল্পী লোকসঙ্গীতের বাজারে যথেচ্ছাচার চালিয়ে শ্রোতাদের আরও নিম্নগামী করে তুলছেন। সে কথা এবারের সমালোচনায় মুরশিদ উল্লেখ করেছেন। এ জন্য দায়ী কে?

পরবর্তী সমালোচনায় (৭৩ বর্ষ : ৩৪শ সংখ্যা), কয়েকটি শিল্পীগোষ্ঠী এবং একক শিল্পীদের সম্বন্ধে মুরশিদ যা লিখেছেন, তা যে কোন নিরপেক্ষ অনুরাগী শ্রোতারই মনোযোগ আকৃষ্ট করবে। প্রতিটি সমালোচনাই আমাকে আনন্দ দিয়েছে। বিশেষভাবে আমার অতি প্রিয় শিল্পী শ্রীঅমর পাল ও শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের সম্বন্ধে মুরশিদ-এর প্রশংসা দেখে।

বেতার কর্তৃপক্ষের প্রসাদপুষ্ট শ্রীনীরেন্দু চৌধুরী, সুধীন মৈত্র, বীণা নন্দী প্রমুখ শিল্পীদের সম্বন্ধে আমি কয়েকদিন পূর্বে বন্ধুমহলে ঠিক 'মুরশিদ'-এর লেখারই প্রতিধ্বনি শুনেছি। আশ্চর্য বোধ হয় যে, এঁদের গানও রাত ১০টার পর শুনতে হয় এই ভেবে।

এটা তোষামোদ করার কথা নয় যে, লোকসঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে 'মুরশিদ'-এর লেখা দেখে মনে হল ছেলেবেলায় পূর্ববাংলার গ্রামে একতারা, দোতারা এবং খমকের সুরের আমেজে পল্লীর স্বভাব-কবির গান যেরূপ সুখশ্রাব্য হতো, বেতারে সেই পরিপূর্ণতা বড় একটা দেখা যায় না। 'মুরশিদ'-এর সমালোচনা পড়েই এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করার প্রয়াস পেয়েছি সে জন্য সাধুবাদ জানাই।

লোকসঙ্গীতের একজন অনুরাগী শ্রোতা হিসাবে 'মুরশিদ'-এর প্রতিটি লেখা আমি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে পাঠ করে থাকি জানবেন। লোকসঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাঁর মহান প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করুক এই কামনা জানাই।

—সুখেন মজুমদার
দেবীগড়
পোঃ মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগনা

রঙ্গমঞ্চে ওয়েস্ট এণ্ড * শিল্পী এবং প্রযোজক

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নর্মান মার্শ্যাল ও গেইট থিয়েটার ঃ পরের সিজন আরম্ভ হবার দু' মাসের ভেতর গেইটের সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গেল। এরপর ঠিক করা হল আর এখন নতুন সভ্য নেওয়া হবে না। কারণ আর বেশি সভ্যসংখ্যা বাড়ালে প্রতি নাটকের প্রদর্শনীর সংখ্যাও বাড়িয়ে দিতে হবে—তা না করলে সব সভ্যকে সব নাটক দেখানো যাবে না। আর তা যদি করা হয় তা হলে গেইটের প্রচলিত নিয়ম মত সিজনে সাতটি নাটক মঞ্চস্থ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যে দুটি নাটকের সাফল্যে গেইটের এই বিরাট ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল, সেগুলো হচ্ছে—'অসকার ওয়াইল্ড' এবং 'দি চিলড্রেনস আওয়ার'।

লর্ড এ্যালফ্রেড ডগলাসের সঙ্গে একমত হয়ে যখন আমি রসট্যাণ্ডের নাটকটি অভিনয় তালিকা থেকে তুলে নিয়েছিলাম, তখন লর্ড ডগলাস আমাকে বলেছিলেন যে, অসকার সম্বন্ধে অন্য কোন নাটক মঞ্চস্থ করলে তিনি আপত্তি করবেন না। এ বিষয়ে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে মত পেয়ে আমি লেজলি এবং সেওয়েল স্টোকসকে অনুরোধ করলাম গেইটের জন্য ওয়াইল্ডের ওপর একটি নাটক রচনা করতে যুগ্মভাবে। লর্ড এ্যালফ্রেডের কাছে নাটকটির পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হল—তিনি সম্মতি তো দিলেনই, এমন কি তাঁর চরিত্র নাটকে থাকার ব্যাপারেও আপত্তি তুললেন না।

ওয়াইল্ড সম্বন্ধে নাটকটি নিয়ে দিন চোদ্দর ওপর মহলা দেবার পর এক বিপদ দেখা দিল। যে নটটি ওয়াইল্ডের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, তিনি জানালেন যে, ভূমিকাটি তিনি ঠিক মত রূপায়িত করতে পারছেন না এবং সেই কারণে তিনি এই ভূমিকাভিনয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চান। এই রোলটিও ছিল প্রিন্স কনসর্টের রোলটিরই মত—অর্থাৎ দৈহিক সাদৃশ্যের দিকটায় যথেষ্ট প্রাধান্য না দিয়ে উপায় ছিল না অসকারের ভূমিকায়। নাট্যকারেরা যখন প্লেটি রচনা করছিলেন, তখন ফ্রাঙ্ক পেটিঙ্গেলের চেহারাটাই বার বার তাঁদের মানসপটে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পেটিংগেলকে আমরা সে সময় পেলাম না। কে একজন এরপর প্রস্তাব করলো যে, রবার্ট মরলে এ ভূমিকায় ভাল অভিনয় করতে পারবেন—অসকারের সঙ্গে তাঁর চেহারারও সাদৃশ্য আছে। মরলেকে আমি কেমব্রিজ ফেস্টিভ্যাল থিয়েটারের সভ্য হিসাবে আগেই জানতাম—সে সময় অভিনেতা হিসাবে কারোরই তার সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণা ছিল না। এর আগে আট বছর ধরে অভিনয় করা সত্ত্বেও সে কখনও লণ্ডন স্টেজে কোন চরিত্রে মঞ্চাবতরণ করে নি। এখানে সবাই তাকে জানতো একটি ছোট গল্পের লেখক হিসাবে—এই গল্পটির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং তাতে বিখ্যাত অভিনেত্রী ম্যারী টেম্পেস্ট নায়িকার রোলে নেমেছিলেন। কিন্তু মরলের সঙ্গে অসকারের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। ভাবলাম দেখা যাক না—অন্তত একটা দৃশ্য আমাদের কাছে রিডিং দিক। মরলে নাটকটির দু-এক পাতা পড়বার পরই বুঝলাম অসকারের ভূমিকায় তাকে নেওয়াটা হবে একটা আদর্শ নির্বাচন। এ ভূমিকায় তার অভিনয় দেখে লণ্ডনের দর্শকেরা পরে মন্তব্য করেছিলেন, বহুদিন এমন অসাধারণ অভিনয় তারা দেখেন নি। পরে নিউ-ইয়র্কেও আমরা নাটকটি নিয়ে গেছিলাম—সেখানে আরও বেশি সম্বর্ধনা পাওয়া গিয়েছিল।

'নট তাঁর অভিনয়শক্তি নিয়েই জন্ম গ্রহণ করেন' এবং 'নট অনুশীলনের দ্বারাই অভিনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন'—এই দুটি উক্তিই সমভাবে সত্য। [তবে এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—জিনিয়াস এবং ট্যালেন্টেড আর্টিস্টের ভেতর যে তফাৎ, বর্ন এ্যাক্টর এবং মেইড এ্যাক্টরের ভেতর ঠিক সেই পার্থক্য।] ভিন্‌সেন্ট প্রাইস ছিলেন বর্ন এ্যাক্টর। গেইটে যখন তিনি প্রথম অভিনয় করতে আসেন তখন সম্পূর্ণ এ্যামেচিওর হিসাবে এলেও, তাঁর অভিনয় দেখে মনে হত যেন অভিনয়-শিল্পী হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা বহুকালের। গেইট থেকে যখন তিনি নিউইয়র্কে ব্রডহার্স্ট থিয়েটারে অভিনয় করতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বিরাট প্রেক্ষাগারের সঙ্গে নিজের অভিনয়কে খাপ খাইয়ে নিলেন—যদিও এখানকার অডিটোরিয়ামটি ছিল গেইটের তুলনায় বিশগুণ বড়। নিউইয়র্কে প্রাইসের অভিনয় দেখে মনে হোত, তিনি যেন বছরের পর বছর বিভিন্ন আকারের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে অভ্যস্ত থাকার ফলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। অথচ

অভিনেত্রী ম্যারী টেম্পেস্ট

পেশাদারী হিসাবেই ছিলেন গেইটে আসবার আগে এবং গেইট থেকেই নিউ-ইয়র্কে যান। আসলে প্রাইস ছিলেন জাত অভিনেতা। রবার্ট মরলে কিন্তু বর্ন এ্যাক্টরের শ্রেণীতে পড়েন না। প্রথম দিকে তার বহু অভিনয় আমি দেখেছি—তার অভিনয় দেখে ভাবতেও পারি নি যে সে ভবিষ্যতে নট হিসাবে নিজেকে কখনও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। বহু বছর সে রেপারটরীতে কাজ করেছে এবং সফরকারী নাট্যকে দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই-ভাবেই সে অভিনয়-শিল্প আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছে। এত বছর শিক্ষানবিশী করবার পুরস্কার সে পেল গেইটে অসকারের ভূমিকায় অভিনয় করতে এসে—most people were of opinion that his performance was a triumph of casting rather than of acting. It was generally agreed that he was a personality rather than an actor. [রবার্ট মরলের সত্যিই এতোটা পার্সো-ন্যালিটি আছে বলে আমার মনে হয় না। স্টেজে তার ওয়াইল্ডের ভূমিকা দেখি নি—তবে ছবিতে দেখেছি। পার্সোন্যালিটি সব বড় অভিনেতাদের ভেতর দেখা যায়—যেমন দেখতাম শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র, রাধিকানন্দের অভিনয়ে—এ ব্যক্তিত্ব আসে এলিয়েনেশনের ফলে। ঠিক এই ব্যক্তিত্বই দেখেছি ইংলণ্ডের মঞ্চে গিলগুড, র‍্যাল্ফ রিচার্ডসন প্রভৃতির ভেতরে এবং জার্মানীতে মিসেস ব্রেশট বা হেলেনা ভাইগেলের অভিনয়ে। ব্যক্তিত্ব এবং অভিনয়-ক্ষমতা পরস্পর বিরোধী গুণ নয়—এরা পরস্পরের সহায়ক—লেখক।]

মরলে সম্বন্ধে এই উদ্ভট মতবাদটি এখনও প্রচলিত আছে। অথচ কথাটা সত্যি নয়—তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে ওয়াইল্ড চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের চরিত্রেও খাপ খাইয়ে অভিনয় করেছেন—যেমন 'দি ফার্স্ট জেন্টলম্যান' নাটকে প্রিন্স রিজেন্টের ভূমিকায়, 'ম্যারি এন্টয়নেটে' লুই দি সিক্সটিনথের রোলে, 'দি ম্যান হু কেম টু ডিনারে' শেরীডেন হোয়াইটসাইড রূপে, ডুমার 'দি গ্রেট রোমান্সার'-এ, 'পিগম্যা-লিয়নে' হিগিন্সের ভূমিকায় এবং 'মেজর বারবারাতে' আণ্ডারস্যাফট চরিত্রে। গেইটে 'অসকার ওয়াইল্ড' নাটকটি দেখানো হয়ে-ছিল ছ' সপ্তাহ ধরে। প্রতি প্রদর্শনীতেই প্রেক্ষাগার লোকে ভর্তি থাকতো। এর পর মঞ্চস্থ হল লিলিয়ান হেলম্যানের 'দি চিলড্রেনস আওয়ার'। এ নাটকটিকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে সেন্সর ব্যান করে দিয়েছিলেন। এতে গেইটে অভিনয় করে-ছিলেন ভ্যালেরী টেলর, উরসুলা জীনস এবং গ্লিনিস জনস (এইটিই মহিলার প্রথম রঙ্গমঞ্চে অভিনয়)। নাটক এত উৎরেছিল যে প্রতি প্রদর্শনীতে আমাদের বসবার জায়গা বিষয়ে রেশন করতে হোত—কোন সভ্যকেই দুটির বেশি টিকেট কিনতে দেওয়া হোত না।

উপরোক্ত দুটি নাটক অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। অন্যান্য পাঁচটি প্রডাক-সনেও যথেষ্ট দর্শক সমাগম হোত। ডায়না মরগ্যান এবং রবার্ট ম্যাকডারমটের লেখা মিউজিক্যাল স্যাটায়ার 'ইওর নাম্বার্স আপ'-এর বিষয়বস্তু ছিল অতি আধুনিক একটি পাবলিক স্কুলের কাহিনী। এর সংগীত পরিচালনা করেছিলেন জিওফ্রে রাইট। জাঁ জাক্‌স বার্নার্ডের 'ইনভিটেশন টু এ ভয়েজ' এবং সেওয়েল স্টোকস্‌-এর কারাগার-জীবন সংক্রান্ত 'আউট অফ সাইট', ভানসেনীর 'লর্ড এ্যাম্প্রিয়েন' এই সিজনে মঞ্চস্থ হয়েছিল। শেষ নাটক ছিল টোবাকো রোড—এটি দেখে অনেক সমালোচক বেশ শকড্‌ হয়ে-ছিলেন। এর মধ্যে একজন তাঁর নোটিশে লিখেছিলেন যে, "নাটকটি দেখে এমন গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করেছিল যে, সোজা রঙ্গালয় থেকে বাড়ি গিয়ে স্নান করে নেবার পর, তবে শরীর সুস্থবোধ করেছিলাম।"

দি টাইমস পত্রিকা মত প্রকাশ করে-ছিল যে, এ নাটকের নটনটীদের প্রতিভা এই ধরণের প্রডাকসনে নষ্ট না করে 'চার্লিজ আন্টের' অভিনয়ে আরোপ করলে তার সু-ব্যবহার হোতো।

The garbage heap and the muck-rake were the favourite similes for describing the play.

কিন্তু দু'-চারজন সমালোচক এই নাটকের বাহ্যিক ভয়াবহ নোংরা দিকগুলোর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নাটকটির আন্তরিকতা এবং সহানুভূতিসম্পন্ন করুণ-রসের দিকটা ধরতে পেরেছিলেন—দেখতে

নোয়ার ভূমিকায় জন গিলগুড

পেয়েছিলেন যে, পালাটির ভেতর রয়েছে একটা বিস্ময়কর অন্ধকারাচ্ছন্ন সৌন্দর্য—এর ভাষার ভেতর তাঁরা সাদৃশ্য পেয়েছিলেন সিঙ্গের ভাষার ছন্দোময়তার এবং স্বতঃস্ফূর্ততার।

গেইট সিজনের শেষে আমি লিরিক থিয়েটারে 'ভিক্টোরিয়া রেজিনা' প্রডিয়ুস করেছিলাম। আমি এবং গিলবার্ট মিলার যুক্তভাবে এটি প্রেজেন্ট করি। হঠাৎ সেন্সর কেন পূর্ব মত বদলিয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করবার জন্য লাইসেন্স দিলেন জানি না। গুজব শোনা গেছিল যে, এডওয়ার্ড দি এইট্থ নাকি এই ব্যান তুলে দেবার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন।

গেইটের পরের সিজন শুরু হল হিউ রস উইলিয়ামসনের 'মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন' নাটকটি দিয়ে। পার্নেল নাটকের অভিনয়ের সময় আমি অনেক চিঠি পেতাম, যাতে আপত্তি তোলা হয়েছিল যে, ঐ নাটকে গ্ল্যাডস্টোন চরিত্রের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় নি। আমি জানতাম যে উইলিয়ামসনও এই মতবাদের পরিপোষক ছিলেন। তাই তাঁকেই অনুরোধ করেছিলাম গ্ল্যাডস্টোনের উপর একটি প্লে লিখতে— অনুরোধ করেছিলাম যেন এই রচনায় গ্ল্যাডস্টোনের হোম-রুল সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টার একটা যথাযথ ঐতিহাসিক বিবরণী থাকে। গেইটে উইলিয়াম ডেভলিন গ্ল্যাডস্টোনের ভূমিকায় অভিনয় করেন—নাটকটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করলো যে, ঠিক করলাম এটিকে অন্য একটি মঞ্চে সরিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু লর্ড চেম্বারলেন লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করলেন—কারণ দেখালেন, যে দুটি দৃশ্যে রাণী ভিক্টোরিয়া রয়েছেন সেগুলো বেশ আপত্তিজনক। এখানে একটা কথা বলা দরকার—হাউসম্যান ভিক্টোরিয়া চরিত্র যেভাবে 'ভিক্টোরিয়া রেজিনা'তে এঁকেছিলেন, উইলিয়ামসন তাঁর 'মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনে' তার থেকে বেশি ক্রিটিক্যাল হয়েছিলেন রাজ্ঞীর চরিত্রচিত্রণে—কিন্তু রাণীর সংলাপে তিনি ভিক্টোরিয়ার প্রকাশিত পত্রাবলীর কথাগুলোই ব্যবহার করেছিলেন—নিজের ইচ্ছামত সংলাপ সৃষ্টি করেন নি। লর্ড চেম্বারলেন তাঁর কাজের দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, হাউসম্যান ভিক্টোরিয়ার চরিত্রচিত্রণে সরকারী অনুমোদন লাভ করলেন—কিন্তু যেহেতু উইলিয়ামসন সমালোচকের দৃষ্টিতে ভিক্টোরিয়ার চরিত্র দর্শকদের উপহার দিতে চেয়েছিলেন, সেই জন্যই তাঁর নাটককে পাবলিক শোয়ের ব্যাপারে নিষিদ্ধ করা হোল।

এই ব্যাপারে আইভর ব্রাউন লিখেছিলেন:

"To forbid a play favourable to Gladstone and less kind to Queen Victoria, after a less favourable picture has been allowed, puts the Lord Chamberlain's office in a most unbecoming light. The Lord Chamberlain is a Palace official but that is no reason for his being a Victorian partisan."

'মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের' পর গেইটে বার্নার্ডের লেখা আর একটি নাটক 'দি আনকোয়ায়েট স্পিরিট' মঞ্চস্থ হল। এতে অপূর্ব অভিনয় করলেন ক্যাথারিন লেসী। এর পরের নাটক ছিল এফিনোজেনভ্সের 'ডিসট্যান্ট পয়েন্ট'-এর এডাপ্টেশন করেছিলেন হিউবার্ট গ্রিফিৎস।

অনেককাল ধরেই আমার একটি সোভিয়েট প্লে প্রডিউস করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যেসব সোভিয়েট নাটক আমার পড়া ছিল সেগুলোর একটিও ঠিক পরিণত মনের দর্শকদের জন্য লেখা নয়। এগুলোর নাটুকেপনা, হাস্যরস এবং প্রচারের দিকটা এত বেশি প্রকট ছিল যে, ইংলণ্ডের দর্শকের কাছে ওগুলোর আবেদন ব্যর্থ হবে বলেই মনে হয়েছিল। 'ডিসট্যান্ট পয়েন্ট' ছিল এর ব্যতিরেক। আমার মনে হয় বিপ্লবোত্তর যুগের রাশিয়ায় রচিত নাটকের ভেতর এটিই সবদিক দিয়ে সেরা (অবশ্য নর্মান মার্শালের মত)। গেইটে নাটকটি মাঝামাঝি রকমের সাফল্য অর্জন করেছিল।। কিন্তু আমার মনে হয় গেইটে আমি যেসব নাটক প্রডিয়ুস করেছি এটিকে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলা চলে। নাটকটির ভেতর ছিল তীক্ষ্যতা, ছিল অদ্ভুত মঞ্চোপযোগিতা—নাটকের চরিত্রগুলোও খুব পারদর্শিতার সংগে রচিত হয়েছিল। ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার নাট্যসমালোচক লিখেছিলেন:

It is a refreshing reminder that Russians, whatever their political prejudices, can still be extremely charming. [ক্রমশ]

রঙ্গজগৎ

একটি তথ্যচিত্রের কথা

পশ্চিমবঙ্গের তথ্যচিত্রের প্রকৃতি বদলের প্রয়োজন সম্পর্কে কয়েক সপ্তাহ আগে লিখেছিলাম। রাজ্য সরকারের তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী এ ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন বলে শুনেছিলাম। সম্প্রতি এক খবর প্রকাশ হয়েছে যে, এক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান নিজেরা উদ্যোগী হয়ে 'মানুষের জয়যাত্রা' নামে একটি দুই রীলের ছবি তুলেছেন। এই ছবিতে ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল থেকে আরম্ভ করে ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে অভূতপূর্ব জয়লাভ এবং জনগণের উল্লাসের চিত্র তুলে রাখা হয়েছে। ছবিটির মুক্তিলাভের অর্থাৎ জনসাধারণের দেখার কোন সুযোগই ছিল না, যদি না যুক্তফ্রন্ট আবার মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারতেন। যুক্তফ্রন্টের তথ্যমন্ত্রী ছবিটি রাজ্য সরকার কর্তৃক ক্রয় করার ব্যাপারে যথার্থ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু গোলমাল বেধেছে সেন্সর বোর্ডকে নিয়ে। এই ছবি সেন্সর করা পশ্চিমবঙ্গের সেন্সর বোর্ডের এক্তিয়ারের মধ্যে। কিন্তু এখানকার বোর্ড ছবিটি পাঠিয়ে দিয়েছেন বোম্বাইয়ের সেন্সর বোর্ডের কাছে। নিজেরা দায়িত্ব এড়িয়ে কেন্দ্রীয় বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেওয়া বিশেষ অর্থপূর্ণ ব্যাপার। জনগণের বিশেষ আস্থাভাজন একটা সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকারের পক্ষে জনসাধারণের ছবি দেখাতে দিতে সেন্সর বোর্ডের ভয়। এই ঘটনা থেকে একদিকে যেমন বোঝা যায় কেন্দ্রীয় সরকার তার আমলাদের কিভাবে শিখিয়ে রেখেছে, তেমনি বোঝা যায় কি ধরনের লোক নিয়ে সেন্সর বোর্ড গঠিত হয়। অথচ কংগ্রেসী বা রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে তাদের কত প্রচার করা হয়েছে 'নাককে হাঁ-করে'। সে সময় সেন্সর বোর্ডের বুদ্ধিমান ভদ্রলোকদের মনে দ্বিধা দেখা যায় নি। কিন্তু যখনই একটা সরকারের পক্ষে জনসাধারণের এমন উল্লাস দেখা যাচ্ছে—যা ইতিপূর্বে কোন সরকারের পক্ষে দেখা যায় নি, একটা সরকারকে কেন্দ্র করে মানুষের মন যখন আশায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, এবং যে কোন মানুষ এই দৃশ্য প্রতিদিন দেখছে, উপলব্ধি করছে। সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা কিন্তু এসব কিছুই দেখছেন না তাই তাঁদের মনে দ্বিধা দেখা দিয়েছে। কারণ যে জন-উল্লাস ছবিতে দেখান হয়েছে এবং আমলা-পুলিশের যে কুকীর্তিগুলি ছবিতে উঠেছে সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যানের অভ্যস্ত চিন্তায় এ সব ত' বামপন্থী ব্যাপার, সিডিশন। এই আমলা এখনো উপলব্ধি করতে পারছে না—বামপন্থীরাই মন্ত্রিসভা গঠন করেছে, এবং যা ছবিতে দেখান হয়েছে তা' ঐতিহাসিক সত্য।

সেন্সর বোর্ডের এই মনোভাব থেকে বোঝা যাচ্ছে রাজ্য সরকার যদি তথ্যচিত্রের প্রকৃতি বদল করেন এবং গণতান্ত্রিক চেতনায় ছবি নির্মাণে উৎসাহ দেন তা' হলে কিন্তু যারা ভারতের কায়েমী স্বার্থের পক্ষে পাহারায় রয়েছে সেন্সর বোর্ড। বাধা দিতে না পারলেও অন্তত বোম্বাই পাঠিয়ে সময় নষ্ট এবং হয়রানি করাতে পারবে। আমরা খবর পেয়েছি 'মানুষের জয়যাত্রা'র মত আরো কয়েকটি ছবি তোলা হয়েছে বে-সরকারী উদ্যোগে। এ পর্যন্ত আমরা এরকম তিনটি ছবির খবর জানি। তার মধ্যে সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা একটা ১৬' মিলিমিটারের রঙিন ছবি তুলেছে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে গণতন্ত্রের জয়যাত্রায় উন্মুখ হয়ে এই যে ছবিগুলি তোলা হল এগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি, কারণ সেন্সর বোর্ডের মত পাহারাওয়ালাদের ছাড়পত্র পাওয়া যাবে কি? এই বোর্ড যখন রাজ্য সরকারের ওপরও ক্ষমতা দেখাতে পারে, তখন বে-সরকারী প্রযোজকদের সহজে ছেড়ে দেবে এমন মনে করা যায় না। হয়ত এর জন্যেও আন্দোলন করতে হবে। সেন্সর বোর্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে হবে। নতুবা এই ভদ্রলোকরা সহজে বুঝবেন না যে, জমানা বদল হয়েছে। এই অভিজ্ঞতায় আমরা পশ্চিমবঙ্গের রেজিওন্যাল সেন্সর বোর্ডের পুনর্গঠন প্রয়োজন মনে করি। —সুজন।

'অন্য মাটি অন্য রঙ' ছবিতে নূপুর বন্দ

চিত্র-সমালোচনা

তিন ভুবনের পারে

চিত্র প্রযোজকরা বর্তমানে পাড়ার মস্তানদের সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তপন সিংহ 'আপনজন'-এ প্রথম মস্তানদের হীরো করে শহুরে শিক্ষিত কর্মজীবী থেকে রাজনীতির ব্যাপারী পর্যন্ত সকলকে এক মানদণ্ডে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এবার সমরেশ বসুর 'তিন ভুবনের পারে' কাহিনীচিত্রটি মস্তানদেরই একজন সুবীর হীরো হয়েছে। শুধু হীরো নয়, কাহিনী লেখক রীতিমত একটা পথ বাতলে দিয়েছেন ওদের শোধরাবার জন্য। পথটা সম্পর্কে অভিভাবকদের, বিশেষ করে মেয়েদের ভাববার কথা আছে। তবে কাহিনীর বক্তব্য যাই থাক, পরিচালকের সময়-চেতনার গুণে ছবিটির আঙ্গিকে কিছুটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়-চেতনা প্রশংসনীয়।

কাহিনীর নায়ক সুবীর কারখানার শ্রমিক হলেও ছবিতে তার রকবাজীটাই প্রধান হয়ে দেখা গেছে। পাড়ায় নবাগতা এম-এ পাশ শিক্ষিকা তাদের নজরে পড়ে এবং সুবীর তার পিছু নেয়। প্রতিদিন

পিছু নেওয়ায় সরসী বিরক্ত হয়ে ধমকে দিলেও সুবীররা ওর দাদার সঙ্গে পরিচয় করে বাড়ি পর্যন্ত যাতায়াত করে এবং নানা উপকারে লাগে। এভাবে যাতায়াতে নাছোড়-বন্দা সুবীর সরসীর মনকে নরম করে তোলে এবং প্রেমে পরিণতি লাভ করে। বিয়ের প্রশ্ন এলে দাদার তীব্র আপত্তি এবং সরসী বাড়ি ত্যাগ করে সুবীরকে নিয়ে আলাদা এক মনোরম বড় ফ্ল্যাটে উঠে যায়। দু'জনের সঙ্গে তাদের পরিবারের সম্পর্ক না থাকলেও কর্তব্যপরায়ণ সুবীর মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাতে থাকে। সরসীর কড়া শাসনে সুবীর বি-এ, এম-এ পাশ করে শেষ পর্যন্ত ডক্টরেট লাভ করে অধ্যাপনা করতে থাকে। এই পরিবর্তিত জীবনে একদা কিছু পরিমাণ ভুল বোঝাবুঝি দেখা যায়। সুবীরের ছাত্রী এক ধনী কন্যা সুবীরের প্রতি হঠাৎ অনুরাগী হয়ে উঠে তাকে সিমলায় এক নতুন চাকরীতে যেতে প্রলুব্ধ করে; সরসীর শাসনে সুবীরও কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছে—কারণ এতদিনে সুবীরের যে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে সেদিকটা সরসী লক্ষ্য করে নি। এক্ষেত্রেও দেখা গেল সুবীরের বিবেচনা সরসীকে ছাড়িয়ে গেছে, তাকে মানুষ করে তোলার কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসাকে সে মলিন হতে দিল না।

রকবাজ বা মস্তানদের সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা, তাদের বিভ্রান্ত হবার কারণ অনুসন্ধান করা ইত্যাদি কথা অনেকে বলে থাকেন। এটা একটা সামাজিক সমস্যা। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশে মস্তানীর জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকেই দায়ী করা হয়। শিক্ষা, চাকুরী, সম্মানজনক জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা থাকলে মানসিক অসুস্থতা ছাড়া মস্তান বা রকবাজ হবার কারণ নেই। এ বিষয়ে ত্রিশ দশকে বিখ্যাত মাকারাঙ্কো অনেক চিন্তা করেছেন, তাঁর লেখা 'রোড টু লাইফ' চিত্ররূপও লাভ করেছে। কিন্তু বাঙালী সাহিত্যিক সমরেশ বসু সমাজব্যবস্থা এবং সমাজ পরিবর্তনের কথা বলার মত সাহস রাখেন না, চিন্তা করার ক্ষমতাও নেই। তাই সহজ পথ বাতলেছেন শিক্ষিতা চাকুরীজীবী মেয়েরা এই মস্তানদের বিয়ে করে ঘর বাঁধ—দেখবে ওরা ভাল হয়ে গেছে। ওদের মধ্যে এত প্রতিভা লুকিয়ে আছে যে বাবার টাকায় লেখাপড়া না শিখলেও বৌয়ের শিক্ষায় ওরা ডক্টরেট পাবার ক্ষমতা রাখে।

'শেষ থেকে সুরু' ছবিতে সমীরকুমার ও বিদ্যা রাও

সুবীরের ছোট ভাইয়ের একটি চরিত্র রয়েছে। পরিবারের দারিদ্র্যে সে পীড়িত; সে চিন্তা করতে পারে কিন্তু পথ খুঁজে পায় না বলে আত্মহত্যা করে। যে যুবক ভাবতে পারে যে—'এ-সমাজে আমরা কেউ বেঁচে নেই', কাহিনীকার তাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়ে চিন্তার শেষ করে দিল। আর যে হাল্কামন, খাও-দাও-বাঁচ নীতিতে বিশ্বাসী সে-ই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকল; আত্মকেন্দ্রিকতার নমুনা হিসাবে। তাই কোন বলিষ্ঠ বক্তব্য ছবি থেকে উচ্চারিত হতে পারল না।

কাহিনী বলিষ্ঠ চিন্তাপ্রসূত না হলেও পরিচালক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ছবিটিকে উপভোগ্য করেছেন। চিত্রগ্রহণের নৈপুণ্য (রামানন্দ সেনগুপ্ত) উল্লেখযোগ্য। প্রধান দুটি চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজার অভিনয় যথাযথ: তবে তনুজাকে বাংলার বাইরে বড় হয়েছে বললে উচ্চারণের দোষ যুক্তিযুক্ত হত। অন্যান্য চরিত্রে আছেন সুমিতা সান্যাল, কমল মিত্র প্রমুখ।

শেষ থেকে সুরু

'চিত্রসাথী' পরিচালিত সাহা চিত্র-পীঠের 'শেষ থেকে সুরু' হাসি-অশ্রু ও কৌতুকে ভরা এমন একটি চলচ্চিত্র, যা আবেগপ্রবণ সকল রকম দর্শকদের বেদনায় ভরপুর এবং আনন্দে উজ্জ্বল করে তুলবে।

কাহিনী লিখেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও কাহিনীর শুরু এবং শেষ কলকাতার কাছেই এক শ্মশানে, তবু কাহিনীর রসব্যঞ্জনায় জীবনের জয়গানই নিবিড়-ভাবে প্রতীয়মাণ।

'শেষ থেকে সুরু'র কাহিনীতেও

মাসিক ১০্ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০্। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা হিন্দীতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B. C.) P.B. 2123, Delhi–7

পুত্রবধূ কর্তৃক শ্বশুরকে নিগ্রহের ঘটনায় পারিবারিক কথা আছে; আছে নিরুপায় এবং স্নেহার্ত দাদুর সংসার ত্যাগের করুণ স্মৃতি, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শ্মশানে গিয়ে তাঁর উপজীবিকা হিসেবে স্টুডিয়োর দোকান খোলার কথা। কিন্তু এই দোকানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিচিত্র জীবন-কথা। এই দোকানের মালিক নীলমণি আর তাঁর এ্যাসিস্ট্যান্ট ভোলার কাছে,—রাত নেই, দিন নেই,—যখন-তখন আসে শ্মশান-যাত্রীরা মৃতের ফটো তোলাতে। রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে যে-সময় দুর্দিন, তখনই এদের ব্যবসায়ে আসে সুদিন। এতদ্‌সত্ত্বেও ব্যবসায়ী ফটোগ্রাফার নীলমণির দুর্বল মনে উঁকি মারে স্নেহার্ত দাদুর অগাধ ভালোবাসা, আর তখনই তিনি যেন ভেঙে পড়েন। মৃতের ফটো তুলতে তুলতে তিনি শুনতে পান স্বজনহারানো শ্মশানযাত্রীর বুকফাটা কান্না এবং এই মৃত স্বজনদের মধ্যে কেউ কোনো দাদুর একান্ত স্নেহের আধার, কেউ বা রেখে-যাওয়া একমাত্র শিশুর মা, আর কেউ ব্যর্থ জীবনের হতা-শ্বাসে তিক্ত প্রেমের যূপকাষ্ঠে আত্মহত্যা-কারী, কেউ বা হন্তারক। সদ্যমৃতকে কেন্দ্র করে সন্দেহ কিংবা সদ্যমৃতকে ভোলার জন্য সুরা পানোন্মত্ত স্বামীর অপচেষ্টা—এমন সব টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে 'শেষ থেকে সুরু' সমাজের ব্যর্থ বেদনার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যের এটা গেল একটা দিক। আর এক দিকে আছে শ্মশানযাত্রীদের হৈ-হুল্লোড় ও ফুর্তি করার ব্যাপার। আর বিশেষভাবে যেদিকটা দর্শকদের মধ্যে কৌতুক ও আনন্দের সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে, শ্মশানঘাটের পুরুতঠাকুর দীননাথের মেয়ে রাণীর সঙ্গে ফটোর দোকানের ভোলার প্রণয়কাহিনী। অবশ্য এই আনন্দ ও কৌতুকে রসের যোগান দিয়েছে আত্ম-ভোলা ও শিশুপ্রিয় এক উদারচিত্ত সন্ন্যাসী।

নীলমণি সংসার ত্যাগের পর সংসারের প্রতি বীতরাগ হলেও পারিবারিক স্নেহ-বন্ধন প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর মধ্যে ছিল সকলের ওপরে। ভোলা ও রাণীর প্রণয়কে তিনি ভালো চোখে গ্রহণ করতে প্রথমে পারেন নি, সেই কারণে ভোলা তাঁকে ত্যাগ করে চলে যায় এবং সন্ন্যাসী ভোলার মৃতদেহ স্টুডিয়োতে আনার ব্যবস্থা করে যাতে ভোলার শেষ ইচ্ছে মতো নীলমণি ভোলার মৃতদেহের একটা ফটো তোলেন। ভোলার মৃতদেহ দেখে নীলমণি নিদারুণ শোক-গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বহু চেষ্টা করেন ফটো তুলতে, কিন্তু তা যেন তাঁর সাধ্যাতীত। এমন সময় ভোলা ধড়ফড় করে তন্দ্রা থেকে উঠে পড়ে। এরপর রাণী

সত্যেন বসুর 'ওয়াপস' ছবিতে শ্রীমতী অলকা

এবং ভোলার বিবাহ বন্ধনের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। নীলমণি আনন্দে আটখানা হয়ে বলেন—এখন থেকে তিনি মৃতের নয়, চলিষ্ণু জীবনের টাটকা জীবন্ত ছবি তুল-বেন।

কাহিনীর শেষাংশে কৌতুকহাস্য খুব জমে উঠলেও ঘটনাটির মৌলিকত্ব দাবি করতে পারেন না কাহিনীকার। বিশ্বপতি চৌধুরী লিখিত এই ধরণের একটি ব্যাপার আছে—যা 'রসচক্রে' একদা বাস্তবে ঘটে-ছিল। দ্বিতীয়ত শ্মশানের বিষয় অবলম্বন করে সমাজ ও জীবনকে কিভাবে উপ-স্থাপিত করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্রই 'অভাগীর স্বর্গ'-তে পথ প্রদর্শন করেছেন—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তৎপ্রদর্শিত পথেই আরো নতুনত্ব ও চমৎকারিত্ব এনেছেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে 'শেষ থেকে সুরু' সম্পূর্ণ নতুনভাবের কাহিনী না হলেও চলচ্চিত্র জগতে এ অভিনব রসাস্বাদের। এই চলচ্চিত্রের দুর্বল অংশ মনে হয়েছে রক এ্যান্ড রোল অংশটুকু। সমাজের এক দিককার একটা চিত্র হিসেবে এ অংশ যদি রাখাও যায়—তবু এতোটা স্থানাধিকার পাওয়া অনুচিত।

অভিনয়নৈপুণ্যে প্রায় সকলেই প্রয়োজনানুযায়ী যোগ্যতা দেখিয়েছেন এবং টীমওয়ার্ক সুষ্ঠু বলে মনে হয়েছে; এছাড়া গভীরভাবে মনে রেখাপাত করে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (নীলমণি), সবিতাব্রত দত্ত (সন্ন্যাসী), সমীর মজুমদার, বিদ্যু রাও, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমানী প্রমথের অভিনয়। সবিতাব্রত-র কণ্ঠে 'শোন ভাই শোন বলি' গানটি কাহিনীর হাসি-কান্নার সুরটিকে উপলব্ধি করতে দর্শক-শ্রোতাদের প্রচুর সহায়তা করেছে। কিশোরকুমারের গানের সুরারোপে কিশোর-কুমারকে নতুন করে তুলে ধরার চেষ্টা হয় নি।

হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে ৪ঠা থেকে ৯ই এপ্রিল হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্র

উৎসব শুরু হয়েছে। এই উৎসবে দেখানো হচ্ছে: নিউ গিলগেমস, আই উইল গো টু দি মিনিস্টার, গোল্ডেন কাইট, কারেণ্ট। উৎসব উদ্বোধন করেছেন হাঙ্গেরীয় জনগণতান্ত্রিক রিপাবলিকের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি মিঃ জি, জিপানী। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের পরিভ্রমণমন্ত্রী শ্রীবরদা মুকুটমণি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমধু বসু।

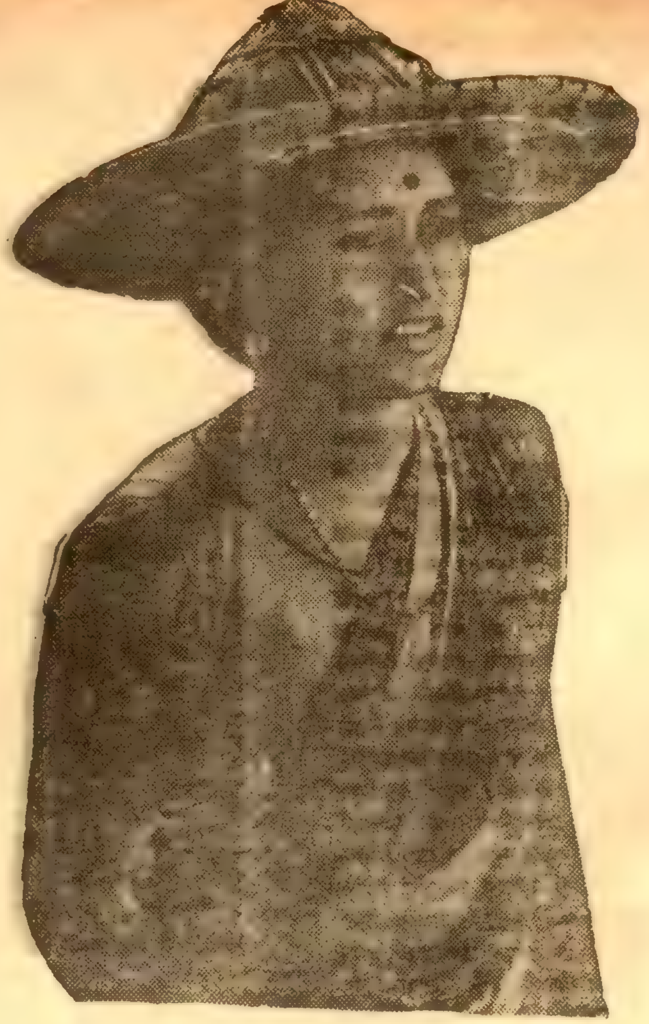

'শুকসারী' ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক

সংবাদকণী

তরুণ অপেরার হিটলার যাত্রাভিনয়ের

১৫০ তম রজনীর বিজয়োৎসব

৪ঠা এপ্রিল মহাজাতি সদনে 'হিটলার' যাত্রাভিনয়ের ১৫০ তম রজনী উপলক্ষে তরুণ অপেরা যে উৎসবায়োজন করেন, তাতে নাট্যকার থেকে সুরু করে সমস্ত নট-নটী, কলাকুশলী এবং যাত্রা পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমন্মথ রায়। উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে, হিটলার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তরুণ অপেরা যাত্রাজগতে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন এবং এইভাবে যুগ পরিবর্তনের মধ্যে যাত্রাভিনয়ে যে নবযুগের সৃষ্টি হচ্ছে, তা যাত্রাকে চিরস্থায়ী করে তুলবে।

প্রধান অতিথি ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য বলেন যে, যুগ পরিবর্তনেও যাত্রা লোকশিক্ষার জন্য পল্লীগ্রাম ও শহরে অভিনন্দিত হবে। সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী বলেন যে, বাইরের কঠিন জীবনে আবদ্ধ না হলেও যাত্রার আছে আপন বিধি, সেখানে সে সুশৃঙ্খল, সুসংবত, স্বাধীন কিন্তু নিয়মানুবর্তী যাত্রার সহজ সরল সুরে গূঢ় তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশিব ভট্টাচার্য বিবরণী পাঠ করেন। এরপর জনসমাগমে পরিপূর্ণ মহাজাতি সদনে যে 'হিটলার' মঞ্চসাফল্যে গৌরবমণ্ডিত হয়েছে তা পুনঃপ্রদর্শিত হয়।

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W.)
P.B. 86, JULLUNDUR CITY

নন্দিতা পুরস্কার

রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর স্মরণে তাঁর স্বামী শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী তিন হাজার টাকার এক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সর্বশ্রেষ্ঠা মহিলা শিল্পীকে প্রতি বছর এই পরিমাণ টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে।

ভারতের বনজীবন

তথ্যচিত্র "ভারতের বন্যজীবন" ১৬শ আন্তর্জাতিক পারমাণবিক ইলেকট্রনিক ও

বেতার চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে 'যুবকদের' বিভাগে প্রথম পুরস্কার 'স্বর্ণ স্পুটনিক' লাভ করেছে। ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর এবং যোগাযোগ দপ্তরের চলচ্চিত্র বিভাগ এই তথ্যচিত্র প্রযোজনা করেছে।

গণ-থিয়েটার

দিল্লী থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল অঞ্চলের ছোট শহরে গণ-থিয়েটার নামে ছোট ছোট থিয়েটার চালু করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগ্রহী। এরকম থিয়েটারের ব্যাপারে সাহায্য দেবার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিন্তা করছে।

স্মৃতি অনুষ্ঠান

'সাজ ও আওয়াজ'-এর উদ্যোগে আগামী ১৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার, ১৬, অক্রূর দত্ত লেন—মিউজিক রুমে শিল্পী মলয় মুখোপাধ্যায়, অরুণাভ মজুমদার, রতন গাঙ্গুলী ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী (২য়) পালন করা হবে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময় শিল্পীরা কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন, তবে পূর্বাহ্ণে তাঁদের অংশ গ্রহণের কথা জানাতে হবে। সংগঠনের পক্ষে শ্রী ভি. বালসারা শিল্পীদের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

"তীরভূমি" ছবিতে মাধবী মুখার্জী ও মঞ্জু দে

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

নর্থ ক্যালকাটা ড্রামাটিক এ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত রবীন্দ্রসঙ্গীত আবৃত্তি ও যে-কোন নাট্যকারের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা আগামী ২৪শে বৈশাখ ইং ৭ই মে, ১৪।২ ভৈরব মুখার্জী লেন, কলকাতা—৪, আর-জি-কর হাসপাতালের উল্টো দিকে অনুষ্ঠিত হবে। উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ পত্রালাপ করুন। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৯।

—সম্পাদক

ফেডারেল জার্মানীতে 'গিজেল' ব্যালে নৃত্যে রুডলফ নুরেইভ ও প্রাইমা ব্যালেরিনা নার্গিয়া হেতি।

মুক্তি প্রাপ্ত ছবি

হিন্দীঃ ওয়াপস—সত্যেন বসু।
রোড টু সিকিম—রবীন্দ্র দুবে।

বিদেশীঃ আইন স্টেশন জেব্রা—এলিট।
বোর্ন এন্ড ব্রাইড—নিউ এম্পায়ার।
ফ্যাদম—গ্লোব

খেলাধুলা

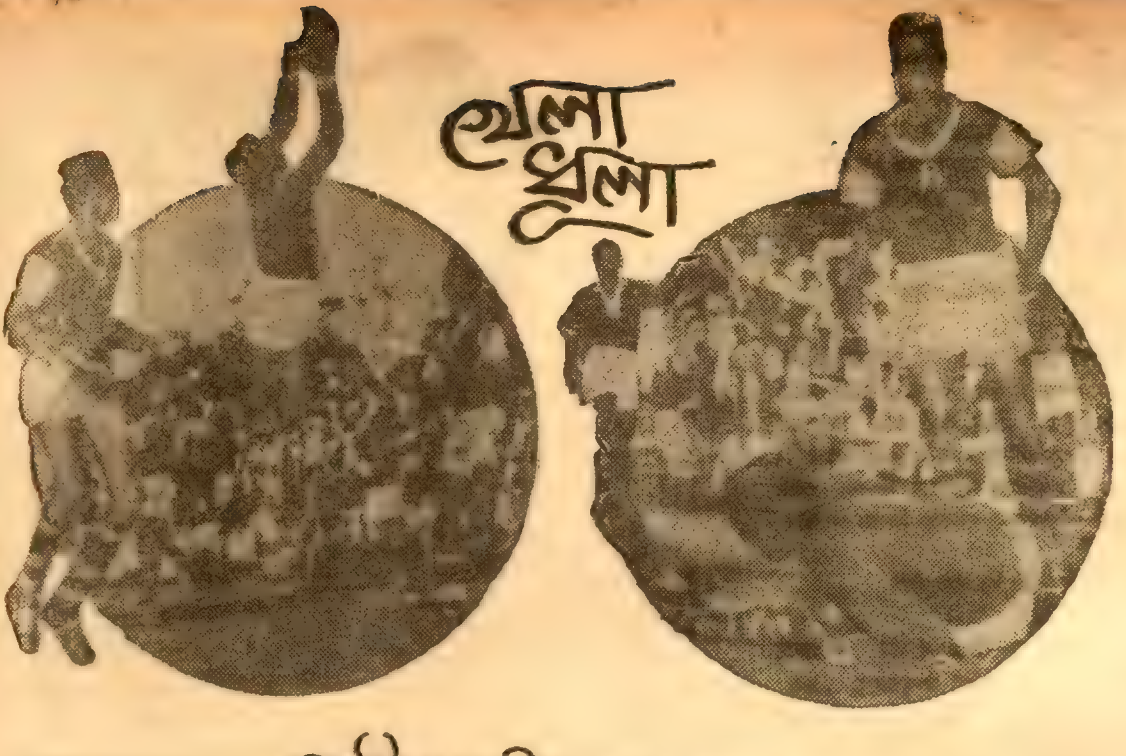

জাতীয় ফুটবল ও বাংলা

জা তীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষের দিক্‌কার খেলাগুলো নিয়ে এবার যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। ভুল বোঝাবুঝি, বললে বোধহয় সত্যি ঘটনার গুরুত্ব কিছুটা কমে যাবে। তাই ব্যাঙ্গালোরে সন্তোষ ট্রফির খেলা নিয়ে এবার যা হলো তাকে শুধু বলা চলে পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্তের সফল অনুষ্ঠান। আর বিচ্ছিন্ন ঐ ঘটনাগুলো থেকে এ কথা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ছলে বলে কৌশলে বাংলাকে হারানোই ছিলো সমস্ত চক্রান্তের একমাত্র লক্ষ্য। আর সেই দিকে তাকিয়েই প্রস্তুত হয়েছিলেন সকলেই—বোধহয় প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষরাও। তা না হলে কিভাবে একের পর এক এমন অভাবনীয় ঘটনাগুলো ঘটলো? ঘটলো কর্তৃপক্ষের চোখের সামনে, অথচ তাঁরা সেদিকে ফিরেও তাকালেন না, এতোটুকুও নজর দেবার প্রয়োজন অনুভব করলেন না তাঁরা। তাই আজ আমরা যদি এ অভিযোগ করি যে, মহীশূরের হাতেই সন্তোষ ট্রফি তুলে দেবার ইচ্ছে ছিল কর্তৃপক্ষের—তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের কাছে সে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পরিগণিত হবে না। কারণ পরস্পর সংঘটিত ঘটনাগুলো যে আমাদের এই অভিযোগকেই আরো বেশি জোরদার করে তুলেছে। সেই সংগে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে এও দেখিয়ে দিয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ কতো উদাসীন। সেই সংগে বাংলাকে কোণঠাসা করার প্রচেষ্টা আর একবার প্রকট হয়ে উঠলো। বাংলা হেরেছে, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু যেভাবে এবার বাংলাকে হারতে হয়েছে তার জন্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আমাদের মনে দানা বেঁধে উঠেছে। হেরে গিয়ে আমরা সাফাই গাইছি না, আমরা চাইছি প্রতিকার। খেলাধুলোর পবিত্র আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই আমাদের এই অভিযোগ, আমাদের এই আবেদন।

যা ই হোক এবার আমরা আমাদের এই অভিযোগ প্রমাণ করতে ফিরে যাই ব্যাঙ্গালোরের খেলাগুলোর দিনে। প্রথমেই ধরা যাক মাদ্রাজ আর মহীশূরের খেলার শেষে টসের বিষয়টির কথা। সেমিফাইন্যালে দ্বিতীয় দিন খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর টস করা হলো। মহীশূরের অধিনায়কই টস করলেন। মুদ্রাটি মাটিতে পড়তে না পড়তেই মহীশূরের কর্মকর্তারা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন—সেই সংগে মেতে উঠলেন দর্শকরাও। অথচ টসে জিতে-ছিলেন মাদ্রাজের অধিনায়ক। বিচারক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডিমেলোও মাদ্রাজের অধিনায়কের সংগে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে লাভ হলো না কিছুই। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে আবার খেলার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও মাদ্রাজ দল প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। মাদ্রাজের কথা থাক। এবার বলি ফাইন্যালে বাংলা বনাম মহীশূরের খেলার কথা। আজিজ আর ভবানী রায় তখন ছিলেন মুখোমুখি। শেষ পর্যন্ত আজিজের পায়ে লেগে বল গোল লাইন পার হয়ে যায়। রেফারী এক্রামুল হক দিলেন কর্নারের নির্দেশ। ভবানী রায় এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে হক সাহেব তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে নাম টুকে নিচ্ছিলেন নোটবুকে। সেই অস্বাভাবিক ও অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে আমজাদের কর্নার কিক থেকে বল পেয়ে নটরাজ হেড দিয়ে গোল করলেন। আর সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে রেফারী গোলটা নাকচ করলেন না। এখানেই শেষ নয়। খেলা শেষ হবার সংগে সংগে দর্শকরা বাংলার খেলোয়াড়দের আক্রমণ করে বসলেন। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আহত হলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিযোগিতার কিম্বা মহীশূরের কর্তৃপক্ষ কিম্বা খেলোয়াড়রা এগিয়েও এলেন না বাংলার খেলোয়াড়দের রক্ষা করতে। পুলিশও বিশেষ কিছু করলো না। ফলে অখেলো-য়াড়ী খেলায় বাংলার খেলোয়াড়রা মার খেলেন, সেই সংগে বাংলাও হারলো। তা হারুক.... কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এ কেমন ধরণের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা? যেখানে নিয়ম নেই, শৃংখলা নেই, নেই খেলার মতো আবহাওয়া—কেন সেখানে ব্যবস্থা করা হয় জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার? এ ধরণের ছেলে-খেলা না করলেই কি নয়......?—শান্তিপ্রিয়॥

ইডেন থেকে

ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যান এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পত্তি। ইডেন উদ্যানের গ্যালারী থেকে আরম্ভ করে সব কিছুরই দখল নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে কি সি· এ· বি আর এন· সি· সি উদ্বাস্তু হলো। না, তা এখনো হয় নি। তাদের এখনো উঠে যেতে বলা হয় নি। হয়তো হবেও না। তবে তাদের এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাড়াটে হিসেবে থাকতে হবে ইডেন উদ্যানে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইডেন উদ্যানের ভবিষ্যৎ কি?

তবে কি ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন উদ্যানে ক্রিকেটের আধিপত্য, ক্রিকেটের ঐতিহাসিক পুরুষ রণজীর নামে তৈরি স্টেডিয়াম আর থাকবে না? সেখানে কি গড়ে উঠবে কম্পোজিট স্টেডিয়াম? ফুটবল-হকি থেকে আরম্ভ করে সব খেলারই আসর বসবে সেখানে?

সত্যি বড় চিন্তার বিষয়। ইডেন উদ্যানের ভবিষ্যৎ আজ মনে হচ্ছে অতল অন্ধকারে।

এই প্রসংগে আরো একটা বিষয় চিন্তা করার প্রয়োজন বড় বেশি। এই বছরই অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণে আসছে। খুব সম্ভব নভেম্বর মাসের শেষের দিকেই ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার দিন ঠিক হবে।

তখন কি হবে?

গল্প হলেও সত্যি

১৮৫৪ সাল......।

আদ্যিকালের আজব শহর কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হলো অভিনব এক ক্রীড়ানুষ্ঠান।

সময়টা বোধহয় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি।

সাগরপারের দেশ থেকে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বড় সাহেবরা সেদিন খেলেছিলেন এক আজব খেলা। একটা হাওয়া ভর্তি চর্ম-গোলককে শুধু লাথালাথি করা—যার নাম নাকি ফুটবল.. ...!

খেলা হয়েছিল এসপ্লানেডের ময়দানে। তবে খেলাটা সেদিন আসল ছিল না। সেই খেলার উদ্দেশ্য ছিলো সাহেব-মেমদের এক সংগে খানিকটা হৈ-চৈ, আনন্দ আর ফূর্তি করা। তাই দল হলো দুটো—"ক্যালকাটা ক্লাব অফ সিভিলিয়ানস" আর ব্যারাকপুর থেকে এলো "জেণ্টেলমেন অফ ব্যারাকপুর"।

সেই প্রথম ফুটবল খেলা। শুধু কলকাতা বা বাংলাদেশেই নয়—ভারতবর্ষের প্রথম ফুটবল খেলা ছিলো সেদিনের সেই "জেণ্টেলমেন অফ ব্যারাকপুর" আর "ক্যালকাটা ক্লাব অফ সিভিলিয়ানস" দলের মধ্যের খেলাটি...!

সেদিনের সংগে আজকের কতো তফাৎ। সেদিনকার সেই আজব খেলাই আজ কলকাতা ময়দানের খেলার রাজা ফুটবল...!

আজ আর কোন সন্দেহ নেই যে, কলকাতা বা বাংলাদেশের খেলার রাজা ফুটবলই......!

॥ বৈদ্যনাথ নাথ ॥

পক প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতায় এবারও লাভ করেছেন বিজয়ীর সম্মান। এ সম্মান তিনি পেলেন পর পর দুবার।

এ মরশুমে ইডেনে যদি ফুটবল খেলা হয় তাহলে কি আর ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত অবস্থায় থাকবে মাঠ? আর যদি এখনই কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি হয় তাহলে নিশ্চয়ই অক্টোবর-নভেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হবে না।

তাহলে টেস্ট ক্রিকেটের আসর বসবে কোথায়?

তবে কি কলকাতায় টেস্ট খেলা বন্ধ হয়ে যাবে? আমরা কি দেখতে পাবো না ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট লড়াই? এ প্রশ্নের উত্তর আজ কে দেবে?

শুধু তাই নয়। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে নিউজিল্যাণ্ডও আসবে ভারত ভ্রমণে। ভারত-নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট লড়াই-এ একটা খেলার আসর

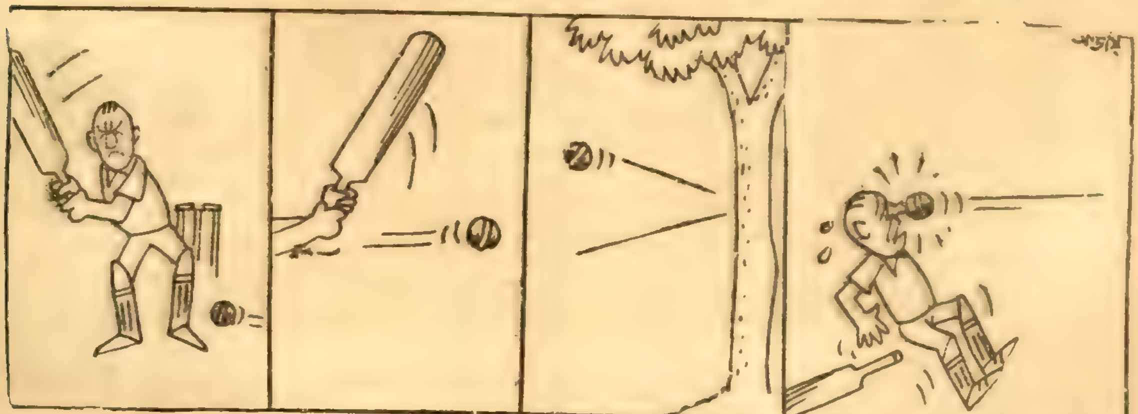

বসার কথা কলকাতাতেই। কিন্তু ইডেন উদ্যানই যদি না পাওয়া যায় তাহলে খেলা হবে কোথায়?

তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা যাই করুন, একটু ভেবে-চিন্তে, ধীরে-সুস্থে করুন—যাতে সব দিকই বজায় থাকে!

আর সেই যখন কম্পোজিট স্টেডিয়াম করতে দু' কোটির ওপর টাকা খরচ হবে আর সি· এ· বি আর এন· সি· সি'কে গ্যালারী, স্টেডিয়াম ইত্যাদির জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে বহু লক্ষ টাকা খরচ হবে—তখন ফুটবলের জন্যে একটা আলাদা স্টেডিয়াম তৈরি করলে ক্ষতি কি?

জানি না আমাদের এই আবেদন মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ও যুক্তফ্রন্ট সরকার একটু সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করবেন কি না......।

॥ পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যায়ামশালা ॥

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে ৮০০ বছরের পুরনো একটা ব্যায়ামশালার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেকালের কোন এক জমিদার তৈরি করেছিলেন এই ব্যায়ামাগারটি। ওখানে তাঁর পাইক-পেয়াদারা কসরত্ করে নিজেদের শরীর সুগঠিত করতো, সুস্থ রাখতো। সেই ব্যায়ামাগারে আজো চলেছে শরীরচর্চার কসরত্। আটশ' বছরের পুরনো সেই ব্যায়ামশালায় এখন সেখানকার ছাত্ররা ব্যায়াম করে।

সমাচারদর্পণ

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ এক রকম পাকা হয়ে গেছে। ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিল জানিয়েছেন যে, অস্ট্রেলিয়া দলের বিগত সফরে টাকা-কড়ির ব্যাপারে যে হারে লেন-দেন হয়েছিল—এবারও সেইভাবেই হবে। ফলে টাকা-কড়ি নিয়ে গোলমাল বাধার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে গেলো বলা যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি টেস্ট আর চারটি প্রথম শ্রেণীর খেলার জন্যে খুব কম করে ৩৫,০০০ হাজার পাউন্ড দাবি করেছে।

॥ ইডেন উদ্যানের দখল নিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

ছবিতে ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জী, পুলিশ কমিশনার শ্রী পি· কে· সেন, শ্রীধ্রুব সেন প্রমুখকে ইডেনের নক্সা নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে।

পেলে এবার করবেন হাজার গোল

রাগে, দুঃখে কেঁদে ফেলেছিলেন পেলে। "এই কি ফুটবল খেলা? আমি আর খেলবো না!" এবার বাঙ্গালোরের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলাকে যে-ভাবে হারানো হয়েছে ১৯৬৬ সালের বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রেজিলের হাল হয়েছিল ঠিক ঐ একই রকম। ছলে-বলে-কৌশলে ব্রেজিলকে হারানোই ছিল লক্ষ্য। আর একটা লক্ষ্য ছিল, সে লক্ষ্যবস্তু পেলে নিজে। পেলে দলে থাকলে ব্রেজিলকে হারানো যে অসাধ্য। তাই সবার আগে পেলেকেই সরাতে হবে দল থেকে। আক্রমণে অতিষ্ঠ আর রেফারীর উদাসীনতায় আহত পেলের চোখে জল এসেছিল রাগে, দুঃখে আর অভিমানে। তাই বলেছিলেন, এ তো ফুটবল খেলা নয়, এ বর্বরতা।

পেলের ওপর বর্বরের মতোই আচরণ করা হয়েছিল গত বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়। আঘাতের পর আঘাত। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়ের জীবনে সকলে মিলে বুঝি টানতে চাইছিলেন ইতির দাঁড়ি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি সেই চক্রান্ত। আঘাত সামলে আবার মাঠে নেমেছেন পেলে। আবার করেছেন গোলের পর গোল। শুধু তাই নয়, কালো মাণিক পেলে চলেছেন এখন এক অভাবনীয় রেকর্ড স্থাপন করতে। পেশাদার খেলোয়াড়ী জীবনে এবার বুঝি পেলে পাবেন হাজারটি গোল করার এক অভিনব সম্মান। পেলের গোলের সংখ্যা এখন প্রায় সাড়ে ন' শ'।

পেলের বয়েস কিন্তু বেশি নয়। আটাশের ঘরে চলেছেন এখন। জন্ম ১৯৪০ সালের ২৩শে অক্টোবর। পেলের বাবাও ছিলেন পেশাদার ফুটবল

পরিচীয়াতে

খেলোয়াড়। তাই ছোটবেলা থেকেই পেলে পেয়েছিলেন ফুটবল খেলার অবাধ সুযোগ। তাই যার ডাক নাম ডিকো আর ভালো নাম এডসন এ্যারাণ্টেস ডু ন্যাসি-মেণ্টো সেই বাচ্চা ছেলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাক লাগিয়ে দিলো সকলকে।

ষোল বছর বয়সে ফুটবল খেলার জন্যেই সে চলে গেলো ব্রেজিলের স্যাণ্টোস শহরে। সেখানেই সে পড়ে গেলো সকলের চোখে। ভালো নাম, ডাক নাম—সব হারিয়ে গেলো তার। পেলে নামে সে পরিচিত হয়ে উঠলো সমস্ত ফুটবল বিশ্বে। ১৯৫৭ সালে সে আর্জেণ্টিনার বিরুদ্ধে খেললো আর তার পরের বছর সে গেলো বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। পেলের বয়েস তখন পুরো আঠারোও হয় নি।

শুধু খেলতে যাওয়াই নয়, ১৯৫৮ সালের বিশ্ব কাপের ফাইন্যালে সুইডেনকে হারিয়ে দিয়েছিল ব্রেজিল—সে খেলায় দুটি গোল করেছিলেন পেলে।

সেই শুরু। তারপর থেকে আজো সমানে বয়ে চলেছে সেই ট্রাডিশন। ব্রেজিলের লেফট ইনের খেলোয়াড় পেলে আজ ফুটবল জগতের এক নিপুণ কারিগর। প্রতিভায় ভাস্বর। পেলের খেলা যেন ছবির মতো। হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের মতো পেলে হলেন ফুট-বলের যাদুকর। পেলের পায়ে পড়লে বলগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর পায়ের জোর? সে কথা না তোলাই ভালো। অনেক চিন্তা করেও বলা যাবে না পেলের কোন পায়ে বেশি জোর। আর মাথায় অনেকের চেয়ে ছোট হলে কি হবে—চিলের মতো ছোঁ মেরে হেড দেন পেলে।

সুতরাং এই পেলেকে নিয়ে যে টানা-টানি শুরু হবে—তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! লক্ষ লক্ষ টাকা দাম ওঠে পেলের। ব্রেজিলের স্যাণ্টোস থেকে নিজেদের দলে পেলেকে আনবার জন্যে ইটালীর জুভেণ্টাস ক্লাব ১৯৬১ সালে দিতে চেয়েছিল ১৯ লক্ষ টাকা। এ তো মাত্র একটা ঘটনা। পেলেকে দলে পাবার জন্য অনেক দলই এইরকমভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন খরচ করতে।

আর পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে পেলের মাসিক রোজগার প্রায় ষোল হাজার টাকা। এ ছাড়া আরো অনেক-ভাবে গাদা গাদা টাকা আসে পেলের হাতে।

আটাশ বছরের পেলে, বিশ্বের ফুটবল সম্রাট আজ আবার চলেছেন অভাবনীয় এক কৃতিত্ব স্থাপন করতে। হয়তো এই মরশুমেই পেলে করবেন হাজার গোল......।

বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসে পেলে বোধহয় লাভ করবেন সর্বকালের সর্ব-শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি......।

অসীমকুমার বসু (হাউজিং এস্টেট, বেহালা)

প্রশ্ন : বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতা কত সালে কোথায় আরম্ভ হয়েছিল? সেবার কোন দল কাকে কত গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে? ১৯৬৬ সালের প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী দলের সংখ্যা কতো? কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কে কাকে হারিয়ে জিতেছিল?

উত্তর : ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কাপের প্রথম বছরের খেলায় উরুগুয়ে ৪—২ গোলে আর্জেণ্টিনাকে হারিয়ে লাভ করেছিল জুলে রিমে কাপ। সেবার প্রতিযোগী দলের সংখ্যা ছিল ১৩।

১৯৬৬ সালে ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড ৪—২ গোলে জার্মানীকে পরাজিত করে জিতেছিল বিশ্ব কাপ। সেবার ৪৩টি দল অংশ গ্রহণ করেছিল বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়।

তড়িৎকুমার চৌধুরী (টাংলা, দরং, আসাম)

প্রশ্ন : আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? কতো সালে? সেখানে ভারতীয় হকি দল যাবে তো?

উত্তর : ১৯৭২ সালে মিউনিকে অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা। ভারতীয় হকি দল নিশ্চয়ই মিউনিক অলিম্পিকে যোগদান করবে।

দীপককুমার দাশ (হরিশচন্দ্রপুর, মালদা)

উত্তর : সোবার্স ও কাউড্রের ব্যাটিং এ্যাভারেজ আপ-টু-ডেট করে জানাবো।

প্রশ্ন করলেই উত্তর পাবেন। এর জন্যে বিশেষ কোন নিয়ম নেই।

প্রশ্ন উত্তর

প্রদীপকুমার বিশ্বাস (গুলমা চা বাগান, গুলমা, আসাম)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সেঞ্চুরী করার রেকর্ড কার। তিনি কোন সালে কোন দলের বিরুদ্ধে কতো মিনিটে কতো রান করেছিলেন?

উত্তর : অস্ট্রেলিয়ার জে· এম· গ্রেগরী, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৯২১-২২ সালের জোহানসবার্গ টেস্টে শতরান পূর্ণ করেছিলেন ৭০ মিনিটে।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : বিজয় হাজারে ও বিজয় মঞ্জরেকারের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

	টেস্ট	ইনিংস	অঃ পঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান সংখ্যা	গড়
হাজারে	৩০	৫২	৬	২১৯২	১৬৪*	৭	৪৭·৬৫
মঞ্জরেকার	৫৫	৯২	১০	৩২০৯	১৮৯*	৭	৩৯·১৩

তোমাকে তো ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিয়েছি। পাও নি কেন জানি না।

অরুণকুমার গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : এম· এল· জয়সীমার ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান সংখ্যা	গড়
জয়সীমা	৩৫	৬৪	৪	২০১৭	১২৯	৩	৩৩·৬১

* অপরাজিত।

অনুপম পাল, পার্থ সেনগুপ্ত, প্রজ্জ্বল নন্দী ও অমিত চন্দ (কিশোর সংঘ, হসপিটাল রোড, দুর্গাপুর—৫)

উত্তর : আপনাদের নতুন ক্লাব প্রতিষ্ঠার কথা জেনে ভীষণ ভালো লাগছে। আশা করবো খেলাধুলার পবিত্র আদর্শই হবে আপনাদের ক্লাবের এবং ক্লাবের সভ্য-সভ্যাদের লক্ষ্য।

নবকুমার গাঙ্গুলী (বেহালা, কলকাতা—৬০)

প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয় কোথায় এবং কতো সালে?

উত্তর : যতোদূর জানা যায় ১৫৫০ সালে প্রথম ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গুইল্ডফোর্ডের ফ্রি স্কুলে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কয়েকটি সংখ্যা আগে আমরা কোচ শ্রীঅমল দত্তর ঠিকানা প্রকাশ করেছি। মনে হয় শ্রীদত্তর সংগে যোগাযোগ করলে আপনার লাভই হবে।

অরিন্দম দাশগুপ্ত (সিউড়ী)

প্রশ্ন : আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর : আকাশবাণী কলকাতা, C/o. আকাশবাণী ভবন, ইডেন গার্ডেন, কলকাতা—১।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজী

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—	৩য়	৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—	১ম	৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—	৩য়	৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
” ”	২য়	৬-০০
” ”	৩য়	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
” ”	২য়	৪-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৩০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী	১ম	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী—		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
স্কট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	৩য়	০-০১
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:—		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
বিভূতিভূষণ মখো: গ্রন্থাবলী—		৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—	১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—	২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—		৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—		৪-০০
” ” ”	—২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—		৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—		৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—		৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ		৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—	৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—	৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—		৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ		৪-০০
কথাসরিৎসাগর—২য় ভাগ		৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—		৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— ১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড		৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—		৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—		৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য়ভাগ		৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
” ” গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—		৩-০০

নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—		৭-০০
গোপেশ্বর বন্দ্যো: ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—	—২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থাবলী—	১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি—		৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—		৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর—		৩-৫০
পরলোক—		৪-৫০
পরলোক রহস্য—		২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—		৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—		১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—		৩-০০
ভারত প্রতিভা—		৫-০০
প্রতাপাদিত্য—		৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—		২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—		৩-০০
নানার মা—		৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ—		৩-০০
বিক্রমাদিত্য—		৩-০০
বিসমার্ক—		২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী—		৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—		২-০০
মাধবী কঙ্কণ—		২-০০

যৌন-মনোদর্পণ

৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ		৪০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া		৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ন্ত্রণ—কালিকদ্বের ব্যাপার সমূহ		৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—	২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—		৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)		৪-০০
DAVID HARE		৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

Thursday, 10th April, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "BASUMATI" Phone : 34—7771, 72, 73, 74

11 APR 1969
CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বসুমতী

কাশীপুর গান-শেল ফ্যাক্টরীতে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ধিক্কারে সারা বাংলা বন্ধ

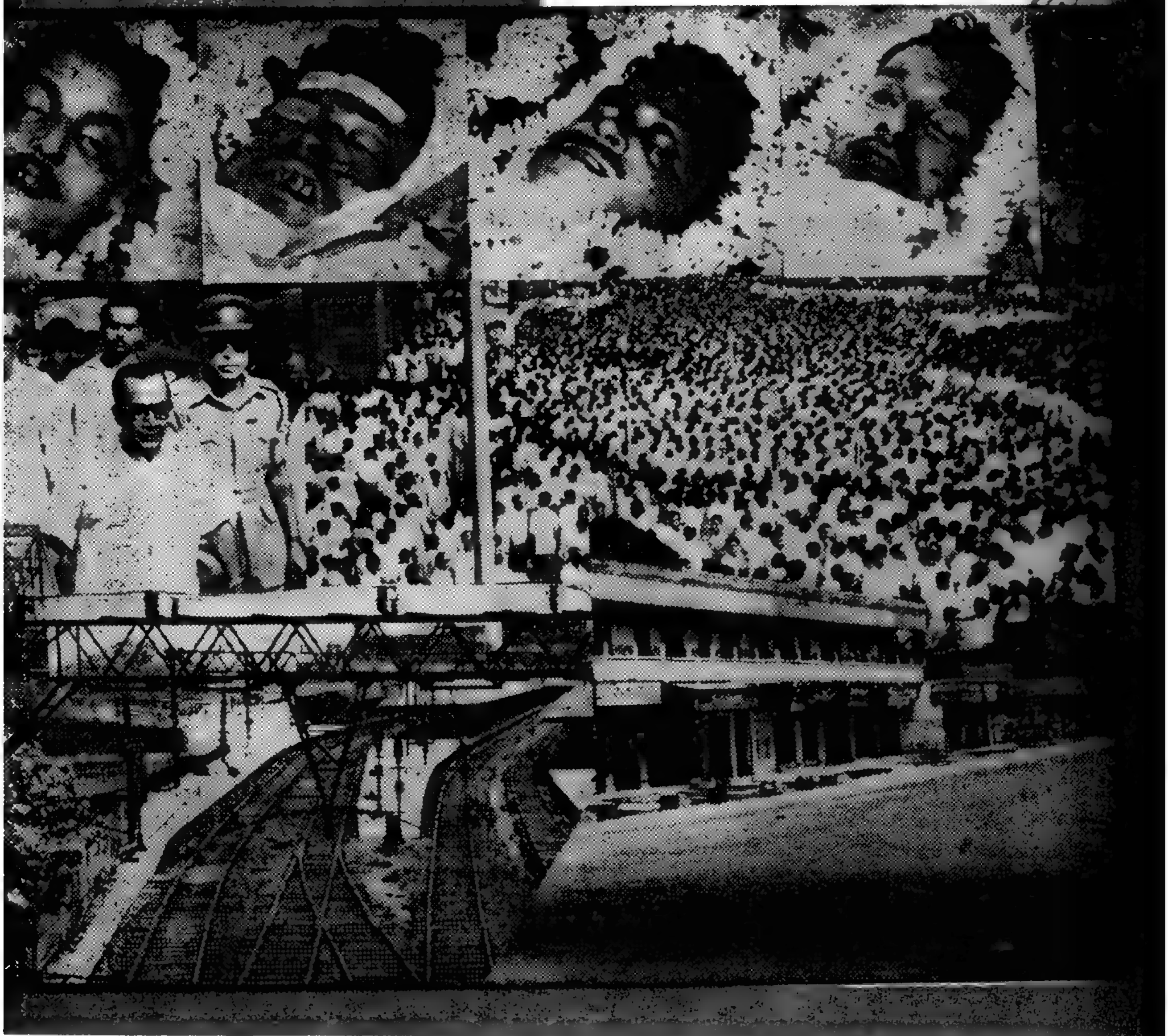

: ৪৩শ সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 43, 17th April, 1969

See Page 2709

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৬৯১
আজকের মানুষ		২৬৯২
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৬৯৩
ফুলের বাগান থেকে ম্যানহোলে (কবিতা)	মনোরঞ্জন হাজরা	২৬৯৭
বঙ্গদর্শন		২৬৯৮
ভারতদর্শন		২৭০১
জালিয়ানওয়ালাবাগ (প্রবন্ধ)	জ্ঞান দত্ত	২৭০৩
আন্তর্জাতিক		২৭০৪
সপ্তাহের বোকা	কৃত্তিবাস ওঝা	২৭০৬
নিকট-দূরে (প্রবন্ধ)	কৌশিক বসু	২৭০৯
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	২৭১১
শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি	শ্রীসওদাগর	২৭১৫
আমার ইউরোপ ভ্রমণ	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২৭১৬
নির্বাচনের পরে	সাগর বিশ্বাস	২৭১৮
নতুন ছড়া (কবিতা	পরিমল ভট্টাচার্য	২৭২০
শোক-স্তব্ধ ঝড়ে (কবিতা)	প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৭২০
তিমিরপ্রান্ত ডুয়ার্স	অগ্নিবর্ণ	২৭২১
আর এক ছায়া (গল্প)	সমীর মুখোপাধ্যায়	২৭২৬
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল জানা	২৭৩২

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স
৯৩।১৭ রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্র-সংগীতে উচ্চাঙ্গ ও লোকগীতির প্রভাব	ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী	২৭৩৭
লোকসংগীতের একাল না আকাল ?	মুরশিদ	২৭৩৯
রংগমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২৭৪১
রূপাজগৎ		২৭৪৩
পাঠকমন		২৭৪৭
খেলাধুলা	শান্তিপ্রিয়	২৭৪৮

প্রণাম জানাই

শহীদদের

জালিয়ানওয়ালা বাগ

সেই সব দেশ-
প্রেমিকদের স্মরণ
করি যাঁরা আমা-
দের স্বাধীনতা
সংগ্রামের মশাল
জ্বালিয়েছিলেন।

CENTRAL
LIBRARY.

৭৩ বর্ষ ঃ ৪৩শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ Thursday, 17th April, 1969

কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বহু রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি সরব ঘোষণা করলেন, রাজ্যে রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলিকে খতম কর। কেন্দ্রে কংগ্রেসের আধিপত্য এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে রাজ্যগুলির ক্ষমতা নামমাত্র থাকায়, উপরন্তু গণতন্ত্রকে হাস্যকর করে তোলার জন্য রাজ্যপালের পদগুলিকে উপঢৌকনের বস্তুতুল্য গণ্য করায়—কয়েকটি রাজ্যে 'আয়ারাম গয়ারামে'র কৃপায় অ-কংগ্রেসী সরকারগুলিকে আকস্মিকভাবে খারিজ করা হোল। স্বভাবতই অনেকের ধারণা হোল, বিরাট এক ষড়যন্ত্রের দ্বারা একচেটিয়া মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীদের মতো আর সম্ভবত তাদেরই নির্দেশে কংগ্রেস একচেটিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তাদের সে দৃঢ় সংকল্পে প্রচণ্ড আঘাত দিল পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি রাজনৈতিক দল দ্বারা গঠিত যুক্তফ্রন্ট। বিগত মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই যুক্তফ্রন্ট এমনভাবে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটালো যে, বলা যায় বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেসের মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় থাকলো। কংগ্রেসের এ-হেন পরাজয়ে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলের বিদ্রোহী গোষ্ঠী তুললো বিদ্রোহের ধ্বজা। জনসাধারণ বিস্মিত হলেন পুরানো এবং দায়িত্বশীল নেতাদের মুখে এই কথা শুনে যে—এতোদিন ধরে কিভাবে কি কারণে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে সরে গেছে। স্বনামধন্য নেতাদের বিরুদ্ধে ভোগ বিলাসিতা ও চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সোচ্চার মন্তব্য প্রকাশ করা হোল।

এই ধরণের মন্তব্য শুনে অনেকেই মুচকি হাসলেন। প্রথম কারণ, যাঁরা মন্তব্য করেছেন তাঁরা এতোদিন কিন্তু চুপচাপ ছিলেন; দ্বিতীয়ত, এর আগে কংগ্রেসের কোনো নেতার সম্পর্কে কেউ কোনো রকম বিদ্রূপ মন্তব্য প্রকাশ করলে, এঁরা রণং দেহি মনোভাব দেখিয়েছেন।

তবু আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, কংগ্রেস দলটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশ্যে এঁরা স্বার্থসম্পন্ন এক শ্রেণীর নেতাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে চেয়েছেন। জনগণের ইচ্ছাকে শিরোধার্য করে কংগ্রেস বিপক্ষ দল হিসেবে বিধানসভায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং প্রায় সকলের এই ধারণা ছিল যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে তার নীতি পাল্টাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ইচ্ছা-মাফিক কাজ করে যেতে হবে। বলা বাহুল্য জনগণ এখন এই ইচ্ছাই পোষণ করে যে, অন্যায়ভাবে যে-প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করা হয়েছে জনগণ পশ্চিমবঙ্গ শাসনের ভার সেই যুক্তফ্রন্টের ওপর পুনরায় যখন অর্পণ করেছে—তখন যুক্তফ্রন্ট সরকার বিনা বাধায় তাদের কাজে অগ্রসর হোক।

দুঃখের ব্যাপার, এতো কাণ্ডের পরও কংগ্রেসী নেতৃবর্গের যথার্থ শিক্ষা হয় নি এবং কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রগতিশীল কাজ-কর্মে বাধা উৎপাদনের জন্য অপঘাতের সৃষ্টি করছে বলে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরই সুরু হোল পশ্চাৎ হতে ছুরিকাঘাত। জগদ্দল, টিটাগড় ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মানব বিদ্বেষী নারকীয় তাণ্ডবলীলা। একথা মনে রাখতে হবে যে, এ ধরণের তাণ্ডবলীলা কংগ্রেস আমল থেকে চলে আসছে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এই সরকারকে অপদস্থ করার জন্য ঐ তাণ্ডবলীলার প্রকাশ ঘটলেও মন্ত্রীরা অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রায় যাদু-বলে মারাত্মক ব্যাধিগুলিকে নিমেষ মধ্যে উৎপাটিত করে দিচ্ছেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের সার্বিক কল্যাণের জন্য যে প্রগতিমূলক কাজে হাত দিচ্ছেন তাতে বাধা উপস্থিত হচ্ছে—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব যেন এই যুক্তফ্রন্ট সরকার কেউ নয়, তারাই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের পোষা রিজার্ভ পুলিশ-বাহিনী দুর্গাপুরে শ্রমিকদের ওপর গুলী চালালো। পশ্চিমবঙ্গে যে একটা সরকার আছে—গুলী চালাবার আগে তাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করাও প্রয়োজনবোধ করলো না। আরো লজ্জার ব্যাপার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন, সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন, কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করলেন না এবং কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে যেন মুখোমুখি লড়াই করার উদ্দেশ্যেই পূর্ব পরিকল্পিত উপায়ে কাশীপুরে নিরস্ত্র শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর গুলীবর্ষণ করে ও নৃশংস উপায়ে পাঁচজনের প্রাণ নিল। যেন এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি উপলক্ষে পঞ্চাশতম বার্ষিক উৎসব পালন করলেন। অর্থাৎ জনবিরোধী কংগ্রেসের আজ কী পরিণতি দেখুন। এরপর যদিও কাশীপুরের গুলী চালনা সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করছেন—সেখানেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে বিনা আলোচনায়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব এই, যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে কেউ নয়। তারাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের ভক্ষক বা রক্ষক। পশ্চিমবঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের বিরুদ্ধে শ্রীচ্যবন খাপ্পা অথচ কংগ্রেসাধীন রাজ্যগুলি গোল্লায় গেলেও তিনি খুশি। জনগণ এসব ভালোভাবে বোঝে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আত্মপ্রচার যাঁরা চান, তাঁরা জানেন কিভাবে কখন নিজের নামটিকে আর পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম ছাপিয়ে তুলে ধরতে হবে। ইতিবাচক পথে যদি কার্যসিদ্ধি না হয়, তবে তাঁরা নেতিবাচক পন্থা নিতেও ইতস্তত করেন না। অবশ্য আজ যে-কোণ্ডা লক্ষ্মণের নাম নিয়ে রাজ্যের ও রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে, তিনি কেবল নিজের নাম ছড়াবার জন্যেই অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন মনে করলে ভুল করা হবে। তবে এটা ঠিক যে, ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকর্ষণ করতে চান। অনশনই হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত উন্নতির সোপান হতে পারে!

অন্ধ্রপ্রদেশের কোণ্ডা লক্ষ্মণ পুলিশী অত্যাচার এবং বাড়াবাড়ির প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করে দিয়েছেন। কাজটি অনেকের কাছেই অদ্ভুত, পরস্পরবিরোধী ঠেকেছে। মাত্র ক'দিন আগেও লক্ষ্মণ রাজ্য সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। পুলিশী অত্যাচার এখানে তেলেঙ্গানা আন্দোলন উপলক্ষেই প্রথম অনুষ্ঠিত হল না, তাঁর মন্ত্রিত্বের আমলেও এ ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে, সে ঘটনার সমর্থনে তাঁকে সোচ্চার হতে দেখা না গেলেও প্রতিবাদও তাঁর মুখে শোনা যায় নি। অবশ্য সেদিন তিনি ভুল করেছিলেন বলে আজ যে শোধরাবেন না, এমন কথাও আমরা বলি না। কিন্তু লক্ষ্মণের রোষের প্রকৃত কারণ যদি পুলিশের ভূমিকার মত তুচ্ছ বিষয় হত, তবে তো তা মেটাতে ঘড়ির কাঁটা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার সময়টুকু পর্যন্ত লাগত না। আসলে তেলেঙ্গানার এবং তেলেঙ্গানাবাসীদের প্রতি যে-অবিচার অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার গত বারো বছর ধরে করে এসেছেন এবং এখনও প্রশ্নটি নিয়ে যেভাবে হেলাফেলা করছেন তাতে লক্ষ্মণ কোণ্ডা বিরক্ত হয়েছেন।

কোণ্ডা রাজনীতি বোঝেন, দীর্ঘকাল ক্ষমতা ভোগ করার ফলে তিনি ক্ষমতার রাজনীতিটাও রপ্ত করেছেন ভাল। আজ থেকে প্রায় ৫৪ বছর আগে তেলেঙ্গানার আদিলাবাদ জেলায় তাঁর জন্ম। ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপরে যথারীতি আইন অধ্যয়ন করে ১৯৪০ সালে হায়দ্রাবাদে ওকালতি শুরু করেছিলেন। অনিশ্চয়তাপূর্ণ ব্যবসা, পসার জমতেও পারে, বটতলা থেকে বটতলায় ব্রীফলেস হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে মরাটাই সার হতে পারে। ঝুঁকি যদি নিতেই হয়, তবে রাজনীতিকের পেশা নেওয়াই শ্রেয়—একদিন নাম হতে পারে, ভগবান যদি দিন দেন তবে শিকেও ছিঁড়তে পারে। স্বাধীনতা আন্দোলনে শরিক হলেন লক্ষ্মণ কোণ্ডা। জাতীয় কংগ্রেস দলের খাতায় নাম লেখালেন। সুচতুর এবং সুবক্তা কোণ্ডার পক্ষে রাজ্য কংগ্রেসের একজন কেষ্টবিষ্টু হতে পাঁচ বছর সময়ই যথেষ্ট। কিন্তু পারিষদীয় রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হবার জন্যে তাঁকে আরও কয়েক বছর

লক্ষ্মণ কোণ্ডা

অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না, তাঁর তালুক থেকে তিনি '৫২ সালের নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন।

ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা একটা স্বীকৃত-সত্য; হায়দ্রাবাদে তো তার ভূমিকা আরো বেশি। লক্ষ্মণ কোণ্ডা দেখলেন, এই একটি ক্ষেত্র তাঁর সামনে পড়ে রয়েছে যেখানে একটু বুদ্ধি খরচ করলে দেশেরও হবে, নিজেরও আখের গুছোনো যাবে। লেগে গেলেন তিনি, রাতারাতি সমবায় সমিতি গড়ে তুললেন এখানে-সেখানে। সমবায়ের দুর্বার স্রোত বইতে শুরু করল তেলেঙ্গানা, হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদে। রাজ্য হ্যাণ্ডলুম এ্যাসোসিয়েশন, নিখিল ভারত হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কংগ্রেস, নেথা সমবায়িক স্পিনিং মিলস, হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি—ইত্যাদি বহু সমবায় কেন্দ্রের প্রধান কর্মকর্তা একজনই—এবং তিনি আমাদের লক্ষ্মণ কোণ্ডা। সার্থক সমবায় আন্দোলন পরিচালনার কারণে তাঁকে 'সহকার রত্ন' খেতাবে ভূষিত করে সোনার মেডেলও দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এই স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মীকে ক্যাবিনেটের বাইরে বেশিদিন রাখা কি শোভন, না নিরাপদ? প্রথমে লক্ষ্মণকে রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকারের পদ দেওয়া হল। কিন্তু কর্মচঞ্চল কোণ্ডার কোন মোহ ছিল না এই 'কর্মহীন' পদটির দিকে। সমবায় আন্দোলন তথা ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর হাতে-কলমে কাজ এবং প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের মন্ত্রিত্ব দেওয়া হল। এ পদের যথাযোগ্য ব্যবহার যদি তিনি সেদিন করতেন, তবে হয়তো তেলেঙ্গানাবাসীদের প্রতি অবিচারের অভিযোগ আজ বড় হয়ে দেখা দিতে পারত না। কিন্তু সে ভূমিকা তিনি সততার সঙ্গে পালন করেছিলেন কি? এর পরে লক্ষ্মণ কোণ্ডাকে দেখা গেল অন্য দপ্তরে। শ্রমদপ্তরের ভার নেবার পর থেকে কিন্তু রাজ্যে শ্রমিক অসন্তোষ বেড়ে চলল। এর একটা কারণ বোধ হয় শ্রমিক সংগঠন বলতে তিনি কংগ্রেস প্রভাবান্বিত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বোঝেন।

এর পরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি লক্ষ্মণ কোণ্ডাকে তাঁর প্রিয় তথ্য ও প্রচারদপ্তরের ভার দিলেন। নিজের কাজে পদটিকে ব্যবহার করতে ভুল করলেন না কোণ্ডা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় তিনি পৌঁছলেন যে, যেন এ পদটিও তাঁর কাছে তুচ্ছ, যেন পদটি তাঁর যোগ্যতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তেলেঙ্গানা আন্দোলন শুরু হতেই তাই তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরেড্ডিকে আক্রমণ করলেন জ্বালাময়ী ভাষায়।

লক্ষ্মণ কোণ্ডা কী চান? বার বার বিবৃতি দিয়ে তিনি তাঁর সম্পর্কে একটা ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট ভাবের সৃষ্টি করেছেন। তিনি কি পৃথক তেলেঙ্গানা চান? পরিষ্কার করে এ-প্রশ্নের জবাব দেন নি, বলেছেন তেলেঙ্গানা প্রশ্নের রাজনৈতিক সমাধান চান। অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার ২৪ জন কংগ্রেস এম-এল-এ পৃথক তেলেঙ্গানার দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। লক্ষ্মণ কোণ্ডাও বলেছেন যদি প্রশ্নটির সুমীমাংসা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার করতে না পারেন, তবে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য সমাধান নেই। সেই নয়া তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর গদির স্বপ্নই কি লক্ষ্মণ দেখছেন?

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হরিপুরায় শান্তির দ্বীপ

সুভাষচন্দ্র উড়ে এলেন ইংলন্ডের উপকূল থেকে ভারতের উপকূলে। ২৩ জানুয়ারী, নিজ জন্মদিনে করাচী পৌঁছলে রেকর্ডসংখ্যক মানুষ তাঁকে সংবর্ধনা জানালো। তারপরে যেখানেই পদার্পণ করলেন জনতার রেকর্ড ভাঙতে ও গড়তে লাগল অবিরত। "স্বদেশে ফিরেছ, তোমাকে অভ্যর্থনা জানাই", সরোজিনী নাইডু বার্তা পাঠালেন, "তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে সম্মানভার ও দায়িত্বভার।" সরোজিনীর স্বতঃউচ্ছ্বসিত কাব্যাবেগ : "হে ঈগল, আশা করি তুমি তোমার শক্তি ফিরে পেয়েছ, আমাদের স্বাধীনতা-স্বর্গের দিকে অভিযানে নেতৃত্ব তোমাকেই নিতে হবে। তুমি আমাদের নিয়ে যাবে, পরম সাহসী হৃদয় যেমন করে এগিয়ে নিয়ে যায়, সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে গান গেয়ে যায় নির্ভয়ে। প্রার্থনা করি হে বিহঙ্গ, তোমার পাখা যেন ক্লান্ত না হয়।"১

সরোজিনীর এবং অনেকের মহাবিহঙ্গ অতঃপর পাখা মেলে দিলেন হরিপুরার দিকে।

হরিপুরায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন একটি বৃহৎ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'গাঁও মে কংগ্রেস'—গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে—নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। গ্রামেই কংগ্রেস বসেছিল যদিও কংগ্রেসের কল্যাণে গ্রাম আদর্শ নগরে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল। হরিপুরা গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম; বরদৌলি থেকে কিছু দূরে। বরদৌলির সর্দার হয়ে বল্লভভাই প্যাটেল ভারতে সর্দার হয়েছিলেন। সেই সর্দারি বা নেতৃত্বের পরিচয় যথেষ্টভাবে এই অধিবেশনকালে তিনি দিয়েছিলেন।

ঠিক হরিপুরা গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় নি, হয়েছিল সেখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে তাপ্তি নদীর তীরে ৫০০ একর জমিতে নির্মিত উপনগরীতে। উপনগরীর নাম বিঠলনগর; বল্লভভাই প্যাটেলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিঠলভাই প্যাটেলের স্মৃতিতে ঐ নামকরণ।

হরিপুরাকে অধিবেশনস্থল হিসাবে নির্বাচনের বিশেষ কারণ, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে এই গ্রামের অধিবাসীদের গৌরবময় ভূমিকা। ভারতে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তো নিশ্চয়ই, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর আন্দোলনেও হরিপুরাবাসী কেউ কেউ প্রথম দফার সত্যাগ্রহী ছিলেন।২

আয়োজনের ও আতিথ্যের প্রাচুর্য এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বোচ্চ প্রশংসা হরিপুরা অধিবেশনের সংগঠকেরা পেতে পারেন।৩ বিঠলনগরের পরিচ্ছন্নতা ও শিল্পসৌন্দর্যও অনবদ্য। শেষোক্ত ব্যাপারে নন্দলাল বসুর কৃতিত্বই সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয়। গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি কংগ্রেস-নগরীর শিল্পসজ্জার জন্য গিয়েছিলেন, এবং যেভাবে সাজিয়েছিলেন, কংগ্রেসের অধিবেশনের ইতিহাসে তা অসাধারণ ব্যাপার বলে স্বীকৃত হয়ে আছে।৪

---

১ অমৃতবাজার, ৩০ জানুয়ারী, ১৯৩৮।

২ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ১৩ জানুয়ারী।

৩ পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করেছেন। আহার নিরামিষ, কিন্তু ব্যবস্থা ঢালাও, তিনি জানিয়েছেন। দুগ্ধ সরবরাহের জন্য ৫০০ গরু আনা হয়েছিল।

৪ হরিপুরা অধিবেশনে নন্দলালের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ প্রায়ই বেরিয়েছে। ১৩৪৪, আষাঢ় মাসে প্রবাসী সম্পাদকের মন্তব্যে পাই—"কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন গুজরাটের যে গ্রামটিতে হইবে...গান্ধীজীর আহ্বানে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু স্থানটি দেখিয়া আসিয়াছেন। বোধহয় পুরীটি যাহাতে শোভন হয়, সে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ তাঁহাকে আহ্বানের উদ্দেশ্য।"

শিল্পসজ্জায় নন্দলালের কৃতিত্ব সম্বন্ধে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে ৪ ফেব্রুয়ারীর সংবাদ—"These six gates are splendid work of artistry and it should be said to the credit of Mr. Nandalal Bose, that he has put life into the whole of Vithalnagar by his simple yet striking work.

বিঠলনগর সে পর্যন্ত কংগ্রেসের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অধিবেশন-নগরী, লক্ষাধিক মানুষের স্থান-সংকুলান হবে এমন বৃহৎ তার প্যান্ডাল, সেখানে ৫১টি তোরণ নির্মিত হয়েছে, কেন না কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন। স্থির হয়েছিল ৫১টি বলদ শোভাযাত্রায় রাষ্ট্রপতির রথ টানবে। এই অধিবেশনে সভাপতির রথ যে রকম পাবলিশিটি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী আর কোনো অধিবেশনে সে রকম ঘটে নি। দশ হাজার টাকা ব্যয়ে রথ তৈরি হবে, শোনা গেল, নন্দলাল বসু না কি সেটি তৈরি করবেন।৫ পরে দেখা গেল রথটি রাজকীয়, ৮০ বছরের পুরনো জিনিস। গ্রামবাসীরা অবশ্য রথটির বয়স দেড়শো বছরের কম করতে রাজী ছিল না। স্থানীয় ক্ষুদ্র এক রাজা, বানসাদার রাজা, রথের মালিক। বছরে একদিন মাত্র রথটি বেরোয়—দশেরার দিন।

রথের রূপবর্ণনাকেও সানন্দে সংবাদপত্রের অলংকার করা হয়েছিল,৬ উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই সূত্রে গান্ধীজী যে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে রাশি রাশি অনুরোধজ্ঞাপক চিঠি পেয়েছিলেন—তার উল্লেখ করতেই হয়। বিঠলনগরের সাজসজ্জা দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা বিহ্বল-ভাবে তুলনা করার যোগ্য একটিমাত্রই পৌরাণিক দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করতে পেরেছিল—তা আর কিছু নয়, কলি যুগে ধর্মক্ষেত্রের পুনরাবির্ভাব। জনগণের ব্যাকুল আবেদন—মহাত্মাজি! আপনি রথের সারথি হোন, কৃষ্ণের মতই, আপনার রথে থাকবেন দুর্ভেদ্য যোদ্ধা অর্জুন, আমাদের সুভাষচন্দ্র বসু। এ কংগ্রেস কুরুক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নয়।৭

না, কংগ্রেস 'কুরুক্ষেত্র' হয় নি হরিপুরায়, (হতে অবশ্য এক বছরের বেশি দেরি হবে না) এবং গান্ধীজী পার্থসারথির ভূমিকায় নামতে রাজী হন নি, গোটা গীতা ব্যাপারটি তাঁর কাছে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সংগ্রাম-কাহিনী ছাড়া কিছু নয়, তবে শেষ পর্যন্ত যিনি সারথি হলেন তাঁরও অতীত ইতিহাস আছে। তাঁর নাম চিতাভাই ভিকাভাই। "অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এঁর জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সেজন্য ইনি বরোদায় চলে যান। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর কখনো বৃটিশ রাজ্যে ঢুকবেন না। দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় গান্ধীজী তাঁকে স্বগ্রামে ফিরতে অনুরোধ জানান, সেই অনুরোধ নিয়ে সর্দার প্যাটেল তাঁর বরোদার বাসস্থানে যান এবং তাঁকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে সমর্থ হন।"৮

অমন রথ, এমন সারথি, রথী—ভারতের তরুণতম কংগ্রেস সভাপতি,৯ যিনি শত্রুপক্ষের আতঙ্ক এবং দেশ-বাসীর আশ্বাস, যাঁর দীর্ঘ দীপ্ত শরীরে অজস্র আঘাত সত্ত্বেও আলোক ভিন্ন আর কিছু নেই,—এক্ষেত্রে সভাপতির

Mr. Bose has painted on the top of the gates pictures of women churning curds, women working in chaki etc., which are wonderful pieces of Indian art."

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রকাশিত *An album of Nandalal Bose* (১৯৫৬) গ্রন্থে যে রকম বিশেষ মূল্য দিয়ে হরিপুরা চিত্রাবলীর বিষয়ে লেখা হয়েছে, তার থেকে ওগুলির গুরুত্ব বোঝা যায়। গান্ধীজী নন্দলালের ছবির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর অনুরোধে নন্দলাল ছাত্রসহ গিয়ে পূর্ববর্তী লখনৌ এবং ফৈজপুর অধিবেশনে ছবি এঁকেছিলেন। হরিপুরা অধিবেশনে তিনি যেতে পারবেন কি না সন্দেহ ছিল, কারণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সুস্থ হওয়া মাত্র বরদৌলি হাজির হন। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে হরিপুরা গ্রামে যান, "সেখানকার গ্রামজীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য। তিনি চেয়েছিলেন, কংগ্রেস প্যান্ডালের অলংকরণের জন্য যে ছবি আঁকবেন তা যেন আশপাশের জীবনছন্দের অনুরূপ হয়।" বরদৌলিতে ফিরে গিয়ে গান্ধীজীকে বলেন, "এখন আমি প্রস্তুত, কি করতে হবে তা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি।" "কংগ্রেস প্যান্ডালের জন্য তিনি যেসব ছবি এঁকেছিলেন, সেগুলি 'হরিপুরা পোস্টার' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।" (পৃঃ—২৫-২৬)।

৫ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ১৩ জানুয়ারী।

৬ অমৃতবাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারী।

৭ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ১৫ জানুয়ারী।

৮ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ১৫ জানুয়ারী।

৯ কংগ্রেসের তরুণতম সভাপতি কে (স্বাধীনতার আগে) সে বিষয়ে কিছু বিতর্ক আছে। অনেকের মতে গোখলেই তরুণতম। পট্টভি অবশ্য তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসে দ্বিধাহীনভাবে সুভাষচন্দ্রকেই ঐ সম্মান দিয়েছেন। মডার্ন রিভিউ পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নোটে লেখা হয়েছিল—

"Mr. Subhas Chandra Bose is one of the youngest Presidents which the Indian National Congress has had during its history of half a century. Perhaps the youngest was Mr. Gopal Krishna Gokhale, who presided over the Beneras session of the Congress in 1905, when he was 39. Pandit Jawaharlal Nehru first presided over the Congress at Lahore, when he was 40. Sir Sankaran Nair was president at Amraoti in 1897 at the same age. Mr. Bose is 40."

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

শোভাযাত্রা স্মরণীয় ব্যাপার হবে সন্দেহ কি। হরিপুরা থেকে শোভাযাত্রা চলতে লাগল, প্রায় তিন মাইল দূরে বিঠল-নগরে তা যাবে, হাজার হাজার মানুষ তা দেখতে ভেঙে পড়ল পথের উপরে। সমারোহের অভাব ছিল না। সর্বাগ্রে জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং, তাঁর পিছনে রঙিন শাড়ি-পরা শত শত 'দেশসেবিকা', এবং ইউনিফর্ম-পরা তরুণ স্বেচ্ছাসেবক, ব্যান্ডের সামরিক সুরের তালে তালে সকলে পা মিলিয়ে চলেছে, পিছনে ৫১ বলদ টানা সভাপতির রথ, লালে সোনায় মেশানো তার অপরূপ সাজ, ঘন্টা ঝুলছে রথের চারধারে, গতির ছন্দে সেগুলি বেজে উঠছে জলতরঙ্গ সুরে, ১০—এহেন শোভাযাত্রায় বসে সুভাষচন্দ্র কী ভাবছিলেন। তাঁর পিছনে আরও ৬টি গরুর গাড়ি ছিল, তার একটিতে বসেছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল—শোভাযাত্রা চলছিল ৫১টি তোরণের মধ্য দিয়ে, ৫১টি গান গেয়ে১১—ব্যান্ডের, বিউগলের শব্দ, ঘণ্টার শব্দ, জয়ধ্বনি, শ্লোগান, হর্ষোচ্ছ্বাস অভিভূত সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় সেই মুহূর্তে তিক্ত পরিহাসের সঙ্গে দশ বছর আগেকার সেই দৃশ্যের কথা মনে করেন নি, যখন জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিংরূপে এরও চেয়ে বৃহৎ একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন এবং তার জন্য পার্কসার্কাসের ক্লাউন উপাধি পেয়েছিলেন কংগ্রেস-অধিনায়কের কাছ থেকে। না, পুরনো ক্ষোভ পুষে রাখার মত ক্ষুদ্র চেষ্টা তাঁর মধ্যে ছিল না; তাছাড়া জানতেন, তাঁর পথ সকলকেই নিতে হবে, কারণ তাই হল স্বাভাবিক পথ; ভারতীয় রাজনীতির রুদ্র এখন শান্ত শিব, ষণ্ডরথাসীন হয়ে পরম সুখে চলেছেন, প্রায় বিবাহযাত্রায়, তবে যে সব কবিরা সঙ্গে গিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের তপোভঙ্গ কবিতার 'কবি' নন, সংবাদপত্রের বেতনভুক রিপোর্টার।

শোভাযাত্রার পরে কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত সুভাষচন্দ্র বললেন —"বিরাট জনতা যে অপূর্ব অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তাতে আমি অভিভূত। এর বেশি আর কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই।"

অতঃপর শুধু অভিনন্দন অভিনন্দন, শুধু প্রশংসা প্রশংসা, নিরাপদ উৎসাহ এবং উৎসাহ। ১১শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রথম দিন। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে সবাই উপস্থিত ঝাণ্ডা চকে—সেখানে পতাকা উত্তোলন করে তবে কাজ শুরু হবে। বিরাট প্রান্তর জন-সমুদ্রে পরিণত, উপরে গান্ধী টুপির শুভ্র তরঙ্গ, 'ধীরে সূর্য উঠে রক্তিম রশ্মি ছড়িয়ে দিল তার উপরে।' 'হাজার হাজার পায়ে ধুলো উড়েছে মেঘের মত, আকাশের রক্তকিরণ বিচিত্র দ্যুতিতে তাতে প্রতিফলিত।'

'গাম্ভীর্যে এবং বিরাটত্বে অসাধারণ এই সমাবেশ', 'কংগ্রেসের ইতিহাসে যার তুল্য অল্পই দেখা গেছে', এই সমাবেশে প্রধান কংগ্রেস নেতারা প্রায় সবাই এসেছিলেন শোভাযাত্রা করে—জহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, শেঠ যমনালাল বাজাজ, শঙ্কররাও দেও, শরৎচন্দ্র বসু, আচার্য কৃপালনী, জয়রামদাস দৌলতরাম, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সরোজিনী নাইডু। লর্ড স্যামুয়েলও ছিলেন, তবে ফটো তোলার জন্য। তোলার যোগ্য চিত্রও সৃষ্ট হয়েছিল। বৃহৎ পতাকাদণ্ড, উপরে সদৃশ্য একটি মালা, ১২ পতাকাদণ্ডের ঠিক নিচে উচ্চ মঞ্চে স্তব্ধ দণ্ডায়মান দেশনেতারা, প্রথমে চতুর্দিকে দেশসেবিকাদের তিন সারি বেষ্টন, তাদের পরনে উজ্জ্বল জাফরাণী শাড়ি, পরবর্তী বেষ্টনগুলি স্বেচ্ছাসেবকদের, ঘন নীল প্যান্ট, খাকি সার্ট এবং সাদা টুপিতে তারা সজ্জিত, আর সেই বিশাল জন-সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে আছে একটি বিশাল আবক্ষ-মূর্তি—বিঠলভাই প্যাটেলের।

বন্দেমাতরম সঙ্গীত হল। রাষ্ট্রপতি পতাকাদণ্ডের কাছে গেলেন। কিন্তু প্রবল বাতাসে ধূলির ঝড় উঠে ইতি-মধ্যে ঢেকে দিয়েছে সব দৃষ্টি। দড়িতে দড়িতে জড়িয়ে গেল, তিন বার, অবশেষে সব ঠিকঠাক হয়ে পতাকা যখন উঠতে আরম্ভ করল, তখন ধূলির ঝড় থেমে গেছে, প্রসন্ন বাতাস বইছে, প্রাতঃস্বচ্ছ আলোকে ত্রিবর্ণ পতাকা দণ্ডশীর্ষে উঠে আবেগে উল্লাসে ভাসছে—তখনি হাজার হাজার কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গৌরব গানে—'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হমারা।'

সুভাষচন্দ্র বললেন—

"এই পতাকা আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াসের স্মারক এই পতাকা। তাই সর্বপ্রকারে যেন

১০ রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনগুলি কী মারাত্মক—যখন রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম, যখন ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম, তখন পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি', মূর্তি ভাবে 'আমি দেব' হাসে অন্তর্যামী। এক্ষেত্রে যদি মূর্তিরূপী সুভাষচন্দ্র 'আমি দেব' ভেবে থাকেন, তাহলে কংগ্রেসের অন্তর্যামী গান্ধীজী বা পশ্চাদ্বর্তী প্যাটেল অবশ্যই হাসতে পারেন। কিন্তু এই 'মূর্তি'র আবার প্রাণ ছিল। সুতরাং তাঁর ভাবনা এবং অন্তর্যামীর ভাবনার লড়াই শুরু হবে অচিরে। তখন হাসবেন, বলাই বাহুল্য কংগ্রেসের অন্তর্যামী নন, আসল অন্তর্যামী।

১১ অমৃতবাজার, ১৪ ফেব্রুয়ারী।

১২ *An album of Nandalal Bose* গ্রন্থে একটি সুন্দর ঘটনার কথা আছে। নন্দলাল পতাকাদণ্ডের উপরে কাপড়ে তৈরি একটি ফুল রেখেছিলেন। রাজনৈতিক নেতারা ওখানে ফুল রাখায় আপত্তি করেন। তাঁদের মতে পতাকার উপরে আর কিছু থাকতে পারে না। নন্দলাল বলেন, আর্টের স্থান সর্বোচ্চে; ফুলটিকে কখনই নামানো উচিত নয়; তাছাড়া পতাকার উপরে তো রয়েছে কপি কলটি, ওটা থাকবে কেন? এই বিতর্কের মীমাংসা হয় গান্ধীজীর দ্বারা। তিনি নন্দলালের কথাতেই সায় দেন। (২৫ পৃষ্ঠা)

ফুলের বাগান থেকে ম্যানহোলে

মনোরঞ্জন হাজরা

ও দেশের কেমিকেল সারে আমাদের ক্ষেতভরা সবুজ ফসল
যেমন বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে যায়,
তেমনিই, ঠিক তেমনিই—
ওদের পূতিগন্ধময় ড্রেনের ধোয়ানিতে
আমাদের তরুণ-তরুণী আর কিশোর-কিশোরীরাও
যাচ্ছে বিবর্ণ হয়ে।
অপমৃত্যু আর অকালমৃত্যু ঘটছে তাদের জীবনে
যখন নাকি
কোমর বেঁধে আর মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে তারা ?
কেন বলো ত' এমন করে স্লুইসের ভূমিকায় এসে দাঁড়ালে
তোমরা—
সুদূর অতলান্তিক পার হতে
দাঁড়িয়ে আসা এই নর্দমার বিষাক্ত মোহানায় ?
কেন নিঃশেষে এমন করে বিকিয়ে দিলে তোমরা নিজেদের।
কেন তোমরা তোমাদের পোশাকে-আশাকে
তোমাদের চলনে-বলনে, আচারে-ব্যবহারে,
তোমাদের গল্পে উপন্যাসে, কবিতায় আর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে
এমন করে ছেড়ে দিলে সেই ক্লেদাক্ত পচানি
স্লুইসের কপাট খুলে—
মরশুমে, অথবা অকাল মরশুমে ?

তোমাদের শিল্পীমনটা কি সত্যিই খড়ের ফাঁপা পাইপ
যা দিয়ে তোমরা দিনরাত বুড়বুড়ি কাটছো নর্দমায়
আর যার বুদ্বুদগুলো উড়িয়ে দিচ্ছো আকাশে
রঙীন ফানুসের মত ?
সেইজন্যেই কি তোমাদের দেখতে পাই রকমারি সাংস্কৃতিকমঞ্চে
সংবাদপত্রের রসালো মজলিসে
আর অনর্থ কোনো এক উন্মত্ত মেলায়
অথবা বিশেষ কোনো আদালতের কাঠগড়ায়
শুঁড়ির সাক্ষী বেহেড মাতাল ?

বলতে পারো কেন শহরের পথে জেব্রার জামায় ঢাকা
অনেক ফুরিয়ে যাওয়া প্রাণের মিছিল
কেন তোমরা প্রেমিকার মুখে ওদের এ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে
মারতে বলো
কেন তোমরা ছোঁ মারো রাহী তরুণীকে ?—
কেন বলো ত !

জানি তোমাদের সাহিত্য-সাধনার কথা তুললে
তোমরা দেখাবে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে মন্দিরে
মাইথলজির লীলা,
আর্যাবর্তের শিবলিংগ আর বৈষ্ণব কাব্যের সেই নায়িকা—
ভোরের আলোয় গায়ে যার দেখা যায় সিঁদুরের দাগ।
বাৎসায়ন ফ্রয়েড আর এলিসকে
এবং যুদ্ধোত্তর জগতের বিকৃত ক্ষুধাকে
সুপার ইম্পোজ করবে তোমরা তার ওপর
একেবারে মুড়ি-মিছরীর দরে লঘুগুরু বিচার না করে।
হ্যাঁ, মাইথলজি আর মেকেসালজির একটা ইমালসন তৈরি হবে
জেনো
কিন্তু সৃষ্টির দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে না—
লক্ষহীরা সম্রাজ্ঞী সেখানে, কালিদাস প্রজা।

কি করলে তোমরা—
শরৎবাবুর সাবিত্রী আর চন্দ্রমুখীকে কি তোমরা দ্যাখো নি
দ্যাখো নি কি লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সোনিয়াকে
ডস্টয়েভস্কি যার সৃষ্টিকর্তা ?
বন্ধু, জীবনের বিহ্বল মুহূর্তে দিয়েও ফুল ফোটানো যায়
সৃষ্টির প্রাঙ্গণে।
শুধু একবার স্মরণ করো কুপরিনের 'ইয়ামা দি পিট'কে।

অথচ একথা খুবি ঠিক—
একদা তোমরা ভাল বেসেছিলে শস্যশ্যামল এই দেশকে,
শরিক হয়েছিলে তোমরা এদেশের মানুষের,
কৃষাণ আর শ্রমিকের,
কামার কুমোর যত ছুতোর আর জেলে মাল্লাদের।
কিন্তু কোথায় গেল তোমাদের সেই অহংকারের অভ্রভেদী
মিনার?
কেন ধ্বসে পড়ল তা ধূলিকীর্ণ জঞ্জালের মধ্যে ?
তাছাড়া কেনই বা তোমরা এমন করে ছিটকে পড়লে
ওদের কনস্যুলেট আপিসের ধাক্কায়—
ফুলের বাগান থেকে একেবারে রাস্তার ম্যানহোলে
যেখান নোংরা অন্তঃস্রোতে
অন্ধকার আর পোকা কিলবিল করছে ?

আমরা এই পতাকার সম্মান রক্ষা করে চলি। পতাকার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে কোনো মূল্যই বেশী নয়।...

পতাকার মর্যাদারক্ষায় সংগ্রামে অবতীর্ণ বীর সৈনিকদের কাহিনীতে ইতিহাস পূর্ণ। আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসেও এই ত্রিবর্ণ পতাকার প্রতি আনুগত্যের প্রভূত কাহিনী আছে।...পতাকা উত্তোলন-উৎসবের তাৎপর্য হল—এখানে আমরা ঘোষণা করব—জাতীয় উদ্দেশ্যাসিদ্ধির জন্য কী পরিমাণ ত্যাগ ও দুঃখবরণ করতে আমরা প্রস্তুত আছি। পতাকা সেই জাতীয় অভিপ্রায়েরই প্রতীক-চিহ্ন।...আসুন, এই পুণ্যক্ষণে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পুনরুচ্চারণ করি—যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছি, ততদিন আমাদের সংগ্রাম থামবে না। এই পবিত্র ভূমি, চতুর্দিকে প্রসারিত বিশাল জনতা, পরিস্কার সুন্দর আকাশে ঐ উড়ছে মহাগৌরবে ত্রিবর্ণপতাকা—আসুন প্রতিজ্ঞা করি—যতদিন না পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করছি ততদিন মুহূর্তের জন্যও সংগ্রামে ক্ষান্ত হব না।...স্বাধীন আমরা হবই, প্রতিজ্ঞা আমরা রাখবই। জয় হোক আমাদের পতাকার।"১৩

[ক্রমশ]

---

১৩ .২০ ফেব্রুয়ারীর অমৃতবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে।

বর্ষ দর্শন

দুর্গাপুরের পর পশ্চিমবাংলার মানুষ আর একবার স্তম্ভিত বিস্ময়ে কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর মধ্যে বিনা কারণে, বিনা প্ররোচনায়, জালিয়ানওয়ালাবাগের "স্বাধীন ভারতীয়" পুনরাবৃত্তি পুনরায় ঘটতে দেখলেন। যেখানে প্রায় বুকের কাছে বন্দুক ধরে নিরপরাধ ও নির্দোষ কয়েকজন শ্রমিক-কর্মচারীকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হল গত মঙ্গলবার ৮ই এপ্রিলের প্রত্যূষে। যখন শ্রমিকেরা কাজে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন, যখন এরকম কোন ঘটনার সম্ভাবনা স্বপ্নেরও অতীত ছিল। কাশীপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী নিরাপত্তা পুলিশ, যারা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অংশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, বিনা প্ররোচনায় জনৈক প্রশাসনিক অফিসারের আদেশে বেপরোয়াভাবে, পূর্বে সতর্ক করে না দিয়ে, নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর গুলী চালায়।— যার ফলে ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত হন, পনেরজন গুরুতর আহত হন, আর একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় যাঁর মৃতদেহ ফ্যাক্টরীর বাথরুমে পাওয়া গেছে। মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। মানুষ যেভাবে নির্বিচারে পোকামাকড় মারে, সেইভাবে শ্রমিকদের হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীকে ঘাতক-বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে।

ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় যে, এটি পূর্বপরিকল্পিত একটি গভীর চক্রান্তেরই বহিঃপ্রকাশ, নতুবা যে পরিস্থিতিতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে তা এতই অকিঞ্চিৎকর যা কল্পনারও বাইরে। কেন না শ্রমিকেরা তখন কাজে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন, অনেকেরই হাতে টিফিনের কৌটো ছিল, কোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ছিল না। কারো প্রতি একটি ইঁটকের কণাও নিক্ষিপ্ত হয় নি, কারখানার একটি কাচও ভাঙা হয় নি, অর্থাৎ ইংরাজীতে যে প্রবাদ আছে— কুকুরকে হত্যা করার আগে একটা বদনাম দিয়ে দাও, সে সুযোগও এখানে ছিল না। নাশকতামূলক কোন কাজের অভিযোগও শ্রমিকদের প্রতি কেউ করে নি, যে সব বদনাম শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ট্রাডিশান আছে, সেরকম কোন পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয় নি, অথচ সুপরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হল। যদি তর্কচ্ছলে ধরেও নেওয়া যায় কোন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেক্ষেত্রেও শ্রমিকদের হুঁশিয়ার করার জন্য পূর্বাহ্নে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হল না, এমন কি পায়ের দিকে গুলী চালানোর প্রাথমিক নিয়মটুকু অনুসরণ করা হল না, সোজাসুজি বুকের সামনে বন্দুক ধরে গুলী করা হল।

ঘটনার পটভূমিকা ও গতিপ্রকৃতি থেকে এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি যারা করেছে তাদের মনোভাব ও মতিগতি বোঝা গেছে এবং এর নেপথ্যে একটি পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত আছে। এটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে যে, যুক্তফ্রন্টকে ঘায়েল করার জন্য নতুন কয়েকটি কৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে; কারণ এম-এল-এ ভাঙানোর কৌশলটা আর এখন কার্যকরী নয়। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার দুমাসের মধ্যেই যেভাবে একাধিক জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটানো হয়েছে— যেমন জেলেপাড়ায়—যেখানে কেন এবং কি উদ্দেশ্যে দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল তা যখন পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা গেছে, এই সকল ঘটনার সঙ্গে যদি দুর্গাপুর ও কাশীপুরের ঘটনাগুলি মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে পিছনে চক্রান্তের জাল কারা বুনছে এবং কিভাবে বুনছে সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। রাজ্যের শ্রমজীবী ও খেটে-খাওয়া মানুষদের যে-কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশকে প্রয়োগ করা হবে না—যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই ঐতিহাসিক ঘোষণাকে যেন বানচাল করার উদ্দেশ্য নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রিজার্ভ পুলিশ বা সেপাইদের শ্রমিক-নিধনের জন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু অনুগত অফিসার মারফৎ কেন্দ্রই যেন এই যজ্ঞের উদ্গাতা। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার মানুষ যুক্তফ্রন্টের মত ও পথকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও পরোক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেসের মত ও পথকেই এই রাজ্যের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ অথবা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সশস্ত্র প্রহরীরাই এই অপকর্মের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, এ বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন নেই। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশকে প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ করলেও কেন্দ্র সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নি।

দুর্গাপুর এবং কাশীপুর দুজায়গার ঘটনার মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান। প্রথমত, দুজায়গাতেই শ্রমিকদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত বিনা প্ররোচনায় এবং বিনা প্রয়োজনে দুজায়গায়ই গুলী চলেছে। মঙ্গলবার কাশীপুরে শ্রমিকরা কোন বিক্ষোভ বা আন্দোলন করেন নি। তাঁরা একটি গেট-মিটিং করেছিলেন মাত্র এবং শ্রমিকদের গেট-মিটিং কলকারখানায় হামেশাই হয়ে থাকে। গুলী চালানোর জন্য কর্তৃপক্ষ যেন তৈরি হয়ে ছিলেন, কোন সুযোগ খোঁজারও প্রয়োজন হয় নি। তৃতীয়ত, যদিও আইন ও শৃংখলার অজুহাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে এই সব হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল, রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন ও শৃংখলা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব যে রাজ্য সরকারের তার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ কিংবা পরামর্শ করা হল না। এবং এইগুলিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, ঘটনাটি কোন একক বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, একটি গভীরতর চক্রান্তেরই বহিঃপ্রকাশ।

পটভূমিকা ও ঘটনার গতিপ্রকৃতি

কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরীর কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন ধরেই কর্মীদের শিক্ষা দেবার কথা ভাবছিলেন। গত বছরের উনিশে সেপ্টেম্বর তারিখে কাশীপুর ফ্যাক্টরীর কর্মিবৃন্দ একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেছিলেন এবং সেই "অপরাধে" বহু শ্রমিকের চাকরী খেয়ে নেওয়া হয়েছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং পদচ্যুত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়" এই প্রবাদটির সার্থকতা প্রমাণ করার জন্যই যেন ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রতি দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে রাজী হন নি। ৫৪ জন বরখাস্ত কর্মীদের কাজে যোগদান করতে দেওয়া হয় নি। অথচ দেখুন, পাশাপাশি ইছাপুর কারখানায় ধর্মঘট উপলক্ষে যে ২৬ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সাম্প্রতিক নির্দেশনামা অনুযায়ী তাঁদের পুনর্বহাল করা হয়েছে।

এই অবিচারের বিরুদ্ধেই মঙ্গলবার ৮ই এপ্রিল তারিখে কাশীপুর ফ্যাক্টরীর তিন নম্বর গেটের সামনে কারখানার মজদুর ইউনিয়নের ডাকে এক প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। সকালের শিফটের ছয় হাজার কর্মীর হাজিরার নির্ধারিত সময় ছিল সকাল সাড়ে সাতটা। কাজেই মজদুর ইউনিয়ন এক ঘন্টা আগেই অর্থাৎ সাড়ে ছ'টায় মিটিং ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে মিটিং হয়ে গেলে সকলে নির্ধারিত সময়েই কাজে যোগ দিতে পারেন। সেই অনুসারে সাড়ে সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগেই মিটিং শেষ হয় এবং কর্মীরা কাজে যোগ দেবার জন্য ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করতে থাকেন। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলের ঢোকা সম্ভবপর হত। কিন্তু ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটার সময় এডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার ডি পি চক্রবর্তীর নির্দেশে ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। গেটে প্রহরারত সিকিউরিটির লোকেরা কেউ কেউ প্রবেশরত কর্মীদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু উক্ত অফিসার তাঁদের ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেন। বাইরে আটক কর্মীরা ভেতরে ঢোকার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তন্দণ্ডেই গুলীবর্ষণের আদেশ দেওয়া হয়। সাতটা তিরিশ মিনিটে গেট বন্ধ হয়েছে, আর সাতটা একত্রিশে গুলী চলেছে।

গেটের লোহার ফাঁক দিয়ে নল বাড়িয়ে প্রায় শ্রমিকদের বুক ছুঁয়ে গুলী চালানো হয়। তন্দণ্ডেই বুলেটের আঘাতে হতভাগ্য চারজনের বুক ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁরা গেটের সামনে লুটিয়ে পড়েন। একজন শ্রমিককে ভিতরে রক্তাক্ত অবস্থায় বাথরুমের ভেতর পাওয়া যায়। উপস্থিত ডাক্তারেরা তাকে পরীক্ষা করে বলেন যে, বুলেটের আঘাতে নয়, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট

পর দিন বুধবার সকালে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরীর নারকীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্তের একটি রিপোর্ট পেশ করেন। ওই রিপোর্টে প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুলীচালনায় তীব্র নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, গুলী চালাবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। জনতা শান্তিপূর্ণ ছিল। বিনা প্ররোচনায় গুলী চালানো হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং লোকসভায় ঘোষণা করেছেন যে, হাইকোর্টের কোন বিচারপতিকে দিয়ে কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরীর কর্মীদের ওপর প্রতিরক্ষা বিভাগের নিরাপত্তা-বাহিনীর গুলীবর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। এই ঘোষণাটির উল্লেখ করে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, সমস্ত ঘটনাটি এ রাজ্যের ব্যাপার, ও'রা কিভাবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে পারেন তা বুঝি না। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে কেন্দ্রের রাজ্য সরকারের সংগে পরামর্শ করা উচিত ছিল।

আমাদের আশংকা, কেন্দ্র কর্তৃক বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা দ্রুত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার দোষীদের আড়াল করতে চাইছেন। বিশেষ করে যখন সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং যখন তাদের বিচারার্থে চালান দেওয়া হবে।

কাশীপুর ও কংগ্রেস

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা যখন একবাক্যে সকলে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে ধিক্কার জানাচ্ছেন, যখন তাঁরা জনগণের সঙ্গে শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, যখন তাঁরা এই অবিচার বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন পাশাপাশি কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এত বড় মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁদের বিবেক বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন ছাড়া আর কোনো কংগ্রেস নেতা হত্যাকাণ্ডের স্থানটি দেখতে যান নি, নিহত আহতদের হতভাগ্য পিতা-মাতা, পত্নী বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিন্দুমাত্র সমবেদনার বাণী উচ্চারণ করেন নি।

যে কথাটি আমরা আগে বলেছি, গতবারে যুক্তফ্রন্টকে টপ্‌লে করার জন্য এম-এল-এ ভাঙানোর কৌশল কার্যকর হয়েছিল, এবারে সে সম্ভাবনা নেই। তাই অন্য কায়দার প্রয়োজন, সে কায়দা হচ্ছে ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি করা, সাম্প্রদায়িক-প্রাদেশিক দাঙ্গা ঘটানো, কলকারখানায় সশস্ত্র অশান্তি সৃষ্টি করা, যুক্তফ্রন্ট সমর্থকদের ওপর দৈহিকভাবে হামলা করা, যেমন বৃহস্পতিবার কাঁচড়াপাড়ায় যুক্তফ্রন্টের সমর্থক পরেশ সাহা নামক জনৈক শিক্ষকের দুটো হাত কেটে নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুলিশও বেশ নিষ্ক্রিয়, কেন না কংগ্রেসী আমলে এলাকায় এলাকায় পুলিশী ব্যবস্থায় যে সব কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করা হয়েছিল, এখনো পর্যন্ত ব্যাপক রদবদল ও বদলির দ্বারা যুক্তফ্রন্ট সরকার এলাকাভিত্তিক সেই কায়েমী স্বার্থগুলিকে ভাঙতে পারেন নি।

সারা বাংলার ধিক্কার

কলকাতা, শহরতলী, বিরাট শিল্পাঞ্চলসহ সমগ্র পশ্চিমবাংলায় কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরীর পাঁচজন শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা এবং বহু শ্রমিককে আহত করার বর্বরতার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ১০ই এপ্রিল তারিখে যে সর্বাত্মক ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়, হরতাল ধর্মঘটের সংগে অতি পরিচিত পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। সমগ্র পশ্চিমবাংলা কাশীপুরের বর্বর হত্যাকাণ্ডে ধিক্কার জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সবকানরর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে রাজ্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে চব্বিশ ঘন্টার জন্য একেবারে স্তব্ধ রেখে। মাত্র একদিন আগে ধর্মঘটের ডাক দেওযা হয়েছিল, কোন রাজনৈতিক প্রস্তুতি ছিল না, মাইনরিটি পকেটগুলি ছাড়া আর কোথাও পুলিশ ছিল না। কোথায় সামান্য বচসাও হয় নি, স্বতঃস্ফূর্ত এই হরতালের তুলনা নেই। সারা পশ্চিমবঙ্গ এই অনাচারের বিরুদ্ধে নিজ অভিমত জ্ঞাপন করেছে।

ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খুব তিক্ত হয়েছে। লোকসভায় এ

নিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। এই মর্মঘটকে উপলক্ষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন যে উক্তি করেছেন তা শুধু পশ্চিমবঙ্গবাসীর কেন্দ্র-বিরোধী মনোভাবে অধিকতর ইন্ধন জোগাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংবিধান-বিরোধী কাজ করছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ঘোষণা শুধু বাস্তবতাকেই অস্বীকার করে না, এত বড় একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কের সুস্থতার প্রতিও সন্দেহের উদ্রেক করে। এই সকল উক্তিগুলিই প্রমাণ করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলি সম্বন্ধে শাসকের মনোভাবই পোষণ করে। এত বড় একটা হৃদয়বিদারক ঘটনা যেখানে ঘটে গেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন তার জন্য কোন সমবেদনাই প্রকাশ করেন নি এবং ঘটনাটির প্রতি তাঁর অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যসমূহ সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

তদন্তের নেপথ্যে

কাশীপুরের ঘটনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার রাতারাতি তদন্ত কমিশন বসিয়ে ফেলেছেন। আকস্মিক এতটা তৎপরতা কেন?

প্রথমত এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোন কথাবার্তা কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করেই বলেন নি। অথচ সাংবিধানিক দিক থেকে কেন্দ্রের সে অধিকার আছে কিনা সেটা সুস্পষ্ট নয়। আমাদের মনে হয় এটা খোলাখুলিই রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। এখন যদি রাজ্য সরকার পাল্টা একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসান (আমাদের মনে হয় রাজ্য সরকারের সেই অধিকার নিশ্চয়ই আছে, কেন না এরকম অবস্থার কোনকালে উদ্ভব হবে তা সংবিধান প্রণেতারা ভাবতেই পারেন নি) তাহলে অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে। কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে যা করেছেন তা রাজ্য সরকারকে পাল্টা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসাতে প্ররোচিত করবে এটা হলফ করেই বলা যায়।

দ্বিতীয়ত কেন্দ্রের মতলবটা কি? কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে উগ্র রাজ্য সম্প্রসারণের প্রেতাত্মা ভর করেছে এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করার কারণ ঘটে নি। তাহলে নিশ্চয়ই এই তদন্ত কমিশন বসানোর পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটা যে কি সেইটাই পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন।

দুর্গাপুর ও কাশীপুরের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রোমোটার-ফোরম্যানদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং গত বাইশ বছরের ইতিহাসে এইরকম ঘটনার নজির নেই। কংগ্রেসী আমলে যদি কোন অফিসার এরকম বেপরোয়া গুলী চালানোর আদেশ দিত, তার গায়ে হাত দেওয়া দূরে থাক তার প্রমোশনের ব্যবস্থা তদণ্ডেই হয়ে যেত। অপরাধ করা এবং তা করতে নির্দেশ দেওয়া দুটোই শাস্তিযোগ্য বিষয়। কাশীপুরের ব্যাপারে চারজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে (ভার্মা উপাধিধারী আর একজনকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না এবং শ্রমিকদের মতে সে নাকি এখনো কারখানার অভ্যন্তরে আছে) এবং পুলিশ এই চারজনকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট আইনের ধারায় ফেলে কোর্টে বিচারার্থ চালান দিয়েছে এবং বিচারক এদের জামিনের অযোগ্য মনে করে হাজতবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। এখন বিচার হবে, বিচারে অপরাধ প্রমাণিত না হলে এরা ছাড়া পাবে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে এদের শাস্তি, এমন কি চরমদণ্ডও হতে পারে।

আইনকে এক্ষেত্রে নিজের পথেই চলতে দেওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় তদন্তের অর্থই হচ্ছে কেন্দ্রের পোষ্য ওই অফিসারগুলিকে বাঁচিয়ে দেওয়া। কেন, সেটা খুলে বলছি। তদন্ত কমিশন গঠিত হয়ে কাজ শুরু করা মাত্রই এই অফিসারগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে। বছরের পর বছর কমিশন চলবে এবং এই অফিসারেরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার যখন কমিশন বসাচ্ছেন সেখানে টার্মস অফ রেফারেন্স কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করে দেবেন। তাতে এই কার্যে উক্ত অফিসারদের দায়িত্ব কতটা এই আইটেম নাও থাকতে পারে। তার অর্থই হচ্ছে উক্ত অফিসারদের গায়ে আঁচড় লাগছে না। তর্কচ্ছলে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এই বিষয়টি টার্মস অফ রেফারেন্সে থাকবে এবং ধরা যাক তদন্ত কমিশন এদের অপরাধী বলে ঘোষণা করলেন, তখন ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কেন্দ্রের। কেন্দ্র তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে আবার নাও পারে। তৃতীয়ত কমিশন তদন্ত করবেন পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, এক্ষেত্রে কোন ফরিয়াদী থাকবে না। যেখানে অপরাধ প্রমাণ করানোর দায়িত্ব কারো নেই, সেখানে অপরাধ করেও আইনকে ফাঁকি দিতে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়।

পক্ষান্তরে রাজ্য সরকার যেভাবে ব্যাপারটিকে নিয়েছেন তাতে বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখা হবে। এটি সোজাসুজি পুলিশ কেস, ফৌজদারী মকদ্দমা। অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব পুলিশের। অপরাপর ক্ষেত্রে যা হয়। কাজেই যদি সত্যই ধৃত ব্যক্তিগণ অপরাধ করে থাকে এবং আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা সে অপরাধ পুলিশ প্রমাণ করতে পারে তাহলে দোষী ব্যক্তির সাজা পাবে, আইনের প্রতি আস্থা বাড়বে।

কাজেই গোড়ায় যা বলেছিলাম সেটাই সত্য বলে মনে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্তটা আসলে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা এই কৌশল বুঝতে পেরেছেন, এখন তাঁরা কি করেন সেইটাই দেখতে হবে।

একটি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

ভারত সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকা বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কণ্ট্রাক্ট হিসাবে দিয়ে ব্যয় করা হয়েছে, এবং তিনটি পরিকল্পনাতেও দেশের যে কিছু হয় নি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে ব্যয়িত অর্থের অধিকাংশই কণ্ট্রাক্টরদের পকেটে গেছে।

বর্তমান ঘটনাটি খুবই ছোট। পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় শেঠ সুখলাল কর্ণানী হাসপাতালে একজন কণ্ট্রাক্টরের কারসাজি হাতে-নাতে ধরে ফেলেছেন। একশোটা পাখা রং করা ও রেগুলেটরগুলি মেরামত করার কথা ছিল, কিন্তু তা হয় নি, অথচ কণ্ট্রাক্টরের বিল ভারপ্রাপ্ত অফিসার মহাশয় মঞ্জুর করেছেন।

অর্থাৎ কাজ না করেই পুরো কাজের দাম আদায়, কিছু দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারকে তার ভাগ দিয়ে, এই খেলাই গত একুশ বছর ধরে চলেছে ছোট বড় সব স্তরে। এটি তার একটি ছোট উদাহরণ মাত্র। সুবোধবাবুর সঙ্গে আমাদের যে ইন্টারভিউ হয়েছিল, তাতে তিনি বলেছিলেন যে এই ঠিকাদারী প্রথাকেই তুলে দেওয়া দরকার। তাঁর এই চিন্তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সত্যিই এ-দিক দিয়ে কোন দিনই ভেবে দেখা হয় নি যে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া মারফত সরকারের যে টাকাটার শ্রাদ্ধ হয়, সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কাজগুলি হলে যখন পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট রয়েইছে, তার অনেকটা সাশ্রয় হবে, দুর্নীতির সবচেয়ে বড় মুখটা বন্ধ হবে। আমরা এও জেনে আনন্দিত হচ্ছি যে সুবোধবাবু বাস্তবিকই তাঁর বিভাগের কিছু কিছু কাজ কণ্ট্রাক্ট দেবার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সরকারী তত্ত্বাবধানে করাবার চিন্তা করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও এই প্রচেষ্টার সম্ভাবনা অনেক।

(১১।৪।৬৯)

ভারত দর্শন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্বেগ।

পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত চেতনায় কাশীপুরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে একদিনের জন্য যে অভূতপূর্ব শান্ত ও সাফল্যপূর্ণ হরতাল পালিত হল তার ওপর বিবৃতি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, একটা বিচার-বিভাগীয় তদন্ত যখন স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে (এ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক আশ্বাস দান করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার স্বর্ণ সিং) তখন সর্বপ্রকার কাজকারবার স্তব্ধ করে দেওয়ার কোনও যুক্তি ছিল না। তা ছাড়া রাজ্য সরকার কয়েকটি সাংবিধানিক কানুনও লঙ্ঘন করেছেন, রাজ্যে আহূত ধর্মঘটের আওতায় কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ফেলে। ঐ সব সংস্থারও কাজ বন্ধ ছিল। হরতালটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বড়ই বিচলিত করেছে। তাঁর সেই ঐতিহাসিক উদ্বেগ আবারও তাঁকে উত্তেজিত করতে শুরু করেছে। তিনি এই সম্পর্কেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ল এণ্ড অর্ডার-প্রেমিক হৃদয়ে স্বদেশবাসীর মৃত্যু, দেশবাসীর ওপর দেশবাসীর বর্বর আঘাত আঘাত করে না। যা তাঁকে বিচলিত করে তা হল শাসকের রাজদণ্ডটি তাঁর মনের মতো ঠিকভাবে না নড়লে। যে পাশবিক হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল, যে ঘটনাকে জনমত নির্বিশেষে সকলে সঘৃণায় ধিক্কৃত করছেন, ইতিহাসে অদ্বিতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেজন্য সামান্য উদ্বেগ প্রকাশ না করে এটা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর হৃদয়ে দেশবাসীর জন্যে বিশেষ মেহনতী জনতার জন্য কোনও আবেগের স্থান নেই। তিনি ল এণ্ড অর্ডারের চাপে আজ প্রস্তরীভূত হয়ে গেছেন। দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর হৃদয়হীন ব্যবহারটা বিজয়ী বিদেশী শাসকদেরও লজ্জা দিয়ে তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রাখবে।

তেলেঙ্গানা :

তেলেঙ্গানা নিয়ে দিল্লীতে বৈঠক হয়ে গেল। কিছু না কিছু একটা ফয়সালার আশাও করা হচ্ছে। তবে স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার দাবি রক্ষা অসম্ভব। একটা মধ্যবর্তী কিছু।

যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে এটা মেনেছেন যে, তেলেঙ্গানায় বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ আছে। ঐ অঞ্চলের স্বার্থ সর্বথা রক্ষিত হয় নি। রক্ষাকবচেরও মর্যাদা দেওয়া হয় নি ঠিক ঠিকভাবে। চাকরীর ন্যায়সঙ্গত দাবি মানা হয় নি।

অনেক মাথা ঘামিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটা আট দফা মীমাংসাসূচী উপস্থাপিত করলেন বটে, কিন্তু তাও সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি। বিশেষত তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি তো একেবারেই নারাজ এই মীমাংসা মেনে নিতে। তাঁদের দাবি স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা, না হলে মীমাংসা নেই। সুতরাং তাঁদের তরফে আন্দোলন চলবে। সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী সদালক্ষ্মী এই মর্মেই মন্তব্য করেছেন সাংবাদিকদের কাছে।

মীমাংসাসূচী

প্রধানমন্ত্রীর মীমাংসাসূচীর মূল বক্তব্যগুলি এই রকম :—

এক, আগামী মাসের মধ্যেই একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি তেলেঙ্গানার উন্নয়নের জন্য অর্থ সঙ্কুলানের প্রশ্নটি বিচার-বিবেচনার পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করবেন। কমিটিতে থাকবেন চেয়ারম্যান হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের জনৈক বিচারপতি এবং দুজন সদস্য।

দুই, ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিক আলোচনাচক্র বসিয়ে অবস্থার পর্যালোচনা করা হবে।

তিন, মুখ্যমন্ত্রীর (অন্ধ্র) সভাপতিত্বে আরও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তেলেঙ্গানা উন্নয়ন কমিটি গঠিত হবে। এতে তেলেঙ্গানার প্রতিনিধিত্ব করে অন্ধ্র মন্ত্রিসভার এমন মন্ত্রিগণও সদস্যপদ লাভ করবেন। পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য এবং তেলেঙ্গানা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতিও এই কমিটির সদস্য হবেন।

চার, কর্মসূচী রূপায়ণকারী কমিটিও গঠন করা হবে। এই কমিটিতে কেন্দ্রীয় অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধি এবং অন্ধ্র রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন পরিকল্পনা কমিশনের জনৈক পরামর্শদাতা। নির্দিষ্ট সময়কালে মধ্যে মধ্যে এই কমিটি কর্মসূচীর যথাবিহিত রূপায়ণ হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

পাঁচ, তেলেঙ্গানার সমস্যা সমাধানে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা মুখ্যমন্ত্রী তা বিবেচনা করে দেখবেন।

ছয়, আইনজ্ঞদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তেলেঙ্গানাবাসীদের চাকরী সংস্থান সংক্রান্ত বিশেষ কোনও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রাখা যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখবেন।

সাত, একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা কমিটি পাব্লিক সার্ভাণ্টদের অভিযোগাদি পরীক্ষা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরে সত্বর সুপারিশ করবেন।

আট, কেন্দ্রের নজরে সর্বদা তেলেঙ্গানার সমস্যাদি তুলে ধরতে সাহায্য করবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতি ছয় মাসে প্রধান ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এতৎ বিষয়ে বৈঠক হবে এবং সেই বৈঠকে তেলেঙ্গানার প্রতিনিধি যাঁরা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, তাঁরাও থাকবেন। থাকবেন উপপ্রধান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সেই সব মন্ত্রী যাঁদের উপস্থিতি প্রয়োজন বলে বিবেচিত হবে।

তেলেঙ্গানা আঞ্চলিক কংগ্রেসের দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সরেজমিনে তেলেঙ্গানার সুবিধে অসুবিধে দেখে আসুন। কিন্তু এই দাবি গৃহীত হয় নি। বস্তুত, এই দাবি মেনে নিলে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হত তা। কেন না ইতিপূর্বে একটি সংসদীয় প্রতিনিধি প্রেরণের দাবি অগ্রাহ্য করেছেন কেন্দ্র। কেন্দ্রের এই গররাজি মনোভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের তিন প্রধান।

বিরোধীপক্ষে আট দফার ঘোষণা ১৪ই তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখার অনুরোধও উপেক্ষিত হয়েছে। পি-এস-পি নেতা নাথ

পাই একরকম তেলেঙ্গানার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারে আগ্রহই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আসামে যেমন মধ্যবর্তী রাজ্যের আশ্বাস আছে এখানেও তেমন হতে পারত, এমন কি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হলেও তিনি বিচলিত হতেন না। স্বতন্ত্র সদস্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী কেবল কয়েকটা কমিটি গঠনের আশ্বাস দিয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে আট দফার মধ্যে কমিটির ফিরিস্তি শুনতেই মাথা ঘুলিয়ে ওঠে। এই সমুদয় কমিটির সদিচ্ছার ওপরই পুনশ্চ তেলেঙ্গানার ভাগ্য অর্পিত হতে চলেছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অন্ধের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাও এই সব কমিটির কাজকারবারে অন্যতম মুখ্য অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। কোন রাজ্যের মঙ্গলের পক্ষে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা যদিও প্রধান থাকাই উচিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্টো কথাও উঠতে পারে। অন্তত বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে কেউ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন নি। তেলেঙ্গানাকে বঞ্চিত ও বিক্ষুব্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর নীতি তো কম দায়ী নয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের সময় অনুন্নত তেলেঙ্গানায় যে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেগুলির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যথার্থ প্রয়োগ হয় নি। সব সময়ই অন্ধ্র-বাসীর কোলে-ঝোল টানা হয়েছে। তেলেঙ্গানা প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধাগুলি পায় নি। অথচ যে পাঁচটি জেলা নিয়ে তেলেঙ্গানা অঞ্চল, রাজ্যে সেই পাঁচটি সর্বাপেক্ষা অনুন্নত যার উন্নতির দিকে প্রকৃত কর্তব্যচ্যুতি ঘটিয়ে অন্ধ্র সরকার কোন দৃষ্টিপাতই করেন নি এ পর্যন্ত। অথচ ভারত সরকারের অন্ধ্রপ্রদেশ আঞ্চলিক কমিটি সম্পর্কিত আদেশ ১৯৫৮ সালে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু সে শুধুই কাগজকলমের ব্যবস্থা।

অতএব কমিটির সংখ্যা বাড়িয়ে এখন যে কাজ হবে এমন গ্যারান্টি সত্যিই আছে কি! ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা তো তাঁদের নিজের নিজের আঞ্চলিক ক্ষমতা ও প্রভাব বজায় রাখতেই ব্যস্ত থাকবেন। কারণ আগে গদী সামলাও, পরে কাজ ও ভাবনা। এই অবস্থায় তেলেঙ্গানার স্বার্থ কে দেখবেন। কমিটির কথা যদি ওঠে, তবে সেই সব কমিটিতে উচ্চ ক্ষমতার শিখরেও থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। যেখানে না থাকবেন সেখানেও অন্যভাবে তাঁর প্রভাব বলবৎই থাকছে। তেলেঙ্গানাকে সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর বদান্যতার দিকেই পুনশ্চ তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। সম্ভবত এই মনোভাব থেকেই তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি এখনও স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার দাবিতে অটুট থাকতে চান। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের অর্থ দেশের অনুরূপভাবে অন্যত্রও বিভাজন, যা আদৌ কাম্য নয়। এই অবাঞ্ছনীয়কে রুখতে হলে, সুতরাং ঢের বেশি উদারতা নিয়ে সকল দল ও মতের প্রতিনিধিদের, বিশেষত তেলেঙ্গানার সর্বস্তরের প্রতি-নিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়াই শ্রেয় ছিল। এখনও সে সুযোগ আছে। সদিচ্ছা থাকলে কাজও হতে পারে। বিরোধীরা এজন্যই ঘোষণাটি বিলম্বিত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু এ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর আট দফাকেই পরীক্ষামূলক প্রাথমিক ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করে তেলেঙ্গানার বিস্ফোরক অবস্থার অবসান ঘটালে খুব ক্ষতির কারণ আছে বলেও মনে হয় না। প্রস্তাবিত কমিটিগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রভাব থাকলেও কমিটি গঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে কেন্দ্রের নজরে তেলেঙ্গানা স্বার্থকে সর্বদা রক্ষা করা। কেন না, ইতিপূর্বে তেলে-ঙ্গানার স্বার্থরক্ষায় রাজ্য ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য কমিটিগুলি কেবলমাত্র আর্থিক সমাধানের দিকেই নজর দিচ্ছে, যেখানে তেলেঙ্গানার জন্য সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সমাধানও সমভাবেই কাম্য।

তেলেঙ্গানা থেকে অধিকতর মন্ত্রী গ্রহণ এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর পদটি তেলে-ঙ্গানার জন্যই রাখা, যদি মুখ্যমন্ত্রী ঐ অঞ্চল থেকে না থাকেন—এই নিয়মটিও লিপিবদ্ধ থাকলে প্রজা সমিতির প্রতিক্রিয়া অন্যতর হলেও হতে পারত।

প্রধানমন্ত্রীর আট দফার সঙ্গে কয়েকটি রাজনৈতিক সমাধানের সুযোগ থাকলে তেলেঙ্গানার মনে আজ যে সন্দেহ বদ্ধমূল তা নিরসনের উপায় হতে পারত। স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার দাবিকে সেই উপায়েই শান্ত করা যায়। আজকের অবিশ্বাস বহু-দিনের বঞ্চনার ফল। অর্থনৈতিক সমাধানের সঙ্গে ক্রমে কাজেই রাজনৈতিক সমাধানই আজকের বিক্ষোভ প্রশমিত করতে পারে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা

চল্লিশজনের পাওনা ছিল, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্যামাচরণ শুক্লা "টু স্টার্ট উইথ" ছত্রিশ-জনকে নিয়ে সবচেয়ে মোটা মন্ত্রিসভা ফাঁদলেন মধ্যপ্রদেশে। বাকি চারজনকে মন্ত্রী না করলে অন্তত পরিষদীয় সচিব বানিয়ে পরিতৃপ্ত করার বাসনা শ্রীশুক্লা কালবিলম্ব না করেই ঘোষণা করেছেন। লম্বা মন্ত্রিসভা গঠনের এ হেন দাবিগুলি অবশ্যই মিটিয়ে দিতে হবে, যদি রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাই বজায় রাখতে হয়। ইতিপূর্বে কংগ্রেসকে এখানে গদী হারাতে হয়েছিল। সেই পরিতাপজনক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করতে কংগ্রেস কি আর পুনশ্চ পা ভাসাবে।

তবু এখনও কংগ্রেস সম্ভবপরভাবে তার কোয়ালিশন-বিরোধী নীতি বজায় রাখতে আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছে। অর্থাৎ প্রায় গদীর জন্য হাঁসফাঁস অবস্থা। সংযুক্ত বিধায়ক দলে ভাঙন ধরানোর পর গদী রক্ষার জন্য শ্রীশুক্লা দলত্যাগী প্রগতিশীল বিধায়ক দলকে নিয়ে কোয়ালিশনে বসতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি সরাসরি এ প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন নি। ইতিপূর্বে 'কোয়ালিশনে বসব না'—মুখ ফসকে এমন অদূরদর্শী হাঁক পেড়ে বসে-ছিলেন হাই কম্যান্ড। কিন্তু এইসব নীতি বাস্তব অবস্থার চাপে টিকিয়ে রাখা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এদিনের কংগ্রেস তো আর সেদিনের কংগ্রেস নয়। কংগ্রেস বলতে সাধারণে যাকে জনগণের জাতীয় দল বলে স্বাধীনতাপূর্ব যুগে মনে কর-তেন, আজ তাঁরা কংগ্রেসকে তেমন আদর্শ-বাদী দল বলে আর গণ্য করে না। এমন কি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় চরিত্রও সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক স্বার্থবুদ্ধির চাপে নষ্ট হয়ে গেছে। কংগ্রেসে গোষ্ঠীপ্রাধান্যের নোংরা প্রভাবও তার পূর্ব ইমেজকে খতম করেছে। তাই একাই একশ', এমন গর্ব আর টেকসই হচ্ছে না। এখন কংগ্রেসকেও বাঁচতে হবে অন্যান্য ছোট দলের মতোই রাজ্যে-কেন্দ্রে কোয়ালিশন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কংগ্রেস যে পথে চলেছে তাতে জনগণের বিশ্বাসভাজন কোন বৃহৎ দলের মধ্যেই সে আর "লাইক মাইণ্ডেড" পার্টি খুঁজে পাচ্ছে না। তাকে খুঁজে নিতে হচ্ছে সেই সব স্যাঙাৎ যারা ক্ষমতার ম্যাগনেটে নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে আইনসভায় 'বারগেন' করছেন। সেদিক থেকে শ্রীশুক্লা যথার্থ স্যাঙাৎ-ই বেছেছিলেন,—তথাকথিত 'প্রগতি-শীল' বিধায়ক দল (দলত্যাগীদের)। কংগ্রেসের এখনও সামান্য চক্ষুলজ্জার মুখোস সে প্রস্তাবে সরাসরি রাজী হতে পারে নি। তাই ভেবে-চিন্তে নির্দলদের সঙ্গে মোর্চা গঠন করে মন্ত্রিসভার পর-ওয়ানা পেলেন শ্রীশুক্লা। নির্দলরা ইতি-পূর্বেও পাষাণের টুকরোর কাজ করেছেন মন্ত্রিসভা গঠনের পাল্লায় ঝুঁকতি আনার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে অনেকে নির্দলীয়-রূপে এজন্যই আইনসভা আলোকিত করতে আসেন। এঁরা দলত্যাগী নন, দলে দলে 'ভাড়া খাটিয়ে' সংখ্যা বিশেষ।

দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই, এখন দেশব্যাপী ব্যবসাদারদের বাজার সরগরম। নিলাম ডেকে মন্ত্রিসভা গঠিত হচ্ছে। দরে না পোষালে সে সভা ভেঙেও যাচ্ছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

জ্ঞান দত্ত

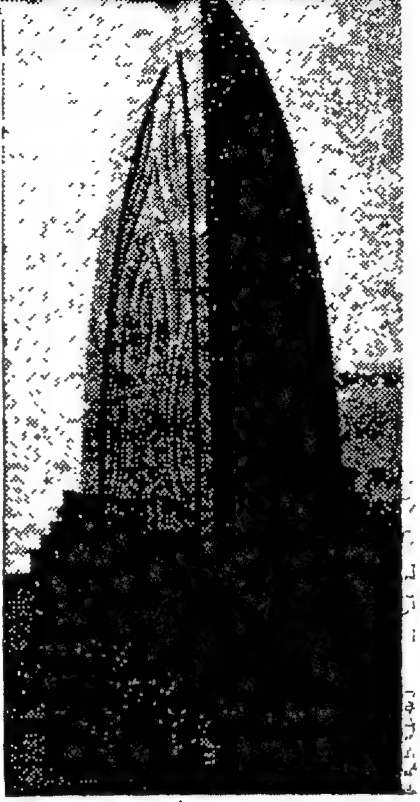

১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। পঞ্চাশ বছর আগে ঐ দিনটি পরাধীন ভারতের বুকে বৃটিশ সরকারের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের দিন। আর ঐ দিনটি জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসরূপেই প্রতিটি ভারতবাসীর মর্মে করুণভাবে গাঁথা। কিন্তু ঐ দিনই আবার নতুন শপথের দিন, অত্যাচারী আর অত্যাচারিত এই দুয়ের ভেদাভেদ উপলব্ধির দিন। বৃটিশ সরকারের কামানের গর্জনে অনুষ্ঠিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেইদিন মৃতের পাহাড়ে সংগ্রামী ভারতীয়দের মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দিলেও—সেই দিনের স্মৃতিই আগামী দিনের স্বাধীনতার সংগ্রামীদের করে তুলেছিল আরো দুর্ধর্ষ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরো সোচ্চার।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পিছনকার ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশশক্তি রীতিমতো ক্ষতবিক্ষত। সেই ক্ষত এবং নিজেদের ক্ষতি পূরণ করতে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার প্রতিশ্রুত ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেবার পরিবর্তে বেআইনী আইনের আশ্রয় নিয়ে ভারতবাসীদের কাছ থেকে সিপাহী ও অর্থ সংগ্রহ করতে সুরু করে। এই বেআইনী কাজে প্রথম অগ্রসর হন পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার। তিনি গরীব চাষীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে না পারলে অমানুষিকভাবে তাদের জমি তাঁর নির্দেশে কেড়ে নেওয়া হয়। চারিদিকে চলতে থাকে বিনা কারণে ধরপাকড়। পাঞ্জাবে আঞ্চলিক ভাষায় যে সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে সেগুলির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়, বাইরে থেকে কোনো জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এমন কি, আইন করে সমাজবিরোধী আর বিপ্লবীদের একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী এই আইনের প্রতিবাদ করে সত্যাগ্রহের আহ্বান জানালেন। শুধু এই আইনের প্রতিবাদ করাই নয়, অন্যান্য যাবতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধেও মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের পথাবলম্বন শ্রেয় বোধ করলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোল। এই ঘটনা পাঞ্জাবের জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুললো। তারা রাওলাট অ্যাক্টের বিরোধিতা করার জন্য আরো এক ধাপ এগিয়ে এলো এবং ৬ই এপ্রিল সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করা হোল। এই হরতাল সম্পূর্ণভাবে সফলতাও লাভ করলো।

সেই সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসের কাছে একটা গো-মেলা চলছিল। জায়গাটা ছিল কুবার্ডগড় দুর্গের বিপরীত দিকে।

উত্তেজনা তখনো খুব ধূমায়মান। ৮ই এপ্রিল সেই মেলায় পাঁচ-ছজন গোরা সৈন্য অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা নিহত হোল। বলা বাহুল্য, হত্যা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা স্বদেশপ্রেমিক। কিন্তু গোরারা পদে পদে ভারতীয় নারী-পুরুষদের ক্রীতদাসের ন্যায় যেভাবে লাঞ্ছনা করত ও সতীত্ব হনন করতো—তাতে তাঁরা নিরুপায় হয়ে গোরাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

ফল অবশ্য উল্টো হোল। গোরা সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে যত্রতত্র বীভৎস অত্যাচার শুরু করলো। ফলে সাতজন নিরীহ ভারতবাসী প্রাণ হারালেন গুলীবিদ্ধ হয়ে।

পাঞ্জাবের জনমনে যে উত্তেজনা ধূমায়মান ছিল তা ক্রমশ অগ্নির আকার ধারণ করতে লাগলো। তাঁরা বিরাট এক মিছিল নিয়ে কবরখানার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। হিন্দু-মুসলমান—কোনোরকম ধর্মের ভেদ নেই। সকলেই অত্যাচারিত। সকলেই উত্তেজিত—বিদ্রোহের এক-একটি অগ্নিশিখা যেন বিরাট অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করে বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়। তখনো তবু সে অগ্নি যেন শান্ত। মিছিলের প্রতিটি মানুষ গিয়ে অর্পণ করলো কফিনগুলিতে এক-একটি সিল্কের কাপড়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সুরু হোল সংগ্রাম—স্বাধীনতার সংগ্রাম সেদিন থেকেই।

১২ই এপ্রিল রাত্রিতে সকলেই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলো। পরদিন অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সভানুষ্ঠানের কথা। কলেজের বার-তেরজন ছাত্র প্রথমে এগিয়ে গেলে পরে তাদের অনুসরণ করলো জনতা। এবং জমায়েত হোল জালিয়ানওয়ালাবাগে। তাদের অনুসরণ করলো জনতা। প্রথম থেকেই সামরিক বাহিনী বাধা দিতে সুরু করলো। জালিয়ানওয়ালাবাগের তিনদিকে দেয়াল। আর খোলা দিকটিতে রাইফেল উঁচু করে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত। জালিয়ানওয়ালাবাগে সবাই যখন উপস্থিত, ডায়ারের সৈন্যবাহিনী মানুষ মারার উদ্দেশে অবিশ্রান্তভাবে গুলী চালাতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সব খতম। মৃতদেহের ওপর মৃতদেহ। সে এক রক্তপ্লাবিত ভয়ংকর মৃত্যুর দৃশ্য।......

যে বৃটিশ জাতিকে গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক বলা হয়, তাদের রাজশক্তির ছিল এই জঘন্য স্বরূপ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর সারা ভারত স্তব্ধ। নেতৃবৃন্দও এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনোরকম বিবৃতি দিতে পর্যন্ত সাহসী হলেন না। মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতারা স্তব্ধতার আড়ালে থাকায় ভারতবাসীদের সেই চরম দুঃসময়ে এগিয়ে এলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বৃটিশরাজের কাছ থেকে যে 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন তা ত্যাগ করার সংকল্প জানিয়ে এক চিঠি দিলেন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে। সেই চিঠির বিষয়বস্তু প্রতিটি ভারতবাসীর গৌরব। কারণ ভারতবাসীর দুঃখের দিনে রবীন্দ্রনাথ সরকারী সম্মান বিসর্জন দিয়ে নিজে ভারতবাসী হিসেবে সমস্ত ভারতবাসীর বেদনা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর সংকল্প ঘোষণা করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি যেমন ঐতিহাসিক তেমনি বিশ্বকবির চিঠি একালের নির্যাতিত মানুষের কাছে মানবতার উদ্বোধনের এক অবিস্মরণীয় দলিল।

আন্তর্জাতিক

চতুঃশক্তি বৈঠকে চার্লস ইয়স্ট, আরমান্ড বেরার্ড, লর্ড ক্যারাডন ও জ্যাকব মালিক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

জর্ডানের রাজা হুসেন আরব-ইজরায়েল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ছয়-দফা শান্তি প্রস্তাব পেশ করেছেন। হুসেন বলেছেন, তাঁর এই প্রস্তাবের পেছনে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসেরের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

১১ই এপ্রিল ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে ভাষণ দিতে গিয়ে হুসেন এই শান্তি প্রস্তাবের কথা বলেন। তিন দিন ধরে সরকারিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর এবং রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন সহ অন্যান্য মার্কিন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে হুসেন প্রেস ক্লাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

রাজা হুসেনের ছয়-দফা শান্তি প্রস্তাবের মূল কথা হল/ঃ আরবরা ইজরায়েলকে স্বীকার করে নেবে, কিন্তু এই স্বীকৃতির প্রতিদানে ইজরায়েলকে ৪ঠা জুন, ১৯৬৭ তারিখের পর দখল করা সকল আরব অঞ্চল ছেড়ে দিতে হবে। এই প্রস্তাব অনুসারে আরবরা ইজরায়েলের সীমানা মেনে চলবে, ইজরায়েলের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেবে এবং সুয়েজ খাল ও আকাবা উপসাগর দিয়ে নিরাপদে ইজরায়েলী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করবে। হুসেন অবশ্য এই সঙ্গে দাবি করেছেন, প্যালেস্টাইন থেকে উৎখাত করা আরব উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে। রাজা হুসেন চতুঃশক্তি শান্তি আলোচনার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

হুসেনের শান্তি প্রস্তাব সকলের কাছেই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হবে। হুসেন প্রস্তাবের পেছনে যদি সত্যি সত্যি নাসের ও অন্য আরব নেতাদের সমর্থন থাকে, তবে স্বীকার করতেই হবে শান্তির আগ্রহে আরবরা তাঁদের পূর্ব নীতি অনেকখানি পাল্টেছেন, তাঁদের দাবি অনেক নামিয়ে এনেছেন। এতদিন আরবরা, পৃথক রাষ্ট্ররূপে ইজরায়েলকে স্বীকার করতেই চান নি।

তবু কিন্তু ইজরায়েল হুসেন প্রস্তাবকে সমর্থন করে নি। ছয়-দফা শান্তি প্রস্তাব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তেল আভিভ থেকে ইজরায়েল সরকারের মুখপাত্র বলেছেন, হুসেনের প্রস্তাবে নতুন কিছু নেই। তিনি বিদ্রূপ করে বলেছেন, প্রেস ক্লাবে বক্তৃতা করে কোন মীমাংসা হবে না, মিটমাট চান তো সরাসরি আলোচনায় বসুন। পরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ারও বলেছেন, হুসেন প্রস্তাবকে তাঁর সরকার আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করবেন না। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, আরবরা শান্তি চায়, কোন্ বোকা এই কথা বিশ্বাস করে!

চতুঃশক্তি বৈঠক সম্পর্কেও তাঁর ভীষণ আপত্তি। তাঁর মতে; এই চার শক্তির মধ্যে দুই শক্তি ফ্রান্স ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন খোলাখুলিভাবে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। আর দুই শক্তি বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের বন্ধু ঠিকই, কিন্তু তারা আরব বিরোধীও নয়। এই অবস্থায় ইজরায়েল এদের কাছ থেকে কি ন্যায়বিচার পাবে?

ইজরায়েল হুসেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে একেবারে বাতিল করতে রাজী নয়। রাজা হুসেনের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রনেতাদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। হুসেন মার্কিন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার পরই তাঁর শান্তি প্রস্তাবের কথা বলেছেন।

শান্তি প্রস্তাব প্রচারের সময়টাও লক্ষণীয়। ওয়াশিংটনে যখন চতুঃশক্তি শান্তি আলোচনা সুরু হয়েছে তখন এই প্রস্তাবের কথা বলা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কিন সরকার এখন ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৭ তারিখের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে আরব-ইজরায়েল বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে আগ্রহী। এই প্রস্তাবে জুন যুদ্ধ ও তারপর ইজরায়েল অধিকৃত সকল আরব এলাকা ফিরিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে। তাই হুসেনের ছয়-দফা শান্তি প্রস্তাবের মূল বক্তব্য গ্রহণে মার্কিন সরকারের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ইজরায়েলকে খুশি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা দখলী এলাকা ইজরায়েলের হাতে রাখতে চায়।

চতুঃশক্তি বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি চার্লস ইয়স্ট এই কথাই বলেছেন। এবং স্বাভাবিক, এই নিয়ে সোভিয়েট প্রতিনিধি জ্যাকব মালিকের সঙ্গে ইয়স্টের মতভেদ হয়েছে।

তবু চতুঃশক্তি বৈঠক চলছে। এ পর্যন্ত দুটি বৈঠক হয়েছে। একটি ফরাসী প্রতিনিধি আরমান্ড বেরার্ডের বাড়িতে, আর অপরটি সোভিয়েট দূতাবাসে। তৃতীয় বৈঠক বসবে ১৪ই এপ্রিল বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড ক্যারাডনের বাড়িতে। বৈঠকের পক্ষ থেকে, একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যসম্বলিত ঘোষণাপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই গ্রুপের ওপর। চতুঃশক্তি প্রতিনিধিরা এটি অনুমোদন করার পর ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও জর্ডানের কাছে স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হবে।

চতুঃশক্তি মীমাংসার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করলেও, এখনও অবস্থা আশাপ্রদ নয়। আরবরা ইজরায়েলকে স্বীকৃতিদানে রাজী হলেও সমগ্র দখল-এলাকা তাদের ফেরৎ চাই। এ ব্যাপারে

কোন আপোষ তারা বরদাস্ত করবে না। বিপরীত দিকে ইজরায়েল যা বন্দুকের জোরে দখল করেছে, তা ফিরিয়ে দিতে একেবারেই রাজী নয়। এ অবস্থার মীমাংসা হবে কি করে?

পেরু:

লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় রকমের একটা বিরোধ কি আসন্ন?

ঘটনার গতি দেখে তাই মনে হয়। যে-কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এই লেখা ছেপে বেরুবার আগেও কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

ব্যাপারটা অনেকদিন ধরে চলছে। গত অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রপতি ফার্নান্ডো বেলন্ডের শাসন উচ্ছেদ করে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল জুয়ান ভেলাসকো আলভারেডো ক্ষমতা দখল করেন। লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে এমন ঘটনায় এখন আর কেউ চমকায় না। সামরিক অভ্যুত্থান এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—অধিকাংশ দেশেই হচ্ছে। কিন্তু তারপর ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ছ'দিনের মধ্যে ভেলাসকো, যিনি মোটেই কমিউনিস্ট নন বরং কমিউনিস্ট বিরোধী, পেরুর শক্তিশালী মার্কিন তেল কোম্পানী ইনটারন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানী (নিউ জারসি'র স্ট্যান্ডার্ড অয়েলের শাখা প্রতিষ্ঠান) ও তার তেল খনি শোধনাগার সব বাজেয়াপ্ত করে নেন, এবং তাও আবার বিনা ক্ষতিপূরণে।

স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষিপ্ত পেরু সরকারের ওপর। পেরুর জন্য মার্কিন সরকার তো কম করে নি। আর এই কি না তার প্রতিদান! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য আইনের সংশোধন করে (১৯৬২ সালে এই সংশোধন হয়; হিকেনলুপার সংশোধনী নামে এটি বিখ্যাত) এখন স্থির করা হয়েছে, যদি কোন রাষ্ট্র ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কোন মার্কিন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, তবে মার্কিন সরকার সে দেশের জন্য সকল সাহায্য বন্ধ করে দেবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে যদি কোন সুবিধা দিয়ে থাকে তা প্রত্যাহার করতে হবে। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ছ'মাসের মধ্যে এই 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে হবে।

পেরু সরকার কর্তৃক ইনটারন্যাশনাল অয়েল কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করার পর ছ'মাস শেষ হয়েছে। এখন নিকসন সরকারকে আইন মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ফলে, পেরু বৎসরে যে ৫০ মিলিয়ন ডলার মার্কিন সাহায্য পায়, তা বন্ধ হবে। তাছাড়া বেশি দরে পেরুর চিনি কেনার জন্য পেরুর বছরে যে ২০ মিলিয়ন ডলার আয় হয়, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই পেরুর অর্থনীতির ওপর এতে প্রচণ্ড চাপ পড়বে।

ভেলাসকো সরকারের বক্তব্য, এই ঘটনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেরুর ওপর চটা অন্যায়। বরং পেরুরই রাগবার কথা। বাজেয়াপ্ত-করা মার্কিন তেল কোম্পানী বে-আইনীভাবে পেরু থেকে ৬৯০·৫ মিলিয়ন ডলার তেল বের করে নিয়ে গেছে। পেরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ন্যায্যভাবে এই টাকা দাবি করতে পারে। তা না করে তারা কেবলমাত্র কোম্পানীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। পেরুর আইন অনুসারে এই কাজ সম্পূর্ণ সংগতভাবে করা হয়েছে।

রিচার্ড নিকসন এই ব্যাপারে একটা মীমাংসার আশায় জন আরউইনকে লিমায় পাঠিয়েছিলেন ভেলাসকোর সঙ্গে কথা বলার জন্য। ভেলাসকো শেষ পর্যন্ত ৭১ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়েছেন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি

ভেলাসকো

হল ২০০ মিলিয়ন ডলার), তাও কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা ৬৯০·৫ মিলিয়ন ডলার পাবার পর। স্বাভাবিকভাবেই আরউইন এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন পেরুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু তবু সে ইতস্তত করছে। কারণ, 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' গ্রহণের প্রতিক্রিয়া কেবল পেরুতে নয় (এখনও পেরুতে ৬০৫ মিলিয়ন ডলার মার্কিন পুঁজি বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় খাটছে), সমগ্র লাতিন আমেরিকায় মার্কিন পুঁজির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে।

৪ঠা এপ্রিল নির্ধারিত ছয় মাস পার হয়ে গেছে। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু করতে পারছে না। এ যেন, গিলতেও পারছে না ফেলতেও পারছে না, এমন অবস্থা।

মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে পেরুর সর্বনাশ হবে, এই সব বলে ভেলাসকোর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অন্য নায়কদের আর একটি অভ্যুত্থানে উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে।

ঘানা:

লেফটেনান্ট জেনারেল যোশেফ আর্থার আনক্রা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। ১৯৬৬ সালে কোয়ামে নক্রুমার হাত থেকে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন আনক্রা।

জনপ্রিয়, প্রগতিশীল ও বামপন্থী নক্রুমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি দুর্নীতিপরায়ণ। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। নক্রুমাকে তাড়িয়ে আনক্রা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ঘোষণা করেছিলেন, সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি দূর করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

অদৃষ্টের পরিহাস! আজ আনক্রাকে বিদায় নিতে হল দুর্নীতির নিদারুণ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, আক্রার বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তিনি ত্রিশ হাজার ডলারেরও বেশি ঘুষ নিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতাদের হাত করার জন্য তিনি এই টাকার অধিকাংশ খরচ করেছেন। সরকারিভাবে যে তথ্য প্রচার করা হয়েছে, তাতে জানা যায়, ফ্রান্সিস নুজোরিবে নামে আক্রার বায়াফ্রাবাসী এক ব্যবসায়ী ও তাঁর সুন্দরী সুইস স্ত্রী'র মারফৎ তিনি বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নানা সুযোগ করে দেবার বিনিময়ে এই টাকা নিয়েছেন। একটি কোম্পানীর কাছ থেকে আনক্রা নিজে হাতে ছ'হাজার ডলার নিয়েছেন।

এই সব ঘটনা জানার পর ঘানার সামরিক পরিষদের নির্দেশে পুলিশ কমিশনার, অ্যাটর্নী জেনারেল ও একজন বিচারপতি অভিযোগের তদন্ত করেন। বেগতিক দেখে আনক্রা সব স্বীকার করেন এবং পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

আনক্রার জায়গায় নতুন রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন ৩২ বৎসর বয়স্ক ব্রিগেডিয়ার আকওয়াসি আমানকুও আফরিফা। আনক্রা মন্ত্রিসভায় আফরিফা অর্থমন্ত্রী ছিলেন।

আফরিফা অত্যন্ত সরল জীবনে অভ্যস্ত। কড়া নীতিবাগীশ বলে তাঁর নাম আছে। তাঁর প্রথম স্ত্রী একবার টোগো থেকে আসার সময় বে-আইনীভাবে কিছু কাপড় সঙ্গে এনেছিলেন। এই অপরাধে আফরিফা তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেন এবং তাঁদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়

১০-৪-৬৯

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

গোপাল তিন দিন পাঠশালায় যায় নি। গুরুমশায় তাকে যেই বললেন—"হে রে গোপাল", অমনি গোপাল লেজ তুলে দৌড়। পরদিন পাঠশালায় আসতেই গুরুমশায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কি রে গোপাল, ক'দিন লিখতে আসিস নি কেন?" গোপাল জবাব দিল—"গুরুমশায়, সেদিন আমার মুখে ধোঁয়া উঠলো দেখে মা বললে যে—তোর পেটে আগুন লেগেছে, আজ আর লিখতে যাসনে।" গোপালের কথা শুনে গুরুমশায় সটান এক ঘা বেত মেরে বললেন —"তার পর আবার কামাই হল কেন?" এইবার গোপাল রিটকেল চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললো—"পাড়ার কলুদের বৌ মরেছে, তাই মা বললে যে বার মাস কলুদের তেল খাই, ওদের বৌ মরেছে—একদিন অশৌচ নেব না? তাই অশৌচ হয়েছিল বলে সেই দিন আসি নি।" গুরুমশার বললেন—"আচ্ছা তারপর কালকে স্কুলে আস নি কেন? এইবার গোপাল সহাস্যবদনে বললো—"কাল আপনার সঙ্গে বারোয়ারীতলায় দেখা হল, কাল আর স্কুল কামাই হল কোথা?" এর পর গুরুমশার গোপালকে কি শাস্তি দিয়েছিলেন জানি না, আর শেষ পর্যন্ত গোপাল কতদূর বিদ্যাভ্যাস করে পণ্ডিত হয়েছিল সেই কথা জানি না। তবে আমার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর সেই সরকারের কার্যধাবা দেখে এই গোপাল ভাঁড়ের বিদ্যাভ্যাসের বহরই মনে পড়ছিল। রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকাব গঠিত হবার পর প্রায় দুই মাস অতিক্রান্ত হতে চললো—এই দুই মাসে সরকার কি রকম, কতদূর কাজ করছেন তার হিসাব করলে হয়ত দেখা যাবে—প্রথম তাদের কেটে গেল মুখে ধোঁয়া উঠছে দেখে পেটে আগুন ধরেছে ভেবে সেই আগুন নেভাতে। তারপর কলুদের বৌ-এর মৃত্যুতে শোক পালনেও দিন চলে গেল—"আহা, যে কলু তাদের বারো মাস তেল দেয়, তাদের বৌ-এর মৃত্যু অশৌচ পালন না করে থাকা যায়"। আর তার পর,—সব শেষের জবাব হল—বারোয়ারী-তলায় গুরুমশায়ের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, তখন আর স্কুল কামাই ধরা হবে কেন?

রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর সেই সরকারের ভালমন্দ সম্পর্কে সকলেই একটা অদ্ভুত নীরবতা পালন করছেন—হয়ত কেউ স্নেহে ও প্রেমে অন্ধ হয়ে কথা বলছেন না, আবার কেউ হয়ত ভয়ে কথা বলছেন না। স্নেহে অন্ধ হয়ে সন্তানের ভালমন্দ না দেখাও যেমন শুভ নয়, আবার ভয়ে চুপ করে থাকাও ভাল নয় —কারণ রাজ্যের বর্তমান সরকারকে যদি আমরা জনগণের তথা নিজেদের সরকার মনে করি, তবে তার ভালমন্দ নিশ্চয়ই বলতে হবে—সেই ক্ষেত্রে কোনপ্রকার আত্ম-সমর্পণ, সে স্নেহের কাছে হোক আর ভয়ের কাছে হোক, সেটা এই সরকারের মঙ্গল তথা জনগণের মঙ্গল হবে না। সেই ভালমন্দের কথায় আসতে হলে প্রথমেই বুঝতে হয়—এই সরকারের কাছে জনগণ কি চায়? আর প্রাক্তন সরকারের কাছে কি না পেয়ে জনগণ প্রাক্তন সরকারকে বিতাড়িত করে যুক্তফ্রন্টের হাতে ক্ষমতা দিল। রাজ্যের সরকারের কাছে চাইবার আছে অনেক, দীর্ঘ দিনে সাধারণ মানুষের মনে বহু প্রত্যাশা জমেছে এই কথা সত্য। কিন্তু আমি সেই বহু প্রত্যাশার মধ্যে যাব না, কারণ আমরা জানি সব চাহিদা পূরণ করা বর্তমান সরকারের আয়ত্তে যেমন নয়, তেমনি রাতারাতি কিছু হওয়ারও নয়। কিন্তু শুধু আবার এই কথা বলেই চুপচাপ বসে থাকা বা লাগাম ছেড়ে দেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

এই ক্ষেত্রে আবার অন্যত্র [illegible] প্রশ্নও আছে, সেটাও খুবই গুরুত্বের—সবই কি সরকার করতে পারে? সরকার বলতে তো কোন একটা যন্ত্র নয় যে, সেই যন্ত্রে ফেলে দিলেই জনগণের চাহিদা তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসবে। সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরাও যেমন জনগণের প্রতিনিধি, তেমনি সরকারী নীতি যাঁরা রূপ দেবেন, তাঁরাও জনগণের অংশ। এই ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার অপেক্ষা জনগণ ও সরকারী নীতি রূপায়ণের কর্মচারীদের দায়িত্ব আমার কাছে বেশি মনে হয়। আমি কিন্তু কোনক্রমেই বুঝতে পারি না, যে জনগণ সরকারের কাছে অনেক কিছু আশা করেন, সেই জনগণের অংশ আবার সেই আশা পূরণে কেন স্থবির হয়ে বসে থাকে। নতুন সরকার হয়েছে—এই সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ন্যায়নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই কথা আমরা হামেশা বলে থাকি—কিন্তু সরকারী দপ্তরগুলিতে যে সহস্র সহস্র কর্মচারী জনগণের অংশ থেকেই কাজে নিযুক্ত, তাঁরা কেন নতুন বাতাবরণ সৃষ্টিতে উৎসাহী হল না। সরকার তো ক্ষমতায় এসেই সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক প্রমুখের জন্য তাঁদের সাধ্যের সীমায় প্রাথমিকভাবে নয় কোটি টাকা খরচ করে ভাতা বৃদ্ধি করেছেন। আর এটাই প্রথম নয়, হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, হয়তো চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়; কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলীর এই কাজ সদিচ্ছার প্রতীক হিসাবে ধরা যেতে পারে। আর এইবারই প্রথম নয়, ১৯৬৭ সাল থেকে দুই বারে যুক্তফ্রন্ট সরকার অন্যায়ভাবে বহু বৎসর আগে চাকুরী যাওয়া মানুষগুলিকে ডেকে এনে আবার চাকুরী দিয়েছেন, তাঁদের বকেয়া বেতন দিয়েছেন, কর্মচারীদের নানাপ্রকার অধিকারও দিয়েছেন—কিন্তু এই সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা কি বলতে পারেন তাঁরা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের সেবা করে তার সামান্য প্রতিদান দিয়েছেন। বিশ বৎসর বা দশ বৎসর বা পাঁচ বৎসর আগে সরকারী দপ্তরে কোন কাজ লাল ফিতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে যে সময় লাগতো, যে গতিতে ফাইল চলতো—তার গতি কি সামান্য বেড়েছে।

কোন একজনের পেন্সনের টাকাই হোক অথবা গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাই হোক অথবা কোন একটা সরকারী আদেশ রূপদানের ক্ষেত্রেই হোক, কোনভাবেই কি কাজ অতীতের কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে বেশ তাড়াতাড়ি বা নির্ভুলভাবে হচ্ছে? সরকারী কর্মচারীরা কি আগের সরকারের আমলে যেভাবে কাজ করতেন, তার বেশি কোন উদ্যোগ দেখিয়ে বা কোন অভিনবত্ব এনে কাজ করছেন? সরকারী কর্মচারী সমিতি অথবা অনেক সরকারী কর্মচারী এই কথা শুনে হয়তো অনেক তথ্য বোঝাতে বসবেন, হয়ত মার্কসবাদ, শোধনবাদ, নয়া শোধনবাদ, সামাজিক শোধনবাদ সহ অনেক কিছুর ক্লাস নিতে বসবেন, কিন্তু শুধু বলতে পারবেন না যে, কাজের সব কয়েক ঘণ্টা তাঁরা কাজ করছেন মনোযোগ দিয়ে বা দ্রুততার সঙ্গে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে নতুন সরকারের আগমন যেমন কোন পালা বদলের হাওয়া আনতে পারে নি, আজও কোন কাজ করতে বা হাতে কিছু গুঁজে দেওয়ার যে ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনে সৃষ্টি হয়েছে, তা বন্ধ হয় নি—আগেও যেমন রাস্তায় দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিশের কিছু কাঞ্চন বা চাঁদি ছুঁড়ে ফেলে যেতে হোত, আজও তেমনি যেতে হয়—আজও কোর্টে কাছারীতে সর্বত্র একইভাবে মুহুরী, পেসকার, বড়বাবু, আরদালী সকলকে কিছু নগদ মূল্য দিয়ে কাজ হাসিল করতে হয়। আবার বড় কাজে, বড় কন্ট্রাক্টে বড়কর্তাদের বড়দরের নমস্কারী দেওয়া রেওয়াজ অব্যাহতভাবে চলেছে। আজও সরকারী দপ্তরে কর্মচারীরা কাজে আসার বেশ পরে এসে যেভাবে এক গ্লাস জল খেয়ে বেশ কিছু সময় দম নিয়ে সহকর্মীর মেয়ের বিয়ের পাত্র থেকে কুকুরের অসুখ পর্যন্ত সমস্ত খবর সবিস্তারে জেনে সেই সঙ্গে কিছু পরচর্চা পর্ব সেরে ফাইলে হাত দিতেন, সেইভাবেই আসেন ও কাজ করেন—মাঝে ফাইল থেকে মুখ তুলে রাজ্য সরকারের নীতি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেন। কোন মন্ত্রী কিভাবে চলেন, কিভাবে হাসেন, শুক্তানিতে কতটা তেঁতো খেতে ভালবাসেন, কে দিনে কতটা সিগারেট খান, কে কতবার চুল আঁচড়ান সব আলোচনা ও প্রসঙ্গ তুলে নিজের জ্ঞান বিদ্যা অভিজ্ঞতা জাহির করেন অথবা কোন দলের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে, কোন দল একেবারে ডুবে যাচ্ছে, কোন নেতা কোন কথা বলে ভুল করেছেন অথবা কোন নেতা যোগ্য সময়ে সঠিক কথা বলে কেন্দ্রের অমুকের গণ্ডদেশে কত জোরে চপেটাঘাত করেছেন—তার তারিফ অথবা সমালোচনা করেন আবার যথারীতি ভিড় বাড়াবার আগে বাড়ি বাড়ি চলে যেতে চান। আজ পাড়ায় অমুক মন্ত্রী যাবেন বা অমুক দলের জি বি মিটিং আছে ইত্যাদি শত সহস্র অজুহাত দিয়ে কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যান—সবই ঠিক আছে। তাঁরা সব করেন, সব হিসাব বোঝেন, কত মহার্ঘভাতা বাড়লে সঙ্গত হত, কোন খাতের টাকা কোন খাতে যুক্ত করলে ভাল হত, যুক্ত না করায় কত ক্ষতি হয়েছে—এই সব টাকা আনা পয়সার হিসাব অতি সুনিপুণভাবে করতে পারেন। এমন কি কেন্দ্র থেকে রাজ্যের সব মন্ত্রীর মনের নিভৃততম কাজের ও চিন্তার হদিস রাখেন—শুধু পারেন না নিজের হাতের কাজটা একটু তাড়াতাড়ি করতে, তাঁর হাতের ফাইলটা একটু তাড়াতাড়ি পাস করে দিতে। হাসপাতালে গেলে আজও ঠিক পূর্বের মত ডাক্তারবাবু-নার্স মহোদয়ার ঘনিষ্ঠ আলাপনের বিঘ্ন ঘটিয়ে মৃত্যুমুখী রোগীর কথা বললে ডাক্তারবাবু বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন, রোগী নিয়ে গেলেই হোক আর বিছানায় রোগীর যন্ত্রণাকাতর মুহূর্তে হোক ডাক্তার বা নার্সদের ব্যবহার ঠিক পূর্বের মতই অতি ব্যস্ততার লয়ে বাঁধা—কেউ একটু ফিরে দেখবার অবসর পান না। পরীক্ষার হলে ছাত্র-শিক্ষক একই সম্পর্কে রয়েছেন, ক্লাসে শিক্ষকরা একই মেজাজে পড়িয়ে চলেছেন আর ছাত্ররাও—পরীক্ষার হলে নকল করা আমার জন্মগত অধিকার বলে নকল করে চলেছেন। এই যদি অবস্থা হয়, তবে পরিবর্তন দেশের হবে কোন পথে আর করবেই বা কে। শ্রীসত্যপ্রিয় রায় শিক্ষামন্ত্রী হলেই শিক্ষকরা শিক্ষা জগতে নতুন জোয়ার আনতে পারেন না, যদি ছাত্র ও শিক্ষকরা এগিয়ে না আসে। শ্রীননী ভট্টাচার্যের পক্ষে শহীদ হয়েও সম্ভব নয় রাজ্যের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা জগতে মানবিক সচেতনতা, দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করতে, যদি না ডাক্তার, নার্স জি ডি এ প্রভৃতিরা শ্রীভট্টাচার্যের নীতি রূপায়ণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করেন। শ্রীজ্যোতি বসু দেড় মাসে কয়েক পাউণ্ড ওজন কমিয়ে ফেলে বা মাথার চুলে আরো বেশি পাক ধরিয়েও কিছু করতে পারেন না, যদি রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন কর্মচারীরা শ্রীবসুর নীতি কার্যকর করতে এগিয়ে না আসেন।

সেই দিন ৭ই এপ্রিল দেখলাম—রাইটার্স বিল্ডিংসের প্রধান ফটক অর্থাৎ যেখান দিয়ে সব মন্ত্রী ও পদস্থ আমলারা যাতায়াত করেন, পুলিশমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী যাতায়াত করেন, যেখানে সঙ্গীনধারী পুলিশ অহোরাত্র পাহারা দেয়, কয়েকজন পুলিশ অফিসার দিবারাত্র বসে সব কিছু দেখেন—ঠিক ফটকের পাশে বসে একজন এক ঝুড়ি কাটা শশা বিক্রি করছে ও শশা কেটে ছোবড়াগুলি গেটের সামনে ছড়াচ্ছে। সেই শশাওয়ালার পাশেই একজন একটা চাকাওয়ালা বাক্স গাড়িতে রং-বেরং-এর জল মিশ্রিত বরফ সরবত বিক্রি করছে। কাটা ফল খাবেন না, সংক্রামক ব্যাধি থেকে সাবধান। বেআইনীভাবে ফুটপাতে পসরা নিয়ে বসে কেনা-বেচা করা পাঁচ আইনযোগ্য অপরাধ সবই সকলে জানেন, কিন্তু দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই দুইজন খোদ রাইটার্সের প্রধান ফটকে বসে এই অস্বাস্থ্যকর বেআইনী কাজ করে গেল: অথচ দেখলাম না কেউ বললো—ও গো তুমি দয়া করে একটু সরে ফুটপাতের ওদিকে যাও, কাটা ফল আর একশ রকম দোকানে সারা রাইটার্স বিল্ডিংসের চারিদিকের ফুটপাত বহুকালই তোমরা দখল করেছো, সমস্ত ডালহৌসী স্কোয়ারে বসে তোমরা বানরের নাচ থেকে বশীকরণের মাদুলী বিক্রি সবের জন্য দখল করেছো, শুধু এই গেটটা ছেড়ে দাও। কেউ বলল না সেই কথা—আমি হলপ করে বলতে পারি আপনি একটু লক্ষ্য রাখুন এই দৃশ্য আপনিও দেখবেন। ডালহৌসী থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হয়েছে—কিন্তু তার কারণ কি এই যে, দৈনিক যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলির কেউ না কেউ একটা না একটা কারণে মিছিল নিয়ে আসবেন আর মহাকরণের প্রধান গেট বন্ধ করে কয়েক ঘণ্টা ধরে নাচন-কোঁদন করবেন, হল্লা-চিৎকার করে রাইটার্সের কাজ অচল করে দেবেন। এতেই শেষ নয়—একের পর এক মন্ত্রীকে সেই জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে তাদের দাবি পূরণের স্পষ্ট আশ্বাস দিতে হবে—ব্যতিক্রম হলেই রাজপথে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীকে বেইজ্জত হতে হবে, টিটকারী শুনতে হবে, নাজেহাল হতে হবে। এ শুধু মহাকরণের ঘটনা নয়—ব্যারাকপুর মহকুমার নদীয়া জেলার প্রান্ত সীমায় একটি থানায় সম্প্রতি একজন ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে খুবই উত্তেজনা

চলছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে থানায় সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ধর্মঘট হল—কারণ পুলিশ নিষ্ক্রিয়। পরে পুলিশ সক্রিয়-হয়ে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এল। অভিযুক্ত ব্যক্তি বৃত্তিতে মেথর। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল হাসপাতালে মেথররা ধর্মঘট করেছে—আর শহরের যত মেথর শহরে যত খাটা পায়খানার ময়লা আছে, টবে ভর্তি করে ময়লার গাড়িতে করে নিয়ে এসে থানায় ঢুকলো অর্থাৎ দুই ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল সমস্ত থানা এলাকা বিষ্ঠা ভর্তি টব ও গাড়িতে বোঝাই—থানা এলাকার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। পুলিশ নিরুপায় হয়ে একজন এ-ডি-এম-কে থানায় এনে, স্পেশাল কোর্ট বসিয়ে তবে সেই আসামীকে জামিন দেবার ব্যবস্থা করে রেহাই পায়। তাই বলছিলাম অবস্থা যদি এই চলতে থাকে, তবে কয়েক দিন পরে দেখা যাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারও গোপাল ভাড়ের মত বিদ্যাভ্যাস করেছে। প্রথম দিন তার যাবে পেটের আগুন নেভাতে, দ্বিতীয় দিন কুলুর বৌ-এর মৃত্যুতে শোকপালনে আর তৃতীয় দিন—একগাল হেসে বললেন—এদিনে ত' গুরু-মশায়ের সঙ্গে বারোয়ারীতলায় দেখা হয়েছে অর্থাৎ এই খাতে এত ব্যয় করেছি, অমুক খাতে এত ব্যয় করেছি—ইত্যাদি ইত্যাদি। গোপালের বিদ্যার্জনের মত যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাফল্য অর্জন শেষ হবে।

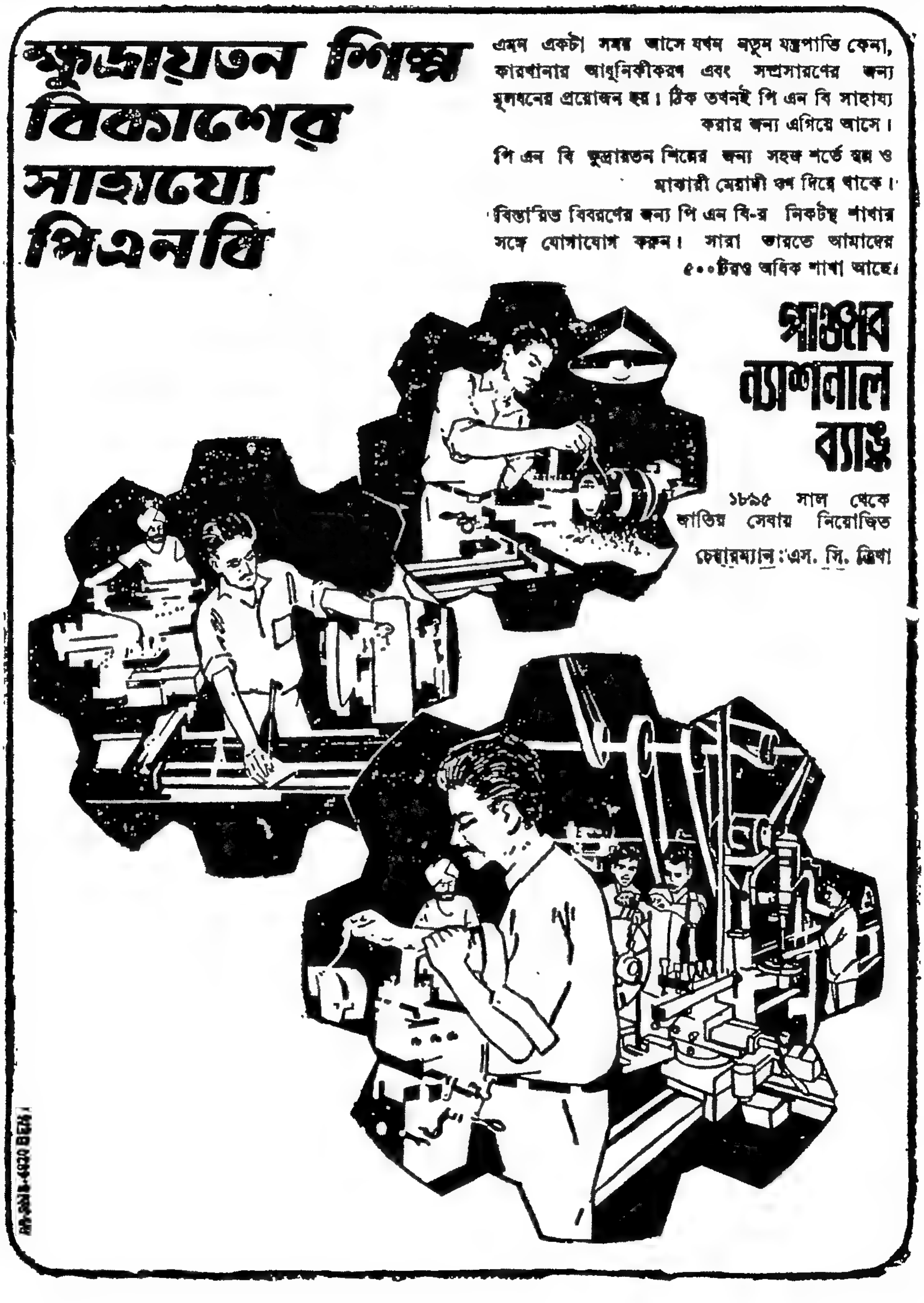

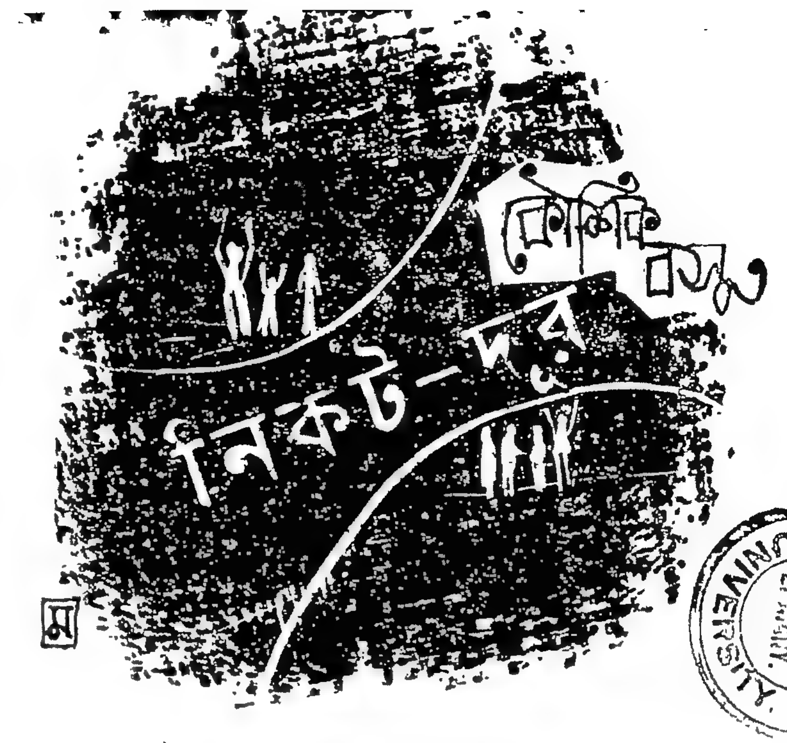

CALCUTTA UNIVERSITY

আজকাল প্রায়ই একটা অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে এই—লাইব্রেরীতে গেলে বই পাওয়া যায় না, অথবা অযথা হয়রানি সহ্য করতে হয়। আমাদের ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী বা জাতীয় গ্রন্থাগার এদিক থেকে তুলনারহিত—বইয়ের জন্য শ্লিপ দিন, হয় সেই বই বাঁধাতে গেছে, নয়তো জরাজীর্ণ বলে হস্তান্তরযোগ্য নয়, কিংবা সেই বই আগেই 'ইস্যু' হয়ে গেছে। এই নৈরাশ্যজনক খবরটি পাবার জন্য আপনাকে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে, বারবার স্তূপীকৃত শ্লিপ ঘাঁটতে হবে এবং জ্ঞানতৃষ্ণাকে স্থগিত রেখে অন্যান্য তৃষ্ণা মেটাতে হবে কয়েকবার। এই তো গেল জাতীয় গ্রন্থাগারের কথা। একটি বেসরকারী গ্রন্থাগারের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত, সেখানে প্রায় প্রয়োজনীয় সব বই-ই আছে, কিন্তু অধিকাংশ বইয়েরই প্রয়োজনীয় অংশটুকু নেই। নিপুণ হাতে ব্লেড বা ছুরির সাহায্যে কে বা কারা একটি অধ্যায় কেটে নিয়ে গেছে। পাঠকদের এই ইঁদুরসুলভ ব্যবহারে প্রথম প্রথম আশ্চর্য হয়ে যেতাম, এখন সয়ে গেছে। যাঁরা লাইব্রেরী চালান, এ-বিষয়ে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা দৃষ্টান্তস্বরূপ—আহত বইটিকে সরিয়ে কোনোমতেই একটি নতুন বই আনতে চান না তাঁরা। একজন পাঠকের জন্য কি অগুণতি পাঠক অসুবিধে ভোগ করবেন? তাহলে লাইব্রেরী রয়েছে কেন?

এইসব কথা আমার মনে এলো আকস্মিকভাবে নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্ট্রাল লাইব্রেরী'র বর্তমান হালের কথা ভাবতে গিয়ে। অসম্ভব সম্পন্ন এই লাইব্রেরী সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি এই লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতির খেলা চলেছে, সে বিষয়ে বিদ্যোৎসাহী মাত্রেরই সাবধান হবার সময় এসেছে। লাইব্রেরী পড়ার জায়গা, কিন্তু যেখানে হাজার হাজার বই আছে, সেখানে নিশ্চয়ই প্রশাসনের দায়িত্ব কম নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী এমন একটি জায়গা যেখানে ছাত্র থেকে শুরু করে অধ্যাপক, গবেষক ও বিদ্যোৎসাহীদের না গেলে চলে না—বাংলাদেশের তো বটেই, ভারতবর্ষেরও গৌরব এই গ্রন্থাগার। কিন্তু হায় বাংলাদেশ, রাজনীতির পাশাখেলা সেখানেও চলেছে আজ। এবং রাজনীতি ও গোষ্ঠীতোষণের কল্যাণে এমন একজন ব্যক্তি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের লাইব্রেরীয়ান হয়ে বসেছেন যে বিশ্ববিদ্যার লয়প্রাপ্তি ঘটতে আর বুঝি দেরি নেই। কে ইনি?

ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ম্যানাসক্রিপ্ট বিভাগের লাইব্রেরীয়ান. চার-পাঁচটা ধাপ টপকে একেবারে নাকি অভিষিক্ত হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান পদে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি লাইব্রেরীয়ানকে (যিনি লাইব্রেরীয়ান হিসেবেও কাজ করেছেন) পাশ কাটিয়ে, বিশ্বভারতীর ডেপুটি লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গত দাবিকে নাকচ করিয়ে, ইনি নাকি তর্-তর্ করে সিঁড়ির প্রথম ধাপে উঠে গেলেন। বাধা যে আসে নি, তা নয়। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক তাঁর দরখাস্ত স্বাক্ষরিত হয় নি, এবং শিক্ষা-অধিকর্তা সিণ্ডিকেটের এক অধিবেশনে তাঁর নিয়োগ বন্ধ করেন। যেখানে তিনি পূর্বে চাকরী করতেন, সেই জায়গাও তিনি নাকি আইনসম্মতভাবে ছেড়ে আসেন নি। সবচেয়ে বড় কথা, তদানীন্তন উপাচার্য ডাঃ বি. মালিকের নিম্নলিখিত মন্তব্য সত্ত্বেও তিনি নির্বাধায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে বৃত হলেন:

The UGC in its letter no.. informed the University that the Librarian-in-charge of the University Library should be a man of the rank of a Professor for which the UGC will give special grant. This has not so far been enforced.

If the person selected for the post of the Librarian of the University Central Library has got the necessary qualifications to be ranked as a Professor, I have nothing to say, otherwise I am of the opinion that the post should be re-advertised.'

এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য সিণ্ডিকেট ২৬-৪-৬৮ তারিখে বিবেচনা করেন এবং বর্তমান গ্রন্থাগারিক কাজে যোগদান করেন তার চারদিন পর, ৩০শে এপ্রিল।

নিয়োগ তো এইভাবে সম্পন্ন হলো। নিয়োগের পর শোনা গেল যে, সংস্কৃত কলেজে তাঁর কার্যকালে ২৫০০-র বেশি বই নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। যখন তিনি ঐ কলেজের গ্রন্থাগারিকের পদ ছেড়ে চলে আসেন, তখন নবনিযুক্ত ব্যক্তিকে নাকি ঠিকমতো কাজ বুঝিয়ে আসেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে বৃত হবার তিন মাসের মধ্যে তিনি নাকি সংস্কৃত বইয়ের একটি দোকান থেকে ২৭০২ টাকা ৭৫ পয়সা মূল্যের বই কেনেন—এমন সব বই কেনেন যেগুলি নাকি গ্রন্থাগারে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত। শোনা যায়, বইয়ের যা মূল্য তার থেকে বেশি মূল্য তিনি ধরে দেন ঐ পুস্তক প্রতিষ্ঠানকে—কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকেই। একটি উদাহরণ দিই: সিদ্ধান্তবাগীশের 'শিশুপালবধম্'-এর মূল্য ষোল টাকা, কেনা হয়েছে নাকি পঁচিশ টাকায়। তিনি যে সমস্ত বই কিনেছেন, সেগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সম্মতি গ্রহণ করেন নি: অধিকন্তু সেইসব বইয়ের জন্য কোনো চাহিদার কথাও নাকি জানা যায় নি।

'সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী'-র বর্তমান গ্রন্থাগারিকের কীর্তিকলাপ এখানেই নাকি শেষ

নয়। শোনা যাচ্ছে, গ্রন্থাগারের বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ কর্মচারীদের স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে তিনি খুবই তৎপর, যাতে ইস্যু-রেকর্ডস দুর্বল হয়ে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ বিনষ্টির দিকে এগোয়। একজন অস্থায়ী কর্মচারীকে ভাসা-ভাসা কারণে তিনি বরখাস্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, অনেকের উন্নতির পথে তিনি প্রধান বাধাস্বরূপ, যদিও কিছু প্রিয় কর্মচারীদের তিনি নাকি দয়ালু ঈশ্বর। তাঁর পুত্র নাকি গ্রন্থাগারে একজন সামান্য সহকারী, কিন্তু পুত্রের উন্নতির জন্য তিনি যোগ্য এবং অভিজ্ঞদের দাবিকে নাকি কোনো আমলই দিচ্ছেন না। কর্মচারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দান, স্বজনপোষণ ইত্যাদি অভিযোগে তাঁকে নাকি দু'বার ঘেরাও করা হয়েছিল—একবার গত বছর ২০শে সেপ্টেম্বর, আব একবার এই বছর ২২শে ফেব্রুয়ারী। তথাপি তিনি বেশ জাঁকিয়ে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন।

এমন এক ব্যক্তি যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হন, তবে পড়াশুনোর হাল কি হবে, তা বোঝাবার জন্য নিশ্চয়ই প্রবন্ধ লেখার দরকার নেই। সাহিত্যিক শ্রীগোপাল হালদার 'কালান্তর' পত্রিকায় (২রা এপ্রিল) এ বিষয়ে লিখেছেন—"যে গ্রন্থাগারে পাঠেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা অনাবশ্যক হয়রান হন, কর্মীরা উত্যক্ত ও তিক্ত, দুর্যোগ সেখানে দেখা দিয়েছে, তা কারও বুঝতে বাকি থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো পাঠক হিসাবে এই গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠাই দেখেছি। বর্তমান দুর্যোগ তাই আমাকে এতটা পীড়া দিয়েছে, আর তা দূর হলেই আমি কৃতার্থ হব।" গোপাল হালদার মহাশয় যে কথা বলেছেন, তা অগণিত পাঠকেরও মনের কথা। যে গ্রন্থাগারে বর্তমানে রবিবারে পড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই (গত তিরিশ বছর ধরে এই ব্যবস্থা চালু ছিল), রেফারেন্স বিভাগে কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, গবেষক ও শিক্ষকদের পড়াশুনোয় ব্যাঘাত ঘটানো হচ্ছে, পত্র-পত্রিকাগুলি ঠিকমতো 'ইস্যু' করা হচ্ছে না। তত্ত্বাবধানের অভাবে অমূল্য বইগুলি নষ্ট হতে বসেছে। লাইব্রেরীতে নবাগতদের নানাভাবে অসুবিধে হচ্ছে—সেখানে বিদ্যোৎসাহী সমাজ যে ক্ষুব্ধ হবেন তাতে আর সন্দেহ কী? একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সুনাম অস্তগামী: এবং সেই অস্তগামিতার মূলে বর্তমান গ্রন্থাগারিক, বই-কে বিদায় দিয়ে যিনি বৈভবের দিকে ঝুঁকেছেন। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা, অধ্যাপক-গবেষকগণ এবং অন্যের সৎ পাঠক, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর বর্তমান দশা সম্পর্কে নীরব থাকবেন না। একমাত্র তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদেই গ্রন্থাগারে আবার আরোগ্যের হাওয়া বইতে পারে, অন্যভাবে নয়—দূর হতে পারে সেই উপদ্রব যা সুস্থ জ্ঞানার্জনের পক্ষে রোগসঞ্চারী মাছির মতো বিরক্তিকর।

নিরাপত্তা!

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীর ষষ্ঠ দফায় শহরে সম্পত্তির সীমানা নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। এই দফায় আছে: শহর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার এবং বর্তমানের সীমাহীন জমি ও গৃহ সম্পত্তির উপর মালিকানার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আপাতদৃষ্টিতে উক্ত দফাটিকে যতটা নিরীহ বলে মনে হয় আসলে কিন্তু তা নয়। ওই দফা কার্যকরী করার দিকে অগ্রসর হলো কায়েমীস্বার্থের গায়ে যে আঘাত লাগবে তার ফলে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ করানোর সময় শহরের জমির উচ্চসীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাবও আসে। ফলে কায়েমীস্বার্থ মহলে এমন কলরব শুরু হয় যে শেষ পর্যন্ত শক্ত মানুষ বলে পরিচিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পর্যন্ত পিছু হটতে হয়। আজকের দিনে জমি আর বাড়ির পিছনে কালো টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ। যুক্তফ্রন্ট সরকার শহর সম্পত্তির উচ্চসীমা নির্ধারণ করে দিতে পারলে দুর্নীতি, কালোবাজারী, ধনিকশ্রেণীর অবাধ শোষণ, কর ফাঁকি দেওয়া প্রভৃতি অপরাধের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবেন। স্বভাবতই কায়েমীস্বার্থের গায়ে যে আঘাত লাগবে, তাতে তারা প্রত্যাঘাত করবে-ই। এজন্য নিচেরতলা থেকে জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোকে।

যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন মহল থেকেও বাধা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এইসব বাধা অতিক্রম করে ফ্রন্ট সরকারকে শক্ত হাতে হাল ধরে এগিয়ে যেতে হবে। শহরের সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ করে তা কার্যকরী করতে পারলে শহরের মেহনতী মানুষের মনে যে উৎসাহের সৃষ্টি হবে, তাতে যুক্তফ্রন্ট গঠনমূলক কাজেও শহরের মানুষকে লাগাতে পারবেন।

শহরের সম্পত্তির উচ্চসীমা কি হবে তা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বসে ঠিক করতে হবে। ফ্রন্টকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। মনে রাখা দরকার ফ্রন্ট সরকার এখুনি কোন বৈপ্লবিক ব্যবস্থা কায়েম করতে যাচ্ছেন না। শহরের সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ-ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার-ই অন্তর্গত। এটা সমাজতন্ত্র কায়েম করা নয়।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারের সপ্তম দফা ঠিকা প্রজা ও ভাড়াটেদের অধিকার সংক্রান্ত। এই দফায় বলা হয়েছে: "কলকাতা ও হাওড়ায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ঠিকা প্রজাদের প্রজাস্বত্ব অধিকার দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনকে এমনভাবে সংশোধন করা হবে যাতে ভাড়াটেদের ন্যায্য নিরাপত্তা রক্ষিত হয় এবং এই আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি দূর হয়।"

ঠিকা প্রজা ব্যবস্থার মাধ্যমে কলকাতা ও হাওড়ার বস্তি বাসিন্দাদের একটা চিরস্থায়ী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে বস্তিগুলো সংস্কারও করা যাচ্ছে না। ফ্রণ্ট সরকার ইতিমধ্যে ঠিকা প্রজা উচ্ছেদ আপাতত বন্ধ রাখার জন্য আইন পাশ করেছেন। এটা প্রাথমিক ধাপ মাত্র। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠী ঠিকা প্রজাদের অধিকারকে অস্বীকার করে নির্মম শোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। ঠিকা জমিতে প্রজাস্বত্ব না থাকায় যুগ যুগ ধরে ঐ ধরণের জমিতে যাঁরা ঘর করে আছেন তাঁরা অসহায় অবস্থায় দিন কাটান। তাঁদের প্রজাস্বত্ব অধিকার দিলে গৃহ সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে বস্তির সংস্কারও সম্ভব হবে। আজ ঠিকা প্রজা আইনের সাহায্যে জমির মালিক সর্বরকম বস্তি সংস্কারকে বাধা দিচ্ছেন আর নিজেদের খেয়াল-খুশিমত বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করছেন।

ঠিকা প্রজাদের প্রজাস্বত্ব দেওয়ার সময় কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে গরীব মালিকের স্বার্থের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন হবে। কলকাতা ও হাওড়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাবে কোন গরীব মধ্যবিত্তের জমিকে বড় বড় ধনী ঠিকা আইনে নিয়ে আবার ভাড়াটে বসিয়েছেন। এইসব ক্ষেত্রে গরীব মালিক যাতে নিজের গৃহ সংস্থানের জন্য জমির অধিকার ফিরে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার।

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বিগত বিধানসভার অধিবেশনে আশ্বাস দিয়েছেন, পরবর্তী অধিবেশনে প্রজাস্বত্ব অধিকার দেওয়ার জন্য সামগ্রিক একটি বিল পেশ করা হবে।

ভাড়াটেদের সমস্যা বিরাট। মাসের পর মাস বাড়িভাড়ার টাকা জুগিয়েও অনেকক্ষেত্রেই ভাড়াটিয়া বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়ে থাকেন, তাকে এক কথায় অসহনীয় বলা চলে। এছাড়া বর্ধিত

॥ মনোজ বসুর রাজনৈতিক উপন্যাস ॥

একালের কথা—তবু এ-উপন্যাস ঐতিহাসিকও বটে। চিরকালের উপন্যাস। এক-ভারতবর্ষ এবং এক-বাংলা কলমের খোঁচায় দুটো দেশ হয়ে গেল, তারই তাজ্জব কাহিনী। দুই বাংলার বর্ডার-লাইনের দুই দিকে ব্লাকে পারাপারের জন্য যাত্রীরা সব জমায়েত হয়েছেন। পরিবেশ: ১৯৬৬-র খাদ্য-আন্দোলন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নৃশংস নরমৃগয়া। তুলনায় আসছে রুশ ও ফরাসিবিপ্লবের পূর্বে ও পরের অবস্থা।

পথ কে রুখবে?

নাইজেরিয়ার মিলিটারি ক্যু ইত্যাদি ইত্যাদি। মাতৃভাষা মুখ থেকে কেড়ে নেবার চক্রান্ত—পূর্ববাংলায় এবং ভারতের শিলচরে বঙ্গ ভাষার জন্য বাঙালীর প্রাণদান। ভ্রান্ত নেতৃত্ব, ভণ্ড নেতৃত্ব, লোভী নেতৃত্ব বাংলাকে সর্বনাশের প্রান্তে এনে দাঁড় করালো। অপরাধী যত মান্যগণ্যই হোন লেখনী কাউকে রেহাই দেয় নি। কিন্তু উভয় বঙ্গের আন্তর সৌহার্দ্য অচ্ছিন্ন—পথ আমাদের কেউ রুখতে পারবে না। এই কাগজে ধারাবাহিক বেরিয়েছিল—অনেক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। আগামী সপ্তাহে বেরুবে। দাম: বারো টাকা।

গ্রন্থপ্রকাশ, C/o বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

হাঁস-মুরগী পালন শিল্পের একমাত্র

বাঙলা মুখপত্র

"ত্রৈমাসিক পোল্ট্রী"

প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা

কার্যালয় :—৫০।এ, সুরি লেন, কলকাতা-১৪, ফোন—২৪-৪২০৪

প্রকাশের সময় :—১লা বৈশাখ, ১লা শ্রাবণ, ১লা কার্তিক ও ১লা মাঘ।

এক বছরের কম গ্রাহক করা হয় না।

গ্রাহক চাঁদা ৪ টাকা ৫০ পয়সা (সডাক)।

বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার পরিমাপ—ডবল ক্রাউন

ফ্রন্ট কভার—২০০ টাকা

ব্যাক কভার—১৭৫ টাকা

অর্ডিনারি ফুল পেজ—১০০ টাকা

সেকেন্ড কভার—১৫০ টাকা

থার্ড কভার—১৫০ টাকা

হাফ পেজ—৬০ টাকা

কোয়ার্টার পেজ—৪০ টাকা।

পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

১। পোল্ট্রী কার্যালয়।

২। কন্টাই হ্যাচারিস্, ১১ পাম এভিনিউ, কলকাতা-১৯।

৩। ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রী, গ্রোয়ার্স য়্যাসোসিয়েশন, ৮৬।এ আচার্য, জে সি বোস রোড, কলকাতা-১৪।

৪। ইন্ডিয়ান পোল্ট্রী ফার্ম, ইন্টালী মার্কেট, কলকাতা-১৪।

৫। 'সুরমঞ্জিল', ৬, রাজা প্যারী-মোহন রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী।

৬। এসিয়ান ট্রেডার্স, ২০।১।সি লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১।

৭। 'প্লান্ট', ৩ ম্যানগো লেন, কলকাতা-১।

৮। নর্থল্যান্ড পোল্ট্রী, ২০।কিউ পাইকপাড়া রো, কলকাতা।

৯। দি হ্যাপী বার্ড এ্যান্ড কোং, ৬৯, রিজেন্ট কলোনী, কলকাতা-৪০।

১০। 'বনস্পতি ডিস্ট্রিবিউটরস' ১৫।এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-১২।

হারে বাড়িভাড়া আদায়, খেয়াল-খুশিমত ভাড়াটে উচ্ছেদ, বে-আইনী সেলামী আদায় প্রভৃতি তো আছেই। কংগ্রেস আমলেই বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু ওই আইনে এমন সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে যার ফলে ভাড়াটেদেব অধিকার প্রতি মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। শুধু অধিকার-ই নয়, তাদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত। ভাড়াটে আইন সংশোধনের দাবি আজ তাই অত্যন্ত সোচ্চার। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনকে ভাড়াটেদের স্বার্থের অনুকূলে সংশোধন করে নতুন আইন পাশ করা হবে।

ফ্রন্টের কর্মসূচীর অষ্টম দফাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দফাকে সফল করার উপর পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই দফাটি রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত। এই অষ্টম দফায় বলা হয়েছে :

"যাতে সমভাবে ও কার্যকরীভাবে জনগণের সেবা করা যায় তার জন্য যুক্তফ্রন্ট সর্বপ্রকার শিল্প, বিশেষ করে কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে নজর দেবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষির সঙ্গে যুক্ত শিল্প গঠনে যুক্তফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট হবে।

রাজ্যের শিল্পের জন্য লাইসেন্স, পুঁজি এবং কাঁচামাল যোগানোর উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ দেবে।

শিল্পে শান্তিরক্ষার জন্য যুক্তফ্রন্ট কার্যকরী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করবে।"

রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের উপর রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। কাঁচামালের, পুঁজির অভাবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প আজ মুমূর্ষু। হাওড়া জেলার, বিশেষ করে হাওড়া শহরে মধ্যবিত্ত বাঙালীদের ঘরে ঘরে যে শিল্প গড়ে উঠেছিল অর্ডার ও কাঁচামালের অভাবে তা আজ উঠে যাওয়ার মুখে। লাইসেন্স পাওয়া পশ্চিম বাংলার পক্ষে লটারীতে পুরস্কার প্রাপ্তির মত। কাঁচামালের কোটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার আজ প্রবাদে পরিণত। পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে আজো কোন শিল্প গড়ে ওঠে নি। সেসব অঞ্চলে কৃষির সঙ্গে যুক্ত শিল্প গঠন করা না হলে গ্রামের অগণিত ও ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন কৃষকের বেকারত্ব দূর করার কোন পথ নেই।

শহরের বেকারত্ব দূর করার জন্য ও ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও বিস্তার করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যাতে বৃহৎ শিল্পপতিদের গ্রাস থেকে মুক্ত থাকতে পারে সেজন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ এবং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়ার সক্রিয় ও নিরপেক্ষ ভূমিকা এবং সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভার অকৃত্রিম প্রয়াসের উপর এই কর্মসূচী কার্যকরী হওয়া নির্ভর করে।

এই কর্মসূচী কার্যকরী করার ব্যাপারে বিরাট বাধা কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করছেন না। দিচ্ছেন না মালপত্র। তাই লড়তে হবে। একদিকে নিজেদের যেটুকু ক্ষমতা ও সঙ্গতি আছে তার সার্থক প্রয়োগ এবং অপরদিকে কেন্দ্রের উপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে দাবি আদায়ের উপর এই দফার সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে।

ফ্রন্ট কর্মসূচীর নবম দফা হোল সমবায়। এই দফায় বলা হয়েছে : "সমবায় প্রসারের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রয়াসী হবে। উৎপাদক ও ক্রেতা উভয় প্রকারের সমবায় বাড়াবার চেষ্টা করা হবে যাতে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শিল্পের স্থাপনা, ঋণদান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদিব দর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিবিধ স্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে।"

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। কয়েকটি গোষ্ঠী আজ কায়েমীস্বার্থের তোষণ করে সমবায় আন্দোলনকে পঙ্গু করে রেখেছে। অথচ সমবায়ী ব্যবস্থা ছাড়া গরীব দেশের সামগ্রিক উন্নতি হতে পারে না। সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী অল্প সময়ের মধ্যেই আসল রোগ ধরতে পেরেছেন। সমবায় আন্দোলনের জঞ্জাল দূর করার পথে তিনি পা দিয়েছেন। কায়েমী স্বার্থের বাধাও আসতে শুরু হয়েছে—আমলাতন্ত্রের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রকৃত সমবায়ী মানুষের উদ্যোগের পথকে প্রশস্ত করে পথ চলতে হবে। রাজ্যে সমবায় গড়তে পারলে অনেক শোষণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই শ্রীমতী চক্রবর্তীকে আরো শক্ত হতে হবে। তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্য পশ্চিম বাংলার প্রতিটি মানুষের কাম্য।

—শ্রীসর্বদর্শী

শিল্প • বাণিজ্য • অর্থনীতি

পঃ বঙ্গের শিল্পে গলদ কোথায়?

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া ইন্‌স্‌টিটিউট অফ রাবার ইণ্ডাস্ট্রিজের বাৎসরিক সভায় রাজ্যের চালু শিল্প সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, শিল্পোৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ এখনও ভারতের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের চালু শিল্প-বাণিজ্যের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে অন্যান্য কয়েকটি অনুগ্রহ-পুষ্ট রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যকে ফাঁপিয়ে তোলবার কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা এখনও পুরোপুরি সফল হয় নি।

শিল্পোৎপাদন থেকে ভারতের যে জাতীয় আয় হয় তার শতকরা ৬০ ভাগ আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। দেশের বৃহত্তম শিল্প-কাঠামো পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও গত কয়েক বছর এই রাজ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়ে ওঠে নি। বরং লগ্নী এবং উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে এবং চাকরী-বাকরীর সংখ্যাও ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। সম্প্রতি এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন বণিক-সমিতি রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। মোটামুটিভাবে একথা বলা চলে যে, কল-কারখানাগুলোয় সময়মত আধুনিকীকরণের কাজে হাত দেওয়া হয় নি বলেই শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। গত তিনটি পরিকল্পনায় দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে অসংখ্য কল-কারখানা খোলবার লাইসেন্স দেওয়া হয়। নতুন নতুন কল-কারখানাগুলো চালু করা হয়েছে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে। ফলে সেই সব কারখানার উৎপাদনের ব্যয় কম এবং পরিমাণ বেশি। তাই তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ এঁটে উঠছে না। যেমন ধরুন, ইলেকট্রিক কেব্‌ল্‌ শিল্পের কথা। আগে ইলেকট্রিক কেবল তৈরি হত প্রধানত ভারতের পূর্বাঞ্চলে এবং তার সিংহভাগ ছিল পশ্চিমবঙ্গের। কিন্তু ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা এবং সরবরাহ বাড়বে অনুমান করে কেব্‌ল্‌ শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের লাইসেন্স দেওয়া হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও কেব্‌ল্‌-এর বড় বড় এবং অতি আধুনিক কারখানা গড়ে ওঠে। তাতে দেশে কেব্‌ল্‌ উৎপাদনের ক্ষমতা দস্তুরমত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চাহিদা আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পায় নি। তাই বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে গুরুতর প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ কোম্পানীকেই লোকসান খেতে হচ্ছে। যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদেরও লাভের হার হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা সজ্জিত কারখানাগুলোই যে লাভের দিকে আছেন, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশের শিল্পপতিরা সময়মত তাঁদের কল-কারখানার আধুনিকীকরণে হাত দেন নি কেন, সে প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। সুস্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, মুনাফার একটা অংশ রিজার্ভ ফান্ড এবং উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয়। সেই তহবিলের টাকা দিয়েই কোম্পানীর আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ হয়ে থাকে। আমাদের দেশের শিল্পপতিদের এক বিরাট অংশই অসাধু এবং ফাটকাবাজ। তাঁরা কোম্পানীর স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থটাকেই বড় করে দেখেন। কোম্পানী দোহন করে নিজেদের ভুঁড়ি মোটা করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের সুস্থ রীতি মেনে চলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। একদিকে তাঁরা আয়কর বিক্রয়কর ফাঁকি দিয়ে সেটা আত্মসাৎ করেন। অপরদিকে কোম্পানীর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে মুনাফার পুরোটাই পকেটে পুরে ফেলেন। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ দুর্দিনের কথা ভেবে অথবা কোম্পানীর উন্নতির কথা ভেবে কোম্পানীর নামে অর্থ সঞ্চয়ের কথা তাঁরা চিন্তা করতে চান না। বাংলাদেশের শিল্পের এটাই আজ সবচেয়ে বড় সঙ্কট।

পুঁজি লগ্নী, উৎপাদন এবং শ্রমিকদের বেতন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি শিল্পে অগ্রসর রাজ্যের তুলনা করলে এই সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালে ভারত গভর্নমেন্ট শিল্পবিষয়ক যে বার্ষিক তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে নিয়োজিত উৎপাদনী মূলধনের (Productive capital) পরিমাণ ১০১৭ কোটি টাকা। এটা ভারতের মোট উৎপাদনী মূলধনের এক-পঞ্চমাংশ। ভারতের অপর কোন রাজ্যের শিল্পে এত বেশি মূলধন নিয়োজিত নেই। পশ্চিমবঙ্গের পরেই মহারাষ্ট্রের স্থান (৯১৪ কোটি টাকা)। তারপরই মাদ্রাজ (৪১৮ কোটি টাকা) এবং গুজরাট (৩৪৯ কোটি টাকা)।

যেসব শিল্প এই সমীক্ষার আওতায় এসেছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গে চাকুরিয়ার সংখ্যা ৮ লক্ষ ২৫ হাজার, মহারাষ্ট্রে ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার, মাদ্রাজে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার।

শ্রমিকের মাথাপিছু স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) নিয়োজিত আছে পশ্চিমবঙ্গে ৭৭৮৭ টাকা এবং মহারাষ্ট্রে ৬৩১৭ টাকা।

মাথাপিছু প্রতি শ্রম-ঘণ্টায় (Man-hour) উৎপাদনের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে ৬ টাকা ৩৩ পয়সা, মহারাষ্ট্রে ৮ টাকা ৯৪ পয়সা, মাদ্রাজে ৭ টাকা ১৩ পয়সা, গুজরাটে ৬ টাকা ১২ পয়সা এবং পাঞ্জাবে ৮ টাকা ৫২ পয়সা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজের কারখানাগুলোই সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা সুসজ্জিত।

মাথাপিছু প্রতি শ্রম-ঘণ্টার কাজে মালিক এবং শ্রমিকের মিলিত পাওনা দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গে ১ টাকা ৩৭ পয়সা মহারাষ্ট্রে ২ টাকা ৫১ পয়সা, মাদ্রাজে ১ টাকা ৯৮ পয়সা, গুজরাটে ১ টাকা ৬৯ পয়সা এবং পাঞ্জাবে ১ টাকা ৯৩ পয়সা।

প্রতি শ্রম-ঘণ্টায় মাথাপিছু বেতন দিতে হয় পশ্চিমবঙ্গে ৯৯ পয়সা, মহারাষ্ট্রে ১ টাকা ৩৮ পয়সা, মাদ্রাজে ১ টাকা ২ পয়সা, গুজরাটে ১ টাকা ৫ পয়সা এবং পাঞ্জাবে ৮৩ পয়সা।

১৯৬৪ সালে সারা ভারতে শিল্পোৎপাদন থেকে মালিক এবং শ্রমিকের প্রাপ্য দাঁড়িয়েছিল ১৫০৪ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৮৩০ কোটি টাকা পেয়েছিলেন শ্রমিকরা। এটা মোট প্রাপ্যের ৫৫ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে মালিক এবং শ্রমিকের মিলিত প্রাপ্য দাঁড়িয়েছিল ৩৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সর্বভারতীয় প্রাপ্যের এক পঞ্চমাংশের চেয়ে সামান্য কম। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকরা পেয়েছিল মোট প্রাপ্যের ৫৭·৬ শতাংশ। মহারাষ্ট্রে মালিক এবং শ্রমিকের মোট প্রাপ্য দাঁড়িয়েছিল ৩৪৮ কোটি টাকা। তার ৫৫ শতাংশ পেয়েছিলেন শ্রমিকরা। গুজরাটে মোট প্রাপ্য দাঁড়িয়েছিল ১১৯ কোটি টাকা। সেখানে শ্রমিকরা পেয়েছিল তার সাড়ে ৬২ শতাংশ। পাঞ্জাবের শ্রমিকরা পেয়েছিল মোট প্রাপ্যের (৫৯ কোটি) সাড়ে ৪০ শতাংশ এবং মহীশূরের শ্রমিকরা পেয়েছিল মোট প্রাপ্যের (৬৬ কোটি) ৪৫·২ শতাংশ।

গড়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কারখানায় স্থায়ী মূলধন লগ্নী করা ছিল ৩২·৬ লক্ষ টাকা, মহারাষ্ট্রে ১৮·৯ লক্ষ টাকা। মাথাপিছু প্রতি কারখানায় গড়ে শ্রমিকের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৪১৯, মহারাষ্ট্রে ৩০০।

পশ্চিমবঙ্গে গড়ে প্রতি কারখানায় উৎপাদনের মালমসলা (input) হিসাবে লগ্নী ছিল (১৯৬৪ সালে) ৪৫·৬ লক্ষ টাকা, মহারাষ্ট্রে ছিল ৩৪·৬ লক্ষ টাকা। কারখানা পিছু উৎপাদন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ৬২·২ লক্ষ টাকা আর মহারাষ্ট্রে হয়েছিল ৪৩·৬ লক্ষ টাকা।

ভারতের শিল্পে নিয়োজিত মূলধন, উৎপাদন এবং চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল সকলের শীর্ষে। কিন্তু ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে ২০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানার সংখ্যা তুলনায় অনেক হ্রাস পায়। আগে ভারতের কল-কারখানার ২৯ শতাংশ ছিল পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু এই ২০ বছরে সেটা পনের শতাংশে নেমে যায়। উৎপাদনী মূলধন ২৮·৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯·৩ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। চাকরী-বাকরীর সংখ্যা ৩৩·৬ শতাংশ থেকে ২১·৭ শতাংশে নেমে যায় এবং উৎপাদনের মোট পরিমাণ ২৭·২ শতাংশ থেকে ২১·৩ শতাংশে এসে আশ্রয় নেয়।

অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু উৎপাদন কম, মুনাফা কম এবং মজুরীও কম। অন্তত ১৯৬৪ সালে সেই অবস্থাই ছিল। ইদানীং সেই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। এই উদ্বেগজনক অবস্থা যে শিল্প সম্প্রসারণের পথকে প্রশস্ত করতে পারে না সেকথা বলাই বাহুল্য। কল-কারখানার আধুনিকীকরণ ছাড়া এই অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কাজেই পাট, কয়লা, চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, বস্ত্র এবং অন্যান্য শিল্পে আধুনিকীকরণই এখন রাজ্যের প্রধান সমস্যা। সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার শিল্প সংস্থাগুলোকে কতখানি সাহায্য করতে পারবেন, সেটা তাঁদের ভেবে দেখতে হবে। অর্থাৎ মালিকের পাপের বোঝা (সময়মত আধুনিকীকরণের কাজে হাত না দেওয়া) বাংলার শিল্পক্ষেত্রে যে ভরাডুবির সম্ভাবনা প্রকট করে তুলেছে, তার হাত থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করাই আজ আমাদের সামনে প্রধান সমস্যা।

আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস করার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের চাকরীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নতুন নতুন কল-কারখানায় নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দেবে। বলা বাহুল্য এসব দায়িত্ব পালনের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য কারও অজানা নেই। কাজেই তাঁদের তৎপর করে তোলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশে লোকসংখ্যার তুলনায় চাষের জমি অত্যন্ত কম। দ্বিতীয়ত পূর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে এখানে চলে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে চাষবাসে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তার ওপর ৬০ লক্ষ অবাঙালী রুজি-রোজগারের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন। তাঁদের সকলের জীবিকার একমাত্র উৎস হচ্ছে শিল্প-বাণিজ্য। সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ছাড়া বাংলার ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন।

এই নিদারুণ বেকার সমস্যার আমলে যাঁরা চাকরীতে নিযুক্ত আছেন তাঁরা ভাগ্যবান। যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেটা আনন্দের কথা। কিন্তু যাঁরা বেকার রয়েছেন এবং প্রতি বছর যাঁরা বেকার হচ্ছেন, তাঁদের চাকরী-বাকরীর সংস্থান করার দায়িত্ব আরও কঠিন। সেই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অবিলম্বেই কাজে নেমে পড়তে হবে। চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তাতে বাংলার যুবকদের রাজ্যের বাইরে চাকরী যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। সে অবস্থায় বাংলাদেশের মধ্যে তাদের চাকরী-বাকরীর যথেষ্ট সংস্থান না করতে পারলে গুরুতর সামাজিক-অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিতে পারে। সময় থাকতে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। —শ্রীসত্যদাস

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমার বন্ধু মিস্টার টমাস ক্রিস্টি (নিবাস, ২৫ লাইম স্ট্রীট, লন্ডন) পৃথিবীকে এক গভীর ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। সিডেনহ্যামে তাঁহার বড়ই শান্তিপূর্ণ একটি ভেষজ উদ্যান আছে। তাঁহার এই ভেষজ উদ্যান দেখিয়া মনে জাগিল আমাদের দেশের এক অতীত যুগের কথা। সেই যুগে, আমাদের মহা পূর্বপুরুষ ভরদ্বাজ জীবিত ছিলেন। মহাবিজ্ঞ সেন্টর কাইরন ঈস্‌কুলাপিয়াসকে যেমন শিক্ষা দান করিতেন, তাহার বহু পূর্বে, ভরদ্বাজ তৎশিষ্য চরককে তেমনি মনুষ্যদেহে ঔষধরূপে ব্যবহার্য উদ্ভিদের সূক্ষ্ম গুণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব বুঝাইতেন। ইতিহাসপূর্ব কালে চরক সুশ্রুত, এবং পরবর্তী কালের ডিওসকোরিডিস উদ্ভিজ্জ-জাত ঔষধের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, মিস্টার ক্রিস্টিও তাঁহার সহকর্মীগণসহ বর্তমানে তাহাই করিতেছেন। উদ্ভিদ জগৎকে এখন যেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহু শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে, এবং বর্তমান কালের রসায়নশাস্ত্র বিশ্লেষণের যে সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাহার সাহায্যে এখন পৃথিবীর যাবতীয় স্থানে অনুসন্ধান চালাইয়া ব্যাধি নিরাময়, বেদনার উপশম এবং আয়ু বৃদ্ধির উপযোগী ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হইতেছে। যে উদ্যম ও মনোভাব আরব-চিকিৎসক অহরম দেখাইয়াছিলেন, যাহার ফলে রুবার্ব, ক্যাসিয়া, সোনা, ক্যাম্ফর এবং অন্যান্য প্রাচ্য ঔষধ ইউরোপে গৃহীত হইয়াছিল এবং যাহার ফলে পরে কুইনিন, মরফিয়া এবং স্ট্রিকনিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মিস্টার ক্রিস্টিও ঠিক তেমনি উদ্যম ও মনোভাব লইয়া গবেষণা করিতেছেন, এবং ইহার ফলে অনেক শক্তিশালী ঔষধ নূতন করিয়া ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার তালিকাভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইতিপূর্বে কয়েকটি কঠিন অসুখের কোনও ঔষধ ছিল না, মিস্টার ক্রিস্টির গবেষণায় সেই সব ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিস্টার ক্রিস্টি কোনও একটি ভারতীয় ফলের গাছের active principle বা সক্রিয় সত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা ডায়াবিটিসের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই গাছের ফল গাদা গাদা মাটিতে পড়িয়া থাকে, এবং বর্ষার জল পাইয়া স্থানটি অঙ্কুরে ছাইয়া যায়, দুর্গন্ধ বিস্তার করে, অবশেষে সেগুলি ছাগের মুখে গিয়া স্থানটি পরিষ্কার হয়। আরও একটি ভারতীয় আগাছা হইতে কঠিন এক অসুখের ঔষধ পাওয়া গিয়াছে। আরও ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে যদি এই জাতীয় প্রয়াস শত শত বৎসরের ভারতীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া একত্র কাজ করিতে পারে। ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান ও প্রাচ্য দেশের প্রাচীন জ্ঞান এই ক্ষেত্রে একত্র মিলিলে ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নূতন শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ে ডাক্তার কানাইলাল দে, ডাক্তার নবীনচন্দ্র পাল, ডাক্তার মুদিন শরিফ, ডাক্তার (অধুনা মৃত) শখারাম দত্ত ও ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্তের সহযোগিতা অনেক কাজে লাগিতে পারিত। মিস্টার ক্রিস্টির কাজে ভারতের বিশেষ স্বার্থ আছে। কারণ এখন যে ভেষজ সম্পদ ভারতের কোনও কাজে লাগিতেছে না, নষ্ট হইতেছে, এমন কি জঞ্জালরূপে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, সেই জঞ্জাল মিস্টার ক্রিস্টির সহযোগিতায় সোনায় রূপান্তরিত হইতে পার।

মিস্টার ক্রিস্টিকে আমি ইংরেজ চরিত্রের একটি প্রধান প্রতীকরূপে আবিষ্কার করিয়াছি। আমার মতে তিনি একজন আদর্শ ইংরেজ। দেহে শক্তিশালী, মনে উদার, উন্মুক্ত এবং দৃঢ়। ভণ্ডামি এবং নির্বুদ্ধিতা-জাত কোনও কাজের প্রতি তাঁহার ঘোর বিতৃষ্ণা। তাঁহার সমস্ত সত্তাটাই যেন কর্মোদ্যমে গড়া, হিন্দু-চরিত্রের বিপরীত। —হিন্দুর সত্তাটি কর্মহীনতায় গঠিত। মিস্টার ক্রিস্টির মানসিক ও দৈহিক শক্তি পূর্ণ বিকশিত, আবহাওয়া ও উৎসাহ-দমনকারী ঋতুর প্রভাবে সব বিষয়ে সমতা ও দৈহিক শক্তির বিনষ্টি ঘটিবার ঠিক পূর্বে আর্যদের যেমন ছিল। বর্তমান যুগের মানুষদের মধ্যে জন বুলকে বলিষ্ঠ মানবীয় গুণসমূহের প্রতিনিধিরূপে ধরা যাইতে পারে। বর্তমানের মানবজাতির এক ভাগ, শৈশবের উদ্দাম প্রকৃতি আজিও ত্যাগ করে নাই, অন্য ভাগে অথর্ব মুমূর্ষু হিন্দু জাতি। অতএব জন বুল তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া বাহিরের শক্তিকে দমন করিতে পারে। আর হিন্দু আদর্শবাদের কয়েক ধাপ পার হইয়া আসিয়া, এবং নব্য-প্লেটোনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার গুরু সাজিয়া অবশেষে বহিঃপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিল, এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির চর্চা দ্বারা কল্পনা পথের আনন্দ-সমাহিত অবস্থা লাভকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া লইল। কিন্তু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই তত্ত্বে যত কবিত্ব অথবা সূক্ষ্মতাই থাকুক, বাস্তব জগতের কঠিনতার সঙ্গে ইহাকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া সহজ নহে, যে জীবনে তুচ্ছ জিনিস লইয়াই বেশি ব্যস্ত থাকিতে হয়, বিশ্বের সেই স্থূল কর্মজীবনের পক্ষে এই তত্ত্ব গ্রহণ করা কঠিন।

আমার হাতে যে অল্প সময়টুকু ছিল, তাহারই মধ্যে আমি লন্ডনের ঔষধের বাজার খুব মনোযোগের সঙ্গে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। বিদেশ হইতে কোন কোন্ ঔষধ তাহারা আমদানি করে ইহাই ছিল আমার জানিবার বিষয়। বর্তমানে এখানে পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, অ্যামেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে আসে, দেখিলাম তাহা ভারতবর্ষ হইতেও আনা যাইতে পারে। Cassia fistula (সোঁদাল)-এর খোসাসমেত বীজ তাহার মধ্যে একটি। এই বীজ সমস্ত ভারতে গাছে গাছে শুকাইয়া নষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন Mallotus Phillippinensis (কামিলা) হইতে প্রাপ্ত হলুদ বর্ণের চূর্ণ, এবং Hemidesmus indicus (অনন্তমূল) দেখিয়াছি। প্রদর্শনীতে ওখানকার এক বণিকদের সভায় এই জাতীয় ভারতীয় নমুনাগুলি তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করা হইল। তাঁরা এগুলি লইয়া যত্নপূর্বক পরীক্ষা চালাইয়া দেখিবেন, এইরূপ ইচ্ছা

প্রকাশ করিলেন। লণ্ডনের বাজারে এ সবের দাম যাচাই করিয়া বোঝা গেল প্রাথমিক অসুবিধাগুলি দূর করিতে পারিলে ইহা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে। এইভাবে অন্যান্য আরও অনেক জিনিসেরও কারবার চালাইয়া ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে। প্রথমেই ধরা যাউক ফাইবার বা তন্তুজাতীয় দ্রব্যের এবং কাগজ প্রস্তুতের উপকরণের কথা। রাজশাহীর বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় এক-জাতীয় তন্তু পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে সবার মনোযোগ হইতে বুঝিতে পারা গেল ভারতীয় উদ্যমে উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। আসল কথা ইংল্যাণ্ডে, বা ইউরোপে বা অ্যামেরিকায় এমন কেহ নাই যিনি ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। সমস্ত সভ্য দেশেরই প্রতি-নিধি পৃথিবীর সর্বত্র সকল দেশে রহিয়া-ছেন যাঁহারা সেই সেই দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করেন, কিন্তু ভারতের মত এত বড় দেশ এমন সভ্য শাসনে থাকিয়াও সর্বত্র প্রতিনিধিহীন।

ভারতীয় কাঁচামাল উৎপাদন প্রশ্ন লইয়া আমি অধুনা মৃত ইউজিন রিমমেল-এর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ভারতবন্ধুদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ভারতের সুগন্ধ দ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত জিনিস ও উদ্বায়ী তেল লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি-বার ভার লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া-ছিলেন, "আজ আমি আপনার অফিসে আমার সুগন্ধ বিষয়ক গ্রন্থখানি (বুক্ অভ পারফিউমস্) রাখিয়া আসিয়াছি। ভারতীয় সুগন্ধি উপকরণ ও উদ্বায়ী তেলের একটি তালিকা আপনি আমাকে দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমি তাহা আনিতে চাহিয়াছিলাম। এই তালিকা বিষয়ে আমার খুবই কৌতূহল ছিল। আপনার যদি এরূপ একখানি তালিকা প্রস্তুতের জন্য সময় করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে উহা আমাকে পাঠাইয়া দিলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।" তালিকাটি পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি ব্যবসার ভিত্তিতে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। প্রখ্যাত রসায়নবিদ্ মিস্টার ক্রস্ তন্তু লইয়া পরীক্ষার ভার লইলেন। একবার একটি তন্তু তিনি আমার হাতে দিয়া ইহার নাম বলিতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম ইহার নাম তসর। কারণ স্পর্শে খুব কোমল ঠেকিল এবং দেখিতেও চকচকে ছিল। কিন্তু আমারই ভুল, কারণ তন্তুটি ছিল পাটের। মিস্টার ক্রস্ তাঁহার আবিষ্কৃত বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাটকে ঐভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। আর এক পদ্ধতিতে অন্য একজাতীয় স্থূল তন্তু (Bauhinia Vahlu)-কে এমন বদল করিয়াছিলেন যাহাতে উহা উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ শাদা উল হইতে পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। ইহার সাহায্যে বেশ একটি ব্যবসাও ইতিমধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা কলিকাতা হইতে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে আমার এক ইংরেজ বন্ধুর চিঠির নিম্নলিখিত অংশ হইতে বুঝা যাইবে।—"মেসার্স — আমার নিকট Bauhinia Vahlu-এর নমুনা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাঁহাদের ইহা হইলে ঐ বস্তু তাঁহাদিগকে পাঠাইতে থাকিব, প্রতি-শ্রুতি দিয়াছি। ......ঐ বস্তু এখানকার পাহাড়ে বিস্তর জন্মে, এবং আগুন প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সামান্য খরচ পড়িবে তাহাতে খুব কম দামেই ইহার যোগান দেওয়া সম্ভব হইবে। মেসার্স — লিখিয়াছেন আপনি তাঁহা-দিগকে আমার সঙ্গে পত্রালাপ করিতে

পরিমল গোস্বামী রচিত

আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা অভিনয়ের উপযুক্ত সাতটি কৌতুক নাটিকা

দন্ত প্রলয়

মূল্য তিন টাকা

ইমপ্রেসারিও, ৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান:
ডি· এম· লাইব্রেরী; কলিকাতা—৬

পরামর্শ দিয়াছেন। আমি সেইজন্য আপনাকে লিখিলাম, এ সমস্ত বিষয় জানাইয়া দিলাম।" এসব নীরস বিষয়ে আমি বিস্তারিত লিখিতেছি শুধু এজন্য যে, আমার দেশবাসী জানিয়া রাখুন, যদি তাঁহারা চোখ খুলিয়া রাখিয়া সভ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন স্বাধীন জীবিকা, সম্পদ ও সমৃদ্ধি তাঁহাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে, কিন্তু এজন্য তাঁহাদিগকে এত-দিনের সংস্কারবদ্ধ বাঁধা পথ ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে হইবে; কারণ এই সংস্কারই জাতীয় উন্নতির কণ্ঠ রোধ করিয়া তাঁহা-দের অগ্রসর হইবার পথও রোধ করিয়া রাখিয়াছে। আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমার মনে হয় এই জাতীয় গবেষণায় বা পরীক্ষায় ইংল্যাণ্ডের বণিকেরা নিজেদের দেশের লোকের চেয়েও "পাগড়ি-পরা" ভদ্রলোকদের প্রতিই বেশি মনোযোগ দিবেন, কারণ তাঁহারা ছোট ছোট চালানের উপর আদৌ ভরসা করিতে চাহেন না, আর ওদিকে ব্যবসায়ীরাও অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে চাহেন না।

সাধারণ দর্শকদের কাছে ভারতের কারুশিল্পের অঙ্গনটিই সর্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ করিয়া যে দিকে প্রাচীন রীতিতে গড়া মণিমুক্তা খচিত মূল্যবান অলঙ্কারের উজ্জ্বল আধারগুলি রাখা হইয়াছিল সেই দিকে তাহারা খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সব অলঙ্কারের কারুকার্য অতি উচ্চ-শ্রেণীর, এবং দুর্লভদর্শন, ইহা দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল। আর আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম ইহাদের দেখিয়া। মুখে স্বর্গীয় সৌন্দর্য মাখা শিশুরা পিতা-মাতার সঙ্গে আসিয়াছে; তাহাদের হলুদ বর্ণের চুলগুলি পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুশ্রী তরুণীরা সদ্য ইস্কুল হইতে আসিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিতে কিছু সঙ্কোচ, মুখে কিছু লজ্জার আভা। কি সুন্দর যে দেখাইতেছে! যুবতীরা আসিয়াছে তাহাদের প্রণয়ীদের সঙ্গে, সমস্ত জীবন তাহাদের নিকট হইতে যে পূজা পাইবে আশা করিতেছে, আর আশা করিতেছে—তাহারই প্রথম কিস্তি এই প্রদর্শনীতে পাইবে, (কিন্তু হায়! প্রেমের প্রথম স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইবার পর তাহা যে অধিকাংশ স্থলেই দাবীর চাপে পরিণত হয়! এবং তাহা এমন যে তাহার বিরুদ্ধে যে-কোনও সফ্রেজিস্ট বিদ্রোহ করিবেন!) ইহা ভিন্ন গৃহিণীরা আসিয়াছেন, তাঁহাদের চালচলনে ভাবে ভঙ্গিতে বেশ একটা দায়িত্বের ভাব এবং আভিজাত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা খুব আগ্রহের সঙ্গে বালা, ব্রেসলেট, চেন, নেকলেস, লকেট ইত্যাদি দেখিতেছেন। এই সব উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার আসিয়াছে ত্রিচিন-পল্লী, কটক, ঢাকা, দিল্লী, লখনৌ এবং জয়পুর হইতে। হায় সুদূর দক্ষিণ-ভারতের 'স্বামী'-সম্প্রদায়ের কারিগর! সে যখন তাহার দীন গৃহে বসিয়া তাহার আদিযুগের পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত নেহাই-এর উপর ঝুঁকিয়া রৌপ্যখণ্ডের উপর ঠুক ঠুক করিয়া তাহার ছোট হাতুড়িটি ঠুকিতেছিল, তখন কি সে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, তাহার হাতের কাজ একদিন দূর পশ্চিমের দেবকন্যাদের মত সুন্দরী নারী ও আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন সংযমের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রণয়ী পুরুষ-দের এমন করিয়া মন ভুলাইবে? ভারতীয় এই কারিগর ইহাদের মনে যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ফলে অনেকেরই হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে, এবং তাহা অনেক পরিবারেরই মনে এমন এক অশান্তির ঝড় বহাইয়া দিয়াছে যাহা দেখিলে অগ্নি ও ধাতুশিল্পের দেবতা

আলক্যানও বিস্ময়ে হতবাক হইতেন। তাহা যাহাদের মনে বিষাদের ছায়া ফেলিয়াছে, সেই ছায়া সরাইয়া তাহাদের অভ্যস্ত মাধুর্য ফুটাইয়া তুলিতে সেই অলঙ্কার-শিল্পী তাহার সর্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারিত না কি? ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যে গড়া রৌপ্য ও স্বর্ণ অলঙ্কারের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যপূর্ণ পদ্মফুলের চিত্র, গভীর লাল রুবি রঙের মিনের কাজ, যাহা বহু দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় হাতের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন, ল্যাপিস-ল্যাজুলি পাথরের উজ্জ্বল নীল বর্ণ, টরকইসের হাল্কা সবুজ, কিংবা পুরাকালের সত্রাজিতের স্যমন্তক মণি কি সত্যই প্রকৃতির নিজের অকৃপণ হাতে বর্ধিত ইংরেজ নারীর মাধুর্যকে বাড়াইয়া দিতে পারিত? বৃষ্টিস্নাত রৌদ্রোজ্জ্বল বসন্ত সৌন্দর্যও ইহার কাছে ম্লান। উত্তর মেরুর নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তুষার ইহার কোমল মসৃণ ত্বক হইতে কিছু স্বচ্ছতা ভিক্ষা করিতে পারে। ইহার গণ্ড হইতে রক্তরাঙা গোলাপ কিছু রক্তাভা যাচ্ঞা করিবে। কঠোর সাধনারত সন্ন্যাসী ইহার রাঙা ওষ্ঠাধর হইতে চুম্বন-চোর যুবকদের ক্ষমা করিবে। ইংরেজ রমণীর এই রাঙা ওষ্ঠাধর দেখিয়া উজ্জ্বল লাল প্রবালসমূহ সমুদ্রের গভীরে লুকাইবে। প্রাচ্য দেশের সৌন্দর্যের আদর্শ অবশ্য পৃথক। দৃষ্টি তাহার খুব প্রখর না হইলে সে ইংরেজ রমণীর বর্ণ ছাড়া আর কোনও সৌন্দর্য দেখিতে পাইবে না। কারণ সে পছন্দ করে চাঁচাছোলা জ্যামিতিক মাপের সৌন্দর্য। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এ রকম পাথরে-খোদাই মূর্তি শুধু চোখকেই ভুলাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইংরেজ রমণীর ভাব-প্রকাশক্ষম মুখ মর্ম স্পর্শ করে। তাহার দুটি চোখের রঙে, মনে হয় তাহা আরও একটু কালো হইলে ভাল হইত। তাহার কেশ যেখানে সোনার রঙের নহে, তাহা একটু কালো, একটু লম্বা এবং আরও ঘন হইলে ভাল হইত। তাহার দেহ আরও একটু পাতলা, কোমল এবং কিঞ্চিৎ কৃশ হইলে ভাল হইত। এবং মুখের ভাবে আরও কিছু পেলবতা, এবং বিদ্রোহী-ভাবের স্বল্পতা থাকিলে ভাল হইত। এই বিদ্রোহভাবটি যেন তাহার মনের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এসব ত্রুটি অতি তুচ্ছ, বরং ইহা তাহার সৌন্দর্যের মহিমা আরও যেন বাড়াইয়াই দিয়াছে। ইংরেজ পুরুষ ইহার জন্য যে গৌরব বোধ করে তাহা অকারণ নহে। মূর্তিপূজারীরা তাহাদের দেবীমূর্তিসমূহের জন্য ইংরেজ রমণীর মুখকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারে। আমার মনে হয় সকল ম্যাডোনা মূর্তিরই বিশেষ করিয়া বিখ্যাত 'ম্যাডোনা অভ দি চেয়ার'-এর আদর্শ ছিল ইউরোপের উত্তর দেশের কোনও মুখের আদর্শে অঙ্কিত, কারণ রাফায়েলের এই ম্যাডোনার সঙ্গে লা ফরনারিনা অথবা জুইশ মুখাবয়বের কোনও সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে ইহার মধ্যে এমন একটা অনির্বচনীয় সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আছে যাহা রমণীকে রমণীয়ত্ব দান করে, এবং যাহা ইউরোপখণ্ডের নারীর মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। এবং আমি যদিও শুধু এই কারণে ইউরোপীয় রমণীর সৌন্দর্যের উপরে ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্যের স্থান নির্দেশ করি, তবু অ্যামেরিকান রমণী প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইলে আমার বিচারে কিছু সঙ্কোচ দেখা দিবে। ইংরেজ রমণীর সমস্ত মাধুর্য সত্ত্বেও সে চাকচিক্যময় সাধারণ অলঙ্কারের জন্য আকুল হইবে, ঠিক যেমন বোরনিওর আদিবাসী ডায়াক রমণী বেতের ব্রেসলেট, দক্ষিণ ভারতের তামিল রমণী তাহার কানের প্রকাণ্ড গর্তে ব্যবহারের জন্য বার্নিশ করা তালপাতার গহনা, এবং উত্তর-পশ্চিম দেশের কৃষক রমণী পাঁচ সের ওজনের পিতলের বেড়ি পায়ে পরিবার জন্য আকুল হয়। এই যন্ত্রণাদায়ক বেড়ি সে সমস্ত জীবন পায়ে পরিয়া বেড়ায় এবং মৃত্যুকালে তাহার উত্তরাধিকারিণীদের বংশ বংশ ধরিয়া ব্যবহারের জন্য দান করিয়া যায়।

প্রদর্শনী খুলিবার কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতীয় যাবতীয় অলঙ্কার এবং অন্যান্য কারুশিল্পের অধিকাংশই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। অলঙ্কার ব্যতীত অন্যান্য যেসব দ্রব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা হইতেছে পটারি, ধাতুদ্রব্য এবং ল্যাকারের কাজ করা দ্রব্য। বম্বাই, হাল্লা, মুলতান, জয়পুর এবং খুর্জার পালিশ করা পাত্রসমূহ সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। বম্বাইয়ের পটারিতে দুই সহস্র বৎসরের পূর্বেকার ভারতীয় জীবনালেখ্য অজন্তা-গুহার অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে পাত্রগুলি বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উহারা ইহার নাম দিয়াছিল Wonderland Pottery Works. এই সব চিত্রের বাস্তবানুগ ভঙ্গি এবং শিল্পমূল্য সম্পর্কে মিস্টার গ্রিফিথ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি "মুমূর্ষু রাজকন্যা" নামক ইহার একটি চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন "ইহাতে যে বেদনার প্রকাশ হইয়াছে, যে সেণ্টিমেণ্টের প্রকাশ হইয়াছে, তাহা আমার মতে শিল্পের ইতিহাসে অনতিক্রম্য।" খুর্জার সবুজ অলঙ্কৃত পোড়ামাটির পটারি সকলেরই খুব ভাল লাগিয়াছিল। বারাণসীর পিতলের বাসনপত্র সোনার মত উজ্জ্বল, প্রদর্শনীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিল, এবং তাহার দাম শস্তা হওয়াতে অল্পবিত্ত দর্শকেরাও প্রদর্শনী দর্শনের চিহ্নস্বরূপ সঙ্গে লইতে পারিয়াছিল। মোরাদাবাদের জিনিসেরও চাহিদা কম ছিল না। ল্যাকারের কাজ করা পাক-পত্তন, ডেরা ইসমাইল খাঁ এবং পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের কাঠের দ্রব্যাদিও সহজেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদি, বুননের কাজ, শাল অথবা বস্ত্রদ্রব্যাদি দর্শকের খুব ভাল লাগে নাই। রুদ্রাক্ষের ব্রেসলেট এবং নেকলেস মহিলাদের মধ্যে প্রচুর বিক্রয় হইয়াছিল। বিলম্বে আসা দর্শকেরা, ভাল ভাল জিনিস সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, বড়ই হতাশ হইয়াছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, ইঁহাদের মধ্যে ম্যাক্স মুলারও ছিলেন।*

[ক্রমশ]

* "A Visit to Europe" গ্রন্থের অনুবাদঃ পরিমল গোস্বামী।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচূলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, বৃহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

নির্বাচনের পরে

সাগর বিশ্বাস

১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের কুশীলবদের প্রতি রাজ্যের সাড়ে তিন কোটি দর্শকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিলো। কেন না কিছুকাল ধরে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে রাজা, মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি মায় সাধারণ পদাতিক সেনাবাহিনীও তখন করিৎকর্মা। এমন কি 'কোই হ্যায়' বললে যারা শেকল নিয়ে ছুটে আসে সেই রক্ষীকুলও তখন তটস্থ। প্রত্যেকের চোখেমুখে দারুণ উৎকণ্ঠা—এই বুঝি climax ঘটে গেলো। অবশেষে সকল crisis-এর অবসান ঘটিয়ে নাটকীয় climax ঘটলো জুন মাসের আট তারিখে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে রিজল্যুশন নেওয়া হলো অজয় মুখার্জীকে বহিষ্কার করার—সঙ্গে যাবেন আর একজন অবাধ্য মানুষ—মেদিনীপুরের অহীন্দ্র মিশ্র। গ্রীক নাটকে নিয়তির (Nemesis) দৌরাত্ম্য দেখা যায়। অ্যারিস্টটল বলেন, অদৃষ্টের কোন্ রন্ধ্রপথে দুর্ভাগ্যের শনি প্রবেশ করবে ট্রাজেডির নায়ক তা জানতে পারবেন না। শেক্সপীয়রীয় নাটকেও এটা দেখা যায়। তুচ্ছ একটি রুমাল যা আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহার্য জিনিস তা-ই যে ওথেলোর জীবনে অতবড়ো দুর্ভাগ্যের অন্ধকার টেনে আনবে এ কি ওথেলো জানতেন? জানতেন না পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের হিরোরাও। ১৯৬৫ সালের জুন মাসের আট তারিখের একটি ঘটনা যে দেখতে দেখতে ভাগ্যকে এত শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে এটা বোঝবার মতো আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি তাঁদের ছিলো না। থাকলো তো ট্রাজেডি ঘটতো না। ট্রাজেডির নায়কের 'ভ্রান্তি'র ছিদ্র পথেই ত' নিয়তি প্রবেশ করবে। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী হিরোগণ এ যুগের বৃহত্তম ট্রাজেডির নায়ক। ট্রাজেডির নায়কের যেমন একসময় জীবন ও জগতের প্রতি একটি নৈরাশ্যজনক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়—কংগ্রেস নেতাদেরও তাই হয়েছিলো। কেউ পদত্যাগ করে জীবনের জ্বালা জুড়োতে চেয়েছেন—কেউ ক্ষোভে-দুঃখে বিধানসভার বিরোধী বেঞ্চে এসে নিয়মিতভাবে বসতেও পারেন নি। কিন্তু ট্রাজেডির নায়ককে ত' ভেঙে পড়লে চলে না। তাই আপাতত নানাপ্রকার বিপ্লবী কায়দায় সংগঠনকে পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চলছে।

কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে লাভ নেই। বলতে গেছিলাম মেদিনীপুরের অহীন্দ্র মিশ্রের কথা। রাজ্য কংগ্রেস থেকে নির্বাসিত দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঐ ১৯৬৫ সালের জুন মাসের আট তারিখে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শ্রীঅজয় মুখার্জীর সঙ্গে শ্রীমিশ্রকেও বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। তারপর বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা একে একে বেরিয়ে গিয়ে কেমন করে বাংলা কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা সকলেরই জানা আছে। নিয়তির অলঙ্ঘ্য নির্দেশে কিংবা ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে শ্রীমুখার্জী আজ বাংলাদেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা। আর অহীন্দ্র মিশ্রও বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্য।

শ্রীমিশ্রের ঘটনাবহুল জীবনের বিচিত্র কথা সেদিন শুনেছিলাম। তার সব কথা বলবার অবকাশ হয়তো নেই। সংক্ষেপে যা বলবার এবং বুঝবার তা হলো ছেলে-বেলা থেকেই তাঁর মধ্যে একটি আপোষহীন বিপ্লবী সত্তা তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠি শ্রীমিশ্রের মামা। মামা চেয়েছিলেন ভাগ্নেকে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বড় করে তুলতে। দেশব্যাপী তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপুল উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার আগুনের উত্তাপ এসে লাগলো নবম শ্রেণীর ছাত্র অহীন্দ্রের মনে। বেরিয়ে পড়লেন বিদ্যালয় থেকে—যোগদান করলেন '৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনের উত্তাপ তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। স্কুলের 'গুড বয়' অহীন্দ্র পালিয়ে গিয়ে নাম লেখালেন নৌ-বাহিনীতে। বোম্বেতে জুনিয়ার এবং সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা পাশ করলেন। ১৯৪৬ সালে যখন বোম্বেতে নৌ-বিদ্রোহ শুরু হলো তখন ওঁরা করাচীতে। করাচী থেকেই ও'রা ওই বিদ্রোহের সমর্থনে বিদ্রোহ করলেন। ক্ষুদ্র 'মনোরা' দ্বীপ থেকে করাচী হারবারে 'হিন্দুস্তান' জাহাজ ওঁরা দখল করে নিলেন। এর আগেই জাপানের পতন হয়ে গেছে। এই বিদ্রোহীদের দমন করতে বৃটিশ সরকার যখন মারাঠা এবং বালুচ রেজিমেন্টকে কাজে লাগাতে সমর্থ হলো না তখন বৃটিশ প্যারাট্রুপার্স দিয়ে তাঁদের আক্রমণ করানো হলো। এ্যাডমিরাল গডফ্রেড সারেন্ডার করবার জন্য হুমকি দেখালেন। বিদ্রোহীরা সেই হুমকির জবাবে 'My guns are loaded' বলে ফায়ার করে ইউনিয়ন জ্যাক ধ্বংস করে ফেললেন। চারিদিকে তখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। এই সময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজী আবেদন জানালেন, "Stop unnecessary blood-shed." তারপর শ্রীমিশ্র সমেত বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করলেন। ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীনতার পরে খুব স্বাভাবিকভাবে শ্রীমিশ্র কংগ্রেসের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। ১৯৫৭ থেকে '৬২ সাল

শ্রীঅহীন্দ্র মিশ্র

পর্যন্ত তিনি মেদিনীপুর জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং '৬২ থেকে ৬৫ পর্যন্ত সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু শেষ দিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ নিয়ে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। '৬৫ সালেই পশ্চিমবঙ্গ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচিত্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (শ্রীমিশ্র তখনো কংগ্রেসের মধ্যেই ছিলেন)। কিন্তু ১৪৬ ভোটে তিনি পরাজিত হন। ঐ বছরই কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহ করেন। তারপর তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। বর্তমানে তিনি মেদিনীপুর জেলা বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক। পশ্চিম পাঁশকুড়া কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত।

দীর্ঘ সময় শ্রীমিশ্রের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সারাক্ষণ তিনি যে সকল সমস্যার কথা বললেন—তা কোনো বিশেষ অঞ্চল কিংবা তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকার সমস্যা নয়—সামগ্রিকভাবে মেদিনীপুরের সমস্যা। তিনি বললেন,

—সবাই বলে ধানের ব্যাপারে মেদিনীপুর উদ্বৃত্ত জেলা। কিন্তু আমি জানি মোটেই উদ্বৃত্ত নয়। আমি এও জানি কি নিদারুণ সংকটের মধ্যে কৃষক ধান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। বাইরে থেকে এই বিক্রি করাটা দেখে হয়তো অনেক কিছু মন্তব্য করা চলে। কিন্তু আসল সত্যটা হলো, অভাব-অনটন আর মহাজনদের শোষণে কৃষকের জীবন দুর্বিবহ। এখানকার মহাজনী সুদের হার এত চড়া যে, বাংলাদেশের অন্য কোথাও এমনটি আছে বলে আমি জানি না। যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে জেলার প্রয়োজন বাস্তবিক মেটে না। অথচ বাইরে থেকে ফসল পাঠানোর তাগাদা আসে। এভাবে জেলার প্রয়োজন না মিটিয়ে কিংবা উন্নত সেচ ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা না করে ফসল বাইরে পাঠানো হলে মানুষের দুঃখ কমবে না—বেকার সংখ্যাও বেড়ে যাবে।

—বেকার সমস্যার জন্য স্থায়িভাবে আপনি কি ভাবছেন?

—ভাবছি ত' অনেক কিছু। কিন্তু কিছু করতে না পারলে ভাবনাটাই সার হবে। শালবনীতে একটা ডেয়ারী ফার্ম করতে পারলে অনেক বেকারকে কাজে লাগানো যেতো। শুধুমাত্র মূলধনের অভাবে অনেক তাঁতী কেবল গামছা বুনেই প্রতিভা নষ্ট করছে। এই তাঁতীরা মেদিনীপুরের এক বিশেষ সম্পদ। সরকারী উদ্যোগে এদের পৃষ্ঠপোষকতা করলে অনেক কাজ হতে পারে।

—আপনার নির্বাচনী এলাকার জন্য কিছু ভাবছেন কি?

—পাঁশকুড়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রয়োজন। কেন না খড়্গপুর, হলদিয়া, কলকাতা রেলপথের সঙ্গে পাঁশকুড়াও যুক্ত। স্থানোপযোগী কিছু কিছু স্থানীয় শিল্প গড়ে তুলতে পারলে বাইরে পৌঁছে দেওয়ার কিংবা বাজার পাবার অসুবিধা হতো না।

বিদায় নেবার আগে আর একটি কথা শ্রীমিশ্র বলেছিলেন, যে কথাটি না বললে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু অব্যক্ত থেকে যাবে। সেই একটিমাত্র কথার মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তার প্রসারতার পরিচয় মিলতে পারে। তিনি বলেছিলেন,

রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতাদের কাব্যপাঠ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে চললেন,—

প্রাত্যহিক জীবনে রাজনীতির শুষ্কতার মধ্যে মানুষের সহৃদয়তা এবং প্রাণের সৌকুমার্য ক্ষয় হতে থাকে। কবিতা এবং চিরায়ত সাহিত্যই এই ক্ষয় থেকে মানবাত্মাকে রক্ষা করতে পারে। তাই কাব্য রাজনীতিবিদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। কেন না যে রাজনীতির সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক নেই সে রাজনীতি ব্যবসায়িক রাজনীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

এবার বিধানসভায় যুক্তফ্রন্ট থেকে ছ'জন মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের একজন (শ্রীমতী পারুল সাহা) সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা লিখেছিলাম (১৩ই মার্চ)। সেদিন দেখা করেছিলাম নিরুপমা চ্যাটার্জির সঙ্গে। শ্রীমতী চ্যাটার্জি হাওড়া জেলার বাগনান কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বাম কমিউনিস্ট সদস্যা। ১৯৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন শ্রীমতী চ্যাটার্জি ১২।১৩ বছরের একটি কিশোরী মাত্র। কাজেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম বলতে গেলে তাঁর অগোচরেই শেষ হয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিযুগের সেই সব আন্দোলনের কথা তাঁরও মনের মধ্যে তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি করতো। এরই পরোক্ষ ফলেই বোধহয় '৪৮ সালের ছাত্র আন্দোলনে অত সহজে তিনি এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তখনো মেট্রিক পাশ করেন নি—৮ম-৯ম শ্রেণীর ছাত্রী মাত্র। মেট্রিক পাশ করেছিলেন ১৯৫০ সালে। তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে প্রথম তাঁর জেল হয়। দেউলটির সেই মিটিং-এর কথা এখনো শ্রীমতী চ্যাটার্জির বেশ মনে আছে। গভীর রাত্রে পুলিশ তাঁকে বন্দী করে। জামিনের পর তাঁকে হাওড়া থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কতার অজুহাতে দণ্ডাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করে শাড়িতেই অন্তরীণ করে রাখা হয়। বিচারে

শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জী

এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিলো। এর পরে বাড়ি থেকে নানাভাবে তাঁকে রাজনীতি তথা গঠনমূলক আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার প্রবল চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু ও পথে যে একবার যায়—সে আর ফিরে আসে না। আসেন নি নিরুপমা চ্যাটার্জিও। দ্বিগুণ উৎসাহে মহিলা, ছাত্র, যুবক ও কৃষকদের আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এর জন্য দুর্ভোগও পোহাতে হয়েছে অনেক। এই সেদিনও ট্রাম আন্দোলনে যোগ দিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় তাঁকেও বন্দী করা হয়েছে—পাঠানো হয়েছে জেলে (২১শে নভেম্বর, ১৯৬২)। শ্রীমতী চ্যাটার্জি প্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন ১৯৬৭ সালে। কিন্তু সেবার ত্রিকোণ যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি। এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিপক্ষ কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরণজিৎ ঘোষচৌধুরীকে ১২ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন (শ্রীমতী চ্যাটার্জী—৩২,৩১৬, শ্রীঘোষচৌধুরী—২০,২১৩)।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পরে বিভিন্ন স্থান থেকে ক্ষেত-মজুর এবং শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচারের যে সকল খবর পাওয়া যাচ্ছে সেদিকে শ্রীমতী চ্যাটার্জীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলাম—এগুলির মোকাবিলার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? উনি বললেন,

—এর জন্য চাই শক্তিশালী শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠন। শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমেই এইসব অত্যাচারের মোকাবিলা করতে হবে। আর সেটা হবেও। গ্রামের মানুষ আজ যথেষ্ট সচেতন।

—বাগনানের নানা সমস্যার কথা ইতিপূর্বে আমরা সাপ্তাহিক বসুমতীর মাধ্যমে তুলে ধরেছি—হয়তো দেখে থাকবেন। সেই

নতুন ছড়া

পরিমল ভট্টাচার্য

আমার মায়ের চোখের জল
নদের এলো বান
বন্ধ্যাভূমি শ্যামল হবে
ফলবে এবার ধান।

আমার প্রিয়ার ভালোবাসা
জ্বললো আগুন হয়ে
পতঙ্গ সব রূপের খেয়ে
মরলো শ'য়ে শ'য়ে।

আমার ভায়ের রক্তে নাচে
ঝড়ো হাওয়ার গান
দৈত্যপুরীর বন্দীশালা
হল রে খান্ খান্।

আমার বোনের হাড় নিয়ে সব
খেললো যারা পাশা
এবার আমার বাংলা দেশ
জবাব দিলে খাসা।

শোক-স্তব্ধ ঝড়ে

প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

শোক-স্তব্ধ বিকেলের রূপ
শূন্যতায় নির্বাক পাণ্ডুর,
অস্থির চঞ্চল।
অমৃতস্য পুত্রগণ
রক্তে রক্তে অসম্ভব নৈঃশব্দ্যে নীরব।

উঠছে পায়ের শব্দ অদ্ভুত
পাঁচটি শবাধার
লক্ষ লক্ষ পদক্ষেপ দৃঢ়তর করে

মুষ্টিভিক্ষা নয়, তারা
বজ্রমুষ্টি নিয়ে
পার হবে সব রাস্তা
স্তব্ধ এই ঝড়ে!

সকল সমস্যা সম্পর্কে স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে আপনি কি ভাবছেন?

—সমস্যা চারিদিকে। বাগনানেও সেচ, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতির অনেক সমস্যা আছে। একটি দিনের একটি কলমের খোঁচায় এত সমস্যার সমাধান হবে না এ-ও জানা কথা। তবু চেষ্টা করতে হবে, যতটা পারা যায়। রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ আজ যুক্তফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই সত্যকে তো ভুলে গেলে চলবে না!

দেখা হয়েছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের দুই সদস্য শ্রীকলিমুদ্দিন শামস এবং শ্রীকালীপদ মণ্ডলের সঙ্গে। একজন কলকাতার কবিতীর্থ এবং অন্যজন হাওড়ার উলুবেড়িয়া (উত্তর) কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত। শ্রীশামসের জন্ম গয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রামে হলেও তিনি মানুষ হয়েছেন কলকাতায়। এম-এ পাশ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। কলকাতা বন্দরের একজন শ্রমিক-সর্দারের ছেলে হিসাবে তিনি বন্দর এলাকায় বিশেষ জনপ্রিয় ব্যক্তি। ১৯৬৫ সালে দীর্ঘ বাইশ বছর স্থায়ী কংগ্রেস কাউন্সিলরকে হারিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। খিদিরপুর উর্দু স্কুলের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতা খিলাফত কমিটি, ইসলামিয়া হাসপাতাল এবং সামাজিক-ধর্মীয় সংগঠনের (Socio-Religious Organisation) সঙ্গে তিনি গভীরভাবে সংযুক্ত। মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী স্থানীয় 'রাজা' শ্রীসত্যনারায়ণ ঘোষালকে পরাজিত করে কবিতীর্থ কেন্দ্র থেকে তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীশামসের বয়স ত্রিশ বছর এবং বিধানসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

আর একজন শ্রীকালীপদ মণ্ডল। উত্তর উলুবেড়িয়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৬৭ সালের উপনির্বাচনেও। শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার সেবার উত্তর উলুবেড়িয়া এবং বাগদা দুটি কেন্দ্র থেকেই জয়লাভ করেছিলেন। ফলে একটি কেন্দ্র তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তাই উলুবেড়িয়ায় উপনির্বাচন (Bi-election) হয়েছিলো। এই উপনির্বাচনেই শ্রীমণ্ডল জয়লাভ করে বিধানসভায় আসেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবার সেই উলুবেড়িয়া কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীগোবিন্দ সিংকে প্রায় ষোলো হাজার

শ্রীকলিমুদ্দিন শামস

ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিধানসভায় এলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের সংস্পর্শে এসেছিলেন ছাত্র অবস্থাতেই। বাসুদেবপুর হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন। স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে (কলকাতা) আই-এ পড়তে শুরু করেন। আই-এ পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজেই বি-এ পড়লেন। কিন্তু পাশ করলেন External ছাত্র হিসেবে। বাংলা সাহিত্যে অনার্স পেলেন ১৯৬৫ সালে। শিক্ষকজীবন শুরু হয়েছে এরও অনেক আগে—১৯৫২ সালে। সেই থেকে আজও শ্রীমণ্ডল রঘুদেববাটি সাধারণের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পঞ্চায়েত, কিছু লাইব্রেরী এবং ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গেও তিনি সংযুক্ত। শিক্ষা-জগতের সঙ্গে শ্রীমণ্ডলের দীর্ঘকালের সম্পর্ক। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার মান দশম হবে কি দ্বাদশ হবে এ সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন আলোচনা চলে আসছে। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বললেন,

—শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে। বলা যেতে পারে আমরা এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে যেতে পারি নি। মাধ্যমিক শিক্ষাকে একাদশ মান পর্যন্ত উন্নীত করাও এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অঙ্গ। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থায় পরিকল্পনানুযায়ী যে সুফল প্রত্যাশা করা হয়েছিলো তা হয় নি। বরং নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সব দেখে অনেকের মতো আমারও মনে হয়, সেই পুরনো ব্যবস্থাই ছিল ভাল।

কথা উঠেছিল নানা দলের নানা মত-সমন্বিত যুক্তফ্রন্টের ঐক্য সম্পর্কেও। অনেকেই এ ব্যাপারে এখনো সন্দেহ পোষণ করেন। শ্রীমণ্ডল বললেন:

—ঐক্য বজায় না রাখতে পারলে সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই যুক্তফ্রন্টের প্রতিটি শরিক দলের এমন কিছু করা কখনোই ঠিক হবে না যাতে এই ঐক্যে ফাটল ধরতে পারে।

—প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নির্বাচনের আগেই প্রচার করেছিলো যুক্তফ্রন্টের নানা দলের নানা মতের মধ্যে সংহতি সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ মেলে নি যে তা অসম্ভব। ওইসব প্রতিক্রিয়া-চক্র আমাদের বিনা বাধায় পথ খুলে দেবে না। কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করে যুক্তফ্রন্টকে এগিয়ে যেতেই হবে।—বললেন শ্রীকলিমুদ্দিন শামস।

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তেরো ॥

দেখা হতেই রতনলাল বলে, আইয়ে আইয়ে জী।

বলে আর হাত জোড় করে থাকে।

ওকে বিনয়ের অবতার বলে মনে হয়।

মুখে কাচুমাচু ভাব। সঙ্গে একটা বিগলিত ভাব হাসির। কপালে চন্দনের ফোঁটাটি কি দেবতার তিলকের মত অক্ষয়? রতনলাল আছে, তার তিলকের ফোঁটা নেই, এমন হতেই পারে না। যখন যেখানেই দেখা হোক, রতনলাল আছে, তার তিলকের ফোঁটা আছে। আর আছে তার নিজস্ব ট্রেড মার্কের হাসিটি।

রতনলাল খাঁ। উত্তরপ্রদেশের লোক। বাপ-দাদার কেউ পল্টনে চাকরি করত। সেই চাকরিসূত্রে বাংলাদেশে আসা। বাংলার উত্তর সীমান্ত-ডুয়ার্সে।

ইস্টার্ন ডুয়ার্সে নানা জায়গায় তার ব্যবসা আছে জানি। কী সেই ব্যবসা তা জানি না। জনরব অনেককিছুই তার নামে। কেউ বলে ডুয়ার্সে আসলে তার গালা মালের ব্যবসা নেই। ব্যবসা যা আছে তা হচ্ছে সোনার চোরাকারবার।

চোরাই কারবারের ব্যবসা একালে খুব ফলাও। সারা দেশটাই ভুগছে চোরাই কারবারের ব্যাধিতে। ডুয়ার্সেও নেই কে বলবে? সীমান্তের পথে পথে এক বিশেষ ভূমিকা আছে এ-ব্যাপারে। সরকার অবশ্য খুবই সতর্ক। তবু তাদের চোখ এড়িয়ে গোপনে চলে কারবার।

রতনলাল এমনিতে খুবই সিধে ও সরল লোক। বাড়ির কাছেই গদি। গদিতে চার-পাঁচজন লোক খাটে। সর্বক্ষণ ব্যস্ত। কাঠের মস্ত এক হাতবাক্সের সামনে গদিতে বসে থাকে রতনলাল।

দেখা হতেই হাত জোড় করে বলে ওঠে, আইয়ে আইয়ে জী।

এটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। বাকি সব কথা বলে সে বাংলাতে। অনেককাল আছে বাংলাদেশে। জন্ম হয়েছিল তেজপুরে। সে ঘোর ইংরাজ আমলে। বাপের কথা তার মনেও নেই তত। সাবালক হতে এক আত্মীয়ের সঙ্গে এসেছিল দলসিংপাড়া বেড়াতে। প্রথম যৌবনের কথা। কিছুদিন ব্যবসা করেছিল কমলালেবুর। তারপর নতুন ব্যবসায়।

এ-সব বহুবার শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে।

হাতে কাজ কম থাকলে কখনো-সখনো তার দোকানে উঁকি দিয়ে যাই।

কি খবর রতনলালজী? ব্যবসা চলছে কেমন?

রতনলাল বলে, আর ব্যবসা!

একটু যেন হতাশ গলাতেই বলে। তারপর আবার বলে, চলছে একরকম আপনাদের দশজনের আশীর্বাদে।

রতনলাল অবশ্য ঠিকই বলে। দশজনেরই যদি আশীর্বাদ না হবে, তবে আর আশীর্বাদ কার হবার কথা। সে-যুগে আশীর্বাদের অধিকারী ছিলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা। লোকে তাঁদের মান্যগণ্য করত। তাঁদের পায়ে মাথা ঠেকাত। সেই গৌরবে খড়ম পায়ে খট-খটিয়ে চলতেন ব্রাহ্মণেরা।

সে-যুগ হয়েছে বাসি। এ-যুগে ব্রাহ্মণদের আর কৌলীন্য নেই। যুগটাই যে ঘোরতর বৈশ্যযুগ। এ-যুগে যাঁদের টাকা আছে তাঁরাই ধনে-মানে কুলীন। তাঁরাই সকলকে রাখেন। রতনলালের ব্যবসা চলেছে টাকাওয়ালাদেরই দৌলতে। গণতন্ত্রের যুগ এটা। তাই সর্বসাধারণের মন রাখতেই হয়।

রতনলালকে বলি, দশজনের আশীর্বাদে তো ভালোই চলছে মনে হয়।

রতনলাল বলে, নাঃ, ব্যবসা করে আর সুখ নেই। ব্যবসা উঠল দেশ থেকে।

সে কী কথা। ব্যবসা উঠবে কেন?

অকৃপণ বিস্ময়ে রতনলালের দিকে তাকাই।

কিন্তু রতনলাল দমে না। বলে, দেশকাল বাবুজী ইংরাজ আমলেই ভাল ছিল। আসলে কি না ওরা ছিল রাজার জাত। রাজ্যশাসন করতে জানত। কোন্ জিনিষটার অভাব ছিল বলুন তো?

এই পর্যন্ত বলে একটু থামে। তারপর বাকিটুকু শেষ করে থেমে-থেমে, এই যে দেখছেন চোরাকারবার, আরে সাত-জন্মে এ-সব ছিল কী। ছিল না। লোকের মধ্যে ভয়-ভিত ছিল যথেষ্ট। একালে সব লোপ পেয়েছে। সবাই নিজেকে একেকজন মহারাজাটাজা শ্রেণীর লোক মনে করে।

রতনলালকে আমি বলেছি, চোর-জোচ্চর সব দেশে সব কালে ছিল রতনলালজী। অর্থই মানুষকে নাশ করে। সমাজ রাষ্ট্র সচেতন হলে কি হবে, মানুষের মধ্যেই অন্যায় করবার লোভ চিরন্তন।

চুপ করে শুনেছে রতনলাল। প্রতিবাদ করে নি। আসলে প্রতিবাদ করা তার স্বভাবই নয়। মানুষকে সন্তুষ্ট রাখাই তার কাজ। সন্তুষ্ট রেখেই সে পয়সা উপার্জন করে। আর পয়সা উপার্জনের জন্যে দরকার বোধ করলে সে সর্বকিছু করতে প্রস্তুত।

দিনকতক কাজকর্ম বিশেষ নেই। শরীরটাও তত ভালো যাচ্ছে না। বুঝতে পারছি ডুয়ার্সের জলবায়ুই এর মূলে। একে তো পূর্ববাংলার জলে-হাওয়ায় মানুষ। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। এখানে আবার দুর্জয় শীতের আধিপত্য। আর সেই শীতে মাঝে-মাঝে মেঘ করে আসে। মাঝে-মাঝে শীতের আকাশে হঠাৎ বলা-কওয়া নেই, তেড়ে আসে বৃষ্টি। সেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্জয় পাহাড়ী শীতকে জাগিয়ে তোলে দুরন্ত হাওয়া। সারা দিনরাত

গাছে-পালায় ডালে-পাতায় দামাল বাতাসের হুটোপুটি।

কাজকর্ম না-থাকলে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ি। খবরের কাগজও আসে দেরি করে। কুচবিহারে আসে প্লেন। সেই প্লেনে কাগজ আসে কলকাতা থেকে। সেখান থেকে বেলা দেড়টার বাসে পৌঁছয় এখানে। ঘরের ভিতরে কাচের জানালা সেঁটে বসে বসে কাগজ পড়ি। দেশের নানা সমস্যা। বন্যা হয়ে গেল কিছুদিন আগে। দুরন্ত বন্যার তোড়ে দু'কূল প্লাবিত করে রাক্ষসীর মত এল তিস্তা। রাত দুপুরে ছলছল করছে ঘোলা জল। কালীর করাল জিহ্বার মত। একশ' বছর পূর্ণ হতে-না-হতে ভেসে গেল জলপাইগুড়ি শহর। ঘটা করে তখন শহর জলপাইগুড়ির শতবার্ষিকীর আয়োজন হচ্ছে।

বিকেলে রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে হয়ত রতনলালের সঙ্গে দেখা। মুখে নেই হাসি। বিনীত বশম্বদের ভূমিকা। আইয়ে আইয়ে জী।

রতনলালকে বাধিত করতে পারি না। বললাম, একটু ব্যস্ত আছি রতনলালজী।

রতনলাল বলে, দু' মিনিট বসে যান। আজকের খবরটা একটু শুনি। খবর শোনাতে বসলে দেরি হবেই স্যার। আর রতনলালের সেই পুরনো অভিযোগ, দেশের কিছু হচ্ছে না। ইংরাজ আমলেই অনেক ভালো ছিলাম এর চাইতে।

রতনলালকে বোঝান দায়। সে-না বোঝে ইতিহাস। না বোঝে রাষ্ট্রনীতি। সে সেই মরণকামড়ে এক নীতি ধরে আছে, স্বাধীনতাই দেশের কাল হল।

আচ্ছা রাজ্যপাল সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?

চন্দনের ফোঁটা চকচক করছে তার কপালে। মনে মনে ভাবি এই চন্দনের ফোঁটার আবিষ্কার হল কবে? কোথায় কার হাতে? চন্দনের আবিষ্কার যে মানুষেরই হাতে। তার টিপ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতার লক্ষণ। রতনলালও কি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতাকে বজায় রাখতেই ললাটে পরে চন্দনের ফোঁটা। কে জানে।

রাজ্যপাল লোকটিকে তো আমার ভালোই লাগে বাবুজী। আমার মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায় না-থেকে নিজেই নিবেদন করে তার মত। বলে, হাঁ লোক বটে। লাটের-গদিতে বসবার মত জবরদস্ত লোকই বটে। যেমন তাঁর চেহারা, তেমনি কাজে-কর্মেও—

রতনলালকে এ-সব বোঝাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। বলে, আসলে ব্যাপার হয়েছে কি জানেন?

কি?

আমার মনে হয়, সব ব্যাটারাই মন্ত্রী হতে চায়।

রতনলালকে রাগ করে বললাম, আপনি গদি দেখছেন রতনলালজী। গদিই দেখুন। এ-সব নিয়ে কেন মিথ্যা মাথা ঘামাচ্ছেন?

রতনলাল বলে অপ্রতিভমুখে, আরে ছি ছি, আপনি রাগ করলেন নাকি? বাবুজী, আমার ওপর রাগ রাখবেন না। আমি নিতান্তই বুদ্ধিবৃত্তিহীন বেকুব লোক। লেখাপড়া কি কোনদিন করেছি যে জানব এ-সব। একটু থেমে বলে, লেকিন, আমার দিল খুব আচ্ছা আছে। আপনাকে দেওতার মত ভক্তি করি বলেই মন খুলে দু'চারটে কথা বলি।

লজ্জিত হয়ে বলি, আরে না, না। রাগ করবো কেন?

রতনলালের বাড়িতে ছ'-সাতটা মুলতানী গাই আছে। তাদের সেবাযত্ন করবার জন্যেই আছে হিন্দুস্থানী তিনটে লোক। যখনই যাব দেখব তারা গরুর খিদমদ করছে। এই জিনিসটি আমার খুবই ভালো লাগে।

কিন্তু দুধ সে নিজে এক ফোঁটাও যদি কোনদিন খেয়েছে। তার অতিবড় শত্রুতেও এ অপবাদ তাঁকে কোনদিন দিতে পারবে কি-না সন্দেহ। বড় বড় টিনে বোঝাই দুধ তাঁর চালান হয়ে যায় গাড়িতে। শুনেছি, বাস-কন্ডাক্টরদের সাথে তাঁর গোপন যোগাযোগ আছে। দুধ তুলে দেয় এখানে। সেই দুধ চলে যায় হ্যামিল্টনগঞ্জের বাজারে। সেখানে নামিয়ে নেয় দুধের ক্রেতা।

আর বলবেন না বাবুজী। মহাদেওজীর কিরা। বলতে বলতে হাসে রতনলালজী। —গরুগুলি নিয়ে কী যে মুশকিলে পড়েছি।

দোকানে ক্রেতা বসে আছে সরল-প্রাণ মেচিয়া বা রাজবংশীদের কেউ কেউ। তারাও শোনে রতনলালজীর কথা। শুনে শুনে এ-সংবাদ অভ্যেস হয়ে গেছে তাদের। কিন্তু উচ্চবাচ্য করে না। কেবল নিঃশব্দে শুনে যায়।

রতনলাল বলে, গরুগুলি কিনে-ছিলাম অমুক বাগানের ম্যানেজার কিষণলালবাবুর কাছ থেকে। কি একটা কাজে যেন গিয়েছিলাম। সেখানেই শুনলাম তিনি গরু বিক্রি করে দিচ্ছেন।

কেন, গরু বিক্রি করে দিচ্ছেন কেন?

শুনলাম কিষণলালবাবুর তবিয়ৎ কিছু খারাপ হতে তিনি চলার না কোথায় যাচ্ছেন। তাই চোখ-মুখ বুজে কিনেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত।

ভালোই তো করেছেন।

না, বাবুজী। বড় ঝকমারি আছে।

ঝকমারি। কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে বলি, কেন ঝকমারি কিসের?

ঝকমারি না? হাজার হোক গরু হচ্ছে গিয়ে গোমাতা। মাতার সেবা করতেই হয়।

শ্রদ্ধা-ভক্তি আর পাণ্ডিত্যের এমন সঙ্গম খুব কমই হয়। রতনলালের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। ডুয়ার্সে আসার পর থেকে এ-পর্যন্ত কত মানুষ দেখলাম। রতনলালও তাদেরই মধ্যে একজন। বয়স মোটামুটি হয়েছে বলা যায়। তাছাড়া ভদ্র আর বিনয়ীও। এইসব মহৎ গুণ-গুলি আজকাল মানুষের মধ্যে মেলে না বললেই চলে।

রতনলালজীকে অনেকেই চেনে। অনেককেই কিন্তু উল্টো কথা বলতে শুনি। বলে, শালা হাড়কঞ্জুস। ওর তলে-তলে বজ্জাতি।

কিন্তু সে-রকম তো কিছু দেখি না।

অপেক্ষা করুন, দেখবেন।

কেউ বলে, জানেন ওর চরিত্র? নিজের তো ছেলেপুলে বলতে কিছু নেই। গিয়েছিল কোন্ সৎভাইয়ের ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে এথেলবাড়ির ওদিকে। তো মিলেসে কি-না শেষ পর্যন্ত নিজেই ওকে বিয়ে করে নিয়ে এল?

মনে-মনে বলি, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম। পুরাণে কত ঋষিরই তো আছে চিত্ত-বিভ্রমের কথা। পুত্রের স্কন্ধে জরাভার চাপিয়ে নিজে যৌবনসুখের সদ্ব্যবহার করেছেন ইতিহাসে তা-ও তো দেখেছি। আর এই সংসারেরই কোন মানবী যদি আশিবৎসরে ঘায়েল করে থাকে কোন ব্যক্তিকে এবং সে-ব্যক্তি যদি তার পাণি-পীড়নে প্রস্তুত থাকেন তাহলে তো কোন বাধাই থাকে না। তাছাড়া, কে-না জানে যে যুবতীর মন সহস্রবর্ষেরই সাধনার ধন? তাহলে এই রতনলাল-জীরই বা একা অপরাধ হবে কেন?

অবশ্য এ-সব কথা কখনো আলোচিতব্য নয় জেনেই চুপ করে থাকতে হয়।

রতনলালজী বলে, দুনিয়াই বেইমান হয়ে গিয়েছে বাবুজী। লজ্জাসরম কিছু নেই। ধর্মই যদি গেল তাহলে আর কি থাকলে?

ধর্ম কথাটার চল এখনো ডুয়ার্সে খুব শুনতে পাই। যেন দুনিয়ার সব ধার্মিক যুক্তি করে এখানে এসে জুটেছে। ডুয়ার্সকে মুক্তি দিতে। ডুয়ার্স অনেক-কাল অরণ্য-শিবিরে বন্দী ছিল কি না, তাই সভ্য জাতি তাকে প্রতি পদে পদে

শিক্ষিত করে তুলছে। আর এই প্রতিযোগিতায় নেমেছে সবাই যুক্তি করে। মুখে রাম নাম, অঙ্গে নামাবলী। মিষ্টি মিষ্টি কথা। আমি এক বৃদ্ধকে চিনি, যিনি যুবককে বলেছেন, বাবা, তাকে জানো? যাঁকে জানলে আর কিছুই বাকি থাকে না। যিনি বলছিলেন, তাঁর হাতও কিন্তু একান্তমনে গোবিন্দধ্যান করছিল না, উল্টে চা-বাগানের মালিককেই কচলে কচলে নিবেদন করছিল, কিছু কন্ট্রাক্ট দাও। চাকরি দাও। নিদেনপক্ষে অমুককে বলে দাও।

তাঁর দোষ কী। ঈশ্বর নিতুই নানারূপে দেখা দেন। একালে তাঁর আবির্ভাব মালিকরূপে। কৃষ্ণের সেই বাঁশীই বাজে। তবে কি না অন্যরূপে। কলকারখানার সিটিতে। আর কেউ যদি সাধকের মাহিমা নিয়ে তাঁর চরণতলে দেখা দেন যুক্তকরে, আর বলেন, হে দেবতা, করুণা কর। তবে সে দেবতার ধর্মই তো তাকে রক্ষা করা।

এইভাবে ধর্মযাজক রক্ষা করছেন তাঁর আশ্রিতকে। ম্যানেজার কুলির প্রতি ধর্মরক্ষা করছেন তাকে নিয়মিত পিপা-পিপা মদ খাইয়ে। এইভাবে ভণ্ড অকর্মার ধাড়ীরা সব দেশের নামে, দশের নামে, জাতির দুঃখ-বেদনা ঘোচাবার নামে ডুয়ার্সের যত্রতত্র বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। রতনলালও সেই ধর্মের কথাই বলে।

ছেলেরা গিয়েছিল রতনলালজীর কাছে। কি জন্যে? না, কিছু চাঁদা চাই। চাঁদা এই জন্যে যে তারা এ অঞ্চলে একটা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে চায়। লাইব্রেরীর জন্যে অনেক টাকা দরকার। তাই সকলকেই কিছু কিছু সাহায্য করতে হবে বৈকি।

রতনলাল হাতজোড় করে, আমাকে বাদ দাও। দীন-দরিদ্র মানুষ আমি। চাঁদা দিতে গেলে তো কিছু পয়সার দরকার। দোকানে বিক্রি-বাটা কিছু নেই।

ছেলেরা বলে, উঁহু এসব শুনব না। আমরা জানি আপনার হাজার টাকা দেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু আমরা তো তা চাই না। আমরা চাই সকলেরই সেবায় সাহায্যে এখানকার লাইব্রেরী তৈরি হোক।

লাইব্রেরী কি তাই হয়তো জানে না রতনলাল। তার সাতপুরুষে শোনে নি লাইব্রেরীর কথা। তাছাড়া এখানে এসেছে সে পয়সা কামাতে। পয়সা খসাতে নয়। ছেলেদের চোখ রাঙানিতেই সেখান থেকে খসিয়ে দিতে পারে না।

ছেলেরাও নাছোড়বান্দা। অবশেষে রঙ্গমঞ্চে নাটকীয় প্রস্থান ছেলেদের। মুখ থমথম করছে বেদনায় ও অপমানে। বুকিবা ঝড় ওঠে। কিন্ত দেখা গেল ঝড়ও ওঠে নি, কিছুই না।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা উঠে দেখি, প্রিজনভ্যান দাঁড়িয়ে আছে রতনলালের বাড়িতে। বাড়িতে মানে বাড়ির বারদরজায়। তারপর কোমরে দাড় বেঁধে একটু পরেই দেখলাম নিয়ে যাচ্ছে রতনলালকে। রতনলালের মুখে মৃদু মৃদু হাসি। কপালে সেই চন্দনের ফোঁটা। শোনা গেল, রাত্রি দুপুরে ছেলেরা ঘেরাও করেছিল রতনলালজীর গালা মালের ট্রাক। কি করে জেনেছিল তারাই জানে। তারাই পুলিশ ডেকে আনে। অবশেষে পাওয়া গেল চোরাই গাঁজা ও আফিম। ট্রাকেরই একটি কোণে। গাড়িটা নিয়ে গেছে পুলিশ আগেই। এইবারে তাঁর জন্যে প্রিজনভ্যানের আগমন।

॥ ক্যাম্প ॥

অন্ধকার রাত্রে মাইক বাজছে।

আকাশে অবশ্য অন্ধকার নয়। মিলিত নক্ষত্রসভার অধিবেশন বসেছে ওখানে। হাজার তারার মিছিল। লক্ষ লক্ষ। কোথায় সপ্তর্ষিলোক? কতদূরে ধ্যানে বসেছেন কালপুরুষ আজ রাত্রে?

ওই দিকে জ্বলে শুকতারা। অন্যমনস্কভাবে তাকাচ্ছি।

তারাগুলি থেকে একটি হঠাৎ খসে পড়ল। মুহূর্তে নীল হয়ে গেছে আকাশের একটি অংশ। দ্রুত নীল আলোর ঝিলিক ছড়িয়ে নিচের দিকে পড়তে লাগল। মনে মনে ভাবি, এই মুহূর্তে আমি যেমন চমকে উঠেছি, উত্তরের বনাঞ্চলে বিচরণরত শত শত জীবজন্তুও তেমনি দেখে নি কি এই নীল আলো? বনের গভীরে ঘন পত্রচ্ছায়ার আড়ালে যারা আছে, তাদের হয়ত চোখে না-ও পড়তে পারে।

কিন্তু কে বলতে পারে দেখে নি রাজাভাতখাওয়া রিজার্ভ ফরেস্টের শালবনের অন্ধকারে ঘেরা কোন কৃষ্ণবর্ণ লোমশ ভাল্লুক ওই দৃশ্য? কে বলতে পারে চুনাইখোরার জল-খেতে-আসা কোন হরিণ ও তার শাবক ওই দৃশ্য দেখে চমকে ছুট দেয় নি আজ রাতে? সংকোশের তীরে নরম ঘাসের গালিচার সমুদ্রে যে গন্ডারশাবক এই মুহূর্তে, সেও হয়ত সচমকে দেখেছে এক পলকের ওই নীল আলোর ছটা। আমি জানি, আজ রাত্রে জলঢাকার পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামে ঘুমন্ত মানুষের চৌহদ্দিতে শিকার সন্ধানে বেরোন বাঘের চোখেও হয়ত বিস্ময়ের ফুলকি জ্বলেছে ওই তির্যক আলোর ছটায়। আমি কল্পনা করতে পারি, পায়ের তলায় নরম পাউডারের মত ধুলো। নদী তীরবর্তী ছোট একটা জংলী ফুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাঘ ওই দৃশ্য দেখল। রাগে গোঁ-গোঁ করছে। লেজের মোচড় দিল একটুখানি। অসংখ্য জোনাকী জ্বলছে। চারধারে বুনো ধুতরো-ক্ষেতের মাঝখানে একটু আগে একদল শেয়াল ডেকে ওঠে নিঃশব্দতায় স্তব্ধ হয়ে গেল। এখন কান পাতলে অনেক দূরে শোনা যাবে নদীজলের শব্দ। আর ফেউয়ের করুণ ডাক।

আমি শুনেছিলাম আসলে ফেউ বলে কোন প্রাণী নেই। অথচ ছোটবেলা থেকে শুনেছি বাঘের-পিছনেই থাকে ফেউ। করুণ সুরে ডেকে ডেকে চলে। আমার স্বপ্নে মনে আসে ছোটবেলা। নদীর ওপারে এসেছে বাঘ। ডাকবাংলোর ওদিকে। বড় বড় কালোজাম গাছের ছায়া পেরিয়ে পায়েচলা পথ চলে গেছে গ্রামের দিকে। মাঠমাঠালি ঘাস। পানের বোড়ো। ওইদিকে এসেছে বাঘ। নিয়ে গেছে এক বুড়িকে। বুড়ির আদ্দেকটা খেয়েছে বাঘে। রক্তমাখা লাস পাওয়া গেছে বাঁশবনের ওখানে। হোগলা ক্ষেতের ধারে। ভয়ে বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। পাঁচ-ছ' বছরের শিশু মা-র কোলের কাছটিতে শুয়ে শুয়ে শোনে, ফেউ ডাকছে। মা-ই বলেন, ওই যে শোন্ ফেউ ডাকছে।

সেই থেকে রক্তের সঙ্গে মাখা হয়ে গেছে ফেউ। বাঘের পিছনে ফেউ ডাকে।

তারপরও এক যুগের কথা। বড় হয়ে ডুয়ার্সে এসে শুনলাম সত্যি সত্যি ফেউয়ের ডাক। কাঠের উঁচু বাংলোর নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বসে শুনি ফেউ ডাকে।

মামা বলেছিলেন, নিশ্চয় বাঘ বেরিয়েছে।

বাঘ? ভয়ে চোখ গোল-গোল করে শুধিয়েছিলাম।

মামা অনেকদিন আছেন ডুয়ার্সে। বলেছিলেন, শোন্ হতভাগা। কান পেতে ওই শোন্। নিশ্চয় বাঘ এসেছে।

বাইরে ঘন গাছ পাতালভাব অরণ্য। বাংলোগুলি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানেও ছিল অরণ্য। তার সাক্ষী দিতে দূরে-দূরে কিছু গাছ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আদিকালের গাছ। কে জানে এইসব অঞ্চলেও হয়ত বাঘ, বুনো হাতী, ভয়াল গন্ডার, হিংস্র ভাল্লুক আসত। আজ সরকারী বনবিভাগের কল্যাণে জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে অনেক। অরণ্য পালিয়ে গেছে পায়-পায়। খানিকটা

সর্দিও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৪

তফাতে চলে গিয়েও উঁকি মেরে দেখছে। চলে যায় নি একেবারে। মামাবাবুর কথায় কান পেতে শুনেছিলাম ফেউ-এর চিকণ ডাক। বুকের রক্তে তুফান বইছিল। নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি নিজেই শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে, বাঘটা যদি এক্ষণি এখানে চলে আসে। ওই যে দরজা বন্ধ আছে ঘরের। মোটা কাঠের খিল ভেঙে ভিতরে আসতে এক মুহূর্তের বেশিও লাগবে না।

শাল কাঠের তক্তার শক্ত ঘর। যতটা সম্ভব মাটি থেকে উপরে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। মামাবাবু ছিলেন বন-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁরই সরকারী বাংলো। প্রায় ছাব্বিশ বছর আছেন ডুয়ার্সে। মনকে বোঝাচ্ছিলাম, ভয় কী। ওই যে মামাবাবু বসে বসে টেবিল লাইটের আলোয় একখানা মোটা ইংরাজী বই পড়ছেন।

তাঁর দামী রাইফেল আছে। হাতের ট্রিগারও অব্যর্থ। লাইটের কেরোসিনের পোড়া-পোড়া একটা গন্ধ। ভাবলে এখনো যেন ভয় পাই। পরে কিছু বড় হতে জেনেছিলাম। বনবিভাগেরই বুড়ো কর্মচারী মুকুন্দবাবুর কাছে। রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের উঁচু চত্বরের উপরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমার ধারণাটা ভুল খোকা। মামাবাবুর কাছেও কি কোনদিন শোন নি ফেউ বলে কোন প্রাণী নেই?

তাহলে? আমি অবাক হয়েছিলাম।

মুকুন্দবাবু তাঁর দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। বললেন, ওটা খেঁকশিয়ালি। অনেক সময় বাঘের শরীরের গন্ধে ভয় পেয়ে অমনি করে ডাকে।

অন্ধকার রাতে মাইক বাজছে।

পুরাণে অনেক অসুরের কথা আছে। মনে হয়, মাইক সেই নতুনকালের অসুর। মাইকাসুর।

রাত্রির সমস্ত আকাশ সমস্ত অন্ধকার মথিত করে সেই অসুরের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কে জানে কোন্ বিয়েবাড়িতে। অথবা নতুনকালের উৎসবে। একালের উৎসবের রূপ হয়েছে পরিবর্তিত। সেকালের উৎসবে অংশ নিতে আসত মানুষ সচেতন প্রাণের তাগিদে। আনন্দের উল্লাসে। সকলের সাথে মিলিত হয়ে সে হত খুশি। শত-ধারে হত ভাব বিনিময়। তার রূপটি ছিল কল্যাণের। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। পুরোহিত দেবমন্দিরে। পট্টবস্ত্র পরেছেন। চন্দন-চর্চিত ললাট। মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে। বাজি পুড়ছে, হাউই উঠে যাচ্ছে আকাশে। দলে দলে মানুষ। বালক-বৃদ্ধ শিশু-যুবা, নারী ও পুরুষ।

একালের উৎসবে মানুষের আর আগের মত সাড়া নেই। দায়ী তার জন্যে নতুন যুগ। অর্থনীতি। নতুনকালের সমাজ ও তার ব্যবস্থা। মানুষের সময় এবং সুযোগেরও ঘটেছে অদ্ভুত পরিবর্তন। তাই ইচ্ছে থাকলেও উৎসবে মিলতে পারে না মানুষ। আবার অনিচ্ছুকও থাকে। মাইক বর্তমানকালে সেই অনিচ্ছুককে জোর করে জানাবার যন্ত্র। কিন্তু তার আকর্ষণ আলাদা। হৃদয় ধরে টানার পরিবর্তে একেবারে কান ধরে টানে মাইক। কিন্তু কান টানলেও প্রাণ কিন্তু বিদ্রোহই করে থাকে।

অনেককে কিন্তু আদৌ বিরক্ত হতে দেখি না। তাঁদের মহাপুরুষ বলব। একই কথা এবং একই সুর হাজার বার জোর করে শোনাবার মধ্যে যদি বা বধির থাকে, শোনার মধ্যে কিন্তু সংযম কম নেই। কেউ কেউ দিব্য আনন্দে শোনেন।

আবার কেউ বা তার চাইতেও কয়েক ডিগ্রী উপরের। তাঁরা সে গান নিজে তো শোনেন-ই। অন্যকেও সচেতন করে দেন শুনিয়ে—বল দেখি কার গান? হয়ত গৃহিণী বলছেন পতিকে।

পতি কিঞ্চিৎ চিন্তিত ও বিচলিত মনে হল।

বল না?

কী?

কার গান হচ্ছে? পুনরাপি হয়ত প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

ও মাই গড! পতি পরম দুঃখে বোধ করি বেদনার প্রখরতা অনুভব করতেই নিজের মাথার টাকে হাত রাখলেন। চোখ বুজে বুজে বললেন, তুমি ওই গানের কথা বলছ? গান না বলে বল মেশিনগান? আমি বরং তোপের গোলা বুকে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু ওকে যদি গান বল—

ভাগ্যিস চোখ খোলেন নি পতিদেবতা। তাই কথাগুলি কিছুদূর পর্যন্ত শেষ করতে পারলেন। নইলে বিংশ শতাব্দীর সতীরমণীর চোখের আগুনে নির্ঘাত ভস্ম হয়ে যেতেন।

এবারে সহধর্মিণীর বিলাপের পালা। তিনি একজন শিল্পীর নাম করে বললেন, ওঁর গানকে বলছ মেশিনগান!

পুরাণে পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করেছিলেন সতী। একালের সতীরাও সব কিছু সহ্য করতে পারেন। কিন্তু প্রিয় শিল্পীর অবমাননা সহ্য হয় না।

অতঃপর বিরহ-বিচ্ছেদ-হাহাকার বেদনা। চাই কি রন্ধনগৃহের সঙ্গে অসহযোগিতাও। এবং পুরুষের পক্ষে সেইটে মোক্ষম অস্ত্র। মহাত্মাজী কি ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই পেয়েছিলেন তাঁর বিপ্লবীজীবনের এই মোক্ষম অস্ত্রটি?

কিন্তু সে যাই হোক, বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির মধ্যে যন্ত্র হিসাবে মাইক যত ছোটই হোক না কেন, ডুয়ার্সে তার আধিপত্যই যেন কিছু বেশি দেখছি একালে। বিবাহ-অন্নপ্রাশন-উপনয়ন-দোল-দুর্গোৎসব-কালী পুজো সরস্বতী পুজো তো আছেই। দিবা-দ্বিপ্রহরে সহসা শুনবেন মাইকাসুরের এক বিশিষ্ট ভক্ত চেলা আপনাকে বন্ধু সম্বোধনে আপ্যায়িত করে জানাচ্ছেন, কোথায় নাকি ফালাকাটা না বীরপাড়ার বাজারে এক ভদ্রলোক ধোলাই লন্ড্রী খুলেছেন, যাতে সকল প্রকার শাল-দোশালা সূতি-পশমি ধুতি-শাড়ি কোট-প্যান্ট ইত্যাদি উত্তমরূপে ধৌত করা হয়। সেই ডুয়ার্সের এক অসামান্য সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষা দ্বারা-বাধিত করবার অকৃত্রিম ও আন্তরিক আহবানে আপনার সারা সপ্তাহের একটি মাত্র রবিবারের দিবানিদ্রাটি বিধ্বস্ত হল। জানি না, এরপরও নিজের ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে গিয়ে তাঁকে বাধিত করবার ইচ্ছে আপনার থাকবে কি না।

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, এতদ্দ্বারা আপনাদের জ্ঞাতকারণে জানান যাইতেছে, আগামী বৃহস্পতিবারে আমাদের ফুটবল টুর্নামেন্টের অমুক খেলাটি—ব্যস, এই পর্যন্ত। তারপর আর আপনার শোনার সৌভাগ্য হল না। মাইকাসুর হঠাৎ অপ্রয়োজনে হয়ত কথা-মধ্যেই গর্জন করে উঠেছে।

যন্ত্রে গাঁ-গাঁ আওয়াজ হচ্ছে।

বন্ধুগণ, আজ সন্ধ্যায় জনসভা—

বন্ধুগণ, আপনারা বিপ্লবের জন্য তৈয়ার থাকুন।

বন্ধুগণ, নির্বাচনে কাউকে ভোট দেবেন কেন?

বন্ধুগণ, আপনাদের প্রিয় প্রেক্ষাগৃহে দেখুন—মোটা গলা গমগম করছে। শুধু কি কণ্ঠধ্বনিই? সেই সঙ্গে বক্তাব ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না প্রভৃতি যাবতীয় নাড়ী ও অন্ত্র সকলের শ্লেষ্মা-ঘড়ঘড়ও কানে আসছে। অহো কি উপাদেয়! আপনাদের প্রিয় নায়কগণ মহানায়ক প্রভৃতিকে যুগলে দেখতে পাবেন—

নিন, অর্থ ধরতে পারছেন তো? এক ডায়ালগেই বিলক্ষণ ফল—মস্তিষ্কের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি। একালের ভাষায় যাকে বলে, ছয়ে যাওয়া। আপনার মস্তিষ্কেব অলিতে-গলিতে যেসকল সূক্ষ্ম শিরা ও উপশিরা-

মাসিক ১০, টাকায় কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল

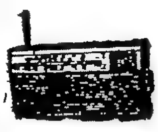

স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা হিন্দীতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies

(B. C.) P.B. 2123, Delhi–7

পড়ে, তারা যদি রক্ত-মাংসের না হয়ে দিশি খাবারের মাল হত তাহলে হলফ করে বলতে পারি এর একশ' ভাগের একভাগ অত্যাচারও সইতে পারত না।

আসুন, আসুন, একটি চিকণ মেয়েলি গলা, আসুন ভগিনী ও দাদাগণ, আপনাদের আসিতে আহবান জানাই।

আমার বন্ধু সিদ্ধেশ্বর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষৌরি করছিল। তার গালে একটা সরু লাল দাগ ফুটে উঠল। বলল, যা গেল—

কি হল?

তোমাদের ওই ভগিনী ও দাদা-সম্ভাষণে যা হয়—

তাকিয়ে বলি, কেটে গেল?

আর বল কেন?

ততক্ষণ মাইক গর্জন করছে, ভগিনী ও দাদাগণ, নদীর পারে দি গ্রেট ভিক্টোরিয়ান সার্কাস আসিয়াছে—ভিক্টোরিয়ান সার্কাস।

হায়, মা ভিক্টোরিয়া তোমার দিন গিয়েছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত, তোমার ভিক্টোরিয়া-উদ্দেশে নিবেদিত সেই কবিতার কলিগুলি—তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু ইত্যাদি একালে নিতান্ত পরীক্ষা-প্রয়োজন ছাড়া কেউ পড়েও না। কিন্তু এই অজানা সার্কাস এখনো তোমার নাম রেখে চলেছে।

কালজানি নদীর ওপারে গিয়ে দেখে এলাম দি গ্রেট ভিক্টোরিয়া সার্কাসের ছেঁড়া তাঁবু উড়ছে বাতাসে। সামান্য আয়োজন। বাঘটাকে দেখে একদল ছেলে ছাগল বলে ঠাট্টা করছিল। না-খেতে পেয়ে জীর্ণশীর্ণ হয়েছে চেহারা। ম্যানেজারটি দেখলাম বাঙালী। বললাম, কেমন চলেছে?

কিছু না। কিছুমাত্র না। ভদ্রলোক হতাশভাবে হাসলেন। বললেন, আছেই বা কী। যা দেখবার জন্য লোক ভিড় করবে। শুধু ক'টি মেয়ের তারের খেলাগুলিই যা লোক আকর্ষণ করে।

এর মালিক কে?

আগে ছিল এক সাউথ ইণ্ডিয়ান। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে আলাদা হ'ল। সার্কাসও গেল সেই সঙ্গে। আমি জলের দরে কিনে নিলাম শেষ পর্যন্ত। সার্কাসই দেখে না লোক একালে। তারপর ত' এই হাল।

ভদ্রলোক করুণ গলায় বললেন, বয়স হয়ে গেছে। কীই বা করব।, তাই দলটি নিয়ে ঘুরে বেড়াই ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলির হাটে-হটে।

ওরা দেখে?

দেখে বলেই তো আছি। ভদ্রলোক তাঁর ঢলঢলে প্যাণ্টটা কোমরে টেনে তুললেন।

ওদিকে তখন আবার একটি হিন্দী-গান বেজে উঠেছে।

মাইক।

বললাম, ক'টায় আরম্ভ?

দুপুরে শো দিয়েছিলাম। লোক হয় নি। তাই পিছোতে-পিছোতে দেরি হয়ে গেল।

এখন মাইক বাজছে?

ভদ্রলোক ব্যস্ত। ম্লান হেসে একদিকে এগিয়ে গেলেন।

একটি ছোকরা ঠাট্টা করে উঠল, যতক্ষণ লোক না-জমে ওই মাইকের গান চলাতেই থাকবে।

আরেকজন তার বন্ধুকে বলল, যাই বল, মেয়েগুলো তারের খেলা দেখায় ভালো।। আর ওদের মেজো মেয়েটাকে দেখলে তোর বাড়িই ফিরতে ইচ্ছে করবে না। এক ঝলক দুর্দান্ত হাসি। বলা বাহুল্য, কোরাস।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রাস্তায় শুনছি—। পুনরপি। রিক্সাবাহিত যন্ত্র গর্জন করছে। গাড়িটি দাঁড়িয়ে। একটি বছর বিশ-একুশের যুবক। ফুল-প্যাণ্ট হাফসার্ট। জামার উপরে সোয়েটার। বেশ নাটকীয় গলা, তবে কি না এই টিকিটখানাই আমি আপনাকে শুধু দিতে পারি। আর কিছুই দিতে পারি না। আপনার ভাগ্যই শুধু আপনাকে দিতে পারে। এবং সেজন্যে আপনাকেই চেষ্টা করতে হবে। কারণ চেষ্টারই আরেক নাম জীবন।

বহু মানুষ ভিড় করেছে। সবাই শুনছে গম্ভীর নাটকীয় গলা।

বন্ধুকে বললাম, এই ছেলেটি চেষ্টা করলে একজন কবি হ'তে পারত।

ডুয়ার্সে এমন কবি অনেক দেখতে পাবে।। বন্ধু মন্তব্য করলেন। আমি তোমাকে মাইকের একটি মজার গল্প বলতে পারি, যা তুমি কখনো শোন নি।

মুখের দিকে তাকাই। চোখ বড়ো-বড়ো দৃষ্টি। প্রত্যাশী।

শুনলাম সেই গল্প। পরীক্ষার হলে ছাত্রদের সাহায্য করছিল মাইক। স্কুল ফ্যাইনাল পরীক্ষা। সংস্কৃতের প্রশ্নপত্র পেতে ছাত্ররা মাথার চুল ছিঁড়ছিল। সহসা কোন বাড়িতে বেজে উঠল মাইক: লিখুন, লিখুন, ছাত্র ভাইসব, নবম প্রশ্নের উত্তর লিখুন। Translate it into Sanskrit. লিখুন—Cows are of different colours. লিখুন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্তব্ধ স্তম্ভিত পরীক্ষাহলের গার্ডদের চোখ ট্যারা হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে শব্দ ফুটছে না। জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়েছেন। টাক-পড়া হেডমাস্টার মশাই সেণ্টারের চার্জ অফিসার জুতোর নাল বাজিয়ে বারান্দায় ছুটোছুটি করছেন ব্যস্তভাবে। মাইক ওদিকে বেজেই চলেছে। ছাত্রদের হাতও প্রাণপণে চলেছে। কান মাইকের দিকে।

তারপর মাইক বন্ধ হল কি করে? অবাক হয়ে শুধিয়েছিলাম।

বন্ধুটি বললেন, সে এক ইতিহাস। পুলিশ এল। দারোগা পুলিশের ছুটোছুটি। সময় বুঝে মাইকও চুপ।

শুনে জোরে হেসে উঠলাম।

বন্ধু বললেন, শীগগিরই এমন দিন আসবে যেদিন মাইক ছাড়া আর কিছু থাকবে না। সেদিন নবদম্পতির বাসরঘরের শয্যাতেও থাকবে মাইক। কানাকানির জন্যে।

একটু থেমে বললেন, ভাবছি, ডুয়ার্সে যদি থাকতেই হয়, তবে মাইকের ব্যবসাই ধরে ফেলব।

রাত্রির অন্ধকারে বসে মাইক শুনছি। কিন্তু এ অন্য সুর, অন্য গান।

রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েছে রেকর্ডে। সুরের পাখায় ভর করে সে গান ছড়াচ্ছে দিগ্‌দিগন্তরে। তোমার মিলন লাগি আসছি আমি—

শুনতে শুনতে রোমাঞ্চ হয়। সারা দেহ অনাস্বাদিত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। অরণ্যের ঘুমের অন্ধকারে ছিল যে-দেশ, কে জানত তারও আকাশ আলোড়িত করে বাজবে রবীন্দ্রনাথের গান। মনে মনে মাইকের উপরে খুশি হয়ে উঠি।

১৯৬৯তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোষ্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ

ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কেন, কিসের জন্যে, পাশের বেঞ্চি থেকে একটা তীব্র, বন্য চাউনি অনেকক্ষণ তার দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাইছিলো। একটা অমানুষিক ক্ষুধিত দৃষ্টি, কপাল পর্যন্ত নেবে আসা উদ্দাম, উগ্র চুল, গায়ে চিটময়লা একটা খোকড়া, চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে লোকটা যেন আমাকে তুক করছিলো। আর আমিও চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে কেমন বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিলাম।

ঐ যে ছোট আখড়ার বামুনদি, পিঠ বেঁকে গেছে বয়সের ভারে, রাস্তার ওপর দিয়ে যেন শুয়ে শুয়ে হাঁটে, আমি ঠিক জানি বামুনদি এখন কোথায় চলেছে। বামুনদি চলেছে এই অবেলায় বাবাজীর খোঁজে, ওঁয়ার যে বালক স্বভাব। এই নব্বুই বছরেও সে স্বভাব গেলো নি। হয়তো কোথাও গানে, কথায় মত্ত হয়ে আছেন ঠাকুর, আমার হয়েছে বকমারি...বামুনদি চলেছে সেই জন্ম-বালককে খুঁজতে যখন নিজেরি হাঁটতে কষ্ট হয়। অথবা ঐ যে টিকিতে ফুল চড়িয়ে, ইঁদুরের মত সতর্ক, চতুর চোখ, বদ্রীদাস পাণ্ডে, সুদী কিস্তিওয়ালা, রূপোর ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে কোথায় চলেছে এখন?

না, আজুমানের লীডর লোক 'বংগট' আজবলালের সঙ্গে একটু বাতপুছ করতে। কাছে না 'মালিক কা যেইসা মেহেরবাণী' বলার দিন ফুরিয়েছে, যা জমানা পড়েছে, মজদুর আর মাগী লোক কখন যে কি করে বসে...

আর ঐ যে খোয়া-ভাঙা পথের ওপর থেবড়ে বসেছে রাধুয়া, হাতে রুপোর খাড়ু, ডোমেদের মেয়েটা, ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে বিড়ি টেনে চলেছে নির্বিকারভাবে, ওর এই উদাস উদাস ভাবটা গেল বলে, 'জে জে রাধা, জে জে কিষুণ' বলতে-বলতে দিনের ফেরি সেরে চানাওয়ালা ছবিলাল যেই আসবে। কাকে চিনি না, কাকে জানি না? কার মনের ভেতর যাই না? যেতে পারি না? কিংবা স্ফূর্তিবাজ হরিপদ, দোকানে বসে বসে সাইনবোর্ড যে লিখছে, প্রায়ই যাকে পায় তাকে শোনায়, 'আমরা, বুঝলে কি না, বিশ্বকম্মার বেটা, মেকানিক লোক, বুঝলে কি না, ভাতের পাতে মাছ না হলে আমরা মরা', সেই হরিপদ হঠাৎ গুম মেরে আছে কেন, এ সবই আমার জানা। কিন্তু এই অদ্ভুত লোকটা...ওর ওই উগ্র চোখ......এ লোকটা কে......এমন অচেনা দৃষ্টি...কে এ...

যাকে সকলে কাজ বলে সে রকম কোন কাজ ছিলো না আমার। তবে আমিও কিছু কাজ করতাম নিশ্চয় আর তার জন্যে মাঝে মাঝেই আমাকে জেলে যেতে হত। ভদ্দরলোকদের কেউ কেউ এমনও বলতো, 'জেলে যাওয়াটাই ওর কাজ।' রাস্তার ধারে আমার একটা ডেরা ছিলো। তার নাম লোকে দিয়েছিলো 'গর্ত'। ঐ গর্তটায় সকাল সন্ধ্যে বসে থাকতাম। দাগী আসামী

না হলেও পুলিশের ছিল আমার ওপর কড়া নজর। যেন আমি চোরাই মদ। সন্ধ্যের পর গর্ত থেকে উঠে বাজারে দুনিয়ালালের চা-খানায় চা খেতে আসতাম। আজো এসেছি। আর তারপর থেকে এই কান্ড।

পাশের সিনেমা হাউসে জোর খেলা 'প্রেম কা জ্বলন' হচ্ছে। দোকানে পিল পিল করে মানুষ ঢুকছে, বের হয়ে যাচ্ছে। ধোঁয়া আর গরম নিশ্বাসে দোকানের ভেতর একটা গুমোটের সৃষ্টি হয়েছে। অদূরে মহানিমগাছটার আড়ালে বজরংবলীর মন্দির থেকে ভেসে আসছে ঢুঢুম্ভে ঘন্টা-ধ্বনি। আরো দূরে ইয়ার্ডের মালগাড়ির সাংটিং-এর অসংখ্য শব্দ কানে ছুঁচ বিঁধে দিচ্ছে। ইঞ্জিনের তীব্র হুইশিল, জেটিতে মাল ওঠানাবার ঝনঝন শব্দ, একটানা কারখানা চলার একঘেয়ে, ঘড় ঘড় আওয়াজ সবই রেজকার মত ঠিক ঠিক চলছে। ঠান্ডা বাতাসের একটা ঝাপট মুখে এসে লাগলো আর আমি সবিস্ময়ে দেখলাম লোকটা দ্বিতীয় ভাঁড় চায়ে চুমুক দিচ্ছে আর তার দৃষ্টি আমার দিক থেকে একটুও সরাচ্ছে না।

এ কথা আমি না ভেবে পারলাম না এক ভাঁড় চা খাবার পর এ্যাতো কি তৃষ্ণা যে দ্বিতীয় ভাঁড় চা না হলে তা' মিটবে না? চায়ের সঙ্গে লোকটা অন্য কিছুই খা খাচ্ছে না কেন? কোন বিস্কুট বা হলদে মিষ্টি পাঁউরুটি অথবা ঘুগনি, যা এখানে পাওয়া যায়?

বেশ যেন মনে হল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলার মত গভীর, অস্পষ্ট কিছু যেন হতে চলেছে ঐইখানে, এই চা-খানায়, আর তারও বেশি দেরি নেই যেন, যখন সামনে বসে আছে এক ভিন্ন ধরণের জীবন্ত প্রাণী, আর জীবনের বিপরীত দেয়ালের কাছে আবদ্ধ কৌতূহল নিয়ে নিঃশব্দে বসে আছি আমি, ঘটনা যেন দ্রুত তার ভেল্কী দেখাবার জন্যে চেয়ার নিয়ে আমার মুখোমুখি বসতে চাইছে।

আমার দিক থেকে দৃষ্টি একটুও না সরিয়ে লোকটা তৃতীয় ভাঁড় চায়ে চুমুক দিলো। আর আমি সম্মোহিতের মত চেয়ে দেখলাম তার অমানুষিক, ক্ষুধিত দৃষ্টি, কপাল পর্যন্ত নেবে আসা উদ্দাম, বন্য চুল, গায়ে চিটময়লা একটা খোকড়া, লোকটা যেন আমাকে তুক করছে, লোকটা যেন...

আমি চারপাশে তাকালাম। অনেকেই ওকে দেখছে। ওর এই অদ্ভুত চা খাওয়া। চা-খানার মালিক দুনিয়ালালের সেই মুখ যা খোজা, হিজড়ে আর ভগবান সব ব্যাপারেই সমান বিশ্বাস সেই মুখে একটা নিশ্চিত দৈববাণী ফুটে উঠছে, যেন 'আমি জানতাম, এ সবই, শালা চারশো বিশ, ফোকটিয়া; শালা সব আমার দোকানে, দুনিয়ার জঞ্জাল'...

লোকটার এসব কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। ধীরে সুস্থে চা-টা শেষ করলো। তারপর ঝুঁকে-পড়া খাড়া নাকের দু'পাশ থেকে ক্ষুধার্ত খাতুর মত তীব্র চোখে আমার দিকে চেয়ে অসীম তাচ্ছিল্য নিয়ে ওপাশের বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লো। আমিও স্বপ্ন-চালিতের মত ওর পিছু পিছু আগিয়ে গেলাম। লোকটা ঘুরে আর একবার উগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার কর্তব্য স্থির করে নিলাম। আমি কোনদিকে না চেয়ে, না লোকটার দিকে না দুনিয়ালালের দিকে, না ঘর-ভর্তি লোকেদের দিকে তাকিয়ে সোজা দুনিয়ালালের হাতে তিন ভাঁড় চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে চা-খানার বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

লোকটা আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে, 'তাহলে তুমি দামটা দিয়ে দিলে, হেঃ হেঃ, এ আইরি বেয়াড়া রগড়'...

ওর কথা আমি শুনছিলাম না। ওর হাসিটা দেখছিলাম। ওর ওই হাসিই স্পষ্ট বলে দিচ্ছিলো আমার মত আহাম্মুখ ও জীবনে এর আগে কখনো দেখে নি।

দু-চারদিন পর 'গর্তে' বসে বসে কিছু একটা লিখছি একমনে, এমন সময় সটান রাস্তা থেকে, টায়ার-কাটা জুতো ঘসড়াতে ঘসড়াতে কে যেন ঢুকলো, 'ওহে মিস্টার?' শুনে কাগজ থেকে চোখ তুলে দেখি দুনিয়ালালের দোকানে দেখা সেই বিচিত্র লোকটা।

হেসে বললাম, 'কি ব্যাপার? চিনলে কি করে?'

'চিনে নিতে হয়, মিস্টার।' তারপর একটু থেমে হঠাৎ হুকুমের স্বরে, 'দেখি আঠারো পয়সা', বলে অসংকোচে হাতটা সামনে এগিয়ে দিলো।

লোকটাকে যতো দেখছি ততো অবাক হচ্ছি। ভিক্ষেই করছে লোকটা, কিন্তু এ কেমন ভিক্ষুক যে চোখ রাঙিয়ে রীতিমত হুকুম করে ভিক্ষে চায়? এ্যাতো জোর ওর আসে কোথা থেকে?

বললাম, 'আঠারো পয়সা কেন? বেশি নয় কেন?'

'আঠারো পয়সার বেশি নিয়ে কি করবো' যেন মহা ফাঁপরে পড়েছে, লোকটা মাথা চুলকোতে লাগলো, 'আমার দরকার একটা পাঁউরুটির পয়সা। সেটা পেয়ে গেলে আমি কোন শালার ধারধারি না।'

বলতে বলতে লোকটার চোখে এক অমানুষিক, দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টি ফুটে উঠলো। পয়সা ক'টা দিয়ে মনে হল এবার ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবার অধিকার আমার জন্মে গেছে।

বললাম, 'এ শহরে কি করে এলে?'

'এই ভাসতে ভাসতে।'

'তা' এই ভাসান খেলা কবে থেকে শুরু?'

'তা' কি মনে আছে মশাই? সেই ছোটকাল থেকেই হবে।'

'কেউ নেই আর?'

'কে আবার থাকবে?' লোকটা যেন মারতে এলো, তারপর মোলায়েম হেসে বলল, 'থাকার মধ্যে থাকছে এই পেটটা, শালার এই পেটটাকে নিয়ে যতো ঝামেলা।'

'নাম কি তোমার?'

'আরে আমি কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি নাকি যে এ্যাতো জেরা করছো? আচ্ছা লোক ত' তুমি?' ও রীতিমত বিরক্ত হল।

'নাম বলবো না।'

'বলোই না?'

'আরে, মহা ঝামেলায় পড়া গেল ত'। এ্যাতো জিজ্ঞেস করছো কেন আমায়?' আমি চুপ করে রইলাম। ও দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একটু ঝুঁকে বলল, 'আর কিছু জিজ্ঞেস করবে?'

'না। আমার সব জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে।'

এতে লোকটা খুশি হল এবং শিস দিতে দিতে চলে গেল রাস্তায়।

লোকটা ওর নাম বললো না বটে, কিন্তু দু'-চারদিন যেতে-না-যেতেই এ শহর ওর একটা নাম দিয়ে দিলো।

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

কে যে ওকে প্রথম 'লাট' বলে ডাকতে শুরু করলো সেটা জানা গেল না বটে, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলাম 'লাট' এই নামটা শহরের সকলের ঠোঁটে উঠে গেছে। যেন ও ভেসে আসা মানুষ নয়। যেন জন্মে ইস্তক ও এ শহরে আছে। ঐ চিটময়লা খোকড়া, বন্য, তীব্র চাউনি, কপালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া রুক্ষ, অবিন্যস্ত চুল আর মেজাজ।

'লাট' এই নামটা যেই দিক সে যে ওর মেজাজটা ঠিক পড়তে পেরেছে তাতে কোন সন্দেহ রইলো না।

লোকটাকেও দেখলাম নামটাকে খুব সহজেই মেনে নিতে। ওকে যতোটুকু জেনেছিলাম তাতে ধারণা হয়েছিলো হয়তো ওরকম একটা বেখাপ্পা নাম শুনে বৃষ্টির ফোঁটার মত ও খিস্তি ঝরিয়ে যাবে। কিন্তু সে সব ও কিছুই করলো না। যেন শান্ত হয়ে ওঠারই চেষ্টা করলো। নামটা যে ওরই বাপ-মায়ের দেওয়া ওর সাড়া দেবার ভঙ্গিতে এরকম একটা সপ্রতিভ ভাব ফুটে উঠলো।

ওকে প্রায়ই দেখতাম হাঁটু ভেঙে হাতের ভেতর মাথা গুঁজে আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকতে থাপিতে। আমার সংগে চোখাচোখি হলে আমি- হাসতাম। ও কিন্তু আমাকে চেনার কোন লক্ষণই দেখাতো না। আমার হাসির জবাবে ও নির্বিকারভাবে শূন্যে মুখটা তুলে এমনভাবে আমার দিকে তাকাতো যেন আমাকে চেনেই না। তারপর ঠোঁট দুটোকে ফাঁক করে একটা দীর্ঘ হাই তুলতো।, সংগে সংগে মুখের কাছে উঠে আসতো ওর ডান হাত। আঙুলগুলো তুড়ি বাজাতো হাঁ-করে থাকা মুখের ওপর, 'তারা, তারা' অথবা 'জীব, জীব'।

অথচ পয়সার দরকার পড়লে আমি যেখানেই থাকি, ওর কোন সংকোচ নেই। ও প্রেতের মতন সামনে ঝুঁকে পড়তো, ওর লম্বা লম্বা, কেঠো কেঠো হাত বাড়িয়ে দিতো অক্লেশে, ঐ হাতের শিরায় শিরায় একটা অধিকারবোধও প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকতো, যেন জানাই ছিলো মানুষ কেন হাত বাড়ায়, বাড়ানো হাতে মানুষকে কি দিতে হয়, কেন দিতে হয় এবং কতোটা দিতে হয়। তাই মুখে কিছু বলতো না, শুধু মুখে দিন, দিন ঝপ করে দিয়ে ফেলুন, এই ক'টি কথা বাজতো। স্বভাবতই একটু বিরক্ত হতাম। সেই একই কারণ।

যে ভিক্ষে চাইছে সে কেন নরম হবে না? যে ভিক্ষে চাইছে তার কেন অসংকোচ চোখ? সহ্য করতে পারতাম না। প্রচন্ড রাগ হত। এই অবিচল সরল, বিশৃঙ্খলতায়। রেগে গিয়ে বলতাম, 'একটা কাজও ত' জোটাতে পারো। এভাবে আর কতোদিন'......

'ফদর ফদর করবেন না দেবেন?' খ্যাঁক করে উঠতো লাট।

'বল ত' চলে যাই।' বলে মুখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে কুঁচকি চুলকোতে থাকতো। আঠারো পয়সা দেবার পর নিশ্চয় তখন আমার কিছু বলার থেকে যায়।

'কিছু না হোক, খাপ্‌রা ছাইতে পারো, মোট বইতে পারো, রিকসা টানতে পারো'...

'ওয়াক থুঃ থুঃ।' দারুণ বিতৃষ্ণায় লাট তারপর রাস্তায় থুতু ফেলতো। এমনভাবে থুতু ফেলতো যেন এই ওর শেষ থুতু ফেলা। থুঃ থুঃ থুঃ করে কোথা থেকে ভগবান জানেন এ্যাতো থুতু বার করতো, আমি একটা একটা কথা বার করতাম ও তার জবাবে থুতু বার করতো। তারপর আমি হাল ছেড়ে দিয়ে গুম হয়ে গেলে ও চলে যেতো ওর দু' চক্ষু যেদিকে চায়।

শুধু যে পয়সা ও আমার কাছেই চাইতো তা' নয়, পয়সা চাইতো সকলের কাছ থেকেই। আমি অবশ্য সবদিন দিতে পারতাম না। তার জন্যে ও কিন্তু বক-বক করতো না বা বিরক্ত হতো না।

কিন্তু অন্য কেউ যদি পয়সা না দিতো তাহলে লাট তার সামনে সমানে গজগজ করতো, গলা নাবিয়ে এমন-ভাবে বিড়বিড় করতো যে না ভালো করে বোঝা গেলেও ও যে সত্যি সত্যি লোক-টাকে পয়সা না দেবার জন্য খিস্তি দিচ্ছে তাতে কোন সন্দেহই থাকতো না।

তেমন তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে অবশ্য ওর টেন্ডাই-মেন্ডাই ভেঙে যেত। উত্তম-মধ্যম খোলাই খেতে হত। ডিজেল আর মবিলে মাখামাখি খানার কাদায় গড়াগড়ি খেতে হত। যতোক্ষণ লোকটা না চলে যেত ততক্ষণ কাদায় মট্‌কা মেরে পড়ে থাকতো। তারপর যেই লোকটা একটু দূরে গেছে অমনি কাদা থেকে উঠে রাস্তার দু' আউড়ি লোককে শুনিয়ে ঝাড়া দু'টি ঘন্টা খিস্তির চূড়ান্ত করে ছাড়তো।

মাঝে মাঝে ও যে পয়সা রোজগারও করতো না এমন নয়।

সপ্তাহে একবার অন্তত ওকে দেখতাম দয়াল সাহার রেশনের দোকানের সামনে। সাহামশাই ফি শুক্কুরবার শুক্কুরবার রাজ কাট্‌রা থেকে মাল গস্ত করে আনতো। যেগুলো পারতো না সেগুলো সিধু ঘোষের লরীতে তুলে দিতো ওখানে। তারপর সেই মাল লরী চেপে সাহামশাই-এর দোকানের সামনে দাঁড়ালে মালগুলো দোকানে মাল-বন্দী করে সাজানোর জন্যে লাট অন্যান্যদের সংগে পাশে গিয়ে দাঁড়াতো।

তবে এ ত' শুধু একটা দিন। রিকসা স্ট্যান্ড, বাস স্ট্যান্ডের ধারে ওকে কতোদিন ঘুরঘুর করতে দেখেছি। বুঝতাম বাসের ক্লিনার হতে চাইছে বা রিকসার বদলী খাটতে চাইছে। কিন্তু ওর যা মেজাজ, কে ওকে কাজ দেবে? তাছাড়া কাজই বা কোথায়? রিকসার বদলীওয়ালার কাজ পেতে গেলেও রিকসাওয়ালাকে চা, 'টোস্ট' খাওয়াতে হবে। অতো পয়সা লাটের কোথায়? বুঝতাম ও কিছুই জানে না, কোন লেখাপড়া শেখে নি, ওর সাতকুলে কেউ নেই যে ওকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবে। কাজও কিছু জানে না, অথচ হোঁৎকার মত গতর আর আছে মেজাজ, লাটের মতই।

কোন বুড়ি গংগা থেকে, উনুন করবে বলে, মাটি নিয়ে আসছে বালতি করে। আর পারছে না বইতে। কোমর বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। 'বাবা গো, মা গো' ত্রাহি ত্রাহি ডাক।

কোন্ থাপিতে হাঁটুতে মুখ গুঁজে পড়েছিলো যম জানে, হঠাৎ ও তড়াক করে বুড়ির সামনে গিয়ে ধমকের সুরে বলল, 'দাও, বালতি,' উদ্ধারকর্তা ভেবে বুড়ি ফোক্‌লা মুখে একগাল হেসে 'বেঁচে থাকো বাবা, সুখে থাকো' বলে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে দিলো. ব্যস। সেইটাই হল ওর কাল। ও বুড়ির পাশে পাশে চলছে নিতান্ত অনুগত জনটির মত। বুড়ি, বুড়ি হয়ে গেছে বলে যে ওর ছেলের বৌ উঠতে বসতে দিনরাত লাথি-ঝ্যাঁটা মারে সেই বৃত্তান্ত ভালো শ্রোতা পেয়ে শোনাচ্ছে, ও 'হুঁ'. 'হাঁ'-ও দিচ্ছে না, মাঝে মাঝে বুড়ির দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, আর তারপর, তারপর আর কি দোরগোড়ায় এসে ওর কেঠো কেঠো হাত বাড়িয়ে দিলো লাট, বলল, 'আঠারো পয়সা, বুঝলে, লাগলো। ছেলের বৌয়ের কাছ থেকে নিয়ে এসো গা।

বুড়ি দন্তহীন মুখে অবর্ণনীয় হেসে বললে. 'সে কি বাবা, এ ত' বাবা আগে তুমি বলো নি, তুমি হচ্ছো গিয়ে ছেলের মতন . ..

ও সব গ্রাহ্য না করে 'ছেলে. এত' খ্যাঁক করে উঠলা লাট। তারপর খাঁক খাঁক করে বলল, 'ছেলে নই তবু, বুঝলে। ছাড়ো দিকি নি মালকড়ি।

এক একদিন নিশ্চয় পয়সা জুটতো না, কেন না কে অতো পয়সা ৬.৫ দবে মাথার ওপর তামাটে, ... আকাশ থলে

মায়েরা!

যেকোন
মামুলী ট্যাল্ক আপনার শিশুর
পক্ষে ভালো এই যদি আপনার ধারণা হয়...

তাহলে
অ্যাডোসল
সম্বন্ধে আপনার
জানা দরকার

জাম্বো সাইজের দাম (১০০ গ্রাম) টা. ৩·৫৫ স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

বিনাকা
বেবী পাউডার

একটি সিবা উৎপাদন

INTERPUB/CBP/41 BEN

আগুনের মত হল্‌কা নেমে আসছে, তেতপ্পর দুপুর, পায়ের তলায় পিচ গলে গিয়ে থক থক করছে কাদার মতন। দোকানপাট বন্ধ, রাস্তায় কুকুরের বেওয়ারিশ বাচ্ছারা পর্যন্ত নেই, খাঁ খাঁ করছে শহর। শুধু পুড়তে পুড়তে এক একখানা বাস চলে যাচ্ছে আর ধুলো উড়ছে পাক খেতে খেতে, কিংবা হয়তো একটা দলছুট রিক্সাওয়ালা মাথায় ভিজে গামছা চাপিয়ে আস্তে আস্তে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে। ওকে দেখতাম, যে কলটায় ঐ দুপুরেও জল থাকা সম্ভব, সেই ঘোলা গংগার কল যা' সমস্ত দিন রাস্তায় জল ছিটোতো তার মুখে মুখ দিয়ে সোঁ সোঁ করে লাট জল টেনে পেট ভরাচ্ছে।

সন্ধ্যের সময় ওকে কতোদিন দেখেছি এ অঞ্চলের বড়ো বড়ো খাবারের দোকানের পাশে ঘোরাফেরা করতে। রাস্তার ধারের প্রকাণ্ড উনুনে বড় বড় কড়াই দুধ ভর্তি চাপানো। কড়াই-এর গা বেয়ে ধোঁয়া উঠছে। হালুইকর একটা পাখা বাঁ হাতে নিয়ে হাওয়া করছে আর লম্বা কাঠি দিয়ে কড়াই-এর গায়ে দুধের সর টেনে টেনে তুলছে। ওকে দেখেছি সে সময়। ওর চোখ দুটো দেখেছি। একেই তীব্র, বন্য চাউনি। তখন কিন্তু ঐ ভয়ংকর চোখে পৃথিবীর সমস্ত জন্ম-হাঘরের খিদে জ্বলে উঠতো। যেন বাঘের চোখ। দপ দপ করে জ্বলছে। চোখাচোখি হলেই যেন আগুনের স্ফুলিংগ ঠিকরে পড়বে। ভয়ে, আতংকে তাকাতে পারতাম না। পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম।

ওর আরো এক ক্ষুধার কথাও আমি জেনেছিলাম ক্রমে ক্রমে। সিনেমার শো হবার ঠিক আগে আর শো ভাঙার ঠিক পরে ওখানে দেখা যেতই। ওর লক্ষ্য থাকতো মেয়েদের ওপর। মেয়েদের দেখতে দেখতে আধো-অন্ধকারে এমনভাবে যে কোন পুরুষের চোখ জ্বলতে পারে তা আগে জানা ছিলো না।

একদিন বালির মোড় দিয়ে যাচ্ছি। সন্ধ্যের সময়, আবছা অন্ধকারে দেখলাম মধু ঘোষের বাইরের দিকের রোয়াকে উপুড় হয়ে লাট শুয়ে আছে। গায়ে সেই চিটময়লা অপরূপ ধোকড়টা দেখে চিনলাম। কেন না মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। অবশ্য মুখ ওর না দেখা গেলেও এরকম সময়ে ও ছাড়া কেই বা অমন নির্বিকারভাবে, রাস্তার ওপরই বলতে হয়, রোয়াকে শুয়ে থাকতে পারে।

ও এমনভাবে শুয়ে আছে যেন মনে হয় ওর কি একটা প্রশ্ন ছিলো এই শক্ত, পাথরের মত নিরেট আর শক্ত মেঝের কাছে, যেন তার জবাব না নিয়ে ও আর মাথা তুলবে না। মুখে মুখ দিয়ে, বুকে বুক দিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে শুয়ে আছে গভীর ঘুমে।

'লাট, এই লাট।' সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে পড়লো। এ্যাতটা ভাবতে পারি নি। ভেবেছিলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত ডাকামাত্র সাড়া দেবে না। কিন্তু ও সাড়া দিলো। অসীম বিরক্তিতে ও উঠে বসলো, হাই তুলে বলল, 'কি বলছো?'

'এখানে শুয়ে?'

'এখানে শোবো না তো বিছানায় শোবো? তুমি শুতে দেবে?'

এ একেবারে মোক্ষম প্রশ্ন। সুতরাং বললাম, 'তা এ সময় শুয়ে আছো কেন?'

'এ সময় ঘুম পেল তাই। কোন তো কাজ নেই।'

ও আবার শুয়ে পড়লো, রাস্তার ওপরই বলতে হয়, রাস্তা ছাড়া আর কি, মধু ঘোষের বাড়ির বাইরের রোয়াকে, আর আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর এই অলক্ষুণে ঘুম দেখতে লাগলাম।

ও কিছু বলল না কিন্তু ওর এই অসময়ে উপুড় হয়ে শোয়া এক অদ্ভুত, অনির্দেশ্য, হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি বিতৃষ্ণাজনকও এমন একটা দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো যে আমাকে বলতেই হল, 'চলো লাট, শুতেই যদি হয় আমার ঘরে চলো।'

'তুমি পাগল নয় তো!' লাট সোজা হয়ে বসে বলল। আর আমি ওর হাসি দেখলাম। সে হাসি নির্দয়, পাশবিক, নির্মম।

'আচ্ছা তাই না হয় হল।' আমি বেশিক্ষণ এর চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি বললাম, 'শোবে তো চল।'

'চলো।'

আমার ঘর বলতে একখানিই। তবে খাটের পাশে খানিকটা জায়গা। যাই হোক রাস্তার থেকে তো এ ভালো হল। লাটকেও দেখলাম খুশি খুশি। যা স্বভাবত ও হয় না।

ও নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলো। বলল, 'তুমি খাটে শোও। আমি মেঝেতে শোবো।' বলে আর দ্বিরুক্তি করলো না। আমি ছেঁড়া একটা চট ওকে এগিয়ে দিলাম। ও সেটা পরিপাটি করে বিছিয়ে ওর ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত গামছাখানা শিয়রে রেখে রাজার মত শুয়ে পড়লো।

প্রথম প্রথম ঠিক সময়ে ও আসছিলো। দশটা বেজে দু'-চার মিনিট আগে-পরে। কোন অসুবিধে হচ্ছিলো না। যা আমি শুতে দিয়েছি বলে আমার কাছ থেকেই খাবারের যোগাড় করা সেসব ও করাইলো না।

কিন্তু দু'-চারদিন যেতে না যেতেই ওর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠতে লাগল। ওর শুতে আসার সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা রইলো না।

কোনদিন এগারোটায় আসে, কোনদিন বারোটায়। কখনো একটায় এসে দরজায় কড়া নাড়ছে, 'ওহে মিস্টার, মিস্টার?'

আমার এই ঘর যেমনই হোক, এ তো আর হাট করে খুলে রাখতে পারি না। তাছাড়া যে বাড়িওয়ালা অবিশ্বাস্য সস্তাদরে এই গর্তে থাকতে দিয়েছে তারও একটা মতামত মেনে চলতে হয়। এ তো আর হোটেলখানা নয় যে যখন খুশি এলে গেলে, এ গেরস্থ বাড়ি। এর একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে। বাড়িওয়ালা এসব আমাকে একদিন ভালো করে বোঝালো।

আবার একদিন দেরি করে আসায় বললাম, 'কি ব্যাপার? দেরি যে?'

'আজ একটু যাত্রা ছিলো হাটতলায়। শুনে এলাম। বুঝলে, ভারি সোন্দর করেছে বাবু, বুঝলে......

এই রাতদুপুরে ওর যাত্রার ফিরিস্তি শোনবার জন্যে আমার ব্যস্ততা ছিলো না মোটেই। আমি সংক্ষেপে একটি শান্ত 'হুঁ' দিয়ে রেগে গুম হয়ে পাশ ফিরে শুলুম।

তার পরের দিনও একই ইতিহাস।

ফলে আমাকে বলতেই হল, 'এখানে তো ওসব চলবে না। ও কি আরম্ভ করেছো তুমি? যখন খুশি আসছো, এসব কি?'

ও শুলে গুমে হয়ে থাকলো। কিছু বলল না। আমিও আর উত্তরের প্রত্যাশা না করে শুয়ে পড়লাম।

এর পরের দিন থেকে কিন্তু ঠিক টাইমে টাইমে আসতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আর এক ফ্যাচাং দেখা দিলো। ও ভয়ানক কাসতে লাগল। কাসে সমস্ত রাত্তির ধরে আর কফ ফেলে এখানে-সেখানে। সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। রাতের পর রাত ঘুম হয় না। ও ঘং-ঘং করে কাসে। কে জানে টি-বি কি না। আর যা কফ ফেলে এখানে-সেখানে, ভয়ঙ্কর নোংরা!

ওকে বলতেই হল, 'এরকম কাসলে তো চলবে না। আমি ঘুমোবো কি করে? এতো কফ ফেলছো যেখানে-সেখানে, এসব কি?'

'আমি ইচ্ছে করে করছি?' লাট খ্যাঁক করে উঠলো। 'তোমার শরীর খারাপ হলে কাসতে না, কফ ফেলতে না?'

অকাট্য যুক্তি। গুম খেয়ে গেলাম। সেদিন ভোরবেলায় লাট ওর ছেঁড়া কানি আর ঐ মোটা চিটময়লা ধোকড়াটা কাঁধে

চাঁড়িয়ে ফেলেছে। একমুখ হেসে বলল, 'চল্লুম হে।'

আমি কিছু বলতে চাইলাম। বলতে পারলাম না। ও ঘং-ঘং করে ভয়ঙ্কর কাসতে কাসতে, বুকে হাত চেপে, কুঁজো হয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো।

তারপর ওকে অনেকদিন দেখি নি।

কি করেই বা দেখবো?

টাটকা এক নওজোয়ান বংশীধারী ছাই-গাদায় দুনিয়ার মজদুরের এক নিশান তুলে ধরলো। বলল, ভুখা, নাংগা মজদুর ভাইলোক, আজ রোটি কো শওয়াল পর তামাম বংগাল মুল্লুক সে বড়া তুফান উঠা হ্যায়, আমি খোবীর বাচ্চা, আমি জানি ইস্ত্রি গরম হলে কি করতে হয়, তোমলোগ সব......এ জালিম সরকার কো......

ব্যস্! কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। ভোঁ আর বাজলো না। মহল্লায় মহল্লায় এক অনিঃশেষ স্তব্ধতা। কোথায় যেন গুলী চলল। কারখানার ফটকে ফটকে পুলিশ। মাঝে মাঝে হাওয়া গাড়ি ছুটতে লাগল। হাওয়া গাড়ি থেকে আওয়াজ উঠলো, হুঁশিয়ার মজদুর ভাইলোক। ইস স্ট্রাইক বিহার আদমীকো হটানে কে লিয়ে...... স্ট্রাইক হোনেসে চুল্লী নহি জলেগা, রোটি নহি হোগা, বালবাচ্চা রোতে রোতে'... 'বংগট' আজবলাল, আঞ্জুমানের লীডার লোক, ওকে আর পাওয়া গেল না। দু'দিন পরে ওর লাস গঙ্গায় ভেসে উঠলো।

বদ্রীদাস পান্ডে, সুদীকিস্তিওয়ালা পালিয়েছে। মজুর লাইনে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। আমিও রেহাই পেলাম না।

দীর্ঘ ছ' মাস পর ফিরে এলাম আবার এই আজব শহরে। মনেও ছিলো না লাটের কথা।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে কি একটা কাজে বার হয়েছি। খুব শীত পড়েছে। শহরটাকে যারা প্রাণবন্ত করে তুলবে সেই দোকানগুলো পর্যন্ত আধ-খোলা। রাস্তায় মানুষের চলাচল বড় কম। বাতাস আঁচড় কাটছে অন্ধকারে। অন্ধকার শুয়োরের কোঁচকানো চামড়ার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাতে হাতে ঘসে আমি ঠান্ডা মুছে ফেলতে চাচ্ছি। বুকের মধ্যে খুড়ে ঢুকে পড়েছে শীত। ঠক ঠক করে কাঁপছি তাই, যদিও সর্বাঙ্গ চাদরে মোড়া। আমার আশেপাশে গাছের পাতা খসছে। অল্প অল্প কুয়াসা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। মনে হচ্ছে গলার মধ্যে যে শব্দ এখনো উচ্চারণ করি নি সে শব্দ জমে জমাট হয়ে গেছে। একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গ, নির্জন পথ ধরে আমি চলেছি...

হঠাৎ চোখে পড়লো লাটকে। লাটই ও'? নিশ্চয় লাট। আশেপাশের সমস্ত দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। কপাট ভেজিয়ে ভেতরে কেনাবেচা হচ্ছে নিশ্চয়। আলো জ্বলছে। রেডিও বাজছে। কিন্তু বাইরে জমাট অন্ধকার জায়গাটা। মাঝখানে একটা তেলেভাজার দোকান। দোকানে ফুলুরি, বেগুনি ছ্যাঁক ছোঁক শব্দে ভাজা হচ্ছে। কাঁচের আলমারির মধ্যে থরে থরে সাজানো। পাশেই মদের দোকান। সবই প্রায় ওখানেই যাবে আর কি। হঠাৎ দেখলাম গায়ে সেই চিটময়লা খোকড়া, কপাল পর্যন্ত নেবে-আসা অবিন্যস্ত চুল, তীব্র বন্য চাউনি, একটা লোক তেলেভাজার দোকান থেকে তিন হাত দূরে, প্রেতের মতন সামনে ঝুঁকে পড়েছে, যেন ছোঁ মেরে দোকানটাকে তুলে নিতে চায়. ওরই পেছনে পড়েছে প্রকান্ড একটা ছায়া। ছায়াটার মধ্যেও একটা ভয়ংকর চক্রান্ত চলছে, ওটা যেন ক্রমশই গুঁড়ি মেরে আগাতে আগাতে...

আমার কাজ ছিলো। আর দাঁড়াতে চাইলাম না। চলে যাবার আগে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলাম লাটকে। এর মধ্যে একবারও কিছু চাইলো না, একটা তেলেভাজাও না। পেছন দিকে ঘাড় ফেরালেই আমাকে দেখতে পেত, ঘাড়ও ফেরালো না, একটা অন্তহীন, নিঃশব্দ প্রতীক্ষার মধ্যে ও যেন ডুবে গেছে। বাইরে বিপুল ঠান্ডা। জমে যেতে হয়। আকাশ অন্ধকার, লোকজন পথে প্রায় নেইই, ও কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, ওর এই দাঁড়ানোর যেন শেষ নেই। আর সেই ছোঁ মেরে কেড়ে নেবার সেই ভঙ্গীটা... ক্রমশই যেন ঝুঁকে পড়ছে, ক্রমশই..

আমার কাজ ছিলো। হ্যাঁ জরুরী, সন্দেহ কি। কাজ করলে দেরি হয়ে যাবে। আজ রাত্রেই করতে হবে।

আমি কিন্তু সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে গেলাম। কতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। অল্প অল্প, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কুয়াসা আরো ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, এই দারুণ শীত, হাড় হিম করা কনকনে কালো হাওয়া, এমন একখানা অদ্ভুত রাত, লাটের অন্তহীন প্রতীক্ষা, ওর মুখে মরিয়ার মত জেগে ওঠা বেঁচে থাকার সেই ইচ্ছের রেখাগুলি, এসব কিছুই আমি দেখছিলাম না। আমি শুধু দেখছিলাম এর পেছনের প্রসারিত ছায়াটাকে। ঘণ্টাখানেক আগেও ওটা অতো বড়ো দেখি নি। রাত যত বড়ো হয়েছে, হাওয়া যতো কনকনে আর কালো হয়েছে, যতো হিম পড়েছে, ততোই লাটের পেছনের ছায়াটা দীর্ঘ, প্রসারিত হয়েছে। অতিকায় সেই ছায়াটায় একটা আদিম, ক্রূর ভঙ্গি ফুটে উঠেছে, যেন গুঁড়ি মেরে মেরে ক্রমশই ও এগিয়ে আসছে, ক্রমশই ও এগিয়ে আসছে, ওর যেন থাবা গজিয়েছে, নখ গজিয়েছে, কাকে যেন নখে নখে ছিঁড়ে কুটি কুটি করবার জন্যে...

লাট কিন্তু অদ্ভুত। ও কিছু চাইছে না। দীন, ভিক্ষুকের ভাব ওর কোনকালেই ছিলো না। তবে চাইতো। মেজাজের সঙ্গে অবশ্য। কিন্তু সেটা চাওয়াই। না পেলে খিস্তি করতো। এখন কিন্তু চাইছে না। খিস্তিও করছে না। ও আরো বেশি ঝুঁকে পড়েছে। পেছনের ছায়াটা আয়তনে আরো বেড়েছে। ছায়াটার থাবা গজিয়েছে।

আমি কি ভেবে পকেট হাতড়ে আঠারো পয়সা, যা ওর প্রাপ্য, তাই ওকে দিতে গেলাম। যদিও ঐ পয়সা আমার রাতের খাবারের জন্যে। কিন্তু আবার চোখ পড়ে গেল ছায়াটার দিকে।

একদিন যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবী-টাই গ্রাস করে নেবে তাকে আঠারো পয়সা দিতে যাবার বিড়ম্বনা থেকে নিজেকে সহসা মুক্ত করে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে সামনে এগিয়ে গেলাম।

নখ আর থাবা গজানো ছায়াটা ততক্ষণে আরো একটু আয়তনে বেড়ে গেছে।

রাণী ধূপ
কাকার প্রডাক্টস

[পূর্বানুবৃত্তি]

...মহেশ চোখ পিট পিট করে দেখছিল বুড়ো কলিমদ্দীকে। ভাবছিল। লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! দুঃখে-শোকে-বার্ধক্যে?

কিন্তু মহেশের পেছনে ভিড়-করা চরের মেয়ে মরদ উৎকর্ণ। হাঁ করে চেয়ে আছে কলিমদ্দীর দিকে: ভয়ে—বিস্ময়ে। বড় খাঁয়ের নাম এ তল্লাটে কে না জানে? ভাগা ওষুধ সিন্নি থেকে বাঁজা বউয়ের মাদুলি—আরও ঢের ঢের বস্তু।

শাদা ভুরুর তলায় নিষ্প্রভ চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে—ফ্যাকাশে মুখটা চনমনে। কলিমদ্দী বললে, "জানো নি মোর আউলিয়া ফকিরকে? চলে যাও সোজা দক্ষিণে—ওই জঙ্গল ধরে। যেখানে গভীর বন, পুরাতন বাতিল জাহাজী বাতিঘর—তাকে বাঁ হাতি রেখে চলে যাও আরও দক্ষিণে—একদম সাগরের ধার, দেখতে পাবে কশবা হিজলীর তখত। হিজলীর মসনদ-আলা সেকেন্দার পহলওয়ান—আউলিয়ার ছোট ভাই। এ তল্লাটের যাতো মুসলমান—সবাই ছিল একদিন মালেক সেকেন্দারের পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল। আর আউলিয়া মছন্দলীর চ্যালা।"

ছিল বটে—এ অঞ্চলের রোয়েদাদ রেকর্ড বলে। ছোট খাঁ সেকেন্দার পহলওয়ান একদিন এ অঞ্চলে লাঠির জোরে মাটি দাবিয়েছে। হুগলী বা দিল্লী—পরোয়া করে নি কারুকে। তখ্ত হিজলীর বিদ্রোহীকে বাগে আনতে পারে নি কোনদিন দিল্লর শাহান্‌শা। দুর্ধর্ষ তার পাইক বরকন্দাজ। আর সাগর থেকে দুরন্ত দুই নদী দুই বাহুর মতো তাকে আগলে রেখেছে। পুবে ভাগীরথী আর পশ্চিমে রসুলপুর। একদিন লোকান্তরিত হলো ছোট খাঁ সেকেন্দার। সুযোগ বুঝে ফৌজ সাজল হুগলীতে। পার হলো দুই নদী। বড় ভাই বড় খাঁ, আউলিয়া ফকির মছন্দলী সে আক্রমণের খবর পেয়ে সশরীরে ঢুকলো কবরে। কোথায় আত্মগোপন করল হিজলী তখ্তের দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্র। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল হিজলীর তখ্ত। সেই বিশৃঙ্খলার দিনে ফুটে উঠল দুই মূর্তিমান ধুরন্ধর—দেওয়ানের পাচক জগন্নাথ পান্ডা বুতাতের মুহুরী ভগবান পট্টনায়ক। আউলিয়া মছন্দলীর জামাই জীয়ন খাঁর সঙ্গে যোগসাজসে ভাগ করে নিল হিজলীর তখ্ত। দিল্লী থেকে নতুন দরবারী খেতাবে পাচক জগন্নাথ পান্ডার বংশধারা পরের পুরুষে হয়ে গেল চৌধুরী-রায় রায়ান। আর ফকির আউলিয়ার চ্যালাচামুণ্ডা—পহলওয়ান সেকেন্দারের সাধের লাঠিয়াল-বরকন্দাজ হয়ে গেল লাঙল-ঠেলা চাষী অথবা দরবেশ ভিক্ষুক। এ কাহিনী ১৫শ খৃস্টাব্দের।

রাজ্য গেছে—কিন্তু মহিমা আছে। মাহাত্ম্য ছড়িয়ে আছে আউলিয়া ফকির মছন্দলীর। জঙ্গল হয়ে গেছে হিজলী তখ্ত। পরিত্যক্ত—জনমানবহীন। তবু কিম্বদন্তীর প্রান্তরে কোনো নিশুতি রাতে ওঠে ঘোড়ার ক্ষুরের পদধ্বনি, দেখতে দেখতে কাকজ্যোৎস্নায় মিলিয়ে যায় দীর্ঘদেহী আউলিয়ার আলখাল্লা. মোহনার গাঙ পার হতে হতে-ঝড়ে-পড়া-নৌকো মছন্দলীর নামে পার হয়ে যায় অবলীলায়। দূর-দুরান্ত থেকে ছুটে আসে নানা মানুষ, ফকির-দরবেশ, টিম টিম করে চেরাগ জ্বলে আউলিয়ার দরগায়।

কলিমদ্দীর বড় বড় চোখ করে সেই সব কথা বলে। জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে, "হোই দেখ, কোথায় কতদূরে ছিল ওই জঙ্গল। চরে নতুন এসে কোথায় দেখেছিলে? সেই বাতিঘরের গায় গায়—কম করে দু' কোশ তফাৎ। আর আজ? কোথায় এসেছে দেখ।"

মহেশ বলল, "সে এখন জমির মালিকরা শরিকে শরিকে লড়াই মামলা করবে—গাঙ থেকে সবে গা ঝেড়ে ওঠা সিকস্তা পয়স্তি জমি. হাসিল করল না—জঙ্গল হয়ে গেল।"

"না—না।" কলিমদ্দী যেন কেঁপে গেল। ঘোলাটে চোখ আবার ঝিকিয়ে ওঠে উত্তেজনায়। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "বাড়ছে—মোর ফকিরের রাজ্য বাড়ছে। আরও বাড়বে—জঙ্গল হয়ে যাবে সব। এ নতুন পাপের দণ্ড। বড় মণ্ডল এই দণ্ড পেয়ে মরেছে—মরবার সময় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত কেউ ছোঁয়ায় নি মেয়ে। মনে করে দেখ।"

মনে আছে সকলেরই। এই তো ক'-মাসের কথা। চরম দণ্ড পেয়ে মরেছে বটে বড় মণ্ডল। গত বর্ষার রোগে বরল—বিছানা নিলে। একলা বুড়ো মানুষ—সংসারে কেউ ছিল না দেখাশোনার। ঘরের মধ্যে মরে পচে ঢোল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পোড়ানও হয় নি—পোড়াতে কেউ

রাজী হয় নি। চৌকিদার ডেকে এনে খালের জলে টেনে ফেলে দিয়েছিল।

মহেশ মণ্ডল গর্ গর্ করতে করতে বলল, "তা সে সকলের পেছনে লাগল, পুলিশ ডেকে আনল চরে—চুকলি করে একে ধরালে, ওকে ধরালে।"

"তাই তো বলছি ছোট মণ্ডল। নতুন পাপ ডেকে এনেছিল সে।"

"এই নতুন পাপ!" কথাটা বুঝতে পেরে মহেশ মণ্ডল যেন একটু মিচকে হাসল। বলল, "এতক্ষণে বুঝলাম।"

মহেশ মণ্ডলের কথার ধরন, ওই মিচকে হাসি—বুড়ো কলিমদ্দীকে যেন চাবুকের ঘা মারলে। বোকা বোকা চোখে খানিক চেয়ে রইল নতুন মাতব্বর ছোট মণ্ডলের দিকে। একলা মানুষ সে, তার কালের সেই হরি মণ্ডলও আজ আর নেই। শুধু সে একলা টিকে আছে তার কালের পাপ-পুণ্য বোধ, সরল বিশ্বাস আর জীবন-সংগ্রামের অফুরন্ত বোঝা নিয়ে।

মহেশের মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে বললে, "নতুন পাপ নয়! না হলে মোর পবনা কোথায়? আসমান মরে গেল কেন? বলো—বলো। আমি কতদিন আর বোঝা টানব!— বলো?"

গলা কাঁপে কলিমদ্দীর। বুড়োর চোখ নিংড়ে বড় বড় দু' ফোঁটা জল এসে জমে চোখের কোণে।

উসখুস করে মহেশ, এই অসহায় বুড়ো মানুষটার সামনে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সান্ত্বনা দিয়ে মহেশ বলল, "আমরা সবাই মিলে তোমার চাষ তুলে দিলম, ঝাড়াই মাড়াই করে দিলম শেষ। আমি কথা দিয়েছি যখন—যা দরকার, করে দেবো।"

এমন সময় কৌতূহলী ভিড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল।

কে বললে, "হোই মুকুন্দকে ধরে আনছে।"

মহেশ উৎসুক চোখে ঘুরে দাঁড়াল।

যে দু'জন মুকুন্দকে খুঁজতে গিয়েছিল তারা আসছে। মুকুন্দ তাদের মাঝখানে। কাঁধে টাঙি।

"দেখ—আবার ওরা কি খবর আনল।" বলতে বলতে মহেশ কলিমদ্দীর ঘর ছেড়ে বাঁধের দিকে এগোলো।

মুকুন্দকে একেবারে সামনে খাড়া করে দিয়ে, তালাসকারদের মধ্যে একজন বললে, "হায় রে বাপ, জঙ্গল হাটকে হাটকে হয়রান। আসতে চায় না ছোট মণ্ডল। বলে—বদলা নিয়ে যাব।"

"কিছু দেখলি চিহ্নটিহ্ন?" মহেশ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

দু'জন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "কিচ্ছু না ছোট মণ্ডল।"

কপাল কুঁচকে মহেশ বলল, "সে-ই হোক, এত কাণ্ডের পর সে কি আর জঙ্গলে আছে! এখন চল—বাকী যারা গেছে তারা ফিরে আসুক। সব খবর শুনি। তারপর দেখা যাবে।"—

ভিড়ের ভেতর থেকে গোলবদন আবার খলবল করে উঠল। যেন ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হলো তার। বললে, "কিন্তু বিচার করতে হবে ছোট মণ্ডল। পাপ তো মুকুন্দের বউয়েরও।"

মহেশ কোনো কথা বললে না। নীরবে পথ চলতে লাগল। পেছনে ভিড়ও চলেছে নানা কথা আলোচনা করতে করতে। কেউ বলে—ভূতুড়ে কাণ্ড, কেউ বলে—কলিমদ্দীর আউলিয়া বড় খাঁয়ের দণ্ড, কেউ বলে—নাঙ্গা সন্ন্যাসী। এমনি আরও হাজার জল্পনা-কল্পনা।

মুকুন্দের ঘরের কাছাকাছি এসে মহেশ বললে, "মুকুন্দ, টাঙিটা দে মোকে।"

"কেটে ফেলব বউকে—না ছোট মণ্ডল?" বলে ম্লান হাসল মুকুন্দ।

মহেশ নীরবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

মুকুন্দ ঘাড় হেঁট করে বলল, "দোষ মোর ছোট মণ্ডল—আমি তাকে যেতে বলেছিলম, আমি তাকে দুষমনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি নি, আমি শোধ নিতে পারলম নি। যা বিচার হয়—কর, দণ্ড দাও মোকে।"—

ক্ষোভে ক্রোধে টাঙিটাকে ফেলে দিয়ে মুকুন্দ হন্ হন্ করে ঘরের দিকে চলে গেল।

॥ চার ॥

রইল পড়ে নতুন ঘরের এক বুক দেওয়াল—মুকুন্দ যেন সে কথা ভুলেই গেল। কোথায় ঘরের কোণে নয়ন ভয়ে ভাবনায় আড়াল করে রাখছে নিজেকে—মুকুন্দ চোখ তুলে তাকালও না। তার চওড়া জোয়ান বুকের মধ্যে দিন-রাত খচখচ করতে লাগল এই কথাটা—বউটাকে বিপদে ফেলেছে সে নিজে, তাকে রক্ষা করতে পারল না—দুষমনের দণ্ডও দিতে পারল না।

আর হরিদাসী যেন কাঁদতেও ভুলে গেল। ছেলের শুকনো মুখের দিকে চেয়ে—আর তার ভাব-সাব দেখে ডুকরে ডুকরে ক্ষণে-অক্ষণে কাঁদা তার একদম বন্ধ।

কিন্তু সেদিন আর সামলাতে পারল না। ফের কপাল চাপড়ে পাড়া মাথায় করলে।

"হায় হায়—মোদের আবার কি চিঠি এল গো!.. মোদের কি অলক্ষণে সব্বনাশে ধরেছে গো!"...

চিঠিটা এনেছিল একটি যুবক। বেশ-বাসে শহরের মানুষ বলেই মনে হয়। এসেছিল সাইকেলে। সাইকেলের বাঁশি শুনে চরের কাচ্চাবাচ্চাগুলো ছুটে এসে জড়ো হয়েছিল বাঁধের ওপরে। ছোকরা মানুষ—চোখে চশমা, গায়ে আধ ময়লা শাদা হাফ সার্ট। সাইকেল থেকে নেমে চরের বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করেছিল, "মুকুন্দ পাইকের ঘর কোন্‌টা রে।"

"হুই তো।—এসো মোদের সঙ্গে।"—

এ চরে এমন সাইকেল নিয়ে কে এসেছে আর কবে! তার ওপরে চিঠি।

মুকুন্দের হাতে চিঠিটা গছিয়ে দিয়ে যুবকটি বললে, "চলি ভাই। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো। চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবো।"

মুকুন্দ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি আছে চিঠিতে?"

"জানি না ভাই।" মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করেছিল, "পড়তে জান?"

মুকুন্দ নীরবে মাথা নেড়েছিল। জানে না।

"তবে তো মুস্কিল।" বলে হাতে বাঁধা ঘড়িটা একবার দেখল। যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, "কোনো ভালো লোককে দিয়ে পড়িয়ে নিয়ো। আমার ওপর যেটুকু হুকুম—তাই করে গেলাম। চলি ভাই।"—

যুবকটি সাইকেলে উঠল।

মুকুন্দ হতভম্ব। আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে আরও দু'-চারটে কথা জিজ্ঞেস করবে বলে যখন সে সচেতন হলো—তখন আগন্তুক ঢের দূরে। তবু পেছন থেকে ডাক দিল, "বাবু—আর দুটো কথা।"—

শুনলো কি না কে জানে, পেছন ফিরে একবার তাকালও না। যেমন হুট করে এসেছিল—চলেও গেল তেমনি। সাঁ সাঁ করে সাইকেল ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল চরের ছোট বাঁধ-রাস্তা ছেড়ে জেলা বোর্ডের সড়কে। তারপর সোজা দক্ষিণমুখো মহকুমা শহরের দিকে। শীতের পড়ন্ত বেলা তখন মলিন হয়ে এসেছে।

লোকটার রকম-সকম যেন কেমন এক-ধারা। তার হকচকানো কাণ্ডকারখানায় হরিদাসী ভ্যাক করে ডুকরে উঠল। আর মুকুন্দ বোকার মত থামে-আঁটা চিঠিটা শুধু উল্টেপাল্টে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

এর মধ্যে জুটে গেছে চরের কিছু মেয়ে মরদ। এদের মধ্যে কারুর কারুর চোখে পড়েছে নবাগতের আগমন এবং দ্রুত প্রস্থান। তারা নানা জিজ্ঞাসায় মুকুন্দকে অস্থির করে তুললে।

"কে—লোকটা কে? কেন এসেছিল? কিসের চিঠি?"

"কিছু তো বুঝতে পারছি নি।"

সদাশয়ের বউ বলল, "আমি মাঠে গরু আনতে গেছলম—দেখেছি। লোকটা হোই উত্তর দিক থেকে এল।"

"আর আমি দেখলাম—বই বই করে চলে গেল দক্ষিণে।" সুদাম বলল, "কি সব তাজ্জব কান্ড রে বাপ! কিসের চিঠি—খুলে দেখ না।"

খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করলে মুকুন্দ। ছোট চিঠি—লাইন দশেক লেখা। চিঠিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মুকুন্দ বলল, "আমি কি ছাই পড়তে জানি। এখন পড়াই কাকে দিয়ে।"

এ চরে কেউ যে কাউকে চিঠি লেখে—সে-ও এই প্রথম। লেখাপড়ার ধার কেউ ধারে না। একমাত্র ভরসা ছোট মণ্ডল—নামটা সই করতে পারে। মুকুন্দ চিঠি নিয়ে হাজির হল মহেশের কাছে।

মুকুন্দের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনাটা শুনে মহেশের কপাল কুঁচকে উঠল। বললে, "লোকটা যখন এল—মোকে একবার খবর দিলি নি।"

মুকুন্দ বলল, "খবর পাঠাবার ফুরসুৎ আর চলো কোথায় ছোট মণ্ডল। হেই এদের শুধাও। লোকটা এল আর একটা দুটা কথা বলে চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে সাঁ সাঁ করে সাইকেল ছুটিয়ে চলে গেল।"

"চিঠিটা দে দেখি।" বলে মহেশ মুকুন্দের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। ছানিধরা মানুষের মতো হাতড়ে হাতড়ে চলা—তবু কয়েকটা শব্দের পাঠোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল। চিঠি পড়া বন্ধ করে বলল, "ই শালার গোটা চিঠি পড়া মোর কম্ম নয়—বড্ড জড়ানো লেখা। মোর হলো লাঙল ঠেলা বিদ্যা—কোন রকমে সইটা করি কোদাল পাড়ার মত। এ চিঠি ভালো লোককে দিয়ে পড়াতে হবে। এতে গোবিন্দের খবর আছে।"

"মোর বাবার খবর!" মুকুন্দ চমকে উঠে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "কোথা থেকে লিখছে গো? কে লিখলো?"

"ঠিক বুঝতে পারলম নি।" মহেশ মাথা চুলকে বলল, "চলো যাই সানো চৌধুরীর কাছে।"

মুকুন্দকে সঙ্গে করে মহেশ তখনি বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে নিলে চরের আরও কয়েকজন।

বিস্তিতে ট্রানজিস্টার।

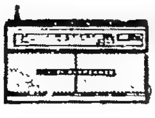

বিশ্ববিখ্যাত 'ন্যাশানাল প্যানা' ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে এখন ভারতেও পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরে পাঠানো যায়। আবেদন করুন:

GIFT HOUSE
P.B. 1451, (W.B.C.) Delhi—6

চৌধুরী বংশের কনিষ্ঠতম শরিক ধরণীকান্ত—চাষীরা বলে সানো চৌধুরী। চরের মাত্র দু' আনী মালিক—আয় অল্প। আদায় ওয়াশীল বাবদ নিজেই আসে চরে। দশ আনী বড় চৌধুরীর মত অতো গোমস্তা বক্সীর বোলবোলাও নেই। বংশধারার কাঁচা হলুদের রং জীবন-যুদ্ধে রোদে পুড়ে জলে ভিজে নিষ্প্রভ—তামাটে হয়ে গেছে। বয়স এখনো চল্লিশও পার হয় নি—মনের উদারতা এখনও আছে, চাষীদের সঙ্গে মেশা-ঘষাও আছে।

মহেশ মণ্ডল সদলবলে তার কাছে গিয়ে হাজির হলো সন্ধ্যের পরে। বললে, "একটা চিঠি পড়ে দিতে হবে সানো কত্তা।"

মামলা-মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখেছিল সানো চৌধুরী—সেগুলো সরিয়ে রেখে বললে, "তুমি এসেছ—ভালো হয়েছে মহেশ। একেই বলে ভাগ্যের যোগাযোগ। জিতবো—এ মামলায় আমি জিতবো নির্ঘাৎ।"

"চরের মামলা?" মহেশ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, আমার কপালের মামলা।"

কপালের মামলাই বটে। জিতলে সানো চৌধুরী রাজা—না হয় ফকির। নতুন জেগে ওঠা চর—দু' পক্ষই দাবিদার। বড় তরফ বলে—আমার জমির বরাবর, সানো তরফের দাবি—তার অংশের লাগাও। দু' তরফই সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে অগ্রসর। সাক্ষী-সাবুদ কাগজপত্র-নক্সা দেখে অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হবে।

সানো চৌধুরী বললে, "সাক্ষীসাবুদের জন্যে আমি দু'-এক দিনের মধ্যেই চরে যেতাম মহেশ। তা তোমরাই এসে গেছ। আগে তোমার কাজ সারি। কি চিঠি—কার চিঠি?"

মহেশ চিঠিটা এগিয়ে দিলে।

সানো চৌধুরী নীরবে পড়তে লাগল। পড়া শেষ হলো—কপাল কুঁচকে উঠল। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, "এ চিঠি দিয়ে গেল কে?"

মহেশ বলল, "মুকুন্দ বলছে—আজ পড়ন্ত বেলার দিকে সাইকেলে করে একটি লোক দিয়ে গেছে। এদিককার লোক নব বলছে।"

মুকুন্দ বলল, "মনে হল—শহরের।"

"বয়স কত? আন্দাজ?"

"পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে।" মুকুন্দ বলল, "চিঠিটা দিয়ে তড়িঘড়ি সাইকেল ছুটিয়ে চলে গেল।"

"তা হবে।" সানো চৌধুরী বলল, "ওরা স্বদেশী ছোকরা—গরম দল। ওদের ধরবার জন্য পুলিশ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ধরতে ছুঁতে পারছে না। ধরা যারা পড়ছে—তাদের একদম ফাঁসী, না হয় দ্বীপান্তর। এই দেখ—চিঠি লিখেছে কিন্তু কারোর সই নেই, নাম নেই, ঠিকানা নেই। এই একটুকরো চোথা কাগজ, বোধ হয় জেল-হাজত থেকে পাচার করা চিঠি। শুধু খবরটুকু দেওয়া দরকার—দিয়ে চলে গেল।"

মহেশ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, "গোবিন্দের কথা কি বলেছে?"

"তাকে বীণপুর ডাকাতি মামলায় দায়রা কোর্টে চালান দিয়েছে।"

"বীণপুর! সে কোথায়?"

"সদর মহকুমায়।"

"আর কোথায় মোদের চর সানো কত্তা!"

"এ তোমাদের দারোগার কারসাজি আর কি।"

মুকুন্দ সক্ষোভে বলে উঠল, "বাপকে মোর ডাকাতিতে চালান দিয়ে দিল।"

"এ কী অন্যায় সানো কত্তা!" মহেশ রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ল।

"বীণপুরের মামলা শুধু ডাকাতি নয় মহেশ।" সানো চৌধুরী বললে, "স্বদেশী ডাকাতি বলে শুনেছি।"

"সেটা কি সানো কত্তা?"

"ওই যে গরম দল বললাম—এ সব হলো তাদের কান্ড।" সানো চৌধুরী ওদের বুঝিয়ে বললে, "ওই তোমার পুলিশের বেধড়ক লাঠি খেয়ে নুন তৈরি করা আর হাটে, গঞ্জে বিলাতী কাপড়ে আগুন জ্বালিয়ে দলে দলে জেলে যাওয়া—এ সবে ওরা বিশ্বাস করে না। বরং ঠিক উল্টো। দেশ থেকে সাহেব তাড়াবার জন্য ওরা বোমা পিস্তল নিয়ে সাহেব মারে, পুলিশ ঠেঙায়। টাকা-পয়সার দরকার হলে মাঝে মধ্যে অত্যাচারী জমিদার বাড়ি লুঠ করে। মামলা-মোকদ্দমায় জেলায় যাই—বীণপুরের ঘটনা আমি শুনেছি।"

চরের সামান্য চাষাভুষো। সানো চৌধুরীর কথায় একেবারে থ মেরে বসে রইল—তাদের কল্পনাতীত বিরাট জটিল একটা ঘটনা জালের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে যেন দিশাহারা হয়ে গেল।

সানো চৌধুরী বললে, "সময়টা ছিল বোধ হয় ফাল্গুন মাস—বিয়ের মরশুম। ঘটনাটা সেই সময়ের।"

একটিমাত্র মেয়ে ইন্দ্র রায়ের—জামাইও পেয়েছিল সুশিক্ষিত এবং ধনবান। শুধু সালঙ্কারা কন্যাই নয়—নগদ অর্থ এবং উপঢৌকনও ছিল মেলা। ছাঁদনাতলার এক পাশে সে যেন এক একজিবিশন। নির্বঞ্ঝাটে বরপক্ষের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল, বিয়ের শুভ-দৃষ্টিও শেষ। বড় বড় ঘরের বাতো মেয়ের পাল জুটেছে ছাঁদনাতলা ঘিরে। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো কার গম্ভীর গলার আদেশ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই: "যে যেখানে আছ—তেমনি দাঁড়িয়ে থাক। একটু নড়েছ কি শব্দ করেছ—একেবারে শেষ হয়ে যাবে।"

ঐ সুন্দর
কেশ বিন্যাস
অতি দীর্ঘকাল
সুন্দর থাকবে
না – – –

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা। শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিন, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইন-সুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনু-যায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

ইন্দ্র রায় সম্প্রদানের আসন থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়েছিল—কে একজন এসে ঠিক বুকের সোজা পিস্তল উঁচিয়ে ধরলে। ইন্দ্র রায়ের বড় ছেলে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল—দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল আর একটা উঁচানো পিস্তলের সামনে। আরও চার-চারটে পিস্তল মুখ উঁচিয়ে আছে চার কোণে। এর মধ্যে জনাতিনেক যুবক থলে হাতে এগিয়ে গেল মেয়েদের দিকে—অনুরোধ করে বললে, "মা-বোনেরা—আমাদের ভিক্ষের ঝুলি ভরে দিন। গয়নাগুলো চাই।" একজন এগিয়ে গেল ইন্দ্র রায়ের মেয়ের সামনে—বললে, "দাও বোন তোমার গয়নাগুলো। তোমার স্বামী সুধীর দত্ত মস্ত বড়লোক—অলংকার তোমার ঢের হবে। দাও—দেরি করো না।" মেয়েটা কাঠ। আবার অনুরোধ এল, "তোমার সেই সোনা-কাকুর কথা মনে নেই—সাহেবরা যাকে ফাঁসীতে লটকেছে! আমরা তার শোধ নেবো বোন—মনে রেখো, তোমার প্রত্যেকটি অলংকার এক-একটি সায়েবের জন্য। তোমার সোনাকাকু আমাদের গুরু। তাঁর জীবনের প্রতিশোধ আমরা নেব।" কথা শুনে কি হলো কি জানি—মেয়েটা সমস্ত অলংকার একে একে খুলে দিল। অন্য দুটো থলেও ভরে গেছে। তারপর দুম্ দুম্ করে কয়েকটা বোমার আওয়াজ হলো। চারদিক ভরে গেল ধোঁয়ায়। ধোঁয়া কাটলে দেখা গেল—আসামীরা ফেরার। দু'-চার দিনের মধ্যে তবু ধরা পড়ে গেল কয়েকজন—জেলা শহর আর খুলনায়। মাসের পর মাস—দিনের পর দিন হন্যে কুকুরের মত অনুসন্ধান তল্লাস চালিয়ে কেস খাড়া করলে পুলিশ। জেলা শহর তোলপাড় করে জুড়ে দিলে যতো সন্দেহভাজন যুবকদের।

সানো চৌধুরী বললে, "তবু তার মধ্যেই একদিন পিস্তলের গুলী খেয়ে মরে গেল জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।"

মহেশ বলল, "কিন্তু গোবিন্দকে মোদের কোথায় কিসের সঙ্গে জুড়ে দিলে সানো কত্তা? কি হবে এখন।"

"ওই তো চিঠিতে লিখে জানিয়েছে—তোমরা উকিল দাও, খালাস হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।"

"জেলা শহর কোথায়—তাও জানি নি। উকিল লাগাব—টাকা কোথায়? ই শালা দারোগার কারসাজিতে কি মুস্কিলেই পড়লাম গো! আচ্ছা সানো কত্তা—পবনার কথা কিছু লেখে নি?"

চিঠিটা আর একবার উল্টে-পাল্টে দেখে সানো চৌধুরী বললে, "নাঃ, তার তো কোনো নাম নেই।"

"তবে সে সত্যি সত্যি গাঙেই গুলী খেয়ে মরেছে।" মহেশ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললে, "দুই স্যাঙাৎকে ধরে নিয়ে গেল একসঙ্গে। আরও কত কত লোককেই তো ধরল—কত কত নেতা ভলান্টিয়ার, সেই বুড়ো মাস্টারবাবু, উকিলবাবু,—তার বউ। মোরা ভেবেছিলম—তাদের সঙ্গেই আছে দুজন। অতগুলান ভালো ভালো লোক আছে—যা হবার হবে।"

নানা কথা শুনেছে ওরা। কেউ বলেছে—ছেড়ে দেবে ছ' মাস বাদে, কেউ বলেছে—জেল দ্বীপান্তর হয়ে যাবে। আবার কিছু কিছু ভলান্টিয়ারকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে খুব মারধর করে ছেড়েও দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। এই সব দেখে শুনে হতাশ হয় নি ওরা। হরিদাসীর মত মেয়েলোক—গোবিন্দের ধরা পড়ার পর যে কান্নাকাটি করে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একেবারে চর মাথায় করেছিল—সে-ও দু'দিন বাদে থেমে গিয়েছিল আশায় আশায়।

সানো চৌধুরীর কাছে সব কথা শুনে আজ ওদের সে আশার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রইল না।

মহেশ বলল, "তা হলে কি করবি মুকুন্দ।"

মুকুন্দ এতক্ষণ পাথরের মত ঘাড় হেঁট করে বসেছিল—মহেশের কথায় মুখ তুলে তাকাল। নানা দিক থেকে ঘা-খাওয়া একটা জোয়ান ছোকরা—ঝক্‌মক্ করছে চোখ। নিরুপায় ক্ষোভে ক্রোধে সে চোখ ওর সজল হয়ে উঠল। দম চেপে বললে, "ওই দারোগা...ছোট মণ্ডল, একদিন আমি এর শোধ লেবো। মোর বাপের দিব্যি। বাপের দিব্যি।"...

সানো চৌধুরী বললে আস্তে আস্তে, "বড় তরফের কেউ শুনতে পেলে এই দারোগার জিম্মায় তোকেও যেতে হবে—আমাকেও যেতে হবে। দুই ছেলেকে তো আমার আগেই ধরে নিয়ে গেছে। তবু দু' হাত তুলে তোকে আশীর্বাদ করি মুকুন্দ, তাই যেন পারিস। ওদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

মহেশ চমকে উঠল। সানো চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলল শুধু, "সানো কত্তা—তুমিও তাহলে এর মধ্যে আছ!"

সানো চৌধুরী বললে, "আমি কি এ দেশে জন্মাই নি মহেশ!"

[ক্রমশ]

JUST OUT JUST OUT

BANKIM RACHANAVALI VOL II

A collection of works of Bankim Chandra Chattopadhyaya—of whatever he wrote in English—so far found out—complete in ONE VOLUME. Edited by Shri Jogesh Chandra Bagal—

CONTENTS

PART I RAJMOHAN'S WIFE

PART II ESSAYS AND LETTERS

ESSAYS :

On the Origin of Hindu Festivals. A Popular Literature for Bengal. Bengali Literature. Buddhism and the Sankhya Philosophy. The Confession of a Young Bengal. The study of Hindu Philosophy. Vedic Literature.

LETTERS :

Total 30 in number.

PART III LETTERS ON HINDUISM

Total 8 in number.

PART IV DEVI CHAUDHURANI (Incomplete)

Foreword, Life-sketch of Bankim Chandra and Editorial notes by the Editor, specimen handwriting and an art-plate of Bankim Chandra have been included in the volume.

REXIN BOUND * FINE JACKET * DECENT GET-UP

RUPEES FIFTEEN ONLY

A volume worth possession and presentation.

SAHITYA SAMSAD

32A, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta 9

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ ও লোকগীতির প্রভাব

ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী

শুধু বাংলা বা ভারতের নয়, সারা বিশ্বের মহাপ্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের মত একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার, নট ও নাট্যকার, শিল্পী ও দার্শনিক ইত্যাদি। তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গে আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যদি অন্য কিছু না হয়ে কেবলমাত্র সঙ্গীত রচয়িতা এবং সুরকার হতেন তাতেও তাঁর কর্মকৃতি অক্ষয়কীর্তি অর্জন করতে পারতো। তাঁর বিশাল এবং বিচিত্র সঙ্গীতসম্ভার সারা বিশ্বের সকলের বিস্ময়ের বিষয়। 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারায়' মিলিত হয়ে যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত মহাজীবন গড়ে উঠেছিল, দীর্ঘ আশি বৎসর ধরে—যার ফলশ্রুতি বহু বিচিত্ররূপে শত-সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে স্তরে স্তরে—মাত্র সামান্য কয়েক পাতায় তার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল সঙ্গীতের প্রভাব, বাংলার অভিজাত (বৈঠকী) এবং লোক-সঙ্গীতের প্রভাব, ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রভাব, নানা প্রাদেশিক সঙ্গীতের প্রভাব ইত্যাদি। আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের গানে হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল সঙ্গীত ও বাংলার লোকগীতির প্রভাব নিয়ে খুব সংক্ষিপ্তাকারে কিছুটা আলোচনা করছি।

সঙ্গীত-ঐতিহ্যবহুল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বংশপরম্পরায় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সে ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে সঙ্গীত সৃষ্টির পথে অগ্রসর হন। অবশ্য ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছাড়া দেশী-বিদেশী প্রায় সব রকম সঙ্গীতের কদর ছিল। সে প্রভাবকেও রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে পারেন নি এবং সময়ে তারাও রবীন্দ্র-সঙ্গীত মহাকাশে পক্ষ সঞ্চালন করতে দ্বিধা করে নি। তাহলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির প্রথম দিকে হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল সঙ্গীতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভাবধারায় তিনি যা গান রচনা করেছেন তাকে প্রধানভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। যথা:—(১) ধ্রুপদ প্রকৃতির রবীন্দ্র-সঙ্গীত, (২) ধামার প্রকৃতির রবীন্দ্র-সঙ্গীত, (৩) খেয়াল প্রকৃতির রবীন্দ্র-সঙ্গীত, (৪) টপ্পা প্রকৃতির রবীন্দ্র-সঙ্গীত, (৫) ঠুংরী প্রকৃতির রবীন্দ্র-সঙ্গীত। পরিপূর্ণ ধ্রুপদ কিম্বা খেয়াল ইত্যাদি না বলে ধ্রুপদ প্রকৃতির, খেয়াল প্রকৃতির ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য—রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার গানের রূপাঙ্গিকের দিক থেকে বেশ কিছু তফাৎ রয়েছে এবং তার জন্যই আলাদা নামকরণের সার্থকতা। এই তফাৎটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় সঙ্গীতের অলঙ্কার প্রয়োগ বিষয়ে। যেমন, হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানে বাঁট অর্থাৎ লয়ের দুগুণ-চৌগুণ ইত্যাদি ক্রিয়াকৌশলের প্রচলন আছে এবং অতীত গ্রহ, অনাগত গ্রহ ইত্যাদি লয়ের কাজও দেখানো হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে এসবের ব্যবহার নেই। প্রাচীন ধ্রুপদ গানে গমকের বাহুল্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ প্রকৃতির গানে গমকের ব্যবহার আছে কিন্তু বাহুল্য নেই। তবে সমগ্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত রচনাধারায় হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ

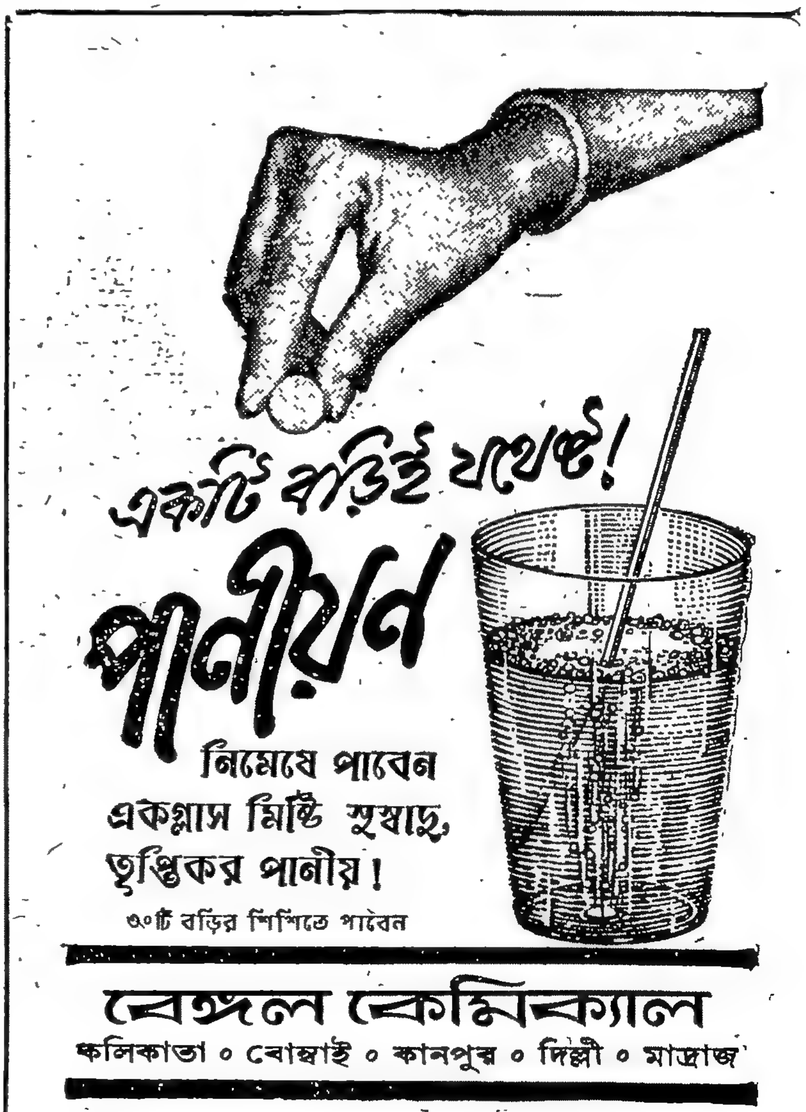

সঙ্গীতের একটি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, সেটা হলো চার তুকের ব্যবহার। ধ্রুপদ গানে সাধারণত স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারটি অংশ বা তুকের প্রচলন বেশি। এর অনুসরণে রবীন্দ্রনাথও তাঁর অধিকাংশ গানে চার তুকের ব্যবহার করেছেন। খেয়ালের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, হিন্দুস্থানী খেয়াল গানে যেমন তান, বোলতান, বিস্তার ইত্যাদির ব্যবহার আছে —কিন্তু রবীন্দ্রনাথের খেয়াল প্রকৃতির গানে কিছু মীড়, গমক এবং অল্পবিস্তর ছোট ছোট হাল্কা তানের ব্যবহার থাকলেও ভারী কোন অলঙ্কারের ব্যবহার নেই। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ক্লাসিকাল প্রকৃতির গানগুলির ক্ষেত্রেও এই একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। সঙ্গীতে অলঙ্কার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটা চিন্তা-ধারা ছিল। অলঙ্কারবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন অলঙ্কারবাহুল্য সঙ্গীতের প্রকৃত রূপকে আবৃত করে রাখে। এই অলঙ্কারবাহুল্যকে তিনি বলতেন 'কার-দানী'। এ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"যারা পালোয়ান প্রকৃতির লোক, সঙ্গীতে তারা দুন-চৌদুনের বেগ দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পদ্মবনের তরঙ্গদোলায় যারা বীণাপাণির মাধুর্যে মুগ্ধ, ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে তাঁর মোটর-রথযাত্রার প্রস্তাবে তাদের মন হায়-হায় করতে থাকে।" তিনি অন্যত্র বলেছেন—"যথার্থ আর্টের মধ্যে সহজ প্রাণ আছে বলেই তার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে: কিন্তু যেহেতু কারুনৈপুণ্যটা অলঙ্কার, যেহেতু তাতে প্রাণের ধর্ম নেই; তাই তাকে প্রবল হতে দিলেই আভরণ হয়ে ওঠে শৃঙ্খল; তখন সে আর্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বন্ধ করে দেয়, তার গতিরোধ করে। তখন যেটা বাহাদুরি করতে থাকে সেটা আত্মিক নয়, সেটা বৈষয়িক; অর্থাৎ তার মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত সঞ্চয় আছে। ......তানসেন প্রভৃতির অক্ষয় কমণ্ডলু থেকে যে ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, ওস্তাদ প্রভৃতি জহ্নু মুনি কার্দানি দিয়ে সেটি গিলে খেয়ে বসে আছে।" মূল কথা হলো রবীন্দ্রনাথ সুর ও বাণীর 'হর-গৌরী' মিলনকে পছন্দ করতেন, সুরের নানা ক্রিয়া-কৌশলে বাণীর মর্মরূপ ব্যাহত হোক, এটার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ প্রকৃতির খেয়াল প্রকৃতির ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার গান-গুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর প্রত্যেকটি ধারার গানগুলি দুটো স্তরে বিভাজিত। প্রথম স্তরের গানগুলি প্রাচীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুকরণে এবং অনুসরণে রচিত। অর্থাৎ এই স্তরের গানগুলির এক অংশে রয়েছে প্রাচীন ওস্তাদদের রচিত গানের হুবহু অনুকরণে সৃষ্ট গানের সমষ্টি এবং অন্য অংশে আছে প্রাচীন ওস্তাদদের রচিত গানের অনুসরণে সৃষ্ট গান। দ্বিতীয় স্তরের গানগুলো রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভার আলোকে সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাবে রচিত হলেও—এতে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিপ্রতিভার যথার্থ স্বাক্ষর রয়েছে। হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল সঙ্গীতের এই বিভিন্ন ধারাগুলোর প্রভাব এক সময়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতমানসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও পরে পরে তিনি এ সমস্ত ধারার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। পারেন নি কেবল হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর মোহপাশ ছিন্ন করতে। এক সময়ে রাগ-রাগিণীর নির্দেশ তাঁর সঙ্গীত থেকে তুলে দিলেও, সে সময়কার, এমন কি তাঁর শেষ পর্বের গানেও এই সমস্ত রাগ-রাগিণীর অবাধ চলাফেরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের লোকগীতি প্রভাবিত গানগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, নিতান্ত বালক বয়সে অর্থাৎ 'ভৃত্যরাজতন্ত্রে' বাস করার সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের লোকগীতির সংস্পর্শে আসেন। এছাড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, ঢপ-কীর্তন ইত্যাদিরও প্রচলন ছিল এবং এখান থেকেও তিনি কিছু কিছু উপাদান পেয়েছিলেন। আবার পিতার সঙ্গে বালক বয়সে বোটে করে পদ্মা নদীর ওপর ঘুরে বেড়াবার সময় মাঝি-মাল্লাদের মুখ থেকেও তিনি কিছু কিছু পল্লীসঙ্গীত শুনেছিলেন। তা-হলেও এর মধ্যে তখনো পর্যন্ত তার অন্তরের যোগাযোগ খুব ছিল না। প্রকৃত-পক্ষে এই যোগাযোগ স্থাপিত হল যখন তিনি জমিদারী পরিচালনার কাজে উত্তর-বঙ্গের কুষ্ঠিয়া, শিলাইদহ ইত্যাদি পল্লী অঞ্চলে যান। এ সময়ে তিনি বাউল, ফকির, দরবেশ, বৈষ্ণব, মাঝি-মাল্লা, জেলে ইত্যাদি বাংলাদেশের নানাশ্রেণীর লোক-জীবনের নিবিড় সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের কাছ থেকে নানা লৌকিক গান ও লৌকিক সুর সংগ্রহ করেন। এ সমস্ত লোকসঙ্গীতের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসার ফলে তাঁর সঙ্গীতচিন্তাধারার মধ্যেও একটা গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ক্রমে এ সমস্ত লোকসঙ্গীত তাঁর সাহিত্য এবং সঙ্গীতকর্মে দূরপ্রসারী বিস্তৃতি লাভ করে। বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাব, ভাষা ও সুরের দিক থেকে বাংলার লোক-সঙ্গীত খুবই সমৃদ্ধ এবং এর শ্রেণী-সংখ্যাও বিস্তর। বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের প্রভাব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে নেই। তাঁর গানে রয়েছে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর প্রভাব। যথা:—(১) বাউল, (২) রামপ্রসাদী সুর, (৩) সারি, (৪) ঢপ-কীর্তন, (৫) কথকতা, (৬) বিভাস সুর। উল্লিখিত পল্লীসঙ্গীত শ্রেণীর সুরের মধ্যে বাউলের সুর রবীন্দ্র-নাথকে অধিকতর প্রভাবিত করেছিল। বাউলধর্ম এবং বাউলের সুর তাঁকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে, তিনি নিজের 'রবিন্দ্র-বাউল' বলতেও দ্বিধা করেন নি। এ প্রসঙ্গে একজন প্রতিভাবান বাউলের নাম স্মরণ করা যায়, যাঁর প্রভাব রবীন্দ্র-সঙ্গীতমানসে খুব বেশি ছিল। তিনি হলেন কুষ্ঠিয়ার লালন ফকির। বাউলের সুরে রবীন্দ্রনাথ অনেক গান রচনা করে-ছেন। এ সমস্ত গানের কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর অনুকরণ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি স্বকীয় প্রতিভার সুরারোপ করেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়—বাউলে, সারিতে এবং কীর্তনে মেশামিশিও হয়ে গেছে। রামপ্রসাদী সুরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানা গান রচনা করেছেন। এক সময়ে তিনি নিজে স্টেজে রামপ্রসাদী সুরে গান পরিবেশন করেছিলেন। সারি গান মাঝি-মাল্লার গান। রবীন্দ্রনাথের কিছু গান সারি গানের সুরে রচিত। ঢপ-কীর্তন অপেক্ষাকৃত সহজ-সুরের কীর্তন। যশোরের মধুসূদন কিন্নর বা মধু কান এই গানের প্রবর্তক। এক সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে ঢপ-কীর্তনের প্রসার ছিল। রবীন্দ্রনাথের গানে ঢপ-কীর্তনেরও প্রভাব রয়েছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কথকতার প্রচলন ছিল, এমন কি বাঁধা মাহিনায় কথকঠাকুরও নিযুক্ত ছিল। এই কথকতার পদক্ষেপও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের লোকগীতিতে একটি বিশেষ সুরের খুব প্রচলন ছিল। এই সুরটির নাম 'বিভাস' এই বিভাসের রাগরূপ 'হিন্দুস্থানী বিভাস' থেকে কিছুটা আলাদা। এই দেশী বিভাসের সুরেও রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লোক-গীতি প্রভাবিত গানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে হুবহু অনুকরণ খুব কম। কবি বিভিন্ন লৌকিক সুর নিয়ে তার সঙ্গে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' একটা আলাদা সুরে রূপান্তরিত করে গানগুলিকে আপন সৃষ্টি সীমানায় আবদ্ধ করেছেন।

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

রেকর্ড-সঙ্গীতের সেকাল

"গ্রামোফোন কোম্পানিতে আমি একদিন একটা ভাওয়াইয়া গানের কলি আওড়াচ্ছিলাম। কাজিদা কতক্ষণ ধরে যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন টের পাই নি। গান শেষ হয়ে গেলেই তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, "গাও তো আব্বাস আবার গাও।" আমি গানটা একবার গাইলাম। বললেন, "না তুমি গেয়েই চল যতক্ষণ আমি থামতে না বলি।" চোখ বুজে গানটা বোধহয় দশ-পনের মিনিট গেয়েছি, এবার তিনি বললেন, "আচ্ছা এবার এই গানটা গাও দেখি ঠিক ঐ সুরে।" ওরই মধ্যে অবিকল সেই সুরে তাঁর গান লেখা হয়েছে।

আমার গানের কলি ছিল—

"নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোং ছেকাপাড়া—"

কাজিদা লিখলেন,

"নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখি লো
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী।"

আব্বাসউদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে নজরুলের এই গীতরচনার পটভূমিকাটি দিয়েছেন। অপূর্ব রচনা। কিন্তু একে কি লোকগীতি বলতে পারি? এ গানটির সঠিক পরিচয় হওয়া উচিত লৌকিক-সুরাশ্রয়ী নজরুলগীতি। কাজী নজরুলের একটি ভাটিয়ালিও জনপ্রিয় হয়েছিল :

কাঁচবরণ কন্যারে তার
মেঘবরণ কেশ
আমায় নিয়ে যাওরে নদী
সেই সে কন্যার দেশ।
পরনে তার মেঘডম্বুরে
উদয় তারার শাড়ি
রূপ নিয়ে তার চাঁদ সুরুযে
করে কাড়াকাড়ি
পিছলে পড়ে চাঁদের কিরণ
নিটোল তারি গায়
সকাল সন্ধ্যা আসে তারি
আলতা হতে পায়।
—ইত্যাদি।

রচনার অঙ্গসৌষ্ঠবে এটাও ভাটিয়ালি নয়, এটা হলো ভাটিয়ালি সুরাশ্রয়ী নজরুলগীতি।

সে সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর স্টুডিওতে আঞ্চলিক 'হালুয়ার ভাষা'র প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। খাঁটি 'বাঙ্গাল' কিংবা "বাহে" ভাষার গান রেকর্ড হওয়ার সম্মান পাবে—এ ছিল অসম্ভব কথা। কাজেই 'কচুয়া নদীকে' অঞ্জনা নাম দিয়ে কিংবা 'তোরষা নদীকে' পদ্ম-দীঘি নাম দিয়ে পোষাক বদলিয়ে সেখানে ঢুকতে হতো। অনেক সময় কিছু কিছু শব্দ বদলিয়ে একটু পালিশ লাগিয়ে রক্ষা করতে হতো—'শিক্ষিত' বাঙালীর রুচিকে পরিবেশন করার জন্য। কিন্তু আব্বাসউদ্দীন প্রমুখ লোক-শিল্পীরা সেদিন তা নীরবে মেনে নেন নি। তাঁদের সংগ্রামের সাফল্যই সেদিন খাঁটি গ্রাম্য মানুষের কথা ও সুরকে বাংলা সংস্কৃতির সম্মানের আসনে বসিয়েছিল।

শচীনদেব বর্মণকেও 'শিক্ষিত রুচির' 'ভদ্র ভাষার' লোকগীতি নিয়ে গ্রামোফোন জগতে প্রথম প্রবেশ করতে হয়েছিল। তাঁর প্রথম গানটি ছিল :

ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে
মাঠের বাটে যাই
আকাশ তখন উষার সিঁথায়
সিঁদুর মাথায় ভাই।

রূপ যেন তার চোখ ধাঁধানো
রোদ মাখানো ছবি
আউলি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি
ঘরে বটের ছবি॥
-ইত্যাদি।

গানখানা রচনা করেছিলেন হেমেন্দ্র-কুমার রায়। শহরের শিক্ষিতশ্রেণী শুধু নয়, গ্রামের কৃষিভিত্তিক মধ্যবিত্তদের মধ্যেও এ ধরণের গান সম্পর্কে কোন প্রশ্নই সেদিন জাগে নি। বরঞ্চ তারা এর মধ্যে সেদিন একটি নতুন আমেজ ও আস্বাদ পেয়েছিলেন।

কিন্তু আব্বাসউদ্দীনের মত শচীন-দেব বর্মণও উপলব্ধি করেছিলেন, গ্রামের জল-মাটি-হাওয়ায় যে ভাষার ও বাক্য-বিন্যাসের উৎপত্তি তাকে বাদ দিয়ে গ্রামের সুর—চখাহাবা চখীর মত অবলম্বনহীন হয়ে পড়ে। আব্বাস-উদ্দীনের "ওকি গাড়ীয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে" কিংবা "ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে" যেমন, তেমনি শচীনদেবের 'মনোদুঃখে মরিবে সুবল সখা' কিংবা "বন্ধু বাঁশী দাও মোর হাতেতে" প্রভৃতি গানে সেদিন যেন শিক্ষিত, ভদ্র, গুমোট পরিবেশে নিয়ে এলো দমকা মেঠো হাওয়ার প্রাণজুড়ানো শীতলতা।

গ্রামোফোন কোম্পানীগুলির প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির জন্য তাঁরা সেদিন বরঞ্চ এতে পরে উৎসাহই দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানীর দক্ষিণা প্রদানের উল্টো রীতিতে—সেদিন কিছু শহুরে রচয়িতার জন্মও দিয়েছিল। সংগৃহীত লোকগীতিতে যে পারিশ্রমিক ছিল, নিজস্ব রচনায় মিলতো তার দ্বিগুণ। কাজেই অনেক সময় সংগৃহীত গান

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
ন্যাশন্যাল ডিলাক্স"
১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন :
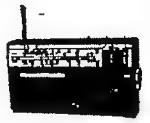
Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

যেমন একটু শব্দের হের-ফের করে নিজের নামে চলতো আবার কেউ কেউ নিজেও রচনা করতেন। কিন্তু সব রচনাই অসার্থক হতো না। বিশেষ করে গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে যাঁদের ছিল গভীর সম্পর্ক তাদের কাছ থেকে কিছু ভাল রচনাও আমরা সেসময় পেয়েছি। জসিমউদ্দীন, আব্বাসউদ্দীনের ভাই আবদুল করিম, গিরীন চক্রবর্তী, ক্ষিতিশ বসু প্রমুখরা গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিলেন, তেমনি আবার গ্রামের জীবনের সঙ্গেও ছিলেন গভীর-ভাবে যুক্ত। আজকের শহুরে রচয়িতা-দের মত তাঁরা বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে বাস করতেন না। তখনো "কমার্শিয়াল গান" রচনার যুগ আসে নি—বরং গ্রাম-মুখীনতার এক আন্দোলনে সেদিনের প্রচেষ্টা ছিল সঞ্জীবিত। ইচ্ছাকৃত বিকৃতি বা সুরসালসা সৃষ্টির রেওয়াজ ছিল না। তাই সে সময়কার অনেক রচনা লোকসংগীতের ধারাস্রোতে সহজেই মিশে যেতে পেরেছিল। কিছু কিছু রচনাতে মার্জিত হাতের স্পর্শ ছিল সুস্পষ্ট কিন্তু এতো বিশ্লেষণের অবকাশ সেদিন ছিল না।

বাংলাদেশের অমর নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী যে একজন ভাল সুরজ্ঞ সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন আজকাল অনেকেই তা জানেন না। টুইন কোম্পানীতে রেকর্ড করা তাঁর একটি গান সেদিন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। গানটি হলো :

"এই যে ভরা নদীর বাঁকে
কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যায় যে ঘরখানি—
সেথায় বধু থাকে লো
সেথায় বধু থাকে।"...

"নক্সীকাঁথার মাঠে"র কবি জসিম-উদ্দীন ছিলেন সেদিনকার রচয়িতাদের অগ্রণী। তিনিও অনেক সময় প্রাচীন পল্লীগীতি রচনায় হাত বুলিয়েছেন, কিংবা পল্লীরচনায় আস্থায়ী নিয়ে তাতে অন্তরা সংযোগ করে দিয়েছেন কিংবা একটু অদল-বদল করেছেন। সেকরম একটি অতি জনপ্রিয় ভাটিয়ালি রেকর্ড করেছিলেন আব্বাসউদ্দীন :

"ও আমার দরদী আগে জানলে
আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায়
চড়তাম না।
ভাঙা নৌকায় চড়তাম না আর
দূরের পাড়ি ধরতাম না
নবলাখ বাণিজ্যের বেসাত ঐ নায়ে
বোঝাই করতাম না"

সোনার দাঁড় পবনের বৈঠা
ময়ূরপঙ্খী নাওখানা
চাঁদ সুরুযে গলই ভরে
ফুল ছড়াইতো জোছনা॥

তার পরেই সঞ্চারীতে ব্যতিক্রম আনা হয়েছে—

"কল কল ছল ছল,
করে জল টল্‌মল্‌
আগে চল আগে চল,
নাহি বল তবু চল
ওরে মাঝি তুই কেন
হলি আজ বিমনা
ও তোর সামনে নাচে বিজলী লয়ে
কন্যা সোনার বরণা।"

এ গানটি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ড বিক্রিতে এক রেকর্ড স্থাপন করেছিল। শুনেছি প্রায় এক লক্ষ রেকর্ড বিক্রি হয়েছিল।

জসিমুদ্দীন রচিত শচীনদেব বর্মণ গীত একটি অতি জনপ্রিয় গান "নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভ্রমরা" এই ধরণের একটি রচনা—যা নিয়ে পরবর্তী সময়ে সংগ্রাহক ও গবেষক মহলে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। এ গানটি ছিল শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার পীর শেখভানুর একটি গানের পরিবর্তিত রূপ। শেখ ভানুর গানটি ছিল মারিফতী দেহতত্ত্বের :

নিশীথে যাইও ফুল বনেরে ভ্রমরা।
নিশীথে যাইও ফুল বনে।
জ্বালাইয়া দিলের বাতি
জেগে রবো সারারাতি
কত রঙ্গে ধরবে ফুলের কলি/
রে ভ্রমরা॥

নয় দরজা করিয়া বন্ধ
লইও ফুলের গন্ধ
অন্তরে জপিও ফুলের নাম/
রে ভ্রমরা॥

ডাল পাতা বৃক্ষ নাই
এমন ফুল ফুটাইছে সাঁই হে
ভাবুক ছাড়া বুঝে না পন্ডিতে/
রে ভ্রমরা॥

অধীন শেখ ভানু বলে
ঢেউ খেলাইও আপন দিলে হে
পদ্ম যেমন ভাসবে গাঙ্গার জলে/
রে ভ্রমরা॥

দেহতত্ত্বের এই গানটিকে বদলিয়ে জসিমুদ্দীন প্রেমের গানে রূপান্তরিত করেছেন। মধ্যলয়ে চতুর্মাত্রিক টানা ভাটিয়ালি সুরের মূল গানটিকে দ্রুত লয়ে ত্রিমাত্রিক সারির ঢঙে রূপান্তরিত করা হয় :

নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা।
জ্বালাইয়া চান্দের বাতি
(আমি) জেগে রবো সারারাতি—গো
আমি কবো কথা শিশিরের সনে/
রে ভ্রমরা॥
—ইত্যাদি।

সঞ্চারীতে সুর বদলিয়ে—

ফুলের ঘুম যেন ভাঙে না....
নীরব চরণে তুমি যাইও..
—ইত্যাদি।

সংযোজিত করা হয়। রচনার গুণে, সুরে ও ছন্দে এবং শচীনদেবের মরমীকণ্ঠে সেদিন এ গানটি বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মনে দোলা লাগাতে পেরেছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে কবি জসিমুদ্দীনের এটা করার কি অধিকার ছিল? এ নিয়ে সুধীদের আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

এইচ, এম, ভি

রেকর্ড প্লেয়ার ও রিপ্রডিউসার।

নগদ অথবা কিস্তিতে

নানা রকমের রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড রিপ্রডিউসর রেকর্ড চেঞ্জার, গ্র্যামোফোন রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার, ট্রান-জিসটর রেডিও ও রেডিওগ্রাম, গদরেজ রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি বিক্রি করা হয়। মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৪-৪৭১৩

রঙ্গমঞ্চে দেশে দেশে শিল্পী এবং আদর্শে

নর্মান মার্শাল ও গেইট থিয়েটার। ক্রিসমাসের সময় আর একটি রেভ্যু মঞ্চস্থ করা হোল—হারমিয়ন জিনগোল্ড এবং বিলি মিলটন ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। এরপর লেজলি এবং সেওয়েল স্টোকসের রচিত 'ফ্রোজেন গ্লোরী' নামানো হল—এঁদেব লেখা অপর দুটি নাটকের মত এটি ঠিক জনপ্রিয় হোল না। আন্দ্রে জেসেটের 'এলিজাবেথ' নাটকটি প্রচন্ড সাফল্য অর্জন করলো। নামভূমিকায় জিলিয়ান ব্রেথ-ওয়েট অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে-ছিলেন। জিলিয়ানের মত নামকরা অভি-নেত্রী. যিনি ওয়েস্ট এন্ডের মঞ্চেই অভিনয় করতে অভ্যস্ত, তিনি যে সব রকমের অসুবিধা সহ্য করেও গেইটে এসে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেও দীর্ঘ ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হবেন একথা আমি কল্পনা করতে পারি নি। তাঁর এই উদারতার প্রতিদানও তিনি পেয়েছিলেন দর্শকদের তরফ থেকে প্রথম রাত্রিতেই। কার্টেন উঠলে দেখা গেল সোনালী পোষাকে মণ্ডিত রাণী কালো পশ্চাদপটের সামনে বসে এসেক্সের সঙ্গে তাস খেলছেন—সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ থেকে হর্ষধ্বনি উঠলো—গেইটে এর আগে কখনও দর্শকেরা কোনো নটের আবির্ভাবকে এভাবে উচ্ছ্বাসের দ্বারা অভিনন্দন জানায় নি। এই নাটকটি নিয়েও পত্র-পত্রিকায় সেন্সরের বিরুদ্ধে বহু অভি-যোগ উঠেছিল সে সময়—কারণ এই নাটকটিকেও পাবলিক শো করবার লাই-সেন্স দেওয়া হয় নি। শেষ পর্যন্ত জন-মতের চাবিতে 'এলিজাবেথ' নাটকটি হে মার্কেট থিয়েটারে অভিনয় করবার অনু-মতি লাভ করে—কিন্তু এটির ওপর এমন-ভাবে কাঁচি চালানো হয়েছিল যে, ওখানে এটি মোটেই জমে নি।

হে মার্কেটে 'এলিজাবেথের' শুভ উদ্বোধন রাত্রে গেইটে নতুন নাটক 'দি মাস্ক অভ্ কিংস্'-এর অভিনয় শুরু হোল। ইংলন্ডের দর্শকেরা এই প্রথম নিজের দেশে ম্যাক্সওয়েল এ্যান্ডারসনের প্লে দেখবার সুযোগ পেলেন। আমি প্রথম ঠিক করেছিলাম যে, উইন্টারসেট্ নাটকটি প্রডিউস করবো—কিন্তু নিউ ইয়র্কে এই নাটকের অভিনয়, প্রডাকসন এবং সেটিং এত উচ্চস্তরের হয়েছিল যে, তারপর এটি গেইটে মঞ্চস্থ করবার সাহস আমার হোল না। কিন্তু নিউ ইয়র্কে 'দি মাস্ক অভ্ কিংস্' দেখে আমার মোটেই ভাল লাগে নি। কস্টিউম প্লে'র ব্যাপারে আমেরিকান অভিনেতা, পরিচালক এবং ডিজাইনাররা খুব স্বচ্ছন্দ হতে পারেন না বলেই আমার বিশ্বাস—তাই আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, এ নাটকটি গেইটে আমি অনেক উন্নত ধরণের প্রডাকসন হিসাবে প্রেজেন্ট করতে পারবো। গেইটের প্রডাকসনের প্রধান প্রধান ভূমিকায় ছিলেন এরিক গোর্টম্যান, মিল্টন রজমার, ম্যারী হিনটন এবং জিল ফার্স—প্রচন্ড সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে-ছিল আমাদের এই প্রডাকসনটি।

এই সিজন শেষ হওয়ার কথা ছিল বেরম্যানের 'সেরেনা ব্ল্যান্ডিস' নাটকটি (এর আরেকটি নাম ছিল ডিফিকাল্টি অভ্ গেটিং ম্যারেড) দিয়ে। রিহার্সালে সেরে-নার ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা ভিভিয়ান লি'র—কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়াতে ঠিক হোল পরের সিজনের প্রথম-দিকে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। ওই সময় আমি চলে গিয়েছিলাম আমেরিকাতে 'অস্কার ওয়াইল্ড' প্রডিউস করবার জন্য। সুতরাং গেইটে 'সেরেনা ব্ল্যান্ডিসের' প্রডাকসনের ভার পড়লো এজমে পারসির ওপর। ভিভিয়ান লি'র বিপরীতে অভি-নয় করেছিলেন স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জার—লন্ডন স্টেজে এই তাঁর প্রথম অভিনয়। আমি ফিরে আসার পর গেইটে জেমসকারেজ লিখিত 'প্রাইভেট হিস্ট্রি' নাটকটি অভি-নীত হচ্ছিল—এটি স্কুল লাইফ বিষয়ক নাটক। এর প্রডাকসনের দায়িত্ব ছিল রেজিন্যাল্ড বেক্উইথের ওপর—এর আগেও বেক্উইথ গেইটে কয়েকটি প্রডাকসন করে-ছিলেন—এর ভেতর নামকরা ছিল 'ইন্-ভিটেশন টু এ ভয়েজ' এবং 'লর্ড এ্যাস্ট্রি-ডেন।' 'প্রাইভেট হিস্ট্রি' প্রত্যহই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হত। ক্রিসমাসের সময় আর একটি রেভ্যু মঞ্চস্থ করা হোল। হারমিয়ন জিনগোল্ডের সহযোগী শিল্পী হিসাবে ছিলেন ওয়াল্টার ক্রিসহ্যাম। এ বছরে গেইট দুটি নতুন শিল্পীকে আবি-ষ্কার করে দর্শকদের সামনে এনে হাজির করলো—মাইকেল ওয়াইলডিং এবং ক্যারোল লিন। কোন্ রেভ্যু দর্শকদের মনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করবে—মহলার সময় তা ঠিকভাবে বুঝে ওঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। রিহার্সালে আমার মনে হয়েছিল গেইটে যত রেভ্যু আমরা মঞ্চস্থ করেছি এটি তার ভেতর সব থেকে নিম্নস্তরের। মঞ্চস্থ হবার পর দেখা গেল এটিই সব সেরা রেভ্যু হিসাবে দর্শক আকর্ষণ করছে। ওয়েস্ট এন্ডের অনেক ম্যানেজমেন্ট থেকে প্রস্তাব এল এটি ওখানকার কোন মঞ্চে নিয়ে অভিনয় করবার জন্য—তবে এঁরা প্রত্যেকেই শর্ত দিলেন নানা জায়গায় নাটকটির অদল-বদল করতে হবে। সাধারণ দর্শকদের জন্য নাটকটিতে নাকি আকর্ষণীয় বস্তুর অভাব ছিল এবং যথেষ্ট কৃত্রিমতা থাকাতে এটি অস্বাভাবিকতার স্তরে চলে গিয়েছিল। তাছাড়া এইসব ম্যানেজমেন্টের লোকেরা বলছিলেন যে, এই রেভ্যুটিকে সত্যিকার আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য দরকার ছিল একটি অর্কেস্ট্রা একদল নৃত্যশিল্পী এবং তারকা শ্রেণীর দু'-এক-জন নটনটী। এ ছাড়াও আর কিছু কিছু নব্য ধরণের বস্তুর অভাব ছিল এই নাটকে এঁদের মতে। অথচ এঁরা যেকথা সঠিক-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি তা হচ্ছে এই—যে রেভ্যু সত্যিকার সাফল্য অর্জন করে জনপ্রিয় হয়, তার ভেতর ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত হয়ে থাকে একটি সূক্ষ্ম সমতার ভাব—সমস্ত কিছুর সঠিক সংমিশ্রণেই এই সমতা গড়ে ওঠে। তাছাড়া যে-কোনও রেভ্যু যদি একটা বিশেষ স্টাইলের পরিচয় বহন করতে চায়—তাহলে একজন ব্যক্তিরই শিল্পরুচি এবং শিল্প-বোধের রূপায়ণ এর ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে—not an indigestible hotch-potch resulting from a dozen people's suggestions and preju-dices. শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম এই গেইট রেভ্যুটিকে যেমন আছে তেমনি অবস্থায় ওয়েস্ট এন্ডে অভিনয় করতে হলে. আমাকে নিজেকেই এর প্রডাকসনের দায়িত্ব নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এ্যামব্যাসেডর থিয়েটার ভাড়া নিলাম এবং শো-টি ওখানে স্থানান্তরিত করলাম—দু বছর পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে রেভ্যুটি অভি-নীত হয়েছিল।

[নর্মান মার্শাল অস্পষ্টভাবে যে কথা বোঝাতে চেয়েছেন 'অর্থাৎ নাটকের সব-দিকের সমতা রেখে নাটকটির ভাষ্য দেওয়া' তা অনেক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ইংলন্ডের বিখ্যাত প্রডিউসার গর্ডন ক্রেগের নানা রচনার মাধ্যমে। ক্রেগ অবশ্য প্রডিউ-সার হিসাবে কর্মজীবনে স্বদেশে বিশেষ কাজ করবার সুযোগ পান নি। জার্মানীতেই তাঁর কাজের কদর হয় বেশি। তাছাড়া স্টানিসলাভস্কি তাঁকে মস্কোতে নিয়ে গিয়েছিলেন 'হ্যামলেট' প্রডিউস করবার জন্য—মস্কো থিয়ে-

দি ডাচেস অভ মলফি—রোজার ফার্সের সেটিং

টারের বিখ্যাত 'হ্যামলেট' প্রডাকসনটি ক্রেগেরই পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতিও অর্জন করেছিল। ক্রেগ বলেছেন: Art is not imitation but vision. খুবই সত্যি কথা—অনুকরণে শিল্প সৃষ্টি হয় না। ভিসন বা অন্তর্দৃষ্টির অনুপ্রেরণায় কাজ করেন বলেই প্রডিউসার মঞ্চরূপায়ণে নাটককে শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যদি অর্কেস্ট্রার বা সিন ডিজাইনারের অযথা প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে তবে নাটকের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। নাটকের মূল ভাষ্য কিভাবে দেওয়া হবে সেটা প্রডিউসারই ঠিক করবেন। সঙ্গীত, দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদি আসবে তাঁর কাজের সহায়ক হিসাবে—নাটকের গতিকে ব্যাহত করবার জন্য নয়।

ক্রেগের 'দি আর্ট অভ্ দি থিয়েটার' প্রবন্ধে এক জায়গায় আছে:

প্রশ্ন: আচ্ছা, দৃশ্যপরিকল্পনার ব্যাপারটা কি সিন পেন্টারের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত?

উত্তর: আধুনিক থিয়েটারে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভুল ব্যবস্থা। "ক" লিখলে একটি নাটক এবং "খ" দায়িত্ব নিলে মঞ্চের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা করতে। স্পিরিট অভ্ এ প্লে'র ঠিকমত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কতটা সূক্ষ্ম শিল্প-কৌশলের দরকার তা তো জান? আর এর জন্য প্রধানত দরকার নাটকটির ভাবধারার সমতা রক্ষা করা। আর এই সমতা বজায় রাখতে হলে সব কাজের সব রকম দায়িত্ব কি "খ"-এর ওপর দেওয়াই উচিত নয়? তা না করে "গ", "ঘ" এবং "ঙ"-র ওপর যদি কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে এই সমতা আসবে কোথা থেকে? প্রডাকসন সম্বন্ধে তাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা বা দেখবার ধরণটাই যে "খ" বা "ক"-এর থেকে অন্য রকম হবে। সেক্ষেত্রে Unity of the spirit of the play বজায় থাকবে কি করে?]

গেইটে তারপর যে নাটকটি মঞ্চস্থ হল সেটি হচ্ছে ফ্রাঁসোয়া মরিয়াকের লেখা 'এজ্‌মোডী'। এর সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন বেসিল বার্টলেট। ম্যারী হিন্টন। ভেরোনিকা টারলে এবং জয়েস রেডম্যান ছিলেন প্রধান ভূমিকাগুলোতে। নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় রেমন্ড মর্টিমার লিখলেন—'যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে সবসেরা যে চার-পাঁচটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে এটি তার ভেতর অন্যতম।' গেইটে এ নাটকটি প্রচুর সাফল্যের সঙ্গে চলেছিল। আমি বেশ আশ্চর্যবোধ করেছিলাম যখন ব্রনসন এ্যালবেরী এই নাটকটিকে 'দি ইনট্রুডার' নাম দিয়ে ওয়াইন্ডহাম থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইলেন। সেখানে প্রথম রাত্রির প্রদর্শনীতে একটা বিশ্রী অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখন ছিল লণ্ডন থিয়েটারগুলোর সিজনের শুরু। বিগত কয়েক সপ্তাহে কোন নাটকের তখনও পর্যন্ত কোন শুভ উদ্বোধন রাত্রির অভিনয় হয় নি। প্রথম রাত্রির দর্শকদলের সব থেকে খারাপ অংশটি থিয়েটার দেখতে এসেছিল ওয়াইন্ডহামে—এরা প্রথম রাত্রের অভিনয়কে "সামাজিক উৎসব" হিসাবে দেখে। ভাল শ্রেণীর প্রথম রাত্রির দর্শকেরা অনেকেই আগে গেইটে নাটকটি দেখেছিলেন বলে এখানে আসেন নি। দর্শকদের এক অংশ—এরা সারা প্রেক্ষাগারে ছড়িয়ে বসেছিল—প্লের সময় নানারকমভাবে বাধার সৃষ্টি করছিল। কেউ বিদ্রূপ করছিল, কেউ চীৎকার করে হাসছিল, কেউ কেউ জোর গলায় কথাবার্তা চালিয়েছিল। পরের দিনে পত্রিকার সমালোচকেরা একযোগে এই জাতীয় দর্শকদের বিশ্রী ব্যবহারের তিক্ত সমালোচনা করে নিজেদের কাগজগুলোতে লিখলেন। একজন সমালোচক এই জাতীয় দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—"a collection of mental degenerates." এ'রা কিন্তু নাটকটির উচ্চ প্রশংসা করে লিখেছিলেন। আট সপ্তাহ ধরে নাটকটি চলেছিল—এবং এই শ্রেণীর নাটকের পক্ষে সে সময়কার রীতি অনুযায়ী এতদিন চলাটা যথেষ্ট জনপ্রিয়তার পরিচায়ক বলেই মনে হয়েছিল। 'দি ইনট্রুডার' যখন ওয়েস্ট এণ্ডে চলছে, সেই সময়েই গেইটের আর একটি প্রডাকসন 'অভ্ মাইস এ্যাণ্ড মেন' ওখানকার আর একটি থিয়েটারে নিয়ে আসা হল। এতে জন মিলস এবং ক্লেয়ার লুচে অভিনয় করেছিলেন। নাটকটি আমেরিকাতে প্রভূত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল। কিন্তু লণ্ডন থিয়েটারের প্রত্যেক ম্যানেজার এ নাটক দেখে বলেছিলেন যে, লণ্ডনের দর্শকদের আকর্ষণ করবার মত নাটক এটি নয়। ওয়েস্ট এণ্ডের দর্শকদের পক্ষে এটি উপযোগী নাটক কি না সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি। আমি এর নিউ ইয়র্ক প্রডাকসনও দেখি নি, কিন্তু নাটকটি পড়ে আমার ভাল লেগেছিল এবং গেইটের দর্শকদের পক্ষে খুব উপযোগী বলে মনে হয়েছিল। গেইটে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হোত, সেগুলো ওখানকার দর্শকদের পছন্দসই হবে, এই ভেবেই ঠিক করা হোত। ওয়েস্ট এণ্ডের দর্শকদের মন আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গেইটে নাটক বাছাই করা হোত না। তবে যে নাটক গেইট থেকে ওয়েস্ট এণ্ডে এসে নাম কিনতো এবং দর্শক টানতো, তাতে গেইটের ভাল আর্থিক উপার্জন হোত। কিন্তু ভবিষ্যতে ওয়েস্ট এণ্ডে নিয়ে গিয়ে আর্থিক সাফল্য লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কখনও গেইটে নাটক মঞ্চস্থ করি নি—তা যদি করতাম তাহলে Gate would have lost its purpose, its integrity, and finally its audience.

[ক্রমশ]

রূপজগৎ

একটি চক্রান্ত কাহিনী

গত সপ্তাহে 'একটি তথ্যচিত্রের কথা' লিখেছিলাম। এই তথ্যচিত্রটিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন আমলা যে কান্ড করছে তা রীতিমত একটা চক্রান্তমূলক ঘটনা এবং আইনকানুন, সাংবিধানিক অধিকার ইত্যাদি জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। গত ৮ই এপ্রিল সাংবাদিকদের 'মানুষের জয়যাত্রা' ছবিটি দেখান হয়েছে। যে ছবির বিষয়ে কেন্দ্র বিশ্রী রকমের হস্তক্ষেপ করছে। ছবি দেখাবার পর প্রযোজক সাংবাদিকদের যে তথ্য জানান তা পাঠকদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি।

গত ২৭শে মার্চ আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ড ছবিটি দেখে। দেখার সময় সেন্সর বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে প্রযোজক ও পরিচালক উপস্থিত ছিলেন, যদি কোন ব্যাপারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ছবি দেখার সময় বা পরে সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সদস্যরা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি। সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান ছবি দেখার পর প্রযোজককে বলেন, ছবিটি মঞ্জুরী পেয়েছে, কোথাও কাটাকাটি বা বাদ দিতে হয় নি। ১লা এপ্রিল সেন্সর সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন, সেদিন বিকালেই তিনি দিল্লী যাচ্ছেন : দিল্লী থেকে ফিরেই সার্টিফিকেট দেবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ছবিটি কিনতে ইচ্ছুক, এ-কারণে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ডিরেক্টর যখন জানতে চান যে ছবিটি সেন্সর সার্টিফিকেট পেয়েছে কি না—তখন তাঁকেও সেন্সর বোর্ড থেকে জানান হয় যে, ছবিটির কোন অংশ বাদ না দিয়েই সেন্সর সার্টিফিকেট পাবে।

কিন্তু ১লা এপ্রিল রাজ্য সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তরের ডিরেক্টর শ্রী পি এস মাথুর প্রযোজককে জানান সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান দিল্লী থেকে ফিরে তাঁকে জানিয়েছেন যে, পূর্বের কথানুযায়ী সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না, ছবিটিকে বোম্বাই পাঠাতে হবে কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের অবগতির জন্যে।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪ঠা এপ্রিল থেকে ছবিটি বিভিন্ন সিনেমায় দেখাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। রাজ্য সরকারের অনুসন্ধানের জবাবে কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান যে, ২রা এপ্রিলের মধ্যে ছবিটি দেখার কাজ শেষ হবে।

এভাবে ছবি বোম্বাই পাঠানো সিনেমাটোগ্রাফ আইনের ধারায় পড়ে না। এই আইনের ২৩ ধারায় আছে—ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের সদস্যদের মতামত জানাতে হবে জনসাধারণকে দেখানোর উপযুক্ত অথবা উপযুক্ত নয় ; সাধারণের দর্শনযোগ্য অথবা কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের দর্শনযোগ্য। এই মতামত পাবার পর চেয়ারম্যান বোর্ডের পক্ষে সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। চেয়ারম্যান যুক্তিসঙ্গত কারণে ২৫ ধারা অনুসারে ছবি পুনর্দর্শনের জন্য রিভাইজিং কমিটির কাছে পাঠাতে পারেন। এই রিভাইজিং কমিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং আঞ্চলিক উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। আইন অনুসারে সব ব্যাপার আঞ্চলিকভাবে অর্থাৎ যে রাজ্যে ছবি তৈরি হয়েছে সেখানেই করার কথা। বোম্বাই দিল্লী পাঠাবার পক্ষে আইনের কোন ধারা নেই। এটি হয়েছে জবরদস্তিমূলক।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, ছবিটি বোম্বাই পাঠাবার ব্যাপারে প্রযোজক সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে যখন লিখিত চিঠি চান তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। অথচ বোম্বাই না পাঠালে সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না বলেন। স্বভাবতই প্রযোজক ছবি বোম্বাই পাঠাবার ব্যাপারে ইতস্তত করলে শ্রীমাথুর একটা চিঠি দিয়ে জানান যে, ছবিটি বোম্বাই থেকে ৫ই এপ্রিলের মধ্যে ফেরৎ পাঠান হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেই ছবিটি পাঠান হচ্ছে।

এই চিঠির পরে ছবিটি বোম্বাই পাঠান হয়, কিন্তু ৫ তারিখ ফেরৎ আসার পরিবর্তে ৮ তারিখ পর্যন্ত ছবিটি নিখোঁজ থাকে। ইতিমধ্যে ৩রা এপ্রিল লোকসভায় জ্যোতির্ময় বসু প্রশ্ন করলে তাঁকে জবাব দেওয়া হয় যে, আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় বোর্ডের মতামতের জন্য ছবিটি বোম্বাই পাঠিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ফিল্ম ক্রয় কমিটির আচরণ জনসাধারণের জানা থাকা দরকার।

এই কমিটি গত ২৮শে মার্চ ছবিটি দেখেন কিন্তু তাঁরা যে দেখেছেন এমন কোন প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেন নি, তাঁদের মতামতও প্রকাশ করেন নি। এই কমিটির সুপারিশের ওপর ছবি কেনা হয়। এই কমিটিতে রয়েছেন শ্রীতালুকদার, শ্রীমাথুর, মিসেস আর গুপ্ত এবং অমৃতবাজার পত্রিকার নির্মল ঘোষ। এঁদের আচরণ বেশ রহস্যজনক।

সিনেমাটোগ্রাফিক আইন অনুসারে একমাত্র সেই ছবি মঞ্জুরী পাবে না যে ছবি ধর্মনিরপেক্ষতায়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বে, নৈতিকতা ও শালীনতা এবং আইনশৃঙ্খলায় বাধা দিচ্ছে ; অথবা

জার্মান অভিনেত্রী হান্নেলোর হোগার 'দি পারপ্লেক্সড আর্টিস্ট ইন দি সার্কাস টেন্ট' ছবিতে অভিনয় করেছেন।

আইন-আদালত অবমাননা করছে। 'মানুষের জয়যাত্রা' এইগুলির একটিতেও পড়ছে না। বরঞ্চ এমন বিদেশী ছবিকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে যেগুলি এই শর্ত রক্ষা করছে না। যেহেতু মানুষের জয়যাত্রা যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে, সেহেতু কেন্দ্র এবং আমলাদের এত উদ্বেগের কারণ হয়েছে; এবং কেন্দ্রীয় সরকার নির্লজ্জভাবে রাজ্যের ছবির ব্যাপারেও নাক গলাচ্ছ!

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের কমিটি এবং আমলাদের আচরণের বিষয় এসে পড়ে। তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী ছবিটি নিজে দেখেছেন এবং তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষে কিনতে আগ্রহ জানিয়েছেন। কিন্তু ছবিটি বোম্বাই পাঠাবার ব্যাপার কি তিনি জানতে পেরেছিলেন? সেই পুরনো দিনের ফিল্ম ক্রয় কমিটিকেই রেখে দিয়েছেন কেন জানি না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করতে হলে সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন কমিটি থাকা দরকার। নতুবা পদে পদে এইরূপ পরিস্থিতি দেখা দেবে। —সুজন।

চিত্রআলোচনা

মানুষের জয়যাত্রা

'মানুষের জয়যাত্রা' এক অভিনব তথ্যচিত্র। সমসাময়িক কালের অভিজ্ঞতায় এই ছবি অভিনন্দনীয় এবং আগামীদিনের মানুষের জন্য এক প্রামাণিক দলিল। ঐতিহাসিক মূল্যে ছবিটি সযত্নে রক্ষা করার উপযুক্ত। এই ছবির প্রযোজক নিও ডেকর (৩এ, হ্যারিংটন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬)। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সাহসিক উদ্যোগের জন্য প্রযোজকসংস্থা দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। মাত্র দু-রিলের এই ছবিটি চলচ্চিত্রশিল্পে এক নতুন পদক্ষেপ।

ছবিটি ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীকে উপস্থিত করেছে বিরাট চক্রান্ত, দুর্নীতি আর অন্ধকার ভেদ করে সাধারণ মানুষের বিজয় হিসাবে। ছবির সুরু দুর্মূল্য বাংলার পটভূমিতে, যেখানে একদিকে মানুষ খেতে পারছে না, চোরাবাজারীদের আধিপত্য চলেছে, আর একদিকে গুদাম ভর্তি চালের বস্তা। আমলাদের সঙ্গে যোগাযোগ মজুতদারদের সঙ্গে, ওদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া। কলকারখানায় ছাঁটাই, আন্দোলন দমনে পুলিশের অতি-আগ্রহ ও ব্যস্ততা। এই পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রণ্ট জয়লাভ করল—মন্ত্রিত্ব গঠিত হল। দীর্ঘদিন পরে কংগ্রেসের দলীয় সরকারের অবসানে মানুষের উল্লাস। যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন করে ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্নিয়োগে, সরকারী কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার ব্যবস্থা, ভূমিহীন কৃষকদের জমি বিতরণ, এবং গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না ইত্যাদি ঘোষণা এবং ট্রাম কোম্পানী সরকারী কর্তৃত্বে নিয়ে আসে।

এবার ছবিতে দেখা গেল যুক্তফ্রণ্টবিরোধী চক্রান্ত। রাজভবনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে রাজ্যপালের সভা ও খানাপিনা। তারপরে হঠাৎ একদিন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা এবং রাত্রির মধ্যে জনসমর্থহীন এক মন্ত্রিসভা গঠন।

'শুকসারী' ও 'নববধূ' ছবিতে নবাগতা শিল্পী সরকার।

এবার দেখা গেল একদিকে চরম নির্যাতন, আর একদিকে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য আন্দোলন। অবশেষে নির্বাচন হল এবং জনসাধারণ যেন প্রতিশোধ গ্রহণের মত যুক্তফ্রণ্টকে জয়ী করে—চক্রান্তকারী দলগুলিকে একরূপ নিশ্চিহ্ন করে দিল।

এবার বিশাল তরঙ্গের মত জনতার মিছিলে মিছিলে জয়োল্লাস। ক্ষেতে, কারখানায়; সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জয়ের আনন্দ। একদিকে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ, আর একদিকে জনতার দাবি ধর্মবীর বাংলা ছাড়। ময়দানের বিরাট বিজয় সমাবেশের দৃশ্যেই ছবির শেষ।

দু'হাজার ফিটের ছবিটি দর্শকরা দেখতে দেখতে কখনো উত্তেজনা, কখনো আনন্দে মেতে উঠবেন। সঙ্গে সঙ্গে এক গণতান্ত্রিকবিরোধী শক্তির প্রতি জাগবে ঘৃণা। ছবিটিতে ক্যামেরাম্যানের বাহাদুরী রয়েছে যথেষ্ট। চক্রান্তের দৃশ্যগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে স্থির চিত্রের নেগেটিভ। এতে ছবির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্যামেরার কাজ করেছেন সত্য রায়। এই ছবিটি আরো আকর্ষণীয় এবং অর্থবহ হয়ে উঠেছে হেমাঙ্গ বিশ্বাস পরিচালিত সঙ্গীতে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজে একজন গুণী শিল্পী এবং গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে তাঁর বিকাশ ঘটেছে। এই ছবিতে গণনাট্য সঙ্ঘের 'জোট বাঁধ তৈরি হও—মাঠ পাথর বন্দরে' গানটিকে মূল বক্তব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

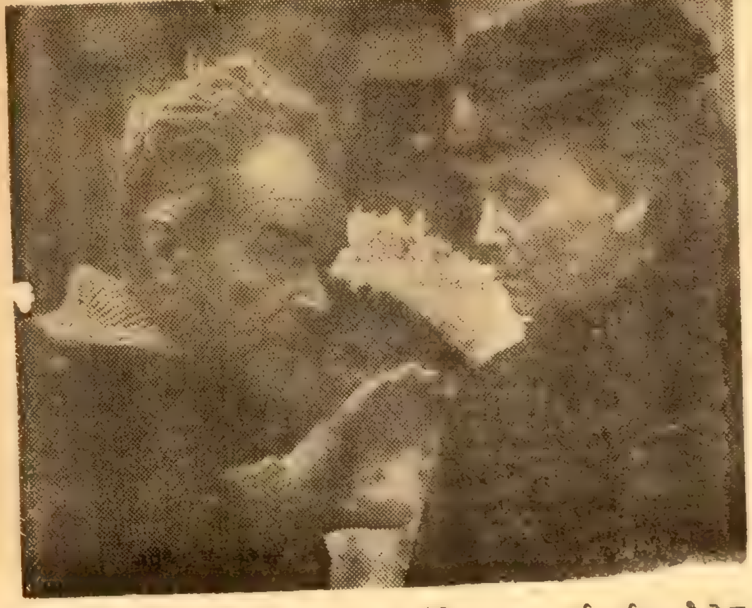

'মাদার্স হার্ট' ছবিতে লেনিনের মা মারিয়া উলিয়ানোভার ভূমিকাভিনেত্রী ইলেনা ফাদেয়েভাকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক মার্ক ডনস্কয়।

'পিতাপুত্র' ছবিতে স্বরূপ দত্ত, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও অনুভা

এই থিম মিউজিকের সঙ্গে কখনো—"বাঁচবোরে বাঁচবো আমরা......" কখনো "চল চল বীর" গানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। একবার বেজেছে রবীন্দ্রনাথের 'সবারে করি নমস্কার'। গণনাট্য সংঘের গানগুলি এই ছবিতে যেন প্রাণসঞ্চার করেছে ; গানের সঙ্গে ছবির এমন শিল্পশোভন মিল দেশী ছবিতে খুব কমই দেখা যায়। ছবির সাফল্য সম্পাদনার কৃতিত্বের ওপর নির্ভরশীল। এই ছবিতে গোবিন্দ চ্যাটার্জি প্রশংসনীয়ভাবে কাজটি করেছেন। ধারাভাষ্যের কাজটি করেছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনার জন্য প্রশংসা পাবেন বিমলকুমার রায়। তিনি ছবির জগতের সঙ্গে অনেকদিন জড়িত আছেন কিন্তু এই ছবির সঙ্গে তাঁর নামটি বিশেষ উল্লেখ্য হয়ে থাকবে।

'মানুষের জয়যাত্রা' শহরের প্রত্যেক সিনেমায় যেমন দেখাতে হবে, তার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় দেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ছবি বাংলার চলচ্চিত্রে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতীক।

স্টুডিও খবর

"মুক্তিস্নান"-এর কাজ সুরু

প্রেয়সী, নতুন জীবন ও বালুচরীর প্রযোজক কার্তিক বর্মণ রাধারাণী পিকচার্সের ৪র্থ ছবি শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে "মুক্তিস্নান"-এর প্রথম চিত্রগ্রহণ পর্বটি আগামী সোমবার শুভ নববর্ষ দিবসে হেমন্ত মুখার্জী ও সন্ধ্যা মুখার্জীর সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—অজিত গাঙ্গুলী। সুর দিয়েছেন—রাজেন সরকার। গীত রচনা করেছেন—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটিতে এখন পর্যন্ত যাঁরা অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন, গঙ্গাপদ, শ্যামল ঘোষাল, ছায়া দেবী, গীতা দে প্রমুখ। কণ্ঠসঙ্গীতে থাকবেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সহ মান্না দে, শ্যামল মিত্র ও আরতি মুখোপাধ্যায়। নর্মদা চিত্র ছবিটির পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন।

জনপদ বধূ

রূপাঞ্জলি চিত্রমন্দিরের 'জনপদ বধূ' ছবির সঙ্গীত গ্রহণ অনুষ্ঠান গত ৯ই এপ্রিল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন নব্যেন্দু চ্যাটার্জি, সঙ্গীত পরিচালনা করবেন নিখিল চ্যাটার্জি।

সংবাদকেন্দ্রী

মস্কোতে প্রথম বিশ্ব ব্যালে প্রতিযোগিতা

আগামী ১১ জুন থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত মস্কোর বলশই থিয়েটারে প্রথম বিশ্ব ব্যালে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১৯টি দেশের ৮০ জনেরও বেশি নৃত্যশিল্পী ইতিমধ্যেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য নাম পাঠিয়েছেন। এ'দের মধ্যে রয়েছেন বুলগারিয়া, রুমানিয়া, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, হল্যাণ্ড, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, আমেরিকা ও জাপানের ব্যালে নৃত্যশিল্পিবৃন্দ।

উক্ত প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান ইগোর মোইসেইয়েভ বলেন যে, এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের সামনে আজ প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ভবিষ্যতের যেসব প্রতিভাসম্পন্ন ব্যালে নৃত্যশিল্পী বিশ্ব "কোরিওগ্রাফিক" ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন তাঁদের বিশ্বের সামনে তুলে ধরা।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ইয়েকাতেরিনা ফুর্ৎসেভা বলেন, এই প্রতিযোগিতার কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ক্ল্যাসিকাল ও আধুনিক ব্যালের বিকাশ সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। এই আলোচনায় কয়েকজন বিশিষ্ট 'কোরিওগ্রাফার', ব্যালে নৃত্যশিল্পী যোগ দেবেন বলে আশা করা যায়। প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হবেন স্বনামধন্যা ব্যালেরিনা গালিনা উলানোভা। এছাড়া এই বিচারকমণ্ডলীতে থাকবেন কিউবা, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের খ্যাতনামা ব্যালে নৃত্যশিল্পী, শিক্ষক ও সংগীতজ্ঞবৃন্দ। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের প্রাক্কালে প্রাচীন রুশ শিল্পের ওপর একটি সুবৃহৎ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য অসংখ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি-

যোগিতায় বিজয়ীরা ১৯৬৯-৭০ সালে রাশিয়ার বিভিন্ন প্রধান প্রধান শহরে তাদের নৃত্য অনুষ্ঠানের অধিকার অর্জন করবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী নাতালিয়া বেসমার্তনোভা ও মিহাইল লাভ্রোভ্স্কি, নিনা সোরোকিনা ও উরি ভ্লাদিমিরোভ থেকে সুরু করে তাতিয়ানা গোলিকোভা ও বরিস আকিমোভ প্রমুখ তরুণ নৃত্য-শিল্পীরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছেন। তাল্লিন, রিগা, মিনস্ক, কিয়েভ, পার্ম ও উলহান-উদে প্রভৃতি স্থান থেকে তরুণ নৃত্যশিল্পীরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছেন।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি-যোগিতায় যোগদানের জন্য যে বিপুল-সংখ্যক আবেদনপত্র এসেছে তা থেকে একথা সহজেই বলা যায় মস্কোয় এই আসন্ন প্রতিযোগিতা বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিনিধিমূলক ব্যালে উৎসবে রূপান্তরিত হবে।

গুপী গাইন বাঘা বাইন

পূর্ণিমা পিকচার্সের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' বার্লিন উনবিংশতিতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মনোনীত হয়েছে। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২৫শে জুন থেকে ৬ই জুলাই। ছবির প্রযোজক নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত এবং পরিচালক সত্যজিৎ রায় উৎসবে উপস্থিত থাকবেন।

এই ছবিটি ভারতের বাইরেও যথেষ্ট ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে।

শীঘ্রই ছবিটি মিনার, বিজলী, ছবিঘর-এ মুক্তিলাভ করবে। ইংরেজী সাব-টাইটেলে ছবিটি গ্লোব সিনেমায় মুক্তি পাবে। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' মেলবোর্ন উৎসবে দেখাবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে।

একটি উপভোগ্য ব্যালেনৃত্য

রুডলফ্ নুরেইভ ও প্রাইমা ব্যালেরিনা মার্গট ফন্টেইন? নার্সিসা হেডী সম্প্রতি স্থানীয় স্টেট অপেরায় ব্যালেনৃত্য 'গিজেল' মঞ্চস্থ করলেন ও সেই সংগে সংগত করলেন জন ক্র্যাংকো ও তাঁর সম্প্রদায়। নৃত্যটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

মহিলা যাদুকর

মহিলা যাদুকর ডি, পুষ্পা বাংলার বিভিন্নস্থানে ম্যাজিক দেখিয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন। তাঁর কয়েকটি খেলা রীতিমত বিস্ময়কর। তরুণী ডি, পুষ্পা পি, সি, সরকারের দলের সঙ্গে বিশ্ব পরিক্রমা করেছেন এবং নানা দেশের ম্যাজিক দেখে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

মাদার্স হার্ট

লেনিনগ্রাডের ম্যাক্সিম গর্কি স্টুডিওতে 'মাদার্স হার্ট' ছবিটি নির্মাণ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক মার্ক ডনস্কয়। ছবিটি লেনিনের মা মারিয়া উলিয়ানোভার জীবনকে অবলম্বন করে। ছেলেরা যখন বড় হয় নি তখন তিনি হারালেন স্বামীকে; তারপরে বড় ছেলে আলেকজান্দারের ফাঁসী হল জারকে হত্যার চেষ্টায়। ভলোদ্যা ও আনা গ্রেপ্তার হল; ছেলে-মেয়েরা বেছে নিল বিপ্লবের পথ। এই ছবির চিত্র-নাট্য লিখেছেন তায়া জস্ক্রেসেঞ্চারা ও ইরিনা ডনস্কায়া। ছবির চিত্র-গ্রহণ করা হয়েছে গর্কি, স্টকহলম ও লেনিন-গ্রাডে।

মহিলা যাদুকর ডি, পুষ্পা

সঙ্গীতকথা

বসন্তোৎসব

মলয় গীতবীথি আয়োজিত বসন্তোৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী মার্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তিনি প্রথমে বাহার রাগে একটি খেয়াল গান করেন, পরে বসন্তবাহার রাগে একটি বাংলা খেয়াল পরিবেশন করেন। অবশেষে অনুষ্ঠান শেষ হয় একটি হোরি ঠুংরি গান দিয়ে। রসসমৃদ্ধ সঙ্গীতে শ্রোতারা পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রথমে একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়, পরিচালনা করেছিলেন শ্রীমতী শেলী সান্যাল ভক্তিময় দাশগুপ্ত ও পরেশ দাস।

পাঠক মন

'পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী—শপথ, হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার সমস্যা' প্রসঙ্গে

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সাপ্তাহিক বসুমতীতে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে ধারাবাহিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল তা, শুধু আমি না, আমার বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য এবং সূক্ষ্ম অ্যালোচনার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদিও নামকরণে 'বুদ্ধিজীবী' বলে পৃথক শ্রেণী নির্ণয়ে আমার আপত্তি। কারণ আমি কট্টর বস্তুবাদী। বুদ্ধি দৈহিক স্নায়ু ক্রিয়াকলাপের যৌগিক ফল হওয়ায় এখন শ্রমেরই অঙ্গ। সুতরাং স্রষ্টারা শ্রমিক।

তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মাননীয় বীরেন্দ্রবাবু সাহসের সঙ্গে বর্তমান লেখকদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত যথার্থ এবং সত্য। সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি যে, এমন অনেক লেখক-শিল্পী গায়ক রয়েছেন, যাঁরা কোন প্রগতিমূলক অনুষ্ঠান অথবা সভা অথবা জলসায় যোগ দেন নি উপরন্তু বিদ্রূপ করেছেন, তাঁরা আজ যুক্তফ্রন্ট এবং বস্তুপন্থী অনুষ্ঠানের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নিজেদের জাহির করছেন। আবার তাঁদেরই হাততালি দিচ্ছি আমরা। এঁদের মুখোশ খুলবার দায়িত্ব তাঁদের যাঁরা প্রতিষ্ঠাবান সৎ সাহিত্যিক বলে পরিচিত। সৎ সাহিত্যিকেরা যদি সুযোগসন্ধানীদের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে চলেন তাহলে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। বীরেন্দ্রবাবু যদি এঁদের চিনিয়ে দিতেন তাহলে আমরা তাঁকে স্বাগত জানাতাম। সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মার্কামারা সেই সব পত্রিকা যাদের সম্পাদনায় কোনও বস্তুবাদী প্রগতিপন্থী লেখকের লেখা সম্পাদিত হয় না তাদেরও উল্লেখ করতে পারতেন। কেমন করে কণ্ঠরোধের চেষ্টা চলে তার ইঙ্গিত না দিয়ে এবং যেসব তরুণ লেখক আদর্শে অভ্রান্ত রয়েছেন তাঁদের উল্লেখ করে না দিলে সাধারণ পাঠক আসল চিত্র কেমন করে পাবেন!

—বীরেন চক্রবর্তী
৪৮, চন্দ্রমণ্ডল লেন
কলকাতা-২৬

* * *

গত কয়েক সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুমতীতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবী শপথ, হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার সমস্যা' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনা আমি আদ্যন্ত পড়েছি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আলোচনার যে অংশে ফ্যাসীবিরোধী ও প্রগতিশীল লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—আমি ওই অংশের উপর আমার কয়েকটি মতামত রাখছি।

সময়টা ছিল উনিশ শ' পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন তিপ্পান্ন'র মধ্যে। আমি তখন ফ্যাসীবিরোধী ও প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসংঘের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত। বস্তুত এ আন্দোলন সুরু হয়েছিল তখনই, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইয়োরোপ থেকে এশিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সেই সময়ের আন্দোলনে পশ্চিমবাংলার যে সব শিল্পীসাহিত্যিকদের নামোল্লেখ করেছেন—তাঁদের ফ্যাসীবাদ বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে তখন কোন প্রশ্ন ওঠার অবকাশ ছিল না। কেন না বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তখন যুদ্ধের জালে জড়িয়ে পড়েছে এবং এই সব শান্তিকামী দেশগুলি আক্রান্ত হয় ফ্যাসীবাদীদের দ্বারা; এটা প্রমাণিত সত্য।

তবে বাংলাদেশ নয়—ভারতবর্ষই তখন এই আন্দোলনকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবেও এ দেশের চেতনা ও সত্তার নিজস্ব বলে গ্রহণ করে নি। করতে পারে নি।

যুদ্ধ যতদিন চলল—ততদিন সামনে একটা প্রোগ্রাম ছিল—সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজও চলছিল—কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার লেখক ও শিল্পীরা তথা বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের আন্দোলনের জন্য কোনও নতুন সূত্র খুঁজে নিলেন না। অথচ সামনে অনেক পথ ছিল। ফল কি হল? প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠীর একদল; যাঁরা রাজনৈতিক বা সামাজিক চেতনার সঙ্গে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে একীভূত করতে নারাজ, তাঁরা স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে কংগ্রেসের যাদুবিদ্যায় এত বিমুগ্ধ হলেন যে, প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে কমিউনিজমের গন্ধ আছে সন্দেহ করে কেটে পড়লেন।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন— দেশ বিভাগের জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ব্যগ্র হয়ে পড়লেও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দেশ বিভাগের পক্ষে ওকালতী করেছিলেন কেন? এই প্রশ্নের জবাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। জবাব বা তার কারণ যাই হোক না কেন—সেই কারণকেই বিশ্লেষণ করলে—বিভাগোত্তর ভারতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কেরলে ও পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সহাবস্থান করে মূল প্রশ্নটিকে আরও জটিল, আরও অর্থবহ করে তোলে নি কি?

আমি তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীদের কথা বলি। দেশ বিভাগের পরও প্রগতিশীল লেখকসমাজ তাঁদের অগ্রগতির পথ খুঁজে পেতেন অনায়াসে—যদি চেষ্টা করতেন। কিন্তু তখন বুঝি আর সম্ভব নয় তা। কেন না ইতিমধ্যে ফ্যাসীবাদ ইয়োরোপের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শান্তির ফতোয়া জারী করছেন—তাঁরাই যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে অশান্তির আগুনকে নেভানোর কাজে হয় ইচ্ছে করেই এগিয়ে আসছেন না—নচেৎ আসতে পারছেন না অন্য কোন কারণে। সুতরাং বাংলার বুদ্ধিজীবীরা তখন নিষ্কর্মার মত শান্তির পারাবত উড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তবু বাংলার দিকে মুখ ফেরালেন না। দেশের কথা ভাবলেন না। যদি মুখ ফেরাতেন—তবে দেখতেন আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ, স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা (?) শুধু ইংরেজের ফেলে যাওয়া শাসনদণ্ডই হাতে তুলে নেয় নি—তাদের দু'শো বছরের শাসন ও শোষণের 'মেড ইজি'-গুলিও সযত্নে হাতে তুলে নিয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে যারা ভয়ে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল—স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তারা নেহরুজী ও ল্যাম্পপোস্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তাদের পূর্বতন ছকেই চলতে সুরু করেছে।

পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীরা তখন হতাশ অবসন্ন, শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় শপথভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। দেশ বিভাগের অভিশাপ মাথায় নিয়ে যারা এদেশে এল, তাদের সামনে সান্ত্বনা বা পুনর্বার জীবনের আশ্বাস দেওয়ার জন্য কেউ উপস্থিত হল না। আমাদের বংশধররা যদি প্রশ্ন করে—দেশ বিভাগ আমাদের পক্ষে কতখানি সুখকর বা বেদনাদায়ক হয়েছিল—তখন আমরা তার জবাব দিতে পারব না। কোনও ইতিহাস বা কোনও চিত্রও তাদের সামনে তুলে ধরতে পারব না। কেন না আমরা তখন উদ্বাস্তু সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক সমস্যা ভেবেছি। তখনও পর্যন্ত মানব সমাজের মৌল সমস্যাকে মগজে রেখে নিজেদের সঙ্গে হঠকারিতা করে চলেছি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ যে, আমাদের রাজনৈতিক চেতনার নতুন সন্ধিক্ষণে আত্মসমালোচনার জন্য পথ করে দিয়েছেন।

'চোমংলামা'
শিলিগুড়ি

বাংলা কি পিছিয়ে পড়ছে?

। কিছুদিন ধরে এ কথাটা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ফুটবল খেলার মান নাকি নেমে যাচ্ছে। বাংলা নাকি হারিয়ে ফেলেছে ভারতীয় ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। ফুটবল খেলার বাংলার আধিপত্যের দিন নাকি ফুরিয়েছে। ভারতীয় ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব আর নাকি থাকবে না। জানি না এ কথা কতোটা সত্যি। তবে আজ আর এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ভারতীয় ফুটবল জগতে বাংলার সেই একচেটিয়া একাধিপত্য এখন আর ঠিক ততোটা নেই। যতোটা ছিল মাত্র কয়েক বছর আগেও। তবে কি ফুটবল খেলাতেও বাংলা পিছিয়ে পড়ছে? হয়তো তাই। কয়েকটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার দিকে তাকালে সেই কথাই তো মনে হয়। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা নাজেহাল হচ্ছে। পর পর দুবার ফাইনালে উঠেও হারতে হলো মহীশূরের কাছে। রোভার্স কাপ পেলেও ডুরাণ্ড এবার হাতছাড়া হয়েছে। তবে সর্বভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে বড়দের চেয়ে ছোটরা এবার দিয়েছে অনেক বেশি কৃতিত্বের পরিচয়। তাই আজ সবার মনে প্রশ্ন, ছোটরা যদি এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে বড়রাও কেন পারবে না? বড়রা কেন পিছিয়ে পড়বে এইভাবে? খেলায় জয়-পরাজয় আছেই। সুতরাং পরাজয়ে ভেঙে পড়ার কোন সংগত কারণ নেই। তবে প্রয়োজন আছে আত্ম-অনুসন্ধানের। নিজেদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার, পরাজয়ের কারণগুলো খুঁজে বার করার দরকারই সব থেকে বেশি। রেফারী ন্যায্য বিচার করেন নি, কর্তৃপক্ষ কিম্বা প্রতিপক্ষ দলের ব্যবহার কিম্বা খেলার ধারা ঠিক ছিলো না—এসব কথা সত্য হলেও, শুধুমাত্র সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তো চলবে না। আমরা কিছু জানি না, আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে এসব কথা বলে নিজেরা নিজেদের কাছে সান্ত্বনা পেয়ে ধোয়া তুলসী পাতার মতো চুপ করে থাকলেই কি সব হয়ে যাবে?

না তা যাবে না—যেতে পারে না। আজ তাই সবার আগে ঢেলে সাজাতে হবে সব কিছু। পরিপূর্ণ পরিবর্তন চাই বাংলাদেশের ফুটবল জগতের। এর জন্যে এগিয়ে আসতে হবে সরকারকে, এগিয়ে আসতে হবে আই· এফ· এ আর কলকাতার ছোট-বড় ক্লাবগুলোর কর্ম-কর্তাদের। সকলে মিলে ধীরে-সুস্থে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যা আবার ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে। এই প্রসংগে কলকাতার বড় ক্লাবগুলোর কর্তৃপক্ষকে একটা বিষয়ে অনুরোধ জানাই, বহির্বঙ্গের খেলোয়াড়দের ওপর খুব একটা বেশি নজর না দিয়ে আপনারা স্থানীয় খেলোয়াড়দের বিষয় নিয়েই একটু বেশি ভাবুন। তাতে কাজ আরো বেশি হবে। এ কথা আজ আরো বেশি করে বলার প্রয়োজন এই কারণে যে, জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বাংলা দলের কয়েকজন অ-বাঙালী খেলোয়াড়ের আচরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা গেছে। বাংলার পরাজয়ে তাঁরা দুঃখিত না হয়ে হেসে-খেলে বেড়িয়েছেন মনের আনন্দে। পরাজয় তাঁদের মনে এতটুকুও দাগ কাটতে পারে নি। কাটবে কি করে? তাঁদের নিজের রাজ্য তো আর হারে নি। সুতরাং......।। শান্তিপ্রিয়॥

ক্রিকেটের খবর

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ নিয়ে আবার জল ঘোলা হতে শুরু করেছে। প্রশ্ন সেই পুরোন—বৈদেশিক মুদ্রার। অস্ট্রেলিয়ার এই সফরটা সরকারী, তাই বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির অজুহাতে একেবারে বাতিল করে দেওয়া হয় নি। বলা হয়েছে, ভ্রমণ-সূচীটা কিছু কাট-ছাঁট করে টাকার অংকটা একটু কমাতে।

পঁয়তাল্লিশ হাজারের জায়গায় তিরিশ হাজার পাউন্ড করতে চাইছেন ভারতীয় অর্থমন্ত্রক ও ক্রীড়াপরিষদ। টাকাটা বৈদেশিক মুদ্রায় দিতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে।

এর জন্যে যদি দরকার হয় তাহলে সফরও করতে হবে সংক্ষিপ্ত। পাঁচটি টেস্ট ও পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর খেলার জায়গায় তিনটি টেস্ট ও তিনটি প্রথম শ্রেণীর খেলার ব্যবস্থা করলে নাকি

॥ টম গ্রেভনী ॥

গ্রেভনী শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠলেন। ইংলন্ডের গত পাকিস্তান সফরের সময় থেকে ৪২ বছরের গ্রেভনীর শরীরটা ঠিক ভালো যাচ্ছিলো না। নিজেই নিজের শরীর নিয়ে হয়ে পড়েছিলেন বড় বেশি বিব্রত। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা হলো, ইলেক্‌ট্রো কার্ডিওগ্রাফও করা হলো। তারপর একটানা বিশ্রাম নিতে হলো গ্রেভনীকে। এখন গ্রেভনী আবার সুস্থ হয়ে মাঠে নেমেছেন। উরচেস্টার কাউন্টি দলের অধিনায়ক গ্রেভনী অন্য খেলোয়াড়দের সংগে অনুশীলন শুরু করেছেন।

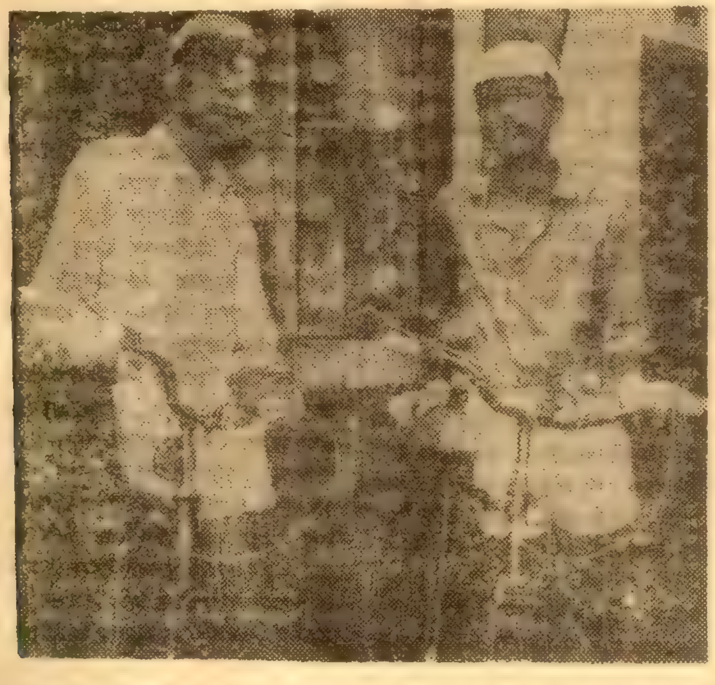

সাইকেলের দু'চাকার ওপর বসে দূরে বেড়াবার রেওয়াজ উঠেছে এখন। কেউ চলেছেন বিশ্বভ্রমণে, কেউ আবার অন্য কোথাও। সেন্ট পলস কলেজের দু'জন ছাত্রও ঐ একই উদ্দেশ্যে পথে নেমেছেন। সাইকেলে চেপে এঁরা ঘুরবেন পশ্চিমবঙ্গ। ছবিতে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজকুমার পাল (বাঁ দিকে) আর শ্যামল দত্ত।

গল্প হলেও সত্যি

অনেক দিন আগের কথা। বোধহয় ১৯১৫ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়। রণজী সিংজী তখন জামনগরের ক্রিকেট মাঠে গিয়ে প্রায়ই উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের একটু-আধটু খেলা শেখাতেন। সেই সময় একদিন ঘটলো ঘটনাটা।

একজন শিক্ষার্থী বোলার রণজীকে বললো যে, সে এমনই ভালো বল করতে পারে যে কয়েক ওভারের মধ্যেই সে যে কোন ভালো ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট করে দিতে পারে। রণজী বুঝলেন যে ছেলেটি কি বলতে চাইছে। শুধু বয়সের ভারে বৃদ্ধ তিনি তখন। চোখেও ভালো দেখেন না। কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে মেনে নেওয়া যায় না তরুণ বোলারের ঐ দম্ভোক্তি!

রণজী তখন ছেলেটিকে চারটি স্টাম্প আর একটা ক্রিকেট বল নিয়ে মাঠে নামতে বললেন। তারপর ঠিক জায়গায় তিনটে স্টাম্প পুঁতে উইকেট বানিয়ে রণজী ব্যাটের বদলে স্টাম্পটা নিয়ে দাঁড়ালেন উইকেটের সামনে। তারপর ছেলেটিকে বললেন বল করতে।

বোলার শুরু করলো বোলিং করতে। একটার পর একটা বল আসছে আর রণজী শুধু ঐ স্টাম্পটা দিয়েই বলগুলোকে পিটোতে লাগলেন ইচ্ছেমতো। নিখুঁত সে সব মার। কোনটা লেট কাট, কোনটা স্কয়ার কাট, গ্লান্স, ড্রাইভ—কিছুই বাদ গেলো না। একটা স্টাম্প নিয়ে খেললেন রণজী।

ছেলেটি তখন নিজের বোলিং-এর বহরের কথা বুঝতে পেরেছে। এও বুঝেছে যে কাকে সে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়েছিল! ব্যাট নয়, শুধু একটা স্টাম্প দিয়েই তার বলগুলো মেরে ছাতু করে দিলেন রণজী...!

রণজী তখন তাকে ডেকে শুধু বলেছিলেন, "ক্রিকেট খেলা অত সহজ নয়......! অনেকদিনের অনুশীলন আর অধ্যবসায়ের জন্যেই নামী খেলোয়াড়রা কুশলী হন...!"

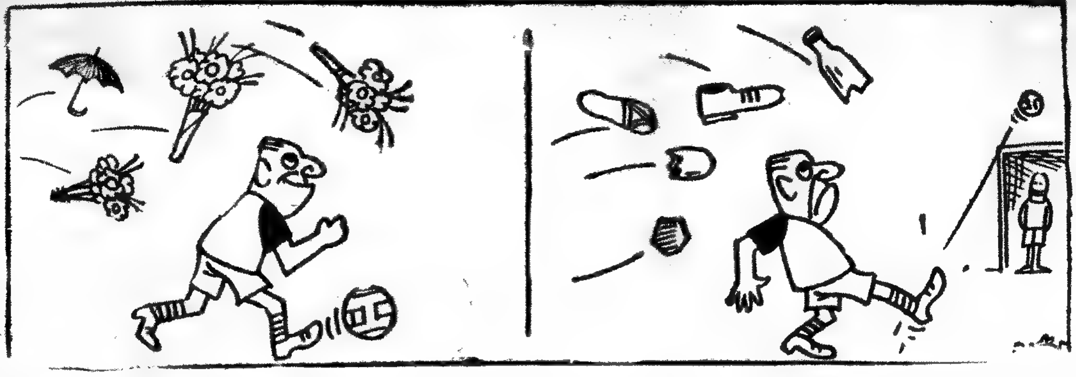

গ্যারাণ্টি-মানির পরিমাণ তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মধ্যেই রাখা যেতে পারে।

প্রত্যেকটি টেস্টের গ্যারাণ্টি-মানি হিসেবে অস্ট্রেলিয়া সাত হাজার পাউণ্ডের কম নেবে না। ওদিকে যদি আবার তিনটি টেস্ট ম্যাচ হয় তাহলে সেগুলো হবে বম্বে, কলকাতা আর মাদ্রাজে। দিল্লীতে টেস্ট খেলার দাবিও উপেক্ষণীয় নয়। তাই মনে হয় হয়তো বা এবারকার সফরকারী অস্ট্রেলিয়া শুধু টেস্ট ম্যাচই খেলবে।

অবশ্য যদি তারা ভারত ভ্রমণে আসে। তবে এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে তখন বিষয়টি পাকা হয়ে যাবে। ১৪ই এপ্রিল দিল্লীতে ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিলের সাব-কমিটির সভা বসছে। এই সভায় ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের কয়েকজন প্রবীণ কর্মকর্তাও উপস্থিত থাকবেন।

এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সরকারকে অস্ট্রেলিয়ার ভ্রমণের বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। আর তারই ওপর নির্ভর করছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ।

এই প্রসংগে আরো একটা বিষয় চিন্তা করার আছে। সেটি হলো অস্ট্রেলিয়ার দিকটা। ভারতের কথামতো কি আর অস্ট্রেলিয়া রাজী হবে? তাদেরও তো সুবিধে-অসুবিধের প্রশ্ন আছে। তার ওপর আবার ভারত ভ্রমণের পর অস্ট্রেলিয়া দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবার কথা। ভারতের সংগে টাকা-কড়ির বিষয় নিয়ে গোলমাল বাধে তাহলে তারা হয়তো ভারত ভ্রমণের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ণাংগ সফর করবে।

সেই সংগে আমাদের অনেকদিনের অনেক আশার মুখে ছাই পড়বে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়......!

সমাচারদর্পণ

দারা সিং শেষ পর্যন্ত কানাডার টাইগার জেট সিং-এর বিরুদ্ধে লড়তে রাজী হলেন। টাইগার জেট সিং ক্যাসিয়াস ক্লের মতো বাক্‌ কাট্‌টাই করে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন দারা সিংকে। দারা সিং বলেন যে তিনি চেয়েছিলেন জেট সিং প্রথমে তাঁর ভাইদের সংগে লড়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করুক। যাই হোক শেষ পর্যন্ত দারা সিং লড়বেন জেট সিং-এর বিরুদ্ধে। তবে সেই লড়াই কবে আর কোথায় হবে তা এখনো ঠিক হয় নি।

পাঁচ বছর পরে

পাঁচ বছর আগে যে খেলোয়াড়টি বাড়ির কাজ করতো আজ সে বছরের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মানে ভূষিত হলো। ইংলণ্ডের ফুটবল রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশনের ভোটে এবার বছরের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেছেন দুজন খেলোয়াড়। একজন ম্যানচেস্টার সিটি দলের ৩৪ বছর বয়স্ক অধিনায়ক টনি বুক আর দ্বিতীয় জন হলেন ডারবি কাউণ্টি দলের অধিনায়ক তেত্রিশের ডেভ ম্যাকে। আর তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন লীডস দলের ক্যাপ্টেন বিলি ব্রেমনার।

* * *

পঞ্চপ্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতায় এবারও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন রেলওয়ের বৈদ্যনাথ নাথ। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেও লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক ও রঞ্জন মার্চেণ্ট শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল হয়ে যান। অন্ধকারে তাঁরা ঠিকমত নির্দিষ্ট স্থান দেখতে না পেয়ে অন্য দিকে চলে গিয়েছিলেন শেষ সীমার মাত্র পাঁচ শ' গজ দূরে থেকে। এর জন্যে মনে হয় কর্তৃপক্ষই দায়ী। তাঁদের অব্যবস্থার জন্যে প্রতিযোগীদ্বয়ের ঐ হাল হয়।

পাঠকের কলম থেকে

আজো আমরা সকলেই বলি যে ফুটবলে বাংলার স্থান সবার উপরে। কিন্তু এই কথাটা কতোটা সত্যি আজ তা ভেবে দেখার বিষয়। গত কয়েক বছর ধরে বাংলা জাতীয় ফুটবলে পরাজয়ের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। তবে এখনও কি বলবো যে বাংলা আজও ফুটবলের মুকুটমণি? আমরা ক্রমেই আমাদের সফলতার পথ থেকে বিফলতার পথে নেমে যাচ্ছি, কিন্তু সেই অনুপাতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে। অতীতে বাংলা সন্তোষ ট্রফি জিতেছে একচেটিয়াভাবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েছেন অনেক গোল দিয়ে। কিন্তু আজ বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ের কথা দূরে থাক, ফাইনালে ওঠার পথে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন। কেন না গোলে তীর ও আচমকা শট করবার মত সুটার নেই।

আজও আমরা নিয়মশৃঙ্খলা রপ্ত করতে পারলাম না। খেলোয়াড় জীবনে এবং দলের খেলায় মানের ব্যাপারে নিয়মশৃঙ্খলা বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু আমাদের খেলোয়াড়েরা নিয়মশৃঙ্খলা মানা তো দূরের কথা তার কাছ দিয়ে ঘেঁষতে চান না। এবারকার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দল গঠন করবার জন্য যে কোচিং এবং ট্রায়াল ম্যাচের আয়োজন করা হয় তাতে নামী খেলোয়াড়েরা ভালভাবে সাড়া দেন নি। মনে মনে ভেবেছিলেন যে, ও আর কি খেলবো, প্রতিবারের মত এবারেও দলে চান্স পেয়ে যাবো—কিন্তু বাধ সাধলেন কর্তৃপক্ষ। তাঁরা দৃঢ়মুষ্টিতে

হাল করেছেন। যাঁরা ঐ সব খেলায় অংশ নেন নি তাঁদের অধিকাংশকেই তাঁরা দলে নেন নি। তাঁদের এই দৃঢ়তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। কেন না হয়তো বা তাঁদের এই দৃঢ়তার জন্য ফুটবলের মান উন্নত হতে পারে।

এখন এইটুকু বললে নিশ্চয়ই অসত্য কিছু বলা হবে না যে, খেলোয়াড়দের এই খেয়ালীপনার জন্যই বাংলার ফুটবল দলের আজ এই পরাজয়।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, যদি কর্তৃপক্ষ এইরূপ দৃঢ় মনোভাব না নিয়ে ভাল খেলোয়াড়দের দলে টেনে নিতেন তবে বোধহয় বাংলা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পারতো। আমিও ধরে নিলাম হয়তো পারতো। কিন্তু এটাও ঠিক যে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের উচিত নয়। তার চেয়ে আমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করাও ভালো।

দল গঠনের ব্যাপারে আরেকটা খারাপ দিক হলো যে, কর্তৃপক্ষের কোন কোন সদস্য তাদের পরিচিতদের দলে ঢুকিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। তা সে খেলোয়াড় খারাপ হোক আর ভালো হোক। সেদিকটা ভেবে দেখা তাঁরা প্রয়োজনই মনে করেন না।

আমাদের এইসব ব্যাপার কঠোরভাবে দমন করা উচিত। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের রাজ্যের খেলাধুলোর মান উন্নত করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। দেখা যাক আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী এ বিষয়ে কতটা কি করতে পারেন।

পরিতোষকুমার নাগ
বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি
উত্তরবঙ্গ

ও দেশে ও

গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় পেরু বনাম ব্রেজিলের খেলাটা ৪০ মিনিট বন্ধ রাখতে হয়েছিলো মাঠে গোলমালের জন্যে। রিও-ডে-জানেরোয় অনুষ্ঠিত এই খেলাটিতে গোলমাল আরম্ভ হলো যখন দু'দলেরই একজন করে খেলোয়াড়কে রেফারী মাঠ থেকে বের করে দিলেন। বিশ্রামের পরে দু'দলই দুটো করে গোল করেছিল। কিন্তু তারপর খেলোয়াড়রাই শুরু করেন গোলমাল। দু'দলের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় আবার খেলা শুরু হলো আর শেষ পর্যন্ত ৩—২ গোলে ব্রেজিল হারিয়ে দিলো পেরুকে।

বিতর্কিত খেলোয়াড় ডলিভিয়েরা আবার শিরোনামায়

আবার শিরোনামায় এসেছেন ডলি—ইংলন্ডের চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডলিভিয়েরা। গত এক বছর ধরে ডলিভিয়েরাকে নিয়ে যেসব কান্ড-কারখানা চলছে তার একমাত্র কারণ, ডলির জন্ম কেপটাউনে আর তিনি বর্ণসংকর।

সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার গোঁড়া বর্ণ-বিদ্বেষীরা তো রেগে লাল। সাদা চামড়া ছাড়া অন্য কাউকে তাঁরা মানুষ বলে মনে করেন না। আর কিনা সেই দক্ষিণ আফ্রিকারই একজন অশ্বেতকায় খেলোয়াড় নিজের দেশে খেলার সুযোগ না পেয়ে ইংলন্ডে বিশ্বজোড়া নাম করে ফেললো।

শুধু তাই নয়, ইংলন্ড দলের হয়ে সে আসবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। খেলবে সাদা চামড়ার দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিরুদ্ধে। যে মাঠে কোনদিনও অশ্বেতকায়রা প্রবেশাধিকার পায় নি, সেই মাঠেই কিনা খেলবে ডলিভিয়েরা।

না, কিছুতেই নয়! কিছুতেই তা হতে দেওয়া হবে না। ডলিভিয়েরা যদি ইংলন্ড দলের সংগে এসে খেলে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাহ'লে বুঝি বিশ্রীভাবে হেরে যাবেন দক্ষিণ আফ্রিকার উগ্র বর্ণবিদ্বেষীরা।

তাই শুরু হলো অভিনব সব অপপ্রচেষ্টা। প্রথমে ডলিভিয়েরাকে লোভ দেখানো হলো। একটা সামান্য কাজের জন্যে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিতে চাইলো দক্ষিণ আফ্রিকার নির্দেশে কোন একটি সংস্থা। কিন্তু সর্ত ছিলো—ইংলন্ডের সংগে ডলিভিয়েরা যেতে পারবেন না। কাজের অজুহাতে দলের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

ডলিভিয়েরা রাজী হন নি। টাকার ফাঁদে বাঁধা যায় নি তাঁকে। সেই সময়কার অর্থাৎ ডলিকে ফাঁদে ফেলার অপচেষ্টার সময়কার কথাবার্তা আজো ধরা আছে টেপরেকর্ডারের ফিতেয়।

কিন্তু তারপর? চাকা ঘুরতে লাগলো খুব তাড়াতাড়ি। প্রথমে ইংলন্ড দলের পক্ষে মনোনীত হলেন না। তাঁকে বাদ দেওয়া হলো দল থেকে।

শুধু ইংলন্ড নয়, সমস্ত ক্রিকেট বিশ্বে উঠলো প্রতিবাদের ঝড়। ইংলন্ডের পত্র-পত্রিকাগুলো নিন্দায় হয়ে উঠলো মুখর। তাঁরা লিখতে ইতস্তত করলেন না যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের চাপে পড়ে এম· সি· সি ডলিকে বাদ দিয়েছেন দল থেকে। কেন না ডলি দলে থাকলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলন্ড সফর বাতিল করে দেবেন।

তখন উঠে পড়ে লাগলো কাগজগুলো। ডলিকে তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাবেই। খেলোয়াড় হিসেবে যেতে পারলেন না যখন ডলি, তখন তিনি যাবেন সাংবাদিক হিসেবে। একটা কাগজ ঠিক করলো যে এম· সি· সি· দলের সংগে ডলিকে তারা পাঠাবে সাংবাদিক হিসেবে।

কিন্তু তারপর ইংলন্ডের অলরাউন্ডার টম কার্টরাইট অসুস্থতার জন্যে যখন জানালেন যে তিনি দলের সংগে যেতে পারবেন না, তখন তাঁর স্থানে ডলিভিয়েরাকে দলভুক্ত করলেন এম· সি· সি· কর্তৃপক্ষ প্রচন্ড জনমতের চাপে।

এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা ধরলেন নিজ মূর্তি। ফলে বাতিল হয়ে গেলো এম· সি· সি· দলের দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ। আর এই প্রসংগে ভ্রস্টার সাহেব যে কথা বলেছেন তাতে হাসি আসাই স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন যে যদি খেলার সময় কোন শ্বেতকায় আম্পায়ার ডলিকে আউটের নির্দেশ দেন তা'হলে তাই নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় নাকি বাধতে পারতো সাদা-কালোর লড়াই।

পুরনো কথা থাক! ডলিভিয়েরা প্রসংগটি আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার ইংলন্ড ভ্রমণে আসার কথা। আর এই সময়ই ডলিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় না যাবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিতে চাইবার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন ইংলন্ডের ক্রীড়ামন্ত্রী ডেনিস হোয়েল। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়……।

প্রশ্ন উত্তর

কল্যাণী জ্ঞান (দমদম)

। প্রশ্ন : গত ৪০ সংখ্যায় হৌরমোহন ভদ্র বোরদের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানিয়েছেন, কিন্তু যতদূর মনে হয় এতে একটু ভুল আছে। মোট রানের সংখ্যাটি মনে হয় ভুল। ওটি হবে।

৫৪টি টেস্ট, ৯৫ ইনিংস, নট আউট ১১ বার, সর্বোচ্চ ১৭৭ রান, শত রান সংখ্যা ৫, মোট রান ৩০৪৩, গড় ৩৬.২১।

উত্তর : ধন্যবাদ।

অভিজিৎ ব্যানার্জী (কোন্নগর, মনসাতলা)

প্রশ্ন : কোন ক্রিকেট ম্যাচ চলার সময় উইকেটরক্ষককে দিয়ে কি বোলিং করানো যায়

উত্তর : আইনে বাধা নেই সুতরাং যায়। তবে অসুবিধে অনেক।

শুভঙ্করঞ্জন দত্ত (ট্রেংগুলার কলোনী, পান্ডু, আসাম)

প্রশ্ন : এবারে সন্তোষ ট্রফির ফাইন্যালে বাংলা দলকে কেন মহীশূরের সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হলো?

উত্তর : বরাতে ছিলো বলে......।

গোপাল পাল চৌধুরী (কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া)

প্রশ্ন : মোহনবাগানের ইনামুর রহমানকে মাঠে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

উত্তর : এখন তো পাচ্ছেন......।

মনীশ মুখোপাধ্যায় (মনোহরপুকুর ২য় লেন, কলকাতা-২৯)

প্রশ্ন : লীগ ফুটবলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে, তার ফলাফল জানতে চাই।

উত্তর : অতো জায়গা যে নেই! যদি বিশেষ কোন বছরের ফলাফল জানতে চান—তা'হলে জানিয়ে দেবো। আশা করি আমাদের অসুবিধেটুকু বুঝবেন।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর, গোলবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ভারত ভ্রমণে আসবে যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলটি, তার খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানাবেন কি?

উত্তর : নিশ্চয়ই। তবে আর কিছু দিন পরে।

অরুণ গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : ক্রিকেটে বোম্বাই ও ফুটবলে বাংলার পর কোন্ কোন্ দলের নাম করা যেতে পারে?

উত্তর : আপনারাই বলুন।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : ১৯৬৮ সালে আপনার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান ও বোলারের নাম জানতে চাই।

উত্তর : আমার মতে ব্যাটিং-এ সোবার্সের পরেই অস্ট্রেলিয়ার ডগ ওয়ালটারস। আর বোলিং-এ পেস বোলার হিসেবে গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জির নামই করা উচিত।

নারায়ণ চক্রবর্তী (অশোক পল্লী, চন্দননগর)

প্রশ্ন : ধরুন একটি খেলোয়াড় বল নিয়ে এগুচ্ছে। বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড় তখন চার্জ করলো। বলটি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে নিজ দলের একজনের কাছে গেলো। সে তখন অফ সাইডে ছিল। রেফারী কি অফ সাইডের নির্দেশ দেবেন

উত্তর : হ্যাঁ, দেবেন।

অসিত চৌধুরী (থুবা, টাকী, ২৪ পরগনা)

উত্তর : তুমি শ্রীঅমল দত্তর সংগে যোগাযোগ করো। সংগে খাম কিম্বা ইনল্যান্ড দিয়ে দিও। আর চিঠিতে এ কথাও লিখতে পারো যে আমার কথা মতোই তুমি তাঁর সংগে যোগাযোগ করছো।

প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগনা)

উত্তর : পেন ফ্রেন্ডের ব্যাপারে আমরা তো বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারবো না। তবে আপনার পোস্টকার্ডটি রেখে দিলাম। কোন খোঁজ পেলে আপনাকে জানাবো।

কাজল বসু (শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ, রামপুরহাট)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলার ইতিহাসে কোন দল কি ফলো-অন এ পড়ে জয়লাভ করেছেন? যদি করে থাকে তবে কোন্ দল, কত সালে, কোন্ দলের বিরুদ্ধে?

উত্তর : আমি ঠিক বলে দিতে পারছি নে। কেউ জানলে—জানালে জানিয়ে দেবো।

তাপসকুমার চৌধুরী (টোংলা, গোলাবাড়ি, দারাং, আসাম)

প্রশ্ন : ভারতের শ্রেষ্ঠ বোলার কে?

উত্তর : স্পিন না পেস কোন্ বিভাগে?

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রহড়া)

প্রশ্ন : কলকাতার ফুটবল লীগের খেলা কবে আরম্ভ হবে?

উত্তর : বোধহয় মে মাসের মাঝামাঝি।

রজতশুভ্র চ্যাটার্জী — (ল্যানসডাউন রোড, কলকাতা)

উত্তর : কম্পোজিট স্টেডিয়ামের ওপর আমাদের লেখা আপনার ভালো লেগেছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি। ইডেনে যাতে 'কম্পোজিট স্টেডিয়াম' তৈরি না হয় তার জন্যে জনমত গড়ে ওঠার দরকার। আমাদের পক্ষে যতোটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করবো।

সুনীলকুমার ঘোষ (বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬)

উত্তর : আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম : ৩৯শ সংখ্যায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে, কেউ বাউন্ডারী কিম্বা ওভার বাউন্ডারী না মেরে সেঞ্চুরী করেছেন কিনা আপনার জানা নেই। কিন্তু আমি জানি যে, ১৯২৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান উডফুল সারে কাউন্টি দলের বিপক্ষে কোন বাউন্ডারী কিম্বা ওভার বাউন্ডারী না মেরে ১১৪ রান করেছিলেন।

অমৃতলাল সাহা (ঝগড়িয়ামুড়া, আগরতলা)

প্রশ্ন : গত ৩১শে মার্চ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে দেখলাম যে, কলকাতার দুই ছেলে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণে বার হয়েছেন। আমার ইচ্ছা আমি তাঁদের সম্পূর্ণ প্ল্যানটা দেখি। কোথা থেকে ওটা পেতে পারি?

উত্তর : তা তো বলতে পারবো না। তবে মনে হয় আমরা যতদূর পর্যন্ত ও'দের যাত্রাসূচী প্রকাশ করেছি—সেই অবধি গিয়ে ও'রা আবার নতুন সূচী তৈরি করে নেবেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর, রাস, শ্রীমদ্‌গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কঠক, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ক্ষুরিকা, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নাবদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্‌ :

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পূর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পূর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবর স্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্‌ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্‌, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

মহানির্বাণতন্ত্র :

(সর্ব দেবদেবীর মন্ত্রকোষ ও শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা-সম্বলিত)

মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, পাদটীকা-সমন্বিত বৃহদায়তন দুর্লভ গ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্রের সার। পঞ্চমকার সাধনার নিগূঢ় মর্ম, তন্ত্রসাধনার গুহ্যতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কালকাতা - ১২

ভিন্ন রুচির লোক:
কোথাও কাঁচা
কোটা মশলা
চলে
কোথাও চলে
বাটা মশলা
আরো
দেবো
ঠাকুমা?
কোথাও
অতিরিক্ত
ডাইলে
কয় গন্ডা লঙ্কা দিছ ?
কোথাও
বা
নামমাত্র
ছালন কো
পকায় কে
পকায় কে-বস,
ইত্তি মসালা!
কিন্তু সবার রুচিকেই
কুকমী পরিতৃপ্ত করে!
শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

18 APR 1969

াপ্তাহিক বসুমতী

নয়াদিল্লীতে অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু ও সোমনাথ লাহিড়ী

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা

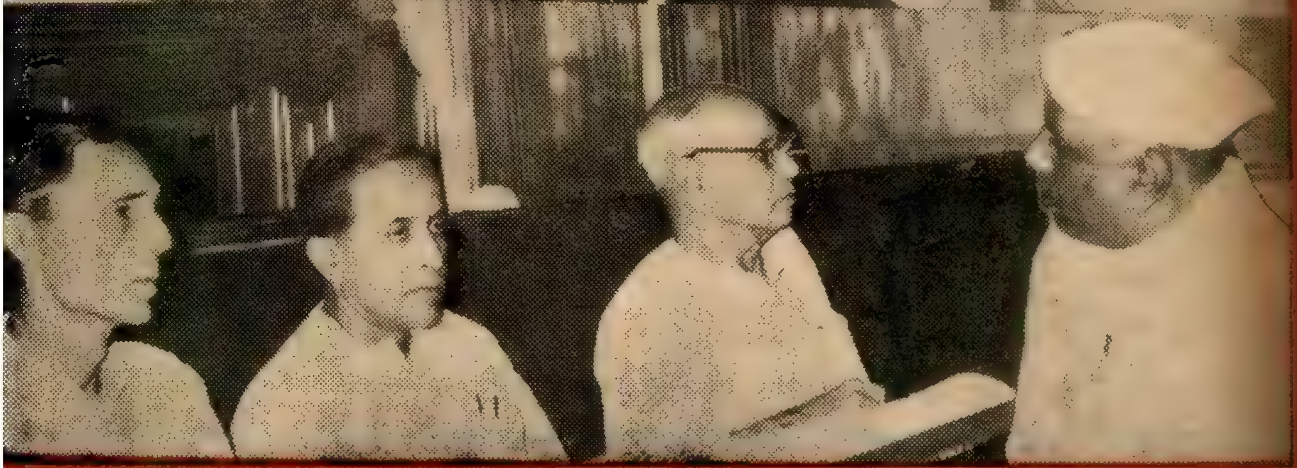

র্ষ : ৪৪শ সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ [OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA] 73 year, No. 44, 24th April, 196

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৭৫৫
আজকের মানুষ		২৭৫৬
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৭৫৭
রঙ্গদর্শন		২৭৬০
ভারতদর্শন		২৭৬৩
আন্তর্জাতিক		২৭৬৬
দু'টি দলের কিনারা হলো না কেন?	— মনোরঞ্জন হাজরা	২৭৬৮
জালালাবাদের স্মৃতি	— শচীন্দ্রনাথ গুহ	২৭৭১
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২৭৭২
কথায় কথায়	— নিবারণ মুনশী	২৭৭৫
মন্ত্রীরা কি বলেন		২৭৭৭
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	২৭৭৮

যে কোন
গয়না
আর
আ স ল
গ্র হ র ত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ডসন্স অব লেট
এস. বি. সরকার

এ. সরকার এন্ড সন্স
৮১/১বি রাসবিহারী এভিন্যু

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নির্বাচনের পরে	সাগর বিশ্বাস	২৭৮০
গ্রন্থমেলা	...	২৭৮৪
আমার ইউরোপ ভ্রমণ	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২৭৮৫
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল জানা	২৭৮৮
পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার সমাধান কোন্ পথে	বারীন ভাদুড়ী	২৭৯২
তিমিরপ্রান্ত ভূবার্স	অগ্নিবর্ণ	২৭৯৫
শাশ্বত ব্রহ্মপুত্র (গল্প)	জহরলাল সাহা	২৭৯৮
চিত্রলেখা	শিলাদিত্য	২৮০২
পাঠকমন	...	২৮০৪
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২৮০৫
রূপাজগৎ	...	২৮০৭
খেলাধূলা	শান্তিপ্রিয়	২৮১২

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা; ব্যায়সা কা ত্যায়সা; জনা; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নেটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন ॥

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

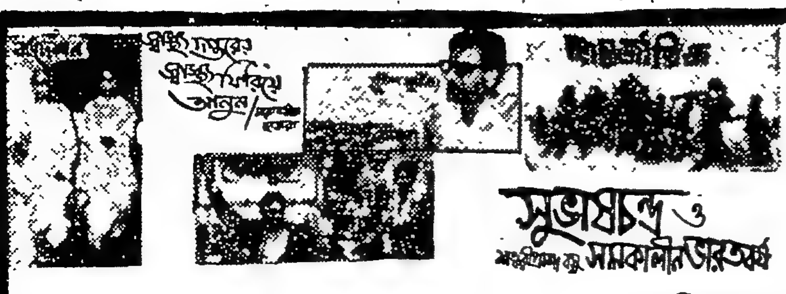

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা — জয়ন্তী সেন

৭৩ বর্ষ : ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 24th April, 1969

CALCU
CENTI
LIBRA
UNIVE

স্বাধীনতালাভের পর

স্বাধীনতালাভের আগে ও স্বাধীনতালাভের পর—এই দুই কালের সমাজের বিচারবিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতালাভের আগে দেশের মধ্যে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি থাকলেও প্রকাশ্য সমাজের শালীনতা কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি; সমাজের সাধারণ মানুষগুলির উচ্চাদর্শের অভাব ছিল না এবং শিক্ষিত ও নিরক্ষরদের চারিত্রিক গৌরব সমান মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃত হোত। স্বাধীনতালাভের আগে এই জাতীয় চেতনা নিয়ে আমাদের দেশের মানুষ বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নৈতিক সংগ্রাম করতে দুর্বার সাহস পেয়েছে। রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দেশে যুবমানস কোথাও ভ্রষ্ট হয় নি। তাই এদেশে আবির্ভাব ঘটেছিল ক্ষুদিরাম ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মহান দেশসেবীদের। এঁদের প্রভাবে সমাজের যুবচিত্ত প্রভূত প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

স্বাধীনতালাভের পর দেশের যুবশক্তি আরো দৃঢ়তা লাভ করবে—এটাই ছিল কাম্য। দেশহিতৈষিগণ আশা করেছিলেন, চরিত্র সৃষ্টিতে এই বাংলাদেশই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কপাল অত্যন্ত মন্দ। তাই স্বাধীনতা গ্রহণের অধিক মূল্য দিতে হল বাংলাদেশকে। বিনিময়ে আমরা পেলাম দুর্দশাগ্রস্ত ক্ষুধার্ত, নৈরাশ্যপীড়িত ও আশ্রয়শূন্য অর্ধ বঙ্গকে।

এই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষগুলিকে সঠিক পথে চালনার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যা পাওয়ার যোগ্য ছিল, তা থেকে ঐ সময় বঞ্চিত হোল, এবং তার কপালে ক্রমাগত আসতে থাকলো একটির পর একটি ধাক্কা। তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষগুলির ভাগ্য বঞ্চিত অবস্থায় পড়লো আরো দুর্বিপাকে আর এই মানুষগুলিকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এলো লঘু থেকে লঘুতর বিচিত্র রকম আনন্দ-বিধানের ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে শালীনতার অভাব দেখা যেতে লাগলো। এবং শালীনতাবোধ আরো ক্ষুণ্ণ হবার পথ পেল মারী গুটিকার মতো চলচ্চিত্রগুলির মাধ্যমে। দেশ সংগঠক ও সমাজসেবীরাও আত্মোৎসর্গের নিদর্শন দেখিয়ে যুবকদের মধ্যে আদর্শবোধ সৃষ্টি করতে এই সময় ব্যর্থ হলেন। কারণ স্বাধীনতালাভের পর তাঁরা তখন রাজ্য রক্ষার তাগিদে ব্যস্ত অথবা দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর আয়াসপ্রয়াসী ও বিলাসাকাঙ্ক্ষী। সমাজদেহে কিভাবে বিষ প্রবেশ করে সমস্ত জাতিটাকে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে চলেছে এ দেখা বা ভাবার সময়ও তখন এঁদের ছিল না। দেশের মানুষগুলির অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করলো এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও তাদের মাধ্যমে প্রচারিত বিকৃত রুচির লেখাগুলি। এই সব লেখার কিছু অংশ বিচারালয়ে দণ্ডিত হলেও এদের অনিবার্য দূষিত স্রোত থেকে দেশের লঘুচিত্তের মানুষগুলিকে বিচারালয় সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারলো না। এই ধরণের দূষিত বিষ সমাজে ছড়াবার মূলে যারা ছিল—তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হওয়ায় দেশের ও দশের নেতৃবৃন্দ ও মুরুব্বিস্থানীয় ব্যক্তিগণ এগিয়ে এলেন না। স্বভাবতই সমাজদেহে যে পচন সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছিল তাকে আরো তীব্র করে তুললো এদেশে আগত বীট-হিপিরা। এবং এ দেশের এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা এদের মাথায় করে তুলে ধরলো। এরাও স্কুল কলেজে বিতরণ করতে লাগলো বিকৃতরুচি ও নোংরামিতে ভর্তি যতো সব লেখা। গাঁজা, আফিম ও এল-এস-ডি'র জয়যাত্রা তারা ঘোষণা করলো। মুক্তমেলা হলো ঐ সবের প্রধান পীঠস্থান এবং প্রকাশ্য দিবালোকে নারীদের শ্লীলতাহানি করা হতে লাগলো। আর তারা ইয়ং জেনারেশনের দফারফা এমনই শেষ করলো যে, মিনিস্কার্ট আর নর্দমা প্যান্ট চারিদিকে গজিয়ে উঠতে লাগলো। স্কুল-কলেজে এ সবের বিরুদ্ধে কিছু বলা হলো না, চক্ষুপীড়াদায়ক ফ্যাশনকারীরা রকে বসে শিস দিতে দিতে মা-বোনদের যেমন জ্বালাতন করতে লাগলো তেমনি এদেরই একদল কবি সম্মেলনে গিয়ে বিকৃত রুচির কবিতা পড়তে লাগলো। রেডিওতে বিকৃত রুচির লেখা প্রশংসিত হতে লাগলো। দেশের তখন বারোটা বাজাবার ব্যবস্থা করা হলেও সমাজকে গোল্লায় নিয়ে যাবার জন্য যারা তৎপর, প্রচ্ছন্নভাবে তাদের প্রশংসা করতে লাগল। এদেশের এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা এবং আশ্চর্যভাবে নীরবতা তখন পালন করলেন দেশের নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকগণ। লঘুচিত্তার এক শ্রেণীর যুবক সম্প্রদায়কে গা ভাসিয়ে দিতে দেখেও কেন যে তাঁরা নীরব রইলেন—এটাই রহস্যময়। এমন কি, কলকাতার রাজপথে বুক স্টল ও চৌরঙ্গীপাড়ায় দেওয়ালগুলিতে বিকৃত রুচির ছবি, বই ও মলাট সহ বই শোভা পেতে থাকলেও কেউ একবারও প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করলেন না। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গ যে সংস্কৃতির জন্যে উচ্চ গৌরবে ভূষিত সেখানে অপসংস্কৃতির প্রচার দেখেও তার বিরুদ্ধে কেউ এগিয়ে গেলেন না। আমাদের নিজেদের ঘরের একদল ছেলেমেয়েই যে জাহান্নমের পথে যাচ্ছে এবং এরাই যে একদিন অনর্থ সৃষ্টি করবে—পরিবারের অভিভাবক ও দেশের হিতৈষিগণ তা ভেবে দেখতে ব্যর্থ হওয়ার ফলই যে, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের বিচার্য বিষয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বর্তমান সমাজে কোনো ঘটনাকেই অতীতের সঙ্গে বিচারে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। তাই স্বাধীনতালাভের পর দেশের যুবশক্তি যে পথ ধরেছে—রবীন্দ্র স্টেডিয়ামের ঘটনায় তারও বিস্ফোরণ। কিন্তু আমরা চাই সমাজ বিষমুক্ত হোক। এর জন্য সামগ্রিকভাবে অনুসন্ধানই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বিখ্যাত কার্টুন সাপ্তাহিক 'শংকরস্ উইকলি' তাঁর এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় লিখেছেন যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লাটে ওঠার ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন তার জন্যে অনেকখানি কৃতিত্ব দিতে হবে শ্রী এস কে পাতিলকে। সাময়িকীটা ব্যঙ্গচিত্র সম্পর্কিত বলেই। হয়তো ব্যঙ্গ করে পাতিল সম্পর্কে অমন রূঢ় কথা বলেছেন পত্রিকাখানা। হিম্মৎসিংজী কিন্তু পাতিলের পার্লামেন্টারী জীবনের সাধ ঘুচিয়ে দেবার জন্যেই যেন তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন। গুজরাটের বনসকণ্ঠ কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে শ্রীহিম্মৎসিংজী নির্দলপ্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসদোবা পাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

কিসে আর কিসে!—পাতিল-হিম্মৎসিংজীর নির্বাচনী লড়াইয়ের কথা শুনে অনেকেই এ-মন্তব্য করবেন। পাতিল হলেন কংগ্রেসের একজন নামজাদা ডাকসাইটে লোক, কংগ্রেসের সামনের সারির প্রবীণ ও সর্বভারতীয় নেতা, তিন-চারবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যমন্ত্রীর গদী অলংকৃত করে পশ্চিমী দুনিয়ায়ও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকা গেলে মার্কিন সরকার তো গদগদ হয়ে তাঁর সম্মানে প্রায় তোপধ্বনি করে, লাল কার্পেট বিছিয়ে দিতেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরুও মার্কিন মুলুকে সে-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু পাতিল সম্পর্কে পাতার পর পাতা লেখা গেলেও এখানে তার অবকাশ নেই, বলছিলাম হিম্মৎসিংজীর কথা। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এ-নক্ষত্রটি কে? নক্ষত্র না উল্কা ইনি? ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় এঁর নাম স্থান পেয়েছে কি? কোনো বক্তৃতামঞ্চে তাঁকে কখনো দেখা গিয়েছে কি? তাঁর কোনো বিবৃতি ইদানীংকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে কি? তাঁর ডাকে লাখো জনতা কি জড়ো হয়েছে? তবে তিনি কার ভরসায়, কিসের জোরে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামছেন? এবং নামছেন কোনো হে'জিপে'জি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নয়, শ্রী এস কে পাতিলের মত একজন জাঁদরেল জবরদস্ত নেতার বিরুদ্ধে? যাঁকে ১৯৬২ সনের নির্বাচনে

হিম্মৎসিংজী

শ্রীকৃষ্ণমেননের মতো জগদ্বিখ্যাত লোককেও পরাজয় স্বীকার করে কুর্নিশ জানাতে হয়েছে।

হ্যাঁ, কৃষ্ণমেননকে সেদিন হার মানতে হয়েছিল, কিন্তু হার মানেন নি স্বল্পখ্যাত, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জর্জ ফার্নাণ্ডেজ। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দল সমর্থিত এস-এস-পি প্রার্থী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পাতিলজীকে ভূতলশায়ী করেছিলেন। সেদিন যাঁরা ফার্নাণ্ডেজকে শ্রীপাতিলের বিরুদ্ধে সমর্থন করেছিলেন, আজ তাঁরাই হিম্মৎসিংজীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কোন চমকপ্রদ রাজনৈতিক অতীত জীবন না থাকা সত্ত্বেও হিম্মৎসিংজী আজ মুখর জনতার মূর্ত প্রতীক।

সক্রিয় রাজনীতিতে হিম্মৎসিংজীর ভূমিকা নগণ্য, অস্বীকার করার জো নেই। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করে চলেছেন সুদূর ছাত্রজীবন থেকেই। বিলেতের অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন, সেখানেই উদারনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন তিনি। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি জড়িত হন সেখানে। সেদিন বিলেতে যে-সমস্ত ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে হিম্মৎসিংজী একজোট হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, আজ তাঁদের মধ্যে অনেকেই মন্ত্রিত্বের গদি পেয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করেছেন।

দেশে ফিরে একটি ঘোষণা প্রচার করে হিম্মৎসিংজী রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। হিম্মৎসিংজী মানসা রাজ্যের প্রজাদের ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে বলেছিলেন অথচ সে ট্যাক্সের প্রাপক তিনি নিজে। উত্তর গুজরাটের ছোট্ট রাজ্য মানসা রাজবাড়ির ছেলে হিম্মৎসিং, কিন্তু গদিতে তখন তাঁর ভাই। বিলেত থেকে ফিরে তিনি রাজত্ব করলেন না, এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সামান্য চাকরি নিলেন।

রাজনীতি বিষয়ে বরাবরই আগ্রহ নিলেও হিম্মৎসিংজী কখনো কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেন নি, যদিও তাঁর বন্ধু ও সুহৃদ রয়েছেন প্রতিটি দলে। ভারতের চারটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, হিম্মৎসিং কোনোবার প্রার্থী হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন নি। আজ হঠাৎ বয়সে তাঁর এ-ভীমরতি হল কেন? মোরারজী-পাতিল চক্রের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার তাগিদে—হিম্মৎসিংজীর জবানী।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

হরিপুরায় শান্তির দ্বীপ (২)

সুভাষচন্দ্র পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তিনদিন আগে, ১৬ ফেব্রুয়ারীতে আরও একটি কাজ করেছিলেন—কংগ্রেস-নগরী যাঁর নামে সেই বিঠলভাই প্যাটেলের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন। বিঠলভাই ভারতীয় রাজনীতিতে গণ্য মানুষ, তাঁর দেহান্ত হয়েছে, সুতরাং তাঁর নামে কংগ্রেস-নগরীর নামকরণ কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি তিনি বল্লভভাই প্যাটেলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা না হতেন, তাহলে বল্লভভাই 'শত্রুপক্ষীয়' ঐ ব্যক্তির নামকে গৌরবান্বিত করতে চাইতেন কি না সন্দেহ। জ্যেষ্ঠের রাজনীতির কঠোর বিরোধী হয়েও এবং তাঁর আদর্শ ও ইচ্ছার প্রতি চরম অবজ্ঞা জানিয়েও, বল্লভভাই ঐ মূর্তিপূজার ব্যবস্থা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—মৃত ভ্রাতার শত্রুতায় তাঁর ভয় নেই।

বিঠলভাইয়ের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের ঈষৎ উল্লেখ আমরা আগে করেছি। পরে আরও করতে হবে। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, সুভাষচন্দ্র মূর্তির আবরণ মোচন করায় অন্তরীক্ষে বিঠলভাইয়ের আত্মা বোধহয় সবচেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল।

বিরাট আবক্ষ মূর্তিটি কংগ্রেস-নগরের প্রবেশপথে সমুচ্চ বেদীর উপরে স্থাপিত হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন অধিবেশনের ভাগ্যদেবতার মূর্তি। উন্মোচন করার পরে সুভাষচন্দ্র যা বলেছিলেন, তার মধ্যে ব্যক্তিগত কথা ছিল, ভাবাবেগ তিনি গোপন করতে পারেন নি—

> "স্বর্গত বিঠলভাইয়ের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে আমাকে বলা হয়েছে—একে আমি বিরাট সম্মান মনে করি। এই সভায় অনেকেই আছেন যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে জানতেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্যদল গঠিত হবার পরে কয়েক বৎসর ধরে তাঁকে আমি জেনেছি। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। আপনাদের কাছে হয়ত অদ্ভুত শোনাবে, তাঁর জীবনের শেষ ৬ মাস সময়ে যখন তিনি ইউরোপে ছিলেন, তখনই তাঁর চরিত্রের গভীরে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ আমার হয়।
>
> ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে বন্দী হবার পরে জেলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ যেতে সরকার তাঁকে অনুমতি দেন। কয়েক মাস পরে কিছু ভাল বোধ করলে আমেরিকায় দীর্ঘ সফরে যান—উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সেখানে প্রচারকার্য। সেখানে তিন মাসের অতি দ্রুত ভ্রমণে তিনি কম পক্ষে ৪০টি সভায় বক্তৃতা করেছিলেন।
>
> এই পরিশ্রম তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। ইংলণ্ডে যখন পৌঁছলেন তখন ভেঙে পড়েছেন। তাহলেও আয়ারল্যাণ্ডে গেলেন, প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরার সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নেবার এবং 'ভারত-আয়ার স্বাধীনতা সংঘের' কাজে উৎসাহ দেবার জন্য। ঐ সমিতিটি তিনি কয়েকজন আইরিশ বন্ধুর সাহায্যে স্থাপন করেছিলেন। লণ্ডন থেকে গেলেন ভিয়েনায়, সেখানে হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞরা বললেন, তাঁর গুরুতর হৃদ্‌রোগ হয়েছে। এক স্বাস্থ্যনিবাস থেকে অন্য স্বাস্থ্যনিবাসে তাঁকে পাঠানো হতে লাগল। যেই একটু ভাল হয়েছেন, অমনি ভিয়েনা থেকে জেনিভায় গেলেন ভারত সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য, সেই সঙ্গে লীগ অব নেশনস্‌-কে ভারতের স্বাধীনতার কাজে কোনোভাবে লাগানো যায় কি না সেই সন্ধান করতে লাগলেন।
>
> দুঃখের বিষয় জেনিভায় পৌঁছেই তাঁর মারাত্মক হৃদ্‌রোগ হল। নিকটবর্তী স্যানাটোরিয়ামে তাঁকে স্থানান্তরিত করে যথাসম্ভব সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। এক মাসের উপর তিনি জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রইলেন। কখনো কখনো মনে হয়েছিল তিনি সংকট কাটিয়ে উঠবেন; শেষ পর্যন্ত জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেল। এই সংকটকালেই তাঁর শয্যা-পার্শ্বে দিনরাত্রি কাটাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার জীবনের সে এক বিরল সুযোগ। নিদারুণ যন্ত্রণা যখন সহ্য করছেন, তখনো দেখেছি, ভারতের স্বাধীনতা ভিন্ন তাঁর কোনো চিন্তা নেই। সে ছবি আমার মনে গেঁথে আছে। কারো বিরুদ্ধে কোনো নির্দয় বাক্য তাঁর মুখ থেকে শুনি নি। বরং সকলের সম্বন্ধেই তিনি কোমলভাবে কথা বলতেন।
>
> যখন বুঝলাম, আর বেশীদিন নেই, জিজ্ঞাসা করতাম প্রায়ই, কোনো বিশেষ আকাঙ্ক্ষা আছে কি, একটিমাত্র উত্তরই পেতাম—'না।'
>
> যন্ত্রণার সাময়িক উপশম যখন হত তখন ভারতের

স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে ভবিষ্যতের কাজ সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার কথা বলতেন, বিশেষতঃ বৈদেশিক প্রচার সম্বন্ধে। একেবারে শেষ ক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি নি, আমাকে কী গভীরভাবে স্নেহ করেন তিনি। যখন তিনি আমাকে তাঁর উইল দেখালেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে আমাকে অনুরোধ জানালেন—তখনই আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বাসের রূপ অনুভব করলাম। আমি যে তাতে কতখানি অভিভূত হয়েছিলাম বলে উঠতে পারব না।

একেবারে শেষ অবধি তাঁর চেতনা ছিল। শেষ কথা বলেছিলেন—তিনি আশা করেন, প্রার্থনা করেন, ভারত অচিরে স্বাধীন হবে। এই সেই বিরাট পুরুষ, হান দেশপ্রেমিক, যাঁকে চার বছর আগে বিদেশে রিয়েছি। তিনি বিদেশে দেহত্যাগ করেছেন, হয়ত তা অকারণে নয়।"১৪

বল্লভভাই প্যাটেলকে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার শেষ অংশ সহ্য করতে হয়েছিল; পোলিটিশ্যানদের অনেক কিছু কার্যগতিকে সহ্য করতে হয়, অপেক্ষা করতে হয় অনুকূল সময় কখন আসবে উপযুক্ত আঘাত হানার। বল্লভভাই এখন গান্ধীজীর পিছনে থেকে দুরন্তকে পোষ মানাবার সহিষ্ণু স্নেহে আছেন। সুতরাং তাঁরই পরিচালনায় আর একটি বর্ণাঢ্য মিছিল পৌঁছল কংগ্রেস মণ্ডপে—রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সদলবলে এলেন সভাস্থলে।

"উন্মুক্ত বিশাল সভাঙ্গনের পশ্চিম দিকের গেট থেকে সভাপতির শোভাযাত্রা পূর্ব দিকের মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল সভাস্থলকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে—তখনকার দৃশ্য সুমহিম। সর্বাগ্রে একদল স্বেচ্ছাসেবক, তারপরেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দরবার গোপালদাস, পিছনে শ্রীযুক্ত বসু, তাঁর কণ্ঠে ত্রিবর্ণরঞ্জিত মালা, ললাটে কুঙ্কুম, ব্যাণ্ডের তালে তালে পা ফেলে অগ্রসর হচ্ছিলেন।......বাঁ দিকে ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল; ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা দুইজন করে সারি দিয়ে পিছনে—সবশেষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু।

শোভাযাত্রা যখন মঞ্চের কাছে পৌঁছল, দেখা গেল লর্ড স্যামুয়েল ছবি তুলছেন।"১৫

"শ্রীযুক্ত বসুর সম্মানীয়া বৃদ্ধ মাতা যখন মহিলাগণের জন্য নির্দিষ্ট বেষ্টনীর মধ্যে আসন গ্রহণ করেন, তখন হর্ষধ্বনি করা হয়।"১৬

রাষ্ট্রপতি সভাস্থলে পৌঁছবার পরে একটি মনোরম নাটকীয় দৃশ্য দেখা গেল। "বিরাট সমাবেশ, যা দুই লক্ষেরও বেশি লোকের হয়ে দাঁড়িয়েছে, সভাপতির শোভাযাত্রা দর্শনের উত্তেজনার পরে তা এখন শান্ত—এমন সময়ে একটি ঢাকা গাড়ি সভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে ধীরে অগ্রসর হয়ে একেবারে মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ির দরজা খুলল—মহাত্মা গান্ধী বেরোলেন—রাষ্ট্রপতি এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনার জন্য। তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চের উপরে গান্ধীজী উঠতে লাগলেন। তাঁর ক্ষীণতনু যখন সিঁড়ির উপরে দেখা গেল, তখন সমগ্র জনতা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে প্রবল হর্ষধ্বনি করে উঠল। মুহুর্মুহু ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ, আনন্দে উজ্জ্বল গান্ধীজীর চোখ; ধীরে ফিরলেন বিশাল জনতার দিকে, তাদের অভিনন্দনের স্বীকৃতিতে দু' হাত উঁচুতে তুললেন—চতুর্দিকে জয়ধ্বনির তরঙ্গ আছড়াতে লাগল।......

মঞ্চে গিয়ে গান্ধীজী শ্রীযুক্ত বসুর ডান দিকে বসলেন, তাঁর বাম দিকে রইলেন সর্দার প্যাটেল।"১৭

পরবর্তী ঘটনার একটি চমৎকার বর্ণনা পাই অমৃতবাজার পত্রিকায় (২১ ফেব্রুয়ারী) আশু দে'র রচনায়। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে তিনি বহুলাংশে ফোটাতে পেরেছেন। পশ্চিম-ভারতের জ্বলন্ত অপরাহ্নে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় কি রকম সুশৃঙ্খলভাবে আড়াই লক্ষ লোকের সমাবেশে অধিবেশন আরম্ভ হয়েছিল, সভাপতির শোভাযাত্রা কিভাবে সভাস্থলে এসেছিল, "সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ সমুন্নত শরীরে রাজকীয় মহিমা" কিভাবে তাঁর সঙ্গীদের ছাপিয়ে বিরাজমান ছিল, তা বলার পরে তিনি লিখেছিলেন—

"নেতৃবৃন্দ আসন গ্রহণ করলেন। যথোচিতভাবে বন্দেমাতরম গাইবার জন্য বাংলা দেশ থেকে যে তরুণ-তরুণীর দলটিকে আনা হয়েছে, তারা যেভাবে গাইল তাতে তাদের আনার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে হল। অবিস্মরণীয় দৃশ্য—সার দিয়ে নেতারা দণ্ডায়মান, কেন্দ্রে মহাত্মাজী, তাঁর বাম পাশে সুভাষচন্দ্র—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুরবিস্তার শুনছেন সুগভীর স্তব্ধতার সঙ্গে। মহাকায় সৌন্দর্যের মত শুভ্র পোষাকে আবৃত সুভাষকে দেখে মনে হল—জাতি যে-গৌরব তাঁকে দিয়েছে তিনি সত্যই তার যোগ্য। ......অতঃপর রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি গাওয়া হল, তার সুরমহিমাও অল্প নয়।......

গানের পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দরবার গোপালদাস বক্তৃতামঞ্চে উঠে হিন্দীতে অভ্যর্থনাভাষণ পাঠ করলেন। এইবার রাষ্ট্রপতির মঞ্চে যাবার সময়—উদ্বেলিত জনসমুদ্রের সামনে এই প্রথম তিনি দাঁড়াবেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর একটু ঝুঁকে মহাত্মাজীকে কি যেন বললেন, তারপরে সম্পূর্ণ আত্মস্থ ভঙ্গিতে বক্তৃতামঞ্চের পাদদেশে হেঁটে গেলেন, তাঁর পিছনে একটি বাক্সে করে একজন কি যেন নিয়ে চলল। মঞ্চে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পথে এক স্বেচ্ছাসেবিকা দৃঢ়, মাপা পায়ে

১৪ ১৭ ফেব্রুয়ারীর অমৃতবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে
১৫ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ২০ ফেব্রুয়ারী
১৬ অমৃতবাজার—২০ ফেব্রুয়ারী
১৭ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও অমৃতবাজার—২০ ফেব্রুয়ারী

এগিয়ে এসে স্যালুট করল, তারপরে তাঁকে নিয়ে এগিয়ে গেল মাইক্রোফোনের দিকে। সভাস্থলের শেষতম প্রান্ত থেকে হর্ষধ্বনি উচ্ছ্বসিত হয়ে রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানাল। তিনি সর্বদিকে ঘুরে নমস্কার জানালেন। এবার বাক্সটি খোলা হল, তার থেকে বিরাট আকারের একটি মালা তুলে নিয়ে তাঁর গলায় পরিয়ে দেওয়া হল। তিনি নত হলেন, মালাটি খুললেন, মঞ্চের রেলিঙে রাখলেন।.....

প্রতিটি ভঙ্গি শান্ত, আত্মস্থ, পরিমাপিত, মানসিক চাঞ্চল্যের এতটুকু চিহ্ন নেই। বক্তৃতামঞ্চের একেবারে কাছে, প্রায় পিছনে বসে আমি দেখছি—এই আত্মস্থতা শুধু প্রশংসনীয় নয়—একেবারে অবিশ্বাস্য! নিতান্ত সহজভাবে মাইক ঠিক করে নিলেন, তারপরে—ভাষণ শুরু করলেন—অনর্গল হিন্দীতে।"

[ক্রমশ]

সানলাইটে

প্রতিবার
আপনার জামাকাপড়
আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন—কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার
প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

লিনটাস-S. 63-150 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

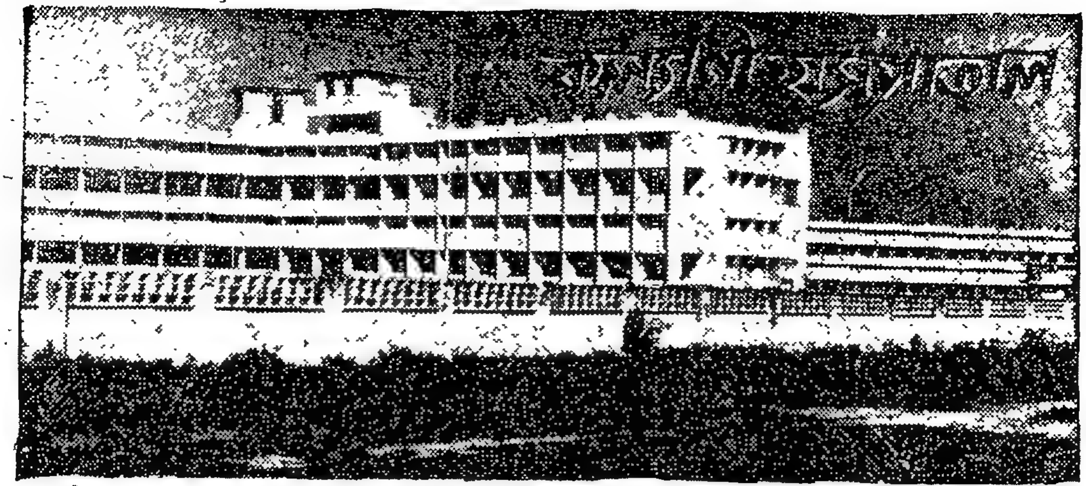

বঁড়দর্শনঃ স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে সাপ্তাহিক বসুমতীর এত মাথাব্যথা কেন? কল্যাণী হাসপাতালের ব্যাপারেই বা সাপ্তাহিক বসুমতীর এত আগ্রহ কেন? —আমলাতন্ত্রের শিকার হয়ে কোনো দায়িত্বশীল মন্ত্রী যদি এ অসহায় মন্তব্য করেন, তবে আমরা নাচার। **এই সব মন্তব্য বা প্রশ্নের সরাসরি জবাব মিলবে এবারকার বঁড়দর্শনে!**

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে একটি জলসা উপলক্ষে "একটা কিছু" ঘটেছে, কিন্তু তা নিয়ে যে আন্দাজ সোরগোল সম্প্রতি সুরু হয়েছে তাতে এটুকু সন্দেহ করার কারণ আছে যে, সোরগোল-কারীরা সামান্য একটি ঘটনাকে একটা বিরাট রাজনৈতিক ইস্যুতে দাঁড় করাতে চাইছেন।

একটা জলসা ভণ্ডুল হয়েছে এবং এই অবস্থায় যা হয় বা যা হওয়া সম্ভব তার চেয়ে বেশি কিছু হয় নি। বিরাট সমাবেশ ভণ্ডুল হয়ে গেলে সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা তার সুযোগ নেয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ছিনতাই, লুটপাট বেশ কিছু হয়েছে এবং আতংকিত নারীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি করেছেন এবং দু-একটি ক্ষেত্রে হয়ত কোন দুর্বৃত্ত তাঁদের এই আকস্মিক বিপর্যয়ের সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছে, হয়ত বা কোন ক্ষেত্রে নিয়েছেও। স্টার হিস্টিরিয়া উপলক্ষ করে যে সব জলসা অনুষ্ঠিত হয়, সকল ক্ষেত্রেই এই ব্যাপার ঘটে, তবে এখানে কিছু বাড়াবাড়ি ঘটেছে। কিন্তু যেভাবে ঘটনাটিকে চিত্রিত করা হচ্ছে তা উদ্দেশ্যমূলক মনে করার কারণ আছে। ঘটনা ঘটে যাবার পরদিন সংবাদ-পত্রগুলিতে তো এই রকম কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি, বলা হয়েছে যে, জলসা ভণ্ডুল হয়েছে, মোটরগাড়ি জ্বলেছে, পুলিশ টিয়ার গ্যাস গুলী চালিয়েছে। সেদিন কি সাংবাদিকদের দৃষ্টি অন্ধ ছিল, তাঁরা অন্ধকারে মেয়ে পুরুষ ঠাওর করতে পারেন নি? ক্যামেরার চোখে পাইকারী শ্লীলতাহানির একটা ঘটনাও ধরা পড়ে নি কেন?

আজকে বলা হচ্ছে এরকম যে ঘটবে সেটা না কি আগে থেকেই জানা ছিল। কোথায় কোন্ ভদ্রমহিলার বান্ধবী তাঁকে জলসায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। ওই পাড়ার লোকেরা না কি এই রকম ঘটনা ঘটবে আগে থেকেই জানতেন; তাই তাঁরা টিকেট কাটেন নি। পুলিশও না কি জানত, কেন না একজন পুলিশ অফিসার না কি তাঁর আত্মীয়াকে সাবধান করে দিয়ে-ছিলেন। কোন মন্ত্রী না কি এই জলসার পৃষ্ঠপোষক! তাই ব্যাপারটা চেপে যাওয়া হচ্ছে! উদ্যোক্তারা না কি বাম কমিউনিস্ট পার্টিকে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছিল! আরও কত কি! এবার আবার দেখছি কোন কোন পত্রিকায় স্টেটমেণ্ট ছাপা হচ্ছে! পুলিশের কাছে স্টেটমেণ্ট দেবার বদলে সংবাদপত্রে স্টেটমেণ্ট দিলে বোধ হয় লোক জানাজানি কম হয়।

কিছুই যে হয় নি তা আমরা বলছি না। একজন নারীর সম্মানহানি হলেও তা সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। উক্ত জলসায় কি কোন পুরুষ ছিলেন না? দলবদ্ধভাবে নারীরা লাঞ্ছিতা হলেন, অথচ পুরুষেরা নির্বিকার রইলেন, এটা কি রকম ব্যাপার?

যুক্তফ্রণ্ট সরকার এক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়ে ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। ঘটনা ঘটার দশ দিনের মধ্যেই তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই দ্রুততা প্রশংসনীয়, কেন না ইতিপূর্বে এত দ্রুত বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া কদাচিৎ হয়েছে। রাজনীতির কারবারীরা ধুয়া তুলেছেন, তদ্দণ্ডেই কেন তদন্তের কথা সরকারের তরফ থেকে বলা হয় নি? এঁরা ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের দিনগুলি কি স্মরণ করতে পারছেন? এঁদের কি খেয়াল নেই ঘটনা ঘটার কতদিন পরে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাহিড়ী কমিশন বসিয়েছিলেন এবং তাও কতটা আন্দোলনের পর? সে তুলনায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার জনস্বার্থের প্রতি অনেক সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন—এর জন্য কোন গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন হয় নি এবং আমাদের ধারণা সংবাদপত্রে কাঁদুনি গেয়ে সে রকম কোন আন্দোলনও গড়ে তোলা যায় না, বিশেষ করে যেখানে সত্য জিজ্ঞাসার চেয়ে রাজনীতিই বেশি কাজ করছে—তবে কিছু লোককে বিভ্রান্ত করা যায় এইমাত্র।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে

গত ১৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ৬৯ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর মহান চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসিদ্ধার্থ রায়, শ্রীহেমন্ত বসু, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অজয়বাবু আজীবন সংগ্রামী। বিশ বছরের কুশাসনের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন যখন দুর্নীতির গভীর অন্ধ-কারে নিমজ্জিত সেই সময় শ্রীঅজয় মুখো-পাধ্যায় বাংলাদেশের সংগ্রামী রাজনৈতিক দলগুলির সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রণ্টের সুষ্ঠু নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালীর আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে এগিয়ে আসেন। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির নমস্য—তাঁর এই

সংগ্রামী চরিত্রের জন্য। বাংলার খেটে-খাওয়া জনগণ তাই এই সহজ, সরল, সাদাসিধে মানুষটির শতায়ু কামনা না করে পারেন না। সমগ্র বাঙালী জাতির সঙ্গে আমরাও বাংলাদেশের জনগণের ঐক্য ও আশার প্রতীক শ্রীমুখোপাধ্যায়ের শতায়ু কামনা করি।

এই জন্মদিবস উপলক্ষ করে যে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল—তা সুন্দর হলেও এ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার বলে মন করি। সেদিন অনেককেই আড়ালে এই কথাগুলি বলতে শোনা গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে—তাতে সম্বর্ধনা সমিতির সদস্যদের নামের এক দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে তথাকথিত ভক্তদের প্রাদুর্ভাব চোখে পড়ার মত। অর্থ রোজগারের জন্য ওষুধে বা শিশুদের আহার্যেও ভেজাল মেশাতে এঁদের মধ্যে অনেকেই দ্বিধা করেন নি। এঁদেরই হাতে কংগ্রেসী আমলে কোটি কোটি মানুষকে প্রত্যহ নিগৃহীত হতে হয়েছে। এখনও এঁদের দৌরাত্ম্য কিছু কম নেই। বর্তমানে কংগ্রেসের যে শোচনীয় অবস্থা তার জন্য এক শ্রেণীর স্বার্থপর ও লোভী কংগ্রেসী-দের ব্যবসায়িকুলের সঙ্গে অসাধু যোগা-যোগ যে অনেকখানি দায়ী—সে কথা আশা করি যে কোনও সুষ্ঠু চিন্তাসম্পন্ন মানুষই স্বীকার করবেন। বাংলাদেশে এঁরা যে চক্র সৃষ্টি করেছেন, তা ভাঙতে অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বহু বছর লড়াই করতে হবে। সত্য কথা সহজ করে বলতে হলে এ কথাই বলা উচিত যে, বাংলাদেশের মানুষের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রীতি বা শ্রদ্ধা নেই। কাজেই উদ্যোক্তাগণ কি ভেবে এঁদের এত বেশি সংখ্যায় ঐ সমিতিতে স্থান দিয়েছেন—তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। শুধু তাই নয়, এঁদের দু-চারজনের ছবিও দেখা গেল ঐ পুস্তিকায়। এরই বা হেতু কি? উদ্যোক্তাদের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এ ভুল করলেন কেমন করে? ব্যবসায়ী সমাজের একাংশ ১৯৬৭ সালে ফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য চেষ্টা করেন নি কি? এবারও যে এঁরা তৎপর নন—সে কথা ভাববার যথেষ্ট কোনও কারণ আছে কি? এ সব প্রশ্নও জনমনে আছে।

শিল্পীদের কেউ কেউ ঐ দিনকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কেও জনগণের ধারণা স্বচ্ছ নয়। এঁদের মধ্যে কেউ রাজ্যপাল ধর্মবীরের নিকট লিখিতভাবে অঙ্গীকার করে এসেছিলেন যে, যুক্তফ্রন্টের কোনও সভায় এঁরা অংশ গ্রহণ করবেন না। এর বিনিময়ে অবাঞ্ছিত রাজ্যপালের কাছ থেকে এঁরা নাকি কয়েক কাঠা জমি আদায় করতে পেরেছেন। নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য এই শিল্পীরা যে কোনও কাজ করতে পারেন, এমন কি জনমতকে উপেক্ষা করে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্ত করতেও এঁদের বিন্দুমাত্র বাধে না। শাস্ত্রে আছে বিশ্বকর্মার পুত্র নাকি ছুঁচো। কথাটি সত্য বলে প্রতিভাত হয় এই শিল্পীদের চরিত্র দেখে। প্রশ্ন জাগে, এঁরা মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রবেশাধিকার পেলেন কেমন করে? যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করাই যাঁদের কাজ হয়েছিল, তাঁদের এনে এই সুন্দর উৎসবটিকে উদ্যোক্তারা ম্লান হতে দিলেন কেন? এঁরা ছাড়া বাংলাদেশে কি অন্যায় কাজ করেছেন—এ কথা যখন যে জঘন্য কাজ করেছেন—এ কথা যখন সারা বাংলাদেশ মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছে, সেই সময় যাঁরা তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে-ছিলেন, জনগণ তাঁদের ক্ষমা করেন নি বা করতে পারেন না।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভেবে দেখবেন কি ?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য নাকি আমাদের ওপর খুব চটেছেন। আমাদের অপরাধ, তাঁর দপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে আমরা বড় বেশি মাথা ঘামাচ্ছি। কল্যাণী হাসপাতাল সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ দেখে এর পিছনকার মতলবও নাকি খোঁজা হচ্ছে। তাঁর নাকি ধারণা নিশ্চয়ই এঁদের কোন স্বার্থ আছে, নইলে স্বাস্থ্যদপ্তর নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন?

এ সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে ব্যাপারটা রীতিমতই দুঃখের। স্বাস্থ্য-মন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিই, সাপ্তাহিক বসুমতী যেদিন থেকে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে, সেইদিন থেকেই স্বাস্থ্য-দপ্তরের প্রতি আমরা বিশেষ মনোযোগ দিয়েছি, তখন ননীবাবুর স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে বহু বছর বাকি ছিল। এই দপ্তরটির প্রতি আমাদের মনোযোগ দেবার কারণ এই যে, এই দপ্তরটি জনজীবনের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এ ছাড়া আমাদের আর কোন স্বার্থ থাকতে পারে?

এবং এ কথা বলব স্বাস্থ্যদপ্তরের খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। যে কথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী, এমন কি দপ্তরের বড় বড় কর্তারাও জানেন না তা আমাদের নখদর্পণে। এই বিভাগটি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে যত অভিযোগ করেছি, সব কটিই নির্ভুল ও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদি আমরা কোন ভুল খবর দিয়ে থাকি, তাহলে স্বাস্থ্যদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন নি কেন? সে সাহস স্বাস্থ্য-দপ্তরের কোন দিনই হবে না। কেন না উক্ত দপ্তরের কর্তারা জানেন যে, এখানে হাত দিতে গেলেই সাপের ছোবল খেতে হবে। শুধু স্বাস্থ্যদপ্তর কেন, এম ডি পরীক্ষা সম্পর্কে আমরা যে মন্তব্য করেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাকে যে আমরা সর্বোচ্চ তামাশা আখ্যা দিয়ে-ছিলাম, কই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকেও তো আমাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় নি। সেখানেও কর্তৃপক্ষ জানেন যে, তা করাটা খুব নিরাপদ নয়, অনেক কিছুই ফাঁস হবে, কাজেই চেপে যাওয়া ভাল। ননীবাবু স্বয়ং তো বলেছিলেন এ বিষয়ে তিনি তদন্ত করবেন, জানি না তিনি তা ভুলে গেছেন কি না।

গোবরা হাসপাতালের হেড ক্লার্কের বিষয়, নদীয়া সি-এম-ও-এইচ অফিসের একজন করণিকের দুর্নীতি সম্পর্কিত বিষয়, কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমো-রিয়াল হাসপাতালের কেলেংকারী, পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল, চব্বিশ পরগনা সি-এম-ও-এইচ-এর ব্যাপার, সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের দুর্নীতি, জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টরের অসাধুতা ও আত্মীয় পোষণের কথা ইত্যাদি বিষয়ে বহু তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ ইতিমধ্যে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, এবং দুর্নীতির বহু তালিকা আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দিয়েছি। সেগুলি যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় তাহলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন। আমরা সে চ্যালেঞ্জ তাঁকে দিচ্ছি। বিগত ১০ই অক্টোবর আমাদের পত্রিকার বঙ্গ-দর্শন বিভাগে 'এদের চাবকানো হোক' শিরোনামায় সরকারী হাসপাতালে ভেজাল ওষুধ সরবরাহের চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রকাশ করা হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধের প্রয়ো-জনীয় কিছু কিছু অংশ আবার তুলে ধরছি।

'সম্প্রতি ভিজিলেন্স কমিশন' এ রকম (জাল ওষুধের) একটি বড় 'কেস' ধরে ফেলেছেন। কমিশন ৭ মাস আগে কোনও একটি সূত্র থেকে খবর পান যে, সেণ্ট্রাল মেডিকাল স্টোর্স থেকে সরকারী হাসপাতালগুলিতে ভেজাল এবং নিম্ন-মানের ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। বহু হাসপাতালের ডাক্তার ভেজাল ওষুধ দেওয়া হচ্ছে বুঝতে পেরে স্বাস্থ্যদপ্তরকে তা জানান। কিন্তু প্রাক্তন স্বাস্থ্য-অধিকর্তার আমলে কার্যত যে আমলাটি (শুনেছি, ইনি নাকি জয়েন্ট ডিরেক্টর), সর্বেসর্বা ছিলেন, যাঁর কীর্তির কথা লিখতে আমরা কোনও দিন ক্লান্ত হই নি, সেই আমলার

মহোদয়ের কারসাজিতে ব্যাপারটি চাপা পড়ে যায়।

স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে ওপরে উল্লিখিত ডাক্তাররা বিষয়টি 'ভিজিলেন্স কমিশনের' নিকট উপস্থিত করেন এবং কমিশন ঐ ব্যাপারে বিশেষ তদন্ত করে একটি দীর্ঘ রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, যারা হাজার হাজার রোগীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে—তাদের কঠোর সাজা হওয়া উচিত, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারদেরও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

'সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স' ওষুধ তৈরি করে না। বিভিন্ন কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে টেন্ডার আহবান করা হয় এবং সেখানে একটি বিশেষ কোম্পানী এই 'কন্ট্রাক্ট' পায়, এর পিছনে কার হাত আছে—সে কথাও 'ভিজিলেন্স কমিশন' উল্লেখ করেছেন।"

এই রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য-অধিকর্তা সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে ওষুধ নেওয়া বন্ধ করেন।

কিন্তু "এতে সংশ্লিষ্ট অফিসাররা, যাঁরা 'সুহৃদ ভান্ডারের' সভ্য হিসেবেই বেশি পরিচিত, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং যাতে উক্ত কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে পুনরায় ওষুধপত্র কেনা হয়—তার জন্য প্রাক্তন স্বাস্থ্য-অধিকর্তার আমলের কার্যত সর্বেসর্বা আমলাটির নেতৃত্বে বর্তমান অধিকর্তার ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। সেখানে সুবিধা করতে না পেরে বাঁকা পথে তাঁরা রাজ্যপালকে আশ্রয় করার চেষ্টা করেছেন।"

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট খুনীদের চাবকানো ছাড়া যে অন্য কোনও শাস্তিই যথার্থ নয়—একথা আমরা ঘোষণা করতে ছাড়ি নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এ সম্পর্কিত কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হলে স্বাস্থ্যদপ্তরে যে সুহৃদ ভান্ডারের অদৃশ্য হস্ত সমস্ত অপকর্মের পিছনে কাজ করছে—তার খোঁজ অবশ্যই মিলবে। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, স্বাস্থ্যদপ্তরের কায়েমী স্বার্থ দূর করতে হলে এই বিষয়টি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন আছে। বিভাগীয় তদন্ত এ ক্ষেত্রে কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ যে সব আমলারা এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত; তাদের হাতে তদন্তের ভার দিয়ে কোনও মতে দায়িত্ব এড়ানো চলতে পারে—কিন্তু, তাতে জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে পদদলিত হতে বাধ্য।

অর্থের জন্য "মানুষের জীবন নিয়ে যারা এভাবে ছিনিমিনি খেলতে পারে—তাদের নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে না কেন?"—এ প্রশ্ন আমরা অক্টোবর মাসেও রেখেছিলাম। যুক্তফ্রন্ট সরকার যেহেতু দুর্নীতি দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন, সেই-হেতু জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধে আমরা মনে করি যে, যে সব অফিসাররা নিছক অর্থের লোভে ঠান্ডা মাথায়, এতগুলি রোগীকে ভেজাল ওষুধ খেতে বাধ্য করেছে এবং কারো কারো মৃত্যু ঘটিয়েছে—তাদের প্রতি সামান্যতম করুণা প্রদর্শন করাও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সমান।

অথচ পদস্থ আমলাটি নাকি স্বাস্থ্য-মন্ত্রীকে একেবারেই হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছেন, এমন কি তাঁর সাম্প্রতিক

ননী ভট্টাচার্য

উত্তরবঙ্গ সফরের সময়েও নাকি উক্ত পদস্থ আমলা তাঁর অনুগমন করেছেন। অথচ আমরা পূর্বে বারবার দাবি জানিয়েছি যে, এই লোকটির ক্ষমতা খর্ব করতে পারলে স্বাস্থ্যদপ্তরের তিন-চতুর্থাংশ দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী একথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করছেন না, পরিবর্তে আমাদের সন্দেহ করছেন! আমরা তাঁর জন্য দুঃখবোধ করি, আমলা-তন্ত্রের শিকার মন্ত্রীরা কিভাবে হন—এ সবই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ভিজিলেন্স কমিশনের উদ্দেশ্য

"কলকাতা, ১৭ই এপ্রিল—ভিজিলেন্স কমিশন কল্যাণী জওহরলাল মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু কমিশনের কাছে দুর্নীতির তথ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করে তাঁকে বাঁচাবার জন্য স্বাস্থ্য অধিকারের এক শ্রেণীর অফিসার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ পেয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ থেকে না ফেরা পর্যন্ত বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঐ তদন্ত কাজ বন্ধ রাখার জন্য আজ কমিশনকে অনুরোধ করেছেন।

স্বাস্থ্যদপ্তরের সচিব শ্রী এস আর দাস ইতিপূর্বে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে দু-দফায় উক্ত প্রাক্তন সুপারিন্টে-ন্ডেন্টকে চার্জ-সীট দেন। অভিযোগ-গুলি তদন্তের জন্য তিনি বিষয়টি ভিজিলেন্স কমিশনের কাছে পাঠান। ইতিমধ্যে কল্যাণী জওহরলাল মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে তাঁকে বদলী করা হয়।

গতকাল থেকে ভিজিলেন্স কমিশন উক্ত অভিযোগের ওপর তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকারের এক শ্রেণীর অফিসার না কি উক্ত প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ছিল, তার ওপর আর গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। এবং সেইভাবেই কমি-শনের কাছে সাক্ষ্য দেবার চেষ্টা চলছে। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী কমিশনকে অনুরোধ করেছেন যে, স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গ থেকে না ফিরে আসা পর্যন্ত যেন তদন্ত কাজ স্থগিত রাখা হয়।"

ওপরের সংবাদটি একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা আবার কিছু লিখলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের ওপর আরো চটবেন জেনেও এবং কল্যাণী হাসপাতালের কোনো স্টাফের বিরুদ্ধে হয়তো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে এ ঝুঁকি নিয়েও আমরা এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করছি। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি—স্বাস্থ্য অধিকারের (হেলথ ডিরেক্টরেট) বেশ কয়েকজন পদস্থ আমলা (এর মধ্যে জয়েন্ট ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর এ্যাসি-স্ট্যান্ট ডিরেক্টর, ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আছেন।) কল্যাণী হাস-পাতালের দুর্নীতি ও অনাচার সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ চাপা দেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন, যার ফলে ভিজিলেন্স কমিশনের তদন্ত একটা প্রহসনে পরিণত হতে পারে।

আশা করি, ভিজিলেন্স কমিশন এবং কমিশনার ফর এনকোয়ারিজ শ্রী এ বি শ্যামের জরুরী দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে।

(১১।৪।৬১)

ভারত দর্শন

অস্পৃশ্যতা এবং শ্রেণীভেদ

ভারতের মতো শ্রেণীবিভক্ত বা বিভিন্ন শ্রেণী-অধ্যুষিত 'মহামানবে'র সাগরতীরে শঙ্করাচার্যের (পুরী) একটি উক্তি নিয়ে যে ঝড় বইছে এটা বাস্তবিকই স্বাস্থ্য ও আরোগ্যের লক্ষণ। যে ভারতবর্ষ অণু-পরমাণুর মধ্যে পরম ব্রহ্মের মহান শক্তিকে উপলব্ধি করেছে ; যে ভারতের অবতারপ্রতিম ধর্মপ্রচারকগণ জীবের সঙ্গে শিবের অভেদ কল্পনায় পর্যন্ত ইতস্তত না করে বলেছেন, আমিই তিনি, তিনিই আমি, জীবের মধ্যেই শিবের অধিষ্ঠান, আত্মা পবিত্র : যে ভারতের পুরাণে মহাকাব্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ সম্পর্কে তর্কের ঝড় উঠেছে, ঈশ্বরপ্রতিম অবতারগণ অস্পৃশ্যকে বুকে করে নিয়েছেন এবং যে ভারতীয় চিন্তা মুচি-মেথর-মুদ্দাফরাশকে গুরুর আসনে বসাতেও কার্পণ্য করে নি, সেই ভারতবর্ষেরই কিছু স্বার্থান্বেষী সমাজপতি স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বালাই বহাল রেখে যুগ যুগ ধরে মানুষে মানুষে বিভেদকে টেনে নিয়ে এসেছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে জিইয়ে রাখার জন্য! বাস্তবিক বিচিত্র ব্যাপার এই যে, অতশত কাব্যকাহিনী, শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং বুদ্ধ চৈতন্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পরেও অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক আজও ভারতের কপোল-কপালকে মসীলিপ্ত করে রাখে। ধর্মগুরুর আসন দখল করে শঙ্করাচার্য খেতাবধারী কোন মানুষ মানুষকে অস্পৃশ্য বলার দুর্মতি পোষণ করেন, দুঃসাহস রাখেন!

লোকসভায় বক্তৃতাকালে আইনমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ মেনন বলেছেন, আদি শঙ্করের যথার্থ ব্যাখ্যাতা স্বামী বিবেকানন্দ ; পুরীর শঙ্করাচার্য হলেন পশ্চাদপদের প্রতি আকৃষ্ট। শ্রীমেনন বিবেক-বাণী উদ্ধৃত করে বলেছেন বিবেকানন্দের মতে অস্পৃশ্যতা একটি মানসিক বিকার।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন। সব রকমের ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আপোষহীন সংগ্রাম। সামন্ততান্ত্রিক পারোহিততন্ত্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন ভারতের যুবশক্তির প্রতি। ঊনিশ শতকে তিনি যে সংস্কার ও কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলন শুরু করেছিলেন, বিশ শতকের শেষ পাদে এসে পুরীর শঙ্করাচার্যের গদির অধিকারী তারই উল্টো ফরমান হাঁকছেন। বস্তুতই বড় বিচিত্র এই দেশের ইতিহাস। এখানে যুগে যুগে ধর্মব্যাখ্যাতারা এসে শুনিয়েছেন মুক্তির মন্ত্র, আবার তারপরেই মুক্তির সমস্ত আলোকরশ্মি আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন এক শ্রেণীর নামাবলী-পরিহিত ধর্মগুরু সম্প্রদায়। আর আমরা কাউকেই পুজারতি করতে পিছপাও হই নি। অর্থাৎ আমরা কাউকেই গ্রহণ করি নি, বর্জনও করি নি। কেউ আমাদের মাথার ওপর থেকে কুসংস্কারের পর্দাটি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করতে পারেন নি। সেজন্যই আজও হরিজনের ঘরে আগুন দেওয়ার লোকের অভাব হয় না; বর্বর মানুষের মতো চামড়ার রঙ দেখে না হোক, চাপিয়ে-দেওয়া শ্রেণীভেদ মেনে আমরা মানুষের সঙ্গে অমানুষের মতো ব্যবহার করি, গণতন্ত্র গড়ে অগণতান্ত্রিক পথে পা বাড়াই।

আসলে মনের সেই বিকারটুকুর আর মৃত্যু হয় না। এদেশে প্রচারক আসেন, বিদায় নেন ; ইতিহাসে নাম রাখেন কিন্তু ভারতের মনে স্থায়ী ছাপ রাখতে পারেন না। তাই জগৎ মাঝে একটি বিস্ময়কর প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করার সৌভাগ্য লাভ করেও ভারতবর্ষ পড়ে থাকে তার আদিমতম কুসংস্কারগুলির ক্ষত এবং বিষাক্ত পুঁজ সর্বাঙ্গে ধারণ করে। সমস্ত রকম বিভেদকে অতিক্রম করার মহৎ শিক্ষা দেওয়ার মতো একাধিক শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব সত্ত্বেও ভারতবর্ষে আবহমানের ভাঁড় গাধার পিঠে চড়ে ঠিকই হেঁটে যায়। কেউ তাকে বাধা দেয় না, কেউ তার পথ আগলিয়ে দাঁড়ায় না। এই সংগ্রাম-অনিচ্ছুক মনই আমাদের আলো-আঁধারির জগতে আবহমানকাল আবদ্ধ রেখেছে। আত্মার বিশুদ্ধিকরণ এবং আত্মশুদ্ধির দ্বারা, দেখা গেছে আমরা মলিনত্ব ঘোচাতে পারি নি। অঙ্গারের মতো পরতে পরতে অস্থিমজ্জায় ম্লান হয়ে আছি। তাই, যদি সেই মলিনত্ব ঘোচাতে হয়, তবে পুড়ে পুড়ে রাঙা হতে হবে। কোন রকম অন্যতর শিক্ষার জলে ধুয়ে আবহমানের কালি মুছে দেওয়ার ক্ষমতা অতিবড় ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্নেরও নেই, এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

পুরীর শঙ্করাচার্য সেই আদিমতায় প্রত্যাবর্তন করতে চান, যে আদিম মধ্যযুগীয় বর্বর মানুষের আদিমতা মানুষকে

পাটনার জনসভায় শঙ্করাচার্য ভাষণ দিচ্ছেন

ঘৃণা করতে শিক্ষা দিয়েছিল শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার বনিয়াদ পাকা করার জন্য। আজকের অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদেরই যা আদিম রূপ।

মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদ তা সে যে আকারেই আসুক না কেন, তার মূল লক্ষ্য, শ্রেণী দমন ও শ্রেণী বিভাজনের দ্বারা এক শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক অপর শ্রেণীর মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন। দাসপ্রথা এক শ্রেণীর মানুষকে জানোয়ারের অধম বানিয়ে যথেচ্ছ শোষণের প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ধর্মীয় অনুশাসনের দেওয়াল তুলে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদকে বজায় রেখেছিল ঐ শ্রেণী শোষণেরই অভিপ্রায়ে আর ধনতন্ত্র মানুষকে ততদূর মুক্তি দিল যতদূর মুক্ত না হলে মানুষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। ধনতন্ত্র গণতন্ত্রকে মানল, ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিল, কারণ গণ-সমাবেশ ভিন্ন বড় বড় কলে-কারখানায় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের অন্যতম উপাদান মানুষের চালান সম্ভব হয় না। ধনতন্ত্রে কুলীন হলেন পুঁজির মালিক, গণতন্ত্রের তন্ত্রমন্ত্রের অধীশ্বরও হলেন তাঁরা জাতি ধর্ম বর্ণের ছাপগুলির ওপর আর বিশেষ জোর দেওয়া হল না।

আমরা ধনতন্ত্র অবধি এগিয়েছি বা এগোবার পথে পা বাড়িয়েছি। অর্থাৎ এখন সামন্তযুগীয় শ্রেণীভেদে ততটা আর প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা "রক্ত-করবী"র রাজার কারখানায় একচল্লিশের 'দ' 'ক' 'মা'-য়ের উল্কী পরেছি সর্বাঙ্গে। ঠিক এই মুহূর্তে পুরীর শঙ্করাচার্যকে আমরা পুরাকালিক বলে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতে পারি। তাতে আমাদের অর্থনৈতিক-সামাজিক বনিয়াদে ধস নামবে না। অন্যতর কোনও শ্রেণী-ভেদ বিলোপের আওয়াজে কিন্তু আমাদের ল' এণ্ড অর্ডারের বনিয়াদ টলমল করে উঠতে পারে। পুরীর শঙ্করাচার্যকে নিয়ে সে সমস্যা নেই।

তাই আজ আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই, যদি লোকসভার প্রত্যেকে এক-মত হয়ে এই সামন্তযুগের প্রতিনিধিদের শাস্তির বিধান তৈরি করেন সত্যি সত্যিই। যদি অতীতে প্রত্যাবর্তনের পথে আমরা সবাই এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারি। আইন বদলাই, শাসনতন্ত্রে প্রয়ো-জনীয় সংশোধনী যোজনা করি।

সুখের বিষয় সে প্রচেষ্টার অঙ্কুর দেখা দিচ্ছে। যদিও হরিজন এম পি-দের অভিযোগ, যতদূর কঠোরতা অবলম্বিত হওয়া উচিত ছিল, শঙ্করাচার্যের ব্যাপারে ততখানি অবলম্বন করা হয় নি। বিহার সরকার তো পারেন নি, কেন্দ্রীয় সরকারও প্রয়োজনীয় তৎপরতা প্রদর্শন করেন নি। পুরীর শঙ্করাচার্য অবাধে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। তিনি পাটনাও গেছেন। দিল্লীও গেছেন।

তবে এইবার অ্যাকশান হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিহার সরকারের প্রতি এই পরামর্শ রেখেছেন যে, যেন পুরীর শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যতা প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বার করা হয়।

সুতরাং লক্ষণ আরোগ্যের দিকে সন্দেহ নেই। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীভেদের ওপর ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে চলেছে, ক্রমে হয়ত এমনও দিন আসবে যখন শ্রেণী শোষণের সব পথগুলিকেই আমরা আইন করে নিষিদ্ধ করব, আর সেই কাজ যদি সংসদীয় প্রথায়ই হয় তাতেও বিস্মিত হব না।

একধাটা আজ পরিষ্কার যে, মানুষের শুভবুদ্ধিকে এখানে কেবলমাত্র উপদেশের দ্বারা জাগ্রত করা এবং টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়; তার জন্য আইনের বিধান প্রয়োজন। এবং এও সত্য যে সমাজে একটিও শ্রেণীভেদ যতকাল বজায় থাকবে ততকাল পাপচক্রের অবসান হবে না, সংগ্রামের ইতি হবে না। আবার কেবল-মাত্র আইনই সর্বরোগের মহৌষধি নয়। বিদ্যাসাগরের মহান প্রচেষ্টায় বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত আইনও পাশ হয়েছিল, কিন্তু বিধবা-বিবাহ চালু হয় নি। আইনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের তৎপরতা এবং প্রতিক্ষেত্রে সেই আইনের প্রয়োগ ও আশ্রয় গ্রহণও প্রয়োজন। অস্পৃশ্যতার ক্ষেত্রেও এই কথাটি মনে রাখতে হবে। আইনের পরিবর্তনের সঙ্গে হৃদয় পরি-বর্তনেরও প্রয়োজনকে সমানভাবে স্বীকার করে সেইমত ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।

বিহারে হরিজন আক্রান্ত

পাটনা জেলার বিহার-শরিফে গত ১৭ তারিখে কতিপয় হরিজনের ওপর বর্ণহিন্দুরা চড়াও হয়ে যে মারপিট করেন তাতে আগ্নেয়াস্ত্রও অবাধে ব্যবহৃত হয়। সাত-সাতজনের শরীরে বন্দুকের গুলীর আঘাত পাওয়া গেছে। অপরাধ? অপরাধ, হরিজন মেয়েরা পানীয় জল সংগ্রহ করতে গেছলেন একটি পাতকুয়া থেকে, যার ওপর কারও ব্যক্তিগত মালিকানাও ছিল না। কিন্তু হরিজন-দের পানীয় জল সংগ্রহের এতবড় অনাচারটী সহ্য হয় নি উচ্চ-বর্ণের হিন্দু মা জননীদের। তাঁরা তখনই বচসার সূত্রপাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণমত্ত পুরুষবাহিনী এগিয়ে আসেন হিন্দুয়ানী রক্ষা করতে। বেধে যায় সংঘর্ষ। পুলিশ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পড়ে। কিন্তু তার আগেই সাধারণ নাগরিকের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করেছে (!)

হরিজনদের মানবিক অধিকার হরণ করার ঘটনা এই প্রথম নয়। তার ওপর অতিসম্প্রতি মহাজাগতিক হিন্দুধর্ম সম্মেলন হয়ে গেছে। শঙ্করাচার্য মানুষের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে উত্তেজনার ইন্ধন জুগিয়েছেন, সংঘর্ষ অনিবার্য বৈকি।

হরিজনদের ওপর যাঁরা চড়াও হয়ে-ছিলেন তাঁদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এলো কোত্থেকে অথবা তাঁদের কতজনকে লক-আপে তোলা হয়েছে, সংবাদে তার বিবরণ নেই। তবে সংবাদের সঙ্গে একটি ইঙ্গিতবহ দোসরা সংবাদ আছে। তা হল, একই তারিখের সন্ধ্যাবেলা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিহর সিং-কে পুরীর শঙ্করাচার্যের প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্নবাদ করা হয়। সংবাদদাতা লিখছেন, মুখ্যমন্ত্রী শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে গর-রাজি, কেন না সেক্ষেত্রে তাঁকে জনসঙ্ঘের সঙ্গে নতুন গড়ে-ওঠা সম্পর্ক হারাতে হতে পারে।

সংবাদটির ভিত্তিতে যদি কিছুমাত্র সত্য থেকে থাকে, তাহলে যে ভয়াবহ অবস্থার আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তরে যাওয়া কত সোজা তাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। রাজনৈতিক কারণে এইভাবে সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলি যদি প্রতিক্ষেত্রে অব-হেলিত হতে থাকে, তবে ল' এণ্ড অর্ডারের হম্বি-তম্বি যে কত নিষ্ফল তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ল' এণ্ড অর্ডার তো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের বস্তু নয়। এক্ষেত্রেও ল' এণ্ড অর্ডার নিয়ে উদ্বিগ্ন যাঁরা তাঁরা কি সামান্য উদ্বেগ বোধ করবেন!

আসামের পার্বতীয়া সমস্যা সমাধানের মুখে

শেষ পর্যন্ত আসাম পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এলো। একমাত্র জনসঙ্ঘ ব্যতীত অন্যান্য সকলেই দলমত নির্বি-শেষে শাসনতন্ত্রের বাইশতম সংশোধনী বিলটি সমর্থন করলেন। সমর্থকদের সংখ্যা ছিল ৩৬৯, বিপক্ষে মাত্র ২৮। ইতিপূর্বে এই বিল কংগ্রেসী সদস্যদের বিস্ময়কর অনুপস্থিতির দরুণ পাশ হতে পারে নি। দ্বিতীয় দফায় প্রচুর সংখ্যা-গরিষ্ঠ সমর্থনে তা পাশ হল।

এই বিল সমর্থনের সময় স্বতন্ত্র নেতা শ্রী এন জি রঙ্গ তেলেঙ্গানার জন্যও স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি করেন। সি পি আই-এর নেতা হীরেন মুখার্জির বক্তব্য ছিল, স্বতন্ত্র শাসনাধিকার দানের ক্ষেত্রে

সরকারের নীতি উদার ও রাজনৈতিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান হওয়া উচিত। তিনি গুর্খাদের জন্য দার্জিলিং-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ সুবিধাদানের পক্ষে বক্তব্য উত্থাপন করেন। কিন্তু যে উপরাজ্য সৃষ্টি করে আসামের পর্বতীয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে, সি পি এম নেতা সাম্বিয়ার তাকে যথেষ্ট বলে গণনা করতে পারেন নি। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ মর্যাদাপূর্ণ পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু নয়। একই আসাম রাজ্যে সমতলবাসী ও পর্বতীয়াদের মধ্যে বিভেদমূলক আচরণকে তাঁর দল সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁরা চেয়েছিলেন দুই অঞ্চলের জন্যই সমান সুযোগ-সুবিধা ও সমানাধিকার।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্বেগ বজায় রেখে বলেন, ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার মনোবৃত্তি ভয়াবহ। বিভিন্ন রাজ্যে উপরাজ্য সৃষ্টির পরিস্থিতিকে কেন্দ্রীয় সরকার মোটেও আস্কারা দেবেন না।

একটি সুখী আবহাওয়ার মধ্যে পরিসমাপ্ত হয় অধিবেশন, যা সচরাচর ঘটে না। পর্বতীয়াদের জন্য যখন সকলে একত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, তখন একমাত্র জনসঙ্ঘীরাই নিজেদের আলাদা করে রাখলেন। তাঁরা 'লজ্জা' 'লজ্জা' বলে চীৎকার করতে চেয়েছিলেন, সে চীৎকার তাঁদের কানেই প্রতিধ্বনি তুলেছে আর কাউকে স্পর্শ করতে পারে নি, বরং সদস্যগণ একটা কাজের মতো কাজ করতে পেরে যেন খুশিতে হাল্কা বোধ করেছিলেন। কর্তব্যপালনের এই আনন্দ থেকে জনসঙ্ঘীরাই কেবল সক্রোধে সরে থাকলেন।

রাজধানীতে মুখ্যমন্ত্রী সমাবেশ

এবার আর কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী নয়, তাবৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা একযোগে চতুর্থ পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন রাজধানী দিল্লীতে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রিবৃন্দ সর্বৈবভাবেই খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনাকে সমর্থন জানাতে অসমর্থ হয়েছেন। আর কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা বলেছেন, রাজ্য পরিকল্পনার কলেবর বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় ছাঁটাই প্রয়োজন। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের দাবি ও অভিযোগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেভাবে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন, অকংগ্রেসীদের বেলায় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ততদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। বলেছেন, এখনো অবশ্য ভেবে দেখা যেতে পারে। যতটুকু রদবদল স্বল্প সময়ে সম্ভব তাও করা যায়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ, রাজ্য পরিকল্পনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের চিন্তার কারণ অবশ্যই উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু একমাত্র কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দ্বারাই ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রীরা যেন সেই সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেশের সমস্যাকে দেখতে চেষ্টা করেন।

এই উপদেশ অবশ্য নতুন নয়। কিন্তু এই উপদেশের দ্বারা কোনও সুরাহা হয় নি এ পর্যন্ত। তাই তর্ক উঠেছিল যে, রাজ্য সরকারকেই প্রধানত জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। রাজ্য সরকারগুলির হাতে রাজ্যের উন্নয়ন বাবদ অধিকতর ক্ষমতা না থাকলে জনপ্রিয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এবং তা যে সম্ভব হয়ও নি, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের বিপর্যয় কি তারই প্রমাণ হাজির করে না।

কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের অভিযোগে কেন্দ্র কিন্তু কখনই কর্ণপাত করতে চান নি। অথচ একথাও জোর করে বলা যায় না যে কেন্দ্রের নজর নিরপেক্ষ, সব রাজ্যের জন্যই কেন্দ্র সমান ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুতরাং কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা অনেক সময় বিমাতৃসুলভ মনোভাবেরও সমালোচনা করেছেন।

আজ রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। কেন্দ্রের ব্যবহারের তারতম্য তাতে আরও বাড়বে বই কমবে না। ফলত রাজ্যগুলির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষও চরমে উঠবে।

সে কারণে আজ দাবি উঠেছে রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা চাই, চাই পরিকল্পনাকে রাজ্যের প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করার মতো করে রূপায়ণের অধিকার এবং সেজন্য সম্পদ সংগ্রহেরও অধিকার। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পরও কোনও সুরাহার লক্ষণ দেখা দেয় নি।

ধর্মঘটের অধিকার

এবার প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। কমিশন যে প্রতিবেদন পেশ করেছেন তাতে কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার থাকা উচিত নয়। কেবলমাত্র এই সুপারিশই নেই, স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, নতুন নিয়োগকালে সরকারী সংস্থায় চাকুরিপ্রার্থীদের এই মর্মে মুচলেকা দিতে হবে যে, তাঁরা কোনো অবস্থাতেই ধর্মঘট করবেন না। অর্থাৎ দাসত্বের শিকলটি গলায় বেঁধে বেকার ভারতের যুববৃন্দ যাবেন তাঁদের স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে চালু রাখতে। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে এর চেয়ে বিস্ময়কর, এর চাইতে বিশ্বাসঘাতকতামূলক প্রস্তাব আর কী থাকতে পারে!

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে যে নয়া দাসত্বপ্রথা প্রচলনের সুপারিশ করা হল ঠান্ডা মাথায় তা স্বাধীনতার সকল শর্তকে বানচাল করে দিতে উদ্যত। স্বাধীন দেশের নাগরিক যদি তার বৃত্তির জীবনে দাসত্বের শেকল গলায় পরে নেয়, তবে তার মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক বিকাশ অবরুদ্ধ হবে. যে অবরুদ্ধ পাঁকে জাতীয় উদ্যমও হবে রুদ্ধগতি। প্রশাসনিক সংস্কার- কমিশনের প্রতিবেদন সুতরাং সরকারী কর্মচারীদেরই শুধু শৃঙ্খলিত করতে চাইছে না, জাতীয় অগ্রগতির ও মুক্তিচেতনার ওপর নির্মম আঘাত হেনে সমস্ত মানবিক অধিকারকেই হনন করতে উদ্যত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, মানুষকে নতুন করে শেকল পরানোর প্রচেষ্টায় যে সাফল্য সহজে আসে না, কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী কে হনুমন্তিয়া তা ভালোভাবেই জানেন। তাই প্রতিবেদন পেশ করে তিনি তাঁর গভীর আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন এইভাবে। বলেছেন, "আমরা যে সব সংস্কারের সুপারিশ করেছি, তার ফলে যে সব কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁদের পক্ষ থেকে সেগুলো প্রতিরোধের চেষ্টা করা হবেই।"

শ্রীযুত হনুমন্তিয়া সুতরাং সজ্ঞানেই সংঘর্ষকে আহ্বান করেছেন। প্রতিবেদনের সঙ্গে তাঁর ফরওয়ার্ডিং লেটারে তাই হনুমন্তিয়া বলেছেন, প্রতিরোধের চেষ্টা চলবে। দেখতে হবে, তা যেন সুপারিশ কার্যকরী করার পথে প্রতিবন্ধক না হয়।

কিন্তু মানুষ তো দূরের কথা পোষা কুকুরও কি ডাক দেওয়া মাত্র মনিবের হাতের শেকল গলায় পরে নেয়! হনুমন্তিয়াজী বড় বেশি আশা করেছেন, দাবিও নিতান্তই বৃথা। আজ থেকে কয়েক শতক আগে এমন দাবি কেউ করলে তাঁকে উন্মাদ বলে কেউ গণনা নাও করতে পারতেন।

হনুমন্তিয়া কমিশন আরও ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। তার একটি হল, সরকারী চাকরিতে পরিবারের একজনের বেশি দুজনকে নিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হবে।

বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এগুলি সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের বিস্তৃত প্রতিবেদন অবশ্য আমাদের হাতে নেই। সংবাদপত্রের টুকরো সংবাদেই আশঙ্কার কারণ দেখছি। হাঁড়ির একটি ভাত টিপে সমগ্র ভাতের অবস্থা বোঝার প্রবাদটি মনে রেখে তাই আতঙ্কিত হতে হচ্ছে।

(১১।৪।৬৯)

মাও সে-তুং ও লিন পিয়াও

চীন ঃ

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস শেষ হয়েছে।

পনেরো দিন ধরে দীর্ঘ আলোচনার পর সম্মেলনে পার্টির নতুন সংবিধান গৃহীত হয়েছে। এই সংবিধান মাও সে-তুং-এর দর্শনের ওপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতিতে এ এক বিরাট পদক্ষেপ। সংবিধানে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, লিন পিয়াও হবেন পার্টিতে মাও সে-তুং-এর উত্তরাধিকারী।

সম্মেলনে লিন পিয়াও কর্তৃক উত্থাপিত রাজনৈতিক রিপোর্টটিও গৃহীত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও চীনের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিষয়ে এই রিপোর্টে আলোচনা করা হয়েছে।

সংবিধান ও লিন পিয়াও রিপোর্ট এখনও সবকারিভাবে সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয় নি।

চেকোস্লোভাকিয়া ঃ

চেকোস্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব থেকে আলেকজান্ডার ডুবচেক অপসারিত হয়েছেন। ডুবচেকের জায়গায় পার্টির প্রথম সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ গুস্তাভ হুজাক।

নিঃসন্দেহে ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জানুয়ারী, ১৯৬৮-তে অ্যানটোনিন নভোটনিকে দলের সম্পাদক ও রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে দলের পূর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ডুবচেক। নভোটনি-ডুবচেক বিবাদ নিতান্ত ব্যক্তিগত বিবাদ ছিল না। নভোটনি স্ট্যালিন নীতির সমর্থক ছিলেন, এবং স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেও তিনি মস্কোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। স্ট্যালিনবাদ ও মস্কো-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ডুবচেক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ডুবচেকের নেতৃত্বে চেকোস্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে সংস্কারসাধন করা হয় এবং যে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়, সোভিয়েট য়ুনিয়ন এবং পূর্ব য়ুরোপের আরও কয়টি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তার তীব্র বিরোধিতা করে। ডুবচেক মস্কোর প্রভাবমুক্ত হয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি পরিচালনার চেষ্টা করেন। স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েট য়ুনিয়ন তা বরদাস্ত করতে রাজী হয় নি। এরই পরিণতি আগস্টে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ। সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়ায় লক্ষ লক্ষ দখলদারী সৈন্য মোতায়েন রেখে চেক নেতাদের মস্কো নিয়ে গিয়ে একটি চুক্তি করা হয়। চেক নেতারা সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করতে স্বীকৃত হন—উদারপন্থী নীতির পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন।

আলেকজান্ডার ডুবচেকও মস্কোয় এই অসম্মানজনক চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্ত তাঁর সমর্থন ছিল না এই আত্মসমর্পণের পেছনে। নিতান্ত বাধ্য হয়ে তাঁকে (এবং আরও অনেককে) এই কাজ করতে হয়েছে। চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণেরও সম্মতি ছিল না। তারাও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সোভিয়েট দখলদারীর বিরুদ্ধে নানাভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি এই বিক্ষোভ আবার বৃদ্ধি পেয়েছে।

সোভিয়েটের ইচ্ছা নয়, ডুবচেক দলের নেতৃত্বপদে থাকুন। কিন্তু চেক জনগণের কাছে ডুবচেকের অসাধারণ জনপ্রিয়তার ভয়ে তাঁরা চট করে কিছু করতেও সাহস পাচ্ছিলেন না। তাঁরা সময় নিচ্ছিলেন।

এখন সময় উপস্থিত হয়েছে। ক'দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, ডুবচেক মস্কো যাবেন। চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যে সভা ডাকা হয়েছে, সেখানে কি আলোচনা হবে এবং কি কর্মসূচী তিনি সেখানে রাখবেন সে সম্পর্কে সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শেষ মুহূর্তে শোনা গেল, ডুবচেকের মস্কো যাবার প্রয়োজন নেই, কর্মসূচী নিয়ে অন্য সহকর্মীদের সঙ্গেই তাঁর মতভেদ হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তাঁকে সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ১১ জন সদস্যবিশিষ্ট নতুন প্রেসিডিয়ামে যদিও ডুবচেককে রাখা হয়েছে, তবু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ডুবচেকের পতন হল।

নতুন প্রেসিডিয়ামে রাষ্ট্রপতি লুডউইগ সবোডা ও প্রধানমন্ত্রী অলড্রিচ চারনিক আছেন। কিন্তু সংস্কার-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা, ডুবচেকের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি জোশেফ স্মরকোভস্কিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

গুস্তাভ হুজাক দায়িত্বভার গ্রহণ করে বলেছেন, তাঁরা আর নভোটনি-যুগে ফিরে যাবেন না—জানুয়ারী, ১৯৬৮-তে যে নীতি নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে তা তাঁরা অনুসরণ করবেন। এদিক দিয়ে ডুবচেকের সঙ্গে তাঁর কোন তফাৎ নেই। কিন্তু তারপরেই তিনি বলেছেন, উদারনীতি গ্রহণের নামে যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তা তিনি বরদাস্ত করবেন না। আর, সোভিয়েটবিরোধিতাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আগস্ট সংকটের সময় যাঁরা সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে মিটমাটের জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন সেই 'বাস্তববাদী'দের অন্যতম প্রধান হলেন গুস্তাভ হুজাক। তাঁর নেতৃত্বে চেকোস্লোভাকিয়া এবার সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করবে। কমিউনিজমের মূল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজের দেশে নিজের পছন্দমত সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিস্ট দুনিয়ার স্বার্থরক্ষা করেও স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণের জন্য ডুবচেকের নেতৃত্বে প্রগতিশীল উদারনীতিকদের যে চেষ্টা, তা আপাতত চেকোস্লোভাকিয়ায় ব্যর্থ হল বলেই মনে হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে 'ন্যাটো' বা 'উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা'র সঙ্গে যুক্ত ১৫টি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা মিলিত হয়েছিলেন।

মন্ত্রীরা এসেছিলেন এই সামরিক জোট সংস্থার বিংশ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। বিশ বছর আগে, ১৯৪৯ সালে, এই ওয়াশিংটন শহরে, কনস্টিটিউশন অ্যাভেনিউ-এর ওপর ডিপার্টমেন্টাল অডি-টোরিয়ামে ১২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিলিত হয়ে 'ন্যাটো'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ১২টি রাষ্ট্র হল : বেলজিয়াম, বৃটেন, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যাণ্ড, ইতালী, লাকসেমবার্গ, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে গ্রীস ও তুরস্ক এবং ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানী এই সংস্থায় যোগ দেয়।

সেদিন 'ন্যাটো'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান। সেদিন ট্রুম্যানের পাশে ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডীন অ্যাচেসন। আর ছিলেন 'ন্যাটো'র প্রধান কর্মকর্তা হেনরী-পল স্পার্ক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্র একত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছে, একত্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে পূর্ব য়ুরোপের দেশ-গুলিতে একের পর এক দেশে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় বিপ্লবের পর পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলি নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ল। সোভিয়েটের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার আগ্রহে বৃটেন, ফ্রান্স, বেল-জিয়াম, লাকসেমবার্গ ও নেদারল্যাণ্ডস ১৯৪৮ সালে ব্রাসেলসে এক বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠক শেষে তারা ঘোষণা করে, তাদের মধ্যে কেউ যদি আক্রান্ত হয়, তবে তারা সবাই মিলে সমবেতভাবে আক্রমণ প্রতিরোধে দাঁড়াবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ব্রাসেলস চুক্তির প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, য়ুরোপে কোন আক্রমণ সে আক্রমণ প্রতিরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এগিয়ে আসবে।

পরের বছর ওয়াশিংটনের বৈঠক ব্রাসেলস বৈঠকেরই সম্প্রসারিত রূপ। এখান থেকেই পাকাপাকি 'ন্যাটো' গঠন করা হয়। 'ন্যাটো'র নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। এর অধীনে য়ুরোপে কয়েক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করা হয়। কেবল য়ুরোপের শক্তি নয়, য়ুরোপ রক্ষার এই সামরিক সংস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডাও যোগ দেয়। 'ন্যাটো'র এলাকা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয় এবং গ্রীস ও তুরস্ককে এর মধ্যে নিয়ে আসা হয়।

বিংশবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন বলেছেন : 'ন্যাটো' যুদ্ধোত্তর বিশ্বের এক বিরাট সাফল্য। তাঁদের মতে, 'ন্যাটো' গঠন করা হয়েছিল বলেই য়ুরোপে সোভিয়েট সম্প্রসারণ বন্ধ হয়েছে, সোভিয়েট সাহায্যে য়ুরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কথাটা হয়তো ঠিকই। কিন্তু 'ন্যাটো' প্রতিষ্ঠার ফলে বিশ্বশান্তির সর্বনাশ যা হয়েছে, তার হিসাব কে করবে? ১৯৪৯ সালে 'ন্যাটো' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই শুরু হল ঠাণ্ডা লড়াই। সম্ভাব্য সোভিয়েট আক্রমণের হাত থেকে য়ুরোপ রক্ষার জন্য সামরিক জোট গঠন আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে গড়ে তোলা মার্কিন-বৃটিশ-সোভিয়েট মৈত্রীর অবসান সূচনা করে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে, য়ুরোপ ভূখণ্ডে মার্কিন সৈন্যের অবস্থান এবং সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও পূর্ব য়ুরোপের বিরুদ্ধে 'ন্যাটো'-চক্রের আক্রমণাত্মক কার্য প্রতি-রোধের উদ্দেশে ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা গঠিত হয়েছে। দুই পক্ষেই প্রচুর সৈন্য সমাবেশ হয়েছে। য়ুরোপে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশ্বে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এতে কার লাভ হয়েছে? বন্দুকের জোরে পশ্চিম য়ুরোপে হয়তো কমিউনিজম বা সোভিয়েট প্রসার রোধ করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সারা বিশ্বে? কমিউ-নিজমের প্রসার রোধ করা যায় নি। তাছাড়া, এই বিশ বৎসরে প্রমাণ হয়েছে, ফ্রান্স বা ইতালী কিংবা বৃটেন, কোন পশ্চিম য়ুরোপীয় রাষ্ট্র আক্রমণের মতলব সোভিয়েট য়ুনিয়নের নেই। পশ্চিম জার্মানীর ব্যাপারেও সে একটা মীমাংসা চায়।

তাই, 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে : এই সংস্থাকে টিকিয়ে রেখে লাভ কি? চার্লস দ্য গল তো 'ন্যাটো'র সব সৈন্যকে ফ্রান্স থেকে সরিয়ে দিয়েছেন—ফ্রান্স এখনও 'ন্যাটো'র সদস্যপদ রেখেছে, তবে তা নামে মাত্র। ক্যানাডা অনেক দিন থেকেই এর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে—সম্প্রতি ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ত্রুদো বলেছেন, ক্যানাডা 'ন্যাটো' থেকে তার সৈন্য ফিরিয়ে নেবে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বিরক্ত হয়ে বলেছে : 'ন্যাটো'র এই বিরাট খরচ সে বহন করবে কেন? (সবটা না হলেও, খরচের মোটা অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই যোগাতে হয়।)

ধীরে ধীরে 'ন্যাটো' বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু এমন সময় হল চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট সামরিক হস্তক্ষেপ। 'ন্যাটো'র সবাই যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল। তাই তো। সোভিয়েট য়ুনিয়ন তো তাহলে আক্রমণ করতে পারে। আজ যদি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করতে পারে, তাহলে আগামী কাল পশ্চিম জার্মানী, আর পরশু ইতালীই বা নয় কেন? সুতরাং 'ন্যাটো' ভেঙে দিলে চলবে না, বরং একে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

তবু আশার কথা, চেকোস্লোভাকিয়ার সংকট সত্ত্বেও, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে শান্তি প্রচেষ্টার মনোভাব দেখা দিয়েছিল, তা একেবারে দূর হয় নি। গত মাসে বুডাপেস্টে ওয়ারশ চুক্তিগোষ্ঠীর বৈঠক থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে, যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের সকল সমস্যার নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য য়ুরোপের দেশগুলির এক বৈঠক ডাকা হোক।

বিংশবার্ষিকী উপলক্ষে আগত 'ন্যাটো' গোষ্ঠিভুক্ত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতি-রক্ষামন্ত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে দুই দিন ধরে আলোচনা করেছেন। তাঁরা বুডাপেস্ট প্রস্তাব নিয়েও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছেন। অধিকাংশের মত হল, সোভি-য়েটের এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত। উত্তেজনার প্রশমন করে, সহযোগিতার পথে অগ্রসর হবার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যে 'ন্যাটো' তৈরি করা হয়ে-ছিল, তা এখন দরকার হলে বন্ধুত্বের কূটনীতির সংস্থায় পরিণত হবে। নিকসনের ভাষায়, যে মুষ্টি প্রতি-রোধের জন্য উদ্যত করা হয়েছে, সেই হাতই এখন বন্ধুত্বের করমর্দনের জন্য এগিয়ে দেব। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে ইতালীর সোস্যালিস্ট নেতা পিয়েত্রো নেন্নী বা ফ্রান্সের মাইকেল দেবরে কিংবা বৃটেনের মাইকেল স্টুয়ার্ট তো বটেই, যা উল্লেখ-যোগ্য তা হল পশ্চিম জার্মানীর বিলি ব্রাণ্ডও সোভিয়েটের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

'ন্যাটো'-মন্ত্রীদের আলোচনা শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও পূর্ব য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রস্তাবিত য়ুরোপীয় সম্মে-লনের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কোন কোন বিষয়ে কার্যকরী আলোচনা ও নিষ্পত্তি সম্ভব তা ঠিক করে অগ্রসর হবার জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ কথা বলতেও ভোলেন নি, পাশাপাশি 'ন্যাটো'র সামরিক শক্তিও বজায় রাখা হবে। ফ্রান্স পর্যন্ত 'ন্যাটো'র অস্তিত্বের প্রয়োজন স্বীকার করেছে।

(২০।৪।৬৯)

দু'টি খুনের কিনারা হল না কেন?

মনোরঞ্জন হাজরা

পশ্চিম বাংলায় মানুষের চোখের জলের যদি অন্ত না থেকে থাকে, তবে আরও একবার তাঁদের চোখে জল আসবে, এমন দুটি হত্যাকাণ্ডের কথা আজ তাঁদের সামনে তুলে ধরছি। এ দু'টি হত্যাকাণ্ডই ঘটেছে হুগলী জেলায় এবং পাশাপাশি দুটি থানায়। হুগলী জেলা পুলিশের পরিচয় বাংলাদেশের মানুষ ইতিপূর্বেই পেয়েছেন তেলিনীপাড়া ও রিষড়ার ঘটনায়। মানুষের চোখের সামনে মানুষের ঘর লুঠ হয়েছে, অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, মানুষ জীবনান্ত হয়েছে অথচ দুষ্কৃতকারীরা পুলিশের পক্ষপুটে ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ করেছে এবং প্রতিকারের দাবি নিয়ে মানুষ যখন ছুটে গেছে তখন তাদেরই ওপর গুলী চালানো হয়েছে। এরও আগে উত্তরপাড়া কলেজের ঘটনা। মানুষ বোধ হয় কোনদিনই বিস্মৃত হবে না সে কথা। অথচ সেই অতি দুর্দান্ত পুলিশ কত না ভদ্রলোক এই আলোচ্য দুটি হত্যাকাণ্ডে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

প্রথম হত্যাকাণ্ড

প্রথম হত্যাকাণ্ডটি সম্পর্কে পুলিশের পূর্বোক্ত কীর্তির কথা আমি উল্লেখ করছি ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্য থেকে। শ্রীরামপুর জি আর কেস নং ১৮৩৪ (১৯৬৭)। ধারা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩২৬।৩০৭।৩০২ এবং এই মামলাতেই ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেছেন—"No report from I. O. Accused persons are discharged." একটি হত্যাকাণ্ডে ধৃত আসামীদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী অফিসার আদালতে কোন রিপোর্ট পাঠাতে পারলেন না এবং সেজন্য আসামীরা ছাড়া পেয়ে গেল। পি-ডি-এফ অর্থাৎ প্রফুল্ল-ধরমবীর ফ্রন্টের এমন কীর্তিকলাপ দেশবাসী বোধ হয় এখনও জানেন না, যদিচ অন্য অনেক কীর্তিকলাপ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করার তেইশদিন আগে উত্তরপাড়া থানার রঘুনাথপুর গ্রামে। হিন্দ মোটর্স ফ্যাক্টরী থেকে অনেক রাতে ডিউটি করে ফিরছিল সমীর কোলে, নারায়ণ পাল। বোমা ও বন্দুক নিয়ে তাদের আক্রমণ করা হল। সমীর ঘটনাস্থলেই মারা গেল। নারায়ণকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কে বা কারা মারল বুঝতে কারো বাকি রইল না। কারণ তার আগে জমি-জায়গা সংক্রান্ত এমন একটি ষড়যন্ত্র গ্রামের লোক উদ্ঘাটিত করেছিল, যাতে হত্যাকারীদের প্রয়োজন ছিল নারায়ণ পালকে পৃথিবী থেকে সরাবার। গ্রামের লোকের জবানবন্দীর ওপরে ধরা পড়ল আসামীরা। তখনও যুক্তফ্রন্ট সরকার। পুলিশ গ্রামের মানুষকে একেবারে অস্বীকার করতে পারল না।

কিন্তু তেইশ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট যখন বাতিল হয়ে গেল স্বনামধন্য ধরমবীর সাহেবের কল্যাণে, তখন সংগে সংগে পুলিশেরও মূর্তি দেখা গেল নতুন করে। আগেই পুলিশ আহত নারায়ণের কোন মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নেয় নি। সৌভাগ্যক্রমে সে বেঁচে উঠেছিল। তার পরেও যে পুলিশ তাকে ঘটনাস্থলে জড়িত একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষিরূপে পরীক্ষা করবে, তাও করে নি। দেশের কোন আইনজীবী একথা কখনও ভাবতে পারেন কি এইরকম উপযুক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য রেকর্ড করে না পুলিশ? কিন্তু উত্তরপাড়া পুলিশের কাছে এ সবের কোন বালাই ছিল না।

কিন্তু কেন পুলিশ আইনমাফিক এই কাজগুলি করতে অস্বীকার করেছে? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমি বলব এই প্রসংগে গত ২।৩ বছরে যে সব কেস রেকর্ড হয়েছে, সেগুলি তাঁরা পরীক্ষা করে দেখুন। এবং তা দেখলেই এর আসল রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামীর অনেকরকম কারবার আছে—দলিল জাল, বে-আইনীভাবে জমি দখল, মদ চোলাই বন্ধকী ও তেজারতি কারবার প্রভৃতি। বেশি উদাহরণ দেবো না দু-একটা ছাড়া। একবার উত্তরপাড়া থানায় উক্ত প্রধান আসামীটি এক এজাহার করে বসল যে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। গ্রামের লোক ডাকাতির কোন খবরই জানে না। তারা জানল সেইদিন যখন গ্রামের বিভিন্ন ঘরের মহিলারা তাঁদের বন্ধকী স্বর্ণালংকার ফেরৎ পাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে তার স্মরণস্থ হল। উক্ত আসামীটি সোজাসুজি জানালে—'কি করে তোমাদের অলংকার দেবো, সব তো ডাকাতি হয়ে গেছে।'

মহিলারা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। পাঁচ ভরির হার রেখে কেউ নিয়েছিলেন পাঁচশো টাকা, দশ ভরি সোনা রেখে কেউ নিয়েছিলেন দশশো টাকা—ডাকাতির কথায় তো তাঁদের সর্বনাশ হয়ে গেল! গ্রামের লোক অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগল কবে কোথায়, কোন সময়ে এ ডাকাতি হল! গ্রামের লোক তা ভাবতে থাকুন, কিন্তু পুলিশ তো জানল এবং অনুমোদনও করল। এখন এই ডাকাতির কথায় কার স্বার্থ জড়িত সেকথা নিশ্চয়ই বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না আর অসুবিধা হয় না পুলিশেরই বা এ বিষয়ে এত কর্মতৎপরতা কেন তা বুঝতে? বিচারপতি মাল্লার একটি কথা মনে পড়ে—'ভারতবর্ষে যদি কোনও সংবেদ্ধ গুণ্ডাদল থাকে তবে সে এদেশের পুলিশ।' পুলিশই এই অসামাজিক লোকদের সমাজে সৃষ্টি করে রাখে তাদের কারবার ফলাও করার উদ্দেশ্যে। এবং এই জন্যই যে, এহেন হত্যাকারীকে তথ্য গোপন করে এবং আদালতে তদন্তের রিপোর্ট না দাখিল করে তারা বাঁচাবার চেষ্টা করবে তা আর বিচিত্র কি? আমি পুরো ব্যাপারটির পুনরুদ্ঘাটন চেয়েছি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।

দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড

দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ১৯৬৮ সালের ২রা থেকে ৪ঠা ডিসেম্বরের মধ্যে। ইতিপূর্বে কয়েকবার সংবাদপত্রে এবং সাপ্তাহিক বসুমতীতেও এ হত্যাকাণ্ডটি বেরিয়েছে। অদ্ভুত এই ঘটনাটি—২রা ডিসেম্বর পরীক্ষা দিয়ে ডানকুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রমের ছাত্রী রমা বাড়ি ফিরছিল। বেলা তখন ১টা কি ১॥-টা। বাড়ি থেকে একশো-দেড়শো গজ কাছে একটি পথের বাঁকে ভাইয়ের সংগে তার দেখা হল। ভাই জিগ্যেস করল, 'পরীক্ষা কেমন হল?' মেয়েটি বললে, 'ভালই।' তারপর দুজনে দুই বিপরীত দিকে চলে গেল। ব্যস, এরপরেই সে মেয়ে আর বাড়ি ফিরল না।

বেলা যত পড়ে আসতে লাগল ততই মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলেন। এক সময়ে দেখা গেল বাড়ির বাইরেকার জানলার কাছে রমার বই ও জুতো পড়ে রয়েছে। কিন্তু এদিক দিয়ে তো মেয়ে কোনদিন বাড়িতে ঢোকে না। তাই সন্দিগ্ধ মনে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। চণ্ডীতলা থানা এলাকা এটা। থানায় যাওয়া হল। কিন্তু কোনরকমেই মেয়েটির সন্ধান পাওয়া গেল না। পরদিনও সমানে খোঁজাখুঁজি চলল। লালবাজারে যাওয়া হল। মিসিং স্কোয়াডে জানানো হল। কিন্তু রমা কোথায়? পরদিন অর্থাৎ ঘটনার তৃতীয় দিনে হতভাগীর মৃতদেহ দেখা গেল স্থানীয় নোনাপুকুরের জলে ভাসছে।

মৃতদেহ জলে দেখার আগে

এখন কথা হচ্ছে—(১) মৃতদেহ জলে ভাসার আগেকার পর্বে পুলিশ যখন ঘটনার খবর পেল (প্রথম দিনে) তখন

ঘটনাস্থলে এল না কেন? (২) পরদিনও পুলিশ যেখানে এসে পারত তাও এল না কেন? একটা পথের মোড়ে যেখানে ভাইবোনে শেষ দেখা হচ্ছে, তারপর সেখান থেকে বাড়ি যখন একশো-দেড়শো গজের মধ্যে তখন এই সূত্র ধরে পুলিশ অনুসন্ধান করলে এই স্বল্প-পরিসর গণ্ডীর মধ্যে দুর্বৃত্তদের ধরা কি সহজ তে না? কারণ ঐ স্থান থেকে দুর্বৃত্তরা কখনই দূরে পালিয়ে যেতে পারে না। যেতে হলে সময়ের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া দিনের বেলায় ঘটনা। কিছুতেই একটা মেয়েকে দূরে নিয়ে যাওয়া যায় না— কেন না কারো না কারো নজরে পড়ার সম্ভাবনা। কাজেই ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে ভাইয়ের সংগে দেখা হওয়ার পর যখুন মেয়েটি একশো-দেড়শো গজের মধ্যে বাড়িতে আর পৌঁছল না তখন খুব সহজেই বোঝা যায় কি হল তারপর। দুর্বৃত্তরা এইটুকু জায়গার মধ্যেই ওৎ পেতে বসেছিল আর এ ওৎ পাতাটা নিশ্চয়ই ছিল একটু অভিনব ধরণের। অভিনব ধরণের বলছি এইজন্য যে, রাস্তায় এ ওৎ পাতা হয় নি এবং রাস্তা থেকেও মেয়েটিকে কেউ gag করে নিয়ে যায় নি। তা করতে গেলে

ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করলে

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত সুস্থ, সবল, সুন্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাকে। মুখ স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়।

সাধনা দশন

একটি আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের
রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র:
ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (ক্যাল) আয়ুর্বেদাচার্য

এ ৩০.২/৩৫

একসংগে অনেক লোককে আগে থাকতেই রাস্তায় দেখা যেত। মুহূর্তমাত্র আগে যাওয়া ভাইও তাদের দেখতে পেত তাহলে। কিন্তু সেরকম কিছু তথ্য নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় তাহলে? এই স্বল্প-পরিসর গণ্ডীর মধ্যে (পথের বাঁক থেকে বাড়ি পর্যন্ত) নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ নারী অথবা পুরুষ ডেকেছে অথবা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে কোন পরিবেষ্টিত চৌহদ্দীর মধ্যে (কোন বাড়ির কথা এখন নাই বা বললাম) এবং সেখান থেকেই দুর্বৃত্তদল তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যাবতীয় কার্যকলাপের ব্যবস্থা করেছে এবং বাড়ির লোককে ভাঁওতা দেয়ার জন্য ও একই সংগে প্রমাণ নষ্ট করার জন্য একেবারে গোড়াতেই এমন একজন কেউ সন্তর্পণে বই আর জুতো রুমাদের জানলার ধারে রেখে এসেছে যাকে কেউ দেখে ফেললেও সন্দেহ করার কিছু থাকত না। কাজেই দুর্বৃত্তরা পরিচিত লোক।

এই প্রসংগে এটাই জিজ্ঞাস্য কেন এমন দু-দুটো মূল্যবান দিন পুলিশ অবহেলা করল? একথা কি সত্যি স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন মহল হতে পুলিশকে ঘটনাস্থল থেকে দূরে রাখার চেষ্টা হয়েছিল? কিংবা পুলিশ তাদের সংগে জড়িত কোন স্বার্থসম্পন্ন লোক এতে জড়িয়ে পড়বে বলে নিজেরাই দূরে সরে ছিল? ঘটনা-দৃষ্টান্তে একথা মনে হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। কারণ এই সময়ে সংশ্লিষ্ট কোন মহল থেকে প্রচার চলছিল মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। সেইজন্য সে বাড়ি থেকে পালিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

জল থেকে মৃতদেহ তোলার পরে

মৃতদেহ জল থেকে তোলার আগে আমি নিজে পুলিশকে জানাই। পুলিশ আসে এবং মৃতদেহ তোলা হয়। মৃতদেহ যে খুব বেশিক্ষণ জলে পড়ে নি তা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা গেল। শুধু যতটা সময় গেলে মৃতদেহ জলের উপরে ভেসে উঠতে পারে ততটা সময়ই লেগেছে। তার বেশি সময় লাগলে কখনই মৃতার কানে নাকে যে জল ঢুকেছিল তা থেকে বুড়বুড়ি কাটত না। অর্থাৎ তখনও জল ঢোকার জায়গা ছিল শরীরে। এতে প্রমাণিত হয় দুর্বৃত্তরা ২রা ডিসেম্বর তারিখেই তাকে হত্যা করে নি। তা করলে আগেকার দিনই জলে ফেলত। এবং আগেকার দিন জলে ফেললে মৃতদেহ আরও পচে উঠত এবং কানে বা নাকে জল ঢোকার জন্য বুড়বুড়ি কাটত না। তাছাড়া জল থেকে মৃতদেহ তোলার পর যেসব ক্ষতগুলি তার শরীরে দেখা গিয়েছিল, সেগুলিতেও অপেক্ষাকৃত তরল রক্ত দেখা যেত না—সে রক্ত জমাট হত, বিবর্ণ হত।

জল থেকে মৃতদেহ তোলার পর দেখা গেল তার গুচ্ছ গুচ্ছ চুল মুখের ভিতরে পুরে দেয়া হয়েছে। দুই কানের পাশে ক্ষত, মাথায় ক্ষত, গলায় নখের দাগ, বুকে ও তলপেটেও তাই এবং সর্বোপরি ধর্ষণের চিহ্ন বর্তমান। মৃতার পিঠের জামায় এমন একধরণের মাটির দাগ যা পুলিশের পক্ষে খুবই সহায়ক ছিল। পুংখানুপুংখরূপে পুলিশ এগুলি আমার সামনেই লিপিবদ্ধ করে এবং আমি তাতে দস্তখতও করি।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পুলিশ গত দুদিনে ঠিক যে পথ ধরে চলছিল, মৃতদেহ পাবার পর ঠিক সেই পথই ধরে চলতে লাগল, অভিজ্ঞতালব্ধ নতুন পথে চলতে পারল না। রুমা নিখোঁজ হয় বাড়ির কাছাকাছি একশো-দেড়শো গজের মধ্যে। মৃতদেহ পাওয়া গেল আরও একশো-দেড়শো গজের মধ্যে। অর্থাৎ আগাগোড়া ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র তিনশো গজ একটি গণ্ডীর মধ্যে। এই তিনশো গজের মধ্যে পুলিশ তাদের শক্তিকে concentrate করলে কি এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা করতে পারত না

ঘটনাকে অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা

অথচ অসংখ্য ক্লু রয়েছে এ সম্পর্কে। এ তাবৎকাল পুলিশের পক্ষপুটে থেকে আর জি পার্টির নাম করে কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোক (আর জি পার্টির সবাই নয়) এখানে কি করে এসেছে আর কি করে বেড়ায় তা সবাই জানে। ভারত-রক্ষা আইনে কমিউনিস্টদের জেলে পুরতে হবে, তাতে এরাই উদ্যোগ নেয়, ওয়াগন ভাঙার নেতৃত্ব দিতে হবে সে এরাই দেয়, নিয়মিতভাবে রাতে চোরাই লোহা চালান দিতে হবে তা এদের পাহারাতেই অনুষ্ঠিত হয়, চোলাই মদের ব্যবসা ফলাও করতে হবে সে এরাই ভরসা যোগায়। পথে কোন গোলমাল, লরী আটকানো, বে-আইনী মাল ধরা যাই কিছু ঘটুক না কেন, এদেরই দেখা যাবে সম্মুখের সারিতে এসে দাঁড়াতে।

কিন্তু আশ্চর্য, ৪ঠা ডিসেম্বর নোনা-পুকুরে রুমার মৃতদেহ যখন জল থেকে তোলা হল, যেখানে শত সহস্র নরনারী উপস্থিত হল—এই আর জি পার্টির নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তিকে সেখানে দেখা গেল না। জিজ্ঞাসা করি পুলিশকে, যাত্রার বিবেক কাঙ্ক্ষর মত যাদের সর্বত্র ঘন ঘন আবির্ভাব হয় তাদের এতবড় একটা ঘটনায় অনুপস্থিতি দেখে পুলিশের কি কিছুই মনে হয় নি?

এদের গোঁড়া একজন সমর্থক ঘটনাস্থলে অবিশ্যি এসেছিলেন। তিনি এসে প্রচার করছিলেন, মেয়েটির বাবাই মেয়েটিকে খুন করে জলে ফেলে দিয়েছেন। তিনি আমাকেও ডেকে এই কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভদ্রলোকের antecedent জানি। তবু আমি বলেছিলাম, 'বাবা খুন করতে পারে না এমন কথা বলি না, কিন্তু বাবা মেয়েকে রেপ করবেন কি করে?' ভদ্রলোক তাতে বললেন, না না রেপ হয় নি। ওটা বাজে কথা। রেপিং-এর চিহ্ন আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পুলিশের কাগজপত্রে লিপিবদ্ধও হতে দেখেছি এবং তাতে আমি সইও করেছি। অথচ ভদ্রলোক এটাকেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কেন চাইলেন তা বুঝতে একটুও দেরি লাগে না। ঘটনাকে ঘুরিয়ে দাও অন্যদিকে, সম্ভবত এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে একথা উল্লিখিত হয়েছে—The girl was raped and murdered.

পুলিশকে জানালে তা দুর্বৃত্তরা জানতে পারে

এইসব ঘটনা অর্থাৎ তিনশো গজের মধ্যে একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্র-স্থল, সেখানে কি কি সম্ভাবনাময় উপকরণ রয়েছে তা ধরবার, আর জি পার্টির নেতাদের ভূমিকাও ঘটনাস্থলে চিরাচরিত অভ্যাসের ব্যতিক্রম, তাদের সমর্থকদের ঘটনাকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা এ সবই আমি হুগলীর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানিয়েছিলাম. তিনি একজন স্পেশাল অফিসারও পাঠিয়েছিলেন আমার বাড়িতে। কাজ কিছু হয় নি—তবে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের মাধ্যমে কি না বলতে পারব না, সংশ্লিষ্ট স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিগুলি সে সব কথা জেনে ফেলেছেন। এতে আপাতত আমার একটু অসুবিধা হয়েছে। তবে সে আমি ভয় করি না। ইতিমধ্যে সে পুলিশসুপারও বিদায় হয়েছেন।

রুমার এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আসামীদের ধরতে পুলিশের ব্যর্থতার সংগে আরও একটি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে সেটা এই প্রসংগে কর্তপক্ষ ভেবে দেখবেন। একটা বিদ্যালয়ের ছাত্রী এমন নৃশংসভাবে নিহত হল, সেই বিদ্যালয়ের প্রধান এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেটার কেউ একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন না কিম্বা কেউ পুলিশকে দুছত্র লিখলেনও না। কিন্ত কেন? এই বিদ্যালয়ের যেসব তথ্য শিক্ষাদপ্তরে পাহাড় হয়ে জমে আছে সেগুলো দেখলে কর্তপক্ষ বুঝতে পারবেন, রুমার হত্যাকারীরা শুধু পুলিশের পেটোয়া লোকদের প্রশ্রয়েই লালিত হয়ে ওঠে নি—শিক্ষাদপ্তরের অনেক পুঞ্জীভূত পাপের গহ্বরেও তারা আশ্রয় পেয়েছে। সময়মতই এ সব কথা সামনে আসবে।

কিন্তু কর্তপক্ষকে বলতে চাই মানুষকে বুঝতে দিন নতুন দিন এসেছে।

জালালাবাদের স্মৃতি

শচীন্দ্রনাথ গুহ

২২শে এপ্রিল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৩০ সালের এই বিশেষ দিনটিতে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে বিশাল বৃটিশবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। সেদিন বহু মুক্তিসেনার উষ্ণ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল এই শৈল-শিখর। আজ সেই রক্তঝরা দিনের স্মৃতি-বার্ষিকী।

১৯৩০ সালে কংগ্রেস সংকল্প গ্রহণ করেছিল সত্যাগ্রহের পথে লবণ আইন অমান্য করবে।' এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গান্ধীজী ১২ই মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯জন সত্যাগ্রহীসহ ডাণ্ডী অভিযান আরম্ভ করেন। কলকাতার দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন বাজেয়াপ্ত পুস্তকের অংশবিশেষ এক বিরাট জনসমাবেশে পাঠ করে আইন অমান্য করেন। প্রখ্যাত জননেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহিষবাথানে ও দেশপ্রিয়ের সহকর্মী, চট্টগ্রামের বরেণ্য নেতা মহিমচন্দ্র দাস কুমিরার সমুদ্র-সৈকতে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন।

ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা এই অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়। ঝিমিয়ে-পড়া জাতির বুকে প্রাণের স্পন্দনকে দ্রুততর করতে হলে একটা বিরাট ঝাঁকুনি দরকার। এখন সেই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। তাই দীর্ঘকাল প্রস্তুতির পর ১৮ই এপ্রিল বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের (মাস্টারদা) নেতৃত্বে সুরু হয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।

১২ই মার্চ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস ডাণ্ডী অভিযান আর ১৮ই এপ্রিল পূর্বপ্রান্তে বীর বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে সহিংস অভিযান—স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই দ্বিমুখী ধারা ১৯৩০ সালের বৈশিষ্ট্য।

১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের বিভিন্ন অংশ রিজার্ভ পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার ও রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী বাহিনীর অস্ত্রাগার আক্রমণ করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেন। ঐ দলের একটি অংশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ ও ধ্বংস করে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। অপর অংশ চট্টগ্রাম শহরের অদূরে রেলওয়ে লাইন অপসারিত করে বাইরে থেকে সেনাবাহিনী আনার পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করেন।

এই বিরাট সাফল্যের পর বিপ্লবীরা সরকারী ট্রেজারী আক্রমণ ও লুণ্ঠন, কোর্ট বিল্ডিং অধিকার করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাঁদের পরবর্তী কার্যক্রমকে রূপদানের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পাহাড়ের আশ্রয়স্থল থেকে বিপ্লবীরা শত্রুপক্ষের সঠিক অবস্থা জানবার জন্য কয়েকজন বিপ্লবীকে চট্টগ্রাম শহরের অভ্যন্তরে প্রেরণ করেন। কিন্তু নানা কারণে কেউ সংবাদ পাঠাতে সমর্থ হন নি। সংবাদসংগ্রহকারীদের অন্যতম ছিলেন বিপ্লবী ছাত্র অমরেন্দ্র নন্দী। তিনি পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্য একটি কালভার্টের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু পুলিশ তা টের পেয়ে অমরেন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। অমরেন্দ্র সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার ফলে কালভার্টের ভিতর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। অমরেন্দ্রও গুলিবর্ষণের দ্বারা প্রত্যুত্তর দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত অমরেন্দ্রকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। তখনো তাঁর দু'হাতে মুষ্টিবদ্ধ দুটি রিভলভার।

বিপ্লবীদের শহরের অবস্থা জানবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা অফুরন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে পরবর্তী সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে তাঁরা আশ্রয় নিচ্ছেন। স্বাভাবিক জীবনধারা থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন। পাহাড়ী কাঁচা আম আর কচি তেঁতুলে তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হচ্ছে। এইভাবে চারদিন অতিক্রান্ত। ২২শে এপ্রিল পঞ্চম দিনে ভোর হওয়ার কিছু পূর্বে তাঁরা উপস্থিত হলেন জালালাবাদ পাহাড়ে। সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন ও লোকনাথ বল শহর আক্রমণের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করছেন। এমন সময় দু'জন কাঠুরে সে পাহাড়ে কাঠ কাটতে এল। অল্পক্ষণের মধ্যে কিছু কাঠ সংগ্রহ করে তারা চলে গেল। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বিপ্লবীদের ধারণা, কাঠুরেরা তাঁদের সন্ধান পায় নি।

অপরাহ্নে অসময়ে শোনা গেল ট্রেনের শব্দ। কিছুক্ষণের মধ্যে জালালাবাদ পাহাড়ের অদূরে অবস্থিত রেললাইনের উপর এসে গাড়ি থামল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সৈন্য গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সেদিনের সেনাপতি লোকনাথ বলের নির্দেশে চারদিনের অনাহারী এই বীর বিপ্লবীদের হাতে রাইফেলগুলি গর্জন করে অগ্নিবৃষ্টি সুরু করে দিল। ইংরেজ সেনানায়ক পরিচালিত Eastern Frontier Rifles এবং Surma Valley Light Horse নামক দুই বিরাট বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের দু'ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। রাতের অন্ধকারে সরকারী বাহিনী পালিয়ে যায় পরাজয়ের কালিমা নিয়ে। আর এই মহা রণাঙ্গনে শহীদের গৌরব অর্জন করেন বারজন মুক্তিপাগল বিপ্লবী তরুণ। তাঁরা হলেন—মধু দত্ত, ত্রিপুরা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল, প্রভাস বল, মতি কানুনগো, জিতেন দাশগুপ্ত, নির্মল লালা, অর্ধেন্দু দস্তিদার, শশাঙ্ক দত্ত ও পুলিন ঘোষ। গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, বিনোদ দত্ত ও বিনোদ চৌধুরী।

যাঁরা জীবিত রইলেন, তাঁদের হৃদয় বেদনা-ভারাক্রান্ত। সেনাপতি লোকনাথ বলের নির্দেশে শহীদদের মৃতদেহগুলি সারিবদ্ধ করে সাজানো হল। তারপর সামরিক কায়দায় সবাই শেষ অভিবাদন জানিয়ে পাহাড় থেকে অবতরণ করে ছড়িয়ে পড়লেন গ্রামে গ্রামে। তার পরবর্তী কাহিনী আরো বিচিত্র, আরো বিস্ময়কর।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, যাঁরা জীবনের সব কিছুকে এমনি করে উজাড় করে দিয়েছিলেন, যাঁরা সাধারণ মানুষের পক্ষে অভাবনীয় দুঃখ-কষ্টের পিচ্ছিল পথে যাত্রা সুরু করেছিলেন, যাঁরা আদর্শের অগ্নিশিখাকে আজীবন প্রজ্বলিত রেখেছিলেন, সেই আদর্শনিষ্ঠ মুক্তিসাধকদের আকাঙ্ক্ষা আজো পূর্ণ হয়েছে কি না।

"বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার এ অশ্রুধারা—
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধুলায় হবে হারা?"

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

একদল মামাবাড়ির পোষ্য ভাগ্নে থাকে, যাদের একমাত্র কাজ হল সময় সুযোগমত মামার পকেটমারা। এই ভাগ্নেকুল এত দড় হয় যে, মামাবাড়িতে যদি আগুন লাগে, তাহলেও তারা আগুন নেভাতে কোনপ্রকার তৎপর বা বিচলিত হয় না। তারা সেই আগুনেরই সদ্ব্যবহার করে মামা-মামীর টাকা-পয়সা-জিনিসপত্র হাত সাফাই করে। তাদের কাছে আগুন বড় কথা নয়, কি পুড়ছে, মামার কি সর্বনাশ হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়। সেই ভাগ্নেদের কথা হল "মামার বাড়ি আগুন লেগেছে সেই আলোতে খেয়ে নিই"। আর একদল পাখি আছে—যার নাম হল ফিঙে। এই ফিঙে পাখিকে আপনি সচরাচর দেখতে পাবেন না, আকাশের অনেক উঁচুতে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা বিচরণ করে। কিন্তু এই ফিঙেকে দেখা যায় যখন কোন বাড়িতে আগুন লাগে। আগুনের হল্কা ও ধোঁয়ার কুন্ডলীর কাছে নেমে আসে, সেই ধোঁয়ার মধ্যে লেজ নেড়ে নাচে আর ধোঁয়া খায়। গত এক সপ্তাহকাল অতি মনোযোগ সহকারে আমি এই ফিঙের নাচন আর মামাবাড়ির ভাগ্নেদের গতিবিধিব আচরণ দেখছিলাম।

প্রায় দুই মাস হতে চলল রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট সবকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর সরকার প্রতিষ্ঠার পরই রাজ্যে সুরু হয়েছে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি বর্ণনা এক কথায় হয় না বা ব্যাখ্যা দেওয়াও সহজ নয়; কিন্তু এই সব ঘটনার একমাত্র ফলশ্রুতি হল দৈনিক খবর কাগজের বাজার গরম করার মত সব খবর। কিন্তু ঘটনাটা যদি শুধু খবর কাগজের খবরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তবে বলার কিছু ছিল না। এই সব ঘটনার তাৎপর্য আরো গভীরে তার শিকড় প্রোথিত করেছে, সেই ঘটনাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

১৯৬৯ সালে রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অভূতপূর্ব শক্তিতে, যে শক্তিকে ভেঙে কেটে ছোট করে এই সরকারের কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা কারও নেই। অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার; শরীরে মেদ বৃদ্ধি পেলেই মানুষ শক্তিশালী হয় না, দেহের ওজন বৃদ্ধিই একমাত্র স্বাস্থ্যবানের লক্ষণ নয়। উদরী রোগীর শরীরও খুব মোটা হয়, শরীরে জল জমেও অনেকের ওজন বাড়ে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকার সেই জাতীয় কোন রোগগ্রস্ত কৃত্রিম ওজন বৃদ্ধিতে শক্তিশালী নয়। এই সরকার রক্ত-মাংস-পেশী-হাড়-মাথায় মিলে সব মিলিয়েই শক্তিশালী হয়েছে, এই নীরোগ শক্তিশালী দেহে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রবেশও সহজ নয়। কারণ সরকার প্রবল জনসমর্থনপুষ্ট হয়ে রোগ নিরোধ ও প্রতিবোধেও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। কিন্তু যারা উৎসাহী তারা অবস্থা জেনে ও বুঝে চুপ করে থাকবে এমন ভাববাব কারণ নেই এবং চুপ করে যে তারা থাকে নি, চুপ করে যে তারা থাকবে না, গত দুই মাসে সেই সত্য প্রমাণিত হলো। তার চরম পরিণতি ঘটলো লেক স্টেডিয়ামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

লেক স্টেডিয়ামে কি ঘটেছে সেই সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু বলার কথা হল লেকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সত্য ধরা পড়লো সেই সম্পর্কে। এই সত্য সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথম কথা হল—লেকের ঘটনাকে কোন একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখলে চলবে না। দুর্গাপুর, কাশীপুর, তেলিনীপাড়া, কাঁচরাপাড়া সব ঘটনার মত লেকের ঘটনাও রাজ্যের বহুমুখী সমস্যা ও সংকটের একটি দিক। কাজেই ঘটনার বিচার করতে হলে কোন ঘটনা থেকে কোন ঘটনাকে একক বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ম্ভু ভাববার কারণ নেই। প্রথমেই বলতে চাই বর্তমান মুহূর্তে কেন্দ্রের আচরণ ও ভূমিকা কি? কাশীপুরের ঘটনার পর কেন্দ্র থেকে হঠাৎ এক বিচারপতি নিয়োগ করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হল। কিন্তু কেন? গুলী-চালনা, মৃত্যু, ভারতবর্ষে সব রাজ্যেই হচ্ছে; তুলনামূলকভাবে, কাশীপুরের ঘটনা অপেক্ষা শ্রীচ্যবনের নিজের রাজ্য মহারাষ্ট্রে শিবসেনাদের তাণ্ডব, অন্যান্য কারণে সরকারী সম্পত্তি ও জীবন-হানির ক্ষতি কিছু কম নয়। প্রকৃতপক্ষে কাশীপুরের ঘটনা একদিনের এবং কয়েক ঘণ্টার আর মহারাষ্ট্রের ঘটনা চলেছিল সাতদিন ধরে। কিন্তু সেই ঘটনা নিয়ে শ্রীচ্যবনের এত তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় নি, তদন্ত কমিটিও গঠিত হয় নি, এমন কি এত হৈ-চৈ দেখাও যায় নি। মহারাষ্ট্রের পর তেলেঙ্গানা নিয়ে গত প্রায় এক মাস যা চলছে তার গুরুত্ব কি কাশীপুর থেকে কিছু কম? জীবন ও কেন্দ্রীয় সরকারী সম্পত্তিহানি কি কিছু কম? কিন্তু সেখানে শ্রীচ্যবনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন উদ্বেগ নেই। এমনিভাবে বহু নজীর দিয়েই বলা যায়—সারা দেশে যে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অন্যান্য ঘটনা ঘটছে এইগুলি কোন একটি রাজ্যের একক ঘটনাও নয়—বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়—সবটার মূলে সামাজিক ব্যাধি এবং সেই ব্যাধি বহুলাংশে সৃষ্টি হয়েছে গত বিশ বৎসরে। কিন্তু তার জন্য কোন একটি রাজ্যের প্রতি প্রেমপূর্ণ ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আর অন্যের প্রতি সতীনের এলে সুলভ আচরণ গ্রাম্য কুঁদুলে মহিলার পক্ষে শোভা পায়, কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের ঐক্য সংহতি রক্ষার চাবিকাঠি যাঁর হাতে তাঁর পক্ষে শোভা পায় না। প্রশ্নে প্রশ্ন ওঠে, কেউ বলবেন শ্রীচ্যবন কি এই সব জানেন না, বোঝেন না, আর যদি জেনে বুঝে করেন তারই বা কারণ কি? এই সম্পর্কে দুইটি সত্য থাকতে পারে। প্রথম সত্য হল শ্রীচাবন বা তাঁর মনোভাবের নেতারা সাময়িকভাবে কংগ্রেস-বিরোধী সরকারসমূহকে মেনে নিলেও পাঁচ বৎসরের জন্য মেনে নিতে প্রস্তুত ন'ন। তাই পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই এই সকল সরকারের যাতে পতন ঘটে, তার জন্য তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন অর্থাৎ এইভাবে একের পর এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এক শুভক্ষণে সরকারের অবসান ঘটানো হবে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে এইসব কাজের মধ্যেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিফলন আছে। কেন্দ্রের সব মন্ত্রী বা কংগ্রেসী নেতা চাবনপন্থী ন'ন তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। শ্রীচ্যবনের সুরে কংগ্রেসের মধ্য থেকে যত না সমর্থন মিলেছে তার চেয়ে বেশি মিলেছে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ, বি-কে-ডি প্রভৃতি দলের

কাছ থেকে। তাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সমস্যা বুঝে নিতে এবং রাজ্য সরকার সঠিকভাবে কি ভাবছে ও করছে জেনে নিতে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় এবং শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কথা বলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য সরকার তদন্ত কমিটি ঘোষণা করেন। শ্রীঅশোক-কুমার সেন প্রকৃতপক্ষে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করে এগুতে উপদেশ দেন। এ ছাড়া আরো একটা প্রশ্ন আছে, যেটা শ্রীচ্যবনের আচরণ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে। পশ্চিম-বঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হবার পর সেই সরকারের স্থায়িত্বের কথা বিবেচনা করে শিল্পপতিরা ধীরে ধীরে সরকারের সঙ্গে মনের আদান-প্রদান সুরু করেছে বলা যায়। বিভিন্ন চেম্বা-রের লোকেরা নিজেরা আগ্রহ করে সরকারের কাছে আসছে, কথা বলছে, নিজেদের সমস্যা সরকারকে জানাচ্ছে, সরকারের সহযোগিতা চাচ্ছে, যা ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে দেখা যায় নি।

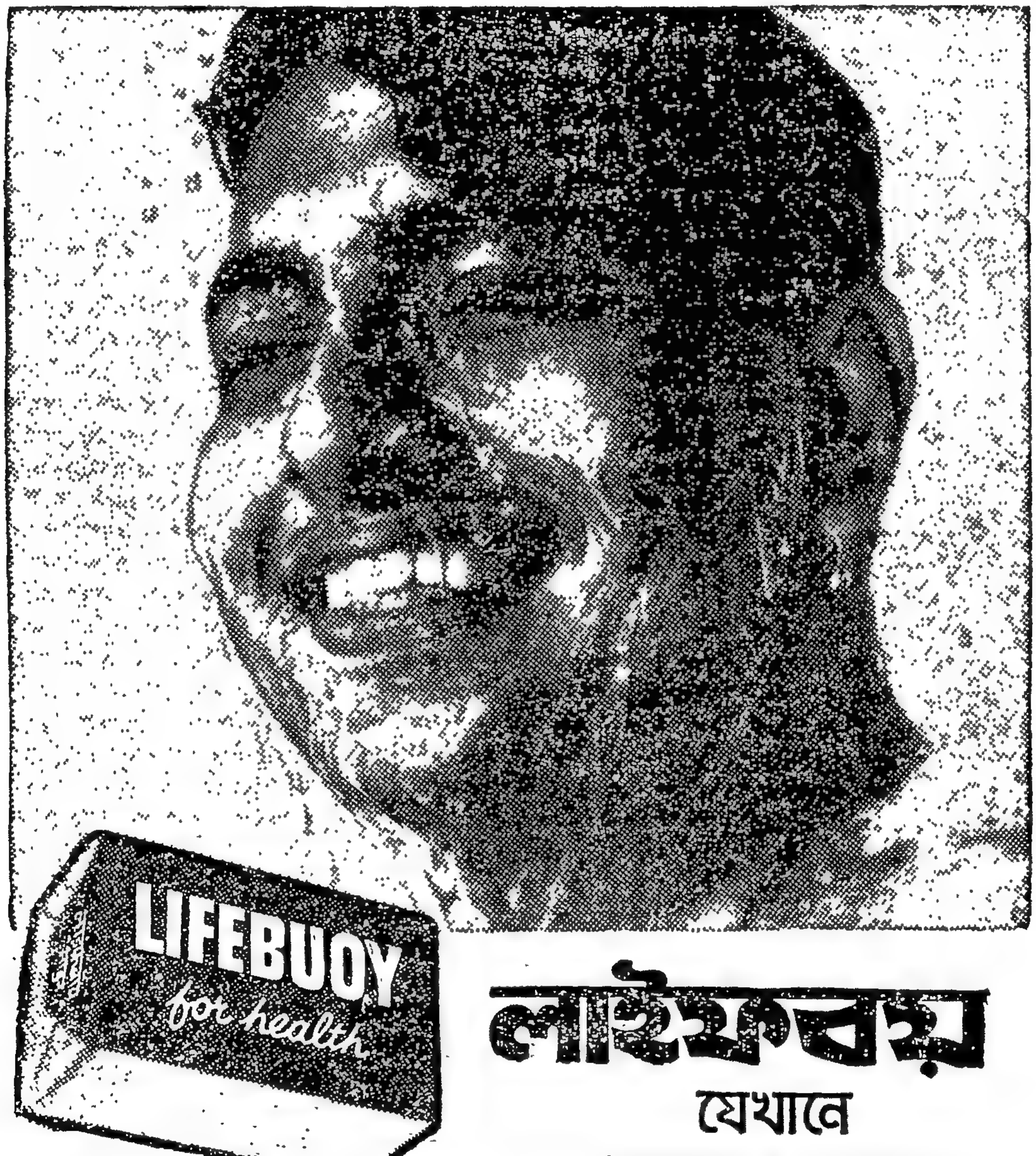

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন। এই
চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের
সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে!

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

লিনটাস-L. 51-৩৬ 80

শ্রীচ্যবন এই প্রচেষ্টা থেকে সম্ভবত সকলকে সারিয়ে নিতে চান, সকলকে বুঝিয়ে দিতে চান—তোমরা যারা ভাবছো পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভালভাবে পাঁচ বৎসর চলবে, টিকে থাকবে—তারা ভুল করছো, সরকারের সঙ্গে অত দহরম-মহরমের দরকার নেই।

এই পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্র-সরোবরের ঘটনা ঘটলো এবং যে ঘটনা প্রকৃতপক্ষে এনফিল্ড টোটার কাজ করলো। রবীন্দ্র-সরোবরের ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল বা তার পিছনে কি আছে না আছে সেটা তদন্তের জন্য কমিশন গঠিত হয়েছে, কিন্তু এই কমিশন গঠন পর্যন্ত সময়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সত্য ধরা পড়লো সেটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। রবীন্দ্র-সরোবরের সেইদিন ৬ই এপ্রিল কতজন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছিলেন আর কত লরী মহিলার অন্তর্বাস পাওয়া গেছে সেটা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। বহু জ্ঞানী-গুণী, সুধীজন সেই সম্পর্কে বহু সারগর্ভ আলোচনা ও গবেষণা করছেন, আমার কিন্তু মনে হয়েছে রবীন্দ্র-সরোবরের ধর্ষণ তত্ত্বের সঙ্গে আরো একটি ধর্ষণ তত্ত্ব ধরা পড়েছে। সেটা হল রাজ্যে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর বেশ কিছু শক্তি এই সরকার সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব প্রকাশের একটা ওয়ে আউট খুঁজছিলেন। কিভাবে, কোন্ পথে তাঁরা এই সরকার সম্পর্কে মুখর হতে পারেন—তার পথের সন্ধান করছিলেন, সেই পথই তাঁরা পেয়েছেন ৬ই এপ্রিল রবীন্দ্র-সরোবরের অন্ধকার রাত্রের ঘটনার মধ্যে। এইসব শক্তির মধ্যে আছেন রাজ্যের কিছু রাজনৈতিক নেতা, কিছু বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্র। এই শক্তি কিন্ত রাজ্যের অন্য কোন ঘটনায় সামান্য বিচলিত হন না যেমন ধরুন কাশীপুরে গুলীচালনায় পাঁচটা তাজাপ্রাণ নিমেষে শেষ হয়ে গেল এবং যাদের গেল তারা কেউ স্ফূর্তি করতে গিয়ে বা ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার টিকিট কেটে বোম্বাই-এর চিত্রতারকাদের দেখতে যায় নি, তারা হাতে টিফিনের কৌটো নিয়ে পরিবারের টিফিন সংগ্রহের জন্য গেছিল। কই তাদের জন্য একটা সমবেদনার কথা এইসব বুদ্ধিজীবী আর জ্ঞানী-গুণীদের কাছে পাওয়া যায় না। নারী জাতির জন্য দরদের সীমাহীন জোয়ারে রবীন্দ্র-সরোবরের, ঘটনায় নিগৃহীত মহিলাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য অত্যাচারের জন্য যাঁদের চোখে বৈশাখের রুদ্রতাপে বর্ষার প্লাবন নামে, তাঁরা কি জানেন কাশীপুরে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ঘরেও মা আছে, বোন আছে, স্ত্রী আছে। সেই মহোদয়রা কি একবার বিচার করেছেন, যাঁরা ৬ই এপ্রিল রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামে কালোবাজারের টিকিট কিনে অমুক কুমার, তমুক ইন্দ্রকে দেখতে গেছিলেন, অথবা চীৎকার করে কোন এক চিত্রতারকাকে কিস করতে না পেরে জীবন ব্যর্থ ঘোষণা করেছেন—অথবা সন্ধ্যা থেকে গণ্ডগোল হচ্ছে দেখতে পেয়ে বা বোমা, টিয়ার গ্যাস চলছে দেখেও যারা নিরাপদে স্থানত্যাগ না করে চিত্রতারকাদের দর্শনের জন্য জীবন বিপন্ন করতে দ্বিধা করে না—চোখের জল কি শুধু তাদের জন্য ঝরবে? না, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অমল ঘোষ, যে মাত্র গত ১লা অগ্রহায়ণ বি-এ পাশ ছাত্রী ২৩ বৎসরের শ্রীমতী অঞ্জলিকে বিয়ে করেছে এবং যে অমল কাশীপুরে গুলীর আঘাতে প্রাণ দিল আর পাঁচ মাসের মধ্যে অঞ্জলির সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল, যে অঞ্জলি স্বামী অমলের মৃত্যু-সংবাদ শুনে জ্ঞান হারিয়ে তিনদিনের মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেল না, মৃত স্বামীর মুখখানি শেষবার দেখল না, সেই অঞ্জলির জন্যও চোখের জল ঝরবে। ফৌজদার সাহেবের স্ত্রী শ্রীমতী রাজিয়া সাহেবার কথা কি কেউ জানেন, যে কাশীপুরে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনটি সন্তান সহ সমগ্র বিশ্বে একা হয়ে গেছে। ফৌজদার যেদিন মারা যায়, সেইদিন সমগ্র পরিবার অনাহারে ছিল। সন্ধ্যায় ফৌজদার কিছু ধার-দেনা করে আনলে তবে আহার জুটবে, সেই ফৌজদার এল না, এল তার মৃত্যু-সংবাদ আর পাড়ার ছেলেরা চাঁদা তুলে কিছু খেতে দিল ফৌজদারের সন্তানদের। সেই রাজিয়ার কথা ভেবে কি একটু চোখের জল ঝরেছে কারো? শ্রীমহাশ্বেতা দেবী শ্রীমতী বাণী রায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল দাস, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু কেউ কি বলতে পারেন তাঁরা এই অঞ্জলি আর শ্রীমতী রাজিয়ার নাম শুনেছেন? কত পুলিশ, কত গোয়েন্দা, কত জ্ঞানী-গুণী, সুধীজন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন রবীন্দ্র-সরোবরে কোন্ মহিলার প্রতি কিভাবে, বা কতটুকু অত্যাচার হয়েছে তার হিসাব সংগ্রহ করতে, কিন্ত তাঁদের হিসাবে কি অঞ্জলি ঘোষ আর শ্রীমতী রাজিযার নাম খুঁজে পাওয়া যাবে? আমি জানি পাওয়া যাবে না, কারণ এঁদের দরদের টিকি অন্যত্র বাঁধা। এঁরা বিবরের প্রকাশে, রেডিওতে অভিনয়ে, ময়দানে মুক্তমেলায় অথবা শহরের অগণিত অশ্লীল পোস্টারে শত-সহস্র হিন্দী, ইংরাজী ফিল্মে এইসব সতী, সাবিত্রীদের উপভোগ করতে দিতে বাধা দেন না। তাঁদের প্রতিবাদ সেখানে নেই, কিন্তু ঐসব সাহিত্য-চলচ্চিত্র আর পোস্টার যখন সজীব হয়, তখনই মনে ব্যথা পান। এস-এস-পি-র শ্রীরাজনারায়ণ সর্বভারতীয় নেতা, তিনি কলকাতায় সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের বললেন—রবীন্দ্র স্টেডিয়ামের ঘটনার পর তিন লরী মহিলাদের অন্তর্বাস আর পোশাক অন্যত্র সরানো হয়েছে। আমি হিসাব করছিলাম এইসব অনুষ্ঠানে যাঁরা যান, তাঁদের স্বল্পদৈর্ঘ্যের পোশাক—তাই যদি তিন লরী হয়, তবে কত মহিলার বস্ত্রহরণ হয়েছিল? হিসাব করতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, আর মাথা খারাপ হয়ে যায় যখন এইসব কথা বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণীরা বলেন। প্রশ্ন জাগে এটা বাংলাদেশ তো? প্রশ্ন জাগে আমাদের দেশের ছেলেরা কি এতই হীনবীর্য, এত নীচ, এতই নোংরা, যারা অন্ধকার আর বিপদের মধ্যে মা-বোনের শ্লীলতাহানি করে, বস্ত্রহরণ করে। আর সেইদিন রবীন্দ্র-সরোবরে স্টেডিয়ামে কি এমন একজন যুবকও ছিল না যে একজন মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে প্রাণ দিতে এগিয়ে যেতে পারে নি—এই কথা বিশ্বাস করার চেয়ে বাঙালী জাতির মৃত্যু ঘোষণা অনেক ভাল। সবাই শুধু দেখে সরে গেল, কেউ প্রতিবাদ করতে, প্রতিরোধ করতে প্রাণ দিল না, এই সত্য বিশ্বাস করার মত বাঙালী জাতির প্রতি অপমান আব কি থাকতে পারে জানি না। সেই অপমানের কলঙ্ক আজ আমাদের কপালে এবং সেই কলঙ্ক প্রতিষ্ঠার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, সেই কলঙ্ক মিথ্যা প্রমাণ করা নয়, সত্য প্রমাণের জন্য আমরা সেই-ষেই করে নাচছি। তবে হ্যাঁ, এর দ্বারা কিন্তু আমি কারো ব্যর্থতা, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা অথবা কোন অসৎ ব্যক্তিদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত না হোক, এই কথা বলছি না। শ্রীজ্যোতিবাবু হঠাৎ যদি পুলিশ-প্রেমে গদগদ না হয়ে প্রথম দিন ঘটনার পরই সমস্ত ঘটনা নিজের হাতে নিয়ে অথবা অন্য মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ করিয়ে তদন্ত করতেন অথবা পুলিশের যে তিনজন ডি-সি, ৫৬০ জন পুলিশ ঘটনাস্থলে ছিল, তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতেন, ব্যবস্থা নিতেন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বা তারও নেপথ্যে যাঁরা আছেন—হতে পারেন তিনি মন্ত্রী, হতে পারেন তিনি বড় আইনবিদ্ বা অন্যকিছু—তাহলে অবস্থা অন্যরকম হত। কিন্তু শ্রীবসু সেখানেও দৃঢ়তা, দ্রুত ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চেষ্টা করতে পারলেন না—তাই লোক স্টেডিয়ামে কুড়িয়ে পাওয়া অন্তর্বাসের দড়ি বানিয়ে সরকারকে ফাঁসিতে ঝোলাবার চেষ্টা শুরুর সুযোগ হয়েছে। তাই যারা এতদিন সরকারের বিরুদ্ধে মুখর হতে ওয়ে আউট খুঁজছিল, তারা রবীন্দ্র-সরোবরে সেই ওয়ে আউট পেল আর শ্রীজ্যোতি বসু সেই ওয়ে আউট করেছিলেন—সব দুর্ভাগ্যের মধ্যে এটাই বড় দুর্ভাগ্য।

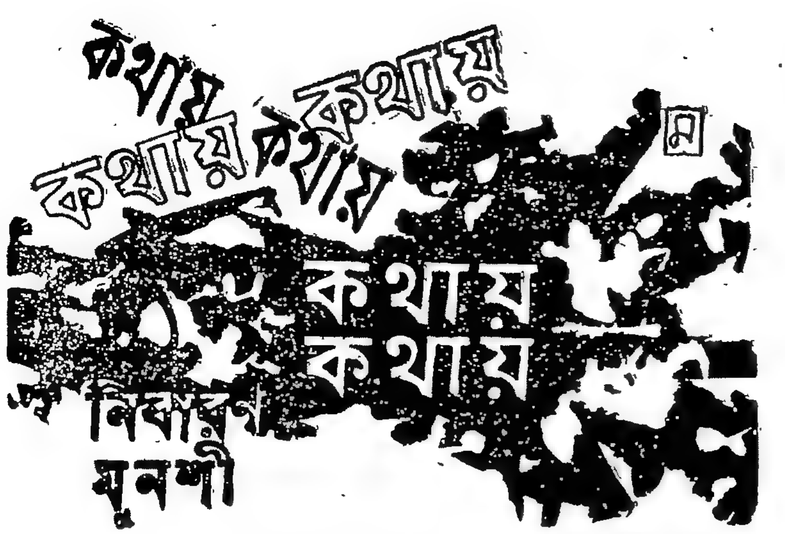

নিজেকে হারানো অনেক সহজ, কিন্তু অখণ্ড নিজেকে আবিষ্কার করার মত যন্ত্রণা আর নেই। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়েও মানুষ যে মুখ দেখে সে মুখ তার আপনার নয়। সে এক প্রসাধিত কল্পিত মুখাবয়ব। সম্ভবত মানুষের দর্পণমাত্রেই রূপকথার দর্পণ। নিজেকে সে যেমন-ভাবে দেখতে চায় দর্পণ তাকে সেইভাবেই দেখায়। মানুষের দাসত্ব থেকে দর্পণ যেদিন মুক্তি পাবে সেদিন সেই দর্পণে মানুষ তার আসল ছায়া দেখে বোধ হয় ভয় পাবে। কোনদিনই আর সে ফিরে আসবে না দর্পণের কাছে, কোনদিন যাবে না নদীর ধারে, তাকাবে না নিথর জলের প্রতিবিম্বের দিকে। শত্রুর রক্তে মাজা উজ্জ্বল বর্শাফলকের দিকেও তাকাবে না সে, পাছে বর্শাফলকের সেই দর্পণে তার নিজের অকৃত্রিম রূপটিকে সে দেখতে পায়।

তবু হঠাৎ হঠাৎ কখনও মানুষকে দাঁড়াতেই হয় নিজের মুখোমুখি, দেখতে হয় অবিকৃত অকৃত্রিম নিজেকে। সে দেখা খুব সুখের হয় না এবং আলোর চেয়ে বোধ হয় সে দেখা অন্ধকারেই জমে ভাল।

সেদিন গভীর রাতে কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে এক বীভৎস আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে দক্ষিণাকাশের আয়নায় অকস্মাৎ নিজেকে দেখতে পেয়েছিলাম। ভয় পেয়েছিলাম। ইচ্ছে করছিল চিৎকার করি।

চিৎকার করলেও আমার চিৎকার সে রাতে কেউ শুনতে পেত না। শান্ত আগ্নেয়গিরি অন্ধকার রাতে হঠাৎ জেগে উঠলে যেমন করে জানোয়ারেরা পালায় তেমনি করে পালাচ্ছিল দলে দলে মানুষ। ইঁট আর কাঁচের গুঁড়োয় পথ ভরে গিয়েছিল, আগুনে আকাশ লাল হয়ে উঠেছিল, কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় সমস্ত পল্লীর চোখ জ্বলছিল।

অগ্নিপরিবেষ্টিতা সীতার মত জ্বলছিল নিরপরাধ দুধের গুমটি, স্টেটবাস আর গাড়ি। এইভাবেই শেষ হয়েছিল সেদিন দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সে রাতের সেই সংস্কৃতির আগুনে ঝলসানো শরীরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমি চিনতে পেরেছিলাম নিজেকে —এই তো আমি অর্থাৎ এই তো আমরা। কারণ আমরা কেউ এর দায়িত্ব এড়াতে পারব না।

বাংলাদেশের সমস্ত পাঠকই হয়তো ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে গত ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিণতির কথা পড়েছেন। ঘটনা ঘটে যাওয়ার দুদিন পরেও লেকের জলে লাস ভেসে উঠেছে, খবরের কাগজে আরও খবর বেরিয়েছে।

নামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলেও কলকাতা শহরে এ ধরণের অনুষ্ঠান যারা করে থাকে তাদের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক খুবই সুদূর।

চিত্রতারকাদের ঘিরে আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের মনে একটা নোংরা লোভ ও কুৎসিত কৌতূহল জাগাতে সাহায্য করে একশ্রেণীর সিনেমা ও যৌন পত্রিকা। অনেক চিত্রতারকাই কিশোর ও তরুণদের মনের এই উন্মাদনা ভাঙিয়ে খান। চিত্রতারকাদের ক্রিকেট খেলার নাম করে ইডেনের মাঠে প্রায়ই শীতকালে যে ছ্যাবলামি ও ন্যাকামি হয় তার পিছনে চ্যারিটির লক্ষ্যের একটা আবরণ থাকে বটে, কিন্তু তার চাইতেও বড় হয়ে ফুটে বেরোয় 'ফ্যান'দের উন্মাদনাকে জিইয়ে রাখার প্রয়াস। তরুণমনের এই উন্মাদনাকে ভাঙিয়ে অর্থ উপার্জন করে আর একদল লোক, যারা প্রধানত উপরোক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মাতব্বর।

ছায়ালোকের চিত্রতারকাকে রক্ত-মাংসের অবয়বে চোখের সামনে দেখার লোভকে কিশোর ও তরুণমনে উসকে দিয়ে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যেই এই ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

চিত্রতারকাদের নিয়ে আজ পর্যন্ত এরকম যতগুলি অনুষ্ঠান হয়েছে তার সবগুলিতেই দেখা গেছে ছোট কিংবা বড় আকারে একই রকম গোলমাল। তার কারণ নিতান্ত পয়সা লোটার লোভেই এসব অনুষ্ঠান। আসনের চেয়ে অনেক বেশি টিকিট বিক্রি করে লাভ করার আশায় উদ্যোক্তারা শুধু দর্শকদের প্রতারিত করে তাই নয়, আইন লঙ্ঘন করে, কর ফাঁকি দিয়ে সরকারকেও প্রতারিত করে। সুতরাং কর্তৃপক্ষ তৎপর হলে ইচ্ছে করলেই সম্ভবত এদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা যায়।

কিন্তু তবু কেন এরা ফাঁকি দিতে পারে? কারণ অনেক সময়েই দেখা যায় এদের পিছনে বড় বড় সরকারি আমলা কিংবা বে-সরকারি হোমরা-চোমরা মাতব্বর থাকে। এই মাতব্বরেরাই এদের বাঁচায়।

বিধিবহির্ভূতভাবে, খেলাধুলোর জন্য নির্দিষ্ট রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম এই ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য কেন এবং কি করেই বা ভাড়া দেওয়া হল সি-আই-টি কর্তৃপক্ষ তাঁদের চলতি নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে কি পরিমাণ

রবীন্দ্র-সংখ্যা

আগামী ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস উপলক্ষে সাপ্তাহিক বসুমতী অভিনব পরিকল্পনায় প্রকাশিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ যাবৎ শত সহস্র আলোচনা হলেও এবারের আয়োজন সম্পূর্ণ নতুন রকমের। সাহিত্য ছাড়াও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রতিভা কী বিচিত্র, কী বিপুল, কী বিস্ময়কর, কী অসাধারণ এবং আজো তা কতো অজ্ঞাত—এবারের মূল্যবান ও আকর্ষণীয় লেখাগুলিতে তার প্রমাণ মিলবে। লিখছেন : বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞগণ।

সিকিউরিটি ডিপোজিট রেখেছিলেন? এ সব প্রশ্নের জবাব আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমরা যতদূর জানি বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে এবং এর জন্য বিধিবহির্ভূত অনুমতি রাজ্যপালের সরকারই উক্ত উদ্যোক্তাদের দিয়ে গেছে। এ ছাড়া অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানান হয় যে, অনুষ্ঠান যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে তার জন্য বিশেষ নজর রাখা হয়েছে এবং দক্ষিণ কলকাতার সুনাম রক্ষার্থে উদ্যোক্তারা সেই সাংবাদিক সম্মেলনে জনসাধারণের কাছে আবেদনও জানান। কিন্তু এর পরেও যে কান্ড ঘটেছে তাতে দুটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—প্রথমত উদ্যোক্তারা নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন নি এবং দ্বিতীয়ত তাঁরা নিশ্চয়ই শান্তিভঙ্গের একটা আশঙ্কা করছিলেন। এর পরেও কেন উদ্যোক্তাদের আইনের কাছে হাজির করা যাবে না?

রবীন্দ্র সরোবরে সেদিনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা কতখানি আইন মেনে চলেছিলেন তার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। কলকাতার একটি সংবাদপত্র লিখেছে পুলিশ ঘটনার পর অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের খুঁজে পায় নি। এটা হাস্যকর।

এ ধরণের হাঙ্গামার আর একটা দিক আছে, সেটা হল এর উল্টো দিকটা। সমাজের গুন্ডারা সর্বদাই যে-কোন হাঙ্গামার সুযোগ নিয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা এই ধরণের সমাজবিরোধীদের বার বার ব্যবহার করেছে গোলমাল সৃষ্টির জন্য। ঠিক সময়ে হাঙ্গামার মুহূর্তটিতে এরা হাজির হয়। হাজার হাজার নিরপরাধ দর্শকের মধ্যে এরা থাকে সংখ্যায় কয়েকজন মাত্র, কিন্তু এরাই আগুন লাগায়, বোমা ছোঁড়ে, চুরি করে, মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করে। ইতিপূর্বে এই শহরে এ ধরণের অনেক গোলমাল হয়েছে; গাড়ি পুড়েছে, বাস পুড়েছে, বোমা ফেটেছে, খুনও হয়েছে কিন্তু এমনভাবে মেয়েদের সম্ভ্রমহানির অভিযোগ শোনা যায় নি। লেক স্টেডিয়ামের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রাত বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন পাশবিকতার নিদর্শন। অনেক বিবস্ত্র মহিলাকে নাকি পল্লীর ঘর থেকে জামা-কাপড় যোগান দিতে হয়েছিল সে রাতে। এ যদি সত্যি হয় তাহলে এই লজ্জার হাত থেকে আমরা কেউ রেহাই পাব না যতদিন পর্যন্ত না অপরাধীদের শাস্তি দিতে পারছি। পাড়ায় পাড়ায় এই সব উঠতি গুন্ডা আর মস্তানদের খুঁজে না পাওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ এরা কেউ অপরিচিত নয়।

সব সত্ত্বেও যখন দেখা যায় বার বার শহরের জীবনে এ ধরণের ঘটনা ঘটছে এবং তার নিরোধের কোন চেষ্টা হচ্ছে না তখনই ভয় হয় নিজের দিকে, নিজেদের দিকে তাকাতে। সভ্যতার পথে হাজার হাজার যোজন পার হয়ে আসবার পরেও আমাদের মুখের আদিমতার চিহ্নগুলি যেন আজও মেলায় না!

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক—কারণ দুর্নীতি, অসাধুতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শুদ্ধ আগুন থেকেই যুক্তফ্রন্টের জন্ম। কিন্তু বাংলার মানুষের সেই আশার মর্যাদা দিতেই হবে। প্রয়োজন মত নিষ্ঠুরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ধরণের উন্মাদনা ও গুন্ডামিকে বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশিদিন আর দর্পণে নিজের এই দগ্ধ মুখ দেখার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না। ৬ই এপ্রিলের নারকীয় রাত্রি বাংলার জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিক। সারা বাংলা যুক্তফ্রন্টেরই জয়ধ্বনি দেবে।

মন্ত্রীরা কী বলেন

পরিবহনমন্ত্রী আবদুল্লাহ রসুল

প্রঃ। কলকাতার পরিবহন সমস্যার সমাধানের জন্য কি করবেন?

উঃ। এখনও কোন নতুন পরিকল্পনা করতে পারি নি। ট্রাম ও বাস উভয় প্রকারের যানবাহন সম্পর্কেই নতুন করে ভাবনার প্রয়োজন আছে। আয় বৃদ্ধির পথ কি আছে, তাও দেখতে হবে। নতুন বাস রাস্তায় না আনতে পারলে সমস্যা আরও বাড়বে। নতুন বাস কিনতে গেলে টাকার প্রয়োজন আছে—সে কথাও ভাবতে হচ্ছে। কিছু পুরোন ট্রাম সারিয়ে রাস্তায় নামানো যায় কি না—সে কথাও ভাবছি।

ভারত সরকার সার্কুলার রেলের কথা বলেছেন। কলকাতার সমস্যা বিরাট। কাজেই বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করতে হবে কি করে যানবাহনের সমস্যাকে কিছুটা কমানো যায়।

প্রঃ। ট্রাম চালাতে গিয়ে সরকারকে বেশ কিছু টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে। এই লোকসানের হাত থেকে রেহাই পাবেন কি করে?

উঃ। লোকসান একেবারে বন্ধ করতে পারব কি না জানি না। তবে লোকসানের পরিমাণ কমানো যাবে কিভাবে—সেই জন্য সমগ্র বিষয়টি রিভিউ করতে চাই। চলতি আয় ও ব্যয়ের অঙ্কের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, এই খাতে সরকারকে বছরে প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে।

ট্রাম কর্মিবৃন্দ বর্ধিত হারে মহার্ঘ-ভাতা দাবি করেছেন। বেতন হারের পুনর্বিন্যাসের কথাও তারা বলছেন। এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও আলোচনা হয় নি। কর্মীদের এই দাবিদাওয়া সম্পর্কে কি করা হবে—তা এখনই বলতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী দিল্লী যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁদের নানা বিষয় নিয়ে কথা হবে। তা ছাড়া আমাদের যেসব 'রিসোর্সেস্' আছে—সে সব সম্পর্কেও বিচার-বিবেচনা করে দেখে যা হয় করা হবে।

প্রঃ। ট্রাম তুলে দিয়ে বেশি সংখ্যায় সরকারী বাস চালু করলে কেমন হয়?

উঃ। ট্রাম তুলে দেবার কোনও পরিকল্পনা আপাতত নেই। বর্ষাকালের মধ্যে পঞ্চাশখানা নতুন বাস চালু করার কথা ভাবছি। এক বছরে যদি একশখানা বাস বাড়াতে পারি—তাহলে বুঝব অন্তত কিছুটা হল।

প্রঃ। সরকারী বাসগুলি চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়। ভাল সার্ভিস পাওয়া যায় না। এর কারণ কি?

উঃ। সরকারী বাসগুলির বয়স হয়েছে। এখন এগুলি মোটামুটি পুরোন। কিন্তু মেরামত করে এই বাসগুলোকে রাস্তায় নামানো হচ্ছে। নতুন বাস দিতে পারলে সব থেকে ভাল হত। কিন্তু এখনই তা সম্ভব নয়।

প্রঃ। বাস-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ কেমন দেখছেন?

উঃ। পাইকপাড়াতে কিছু খারাপ বাস ছিল। বাস-কর্মীরা নিজেরাই আগ্রহ করে দুখানা বাসকে সারিয়ে যাত্রী বহনের উপযোগী করেছে। আমাকে তারা একদিন নিয়েও গিয়েছিল। ছোট একটি সভাও হয়েছিল এই উপলক্ষে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই কাজের জন্য কর্মীরা কোন অতিরিক্ত বেতন (ওভারটাইম) নেন নি।

প্রঃ। সরকারী বাসে ক্ষতির পরিমাণ কি রকম?

উঃ। বছরে দু' কোটি আটাশ লক্ষ টাকার মত লোকসান হয়। বাসের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য যথাযথ পরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত করা হয় নি। যার ফলে, এখন নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

তপশীল ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী দেওপ্রকাশ রাই

প্রঃ। আপনার দপ্তরের কাজ প্রধানত কি কি?

উঃ। অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি করা।

প্রঃ। বাংলাদেশে যে-সব নেপালী আছেন—তাঁদেরও কি অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয়?

উঃ। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত নেপালীদেরও অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত করা হত। তার পর কোন্ অজ্ঞাত কারণে তাঁদের বাদ দেওয়া হল—তা বলতে পারি না। আমি এ বিষয়টি নতুন করে মন্ত্রিসভায় তুলব। নেপালীরা যাতে শিক্ষার ব্যাপারে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মত সুযোগ পান—আমি তার জন্য চেষ্টা করব।

প্রঃ। বর্তমানে অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির মঙ্গলের জন্য যে নীতি-নিয়ম সরকার অনুসরণ করেন—তার কিছু পরিবর্তন হওয়া উচিত নয় কি?

উঃ। এখন পর্যন্ত যে নিয়ম চলছে—তা

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এবার তাদের নির্বাচনী কর্মসূচীর দশম দফাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এই দফা শিক্ষা সংক্রান্ত। এই দফায় বলা হয়েছে ঃ "যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থা দূর করার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং একটি সুষ্ঠু পারম্পর্যসম্পন্ন এবং সংহত শিক্ষা পদ্ধতি চালু করবে। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই (ক) শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম করা হবে। (খ) চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে—প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয় নি এমন সমগ্র অঞ্চলে বিদ্যালয় খোলা হবে; (গ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে; (ঘ) গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার মান এবং শিক্ষকদের চাকরিবিধির মাঝেও যে বৈষম্য চলতি রয়েছে সেগুলি দূর করা হবে; (ঙ) প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে একটি নতুন সামগ্রিক আইন চালু করা হবে; (চ) বর্তমান জেলা স্কুল বোর্ড-গুলো বাতিল করে তার স্থলে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নতুন বোর্ড স্থাপন করা হবে; (ছ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনার গণতন্ত্রীকরণ করা হবে; (জ) সকল শ্রেণীর শিক্ষক ও অ-শিক্ষক বিদ্যালয় কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে এবং চাকরিবিধিরও বদল করা হবে—যাতে কাজের নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়; (ঝ) শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সময়মত বেতনের ব্যবস্থা করা হবে; (ঞ) শিক্ষক প্রশি-ক্ষণ ব্যবস্থাকে বাড়ানো হবে; (ট) নতুন প্রতিষ্ঠান খুলে এবং চলতি প্রতিষ্ঠানেও নতুন শিফট প্রথায় ছাত্র ভর্তি সমস্যার মীমাংসা করা হবে; (ঠ) চলতি পরীক্ষা গ্রহণ প্রথার সংস্কার করা হবে; (ড) বিদ্যায়তনের প্রধানের অনুমতি ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে; (ঢ) ছাত্র ও যুবকদের কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে; (ণ) শিক্ষক, ছাত্র ও পরিচালকদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো হবে; (ত) সাহিত্য, কলা, খেলাধুলো, শরীর চর্চা এবং যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে এবং (থ) কলকাতায় একটি স্টেডিয়াম খোলা হবে।"

যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় আজীবন শিক্ষক আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা। এ বি টি এর প্রধান হিসেবে তিনি শুধু শিক্ষকদের দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে এসেছেন বললে সত্যের অপলাপ করা হবে—এ বি টি এ বরাবর-ই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার-ও চেয়েছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এ বি টি-এ বারংবার দেশের সামনে উপস্থাপিত করেছে। প্রায় আজ শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব-গ্রহণ করে সুযোগ পেয়েছেন তাঁর ও এ বি টি এ'র পরিকল্পনা কার্যকরী করার।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের মাত্র মাস দুয়েকের শাসনকাল শেষ হলো। এর মধ্যেই বিরাট কিছু পরিবর্তনের আশা করা ঠিক নয়। গত দু মাসের মধ্যে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের মাসিক দশ টাকা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি ছাড়া যুক্তফ্রন্টের শিক্ষাদপ্তর আর একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এটি হোল চব্বিশ পরগনা জেলা স্কুল বোর্ড বাতিল করা।

শিক্ষামন্ত্রী সময় পান নি একথা যেমন ঠিক তেমনি একথাও অত্যন্ত সত্য বর্তমানে রাইটার্স বিল্ডিংসের কাজ-কর্ম যেভাবে চলছে তার পরিবর্তন না

আজ থেকে ২০ বছর আগের তৈরি। তখনকার অবস্থা বর্তমান অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। কাজেই আমি নতুন করে নীতি-নির্ধারণের কথা ভাবছি। শিডিউল্ড ট্রাইবস্ স্টেট অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল এবং শিডিউল্ড কাস্টস্ স্টেট্ অ্যাডভাইসারি বোর্ড-এর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলব এবং নতুন করে নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করব।

প্রঃ। অনগ্রসর সম্প্রদায় ও উপজাতিদের যে সাহায্য দেওয়া হয়—তা কি যথেষ্ট মনে করেন ?

উঃ। কখনই নয়। ১৯৬৭-৬৮ সালেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের উন্নতির জন্য মাথা পিছু ১, টাকার বেশি খরচ করতে পারেন নি। আমি তখন দুবার দিল্লী গিয়েছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম—যাতে কিছু অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু আমার চেষ্টা ফলবতী হয় নি। আমি অত্যন্ত বেদনাবোধ করি—যখন দেখি যে, অনুন্নত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অসহায় তরুণ-তরুণীরা আমার দিকে সাহায্যের আশায় তাকান। তাঁদের কি করে বোঝাব যে আমার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের পক্ষে যা করা সম্ভব—তা তাঁরা করবেন। কিন্তু সমস্যা যে বিরাট। সর্বান্তঃকরণে এঁদের মঙ্গলের কথাই ভাবছি। জানি না কি করতে পারব। আমা-দের দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না—এইটাই সান্ত্বনা।

প্রঃ। দার্জিলিঙ্-এর উন্নতিকল্পে নতুন কোনও পরিকল্পনা আছে কি ?

উঃ। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনের শেষ দিকে আমরা চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ডেভালেপমেন্ট অফ্ হিল এরিয়াস' নামে একটা 'স্কিম্'-এর কাগজপত্র হাতে পাই। এই কাগজপত্র রাজ্য সরকারের হাতে আমাদের মন্ত্রি-সভা গঠনের অনেক আগেই এসেছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার এ-বিষয়ে কিছুই করেন নি। আমরাও যখন এই কাগজপত্র পেলাম—তার অল্পদিন পরেই আমাদের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হল। তবুও যেটুকু সময় পেয়ে-ছিলাম—তারই মধ্যে কিছু চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু কিছু করে উঠতে পারি নি। এবার এসেই এই ফাইলটি চেয়ে পাঠিয়েছি। কিছু করা যায় কি না দেখছি। এই স্কিমটি তিন কোটি টাকার। যদি একে কার্যে রূপায়িত করা যায়—আশা করি দার্জিলিঙ-এর অধি-বাসীদের খানিকটা উপকার হবে।

প্রঃ। আর কিছু ভাবছেন ?

উঃ। ভাবি তো অনেক কিছু। কিন্তু আমাদের সঙ্গতি খুব কম। অর্থের অভাবে যা অবশ্য করণীয়—তাও করা যাচ্ছে না। জনসাধারণ এ কথা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে, ফ্রন্ট সরকার কোনও ক্ষেত্রেই জনগণের মঙ্গলের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।

করলে শিক্ষামন্ত্রী তথা যুক্তফ্রন্ট সরকারের শত-সদিচ্ছা সত্ত্বেও ফ্রন্টের ঘোষিত কর্মসূচী কার্যে রূপান্তরিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রীর কক্ষ প্রায় এ বি টি এ'র অফিস ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষকদের ভিড় শিক্ষামন্ত্রীর কক্ষের কাছাকাছি গেলেই টের পাওয়া যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেভাবে দরবারের ঢেউ চলতে থাকে তাতে নতুন কোন কিছু করা দূরের কথা, দৈনন্দিন কার্য পরিচালনাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শিক্ষামন্ত্রী ডেপুটেশন আর দরবার নিয়ে ব্যস্ত আর সেই সময়ে আমলাতন্ত্র যথারীতি তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কর্মসূচীর কোন একটি দফাকেও কার্যে রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষাদপ্তরের বড় কর্তাদের প্রতি কাজে হস্তক্ষেপ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী আগেও জানতেন আর তাঁর গত দু মাসের অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়-ই তিনি বুঝতে পেরেছেন শিক্ষাদপ্তরের সর্বাঙ্গে যে পচন ধরেছে তা রোধ করতে না পারলে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। মহাকরণ, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ, সমস্ত জেলা স্কুল বোর্ড এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, শিক্ষাবিভাগের সর্বস্তরে দুর্নীতির পঙ্ক এমনভাবে জমে আছে যে তা উদ্ধার না করা পর্যন্ত কোন কিছুই করা যাবে না। অনেকে শুনে অবাক হয়ে যাবেন দুর্নীতির ক্ষেত্রে শিক্ষাবিভাগ আজ অন্যান্য সমস্ত বিভাগকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকারের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। একে চরম আর্থিক সঙ্কট, তারপর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ থেকে সুরু করে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ ও প্রণয়ন, বিদ্যালয় অনুমোদন, পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি সব কিছুতেই চরম দুর্নীতি। বর্তমান ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা তো দূরের কথা, বর্তমান নীতির সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে কার্যে রূপায়ণ করতে হলেও সর্বস্তরের কায়েমী স্বার্থকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে। দুর্নীতির যত রকম ব্যাখ্যা হতে পারে তার প্রত্যেকটির পরিচয় শিক্ষাদপ্তরে পাওয়া যাবে।

প্রাথমিক স্তরের কোন কাজ করতে হলেও শ্রীসত্যপ্রিয় রায়কে অনেক জঞ্জাল দূঢ়হস্তে সাফ করতে হবে। গত দু মাসের মধ্যে শ্রীরায় কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁকে আরো অনেকদূর এগুতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী তথা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মনে রাখতে হবে যে কোন পরিবর্তন-ই তাঁরা আনতে চান তাঁদের তা পর্বতপ্রমাণ বাধা অপসারিত করে এগুতে হবে। বাধা আসতে সুরু করেছে আরো আসবে। আমলাতন্ত্র থেকে সুরু করে বিভিন্ন স্তরের কায়েমী স্বার্থ ইতোমধ্যেই জোট বাঁধতে সুরু করেছে। তাঁদের আর্তনাদ সুরু হওয়ার মুখে। "গেল গেল" রব তুলে তাঁরা আবহাওয়া বিষিয়ে তুলবার চেষ্টা করবেন। উদাহরণস্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষার কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। একটিমাত্র চব্বিশ পরগনার স্কুল বোর্ডকে বাতিল করলে হবে না—বাতিল করতে হবে সবগুলো স্কুল বোর্ড। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অভিযোগ অজস্র প্রমাণ দিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বারংবার প্রকাশিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের বিরুদ্ধেও অভিযোগের অন্ত নেই। এই সব অভিযোগ দূর করার জন্য স্কুল বোর্ড আর পর্ষৎগুলো ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকম বিভাগ তুলে দিয়ে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা একই পর্যায়ে আনতে হবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক—প্রত্যাশা শুধু শিক্ষকদেরই নয়। শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পেতে চান, তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তেমনি যারা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষালাভ করে তাদের শিক্ষাদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আজো যে হাজার হাজার বালক-বালিকা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের-ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার যদি একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী করতে পারেন তাহলেই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে তথা সরকারকে আশীর্বাদ করবে। তারপর যে বিপুল জনসমর্থন ফ্রন্ট পেয়েছেন সেই সমর্থন আরো সুদৃঢ় হবে। একমাত্র এই সমর্থনের উপর নির্ভর করে যে কোন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন জনগণ তা সমর্থন করবে—প্রতিরোধ করবে কায়েমী স্বার্থের আঘাত সর্বশক্তি দিয়ে।

শহরাঞ্চলে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা চালানো, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা সংস্থা বে-আইনীভাবে কুক্ষিগত করে রেখে অর্থ আত্মসাৎ থেকে সুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর জমিদারী চালানো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে একনায়কতন্ত্র চালানো আজ শিক্ষাক্ষেত্রের চিত্র। আর এই সবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ হতাশায় নিমজ্জিত। ফলে শিক্ষার নামে যা চলছে তাতে শিক্ষার ছোঁয়াচটুকুও নেই।

যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে বিপ্লবের কথা নেই—আছে সংস্কারের কথা। বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই এই সব সংস্কার করা সম্ভব। তাই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রীকে আর একবার তাঁদের দেয়া প্রতিশ্রুতি, তাঁদের-ই রচিত কর্মসূচীর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

—শ্রীসর্বদর্শী

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

নির্বাচনের পরে

সাগর বিশ্বাস

ইলা মিত্র। বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত অতি জনপ্রিয় বিপ্লবী নাম। আজকের ইলা মিত্র, সেদিনের ইলা সেন। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন এ জি বেঙ্গলে চাকরী করতেন। পরে ডেপুটি এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল হয়েছিলেন। আদি বাড়ি ছিলো যশোর জেলার বাগুটিয়া গ্রামে। কিন্তু ইলা সেনের জন্ম কলকাতায়—শিক্ষাদীক্ষাও এখানে, যশোরের সেই ছায়াঘেরা গাঁয়ের সঙ্গে জীবনে তেমন পরিচয় ঘটে নি। নগেন্দ্রনাথ যখন কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি কানাই ধর লেনে বাস করতেন, তখন হেয়ার স্কুলের মাঠ এবং কলেজ স্কোয়ারকে কেন্দ্র করেই ইলা সেনের খেলাধুলোর হাতে খড়ি হয়। ১৯৩৬ সাল থেকে '৪২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের খেলাধুলো জগতে ইলা সেন ছিলো একটি অতি উজ্জ্বল নাম। বেথুন স্কুলের ছাত্রী ইলা সেনের শুধু অ্যাথলেটিক স্পোর্টসেই নয়, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল এবং টেনিকোয়েটেও সমান প্রতিষ্ঠা ছিলো। ১৯৩৭ সালে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে বারবারা এডওয়ার্ডের ৫০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড ভাঙলেন বাঙালী মেয়ে ইলা সেন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠানে তিনিই প্রথম বাঙালী মহিলা প্রতিনিধি। এর আগে বারবারা বিক, লোলা সিভিল, এড্‌না জনসন ডরোথী বেলগার্ড প্রভৃতি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েরাই বরাবর বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। ১৯৪০ সালে বৃটিশ-ভারতের বাংলায় শ্বেতকায় মহিলা অ্যাথলীট দলের একমাত্র কালো মেয়ে ইলা সেন সেই চিরাচরিতের বাঁধ ভেঙেছিলেন। তখন কাগজে কাগজে ইলা সেনের ছবি আর ইলা সেনের দু-হাত ভরা পুরস্কারের মালা।

কিন্তু ১৯৪২ সালে যখন বেথুন কলেজ থেকে আই-এ পাশ করলেন, তখন ইলা সেনের চোখে নতুন স্বপ্ন। দেশের কাজ—সংগঠনের ডাক। ১৯৪৪ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ বি-এ পাশ করে উইমেন্স কলেজ থেকে বেরোলেন। ঐ বছরই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা পদ লাভ করলেন। পরের বছর কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী মালদা জেলার কৃষক নেতা রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে পরিণীতা হয়ে সেদিনের ইলা সেন হলেন আজকের ইলা মিত্র। জীবনের গতিপথে হলো এক বৈপ্লবিক দিক্-পরিবর্তন।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গা প্রতিরোধ ও শান্তি স্থাপনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ইলা মিত্রও নোয়াখালি গেলেন। ফিরে এসে মালদায় শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। মালদা জেলার রামচন্দ্রপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। দেশবিভাগের ফলে এই রামচন্দ্রপুর সমেত মালদা জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমা পাকিস্তান-ভুক্ত হয়। ১৯৪৬ সাল থেকেই

ইলা মিত্র

ইলা মিত্র এই অঞ্চলে কৃষক ও নারী-সংগঠনের কাজ শুরু করেছিলেন। অনুন্নত মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি একটি স্কুল গড়ে তোলেন এবং নিজেকে একান্তভাবে কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেন। দেশবিভাগের ফলে মালদার যে পাঁচটি থানা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়—তার একটির নাম নাচোল। ১৯৪৮ সালে এই নাচোলের কৃষক আন্দোলন এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের সৃষ্টি করেছিলো। নাচোল থানার অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জন ছিলেন আদিবাসী এবং বাকী ২০ জন হিন্দু ও মুসলমান। পাশের থানাগুলি হতে বহুসংখ্যক কৃষক এসে নাচোলের এলাকার জমিতে ভাগচাষ করতেন। এঁরা ছিলেন বেশির ভাগ মুসলমান। এই ভাগচাষীরা উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ পাবেন এবং ক্ষেত-মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি করতে হবে—এই ছিল কৃষকদের মূল দাবি।

কিন্তু নয়া পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার মহিলা ও কৃষকদের এই আন্দোলন সহ্য করতে পারে নি। ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুতে তাই দেরি হয় নি। কিন্তু তাকে ত' বন্দী হলে চলবে না? তাই দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাঁকে বিভিন্ন উপায়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সন্তান-সম্ভবা ইলা মিত্রকে একদিন লুকিয়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু অযথা দেরি করবার সময় ছিলো না আর। নবজাত শিশুকে শাশুড়ির হাতে তুলে দিয়ে আবার নাচোলে। এর পরের ইতিহাস রক্তাক্ত ঘটনার আলেখ্য। আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর পুলিশের বর্বর আক্রমণ। সাঁওতালের তীরে চারজন পুলিশের মৃত্যু। ইলা মিত্রকে খুঁজে বের করতে পুলিশের অসাধারণ তৎপরতা। কবি গোলাম কুদ্দুসের ভাষায়—

> খুন ঝরা নাচোলে সেদিন
> একটি নারীর ভয়ে হায়
> জেগে ওঠে কত না পৌরুষ।

কিন্তু ইলা মিত্র ধরা পড়লেন। সেটা ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাস। থানায় তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হলো। রাজসাহী জেলে যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি মৃতপ্রায়। প্রায় এক বছর তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলাই কোর্টে তোলা যায় নি। পরে যখন মামলা ওঠে তখনো তাঁকে স্ট্রেচারে শুইয়ে আনতে হতো। এই বিভীষিকার মধ্যে কোন আইনজীবী আসামীপক্ষ সমর্থন করতে চান নি। ফলে স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়ে নিজেকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে মামলা চালাতে হলো। ৫০ জন কৃষক সহ অগ্নিকন্যা ইলা মিত্রর সেদিন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছিলো।

পাক-ভারতের ইতিহাসে নাচোলের এই মামলা একক স্থান অধিকার করে আছে। এই মামলায় কেউ রাজসাক্ষী হয় নি। এমন কি মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ একজন মুসলমান সাক্ষীকেও আসামীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারে নি। অসুস্থ শরীরে যখন ইলা মিত্রকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যেতে হলো—তখন তাঁর মুক্তির দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। নির্বাচনের মুখে ভীত হয়ে সরকার তাঁকে জেল থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করলেন এবং প্যারোলে মুক্তি দিলেন। লীগ সরকারের পতনের পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সার্জারীর প্রফেসর নিজে সংগে করে তাঁকে সুচিকিৎসার জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

সেই থেকে তিনি কলকাতায়। ১৯৫৮ সালে প্রাইভেটে এম-এ পাশ করে সিটি কলেজ সাউথের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি সেনেট সদস্যা। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র কাজের মধ্যেও তাঁর রাজনৈতিক জীবন আজও অম্লান। এক সময় ভারত ও পাকিস্তানের ঘরে ঘরে ইলা মিত্রের নাম আলোচিত হয়েছে, সংবাদপত্র ছেপেছে তাঁর কৃতিত্ব আর দুঃসাহসের কথা, কবি রচনা করেছেন তাঁকে নিয়ে কাব্য, সাঁওতাল কৃষকেরা পর্যন্ত মাটি কেটে রাস্তা তৈরি করে সে রাস্তার নাম রেখেছে ইলা মিত্র রোড (হবিবপুর; মালদা)। আজও বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ইলা মিত্র একটি অতি পরিচিত, অতি জনপ্রিয় বিপ্লবী নাম। কমিউনিস্ট পার্টির তিনি নিরলস কর্মী। বর্তমানে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্যা ও আইনসভার কমিউনিস্ট দলের ডেপুটি লীডার। ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে প্রথম রাজ্য বিধানসভায় প্রবেশ করেন। সেই থেকে পর পর তিনবারের নির্বাচনেই তিনি উত্তর কলকাতার মানিকতলা কেন্দ্রের বিজয়িনী প্রার্থী। বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে ইলা মিত্রের স্থান কোথায় তা প্রতিটি রাজনীতি-সচেতন মানুষই জানেন। সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করবার আবশ্যক নেই। তাঁর বিচিত্র কর্মজীবন আজ একদিকে পরিষদীয় কাজ, অন্যদিকে গণ-আন্দোলন আর গণ-সংগঠনে পরিপূর্ণ। ইলা মিত্র জানেন বিধানসভায় কথার ফুলঝুরি দিয়ে কংগ্রেসকে হারাবার মধ্যে চমক থাকতে পারে, কিন্তু কর্মক্ষেত্র বাইরে। তাই ইলা মিত্র জনতার সাথী। ইলা মিত্র কৃষকের প্রাণ। ইলা মিত্র শ্রমিকের বোন। ইলা মিত্র শিক্ষক আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলন ও মহিলা আন্দোলনের নেত্রী। তাই তাঁকে যেমন দেখা গেছে '৬২ সালে বিধানসভায় পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু এবং মালদার সাঁওতাল শরণার্থীদের প্রতি (যাঁরা একদা পাকিস্তানে তাঁর আন্দোলনের সাথী ছিলেন) সরকারী আচরণের নির্লজ্জ প্রমাণ হাজির করতে, প্রফুল্ল সেন সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে মাণিকতলার বস্তীবাসীদের দীর্ঘকালের দাবি-দাওয়া কিছু ছিনিয়ে আনতে, '৬৫ সালে সেন সরকারের সামনে মালদার মানুষের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা প্রমাণ করতে—তেমনি দেখা গেছে '৬৪ সালের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সময় নারকেলডাঙায় সংখ্যালঘু ভাইবোনদের ঘরে ঘরে—দেখা গেছে কৃষ্ণনগরে শহীদ আনন্দ হাইত এবং শক্তি বিশ্বাসের শোকাতুরা মাতাদের শিয়রে। এই সেদিনও তাঁকে দেখলুম কেন্দ্রীয় পুলিশের নৃশংস রক্ত পিপাসার পর কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরীতে—থমথমে মুখে।

মাত্র কয়েকদিন আগে যখন তাঁর সি-আই-টি রোডের বাসস্থানে গেছিলাম, তখন বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির হাঙ্গামা হয়ে গেছে। কলকাতা কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচনেও আসন বণ্টনের ব্যাপারে বাম কমিউনিস্ট পার্টি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের প্যানেল তৈরির পালাবদল চলছে। স্বভাবতই এসব ঘটনা সেই মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। সংবাদপত্রে ৬ এপ্রিলে বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির ঘটনার প্রতি শ্রীমতী মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চেয়েছিলাম—এ সব ঘটনা ইউনাইটেড ফ্রন্টের ইউনিটিকে খর্ব করে কিনা। যদি করে তাহলে যুক্তফ্রন্টের ইমেজকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে কি? উত্তরে শ্রীমতী মিত্র বললেন—

—এ ধরনের ছোটোখাটো ঘটনা একেবারেই ঘটবে না একথা বলা যায় না। তবে বাংলাদেশের যে মানুষেরা আসলে যুক্তফ্রন্টের ইমেজ গড়ে তুলেছে, তাদের আন্দোলনের চাপে যুক্তফ্রন্টেরও সঠিক পথনির্দেশ হবে।

—যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে মহিলাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে—সে সব রক্ষা করা যাবে বলে কি আপনার মনে হয়?

—নারী-পুরুষের যে সমানাধিকারের কথা আমরা বলি তার প্রকৃত রূপায়ণের জন্য কোনো বৈষম্য রাখলে কথাটাই ত' মিথ্যে হয়ে যায়। এই সমানাধিকার শিক্ষা চাকুরী বিনিয়োগ সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের সমস্যা শহরাঞ্চল থেকে বেশি। গ্রামে ও শহরে ছোটখাটো শিল্প গঠন করে অল্পশিক্ষিতা মেয়েদের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারলে সমস্যার কিছু সমাধান হতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষিকার কাজে মেয়েদের নিয়োগ করা উচিত। এ ছাড়া মেয়েরা যাতে কারিগরী শিক্ষার সুযোগ পান সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

—গ্রামের সম্পত্তি সম্পর্কে যুক্তফ্রণ্টের বক্তব্য স্পষ্ট হলেও শহরের সম্পত্তি সম্পর্কে অস্পষ্ট। গ্রামে কেউ পঁচাত্তর বিঘার বেশি জমি রাখতে পারবে না, কিন্তু শহরে যত খুশি ঘরবাড়ি রাখতে পারে। গ্রামের জমির চেয়ে কলকাতায় একটা ছোট দ্বিতল বাড়ির দাম বেশি। এ সম্পর্কে কিছু বলবেন

—শহরের সম্পত্তিরও সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত।

—গ্রামে জমি ও ভেড়ি ইত্যাদির দখলের ব্যাপারে বে-সরকারী প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে সংঘাতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই ব্যবস্থায় সংঘাতকে এড়ানো যাবে কি?

—একথা সত্য যে এগুলি একমাত্র শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। হাঙ্গামা আর সংঘাত হয়তো অল্পবিস্তর ঘটবে। তবু এই সংঘাতের মাধ্যমেই গণ-সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যে সকল অঞ্চলে কৃষক সংগঠন নেই, সে সব স্থানে এই সংঘাতের মাধ্যমেই দ্রুত শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠবে। শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব হবে জোতদার ও জমিদারের বেআইনী জমি দখল করা।

—যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যে সব বক্তব্য রাখা হয়েছে তা কি বৈধ ছাড়পত্রহীন সকল উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রযোজ্য?

—পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে অসংখ্য উদ্বাস্তু আছে যাদের কোনো বৈধ ছাড়পত্র নেই। শুধুমাত্র বৈধ ছাড়পত্রের অভাবে কেউ যাতে সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হয় তা সরকারের অবশ্যই দেখা উচিত।

—সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষকগণ যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

—আন্দোলনটা ত' অযৌক্তিক নয়। তবে ডি-এ বাড়াবার এই আন্দোলনটা হঠাৎ হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক শিক্ষকেরাই শিক্ষক-সমাজে সব থেকে বঞ্চিত। কাজেই তাঁদেরই সব থেকে বেশি ডি-এ বাড়ানো উচিত।

—মাধ্যমিক স্তরে দ্বাদশশ্রেণীর প্রবর্তন সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই;

—যদিও কোঠারী কমিশন দ্বাদশশ্রেণীর প্রচলনের জন্য সুপারিশ

করেছেন, তথাপি বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা সম্ভবপর বলে আমি মনে করি না। এ ক্ষেত্রে অর্থটাই প্রধান অন্তরায়। সামান্য যে অর্থ পাওয়া যায় তা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দেখা উচিত মেয়েদের বিদ্যালয়-শিক্ষা (মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত) অবৈতনিক করা যায় কিনা।

আর একজন বিপ্লবী মানুষ হুগলীর শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা। ১৯৬৮ সালে প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের পুলিশ বাহিনী যে উত্তরপাড়ায় এক বীভৎস রক্তাক্ত ইতিহাস তৈরি করেছিলো, সেই উত্তরপাড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধানসভার বাম কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীহাজরা ছেলেবেলা থেকেই একটা বিদ্রোহী মনের অধিকারী। ছেলেবেলার একটি দিনের একটি ঘটনাই তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিলো। সময়টা ছিলো বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ার দিক। শ্রীহাজরা তখন শ্রীরামপুরের বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়াশুনা করেন। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয়েছিল অবশ্য কারখানায় বাবার কাছে বসে বসে। কেন না বাবা কারখানায় চাকরী করতেন। 'নাট', 'বল্টু', 'স্প্রিং', 'বয়লার' প্রভৃতির সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই পরিচয় ঘটেছিল। তাই বোধ হয় পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক জীবন গঠিত হয়েছিলো- কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্যে থেকে। যা হোক যা বলছিলাম বলি। শ্রীরামপুরে চাতরাতে রেলী ব্রাদার্সের বিরাট পাটের গুদাম ছিলো। তার ম্যানেজারের ফিটন গাড়িব সঙ্গে একদিন রাস্তার একটি গরুর গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হলো। আর যায় কোথা। শ্বেতাঙ্গ বেনের জাত। গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে বর্বরের মতো পিটোতে শুরু করলো। চারিদিকে লোক জমে গেল। এই ভিড়ের মধ্যে থেকে অত্যাচারী সাহেবকে লক্ষ্য করে যিনি পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করলেন তিনি মনোরঞ্জন হাজরা—তখন একটি সামান্য স্কুল বয়।

এই ঘটনার পরে সকলের কাছেই তিরস্কৃত হতে থাকলেন। কত বড় বেয়াদাপ! সাহেবের গায়ে হাত! কিন্তু সমস্ত তিরস্কার থেকে আত্মরক্ষা করবার একটি বর্ম শ্রীহাজরার ছিল। সে বর্ম তাঁর বাবা। বাবা সস্নেহে তাঁর সমস্ত প্রাপ্ত তিরস্কার অপনোদন করে কাছে টেনে নিলেন। বাবার এই স্নেহ ও আনুকূল্যের কথা আজও শ্রীহাজরা ভুলতে পারেন না। যাবা তাঁর জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে এগিয়ে আসেন নি কখনো।

কিন্তু পাথরের ঘায়ে রেলী ব্রাদার্স লিমিটেড-এর ম্যানেজারকে খুন করা যায় নি। পিস্তল চাই। একদিন সত্যি সত্যি কলকাতা পোর্টের কুলীদের কাছ থেকে পিস্তল সংগ্রহ করলেন। তখন বারো বছর বয়স মাত্র। স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী দলের চমকপ্রদ কাহিনী, শ্রমিক আন্দোলনের গল্প তাঁর অপরিসীম কৌতূহল উদ্রেক করে। এই সময় শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায় তাঁকে ম্যাকসিম গোর্কীর 'মাদার' উপহার দেন। 'মাদার' তাঁকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করে তোলে। রাজনীতির জন্য স্কুল থেকে একদিন বহিষ্কৃত হতে হলো। ১৯৩০ সালে হলো প্রথম কারাবাস। ইতিমধ্যে অবশ্য সন্ত্রাসবাদী 'যুগান্তর' দলে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন। জেলে আর এক শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ প্যাডির হাতে নির্দয়ভাবে প্রহৃত হন। 'মাদার' তখন তাঁর জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করছে। মেদিনীপুরে সেন্ট্রাল

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা

জেলেও 'মাদার' স্মাগলিং করে নিয়ে তখন পড়তেন।

জেল থেকে বেরিয়ে বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ সোসালিস্ট ইউনিয়ন গঠনে অংশ গ্রহণ করলেন। মনে তখন গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের দারুণ ক্ষত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মীরাট কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত শুনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি আগ্রহান্বিত হলেন। গড়ে তুললেন ইন্ডিয়ান প্রলেটেরিয়ান রিভল্যুশনারী পার্টি। পরে এই পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৩২ সালে 'গণনায়ক' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। পরের বছর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই একটি ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হয়ে তিন বছরের জন্য জেলে গেলেন—বাবাব হলো এক বছরের জেল—বাড়ি নীলাম হয়ে গেলো। জেল থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন বুলেটিন লিখে সাহিত্যে যে হাতেখড়ি হয়েছিল, আজ তারই পরিপক্কতা লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর সংগ্রামী রচনার মধ্যে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট শ্রীদুর্গা কটন মিলের চারজন শ্রমিক ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তারই অনিবার্য ফলে প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের পুলিশের বন্দুক থেকে যে গুলী বেরিয়ে এসেছিল তাঁর বুক লক্ষ্য করে—সম্ভবত সেটাই স্বাধীন ভারতে প্রথম গুলী।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা বিধানসভার প্রবীণ সদস্যদের অন্যতম। পর পর পাঁচটি নির্বাচনেই তিনি উত্তরপাড়া থেকে নির্বাচিত সদস্য। '৬২ সালের ইন্দো-চায়না যুদ্ধের সময় বামপন্থী কমিউনিস্ট দলে এসেছেন। উত্তরপাড়ার সমস্ত আন্দোলনেরই তিনি পুরোভাগে থাকেন। বর্তমান বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিকবার তিনিই কারাবাস করেছেন। রাজনৈতিক জীবনের সাফল্যে তাঁর পিতার ভূমিকা সর্বদাই মনে পড়ে। জীবিত পিতাদের মধ্যে পুত্রের পাঁচবার সাফল্য দেখার একমাত্র অধিকারীও বোধ হয় তিনি।

১৯৬৮ সালে প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের আমলে উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন কলেজে যে পুলিশী তাণ্ডবে কয়েকটি তাজা প্রাণ বলি হয়েছিল, তার প্রতিবাদে শ্রীহাজরা আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন পুরোভাগে দাঁড়িয়ে। আইন অমান্য করেছিলেন তিনিই প্রথম। জিজ্ঞেস করলাম, দুষ্কৃতিকারী সেই সব পুলিশ এবং পুলিশ অফিসারদের সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?

উত্তরে শ্রীহাজরা বললেন-

—সমস্ত অত্যাচারের সুষ্ঠু তদন্তের দাবি আমরা করেছিলাম। একটা নন-অফিসিয়াল তদন্ত কমিশনও গঠিত হয়েছিল এবং সেই কমিশন একটি রিপোর্টও দিয়েছিলেন। কিন্তু নন্-অফিসিয়াল কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে অবশ্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। তবে উত্তরপাড়া কলেজের ছাত্রদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে মন্ত্রিসভায় আলোচনা হওয়া দরকার। দুষ্কৃতিকারী পুলিশ এবং পুলিশ অফিসারদের অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত। যদি নন-অফিসিকাল কমিশনের রিপোর্ট মানতে কোনো 'technical' অসুবিধা না থাকে তাহলে তাঁদের (পুলিশ) বিরুদ্ধে *Assault, Looting* এবং *Unauthorised firing*-এর *charge* আনা যেতে পারে।

—কলকারখানায় ঘেরাও সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—গত বছরের হিন্দ মোটর কারখানার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ঘেরাও-এর ব্যাপারে *'backward workers'*-দের আগ্রহই বেশি থাকে?

অপ্রগতির পথে আর্থিক। কোনো *trade unionist*-এর এই নীতি থাকা ঠিক নয়, সমর্থনও করা উচিত নয়। শ্রমিকদের আর্থিক দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ক্ষমতা সম্পর্কে উদাসীন থাকা ঠিক নয়। এই বাস্তব দিক থেকে সচেতন শ্রমিক তৈরি করতে না পারলে শ্রমিক আন্দোলনের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

—যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে গ্রামীণ সম্পদ সম্পর্কে বক্তব্য অনেকাংশে স্পষ্ট হলেও শহরের সম্পত্তি সম্পর্কে মোটেই স্পষ্ট নয়। এ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

—একটা জিনিস আমার খুবই খারাপ লাগে তা হলো বাড়ি-ভাড়া ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে কিছু নিয়ম-কানুন করা খুবই দরকার। বাড়ি-ভাড়ার একটা সর্বোচ্চ সীমা থাকা উচিত যার উর্দ্ধে আদায় হলে মালিককে অবশ্যই তার একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে দিতে হবে। সীমাহীন ভাড়াতেও সরকারকে মালিকপক্ষ কিছুই দেবেন না—এ ব্যবস্থা সুস্থ নয়। এ সম্পর্কে আপনারা সংবাদ-পত্রে কিছু লিখুন।

চব্বিশ পরগনা জেলার গোসাবা কেন্দ্রের আসনটি পেয়েছেন আর-এস-পি দল। গত নির্বাচনে এই আসনটি লাভ করেছিলেন জনসঙ্ঘ। এবারে জনসঙ্ঘ এই কেন্দ্রে প্রার্থী দেন নি। আর-এস-পি দলের শ্রীগণেশচন্দ্র মণ্ডল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীচন্দ্রকান্ত সরকারকে প্রায় সাড়ে দশ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীমণ্ডল এতদঞ্চলে শিক্ষক এবং সমাজকর্মী হিসাবে পরিচিত। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে শ্রীমণ্ডলের সম্পর্ক খুবই অল্পদিনের হলেও ছেলে-বেলা থেকে জনসেবা এবং রাজনীতির প্রতি একটি আগ্রহ বরাবরই ছিলো। ২৪ পরগনার রাধানগর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রীমণ্ডলের জন্ম। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয় খুলনার (২৪ পরগনা) পি সি লাহা বিদ্যালয় থেকে। বি-এ পাশ করেন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে। তাঁর বর্তমান বয়স তেত্রিশ বছর। তিনি আর-এস-পি-এর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য। রাজনীতি ও জনসেবার কাজে হাতেখড়ি হয় অঞ্চল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। ১৯৬৪ সালে তিনি রাধানগর অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন। সেই থেকে অবহেলিত সুন্দরবনের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন লোকহিতকর এবং গঠন-মূলক কাজে তিনি লিপ্ত। রাধানগর যতীন্দ্রনাথ সেন শিক্ষানিকেতনের (উচ্চতর মাধ্যমিক) শুধু শিক্ষকই নন, তিনি এর অন্যতম সংগঠক এবং পরিচালকও বটেন।

বিদ্যালয়ে দ্বাদশশ্রেণী প্রচলনের পক্ষপাতী তিনিও নন। তাঁর মতে বিদ্যালয়ে দশমশ্রেণীর সেই পুরোনো শিক্ষা-

শ্রীগণেশ মণ্ডল

ব্যবস্থাই ভালো ছিল। প্রয়োজন ছিলো কেবল গুণগত পরিবর্তনের। পরিচালক সমিতি সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য হলো—সমিতিকে উৎখাত না করে তার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগ থেকে সকল প্রকার আর্থিক ক্ষমতাও সমিতির হাতে ন্যস্ত। অপরিমিত ক্ষমতার জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতিগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—যত দূর জানি আপনাব অঞ্চলে কৃষির একটা বিরাট বাধা হলো সুষ্ঠুভাবে জল নিষ্কাশনের অব্যবস্থা। এ সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন?

—সেচ এবং জলনিকাশী ব্যবস্থাকে উন্নত করা দরকার। প্রয়োজনের তুলনায় স্লুইস গেট আমাদের অঞ্চলে কম। তা-ও আবার বেশির ভাগ অকেজো হয়ে পড়ে আছে দিন-মাস-বছর ধরে। এ ব্যাপারে সবকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আমি যোগা-যোগ করবার চেষ্টা করছি। এই মুহূর্তে প্রয়োজনানুগ স্লুইস গেট প্রস্তুত করা সম্ভব না হলেও অন্তত অচল গেটগুলিকে সচল করতে হবে।

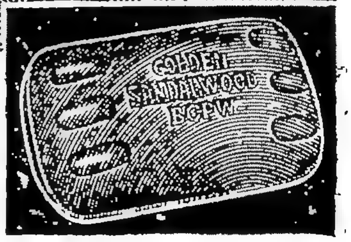

ত্বকের রুক্ষতা ঢেকে দেবে নবীন লাবণ্যে। বর্ণে আনবে স্নিগ্ধ সুষমা। চন্দনের গন্ধ-বিহ্বল দিনের প্রতিটি মুহূর্ত মনে হবে স্বপ্নের মতো সুন্দর।

আজ থেকেই ব্যবহার করুন

বেঙ্গল কেমিক্যালের গোল্ডেন স্যাণ্ডালউড সোপ

BCPW কস্‌মেটিকস্ ডিভিসন বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ○ বোম্বাই ○ কানপুর ○ দিল্লী ○ মাদ্রাজ

গ্রন্থমেলা

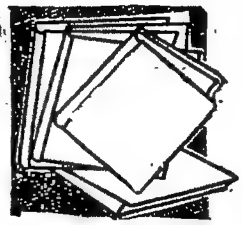

'জননায়ক অশ্বিনীকুমার' (১৯৬৯) হীরালাল দাশগুপ্ত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম : ২ টাকা।

সহজ সাবলীল ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বরিশাল তথা বাংলা এবং ভারতের এক মহাপ্রাণ মনীষীর কর্মবহুল জীবনালেখ্য চিত্রিত করেছেন শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত তাঁর 'জননায়ক অশ্বিনীকুমার' গ্রন্থটিতে।

সত্যানুরাগী, দৃঢ়চেতা, পূতচরিত্র অশ্বিনীকুমার (১৮৫৬, ২৫শে জানুয়ারী —১৯২৩, ৭ই নভেম্বর) সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজসেবী (বরিশালের দুর্ভিক্ষ, রোগীসেবা), শিক্ষাব্রতী (ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি), সংগঠক (পঞ্চায়েতী, জাতীয় মহা সমিতির সম্পাদক ইত্যাদি) এবং রাজনীতিক (অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, লক্ষ্ণৌতে কারাবাস, বরিশালে দু'বার কংগ্রেসের অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)। আদর্শনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালে নতুন প্রাণের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। 'ইনি বরিশালের ধূলিমুষ্টি হাতে নিয়ে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করেছিলেন।'

ওকালতি ছেড়ে দেশসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সুদূর পল্লীগ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন প্রকৃত বাঙালী। তিনি দরবার সম্মত পোষাক পরেন নি বলে ম্যাজিস্ট্রেট ইমারসন বেরিয়ে যেতে আদেশ দেন। অশ্বিনীকুমার বলেছিলেন, 'এই আমার জাতীয় পোষাক।' সারা জীবন তিনি সেই জাতীয় পোষাকই পরেছেন।

এই মনীষী সান্নিধ্য লাভ করেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের। স্বামীজীর সঙ্গে আলমোড়ায় তাঁর মিলনের অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক (১১৬ পৃঃ) নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ, মোতিলাল, গান্ধীজী ইত্যাদি সকলেরই তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। কেওড়াতলা শ্মশানে শোকাহত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণাম নিবেদন করতে এসেছিলেন অশ্বিনীকুমারকে। বহুমূত্র রোগে ভুগে অশ্বিনীকুমার মারা যান।

স্বল্প পরিসরে লিখিত হলেও বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পুস্তকটি সুসমৃদ্ধ। চারণকবি মুকুন্দ দাসকে অশ্বিনীকুমারই আবিষ্কার করেন। 'বৃত্রসংহার'-এর কবি হেমচন্দ্রের জীবনের গতিপথও ইনিই পরিবর্তন করেছিলেন।

'আমি পল্লীর কবি' (১৩৭৪, চৈত্র) শ্রীভোলানাথ মোহান্ত। মিঠাপুকুর, বর্ধমান। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পল্লীপ্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্য এবং বর্ধমান অঞ্চলের অতীত ও বর্তমান কীর্তিকাহিনী সংবলিত বিবরণধর্মী ২৯টি কবিতার সমাহার "আমি পল্লীর কবি"। আঙ্গিকে এবং রচনায় কবি প্রাচীনপন্থী। এগুলি গাথা জাতীয় কবিতা। তাহলেও বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম আমতরু, অশত্থের বেড়া, বাঁশঝাড়, তালগাছ, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, ঝিল্লিতান, আজান, আরতি, বুড়োশিব, বুড়োপীর, পলিপড়া রাঙা বালুচর, নদীর ঘোলা কাচ জল, পদ্ম-পলাশ-শিউলি, পাপিয়া-বুলবুল নিয়ে কবির মনে আনন্দের অনুরণন তুলেছে। অতীত ও বর্তমান বর্ধমানের কীর্তিকাহিনী স্থান পেয়েছে বিভিন্ন কবিতায়। কুসুমপিসী, গৌর সর্দার, বাদামী, বুধুয়া প্রভৃতি কতকগুলি চরিত্র অঙ্কন করেছেন দরদ দিয়ে। আন্তরিকতা অনুভবনীয়।

ক্রান্তি—সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ডি লিট। ৮বি কলেজ রো, কলকাতা-৯। মূল্য : দু' টাকা।

বিদগ্ধমহলে 'ক্রান্তি' সুপরিচিত। অপর পক্ষে বলা যায়, গণ-সংগ্রামের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত এবং যাঁরা সমাজতান্ত্রিক নতুন পৃথিবীর জন্য প্রচেষ্টারত—তাঁরা এ পত্রিকার নানা নিবন্ধ থেকে নানাভাবে উপকৃত হবেন। 'ক্রান্তি'র উপজীব্য শিল্প-সাহিত্য-নন্দনতত্ত্ব-দর্শন-সমাজতত্ত্ব-অর্থনীতি-রাজনীতি-ইতিহাস ও বিজ্ঞান দু'-একজন বাদে প্রায় সব লেখকই প্রাজ্ঞ-প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ।

প্রথম বর্ষের বিশেষ বর্ধিত (চতুর্থ) সংখ্যাটিতে বিভিন্ন আলোকে মার্ক্সীয় তত্ত্বের আলোচনাগুলির মধ্যে ঐতিহ্যবিচারে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। লিখেছেন সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। 'তৃতীয় বিশ্বে'র ধারণা যারা পোষণ করে 'কোয়ামে নক্রুমা' ঐতিহাসিক ও বিশ্বরাজনৈতিক পটভূমিকায় তাদের সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন "'তৃতীয় বিশ্ব' প্রসঙ্গে" প্রবন্ধটিতে। মাখনলালের 'কিউবা, বিশ্বের বিস্ময়' পড়লে তথ্যভিত্তিক ধারণা হবে দশ বছরের মধ্যে ঐ দেশ কিভাবে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছে। ড্যানিয়েল থরনার-এর ভারতীয় কৃষিতে লুণ্ঠনকারী ধনিকতন্ত্র মূল্যবান লেখা। এ সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা প্রকাশিত হবে, আশা করি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাংলাদেশ : শিল্পীর দায়িত্ব' প্রবন্ধে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্বন্ধে যেমন হতাশা ও করুণাবোধ করেছেন, তেমনি নিজেও যেন একাকীত্ববোধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। ক্রান্তির পুস্তক পরিচয়াংশ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরো কতকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে জ্যোৎস্না সিংহরায়ের সোভিয়েত শিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধটি এদেশের শিল্পীদেরও হুঁশিয়ার করে দেওয়া উচিত। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ পোদ্দার, নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ পাঠকদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাকে অনেকটা এগিয়ে দিতে সহায়তা করেছেন। ক্রান্তি ত্রৈমাসিক। জ্ঞানার্জনে এই পত্রিকা প্রভূত উপকার সাধন করবে।

বাংলা গল্প—পঞ্চম সংকলন। সম্পাদক রজত চৌধুরী। ১এ, সর্দার শঙ্কর রোড, কলকাতা—২৬। মূল্য: ৭৫ পয়সা।

বর্তমান সংকলনটি ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সংখ্যারূপে চিহ্নিত। ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। আলোচ্য সংকলনটি এই পবিত্র দিনটির স্মরণে উভয় বাংলার আত্মিক যোগসূত্রটিকে দৃঢ় করার প্রয়াস পেয়েছে। উভয় বাংলার লেখকদের কয়েকটি গল্প আলোচ্য সংকলনের নৈবেদ্য। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের জীবনকাহিনী নিয়ে লেখা গল্পগুলি সুখপাঠ্য। আহমদ ছফার 'হাত', শওকত আলীর 'আহত ফাল্গুন' কাদের মাহমুদের 'বেদনার এনাটোমি' অমরেন্দ্র সরকারের 'বাথান' প্রভৃতি গল্পের লেখকদের শক্তি ও মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া আলোচ্য সংকলনে রয়েছে সম্পাদকের নিজস্ব একটি আবেদন। বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতি ও সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য সম্পাদক রেখেছেন বলিষ্ঠ ঘোষণা এই আবেদনে। যে সমস্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠান সাহিত্যজগৎকে কণ্টকিত করেছেন তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সম্পাদকের এই মতবাদের সঙ্গে আমরাও একমত।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমি এই ভারতের সর্বজনপ্রিয় বিশ্বখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতকে অক্সফোর্ডে, আমার বিলাত প্রবাসের শেষ দিকে দেখিয়াছিলাম। সম্প্রতি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুতে শোক পাইয়াছেন। এই সময়ে তিনি কিছুদিন নির্জন বাস করিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন দূর ভারত হইতে একজন হিন্দু আসিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি আনন্দের সঙ্গে দুইখানি হাত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে সহৃদয় অভ্যর্থনা করিলেন। পার্থিব সকল প্রিয় জিনিস হইতে ভারত তাঁহার প্রিয়তর। নবেম্বর মাসের এক কুয়াসা ঢাকা সন্ধ্যায় আমি অক্সফোর্ডের শহরতলীবাসী তাঁহার ঘরের দরজার দর্শকদের নির্দিষ্ট ঘণ্টা বাজাইয়া আগমন ঘোষণা করিলাম। মিসেস ম্যাক্স মূলার নিজে দরজা খুলিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রোফেসর মহাশয় কি বাড়িতে আছেন?" তিনি বলিলেন, বাড়িতেই আছেন, এবং আমাকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। বৃদ্ধ অধ্যাপক আমাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, মাঝপথে আমাদের দেখা হইল। তাঁহার শ্রদ্ধেয় মূর্তি দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। বুঝিলাম, আমি এমন এক ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি যিনি গভীর বেদজ্ঞানে সায়ন ও যাস্কের সঙ্গে, এবং বিশ্লেষণী অনুসন্ধিৎসা ও বিচারসহ তথ্য সংগ্রহে পাণিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। আমি তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি প্রোফেসর ম্যাক্স মূলারের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার গৌরব লাভ করিতেছি?" তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি।" আমরা অতঃপর তাঁহার সুন্দর বৈঠকখানা ঘরটিতে গিয়া বসিলাম। একপাশে অগ্ন্যাধারে আরামদায়ক আগুন জ্বলিতেছিল, কিন্তু সমস্ত বাড়িখানাতেই যেন একটা বিষাদের ছায়াপাত ঘটিয়াছে।

অধ্যাপক মহাশয় সব সময়েই শুধু ভারতবর্ষ ও হিন্দুদের বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, এই দুইয়েরই প্রতি তাঁর ভালবাসা ও সহানুভূতি অতি গভীর। তিনি বলিলেন তাঁহার দেহটি ইংল্যাণ্ডে থাকিলেও তাঁহার মন ও আত্মা ভারতে রহিয়াছে। তাই তিনি ভারতীয় যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা দ্বারাই পরিবৃত থাকিতে চাহেন। এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রদর্শনীতে কিছু কিছু ভারতীয় দ্রব্য কিনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সবই বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে তিনি কিছু আনিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে তিনি যে সব ভারতীয় জিনিস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা দেখাইলেন, এইগুলিকে তিনি অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পিতলের ঘড়া। এই ঘড়াটি কলিকাতার এক ভদ্রলোক তাঁহার মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সংস্কৃত পণ্ডিত হিসাবে তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন। প্রোফেসর এই উপহারটিকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করেন, এবং ইহাকে একটি বিশেষ স্থানে রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইউরোপে যে বিবাহ প্রথা চলিত আছে তিনি তাহার বিশেষ নিন্দা করিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি পিতামাতা নির্দিষ্ট প্রথম বয়সের বিবাহ পছন্দ করেন, তবে ভারতে যত অল্প বয়সে বিবাহ চলে, তাহা তাঁহার পছন্দ নহে। ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ইংল্যাণ্ড প্রবাসের একটি সুমধুর সন্ধ্যা আমার কাটিয়া গেল। তিনি পুনরায় আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাজের চাপে ইহা সম্ভব হয় নাই।

প্রদর্শনীর ভারতীয় অংশে সিল্কের পৃথক একটি বিভাগ ছিল। স্ট্যাফোর্ডশিয়রের লীক নামক স্থানের অধিবাসী মিস্টার টমাস ওয়র্ডল এই বিভাগের কর্তৃত্বভার লইয়াছিলেন। তাঁহার মত অন্য কেহ ভারতীয় সিল্ক বিষয়ে অনুশীলন করেন নাই। গত পূর্ব বৎসরে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিজ চোখে দেখিয়া যান। সিল্ক শিল্পের বাজার মন্দা হওয়াতে বীরভূম, মুরশিদাবাদ ও অন্যান্য সিল্ক উৎপাদন স্থানে ইহাতে নিযুক্ত লোকদের সর্বনাশ হইয়াছে। মিস্টার ওয়র্ডল অবশ্য এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন এ বিষয়ে সুনিশ্চিত আশা পোষণ করেন। এমন কি ইতিমধ্যেই তাঁহার চেষ্টা সাফল্যলাভ করিয়াছে, কারণ তিনি সিল্কের কারবারের অনেকখানি অংশ চীনাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, বাংলাদেশ ইংল্যাণ্ডের বাজার যেটুকু হারাইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। আমার ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে বাংলাদেশের সিল্ক ও গুটি বা কোকুনের চাহিদা হঠাৎ খুব বাড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি, ঐ সঙ্গে দামও বাড়িল এবং প্রত্যেকটি আউন্স বিক্রয় হইয়া গেল, ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যোগান কুলান গেল না। অবশ্য পরবর্তী মরশুমের জন্য বড় বড় অগ্রিম অর্ডার গ্রহণ করা হইল। মিস্টার ওয়র্ডল সিল্কের সূতা রীলে জড়াইবার একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ইহাতে ভারতীয় সিল্কের চাহিদা আরও বাড়িয়াছিল। তাঁহার উদ্ভাবিত এই যন্ত্র প্রদর্শনীতে লিয়ঁবাসিনী এক ফরাসী স্ত্রীলোক চালাইয়া দেখাইতেন। এই উপায়ে রীল করা সিল্ক আরও বেশি দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইল। যন্ত্রটি সহজে বহনযোগ্য, গঠন সরল, দামেও শস্তা—মাত্র ১২ পাউণ্ড। ইতিমধ্যে মিস্টার ওয়র্ডলের অক্লান্ত প্রয়াসে গভর্নমেণ্টও এদিকে দৃষ্টি দিলেন, এবং বাংলার সিল্ক ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিল কেন তাহার পূর্ণ অনুসন্ধানের আদেশ জারি করিলেন। এই কাজে গভর্নমেণ্ট মিস্টার উডমেসন নামক এক ভদ্রলোকের

সাহায্য লাভ করিলেন, এবং মিস্টার নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভারতীয়কে তিনি সক্রিয় সহযোগীরূপে পাইয়াছেন বলিয়া আমি খুশি হইয়াছি।

সমস্ত বিষয়টাই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। বমবিসাই ডিস ও স্যাটারনিআই ডিস (রেশমের পোকা) দিগকে পুষিবার আয়োজন করা হইতেছে। নির্দোষ বেচারীরা জানেও না তাহাদের কি বিপদ আসিতেছে, তাই তাহাদের জঙ্গল আবাসের দুর্গে তাহারা আনন্দে গাছের ডালে ডালে বুকে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। নিষ্ঠুর মানুষ তাহাদের এই দুর্গের উপর আক্রমণ চালাইবে। সেই দুর্গ সুতার গড়া। তাহারই মধ্যে নিজেদের বন্দী করিয়া ধ্যানাবস্থায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে, তাহার পর একদিন সেই গুটি ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। বাহিরে আসিয়া কিছুক্ষণ নড়িবার ক্ষমতা থাকে না। ইহাদের লইয়াই বিজ্ঞানী মানুষ এখন গবেষণায় মাতিয়াছে, মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখিতেছি কি কি উপায়ে তাহাদের কাছ হইতে আরও বেশি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ইহাদের 'বম্বিক্স মোরি' প্রজাতিভুক্ত গুটিপোকা, মধ্য বাংলার সযত্নে রোপিত তুঁতগাছের পাতা খাইয়া বাঁচে। ছোটনাগপুরের উচ্চ জমিতে 'অ্যানথিরিয়া মাইলেট্টা' (তসর) নামক প্রজাতিভুক্ত গুটিপোকা কোলেরা পালন করে। ফিলোসামিয়া রি সি নি (এড়িয়া) নামক গুটিপোকা নিম্ন ভূমির ভেরেন্ডার পাতা খায়। এটি পূর্ব হিমালয়ের দক্ষিণের রাজ্য। অ্যানথিরিওপ্সিস আসামা (মুগা) মাকিলাস ওডোরাটিসিমা, নীস্-এর তন্তু খাইয়া থাকে। এবং আরও নানা জাতীয় গৃহ-পালিত লেপিডপটেরাস (প্রজাপতি, মথ ইত্যাদির জাতির নাম) যাহাদিগকে ভারতে পালন করা হয়, ইহাদের সঙ্গে কেবলমাত্র তরুণ কর্মতৎপর অফিসারটির তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি ভীত জমিদারের সম্মুখে তাঁহার জমির উপযোগিতা পরীক্ষা করিতেছিলেন। গম্ভুজ কূপ হইতে জমিতে জল দিবার পথের অর্ধলুপ্ত চিহ্ন দেখা যাইতেছে, এই কূপের উদ্দেশ্য এই যে, ত্রিশ বৎসরের বন্দোবস্তী মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে গ্রামের খাজনা বৃদ্ধি করা চলিবে।

প্রদর্শনীর একটি আলোচনী সভায়, মিস্টার ওয়ার্ড্‌ল ভারতীয় গুটিপোকার চাষ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার বলা শেষ হইলে, আমি বলিলাম বাংলাদেশের সিল্কের উন্নতি যেমন প্রার্থনীয়, তেমনি ইহার মূল্য হ্রাসও প্রার্থনীয়, কারণ তাহা হইলে তাহা চীনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সফল হইবে। এবং ইহা একমাত্র উৎপাদন ব্যয় কমাইলেই সম্ভব হইতে পারে। জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে কাহারও লাভের অঙ্ক কমাইতেই হইবে। উৎপাদনকারী, মধ্যবর্তী দালাল এবং বণিক—ইহাদের প্রত্যেকেরই পশম কাটিতে কাটিতে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং মনে হয় চামড়ার পরের স্তরেও অস্ত্র পৌঁছিয়াছে। একা জমিদার (ইঁহার ভূমিরাজস্বের স্থায়ী কৃষক) একদিন কাঁচি এড়াইয়া গিয়াছেন, এখনও তিনি প্রচুর পশমের বোঝা ঘাড়ে লইয়া ফিরিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারই লোভ সিল্ক-ব্যবসাকে ধ্বংস করিয়াছে। অন্যান্য শস্যের বেলায় ভূমিকর যেমন কম, তুঁতগাছের জমিতে তেমনি বেশি। এইখানে উহা কমাইবার সুযোগ আছে। সিল্ক-ব্যবসায় যখন প্রচুর লাভ হইত, সে সময়ে যে খাজনা সম্ভব হইয়াছিল এখন তাহা সম্ভব নহে। বর্তমানের হিসাবে উহা মাত্রাতিরিক্ত। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাজনাও কমাইয়া আনিতে হইবে। যদি চাহিদা ও যোগানের রীতির উপর খাজনা সংশোধনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যবসাটি সমূলে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাহা সম্ভব হইবে না। কারণ আমাদের দেশের লোকেরা বাহিরের জগতের কোনও সংবাদ রাখে না। তাহাদের দৃষ্টি বৃহৎ পৃথিবীর বিস্তার মাপিবার শিক্ষা পায় নাই। তাহাদের পূর্বপুরুষ পায়ে হাঁটিয়া অথবা গোরুর গাড়িতে চাপিয়া শত শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর যেটুকু দেখিয়াছেন ইহাদের দৃষ্টি তাহার বাহিরে যায় না। তাই তাহারা বুঝিতে পারে না, যে সব কারণে দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে অধিকাংশক্ষেত্রে তাহার প্রতিকার সম্ভব। সর্বশেষ, তাহারা সমবিপদে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সেজন্য অবশ্যম্ভাবীকে স্বীকার করাইয়া লইতে জমিদারের উপর বাধ্যতামূলক চাপ দরকার। এই সভায় মিস্টার কেস্‌উইক নামক একজন উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি সুন্দর একটি ছোট্ট বক্তৃতার সাহায্যে তাঁহার নিজস্ব মত ব্যক্ত করিলেন। ভারতীয় সিল্কের নানা বস্ত্র মিস্টার ওয়ার্ড্‌ল সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞীও এইরূপ সুন্দরভাবে সাজান দেখিয়া খুশি হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীতে 'ভারতীয় বাজার' ইংরেজ সাধারণের কাছে বড়ই মনোহর বোধ হইয়াছিল। এইখানে হিন্দু ও মুসলমান কারুশিল্পীগণ তাহাদের নিজ নিজ কাজ করিতেছিল, এবং তাহা দেখিবার জন্য ব্রিটেনের সকল দিক হইতে নরনারীর ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নিরেট জনতার সম্মুখে এই সব শিল্পী কেহ বা বস্ত্রে জরির বুটি বুনিতেছিল, কেহ বা গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে কার্পেটের প্যাটার্ন বুনিতেছিল, কেহ বা হাতে ক্যালকো-প্রিণ্টিং-এর কাজ করিতেছিল। যেসব স্থূল যন্ত্রাদি ইংরেজরা বহুদিন ত্যাগ করিয়াছে, তাহারই সাহায্যে ভারতীয়দের শিল্পকাজ করিতে দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গিয়াছিল। ঠিক যেমন একজন হিন্দু অবাক হইত একটি চিম্পাঞ্জিকে পুরোহিত সাজিয়া তালপাতার লেখা হইতে গ্রন্থের মন্ত্র পড়াইতে দেখিলে। আমরা তাহাদের চোখে দেখিবার মত প্রাণীই বটে, যেমন জুলুরা কিংবা সিয়ু মোড়ল এখন (১৮৮৭) আমাদের চোখে। সর্বত্রই মানুষের স্বভাব অভিনবত্বের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, এবং যে জিনিস যত অভিনব হয়, তাহাও ততই বেশি দর্শনীয় হইয়া উঠে। মহিলাদের নিকট হইতেই আমরা খুব বেশি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের সর্বাবস্থায় হাঁটায়, বসায়, খাওয়ায়, কাগজ পড়ায় সকল প্রকার চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমাদের বিদ্ধ অনুবিদ্ধ করিতেছিল। সবুজ চোখ, ধূসর চোখ, নীল চোখ, কালো চোখ একত্র মিলিয়াছিল, এবং সব সময় তাঁহারা বলাবলি করিতেছিলেন "O, I, never!" আমরা প্রত্যেকে কতজন করিয়া স্ত্রী বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছি ইহা লইয়াও তাঁহাদের মধ্যে আলোচনার অন্ত ছিল না। কেহ অনুমান করিতেছিলেন ২৫০ নিশ্চয় হইবে। অনেকেরই এই অনুমান। ইঁহাদের কাছে এ বিষয়ে যত্র অসম্ভব কথাই বানাইয়া বলা যাউক, ইহারা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবে না। আমাদের মধ্যকার একজন এক সুন্দরী পরিচারিকাকে বলিয়াছিলেন, তোমার ব্যবহারে আমি ভীষণ খুশি হইয়াছি, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই। তুমি কি আমার গৃহে আমার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর পদ পূরণ করিতে রাজি আছ? এই পদটি সম্প্রতি আমার দেশ ত্যাগের পূর্বে আমার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর মৃত্যুতে খালি হইয়াছে। পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কতগুলি স্ত্রী আছে?" "যেমন হয়ে থাকে—২৫০টি" —সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন আমার বন্ধু। "আপনার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর কি হইয়াছিল?" "আমি তাহাকে মারিয়া

ফেলিয়াছি—কারণ সে আমার রান্না খারাপ করিয়াছিল।" বেচারী পারিচারিকা ইহা শুনিয়া ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। বলিল, "হতভাগা! দানব!" পরে তাহার নিকট হইতে তাহার এক বান্ধবীর দুর্ভাগ্যের কথা শোনা গেল। সুন্দরী সরলা বালিকা, সে এক এডনবরোয় পাঠরত এক আফ্রিকার ছাত্রের প্রেমে পড়িল। ছেলেটি তাহার কাছে আসিয়া প্রণয় নিবেদন করিত। অবশেষে ইংল্যান্ডে তাহাদের বিবাহ হয়। দিন বেশ ভালই কাটিতেছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে ছেলেটি তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার লাইবেরিয়ার মরুদেশের বাড়িতে লইয়া গেল। সেখানে একটিও শ্বেতাঙ্গ নাই, তাহার সেখানে বড়ই একা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার উপর একদিন তাহার শাশুড়ি পাখীর পালক ও পশুর চামড়া পরিয়া অর্ধ-মাতাল অবস্থায় নাচিতে নাচিতে বাড়ি ফিরিল, সেই দিন তাহার সহ্যসীমা পার হইয়া গেল। দুঃখে বেদনায় হতাশায় শুকাইয়া শুকাইয়া মেয়েটি মরিয়া গেল।

অবশ্য পৃথিবীর সকল দেশের লোকই অন্য দেশের লোকদের অসভ্য মনে করিয়া থাকে, অন্ততপক্ষে তাহারা যে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ থাকে না। বহুকাল হইতে মানুষের এই মনোভাব চলিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও বহুকাল থাকিবে। অতএব ইংরেজদের জনসাধারণ যে আমাদের বর্বর মনে করিবে ইহাতে আশ্চর্য হই নাই। কারণ তাহাদের চোখে আমরা সবদিক হইতেই অসভ্য বিবেচিত হইয়াছিলাম। পোষাক, আচরণ এবং মানুষের সাধারণ চালচলন হাবভাব বিষয়ে তাহাদের মনে একটি নির্দিষ্ট ধারণা আছে, ইহা হইতে এক চুল এদিক-ওদিক হইলে তাহা তাহদের চোখে ধরা পড়িয়া যায়। ইহা তাহারা ক্ষমার অযোগ্য ভাবে। আমাদের অবশ্য তাহারা সর্বত্রই যথাসম্ভব প্রশ্রয় দিয়াছিল। সম্রাজ্ঞী নিজে তাঁহাদের সাধারণ রীতি আমাদের ক্ষেত্রে শিথিল করিয়াছিলেন, এবং সর্বত্রই আমাদের প্রতি লোকে এই অনুগ্রহ দেখাইয়াছে। একটি প্রাচীন জাতির প্রতিনিধিরূপে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলাগণ আমাদিগকে সম্মান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায়শঃই আমাদিগকে তাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন, প্রাইভেট পার্টির আয়োজন করিতেন এবং নানা উপভোগ্য আমাদের ব্যবস্থা করিতেন। কতকগুলি গৃহে আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম, এবং প্রায় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত লোক হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইঁহাদের কাছে আমরা সর্বদা 'সুস্বাগতম্' ছিলাম, এবং তাঁহাদের গৃহে গমন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমন আমাদের খুশিমত করিতাম। তাঁহাদের মধ্যে আমরা কয়েকজন বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম, এই ভদ্রলোকেরা আমাদের কয়েকদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই নিজেরা আসিয়া আমাদের বাড়ি লইয়া যাইতেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যে আনন্দময় দিনগুলি কাটাইয়াছিলাম তাহা আজও অনুরাগের সহিত স্মরণ করি, এবং আমাদের প্রবাসকালে তাঁহারা আমাদের প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সরকারী বিষয়ক কাজে বেসরকারী ভদ্রলোকেরাও আমাদের দিকে তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক সময়েই "আমরা পাগড়িপরা ভদ্রলোকদের কথা শুনিতে চাই" এরূপ দাবি শুনা যাইত। কিন্তু আমরা যে ভয়ংকর রকমের এক আশ্চর্য জীব এ ধারণা অপরিচিতদের মধ্য হইতে দূর হয় নাই। আমরা যে তাহাদের ভাষা বুঝি, ইহা জানিলে কি তাহারা এমন মন খুলিয়া আমাদের সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিত? আমাদের বিষয়ে তাহারা যাহা বলিত তাহা খুবই মজার। কাজের চাপে যখন আমাদের মন ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন এক গ্লাস পোর্ট ওয়াইন অপেক্ষা ইহাদের মন্তব্য বেশি ভাল লাগিত। আমাদের বিষয়ে ঐ সব পুরুষ ও মহিলাগণ যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিবার যে নিপুণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা হুবহু বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। তাহা থাকিলে সেই সব আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে তাহা একখানি সেরা চিত্তাকর্ষক গ্রন্থরূপে গণ্য হইতে পারিত। অথবা যদি জানিতাম আমাকে পরে আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে, তাহা হইলে পল্লীবাসীদের মুখের সরল মন্তব্যগুলির কিছু অন্তত টুকিয়া রাখিতাম। তাহারা অজ্ঞাতসারে অনেক সত্য কথাই বলিয়াছে আমাদের সম্পর্কে। এই জাতীয় মনোভাব সকল দেশেই আছে, এবং তাহাদের মন্তব্যে, আমাদের নিজেদের বিষয়ে আমাদের যে ধারণা, এবং তাহাদের যে ধারণা, তাহার ভিতরের বস্তুগত পার্থক্য লইয়া দার্শনিকতার অবতারণা করা যাইতে পারে।

যে সব লণ্ডনবাসী তাহাদের পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্যের লোকদের দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহাদেরই চোখে যদি আমরা এমন দেখিবার মত জীব হইয়া থাকি, তাহা হইলে ইংল্যান্ডের যে সব হাজার হাজার পল্লীবাসী প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের চোখে যে আমরা কি বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহাই ভাবি। তাহারা অবশ্য আমাদের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিয়াছিল। তাহারা আমাদের সঙ্গে আলাপ করা পছন্দ করিত, এবং আমরাও সুযোগ পাইলে তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যাঁহাদের আত্মীয়েরা ভারতে সৈন্যরূপে অথবা অন্য কাজ উপলক্ষে ভারতে আছে, তাহারা ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে আমাদের কাছে আসিয়া আমাদের করমর্দন করিতেন, এবং ভারতাস্থিত আত্মীয়বর্গের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। এইভাবে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিত। "মহাশয়, জিমকে চেনেন? ঐ যে, জেমস রবিনসন—অমুক রেজিমেন্টের?"—এক প্রৌঢ়া মহিলা ভিড় ঠেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন একদিন। আমার ঘাড়ে যেন তিনি ঝড়ের মত ভাঙিয়া পড়িলেন। কোনও ভূমিকা নাই, অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে কথা কহিবার রীতি মান্য করার বালাই নাই, সোজা প্রশ্ন। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাইলাম, তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তিনি তখন নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন তিনি জিমের আণ্ট অর্থাৎ পিসি। তাহার পর তিনি তাঁহার ভাইপো কেমন করিয়া সেনাদলে যোগ দিল তাহার দীর্ঘ ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনাদের মারফৎ তাহার খবর পাঠাইবার এমন চমৎকার সুযোগ সে নষ্ট করিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাহাকে তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তিনি তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই মহিলার কিছু কিছু দুর্বোধ্য বৈশিষ্ট্য যাহা লক্ষ্য করিলাম, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—আমরা সাধারণত যে ধরণের ইংরেজী শুনি, ইঁহার ইংরেজী সেরকম নহে, তাঁহার ভাষাও মাঝে মাঝে এলোমেলো হইয়া যাইতেছিল। তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন, আমি ফিরিয়া যাইবার পর যেন জিমকে এই মূল্যবান খবরটা দিই যে, মিসেস জোনস্-এর পরিপুষ্ট শূকরটি স্মিথফিল্ড কৃষি প্রদর্শনীতে একটি পুরস্কার লাভ করিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলাম, আমি ফিরিয়া গিয়াই উত্তর বর্মার অরণ্যপর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া এ সংবাদ জিমকে দিয়া আসিব। মিসেস্ জোনস্ তাঁহার বন্ধুদের বলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

[ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

৫

সামান্য নুনকে উপলক্ষ্য করে মরা আগুন যেন খোঁচা খেয়ে জ্বলে উঠেছিল। এ চরের খালের ধারে মাত্র একটা উদ্‌যাপন হয়েছিল যেন তার।

খালের ধারের সেই বে-আইনী ক্যাম্পটাকে সমূলে উৎপাটিত করে, সারা চরটাকে দলে পিষে; আহত রক্তস্নাত কতকগুলো লোককে গারদে ভরে দিয়ে সরকারী বড় বড় আমলা থেকে পুলিশের গহিয়া চৌকিদারটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে ভেবেছিল—আপদ বিদায় করা গেছে। কিন্তু হলো উল্টো। আগুন ছড়িয়ে গেল সারা জালপাই মহালের চরে চরে। তার চাপা তাত আর উত্তেজনা ঝিমঝিম্ করে উঠল সদ্য জাগাও গ্রামের স্নায়ুতে স্নায়ুতে—এমন দু-পাঁচ ক্রোশ।

শেষদিনের আচমকা আঘাতের প্রচণ্ডতায় স্বেচ্ছাসেবকরা যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর দিন কয়েক ওরা শুধু প্রভাতফেরি করে চরে চরে—গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়াল। নতুন নতুন দল এসে জুটলো মহকুমা থেকে—বেশির ভাগ স্কুলের ছাত্র। দু-চারজন বয়স্ক যুবক অথবা প্রৌঢ় কর্মী। প্রথম প্রথম গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে যে-যার কুঁড়ের কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতো সে গান। ভোরের স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা আলোয়—ফসল তোলা শূন্য মাঠের অবাধ হাওয়ায় ওদের অশ্রুতপূর্ব সে গানের সুরে কেমন যেন একটা মায়া জাগিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল......

ধনধান্য পুষ্প ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—
সকল দেশের সেরা!
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ,
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—
আমার জন্মভূমি।

লোকালয়ের পাশ দিয়ে, গ্রামের ভেড়ি বাঁধে, মাঠের পথে পথে ওরা গান গাইতে গাইতে চলে যায়। গ্রামের মানুষ তার সবটুকু অর্থ বুঝুক আর নাই বুঝুক—ওদের চোখের সামনে কাঁপে ওদেরই মাঠঘাট প্রান্তর, পুষ্পগন্ধ ভরা বনভূমি; বিচিত্র পোষপাখালির ডাক; ছোট ছোট কুঁড়েগুলি—সামনে ছোট ছোট মরাই-মাচা, খড়ের গাদা। মাথার ওপরে উদার গম্ভীর আবাল্য পরিচিত অনন্ত উদ্‌ভ্রান্ত আকাশ—আর অদূরে প্রবহমাণ প্রভাতের স্নিগ্ধ সমুদ্রগামিনী নদীটি......

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার,
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র
আকাশ তলে মিশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—
আমার জন্মভূমি।

আস্তে আস্তে গানের সুর আর কথা একাকার হয়ে যায় ওদের হলুদে ফুলে ভরা সর্ষের ক্ষেত, ফসল তোলা মাঠ—নদী আর আকাশের সঙ্গে। বুকের গভীরে কিসের একটা যেন অন্ধ বোবা আবেগ নড়ে চড়ে ওঠে। সে কি ওদের অসাড় জীবনের আত্মবিস্মৃত বছরগুলির সঙ্গে এই গ্রাম—এই চর—এই আকাশ বাতাস নদীর নাড়ীতে নাড়ীতে বাঁধা একটা মায়া—না, সুরে কাঁপা ওই কাঁচা কোমল গলাগুলোর আবেদন—কে জানে!

...ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন
এই দেশেতে মরি!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—
আমার জন্মভূমি।

জন্মভূমি!'

কথাটা বারে বারে ঢেউ তুলে মিলে মিশে যায় ওদের ওই মাঠ ঘাট প্রান্তর আর আকাশের সঙ্গে। এই মা, এই ভাই—এই চেনা মানুষগুলোর মধ্যে জন্মেছে তারা—একদিন এইখানেই তো মরে যাবে বটে!

আর কোনো দেশ তারা জানে না।' এই গ্রাম—এই নদী—ওদের এই শস্যক্ষেত্রের টুকরো টুকরো অস্পষ্ট ছবিগুলো গায়ে গায়ে মিশে একটা অখণ্ড প্রত্যক্ষ ছবির মতো ঝলোমল করে দিগন্তছোঁয়া মাঠের দেশে।

জন্মভূমি।

প্রথম দিন অবাক হয়ে শুনলো ওরা নিজের নিজের কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে; দ্বিতীয় দিনে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল গ্রামের ভীড় বাঁধে—আর তৃতীয় দিনে কেউ কেউ এসে মিশে গেল প্রভাতফেরির সঙ্গে।

থানা চুপচাপ। ভাবলে বোধ করি—মরুক গে ব্যাটারা মাঠেঘাটে ভেউ ভেউ করে। বে-আইনী নুনের ঝামেলা তো আর হচ্ছে না।

কিন্তু এ দেশের মানুষের হাড়ে হাড়ে আছে নুন—শুধু জলে নয়, মাটিতে নয় দক্ষিণ সমুদ্রের উথালপাথাল হাওয়াতেই নয়।'

তাই প্রভাতফেরির নিরীহ ওই গান শুনতে শুনতে ক্ষেপে যায় সানো চৌধুরী, চটে যায় জগৎ ডাক্তার। বিড় বিড় করে বুড়ো ভিখন রাউৎ—কি বলে ঠিক বোঝা যায় না।

ডিসপেনসারিতে ডাক্তার কাটা ঘা। ড্রেস করছিল ভিখনের পায়ে। বুড়ো মানুষ—কোদালের বাড়ি মেরেছে নিজের পায়ে। ব্যাণ্ডেজ জড়াতে জড়াতে ডাক্তার বললে, "কি বিড়বিড় করিস ভিখন। লাগছে?"

"না।"

"তবে?"

"বলি অদের নুনের কারবার কি উঠে গেল?"

"অ'...মনে লেগেছে।" ডাক্তার যেন কৌতুক করে—বিদ্রূপ করে বললে, "আমি ভাবলাম তোর ঘায়ে লাগল। বুড়া মলঙ্গী তুই; ভেবেছিলি—শহরের বাবুরা এসে তোর বাপ-ঠাকুর্দার কালের কোম্পানীর আইন তুলে দেবে,—নতুন খালাড়ির* পত্তন হবে; ঝুড়ি খুরপা নিয়ে যাবি নুনমাটি চাঁছতে!"

ভিখন বোকা বোকা ভাবে বলল, "তা বাবুরা এসে যেভাবে আরম্ভ দিল।"

আর যায় কোথায়। ওর কথা শেষ হলো না—জগৎ ডাক্তার ফোঁস করে উঠল। চটলে জগৎ ডাক্তারের মুখের ঠিক নেই—এ কথা সবাই জানে। ভেতরের চাপা একটা রাগে ফেটে পড়ল ডাক্তার, "তুই মুখ্যু, তুই ছোট জাত—তুই জানোয়ারের সামিল। নুনের ভূত। জন্মেছিলি গোলামের ঘরে, গোলাম হয়ে মরবি। তোর আবার আশা—বুড়া গিধ্‌ধোড়। বয়স কত হলো?"

হঠাৎ কতগুলো গালাগালি খেয়ে ঘাবড়ে যায় ভিখন। চুপ করে থাকে।

"বলি বয়স কত হলো?" ডাক্তার খেঁকিয়ে উঠল।

ভিখন মিন্ মিন্ করে বললে, "উই তো সানো কত্তা বসে আছে। সেবার হিসাব করে বলেছিল ছিয়ানব্বই।"

"সেবার বলেছিল। আজও তাই চলছে।" ডাক্তার তেমনি খ্যাপা গলায় বললে, "মরে যা—মরে যা। এ তল্লাট থেকে শেষ হয়ে যাক মলঙ্গীর চিহ্ন। কি হবে—কি হবে থেকে?"

সানো চৌধুরী ডিসপেনসারির সামনে পাতা একটা বেঞ্চিতে বসে চেয়ে চেয়ে দেখছিল দূরের সেই সঙ্গীতমুখর প্রভাতফেরি। মন ছিল ডাক্তারের কথায়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "চৌধুরীদের এস্টেটের মধ্যে আজ পুরাতন আজুরা মলঙ্গী বলতে বেঁচে আছে শুধু ওই ভিখন রাউৎ। দেখে শুনে তার মনে যদি কোনো আশা জাগে—দোষের নয় ডাক্তার।"

বিদ্রূপ করে ডাক্তার বললে, "কথা শুনে মনে হচ্ছে—তোমারও কিছু আশা ছিল।"

"আশা?" সানো চৌধুরী নীরবে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল—তারপর আস্তে আস্তে বললে, "না; আশা আর কি থাকবে ডাক্তার। চৌধুরী আর তার আজুরা মলঙ্গীদের দিন চলে গেছে বহুদিন।"...

সে রামও নেই—সে অযোধ্যাও নেই।' সে মরা ইতিহাস।

তমলুক হিজলীর সারা উপকূলভাগ জুড়ে ছিল একদিন জমিদারদের নিমক পোক্তান। ক্ষারযোগ্য চাকরান জমির বিনিময়ে হাজার হাজার গ্রামের মানুষ বছরের প্রায় আট মাস নুন তৈরি করত এই সব পোক্তানে। মাত্র বর্ষাকালটুকু ছিল কৃষিকাজ। তার ফসল তুলতো নিজের গোলায় আর নুন তুলতো জমিদারের গোলায়। বাঙলার ইতিহাসে তারা মলঙ্গী—আজুরা মলঙ্গী নামে পরিচিত। তাদের তৈরি সেই নুনের জন্যে জমিদারের গোলায় এসে জড়ো হতো গ্রামদেশের যত ব্যাপারী—আর নানা প্রদেশের সওদাগরের দল—কাশ্মিরী, শিখ, মুলতানী, ভাটিয়া। এই ধারায় কেটে গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। তারপর ঘটেছে রাজ্যাধিকারের পরিবর্তন—এসেছে পাঠান, এসেছে মোগল। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলার সুদীর্ঘ উপকূল-ভাগ জুড়ে যে নিরলস কর্মধারা—তার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। শুধু এ ব্যবসারের ভারপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে একজন বাদশাহের মুসলমান প্রতিনিধি—উপাধি ছিল যার মালিক-উল-তুজ্জব—ফকর-উল-তুজ্জব, সওদাগরের রাজা—সওদাগরের গৌরব।'

কিন্তু সুদূর শতাব্দী জোড়া সে গৌরব একদিন ধুলোয় লুটিয়ে গেল। এল

* নুন তৈরির জায়গা।

ইংরেজ—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তমলুকে আর হিজলীর সেই অসংখ্য খালাড়ি—লবণ-কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ অধিকার কায়েম হলো কোম্পানীর, সল্ট এজেন্ট কুঠির। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল পুরাতন বিধিব্যবস্থা, জমিদারের আজুরা মলঙ্গী রূপান্তরিত হলো কোম্পানীর জউনদার—ঠিকা শ্রমিকে। আর তার ঘাড়ের ওপরে চেপে বসল কোম্পানীর যত দালাল, ঠিকাদার, এৎমাম্‌দার, গোমস্তা আর নিমক-দারোগা। রাজধানী কলকাতা থেকে উদয় হলেন অনেক চাটুজ্যে, মুখুজ্যে, মিত্তজা, বসুজো —এলেন রাধামোহন, গোপীমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর। বন্ধ হয়ে গেল তমলুক-হিজলীর ব্যক্তিগত নুনের ব্যবসা। ১৮০১ সালে কোম্পানীর আইন ঘোষণা করলে—ব্যক্তিগত কারবার ধরা পড়লে জরিমানা পাঁচ হাজার তংকা। একচেটিয়া কারবারে কোম্পানী ৭৫৲ টাকার নুন বিক্রি করলে ৫০০৲ টাকায়। এদিকে গরীব চাষী-মলঙ্গী ভয়ে ভয়ে লুকালো তার নুনের হাঁড়িকুড়ি খুরপা। কোলের মাটির উৎপাদনে নির্মূল হয়ে গেল তার চিরকালের অধিকার। জমিদার অসহায় দর্শক।

সে ইতিহাস বোধ হয় ছটফট করে সানো চৌধুরীর রক্তে। একটা চাপা উত্তেজনায় মুখ চোখ লালচে দেখায়। কিন্তু কথা বলে আস্তে আস্তে, "আশা নয় ডাক্তার—বরং বলো, প্রতিশোধের ইচ্ছা—বহুদিনের বঞ্চনার একটা জবাব।" একটু থেমে আবার বললে, "তুমিই বা অমন খ্যাক খ্যাক করে উঠছো কেন? আসলে তোমার গায়ের ঝাল ঝাড়ছো বেচারী ভিখনের ওপরে। তোমার রক্তেও আছে সেই বঞ্চনার জ্বালা। তাই সেদিন ছুটে যেতে পেরেছিলে পুলিশের ওই লাঠি ডান্ডার মাঝখানে।"

"আমি ডাক্তার।" সানো চৌধুরীর কথাটাকে কেড়ে ফেলে ডাক্তার বলে উঠল, "আর্তের সেবা আমার ধর্ম।"

"স্বীকার করতে না চাও—করো না।" সানো চৌধুরী তেমনি আস্তে আস্তে বললে, "তবু তোমার চোদ্দ পুরুষ এ মহকুমার জলজঙ্গলে মানুষ। তোমার রক্তের মধ্যেও আছে এ মাটির সে-ই নুন।"

"দূরে—দূর।" ডাক্তার বললে, "ও তোমার দু' পয়সা চার পয়সার নুনের জন্যে আমার অত মাথা ব্যথা নেই।" বিরক্ত হয়ে বললে, "ও চুলোয় যাক। ওর নাম আর মুখে এনো না।"

সানো চৌধুরী মৃদু শব্দ করে একটু হাসলো। আপন মনে বললে, "দু' পয়সা চার পয়সার নুন।—তাই বটে।" তারপর বললে, "জানো ডাক্তার, ওই দু' পয়সা চার পয়সার নুনের জন্যে একদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরা ভিখনের বাপের মত পাকা মলঙ্গীদের অস্ট্রেলিয়া না কোথায়—সেই কোর্ট মার্শালয়েতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল? ওই নুন তৈরির কেরামতিটুকুর জন্যে?"*

ভিখন চুপচাপ শুনেছিল এতক্ষণ—সানো চৌধুরীর ভুল শুধরে বললে, "আর বাপ নয়—ঠাকুরদাদা।"

"তাই হয়তো হবে।" সানো চৌধুরী বললে, "আমি গল্প শুনতাম আমার বাবার কাছে।"—বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে আবার, "আমাদের এ নুন শুধু আমাদের নিত্যি প্রয়োজনের নুন নয় ডাক্তার—পূর্বপুরুষের রক্তের মতো এ আমাদের এক উত্তরাধিকার। রক্তের ভেতরে ঘুমিয়ে আছে। তাই সেদিন সামান্য ওই নুন নিয়ে চরের মানুষ এত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।"

এরপর কেউ আর কোনো কথা বলে না। জগৎ ডাক্তার জোর করে যেন সে-দিনের সদ্য আগত অর্ধ-সাপ্তাহিক কাগজটার ওপরে মনোনিবেশ করলে। সানো চৌধুরী আর তার ছিয়ানব্বই বছরের শেষ আজুরা মলঙ্গী ভিখন রাউৎ জেলা বোর্ডের সড়কের ওপরে ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে শূন্য চোখে চেয়ে রইল চরের দিকে। চরের শূন্য মাঠের একান্তে চাষীদের ছোট ছোট কুঁড়েগুলো পার হয়ে—আরও দূরে—ঘন সবুজ বনসীমার ধার ঘেঁষে দেখা যায় হুগলী নদীর গৈরিক জলধারা।

দেখছে—দুজনেই দেখছে: ছায়াবাজীর মতো শতাব্দী পারের স্বপ্ন। ফসলের শূন্য ক্ষেত নয়—

খালাড়ির পর খালাড়ি—জলাট জুড়ে নিমক পোক্তান। অনেক পীড়ন—আইন-শোষণেও টিকে আছে সেখানে হিজলী-তমলুকের চাষী-মলঙ্গী কোম্পানীর কুল-মলঙ্গীর খাতায় নাম লিখিয়ে। কার্তিকের সোনা জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে সারা চর। শুকনো ডাঙা থেকে নুন-বসা মাটি চেঁছে তুলছে মলঙ্গীদের ছেলেপুলে মা-মেয়ে বৌ-ঝি। উনুনে উনুনে বসেছে পরিস্রুত নুনজলের হাঁড়ি—ফুটছে টগবগ করে। দূরে দূরে নুনের কাঁড়ি সাজানো—যেন সাগর ছেঁচা মুক্তোগুঁড়োর ছোট ছোট টিলা। কয়াল মেপে তুলছে। গোমস্তা হিসেব টুকছে। গ্রাম পথে পথে চলেছে নুনের ছালা বোঝাই গোরুর গাড়ি—কোথাও বলদের সারি। খালের মুখে হুগলী নদীর বুক ভরে সওদাগরি বোট-পান্‌সির ভিড়। খেজুরীর বন্দরে আনাগোনা করেছে ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজের বাণিজ্যতরণী। হাজারো মানুষের গুঞ্জরণে সারা উপকূলভাগ জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন এক কর্মচঞ্চলতা।...

বহু শতাব্দীর চলমান জীবন্ত এ ছবি।......

"ডাক্তারবাবু।"

দুজন ভলান্টিয়ার এসে দাঁড়াল। দুই তরুণ। গায়ে খয়েরী রংয়ের খাকি হাফসার্ট, মাথায় ব্যান্ডেজের ফেটি বাঁধা। রক্ত চুইয়ে শুকিয়ে গেছে একজনের কপালের বাঁ দিকে, অন্যজনের চাঁদির পাশে।

ওদের মধ্যে বড়টি বললে, "আজ আমাদের ব্যান্ডেজ খুলবেন বলেছিলেন।"

কাগজ থেকে মুখ তুলে ডাক্তার খানিক চেয়ে চেয়ে দেখলে ওদের। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "ব্যথা আছে?"

ওদের মধ্যে ছোটটি ফেটিতে হাত বুলিয়ে টিপে-টুপে হেসে বললে, "ঠিক বুঝতে পারছি না।"

বিদ্রূপ ভরা গলায় ডাক্তার বলে উঠল, "বুঝতেও পারছ না? রেগুলেশন লাঠির ব্যথা বড় তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ মনে হচ্ছে! তাই ও গলায় তোমাদের গান আসে।" জ্বলে উঠল জগৎ ডাক্তার, "যাও, ওই সোজা সড়ক—থানা। যন্ত্রণার জ্বালা আবার মাথায় করে নিয়ে এস—যাতে লাঞ্ছনার কথা আর কোনোদিন ভুলতে না পার।"

ঘাবড়ে গিয়ে ছেলে দুটি ডাক্তারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

ডাক্তার বুনো বেড়ালের মতো গর্‌গর্‌ করছে। তাই দেখে সানো চৌধুরী মিটি মিটি হাসছিল। সে হাসি যেন বলতে চাইছিল—তোমার ডাক্তারির জামার ভেতর থেকে আসল লোকটা বড্ড তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল হে ডাক্তার।

সানো চৌধুরীর সে হাসি লক্ষ্য করেই

* সেক্রেটারী C. M. Rickett-কে লেখা Salt Agent Mason-এর চিঠি, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮০৭।

রিস্ট ওয়াচ
মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১৷১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য: আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

ফেন ডাক্তার গর্‌গর্‌ করতে করতে বললে, "ডাক্তারি আমার ব্যবসা—বিনা পয়সার ডাক্তারি আমি করতে যাব কেন? ওরা কে!"

ছেলে দুটি সসংকোচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একটু ইতস্তত করে তারপর ডিসপেনসারির বারান্দা থেকে টুপ্‌ করে রাস্তায় নেমে পড়ল।

"এ্যাই!"—পেছন থেকে ডাক্তার হাঁকড়ে উঠল।

চম্‌কে ছেলে দুটি পেছন ফিরে তাকাল। ডাক্তারের রুদ্র দৃষ্টির সামনে তাদের আর পা উঠল না।

ডাক্তার বললে, "চলে যাচ্ছ যে বড়!"

ওদের মধ্যে বড় ছেলেটি বললে, "আমাদের কাছে পয়সা নেই!"

"যেদিন বেঁধেছিলাম সেদিনও ছিল না। এসে বসো।" ধমকের সুরে বললে ডাক্তার—তারপর সানো চৌধুরীর দিকে আড়চোখে একটু দেখে নিয়ে আত্মগতভাবে বলে উঠল, "আর্তের সেবা আমার ধর্ম।"

সানো চৌধুরী অন্যদিকে মুখ করে তেমনি মুখ টিপে টিপে হাসছে। ভিখন তেমনি চরের দিকে চেয়ে চেয়ে জাবর কাটার মতো অনবরত মুখের সুপুরি চিবোচ্ছে। ওদের মাঝখানে ছেলে দুটো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল তো রইলই।

ডাক্তার তেমনি কট্‌কট্‌ করে বললে, "এসে বসো ওই বেঞ্চিতে। দেখি।"

সসংকোচে বেঞ্চিতে এসে বসল ছেলে দুটি—দু জোড়া চোখে বিস্ময় মাখানো। লোকটিকে বুঝতে পারছে না। একদিন পেয়েছিল সস্নেহ সেবা—আজ দেখছে উল্টো রাগ।

ডাক্তার একজনের ব্যান্ডেজ খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলে, "এখানে এসে জুটবার আগে কি করা হতো?"

বড় ছেলেটি বললে, "আমি বি-এ পড়তাম—আর ও হিমাংশু আই-এ।"

"তারপর গোলামখানা ছেড়ে দেশের সেবা করতে এখানে এলে?"

ডাক্তারের কথার ধরনে ছেলে দুটি আবার চুপ করে গেল।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, "তা—একজনের তো নাম জানলাম, তোমার নাম?"

"বিমল মুখোপাধ্যায়।"

ডাক্তার বললে, "বাড়ি?"

"কলকাতা।"

"আরি বাপরে—খাস রাজধানীর লোক! ও সানো কর্তা, ওরে বর্বর মলঙ্গী ভিখন রাউৎ—দেখ, দেখ। তাই এ্যাত গানের বাহার!" ডাক্তার বলতে লাগল, "হবেই তো—হবেই তো!"

হিমাংশু সক্ষোভে বললে, "ও শুধু গান নয়—আমাদের দেশ-বন্দনা। জন্মভূমির বন্দনা।"

"আলবৎ। একশ'বার।" ডাক্তার বললে, "এসেছিলে নুন তৈরি করতে—ইংরেজের গলা চাপা আইন ভাঙতে। তারপর ডান্ডা খেয়ে ঠান্ডা মেজাজে এখন গান গেয়ে বেড়াও।"

ডাক্তার টগবগ করতে লাগল। এ সেই চিরকালের সংঘাত—নগরের বিমূর্ত ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে গ্রাম্য সীমায়িত জীবনের রূঢ় রুক্ষ প্রত্যক্ষ অনুভূতির সংঘাত।

"মিথ্যে তুমি চটে যাচ্ছ ডাক্তার।" সানো চৌধুরী এবার মুখ খুললে, "যেমন ওদের নেতার নির্দেশ"—

সানো চৌধুরীর কথার ওপরে ডাক্তার বলে উঠল, "কে নেতা! কোনো নেতা আর ওদের বাইরে নেই। ওই কাগজ পড়ে আছে—দেখ, ডাণ্ডি রাদেশীল থেকে মেদিনীপুর—চট্টগ্রাম। ইংরেজ সরকার কারুকে আর বাইরে রাখে নি, সেঁকে গারদে ভরেছে।"

ছেলে দুটির মুখ নিমেষে বিষণ্ণ-মলিন হয়ে গেল। বোধ করি কাগজের খবরটুকু জানতো না। চেয়ে রইল শূন্য চোখে।

ডাক্তার বললে, "রাজধানীর লোক—দেশসেবার ব্রতে এসে পড়েছ বড় খারাপ জায়গায়। এর মাটি মিষ্টি নয়—নুনে। এর লোকগুলোর রং মাজা নয়—কালো। এদের নামধামগুলোও বেয়াড়া শোনাবে রাজধানীর কানে। তার চেয়ে যাও—গান গাইতে গাইতে চলে যাও রাজধানীতে।"

বিমল ধীর উদ্দীপ্ত গলায় বললে, "না, ফিরে যাওয়ার জন্যে আমরা আসি নি।"

"আসো নি?" জগৎ ডাক্তার তার একরোখা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল দুজনকে।

হিমাংশু মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "না।"

"তবে নেতা করে নাও ওই ছিয়ানব্বই বছরের বুড়া মলঙ্গীকে। ওই যে সামনে বসে আছে।" ডাক্তার ভিখন রাউৎকে দেখিয়ে বললে, "নুনের ছিয়ানব্বই বছরের মন্ত্রণার সাক্ষী। আমিও যাবো—ওর পেছনে পেছনে আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে।"

উজ্জ্বল চোখে ভিখনের দিকে চেয়ে রইল দুই তরুণ।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, "ক্যাম্পে এখন কত ভলান্টিয়ার আছে তোমাদের?"

"জনা পঞ্চাশ হবে।" বিমল বললে।

"মাত্র।" ডাক্তার জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সানো চৌধুরীর দিকে।

প্রথম আঘাতে সঙ্ঘবদ্ধ দল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে পুলিশ—অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু সানো চৌধুরী তার স্বভাবসিদ্ধ ধীর শান্ত গলায় বললে, "কত ভলান্টিয়ার চাই ডাক্তার?—গ্রাম আর চরের সব মানুষ তাদের জগৎ ডাক্তারের পেছনে পেছনে যাবে। দেখে নিয়ো।" [ক্রমশ]

বাহির হইল

কালিকট থেকে পলাশী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত। পশ্চিমী জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযানের কাহিনী—ইংরেজের ভারত-বিজয়ের আদিপর্ব—ইতিহাসের একটি স্বল্প-পরিচিত অধ্যায়ের সরস বিন্যাস—দশটি মূল্যবান মানচিত্র। কৌতূহলী পাঠকের অবশ্যপাঠ্য।

:: বিষয় সূচী ::

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্যের পটভূমিকা—পোর্তুগীজ পর্ব—ডাচ ওরফে ওলন্দাজ পর্ব—ফরাসী, দিনেমার ও বেলজিয়াম পর্ব—বিদেশীর চোখে বাঙালী—ইংরেজ পর্ব।

:: মানচিত্র সূচী ::

১। ভূমধ্য-সাগর-কেন্দ্রীয় জনপদের অবস্থান ২। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্য পথ (মুর ও লম্বার্দিদের আমলে) ৩। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্য পথরেখা (আলেকজান্দারের কালে) ৪। পোর্তুগীজের বাণিজ্য-সাম্রাজ্য ৫। ওলন্দাজের বাণিজ্য-সাম্রাজ্য ৬। ফরাসীর বাণিজ্যক্ষেত্র ৭। ভারতবর্ষ ১৭০৭ ৮। রেনেলের মানচিত্র অনুসারে বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যা ১৭৭৯ ৯। আধুনিক ইউরোপ ১০। অবিভক্ত বাঙলার শহর ও বন্দর।

সুন্দর ছাপা ॥ ভাল কাগজ ॥ মনোরম প্রচ্ছদ ॥ মজবুত বাঁধাই

দাম সাড়ে ছ' টাকা মাত্র

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ৯

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যার সমাধান কোন পথে?

বারীন ভাদুড়ী

খাদ্যোৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি প্রদেশ। এ সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে সরকারী, বে-সরকারী পরিসংখ্যান ও জনসাধারণের তিক্ত অভিজ্ঞতা। সঠিক অঙ্ক অবশ্য নির্ভুল পরিসংখ্যানের তথ্য-নির্ভর। মোটামুটি নির্ভরযোগ্য—সংখ্যা প্রকাশক সংস্থা—স্টেট্ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরো। কৃষি বিভাগ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বুলেটিন। এদের হিসাবের উপর ভিত্তি করে বলা যায়—প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের দৈনিক ১৬ আউন্স হিসেবে বছরে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন মোটের উপর ৭২ লক্ষ টন। ১৩ আউন্স হিসেবে আনুপাতিক হারে কম।

উপরোক্ত সরকারী পরিসংখ্যান মতে খাদ্যোৎপাদনের গড় (বন্যা, দুর্বিপাক-জনিত বিশেষ অবস্থা ছাড়া) ৪৫।৪৬ লক্ষ টন। অতএব ঘাটতি (১৬ আউন্স হিসেবে) কম-বেশি ২৬।২৭ লক্ষ টনের মধ্যে বলা যায়। এই বিরাট ঘাটতি পূরণের দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু কেন্দ্র নীতিগতভাবে দায়িত্ব স্বীকার করলেও তা পুরোপুরি পালনে অক্ষম। ফলে, পশ্চিমবঙ্গকে প্রতি বছরই খাদ্য-সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—কখন জনসংখ্যার বিপুল অংশকে অর্ধাশনে রেখে—কখন বা চাল ও গমের পরিবর্তে নিকৃষ্ট খাদ্য—মাইলো, ভুট্টা, যব, জোয়ার প্রভৃতি যোগান দিয়ে। চালের সংকট-জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা অনেক সময়ই করতে হয়েছে কিছু অংশ খুদ সরবরাহ করে। জনসাধারণের সহনশীলতাও এমন পর্যায়ে এসে গিয়েছে যে, এ দুর্দৈবের চিত্র চোখের সামনে মেলে ধরলেও চোখ পীড়িত হয় না, মেজাজ রুক্ষ হয় না, মনেও কোন দাগ কাটে না।

সরকার পক্ষ অবশ্য নিশ্চেষ্ট নয়। দাবির পর দাবি নিয়ে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র হতে দাবির অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আদায় করা সম্ভব হয় নি। অবস্থা অসহনীয় হলেও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে তা সহ্য করতে হচ্ছে অসহায়ভাবে। আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। উৎসাহ-উদ্দীপনাও ফলপ্রসূ। যার বিশেষ প্রকাশ—ভূমি সংস্কারে, উন্নত ফলনশীল বীজ রোপণে, দো-ফসলা উৎপাদনে, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়নে, একর প্রতি জমির ফলন বৃদ্ধির তৎপরতা ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে গম চাষের পরিকল্পনায়। ফলস্বরূপ—গত বছর উত্তরবঙ্গ ও মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় বন্যাজনিত ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। সরকারী খাদ্য-ভাণ্ডার আশানুরূপ স্ফীত না হলেও এখনও খোলা বাজারে চালের আমদানী যথেষ্ট এবং তা অব্যাহত। দরও কেজি প্রতি—১·১৫—১·২৫-এর মধ্যেই স্থিতিশীল। কেন্দ্রের দেয় ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত হলে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে খাদ্যসমস্যা তীব্রতর হওয়ার আশঙ্কা নেই। অতএব সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যেতে পারে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ আনুমানিক ১০ লক্ষ টন।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গ কি খাদ্যব্যাপারে চিরদিনই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে? স্বাবলম্বনের প্রতিশ্রুতি কার্যে রূপায়ণের সম্ভাব্য উপায় কি? আমরা জানি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্য একটা স্থির (constant) সংখ্যা নয়। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে তাল রেখে চলতে না পারে—তবে সমস্যা সমস্যাই রয়ে যাবে। আপাত অগ্রগতিকে আরোও পিছিয়ে সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলবে। এদিকে দৃষ্টি রেখে সরকারী যন্ত্রকে আরোও বৈপ্লবিক কর্মধারা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে যাতে জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে না যায়—অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে না পড়ে—যার বিষময় ফল—দাঙ্গা, হাঙ্গামা, চোরাই চালান, কালোবাজারী, বেআইনী মজুত, লুঠতরাজ প্রভৃতি নানা উপসর্গ। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে খাদ্যের নিদারুণ সংকটজনক অবস্থায় সরকারী যন্ত্র কত অসহায়। সমাজবিরোধীদের দমনে কোন কোন ক্ষেত্রে সক্রিয় হলেও অনেকক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয়। কর্ডন ভঙ্গ করে নিয়মিত রেশন এলাকায় (S. R. Area) অবাধে খুচরো চাল কেনা-বেচা রোধে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে সরকারী যন্ত্র দ্বিধাগ্রস্ত। এর কারণ রেশন এলাকায় প্রয়োজনমত চাল যোগানের অক্ষমতা। অক্ষমতা হতে আসে দুর্বলতা। যার ফলে আইনের মর্যাদা প্রতি পদে লাঞ্ছিত হতে দেখেও সরকারকে ঠাট বজায় রেখে নিষ্ক্রিয় থাকতে হচ্ছে। অবস্থা অসহনীয় হলেও তা কার্য-কারণ সম্পর্কে বাঁধা—তার সাথে বাঁধা পড়েছে মানুষের নীতিজ্ঞান, মূল্যবোধ ও জাতীয় চরিত্র। সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা থাকার কথা নয়। এ অবস্থার মোকাবিলা সম্ভব রেশনের প্রয়োজনীয় দাবি মিটিয়ে বা অভাবের সময় পাশাপাশি ন্যায্য মূল্যের দোকান (Fair Price Shop) চালু করে। এতে কর্ডনভঙ্গের সুযোগ প্রদানের দায় হ'তে সরকার অব্যাহতি পাবেন এবং জনসাধারণও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এ ঘাটতি সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব কি না। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ২১।২২ বছরেও যদি সম্ভব না হয়ে থাকে তবে আর ৫ বছরে কতটা সম্ভব। পাঁচ বছরের সীমা নির্দেশ অবশ্য যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বর্তমান স্থায়িত্বকাল ধরে। আমার মনে হয়—সমস্যাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারা (Disguise) ও গোড়ার গলদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কাজ করার মধ্যেই নিহিত আছে সমাধানের বীজ। প্রয়োজন দৃঢ় অথচ সংযত পদক্ষেপ। সাংবিধানিক কাঠামো ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিবন্ধকতার পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু সম্ভব সমাধানের সূত্র বের করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রথমত আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে পূর্বে উল্লিখিত ছোট

ছোট স্কেচ পরিকল্পনা (লিফট ইরিগেশন যার অন্তর্গত), নিবিড় চাষ, উচ্চ ফলনশীল ধান রোপণ, গম চাষের বিস্তৃত পরিকল্পনার অব্যাহত গতি অনেকাংশে এই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে বলা বাহুল্য। দ্বিতীয়ত অবশিষ্ট অংশের দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি প্রদেশ নিয়ে (অবশ্য কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষে) খাদ্যাঞ্চল গঠন ও পরিকল্পিত সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থার দ্বারা এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। এতে কেন্দ্রের নিকট হতে অধিকতর ক্ষমতা ও দাবি আদায়ের তিক্ততার হ্রাস পাবে। কেন্দ্রের দেয় চালের একটা মোটা অংশ (গম ছাড়া) যা পুরোপুরিই অনায়াসে খাদ্যাঞ্চলভুক্ত উদ্বৃত্ত প্রদেশ হতে সরাসরি আমদানীর সুযোগ থাকবে। সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশ হতে আমদানীও সে পরিমাণে কমবে। একান্তভাবে কেন্দ্র-নির্ভর না হয়ে প্রত্যেক ঘাটতি প্রদেশ স্বাবলম্বনের প্রেরণায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরো সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত হবে এবং ফলে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে খাদ্যোৎপাদনের ১৯৬৯-৭০ সনের উচ্চ সীমা নির্ধারক সংখ্যা (Target) ৭০ লক্ষ টনের বা কাছাকাছি পৌঁছান অসম্ভব হবে না। যেহেতু এরূপ উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি অঞ্চল বণ্টনের পূর্ব নজীর আছে, কেন্দ্রের পক্ষেও ইহা একান্ত পরীক্ষিত ও গ্রহণীয় নীতি হিসেবে অনুমোদনযোগ্য।

এবার সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই।

সংগ্রহ ব্যবস্থা

বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র উৎপাদন সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে আনা সম্ভব নয়। কাজেই সামগ্রিক উৎপাদনের উপর পূর্ণ স্টেট কন্ট্রোলের প্রশ্ন আসে না। রেশন এলাকার (পূর্ণ ও আংশিক) দাবির উপরই সরকারের সংগ্রহ ব্যবস্থা। এর পরিপ্রেক্ষিতেই সংগ্রহের সীমা নির্দেশ। যদিও বর্তমানে তা সাড়ে চার লক্ষ টন ধার্য করা হয়েছে, তর্কের খাতিরে, ঊর্ধ্ব সীমা ১০ লক্ষ টন অযৌক্তিক নয়। এই দশ লক্ষ টন সংগ্রহের উপযুক্ত গুদাম সরকারের হাতে থাকা চাই। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সরকারী গুদামের অভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের অপচয় রোধ করা অসম্ভব। তা ছাড়া প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার। রেশন এলাকার বাইরের বিপুল জনসংখ্যা খোলা বাজারের চালের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল— কাজেই সরকারী সংগ্রহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে খোলা বাজারের সাথে সামঞ্জস্য, নমনীয়তা ও সহাবস্থানের নীতি বজায় রেখে। নতুবা সরকারের ঘাড়ে বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য যোগানের দায় এসে পড়ে। খোলা বাজারের সুযোগ যথারীতি বজায় রেখে চালকলগুলির উপর ৫০% লেভি ধার্য সরকারের সংগ্রহ ব্যবস্থার একটা সুপরীক্ষিত ও বাস্তব দিক। উৎপাদন বৃদ্ধির হার মোটামুটি ঠিক থাকলে এতে কমপক্ষে ৫।৬ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ হতে পারে।

ধান-চাল কেনা-বেচার লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাতাল সম্বলিত হাস্কিং মেসিনগুলির উপরও ৫০% লেভি ধার্য হওয়া উচিত। নিকটবর্তী ডি পি এজেন্ট মারফৎ গুদামজাত করে প্রয়োজন মত স্থানীয় এলাকায় উক্ত চাল আংশিক রেশনে বিতরণ করলে চালের একটা অংশের দাবি স্থানীয়ভাবেই মিটতে পারে। এরূপ হাস্কিং মিলের সংখ্যা নিরূপণের উপর সংগ্রহের পরিমাণ নির্ভর করে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে 'রিকুইজিশন' করা ধান অনেক সময়ই কাছাকাছি চালকল না থাকায় পরিবহনে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয় এবং অনেকক্ষেত্রেই তা আদায় করতে সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। এই ধানও নিকটবর্তী হাস্কিং মিলে সরকার নির্ধারিত 'বাণীতে' ভানিয়ে আংশিক রেশনে স্থানীয়ভাবে বিতরণ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত* ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার মতো জনস্বার্থবিরোধী নিছক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সংস্থার মাধ্যমে চলতি সংগ্রহ ব্যবস্থা রহিত করে সরকারের নিজ দায়িত্বে ও পরিচালনায় সমগ্র সংগ্রহ ব্যবস্থা রূপান্তরিত করা দরকার। সরকার নিয়ন্ত্রিত স্ট্যাটুটারী সংস্থা বা ডি পি এজেন্ট মারফৎ প্রত্যক্ষ ও ঐচ্ছিক সংগ্রহ ব্যবস্থায় চাষীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে সরকার, নির্ধারিত দরে ধান ক্রয় করতে পারেন। ঐ ব্যবস্থারও পূর্ব নজীর আছে এবং তা জনপ্রিয় না হবার আশঙ্কা নেই। বর্ষাকালে ধান সংগ্রহের অন্তরায় গ্রামের অচল রাস্তাঘাট। ঐ সময়ে মাইল প্রতি নির্দিষ্ট হারে পরিবহন খরচা সরকার বহন করলে চাষীর ধান বিক্রয়ের বাস্তব অসুবিধাগুলি দূর হয় এবং সংগ্রহেও ভাটা পড়ে না। বোনাস দেবার রীতির চেয়ে এ ব্যবস্থা বেশি জনপ্রিয় কারণ এতে কিছু বাড়তি কাজের সুযোগ বৃদ্ধি হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে ধান সংগ্রহের পরিমাণ চাল সংগ্রহের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি হয়ে থাকে। সে হিসেবে অন্ততপক্ষে ৩ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ অসম্ভব কিছু নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে প্রয়োজনীয় অর্থ এজন্য সংগ্রহ করা দরকার। পুরোপুরি বরাদ্দে বা একেবারেই কেন্দ্র দিতে রাজী না হলে F. C. I.-কে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন ডি পি এজেন্টরূপে বা চীফ এজেন্টরূপে ধান-চাল খরিদের দায়িত্ব অর্পণ করেও সংগ্রহ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা যায়। ইহারও পূর্ব নজীর আছে শ' ওয়ালেশ, ইস্পাহানীর ন্যায় প্রতিষ্ঠানের নিয়োগে। কেন্দ্রের অনুমোদন ক্রমে বণ্ড বা ঋণপত্র বাজারে ছেড়ে ধান ও চাল সংগ্রহের টাকা সরকার সংগ্রহ করতে পারেন। প্রাথমিক অর্থ উক্ত সংস্থা বা ডি পি এজেন্টগণ বিনিয়োগ করবে। কেন্দ্র হতে প্রাপ্য অর্থ (যে পরিমাণ কেন্দ্র দিতে সক্ষম) ও রেশন বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে তা পরিশোধব্য। শুধু সরকারের গুদামে অবিলিকৃত মজুত অংশের দরুণ প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট কিস্তিতে credit voucher দিয়েও কাজ চালান যায়। এবং এই accommodation-এর দরুণ সুদ সহ সুবিধামত কিস্তিতে রেশন বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে পরিশোধ করা চলতে পারে। এই সুদের দরুণ বাড়তি খরচা অন্তর্ভুক্ত করেই চালের বিক্রয় মূল্য ধার্য করতে হবে। চাল খরিদের সময় আনুপাতিক নিম্ন মূল্য বাঁধা থাকলে খোলা বাজারে ৫০% চাল বিক্রয়ে চালকলগুলির পক্ষে ঐ লোকসানের ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে। যদিও খোলা বাজারের উপর এর সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। উৎপাদনে যতদিন ঘাটতি অবস্থা বজায় থাকবে ততদিন খোলা বাজারের দর এই চালকলগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। অবশ্য এরূপ ব্যবস্থা তখনই গ্রহণযোগ্য যখন ঋণপত্র বা কেন্দ্রীয় সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি যদি এমন

* এর ভূমিকা সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

ন্যাশন্যাল ডিল্যুক্স"

১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

Music & Sound (B.W.C.—10)

Post Box 1576, Delhi—6.

পর্যায়ে এসে পড়ে যে পশ্চিমবঙ্গকে আর ঘাটতি প্রদেশ বলা চলে না, তখন রেশন ব্যবস্থারও আর প্রয়োজন থাকবে না। আশা করা যায় উৎপাদনের বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে আর ২।৩ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে।

ঐচ্ছিক সংগ্রহের মরসুম সাধারণত নবেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত। এর পরও যে সব বড় চাষী ধান মজুত রাখবেন তাদের বছরের বাকী অংশের দরুণ খোরাকী, চাষের ও বীজ ধানের খরচা বাদে উদ্বৃত্ত ধান মজুত ভিত্তিক ৪৮ ঘন্টার দাবি নোটিশে আদায় করতে হবে। সঙ্গত কারণ ছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আটক করে তা সংগ্রহ করতে হবে। বড় বড় চাষীর ক্ষেত্রে সামান্য অসন্তোষ সৃষ্টি হলেও সরকারকে দৃঢ়হস্তে সে ঝুঁকি নিতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার কোন স্থান রাখা চলবে না। স্বল্প-মেয়াদী দাবির প্রধান সুবিধে এই যে, ধান অন্যত্র পাচার করা বা 'ম্যান্ডামাসে'র আশ্রয় গ্রহণ করা আয়াসসাধ্য নয়। এরূপ সংগ্রহে সরকারকে পূর্বেই আইনসভার মাধ্যমে যথারীতি আইন পাশ করিয়ে নিতে হবে।

পক্ষান্তরে লেভি নোটিশ দিয়েও ধান সংগ্রহ করা চলতে পারে। তবে তা বাস্তবানুগ হওয়া চাই। ধান রোপণের সময় হতেই সরেজমিনে তদন্ত দ্বারা আঞ্চলিক ভিত্তিতে চাষে নিযুক্ত, (চাষযোগ্য নয়) জমির পাকা দলিল তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। এতে প্রতি চাষীর মরসুম পাশাপাশি চাষীর মোট উৎপাদন, খোরাকী ইত্যাদির দরুণ ছাড় বাদে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ধানের হিসাব থাকবে। ১৯৫৩ সালে রেশন ব্যবস্থা রহিতের প্রাক্কালে এরূপ রেকর্ডের ভিত্তিতেই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে 'জমিভিত্তিক' নোটিশ জারীর যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা এক বা একাধিক কারণে কার্যকরী বা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের উপর নোটিশ জারী হয়েছে, কোন কোন চাষীর ক্ষেত্রে জমি পূর্বেই এক বা একাধিক ব্যক্তির হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে বা সেই জমির উপর কারখানা বা ঘর-বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু লেভি নোটিশের ভিত্তি যে ল্যান্ড রেকর্ড তা আদিম অবস্থাতেই শোভা পাচ্ছে। সরেজমিনে তদন্ত দ্বারা তৈরি রেকর্ডের ভিত্তির উপর অগ্রসর হলে একদিকে যেমন লেভি আদায় সহজসাধ্য হয়, ফাঁকের অভাবে ফাঁকি দেওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, অপরদিকে সাধারণ চাষী অযথা হয়রানি হতে রক্ষা পায়।

লেভি ছাড়াও 'রিকুইজিশন' দ্বারা মজুত ধান উদ্ধার করা ধান সংগ্রহের অন্যতম উপায়। দাবি, নোটিশ, লেভি ও রিকুইজিশন দ্বারা অন্ততপক্ষে দেড় দুই লাখ টন ধান সংগ্রহ অসম্ভব নয়। অবশ্য ঐচ্ছিক সংগ্রহের 'টারগেট' পূরণ না হলে এ সংখ্যা সে অনুপাতে ছাড়িয়েও যেতে পারে।

কর্ডন ব্যবস্থা

ধান পাচারের রন্ধ্রগুলি 'সিল' করা সংগ্রহ পরিকল্পনার সাথে অভিন্নভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত ধান পাকিস্তান ও অন্যত্র সংলগ্ন প্রদেশে মূল্যের তারতম্যে পাচার না হয় এজন্য পশ্চিমবঙ্গের সাথে উক্ত দেশের বর্ডারগুলি কঠোরভাবে 'সিল' করা দরকার। সাধারণ পুলিশী কর্ডন ব্যবস্থার সাথে রাত্রে গাড়ীচলাচলের বিধি-নিষেধ ও প্রয়োজনমত বিশেষ স্থানে ৩ মাইল বা ৫ মাইল বেল্টে গ্রামাঞ্চলের 'মডিফায়েড' রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা বলবৎ করা চলতে পারে। এতে ধান পাচারের রন্ধ্রপথও যেমন বন্ধ হয়, আবার নিয়োগের সুযোগও বাড়ে। এই বেল্টের অধীন চাষী বা মজুতদারের মজুত ধান খোরাকী ইত্যাদি বাদে 'রিকুইজিশন' দ্বারা সংগ্রহ করে সেখানেই পূর্ণ রেশনে বিতরণ করা সম্ভব। তা ছাড়া রেশন এলাকার চারদিকেও কর্ডন ব্যবস্থা বলবৎ রাখতে হবে।

আভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংগ্রহ দ্বারা পূর্ণ ও আংশিক রেশনের দাবি মিটিয়ে যতটুকু ঘাটতি থেকে যাবে তা কেন্দ্র হতে পূরণ করা চলতে পারে। আমার মনে হয় সংলগ্ন প্রদেশ উড়িষ্যার সহিত পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত থাকলে কেন্দ্রের নিকট হতে গম ছাড়া চাল সরবরাহের প্রয়োজন থাকবে না। এভাবে পশ্চিমবঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রথম ধাপে এগিয়ে যাবে। গমের ফলনও যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে হয়তো ২।৩ বছরের মধ্যে স্থানীয় গম দিয়েই দাবি পূরণ করা সম্ভব হবে। তখন স্বাবলম্বনের দ্বিতীয় ধাপে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে গেছে একথা নিশ্চয় করে বলা চলবে।

বণ্টন ব্যবস্থা

জেলার অভ্যন্তরে খাদ্য চলাচলের অবাধ ব্যবস্থা বজায় রেখে পূর্বে নির্ধারিত প্রয়োজনভিত্তিক হিসাবমত জেলা শাসকের পারমিটে লাইসেন্সপ্রাপ্ত নির্বাচিত ডিলারদের দ্বারা লেভিমুক্ত ৫০% চাল চালকলগুলি হতে ঘাটতি জেলায় সরবরাহ করে রিটেল ডিলার মারফৎ পূর্ণ রেশন এলাকা বহির্ভূত শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিতরণ করার পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা বলা চলে। এতে জনসাধারণের পক্ষে খোলা বাজারে ন্যায্য দরে চাল খরিদ অনায়াসসাধ্য হবে। ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত অঞ্চলে দরের স্বাভাবিক সমতা বজায় থাকার স্বাভাবিক ব্যবসায়ের হাওয়া সর্বত্রই সমান ভাবে বইবে। খোলা বাজারে চালের দর যতদিন পর্যন্ত সরকার নির্দিষ্ট রেশন এলাকার চালের দরের কাছাকাছি স্থিতিশীল থাকবে—ততদিন পর্যন্ত (অর্থাৎ যা সে মাস পর্যন্ত ধরা যেতে পারে) আংশিক রেশন অঞ্চলে সরকারকে চাল বিতরণের দায়িত্ব বহন করার প্রয়োজন হবে না। দরকারমত এখানেও ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু করে বণ্টন ব্যবস্থাকে আরোও সুদৃঢ় করা চলতে পারে।

জুন হতে অক্টোবর। নবেম্বর মাস পর্যন্ত এই ৫।৬ মাস (খোলা বাজারের চালের দর যখন স্বাভাবিক কারণেই ঊর্ধ্বগতির সম্ভাবনা) সরকারের মজুত ভাণ্ডার হতে রেশন কার্ড মারফৎ চাল বিতরণ করলে সরকারকে প্রকৃতপক্ষে ছয় মাসের বেশি আংশিক রেশনের দায় বহন করতে হয় না। পক্ষান্তরে উদ্বৃত্ত প্রদেশ হতে পারমিট দ্বারা সংগৃহীত ও লেভি প্রভৃতি দ্বারা আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ হতে মজুত চাল সরকারী ভাণ্ডারে জমা থাকায় সব সময়ই একটা শক্তিশালী মজুত ভাণ্ডার সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। তা ছাড়া আছে কেন্দ্র হতে আমদানীকৃত গম। এতে খোলা বাজারের চালের সম্ভাব্য ঊর্ধ্বগতিও স্তব্ধ হবে এবং তা সঙ্গত কারণেই নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবে না। কালোবাজারের সম্ভাবনার উপরও ইহা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার !
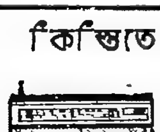
বিশ্ববিখ্যাত 'ন্যাশানাল ডিলাক্স' ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে এখন ভারতেও পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরে পাঠানো যায়। আবেদন করুন:
GIFT HOUSE
P.B. 1451, (W.B.C.) Delhi—6

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

১

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পনেরো ॥

মস্ত একটা য়্যুকিলিপ্‌টাস্‌ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্তে চি র কা ল একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে আসছেন বিশ্বভূষণ প্রায় আজ তিরিশ বছর। বাইশ বছর বয়সে মামার সঙ্গে এসেছিলেন দেশের বাড়ি থেকে। তখন তিনি পূর্ণ যুবক। আর এখন বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। পঁচিশ-তিরিশ বছর কাটিয়ে দিলেন ডুয়ার্সে। দেশ না ছেড়ে উপায় ছিল না।

কী একটা সূত্রে ঢুকে পড়েছিলেন দেশের গাঁয়ের একটা ব্যায়ামাগারে। শরীর গড়ার সাধনার। মনে ইচ্ছে ছিল, বড়ো হয়ে পালোয়ান হবেন। নাম ছড়িয়ে পড়বে চারধারে। বাঙালী শ্যামাকান্তের উত্তরাধিকার বহন করবেন নিজের জীবনে। পিতৃ-পিতামহের মুখ উজ্জ্বল করবেন। আত্মীয়-স্বজনদের বিস্মিত দৃষ্টি পড়বে তাঁর মুখে। সবাই তাঁর কথা বলাবলি করবে। পরবর্তী যুগের বংশধরদের গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় হবেন উনি। হয়ত তাঁর ফটো দেয়ালে শোভা পাবে।

একমনে খাটলে কি হয় না? সাধনার ফল মিলবে না জীবনে?

এই প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন তারকবাবুর কাছে। তারকবাবু নিজে ব্যায়ামবীর। গ্রামেই থাকেন। গ্রামেরই ছেলে। ব্যায়ামাগার খুলেছেন তিনি। উদ্দেশ্য ছেলেদের শুধু নয়, মেয়েদেরও সুশিক্ষিত করে তুলবেন। শরীরচর্চায় যদি তাদের ফেরান যায় তবেও দেশের তরুণসমাজের একটি হিল্লে হতে পারে। গ্রামের যুবকদের ক্লান্ত শীর্ণ অবসাদ-গ্রস্ত চেহারা ও মানসিক উদ্যমের অভাব ক্লিষ্ট করতে থাকে। মনে মনে ভাবতেন, কী করে তাদের সুস্থ করে তোলা যায়। সবল করা যায়।

এই কার্য কঠিন নয়। অথচ আজো পর্যন্ত গ্রামের ছেলেদের দৃষ্টি কেউ এদিকে ফেরাতে পারলেন না। যুবকসমাজই যে দেশের আশা-ভরসা। যা কিছু বলিষ্ঠতার আশ্রয়। তারাই কি শেষ পর্যন্ত বয়ে যাবে অগোচরে অনাদরে? রোগের পীড়নে, অভাবের চাপে, নৈরাশ্যের শোষণে তার থাকবে না স্বাস্থ্যের বিন্দুমাত্র সম্পদ।

সেই এক যুগ। তার অনেক আগে থেকেই দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। অগ্নিময় বাণী তাঁর জাতির অলস ধমনীতে সঞ্চার করেছিল প্রাণের অনন্য প্রেরণা। দেশপ্রেমের আবেগে উন্মুখ করে তুলেছিল দেশবাসীকে। আর দেশ ও ধর্মের মধ্যে তো কোন পার্থক্য ছিল না সেকালে। যার নাম দেশ, তাই ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দেশজননীরই পবিত্র মন্ত্র রচনা করেছিলেন।

তারকবাবু গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত। ছেলেরা যেত সেখানে বিকেলের দিকে। তারকবাবু প্রথম প্রথম থাকতেন। দু'টি-একটি ছেলেকে তখন তিনি গড়েপিটে মানুষ করে তুলেছেন। কী সুন্দর তাদের স্বাস্থ্য! বলিষ্ঠ মাংসপেশী। দেখলে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ব্যায়ামাগার ওরাই চালাচ্ছে তখন। তারকবাবু মাঝে মাঝে আসেন। দেখাশোনা করেন। কোন-কোনদিন বসে বসে দেখেন, ছেলেরা ডাম্বেল কষছে, মুগুর ভাঁজছে প্যারালাল বার করছে। মাঝে মাঝে কুস্তিও খেলা হচ্ছে।

একদিন প্রবল এক আবেগ নিয়ে বিশ্বভূষণ এসে উপস্থিত হলেন তারকবাবুর কাছে।

সে কতদিনের কথা। বাইশ বছর বয়সে ডুয়ার্সে আসেন মামার সঙ্গে। আটচল্লিশ বছর বয়স হল আজ। দু'-এক মাস কম বা বেশি হতে পারে। মাথার সামনের দিকে না-পাকলেও কানের দু'পাশে কিছু চুল পাক ধরেছে এরই মধ্যে। রুপোলী রঙ চকচক করে। বেশ কিছুদিন আগেই আয়নায় দাড়ি কামাতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন। বিশ্বাস হয় নি প্রথমে। এরই মধ্যে তাহলে বয়সের আসন পাকা হতে চলেছে।

জানালার ধারে বসে বসে ভাবেন বিশ্বভূষণ দাস। নিজের মনে। মস্ত য়্যুকিলিপ্‌টাস্‌ গাছটা দাঁড়িয়ে উঠেছে জানালার বাইরেই। আজ প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর দেখছেন গাছটাকে। দেখতে দেখতে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে গাছটা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে।

অবসর পেলে এই জানালার ধারেই এসে বসেন। পাশ দিয়ে গেছে চওড়া চকচকে অ্যাশফল্টের রাস্তা। নতুন যুগের রাজপথ ওটা। প্রথমে ছিল কাঁচা। গরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচর কোঁচর শব্দে ঘুম ভাঙত সকালে। হাটের দিনে যেত গরুর গাড়িগুলি। আর ধুলো উড়ত। সে কী ধুলো! তারপর এল দু'টি-একটি বাস। হাট-বাসগুলো রাজ্যিজোড়া জিনিসপত্র ও মানুষজন চাপিয়ে হাটে আসত। তাদের হাঁক-ডাক। মালপত্র। মুরগী-ছাগলও থাকত। আজ বদলে গেছে চেহারা। চকচকে রাস্তায় এখন চলে ঝকঝকে বাসগুলি। কত যাত্রী নিয়ে। শুধু আর হাটের বাস নয়। যাত্রীগাড়িগুলি চলে যাচ্ছে যাত্রীদের নিয়ে। বিশ্বভূষণ জানেন ওই রাস্তা গেছে ময়নাগুড়ির দিকে।

অনেকগুলি গাড়ি আসে দূরে দূরে থেকে। আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটা হয়ে বাড়ির সামনে দিয়েই যায়। কনডাক্টর দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ির দরজায়। মাঝে মাঝে যাত্রীদের ওঠা-নামা। টিকিট কেটে দিচ্ছে কনডাক্টর। স্টীয়ারিং ধরে বসে আছে ড্রাইভার। সামনের দিকে। গাড়ির ডায়নামো ধুক্‌ ধুক্‌ করছে।

মাঝে মাঝে আবার ফাঁকা। জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন বিশ্বভূষণ। একমনে। জানালার গরাদ দিয়ে মন উধাও হয়ে যায় অজানায়।

নিজেকে ভোলেন তিনি। এই মুহূর্তের নিজেকে। সবকিছু ভুলে দূর অতীতে ফিরে যান।

বাইশ বছর বয়সে এলেন মামার সঙ্গে। তারপর আরো পঁচিশ-তিরিশ বছর। একটানা কেটে গেল ডুয়ার্সে। সে-ডুয়ার্স আর নেই। নতুন কালের ডুয়ার্স আজ। যুগটাই পাল্টে গেছে। বাইরের পৃথিবীটা পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডুয়ার্সও গেছে বদলে। অতীতের ডুয়ার্স আজ স্বপ্ন।

কিন্তু আরো দূর অতীতের স্বপ্ন আছে। সে-দিনগুলি ডাকে হাতছানি দিয়ে। ডুয়ার্সে না এসে তাঁর উপায় ছিল না।

পনেরো-ষোল বছরের সরল কিশোর যুবক গিয়েছিলেন তারকবাবুর কাছে। স্পষ্ট মনে আছে আজো তারকবাবু বসেছিলেন তাঁর বাড়ির সামনে বাগানে। ফাল্গুন মাস সেটা। বাতাপী লেবুর ফুলের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ-বাতাসে। গন্ধটা যেন এখনো নাকে এসে লাগে। বাগানের মাটিতে ঝরে পড়েছে আম্র-মুকুল। গাছে গাছে গুনগুন করছে মৌমাছি।

তারকবাবু বাগানে ইজিচেয়ারে বসে একখানা ইংরেজি কেতাব পড়ছিলেন। তিনি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পায়ের শব্দে চমকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, কি খবর?

সারা মুখে রাজ্যের রক্ত ছলাৎ করে উঠে এসেছিল হঠাৎ। গলা কাঁপছিল বিধুভূষণের স্পষ্ট মনে আছে এখনো। কল্পনায় দেখতে পান আজো বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন। বেলা নটা-দশটা।

একটা বেতের মোড়া রাখা ছিল পাশেই। তারকবাবু বইখানা ভাঁজ করে কোলের উপর রাখতে রাখতে ছোট একটি কথা বলেছিলেন, বসো।

বসেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা। ইচ্ছের কথা। কিছুই গোপন না করে সব খুলে বলেছিলেন। যতক্ষণ কথা বলছিলেন, ততক্ষণ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলেন তারকবাবু। হাসি-খুশি মুখখানা তেমনি থাকল। বললেন, বেশ তো। খুব ভালো কথা। আজ বিকেলে এসো। আমি থাকব।

তারপর উঠে আসবার কালে নিঃশব্দে একটি প্রণাম করে এসেছিলেন বিধুভূষণ।

তারপর ভর্তি হয়ে গেলেন ব্যায়ামাগারে। সে আজ কতদিনের কথা। খুবই আগ্রহ নিয়ে সবকিছু শিখতে লাগলেন। কিন্তু তখনো অনেক কিছুই জানতে বাকি ছিল। ব্যায়ামাগারেই তাঁর প্রথম হাতেখড়ি হল দেশমন্ত্রে। আজো মনে পড়ে সে দিনটির কথা। যেদিন তারকবাবু নিজে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের শোবার ঘরে। বলেছিলেন দেশের পরাধীনতার কথা। আজো কানে বাজছে স্পষ্ট সুন্দর কথাগুলি : তুমি মনে রেখো বিধু। আমাদের কিছুই নিজের নয়। এই দেহও আমার একার নয়। আমার প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি কর্তব্যকর্ম প্রতিটি সাধনার পশ্চাতে রয়েছে সারা দেশের মানুষের দাবি। যে-দেশ পরাধীন থাকে, যে-দেশের বুকের পাঁজরে বুট-শুদ্ধ পা তুলে দিয়ে থাকে বিদেশী, সে-দেশের সন্তানের ব্যক্তিগত সুখ-আহ্লাদ বলতে কিছু থাকতে নেই। কঠোর সাধনার দ্বারা যে-দেহ তুমি গড়ে তুলেছ, মজবুত এই স্বাস্থ্য, আমি চাই তুমি দেশের জন্য উৎসর্গ করবে।

দেহের প্রতিটি শিরায়-উপশিরায় শরীরের প্রতি কোষে কোষে কথাগুলি বাজছিল বিধুভূষণের। আজো মনে পড়লে শরীরের রোম দাঁড়িয়ে উঠে বিস্ময়কর এক অনুভূতিতে। তারপর তিনি তারকবাবুর কথাগুলিই শিরো-ধার্য করে নামলেন মুক্তি-যজ্ঞের আন্দোলনে। ততদিনে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল গ্রামের সেই ব্যায়ামাগারের ভূমিকা। গীতা স্পর্শ করে শপথ নিতে হয়েছিল তাঁকে।

সে ঘোর ইংরাজ আমলের কথা। বাড়ির সকলের নিষেধ-সতর্কবাণী রক্ত-চক্ষু তুচ্ছ করে স্বাধীনতার আন্দোলনে গোপন সংগঠকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল তাঁকে। তার পরই একদিন শাসক ইংরাজের পরোয়ানা। গ্রামের পর গ্রাম দিনের পর দিন পালিয়ে ফিরতে হচ্ছিল তাঁকে। তারকবাবু আগেই জেলে গেছেন। অবশেষে আসল সেই দিন, যেদিন ক্লান্ত হলেও ভগ্নোদ্যম হন নি বিধুভূষণ। মামা তাঁকে বোঝালেন, এখন তোমার কিছুদিন এখান থেকে সরে পড়া ভালো। সরকারের চোখে ধুলি দিয়ে। তারপর সময় বুঝে আবার আসলেই চলবে।

মনে দ্বিধা ছিল তবু। এমন সময় একটি লোকের হাতে তারকবাবুর হাত-চিঠি। ছোট নির্দেশ ছিল, সংগঠনের প্রয়োজনে কিছুদিন গা-ঢাকা দাও। ধরা পড়লে চলবে না।

অবপরই মামার সঙ্গে ডুয়ার্সে পলায়ন। সেই প্রথম ডুয়ার্সে আসা। ডুয়ার্সের নাম অবশ্য আগেই শুনে-ছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে মামা পথে লুকিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে কুড়িগ্রাম-কাউনিয়া হয়ে রংপুর-লালমণির হাটের পথে ডুয়ার্সে আসলেন বিধুভূষণ। সদাশয় ইংরাজ সরকার এ ধারণা করতে পারে নি। তাই নিরাপদেই আসতে পারলেন। চোখ কচলে কচলে লাল করে ফেলে-ছিলেন বিধুভূষণ। কান্না চাপতে।

ফিরে যাওয়া আর তাঁর হয় নি। এখানেই রয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে মিশিয়ে দিতে লাগলেন এখানকার জন-স্রোতে। মামা ততদিনে সাহেব-বাগানে সাহেবের প্রিয় কর্মচারীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। তাঁর ছেলে-মেয়েরা বড়ো হচ্ছে।

ভাগ্নেকে একদিন তিনিই পথের সন্ধান দিতে চাইলেন, চাকরি যদি করিস, সাহেবকে বলে একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

না, মামাকে স্পষ্ট বলে দিলেন বিধুভূষণ। সেই দিনই ছাড়লেন মামার আশ্রয়। চলে এলেন এখানে। এ দেশের সরল প্রাণ সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে ততদিনে পরিচয় হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলেন তিনি, না, ঢের সময় ও সুযোগের হয়েছে অপচয়। দেশের রাজ-নৈতিক আন্দোলনের ধারাও ফিরে যাচ্ছে অন্যদিকে। ওদিকে যুদ্ধ অনেকদিনই বেধেছে। য়ুরোপের যুদ্ধের আঁচ স্পর্শ করছে আমাদের দেশকেও। কিছু কিছু গোরা সৈন্যদেরও এদিকে দেখা যেতে লাগল।

বিধুভূষণ ভাবলেন, এবারে তাঁকে কিছু কাজ করতে হবে। যেটুকু তাঁর পক্ষে সম্ভব। গড়ে তুললেন ছোট একটি স্কুল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে।

তারকবাবু, তোমাকে প্রণাম। পথের চোখ তুমিই খুলে দিয়েছ। মন দিয়ে ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাতে লাগলেন তিনি। যে-ঘরে থাকতেন, সেই ঘরেই খুললেন ইস্কুল। যে যা দিতে পারে তাইতেই চলে যাবে তাঁর একক জীবন।

চলেও গেছে ভগবানের দয়ায়। বয়স যে কোথা দিয়ে বেড়ে গেল জানতেও পারলেন না বিধুভূষণ। কিন্তু সেজন্য দুঃখ নেই তাঁর। সেদিনের তিল তিল সাধনা দিয়ে যে ইস্কুল গড়ে তুলেছিলেন, সেই ইস্কুল আজ কত বড় হল। কত ছেলে লেখা-পড়া করছে সেখানে। নতুন হেড মাস্টার এসেছেন। অনেক কজন মাস্টার। তিনি আছেন আজো তাঁর প্রাইমারী সেকশ্যন নিয়ে। বছর বছর আসে নতুন নতুন ছেলেরা। কচি কচি মুখ। ভবিষ্যতের আশা ওরা। এইসব শিশুতরুগুলি সঞ্জীবিত হবে ফুলে-ফলে।

জানালার ধারে বসে চুপচাপ চেয়ে থাকেন বিধুভূষণ। রাস্তার ওপাশেই খানিকটা জায়গা ফাঁকা। তার পরই

শালের চারার আবাদ। ছোট-ছোট শালের চারাগুলি। সরকারী বন-বিভাগের আবাদ। চারাগুলি ডগমগ করছে। ওইগুলি দাঁড়াবে বড়ো হয়ে। আকাশের রৌদ্রকে আহ্বান করে নেবে পাতার শিরা ও ডগায়।

এমনি করেই পুরান ভাঙে। নতুন গড়ে ওঠে। ছোট যারা তারা বড় হয়। ভাঙনের ফলেই তো নতুন সৃষ্টির আহ্বান। ডুয়ার্সের অতীত যা-ই হোক, মহান তার ভবিষ্যৎ। মহাকালের রথ চলেছে এগিয়ে। আজ চারদিক চকচকে। নতুন নতুন বাড়িঘর উঠছে। মানুষজন। নতুন ঘর-সংসারে ও আশা। একদিন অরণ্য ছিল এইখানে। মানুষের বসতি ছিল না। লোকের কাছে শুনেছেন। নিজেও দেখেছেন কিছু কিছু। বাঘ, গণ্ডার, হাতীর ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্ত থাকত। ঘরের মধ্যে কত রাত বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে নি। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রেখেছেন ঘরে।

একরাতে মাটির কলসী গড়িয়ে জল খেতে গিয়ে সাপের হাতে মারাই যাচ্ছিলেন। ভয়ংকর কোব্রাজাতীয় সাপ। এ অঞ্চলের ভাষায় বলে গোমো। ফোঁস্ করে উঠেছিল ফণা। লাফিয়ে সরে গিয়েছিলেন চকিতে। নেহাৎ ভাগ্যের জোর বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু সারা রাত ঘরে সাপ নিয়ে বসে কাটাতে হয়েছিল। বাইরে অন্ধকার রাত্রি। ছুটে বাইরে যাবার উপায় ছিল না।

সে-সব কথা মনে হয় মাঝে-মাঝে। ডুয়ার্সের দিন ফিরে গিয়েছে আজ। এসে পড়েছে কত মানুষ। জমির দাম বেড়ে গেল কত। তাঁকেও জমি নিতে বলেছিল কতজন। বলেছিল, কিছু অন্তত কিনে নিন মাস্টারমশাই। শুনে হেসেছিল বিধুভূষণ। না, জমি আর তিনি করবেন না। কী হবেই বা করে। তাঁর নিজের একটিমাত্র ত' জীবন। নিজের জন্য তিনি ভাবনা করেন না। দিন কেটে যাবেই।

শুধু মাঝে মাঝে তাঁর মন খারাপ হয়ে যায় কোনদিন। সেদিন হয়ত কাজ থাকে না। আপনমনে তিনি বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। বাজার-বন্দরের দিকে তিনি যান না। সেখানে তো শুধু মানুষের ভিড়। গাড়োয়ারী দোকান খুলে বসেছে। বিহারীর পানের দোকান। বড়ো বড়ো বাসগুলি এসে দাঁড়াচ্ছে। ব্যস্ত-সমস্ত যাত্রীরা। এখন শীত-দিন। ডুয়ার্সে প্রচণ্ড শীত। গরম পোষাক-পরিচ্ছদ যাত্রীদের। কোট-প্যান্ট জুতো-মোজা। কারোর বা গলায় মাফলার। বড় বড় হোটেল-রেস্টুরেণ্ট। যাত্রীরা সেখানে ভিড় করছে।

দেখি দুটো চমচম।

সিঙাড়া গরম হবে?

মালাইক্যারী?

রসমঞ্জরী এক প্লেট।

দুর্দম যাত্রীর চাহিদা। দোকানী ঘাড় তুলে কিছু করতে পারছে না। দুহাতে টাকা রাখতে হচ্ছে। খুচরো ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

কমলালেবুর দোকান। একটি ঝকঝকে ট্যাক্সী এসে লাগল ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের সামনে। আধাবুড়ো এক সাহেব। হাফ প্যাণ্ট পরণে। সঙ্গে যুবতী স্ত্রী। রঙকরা ঠোঁট। ড্রাইভার গাড়ি পার্ক করাচ্ছে।

শ্যা-র এবার একটা ফয়সলা হবেই মনে হচ্ছে। একজন যুবক বলল অন্যজনকে। বন্ধু মনে হচ্ছে দুজন।

অন্য বন্ধুটির উত্তর, রাজনীতিই খেলা দেশকে।

তাকিয়ে দেখেন বিধুভূষণ এক পলক। দ্রুত পাশ কাটাচ্ছেন।

এই নাকি স্বাধীনতা? এর জন্যেই জীবন দিয়েছিল বাঙালীর ছেলেরা?

রক্তের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ খেলাল। দ্রুত। এক মুহূর্ত। ভালো লাগল না। দেশ তো এগোচ্ছেই। চোখ বুজে থাকলে চলবে কেন? দ্যাখই না কেন ডুয়ার্সের দিকে তাকিয়ে। কত দ্রুত জাগছে ডুয়ার্স। পাশ ফেরা নয়, ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। পরক্ষণেই মনে হল, তবু যেন অসন্তুষ্টির কারণ আছে। কিন্তু যুবকটি বাংলাদেশের কথা বলছে কেন শুধু? কেন বলছে না ভারতবর্ষ? ক্ষুদিরামরা কি বাংলাদেশের কথা ভেবে জীবন দিয়েছিলেন শুধু? না, সারা ভারতবর্ষের জন্যে? অবশ্য, শাসনের কর্তৃত্বে বসে গায়ের জোরে আর শাসকরা তা স্বীকার করতে চায় না।

ইস্কুলবাড়ির মাঠের ধারে এসে গেলেন বিধুভূষণ। ওই ত' ঝক্ ঝক্ করছে নতুন ইস্কুলের টিনের চাল। কতদিনের স্বপ্ন। পলাশের ডাল একটা রাঙা হয়ে আছে। ডুয়ার্সে অনেক পলাশফুল ফোটে। খুঁজে খুঁজেই তিনিই এনেছিলেন চারাটা। বসিয়ে দিলেন ইস্কুলের একটা কোণায়। সেই গাছে ফুল ফুটেছে আজ। সরস্বতী পুজো এগিয়ে এল।

ছেলেবেলার কথা মনে করে মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর হঠাৎ। নিজের দেশ-বাড়ি-গাঁয়ের কথা মনে হয়। আর শত চেষ্টা করলেও ফিরে যেতে পারবেন না সেখানে। সে-পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইতিহাস। ছোটবেলায় সরস্বতী পুজোর দিনগুলোয় কত আনন্দ করতেন। খুঁজে খুঁজে পলাশ আনতে যেতেন বন্ধুদের সঙ্গে।

ধলেশ্বরীর তীরে তীরে আজো কি আছে সেই গ্রাম? নদীর উপর থেকে উঠে-আসা জোরালো হাওয়ায় কাঁপিয়ে দিচ্ছে নারকেল-সুপারী-তালগাছের মাথা। কামোজামের শাখাগুলি পুরান পাতা ঝরিয়ে একটু আগে-আগেই শ্যামলী হয়ে বসেছে। মনে পড়ছে, হ্যাজাক-আলো জ্বালিয়ে শিবু কুমোর শেষ রঙের তুলি বুলাচ্ছে সরস্বতী-প্রতিমায়।

স্যার!

চমকে ওঠেন বিধুভূষণ। ইস্কুল আজ বন্ধ। সরস্বতী পুজোর আগে আগে কাজকর্মের ছুটি। তাহলে কে ডাকে এখানে?

একটি ছেলে। হরিভূষণ মণ্ডল। এখানকার মেচদের ছেলে।

বিধুভূষণ বললেন, কি খবর হরি?

হরি বলল, এই ঘরে আমরা রিহার্সেল দিচ্ছি স্যার। আপনি আসুন।

বিধুভূষণ বলেন, অজয় এসে গেছে?

অজয় এখানকার বাংলার মাস্টার। বাড়ি কলকাতায়। থিয়েটারে তার ভীষণ ঝোঁক। কিন্তু আজ তো তার থাকার কথা নয়। স্কুলের কাজ নিয়ে জলপাইগুড়ি গেছে অজয়।

হরি বলল, এই ত' উনি এলেন। বাস থেকে নেমেই চলে এসেছেন।

তাই নাকি? বিধুভূষণ পলাশগাছটার দিকে একবার তাকাল। তারপর বলেন, তাহলে থিয়েটার তোমরা করবেই করবে? চলো দেখে আসি।

[ক্রমশ]

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ

ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

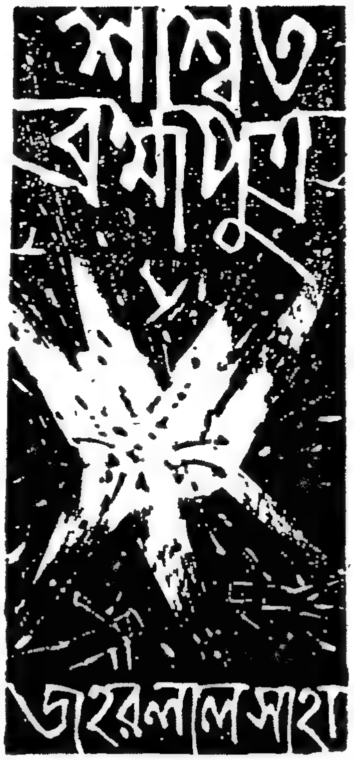

বনমালীর সহিত বেশ জমিয়া উঠিল। বনমালী মুসলমান। পূর্ববাঙলার লোক। কেমন করিয়া জমিল তাহাই বলিব।

পূর্ববাঙলাকে আলগা করিয়া দিয়া ভারত একটি পৃথক রাষ্ট্র হইয়াছে বটে, কিন্তু কলিকাতার মাল আসাম আসিতে পদ্মার প্রয়োজন। গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র—এই করিয়া পূর্বপ্রান্তে আসিতে হয়। দুই দেশে চুক্তি হইয়াছে ; জাহাজী চুক্তি। স্টিমার কোম্পানীর কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের লইতে হয়। বনমালী তেমনি একজন পাকিস্তানী——ভারতীয় কোম্পানীর কর্মচারী। বছরের ছ'মাস ভারতের নাগরিক, আর বাকী ছ'মাস পাকিস্তানের।

এবারের যাত্রায় জাহাজ গৌহাটী আসিয়া আর ফিরিতে পারিল না। কাশ্মীর লইয়া দুই দেশে মারামারি, গোলাগুলী, অবশেষে বোমাবোমি আরম্ভ হইল সীমানায় কাঁটা পড়িল। ব্রহ্মপুত্রের জল ঠিকই পদ্মায় মিশিত, কিন্তু তাহার উপর যাহারা ভাসিয়া আসিত তাহারা আটকা পড়িল। বনমালী দেশে ফিরিতে পারিল না।

গৌহাটীর জাহাজঘাটায় বেশ কয়েকটি জাহাজ অবিশ্রান্ত ব্রহ্মপুত্রের এক কিনারে বসিয়া উদাস হইয়া ভাবিত কবে মোটা কাছির গিঁট আলগা করিয়া আবার এই স্রোতে ভাসিয়া পড়িবে। হাতে অখণ্ড অবসর। বনমালীরা কর্মহীন দুশ্চিন্তার মধ্যে সুদীর্ঘ সময় ঘুমে গল্পে কাটাইতে লাগিল।

আমাদেরও বিরাট অবসর। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে স্কুল-কলেজ বন্ধ। আমরা লাহোরের বিদেশীগণকে সমুচিত শাস্তি দিতে নিয়মিত লেফট্-রাইট আরম্ভ করিলাম। সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ ছুটি পাইলেন আর খবরের কাগজ লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। রেডিওতে দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল ইসলাম চলিলেন। দুই সেন্টারেই দুর্গম গিরি কান্তার মরুতে ঢাকা ও কলিকাতাতে ভুল হইত। আর দিনে-রাতে সাইরেনের থামিয়া থামিয়া আর্তচিৎকারে ঘরসুদ্ধলোক তক্তাপোষের তলে চোর সাজিত। বন্ধুদের সাথে রাশিয়া-আমেরিকার আলোচনা করিতে করিতে এই শীতের বিকালে নদীর পাড়ে চলিয়া আসিতাম। একদিন কি খেয়াল হইল, সকলে মিলিয়া নোঙর-করা জাহাজগুলির একটাতে উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। শীতের বেলা, অল্পেই শেষ হইয়া যায়। পশ্চিমের আকাশ লাল করিয়া কামাখ্যা পাহাড়ে আসিয়া সূর্যদেব ডুবি ডুবি করিতেছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের মৃদু ঢেউ-এ সে বর্ণালী ভাসিয়া হাসিয়া জাহাজের কোলে ঠাক খাইতেছিল। উমানন্দের সহজ গাছের ছায়ায় পাখি ও বনকুহু ডাক জুড়িয়া দিয়াছিল। আমরা নিচে ফিরিয়া চলিলাম।

এই নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে জাহাজবাসীদের নিস্তব্ধতা বেমানান নহে। কিন্তু তবু যেন কেমন লাগিতেছিল। যেন কয়েকজন ছিল সবাই বারান্দার কাছে চাদর মুড়িয়া বসিয়া কি বলিতেছিল. মুখ বিমর্ষ। আমাদের কে একজন চুপিচুপি বলিল.

'মিঞা বিবির কথা ভাবছে রে।'

অন্যজন বাধা দিল, 'বাঃ, এসময়ে আর সে ভাবার সময় কই ?'

কেউ বলিল, 'আহা, বল্, বেচারির কি দোষ ? কাশ্মীর তো আর সে এ্যাটাক করে নি ?'

প্রথমজন খপ্ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'রায়ট তো করতে পারে ?'

কেউ-ই আর বেশিদূর আগাইল না। আমাকে নীরব দেখিয়া সবারই চোখ পড়িল। আমি ঘাড় উঠাইয়া অদূরে একটা লোক দেখাইয়া দিলাম।

লোকটির উপর আমার চোখ পড়ার কারণ ছিল। বাঁশের বেতি দিয়া সে মানুষের মত কষিয়া কি যেন একটা বানাইতেছিল। বন্ধু বলিল.

'কি বানায় রে ?'

কথাটি অল্প জোরেই হইয়াছিল। শুনিতেই লোকটি চকিত হইয়া আমার দিকে চাহিল.

নাম্বার টেন সিগারেটের পরম তৃপ্তি-দায়কতার মূলে
মাত্র একটি সমীচীন কারণ ঃ
নিবিড় স্বাদে ও গন্ধে পরিপূর্ণ নাম্বার টেন
ভারতের সমশ্রেণীয় সিগারেটের মধ্যে
সবচেয়ে বেশী মিঠে আমেজ জোগায়—মধুর আবেশ জাগায়।
তাই তো হওয়ার কথা—
নাম্বার টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া তামাক
—যা সংগ্রহ, পরিপক্ক এবং ব্লেণ্ড করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজ্ঞ তামাক বিশেষজ্ঞরা।
মিঠে আমেজের বিলাস...
নাম্বার টেনের
পরিচয়
টাকার মূল্যের পূর্ণ মর্যাদা দেয়
NUMBER
TEN
VIRGINIA

'অ আপনেরা বাঙালী, হেই কথা কন; আমি মনে করছি অন্য কিছু নি? আহেন আহেন, বন।'

আমরা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করিলাম। সে বলিল,

'দেহেন দেশের মানুষ বড় বেশি নাই। কথাবার্তা কার লগে কমু—কন?'

কাছে গিয়া তাহার বয়স প্রৌঢ়ই মনে হইল, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, দোহারা চেহারা, পরনে লুঙি, গায়ে একটা তাঁতের চাদর। জিজ্ঞাসা করিলাম,

'কি বানাচ্ছ?'

হাসিয়া বলিল, 'এই আর কি করমু; বইয়া থাকতে ভাল লাগে না; একটা হাজি বানাইতাছি।'

এতক্ষণে দেখিলাম, বাঁশের বেতি দিয়া তৈরি একটা ছোট মানুষের মূর্তি। আর মূর্তিটার হাতে একটা ফুলের সাজি। সে আর একটি বেতি ঘুরাইয়া দিল। আমি উপুড় হইয়া দেখিতে চলিয়াছি, পিছন হইতে তাড়া আসিল,

'চল বাড়ি, সন্ধ্যে হয়ে এল; ব্ল্যাক আউট; দেরি হলে—পুজো আছে।'

আমি কি বলিতে চাহিয়াছিলাম; লোকটি বলিল, 'কি কইলেন বাবু, যাই-বেন গো? হ' কতা ত' ঠিকই—আন্ধাইর অইলে পুলিশে ধরব। এই ধরেন কাইলকা আমারেই......' বলিয়া সে থামিয়া গেল।

বুঝিলাম কাল তাহাকে পথে ধরিয়া টানা-হেঁচড়া করিয়াছে। সরকারী ঘোষণা, পাকিস্তানী গুপ্তচর ধরিয়া দিলে পুরস্কার মিলিবে। হুজুগের নাচে ভাল-মন্দ নাই, মুসলমান পাইলেই হইল, লুঙি-দাড়ি দেখিলেই তার যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হয়। পুলিশের ভয় দেখানো হয়। বুঝি-লাম সে তাদের পাল্লায় পড়িয়াছিল।

চারিদিকের লোকগুলি কেমন সন্দেহের চোখে চাহিয়া আছে। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় মুহূর্তমাত্র নীরবতা যে কত দুঃসহ তা সে অবস্থায় ছাড়া আর বোঝান যায় না। আমি বললাম,

'তবে যাই।'

পাশের লোকগুলির মধ্যে একজন ঢাকাই গলায় বলিয়া উঠিল,

'ঐ বনমালী, বাবুরে বইবার দিলি না হালায়?'

শিল্পী তাহার হাতের বেতি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অপরাধীর মত কহিল,

'হ বাবু, বন বন, দেখ আমি কি, বাবুরে বইত কইলাম না!'—

বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা সুন্দর কাজ-করা বেতের মোড়া বাহির করিয়া আনিল।

আমি কহিলাম, 'না, আজ যাই।'

বনমালী আসিয়া আমার সামনে হাসিয়া কহিল, 'কিছু মনে কইরবেন না, কাইলকা আইবেন; আইবেন ত'? আপনেগ লগে কতা কইতাম মন চায়। বাবু আপনেগ বাড়ি কোন্ ঠাঁই আছিল?'

—ঢাকা।

ঢাহা? ঢাহা কোন্ ঠাঁই কন ত'? আমগ বাড়ি অত' ঢাহা।

দেখিলাম মুহূর্ত মধ্যে বনমালীর চোখে-মুখে বিদ্যুতের মত হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল। বলিলাম,

'পাঁচদোনা'।

—ও পাঁচদোনায়? হা খোদা, দ্যাশের মানুষ! আমগ কত কাছের!

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহার গ্রাম মনোহরদী। মনোহরদী পাঁচ-দোনার পাঁচ মাইল উত্তরে। বড়জেঠুর নাম করিতেই বনমালী লাফাইয়া উঠিল,

'গাঙ্গুলীবাড়ির কথা কইতাছেন না?'

—হ্যাঁ, তুমি চেন কেমন করে?

—হায় আল্লা, কি কমু, এই গাঙ্গুলী-বাড়ি......

বন্ধুরা টানিয়া বলিল, 'তুই এখানে থাকবি ত' থাক, আমরা যাই।'

বনমালীকে কহিলাম, 'আচ্ছা ভাই, কাল আসব তাহলে।'

বনমালী কপালে হাত ঠেকাইল, 'সেলাম বাবু, আইবেন কিন্তু।'

—নিশ্চয়ই আসব।

এই বনমালীর কথাই বলিতেছিলাম।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

অবসরশ্রান্ত মন কিছু একটা লইয়া থাকিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বহুদিন পর ইচ্ছা ও অবসর আমাকে পার্কে টানিয়া লইয়া চলিল। অনেকদিন এদিকে আসি নাই। আজ যাইতেই বহু পরিচিত একটা পড়োবাড়ির মতো দূর্বাঘাস জমিয়া-উঠা, ঝরা-পাতার আস্তরণে উদ্যানকে আর উদ্যান মনে হইল না। শীতে ফুলগুলি কোঁকড়া হইয়া আছে। বোমার ভয়ে মালী আসাম ছাড়িয়া বিহারের ছাতুধরা মাটিতে তল্পি গুটাইয়াছে। আর তাহার অভাবে পূর্ব-লালিত বাগানখানা পিতৃহীন অসহায় দিন কাটাইতেছে।

লোক নাই। অবসর কাটিতে চাহে না।

নির্জন অবসর কাটিতে ছিল না বলিয়াই যে জাহাজঘাটার দিকে চলিলাম এমন নহে। বরং জাহাজঘাটার দিকে যাইতেছিলাম না বলিয়াই বোধহয় সময় কাটিতে চাহিতেছিল না। বনমালীর জাহাজের কাছিটি আমার সাথে বাঁধা ছিল না ঠিক। যদি তাই হইত তবে সে রশি যত শক্তই হোক ছিঁড়িতে পারিতাম। কিন্তু যাহা আমাকে বাঁধিয়াছিল তাহা ছিঁড়িবার নহে, কাটিবার নহে।

আমি নদীতীরে আসিলাম।

বনমালীদের জাহাজে উঠার পথ পাই-লাম না। যে দুহাত শত লম্বা তক্তা ফেলিয়া বাঁশের সাঁকোর সাথে বাঁধা হইয়াছিল সেগুলি পাটাতনের উপর টানিয়া লওয়া হইয়াছে। নীরব দুপুরে আসা-যাওয়া নাই। বোধহয় তাই। আমার ও জাহাজের মাঝখানে কয়েক হাতের জল লইয়া ব্রহ্ম-পুত্র চমৎকার ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

কী করিব ভাবিতেছিলাম। দুপুরের অলস প্রকৃতি শীতের আমেজে বালুর চরে বেলাশেষের হলুদ রোদ মাখাইয়া আসন্ন-মৃত্যু কন্যার মত সোহাগ করিতেছিলেন। ছোট ছোট ঢেউগুলি বঙ্কুরেখার মত হাসিতে হাসিতে আসিয়া পাড়ে, ছোট ঘাসের কোলে টুকরা টুকরা হইয়া মিশিয়া যাইতেছিল।

জাহাজের লোকজন দিবানিদ্রায়; সাড়া-শব্দ পাইলাম না। ফিরিব ফিরিব করিতে-ছিলাম; হঠাৎ ডাক শুনিলাম,

'আরে বাবু নি? আইয়েন আইয়েন। হেইদিন কইয়া গেলেন, আর ত' মাইনষের লগে দেখা নাই।......'

চাহিয়া দেখিলাম বনমালী তর তর করিয়া নামিয়া আসিতেছে। কাঠ দুইটা ধাক্কা দিয়া দিতেই আমি হাত বাড়াইয়া সাঁকোতে জুড়িয়া দিলাম। এতক্ষণে কয়-হাত জলের উপর যে সরু রাস্তাটি হইল, আমি নির্বিঘ্নে সেই ক্ষুদ্র সেতুটি দিয়া পাটাতনে উঠিয়া আসিলাম।

বনমালীর সহিত জমিয়া উঠিল। প্রতি-দিন নিয়মিত তাহার বেতের ঝুড়িটি লইয়া আসিয়া বসিত। কখনও কখনও হুঁকাটিতে জল ভরিয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখিত। মোবারক কল্কিতে আগুন দিয়া কিছুক্ষণ টানিয়া ধরাইয়া দিত। কথার ফাঁকে ফাঁকে বনমালী তাহাতে টান মারিয়া ধোঁয়া ছাড়িত। বেত ঘুরানি ও গল্প চলিত একসাথে। কখনও কখনও বনমালী আমার জন্য মকাই-জোয়ার পোড়াইয়া রাখিত। কতকালের কথা যেন আমাদের জমা ছিল। গাঙ্গুলীরা চলিয়া আসার পর গ্রামের স্কুলঘরটি এতদিনে আবার নতুন করিয়া হইয়াছে। মাড়োয়ারী হুকুম লালচান তাহার দোকান বন্ধ করিয়া হিন্দুস্থান চলিয়া আসিয়াছে। আরো কত কি। ঘরের, বাইরের। একান্ত ব্যক্তিগত, সামাজিক; কখনও বা পরামর্শ,—যেমন বাড়ির মুরগী কয়টি বেচিয়া একটা গাই-বাছুর কিনিলে কেমন হয়; আর নসুরের মার জন্য আসাম থেকে একটা কাপড় কিনিতে হইবে। নসুরের কথা বলিতে বলিতে সে অনেক সময় চুপ করিয়া যাইত। অন্যমনস্ক উদাসদৃষ্টিতে উমানন্দের সবুজ পাতায়-ছাওয়া চূড়াটির দিকে তাহাকে অনেকদিন চাহিতে দেখিয়াছি। নসুর তাহার ছেলে। বাড়িতে

থাকে। মোট্রিক পড়াশুনা করিয়াছে। বয়স আমার চেয়ে কিছু বড়। এই ত' কয়দিন হইল সাদি করিয়াছে। বউ নসুরের চাচারই মেয়ে। স্বভাবে মাটি। দেখিতে সোনার মত। বনমালীর সাথে আমার বয়সী একটা ছেলে আসিয়াছে। নাম মোবারক। তার ও নসুরের বিবাহ একদিনেই হইয়াছে। বনমালীর মেয়ের ঘরের নাতনীর সাথে। বনমালী সাহেবের কাছে বলিয়া-কহিয়া মোবারককে একটা চাকুরী দিয়াছে। জাহাজে জাহাজে ঘুরিয়া দেশ দেখার বড় সখ। এমনি সব কথা। আমাদের বাড়ির কথা বলিতে বলিতে বনমালী উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। বাবার জেঠামশাই অর্থাৎ আমার বড়দাদু ছিলেন কবির সরদার। তাহার ঢুলী ছিল যাদব বাদ্যকর। একবার পুজোর কবির লড়াইয়ে কবিতে কবিতে যেমন লাগিয়া গিয়াছিল, ঢুলীতে ঢুলীতেও তেমনি লাগিয়া গিয়াছিল। যাদব বাদ্যকর ঢোলে রামনাম তুলিতে পারিত। আমাদের বনমালী সে সভায় কাঁসি বাজাইতে গিয়াছিল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। বনমালীও জাতিতে বাদ্যকর মুসলমান। যাদবের আত্মীয়। সেই সূত্রেই তাহার সে সভায় যাওয়ার সৌভাগ্য। সেই দিন মোহিত গাঙ্গুলী অর্থাৎ আমার দাদামশাই যেভাবে পাল্টা কবিকে জখম করিয়াছিলেন তাহা কেউ কোনোদিন ভুলিবে না। বহিরাগত কবি দাদামশায়ের কাছে তাহার বাদ্যসরঞ্জাম হারিয়া গিয়াছিল। দাদু কিন্তু সহৃদয়ভাবে এগুলি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই গল্পটি মার মুখেও আগে শুনিয়াছি। বনমালী বলিল,

'বাবু, আপনেরাও নাই, পূজাপালী বন্ধ, আমগ ঢাক ভাইঙ্গা গেছে। আমরা অখন পূর্বপুরুষের খোল ছাইড়্যা নদীর কূলে ফিরি।'

এমনি করিয়াই আমাদের অনেকগুলি দুপুর ও বিকাল কাটিতেছিল। আর যথারীতি যুদ্ধেরও থামিবার কোন ব্যবস্থা দেখা যাইতেছিল না।

একদিন একটা কাণ্ড হইয়া গেল।

বাহিরে থাকিতেই মনে হইয়াছিল একটা কিছু ঘটিয়া থাকিতে পারে। উঠিয়া দেখিলাম, সবাই মোবারককে লইয়া টানা-হেঁচড়া আরম্ভ করিয়াছে, সাধাসাধি করিতেছে, আর মোবারক বারবারই ঠেলিয়া দিতেছে,

'আমি খামু না, আমার ভাল লাগে না। তোরা খাগিয়া।'

—এমনে না খাইলে কেমুন অইব। গতর খারাপ অইলে কেমুন করমু বিদেশ হ'—

বলিতে বলিতে বনমালী পিছন ফিরিয়া চাহিতেই আমার উপর চোখ পড়িল। সে মুচকি হাসিয়া কহিল,

'আইচ্ছা কন্ ত বাবু, আমার লগে রাগ কল্লে কি অইব। আমি কি তরে আটকাইয়্যা রাখছি? বউ-এর লাইগ্যা পরাণ পুড়ে ত' আইছিলি ক্যান্?'

মোবারক লাফাইয়া উঠিয়া রাগে কাঁদিয়া ফেলিল,

'হ' তোমারে কইছে; আমার পেটটা বিশ করতাছে, আমি খামু কেমনে?'

বনমালী ও সবাই হাসিয়া উঠিল,

'অখন বুঝি পেট বিশ করতাছে? ওঠ ওঠ, খাবি আয়।'

মোবারকের মুখ লাল হইয়া গিয়াছে। বন্ধুদের হাতে আর জোর করিল না। সবাই চলিয়া গেলে দেখিলাম, বনমালী চাদরের খোঁট দিয়ে চোখ মুছিতেছে,

'বাবু, যুদ্ধ কি থামব না? কন ত' কি করি? এই পোলাডারে কেমুন কইর‍্যা বুঝাই? বাড়িতে যে এই রকম আর একটা দিন চাইয়্যা চাইয়্যা মরতাছে?'

একথার উত্তর হয়ত দেওয়া যাইত। বলিতে পারিতাম রাশিয়া শাস্ত্রী ও আয়ুবখাঁকে যুদ্ধ থামাইতে চিঠি দিয়াছে। শীঘ্রই যুদ্ধ থামার আশ্বাস দিলে মিথ্যা বলা হইত না। কিন্তু এ সবই মূল্যহীন মনে হইল। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বনমালী নামাজ পড়িতে গেল।

তারপর অনেক কথা। সেদিন রাত করিয়াই ফিরিলাম।

পরদিন যথারীতি জাহাজঘাটার দিকে রওনা হইলাম।

বনমালীদের জাহাজটা আজ নিতান্তই নীরব মনে হইতেছিল। অন্যদিনের মত ক্ষুদ্র কাঠের পুলটি পার হইতেছিলাম। হঠাৎ তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত বনমালীর আর্তস্বর আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিকে নিশ্চল করিয়া দিল।

উপরে উঠিয়া দেখিলাম বনমালী দুই হাতে ভাঁজ-করা একটা পত্রিকা দিয়া মুখ ঢাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে অন্যেরা দাঁড়াইয়া ছিল। মোবারকের চোখে জল। আমাকে দেখিয়া সে-ও হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিতেই তাহাদের একজন অনেক কথায় যে ঘটনাটি বলিল তাহা এই ঃ

কিছুক্ষণ আগে এই পত্রিকাখানিতে ফটোসহ বনমালীর পুত্র নসুরের মৃত্যুসংবাদ তাহাদের সাহেবের চোখে পড়ে। সাহেব নসুরের কথা জানিত। তাহাদের সবাইকে ডাকিয়া চুপিচুপি এই খবরটি দিয়াছিল। কেমন করিয়া মোবারক তাহা টের পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। অব বনমালীর কাছে এই সংবাদ চাপা থাকে নাই।

দৈনিক কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিলাম প্রথম পৃষ্ঠায় তিনিটি পাশপোর্ট-সাইজ ফটো। একটির নিচে লেখা 'নসুর মিঞা'। ফটোর পাশে তাহার ডায়েরীর এক পৃষ্ঠার ছবি। খবরে লেখা "তিনজন পাকিস্তানী প্যারাট্রুপার্সের মৃত্যু।" ফটোর মুখটি বনমালীর চোখের জলে ভিজিয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম। বলিতে পারিতাম, 'এ নসুর বনমালীর ছেলে না-ও হতে পারে।' কিন্তু যেকথা আমাকে বুঝাইতে পারিতেছিলাম না তাহা দিয়া পুত্রহীন পিতাকে অবিশ্বস্ত সান্ত্বনা দিতে আমার মন কিছুতেই সায় দিল না। আশ্চর্য হইলাম, তাহার ছেলে যে মিলিটারীতে কাজ করে একথা বনমালী ত' আগে বলে নাই!

লোকটি বলিল, 'বাবু আপনেরে এইসব কতা কইতে আমরাই বারণ করছিলাম।'

বনমালী উঠিয়া আসিয়া আমাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, 'বাবু গো কেনে আমার এমুন হইল গো, আমার নসুর....।'

এতক্ষণে বুঝিতে বাকী রহিল না, কেন বনমালী নসুরের কথা বলিতে বলিতে থামিয়া যাইত, আর সশঙ্কচিত্ত পিতা হিন্দুর দেবতার পানে চাহিয়া উদাস হইয়া যাইত।

সূর্য তখন পশ্চিমে লাল মেঘের সিঁদুর আঁকিয়া পাড়ি জমাইয়াছে মাত্র। কেউ টুঁ-শব্দটি করিতেছে না। এক অদৃশ্য তুলিকারের আঁচড়ের মত বনমালীকে ঘিরিয়া আমরা অসহায় মানুষগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। সান্ত্বনা বিড়ম্বনা মাত্র। চাহিয়া দেখিলাম, ব্রহ্মপুত্রের অস্থির জলস্রোত উমানন্দের দ্বীপখানি ঘিরিয়া পশ্চিমদিকে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। সেই স্রোতে কয়েকটি কচুরীপানার ফুল পাল মেলিয়াছে। দিনশেষের ডাকে পাখিরা যে যাহার কুলায়ে ফিরিয়া যাইতেছে।

আমার চোখের সামনে বনমালীর গ্রামখানি ভাসিয়া উঠিল। গ্রামের পাশে ব্রহ্মপুত্রের এক শীর্ণ শাখা। তারই পাড়ে পাড়ে কড়াইশুঁটির ক্ষেত। সবুজ আলের উপর দিয়া সদ্যবিবাহিতা দুইটি প্রোষিতভর্তৃকা পড়ো-বেলায় নদীতে জলকে চলিয়াছে। তাহারা কি বুঝিবে যে তাহাদেরই পরম শুভাকাঙ্ক্ষী এক বৃদ্ধের কান্না সে গাঙের ক্ষুদ্র জলধারার বুকে বৃদ্ধ ব্রহ্মপুত্রের স্পর্শে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে?

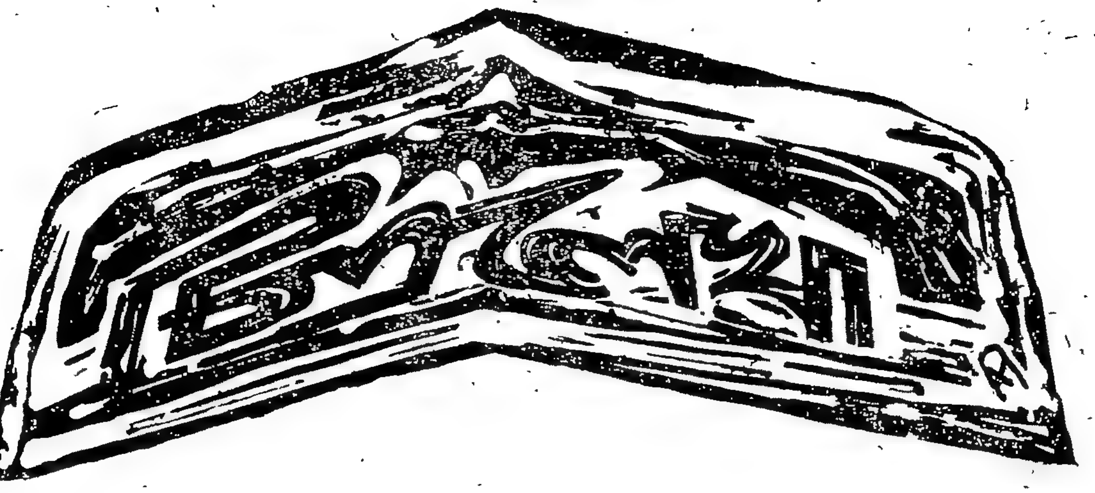

শিল্পী ও সমাজ

নগর কলকাতা ও তার শহরতলীর সীমার মধ্যে এদিক-ওদিক সুকুমার কলার প্রদর্শনীর আয়োজন করার রেওয়াজ আজ এক প্রচলিত ফ্যাসান। সাহিত্যমেলা বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আঙিনায়, নতুবা পুজো-প্যাণ্ডেলের আশেপাশে এমন প্রদর্শনীর আয়োজন বেশ কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে। সম্প্রতি মুক্তমেলা, চন্দ্রিকা-মেলার ধুয়ো ধরে এক শিল্পমেলার আযোজনও হয়েছিল নগর কলকাতার সেরা বাজারের এক কোণে। এখন শোনা যাচ্ছে যে, এ বছরের শেষ থেকে কলকাতার পৌর নিগম শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়িয়ে থাকা পার্কগুলিতে এমন প্রদর্শনীর আয়োজন করে নাগরিকদের মধ্যে শিল্পরস বিতরণের দায়িত্ব পালন করবেন। পৌর নিগমের স্বভাবসিদ্ধ বহু অকাজ-কুকাজের মধ্যে এমন সদিচ্ছা শুভ সম্ভাবনার হদিশ দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে প্রথমেই যে কথা মনে আসে তা হলো আজকের কলাজীবী ব্যক্তিদের মধ্যে যে সরাসরি আমদানির মোহ, এবং সহজিয়া পন্থায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে তার আবশ্যিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ কি জরুরী হয়ে ওঠে নি।

পাশ্চাত্যে প্রচলিত সমকালীন চিত্র আন্দোলনের অবশ্য প্রয়োজনীয় অনুশীলন, অনুধাবন, পরীক্ষা, নিরীক্ষার অশেষ ধৈর্যপূর্ণ পন্থা ও বহু ক্লেশ অর্জিত বিচক্ষণতা সংগ্রহের জন্য এদেশে, আজকের নবীন শিল্পিকুল যথাযোগ্য সময় দিতে নারাজ। পশ্চিম দেশ ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে পরপর দুটি মহাযুদ্ধ-বিধ্বস্ত মানুষের বিপর্যস্ত মন আজ দিশেহারা, আত্মপ্রত্যয়হীন। সেই সন্দিগ্ধমনা মানুষের কাছে আজ আত্ম-বিশ্বাসের পুনর্বাসনই সবচেয়ে কামাবস্তু। তারই সন্ধানে আজ পাশ্চাত্যের নবীন যুবা প্রাচ্যের দিক-বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আত্মপ্রত্যয়ের হারিয়ে যাওয়া পরশমণির খোঁজে—বীট, মড ও হিপির বেশে। সিদ্ধি, গাঁজা, মারিজুয়ানা, এল এস ডি'র মধ্যে যেমন আজ তারা আত্ম-বিশ্বাসকে খুঁজে ফিরছে তেমনি অন্তর্মুখী অবচেতন মনের আন্দাজী আভাসকে ধরে নিয়ে তার মধ্যেও খুঁজে ফিরছে হারিয়ে যাওয়া আত্মপ্রত্যয়কে।

আত্মজিজ্ঞাসাই মানুষকে মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে বিচিত্র ও বিভিন্ন করেছে। আত্মজিজ্ঞাসাই মানুষকে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি সুকুমার কলার বৃত্তিগুলি দিয়েছে। তাই যথোচিত আত্মজিজ্ঞাসাই মানুষকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসার ভান করে আত্মপরিতৃপ্তির অসামাজিকতা অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে পৌঁছে দেবে দিশেহারা সমকালীন মানুষকে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় আমাদের খুঁজতেই হবে।

আজকের এই নেশাগ্রস্ত পশ্চিমী মনের বহুরূপী প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তার বীভৎস কল্পনা, রচনা ও জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। তার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবক্ষয়ী বিমূর্ত চিত্র-ভাস্কর্য রচনায়। অন্তর্মুখী অবচেতন মনের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে দর্শনগ্রাহ্য শিল্প-মাধ্যমকে বিমূর্ত কলার আদল দিয়ে যে কিম্ভূত রচনা ওঁরা ওদেশে করে চলেছেন, যন্ত্র-যুগের তুঙ্গাশ্রয়ী ওদেশে আজ তার বিধ্বংসী রূপ অনুভব করা সম্ভব না হলেও কৃষিজীবী আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষে তা অতি সুস্পষ্ট।

মন বিমূর্ত বস্তু তাই দর্শনগ্রাহ্য নয়। মানুষের কাছে মানব মন যখনই যতটুকু ধরা দিয়েছে তা মানুষের চিন্তা-শীল মনের আভাস ধরেই। পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার আধারে মানব মন সংগঠিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। মানব সভ্যতার সম্পদগুলি যথা দর্শন, বিজ্ঞান, কলা বস্তুর মধ্য দিয়েই মনের হদিশ পাওয়া যায়। সমকালীন মানব মনের পরিধি ও পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব হয়। মনের মত অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে যদি আবার অন্তর্মুখী বহির্মুখী প্রভৃতি অংশে বিভক্ত করে ধরা হয়, এবং সেই অজানা অন্তর্মুখী মনের গভীর অন্তর্দেশে বিগত বহুযুগের মানব বিবর্তনের অংশীদার আজকের মানুষ যদি সত্যই কিছু সঞ্চয় করে থেকে থাকে তাহলে সেই নিরাকার, কল্পনাতীত, নিষ্প্রাণ মনের দর্শনগ্রাহ্য প্রকাশ কি করে সম্ভব? কলা বস্তুর প্রকাশ মাধ্যমগুলি যেমন রঙ, তুলি, পাথর, ছেনি, হাতুড়ী, কাগজ, কাপড়, এ সবই দর্শনগ্রাহ্য এবং প্রত্যক্ষ বস্তু। তাই নিরাকার, অজ্ঞাত অন্তর্মুখী অবচেতনের আন্দাজ আকার এই প্রকাশ মাধ্যমগুলির মধ্যে আরম্ভ সম্ভব নয়।

এ মীমাংসা মেনে নিলে বোঝা সম্ভব এই যে সার্থক কলাসৃষ্টির অবশ্য প্রয়ো-জনে বিমূর্ততাটুকু ছাড়া আরোপিত কোন বিমূর্ততা শিল্পসৃষ্টিতে অপ্রয়ো-জনীয় বস্তু। সিন্ধু, দর্শন-শাস্ত্র অভিজ্ঞ ভারতবর্ষে এমন অর্বাচীন কল্পনা সম্পূর্ণ অবান্তর। তাই সরাসরি আম-দানিজাত এই সব কিম্ভূত বস্তু আর যাই হোক কলা বস্তু নয়। এমন উদ্ভট সামগ্রীকে জনসমক্ষে প্রচারের দায়িত্ব পালন করে পৌর নিগম তাই আর এক কুকাজকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এই যে, শুভচিন্তাজাত সমাজ-সচেতন সুশিল্প প্রচারের দায়িত্ব তাহলে কে বা কারা বহন করবে? এর উত্তরে এই বলা যায়, সাংস্কৃতিক পরিবেশ-পুষ্ট রসিক মন ও সহগামী সাংস্কৃতিক প্রকাশ মাধ্যমগুলির শিল্পীদের এগিয়ে এসে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। বহু ব্যবহৃত এবং জনমনগ্রাহ্য প্রকাশ মাধ্যম লেখ্য ও কথ্যভাষার শিল্পীদের তাই অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত ও অজ্ঞাত শিল্প প্রকাশ মাধ্যমগুলি—যথা চিত্র ও ভাস্কর্যের

মত স্বল্প প্রচারিত ও জনসংযোগহীন শক্তিশালী প্রকাশ মাধ্যমকে জনসমক্ষে আনবার দায়িত্ব পালন করতে হবে। একদিন প্রবাসীতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একক প্রচেষ্টায় ভারতীয় চিত্র আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তেমনি আজ পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন আসর, আলোচনা ও সম্মেলনে সুকুমার কলার যথাযোগ্য স্থান করে দিয়ে তাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যমগুলির রসিক ও শিল্পিবৃন্দকে এই জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হলো প্রদর্শনী বিকেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ শহর থেকে সরাসরি গ্রামাঞ্চলে, অনভিজ্ঞ দেশবাসীর সামনে এই গণসংযোগহীন শিল্প মাধ্যমগুলিকে উপস্থিত করতে হবে।

মার্কিন দেশে প্রদর্শনী-যান সহযোগে এমন প্রচেষ্টা গত পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে সুরু হয়েছে। এদেশেও তার আংশিক রূপ দেখা গেছে কলকাতার বিড়লা বিজ্ঞান-নিদর্শনশালায়। এবং সম্প্রতি কলকাতার ভারতীয় নিদর্শনশালার প্রদর্শনী-যান সহযোগে আপন আপন প্রদর্শন বস্তুর গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সুকুমার কলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ললিতকলা আকাডেমী বা স্থানীয় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম বাংলার সংগীত, নাটক ও সুকুমার কলার আকাডেমীর এমন অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব পালনে অনীহার জন্য আজো এ বিষয়ে কোন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

সেদিক থেকে এক পথিকৃৎ প্রচেষ্টা করেছেন এবারের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন তাঁদের আয়োজিত মুর্শিদাবাদের কান্দিতে, চিত্র প্রদর্শনী মারফৎ।

—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

"বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে চিত্র প্রদর্শনী"

মুর্শিদাবাদ মহকুমা শহর কান্দিতে গ্রামীণ পরিবেশে এবার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বত্রিশতম অধিবেশন হয়ে গেল গত ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল। এই সম্মেলন উপলক্ষে কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এবারের সংগঠকবৃন্দ। তার মধ্যে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন একটি বিশিষ্ট সংযোজন। গত ৩১টি অধিবেশনেও যা করা সম্ভব হয় নি।

এই প্রদর্শনীতে মোট ৬২টি চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল শিল্পী ইন্দ্র দুগড়ের ৬টি ঘন জলরঙ-এ আঁকা ছবি। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ৩৩টি জলরঙ, তেলরঙ ও সাদা-কালো রেখচিত্র। কুমারী শিপ্রা আদিত্যের ১৬টি জলরঙ ও সাদা-কালো রেখচিত্র। কুমারী মণিকা বসুর ৩টি জলরঙ ও একটি লিনোকাট ছবি। এছাড়া শিল্পী চিত্ত সরকারের ১টি ও সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘন জলরঙ দুটি ছবি।

শিল্পী ইন্দ্র দুগড় মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জবাসী। স্বভাবতই তাঁর চিত্রমধ্যে জিয়াগঞ্জের ঘাট, আজিমগঞ্জের ঘাট প্রভৃতি স্থানীয় নিসর্গ চিত্র স্বদেশের জনগণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। পরম্পরা ঘেঁষা ঘন জলরঙের নিসর্গ চিত্র রচনায় দুগড় পরিবারের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে. শ্রীদুগড়ের পিতা বিগত হীরাচাঁদ দুগড় মহাশয়ও এ পদ্ধতিতে অদ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন। ইন্দ্রবাবুও সে পরম্পরা সার্থকভাবে বহন করে চলেছেন। এ প্রদর্শনীতে শ্রীদুগড়ের ৬টি ছবির মধ্যে "জিয়াগঞ্জের ঘাট"টি সর্বোৎকৃষ্ট, যদিও বর্ণবিন্যাসে শিল্পী কিছুটা সন্ত্রস্ত হওয়ায় রচনাটির রসসৃষ্টির সামর্থ্য কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। আজিমগঞ্জের ঘাট ছবিটিতে গুটিকয়েক নৌকার সহজ সরল অনুস্থাপন ও স্বচ্ছন্দহীন সরল বর্ণ-প্রলেপ সাধারণের মনোহরণ করতে সমর্থ হলেও রসিকজনের কাছে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। এই শিল্পীর আর একটি রচনা বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের ছবিটি কষ্টার্জিত বিশদিকরণ ও অনুস্থাপনে ক্ষয়-বৃদ্ধির ব্যবহার শিল্পীর বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। নিঃসঙ্গ রাখাল ও প্রান্তর ছবি দুটি সাধারণ পর্যায়ের ওপর উঠতে পারে নি, এবং কুয়াসাঘেরা কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিটির বর্ণবিন্যাস ও অনুস্থাপন দুর্বল।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর ৩৩টি ছবির মধ্যে বারাণসীর ঘাটের চিত্রাবলী, সুন্দরবন, দীঘা প্রভৃতির নিসর্গ চিত্র এবং কফি হাউস, ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি রঙিন পেনসিলের কাজ এবং বিশেষত সাদা-কালোর রেখচিত্রাবলী বিচক্ষণ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বারে বারে প্রমাণ করেছে। তবে স্থানীয় জনমন জয় করতে পেরেছে শিল্পীর দুটি উগ্রপন্থী রচনা "স্বপ্ন শেষ" ও "সুন্দরবনের মাঝি"। এ ছবি দুটির বিভিন্ন অনুস্থাপন সহজীকরণ ও যাবকলন প্রভৃতি সার্থক সৃষ্টির আবশ্যক গুণাবলীর সঙ্গে চিত্রকরের শক্তিশালী রেখার সমন্বয় ছবিগুলিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। জনপ্রিয় শিল্পী দেবব্রতবাবু কিন্তু এবারের এ প্রদর্শনীতে অধিকতর ছবি নিয়ে উপস্থিত থাকলেও স্থানীয় অতি ঘনিষ্ঠ পরিবেশ নিয়ে রচিত সহজ সরল স্বল্প কয়েকটি ছবির দ্বারা এবং স্বদেশবাসী জনগণের মধ্যে ইন্দ্র দুগড়ের জনপ্রিয়তার কাছে [illegible]। এ প্রদর্শনীর অভিমতের খাতায় তাই ইন্দ্র দুগড়ের "ফটো"গুলির কাছে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর "ছবি" কিছুটা ম্লান বলে কিছু দর্শক অভিমত দিয়েছেন।

দেশে ও বিদেশে সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে কুমারী শিপ্রা আদিত্য ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছেন। এ প্রদর্শনীতে তাঁর ছোট বড় ১৬টি ছবির মধ্যে "বিছন ছড়াই", "বহন", "শিকারী" প্রভৃতি জলরঙের পটধর্মী চিত্রগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তবে শিল্পীর রেখাবিন্যাসে গুরু দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট। আশা করি অনুশীলন অনুধাবনের মাধ্যমে শিল্পী শীঘ্রই তার নিজস্ব শিল্পভাষা সৃষ্টিতে সক্ষম হবেন। সেদিক থেকে বিচার করলে শিল্পীর ক্ষুদ্র আভাস চিত্রগুলিতে যথেষ্ট সক্রিয়তা রয়েছে, বিশেষত কাশ্মীরের রেখচিত্রাবলী শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

কুমারী মণিকা বসুর ৪টি ছবির মধ্যে লিনো পদ্ধতিতে রচিত রঙিন রেখচিত্র "তিরু মালাই" ছবিটিই কিছুটা সার্থক সৃষ্টি। এছাড়া শিল্পী চিত্ত সরকারের একটি ঘন জলরঙে রচিত চিত্র সাধারণ পর্যায়েই রয়ে গেছে। সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর দুটি ছবির মধ্যে "জয়পুর" জলরঙ চিত্রটি অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু রচনা।

গ্রামাঞ্চলে এমন প্রদর্শনীর আয়োজন করে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ একটি অবশ্য করণীয় সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করলেন। সাংস্কৃতিক প্রকাশ মাধ্যমগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই চিত্রকলা আজ নানা কারণেই জনগণের নাগালের বাইরে পড়ে রয়েছে, তাই আজ জনসংযোগহীন শিল্পীরা মাটিছাড়া হয়ে "ত্রিশঙ্কু" কলা বস্তু রচনায় বিভ্রান্ত, এবং জনগণের কাছেও সুকুমার কলার শিল্পভাষা আজ অজ্ঞাত বস্তু। বারে বারে এমন প্রচেষ্টাই শিল্পীকে, জনসাধারণকে পরস্পর সমঝোতার মধ্য দিয়ে পুনর্বাসিত করতে সক্ষম হবে।

'শিলাদিত্য'

সর্দ্দি ও কাশিতে
রক্ষিতের
তাল মিছরি
ফোন ৫৫-৩০৮৫

পাঠক মন

'সোমেন চন্দ সম্পর্কে আমরা নীরব কেন?

ঢাকার সংবাদপত্র থেকে জানা গেলো, এ বৎসরেও সেখানে সোমেন চন্দের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। সোমেন চন্দ ছিলেন ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কনিষ্ঠতম সদস্য, নিজেও বিরাট প্রতিশ্রুতিবান লেখক। "সংকেত ও অন্যান্য গল্প" নামে তাঁর একটি গল্প সংকলন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলনটি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও লীলা রায়ের হাতে পড়াতে তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার কয়েকটি গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু সোমেন শুধু লেখকই ছিলেন না, শ্রমিক সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এক ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগ দেবার জন্য কলকাতা থেকে বঙ্কিম মুখার্জী, জ্যোতি বসু, সাধন গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য; শামশুল হুদা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সেখানে যান। সোমেন রেল শ্রমিকদের এক মিছিল নিয়ে সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে প্রতিপক্ষীয় রাজনৈতিক দলের আক্রমণে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন; সে সময় তাঁর বয়স একুশের বেশি নয়। বলা বাহুল্য, ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়েই সে সময়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে তীব্র পারস্পরিক বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। সোমেনের শোচনীয় মৃত্যুর পর কলকাতার প্রগতি লেখক সংঘ তাঁর স্মরণে "প্রাচীর" নাম দিয়ে এক কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। সংকলনটির আমি এক সমালোচনা লিখি, 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তা' প্রকাশিত হয়। ঢাকার সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী প্রতি বৎসর সোমেনের স্মৃতিবার্ষিকী পালনের আয়োজন করে আসছেন। ঢাকার সংবাদপত্র ঐ উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকেন: "সংবাদ" পত্রিকা এ বৎসরও কয়েকটি বিশেষ রচনা ও সোমেনের লেখা একটি গল্প প্রকাশ করেছেন। সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী সোমেনের একটি জীবনী ও রচনা সংগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কলকাতায় সোমেনের স্মৃতিবার্ষিকীতে কারু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ফ্যাসিবিরোধী তথা প্রগতি লেখক সংঘের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা এখনও সক্রিয় আছেন তাঁরা এ বিষয়ে আলোকপাত করলে বাধিত হবো।

—সন্ধ্যা চক্রবর্তী

রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা

রবীন্দ্র সরোবরের ৬ই এপ্রিলের ঘটনার যে সব বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা' মর্মন্তুদ। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন নিয়োগের ঘোষণা কয়েকটা দিন আগে হলে খুবই ভালো হতো। যা হোক, কমিশন যদি দেখেন যে, পাইকারী হারে নারীনিগ্রহের ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল, তবে অপরাধী কারা সেই বিষয়ে আলোকপাত করাও কমিশনের পক্ষে উচিত হবে। অপরাধীদের শাস্তি দিতে পারলেই বাংলাদেশের অপমানের বোঝা একটু লাঘব হবে। আর যদি কমিশন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ওই সব বিবরণ মাত্রাতিরিক্তভাবে অতিরঞ্জিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাল্পনিক, তবে রটনাকারীদের মুখোসও কমিশনকেই খুলতে হবে। কারণ, ১৯৬০-এ অসমে নারীনির্যাতন, ১৯৬৭-র ১লা জানুয়ারী দিল্লীর কটন প্রেসে বিদেশী মহিলাদের অপমান, তামিলনাড়ুতে বহু সংখ্যক নারীকে পুড়িয়ে হত্যাতেও যাঁদের নিশ্চিন্ত নিদ্রাকে ব্যাঘাত ঘটে নি, সেই 'নারীদরদীরা' রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে আঘাত করবার এমন চমৎকার অস্ত্র পাওয়ায় তাঁরা উল্লসিত। আর সেই অস্ত্র যারাই যুগিয়ে থাকুক, তাদের ক্ষমা নেই।

—অশোককুমার দাশগুপ্ত
কলকাতা—৪৭

*

বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের যে ছবি কবি, যোদ্ধা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিচ্ছেন, তার জন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। নিজের সমালোচনা একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অন্যান্য ভেকধারী সাম্যবাদী শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের কাছে। তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ—ধন্যবাদ আপনাকেও এই লেখা প্রকাশের জন্য। এই প্রসঙ্গে অরুণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে প্রশংসা করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে বলছি যে, তিনি 'উত্তরসূরী' মারফৎ স্বাধীন-সাহিত্যের দরবারে সাহিত্যও করেছেন। এবং পাত্তা দিয়েছেন সেইসব কবিদের যাঁরা লম্পট, চোর, ভণ্ড। তিনি ক্ষমার যোগ্য নন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে শেষ দিকে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করাটা কি বন্ধুর প্রতি কিছু মমতা—অনুকম্পা—সহানুভূতি? সুভাষবাবু যা করেছেন এই ক'বছরে—এই সেদিন মুক্তমেলায় গিয়ে, তাতে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীলদের গোলামই বলা উচিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, "পরিচয়" পত্রিকার বর্তমানের একজন সম্পাদক তো বটে (!) কবিদের হয়ে সাক্ষী দিলেন!

আপনার পত্রিকা মারফৎ আরও মুখোস খুলুন এইসব বুদ্ধিজীবীদের। এদেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

—অনুপম মিত্র
২, নারায়ণ রায় রোড,
কলকাতা—৮

*

"কবরের কান্না"

গত……সংখ্যায় শ্রীমনোরঞ্জন হাজরার "কবরের কান্না" গল্পটি পড়লুম। মার্ক্সীয় দর্শনকে স্বীকার করে এরকম রোমান্টিক সার্থক গল্প অনেকদিন পড়ি নি—আর একটু সংহত হলে বোধহয় ছোটগল্প হিসেবে আরো নিটোল হত। তবুও লেখাটি খুব ভাল লাগল। লেখককে আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাতে খুশি হব।

—দিনেশ দাস
৪।১, আফতাব মস্ক লেন
কলকাতা—২৭

'সপ্তাহের বোঝা' প্রসঙ্গে

'সপ্তাহের বোঝা নামাতে গিয়ে শ্রীওঝা বলেছেন:

"……অথবা শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী বা শ্রীমতী আভা মাইতি ইতিহাসের বিচারে সবাই তো বার্ডস অব দি সেম ফেদার"……। এখানেই "ছেদ" টানলেন শ্রীওঝা। পড়ে মনে হল—এ তো পূর্ণচ্ছেদ নয়, এ যেন এক অনন্ত জিজ্ঞাসা।

দক্ষ সমালোচক শ্রীওঝা হঠাৎ থামলেন কেন? বারান্তরে তিনি যদি এই প্রসঙ্গে আরও কিছু আলোকপাত করেন, তাহলে আপনার "শুক্রবার সাপ্তাহিকের" অনেক পাঠক-ই খুশি হবেন।

—শ্রীঅমিয়কুমার সাহি
অ্যাডভোকেট,
বর্ধমান আদালত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে
শিল্পী এবং এদেশে

নর্ম্যান মার্শাল ও গেইট থিয়েটার: এই সিজনে ছ'টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং তার ভেতর শেষ নাটকটি ছিল জ্যাকস্ বার্নার্ডের লেখা "দি স্প্রিং টাইম অভ আদার্স।" প্রধান দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ভেরোনিকা টার্নলে এবং রবার্ট ডগলাস। প্রডিউসার ছিলেন আইরিন হেন্টসেল—তিনিই ১৯২৬ সালে এটির পরিচালনা করেছিলেন এভ্রিম্যান থিয়েটারে। সেই প্রথম ইংলন্ডের দর্শকেরা বার্নার্ডের নাটক দেখবার সুযোগ পেয়েছিল।

গেইট প্রডাকসন্সের চারটি নাটক এখন লন্ডনের বিভিন্ন স্টেজে অভিনীত হচ্ছিল—আর নিউ ইয়র্কে আট মাসের প্রদর্শনীর পর, সবেমাত্র "অসকার ওয়াইল্ড" নাটকটির শেষ অভিনয় সমাপ্ত হয়েছিল।

সোনালী ভবিষ্যতের ছবি ভেসে উঠছিল মনের পর্দায়। আমি স্থায়িভাবে এ্যামব্যাসেডর থিয়েটারে থেকে গেইট রেভ্যুজগুলো সেখানে মঞ্চস্থ করবো বলে ঠিক করেছিলাম। এ্যাপোলোতে 'মাইস এ্যান্ড মেনের' পর 'লেডিজ ইন রিটায়ারমেন্ট' প্রডিয়ুস করবো ভাবছিলাম। এদিকে গেইটের পলিসির কোন পরিবর্তন হবে না বলেই ঠিক করা হয়েছিল। নিউ ইয়র্কে 'অসকার ওয়াইল্ডের' বিরাট সাফল্যের ফলে আমেরিকান থিয়েটার মালিকদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল গেইটের আরও কয়েকটি প্রডাকসন ওদেশে নিয়ে যাবার জন্য। অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ লাগবার সম্ভাবনাকে একরকম যুক্তিবর্জিত লজিক দিয়েই আমি অস্বীকার করতে চাইছিলাম এবং গেইট থিয়েটারকে সিজনের শেষে নতুনভাবে সুসংস্কৃত এবং সুসজ্জিত করা হোল।

থিয়েটারের জগতে একটা বহু পুরনো কুসংস্কার আছে। কোন রঙ্গমঞ্চের কার্টেন যদি বদলানো হয়, তাহলে তার ভাগ্যপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। গেইট সুসজ্জিত করবার সময় একটি নতুন কার্টেনও লাগানো হয়েছিল। দু-এক সপ্তাহ বাদে বিশ্বযুদ্ধ বাধলো এবং গেইটকে রেক্যুইজিসন করা হল অক্জিলিয়ারি ফায়ার স্টেশন হিসাবে। সুতরাং গেইটে এর পরের সিজন আর করা গেল না।

১৯৪০-এর বসন্তকালে এ-এফ-এস গেইট থিয়েটার ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। ঠিক করলাম তিনটি নাটক দিয়ে একটি ছোট গ্রীষ্মকালীন সিজন করবো। এর প্রথমটির নাম ছিল 'জার্সি লিলি।' 'লিলি ল্যাংট্রির' জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা নাটক। যুদ্ধ সুরু হবার আগে এই প্লে'টি বেসিল বার্টলেটকে লিখতে দিয়েছিলাম। বেসিলের নাটক লেখার হাত ছিল—তাছাড়া এ নাটকটি যে সে ভালই লিখবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না—কারণ তার স্ত্রী ছিল লিলি ল্যাংট্রির নাতনী। পেশাদারী মঞ্চে এ নাটক নামানো সম্ভব ছিল না, কারণ এডওয়ার্ড দি সেভেন্থ্ ছিলেন এই নাটকের অন্যতম চরিত্র। এই ভূমিকায় লিও জেন অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। হারমিওন হানেন নিয়েছিলেন লিলির ভূমিকা। এছাড়া অন্য প্রধান ভূমিকাটি ছিল প্রিন্স লুই ব্যাটেনবার্গের—অভিনয়ে চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়েছিলেন পল্ হেনরিড। পরের নাটক ছিল ককতোর Les Parents Terribles—ককতোর লেখা অন্য নাটকের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতের। অত্যন্ত বাস্তববাদী নাটক—এক কথায় একটি অদ্ভুত থিয়েট্রিক্যাল মেলোড্রামা—পাঁচটি মাত্র চরিত্র—কিন্তু এ নাটককে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য দরকার ছিল অনন্যসাধারণ অভিনয়। ম্যারি হিনটন্, মারটিটা হান্ট, ভিভিয়েন বেনেট, সিরিল কুসাক এবং হেনরি অস্কার নাটকটিকে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন অভিনয় প্রতিভায়—দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করলো এই নাটকটি গেইট থিয়েটারে।

সিজনের শেষ হল রেজিন্যাল্ড বেকউইথের 'বয়েজ ইন ব্রাউন' দিয়ে—বোরস্টেলের জীবনের আলেখ্য ছিল নাটকটিতে। প্রধান দু'টি ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছিলেন জন ক্যারোল এবং ডেরেক ব্লোমফিল্ড।

এই সময় জার্মানরা ফ্রান্সকে করতলগত করে নেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছিল। আমরা সবাই বেশ বুঝতে পারছিলাম যে 'বয়েজ ইন ব্রাউন'ই গেইটের শেষ প্লে হিসাবে পরিগণিত হবে এবং তারপর থিয়েটার বন্ধ করে দিতে হবে। যেদিন শেষ প্রদর্শনী হল, তার পরের দিন মাইকেল মোরিস সৈন্যদলে যোগ দিলেন—এর চার বছর বাদে তিনি বার্মা ফ্রন্টে মারা যান। মোরিস সৈন্যদলে ভর্তি হবার কয়েক সপ্তাহের ভেতরই আমি এবং ম্যাকেঞ্জিও সৈন্যদলে নাম লেখালাম।

সেই বছর শীতের সময় প্রতি রাতে শত্রুর বিমান আক্রমণ চলছিল—গেইটের তখন পর্যন্ত কোন ভয়াবহ ক্ষতি হয় নি, কিন্তু রাস্তার অপর পারে কিপলিং হাউস ডাইরেক্ট হিট হোল। এই বাড়িটিতে আমাদের অফিস ছিল। সেখানে আমাদের সিনারি এবং কসটিউম রাখা হোত—

'দিস ওয়ে টু দি টোম' নাটকের কম্পোজিশন

সেগুলো সব ধ্বংসে পরিণত হয়েছিল। গেইটের পাশের আমাদের বিলিয়ার্ড সেলুনটিও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪১ সালের বসন্তকালে ডিনারের পর আর্মি মেসে বসে আমি রেডিওর খবর শুনেছিলাম—

I heard the announcer say that among the buildings hit in the previous nights raid was 'One of London's smallest but not least famous theatres.'

পরের দিন ছুটি নিয়ে লণ্ডনে এলাম। চেয়ারিং ক্রশ থেকে ভিলিয়ার্স স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছোট্ট থিয়েটারটির ভগ্নস্তূপ চোখে পড়লো।

ভগ্ন অট্টালিকার জঞ্জালরাশির ভেতর দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ—মনে মনে ভাবছিলাম এই রঙ্গগৃহটিতে যত আনন্দের সঙ্গে কাজ করেছি সে সুযোগ আর জীবনে ফিরে আসবে না। আমরা যারা এখানে কাজ করতাম সবারই ভেতর একটা আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ছিল—হিংসা, দ্বেষ কারোর মনে স্থান পেত না। আর রঙ্গালয়ে এই সব জিনিসেরই অভাব হয় সব থেকে বেশি। গেইট থিয়েটার ছিল সব দিক থেকেই অত্যন্ত ডেমক্রেটিক।

সেখানে তারকাশ্রেণীর অভিনেতাই হোন বা অপরিচিত নট যাকে মাত্র দু'-এক লাইন সংলাপ বলতে হচ্ছে—সবাই অতি সামান্য একই অঙ্কের বেতন পেতেন। দুটি ড্রেসিং রুম ছিল—সমস্ত ভূমিকাভিনেতাদের এই দুটি ঘরই ব্যবহার করতে হোত অভিনয়ের সময়। সুতরাং ড্রেসিং রুমের ব্যবহার বিষয়ে কারোর মনে কোন মান-অভিমানের প্রশ্ন উঠতো না। অন্যান্য থিয়েটারে বিলিং-এর ব্যাপারও সমস্যার সৃষ্টি করে—কার নাম আগে দেওয়া হল, কার নাম পরে বসলো এ নিয়ে নটনটীদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়—গেইটে কোন বিলিং-এর ব্যবস্থা ছিল না—সভ্যদের শুধু কি নাটক হচ্ছে তা পোস্ট কার্ডে লিখে জানানো হত।

অভিনয় সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা হিন্দীতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B. C.) P.B. 2123, Delhi–7

টুয়েলভ্থ্ নাইট-এ টানিয়া ময়সিউইচের সেটিং

বলেই এ থিয়েটারে নটনটীর সমাগম হোত। কারণ এখানে পয়সা পাবার আকর্ষণ ছিল না—ভবিষ্যতে ওয়েস্ট এণ্ডের বড় থিয়েটারে যাতে অভিনয় করা যায় সে কথা ভেবেও এখানেও কোন নাটকের তালিম দেওয়া হোত না।

গেইটের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, সব নাটক সত্যিকার ভাল অথচ সাধারণ পেশাদারী মঞ্চে ব্যবসার দিক ভেবে যেগুলিকে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয় না। অথবা যে সব প্লে শুধু ইন্টিমেট থিয়েটারেই মঞ্চস্থ হবার যোগ্য, সেই সব নাটকের প্রডাকসন করা। এসব নাটক দেখাবার জন্য বিশেষ শ্রেণীর দর্শকেরও অর্থাৎ যে দর্শক থিয়েটারটিকে অন্তর থেকে নিজের বলে গ্রহণ করবে—গেইটে যারা থিয়েটার দেখতে আসতো তারা ছিল থিয়েটারের মেম্বার। সুতরাং এ থিয়েটারের পলিসির সম্বন্ধে তাদের একটা আন্তরিক সমর্থন ছিল। তাছাড়া দর্শকদের বেশির ভাগই ছিল তরুণ-তরুণী—এক্সপেরিমেন্টাল নাটককে গ্রহণ করবার মত মনের সজীবতা তাদের ছিল। থিয়েটার দেখবার জন্য বেশি পয়সাও তাদের খরচ করতে হোত না। সবচেয়ে বেশি দামী টিকিটের জন্য দিতে হোত পাঁচ শিলিং। আর সস্তা টিকিটের জন্য দু' শিলিং চার পেন্স। সাধারণত ওয়েস্ট এণ্ডে গিয়ে অত খরচ করে টিকেট কিনবার সম্পাতিও এই সব দর্শকদের ছিল না। আর বসবার আসনগুলোতেও তেমন কোন তারতম্য ছিল না—সুতরাং অমুক দর্শকেরা খুব দামী আসনগুলোতে বসেছে এবং আমি তুলনায় অত্যন্ত সস্তা দামের আসনে বসেছি এ বোধটাও প্রকট হয়ে উঠতো না গেইটের প্রেক্ষাগারে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও লোকে কনসাস হোতো না—পুলোভার বা সাদা টাই পরেও সভ্যেরা থিয়েটারে এসে স্বচ্ছন্দে বসে অভিনয় দেখতে থাকতো।

পরিশেষে নর্ম্যান মার্শাল বলেছেন:

I believe there will always be a need for a theatre like the Gate in London where plays will be chosen not because they are to appeal to nearly half a million people (the number required to keep a play running for a year in an average sized theatre) but because they are plays of originality and distinction which the minority playgoer is entitled to have an opportunity of seeing.

[এখন কিছুকালের জন্য "রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে" শীর্ষক আলোচনা বন্ধ থাকবে। এর পর সুযোগ-সুবিধা মত লিলিয়ান বেলিস এবং ওল্ড ভিক্ থিয়েটার নিয়ে আবার ইংলিশ স্টেজ সম্বন্ধে লেখা শুরু করবো। সাপ্তাহিক বসুমতীর নাট্যরসিক পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় জানেন যে, ১৯৫০ সালে নর্ম্যান মার্শাল একটি ছোট দল নিয়ে কলকাতায় অভিনয় করতে এসেছিলেন। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে এই দলটি সেক্সপীয়ারের নাটক থেকে কয়েকটি বাছাই দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়েছিলেন। এ অভিনয় খুব উচ্চশ্রেণীর না হলেও মোটামুটি ভালই হয়েছিল।]

রঙ্গজগৎ

অপ-সংস্কৃতির বিকার

রবীন্দ্র সরোবরের সংস্কৃতির ব্যাপার এক চরম অসংস্কৃতির রূপে ধারণ করেছে। সেদিন রাত্রে যে পাশবিকতা ঘটেছে তার যেমন তুলনা হয় না, তারপরে যা ঘটেছে তারও নজির মেলে না। এই ঘটনাকে নিয়ে এতদিন কেউ কেউ বাঙালীর ইজ্জত রক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছিল : এখন দেখছি ইজ্জতের টানে দেশের ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছেন। পাড়ায় পাড়ায় মস্তানরা পোস্টার দিচ্ছে। নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পি এস পি, জনসংঘের সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মস্তানরা যেভাবে এক লাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন এটাও এক কৌতূহলজনক ব্যাপার। ব্যাপারটা সুরুতে ছিল অপ-সাংস্কৃতিক, এখন দাঁড়িয়েছে অপ-রাজনৈতিক। এই অপ-রাজনীতির চেঁচামেচিতে অপ-সংস্কৃতি রেহাই পেয়ে যাচ্ছে।

যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিবৃতি প্রচার করে গুজবকে সত্যের মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁরা অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। ঘটনাটা যে অপ-সংস্কৃতির বিকার দেশের এই চিন্তাশীলরা সে কথাটা স্বীকার করবেন আশা করেছিলাম। আসলে এই ঘটনার পটভূমি রচিত হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। বিদেশী সিনেমাগুলিতে প্রথমে নাইট সিরিজের, তারপরে গোয়েন্দা সিরিজের ছবিতে বিবস্ত্রা নারীদেহ ও শৃঙ্গার-কেন্দ্রিক অশালীন বিষয়বস্তু এবং তার সঙ্গে হত্যা ও নিষ্ঠুরতার বীভৎস দৃশ্যে দেশের মানুষের স্নায়ু শিথিল করে দেওয়া হচ্ছে। রক এন্ড রোল, টুইস্ট, জাক নাচের সঙ্গে বিটল, পপ গানের হাল্কা রসে যুবকদের সিরিয়াস ও দেশের চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। এসব মার্কিন অপ-সাংস্কৃতিক ছবি দেখাবার ব্যাপারে সরকারের উৎসাহ পাওয়া গেছে। এই ছবিগুলি দেশী ছবিতেও প্রভাব বিস্তার করেছে। তার প্রকাশ একদিকে যেমন বোম্বাইয়ের স্থূল ছবি আর একদিকে 'আপনজন'-এর মত ছবির জনপ্রিয়তা। অপ-সংস্কৃতির চোরাগলিতে ক্ল্যাসিকাল ও লোক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে উঠছে। মস্তানদের হাতে পড়ে অশোককুমার ও রাজকাপুর নাইট (মার্কিন অনুকরণে বানান)-এর মত অনুষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানগুলিতে সিনেমার হীরোরা প্রধান। তাদের পাঁচমেশালী সুর ও ভাষার গান, অঙ্গভঙ্গি রসের যোগান দেয়। এই হীরোদের অটোগ্রাফ নেবার জন্যে মেয়েদের বেহায়াপনা মানুষকে লজ্জা দেয়। এই হচ্ছে বিচিত্রানুষ্ঠানের চেহারা। এই বিচিত্রানুষ্ঠানগুলি উদ্বোধন করেন স্পীকারের মত মান্য ব্যক্তিরা ; এসব অপ-সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন পুলিশ অফিসাররা, পৃষ্ঠপোষকতা করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা একবার ভেবে দেখেন না কিরূপ সংস্কৃতি পরিবেশনে তাঁরা সহযোগিতা করছেন। এই অপ-সংস্কৃতির চোরাপথে বসেছে 'যুব-মেলা': যুবক-যুবতীদের গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়ে নেবার চক্রান্ত। এই বিকৃতির প্রকাশ মেয়েদের অশালীন পোষাক, ছেলেদের ড্রেন পাইপ প্যান্ট-এ। অপ-সংস্কৃতি আজ জাতির এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে পূজা-পার্বণে, উৎসবে পাড়ায় পাড়ায় জাতির পরিচয় ও রুচিহীন রেকর্ড গানের আসর বসে। টুইস্ট নাচের অনুকরণে যুবকরা পথে অঙ্গভঙ্গি করতে লজ্জা পায় না। আধুনিক গানের গায়করা সুর বিকৃত করে শ্রোতাদের তুষ্ট করতে বাধ্য হন। লোকশিল্পীদেরও বিকৃত সুরে গেয়ে পয়সা কামাতে হচ্ছে।

'তীরভূমি' ছবিতে রুমা গুহঠাকুরতা, মাধবী মুখার্জী ও সীতা দেবী

এই বিচিত্রানুষ্ঠানগুলি অপ-সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রক্ষণশীলতার দৃষ্টিতে কথাগুলি বলা হচ্ছে না। কারণ এসব বিচিত্রানুষ্ঠানের সঙ্গে প্রগতির কোন সম্পর্ক নেই। প্রগতির সঙ্গে আদর্শের সম্পর্ক থাকে। আর বিচিত্রানুষ্ঠানগুলি হচ্ছে পুঁজিবাদী অবক্ষয়ী চিন্তাজাত রঙ্গমেলা, পয়সা রোজগারের ফিকির। যে সমাজে নারীকে বেশ্যাবৃত্তিতে লাগান হয়, সেখানে যেমন মারামারি হাঙ্গামা লেগে থাকে; সংস্কৃতিকে যেখানে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে সেখানেও অরাজকতা অস্বাভাবিক নয়। কারণ এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে রসিক অপেক্ষা অরসিকের সমাবেশ ঘটে বেশি। উদ্যোক্তাদের মধ্যেও রেষারেষি থাকে পয়সা ও মস্তানী দলের কারণে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা করে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। কেবলমাত্র কারা দোষী এবং আইনগত কারণগুলি নির্ণয় করাতেই যথেষ্ট হবে না। এই অপ-সংস্কৃতির মূল কোথায় এবং প্রেরণাদাতাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে হবে। বাংলাদেশকে এই অপ-সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসাবার ব্যাপারে দেশী-বিদেশী যে শক্তিগুলি কাজ করছে তারও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে গুন্ডামীর জন্য দোষীদের যেমন কঠোর শাস্তি চাই, তেমন চাই গুজব, অতিরঞ্জন এবং অপ-রাজনীতি ব্যবহারকারীদের নিন্দা। এইরূপ অপ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি আর যেন মাঠে-ময়দানে অনুষ্ঠানের সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা। দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংস্থাগুলির আন্দোলন এই অপ-সংস্কৃতির কর্দমস্রোত রোধ করতে পারে। —সুজন।

'সমান্তরাল' ছবিতে মাঃ মলয় ও মাধবী মুখার্জী

সম্মিলিত নাট্যোৎসব

বাংলা নাটামঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির উদ্যোগ গ্রহণ

গত ১৬ই মে প্রেস ক্লাবে এক সংবাদিক সম্মেলনে বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির পক্ষে অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্র বাংলা নাটামঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির প্রাথমিক প্রচেষ্টা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন। তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পায় যে, এই উদ্যোগের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়, বিষ্ণু দে, প্রদোষ দাশগুপ্ত, শৈবাল গুপ্ত, ক্ষিতীশ রায়, ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, গঙ্গাপদ বসু, কুমার রায়, খালেদ চৌধুরী, বাদল সরকার, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যুক্ত আছেন। সমিতির উদ্দেশ্য : জাতীয় প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের বর্তমান অবস্থায় একটি গঠনমূলক কার্যক্রম অনুসরণ এবং জনগণের সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার পথে বাধা দূরীকরণ।

শ্রীমিত্র বলেন, ইদানীং সংস্কৃতি প্রেমীদের মনে একটা আশংকা সৃষ্টি হয়েছে যে, বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতি বিষম সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতির পথে বিস্তর বাধা দেখা দিয়েছে। এই সঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, বিগত তিন দশকে শিল্প-সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তা আন্দোলনের ফসল। মঞ্চে, চলচ্চিত্রে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রশিল্পে—সর্বক্ষেত্রেই। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল শুধুমাত্র শিল্পের প্রতি অনুরক্তি থেকে, কোন ব্যবসায়িক বোধ থেকে নয়। অথচ শিল্পের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যবসায়ীদের দখলে এবং শিল্প উপভোগের জন্য জনসাধারণ যে টাকা দেন তাও ব্যবসায়িক স্বার্থের গহ্বরে যাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ শিল্পীদের পথে-মাঠে প্রদর্শনী করতে হচ্ছে, পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ নেই, কবি নাট্যকাররা উৎসাহী পাঠকদের কাছে উপস্থিত হবার সুযোগ পান না। নবনাট্য আন্দোলনের শরিক দলগুলি উপযুক্ত হলের অভাবে নাটক করতে পারেন না।

শ্রীমিত্র বলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সামনে দুটি পথ আছে। হয় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা, অথবা নিজেদের পথ করে দেওয়া। শেষের পথটি তাঁরা নিয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার কোন স্থানে জমি কিনে তাঁরা একটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করছেন। এই হলে নাটক করার যেমন ব্যবস্থা থাকবে তার সঙ্গে থাকবে চিত্র প্রদর্শনী, কবিতা ও নাটক পাঠ, রিহার্সাল দেওয়া, পাঠাগার এবং লোকসঙ্গীত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি। এক কথায় জাতীয় নাট্যশালার এক বিকল্প ব্যবস্থা। এখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হবে।

এই প্রচেষ্টাকে রূপ দেবার জন্যে ইতিমধ্যেই উদ্যোগীরা কিছু টাকা তুলেছেন। তাঁরা এক লক্ষ টাকার তহবিল করে কাজ আরম্ভ করবেন। তাঁরা আশা করেন দেশের নাটক-রসিক মানুষ, সরকার, পৌর সংস্থা এবং সংবাদপত্রগুলির সহযোগিতা পেলে তাদের উদ্দেশ্য সার্থক করতে দেরি হবে না।

শ্রীশম্ভু মিত্র তাঁদের নতুন উদ্যোগকে রূপ দেবার উদ্দেশ্যে এক নাট্যোৎসবের কথা ঘোষণা করেন। আগামী ৩রা মে বিড়লাদের কলামন্দিরে এই নাট্যোৎসব সুরু হয়ে ৭ই মে পর্যন্ত চলবে। নাট্যোৎসবের আয় নতুন নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা হবে। শের আফগান, রক্ত করবী, এবং ইন্দ্রজিৎ, চলচ্চিত্র চঞ্চরী ও ব্যাপিকা বিদায় এবং বর্বর বাঁশী নাটকগুলির

'স্যাডোস অব ফরগটেন এনচেন্টারস্' সোভিয়েট ছবিতে তাতিয়ানা বাস্তেয়েভা এবং ইভান মিকোলাইচুক

অভিনয় হবে। অংশ গ্রহণ করবেন : নান্দীকার, রূপকার, বহুরূপী এবং হিন্দী নাটকের দল অনামিকা। রক্তকরবী নাটকটি বহুরূপী, রূপকার ও নান্দীকার-এর সম্মিলিত অভিনয় হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তারা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

অপ-সংস্কৃতিবিরোধী কনভেনশন

গত ১২ই এপ্রিল রামমোহন লাইব্রেরী হলে অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছাত্র ও যুবকদের এক বিরাট কনভেনশন হয়েছে। এই কনভেনশনে বিকৃত সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসার রোধ করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং ছাত্র, যুবক, মহিলা ও শিক্ষাব্রতী অপ-সংস্কৃতিবিরোধী অভিযান গড়ে তোলার আহবান জানান হয়েছে।

এই কনভেনশনে সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত সিনেমাকে পণ্যচিত্রে পরিণত করে কিভাবে তরুণমনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে তার বিবরণ দান করেন। এই সঙ্গে নাটকে ও গানে বিকৃত সংস্কৃতির তথ্য তুলে ধরে তিনি অপ-সংস্কৃতিবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। সভায় মাসিক 'নন্দন' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, যুবনেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষাল, অধ্যাপক কৃষ্ণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রশান্তকুমার বসু, শিল্পী বিজন চৌধুরী, ছাত্রনেতা শ্যামল চক্রবর্তী, অনুনয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত কর্মসূচীতে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কলেজে আলোচনাসভা, প্রাচীর পত্রিকা ও পোস্টার, সংবাদপত্র ও রেডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন, অপ-সংস্কৃতিবিরোধী মিছিল ইত্যাদি সংগঠন এবং রাজ্য সরকারের নিকট স্মারকপত্র পেশ।

নাটকের কথা

দুর্গেশনন্দিনী

গত ৯ই এপ্রিল ১৯৬৯ ট্রাকটরস্ ইণ্ডিয়া এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এ নাটকটি শিল্পীদের নিষ্ঠা ও অভিনয়-গুণে যথার্থ রূপ পায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (জগৎসিংহ), হরবিলাস চক্রবর্তী (বীরেন্দ্র সিংহ), রঘুনাথ পাল (ওসমান খাঁ)

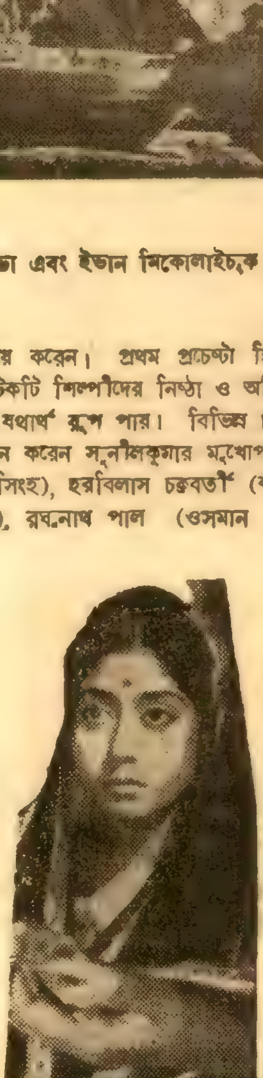

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

এ্যাকটরস্ ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের অভিনীত দুর্গেশনন্দিনী নাটকে হরবিলাস চক্রবর্তী (বীরেন্দ্র সিংহ) ও মিতা দাশগুপ্ত (বিমলা)।

অজিতকুমার মজুমদার (কতলু খাঁ), মিতা দাশগুপ্তা (বিমলা), দীপা হালদার (তিলোত্তমা) ও স্মৃতিকণা পাল (আয়েষা) প্রভৃতি। বিদ্যাদিগ্‌গজ-এর ভূমিকায় অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন। পরিচালনা করেছেন ইন্দ্র রায়।

বিভিন্ন অংশে ছিলেন—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ দাশগুপ্ত, অসিত মজুমদার, জয়ন্ত ঘোষ, মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ বিশ্বাস, বাসুদেব জানা, বিমল সিংহ, সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যেন সেন। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার নীরেন সেন।

ঝালাপালা

বেলুড় খেলাঘরের তরুণ শিল্পিবৃন্দ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাধারণ গ্রন্থাগারের 'রবিতীর্থ' হলে সুকুমার রায় রচিত 'ঝালাপালা' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

ক্লান্ত রূপকার

ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কলকাতা শাখাগুলির কর্মচারীদের কৃষ্টিসংস্থা 'মঞ্চভারতী' তাদের নবম বার্ষিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করলেন গত ১৫ই এপ্রিল বিশ্বরূপায়। অনুষ্ঠানে সভাপতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরীর আশীর্বাণী এবং প্রধান অতিথি প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের মাঙ্গলিকে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। মঞ্চভারতীর শিল্পিবৃন্দ শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত 'ক্লান্ত রূপকার' নাটক অভিনয় করেন।

শ্রীনিয়োগীর নির্দেশনায় শিল্পীরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্রের প্রতি যত্নবান ছিলেন। নীতিন ব্যানার্জির 'রণজিৎ' এবং 'শুনু'র ছোট চরিত্রটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল মিলন মুখার্জীর অভিনয়ে। তপন মিত্রের 'বিজলী' প্রদীপ পালের 'মণি' প্রশংসনীয়। অরুণ দত্ত, হীরেন সোম, দিলীপ চ্যাটার্জি, শিবসুন্দর সিংহ, নিরাপদ পাঠক, চন্দ্রকান্ত নিয়োগী, কালী ব্যানার্জী এবং যোগেন দত্ত অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন 'নন্দিতা'র ভূমিকায় সুতপা ভট্টাচার্য।

স্টুডিও খবর

দুটি মন

গত ১১শে এপ্রিল ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে এস এস ফিল্মসের 'দুটি মন' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান হয়েছে। ক্ল্যাপস্টিক দিয়েছেন শ্রীমতী কানন দেবী। ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও সুপর্ণা সেন। পরিচালনা করবেন অজিত গাঙ্গুলী। বিনয় চট্টোপাধ্যায়

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। সম্পাদনা করবেন অমিয় মুখার্জী।

মহাতীর্থ গয়া

১৯শে এপ্রিল ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'মহাতীর্থ গয়া' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান হয়েছে। ক্ল্যাপস্টিক দিয়েছেন। উত্তমকুমার। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিত গাংগুলী। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অনিল বাগচী।

নববধূ

গত ১লা বৈশাখ ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে 'নববধূ' ছবির শুভ অনুষ্ঠান সূচনা হয়েছে।

অহোরাত্র রবীন্দ্র জন্মোৎসব

রবীন্দ্র অনুরাগীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এ বছরও রবীন্দ্র জন্মোৎসব অহোরাত্র-ব্যাপী প্রতিপালিত হবে মহাজাতি সদনে ২৫শে বৈশাখ, নাট্য সম্মেলন ও মহাজাতি সদন অছি পরিষদের যুগ্ম প্রচেষ্টায়। অনুষ্ঠান সেদিন ঊষাকালে (৫টায়) আরম্ভ হয়ে পরিসমাপ্তি ঘটবে পরদিন ঊষায়। সর্বসাধারণের জন্য বিনা প্রবেশ মূল্যেই মণ্ডপম্বার উন্মুক্ত থাকবে। জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীসুশীল সিংহ, কর্মাধ্যক্ষ নাট্য সম্মেলন, ২-ই, বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা—৩। (ফোন : ৫৫-২৪৭০) থেকে জানা যাবে।

মুদ্রা ডান্স একাডেমির অনুষ্ঠানে জিপসী নৃত্যে পরিবেশনে ইতি ভট্টাচার্য, উমা চ্যাটার্জী ও ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ছোটদের মেলা

গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল ছোটদের সংসদের সপ্তম বর্ষ প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে হাওড়ার শিবপুর সরসীবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে 'ছোটদের মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত আকাশের নিচে অসংখ্য শিশু ও কিশোরদের উপস্থিতিতে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। স্টুডেন্টস হ্যাপী হোমের ছাত্রছাত্রীগণ সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' ও দমদম শিব সঙ্ঘের ভাইবোনেরা রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা' নাটিকা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে।

সংবাদকণা

সুরসভার "শেষ-বসন্ত"

গত ১৪ই এপ্রিল বালিগঞ্জস্থিত রবিতীর্থ ভবনে দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা সুরসভার নববর্ষ উৎসব শ্রীশম্ভু ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে "শেষ-বসন্ত" গীতালেখ্য পরিবেশিত হয়। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন রথীন চৌধুরী। সঙ্গীতাংশে ছিলেন চম্পা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, শ্যামলী বেদজ্ঞ, প্রগতি রায়, অমিতা মজুমদার, রবীন মুখোপাধ্যায় ও গৌতম বসু। সবশেষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে খেয়াল গেয়ে শোনান কান্তি মৈত্র (নায়কী কানাড়া) ও গৌর বসাক (গোরখ্ কল্যাণ)। তবলায় ও যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করেন দুলাল ভট্টাচার্য, কিশোর নন্দী, শম্ভু পাল ও স্বপন মুখোপাধ্যায়।

সুরবিতানের নববর্ষ উৎসব

গত ১লা বৈশাখ সকাল নয়টায় খিদিরপুর মনসাতলা লেনে 'সুরবিতান' এর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নববর্ষ উৎসব পালন করে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রবীন বসু এবং কুড়িজন শিল্পী।

খেলাধূলা

মোল্লার দৌড়

ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে সময়টা নেহাতই খারাপ। চারদিকেই শুধু একটার পর একটা গোলমাল, অব্যবস্থা, অনিশ্চয়তা। কিন্তু সেই জন্যে যে বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারত কোণঠেসা হয়ে যাচ্ছে—সে কথাটা কেউ একবার ভেবে দেখারও প্রয়োজন অনুভব করছেন না। আর করছেন না বলেই দিনের পর দিন ভারতীয় ক্রিকেটের হাল শোচনীয় হয়ে উঠছে। সরকারের কৃপায় স্পোর্টস কাউন্সিল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যার কাজ, ভারতবর্ষে খেলাধুলোর উন্নতি করা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে, নিজেদের আসল কাজটুকু ছাড়া তাঁরা আর সবই করছেন। আর তাঁদের কাজের ধরণ অনেকটা সেই কলুর বলদের মতো চোখ বুজে সরকারের খোশামোদ করা। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণের প্রসংগটি নিয়ে খোলা মনে একটু চিন্তা করলেই এই গোপন সত্যটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। সত্যিকথা বলতে কি, খোদার ওপর খোদকারীর মতো ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিল ভারতীয় ক্রীড়া জগতের সর্বস্তরে শুধু লাঠি ঘুরিয়েই চলেছেন। সেই লাঠি ঘুরিয়েই এবার তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার সংক্ষিপ্ত ভারত সফরকে কেটে-ছেঁটে আরো ছোট করে দেবার প্রস্তাব করেছেন। শুধু প্রস্তাব বললে ভুল হবে—ওঁদের সিদ্ধান্তই যে অনেকাংশে পাকা। অজুহাত সেই পুরোন। ভারতের চিরন্তন বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সেই একঘেয়ে প্রশ্ন।

এই একই প্রশ্নে কয়েক মাস আগে ওঁরাই ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলেন। দোহাই দেখিয়েছিলেন দুটি। একটি হলো বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন ও গ্যারাণ্টি মানির বিষয় আর দ্বিতীয়টি হলো অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সরকারী সফরের বিষয়। ইংলণ্ডের সফরটি ছিল বে-সরকারী আর গ্যারাণ্টি মানির গোঁও তাদের ছিলো খুব। মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়েছিল সেখানে। তাই সেই সফর বাতিল হওয়ায় আমরা কর্তৃপক্ষকে সমর্থনই করেছিলাম। কারণ আমাদের কাছে ইংলণ্ডের বে-সরকারী সফরের চেয়ে অস্ট্রেলিয়ার সরকারী সফরের মূল্য অনেক বেশি। তার ওপর স্পোর্টস কাউন্সিল যখন আবার বলেছিলেন যে, ইংলণ্ডের ভারত ভ্রমণ কার্যে পরিণত হলে অস্ট্রেলিয়ার সফর নিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে গোলমাল হতে পারে—তখন সকলেই চেয়েছিলেন যে ইংলণ্ডের ভারত ভ্রমণের দরকার নেই—অস্ট্রেলিয়াই আসচে শীতে আসুক ভারতে। কিন্তু এবারও যখন স্পোর্টস কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরের বিষয়টি নিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন তুললেন তখন আর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া আজ বিশ্ব ক্রিকেটের শীর্ষে। তাই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্যে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যেমন উন্মুখ হয়ে আছেন তেমনি ভারতের প্রতিটি ক্রিকেট উৎসাহী খেলা দেখার আশায় একটি একটি করে দিন গুণে চলেছেন। জানি নে আমাদের সেই আশার মুখে ছাই পড়বে কি না। কারণ এখনো পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে তাতে অস্ট্রেলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে তিনটির বেশি টেস্ট খেলবে না। কোথায় হবে টেস্ট ম্যাচগুলো? বম্বে, মাদ্রাজ আর কলকাতায়। কিন্তু দিল্লী কি চুপ করে থাকবে......? —শান্তিপ্রিয়॥

খুশিবলে-খুশবলে

কলকাতার ফুটবল লাগ শুরু হতে আর একমাসও বাকী নেই। একমাস বাদে এই সময়ই ময়দানী ফুটবল আসর জমিয়ে বসবে। আর তারই প্রস্তুতি আজ সব জায়গায়। খেলোয়াড়দের দল বদলের পালাকে কেন্দ্র করে দল ভাঙা-গড়ার পর্ব শেষ হয়ে গিয়ে এখন ক্লাবে ক্লাবে চলেছে জোর অনুশীলন।

মাঠে নামার আগের শেষ প্রস্তুতি। তাই আজ খেলোয়াড়দের সংগে তাল দিয়ে কলকাতার দর্শকরাও মেতে উঠেছেন, হকি ঠিক যেন কলকাতার দর্শকদের টানতে পারে না। তবে হকি খেলাই কলকাতা ময়দানে বয়ে আনে ফুটবলের আগমনবার্তা।

ময়দান এখন ফাঁকা—একদম ফাঁকা। কিন্তু আর একমাস পরে দুপুর গড়িয়ে

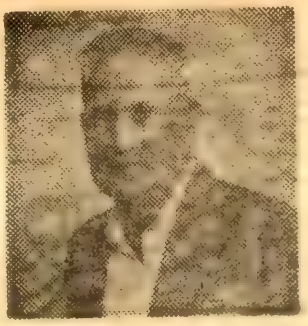

সতু চৌধুরী মারা গেলেন। ৬৩ বছর বয়সে মারা গেলেন কলকাতা ময়দানের এক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেফট ইন্ খেলোয়াড়। জন্ম ১৯০৬ সালের জুন মাসে। ১৯২৭ সালে মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন। তার আগে টাউন ও নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ারে খেলেছেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সতু চৌধুরী মোহনবাগানের পক্ষে খেলেছেন। ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য হিসেবে তিনি দক্ষিণ অফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও কলম্বো সফর করেছেন। ১৯৫২ সালে তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

রুমেল বলেছিলেন, "আমি আবার লাফাবো!" তখন সকলে হেসেছিলেন। হাসবার কথা বটে! যে অমন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে, জীবনে যে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে কি না সন্দেহ, সেই-ই বলছে কি না "আমি আবার লাফাবো...!" কিন্তু নিজের কথা রেখেছেন রুমেল। এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁর মনের জোরের জন্যেই। রুমেল আবার লাফাচ্ছেন—শুনো লাফিয়ে আবার কি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবেন রুমেল? সেই চেষ্টাই করছেন তিনি। ছবিতে তাঁর নতুন প্রশিক্ষক উঁর খিস্টাকভ রুমেলের জুতো-সুদ্ধ পায়ের মাপ পরীক্ষা করে দেখছেন।

গল্প হলেও সত্যি

১৯৪৮-৪৯ সাল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এলো ভারত ভ্রমণে। মুস্তাক আলী তখন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। তবু দিল্লীর প্রথম টেস্টে দল থেকে বাদ পড়লেন মুস্তাক। ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের নির্বিচার অত্যাচারের শিকার হয়েছেন মুস্তাক আলী।

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টেও হয়তো চান্স পেতেন না তিনি। কিন্তু খেলার আগে কলকাতায় মুস্তাকের জন্যে শুরু হলো এক অভাবনীয় আন্দোলন—নো মুস্তাক, নো টেস্ট। ফলে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ মুস্তাককে দলে নিলেন।

কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে মুস্তাক বিদ্যুৎ গতিতে ৫৪ রান করে আউট হয়ে গেলেন। চোখ ঝলসানো সে খেলা। তবু সন্তুষ্ট নন কর্তৃপক্ষ। তাঁদের একজন বললেন, "দূর দূর মুস্তাক আর আগের মতো খেলতে পারেন না। ৫৪ রান হঠাৎই করে ফেলেছেন।" আশ্চর্য! এ কি অবিচার! কি নির্মম মন্তব্য। অবশ্য তার জবাব পেতে খুব একটা দেরি হলো না।

৪১৫ মিনিটে ৪৩৯ রান করলে ভারত জিতবে, এমন অবস্থায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলো ভারত। মুস্তাক আর ইব্রাহিম এলেন ইনিংস সূচনা করতে। মুস্তাক বেপরোয়া। কিন্তু ইব্রাহিম সতর্ক। ফলে ৬৬ রান উঠলো ১১৫ মিনিটে। খেলার শেষ দিন। ভারতকে জিততে হলে ৩৩০ মিনিটে করতে হবে ৩৬৫ রান। খেলা আরম্ভ হতে-না-হতে ইব্রাহিম আউট হয়ে গেলেন। কিন্তু মুস্তাকের তখন সংহার মূর্তি। দর্শকদের পাগল করে দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুস্তাক পূর্ণ করলেন শতরান।

সেই দিন রাত্তিরে কলকাতার এক হোটেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেরা পেস বোলার প্রিয়র জোনস বললেন, "If Mushtaq came to West Indies, he would be adored and idolised.."

দু' দিন আগে ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের যে সদস্যটি মুস্তাক সম্বন্ধে বলেছিলেন, মুস্তাক ফুরিয়ে গেছেন—তিনিও সেদিন রাত্তিরের সেই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিকেল হতে-না-হতে পিঁপড়ের মতো সার বেঁধে মানুষ আসতে শুরু করবে ময়দানে। ফুটবলানন্দে মেতে উঠবে কলকাতা ময়দানের আকাশ-বাতাস। উচ্ছ্বসিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে শুধু কলকাতা নয়, মেতে উঠবে সমস্ত বাংলাদেশ।

গত দু' বছর ময়দানী ফুটবলের ওপরে বোধহয় ছিল 'শনির দশা'। লীগ-শীল্ড ভণ্ডুল। গোলমাল। আরো কতো কি! শেষ পর্যন্ত আইন-আদালতকেও টেনে আনা হলো খেলার মাঠে। আর গত বছরের ঠোকা লীগের খেলার ওপর একটা মামলা এখনো চলেছে।

আর সেই জন্যেই কলকাতা ময়দানে এবারের লীগ ফুটবল নিয়ে জট পাকাতে শুরু করেছে। ঐ মামলার নিষ্পত্তি কিম্বা প্রত্যাহার করে না নিলে এ জট ছাড়ানো যাবে বলে মনে হয় না। আর সেই জন্যেই লীগ সাব কমিটির প্রথম দিনের সভা শুরুতেই বন্ধ হয়ে যায়।

তবে এ অনিশ্চিত অবস্থা এবার আর থাকবে বলে মনে হয় না। মনে হয় এবার যাতে সুস্থ পরিবেশে লীগ ফুটবলের আসর বসে তার জন্যে চেষ্টা করবেন সকলেই। বৃহত্তর স্বার্থে এ প্রচেষ্টা ফলবতী হতে বাধ্য। তবে এখন সব কিছু নির্ভর করছে ময়দানের হাল-চালের ওপর।

যাই হোক এবার মনে হয় আর আগের মতো গোলমাল পাকাবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার খেলাধুলোর জন্যে আলাদা বিভাগ করেছেন, আর ক্রীড়ামন্ত্রীও মনে হয় খেলাধুলোর উন্নতির জন্যে চেষ্টা করবেন। ফলে সরকারী হস্তক্ষেপে সব গোলমাল মিটে যাবে। সেই সংগে যদি কলকাতা ময়দানের বড় ক্লাবগুলো সরকারী সহায়তায় খেলাধুলোর উন্নতির জন্যে এগিয়ে আসেন, তাহলে তো আর কথাই নেই।

কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ হবে তো ?

এবার কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ হবে তো? অস্ট্রেলিয়া যদি ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করে তাহলেও কলকাতায় একটা টেস্ট ম্যাচ হবার কথা। কলকাতা ছাড়া সম্ভবত টেস্ট ক্রিকেটের আসর বসবে বম্বে আর মাদ্রাজে। কিন্তু দিল্লীও ছেড়ে কথা কইবে না। তারা এক বছর আগে থেকেই টেস্ট ম্যাচের দাবি জানাচ্ছে।

ওদিকে নাকি মাস দুয়েকের মধ্যে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির কাজ আরম্ভ হবে। আর যাই হোক নভেম্বরের মধ্যে সে কাজ কিছুতেই শেষ হবে না। তাহলে টেস্ট খেলার কি হবে? তবে কি ইডেনে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ হবে না? জানি না কি হবে—তবে এ কথা ঠিক যে, ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেনের ভাগ্য আজ বড়ই অনিশ্চিত।

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যাণ্ডের ভারত ভ্রমণে আসার কথা। কিন্তু ইডেনে যদি টেস্ট ম্যাচ হতে না পারে তাহলে বাংলাদেশের ক্রিকেট-উৎসাহীরা হারাবেন টেস্ট ক্রিকেটের আসরে উপস্থিত হবার সুযোগ। কম্পোজিট স্টেডিয়াম করতে যখন দু' কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে—তখন ইডেনে না করে স্টেডিয়ামটা অন্য কোথাও করলে ক্ষতি কি… ?

দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়—আর কলকাতার ফুটবলের বরাতে এবার কি আছে……!

[২৮১৫ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীপানের জানা নেই বলে তিনি জানালেন।

এ ছাড়া তিনি আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেগুলো নিচে তুলে দেওয়া হল ঃ

[১] ইডেন ক্রিকেটের জন্য তৈরি, তাই এর গঠন ওভাল। এ অবস্থায় ফুটবল খেলা দেখে দর্শকরা তেমন আনন্দ পাবেন না, এত দূর থেকে দ্রুতগতির কোন খেলা দেখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

[২] কম্পোজিট স্টেডিয়াম করতে হলে 'সিট' বাড়াতে হবে। ৫০ হাজার থেকে ১ লাখে আসন সংখ্যা নিয়ে যেতে হলে 'গ্যালারি' উঁচু করতে হবে। 'গ্যালারি' উঁচু করলে উত্তরে হাওয়া ঢুকতে পারবে না। আর বাতাস ভালোভাবে চলাচল না করলে বল স্যুইং করে না। তাহলে স্পেস বোলারের স্থান ইডেনে হবে না।—'এণ্ড ক্রিকেট উইল বি কিল্ড।'

[৩] এখনই ইডেনের প্রবেশ পথের যে ব্যবস্থা আছে তাতে ৫০ হাজার দর্শকের পক্ষে দীর্ঘ লাইন দিয়ে যথা সময়ে মাঠে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। ১ লক্ষ দর্শককে সেই পথ দিয়ে প্রবেশ করতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন, এতে বিশৃংখলা দেখা দেবে। দর্শকদেরও অসুবিধা ভোগ করতে হবে।

[৪] এখন ইডেনে ৬।৭ মাস ক্রিকেট খেলা হয়, অনুশীলন চলে পুরোদমে। সেজন্য ইদানীংকালে ক্রিকেটের বিভিন্ন আসরে বাংলা উন্নততর সাফল্যের নজীর রাখতে পারছে। ইডেনের মাঠে ফুটবলের অনুপ্রবেশ ঘটলে সে সুযোগ হারাতে হবে।

[৫] ফুটবল এবং ক্রিকেট সিজনের স্বল্প ব্যবধানে টেস্ট খেলার উপযোগী পিচ তৈরি করা যাবে না।

(চলবে)

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসংগে

বাংলার সেরা ক্রীড়াবিদরা কি বলেন

সংগ্রাহক-অরুণ চট্টোপাধ্যায়

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম কি শেষ পর্যন্ত হবেই? হাব-ভাব দেখে তো সেই কথাই মনে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়াবিভাগও এই বিষয়ে অর্থাৎ ইডেনের ঐতিহ্য নষ্ট করে, কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি করার জন্যে যত্নবান। কিন্তু কম্পোজিট স্টেডিয়াম হলে ইডেনের কি অবস্থা হবে সেই কথা আমরা বার বার লিখেছি। লিখেছি বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের পরামর্শ নিয়ে যেন কাজে হাত দেওয়া হয়। কিন্তু সে কথা কে শোনে। ইডেনে নামে কম্পোজিট হলেও আসলে ফুটবলের জন্যে কম্বাইন্ড স্টেডিয়াম তৈরির কাজে হাত দিতে চলেছেন সরকার। এ বিষয়ে কারো কোন মতবাদের ওপর গুরুত্ব হয়তো সরকার দেবেন না। তবু আমরা বাংলাদেশের সেরা ক্রীড়াবিদদের মতামত প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছি। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে এই মতামতগুলি। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো অতীতের খ্যাতনাম বাঙালী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পুটু চৌধুরী ও টেস্ট আম্পায়ার শম্ভু পানের বক্তব্য।

—ক্রীড়া সম্পাদক

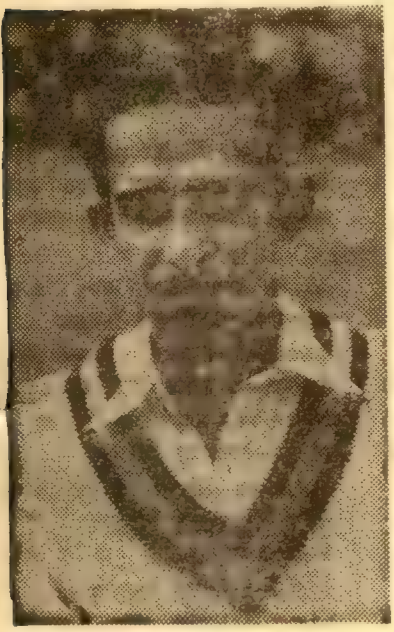

পুটু চৌধুরী কি বলেন

ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার নীরোদরঞ্জন চৌধুরী (পুটু চৌধুরী)-কে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম গঠনের কথা জানাতেই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না, না, এ কখনই হতে পারে না।'

খোলাখুলিভাবে তিনি যা জানালেন তা' সংক্ষেপে এই ঃ

ইডেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাঠ। তার সেই গৌরবজনক ঐতিহ্য নষ্ট করা উচিত নয়। 'লর্ডস'-এর খ্যাতি তার ঐতিহ্যে, সেখানে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়েছিল। তাই প্রথম অবস্থার 'লর্ডস্'-কে ঠিক সেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। 'লর্ডস্'-এর একদিকে (সম্ভবত পূর্বদিকে) উঁচু ঢিবি আছে, তা' খানিকটা ছোট পাহাড়ের মত। এর সংস্কার তো করা যেতো অনায়াসেই। বরং সে ঢিবি এখন ঐতিহ্য বহন করে অম্লান রয়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংস্‌কে তো আর হকার্স কর্নারে পরিণত করা যায় না।

কম্পোজিট স্টেডিয়াম সম্পর্কে এক সময় ডন ব্র্যাডম্যানের মত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, মাটির গঠনের উপরই এ ধরণের স্টেডিয়ামের সাফল্য নির্ভর করছে। তাই ইডেনের এ'টেল মাটি না পাল্টালে কম্পোজিট স্টেডিয়াম সম্ভব নয়, শ্রীচৌধুরীর এটা দৃঢ় বিশ্বাস। এ'টেল মাটিতে ফুটবল খেলা সম্ভব নয়, বুটের স্পাইক মাটিতে জড়িয়ে যাবে। সেজন্য বালির ভাগ সে মাটিতে একটু বেশি পরিমাণে থাকা দরকার। আবার বালি মেশালে ঘাস ভালো জন্মায় না, পিচের চরিত্রও পাল্টাতে বাধ্য।

ধরে নেওয়া গেল যে, ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম করা হয়েছে। তাহলে ফুটবলের পর ক্রিকেট শুরুর মধ্যে ব্যবধান থাকবে মাত্র এক মাস, এই এক মাসের মধ্যেই 'আউটার ফিল্ড' ও 'পিচ' তৈরি করতে হবে। এত অল্প সময়ে জল-কাদা-বুটে ক্ষত-বিক্ষত ইডেনের হারিয়ে যাওয়া জৌলুস ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। ইডেনে ফুটবল খেলার পর মাঠের চেহারা কি হয়েছিল সে অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। নন্দন কানন ইডেনের সে সবুজ চেহারা আর ছিল না।

ক্রীড়ামন্ত্রী বাস্তুঘুঘুদের তাড়ানোর কথা বলেছেন, খুবই ভালো কথা। তবে তা' একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাদের তাড়াতে গিয়ে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম হবে এ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

ফুটবলের জন্য স্টেডিয়াম চাই। তার জন্য ময়দানে জায়গা না মিললে 'সল্ট লেকে' হতে পারে। শহরের কেন্দ্রস্থলেই স্টেডিয়াম করতে হবে—এমন কোন কথা নেই। বিদেশে বহু স্টেডিয়াম শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে গড়ে উঠেছে।

শম্ভু পানের বক্তব্য

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেট আম্পায়ার শ্রীশম্ভু পান ইডেন উদ্যানের মাটির বৈশিষ্ট্যের কথাই প্রথম বললেন। এখানকার মাটিতে কাদার ভাগ বেশি, বালি নিতান্ত কম। এ ধরণের এ'টেল মাটিতে ক্রিকেট খেলাই সম্ভব, এবং সে জন্যই তা' টেস্ট ক্রিকেটের উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে। ফুটবল মাঠে বালি ও কাদার ভাগ সমান সমান থাকে। সেজন্য ইডেনের মাটিতে ফুটবল খেলা খুবই কষ্টকর, বৃষ্টি হলে পা রাখা যায় না। আবার মাটি পরিবর্তন করলে ক্রিকেটের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় রয়েছে। সে অবস্থায় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট পিচ তৈরি করা যাবে না। টেস্ট ক্রিকেট ও ফুটবল একই মাঠে খেলা হয় এমন কোন নজীর

[শেষাংশ ২৮১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন উত্তর

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর, লাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন ঃ টেস্ট ক্রিকেটে ডাবল কেন কোন ভারতীয় খেলোয়াড় লাভ করেছেন?

উত্তর ঃ টেস্ট খেলায় ডাবল লাভ অর্থাৎ ১০০০ রান ও ১০০ উইকেট লাভ যার কৃতিত্ব লাভ করেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র ভিনু মানকাদই। মানকাদ করেছেন ২১০৯ রান ও লাভ করেছেন ১৬২টি উইকেট।

অঞ্জন ব্যানার্জী (ব্যানার্জীপাড়া রোড, কলকাতা-৪১)

প্রশ্ন ঃ উলী, হ্যাসেট, হবস ও হেনড্রেনের টেস্ট খেলার ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর ঃ

	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	শত রান	গড়
উলী	৬৪	৯৮	৭	৩২৮৩	১৫৪	৫	৩৬'০৭
হ্যাসেট	৪৩	৬৯	৩	৩০৭৩	১৯৮*	১০	৪৬'৫৬
হবস	৬১	১০২	৭	৫৪১০	২১১	১৫	৫৬'৯৪
হেনড্রেন	৫১	৮৩	৯	৩৫২৫	২০৫*	৭	৪৭'৬৩

মৃদুলকান্তি দে (নামবাড়ি কলোনী, গৌহাটি)

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে কত রকম সাঁতার আছে বলে আপনি জানেন? নামগুলো কি কি?

উত্তর ঃ দু'রকমই তো—ডুব সাঁতার আর............!

পবিত্রকুমার মাজী (উত্তর চড়া শঙ্কর ...া, তমলুক, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন ঃ ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে কার রানসংখ্যা সর্বোচ্চ এবং কত? পাতৌদির ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর ঃ ভিনু মানকাদের ২৩১ রানই সর্বোচ্চ!

পাতৌদি—৩১টি টেস্ট, ৫৬টি ইনিংস, ২ নঃ আঃ, ২২০৩ রানসংখ্যা, ২০৩ (অপরাজিত) সর্বোচ্চ, ৬টি সেঞ্চুরী, ৪০.৭৯ গড়।

রীতা, রীনা ও রঞ্জু দে (নামবাড়ি কলোনী, গৌহাটি)

উত্তর ঃ শ্রী মিত্র, ৫৭ হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-২৬।

শুকদেব মুখোপাধ্যায় (মিরহাট, বৈদ্যপুর, বর্ধমান)

উত্তর ঃ আপনাকে তো ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিয়েছি। কেন পেলেন না জানি না। যাই হোক ক্রিকেটের রেকর্ডস জানার জন্যে আপনি এ বছরের উইসডেন বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। আর ছবির জন্যে আপনি এম এস ডি রতন, ২২।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ এই ঠিকানায় চিঠি লিখে দেখুন।

প্রদীপকুমার মিত্র (রিজেন্ট পার্ক হাউজিং এ্যাস্টেট, কলকাতা—৪০)

প্রশ্ন ঃ সাটক্লিফ, পনসফোর্ড, ওরেল, হেডলে ও বিজয় হাজারের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর ঃ

	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	শত রান	গড়
সাটক্লিফ	৫৪	৮৪	৯	৪৫৫৫	১৯৪	১৬	৬০'৭৩
পনসফোর্ড	২৯	৪৮	৪	২১২২	২৬৬	৭	৪৮'২২
ওরেল	৫১	৮৭	৯	৩৮৬০	২৬১	৯	৪৯'৪৮
হেডলে	২২	৪০	৪	২১৯০	৭০০*	১০	৬০'৮৩
হাজারে	৩০	৫২	৬	২১৯২	১৬৪*	৭	৪৭'৬৫

দিলীপকুমার ঘোষ (জলপাইগুড়ি)

উত্তর ঃ নববর্ষে আপনার শুভেচ্ছালিপি পেয়েছি। আপনিও আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আব্দুল মালেক (মিলনী লজ, সিউড়ী, বীরভূম)

প্রশ্ন ঃ ক্রিকেটের সর্ব বিভাগে অর্থাৎ ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং ও দল পরিচালনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের গারফিল্ড সোবার্সের ন্যায় অনুরূপ দক্ষতা অতীতে কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে দেখা গেছে কি?

উত্তর ঃ বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। সোবার্সের ঠিক আগে যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ছিলেন সেই স্যার ফ্রাংক ওরেলের কথা মনে করুন না কেন!

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন ঃ পর পর পাঁচটা টেস্টেই টসে জিতেছেন এমন অধিনায়কের নাম জানতে চাই। সালটাও জানাবেন।

উত্তর ঃ

১৯০৫—ইংলণ্ডের এফ. এস. জ্যাকসন—অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে

১৯০৯—অস্ট্রেলিয়ার এম. এ. নোবেল—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে

১৯২৭-২৮—সাউথ আফ্রিকার ডিয়েন—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে

১৯৪৮-৪৯—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গডার্ড—ভারতের বিরুদ্ধে

১৯৫৩—অস্ট্রেলিয়ার এ. এল. হ্যাসেট—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে

১৯৬০—ইংলণ্ডের কাউড্রে—সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে

১৯৬৩-৬৪—ভারতের পতৌদি—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন ঃ উইকেট ভাঙা অবস্থায় আছে। সেই সময় ব্যাটসম্যান বা নন স্ট্রাইকারকে রান আউট করার সুযোগ এলো—ভাঙা উইকেটের দিকেই তখন তাকে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ বল শুদ্ধ হাত দিয়ে ভাঙা উইকেট থেকে একটা স্টাম্প তুলে নিয়ে আবেদন জানাতে হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
...-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজী

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—	৩য়	৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—	১ম	৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—	৩য়	৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
" "	২য়	৬-০০
" "	৩য়	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
" "	২য়	৪-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী—		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
ট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
ট গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:—		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী—		৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—	১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—	২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—		৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—		৪-০০
" " " —	২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—		৬ ০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—		৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—		৪-৫০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—	২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—	৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—	৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—		৫-০০
কথাসরিৎসাগর—	১ম ভাগ	৪-০০
কথাসরিৎসাগর—	২য় ভাগ	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—		৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— ১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড		৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—		৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-৫০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—		৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—	২য় ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
" , গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—		৩-০০

নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০
গোপেশ্বর বন্দ্যো: ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস— ২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থাবলী— ১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি—	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর—	৩-৫০
পরলোক—	৪-৫০
পরলোক রহস্য—	২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
ভারত প্রতিভা—	৫-০০
প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
নানার মা—	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ—	৩-০০
বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
বিসমার্ক—	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী—	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
সাধবীকঙ্কণ—	২-০০

যৌন-মনোদর্শন

৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিরত-কালিকত্বের ব্যাপার সমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী— ১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী— ২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-১২

Thursday, 24th April, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "BASUMATI" Phone : 34—7771, 72, 73,

25 APR 1969

সাপ্তাহিক বসুমতী

বিগত সপ্তাহের কলকাতার একটি চিত্রপট

CALCUTTA UNI... CENTRAL LIBRARY

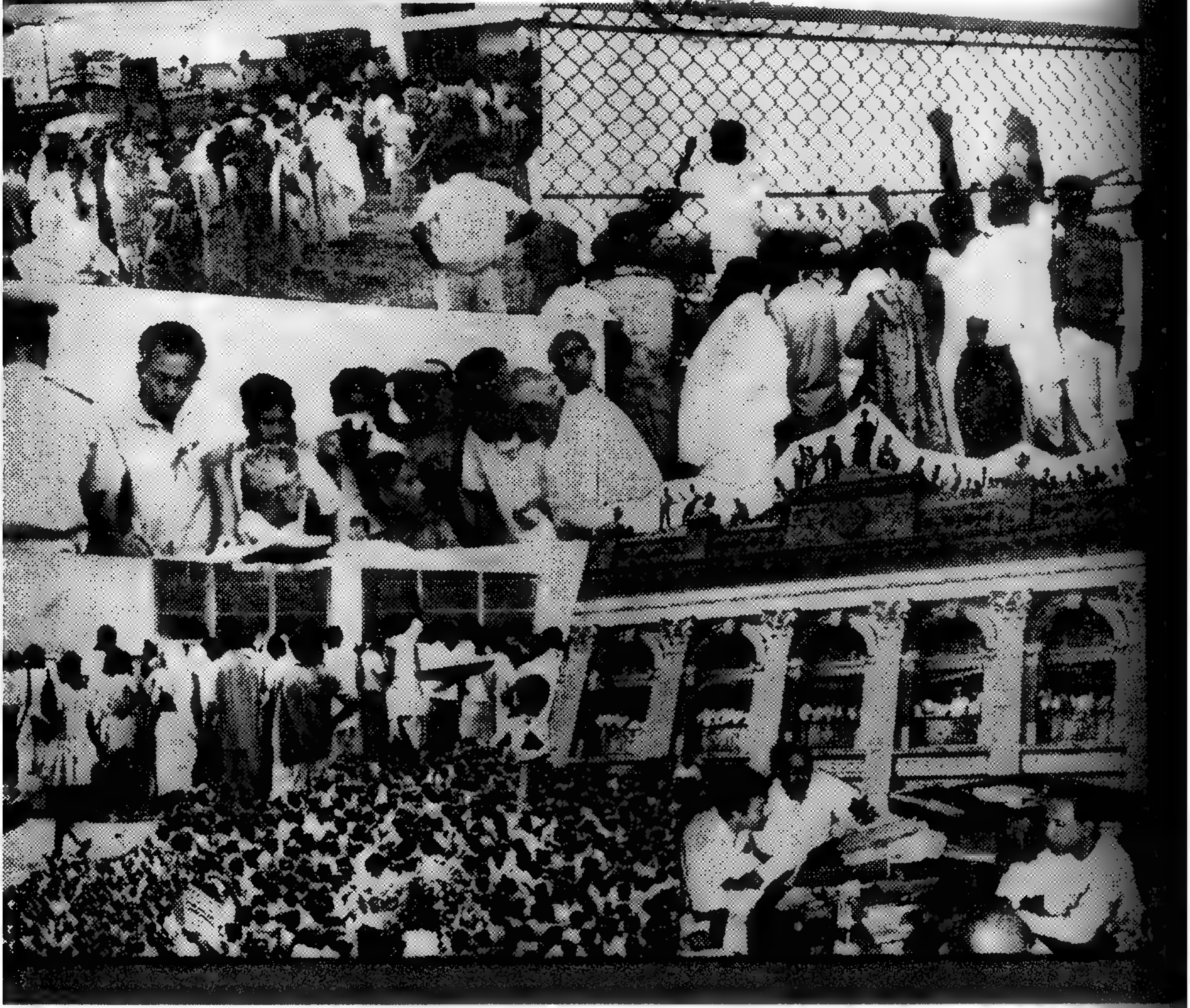

বর্ষ : ৪৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ [OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA] 73 Year, No. 45, 1st May, 19

সূচীপত্র

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৮১৯
আজকের মানুষ		২৮২০
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৮২১
রঙ্গদর্শন		২৮২৬
ভারতদর্শন		২৮২৯
অন্ত্য মে ডে (কবিতা)	গোবিন্দ চক্রবর্তী	২৮৩১
আন্তর্জাতিক		২৮৩২
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	২৮৩৪
নিকট-দূরে (প্রবন্ধ)	কৌশিক বসু	২৮৩৬
মুক্তকণ্ঠ সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	২৮৩৮
নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে	রাহুল বর্মণ	২৮৪০
স্বাধীন, প্রগতিশীল	উদ্খড়	২৮৪২
নির্বাচনের পরে	সাগর বিশ্বাস	২৮৪৩
আমার ইউরোপ ভ্রমণ	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২৮৪৭
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল জানা	২৮৫১
তিমিরপ্রান্ত ভুরার্স	অগ্নিবর্ণ	২৮৫৫
কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন কি সম্ভব	তুষার চট্টোপাধ্যায়	২৮৫৮
মে-দিবস (কবিতা)	মনোরঞ্জন হাজরা	২৮৬১
প্রমিথিয়ুস (গল্প)	অনিলকুমার দলুই	২৮৬২

যে কোন

গয়না

আর

আসল

গ্রহরত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট

এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
...ম দিন (কবিতা)	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৮৬৪
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	অশোক সেন	২৮৬৬
গ্রন্থমেলা		২৮৬৯
পাঠকমহল		২৮৭০
রূপাজগৎ		২৮৭১
খেলাধুলো	শান্তিপ্রিয়	২৮৭৬

আসুন... ইউবিআইতেই সঞ্চয় করুন

- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের বার্ষিক সুদ পাবেন সেভিংস অ্যাকাউন্টে শতকরা ৩½ টাকা, মেয়াদী আমানতে সর্বোচ্চ শতকরা ৬½ টাকা।
- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে আপনার টাকা খরচ করতে পারবেন।
- ইউবিআইতে আপনার ও আরও অনেকের সঞ্চয় একত্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে, রপ্তানীর জন্যে, আর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্যে সরকারকে আমরা আরও বেশী ঋণ দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করব।

ইউবিআই

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিস্টার্ড ও হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা অফিস আছে।

৭৩ বর্ষ ঃ ৪৫শ সংখ্যা—মূল্য ঃ .৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
PRICE : 30 Paise
Thursday, 1st May, 1969

ন্যক্কারজনক তবু আশাহত নই

চলচ্চিত্র শিল্পে সঙ্কটের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির আহবানে ছায়াচিত্রের শিল্পী, কলাকুশলী, প্রযোজক, পরিচালকরা মিছিল করে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ এসেছিলেন গত শুক্রবারে।

সমিতির উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্র শিল্পে সঙ্কটের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু মিছিলে আগত অভিনেতাদের দেখার জন্য মহাকরণে একশ্রেণীর নারী-পুরুষ দর্শকের যে রকম ভিড় হয়েছিল, তাতে আমাদের সমাজের মধ্যে গভীর সঙ্কটেরই ছায়াপাত করে। আরো মজার ব্যাপার, এই কিছুদিন আগে যে-সব করণিক যুক্তফ্রন্টের সংগ্রামী মন্ত্রীদের স্বাগত জানাবার জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন বলে দাবি করেন, তাঁরাই কাজ-কর্ম ফেলে কো-অর্ডিন্যান্স কমিটির কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধ-উপরোধ তুচ্ছ করে তাঁদের প্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের একবার দেখার জন্য অসঙ্গত কিছু করতে বাকি রাখেন নি।

গত সপ্তাহের সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা সমাজের চরম অবক্ষয়ের দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এখনো আমাদের অভিমত এই যে, এক ধরণের চলচ্চিত্র এমনভাবে তৈরি হয় এবং ঐ-সব চলচ্চিত্রের নায়ক এমনভাবে নির্বাচিত করা হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে লঘুচিত্ত দর্শকদের মাদকতার দ্বারা আকর্ষণ করা। আমরা ভাবতে পারি না, অর্থমোহে একশ্রেণীর নায়ক কেন যে দেশের ও দশের মঙ্গলের কথা চিন্তা না করে দর্শকদের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করেন! আবার দর্শকরাও চলচ্চিত্রের নেশার ঘোরে নায়কদের দেখার জন্য কুৎসিত কাণ্ড করতে পারে—এ-ও অ-কল্পনীয়। তবে, এই শ্রেণীর যারা দর্শক তারা নাকি রকবাজ অকালকুষ্মাণ্ড এবং সমাজের অবহেলিত অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় এমন ধারণা অনেকেই করেন। কিন্তু মহাকরণে যাঁরা ভিড় জমিয়েছিলেন, তাঁরা নাকি শিক্ষিত, সমাজে স্বীকৃত এবং সরকারও তাঁদের আর্থিক দাবির কাছে তাড়াতাড়ি মাথা নত না করে পারেন না। এই করণিকদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন—যাঁরা উপরি-উক্ত ধরণের লঘুচিত্ততায় আত্ম-বিসর্জন দেন না, তাঁরা শিশির ভাদুড়ির নাম জানেন, ছবি বিশ্বাসের শিল্প-প্রতিভার প্রশংসায় নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করেন। কিন্তু মহাকরণের ঘটনায় এটাই প্রমাণ হোল, যে-সব নায়ক-নায়িকা বাংলা দেশের ঐতিহ্যের প্রতি মর্যাদায় মনোভাব পোষণ করে না—তাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য করণিকদের সংখ্যাই মহাকরণে বেশি। তাদের ভিড়ে গোটা মহাকরণটাই বে-সামাল। এই বে-সামাল অবস্থা আমাদের সমাজের কোন দিকটার প্রতি ইঙ্গিত দেয়?

বেশ কয়েক বছর আগে জনৈক চলচ্চিত্র শিল্পী একবার অত্যন্ত খেদের সঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখে জনসাধারণকে এই বলে সচেতন করে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন নায়কদের দেখার জন্য অশোভন পোষাকে নগ্ন মনোভাব পোষণ না করেন। তিনি অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের পাশে অবস্থিত তাঁকে দেখার জন্য জনসাধারণ যখন অন্যায় কৌতূহল পোষণ করেন, তখন তিনি সর্বাধিক লজ্জা বোধ করেন। জনৈক বিদগ্ধ নায়কের এই অভিমত নিঃসন্দেহে অন্য সব নায়কদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাঁরা নিজেদের অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে প্রকাশ করতে ভালবাসেন।

এক ধরণের পত্রিকায় তাঁদের নানা রকম কেচ্ছাকাহিনী প্রকাশ করলেও তাঁরা কোনো রকম প্রতিবাদ করে না। এবং সমাজের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে পরিচিত এবং অকারণে বিবৃতিদানে সদাই প্রস্তুত, তাঁরা একবারও ভাবেন না যে, ঐ সব কেচ্ছাকাহিনী যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কী জঘন্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের সমাজ আর্থিক সংঘাতে এবং নানা কারণে চরম অবক্ষয়ের দিকেই যাচ্ছে। এই মুহূর্তে চলচ্চিত্রের নায়করাও যদি তাঁদের শিল্প সংকটের নামে সমাজ সংকট আরো বৃদ্ধি করে—তাতে না হবে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি অপরপক্ষে হবে সমাজের নিদারুণ ক্ষতি। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের আশা ছিল ডালহৌসি অঞ্চলের কর্মচারী ও মহাকরণের করণিকরা সংযম ও শুচিতার পরিচয় দেবেন। কিন্তু নায়ক দেখার জন্য তাঁরা যে-কাণ্ড করেছেন—তা গভীরতম লজ্জার এবং শিক্ষিতমহলেও আজ কোন্ ব্যাধি প্রবেশ করেছে, তাও আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে একেবারে নৈরাশ্যেরও কারণ নেই। একশ্রেণীর বয়স্ক মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে যে রোগের প্রকোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে—তা এখনো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। তাই কলকাতার উপকণ্ঠে হিপিরা ছাত্রদের বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে দলবদ্ধভাবে ছাত্ররাই এসে তার প্রতিবাদ করেছে।

দেশের নেতৃবৃন্দ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের ওপর এখন অনেকেই প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন; হয়তো যুব-সম্প্রদায়ই নবীন চেতনায় আগামী দিনে সমাজকে নতুন পথ দেখাবে। তারাই এখন একমাত্র আশা-ভরসা। বাংলাকে তারা নবজীবন দান করুক—এই আমাদের কামনা।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

চেকোশ্লোভাক রাজনৈতিক নাটকের আবার পট পরিবর্তন হল। গত বছর জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট আন্তোনিন নোভৎনিকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে আলেকজান্ডার ডুবচেককে সে-পদে বহাল করে যে-নাটকের সূচনা তার আর একটা অঙ্ক সংযোজিত হল ডুবচেককে অপসারণ করে ডঃ হুসাককে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বরণ করার মধ্য দিয়ে। সে-দৃশ্যটাই ছিল নাটকটির সবচেয়ে উদ্বেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ, যখন সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত পাঁচটি দেশের সৈন্যরা সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নিয়েছিল। এ-ঘটনার পর থেকে বিশেষত সোভিয়েট য়ুনিয়নকে কেন্দ্র করে চেকোশ্লোভাকিয়ায় নিরন্তর যে-নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত ঘটনা ও রটনা চলে আসছে তারই একটা পরিণতি লাভ করল ডঃ হুসাকের পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারীর পদলাভে।

ডুবচেক, সার্নিক ওটা সিক, স্মরকোভস্কি প্রমুখ চেক নেতারা চেয়েছিলেন কঠোর বিধি-শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্তি দিতে, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও উদারতার হাওয়া বওয়াতে। কিন্তু সংবাদপত্র ইত্যাদি সেন্সরশিপের বাধানিষেধ থেকে মুক্তি পাবার পর সোভিয়েটের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। এতটা বাড়াবাড়ি সোভিয়েট নেতাদের সহ্য হয় নি। তাঁরা আরো অভিযোগ আনলেন যে, উদারতার নামে নয়া চেক নেতারা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার খপ্পরে পড়ে গিয়েছেন, তাঁরা সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে মস্কো-প্রাগ চুক্তি সম্পাদন করে দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্বেকার সহজ সম্প্রীতিটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ফলে দুটো দেশের মধ্যে যে-ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে তা যেন আর কিছুতেই জোড়া লাগতে চাইল না। সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা প্রচার বন্ধ করার ব্যাপারে ডুবচেক হয় অক্ষম নয়তো অনিচ্ছুক ভেবেই তাঁকে প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে সরানো অপরিহার্য হয়ে পড়ল। ডঃ হুসাকের পদোন্নতি সে-কারণেই।

কিন্তু গুস্টাভ হুসাক কি পারবেন চেক তরুণদের সোভিয়েট-বিরোধী মনোভাবের কোনো পরিবর্তন সাধনে? একথা অবশ্য অস্বীকার করার যো নেই যে, ডঃ হুসাক চেক কমিউনিস্ট পার্টির একজন পোড়খাওয়া নেতা। ডুবচেকদের সঙ্গে উদারনীতির প্রবর্তন আন্দোলনের হুসাকও শরিক ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ডুবচেক, স্মরকোভস্কি থেকে তাঁর পন্থা স্বতন্ত্র।

গুস্টাভ হুসাক

এ-স্বাতন্ত্র্যের দরুণ তাঁকে বিস্তর সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে, শিকার হতে হয়েছে বহু আক্রমণের। আক্রমণ হেনেছে সাহিত্য পত্রিকা লিটারেলি লিস্টি, আঘাত করেছেন শিল্পীসঙ্ঘ, উদারনীতিবাদী বহু সংবাদপত্রও। কিন্তু সে-আঘাত বা আক্রমণে হুসাক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গর্ত খোঁজেন নি. তিনি সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছেন, পাল্টা আক্রমণও করেছেন। বস্তুত হুসাককে দলের বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী কোনপন্থীই ফেলা যাবে না, তিনি হচ্ছেন মধ্যপন্থী। তিনি বুক বাজিয়ে বলেছেন যে, দলীয় শৃঙ্খলা যাঁরা ভঙ্গ করবেন, তাঁদের পার্টি সদস্যকার্ড বাতিল করে দিতেও ডঃ হুসাক এতটুকু দ্বিধা করবেন না।

ডঃ হুসাক বরাবরই শক্ত মানুষ হিসেবে পার্টির মধ্যে সম্মানিত। আইনে ডক্টরেট লাভ করার পর গুস্টাভ হুসাক প্রথমে আইন ব্যবসা সুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার আগে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দেশ যখন জার্মানীর দখলে গেল ডঃ হুসাক তখন এক নাৎসী-বিরোধী অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন ১৯৪৪ সালে। শ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন তিনি একই বছরে এবং যুদ্ধের শেষে যখন ১৯৪৫ সালে দেশে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়, তখন হুসাক প্রথমে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক কমিশনার এবং পরে কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করেন। এর পরের পাঁচ বছর (১৯৪৬—৫১ সাল) তাঁকে দেখা গিয়েছে বোর্ড অফ কমিশনারের চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করতে। '৫৪ সনে হুসাকের জীবনে নেমে এল এক বিপর্যয়। পোল্যাণ্ডের গোমুলকার মত তাঁকেও বন্দী হতে হল, প্রেসিডেন্ট নোভোৎনি তাঁকে কারাগারে আটক রাখলেন দীর্ঘ ছ' বছর।

সার্নিকের প্রধানমন্ত্রিত্বে গত বছরের এপ্রিল মাসে দেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করা হলে ডঃ হুসাককে তার অন্যতম উপ-প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ডুবচেকদের পার্থক্য এখানে যে, ডঃ হুসাক সোভিয়েট-বিরোধী নন, কিম্বা উদারনীতির নামে পশ্চিমী দুনিয়ার দিকে ঘেঁষারও ঘোর বিরোধী। তাই বলে দেশকে জানুয়ারী-পূর্ব কঠোরতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও তিনি চান না। ডঃ হুসাক চান সোভিয়েটের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক বজায় রেখে দেশকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু ডঃ হুসাকের নতুন পদপ্রাপ্তিতে দেশের সকল আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের পূর্ণ অবসান ঘটবে—এতটা এখুনি আশা করা যায় কি?

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হরিপুরায় শান্তির দ্বীপ—(৩)

সব কিছুই ছন্দোময়, কিন্তু ছন্দোনাশ হবার সম্ভাবনা ছিল সমূহ। রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুযায়ী সকলেই হরিপুরায় দক্ষিণপন্থীদের সংগে বামপন্থীদের সংঘর্ষ আশা করছিল। "সোস্যালিস্ট ও বামপন্থীরা আবার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে"; স্টেটসম্যানের ১৭ ফেব্রুয়ারীর রিপোর্টে পাই, "ঐসব গোষ্ঠীর কাছে সংঘাতের বিষয়গুলির বাস্তব গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কারণ কংগ্রেস এখন বিরোধী দলের ভূমিকা ত্যাগ করে সাতটি স্বয়ংশাসিত প্রদেশে সরকারী দল।" বিহার ও অন্যত্র কিষানদল ও কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্ছেদ, ফেডারেশন প্রশ্ন, শ্রমিক আন্দোলন, দেশীয় রাজ্যের ঘটনাসমূহ বামপন্থীদের আক্রমণের বিষয় হবে এবং তারা 'অধিকতর চরমপন্থা নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করবে।'

কিষানদল সম্বন্ধে কংগ্রেসের বিরূপ আচরণে সোস্যালিস্ট দল তখন সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ। কিষান-আন্দোলনের ক্ষেত্রেই কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলের মনোভাবের মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা দেখা দিয়েছিল। "বিহার কংগ্রেস কর্তৃক কিষানদলের বিতাড়ন সম্বন্ধে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সম্প্রতি বলেছেন, বামপন্থীদের হটিয়ে দেবার জন্য দক্ষিণপন্থীরা যে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, এটি তারই অংশ।"১৮

কিষান-আন্দোলন কিছুদিন থেকেই কংগ্রেসের কাছে উৎপাতের মত হয়ে উঠছিল। পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসে (২য় খণ্ড) কিষান-আন্দোলনের আতঙ্কিত বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রামসমূহের মধ্য দিয়ে মাইলের পর মাইল তাদের শোভাযাত্রা, হাতে রক্তপতাকা, যার উপরে সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন, হিংসার দিকে তাদের ঝোঁক, কংগ্রেস-প্রবর্তিত জাতীয় পতাকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দলীয় পতাকা উত্তোলনের উগ্র চেষ্টা—এই সকলের মধ্যে পট্টভি গান্ধীবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের সংঘর্ষ দেখেছেন; সমাজতন্ত্রও ঠিক নয়, একেবারে কমিউনিজমের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করেছেন। "সোসিয়ালিস্টরা কমিউনিস্টদের সংগে মিশে যাচ্ছে, কমিউনিস্টরা ঢুকে পড়ছে ন্যাশন্যালিস্টদের মধ্যে।"১৯

কিষান-আন্দোলন ধনিক, বণিক ও জমিদারদের মধ্যে কী অশুভ সংকেত এনেছিল, তার কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে এলাহাবাদের পায়োনীয়ার কাগজ থেকে। ইংরেজ স্বার্থের, সেই সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও অভিজাত স্বার্থের সমর্থক বিখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রটির ১২ জানুয়ারী, ১৯৩৮, তারিখের সংবাদ-শিরোনামা—

Cult of Lathi in Bihar

Violence Preached by Kisan Sabha

Final Warning by Babu Rajendra Prasad

Attempt at Parallel Organisation

"Foul Propaganda" Against Zemindars

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কিষানসভা-বিরোধী বিবৃতিকে পায়োনীয়ার পরম উল্লাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছিল। তার কিছু অংশ আমি অনুবাদ না করে তুলে দিচ্ছি—

"That a violent atmosphere prevails in many parts of the province by the preaching of the cult of the *Lathi* can be felt by anyone who chooses to pay a visit to these parts." Thus Babu Rajendra Prasad in a statement commenting on the anti-Congress and anti-Zemindar agitation formulated by the Kisan Sabha in Bihar.

Zemindars, it is pointed out have come in bitter criticisms at the hands of Kisan Sabha leaders who preach at big gatherings that the landlords "should be taught a lesson."

The most popular slogan among the Kisan Sabha workers is: *Mal-*

---

১৮ স্টেটসম্যান, ১৪ ফেব্রুয়ারী।

১৯ পট্টভির কংগ্রেস ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা।

guzari loge kaise danda hamara zindabad (how are you going to realise the rents, long live our lathi!).

"Congressmen who are not in the Kisan Sabha or who do not sympathise with such activities", states the ex-President of the Congress, "have been condemned in meeting as henchmen of Zemindars. It has been freely stated that even prominent Congressmen are not above being influenced and purchased by Zemindars.

The whole attempt of the Kisan Sabha ever since the Congress took office has been to show that Congressmen, as distinguished from the Kisan Sabha and its workers, cannot be relied upon to safeguard the interest of the Kisans and that it is necessary to set up a strong parallel organisation and also capture Congress.

"If there is no improvement in the situation", warns Babu Rajendra Prasad, "the Provincial Committee will be compelled to take action in the terms of the resolution of the Working Committee of the Congress."

শৃঙ্খলারক্ষায় অর্থাৎ কিষানদলের আন্দোলন নিবারণে কংগ্রেস বিহারে ব্যর্থ হয়েছিল। তখন কিষানদলগুলি থেকে কংগ্রেসীদের সরে আসার নির্দেশ দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। জহরলাল নেহরুও অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। "ফল হল, বহু কংগ্রেসী মুখে কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ভিতরে ভিতরে কিষানসভার হয়ে কাজ করতে লাগল।" বিহারের বিখ্যাত কিষাননেতা স্বামী সহজানন্দ—যিনি পরে সুভাষচন্দ্রের এক প্রধান সমর্থক হবেন—কংগ্রেসীদের কাছে চক্ষুশূল, তাঁর মুক্ত বিদ্রোহের জন্য। তিনি খোলাখুলি বলেছিলেন, কিষানদের মধ্যে কাজ করা ছাড়ার চেয়ে তিনি বরং কংগ্রেসই ছাড়বেন। বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা জমিদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কৃষকদের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়েছে। আরও মারাত্মক, তিনি কৃষকদের বলছিলেন, সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য যদি দরকার হয় কৃষকেরা যেন লাঠি ধরে। ভারতবর্ষে শাসন শৃঙ্খলারক্ষার জন্য বৃটিশ বেয়নেটের পক্ষপাতী পায়োনীয়ার একই সঙ্গে কংগ্রেসী অহিংসার অতীব ভক্ত। স্বামী সহজানন্দের সর্বনাশা কথাবার্তা শুনে পত্রিকাটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে অহিংসার মাহাত্ম্য এবং জমিদার-স্বার্থ সংরক্ষণের পবিত্র কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। সহজা[illegible] দলবলের পাল্লায় পড়ে জমিদাররা কী শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে, তা হৃদয়বিদারক ভাষায় লিখেছিল ১১ জানুয়ারীর সম্পাদকীয়তে—

"He (Sahajananda) also inunciated the doctrine of defensive violence and admitted that "he had advised the Kisans to defend their property and honour, if necessary with force. He had told the Kisans that the threat of using *danda* against oppressors would be a sufficient safeguard of their honour and property." As a result of this advice....we are told that the Kisans of the Bihar are free and not afraid of the landlords who "are trembling in their shoes." Swami Sahajananda's agrarian programme does not stop short at this point. He desires that Kisan Sabhas should be given freedom to work so that they may drive away all landlords from their land "without the use of violence." This illuminating speech was made at a public meeting in Cawnpore." ("Kisan leader's threat".—পায়োনীয়ারের সম্পাদকীয়, ১১ জানুয়ারী, ১৯৩৮)।

"কংগ্রেস নেতাদের ধৈর্য তখন একেবারে নষ্ট হবার মুখ", পট্টভি কংগ্রেসের ইতিহাসে লিখেছেন, "তাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল হরিপুরায়।" পট্টভি স্বীকার করেছেন, কিষানসভাগুলি ভারতের স্বাধীনতা চায় নি তা নয়, বরং তাদের প্রতিবাদের বিষয় ছিল—কংগ্রেস এক্ষেত্রে যথেষ্ট দ্রুত ও সর্বাত্মক পথ অবলম্বন করে নি।"

(কং-ইতিহাস, ২য়, পৃ—৮১)

কংগ্রেস যে প্রস্তাব নিয়েছিল তাতে কিষানদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতির অভাব ছিল না; "ভারতের বেশী মানুষ কিষান, সুতরাং কংগ্রেস প্রধানতঃ কিষান প্রতিষ্ঠানই"; কিষানদের আরও অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগদানে আহ্বান জানানো হয়েছিল, কিন্তু যেখানে কংগ্রেসের নীতি নষ্ট হচ্ছে সেখানে কংগ্রেস অবশ্যই আপোষ করতে পারে না, ইত্যাদি। (পট্টভি—কং-ইতি, দ্বিতীয়—৮০—৮১)

দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কও তখন আর একটি বিতর্কের বিষয়। কংগ্রেসের কার্যক্ষেত্র বৃটিশ ভারত, কিন্তু ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতেরই অন্তর্গত। সেখানকার প্রজারা কার্যত দ্বিগুণ পরাধীন—স্বদেশীয় রাজাদের দ্বারা এবং ঐ রাজাদের প্রভু

মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের দ্বারা। কংগ্রেসী আন্দোলন দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের হৃদয়কে চঞ্চল করে তুলেছিল, সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টির জন্য তারা কংগ্রেসের নেতৃত্ব চাইছিল। ১৯৩৭ সালে কলকাতা এ-আই-সি-সি'র সভায় কংগ্রেস মহাশয়দের প্রজা আন্দোলন সমর্থনের প্রস্তাব নিয়ে ফেলেছিল—পট্টভি জানিয়েছেন; এটা কংগ্রেসের পক্ষে দারুণ ক্যাসাদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অল্পদিনের মধ্যে নানা দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন আরম্ভ হল—এবং সকলে কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থন চাইতে লাগল। ১৯৩৮ সালে এ-আই-সি-সির পূর্বোক্ত প্রস্তাব যদিও পণ্ডিত জহরলালের সভাপতিত্বকালেই গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেটিকে পছন্দ করেন নি, গান্ধীজীও করেন নি। ফলে কিছু পরেই কংগ্রেসের পিছু হটার লক্ষণ দেখা গেল, এবং সেটা স্বতই দেশীয় রাজ্য আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করল। হরিপুরা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের দেশীয় রাজ্য বিষয়ে সরকারী প্রস্তাবের উপর নানা সংশোধনী প্রস্তাব আসতে লাগল। সুভাষচন্দ্র তখন সভাপতির আসনে। সুভাষচন্দ্র—সর্বপ্রকার আন্দোলনের পক্ষপাতী—তিনি বসে আছেন সভাপতি হয়ে—সংগ্রাম সমর্থনের পক্ষে প্রস্তাব আসছে, ওয়ার্কিং কমিটি যার বিরোধী—সুভাষচন্দ্রের মনের চেহারা অনুমান করতে পারি। শেষ পর্যন্ত তিনি যা করেছিলেন, সে বিষয়ে বোম্বাইয়ের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' কাগজের (২২ ফেব্রুয়ারী) বক্র বিবরণীটি উল্লেখযোগ্য:

"পরবর্তী প্রস্তাব দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধীয়। সভাপতি (সুভাষচন্দ্র) ঘোষণা করলেন, তিনি দুটি সংশোধনী প্রস্তাব পেয়েছেন, তার একটি সরিয়ে রাখছেন কারণ বিষয়-নির্বাচনী সভায় যথাসময়ে সেটি হাজির করা হয় নি।

"প্রতিনিধিদের বেষ্টনীমধ্যে এর ফলে হৈ-চৈ পড়ল। কয়েকজন প্রতিনিধি বললেন; কংগ্রেসের উন্মুক্ত অধিবেশনে তাঁরা যে-কোনো সংখ্যায় সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারেন, বিশেষতঃ তাঁদের অনেকেই যখন বিষয়-নির্বাচনী সভার সদস্য নন। সভাপতি জানালেন, তিনি অতীতের নজির মেনে চলছেন। তিনি অবশ্য পুনঃপুনঃ প্রতিনিধিদের প্রতি সহানুভূতি জানালেন, এবং পুনঃপুনঃ জানালেন এক্ষেত্রে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা চালিত।

"অনেকেই মন্তব্য করলেন, সভাপতির রুলিং সভাপতিই দেবেন, এক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা তিনি চালিত হলেন কেন? প্রতিনিধিদের সরব দাবিকে তখন তিনি মেনে নিয়ে বললেন, কি করবেন তাঁরাই ঠিক করুন। তাঁরা স্থির করলেন যে, নতুন সংশোধনী প্রস্তাব তাঁরা আনতে পারেন।

"সভাপতির এই দুর্বলতা ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করল। সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য প্রতিনিধিদের দাবি এইভাবে স্বীকৃত হওয়ায় সংশোধনী প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব খুবই বেড়ে গেল। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা একে একে মঞ্চে উঠলেন এবং সভাপতিকে ঘিরে ধরে ব্যস্ত হয়ে আলোচনায় বসে গেলেন। মৌলানা আজাদ কিছু আগে সভাস্থল ত্যাগ করে গিয়েছিলেন; তাঁকে নেতাদের শিবির থেকে দ্রুত ডেকে আনা হল। সভাস্থলে ভোটের ফলাফল নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন—যেভাবেই হোক জয়ী হতেই হবে।

"সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থক বক্তারা বললেন, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করুক।......শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল উঠে ওয়ার্কিং কমিটির মুখরক্ষা করলেন। তিনি বললেন, কংগ্রেসের মূল লড়াই স্বাধীনতার জন্য, দেশীয় রাজ্যের তুচ্ছ ঝগড়ায় মাথা ঘামিয়ে কংগ্রেস মূল লড়াই নষ্ট করতে পারে না। তারপর তিনি তাঁর চরম অস্ত্র তুললেন। "আপনারা যা বলছেন তা আমরা করতে পারি না। যদি আপনারা সন্তুষ্ট না হন, আমাদের বরখাস্ত করে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুন।" তাঁর জয় সম্পূর্ণ হল যখন বললেন—"যদি ইচ্ছা করেন কংগ্রেস ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলুন মহাশয়দের রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে।"

ফলে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি পরাভূত হল।......

এইভাবে কলকাতায় এ-আই-সি-সির সভায় যে দুষ্কার্য করা হয়েছিল, তার সংশোধন হল এবং আসন্ন ফেডারেশনের পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির কূটনৈতিক বিজয় ঘটল।"

এই সমস্ত প্রশ্নের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল একটি চমকপ্রদ ঘটনায়—হরিপুরা কংগ্রেসের ঠিক আগে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে বসে বন্দীমুক্তি প্রশ্নে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে জনমতের চাপে পড়ে বন্দীমুক্তির জন্য সচেষ্ট হতে হয়েছিলই; অনেক বন্দীর মুক্তি হয়েছিল, কিন্তু হিংসাত্মক কাজের সঙ্গে যুক্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল রাজী হন নি। এদিকে মন্ত্রিসভার অধিকারে হস্তক্ষেপ ধরে নিয়ে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে বসল।

অসহ্য উদ্বেগ ও দারুণ চাঞ্চল্যের ক্ষণ। কংগ্রেসের অপরাপর মন্ত্রিসভাগুলিও কি পদত্যাগ করতে যাচ্ছে? কংগ্রেস কি এখনি জাতীয় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

না, কংগ্রেস তেমন কিছু করে নি, কংগ্রেস সংকটের বিস্তার চাইল না; অন্যান্য মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বলল না; বড়লাটের কাছে আবেদন জানাল সুবিবেচনার জন্য। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—বিশেষত যাঁরা

মন্ত্রিত্ব ও তদনুষঙ্গ সুযোগ-সুবিধা হারানোর চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত।২০

কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে যে-প্রস্তাব নিয়েছিল, তাতে মুক্তি আদায়ের জন্য অনশনের কঠোর নিন্দা করা হয়, সবিনয়ে জানানো হয়, হিংসায় বিশ্বাসী বিপ্লবীদের মুক্তি-লাভের পরে কংগ্রেস কিভাবে জনগণের ভাবোচ্ছ্বাসে শীতল জল ঢেলেছে। পট্টভি লিখেছেন, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা মুক্তিলাভ করার পরে যে অভ্যর্থনা জানানো হয় ও যেসব বক্তৃতাদি হয়, তাতে গভর্নর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং পণ্ডিত জহরলালও ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও একই পথ নিয়েছিলেন। "এইসব সংশোধনী চেষ্টায় জনমত পরিবর্তিত হয়। তার ফলে যখন ৬ জন বন্দী মুক্তিলাভ করেন, যাঁদের একজন কাকোরী দলের মুখ্য ব্যক্তি, তখন কোনো অভ্যর্থনানুষ্ঠান হয় নি, কোনো অভিনন্দনও জানানো হয় নি।"

গোপীনাথ সাহার মৃত্যুদণ্ডের পরে, অনশনে যতীন দাসের প্রাণত্যাগের পরে, যে-সুভাষচন্দ্র গান্ধী-কংগ্রেসের শীতল নীতির পায়ে বৃথা মাথা খুঁড়েছেন এতটুকু সহানুভূতি কামনায়—তাঁকে এসবই সহ্য করতে হয়েছিল অন্ধে বসে। কিন্তু অন্তরালে তিনি কী করেছিলেন? এক্ষেত্রে স্টেটসম্যান পত্রিকার ১৬ ফেব্রুয়ারীর *'Queer Crisis'* নামক বৃহৎ সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্যে প্রভূত আলোক রয়েছে। জানা গেল, ওয়ার্কিং কমিটিই চাপ দিয়ে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিয়েছিল, এবং সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল তার মূলে ছিলেন। পদত্যাগের প্রশ্নে ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। যাঁরা শুরু থেকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, তাঁরা সেবার পরাভূত হলেও এবার শক্তিশালী হয়ে কনস্টিটিউশনকে ভাঙার কাজে সচেষ্ট, এমন বলা হয়েছিল। দোষটা সুভাষচন্দ্রের ঘাড়েই বেশি চাপানো হয়েছিল, কারণ তিনি অল্পদিন আগে লণ্ডনে বলেছিলেন, মন্ত্রিসভার সঙ্গে গভর্নরের মতভেদ হচ্ছে।২১

---

২০ "Following the release of the Working Committee of its long awaited resolution on the ministerial crisis, the tension of the last few days was relieved when it was announced that the Congress was not participating in a crisis in the other provinces and they are appealing to the Governor-General for a reconsideration of the position, regarding Bihar and U.P. The future held out promises of peace and not war."

(অমৃতবাজার, ২০ ফেব্রুয়ারী)

২১ "The Working Committee is believed to be by no means unanimous on the subject and the division of opinion corresponds roughly to the division of opinion last year concerning the question of office acceptance. Those who opposed office acceptance, when they were overborne on that point, insisted that public emphasis should be laid on the fact that office had been accepted only in order to end the Constitution.......... The present President Pandit Jawaharlal Nehru and the President-elect Mr. Subhas Bose are both believed to favour a crisis on these lines. The fact that Congress Ministries and the Governors worked harmoniously together was a disconcerting factor, and Mr. Bose in London was reduced to giving a highly incorrect picture of the existing relations. In the end, the crisis has had to be manufactured from outside."

(Statesman : Ed. Feb. 16, 1938)

সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি ১৯৩৭ সালে দিল্লীতে এ আই সি সি-র মিটিংয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধতা করেছিলেন, সে বিষয়ে টেণ্ডুলকরের গান্ধী-জীবনীতে লেখা আছে—

"In the third week of March, Gandhi proceeded to Delhi to attend the A.I.C.C. Opinion within the Congress leadership was sharply divided on the question of office-acceptance. The right-wing leaders maintained that by forming ministries the Congress could improve its position in the fight against the new constitution. Nehru, Bose and the left-wing groups were opposed to taking office. After two days' discussion, the A.I.C.C. adopted Gandhi's compromise formula by a vote of 127 to 70. The resolution authorised the acceptance of offices in the provinces where the Congress commanded a majority in the legislature, provided that "the ministership shall not be accepted unless the leader of the Congress Party in the legislature is satisfied and is able to state publicly that the Governor will not use his special powers of interference or set aside the office of ministers in regard to their constitutional activities."

(Mahatma : Vol.—4, p. 143)

গভর্নরদের সঙ্গে মন্ত্রীদের মতভেদের ব্যাপারটা মোটেই ঠিক নয়, তাঁরা মিলে-মিশে বেশ সুখী পরিবারের মত রয়েছেন, স্টেটসম্যান লিখেছিল, সুভাষ বোসের মত লোকেরাই বাইরে থেকে গন্ডগোল পাকাচ্ছে। কথাটা শুধু বৃটিশ স্বার্থের পোস্টা স্টেটসম্যানেরই নয়, অন্যতম কংগ্রেসী 'প্রধানমন্ত্রী', ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীরও। লন্ডনে সুভাষচন্দ্র যা বলেছিলেন, তার প্রতিবাদে রাজাগোপালাচারী সহ তিনজন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসে জানিয়েছিলেন, গভর্নরের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতায় কোনই অসুবিধা ঘটে নি। ২৮ জানুয়ারী স্টেটসম্যান পত্রিকায় পরিতৃপ্তির সঙ্গে লেখা হয়েছিল—

"Three Congress Premiers, notably Mr. Rajagopalachari, have denied having had any difficulty with their Governors. They have thought it necessary to say so in public because their attention was drawn to Mr. Subhas Bose's recent description in London, of fiction going on everywhere. So sweeping a statement needed a denial and it is good that it has come from authoritative quarters."

রাজাগোপালাচারীদের কাছে যে-কোনো মন্ত্রিত্ব রক্ষণীয় যে-কোনো উপায়ে। সুতরাং সুভাষচন্দ্র প্রমুখ যদি বিহার-যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করানোয় সমর্থ হন, হার মেনেছিলেন সকল কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করানোর ব্যাপারে। অন্তত পায়োনীয়ার পত্রিকায় ২০ ফেব্রুয়ারীর কার্টুনে তাই দেখি। আর হারিকিরি করতে রাজী নই, রাজাগোপালাচারী প্রমুখ জানাচ্ছেন সুভাষচন্দ্রকে, যিনি আত্মহত্যার অস্ত্র এগিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁদের দিকে।

ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু চরম পন্থা না নিয়েও বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ঘটনার দ্বারা জনপ্রিয়তা ও আধিপত্য দারুণ বাড়িয়ে নিয়েছিল। হরিপুরার সংগঠক বল্লভভাই প্যাটেল এখন ওয়ার্কিং কমিটির মহানায়ক। তিনি আঙুল তুললে সৃষ্টি, আঙুল নামালে প্রলয়। ইতিপূর্বে তাঁর এক প্রচন্ড চেহারা দেখে এসেছি, এখন প্রচন্ডতর চেহারা দেখা যাক। সমাজতন্ত্রী-নিসূদন বল্লভভাই এই প্রকার ঃ

"মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল বিতর্কের উত্তর দিলেন। সভায় মিলিতভাবে কাজ করার ইচ্ছা দেখে তিনি শুরুতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন কিন্তু সোস্যালিস্টরা যে-ধরনের ক্যাপার মত কথাবার্তা বলছে তাতে দুঃখ জানালেন। এইরকম দায়িত্বহীন কথাবার্তার জন্য তিনি কষে ধমক দিলেন।

এই মন্তব্য শুনে সোস্যালিস্টরা হৈ হৈ করে প্রতিবাদ করল।......

মিঃ প্যাটেল চোখা উত্তর দিলেন। যত ইচ্ছে তত সংশোধনী প্রস্তাব সোস্যালিস্টরা আনুক, কিছু এসে যায় না। তিনি জানেন, সভায় তাঁর পক্ষে সমর্থন বিপুল। সমর্থকেরা সর্বসময়ে উৎসাহধ্বনি তুলছিল। কিছুসংখ্যক লোক তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করছিল, হাত উঁচিয়ে, মুখে আগুন ছুটিয়ে, আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তারা যেন লড়াইয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যদি হাতে-নাতে লড়তে হয় তাতেও পিছপাও নই—ভাবখানা এমনই। ওদের চেঁচিয়ে থামিয়ে দিচ্ছিল মিঃ প্যাটেলের বিপুলসংখ্যক সমর্থক।

"কি রফা হয়েছে সে নিয়ে আমি ব্যস্ত নই; অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে; দু' বছর ধরে ধৈর্যের সঙ্গে তোমাদের সহ্য করেছি। আর সইতে রাজী নই", মিঃ প্যাটেল জানালেন। তিনি এখন শিখরাসীন। বামপন্থীদের প্রতিবাদ ক্রমেই বাড়ছিল, তিনি অবিচলিত, আরও সরস হয়ে উঠতে লাগলেন এবং আক্রমণ।

বামপন্থীদের হুমকিতে হেসে উঠলেন।—"কংগ্রেস এক, এই আমি জানি। বামপন্থী দল বা দক্ষিণপন্থী দল, ওসব কথা আমি বুঝি না। আমার কাছে অখন্ড এক কংগ্রেসই আছে। তোমরাই তার মধ্যে বজ্জাতি বাধাবার চেষ্টায় আছ"—তিনি যোগ করে দিলেন।

প্রতিবাদীরা তাদের বক্তব্য বোঝাতে চাইল কিন্তু সভাস্থ অধিকাংশ মানুষই তাদের কথা শুনতে নারাজ। এরপর প্রস্তাব কার্যত সর্বসম্মতিতে গৃহীত হল —বিপক্ষে গোটা চার-ছয় হাত উঠেছিল।"

(টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২২ ফেব্রুয়ারী)

প্যাটেল যখন সোস্যালিস্টদের বিধ্বস্ত করছিলেন, তখন তাদের ভারগুরু জহরলাল নেহরু খুবই সুশান্ত মেজাজে ছিলেন। এক স্নিগ্ধ সমাহিত বক্তৃতায় ভাবাকুলভাবে মূল প্রস্তাবের রস নষ্ট না করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।২২

[ক্রমশ]

২২ "Pandit Nehru spoke in a serene tone and made a moving appeal to the House not to spoil the effect of the resolution by bringing in any amendment."

(Times of India : Feb. 22, 1938)

বঙ্গদর্শন

কসবা, বাগুইআটি, দমদম, মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী প্রকাশ্য রাস্তায় বুক ফুলিয়ে অপরাধ করে যাচ্ছে, পুলিশ তা দেখেও কেন নির্বিকার? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে এবার "বঙ্গদর্শন" লেখক সমাজবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে পুলিশের অন্তরঙ্গতার অন্তর্নিহিত কারণ বিশ্লেষণ করেছেন।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল। ওই খসড়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নি এবং রাজ্যগুলির প্রতি যে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল নয়াদিল্লীর সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই একমত হতে পারেন নি। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে, অর্থকমিশনের রিপোর্ট পাবার আগে রাজ্যগুলিকে টাকা দেওয়া হবে না এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের আগে সেই রিপোর্ট বার হবার কোন আশা নেই। অর্থাৎ এক বছরের আগে কিছুই হবে না যার ফলে পশ্চিমবঙ্গকে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় খোলাখুলি জানিয়েছেন যে এই রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিপুল ফাঁক যদি পূর্ণ করার ব্যবস্থা না হয়, তবে চতুর্থ পরিকল্পনার ছাঁটাই অনিবার্য হয়ে উঠবে, যার অর্থ হবে রাজ্যের আর্থিক সংকট, বেকার সমস্যার বৃদ্ধি, শিল্পের সংকট, সামাজিক সমস্যা ও কলকাতার দুর্বিষহ সমস্যাকে দীর্ঘস্থায়ী করা। বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা সত্যই অসহনীয়। দেশ বিভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যার ক্ষতচিহ্ন এখনো রয়ে গেছে, বেকার সমস্যা ভারতের যে কোন রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে তীব্রতর, শিল্পবাণিজ্যে মন্দা সবচেয়ে প্রবল, কৃষি-স্বাস্থ্য-শহর উন্নয়ন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্যার জঞ্জাল পুঞ্জীভূত। অথচ পশ্চিমবঙ্গের এই গুরুতর পরিস্থিতির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার নির্মমভাবে উদাসীন। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের প্রতি তার সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছে, অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবুর সম্প্রতি নয়াদিল্লী সফরের পর এ-কথা কেন্দ্রীয় নেতারাও স্বীকার করেছেন। কিন্তু সহযোগিতা তো একতরফা হয় না। একপক্ষ পড়ে মার খাবে আর একপক্ষ বুড়ো আঙুল দেখাবে তা তো হতে পারে না।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বিমান দুর্ঘটনায় চুয়াল্লিশজনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমেছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটি একটি বড় দুর্ঘটনা। তবে নিহতের জন্য দুঃখবোধ করা ও তাঁদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করার মধ্যেই কিন্তু আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। কেন না এই দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে, যেগুলির সদুত্তর জনসাধারণ অবশ্যই দাবি করতে পারেন। কেন না দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হবার পর শিলচরের মানুষ যে সব অভিযোগ করেছেন সেগুলি অত্যন্ত গুরুতর। তাঁদের ধারণা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের ম্যানেজমেন্টের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ও উপেক্ষার মনোভাবের জন্যই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বিমানটির শিলচর থেকে ছাড়বার কথা ছিল বেলা ৪-৪০ মিনিটে, কিন্তু বিমানটি ছাড়ে ৭০ মিনিট পর। শিলচর-আগরতলা-কলকাতা রুটের যাত্রীরা ২৫৯ ও ২৬০নং সার্ভিস আরও বেলাবেলি অর্থাৎ ২।৩টের মধ্যে করার দাবি দীর্ঘকাল জানিয়ে আসছেন। কারণ বছরের এই সময়ে সন্ধ্যার দিকে এই অঞ্চলে প্রায়ই ঝড়বৃষ্টি হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই দাবিকে বিশেষ আমল দেন নি। স্মরণ থাকতে পারে ১৯৫৯ সালের ২৯শে মার্চ এই রুটেই শিলচরগামী একটি বিমান ঝড়ের মুখে পড়ে হাইলাকান্দির নিকট ধ্বংস হয়েছিল, এবং সকল যাত্রী নিহত হয়েছিলেন। ৭০ মিনিট দেরি করেই বা বিমানটি ছাড়া হল কেন? হতভাগ্য বিমানটি শিলচর বা আগরতলা ছাড়বার সময় কি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কবাণী পায় নি?

প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অপপ্রচার এবং বাস্তব পরিস্থিতি

প্রকাশ যে, যুক্তফ্রন্টের শরিক দল ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ধারণা হয়েছে যে, ধীরে ধীরে যুক্তফ্রন্ট সরকারবিরোধী একটি চক্রান্ত ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। এই ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য নানাভাবে সরকারকে জনসমক্ষে হেয় করা এবং ক্রমাগত বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সরকারের দৃষ্টি

স্থানান্তর থেকে অন্যত্র সরিয়ে আনা। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনাবলীকে উপলক্ষ করে এরই একটি চরম প্রকাশ ঘটানো হয়েছে, যা দেখে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, অতিরঞ্জনেরও একটা সীমা ও মাত্রা থাকা দরকার।

শুধুমাত্র সরকারবিরোধীদের ছত্রছায়াতে এই ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে তাই নয়, যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির নিজেদের কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি এই কাজে সহায়ক হয়ে উঠেছে বলেও অনেকের ধারণা। কয়েকটি সংবাদপত্রও যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কাজে, সূক্ষ্মভাবে সাহায্য করছে। একটি পত্রিকায় তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বরে অনুষ্ঠিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূল্যায়ন করার নামে সূক্ষ্মভাবে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়েছে সম্প্রতি। কয়েকটি সংবাদপত্রে বহু অসত্য ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ও সহকারী মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি দিল্লীতে অনুভব করে এসেছেন যে, রাজ্যের বাইরে ঠিক গতবারের মত যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে নানা কাহিনী রটনা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাকি কয়েকটি মিথ্যা ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা পশ্চিমবঙ্গে আদৌ ঘটে নি। ক্রমাগত আওয়াজ তোলা হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন, ঠিক গতবারের মত।

বস্তুত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যে একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল থেকেই চলছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে গুপ্ত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টটির কথা এখানে উল্লেখ করা চলতে পারে। পাঠকদের স্মরণে আছে, প্রথমবার যখন যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হন, তার অব্যবহিত পরেই বাগমারী অঞ্চলে বাঙালী ও শিখদের মধ্যে একটি দাঙ্গা হয় যা যুক্তফ্রন্ট সরকারের তৎপরতার ফলে বেশি দূর গড়াতে পারে নি। সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য যে কমিশন নিয়োগ করা হয় তার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার উদ্দেশ্য নিয়েই সুপরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই দাঙ্গা ঘটানোর পিছনে কয়েকজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি বহু টাকা ঢেলেছিলেন। তাঁরা যে কারা সেটা বুঝতে এর পরে নিশ্চয়ই কারুর অসুবিধা নেই, কাজেই মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এ তো গেল এক দিক, অপর দিকও আছে, যেখানে সত্যই কিছু কথা বলার আছে। বিষয়টিকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি—গ্রুপ-ফাইটিং, সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্য এবং পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা।

গ্রুপ ফাইটিং বলতে বোঝায় সাধারণত ছেলে-ছোকরাদের ব্যক্তিগত হাতাহাতি, মারামারি, একজন বনাম আর একজন, একদল বনাম আর একদল, এক-পাড়া বনাম অন্যপাড়া ইত্যাদি। এই জিনিসটি কিন্তু বরাবরের, আমাদের উঠতি বয়সেও ছিল। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে হাতাহাতি হবে এটার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু আমাদের আমলের সঙ্গে এ আমলের কিছু পার্থক্য আছে। সে আমলে হাতাহাতি মারামারি হত, কিন্তু তার জন্য কেউ থানা-পুলিশ করত না, বা মন্ত্রীর কাছে আর্জি যেত না। তখনো রাজনীতি জীবনকে সর্বস্তরে গ্রাস করে ফেলে নি। কাজেই ব্যক্তিগত বা অন্যান্য কারণে সামান্য বচসা বা হাতাহাতি হলেই তার ওপর রাজনীতির রং দেবার প্রয়োজন পড়ত না। এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও তখন এত চ্যাংড়া ছিলেন না। এখন নির্বাচনের পোস্টার লাগালেই রাজনৈতিক কর্মী, তা সে যেমন চরিত্রের ছেলেই হোক না কেন। কোথাও হয়ত মস্তানি করতে গিয়ে মার খেয়েছে, কিন্তু যেহেতু সে অমুক রাজনৈতিক দলের মিছিলে ছিল, কি অমুক রাজনৈতিক দলের পোস্টার লাগিয়েছে—অতএব থানায় যাও, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর্জি দাও, মন্ত্রীর কাছে মিছিল নিয়ে চল, কেন না রাজনৈতিক কর্মীর ওপর অত্যাচার হয়েছে। আমাদের আমলে এটা ছিল না। তখনো কংগ্রেস চোরাকারবারী-কন্ট্রাকটারদের পরিপূর্ণ কবলিত হয় নি, উটকো নেতৃত্ব গড়ে ওঠে নি। ঐতিহ্যবাহী নেতারা জনজীবনে বর্তমান ছিলেন। আর কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী বা সদস্য হওয়া তখন সোজা ব্যাপার ছিল না। যে-সে লোককে পার্টি-কর্মীই করা হত না, আর পার্টির সদস্য হওয়া তো দুষ্কর সাধনার ব্যাপার ছিল। অত্যন্ত সুপরীক্ষিত কর্মী ভিন্ন

কাউকে সদস্য করা হত না। এখন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নীতি কি জানি না, তবে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে, সে আমলের কমিউনিস্টদের যে ইন্টিগ্রিটি দেখেছি, কর্মীদের যে শৃংখলাবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখেছি তা এখন যেন একেবারেই অনুপস্থিত। নেতারা হয়ত বলবেন যে এঁরা দরদী ও সমর্থক মাত্র, পার্টি কর্মী নয়, কিন্তু তাহলেও পার্টির দায়িত্ব তার সমর্থকদের প্রতিও কিছুটা থাকা উচিত। কোন কোন কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী নেতাকে অতুল্যবাবুর অপর পিঠ বলেই মনে হয়, যাঁরা রাজনীতি বলতে ক্ষমতার রাজনীতিই বোঝেন।

আজকে প্রতি এলাকায় তরুণদের মধ্যে যে এই গ্রুপ ফাইটিং-এর প্রভাব অত্যন্ত বেড়েছে, এবং তার ফলে আইন-শৃংখলার ক্ষেত্রে যে ফালতু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলির আন্তরিকতা ভিন্ন তা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। আর তাছাড়া পাড়াতুতো ব্যাপার মেটাবার জন্য জ্যোতিবাবু তাঁর মহামূল্য সময় নষ্ট করছেন, দৃশ্য হিসাবে এটাও নয়নলোভন নয়।

কিন্তু এর চেয়ে অনেক মারাত্মক হচ্ছে সমাজবিরোধীদের সমস্যা এবং এখানেও রাজনীতির রং লেগেছে। পেশাদার গুন্ডারা যদি মার্কসবাদী বা গান্ধীবাদী হয়ে ওঠে সেটা বড়ই ভয়ের ব্যাপার। অথচ যে কোন একটা রঙের আড়ালে তারা ঠিকই নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে।

কংগ্রেসী আমল থেকেই সমাজবিরোধী শক্তিগুলিকে রাজনীতির প্রয়োজনে লাগানোর প্রচেষ্টা হয়েছে, এবং তারাও এম-এল-এ, মন্ত্রী ইত্যাদির পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে অবাধে রাজত্ব চালিয়েছে। এই শক্তিটি দিনের পর দিন প্রশ্রয় পেয়ে আজ এমন একটা স্তরে এসে উপনীত হয়েছে যে, এদের শায়েস্তা করাই এখন পুরোদস্তুর সমস্যা হয়ে গেছে। এরা যে নির্বোধ তা নয়, বরং দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিটা ভালই বোঝে এবং অনেকেই সুবিধামত আনুগত্য বদল করে নিয়েছে, তাছাড়া চেহারা দেখেও সর্বদা বোঝার উপায় নেই এরা কি চরিত্রের, এবং স্থানীয় বামপন্থী নেতাদের বিভ্রান্ত করার মত বুদ্ধি ও অভিনয়কুশলতা এদের অনেকের মধ্যেই বর্তমান। তাছাড়া পুলিশের সঙ্গে এদের সম্পর্কটাও খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। এরা বর্তমান পরিস্থিতির রীতিমত সুযোগ নিচ্ছে, এবং কোন কোন স্থানে এদের অবাধ রাজত্ব কায়েম হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় কসবা, হালতু প্রভৃতি অঞ্চল যেন এদেরই করতলগত, অপরিচিত কোন মানুষ ওই সকল অঞ্চলে কোন কাজে গেলে তাঁর সর্বস্ব তো ছিনতাই হবেই, উপরন্তু প্রাণটিও খোয়া যাবার সম্ভাবনা। দমদম, বিরাটি, নব ব্যারাকপুর, মধ্যমগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, স্থানীয় পুলিশ সকল ক্ষেত্রেই নির্বিকার। মধ্যমগ্রামে কয়েকটি দুর্বৃত্ত-শ্রেণীর যুবক (এদের নাম বারাসত থানার পুলিশকে বহুবার জানানো হয়েছে।) নিত্য গুন্ডামী করে বেড়াচ্ছে, প্রতিবাদ করলে মানুষকে শাসাচ্ছে, বোমা-ছোরা নিয়ে আক্রমণ করছে। পথে-ঘাটে মেয়েদের প্রতি অশালীন ব্যবহার করছে, কিন্তু বারাসত থানার পুলিশ এ সব খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো—খুঁজতে এসে পুলিশ না কি এদের দেখা পায় না। অথচ এরা প্রকাশ্য দিবালোকেই বেপরোয়া অপরাধমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

এ তো গেল একদিক। পাশাপাশি আরও একটি অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হচ্ছে কিছু কিছু অকালপক্ক তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মী কর্তৃক ব্যক্তিবিশেষকে নিগ্রহ, ঠিক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপার যা রাজনীতির নামে চালানো হচ্ছে। এই রকম কয়েকটি অভিযোগ আমাদের দপ্তরে এসেছে। ব্যারাকপুর থেকে এক ভদ্রলোক লিখেছেন যে, তাঁকে কিছু লোক প্রায়ই নিগ্রহ করছে যারা নিজেদের বামপন্থী একটি দলের কর্মী বলে পরিচয় দেয়। চুঁচুড়া থেকে একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন যে, তাঁর প্রতি কল্পিত নানা অভিযোগ এনে কিছু ব্যক্তি তাঁর ওপর নিয়ত হামলা করছে, এবং এরাও না কি একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী বলে নিজেদের পরিচিত করে। ভদ্রলোক বিষয়টি নিয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি না কি ইতিমধ্যেই আকর্ষণ করেছেন, যদিও তার কিছু ফলাফল এখনো হয় নি। ইতিমধ্যেই এরা তাঁর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। এই রকম আরও অভিযোগ বিভিন্ন স্থান থেকে আসছে। এগুলির প্রতিকার হওয়া দরকার। আইনকে নিজের হাতে নেবার অধিকার কারুরই নেই। এই সব ঘটনা যুক্তফ্রন্ট সরকারের সুনাম বৃদ্ধি করবে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কর্তব্য নিজেদের র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইলকে সংযত করা, এবং যাতে আজে-বাজে লোক কোন বামপন্থী রাজনৈতিক দোহাই দিয়ে কোন অপকর্ম করতে না পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা। ইমেজ গড়ে তুলতেই সময় বেশি লাগে, ভাঙতে বেশিক্ষণ নয়। আশা করি যুক্তফ্রন্টের সকল শরিক দলই এটা উপলব্ধি করবেন।

*

এরপরে আসে পুলিশ প্রসঙ্গ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, সমাজবিরোধীদের যাতে নির্মমভাবে দমন করা হয় দলমত-নির্বিশেষে, সে আদেশ তিনি পুলিশকে দিয়েছেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রী পি কে সেন সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, পুলিশের কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কলকাতা মহানগরীতে গুন্ডা, মস্তান ও অন্যান্য সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য অনেক কমে গেছে। তিনি জানিয়েছেন যে, গুন্ডা দমনের জন্য জ্যোতিবাবু যে নির্দেশ দিয়েছেন তা কার্যকর করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুমাসে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ২২৮ জন সমাজবিরোধীকে নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যান্য যে কোন সময়ের চাইতে এ সংখ্যা অনেক বেশি বলে পুলিশ কমিশনার দাবি করেন।

শুভ সংবাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু বক্তব্য এখানেই শেষ হচ্ছে না। আমরা বরাবর বলে এসেছি পুলিশ ও সমাজবিরোধী একই মুদ্রার দুই পিঠ, এবং যুক্তফ্রন্ট গদিতে আসীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের চরিত্র বদলায় নি। সমাজবিরোধীদের গায়ে পুলিশ সহজে হাত লাগাতে চায় না, বরং তাদের বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ করতে গেলে বলে, 'এ বিষয় স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখি', অথবা কেউ কেউ সোজা বলে বসে 'এখানে কেন এসেছেন, জ্যোতিবাবুর কাছে যান না'। এই স্পর্ধা পুলিশের কোথা থেকে এল? উত্তরটি খুবই সহজ। পুলিশের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করবেন না। শুধু উচ্চ পর্যায়ের দু-একজন লোককে বদলালেই হয় না, সমগ্র পুলিশ বিভাগেই স্থানীয় স্বার্থ প্রবেশ করেছে। যিনি যেখানে আছেন, ও-সি থেকে আরম্ভ করে কনস্টেবল পর্যন্ত, তাঁরা সেই অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থগুলির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই একাত্ম হয়েছেন, পকেটেও দুটো পয়সা আসছে, অতএব মন্দ চলছে না। কাজেই অপরাধ নিবারণে ও সমাজবিরোধীদের দমনে তাদের আগ্রহ নেই। দু-চারজন সৎ ব্যক্তি ছাড়া। এই কারণেই পুলিশ বিভাগে ব্যাপক রদবদল প্রয়োজন, ওপরতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত এবং একজায়গায় কোন লোককেই যেন বেশি দিন না রাখা হয়, তাহলেই তার মধ্যে স্থানীয় স্বার্থের শিকড় গজাবে। আশা করি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি ভেবে দেখবেন। পুলিশের ক্ষেত্রে শুধু ওপর মহলেই নয় নিচের মহলেও ব্যাপক রদবদলের প্রয়োজন।

ভারত দর্শন

কংগ্রেস অধিবেশনে দৃষ্টিকোণ বিচার

ফরিদাবাদ কংগ্রেসে এবার সরাসরি দুই বিপরীত মার্গীয় দৃষ্টিকোণের সংঘর্ষ অনেকেই আশঙ্কা করছেন।

বর্তমান অধিবেশনে পাতিল কমিটির প্রতিবেদন অন্যতম আলোচ্য বিষয়। পাতিল সাহেব যে ধনিকশ্রেণীর খোলাখুলি প্রতিনিধিত্ব করেন, কংগ্রেসের আর এক অংশ তার সঙ্গে সমতালে তালি বাজাতে অক্ষম। অধিবেশনের প্রাক্কালেই তাই প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লীতে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে প্রচার করেছেন।

কংগ্রেসের মধ্যপন্থা

প্রধানমন্ত্রী এমন আশঙ্কা করছেন যে, দ্রুত রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলে কংগ্রেসকে এবার খোলাখুলি কোন একটা পথ বাছাই করে নিতেই হবে। নেহরুযুগ থেকে কংগ্রেসের দুনৌকোয় পা দিয়ে চলার সহজ পথ আর বোধহয় খোপে টিকবে না। তাই শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসের জন্য মধ্যপথ বাতলেছেন। যা অতি কট্টর দক্ষিণী পথ নয় (পাতিল মোরারজী পথ নয়) আবার যা হবে না অতি বামমার্গীয়, কারণ তাহলে কংগ্রেসের জাতীয় চরিত্রই নাকি বরবাদ হয়ে যাবে। শ্রীমতী গান্ধীর মতে অতি চরম কোন ক্যাম্পে পদার্পণ কেবলমাত্র 'ছোট' দলেরই কর্ম, কংগ্রেসের মতো ভারতজোড়া একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই ছোট দলের চরিত্র ধারণ করতে পারে না। অর্থাৎ দুয়ের মধ্যে একটা রফা নিষ্পত্তি করে পুনরায় সেই গণতন্ত্র আর জাতীয় সংহতির শ্লোগান নিয়ে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। দুকূল বজায় রেখে চলাই বাঁচার একমাত্র পথ।

পাতিল প্রমুখরা কিন্তু সাফ বলেছেন যে, সর্বনাশ উপস্থিত হলে বুদ্ধিমানের পক্ষে অর্ধভাগ ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়, তাতে একপক্ষ কাটা গেলেও অন্যপক্ষে বাতাস ঝাঁকিয়ে কিছুদিন হাওয়ার গতির সঙ্গে লড়াই করা যায়।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, কংগ্রেসের দুকূল বজায় রাখা নীতি পদে পদে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে এবং যে পক্ষ ভারী সে পক্ষ অন্যপক্ষকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করেছে। যেমন কংগ্রেস যখন যেমন জনহিতকর কর্মসূচী গ্রহণ করতে গেছে, সম্পদশালী পক্ষ তখনই তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কার্যসূচী লিখিত প্রতিশ্রুতিতেই পর্যবসিত হয়েছে এবং কংগ্রেসকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পদগ্রাসী একটি সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণে নিয়োজিত করা হয়েছে। নেহরুজীর আধা সমাজতন্ত্র চূড়ান্তভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে মাঝপথেই থমকে দাঁড়িয়েছে। সেই চিরাচরিত কংগ্রেসী পন্থাকে এবার সমস্ত ঘেরাটোপ খুলে সরাসরি সংঘর্ষের মাঝে এনে দাঁড় করাতে সাহায্য করেছেন একদল। শ্রীমতী গান্ধী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজও চেষ্টিত এই কট্টর দক্ষিণীপন্থাকে সমঝোতায় আনার জন্য। বলা বাহুল্য, কার্যক্ষেত্রে তা যে সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ এতোকাল দেশবাসী চোখের সামনেই প্রত্যক্ষ করেছেন। কংগ্রেসের পক্ষেও শ্রীমতী গান্ধী-কল্পিত মধ্যপন্থা আর বেশিকাল টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। এজন্য ১৯৬৭-র নির্বাচনের পর থেকেই কংগ্রেসের কিছু নেতা সমমনোভাবাপন্ন দল খুঁজতে তৎপর হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে পাতিল অন্যতম। শ্রীমতী গান্ধী আজও মনে করেন মধ্যপন্থা বজায় রেখে কংগ্রেসের ঘোষিত সমাজতন্ত্রে পৌঁছনো যাবে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালের পূর্বাপর অবস্থা লক্ষ্য করে এই কল্পনা-কৌশলে পক্ষ বিস্তার করা আজ নিষ্ফল। সমাজতন্ত্রের ধারণাও আজ কোন কংগ্রেস সদস্যের পক্ষে প্রকাশ্যে পোষণ করাও কি বিপজ্জনক নয়? তাঁকে কি পদে পদে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় না? এসবই অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর অবগতিতে আছে। প্রসঙ্গত তিনি স্বীকার করেন যে, কংগ্রেসের ওপরমহলে নেতাদের মধ্যে মতভেদ আছে। আর এই মতভেদ এমন কিছু আনকোরা নতুন জিনিস নয়। স্বাধীনতার আগেও ছিল। এখনও আছে। তবে, এই মতভেদ কি কংগ্রেসকে দুর্বল করেছে? শ্রীমতী গান্ধীর ধারণা, বরং তার উল্টোটাই হয়েছে, অর্থাৎ দলের প্রতি আনুগত্যই বেড়েছে।

দলাদলির চিত্র সত্যই পুরাতন। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে দলাদলি, এম এন রায়েরও সেযুগের বৈপ্লবিক চেতনা-সম্পন্ন অনেক নেতা ও সদস্যের দলত্যাগ নীতির প্রশ্নে এ-ও নতুন নয়। এমন কি নেহরু-ট্যান্ডনের বিরোধ, তারও স্মৃতি খুব বেশি দিনের নয়। আজকের মত-বিরোধও সেই ঐতিহ্যকেই টেনে নিয়ে চলেছে। আগেও যেমন এখনও তেমনি প্রগতিশীলদের ঠাঁই হচ্ছে না কংগ্রেসে। অবশ্য ট্যান্ডনের পদত্যাগ, কৃপালনী বা রাজাগোপালের কট্টর দক্ষিণী পক্ষাবলম্বন আবার স্বতন্ত্র ব্যাপার। তাই দলের সাংগঠনিক শক্তি যদি পুষ্ট হয়ে থাকে তবে তাও অধিকতর দক্ষিণপন্থীর পরিপোষণায়ই হয়েছে, যে কারণ কংগ্রেস ক্রমশ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং নেহরুজীর পর কংগ্রেসের প্রতি সাধারণের আকর্ষণও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নেহরুজীর নামাঙ্কিত ছিল বলেই, কংগ্রেসও স্ববিরোধী নীতির দুর্বলতা সত্ত্বেও ঐক্য ও সংহতির প্রতীক ছিল নেহরু অবয়বের আড়ালে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী যদি আজও সেই একই অবস্থার কল্পনায় সুখী থেকে থাকেন, তবে ভুল হচ্ছে বুঝতে হবে। কোন বিশেষ দল দেশের সংহতির প্রতীক, তা সে দল মুষ্টিমেয়ের স্বার্থসাধক হলেও তাই, এমন আত্মতৃপ্ত ধারণার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যপন্থা সুতরাং টেকসই হবে এতোবড় আশা তাই সাধারণ্যে আছে এমন কথা আজ আর নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

দক্ষিণী কোয়ালিশন ছাড়া পথ নেই
জনসঙ্ঘের বোম্বাই অধিবেশন

কেন্দ্রে কোন দলই আর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারছে না আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর। অবস্থাটি দক্ষিণপন্থী শক্তির কাছে বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসঙ্ঘও এ নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন। সঙ্ঘের দুই প্রধান, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং বলরাজ মাধোক যেন পাতিল প্রমুখ কংগ্রেসী

নেতৃবৃন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়েই ঘোষণা করেছেন, দক্ষিণী কোয়ালিশন ছাড়া পথ নেই।

বস্তুত দক্ষিণী স্বার্থের পরিপোষকদের এখন সেই মুখোরোচক বুলিটি একমাত্র সম্বল করে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নামতে হবে। এ বুলির ধার কমে গেলেও এ বুলি 'সেন্টিমেন্টাল' আর তাই জনগণের একাংশের ওপর সহজ প্রভাব বিস্তারেও সক্ষম। বুলিটি, সংহতির বুলি। শুধু সেন্টিমেন্টের বিভ্রমই নয়, আর একদিকে এ বুলির পেছনে পরোক্ষে ল' এন্ড অর্ডারের হুমকিও ওতপ্রোত আছে। কোথাও বাঁচার দাবি উঠলে এই বুলিকে ঢালের মতো ব্যবহার করে সে দাবির কণ্ঠরোধ করা ও মোকাবিলা করার প্রভূত সুযোগ। দক্ষিণীদের হাতে অন্যান্য অস্ত্র কতদূর ভোঁতা হয়ে আসছে, অকারণে ঐক্য ও সংহতির (যা ধ্বংস করার জন্য সংহতির উকিলবৃন্দ চেষ্টার কসুর করেন নি) জন্য উদ্বেগাকুল হওয়ার তারই পরিচয় সম্যক ধরা পড়ে। যেন গোষ্ঠীস্বার্থরক্ষার দক্ষিণীরাই একমাত্র দেশের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। কিন্তু না ভূগোলে না রাজনীতির ইতিহাসে এমন দাবির সমর্থন মেলে। যাই হোক, যদি কেউ কেউ ভেবে বসে থাকেন যে আমি নইলে হারিয়ে যাবে দেশহিত আর সংহতি, তবে তিনি তাঁর সুখের স্বর্গে বাস করুন। কিন্তু আসল সত্য হল, ঐক্য ও সংহতি ধনকুবেরদের বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না।

তবে হ্যাঁ, কোয়ালিশন একটা চাই-ই। জনসঙ্ঘের বোম্বাই অধিবেশনে গোয়ালিয়রের রাজমাতা শ্রীমতী বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার উপস্থিতি এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। শ্রীমতী সিন্ধিয়া সঙ্ঘের সদস্যা নন, বিশেষ আমন্ত্রিতা অতিথি। সিন্ধিয়ার প্রচেষ্টা রাজ্যহীন ভারতের মুকুটহীন ধনকুবেরদের একত্রিত করা আর রাজপরিবারগুলির হাত থেকে খসে-পড়া রাজদণ্ডটি পুনশ্চ মুঠিবদ্ধ করে ভারতের তাবৎ প্রজাসাধারণের ওপর ল' এন্ড অর্ডারের ঐক্য কায়েম করা। জনসঙ্ঘ যেমন সভীত কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বামপন্থী শক্তির অস্তিত্বে, রাজমাতাও সেজন্য সবিশেষ চিন্তিত। জনসঙ্ঘ কংগ্রেসের কট্টর দক্ষিণীদের সঙ্গে হাত মেলাতে নিমরাজি। রাজমাতার তাতেও উৎসাহ নেই। তিনি ছুটে গেছেন জনসঙ্ঘ স্বতন্ত্রকে নিয়ে বি-কে-ডি'র একটা মিলিত মোর্চা গঠনের অনুকূলে হাওয়া তৈরি করতে।

ওয়াই বি চ্যবনের আশা

কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রীযুত চ্যবন ঘোষণা করেন, ১৯৭২ সালের পর কেন্দ্রে কংগ্রেস দুর্বল হবে। তিনি বলেন; সদস্যরা কোয়ালিশনের কথা চালাতে রাজী নন। কারণ তা কংগ্রেসকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবে। শ্রীচ্যবন একথাও উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নে আঞ্চলিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য সদস্যরা রাজ্যে দেয় সুবিধা বৃদ্ধি করার অনুকূলে মতামত দিয়েছেন।

কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন

কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা পাতিল-লাইনেই আস্থা প্রকাশ করেছেন। পাতিল কমিটি দলের সংবিধানে রদবদল করে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে কংগ্রেস পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু করার যে প্রস্তাব রেখেছেন, নিজলিঙ্গাপ্পা তাতে আস্থাশীল।

কিন্তু দলের একাংশের দ্বারা এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোর আওয়াজ শোনা গেছে। তাঁরা মনে করেন, নেতৃত্বে ও সাধারণ কর্মীদের মধ্যে আজ যে বিরাট ফারাক তাই দলকে দুর্বল করেছে। সংবিধানে কোনও ত্রুটি নেই।

শ্রমদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভগৎ ঝা আজাদ আক্রমণ করেন মোরারজী দেশাইয়ের নিষ্ক্রিয়তাকে। মোরারজীর ব্যাঙ্ক ও সাধারণ বীমা জাতীয়করণের বিরোধী কার্যকলাপ অসমর্থিত হয়। তাঁবা দলের কর্মসূচীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপদানের পক্ষে দাবি তোলেন। মোরারজী দেশাইয়েব যুক্তি খুব একটা রেখাপাত করতে পেরেছে বলে কোনো সংবাদ নেই। শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ বৈদেশিক বাণিজ্যের জাতীয়করণের জন্যও প্রস্তাব রাখেন।

সর্বনাশ! অকংগ্রেসী রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্র নরম

কংগ্রেসের ফরিদাবাদ অধিবেশনে বিবেচনার জন্য এ-আই-সি-সি'র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রী টি ম্যানিয়েন এবং জনৈক কংগ্রেস নেতা শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের তরফ থেকে একটি নোট যাচ্ছে যাতে তাঁবা এই মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, অকংগ্রেসী রাজ্যগুলির প্রতি নরম মনোভাব প্রদর্শন উদ্বেগজনক। এবং অকংগ্রেসী রাজ্য বলতে প্রধানত যাঁদের সম্পর্কে তাঁদের ভীতি স্বাভাবিক, সেই

সাপ্তাহিক বসুমতী

রবীন্দ্র-সংখ্যা

আগামী ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস উপলক্ষে সাপ্তাহিক বসুমতী অভিনব পরিকল্পনায় প্রকাশিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ যাবৎ শত সহস্র আলোচনা হলেও এবারের আয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ও নতুন ধরণের। সাহিত্য ছাড়াও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রতিভা কী বিচিত্র, কী বিপুল, কী বিস্ময়কর, কী অসাধারণ এবং আজো তা কতো অজানা—এবারের মূল্যবান ও আকর্ষক লেখাগুলিতে তার আশ্চর্য রকম প্রমাণ মিলবে।

আমরা মনে করি, এ সংখ্যার প্রতিটি লেখাই পাঠকদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে। এই রকমের সুপরিকল্পিত আলোচনা বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নি বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

:: এ সংখ্যায় লিখছেন ::

অমিয়কুমার হাটি	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
অশোক সেন	বেলা দত্তগুপ্ত
চিত্তরঞ্জন দেব	মনোরঞ্জন হাজরা
নারেন ভট্টাচার্য	রজত রায়চৌধুরী
নির্মল বস	শৈলজারঞ্জন মজুমদার
প্রদ্যোত রায়	সুশীল রায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র	হরপ্রসাদ মিত্র

এবং আরো অনেকেই

● দাম বাড়ানো হয় নি ●

আজ মে ডে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ফুটবে না ফুল,
ডাকবে না পাখি—
আর কেউ না আসে,
আসবে কালবৈশাখী।
জ্বলবে বিদ্যুৎ, পড়বে বাজ।
মে ডে—
আজ মে ডে।

আজ ইতিহাসের
একেবারে পাল্টা চাল
একটাই পতাকা—টকটকে লাল।
ঐ একটাই গান :
স্লোগান আর স্লোগান।
মিছিলে প্রলাপ, মিছিলেই রাজ—
মানুষ চায় রুটি—মানুষ চায় কাজ।
মে ডে—
আজ মে ডে।

আজ—হাতের সংগে হাত,
মালার মত জড়াও।
আজ—পায়ের সংগে পা,
চাকার মত গড়াও।
এস, কাঁধে মেলাই কাঁধ—
টেনে নামাই চাঁদ ;
চালা কুচকাওয়াজ—
আজ, কথাই হোক আওয়াজ।
মে ডে—
আজ মে ডে।

বিখ্যাত এই যে মাস।
যে-ই ভাঁজুক না তাস—
জেনো, দু-একজনই সাহেব বিবি,
বাদবাকী সব গোলাম।
তোমার-আমার একই নাম
একই দিল, একই সাজ।
মে ডে—
আজ মে ডে।

বাম কম্যুনিস্ট প্রধান দুই রাজ্যের সম্পর্কে তাঁরা এ-আই-সি-সি-কে সাবধান করতে চেয়েছেন বলে প্রকাশ। তাঁরা মনে করেন, কেন্দ্র নরম হলেই এই রাজ্যগুলি কেন্দ্রের ওপর অধিকতর চাপ দিতে চেষ্টিত হবে। তাছাড়া একদিন যেসব দাবি রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার আদায়ে ব্যর্থ হয়েছেন, আজ যদি অকংগ্রেসীরা তা-ই মিটিয়ে নিয়ে যান তবেই তো মহা বিপত্তির কথা।

ম্যানিয়েন-দত্তের এবম্বিধ আশঙ্কা যে বাস্তব ভিত্তিহীন কিম্বা অযৌক্তিক তা বলা যায় না। কিন্তু কেন্দ্র সাধ করে অকংগ্রেসী রাজ্যগুলির প্রতি নরম ভাব প্রদর্শন করছেন, যা ইচ্ছে করলেই বন্ধ করা যায়, এ ধারণা ভুল।

রাজ্যে কংগ্রেস সরকার বর্তমান থাকাকালীন রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ কেন্দ্রের বদান্যতার ওপর যেভাবে একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, রাজ্যবাসী, যাঁরা কেন্দ্রের নেকনজরে ছিলেন না (যেমন পশ্চিমবঙ্গ) এতোকাল যেভাবে অবিচার মাথা পেতে গ্রহণ করে এসেছেন, আজ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্রের সেই সর্বগ্রাসী দাদা-ইজমের যেমন ইতি হতে চলেছে জনমনেও দাবি আদায়ের উৎসাহও সেইভাবে বাড়ছে। সুতরাং কেন্দ্র স্বেচ্ছায় কিছু, কিছু দাবি মানার আশ্বাস প্রদান করলে এবং কিছুদূর পর্যন্ত তা কার্যে রূপায়িত করাতে অনন্যোপায় হলে বুঝতে হবে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনই এর মূলীভূত কারণ, কেন্দ্রের হঠাৎ বদান্যতা নয়।

শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় পশ্চিমবঙ্গবাসী, যদি কেন্দ্রের সদ্বুদ্ধির ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গের বহু অবহেলিত কয়েকটি সমস্যার সমাধানের পথ মুক্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে তাতে তাঁর খুশি হওয়ারই কথা। পরিবর্তিত যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আশার সঞ্চার হয়েছে, ন্যায্য দাবি আদায়ে তাই সবচেয়ে বড় শক্তি এবং তার বিরুদ্ধাচরণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

ওঁদের আরও আশঙ্কা কেন্দ্র নরম হলে, জনগণ ভেবে বসবেন যে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবশ্য কথাটা এক হিসেবে সত্যি নিঃসন্দেহ। কারণ রাজ্যের ওপর ইতিপূর্বে কেন্দ্র যেমনভাবে তাঁর 'ডিক্টেশন' নির্দেশাবলী চাপাতে পারতেন, আজ আর তা সম্ভবপর নয়। এ পরিস্থিতি কেন্দ্রের রাজনৈতিক শক্তিহানির পরিচায়ক বটে। কিন্তু একথাও সত্য যে রাজ্যবাসী বিশ-একুশ বছর ধরে যন্ত্রণা সহ্য করার পর আজ মুক্তকণ্ঠ হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই গণতান্ত্রিক দাবির কণ্ঠরোধ করে কেন্দ্রের মান বাঁচাতে গেলে তা কি ম্যানিয়েন-দত্ত মহাশয়দের প্রিয় দলেরই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিপক্ষে যাবে না।

কংগ্রেস মণ্ডপে আগুন

১৯৪৯ এবং ১৯৫১-সনে যথাক্রমে মীরাট ও দিল্লী অধিবেশনে আগুন লেগেছিল, ১৯৬৯-এ ফরিদাবাদ অধিবেশনে কংগ্রেস মণ্ডপ ভস্মীভূত হয়ে গেল। ছয় লক্ষ টাকার ক্ষতির হিসেব তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া গেছে। হতের সংখ্যা শূন্য বটে কিন্তু আঘাত এড়াতে অনেকেই পারেন নি। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলমের আঘাত বেশ গুরুতর। তাঁর হাত ভেঙেছে। তবে অন্যতর কোনও আশঙ্কা নেই। আশ্চর্যের কথা মণ্ডপে নাকি অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল। হঠাৎ শর্ট সার্কিটের ফলেই এই অগ্নিকাণ্ড। এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে অনেকেই বিচলিত। বিরোধী নেতারা দুঃখ প্রকাশ করে পত্রাদি পাঠিয়েছেন। তবে এই প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের পরেও অধিবেশন যথারীতি চলছে।

(২৬।৪।৬৯)

পানমুনজন বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি জেনারেল ন্যাপ (ওপরে—বাঁ দিকে) ও উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধি জেনারেল চুন সুন লীকে (ওপরে—ডান দিকে) দেখা যাচ্ছে।

উত্তর কোরিয়া

উত্তর কোরিয়ার মিগ জেট বিমানের আঘাতে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ই সি—১২১ বিধ্বস্ত হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৫ই এপ্রিল। জাপান সাগরে উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক দরিয়ায় মার্কিন গোয়েন্দা বিমানটি গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশ করেছিল, এই অভিযোগে উত্তর কোরিয়ার নৌ-বিভাগের টহলদারী বিমান থেকে বোমা-বর্ষণ করে এই মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ধ্বংস করা হয়। ফলে ৩১ জন বৈমানিক সহ বিমানটি জলে পড়ে যায়। বিমানটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। পরে মার্কিন নৌবিভাগের নৌকো বিমানের কিছু ধ্বংসাবশেষ ও মৃত বৈমাকিদের মধ্যে মাত্র দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ বলছেন, উত্তর কোরিয়া সরকার অন্যায়ভাবে তাদের এই বিমান আক্রমণ করেছে। তারা উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক দরিয়ায় প্রবেশ করে নি—আন্তর্জাতিক সাগরের ওপর ছিল। এখানে অবস্থানকালে তাদের ওপর আক্রমণের অধিকার কারও নেই।

অপরপক্ষে উত্তর কোরিয়া সরকার জোর দিয়েই বলেছেন, মার্কিন গোয়েন্দা বিমান তাদের এলাকার ভেতর প্রবেশ করেছিল। নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই তারা আক্রমণ চালাতে বাধ্য হয়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ 'পুয়েবলো'র ব্যাপার নিয়েও ঠিক একই ব্যাপার হয়েছিল। মার্কিন সরকার স্বীকারই করতে চান নি যে, জাহাজটি উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক দরিয়ায় প্রবেশ করেছিল। শেষ পর্যন্ত 'পুয়েবলো'র ক্যাপ্টেন সব ফাঁস করে দেওয়ার পর মার্কিন সরকার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে 'পুয়েবলো'র নাবিকদের ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এবার প্রমাণ করা শক্ত। কারণ, গোয়েন্দা বিমানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং তার সব ক'জন বৈমানিক মারা গিয়েছেন। তবে সব ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর মার্কিন সরকার যেভাবে চুপ করে গেছেন, তাতে সন্দেহ হয় অপরাধ মার্কিন পক্ষেরই।

মুখে অবশ্য খুব জোর দিয়েই মার্কিন কর্তারা বলছেন, তাঁরা কোন অন্যায় করেন নি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মার্কিন বিমানের ওপর এত বড় হামলার বিরুদ্ধে তাঁরা কিছুই করলেন না। পানমুনজনে দু'পক্ষের বৈঠকে উপস্থিত মার্কিন প্রতিনিধি জেনারেল ন্যাপ এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বৈঠক ছেড়ে চলে এসেছেন।

আর, রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন ঘোষণা করেছেন, জাপান সাগরে গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে বিমান ও জাহাজ চলাচলের কাজ অব্যাহত থাকবে। এদের কাজে সাহায্য করার জন্য, এদের রক্ষা করার জন্য এই অঞ্চলে মার্কিন সৈন্য এবং জাহাজ, বিমান ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হবে। নিকসন নির্দেশ দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সাগরে এই গোয়েন্দাগিরিতে বাধা দেবার জন্য যদি কোন শত্রু জাহাজ বা বিমান চেষ্টা করে, তবে তা ধ্বংস করতে হবে।

কিন্তু এ সবই তো হল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল না কেন? ই সি—১২১ বিধ্বস্ত হবার পর জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ও জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের যুক্ত বৈঠকে বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা উঠেছিল। নৌ-অবরোধ, বিমান থেকে বোমাবর্ষণ, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বোমাবর্ষণ এবং সাধারণ যুদ্ধ, সব ক'টি সম্ভাব্য উপায় নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, এর কোনটিই নয়, কেবল এখানে মার্কিন সামরিক শক্তি আরও বাড়ানো হবে।

নিকসন রাষ্ট্রপতি হবার পর এটাই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বড় সংকট। অনেকেই ভেবেছিলেন, নিকসন পাল্টা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্ত তিনি বোধ হয় ভিয়েতনামের থেকে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাই চট করে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন নি।

নিকসন প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিম ইল সুং ও তাঁর সরকার নতুন করে এই অঞ্চলে যুদ্ধ সুরু করতে চান, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এতে জড়াতে চান। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁরা এই কাজ করেছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে চায় না। দুঃখ করে মার্কিন মুখপাত্ররা বলছেন, এ হ'ল ক্ষুদে শক্তির শক্তি। বৃহৎ শক্তি যুদ্ধের ঝুঁকি নেবে না জেনে তারা

সুবিধা মত তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অপমানটা হজম করতে হল।

উত্তর আয়ারল্যান্ড

উত্তর আয়ারল্যান্ড বা আলস্টারে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রোটেস্টান্টদের সঙ্গে সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের জোর দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে।

গোলমাল অনেক দিন ধরেই সুরু হয়েছে। আয়ারল্যান্ড ভূখণ্ডের অংশ, কিন্তু বৃটিশ শাসনাধীন, বৃটেনের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত উত্তর আয়ারল্যান্ডের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। প্রোটেস্টান্ট-পরিচালিত য়ুনিয়নিস্ট পার্টির শাসনে ক্যাথলিকদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে।

তাই কিছুকাল ধরে সংখ্যালঘু ক্যাথলিকরা নাগরিক অধিকারের দাবিতে, সমান ভোটাধিকারের দাবিতে, উন্নত গৃহ ও জল সরবরাহের দাবিতে আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনকে উপলক্ষ করেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়েছে।

গত সপ্তাহে অবস্থা চরমে উঠেছে। সরকারের অনুরোধে বৃটিশ সৈন্য রাজধানী বেলফাস্ট ও অন্যান্য শহরের প্রধান প্রধান স্থানগুলি পাহারা দিচ্ছে। ২৫০০ বৃটিশ সৈন্য উত্তর আয়ারল্যান্ডে এসেছে। রয়্যাল আলস্টার কনস্টেবুলেটরি সম্পূর্ণে ব্যর্থ হয়েছে। দাঙ্গাকারীরা পোস্ট অফিস জ্বালিয়ে দিয়েছে, জলের পাইপ ফাটিয়ে ফেলেছে।

অবস্থার গতি দেখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন তাঁর পল্লীভবন থেকে লন্ডন ফিরে এসেছেন। বৃটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডেনিস হিলে বেলফাস্ট ছুটেছেন। উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন টেরেন্স ও'নীল লন্ডন গিয়েছেন উইলসনের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য। উইলসন নাকি ও'নীলকে ক্যাথলিকদের দাবি মেনে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু উগ্র ক্যাথলিকবিদ্বেষী য়ুনিয়নিস্ট পার্টি উইলসনের পরামর্শ মানবেন কিনা বলা শক্ত। উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্যের অংশ হলেও, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা মোটামুটি স্বীকার করা হয়েছে।

এদিকে আইরিশ প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, উত্তর আয়ারল্যান্ডে অবিলম্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্য পাঠানো হোক। আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিউ ইয়র্ক পাঠিয়েছেন, নিজে লন্ডন গিয়েছেন।

কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে শীগ্‌গিরই অবস্থা শান্ত হবে বলে মনে হয় না। মিড্-আলস্টার থেকে নব-নির্বাচিত এম-পি শ্রীমতী বার্নাডেটে ডেভলিন বলেছেন, "এই তো গৃহযুদ্ধের সুরু।"

বার্নাডেটে ডেভলিনের নির্বাচনী সাফল্য সমগ্র দেশে চমকের সৃষ্টি করেছে। উত্তর আয়ারল্যান্ড থেকে বৃটিশ কমন্সসভায় যে ১২টি আসন রয়েছে, তার একটির উপনির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেছেন। মাত্র ছ'মাস আগেও তিনি বেলফাস্টের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর বয়স মাত্র ২১ বৎসর। তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম মহিলা সদস্য, এবং বর্তমান সকল সদস্যের মধ্যেও বয়ঃকনিষ্ঠ।

বার্নাডেটে ডেভলিন

প্রোটেস্টান্ট-প্রধান একটি কেন্দ্র থেকে ক্যাথলিক বার্নাডেটে ডেভলিনের জয় খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি য়ুনিয়নিস্ট পার্টির প্রার্থী শ্রীমতী আনা ফরেস্টকে চার হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন। এই কেন্দ্রে এবারের উপনির্বাচনে মোট ভোটদাতাদের ৯১·৭৮% জন ভোট দিয়েছেন।

ছাত্র-আন্দোলনের কর্মীরূপে বার্নাডেটে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুদিন আগে যখন নাগরিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ছাত্র নেতারা 'পিপলস ডেমোক্রেসি' নামে একটি দল গঠন করেন, তখন বার্নাডেটেও এই দলে যোগ দেন। গত ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে তিনি কৃষিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। এইবার জয়লাভ করে তিনি তাঁর আগের পরাজয়ের শোধ তুললেন।

বার্নাডেটে বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের তিনি একজন নেত্রী। কমন্সসভায় বার্নাডেটের প্রবেশের ফলে উত্তর আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম আরও জোরদার হবে।

ফ্রান্স:

এই প্রবন্ধ যখন ছেপে বেরুবে, তখন ফ্রান্সে আর একটি গণভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে, হয়তো- বা নির্বাচনের ফলও প্রকাশিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল দেশবাসীর সম্মুখে তাঁর সংস্কার-প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। দুটি বিষয় রয়েছে এই প্রস্তাবে। প্রথম: আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। বর্তমান ৯৮টি 'ডিপার্টমেন্ট'কে ২১টি 'রিজিয়নে'র অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি 'রিজিয়নে'র জন্য আরও বেশি শাসন ক্ষমতা তিনি দিতে চান। এই প্রস্তাবে দেশবাসীর বিশেষ আপত্তি নেই, বরং সমর্থনই আছে বলা যায়। কিন্তু আপত্তি দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় প্রস্তাব নিয়ে। দ্য গল জাতীয় আইনসভায় উচ্চ কক্ষ সেনেটের বিলোপের প্রস্তাব করেছেন। বর্তমান সেনেটের জায়গায় একটি পরামর্শদাতামণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে—পরামর্শদাতাদের কিছু নির্বাচিত হবেন, আর কিছু হবেন মনোনীত। এই প্রস্তাবে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী সকলেরই আপত্তি। তাঁদের ধারণা, রাষ্ট্রপতি তাঁর স্বৈরাচারী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সেনেট তুলে দিতে চাইছেন।

সেনেট বিলোপের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখে দ্য গল বলেছেন, দেশবাসী যদি তাঁর এই প্রস্তাব সমর্থন না করে, তবে ডিসেম্বরে তাঁর কার্যকাল শেষ হবার আগেই তিনি পদত্যাগ করবেন। এমনিতেই তিনি বলে রেখেছেন আগামীবার রাষ্ট্রপতিপদের জন্য তিনি আর নির্বাচনপ্রার্থী হবেন না।

গলপন্থীদের আশা দ্য গলের এই কথার পর দেশবাসী সেনেট-বিলোপ সমর্থন করবে। কিন্তু না হলে?

ফরাসীদের 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে গণভোটে তাদের মত জানাতে হবে।

(২৭-৪-৬৯)

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

হাতী কাদায় পড়লে ব্যাঙেও চাট মারে। হাতীর সেই দুর্দিনের কথা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। সেই একই অবস্থা হয়েছে রাজ্য কংগ্রেসের। নইলে কর্পোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভের জন্য কত তাড়া পড়ে যায়, কত ছুটোছুটি পড়ে, কত ভিড় লেগে যায়, আর সেখানে এবার কংগ্রেসের মনোনয়নের জন্য কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। এমন কথা কি কল্পনা করা যায় যে, কংগ্রেস একশ'টা ওয়ার্ডে প্রার্থী দিতে পারলো না বা যাদের দিল তারা শেষ মুহূর্তে মনোনয়নপত্র দাখিল করলো না। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সর্বময়কর্তা হলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। এতদিন কংগ্রেসের কে মনোনয়ন পাবে, কে মেয়র আর কে ডেপুটি মেয়র হবে—সব কিছুরই শেষ সিদ্ধান্ত করে এসেছেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। কিন্তু আজ সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই—রামচন্দ্র আজ বিবাগী বনবাসী। তাই অযোধ্যাপুরীও অন্ধকার, সেখানে শুধু কিছু রামভক্ত প্রভুর পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলেছেন।

কথায় বলে গোদের ওপর বিষফোড়া বা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। কংগ্রেসের এই দুর্দিনে আবার কংগ্রেসের মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে বিদ্রোহ করলেন। পৌর নির্বাচন যখন শিয়রে, মনোনয়নপত্র যখন জমা দেবার শেষ তারিখ শিয়রে, ঠিক সেই সময় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে পদত্যাগ করে মধ্যাহ্নে অন্ধকার নামিয়ে আনলেন। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে কংগ্রেসের আকাশে নতুন তারকারূপে উদিত হয়েছিলেন। কয়েক বৎসর বেশ পসার জমিয়েছিলেন রাজ্য-রাজনীতিতে। মন্ত্রিসভার সদস্যরূপেও নাম উঠেছিলো গতবার, রাজ্যের ভাবী অর্থমন্ত্রী এমন কি মুখ্যমন্ত্রীরূপেও শ্রীদের নাম উচ্চারিত হয়েছিল। শুধু তাই না পি. ডি. এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটিয়ে যে জাতীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীআশুতোষ ঘোষ, শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকাজেম আলি মির্জা প্রমুখ—তাঁদের সঙ্গে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে, শ্রীগোপালদাস নাগ, শ্রীমিহির উপাধ্যায়, শ্রীশান্তি রায় প্রমুখ অনেকে শরিক হয়েছিলেন। একটি প্রতিনিধি দল যাঁরা রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশনে গিয়ে এই জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন, শ্রীদে ছিলেন তাঁদের অন্যতম মুখপাত্র ও প্রবক্তা। এইখানে শেষ নয়—কংগ্রেস পরিষদ দলের সভায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে নেতৃপদ থেকে অপসারণ করা সম্পর্কেও শ্রীদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। শ্রীদাশগুপ্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনবার তোড়জোড় করতেও শ্রীদে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু সেইদিন কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে জাতীয় সরকার গঠন সম্ভব হয় নি, রাষ্ট্রপতি শাসনের যূপকাষ্ঠে সেই জাতীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা বলি হয়ে যায়। কিন্তু এর জের চলেছিল অনেক দিন। রাজ্য কংগ্রেসের সভায় শ্রীদেব শ্রীআশু ঘোষকে নিয়ে এই দহরম-মহরম, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করা প্রভৃতি ঘটনা নিয়ে ঝড় উঠেছিল। সেই দিনই কিছু কিছু কংগ্রেসী চেয়েছিলেন শ্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক—কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি শ্রীঅতুল্য ঘোষেরই ইচ্ছায়। শ্রীঘোষ সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন শ্রীদে-কে, তাই মামুলী একটা পত্র লিখে নিজের কাজের সামান্য কৈফিয়ৎ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ঘটনার সমাপ্তি হয়েছিল। পরে আবার ঝড় উঠলো মেয়র নির্বাচনের সময়। [illegible] কংগ্রেসী আবার প্যাঁচ কষলেন—না, শ্রীগোবিন্দ দে-কে মেয়র করা চলবে না, কারণ শ্রীদের ভূমিকা খুব সুবিধের নয়। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে একটি নিন্দা প্রস্তাব একদা শ্রীনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এনেও পাশ করতে পারেন নি শুধু শ্রীদের কারণে। তাই অনেকে জোট বাঁধলেন—শ্রীদেকে মেয়র করা হবে না। কিন্তু সেখানেও শ্রীঅতুল্য ঘোষ এগিয়ে এসে শান্তিস্থাপন করলেন এবং শ্রীদে দ্বিতীয় বার মেয়র হলেন। মেয়র নির্বাচিত হবার পর রাত আটটায় শ্রীদে ছুটে গেলেন কংগ্রেস ভবনে, হাতে গোড়ের মালা আর এক বাক্স সন্দেশ। শ্রীঅতুল্য ঘোষের গলায় মালা পরিয়ে হাতে সন্দেশের বাক্স তুলে দিয়ে পায়ের ধুলো নিলেন শ্রীদে। শ্রীঘোষ বাক্স খুলে নিজে সন্দেশ খেতে দিলেন শ্রীদে-কে, নিজে খেলেন একটা আর আমাকেও দিলেন কয়েকটা। শ্রীগোবিন্দ দে'র দেওয়া আমসন্দেশ সেই দিন অনেকেই কংগ্রেস ভবনে খেয়েছেন, কিন্তু সেই দিন কি কেউ ভেবেছেন যে শ্রীদে এক বছরের মধ্যে কংগ্রেস ভবনের অনেককে আমাশার রোগীতে পরিণত করবেন? ভাবতে পারেন নি—তাই মধ্যবর্তী নির্বাচনে শ্রীদে নিজে প্রার্থী হতে চান নি, কারণ কল্যাণী স্পিনিং মিলের সঙ্গে সুতোর কারবারে তিনি সরকারের সঙ্গে লেন-দেনের সম্পর্কে আবদ্ধ, তাই তাঁর প্রার্থী হওয়া সম্ভব হবে না। মনোনয়নপর্ব চলাকালেই শ্রীদে চলে গেলেন জাপান, কিন্তু ফিরে এসে মনোনয়ন নিলেন কংগ্রেস প্রার্থীরূপে। কারণ সুতোর কারবারের সঙ্গে নিজের নাম কেটে সেখানে শ্রীমতী দে'র নাম বসানো হয়ে গেছে।

নির্বাচন হয়ে গেল—শ্রীদে পরাজিত হলেন শ্রীহেমন্তকুমার বসুর কাছে।

কিন্তু তখনও শ্রীদে সম্ভবত কংগ্রেস ত্যাগের কথা ভাবেন নি। এই ভাবনা প্রথম এল যখন রাজ্যের কুটিরশিল্প-মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ তাঁর পাওয়ারলুম তদন্ত কমিশনের রায় বের করলেন। পাওয়ারলুমের সুতোর ব্যাপারেও শ্রীদের নাম জড়িত করে রিপোর্টে উল্লেখ ছিল। শ্রীদে কংগ্রেসের ভরাডুবি দেখছিলেন—অনুভব করছিলেন অনেকদিন, কিন্তু এইবার নিজেরও বিপদ দেখতে আরম্ভ করলেন। কাজেই যঃ পলায়তি স জীবতি। কর্পোরেশন হাতছাড়া হবেই, কাজেই কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে লাভ নেই—তাই এখন থেকে যদি যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে পরোক্ষে নিজেকে যুক্ত করা যায়, তবে হয়ত ভবিষ্যতে কর্পোরেশনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটাবার অবদান হিসাবে যুক্তফ্রন্টের সহানুভূতি পাওয়া যাবে। তাই মরার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরে শ্রীদে মৃত কংগ্রেসকে আরো এক ঘা মেরে কর্পোরেশন নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের আশায় এক কুলো ছাই ঢেলে দিলেন। যুক্তফ্রন্ট তার নিজের সংগঠন ও প্রচারের মাধ্যমে কর্পোরেশন নির্বাচনে কংগ্রেসকে যতটা কোণঠাসা করতে পারতো—তার চেয়ে বেশি কাজ পেল কংগ্রেসের দারুণ সঙ্কটময় সময়ে শ্রীগোবিন্দ দে কর্তৃক পদত্যাগপত্র দাখিল করায় ও অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্রকে কড়া ভাষায় পত্র লেখায়। কথায় বলে শাকেই জোড় হাত, ভোজবাড়িতে সবে পাতা পেতে খাওয়া সুরু হয়েছে—এখনও পোলাও মাংস, কোর্মা, কোপ্তা, দই, মিষ্টি, পায়েস সব বাকী, কিন্তু অতিথি পাতায় বসে শাকভাজা খেয়েই জোড় হাত করলেন—আর চাই না, আর দেবেন না, আর খেতে পারবো না। কংগ্রেসের অবস্থা হল এই। নির্বাচনের দেরি আছে, সবে মনোনয়নপত্র দাখিল সুরু হল, তাতেই দেখা যাচ্ছে—শ্রীগোবিন্দ দে সরে গেলেন, জোড় হাত করলেন শ্রীঅরবিন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীধীরেন দাশগুপ্ত, শ্রীদেবেন দত্ত, শ্রীপ্রীতি রায়চৌধুরী, শ্রীযোগেন সাহা ও শ্রীমিহির গাঙ্গুলী, শ্রীদেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এমন কি হালদারবাড়ির শ্রীঅমিয় হালদার পর্যন্ত।

অর্থাৎ কংগ্রেসের যাঁরা রিসোর্সফুল ক্যান্ডিডেট—যাঁরা মেয়র, ডেপুটি মেয়র হওয়ার উপযুক্ত, বলিয়ে-কইয়ে, সর্বোপরি নিজেদের পয়সা-কড়ি আছে ও নির্বাচনে খরচ করে থাকেন—তাঁরা কেউ দাঁড়ালেন না। কংগ্রেস প্রার্থী হলেন—সেই আদি অকৃত্রিম গণাদা ওরফে গণপতি সুর, শ্রীঅমূল্য সরকার, শ্রীশঙ্কুলাল বিশ্বাস। কলকাতার ওপরে পৌর নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীতে ঘাটতি পড়লো এমন ঘটনা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু তাই হল—বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা ওয়াক ওভার পেয়ে গেল।

যাত্রা শুরুতে যদি যুক্তফ্রন্ট ওয়াক ওভার পায়, তবে নির্বাচনে কি হবে সেটা অনুমান করা কষ্ট নয়। যাঁদের দিব্যজ্ঞান আছে, যাঁরা কিছু ভবিষ্যৎ দেখতে পান, তাঁরা বেশ দেখতে পাচ্ছেন—কর্পোরেশন নির্বাচনে কংগ্রেসের কি হবে। এই যাঁরা দেখছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীগোবিন্দ দে অন্যতম—তাই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন, কংগ্রেসের ভ রা ডু বি র শরিক হতে চান নি।

—২৫শে এপ্রিল, '৬৯

নীরো—

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

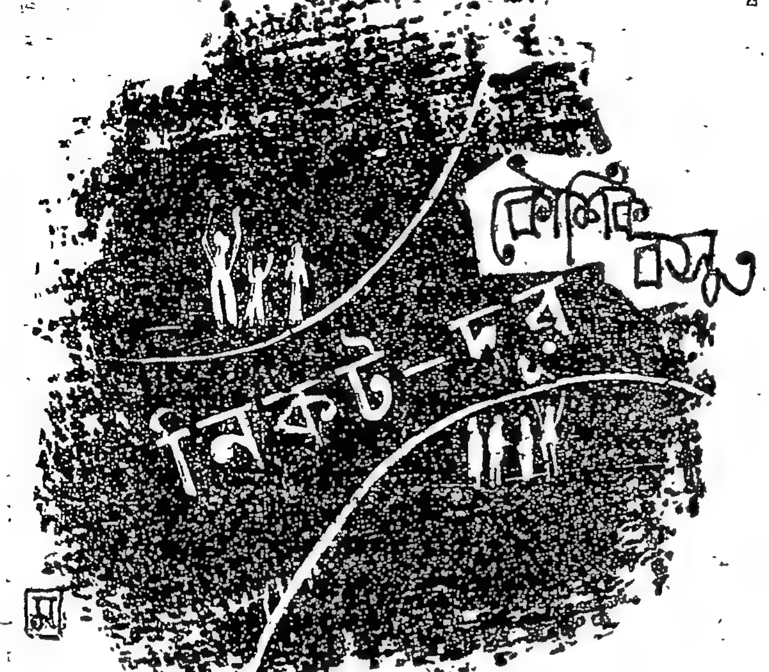

একটি বিস্ফোরক বই

বই লিখে জেলে যাওয়াকে অনেকে খ্যাতির পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন, কিন্তু আটাশ বছরের তরুণ রেগিস্ ডেব্রে-র ক্ষেত্রে তা খ্যাতির বিড়ম্বনাই হয়েছে। ১৯৬৭ সালে তিনি তিরিশ বছরের জন্য বন্দী হন, তাঁর অপরাধ তিনি একটি বই লিখেছেন যার নাম 'Revolution in the Revolution ?' বা 'বিপ্লবের ভিতরে বিপ্লব'। নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বইটি কোনো সাহিত্যকর্ম নয়। মূলে স্প্যানিশ ভাষায় রচিত এই চিন্তাখর বইটির বিষয়বস্তু কিউবার বিপ্লব ও তার শিক্ষা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে সেই শিক্ষা কতদূর কার্যকরী হতে পারে। ডেব্রে দেখিয়েছেন যে স্থান ও কাল অনুসারে বিপ্লবের রীতিনীতি পাল্টায়, বিপ্লবের মধ্যেই মাঝে মাঝে বিপ্লবের প্রয়োজন হয়। এই পর্যবেক্ষণটি সাংঘাতিক বলে বিবেচিত হয়েছে, কারণ তা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একটি মারাত্মক মন্ত্র। অবশ্য, অনেকে এমনও মনে করেছেন যে ডেব্রের গ্রেপ্তারের সঙ্গে তাঁর গেরিলা কার্যকলাপের সম্পর্ক আছে।

ডেব্রে একজন মার্ক্সবাদী দার্শনিক। যখন তিনি ১৯৬১ সালে প্রথম কিউবা যান, সেখানে তখন নিরক্ষরতা দূর করার মরণপণ তোড়জোড় চলেছে। সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপারে কিউবার সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হয় নি। অতঃপর তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘ সময় কাটান, রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনগুলি খুঁটিয়ে বোঝেন এবং যখন সুযোগ পান তখনই গেরিলা ফ্রন্টগুলি পরিদর্শন করেন। ১৯৬৬ সালে আবার তিনি কিউবায় ফিরে আসেন, এবার হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হয়ে। এই সময়ে তিনি অনেক অপ্রকাশিত দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহার করার সুযোগ পান, কিউবা-বিপ্লবের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান, এবং ফিডেল কাস্ত্রোর সঙ্গেও প্রভূত সময় অতিবাহিত করার সুযোগ পান। এই আলাপ-আলোচনা পড়াশুনোর ফল 'Revolution in the Revolution ?' এই বই প্রকাশের মাত্র কয়েকমাস পরেই একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মুখপাত্র হিসেবে যখন ডেব্রে বোলিভিয়া ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় বোলিভিয়ার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বোলিভিয়ায় তৎপর গেরিলা অভ্যুত্থানে সহায়তা করেছেন, শুধু তাই নয় তিনি কাস্ত্রোর ডানহাত চে-গেভারার দ্বারা পরিচালিত। ফলত, পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আবেদন সত্ত্বেও ডেব্রের তিরিশ বছরের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড কমে নি।

'বিপ্লবের ভিতরে বিপ্লব' মোটেই গল্পের বইয়ের মত সহজপাঠ্য নয়। এই বই ভালোভাবে বুঝতে হলে দরকার ঐতিহাসিক চেতনা, সমাজনীতি-অর্থনীতির জ্ঞান এবং সর্বোপরি দার্শনিক মন। প্রসঙ্গত বইটির সূচনায় যে অসামান্য বোধের পরিচয় লেখক দিয়েছেন, তা উদ্ধারযোগ্য: 'আমরা কখনোই বর্তমানের সঙ্গে পুরোপুরি সমকালীন নই। ইতিহাস এগোতে থাকে ছদ্মবেশে; পূর্ব দৃশ্যের মুখোস পরে সে যখন মঞ্চের উপর হাজির হয়, আমরা তখন হারাই নাটকের তাৎপর্য। যতবার যবনিকা ওঠে, ততবারই পারম্পর্য পুনঃস্থাপন করতে হয় আমাদের। দোষটা অবশ্য ইতিহাসের নয়, আমাদের দৃষ্টির, যে-দৃষ্টি অতীতের স্মৃতি আর মূর্তিতে ভারাক্রান্ত। আমরা বর্তমানকে দেখি অতীতকে তার উপর চাপিয়ে, এমন কি যখন বর্তমান একটি বিপ্লবের কাল তখনও।'

এই উদ্ধৃতি ডেব্রের বই-এর যোগ্য ভূমিকা। তাঁর পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র কিউবা হলেও, তিনি অতীতচারী নন। কিউবার বিপ্লব যে শিক্ষা দেয়, ল্যাটিন আমেরিকার ভবিষ্যৎ তার উপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং ডেব্রের দার্শনিক প্রজ্ঞা ভাবীকালে সম্প্রসারিত, তাঁর বই-এর সূচী থেকেও সেটা স্বচ্ছ। তিন অধ্যায়ে বিভক্ত এই বই-এর প্রথম অধ্যায় 'কীভাবে বর্তমানকে অতীত থেকে মুক্ত করা যায়', দ্বিতীয়, 'বর্তমান কালের জন্য মুখ্য শিক্ষা' এবং তৃতীয় অধ্যায় 'ভবিষ্যতের জন্য ফলাফল'।

ডেব্রের মতে, কিউবা প্রথম থেকেই একথা বুঝতে পেরেছিল যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সশস্ত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের ফলেই আসে সামাজিক বিপ্লব। যদিও সশস্ত্র সংগ্রাম স্থান-কাল সাপেক্ষ, তবু তার পুনরাবৃত্তিও ঘটে। তাই রাশিয়ার বিপ্লবে পুনরাবৃত্ত হয় প্যারিস কমিউন, চীনা কম্যুনিস্টরা ভাবেন অক্টোবর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভিয়েতনামীরা তাদের অভ্যুত্থানকে সাজান রাশিয়ার কৃষিজীবীদের অনুসরণে। কিন্তু এটাও ঠিক, প্রাগ্বর্তী বিপ্লবের ঔজ্জ্বল্য নয়, তার পদ্ধতি ভালো করে বোঝা দরকার, যদি সেই বিপ্লবের শিক্ষাকে ঠিক-মতো কাজে লাগাতে হয়।

পুলিশের চোখে ডেব্রের দোষ এই যে তিনি গেরিলাযুদ্ধ বা সশস্ত্র গণসংগ্রামের খুব জোরালো ব্যাখ্যাকার এবং সমর্থক। তিনি নিজে যে একজন পদ্ধতিবিদ্ মাত্র তাই নয়, বাস্তবক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা গভীর। একজন মার্ক্সবাদী দার্শনিক,

তিনি তাঁর সমস্ত মেধা প্রয়োগ করেছেন মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মধ্যে যে ফাঁক আছে তা দূর করার জন্য। এবং সেই শূন্যস্থান পূরণের একমাত্র উপায় গেরিলা আন্দোলন, যে আন্দোলনের রাজনীতি ও সামরিক নীতি একীভূত। শুধু তত্ত্ব নয়, কাজও দরকার, দরকার মৃত্যুবরণের। তাঁর ভাষায়—"এই সমস্ত মানুষ হয়তো মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু অন্যেরা শীঘ্রই তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। ঝুঁকি নিতেই হবে। তত্ত্ব এবং তত্ত্ব-প্রয়োগের একীকরণ একটি সংগ্রাম, এবং কোনো সংগ্রামই আগে থেকে জয় করা যায় না। এই একীকরণ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে সম্ভব না হয়, তা হলে তা অন্যত্র কোথাও সম্পন্ন হবে না।"

কিউবা-বিপ্লবের সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে লেখক বলতে ভোলেন নি যে, রাজনীতির সম্পদকে এমন একটি সংগঠনের কাজে লাগাতে হবে যা একাধারে রাজনৈতিক এবং সামরিক। সাধারণ আদর্শবাদী রাজনীতি এবং বৈপ্লবিক রাজনীতির মধ্যে তফাৎ আছে। যে রাজনীতি শুধু তত্ত্ব আর আদর্শ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, ডেবরের ভাষায়, তা 'politics' নয়, 'politiking'. বর্তমান বিশ্বে politiking অর্থহীন—চিন্তার সঙ্গে কর্ম যদি না মেশে তবে রাজনৈতিক সংগঠন অকেজো হয়ে পড়ে। কিউবার শিক্ষা বিপ্লবের শিক্ষা; ডেবরে তাই ল্যাটিন আমেরিকার দিকে তাকিয়ে এই তিনটি মন্তব্য করেন —প্রথম, রাজনীতিকে বৈপ্লবিক নীতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে; দ্বিতীয়, লেনিনের সেই কথা ভুললে চলবে না; 'সামাজিক গণতন্ত্রবাদীরা কী ভাবছে তা জানার জন্যে তাদের হাতের দিকে তাকাও, মুখের দিকে নয়'। এবং তৃতীয়, ল্যাটিন আমেরিকার পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লব একটি অবশ্যকৃত্য।

এমন একটি বই, সশস্ত্র বিপ্লবের কথা যার ছত্রে ছত্রে, তা যে পুলিশ-রোষে পড়বে, তাতে আর সন্দেহ কী? এমন কি পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকায় এই জোরালো বই যে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দিতে পারে তা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু লুঠ-পাট, ছুরি-চালানো, উদ্দেশ্যহীন মারামারি আর নির্বাচনোত্তর আক্রোশ এবং 'বিপ্লব' (শব্দটির যে মানেই ধরা যাক না কেন)—যে এক ব্যাপার নয় তা বোঝবার জন্যে 'বিপ্লবের ভিতরে বিপ্লব'-এর লেখকের কাছে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। আমরা যখন ক্রমশ 'বিপ্লব' শব্দটির মূল্যহ্রাস ঘটাচ্ছি, (প্রসংগত 'আলু-বিপ্লব' শব্দটি স্মরণ করি) তখন অন্তত এই বইটি পড়লে আমরা বুঝতে পারবো লেখক কত উচ্চ মূল্যে তাকে কিনতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ডেবরের মতামতে সায় না দিতে পারেন, 'সশস্ত্র বিপ্লব' ব্যাপারটিই অনেক মানুষের কাছে একটি ভয়াবহ প্রস্তাব। কিন্তু তাতে বইটির মূল্য কমে না। ডেবরে এমন একজন ব্যক্তি যাঁর কথাকে না মানলেও কোনো-ক্রমেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবং অন্তত আমি তাঁর একটি সিদ্ধান্তে সায় দিতে ইচ্ছুক যে 'সাম্যবাদ' ব্যাপারটি কোন স্থাণু ধারণা নয়, সময় ও সমস্যার দ্বারা সে নিত্যসচল। কিন্তু সিদ্ধান্তে সায় দিলেও, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য ডেবরে যে অনিবার্য গেরিলা-যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেছেন, তা শেষ পর্যন্ত মানবসভ্যতার কাছে একটি প্রশ্নচিহ্ন।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায়

এই উৎসবের মধ্যে এক পক্ষকাল

৬ মে থেকে ২০ মে

সুলভ মূল্যে—শতকরা ১২½ টাকা বাদ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতী প্রকাশিত ও প্রচারিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুবিধা পাবেন।

॥ পুস্তকবিক্রেতাদের প্রতি নিবেদন ॥

নির্দিষ্ট সময়ে পুস্তকবিক্রেতাগণ যাতে ক্রেতাসাধারণকে পুস্তক সরবরাহ করতে পারেন সেজন্য নির্ধারিত অতিরিক্ত কমিশনে ৩ মে থেকে তাঁরা এই কয়টি কেন্দ্রে পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা ১২

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯

জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা ৯

বিশ্বভারতী শিল্পসদন
শান্তিনিকেতন। বীরভূম

দামোদর পুস্তকালয়
২৪ বিজয়চাঁদ রোড। বর্ধমান

পত্রিকা সিণ্ডিকেট
গোল মার্কেট। নিউ দিল্লী

হুইলার ডিস্ট্রিবিউটার্স
১৫ এলগিন রোড। এলাহাবাদ

ভারতী ভবন
গোবিন্দ মিত্র রোড। পাটনা ৪

ন্যাশ্যনাল ব্রাদার্স
২৬ মেন রোড। জামসেদপুর-১

বিশ্বভারতী

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

এবং পনের দফা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই দুই দফার বক্তব্যের মধ্যেই জড়িয়ে আছে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। এগারো নম্বর দাবি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, মানুষের চিকিৎসার সুযোগলাভের প্রাথমিক অধিকার সম্পর্কিত। আর চোদ্দ এবং পনের নম্বর দফা শোষিত ও বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বেঁচে থাকার অধিকার সম্পর্কিত।

এগারো নম্বর দফায় অতি সাধারণভাবে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে মৌলিক সূত্রটি উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই দফায় বলা হয়েছে : যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সেবা ব্যবস্থা বৃদ্ধির জন্য যত্নবান হবে, মেডিক্যেল শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রসার ঘটাবে এবং হেলথ সার্ভিসকে জাতীয়করণ করার পথে অগ্রসর হবে।

"হাসপাতালগুলির ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করার জন্য এবং জনসাধারণের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।"

"গোটা রাজ্যে উপযুক্ত পরিমাণ পানীয় জল সরবরাহের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মসূচীটি অত্যন্ত ভাসাভাসা। সুনির্দিষ্ট করে কিছুই বলা হয় নি। তাই কর্মসূচী রূপায়ণের দায়-দায়িত্ব পড়ছে অনেকটাই বিভাগীয় মন্ত্রীর ওপর।

একে অর্থের অভাব—তার ওপরে স্বাস্থ্যদপ্তরের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল সমস্ত দপ্তরটিকে এমন অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছে যে, জঞ্জাল সাফ করতে না পারলে জনসাধারণের অতি সামান্যতম উপকার করাও সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সমস্যার অন্ত নেই। এখন পর্যন্ত পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ বিন্দুমাত্র সরকারী চিকিৎসার সুযোগ পায় না। গ্রামে যে সামান্যসংখ্যক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হয়েছে সেখানেও ডাক্তার নেই। চিকিৎসকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কায়েমীস্বার্থ। কায়েমীস্বার্থের চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকলে তাঁর নামডাক হয়। শহরে পসার বাড়ে।

প্রতিটি হাসপাতালের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। চিকিৎসক আর জনসাধারণের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে দিনের পর দিন। কোথাও কোথাও পরিণতিতে দেখা দিচ্ছে সংঘর্ষ। রাজ্য সরকারের বৃহত্তম দপ্তর হচ্ছে স্বাস্থ্যদপ্তর। সমস্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীর প্রায় শতকরা ৪০ ভাগই স্বাস্থ্যদপ্তরের অধীন। এই দপ্তরে যতগুলি গেজেটেড অফিসার আছে অন্য সব দপ্তর মিলিয়েও তত সংখ্যক গেজেটেড অফিসার নেই।

পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ ব্যবস্থাও এই দপ্তরেরই অন্তর্ভুক্ত। ফলে সমস্যা আরো বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের খবর যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে পল্লী অঞ্চলের শোচনীয় জলাভাবের কথা আদৌ অজানা নয়। সমস্যার তুলনায় সরকারী ব্যবস্থা অতি সামান্য। যেটুকু ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব তাও বিভাগীয় গাফিলতি আর সমন্বয়ের অভাবে হতে পারে না।

তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। চিকিৎসকদের গ্রামাঞ্চলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা, প্রমোশনের একটা স্থায়ী নিয়মকানুন গড়া, দুর্নীতির চক্র ভাঙা প্রভৃতি কাজে হাত দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীভট্টাচার্য ইতোমধ্যেই অনেক শত্রু তৈরি করে ফেলেছেন।

সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির শোচনীয় অব্যবস্থা তো আছেই—তার ওপর বে-সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির অবস্থা তো আছেই। বে-সরকারী হাসপাতাল আর মেডিকেল কলেজের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি ফ্রন্টের কর্মসূচীতে দেওয়া হয়েছে। আরো নতুন মেডিকেল কলেজ খোলার প্রশ্নও আছে।

এই অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবিলম্বে দপ্তরের কোন কোন কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তার একটা তালিকা করে ঘোষণা করা উচিত। আর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন শ্রীভট্টাচার্যের পূর্ব ঘোষণানুসারে সমস্ত স্তরে স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠন। এই স্বাস্থ্য কাউন্সিলগুলো গঠিত হলে বর্তমানে সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিচ্ছে তার অবসান ঘটতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি কথা বলা যেতে পারে—চতুর্থ শ্রেণীর হাওয়াকে যেভাবে বিষাক্ত করে তুলছেন তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠন একান্ত প্রয়োজনীয়।

এবার যুক্তফ্রন্টের শ্রমনীতির প্রশ্নে আসা যাক। ফ্রন্ট কর্মসূচীর চোদ্দ দফায় বলা হয়েছে—"যুক্তফ্রন্ট সরকার (ক) বাঁচার মত মজুরী, (খ) বেকার ভাতা (গ) উপযুক্ত পরিমাণ বোনাস ও বোনাস আইনের সংশোধনের জন্য এবং (ঘ) ছাঁটাই, অটোমেশন প্রভৃতির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রামে সাহায্য করবে।"

"চলতি শ্রম-আইনগুলির যেখানেই শ্রমিকশ্রেণীর সুবিধার্থে প্রয়োজন হয় যমন রকমের সংশোধনী যুক্তফ্রন্ট সরকার আনবে। (ক) অসদুদ্দেশ্যে মালিকদের কারখানা বন্ধের ক্ষেত্রে শাস্তিবিধান; (খ) কনট্রাক্ট শ্রম ও ক্যাজুয়াল শ্রম নিষিদ্ধকরণ; (গ) ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক করা; যে-সব ক্ষেত্রে একাধিক ইউনিয়ন থাকবে সেক্ষেত্রে দু-বছর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রধান ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদান—অবশ্য বাকী অস্বীকৃত ইউনিয়নগুলিরও প্রতিনিধিত্বের অধিকার থাকবে; (ঘ) লক-আউটকালীন সময়ের বেতনদান—লক-আউটকালীন অবস্থাতেই ৫০ শতাংশ বেতন দিয়ে যাওয়া; (ঙ) যে-সব শ্রমিকের কাজ টারমিনেট করা হয়েছে, তাদের, অথবা অসদাচরণের অভিযোগে ছাঁটাই, অস্থায়িভাবে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দান; (চ) সালিশীর বৈঠকে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ উভয়ের উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক করা; (ছ) প্রভিডেন্ট ফান্ড তহবিলে মালিকদের টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে ফাঁকির ক্ষেত্রে শাস্তিবিধান প্রভৃতি নতুন নতুন আইনও যুক্তফ্রন্ট সরকার রচনা করবে। শ্রমিকদের অধিকার বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে স্ট্যান্ডিং আচরণবিধির সংশোধন এবং সালিশীর প্রশাসনিক ও চালনা সম্পর্কিত বিধি-বিধানেরও উন্নতি বিধান করা হবে। রাষ্ট্রবীমা পরিকল্পনার উন্নয়নের জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। সর্বপ্রকার সরকারী চাকুরেদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্বীকার করা হবে এবং কর্মচারীদের অধিকারের দিকে নজর রেখে তাদের কন্ডাক্ট-রুলস পরিবর্তনেরও ব্যবস্থা করা হবে।

"১৫। সমগ্র রাজ্যে ক্ষেত মজুরদের নিম্নতম বেতনের নিশ্চিতকরণের জন্য, তাদের কাজের জন্য এবং সরকারী কৃষি-ফার্মে ক্ষেত মজুরদের নিয়মিত শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।"

যুক্তফ্রন্টের শ্রমিকনীতি যে মূল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরিচালিত হবে তার মর্মকথা আছে ২৯ দফায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা

সম্পর্কিত কর্মসূচীতে। ঐ দফায় বলা হয়েছে : "২৯। যুক্তফ্রন্ট সরকার মৌলিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে সম্মান ও রক্ষা করবে। শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কদাপি নিবর্তনমূলক আটক আইন ব্যবহার করা হবে না। কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশ লাগানো হবে না, যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল হবার পর পুলিশ যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছে সে সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনকল্পে যাবতীয় মামলাগুলি প্রত্যাহার করা হবে। সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। দেশের যাবতীয় অ-গণতান্ত্রিক ও নির্যাতনমূলক আইন যথা—"বে-আইনী কার্যকলাপ নিরোধ আইন," "অপরিহার্য সার্ভিস রক্ষা আইন" প্রভৃতি বাতিলের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।"

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আজ তাদের ঘোষিত নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সরকার গঠনের পর দু-মাস পুরোপুরি অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট কমিটি তাঁদের পূর্ণাঙ্গ শ্রমনীতি নির্ধারণ করতে পারলেন না। স্বভাবতই তাই মন্ত্রিসভায় কোন নির্দিষ্ট নীতি এখনো গ্রহণ করা হয় নি। ইতোমধ্যে শ্রমমন্ত্রীকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে অবস্থানুসারে নীতি কার্যকরী করতে হচ্ছে। ফলে ফ্রন্টের বিভিন্ন দলের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিচ্ছে যা ক্রমে প্রকাশ্য বিতর্কের রূপ নিয়ে ফ্রন্টের ভাবমূর্তিকে মলিন করে দিতে সুরু করেছে।

গত দু মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার যেটুকু করতে পেরেছে তা সরাসরি শ্রমনীতির অন্তর্ভুক্ত না হলেও শ্রমনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রাজ্য সরকার শিল্পপতিদের কিছুটা আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। শিল্পে শান্তিরক্ষায় যুক্তফ্রন্ট সরকার যে সচেষ্ট তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য যাই হোক না কেন বর্তমান অবস্থায় শিল্প অর্থনীতি যে তাঁরা মেনে নিয়েছেন তা তাঁরা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করছেন।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই ফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার পর কতকগুলি ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের শ্রমিক-মালিক বিরোধ মিটিয়ে অনেকগুলি বন্ধ কারখানার দরজা খোলার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেইসব ক্ষেত্রে কাজ ফিরে পাওয়া ছাড়া শ্রমিকগণ যে-সব দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম সুরু করেছিলেন তার কতটা আদায় হয়েছে আজও তার বিচার-বিবেচনা করার সময় আসে নি। শ্রমিকদের ওপর মালিকের জুলুম ও শোষণ বন্ধ রাখার দিকে জোর না দিয়ে শিল্পে শান্তিরক্ষার নীতির ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে ইতোমধ্যেই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন দল অভিযোগ তুলতে সুরু করেছেন।

শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য যে-সব আইন করার কথা ফ্রন্টের কর্মসূচীতে ঘোষণা করা হয়েছিল এখনও পর্যন্ত তার একটিও কার্যকরী করা হয় নি।

১৯৬৭ সালে যে "ঘেরাও" নীতি নিয়ে দেশ-বিদেশে এত হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল সে সম্পর্কেও অনেকটা ভাসাভাসা কথা বলা হচ্ছে। বরং জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ধারণাই সৃষ্টি হয়েছে যে, বর্তমান সরকার আগের মত আর ঘেরাওয়ের পক্ষপাতী নন। ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়া ও প্রসারের মূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এখন পর্যন্ত পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে না।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ করা হয় নি। কিন্তু, আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রয়োগ না করার নীতি পুরোপুরি মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠতে সুরু করেছে। অবশ্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কিত দফার মধ্যে পুরাতন মামলা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান প্রভৃতি বিষয়গুলি মোটামুটিভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে।

যাই হোক আর দেরি না করে ফ্রন্টের শ্রমনীতি দ্রুত নির্ধারণ করা প্রয়োজন। শ্রমিকদের কল্যাণমূলক যে-সব আইন প্রণয়ন করার কথা কর্মসূচীতে ঘোষণা করা হয়েছে, অবিলম্বে তা কার্যকরী করতে না পারলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়বে আর অন্যদিকে মালিকদের আক্রমণের বেগও বাড়বে।

প্রসঙ্গক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য রক্ষা ও প্রসারের প্রশ্নও একান্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে এ সম্পর্কে নীতি স্থির করা, নিচের তলা থেকে ঐক্য গড়ার দিকে নজর না দিলে মালিকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। তাই আজ আর একবার শ্রমমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা তথা যুক্তফ্রন্টকে তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

—শ্রীসর্বদর্শী

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস :

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ।) মূল্য—৩'০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম্ শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম্, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম্, শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম্, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম্। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩'০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত।

প্রথম খণ্ড—৫'০০ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড—৪'০০ টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ :

(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সম্বলিত)

আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। পয়ারছন্দে। রাজসংস্করণ। সচিত্র। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে

রাহুল বর্মণ

নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ আগামী ৩০শে মে দু' বছরে পা দেবে। ঠিক দু' বছর আগে এমনি দিনে বিয়াফ্রা আর ফেডারেল সরকারের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল রক্তাক্ত সংঘর্ষ। দীর্ঘ চব্বিশ মাস পরেও দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের অবস্থা প্রায় অপরিবর্তনীয়। বিয়াফ্রা চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেও নুয়ে পড়ে নি; তারা তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে। ফেডারেল সরকার আর বিয়াফ্রার বিবাদের সমাধান সামরিক উপায়ে সম্ভব নয় বলেই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

দীর্ঘ দু' বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলার ফলে যে সঙ্কটের উদ্ভব তার কারণ জানতে হলে এই ফেডারেল রাষ্ট্রের অতীতের ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন।

১৯৬০ সালে বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করার সময় নাইজেরিয়া ছিল উত্তর, পশ্চিম আর পূর্বাঞ্চলে বিভক্ত। উক্ত তিনটি অঞ্চলের উপজাতিরা হানসাফুলানী, জরুবাস এবং ইবো বলে পরিচিত। উত্তরাঞ্চল আয়তনে এবং লোকবলে বড় হবার ফলে বাদবাকী দুটি অঞ্চলের উপর চিরকাল কর্তৃত্ব চালিয়ে আসছে। যদিও শিক্ষা আর অর্থনৈতিক দিক থেকে সে অঞ্চল ছিল অন্যদের চেয়ে অনগ্রসর। স্বাধীনোত্তর কালে নাইজেরিয়াব আভ্যন্তরীণ অবস্থা এরূপ হওয়ার দরুণ সেখানে ক্ষমতার লড়াই চলছিল বহুদিন আগে থেকেই। উত্তরাঞ্চলের মানুষেরা অন্য যে-কোন একটি উপজাতি সম্প্রদায়কে হাতে রেখে সর্বময় কর্তৃত্ব ফলাতো সংখ্যালঘুদের উপর। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই সংখ্যালঘু উপজাতিগুলির মধ্যে পৃথক অস্তিত্বের মনোভাব গড়ে ওঠে। সেজন্যে ১৯৫৭-৫৮ সালে সংখ্যালঘুদের দাবিগুলি পরীক্ষার্থে এক কমিশন বসে। কমিশন পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে রিপোর্ট প্রদান করেন; কিন্তু সেটা বাতিল করা হয় এই দাবিতে যে সংখ্যালঘুদের দাবি মেনে নিলে স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটবে। ফলে সমস্যার সমাধান আর হল না।

উক্ত তিনটি অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সংখ্যাগুরুদের হাতে অসাম্যমূলক ব্যবহার লাভ করার দরুণ ক্রমেই দেশব্যাপী একটা পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। বিয়াফ্রার বিদ্রোহ তারই ফলশ্রুতি।

১৯৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচন পূর্বাঞ্চল বয়কট করে। তাতে দেশব্যাপী দুর্যোগের কালোমেঘ ঘনিয়ে ওঠে। অবশ্য পরে উভয়পক্ষে একটা সমঝোতা হয় তবু সন্দেহের বীজ বিদূরিত হল না আর নতুন ব্যবস্থায় দেশের তিনটি অঞ্চলের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গড়ে উঠলো ফেডারেল সরকার। সরকারের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় থাকার ফলে স্বার্থের সংঘাত বাধলো কিছুদিনের মধ্যেই। পশ্চিমাঞ্চলে যে উপ-নির্বাচন হল তাকে অনেকটা নির্বাচনের প্রহসন বলা চলে। ভোট চুরি করে সরকার সমর্থক দলকে বসানো হল ক্ষমতায়। পারস্পরিক সন্দেহ আর বিদ্বেষে ভরে গেল সমগ্র দেশ। ফেডারেল সরকার তখন মৃত সৈনিকের ভূমিকায়। এরই মাঝে ১৯৬৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী মধ্যরাতে পাঁচজন ইবো জেনারেল বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ফেডারেল সরকারের বিরুদ্ধে। নিহত হলেন প্রধানমন্ত্রী আবুবকর তফাওয়া। পরিবর্তনের আশায় দেশবাসীরা স্বাগত জানালেন নবীন তুর্কীদের।

কিন্তু বেশিদিন সে সুখ রইলো না। ১৯৬৬ সালে ঘটল আর একটি বিদ্রোহ। এবার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেন কর্নেল ইয়াকুবু গোহান। সমস্ত দেশে আর একবার বয়ে গেল রক্তগঙ্গা। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে হল দেশব্যাপী এক নিদারুণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা। ইবোরা হয়ে উঠলো ক্রুদ্ধ আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিভেদের ব্যবধান উত্তরাঞ্চল আর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আরো বেড়ে গেল।

১৯৬৭ সালের ৩০শে মে ভোরবেলা ফেডারেল নাইজেরিয়ার পূর্বাঞ্চল (ইবো হার্ট ল্যান্ডরূপে পরিচিত) লেঃ কর্নেল ওডুমেগু ওজুকুর নেতৃত্বে সার্বভৌমত্বের দাবি জানিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। নতুন রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হল 'রিপাবলিক অফ বিয়াফ্রা'। সেদিনই বেলা এগারোটা নাগাদ ফেডারেল সরকারের অন্তর্গত লাগোস, ইবাদিন, লাগোজা আর কাদুনা শহরে বোমাবর্ষণ করলো বিদ্রোহী বিমানবহর। যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ফেডারেল সরকার। তারপরের ঘটনা প্রায় সবারই জানা। গত বছর ফেডারেল সেনাবাহিনীর কর্নেল বেঞ্জামিন ওডে কুনলের (ইনি কালো বৃশ্চিক নামে সর্বত্র পরিচিত) হাতে পোর্ট হারকোর্টের পতন ঘটায় বিয়াফ্রা বেছে নিয়েছে গেরিলা যুদ্ধের পথ। ডাহাটে সেনার শক্তি আর সাওতোমে দ্বীপ থেকে উড়ে-আসা রসদ হচ্ছে বিয়াফ্রার বেঁচে থাকার একমাত্র পথ।

গৃহযুদ্ধটা চলছে মূলত ইবো অধিষ্ঠিত পূর্বাঞ্চল আর বাদবাকী নাইজেরিয়ার মধ্যে, দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা কব্জা করার জন্য। উত্তরাঞ্চল হচ্ছে মুসলমান প্রধান; বিয়াফ্রা হল খৃস্টান রাষ্ট্র। ইবোরা নিজেদের নাইজেরিয়ার ইহুদী বলে মনে করে। এজন্যে তারা গর্বিত। দাম্ভিকও। নাইজেরিয়াতে প্রগতিশীল শক্তির ধারক তারাই। তাই বিয়াফ্রার কাছে এ লড়াই বাঁচার লড়াই। ক্ষুদ্র বিয়াফ্রা গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল অবলম্বন করে যেভাবে গত এক বছর যাবৎ লড়াই চালিয়ে আসছে তা রীতিমত আশ্চর্যজনক।

গৃহযুদ্ধ না থামার এক বড় কারণ বৈদেশিক তৈলপতিদের কূটকৌশল। লাগোস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাবুরী বাইয়োবাকুর মতে বিয়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাবের জন্মদাতা তাঁরাই। বিদেশী তৈলপতিরা মনে করেন নাইজেরিয়া বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের পক্ষে দেশটিকে শোষণ করা সহজ হবে। অবশ্য মেঃ জেনারেল ইয়াকুবু গোহান বারোটি রাষ্ট্রের এক ফেডারেল পরিকল্পনা রচনা করে বৈদেশিক তৈল স্বার্থের প্রতিভূদের মনস্কামনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিলে দেশের কোন একটি সম্প্রদায়ের পক্ষে একাকী সর্বময় কর্তৃত্ব ফলানো সহজ হবে না। কিন্তু গৃহযুদ্ধের অবস্থা এখনও বোঝা অসুবিধাজনক। নাইজেরিয়া কি বাঁচবে, না খণ্ড খণ্ড বিভক্ত হয়ে আফ্রিকার বুক থেকে নিজস্ব অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

যদি বিয়াফ্রার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয় তবে নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হবে বড় ভয়ঙ্কর। নাইজেরিয়া তৈল-সমৃদ্ধ দেশ, দেশের বহু জায়গাতে তেলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, আবার এদিকে কৃষিক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের অগ্রগতি সন্তোষজনক। সুতরাং ভবিষ্যতে আফ্রিকাতে নাইজেরিয়ার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের সম্ভাবনা থাকছে। দেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আরো দুটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কাজ প্রায় শেষ। সমগ্র দেশে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য। স্কুল-কলেজের অভাব নেই। সুতরাং উন্নতির চরম শিখরে ওঠার আগেই যদি দেশটিকে বহু প্রদেশে ভাগ করে উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয় তবে তার ফল নাইজেরিয়ার পক্ষে কি রকম হবে তা সহজেই অনুমেয়। একটি সম্ভাবনাময় দেশের বিলুপ্তি ঘটবে ধ্বংসের মাঝে চিরকালের জন্য। আফ্রিকার আর একটি রাষ্ট্র কঙ্গোর অবস্থাই তো এর বড় প্রমাণ। কিন্তু আসল প্রশ্নের সমাধান তখনও হবে না হয়তো; আসল প্রশ্নটি হচ্ছে ফেডারেল নাইজেরিয়ার উপর ইবোদের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। এবং আজ যদি বিয়াফ্রা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে তাহলে ভবিষ্যতে সমগ্র

নাইজেরিয়ার উপর তাদের অধিকার তারা চাপিয়ে দিতে চাইবে। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের উপর বিয়াফ্রার বার বার আক্রমণ তার বড় প্রমাণ। অবশ্য বর্তমানে বিয়াফ্রা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধুমাত্র উমাহিয়া, কালাবার আর পোর্ট হারকোর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিয়াফ্রার অবস্থা ইজরায়েল রাষ্ট্রের মতন। ইজরায়েল রাষ্ট্র যেমন চারদিকে শত্রু আরব রাষ্ট্রগুলির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বেঁচে থাকছে তেমনি নাইজেরিয়ার এক কোণায় বেঁচে থাকতে হবে বিয়াফ্রাকে। কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা আর সামরিক শক্তিতে ইজরায়েলের সঙ্গে বিয়াফ্রার তুলনা চলে না। বিয়াফ্রা একটি দুর্বল রাষ্ট্র। অপরের সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে বেশিদিন চলা মুস্কিল। তাই বৃহত্তর স্বার্থে নাইজেরিয়ার নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিয়াফ্রার উচিত ফেডারেল কাঠামোতে ঢুকে পড়া। এর কোন বিকল্প নেই। বিয়াফ্রা যদি সার্বভৌমত্বের দাবি ছেড়ে ফেডারেল রাষ্ট্রের কাঠামো মেনে নেয় তখন নতুন সংবিধান রচিত হবে হয়তো।

গত দু' বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলাকালে বিয়াফ্রাকে স্বীকৃতি দিয়েছে জাম্বিয়া, তানজানিয়া, গ্যাবন আর আইভরি কোস্ট। মধ্যে শোনা গিয়েছিল ফ্রান্স নাকি ওজুকু সরকারকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু নাইজেরিয়াতে ফ্রান্সের তৈল স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকায় সেটা আর বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নি। ফ্রান্স ছাড়া আর পর্তুগালের সাহায্য পেয়েছে বিয়াফ্রা। সাওতোমে দ্বীপের (যেখানে সালাজারের রাজনৈতিক শত্রু মারিও সোয়েজকে বন্দী করা হয়েছিল) সামরিক সাহায্যই এখন বিয়াফ্রার বাঁচার একমাত্র উপায়। দ্বীপের বিমানবন্দর থেকে বিমানগুলি উড়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে সমরসম্ভার প্যারাসুটযোগে ফেলে আসে বিয়াফ্রার ঘাঁটিগুলিতে। অবরুদ্ধ স্থানগুলিতে খাদ্যাভাব অত্যন্ত প্রকট। গত বছর দৈনিক মৃত্যুর হার ছিল প্রায় তিন হাজার।

গৃহযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

আমেরিকা প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায়। যখন ফেডারেল সরকার অস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন তখন আমেরিকা ছিল নিরুত্তর। অবশ্য গত ক'মাস ধরে বিবদমান উভয়পক্ষকেই খাদ্য সাহায্য পাঠাচ্ছে হোয়াইট হাউস। আমেরিকা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করায় লাভ হয়েছে বিয়াফ্রার।

উইলসন সরকার প্রথমে ছিলেন নিরপেক্ষ, কিন্তু পরে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কারণ যখন ফেডারেল সরকার রাশিয়া এবং পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলি থেকে সমরসম্ভার পেতে থাকে তখন বাধ্য হয়ে নিজস্ব সম্মান বাঁচানোর অছিলে ফেডারেল সরকারের পক্ষে বৃটেন নেমে পড়ে এবং সালাদিন 'আর্মার্ড কার', হাউটজার কামান আর মর্টার প্রভৃতি সমরাস্ত্র পাঠায়। বৃটিশ সরকারের ইচ্ছা ছিল বিয়াফ্রাকে সাহায্য করা। কারণ, বৃটিশ মালিকানায় পরিচালিত তৈল উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ছড়িয়ে রয়েছে বিয়াফ্রা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে।

ফ্রান্স প্রথম থেকেই ফেডারেল সরকারের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং অস্ত্র সাহায্য দেয়। কিন্তু অন্যদিকে তারা বিয়াফ্রাকে সমরসম্ভার পাঠায় প্রাইভেট কোম্পানীর মাধ্যমে। ওজুকু সরকারের প্রধান অস্ত্রদাতা হচ্ছে প্যারিস। বর্তমান গৃহযুদ্ধে ফ্রান্সের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসের বিদ্রোহের মধ্যে রাশিয়া দেখতে পেয়েছিল নাইজেরিয়াতে প্রগতিশীল শক্তির নবজাগরণ। সংখ্যালঘুদের অভ্যুত্থান আর দেশের সর্বত্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন গোষ্ঠীর আবির্ভাবে মস্কো উৎসাহিত হয়। তাই মস্কো সব সময় ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী নাইজেরিয়া গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। সুতরাং নাইজেরিয়ার ঐক্য রক্ষার্থেই রাশিয়া জেঃ গোহানের ফেডারেল সরকারকে সামরিক সাহায্য দেয়। সামরিক সাহায্যের মধ্যে আছে মিগ বিমান, ট্যাঙ্ক আর উভচর (Amphibious) বাহিনীর মোটর পেট্রল বোট। রুশ মিগ-ফাইটার বিমানগুলি আবার চালনা করেন মিশরীয় বৈমানিকরা। কারণ নাইজেরিয়াতে সুদক্ষ বিমানচালকের বড় অভাব। রুশ নেতারা দূরদর্শী। ফলে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে নাইজেরিয়াতে প্রগতিশীল শক্তিকে বাঁচাতে হলে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

বার বার শান্তি প্রস্তাব ব্যর্থ হবার ফলে এখন ফেডারেল সরকার প্রায় ধৈর্যহারা। বিয়াফ্রার সামনে এখন দুটি পথ উন্মুক্ত। হয় ফেডারেল সরকারের শান্তি প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া, নতুবা অনাগত ভয়ঙ্কর বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা। ওজুকু তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল। তাই মনে হয় যুদ্ধ চলবে আরো বহুদিন, যতদিন না ফেডারেল সেনাবাহিনী বিয়াফ্রাকে শেষ ঘাঁটিগুলি থেকে উৎখাত করতে পারে। কালো বৃশ্চিক নামে পরিচিত ফেডারেল কর্নেল ওভে ফুনলের তৃতীয় মেরিন কম্যাণ্ডো আর মেজর জেনারেল মহম্মদ শিওয়ার প্রথম ডিভিশনের আক্রমণের মুখে বিয়াফ্রা কিভাবে শেষ লড়াই চালায় সেটা এখন লক্ষ্য করার বিষয়।

জয়ন্তী সেনের

তুষারে রোদ

দাম : তিন টাকা

একালের বহুল প্রশংসিত অনন্যস্বাদের একটি আশ্চর্য কাব্যগ্রন্থ

"এ গ্রন্থের সমস্ত কবিতা পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করলে একটি সহজ সুন্দর স্বাভাবিক কবিসত্তা অনুভব করা যায়"।—দেশ

"বর্তমান যুগ ও জীবনের যন্ত্রণা তাঁর কবিতাকে প্রখর অনুভূতিময়, স্পষ্টমুখ ও বিষয়বস্তুপ্রধান করে তুলেছে।...তাঁর কবিতায় সমকালীন ঘটনাসংঘাতের অনুকম্পন যেমন অবশ্যশ্রুত, তেমনি শোনা যায় ব্যক্তিগত অনুভূতির স্ফূর্তিচারী উচ্চারণ।"—অমৃত

"আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে দেখছি আত্মসত্তার উপলব্ধির পরশমণির স্পর্শে বেদনা-বিধুর আনন্দ-উজ্জ্বল এক মহিম-রূপ।...শব্দ-চয়নে যে মালিকা-মালা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলেছে, তাও কত সহজ-সরল। যেন সহজাত কুশলী-শক্তির অধিকারী এই কাব্যের কবি। প্রত্যেকটি কবিতাই ভাবদীপ্ত ও স্নিগ্ধতায় ভরপুর।" —যুগান্তর

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ও

অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

স্বাধীন, প্রগতিশীল

উলুখড়

কথঁসংস্কৃতি

'এক পয়সায় বুদ্ধমূর্তি, দু' পয়সায় বিষ্ণুমূর্তি'—
ম্যাজিক দেখায় বালকেরা!
স্বাধীন প্রগতিশীল পরস্পর গলা ধরে
গীত গায়, 'ছ্যা রা! র‍্যা রা! র‍্যারা!'

মুক্তমেলা/

যারা একদিন ফিরি করেছে স্বাধীনতা
কেউ বা পীর, কেউ লেঠেল সর্দার;
আজ তারাই হাঁকে: 'লে বাবু, কবিতা!'
কাগজে রোজ দেখি বাহার ছবি তার।

চন্দ্রিকা-চর্চা/

চাঁদের বুড়ি ছুঁয়ে আসে মানুষ
তা দেখে খোকা খুকু লাফায়, হাসে, খেলে...
বাহাত্তুরে কবি পার্কে মদ গেলে:
পূর্ণিমায় হবে মুক্ত মেলা তাই মুক্তকচ্ছ সে থাকেনা হুঁস।

নির্বাচনের পরে

সাগর বিশ্বাস

প্রথমেই একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শুরু করবো। সেটা হলো 'নির্বাচনের পরে' এই পর্যায়ের ধারাবাহিক লেখা যা মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরে শুরু করেছিলাম তা বর্তমান সংখ্যার সঙ্গে শেষ করে দিতে চাই। পাঠক এ বিজ্ঞপ্তি কিভাবে গ্রহণ করবেন জানি না। নির্বাচনের পরে বিভিন্ন সাম্প্রতিক সমস্যা সম্পর্কে বিধানসভার বিভিন্ন নবনির্বাচিত সদস্যদের ভাবনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটানোই ছিলো এই পর্যায়ের রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের সফলতা-বিফলতার বিচারের ভার আমার ওপরে নয়। লক্ষণীয় যে, এই পর্যায়ের লেখা থেকে আমি রাজ্যের মন্ত্রীদের বাদ রেখেছি। মন্ত্রীরা সরকারী নীতির প্রবক্তা—প্রত্যেকেই নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য জানাতে পারেন। কিন্তু সমস্যা এবং সরকারী নীতি সম্পর্কে একজন সাধারণ সদস্যের ব্যক্তিগত মতামত কি—এটুকুই আমরা জানতে চেয়েছি। কিন্তু বিধানসভার সমস্ত সাধারণ সদস্যের ভাবনা ও বক্তব্যকে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা সম্ভবপর ছিলো না। তবে 'Greatmen think alike' কথাটা যখন সত্য তখন একটি সরকারের সদস্যদের এই ভাবনার মধ্যেও যে খুব একটা 'disparity' থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। এদিক থেকে মোটামুটিভাবে সদস্যদের ভাবনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটেছে বলেই বিশ্বাস। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই আলোচনা-পর্যায় থেকে বিরোধী সদস্যদেরও বাদ রেখেছিলাম। তবে বিরোধীদের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছাকে আপাতত বাদ রাখলাম না।

নির্বাচনের পরে একাশি দিন অতীত হয়েছে। এই একাশি দিনে পশ্চিমবাংলায় যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। সেগুলি প্রধানত বিধান পরিষদ বিলোপ, রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষকদের মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধি, ট্রামের ভাড়া হ্রাস, আংশিকভাবে স্কুল বোর্ড বাতিল, সরকারী কর্মচারীদের দুই বছরে স্থায়ী করবার সিদ্ধান্ত, ভূমি-সংস্কার প্রস্তাব, শহরে সম্পত্তির মালিকানার সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ প্রস্তাব, ভূমিহীনদের ভূমি দান, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, কলকাতার ইডেন গার্ডেন দখল এবং স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রতিশ্রুতি। উল্লেখ্য ঘটনার মধ্যে আরো আছে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিক্ষোভ, বাংলা বন্ধ এবং নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বেদনাদায়ক ৪৪তম অধিবেশন। এরই পাশে পাশে ঘটেছে তেলিনীপাড়ার ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, কাশীপুরে নৃশংসভাবে শ্রমিক-হত্যা এবং রবীন্দ্র সরোবরে উচ্ছৃঙ্খলতা। বিভিন্ন ঘটনাদৃষ্টে স্পষ্টতই মনে হচ্ছে বাংলাদেশের নিশাচরের দলগুলি সজাগ হয়ে উঠেছে। অলি-গলির অন্ধকারের বাঁকে বাঁকে যেন তাদের পায়ের শব্দ আর ফিস-ফিসানি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ করবার ব্রতই যেন তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সংগ্রামের বিনিময়ে গঠিত জনতার সরকারকে এদিক থেকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। প্রসঙ্গত, কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে সাধারণের মনে কিছু প্রশ্ন উঠছে। কংগ্রেসী আমলে রাজ্যের প্রতিটি লোকের পঁচাত্তর বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা রাখার অধিকার ছিলো। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যবস্থার সংশোধন ঘটাতে চান। সরকার বলছেন ব্যক্তি নয়, এখন থেকে এই অধিকার বর্তাবে এক একটি পরিবারের ওপর। অর্থাৎ একটি পরিবারের মালিকানায় সর্বাধিক পঁচাত্তর বিঘা জমি থাকতে পারবে। এ পর্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু সরকার যে জিনিষটি স্পষ্ট করে বলছেন না সেটা হলো একটি পরিবারের গন্ডী কতদূর বিস্তৃত হবে। গ্রামের চাষীদের কাছে এ প্রশ্ন অনেকবার শুনেছি। বাংলাদেশ একান্নবর্তী পরিবারের দেশ। ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থা তথা ইনডিভিজুয়ালিজম-এর সর্বনেশে বন্যায় এই একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থার ভাঙন লেগেছিলো। আজও ধ্বস নামছে। কিন্তু এখনো অসংখ্য একান্নবর্তী পরিবার বাংলাদেশের ঐতিহ্য বজায় রেখে টিকে আছে। পরিবার বলতে যদি স্বামী-স্ত্রী এবং তিনটি ছেলেমেয়ে (লাল ত্রিকোণ এ কথাই বলে) বোঝায় তাহলে অধিক জমির মালিক এই সকল যৌথ পরিবারগুলির ক্ষতির কি আছে? রাতারাতি কি অন্তত বহিরঙ্গ দিক থেকে তাদের সনাতন পারিবারিক পদ্ধতিতে ইউরোপীয় Single family system চালু হয়ে যাবে না? পঁচাত্তর বিঘা জমি একটা তামাশার ব্যাপার নয়। উদাহরণস্বরূপ দুইটি সাবালক বিবাহিত পুত্রসন্তান সহ একটি পরিবারের দুশো বিঘা জমির মালিকের তখন তিনটি পরিবার চিহ্নিত করা সহজ হবে। ফলে জমি উদ্বৃত্ত ত' হবেই না বরং ঘাটতি দেখা যাবে (৭৫×৩=২২৫) ২৫ বিঘার। অর্থাৎ আরও পঁচিশ বিঘা জমি তাঁরা কিনতে পারবেন। এ ছাড়া বর্তমানে যে পিতৃ-সম্পত্তির ওপর কন্যাসন্তানের অধিকার স্বীকৃত, তারই বা কি হবে? আর যদি যৌথ পরিবার ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টন করা হয় তাহলে কি বাংলাদেশে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ফিরিয়ে আনা আদৌ সম্ভব? সামাজিক বিবর্তনের স্রোতকে রুদ্ধ করা সম্ভব কি? যা হোক এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে পরিবারের সঠিক সীমা নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। আরো একটি প্রশ্ন থাকে যে, শহরের সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করবার সময় গ্রামের সঙ্গে uniformity বজায় রাখা সম্ভব হবে ত'? না কি কাজীর বিচারের নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে? এ ব্যাপারে নতুন সরকারের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ অথবা সাধারণ মানুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক হোক—এটাই আমরা চাই। তেলা মাথায় তেল দেওয়ার সনাতন রীতির নিঃশেষ অবলোপ ঘটুক।

কাশীপুর গান-শেল ফ্যাক্টরীর ঘটনা সভ্যতার প্রতি দানবের লজ্জাকর ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। নীরবতা নয়—এ সব ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে সাধ্যমত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। নীরবতা নয়—রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা সম্পর্কেও। বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং আকাশবাণী হয়তো সে রাত্রির ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করেছে। অতিরঞ্জনের মাত্রা ছাড়িয়েছে এস এস পি-র শ্রীরাজনারায়ণের উক্তি। তথাপি এ কথা কি সত্য নয় যে, সারা বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে, বাজারে, গঞ্জে হাজার হাজার ক্লাব

আর সাংস্কৃতিক সংঘ অধিকাংশক্ষেত্রেই কতকগুলি অসুস্থ চিন্তা আর উন্মত্ততার পীঠস্থান ছাড়া আর কিছু নয়? পোষাকে-আষাকে, চলনে-বলনে যারা মার্কিনী স্টাইলকে গ্রহণ করেছে মনে-প্রাণে, মুখে যাদের হিন্দী গানের সুর লেগে থাকে, প্রাণে যাদের বোম্বাই-তারকা-প্রেম কাণায় কাণায় ভর্তি—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ তাদেরই একচেটিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে যা হবার হচ্ছে। মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তিটুকুও এরা জলের দাগের মতো মুছে দিতে চাইছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের (বিশেষ করে স্কুল-কলেজের তরুণমতি বালক-বালিকাদের) ওপর মার্কিনী কালচারের মাদকতা অতি সাবধানে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সেদিনের সেই 'সরোবর-নাইট' ও' অ্যারাবিয়ান নাইটের গল্প নয়—বাস্তব ইতিহাস। তথাকথিত ইয়ংম্যানদের কর্নারেও কলহের অসম্ভাব নেই। জানি না সেটা 'কালচারাল কলহ' কি না। মোট কথা, এই ঘটনাকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে না দেখে পেছনের দুষ্টচক্রকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। যদিও সমস্ত ব্যাপারটা আপাতত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের ওপর নির্ভরশীল, তথাপি বাংলাদেশের তথাকথিত সংস্কৃতি-সংঘ এবং বিচিত্রানুষ্ঠান সম্পর্কে সরকারের কিছু ভাববার এবং করবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না। অস্বীকার করেন নি বিধানসভার কমিউনিস্ট সদস্যা শ্রীমতী গীত মুখার্জীও। অলিতে-গলিতে আজ সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটছে রুদ্ধ-শ্বাসে। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অজুহাতে বছরে বছরে শত শত রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যে 'শ্রদ্ধা' আর রুচি-বিকারের বিস্ময়কর ইমালশন পরিবেশিত হয়, তা সুস্থমস্তিষ্কে গ্রহণ করা চলে না।

শ্রীমতী মুখার্জী বিধানসভার মহিলা সদস্যাদের মধ্যে অন্যতমা। বাংলাদেশের রাজনীতি তথা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে গীতা মুখার্জী অতি পরিচিত নাম। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীর ভ্রাতৃবধূ এবং সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীর সহধর্মিণী। ১৯৩৮ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ সহজসাধ্য ছিলো না। দীর্ঘ চার বছর কাল পার্টির বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থেকে অবশেষে '৪২ সালে সদস্যাপদ লাভ করেন। '৪৫—'৪৬ সালে দেশব্যাপী ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। '৪৫ সালের ২১ নবেম্বর ধর্মতলায় ছাত্রদের ওপর প্রথম যে পুলিশের গুলীবর্ষণ শুরু হলো—তখনো তিনি ছাত্রদের পাশে। এই ছাত্রদের মধ্যে থেকে সরে আসতে হয়েছিলো আরো অনেক পরে। তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পরে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়েছে। ওঁরা তখন আত্মগোপন করে দিন কাটাচ্ছেন। এই সময় শ্রীরাজ্যেশ্বর রাও-এর পরামর্শে তাঁকে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে আসতে হয়। তিনি তমলুকে চলে এলেন। ঘটনাক্রমে এখানেই হলো তাঁর শ্বশুরবাড়ি। গ্রামের কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনে নেমে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করলেন—যা তাঁর নিজের কথায় "কলকাতায় থাকলে হতো না।" সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সর্বদা অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন। এসব করতে গিয়ে তাঁকে বারবার জেলে যেতে হয়েছে। তথাপি ক্লান্তি ছিলো না। সত্যিকার কমিউনিস্টদের ওই বস্তুটি থাকতে নেই। গ্রামের ছায়াঘেরা নিরালা পরিবেশে যে মেয়েদের পরিচয় তিনি পেয়েছেন তা আজও তাঁর গভীরভাবে মনে পড়ে। আজও শ্রীমতী মুখার্জীর মনে হয়

শ্রীমতী গীতা মুখার্জী

যদি আবার তাদের কাছে ফিরে যাওয়া যেতো! একদিনের একটি ঘটনা বেশ মনে আছে। তখন ওঁরা মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে কাজ করছেন। অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য তাঁরা team work শুরু করেছেন। সে ছিলো এক শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। চাঁদের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। গাছের একফালি ছায়ার মধ্যে হঠাৎ কে যেন তাঁর হাতের মধ্যে একটি জিনিষ গুঁজে দিলো। তিনি দেখলেন, সপ্তম শ্রেণীর একটি মেয়ে। মেয়েটি বললো, 'তোমাকে দিলাম, কিছু কিনে খেও। তোমরা কত কষ্ট পাও আমাদের লেখাপড়া শেখাতে।' মেয়েটি পালিয়ে গেলো। শ্রীমতী মুখার্জী হাতের মুঠোটি খুলে দেখলেন তাঁর হাতের মধ্যে একটি দুয়ানি। ভালবাসার এই অকিঞ্চিৎকর পুরস্কারের দিকে তাকিয়ে চোখ জলে ভরে এলো। এই অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য মেয়েদের চোখে মুখেও আবার ফসলের মরশুমে জোতদারের প্রতি দেখেছেন কি তীব্র ঘৃণা এবং বিদ্বেষ! ওই সহজ সরল তেজস্বী গ্রাম্য মেয়েরা আজো যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু বৃহত্তর কাজের বোঝা আজ তাঁকে বন্দী করেছে শহরে। কতবার দেশের গণ্ডী পেরিয়ে ছুটতে হয়েছে বিদেশে। ১৯৫৪, '৫৭ ও '৬৪ সালে বার্লিনে বিশ্বগণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের তিনিই ছিলেন ভারতের প্রতিনিধি। একই উদ্দেশ্যে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তাঁকে যেতে হয়েছে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন প্রথম ১৯৫৭ সালে শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। এবারেও পাঁশকুড়া পূর্ব থেকে তিনি নির্বাচিতা সদস্যা। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতী মুখার্জীর নির্বাচন লড়াই থেকে সংগঠন ও গণসংগ্রাম ভালো লাগে। Legislative-কার্যাবলীকে সেই সংগ্রামের অংশ হিসাবেই তিনি গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের মহিলাদের শিক্ষা, চাকুরী-বিনিয়োগ প্রভৃতি সমস্যার প্রতি শ্রীমতী মুখার্জীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চেয়েছিলাম এ সম্পর্কে তাঁরা কি ভাবছেন? উত্তরে তিনি বললেন.

—একটা কথা যা প্রথমেই বলা এবং বোঝা দরকার তা হলো, বর্তমান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে যে কোনো সমস্যারই সহজ সমাধান হতে পারে না। এই পরিস্থিতির উদ্ভব একদিনে হয় নি। একদিনে এর অবলোপও হবে না। তাই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে সংগ্রাম কমিউনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য, সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে রাজ্য সরকার হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন। বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়াই করেও যুক্তফ্রন্টকে পুনর্নির্বাচিত করেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সে আন্দোলন এক ধাপ এগুলেও এগিয়েছে। রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় এটুকু অবশ্যই সরকারকে দেখতে হবে। রাজ্যের জনসাধারণ জানেন যে, সরকারের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তবুও সেই সীমিত ক্ষমতার প্রয়োগ অবশ্যই তাঁরা দেখতে চান। একটা frame-work-এর মধ্যে থেকেও maximum করার প্রচেষ্টাই এক কথায় রাজ্য সরকারের লক্ষ্য।

মহিলাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে

যদি আপনি গুদামঘর ব্যবহার করেন..

তবে আপনার ভাঁড়ারটি পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন আছে কিনা দেখেনিন্।

ছাদ ফুটো হয়ে যেন জল চুইয়ে না পড়ে সেটাও পরখ করে নিন্।

দেওয়াল থেকে ২ ফুট জায়গা ছেড়ে থলেগুলো কোণাকুণি ভাবে সাজিয়ে রাখুন। মেজেতে পলিথিনের চাদর বিছিয়ে দিন বা কাঠের বাক্সটাক্স ফেলে তার ওপরে থলেগুলোকে রাখুন।

জানালা আর অন্যান্য ফাঁক-ফুকরগুলো জালে ঢেকে দিন যাতে শালিক কি চড়ুই আসতে না পারে।

মাঝে মাঝে গিয়ে ভাঁড়ারটিকে দেখেশুনে আসুন।

ভাঁড়ারঘরে যদি পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ কিছু চোখে পড়ে, তবে ধুনো দিন। ইঁদুর-মারা ওষুধ ব্যবহার করে ইঁদুরদের বংশনাশ করুন।

আজকাল প্রিক্যাব, টাইপের, নতুন ধরণের, ধাতুতে তৈরী পিপে (বীন) পাওয়া যাচ্ছে। এতে করে গুদামজাত ফসল শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। স্যাঁতস্যাঁতে জলহাওয়া, পোকা-মাকড়, ইঁদুর ও পাখী-পখালী এসবই তো ফসলের শত্রু।

ধাতুতে তৈরী পিপেগুলোকে সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, নিজের হাতেই তৈরী করা নেওয়া যেতে পারে আর দামও তেমন কিছু নয়—ন্যায্য।

ফসল বাঁচানো আর ফসল জন্মানো দুটো একই কথা

এবিষয়ে আরও ভালোভাবে জানতে হলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
ডাইরেক্টোরেট অব স্টোরেজ এ্যাণ্ড ইন্সপেকশান্
খাদ্য দপ্তর, কৃষি ভবন, নয়া দিল্লী।

davp 68/619

চাকরীর প্রশ্নটা অবশ্যই ভাবতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মহিলা যে চাকরী করেন তা যেন তাঁর দেহ-মনের সঙ্গে সংগাতপূর্ণ হয়। বিগত কুড়ি বছরে শাসকসম্প্রদায় এইদিক থেকে ব্যাপারটা কখনোই ভাবেন নি। আর একটু স্পষ্ট করে বলি। যেমন ধরুন, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি মহিলাদের নিযুক্ত করা যায় তাহলে বৃত্তিটা কোনো বিষম সম্পর্ক সৃষ্টি করে না। কিন্তু একজন মহিলাকে যদি পুলিশের চাকরী করতে হয় তাহলে কি হয়? মেয়েদের মানসিক গঠনের সঙ্গে কর্মের সংঘাত সৃষ্টি হয় না কি? আমরা টেস্ট রিলিফ স্কীমের মধ্যে যাতে অধিকসংখ্যক মেয়েদের নিয়োজিত করতে পারা যায় সেটা গভীরভাবে ভাবছি। প্রাথমিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক করলেও সেখানে কিছু মহিলাকে নিয়োগ করা সম্ভব হবে। কিন্তু যাই হোক না কেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল সমস্যার সমাধান হবে এ আশা কিংবা বিশ্বাস কেউ করলে সেটা হবে সম্পূর্ণ বাস্তবতা-বর্জিত।

—মেয়েদের কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

—এ সম্পর্কে যে কথাটা একটু আগেই বললাম—তারই পুনরাবৃত্তি করবো। কারিগরী শিক্ষা যদি তাদের বাস্তবজীবনে উপকারে না লাগে তাহলে সে শিক্ষার দাম নেই। শুধু দক্ষতার দিকে লক্ষ্য রাখলেই হবে না। যেমন, রেডিও এবং ইলেকট্রিক্যাল মেকানিজমে মেয়েরা হয়তো দক্ষতা দেখাতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে এর আদৌ ভবিষ্যৎ আছে কি না। আজ বাংলাদেশে যদি মেয়েদের ইলেকট্রিক্যাল কারিগরী শিক্ষাদান শুরু করা যায় তাহলে তাদের মেটেরিয়াল লাভ কতদূর হবে? কাজেই এ ব্যাপারে গভীর চিন্তার প্রয়োজন আছে। আমার মনে হয় ফুড প্রোডাক্টস, পোলট্রি, এনিম্যাল হাসব্যানড্রি এবং স্বাস্থ্যদপ্তরে (পরিবার পরিকল্পনা বিভাগসহ) মেয়েদেরকে যতদূর সম্ভব নিয়োজিত করা চলে। মেয়েদের কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারে তাই বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে দিক নির্ণয় করা উচিত।

—সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন বৃহৎ প্রাইভেট শিল্পসংস্থা বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা ইঞ্জিনীয়ারদের মাসিক দুশো টাকা কিংবা তারও কম নির্ধারিত বেতনে (consolidated pay) অ্যাপ্রেণ্টিস হিসাবে নিয়োগ করে বছরখানেক পরেই ছাঁটাই করে দেন। এর কোনো প্রতিকার নেই কী?

—এর প্রতিকারের সবচেয়ে প্রকৃষ্টতম পথ হলো ইঞ্জিনীয়ারদের শক্তিশালী সংগঠন। বাংলাদেশের ইঞ্জিনীয়ারদের শক্তিশালী সংগঠন নেই বলেই এত নীরবে তাঁদের শুধু মার খেয়ে যেতে হচ্ছে। মালিকপক্ষের সঙ্গে সংগঠন ভিন্ন বোঝাপড়ার উপায় আজ আর নেই। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার কথা মনে রেখে এই মুহূর্তে ইঞ্জিনীয়ারদের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা উচিত।

—এতকাল ব্যক্তিগতভাবে পঁচাত্তর বিঘা জমি রাখবার আইন ছিলো। সরকার এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে পরিবার পিছু পঁচাত্তর বিঘার মালিকানার কথা বলছেন। কিন্তু পরিবারের সীমা নির্দেশ করা হবে কিভাবে?

—এ সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না। এ ব্যাপারে যতদূর জানি এখনো কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। কাজেই আলোচনার অবকাশ আছে।

দীর্ঘসময় শ্রীমতী মুখার্জীর সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেছিলাম। সারাক্ষণ অক্লান্তভাবে তিনি আমার সমস্ত প্রশ্নের ওপর বিস্তৃত এবং তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছিলেন। বাইরে তখন তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিলো। তাঁর বেলগাছিয়ার ফ্লাট থেকে যখন বেরুলাম তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। আসবার আগে আর একটা প্রশ্ন করেছিলাম—যদিও কর্পোরেশনের নির্বাচনের ব্যাপারে সমস্ত মতবিরোধের অবসান হয়েছে তখন। জিজ্ঞেস করেছিলাম—

—কর্পোরেশনের নির্বাচনের আসন নিয়ে যে মতবিরোধ—এমনই মতবিরোধ আর একবার হয়েছিলো যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাক্কালে। মাত্র কয়েকদিন আগে বরানগর পৌরভবনে ফ্রন্টের দুই শরিক দলের মধ্যে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেছে। এ সব ঘটনা যুক্তফ্রন্টের ইমেজ মলিন করে না কি?

—এ ব্যাপারে একটা সহজ সত্য মনে রাখলে জটিলতা কমবে। মনে রাখতে হবে যুক্তফ্রন্ট বিভিন্ন দলের মতাদর্শের সমন্বয়ে গঠিত হয় নি। গঠিত হয়েছে কেবলমাত্র কর্মসূচীর ভিত্তিতে। কাজেই বিভিন্ন দলের মধ্যে মতবিরোধ অতি স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেবে। মতবিরোধ হয়েছে একথা যেমন সত্য, তেমনি এটাও ত সত্য যে, তার নিরসনও প্রতি ক্ষেত্রে হয়েছে। তবে কোন প্রকার আপোষহীন মনোভাব কিংবা একের অন্যের প্রতি প্রভাব বিস্তারের মনোবৃত্তি যদি দেখা যায়, তবে তা ফ্রন্টের ইউনিটিকে খর্ব করতে পারে। এদিক থেকে ফ্রন্টের সকল শরিক দলের কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

যুক্তফ্রন্টের আর একজন মহিলা সদস্যা শ্রীমতী নন্দরাণী দল। মেদিনীপুরের ঘাটাল থেকে নির্বাচিত বিধানসভার বাম-কমিউনিস্ট সদস্যা। কৃশকায় এই কালো মেয়েটিকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত মানুষ হিসেবেই আমি দেখেছি। গত মাসের শেষ দিকে তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিলো, তখন বিধানসভার অধিবেশন চলছে। আমার বেশ মনে আছে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি তিনবার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবটা এইরকম—'দাঁড়াবার সময় যে নাই'। অবশ্য সেই ব্যস্ততার (কিংবা পলায়নী তৎপরতার) কোনো কারণ আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিলো না, আজও নেই। শ্রীমতী দলের সঙ্গে তাই সেদিন বেশিক্ষণ কথা বলবার সৌভাগ্য হয় নি। অবশ্য পরে পত্রালাপ করবার প্রতিশ্রুতি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার যেহেতু কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সেইহেতু পরবর্তীকালে কোনো পত্র সংযোগ ঘটে ওঠে নি। আজ শুধু নোটবইয়ের পাতা উল্টিয়ে দেখতে পাচ্ছি ২৪শে মার্চ তারিখে সেই অতিব্যস্ত মুহূর্তে কয়েকটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব। আজ দীর্ঘ এক মাস পরে সেই সব প্রশ্নের বেশির ভাগ অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেগুলি পাঠকের কানে সেকেলে লাগবে বলে আর উল্লেখ করতে চাই না। শুধু নকশালবাড়ি গ্রুপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যটুকু তুলে ধরলুম:

—নকশালবাড়ি গ্রুপকে আমরা ভয় পাই না। দেখেছি ত'—দিনের বেলা যারা বড় বড় বিপ্লবের বুলি আউড়েছে, রাত্রে তারাই গান্ধীটুপির আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছে। ওদের দৌড় যে মসজিদ পর্যন্ত, সে তো নির্বাচনের পরে প্রমাণ হয়ে গেছে। ওরা ত' সারা বাংলাদেশে ভোট বয়কটের বিপ্লবী শ্লোগান তুলেছিলো। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে কি? খাস নকশালবাড়িতেই তাদের কি হাল হলো সে তো আপনারা জানেন। এভাবে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করবার প্রচেষ্টা আর কতদিন চলবে তাই ভাবি।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

এক সময় আমি প্রদর্শনীর একটি উচ্চশ্রেণীর রেস্টোরাণ্টে বসিয়া খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইতেছিলাম। সকালে কাগজ পড়িবার সময় পাই নাই। পাশের এক টেবিলে ভদ্র চেহারার এক পরিবারের লোকেরা বসিয়াছেন। বোধ হইল তাঁহারা পল্লী অঞ্চলের লোক। ঐ টেবিল হইতে মাঝে মাঝে আড় চোখের দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আমি ভাবিলাম কিছু মজা করা যাউক। আমার দিকে সবাই চাহিতেছে এ বিষয়ে সজাগ হইলাম, তাঁহারাও দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইলেন। আমি পাঁচ মিনিট ধরিয়া কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম, যাহাতে উহাদের দৃষ্টি সম্মুখস্থ প্লেট হইতে আমার দিকে ফেরে। এবং আমি যতই কাগজে মনোযোগ দিতেছি, ততই উহাদের চপল দৃষ্টিও আমার দিকে নিবদ্ধ হইল। মনে হইল আমাকে ভাল করিয়া দেখিবার পর আমার সম্পর্কে উহাদের ধারণা আগে যতটা খারাপ হইয়াছিল সে রকম এখন আর নাই। সম্ভবত আমার নরমাংসভোজনের যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহার বাহিরের কোনও লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যায় না, কিংবা হয়ত ঐ প্রবৃত্তি সম্প্রতি আমি দমন করিয়া রাখিয়াছি, অথবা স্থান ও পরিবেশ এমন নহে যাহাতে আমি উহাদের ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি; অথবা অন্য যে কারণেই হউক, তাহারা কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়া উঠিল এবং চাপা গলায় এমন আলাপ জুড়িয়া দিল যাহাতে আমার দৃষ্টি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষ কর্তব্যটি অবশেষে ঐ দলের প্রায় সতের বৎসর বয়স্কা সুন্দরী মেয়েটির উপর ন্যস্ত হইল; অবশ্য আমাকে শুনাইবার জন্য নহে; কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে "এই লোকটির সঙ্গে কথা বলিবার আমার ভীষণ ইচ্ছা হইতেছে।" এমন কথা শুনিয়া আমি কি করিয়া চুপ করিয়া থাকি? আমি উঠিয়া তাহাদের কাছে গেলাম, এবং মেয়েটিকে বলিলাম, "তুমি কি আমার উদ্দেশে কিছু বলিতেছিলে?" সে ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইল এবং মাথা নিচু করিয়া রহিল। তাহার পিতা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার এই মেয়েটি প্রদর্শনীতে ভারত হইতে আনা দ্রব্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে। কয়েকটি প্লেটে ও ঢালের উপর আপনাদের ভাষায় কি সব লেখা রহিয়াছে, সে উহার অর্থ জানিতে চায়। কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া পাই নাই। তাহার পর আপনাকে এখানে দেখিয়া আপনার কাছাকাছি স্থানে বসিয়াছি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে বসিয়া কিছু পানীয় গ্রহণ করিবেন? আপনি কি পছন্দ করেন? এখানে দেখিতেছি মোজেল সরাটি উৎকৃষ্ট। অথবা আপনি শ্যামপেন কিংবা আরও কড়া কিছু পছন্দ করেন?" আমি ধন্যবাদের সহিত পানীয় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম, এবং একটি চেয়ারে তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া কফটগারি পাত্রে যে সব উৎকীর্ণ কবিতা সোনায় অলঙ্কৃত করা আছে, তাহার কয়েকটির অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। তরুণী ততক্ষণে তাহার লজ্জা ত্যাগ করিয়া এমন উৎসাহের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যাহা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া আমি মনে করি নাই। যাহা বলিতেছি তাহাতেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, এবং আমার ইংরেজী শুনিয়া বিস্মিত হইতেছে, এবং "আমার" দেশ হইতে আনা ব্যাণ্ড বাজনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেছে। আসলে ওটা ইণ্ডিয়ান নহে, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ব্যাণ্ড, নিগ্রো এবং ম্যুলাটো (শ্বেত ও কৃষ্ণকায়ের সঙ্কর)-রা বাজাইতেছিল। মেয়েটির প্রশংসা যে যথাস্থানে বর্ষিত হইল না, সেজন্য একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও আমি প্রায় পনেরো মিনিটকাল আলাপ চালাইয়া গেলাম। এবং তাহার বন্ধু, মিনি, জেন বা লিজি, যেই হউক তাহাকে নস্যাৎ করিয়া, তাহার যে-সব আত্মীয় তাহার মত সৌভাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদিগকে অবজ্ঞা বলিতে পারিবে যে সে একজন আসল ব্যাকর সঙ্গে আলাপ করিয়াছে—এই সব গল্প করিবার প্রচুর উপকরণ যোগাইয়া দিয়াছি।

অন্য আর এক সময় গ্রিল রুম নামক এক সস্তা খাদ্যালয়ে—সেখানে অল্প কয়েকটিমাত্র পদের খাদ্য বিক্রয় হয়, সেইখানে এক নাবিক আমার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল, আমি যেন তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু আলাপ করি। সে বলিল গত পূর্বদিন সে অস্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছে, এবং একদিনের ছুটি লইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রদর্শনী দেখাইতে আনিয়াছে। সে তাহাকে যতটা সম্ভব খুশি করিতে চাহে। তাহার স্ত্রীর মাথায় এক ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে আমি তাহার সঙ্গে আলাপ না করিলে সে খুশি হইবে না, প্রদর্শনী উপভোগও করিতে পারিবে না। এই অদ্ভুত আবদারে বিরক্ত হইয়া আমি বলিলাম, "ইহার কোনো মানে হয় না, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে পারিব না।" কিন্তু লোকটি নাছোড়, সে ভীষণভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, এবং বারবার দূরের এক টেবিলে বসা গোমরামুখী স্ত্রীর দিকে তাকাইতে লাগিল। যাহা হউক তাহার দৌত্য অবশেষে সফল হইল, আমি গিয়া তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিলাম। তাহার মুখচোখ তৎক্ষণাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার স্বামীকে পুরস্কারস্বরূপ আরও একপাত্র হুইস্কি পানে অনুমতি দিল। উহাদের বিবাদও মিটিল। শেষ পর্যন্ত তাহার স্ত্রীর সহায়তায় তাহাকে ধরাধরি করিয়া ক্যাবে তুলিয়া দিলাম, তাহা না হইলে সে বিপন্ন হইত।

আমাদের প্রতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহার কিরূপ? আমার বিশ্বাস আমার দেশবাসী তাহা জানিতে চাহেন। ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্রলোকের যেরূপ ব্যবহার তাঁহারাও আমাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সার জর্জ বার্ডউডের

অপেক্ষা সদয় এবং সহৃদয় বন্ধু আর কি আশা করা যাইতে পারে? তাঁহারা এবং আমরা যেন এক দেশেরই মানুষ এই রকম একটা সহানুভূতির ভাব আমাদের মধ্যে ছিল। ভারতে চাকরির পদমর্যাদা আমাদিগকে পৃথক রাখিয়াছিল, ইংল্যাণ্ডে আমরা সবাই অতিথি। সম্মানিত অতিথির মর্যাদা তাঁহারা যদি না বুঝিতেন, তবে তাঁহাদের প্রবাস বাস বৃথা হইত। মাঝে মাঝে অবশ্য আমরা অদ্ভুত চরিত্রের দুই-একজনের দেখা পাইতাম, যাঁহারা, বিশেষ করিয়া যদি সঙ্গিনীসহ থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে হিন্দি ভাষায় পণ্ডিত তাহা জাহির করিতে ব্যস্ত হইতেন, সে ভাষায় জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক। এবং ইহা দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহারা আমাদের চেয়ে কত বড়। অর্থাৎ সঙ্গিনীদের দেখাইতেন "দেখ, আমরা কত বড়!" এ পর্যন্ত ভালই। আমরাও তাঁহাদের ভারতীয় ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানের কাছে নত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গিনীর চোখে তাঁহারা যাহাতে খুব মহৎ প্রতিভাত হইতে পারেন, সে বিষয়ে সাহায্য করিতাম। মহিলারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, এতই তাঁহাদের আনন্দ এবং গর্ব বোধ হইত। একেবারে যেন খাঁটি নাগরিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিমন্ত্রণ পাইতাম। হায় রে! আমরা নিজেদের কি নরাধমই না ভাবিয়াছি! কিন্তু এ সবই উদারতার পরিচয়। যাহাই হউক ভারতীয় কয়েকজন প্রতারকের সঙ্গেও লণ্ডনে আমাদের মোলাকাত হইয়াছিল। ইহাদের ব্যবসা বড়ই মন্দা যাইতেছিল। একবার আমি, এবং একবারই মাত্র, এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের নিকট হইতে রূঢ় ব্যবহার পাইয়াছিলাম। সে কি বলিয়াছিল, ঠিক সেই ভাষার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নহে, তবে আমি তাহার নিহিতার্থ এবং ভঙ্গিটি কথায় প্রকাশ করিতেছি। সে রাজকীয় ভঙ্গিতে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "স্লেভ, আমাকে অমুক অফিসটি কোথায় দেখাইয়া দিবি?" আমি তাহার উত্তরে বলিলাম, "আমি দুঃখিত, আমি অন্য কাজে ব্যাপৃত আছি, আপনার আদেশ আমি এই মুহূর্তে পালন করিতে অক্ষম। তবে যদি আপনি সোজা গিয়া ডান দিকে ঘোরেন, এবং তাহার পরে বাম দিকে, তাহা হইলে আপনি সেই অফিসটি দেখিতে পাইবেন। সে রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেই হইবে, তুমি কাহার কাজে নিযুক্ত আছ? কে তোমার প্রভু?" "আমি, মহাশয়, বর্তমানে ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত আছি, তিনিই আমার প্রভু। আর আমার সম্মুখে যে ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছেন, তিনি অমুকের রিপোর্টার।" কিন্তু যাঁহার নাম করিলাম সেই নাম শুনিয়া লোকটি যেমন কেঁচোর মত হইয়া গেল, তাহা তাহার রূঢ় ব্যবহার অপেক্ষাও আমাকে বেশি পীড়িত করিয়াছিল।

প্রদর্শনীর বাহিরে আমরা কখনও কাহারও নিকট হইতে কোনও অসদ্ব্যবহার পাই নাই। ঈস্ট এণ্ড, ওয়েস্ট এণ্ড, এবং অন্যান্য স্থানে ঘুরিয়াছি, এবং অনেকবার পথ হারাইয়াছি। ছেলেমেয়েরা আমাদের চারিদিকে ভিড় করিয়াছে। কিন্তু আমাদের উপর কোনও অত্যাচার করে নাই। ভিখারী এবং অসৎ চরিত্রের স্ত্রীলোকেরা আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে একটু বেশি সাহস দেখাইয়াছে, এই সাহস তাহারা ইংল্যাণ্ডবাসীদের সঙ্গে ব্যবহারে দেখাইতে পারে না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করে নাই। কোনও বাউণ্ডুলে স্ত্রীপুরুষ বা গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক আমাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রতারিত করে নাই। বরং যাহারা দরিদ্র পল্লীর সাধারণ পানালয়ে অলসভাবে বসিয়া বসিয়া সময় কাটায়, তাহারা সব সময়ে আমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে, পথ হারাইলে পথ বলিয়া দিয়াছে। যে সব স্থানে লণ্ডনের শহুরে লোকেরাও দিনের বেলা যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে, আমরা সেখানে কোনও অঘটনের সন্ধানে গিয়াছি, কিন্তু প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে পারিলে অঘটন ঘটিবে কেন? একবার এক দুরাত্মার মত চেহারার জন্য আমার উপরে হাতে-কলমে রসিকতা ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোজন লোক ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বাঁচাইয়া দিল। অথচ ইহারা বেপরোয়া ধরনের লোক এবং সবাই আমার অপরিচিত। অন্য আর এক সময় কোনও একজন লোক চিৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ যে বিদেশী!" সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক বলিয়া উঠিল, "না উনি বিদেশী নহেন, আপনার আমার মতই ব্রিটিশ-প্রজা।"

ইংরেজদের অনুগ্রহের প্রসঙ্গে আমি একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। ঘটনাটি আমার বন্ধু মিস্টার গুপ্তের সম্পর্কে। তিনি এবং সার এডওয়ার্ড বাক্ একদিন সকালে কভেণ্ট গার্ডেন মার্কেটে গিয়াছিলেন। এখানে পৃথিবীর সকল দেশের টাটকা ফল প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। এই স্থানে সকল ঋতুতে উৎকৃষ্ট ফুল ও উত্তম সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। সকাল ছয়টার সময় সর্বাপেক্ষা বেশি ভিড় হয় এই বাজারে, বিশেষ করিয়া মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবারগুলিতে। সার এডওয়ার্ড আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কখনও র‍্যাস্পবেরি আস্বাদন করিয়াছেন কি না। বন্ধু তাহার উত্তরে "না" বলাতে, সার এডওয়ার্ড কিছু র‍্যাস্পবেরি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন দেরি হইয়া গিয়াছে, সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এক খুচরা বিক্রেতা কয়েক ঝুড়ি র‍্যাস্পবেরি সকালে কিনিয়া সেগুলি সহ রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সার এডওয়ার্ড এক ঝুড়ি কিনিতে চাহিলেন, কিন্তু সে বলিল, সে বিক্রয় করিবে না। তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলা হইল এই ভারতীয় বন্ধুর জন্য দরকার ছিল, তাহা শুনিয়া লোকটি তৎক্ষণাৎ এক ঝুড়ি ফল তাঁহাকে দিল। কিন্তু দাম কিছুতেই লইল না। সে বলিল, "মহাশয়, ইনি আমাদের অতিথি, আমি এই ঝুড়িটি তাঁহাকে উপহার দিলাম।"

আমার আগে ধারণা ছিল গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিই ফলের দেশ এবং আমই সবার সেরা ফল। এখন দেখিলাম আমার ধারণার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। হট হাউসে যে সব ফল হয় তাহার একটি চমৎকার গন্ধ আছে, তাহা খোলা জায়গার ফলে পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট আম অবশ্যই ভাল, কিন্তু ইহা শ্রেষ্ঠ ফলগুলির অন্যতম, একমাত্র শ্রেষ্ঠ ফল নহে। বিনা সঙ্কোচে আমি ইহার সঙ্গে পীচ, নেকটারিন, আনারস এবং স্ট্রবেরিকে একাসনে বসাইতে পারি। ভারতে যাহা জন্মে তাহা নিকৃষ্ট। প্রথম শ্রেণীর দোকানগুলিতে যে আঙুর বিক্রয় হয় তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, হট হাউস ফলের কিরূপ উন্নতিসাধন করিতে পারে। ইউরোপ হইতে যে সব আঙুর আমদানি করা হয়, তাহা আমরা যে কাবুলি আঙুর আনাই, তাহার সমান। কিন্তু ঐ গরম ঘরের আঙুর তাহা অপেক্ষা পাঁচগুণ বড় এবং দশগুণ বেশি রসাল এবং মধুর। ইংল্যাণ্ডের আপেল আমার খুব ভাল মনে হয় নাই, কিন্তু পিয়ার, এবং আমরা যাহাকে পেয়ারা বলি, তাহা আমাদের দেশের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। চেরি, গুজবেরি, এবং গ্রীনগ্রেজ এবং অন্যান্য প্লাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আমদানি করা ফলের অপেক্ষা হট হাউসের ফলের দাম অনেক বেশি স্বভাবতঃই। পীচ ও নেকটারিন প্রথম শ্রেণীর হইলে প্রতিটির দাম তিন হইতে আট পেনি, হট হাউসের আনারস প্রতিটি এক গিনি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হইতে আনা প্রতিটি ৪ শিলিং, বাহির হইতে আনা আঙুর এক পাউণ্ড ৫ পেনি, সর্বোৎকৃষ্ট হট হাউসের আঙুর এক পাউণ্ড ৫ শিলিং। ইংল্যাণ্ডে আম জন্মে না। কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে বম্বাই হইতে আম আমদানির চেষ্টা

করিয়া বার বার ব্যর্থ হইয়াছেন। ভাল কলা পাওয়া যায় না, কিন্তু কয়েক জাতীয় সবুজ কলা (বম্বাই মাদ্রাজ বর্মা প্রভৃতি দেশে যেমন হয়) ওয়েস্ট ইন্ডিজ হইতে আনা হইয়াছিল। বরফঘরে যেমন মাংস ঠান্ডা করিয়া অনেক দিন পর্যন্ত টাটকা রাখা যায়, তেমনি যদি কেহ টাটকা ফল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে তিনি প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন। কমলালেবু ইটালি, মলটা এবং স্পেন হইতে ইংল্যাণ্ডে আমদানি করা হয়। হট হাউস অর্থাৎ উপরে ঢাকা, এবং চারিদিকে অপ্রবিস্তর ঘেরা—সবই কাঁচের। ইহার মধ্যে গাছের বা ফুলের বৃদ্ধিতে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন তাহা সৃষ্টি করা হয় গরম জলপূর্ণ পাইপ অথবা কিছুদূরে অবস্থিত বয়লার হইতে আনীত গরম বাষ্প দ্বারা। এইভাবে প্রয়োজনীয় আলো এবং উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করা চলে। পৃথিবীর যে অঞ্চলের গাছ, সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা ইহাতে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা চলে, এবং দেশী বা বিদেশী সব রকম ফুল বা ফলের গাছেরই বৃদ্ধি বা বৃদ্ধিরোধ দুই-ই ইচ্ছামত করা যায়। তাই মরশুমের বাহিরে হউক বা মরশুমে হউক সকল সময়েই সব রকম ফুল ও ফল উৎপাদন করা চলে। ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক বড় বাড়ির সঙ্গেই একটি করিয়া হট হাউস যুক্ত আছে। আমার মতে ভারতেও এইভাবে ফলমূল বা সবজী এই রূপ লাভজনকভাবে উৎপাদন করা যাইতে পারে। কাঁচের ঘর থাকিলে আবহাওয়ার কঠোরতা হইতে তাহাদের রক্ষা করা সহজ হইবে।

প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া আসিয়াছি, আরও কিছুদূর চলিতে চাহি, কারণ ইহা অকারণ নহে। আমার স্বদেশবাসীরা অবশ্যই জানিতে উৎসুক হইয়াছেন ইংল্যাণ্ডে কি কি সবজী পাওয়া যায়। প্রথমেই নাম করিতে হয় আলুর। তাহার সঙ্গে মাংস ও রুটি যুক্ত হইয়া ইংরেজদের প্রধান খাদ্য হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীরই ইহাই প্রধান খাদ্য। প্রাচীন জগৎ নূতন জগতের কাছে অর্থাৎ অ্যামেরিকার কাছে, দুটি খাদ্য বিষয়ে কৃতজ্ঞ—আলু ও মকাই। অ্যামেরিকা আমাদের দিয়াছে অনারস। এবং তামাককেও আমি অগ্রাহ্য করছি না। প্রথম প্রথম আমরা যেমন করিয়াছি ইংরেজরাও তেমনি প্রথমে আলু খাইতে রাজি হয় নাই। উহারা বলিত, আলুর কথা বাইবেলে নাই। এর পরেই নাম করিতে হয় বাঁধাকপির। ইংল্যাণ্ডের এটি একটি মূল্যবান সবজী। ফুলকপিও দেখা যায়, কিন্তু এমন অপর্যাপ্ত নহে। গরমকালে সবুজ কড়াইশুটির মরশুম। কিন্তু উহারা কড়াইশুটি টিনে সংরক্ষিত করিয়া সকল ঋতুতেই ব্যবহার করে। ইহা ফ্রান্স হইতেও আসে, ভারতবর্ষেও ইহা ফ্রান্স হইতে আমদানি করা হয়। ভারতবর্ষেই কড়াইশুটি সংরক্ষিত করা যায় কি না আমি জানি না, যথাকালে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়। শুনিলাম ইউরোপের উৎপন্ন কড়াইশুটির স্বাদ ভারতের অপেক্ষা মিষ্টতর। আমি কিন্তু তুলনা করিয়া কোনও পার্থক্য বুঝিতে পারি নাই। লাউজাতীয় একরকম ফল আছে, ইহাকে 'ভেজিটেবল ম্যারো' (cucurbita ovijera) বলা হইয়া থাকে, ইংরেজদের একটি প্রিয় খাদ্য, ইহার একজাতীয় মৃদু সুগন্ধ আছে। শশাও একটি প্রিয় খাদ্য, পাতলা করিয়া কাটিয়া কাঁচাই খায়। খোসা বাদ দিয়া অথবা খোসাসুদ্ধ খাওয়া হইয়া থাকে। খাইবার সময় ইহার সহিত প্রচুর ভিনিগার ও ঝাল মিশাইয়া লয়। বড় আকারের কুমড়ো (cucurbita pepo) ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন হয়, ইহা ওয়েস্ট ইন্ডিজ হইতেও আসে। উহাদের মূলো আমাদের দেশের মত বড় আকারের নহে, কিন্তু ইহাদের ওলকপি ও গাজর খুব উৎকৃষ্ট। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের বড় বড় শহরের আশেপাশে একমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য যে ইউরোপীয় গাজর বর্তমানে উৎপন্ন হয়, তাহার স্বাদ আমাদের দেশের অনেকেই পান নাই। আমি তাঁহাদিগকে উহা একবার খাইয়া দেখিতে বলি। কাঁচা অবস্থায় বেশ মিষ্ট এবং কচকচ করিয়া চিবাইয়া খাওয়া যায়, ঠিক আধ-পাকা পেঁপের মত। আমাদের দেশী গাজরে জলীয় অংশ বেশি, ইহার পরিবর্তে বিলাতি গাজরের চাষ করিলে হয়। কিন্তু ভয় হয় ফলন খুব বেশি না হইতে পারে, এবং ফলন না হইলে চাষীরা ইহার দিকে ঝুঁকিবে না। স্পেনদেশীয় পেঁয়াজ আকারে প্রকাণ্ড, তাহা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়। ছোটগুলি চাকাচাকা করিয়া কাটিয়া ভাজা হয়। মাশরুম বা ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) ইহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। বাহিরে যেখানে জন্মে সেখান হইতে, অথবা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রচুর সার দিয়া খুব যত্নের সঙ্গে উৎপন্ন করা হয়। কয়েক জাতীয় ছত্রাক বিষাক্ত, কিন্তু এইগুলিকে পৃথক করিয়া চেনা কঠিন। ইংরেজরা 'ট্রাফল' জাতীয় ছত্রাকও খায়। একজাতীয় ট্রাফল কালো রঙের (Tuber cibarium) মাটির এক ফুট নিচে জন্মে, বাহিরে তাহার কোনও চিহ্ন থাকে না, অতএব কোথায় খুঁড়িলে ইহা পাওয়া যাইবে তাহা বুঝা যায় না। শোনা গেল ইহার সন্ধানের জন্য কুকুরকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। জেরুসালেম-আর্টিচোক এবং পারস্নিপ (মূলো জাতীয়) কিছু কিছু চলে। স্পিনাজ পাতা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়। টমাটো ইহারা প্রচুর খায়, ইহাদের মতে ইহা যকৃতের পক্ষে উপকারী। গ্রীন স্যালাড ইহাদের বড়ই প্রিয় খাদ্য। কাঁচা পাতা (সাধারণত লেটুস), খণ্ড খণ্ড সিদ্ধ ডিম, বীট-শিকড়, লবণ, ভিনিগার, তেল ও অন্যান্য মশলা সহযোগে খায়। সিদ্ধ গলদা চিংড়ি কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া ইহার সঙ্গে মিশাইয়া দিলে তখন ইহার নাম হয় লব্‌স্টার স্যালাড। ওয়াটার-ক্রেস্‌ একজাতীয় জলজ উদ্ভিদ, সেটিও কাঁচা খাওয়া হয়। আরও একটি নরম রসালো ডাঁটা জাতীয় এক রকম খাদ্য সিদ্ধ অবস্থায় খাইতে দেখিয়াছি। ইহার উপরের দিকটি শুধু দাঁতে কাটিয়া লয়, নিচের দিকটি শক্ত। নাম ভুলিয়া গিয়াছি। হয় তো অ্যাসপারাগাস্‌। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কোনও কোনও অংশে আমি রুবার্বের চাষ দেখিয়াছি। ইহার পাতা খাদ্যে সুগন্ধ যোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইগুলিই ইংল্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিজ্জ খাদ্য।

নিরামিষ খাদ্যের প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের দুধের কথাটাও বলা উচিত। ইংল্যাণ্ডে এবং হল্যাণ্ডের কয়েকটি ডেয়ারি পরিদর্শন করিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে ইউরোপীয়ানদের যদি কিছুমাত্র রুচিজ্ঞান থাকে তবে তাহারা অবশ্যই ভারতীয় দুধকে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু বলিয়া মনে করিবে। গোরুর প্রতি হিন্দুরা যে ব্যবহার করে, তাহার মত এতখানি লজ্জাজনক অধঃপতন সম্ভবত তাহার অন্য কোনও বিষয়ে হয় নাই।

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে

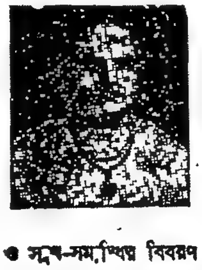

আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

অনাহারক্লিষ্ট, কঙ্কালসার পশুগুলি এমনই দুর্বল যে, ল্যাজ নাড়িয়া মাছি তাড়াইবার ক্ষমতাও কমই অবশিষ্ট আছে, এ দৃশ্য নবাগত ইউরোপীয়ের চোখে সুখের নহে, এবং গোজাতি যে হিন্দুর বিশ্বাসমতে অতি পবিত্র এ-কথাও তাহারা বুঝিবে না। তাহার কাছে এটি বড়ই লজ্জাকর বোধ হইবে যে, যে মানুষেরা বিসমার্কের রাজনীতির ত্রুটি বাহির করে, হারবার্ট স্পেনসারের সমালোচনা করে, জন স্টুয়ার্ট মিলের ভ্রম সংশোধন করে, এবং হাক্সলি, টিন্ডাল এবং ক্যারাডের গবেষণা বিষয়ে বিতর্কের ভাব পোষণ করে, তাহারা স্থির মস্তিষ্কে, এবং অতি উৎসাহের সঙ্গে এই সব দুর্দশাগ্রস্ত পশুদের যন্ত্রণা যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহার জন্য আন্দোলন করিতে পারে! সে স্বভাবতই প্রশ্ন করিবে "এই জীবন হইতে তাহাদের মুক্তি দেওয়া কি তাহাদের পক্ষে আরামদায়ক নহে?" তাহার বন্ধু বলিবে "চুপ! তুমি পাপ-বাক্য উচ্চারণ করিতেছ।" ভারতের বহু দুর্দশা আছে। ভারতের বহু সন্তান বহুবিধ অন্যায় কাজ করিয়া থাকে, এবং সমস্ত দেশে হিন্দুরা জাতি হিসাবে গোরুর উপর যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা সেই সব দুষ্কার্যের অন্যতম। যে পশু আমাদের এত উপকার করে, তাহার প্রতি এই অমানুষিক বর্বরোচিত ব্যবহার কোনো দয়ামায়াবোধসম্পন্ন সরকারের অধীন চলিতে দেওয়া উচিত নহে। আমার মতে অবিলম্বে ঐ কষ্টের আইনের সাহায্যে হিন্দুদিগকে এই দুষ্কার্য হইতে নিবৃত্ত করা উচিত। ইউরোপের বহু গোশালা আমি দেখিয়াছি। সেগুলি বেশ প্রশস্ত এবং তাহাতে হাওয়া খেলিবার সুবন্দোবস্ত আছে, বারান্দা আছে, এবং সে সব এমন পরিচ্ছন্ন যে তাহা মনুষ্যাবাস হইতে পৃথক নহে। মেঝে ইট দিয়া ঢাকা, তাহার উপর প্রচুর শুষ্ক ঘাস ও খড় ছড়ানো আছে। ইহার উপর গোরুগুলি ইচ্ছামত দাঁড়াইয়া অথবা শুইয়া থাকিতে পারে। এই খড়ের বিছানা প্রতিদিন বদল করা হয়, এবং মেঝের যাবতীয় জিনিস দূরে অবস্থিত থাপায় নিক্ষিপ্ত হয়। জঞ্জাল সরাইবার পরে প্রতিদিন মেঝে ঝাঁটার সাহায্যে পরিষ্কার করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে জলে ধোয়া হয়। গোরুদের পশ্চাৎ দিকে দেয়াল বরাবর প্রণালী কাটা আছে, ধোয়া জল সেই পথে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। সেই প্রণালীটিও দিনে দুইবার ধোয়া হয়। দুগ্ধবতীদের আহার্যের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ অ্যালবুমেন ও ফসফেট দেওয়া হয়, ইহাতে দুধের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের দুগ্ধ বিক্রেতারা সাধারণতঃ যেভাবে গোরুর মাংস, চর্বি এবং রক্তকে দুধে পরিণত করে, ইহারা তাহা করে না। আমি দেখিয়াছি ইংল্যান্ডে একরের পর একর জমিতে নানা জাতীয় শালগম উৎপাদন করে শুধু গোরুর খাদ্যরূপে ব্যবহারের জন্য। খাশ বাংলাদেশে এই উদ্দেশ্যে এক একর জমিও ছাড়া হয় বলিয়া আমার জানা নাই। উত্তর ভারতে Sorghum Vulgare বা জোয়ারের কিছু চাষ হয় এই উদ্দেশ্যে। ইউরোপে পানের জন্য গোরুকে বিশুদ্ধ জল দিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। ছোটদের টাইফয়েড ফিভার অনেক সময় অপরিষ্কার জল খাওয়া গোরুর দুধ হইতে হইয়া থাকে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে গোরুর দুধের সঙ্গে সবরকম নোংরা জলই মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এরূপ দুধ খাইয়া কত শিশুর মৃত্যু ঘটে তাহার হিসাব কেহ রাখে না। তাহার পর ইউরোপের ডেয়ারির কথা। এইখানে, যেখানে দুধের ভাণ্ডার থাকে এবং ক্রীম প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিবার মত। এই স্থানের ঘর যথেষ্ট উচ্চ, আলো হাওয়া প্রচুর, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থানটি পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, ইহার মধ্যে কোথাও ফাঁকি নাই। নিকটে কোনও দুর্গন্ধ বিস্তারকারী পয়ঃপ্রণালী, অথবা শূকরদের থাকিবার স্থান থাকিলে চলিবে না। এমন অযোগ্য স্থান হইতে দূরে ডেয়ারি নির্মাণ করা হইয়া থাকে। টাটকা দুধ ব্যতিরেকে অন্য কোনও প্রকার খাদ্য—যথা মাংস, চীজ, কিংবা অন্য কোনও জান্তব খাদ্য এই ডেয়ারিঘরের ভিতর খাওয়া চলবে না। এমন কি এক ফোঁটা দুধ মেঝেতে পড়িলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। তাকও মেঝে প্রতিদিন অতি যত্নের সঙ্গে ঘষিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করা হয়। ডেয়ারির কাজের জন্য যে-সব মেয়ে নিযুক্ত আছে, তাহাদেরও সব সময় সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিতে হয়। ডেয়ারির ভিতরের হাওয়া যাহাতে কোনও মতেই দূষিত হইতে না পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন লওয়া হয়। ডেয়ারির কাজে নিযুক্ত মেয়েরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও সেখানে কাটাইতে পারে না। ধনীরাও ডেয়ারি রাখিয়া থাকেন। ইঁহাদের ডেয়ারিতে পরিচালনা বন্দোবস্ত আরও ব্যাপক। প্রয়োজনের জন্য প্রচুর ব্যয় করিবার পরেও ডেয়ারিটি যাহাতে দেখিতে খুব মনোহর হয় তাহার জন্যও যত ইচ্ছা টাকা খরচ করা হয়। জানিতে পারিলাম একটি গোরুর দাম ৭৫০০০ টাকা (৫০০০ পাউণ্ড), এবং এই দাম খুব বেশি মনে করা হয় না। এত দাম দুধ বেশি দিবার জন্য নহে, ইউরোপীয় আদর্শে যে গোরু দেখিতে সুন্দর তাহার জন্য এই দাম। একটি দণ্ডের মত পিঠটি সরল, মাথাটি ধীরে ধীরে সরু হইয়াছে, বড় বড় দুটি চোখ উজ্জ্বল দেখাইতেছে, ঘাড় হ্রস্ব, বাঁটগুলি উত্তম আকারের, এবং দেহটি মসৃণ রেশমের মত লোমে ঢাকা—দুগ্ধবতী গাভীর অন্যান্য গুণের মধ্যে এগুলি অন্যতম। আয়ারশিয়র ও অলডারনি (চ্যানেল দ্বীপ) গোরু, ব্রিটেনের কয়েকটি বিখ্যাত পালিত গোরুর জাত। যে সব যত্নের কথা উল্লেখ করিলাম তাহা বিবেচনা করিলে ইংল্যান্ডের দুধ যে ভারতীয় দুধ হইতে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। গোয়ালা নিজেই গোরুর মালিক হইলে লণ্ডনেও ভাল দুধ পাওয়া যায়। এমন কি সাধারণ দুধের দোকানের দুধ আমি খাইয়া দেখিয়াছি (এক গ্লাস, দাম এক পেনি) সে দুধ খুব সুস্বাদু, অন্ততপক্ষে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট দুধের অপেক্ষা ভাল। লণ্ডনের কয়েকটি ডেয়ারিও আমি দেখিয়াছি। লণ্ডনে সাধারণতঃ গো-হত্যা করা হয় না, কিন্তু আমি এই সব শহরের ডেয়ারিতে নিজে যাহা দেখিয়াছি এবং জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয়, যখন দুধ দিবার ক্ষমতা থাকে না তখনই সেই গোরুকে কসাইয়ের কাছে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। কলিকাতার হিন্দু গোয়ালারাও ইহাই করিয়া থাকে। আইন অনুযায়ী ইংল্যান্ডে দুগ্ধবতী গাভী মাংসের জন্য হত্যা করা নিষেধ, তবু যতটা খাদ্য দরকার তাহা শুকনা গোরুরা পাইতে পারে না। কাজেই বাছুর অবস্থায় যতটা খাদ্য পাওয়া যায় তাহা যোগান দিয়া তাহাদিগকে বড় হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। যাহারা বাকি থাকে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ভীল (বাছুরের মাংস) রূপে ব্যবহার করা হয়। আমি ইংল্যান্ডে একটি অতি নিষ্ঠুর প্রথা দেখিয়াছি। অসহায় বাছুরগুলিকে তাহারা রক্তমোক্ষণের দ্বারা বধ করে, ইহাতে তাহার মাংস শাদা রঙের হয়।

দেখা যাইতেছে কোনও কোনও হিন্দু ইংল্যান্ডে বাস করিয়া, ইচ্ছা করিলে জাত বাঁচাইয়া চলিতে পারে। চাল-ময়দা পাওয়া যায়, জার্মানি ও ইজিপট হইতে ডাল আমদানি হয় (মসুর জাতীয়)। সবজী অপর্যাপ্ত, ফল-মূলও তাই; ভাল দুধ মাখন এবং চিনি যত ইচ্ছা পাওয়া যায়।*

[ক্রমশঃ]

---

*"*A Visit to Europe*" গ্রন্থের অনুবাদঃ পরিমল গোস্বামী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডাক্তারের পেছনে গ্রাম আর চরের সবাই এসে দাঁড়াবে— সানো চৌধুরীর এ কথায় ডাক্তার আবার খ্যাঁক করে উঠল।

ডাক্তার বললে, "সেটাও হবে ফাঁকি। আমি কে? নুনের চোদ্দ পুরুষের যন্ত্রণার ইতিহাস আমার গায়ে দাগা নেই—দাগা আছে ওই ভিখন রাউতের গায়ে। সেই ভালো করে জানে—এ দেশের কি ছিল, কি গেছে।"

ভিখন কোনো কথা বললে না—নীরবে শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে।

ছিল। ি— একটা গর্ব করার মতো তার ছিল। শোষণ ছিল, শাসন ছিল, অভাব ছিল—অধিকারও ছিল। তার জমি ছিল—খালাড়ির জমিতে নুন ছিল এবং সে নুনে তার রুজি ছিল—আশা ছিল। ভোজবাজির মতো একদিন তা শেষ হয়ে গেল। ইতিহাসের সে এক মর্মান্তিক অধ্যায়। একচেটিয়া বাণিজ্যে শতাধিক বছরের শোষণের পর ইংরেজ বানিয়া একদিন বাজার ছেয়ে দিলে চেসায়ার লিভারপুলের সস্তা নুনে। তবুও হটে নি হিজলী তমলুকের নুন। চরম আঘাত এলো ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে। শ্বেত বজ্রমুষ্টি গলা চেপে ধরলে কালা নুনের। সর্বনাশা আইনে রদ করে দেওয়া হলো সমস্ত খালাড়ি—গঞ্জ-গোলা। ভোর হতে না হতে চুলিয়ার চুলোয় আগুন আর গনগনিয়ে উঠল না। মাটিতে গড়াগড়ি গেল নুনের সরঞ্জামী হাঁড়িকুঁড়ি। ঝিমিয়ে এল কুমোরের চাক। শুকনো ডাঙায় কাৎ হয়ে পড়ে রইল হাজার দাঁড়ি মাঝির চালানী বোট পানসি। স্তব্ধ হয়ে গেল ওজন হাঁকা কয়ালের গলা। ছালা বওয়া, গাড়ি টানা ক্ষুধার্ত বলদের পাল শুঁকে বেড়াল নির্জন চরের নোনা মাটি। খুড়ি-খুরপা নিয়ে মুখ শুকনো করে ঘরে ফিরে এল হাজার হাজার মলঙ্গী। আজুয়াদের সম্বল চোদ্দ পুরুষের চাকরান-জমি—কিন্তু মাথায় হাত দিয়ে বসলে কোম্পানীর ঠিকা মলঙ্গী-কুলি-কামিন : জমি নেই—রুজি নেই—রোজগার নেই।

চোর, ভিখারী, খালাড়ির ক্ষুধার্ত রাক্ষসের দল ধাওয়া করলে রায়ত চাষীর গ্রামে।

সানো চৌধুরীর ঠাকুর্দাকে কাঙালির মতো ঘিরে ধরেছিল সবাই :

"বাঁচাও কর্তা—অন্ন দাও, জমি দাও—চাষ করি।"

কোন জমিদার—কোথায় পাবে ওই কর্মহারা লক্ষ মানুষের কৃষিযোগ্য জমি। আছে ওই খালাড়ির নুনে পোড়া অনুর্বর মাটি। আর আছে জালপাই জঙ্গল—যেখান থেকে নুন জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি সংগ্রহ করছে ওরা এতদিন।

ঠাকুর্দা বলেছিল, "ওই আছে—আর নেই। পারলে জঙ্গল সাফ করো—জমি হাসিল করো, চাষ করো।"

সেই অনুর্বর জালপাই জঙ্গল আর খালাড়ি সাফ করে করে পুরুষের পর পুরুষ ধরে মলঙ্গী হয়েছে রায়ত—চাষী।

সে দীর্ঘ বেদনার ইতিহাস ভিখন জানে—জানে না একালের চরের মাধ্যমে। ভূশণ্ডির কাকের মতো ঝিম মেরে বসে আছে ভিখন, শিথিল পেশী, ঘোলাটে দুই চোখের ওপরে শাদা এক জোড়া ভুরু—মাথায় চুলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গায়ের চামড়া কুঁকড়ে কুঁচকে হয়ে গেছে গাছের ছালের মতো—ঠেলে উঠেছে ভেতরের হাড়-গোড়। মানুষ নয়—যেন মানুষের আদলের একটা বিদ্রূপ। কেউ জানে না তাকে।

সানো চৌধুরী বললে, "তাকে আব কে জানে ডাক্তার। একটা লোক বেঁচে আছে প্রায় এক শ' বছর—এখনও তার হাত পা চলে, চরের মানুষ জানে শুধু এইটুকু।"

"তাই তো তার আসল পরিচয়টা আজ সকলের আগে জানানো দরকার সানো কর্তা।" একটু থেমে ডাক্তার বললে, "এ চরে একটা ছটাকও নুন কেউ কখনো কিনে খায় না—আমি জানি। নিজের জমিতে নুন তৈরি করে খায়—চোরের মতো। ভয়ে ভয়ে। সেই ভয়কে ভাঙতে হবে তোমাদের ওই চোদ্দ পুরুষের শেষ আজুয়াকে সামনে রেখে। আমাদের ভুলে-যাওয়া-যন্ত্রণার—ভুলে-যাওয়া অধিকারের শেষ সাক্ষী ভিখন।"

বিমল আর হিমাংশু চেয়েছিল ভিখনের দিকে। ওদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের সামনে—ওদের তারুণ্যের উন্দী-পনায়, কল্পনায়—সামনে কুঁকড়ে উবু হয়ে বসা একটা স্থবির, বেটপ, কুদর্শন মানুষের আদল ডাক্তার আর সানো চৌধুরীর কথার মধ্যে দিয়ে তার জানা-অজানা নানা আখ্যান আর ইতিহাস নিয়ে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ওদের বিমূর্ত দেশপ্রেমের আবেগের মধ্যে

একটা নির্মম নিষ্ঠুর ইতিহাস শতাব্দী লাঞ্ছিত আবর্জনার মতো ওই দেহপিণ্ডটা থেকে বেরিয়ে এসে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠল।

হিমাংশুর বয়স অল্প। সহজে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বললে, "ওর পরিচয় আমরা সকলের কাছে পৌঁছে দেবো ডাক্তারবাবু। বিমলদা—বলো!"

বিমল বলল, "হ্যাঁ, সে ভার আমাদের দিন ডাক্তারবাবু।"

ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে আস্তে আস্তে হাঁটছিল ওরা চারজন। পায়ের ব্যথা নিয়ে ভিখনের হাঁটতে একটু অসুবিধেই হচ্ছিল। পেছিয়ে পড়েছিল।

সানো চৌধুরী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ভিখন?"

ভিখন বললে, "সে কিছু নয়—সে কিছু নয়। তোমরা আগাও বাবু।"—

বিমল আর হিমাংশু পেছিয়ে এল—কাঁধ এগিয়ে দিলে দু' পাশে দু'জন।

হিমাংশু বললে, "আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে চল।"

ভিখন ত্রস্তে দু' হাত তুলে বলে উঠল, "না না—ধরতে হবে নি, ধরতে হবে নি। আমি ঠিক চলে যাব।"

"না। তোমার চলতে অসুবিধা হচ্ছে।" বিমল বললে, "আমাদের কাঁধ ধরো।"

দু' পাশ থেকে দু'জন ওর কোমরে, হাত দিয়ে কাঁধ এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভিখনের সঙ্কোচের সীমা নেই। অসহায়-ভাবে তাকিয়ে রইল সানো চৌধুরীর দিকে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সানো চৌধুরী বললে "ও তোমাদের কাঁধে হাত দিতে সাহস পাচ্ছে না বোধ হয়। না-কি ভিখন?"

ভিখন কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "কতো চন্দ্য—শহরের বাবুভায়া তো সানো কত্তা। আমি চরের জংলী মলঙ্গী।"

উদ্দীপিত তরুণ দুটির মুখ সহসা যেন চাবুক খেয়ে বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গেল। হঠাৎ ওদের মনে হলো—এত কাছে থেকেও এই লোকটির কাছ থেকে তারা কতদূরে!

কিন্তু দ্বিধা বাধা আঘাত ওদের মুহূর্তের। যে আবেগ—যে তরুণোচ্ছ্বাস ওদের ঘর-ছাড়া করেছে, ছিটকে দিয়েছে প্রচলিত ভদ্র শান্ত জীবন-ধারা থেকে, সে অদম্য। মুহূর্তের আবেগে এই দুটি তরুণ ভিখনকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল।

হিমাংশু তার উচ্ছ্বাসকে চাপতে পারলে না। বললে, "এ নুনের রাজ্যে তুমি আমাদের নেতা। তোমাকে ছাড়ব কি করে ভিখন ভাই!"

পরের দিন থেকে নতুন প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল পরবর্তী অধ্যায়ের। কিছুটা প্রকাশ্যে—কিছুটা গোপনে। প্রকাশ্যে চলতে লাগল ছোট ছোট দলে সভা-সমিতি-মজলিশ— হাটে গঞ্জে ফেরি-ঘাটে। নানা কথা-উপকথায় পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মলঙ্গী ভিখন রাউৎ আর হিজলী-তমলুকের নুনের ইতিহাস। নতুন উত্তেজনায় ছুটল ভলান্টিয়ারের দল এ-হাট থেকে ও-হাটে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটল আবার পেছনে পেছনে। ওরা গা ঢাকা দিয়ে সরে গেল। প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটলো না।

আর গোপন প্রস্তুতির অংশ সানো চৌধুরীর—তার খবর জগৎ ডাক্তার, ভিখন রাউৎ ছাড়া আর কেউ রাখে না। খালের ধারে ধারে নোনা মাটির চরে পাখির ঝাঁকের মতো বসে যায় গ্রাম আর চরের যতো বৌ ঝিউড়ি কাচ্চাবাচ্চা—সারা দিন চেঁছে চেঁছে তোলে নুন-মাটির কাঁড়ি—স্তূপের পর স্তূপ। রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় সব। জালপাই জঙ্গল থেকে দিনের পর দিন কাঠকুটোর বোঝা ভারে ভারে বয়ে নিয়ে গেল গ্রামের মানুষ—চরের চাষাভুষো। কুমোর শুধু নুনের হাঁড়ি যোগান দিয়ে গেল দিনের পর দিন—রাতারাতি তা পাচার হয়ে গেল কোথায় না কোথায়।

কুমোর গঙ্গারাম একদিন আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে, "এত হাঁড়ি সব কোথায় কি হবে সানো কত্তা!"

সানো চৌধুরী বললে, "হাঁড়ির ব্যবসা করছি হে—সব কলকাতায় চালান যাচ্ছে।"

আইন অমান্যের নির্ধারিত দিন তখনো ঠিক হয় নি। গ্রামের পর গ্রাম—চরের পর চর একটা নতুন ঝড়ের অপেক্ষায় থম থম করতে লাগল। একদিন দু'দিন করে কেটে গেল প্রায় পনেরো দিন।

হিমাংশু চঞ্চল। বিমলকে খোঁচাতে লাগল, "আসল ব্যাপারটা কবে হচ্ছে বিমল-দা?"

বিমল বললে, "এর আবার আসল নকল কি রে! কর্তব্য তো আমরা করছিই।"

উত্তরটা হিমাংশুর মনে লাগল না। অধীরকণ্ঠে বললে, "আমি বলছি আইন অমান্যের কথা—নুন তৈরির কথা।"

বিমল হেসে বললে, "পুলিশের লাঠির জন্যে পিঠ মাথা তোর চুলকোচ্ছে। সবে এই ক'দিন হলো মাথার ব্যান্ডেজ খুলেছিস।"

"বোধহয় তাই।" হিমাংশু বিরক্ত হয়ে বললে, এ "আমার আর ভালো লাগছে না।"

ওর তাজা প্রাণের অস্থির চাঞ্চল্য, ওর বিরক্তি, ওর আগ্রহ দেখে বিমল আবার হাসল। আস্তে আস্তে বললে, "ধৈর্য হারাস নে হিমাংশু। দেশের মানুষ যে দায় নিয়েছে—তার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। নেতারা সবাই জেলে—এখন এরাই নেতা, এরাই ভরসা।"

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে হাজির। গাঁট্টাগোট্টা খাস বিলেতী সাহেব। বোধ করি উপদ্রুত আন্দোলিত অঞ্চলগুলো পরিদর্শনে এসেছে। ওদিকে উত্তরে সুতাহাটা মহিষাদল থেকে জেলার দক্ষিণান্তে রামনগর পিছাবনি—সমগ্র মলঙ্গী অঞ্চল যেন টগবগ করে ফুটছে। এখানে জেলা বোর্ডের ডাক-বাংলোয় ঘণ্টাকয়েক বসে থানা অফিসার-দের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্থানীয় খবরাখবর নিলে, গোপনে সলাপরামর্শ করলে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে মোটরে উঠবার মুখে থমকে দাঁড়াল। মুখ-চোখ মুহূর্তে রাঙা হয়ে উঠল।

"বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে মুখরিত মস্ত এক মিছিল এগিয়ে আসছে জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে। সামনে ভলান্টিয়ারের দল। পেছনে গাঁয়ের মানুষ।

সাহেব চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে, "এরা সব লোক্যাল আদমি?"

"ওই যে স্যার বললাম।" বড় দারোগা বিপাকে পড়ে আমতা আমতা ক'রে বললে. "কিছু ভলান্টিয়ার থেকে গেছে। সামান্য। নতুন একটা ক্যাম্প ক'রে আছে।"

"জমি কাহার?"

দারোগা আরও বিপাকে পড়ে গেল। বললে. "ওই কালভার্টের গায়ে একটা পতিত জমিতে।"

"আই সে—জমি কাহার? সরকারের না জমিনদারের?"

দারোগা বিপদে পড়ে চৌকিদারদের দিকে তাকাল। ওদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে বসল, "সরকারের হুজুর।"

"তবে?" সাহেব জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

সে চোখের ইঙ্গিত বুঝলে দারোগা। বললে. "সাফ করে দেবো স্যার।"

ধ্বনি দিতে দিতে গর্জিত মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

সাহেব মিছিলের দিকে চেয়ে বললে, "সেই মলঙ্গীটা ওর মধ্যে আছে?"

দারোগা চোখ চারিয়ে দেখে বললে, "নো স্যার। বুড়ো জরদগবটাকে দেখছি না।"

সাহেব আর কিছু বললে না। মোটরে উঠল। গাড়ি স্টার্ট দিল। হুস করে বেরিয়ে গেল সামনের মিছিল ছত্রভঙ্গ করে।

পড়ল—কে একটা চাকার সামনে ছিটকে পড়ল। গাড়ি দাঁড়াল না। ধোঁয়া ছেড়ে

কমলো রংয়ের গাড়িটা যেন পোকার মতো উড়ে বেরিয়ে গেল।

প্রথম হয়েছে গাঁয়ের এক ছোকরা—বছর চোদ্দ পনেরো বয়স হবে। আঘাত গুরুতর। ভল্যান্টিয়াররা তার অচেতন দেহটা কোলে করে নিয়ে এল ডাক্তারখানায়। খবর পেয়ে ছুটে এল জগৎ ডাক্তার। দেখে শুনে থমথমে গলায় বললে, "আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি—ওকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।"

লোকের অভাব হলো না—পাল্কীও পাওয়া গেল। ছত্রভঙ্গ মিছিলের মানুষ আবার মিছিল করে ফেরিঘাট পর্যন্ত গেল পাল্কীর পেছনে পেছনে। নৌকোয় পাল্কী উঠিয়ে দিয়ে ফিরে এলো থমথমে মুখে ওদের চরে—ওদের গ্রামগুলোয়। ওদের কোটরে ঢোকা চোখের থমকানো দৃষ্টির পেছনে আর চাপা চাপা ঠোঁটের আড়ালে যেন কি একটা ভয়ংকর অনুচ্চারিত শপথ স্তব্ধ হয়ে রইল।

শুধু হিমাংশু বললে, "টেকো সাহেবটাকে চিনে রাখলাম। ভগবান যদি দিন দেন"—

বিমল থমকে উঠল, "কি বলছিস তুই হিমাংশু! তুই না সত্যাগ্রহী?"

হিমাংশু চুপ করে গেল। কিন্তু চোখ তার ঝকমক করতে লাগল—যেন তীক্ষ্ণাগ্র ছুরির ফলা। সারাটা দিন আর একটি কথাও কইলে না কারুর সঙ্গে।

সময় ও সুযোগ বুঝে দুপুরের দিকে সানো চৌধুরী খবর পাঠালে—কাল ভোর থেকে কাজ শুরু হোক। সন্ধ্যেবেলা ডাক্তারখানায় দেখা হবে।

কিন্তু সন্ধ্যার আগেই সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

বেশ বড় একদল সেপাই সান্ত্রী নিয়ে বড় দারোগা স্বয়ং এবং দুজন সাব ইন্সপেক্টার সামরিক কায়দায় মার্চ করতে করতে সন্ধ্যার কিছু আগে এক গ্রামে গিয়ে ঢুকল। গ্রামের নাম বাঁশবেড়িয়া—চাষী রায়তের বাস খুবই অল্প। আছে শুধু খোলা মাঠ আর চৌধুরীদের আদ্যিকেলে বাঁশবাগান। আশপাশে দু'-চার ঘর ডোমের বাস, বাঁশের কাজ করে—চাঙারি কুলো বানায়। তারা ভয়ে ভয়ে চোখ পিট পিট করে দেখলে। সেপাই সান্ত্রীর দল এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশবাগান ঘিরে ফেললে।

বাঁশে বাঁশে ঠাসা—হরেক রকম বাঁশ। সামনেটা কাঁটা বাঁশের ঝাড়ে দুর্ভেদ্য। ভেতরে জঙ্গল-সাফ তরল বাঁশের ঝাড়—তার মধ্যে কর্মব্যস্ত কয়েকটি লোক।

একটা সেপাই ফিস ফিস করে বললে, "উহ দেখিয়ে সাহাব।"

শুধু কি লোক, সেখানে হাঁড়ির ওপরে হাঁড়ি সাজানো সারি সারি নুন-জলের ফিল্টার। উনুনে উনুনে টগবগিয়ে ফুটছে নুন জলের হাঁড়ি। কোনোটার জল মরে নুন তৈরি হয়ে গেছে। বাঁশ কেটে সাফ করা পরিচ্ছন্ন একটা জায়গায় নুনের ধবধবে একটা কাঁড়ি। গোটা দুই বস্তা বোঝাই নুন—কিছু খালি বস্তা। বাইরে কারা এসে গোটা বাগানটা ঘিরে ফেললে—ভেতরের লোকগুলো জানলও না। তারা যেমন নিঃশব্দে কাজ করছিল—তেমনি কাজ করতে লাগল।

বড় দারোগা চারদিকটা ভালো করে দেখে নিয়ে ভাবিত গলায় বললে, "কিন্তু

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ঢুকবে কি করে। হাতিয়ার নিয়ে ঢোকার বিপদ আছে। দরকার পড়লে হাতিয়ার চলবে না। চট করে বেরোনোও যাবে না।"

একজন সাব ইন্সপেক্টর বললে, "তার চেয়ে আগুন লাগিয়ে দিন স্যার। সেপাই সান্ত্রী নিয়ে আমরা চারদিক ঘিরে থাকি। হয় ওরা বেরিয়ে আসবে—না হয়"—

জ্বলে পুড়ে সেদ্ধ হয়ে যাবে। গাছের তলায় বাঁশের ঝরা-পাতা জমে আছে পুরু হয়ে। মাটি দেখা যায় না কোথাও।

বড় দারোগা চুপ করে একটু ভেবে নিয়ে বললে, "তা-ই বোধ হয় করতে হবে। আগে ডেকে দেখি ব্যাটাদের।"

সান্ত্রীরা গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করলে। ভেতরের লোকগুলো হঠাৎ সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

বড় দারোগা হাঁকলে, "বেরিয়ে আয় ব্যাটারা।"

লোকগুলো দেখতে পেলে দারোগাকে—সেপাইকে—সান্ত্রীকে। ছুটল উল্টো দিকে। কিন্তু কোথায় যাবে। সেপাই-সান্ত্রীতে চারিদিক ঘেরা। তবু এদিক-ওদিক ওরা ছুটোছুটি করতে লাগল। ওদের মধ্যে শুধু একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। বুড়ো মতো। দু-চার পা এদিক-ওদিক গিয়ে থপ করে বসে পড়ল। জঙ্গলের বাইরে বেরোলো না কেউ। কাটা বাঁশের ঝাড় পেরিয়ে পুলিশও এগোতে সাহস পেল না।

এ যেন লুকোচুরির খেলা।

বড় দারোগা শেষ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে হুকুম দিলে, "লাগা আগুন।"

পাতা তো নয়—বারুদ। ক্ষ্যাপা বারুদ। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে চারিদিক থেকে। বাতাস লেগে নেচে উঠেছে শিখা লকলকিয়ে। এগিয়ে যাচ্ছে ভেতরের দিকে।

সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে তাতে—জ্বলে ঝলসে যাচ্ছে মুখ চোখ। আর পারল না। প্রাণভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে লোকগুলো। জড়াজড়ি করে পথ খুঁজছে আগুনের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে বড় দারোগা বললে, "বানাও—এখন বানাও শালা চোরাই নুন।"

সকলের শেষে ভালুকের মতো থপ থপ করে আসছে সেই বুড়োটা। মাঝে মাঝে দম নিচ্ছে হাঁ করে—কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন চোখ দুটো। দেরি করে ফেললে—আগুন কাটিয়ে আসতে পারল না। লেলিহান শিখা ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল যেন তার ওপরে। পেছিয়ে গেল। ঘুরে গেল বাঁ দিকে অসহায়ভাবে। বাঁ দিকে একটু ফাঁক আছে। ওদিকের আগুনের বেষ্টনী এখনো দূরে—তবু ছুটে আসছে লকলক করে। দল-ছুট লোকটা সেই দিকে মুখ ফেরাল। কিন্তু সে তো ছুটতে পারছে না। থপ থপ করেও যেতে পারছে না জোরে। বরং টলে পড়ছে—বাঁশ ধরে ধরে এগোচ্ছে একটু একটু করে।

অগ্নি-বেষ্টনীর এপারে সেপাই সান্ত্রী যেন পাথর—ওই আগুনের আকস্মিক পরিব্যাপ্তিতে হকচকিয়ে গেছে। পাথরের মতো চোখ মিলে অবাক হয়ে যেন এ জীবনে প্রথম দেখছে—একটা মানুষ মরিয়া হয়ে বাঁচতে বাঁচতে একটু একটু করে কেমনভাবে মরে।

গাঁয়ের মানুষ আর ভলান্টিয়ারের দল তখন ছুটতে ছুটতে আসছে। বোধ করি ডোমেরা গিয়ে খবর দিয়েছিল। ছুটে এসে ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। সেপাই সান্ত্রীকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। ত্বরিৎ হাতে বাঁশের পাতা সরিয়ে অগ্নিবেষ্টনী বিচ্ছিন্ন করে দিলে। সেই ফাঁক দিয়ে কোনো রকমে ধরাধরি করে বের করে আনলে আবদ্ধ মানুষগুলোকে।

বিশৃঙ্খল জনতা দলবদ্ধ হওয়ার আগেই বড় দারোগা হুঙ্কার দিলে, "চার্জ।"

সূর্য তখন অস্ত গেছে। ঘন বাঁশবনের আড়ালে দিনের আলো অন্ধকারে মলিন হয়ে এসেছে। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে আহত মানুষের আর্তনাদ, ভয়ার্ত ছুটোছুটি আর নির্বিচার লাঠি বৃষ্টি যেন মূর্তিমান এক নরকের সৃষ্টি করল। ভীতচকিত নিরস্ত্র মানুষ যে যেদিকে পারল—ছুটে পালাল।

মারমুখী পুলিশের সামনে সঙ্ঘবদ্ধ ভলান্টিয়াররাও দাঁড়াতে পারল না। পিছু হটলে। ওদের তাড়া করে নিয়ে এলো একেবারে ক্যাম্প পর্যন্ত। তার পর ক্যাম্পে ঢুকে আবার সেই নির্বিচার লাঠি বৃষ্টি। ছেলেছোকরা ভলান্টিয়ারের দল মাথার ওপরে হাত ঢেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিসের কি, ক্ষ্যাপা সেপাই সান্ত্রীর দল যাকে সামনে পেলে একেবারে পাটপেটা করে শুইয়ে দিলে। তারপর ক্যাম্পের হোগলা, বাঁশ-বাখারি টিনে ছিঁড়ে ছত্রখান করে দিয়ে গটগটিয়ে চলে গেল। ধরলে না কারুকে। জেলে বোধ করি আর জায়গা নেই।

এখানেও ছাউনি নেই। মাথার ওপরে একচিলতে খড় নেই। সামনে রাত। আহতরা ওই কালভার্টের ওপরে মুখ গুঁজে গোঙাতে লাগল। কেউ ছটফট করছে যন্ত্রণায়। রক্তে শুধু ওদের জামাকাপড়ই নয়—ভিজে উঠল এ চরের নোনা মাটি।

জগৎ ডাক্তার বললে, "সবাইকে ডাক্তারখানায় নিয়ে এস।"

গাঁয়ের মানুষ আহত অচৈতন্য ভলান্টিয়ারদের ভাঙা ক্যাম্পের কাছ থেকে বয়ে বয়ে আনলে। অক্ষত আর কেউ নেই। দেখতে দেখতে ডাক্তারের ডিসপেন্সারির মেঝে ভরে গেল। তখনও বাঁশবেড়িয়ার জখমি লোকগুলো আসে নি। এলো খানিক বাদে। চেয়ার টেবিল বেঞ্চি বাইরে বের করে দিয়ে তাদেরও জায়গা করে দেওয়া হলো।

একজনকে চার-পাঁচজন লোকে কাঁধে করে সন্তর্পণে বয়ে নিয়ে এল। শুইয়ে দিলে ডিসপেন্সারির দাওয়ায়।

অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায় না।

"এ কে!" ডাক্তার বলে উঠল, "তাড়াতাড়ি আলোটা দাও।"

লণ্ঠন ওই একটাই। ঘরের ভেতর থেকে সেটা এনে একজন অচেতন লোকটার মুখের কাছে তুলে ধরল।

ডাক্তার অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, "ভিখন রাউৎ!"

ভিখন রাউৎ। এ চরের শেষ মলঙ্গী। তার সাতানব্বই বছরের বুড়ো দেহটা চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে ডিসপেন্সারির দাওয়ায়। চোখ দুটো অর্ধনিমীলিত। কপালে মুখে গালে রক্তের ধারা।

সানো চৌধুরী বললে, "ওকে আগুনের ভেতর থেকে বের করে আনতে পেরেছিলাম ডাক্তার। কিন্তু লাঠির মুখ থেকে রক্ষা করা গেল না।"

"তবু যতোটা পেরেছি—আড়াল করে রেখেছিলাম।" বিমল বললে, "হিমাংশু আর আমি। পারলাম না"—

হিমাংশু একদৃষ্টে চেয়ে আছে ভিখনের অচৈতন্য, অভিব্যক্তিহীন মুখটার দিকে। মাথা তার আবার ফেটেছে। রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে তখনো। গায়ের সার্ট ছুপে উঠেছে তাজা রক্তের ধারায়।

ডাক্তার মৃদু গলায় ডাকল, "ভিখন!"

হিমাংশু অস্ফুট কণ্ঠে শুধালো, "ও কি বেঁচে আছে ডাক্তারবাবু?"

[ক্রমশ]

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

ন্যাশন্যাল ডিল্যুক্স"

১০৲ মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন :

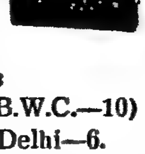

Music & Sound (B.W.C.—10)

Post Box 1576, Delhi—6.

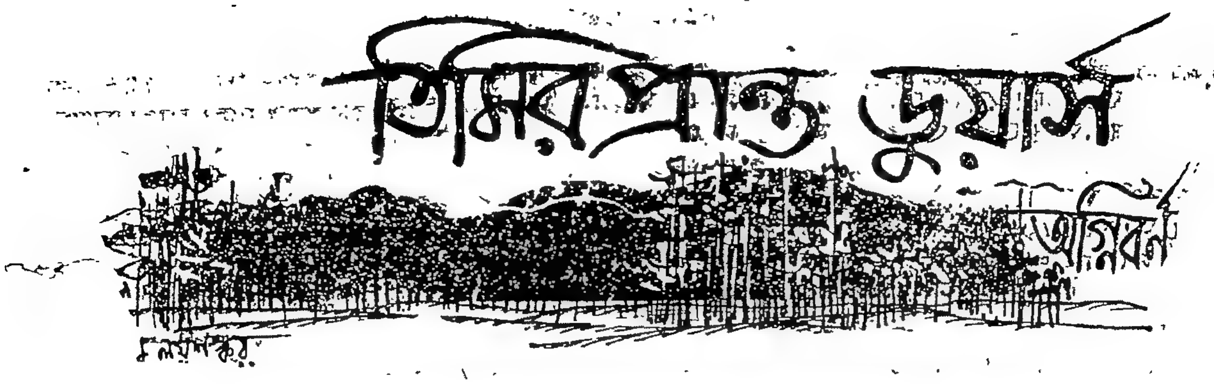

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

যোল

নন্দকিশোরের সঙ্গে দেখা হল।

বাগটা স্টেশনে দাঁড়াতেই আমি পড়ি-কিমরি করে নামছিলাম।

একা আমি না। বাসের সব যাত্রীই। দেখা গেল তাদের নামতে-না-দিয়ে ঠেলে উঠে পড়ছে লোকেরা।

নামতে দিন। নামতে দিন আমাদের। ব্যাকুল অনুরোধ করছি আমরা।

কে শোনে কার কথা। ঠেলে উঠতে না-পারলে কিছুতেই বসবার সীট পাওয়া যাবে না। তাইতেই যাত্রীদের এত ব্যস্ততা।

ডুয়ার্সের সব লাইনেই এই অবস্থা। গাড়ি আছে অবশ্যই। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

অধিকাংশ রাস্তাতেই দেখা যাবে গাড়িগুলো একগাদা মুরগী-ছাগলের মত মানুষজন গাদাগাদি করে নিয়ে ছুটছে।

ভিতরকার যাত্রীদের অবস্থা শোচনীয়। তাঁরা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন।

কনডাক্টর লোকটি মহাপুরুষ।

কোথায় লোক তুলছেন দাদা?

কাকে জিজ্ঞাসা করছেন? এ-গাড়ির কনডাক্টর কানে কম শোনে। একজন রসিক ব্যক্তি বলে উঠলেন।

কানে কম শুনলেও চোখে যে ঢের বেশি দেখেন, রাস্তার লাইনে বারবার তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। গাড়িতে তিলধারণের জায়গা নেই। লোকের চাপে গিজগিজ করছে। তবু থামবার শেষ নেই। গাড়ির চাকা কয়েক পাক ঘুরতে-না-ঘুরতেই আবার অব্যর্থ নিয়মে নেমে পড়ছে। কী এক অভ্যস্ত কায়দায় পিঠ-ঘাড় বাঁকিয়ে কনডাক্টর বাইরে ঝুঁকছে জানালায়। চেঁচাচ্ছে, কোথায় যাবেন? এবং কানে-না-শোনার সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও দিব্যি লাইন-যাত্রীদের কথা শুনে ফেলছে এবং অচিরাৎ এ্যাসিস্ট্যান্টের উদ্দেশে, গোপাল তুলে নে।

গোপাল নিতান্তই সুবোধ বালক। নাম-মাহাত্ম্য মুহূর্তে-মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলছে, আসুন, দাদা, আসুন।

দাদা কথাটি দেখি ডুয়ার্সেও একহাত পরিক্রমা সেরে নিয়েছেন।

কি খবর দাদা? রাস্তায় দেখা হতে স্বল্প-পরিচিত একজনের প্রতি অন্যজনের প্রশ্ন।

ভালো তো দাদা? একটু নিকট সম্পর্কের প্রশ্ন।

টিকিট দেখি দাদা। বুকিং কাউন্টারে।

আরে দাদা, লম্বা-লম্বা বুকনি না ঝেড়ে এইখানটা কেটে পড়ুন। চায়ের দোকানে এক যুবক অন্য যুবকের প্রতি।

ক'টা বাজে দাদা? ব্যাকুল উদ্বিগ্নকণ্ঠ।

রাস্তায়, বাজারে, হাটে, ঘাটে, মাঠে, জনারণ্যে, ইস্কুলে, সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়, ঘরে-বাইরে সত্যিই দাদা-সম্বোধনের যত্রতত্র সদ্ব্যবহার দেখে অবাক হতে হয়। এক হিসাবে সকলকে সমান করে দেখবার এক বিশ্বজনীন আবেদন এতে আছে। বাপের বয়সী, ঠাকুর্দার বয়সী, কাকা-জেঠা ও মামার বয়সী ঢের লোক পৃথিবীতে আছে—এবং সকলকে এক অভিন্ন সম্বোধনে আপ্যায়িত করবার এমন সুযোগ আর কিসে আছে? তবে পুশিচন্তার কথা, এই যে সত্যকার দাদারা না এতে চটে যান।

নামছিলাম। ডুয়ার্সের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। কাঠের ব্যবসাকেন্দ্র। বেলা বারোটা-একটা। আকাশে মধ্যদিনের সূর্য।

এখানে একটু কাজ সেরে পরের গাড়িতে ফিরব। বেশিক্ষণের কাজ নয়। যার কাছে এসেছি, তাকে পেলে এক্ষুণি এই গাড়িতেও ফিরতে পারি।

নামায় ব্যস্ততা ছিল।

নামতে দিন, নামতে দিন। একটানা আর্ত আবেদন চলেছে।

কিন্তু আবেদন কে শোনে। এ-যুগে বাঁচার। জোরে লড়াই করে বাঁচার। ধমক দিন। ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে যান। ভিতরে জায়গা থাকুক না-থাকুক কী এসে যায়। ভদ্রমহিলাটিও নামবেন। একটি ছোট বাচ্চা মেয়ে আছে সঙ্গে।

তিনি করুণ গলায় মিনতি করছেন, দয়া করে একটু নামতে দিন।

চীৎকার ও ঝংকার গলার এই দুই স্বর। ঝংকারে মানুষ মোহিত হতে পারে বটে। কিন্তু মনে মনে ঠিক জানি চীৎকার ছাড়া কাজ হয় না। ভদ্রমহিলার কণ্ঠ ছিঁড়ে যাচ্ছে। নামুন মশাই। এক ভদ্রলোক হাঁক দিলেন। মেয়েছেলেকে নামতে দিন মশাই।

মশাই, অর্থাৎ মহাশয় অর্থে মহৎ আশয়-সম্পন্ন ব্যক্তি যদি হন, তাহলে এরপরে অন্তত সচেতন হওয়া উচিত। কিন্তু এঁরা একমাত্র বিশ্বাসী নিষ্কাম কর্মে। ফল যাই হোক। আমার সামনের ভদ্রলোক কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যেই অবলীলাক্রমে বাসের ভিতরকার আয়নার সামনে অমিত-বিক্রমে দাঁড়িয়ে গেছেন। দ্রুত পকেটে হাত চালিয়ে বার করে এনেছেন একটি পকেট-চিরুনি। খস্‌খস্‌ করে চুলে চিরুনি টেনে নিচ্ছেন। ওঁর লক্ষণ দেখে মনে হয় তিনি বোধ করি বাস থেকে নেমেই কোন মদিরাক্ষীর নয়নে পড়বার চিন্তায় বিচলিত। তাঁকে পুরুষ-সুলভ ভরসা দেবার উদ্দেশে গলাটা কেসে পরিষ্কার করে নিচ্ছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ নন্দকিশোর মুখোমুখি। বাসের ভিতরে তেড়ে-আসা যাত্রীদের মধ্যে সে-ও ছিল। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি তক্ষুণি নিচে নেমে দাঁড়াল। সেই অবকাশে অতঃপর রথ-জঠর থেকে পরিত্রাণ। ভূতলে উত্তীর্ণ হওয়া গেল।

নন্দকিশোর কিন্তু আর গাড়িতে ওঠবার চেষ্টা করল না। আমার কাছে এসে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, দাদা হঠাৎ এখানে?

কেন, দাদার কি আসতে নেই? আমি হাসিমুখে বললাম।

নন্দকিশোরের গলার স্বর হঠাৎ কেমন করুণ শোনাল, দাদা আপনি এই কথা বললেন?

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতটা ধরে ফেলল সে। এবং বাকিটা তেমনি গলায় বলল, আপনি তো জানেন, দাদা। আপনি আমার কতটা শ্রদ্ধার পাত্র?

কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। নন্দকিশোরকে দূর অতীতে তাকিয়ে আমি ক্ষণকালের মধ্যে ভাবলাম। কে বলবে আমি তাকে ভুলে গেছি? তাকে কি ভুলে যাওয়া সম্ভব?

সংসারের এই পথ গোলকধাঁধা। কত মানুষের সঙ্গেই না পৃথিবীতে প্রতিদিন পথ হাঁটতে হয়। জেনে, না-জেনে। তাদের কারুর সঙ্গে পরিচয় হয়। হয়ত সে-পরিচয় ভাসা-ভাসা। আবার কারুর সঙ্গে সাধারণ পরিচয় থেকে গভীরতা। এই গভীরতাটুকু সম্পূর্ণই হৃদয়ের উপলব্ধি-গত ব্যাপার। এ নির্ভর করে কারুর সঙ্গে আনন্দ পাবার উপরে। যার সঙ্গে পরিচয়ে আনন্দ নেই, তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করবার কী প্রয়োজন ভেবে পাই না। নন্দকিশোর ঠিকই বলেছে। তার সঙ্গে এককালে সম্পর্কের গভীরতাই ছিল। আমি মুহূর্তমধ্যে প্রায় এক যুগ আগেকার নন্দকিশোরকে ভাবলাম। তার হাতটা ধরে এতক্ষণ পরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলাম, তার আগে তুমি বল। তুমি কি করে হঠাৎ এলে এখানে?

নন্দকিশোরের চোখগুলি ছলছল করছিল। দেখলাম এখনো সে দশবারো বছরের আগেকার সেই লাজুক বিশ বছরের ছেলেটিই আছে। বয়স বেড়েছে এই ক'বছরে। কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সে দু'-এক সেকেন্ড দেরি করছিল।

শব্দ করে একটা বাস এল। আগেও এসেছে অনেকগুলি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। নতুন করে গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ওড়ে। এখানকার রাস্তায় এ-সময়ে এমনি হাওয়া দেয়। দু'-তিনদিন ধরে ক্রমাগত হাওয়া চলতে থাকে। বাতাস শোঁ-শোঁ বেগে ফুঁসতে থাকে। আমি নন্দকিশোরকে সচেতন করে দিতে বললাম, তুমি তো আমাকে দেখেই নেমে পড়লে। আর ওদিকে দেখলে তো গাড়িখানার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে।

নন্দকিশোর তাকিয়ে দেখল। বলল, এতে আর আশ্চর্যের কি?

বললাম, তুমি জায়গা পাচ্ছ না। ইস্, এ-গাড়িতে দাঁড়িয়ে যাওয়াও তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে। যাও, যাও একবার চেষ্টা করে দেখ।

নন্দকিশোর হেসে বলল, এ-জন্যেই তো গাড়ি থামতে-না-থামতে লোক এমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কলকাতার চেহারা কল্পনা কর তো।

তবু কলকাতার চাইতে ঢের ভালো এখানে।

এ কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। দাদা, কলকাতার বেঁচে-থাকা এখন কী যে কঠিন হয়ে গেছে তা আর আপনাকে কী বলব।

বললাম, তবু কলকাতা কলকাতাই। কলকাতার কাছে দাঁড়াতে পারে ভারতবর্ষের এমন একটি নগরী কল্পনা করতে পার? গত শতাব্দী ধরে ভারতকে সে জোগান দিয়েছে চিন্তা-ধর্ম-দর্শন বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য। এখনো কলকাতাই সেরা শিল্প-সাহিত্যে নানা জাতীয় আদর্শ সৃষ্টি করে চলেছে। কে বলতে পারে হয়তো আগামীকালের সেরা বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিক কালকের প্রধানমন্ত্রী এই ভিড়ের মধ্যে এখানে জন্ম নিচ্ছে।

নন্দকিশোর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি নামতেই বলে, দাদা, আজও আপনি তেমনি আছেন। আপনার কথা শুনলে আমার আজো কী যে ভালো লাগে। মানুষকে জাগিয়ে তোলার এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে আপনার।

এই কথা আমি আবারও শুনলাম নন্দকিশোরের মুখে। ঠিক মনে নেই, কত বছর হবে। তবে অনুমানে বলতে পারি, দশ-বারো বছর আগেও নন্দকিশোর আমাকে অমনি কথা বলত।

নন্দকিশোর বলল, দাদা, আজ আর আপনাকে কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছি না।

আমি চমকে উঠে বললাম, সে কী! তুমি না কোথায় যাচ্ছিলে?

দাদা, আপনি আমাকে এই কথা বলতে পারলেন? বলতে বলতে সে আমার হাত চেপে ধরল দু'টি হাত দিয়ে। আবারও বলল, পারলেন বলতে? নন্দকিশোরের গলা কাঁপছিল। ঠোঁটও বুঝি একটু কাঁপছিল। জানি এই নন্দকিশোরের স্বভাব। দশ-বারো বছর আগেকার লাজুক-লাজুক স্বভাবের সেই ছেলেটি আজো তেমনি আছে? আমার ভাবতে ভালো লাগল, সংসারে অনেক কিছুই পাল্টায় বটে, এবং এই এতগুলো বছরে রেসের ঘোড়ার গতিতে পৃথিবীর উপর দিয়ে সময় কত দ্রুত দৌড় মারল, সমাজ-ইতিহাস-রাষ্ট্রে প্রতিদিনের ভাঙাগড়ায় কত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করল, কিন্তু আমার পরিচিত এই প্রিয় পরিধিটুকুর কোন পরিবর্তন হয় নি।

নন্দকিশোর বলল, দাদা, আজ কতদিন পরে কলকাতা থেকে কতদূরে আপনার সঙ্গে এই দেখা। আমার যত কাজই থাক, যত প্রয়োজনই থাক, আমি কি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি?

তাহলে চলো কোথায় উঠে দাঁড়াই। উপস্থিত ডুয়ার্সের এই প্রথম রৌদ্রোত্তাপটি কিন্তু বড়ই বেসরম লাগছে।

এইবার নন্দকিশোরের হেসে ওঠবার পালা। তার হাসি একেবারেই বেআব্রু অট্টহাসি। মনে পড়ল কলকাতায় কতদিন তাকে অতীতে আমি এই উচ্চহাস্য থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছি। বলেছি, নন্দ, ঐ হাসি সুন্দরও নয়, শোভনও নয়। যাতে শালীনতা ক্ষুণ্ণ হয় অমন কিছু না করাই ভালো।

আমার বলার কারণ ছিল। নন্দকিশোরের সঙ্গে বেরিয়ে ওই হাসিতে আমি অনেকদিন বিব্রতবোধ করেছি। দেখেছি গাড়ির চাকায় হঠাৎ পাংচার্ড হতে যেমন একটা শব্দ বেরোয় এবং লোক দাঁড়িয়ে পড়ে, তেমনি তার হাসিতে অনেক সময় পথ-চলতি মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখেছি নিজের চোখে একদিন এক তরুণী গড়িয়াহাট মার্কেটের পাশ দিয়ে ওই হাসি শুনে চমকে ট্রামের হাতল ছেড়ে দিয়েছিলেন। গাড়িটা তখন স্পীড বাড়িয়েছে। আর ওটাকে ধরা সম্ভব ছিল না। তরুণীর চোখে-মুখে আমি যে-জাতীয় রক্তিম আভা প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাকে যাই হোক সান্ধ্যদীপের শিখার সাথে তুলনা না-করাই ভালো।

নন্দকিশোরের হাত আমি টিপে দিয়েছিলাম। ততক্ষণে একটি যুবক আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে রসিক উপদেশ নিবেদন করে গিয়েছিলেন, দাদা, সজাগ থাকুন। কলকাতায় এমনি অনেক দুর্ঘটনা আছে, আর ঘটাবেন না।

শুনে আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

নন্দকিশোর বলেছিল, কি বলে গেল?

বলল, তোমার হাসিতে যে-কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বলল?

এই মহিলাটি ট্রামের হাতল ছেড়ে

মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০৲। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা হিন্দীতে যোগাযোগ করুন।

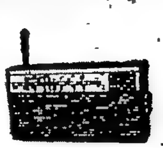

Allied Trading Agencies
(B. C.) P.B. 2123, Delhi–7

দিয়ে বাঁচলেন। কেউ হয়ত ট্রামের তলায় কাটাও পড়তে পারেন। তখন তোমাকে তো বটেই, আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে দু'-এক বেলা হাজত বাস করতে হবে।

নন্দকিশোরের মুখের ভাব শক্ত কঠিন আকার ধারণ করেছিল। বলেছিল, দাদা, জানবেন, এইসব মহিলারা প্রায়ই কাটা পড়েন না। কারণ তাঁরা নিজেরাই অন্যকে কাটবার যন্ত্র।

একটু থেমে বলেছিল, আর একটা কথা বলি। আপনি অপরাধ নেবেন না। সেটা আপনাকে নয়। আমি নিজের উদ্দেশ্যেই স্বগতোক্তি করছি। সভ্যতার যে জঙ্গলে মানুষ হাসতে জানে না, হাসি পেলেই ঠোঁটের প্রান্তে সৌখিন রুমাল দিয়ে মুছে নিতে হয়, সেখানে জন্মানটাই আমার পক্ষে একটা ভয়ানক অপরাধ হয়েছে।

আজ কতদিন পরে নন্দকিশোরকে আমি সেই গলায় হাসতে শুনলাম। বলল, ডুয়ার্সের শুধু রৌদ্র নয়। সবকিছুই বেসরম দাদা। জানি না, আপনি কতদিন এখানে আছেন। আমি যে ক'দিন আছি তাইতেই তো এই দেখলাম।

বলে আমার হাত ধরে টানলে একটু-খানি, আসুন এইখানটায় দাঁড়াই। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে আসি।

তুমি সত্যিই যাবে না? তোমার গাড়ি কিন্তু ছাড়ছে?

আমার নাগ্রাকাটা যাবার কথা ছিল। কিন্তু আজ না গেলেও চলবে। তেমন জরুরী কিছু নয়। তবে আমার লোক একজন যাচ্ছে, তাকে একটা কথা বলে আসি।

গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছিল। ইতিমধ্যে যাত্রী-বোঝাই হয়ে গেছে। প্রায় তিন গাড়ির লোক উঠেছে একটিই গাড়িতে। বাসের আরোহী-ধারণ ক্ষমতার একটি প্লেট লিপি-বদ্ধই আছে। ভিতরের দিকে আটকান। কিন্তু কেউ তা দেখেও না। শিক্ষিত মানুষেরাও কোন প্রতিবাদ করে না। প্রতি-বাদ করলেই বা কে শুনছে। কিন্তু শোনান উচিত। শুনতে শুনতে কান আসুক। আমি জানি বাসচালকেরা কেউ সুকুমার-মতি বালক-বালিকা নন। তাঁদের কান অত সহজে লাল হবার নয়। বরং মালিকের দিকেই কান একটু বেশি পরিমাণে সজাগ রাখতে হয়। কথা প্রসঙ্গে মনে এল। ডুয়ার্সের একটি প্রাইভেট বাস-মালিক ও তার কনডাক্টর কর্মচারীর কথা শোনাই। মন এক আশ্চর্য ডিক্টোফোন। তার লাগে না কোন ব্যাটারি, যন্ত্র-ঝামেলা নেই। টেপ-এর দরকার নেই। সে কখন যে কী শোনে। কোথায় কোন জিনিস গুছিয়ে রাখে।

ধরা যাক বাস-মালিকটির নাম বিরু-পাক্ষবাবু। দিনান্তের হিসাব গুণতে গুণতে বললেন, টাকা এত কম কেন?

আজ্ঞে যাত্রী বেশি হয় নি।

হুম্ করে একটি আওয়াজ হল। মালিক বললেন, আপনাকে আমি আলটি-মেটাম দিচ্ছি। কাল থেকে যদি অন্তত ডবল টাকা বেশি না হয়, তাহলে কিন্তু চাকরি থাকবে না।

আজ্ঞে। তাই হবে।

কনডাক্টর বিদায় নিলে গৃহিণী বল-লেন, উনি তো মোটামুটি ভালোমানুষ। এঁর বদলে কাকে নেবে? অন্তত আদ্দেক টাকা তো দিচ্ছিলেন!

তোমার ভাই বসে আছে। ভাবছি কনডাক্টরের কাজটা তাকেই দিয়ে দেব।

গৃহিণী একপাক এমন চক্কর দিয়ে এলেন যে, নৃত্যশাস্ত্রের কোন্ এলাকায় ব্যাপারটা পড়বে বোঝা কঠিন হল। হাতটা অপার্থিব এক মুদ্রার ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে বললেন, তাহলে তোমার টাকার থলিটাসুদ্ধ যাবে, সেকথা কিন্তু আমি আগেই তোমাকে বলে রাখছি। যা তোমার গাড়ির দশা। চড়তে গেলে ভুঁড়িটা পর্যন্ত দোলে।

বলা বাহুল্য, তাঁর ভুঁড়িটা সম্পর্কে তিনি একটু বিশেষ পরিমাণে সজাগ এবং মমতাও কিছু অধিক।

আর সেই বাস-মালিকটির চেহারা কল্পনা করুন। ভাঙা ঝরঝরে গাড়ি ও বিকট ভুঁড়িওয়ালা স্ত্রী, উভয়েই রম্য। এঁদের পোষণের জন্য যদি যাত্রীদের খানিকটা গলদঘর্ম দশা সইতেই হয়, তাতে অসহিষ্ণু হলে চলবে কেন?

পরোপকার-ব্রতে ও সহিষ্ণু প্রেমে বর্ত-মান যুগে ডুয়ার্সের যাত্রীদের দশা জগাই-মাধাইয়ের মত আন্তরিক। মেরেছ, মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?

[ক্রমশ]

কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন কি সম্ভব

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক হয়ে গেল তার সামনে প্রধান প্রশ্ন ছিল কি করে কংগ্রেসের পুনর্জীবন আনা যায়। এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই তিনটি কমিটির রিপোর্ট ও প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সামনে পেশ করা হয়েছে। যদিও ওয়ার্কিং কমিটি এই বৈঠকে সে সব প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নি, পরবর্তী এ-আই-সি-সির বিবেচনার জন্য তা রেখে দিয়েছে, তবু এই প্রস্তাবগুলি থেকেই কংগ্রেস-নেতৃত্বের মনোভাব বোঝা যায়। সাংগঠনিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও কোয়ালিশন সংক্রান্ত—এই তিন বিষয়ে পন্থা নির্ধারণের জন্য এই তিনটি কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়েছিল। তিন কমিটিই অনেক নতুন নতুন কথা বলেছে। কিন্তু কংগ্রেসের পুনর্জীবন তার দ্বারা হবে কি না সেটাই প্রশ্ন।

রাজনৈতিক ক্ষমতার কথাটাই প্রথম নেওয়া যাক। ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচন থেকে শুরু করে এই মধ্যবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত কংগ্রেসের ক্ষমতা-হ্রাস দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে। কিন্তু সেই গতি রোধ করার চেয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্বের এখনকার প্রধান দুশ্চিন্তা, কি করে কেন্দ্রে ক্ষমতা রক্ষা করা যায়। অনেকদিন পর্যন্ত কংগ্রেস-নেতৃত্ব প্রকাশ্যে এ দুশ্চিন্তা জানতে দেন নি। কিছুদিন আগে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনার সুপারিশ করতে গিয়ে ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি কামরাজই সর্বপ্রথম এ কথাটা বলেন। ১৯৭২-এ কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ না-ও হতে পারে, এই আশঙ্কা তিনিই খোলাখুলি প্রকাশ করেছেন। তারপর এই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। এই বৈঠকে সুব্রহ্মনিয়ম কমিটি তো এই প্রশ্নটাকেই প্রধান ভিত্তি করেছে তার বক্তব্যের। এই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৭২—৭৭ সময়কালে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা কি রকম হবে তা এখন থেকেই ঠিক করা দরকার। এ কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, উত্তরের রাজ্যগুলি থেকে ১৯৬৭-তে কংগ্রেস যত আসন পেয়েছিল, ৭২-এ তা না পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। অর্থাৎ কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। আর, তা হলে কি হবে? এই কমিটির মতে তাহলে সংবিধানটাই একেবারে ধসে পড়বে, পার্লামেন্টে অচল অবস্থা দেখা দেবে।

সুব্রহ্মনিয়ম কংগ্রেস-ক্ষমতা না থাকাকেই সংবিধান ধসে পড়া ও পার্লামেন্টে অচল অবস্থা হওয়া বলে মনে করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে গেলে সংবিধানই বা ধসে পড়বে কেন? পার্লামেন্টই বা অচল হবে কেন? রাজ্য ভিত্তিতে যদি কংগ্রেসের বদলে অ-কংগ্রেসী দলগুলির মিলিত ফ্রন্টের গভর্নমেন্ট তৈরি হতে পারে, তবে কেন্দ্রেও তা কেন হতে পারে না? আর, সেই মিলিত ফ্রন্টের চরিত্র যেমন হবে, সেইভাবেই সংবিধান রক্ষিত বা পরিবর্তিত হবে, সেইভাবেই পার্লামেন্ট চলবে। স্বভাবতই বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির শক্তি যে পরিমাণে হবে, সেই পরিমাণেই সংবিধানের বিধানগুলিকে অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত করার চেষ্টা হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিও সেই পরিমাণে গণতন্ত্রমুখী হবে।

১৯৭২-এ কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী মনে হলেও বিকল্প সরকারের চরিত্র কেরালা ও পঃ বঙ্গের মতো হওয়া কঠিন। অনেকগুলি রাজ্যে বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে কেন্দ্রে তার প্রতিফলন হতে পারে না। কিন্তু সেরকমটা না হলেও, বিহারের অ-কংগ্রেসী ফ্রন্টের মতো চরিত্র অর্জন করা কেন্দ্রের বিকল্প সরকারের পক্ষে অসম্ভব মোটেই নয়। এই ধরনের বিকল্প সরকারের পরিচালনাতেই চলবে পার্লামেন্ট, থাকবে সংবিধান।

আসল কথা, কেন্দ্রে কংগ্রেস-ক্ষমতা না থাকাটাই হচ্ছে কংগ্রেসের পক্ষে চূড়ান্ত সংকট এবং সংবিধানকে কংগ্রেস-নেতৃত্ব দেখছে শুধু এই ক্ষমতার অস্ত্র হিসাবেই। অনেক রাজ্যে কংগ্রেসী কর্তৃত্বের অবসান হয়েও যদি কেন্দ্রে কংগ্রেস কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে সংবিধানের বর্তমান বিধানের জোরে সারা দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। অ-কংগ্রেসী রাজ্যগুলির ভিন্নধারা অনুসরণও অনেক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সর্বোপরি অ-কংগ্রেসী রাজ্যগুলির উপর সদাসর্বদা একটা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির সুযোগ থাকে। এই সুযোগ কত রকমভাবে যে কেন্দ্র ব্যবহার করে তা গত তিন বছরে ভালভাবেই দেখা গিয়েছে। সুতরাং, কেন্দ্রে কংগ্রেসের ক্ষমতা না থাকা মানে কংগ্রেসের বাঁচবার শেষ ভরসাটাও লুপ্ত হয়ে যাওয়া। যে সব রাজ্যে কংগ্রেসের ক্ষমতা থাকবে, কেন্দ্র অ-কংগ্রেসী হয়ে গেলে সে সব রাজ্যেও অতিদ্রুত হাওয়া পাল্টে যাবে, কংগ্রেসের ভিতর থেকেই বহু লোক বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ ক্রমশ সেই রাজ্যগুলিও অ-কংগ্রেসী হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এই রকম আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করেই আসছে ১৯৭২। কাজেই ১৯৭২-এর দিকে চেয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্ব যে ভয়ানকভাবে আতঙ্কিত হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন তাই আজ একান্তভাবে নির্ভর করছে কেন্দ্রে কংগ্রেসী ক্ষমতা রক্ষা করার উপর।

কংগ্রেসের কোয়ালিশন-নীতি নির্ধারণের বিষয়টাকেও দেখতে হবে এই পরিপ্রেক্ষিতেই। কোয়ালিশন-নীতি নির্ধারণের জন্য একটা বিশেষ কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল কেন? হায়দ্রাবাদ কংগ্রেস থেকে রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কোয়ালিশনের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হলেও কোয়ালিশনকে সুনির্দিষ্ট নীতিরূপে ঘোষণা করা হয় নি। আজ কোয়ালিশনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরির কাজে কংগ্রেস-নেতৃত্ব এত সচেষ্ট কেন? কারণ, এখন, বিশেষ করে এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের পরে, রাজ্যভিত্তিক ব্যবস্থার চেয়ে একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে ১৯৭২-এর পরীক্ষায় কেন্দ্রকে রক্ষা করার চিন্তাই কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রধান দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাহ্যত যে কথাই বলা হোক না কেন, কেন্দ্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই কংগ্রেস-নেতৃত্বের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন কোয়ালিশন সম্বন্ধে।

কিন্তু এইখানেই কংগ্রেস-নেতৃত্বের সমস্যা চড়েছে আরো বেশি। অবস্থার চাপে যে রাস্তায় কংগ্রেসের কোয়ালিশন-

ঐ সুন্দর কেশ বিন্যাস অতি দীর্ঘকাল সুন্দর থাকবে না – – –

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ ফ্রেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যাণ্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্সগণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

সম্ভাবনা এগিয়ে চলেছে. এতদিন কংগ্রেস সে কোয়ালিশনকে নীতিবিগর্হিত বলে এসেছে এবং এখন হঠাৎ নীতি পাল্টে ফেললে কংগ্রেসের মধ্যেই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। আবার, নীতি রাখতে গেলে কংগ্রেসের ক্ষমতা রক্ষাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোয়ালিশন সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য যে কমিটি হয়েছে, সেই কমিটি বলেছে যে, স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘের সঙ্গে কোয়ালিশনের কথা ভাবা যায় না, কেন না তাতে কংগ্রেসের নীতিরই মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু অন্য যাদের সঙ্গে কোয়ালিশনের কথা ভাবা যায়, অর্থাৎ পি-এস-পি, এস-এস-পি, বি-কে-ডি প্রভৃতি, তাদের সঙ্গে কোয়ালিশনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলেও কংগ্রেসের বর্তমান নেমে-যাওয়া অবস্থায় হবে না, তার জন্য আগে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। সুতরাং, এই কমিটি কোয়ালিশন সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা দেখিয়ে না দিয়ে সম্ভাবনা ও সমস্যার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছে তাদের বক্তব্য। সংবাদ-পত্রের রিপোর্টে প্রকাশ (৫-৪-৬৯), রিপোর্টের এইরকম বক্তব্য কংগ্রেস-নেতৃত্বের সুবিধাই হয়েছে তাঁরা বিষয়টি আরো ভাল করে চিন্তা করার সময় পাবেন, বিশেষত যখন রাজ্যভিত্তিক কোয়ালিশনের প্রশ্নটি কোনো জরুরী প্রশ্ন এখন আর নেই। অর্থাৎ, কংগ্রেস-নেতৃত্ব প্রধানত কেন্দ্রের দিকে চেয়েই কোয়ালিশন-সম্ভাবনা বিচার করতে চান।

অবস্থার চাপে স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ প্রভৃতির সঙ্গেই যে কোয়ালিশন-সম্ভাবনা এগিয়ে চলেছে, এটা আজ কোনো গোপন কথা নয়। এবং এই অবস্থার চাপটাও হচ্ছে দেশের মূলে রাজনৈতিক সংঘাত, যাতে একদিকে কংগ্রেস আর একদিকে গণতান্ত্রিক শক্তির মোকাবিলা ক্রমশই প্রচণ্ড হচ্ছে এবং যা ক্রমশই কংগ্রেসকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। এই অবস্থার জন্যই কেন্দ্রকে হাতে রাখবার জন্য কংগ্রেস-নেতৃত্বের মরিয়া চেষ্টা। সুতরাং, মুখে কংগ্রেস-নেতৃত্ব যাই বলুন না কেন, কার্যত তাঁদের এগিয়ে যেতেই হবে স্বতন্ত্র, জনসংঘের সঙ্গে জোট-বন্ধনের দিকে। বাস্তবেও আমরা তাই দেখছি না কি? এস কে পাতিল ও তাঁর গোষ্ঠী অনেকদিন থেকেই ইঙ্গিত দিয়ে আসছেন যে স্বতন্ত্র ও জনসংঘের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হবে। সম্প্রতি এক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তিনি বলেছেন কোয়ালিশনই হচ্ছে অবধারিত গতি। এক সময়ে এই গোষ্ঠীর মতটাকে অফিসিয়াল মত বলে মনে করা হত না, এমন কি এখনও তা মনে করা হয় না। কিন্তু কাজে কি হচ্ছে? বিহারের ক্ষেত্রে কংগ্রেস-নেতৃত্ব স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনের মঞ্জুরী দিয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি নিজ-লিঙ্গাপ্পা তো আরো এক ধাপ এগিয়ে-ছিলেন। জনতা পার্টির দুর্নীতিখ্যাত রামগড়ের রাজাকেও নিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। এ থেকেই কংগ্রেস-নেতৃত্বের মনোভাবটা বোঝা যায়। শুধু রাজ্যের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে কিছুটা অদল-বদল যদিও বা চলতে পারে, কিন্তু কেন্দ্র নিয়ে কংগ্রেসের অস্তিত্বই যেখানে বিপন্ন, সেখানে কংগ্রেস-নেতৃত্ব নিশ্চয়ই কোনো দুর্বলতা দেখাবে না। বিশেষত, অনেক দিন থেকে স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘ বাম-পন্থী শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি ব্যাপারে যেভাবে কংগ্রেস-নেতৃত্বকে সমর্থন করছে, তাতে আজকে তারাই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। পঃ বাংলার গভর্নরের কার্যকলাপে এরা জোরালো-ভাবেই যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষসমর্থন করেছিলেন। সম্প্রতি 'বাংলা বন্ধের' ব্যাপারে স্বতন্ত্র ও জনসংঘ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবনের সবচেয়ে বড় সঙ্গী। স্বতন্ত্র নেতা রঙ্গা তো দাবি করেছেন যে, পঃ বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা উচিত। এত সহধর্মিতা যেখানে, সেখানে কোয়ালিশন আটকে থাকতে পারে কি? এই সঙ্গে পি-এস-পি ও বি-কে-ডির কথাও উল্লেখ করতে হয়। যদিও সব বিষয়ে তারা কংগ্রেসকে সমর্থন করে না, বিশেষত রাজ্যভিত্তিতে এখনও তারা অনেকাংশে কংগ্রেসবিরোধী শক্তির পক্ষে থাকছে, তবু তাদের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মনোভাব ক্রমেই কংগ্রেস-নেতৃত্বের দিকে ঝুঁকেছে। মোটের উপর, পঃ বাংলা বনাম কেন্দ্র, এই যে সংঘাত আজ শুরু হয়েছে এবং একের পর এক নতুন নতুন প্রশ্ন এর মধ্যে যেভাবে এসে পড়ছে, তাতে এই সংঘাতকে উপলক্ষ করেই পোলারিজেশনটা বাড়বে কংগ্রেস বনাম গণতান্ত্রিক মোর্চার মধ্যে, এবং এর ভিতর দিয়েই হয়ত কংগ্রেস তার কোয়ালিশনের শক্তি ঠিক করে ফেলবে। সে শক্তির মধ্যে স্বতন্ত্র ও জন-সংঘের ভূমিকা যে বড় হবে তাও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ১৩ই এপ্রিলের খবরে প্রকাশ যে জনসংঘ, স্বতন্ত্র ও বি-কে-ডি নেতারা কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছে 'জাতীয়তাবাদী' দলগুলির এক সম্মেলন ডাকতে। এটাও ভবিষ্যৎ কংগ্রেস কোয়ালি-শনের কিছুটা ইঙ্গিত বহন করে।

কিন্তু এই ধরনের কোয়ালিশনের পথে চলে কি কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন হবে, না কংগ্রেস আরো ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাবে? এ ধরনের কোয়ালিশনের যারা বিরোধী, তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংঘাত বৃদ্ধি পাবে তো বটেই, অধিকন্তু পুনরুজ্জীবনের অন্যান্য প্রস্তাব নিয়েও সংঘাত বেড়ে উঠবে। কোয়ালিশন সংক্রান্ত কমিটি বলেছে যে, কোনোরকম কোয়ালিশন ঠিক করার আগে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে প্রগতিশীল সামাজিক-অর্থ-নৈতিক কর্মসূচী অনুসরণ দ্বারা, যাতে কংগ্রেসবিরোধী জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তন করা যায়। জনসাধারণ বলতে তাঁরা কৃষিজীবী, ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, যুবক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সকলের কথাই বলেছেন। এঁদের স্বার্থরক্ষার দিকেই নজর দিতে হবে। কথাটা ভূতের মুখে রাম নামের মতোই শোনায়, কেন না এই জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী পথে চলার জন্যই ২০ বছরে ধীরে ধীরে কংগ্রেস জন-সাধারণের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আজ কিছু ভাল কথা শোনালেই রাতারাতি কংগ্রেস জনসাধারণের মিত্র হয়ে যেতে পারে না। তাই তাঁদের এই প্রগতিশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচীটি কি বস্তু এবং তার মধ্যে কায়েমীস্বার্থের ব্যবস্থা যে ভাল রকম থাকবে না, সে বিশ্বাস কেউ করতে পারে না। অর্থাৎ, গুমের্দুর মুখে হরিনামের মতো এটাও একটা বাঁচবার শেষ চেষ্টা বলেই মনে হয়। তবু, তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে কংগ্রেস-নেতৃত্বের একাংশ সত্যিই কিছুটা প্রগতিশীল হতে চেষ্টা করছে, তাহলে সে পথও কংগ্রেস-নেতৃত্বের মূল অংশ বন্ধ করে দিয়েছে। ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে যদি দক্ষিণী প্রতিক্রিয়ার শক্তির সঙ্গে কংগ্রেসকে জোটবন্ধন করতে হয়, তাহলে প্রগতিশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচীটি কি বস্তু এবং তার মধ্যে কায়েমী স্বার্থের হয়। একচেটিয়া পুঁজি, সামন্ততন্ত্র প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে-ওঠা স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী জন-সংঘের সঙ্গে হাত মেলানো মানে কংগ্রেসের দিক থেকে আরো প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক পন্থা অনুসরণ করা, অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থের আরো বিরোধিতা করা, জনসাধারণের আরো ঘৃণিত শত্রু হিসেবে অবতীর্ণ হওয়া। সুতরাং, কংগ্রেসের রাস্তাটাই আজ হচ্ছে আজ কংগ্রেস পুনরুজ্জীবনের ঐ সামাজিক-অর্থনৈতিক ফর্মুলার বিরোধী। যদি এরকম হত যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং দুর্বল এক গোষ্ঠী কংগ্রেসকে আজো প্রতিক্রিয়া-শীল রাস্তায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, আর শক্তিশালী অধিকাংশ পুনরুজ্জীবনের প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর, তা হলেও বলতে পারা যেত যে একটা পরিবর্তন হতেও পারে। কিন্তু অবস্থাটা তার ঠিক উল্টো। পাতিল, মোরারজী, চ্যবন প্রভৃতির 'লাইন' কংগ্রেসের 'অফি-সিয়াল' লাইন না হলেও, প্রায়-'অফিসিয়াল' লাইনই হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রমশ এবং ইন্দিরা গান্ধী প্রভৃতি যাঁদের সঙ্গে এঁদের কিছু বিরোধ আছে বলে শোনা যায়, তাঁরাও একটু-আধটু লোক দেখানো পরিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত এই লাইনেই এসে পড়েন কংগ্রেস-ক্ষমতা

মে-দিবস

মনোরঞ্জন হাজরা

চিমনীর ধোঁয়ায় কালো উদ্‌ভ্রান্ত আকাশ
দুর্বিনীত অন্ধকারে চরাচর ঢাকা
দিগন্তে তারার ফোঁটা রক্তাক্ত শিমুলে
আরও রক্ত ঢেলে দিলে
কৃষ্ণচূড়া ফুল।
কবে কোন জনপদে হাটুরিয়া গেছে
মরেছিল শ্রমিকের কলিজার কলি
কৃষ্ণচূড়া রং তার
ভোরের আলোয়।
লেগেছিল বনে বনে তেপান্তর মাঠে
খনির গহ্বর আর কারখানা ঘরে।
সেদিনের সেই রং
ঋতুচক্রে লাগে—
মে-দিবস অগ্নিক্ষরা দুর্জয় শপথে।

চালচিত্র ভাঙা দেশ মানচিত্র সার
ইতিবৃত্ত লেখা আছে পাতায় পাতায়।
চরকার দৌলতে
দুয়োরেতে হাতী—
ক্রমে হল শাদা হাতী সুতোকল ঘরে।
পিকেটিং পর্ব শেষ, সাংকেতিক পথে
চক্রবৃদ্ধি হারে তাই রাজদণ্ড লাভ
ইতিহাস তুমি আমি লাঠির ডগায়।

বিজ্ঞান তোমার নয় অজ্ঞানের দেশে
আদার ব্যাপারী তুমি কন্দর কন্দর,
ঘানি টানো কক্ষপথে ঠুলি বেঁধে চোখে।
গরীবের 'অহি' ওরা শাস্ত্রীয় দর্শন—
পুরোহিত দর্পণেতে ভাষ্য লেখা তার।

মীনবংশ ধ্বংসে তাই মার্জারের প্রেমে
বন্দিনী কমলা কাঁদে স্বদেশী ধর্ষণে,
অজস্র জোঁকের মেলা প্রাণের ফসিলে।

রক্তহীন মহাদেশে রুগ্ন শক্তি নেই,
বাজারে বন্ধ্যাত্ব তবু শ্রেষ্ঠী সমাবেশ।
রাহুগ্রস্ত মুদ্রামান,
সার্বভৌম দেশ—
আভিজাত্য বিজ্ঞাপিত ভিক্ষার ঝুলিতে,
কলসীতে শামুক নাড়ায় প্রত্যহ আদেশ।
খাতকের ব্যাকরণ সূত্র ধরে চলে
বারবধূ অর্থনীতি মুখর শৃঙ্খলে।

আজ সেই মে-দিবস অগ্নিক্ষরা দিন
নতুন আকাশ দেখি অসামান্যরূপে।
বজ্রের মাতৃত্বভারে কালোমেঘ
আসন্নপ্রসবা,
ঝড়ে ঠাসা মহাশূন্যে প্রস্তাবনা শব্দ
টুপটাপ বৃষ্টি পড়ে চিমে তেতালায়
পাক খোলে কেয়াবনে বিষধর সাপ।

সহস্র ফণায় ওরা তারের পুতুল
নাচায় দু'হাতে কোন বিদেশী মস্তান,
ডুগডুগি তাল দেয় তা-থৈ তা-থৈ।
জানি, এই প্রতিচক্র সর্বত্র লালিত—
প্রার্থিত সংহতি তাই মিছিলে মিছিলে
চক্রীদের ঠাঁই নেই অগ্নিক্ষরা দিনে
নতুন আকাশ দেখি অসামান্যরূপে।

সাংগঠনিক দিক থেকেও কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের অনেক প্রস্তাব হয়েছে। এবং এই প্রস্তাব করেছেন পাতিলের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি। পাতিলের মতো দক্ষিণী ব্লকের নেতাকে এই দায়িত্ব দেওয়া থেকেই বোঝা যায় কংগ্রেস-নেতৃত্বের গতিটা কোন দিকে। পাতিল-কমিটি যে সব সুপারিশ করেছে তার সাধারণ খুঁটি-নাটিগুলি না ধরে কতগুলি নতুন বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক। কংগ্রেসের তহবিল পূর্ণ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যে দশ হাজার টাকা হিসাবে এক-একটা 'ডোনেশন' নেওয়া যেতে পারে। এর পরেই সুপারিশ করা হয়েছে যে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেসের সভ্য করা উচিত। অবশ্য পরে এ-আই-সি-সি অফিস থেকে ঘোষণা করা হয় যে, এই অংশ সুপারিশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুপারিশটা যে ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে সেটার নিশ্চয় একটা অর্থ আছে। এমন হ'তে পারে যে আবার পাতিলের চাপে এটা গ্রাহ্য হয়ে যাবে। আরও নতুন সুপারিশ যা করা হয়েছে তার মধ্যে আছে (১) কংগ্রেস সভ্যদের দ্বারা গভর্নমেন্ট বা কংগ্রেসের প্রকাশ্য সমালোচনা চলবে না। (২) ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ আনলে তাকে অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে।

এই নতুন ব্যবস্থাগুলির মানেই হচ্ছে একদিকে কংগ্রেসকে আরো বেশি পুঁজি-পতি-নির্ভর করে তোলা এবং অন্যদিকে কংগ্রেসের ভিতরকার দুর্নীতিগুলোকে আরো ভাল করে আড়াল করে রাখা। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেস-সভ্য করার প্রস্তাবটা অত্যন্ত বেশি নির্লজ্জ মনে হওয়াতেই হয়ত আপাতত বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দশ হাজার টাকার বাৎসরিক 'ডোনেশন' তো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একমাত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকেই। আর প্রকাশ্য অভিযোগ বন্ধ করারও মানে হচ্ছে, আরো বেশি করে কায়েমী স্বার্থের পুতুল করে তোলা কংগ্রেসকে। মোরারজী দেশাইয়ের বিড়লা-তোষণের কীর্তিকাহিনী যেভাবে কংগ্রেস সদস্যরাই ফাঁস করে দিয়েছে, তাতে এরকম কড়া ব্যবস্থা না করলে কংগ্রেসকে লোকের সামনে হাজির করা যাবে কি করে? এই ধরনের সাংগঠনিক নীতি যেখানে ঠিক করা হচ্ছে, সেখানে প্রগতিশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচীরই বা মূল্য কি, আর অন্য অন্য ভাল কথারই বা মূল্য কি?

তিনটি মূল প্রশ্নই আজ কংগ্রেস-নেতৃত্বের সামনে। (১) কেন্দ্রে যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতা রক্ষা করতেই হবে, তা না হলে দেশের রাজনীতির বামমুখী গতি কিছুতেই বাধা দেওয়া যাবে না। (২) তার জন্য যে কোনো রকম কোয়ালিশন, এমন কি দক্ষিণী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনও করতে হবে. (৩) এই সবেরই উপযোগী করে চরম কর্তৃত্বপরায়ণ (authoritarian) সংগঠন হিসাবে দাঁড় করাতে হবে কংগ্রেসকে, যাতে কোনো আভ্যন্তরীণ বাধাও আসতে না পারে। সর্বভারতীয় নেতা থেকে আরম্ভ করে পঃ বাংলার নেতা পর্যন্ত সকল কংগ্রেসীই বলছেন যে কংগ্রেসের 'ইমেজ' নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেটাকে ফিরিয়ে না আনতে পারলে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন কিছুতেই হবে না। কিন্তু এইভাবে চেষ্টা করে কংগ্রেসের 'ইমেজ' ফিরবে কি? জনসাধারণের কাছে তো দূরের কথা, কংগ্রেসীদের নিজেদের কাছেই কংগ্রেস-ইমেজ এতে কি-রকম দাঁড়াবে, সে প্রশ্ন কংগ্রেসীরা নিজে-দেরই করে দেখুন।

স্টেশনে নামে পরমেশ। ছোট স্টেশন। দু-চারজন ওঠা-নামা করে। কিছু কলরব, কিছু ব্যস্ততা।। ট্রেন হুইসেল দেয়। গার্ড সবুজ নিশান নাড়ে। লোহা-লক্কড়ে শব্দ তুলে গাড়ি চলতে শুরু করে।

পরমেশ টিনের সুটকেসটা ডান হাতে ঝুলিয়ে নেয়। শতরঞ্চিতে বাঁধা বেডিংটা বাঁ বগলের নিচে চেপে ধরে। পাক্কা দশ মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে। তাদের গাঁয়ে যাবার কোন গাড়ি নেই। পা-ই সম্বল। গাঁয়ের লোকেরা এই সামান্য রাস্তা হাঁটাকে আমল দেয় না। তারও হাঁটা অভ্যেস আছে। তবে একটানা পাঁচ-ছ' বছর শহরে থাকার পর হাঁটতে যেন একটু কষ্ট হয়।

বাঁধে নেমে পড়ে। দু'ধারে বট-অশ্বত্থ-খেজুর-বাবলাগাছের সারি। শীতে বট-অশ্বত্থ পত্রহীন। রাস্তার ওপর শুকনো পাতা জমে রয়েছে। হাওয়ায় ওড়ে এদিক-ওদিকে। বাঁধের দু'ধারে নয়ানজুলি জলে টইটম্বুর। ছোট ছোট চিকন মাছ ফুট কেটেই ডুবে যায়। রুপোর পাতের মত চলকে ওঠে দুপুরের রোদে। কটা গরু খুটে খুটে ঘাস খায়। এক-একবার আকাশের দিকে মুখ তোলে। তাদের ডাগর ডাগর আয়তচোখে আকাশের জল-ছবি ভাসে। ডাইনে-বাঁয়ে মাঠ-জোড়া সবুজ ধানের বন্যা। বাতাসে পাকা ধানের সোঁদা সোঁদা গন্ধ।

ভারি ভালো লাগে পরমেশের। শহরে এ গন্ধ নেই; এ আকাশ নেই; এ মাটির রাস্তা নেই। মোলায়েম ধুলোর মধ্যে চটি-সুদ্ধ পা ডুবে যায়। কেমন নরম লাগে। একটা কোমলতার স্পর্শ। গা কেমন শির-শির করে। মনে পড়ে মায়ের কথা।

শহরে যাওয়ার আগের রাতে মা জিজ্ঞেস করেছিল—খোকা, আবার কবে আসবি?

বাবার হুঁকোর শব্দ থেমে গেসল। ঘুণ্টি-ধোয়া আকাশে ফ্যাকাশে চাঁদ উঠেছিল। পটুদের নারকেলগাছের চিরোল চিরোল পাতায় পিছলে পড়ছিল চাঁদের আলো। ঝিঁঝিঁ ডাকছিল একসুরে। পুকুরে ডাকছিল ব্যাঙের দল।

মাটির দাওয়ার ওপরে মা বসেছিল। পরমেশ তার পাশে। সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মাকে মাঝে মাঝে ক্লান্ত দেখায়। মা হেসে বলে—বয়েস হচ্ছে না! তবু সে রাতে মায়ের কালো মুখের ওপর শংকার ছায়া ছিল।

সে বলেছিল—আর কামাস বাদে একেবারে ফিরে আসব।

—আর যাবি না?

—না।

—কেন?

—পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। আর আমাকে শহরে থাকতে হবে না। জানো, মা, আমি এখানের ইস্কুলে মাস্টারী করব।

—খুব ভাল হবে, খোকা, খুব ভাল হবে।

হ্যারিকেন নিভিয়ে দিয়েছিল চাঁপা। পাশে শুয়ে বলেছিল—গাঁয়ের ইস্কুলে মাস্টারী করবে?

—হ্যাঁ। ভাল হবে না?

—সংসার চলবে কি করে?

—কেন গোলায় ধান আছে, আমি যা পাব, সেটা বাড়তি হবে।

—রমণী চাটুজ্জে এবার নাকি আমাদের চাষ করতে দেবে না।

—কেন?

—ভাগচাষী রাখবে না।

—ঠাকুরদার আমল থেকে আমরা চাষ করে আসছি, আর আজ না বললেই শুনবে কে? জমির ওপর আমাদের স্বত্ব জন্মে যায় নি? কে বললে এ কথা?

—ও বাড়ির কাকা বলছিলেন।

—লক্ষ্মণ-কা?

—হ্যাঁ। বাবা চাষ দেবার কথা বলতে, ও বাড়ির কাকা ও কথা বললেন।

—বাবা কি বললেন?

—কাল মাঠে লাঙল দিতে যাবেন। উনি কারোর বাধা মানবেন না।

—বাধা কেন মানবেন?

—রমণী চাটুজ্জে নাকি লেঠেল এনেছে।

—বাজে কথা।

পরমেশ তাকায় আকাশের দিকে। নির্মেঘ আকাশ। দুপুরের পোড়া-আকাশে শংখচিল ডানা মেলে রোদ পোহায়। ধান-খইরিরা ঝাঁকে ঝাঁকে মাঠে নেমে আসে। কিচির-মিচির করে; ছোট ছোট ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে কাক-তাড়ুয়া। বাতাসে তার ঢোলা জামা কাঁপতে থকে। চাষীর ছেলেরা 'চিললো-চিললো' করে ঢিল ছোঁড়ে ধান-খইরির ঝাঁকে। পাখিগুলো ছিটকে পড়তে থাকে। বাগদী-তেওরের মেয়েরা শামুক কুড়োয়। নয়ানজুলীতে চাটনি-জাল দিয়ে কুঁচো-মাছ ধরে। কোমরে দড়ি দিয়ে-বাঁধা ছুঁতো-হাঁড়িটা পেছনে ভেসে যায়।

—কোথা যাওয়া হবে?

পরমেশ সামনে তাকায়। একটা বুড়ো লোক। হাতে তকলি। মাছ-ধরা জালের সুতো তৈরি করে।

—নলহাটি।

—কাদের বাড়ি?

—সাঁপুইদের।

—ঠাকুরের নাম কি?

—জগন্নাথ সাঁপুই।

—শ্রাবণ মাসে রমণী চাটুজ্জের লেঠেলরা মাথা ফাটিয়ে গেছল?

—হ্যাঁ।

চাঁপার চিঠিতে পরমেশ খবর পেয়েছিল। তার কেমন ঘোর লেগেছিল। চাঁপার চিঠিটা বার বার পড়েছিল। জগন্নাথ মার খেয়েছিল চাষ দিতে গিয়ে। মাথা ফেটে গেছল। দাঙ্গা বেধেছিল মাঠে। চাঁপার না কি ভীষণ ভয় করছিল। পুলিশ এসেছিল। কজন চাষীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল দাঙ্গার অভিযোগে।

শুধু খবর। আসল ব্যাপার চাঁপার চিঠি পড়ে বোঝা যায় নি। পরমেশ গাঁয়ে ফিরেছিল। জগন্নাথের মাথায় বিরাট ব্যাণ্ডেজ। রোদে-পোড়া মজবুত কালো দেহে লাঠির দাগ। ডোরা ডোরা কালসিটে। মুখে-চোখে উত্তেজনা। একটা বুনো মোষ ফুলছে, ফুঁসছে, দুষমনকে বাঁকা শিঙে ফেঁড়ে ফেলবার জন্যে দুরন্ত ক্রোধে খুর দিয়ে মাটি ক্ষতবিক্ষত করছে।

জগন্নাথের এরূপ পরমেশ দেখে নি। চিরকাল সে নির্বিবোধ মানুষ। মাঠের কাজ করে। বিরামহীন খাটুনি। বসে থাকতে জানে না। মা মাঝে মাঝে বলত—একটু কি জিরুতে ইচ্ছে করে না?

—চাষার আবার জিরোনা।

—একটু কি ঘরে-দোরে থিতু হতে নেই?

—বড় বৌ, চাষার বাড়ি জন্মে শিখেছি, জমির পেছনে লেগে থাকতে হয়। বেটি বড় সোহাগী। লেগে না থাকলে অভিমান করে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

নিপাট ভালো মানুষ। সংসারে কি হয় না-হয় তা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায় না। টাকা-পয়সার হিসেব মা রাখে। তার শুধু একটা নেশা ছিল—তাড়ি খাওয়া। মা বলত—ও ছাই-পাঁশ গেলো কেন?

—মাঠের কাজে গা-গতর আটড়ে যায়। তাড়ি না খেলে টাটানি মরে না।

পরমেশের বিয়ের পর মা একদিন বলল—আর ওসব খেও না, বাড়িতে বৌ এসেছে, কি মনে করবে?

—খাব না, বলছ? বৌমা কি মনে করবে? বেশ, খাব না।

জগন্নাথ তার কথা রেখেছে। নেশা-ভাঙ আর কোনদিন করে নি। বর্ষাকালে জলে ভিজে বাড়ি ফিরেছে। পেখেটা মাথা থেকে নামিয়ে চাঁপাকে বলত—বৌমা, একটু চা কর, জাড় ধরেছে।

এই তার বাবা। সারা জীবন জমি নিয়ে পড়ে আছে। সুখী, শান্ত, সহজ, সরল চাষী। শহরের কথা সে জানে না। গাঁয়ের বাইরে যে আরো একটা বড় জগৎ আছে, সে সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু সে মাটি চেনে, আকাশ চেনে, চেনে মেঘের হরেক রূপ।

তাকে দেখে জগন্নাথ বলেছিল—তোকে কে খবর দিল?

—তোমার বৌমা। কেমন আছ?

—আমি বৌমাকে বারণ করেছিলুম তোকে খবর দিতে, তোর সামনে পরীক্ষা না! আমার কিছু হয় নি, ভাল আছি। তুই এখানে থাকিস নি, চলে যা।

চাঁপা বলল, লাঠির চোট খেয়ে জগন্নাথ মাঠে পড়ে গেসল। রক্তে মাঠের কাদাজল লাল হয়ে উঠেছিল। হাতে তখনও ধানের চারার গুছি ধরা ছিল। লক্ষ্মণ-কা ও অন্যান্য চাষীরা তার সংজ্ঞাহীন দেহ বয়ে এনেছিল আগড়ের ওপর শুইয়ে। মানুষটা জ্যান্ত কি মরা মালুম হচ্ছিল না। মাথা দিয়ে তখনও ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছিল।

লক্ষ্মণ-কা বলেছিল—জগাদা' মায়ের দুধ খেয়েছে। পিঠে-পাছায় লাঠির ঘা মারছে শালার পো-রা কিন্তু জগাদা'র ভ্রূক্ষেপ নেই; চারা লাগিয়ে যাচ্ছে। শেষমেষ মাথায় লাঠি চালিয়ে কাবু করে ফেলল জগাদাকে। এখনকার মত কাজ শেষ হয়েছে। ধান-কাটার সময় দেখব, শালা রমণী চাটুজ্জের লেঠেলরা কি করে।

—ধান কাটবে?

—কাটবো না, হকের জিনিষ ছেড়ে দেবে?

—পুলিশে লোক ধরে নিয়ে গেছে?

—গেছল। সে লোক উকিল জামিনে খালাস করে এনেছে।

চারদিক চুপ। গ্রাম ঘুমিয়ে আছে গাছপালার ছায়ায়। শহরের কোলাহল এখানে নেই। এখনকার মানুষ লোভে উন্মুখ নয়, উন্মত্ত নয় ক্ষমতার গদি অধরাকে ধরবার জন্যে। শহরের লোক মুখ চেপে ফেলে, জিগির তোলে অত্যাচারের, আওয়াজ দেয় প্রতিবাদের। ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে শহরে আকাশ-বাতাস দিনরাত কোলাহলমুখর, কলরব চঞ্চল।

এখানে বিশাল আকাশের তলায় গাছের ছায়ার নিচে লোকগুলো নীরব। বঞ্চনার ইতিহাস ওদের সর্বাঙ্গে লেখা।

মে দিন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এইদিন সূর্যেরো আগে
পৃথিবীর প্যাভেলেরা জাগে।

তারা পায়েহাটা রাস্তাগুলিকে
আগুনের মতো বানায় ;
তারা দুহাতের শিকল খসিয়ে
ভাঙনের গান গায়।
ঊর্ধ্বে রক্তপতাকা, হাজার রক্তজবা
মানুষের খুনে লাল—
তারা গান গায়, 'মানুষ আমরা মানুষ......
এসে গেছে আজ হিসেব নেবার কাল।'

এইদিন প্যাভেলের মা
ছুঁড়ে ফেলে দেয় কান্না।

মিছিলে মিছিলে কে জাগে ?—
মানুষ জাগে।
'দুনিয়ার মজদুর, এক হও! দুনিয়ার মজদুর!
দ্যাখো, প্যাভেলেরা হেঁটে যায় ঐ আগে।
পিছনে আসেন মা—
আর না, কিছুতে না! দিনরাত্রির উপোস সইবো
দুনিয়ার মজদুর এক হও! দুনিয়ার মজদুর.....?
'শিকল আমরা ভাঙবোই......দুষমন!......হুঁসিয়ার!'

অত্যাচার ওদের নিত্য পাওনা, অনশন ওদের চির সংগী। দেনাদার হয়ে ওরা জন্মায়, দেনাদার হয়ে বেঁচে থাকে, দেনাদার হয়ে মারা যায়।

ওরা কোনদিন গর্দান খাড়া করে দাঁড়াবার কথা কল্পনা করতে পারে না। ওরা জানে না, ওদের রক্তে কোনদিন আগুন জ্বলতে পারে। ওদের নিস্তরঙ্গ জীবনে যে কোনদিন সাগরের কল্লোল ধ্বনিত হবে, ওরা ভাবতে পারে না।

চাঁপার চিঠিতে পরমেশ জানতে পেরেছে, জগন্নাথ ধান কাটার জন্যে বদ্ধ-পরিকর। গ্রামের সব চাষীরা না কি তৈরি হচ্ছে। ওদিকে রমণী চাটুজ্জে হাত গুটিয়ে বসে নেই। ধান-কাটার মোকাবিলা করবার জন্যে সে তার সব শক্তি প্রয়োগ করবে।

আকাশের রোদ কমে আসে। দূর গ্রামের গাছের কোলে কোলে কুয়াশার ধূসর স্তর জমে ওঠে। ধানখইরির দল উড়ে চলে। শূন্য আকাশে বকের দল ডাকতে ডাকতে ফিরে চলে। গরুর হাম্বা রব মাঠে মাঠে প্রতিধ্বনিত হয়।

বাড়িতে পৌঁছতে মা বলে—আগে খবর দিলি না কেন, ইস্টিশানে লোক যেত।

—কি-ই-বা জিনিষ!

মা কেমন শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়। তার মুখে হাসি নেই। পরমেশ চিন্তা করেছে, সে বাড়ি ফিরলে মা বেজায় খুশি হবে; কত না আনন্দ করবে। কিন্তু কোথা সে আনন্দ! একটা চিন্তার কালো ছায়া মা'র মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

চাঁপা আসে। পরমেশ বলে—কেমন আছ? তুমি আজ কেন এলে?

—কেন কি হয়েছে?

—বাবা কাল ধান কাটতে যাবে। ভীষণ না কি গোলমাল হবে। গাঁয়ের চাষীরা সব একজোট্টা হয়েছে। জান, আমার ভীষণ ভয় করছে।

—ভয়ের কি আছে?

—ওরা যদি আবার বাবাকে মারে?

চাঁপা কেঁদে ফেলে। হ্যারিকেন জ্বলে। ঘরের দেয়ালে চাঁপার কালো ছায়া কেঁপে কেঁপে ওঠে। রান্নাঘর থেকে টুকটাক খুচরো শব্দ ভেসে আসে। পরমেশ কিছু বলতে পারে না।

সন্ধ্যের পর গ্রামের রাস্তা আঁধারে ছাওয়া। ঝিঁঝিঁ ডাকে। জোনাকি জ্বলে। ঝোপে-ঝাড়ে। আকাশে অগুণতি তারা। ভাসা-ভাসা কথা শোনা যায়। তাকে দেখে একটা কুকুর ডেকে ওঠে।

—কে যায়?

—আমি পরমেশ।

আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে লক্ষ্মণ-দা। সংগে আরো ক'জন। অন্ধকারেও সে সবাইকে চিনতে পারে—লোচন, লেটো, বদন, বসির, রমজান। সকলের হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। চাপা উত্তেজনায় ওরা চঞ্চল। মাঝে মাঝে লাঠি ঠোকে মাটিতে।

—রাতে এমন করে রাস্তায় ঘুরিস নি, বাড়ি যা।

—কেন?

—পরে বলব।

তার রাতে ভাল ঘুম হয় না। বার বার মনে হতে থাকে, সে যেন তার একান্ত চেনা পরিবেশকে হারিয়ে ফেলেছে। লোচন-বসির ওরা যেন অনেক দূরের মানুষ। ওদের চেনা যায়, বোঝা যায় না; ধরা যায়, ছোঁয়া যায় না। ওরা আলাদা জগতের লোক।

আর বোঝা যায় না জগন্নাথকে। ভাত খাবার সময় পাশাপাশি বসেছিল। একমনে ভাত খেয়ে যাচ্ছিল। কোন কথা নেই, নেই কোন জিজ্ঞাসাবাদ। বাঁদিকের কপালে বিরাট ক্ষতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটা নতুন কেউ,—তার বাবা জগন্নাথ সাঁপুই নয়।

গাজনের মেলার সং জগন্নাথ নয়। মহাদেব সাজত। সারা গায়ে ছাই; মাথায় জটা; কোমরে বাঘছাল-ছাপা কাপড়। কানে ধুতরো ফুল। বাড়ির দরজায় এসে হেঁকে বলত—কই গো অন্নপূর্ণে, ভিক্ষে দাও, ভোলা মহেশ এয়েছে।

সকলে হাসত। মা-ও বলত—কত রঙ্গই জান!

কিন্তু পাশে বসে যে জগন্নাথ ভাত খাচ্ছিল সে আলা-ভোলা পাগল শিব নয়। একটা কঠিন শপথ আঁকা রয়েছে সারা মুখে। চোখে ধ্বংসের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে।

সকাল হয়। গাছ-গাছালিতে পাখি ডাকে। কাঁচা রোদ ছড়িয়ে পড়ে গাছের মগডালে।

পঞ্চাশ-ষাটজন চাষী জমায়েত হয় তাদের বাড়ির সামনে। কারো হাতে লাঠি; কারো হাতে কাস্তে। সরল নিরীহ চাষীরা হঠাৎ যেন পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়েছে। কালো কালো শরীরের মাংস-পেশী দুরন্ত উত্তেজনায় বাচ্চা সাপের মত কিলবিলিয়ে ওঠে। ওরা মাঠের দিকে চলতে শুরু করে।

পরমেশ এগিয়ে আসে। চাঁপা বলে—তুমি যাবে না কি?

পরমেশ বলে—বাধা দিও না, তোমার ছেলের জন্যে আমাকে যেতে দাও।

মিছিল এগিয়ে চলে। রোদ লেগে কাস্তে ঝলসায়। একটা স্থির সঙ্কল্প যেন বাস্তবে রূপ ধরে এগিয়ে যায় ধানের ক্ষেতের দিকে। বাতাসে ভেসে আসে পাকা ধানের গন্ধ। পরমেশের মনে পড়ে—

কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান?

আমার ক্ষুধার অন্ন পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ।

মিছিলের চলার তালে তালে মাটি কেঁপে ওঠে থরথর করে। পরমেশের মনে হয়, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জাগছে। প্রচণ্ড অগ্নিজ্বালা বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে তার অন্তরকে। অসীম উত্তেজনায় যেন সে কাঁপছে।

মাথার ওপর প্রথম সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়ে।

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

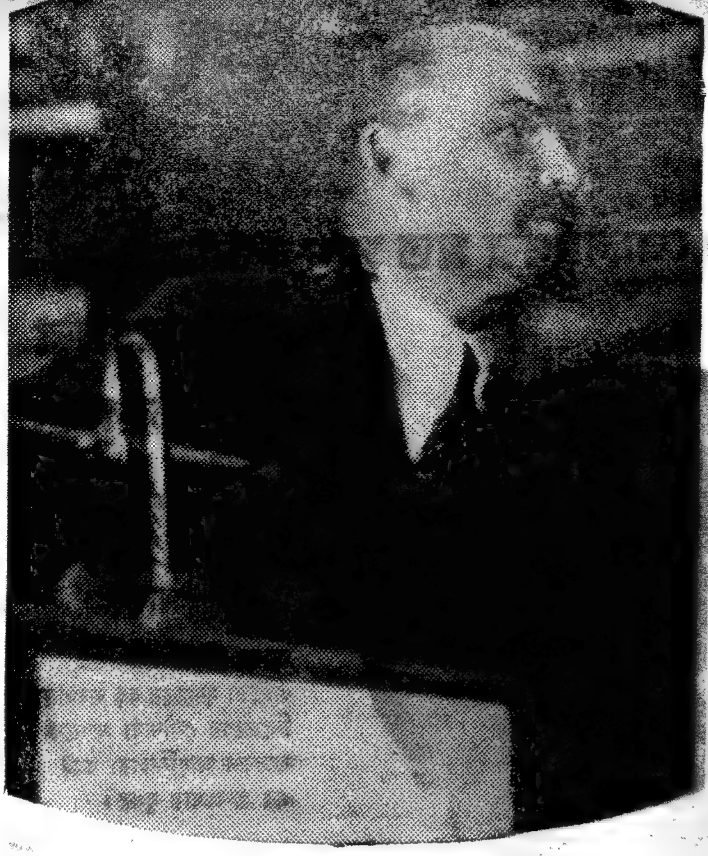

প্রবন্ধ ঃ লেনিনের জীবনের শুরু থেকে অক্টোবর বিপ্লব এবং লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বলশেভিজমের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়টা এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকটি লেখা হয়েছে ব্রেশ্‌টিয়ান স্টাইলে। কথক এ নাটকের একজন চরিত্র, যেমন স্টোরি-টেলার রয়েছেন ককেশিয়ান চক্‌ সার্কলে। সমস্ত ঘটনাই প্রায় ঐতিহাসিক—জায়গায় জায়গায় ঘটনাগুলোকে ভালভাবে বোঝাবার জন্য, সিনেম্যাটোগ্রাফী এবং স্লাইডসের ব্যবহার দরকার হবে। দৃশ্যসজ্জা সাজেশটিভ হলেই ভাল। অভিনয়ে যথেষ্ট এলিয়েনেশনের ভাব রাখতে হবে নট-নটীদের। কারণ কিভাবে মহানায়ক লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়াতে ডিক্টেটরশিপ অভ্‌ দি প্রলিটেরিয়েটের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার বাস্তব দিকটাকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই এ নাটকের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অভিনয় এমনভাবে হবে যাতে দর্শক সম্পূর্ণ সচেতন মন নিয়ে নাটকের ঘটনাবলী বিশ্লেষণের সাহায্যে বুঝতে পারেন। এইবার নাটকের প্রথম দৃশ্যে চলে আসা যাক ঃ

॥ ১ ॥

[কার্টেন উঠলে দেখা যাবে স্টেজের মাঝামাঝি জায়গায় একটি টেবিল পাতা রয়েছে—তার দুপাশে কয়েকটি চেয়ার। কিছুক্ষণ স্টেজ খালি থাকবে—অল্প পরে একজন কথক ঢুকবে—সে দর্শকদের সামনে এগিয়ে এসে বলতে থাকবে ঃ]

কথক ঃ ১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল—ভল্গানদীর ধারে সিমবার্স্ক শহরে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো। ভবিষ্যতে এই শিশুটিই তার মাতৃভূমিতে এবং সারা বিশ্বের মানবমনের চিন্তাধারায় এনেছিল এক বিরাট পরিবর্তন। যারা শোষিত, যারা পদদলিত, যারা বুভুক্ষু—সেই শ্রমিক এবং কৃষকদের সে শেখালে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে—শোষক এবং মুনাফাখোরদের হাত থেকে শাসনযন্ত্র কেড়ে নিতে, ছিনিয়ে নিতে—শেখালে সাম্যবাদের মন্ত্র। আজ তাই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে সাম্যবাদের জয়গান—গাইছে কৃষক, শ্রমিক, বঞ্চিত মেহনতী মানুষের দল—আর এই জয়গানের নিনাদে থেকে থেকে কম্পিত হচ্ছে, ধনতন্ত্রবাদের এতদিনের প্রতিষ্ঠিত সোনার-সিংহাসন, ভেঙে যাচ্ছে মুনাফাখোরদের সুখনিদ্রা। এই শিশুর নামকরণ হয়েছিল ভ্যাডিমার ইলিচ উলিয়ানভ। তার বাবা নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ জন্মেছিলেন আস্ত্রাখানের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে সম্পূর্ণ নিজের মেধাবলে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। পেশা নেন শিক্ষকের—পদোন্নতি হতে হতে সিমবার্স্ক গাবার্নিয়ার স্কুলগুলোর ডিরেক্টর হয়েছিলেন। নিকোলায়েভিচ ছিলেন উদার মনের মানুষ—সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য এবং ব্রত। শিশুটির মা মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ছিলেন ডাক্তারের মেয়ে—লেখাপড়া শিখেছিলেন বাড়িতে। বহু ভাষা জানতেন মারিয়া, সাহিত্য এবং সঙ্গীতে ছিলেন পারদর্শী। দৃঢ় চরিত্রের মহিলা—বুদ্ধিমতী, শান্ত এবং সংস্বভাবের। ছটি সন্তানের জননী ঃ আনা, আলেকজাণ্ডার, ভ্যাডিমার, অলগা, ডিমিত্রি এবং মারিয়া। প্রত্যেকটি শিশুই বিপ্লবের আদর্শ সামনে রেখে বড় হয়ে উঠেছিল। খেলাধুলো এবং হৈ-চৈ করার ব্যাপারেও তারা কমতি ছিল না। ভ্যাডিমার স্কুলে প্রত্যেক পরীক্ষাতেই পরস্পর পেরে পাশ করতো। অল্প বয়সেই সে বিখ্যাত রাশিয়ান সাহিতিকদের লেখা পড়ে ফেলেছিল। যে সময়ের কথা বলছি তখন রাশিয়াতে ক্যাপিটেলিজম দ্রুতগতিতে বিস্তারলাভ করছে। চারদিকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কল-কারখানা। হাজার হাজার শ্রমিক পেটের ধান্দায় কাজ নিচ্ছে শ্রমিকের, সারাদিন খেটে মাথার ঘাম পায় ফেলে যা কামাচ্ছে তাতে তাদের একবেলাও পেট ভরা খাবার মিলছে না, কিন্তু মালিকদের লাভের অঙ্ক ক্রমাগত ফেঁপে উঠছে, এ তো হল

উলিয়ানভ পরিবার। মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ও ইলিয়া নিকোলায়েভিচ এবং তাঁদের সন্তানসন্ততি।
(ফটো: ১৮৭৯)

নতুন কল-কারখানা মালিকদের কীর্তি-কাহিনী। এ ছাড়াও আগে থেকেই কৃষকদের ওপর চলে আসছিল বহুকাল থেকে জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার। বালকটি যখন স্কুলে পড়ে তখন থেকেই এসব সমস্যার চিন্তা তার মনকে পীড়িত করতো। ১৯১৭ সালের সাময়িক বুর্জোয়া সরকারের প্রধান এ কেরেনস্কির বাবার নাম এফ্‌ কেরেনস্কি—ভ্ল্যাডিমার যে জিমনাসিয়ামে পড়তো, তিনি ছিলেন সেখানকার প্রধান শিক্ষক। একদিন কেরেনস্কির ঘরে তাঁর সঙ্গে ভ্ল্যাডিমারের যেভাবে কথোপকথন হয়েছিল সে দৃশ্যটি এবার দেখানো হবে:

[কথক চলে যাবেন। বই হাতে কেরেনস্কি এসে টেবিলের মাঝের দিকের চেয়ারটিতে বসবেন। বই দেখতে থাকবেন—কিছুক্ষণ বাদে ভ্ল্যাডিমার এসে ঢুকবে—সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেরেনস্কি চোখ তুলে তাকাবেন এবং তাকে বসতে ইঙ্গিত করবেন—তারপর ড্রয়ার খুলে একটা খাতা বের করে বলতে থাকবেন:]

কেরেনস্কি—ভ্ল্যাডিমার! তুমি আমাকে হতাশ করেছ! (বালক লেনিন কি বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে) না, না, আগে আমাকে বলতে দাও! কি পাগলের মত সব কথা পরীক্ষার খাতায় লিখেছ? "বঞ্চিতের দল", "শোষিতের শ্রেণী", "মেহনতী মানুষকে যারা ঠকিয়ে খাচ্ছে"—কি সব পাগলের প্রলাপ বকেছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়েছিল "মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য মানুষকে সারাজীবন কিভাবে সাধনা করতে হয়।" তোমাদের ক্লাসের সব থেকে খারাপ ছেলেটিও দু'-চারটে সঠিক জবাব দিতে পেরেছে—লিখেছে যে, "ছেলেবয়স থেকে শ্রমশীল হওয়া দরকার, অধ্যবসায় না থাকলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, সংযম অভ্যাস করা উচিত"—আর তুমি কি না ক্লাসের সবসেরা ছাত্র হয়ে উন্মাদের প্রলাপ উদ্গার করে গেছ তোমার উত্তরপত্রে: তুমি লিখেছ—"মানুষের জানা দরকার সব মানুষই সমান—কেউ কারোর থেকে বড় বা ছোট নয়—প্রত্যেক মানুষেরই উচিত নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজের সবরকম দাবি আদায় করে নেওয়া—মন থেকে দাসত্বের ভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজেকে গড়ে তোলা"—আর কত বলবো? এসব কথার মানে কি বলতে পার?

বালক লেনিন—কিন্তু এই তো সত্যি কথা স্যার। সামান্য কয়েকজন লোক যদি দেশের বেশির ভাগ মানুষকে বঞ্চিত করে রাখে—যারা দিন-

এন. ঝুকভ অঙ্কিত লেনিনের একটি ছবি

রাত্রি মেহনত করে কল-কারখানার উৎপাদনের কাজ চালাচ্ছে, মালিকেরা যদি ক্রমাগত তাদের শোষণ করে......

কেরেনস্কি—(হো হো করে হেসে উঠবেন) আরে থাম, থাম। কি পাগলের মত যা তা বকছ? মালিক না থাকলে কল-কারখানা খুলতো কে? তাঁরা গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে রাশিয়াতে শিল্পযুগ শুরু করেছেন—কত শ্রমিক তাঁদের কারখানায় কাজ পেয়ে নিজেদের রোজগারের পথ খুঁজে পাচ্ছে—বিনা পয়সায় খাটছে কি তারা? ন্যায্য বেতন পাচ্ছে।

বালক লেনিন—না ন্যায্য বেতন পাচ্ছে না স্যার—তাই তারা বঞ্চিত। মালিকেরা সারাদিন তাদের গাধার মত খাটিয়ে নিচ্ছে, প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে—আর মুনাফা লুটছে নিজেরা......

কেরেনস্কি—তুমি কি বদ্ধ পাগল হয়ে গেছ ভ্যাডিমার? মালিকদের যখন লোকসান হয়, তার দায় কি শ্রমিকদের ঘাড়ে এসে পড়ে? পড়ে না—তেমনি যা লাভ হয় সেটাও তাদেরই প্রাপ্য।

বালক লেনিন—লোকসানের সমস্ত দায়িত্ব মালিকের। কারণ অযোগ্য পরিচালনা না হলে ব্যবসায় লোকসান হতে পারে না। আর লাভের বেলায় শ্রমিকদের লভ্যাংশ ভাগ করে না দিলে সেটা ঘোরতর অন্যায়—কারণ লাভের ব্যাপারে মেহনতের অবদানও কম নয়। সেই মেহনতের দাম তাদের দিতেই হবে।

কেরেনস্কি—কি চমৎকার তোমার বিচারশক্তি! (আবার হো হো করে হেসে উঠবেন) লাভের বেলায় শ্রমিক অংশীদার—লোকসানের বেলায় কিন্তু তাকে পুরো মাইনে দিতে হবে!

২০, মূল্যবান রিস্টওয়াচ ও ৪টি বহুমূল্য উপহার। প্রত্যেক গ্রাহক টর্চ লাইট

ব্যাটারী সহ, ফাউন্টেন পেন, সিগারেট লাইটার ও ১টি সুদৃশ্য মজবুত নিকেল কেস ডামি রিস্টওয়াচ (৩ বঃ গ্যাঃ) পাইবেন। ডাক মাশুল অতিরিক্ত।

ইস্টার্ন ওয়াচ কোং (B.W.)

পোঃ বঃ ১২২২২, কলিকাতা—৫।

(আবার হা হা করে হাসতে থাকবেন)।

বালক লেনিন—হ্যাঁ, কারণ লোকসানের জন্য সে দায়ী নয়। শ্রম সে এক্ষেত্রেও করে, অর্থাৎ তার যা করণীয় তা সে করে—কিন্তু মালিক এক্ষেত্রে ঠিকমত ব্যবসার পরিচালনা করতে পারে নি বলেই লোকসান হয়।

কেরেনস্কি—তোমার মাথা হয়! আর থেকে থেকে তুমি তোমার প্রবন্ধে চার্নিশেভস্কির মতামত তুলে নিজের উদ্ভট থিওরিগুলো প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছ।

বালক লেনিন—ওঁর বিখ্যাত রচনা 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' বইটা থেকেই কোটেশন দিয়েছি।

কেরেনস্কি—আমার মাথা কিনেছ। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি ভ্যাডিমার ইলিচ, এ লোকটার নাম ভবিষ্যতে আমার কাছে উচ্চারণ করবে না। ওর কত বড় ধৃষ্টতা, মহামান্য জারের সম্বন্ধে পর্যন্ত ও কতকগুলো কদর্য উক্তি করেছে ওই বইটাতে। আমাদের জার অত্যন্ত সদাশয় এবং মহানুভব বলেই ওই বাজে বইটাকে এখন পর্যন্ত সরকার থেকে নিষিদ্ধ করা হয় নি। আর চার্নিশেভস্কিকেও ওই সিডিশাস বইয়ের লেখক হিসাবে সাইবেরিয়াতে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে হচ্ছে না। যাকগে সে সব কথা! তোমাকে আমি স্নেহ করি। প্রতিবছর তুমি বৃত্তি পেয়ে পাশ করছ। ভবিষ্যতে তুমি আমার জিমনাসিয়ামের মুখোজ্জ্বল করবে, আমি এই আশা রাখি বলেই তোমাকে আলাদা আমার ঘরে সাবধান করে দিলাম। এখন তোমার ক্লাসে যেতে পার।

[মুখ নিচু করে বালক লেনিন চলে যাবে।]

কেরেনস্কি—(আবার হো হো করে হেসে উঠে) যত সব বাজে বই পড়ে ছেলেটার মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। আর ছেলের থেকে এ বিষয়ে অভিভাবকদেরই বেশি দোষ। ওর বাবাও তো শিক্ষক। ছেলে যে এই বয়স থেকেই কতকগুলো পাজী লোকের লেখা বাজে বই পড়ে গোল্লায় যেতে বসেছে, সেদিকে কি ওর বাপ-মা নজর দেয় না?

[আলো নিভে যাবে। অন্ধকারের ভেতরই মাইকের ভেতর দিয়ে এই কথাগুলো দর্শকেরা শুনতে পাবেন : রাশিয়ার বিপ্লবী যুবকেরা কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই কার্ল মার্কসের নামের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। অন্য ভাষায় ক্যাপিটেলের অনুবাদ সম্পর্কে মার্কসের কাছে প্রথম প্রস্তাব আসে রাশিয়া থেকে। মার্কস নিজেই বলেছেন যে তাঁর লেখা The Povertv of Philosophy এবং A contribution to the critique of Political Economy-র জনপ্রিয়তা অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়াতে অনেক বেশি। মার্কসও রাশিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহী এবং উৎসুক ছিলেন। রাশিয়ার অর্থনীতি, কৃষ্টি, সাহিত্য এবং জার ও জমিদার-বিরোধী জনগণের সংগ্রামের সম্পর্কে জানবার জন্য মনে মনে মার্কস যথেষ্ট কৌতূহলী ছিলেন। ১৮৬৯ সালে তিনি রাশিয়ান ভাষা শিখতে শুরু করেন এবং অল্পদিন বাদেই মূল রাশিয়ানে পুস্কিন, গোগোল, সল্টিকভ-সেড্রিন, ফ্লেরোভ্স্কি, হার্টজেন, ডোব্রোলিউবভ, চার্নিশেভস্কি এবং অন্যান্য রাশিয়ান লেখকদের বই পড়ে ফেলেন। মার্কস তাঁর ক্যাপিটেলের দ্বিতীয় সংস্করণে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন যে "বিখ্যাত রাশিয়ান পণ্ডিত এবং সমালোচক চার্নিশেভস্কি তাঁর Outlines of Political Economy According to Mill" বইতে দক্ষতার সঙ্গে বুর্জোয়া পলিটিক্যাল ইকনমির অন্তঃসারশূন্যতার কথা প্রমাণ করেছেন। লেনিনের জন্মের বছর, অর্থাৎ ১৮৭০ সালে মার্কস লিখেছিলেন—ফ্লেরোভ্স্কির এবং চার্নিশেভস্কির রচনা সত্যিই রাশিয়ার পক্ষে গৌরবের বস্তু। বিখ্যাত বিপ্লবী জি লোপাটিনের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ইনিই প্রথম রাশিয়ান ভাষায় ক্যাপিটেলের অনুবাদ করেন। মার্কস বলতেন যুদ্ধ দুই প্রকারের—এক—"লুণ্ঠনী মনোবৃত্তির," দুই—"মুক্তির সংগ্রাম।" প্রথমটি ন্যক্কারজনক—আর দ্বিতীয়টি প্রগতির পরিচায়ক। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন মার্কস—আর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সারা দুনিয়াতে চিরস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে। এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, সব দিক থেকেই লেনিন ছিলেন মার্কসের সুযোগ্য উত্তরসূরী।]

[ক্রমশ]

গ্রন্থমেলা

রম্যাণি বীক্ষ্য (অন্ধ্র পর্ব) : শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্যঃ নয় টাকা।

উপন্যাস রসসিক্ত এই ভ্রমণকাহিনীর লেখক শ্রীসুবোধ চক্রবর্তী বাংলার পাঠকসমাজের কাছে সুপরিচিত। রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। এর অর্থ রম্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব উদিত হল তার কথা। ভ্রমণের আনন্দ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা এ জিনিসটি ঠিকমত বুঝতে পারবেন। আর যাঁরা ভ্রমণ না করেও ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান রম্যাণি বীক্ষ্যের যে-কোন একটি খণ্ড পড়লেই তাঁরা সেটি পাবেন।

অন্যান্য খণ্ডগুলির মতই এই গ্রন্থে লেখক কেবলমাত্র অন্ধ্রের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পরিচয় দিয়েই থেমে যান নি। বহু পৌরাণিক কাহিনী ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও করেছেন। এছাড়া প্রাচীন ভারতের নানাবিধ শিল্প ও মন্দির স্থাপত্যের আলোচনা এমন মনোরম ভাষায় তিনি করেছেন যে, বইখানা আগাগোড়াই হয়েছে খুবই সুখপাঠ্য। পাণ্ডিত্যের কচকচি না থাকায় জানবার জিনিসগুলি সুন্দরভাবে জানানো হয়েছে এবং হৃদয়ের কথাগুলি বোধে জাগানো হয়েছে।

ভ্রমণকাহিনীর পাশে পাশে রম্যকাহিনীটিও সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি এবং গোপাল কেমন করে দুজনের কাছাকাছি এল। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গলাগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে ভ্রমণের সময় অন্ধের মধ্যে যে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল সে কাহিনী পাঠকদের ভাল লাগবে বলে আমরা মনে করি।

গম্ভীরা লোকসঙ্গীত ও উৎসব একাল ও সেকাল : প্রদ্যোৎ ঘোষ : চক্র এণ্ড কোং, ৬৪বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা-২৬ মূল্যঃ ৫ টাকা।

গম্ভীরা মালদহের লোকগীতি মহাদেবকে গ্রামের নেতা এবং প্রবীণ ব্যক্তি হিসাবে ধরে নিয়ে, সমাজের ভালমন্দ সব কিছুর জন্য তাঁকে দায়ী করে সেই কথাগুলি গম্ভীরা গানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করার প্রয়াস বহুদিন ধরে প্রচলিত। প্রতি বছর নতুন নতুন গান রচনা করে তারই মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে যে সব উন্নতি বা দুর্নীতিমূলক কাজ ঘটে সেগুলির কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। লেখক বলেছেন—'এখন গম্ভীরা উৎসব নয়, গম্ভীরা গানই আদরণীয়—তার সার্বজনীন মূল্যে; তার আবেদনে; রস-রসিকতা ও নির্মল হাস্যের প্রবহমাণ প্রস্রবণে। সে পল্লীর অজ্ঞ নিরক্ষর মানুষকে পর্যন্ত ধর্মোৎসবের মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই দেয় শিক্ষা।'

বাংলার লোকসংস্কৃতির এই মহামূল্যবান নিদর্শন সম্পর্কে শ্রীহরিদাস পালিত, 'আদ্যের গম্ভীরা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। এছাড়া শ্রীমণি বর্ধন এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এ বিষয়ে কিছু প্রবন্ধাদি রচনা করেন। সুতরাং এ বিষয়ে, বিশেষ করে আজকের দিনের গম্ভীরা গান সম্পর্কে একটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রদ্যোৎবাবুর সুলিখিত গ্রন্থটি সে অভাব অনেকখানি পূরণ করেছে বলে আমরা মনে করি।

সেদিন পলাশপুর—তারা দাশ। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২। দামঃ ৪·৫০ টাকা।

স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের জাতীয় জীবন ছাড়া সাহিত্যেও যে প্রেরণা দিয়েছিল তার প্রচুর নিদর্শন আছে। তারা দাশের 'সেদিন পলাশপুর' এই শ্রেণীর উপন্যাস। বিদেশী ইংরাজ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে পল্লী বাংলার যে সব নরনারী অকাতরে অশেষ দুঃখ, কষ্ট ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন, তাঁদের কেন্দ্র করেই এই উপন্যাস রচিত। গান্ধীজী স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে। এই অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র ভারতের জনসমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠল। সেই উত্তাপ শুধুমাত্র শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না সুদূর গ্রামের জনসাধারণের মধ্যেও সঞ্চারিত হল। এগিয়ে এল পুরুষের সাথে নারীরাও এই অসহযোগ আন্দোলনে। পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তির বিরুদ্ধে ... অভূতপূর্ব নয়, অচিন্ত্যপূর্ব।

পলাশপুর বাংলাদেশের এক অখ্যাত পল্লী। সেখানে বাস প্রধানত নমঃশূদ্রদের। দামিনী এই পলাশপুরের গৃহস্থঘরের বধূ। স্বামীর মৃত্যুর পর সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করল স্বাধীনতা সংগ্রামে। গ্রামের আরো পাঁচটি মহিলা তার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হল। বিদেশী বস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের দোকানে পিকেটিং চালাতে নারীদের ডাক দিলেন গান্ধীজী। সেই ডাককে উপেক্ষা করতে পারল না দামিনী ও তার সহকর্মীরা। মদনগঞ্জের বাজারে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করে দিল নারী স্বেচ্ছাসেবিকারা। এই পিকেটিংকে কেন্দ্র করে চলল পুলিশের অত্যাচার। শেষ পর্যন্ত দামিনী সহ কয়েকজন নারীকর্মীকে কারাবরণ করতে হল। এই আন্দোলনের পিছনে যেমন ছিল তদানীন্তন কংগ্রেসকর্মীরা তেমনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল মদনগঞ্জের খ্যাতনামা ডাক্তার অনঙ্গমোহন। উপন্যাসের মধ্যে মীরজাফর চরিত্রেরও অভাব নেই। পলাশপুরের পঞ্চানন কর্মকার পুলিশের সঙ্গে যোগসাজস করে দামিনীকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে এবং ডাক্তার অনঙ্গমোহনের গতিবিধির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। তবে তার কার্যাবলীর মধ্যে দামিনীর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশই প্রাধান্য লাভ করেছে।

এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ইতিহাসনির্ভর না হলেও এতে ঘটনাপুঞ্জের দিকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দামিনী ও অনঙ্গমোহন চরিত্রের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী আত্মজিজ্ঞাসা ও গভীর জীবন বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল তা লেখক সঠিকভাবে রূপায়িত করতে সক্ষম হন নি। তবে লেখক অনঙ্গমোহন ও দামিনীর মিলনের ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কোনরূপ তরল রোমান্টিকতাকে প্রশ্রয় দেন নি। তবে ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও উপন্যাসটির আবেদনে তীক্ষ্ণতা অনস্বীকার্য।

রাণীধূপ
বসাকস প্রডাক্টস

পাঠক মন

৪ঠা বৈশাখ ১৩৭৬-এর সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'সপ্তাহের বোঝা' পড়ে আনন্দ পেয়েছি। কৃত্তিবাস ওঝা বিভিন্ন সমস্যাকে যেভাবে আলোচনা করেছেন, তা পড়ে অনেক সময় নিজেরই মনের কথা বলে মনে হয়েছে। ন্যায্য দাবি আদায়ে গণতান্ত্রিক পন্থা আজ স্বীকৃত; কিন্তু তাই বলে জনগণের বিপদ সৃষ্টি করে তা করতে দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত নয়। ব্যারাকপুরের যে ঘটনার কথা কৃত্তিবাস ওঝা উল্লেখ করেছেন, তা সকলেরই স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করা উচিত—কারণ কোন অন্যায় কাজের জন্য ধৃত ব্যক্তি যদি বৃত্তিতে মেথর হন, তবে মেথরের ধর্মঘট হবে; যদি ট্যাক্সিচালক হন, তবে ট্যাক্সি ধর্মঘট; অথবা অন্য কোন বৃত্তি-সম্পন্ন লোক হন, তবে সেই বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ধর্মঘট। আর কোন-ক্রমে ধর্মঘটী ব্যক্তিদের বৃত্তি যদি গুরুত্বপূর্ণ (যেমন মেথরের বৃত্তি) হয়, তবে আর কথা নেই। কর্তাব্যক্তিদের ছোটাছুটি, মাথা নত করে আপোষের চেষ্টা করতে হবে; নইলে ভীষণ বিপদ, হাহাকার পড়ে যাবে। অতএব, অপরিহার্য বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ঘাঁটানো অনুচিত; অন্যায় করলেও না। ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই দাঁড়াচ্ছে নাকি?

সরকারী অফিসের কোন কর্মচারীর কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য গেলেই পান চিবোতে চিবোতে উত্তর আসে, "অন্যদিন আসবেন, মশায়।" অন্যদিনটি আগন্তুক ব্যক্তির কাছে কত কষ্টদায়ক ব্যাপার, তা কিন্তু কর্মচারীটি একবারও সহানুভূতির সাথে উপলব্ধি করেন না। এ অবস্থায় শুধু আমি নই, প্রত্যেকে প্রায় পড়েছেন। সরকারী কর্মচারীরা কতটা কাজ করেন আর কতটা গল্প করেন, তা তাঁরা নিজেরাই বিচার করে দেখতে পারেন। মাইনে বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করা অযৌক্তিক নয়, তবে কোন সহকর্মী কাজে অবহেলা করলে তার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে ওঠা উচিত। কারণ দেশের সেবায় তাঁদেরও গুরুদায়িত্ব রয়েছে।

—শ্যামলেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী
কলকাতা—৩২

"লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল? প্রসঙ্গে"

৭৩ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুমতীতে মুরশিদ তাঁর 'লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল' নিবন্ধে "বাহে ভাষার গান" কথাটি দ্বিধাহীন-ভাবে সংযোগ করেছেন। এ সম্বন্ধে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই—যদিও এটা তাঁর নিবন্ধের সঙ্গে সংযোগহীন, বাংলাদেশের ভাষার ইতিহাসে তিনি কোথায় 'বাহে ভাষার' সন্ধান পেয়েছেন জানি না। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বাংলা ভাষার যে উপভাষাগুলি আছে, তা হলো—রাঢ়ী, বারেন্দ্রী, বঙ্গাল, কামরূপী এবং ঝাড়খণ্ডী। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রচলিত ভাষা আছে, যা 'রাজবংশী ভাষা' নামে সর্বজনবিদিত। কতিপয় অতিশয় ভদ্র ব্যক্তি উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের 'বাহে' নামে চিহ্নিত করে তাঁদের প্রচলিত ভাষাকেও 'বাহে ভাষা' নামে অনুন্নত একটি বিরাট জনসমাজের প্রতি যে কটাক্ষপাত করে থাকেন, তথ্যাভিজ্ঞ মুরশিদ মহাশয়ও কি তাঁদের সমর্থন জানাচ্ছেন?

তিনি কি জানেন না, বাংলাদেশের বহু অভিজাত পত্র-পত্রিকায় এই 'বাহে' শব্দটি বহু বিতর্কিত এবং বহুভাবে আলোচিত? তিনি কি জানেন না দশম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা থেকে প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাজিকর' গল্পটি কেন বাদ দেওয়া হয়েছে। বাহে শব্দটি কোন জাতি কিংবা ভাষার প্রতীক নয়, এটি রাজবংশী ভাষার সম্বোধন-সূচক শব্দ মাত্র, তা কি তাঁর মোটেই জানা ছিল না? আমার প্রতিবাদমূলক আলোচনাকে উপেক্ষা করার ইচ্ছা থাকলে মুরশিদ মহাশয় যেন 'বাহে' ভাষার ইতিহাস সবিস্তারে বসুমতীতে লিখতে থাকেন এবং আমার ন্যায় অনভিজ্ঞরাও তা আহরণ করতে থাকব।

—শ্রীবাঞ্ছামোহন রায়
আমগুড়ি বাজার
জলপাইগুড়ি।

রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা প্রসঙ্গে

গত ৬ই এপ্রিল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে যে নারকীয় অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেছে তাতে প্রত্যেক সৎ নাগরিক যেমন মর্মাহত তেমন ভবিষ্যৎ নাগরিক-হয়েছেন।

এই সব কিশোর ও তরুণদের মস্তিষ্ক কারা চর্বণ করেছেন? বাঙালীর কপালে এই কলঙ্কতিলক কারা পরিয়ে দিল? বাংলার ইতিহাসে যা কোন দিন ঘটে নি—সেই ইতিহাস এই উঠতি মস্তানরা কেন সৃষ্টি করতে গেল? কেন শাড়ির টুকরো, ব্লাউজের টুকরো, অন্তর্বাস ও বক্ষাবরণ বিক্ষিপ্ত ছিল?

খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে এই অশালীন আচরণের কারণ পেতে বেশি বিলম্ব হবে না।

এক শ্রেণীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিক নামধারী পত্রিকা যেভাবে যৌন আবেদনমূলক উপন্যাস বা গল্পে, নারীশরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা, সাহিত্য সৃষ্টির নামে ছড়িয়ে কিশোর তরুণ ও যুবকদের মনকে বিকৃত করে তুলছেন, তাতে কিশোর ও তরুণরা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে নারীদেহের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তাদের সেই অবদমিত কৌতূহল দমন করার উদ্দেশ্যেই যত্র-তত্র ব্লেড চালিয়ে নগ্ন সৌন্দর্য উপভোগ করেছে।

এ বিষয়ে মস্তানদের কৌতূহলী করে তুলেছে কয়েকটি রাজ্যের চলচ্চিত্রও বটে। এই অশ্লীল সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র কিশোর, তরুণ ও যুবকদের ওপর বিকৃত প্রভাব কতটা বিস্তার করেছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনায় জানতে পেরেছি। প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকরা যেভাবে নারীর অঙ্গ বিশেষের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে আদিরসের অবতারণা করেছেন তাতে উঠতি এই মস্তানরা কেবলমাত্র কুমারী ও যুবতীদের নিগ্রহ করেই ছেড়ে দিয়েছে দেখে বিস্মিত হয়েছি। পাশব প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে যদি চরিতার্থ করতে উদ্যত হোত তাহলে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না।

যাই হোক প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে মস্তানরা অন্যত্রও এইভাবে মা-বোনদের আক্রমণ করতে পারে। সেদিকে যেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার তেমনি অশ্লীল সাহিত্যের লেখক ও পত্রিকা-গোষ্ঠীর লেখনীকেও স্তব্ধ করে দিতে আদর্শবাদী তরুণ ও যুবকদের এগিয়ে আসা দরকার।

—রত্নাকর, ডানপিটেদের
আসর, জলপাইগুড়ি

রঙ্গজগৎ

এ তো বড়ো রঙ্গ

"এ তো বড়ো রঙ্গ যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যা ভেল্কি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যা কাচের পান্না,
তাহার অধিক মিথ্যা তোমার নাকি সুরের কান্না ॥"

—(রবীন্দ্রনাথ)

শনিবারের সংবাদপত্রের একটা খবর পড়তে পড়তে হঠাৎ পংক্তি কয়টি মনে পড়ে গেল।

টালিগঞ্জ থেকে একটা মিছিল এসেছিল ডালহৌসিতে লালদীঘির লাল বাড়িতে। খর রোদের মধ্যে রূপালী পর্দার 'তারকারা' আর তাঁদের সঙ্গে কারিগর থেকে হুকুমবরদারের বাহিনী। তবে মেয়েরা এসেছেন লরীতে, আর নায়কর‍া জীপে। পদাতিকরা চিরদিনের পদাতিক! তাতে রক্ষা, নতুবা এই রোদে তাঁদের মাখন-মসৃণ শরীরের কি হত কে জানে। ডালহৌসির মেয়ে করণিকদের একটা অংশ সেই ভাবনায় টেবিল ছেড়ে রাস্তায় এসে ছটফট করছিল। আর পুরুষ করণিকরা যাঁরা ঝাণ্ডা হাতে 'লড়কে লেঙ্গে' হুঙ্কারে মিছিল করে রাস্তা বন্ধ করেন, যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন করে সর্বাগ্রে যাঁদের মাইনে বাড়িয়েছে, তাঁরা লাল নিশানের পরিবর্তে খর রোদে প্রেমের নিশান ধরেছেন। সংগঠনের নেতাদের অনুরোধ ও নির্দেশ তাঁরা গায়ে মাখেন নি। প্রেমের রঙে মন রাঙিয়ে আপাতত সব ভুলে শুধু তুমি আর আমি আছি প্রেমের ভুবনে—বলে উত্তমপন্থী হয়ে উঠেছিলেন।

এই 'তারকা মিছিল' কেন? কি এমন ঘটেছে যে, যার জন্য তারকা জগৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন? টালিগঞ্জ থেকে মিছিল করে আসতে হয়? তারকা প্রতিনিধিরা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যা বলেছেন তাতে মূল কথাটা বোঝা গেছে মিনার, বিজলী, ছবিঘর সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেছে, সুতরাং তার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা চাই; অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-কে মুক্তি পেতে দেবেন না। তার জন্যে পিকেটিং করতে হবে এবং তার সঙ্গে 'ইত্যাদি' ঘটতে পারে। তার জন্যে জনসমর্থনের একটা স্ট্রাটেজী রচনা এবং সরকারের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা। এই সঙ্গে অন্য নতুন চিত্রগৃহ খোলার দাবিও রাখা হয়েছে। কয়েকজন হুকুমবরদারের অতি উৎসাহে যুক্তফ্রন্টের 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে' শ্লোগানের অপব্যবহার করা হয়েছে। তবে মিছিলে সকলেই যে শিল্পী ও টেকনিশিয়ান ছিলেন এমন নয়, পরিবেশকদের অফিসের করণিক এবং পাড়ার চেনা মুখ গজা-ভজাকেও দেখা গেছে 'শিল্পী' হয়ে গেছে। তারকা মিছিলের আগমন যদিও যোশ, ভাবাবেগে, কিন্তু তা পরিণত হয়েছে তামাসায়।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী স্মারকপত্রের জবাবে প্রতিনিধিদের বলেছেন, চলচ্চিত্র জগতের সকলের সঙ্গে আলোচনায় বসে বিরোধ মীমাংসায় উদ্যোগী হতে—সেরূপ ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রীর এই জবাব যুক্তিপূর্ণ। প্রতিনিধিরা খুশী নাও হতে পারেন। আসলে বিরোধটা চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকের। উভয় পক্ষের কাগজপত্র পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনা করে যা বুঝেছি তাতে শিল্পীদের বিচলিত হবার মত কিছু নেই। দর্শকদের কোন দিকেই কিছু করার নেই। নিজেদের ঘরোয়া বিরোধের ব্যাপার-টাকে নিয়ে এত ঘটা করে মিছিল করে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আসার কারণ কি? সবাই আজকাল ১৪৪ ধারার অবরোধমুক্ত পেয়ে প্রতিদিন মিছিল করে যে-কোন তুচ্ছ ব্যাপারেও রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আসছে। সংরক্ষণের তারকাদেরও কি সেই রোগে পেয়েছে? একটা স্মারকপত্র নিয়ে কয়েকজন প্রতিনিধি এসে যে ব্যাপারটা সহজে আলোচনা করে যেতে পারতেন, সেক্ষেত্রে এত ঘটা করে ট্রাফিক বন্ধ করে, অফিসের কাজ-কর্ম অচল করে দেবার প্রয়োজন কি ছিল? গত বিশ বছরে যে শিল্পীদের কোন গণতান্ত্রিক ভূমিকা ছিল না, হঠাৎ তাঁরা যুক্তফ্রন্টের আমলে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। রূপজগতের অভিনব ঘটনা!

রাইটার্স বিল্ডিংসের সংগ্রামী কর্মচারীদের মত এই রূপপ্রবাহে ভাসতে পারলাম না, বরঞ্চ মিথ্যে ভেলকির রঙ্গ দেখতে পেলাম। —সুজন

'পরিণীতা' ছবিতে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

নাটকের কথা

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য নবীন

গত ১৩ই এপ্রিল রবিবার রবীন্দ্র সদনে শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় সুরঙ্গমার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য নবীন পরিবেশন করেন। সেই দিনটি ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস। নব-জাগ্রত ভারত ত্যাগ ও তপস্যায় সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সেদিন যে প্রতিবাদবহ্নি প্রজ্বলিত করেছিল তারই প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও চিরনবীনকে আবাহন করার জন্য শান্তিনিকেতনের শিক্ষাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে দু মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের আহ্বান জানান। সৃষ্টির উষা-কাল হতে প্রাণলোকের যে জয়বার্তা ঋতুর আবর্তনে ঘোষিত হচ্ছে, প্রকৃতির অন্তর হতে—তার দাক্ষিণ্যে ও কৃপণতায় যে অনন্ত প্রাণ উৎসারিত হচ্ছে নবীনে তাই প্রতিধ্বনিত। বিশ্বসৃষ্টির পটভূমিকায় রচিত বসন্তের এই আবাহনে নাটকীয় বিষয়বস্তু, ঘটনার সংঘাত বলতে যা বোঝায় তা নেই। কিন্তু নৃত্যে, গানে, দৃশ্যপটে ও কথায় রবীন্দ্রনাথের এ এক অপূর্ব সৃষ্টি, সকলেরই সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশনে, সেদিন যে রসলোকের সৃষ্টি হয়েছিল তার তুলনা নেই।

নবীন ও শাপমোচনের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম নৃত্যনাট্য রচনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় এই দুটি নৃত্যনাট্য ছাড়া আর কোন নৃত্যনাট্য সমগ্র ভারতে ও সিংহলের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী তাসের দেশ এবং আরও তিনটি নৃত্যনাট্য রচনার পর নবীন আর শাপমোচনের নাম বেশি শোনা যায় নি।

নবীনের অধিকাংশ নৃত্য-পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সকল রকম নাচের ছাঁদ ও আঙ্গিক-এর বিভিন্ন দিক নৃত্য-পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছে। তা ছাড়া ব্রহ্মদেশের পোয়ে নাচ, জাভার ভ্যাণ্ড নৃত্য এবং সিংহলী নাচও এতে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সুপরিকল্পিত। তবে ভাবের দিকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আঙ্গিকের দিকে ততটা নয়। সুরে, তালে, লয়ে, ছন্দে, আলোকসম্পাতে প্রত্যেকটি নৃত্য, প্রতিটি নৃত্যশিল্পীর নৃত্য অপূর্ব হয়েছে। নাচে বিশেষ করে পূর্ণিমা ঘোষ, শুক্লা সেনগুপ্ত, অরুন্ধতী চাকলাদার, শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত, ডেরিক মনরো প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। একক ও সমবেত প্রত্যেকটি সংগীতও সুগীত হয়েছে। মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, যন্ত্রসংগীত, আলোকসম্পাত নাট্যানুষ্ঠানের প্রত্যেকটি দিকই সুপরিকল্পিত। নাচে যেমন নানা দেশের নাচের সমন্বয় তেমনি গানেও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি গানেরই সুর রবীন্দ্রনাথ এতে নিয়েছেন। শ্রীনীলিমা সেন ও বুলবুল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে সেই সকল গানের করুণ রেশ অপূর্ব আবহ ও বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্র গীততীর্থ

গত ১৬ই এপ্রিল মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র গীততীর্থের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। সমবেত বেদগানের পর বিদ্যালয়ের সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পাঠান্তে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্তা শ্রীএণাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন: প্রসাদ সেন, বিভাস ঘোষ, মায়া সেন ও এণাক্ষী মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীকানুপ্রিয়া বসু। 'বসন্ত' গীতিনাট্যে সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেন ইন্দ্রাণী বসু, একা বসু, রীণা মুখার্জী, রত্না মুখার্জী, অভিজিৎ দাস। গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় নৃত্য পরিকল্পনা করেন।

'ইউ আর বিগ বয় নাউ' ছবিতে এলিজাবেথ হার্টম্যান।

'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য

১৯শে এপ্রিল বাটা ক্লাবে (বাটানগর) ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। নৃত্যে—কানাই মজুমদার, মৃদুলা চ্যাটার্জী, মঞ্জুলা

রূপকল্পনার নৃত্যনাট্য 'নবীন'-এ পূর্ণিমা ঘোষ ও শুক্লা সেনগুপ্ত

সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'শুকসারী' ছবির একটি দৃশ্যে অঞ্জনা ভৌমিক ও উত্তমকুমার

চ্যাটার্জী, সুতপা দত্ত, পাপড়ি বোস, নন্দিতা চক্রবর্তী, অনুপ শঙ্কর, নির্মল শঙ্কর, কমল ভট্টাচার্য, দেবল রায়, নীরেন্দ্র নাথ দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেন। অরুণা দে, ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তা, মায়া ভট্টাচার্য, তন্দ্রা রায়ের বিশ্বপ্রণাম (কথাকলি) নৃত্য উপস্থিত দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শকুন্তলা নৃত্যনাট্য রচয়িতা—বাদল রায় সূত্রধরের ভূমিকায় ছিলেন।

শিল্পী সংসদের 'তাপসী'

সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের রবীন্দ্রভারতী রঙ্গমঞ্চে হায়দ্রাবাদের নবগঠিত নাট্য সংস্থা শিল্পী সংসদের প্রযোজনায় উত্তরবঙ্গের সাহায্যার্থে 'তাপসী' নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকে প্রত্যেক শিল্পীই সুঅভিনয় করেন। বিশেষত তৃপ্তি মিত্রের তাপসী, শোভনা দত্তের সুতপা, পুষ্প গুপ্তের সুকুমার, অশোক ব্যানার্জীর দীপক ও সুনীল ব্যানার্জীর গোপেন সকলের প্রশংসাধন্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া সংগীত পরিচালনায় ধর্মজিৎ গুপ্তশর্মা, মঞ্চ-সংস্থাপনায় পুষ্প গুপ্ত ও আলোক-সজ্জায় দিলীপ চক্রবর্তী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন সুনীল ব্যানার্জী। সংসদের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১২৫১৲ টাকার ড্রাফ্‌ট্‌ প্রেরণ করা হয়।

গোর্কির 'মা'

গত ১৩ই এপ্রিল, রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে গোর্কির 'মা'র অভিনয় হয়ে গেল। প্রযোজনা করলেন 'টর্নাডো' নাট্যগোষ্ঠী। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীসুহৃদ চট্টোপাধ্যায়। সাম্প্রতিককালে প্রযোজনার ক্ষেত্রে এরূপ একটি বলিষ্ঠ নাটক নিঃসন্দেহে দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। সংলাপের বলিষ্ঠতা, নাট্যসংঘাত এবং নাট্যপরিস্থিতির সৃজনকৌশলে শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রশংসা পাবেন। চরিত্রানুগ অভিনয় যেমন প্রশংসনীয় তেমনি মানানসই আকৃতির চরিত্র নির্বাচন। টিম-ওয়ার্ক ভালো। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায়ের সংগীত প্রশংসা পাবার মতন।

মা'র চরিত্রে মীনাক্ষী গোস্বামী, খখলের চরিত্রে সুনীত বসু, পুলিশ অফিসার সৌরীন চৌধুরী ও নিকলাইয়ের চরিত্রে সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় যেরকম অভিনয় করেন সেরকম মণ্টু হালদারের জনৈক শ্রমিক ও তাপস চক্রবর্তীর ইয়েগর-ও সমস্ত দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। নাটকটির একটিমাত্র সেটের (মা'র ঘর) পরিকল্পনাও অতি সুন্দর। পরিচালনার কৃতিত্বও নাট্যকার সুহৃদ চট্টোপাধ্যায়ের।

স্টুডিও খবর

মহাকবি কৃত্তিবাস

নবগঠিত "রামায়ণ চিত্রম্"-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য বাংলার আদিকবি রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাসের জীবনী অবলম্বনে রচিত "মহাকবি কৃত্তিবাস"। "লবকুশ"-খ্যাত পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবিটির প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত এবং ইতিমধ্যে শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তিদারের সুরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে কয়েকখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে। নৃত্যবিদ্‌ গোপীকিষণের নির্দেশনায় কিছু নৃত্যাংশও ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে।

ছবিটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। পরিচালক শ্রীচট্টোপাধ্যায় বহির্দৃশ্য গ্রহণের স্থান নির্বাচন করতে ফুলিয়া, গৌড় প্রভৃতি স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

—ফটো বিউটি স্টুডিও—
সুন্দর ছবি তোলাতে হ'লে
ফটো বিউটিতে আসুন
৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কালী বাবুর বাজার (হাওড়া)
ফোন : ৬৭-৪৫২৬
(ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্কের নীচে)

"নল-দময়ন্তী"

মহাভারতের অনবদ্য প্রেমোপাখ্যান "নল-দময়ন্তী" অবলম্বনে রচিত পৌরাণিক ছবি "নল-দময়ন্তী" বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষিত। জয়দেব চক্রবর্তী ও সমীরণ মজুমদার প্রযোজিত জে এস প্রোডাকসন্সের "নল-দময়ন্তী" ছবিটি পরিচালনা করেছেন —গোপালকৃষ্ণ রায়। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও কালীপদ সেন সুরারোপিত এ ছবির সঙ্গীতাংশ সমৃদ্ধ হয়েছে—মান্না দে, সতীনাথ মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, গীতা দাস ও গঙ্গা দের কণ্ঠমাধুর্যে। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় রয়েছেন যথাক্রমে দিব্যেন্দু ঘোষ, সুনীল সরকার ও বিশ্বনাথ নায়ক। বেনেটকুমার এ ছবির নৃত্য-পরিচালক।

বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত "নল-দময়ন্তী" ছবিটি নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপদান করেছেন—অসীমকুমার ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী। অন্যান্য চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন—রবীন ব্যানার্জী, জহর রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু, দীপিকা দাস, পদ্মাদেবী, রেণুকা রায়, মণি-শ্রীমানী, নারায়ণ মুখার্জী, ধীরাজ দাস, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, গোপী চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, ইন্দিরা দে, লীনা চক্রবর্তী, সুস্মিতা দে, সীমা ভৌমিক রত্না ঘোষাল, তপন চ্যাটার্জী, সমন মুখার্জী, জীবনকুমার, মলিন মুখার্জী, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য, বিনয় মিত্র, জয়ন্তী, ঋষি ব্যানার্জী, শৈলেন গাঙ্গুলী, কল্পনা দাস প্রমুখ শতাধিক শিল্পী।

পারফেক্ট ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিটির পরিবেশক।

"প্রতিদান" মুক্তি প্রতীক্ষায়

নবগঠিত এম বি প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "প্রতিদান" বর্তমানে মুক্তির দিন গুণছে। যাঁরা নিজেদের নিঃস্ব করে যুগে যুগে কালে কালে জাতির ভবিষ্যৎ তৈরি করার মহান ব্রত উদ্‌যাপন করেন, আমাদের দেশের সেই সব অবহেলিত শিক্ষকসমাজের এক শরিককে কেন্দ্র করে এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—চিত্রপরিচালক অজিত গাঙ্গুলী। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন—শৈলেন মুখার্জী।

এই কাহিনীটির বিশিষ্ট চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন—কালী ব্যানার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, কাজল গুপ্ত, সত্য ব্যানার্জী, জহর গাঙ্গুলী, সুখেন দাস, নবাগতা সুচেতা ব্যানার্জী, জহর রায়, মলিনা দেবী, অনুভা গুপ্তা, কালীপদ চক্রবর্তী, রুমা গুহঠাকুরতা, প্রীতি মজুমদার, শীতল ব্যানার্জী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সুশীল দাস, সমরকুমার প্রমুখ।

সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির একটি দৃশ্য

'নতুন স্বপ্ন' ছবির মহরৎ

গত ১লা বৈশাখ শুভ নববর্ষে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে নবগঠিত শ্রীশঙ্কর প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে শঙ্কর রায়চৌধুরীর প্রযোজনায় "নতুন স্বপ্ন" ছবির শুভমহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহরৎ শিল্পী ছিলেন জ্যোৎস্না বিশ্বাস। মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দেন শিল্পী কালী ব্যানার্জী।

"নতুন স্বপ্ন"-র কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীমতী প্রিয়া ভদ্র। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—শ্রীশান্তনু। কালীপদ সেন ছবিটির সুরকার। চিত্রগ্রহণে আছেন —দিব্যেন্দু ঘোষ। চিত্রনাট্য রচনা ও সম্পাদনায় আছেন—বিশ্বনাথ নায়ক।

বিভিন্ন চরিত্রে এ-পর্যন্ত যাঁরা মনোনীত হয়েছেন—তাঁরা হলেন—কালী ব্যানার্জী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, নবাগতা লীনা চক্রবর্তী, রীতা চক্রবর্তী এবং বোম্বাইয়ের—শবনম।

সংবাদিকী

নাট্য সাহিত্য সম্মেলন

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের একাদশ বার্ষিক বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলন শুরু হচ্ছে বিশ্বরূপা থিয়েটারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ১লা মে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। চারদিন ধরে (১লা, ২, ৩ ও ৪ঠা মে প্রত্যহ সাড়ে ছ'টায়) চারটি অধিবেশন বসবে, সম্মেলনের প্রতিটি অধিবেশনে সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা মে মাসের ৫ ও ৬ তারিখে 'নো লাফিং ম্যাটার' (চেকোস্লোভাকিয়া) এবং 'নো আইডেণ্টিফিকেশন মার্ক' (পোলিশ) ছবি দুটি ফাইন আর্টস একাডেমি হলে দেখাচ্ছে।

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি তিনটি ফরাসী ছবি দেখাবে প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে। ছবি তিনটি যথাক্রমে 'লিফট টু স্ক্যাফোল্ড' 'দি স্কারলেট এণ্ড দি ব্ল্যাক', 'দি কাজিনস'। ছায়া সিনেমায় মে মাসের ৪, ১১, ১৮ তারিখ সকালে তিনটি বুলগেরিয়ান ছবি দেখান হবে। ছবি তিনটি 'পীস ডিক', 'দি রেস্টলেস হোম', 'দি হোয়াইট রুম'।

'[illegible]' ছবিতে ভেনসা রেডগ্রেভ। ছবিটি এলিটে চলছে।

বৈতানিকের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

প্রতিবারের মত এ বছরও 'মহর্ষি ভবনে' বৈতানিকের উদ্যোগে আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর ১০৮তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে "রবীন্দ্রসংগীতে আনন্দতত্ত্ব" শীর্ষক আলোচনা সহযোগে গান পরিবেশিত হবে। আলোচনা করবেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুষ্ঠানের পূর্বে 'নন্দিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতা'য় বিজয়িনীদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রবেশপত্রের জন্য 'বৈতানিক'—৪নং এলগিন রোড, কলকাতা—২০ ও 'বুকল্যান্ড'—১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা—৬, এই দুই ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মহাজাতি সদনে 'হিটলার'

আগামী ৯ই মে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মহাজাতি সদনে তরুণ অপেরা কর্তৃক 'হিটলার' অভিনীত হবে। এই নাটক যাত্রাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ইতিহাসের পাতা থেকে নতুন নতুন বিষয়বস্তু

॥ দশ ॥

[সোভিয়েট ছবির ধারাবাহিক ইতিহাস 'ইতিহাসের পাতা থেকে' সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। নয়টি কিস্তি বার হবার পর বন্ধ থাকে, কিন্তু বহু পাঠক-পাঠিকা চিঠি লিখে বাকি লেখাগুলি প্রকাশ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধ অনুযায়ী 'ইতিহাসের পাতা থেকে' পুনর্বার প্রকাশিত হচ্ছে]

বিশ দশকের সোভিয়েট ছবিতে দেখা গেল শিল্পশোভনতা বিকাশের এক নতুন জিজ্ঞাসা। নতুন নতুন বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হল বিপ্লবের ফলে দেশে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তার রূপ। প্রথমে নির্মাতারা ক্যামেরা ধরলেন ১৯০৫ সনের বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৭ সালের অক্টোবর এবং গৃহযুদ্ধের দিকে। ব্যাটলশিপ পটেমকিন, মাদার অক্টোবর, দি এন্ড অব সেন্ট পিটার্সবার্গ, আর্সেনাল এবং টুয়েন্টি-সিক্স কমিশার প্রভৃতি ছবিতে অদূর অতীতকে দেখা গেল। এসব ছবিতে বিপ্লবী চরিত্র ও ইতিহাসের ঘটনাবলী রূপ পেল, এই সঙ্গে সমসাময়িক দিনের ঘটনাবলী নিয়েও ছবি হল।

দেশে তখন অর্থনৈতিক পুনর্গঠন চলছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং বিদেশী যুদ্ধবাদীদের হস্তক্ষেপে দেশ ধ্বংসপ্রায় হয়ে গেছিল। খাদ্য সংকট, বেকারী, দারিদ্র্যে এক চরম অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে সুরু হল নতুন জীবন, নতুন নৈতিকতা, নারী-পুরুষের সম অধিকার, নতুন সমাজচিন্তার জন্য সংগ্রাম; এই সংগ্রাম এক নাটকীয় অবস্থা সৃষ্টি করল। এসব বিষয়বস্তুকে প্রধান করে নতুন পরিচালকরা এগিয়ে এল ছবি করতে।

অন্তর্বর্তীকালের সংঘাত মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় বিরাট আবেদন নিয়ে প্রকাশ হল ফ্রেড্রিচ এর্মলারের ছবিতে। তাঁর 'কাত্যা-দি এপলউম্যান' (১৯২৬) এক কৃষকের মেয়ের কাহিনী যে আপেল বিক্রয় করত এবং এক যুবক দস্যুর রক্ষিতায় পরিণত হয়েছিল। এক বুদ্ধিজীবী নিজের এবং সমাজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ভবঘুরে হয়ে গিয়েছিল। সময়ের যথাযথভাবে বর্ণনা করে, কোনরূপ ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় না দিয়ে, বরঞ্চ কঠোর বাস্তবকে দেখিয়ে এর্মলার দেখালেন এই লোকগুলো সুখ অর্জন করলো। তারা শহরতলীর নিচের মহলে নিজেদের আবিষ্কার করেছে অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসাবে। তাদের বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হল এবং প্রেম তাদের দিল মর্যাদাবোধ, আত্মসম্মান এবং বেঁচে থাকার বা সুখ অর্জন করার জন্য সংগ্রামের ইচ্ছা। এর্মলার এই ছবিতে সাফল্য অর্জন করেছেন ফিওডর নিকিতিনের সহযোগিতায়। নিকিতিন সোভিয়েট নির্বাক ছবির যুগের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। উল্লেখযোগ্যরূপে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি এমন একজন লোকের জটিল মানসিকতাকে রূপায়িত করেন যে, সমাজের নিচের তলার জীবনে ডুবে যাওয়ার যন্ত্রণায় কাতর। নিজেকে সে অপদার্থ মনে করে, কিন্তু হঠাৎ এক সময় আবিষ্কার করে যে, তার মধ্যেও কিছু ভাল উপাদান এখনো আছে।

এর্মলারের শেষে নির্বাক ছবি কার্ডোরিনা ভিনোগ্রাডস্কায়ার লেখা চিত্রনাট্য 'এ ফ্রাগমেন্ট অব দি এম্পায়ার' (১৯২৯) ছবিতেও প্রধান ভূমিকায় রূপদান করেছেন নিকিতিন। চরিত্রটি প্রথম মহাযুদ্ধে এক সৈনিকের, যুদ্ধের ভয়াবহতায় সে স্মৃতিশক্তি হারায়, দশ বছর পরে স্মৃতিশক্তি ফিরে পায়। দেশে যে বিপ্লবী রূপান্তর চলছিল, সমাজের যে পরিবর্তন হচ্ছিল তা এই স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটির চোখ দিয়ে দেখান হচ্ছিল, যে বিপ্লব সম্পর্কে কিছুই জানে না। ছবিটি কেবলমাত্র সমাজের নতুন দিকটাই তুলে ধরে নি, সেই সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, সমাজের মধ্যে পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি এখনো রয়েছে। অত্যন্ত সুকৌশলে ভুয়ো বিপ্লবীবুলির আড়ালে এই মানসিকতা আত্মগোপন করে আছে। —ক-স-গ।

বিনীত নিবেদন

গত ৪ঠা এপ্রিল '৬৯ মহাজাতি সদনে আমাদের ১৫০তম অভিনয় বাসরে বহু সুধী দর্শক আসন না পাওয়াতে বিফলমনোরথ হন। তাঁদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন—

তরুণ অপেরার

হিটলার-এর

পুনরভিনয় মহাজাতি সদনে

৯ই মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥টায়

অফিস ১১৩, আপার চিৎপুর রোড, ৫৫-৭১২১এ খোঁজ করুন।

যাত্রা জগৎ পড়ুন

ছবিতে এ বছরের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের দেখা যাচ্ছে

খেলাধুলা

খেলাধুলার জগতে এখন একটা বিশ্রী রকমের অরাজকতা চলেছে। সব জায়গাতেই বিশ্রী পরিবেশ। খেলাধুলার আসল আদর্শের কথা আজ আর কারো মনে নেই। জয়লাভের নেশায় আজ সকলেই পাগল। যে কোরে হোক জিততেই হবে—তার জন্যে যদি অন্যায় কিছু করতে হয় তাতেও পিছু-পা নন কেউ। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি—খেলাগুলোর সর্বস্তরেই আজ এ কথা প্রযোজ্য। ফাঁকতালে হাততালি কুড়োবার জন্যেই আজ সকলে থাকেন উন্মুখ হয়ে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আজ শুধু কলকাতা ময়দানেই নয়, ভারতের প্রতিটি প্রান্তে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাঙ্গালোরের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় এ বছর যে সব কাণ্ড-কারখানা হয়েছে, সত্যি কথা বলতে কি, তার তুলনা মেলা ভার। সেখানকার পরিচালকমণ্ডলী, রেফারী, প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়গণ আর দর্শকরা যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তাকে আর যাই হোক, কিছুতেই খেলোয়াড়সুলভ বলা চলে না। বাংলা দলের খেলোয়াড়দের জীবন নিয়ে টানাটানি পর্যন্ত হয়েছিল সেখানে। অথচ তার জন্যে এখনো পর্যন্ত কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি, এমন কি মৌখিক তিরস্কারও করা হলো না আজো। এর থেকে দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় কি হতে পারে!

সম্প্রতি কলকাতা ময়দানেও খেলোয়াড়, ক্লাব পরিচালকবর্গ ও আম্পায়ারদের কাছ থেকে এই ধরনের অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেলো। প্রথম বিভাগীয় হকি লীগে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের খেলায় খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে মারামারি করলেন, আর দু'টি ক্লাবের পরিচালকবর্গের কেউ কেউ করলেন হাজার হাজার দর্শকের সামনে খেলার মাঠের সীমানার ঠিক বাইরে। সে এক অভাবনীয় পরিস্থিতি, অকল্পনীয় দৃশ্য। খেলোয়াড়দের আর দর্শকদের মারামারি দেখতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু ক্লাব-কর্মকর্তাদের......? ছি, ছি এর থেকে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে! যাক সে কথা। সেদিন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের হকি খেলা দেখতে দেখতে শুধু একটা কথাই মনে হয়েছে। এ আমরা কোথায় চলেছি। খেলার মান যদি দিনের পর দিন এই-ভাবে নেমে যায় তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্ব হকির দরবারে ভারত একেবারে কোণঠাসা হয়ে যাবে। ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের সেই পুরোন আর সব চেয়ে মারাত্মক এবং সুন্দর পদ্ধতি স্টিক ওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল খেলার ধারা ছেড়ে দিয়ে এখন দিতে চাইছেন গায়ের জোরের ওপর বেশি নজর। ফলে হকির স্টিক ওয়ার্কের সূক্ষ্ম কলা-কৌশল ধীরে ধীরে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, আর ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয় খেলোয়াড়রা হয়ে পড়ছেন আরো বেশি অসহায়। সব শেষে আর একটা বিষয়ের কথা বলার প্রয়োজন। মোহনবাগান বনাম পোর্ট কমিশনার্সের মধ্যে সি এ বি নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আম্পায়ার সুনীল ব্যানার্জী যে কাণ্ডটি করলেন তার জন্যে সি এ বি তাঁর ওপর কারণ দর্শাবার নির্দেশ দিয়েছেন কি না জানি না। তবে একটা কিছু করা যে উচিত সে বিষয়ে আজ আর কারো কোন সন্দেহই নেই। খেলার শেষ দিন মাঠ ভিজে থাকায় খেলা দেরিতে আরম্ভ হবে বলে সুনীলবাবু আসছি বলে সেই যে চলে গিয়েছিলেন—আর ফিরে আসেন নি। এমন কি কোন খবরও দেন নি। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত আম্পায়ার দিয়ে খেলা শেষ করতে হলো। কলকাতা ময়দানে এও এক অভিনব ঘটনা......!

—শান্তিপ্রিয়

ক্রিকেটের খবর

" শেষ পর্যন্ত সোবার্স সমস্যার সমাধান হলো। সোবার্সকে কেন্দ্র করে

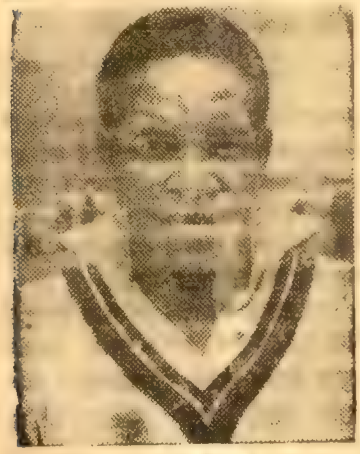

॥ সোবার্স ॥

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট মহলে যে গোলমাল শুরু হয়েছিল তা শুধু মিটেই যায় নি, সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ইতিমধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে ইংলণ্ডে।

অবশ্য এর আগে জল ঘোলা হয়েছিল অনেক। সোবার্স ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল গঠন প্রসংগটি নিয়ে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। রাগের কারণ ডাকযোগে পাঠানো সোবার্সের রিপোর্ট পাবার আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সিলেকশন কমিটি ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের মনোনয়ন পর্ব সাংগ করে খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করে বসলেন।

ফলে সোবার্সের রিপোর্ট কোন কাজেই লাগলো না। তাই সোবার্সের অতো গোঁসা। অবশ্য গোঁসা হবে নাই বা কেন? বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আজ হারাতে বসেছে, শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। আর তার দায়-দায়িত্ব অনেকাংশেই পড়েছে অধিনায়ক সোবার্সের ওপর। সোবার্সকেই বার বার হতে হয়েছে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন।

তার ওপর অস্ট্রেলিয়ার কাছে ঐভাবে হেরে যাবার পর যদি না ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভালো খেলতে না পারে, তাহলে বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্থান অনেক নেমে যাবে। তাই সোবার্স চেয়েছিলেন যে তাঁর মত অনুযায়ী দলগঠন করা হোক। কিন্তু তাঁর মতামত সম্বলিত রিপোর্ট পাবার আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়ে যায়। তাই সোবার্সের গোঁসা হয়েছিল আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট মহলের জল ঘোলা হয়েছিল তাঁকে কেন্দ্র করে......!

প্রায় দু' বছর পরে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করেছেন অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের

॥ জয়সীমা ॥

ম্যানেজার শ্রীগোলাম আমেদ। তাঁর রিপোর্টে শ্রীআমেদ ভারতের ছজন খেলোয়াড়—বোরদে, সারদেশাই চন্দ্রশেখর, সুব্রহ্মনিয়ম, সাকসেনা ও দেশাই-এর সম্বন্ধে বলেছেন যে, এঁরা নিয়মমাফিক চলেন নি।

এঁদের মধ্যে বোরদের বিরুদ্ধেই গোলাম আমেদের অভিযোগ সব থেকে বেশি। দলের সহ-অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও বোরদে সব সময় নিয়ম মেনে চলেন নি। তা ছাড়া গোলাম আমেদের মতে বোরদের দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে।

॥ বোরদে ॥

তাই তিনি ভালো খেলতে পারেন নি। মনে হয় গোলাম আমেদের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বোরদের টেস্ট খেলোয়াড় জীবনের ওপর এবার হয়তো পড়বে ইতির দাঁড়ি।

যাই হোক গোলাম আমেদের এই রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে যদি অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরের সময় ভারতীয় দল গঠন করা হয় তাহলে কাজের কাজ হবে। আর সারদেশাই প্রভৃতি খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং-এর ওপর জোর দেবার ও ফাস্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে পারলে হয়তো বা ভারত এই মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার সংগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে পারবে......!

ভলিবলে বাংলার মেয়েরা

এবার এগিয়ে আসছেন

সন্তোষকুমার শীল

আমাদের দপ্তরে মেয়েরা প্রায়ই চিঠি লেখেন, তাঁদের খেলাধুলোর বিষয় নিয়ে কিছু লেখা প্রকাশ করার জন্যে। তাঁদের অনেকেই দুঃখ জানিয়ে লেখেন যে, বাংলা দেশে মেয়েদের খেলার সুযোগ খুবই সীমিত। ইচ্ছে থাকলেও তাঁরা বিশেষ কোন খেলায় যোগ দিতে পারেন না—নানা রকম অসুবিধের জন্যে। কিন্তু ভলিবল খেলায় বাংলার মেয়েরা আর পিছিয়ে থাকছেন না। তাঁরা এগিয়ে আসছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে ভলিবল খেলায় বাংলার মেয়েদের কথাই লেখা হয়েছে।

—ক্রীড়া সম্পাদক]

১৯৫৩ সালে রাশিয়াতে যে বিশ্ব-ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ভারতীয় মহিলা দল অংশগ্রহণ করেছিল। সেবার বাংলা দেশের তিন-জন মহিলা খেলোয়াড় ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছিলেন। এর পরও এক যুগ কেটে গেলো, তবুও বাংলা দেশে মেয়েদের ভলিবল খেলার প্রচলন খুব একটা হলো না। তবে চেষ্টা চলছিল, আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭-৬৮ সালে কলকাতায় জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার আসর বসে। এই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মহিলা ভলিবল দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। এই বৎসর বাংলা মহিলা দল কোনরকমে দলগঠন করে জাতীয় ভলিবল প্রতি-যোগিতায় প্রথম অংশগ্রহণ করে। তবে, প্রথম বছর যোগদান করে তারা মোটা-মুটি ভালোই খেলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশন বিভিন্ন দেশের মহিলাদের ভলিবল খেলার পারদর্শিতা লক্ষ্য করে ১৯৬৮ সালে সর্বপ্রথম কলকাতায় মহিলা ভলিবল লীগ খেলা চালু করেন। অনেক প্রচেষ্টার পর সেবার মাত্র চারটি দল যোগদান করে।

এর পর মেয়েদের ভলিবল খেলায় উৎসাহ দানের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশন বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে বিনা পয়সায় ভলিবল শিক্ষক নিয়োগ করে। ফলে সুফল দেখা দেয়। এই বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে মোট সাতটি দল লীগের খেলায় যোগদান করে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই সাতটি দলের মধ্যে তিনটি কলেজ, স্কটিশ চার্চ, ভিক্টোরিয়া ও বিহারীলাল কলেজ আছে। এটা নিশ্চয়ই ভলিবলের ক্ষেত্রে শুভ সূচনা।

এক সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশনের একজন মুখপাত্র বলেন যে, বাংলা দেশের মেয়েদের লজ্জাই ভলিবল খেলায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা স্কার্ট পরে খেলতে লজ্জা পায়। ফলে তারা ভলিবল খেলার কলাকৌশল ঠিক-মত রপ্ত করতে পারে না।

মেয়েদের ভলিবল খেলার আগ্রহের জন্য চাই, স্কুল থেকে খেলা আরম্ভ করা। নতুবা বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর ভারী হয়ে যাওয়ায় মেয়েরা ভলিবল খেলতে অসুবিধা বোধ করে। এই কারণে, পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডা-রেশন রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেন যাতে মেয়েদের স্কুলে বাধ্যতা-মূলকভাবে ভলিবল খেলার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি।

রবিবার ২০শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল মাঠে আয়োজিত কলকাতা মহিলা ভলিবল লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ্ নির্ণায়ক শেষ খেলায় গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান টালীগঞ্জ সুভাষ সংঘ ১৫-২, ১৫-৮, ১৫-৪, ৫-১৫ পয়েন্টে নৈহাটি এ, সিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। বিজয়ী দলের অধিনায়ক শুভ্রা বসু ও মুক্তি বসু প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হন।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে, বাংলা দেশে মেয়েদের ভলিবল খেলা জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশন, রাজ্য সরকার ও স্কুল-কলেজগুলি এগিয়ে আসবে এবং সর্বভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে বাংলা দেশের মেয়েরাও দেবেন দক্ষতার পরিচয়।

এশহরের মহিলা ভলিবলের লীগ চ্যাম্পিয়ান টালীগঞ্জ সুভাষ সংঘের খেলোয়াড়-দের দেখা যাচ্ছে ছবিতে।

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে

বাংলার সেরা ক্রীড়াবিদরা কি বলেন

সংগ্রাহক—অরুণ চট্টোপাধ্যায়

[এবারের কিস্তিতে আমরা প্রকাশ করছি দু'জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়ের মতামত। এঁদের মধ্যে একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ইডেনে ক্রিকেট এবং ফুটবল দু'টি খেলাতেই যে গলনের অভিজ্ঞতা এঁর আছে। একজনের সে অভিজ্ঞতা না থাকলেও, দু'জনেই বলেছেন যে, 'ইডেনে ফুটবল আর ক্রিকেট একসঙ্গে কিছুতেই চলতে পারে না...!' —ক্রীড়াসম্পাদক]

প্রদীপ ব্যানার্জী কি বলেন।

প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জীকে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত জানতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ক্রিকেট-ফুটবল এক সঙ্গে কিছুতেই চলতে পারে না। আর তা ইডেনে তো একেবারেই সম্ভব নয়।

তিনি জানালেন, অনেকে মেলবোর্ন, বারবাটির কথা বলেন। মেলবোর্ন স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ও রাগবি খেলা হয়। রাগবি খেলায় মাঠের বিশেষ ক্ষতি হয় না। সেখানকার মাটিও সেরকম করে তৈরি করা হয়েছে। আর বারবাটিতে খুব অল্পসংখ্যক খেলা হয়। সেখানে তো টেস্ট ক্রিকেট হয় না।

ইডেনের মাটি সম্পর্কে পি. কে'র অভিমত :

এখানকার মাটি খুবই নরম। বল গার্ড না করে ধরা মুশকিল। মাঠ এত 'ফাস্ট' যে সেখানে ফুটবল চলে না। আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। ভিজে মাঠ আঠালো হয়ে যায়, বুটে কাদা জড়িয়ে যায়, মাঠে দাঁড়ানো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পি. কে. ফুটবলার, তাই ক্রিকেট সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান নেই জানালেন। তবু তাঁর অভিমত ভেবে দেখার মত : ক্রিকেটের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা মাঠ প্রয়োজন। তবে ইডেনে ক্রিকেটের সঙ্গে এ্যাথলেট চলতে পারে অনায়াসেই। হকিও সেখানে চলতে পারে, এক সঙ্গে দু'টো হকি মাঠ ইডেনে পাশাপাশি হতে পারে।

প্রশ্ন করলাম : ফুটবলের জনপ্রিয়তার জন্যই তো ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়ামের প্রস্তাব করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কি বলেন?

উত্তর : পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই, ইডেনে ফুটবল-ক্রিকেট একসঙ্গে কোন মতেই সম্ভব নয়। মাটি পরিবর্তন করলে ক্রিকেটের অসুবিধে হবে। ক্রিকেটের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ইডেন ক্রিকেটের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। জনপ্রিয়তার দিক থেকে ফুটবলের দাবি অগ্রগণ্য, তাই ফুটবল খেলার জন্য স্টেডিয়াম চাই-ই।

বায়ু চলাচল প্রসঙ্গে পি. কে'র অভিমত খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বললেন, ইডেনের উত্তর-দক্ষিণ খোলা রাখা হয়েছে যাতে সহজেই হাওয়া ঢুকতে পারে, স্পেস বোলিং-এর পক্ষে তা খুবই দরকার। অন্যদিকে ফুটবলের আকার বড়, তাই বাতাস থাকলে ভালো খেলা আশা করা যায় না। সেজন্য প্রথম শ্রেণীর খেলার জন্য ভালো পরিবেশ পেতে হলে ইডেনের দু'টো দিক ব্লক করতে হবে।

চুনী গোস্বামীর অভিমত

ভারতীয় ফুটবলের সার্থক শিল্পী, বাংলার ক্রিকেটের নবনায়ক চুনী গোস্বামীর অভিমত জানতে চাইলাম। চুনীই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি ইডেনে ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলেছেন। তিনি জোরের সঙ্গে জানালেন, কলকাতা ভারতীয় ফুটবলের কেন্দ্রমণি, এখানে ফুটবলের বড় স্টেডিয়াম একান্তই দরকার। 'দিস্ ইজ এ মাস্ট নাউ।' ফুটবলে গণ্ডগোলের অন্যতম কারণ বড় স্টেডিয়ামের অভাব।

মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর উদ্যমকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বললেন, আমরা চাই, ফুটবলের জন্য অন্য জায়গায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্টেডিয়াম। মেলবোর্ন-এর উদাহরণ দেখিয়ে অনেকে বলেন যে, ফুটবল-ক্রিকেট এক সঙ্গে চলতে পারে। কিন্তু ইডেনে তা সম্ভব নয়। অস্বীকার করবো না যে শুকনো ইডেনে খেলতে অসুবিধে হয় না। তবে ভিজে মাটিতে সেখানে দাঁড়ানো মোটেই সম্ভব হয় না। বুট পরে দাঁড়ানোই দুষ্কর, ভালো খেলার প্রশ্নই ওঠে না। এ অভিজ্ঞতা আমার আছে। বাংলা দেশে ফুটবল-সীজনের বেশির ভাগই বৃষ্টির মধ্যে অতিবাহিত হয়, তাই ইডেনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী মাঠে ফুটবল সম্ভব নয়। কেউ চাইবেন না যে ফুটবলের মান নিচে নেমে যাক। ইডেনের বর্তমান মাটিতে ফুটবল খেলা হলে ফুটবলের মান নামবেই। অন্য জায়গায় ফুটবলের জন্য স্টেডিয়াম করলে ক্ষতি কি?

প্রশ্ন করলাম, আপনি তো ইডেনে ক্রিকেটও অনেক খেলেছেন; ফুটবলের পর কোন অসুবিধে হয়েছে কি?

তিনি জানালেন, নিশ্চয়ই। গত দু' বছর ধরে ইডেনে অনেক ভালো ম্যাচ হয়েছে, কিন্তু ব্যাটসম্যানরা সুখ পান নি সে উইকেটে খেলে। ফুটবলের আগে এবং পরে ইডেনে ক্রিকেট খেলে দেখেছি, আগের মত ইডেনের সে 'ফাস্ট' উইকেট আর নেই। এজন্যই পূর্বাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চলের খেলায় মাত্র ১৭৫ রানে দক্ষিণাঞ্চলের সকলে আউট হয়ে গেলেন!

এর কারণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

[শেষাংশ ২৮৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন উত্তর

কৃষ্ণগোপাল রায় (রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : আন্দামান বিজয়ী দুই তরুণ এ্যালবার্ট ডিউকের মধ্যে, ডিউক বলেছেন যে, কলকাতাটা বোগাস। এই রকম কথা বলার কারণ কি? পিনাকী চ্যাটার্জীকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবেন।

উত্তর : ও কথা ডিউক বলেছিলেন প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে ব্যক্তিগত কারণে। পিনাকীকে আপনার শুভেচ্ছা জানানো হলো।

সুভাষরঞ্জন দত্ত (ট্রাঙ্গুলার কলোনী, পান্ডু, গোহাটী-১২)

উত্তর : সন্তোষ ট্রফির খেলায় উৎকোচ গ্রহণের কোন সংবাদ আমরা পাই নি। তবে পরিচালকবৃন্দ ও রেফারীরা যে পক্ষপাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন সে খবর আমরা পেয়েছি।

আপনিও নববর্ষে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচমুড়া কলেজ, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন : বাংলার এমন কি কোন ফুটবল খেলোয়াড় আছেন যিনি কখনো দল বদল করেন নি?

উত্তর : চুনী গোস্বামীর কথা ভুলে গেলেন নাকি?

অনিলচন্দ্র দাস (মান্নাপাড়া, হালিসহর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : বোলার বল করার পর ব্যাটসম্যান হিট করলো। যে কোন কারণেই হোক হিট করার পর বলটা ব্যাটসম্যানের দিকে সোজা অর্থাৎ উইকেট লক্ষ্য করে আসছিল। ব্যাটসম্যান তখন বলটা পা দিয়ে না ঠেকিয়ে বলটা সজোরে কিক করলো। দেখা গেলো বলটা বাউন্ডারী সীমানা অতিক্রম করে গেছে। এক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর : না, এক্ষেত্রে বাউন্ডারীও হবে না আউটও হবে না।

অসীম ব্যানার্জী (দারাং, আসাম)

উত্তর : এখনো সব দলের অধিনায়ক ঠিক হয় নি। আপনি লেখা পাঠাতে পারেন।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : ১৯৫১ সাল থেকে এ পর্যন্ত কলকাতার হকি লীগ বিজয়ীদের নাম জানতে চাই।

উত্তর : ১৯৫১—মোহনবাগান
১৯৫২—মোহনবাগান
১৯৫৩—ভবানীপুর
১৯৫৪—ভবানীপুর
১৯৫৫—মোহনবাগান
১৯৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মোহনবাগান
১৯৫৮—মোহনবাগান
১৯৫৯—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৬০—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬১—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬২—মোহনবাগান
১৯৬৩—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৪—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৫—বি এন আর
১৯৬৬—বি এন আর
১৯৬৭—বি এন আর
১৯৬৮—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৯—মোহনবাগান।

সুজন মিত্র (এন ২৫৫ ফতেপুর সেকেন্ড লেন, কলকাতা-২৪)

উত্তর : আপনার প্রশ্নের উত্তর দু-চার সপ্তাহ আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

[২৮৭৯ পৃষ্ঠার পর]

'এখন টার্নিং উইকেট' ইডেনের চরিত্র পাল্টে দিয়েছে। এই উইকেটে বোলারের প্রাধান্য থাকে 'ব্যাটে বলে' ক্রিকেটের লড়াই জমে না। ফুটবল খেলা শেষ হয় সেপ্টেম্বরে তার পর মাঠকে 'রেস্ট' দিয়ে পিচ তৈরি করতে যে সময় পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয়। সেজন্য মাটি দানা বাঁধতে পারে না। মাটি দানা না বাঁধলে ভালো পিচ তৈরি হতে পারে না' এবং সে 'পিচ'-এর চরিত্র যা হওয়া উচিত ইডেনেও তাই হয়েছে।

তিনি আবার জোর দিয়ে বললেন, 'তাই বলছিলাম অন্য জায়গায় ফুটবলের জন্য বড় স্টেডিয়াম তৈরি করতেই হবে। ইডেনের ঐতিহ্যের কথাও ভুললে চলবে না।'

গল্প হলেও সত্যি

বেশি দিনের কথা নয়!

কুয়ালালামপুরে সেবার মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশই অংশ গ্রহণ করে। ভারতবর্ষও বাদ যায় নি।

কিন্তু সেখানে তারা (ভারতীয়রা) সেবার প্রতিটি বিপক্ষদলের খেলোয়াড়, এমন কি কুয়ালালামপুরের দর্শকদের কাছ থেকে লাঞ্ছনা পেতে থাকে। প্রতিটি খেলায়, ভারতীয় খেলোয়াড়রা অশুভ আচরণ, বিপক্ষদল ও সমর্থকের কাছ থেকে লাভ করে।..... এমনি একদিনে, খেলা হতে হতে হঠাৎ দেখা গেল, একদল দর্শক দৌড়ে চলেছে, যেখানে সমস্ত দেশের পতাকাগুলি রয়েছে। তাদের মনোভাব, ভারতীয় পতাকা তারা পুড়িয়ে দেবে। কিন্তু তারা পতাকা ধরতে যাবে, এমন সময় দেখা গেলো একজন ভারতীয় খেলোয়াড়, খেলার মাঠ ছেড়ে এক দৌড়ে পতাকার কাছে এসে, সমস্ত দর্শককে ঠেলে দিয়ে ভারতীয় পতাকা বুকে নিয়ে দাঁড়ালো।

আশ্চর্য—যারা পতাকা পোড়াতে এসেছিল, তারা অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ালো। দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সাহস হলো না।

এই দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়টি হলেন, পিটার থঙ্গরাজ। সেদিন থঙ্গরাজ প্রতিযোগিতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে, জাতীয় পতাকাকে রক্ষা করার জন্য, নিজের জীবন বিপন্ন করে সবার মাঝখান থেকে পতাকা বুকে তুলে নিয়েছিলেন!

তারপর—সমস্ত দর্শকের কাছে উচ্চকণ্ঠে বলে ছিলেন, 'আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা হলো এইটি, কারণ আমি আমার জাতীয় পতাকাকে রক্ষা করতে পেরেছি।'

অজানা এই ঘটনাটা বীরভূমের সিউড়ী থেকে লিখে পাঠিয়েছেন

—অরিন্দম দাশগুপ্ত

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
জয়শ্রী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
জয়শ্রী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

ধনুর্বেদ :

কাশীরাজ পণ্ডিত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত। বহু আয়াসে তাঞ্জোরের প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সংগ্রহশালা, কাশীর কুইন্স কলেজ লাইব্রেরী, কাশী মহারাজার বিশাল গ্রন্থাগার হতে সংগৃহীত। মূল্য—২-০০ টাকা।

বেদান্তসার :

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত : ধর্মশাস্ত্রপ্রচার-ব্রতী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (সুবোধিনী-টীকা সহ)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতিঃ বিবম্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মানসোল্লাস :

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ :

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ অনূদিত। (১ম নাই) চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৩-০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫-৫০ টাকা। ৩য় খণ্ড ৪-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয় নিস্যন্দিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য—২-৫০ পয়সা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্ :

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত—২-০০ টাকা।

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি :

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। সংবর্ধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহৃত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত আর্য সৎকর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থ শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, ব্রত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়-সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০ টাকা।

পবন-বিজয়-স্বরোদয় :

বায়ু জয়ই যে সব শ্রেষ্ঠ সাধনা। অলৌকিক সত্য নির্দেশক যোগক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিশারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান :

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পয়সা।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস :

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যম্ :

যোগীপ্রবর মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

Thursday, 1st May, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "BASUMATI" Phone : 34—7771, 72, 73,

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সাপ্তাহিক বসুমতী

"এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালোবাসা।'"

৩ বর্ষ ঃ ৪৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA | 73 Year, No. 46, 8th May, 1969

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৮৮৩
রবীন্দ্রকাব্যে গতি	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২৮৮৪
শ্যামল অঞ্জন, কালের ওঙ্কার ও রবীন্দ্রনাথ	হরপ্রসাদ মিত্র	২৮৮৬
সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ	বেলা দত্তগুপ্ত	২৮৯১
আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ	মনোরঞ্জন হাজরা	২৮৯৭
ইতিহাসচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ	নরেন ভট্টাচার্য	২৯০১
রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র	মৈত্রেয়ী দেবী	২৯০৪
রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয়তা	সুশীল রায়	২৯০৮

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার এন্ড সন্স
৩১/১এ রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ—		
জরা ব্যাধি মৃত্যুর আলোকে	— নীরদকুমার হাটি	২৯১২
গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ	— প্রদ্যোত রায়	২৯২০
রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান	— বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২৯২১
কৃষি, সমবায় ও রবীন্দ্রনাথ	— রজত রায়চৌধুরী	২৯২৫
পল্লীগীতি সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথ	— চিত্তরঞ্জন দেব	২৯২৮
গায়ক ও সঙ্গীতশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ	— শৈলজারঞ্জন মজুমদার	২৯৩৪
রবীন্দ্রনাথ—অভিনেতা ও প্রযোজক	— অশোক সেন	২৯৩৮
ক্রীড়ারসিক রবীন্দ্রনাথ	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯৪৩

প্রচ্ছদ-চিত্র : শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ ও শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। অপ্রকাশিত চিত্রটি লক্ষ্ণৌতে তোলা।

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; ম্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

আবলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

ডঃ জাকির হোসেন স্মরণে

'কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন চেয়ে বসে রও?
কথা কও কথা কও।'

ডক্টর জাকির হোসেন প্রথম যেদিন রাষ্ট্রপতিরূপে অভিষিক্ত হন, সেদিন পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার সম্পূর্ণ অংশ। মাত্র দু' বছর আগেকার কথা। সেদিনটি বড় স্পষ্ট, বড় উজ্জ্বল, এখনো ভাসছে সেই দিন চোখের সামনে।

আর ১৯৬৯-র ৩রা মে এগারোটা কুড়ি মিনিটেই একটি মহৎ জীবনের শেষ। ডক্টর জাকির হোসেন আকস্মিকভাবে আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিলেন। ভারতের কোটি কোটি মানুষ শোকাশ্রু নিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেও তারা যেন সমস্বরে বলে উঠলো—

'কথা কও, কথা কও।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর অঙ্গুলিমেয় যে ক'জন ব্যক্তি আজো রয়েছেন, ডক্টর জাকির হোসেন তাঁদেরই একজন। তাঁর জীবন কর্মময়। তদানীন্তন পরাধীন ভারতে বৃটিশ রাজশক্তির সহযোগিতা না করে ডক্টর হোসেনের মতো জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি দেশের ও দশের কাজেই আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তাঁর সুবিপুল মেধা নিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগ-পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। আবার তাঁর যাবতীয় লেখায় ভারত সংস্কৃতিই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান। কবিতা, গোলাপ তিনি ভালোবাসতেন, বহু জাতের পাথর সংগ্রহে তাঁর বিরাম ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে তাঁর বড় ছিল কর্মৈষণা। আর এই এষণার মূলে ছিল ভারতের কোটি কোটি মানুষের সার্বিক কল্যাণ কামনা। এই কল্যাণ কামনার জন্যই ছিল তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা।

বর্তমান সময়ে আমরা সবচেয়ে বেশি যা আশা করি—তা প্রেরণা। এই বিবদমান কালে প্রেরণা দেবার মতো, সৎ বুদ্ধি দেবার মতো দরদী ও অজাতশত্রু মানুষের অত্যন্ত অভাব। ডক্টর জাকির হোসেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও জীবনের শেষ প্রান্তে যে কথা বলে গেছেন আমরা যেন তা না ভুলি। কচ্ছপ ও শশকের দৌড়ের কথায় কে জিতলো তা আমাদের অজানা নয়, কিন্তু এককভাবে না দৌড়ে এক সঙ্গে দৌড়লে সম্মিলিত শক্তি যে কতো বৃদ্ধি পায়—পুনর্লিখিত গল্পে তিনি আমাদের সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যোদ্ধৃতির সাহায্যে রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন আমাদের অতীতের ভিত্তির ওপর বর্তমানকে প্রতিষ্ঠাদানের সংকল্পের কথাই জানিয়েছিলেন। ডক্টর জাকির হোসেন সশরীরে আমাদের মাঝখানে আর না থাকলেও, আছে তাঁর বহুল-বিস্তৃত কর্মকেন্দ্রগুলি, আছে তাঁর সযত্নসৃষ্ট রচনাবলী আর সুনিবিড় মানবতাবোধ। তাই বর্তমান যে শোক, তা আজ আমাদের মুহ্যমান করে তুললেও আমরা জানি, সমগ্র ভারতবাসীর পরিশুদ্ধ চেতনার মধ্যে যুগে যুগে তিনি বিরাজ করবেন। সমগ্র ভারত ছিল যাঁর দেশ, আর প্রতিটি ভারতবাসী ছিল যাঁর পরিবারভুক্ত তাঁর মৃত্যুতে আজ সবাই সমানভাবে শোকমগ্ন।

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র কাব্যে গতি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সিন্দুক খোলার যেমন, এক-একজন লেখকের প্রতিভার রহস্যমূলে পৌঁছোবার এক-একটি চাবিকাঠি থাকে না কি?

রবীন্দ্রনাথের বেলায় সে রকম চাবি-কাঠি কিছু আছে কি না খুঁজতে গেলে প্রথমেই আমার অন্তত একটি লেখার কথা মনে পড়ে।

লেখাটি অবশ্য কবিতা, এবং লেখা তাঁর বেশ পরিণত বয়সে, পরমায়ুর সূর্য তখন অস্তদিগন্তের দিকে হেলতে শুরু করলেও প্রতিভার দীপ্তি যৌবনের চেয়ে অনেক বেশি প্রখর।

রবীন্দ্রনাথ জীবনে আশ্চর্য কবিতা অনেক লিখেছেন। যে কবিতাটির কথা বলতে যাচ্ছি কাব্যবিচারে তাঁর অসংখ্য শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে এটির সর্বোচ্চ স্থান না হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সত্তা এই কবিতাটির মধ্যে যেন সবচেয়ে ইঙ্গিতময়-রূপে প্রতিবিম্বিত।

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। সে বইটিতে কবিতাটির আলাদা কোনো নাম দেওয়া ছিল না। শুধু সংখ্যা দেওয়া ছিল—আট। কবিতাটির প্রথম লাইন হল, 'হে বিরাট নদী...'

'বলাকা' বইটি এই কবিতাটির জন্যে খুঁজে বার করে নিজের হাতে লেখা সই আর তারিখ দেখেই বুঝলাম, ১৯২১ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বার হবার সময়ই কিনেছি। আমার কেনাকাটার বাহাদুরী নিতে নয় কটি কবিতার রচনার তারিখের তাৎপর্য ভালো করে দেখাতে এ কথাটার উল্লেখ করলাম।

১৯২১-এর মধ্যে বলাকার দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে গেছে আর হে বিরাট নদী কবিতাটি লেখা হয়েছে তার সাত বছর আগে ১৯১৪ সালের শেষে।

১৯১৪ সাল পৃথিবীর ইতিহাসের অত্যন্ত স্মরণীয় একটা বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন আরম্ভ হয়েছে। সে বিশ্বযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে মহাযুগসন্ধনের যে অসামান্য কবিতা রচনার প্রেরণা দিয়েছিল সেটির কথা বাংলা সাহিত্যে ভোলবার নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আর এক মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে আরো প্রচণ্ডভাবে মথিত করে গেছে, সমস্ত মানবসমাজের ভবিষ্যৎই অনির্বাণ এক বিশ্বব্যাপী অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে নির্ণীত হতে চলেছে। এই রবীন্দ্রনাথের মহাযুগসন্ধনের সে কবিতার ওপর সময়ের পলি কিন্তু পড়ে নি। তার তাৎপর্য আজো সমান উজ্জ্বল।

'দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন,
ওরে দীন,
ওরে উদাসীন...!'

বলে তার উত্তাল উদাত্ত আহ্বান আজকের দিনেও সমান তীব্রতায় ইতিহাসের কানে বাজছে।

সেই সঙ্গে মানব-সভ্যতার সেই আর্ত আকুল প্রশ্ন;—

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই
যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার
অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত।
....
....
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না
দিন।

বলাকার এ কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের আর্ত জিজ্ঞাসা আর আকুল আশা ধ্বনিত হয়েছে। এ কবিতায় পাই তাঁর জীবন-ভাবনা কিন্তু তাঁর কবিসত্তার প্রেরণামূল খুঁজতে অন্য কবিতাটির শরণ নিতে হয়।

"হে বিরাট নদী", বলে কবিতাটি শুরু হয়েছে। এ কবিতার রচনার তারিখ যা পাচ্ছি তা ইংরাজি তারিখ হিসাবে ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরের শেষাশেষি।

প্রথম মহাযুদ্ধ তখন আর অস্পষ্ট সুদূর একটা কোলাহল মাত্র নয়, আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জার্মান সেনাপতি হিণ্ডেন-বার্গের কাছে রুশবাহিনীর পরাজয়ের পর সমস্ত পৃথিবীর দুঃসংবাদ হয়ে উঠেছে। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতা এই সময়টিতেই লেখা হলেও ১৯১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিশ্ব সঙ্কট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো সুস্পষ্ট সচেতনতার পরিচয় তাঁর কবিতায় পাই না।

বিশ্বমহাযুদ্ধের বারুদের ধোঁয়া ভারতের আকাশ পর্যন্ত পৌঁছোলেও রবীন্দ্রনাথ তখনো নিজস্ব ধ্যানেই তন্ময় হয়ে আছেন। সে ধ্যান স্থিতির নয় চির অস্থির গতির আর 'হে বিরাট নদী'-তে তা সবচেয়ে গাঢ় গভীরভাবে বিম্বিত।

সৃষ্টি ও জীবনের গতিময়তাই যে প্রাণধর্ম এ উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের সারা-জীবনের রচনা বৈচিত্র্যের মধ্যে 'বলাকা'-তেই সার্থকতম কাব্যরূপ পেয়েছে। 'বলাকা'-র কাব্যসংগ্রহ প্রধানত্বই যেন নিখিলের বিকাশ-বিবর্তন-রহস্য যে গতি-বেগে নিহিত, তারই উপাসনা।

অদৃশ্য নিঃশব্দ যার জল অবিচ্ছিন্ন

অবিরল সেই সৃষ্টিপ্রবাহ কাব্যমূর্তি পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র
কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে
বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
....
....
হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা
তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই
তুমি ঘরছাড়া।
....
....
ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।

'অবারণ চলা'র অকারণ বিশ্লেষণজনিত কল্পনার শৈথিল্য যদি বা একটু আছে বলে মনে হয় সে চলায় কবির উতলা হওয়া সম্বন্ধে আমাদের কোন অবকাশ নেই। এবং নিখিলরহস্যের দার্শনিক ব্যাখ্যার সঙ্গেই শুধু নয় সাধারণ ব্যক্তিগত প্রবণতার দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ চিরদিন যে মনে মনে অবারণ এবং সেই সঙ্গে অকারণ চলার নেশায় মত্ত তা বলাকার কবিতাগুচ্ছে ত' বটেই তাঁর আদিকালের কাব্যসৃষ্টি থেকেই সুস্পষ্ট।

বলাকার বেশির ভাগ কবিতাতেই অবশ্য গতিবেগের দোলা। নবীন কাঁচাদের ডাক দেওয়া প্রথম কবিতাতেই,—

আনরে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর্ অবাধপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।

বলে যে বাসনা ধ্বনিত হয়েছে, তারই প্রকাশ দেখি নানা কবিতায়।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পায়ের ধূলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে
বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তে'-র মত

প্রতি ছত্রে পর্যন্ত তারই প্রকাশ দেখি।

এ দুই-এর মাঝখানে অদৃশ্য অসীম সৃষ্টিপ্রবাহ নিয়ে লেখা কবিতাটিই শুধু নয়, তাজমহল, কি ঝিলমের ওপরের আকাশে শোনা হংসবলাকার পক্ষধ্বনি, এমন কি বিশ্বযুদ্ধের মহামরণযজ্ঞ নিয়ে লেখা কবিতাও এই অশেষ অবিরাম গতিবেগের দার্শনিকতাতেই ভাসানো।

'তাজমহল'-এ প্রেমের শাশ্বত শপথ
দাঁড়িয়ে উঠে শুনি,...
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির,
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে
যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
....
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।'

হংসবলাকার পক্ষধ্বনি থেকে পাই:—

*

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।

আর,—

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের
পাখার এ গানে,—
'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনখানে।'

আর বিশ্বযুদ্ধে মহামরণ যজ্ঞও সঙ্কল্প জানায়—

'শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়—পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়-ধ্বজা তুলে।'

প্রায় সব মানুষের অন্তরেই চিরসুদূরসন্ধানী একটা ভবঘুরে বোধহয় লুকিয়ে থাকে। সৃষ্টি-প্রতিভায় যাঁরা দীপ্ত তাঁদের মধ্যে এ অস্থিরতার বেগ বুঝি আরো প্রবল।

এ অস্থিরতা রবীন্দ্রনাথকে প্রথম যৌবনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়েছে, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।' বলে আক্ষেপ-মুখর করেছে গরুর গাড়িতে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবার মত অর্বাচীন অভিলাষ জাগিয়েছে তাঁর মনে এবং সারাজীবন পূর্বে ও পশ্চিমে পৃথিবীর দেশে দেশে বাস্তবিকপক্ষেও কম টহলদারী করায় নি।

কিন্তু এই ভবঘুরে মানসিকতা তাঁর চরিত্রের একটা বাইরের দিক মাত্র। শুধু এই প্রবণতা নিয়ে স্মরণীয় একজন ভূপর্যটকের বেশি অনেকে আর কিছু হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যা প্রাণমন্ত্র ও তাঁর কবিসত্তার রহস্য বোঝবার যা কুঞ্চিকা, সেই গতি-চেতনার সঙ্গে সাধারণ ভ্রমণ-পিপাসার সম্পর্ক অতি সুদূর। এ গতি-চেতনার ভিত্তি তাঁর জীবন-দর্শন আর শারীরিক পাদমেকম্ না নড়ে বসেও এ চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

[illegible] 'কাব্যের উদ্ধার' ও রবীন্দ্রনাথ

হরপ্রসাদ মিত্র

ভাবকল্পনায় সত্যসন্ধান,—মিল, রূপক, উপমা ইত্যাদির অভিনবত্ব,—কবিকর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা,—গদ্য, পদ্য, নাটক ইত্যাদির প্রসঙ্গ এবং এইরকম আরো বিভিন্ন উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতাগুলিতে অজস্র পরিমাণে দেখা দিয়েছিল। তাঁর নানা বয়সের গদ্য-নিবন্ধগুলিতে তো বটেই,—তা ছাড়া গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও এরকম উল্লেখ বিদ্যমান। তবু, বিশেষভাবে, তাঁর আয়ুষ্কালের শেষ দশকটিতে রচিত তাঁর কবিতাগুলির বিচিত্র ভাবপ্রবাহে সাহিত্যতত্ত্বের এই সব দিক বার-বার ব্যক্ত হয়েছে। এই সব প্রসঙ্গের শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে এইভাবে—গল্প, কবিতা, নাটক,—গদ্য-পদ্যের রীতি,—রোমান্টিক ও বাস্তব দৃষ্টি,—সাহিত্যের কাল-পরিবর্তন,—ব্যঞ্জনা, অলঙ্কার ইত্যাদি। এইভাবে শ্রেণীনির্ণয়ের চেষ্টা কতকটা মামুলি মনে হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে তাঁর এই পর্বের মননের বা তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির এই বিশেষ দিকটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হতে বাধা নেই। 'পুনশ্চ' থেকে শুরু করে আলোচ্য দশকের প্রবাহে সাহিত্য-সম্পর্কিত এই যে প্রসঙ্গগুলি পাওয়া যায়, তার কাব্যধারায় পূর্ববর্তী বিভিন্ন পর্বেও এরকম উল্লেখ বিরল নয়। তবে, শেষপর্বের কবিতায় এই প্রবণতার আপেক্ষিক প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার্য। জগতের দিক থেকে তাঁর মন যে সরে এসেছিল তা নয়। কিন্তু তিনি তাঁর শিল্পরীতির নানা চিন্তায় নিঃসন্দেহে ব্যাপৃত ছিলেন।

'পুনশ্চ' [১৯৩২] থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' [১৯৪১] পর্যন্ত এই দশ বছরের বিস্তারে তিনি অনেক-গুলি কাহিনী-কবিতা লিখে গেছেন। এই শ্রেণীর রচনাও এই পর্বের নতুন ফসল বলা ঠিক হবে না, কারণ এর আগেও এরকম রচনার অভাব ছিল না। তবে শেষ দিকে এই ধরনের কাহিনী-কবিতার মধ্যেও সাহিত্যের নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে ইশারা দেখা দিয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'বাঁশরী'-তে [১৯৩৩] বা 'শেষের কবিতা'য় [১৯২৯] যেমন,—এই শেষ দিকের কাহিনী-কবিতাগুলির মধ্যেও তেমনি সাহিত্যের প্রকারগত অথবা আদর্শগত নানা চিন্তার অভিব্যক্তি এক বিশেষ আবেদনের বিষয়। ব্যাপকভাবে বলা যায় যে, জীবনের সার্থকতা-সন্ধানের তর্ক-বিতর্ক তাঁর অনেক কাহিনী-কবিতাতেই দেখা দিয়েছে,—এবং সে-ব্যাপারটি শুধু শেষপর্বের কবিতাতেই নয়,—'পুনশ্চ'-র আগেকার লেখাতেও তার উদাহরণ আছে। 'পলাতকা'-র 'মালা'-কবিতায় 'বিজয়মালা' আর 'বরণমালা'-র প্রভেদ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কবিমনের সার্থকতা-সন্ধানের ভাবনা সম্বন্ধেও এই কবিতার ভাবগত সিদ্ধান্ত অবান্তর নয়। তাছাড়া সাহিত্যের সমালোচনা সম্বন্ধেও তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ছিল সেই 'পলাতকা'রই 'আসল' নামে একটি কবিতার এক জায়গায়। এরকম ব্যাপারও আগেকার কবিতায় আরো দেখা গেছে—যেমন, 'ক্ষণিকা'র প্রসিদ্ধ কোনো কোনো উক্তিতে। সে যাই হোক, 'পলাতকা'র ঐ 'আসল' কবিতাটিতে তিনি লেখেন যে তাঁর ষাট বছর বয়সেও সমালোচনার তিক্ততা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে—

> যত লিখ্‌চি কাব্য
> ততোই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।

'লিপিকা'র [১৯২২] পরে 'পুনশ্চ'-তেই তিনি গদ্য-কবিতার রীতি সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার পরিচয় রেখে গেছেন। 'পুনশ্চ' বইখানির ভূমিকায় (২, আশ্বিন, ১৩৩৯) তিনি জানিয়ে গেছেন যে, 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ রচনার সময় থেকেই 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে' বাংলা গদ্যে ইংরেজির মতোই কবিতার রস দেওয়া যায় কি না, সে-বিষয়ে তাঁর মনে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। 'লিপিকা'য় তাঁর সেই চেষ্টার ফল দেখা দেয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি এই রীতি চর্চা করবার অনুরোধ জানান। সত্যেন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেন নি। অবনীন্দ্রনাথকেও তিনি অনুরোধ করেন। অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টা সম্বন্ধে এই ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি।" অতঃপর তিনি নিজেই 'পুনশ্চ'-তে পুনরায় সেই প্রয়াসে অগ্রসর হন।

গদ্যকবিতার রীতি বা গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্যের ব্যবধান সম্বন্ধে, 'পুনশ্চ' বইখানির এই ভূমিকাতে এবং অন্যত্রও তাঁর আলোচনা অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেরই সুপরিচিত। তবে, সে-সব কথা এই প্রবন্ধের মূল বিষয় নয়। এখানে বিশেষভাবে কবিতার ধারাতেই তাঁর আনুষঙ্গিক শিল্প-চিন্তার কিছু কিছু উদাহরণ দেখা যাক। কথায়-কথায় এক-একটি কবিতার মধ্যেই কোথাও গদ্য ও পদ্য সম্বন্ধে, কোথাও বা ভাষারীতি সম্বন্ধে, কোথাও আবার সাহিত্যের অন্য কোনো রীতি বা আদর্শ সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু মন্তব্য শুনিয়ে গেছেন। 'পুনশ্চ' থেকে 'কোপাই'-কবিতার কয়েকটি ছত্র স্মরণ করা যায়। কোপাই নদীর স্রোতের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি লেখেন-

> ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—
> তাকে সাধুভাষা বলে না।
> জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
> রেষারেষি নেই তার তরলে শ্যামলে।

আবার—

কোথাই আজ কাব্যের ছন্দকে আপন সাথ করে মেলে
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

গদ্য এবং পদ্যের,—অথবা অন্যভাবে বলা যায়,—ভাষার স্থূল অর্থ প্রকাশের দিক, আর তার সূক্ষ্ম গভীর ব্যঞ্জনার দিক—এই দুটি আদর্শের সমন্বয় খুঁজেছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য, এ শুধু বাইরে থেকে একটা পথ পেয়ে যাওয়া নয়। এ তাঁর শেষ বয়সের জগৎদৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। ভাষার ধারণী ক্ষমতার সীমা বাড়িয়ে দেবার প্রেরণা ছিল এই অভিপ্রায়ের মূলে। এ তাঁর বিশ্বানুভূতির প্রকাশকল্প সম্পর্কিত চিন্তা।

'নাটক' নামে আর একটি কবিতায় রচনার আবেদন সম্বন্ধে কথা আছে এবং সেই সঙ্গে আবার গদ্য-পদ্যের পার্থক্যের কথাও দেখা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন—

পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।

এবং—

গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।

এই কবিতার শেষ দুই ছত্রের ইঙ্গিতটি এই—

সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

সাধারণভাবে তাঁর যাবতীয় নাট্যসাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে এটি তাঁর আত্মসমালোচনা নয়। বিশেষভাবে 'পুনশ্চ'-র ঐ 'নাটক' নামে কবিতাটিই এর উদ্দিষ্ট ক্ষেত্র—এবং ব্যাপকভাবে বোধ হয়, তাঁর শেষ দিকের কাহিনী-কবিতাগুলির এই প্রকৃতিগত ইঙ্গিতটিও গ্রাহ্য। চির-কালের স্তব্ধতা এবং চলতি কালের চাঞ্চল্য মিলিয়ে দেবার আগ্রহ সক্রিয় ছিল এই শ্রেণীর রচনায়। 'পুনশ্চ'-র 'বাঁশি' এই সামর্থ্যেরই উদাহরণ। আকবর বাদশা'র সঙ্গে হরিপদ কেরানীর মিল ধরা পড়ে এই উপলব্ধিতে। তাঁর শেষ পর্বের কবিতার ভাষা-রীতি সম্বন্ধে ভাবতে গেলে এই অন্বয়ের দিকে ঝোঁক বিশেষভাবে দেখতে হয়।

এই 'নাটক' কবিতাটিতে তিনি যেমন লিখেছিলেন—'এক কালের ভালোটা/হয়তো হবে না অন্য কালের ভালো'—তেমনি 'নূতন কাল'-কবিতাতেও রুচি বদলে যাওয়ার কথা আছে, কিন্তু এই কবিতার 'তুমি' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা সন্ধানে এগিয়ে গেলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে মীমাংসা সহজ নয়। তিনি নিজে 'তুমি'র এইটুকু মাত্র পরিচয় দিয়েছেন—

যাচাই করতে আস নি তুমি—
তুমি দিলে গ্রন্থি বেঁধে তোমার কালে
আমার কালে হৃদয় দিয়ে।

সেই 'তুমি'-র জন্যেই তাঁকে দিনের শেষে নতুন পালা শুরু করতে হয়—

আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে;
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে করে।

এই পর্যন্ত এসে মনে হয় 'তুমি' বোধ হয় পাঠকের রুচি বা সংস্কারেরই সংকেত—যা সেকালেও ছিল, একালেও আছে; এই 'তুমি' যেন কবির প্রতি পাঠকপক্ষের নিষ্ঠা, বিশ্বাস, প্রীতি। তিনি এ-ব্যাখ্যা সমর্থিত হতে দিয়েছেন শেষ দিকের এই ছত্রগুলি লিখে—

সজ্জনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।
কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে।
সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয় দিয়ে যাব
এই ইচ্ছা।

কিন্তু এই উক্তির পরের ছত্রগুলিতে পৌঁছে হঠাৎ এ-ব্যাখ্যা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে—

যেন গর্ব করে বলতে পার
আমি তোমাদেরও বটে,
এই বেদনা মনে নিয়ে নেমেছি এই কালে—
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি তুমি নেই।
তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরনো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।

এ কি নিজের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে ব'লে কবির চূড়ান্ত উপলব্ধির নৈরাশ্য? তা যদি হয়, তাহলে 'তুমি'-হারা বর্তমান মানে, শিল্পীর সমজদার-হীন পরিবেশে,—সেই পরিবেশের শোচনীয় নিঃসঙ্গতা। শেষ দুটি পংক্তিতে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই
ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই।

গদ্য এবং পদ্যের শক্তিভেদ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার আর একটি ব্যাবহারিক নমুনা এই দশকের শেষ প্রান্তের একটি রচনা থেকে এখানেই স্মরণ করা যেতে পারে। 'প্রহাসিনী'র 'মিলের কাব্য' লেখা হয় শান্তিনিকেতনে,—রচনাকাল ১৯, জানুয়ারি, ১৯৪১। এই কবিতায় তিনি লেখেন—

ছন্দ ভাষা বাস্তব নয়, মিল যে অবান্তর—
নাই তাহাতে হাট-বাজারের গদ্য কলরব।

পুরুষ গদ্য,—নারী-পুরুষের মিলনেই দেখা দেয় পদ্য; এই ইঙ্গিতটি এই 'মিলের কাব্য'-তে প্রকাশিত।

একদিকে ভাবের এই বাহনভেদের ভাবনা দেখা দেয়, অন্যদিকে শ্রব্য ও পাঠ্য কবিতার আবেদনভেদ ও ভূমিকা-ভেদের প্রসঙ্গও তিনি ভেবেছেন। 'পুনশ্চ'-র 'পত্র'

কবিতাটি এ-দিক থেকে স্মরণীয়। বিক্রমাদিত্যের সভায় কবিরা যখন কবিতা শোনাতেন, আর আধুনিককালে ছাপা-বই থেকে পাঠককে যখন কবিতা পড়তে হয়, এই দুই ভূমিকার পার্থক্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

হায় রে; কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি-লোকে।

এই কথা-সূত্রেই আবার একটি 'তুমি'-র প্রয়োগ ঘটে—এবং এই 'তুমি' নিঃসন্দেহে পাঠকপক্ষই—

মন বলছে নিশ্বাস ফেলে,—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য—
আর আমি যদি হতেম—কী হবে বলে।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।

সে যাই হোক, ১১৩৯-এর ১০ই ভাদ্রের এই কবিতার সঙ্গে ১৪ই আষাঢ়ের রচনা 'পত্রলেখা'র কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। বিরহিণী সোনামোড়া ফাউন্টেন পেন নিয়ে চিঠি লিখতে বসেছেন,—কিন্তু তাঁর দুঃখ এই যে তিনি কবি নন,—'ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারি নে তো দিতে।'

এইসব কবিতায় ভাষার ভিতরে কণ্ঠস্বর সঞ্চারিত করবার নানা কৌশল ধরা দিয়েছে। সেকাল-একালের তুলনাও চলে,—সেই সঙ্গে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত তাঁর অজস্র চলতি মুহূর্তের স্মৃতিধারাও দেখা দেয়। সেই স্মৃতির অ্যালবাম থেকে এক-একটি দৃশ্য তোলা হয়েছে আশ্চর্য সব সাদৃশ্যের গুণে, যেমন—

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।
['সুন্দর']

শিল্পে ব্যক্তির বেদনা যে অলোকিক হয়ে ওঠে, মনে হয় এই উপলব্ধিরই ইশারা দেখা দিয়েছে ক্ষণে ক্ষণে,—যেমন 'বিচ্ছেদ'-কবিতায়—

মেঘদূত উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার পরে,
সেই ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী।

এই মুক্তিতত্ত্বের দিকটিই পুনরায় পাওয়া যায় 'পানের বাসা' কবিতাটিতে; আবার 'শেষ সপ্তক'-এর আট সংখ্যক কবিতার শেষ ছত্রগুলিতে এই মুক্তির আর এক ব্যাখ্যা ধ্বনিত।

দশ বছরের দুরন্ত ছেলের জগৎ যে তাঁর নিজের কবিতায় ধরা দেয় নি, এই স্বীকৃতি শোনা যায় 'ছেলেটা' কবিতার শেষ কয়েক ছত্রে—

কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।

এসব কথা শুনতে হয়তো কতকটা কৌতুকের মতো, কিন্তু এর গভীরে ছিল শিল্প রচনায় মন সম্বন্ধে তাঁর আত্মানুসন্ধান। 'বিশ্বশোক' কবিতাটিতে এই কথাই আর একভাবে বলা হয়। ব্যক্তিগত দুঃখ যতক্ষণ বিশ্বের গ্রাহ্য না হয়, ততক্ষণ তা সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে। অতএব—

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিও
বিশাল বিশ্বসুরে।

এই বেদনারই আর এক অভিব্যক্তি 'পুনশ্চ'-র 'কীটের সংসার'। 'পিঁপড়ে, মাকড়সা ইত্যাদি কীটপতঙ্গের জগৎ দেখতে ছোটো, তবু ছোটো তো নয়।' তিনি বলেন—

ঐ মাকড়সার জগৎ বন্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে;
ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে,
আমার সুখে দুঃখে রুদ্ধ
সংসারের ধারেই।

এই দৃষ্টি বিস্তারের তাগিদে বা সমবেদনার গুণেই 'শালিখ'-কবিতায় তিনি দলছাড়া সঙ্গীহারা শালিখের নির্বাসন-যন্ত্রণার হেতু সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। 'একজন লোক'-ও এই অনুভূতির ফসল। ১৭ই ভাদ্র ১৩৩৯,—এই কবিতার রচনাকাল। আধবুড়ো হিন্দুস্থানি সেই লোকটিকে—ছিটের মেরুজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি, বাঁ-কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,—পায়ে নাগরা—ভাদ্রের সকালে শহরের দিকে হাঁটতে দেখে—নিজের মনের গ্রাহিকা শক্তির সীমার কথাই রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল।—

ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্র মাসের সকালবেলায়
একজন লোক।

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতোটুকু জানি',—এই অজ্ঞান-চেতনার হাহাকার তাঁর বিশ্ববোধের পিপাসার সঙ্গেই জড়িত। এই পিপাসা তাঁর সারা জীবনের সত্য বটে, কিন্তু শেষ পর্বে এর তীব্রতা বিস্ময়কর।

পাশাপাশি অবস্থানের ক্ষেত্রেও,—যথার্থ আন্তরিক নৈকট্যের জাতিগত বাধা অনুভবের উদাহরণ পাওয়া যায় 'পুনশ্চ'-র 'অস্থানে' কবিতাটিতে। চামেলি আর মধুমঞ্জরী একই লতাবিতানে পাশাপাশি কাটিয়েছে দশ বছর। কিন্তু চামেলিলতা পাশের বিজলিবাতির লোহার তারে তারে ছড়িয়ে পড়ল যখন, তখন 'বিজলিবাতির অনুচরের দল' এসে 'তীক্ষ্ণ কুটিল আঁকশি দিয়ে' একদিন ছিঁড়ে ফেললো সেই লতা।

'এত দিনে বুঝল হঠাৎ অবোধ চামেলিটা
মৃত্যু-আঘাত বক্ষে নিয়ে,
বিজলিবাতির তারগুলো ঐ জাত আলাদা।'

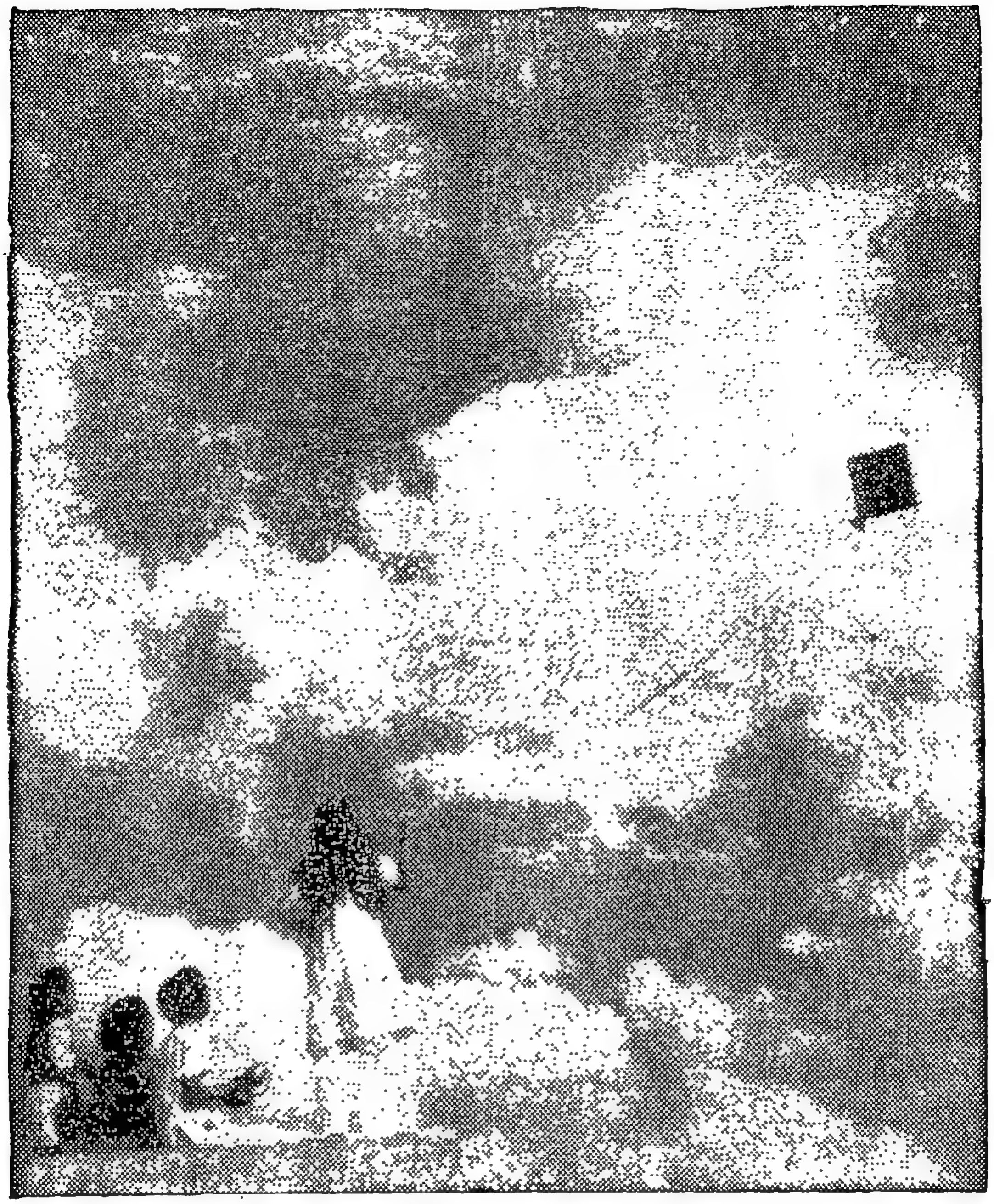

আরও এগিয়ে আরও উঁচুতে

উঁচু থেকে আরও উঁচুতে। গত বছরে স্টেট ব্যাঙ্কের আমানত ওই ভাবেই চলে আসছে। আজ তা ৯,১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আর শাখার সংখ্যা বেড়ে উঠেছে ১৫৫০০-এর ওপর। তার মানে আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা আরও হাজার হাজার লোক পাবে, বিশেষ ক'রে দূর-দূর অঞ্চলে। ওর মানে আপনার জন্যে সেবাও আরও ভাল হয়ে উঠবে। আপনি তা পাবেন, যখন আপনার প্রয়োজন হবে···যেখানে আপনার প্রয়োজন হবে।

সকলের সেবায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক

যা সাম্প্রতিক, তা নশ্বর। কিন্তু পরিদৃশ্যমান চলতি মুহূর্তের দৃশ্যমালার মধ্যেই চিররূপ বিদ্যমান। এই চিরন্তনকে ভাষায় ধরবার সাধনাই শিল্পের সাধনা। 'পুনশ্চ'-র 'চিররূপের বাণী'-তে এই ভাবটি দেখা দিয়েছিল। আবার 'বিচিত্রিতা'-র 'পসারিণী'-তে দেখা যায়—

নিরালা মাঠের মাঝে বসি
সাম্প্রতের আবরণ মন হতে গেল দ্রুত খসি।
আলোকে আকাশে মিলে
যে-নর্তন এ নিখিলে
দেখ তাই আঁখির সম্মুখে।

সেই নিখিলসত্য-কে তিনি বলেছেন—বিরাট কালের ওঙ্কার-ধ্বনি। এ ধ্বনি-তরঙ্গ অণুতে অণুতে জগৎসত্যের শোভা-সৌন্দর্যের বাচক। এর শ্রব্য আবেদন ওঙ্কার-ধ্বনি—এর দৃশ্যরূপ শ্যামল। তাঁর এই শেষ পর্বের অজস্র রচনায় অন্যান্য বর্ণশোভার বিরলতা নেই, কিন্তু এই শ্যামলেরই প্রাচুর্য।

'শ্যামলী' [১৯৩৬] গ্রন্থনামে এবং ঐ সংকলনের প্রথম ও শেষ কবিতায় যেমন, তেমনি আবার 'বিচিত্রিতা'-র [১৯৩৩] 'শ্যামলা' কবিতাটিতেও এই ব্যাপারের নজীর আছে। এই 'শ্যামলা'-তে তিনি লেখেন—তরুলতিকার ঘাসে যে প্রাণমূর্তি ব্যক্ত হচ্ছে—তারই প্রশান্ত পূর্ণতায় তিনি অনুরাগী। এই প্রশান্তির মানে কি? প্রশ্নটির জবাব আছে 'শেষ সপ্তক'-এর [১৯৩৫] চার সংখ্যক কবিতায়—যেখানে তিনি চঞ্চল বসন্তের অবসানে আকণ্ঠ ডুব দিতে চেয়েছেন সহজ নিরীক্ষার সত্যে,—বলেছেন—

ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগরসংগমে।

আর, শ্যামল রঙের প্রতি কবির আত্মনিবেদনের পুনরুল্লেখ আছে 'শেষ সপ্তক'-এর ত্রিশ এবং চুয়াল্লিশ সংখ্যক রচনায়।

পূর্ণ প্রকাশের ব্যাকুলতা তাঁর শেষ দিকের মানসিকতার বিশিষ্ট একটি দিক। 'শেষ সপ্তক'-এর পাঁচ-সংখ্যক কবিতায় এ-দিকটির উদাহরণ পাওয়া যায় এবং এই উদাহরণে মৃত্যু ও অপ্রত্যাশিত ছেদ নয়,—প্রকাশেরই অন্তর্ভুক্ত উপসম্পন্ন মাত্র। তিনি লিখেছেন—

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে
বধূ যেমন সত্য করে জানে আপনাকে,
সত্য করে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে প্রেম...
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

এই পূর্ণ প্রকাশের ভাষাকেই শেষ পর্বের কয়েকটি কবিতায় তিনি বলেছেন 'বাণী'। 'পুনশ্চ'-র 'চিররূপের বাণী'-র আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'শেষ সপ্তক'-এর নয় সংখ্যক কবিতায় সেই অর্থেই আবার তিনি 'বাণী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে?
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে......

কিন্তু এ পূর্ণতা, এ-বাণী কি শিল্পের লক্ষ্য হবে নাকি? তিনি নিজেই জবাব দিয়েছেন—

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী।
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে;
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।

আবার সতেরো-সংখ্যক কবিতায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গান সম্বন্ধে নিজের কথা জানাতে গিয়ে এই 'বাণী' শব্দটিই ব্যবহার করেন—

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,
বাহন করতে চায় কথাকে—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা...
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

বাণী' শব্দটির প্রয়োগ 'শেষ সপ্তক'-এর আরো কোনো কোনো রচনায় দেখা যায়,—যেমন একুশ-সংখ্যক রচনায়, কিন্তু সেখানে পূর্বোক্ত অর্থে নয়। 'আকাশবাণী' কথাটি পাওয়া যায় বাইশ-সংখ্যক কবিতায়,—'আবাঁধা বেণীর বাণী' আছে চব্বিশ-সংখ্যক কবিতায়। 'সৃষ্টির শাশ্বত বাণী' এবং 'আদিম বাণী' দুই-ই দেখা যায় ছাব্বিশ-সংখ্যক রচনায়। একত্রিশ-সংখ্যক কবিতায় পাওয়া যায় 'অগ্রদূতবাণী',—পঁয়ত্রিশ-সংখ্যক রচনায় 'খাঁচার পাখির কণ্ঠে যে বাণী' ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত বাড়াবার দরকার নেই,—এ-কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে যে শেষ দিকে ভাষা, বাণী, চিররূপ, ওঙ্কার ইত্যাদি শব্দ রবীন্দ্রনাথের চেতনা অধিকার করেছিল। তিনি শান্ত শাশ্বতকেই উপযুক্ত বাণীতে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন—'বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে।'—

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণক্ষেত্রে।

[৩৯-সংখ্যক]

সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নিজের জীবনের শেষপর্বের অতিমাত্রায় 'বর্তিয়ে-থাকা' বর্তমানকে তিনি সাহিত্যের একটি সহজ সূত্র দিয়েছিলেন চারুচন্দ্র দত্তের উদ্দেশ্যে লেখা 'শেষ সপ্তক'-এর বিয়াল্লিশ-সংখ্যক কবিতায়—'সব-কিছুর কাছে থাকাই সাহিত্য।' বিশেষভাবে সকল কালের প্রতি মানবিক দরদের প্রয়োজনীয়তাই তিনি দেখিয়ে দেন। অসহিষ্ণু, তর্কাতিশয্যময়, অহঙ্কারী পরিবেশকে তিনি তাঁর আয়ুষ্কালের শেষপর্বে—পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে বলেছিলেন—

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো।

সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ

বেলা দত্তগুপ্ত

সম্প্রতি প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোস্যাল সায়েন্সেস-এ ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা প্রায় হয় নি বললেই চলে। কারণ ধর্ম এবং ধর্মীয় রীতিনীতি এদেশে সমাজ সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় "যা সমাজবিজ্ঞানের একান্ত অপরিহার্য; অঙ্গ) ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। ফলত সমাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞানধর্মী চিন্তা ও মননের অভাব আছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান মহাকোষের বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর মতে ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানের কোঠায় শূন্য এটাই ধরে নিতে হয়। সুতরাং 'সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ' এই প্রবন্ধ লেখার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না, কারণ সমাজবিজ্ঞান ছিল না, নেই, অতএব সমাজবিজ্ঞানীও থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্তমান প্রবন্ধে সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথকে অনুসন্ধান করছি, কারণ বিদেশী ভারতবিশেষজ্ঞরা (?) সব সময়ই অভ্রান্ত নন এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই সীমিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই যে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয় সে তথ্য তাঁদের অগোচরে থেকে গেছে; এবং ঐ সময় থেকেই সমাজবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল বলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখায় অত্যন্ত উঁচুদরের সমাজবিজ্ঞানের রচনা পাই। স্কটল্যাণ্ডের সমাজবিজ্ঞানী অ্যাডাম ফার্গুসনের সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানী ডোনাল্ড ম্যাকরে যে মন্তব্য করেছেন ঠিক একই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-চেতনা সম্বন্ধে আমরা করতে পারি। ডোনাল্ড ম্যাকরে বলেছেন:

"He (Adam Fergusson) could not employ, of course, the vocabulary of special words and usages which sociology and anthropology have now developed, but read with attention he is not merely instructive and helpful, he can surprise with novel suggestions, insights and ideas that deserve consideration and research. We should not permit a change of terms to veil him from us."

রবীন্দ্রনাথের অগণিত রচনায়, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে, কবিতায় তাঁর সমাজবিজ্ঞানী চেতনার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমাজবিজ্ঞান-সচেতনার একটি আভাস দেওয়া হল মাত্র। এ কাজ দীর্ঘদিনের গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ও "সমাজবিজ্ঞান" প্রায় সহজাত। "সমাজবিজ্ঞান"-এর জন্ম ১৮৫০ খৃস্টাব্দে ইওরোপে, আর রবীন্দ্রনাথের, ১৮৬১ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষে। ১৮৫০-এ জন্ম হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে "সমাজবিজ্ঞান"-এর অধ্যয়ন ও অনুশীলন শুরু হয় ১৮৫৭ সন থেকে। ঐ বৎসর ইংলণ্ডে "ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোমোশন অব সোস্যাল সায়েন্সেস" নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লর্ড ব্রুহাম বলেন:

"....it was distinctly stated that its object was to elicit truth, not to profound dogmas, and that in every department any argument coming within the limits of the subjects for discussion and temperately and fairly urged, would be listened to with respect. In short the aim of the Association is to collect facts, to diffuse knowledge, to stimulate enquiry..."

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এর মাধ্যমে অনেক সমাজহিতকর কাজও হয় ইংলণ্ডে এবং ইওরোপের বিভিন্ন দেশে অনুরূপ সভা স্থাপনার উদ্যোগ চলে। ১৮৬২ সনে "ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোমোশন অব সোস্যাল সায়েন্সেস" নামে একটি আন্তর্জাতিক সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এ-বিষয়ে জার রাশিয়া একটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রেভারেণ্ড জেমস লং বিদেশের এই ধরণের অধ্যয়ন ও গবেষণার কথা জানতেন। ১৮৬৬ সনে বড়বাজার গার্হস্থ্য সমিতিতে (Burrabazar Family Literary Club) "Social Science for India" এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব বোঝাতে তিনি বক্তৃতা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, কৃষ্ণনগর, সিউড়ী, উত্তরপাড়া, বহরমপুর প্রভৃতি শহরে সমাজবিজ্ঞান চর্চার সমিতি স্থাপন করেন। সৌভাগ্যক্রমে, ঐ সময় ইংলণ্ডের খ্যাতনামা সমাজসেবী মিস কার্পেণ্টার ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। রেভারেণ্ড লং শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে তাঁর সমাজবিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনের কথা জানান এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এর ধরণে কোনো সংস্থা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা এ সম্বন্ধে শ্রীমতী কার্পেণ্টার-এর মতামত জিজ্ঞেস করেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লং সাহেবকে উৎসাহ দেন। ১৮৬৭ সনে কলকাতায় বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা (Bengal Social Science Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল "to collect, arrange and classify series of facts bearing upon the social, moral and intellectual condition of the people of Bengal, and by

such means to assist in the promotion of measures for the good of the country." অবশ্য, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠা হবার আগেই বেথুন সোসাইটি (১৮৫১), "দি অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্রেন্ডস্ ফর দি প্রোমোশন অব সোস্যাল ইমপ্রুভমেন্ট" (১৮৫৮) এবং বেনারেস ইনস্টিটিউট (১৮৬১) প্রভৃতি সভায় ও সমিতিতে সমাজবিজ্ঞান চর্চা ও আলোচনা হত। বেথুন সোসাইটিতে সমাজবিজ্ঞান শাখা (Sociology Section) বলে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। বেথুন সোসাইটি-র এই সমাজবিজ্ঞান শাখা বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞান সচেতনতার একটি জ্বলন্ত স্বাক্ষর। এই প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই আমরা নিঃসন্দেহে দাবি করতে পারি যে আমাদের দেশের সমাজবিজ্ঞান ধর্মের ধোঁয়াচ্ছন্ন নয় বরং অকপট বস্তুনিষ্ঠ ছিল। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা এই বস্তুনিষ্ঠ মনন ও গবেষণায় নতুনতর উৎসাহ সঞ্চার করে। রেভারেন্ড লং তাঁর "বাংলাদেশের সমাজ সম্বন্ধে পাঁচশত প্রশ্ন" রচনা করেন। প্রায় চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই প্রশ্নাবলী বাংলাদেশের সমাজের বিভিন্ন স্তর ও দিক সম্বন্ধে গবেষণার সূত্র নির্দেশ করেছে। ১৮৬৮ সনে লেখা এই "পাঁচশত প্রশ্ন" বর্তমানের সমাজগবেষণার পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। বর্তমান সমাজবিজ্ঞানের যা অধিতব্য বিষয়, প্রকৃতি ও পরিবেশ, পরিবার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, লোকযান ও লোককৃষ্টি, অপরাধতত্ত্ব, শাস্তিবিজ্ঞান ইত্যাদি. এ সবই বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভায় অধীত ও আলোচিত হত। ১৮৭০ সনে শ্রীমতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল "ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যব্যবস্থা" এবং ১৮৭৫ সনে শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টার "কারাগারে শৃঙ্খলা ও সংশোধনী বিদ্যালয়" (Prison Discipline and Reformatory Schools) সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। "স্ত্রীজাতির উন্নতি ও স্ত্রীশিক্ষা", কেশবচন্দ্র সেন ও চন্দ্রনাথ বসু; "বাঙ্গালীর পাল পার্বণ"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; "আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা"—লালবিহারী দে; "ইংরেজি শিক্ষা"—কিশোরীচাঁদ মিত্র; "বাংলাদেশের প্রবাদ", "বোম্বাই ও কলিকাতার দেশীয় সমাজ", "রাশিয়া ও ভারতবর্ষের গ্রাম—তুলনামূলক আলোচনা"—রেভারেন্ড লং—প্রভৃতি আলোচনায় ও প্রবন্ধে তদানীন্তন সমাজবিজ্ঞান চর্চার নির্দেশ মেলে। নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশে, তথা ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান চর্চার সম্যক সূচনা ১৮৬৭-তে, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১-তে, সুতরাং একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে "সমাজবিজ্ঞান"-এর কোলেই জন্মেছেন। ১৮৭০ সনে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর ভারত-সংস্কার সভা (The Indian Reform Association) স্থাপন করেন। সভার উদ্দেশ্য খুবই ব্যাপক ছিল— 'to promote the social and moral reformation of India' এবং এই ব্যাপক উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করবার জন্য সভার কাজ পাঁচটি শাখার ওপর ন্যস্ত করা হয়; এই শাখাগুলি যথাক্রমে (ক) স্ত্রী জাতির উন্নতি (খ) শ্রমজীবীদের শিক্ষা ও কারিগরি বিদ্যালয় (গ) সুলভ সাহিত্য (ঘ) মাদকদ্রব্য নিবারণ ও (ঙ) দাতব্য। পরবর্তীকালে বামাবোধিনী সভা, বামাহিতৈষিণী সভা, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সব সভা কিংবা সমিতিগুলি যুগপৎ জ্ঞানান্বেষণ ও সমাজহিতৈষণায় সাহায্য করেছে। এই 'informing and reforming' দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান এই সব সভা ও সমিতির মাধ্যমে জোগাড় করা সম্ভব ছিল। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৮-৬৯ সনে বাংলাদেশে শ্রমজীবী মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। (পরবর্তীকালে "সাধনা"-তে রবীন্দ্রনাথের "নারীশ্রমিক" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়) নিঃসন্দেহে, এই সব সভা ও সমিতিগুলি বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত ও নির্বাধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্যে বড় হয়ে উঠেছেন এবং এই সভা বা সমিতির 'informing and reforming' দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সারাজীবন অনুপ্রাণিত করেছে। যুক্তি ও মননের আলোকে আভাসিত রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার সূত্র ও প্রত্যয়। বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় তিনি যে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদেরই সগোত্র ছিলেন তা তাঁর রচনা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে।

সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথকে চিনে নেবার আগে পশ্চাদপটের একটু পরিচয় নেওয়াও প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ যে কালে জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন সে কালটা ছিল নতুন ভাবনার, নতুন মননের এবং নতুন জীবনবীক্ষার। ইওরোপের দিকের সব কটা জানালা খোলা। বুদ্ধির মুক্তির আলো এসে পড়ছে অবিরত। গানে, গল্পে, মজলিশে, আলোচনায়, গবেষণায় ও আত্মম্ভর বিশ্বাসের স্বীকৃতিতে মনের মুক্তি ধ্বনিত হচ্ছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বৈঠকখানা তো একাই একশ এদিক দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"তে এই আশ্চর্য জীবন্ময় পরিবেশের ছোট ছোট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরিশীলিত যুক্তি ও বুদ্ধির আলোয় সমাজকে চিনে নেবার শিক্ষা ও উপকরণ রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম থেকেই আহরণ করেন তাঁর পারিপার্শ্বিক থেকে। দ্বিতীয়ত অতি অল্প বয়সেই তিনি ইওরোপে যাবার সুযোগ পান। স্বদেশের সমাজ তাঁর জানা ছিল, এবার সুযোগ এল বিদেশীসমাজকে জানবার। তুলনামূলক আলোচনা বা গবেষণার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল তাঁর কাছে। এ সত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল যে, সম্পূর্ণভাবে কোনটাকেই, না বিদেশ, না স্বদেশ, বর্জন করা সম্ভব। "য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী"র ভূমিকায় দ্বিতীয়বার বিলাত প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এখানে স্মরণীয়:

"...এই রচনায় পদে পদে আমার এক পদ আর পদকে প্রতিবাদ করে চলেছে; আমার এক পদ যখন গতি আশ্রয় করে অগ্রসর আর এক পদ তখন স্থিতি আশ্রয় করে পশ্চাদবর্তী; আমার দক্ষিণ পদ যখন পূর্বের দিকে আমার বামপদ তখন পশ্চিমের দিকে...এখনো আমরা দুইশক্তির মধ্যে দোদুল্যমান, তাই উভয়পক্ষের সত্যকেই অনিশ্চিত ছায়ার মত অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।"

পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার কর্মিষ্ঠতা ও গতিময়তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল এবং একথা তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছিলেন যে, এই কর্মিষ্ঠতা ছাড়া দেশের অচলায়তন অপসরণের নান্যঃ পন্থা। তাই একদিকে যেমন তিনি ওদেশের কর্মিষ্ঠতার স্বপক্ষে এদেশের "আচারের অত্যাচার" ও "আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা"র ওপর কশাঘাত করেছেন, ঠিক তেমনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন এদেশের নকলনবিশী মানসিকতার ওপর। "নকলের নাকাল" এদেশের নকলপটু জীবনযাত্রার ওপর একটি সূচীতীক্ষ্ণ শ্লেষ। মননে, চিন্তনে, পরিধানে, কোনখানেই রবীন্দ্রনাথ সস্তা বিক্রয় সমর্থন করেন নি অথচ বিদেশী মাত্রই পরিত্যাজ্য এমন কথাও কখনো উচ্চারণ করেন নি। এই আত্মসম্মানী স্বয়ম্ভরতা ও উভমুখী শ্রেয়োবোধ রবীন্দ্রনাথের সমাজবিজ্ঞানী চিন্তা এক মূল্যবোধ বা value judgement-এ চিহ্নিত করেছে। "ভারতবর্ষ", "স্বদেশ", "সমাজ" প্রভৃতি বহু রচনায় এই মূল্যবোধের স্বীকৃতি দেখতে পাই। সমাজবিজ্ঞানে মূল্যবোধ বা value judgement একদা নিন্দিত হলেও বর্তমানের সমাজবিজ্ঞানীরা, যথা টি এইচ মার্শাল, জি সি হোমানস্, সি রাইট মিলস্, এ ভি গুল্ডনার, এবং আরও অনেকে সমাজ-

বিজ্ঞানে এই মূল্যবোধকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। "Anti-Minotaur : The Myth of a value-free sociology" শিরোনামায় এ. ডি. গুল্ডনার যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে:

"It would seen that social science's affinity for modelling itself after physical science might lead to instruction in matters other than research alone. Before Hiroshima, physicists also talked of a value-free science : they too, vowed to make no value judgements. Today many of them are not so sure. If today we concern ourselves exclusively with the technical proficiency of our students and reject all responsibility for their moral sense, or lack of it, then we may someday be compelled to accept responsibility for having trained a generation willing to serve in a future Anschwitz. Granted that science always has inherent in it both constructive and destructive potentialities, it does not follow that we should encourage our students to be oblivious to the difference. Nor does this in any degree detract from the indispensable norms of scientific objectivity ; it merely insists that differ radically from moral indifference." Value-free সমাজবিজ্ঞানের চর্চাকে "narrow technicians who reject responsibility for the cultural and moral consequences of their work"-এর প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত গুনার মিরডালের "এশিয়ান ড্রামা"তে অনুরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়—

Efforts to run away from the valuations are misdirected and foredoomed to be fruitless and damaging." (vol. I. 33).

রবীন্দ্রনাথ যে অনেক আগে সমাজ সম্পর্কে আলোচনায়, গবেষণায় মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এতে তাঁর বৈজ্ঞানিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজবিজ্ঞানে আজ একথা বহুল স্বীকৃত এবং বহুল প্রচারিত যে, "all social science is action research no matter how etherealized."

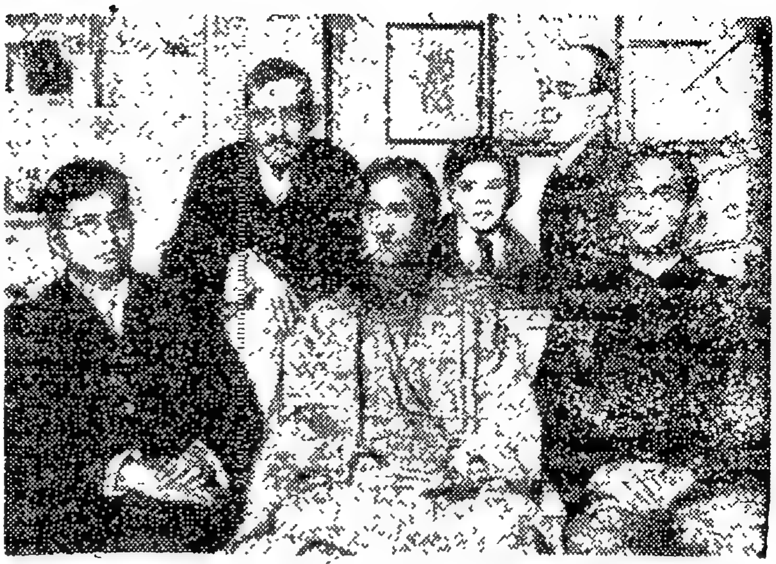

রোজেনস্টাইন পরিবারের সঙ্গে সপুত্র রবীন্দ্রনাথ (ফটো: ১৯১২)

এই পশ্চাদভূমির পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন সম্ভব।

সমাজবিজ্ঞানীর কাছে সবচেয়ে গোড়ার প্রশ্ন হল, সমাজ কি? সমাজে মানুষে মানুষে কি সম্পর্ক? এবং সমাজে শক্তির উৎসই বা কি? মানুষে মানুষে যুক্ত হয়েই যে সমাজ, সমাজবিজ্ঞানের এই প্রাথমিক ও মৌল সত্য রবীন্দ্রনাথের মননে ও লেখনে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি যখন লেখেন—

"পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা মানুষ, একলা মানুষ টুকরা মাত্র" ("সমবায়নীতি"), তখন কি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের কণ্ঠই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না—

"It is not natural for a man to be alone, and that some form of social unity is implied in his essential structure." (Mackenji—Outlines of Social Philosophy)" ? অথবা—

"দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই যে অনেকে এক হয়ে বাস করে তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের শক্তির ফল লাভ করে" (সমবায়নীতি)। এরই সাথে আমরা বিদেশী সমাজবিজ্ঞানীর উক্তির "that essence of man which is special to him can be directly known only in a living relation....the I exists only in relation to the Thou" (Martin Buber—*Between Man and Man*) এক অতি আশ্চর্য সাদৃশ্য কি খুঁজে পাই না?

মানুষে মানুষে যুক্ত এই সমাজ কি ভাবে সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগরায়নের পথে এগিয়ে প্রাধান্য লাভ করল, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমাজবিজ্ঞানী চেতনা অত্যন্ত প্রখর ছিল। গ্রাম ও নগরের দ্বৈতসত্তা ও প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনেক বিচক্ষণ সমাজবিজ্ঞানীকে চমক লাগিয়ে দেবে।

"সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগর আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। দেশের প্রাণ যে নগরে বেশি বিকাশ পায় তা নয়; দেশের শক্তি নগরে বেশি সংহত হয়ে ওঠে, এই তার গৌরব।"

"সামাজিকতা হল লোকালয়ের প্রাণ। এই সামাজিকতা কখনই নগরে জমাট বাঁধতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে, নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সেখানে স্বভাবতই আলগা হয়ে থাকে। আর একটা কারণ এই যে, নগরে ব্যবসায় ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন ও সুযোগের অনুরোধে জনসংখ্যা অত্যন্ত মস্ত, সেখানে মানুষ মুখ্যতঃ নিজের আবশ্যককে চায় পরস্পরকে চায় না। এই জন্য শহরে এক পাড়াতেও যারা থাকে তাদের মধ্যে চেনাশুনা না থাকলেও লজ্জা নেই। জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে।"

"এই সামাজিক আত্মবিচ্ছেদের বীজ ভেসে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এতে যে কেবল মানবজাতির সুখ ও শান্তি নষ্ট করে তা নয়, এটা ভিতরে ভিতরে প্রাণঘাতক।"

ঠিক একই সুর ও সাবধানবাণী প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী লুই ওয়র্থ-এর লেখায় ফুটে উঠেছে।

"Our acquaintances tend

to stand in a relationship of utility to us in the sense that the role which each one plays in our life is overwhelmingly regarded as a means for the achievement of our own ends. Whereas the individual gains, on the one hand, a certain degree of emancipation or freedom from the personal and emotional controls of intimate groups, he loses, on the other hand, the spontaneous self-expression, the morale and the sense of participation that comes with living in an integrated society." (*Community Life and Social Policy*—by Louis Wirth)

এলিয়েনেশন বা অনন্বয় বা বিচ্ছিন্নতা যাকে রবীন্দ্রনাথ 'সামাজিক আত্মবিচ্ছেদ' বলেছেন, আজকের সমাজবিজ্ঞানে সবচেয়ে বহুল চিন্তিত ও আলোচিত বিষয়। কি ভাবে এই অনন্বয় সমাজের সর্বত্র চারিয়ে গেছে এবং কি যৌথ, কি ব্যক্তি-জীবনকে নিরর্থক প্রমাণ করছে সে সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। তাই তাঁরা "Save Society" গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করছেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী Simmel তো নগরায়ন ও মানসিক ব্যাধির মধ্যে একটি কার্যকারণের সূত্র প্রমাণে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে ও নগরায়নের কলঙ্কগুলি অস্পষ্ট নয়, তাই তাঁরা আশঙ্কা করছেন যে একদার Metropolis একদিন Necropolis-এ পরিণত হবে। সমাজের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের জন্য আমরা যদি এইসব বিলিতী জর্মন মার্কিন সমাজবিজ্ঞান মন্তব্য, উক্তি, 'অমুক উবাচ' এই বলে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে মুহুর্মুহু উদ্ধৃতি করতে পারি, তাহলে রবীন্দ্রনাথকে কেন সেই পংক্তিভুক্ত করব না? নগরায়ন, এলিয়েনেশন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কোনক্রমেই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের ভাবনার চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। তাছাড়া "সমবায়নীতি"-র প্রবন্ধগুলি লেখা হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রাম ও শহরের জটিলতা তখন এত ব্যাপক ও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় নি। নগরায়ন ও এলিয়েনেশন এর সম্বন্ধে কোন সচেতনতাই ছিল না তদানীন্তন সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমাজবিজ্ঞানী-চিন্তার প্রাগ্রসরতা অতি অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে।

নগরায়ন বা নগরসভ্যতার কলঙ্ক-গুলির সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকলেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের স্থাণুত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে যুগধর্ম ও কালের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। "আচারের অত্যাচার" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

"ইংরেজিতে একটা কথা আছে, পেনি ওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ—বাংলায় তর্জমা করা যাইতে পারে 'কড়ায় কড়া কাহনে কাণা' অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিল দেওয়া। তাহার ফল হয়, বস্ত্র আঁটিন ফস্কা গিরো—প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল। আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা আচার-বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অংশের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।"

ইওরোপের কর্মিষ্ঠ জঙ্গম যুগটি রবীন্দ্রনাথকে কর্মে উজ্জীবিত করেছে। তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথের কর্ম-উন্মাদনা থেকে রেহাই পান নি। সমাজের অচল অনড় অবস্থায় তিনি দুঃখ বোধ করেছেন, শঙ্কিত হয়েছেন, কখন বা হতাশার-সঞ্চার হয়েছে মনে। কিন্তু অচলায়তনের মূলে আঘাত হানতে একটুকু দ্বিধা করেন নি তিনি। "সমুদ্র-যাত্রা" প্রবন্ধে দেখি, নির্মল তাঁর লেখনী,

"আমাদের সমাজে কোনো প্রকার স্বাধীনতার কোন অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল অন্ধকারে সমাজের অন্ধ-কূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তিলাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে।

"...আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশ-ব্যাপী অপূর্ব কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে।

"...যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিনা। তাহা যদি পারিতাম তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম অমুক কার্য আমাদের পক্ষে ভাল এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।" একই প্রতিধ্বনি দেখতে পাই "মানুষের ধর্ম" প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে—

"ধর্ম সম্প্রদায়েও যেমন সমাজেও তেমনি, কোনো এক পূর্বতন কালে যে সমস্ত মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্তীকালে আপন অধিকার ছাড়তে চায় না। পতঙ্গমণ্ডলে দেখা যায়, কোন কোন নিরীহ পতঙ্গ ভীষণ পতঙ্গের ছদ্মবেশে নিজেকে বাঁচায়। সমাজরীতিও তেমনি, তা নিত্যধর্মের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। একদিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর, অন্যদিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন কি অন্যায় প্রণালী—ঘরগড়া নরকের তর্জনীসংকেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তন।"

তাই রবীন্দ্রনাথ "অচলায়তন" ভাঙতে দৃঢ়সংকল্প। এই অচলায়তনই তো মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ আনে, নিজের মধ্যেও আত্ম-বিচ্ছেদ (এলিয়েনেশন) ঘটায়। ঠাকুর্দা আর বাঁদার চাপে অমল হয় গৃহবন্ধ, বিচ্ছিন্ন। "আমি যদি কাঠবেড়ালী হতুম" অমলের এই ছোট্ট উক্তি তো তার এলিয়েনেশন-মুক্ত হবার আকুতি। এবং এলিয়েনেশন থেকে মুক্তিই যে মানুষের কাম্য সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে "ডাকঘর"-এর শেষ লাইনটিতে।

"বলো সুধা তাকে ভোলেনি"

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানী মনোভাবেরই অনুসারী। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত আধুনিক Functionalist সমাজবিজ্ঞানীদের মতই নিজের বক্তব্য রেখেছেন। যৌথ পরিবার ও বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে কার্যকরী ছিল। অর্থাৎ তাতে সমাজের স্থিতি-স্থাপকতা বজায় থাকতো। আজ যদি বলা যায় যে যৌথ পরিবার ভাল কিন্তু বাল্যবিবাহ ভাল নয় তাহলে যৌথ পরিবার ও বয়স্কবিবাহ পরস্পরে dysfunctional হয়ে উঠবে। "একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছি, অথচ বাল্য-বিবাহ উঠাইতে চাই। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে অধিকবয়স্ক নূতন লোক প্রবেশ করিতে পারেনা। চরিত্র গঠনের পূর্বেই উক্ত পরিবারের সহিত লিপ্ত হওয়া চাই, নতুবা সেই নূতন লোক অচর্বিত কঠিন খাদ্যের ন্যায় পরিবারের পাক-স্থলীতে প্রবেশ করিয়া বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে।" (সমালোচনা)। Functional পদ্ধতি তিনি হয়ত সচেতনভাবে ব্যবহার করেন নি। তবে তাঁর সমাজ-বিজ্ঞানী চেতনা যে অত্যন্ত প্রখর ছিল তা এ থেকে বোঝা যায়।

ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ এবং তুলনামূলক সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি ডিভোর্স সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। ১২৯৪ সালে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে "হিন্দুবিবাহ" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে ডিভোর্স সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

"অনেকে হিন্দুবিবাহের পবিত্র একীকরণ প্রসঙ্গে ইংরেজি ডিভোর্স প্রথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ডিভোর্স প্রথার ভাল মন্দ বিচার করিতে চাহিনা। কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে ডিভোর্স প্রথা নাই বলিয়া যে আমাদের বিবাহের একীকরণতা বিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে তাহা বলিতে পারিনা। যে দেশে শাস্ত্র ও রাজনিয়মে একাধিক বিবাহ হইতেই পারে—না সেখানে ডিভোর্স প্রথা দূষণীয় বলা যায়না। স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছা মত তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি। স্বামী ব্যভিচার পরায়ণ হইলেও স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। স্বামী যখন প্রকাশ্যভাবে অন্যস্ত্রী অথবা বারস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পবিত্র একীকরণের মস্তকের উপর পঙ্কিল পাদুকা-সমেত দুই চরণ উত্থাপন করেন, তখন অরণ্যে রোদন ছাড়া স্ত্রীর আর কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। যদি জানা যাইত অন্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষের অধিকাংশই বারস্ত্রীসক্ত নহে তবে হিন্দুবিবাহের পবিত্র প্রভার সম্বন্ধে সন্দেহমোচন হইত।"

আবার, "...বর্তমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচনা করিবার অধিকার আছে। যদি দেখা যায় হিন্দুবিবাহে আমাদের বর্তমান সমাজে রোগ শোক দারিদ্র্য বাড়িতেছে, তবে বলা যাইতে পারে; মনু সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া বিবাহের নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব সেই সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহের নিয়ম পরিবর্তন করা অন্যায় নহে।"

"সভ্যতার প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রমবিভাগ" (সমালোচনা) এই প্রত্যয়ের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন "মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্যমান সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পরযুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা, আর একটা সামাজিক, এদের মাঝখানে ভেদ নেই...... মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয়, সেইখানেই বর্বরতা।...বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ। বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি। বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্যমানবের লক্ষ্য।" (পল্লীপ্রকৃতি) কারণ—

"সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্বপরায়ণ ভাব সকল অন্তর্হিত হইয়া সামাজিক ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, কেবলমাত্র স্বার্থপর ভাবসকল দূর হইয়া পরমার্থসাধক ভাবের চর্চা হইতেছে। এইরূপ সামাজিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যজাতিদের সমবেদনার ভাব বিকশিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে তাহাদের মধ্যে সমবেদনার ভাষাও বাড়িয়া উঠিতেছে।" (সংগীত) শ্রমবিভাগ, সভ্যতার বিকাশ, সহযোগীবৃত্তির প্রকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বর্তমান সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তারই সগোত্র। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুর্খাইম তাঁর *The Division of Labour in Society* বইটিতে শ্রমবিভাগের সঙ্গে সমাজের সংহতি ও সহযোগীবৃত্তির বিকাশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর যান্ত্রিক সমস্বার্থতা ও আঙ্গিক সমস্বার্থতা এই প্রত্যয় দুটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে সমাজের প্রাক্-বিকাশপর্বে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ যান্ত্রিক সমস্বার্থতার কিন্তু শ্রমবিভাগের বিকাশ-উত্তর সমাজে মানবিক সম্বন্ধপাতের ভিত্তি আঙ্গিক সমস্বার্থতা।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা যে সব কথা এখন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন এবং আমরাও ভাবছি যে অনেক নতুন কথা আমাদের শোনান হচ্ছে, সে সব কথা যে আমাদের একান্ত আপন সমাজবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ বহু আগে বলে গেছেন, সে-কথা আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত ছিলাম কারণ রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই—"দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি; ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই; ঘরের পাশে কি আছে জানিতে হইলেও হান্টার বই গতি নাই।" সুতরাং Eric Fromm-কে তাঁর *Save Society* বই-এর জন্য এবং তদন্তর্গত প্রত্যয়ের জন্য সাধুবাদ জানাই কিন্তু সেই একই প্রত্যয় রচনার জন্য (এবং এবিষ ফ্রমের লেখার বহু আগে) কি রবীন্দ্রনাথের সমাজবিজ্ঞানী মনকে অনুরূপ স্বাগত করি? ১৩১১ সালে "ভারতবর্ষীয় সমাজ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মেলা প্রসঙ্গে লিখছেন—"মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।" মেলা যে শুধু মানুষে মানুষে মিলনক্ষেত্র রচনা করবে তা নয়, মেলার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও সম্প্রসারিত করা যায়। অর্থনৈতিকভাবে ও শিক্ষাগতভাবে অনুন্নত দেশে রাজনৈতিক অথবা সামাজীকরণের উপায় হিসেবে মেলা, গ্রামীণ সমাবেশ ইত্যাদির যে প্রভূত মূল্য আছে বর্তমানের রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা এ-কথা দৃঢ়ভাবে প্রচার করছেন। কোলম্যান, লুসিয়েন পাই, সিডনী ভেরবা, ইথিয়েল দ' সোলা-পুল প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা এই যোগাযোগ সমাজবিজ্ঞান-এর ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "ভারতবর্ষীয় সমাজ" প্রবন্ধে অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"......এই মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

"প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোনপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।" অর্থাৎ রাজনৈতিক সামাজীকরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এবং "দিশি লোকের সঙ্গে যে দিশি ধারায় মিলিতে হইবে" এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমাজবিজ্ঞানী মন অত্যন্ত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীদেরও এই একই মত।

সমাজসন্ধিৎসা যে সমাজবিজ্ঞানের তথা সমাজজীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সমাজবিজ্ঞানী মনে সে সত্য স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছিল। ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে "ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ"-এ তিনি বলেন—

"সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বনগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থান ভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।"

". আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology বইয়ে পড়িনা তাহা নহে। যখন দেখিতে পাই সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মেনা জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কতো বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।"

"...ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণসুরে বীণা বাজাইতেছে এ কথা ধ্যান করা নেশামাত্র, কিন্তু ভারতমাতা যে পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"

শুধু উপদেশ নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে এই সংগ্রহের একজন শরিক ছিলেন তার প্রমাণ পাই কবি মোহিতলাল মজুমদারের **রবি প্রদক্ষিণ**-এ। কবি মোহিতলাল একবার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সংগে দেখা করতে যান। কবি তখন পদ্মার ওপর নৌকায় (বোটে) বাস করতেন। নৌকায় তাঁর ঘরে অনেক ধরণের জিনিসপত্র দেখে মোহিতলাল খুবই অবাক হন এবং ঐ সব জিনিস সংগ্রহের কারণ জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমি কিছুদিন যাবৎ একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি; বাংলার নিজস্ব আর্ট, আইডিয়া ক্রমে বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

নিজে তো লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পের নমুনা সংগ্রহ করতেনই। অন্যদেরও উৎসাহ দিতেন। তাঁরই একান্ত উৎসাহে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় দেশজ ও গ্রাম্য শব্দের সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে ধারাবাহিক ভাবে। তাঁরই উৎসাহে প্রাণিত হয়ে চন্দ্রকান্ত দে, দীনেশচন্দ্র সেন বেরিয়ে পড়েন মলুয়া, ময়নামতীর খোঁজে। দেশের সাহিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় **পূর্ববঙ্গের গীতিকা**। এই গীতিকার সুরমাধুর্য দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই রম্যাঁ রল্যাঁর ও ডুসান জ্‌ভাবিতেলের অনুরাগ ও প্রশস্তি-ধন্য হয়েছে এই **পূর্ববঙ্গের গীতিকা।** লোকযানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৩০০ সালে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় **মেয়েলিব্রত** প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথেরই আশীর্বাদ। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি"ও এই লোকমানসের অন্তরে যাত্রার একটি নিদর্শন। দক্ষিণারঞ্জনের বইতে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা লিখে দেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। এবং সে তথ্য সকলেরই জানা আছে।

লোকশিল্প ও লোকসাহিত্যের নমুনা সংগ্রহের কাজে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যস্ততা' কখনই স্তব্ধ হয় নি। দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে আমরা দেখি—

"চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপুজো, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে সমস্ত আলপনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোন শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিস হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই—চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর আছে তার ফোটো বা অন্য কোনো রকমের প্রতিকৃতি। ...ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির কাঁড়ের বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কিরকম চলিত আছে ভালো করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন।"

এমপিরিক্যাল বা বস্তুনিষ্ঠতার এর চেয়ে আর বড় কি নিদর্শন হতে পারে? বিদেশী লেখায় যেইমাত্র আমরা পড়ি যে ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানের অনুকূল আবহাওয়া ও চিত্তবৃত্তির অভাব আছে আমরা তখনই সায় দিয়ে বসি। আমেরিকান **জর্নাল অব সোসিওলজি, আমেরিকান সোসিওলজিস্ট বৃটিশ জর্নাল অব সোসিওলজি** প্রভৃতি পত্রিকায় ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন প্রবন্ধ দেখা যায়। এ সব প্রবন্ধের উত্তরে আমাদের দেশের হালের সমাজবিজ্ঞানীদের বিদেশী মন্তব্য খণ্ডনের কোন চেষ্টা তো নেই বরং কেমন যেন অপরাধের সুর ফুটে ওঠে তাঁদের লেখায়। অজ্ঞতা উভয়ত। বিদেশীদের অজ্ঞতা যদি বা মার্জনা করা যায়, দেশের লোকের নৈব নৈব চ। (প্রবন্ধের কলেবর স্ফীতির আশঙ্কায় এখানেই শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি।)

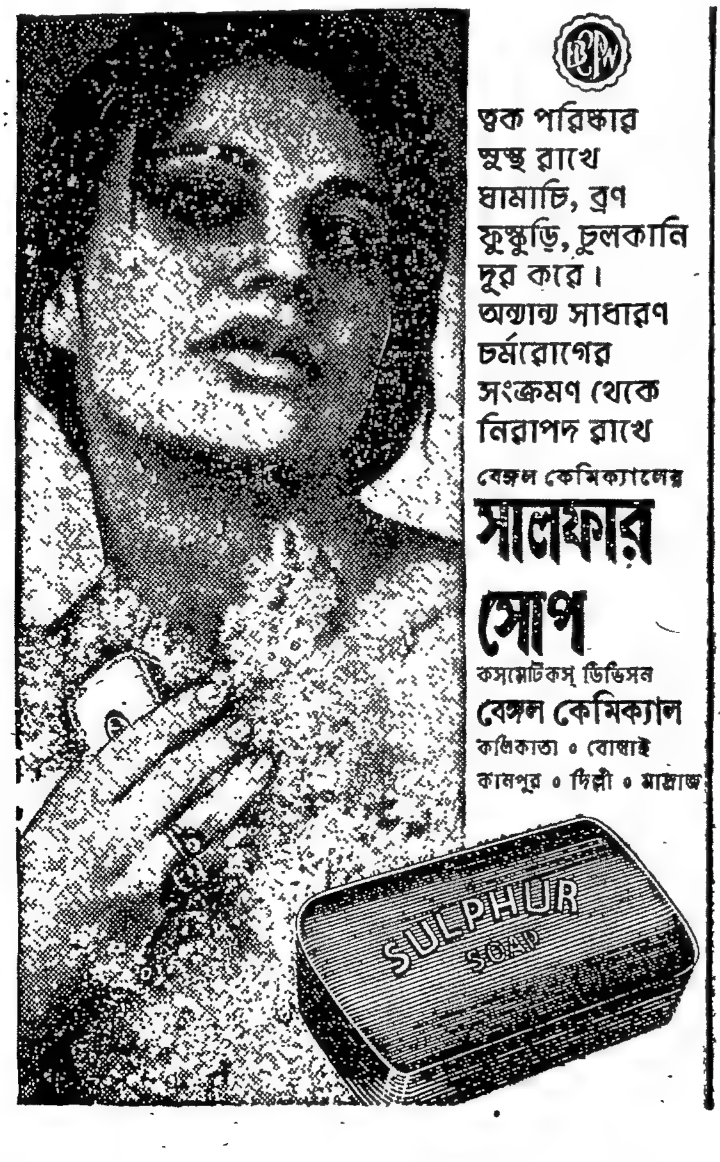

আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

মনোরঞ্জন হাজরা

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নেই। যত দিন যাচ্ছে, আর যত দিন যাবে এ বিস্ময়ের ক্ষেত্র যে ততই বিস্তৃত হবে, সে কথা না বললেও চলবে। কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর সৃষ্টির যাঁরা সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন তাঁদের চেয়ে পরবর্তী জেনারেশনের পরিধি অনেক বেশি এবং সে বেশি শুধু এদেশেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই। কাজেই গণ্ডীবদ্ধ সীমার মধ্যে জানায় চেহারাটা যতই সম্পূর্ণীকৃত হোক, একটা অতিকায় রিপুল সৃষ্টির রহস্যকে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার চেষ্টা বহু মানুষের মধ্যে হবেই এবং তাহলে আরও নব-নব দিগন্ত যে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে তা বলা বাহুল্য। তাই একথা কে অস্বীকার করবে যে সেই নব-নব দিগন্তের উদয়াচলে অধিকতর বিস্ময়ের আবির্ভাব ঘটবে না? এত পর্বতপ্রমাণ সৃষ্টির ঐশ্বর্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন যে তার সকল দিকে একসঙ্গে দৃষ্টি দেয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় এবং কোন কারণেও যদি বা তা সম্ভব হয়, তবে সকল দিকে সে মানুষের দৃষ্টি সমানভাবে নিবদ্ধ হওয়া রীতিমত কঠিন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ভাব-মূর্তিটিকে ফুটিয়ে তোলার যথার্থ প্রয়াস না করে আমি শুধু তাঁর মহান্ সৃষ্টিরহস্যের একটি দিককেই উল্লেখ করবার চেষ্টা করব।

ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড দারুণ মর্মপীড়ায় আহত তখন। এ মর্মপীড়া সম্ভবত জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যালীলার জন্য নয়। মর্মপীড়া বোধ করি এই জন্য যে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী শাসক হৃদয়কে অনাবৃত করে দিয়েছিলেন পৃথিবীর কাছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যে দেশের মানুষের অসহায় অবস্থায় কীট-পতংগের মত নির্বিচারে হত্যা করা হয় সে দেশে 'সম্মানের উচ্ছিষ্ট পত্র' পরিত্যাগ করাই ভালো এবং এক ঐতিহাসিক পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথ সেদিন সেই 'নাইট' পদবী ত্যাগ করেছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেদিন একদিকে যেমন ভারতে বৃটিশশাসনের নগ্নতা সমগ্র বিশ্বজগতের কাছে প্রকট হয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনিই আরেকদিকে কবিমনের গভীর অথচ পরিচ্ছন্ন একটি জাতীয়তাবাদী মনের পরিপূর্ণ রূপও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি জাতীয়তাবাদের এই প্রসন্ন চেতনাময় মূর্তি ভারতবাসীর কাছে প্রথম মূর্ত হয়ে উঠল? না তা তো নয়। রবীন্দ্রনাথকে এরও আগে এই মূর্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠতে দেখা গেছে। ঠাকুরবাড়ির তাঁত ও স্বদেশী বস্ত্রের প্রচলন থেকে যে শিশু রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে যাত্রা শুরু, সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি স্বদেশীয়ানার অন্যতম নায়ক হিসাবে। সেদিনকার 'স্বদেশী সমাজ' ও 'শিবাজী উৎসব পাঠের কাহিনী' সর্বজনবিদিত। তাঁকে আমরা দেখেছি এ সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে রাখীবন্ধনের মিছিলে নগ্ন পদে রাজপথ পরিক্রমা করতে। এই নবজাগরণকে তিনি অভিনন্দিতও করেছিলেন এই বলে—'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।' তাছাড়া পরবর্তীকালে উদাত্তকণ্ঠে তিনি স্বদেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—'সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি/যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলংক তিলক।' জালিয়ানওয়ালাবাগে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি অসহ্য মনোবেদনায় জাতির মর্মকথাকে পৃথিবীর কাছে উদ্ঘাটিত করে দিতে—সেই রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রভাতেই সূত্রপাত হয়েছিল এসবের। এই প্রসঙ্গে তাঁর জাতীয় কংগ্রেসে "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" সঙ্গীতটি পরিবেশন করার কথা রীতিমত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯০৮ সালে পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির আসন থেকে গ্রামোন্নয়নের যে সব কথা তিনি বলেছিলেন তাতেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে একটি সুস্থ জাতীয়তাবাদী মনের রুচিস্নিগ্ধ প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর জীবনে কারারুদ্ধ অসুস্থ সুভাষচন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠা, হিজলী বন্দীশালায় নিরস্ত্র বন্দীদের প্রতি নির্বিচারে গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, গান্ধীজীর অনশনে বিচলিত হওয়া প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে তাঁর এই মনেরই পরিচয় মেলে। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে তিনি লিখেছিলেন "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান', কিন্তু একথা তো তাঁর সারা দেশের সর্বকালের বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে

রোমে রবীন্দ্রনাথ (১৯২৬)

বিরচিত বলা যেতে পারে। স্বদেশের এই মহাপ্রাণ মানুষদের জন্য রবীন্দ্রনাথের মন সর্বদাই ব্যথায় বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ১৯৪১ সালে ৪ঠা জুন তারিখে লেডী র‍্যাথবোনের উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠিখানি তাঁর এই মন থেকেই যে স্বতঃ-উৎসারিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল সেকথা কি অস্বীকার করা যায়? র‍্যাথবোন চিঠি লিখেছিলেন পণ্ডিত নেহরুকে কিন্তু নেহরু সে সময়ে কারারুদ্ধ—সুতরাং সে চিঠির উত্তর আর কে দেবে; তাই রবীন্দ্রনাথ নিজে ধরেছিলেন তাঁর লেখনী। এই চিঠিতে ভারতে বৃটিশশাসনের যে-বাস্তব-চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন—উত্তরকালের কোন ঐতিহাসিক যিনি এই যুগকে আঁকতে যাবেন, তাঁকে এই চিঠিখানির সাহায্য নিতেই হবে। এখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ সবই হচ্ছে একটি খাঁটি-জাতীয়তাবাদী মানুষের নিখাদ চেতনার অভিব্যক্তি এবং এ অভিব্যক্তি হয়েছে এক অসামান্য রূপচিকর রূপরেখার মধ্যে দিয়ে।

মস্কোয় একটি মিউজিয়াম দেখে বেরিয়ে আসছেন রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনাই কি রবীন্দ্রনাথের জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছিল? না, তা কখনই না। যে কবি সীমার মাঝে অসীমকে দেখতে পান, সে কবি কখনো স্বদেশের চৌকাঠের এপারে দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না; থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়। সুস্থ জাতীয়তাবাদ কখনো আন্তর্জাতিকতাবাদের পথে অন্তরায় হতে পারে না। কোনও ব্যক্তির বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে তার স্বতন্ত্রতা থাকা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক বারোয়ারী-তলায় গিয়েও সামিল হওয়া। তাতে কারোরই কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বাড়ির চৌকাঠের মধ্যে থেকে নিজের স্বতন্ত্রতায় যদি কেউ উগ্রপনার পরিচয় দেয় তবে তাতে পারিবারিক আভিজাত্য প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু প্রতিবেশীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই যে জাতীয়তাবাদের অনুসরণ করতেন তা কোনক্রমেই উগ্রজাতীয়তাবাদ ছিল না এবং সেজন্য তিনি দেশের ভৌগোলিক সীমানা পার হয়ে যে বিরাট বহির্বিশ্বকে তাকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরম রূপটি সার্থক হয়ে উঠেছে এবং সম্পূর্ণীকৃতও হয়েছে বলা যেতে পারে।

সোভিয়েট রাশিয়ার জন্মলগ্নে ছিল যুদ্ধজনোচিত ক্ষয়ক্ষতি এবং অনুৎপাদনের অভিশপ্ত প্রভাব এবং এর ফলে তাকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হয়। সেদিন সোভিয়েট ছিল সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীর বুকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম আবির্ভূত রাষ্ট্র। তাই সেদিন পৃথিবী দুর্ভিক্ষপীড়িত রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতি দেখানো তো দূরের কথা তারা চাইছিল এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাক। কিন্তু সেদিন একটি মানুষ এদেশ থেকে আশা ও আশ্বাস সহানুভূতি ও সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন এবং তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সুস্থ জাতীয় চেতনার সুষ্ঠু প্রকাশ এই আন্তর্জাতিকতাবোধে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ 'সীমার মাঝে অসীম'। এটা ১৯২২ সালের কথা। এ সময় দেশের অনেককেই বলতে শোনা যেত, আগে আমার দেশ তারপর বিশ্বপ্রেমিকতা। কিন্তু আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথ কখনও এমনিতরো সংকীর্ণ মতবাদের শিকার হন নি। একই সংগে তিনি দুয়েরই প্রকাশ 'মধুর' করে তুলেছেন।

১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ, রাণী এলমহার্স্ট, শিল্পী নন্দলাল বসু, ডক্টর কালিদাস নাগ ও ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে কবি।

এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই একদা তিনি জাপানের উগ্রজাতীয়তাবাদের নিন্দা করেছিলেন। এ ঘটনা নোগুচিকে পত্র লেখার প্রায় কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা। পোর্ট আর্থার, মাঞ্চুরিয়া আর কোরিয়ার ঘটনার পর পরবর্তী অধ্যায়ে জাপান নিজের জাতীয়তাবাদকে যে উদ্দেশ্যে উগ্রপনায় ভরিয়ে তুলছিল, সে উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগে নি। যেমন ভাল লাগে নি তৎকালীন উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের। দেশের বাইরে কোন শক্তি কিভাবে গোটা পৃথিবীটাকে রসাতলে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, সেটা তখন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না এবং তিনি সেটা নির্ঘাতভাবেই ধরে ফেলতেন। তাই তৎকালীন জাপানের ব্যাপারে তিনি রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

এই আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি আগ্রহান্বিত ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন তার একটি জাজ্বল্যমান ঘটনা আছে তাঁর জীবনে। মানুষের সভ্যতা যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্মরণে রাখবে। সে কী সমাজতন্ত্রী মুসোলিনী সমাজতন্ত্রের মুখোস খুলে ফেলে তখন ইতালীতে ফ্যাসিবাদের প্রবর্তন করেছেন। চতুর মুসোলিনী দেখলেন যদি তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষীদের আমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের দিয়ে কোনরকমে একবার ফ্যাসিবাদের গুণগান করিয়ে নিতে পারেন তাহলে আর যাই হোক, যে সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলে তিনি ইতালীর সর্বময় কর্তারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন সেই জাতীয় মার্কা সমাজতন্ত্রই যে দেশ গঠনের পক্ষে একান্ত সুষ্ঠু পথ তা বিজ্ঞাপিত করতে পারবেন। তাতে চাই কি পরবর্তী যুগে বিপ্লবের হাত থেকে বাঁচবার কিছুটা সুযোগ করতে পাবা যাবে আর ধনতন্ত্রবাদের মৃত্যুঘন্টাকেও দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই একদা মুসোলিনী রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানালেন ইতালীতে।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেও ইতালীতে গিয়েছিলেন। ইতালী সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবারে যেতে মুসোলিনী তাঁকে রাজার মত সম্বর্ধনা জানালেন। কিন্তু কবি তখনও মুসোলিনীর মতবাদ সম্পর্কে ততখানি সচেতন ছিলেন না। সেজন্য আমন্ত্রণ, সম্বর্ধনা ও আতিথেয়তার পরিবেশে তিনি স্বভাবসিদ্ধভাবেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার করে গেলেন মুসোলিনীর ইতালীর সঙ্গে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অসচেতনতায় জগতের আরেকজন মনীষী রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েন। ইনি হলেন সেই বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী লেখক মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ। রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সুইজারল্যান্ডে নিয়ে আসেন এবং ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অবহিত করান।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব চরিত্র মাধুর্যের প্রকাশ। তাঁর হিমালয় সদৃশ ব্যক্তিত্ব, যিনি আপন অপরিমেয় সৃষ্টির মধ্যে আপনিই সূর্যের মত ভাস্বর, জীবনের মন্ত্রপাঠ তিনি কি করে নিতে পারেন অন্যের কাছ থেকে? কিন্তু এত বড় ঘটনা পৃথিবীতে কে না জানে। রবীন্দ্রনাথের যাত্রাপথে সেই ১৯২৬ সালে যদি রোলাঁর সঙ্গে তিনি মিলিত না হতেন, তবে তাঁর জীবনের একটি দিক হয়তো অন্ধকারেই থেকে যেত আর সেই অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তিনি হয়তো কি পান নি তারি হিসাব মিলাতে বারে বারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন কিংবা পরবর্তীকালে যখন ফ্যাসিবাদের হিংস্র বর্বর মূর্তি দেখতে পেতেন তখনই হয়তো আতংকে তিনি শিউরে উঠতেন এবং জীবনকে যিনি কোনদিন ধিক্কার দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি, সেই ধিক্কার দিয়েই তিনি বলতেন "...এই পর্যুদস্ত গেসে এসেছি আমি একদিন।' সেন্ট পল ক্যাথিড্রালে বোমা বর্ষিত হলে যে রবীন্দ্রনাথ 'মানুষজন্তুর হুহুঙ্কার' শুনতে পেতেন সেই রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের সেই ভয়াল রুদ্রমূর্তিতে আপন অজ্ঞানতাকে কি ধিক্কার না দিয়ে পারতেন? সেদিন ইউরোপের সিংহদরজায় মানব-সভ্যতার অতন্দ্র প্রহরী রোম্যাঁ রোলাঁর সঙ্গে প্রতীচ্যের সহযোদ্ধা রবীন্দ্রনাথের ভাবের মিলন বিশ্ববাসীকে দিয়ে গেছে চিন্তারাজ্যে এক ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিপুল সম্পদ—যে সম্পদে গরীয়ান হয়ে এগিয়ে চলছে তাঁদের উত্তরকালের বংশধরেরা।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেখা গেছে সেই জাগ্রত চেতনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। পৃথিবী পরিক্রমা করতে করতে রাশিয়ায় পৌঁছে তিনি যে কথা বললেন তাতে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'রাশিয়ায় না এলে আমার এ জীবনের তীর্থদর্শন বাকি থেকে যেত'—পৃথিবীর একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রকে এমনভাবে আর কে অভিনন্দিত করতে পেরেছে? শুধু তাই নয় এই রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, 'খুঁড়িয়ে চলার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে ... রথ

১৯১৬ সালে জাপানে কবির অনুরক্ত পিয়ার্সনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

বানিয়েছে।' তাছাড়া লীগ অফ নেশনসে রাশিয়া কর্তৃক উত্থাপিত নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবকেও তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তৎকালীন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের যেন কোন পার্থক্যই ছিল না। অথচ একথা কোন সমালোচকই কোনদিন বলতে পারবেন না যে মাঠে-ময়দানে ঝাণ্ডা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করে বেড়াতেন। কিন্তু চিন্তারাজ্যে ও সম্মুখপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা তাঁর এমনিই ছিল যে পৃথিবীর নব-জাগ্রত শক্তির সঙ্গে সমান-তালে চলতে জীবনে তিনি কখনও কোন অসুবিধা বোধ করেন নি।

এই মহৎ আন্তর্জাতিকতাবাদেরই প্রকাশ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের আরেকটি পত্রে—Poet to Poet লেখাখানিতে। পত্রখানি তিনি লিখেছিলেন ১৯৩৮ সালে জাপানের জাতীয় কবি নোগুচিকে। পর-রাজ্যলোভী জাপান তখন তার অভিযান চালাচ্ছিল মহাচীনে। মাছিমারা কাগজে যেমন করে কাতারে কাতারে মাছি মরে ঠিক তেমনি করে মহাচীনের শহরে-প্রান্তরে জাপানের উগ্র জাতীয়তা-বাদী শক্তি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা তখন মানুষ মেরে বেড়াচ্ছিল। নোগুচি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে তারই সমর্থন। দুর্ভাগ্য নোগুচির আর দুর্ভাগ্য জাপানের শাসকমণ্ডলীর যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারেন নি। বিশ বছর আগে জাপানের উগ্রজাতীয়তাবাদের মধ্যে ভবিষ্যতের যে বিপদকে তিনি অন্তর্নিহিত অবস্থায় দেখেছিলেন তারই অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ ও একজন জাতীয় কবিকে সেই সম্পর্কেই ওকালতি করতে দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রায় গর্জন করে উঠলেন। তীব্র ভাষায় তিনি নোগুচিকে নিন্দা তো করলেনই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, পথ কোনদিকে তার ইঙ্গিত দিয়ে।

এর পর মনে পড়ে সেই ভয়ংকর দিনগুলির কথা—যখন নাকি হিটলার ও মুসোলিনীর প্রত্যক্ষ যোগসাজসে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট শাসিত স্পেনকে আক্রমণ করল। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পতনের কথা একদিকে যেমন ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি আরেক ঐতিহাসিক ঘটনাও সেই সময়ে ঘটে এবং সেটি হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয়। সেদিন চার্চিল বলে ফেলেছিলেন "পরাজিত শত্রু জার্মানীকেই আমাদের সাহায্য করতে হবে, তা না হলে সমগ্র ইউরোপ তথা পৃথিবীতে সাম্যবাদ বিস্তৃত হয়ে পড়বে।" ইউরোপীয় রাজনৈতিক নেতাদের এই মনোভাব যে কি সাংঘাতিক তা সেদিনকার পৃথিবী কতখানি উপলব্ধি করেছিল তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু এই মনোভাবেরই পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, স্পেনের কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, এ্যানার্কিস্ট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দলগুলির সম্মিলিত শক্তির ভিত্তিতে গঠিত সংযুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে একটা দেশে একটা ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশকে ইউরোপীয় ধনতন্ত্রবাদের কুশীলবেরা ভাল চোখে দেখতে পারেন নি—যেমন ঠিক ভার্সাই সন্ধির পরেও সোভিয়েট রাশিয়াকে তাঁরা ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁরা আজন্ম শত্রু জার্মানীকে বরং টেনে তুলবেন তবু সোভিয়েট রাশিয়াকে বরদাস্ত করবেন না। তাই এ ক্ষেত্রেও হিটলার ও মুসোলিনীর হাতের পুতুল হয়ে ফ্রাঙ্কো স্পেনের বুকে হামলা করুক, সেও বরদাস্ত করা যাবে। কিন্তু স্পেনের সংযুক্তফ্রন্ট সরকারকে জীবিত থাকতে দেয়া হবে না। কিন্তু পাছে এই মনোভাব ধরা পড়ে, পাছে লীগ অফ নেশনসে প্রেসিডেন্ট উইলসনের সেই দফাটি উঠে পড়ে, যে দফায় লিখিত ছিল আক্রান্ত দেশকে সহায়তা করতে হবে—তাই সেদিন গ্রেট বৃটেনের নেতৃত্বে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি 'নন-ইন্টারভেনশনের' আওয়াজ তুলে দিল।

কিন্তু এ সময়ে সমগ্র পৃথিবীর চিন্তাধারা দ্রুত বদলে যাচ্ছিলো। সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয় পৃথিবীর ইনটেলেকচুয়াল মহলকে একেবারে নাড়া দিয়ে দিয়েছিল। ইতিপূর্বে রোম্যাঁ রোলাঁ প্রসঙ্গে সে কথা আমরা পেয়েছি। তাই এ সময়ে দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী ব্যক্তিবর্গ মিলে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড গঠন করলেন। উদ্দেশ্য স্পেনের গৃহযুদ্ধে সংযুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাঁচাতেই হবে। নন-ইনটারভেনশনের গণ্ডীবদ্ধ আইনকে ডিঙিয়ে বিভিন্ন দেশের লেখক শিল্পী সাহিত্যিকরা পর্যন্ত মসী ছেড়ে অসি হাতে যোগ দিলেন এই ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে। ইতিহাসে স্মরণীয় আছে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল স্পেনের রণাঙ্গনে। এই যুদ্ধে লেখক র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কর্ডওয়েল প্রমুখ লেখকরা প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

'নন-ইন্টারভেনশনের' নামে স্পেনকে এইরকম অসহায়ভাবে ডোবানোর প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় ধনতন্ত্রবাদের কুশীলবদের ওপর রীতিমতভাবে বিক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন, 'নন-ইন্টারভেনশনের নামে "স্পেনের প্রজাতন্ত্রী গভর্নমেন্টের তলায় ইংলণ্ড কীরকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে", তার কথা। এ যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কত বড় অভিজ্ঞতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির কথা তা রাজনীতির ছাত্রমাত্রেই উপলব্ধি করবেন। এই ভণ্ডামিকে রবীন্দ্রনাথ যথাযথভাবে ধিক্কার দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে আরেকটি কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে কথাটি হচ্ছে যুদ্ধ-বিরোধী দর্শন সম্পর্কে। প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদের মর্মবাণী হচ্ছে যুদ্ধ নয়, শান্তি। টলস্টয়, লেনিন, গোর্কি, রোম্যাঁ রোলাঁ, বার্নার্ড শ', রাসেল যে যুগে আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে যুদ্ধবর্জন ও শান্তিকেই মানুষের মহৎ কামনা বলে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এমন কি এজন্য তাঁদের নানা প্রকারের বিরোধিতা ও নির্যাতনের সম্মুখীনও হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এই মহৎ কামনার তীব্র আবেগে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। বরং নিন্দা ও সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ভগবান বুদ্ধের নিকটে প্রার্থনা জানিয়ে কিংবা গীর্জায় উপাসনা করে যুদ্ধযাত্রা করাকে তিনি তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে তিনি যখন দেখলেন, "সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কীরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত" তখন তিনি লিখলেন, "এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।" এর চেয়ে যুদ্ধের বিভীষিকা আর তার বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তোলার বাণী আর কি হতে পারে।

যুদ্ধ নয়, শান্তি, তারও আবার একটা দিক আছে। সেদিক মানুষের দিক, তার কল্যাণের দিক, মানুষকে সুমহান আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দিক। রবীন্দ্রনাথ তাই যে-আন্তর্জাতিকতাবাদী, সেখানে তিনি শান্তির সাধক, বিরাট মানবতার প্রতীক। তাঁর নিজের কথা দিয়েই আমার এ রচনা শেষ করব। তিনি বলছেন—"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

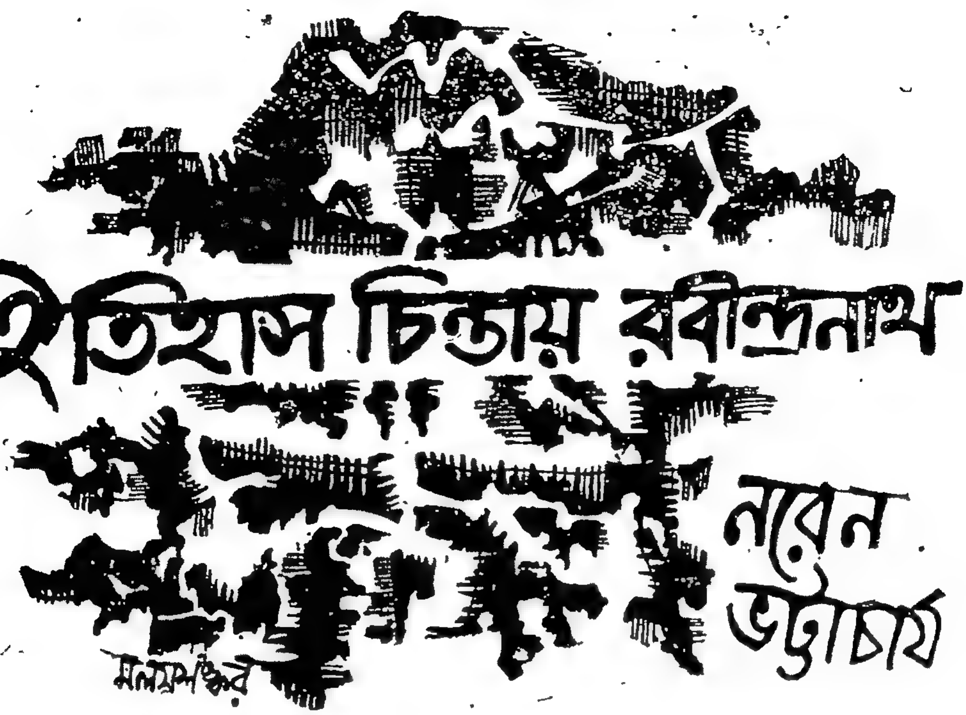

ইতিহাস চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ

নরেন ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন দিকগুলির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করার একটি পরিকল্পনা সাপ্তাহিক বসুমতীর রবীন্দ্র-সংখ্যার জন্য কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন এবং সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা সম্পর্কে কিছু লেখবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু এ-বিষয়ে কিছু লেখার আগে আমার মনে যে প্রশ্নটি জেগেছে সেটি আমি বিচক্ষণ পাঠক, রবীন্দ্রানুরাগী এবং সাপ্তাহিক বসুমতীর কর্তৃপক্ষের নিকট রাখছি। রবীন্দ্রনাথের মত যাঁরা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, যাঁরা অজস্রধারায় লিখেছেন এবং সবকিছু মিলিয়ে অনন্যসাধারণ কালজয়ী বিরাট পুরুষে পরিণত হয়েছেন তাঁদের এভাবে খণ্ডবিখণ্ড করে দেখা সঙ্গত কি-না। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মত মানুষদের মূল্যায়ন সামগ্রিকভাবেই করা উচিত। বিশেষ করে যেগুলি তাঁদের প্রতিভার অপ্রধান দিক সেগুলি সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক ছিলেন না, তবে ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তা প্রচুর ছিল। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে তাঁর ইতিহাসচিন্তার পরিচয় এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে এবং সেগুলিকে একত্র করারও প্রচেষ্টা হয়েছে। কবিগুরুর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বহু রচনায় এই প্রচেষ্টার পরিচয় আছে। নিজের সুদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবি তাঁর ইতিহাসচিন্তা ব্যক্ত করেছেন এবং সেই কারণেই তাঁর মন্তব্য-সমূহের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি থাকতে বাধ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোটের ওপর তিনি ইতিহাসের নর্মেটিভ দিকটি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

[অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের দেশের একটি রীতি হচ্ছে এই যে, এখানে কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হন, বা বিশেষ ক্ষেত্রে কোন প্রতিভার নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অপরাপর বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার জন্মে যায় এবং অধিকাংশ মানুষই সেটাকে মেনে নেন। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত-সমূহ কোন অনধিকার চর্চার পরিচয় বহন করে না। রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন, কাজেই ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলিকে কোন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর মতামত বলে গ্রহণ করলে হবে না, একজন ইতিহাস-নিষ্ঠ অনুরাগী ব্যক্তির মতামত বলেই গ্রহণ করতে হবে, যিনি একটু চেষ্টা করলেই একজন প্রথম সারির ঐতিহাসিক হতে পারতেন।]

বাল্যকাল থেকেই কবি বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উল্লেখ আছে। তাঁরা অনেকে মিলে একটি সারস্বতসমাজ গড়েছিলেন এবং একটি ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়ের কাজে হাত দিয়েছিলেন। উনিশ শতকে বাংলাদেশে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের ব্যাপক প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কাজে অনেকেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা যে সকলেই পেশাদার ঐতিহাসিক ছিলেন তা নয়, যেমন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্যবিদ্যায় যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর অবদানও বড় কম নয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস নিয়ে রীতিমত মাতামাতি করেছিলেন এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণাও করেছিলেন। উত্তর জীবনে রবীন্দ্রনাথ অনেক প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, তাঁর যুগের সকল বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের সঙ্গেই তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তাঁদের কাজ করার পদ্ধতিও তিনি যত্নসহকারে অনুধাবন করেছিলেন। লেভী, ভিন্টারনিৎস প্রমুখ ভারততত্ত্ববিদ শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল কাটিয়ে গেছেন। কাজেই এই সকল প্রভাব তাঁর জীবনে ও রচনাবলীর ওপরে যথেষ্ট পড়েছে। তাঁর পূর্বসূরীদের মত ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক ও উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন।

আমি নিজে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র, কাজেই বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কি রকম ছিল সে বিষয়ে কিছুটা আলোকসম্পাত করার চেষ্টা করব। তাঁর যুগে ইংরাজী শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত বাঙালীর সামনে প্রাচীন ভারতের আবেদন বিমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এক দলের কাছে প্রাচীন ভারতের যা কিছু সবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অচল এবং অপর দলের কাছে প্রাচীন ভারতের যা কিছু সবই আদর্শ, সুগভীর তাৎপর্যবাচক টিকি রাখারও নাকি বৈজ্ঞানিক কারণ ছিল। উভয় তরফের এই বাড়াবাড়ি রবীন্দ্রনাথের মত যুক্তিবাদী মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল এবং বিভিন্ন রচনায় তিনি এই অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে কখনো খোলাখুলি কখনো বা ব্যঙ্গমূলক রচনায় তীব্র সমালোচনা করেছেন। ব্যঙ্গকৌতুক গ্রন্থের একটি রচনায় প্রাচীন ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার ছিল কি-না তার ওপর একটি শ্লেষাত্মক আলোচনা করেছিলেন দুজন কল্পিত ঐতিহাসিকের কল্পিত রচনা দিয়ে। অপর একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের তথাকথিত আর্যবাতিক নিয়ে সরস আলোচনা করেছেন। এগুলি অবশ্য তাঁর কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, যথার্থ ইতিহাস-অনুরাগীর যে গুণগুলি থাকা প্রয়োজন।

ইতিহাস বলতে শুধুমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজাবাদশার কাহিনী বোঝায় না এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই বুঝেছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে উপকরণের সত্যই যে অভাব আছে এবং শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হওয়া যে উচিত নয়, তা তিনি সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "ইতিহাস সকল দেশের সমান হইবেই এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথচাইল্ডের জীবনী পড়িয়াছে সে খৃস্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও অফিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই, সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেত্রের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে, সে-ই প্রাজ্ঞ। যিশুখৃস্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয়ে সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়, তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়।"

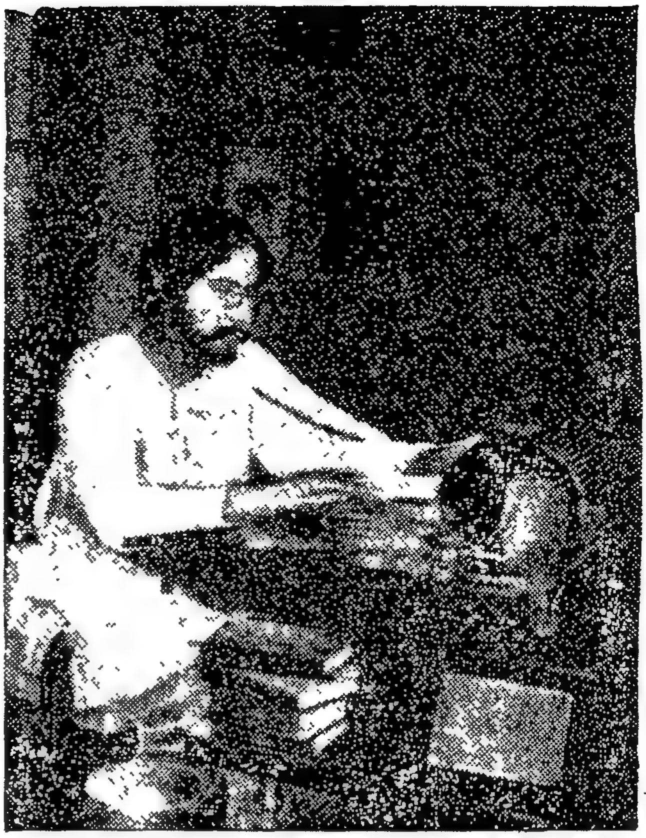

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভেদের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন করা। "বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ

২৫শে বৈশাখ বেরুচ্ছে
বাংলার কৃষক জীবনের সংগ্রামী আলেখ্য
প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা
আবদুল্লাহ রসুল-এর
নতুন ধরণের উপন্যাস
আ বা দ
দাম : বারো টাকা
পরিবেশক
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—ইহাদিগকে একটি মূল ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূল ভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূরে করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিয়ুজীল্যান্ড, কেপকলনিতে তাহার পরিচয় আজ পর্যন্ত পাইতেছি। হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে।"

অবশ্য প্রাচীন ভারতকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখতে চেয়েছেন, বাস্তব অবস্থাটা সত্যই সেরকম ছিল কি না সেটা অবশ্যই বিচার্য বিষয়। পেরিক্লসের সমাধি-ভাষণ আসলে থুকিডিডেসের নিজেরই কথা, তিনি যেভাবে আথেনীয়দের দেখতে চেয়েছিলেন, যদিও বাস্তবে আথেনীয়রা তা ছিল না। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে কোনদিনই ঘটনাপরম্পরা হিসাবে দেখেন নি, উপরি-উক্ত উদ্ধৃতি দুটিই একথার প্রমাণ। ইতিহাস ঠিক "রেকর্ড অফ থিংস" নয়, সেখানে একটি "পয়েন্ট অফ ভিউ"-রও প্রয়োজনীয়তা আছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাসের মধ্যে কয়েকটি ভাবের বিকাশের পদ্ধতিটিকে খুঁজতে চেয়েছেন। তাঁর মতে "য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারা যায় না। এই জন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদাই জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।" এ দৃষ্টিভঙ্গি যে কতদূর সঠিক তা নিয়ে হয়ত প্রশ্নের অবকাশ আছে, কিন্তু এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে তিনি কোন এক শাশ্বত সম্পদকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ সকল কার্যে আজীবন উৎসাহ দিয়েছেন। আগেই বলেছি বিশ্বভারতীতে তিনি প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্‌দের সমবেত করেছিলেন। তাছাড়া সার্থকভাবে ইতিহাস রচনা করতে গেলে দেশ, সমাজ এবং বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতির সঙ্গে যে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ তা সর্বাগ্রে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাইরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস, তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোন দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক, অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনো হইতেই পারে না। ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্বল থাকে, তখন উদ্ভাবনা শক্তির আশা করা যায় না। এমন কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আরম্ভ করিতে পারি নাই।" একথা রবীন্দ্রনাথের যুগে যতটা সত্য ছিল, আজও ঠিক তাই আছে।

সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থমালা

সিকন্দর থেকে পলাশী	শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পশ্চিমীদের প্রাচ্য-অভিযানের কাহিনী। ১০টি মূল্যবান মানচিত্র। [৬·৫০]
ঠাকুরবাড়ীর কথা	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের সুষ্ঠু আলোচনা। [১২·০০]
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি	ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার গবেষণামূলক সরল আলোচনা। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা। [১০·০০]
রবীন্দ্র-দর্শন	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেদের সরল ব্যাখ্যা। [২·৫০]
উপনিষদের দর্শন	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপনিষদ-সমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·০০]
বাঁকুড়ার মন্দির	শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৬৭টি আর্ট প্লেট। [১৫·০০]
বৈষ্ণব পদাবলী	সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সঙ্কলিত প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ। [২৫·০০]
ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]
রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত	সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত যুগোপযোগী প্রকাশনায় সৌষ্ঠবমণ্ডিত। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা। সূর্য রায় অঙ্কিত-বহু রঙীন ছবি। [৯·০০]
ডোটানিষ্ঠ	অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ভূমিকা। [৩·০০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯

রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র

মৈত্রেয়ী দেবী

এক সময়ে যখন ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পলিটিক্স চলছিল ও মুসলমানদের জন্য মুসলমানী ভাষার কারখানা খোলা হয়েছিল অর্থাৎ জবরদস্তি করে বাংলার মধ্যে আরবী ফারসী শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন এই কাজে যে সব গদা-ধরেরা সাহিত্যের উপর গদাঘাত করছিলেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও রেহাই দেন নি। মোহম্মদীতে একটি প্রবন্ধে বিচারক কবিতাটি থেকে রঘুনাথ রাওর উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছিল :—

'প্রভু কেন আজি কহে রঘুনাথ, অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ, চলেছি করিতে যবন নিপাত যোগাতে যমের খাদ্য'—যেন রঘুনাথ নয় রবীন্দ্রনাথই চলেছেন 'যবন নিপাত' করতে। নাটকের পাত্র-পাত্রীর বক্তব্য সর্বদাই লেখকের বক্তব্য হতে পারে না. রাবণ যে সীতাকে হরণ করেছিল বাল্মীকিরও সেটিতে সমর্থন ছিল এ কথা বলা যায় না কিন্তু কে কার কথা শোনে।

তারপরে পাকিস্তানে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে যখন নবীন সাহিত্যিকরা রাজনীতির জঞ্জালকে সরিয়ে বঙ্গসাহিত্যের রাহুমুক্ত রূপ বাঙালী মুসলমানের কাছে প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তখনও রাজনীতির আক্রমণে তাঁদের চলার পথ বিঘ্নে কণ্টকিত হতে লাগল। পাকিস্তানে রাজরোষ পড়ল সবচেয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর—কারণ যে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদ ঘটান হয়েছে, দেশ ভাগ হয়েছে সেই সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্রতা রবীন্দ্র সাহিত্যের মুক্ত বাতাসে উড়ে যেতে বাধ্য। মানব মহিমার জয়গানে মুখর মানব ঐক্যে আস্থাশীল আত্মার এক ভাস্বর দীপ্তিতে উজ্জ্বল রবীন্দ্র বাণী যে শক্তি সঞ্চার করে তাতে বন্দিখানে নিক্ষেপ করে মানুষকে কতকগুলি বাঁধা বুলি দিয়ে আর বেঁধে রাখা যায় না।

তখন অনেক নতুন নতুন তর্ক উঠতে লাগল—রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের সম্পর্কে কিছু লেখেন নি, তাঁর লেখায় কোনো থীম নেই মুসলমান সমাজজীবন সম্বন্ধে, তিনি মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু ভাবেন নি ইত্যাদি।

এ সব তর্কের উত্তর দিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা অনেকটাই বৃহত্তর দিক থেকে। তাঁদের অনেকের বক্তব্য তিনি মানুষের কথা লিখেছেন তার মধ্যেই সকলের বিশেষ কথা রূপ নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে উপস্থিত ছিলেন তখন থেকে এখনও পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানসমাজ এত বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করে যে একে অন্যের সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে পারে না। বিশেষত মুসলমানের অন্তঃপুর তো চিরকালই জেলখানা—সেখানে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। গ্রামে কিছুটা মেশা-মেশি থাকলেও শহরে একে অপরের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল না। সাহিত্য জীবন নির্ভর। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আচার-সংস্কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব-সমস্যা এ সমস্তের ঘাত-প্রতিঘাতে মন্থিত হয়ে সৃষ্ট হয় সাহিত্য রস—অপরিচিত জগৎ থেকে তা সংগ্রহ করা যায় না, করলেও কৃত্রিম হয়। রবীন্দ্রনাথ বহুবার ইয়োরোপ ভ্রমণ করেছেন কিন্তু ইয়োরোপীয় নর-নারীর জীবন নিয়ে কিছু লেখেন নি. আজকাল যেমন বিদেশ ঘুরে এলেই দেখি অনেক সাহিত্যিক সাহস করে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লিখে থাকেন—রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। তাঁর গল্প উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর অধিকাংশই তাঁর আজন্ম পরিচিত জগতের। তা সত্ত্বেও মুসলমানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন না বা তাঁর রচনায় ঐ সম্প্রদায়ের কোনো উল্লেখ নেই তা নয়। আছে। এবং যেটুকু আছে তা সহানুভূতিতে ভরা। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে যে ফাঁকটা আছে, যে ফাঁক মূলত হিন্দু সংস্কারের ফল তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'গল্পগুচ্ছের দুটি গল্প স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়—এক 'দুরাশা' আর এক 'সমস্যাপূরণ'।

'দুরাশা' গল্পের বদ্রাওনের নবাবপুত্রীর ব্রাহ্মণ কেশরলালের প্রতি প্রেমের গল্পটিতে হিন্দুধর্মের নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণাচার যে কোনো নিত্য সত্যের মূল্যে মূল্যবান নয় তা এক করুণ ট্র্যাজেডির মধ্যে স্ফুটিত। মৃত্যুশয্যায় মুসলমানীর হাতের জল তৃষ্ণার্ত কেশরলাল যখন প্রত্যাখ্যান করল—নবাবপুত্রী ভাবলেন, "হে ব্রাহ্মণ তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না। তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই।"... তারপর নবাবপুত্রী মনে করলেন যে, কেশরলালের সঙ্গে মিলনের পূর্বে তাঁকে ব্রাহ্মণ হতে হবে। ত্রিশ বছর ধরে সেই সাধনা চলল। তিনি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হলেন। তিনি কেশরলালকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন—অন্যদিকে রাজ-চরেরাও তাঁকে খুঁজছিল। নবাবপুত্রী সেই ব্রাহ্মণের মানসমূর্তি ত্রিশ বছর ধরে হৃদয়ে মুদ্রিত করে রেখেছেন "আমি অহরহ দেখিতেছিলাম, ব্রাহ্মণ নির্জন স্রোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনির্দেশ্য মহারহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহার কোনো সঙ্গী নাই, সেবক নাই, সেই নির্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ.....

অথচ আটত্রিশ বছর পরে দার্জিলিং-এ কেশরলালকে দেখলেন। বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র-পৌত্র লইয়া ম্লান বস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

নবাবপুত্রী তৎসঙ্গে নাকি ধর্মীয় সংস্কারের যথার্থ রূপটি দেখতে পেলেন। নবাবকন্যা বললেন, "যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কারমাত্র—আমি জানিতাম তাহা ধর্ম তাহা অনাদি অনন্ত।"

জাতি বর্ণ আচার সংস্কারের বেড়ায় কণ্টকিত ধর্মের যে রূপ তাকে আমরা আজও শাশ্বতধর্মের অঙ্গ বলে ভুল করি—অথচ শাশ্বতধর্ম এ নয়।

অনেকটা এই বক্তব্যই প্রকাশ পেয়েছে সমস্যাপূরণ গল্পটিতে। নতুন জমিদার বিপিন সচ্চরিত্র এবং কড়া লোক। জমিদারী পেয়ে দেখলেন যে তাঁর পিতা নিশ্চিন্তমনে দুই হাতে দান-খয়রাত করেছেন। তিনি সে সব দান প্রত্যাহার করতে লাগলেন একটা "প্রিনসিপল" অনুযায়ী কাজ করতে লাগলেন। এর মধ্যে একটা মুসলমানসন্তান অনেকটা

সোডিয়াম্ মোনো-ফ্লোরো-ফস্ফেট্

(বা সংক্ষেপে এস্-এম্-এফ-পি)

বিনাকা ফ্লোরাইড্‌কে দেয় তার দুর্দম শক্তি

প্রমাণত : ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলকে এসিডের বিরুদ্ধে অটুট রেখে বীজাণুর দাঁতের কোষের মধ্যে ঢোকার পথ বন্ধ রাখছে।

আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে সব থেকে ফলপ্রসূ ফ্লোরাইড্ মিশ্রণ সোডিয়াম্-মোনো-ফ্লোরো-ফস্ফেট্ (এস্-এম্-এফ-পি)-যেটা পাবেন বিনাকা ফ্লোরাইডের মধ্যে-দাঁতের এনামেলের সাথে যোগ দিয়ে তাকে সুদৃঢ় করে ও ক্ষয়শক্তির বিরুদ্ধে তাকে ত্রিবিধ প্রতিরোধ শক্তি দেয়। বর্ণে হিম-নীল, স্বাদে মিষ্টি-ঝাল। বিনাকা ফ্লোরাইড শুধুমাত্র একটা টুথপেষ্ট নয়, এ ভার নেয় দাঁতের পূর্ণ পরিচর্যার।

C I B A
Cosmetics

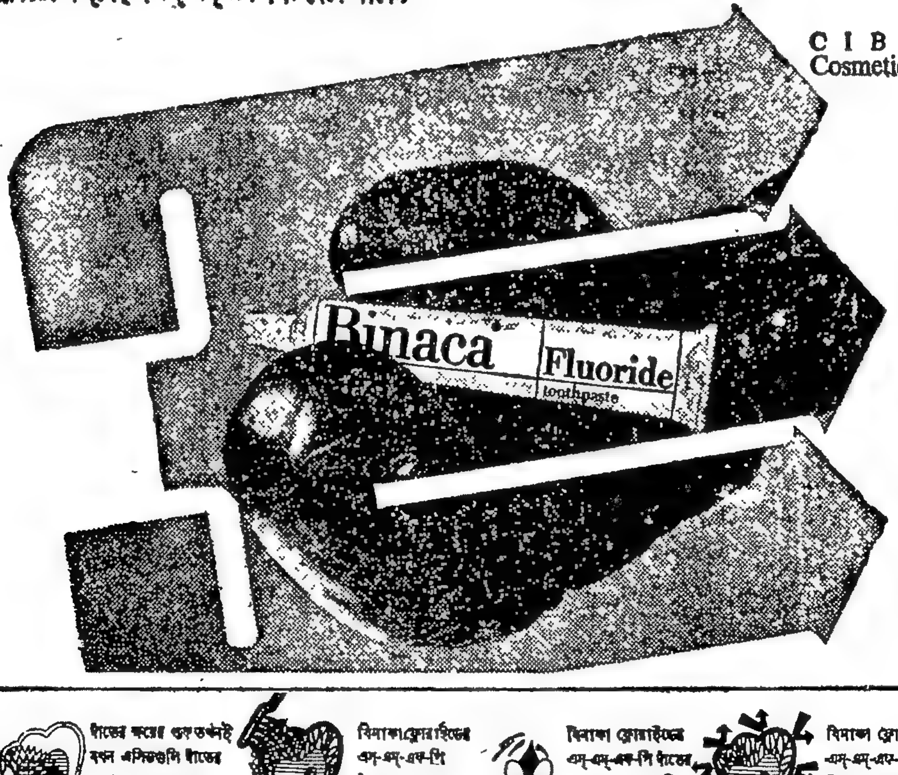

দাঁতের ক্ষয়ের শুরু তখনই যখন এসিডগুলি দাঁতের এনামেলকে নাশ করে ও দাঁতের জীবিত তন্তুকে বীজাণুর কাছে উন্মুক্ত করে বেদনাদায়ক ক্ষয়-গহ্বর গড়ে তোলে।

বিনাকা ফ্লোরাইডের এস্-এম্-এফ-পি দাঁতের এনামেলের সংগী হয়ে তাকে এসিডের আক্রমণ প্রতিরোধে শক্তি দেয়।

বিনাকা ফ্লোরাইডের এস্-এম্-এফ-পি দাঁতের এনামেল-ক্ষয়কারী এসিডের পতন রোধ করে।

বিনাকা ফ্লোরাইডের এস্-এম্-এফ-পি দাঁতের এনামেলকে তার প্রাথমিক ক্ষয়ের গ্রাস থেকে সেরে উঠতে সাহায্য করে।

দন্তক্ষয় ও বেদনাদায়ক ক্ষয় গহ্বরের অবসানে ত্রিবিধ প্রতিরোধক

নস্কর জমি ভোগ করছে দেখে তার বিস্ময় আরো বেড়ে উঠল। অছিমদ্দীর মা মির্জাবিবি এ বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করে পারল না।—মকদ্দমা চলতে লাগল অছিমদ্দী সর্বস্বান্ত হল—ক্রুদ্ধ হয়ে একদিন হাটের মধ্যে জমিদার বিপিনকে আক্রমণ করল।

বিচারের দিন কাশী থেকে বিপিনের পিতা এসে উপস্থিত হলেন।

বিপিন পিতা কৃষ্ণগোপালকে বললেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া দিয়াছি তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর এই মুসলমানসন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্যন্ত অধ্যবসায়...... লোকের কাছে কি বলিব?"

কৃষ্ণগোপাল "দ্রুত কম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিও অছিমদ্দীন তোমার ভাই হয় আমার পুত্র।"

"যবনীর গর্ভে?" "হাঁ বাপু"—আধুনিক বিপিন ভাবলেন, একটা প্রিনসিপল না থাকার এই ফল। আর সূক্ষ্মবুদ্ধি উকীলেরা সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করে ভাবল—"যিনি যতই মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতই সব বেটা।"

রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র অনুপস্থিতও নয় অবহেলিতও নয় শুধু তিনি তাঁদের যতটুকু চেনেন বা জানেন এবং হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে তাদের যা দেখেছেন সেইটুকুই লিখেছেন—এবং সেই দেখায় বাংলা দেশের

সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধরাজি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী দুই ভাগ একত্রে পাঁচ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

রবীন্দ্রনাথ : ইরান যাত্রার প্রাক্কালে

দরিদ্র চাষী মুসলমান যারা নানাভাবে বঞ্চিত ও উৎপীড়িত তাদেরই পরিচয় টুকরো টুকরোভাবে ফুটে উঠেছে—লেখকের করুণা ও সহানুভূতি এই বঞ্চিত মানবতার প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়েছে—কাহিনীর নানা বর্ণনার মাধ্যমে। কোথাও মুসলমানসমাজের প্রতি কোনো খোঁচা নেই।

কাবুলিওলা, দালিয়া, রাজর্ষি প্রভৃতির মধ্যে মুসলমান চরিত্রগুলি কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ নয় তারা চিরন্তন মানবধর্মেরই প্রকাশ করছে।

মৃত্যুর অল্প পূর্বে 'মুসলমানীর গল্প' নামে একটি অসম্পূর্ণ গল্পের খসড়া আছে। যতদূর মনে পড়ে দাঙ্গার সময় অপহৃতা কোনো নারী রেসকিউ হোমে ফিরে আসতে চায় নি, এমনি কোনো কাহিনীই গল্পটির প্রেরণা জোগায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় গল্পটি তেমনভাবে সম্পূর্ণ করা হয় নি। এই কাহিনীতে ডাকাত কর্তৃক অপহৃতা নারীদের হিন্দুসমাজে লাঞ্ছনার চিত্র আছে। মুসলমান ডাকাতের কথাও আছে আর পরিত্রাতা হবিব খাঁর চরিত্রও মহিমাময়—"মধু মোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত তার হাতে পড়লে রক্ষা নেই। কমলা ভয়ে চতুর্দোলা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল, এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ হবিব খাঁ।"

তাঁকে ডাকাতরা পয়গম্বরের মত ভক্তি করে অতএব রণে ভঙ্গ দিতেই হল। হবিব কমলাকে ঘরে নিয়ে গেল—বললে, "মনে রেখো যারা যথার্থ মুসলমান তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে। আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতই থাকবে।" কাকার কাছে ফিরে যেতে চাইল কমলা—হবিব বলেছিল, "বাছা ভুল করছ আজ তোমায় বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না।"......কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—কাকি বললে, "দূর করে দাও অলক্ষ্মীকে সর্বনাশিনী বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিল।".. কাকা বললে, "উপায় নেই মা আমাদের যে হিন্দুর ঘর!"

অবশেষে মুসলমানের ঘরে কমলার মন বাঁধা পড়ল—সে বললে হবিব খাঁকে—"বাবা আমার ধর্ম নেই। আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে অবজ্ঞার আঁস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না।...যে দেবতা আমাকে

আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা তিনি হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে, করিম তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি, আমার ধর্ম-কর্ম ওর সঙ্গে বাঁধা পড়েছে।”...

এই গল্পের প্লট কবির মনে এসেছিল দারুণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে যখন ভারতবর্ষ মথিত হচ্ছে। প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাতেও।

মুসলমানের ঘরেও প্রবঞ্চিত নারীত্বের সমস্যা আছে কিন্তু তার সমগ্র রূপটি কবির জানা নেই—কিন্তু নিগৃহীতা নারী, অপহৃতা নারী, হিন্দু-সমাজে কিভাবে লাঞ্ছিত তা তাঁর কাছে স্পষ্ট। তারপর অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে প্রেমের নিত্য সম্বন্ধ সম্ভব, তা সমাজের কাছে অস্বীকৃত হলেও কবির কাছে নয়।

'সতী' নাট্যকাব্যটিও এই একই সত্য প্রকাশ করেছে। রাজপুত ও মুসলমানের সংঘর্ষে রাজপুত বীরত্ব কাহিনী কবির রচনায় আছে—কথা ও কাহিনীর হোরি-খেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিন্তু 'সতী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সে যুগে যে অসমসাহসিকতা দেখিয়েছেন তার তুলনা নেই।

উপন্যাসে গোরাতেও বার বার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা কাহিনীর নানা প্রসঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। সমগ্র গ্রন্থটিতেই লোকাচার, দেশাচার, জাতি-ভেদ ও সংস্কারের ব্যর্থতা গল্পের প্লটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। পরেশ বললেন, "হিন্দুসমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই। অন্তত সদর রাস্তা নেই, খিড়কির দরজা থাকতেও পারে। এ সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়—দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে তাদের সমাজ। ...মুসলমানসমাজের সিংহদ্বার সমস্ত মানুষের জন্যই উন্মুক্ত।"

গোরা যখন পল্লীভ্রমণে বেরুল তখন হিন্দুসমাজের আচারের অত্যাচারের অনেক নমুনা দেখল এবং এও দেখল যে, "মুসলমানদের মধ্যে সেই জিনিসটি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদের এক করিয়া দাঁড় করানো যায়। গোরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে গ্রামে কোনো আপদ বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা এমন হয় না।"... এই প্রভেদের চিন্তা করে যে উত্তরটি পেল তাতে গোরার মন "ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল, যে ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে।"

অবশেষে ভারততীর্থ কবিতার যা বক্তব্য—জনগণমন সঙ্গীতের যা বাণী—রবীন্দ্র সমাজ-চিন্তার যা ফল তা গোরা এক মুহূর্তে বুঝতে পারল যখন সে জানল যে ব্রাহ্মণ্যগর্বে সে এতদিন পূর্ণ ছিল তা কত অলীক। সে আইরিশ-ম্যানের বংশধর। সে তখন সেই অমোঘ বাণীটি অসঙ্কোচে ঘোষণা করল—

"আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না আজ আমি তাই হয়েছি। আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই।... আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে, চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না।"

ঘরে বাইরে উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে তখন পোলেটিক্যাল দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছিল। গোরার সময়ে শুধু সামাজিক প্রভেদই ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, এই পোলেটিক্যাল দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের সম্বন্ধে সহিষ্ণু ও সুবিচারী।

নিখিলেশ রবীন্দ্রনাথের কথাই বলছে, "ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-একজায়গায় গরু জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজার কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম ঠেকান শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে সেটাই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কী? মুসলমানকেও নিজেদের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে।...

তারা বললে, মহারাজ এতদিন তো এ সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বললুম ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছে করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বললে, না মহারাজ সেদিন নেই, শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপরে মানুষের প্রতিহিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।......

এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজি পড়া, সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেছে। সে বললে দেখুন, এটা তো কেবল সংস্কারের কথা নয় আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এ দেশে গোরু যে—

আমি বললুম, এ দেশে মহিষও দুধ দেয়, মহিষও চাষ করে কিন্তু তার কাটা মুণ্ডু মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয় ওটা অন্ধ সংস্কার।"......

কেবল কথাসাহিত্যে নয় বহু প্রবন্ধেও মুসলমান সম্পর্কে নানা আলোচনা বিভিন্ন প্রসঙ্গে করেছেন কিন্তু কোথাও বিন্দুমাত্র অবিচার করেন নি। মুসলমান লেখকরা সাম্প্রদায়িকভাবে যে সব সমস্যা আলোচনা করে নিজেদের সমাজের অনেক ক্ষতি করেছেন—রবীন্দ্রনাথের কলমে সেই সব সমস্যাগুলি সমগ্র মানবজাতির সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে, যুক্তি-বিচারে আলোচিত হয়ে—পক্ষপাত-শূন্য দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

দুঃখের বিষয় না হিন্দু না মুসলমান আমরা কেউই সে শিক্ষা গ্রহণ করি নাই। এবং যোগ্য জিনিস যে মূঢ় গ্রহণ করতে পারে না, তার যে গতি হয় আমাদেরও তাই হচ্ছে

তরুণ অপেরার

অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

হিটলার

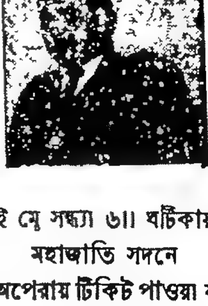

৯ই মে সন্ধ্যা ৬।। ঘটিকায়

মহাজাতি সদনে

তরুণ অপেরায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।

● যাত্রা জগৎ পড়ুন ●

রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয়তা

সুশীল রায়

অনেক লেখক আছেন যাঁরা হাসি-ঠাট্টা ব্যঙ্গ-তামাশা বিশেষ পছন্দ করেন না। তাঁরা সব সময়ই বিশেষ-রকম সিরিয়স। তাঁদের হয়তো ধারণা এই যে, একটু হাসি-ঠাট্টা লেখার মধ্যে এসে গেলেই কেবল লেখাটিই হালকা হয়ে গেল—এমন নয়, লেখক স্বয়ং-ই হয়তো রীতিমত হালকা হয়ে যাবেন।

কিন্তু কৌতুকপ্রিয়তা এমনই জিনিস যে, এর অভাব কারো মধ্যে থাকলে তাকে রীতিমত কাঠখোট্টা বলে মনে হয়। জীবনে ঝাল-নুন-লঙ্কা যেমন দরকার, চাটনিও দরকার সেই রকমই, আবার একটু মিষ্টান্ন হলেও মন্দ হয় না।

মাইকেল মধুসূদন গুরুগম্ভীর রকমের মহাকাব্য রচনা করেছেন, তখন তিনি বেশ সিরিয়স। আবার তাঁর হাত থেকেই আমরা পেয়েছি দু'টি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। হালকা মেজাজেই তিনি এ-দু'টি রচনা করেছেন, কিন্তু তবুও এ-দু'টিকে আমরা কবির কৌতুকপ্রিয়তা বলে মনে করতে পারি নে; সমাজের বিশেষ-বিশেষ ধরণের আচরণের প্রতি কটাক্ষ করার জন্যেই তিনি রচনা করেন ঐ প্রহসন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশেষরকম কৌতুকপ্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। তাঁর বিবিধ গদ্য রচনার মধ্যে তো আছেই, কিন্তু অধিক পরিমাণে আছে কমলাকান্ত ছদ্মনামের রচনার মধ্যে।

একজন মানুষকে সমগ্রভাবে মানুষ হয়ে-ওঠার জন্যে তাঁর মেজাজের মধ্যে কঠিন ও কোমল ভাব থাকা যেমন চাই, লেখকও সমগ্রভাবে লেখক হয়ে ওঠেন তখনই যখন এই দুইটি মেজাজই যুগপৎ তাঁর রচনার মধ্যে ধরা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে তাঁর চরিত্রের সামগ্রিকতা বেশ স্পষ্ট। তিনি যে বিশ্বকবি তার প্রমাণও তিনি যেমন দিয়ে গিয়েছেন, তিনি যে বেশ বৈঠকী মেজাজের মানুষ তার প্রমাণও আছে যথেষ্ট। তিনি যে সহজ মানুষ ঘরের মানুষ, আপনার মানুষ—এই অন্তরঙ্গতার পরিচয়ও তাঁর রচনায় আছে। রাজর্ষি দেবর্ষি ইত্যাদি নানা-প্রকার ঋষিত্ব তাঁর উপর আরোপ করলেও, এ কথাও ভুলতে পারা যায় না যে, তিনি আমাদের একজন প্রতিবেশীও। প্রতিবেশীর সঙ্গে কখনো-কখনো তত্ত্বকথা নিয়েও যেমন আলাপ-আলোচনা হয়, আবার কাল্পনিক বা বাস্তবিক কোনো রহস্যজনক কথা নিয়েও রহস্য করা হয়ে থাকে। এই রস ও রহস্য যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদের কেমন-যেন রহস্যজনক মানুষ বলে মনে হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ সেরকম রহস্যজনক জীবনযাপন করেন নি। যখন যে কথা রহস্য করে বলার ইচ্ছে হয়েছে, তখন তিনি ভারী যবনিকা উত্তোলন করে হালকা ওড়নায় নিজেকে আবৃত করে স্বচ্ছ হয়েছেন। তখনই আমরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে।

কবি যখন কাব্য রচনায় ব্যাপৃত হন, তখন বিশেষ-একটি শক্তি এসে তাঁকে ভর করে। কবি তখন যেন নিজের মধ্যে নিজে থাকেন না, তিনি অন্যজন হয়ে যান। এই-যে শক্তি একেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর 'অন্তর্যামী'। এই অন্তর্যামীটি এসে কবিকে দিয়ে কাব্যরচনা করিয়ে নেন। ঝরণার গভীরেও থাকে এইরকম একটা শক্তি, সেই শক্তির প্রভাবে ও প্রেরণায় ঝরণার নিভৃতের জলধারা তার মুখ দিয়ে ফোয়ারা হয়ে বের হয়। যেখানে-সেখানে যেমন ঝরণা থাকে না, যে-কেউই তেমনি কবি নয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, নকল ঝরনা আমরা যেমন তৈরি

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

করে নিতে পারি,. নকল কবিও তেমনি আমরা আখছার দেখতে পাই। কিন্তু সে কথা অন্য।

কবি এই সময় নিজের মধ্যেই নিজে বিকশিত হয়ে একটি প্রফুল্ল সুন্দর ও শান্ত মূর্তি ধারণ করেন। তখন তাঁর রূপ অন্য, তাঁর রূপ আলাদা। তিনি তখন বলেন—

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা-কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।...
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপনজনারে
শুনাতেছিলুম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত—
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

লেখক-মাত্রেরই এ অভিজ্ঞতা আছে। যে জিনিস তিনি রচনা করবেন বলে স্থির করেছেন, অনেক সময়ই তাঁর ইচ্ছাকে ছাপিয়ে অন্য জিনিস রচিত হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, কোনো উপন্যাস-রচনার সময় হঠাৎ এমন-একজন ব্যক্তিত্বশালিনী নায়িকা সেই কাহিনীর মধ্যে আবির্ভূতা হন এবং সমগ্র কাহিনীকেই গ্রাস করার জন্যে এমনভাবে উদ্যত হয়ে ওঠেন যে, লেখককে বিব্রত ও বিচলিত হয়ে উঠতে হয়। অন্যান্য রচনার সময়ও অনুরূপ অভিজ্ঞতা লেখক-মাত্রেরই থাকা স্বাভাবিক।

'আপনার কথা আপনজনারে' বলার জন্য যখন কবি প্রস্তুত হয়েছেন তখন ঐ ব্যক্তিত্বশালিনী কৌতুকময়ী এসে কবির সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করে তাঁকে দিয়ে অন্যকথা বলিয়ে নিলেন। এখানে কবি সিরিয়স। এখানে কবি কেবলমাত্র কবিই। অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত এই কথা তাঁর অন্তরের কথা বটে, আন্তরিক কথা বটে, কিন্তু এ-যেন অন্তরঙ্গ কথা নয়। কৌতুক-ময়ীর প্রভাবে জীবনের কৌতুকের দিকটা বোধ হয় চাপা পড়ে যায়। সে পরিচয় তাই পেতে হবে অন্যত্র।

কৌতুকের জন্যেই কৌতুক করা, কৌতুক করব বলেই কলম ধরা—এর অনেক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্ররচনায় আছে। তাঁর রচিত 'হাস্যকৌতুক' বা 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' হচ্ছে এর উদাহরণ। কিন্তু এগুলিকে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন বলে মেনে নিতে বাধে। এগুলি ঠিক যেন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। মনে হয়, চেয়ার টেনে নিয়ে জমাট হয়ে বসে কবি ঠিক করলেন—এবার একটু কৌতুক করা যাক।

যাঁরা তেমন কৌতুকপ্রিয় নন, তাঁরাও এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে বসলে সম্ভবত কিছুটা কৌতুক পরিবেশন করতে পার-বেন। কিন্তু একে ঠিক কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন বলে মেনে নেওয়া বোধহয় যাবে না।

রক্তের সঙ্গে মিশে আছে যে কৌতুক, প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে কৌতুক—তাকেই বলা যায় নির্ভেজাল ও নিখাদ মেজাজ।

এ মেজাজ কোথায় পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে অন্তরঙ্গ আলাপের মধ্যে, ব্যক্তিগত আলোচনার মধ্যে। রবীন্দ্র-নাথের ক্ষেত্রে এই মেজাজের পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর পত্রধারার মধ্যে। বিভিন্ন ব্যক্তিকে অজস্র পত্র লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই সব চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত।

আমরা মাত্র তিনজনকে লেখা চিঠি-পত্র থেকে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত দেব স্থির করেছি। সম্প্রতি লোকান্তরিত এই তিনজন হচ্ছেন—দৌহিত্রী নন্দিতা, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী।

দৌহিত্রী নন্দিতাকে লিখছেন—

মেমসাহেব, আজ পয়লা বৈশাখে তোর চিঠিতে তোর কুশলসংবাদ শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম। এখন কেবল পরীক্ষায় তোর ফেল হবার সংবাদের অপেক্ষা করচি—নইলে আমার মতো ইস্কুল-পালানো পরীক্ষা-এড়ানো ছেলে তোর কাছে যে মাথা তুলতে পারবে না।

স্কুলের জীবন রবীন্দ্রনাথের যে পছন্দসই ছিল না, এ কথা সর্বজন-বিদিত। বালক-কালে স্কুলকে তিনি তাঁর মনের মতন স্থান বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। উত্তরজীবনে সেই কথা স্মরণ করে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যালয়। ছাত্রেরা তাদের ছাত্রজীবন যাতে বন্দীদশা বলে মনে না করে, সেইজন্যে নতুন পরিবেশে উন্মুক্ত প্রান্তরে তিনি খুললেন তাঁর বিদ্যায়তন। কিন্তু, একদা তিনি যে স্কুলের গণ্ডি পার হন নি, আজ যদি তাঁর নাতনিটি সেই গণ্ডি পার হয়ে যায়, তাহলে সেটা যেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একটা মস্ত পরাভব—এইরকম কৌতুক প্রচ্ছন্ন আছে ঐ পত্রে। ১৩৪২ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে লেখা ঐ চিঠি—নন্দিতা সেবার ম্যাট্রিক পাস করেন।

নন্দিতার ডাকনাম ছিল 'বুড়ি'। এই নাম নিয়েও তামাশা করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্বোধন করে অনেক চিঠিই লিখেছেন, তার একটি এই, চিঠির তারিখ ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫, রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যুর বছর ছয় আগের—

কল্যাণীয়াসু,

বুধা, তোর চেয়েও আমার বয়স বেশি হয়েছে এই কথাটার প্রমাণ প্রতিদিন পাচ্ছি। কাজকর্মে মন নেই, কলমও চলতে চায় না। চিঠি-পত্র প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। কেদারাটা শরীরেরই একটা অংশের মতো হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধ হয়ে থাকি শ্যামলীতে, দর্শনপ্রার্থীর দল আসা-যাওয়া করে—মাটির বাড়ি দেখে, আর দেখে যায় এই মাটির মানুষটিকে।

নেতাজীর সহকর্মী শিশির দাশের—

'মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র'

গ্রন্থখানি নেতাজী সম্পর্কে ইদানীংকালে রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অনবদ্য ভূমিকা ও তাঁর রাষ্ট্রদর্শন, চিন্তাধারা, এবং তেজোদ্দীপ্ত জীবন-ইতিহাস অত্যন্ত বিশদভাবে ও প্রেরণাসঞ্চারী ভাষায় লিপিবদ্ধ। গ্রন্থখানি প্রতিগৃহে ও গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হবার যোগ্য।

প্রথম খণ্ড—মূল্য : ১২·৫০ পয়সা

—প্রাপ্তিস্থান—

(১). এস, আর, দাশ
৩৫নং আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫

(২) শ্রীসুবোধ ঘোষ (গোবর্ধন প্রেস)
২০৯বি, বিধান সরণি, কলি-৬

বিশিষ্ট পুস্তকালয়সমূহেও পাওয়া যায়।

পত্রধারার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন অনেক আছে। 'চিঠিপত্র প্রায় ছেড়ে দিয়েছি' বলে তিনি সুতনীর কাছে কবুল করেছেন বটে, কিন্তু চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথকে কখনো ছাড়ে নি। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত—সকলকেই তিনি চিঠি লিখেছেন, সব মোট মিলিয়ে কত চিঠি তিনি লিখেছেন রবীন্দ্র-গবেষকেরা আজ পর্যন্ত সে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারেন নি। এই চিঠির সমুদ্র মন্থন করলে অনেক হলাহল যেমন পাওয়া যাবে—অনেক দুঃখের কথা, অনেক বেদনার কথা, নকল বন্ধুদের বিস্তর বিরোধিতার কথা; তেমনি অনেক সুধার সন্ধানও পাওয়া যাবে। আমরা তার দু'-একটি কণা মাত্র এখানে পরিবেশন করছি।

১৯৩০ সালের ১৮ অগস্ট, রবীন্দ্রনাথ তখন জার্মানীতে। সেখানে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে—সেখানকার ন্যাশনাল গ্যালারিতে তাঁর পাঁচখানা ছবি নিয়েছে। অন্যান্য দেশ থেকে প্রদর্শনীর প্রস্তাব আসছে, "আমি যে পোটো সেই নামটাই ছড়িয়ে পড়ছে কবি নামকে ছাপিয়ে", কবির মনের অবস্থা তখন বেশ প্রফুল্ল। তিনি পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখলেন—

কল্যাণীয়াসু,

বৌমা, বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি দিনের পর দিন। সবাই বলচে এমন কাণ্ড হয় না কখনো। আমি মনে-মনে ভাবচি এটা আমারি কীর্তি। আমি বর্ষার কবি। শ্রাবণ মাসে বর্ষামঙ্গল আমার পিছনে-পিছনে সমুদ্র পার হয়ে এসে হাজির।..

বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়চে আছি বার্লিনে—বড়োলোক সেজে—বড়ো কথা বলতে হবে—বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চলতে হবে দিনের পর দিন—জগৎজোড়া সব সমস্যা রয়েছে তর্জনী তুলে, তার জবাব চাই।

তার পর রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা নন্দিনী প্রসঙ্গ নিয়ে প্রতিমা দেবীকে লেখা একটি চিঠি থেকে কিছুটা উদ্ধার করা যায়। নন্দিনীর ডাকনাম পুপে। এই আদরিণী নাতনীটির কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক চিঠিতেই অনেক রকম রহস্য করে লিখেছেন। তার একটি থেকে এইটুকু তুলে দিচ্ছি—

পুপের কথা লিখে আমাকে লোভ দেখাও কেন, বৌমা? তুমি মনে-মনে জান ঐ কন্যাটি আমাকে মোহ-পাশে বেঁধেচে। ঐ মায়াবনী মরীচিকার মত আমাকে ভোলায় কিন্তু আমাকে ধরা দেয় না। এমনি ক'রে ফাঁকি দিয়ে ও আমার কাছ থেকে কেবল গান আদায় করে। এত অল্প বয়সে ওর এমন সর্বনেশে বুদ্ধি হল কী ক'রে? ও কেমন ক'রে জানলে কবির কাছ থেকে গান আদায় করবার এই একমাত্র উপায়—দুঃখ না দিলে ফাঁকি না দিলে বাঁশি ডাক দিতে চায় না। তুমি লিখেচ, দাদার গান ছাড়া আর কারো গান ওর পছন্দ হয় না, ও আমি কিছু বিশ্বাস করি নে। ও যদি স্বয়ম্বরা হয়, ওর দাদার গলায় মালা দেবে না, সে আমি নিশ্চয় জানি। তা হোক না, মনে কোরো না তাই নিয়ে আমি হৃদয় বিদীর্ণ করব। আমার জন্যে মালা গাঁথাকে ভাগ্য মনে করে, দেশে-বিদেশে এমন সুন্দরী ঢের আছে।

পুপের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন, তার একটি থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করা যায়—

কাছের থেকে দেয় না ধরা,
দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার,
দুঃখ জানাই কাকে?...
আলো যেমন চমকে বেড়ায়
আমলকির ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার
দূরের থেকে নাচে।...
বন্দী হতে চাই যে কোমল
ঐ বাহুবন্ধনে
তিন বছরের প্রিয়ার আমার
নাই সে খেয়াল মনে।...
কবি ব'লে লোকসমাজে
আছে আমার ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে
কবির আদর নাই।...
বয়স হলে ইচ্ছা হবে
আকাশ পানে চেয়ে
আবার হতে কবির প্রিয়া,
তিন বছরের মেয়ে।

তিন বছর বয়স্কা নাতনীটিকে নিয়ে এই তামাশা একেবারে তামাশা ব'লেই অগ্রাহ্য হয়ে যায় নি, এটা কাব্য বলেই গৃহীত হয়েছে। তাই 'পূরবী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এটি।

এবার তাঁর কন্যা মীরা দেবীকে লেখা একটি চিঠি দেখা যাক। এই পত্রে ভৃত্য উমাচরণের প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

উমাচরণ অনেক চেষ্টায় নিজের যোগ্য একটি পাত্রী জুটিয়েছিল—কিন্তু উপযুক্ত পণ জোটাতে পারে নি। পাত্রীর বয়স তিন বৎসর। সুতরাং তিন শো টাকার কমে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। আরো দু'-এক বছর কম বয়স হলে বোধ করি সেই পরিমাণে দামও কম হতে পারত। কিন্তু উমাচরণ অনেক দিন ব্রাহ্ম-বাড়িতে কাজ করচে বলে বাল্যবিবাহের প্রতি তার আন্তরিক বিদ্বেষ। এই জন্যে সে অতি কঠোর পণ করেছে যে, তিন বছরের কম বয়সের মেয়েকে সে কোনোমতেই বিয়ে করবে না—মরে গেলেও না। তার এই সাধু সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আমরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। কত দু'-মাস তিন-মাসের মেয়ে তাদের মা'র কোলে শুয়ে চীৎকার শব্দে কাঁদচে, কিন্তু সে কান্নায় সে কিছুতে কর্ণপাত করচে না—এমনি ওর হৃদয় পাষাণের মত অটল। কত সদ্যোজাত নবনীতকোমলা কুমারী দুই চক্ষু মুদ্রিত ক'রে অহোরাত্রি ধ্যান করচে, কিন্তু তাদের সেই তপস্যার প্রভাবও উমাচরণের হৃদয়কে লেশমাত্র বিচলিত করতে পারচে না। ওর এই চরিত্রবল দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার এই সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ তোরা যদি আপনা-আপনির মধ্যে তিন শো টাকা কোনোমতে চাঁদা করে তুলতে পারিস তাহলে এই একটি তিন-বৎসরের মেয়ের আইবড়-দশা ঘুচে যায়। বৌমাকে বলিস তাঁদের উচিত—গয়না বিক্রি করেও এই সৎকার্যটি করা।

নারিকেলের উপরিভাগের যে কাঠিন্য সেটা তার অভ্যন্তরের কোমলতা রক্ষা করার জন্যই। কবির জীবনেরও দার্শনিক গাম্ভীর্য সম্ভবত তাঁর অন্তরস্থ রসধারা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই। পাহাড়-প্রাচীর ডিঙিয়েই নামে ঝরণার স্বচ্ছ-সলিল ও স্বচ্ছন্দ সংগীত।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনার অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-

চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ— জরা ব্যাধি মৃত্যুর আলোকে

অমিয়কুমার হাটি

॥ এক ॥

কথিত আছে, রবীন্দ্রনাথকে কবি বললে তিনি যত-না খুশি হতেন, সফল চিকিৎসক হিসাবে প্রশংসা করলে তত্যোধিক আনন্দিত হতেন। একথা মনে জাগা স্বাভাবিক, যদি তিনি সাহিত্যের ডাক্তারি না করে শুধুমাত্র চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে থাকতেন, তাহলে অলৌকিক প্রতিভার আশীর্বাদপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হতেন কি না। ইতালির অসামান্য প্রতিভাধর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কথা আমরা জানি। শিল্পে-সাহিত্যে-চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর—প্রতিটি ক্ষেত্রে কালজয়ী শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সেক্সপীয়ারের কথা এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই এসে পড়ে। সেকালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত চিকিৎসক হার্ভের সঙ্গে সম্ভবত তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি, কিন্তু দেহে রক্ত চলাচল সম্বন্ধে যে নতুন আলোকপাত করেছিলেন হার্ভে, সেক্সপীয়ারের কাছে তা অজানা ছিল না। তাঁর মেয়ে সুসানার স্বামী জন হল ছিলেন খুব একজন নামজাদা ভাল ও বড ডাক্তার। প্রখ্যাত চিকিৎসকদের মতোই সেক্সপীয়ার রোগ এবং রোগীর সুন্দর যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। সেক্সপীয়ারের ২।১টি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি :

'What rhubarb, senna or
what purgative drug,
Would scour these English
hence.'
(Macbeth V, 8, 55-56)

'A small grey coated gnat
Not half so big as a
round little worm,
Prick'd from lazy fingers
of a maid.'
((Romeo & Juliet I, 4, 64-66)

অবশ্য সেক্সপীয়ার চিকিৎসা করেন নি। র‍্যাবেলিয়াস ছিলেন একজন চিকিৎসক, তাঁর লেখায় যেমন রয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা, তেমনি রয়েছে আইনের পরিভাষা। বেকন ছিলেন একজন আইনবিদ্। তাঁর লেখায় কিন্তু আইনের থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষার অধিকাংশই যেন লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা জানি, কলেরা মহামারীর সময় কার্মাটার-এ সাঁওতাল পল্লীতে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। হোরেস হেম্যান উইলসন একাধারে ছিলেন প্রাচ্যবিদ ও চিকিৎসক। একদিকে তিনি শল্যচিকিৎসা করেছেন, অপরদিকে তিনি বিষ্ণুপুরাণ, মেঘদূত প্রভৃতির অনুবাদ করেছেন, লেখমালার পাঠোদ্ধার করেছেন, ভারত ইতিহাসের অনেক হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করেছেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডাঃ রোনাল্ড রস খুব ভাল কবিতা লিখতেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিজ্ঞান সচেতন। নিজে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। পল্লীস্বাস্থ্য সংগঠনে আগ্রহের সঙ্গে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ সুরু করেছিলেন। সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁর হার্দ্য সম্পর্ক ছিল। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে তাঁর চেষ্টা ও উদ্যমের অন্ত ছিল না। সেই কালেই পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। মহামারী, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি নিবারণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন মানবদরদী এই কবি। 'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা' গাঁথতে গেলে চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ-সেই মালার অঙ্গীভূত হবেন।

॥ দুই ॥

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য তাঁর লেখা "ভারতীয় ব্যাধি" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, কবি সাঁওতালদের চিকিৎসা করতেন। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। এক সময় গান শেখবার জন্যে শান্তিনিকেতনে তিনি মাস দুই ছিলেন। কবির মৃত্যুর পর তিনি লেখেন, 'তাঁর ঘরে দেখলাম, হোমিওপ্যাথির কয়েকটা মোটা মোটা বই আছে। প্রত্যহ সকালে দেখতে পেতাম, অনেক রোগী তাঁর দরজায় এসে জড়ো হয় ওষুধ নিতে। একদিন দেখলাম, আশ্রমের একটি ছেলের ইরিসিপেলাস হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে ওষুধ দিচ্ছেন। ব্যাপারটা নিতান্ত সামান্য হয় নি, কিন্তু কয়েকদিন বাদে দেখলাম, ছেলেটি সেরেই গেল। আশ্রমের লোকেরা বললে, উনি চমৎকার ওষুধ দিতে পারেন, তাতেই তাদের অনেক রোগ সেরে যায়, অন্য ডাক্তার দেখাবার প্রায়ই দরকার হয় না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, "হোমিওপ্যাথির বড় বড় বই তিনি দস্তুরমত অধ্যয়ন করেছিলেন, বায়োকেমিক চিকিৎসাও ভাল জানতেন। চিকিৎসা করতেনও ভাল। কখনো কখনো রহস্য করে বলতেন, 'আমি ফি' নেই না বলে আমার প্রশংসা বা পসার হয় নি।' "

১৯১৪ সালে যখন তিনি রামগড়ে গিয়েছিলেন, তখন কবির ডাক্তার বলে খ্যাতি পাহাড়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কবি এর আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট পেয়েছেন। তাঁর নামের আগে ডক্টর থাকায় স্থানীয় পোস্টমাস্টার সবাইকে বলতে থাকেন যে, বাংলাদেশ থেকে খুব বড় ডাক্তার এসেছেন। তাঁর কাছে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী প্রায় আসতেন। কবি ওষুধ দিয়ে এঁকে সুস্থ করেন। তাতে তাঁর ডাক্তারীখ্যাতি বেড়ে যায়। পাহাড়ীদের তাঁর উপর ছিল অগাধ আস্থা। গোমস্তা টীকারাম তাঁর কাছ থেকে রোগীদের ওষুধ নিয়ে যেত।

তিনি বলতেন যে, তাঁর মতো সাহিত্য ডাক্তারকে দায়ে পড়ে ভিষক ডাক্তার হতে হয়। এক জায়গায় বলছেন, 'যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোন চিকিৎসার উপায় নেই, তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এতবড় নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারি নে যে পুরো চিকিৎসক নই বলে কোন চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা চিকিৎসকদেরও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে।' কবি শেষ জীবনে রোগশয্যায় অনেক সময়েই কাউকে কিছু না বলে নিজে নিজেই বায়োকেমিক ওষুধ খেতেন. কেলি সালফ বা ব্রোমোকুইনিন।

কবি শয্যাগত। নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর শুশ্রূষা করছেন। নির্মলকুমারীর নিজেরই গায়ে জ্বর। কবির

অসুস্থ দেহে যখন তিনি হাত বুলোচ্ছিলেন, তখনই কবি তা' বুঝেছিলেন এবং তাঁর প্রিয় একটি ওষুধ কেলি সালফ খেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন নির্মলকুমারীকে।

১৯৪০ সনে নির্মলকুমারীকে একটি পত্রে ওষুধের নির্দেশ দিচ্ছেন—'তুমি জানিয়েছ Calc Sulph তোমার পক্ষে অকার্যকরী, এটা অশাস্ত্রীয়। Silicea-র সঙ্গে পর্যায়ক্রমে খেয়ে দেখতে পারো।'

হারাসান বলে একটি জাপানী মেয়ে ১৯১৯ সালে এসেছিলেন আশ্রমে। ইনি প্রায়ই ভুগতেন। যখন তৃতীয়বার জ্বরে পড়েছিলেন, কবি তখন এ'র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছিলেন। ওষুধ দেন ফেরাম ফস ও কেলি সালফ আধঘণ্টা অন্তর। বলছেন, 'জানি কেলি সালফ ঘাম দিয়ে জ্বর সারায়।'. জ্বর সত্যি-সত্যিই কমতে কমতে ৯৯ ডিগ্রীতে এসেছিল। পথ্যেরও নির্দেশ দিয়েছেন এই সঙ্গে: বার্লির রস অথবা ডালের সুপ, 'পুটপাকপক্ক' মুর্গীর সুপ, সোডা, জলযুক্ত দুগ্ধ, বহু তরলীকৃত স্যানাটোজেন, সম্ভব হলে বেদানার রস।

॥ তিন ॥

পল্লীস্বাস্থ্য সংরক্ষণে কবি রবীন্দ্রনাথ সাহসের সঙ্গে সংগঠনমূলক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। গ্রাম সংস্কার কার্যসূচীর মধ্যে ছিল: ১—চিকিৎসা, ২—প্রাথমিক শিক্ষা, ৩—পূর্তকার্য বা কূপ, রাস্তা প্রস্তুত, মেরামত, জঙ্গল সাফ, ৪—ঋণদায় থেকে দরিদ্র চাষীকে রক্ষার ব্যবস্থা, ৫—সালিশী বিচারে বিবাদের নিষ্পত্তি।

চিকিৎসাদির কাজ আরম্ভ হয় তিনটি ক্ষেত্রে—পতিসর, কামতা ও রাতোয়াল-এ। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করে ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়, হাসপাতালের ডাক্তার নিয়োগ করা হয়, এবং ২।৩টি রোগীকে রাখবার বন্দোবস্ত করা হয়। জমিদার হিসাবে খাজনার টাকাপিছু এক আনা দিতেন রবীন্দ্রনাথ, প্রজারা দিতেন এক আনা। এছাড়া সমাজ শাসনে অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রামে যে জরিমানা দিত, সে-টাকা আসত সাধারণ তহবিলে। তার থেকেও চিকিৎসার জন্যে টাকা পাওয়া যেত। এসব ১৯১৫ সনের কথা।

জমিদারীর কোন কোন জায়গায় কলেরার প্রকোপ দেখা দিত। এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গ্রামে ওলাওঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে আমি স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে......আমি কয়েকটি ওলাওঠার ওষুধের বাক্স শীঘ্র পাঠাইতেছি এবং যদি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার পাঠাইতে পারি চেষ্টা দেখিব।'

শান্তিনিকেতনে আশ্রমের আবাসিকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। প্রত্যেককে হাসপাতাল যেতে হ'ত প্রতি বুধবার—ওজন নেওয়া হত—দু'হপ্তা পরে ওজন কমলে তখান তদারক শুরু হ'ত।

'গ্রামবাসীদের প্রতি' প্রবন্ধে তিনি বলছেন, 'এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ অনেক কম, ভাল ডাক্তার পাই, ডাক্তারখানা আছে।'

'দেশের কাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত আহ্বান—'রোগপীড়িত এই বৎসরে এই সভায় আজ আমরা বিশেষ করে এই ঘোষণা করছি যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, অবিরোধে ঐকব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন, তেমনি আবার দারিদ্র্যও ব্যাধিকে পালন করে।'

১৯০১ সাল। কলকাতায় তখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব। কবি অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে ছিলেন। এই অসুস্থ শরীর নিয়েই কলকাতায় ফিরে এলেন এবং মানুষের মনে আশার বাণী প্রচার করতে প্রবৃত্ত হলেন, প্রেরণা ও উদ্দীপনা জোগালেন রোগীর সেবাকার্যে।

ম্যালেরিয়া বিষয়ে তাঁর দুটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য—'ম্যালেরিয়া' ও 'সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ'। এ্যান্টিম্যালেরিয়া সোসাইটিতে এই দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটিতে কালাজ্বরের উল্লেখ আছে। বস্তুত এই দুটি ব্যাধি জাতিকে তখন প্রায় নির্জীব করে ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথও বলছেন, 'পরীক্ষা করলে দেখা যায়, ম্যালেরিয়া শরীরের মধ্যে থেকে তেজ কেড়ে নিয়েছে।' ......'দেশে মশা আছে, এটা বড় সমস্যা নয়—বড় কথা এই দেশের লোকের মনে জড়তা আছে।' দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলছেন, 'ম্যালেরিয়া অন্য ব্যাধির আকর। ম্যালেরিয়া থেকে যক্ষ্মা, অজীর্ণ প্রভৃতি নানারকম ব্যামো সৃষ্টি হয়।' বলছেন মশা জন্মানো ডোবার সংস্কারের কথা, নিজেদের শক্তির উপর, পরস্পরের সহযোগিতার উপর জোর দিচ্ছেন। উভয় প্রবন্ধে রয়েছে গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক হিতব্রতী ডাক্তার-এর উল্লেখ—যিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে ম্যালেরিয়া ব্যাধি সম্বন্ধে লোককে সচেতন করে তোলবার ব্রত নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'যদি এঁ'র সঙ্গে আমাদের কাজ জড়িত করতে পারি, তাহলে কৃতার্থ হব, কেবল সফলতার দিক থেকে নয়, এঁ'র মত লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া একটা গৌরবের বিষয়।' দ্বিতীয় প্রবন্ধে এক সেবিকা আমেরিকান মহিলা ও সহৃদয় ইংরাজ এলমহার্স্টের উল্লেখ আছে।

॥ চার ॥

দীর্ঘজীবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এমন উজ্জ্বল প্রাণবন্ত চেহারা বাঙালীদের মধ্যে বিরল। অত্যন্ত কর্মঠ। স্বদেশ ও বিদেশের নানাস্থানে বারবার ঘুরেছেন, দুর্গম তীর্থযাত্রায় গিয়েছেন, সংসারের নানা কাজকর্ম করেছেন, জমিদারী দেখেছেন, লিখেছেন প্রচুর। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয় কোথা থেকে তিনি এত প্রাণপ্রাচুর্য পেয়েছিলেন। রোগে-শোকে মাঝে মাঝে ভুগেছেন, কিন্তু মনে কোনরকম দুর্বলতা আসে নি। ১৯০১ সালে শিলাইদহে একবার অসুস্থ হয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে হাজারিবাগে একবার জ্বর ভোগ করেন। ১৯০৮ সালে অর্শের রক্তপাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়েছিলেন। ১৯১২ সালে যখন বিলেতে, তখন ভাবছেন, অর্শের ব্যাপারে আমেরিকার ডাঃ ন্যাসকে দিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাবেন। আমেরিকার ঐ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে কোন সুফল হয় নি। ইংলন্ডে ১৯১৩ সালে রোদেনস্টাইন-এর চেষ্টায় নামমাত্র 'ফিস'-এ অর্শের অস্ত্রোপচার করান। Duchess Nursing Home-এ এই অস্ত্রোপচার হয়। হাসপাতালে থাকতে হয় এক মাস। ১৯১৪ সালে সুরুলের বাড়িতে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে তাঁর কানের অসুখের সূত্রপাত। এই সময় বার্ধক্যের 'ভয়ানক একটা সঙ্গীহীনতা' অনুভব করছিলেন। ১৯১৯ সালে মাদুরায় Message of the Forest (১৪ই ফেব্রুয়ারী) পাঠ করার পরই রাত্রে জ্বর আসে, বিশ্রাম নেন ৭ দিন। ঐ সময় তাঁর খুবই শরীর খারাপ হয়েছিল। ঐ অসুস্থ শরীর নিয়েও সারা দক্ষিণ ভারত ঘুরেছেন। তাঁর শ্রমশক্তির এটি নিদর্শন। ১৯২২ সালে সিংহল যাবার পথে অত্যন্ত ঘোরাঘুরিতে শরীর আবার খারাপ হয়। ১৯২৩ সালে সাংবাদিক মৃণালকান্তিবাবু কবির শরীর সম্বন্ধে বল্লেন, 'তিনি অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন, কিন্তু যদিও দেহটা শুকাইয়াছে, মনটা কিন্তু এতটুকুও সজীবতা হারায় নি। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর—এবার অসুস্থ শরীর নিয়েই কবির বিদেশযাত্রা। মাদ্রাজ থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকেচুরে গিয়েছিল, ক্লান্ত ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।' ১৯২৫-এ জানুয়ারী মাসে ইতালিতে পুনরায় অসুস্থ হন। ডিউক মিলানের দক্ষেন বিখ্যাত

চিকিৎসককে কবির স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। এই সময় তিনি প্রায় শয্যাগত। ভেনিসে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সমিতির সভাপতি ডাঃ অধ্যাপক জেনো এসে কবির শরীর পরীক্ষা করে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন। ১৯২৬-এ শরীর খারাপ নিয়েই বিদেশ ঘুরেছিলেন। বিফল হল একেবারে। হাঙ্গেরীর বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাসে বালাতন হ্রদের তীরে কবি আশ্রয় নিলেন। ১৯২৮-এ শরীর খারাপ হওয়ায় মাদ্রাজে এসেও কবি বিদেশ গেলেন না। ইতোমধ্যে হার্টের কষ্ট, পা ফোলা এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ১৯২৯-এ জাপানে থাকাকালীন কবি অসুস্থ হয়েছিলেন। ১৯৩০-এ রাশিয়ায় মস্কোতে ডাক্তাররা শরীরের অবস্থা দেখে সাবধান করে দিয়েছিলেন। ১৯৩০-এ আমেরিকায় কবির শরীর খারাপ হল। পৃথিবীময় রাষ্ট্র হল কবি অসুস্থ। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। কবি এদিকে বলছেন, তাঁর শরীর অসুস্থ সত্য, কিন্তু খারাপ হলেও এমন কি খারাপ!' ১৯৩৪—বার্ধক্য ও জরা ধীরে ধীরে কবির দেহে ছাপ ফেলছে। চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে আসছে, শ্রবণশক্তিও কমে আসছে। নিঃসঙ্গতায় মন সময় সময় ক্লান্ত হয়। ১৯৩৭-এ শান্তিনিকেতনে হঠাৎ কবির অচৈতন্য হয়ে যাবার কথা আগেই বলেছি। নীলরতনবাবুর চিকিৎসায় স্বল্পকালেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। ১৯৩৭-এ কলকাতায় এসে মহলানবিশদের স্নেহচ্ছায়ায় থাকলেন কিছুদিন বেলঘরিয়ায়। ১৯৩৮-এ কবির একবার শরীর খারাপ হয়। ছায়া সিনেমাতে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা অনুষ্ঠিত হবে। কবি উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে ইন্দিরা দেবীকে বিশ্রাম গ্রহণ করার ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট না হয়ে লিখছেন, 'আমার পথরোধ করেছে ডাক্তারের দল, যে কারণ দেখিয়ে, সেটা সম্পূর্ণ আজগবি। ...আসল কথা, তারা কিছুই জানে না—কি জন্যে আমার অকস্মাৎ এই ব্যাধির উপসর্গ—চিকিৎসাবিদ্যার মান রক্ষার জন্যে যা তা এমন একটা হেতু খাড়া করলে যার স্বপক্ষে বিপক্ষে কোন প্রমাণই নেই—একমাত্র প্রমাণ নামজাদা ডাক্তারদের নাম...কিন্তু মূঢ়ের মতো বিশ্বাস করতে পারি নি। মোট কথা, কলকাতায় যাব না।' বলা বাহুল্য, কবি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিজ্ঞারক্ষা করতে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪০—শরীর রীতিমত ভেঙেছে, দ্রুত ভাঙছে। দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, শ্রবণশক্তি তার চেয়েও ... হাঁটতে চলতে অসম্ভব কষ্ট। চেয়ারে ঘোরাঘুরি করেন। সেপ্টেম্বর-এ কবি কালিম্পং-এ। কলকাতা থেকে ডাক্তাররা এসেছেন অসুস্থ কবিকে নিয়ে যাবার জন্যে। মহাদেব দেশাই এসে গান্ধীজীর সহানুভূতি, আন্তরিক প্রেম ও প্রীতি জানালেন। কবি কাঁদছেন। বোঝাচ্ছেন যে, তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর চোখে জল এই প্রথম। কিন্তু কবিসত্তা সদাজাগ্রত। রোগশয্যাতেও লিখছেন অপূর্ব সুন্দর কবিতা:

'সত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী
পরমাণু
পদযুগ ঘিরে জ্যোতির্মঞ্জীরে বাজিল
চন্দ্রভানু।
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে
তালে তালে
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার
পরমানন্দ হে॥'

শেষ অসুস্থতায় যে কয়জন সেবাকার্য করতেন, সুধাকান্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ডাক্তার দীননাথ তাঁদের অন্যতম। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কবি—'হেড নার্স' বলতেন আদর ও সম্ভ্রমের সঙ্গে। সুধাকান্ত লিখেছেন, 'রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় রোগী কাতরতা প্রকাশ করে, এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু......রোগকাতর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা যা লক্ষ্য করলুম, তা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার। যন্ত্রণাকে অবিচলভাবে সহ্য করার অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যাঁরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁদের চিত্ত-বিনোদন করেন তিনি নানারকম হাস্য-পরিহাস দিয়ে, নিজের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করবারও উপায় হয়তো তাই। বিমর্ষতার চর্চা করা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ১৯৪১—২৫শে বৈশাখ—শরীর ক্রমশ মন্দ, চিঠিপত্র এলে, ভাল বই পেলে ঠিকমতো জবাব পাঠান এখনো। আষাঢ় মাসে ডাক্তারদের মত নিয়ে কবিরাজী চিকিৎসাও হয়েছে। ফললাভ হয় নি। অবশেষে ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার প্রমুখ পরামর্শ করে ঠিক করলেন প্রস্টেটগ্রন্থি বৃদ্ধির (Enlarged Prostate) অস্ত্রোপচার দরকার। ২৫শে জুলাই কবিকে শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আনা হয়। রোগশয্যায় জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে ২৭শে জুলাই-এর কবিতা:

'প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—কে তুমি...'

২৯শে জুলাইয়ের কবিতা:

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে—'

৩০শে জুলাই অস্ত্রোপচারের দিনেও কবিতা রচনা করেছেন—

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ
করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।'....

অস্ত্রোপচারে কবি অন্তর থেকে সম্মতি দেন নি। বলছেন, 'আমি কবি। আমার ইচ্ছে কবির মতনই যেতে—সহজে এই পৃথিবী থেকে ঝরে পড়তে চাই শুকনো পাতার মতো। যাবার আগে আমাকে নিয়ে এই টানা-হ্যাঁচড়া কেন।'

লোক্যাল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি বেশ ব্যথা পেয়েছিলেন। অস্ত্রোপচার ভালই হয়েছিল—কোন খুঁত ছিল না। অস্ত্রোপচারের পর তিনি বলছেন, 'আমার খুব লেগেছে—এত কষ্ট হচ্ছিল যে আমি জোর করে ঠোঁট টিপে চোখ বুজে পড়ে রইলুম—পাছে আমার মুখ দিয়ে কোনরকম আর্তনাদ বেরিয়ে যায়।'

অস্ত্রোপচারের পর অবস্থার কোন উন্নতি হল না। ১লা আগস্ট দুপুর থেকে হিক্কা আরম্ভ হল। ৩রা—কখনও ঘুমের মত অসাড়, কখনও কথা বলছেন। ওষুধ খাবার অনিচ্ছা—এক বুলি—'আর জ্বালিও না তোমরা।' ৪ঠা আগস্টও আচ্ছন্ন অবস্থা কাটল না। কিডনি ফেল করেছে। ৫ই আচ্ছন্ন, অচৈতন্য। নীলরতনবাবু ঐদিনই দেখতে এসেছিলেন, বহুদিন পর। ৬ই অচৈতন্য অবস্থা আর কাটল না। ৭ই আগস্ট, ১৯৪১, দুপুর ১২টা ১০ মিনিট—জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির জীবনদীপ নিভে গেল।

॥ পাঁচ ॥

কী অপরিসীম ধৈর্য, কী অদ্ভুত সহনশীলতা। কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যে তাঁর জীবননাট্যে চলেছে একের পর এক শোক-মিছিল। কবি মুহ্যমান হন নি, মৃত্যুর এই ভয়ানক শোভাযাত্রা দেখে চোখ দিয়ে তাঁর একফোঁটা জলও বেরোয় নি। শোক শোণিতের মধ্যে মিশে গেছে—জন্ম দিয়েছে জীবন প্রদায়ক শ্লোকসমূহের। রবীন্দ্রনাথ শোকে শ্লোক রচনা করেছেন, শোকে শোকগাথা গেয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে টলস্টয়ের সেই কথাটা মনে পড়ে—

Pure and complete sorrow is as impossible as pure and complete joy.

মা সারদা দেবী অসুস্থ ছিলেন তাঁর শেষ জীবনে। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৪, তখন তিনি মারা যান। মায়ের কথা

রবীন্দ্রনাথ খুব কমই বলেছেন। জীবন-স্মৃতির 'মৃত্যুশোক'-এ মায়ের মৃত্যুর রাত্রিটির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সাহিত্য জগতের অনুপ্রেরণাদাত্রী জ্যোতিরিন্দ্র পত্নী কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলেন ১৮৮৪ সালে। তাঁর কাছে এ ঘটনা অত্যন্ত শোকাবহ। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর 'শৈশব সংগীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' তাঁকেই উৎসর্গ করেন। এ ছাড়া ভগ্নহৃদয়, প্রকৃতির পরিশোধ, ছবি ও গান তাঁর নামেই উৎসর্গীকৃত হয়। কাদম্বরী দেবী দুর্ঘটনার দু'মাসের মধ্যেই সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। এরপর মৃত্যু হল হেমেন্দ্রনাথ-কন্যা অভিজ্ঞার। ইনি কবির প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে 'চৈতালী'-তে কয়েকটি কবিতা আছে। ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ১৩০৬ সালে যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন কলকাতায়। ১৯০২ সালের আষাঢ় মাসে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে লাগলেন। কিন্তু শরীর যখন খুবই খারাপ হয়ে পড়ল, তখন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। ৭ই অগ্রহায়ণ—১৩০৯ সালে কবিপ্রিয়া পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে, কবিকে ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল অমর কাব্যগ্রন্থ 'স্মরণ'। আঘাতের পর আঘাত আসছে। তৃতীয় কন্যাসন্তান রেণুকা অসুস্থা। হাজারিবাগ, আলমোরা অনেক ঘোরাঘুরি করলেন। ১৩১০ সালে কলকাতায় পৌঁছানোর কয়েকদিন পরে মৃত্যুবরণ করলেন রেণুকা—তাঁর রোগের মৃত্যু হল বসন্তরোগে। সালে আশ্রমে কবির প্রিয়বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হল বসন্ত রোগে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ মহাপ্রয়াণ করলেন ১৯০৫-এর ১৯শে জানুয়ারী। ১৯০৭-এ কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ মাত্র ১৩ বছর বয়সে মুঙ্গেরে কলেরায় ভুগে মারা গেলেন। ১৯০৮-এ শিলাইদহে খবর পেলেন, মধ্যম জামাতা ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কয়েকদিনের জ্বরে ভুগে মারা গেছেন। এঁর একটু ইতিহাস আছে। কন্যা রেণুকার স্বামী ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এলোপ্যাথি ডিগ্রীর উপর হোমিওপ্যাথির চূড়া চাপাবার জন্যে আমেরিকা যান বিয়ের পরেই—ফুলশয্যা অনুষ্ঠানই হয় নি। মৃণালিনী যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি জিদ ধরে জামাতা সত্যেন্দ্রনাথকে আমেরিকা থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং রেণুকার ফুলশয্যা উৎসব সম্পন্ন করেন। ১৩১৫ সনে দুমকার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হল। ১৯১৮-তে জ্যেষ্ঠাকন্যা বেলা মারা যান। প্রায়ই দেখতে যেতেন রুগ্না কন্যাকে। ১৬ই মে দুপুরে গিয়ে শুনলেন, বেলার মৃত্যুসংবাদ। অভিভূত বিমূঢ় পিতা মৃতা কন্যাকে না দেখেই ফিরে এলেন। বিকালে বিচিত্রা ভবনে গিয়ে তিনি অন্যদিনের মতো স্বাভাবিকভাবেই সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন। এত বড় শোকের কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নি। তাঁর স্নায়ু যে কী ধাতুতে তৈরি ছিল, কে বলবে! ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বরে সংবাদ এলো সুহৃদ পিয়ার্সন ইতালিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ১৯২৫-এ দার্জিলিং-এ জননায়ক চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু। ১৯২৬-এ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনলেন ১৯৩১-এ। ১৯৩৭-এ ডিসেম্বর মাসে গিরিডিতে বৈজ্ঞানিকবন্ধু জগদীশচন্দ্রের জীবনদীপ নিভে গেল। ১৯৩৮-এ অত্যন্ত প্রিয়পাত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেলেন। ১৯৪০-এ মৃত্যুসংবাদ শুনলেন খৃস্টান সন্ন্যাসীবন্ধু এণ্ড্রুজ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কালীমোহন ঘোষ-এর।

মৃত্যুশোক সম্বন্ধে জীবন-স্মৃতিতে তিনি লিখছেন, 'যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম, তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম।'

॥ ছয় ॥

কবি এবং চিকিৎসক উভয়ের কাছেই মৃত্যু একটি অস্বস্তিকর অথচ অমোঘ পরিণতি—তার রূপ এবং স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। কবি মৃত্যুকে তাঁর জীবনে এবং কাব্যে নানাভাবে, নানারূপে দেখেছেন। কখনো মনে হয়েছে, 'এ ধরণী মরণের পথ, এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ', আবার পরক্ষণেই বলছেন 'মরণ বাড়িবে যত, জীবন বাড়িবে তত' (অনন্ত মরণ) মরণ তাঁর বন্ধু, প্রতিবেশী—'বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ/বিদায় কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস' (হতভাগ্যের গান) প্রিয় মরণকে সম্বোধন করে বলছেন 'অতি চুপি চুপি কেন কথা কও/ওগো মরণ হে মোর মরণ/অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও/ওগো, একি প্রণয়েরি ধরণ। (উৎসর্গ) মরণ তাঁর দোসর—'মরণকে মোর দোসর করে রেখে গেছে—আমার ঘরে।' (দান) মরণকে অত্যন্ত প্রিয়জন কল্পনা করছেন, 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' (ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী) কখনো দেখি মৃত্যুর সঙ্গে বিরহ সম্পর্ক 'মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়/ পাঠায় সে বিরহের চর' (বিরহীর পত্র) আবার জীবনপ্রেমিক কবি স্পষ্টস্বরে বলছেন—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' (প্রাণ) কোন মুহূর্তে তাঁর কাছে "মরণ দানব।" মৃত্যু যে ধ্রুবসত্য জেনেছেন 'ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে বেঁধেছিস বাসা।' (প্রতীক্ষা) আবার মৃত্যুকে অস্বীকার করেছেন কখনো—দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা বলে, 'মৃত্যু তুমি নাই'। (যেতে নাহি দিব) মৃত্যু উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন—'এ মৃত্যু ছেদিতে হবে এই ভয়জাল।' (নৈবেদ্য) কখনো তাঁর কাছে 'মরণ খেলা নিশীথ বেলা' (ঝুলন), মরণ বড় শীতল কোমল, সেখানেই সব শান্তি—'যদি মরণ লভিতে চাও এসে তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে' (হৃদয় যমুনা) বা বধূ কবিতায় 'কবে যে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা, নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল।' একই ভাব—'স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়/কি আছে শান্তি, কি আছে সুপ্তি/তিমির তলে?' (নিরুদ্দেশ যাত্রা) দীঘির জল দেখে মনে পড়ছে মরণকে—ছায়া নিচোল দিয়ে ঢাকা মরণভরা তব বুকের আলিঙ্গন' (দীঘি) প্রশ্ন জেগেছে মৃত্যুর পারে কি? 'হয়ত মৃত্যুর পারে ঢাকা সব অন্ধকারে' (স্নেহস্মৃতি) আবার "মৃত্যু-মাধুরী"ও। জীবনমৃত্যু তুল্যমূল্য তাঁর কাছে জন্মমৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা/যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা' (জীবন) বলছেন, 'আমার আকুল জীবনমরণ টুটিয়া লুটিয়া নিয়োগো তোমার অতুল গৌরবে' (যাচনা) ভেবেছেন, যদি এমন অবস্থা হত—'চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি, থাকতো নাকো জরা/মৃদুপদে যেতেম যেন নাইকো মৃত্যু জরা' (সেকাল) আবার তাঁর কাছে অসীমের স্বরূপ না জানাইতো মরণ—'মৃত্যু যে ধরে মৃত্যুর রূপ/দুঃখ যে হয় দুঃখের কূপ/তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে/আপনার পানে ধাই (নৈবেদ্য)। ভয় হয় মৃত্যুকে সময় সময়—'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে/ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।' আপনার লোকান্তরিত প্রিয়ার স্মরণ মননে মৃত্যুর অনুধ্যান—'তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী' (স্মরণ) কখনো অনন্ত প্রাণ-প্রবাহের কথা ভাবছেন, 'তুমি মরণ ভুলে কোন অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।' (গীতাঞ্জলি) মরণকে নিজের বলে ডেকে কথা কওয়াতে চাইছেন কানে কানে—'মরণ আমার মরণ, তুমি/কও আমারে কথা' (ঐ) কখনো বুঝিবা হার স্বীকার করছেন/'মরণে তোমার হবে জয়, মোর জীবনে তোমার পরিচয়' (গীতালি) মরণই আবার জীবন-তরী বহন করছে, 'মরণ বলে আমি তোমার জীবনতরী বাই'। (ঐ) কখনো বা দূরে থেকেই মৃত্যুর গর্জন শোনেন 'দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন' (বলাকা) মরণেই মুক্তি—'শুধু যে মুক্তির

অঞ্জলিখানি/ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি' (নৈবেদ্য) প্রাণধারা জন্ম-মৃত্যুকে নিয়েই—জন্মদিন মৃত্যুদিন মাঝে তারি স্থির প্রাণভূমি' (অপূর্ণ) জীবনমরণ তাই বুঝি একাকার—'জীবনমরণ ঝাঁঝরে ধরধ্বনি/নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে' (জীবনমরণ) জন্মমৃত্যুর, সত্যিই তো, পার্থক্য কোথায়?—'জন্মদিন মৃত্যুদিন একাসনে দোঁহে বসিয়াছে' (জন্মদিন) এই-রকম, 'জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি' (জন্মদিন)॥ তাই জন্ম-মৃত্যু হাসিকান্না হীরাপান্না 'জন্ম মরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসি ক্রন্দনের' (প্রতিচ্ছবি)॥ মরণকে দেখছেন কখনো মায়ের মতো "মরণমাতা"॥ মরণেই যেন চরিতার্থতা—তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি/চরিতার্থ হোক আজি মরণের প্রসাদ বহিতে॥' (প্রান্তিক) জীবনের ছেলেমানুষী বলতে গিয়ে বলছেন, 'জীবনের এ ছেলেমানুষি/মরণেরে বঞ্চিতার ভান করে খুশি/বাঁচা-মরা খেলাটিতে জিতিবার শখ' (ভূমিকা), বক্ষে কখনো কখনো বাজে 'মরণভেরি' (কর্ণধার) দেখছেন, সম্মুখে শান্তি পারা-বার' (শেষ লেখা) কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনদর্শন—'রাহুর মতন মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া/পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত' (শেষ লেখা)॥

॥ সাত ॥

রবীন্দ্রসাহিত্যে ডাক্তার চরিত্র মোটেই দুর্লভ নয়। কবিতা-নাটক-উপন্যাসে বর্ণিত এই ডাক্তারদের কেউ ভাল, কেউ খারাপ কেউ বা দোষেগুণে মেশানো চরিত্রের লোক। সেক্সপীয়রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা এসে পড়া স্বাভাবিক। সেক্স-পীয়রের নাটকগুলিতে মোট ৬টি ডাক্তারের কথা আছে। সেক্সপীয়র কখনও চিকিৎসককে খারাপ করে অঙ্কিত করেন নি। মাত্র একটি খারাপ, বদ চিকিৎসকের বর্ণনা পাই King Lear-এ। চিকিৎসক চরিত্র অঙ্কনে তিনি হয়ত তাঁর জামাতার চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর 'কমেডি অব এররস'-এ Pinch বলে একজন হাতুড়েরও বর্ণনা দিয়েছেন। 'দুই-বোন' উপন্যাসে হাতুড়ের কথা আছে—'শশাঙ্ক কোনরকম হাতুড়েদের সহ্য করতে পারত না।'

'নিষ্কৃতি' কবিতায় বাল্যবিধবা মঞ্জুলিকার বিয়ে দিতে নারাজ বাবা যখন নিজের বৌ-এর মৃত্যুর পর আবার বিয়ে করতে গেল, তখন গৃহচিকিৎসক পুলিন ডাক্তার মঞ্জুলিকাকে বিয়ে করে ফরাক্কাবাদ চলে গেছে।

স্পাই কবিতায়—'শক্ত হ'ল রোগ/হপ্তা পাঁচেক ছিল আমার ভোগা/—কেউ বা বলে মহেন্দ্র ডাক্তার/এই ব্যামোতে তার মত শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ নেই আর।'

ডাক্তার নিয়ে ছড়া—(১) 'আদিকে সোজাসুজি সর্দি বলেই বুঝি মেডিক্যাল বিজ্ঞান না শিখে/ডাক্তার দেয় ত্রিশ টাকা নিয়ে পঁয়ত্রিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে কাশিকে।' (খাপছাড়া)

(২) 'পাড়ায় এসেছে এক নাড়ীটেপা ডাক্তার/দূর থেকে দেখা যায় অতি উঁচু নাক তার/নাম লেখে ওষুধের/এদেশের পশুদের/সাধ্য কি পড়ে তাহা এই বড় জাঁক তার/যেথা যায় বাড়ি বাড়ি/দেখে যে ছেড়েছে নাড়ী/পাওনাটা আদায়ের মেলে না যে ফাঁক তার/গেছে নির্বাকপুরে ভক্তের ঝাঁক তার' (ঐ)

(৩) 'ডাক্তার তিনকড়ি সাণ্ডেল। বদলী করেছে বাসা বাণ্ডেল' (ছেড়া)

(৪) 'ডাক্তারেরা লাটুল কড়ি/খাওয়ায় জোলাপ খাওয়ায় বড়ি/অবশেষে বাঁচল না সে বয়স যখন একাশি।' (খাপছাড়া)

'রামকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা', 'শাস্তি', আপদ প্রভৃতি গল্পে ডাক্তারের উল্লেখ আছে। 'কঙ্কাল' গল্পে একটি মেয়ের কঙ্কাল গল্প শোনাচ্ছে—কি করে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে দাদার বন্ধু ডাক্তার শশি-শেখর, যে তার প্রেম ভুলে দশ হাজার টাকার লোভে বিয়ে করতে চলেছে, তাকে বিষ খাইয়েছিল। 'নিশীথে' গল্পে লেখক নিজেই ডাক্তার—স্ত্রীর আরোগ্য আশাহীন সেবাকার্যে দক্ষিণাবাবুর পরিশ্রান্ত—হারাণ ডাক্তারের কন্যা মনোরমার সঙ্গে তাঁর প্রণয়—স্ত্রী তাঁর ইচ্ছা করেই ভুল ওষুধ খেয়ে মারা গেলেন—মনোরমাকে অতঃপর বিয়ে—তারপর থেকে একটি ভীতি—অনুতপ্ত দক্ষিণাবাবু শোনেন অন্ধকারে অবরুদ্ধ স্বর — "ওকে-ওকে-ওকেগো" — 'দৃষ্টিদান' গল্পে স্বামী ডাক্তারী পড়ছিলেন—তাঁর চিকিৎসার অত্যুৎসাহে চোখ নষ্ট হল—সংসারে এল পিসীমার ভাসুরঝি হেমাঙ্গিনী—স্বামীর ভুল বোঝাবুঝি অবশেষে স্ত্রীর দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিয়ে—ডাক্তার ও স্ত্রীর আত্মিক মিলন।

'রোজের চিকিৎসা' (রোগীগুলোকে হাতে পেলে ডাক্তার সাহেব পটপট করে মেরে ফেলে) 'রোগীর বন্ধু' (এ্যালো-প্যাথরা তো বিষ খাওয়ায়, হোমিওপ্যাথিতে তো শুধু জলের ব্যবস্থা) 'আন্ত্যেষ্টি সৎকার' প্রভৃতি হাস্যকৌতুকে ডাক্তারের উল্লেখ পাই।

'গোড়ায় গলদ' নাটকে কিঞ্চিৎ বোকা ডাক্তারী ছাত্র নিমাই কাদম্বিনীর খোঁজে বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—নাকি হাওয়া খেতে আসে পটলডাঙার কলেজ থেকে, কবিতাও লেখে 'কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে/কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।'

'ডাকঘর'-এর কবিরাজ অমলকে খুব সাবধানে রাখতে চান, বাধাবন্ধের মধ্যে। তারপর রাজ কবিরাজ এসে বলে—'একি! চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ। খুলে দাও—খুলে দাও—যত দ্বার জানলা আছে সব খুলে দাও।' এ অবশ্য রূপক।

'রক্ত করবী'র চিকিৎসক বলছে, 'রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের—হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা'—

'গৃহপ্রবেশ'-এ ডাক্তারের সংসারের বিচিত্র মনের অভিজ্ঞতা আছে—সহানুভূতি মণ্ডিত করে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

'চোখের বালি' উপন্যাসের মহেন্দ্র 'এম-এ পাশ করিয়া ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।' মহেন্দ্রের নাইট ডিউটির কথা আছে। উপন্যাসের শেষাংশে বিহারীকে বলছে—'ভাই বিহারী, আমি ডাক্তারী জানি, তুমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছ, আমাকেও তাহার মধ্যে নাও।'

'গোরা'র আরম্ভেই বিনয়ের বাড়ির সামনে পরেশবাবুর গাড়িতে দুর্ঘটনা। ডাক্তার এলেন বিনয়ের বাড়িতে আহতদের শুশ্রূষার জন্যে। সুস্থ হয়ে সুচরিতার সঙ্গে ফিরে গেলেন পরেশবাবু। এরপরে বিনয়কে লেফাপার মধ্যে ডাক্তারের ভিজিট দিয়ে গেল সুচরিতার ভাই সতীশ। মরণাপন্ন কৃষ্ণদয়াল গোরার জীবন ইতিহাস বলছেন যখন, তখন "পরিবারের বাঙালী চিকিৎসকের সঙ্গে সাহেব ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল।"

'ঘরে বাইরে'-তে ডাক্তারের উল্লেখ আছে। ডাক্তারের পরামর্শে স্বামীর বন্ধু সন্দীপবাবু উটকামণ্ডে স্বাস্থ্যান্বেষে যাবেন। পঞ্চু বলছে—ডাক্তার খরচের জমিজমা কিছু বিক্রি আর বাকি সমস্ত বন্ধক পড়ে গেছে। শেষাংশে দেখি বিমলার স্বামী আহত নিখিলেশের পাল্কির পাশে পাশে মথুর ডাক্তারকে।

'যোগাযোগ'-এ কুমুদিনীর বাবা মুকুন্দ-লালকে কলকাতা থেকে ডাক্তার আসেন দেখতে॥...বিপ্রদাসের অসুখে ডাক্তার বলছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, হয়তো নিউমোনিয়াতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে। বিপ্রদাস গৃহ-চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করছে। 'একটু এসরাজ বাজাতে পারি কি?' ডাক্তার বললে, "না—আজ থাক।"

'দুই বোন' উপন্যাসে শশাঙ্কের শ্যালিকা ঊর্মিমালার প্রেমাস্পদ ডাক্তার নীরদ বিলাতে গিয়ে মেমসাহেব বিয়ে করে, স্ত্রীর অসুখের সময় শশাঙ্ক শেষে ঊর্মিমালার প্রণয়াসক্ত হয়, শেষ পর্যন্ত ঊর্মিলা চলেছে বিলাত—সব মায়া কাটিয়ে —বাবার আদেশ মত ডাক্তারী শিখে আসতে॥

ঐ সুন্দর কেশ বিন্যাস অতি দীর্ঘকাল সুন্দর থাকবে না – – –

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।
শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিন, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যাণ্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

॥ আট ॥

রবীন্দ্র-সাহিত্যে চিকিৎসাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শব্দ বা পরিভাষা ছড়িয়ে রয়েছে। হৃদয়, স্বপ্ন, ঘুম, রক্ত, চোখ, নাক-কান-গলা, কেশ, নানা ধরণের অসুখ, ক্ষতচিহ্ন, বিষ, সাপ, পোকামাকড় ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এই সব ব্যাপার নিয়ে কবি এবং চিকিৎসক উভয়কেই চিন্তা করতে হয়। তার ধরণ-ধারণ অবশ্য আলাদা। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের কবি। শোভনতা ও শালীনতার সীমা তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নি। ভয়ানক রস কোথাও নেই তাঁর কবিতায়। সেক্সপীয়ারের মতো ক্ষতের চুলচেরা বর্ণনা রবীন্দ্রনাথে দুর্লভ। পুঙ্খানুপুঙ্খ রোগ বর্ণনা বা তার লক্ষণ বর্ণনাও রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল। সেইরকম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিভাষাও নির্দিষ্ট অর্থে তেমন ব্যবহৃত হয় নি। অধিকাংশক্ষেত্রেই কিন্তু তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনের পরিচয় নিহিত রয়েছে। এই বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

॥ নয় ॥

তাঁর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষাবিধির সঙ্গে জড়িত কতকগুলি কৌতুককর ঘটনা বিবৃত করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কথিত আছে, 'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা, তোমায় জানাতাম' গানটি রচিত হয়েছিল এমন একটি সময়ে, যখন একটি স্ফোটকের যন্ত্রণায় কবি কষ্ট পাচ্ছিলেন।

শেষ জীবনে কবি কানে কম শুনতেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ভাই শান্তি-নিকেতনে এলেন পড়তে। কবির সেক্রেটারী অনিল চন্দ সতর্ক করে দিয়ে জোরে কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন। কবি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিহে, তুমি বলাই-এর ভাই কানাই নাকি?' ভ্রাতাটি খুব জোরে চেঁচিয়ে বললেন, 'না, আমি অরবিন্দ।' হাসতে হাসতে কবি উত্তর দিলেন, 'না, কানাই নয়, এ দেখছি একেবারে সানাই।'

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন এসেছেন সকালে উত্তরায়ণে। কবি কি চুমুক দিয়ে খাচ্ছেন, গ্লাসে অনেকখানি। সেন মহাশয় চেয়ে দেখছিলেন। হয়তো তাঁর খাবার ইচ্ছে হয়েছে, এই মনে করে রবীন্দ্রনাথ ভৃত্যকে আদেশ দিলেন—তাঁকেও ঐ জিনিস পরি-বেশন করা হল, পরিমাণে কিন্তু অল্প। অধ্যাপক মহাশয় হয়ত বা অল্পপ্রাপ্তির এই অসৌজন্যে অসন্তুষ্টও। কিন্তু চুমুক দিয়ে অস্বস্তি। এ যে মহা তেতো নিমপাতার রস! রবীন্দ্রনাথ নির্বিচারে গলাধঃকরণ করতেন ঐ পাচন প্রত্যহ। এ ছাড়া বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ আনানো বাতিক ছিল তাঁর। ভরসা করে নিজের ওপর পরীক্ষাও করেছেন—আবার ব্যর্থ পন্থা হওয়াতে ফেলেও দিয়েছেন।

॥ দশ ॥

বিয়ের প্রথা, বিয়ের বয়স ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞানসম্মত সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর দুটি প্রবন্ধ "ভারতবর্ষীয় বিবাহ" ও "হিন্দু বিবাহ" (Science Association Hall-এ পঠিত) এবং মিসেস স্যাংগারকে লিখিত একটি পত্র উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য, 'বিজ্ঞান বলে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেখানে কোন বংশসঞ্চারী দৈহিক রোগ বা মানসিক বিকার আছে, সেখানে রাজদণ্ডের বা সমাজশাসনের সাহায্যে বিবাহকে বাধা দেওয়া কর্তব্য।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাতৃত্বের তুলনামূলক সমালোচনা করে বলছেন, 'আজকাল পাশ্চাত্য দেশে অনেক সময় দেখা যায় মেয়েরা মাতৃত্বের মধ্যে হীনতা অনুভব করে। অর্থাৎ মেয়েদের ওপর প্রকৃতির জবরদস্তিকে তারা অপমানকর বলেই জানে। কিন্তু এই অপমান থেকে রক্ষা পাবার উপায় মাতৃত্বকে পরিহার করে নয়; মাতৃত্বকে আপন কল্যাণ অভিপ্রায়ের সঙ্গে সংগত করে তাকে আত্ম-শক্তির দ্বারা নিয়মিত করা। প্রাচীন ভারতে সুসন্তান লাভের সেইরূপ একটি সাধনা ছিল, তা যথেচ্ছাকৃত ব্যাপার ছিল না। সেই সাধনা বর্তমান বিজ্ঞানের নিয়মসংগত কিনা, সে প্রশ্ন বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্য নয়,—কিন্তু এই আত্মসংযত মানসিক সাধনার দ্বারাই মানবমাতা আপন মর্যাদালাভ করেন এইটেই বড় কথা।'

'হিন্দু বিবাহ' প্রবন্ধে বলেছেন, 'বাল্য বিবাহে দুর্বল সন্তান জন্মিয়া থাকে।' এই প্রসঙ্গে কবি শারীরতত্ত্ববিদ কার্পেন্টার-এর মতামত উল্লেখ করেছেন। বয়স সম্বন্ধে কৌতুক করে বলেছেন, '২৪শে এবং ৮এ বিবাহ হইলে হাড়েহাড়ে কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ হইতেও পারে, কিন্তু সে মিশ্রণ সত্বর বিশ্লিষ্ট হইতেও আটক নাই।' বিয়েতে নির্বাচনপ্রথা প্রসঙ্গে, 'অতএব দেখিতেছি, নির্বাচনপ্রথা অল্পে অল্পে সুরু হইয়াছে, যাহাতে স্বতঃই বাল্যবিবাহ অধিককাল টিঁকিতে পারে না। সমাজে অল্পে অল্পে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।'

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য তৃতীয় সন্তান রেণুকার বিয়েব পরেই—ফুলসজ্জা অনুষ্ঠান না করেই ডাক্তার জামাই সত্যেন্দ্রনাথকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেন। এর পরের ঘটনা আগেই বিবৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল ২২ বছর বয়সে। পত্নী ভবতারিণী দেবীর (ঠাকুরবাড়িতে নামকরণ—মৃণালিনী দেবী) বয়স ছিল তখন ১০।১১ বৎসর।

রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে স্বকীয় মতামত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য পরি-কল্পিত পরিবার হলে আমরা রবীন্দ্র-নাথকে পেতাম না। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্র-নাথের অষ্টম পুত্র এবং চতুর্দশ সন্তান। রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যা এবং দুই পুত্র। তাঁদের কেউই আজ আর জীবিত নেই। কবির বংশধারাও লুপ্ত।

জন্মনিয়ন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাস্তব-জ্ঞানের পরিচয় পাই। ১৯৩৫ সনে মিসেস মার্গারেট স্যাংগার কবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এই আমেরিকান মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। এর দশ বছর আগে কথা। গান্ধীজী তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। গান্ধীজীও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। তবে তাঁর পথ হচ্ছে কঠোর ব্রহ্মচর্য ও সংযমের পথ। অর্থাৎ ধর্মনীতির ওপরই তিনি নির্ভর করছেন। ঐখানেই তাঁর সঙ্গে কবির চিন্তাধারার মৌল তফাৎ। রবীন্দ্রনাথ রক্তেমাংসে গড়া—মানুষের দুর্বলতার প্রতিকার করার জন্যে উৎসুক। বাস্তব সত্যের দিক থেকে মানুষকে দেখতেন বলেই এটি সম্ভব। মিসেস স্যাংগার রবীন্দ্র-নাথকে লেখেন:

(1925, 12 Aug.) The Indian Papers just received report that Mahatma Gandhi has been visiting you at Santiniketan. Perhaps you have seen his recent statement in opposition to Birth Control. You have travelled all over the earth, and you have observed the joys and sorrow & miseries of the world, and we take it for granted that with your international outlook on life and human society, you cannot but feel friendly towards Birth Control.'

কবি তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিলেন,—Birth Control Review-এ তা প্রকাশিত হয়েছিল:

I am of opinion that Birth Control movement is a great movement, not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause

off peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its own rightful limits. In a hunger striken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children into existence that could properly be taken care of; causing endless suffering to them and imposing a degrading condition upon the whole family. It is evident that the utter helplessness of a growing poverty very rarely acts as a check controlling the burden of overpopulation. It proves that in th s case nature's urging gets better of the severe warning that comes from the providence of civilized social life. Therefore, I believe that to wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generations of children to suffer privations and ultimately death for no fault of their own is a great social injustice which should not be tolerated. I feel grateful for the course you have made your own and for which you have suffered.

॥ এগার ॥

রবীন্দ্রমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রগতিশীলতা। বিজ্ঞান-চেতনার আলোকে তাঁর চিত্ত ভাস্বর। বড় বড় বিজ্ঞানী যা পারেন নি, বা করেন নি—রবীন্দ্রনাথ সেই অসাধ্যসাধন করেছেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়বস্তু সহজ সুন্দর সাবলীল করে প্রকাশ করেছেন। 'বিশ্ব-পরিচয়'-এ পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌর-জগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক নামক সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আগ্রহে ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য 'ভারতীয় ব্যাধি ও আহার প্রতিকার' গ্রন্থটি লেখেন। ভূমিকায় কবি লেখেন: 'ডাক্তারি বই-এর ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজকে মানায় ভালো। এ কাজে আমার যদি সত্যিকারের কোন দাবি থাকে, সে তবে রোগীর তরফ থেকে। কিছুকাল থেকে গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছি, দেখেছি এদেশে সকলের চেয়ে দুস্তর অন্তরায় আত্মরক্ষার বিধিবিধ উপায়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে এ দেশের লোককে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কী করে রোগ ঠেকানো যায়। রাশিয়াতে এই প্রচারকার্য কিরকম সম্যকভাবে ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশ জুড়ে চলছে তা দেখে এসেছি। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন সেখানে তার চেয়ে অনেক বেশি, অথচ আয়োজন নেই বললেই হয়।...গ্রামের যদি কোথাও এক আধজন হিতৈষী শিক্ষিত লোক থাকেন, তাঁরাও এইরকম বই-এর সাহায্যে অনেক উপকার করতে পারবেন, আমার মতো সাহিত্য ডাক্তার, যাকে দায়ে পড়ে ভিষক ডাক্তার হতে হয় তার তো কথাই নেই...ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্বাদ করে আমি মাঝে মাঝে বইখানি পড়ব এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।'

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রসার এবং প্রচারের এই আগ্রহ ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ডাঃ ভট্টাচার্যের আর একখানি বই 'আহার ও আহার্য' পড়েও খুশি হয়ে লিখলেন, 'পশুপতি পরিভাষা বর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত পথ্যবিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভাল লেগেছে বলে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আনন্দের সংগে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশের কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি তোমার এই লেখা দেশের লোকের আহার সম্বন্ধে অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সংগে ব্যবহার করবো।' প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত' প্রবন্ধে আবেগ, ধর্ম এবং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপরে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন।

আমাদের দেশে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্যেও তিনি চিন্তা করেছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্যতম গবেষণাগার 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ'-এর উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৩৫-এর ১লা জানুয়ারী। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁরা অর্থের জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ নীলরতন সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মদনমোহন মালব্য, সি. ভি. রমণ প্রমুখ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ দেশের নিজস্ব গবেষণাগারের প্রয়োজন অনুভব করে জনগণের কাছে আবেদন জানান কবি রবীন্দ্রনাথ (২রা জুলাই, ১৯৩৩) 'চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যে পরিকল্পনা সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে, তা আমাদের গভীরতম বিবেচনা ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমাদের অন্যতম জাতীয় সম্পদ জাতীয় স্বাস্থ্যের প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শিত হয় তা ভয়াবহ। নিরাময়যোগ্য রোগেও মৃত্যুর সংখ্যা বিরাট। শুধুমাত্র রোগ নিরাময়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের পদ্ধতি প্রয়োগে ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান কিছুতেই হতে পারে না। ভারতের স্বাস্থ্য সমস্যার বিপুলতার জন্যই প্রয়োজন সাধারণভাবে জনগণ ও বিশেষভাবে চিকিৎসকবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, অন্যথায় রোগ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও মহামারী থেকে উদ্ভূত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি বেড়েই চলবে। ...এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে জৈব বৈজ্ঞানিক ও ঔষধাদি উৎপাদনের মানদণ্ড নির্ধারণক্ষম একটি কেন্দ্র স্থাপন। যে দেশ ভেজাল দ্রব্যের আড়তে পরিণত হয়েছে, সে দেশে এরূপ প্রচেষ্টা জাতির পক্ষে আশু জরুরী মহৎকাজ বলে আমার মনে হয়েছে... জনসাধারণের থেকে পাওয়া প্রয়োজনানুযায়ী চাঁদা ও দানের ওপরেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য সুচিন্তিত এরূপ একটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। আমি আমার স্বদেশবাসী জনসাধারণের কাছে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্যদানের আবেদনে আশু সাড়া দেবার অনুরোধ জানাতে চাই, যাতে তাঁদের সমর্থনের মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টা সার্থকরূপে সফল হয়ে উঠতে পারে।'

॥ বার ॥

একজন চিকিৎসক কতজনেরই বা আর চিকিৎসা করতে পারেন? ব্যাপক অর্থেই দেখতে গেলে যিনি কবি, তিনিই তো সবথেকে বড় চিকিৎসক। মানুষের মনের অশান্তিই বড় অসুখ। মনের সমস্ত ক্লেদ-গ্লানি-দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশা-অস্থিরতা-অসুস্থতা কবি ছাড়া আর কে দূর করতে পারেন? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই—নিত্যকালের মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত

২৭ বর্ষ **একক** ৪র্থ সংখ্যা

বের হলো। লিখেছেন—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কমলাচরণ গুহ, নিখিল সেন, রবীন সুর, মলয় ঘোষ, অরুন্ধতী রায় প্রমুখ।

●

একক সবচেয়ে বর্ষীয়ান পত্রিকা।

বৈশাখে বছর সুরু। গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক পাঁচ টাকা ॥ ঠিকানা—২৯, কাজী টেম্পল রোড, কলি-২৬ ফোন ৪৭-৮৯০৮

গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

প্রদ্যোত রায়

শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনবোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে গ্রন্থাগারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দান করেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের গ্রন্থাগারের ইতিহাসপাঠ করলে দেখি—প্রথমাবধিই এটির সম্প্রসারণ ও যথাযথ ব্যবহারকল্পে রবীন্দ্রনাথের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল। এই গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র করে তাঁর গ্রন্থাগারিক সুলভ মনোভাব গড়ে ওঠে। গ্রন্থাগারটিকে আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত করতে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। মহর্ষির 'টাস্ট ডীড্' অনুযায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থাগারটিও প্রতিষ্ঠিত হয় আশ্রমের একমাত্র তিনকামরাযুক্ত বাড়ির একটি কামরায়। ১৯১৯ সাল থেকে আশ্রমে নিয়মিতভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র, সংস্কৃত, পালি প্রাকৃত, তিব্বতী ও চীনা প্রভৃতি ভাষায় উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় এবং প্রত্যেক বিষয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য পুঁথিপত্র সংগৃহীত হতে থাকে। ১৯২৭ ও ১৯২৯ সালে মিশর ও নিজাম সরকার এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বহু মূল্যবান আরবী পারসী ও উর্দু গ্রন্থ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে দান করেন। ১৯৩৫ সালে চীনা ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় চীনা বন্ধুদের নিকট থেকে বহু মূল্যবান পুঁথিপত্র গ্রন্থাগারটি লাভ করে। ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের জানিয়েছেন ঃ আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স, জর্মানি, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, বোহেমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণে বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারটির সম্মুখে নানা সমস্যা দেখা দিল। বইপত্র রাখার মত স্থানের অভাব দেখা দেওয়ায় পুরাতন গৃহের ওপরে খড়ের যে ছাত্রাবাস ছিল তা ভেঙে দ্বিতল গ্রন্থাগার নির্মিত হল। পিঠাপুরমের মহারাজার দানে (২০০০ টাকা) দ্বিতলটি নির্মিত হয়। এই আশ্রম গ্রন্থাগারটির জন্য কবির মমতার অন্ত ছিল না। পৃথিবীর যে দেশে যখনি গিয়েছেন সেখানকার গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেছেন এবং মনে মনে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারটির সঙ্গে ঐসব গ্রন্থাগারের তুলনা করেছেন। অসংখ্য কাজের মধ্যেও গ্রন্থাগারের খুঁটিনাটি সমস্যা, তার উন্নতির পথ, গ্রন্থাগারিকের ধর্ম ও পাঠকচিত্ত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর এই চিন্তারাজি বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে। 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থাগার রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

গ্রন্থাগারের দায়-দায়িত্ব কতখানি কী তার লক্ষ্য—এ বিষয়ে কবির বক্তব্য ঃ লাইব্রেরীর একটি নিজস্ব দায় আছে—সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে—সেহেতু সেগুলি পড়িয়ে দিতে পারলে যেন সে ধন্য হয়। সে নিক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না ; সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেন না 'অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'... 'অমন্টং বন দীয়তে।'

গ্রন্থাগারের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পুস্তক সংরক্ষণের ওপরেই সমস্ত মনোযোগ - নিবদ্ধ। পুস্তক-সংরক্ষণ নিঃসন্দেহে অন্যতম কর্তব্য, কিন্তু তাই বলে তা মুখ্য কর্তব্য নয়। অনেক ধনী গৃহে ঝকঝকে আলমারীতে যত্নসহকরে হরেক রকম বই সজ্জিত রাখা হয়। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার হয় না। এ তো একটি বাস্তব ঘটনা—যা আমরা মোটামুটি সবাই জানি। কবি এই সত্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

"পাষাণ গাঁথা প্রাসাদপুরে আছেন ভাগ্যবন্ত
মেহগিনীর মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না
কেউ পাতা
আস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে যত্ন পুরামাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী সেথায় করবি
যাত্রা।"

অর্থাৎ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তক পাঠক সাধারণের মধ্যে অধিক পঠিত হলেই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তা না হলে গ্রন্থ সাজিয়ে রাখার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নেই। প্রয়োজনীয়তা তো নেই-ই।

"অধিকাংশ লাইব্রেরিই সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থ-

অনেক টাকা আমাদের দেশে তাকে বড়ো মানুষ বলে; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগদানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহংকারতৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়।"

গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি অতি মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। বর্তমান কালে বাংলাদেশে প্রকৃত গ্রন্থাগারিকের অভাব স্পষ্ট। সচরাচর গ্রন্থাগারিকদের যে সব দোষ থাকে, কবি নির্মমভাবে সে-কথা ব্যক্ত করেছেন।

"গৃধ্নুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়—সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে।

"লাইব্রেরি তার যে অংশ মুখ্যত জমা করে, সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত—সে অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চান না। তার কারণ সঞ্চয় বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।

"লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। সেলফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখলেই তার কাজ সারা হোল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সবচেয়ে বড় কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।

"লাইব্রেরিয়ান হলেন যথার্থ সাধক—নির্লোভ * *। আর লাইব্রেরিয়ানের থাকবে গুদামরক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্যপালনের যোগ্যতা। * * * নূতন বই এলে খুব অল্প লাইব্রেরিয়ান তার বিবরণ নিজে জেনে পাঠকদের জানিয়ে দেবার উপায় করে থাকেন। * * * প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্য রূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন—তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মাধ্যম। অর্থাৎ, তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। * * যে বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেছেন, কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্তব্য আবদ্ধ নয় ; তাঁর জানা থাকা চাই, বিষয় বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কি কি বই প্রকাশিত হচ্ছে।"

রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

'রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী ছিলেন',—বললে বিজ্ঞানকে যেমন, রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি অপমান করা হয়। কিন্তু যদি বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক-ভাবাপন্ন ছিলেন, তবে অপমানের বোঝাটা কারও ওপরেই চাপিয়ে দেবার ভয় থাকে না; উপরন্তু রবীন্দ্রনাথেরই স্বীকৃতি থেকে 'বলা'র সমর্থন মেলে। স্বীকৃতি আছে বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায়। ওখানে কবি বলছেন,

> "জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না। অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।"

অনুভব কী করে করবেন কবি? ক্ষতি যেখানে বিন্দু-প্রমাণ আর লাভ সিন্ধু-প্রতিম, লোকসানের প্রশ্ন তো সেখানে ওঠে না।

এই সিন্ধু-প্রতিম লাভটা যথার্থই সপ্তসিন্ধুর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ মিলিয়ে প্রায় আমাদের চেনা পৃথিবীরই মতো আর একটি পৃথিবী গড়ে তুলেছে।

'প্রায়' বলছি কেন? না মহৎ কোনো সাহিত্যিকের পৃথিবী বা জগৎ হুবহু বাস্তবের অনুকৃতি হয় না বলে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি, কথাশিল্পী বা নাট্যকারদের নিজস্ব এক একটা জগৎ থাকে বলে।

নিজস্ব এক জগৎ রবীন্দ্রনাথেরও আছে: এবং এই জগৎ-নির্মাণে বিজ্ঞানের ভূমিকাটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এ বরং বিজ্ঞানবুদ্ধির দৌলতেই অপরূপ হয়ে উঠেছে; প্রকৃতি ও মানবপ্রেমিক কবিকে নিয়ে গেছে সৃষ্টিরহস্যের একেবারে মর্মমূলে।

সৃষ্টিরহস্য নিয়ে বিজ্ঞানীর মাথাব্যথা সেই কবে থেকে। সেই কবে থেকে বিজ্ঞানীরা কবি হয়ে উঠছেন; স্বপ্ন দেখছেন কোটি কোটি বছর আগেকার আগুন-ঝরা পৃথিবীর।

সত্যি নাকি অনেক ঝরল আগুন। কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য-প্রণাম জানাতে গিয়ে পৃথিবী নাকি অনেক তাপ হারাল। এবং দিতে দিতে দিতে দিতেই একদিন নাকি আদিকালের আগুনের পিণ্ডটা ঠাণ্ডা হয়ে জল-স্থলের মুখ দেখল।

জল-স্থল দেখল আবার বায়ুকে; আর বায়ু দেখল প্রাণকে।

প্রাণের প্রবাহ বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আজকের সব প্রাণীতে এসে পৌঁছল। অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে, আজকের প্রাণিদেহের উপাদানগুলো সেদিনের পৃথিবীতেও ছিল; তবে সব ছিল অন্যভাবে, অন্যরূপে।

ওদিকে দেখতে দেখতে রূপবদল হল পৃথিবীর প্রাণিসমাজে। কিন্তু তার উপাদানের সমাজে এমন কোনো পরিবর্তন হল না যা' দিয়ে প্রকৃতির সেন্সাস-রিপোর্টে জন্ম-মৃত্যুর আঁচড় পড়তে পারে।

আসলে জন্ম তো নেই-ই উপাদানগুলোর; মৃত্যুও নেই। তাই আদিকালের পৃথিবীরই শরিক ওরা; ওরা সেই আগুন-ঝরা পৃথিবীপ্রসূত। তাই পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ, মায়ের সঙ্গে সন্তানের মতো যোগ। আর মা-ও পাঁচ-সাত দশকের কিছু নয়; একেবারে কোটি কোটি বছরের পুরাতনী, মমতাময়ী তিনি। তাই সমুদ্রের গর্জন প্রাগৈতিহাসিক দিনগুলোর ওপার থেকে কবির কাছে নতুন খবর বয়ে আনে। কবির যেন নতুন করে মনে পড়ে—

মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন
ওই ভাষা জানে—
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়,
যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই
বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে
লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান
অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে;
সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী'-পরে সেই
নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ
আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়,
শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই
পুরাতন কলধ্বনি।

[সোনার তরী: সমুদ্রের প্রতি]

জন্মের পূর্বে ভ্রূণ হয়ে এই পৃথিবীতে ছিলাম আমরা। আবার মৃত্যুর পরেও এই পৃথিবীরও মাটির সঙ্গে আমরা একাত্ম হবো। পৃথিবী আমাদের কাছে তাই জন্মের উৎস, জীবনের বন্ধু এবং মরণের আশ্রয়। আমাদের কাছে তাই নিত্য-নবীনা: রঙে-রসে ফুলে-ফলে নিত্য বিচিত্রিতা।

এই বিচিত্রিতার ঢঙ দেখে রসে মজেন কবি, রঙ দেখে দিশেহারা হন। লক্ষ কোটি বছর ধরে সেই যে সে চলছে তো চলছেই, সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে তো করছেই। তার চলার বুঝি বিরাম নেই আর; সূর্য-প্রদক্ষিণের বুঝি আর শেষ নেই। তাই 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবিকে বলতে শুনি,

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

হ্যাঁ, গন্ধ তো আছেই। রেণুর মধ্য দিয়েও তো চলেছে প্রাণের প্রবাহ। গাছপালা, তৃণলতা, সব কিছুর মধ্য দিয়েই চলেছে। আর চলেছে বলেই অখণ্ড এই প্রবাহের সঙ্গে কবি নিজের প্রাণের প্রবাহের যোগ অনুভব করেন। বারবার তাঁর মনে হয়, এই পৃথিবীর ছোট-বড় প্রতিটি বস্তুই যেন তাঁর চিরসঙ্গী, তাঁর দুঃখ-সুখের চির-সহচর। সৃষ্টির কোন্ সেই আদিকাল থেকে একই বাঁধনে আবদ্ধ ওরা সবাই।—

বৈজ্ঞানিক সত্যনির্ভর এই বিশেষ

আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

ভাবনাটি রবীন্দ্রকাব্য-জগতের বহু জায়গাতেই খুঁজে পাই। 'চৈতালি' কাব্যের 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় পাই, 'উৎসর্গে'র 'প্রবাসী'তে পাই; আর পাই 'বিচিত্রিতা'র 'পুষ্পে'। দেখি, বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আর বিবর্তনবাদ কবির বিশ্বাত্ম-বোধকে প্রবাহিত করেছে।

কিন্তু কবি তো এক সুরে গান করেন নি কখনও। একরকম ফুলে মালা গাঁথেন নি। তাই বিশ্বভুবন তাঁর কাব্য-ভাবনার ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে রঙ-বদল করে দেখা দিয়েছে তাঁর সামনে। ঋতুরাজ বসন্তের রাজবেশে দেখা দিয়েছে কখনও; কখনও আবার দেখা দিয়েছে গেরুয়াধারী বাউলের বেশে।

কবির মনও বাউল হয়ে উঠেছে তখন। ভোগসুখে পরিপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তখন তাঁর মহত্তর জীবনাদর্শের বিরোধ ঘটেছে। আর যখনই বিরোধ ঘটেছে এইরকম, তখনই বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব কবির কাছে অসার ও অর্থহীন মনে হয়েছে। চিত্রা থেকে সুরু করে কল্পনা হয়ে কণিকা অবধি রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্ট।

কণিকার পর আসছে 'নৈবেদ্য'। কিন্তু ওখানে নৈবেদ্য সাজিয়েছেন কোন্ কবি? উপনিষদের রসপুষ্ট সনাতন ভারতবর্ষের কেউ? না কি বিজ্ঞানের সত্যলব্ধ আজকের পৃথিবীর কেউ?

দুজনেই বোধ করি। বোধ করি দুযুগের দুটো বিশেষ সত্তা এখানে এসে মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে। আর এক যদি না হবে তো নৈবেদ্যের 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতায় ভগবৎ-মাহিমার কথা বলতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ কেন করবেন কবি। কেনই বা 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর' গাইতে গাইতে কবি বলবেন, সব কিছু ভগবানে নিবেদন করলে হারাবার ভয়ে অনুক্ষণ উতলা হতে হয় না। কারণ, অণু-পরমাণুতে গড়া, লক্ষ লক্ষ চন্দ্র-সূর্যে ভরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হারায় না কোনো কিছুই—

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু

ঠিক কথা; হারায় না। চন্দ্র-সূর্য থেকে সুরু করে আমাদের দেহ এবং এমন কি তৃণ অবধি সর্বত্রই চলেছে এই না-হারাবার খেলা। বিধাতার গড়া এই বিশ্বভুবনে অনন্তকাল ধরে একই অণু-পরমাণুর লীলা চলেছে। তাই হেমন্তের শান্ত দুপুরে জনশূন্য প্রান্তর আর ক্ষীণরেখা নদীর দিকে তাকালে কবির মনে হয়—

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে,
লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত
কল্লোল।

[নৈবেদ্যের ২৩ সংখ্যক কবিতা]

নৈবেদ্যের পরবর্তী রচনা 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'তে ভগবৎপ্রেমিক কবির গান শুনি আমরা; এবং সেই সঙ্গে শুনি 'বিজ্ঞান-সচেতন কবিকণ্ঠকেও। গীতিমাল্যের 'এই যে এরা আঙিনাতে' দেখি, কবি-কল্পনার আঙিনাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চকিত আবির্ভাব। দেখি, কবি গাইছেন,—

জ্বলে নেভে কত সূর্য
নিখিল ভুবনে।
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
রাজার ভবনে।

গীতিমাল্যের পরবর্তী কাব্য 'বলাকা'য় বিজ্ঞান তার রহস্যের ঝাঁপি নিয়ে আমাদের একেবারে ঘরের সামনে হাজির। ওখানে দেখি, মানুষ, প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের যে গতিচাঞ্চল্যকে কবি জীবনধর্ম ও উন্নতিলক্ষণ বলেছেন, তা বিজ্ঞানীদের ভাবনার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। বিজ্ঞানীর মতেও গতিই জীবন, চাঞ্চল্যই প্রাণধর্ম। হংসবলাকাকে কেন্দ্র করে গতিময় বিশ্বচরাচরের চিরন্তন চাঞ্চল্য কেমন করে কবির চোখে ধরা পড়ল, কবি-প্রদত্ত বিজ্ঞান-সত্য-নির্ভর বর্ণনা থেকেই তা জানা যায়—

"সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী

হংহংবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল—এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চলেছে; তাদের কোথা থেকে সুরু, কোথায় শেষ, তা' জানি নে। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা' জানি নে, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী—'এখানে নয়' 'এখানে নয়'।"

[বলাকা : পরিশিষ্ট]

প্রশ্ন উঠবে, 'এখানে নয়' তো কোথায়?

উত্তর হল, কবি নিজেও জানেন না, কোথায়। তাই 'বনবাণী'র 'বৃক্ষ-বন্দনা'য়, 'পরিশেষ'-এর 'প্রণামে', 'সানাই'-এর 'জ্যোতির্বাষ্পে' এবং 'শেষ সপ্তক'-এর 'তুমি প্রভাতের শুকতারা'য় এই 'কোথায়'কে খুঁজে বেড়ান কবি। সুদূরের রহস্যময় শুকতারার সঙ্গে নিগূঢ় এক প্রীতির সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। কিন্তু শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে আবিষ্কৃত তত্ত্ব নয়, অনাবিষ্কৃত রহস্যই কবির কাছে বড়। তাই বড় মুখ করেই পণ্ডিতদের তিনি চ্যালেঞ্জ করেন—

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত দিগরঙ্গের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্‌ব্যাপার
যেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটি বৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে
তুমি অবগুণ্ঠিত।

গ্রহ-নক্ষত্রকে ঘিরে আশ্চর্য-সুন্দর সব কল্পনার পরিচয় 'শেষ সপ্তক'-এর আরও কয়েকটি কবিতায় আছে। কোথাও আছে লক্ষকোটি নক্ষত্রের আবির্ভাব-তিরোভাবের কথা, বিশ্বসৃষ্টির মহাপ্রাঙ্গণে নক্ষত্রের জন্মমৃত্যুর লীলাখেলার কথা—

ঐ নির্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের
হয়েছে আবর্তন।

উপহার সম্বন্ধে সমস্যা?

বিবাহ, জন্মদিন, নববর্ষ, দুর্গোৎসব, দেওয়ালি, বড়দিন, ঈদ—উপলক্ষ্য যাই হোক, দেওয়া চলবে। দেখলে পছন্দ হবে আপনার—সুন্দর চেক, সুন্দর ফোল্ডার। আর নাই থাকল অ্যাকাউণ্ট, আপনিই চেক সই করবেন

ব্যাঙ্কের যে-কোন শাখা অফিসেই কিনতে পারেন।

গিফ্‌ট চেক

দেখুন না...

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা আছে

নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ী ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,
ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের
ফেনপুঞ্জে,
অবশেষে যুগান্তে তারা
তেমনি করেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণশান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ।

বিজ্ঞানীরাও ঠিক এই একই কথা বলেন। ওঁরা বলেন,—হ্যাঁ, পতঙ্গ তো বটেই। গ্রহরা যেমন নক্ষত্ররাও তেমনি ঠিক পতঙ্গ। কিন্তু উপগ্রহরা তবে কী? পতঙ্গের যারা পারিষদ, তাদের কোন্ চোখে দেখছেন কবি?

'পত্রপুট'-এর 'উদাসীন' কবিতায় দেখি, আমাদের প্রতিবেশী উপগ্রহ চাঁদকে কবি বিজ্ঞানীর চশমা দিয়েই দেখছেন। কেন না, দেখাটা নিখুঁত না হলে চাঁদের অতীত ও বর্তমান জীবন্ত হয়ে উঠত না আমাদের সামনে। আমরা কবির কাছ থেকে শুনতাম না,—

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্যনবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হোলো সে আপনার
মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন
দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা
নির্ঝরিণী॥

রিস্ট ওয়াচ
মাত্র ৬্ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬্ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অ তি রি ক্ত।

দ্রষ্টব্য : আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH
TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur
City.

পত্রপুট-এর প্রায় সমসাময়িক কালে লেখা বিশ্বপরিচয়েও চাঁদ সম্পর্কে এ-ধরণের মন্তব্য আছে। এখানেও সত্যসন্ধানী কবিকে বলতে শুনি,—

"চাঁদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া এত গরম হয়ে উঠেছিল যে, চাঁদ তার বাতাসের পরমাণুদের ধরে রাখতে পারে নি। তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের পরমাণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল-হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো রকমের প্রাণ টিকতে পারে বলে আমরা জানি নে। চাঁদকে একটা তাল-পাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।"

[বিশ্বপরিচয় : দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৪৪; পৃঃ ৯৬]

'শেষ সপ্তক' ও 'বিশ্বপরিচয়' প্রকাশিত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই কবি-ভাবনার এক নতুন যুগের অভ্যুদয় দেখি 'আকাশ প্রদীপ', 'নবজাতক', 'রোগ-শয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষ-লেখা'য়। এ-পর্বে দেখি, চরাচরপ্রসারী কল্পনাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবি বৈজ্ঞানিক সত্যের আশ্রয় নিচ্ছেন।

অবিশ্যি সন্দেহ নেই, এমন আশ্রয় আগেও এক একবার নিয়েছেন কবি। কিন্তু আগে তা এ পর্বের মতো রঙে-রসে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে নি। তা অভ্যুদয় হয়ে ওঠে নি ঠিক।

এ-পর্বে লক্ষ্য করি, কবি যেন বিরাট সৃষ্টির মহাপ্রাঙ্গণটিকে দেখতে পাচ্ছেন। এবং দেখতে দেখতে দেখাবারও উদ্যোগ করছেন সেই রহস্যময়কে।

সৃষ্টি নিয়ে কত তাঁর জিজ্ঞাসা। সূর্য সম্বন্ধেও কত প্রশ্ন তাঁর! সূর্যের আলোর সামান্য একটা অংশ এসে পৃথিবীতে পড়ে। নক্ষত্রের বেলায়ও তাই। ওদেরও আলোর সামান্যই আসে পৃথিবীতে। অর্থাৎ, বিশ্বভুবন জুড়ে আলোর চলে বিরাট এক অপচয়।

এই অপচয় সম্বন্ধে 'নবজাতক'-এর 'কেন' কবিতায় কবির জিজ্ঞাসা,—

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান-যজ্ঞের হোমাগ্নি-
বেদিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্ররূপে
এ বিশ্বের মন্দির মণ্ডপে
অতিতুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের
পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ
স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার
তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী
নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার
নির্মম অন্যায়।

আরোগ্য কাব্যের 'বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে' ও 'বিরাট মানবচিত্তে' নামক কবিতা দুটিতেও দেখি, কবির চরাচর-ব্যাপী কল্পনাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করছে বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টি। কবির ধারণা, 'শত শত নির্বাপিত-নক্ষত্রের নেপথ্য-প্রাঙ্গণে' একমাত্র সত্য আদি-জ্যোতি। এবং এই আদিজ্যোতিই হল একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য। এ-সম্পর্কে বিশ্বপরিচয়ে কবির মন্তব্য,

"নিত্য বলে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল এই আদিজ্যোতি, যা রয়েছে সব কিছুরই ভূমিকায়, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।"

আদিজ্যোতিতে সুরু, আদিজ্যোতির মধ্যেই আবার শেষ। এই শেষের-প্রান্তে অমৃতের প্রতীক, অমরত্বের আধার। কবি তাই দেখতে পান যেন,

এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের
মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।

[রোগশয্যায় : ২০ সংখ্যক কবিতা]

আমরাও বলি,—হ্যাঁ ঠিক তাই। চৈতন্যসাগরেরই তীর্থপথে যাত্রী কবি। বিশ্বভুবন সম্পর্কে বিজ্ঞান-নির্ভর ধারণা তাঁকে সেই তীর্থপথ চিনিয়ে দিতে অনেকখানি সাহায্য করল।

কৃষি, সমবায় ও রবীন্দ্রনাথ

রজত রায়চৌধুরী

কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষীয় গ্রাম্য-সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ব্যতিরেকে ভারতীয় জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব নয় বলেই গ্রামীণ জীবনের পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই পুনর্গঠনের সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, বড় বড় খামার সংগঠন, সেচ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ঋণদান পদ্ধতির সুষম বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কৃষিজ পণ্যের বাজার ব্যবস্থার সংস্থাপন ও সঞ্চয় ভাণ্ডার গঠন প্রভৃতি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এবং বলা বাহুল্য, বাস্তব, মোহমুক্ত সমস্ত সমস্যার সঙ্গে গভীর-ভাবে পরিচিত সুষ্ঠু পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের ওপর গ্রাম্যজীবনের সার্বিক উন্নতি নিহিত। এর সঙ্গে স্বভাবতই গ্রামীণ সামাজিক জীবনের প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ একান্ত দরকার। ভারতবর্ষের শতকরা সত্তর জন অধিবাসীর জীবিকা সংস্থান ও জীবনযাত্রাই কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত। অতএব কৃষির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বৃহৎ ভারতের বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর উন্নয়ন কৃষির দিকে লক্ষ্য রেখেই গঠন করা দরকার।

একথা শুধু চিন্তা নয়, হাতে-কলমে তার কার্যকরী রূপদানের সকল রকম প্রচেষ্টাই কর্মী রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন। সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা কৃষির ক্ষেত্রে যে একান্তই দরকার, তা বাস্তব পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনুভব শক্তি দিয়ে তিনি পর্যালোচনা করেছেন। মাইলের পর মাইল ক্ষেত বাংলার যে কোনো গ্রামেরই পরিচিত দৃশ্য। ঢের লোক চাষ করে সে সব ক্ষেত। কিন্তু জমির ভাগ কারো-বা দু' বিঘে কারো-বা দশ বিঘে। তার সীমানা আঁকা-বাঁকা, তার ওপর ফসল কাটা হলে সেই কাটা ফসল প্রত্যেক চাষীর ঘরে তোলবার জন্য পৃথক গাড়ির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরীর প্রয়োজন। তাছাড়া স্বতন্ত্র গোলাঘর ও স্বতন্ত্রভাবে বেচবার বন্দোবস্তও করতে হয় চাষীকে। মানুষের কর্মশক্তির এই অপচয় এবং দলগত কর্মপ্রচেষ্টার পরিবর্তে এই একলা চলার ভাবটাই আমাদের দৈন্যের কারণ॥

অথচ এই উপকরণ, এই পদ্ধতি এবং এই কৃষিব্যবস্থায় এককালে দেশের উন্নতির স্রোত ব্যাহত হয় নি। কিংবা বলা যেতে পারে, তখন অভাব হয় নি গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের, অন্নের, সর্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তির॥

গ্রামকে বাঁচাতে চেয়েছেন রবীন্দ্র-নাথ, গ্রাম্যতাকে নয়। "গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা বুদ্ধি বিশ্বাস ও কর্ম, যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত—বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ।

পূর্বেকার গ্রাম্যজীবনে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সকলের মধ্যে যে সর্ব-স্বীকৃত সহজ ব্যবস্থায় সামাজিক যোগ ছিল, য়ুরোপীয় আদর্শে নগরগুলি দেশের মর্মস্থান হওয়ায় তারই আঘাতে এই সামাজিক স্নায়ুজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কারণ নগরভিত্তিক সভ্যতায় ঐশ্বর্যের ভোগ একান্তভাবেই সংকীর্ণ-তায় আবদ্ধ হয়ে পড়ল। অথচ এই ঐশ্বর্যের ধারাই বিভিন্নমুখী খালের জলধারার মত গ্রামে গ্রামে সর্বজনচিত্ত ধর্ম-কর্ম-ভোগে প্রবাহিত হত। তাতে সমাজ হয়তো বেঁচেছিল। "কিন্তু সেই দানদাক্ষিণ্যের প্রথা থাকাতে সাধারণ লোক আত্মবশ হতে শিখতে পারে নি। তারা অনুভব করে নি যে, গ্রামের অন্ন ও জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ধর্ম ও আনন্দ তাদের প্রত্যেকের শুভ-ইচ্ছার সমবায়ের উপরেই নির্ভর করে।" কাজে কাজেই পরিবর্তিত সমাজনীতিতে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য যখন লোকহিতে প্রযুক্ত নয় তখন ভিক্ষা চাওয়া মৃত্যুরই নামান্তর, মনে মনে ভরসার সঞ্চারই, একান্তভাবে কাম্য। যে ভরসা ধন-উপার্জনে ও শক্তি-উপার্জনে সম্মিলিত হলে সকল দৈন্য ঘুচবে বলেই রবীন্দ্রনাথের ভরসা।

টুকরো টুকরো জমি চাষের পরি-বর্তে গ্রামের সমস্ত চাষীর কর্মশক্তিতে একীভূত করে শুধু হাতের সঙ্গে হাতি-য়ার ব্যবহার করেই নয়, যন্ত্র ব্যবহারের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুললেই উন্নতি। আজ নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চাষীদের উদ্দেশ করে বলেছেন, 'আজ আমাদের চাষী-দেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না।......য়ুরোপ-আমে-রিকার সকল চাষীই কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। ইহার সুবিধা কী তাহা সামান্য একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়।' মানব সভ্যতার পর্বে পর্বে মানুষ এই সত্যেই ধ্রুব হয়েছে যে, পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় নিজেকে নিজের প্রয়োজনকে খাপ খাইয়ে না নিলে দুর্যোগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অথচ যন্ত্র ব্যবহারের জন্য যেমন বেশি পরিমাণে জমির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়ো-জন অর্থের। এবং এই উভয়বিধ সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র সমবায় প্রণালীতেই সম্ভব, এ অভিমত রবীন্দ্রনাথেরও।

স্বীকার করা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ অর্থনীতিবিদ নন। সুতরাং অর্থনীতি-বিদ যেভাবে এ সমস্যার আলোচনা করবেন, রবীন্দ্রনাথের কৃষি-সমবায়ের আলোচনা হবে একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথের মতনই করে দেখা। প্রজ্ঞার ও মননশীল-তার সাযুজ্য একদিকে ইতিহাসচেতনায়, অপরদিকে মানবসত্যকে প্রাধান্য দেবার অঙ্গীকারে বহুধাবিভক্ত মানবসমাজের বিভিন্ন স্রোতধারার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে সমবায়ের দুর্লভ ও দুর্জয় শক্তিকে অন্বেষণ করিয়েছে। একলা-মানুষ যে পূর্ণ-মানুষ নয়, সে যে সভ্যতার বিবর্তনে সর্বস্তরে সমবায় দ্বারাই পূর্ণ হয়েছে—এ অভিমত

রবীন্দ্রনাথের। জ্ঞানের, শিক্ষার, ধর্মের, প্রতাপের, অর্থের সব কিছুর মূলেই তিনি এক প্রকার মানুষের সমবায় লক্ষ্য করেছেন। এবং কবিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্য ব্যতিক্রমধর্মী এই স্তরের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সমস্যার গভীরে অত্যন্ত সহজভাবেই প্রবেশ করেছেন।

এখন প্রশ্ন, আমাদের মতন দেশে গরীব চাষীদের, যাদের দু-বেলা অন্ন জোটাই ভার, তারা টাকার যোগাড় করবে কেমন করে? রবীন্দ্রনাথের উত্তর সোজা, 'সমবায় প্রণালীতে।' "জনসাধারণ যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূলে সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তিবিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখাতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না।" কিন্তু সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত না হলে এ সদিচ্ছা প্রতিহত হতে বাধ্য। রাষ্ট্রশাসনে যদি ধনের শাসনের প্রাবল্য ও প্রতাপ অব্যাহত থাকে, তবে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন অসার্থক। কাজে কাজেই ধনার্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা একান্ত প্রয়োজন। "আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।"

দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় সমবায় নীতি। কিন্তু কোন্ পথে এগুলে সফলতা পাওয়া যাবে, তা নিয়ে দুটি ধারার আলোচনা দেখা দিয়েছিল। কেউ আলোচনা করেছিলেন গান্ধীবাদের যানানুসরণে। কারুর আলোচনা চলছিল রাশিয়ার সাম্যবাদকে সামনে রেখে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীবাদকে গ্রহণ করেন নি, কালান্তরের 'চরকা' প্রবন্ধে তার সাক্ষ্য সুস্পষ্ট। তাছাড়া 'সমবায়নীতি' পুস্তিকায় বললেন, 'একথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে এককালে আমাদের জীবনযাত্রা যে রকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণ ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তা হলে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধঃপাত হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না।' প্রসঙ্গত দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, 'যে প্রয়োজনে ভেরেণ্ডা তেলের প্রদীপ একদিন সন্ধ্যাবেলায় জ্বালতে হয়েছে সেই প্রয়োজনেরই উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিজুলি-বাতি। আজ একে যদি ব্যবহার করি তবে সেটা বিলাস নয়, যদি না করি সেটাই দারিদ্র্য।' তেমনি বল-প্রয়োগ দ্বারা কিংবা কৌশলের দ্বারা ধনের অসামান্য দূরীভূত হতে পারে—এ বিশ্বাসও তিনি রাখেন নি। কারণ তিনি মনে করতেন বাইরের আক্রমণে ভাঙা যায় যেমন, তেমন জোড়া যায় না। অথচ গুটিকয় ধনবানের হাতেই অর্থশক্তি পুঞ্জীভূত. বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করেই ধনীর ঐশ্বর্য ও প্রতাপ। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অর্থ-নৈতিক মতবাদ রাশিয়ার মতবাদ ঘেঁষা সন্দেহ নেই, কেবল 'গায়ের জোর' প্রসঙ্গটিতে রবীন্দ্রনাথ একমত নন। অথচ গণতন্ত্রেও (আমেরিকা যুক্তরাজ্যের) মূলধন ও মজুরীর প্রভেদ বিপুল—সেখানে টাকার জোরই সব—তাকে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সমবায় প্রণালীর দ্বারা সর্বসাধারণের সমস্ত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাতে। প্রত্যেক মানুষের বিচ্ছিন্ন বলকে একত্র সমাবেশ করতে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, "কোনোমতে খেয়ে-পরে টিকে থাকতে পারে এইটুকুমাত্র ব্যবস্থা কোনো মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ, উদ্বৃত্ত অবকাশ মনুষ্যত্ব চর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।"

একথা সত্য রাশিয়া ঘুরে আসার পর রবীন্দ্রনাথের চিত্তে দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। নিচুতলার মানুষদের উন্নতির কথাই পাবনা কন্ফারেন্সে ব্যক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর এই পথের একমাত্র সঙ্গী কালীমোহনকে নিয়ে তিনি এই দুর্গম ব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন "জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর, দ্বিতীয়ত, সমবায়-নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না।"

বঙ্গভঙ্গের কিছুকাল পরেই তিনি প্রজাদের আত্মসম্মান ও আত্মশক্তি জাগ্রত করবার জন্য যেমন স্থাপন করলেন 'লোকসভা', তেমন সঞ্চয়-অভ্যাস কৃষকদের মধ্যে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে 'পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্ক' স্থাপন করলেন। নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখার অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল ঐ অঞ্চলের উন্নতি। পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনে সমবায় প্রথার প্রবর্তন করেন তিনি। ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতনে সমবায় ভাণ্ডার গঠিত হয়। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের যৌথ উদ্যোগে সমবায় ভাণ্ডারের দ্বারাই সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হবে এবং বণ্টন করা হবে—এরকমই বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথের।

যদিও ১৯০৪ খৃস্টাব্দে এদেশে প্রথম 'সমবায় ঋণদান সমিতি আইন' প্রণীত হয়, প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী চল্লিশ বছরে তার অগ্রগতি অকিঞ্চিৎকর। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে (রবীন্দ্র রচনাবলী; ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮০, শতবার্ষিক সংস্করণ) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। "আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকে কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে। সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।

তার প্রধান কারণ, যে শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় করে আমলা-বাহিনী সমবায়নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হল, সে যন্ত্র অন্ধ, বধির, উদাসীন।" রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখেছিলেন, "আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ কনগ্রেসের পান্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা-উদ্ঘোষণের মধ্যে'—তেমনি, সমবায়নীতির অসার্থকতার মূলেও দেখেছিলেন কলমবাঁধা হাতের চরম অকর্মণ্যতা। এছাড়া নিজেদের চারিত্রিক-ত্রুটি-বিচ্যুতির কথারও উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবই এই দুর্বলতা।

একদা বিরল্যাঙ্গিক ভারতীয় জীবন-যাত্রায় সমবায়নীতি অনেকটা প্রচলিত ছিল। এখনকার জীবনযাত্রা কেবলমাত্র বহুলাঙ্গিকই নয়, জনসংখ্যাও ক্রম-বর্ধমান। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় অর্থনীতির পুনর্গঠন কৃষিক্ষেত্রে একমাত্র সমবায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেই ভারতের গ্রামগুলি বেঁচে উঠবে। ভারত বাঁচবে। ধনের মুক্তি না হলে দেশের মুক্তি নেই। সমবায় প্রণালীতে ধন উপার্জনই এর প্রকৃষ্ট পন্থা। রবীন্দ্র-নাথের অভিমত হচ্ছে কয়েকটি পল্লী নিয়ে এক একটি মণ্ডলী গঠন করা। এই মণ্ডলীর প্রধানগণই গ্রামের যাবতীয় কর্ম নিরূপণ করবেন এবং প্রত্যেক মণ্ডলীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবেন। 'পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্য-ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক-স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে।'

প্রচুর শস্য উৎপাদন করো—এই শ্লোগান তোলা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। অথচ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে কর্ণপাত করা হলে অনেক আগেই অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হত। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে একটি প্রবন্ধে (প্রবাসী/পৌষ) রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "এ কথা ভুলিলে বিপদ যে, উদ্বৃত্ত অন্নই আমাদের শক্তির পরিচয় ও শক্তির আশ্রয়, এই শক্তিই সকল সভ্যতার মূল।...আজ পৃথিবীতে সর্বত্রই ফসল ফলানোর ব্যাপার কেবলমাত্র চাষীর হাতে নাই। জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও উদ্ভাবনপটু যান্ত্রিকদল ইহাতে মন দিয়াছেন, যাহা অন্ধ অভ্যাসের কাজ

ছিল তাহাতে চিত্তের দৃষ্টি পড়িবামাত্র আশ্চর্য সফলতা ঘটিয়াছে। তাই আমাদের দেশের কৃষির পশু ও কৃষিফলের সহিত পাশ্চাত্য দেশের তুলনা করিলে মাথা হেঁট হইয়া যায়। যে অযোগ্যতার বিধিনির্দিষ্ট শাস্তি মৃত্যু, সেই শাস্তি স্বীকার করিয়াও দেশের বুদ্ধি এই কাজে একটুও লাগিল না। উপবাসে মরিতে মরিতেও নিরক্ষর চাষীর উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। যাহা যেমন আছে তাহা তেমনই থাকিবে; স্বচেষ্টায় তাহার উন্নতি করিতে পারি এ শ্রদ্ধা নিজের উপর নাই—তাই জীর্ণ সাবেক কালকে দিয়া বর্তমান কালের বিপুল দায় মিটাইবার তাড়ায় প্রাণ বাহির হইল।"

দুঃখের বিষয় হলেও একথা স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য এখনও অনেকাংশে সত্য। কৃষি-সমবায় প্রণালীর সার্থক ব্যবহারিক প্রয়োগ এখনও প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ। সার ও বীজ বন্টন বা কৃষি-ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে কোন সুষম প্রণালী অবলম্বিত হয় নি বলেই অনেকের ধারণা। সর্বোপরি সমবায়নীতির আমলা-বাহিনীর দাপটে কৃষি-সমবায়ে নানা জঞ্জাল। মোট কথা রবীন্দ্রনাথের কৃষি-সমবায়ের চিন্তাধারা সাম্প্রতিক কালেও ভাবা দরকার।

পল্লীগীতি সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথ

চিত্তরঞ্জন দেব

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত গীতির অধিকাংশ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ও গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।১ কিছু গান ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে তাঁর বক্তৃতা ও গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে।২ অনুরূপ একটি এখানে উদ্ধৃত করি :

"প্রেম আমার পরশমণি
তাঁরে ছুঁইতে যে কাম
হয়রে সেবা।
ঐ প্রেমের লাগি সর্বত্যাগী গো,
গোলোক চায় যে ভূলোক হৈতে
মানুষ হৈতে চায় যে দেবা।"

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত অবস্থায় এ-গানটি আমরা দেখেছি।৩ বাউলগানের অন্যতম সংগ্রাহক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের মুখে শোনা নিম্ন-লিখিত গানটিও রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লিখে রেখেছিলেন দেখতে পাই,

"তোমার পথ ঢাইকাছে মন্দিরে মস্‌জেদে।
তোমার ডাক শুইনা সাঁই চল্‌তে না পাই
রুইখা দাঁড়ায় গুরুতে
মস্‌জেদে।৪

(শেষের শব্দটি পণ্ডিত ক্ষিতি-মোহনের মুখে আমরা শুনেছি 'মুরসেদে') রবীন্দ্র-সংগ্রহে ছড়া এবং বাউলগানের প্রাধান্য। এক সময়ে তিনি কিছু সাঁওতালী গানও সংগ্রহ করে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। একখানি পত্রে লিখেছেন,

"...মাঝে মাঝে লেখার প্রয়োজনে সাঁওতালি ছড়ার খোঁজ করেছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম সাহিত্য পরিষদে তাদের কবর হয়েছে। ওগুলো পাঠিয়ো। মূলগুলি সাঁওতালি। কিন্তু বাংলাটা আমার।"৫

এ ছাড়া, পাঁচালি, কবি, সারি, আগমনী, কৃষ্ণলীলা গানের উদাহরণ আছে তাঁর নানা প্রবন্ধে। সারি, ঝুমুর, কথকতা, ভাটিয়ালি গানের উদ্ধৃতি তাঁর লেখায় খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু, তিনি যে এ-সকল গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে এ-সকল সুরের রবীন্দ্রসংগীত-গুলিতে।৬

তাঁর সংগ্রহের আরম্ভে পাই 'ছড়া'। মানুষের আদিতে শিশু, আর পল্লী-গীতির আদিতে ছড়া। ঘুমপাড়ানি ছড়ার 'স্নেহ-সংগীত-স্বরগুলি' রবীন্দ্র-নাথ সেজন্যই প্রথমে সংগ্রহ করেছেন। ছড়াগুলি নামে ছড়া হলেও আসলে ওগুলি পল্লীগীতির শিশু।

ছড়া-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ জানা যায় নিম্নলিখিত উক্তি থেকে.

"আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে...ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে -- কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইতেছিল।৭"

"বাঙলাভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।৮

ছড়ার সৌরভে অভিভূত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"সদ্য কর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদবেল-কর গন্ধ, তাহাকে পুষ্পচন্দন গোলাপ-জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে; সেই মাধুর্য-টিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে।..

শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।...এই ছড়াব মধ্যে মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর

---

১ সাধনা, ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক। মেয়েলি ছড়া: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০১ মাঘ। ছেলে ভুলানো ছড়া; লোক-সাহিত্য। ছেলে ভুলানো ছড়া, ছেলে ভুলানো ছড়া ২; কবিসংগীত, গ্রাম্য-সাহিত্য।

২ *The Religion of Man*: The Man of My Heart; *Creative Unity*: An Indian Folk Religion; *The Philosophy of our People*—published in *The Modern Review*, 1926 January. *The Fugitive*

৩ শারদীয়া বসুমতী ১৩৫৩; পৃঃ ৩২-এর পরবর্তী সংযোজিত এক স্বতন্ত্র পাতার ২য় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

শিরোনাম : "ছড়া—বিশ্বকবির স্বহস্ত লিখিত গ্রাম্য ছড়ার সংকলন" (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি 'বাউলগান')

৪ তদেব। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন-সংগৃহীত, রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লিখিত। The Religion of Man—গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় এ-গানটিরও অনুবাদ প্রকাশিত।

রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মুদ্রিত এই গান-গুলির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রবীন্দ্র-সদনের অবেক্ষক শ্রীযুক্ত শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

৫ কিশোরীমোহন সাঁতরাকে ৮-১-৩৯ তারিখে লিখিত পত্রের অংশ।

৬ পল্লীগীতির সুরে রবীন্দ্রসংগীতের দৃষ্টান্ত :—

সারি। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'. ইত্যাদি

ঝুমুর। 'ওরে বকুল পারুল...'"

কথকতা। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'..."

ভাটিয়ালি। 'তোমার খোলা হাওয়া...'"

রামপ্রসাদী। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'—"

৭—১০ লোকসাহিত্য। ছেলে ভুলানো ছড়া

জড়িত হইয়া আছে। এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহের শৈশবনৃত্যের নূপুর নিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে।"৯

ছড়ার সাহিত্যমূল্য নানা দিক থেকে প্রমাণ করার জন্য তিনি জনপ্রিয় কয়েকটি ছড়ার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তারই একটি হল.

আয় আয় চাঁদমামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥১০

"এই ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে আমার মতো মর্যাদাভীরু গম্ভীর স্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে!"

ছড়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার সুরে তাঁর নিজের যে ভাবান্তর হয় সেদিকে তিনি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে বলেছেন,

"পাঠকগণ, আপন আপন গৃহ হইতে, আপন বাল্যস্মৃতি হইতে সেই সুধাস্নিগ্ধ সুরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সংগীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্যচ্ছবি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিব! ভরসা করি, এই ছড়াগুলির মধ্যে সেই মোহমন্ত্র আছে।"১১

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছড়াগুলি দুই কিস্তিতে মুদ্রিত হয়েছে।১২

প্রথম কিস্তিতে প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সংকলিত ছড়ার সংখ্যা প্রায় কুড়িটি হবে। দ্বিতীয় কিস্তিতে আছে একাশিটি ছড়া। তার মধ্য থেকে অতি-পরিচিত কয়েকটি ছড়ার প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করছি—

আয় ঘুম আয় কলা বাগান দিয়ে...
ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার
বাড়ি যেয়ো...
খোকা গেছে মাছ ধরতে...
ইক্‌ড়িমিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি...
দোল দোল দোলানি...
খোকা আমাদের সোনা...
মাসি পিসি বনকাপাসি...
আতাগাছে তোতাপাখি...
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর
বিলে...
খোকা ঘুমালে দিব দান।

এগুলির মধ্যে 'ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি'—ছড়াটির মোট চারটি পাঠ রবীন্দ্রনাথ সংকলন করেছেন। তিনি ছড়াকে 'জাতীয় সম্পত্তি' রূপে ঘোষণা করে গেছেন,

"এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য।"১৩

বালক রবীন্দ্রনাথ পাঁচালির গান শুনেছিলেন তাঁর পিতার পরিচর কিশোরী চাটুজ্জের কাছে। স্মৃতির সংগ্রহালয় থেকে তিনি তিনটি পাঁচালি উদ্ধার করে এনেছেন আমাদের জন্য। তারই একটি :

কাতরে রেখো রাঙা পায় মা—
অভয়ে দীনহীন ক্ষীণজনে যা করো,
মা, নিজগুণে—
তারিতে হবে অধীনে, আমি অতি
নিরুপায়!

পাঁচালি যে সহজভাবেই বাঙালীর ভাবপ্রবণ হৃদয়ে সৃষ্টি হয় সে-কথায় জোর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"বাঙালীর হৃদয় অত্যন্ত তৃষিত হয়েই গান চেয়েছিল,...তাই বাংলা-সাহিত্যে গান যখন তখন যেখানে সেখানে অনাহূত অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।"১৪

যার মুখে পাঁচালি গান শুনতেন সেই কিশোরী চাটুজ্জের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতার ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে নিম্নলিখিত ভাষায়,

"পূর্ববয়সে সে ছিল কোনো পাঁচালি দলের নেতা। সে আমাকে প্রায় বলত, 'দাদাজি, তোমাকে যদি পাঁচালির দলে পাওয়া যেত!'"১৫

রবীন্দ্রনাথ পাঁচালির গানে উৎসুক তাঁর সেই শৈশবের চেহারাটিকে আরও স্পষ্ট করবার জন্যই যেন লিখেছেন,

"বালক দাদাজিরও মনে চঞ্চল হয়ে উঠত পাঁচালির দলে খ্যাতি অর্জন করবার অসম্ভব দুরাশায়।"১৬

আগমনী গানগুলিও ছিল রবীন্দ্রনাথের আদরের সামগ্রী। প্রায় দেড় শত পঙ্‌ক্তিতে নানা ছন্দে সম্পূর্ণ একটি দীর্ঘ 'আগমনী'র সংগ্রহ দেখা যায় তাঁর

১৪—১৬ সংগীতচিন্তা। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান

পরবাস ॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ ৬·০০
হারেমের নায়িকা ॥ সুভাষ সমাজদার ॥ ৬·৫০
আদিম লিপ্সা ॥ কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪·৫০
চন্দন মালিকা ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ ৩·৫০
রূপালী রেখা ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৪·০০
রঙ বদলায় ॥ অমরেন্দ্র দাস ॥ ৩·০০
মসনদ ॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ ৩·৫০
সুর। মতার মন ॥ সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ॥ ৩·৫০
একই আকাশ তলে ॥ শান্তিময় ঘোষাল ॥ ৩·০০
বীরু চট্টোপাধ্যায়ের ॥ অপরাধ দেশে দেশে
॥ ৪·৫০ ॥ বিস্ময়কর বহুরূপী ॥ ৫·০০ ॥
সেই মেয়েটি ও কাণ্ডলারদের কাহিনী
॥ ৩·৫০ ॥ অ্যানা পিটারসন ও আমি ॥ ৩·৫০
সাহিত্য প্রকাশ ॥ ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

এক প্রবন্ধে।১৭ গানের আরম্ভে আছে,

"শরৎকালে রাণী বলে বিনয় বচন
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার
স্বপন...

এই স্বপ্ন হইতে কথা আরম্ভ। সমস্ত আগমনী গানের এই ভূমিকা।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"প্রতি বৎসর শরৎকালে ভোরের বাতাস যখন শিশিরসিক্ত এবং রৌদ্রের রঙ কাঁচা সোনার মতো হইয়া আসে, তখন গিরিরাণী সহসা একদিন তাঁহার শ্মশানবাসিনী সোনার গৌরীকে স্বপ্ন দেখেন আর বলেন,

"আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার
স্বপন।"

বাঙালীর মেয়েরা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নানা কারণে সুখে নেই—মেয়ের মায়ের মনের এই দুর্ভাবনা থেকেই আগমনী গানের উৎপত্তি। বাঙালীর মেয়েই আগমনী গানে গৌরী এবং জামাতা হয়েছেন হর বা মহাদেব। মানুষের সঙ্গে দেবতা এক হয়ে জড়িয়ে আছেন এই আগমনী গানগুলিতে।

বরের ঘর থেকে মেয়েকে বৎসরে অন্তত একবার বাপের বাড়ি নিয়ে আসার রীতি প্রচলিত ছিল বাংলাদেশে। শারদীয় দুর্গাপূজায় হর-গৌরীর আগমনের মধ্যে সেই তাৎপর্যই খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"ইতিবৃত্তের কোন্ বৎসরে জানি না, হরগৌরীর বিবাহের পরে প্রথম যে শরতে মেনকারাণী স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যূষে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন—সেই প্রথম শরৎ সেই তাহার প্রথম স্বপ্ন লইয়াই বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া আসে। জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে, যাহাকে পরের হাতে দিয়াছি আমার সেই আপনজন কোথায়?

বৎসর কত হয়েছে গত,
/করছে শিবের ঘর
যাও গিরিরাজ আনতে গৌরী
কৈলাস শিখর..."১৮

নিজেদের সংসারের ঘটনা দিয়ে দেব-দেবীর লীলাখেলার এই করুণ-মধুর গীতিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"আমাদের ঘরের কথা।...তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"১৯

কৃষ্ণলীলার গীতগুলির প্রতিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উক্ত গীতির প্রায় সোয়া শ' পদ সংগ্রহ করে একটি প্রবন্ধে ২০ ব্যবহার করেছেন। তারই চারটি—

"স্থানে স্থানে ফেরেন রাখাল
সঙ্গে কেহ নাই।
ভাণ্ডীবনে ধেনু চরান সুবল
কানাই॥
সুবল বলিছে শুন
ভাইরে কানাই।
আজি তোরে ভাণ্ডীবন
বিহারী সাজাই॥

এই গীতগুলির প্রকৃতি বিচার করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন এগুলির জাতি স্বতন্ত্র। সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা, সাংসারিক ব্যাপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায় না। সেই অপরূপ রাখালের রাজ্য বাঙালি ছড়া-রচয়িতা ও শ্রোতাদের মানস-রাজ্য।"

কৃষ্ণলীলা-গীতি সম্পূর্ণভাবে না শুনলে বা এর পদগুলি না পড়লে রবীন্দ্রনাথের অভিমত যথাযথ হৃদয়ঙ্গম হবে না। কিন্তু এই প্রবন্ধে কৃষ্ণলীলার সম্পূর্ণ গীতি উদ্ধৃত করার মতো স্থানের অভাব। কৌতূহলী পাঠক নির্দিষ্ট প্রবন্ধটি ২১ পাঠ করে দেখতে পারেন।

হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ-গীতি ছাড়া রাম-সীতা এবং রাম-রাবণের কাহিনী নিয়েও লৌকিক গীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এই গীতির সংখ্যা খুবই কম। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে একটিও আছে বলে জানা নেই। কিন্তু তাই বলে বলা চলে না যে, রবীন্দ্রনাথ রামলীলার খবর রাখেন নি। তিনি ভাল করেই রামলীলা-গীতি শুনেছেন এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছেন,

"এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে,... রামসীতার দাম্পত্য হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত, এবং বিশুদ্ধ।...রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"২২

কবিগান বাংলাদেশে বহুবিশ্রুত। শুধু এই গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। গান হিসেবে কবির গান কবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মনঃপূত হয় নি বলে দীর্ঘ প্রবন্ধে মাত্র তিনটি গান তাঁর সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তারই একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা যাক্—

"গেল গেল কুল কুল—যাক কুল—
তাহে নই আকুল
লয়েছি যাহার কুল, সে আমার
প্রতিকূল।
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা
হন আমার
অকূলের তরী কূল পাব পুনরায়॥
এখন ব্যাকুল হয়ে কি দু-কূল
হারাব সই।
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত
রিপুচয়॥"২৩

গানটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

""পাঠকেরা দেখিতেছেন, উপরে উদ্ধৃত গীতাংশে এক কুল শব্দের কুল পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোনো গুণপনা নাই; কারণ উহার অধিকাংশই একই শব্দের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু শ্রোতৃগণের কোনো বিচার নাই। তাহারা অত্যন্ত সুলভ চাতুরীতে মুগ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন।"২৪

বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য।... কবির গানগুলিও গান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।...২৫

"কবির গান এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না। এখন তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।"২৬

পল্লী প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সঙ্গ রবীন্দ্রনাথ যৌবনকাল থেকেই পেয়েছেন। পৈতৃক জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে বাংলার কবি হলেন পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের সঙ্গী। পল্লীর অন্নাভাব, অর্থাভাব, জলকষ্ট প্রভৃতি দুর্গতি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি উপভোগ করেছেন পল্লীর সহজ নির্মল আনন্দের উৎস-স্বরূপ পল্লীগীতিগুলি নানা উপলক্ষ্যে শুনেছেন নানা গান—সারি, জারি, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ আশৈশব গানের পিয়াসী, তাই বলতে পারেন,

"আত্মপ্রকাশের জন্য বাঙালী গানকে

১৭—২২ লোকসাহিত্য। গ্রাম্যসাহিত্য

২৩—২৬ তদেব। কবিসংগীত

অত্যন্ত করে চেয়েছে।...নদীমাতৃক বাংলা-দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে যেমন ছোটবড়ো নদীনালা স্রোতের জল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়।"২৭

এ-থেকেই বুঝতে পারা যায় পল্লী-বাংলার গীতধারার সঙ্গে তাঁর জীবন-ধারাও প্রবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার একটি দিনের ঘটনা তাঁর লেখা একখানি পত্র থেকে উদ্ধৃত করি। তিনি লিখেছেন,

"বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম—একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানালাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপর ফুটফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি।"২৮

এই মিষ্টি গানটি যদি তিনি সংগ্রহ করে রাখতেন তাহলে পল্লীগীতি-সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথকে আমরা আরও একটু বেশি করে জানতে পারতাম।

'গানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি'—দেখার এক দুর্নিবার নেশায় কবে থেকে যে রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিল তার সন তারিখ খুঁজে না পেলেও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, এ সকল ঘটনার ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনকে দেখবার চেষ্টা করলে।

আরও একটি দিনের ঘটনা : প্রথমে তিনি একখানি চিঠিতে২৯ লিখেছিলেন। পরে আবার পুনরাবৃত্তি করেছেন এক প্রবন্ধে৩০; কিন্তু পরিবর্তিত ভাবে ও ভাষায়। বলেছেন আবেগভরে,

"শ্রাবণের শেষে নৌকা করিয়া পাবনা-রাজশাহির মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম। মাঠঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়াছে।...কূলের রেখা দেখা যায় না।...শুধু জল ছলছল করিতেছে। ইহার মধ্যে যখন সূর্য অস্ত যাইবে এমন সময়ে দেখা গেল প্রায় দশ-বারোজন লোক একখানি ডিঙি বাহিয়া আসিতেছে—তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চ-কণ্ঠে এক গান ধরিয়াছে এবং দাঁড়ের পরিবর্তে এক একখানি বাঁখারি দুই হাতে ধরিয়া গানের তালে তালে ঝোঁকে ঝোঁকে ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দে জল ঠেলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে।"

গীতিসাধক ও সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথ একটি স্মরণীয় মুহূর্তের প্রতি আমাদের মনোযোগ একান্তভাবে আকর্ষণ করে বলছেন,

"গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম—অবশেষে বারম্বার আবৃত্তি শুনিয়া যে ধুয়াটি উদ্ধার করিলাম তাহা এই—

যুবতী, ক্যান বা কর মন ভারী—
পাবনা থ্যাহে আন্যে দিব
ট্যাহা দামের মোটরি।

রবীন্দ্রনাথ অতঃপর আমাদের পিপাসিত চিত্তকে সচকিত করবার জন্যই যেন লিখছেন,

"গানের এই দুটি চরণে সেই জল-মরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামপল্লী কথা কহিয়া উঠিল।"

এই ধরণের সারিগান আরও তিনি শুনেছেন বলে আমরা অনুমান করি। তা না হলে সারিগানের সুরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত৩১ রচিত হল কোন্ প্রেরণায়।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইশ বৎসর। একদিন বাউলগানের একটি বই এল তাঁর হাতে ভারতী পত্রিকায় সমালোচনার জন্য। গানগুলি তাঁর ভাল লাগল। একটি গানের প্রশংসা করে তিনি সেই গানের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং লিখলেন,

"আমাদের ভাব আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করতে চাই তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।"৩২

তিনিও কান পেতে রইলেন 'বাঙালির হৃদয়ের কথা' আর কোথায় শোনা যায়। বাসনা পূর্ণ হল একদিন। শিলাইদহ অঞ্চলের এক বাউল কলকাতায় এসে একতারা বাজিয়ে গাইতে লাগল,

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে
বেড়াই ঘুরে।৩৩

... ...

খাঁটি বাউলগান এই প্রথম শুনলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ঘটনার কথা তিনি নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এই গানটি দিয়েই প্রবাসী পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগের পত্তনও করলেন। যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা হবে।

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছেন,

"আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজে মিশে গেছে।"৩৪

এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বাউল' নামক গানের বই প্রকাশে (১৯০৫)।

'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসের প্রথম পাতায় একটি দৃশ্য চোখে পড়ে,

"আলখাল্লা পরা একটি বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিনপাখি
কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি
দিতেম তাহার পায়।

রবীন্দ্রনাথ তখন বাউলগান সংগ্রহের চেষ্টা করছেন—তার প্রমাণ স্বরূপ এক-খানি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। কনেষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে লিখছেন তিনি শান্তিনিকেতন থেকে,

"তোর মামা কিম্বা মামাশ্বশুরকে বলিস সেই বাউলদের গান আমাকে শীঘ্র সংগ্রহ ক'রে পাঠাতে—দেরি না করে।"৩৫

পত্রে উল্লিখিত 'সেই বাউলদের' সঙ্গে যে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ তার আগেই হয়েছে সে-কথাও জানা যায় নিম্নলিখিত উক্তি থেকে :

"শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউলদের

---

২৭ ঐ। সঙ্গীতচিন্তা। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান

২৮ ঐ। ঐ। আত্মকথা, ছিন্নপত্রাবলী। ১৮৯১ অক্টোবর ৬

২৯ ঐ। ছিন্নপত্র। ১৩৬৭ শ্রাবণ সং। পতিসর ১৮৯৩ আগস্ট ১১

৩০ ঐ। লোকসাহিত্য। গ্রামসাহিত্য। পৃঃ ৮৮

৩১ দ্রঃ ৬ (সারি গানের সুরের গান)

৩২ ভারতী ১২৯০ পৌষ।

৩৩ রবীন্দ্রনাথ-শ্রুত প্রথম বাউল গান। সম্পূর্ণ গানটির জন্য দ্রঃ প্রবাসী ১৩২২ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—'হারামণি'—বিভাগ

৩৪ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। হারামণি। আশীর্বাদ। পৃঃ ।৵০—৷০

৩৫ রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৪, সংখ্যা ৪। তারিখ ১৩১৭ চৈত্র

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০, । দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল

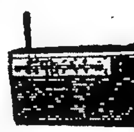

স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা হিন্দীতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B. C.) P.B. 2123, Delhi–7

সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত।"৩৬

সম্ভবত ঐ সময়েই কোনো বাউল বা তাঁর চেলাকে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেছিলেন কয়েকটি বাউল গান লিখে দেবার জন্য (কারণ বাউলরা সাধারণত গান লিখে রাখে না, গুরুর মুখ থেকে গান শিষ্যেরা পায়—এমনিভাবে গানের ধারা বয়ে চলে)। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কথাগুলি ভেবে দেখবার মতো; তিনি বলেছেন,

"I remember how troubled they were, when I asked some of them to wirte down for me a collection of their songs. When they did venture to attempt it, I found it almost impossible to decipher their writing—the spelling and lettering were so outrageously unconventional."৩৭

বাউলগান লেখা দুখানি সাধারণ খাতা৩৮ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। কোন সালের কোন তারিখে পেয়েছিলেন-তার লিখিত কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। বাউলগানগুলি রবীন্দ্রনাথ উক্ত খাতা থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা যে করেছেন—সে কথা বোঝা যায় কোনো কোনো পাতায় তাঁর হস্তাক্ষরে লেখা দু-একটি শব্দ বা দু-একটি অক্ষর দেখে। এই খাতাগুলি দেখেই রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন কি না—সে কথা বলা কঠিন।

উল্লিখিত দুই খাতায় মোট ২৯৮টি গান লেখা আছে। গানের ভণিতায় লালন ফকিরের নাম পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় গানগুলি সবই লালন ফকিরের রচনা। শিলাইদহের বাউল সম্প্রদায়ের কোনো একজন এই গানগুলি লিখে দিয়েছেন বলে অনুমান হয়। খাতাগুলি উর্দু বা আরবী বইয়ের মতো করে বাঁধা। বাংলা ইংরেজি বইয়ের ঠিক বিপরীত। শেষ দিক থেকে আরম্ভ। খাতায় লেখা অক্ষর ও বানান কোনো কোনোটি প্রাচীন পদ্ধতির। খাতা দুটি বর্তমানে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহালয়ের সম্পত্তি।

গোরা উপন্যাস ও গীতাঞ্জলির প্রকাশে (১৯১০) রবীন্দ্রজীবনের এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হয়। ইংরেজি গীতাঞ্জলি (১৯১২) রবীন্দ্রনাথকে কেবল সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারই (১৯১৩) দেয় নি বিশ্বের সঙ্গে বাংলার যোগসাধন করেছে। উপনিষদের মন্ত্রপূত রবীন্দ্রসাধনা বাংলার নিরক্ষর বাউলের গানের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। রবীন্দ্রনাথ নূতন উদ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথ খুঁজে চললেন বাউলগানে প্রচারিত মত ও বিশ্বাসে। তিনি খাঁটি বাউলগান সংগ্রহের কাজ জোরদার করার জন্য আশ্রয় করলেন তৎকালে প্রতিষ্ঠিত একটি মাসিক পত্রিকা।

১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে 'হারামণি' শীর্ষক নতুন একটি বিভাগের পত্তন হল প্রবাসী পত্রিকায়। 'হারামণি'র উদ্দেশ্য বিবৃত হল নিম্নলিখিত ভাষায়,

"এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। প্রবাসীর পাঠক এই কার্যে আমাদের সহায় হইবেন আশা করি। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্ব রস মধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, তর্জা-ওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের। প্রবাসীর পাঠকপাঠিকারা ইঁহাদের যথার্থ কবিত্ব-পূর্ণ রসভাবপূর্ণ রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।"৩৯

দেখা যায়, এই আবেদনে সাড়া প্রথম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

হারামণি'র প্রথম বিজ্ঞাপনের সঙ্গেই 'মনের মানুষের সন্ধানে' শিরোনামে একটি বাউলগান প্রকাশিত হয়। গানটির আরম্ভ—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।'

এই গানটিই রবীন্দ্রনাথ প্রথম শুনেছিলেন শিলাইদহের এক বাউলের মুখে। সে কথা আগে বলা হয়েছে।

পত্রিকা সম্পাদকও মন্তব্য করেছেন,

"...প্রকাশিত গানটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারী শিলাইদহ পোস্ট আফিসের ডাকহরকরা গগন গাহিয়া গাহিয়া ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করিত। এই গানটি ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত।"

'হারামণি' বিভাগে প্রকাশিত প্রথম পল্লীগীতিটির বৈশিষ্ট্য নানা দিক থেকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গানের ভাব দিয়ে গগন হরকরার ছবি এঁকেছেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ-সমস্তই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে হয়েছে এবং প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়েছে বলে আমাদের অনুমান হয়।

যে-গানটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা অত্যন্ত উচ্চ সেই গানের রচয়িতা গগন হরকরা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি এই গানের প্রশংসা করতে করতেই একস্থলে গগনের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করলেন,

The name of the poet who wrote this song was Gagan. He was almost illiterate; and the ideas he received from his baul teacher found no distraction from the self-consciousness of the modern age. He was a village postman, earning about ten shillings a month and he died before he had completed his teens."৪০

প্রবাসীর হারামণি বিভাগে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ আরও কুড়িটি গান তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রকাশ করেন। এই সব ক'টি গানই বাউল সাধক লালন ফকিরের রচিত বলে উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর যে-বাউল গানের সংগ্রহ শান্তিনিকেতনে আছে সেই ২৯৮টি গানও লালন ফকিরের রচনা বলে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ লালন ফকির সম্বন্ধে নীরব কিন্তু একটি প্রবন্ধে তাঁর গান উদ্ধৃত করে বলেছেন,

"প্রাকৃত বাংলার দুয়োরাণীকে যারা সুয়োরাণীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত' লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের

৩৬ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। হারামণি। আশীর্বাদ। পৃঃ ।৶০—৷৷০"

৩৭ Rabindranath: The Philosophy of our People, পৃঃ ১৫

৩৮ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত বাউল গান সংগ্রহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'লালন-গীতিকায়' সংকলিত।

৩৯ প্রবাসী ১৩২২ বৈশাখ পৃঃ ১৫৪

৪০ Rabindranath: Creative Unity: An Indian Folk Religion, P. 79

গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিইঃ

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে
উচ্চ স্বরে
কোন্ পাগেলা।
ওরে যে যা বোঝে তাই সে-বুঝে
তাকে ভোলা
যেথা যার ব্যথা নেহাৎ
সেইখানে হাত
ডলামলা,
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে ভোলা।
যে জনা দেখে সে রূপ
করিয়া চুপ
রয় নিরালা।
ওরে লালন-ভেড়ের লোক দেখানো
মুখে হরি-হরি-বোলা।৪১

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন,

"বাঙলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুলকলেজের অগোচরে আপনি আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দুমুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে এই বাউলগানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"৪২

লালন ফকিরের বিখ্যাত সেই গানটি এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে, (দ্রঃ লালন গীতিকা, পৃঃ ৩৮)ঃ

"সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে, জাতির কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে।
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতের প্রমাণ
বামনী চিনি কি প্রকারে।"

... ...

লালন ফকিরের যে-সকল গান রবীন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রচার করেছেন তার সবগুলি এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব হল না। যে-লালনের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসায় পঞ্চমুখ—সেই লালনের জীবনবৃত্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা অনেকের কাছে বিস্ময়কর। আরও একটি বিস্ময় জাগে আমাদের মনে এই কথা ভেবে যে, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কোনো কোনো লেখক তাঁদের রচনায় লালন ফকিরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের কথা প্রচার করেছেন। এ-বিষয়টি যে এখনও অনুসন্ধান এবং গবেষণাসাপেক্ষ সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাউলগানের অন্যতম সংগ্রাহক পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের কাজে অনেক সহায়তা করেছেন। তাঁর সহায়তায় সংগৃহীত কিছুসংখ্যক গানও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এ-রকম গানের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—

হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে,
নিঠুর গরজী তুই...
মম আঁখি হইতে পরদা...
রূপ দেখিলাম রে...
ফুলের বনে কে ঢুকেছে...
খাঁচার মধ্যে অচিনপাখি...
যেজন ডুবল সখি...
মনরে আমার মনের সাধে...
আজি তোমার সঙ্গে আমার হোরি...
আমায় পথের মাঝে ডাকো যদি...
প্রেমের মেলে প্রেমই-রে বান্দা...
নয়ন দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি...
আমার আজব অতিথি...
ওগো মুলাধার তুমি আমে কর পার...
ছেড়ে দে পথ ছেড়ে দে বুক চিরে...
ময়ন যাচা যে জন তারে আনিস্ না ঘরে...

ছাড়াও কয়েকটি গান আছে, যেগুলি কোথায় প্রকাশিত হয়েছে এখনও জানা যায় নিঃ

ওগো দরদী পরাণ আমার
উদাসী হৈতে চায়...
ঘরে জবলে আজব বাতী...
রসের সাগর ডুব দিতে যে
বড়ই লাগে ডর...
আমার চৌদ্দপোয়া নৌকাখানি......

নিরক্ষর বাউলের গানে যে বার্তা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন সে-কথা মনে করে তিনি দেশের শিক্ষিতসমাজকে উদ্দেশ করে বলেছেন,

"আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন, তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দুমুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস, আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়; পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি — এ-জিনিস হিন্দুমুসলমান উভয়েরই। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি, এই মিলনে গান জেগেছে। সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দুমুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরাণে পুরাণে ঝগড়া বাধে নি।"৪৩

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

"...একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়।"৪৪

কিন্তু গানেও ভালমন্দের ভেদ আছে। পল্লীগীতি সংগ্রহের নামে আবার একটা মিথ্যা সৌখীন মজদুরির প্রাদুর্ভাব না ঘটে সে কথা ভেবে উচ্চারণ করেছেন শেষ সাবধানবাণী।

"অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে। তা চলতি হাটের সস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনা দ্বারা আকীর্ণ,—তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টানবার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়া অসম্ভব, খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতে হয় ও তাকে গভীর করে চিনতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এই জন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে। সাধারণতঃ যে সব বাউল গান যেখানে সেখানে পাওয়া যায় কি সাধনার কি সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশি নয়।"৪৫

---

৪১ রবীন্দ্রনাথ। ছন্দ (১৯৬২ সং) ছন্দের প্রকৃতি, পৃঃ ১২৯—৩০।

এখানে উদ্ধৃত লালনের গানটি প্রবাসীর 'হারামণি' বিভাগে প্রথম প্রকাশিত হয়। হারামণিতে প্রকাশিত মোট ২০টি লালন্-গীতির মধ্যে মাত্র ৮টি পাওয়া যায় রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত সংগ্রহে।

৪২ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। হারামণি। আশীর্বাদ—পৃঃ ⅟₀

৪৩ ঐ ঐ ঐ —পৃঃ ⅟₀

৪৪ রবীন্দ্রনাথ। সংগীতচিন্তা। আত্মকথা। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা

৪৫ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। হারামণি। আশীর্বাদ—পৃঃ ⅟₀

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
ন্যাশন্যাল. ডিল্যাক্স"
১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুনঃ

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

গায়ক ও সঙ্গীত শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

সম্পাদিকার কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে, গাইয়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান শেখানোর ব্যাপারে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে দিতে। কাজটা দুরূহ, এই দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতাও আমার নেই। কেন না রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম তাঁর শেষ বয়সে। তখন তাঁর গানের কণ্ঠ ক্ষীণ ও নিস্তেজ। যৌবনের সরলতা, মাধুর্য ও যাদুস্পর্শ অন্তর্হিত। আক্ষেপ করে বলতেন, বিধাতা দত্তাপহরণ করলেন, দিয়েছিলেন ফিরিয়ে নিলেন। বস্তুত বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যেই যে তিনি গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই। তাঁর সেই সময়কার গানের গলার পরিচয়ই হল গায়ক রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয়। সত্য বটে, আমরাও তাঁর কাছে বসে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে কত বিচিত্র সুরের কত গান তাঁকে গাইতে শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম কখনও শান্তিনিকেতনে মন্দিরে উপাসনায় গেয়ে উঠলেন—"বীণা বাজাও হে মম অন্তরে" আবার কখনও অভিনয়ে. যেমন—শারদোৎসবে "তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ"। মনে পড়ে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী একবার শান্তিনিকেতনে শ্যামলীতে গুরুদেবকে তাঁর বাজনা শুনিয়েছিলেন, তখন অনুরোধে গুরুদেব "আমার পরাণ বয়ে" তাঁর এই প্রিয় গানটি চমৎকার গাইলেন। কিন্তু তাঁর মনোহরণ কণ্ঠসম্পদের সাবলীল ব্যঞ্জনার রসাস্বাদন থেকে আমরা অনেকে বঞ্চিতই থেকেছি। তবু একটা কথা সন্দেহাতীতরূপে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে তাঁর গানের যে একটি বিশেষ চরিত্র ফুটে উঠত তা আর কোথাও পাই না। তাঁর সেই গান আজ শত-সহস্রের গলায় শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু সেই বিশেষ রহস্যটি আর কোথাও পাই না যেটি গুরুদেবের কণ্ঠে ফুটত। সেই রহস্যটি যে কি, তাঁর গানের শিক্ষকতা করতে গিয়ে আজীবন তাই ভেবেছি। সেটি মনে হয় তাঁর ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। তাঁর গানে যতটা তা প্রকট হতো এমন বোধ হয় তাঁর অন্য কোন সৃষ্টিতে নয়।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ ছড়িয়ে আছে তাঁর নানামুখী সৃষ্টিতে। কিন্তু তাঁর গানে তিনি সম্পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন। একথা মুখেও তাঁর কাছে অনেক সময় শুনেছি।

গায়ক রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় সংরক্ষিত হয়েছে তাঁর গাওয়া গোটাকয়েক গানের রেকর্ডে মাত্র। কিন্তু তার সবগুলিই শেষ বয়সের কালে তোলা। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁর মধ্যবয়সের গাওয়া একখানি রেকর্ড 'রবীন্দ্রসদনে'র উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল. সেখানি তাঁরই দেওয়া সুরে গাওয়া 'বন্দে মাতরম' গান। এই একখানি মাত্র রেকর্ড আমাদের কানে।

গান গাওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন—"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাতো মনে পড়ে না।" কিশোর বয়স থেকেই তাঁর গান গাওয়া শুরু। যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাও ছিল গানে ভরপুর। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বালক রবীন্দ্রনাথের গানের একজন উৎসাহী ছিলেন শ্রীকণ্ঠবাবু। তাঁরই শেখানো 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরি' গানখানা তাঁকে দিয়ে না গাওয়ালে তাঁর তৃপ্তি হত না "ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘর থেকে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম। তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন......।" জীবনস্মৃতির আর এক জায়গায় পাই, তখন তাঁহার বয়স বারো কি তেরো, "কৌতুহলীর দলে ঘর ভরতি হইয়া গেল। সকলেই আমার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি দুই-একটা গান গাহিলাম। তখন আমার বয়স অল্প। কণ্ঠস্বরও সিংহগর্জ্জনের মতো সুগম্ভীর ছিল না। অনেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল—তাই তো, ভারি মিষ্টি গলা।" বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে হিমালয় যাত্রায় পিতার সঙ্গী হয়েছিলেন সেখানে নিত্য পিতার সম্মুখে বসে তাঁর গান শোনাতে হতো—"যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগ গান গাহিতেছি—'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে, কে সহায় ভব অন্ধকারে।" আরেকবার কিছু পরবর্তীকালে যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছেন:

"একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরী করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান—'নয়না তোমায় পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

"পিতা তখন চুঁচড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে, তিনি নূতন গান সব কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোন কোন গান দুবারও গাহিতে হইল।

"গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া একখানি পাঁচশো টাকার চেক্‌ আমার হাতে দিলেন।"

তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ সম্পর্কে একটি উল্লেখ পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবীর "রবীন্দ্রস্মৃতি" নামক গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। সেখানে বিলিতী সংগীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা জোরালো তার-সপ্তকের চড়া গলা যাকে ওদেশে বলে টেনর, শুনে ওরা মুগ্ধ হতো। রবীন্দ্র-নাথের গলার এই আশ্চর্য গুণের কথার অন্যত্রও উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম বয়সে গলা ছিল অতি সুমধুর। অতি সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর গলায় সুরের আসা-যাওয়া হত বিনা আয়াসে। স্রোতকটা জলধারার মত। সব কঠিন প্যাঁচগুলি এমন অনায়াসে লঘু পদক্ষেপে পেরিয়ে যেতেন—তা আশ্চর্য।

আরেকজনের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করি, তিনি সরলা দেবী। রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"ছেলেবেলা থেকেই গান গাই বটে, গান কুড়িয়ে নিই যেখান থেকেই পাই—কিন্তু গানের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে প্রথম দেখতে শিখি রবিমামার সংসর্গে যখন গাজিপুরে তাঁর কাছে থাকি। সত্যি সত্যি গান জিনিসটা যে একটা যান্ত্রিক কিছু নয়—সঙ্গীতের বুকের ভিতর যে একটি দিব্যপ্রাণী বিরাজ করেন, সেই অনুভূতির একটা আবছায়া আবছায়া স্পর্শ পেতে থাকি গাজিপুরে—রবিমামার মুখ-চোখে সেই সঙ্গীত দেবতার প্রতিচ্ছায়া দেখে, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় যখন গানের চর্চায় তিনি নিযুক্ত হতেন আমাদের সঙ্গে নিয়ে—সে কোন ওস্তাদকে বসিয়ে তবলা পাখোয়াজের চাঁটিতে দ্রুতমধ্যমাকারের চর্চা নয় কিংবা নিজের তৈরী গান আমাদের শেখানোর চর্চা নয়। সেটি সঙ্গীতের রূপ ও রসের পিছনে পিছনে ঘোরা ও আমাদের ঘোরানোর চর্চা। তখনকার অপরিণত বয়সে তাঁর ক্রিয়াটার শুধু অনু-সরণ করেছি মাত্র, কি যে করছি তা ভাবিনি।"

তাঁর গান রচনা আর গাওয়ার আরেকটি উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ (জীবন স্মৃতি, পৃঃ ১১৬)—"কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়মযন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত।"

স্বভাবতই এ গান আসরের উপযোগী যতটা ছিল তার চেয়েও বেশি ছিল প্রকৃতির আসরে নিজের হৃদয়কে অবারিত করে গাইবার মত। পরবর্তীকালে দেখেছি কবির এই গান রচনার প্রেরণা যেন প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সূত্রে বাঁধা। বিশেষ করে বর্ষা-বসন্ত ঋতুর গান তিনি জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত রচনা করেছেন। কিন্তু এই শেষের গানগুলির মধ্যে একটি হৃদয়াকুতি পাওয়া যায় যেটি অতীন্দ্রিয় নয় বরং মনুষ্য হৃদয়ের অতি সহজ ও সরল প্রেরণায় তার জন্ম। কিন্তু কী এক অধরা বেদনার আর্তি তাঁর সুরের অনুভূতিতে। সমস্ত মনকে তা নিয়ে যেতে চায় কোনো একটা বিরহবেদনা-ঢালা পথ দিয়ে। বিমূর্ত কোনো সুরলোকে। একটি গানের উল্লেখ করি যেটি কবির খুব প্রিয় গান ছিল। যেটি তাঁকে গেয়ে শোনানো হত প্রায়ই। সেটি হল—"মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে।" কবির কণ্ঠে এ গান অন্যলোকের বাণী বহন করে আনতো।

"এক নতুন পৃথিবী সৃষ্টির জন্যে এই বিশাল দেশ (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র) জুড়ে যে বিরাট শক্তি বিপুলভাবে কাজ করছে তা আমাকে অত্যন্ত গভীরভাবে অভিভূত করেছে। কারণ এই মহৎ স্বপ্নের প্রকাশ কেবলমাত্র জাতির স্বার্থের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, সর্ব মানবের মাঝেই তার ব্যাপ্তি।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(দি বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি
৩২ খণ্ড ২য় সংখ্যা, ১৯৬৬-৬৭)

'এই বিশাল দেশ' সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মহান্ জনগণ কীভাবে এক নতুন জীবন গঠন করে চলেছেন ও 'মহৎ স্বপ্ন' রূপায়ণের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন তার প্রকৃত কাহিনী জানতে হলে :—

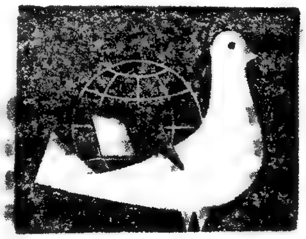

পড়ুন ও গ্রাহক হোন

সোভিয়েত দেশ

সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা

(বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, ইংরাজী ও অন্যান্য ৯টি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়।)

চাঁদার সুলভ হার ৩১-৫ ৬৯ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হলো।

	১ বছর	৩ বছর
	২৪ সংখ্যা	৭২ সংখ্যা
বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা	টা: ৬-০০	টা: ১২-০০
ইংরাজী সংস্করণ	টা: ৭-০০	টা: ১৪-০০

মণি অর্ডারযোগে এক বা তিন বছরের জন্য চাঁদা পাঠান ও ১৯৬৯ সনের বহু বর্ণরঞ্জিত ১৩ পৃষ্ঠার একখানি ক্যালেণ্ডার রেজিস্টার্ড ডাকযোগে লাভ করুন বা ভি, পি, পি, যোগে ক্যালেণ্ডার চেয়ে এক বা তিন বছরের জন্য চাঁদা গ্রহণ করার জন্য চিঠি লিখুন। অনুগ্রহ করে মণি অর্ডার কূপন বা ভি পি অর্ডারবাহী চিঠিতে কোন্ ভাষায় ও কত বছরের জন্য গ্রাহক হতে চান উল্লেখ করুন।

সোভিয়েত দেশ, ১।১ উড্ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

'NTERADS

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ

আমার জীবনে সৌভাগ্য হয় বেশ কয়েক বছর তাঁর কাছে গান শেখার। বিশেষ করে তাঁর শেষ পর্বের গানগুলি রচিত হওয়ার কালে। প্রায় এক যুগ ধরে (১৯৩২—৪১) তাঁর শেষের গানগুলি রচনার সময় আমি শান্তিনিকেতন কলেজে রসায়নের শিক্ষকতার জন্য নিযুক্ত হই। মাস্টারী করা ছাড়াও তাঁর কাছে গিয়ে এই সময় তাঁর নতুন গানগুলি শুনতে ও শিখতে পেরেছিলাম। এবং তাঁর মতো আদর্শ গুরুর তত্ত্বাবধানে তাঁরই সঙ্গীতলোকে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম।

আমার বিশ্বাস যে, গুরুদেব নিশ্চিত ধরে নিতে পেরেছিলেন শান্তিনিকেতনের কলেজে রসায়নের অধ্যাপনার কাজের জন্যে শুধু আমি সেখানে যাই নি। আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল, বাইরে থেকে যা পারি নি, শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে পেয়ে ধন্য হব।

এমনি পরিস্থিতি দাঁড়ালো যে কিছুদিনের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ (সকল গানের ভাণ্ডারী সকল নাটের কাণ্ডারী) শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতাবাসী হলেন এবং তার পরেই হল তাঁর লোকান্তর। গান শেখা আমার বন্ধপ্রায়। গুরুদেব জানতে চাইলেন আমার গান শেখা কেমন চলছে। উত্তরে যেমনি জানলেন যে, আমার আর গান শেখা হচ্ছে না, তখন বললেন, “সে কি হয়? আমি জানি তুমি তো আমার গান শেখার টানেই এখানে এসেছ, গান শেখা বন্ধ হলে চলবে কি করে, তুমি আমার কাছে এসো গান শিখতে।” তারপর থেকে প্রতিদিন বিকেল তিনটাতে ‘গীতবিতান’ বইটি নিয়ে তাঁর কাছে গান শেখার পালা শুরু হল। এখনো সেই গীতবিতান বইটির পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে যখন দেখি, তখন সেই গান শেখার ছবি স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে।

প্রথমে তিনি ‘মায়ার খেলা’ অভিনয়ের “পথহারা তুমি পথিক যেন গো”—এই গানটি দিয়ে ক্লাস শুরু করেন। তারপর ঐ নাটকেরই পর পর গানগুলি শিখিয়ে চলেন। অভিনয়ের গান শিখতে গিয়ে তাঁর গানের দরদ অধিকতর সুস্পষ্টভাবে আমার কাছে যেন ধরা দিল।

তারই মাঝে তিনি পুরনো গান, যা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল যেমন, (১) মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে (২) বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে (৩) আমার পরাণ লয়ে কী খেলা (৪) বঁধু ফিরে এসো, (৫) কী রাগিণী বাজালে (৬) আজি যে রজনী যে যায় (৭) তবু মনে রেখো (৮) জগতে তুমি রাজা, (৯) সার্থক জনম আমার, (১০) বড়ো বিস্ময় লাগে ইত্যাদি গানও মাঝে মাঝে তিনি নিজেই নির্বাচন করে শিখিয়ে চলছিলেন। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন ক্লাসে যেতেই বলে উঠলেন, “আজ তোমার জন্য খুব ভালো একটা গান ঠিক করে রেখেছি, এসো, শিখে নাও।” আমি প্রবল উৎসাহে এবং আগ্রহে সেই গানটির সম্বন্ধে জানতে চাইলে বললেন, ‘ওলো সই, ওলো সই’ এই গানটির কথা। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফের আপত্তি জানিয়ে বললাম এ গান আপনি মেয়েদের শেখাবেন, এ গান ওদের মানায়।’ তখন তিনি খুব রসিকতা করে বললেন “একবার শুনেই দেখ না, কেমন লাগে।” এই বলে আর অপেক্ষা না করে নিজেই গেয়ে উঠলেন। শোনামাত্র আমার আমূল ভাবান্তর ঘটে গেল। আমার এত ভালো লাগলো যে অতি আগ্রহের সঙ্গে গানটি তৎক্ষণাৎ কণ্ঠে তুলে নিলাম। মনে পড়ে এই গানটি পরবর্তীকালে “চোখের বালি” ছায়াচিত্রের বিনোদিনীর কণ্ঠের জন্য এবং তারও পরে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত ‘যোগাযোগ’ অভিনয়ে শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠের জন্য শিখিয়ে দিতে বলেছিলেন।

এমনিভাবে ক্লাসে গুরুগম্ভীর গানের মধ্যে হঠাৎ আর একদিন ছোটদের জন্য ‘হ্যাদেগো নন্দরাণী’ এই গানটি শিখিয়েছিলেন। এইসব গানের ভাবপ্রকাশ এত সুন্দরভাবে করতেন, দেখে অবাক লাগতো আর ভাবতাম, একই কণ্ঠে এত ভাব! প্রসঙ্গত বলি, এর কিছুদিন পূর্বেই তাঁরই উৎসাহে এবং দাক্ষিণ্যে ছোটদের একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাস নিতে শুরু করেছিলাম। এই গানটি সেই শিশুদের শিখিয়ে দিতে বলে বললেন, ‘গান শেখালে নিজের শিক্ষাও পাকা হয়।’

“আমি রূপে তোমায় ভোলাব না”—এই গানটি অরূপরতন অভিনয়ে কলকাতায় কবি স্বয়ং গেয়েছিলেন। সেই বোধ হয় তাঁর মঞ্চে শেষ অভিনয়। গাইবার পর জানতে চাইলেন, তোমাকে তো স্টেজে গানের দলে দেখি নি, কোথায় ছিলে? মেজাজ যেন বেশ একটু কড়া! উত্তরে, তেমনি জোরে জানালাম, ‘আমি ঠিক জায়গাতেই ছিলাম।’ সঙ্গে সঙ্গে

তখন একটু নরম সুরে প্রশ্ন এল, "শোনা গিয়েছিল?" উত্তরে আমি বায়না ধরলাম, এবারে শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে ক্লাসে প্রথমেই এই গানটা শিখব। আমার আশা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

"মরলো মার" এই গানটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যে-কোন প্রসঙ্গে এই গানটির উল্লেখ হত, সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেয়ে উঠতেন এবং বার বার একই সুরে গাইতেন। আমরাও বার বার শুনে ঠিক করে নিতাম মিলিয়ে। একবার একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে বিশেষকণ্ঠে তিনি নিজে এই গানটি শিখিয়ে যখন গাওয়াচ্ছিলেন তখন শিল্পীকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই গাইতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অন্য এক প্রসঙ্গে একবার শাসিয়ে বলেছিলেন, "বলে দিয়ো, এ গান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলাদেশে আর কেউ শেখাতে পারে না।"

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করি। কবি গান বেঁধেছিলেন সারাজীবন ধরেই। তাঁর সেই জীবনের উষ:কাল থেকে সায়াহ্ন অবধি রচিত গানের দুটি ধারা সুস্পষ্ট। একটিকে আমরা বলতে পারি প্রাচীন। আর একটি আধুনিক। যদিও এই দুইকালের গানের চরিত্রে কোন মৌলিক দিক পরিবর্তন সূচিত হয় নি কিন্তু কথায়, সুরে ও মেজাজে এই দুই ভাগের গানগুলিতে যে একটি রসের বিভিন্নতা বর্তমান, তা নিঃসন্দেহ। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর একটি লেখায় তিনি বলেছেন—"তিনি নিজে আমাকে বলেছেন আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল। এখনকার গানগুলি ইস্থেটিক।" আরও একটি ব্যাপারের উল্লেখ করা যায়। কবির শেষ জীবনে দেখেছি তিনি যখন অপরকে বলতেন গান গাইতে, তখন তাঁর সর্বাধুনিক গানগুলিই অপরের মুখে শুনতে চাইতেন। কিন্তু নিজে যখন গাইতেন তখন তাঁর অতি পুরনো গানগুলি যেমন, তাঁর প্রিয় গান ছিল—(১) বড়ো বেদনার মত (২) জগতে তুমি রাজা (৩) বধূ ফিরে এসো (৪) আমার পরান লয়ে, (৫) আকুল কেশে, (৬) মরিলো মরি ইত্যাদি। বিশেষ করে লক্ষ্য করতাম কয়েকটি গান কবির অতি প্রিয়। সেগুলি গাইবার সময় তিনি যেন অন্য একটি জগতে চলে যেতেন। আনন্দ-হর্ষ-বিষাদের সূক্ষ্ম অনুরাগে ভরা গানগুলি গাইবার সময় এমন এক অনির্বচনীয়তা ফুটে উঠত যে তা ভাষায় বোঝান যায় না। যাঁরা তাঁর স্বমুখে। গান শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই তা বলবেন।

মুখ্যত তবু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সঙ্গীতের স্রষ্টা। তাঁর সেই সৃষ্টি ছিল অবিশ্বাস্য অকল্পনীয়। কোন কোনদিন চার-পাঁচখানি গানও পরপর রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন। স্বভাবতই এত বিপুল সংখ্যক গান মনে ধরে রাখার তার উপায় ছিল না তা প্রয়োজনও ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ কোথাও বলেছিলেন যে তিনি গান তৈরি করতেনও যত তাড়াতাড়ি, ভুলতেনও তত তাড়াতাড়ি। তাই অন্যদের কাজ ছিল তাঁর গানগুলি সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে নিয়ে স্বরলিপি করে সংগ্রহশালায় জমা করা। নানা পর্যায় নানাজনে সে কাজ করেছেন। আদিযুগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাঙালীচরণ সেন, ইন্দিরা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীযুগে দিনেন্দ্রনাথ ও অনাদিকুমার দস্তিদার।

একটি জিনিস লক্ষণীয়—এই স্বরলিপিগুলি রবীন্দ্রনাথের গানের হুবহু অনুলিপি হলেও তাদের মধ্যে কোথা যেন একটু মাত্রাভেদ দেখা যায়। যেমন প্রাচীন স্বরলিপিগুলিতে সুরের কারুকার্য একটু ব্যাপক বা একটু ক্লাসিক্যাল ভঙ্গী বেশি। এখানে অনুমান করা সঙ্গত যে যাঁরা স্বরলিপি করতেন তাঁদের আপন আপন শিক্ষা ও রুচির একটু প্রভাব এসে পড়ত স্বরলিপিতে। তাই প্রত্যেক স্বরলিপিকারের স্বরলিপিগুলিতে অল্পবিস্তর চারিত্রিক পার্থক্য ফোটে।

তাঁর মধ্যকালীন রচনার বেশির ভাগ গানের স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ করেছিলেন। দিনেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর আমার ওপরেও ভার পড়ে গুরুদেবের গানগুলি শেখার ও অন্যদের শেখানোর এবং স্বরলিপি করারও। এই সময় তাঁর জনপ্রিয় বিখ্যাত তিনটি নৃত্যনাট্যও রচনা করেন কবি। তার জন্য নতুন নতুন গান ও নৃত্য পরিকল্পনার ধুম চলে। সে এক গভীর উত্তেজনাপূর্ণ কাল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে রূপান্তরিত করতে চাইলেন নাটকের প্রয়োজনে। শুধু তাই নয়, তাকে নৃত্যের অভিনয়ের সম্পৃক্ত করতে হবে। তাই এই নৃত্যনাট্যের অন্তর্ভুক্ত গানগুলি যেন এক নতুনতর সত্তা নিয়ে প্রকাশ হতে লাগলো। এ সময় রিহার্সেলগুলি গুরুদেব স্বয়ং তত্ত্বাবধান করতেন। গানও শেখাতেন। নাচের পরিকল্পনা যেগুলি প্রধানত প্রতিমা দেবীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত, তাতেও তাঁর নির্দেশ মাঝে মাঝে দিতেন। এই পর্যায়ের গানগুলি একটু বেশি বেগবান, ছন্দবহুল, আবেগসম্পৃক্ত হয়েও যেন তাদের সূক্ষ্মসমাহিত স্থৈর্য ছেড়ে কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। পুরাতন গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' 'বাল্মীকি প্রতিভার' সঙ্গে তুলনা করলে শেষের এই নৃত্যনাট্যগুলির গানের প্রভেদ [illegible] মনে হবে।

এই সময় দেখেছি গুরুদেব তাঁর গানের সুরগুলি অপরের কণ্ঠে যাতে নিখুঁত হয় তার জন্যে কি পরিমাণ সযত্ন ছিলেন। একটি লাইন বারে বারে গেয়ে যতক্ষণ তার সামান্যতম ত্রুটিও না সংশোধিত হত, ততক্ষণ তিনি তৃপ্ত হতেন না। গান শেখাবার সময় কথার উচ্চারণ, ঢং, গায়কী, সুরের কারুকার্য তাঁর নিজের গলায় যেমনটি হতো তেমনটি অবিকল হওয়া চাই যারা গাইছে তাদের গলাতেও। কোথাও একটু রূঢ়তা, অনাবশ্যক প্রগল্ভতা বা কুরুচি প্রকাশ পেলে তিনি মর্মান্তিক জ্বালা অনুভব করতেন। তবু তিনি গায়ক-গায়িকাদের আপন মাধুর্য ও ব্যক্তিত্ব ফোটাতে কোন বাধা দিতেন না যতখানি তা তাঁর গানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ফুটতে পারতো। কিন্তু বিজাতীয় কোন রুচি বা প্রবৃত্তি প্রকাশ তাঁর গানের আসরে প্রায় অসম্ভব ছিল।

উপসংহারে বলি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষাগুরু হিসাবে লাভ করা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে আমি মনে করি। তাঁর কাছ থেকে তাঁর গানগুলি না শিখতে পারলে কোনদিন তার অন্তরালবর্তী যে মায়াময় রহস্যলোক আছে, তার সন্ধান পেতাম না। তিনি খুলে দিয়েছিলেন তাঁর গানের সেই সৌন্দর্যের জগৎ আর যে সূক্ষ্ম সুরবিন্যাস সেখানে প্রবেশের চাবিকাঠি তা তাঁর কণ্ঠে শুনে ধন্য হয়েছিলাম। সুদীর্ঘকাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষকতার মধ্যে এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছি যে তাঁর গান বাঙালীর প্রাণের জিনিস হয়ে থাকবে চিরকাল এবং যুগে যুগে মানুষের প্রাণে সুধারস বর্ষণ করবে।

রবীন্দ্রনাথ—অভিনেতা ও প্রয়োজক

অশোক সেন

মঞ্চের সঙ্গে নাড়ীর যোগ না থাকলে সত্যিকার বড় নাট্যকার হওয়া যায় না। ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইওরিপিডিস শুধু নাটক লিখেই ক্ষান্ত হন নি। নিজেদের রচিত নাটকের নিজেরাই পরিচালনা করতেন, নৃত্য এবং সঙ্গীত শিক্ষাও নিজেরাই দিতেন। ইস্কাইলাস উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন, সোফোক্লিসও কিছুকাল অভিনয় করেছেন। ইউরিপিডিস অভিনয় করেছেন বলে কোনো লেখা পড়ি নি।

সেক্সপীয়ার আগাগোড়াই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিনয়ও করতেন—তবে নায়কের ভূমিকায় নয়—হ্যামলেটে তাঁকে ঘোস্টের ভূমিকা দেওয়া হোত। মলিয়ের কিন্তু ভাল নট ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর রোমাণ্টিক কবিরাও নাট্যকার হবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু স্টেজের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না রেখে। তাই শেলী, বায়রন প্রমুখ কেউই ভাল নাটক রচনা করতে পারেন নি। পরের দিকে টেনিসন, ব্রাউনিংও সফল নাট্যকারের প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। মঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবেই এমনটা হয়েছে।

আধুনিক যুগের যাঁরা বাঘা বাঘা নাট্যকার, অর্থাৎ ইবসেন, স্ট্রীণ্ডবার্গ, হাউপ্টমান বা শ, ওনীল, বেরটল্ট ব্রেশট্ এদের স্টেজ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল—ব্রেশট্ অবশ্য শুধু নাট্যকার নন, আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রডিউসার। যৌবনে নিজেও অভিনয় করতেন—পরে শুধু নাট্যরচনা এবং প্রযোজনা।

পৃথিবীর সেরা নাট্যকারদের পাশে আমাদের দেশে এযুগে নাট্যকার হিসাবে এক রবীন্দ্রনাথের নামই উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহু নাটক ইওরোপ এবং আমেরিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। সাঙ্কেতিক নাটকের রচয়িতা হিসাবে পৃথিবীর সেরা নাট্যকারদের ভেতরেও (যথা স্ট্রীণ্ডবার্গ, মেতারলিঙ্ক, হাউপ্টমান) তিনি শীর্ষস্থানীয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই মঞ্চাভিনয় এবং পরিচালনার ব্যাপারে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুদিন বাদেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন: "বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা। যৌবনের প্রারম্ভ হতে, যদিও ব্যবসাদার হিসাবে নয়, তিনি নট ও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন। এমন কি বার্ধক্যে পদার্পণ করবার পরও তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রয়োগনৈপুণ্যের বিবিধ কলাকৌশল দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মত অভিনয় করবে—এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা গুরুতর

বাল্মীকির বেশে রবীন্দ্রনাথ

অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে যে বেড়া লেকচারের ধারার, গ্রাক ট্র্যাজেডার আভিনয়ে, এমন কি সেক্সপীয়রের থিয়েটারে ছিল না, যে বেড়া তুলে দেবার জন্য বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন প্রয়োগাচার্য (মায়ারহোল্ড এবং রাইনহার্ট) চেষ্টা করে আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন, সেই বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও নিজস্ব দল নিয়ে দু-একবার করেছেন।"

এড্ওয়ার্ড টমসন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর' বইতে এক জায়গায় লিখেছেন:

"That he should turn to drama was inevitable. Among his many gifts, he was a great actor. Bengal knew that he could act.

অন্যত্র 'ডাকঘর' নাটকের প্যারিস, লণ্ডন এবং বার্লিনের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় টমসন সাহেব বলেছেন:

"I think its great vague among his Indian followers, at any rate, was partly due to accidents, not least to the fact that the poet himself took the part of Thakurdada superbly and unforgettably—when Rabindranath acted, he laid a spell upon his audience, which lasted while memory lived."

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় অভিনেতা হিসাবে কবিগুরু কি অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

এরপর শ্রীইন্দ্র মিত্রের সাজঘর থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"কিন্তু নট-নাট্যকাররূপে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মঞ্চে দেখা দিয়েছেন কবে? ১৮৮১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী। জোড়াসাঁকোর বাড়ির সৌখিন নাট্যমঞ্চে। সেদিন 'বাল্মীকি প্রতিভা' হল। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করলেন। সেই অভিনয়ের দর্শকদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্র আছেন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, রাজকৃষ্ণ রায় আছেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আছেন।

সেই অভিনয় দেখে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন?

"উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ, ঘুমায়ে
থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল
হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে
পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণভরে, সুখতৃষ্ণা
যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি
অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা
দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না
আর।"

নাট্যকার এবং প্রযোজক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কত বড় ছিলেন স্পষ্ট বোঝা যায় যখন দেখি নাটিক উৎকর্ষের খাতিরে এবং মঞ্চরূপের সার্থকতার তাগিদে তিনি 'রাজা ও রানী' নাট্য-কাব্যকে গদ্যনাট্য 'তপতী'তে রূপান্তরিত করলেন এবং 'গোড়ায় গলদ'কে ভেঙে সাজালেন 'শেষরক্ষা'য়। নাটিক প্রয়োজনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবুকেও তিনি অদল-বদল করতে দ্বিধা করেন নি। এবিষয়ে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"একবার ড্রামাটিক ক্লাবে 'অলীকবাবু' অভিনয় হয়। অলীকবাবু জ্যোতিকাকামশায়ের লেখা, ফরাসী গল্প, মোলেয়ারের একটা নাটক থেকে নেওয়া। সেই ফরাসী গল্প উনি বাংলায় রূপ দিলেন। অত জো পাকা লিখিয়ে ছিলেন, কিন্তু ফরাসী ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। নয়তো হেমাঙ্গিনী কি আমাদের দেশের মেয়ে। এখনকার কালে হলেও সম্ভব ছিল, সেকালে অসম্ভব। এই অবস্থায় আমরা যখন প্লে করি রবিকাকা তো অনেক অদল-বদল করে দিয়ে তা ফরাসী গল্প থেকে মুক্ত করলেন। এইখানেই হল রবিকাকার আর্ট। আর করলেন কী, হেমাঙ্গিনীর প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। আগে ছিল অলীকবাবুই নানা সাজে ঘুরে ফিরে এসে বাপকে ভুলিয়ে হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করে। রবিকাকা সেখানে অনেকগুলি লোক এনে ফেললেন। তাতে হল কী, অনেকগুলি ক্যারেকটারেরও সৃষ্টি হল। হেমাঙ্গিনীকে রাখলেন একেবারে নেপথ্যে। তাছাড়া তখন মেয়েই বা কই অ্যাকটিং করবার? তাই হেমাঙ্গিনীকে আর বেরই করলেন না। সেবারে লেখায় কতকগুলো এমন মজার 'ডায়লগ' ছিল, সেই স্টেজ-কপির পিছনেই উনি লিখেছিলেন বাড়তি অংশটুকু। ভারি অদ্ভুত অদ্ভুত ডায়লগ সব। অলীকবাবু বলছেন এক জায়গায়, একেবারে তাঁহা তাঁহা লেগে যাবে। তাঁহা তাঁহা মানে কী তা তো জানি নে, কিন্তু ভারি মজা লাগতো শুনতে। আরো কত সব এমনিতরো কথা ছিল।"

শ্রীইন্দ্র মিত্র তাঁর সাজঘরের এক জায়গায় লিখেছেন: "আরও একবার রঘুপতিরূপে অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ স্থান-কাল ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর হাতের খাঁড়া যে সত্যি সত্যি তীক্ষ্ণধার, একথা মনে ছিল না। ধ্রুবের ভূমিকায় যে অভিনয় করছিল, অবস্থা বুঝে কে একজন তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে নিলে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের তন্ময়তার ফলে সেদিন একটা দারুণ দুর্ঘটনা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না।" এটিকে কল্পিত কাহিনী বলেই মনে হয়। আমি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এবং শিশিরকুমারের মুখে অনেকবারই শুনেছি যে, রবীন্দ্রনাথ নট হিসাবেও ছিলেন প্রথম শ্রেণীর। তিনি যে অভিনয় করতে করতে ভাবাহত হয়ে একেবারে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে তীক্ষ্ণধার খাঁড়া দিয়ে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনার সৃষ্টি করতেন একথা মনে হয় না। হয়তো উত্তেজিত হয়েছিলেন—উত্তেজিত হওয়া এক কথা, তবে আত্মবিস্মৃত হওয়াটা কিন্তু অভিনেতার গুণের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যে অভিনয় করবার সময় আত্মবিস্মৃত হতেন না সে-কথা অবনীন্দ্রনাথের নিজের লেখাটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়:

"রবিকাকাকে ও-রকম উত্তেজিত হতে কখনও দেখি নি। এখন, রবিকাকা রঘুপতি সেজেছেন, জয়সিংহ তো বুকে ছোরা মেরে মরে গেল। স্টেজের এক-পাশে ছিল কালীমূর্তি বেশ বড়, মাটি দিয়ে গড়া। কথা ছিল রঘুপতি দূর দূর বলে কালীর মূর্তিকে ধাক্কা দিতেই, কালীর গায়ে দড়াদড়ি বাঁধা ছিল, আমরা নেপথ্য থেকে টেনে মূর্তি সরিয়ে নেব। কিন্তু রবিকাকা করলেন কী, উত্তেজনার মুখে দূর দূর বলে কালীর মূর্তিকে নিলেন একেবারে দু'হাতে তুলে। অতো বড় মাটির মূর্তি দু'হাতে উপরে তুলে ধরে স্টেজের এক পাশ থেকে আর-এক পাশে হাঁটতে হাঁটতে একবার মাঝখানে এসে থেমে গেলেন। হাতে মূর্তি তখন কাঁপছে, আমরা ভাবি কী হল রবিকাকার, এইবারে বুঝি পড়ে যান মূর্তিসমেত। তারপর উইংসের পাশে এসে মূর্তি আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন। তখনও রবিকাকার উত্তেজিত অবস্থা।......আমরা জিজ্ঞেস করলুম, কী হল রবিকাকা তোমার। ওই অতবড় কালীমূর্তি দু'হাতে একেবারে তুলে নিলে?

উনি বললেন, কী জানি কী হল, ভাবলুম মূর্তিটাকে তুলে একেবারে উইংসের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দেব। উত্তেজনার মুখে মূর্তি তো তুলে নিলুম, ছুঁড়তে গিয়ে দেখি ওপাশে বিবি না কে যেন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। এই মাটির মূর্তি চাপা পড়লে তবে আর রক্ষে নেই—হঠাৎ সামলে তো নিলুম, কিন্তু কোমর ধরে গেল।"

উপরের ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, উত্তেজিত হলেও কবি সচেতন মনেই অভিনয় করতেন।

বন্ধুবর ডাক্তার আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্র নাট্যধারা' বইয়ের এক জায়গায় অন্যমনস্কতাবশত লিখেছেনঃ "রবীন্দ্রনাথ নিজের যোগ্যতা অনুযায়ীই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিতেন। হাস্যরসাত্মক কিম্বা লঘুবিষয়ক কোন ভূমিকায় তিনি কোনদিন অবতীর্ণ হন নাই। অতএব তিনি যে অংশে অবতীর্ণ হইতেন, তাঁহার দিক হইতে তাহা নিখুঁতভাবেই অভিনীত হইত।" এ কথাটা ঠিক নয়। ইন্দিরা দেবী তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতিতে 'নাট্যস্মৃতি' পরিচ্ছেদে যেসব কথা লিখেছেন তার থেকে আমরা জানতে পারি—জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্ররোচনায় মানময়ী নাটক (প্রথম প্রকাশ ১৮৮০) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আপনা আপনির মধ্যে রচিত হয়—এটি রচিত হয় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবীর যৌথ প্রচেষ্টায়—হাস্যরসের নাটক, রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেবতাদের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একবার অভিজাত বন্ধুবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য বিবাহঘটিত একটি ক্ষুদ্র গীতিনাটিকা অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিবাহের পক্ষ, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিবাহের বিপক্ষ অবলম্বন করে এই তরুণ গীতিনাটিকার অভিনয় করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন 'এমন কর্ম আর করব না' র 'অলীকবাবু'তে রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবু চরিত্রে তরল হাস্যরসের চরিত্রেরই অভিনয় করতেন।

এই বইতেই ইন্দিরা দেবী এক জায়গায় লিখেছেনঃ "সকলেই জানেন, রবিকাকা, গগনদাদা আর দিনু ঠাকুরবাড়ির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। অবনদাদারও হাস্যরসের অভিনয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল।'

১৯১২ সালের গোড়ার দিকে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন, অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।'

উপরোক্ত অভিনয়ে কেদার সেজেছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

কেদারের পার্টে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল—অভিনয়ে নেমেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ প্রমুখ। এই অভিনয় প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ পরে লিখেছেনঃ "ওই সেবারই আমার অভিনয় খুব নাম হয়। ......একহাতে সন্দেশের ঘুড়ি, আর একহাতে খেতে খেতে স্টেজে ঢুকছি, রবিকাকার সঙ্গে সমানে সমানে কথা কইছি, প্রায় ইয়ার্কি দিচ্ছি খুড়ো-ভাইপোতে', ইত্যাদি। এইসব বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় হাল্কা চরিত্রের অভিনয়েও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ার মাসে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনীত 'বাল্মীকি-প্রতিভায় বাল্মীকির ভূমিকায় নামেন। এরপর ঐ বাড়ির মঞ্চেই ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'কাল-মৃগয়া'-তে তিনি অন্ধমুনির ভূমিকা নেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ৪৯ পার্ক স্ট্রীটে ১৮৮৯ সালে 'রাজা ও রানী"-র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বিক্রম দেবের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতি বইতে লিখেছেনঃ রাজা ও রানী (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৯) নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম অভিনয়ের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। কলকাতার সেণ্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রেলের লাগাও জমিতে তখন একটি বিরাট পুকুর ছিল। তাকে লোকে বলত বির্জি-তলাও। তারই সামনে বর্তমান প্রেসিডেন্সী হাসপাতালের জমিতে বিজনি—রাজার একটি পুরনো বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়ে বহুদিন ছিলুম। বাড়িটি জীর্ণ হলেও তার সঙ্গে আমাদের সেকালের অনেক সুখস্মৃতি জড়িত। তারই একতলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে প্রথম রাজা ও রানী'র অভিনয় হয়। তার পাত্র-পাত্রী ছিল এই রকম—

বিক্রম—রবিকাকা, সুমিত্রা—মা, দেবদত্ত—বাবা, নারায়ণী—কাকিমা; মৃণালিনী দেবী।

মা খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন শুনতে পাই। পরদিন বঙ্গবাসী কাগজে 'ঠাকুরবাড়ীর নতুন ঠাট' বলে একটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ বেরল। তাতে উক্ত পাত্র-

'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ে ক্ষিতীন্দ্র সুরেন্দ্র অরুণেন্দ্র বলেন্দ্র যশঃপ্রকাশ হিতেন্দ্র গগনেন্দ্র ঋতেন্দ্র অবনীন্দ্র রবীন্দ্র

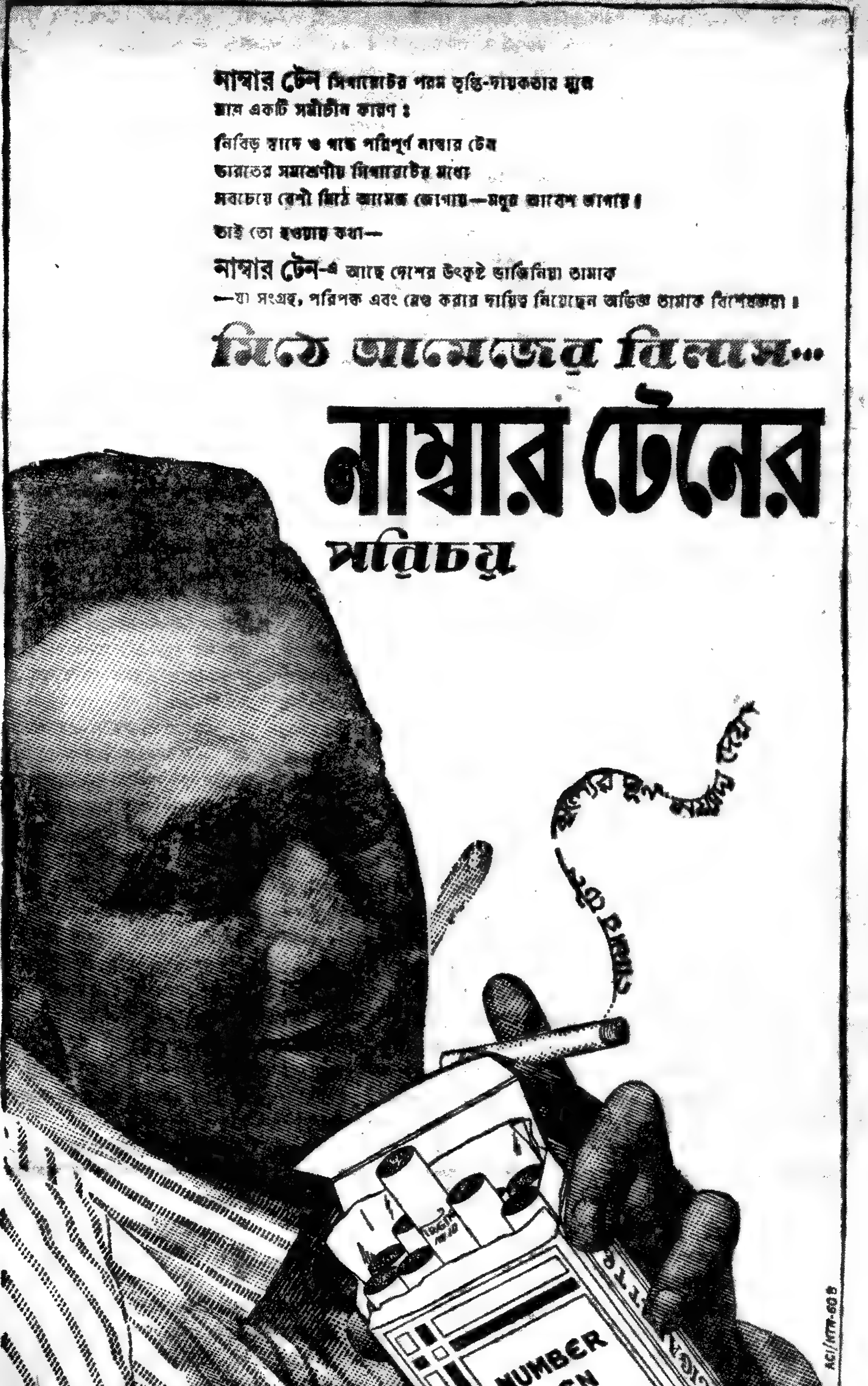
নাম্বার টেন সিগারেটের পরম তৃপ্তি-দায়কতার মূলে
আছে একটি সমীচীন কারণ :
নিবিড় স্বাদে ও গন্ধে পরিপূর্ণ নাম্বার টেন
ভারতের সমশ্রেণীর সিগারেটের মধ্যে
সবচেয়ে বেশী মিঠে আমেজ জোগায়—মধুর আবেশ জাগায়।
তাই তো হওয়ার কথা—
নাম্বার টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া তামাক
—যা সংগ্রহ, পরিপক্ক এবং ব্লেণ্ড করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজ্ঞ তামাক বিশেষজ্ঞরা।
মিঠে আমেজের বিলাস...
নাম্বার টেনের
পরিচয়
NUMBER TEN
VIRGINIA

পাত্রীর তালিকা এবং পরস্পরের সম্পর্ক পারিপাট্য করে লিখে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, বাবা এসব সমালোচনার সুযোগও করলেন না। মনে হয় এর অভিনয়েই 'ষ্টান' কুমার, এবং প্রতিভাদাদ হলা সেজেছিলেন।

মায়ার খেলায় একটি অভিনয় এই বিজিতলার বাড়ির বারান্দাতেই হয়েছিল, তার বিশেষত্ব এই ছিল যে, মায়াকুমারী-দের অভাবে রবিকাকা, জ্যোতিকাকা বসন্ত ও মদন সেজে তাদের গান গেয়েছিলেন।"

১৮৮০ সালে প্রথমে জোড়াসাঁকো এবং পরে পার্ক স্ট্রীটে 'বিসর্জন'-এর অভিনয় হয়—রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৯২৩ সালের ২৫শে আগস্ট 'বিসর্জন' অভিনয় করা হয় ওল্ড এম্পায়ার মঞ্চে। ৬২ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের রোলে অপূর্ব অভিনয় করেন। দীনুবাবু হয়েছিলেন রঘুপতি।

১৮৯৭ সালে জোড়াসাঁকোতে বৈকুণ্ঠের খাতার অভিনয়ে কবি সাজেন কেদার এবং গগনেন্দ্রনাথ বৈকুণ্ঠ। ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে শারদোৎসবের অভিনয়ের সময় কবিগুরু সন্ন্যাসীর ভূমিকা নেন। ১৯০৯ সালে শান্তিনিকেতনে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখা দেন ধনঞ্জয় বৈরাগীরূপে।

১৯১১-র ৭ই মে—রাজা নাটকে রবীন্দ্রনাথের ছিল দ্বৈতভূমিকা—অদৃশ্য রাজা এবং ঠাকুর্দা। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে এণ্ড্রুজ সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য 'অচলায়তন' স্টেজ করা হয়েছিল—কবি হন আচার্য অদীনপুণ্য।

১৯১৫ সালের ঈস্টারে শান্তিনিকেতন আশ্রমে 'ফাল্গুনী' মঞ্চস্থ হল—কবি অন্ধ বাউল এবং সূচনায় কবিশেখররূপে মঞ্চে আসেন। ১৯১৬ সাল—আশ্রমে দুটি নাটক অভিনয় হল একসঙ্গে 'ফাল্গুনী' এবং 'বৈরাগ্যসাধন'। কবির দ্বৈতভূমিকা—প্রথমে কবিশেখর এবং পরে অন্ধ বাউল।

১৯১৭-র জুলাইতে আশ্রমে 'ডাকঘর' অভিনয় করা হোল। 'ডাকঘর'-এ কবি ঠাকুর্দার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। টমসন তাঁর বইতে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দার অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন, সে কথা আগেই বলেছি।

১৯২২ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর এ্যালফ্রেড থিয়েটারে 'শারদোৎসব'-এ কবি সন্ন্যাসী চরিত্রে নামেন—পরের দিন ম্যাডানে এই নাটকের পুনরভিনয় হয়।

১৯২৩ সালের ২৫শে অগাস্ট ওল্ড এম্পায়ার মঞ্চে 'বিসর্জন' অভিনীত হয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চারদিনের জন্য (২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১শে জানুয়ারী 'নটীর পূজা'র অভিনয়ে কবি ভিক্ষু উপালির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে (২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'তপতী' মঞ্চস্থ হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ বিক্রমের ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয় করেন।

এরপরেও বহুবার শান্তিনিকেতনের দল এসে যখন কলকাতায় অভিনয় করতো, রবীন্দ্রনাথ স্টেজে বসে আবৃত্তি করতেন এবং সময় সময় যখন নৃত্যনাট্য হোত, কবি নাট্যকাব্যটি স্টেজ থেকে আবৃত্তি করে শোনাতেন।

নাটকাভিনয়ে অভিনয়ের উপরই রবীন্দ্রনাথ জোর দিতেন—পাশ্চাত্যের থেকে ধার করা বাস্তবধর্মী মঞ্চসজ্জার ব্যাপারটা নাটকের গতি এবং নাটকের পরিস্ফুটনে বাধার সৃষ্টি করে বলেই তিনি মনে করতেন।

'তপতী'র ভূমিকায় আছে : "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।

নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। দৃশ্যপটটা তার বিপরীত : অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"

'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইতে 'রঙ্গমঞ্চ' সম্পর্কে আলোচনায় কবি অভিনয়শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি সার কথা বলেছেন। যথা :

(১) অভিনয়কে নাটকের পথ চেয়ে বসে থাকতে হয়—নাটকের গৌরব অবলম্বন করে অভিনেতা আপন গৌরব দেখাতে পারে। এর দ্বারা কবি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, অভিনয়ের উদ্দেশ্য নাটককে দর্শকদের কাছে পরিস্ফুট করে তোলা। যে অভিনয় নাটককে ছাপিয়ে উঠবে তা যে ব্যর্থ অভিনয় অনুমান করা যাবে সে ইঙ্গিতও কবির আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

(২) দৃশ্যসজ্জার অবতারণায় অভিনেতার অক্ষমতা এবং কাপুরুষতাকেই প্রকট করে তোলা হয়।

(৩) দর্শকদের কল্পনাশক্তি আছে—তার দ্বারাই তারা দৃশ্যসজ্জার অভাবটা পূরণ করে নেয়। এই কল্পনাশক্তির প্রতি পুরাকালের প্রযোজকদের শ্রদ্ধা ছিল বলেই ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে—কিন্তু দৃশ্যসজ্জার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না।

কয়েকদিন আগে কঙ্করদার (শান্তিনিকেতনের শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন) বাড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম রবীন্দ্রনাথের অভিনয়, প্রযোজনা এই সব ব্যাপার নিয়ে। কঙ্করদা বললেন অভিনয় করবার সময় রবীন্দ্রনাথ বইয়ের সংলাপ ছাড়াও অনেক নতুন সংলাপ যোগ করতেন মুখে মুখে—তবে বিপরীতে যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁদের কোনই অসুবিধা হোত না, কারণ সংলাপের কিউটা তাদের ঠিক মতই ধরিয়ে দিতেন নিজের সংলাপ শেষ করতে গিয়ে। এই সব বাড়তি সংলাপ যদি লিখে রাখা সম্ভব হোত তাহলে অনেক অমূল্য জিনিস পাওয়া যেত।

একবার 'বিসর্জন'-এর মহলার সময় মবু সিনে সন্তোষ মিত্র মশায় নাকি দুটি বাড়তি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। কবি এই মহলাতে উপস্থিত ছিলেন। পরে সন্তোষবাবু কবিকে এই বাড়তি শব্দ দুটির ব্যবহারের কথা বলায় কবি বলেন, তিনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন এবং আসল অভিনয়ের সময়েও ঐ দুটি শব্দ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন সন্তোষ মিত্রকে।

কঙ্করদার কাছ থেকেই শুনলাম যে মহলার সময় কবি নাটকের চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণ করে সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন, দরকার মত উচ্চারণ শুদ্ধ করে দিতেন, বাচনভঙ্গী শেখাতেন—কিন্তু কখনই কারোকে নিজের অনুকরণ করতে বলতেন না।

অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কঙ্করদা বললেন যে, কবিগুরু 'তপতী'তে যখন বিক্রমদেবের ভূমিকায় অভিনয় করছে করতে নরেশকে সুমিত্রা সম্বন্ধে বলছেন—'চলে গেছেন? বিদ্রোহী প্রজাদের উত্তেজিত করতে? ফিরিয়ে নিয়ে এসো, ধরে নিয়ে এসো, বেঁধে নিয়ে এসো, ধরে নিয়ে এসো, শৃংখল দিয়ে—স্বৈরিণী!"

"স্বৈরিণী!" শব্দটি একবারে উচ্চারণ করতে যেন বিক্রমের মুখে বাধতো—কথাটাকে ভেঙে বলতেন। এই বলবার ভেতর দিয়েই বিক্রম চরিত্রের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটা ফুটে উঠতো।

ক্রীড়ারসিক রবীন্দ্রনাথ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রীড়ারসিক রবীন্দ্রনাথ!

বিস্ময়ের বিষয় বৈকি। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনানুসন্ধানে এ কথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ একজন খাঁটি ক্রীড়ারসিক ছিলেন। ক্রীড়াঙ্গনের আনাচে-কানাচে তাঁর দিন না কাটলেও, খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় তাঁর মধ্যে যতোটা পাওয়া গেছে, ততটা বোধহয় পাওয়া যাবে না নামী খেলোয়াড়-দের মধ্যেও।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্র-নাথ মনে-প্রাণে ছিলেন সত্যিকারের খেলোয়াড়। খেলাধুলোর আদর্শই ছিলো তাঁর কাছে আসল।

তবে যাঁরা মনে করেন মাঠে গিয়ে বলে কিক করতে না পারলে কিম্বা ব্যাট ঘুরিয়ে বল বাউন্ডারীতে পাঠাতে না পারলে অথবা ছড়ির মতো হকি স্টিক ঘোরাতে না পারলে সত্যিকারের খেলোয়াড় হওয়া যায় না—তাঁদের বিচারে রবীন্দ্রনাথকে অবশ্যই পিছিয়ে পড়তে হবে। কারণ, খেলোয়াড়জীবন হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সম্বল শুধু ঐ ছোটবেলার কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে ডন-বৈঠক আর পালোয়ানের কাছে কুস্তির কসরত, আর সাঁতার কাটা।

সাঁতার কাটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলো পরম উপাদেয়। সেই যে সেবার?

রবীন্দ্রনাথের তখন বিশ্বজোড়া নাম। কিন্তু বর্ষার টই-টম্বুর শিলাই-দহের পদ্মা দেখে আর লোভ সামলাতে পারলেন না বিশ্বকবি। ঝাঁপিয়ে পড়-লেন নদীর বুকে। দুরন্ত পদ্মা তখন ভয়ঙ্করী। বর্ষার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত জলধারা আপন বেগে চলেছে বয়ে।।

আর সেই কল্লোলিত জলস্রোতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আপন মনে চললেন সাঁতার কেটে।

হৈ-হৈ কাণ্ড! নায়েব-গোমস্তা থেকে আরম্ভ করে উপস্থিত সকলেই তটস্থ। হৈ-হট্টগোল! সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। তাড়াতাড়ি নৌকো নামানো হলো জলে আর জলের নৌকো আগেই ছুটেছে। কিন্তু নৌকোয় উঠলেন না কবি। মাঝপদ্মা থেকে আবার সাঁতার কেটেই ফিরে এলেন তীরে।

সাঁতার কেটে রবীন্দ্রনাথ পদ্মা পার হতে পারবেন না সে কথা তিনি নিজেও জানতেন। আর এই না পারাটাই তাঁর কাছে বড় হয়েছিলো। মনের মধ্যে জমে-ছিল পুঞ্জীভূত ক্ষোভ।

মনের কোণে জমে থাকা এই ক্ষোভ আর তার খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরি-চয়ের কথা জানা গেছে প্রখ্যাত সাঁতারু শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের[১] কাছ থেকে। ১৯৩৮ সালে প্রফুল্ল ঘোষ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে যাবেন ঠিক করে, গিয়েছিলেন মংপুতে কবিগুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ প্রাণভরে আশীর্বাদ করে শিলাইদহের কথা তুলে প্রফুল্ল ঘোষকে বলেছিলেন, "...ওরা শেষ পর্যন্ত দিলো না আমায় পার হতে।...তুমি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে এসো এই আশীর্বাদ করি, আমার মতো ফাঁকি দিও না।"[২]

ফাঁকি অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও দেন নি। ছেলেবেলায় খেলাধুলো তাঁর কাছে ছিলো অনেকটা বাধ্যতামূলক। শরীর শিক্ষার অঙ্গ। কানা পালো-য়ানের কাছে কুস্তি করতে হতো রোজ। সেই সংগে চলতো জিমনাস্টিকের মহড়া। শরীরটাকে গড়ে তোলার জন্যে রুটিনমাফিক কেটে যেতো তাঁর দিনগুলো।

রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার সেই মজার দিনগুলোর কথা আমরা সকলেই জানি। জানি জ্যোতিদাদার নেতৃত্বে নৈহাটির বাগানে ঘেরা পুকুরে সাঁতার কাটার কথা, জানি সেই পড়োবাড়িতে অভিযানের কথা।

১। শারদীয়া স্টেডিয়াম ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত আরবির 'খেলার গুরু রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।

২। শারদীয়া অলিম্পিক ১৯৬৪ সাল—দ্রষ্টব্য।

প্রকাশিত হয়েছে! প্রকাশিত হয়েছে!

খ্যাতনামা ক্রীড়া-সাংবাদিক

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

খেলার রাজা ফুটবল

(দাম—পাঁচ টাকা)

খেলার রাজা ক্রিকেটই। কিন্তু বাংলাদেশের খেলার রাজা যে ফুটবল—এ কথা কেউই অস্বীকার করবেন না। উপন্যাসের ঢং-এ কলকাতা, তথা বাংলাদেশ তথা ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখা এই বইটি বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যের একটি অনন্য সংযোজন। শুধু তাই নয়—বর্তমান ফুটবল জগতের খুঁটি-নাটি বৃত্তান্ত সহ বইটিতে আছে ভারতীয় ফুটবলের অমূল্য রেকর্ডস্‌। এক কথায় বলা যায় যে, বইটি হাতে পেলে সমস্ত ফুটবল জগতটাই এসে যাবে হাতের মুঠোর মধ্যে। বইটির আর একটি আকর্ষণ হলো দুষ্প্রাপ্য সব আলোকচিত্র। ফুটবল ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় আটচল্লিশ পাতা ছবিতে ভরা বইটি। ছোট বড় সকলের ভালো লাগার মতো সত্যিকারের একটি ভালো বই।

জ্ঞান তীর্থ

১নং বিধান সরণী, কলিকাতা-১২

যাক সে কথা। আমরা খেলোয়াড় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে বসি নি, আমরা বসেছি ক্রীড়ারসিক রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করতে।

রবীন্দ্রনাথ হয়তো নিজে এক সময় খেলেছেন। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় কথা হলো, খেলাধুলোকে গুরুদেব শুধু ভালোই বাসেন নি—খেলাধুলোর আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মনে-প্রাণে।

তাই শান্তিনিকেতনে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে তিনি খেলাধুলোকে দিয়েছিলেন একটা বিশিষ্ট স্থান। ফুটবল-ক্রিকেট থেকে আরম্ভ করে কোন খেলাই বাদ যায় নি। শুধু তাই নয়, কবিগুরু নিজে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলোর ক্ষেত্রে জুগিয়েছেন অপরিসীম উৎসাহ।

ভাবতে খুবই অবাক লাগে যে, রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এক সময় শান্তিনিকেতনের ফুটবল দল অপরাজেয় হয়ে উঠেছিলো। তাদের হারাতে পারতো না কেউ। বোলপুর, সিউড়ী, রামপুরহাট প্রভৃতি দলগুলির কথা তো ছেড়েই দিলাম, কলকাতা থেকে খোদ মোহনবাগানের একটা দল গিয়ে হেরে এসেছিল তাদের কাছে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" বইটিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এক জায়গায় শ্রীবিশী লিখেছেন, "...শীতকালে ক্রিকেট অন্য সময়ে ফুটবল; ফুটবল খেলাই বেশি জমিত।...শান্তিনিকেতনের ফুটবলটীম প্রায় অজেয় ছিল বলিয়াছি। কলিকাতা হইতে অনেক কলেজের ফুটবলটীম ওখানে খেলিতে যাইত কোন দল যে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এমন মনে পড়ে না। একবার মোহনবাগানের একটা দল খেলিতে গিয়াছিল তাঁদেরও হারিতে হইয়াছিল। আমাদের সময়ে আশ্রমের নামজাদা খেলোয়াড়দের মধ্যে গৌরগোপাল ঘোষ, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সূর্য চক্রবর্তী, বীরেন সেন প্রভৃতি ছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই পরবর্তীকালে কলিকাতার নামজাদা সব দলে ভর্তি হইয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আশ্রমের ফুটবল দল শিউড়ী, বর্ধমান, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নলহাটী প্রভৃতি স্থানে প্রতিযোগিতা করিতে যাইত, জিতিয়া আসাই রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।......আমরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িতাম। হঠাৎ কখন এক সময়ে বিজয়ী দলের সম্মিলিতকণ্ঠে 'আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন' গান শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া যাইত।......সেই রাত্রেই সকলে মিলিয়া গান গাহিয়া আশ্রম প্রদক্ষিণ হইত; নিদ্রাজনিত কষ্টের কারণ ছিল না, কারণ পরের দিন অবধারিত ছুটি...!"

ক্রীড়ারসিক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, "একমাত্র আনন্দের লক্ষ্যে দেহমনের ক্রিয়া, তাই ছিল রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত খেলাধুলোর স্বরূপ। অথচ বাংলার নানা অঞ্চল থেকে, এমন কি কলকাতা, বহু দল বহুবার আমন্ত্রিত হয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল খেলাধুলো করতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও উপস্থিত থাকতেন অধিকাংশ সময়ে। বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন তিনি করেছেন। প্রথম জীবনে নিজে অংশ গ্রহণ করেছেন এমন সাক্ষ্যও আমি পেয়েছি...।"

শুধু এই নয়। শান্তিনিকেতনের প্রারম্ভিক যুগে, যখন অভাবনীয় আর্থিক অনটন চলছিল তখনো খেলাধুলোকে উপেক্ষা করেন নি রবীন্দ্রনাথ, ভুলে যান নি খেলাধুলোর মহান্ আদর্শের কথা। একমাত্র আনন্দের লক্ষ্যে দেহমনের ক্রিয়ার কথা মনে রেখে অনেক টাকা খরচ করে জাপান থেকে শিক্ষক নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের যুযুৎসু শেখাবার জন্যে। আর লাঠি খেলা শেখাবার ভার দিলেন পুলিন দাসের এক শিষ্যের হাতে।

রবীন্দ্রজীবনের কথা ছেড়ে যদি আমরা প্রবেশ করি রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে তাহলেও আমরা দেখতে পাবো রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যাদুবলে খেলাধুলোও তাঁর সাহিত্যের একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

ক্যামেলিয়ার সেই ফুটবল খেলোয়াড়কে আজ কে না চেনে। ফুটবল খেলোয়াড়ের জনপ্রিয়তার চিত্রটি বড় সুন্দরভাবে, বড় নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করেছেন কবি। আর এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তাঁর ক্রীড়ানুরাগী মনের জন্যে। তাই ফুটবল খেলোয়াড়দের মনের ভাবটুকু পর্যন্ত ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়,

মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেম
চুরুট রাস্তায়।
হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার
তাকালো কট্‌মট্ করে,
আর-কিছু বললে না,
এক লাফে নেমে গেল।
বোধ হয় আমাকে চেনে।
আমার নাম আছে ফুটবল খেলায়
বেশ একটু চওড়াগোছের নাম।

কিম্বা—

ফিরব মনে করছি এমন সময়ে আমার
এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,
মোহনলাল—
রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা—
দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায়
একটু উৎসাহ পায়।

অথবা—

মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু—
যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক,
আহারে ততটা নয়।
ফুটবলের সর্দারের 'পরে
তাই এত অদ্ভুত ভক্তি—
মনে করলে, আলাপ করতে এসেছি
সে আমার দুর্লভ দয়া।

ক্রীড়ারসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বোধ হয় আর দেবার দরকার নেই। তবে এ কথা ঠিক যে আজকের খেলাধুলোর জগতের এই চরম অরাজকতার যুগে ক্রীড়ারসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে যদি আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারি তাহলে আর যাই হোক বাংলা দেশের ক্রীড়াঙ্গনের কিছুটা পরিবর্তন হবেই।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসদকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজী

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী---	১ম	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী---	২য়	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী--	৩য়	৮-০০
াইকেল গ্রন্থাবলী---	১ম	৪-৫০
াইকেল গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-৫০
ঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---৩য়		৩-০০
ঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---১ম		৩-০০
ঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---৩য়		৩-০০
বজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী---	১ম	৬-০০
" "	২য়	৬-০০
" "	৩য়	৮-০০
ত্রলোক্য গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
ীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
" "	২য়	৪-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী---		৩-৫০
ানিক গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
ানিক গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
ামোদর গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-৩০
ামোদর গ্রন্থাবলী---	৪র্থ	৪-০০
মৃতলাল গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
মৃতলাল গ্রন্থাবলী---	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী---	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী	১ম	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী---		৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী---		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী---		৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী---		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী---		৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী---		৩-৫০
স্কট গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী---	৩য়	০-০১
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:---		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী--- ২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী---	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী---	৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী---	৩-৫৫
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী---	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী---	৪-০০
" " " ---২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী---	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী---	৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী---	৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:---২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী---	৫-০০
কথাসরিৎসাগর---১ম ভাগ	৪-০০
কথাসরিৎসাগর---২য় ভাগ	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী---	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী--- ১ম, ২য়, ৩য়---প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড---প্রতি খণ্ড---	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী---২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী---	৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা---২য়ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী---২য়	৩-০০
" " গ্রন্থাবলী---৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী---	৩-০০

নবীন সেনের গ্রন্থাবলী---	৭-০০
গোপেশ্বর বন্দ্যো: ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস--- ---২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থাবলী--- ১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি---	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী---	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর---	৩-৫০
পরলোক---	৪-৫০
পরলোক রহস্য---	২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব---	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়---	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা---	৩-০০
ভারত প্রতিভা---	৫-০০
প্রতাপাদিত্য---	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত---	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার---	৩-০০
নানার মা---	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ---	৩-০০
বিক্রমাদিত্য---	৩-০০
বিসমার্ক---	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী---	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত---	২-০০
মাধবী কঙ্কণ---	২-০০

যৌন-মনোদর্শন

৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ন্ত্রণ-কালিকল্পের ব্যাপার সমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী--- ১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী--- ২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী---	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
10 MAY 1969

সাপ্তাহিক বসুমতী

সংবাদ-সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টির জন্য শ্রীগোপাল হালদারের সম্বর্ধনা।

৭৩ বর্ষ ঃ ৪৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার. ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ [OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA] 73 Year, No. 47, 15th May, 1

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	—	২৯৪৭
আজকের মানুষ	—	২৯৪৮
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৯৪৯
ব্যঙ্গদর্শন	—	২৯৫৩
ভারতদর্শন	—	২৯৫৭
আন্তর্জাতিক	—	২৯৬০
সপ্তাহের বোকা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২৯৬২
কথায় কথায়	— নিবারণ মুনশী	২৯৬৫
স্মরণীয় দিনে বরণীয় মানুষের সম্বর্ধনা	—	২৯৬৭
গ্রন্থমেলা	—	২৯৭০
পাঠকমন	—	২৯৭২
মন্ত্রীরা কি বলেন	—	২৯৭৪

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ.সরকার এণ্ড সন্স
রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	২৯৭৬
বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা ঃ কয়েকটি নতুন প্রশ্ন	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৯৭৮
ত্রিভুবন (প্রবন্ধ)	— ননীমাধব চৌধুরী	২৯৮১
জবালা (গল্প)	— সাধন চট্টোপাধ্যায়	২৯৮৩
তিমিরপ্রান্ত ভুবর্গ	— অগ্নিবর্ণ	২৯৮৭
কামার ইস্পাত (কবিতা)	— রাধামোহন মহান্ত	২৯৮৯
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	— অশোক সেন	২৯৯০
হয় না, হয় না (কবিতা)	— সনাতন কবিয়াল	২৯৯৩
সাগর সঙ্গমে	— সুশীল জানা	২৯৯৪
রূপজগৎ	—	২৯৯৯
খেলাধূলা	— শান্তিপ্রিয়	৩০০৪

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে !!—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।...... বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।...... নবীনবাবুর যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮। মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৭৩ বর্ষ : ৪৭শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 15th May, 1969

রবীন্দ্রনাথের পর

নানা ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে বাংলা দেশের গৌরব আজো শ্রদ্ধায় স্বীকৃত হয় তার সংস্কৃতির জন্য। বাংলা দেশের সংস্কৃতির ধারাটিকে আরো পুষ্ট ও প্রবল করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বর্তমান সময়ে বাংলা দেশের প্রবহমাণ সংস্কৃতির ধারাটির অন্য রূপ লক্ষ্য করে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। যুগের পটপরিবর্তনে মানুষের রুচি বদলায়, কিন্তু সেই পরিবর্তিত রুচি বিকৃত রুচির রূপ নেবে এমন কেউ আশা করেন না।

গোটা বাংলা দেশের রুচি বিকৃতি ঘটেছে, একথা বলা যায় না। পূর্ববঙ্গের মানুষ তাঁদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। নানা রকম পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাঁরা ঐতিহ্যকে ত্যাগ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে ঐতিহ্যকে ত্যাগ করেছে—একথাও ঠিক নয়। বরং সংস্কৃতি রক্ষার কথা কেউ কেউ সাড়ম্বরে ঘোষণা করছেন। রবীন্দ্র-ভূমিতে সংস্কৃতির ভিন্নরূপ দেখে আতঙ্কিত হচ্ছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা প্রয়োজন, আমাদের সংস্কৃতির বদলে কেন অপসংস্কৃতি নিজ মূর্তি প্রকাশ করছে, সেদিকে নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি দৃষ্টিপাত করছেন!

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়, যুবকদের মধ্যে নিদারুণ হতাশা, বেকারিত্বের ভয় ; এমন কি গৃহেও স্থানাভাব। এই অবস্থায় অবসাদ ও নৈরাশ্য থেকে ক্ষণিক মুক্তি লাভের আশায় চটুল ব্যবস্থার মাধ্যমে শহুরে শিক্ষিত যুবকদলও আকৃষ্ট হতে চলেছে। বাংলার যে সংস্কৃতি পল্লীর নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, সেখানে তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, শহর থেকে তারাও শিক্ষা-দীক্ষার এক ভাগ না পেলেও অপসংস্কৃতির মতো চটুল বস্তুর শতকরা পুরো ভাগ বহন করে নিতে তারা আজ সুখবোধ করছে। তাই শহরের শুধু কটা তথাকথিত সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের বিচার করে জাতিকে অপসংস্কৃতির কবল থেকে মুক্ত করা যাবে না। আজ প্রয়োজন অপসংস্কৃতির মূল শিকড় উৎপাটন করা।

এই মূল শিকড়টিকে উৎপাটন করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ এটিকে লালন ও পালন যারা করছে তারা সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তবু জানা দরকার লালন-পালনের ভার কারা গ্রহণ করেছে?

সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি প্রচারের মূলে আছে, লারেলাপ্পার মতো সিনেমার গান, অরুচিকর চলচ্চিত্র, টুইস্ট নাচ, হিপ্নোটাইজ করার জন্য হিপিদের মাদক জাতীয় উপকরণ, রেডিওতে প্রচারিত বিবিধ ভারতীর মতো অনুষ্ঠান, সর্বোপরি ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন একশ্রেণীর অর্থ-গৃধ্নু ব্যক্তি—যাদের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির নামান্তর।

শহরের নানা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী থেকে সুরু করে বয়স্ক-বয়স্কারা পর্যন্ত বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অধুনা আকৃষ্ট হচ্ছে। রেডিও ও সিনেমা তাতে কড়া ইন্ধন যোগাচ্ছে। কিন্তু বাউল ভাটিয়ালীর দেশকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করছে আকাশ-বাণীর বিবিধ ভারতীর মতো অনুষ্ঠান। আমাদের বেদনার কারণ সবচেয়ে বেশি হয় তখনই, যখন দেখি নামকরা শিল্পীরা অর্থমোহে অপ-সংস্কৃতির বাহক হয়ে ওঠেন।

শহুরে শিক্ষিত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেবার জন্য একশ্রেণীর লেখকও যা লিখছেন—তা কি দেশের রুচি ও সংস্কৃতি বিন্দুমাত্র বহন করে? রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে সংস্কৃতি রক্ষার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় অধুনা যে সব বিকৃত রুচির রচনা প্রকাশিত হচ্ছে—তার বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করা সম্ভব হচ্ছে না কেন। সংস্কৃতির জন্যে যারা হন্যে হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা বন্য আইনের বিরুদ্ধে দু'চার কথা বলুন অন্তত দেশের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

সাহিত্যের রস গ্রহণে [illegible] ও অক্ষর পরিচয়ে আজো যারা [illegible] মধ্য থেকেও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে চলেছে কেন? রবীন্দ্রনাথ একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেশের সংস্কৃতিকে খুঁজে বেড়ান নি। লালন ফকিরের বাউল গানের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষগুলিকে আর্থিক দৈন্য থেকে মুক্তিদানের জন্য গড়ে তুলেছিলেন বিস্কজন পরিবেষ্টিত শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি শ্রীনিকেতন।

শহরে বসে গান, আবৃত্তি বা আলোচনা করতে পারাটাই সংস্কৃতির একমাত্র পরিচয় নয়। গ্রামের নিরক্ষর তবু শিক্ষিত মানুষগুলিকে ৩৬৪ দিন বাদ দিয়েও মাত্র একদিন অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ আমরা কি বুঝতে চেষ্টা করেছি? যে দেশে সাক্ষর ব্যক্তির শতকরা হার ২৩, সে দেশে রবীন্দ্রনাথের নাম সুদূর পল্লী অঞ্চলে মুখে মুখে ফিরবে একথা কল্পনা করা যায় না, কিন্তু সেই দিনই কি ব্যবস্থা করা যায় না রবীন্দ্রজন্মদিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের মাধ্যমে সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ এবং তাদের নিজেদের হাতের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করার।

কিন্তু এসব ব্যবস্থা করবে কে? দেশের একদল উচ্চশিক্ষিত মানুষ আজ পণ্ডিত-ম্মন্য। আর দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মনোন্নয়নের ভার যাঁদের হাতে, বছরের একটি দিন অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ ছাড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁরা নীরব। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে নতুন কি আশা করা যায়? হয়তো যে যুবকদল আজ ঘূর্ণিস্রোতে বিভ্রান্ত—একদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে তাদেরই কেউ দেখাবে পথ। হয়তো সেদিনই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটবে। সেদিন খুব দূরে নয়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

দ্য গলের বিদায় গ্রহণের পর ফ্রান্সের নতুন অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এলেন পোহার। তাঁর পদের মেয়াদ মাত্র ৩৫ দিন। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করবার ভার পড়েছে তাঁর ওপর। দ্য গলের উত্তরাধিকারীর নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেলেই তাঁকে এলিসি প্যালেস ছেড়ে আসতে হবে। এই ৩৫ দিন তিনি প্রধানমন্ত্রী মরিস কুভ দ্য মারভিলের গভর্নমেন্টকে নিয়েই রাজ্যপাট চালাবেন।

এলেন পোহার গত এপ্রিল মাসে ৬০ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। করিৎকর্মা এক ইঞ্জিনীয়ারের পুত্র পোহার ইঞ্জিনীয়ারিং, আইন এবং রাজনীতি বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট। গত ২৫ বছর তিনি ফ্রান্সের রাজনীতিতে নানা ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এর আগে কখনও প্রথম সারির নেতৃত্বে স্থান পান নি। রবার্ট সুম্যানের চেলা হিসাবে তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন এবং ফ্রান্সের চতুর্থ প্রজাতন্ত্রে উপ-মন্ত্রিসভার বিভিন্ন ছোটখাট প৽ অলঙ্কৃত করবার পর সিনেটে প্রবেশ করেন। সুম্যান তাঁকে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নিস্ট হিসাবে দীক্ষা প্রদান করেন। পোহার গোড়ায় ইউরোপীয় কয়লা এবং ইস্পাত সমন্বয়ে কাজ করেন। পরে স্ট্রাসবুর্গে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে যান। গত অক্টোবর মাসে দ্য গলের গণভোটের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর আন্দোলনে সামিল হবার জন্য সিনেটের দীর্ঘকালের প্রেসিডেন্ট গ্যাসটন মোনারভিল যখন পদত্যাগ করেন, তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এলেন পোহার। অনতিবিলম্বে তিনি বিরোধী দলেও যোগদান করেন এবং বিগত জন্মদিন (১০ই এপ্রিল) জাতীয় টেলিভিশন প্রোগ্রামে ঘোষণা করেন যে, তিনি দ্য গলের সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধী। তারপরই তিনি ফ্রান্সের শহরে শহরে দ্য গলের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযানে নেমে পড়েন.

দ্য গলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে বলে যে [illegible] সৃষ্টি হয়েছিল, ব্যাপক প্রচারকার্যের দ্বারা সেটা তিনি দূর করতে সমর্থ হন। তিনি ঘোষণা করেন, "একটি মানুষ পদত্যাগ করলেই ফ্রান্স জাহান্নমে যাবে—এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত।" অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে পোহার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশনের কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠান এবং কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেন, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বেতার এবং টেলিভিশনকে

এলেন পোহার

কোনক্রমেই দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা চলবে না। যদি দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তিনি বিষয়টা ফরাসী জনগণের সামনে তুলে ধরতে বাধ্য হবেন। দ্য গল প্রায়ই বলতেন, তাঁর বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে অরাজকতা দেখা দেবে। তাই তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য দেশের সর্বত্র বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। পোহার অবিলম্বে এই পুলিশবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করবার নির্দেশ দিয়েছেন। দ্য গলের [illegible] যে ভিত্তিহীন, সেটাই তিনি প্রমাণ করতে চান। অতঃপর পোহার সেক্রেটারী জেনারেল ফর আফ্রিকান এ্যাফেয়ার্স দ্য গলপন্থী জ্যাকুস ফোকার্টকে বরখাস্ত করেন। ফোকার্ট নাকি আসলে দ্য গলের গোয়েন্দাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন। এই গোয়েন্দাবাহিনীটিকে ফ্রান্সের নাগরিকরা নাকি মোটেই পছন্দ করেন না। পোহারের সঙ্গে দ্য গলপন্থী মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক খুব প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হয় নি। বৈঠকের কয়েকঘণ্টা বাদেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল ডেবরে মন্তব্য করেন, "গত রবিবার ফ্রান্স মস্ত পরাজয় বরণ করেছে।" এই মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে পোহারের দপ্তর তার প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন যে, মন্ত্রিসভার গোপন কার্যাবলী প্রকাশ করার কোন অধিকার মন্ত্রীদের নেই। পোহারের এই তৎপরতায় খুশি হয়ে কোন কোন মহল প্রস্তাব করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য পোহারকে মধ্যপন্থী প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানো হোক। শুনে পোহার বলেছেন যে, তিনি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন, তবে উপযুক্ত সমর্থন পেলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারেন। কিন্তু মধ্যপন্থী দলগুলোর মধ্যে যে রকম খেয়োখেয়ি শুরু হয়ে গেছে, তাতে আশানুরূপ সমর্থনলাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। যদি তিনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী না হন অথবা পদপ্রার্থী হয়েও পরাজিত হন, তাহলে ৩৫ দিন বাদেই তাঁকে এলিসি প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে।

শান্তশিষ্ট আত্মবিশ্বাসী মানুষ পোহার ফ্রান্সের স্থায়ী প্রেসিডেন্টপদে রতী হোন বা না হোন দ্য গলের বিদায় মুহূর্তে তিনি যে ফ্রান্সে প্রলয়কাণ্ড ঘটতে দেন নি, সেটাই তাঁর মস্ত কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে। পোহার ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ নন, মৌলিক চিন্তাবিদও নন। কাজেই প্রেসিডেন্ট হবার যোগ্যতা তাঁর কতটুকু আছে, সে সম্পর্কে তাঁর সমর্থকেরাও সুনিশ্চিত নন। কিন্তু ফরাসী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে তিনি যে সামান্য কয়েকদিনের জন্যও ফ্রান্সের কর্ণধার হতে পেরেছেন, সেটাই অনায়াসে তাঁর বাকী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হরিপুরায় শান্তির দ্বীপ—(৪)

কংগ্রেসের ইতিহাসের সবচেয়ে বর্ণময় অধিবেশন সমাপ্ত হল। এ রকম সাফল্যময় অধিবেশনও কম দেখা যায়। শুধু ব্যবস্থাপনার সাফল্য নয়, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের নীতি ও কর্মধারার সাফল্যও বটে। ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রে যিনি ছিলেন, কংগ্রেসের পরিচালনাতেও তিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন—তখনও তিনি বাড়ন্ত লৌহমানব—শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের মহিমা গরমে-নরমে যথেষ্ট বেড়েছে। দুটি মন্ত্রিসভার নাটকীয় পদত্যাগের দ্বারা কংগ্রেস তখন সংগ্রামী সংঘ, এবং সংকট-মুক্তিতে অনিচ্ছার দ্বারা বিবেচক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস এর ফলে উগ্র বামপন্থী এবং শীতল দক্ষিণপন্থী—সকলেরই যাত্রীভূমি। মন্ত্রিত্বকে যারা বিষদৃষ্টিতে দেখে তারা আশ্বাস পেল যে মুহূর্তের নোটিশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব-বৈরাগ্য গ্রহণ করতে পারে, আবার মন্ত্রিত্বসুখে যারা রসায়িত, তারা বুঝল, বৈরাগ্য বটে, তবে বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়। সোস্যালিস্টরা চড় খেয়েছিল প্যাটেলের হাতে, সেইসঙ্গে প্যাটেলের হাত-বাড়ানো মালা ঝুলেছিল বামপন্থী সুভাষ বোসের গলায়। কত কি শোনা গিয়েছিল—কত বাধা বিপত্তি আসবে—কিছুই এল না; বরং এল প্রশস্তির স্তোত্র এবং অব্যাহত আধিপত্যের সম্ভাবনা।

সুভাষচন্দ্র আনন্দগম্ভীরকণ্ঠে বললেন, হরিপুরা অধিবেশনের আগে খুবই নার্ভাস বোধ করেছিলুম, কেননা ৬ বছরের উপর জনজীবন থেকে আমি বিচ্ছিন্ন; আজ আমার মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ, সবই সাবলীলভাবে ঘটে গেছে, অথচ সংকটের যথেষ্ট কারণ ছিল। ২৩

কংগ্রেস-কর্তাদের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র কম অভিনন্দন

পেলেন না। একটু-আধটু পুরনো বেয়াড়াপনা দেখান নি তা নয়, সে কিন্তু পুরনো চেহারার ছায়া মাত্র। সুভাষচন্দ্র একমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি পর্যন্ত গঠনে সম্মতি দিলেন; এমন কি এহেন বিপরীত আচরণের ব্যাখ্যা পর্যন্ত করলেন যত্নের সঙ্গে। "দলসংহতি রাখার জন্য এবং পুরনো নীতি অব্যাহত রাখার জন্যই ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রায় পূর্ববৎ রাখা হয়েছে",—তিনি জানিয়েছিলেন। ২৪

সুভাষচন্দ্র সুস্থ আছেন তো, তাঁর পুরনো সহকর্মী ও ভক্তেরা ভাবতে পারেন। এতদিনে ছোকরা সত্যই সুস্থ হয়েছে—বৃদ্ধ নেতারা ভেবেছিলেন। কংগ্রেস-কর্তাদের মুখে অতঃপর সুভাষ-প্রশস্তির বান ডেকে গেল। মুখে মুখে গদ্যকবিতা রচনায় পারদর্শিনী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে পূর্বে কী বাণী পাঠিয়েছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করেছি। তিনি আরও কিছু বললেন। বললেন যে, সভাপতির আসনে পণ্ডিত নেহরুর উত্তরাধিকারী হওয়া যে-কোনো মানুষের পক্ষেই কঠিন। ব্যাপারটি যে সত্যই কঠিন তা যে-কোনো মানুষের তুলনায় বেশি উপলব্ধি করেন নতুন সভাপতি—এইটেই আশার কথা। যুদ্ধ বা শান্তি, ভবিষ্যতে যাই আসুক না কেন, ইনি নিজ দায়িত্ব উপযুক্তভাবে সমাধা করবেন।

"কংগ্রেসের তরুণতম সভাপতি"—এই আখ্যায় সুভাষচন্দ্রকে ভূষিত করে তিনি বলেছিলেন—"তারুণ্যের কাছে আমরা আমাদের আনুগত্য নিবেদন করছি। নিয়মশাসিত এবং স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত এই তারুণ্য। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের নূতন নেতা—তাঁকে অভ্যর্থনা করি।"২৫

অধিবেশনের সমাপ্তিদিনেও সরোজিনীর মধুকণ্ঠ

---

২৩ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ২২ ফেব্রুয়ারী

২৪ হরিপুরা কংগ্রেসে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্র ছাড়া ছিলেন—জহরলাল, বল্লভভাই, গফুর খান, সরোজিনী, কৃপালিনী, সীতারামিয়া, জয়রামদাস দৌলতরাম, ভুলাভাই দেশাই, মৌলানা আজাদ, যমনলাল বাজাজ, হরেকৃষ্ণ মহতাব, শরৎ বসু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সুভাষচন্দ্র জানিয়েছিলেন, স্যোসালিস্ট দলের নরেন্দ্র দেব ও অচ্যুত পটবর্ধন ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকতে রাজী হন নি।

(২৩ ফেব্রুয়ারী, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড)

২৫ অমৃতবাজার, ১৭

২৩ ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রেই এক-মতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়।

শোনা গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর সলজ্জ সংকোচ, "রক্তে আমি বাঙালী, সভাপতিও বাঙালী।" তবে কুণ্ঠা তিনি জয় করেছিলেন, কারণ সুভাষচন্দ্র তাঁর গায়ের প্রাদেশিক ছাপ মুছে ফেলেছেন। "আজ তিনি ভারতীয় জাতির নেতা। সেইসঙ্গে নেতৃত্বের মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব গুণ যোগ করে দিয়েছেন—সেই সাহস যা ইতিহাস রচনা করে, এবং করেছে,—ভারতবর্ষে এনেছে প্রাণপ্রবাহ বীর ও বীরাঙ্গনাদের সংগ্রামের দ্বারা।" সরোজিনী শেষ করেছিলেন এই নিশ্চিত বিশ্বাসে—"সুভাষচন্দ্র তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে বিরাট সেনানায়কের গুণাবলী প্রকাশ করবেন।" ২৬

কবিরা ক্রান্তদর্শী হন, সুতরাং দৈববাণীত সরোজিনীর স্বাভাবিক অধিকার। গোবিন্দবল্লভ পন্থকে কবির দুর্নাম কেউ কখনো দেয় নি (কিংবা দিয়েছে কি না জানি না) কিন্তু তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার মধ্যে ভবিষ্যতের ছায়াপাত ছিল, অন্তত তিনি যে-প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বর তা শুনেছিলেন; শুনে ভাল করেছিলেন কি না সে বিষয়ে অবশ্য অচিরে কংগ্রেসের কর্তামহলে মতভেদ দেখা দেবে। পন্থ বলেছিলেন—

"আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকেও আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়, অনেকদিন ভারতের বাইরে ছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে তিনি দিনরাত্রি পরিশ্রম করছেন। শক্ত মানুষ বলে এই ধকল তিনি অদ্ভুত ভালভাবে সহ্য করতে পেরেছেন। মহা দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই বোঝা বইবার শক্তি তিনি যেন এঁকে দেন।"২৭

ভাবাবেগের ভাষা কদাপি বল্লভভাই প্যাটেলের নিজের ভাষা নয়। সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তিনি অগত্যা কিছু আকর্ষণীয় তথ্য দিয়ে ফেললেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, বিধাতার বিচিত্র ইচ্ছায় কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের বাংলা এবং বল্লভভাইয়ের গুজরাট গাঁটছড়ায় বাঁধা। তিনি বলেছেন—

"বাংলা ও গুজরাটের সম্পর্কের জন্য আমি গর্বিত। সকলের কাছে আকর্ষণীয় সংবাদ মনে হবে—গুজরাটে এ-পর্যন্ত যে-চারটি কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছে তার সব কয়টিতেই সভাপতিত্ব করেছেন বাঙালীরা। যথা, আমেদাবাদ অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরাট অধিবেশনে রাসবিহারী ঘোষ, পুনশ্চ আমেদাবাদ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ এবং হরিপুরায় সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র বসুকে গভীর ধন্যবাদ, অধিবেশনের সাফল্যের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আসা অবধি তাঁর কোনো বিশ্রাম ছিল না।২৮

সুরাট যে গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত একথা মুহূর্তে সুভাষচন্দ্রের মনে পড়েছিল কি না জানি না। যদি মনে পড়ে থাকেও হয়ত দক্ষিণপন্থীদের আচরণে ভিন্নতা দেখেছিলেন। সুরাট কংগ্রেসের পুনরাবৃত্তি এবার ঘটে নি, ঘটবেও না ভবিষ্যতে। সুতরাং 'আশার ছলনে ভুলি' তিনি সোচ্ছ্বাসে সর্দার প্যাটেল সম্বন্ধে স্তুতিবাদ করেছিলেন, "যাঁর যাদুদণ্ডের স্পর্শে এই অপূর্ব নগরী নির্মিত হয়েছে।" প্যাটেলের এবং সকলের পিছনে নীরবে বর্তমান ছিলেন "মহাত্মা গান্ধী, এইসব অলৌকিক কাণ্ডের মূলে যিনি।"২৯

প্যাটেলের বৃথা প্রশংসা সুভাষচন্দ্র করেন নি। কোনো সময়েই বৃথা বাক্যব্যয়ে তাঁর মন সায় দেয় না। প্যাটেলের নেতৃত্বে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দলের শৃংখলা তাঁকে মোহিত করেছিল। স্বেচ্ছাসেবক দলই কংগ্রেসের 'লোহার কাঠামো',—সুভাষচন্দ্র প্রায় তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকার কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে নিতান্ত আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, "হরিপুরার বাণী নিপুণ সংগঠন এবং লৌহকঠিন শৃংখলা—দেশের জন্য যার প্রয়োজন সর্বাধিক। এই বাণী ভারতের প্রতিটি গ্রামে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। অধিবেশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেষ হয়ে গেল না। ভারতের প্রয়োজন ঐক্য ও সংহতি।" তিনি সেইসঙ্গে যোগ করেছিলেন—"এই সবকিছুর পিছনে আছেন মহান অধিনায়ক সর্দার প্যাটেল, কল্পনাতীত কাণ্ড যিনি করেছেন। সংগঠনের দ্বারা কতখানি অর্জন করা যায় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।"৩০

হরিপুরা অধিবেশনের সমাপ্তিভাষণেও সুভাষচন্দ্র সংগঠনের কথাই আবার বললেন, "হরিপুরার বাণী সংগঠন। গভীরতম সংকটের মুখে আমরা যে লৌহকঠিন শৃংখলা ও সংহতি দেখাতে পারি, তা বুঝিয়ে দিয়েছি।" এর জন্য কাকে ধন্যবাদ দেবেন তা স্থির করতে অসমর্থ রাষ্ট্রপতি শত্রুপক্ষকেই ধন্যবাদ দিলেন, "আমাদের সেরা ধন্যবাদ বৃটিশ সরকারকে। দুটি প্রদেশে সংকট বাধিয়ে তারা আমাদের উপলব্ধি করিয়ে দিয়েছে—আমরা সবাই কংগ্রেসী, সবাই ভারতীয়, আমাদের মতভেদের পরিমাণ অল্প এবং মতৈক্যের ক্ষেত্র বৃহৎ।" ভবিষ্যতে এই রকমই ঐক্যবদ্ধতা

২৬ অমৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারী
২৭ অমৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারী
২৮ অমৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারী
২৯ অমৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারী
৩০ অমৃতবাজার ২৩ ফেব্রুয়ারী

চাই যদি ফেডারেশনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। "আমাদের অস্ত্রাগারে যতকিছু অস্ত্র আছে সবই ব্যবহার করব।" রাষ্ট্রপতি অবশ্য এইরকম হিংসাত্মক যুদ্ধের ভাষা তখনি সামলে নিয়েছিলেন—"আমাদের লড়াই, অহিংস অসহযোগের সীমার মধ্যে থেকেই।" ঐক্য—ঐক্য চাই—রাষ্ট্রপতি আবার বললেন—"আজ হয়ত শাসনতান্ত্রিক সংকট, কাল হয়ত বিক্ষোভ-আন্দোলন, পরশু হয়ত অসহযোগ—যাই হোক না কেন আমরা ঐক্যব্যূহ রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" ঐক্যের পক্ষে আবেগমথিতকণ্ঠে শেষ বাক্যগুলি উচ্চারণ করলেন—

"আমাদের প্রাণ এক, লক্ষ্য এক, দৃষ্টিও এক। আমরা আত্মায় এক, আশায় এক, স্বপ্নে এক—সকল প্রয়াসেও এক। এই পবিত্র তাপ্তি নদীর তীরে, আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে দাঁড়িয়ে, আসুন আমরা

লিপটনের

হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট

গুঁড়ো চা

হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট গুঁড়ো চা যে খেয়েছে সেই মজেছে। যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি স্বাদে গন্ধে ভরপুর। চা হবে কাপের পর কাপ। খেয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি।

অন্য সব গুঁড়ো চা-কে টেক্কা দেয় হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট।

LIPTON

লিপটন বলতেই ভালো চা

AHOC.8 BEN

এই প্রতিজ্ঞা করি, সকল ভেদ-বিভেদ ভুলে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে অগ্রসর হয়ে যাব বিজয়ের পথে, স্বরাজের পথে। ভারত স্বাধীন হতে যাচ্ছে, ভারতকে স্বাধীন করবার কাজে আমরা উপযুক্ত ভূমিকা নেব। সেই স্বাধীনতাকে আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কোনো সন্দেহই সে বিষয়ে আমার নেই। আমরা যেন ভারতের ভবিষ্যতে আস্থা রাখি।৩১

বন্য যখন গৃহপালিত হয়, তখন গৃহকর্তাই শুধু নয়, বাড়ির আর পাঁচজনেও পিঠ চাপড়ায়। পট্টভি সীতারামিয়া, যিনি বছরখানেকের মধ্যে সুবিখ্যাত হয়ে উঠবেন, ইতিমধ্যেই পুষ্পিত রচনাদির জন্য যিনি পরিচিত, তিনি হরিপুরা কংগ্রেস শেষ হবার পরেই "ত্রিবেণী" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখলেন, তার বহুবচনের কিছু ভাগ সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন।৩২ হরিপুরায় যে কী অপার্থিব শান্তি বিরাজিত ছিল তার মুগ্ধ নিবেদন এই রচনায় দেখেছি; বাংলার বিপ্লবীরা হিংসা ত্যাগ করায় প্রেমঘন আনন্দ,৩৩ উগ্র তরুণদের সম্বন্ধে কংগ্রেস-কর্তাদের সস্নেহ সহিষ্ণুতা,৩৪ এবং মন্ত্রশান্ত বিরোধিগণ।৩৫

এই পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র স্বভাবতই কিছু সাধুবাদ লাভ করেছিলেন। বিপ্লবীদের হিংসা ত্যাগ করানোয় তাঁর ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছিল,৩৬ এবং "বহু বছর ধরে যে সরকার তাঁর লাঞ্ছনা করছে, তার বিরুদ্ধে সভাপতি-নির্বাচনের দ্বারা কার্যকর উত্তর দেওয়া হয়েছিল।"৩৭

পট্টভি সীতারামিয়া যখন এইসব কথা লিখছিলেন, তখন তাঁর গাঢ় মনে যে ধুয়াটি সারাক্ষণ ফিরে ফিরে আসছিল, স্বভাবতই তা গান্ধীর—'জয় হে জয় হে জয় হে'—

"ভাইসরয় পিছু হটলেন।...হরিপুরা কার্যত দিল্লীকে পর্যুদস্ত করল। পশ্চাতে শক্তির উৎস কোথায়? সেই একই অর্ধ-নগ্ন ফকির, চার্চিল যা বলেছেন; যন্ত্রপূজকের তাচ্ছিল্যবচন অনুযায়ী সেই একই 'চরকাওয়ালা'; স্টিয়ারিং-ধরা মোটরবিহারীর দৃষ্টিতে সেই একই গোরুর গাড়ির মনোভাবসম্পন্ন মানুষ।'...তাঁর একটি...দৃষ্টিপাত, তার অর্থ মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগ এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উদ্যত বিপর্যয়; আর একটি দৃষ্টিপাত...তার মানে 'যথাস্থানে ফিরে যাও।' এই অখণ্ড আদেশ, এই অনবদ্য শক্তি, যা সকলের প্রেরণার উৎস...এই অদৃশ্য কিন্তু সর্বব্যাপক প্রভাব, যা মহাসাম্রাজ্যের সঙ্গে সংগ্রামে প্রস্তুত, যা রাজনৈতিক কূটনৈতিক সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী করে দেয় যথেচ্ছ, সত্যের এই মহাবাদুকর, অহিংসার এই নব তন্ত্রমন্ত্রধর..."

পট্টভি সীতারামিয়ার কবিতার অলঙ্কার ঝলমল করে শান্তরসে:

"হরিপুরায় চিত্রের পশ্চাৎপট একেবারে বদলে গেল। এখন সেখানে শিকারসন্ধানী বাঘ বা নেকড়ের দল নেই, শুধু আঁকা আছে সবুজ পাহাড়, শস্যপূর্ণ প্রান্তর, রাখাল ও তার চরানোর গাভীদল।"

[ক্রমশ]

---

৩১ অমৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারী

৩২ ২১ মার্চের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে উদ্ধৃত

৩৩ "The great accession of strength which the Congress received through the disavowal by the detenues of their faith in violence..This new harmony arising from the univarsal endorsement of non-violence as a creed..this wide acceptance of the old philosophy which has realigned the Congress march during the past eighteen years."

৩৪ "Its (Haripura's) deliberations were characterised by allround forbearance showing itself through the ready willingness on the part of the Congress High Command to listen to and to study the stand-points of their opponents,—not that they are opponents really but that they are younger Congressmen, more enthusiastic, even if less wise. . . ."

৩৫ "The Socialists were less obstreperous than ever before, the State's people became friends with the Congress and the terrorists disavowed their faith in violence."

৩৬ "There is no doubt that Subhas Babu should have played no small part in influencing opinion in this behalf."

৩৭ কংগ্রেস-ইতিহাসে পট্টভি সীতারামিয়া হরিপুরায় সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর প্রদেশ বাংলাদেশ সম্বন্ধে মৃদু গুণগান করেছিলেন:

"After long and strenuous work President Jawaharlal handed over charge to one not only considerably younger than himself but one that was undoubtedly the youngest President of the Congress, Subhas Babu was still recovering from a long illness. He comes from a province whose youngmen and patriots had suffered most in the annals of India; had striven most in promoting national culture and suffered most in effecting India's emancipation."

বর্ণ দর্শন

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মাথার ওপর কালো মেঘ জমে আছে এবং এই সরকারকে উৎখাত করার একটা প্রচেষ্টা সর্ব স্তর থেকে উৎকট পর্যায়ে পৌঁছেছে। গতবারে যুক্তফ্রণ্টকে উচ্ছেদ করা খুব কঠিন ব্যাপার হয় নি, কিন্তু দলত্যাগের রাজনীতিকে উৎসাহ দেওয়া এবার আর সম্ভব হবে না, কেন না এবার যুক্তফ্রণ্টের ভিত্তি কোন অংশেই দুর্বল নয়। কাজেই এবারে আঘাত করার ভঙ্গিটা অন্য ধরণের এবং ইতিমধ্যেই একটি যে নিপুণ চক্রান্তজাল বোনা হয়েছে তার কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

নেকীরামনগরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সকল ক্ষমতা কংগ্রেস-বিরোধীদের হাতে চলে গেছে এবং এই সব গণতন্ত্র-বিরোধীদের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানো নাকি এখনি প্রয়োজন। এটা যে নিজলিঙ্গাপ্পা সাহেবের নিজের কথা নয় এবং এই রকম যারা চিন্তা করছে তাদেরই মুখপাত্র হিসাবে তিনি বলছেন এটা প্রমাণ করা কঠিন কাজ নয়। গত ২১শে এপ্রিল দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক আলোচনার সময় বক্তার পর বক্তা উঠে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে রোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীমতী সারদা মুখার্জী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে নাকি এখন অরাজকতা, হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন চলছে, অতএব এই মুহূর্তেই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ দরকার। পাকিস্তান হাই কমিশনের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের একটা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তা নিয়ে দিল্লী তোলপাড়! সি· ডি· পান্ডে ও রাজেন বড়ুয়া বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ নাকি পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য আলোচনা করছে অতএব এই দেশদ্রোহীদের এমুহূর্তেই কোতল কর। সুরেশ দেশাই বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সম্পদ একেবারে নয়-ছয় করে ফেলেছেন। তাঁরা ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে বেচারা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিতে চান। শুধু কংগ্রেস নেতারাই নন, স্বতন্ত্র পার্টির দান্ডেকার তো প্রকাশ্যেই দাবি করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে এই মুহূর্তেই বাতিল করা হোক, আর পি-এস-পি'র হেম বড়ুয়া তো ঢাকের কাঠি হয়ে কাজ করছেনই।

এই বিষয়ে দৈনিক বসুমতীর একটি সম্পাদকীয় থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি: "এই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য কেন্দ্রের অদূরদর্শী কিছু লোকের হাত যে নিসপিস করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং সেই হস্তক্ষেপের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য এঁরা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শুধু দিল্লীতে নয়, সারা ভারতে যে রকম উন্মত্ত অপপ্রচার চালানো হইয়াছে, যেভাবে বাংলাদেশের নামে সংঘবদ্ধভাবে কলঙ্কলেপন করা হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায় নাই। আমাদের সংবাদপত্রের একজন সাংবাদিক সম্প্রতি ভূপালে সাংবাদিক ফেডারেশনের বৈঠকে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কলিকাতায় অবাঙালী মহিলাদের উপর অত্যাচারের রোমহর্ষক বিবরণ সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে মতলববাজদের দ্বারা। বোম্বাই-এর কোন কোন সংবাদপত্র এই সব কাহিনী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই প্রচারে কংগ্রেসের একাংশের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছিলেন রাজনারায়ণের মত 'প্রগতিশীল' নেতারা। আসল কথা, বিশ বছর ধরিয়া বাংলা দেশে যে লুঠের রাজত্ব কংগ্রেস কায়েম করিয়াছিল তাহা হাতছাড়া হওয়ায় কংগ্রেস এবং তার বেনামদার 'প্রগতিশীলেরা' মাছের শোকে বকের কান্না জুড়িয়া দিয়াছে।"

এ তো এক দিক। অপর দিকে "সাচ্চা বিপ্লবী" নামে কথিত অপর একটি দল যুক্তফ্রণ্টের গলায় সাপের ছোবল বসাতে উদ্যোগী হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে কোন সময়েই দ্বিধাবোধ করছে না। ব্যাপারটা কাকতালীয় নাও হতে পারে, কেন না দেখা যাচ্ছে এই "সাচ্চা বিপ্লবীদের" গ্রুপটি যে সব রাজ্যে বামপন্থী প্রভাবিত যুক্তফ্রণ্ট রয়েছে সেখানেই আখের গুছিয়ে বসেছে, কংগ্রেসী রাজ্যগুলিতে এদের কোন অস্তিত্ব নেই এবং পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেসী আমলে বা রাষ্ট্রপতির আমলে এদের টিকি দেখা যায় নি, কাজেই সন্দেহ হয় যে, এরাও কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বেনামদার "সেনা" কি না। এঁদের নেতা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে তিনি জ্যোতিবাবুর দয়ায় মুক্তি পান নি, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশেই নাকি মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু ইতিহাসের এই "অমোঘ নির্দেশটি" যে আরও কিছুকাল জ্যোতিবাবুর করতলগত থাকবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে পুনরায় মামলা রুজু করে সাচ্চা বিপ্লবের আগমনের অমোঘ ঐতিহাসিক নির্দেশকে আরও কিছুকাল পিছিয়ে দেবার "ঐতিহাসিক শক্তির" অধিকার আপাতত জ্যোতিবাবুর করতলগত সেটা বোধহয় ওই সাচ্চা বিপ্লবীরা খেয়াল করেন নি। মে দিবসের ময়দান বক্তৃতায় এঁরা যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে খতম করার শপথ নিয়েছেন, শ্লোগান দিয়েছেন, "চ্যবন-জ্যোতি ভাই ভাই, ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ"। যাঁরা কৃষি-বিপ্লব নিয়ে আসবেন, সেই কৃষকদের মহলে না হোক, ছাত্র মহলে এই "সাচ্চা বিপ্লবীদের" কিছু প্রভাব আছে, এবং আশংকা করা যায় যে কলকাতা শহরে বিশেষ করে শিক্ষাজগতে এঁরা কিছু হাঙ্গামা বাধাবেন।

একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অপর দিকে এই তথাকথিত উগ্র বিপ্লবীরা একই সঙ্গে দু' দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে আক্রমণ করতে চলেছে, অসলে এটি একই শক্তির দুই দিক। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার অন্যভাবেও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। টাকা পয়সার ব্যাপারে কেন্দ্রীয়

অর্থমন্ত্রীর মনোভাব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, চতুর্থ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের দাবি সোজাসুজি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্র আবার পশ্চিমবঙ্গকে ভাতে মারারও একটি পরিকল্পনা নিয়েছেন- উদ্দেশ্যমূলকভাবেই। গত দু' বছর ভারতের সব রাজ্যেই পূর্বের তুলনায় বেশি শস্য জন্মেছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার বারবার ঘোষণা করেছেন যে, দেশ আগামী দু' বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে। অথচ সেই একই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও চাল ও গমের দাম বাড়িয়েছেন। বাংলার চালের দাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার না বাড়ালেও কেন্দ্রের সরবরাহ করা চাল ও গমের দাম বাড়ানোর ফলে বাংলার চাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে কালোবাজারীদের হাতে চলে যাবে, ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পুনরায় খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হবে। কাজেই সন্দেহ করার কারণ আছে যে তণ্ডুলের এই আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটানোর পিছনে যুক্তফ্রন্টকে অপদস্থ করার মতলব কাজ করেছে।

ঘুঘুর বাসায় বজ্রাঘাত

রাজ্য সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে রাজ্যের সমস্ত জেলা স্কুল বোর্ডকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত খুবই সুবিবেচনাপ্রসূত হয়েছে, কেন না কংগ্রেসী আমলে জেলা স্কুল বোর্ডগুলি দলীয় দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল এবং এই দুর্নীতির ঘাঁটিগুলি মারফৎ কত সরকারী টাকার যে নয়-ছয় হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে, শিক্ষকদের টাকা দেওয়ার ব্যাপারে, প্রাথমিক স্কুলগুলির বই কেনার ব্যাপারে, সব কিছুতেই জেলা বোর্ডগুলি দুর্নীতির রেকর্ড স্থাপন করেছে, এবং সর্বোপরি জেলা স্কুল বোর্ডগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনীতির দলীয় প্রয়োজনে। এ বিষয়ে তথ্যাবলী পেশ করে তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য বলেছেন যে, ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ পান এবং অভিযোগ তদন্ত করার পর বোর্ড বাতিল করে দেন। তা ছাড়া ওই আমলে বীরভূম ও চব্বিশ পরগনা জেলা স্কুল বোর্ড সম্পর্কে তদন্ত শুরু হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে চব্বিশ পরগনা স্কুল বোর্ড সম্পর্কে একবার তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু ওই তদন্তের রিপোর্ট তখন প্রকাশ করা হয় নি। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে তিনি ওই রিপোর্ট খুঁজতে গিয়ে জানতে পারেন, সেটি না কি উধাও হয়ে গেছে, পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে তা পাওয়া যায় এবং তাতে অনেক মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ লিপিবদ্ধ ছিল। কংগ্রেস আমলে ওপর মহলের স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে জেলা স্কুল বোর্ডগুলির এক শ্রেণীর কর্মচারীরাও সরকারী টাকা লুটেপুটে খেয়েছে। তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, স্কুল বোর্ডগুলি বাতিলের ব্যবস্থা সাময়িক ব্যাপার। শিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য সামগ্রিক আইন তৈরি করছেন এবং আগামী বিধানসভার অধিবেশনে সম্ভবত ওই আইন পেশ করা হবে।

আরও একটি ঘুঘুর বাসা ভেঙেছেন রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েতমন্ত্রী শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত; পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল করার নির্দেশ দিয়ে। ১৫টি জেলা পরিষদ ও ৩২৫টি আঞ্চলিক পরিষদের সকল ক্ষমতা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের হাতে দেওয়া হয়েছে। শ্রীদাশগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে গ্রামাঞ্চলের তিনটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, গ্রামাঞ্চল-জেলা পরিষদগুলির গঠনকার্য এখন থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যবস্থার দ্বারা গণতন্ত্রকে আরও প্রসারিত ও বিকেন্দ্রীভূত করে দিতে চাইছেন। বিগত কয়েক বছর যাবৎ পঞ্চায়েতের কোন স্তরেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার দরুণ গণতন্ত্র শিকেয় উঠেছিল। বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে শুধুমাত্র গ্রামসভার নির্বাচনই প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হত। অঞ্চল, আঞ্চলিক বা জেলা পরিষদের নির্বাচন হত পরোক্ষভাবে। গ্রামসভার প্রতিনিধিরা তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং অঞ্চল পঞ্চায়েত আবার তাঁদের প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করত। জেলা পরিষদ গঠিত হত জেলার এম এল এ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে। প্রস্তাবিত আইনে সকল স্তরের নির্বাচনই প্রত্যক্ষ করা হবে, অর্থাৎ গ্রামসভা অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ নিজ নিজ এলাকাধীন সর্বসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। স্কুল বোর্ডের পর জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদগুলি ভেঙে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির একটি স্তম্ভ উৎপাটিত করা হল। এ ছাড়া প্রস্তাবিত আইনে, বিশ বছরে কংগ্রেসী সরকার যা পারে নি, অর্থাৎ গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত করা হল, যা গণতন্ত্রের পথে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ বলা যায়।

ডাক্তারবাবুরা ভেবে দেখুন

ডাক্তারবাবুরা ১৫ তারিখ থেকে আন্দোলনে নামবেন এরকম একটা হুমকি দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের নাকি নিরাপত্তা ব্যাহত হচ্ছে। তাঁরা নাকি এখানে-ওখানে প্রহৃত হচ্ছেন, লাঞ্ছিত হচ্ছেন এবং তাতে তাঁদের মানে নাকি বড় আঘাত লেগেছে। ইণ্ডিয়ান মেডিকাল অ্যাসোসিয়েসন হুমকি ছেড়েছেন।

কিন্তু একটি কথা তাঁদের আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারি। তাঁরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন কেন? লোকে তাঁদের ওপর হামলা করছে কেন? শুধু শুধু কেউ কাউকে প্রহার করে না, অকারণে কেউ কাউকে লাঞ্ছনা করে না। ডাক্তারবাবু আপনি কি আশা করেন যে, আপনি ঠাণ্ডা মাথায় আমার রোগীকে খুন করবেন, আর আমি আপনাকে ছেড়ে দেব? অতীতে আমার হাত-পা বাঁধা ছিল, আপনার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকেই জেলে পচতে হত। কিন্তু এখন যে দিন বদলেছে এটা কি আপনারা ভুলে গেছেন?

সমাজের পালিশকরা ব্যক্তিরা নাক কুঁচকে বলবেন এ বড় অন্যায়, আইন তুমি নিজের হাতে নিতে পারো না। কথায় কথায় বিদেশের প্রসঙ্গ; বিশেষ করে বিলাতের প্রসঙ্গ তোলা হয়, কিন্তু সেখানে আইন মানুষকে আশ্রয় দেয়। ডাক্তারের অবহেলায় রোগীর মৃত্যু ঘটলে সেখানে ডাক্তারকে রেহাই দেওয়া হয় না।

ডাক্তারবাবুরা কি হাসপাতালে নিজেদের কর্তব্য পালন করেন? এই স্থূল প্রশ্নটির জবাবে তাঁরা যদি হ্যাঁ বলেন, তাহলে তাহা মিথ্যা বলা হবে। তাঁরা বলেন ডাক্তার কম, রোগী বেশি; ঔষধ নেই, লোকেরা অবুঝ, দোষ সরকারের ইত্যাদি ইত্যাদি। সব স্বীকার করে নিলেও যে স্থূল প্রশ্নটি থেকে যায় সেটাই আবার বলছি: ডাক্তারবাবুরা কি হাসপাতালে নিজেদের কর্তব্য পালন করেন?

করেন না। এবং সেটা প্রমাণ করার জন্য বেশি দূর যাবার দরকার পড়ে না। অবশ্য দু'-চারজন যে সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ চিকিৎসক নেই তা নয়, কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম, নিয়ম নন। হাসপাতালে যতক্ষণ অ্যাটেণ্ড করা উচিত তা কি তাঁরা করেন? অধিকাংশের কাছেই সে হাসপাতাল প্রাইভেট প্রাকটিশের একটি হাতিয়ার মাত্র। আধ ঘণ্টা কি এক

কলকাতায় বিশ্ব রেড ক্রশ দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণদান প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য চিকিৎসক ও চিকিৎসাবৃত্তির ওপর জনগণের আস্থা কমে যাবার জন্য চিকিৎসা জগতের কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে দায়ী করেন।

ঘণ্টার জন্য হাসপাতালে চক্কর দিলেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়? তবুও কলকাতায় কিছুটা লোকদেখানো ভঙ্গি আছে, মফস্বলে সেটুকুরও বালাই নেই।

সত্যি বলতে কি সাধারণ মানুষের চোখে ডাক্তারেরা আজ এতদূর নেমে গেছেন যে, তাঁরা আজকে নিজেদের একটি মনুষ্যত্বহীন শ্রেণীতে পরিণত করেছেন। প্রাইভেট প্রাকটিশ আর কালোবাজারী চিকিৎসা (নার্সিং হোম ইত্যাদি) তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালে তাঁরা চিকিৎসা করেন না এটাই স্থূল কথা, যেটাকে অন্য কোনভাবেই চাপা দেওয়া যাবে না।

বিগত দিনে অপরাপর সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির মত এঁরাও রীতিমত প্রোটেকশান পেয়েছেন এবং সেই সুযোগে যথেচ্ছাচারের সকল সীমা এঁরা লংঘন করেছেন। কিন্তু মানুষ আজকে সহজে ছেড়ে দেবে না। ডাক্তারেরা স্বভাব না বদলালে যুক্তফ্রন্টের নৈতিক আবেদনযুক্ত বক্তৃতা বা উপদেশেও জনসাধারণ চুপ করে থাকবে না। দিন বদলাচ্ছে, চেতনা ও স্বাধিকারবোধ সম্পর্কে জনতা যুক্তফ্রন্ট সরকারের চেয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। এটুকু ডাক্তারদেরও উপলব্ধি করা উচিত।

আন্দোলন করে বা অনশন করে কিছু হবে না। ডাক্তাররা দায়িত্বশীল হোন মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করুন, তাতেই সব হবে। যাঁরা সাধারণ মানুষকে জানোয়ার ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না, নিজেদের আচরণের দ্বারা তা বুঝিয়ে দেন, তাঁরা কোন্ অধিকারে তাদের কাছ থেকে তথাকথিত মানবিক আচরণ দাবি করেন?

নজরুল ভবন প্রসঙ্গে

যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের বাসভবন নির্মাণ সম্পর্কে মহম্মদ সাবেরের একটি চিঠি আমরা পেয়েছি। চিঠিটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বঙ্গদর্শনের পাতায় প্রকাশ করা হলো। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

"সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, কবি নজরুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সেচমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কবি নজরুলের উদ্দেশে রাজ্যপাল প্রদত্ত জমির দলিল এবং ১০ হাজার টাকার চেক ফেরত দিয়েছেন। এই সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘ মেয়াদী লীজে জমি এবং সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে বাড়ি নির্মাণ করে দেবার দাবি করেছেন। খবরে প্রকাশ, সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জী ৯৯ বছরের লীজে জমি এবং সরকারী ব্যয়ে বাড়ি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৮ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার কবির মাসোহারা একশত টাকা বাড়িয়ে দিয়েছিল (বর্তমানে কবি মাসে সাড়ে সাত শ' টাকা ভাতা পান); এবং একটি নজরুল ভবন নির্মাণ করার সংকল্প ঘোষণা করেছিল। বলা হয়েছিল, পরিকল্পিত এই ভবনে কবি বাস করবেন, তাঁর অবর্তমানে বাড়িটি নজরুল স্মৃতিরক্ষা ভবনে পরিণত হবে এবং একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু ফ্রন্ট সরকার অকস্মাৎ বাতিল হয়ে যাওয়ায় এই পরিকল্পনা কার্যকর হয় না। জাতির দুর্ভাগ্যজনক এই পরিস্থিতিতে কবির জ্যেষ্ঠপুত্র ও শৈলজানন্দবাবু রাজ্যপালের শরণাপন্ন হন। প্রকাশ যে, কয়েকজন কংগ্রেস নেতার মাধ্যমে তাঁরা যোগাযোগ করেন। মধ্যবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে যে-কোনো রকমে জমি আদায়ের জন্য তাঁরা এত অস্থির হয়ে উঠেন যে, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে কোনো সভা-সমিতিতে তাঁদের দেখা যায় না। আড়ম্বর সহকারে কুখ্যাত ধরমবীর মাত্র ১৫ বছরের মেয়াদী জমি দান করেন, আর তাঁর রক্তাক্ত হাত থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁরা গ্রহণ করেন। সেই অনুষ্ঠানে একবারও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরিকল্পনার কথা তাঁরা বলেন নি, কোনো বামপন্থী নেতাকেও আমন্ত্রণ করা হয় নি। বরঞ্চ ধরমবীরকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে বারবার।

কিন্তু আজ আবার সেই শৈলজানন্দ এবং কাজী সব্যসাচী সেচমন্ত্রীর হাতে ধরমবীরের কলঙ্কিত হাত-থেকে-নেওয়া জমির দানপত্র ফেরত দিয়ে আরো বেশি সুবিধা দাবি করছেন। কারণ তাঁরা এখন বুঝেছেন এবার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিত্ব স্থায়ী হবে। অথচ কৃতকার্যের জন্য কোনোরূপ অনুশোচনা তাঁরা প্রকাশ করেন নি।

কবি নজরুলের জন্য বাসভবন নির্মিত হলে সকলের খুশির কথা। কিন্তু সেচমন্ত্রী যেভাবে উত্তরাধিকার বর্তাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে প্রকাশ, মনে হয় তা ঠিক সংবাদ নয়। তবে সেচমন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা, তিনি ধরমবীরের দানপত্রটা গ্রহণ করলেন কী করে? এই সঙ্গে আমার প্রস্তাব: 'নজরুল ভবন' হবে সরকারী সম্পত্তি এবং একটি ট্রাস্টিবোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, আর সেই বাড়িতে নজরুল বাস করবেন এবং নজরুল মিউজিয়ামরূপে কাজ হবে। এক্ষেত্রে আইনসঙ্গতভাবে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন আসে না। এ ছাড়া নজরুলের ক্ষেত্রে বাড়ি অপেক্ষা তাঁর সাহিত্য-কীর্তিকে রক্ষা করা প্রধান কাজ।"

টুকরো খবর

ভবিষ্যতে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভিন্ন শরিক পার্টি নিজেদের মতপার্থক্য নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনায় অংশ নেবেন না, এই

ন্যূনতম কোড অফ কন্ডাক্ট যুক্তফ্রন্ট গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন পার্টির মধ্যে মত-পার্থক্য হলে তা প্রকাশ্যে না জানিয়ে নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলা হবে। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তখন ফ্রন্টের নিকট তা পেশ করা হবে এবং সেই চেষ্টাও সার্থক না হলে সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশের মধ্যে তা প্রকাশ করা যেতে পারে। সকল দলের প্রতিনিধিই একবাক্যে বলেছেন যে চোদ্দটি পার্টিকে নিয়ে ফ্রন্ট গঠন করে যে পরীক্ষা চলছে, সারা ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত মানুষরা সেদিকে তাকিয়ে আছেন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে জেলা পর্যায়ে যুক্তফ্রন্ট কমিটি গঠনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ফ্রন্টের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এই সংবাদে সকলেই আনন্দিত হবেন।

*

বাংলাদেশের কলকারখানায় বাঙালী অফিসার এবং কর্মচারীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এই অভিযোগ উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ভবনে বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিদের বৈঠকে পেশ করেছেন। তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন যে, বাঙালী-অবাঙালী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের নেই, তবে শিল্পপতিদের বোঝা উচিত এইভাবে অবিচার চলতে থাকলে এই রাজ্যেও শিবসেনার মত সংগঠন মাথা তুলতে পারে। এই বৈঠকে উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বলেন, কলকাতা উন্নয়নের জন্য গঠিত কর্পোরেশনে শিল্পপতিরা মেজরিটি শেয়ার দাবি করায় দিল্লীও বিস্মিত হয়েছে। তাঁর ধারণা শহর উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে জঞ্জাল সাফাই-এর ওপর, শুধুমাত্র গৃহ, সেতুর ওপর নয়। শিল্পপতিদের কলকাতার উন্নতি সাধনে যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে জঞ্জাল সাফাই, জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির দিকেও শিল্পপতিদের দৃষ্টি দিতে হবে। শ্রীলাহিড়ী শিল্পপতিদের শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণ করতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, কোম্পানীগুলি বলতে গেলে কোন পয়সা না দিয়েই শ্রমিকদের জন্য বাড়ি তৈরি করতে পারেন। কেন্দ্র টাকা দিতে ইচ্ছুক তবুও কিছু হচ্ছে না।

চন্দ্রশেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবলিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরগণ—ইংরেজ? একবার পেলে হয়—মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড :
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

*

কাশীপুরে গুলী চালানোর ব্যাপার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছেন। আমরা আগেই বলেছিলাম যে, ওই ব্যাপারে যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পুলিশ কেস করেছেন, তখন তদন্ত কমিশন বসানোর কোন অর্থ হয় না, কেন না এখন আদালতে অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব পুলিশের, পুলিশ তা প্রমাণ করতে পারলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাজা হবে, না পারলে তারা খালাস পাবে। পক্ষান্তরে তদন্ত কমিশন বসালে উক্ত ব্যক্তিদের আদালতে অভিযুক্ত করার সুপারিশ কমিশন না করা পর্যন্ত কিছুই করার নেই, কমিশন উপরি উক্ত সুপারিশ করবেন কি না তাও বলা শক্ত। নরহত্যার অভিযোগ যাদের নামে আনা হয়েছে তারা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানের আশ্রিত বলেই যদি রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করার সুযোগ না পান তাহলে ন্যায় বিচারের আদর্শ রক্ষিত হয় না। তবে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের গতিগতি দেখে মনে হচ্ছে যে তাঁরা কিছুটা মচকেছেন, তদন্ত কমিশন নিয়ে তেমন আর মাতামাতি করতে চাইছেন না। পক্ষান্তরে যে তিনজন ব্যক্তিকে সামরিক কর্তৃপক্ষ আড়াল করতে চাইছেন, স্বরণ সিং-এর বিবৃতির ভাষ্য করলে যা দাঁড়ায়, তাদের আদালতের হাতে সমর্পণ করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু দাবি জানিয়েছেন এবং এই দাবি রক্ষিত না হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করবেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

*

পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি সন্তোষজনকভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দলমত নির্বিশেষে যে সমাজবিরোধীদের দমন করতে আদেশ দিয়েছেন, তা কার্যকর করার জন্য পুলিশী প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটেছে। কসবা অঞ্চলে পুলিশ ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে, যার ফলে ওখানে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এই রকম পুলিশী অভিযান পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই করা উচিত। সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে তৎপর করার জন্য থানা পর্যায়ে পুলিশ কর্মচারীদের ব্যাপক বদলী করা উচিত, যাতে পুলিশের পক্ষে আঞ্চলিক স্বার্থমুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয়। আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি যে, পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় সমাজবিরোধীদের একটা আনহোলি অ্যালায়েন্স প্রায়শই গড়ে ওঠে, যার ফলে সমাজবিরোধীদের দমন করা যায় না। এ প্রসঙ্গে চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত থানার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে সাধারণ কনস্টেবল থেকে সুরু করে অফিসার (অবশ্য বর্তমানে যিনি অফিসার-ইন-চার্জ, তিনি নতুন এসেছেন এবং দক্ষ অফিসার হিসেবে তাঁর সুনামও নাকি আছে।)—প্রায় সকলেই সমাজবিরোধীদের সঙ্গে আনহোলি অ্যালায়েন্স করে নাকি প্রচুর রোজগার করে থাকেন বলে নানা অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের কয়েকটি দুর্বৃত্ত-শ্রেণীর যুবক (এর মধ্যে একজন নাকি কলকাতা পুলিশের কর্মচারী, একজন মিলিটারী সার্ভিস থেকে এ্যাবস্কণ্ডার।) বারাসত থানার বিভিন্ন এলাকায় গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে, ট্রেনে-বাসে, পথে-ঘাটে চুরি, পকেটমারা, ছিনতাই, বোমাবাজী, ইত্যাদি এদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম; অথচ বারাসত থানার পুলিশ এদের খুঁজে পায় না—খুঁজে পেলেও ছেড়ে দেয়, এমন কি উল্টে গুণ্ডামি-স্থলে গিয়ে গুণ্ডাদের বদলে স্থানীয় নিরীহ লোকদেরই শাসায়। বারাসত থানায় নিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীদের অবিলম্বে অন্যত্র অপসারণ না করলে মধ্যমগ্রাম অঞ্চল যে কোন মুহূর্তে বর্তমানের কসবা বা অতীতের বেলঘরিয়ায় পরিণত হতে পারে।

বেলঘরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বছরের পর বছর সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তা বন্ধ করা সম্ভবপর হয়েছে ওখানে নিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীদের ব্যাপক বদলী ঘটিয়ে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্মরণ রাখা উচিত যে, আইন ও শৃংখলার ধুয়ো তুলে তাঁদের অপদস্থ করার প্রচেষ্টা প্রতিমুহূর্তেই হবে এবং সরকারের সামান্য অসতর্কতার সুযোগ প্রতিপক্ষ সর্বদাই গ্রহণ করার চেষ্টা করবে। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে নরককাণ্ড বাধানো হচ্ছে তা দেখেই আশা করি যুক্তফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট শিক্ষালাভ করবেন।

ভারত দর্শন

বর্ধমান বৃহৎ পরিবার

ডঃ জাকির হোসেনের আকস্মিক লোকান্তরে ভারতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষের চোখে-মুখে শোকের যে মলিন ছায়া নেমে এসেছিল ডঃ হোসেনের ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয় আদর্শবাদের সেটাই সর্বোত্তম স্বীকৃতি। ডঃ জাকির হোসেন ছিলেন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ বৃহৎ পরিবারে সত্যকার সংস্কারমুক্ত জ্ঞানতপস্বী এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যিনি বিশ্বাস করতেন, "আমাদের এই বৃহৎ পরিবার অনুক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব পথে তাকেই সমৃদ্ধি-শালী করে তুলতে সর্বতোভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে।" আর এই বিশ্বাসে স্থিরসঙ্কল্প ছিলেন বলেই জাকির হোসেন বৃটিশের জাতীয়তা-বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে 'মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ' থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ছয়জন ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে। সেই তাঁর যাত্রা শুরু। এক জাতি এক প্রাণ একতার মন্ত্রে সেই তাঁর দীক্ষা গ্রহণ। সংস্কারমুক্ত জাতীয়তা-বাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের ওপর তাঁর বিশ্বাস গ্রথিত ছিল বলেই ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে তিনি অলঙ্কারবিশেষ হতে পেরে-ছিলেন। সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণে বেগ পেতে হয় নি তাঁকে। তিনিই প্রথম ভারতের রাষ্ট্রপতি যাঁকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকাংশের সমর্থন নিয়ে ঐ পদে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়েছিল। ডঃ হোসেনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর ব্যক্তিগত প্রতি-দ্বন্দ্বী নন। সে লড়াই ছিল কংগ্রেসী এবং বিরোধীদের লড়াই। ডঃ হোসেনের নির্বাচনের পর তাই খুবই সহজে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলে গ্রহণ করতে পেরে-ছিলেন।

ডঃ হোসেন যেমন নিজে কোনদিন আপনাকে সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি বলে গণনা করেন নি, সমগ্র ভারতবর্ষও তেমনি কোনদিন তাঁকে সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টির ঘসা কাঁচ চোখে পরে দেখে নি।

তিনি ছিলেন আমাদের বৃহৎ ভারতীয় পরিবারের প্রীতিধন্য নেতা। তাঁর আকস্মিক লোকান্তরে তাই গোটা পরি-বারই শোকাচ্ছন্ন।

তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রকৃষ্ট পন্থা তাই তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শে অনুরক্তি ও শ্রদ্ধা। সেই আদর্শ হল সংস্কারমুক্ত জাতীয় চেতনাকে সর্বদা সতর্ক ও জাগরূক রাখা।

তাই যদিও আজ ডঃ হোসেনের মর-দেহ আমাদের সঙ্গে নেই, কিন্তু তাঁর এক জাতি এক প্রাণের আদর্শ চিরকাল আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে এবং যতকাল থাকবে, ততদিন ডঃ হোসেনের অমর আত্মার আশীর্বাদও থাকবে আমাদের সর্ব-কাজের নিশ্চিতে ওতপ্রোত হয়ে।

উত্তরাধিকারী

ডঃ জাকির হোসেনই প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন, আবার প্রথম, যিনি সেই মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রপতির আসনে কার্যরত অবস্থায় লোকান্তর যাত্রা করলেন। এমনতর পরিস্থিতি ইতিপূর্বে ঘটে নি বলেই সাংবিধানিক রীতিতে তাঁর উত্তরাধিকারী কে, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উপরাষ্ট্রপতিই কি পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপতির শূন্য আসন পূর্ণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রে সে নিয়ম আছে, নেই কিন্তু ভারতের সংবিধানে। তাই ভি, ভি, গিরি পদাধিকার বলে স্বাভাবিক উত্তরাধিকার লাভ করতে পারছেন না। সংবিধানের ৩৫ নং ধারায় তেমন নির্দেশ নেই। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও তাঁর কার্যভার গ্রহণকাল পর্যন্তই উপরাষ্ট্রপতি উত্তরাধিকার বলে রাষ্ট্রপতির কাজ চালিয়ে যাবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনপর্ব সম্পন্ন করে নিতে হবে ছয়মাসের মধ্যেই। এ পর্যন্ত এ হেন ঝামেলা পোহাতে হয় নি। কারণ পূর্বাপর সমস্ত ব্যবস্থাই করে গেছলেন জওহরলাল নেহরু। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে। শুধু যে এই দুজনে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন তাই নয়, উত্তর ভারত থেকে যেমন নেহরু গ্রহণ করেছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদকে, দক্ষিণ ভারত থেকে তেমনিই তিনি বেছে নেন ডঃ রাধা-কৃষ্ণনকে। আর এতদ্দ্বারা উভয় ভূখণ্ডের মনস্তুষ্টি সম্ভব হয়েছিল। ডঃ রাধা-কৃষ্ণনকে রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করার কালে উপরাষ্ট্রপতির আসনে তিনি আনলেন ডঃ জাকির হোসেনকে, আর এইভাবে যেমন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে রূপায়িত করা হল হোসেনের প্রতিনিধিত্বে তেমনি সন্তুষ্ট করা হল ভারতের সর্ব-বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে। বৃহৎ ভারতীয় পরিবারের বড় ভাই ছোট ভাই-এর দাবি এইভাবেই মেনে নেওয়া হয়েছিল সেদিন।

এইভাবে বৃহৎ ভারতীয় পরিবারের সকল সম্প্রদায়ের মনের ক্ষোভ মিটিয়ে দেওয়ার যে রেওয়াজ চলে আসছে, তাতে ঐ ধারার অনুসরণ করলে এবার যাঁদের দাবির প্রতি দৃষ্টি দিতে হয় তাঁদের মধ্যে সম্প্রদায় ভিত্তিতে দাবিদার হলেন, অনুন্নত সম্প্রদায় আর অঞ্চলভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম।

এ পর্যন্ত ভারতের না-প্রধানমন্ত্রী, না-রাষ্ট্রপতি কোন পদেই এই তিনের দাবি পূরণ করা হয় নি। ভারতে পদবণ্টনের ক্ষেত্রে পূর্ব ভারত অবহেলিত, বিশেষ বঙ্গভঙ্গের পর বাংলার দাবি প্রায় নস্যাৎ হয়ে গেছে। ক্যাবিনেটে একটি দায়িত্বশীল মন্ত্রিত্বের দাবিও তার নেই। বাংলার অধি-কাংশ জমি কেটে বাদ দিয়ে ভারতের উত্তর দেশীয় প্রভুবৃন্দ এইভাবেই বাংলাকে হীনবল করে রেখেছেন। আসাম থেকেও দায়িত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী আছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আইন ও অর্থ দপ্তরে মন্ত্রিত্ব স্থায়ী হয় নি। রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করতে পারেন এমন কৃতী সন্তান পশ্চিমবঙ্গ একাধিক পরিমাণে যোগান দিতে সক্ষম হলেও তা গ্রাহ্য হবে না। তাই পূর্ব ভারতের দাবি গোল্লায় গেছে। পূর্ব ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতও পারে উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের যোগান দিতে। অবশ্য এই মুহূর্তে তেমন কোনও ব্যক্তিকে স্মরণ হচ্ছে না। পশ্চিম ভারতে মোরারজী পাতিলের জয়-জয়কার। কিন্তু রাষ্ট্রপতির আসনে এঁরা অকল্পনীয়। কারণ একবাক্যে কেউই নিষ্কলুষ নন—অর্থাৎ বিরুদ্ধে অভিযোগ একাধিক।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগ-জীবন রামকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রস্তাব করে বর্ষীয়ান কংগ্রেস সদস্য শেঠ গোবিন্দ দাস বলেছেন : আমরা যে জাতিভেদে বিশ্বাসী নই এতদ্দ্বারা তাই প্রমাণিত হবে। এস এস পি দলের পক্ষ থেকে

একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

শ্রীইন্দ্রকুমারও একজন হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতিরূপে বরণ করার অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস অবশ্য এ-বিষয়ে এখনও চুপচাপ। আবার এস এস পি-র অন্যতম নেতা শ্রীভোলাপ্রসাদ সিং নির্দলীয় সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকেই উপযুক্ত প্রার্থিরূপে গণনা করেন। স্বতন্ত্র দলের ঝোঁক সুব্বা রাওয়ের প্রতি।

শ্রীজগজীবন রামের অনুকূলে যদিও আবহাওয়া বেশ নরম, কেন না একে তো অস্পৃশ্যতা সমস্যা নিয়ে এই মুহূর্তে দেশজোড়া আলোড়ন, তার ওপর এটা হল গান্ধী-শতবার্ষিকী বর্ষ। গান্ধীজীর হরিজনপ্রীতি সর্বজনবিদিত। এই মুহূর্তে জগজীবন রামকে প্রার্থী খাড়া করলে অনেকের ধারণা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বিঘ্নে নির্বাচন সমাধা হতে পারে।

১৯৭২ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না বলে রাজনৈতিক মহলে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেই আশঙ্কার আঁচ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে স্পর্শ রেখে যেতে বাধ্য। যিনি রাষ্ট্রপতির আসন অলংকৃত করবেন তিনি ১৯৭২-এর পরেও ঐ পদে বহাল থাকছেন, এই প্রশ্নটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাই রাজনীতিকদের আজ প্রধান বিবেচ্য, ১৯৭২-এর পর রাষ্ট্রতরণীর হাল দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরতে সক্ষম এমন একজনকে প্রার্থিরূপে বাছাই করা। যিনি থাকবেন দলাদলির ঊর্ধ্বে। কেন্দ্র-রাজ্যের তিক্ত সম্পর্ক, সাংবিধানিক সঙ্কটাদি থেকে যিনি পারবেন দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ দান করতে। এই সম্ভাবনা[illegible] কেউ কেউ জয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যে [illegible] পাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ত[illegible] প্রতি কি দলমতনির্বিশেষের আস্থা [illegible]। তাঁর পূর্বতন রাজনৈতিক ভূমিকা কি এ প্রসঙ্গে বিবেচিত হবে না?

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে শ্রেষ্ঠী মদত

অবশেষে সেই বহু বিতর্কিত বিলটি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলিকে মদত দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দান নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিল প্রথম উত্থাপিত হয় ১৯৬৮ সালের তেসরা মে তারিখ। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতার বিরুদ্ধাচরণের ফলে অভীষ্ট পথে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। পুনরায় বিলটি উপস্থাপিত করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দীন আলি আহমেদ। একই বিলে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলোপের প্রস্তাব আছে।

কোম্পানী দানসংক্রান্ত অংশটি লোকসভায় দলনির্বিশেষে অভিনন্দিত হয়েছে। স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীমাসানী দাবি করেছেন যে, যদিও তাঁর দল এই বাবদ মোটা আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেন তবু তিনিই প্রথম কোম্পানী দান বিলোপের দাবি তুলেছিলেন ১৯৬০ সালে, আর তা নস্যাৎ করে দেন কংগ্রেসী পক্ষ।

কংগ্রেসের শ্রী পি সি ভার্মা বলেছেন, স্বতন্ত্র দল কংগ্রেসের চেয়ে ঢের বেশি 'দান' ন্যস্ত করে থাকে। ঐ বিল এখনই গ্রহণ করে ব্যবসায়ী মদত নিষিদ্ধ করা উচিত।

জনসঙ্ঘের শ্রী কে এল গুপ্ত স্মরণ করেছেন উক্ত বিলের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন যে সমুদয় কংগ্রেসী নেতা, তাঁদের। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ করে শ্রী এস কে পাতিল, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষের উল্লেখও করেন আর বলেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে কোম্পানী মদত পাওয়ার লোভেই কংগ্রেস এই বিল উত্থাপনে গড়িমসি করে আসছিল।

বিল উত্থাপন করে ফকরুদ্দিন আলি সাহেব সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, এ বিল রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে প্রয়াসী।

লক্ষণীয় এই যে, পাতিল সাহেবের সমমনোভাবাপন্ন দলত্রয় একত্রে বিলটি নিয়ে আজ যেরকম বক্তব্য সব হাজির করছেন তাতে এই আশা রাখা যেতে পারে যে, কোম্পানী ম্যানেজমেণ্টে একচেটিয়া অধিকার সংরক্ষণের বিপক্ষেও তাঁরা এগিয়ে আসবেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি। স্বতন্ত্রের মাসানী মহোদয় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বিলোপের ঘোরতর বিরোধী। তিনি পুরো বিলটাই একটা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণে উৎসাহী, কারণ তাঁর মতে বিলটি বিতর্কমূলক। কোম্পানী অনুদানের ক্ষেত্রে মাসানী মহোদয় যখন বলছেন, অনুদান প্রদানে শেয়ারহোল্ডারদের হাত থাকে না তাই এই প্রথা তাঁদের স্বার্থেই বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন, ঠিক সেই সময়ই তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা রক্ষিত হওয়া উচিত, কারণ শেয়ারহোল্ডাররা কোন্ ধরণের ম্যানেজমেণ্ট বরণ করে নেবেন তা তাঁদের বিবেচ্য। তাঁদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অনুচিত।

মাসানী সাহেবদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বক্তব্যটাই যে মূলত স্ববিরোধী অর্থনীতির সাধারণ ছাত্রও তা অবগত আছেন। স্বতন্ত্র দল ব্যবসায়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ও সর্বনিম্ন সরকারী হস্তক্ষেপের প্রবক্তা। বলা বাহুল্য ঐ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বুলিটাই একটা মস্তবড় ধনতান্ত্রিক ভাঁওতা। ব্যবসার ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজিপতির সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবসায়ী সমাজ নস্যাৎ হয়ে যাবেই আর একচেটিয়া মালিকানার মোচ্ছব শুরু হবে, যা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকেই সর্বতোভাবে গ্রাস করবে। ব্যবসায়ে স্বাধীনতা ভোগ করবেন মুষ্টিমেয় দু-একটি বৃহৎ পুঁজিপতি। জাতীয় সম্পদ তাঁদেরই কুক্ষিগত হবে এবং নিষ্কলুষ রাজনীতির ভাঁওতাপূর্ণ বুলিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেশের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতাকেও সেই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিই মুঠোর মধ্যে ধরে রাখবেন। ইতিহাসের এই বস্তাপচা চাতুরী নিয়ে

আসানীরা আজও বাজার মাৎ করবেন বলে বিশ্বাস রাখেন কেবলমাত্র টাকার জোরে, সুতরাং এই ভাঁওতা আজ সর্বত্রই জলের মতো পরিষ্কার।

হঠাৎ কোম্পানী অনুদান বন্ধের ব্যাপারে এ'দের সাড়ম্বর উৎসাহেও তাই সন্দেহের অবকাশ থাকে। অকস্মাৎ এই দুর্মতির কারণ কি?

কারণটার কিছুটা আঁচ বোধ হয় কংগ্রেসী এক শ্রেণীর গোড়াতেই ধরা পড়েছে। তাঁর মতে, স্বতন্ত্র দল কংগ্রেসের চেয়ে ঢের বেশি অনুদান বাগিয়ে নিয়েছে। বলা বাহুল্য, পুঁজিপতি স্বার্থে এইভাবেই সংঘাতের শুরু হয়। ভাগে ও ভাগাভাগিতে টান পড়লে সচেতনা জাগে। কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাতে বসেছে দেখে পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যেও বিভ্রান্তি দেখা গেছে। ১৯৬৭-র নির্বাচনে কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পুঁজির মালিকরা প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে জনসংঘ স্বতন্ত্র দলকে অর্থে ও লোকবলে সাহায্য করেছে। তাঁদের শোষণের চূড়ান্ত সুযোগদানে এতটুকু কার্পণ্য দেখা দিলে এই ব্যাপার ঘটবেই। কিন্তু একটি সর্বভারতীয় দল হিসেবে কংগ্রেসকে সাধারণ মানুষের স্বার্থও দেখতে হয়।

(১০।৬।৬৯)

সানলাইটে প্রতিবার আপনার জামাকাপড় আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

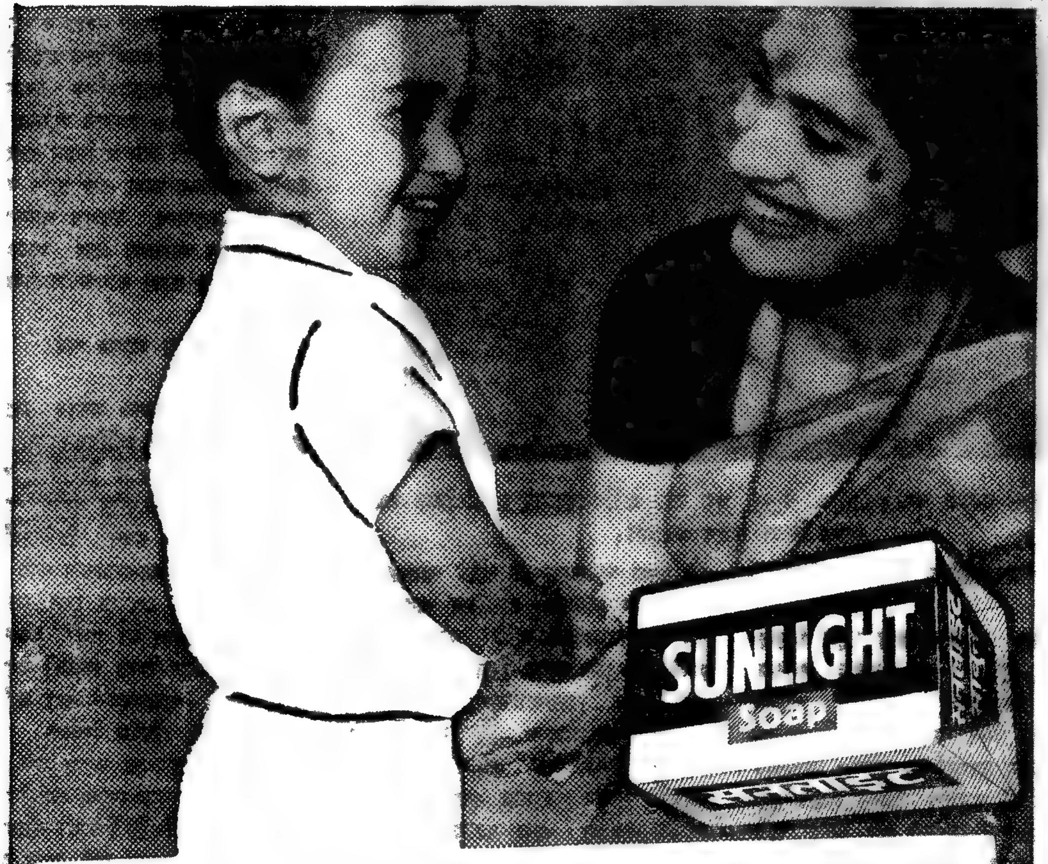

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন···কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

লিনটাস-S. 62-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

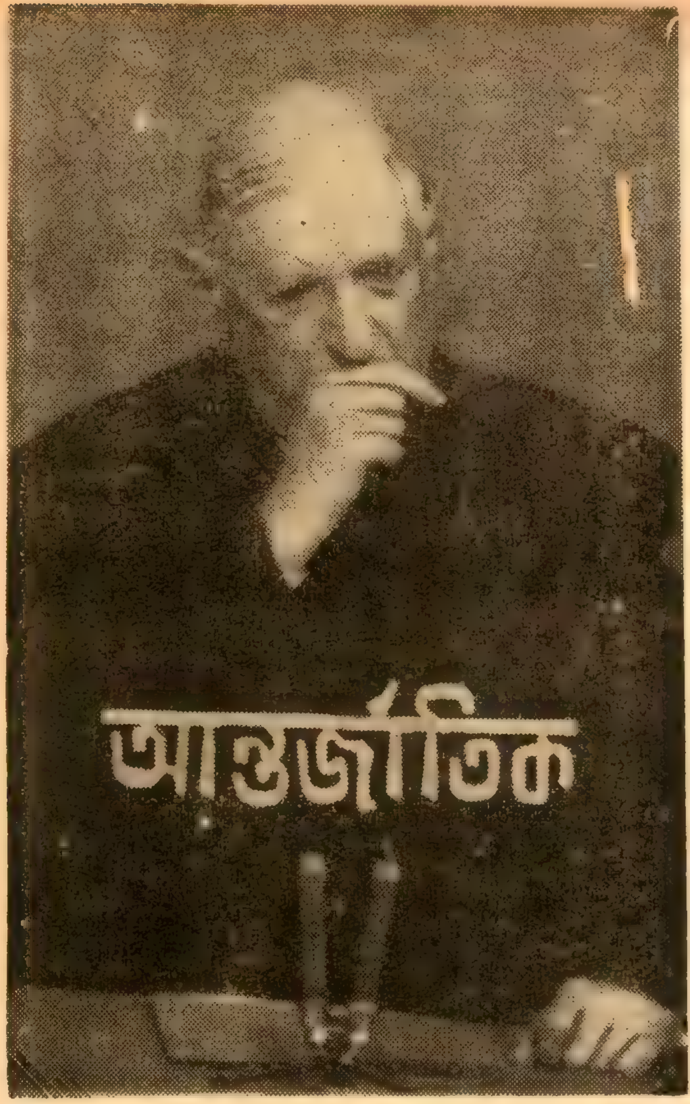

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। প্রেসিডেন্ট দ্য গল তাঁর জীবিতকালেই রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ইসরাইল—পারমাণবিক বোমার অধিকারী

১৯৬৭ সালের জুন মাসে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে পশ্চিম এশিয়ায় কোনদিনই পরিপূর্ণ শান্তি ফিরে আসে নি। দুই পক্ষের মধ্যে বড় রকমের কোন সংঘর্ষ না হলেও ছোটখাট সংঘর্ষ লেগেই আছে। কিন্তু তাতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ মোটেই কম নয়। এই অশান্তির মধ্যে সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে যে ইসরাইল নাকি পৃথিবীর ষষ্ঠ পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর "ডার স্পিগেল" পত্রিকা এবং আমেরিকার "মণ্ট্রিল গেজেট" পত্রিকা প্রত্যক্ষ সূত্রে জানতে পেরেছেন যে, নেগেভের মরুভূমিতে ইসরাইলীরা একটা পারমাণবিক বোমার কারখানা খুলেছে এবং সেই কারখানায় ইতিমধ্যে ৬টি ৫ থেকে ২০ কিলোটনী পারমাণবিক বোমা তৈরি হয়েছে। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে এই রকম ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পারমাণবিক বোমাই বর্ষণ করা হয়েছিল এবং তার ফলে জাপানের ঐ দুটি বর্ধিষ্ণু শহর কার্যত মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখনও তার বিষক্রিয়ায় বহু লোক বছরের পর বছর অকালমৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ইসরাইলের এই পারমাণবিক অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে ফরাসী গভর্নমেণ্টের সাহায্য এবং সহায়তায়। এই সংবাদ প্রকাশিত হবার পর ইসরাইলী সরকার কোন প্রতিবাদ করেন নি। মিশরের গোয়েন্দা বিভাগ গত ফেব্রুয়ারী মাসেই এই পারমাণবিক বোমার কথা জানতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবাদটা তাঁরা সোভিয়েট রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেন। মস্কো এ-ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে তাঁর ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত নৌবহরে পারমাণবিক অস্ত্রবাহী কিছু জাহাজ পাঠিয়ে দেন। ইসরাইল পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ায় পশ্চিম এশিয়ার শক্তি-সাম্য তো নষ্ট হয়েছেই, অন্যান্য দেশেও গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকার মনে করছেন, ইসরাইলের পারমাণবিক বোমা লাভের পর পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধান করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। এর পর আরব রাজ্যগুলোকে পারমাণবিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সোভিয়েটের উপায় থাকবে বলে মনে হয় না। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার নিরোধক চুক্তির কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলো নিরাপত্তা পরিষদে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। কাজেই ইসরাইলের পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার সংবাদে আমেরিকাও কম দুশ্চিন্তায় পড়ে নি। পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধক চুক্তির ভবিষ্যৎ যে খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন, এটা তারই লক্ষণ। রাষ্ট্র-সঙ্ঘে ইসরাইল সেই চুক্তির পক্ষে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও গোপনে গোপনে সে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে যাচ্ছিল। ভারত সেই চুক্তির পক্ষে ভোট দেয় নি। এখন দেখা যাচ্ছে ভারতের সেই সিদ্ধান্ত মোটেই অযৌক্তিক হয় নি। ইসরাইলের এই পারমাণবিক বোমা তৈরি শুরু হয় ১৯৫৬ সালের সুয়েজ যুদ্ধের পর। প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন এবং প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের মধ্যে এক চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স এ-ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে। পরে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আর্জেণ্টিনার কাছ থেকেও তারা যথেষ্ট সাহায্য পায়।

দ্য গলের পর

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। প্রেসিডেণ্ট চার্লস দ্য গল তাঁর জীবিতকালেই ফ্রান্সের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্শাল পেঁতা যখন হিটলারী সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে ফ্রান্সকে নরকের দ্বারে পৌঁছে দেন, সেই সময় তরুণ জেনারেল দ্য গল ফ্রান্স থেকে পালিয়ে বৃটেনে গিয়ে প্রবাসী ফরাসীদের নিয়ে একটি গভর্নমেণ্ট এবং মুক্তিফৌজ গঠন করেন। তিনি ছিলেন পেশাদার সৈনিক এবং যুদ্ধের আগে কখনও রাজনীতি করেছেন বলে শোনা যায় নি। যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি বিজয়ী বীরের বেশে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন বটে, তবে বেশিদিন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকার সুযোগ পান নি। রাজনৈতিক দলাদলি এবং ব্যক্তিগত কলহের ফলে যুদ্ধপরবর্তীকালে বছরের পর বছর ফ্রান্সে স্থিতিশীল গভর্নমেণ্ট গঠন করা এক দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত নিম্নগামী হতে থাকে। ইতিমধ্যে ফরাসী উপনিবেশ আলজেরিয়ায় মুক্তি-আন্দোলন উগ্রমূর্তি ধারণ করে এবং সেখানে বসবাসকারী

ফরাসী অধিবাসীরা আলজেরিয়দের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ফ্রান্সের ওপর চাপ দিতে থাকে। সেনাবাহিনীর এক শক্তিশালী অংশকে হাত করে তারা ফ্রান্সে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করতেও পিছপা হয় না। সেই সঙ্কট মুহূর্তে ফ্রান্সের রাজনৈতিক মঞ্চে দ্য গলের পুনরাবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তিনি একগুঁয়ে এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী হলেও ডিক্টেটর হতে চান নি। তাই ক্ষমতা লাভের পরই তিনি গণভোটের মাধ্যমে নিজের প্রতি জনগণের আস্থা আদায় করে নেন। তারপর যতবার তাঁর কোন সিদ্ধান্ত অথবা কার্যক্রম দেশে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি করেছে, ততবারই তিনি গণভোটের মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন। গত এক যুগ তিনি এইভাবে ফ্রান্সের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে সেই দেশ শাসন করেছেন। তাঁর স্থিতিশীল শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় ফ্রান্স অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছিল এবং দ্য গল হয়ে উঠেছিলেন পশ্চিম য়ুরোপের মুখ্য রাজনৈতিক নায়ক। তাঁরই একগুঁয়েমীতে বছরের পর বছর চেষ্টা করেও বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অংশীদার হতে পারে নি। মাত্র কয়েক মাস আগে দেশব্যাপী শ্রমিক ও ছাত্র-বিক্ষোভ এবং লাগাতার ধর্মঘটের ফলে ফ্রান্সে যখন রাষ্ট্রবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়েছিল, তখন দ্য গল নাটকীয়ভাবে শ্রমিক ও ছাত্রদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন এবং সেই নির্বাচনে তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জয়ী হয়। কয়েকমাস বাদে ফ্রান্সের মুদ্রা

মিতারাণ্ড

সঙ্কট যখন পশ্চিমী দুনিয়ায় নিদারুণ সঙ্কট ডেকে এনেছিল তখন তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ফ্রাঁর মূল্য হ্রাস করা ছাড়া অন্য কোন উপায় আছে বলে কারও মনে হয় নি। দ্য গল কিন্তু মুদ্রামূল্য হ্রাস না করেই সেই সঙ্কটের হাত থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পেয়েছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দ্য গল টিকে থাকতে পারলেন না। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব নিয়ে দারুণ মতভেদের সৃষ্টি হয়—এমন কি তাঁর নিজের সমর্থকদের মধ্যেও। তখন দ্য গল তাঁর নিজস্ব কায়দায় আবার গণভোটের সম্মুখীন হন। কিন্তু এবার তাঁকে হার মানতে হল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এবার জয়লাভ করলে তিনি ১৯৭২ সালে চিরকালের মত ক্ষমতা থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। গণভোটের ফলাফল প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে উত্তরাধিকারের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। পম্পিদু, গিসকার্ড দ্য এস্টিং এবং দ্য মারভিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে বহু সমর্থক পেয়ে যেতে পারেন। পোহার সম্ভবত মধ্যপন্থীদের প্রার্থী হবেন। মিত্তারাণ্ডও সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে পারেন। কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যেই দুক্লোকে দাঁড় করাবার কথা ঘোষণা করেছেন। জেনারেল দ্য গল যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তা তাঁর বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে। দক্ষিণ ও মধ্যপন্থীরা বরাবরই দ্য গলকে সমর্থন করতেন। বামপন্থীরা অন্য কোন ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ না থাকলেও দ্য গলের বিরোধিতায় সব সময় ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। বর্তমানে ফ্রান্সে বিভিন্ন দক্ষিণ বাম ও মধ্যপন্থী দলগুলোর মধ্যে যে রেষারেষি দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে সম্পর্কের যে পুনর্বিন্যাস ঘটছে, তাতে সেখানে বিভিন্ন দলের মধ্যে সুবিধাবাদী পার্লামেন্টারী কোয়ালিশন গড়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। সে অবস্থায় ফ্রান্সে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রকট হয়ে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফ্রান্সে যে আবার মুদ্রা-সঙ্কট দেখা দিয়েছে, সেটা মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। নতুন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় আসবার আগেই এই নিদারুণ মুদ্রা-সঙ্কট ফ্রান্সকে কোথায় নিয়ে যায়, সেটা লক্ষ্য করলেই ফ্রান্সের অনাগত ভবিষ্যৎ আঁচ করা সহজ হয়ে উঠবে। দ্য গলের বয়স বর্তমানে ৭৮ বছর। অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি আজীবন ৩৫ হাজার ডলার করে

পম্পিদু

পেনসন পাবেন। দ্য গলের বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে মহাপ্রলয় ঘটবে বলে যে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা একেবারেই অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফ্রান্স প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গেই এই নতুন পরিস্থিতি গ্রহণ করেছে এবং কোথাও কোন অশান্তির লক্ষণ দেখা যায় নি। ইতিহাস অতি নির্মম এবং নিষ্করুণ। নিজের প্রয়োজনেই সে পৃথিবীতে নতুন নতুন নায়ক সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তাকে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করে। দ্য গলের কাছ থেকে যতটুকু আদায় করার ছিল, তা ইতিহাস আদায় করে নিয়েছে। এখন আর কিছু পাবার নেই জেনে তাঁকে সে বিনা দ্বিধায় বিদায় করে দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী বীর চার্চিলকেও ইতিহাস এমনি নির্মমভাবেই বৃটেনের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় দিয়েছিল। ইতিহাস নায়ক সৃষ্টি করে কিন্তু নায়ক যদি ইতিহাসকে আয়ত্ত করতে না পারেন, তাহলে ইতিহাস তাঁকে ক্ষমা করে না। দ্য গল পশ্চিমী দুনিয়ায় ফ্রান্সের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য চিরকাল চেষ্টা করে গেছেন। সেজন্য বৃটেন, আমেরিকা এবং পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রনায়করা তাঁর ওপর খুব খুশি ছিলেন না। তাই দ্য গল অপসৃত হওয়ায় তাঁদের মনে খুশি দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ফ্রান্সের নতুন নায়করা ফ্রান্সের সেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না। কারণ জাতীয় মর্যাদার পরিপন্থী কোন কাজে অগ্রণী হলে ইতিহাস সেটা বেশিদিন বরদাস্ত করবে না।

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

সত্য সেলুকাস ! কি বিচিত্র এই দেশ!
সাইন বোর্ডে মার্ক্সবাদী, কাজে কংগ্রেস।
চ্যবন জ্যোতি এক হ্যায়
ভুলো মৎ—ভুলো মৎ।

চারিদিকে পরিপূর্ণ যুদ্ধের আবহাওয়া—লাঠি, টিয়ারগ্যাস, বোমা, পটকা, সোডার বোতল, পাইপগান—একের পর এক ব্যক্তি আহত হচ্ছে, ধরে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে, কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে, রুমাল বেঁধে সেই রক্ত বন্ধ করতে গিয়ে শাদা রুমাল রক্তাক্ত হয়ে উঠছে। একদা শ্রমিক শ্রেণীর বুকের রক্তে পতাকা রক্তাক্ত হয়েছিল, উড়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির পতাকা সারা বিশ্বে। যে দিবস পবিত্র হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির দিন হিসাবে। দিন পরিবর্তন হয়েছে সারা বিশ্বে না হোক ভারতে, ভারতে না হলেও পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই। তাই গত পয়লা মে কলকাতার ময়দানে নতুনভাবে মে দিবস পালনের মহড়া দেখা গেল। বিপ্লব নয়, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলন নয়—নিজেদের যাঁরা কম্যুনিস্ট বলে পরিচয় দেন এবং একে অপরের চেয়ে নিজেকে সাচ্চা বলে মনে করেন, সেই সাচ্চা প্রমাণের প্রতিযোগিতায় এই রক্তাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হল। যাঁরা একে অপরের মাথা ফাটালেন, একে অপরের বুক লক্ষ্য করে অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন—তাঁদের উভয়ের বুকেই ছিল মে দিবসের প্রতীক রক্তপতাকা। মঞ্চে বক্তাদের আওয়াজ ছিল—একদিকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে শ্রীজ্যোতি বসু বলছেনঃ ওরা সমাজবিরোধী। সমাজ-বিরোধীদের ঠাণ্ডা করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। আর একদিকে ময়দান থেকে শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীকানু সান্যাল বলছেনঃ "চ্যবন-জ্যোতি এক হ্যায় ভুলো মৎ।" এই ভাবেই, এই পরিবেশে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম ঘোষিত হল। বড় চমৎকার মিল অতীতের সঙ্গে বর্তমানের—তফাৎ শুধু ডিগ্রীর। সদ্য-গঠিত কম্যুনিস্ট পার্টিকে যদি তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বলা হয়, তবে সে যেমন দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির গর্ভ থেকে বেরিয়ে এল—যেমন দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বেরিয়ে এসেছিল প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে। কিন্তু তৃতীয়ই কি শেষ? অবস্থা দেখে কিন্তু সেটা মনে হবার কোন কারণ নেই, কারণ তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির জন্মলগ্নে ধীরে ধীরে একইভাবে হয়ত দশ মাস দশ দিনের অপেক্ষা করছেন চতুর্থ কম্যুনিস্ট পার্টি। ঠিক একইভাবে কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে যারা দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করলেন—নাম দিলেন কম্যুনিস্ট পার্টি, ব্রাকেটে পুরলেন মার্ক্সবাদকে, আর দ্বিতীয় থেকে বেরিয়ে এসে তৃতীয় একইভাবে ব্রাকেটে পুরলো মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে। সোনার পাথরবাটি কাঁঠালের আমসত্ত্ব-তথ্য যদিও বোঝা যায়, কিন্তু কোনদিনই বোঝা যাবে না কম্যুনিস্ট পার্টির পাশে মার্ক্সবাদী বা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শব্দগুলিকে ব্রাকেটে পুরে লিখবার কি যুক্তি থাকতে পারে?

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ আর কম্যুনিস্ট পার্টি আলাদা কিভাবে হয়—কোন ব্যাখ্যায় তা পাওয়া যাবে না। যে কম্যুনিস্ট, সে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী। এটা মুখে বলে বা লিখে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না—কম্যুনিস্ট পার্টিও মার্ক্সবাদ বা লেনিনবাদ থেকে আলাদা হতে পারে না, অথচ নতুন নতুন কম্যুনিস্ট পার্টি জন্মগ্রহণ করছে আর নামের পাশে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ শব্দ যুক্ত করা হচ্ছে।

ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ যদি না করা হয়, তবে একদিন ভারতের শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবী জনগণ শুধু কম্যুনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী, মার্ক্স-লেনিন, এঙ্গেলসবাদী, মার্ক্স, লেনিন, স্টালিন, ট্রটস্কি, মাও সে-তুং, লিও-শাও-চি-বাদের নামের ভারেই চাপা পড়ে যাবে। শ্রেণী সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক বিপ্লব, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব—সব শেষ হবে এক কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আর এক কম্যুনিস্ট পার্টির লড়াইয়ে। এই কম্যুনিস্ট পার্টির যোদ্ধাগণ নিজেদের মধ্যে ভয়ানক জোর লড়াই করবেন, তীব্র ও প্রাণপণ লড়াই করবেন, শুধু অবসর পাবেন না জনগণের জন্য লড়াই করতে—জনগণকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করতে। গত ১লা মে কলকাতায় কম্যুনিস্ট বনাম কম্যুনিস্ট দলের স্বেচ্ছাসেবকদের যে

মায়েরা !

যেকোন
মামুলী ট্যাল্ক আপনার শিশুর
পক্ষে ভালো এই যদি আপনার ধারণা হয়...

তাহলে
ব্রাডোসল
সম্বন্ধে আপনার
জানা দরকার

আপনার শিশু নিজেই আপনাকে বলুক না কেন—
তার হাসিখুশী খুশি মনের আপনাকে জানায়
যে বিনাকা বেবী পাউডারের একান্ত নিজস্ব বিশেষ
উপাদান ব্রাডোসল মায়ের মতোই সস্নেহে শিশুর
ত্বকের যত্ন আত্তি করে।
আর ব্রাডোসল ত্বকের যন্ত্রণাকর জ্বালাযন্ত্রণা, র‍্যাশ
উঠে যাওয়া ও ভাজিতার ঘা থেকে চুলকানি
থেকে শিশুর ত্বক আরামে রাখে।
বিনাকা বেবী পাউডারের বিশেষ আরামদায়ক
এবং স্নিগ্ধকারী আরামপ্রদ রেশমের মত
মোলায়েম স্পর্শে আপনার ছোট্ট শিশুর
ত্বকের যত্ন নেয়।
স্নিগ্ধ বিনাকা বেবী পাউডার প্রচুর পরিমাণে
সারা গায়ে ছড়িয়ে দিলে আপনার শিশুর
ত্বক দরকার মত দিনের পর দিন শুকনো
নিয়ে থাকবে রাখে।
আপনার বাচ্চাকে নির্ভয়ে সিবার বিনাকা
বেবী পাউডারের হাতে সঁপে দিন।

বিনাকা
বেবী পাউডার

একটি সিবা উৎপাদন

আবারা সাইজের দাম (১৩০ গ্রাম) টা. ৩·৩৫. স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

INTERPUB/CBP/41 BEN

লড়াই হয়ে গেল, তার এই হল একমাত্র ফলশ্রুতি।

কিন্তু যে হুবহু মিলের কথা বলছিলাম, সেটা কিন্তু বেশ চমকপ্রদ, হয়তো এর মধ্যে শিক্ষারও কিছু আছে। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের পর ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়, সেই অন্তর্বিরোধই পরিণতি লাভ করে ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৪ সালের আগে পরের ঘটনাগুলির শুরু হয় জাতীয় মহাফেজখানায় শ্রীডাঙ্গের একখানি চিঠিকে উপলক্ষ করে—তারপর বেরিয়ে এলেন ৩২ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য, তাঁরা প্রথম বৈঠকে মিলিত হলেন তেনালীতে, মঞ্চে মাও সে-তুং-এর ছবি টাঙিয়ে। তারপর কলকাতায় ত্যাগরাজ হলে পার্টি-কংগ্রেস করে গঠিত হল কম্যুনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী। মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ঘোষণা করলো—কম্যুনিস্ট দক্ষিণপন্থীরা হল শোধনবাদী, কংগ্রেসেরই সমগোত্রীয়। ইতিহাসের চাকা ঘুরলো—এল ১৯৬৭ সাল। নকশালবাড়িতে শ্রীকানু সান্যালের নেতৃত্বে শ্রীচারু মজুমদারের দর্শন ভিত্তিতে শুরু হল আন্দোলন। তারপর 'দেশহিতৈষী' পত্রিকা দখলকে কেন্দ্র করে শুরু হল সংঘর্ষ ও বহিষ্কার পর্ব। কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি করে ধীরে ধীরে আলাদা হতে শুরু করলেন একটি দল মার্ক্সবাদী দল থেকে—অবশেষে লেনিনের জন্মদিনে গঠিত হল মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির গর্ভ থেকে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। সেই দিন মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ নতুন পার্টি গড়ে ঘোষণা করেছিলেন—ওরা কংগ্রেসের চর। আর ওরা আর এককাঠি এগিয়ে বললেন—চ্যবন-জ্যোতি এক হ্যায় আর সাইন বোর্ডে ওরা মার্ক্সবাদী, কিন্তু কাজে ওরা কংগ্রেস।

শেষ এখানে নয়—কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ার কাজে যাঁরা অগ্রণী ও পুরোধা ছিলেন, তার মধ্যে শ্রীপরিমল দাশগুপ্ত ছিলেন অন্যতম। শ্রীপরিমল দাশগুপ্ত তাঁর সহগামীদের নিয়ে তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে ঘোষণা করলেন—ওদের দলে তিনি বা তাঁরা নেই, তাঁরা নতুন পার্টি গড়ার পথে এগিয়ে চলেছেন। কারণ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কম্যুনিস্টরা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী হতে পারে, কিন্তু ওরা মাওবাদী নয়। আর ওরা মাও-এর পথে নয়, চলেছে চে গুয়েভারার পথে। তারপর শ্রীপরিমল দাশগুপ্ত প্রায় একই অভিযোগ দায়ের করেছেন নবগঠিত পার্টির বিরুদ্ধে। ভাবী কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্রে প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে—"অসাধু পদ্ধতি বিপ্লবী রাজনীতি নয়।" "পুরাতন পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সময় প্রমোদ দাশগুপ্ত, সুধাংশু দাশগুপ্ত আমাদের সম্পর্কে নানা মিথ্যা, অর্ধসত্য, বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন......এখন বেদনার বিষয়, আপনারাও সেই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন।" এরও জবাব দিয়েছেন 'ঘটনা প্রবাহ' পত্রিকায় স্বয়ং শ্রীচারু মজুমদার ও শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী। শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী লিখেছেন, "পরিমল দাশগুপ্ত প্রসঙ্গে" আর শ্রীচারু মজুমদার লিখেছেন—"পরিমলবাবুর রাজনীতি" বলে বৃহৎ দুইটি নিবন্ধ। একদা দেশহিতৈষী দখলের নামে যে অভিযোগ শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে এনেছিলেন শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, সেই একই অভিযোগ আনা হয়েছে শ্রীপরিমল দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে এবং অভিযোগ এনেছেন শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী। শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী লিখেছেন "চীন-বিরোধী, নকশালবাড়ি-বিরোধী রাজনৈতিক চক্রান্ত হাসিলের জন্য দেশব্রতীকে কব্জা করার যে মতলব ছিল পরিমল দাশগুপ্তের"......ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীচারু মজুমদার বলেছেন—"পরিমলবাবুরা তাঁদের লেখা ও তাঁদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে যে রাজনীতি প্রচার করলেন, তা বিপ্লবীদের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর রাজনীতি। এতকাল যে সংশোধনবাদী পথে চলতে অভ্যস্ত ছিলাম, সেই পথে গা এলিয়ে দেবার পক্ষে বিপ্লবী আচরণে যুক্তি দেবার চেষ্টা হচ্ছে" অর্থাৎ শ্রীপরিমল দাশগুপ্ত সংশোধনবাদী।

এই হল খুব কমকথায় মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী সব ক'টি দলের সর্বশেষ চিত্র। সকলে সকলকে গালি দিচ্ছেন, সকলে সকলকে ধিক্কার দিচ্ছেন, সকলে নিজেকে সাচ্চা কম্যুনিস্ট প্রমাণের চেষ্টা করছেন। এইসব বাণী ও কথা শুনে আমার শুধু মহান লেনিনের ক'টি কথা মনে পড়ছে। সেই কথা হলঃ

> "বিরক্তিকর রোগ চুলকানি। আর যখন বিপ্লবী-বুলির চুলকানি লোককে পেয়ে বসে তখন সেটা শুধু চোখে দেখলেই অসহ্য কষ্ট লাগে। আলোচ্য ধরণের চুলকানিতে যে ভোগে সে, পরিষ্কার বোধগম্য স্বতঃসিদ্ধ এবং মেহনতী জনগণের যে-কোন প্রতিনিধির কাছে তর্কাতীত সত্যগুলিকে বিকৃত করে তোলে। এই বিকৃতিটা প্রায়ই ঘটে সর্বোত্তম মহত্তম ও উচ্চতম অনুভূতি থেকে নিতান্তই কতকগুলি তাত্ত্বিক সত্যের অপরিপাকবশত অথবা তাদের আনাড়ি ছেলেমি ছাত্রসুলভ-দাসসুলভ অপ্রাসঙ্গিক পুনরাবৃত্তির ফলে। (এসব লোকের কথায় বাকে বলে ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান নেই।) কিন্তু তাতে করে চুলকানির কদর্যতা থামে না।
>
> (লেনিন রচনাবলীঃ পঞ্চম রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৩৫ঃ পৃষ্ঠা ৩৬১)

কম্যুনিস্ট পার্টি ক'টা হবে জানি না, অনেকগুলি হলেও দোষ নেই। বহু দেশ আছে যেখানে এক ডজন কম্যুনিস্ট পার্টি, কিন্তু বিপদ হল বিপ্লবী বুলি নিয়ে। বিপ্লবী বুলি যদি আবার চুলকানি সৃষ্টি করে, তবে আরো বিপদ।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

কথায় কথায়

নিবারণ মুনশী

নিজের কথা তো অনেকদিন বলেছি আজ আমি অন্য একজনের কথা বলব। যার কথা বলতে চাই তিনি এই বাংলাদেশেরই একটি হাসপাতালের ডাক্তার। গ্রামাঞ্চলে তার হাসপাতাল—সরকারী হাসপাতাল নিঃসন্দেহে। শালবনের মাঝখানে মস্তবড় জমি নিয়ে তৈরি হাসপাতালে দূরে দূরে নার্সদের কোয়ার্টার, ডাক্তারদের কোয়ার্টার, হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফ ও জমাদারদের কোয়ার্টার, আউটডোর আর ইনডোর। স্বাস্থ্যকর জায়গাটা। এককালে এখানে দুধ ডিম তরিতরকারি সবই সস্তায় মিলত আজ সেদিন নেই।

সন্ধ্যা হতে না হতেই শালবন থেকে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। শেয়ালও ডাকে প্রহরে প্রহরে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই। দিনের বেলা যা অতটা বোঝা যায় না, রাত্রিবেলা এই হাসপাতালের দিকে তাকালে তা বোঝা যায়। নার্সদের কোয়ার্টারগুলির মধ্যে তিনটিই বন্ধ, কেবল দুটো কোয়ার্টারে জানলা থেকে হ্যারিকেনের আলো আসছে। ডাক্তারদের জন্য নির্ধারিত চারটে কোয়ার্টারের দুটোতে দু'জন ডাক্তারবাবু থাকেন, বাকি দুটো তালা দেওয়া। ডাক্তারবাবুদের কোয়ার্টার থেকেও কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্পের আলো দেখা যায়। অদ্ভুত এই হাসপাতাল—হাসপাতালের পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেই রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে, কিন্তু হাসপাতালে ইলেকট্রিক নেই। এ হাসপাতালেও ডাক্তারবাবুকে রাতে জরুরী কোন রোগী এলে অপারেশন করতে হয়। অপারেশনের সময় জমাদার পেট্রোম্যাক্স জেবলে দু'হাতে উঁচু করে ধরে এবং সেই আলোতেই ডাক্তারবাবু ছুরি চালান। রোগীর অবস্থা যদি পেট্রোম্যাক্স জবালাবার সময় না দেয়, তাহলে সেই কালিপড়া লণ্ঠনের আলোতেই ডাক্তারবাবুকে তার অধীত বিদ্যার পরিচয় দিতে হয়। এরকম অনেক হাসপাতালেই ইলেকট্রিক আলো আছে তবু এ হাসপাতালে কেন নেই? গ্রামের লোকের এ প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ডাক্তারবাবুর চোয়ালে স্থায়ী একটা ব্যথা হয়ে গেছে। অনেকবার অনেক চিঠি লেখা হয়েছে, প্রতিবারই নাগরদোলার খাঁচার মত রাইটার্স বিল্ডিংস-এর স্বাস্থ্যদপ্তর পর্যন্ত উঠে চিঠির জবাব চক্রাকারে ফিরে এসেছে। একই জবাব বারে বারে—সামান্য একটা টেকনিক্যাল কারণেই নাকি সদর রাস্তা থেকে মাত্র হাতদশেক দূরে হাসপাতালে ইলেকট্রিক আলো আসতে পারছে না। এই একটি জবাবই প্রশাসনিক লালফিতার ফাঁস ছাড়িয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে আসতে মাসাধিক কাল কাটিয়ে দিচ্ছে। পাটিগণিতে পৌনঃপুনিক অঙ্কের মত বার বার একই উত্তর একই ভাষায় এক ধরণের কাগজে ফিরে ফিরে আসছে। কিন্তু প্রতিদিন রোগী ও তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে বহুবার করে ডাক্তারবাবুকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়—কেন ইলেকট্রিক আসছে না, কেন ডাক্তার আর নার্সের কোয়ার্টারগুলি খালি পড়ে আছে?

গোড়া থেকেই হাসপাতালে যদি দু'টি ডাক্তার এবং তিনটি নার্স দিয়ে চালানোর ইচ্ছা থাকে। তাহলে এত পয়সা খরচ করে কনট্রাকটরকে চুরির এত ঢালাও সুযোগ দিয়ে এতগুলি ঘর-বাড়ি বানান হল কেন? সে-টাকার অন্তত আরও কয়েকটা বেড হতে পারত, অন্তত আরও বেশি করে ওষুধ দেওয়া যেত। এই বিলাসিতার এই অর্থহীন অপচয়ের কি অর্থ? গ্রামের মানুষের এই ন্যায়সঙ্গত জিজ্ঞাসার উত্তর ডাক্তারবাবু কি করে দেবেন? তিনি তো সরকারের কর্মচারী। যাদের দেওয়া উচিত তাঁরা কালে-ভদ্রে অমন হাসপাতালে যান। সম্বর্ধনার বেড়া ডিঙিয়ে গাঁয়ের মানুষের প্রশ্ন নিয়ে তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছনও যায় না। যদি পৌঁছন যায়-ও তাঁরা তৎক্ষণাৎ সমস্ত অভাব দূরে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাততালি কুড়িয়ে চলে আসেন এবং ট্রেনে উঠতে না উঠতেই সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান।

ফাঁকা প্রতিশ্রুতি, নির্দয় অবহেলা এবং অপচয় ক্রমে ক্রমে গ্রামের মানুষের মনে বিক্ষোভ জমিয়ে তোলে। সেই সমস্ত বিক্ষোভের দায়ভাগী হয়ে পড়েন ডাক্তারবাবু। শালা ডাক্তারটা চোর—কয়েক মাসের মধ্যেই ডাক্তারবাবুর ভাগ্যে এইসব নতুন নতুন বিশেষণ জুটতে শুরু করে।

এই হাসপাতালেই অপারেশন টেবিলে একদিন একটি রোগী মারা যায়। সে রোগী আদৌ বাঁচত কি না, কলকাতার নামকরা সার্জনের হাতে পড়লেও, নামী হাসপাতালে গেলেও সেই রোগীকে বাঁচান যেত কি-না অথবা সত্যিই ডাক্তারবাবুর কোন অবহেলা ছিল এর বিচার না করেই রোগীর আত্মীয়স্বজন ও মারমুখী একদল

লোক ডাক্তারের উপর আক্রমণ চালায়। জমাদার কম্পাউন্ডার নার্সেরা ছুটে এসে যদি ডাক্তারবাবুকে বাঁচাতে পারে, তাহলে পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় আবার ডাক্তারবাবুকে দেখা যায় আউটডোরে বসে প্রেসক্রিপশন লিখতে। যদি আক্রমণের হাত থেকে ডাক্তারকে বাঁচান না যায়, তাহলে সেই রাতেই ডাক্তারবাবুকেও রোগী হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ময়রা কখনো সন্দেশ খায় না বটে, কিন্তু আজকাল ডাক্তারকেও হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

গ্রামের রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতারা ক্ষুব্ধ মানুষের দল নিয়ে প্রায়ই হানা দেন হাসপাতালে। "আপনার হাসপাতাল এত নোংরা কেন? মেঝেতে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ধুলো তারই মধ্যে রোগীদের শুইয়ে রেখেছেন, ময়লা ফেলার পাত্রগুলি উপছে পড়ছে মেঝেতে, রোগীরা এক গ্লাস জল চাইলে আধঘণ্টায় তা পায় না, প্রেসক্রিপশন লিখে দায় সারছেন অথচ ওষুধ দিতে পারছেন না কেন?"

এই প্রত্যেকটি কেনই সত্যি—অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্যি। কিন্তু সেই প্রত্যেকটি কেনর জন্য ডাক্তারেরও কৈফিয়ৎ আছে। সে কৈফিয়ৎ একমাত্র স্লোগান তুলে চ্যাঁচামেচি করে উড়িয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হাসপাতালের জন্য নির্ধারিত মাত্র ৮৬টি বেড, কিন্তু হাসপাতালে রোগী ভর্তি করতে হয়েছে ডাক্তারকে ১২০ জন। মেঝেতে বিছানা দেওয়া ছাড়া উপায় কি? বেডের বেশি রোগী ভর্তি করব না এমন কথা বললে অনেক আগেই ডাক্তারের ধড় থেকে মুণ্ডু চলে যেত।

মেঝেতে যদি রোগী শুয়ে থাকে তাহলে সে মেঝে ভাল করে পরিষ্কার করা যায় না। ছিয়াশীটি ময়লা ফেলার পাত্রে যদি একশো বিশজন রোগী ময়লা ফেলে তাহলে তা উপছে পড়বেই। হাসপাতালে জমাদার মাত্র একজন। দিন কয়েক সে মুখ বুজে ছিয়াশীজনের জায়গায় একশো বিশজনের ময়লা পরিষ্কার করে, মেঝেও ঝাঁট দেয় বটে কিন্তু তারপর থেকে সেও বেঁকে বসে—"বাড়তি কাজের জন্য বাড়তি পয়সা চাই।"

দাবিটা জমাদারের অন্যায্য না হলেও পয়সা দেবার মালিক তো ডাক্তারবাবু নয়, যারা মালিক তারা এ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না। দু-পাঁচদিন ডাক্তারবাবু বাবা বাছা করে, এমন কি ডাক্তার-গিন্নী পর্যন্ত জমাদারকে আলুটা মুলোটা দিয়ে, ওর বাচ্চা ছেলেটার জন্য বার্লি আর দুয়েকটা ছেঁড়া জামাকাপড় দিয়ে হয়তো জমাদারকে ঠাণ্ডা করে রাখে, কিন্তু সে আর কতদিন? অনতিবিলম্বে ডাক্তারবাবুও জমাদারের শালা হয়ে ওঠেন। নার্সের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর ফষ্টি-নষ্টি করার কল্পিত কাহিনী, হাসপাতালের ওষুধ চুরি করে শহরের ফার্মাসীতে বিক্রি করার কাহিনী জমাদারই ডাক্তারবাবুর নামে হয়তো প্রচার করতে শুরু করে।

রটনা ক্রমে ক্রমে গ্রামে গ্রামান্তরে দৃঢ়-বিশ্বাসে পরিণত হয়। ওষুধ চেয়ে চেয়েও যে স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছ থেকে চিঠি আর চিঠি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি, এ কথা বোঝাবার আগেই একদা ডাক্তারবাবু হাসপাতালে ঘেরাও হন স্লোগানে সমস্ত হাসপাতাল উচ্চকিত হয়ে ওঠে। ঝিঁঝির ডাকে মন্দ্রিত শালবনের সেই হাসপাতালের শয্যায় স্লোগান শুনে মুমূর্ষু রোগী পরিষ্কার চোখের সামনে পরলোকের পথ দেখতে পায়। রোগী যদি বুঝবান হয়, তাহলে সে হয়তো ডাক্তারের কাজ হালকা করে দিয়ে পরলোকেই কেটে পড়ে।

* * *

সর্বশেষে এ কথাও বলে রাখা ভাল যে, এ শুধু একদিকের ছবি। এর অন্য একটা দিকও আছে। যেমন শিক্ষক মাত্রেই নীতিজ্ঞানী হয় না, সরকারী কর্মচারী মাত্রেই সৎ হয় না, অধ্যাপক মাত্রেই পণ্ডিত হয় না, মন্ত্রী মাত্রেই কর্মক্ষম হয় না তেমনি ডাক্তার মাত্রেই যে নির্দোষ হয় তাও নয়। হৃদয়হীন ডাক্তারও আছে যাদের হৃদয়হীনতার ও গাফিলতিরও অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবু আজ আমি শুধু সমস্যার কথাই বললাম—ভবিষ্যতে এর সমাধানের প্রসঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

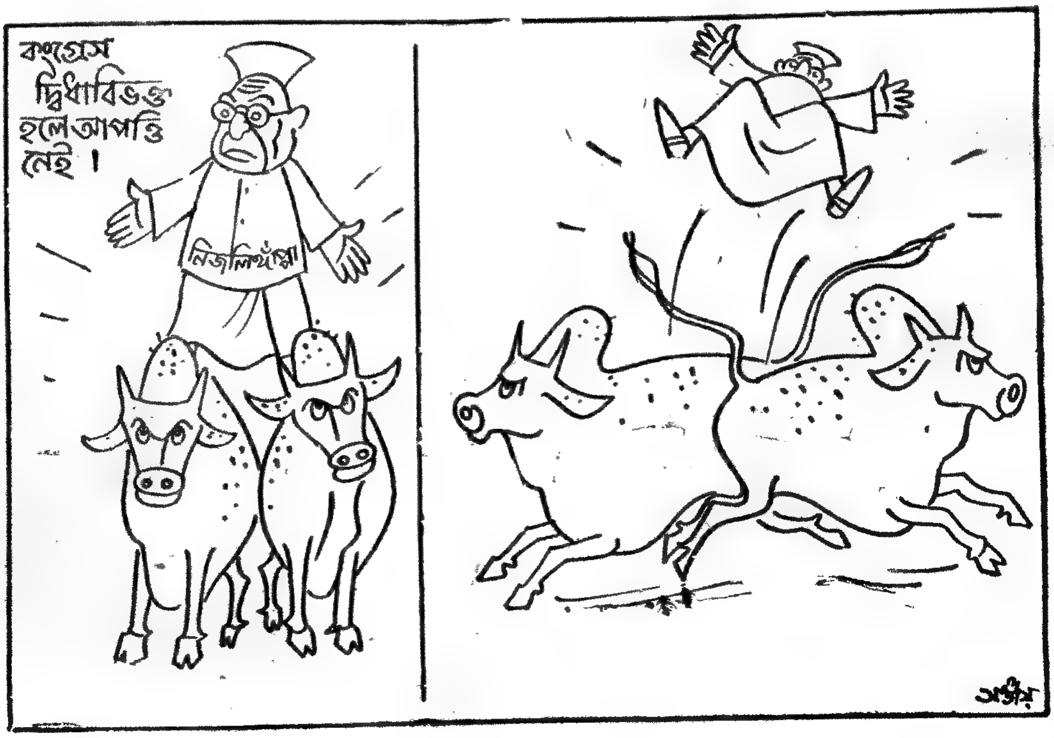

স্মরণীয় দিনে বরণীয় মানুষের সম্বর্ধনা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পঁচিশে বৈশাখ। এদিনের বৈশিষ্ট্য কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। এইদিনে সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানটির পত্তন করা হয়েছে গত বছর থেকে সংবাদ-সাহিত্যকে উপলক্ষ করে—সেই অনুষ্ঠানটি এবারেও হল। গত বছরে এই অনুষ্ঠান যাকে কেন্দ্র করে করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন বাংলা দেশের অন্যতম কথাসাহিত্যিক এবং সংবাদ-সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এবারে যাঁকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান করা হল, তিনি স্বনামধন্য সংবাদ-সাহিত্যিক তো বটেই—উপরন্তু বিদগ্ধসমাজের একজন প্রতিভাধর লেখক এবং রাজনীতিক শ্রীগোপাল হালদার। সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ তিনি, ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, গলায় চাদরের ভাঁজ—সর্বাংগে একটি বিনম্র ব্যক্তিত্বের দৃঢ় পৌরুষ। অনেক পথ হেঁটেছেন তিনি, এখনও হাঁটতে হবে অনেক, সুদীর্ঘ সংগ্রামজনিত প্রচ্ছন্ন বলিরেখা লাঞ্ছিত ললাট কিন্তু এখন অক্লান্ত। সংবর্ধনা জানানো হল এই মানুষটিকে।

সুন্দর একটি রুচিস্নিগ্ধ পরিবেশে সভা বসেছিল। বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের সামনেকার সেই হলঘর, যেখানে বসে সারাদিন ধরে এখানকার পরিচিত সেবকরা টাকা-আনা-পয়সার হিসাব করেন—ঠিক সেইখানে, ঠিক যেন কোন শিশুর অংকের খাতায় লেখা হৃদয়ের স্বতোৎসারিত একটি লিরিক কবিতার মতো এই সভাটি। এ সভার গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীমতী লীলা মজুমদার, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল জানা প্রমুখ আরও অনেক।

যাঁর জন্মলগ্ন বহন করে পঁচিশে বৈশাখ ধন্য তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ব্রহ্মস্তব দিয়ে সভার মংগলাচরণ করলেন শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য। সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সুগায়ক শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস এবং তাঁর সহযোগীরা 'মঙ্গলালোকে' গানটির মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করলেন সভার। সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী সেন এক মানপত্রের মাধ্যমে শ্রীগোপাল হালদারকে সংবর্ধনা জানিয়ে বললেন,—

..."এই উপমহাদেশের মানুষ এখনো নৈরাশ্যপীড়িত এবং এক শ্রেণীর সাহিত্যিক এই নৈরাশ্য চেতনার সর্বাধিক শিকার। এমন ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে আপনি এক মূর্ত প্রতিবাদ। সংবাদের তথ্যকে আপনি সাহিত্যিক সত্যে রূপান্তরিত করে বলিষ্ঠ ভাবার কারিগর হিসেবে এখনো গণচিত্তে প্রতিফলিত করে চলেছেন আশার আলো। আমরা তাই কামনা করি, আপনার সৃষ্টি অব্যাহত গতিতে চলুক। আজ আমরা আমাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ও গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে আপনাকে এই গুণীজন সভায় বরণ করি।"

তার পর শ্রীমতী সেন ফুলের তোড়া চাদর আর বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিলেন শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে শ্রীহালদারের হাতে।

প্রথমেই সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে শ্রীহালদারকে অভিনন্দিত করতে উঠে বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন বললেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে যে গতি সেই গতিই আজকে মানুষের জীবনধারায় মিশে যাক। আজকের দিনে সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মর্মবাণী। এই শুভদিনে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তা সার্থক হয়ে উঠুক। শ্রীসেন অতঃপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ মাথায় রেখে বসুমতী প্রতিষ্ঠানকে যে পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সে পথ এই একই পথ বলে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সকলের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ কামনা করলেন।

এইখানে একটি মজার ঘটনা ঘটে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলার গল্প-লেখক কবি-শিল্পী শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তখনও অনুপস্থিত। তিনি এসে পড়লেন শ্রীসেনের ভাষণের শেষাশেষি। কিন্তু তার পরই তাঁর ভাষণের পালা। কুশলী সিনে-টেকনিসিয়ান তিনি। অদ্ভুত এক কায়দায় নিজের বিলম্বতার কৈফিয়ৎ দিলেন তিনি, শ্রীগোপাল হালদারকে সংবর্ধনা জানাতে বিলম্ব হয়ে গেছে বাংলাদেশের এই উক্তিটি 'মিস্ ট' করে। সভাস্থ সকলেই এই মন্তব্যে একদিকে কর্তব্যবোধের দায়িত্বে এবং অন্যদিকে সংযত খুশির অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন যেন। শ্রীমিত্র আরও একটি মূল্যবান মন্তব্য করলেন: বসুমতীর কর্তৃপক্ষ বিশেষ এক জাতের প্রতিভাধর শিল্পী শ্রীগোপাল হালদারকে সংবর্ধনা জানাতে গেলেন কেন এই প্রসঙ্গে এক জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য উদ্ধৃত করে তিনি বললেন—দুই সমান্তরাল রেখা একটি বিন্দুতে গিয়ে মিলে যায়। প্রধান অতিথির এই ভাষণ এত সরস হয়েছিল যে সমগ্র সভাটিকে রীতিমত ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে একান্ত আপনজনেরা যেন কথা বলাবলি করছে বলে মনে হচ্ছিল।

এর পর উঠলেন আচার্য সুনীতিকুমার। জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া যেন, চলমান জীবনে সমস্ত ভূগোলখানা ঘুরিয়ে আনছিলেন সভাস্থ সকলকে। কোথায় ভাসখন্দ, কোথায় দক্ষিণ ভারতের মহাবলীপুরম, কোথায় প্রেসিডেন্সী জেল—গোপাল হালদারের অগ্রজ হিসাবে যেন তাঁকে আদেশ, উপদেশ, সাহচর্য, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা সকল কিছু দিয়ে সর্বত্র সংগে করে নিয়ে চলেছেন তিনি। কোথাও সে সব কাহিনীর মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা, কোথাও প্রচুর হাসির খোরাক এবং কোথাও বা একটি বিদগ্ধ পণ্ডিত মনের অনন্যসাধারণ প্রকাশ। একটি কথা আচার্য বললেন, সেটি হচ্ছে গোপাল হালদারের কাছেও তাঁর শিক্ষণীয় অনেক কিছু ছিল। সেটি কিন্তু উপযুক্ত শিষ্যের প্রতি আচার্যের স্নেহ-দুর্বল ভালবাসা নয় শুধু—গোপাল হালদার সেদিক দিয়ে নিজ আচার্যের মতই অবদান-দক্ষ পরিশ্রমী মানুষ। এই প্রসংগে সুনীতিবাবু গোপাল হালদারের 'একদা' থেকে শব্দ ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির কথা উল্লেখ করলেন।

এরপর উঠলেন, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। শ্রীচৌধুরী উল্লেখ করলেন শ্রীহালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তরের' কথা। সেই প্রসংগে তিনি বললেন, শ্রীহালদারের মধ্যে যে "বিদগ্ধ মণীষা" রয়েছে তারই কথা। বাংলাদেশের কি সংবাদ সাহিত্যিক, কি শিল্পী সাহিত্যিক তাঁদের মধ্যে শ্রীহালদারের এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে বারে বারে আকর্ষণ করেছে। শ্রীহালদারের 'রুশ সাহিত্য' সম্বন্ধে লেখাটি যে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি অতুলনীয় কীর্তি, শ্রীচৌধুরী সে কথারও উল্লেখ করেন।

প্রখ্যাত বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র দেবকে সভাপতি মহাশয় আহ্বান জানালে চিকিৎসকের নির্দেশে তাঁর বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ জানিয়ে তিনি তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে বক্তব্য রাখবার কথা বলেন। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী অতঃপর শ্রীহালদারকে অভিনন্দন জানিয়ে

বলেন—প্রত্যেক মহৎ সৃষ্টিই আমাদের আকর্ষণ করে। সেই হিসাবে শ্রীগোপাল হালদারের যে সৃষ্টি, তা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, গোপালদার রুশ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই শুধু একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি নয়, পৃথিবীর সাহিত্যভাণ্ডারে বোধ করি একমাত্র সৃষ্টি। এই ধরণের বই এতাবৎকাল আর একটিও লিখিত হয় নি।'

সুসাহিত্যিক প্রবীণ কথাশিল্পী মনোজ বসু শ্রীহালদারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, গোপালবাবুর মত লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা নিজেরা গৌরবান্বিত হচ্ছি।' এরপর শ্রীমতী লীলা মজুমদার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণে শ্রীহালদারের চরিত্রের একটি দিক এমন

মাধুরাণী দেবী

সরস মন্তব্যে ও নির্মল উক্তির দ্বারা প্রকাশ করেন যাতে সভার হাসির একটা বিস্ফোরণ ঘটে যায়। শ্রীমতী মজুমদার বলেন—গোপালবাবু চিরকাল বিনয়ী, কিন্তু একবার তিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলেন এবং সেটি প্রকাশ করেছিলেন একটি মহিলা সম্পর্কে। তিনি নাকি সন্ন্যাসিনী হয়ে যাচ্ছিলেন আর শ্রীহালদার তাঁকে গৃহী করেছেন।" এই সংবাদে মানুষ না হেসে কি পারে? অন্যতম সাহিত্যিক শ্রীসুশীল জানা বলেন, আমরা গোপালদার কাছে ঋণী। তিনি আমাদের অগ্রজ।

অভিনন্দনবাণী ও গুণমুগ্ধদের আশীর্বাদ ও স্নেহসিক্ত ভাষণের জবাব দিতে উঠলে শ্রীহালদারকে দেখা গেল তিনি রীতিমত অভিভূত। বিনম্রভাবনত মস্তকে আবদ্ধ দৃষ্টি নিচুদিকে প্রসারিত করে তিনি বলে উঠলেন,—আপনাদের আশীর্বাদ ও প্রীতিতে আমি ধন্য। আমি যে বয়সে পৌঁছেচি সে বয়সে মানুষ নিজেকে যে চিনতে না পারে তা নয়—তাই আমি জানি আমি কতটুকু কি করতে পেরেছি। তবু বলব আপনাদের প্রীতি ও ভালবাসাই আমার একমাত্র কামনা। তিনি বললেন, এমন অনেক কথা আছে যা আড্ডায় বসে বলা যায়, কিন্তু সভায় বলা যায় না। আর তা সভাতে সব সময়ে গুছিয়েও বলা যায় না।

তবু শ্রীহালদার তাঁর সাংবাদিক জীবনের কয়েকটি অপ্রকাশিত ঘটনা বললেন, যা সভায় প্রচুর ঔৎসুক্য সৃষ্টি করল।

গুড নাইট স্যার স্ট্যাফোর্ড অথবা গুড-বাই স্যার স্ট্যাফোর্ড

যেদিন ক্রীপস মিশন ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কি হবে তা ঠিক করতে এবং তা নিয়ে যখন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শেষ আলোচনা হয়ে গেল, তখন শ্রীহালদার হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার জন্য লিখেছিলেন "গুড নাইট স্যার স্ট্যাফোর্ড।" কিন্তু সে সময় প্রধান সম্পাদক শ্রীহেমচন্দ্র নাগকে প্রেস আইনের দরুণ ইংরেজ সরকার প্রায় প্রতিদিন একটি করে ওয়ার্নিং দিচ্ছিলেন, তাই একথা লিখলে যে নিশ্চিত এবং পীড়নমূলক কিছু এসে পড়বে শ্রীনাগের ওপর, এটাও তিনি অনুমান করেছিলেন। সে জন্য তিনি একটা বিকল্প কথাও ভেবে রেখেছিলেন এবং সেটি হচ্ছে "গুড-বাই স্যার স্ট্যাফোর্ড।" শ্রীনাগ প্রথমটি অনুমোদন করতে পারেন নি। ব্যাপারটি সুরেশ মজুমদার মশায়ের কাছেও যায়। সুরেশবাবু শ্রীহালদারকে প্রথমটাই রাখার জন্য বলেন। কিন্তু শ্রীনাগ এটাকে ঠিক মেনে নিতে না পারায়, পাছে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে আবার জেলে যেতে হয়, সে জন্য শ্রীহালদার ঐ কথাটির জন্য আর পীড়াপীড়ি করেন না। "গুড-বাই স্যার স্ট্যাফোর্ড" এই বিকল্পটিই রাখেন।

সাংবাদিক জীবনের আরও একটি ঘটনা তিনি সভায় বললেন, সেটি সুভাষবাবু সম্পর্কে। 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকে তিনি সম্পাদকীয় লেখেন তখন। তখনও প্রেস আইনের সেই কঠিন বেড়াজাল। প্রায়ই হুমকি দিয়ে চিঠি আসত। একটি সম্পাদকীয়কে কেন্দ্র করে প্রধান সম্পাদক হিসাবে সুভাষবাবুর ওপর 'সিডিশনের' মামলা হয়। সুভাষবাবু শ্রীহালদারকে বলেন, কেন লিখবেন না এ সব, আপনি ঠিকই লিখেছেন, সিডিশন হয়েছে তো কি হবে? শ্রীহালদার আবেগপূর্ণ কণ্ঠে যখন এই সব তথ্যবহুল ঘটনাবলী পরিবেশন করছিলেন, সভাস্থ সকলে তখন বিস্ময়নিস্তব্ধ হয়ে কথাগুলি শুনছিলেন। শ্রীহালদার অতঃপর বললেন, "সেই সিডিশন মামলায় আর বিচার হয় নি সুভাষবাবুর—তারপরই তিনি অন্তর্ধান হন।"

সভাপতির ভাষণে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণে বলেন—"শ্রীগোপাল হালদার যে রাজনৈতিক মতের মানুষ, সে রাজনীতি হচ্ছে কমিউনিস্ট রাজনীতি। সমাজের সর্বস্তরে যে বঞ্চনা, যে শোষণ, যে লাঞ্ছনা বর্তমান—তাকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে

সবিতাব্রত দত্ত

হবে। সোভিয়েট দেশ একদিন এই কাজ সুসম্পন্ন করে। তাই সোভিয়েট আজ নিপীড়িত, কোটি কোটি লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষের প্রেরণার উৎস। গোপালবাবুর জীবনসাধনা এই পথে। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই, তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করুন।"

এই সভায় প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস, শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার, শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী নন্দিতা বসু প্রমুখ সঙ্গীতে ও শ্রীসবিতাব্রত দত্ত আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন। মাসিক বসুমতী সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এই সংবর্ধনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কিন্তু সভার রেশটা যেন তখনও রয়ে গেল।

গ্রন্থমেলা

Indian atheism : A Marxist Analysis— দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা। মূল্য ঃ ১৫·০০।

মার্কসবাদী পণ্ডিত হিসাবে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এদেশে সুপরিচিত। তাঁর ইতিপূর্বে রচিত লোকায়ত দর্শন, ভারতীয় দর্শন (১ম খণ্ড) প্রভৃতি গ্রন্থে যেভাবে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে ভারত ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠাগুলিকে নতুনভাবে দেখার প্রচেষ্টা হয়েছে তা বিদগ্ধ পাঠককে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। একাধিক ভাষায় তাঁর গ্রন্থগুলির অনুবাদই এই বক্তব্যের সার্থকতা প্রমাণ করে। আমাদের দেশে মার্কসবাদীদের মধ্যে পণ্ডিত অনেক আছেন, কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে মার্কসবাদী বড় কম। দেবীপ্রসাদ সেই বিরলসংখ্যক পণ্ডিতদের মধ্যেই একজন, যাঁর রচনাবলী পাঠককে বিশেষভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে, গবেষকদের সামনে নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মোচিত করে দেয়। এ ক্ষেত্রে জর্জ টমসনের সঙ্গে সহজেই তাঁর তুলনা করা চলে।

ইণ্ডিয়ান এথেইজম বা ভারতীয় নাস্তিক্য শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সম্প্রতিতম রচনা। ভূমিকাতেই লেখক তাঁর রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রচার করেন তাঁদের একটি বড় বক্তব্যই হচ্ছে এই যে, যেহেতু মার্কসবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে শিক্ষা দেয়, সেহেতু তা ঈশ্বরকেন্দ্রিক ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং তা নয় বলেই মার্কসবাদ পরিত্যাজ্য। এই যুক্তি যে কতখানি অসার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক তা দেখিয়েছেন এবং পরিশেষে প্রশ্ন করেছেন, যাঁরা শুধুমাত্র নাস্তিকতার জন্যই মার্কসবাদকে পরিহার করতে চান তাঁরা কি আমাদের প্রাচীন দার্শনিকদের রচনাবলী পড়ে দেখেছেন? ষড়দর্শন অর্থাৎ সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব ও উত্তরমীমাংসার কোনটি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরবাদী?

রাধাকৃষ্ণণ থেকে সকলেই একবাক্যে বলে এসেছেন যে, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাসমূহ একান্তই ঈশ্বরকেন্দ্রিক, হিন্দুর নিকট দর্শন একটি অন্তরের ব্যাপার, ঈশ্বরকে জানা, নিজের মধ্যে ঈশ্বরত্বের উপলব্ধি ঘটানোই হচ্ছে ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য, যার সঙ্গে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন মিলই নেই। কিন্তু দেবীপ্রসাদ এই অতিকথন খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ পণ্ডিতেরা যেভাবে ভারতীয় দর্শনকে দেখতে চান, কার্যত ভারতীয় দর্শন কিন্তু উল্টোটিই দেখায়। ঈশ্বরখণ্ডনের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের বাঘা বাঘা দার্শনিকেরা অকল্পনীয় যুক্তিতর্ক সহকারে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের অস্ত্রের তীক্ষ্ণতাও বড় কম নয়। রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখেরা যেভাবে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে আস্তিক্যকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন, সেইরকম নাস্তিক্যকে খুঁজে পাবার কোন প্রয়াস দেবীপ্রসাদ করেন নি। নিজস্ব ভাষ্যের দ্বারা মূল বক্তব্যকে তিনি নিজ বিশ্বাসের অনুকূলে করে তোলার চেষ্টা করেন নি। প্রাচীন দার্শনিক ও টীকাকারেরা যা বলে গেছেন সেইগুলিকেই তিনি বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন এবং তাঁদের কথাগুলিই হুবহু তুলে দিয়েছেন।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন দৃশ্যতই নিরীশ্বরবাদী এবং স্বভাববাদী লোকায়ত দর্শনও তাই। সাংখ্যদর্শনে প্রমাণাভাবে ঈশ্বরকে অসিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাংখ্য পরিণামবাদ অনুসারে এ জড়জগৎ যদি কার্য হয় তাহলে তার কারণ জড় প্রকৃতি, কেন না একমাত্র বস্তু থেকেই বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব, অবস্তু থেকে নয়। সাংখ্য অনুযায়ী নিমিত্ত কারণ হিসাবে কোন ঈশ্বরের কল্পনার প্রয়োজন নেই। শংকরের মত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদীর পক্ষেও কার্যকারণ শৃঙ্খল মেনে নিয়ে অবস্তু থেকে বস্তুর নিষ্ক্রমণ ঘটানো সম্ভবপর হয় নি, ফলে অবস্তুর সত্যতা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে হয়েছে। বিদেহী বস্তুনিরপেক্ষ, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে ঠিক বিপরীত গুণসম্পন্ন জড়জগতের বিকাশ ঘটতে পারে না, এবং এইজন্য সেই নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে পরিণত করা হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মের তুলনায় জগৎ যে রকম মিথ্যা ঈশ্বরও অনুরূপ মিথ্যা এবং যে তার চেয়ে কিছু ভাল নয়, সেকথাও শংকর জানিয়ে দিতে ভোলেন নি।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীচট্টোপাধ্যায় ষড়দর্শনের তিনটি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন—সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক এবং পূর্বমীমাংসা। তিনি পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে, আদি ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের কোন স্থানই ছিল না, পরবর্তীকালের লেখকেরা সেখানে জোর করে ঈশ্বরকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, এবং এই ঈশ্বরের ভিত্তি যে কত দুর্বল তা প্রমাণ করার জন্য এই প্রসঙ্গে মীমাংসক কুমারিল ও প্রভাকরের বক্তব্যগুলি তুলে দিয়েছেন। পূর্বমীমাংসা দর্শনের প্রাচীন টীকাকারদ্বয়, কুমারিল ও প্রভাকর এক কথায় ন্যায়-বৈশেষিক ঈশ্বরকল্পনাকে তুলোধোনা করেছেন, শুধু ন্যায়-বৈশেষিকই নয়, অপরাপর দর্শনগুলিও তাঁদের প্রচণ্ড আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। মীমাংসকদের মতে সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন সৃষ্টি বা প্রলয়ের কথা কল্পনামাত্র, অতএব জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়ন্ত্রণকর্তা ঈশ্বরের পরিকল্পনাও অবান্তর।

বস্তুত এই ধরণের একটি গ্রন্থের প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরেই বর্তমান ছিল। নাস্তিক্যের ঐতিহ্য ভারতীয় দর্শনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যাঁরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছেন এ সত্য তাঁদেরও দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, কিন্তু এই বিষয়টিকে এত জোরের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে দেবীপ্রসাদ ছাড়া আর কেউ উত্থাপন করেন নি। ঈশ্বরবাদী ঐতিহ্যের কল্পিত মোহ অনেক প্রথিতযশা পণ্ডিতকেও আচ্ছন্ন করেছিল, উদয়নাচার্য যেমন সাংখ্য এমন কি চার্বাকদর্শনের মধ্যেও ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন—একালের পণ্ডিতদের মধ্যেও অনেকে সেই একই ধরণের চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ভারতীয় নাস্তিক্যের সকল দিকের আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে সম্ভবপর হয় নি, এবং তা হওয়াও সম্ভবপর নয়। লেখক ভূমিকাতেই জানিয়েছেন যে বর্তমান খণ্ডটি একটি বৃহৎ প্রয়াসের সূচনামাত্র। আমরা আশা করব যে, পরবর্তী খণ্ডগুলিও অচিরে প্রকাশিত হবে। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা প্রয়োজন যে, তাঁর "ভারতীয় দর্শন" গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড আজও প্রকাশিত হয় নি, এবং যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেছিলেন পূর্বমীমাংসা দর্শন পর্যন্ত আলোচনার পর তা রুদ্ধ হয়ে গেছে।

ভারতীয় নাস্তিক্য গ্রন্থটিতেও শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা ও শ্রমশীলতার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করে একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে মনে জাগে। নাস্তিকতার ঐতিহ্য আমাদের দেশে অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রভাব বৃহত্তর জনজীবনের উপর পড়ে নি কেন? নিরীশ্বরবাদী দর্শনকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ঈশ্বরবাদী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এমন ঘটনা এখানে মোটেই বিরল নয়। একটি অধ্যায়ে দেবীপ্রসাদ অবশ্য ভারতীয় নাস্তিকাচর্চার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তবে এই প্রসঙ্গে আরও কিছু জানতে ইচ্ছা হয়। বর্তমান গ্রন্থটিতে লেখকের পাণ্ডিত্য, রসবোধ ও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। শুধু দর্শন ও ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষক ও ছাত্রদের নিকটই নয়, সাধারণ পাঠকের নিকটও গ্রন্থটির যথেষ্ট আবেদন থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থটির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস—শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল। প্রকাশক—সংস্কৃত কলেজ; ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ঃ পনের টাকা।

যতদূর জানা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস নিয়ে আলোচনা আজ অবধি খুব অল্পই হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে মারাঠী সাহিত্যে 'হাস্যবিনোদ মীমাংসা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। এছাড়া ডঃ সুশীলকুমার দে'র "Aspects of Sanskrit literature" গ্রন্থে "Wit, Humour and Satire in Sanskrit Literature" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। আর আছে বিদূষক চরিত্র নিয়ে অধ্যাপক জে টি পারেখ ও ডঃ ভট্ট-এর কিছু আলোচনা। কিন্তু এই সকল আলোচনার কোনটিই বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট একটি বিষয় হাস্যরসের সম্যক পরিচয়-প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট নয়; এবং নয় বলেই বিনা দ্বিধায় বলতে পারি আমরা, দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল 'সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস' নামক গবেষণা-গ্রন্থটির মাধ্যমে দীর্ঘকালের একটি অভাব দূর করলেন।

হাস্যরস হল নবরসের অন্যতম। আলঙ্কারিকদের মতে, কাব্যের মূলে রয়েছে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতি নয়টি রস এবং এ রসগুলির উপযুক্ত ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়েই কাব্য সার্থকতা লাভ করে।

আলোচ্য গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য রসের তুলনায় হাস্যরসের স্থান কোথায়, তা নির্ণয়ের চেষ্টা সার্থকভাবেই করা হয়েছে এবং মাৎসর্য নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির ন্যায় কৌতূহল থেকেও যে হাস্যের জন্ম হয় তা বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে হাস্যরস ও রসাভাস এক নয়, কিন্তু রসাভাস থেকে হাস্যের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রসবিরোধের স্বরূপ—হাস্যের প্রকার-ভেদ এবং বিদূষক ইত্যাদি প্রসঙ্গও যথেষ্ট মৌলিকতার দাবি রাখে। নবম অধ্যায়ে বৈদিক যুগ থেকে সুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, তাদের তুলনামূলক ও ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

দৃষ্টিকোণের এই অভিনবত্বই এ গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের উক্তিসমূহকে নতুনভাবে আলোচনা করা হয়েছে এখানে। জায়গায় জায়গায় ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে এদের সাদৃশ্যও প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

আমাদের মনে হয়, লেখকের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে বিদ্বৎসমাজ একবাক্যে সাধুবাদ জানাবেন এবং 'সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস' এ-যুগের একটি বিশিষ্ট গবেষণা-কীর্তি বলে বিবেচিত হবে।

কিশোর ভারতী—সম্পাদক ঃ দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ঃ ২·৫০।

এটি নববর্ষ সংখ্যা। এর আগে সাতটি সংখ্যা বের হয়েছে। কিশোর ভারতীর আগেকার প্রতিটি সংখ্যাই আমাদের খুশি করেছে, বলা বাহুল্য কিশোরদেরও মন জয় করেছে। বাংলা ভাষায় এই ধরণের পত্রিকা কল্পনা করা যায় নি। কারণ ব্যবসায়ে মুনাফা করাটাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে কিশোরদের সংখ্যায় সংখ্যায় অবাক করার মতো পত্রিকা বের করতে হলে ব্যয়ের ধাক্কা সামলানো কঠিন। কিন্তু কিশোর ভারতীর ছাপা, মলাট ও কাগজ তো খুব ভালো বটেই, উপরন্তু আছে পাতায় পাতায় ছবি। রেখার সঙ্গে লেখার এবং লেখার সঙ্গে রেখার এমন অপূর্ব সমন্বয় কদাচিৎ দেখা যায়। নববর্ষ সংখ্যাটির দাম আড়াই টাকা হলেও পত্রিকার উৎকর্ষের কাছে তা নগণ্য বলে মনে হয়।

এরপর আছে কতোরকমের ফিচার আর বড় লেখকের প্রিয় লেখা। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প নববর্ষ সংখ্যায় রয়েছে। এ ছাড়া আছে নানান ধরণের গল্প। যেমন হর্ষবর্ধনের গল্প, সামাজিক গল্প, হাসির গল্প, বিজ্ঞান-ভিত্তিক রহস্য গল্প, ম্যাজিকের গল্প, মিষ্টি গল্প। কাহিনীর সংখ্যাও প্রচুর। গোয়েন্দা কাহিনী থেকে সুরু করে বিজ্ঞানের সরস কাহিনী। কাব্যনাটিকা, জীবজগতের কথা, ছড়া ও কবিতা, বিজ্ঞানীর দপ্তর, গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখার আসর, খেলাধূলো ও ব্যায়াম, ভালো বইয়ের আলোচনা, ছবিতে গল্প, সওয়াল জবাব, টুকরো হাসি, জাদুবিদ্যা, ধাঁধা-হেঁয়ালি ও কবিগুরুর স্মরণে তো আছেই এবং আছে আরো অনেক কিছু—যা গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতে ছেলেরা খুব মজা করে পড়তে পারবে।

লেখকের সংখ্যাও অনেক। তাঁদের মধ্যে শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে ছেলেরা বেশ চঞ্চল হবে, খুশি হবে, তৃপ্ত হবে। সুন্দর প্রচ্ছদপট এঁকেছেন সূর্য রায়। মলাট বোর্ড বাইন্ডিং-এর হলে ছেলেরা আরো খুশি হতো বৈকি।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী ঃ

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪·০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পাঠক মন

গোপাল হালদারের সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠান

সংবাদ-সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টির জন্য সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে শ্রীগোপাল হালদারকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য পঁচিশে বৈশাখ বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডে যে প্রীতি-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, এবারের সে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রবীণ গুণী-সুধীর সমাগমে সভাগৃহটি আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল—স্বয়ং গোপাল হালদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, লীলা মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। সে দৃশ্যটি বড় আনন্দের। 'কেশে যাঁদের পাক ধরেছে' তাঁদের মধুর বিগত স্মৃতির দ্বার উন্মোচনে, পরস্পরের স্মরণ-শক্তির দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সেই ছোট্ট সভাগৃহে একটি বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। নবীন শ্রোতারা এবং অংশগ্রহণকারী গুণীরাও দর্শকের আসনে বসে তা বিশেষভাবে উপভোগ করেন। শ্রীরাধারাণী দেবী, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বয়ং গোপাল হালদার—এঁদের ভাষণ সবাই বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন। লীলা মজুমদার হঠাৎ এসে তাঁর চপল মধুর ভাষণে দক্ষিণ হাওয়ার বাতায়নটি খুলে দিয়ে কোথায় সরে পড়লেন! ইতিমধ্যে কখন শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এসে নীরবে শ্রোতা-দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আসন করে নিয়ে বসেছেন স্মিতহাস্যে অনেকেরই অলক্ষ্যে! মনে হল প্রবীণদের সমস্ত কীর্তি-কাণ্ড দেখে-শুনে তাঁদের মনের গতি বুঝে নিচ্ছিলেন! সবশেষে তিনি উঠে এলেন—রবীন্দ্রসঙ্গীত রাজ্যের রাজা। লীলা মজুমদার যে বসন্তের হাওয়াটির প্রবেশপথের দ্বার উন্মোচন করে দিলেন—মনোরাজ্যের সেই হাওয়াটিকে জাগিয়ে দিয়ে যৌবনের গান ধরলেন তিনি তাঁর আশ্চর্য ঐশ্বর্যময় গলায়। আশ্চর্য সুরের ঝড় তুললেন প্রতিটি প্রবীণ বুকের পাঁজরে পাঁজরে—"আমরা দূরে আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা সব যত—" শুভ্রকেশী সাহিত্য-সেবী সুধীরা আত্মবিস্মৃত হয়ে মাথা দোলাতে লাগলেন! এঁর প্রথম গানটি "তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো" সমুদ্রের কল্লোলের গাম্ভীর্যে পঁচিশে বৈশাখ দিনটিকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করলো। সাহিত্যসেবিবৃন্দের মুকুটমণি গোপাল হালদারের সম্বর্ধনা সার্থক হল। এই সঙ্গীত-সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে প্রাণতোষ ঘটকের ভাষণটি কিন্তু (বহু ভাষণেই ইতিমধ্যে হয়ে গেছে) একেবারেই ভেসে গেল। বরং সবশেষে মনে হল, এই বাক্‌পটু (সভায় সর্বক্ষণই এঁদের মনোজ্ঞ বাক্-যুদ্ধ লেগেই ছিল!) সুধিবৃন্দ "আমিও না তোমার গান" বলে কোলাহল করে উঠে বয়ঃকনিষ্ঠ শিল্পী, অশোকতরুকে টেনে বসিয়ে আরও দুখানা পরম রসিক, চির যুবক কবির যৌবন উদ্বেলিত গান বুকের কোটরে ভরে নিলেন না কেন? তবেই তো সম্পূর্ণ হতো সেদিনের সুন্দর সভা। সাহিত্যের সভায় সঙ্গীত তো অপরিচিত অতিথি নয়। বিশেষ করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়—যাঁর সঙ্গীতের দিকে আগ্রহ যে একটু বেশিই মনে হল? অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেই তিনি ঘুরে বসলেন—অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন তাঁকে। শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ তাঁর ভাষণের জন্যে—গোপাল হালদার মহাশয়কে নব-ভঙ্গিতে নব-রচনায় প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করার জন্যে—রসগ্রাহিতায় তাঁর ঔৎসুক্যের এই আসরে তাঁকে চেনবার সুযোগ হল বলে বড় ভাল লাগলো। সর্বোপরি, আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মকর্তাদের—তাঁরা গুণীর উপযুক্ত সমাদর দেখিয়েছেন, আমাদের তা দেখবার সুযোগ দিয়েছেন, আর সুযোগ দিয়েছেন আমাদের ছোট আসরে বসে একেবারে সহজ পরিবেশে আশ্চর্য সঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য-লাভের। এ দিনটির আসর ভোলবার নয়। গোপাল হালদারের বিনয়-নম্র চেহারাটি চিরদিন ছবির মতো মনে থাকবে।

—চিত্রিতা গুপ্ত

৪৫।ই।৩, মুর এভিনিউ, কলিঃ-৪০

কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসে ঘুষের দৌরাত্ম্য!

সম্প্রতি সাপ্তাহিক বসুমতী ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় কমার্শিয়াল ট্যাক্স (সেলস ট্যাক্স) অফিসারদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং তার জন্যে বিক্রয়কর আদায়ের পরিমাণ কমছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা সংবাদটি সংগ্রহ করেন, তাঁরা সম্ভবত কমার্শিয়াল ট্যাক্স আদায় দেন না এবং ১৪ বেলেঘাটা মেন রোডের কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসের ঘরে ঘরে বারান্দায় সিঁড়িতে ঘুষের কী অবারিত দৌরাত্ম্য চলছে তার কোন খোঁজ রাখেন না! রাখলে কখনই তিনি এমনতর ওকালতি করতেন না। কারণ ঐ সংবাদ পাঠ করে ব্যবসায়ীমহলে হাস্য সংবরণ করা সম্ভব হয় নি। ঐ অফিসের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন যে, এঁদের অধিকাংশের পক্ষে ঘুষই আসল আয়, সরকারী মাইনেটা স্রেফ উপরি। আবার ১৩ই এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোল এই সব অফিসারদের এক দল কমিশনারের ঘরের সামনে বসে আছেন। সেলস ট্যাক্স অফিসে প্র্যাকটিশ করেন এমন একজন ভদ্রলোক ছবিটি দেখিয়ে হেসে বললেন, এতগুলি ঘুষ-জীবীর গ্রুপ ফোটো দেখতে পাওয়া বিরল! তাঁকে বললাম, যদি আড়ালে একথা বলেন তবে প্রকাশ্যে বলতে বাধা কি? কেন রুখে দাঁড়ান না দুর্নীতির বিরুদ্ধে। তিনি হাসি থামিয়ে বললেন, দু-একজন হলে নিশ্চয় ধরিয়ে দিতাম। কিন্তু তাতে তো কাজ হবে না। উল্টে এই অফিসে প্র্যাকটিশ বন্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে। দুর্নীতি দূর করতে গিয়ে শেষে পথে পথে ভিক্ষে করব। ওসব আইডিয়ালিজম্ ছাড়ুন। দুর্নীতির সংগে সহযোগিতা না করলে নাজেহাল আপনি হবেন, অফিসার নয়। তখন প্রশ্ন করলাম, সরকারী মাইনেটা যদি উপরি হয় তবে তাঁরা আন্দোলন করছেন কেন গ্রেড বাড়ানর জন্য এবং কেনই বা খবরের কাগজের লোক ডেকে এত ঘটা করে প্রচার করা? যেমন ধরুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকার Loopholes in the Sales Tax laws cost lakhs. তাতে বোঝান হচ্ছে ব্যবসায়ীরা অতীব প্রতারক এবং অফিসাররা এক-একটি ধোয়া তুলসী পাতা। একথা তাঁরা প্রকাশ করলেন না যে জটিলতা থাকার জন্যে ভুল বেশি হয়। এই অফিসাররাই নতুন ব্যাখ্যাতা হয়ে ভুলের সাজা হিসেবে কিছু আদায় করে নেন বাঁ হাতে।

এসব কথা কোন ব্যবসায়ীই প্রকাশ্যে বলবেন না, কারণ তাহলে ব্যবসায় তুলে দিতে হবে। কিন্তু অফিসার-কেরানীদের ঘুষ আদায়ের কৌশল দিন দিন এত নৈপুণ্য লাভ করছে যে, দেশের স্বার্থে এঁদের মুখোস খুলে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। এবং একাজে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেছি বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের ৩২ দফা কর্মসূচীর প্রথম দফা পড়ে যাতে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত করবেন।

অতএব আর একটু খুলে লেখা যাক। আপনি নতুন ব্যবসায় শুরু করেছেন, আপনার সেলস ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন দরকার। যতক্ষণ না পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবসায় হচ্ছে ততক্ষণ আপনাকে নম্বর দেয়া হবে না। অর্থাৎ আপনাকে সেলস ট্যাক্স দিয়ে মালপত্র কিনতে হবে, কিন্তু আপনি সেই মাল বিক্রয়ের সময় ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন না। আপনার লাভ থেকে এই ট্যাক্স দিতে হবে। যাঁরা ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক তাঁরা তাঁদের কাঁচা মাল কেনার সময় ট্যাক্স দিয়ে কিনবেন, কিন্তু বিক্রয়ের সময় ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন না। তার ফলে তাঁদের লাভ বরবাদ হয়ে যায়। দশ হাজার টাকা বিক্রয় পর্যন্ত এই রকম চলার পর রেজিস্ট্রি করার আবেদন করার অধিকার হয় তাঁর। আইন বলে যে দশ হাজার টাকা বিক্রি হবার পর দু' মাস পর্যন্ত কোন সেলস ট্যাক্স আদায় করার দায়িত্ব থাকবে না। বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু' মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর তাঁকে দেওয়া হবে।

কিন্তু দু' মাসের মধ্যে নম্বর পেতে গেলে আপনাকে নগদ সাড়ে পাঁচ শো টাকা গুনে দিতে হবে। অবশ্য অনুনয়-বিনয় করে কোন কোন ক্ষুদ্র শিল্পপতি সাড়ে তিন শো টাকাতেও নম্বর পেয়েছেন। তাছাড়া খাতাপত্র দেখতে দু'জন ইন্‌স্পেক্টর আসবেন তাঁদেরও প্রাপ্য হয় পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা। এটা তাঁরা নেন কোন বেকায়দা কিছু না লেখার কী হিসাবে। যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া হিসাবে এঁরা প্রতি ভিজিটে ১০ টাকা মত নেন। তাছাড়া চা-জলখাবার দরুণ কিছু খরচ ধরে রাখতে হয়। এসব টাকা যদি আপনি না দেন আপনাকে বছরখানেক ধরে হয়রান করে ছাড়বেন এনারা। আপনার কাগজপত্র কিছুতেই পছন্দ হবে না। আড়াই হাজার টাকা ডিপোজিট দাবি করা হবে। আপনার এমন অবস্থা করে দেওয়া হবে যে, বিক্রয়ের ওপর ট্যাক্স জমা দিতে হবে কিন্তু আপনি আদায় করতে পারবেন না অর্থাৎ নিজের পকেট থেকে ট্যাক্স দিতে হবে। এইটেই চরম প্যাঁচ। এই প্যাঁচে ফেলে ঘুষটা দিতে বাধ্য করা হয়।

ক্ষুদ্র শিল্পপতি ও নতুন ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি উপকৃত হবেন যদি এই রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতিকে সরলীকরণ করা হয়। এবং নম্বর দেওয়াটা ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন থেকে সহজলভ্য হয়।

ব্যবসায়ীদের সেলস ট্যাক্স সংক্রান্ত কোন কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে বলা হয় জনসংযোগ অফিসার-এর সংগে দেখা করতে। আপনার জিজ্ঞাস্য যদি একটার বেশি দুটো হয় তাহলে তিনি বড়ই বিরক্ত হন। তাঁর মুখে দিয়ে কিছু বার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে হ্যাঁ সেলস ট্যাক্সের উকীলের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর-এর খোঁজ এঁরা রাখেন। আপনাকে শুধু কষ্ট করে বলতে হবে কোন এলাকা থেকে আপনি আসছেন। তক্ষুণি ডায়েরী খুলে বলে দেবেন কার কাছে গেলে পরামর্শ ও ফর্ম পাবেন।

রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেতে যা কষ্ট, নম্বর পেয়ে আপনার কষ্ট আরো বাড়বে। কারণ ফর্ম আনার হয়রানি অত্যধিক। এটা আর এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এবং প্রতিবার ফর্ম আনতে যাওয়া মানে কিছু খরচ সংগে নিয়ে যাওয়া। ফর্ম পাওয়ার হয়রানি বন্ধ হলে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে।

সেলস ট্যাক্সে যদি আপনার হিয়ারিং থাকে তবে জীবনের আরেকটি শিক্ষা আপনার হবে। অনেক উকীল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, জ্যোতিষী ইত্যাদি পেশাদার লোক আছেন যাঁদের চেম্বারে বসলে আগে টাকাটা বার করে দিতে হয়। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কয়েকজন কমার্শিয়াল অফিসার এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই টাকাটা দেওয়া ব্যবসায়ীদের অভ্যেস করতে হয়, পরিবর্তে তাঁরা কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেন।

সেলস ট্যাক্সে দুর্নীতির কথা বলতে গেলে শেষ হবে না। তবু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, পার্টির গাড়িতে বা ট্যাক্সিতে চড়ে বাড়ি ফেরা বা মার্কেটে যাওয়া কি সার্ভিস রুল সম্মত? সকাল সাড়ে এগারটা-বারটার সময় অফিসে আসা? অন্য অফিসারের ঘরে গিয়ে গল্প-গুজব জমানো?

সংবাদপত্রে বার বার প্রকাশ করা হচ্ছে যে, অফিসারদের দাবি মেনে না নিলে রাজস্ব আদায় কম হবে। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই হুমকীজনক অপপ্রচার চালান হচ্ছে। কারণ সরকারের যদি কিছু প্রাপ্য হয়ে থাকে তা পাঁচ বছরের মধ্যে সরকার আদায় করে নিতে পারবেন। দু'-পাঁচদিন ধরে কয়েক দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার তাঁদের অযৌক্তিক দাবি-দাওয়া নিয়ে কমিশনারের ঘরের সামনে বৈঠকখানা বসালে তাতে সরকারের লোকসান হবে না।

পশ্চিমবংগ সরকার একদিন বুঝবেন যে, অল্পসামর্থ্য পার্টিগুলিকে নেকড়ের মুখে ছেড়ে দেওয়াটা রাজস্ব আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা নয়। সেলস ট্যাক্সের বিভিন্ন রেট, একই পণ্যের ওপর দু'রকম রেট, ট্যাক্স জমা দেবার মধ্যে অনাবশ্যক হয়রানি ও অব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে লাভবান হচ্ছেন দুর্নীতিপরায়ণরা—অফিসার বা ব্যবসায়ী। মনে রাখা দরকার ঘুষ কেউ বিনা কারণে দেয় না এবং ঘুষের টাকা সরকারের লোকসান ঘটিয়ে আদায় করা হয়।

এই প্রসংগে এসে পড়ে কেরানী-পিওনদের দুর্নীতির কথা। একে অভাবের সংসার অন্যদিকে চোখের সামনে অফিসারদের অবারিত ঘুষ গ্রহণ অধস্তন কর্মচারীদের নীতিবোধকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দিয়েছে। নানা ছলছুতোয় তারা ব্যবসায়ীদের পুরো শোষণ চালাচ্ছে। একদিন সেলস ট্যাক্স অফিসে গেলে এরা আপনাকে পুরোপুরি বেইজ্জত করে দেবে। কেরানীবাবুরা চুপটি করে থাকেন। টাকাটি হাতে না পেলে পাতাটি নাড়েন না। পিওনের প্রাপ্য প্রতিটি পার্টির কাছ থেকে এক টাকা। এইটাই সর্বনিম্ন। কম দিলে প্রকাশ্যেই এরা বলে, "না দেবেন তো পরের হিয়ারিঙের দিন আপনার ফাইল পাওয়া যাবে না।" অর্থাৎ সারাদিন বসে থাকলেও ফাইল মিসিঙ। তিন মাস বাদে আবার তারিখ পড়বে। তখন ফাইল পাওয়া যাবে কিন্তু তাতে কয়েকটি জরুরী কাগজ থাকবে না। তখন অফিসার আপনাকে অনুরোধ করবেন, প্রকৃত নকল পাঠাতে। দায় আপনার। সরকারী অফিসে সরকারী আইন রক্ষা করাও আপনার দায়িত্ব।

কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিস থেকে দুর্নীতি দূর করা সরকারের কর্তব্য প্রথমেই হওয়া উচিত। তাতে উচ্চ পর্যায়ের যোগসাজসে রাজস্বের ক্ষতি হবে না। ছোট পার্টিরাও চোখ রাঙানোর হয়রানি থেকে বাঁচবেন।

—জনৈক ভুক্তভোগী

মন্ত্রীরা কী বলেন

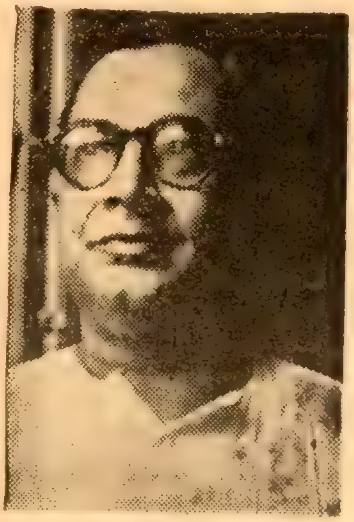

পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী

প্রঃ। আপনার বিভাগের কাজ কি?

উঃ। আমাকে প্রধানত চীফ হুইপ হিসাবে আমাদের দল ঠিক রাখতে হবে। বিরোধীপক্ষের সংগে যোগাযোগ করা এবং আইনসভার যা কিছু কাজ —তা কো-অর্ডিনেট করা এবং বিভিন্ন মন্ত্রীদের সংগে এসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা ইত্যাদি।

পশ্চিমবংগে এবারই প্রথম পরিষদীয় মন্ত্রী হিসেবে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হল। ১৯৬৭ সালে সিমলাতে নিখিল ভারত হুইপ সম্মেলনে এ-কথা বলা হয়েছিল যে, প্রতি রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকায় পরিষদের কাজ দেখা-শোনার জন্য একজন করে পরিষদীয় মন্ত্রী রাখা উচিত। তা হলে, "This will make for effective planning and co-ordination of all kinds of Govt. business in the Legislature and liaison with Opposition Groups and their leaders. * * * This could, however, be done better if a regularly constituted Dept. of Parliamentary Affairs starts functioning in the States."

আমার বিভাগে এখনও কোনও 'সেক্রেটারিয়েট' নেই। চেষ্টা হচ্ছে যাতে তাড়াতাড়ি এ-কাজটি সম্পন্ন করা যায়।

প্রঃ। বিধান পরিষদ তুলে দেবার কাজ কতটা এগোল?

উঃ। প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভায় এ-বিষয়টি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আশা করা যায়, ১৬ই মে'র মধ্যেই এ-সম্পর্কিত যা করণীয় তা করা হয়ে যাবে। তা না হলে পশ্চিমবংগে বিধানসভার সদস্য না হয়েও যাঁরা মন্ত্রী আছেন—তাঁদের নিয়ে একটু অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। তবে তা খুব একটা বড় সমস্যা নয়।

প্রঃ। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সাত দিন আপনি তো স্বাস্থ্যদপ্তরের কাজ-কর্ম দেখেছেন? ঐ দপ্তর সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উঃ। বর্তমানে স্বাস্থ্যদপ্তরের যে অবস্থা —তার আমূল সংস্কার করা না হলে যুক্তফ্রন্ট সরকার এ ক্ষেত্রে কিছু করতে পারবেন না—এ আমার বদ্ধমূল ধারণা। শক্ত হাতে কোনও রকম ভয় না করে যদি এই বিভাগ পরিচালনা করা যায়—তবেই কিছু হতে পারে। গত বাইশ বছর ধরে এই বিভাগের ঘুঘুর বাসা গড়ে উঠেছে। আমলারাই প্রকৃতপক্ষে শাসন করছে। তবে আমার বন্ধু শ্রীভট্টাচার্যকে আমি সব কথা জানিয়েছি। আপনাদের পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে যে সব খবর বেরিয়েছে, আমি সেগুলি তাঁকে দিয়েছি। কিছু কিছু তদন্ত হচ্ছে।

প্রঃ। কাশীপুরে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির যুগ্ম আহবায়ক হিসাবে সারা বাংলায় ধর্মঘট পালিত হবার আহবান আপনি দিয়েছেন। এদিকে আপনি তো একজন মন্ত্রী। এতে সাংবিধানিক কোনও সমস্যার সৃষ্টি হবে না তো?

উঃ। আমি তা মনে করি না। প্রধান-মন্ত্রী সরকারী গাড়ি চড়ে আসছেন, যাচ্ছেন, কংগ্রেসের মিটিং-ও করছেন। আমরা ধর্মঘটের দিনে সরকারী গাড়ি ব্যবহার করি নি। দলীয় কাজে সরকারী কোনও জিনিস আমরা ব্যবহার করি না। যুক্তফ্রন্ট মূলত সাধারণ মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার। কাজেই আমরা যে ধর্মঘটের আহবান দিয়েছিলাম তার মধ্যে কোনও অযৌক্তিকতা দেখি না।

সমষ্টি উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীচারুমিহির সরকার

প্রঃ। আপনার বিভাগের কাজ কি কি?

উঃ। গ্রামগুলি যাতে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে উন্নত হয়—সেই চেষ্টা করাই এই বিভাগের প্রধান কাজ। ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর 'ব্লকের' জন্ম হয়। পশ্চিমবংগে ৩৬৫টি ব্লক আছে। একটি নির্দিষ্ট স্থান নিয়ে এককেটি ব্লক তৈরি হয়েছে। বি-ডি-ও ও তাঁর অধীন 'এক্সটেনশন অফিসারগণ' ব্লকের কাজ পরিচালনা করেন। ব্লকের নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী হলেন গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকা।

প্রতিটি ব্লকের দুটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে ব্লকের কাজের জন্য ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের খরচ পাঁচ লক্ষ টাকা।

১৯৭৪ সালের মধ্যে পশ্চিমবংগের সমস্ত ব্লকগুলিরই দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হয়ে যাবে। সমগ্র খরচের শতকরা ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকেন।

১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত ব্লক-উন্নয়নের জন্য দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বাজেটে রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার এ-পরিমাণ টাকা দিতে পারেন নি। রাজ্য সরকার যদি এই পরিমাণ টাকা খরচ করতে পারতেন, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ছয় কোটি ষাট লক্ষ টাকা পাওয়া যেত। অর্থের অভাবে গ্রামের উন্নতি ব্যাহত হয়েছে।

প্রঃ। এ-পর্যন্ত গ্রামের উন্নয়নের কাজ কেমন হয়েছে বলে মনে হয়?

উঃ। মেয়েদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ এবং পুরুষদের মধ্যে অর্ধাংশ সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের নাম শোনে নি। ত্রাণের কাজ নিয়েই বি-ডি-ও এতকাল ব্যস্ত থাকতেন। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। কিন্তু পঞ্চায়েতের পরিচালন ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় উদ্দেশ্য ফলবতী হয় নি। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হত। কাজেই জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয় নি।

প্রঃ। পঞ্চায়েতের সঙ্গে ব্লকের সম্পর্ক কি?

উঃ। বি-ডি-ও-কে আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি ও সভ্যদের মত নিয়ে কাজ করতে হয়। আঞ্চলিক পরিষদে দুর্নীতি থাকায় সমষ্টি উন্নয়ন একটি হাস্যকর অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতির বেতন মাসিক দেড়শত টাকা। সহ-সভাপতির বেতন মাসিক এক শত টাকা। এ ছাড়া সদস্যদের রাহা খরচ তো আছেই। এমনভাবেই অর্থের অপচয় ঘটেছে।

প্রঃ। শোনা যাচ্ছে বি-ডি-ও এখন থেকে কৃষি বিভাগের কাজকর্মের দিকেই বেশি নজর দেবেন। ব্লকের অন্যান্য কাজ চলবে কেমন ক

উঃ। কৃষিকে প্রাধান্য দেওয়ায় ৮২টি ব্লকের বি-ডি-ও প্রধানত কৃষি বিভাগের কাজকর্ম দেখবেন। 'জয়েন্ট বি-ডি-ও' ঐ সব ব্লকের অন্যান্য কাজকর্ম দেখবেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ব্লকের মাধ্যমেই গ্রামে কাজ করে থাকে।

প্রঃ। আপনার দপ্তরে অফিসারের সংখ্যা কত?

উঃ। বি-ডি-ও ৩৩৫ জন। জয়েন্ট বি-ডি-ও ৮২ জন। অন্যান্য অফিসার ২৬৮০ জন। গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকার সংখ্যা ৫৫০০ জন।

প্রঃ। আপনার দপ্তরের কাজ যথাযথভাবে করার জন্য নতুন কোনও পরিকল্পনা করেছেন কি?

উঃ। গ্রামের উন্নতি অনেকাংশে জনগণের উপর নির্ভরশীল। জনগণকে সজাগ করতে পারলেই কাজ যথাযথভাবে হবে। যুক্তফ্রন্টের কর্মীদের এ-বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। আমার দপ্তরের অফিসারগণ যুক্তফ্রন্ট কর্মীদের সংগে যুক্ত হয়ে কাজ করলে ভাল হবে। মন্ত্রী থেকে শুরু করে এ বিভাগের সকলকেই মনে রাখতে হবে যে সকলেই সেবক। সেবার মাধ্যমেই দেশ গড়ে তোলা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ-কাজ করতে গিয়ে কোনও অবস্থাতেই যেন কোনও বৈষম্য না থাকে।

গ্রামসেবকদের গ্রামে কাজ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও দিতে হবে। টাকার অভাব বড় বেশি। কাজেই কতটা কী করে ওঠা যাবে বলা কঠিন। তবে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

এরপর মন্ত্রীমহাশয়কে 'বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজ' সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

[প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রীচারুমিহির সরকার ঐ কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি এবং ঐ কলেজটি নিয়ে বেশ কিছু দিন যাবৎ নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে। চারুবাবু ঐ কলেজের অধ্যক্ষের কাজকর্মে মোটামুটি সন্তুষ্ট বলে মনে হল। যদিও এই অধ্যক্ষের কাজকর্ম সম্পর্কে নানারকম গুজব শোনা যায়।]

মৎস্যমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস রায়

প্রঃ কলকাতায় মাছের চাহিদা ও সরবরাহ কেমন? ঘাটতি কত এবং তা পূরণ করা হয় কেমন করে?

উঃ কলকাতায় দৈনিক মাছের চাহিদা ছয় হাজার মণ। শীতকালে প্রায় চার হাজার মণের মত মাছ বাজারে আসে। সাধারণত আড়াই থেকে তিন হাজার মণ মাছ আমদানী হয়। জুন-জুলাই মাসে আমদানীর পরিমাণ সবচেয়ে কম—দুই হাজার মণের মত। ঘাটতি পূরণ করা হয় না। আমদানী মাছের শতকরা ২৫ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের মাছ। বাকীটা বাংলার বাইরে থেকে আসে। বিহার-উড়িষ্যা, অন্ধ্র, গুজরাট, রাজস্থান, দিল্লী প্রভৃতি স্থান থেকে বাংলাদেশে মাছ আমদানী করা হয়। এই সব মাছ সাধারণত পুকুর বা জলাশয় থেকে ধরা হয়ে থাকে। চিল্কা হ্রদ থেকেও কিছু মাছ পাওয়া যায়।

প্রঃ কেরালা থেকে মাছ আমদানী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ করে দিলেন কেন?

উঃ কেরালায় মাছ সস্তা। সামুদ্রিক মাছ প্রতি কিলো চল্লিশ-পঞ্চাশ পয়সায় পাওয়া যায়। ভেবেছিলাম—ওখান থেকে মাছ আনতে পারলে কলকাতার চাহিদা মেটানো যাবে। কেরালা ও মাদ্রাজ সরকার মাছ জোগান দিতে রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু হিসেব কষে দেখলাম ওখান থেকে মাছ আনতে হলে পরিবহন খরচা খুব বেশি পড়ে যাবে। এখানে ঐ মাছ আড়াই টাকার কম প্রতি কিলো বিক্রি করা যাবে না। কিন্তু এখানকার বাজারে এর থেকে কিছু কম দামে ঐ ধরনের মাছ পাওয়া যায়। কাজেই এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হল।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে মাছ-চাষের জন্য কি পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা হয়?

উঃ বাজেট থাকে ষাট লক্ষ টাকার। ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা মূলধন হিসাবে খাটে। মৎস্যজীবীদের টাকা ধার দেওয়া হয়। সরকারের নিজস্ব কিছু কিছু 'ফিসারী'-ও আছে। জোনপুর, কুচবিহার, পুরুলিয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, ফ্রেজারগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় রাজ্য সরকারের ফিসারী আছে।

এ ছাড়া মৎস্য চাষের জন্য যে কর্পোরেশন আছে তা দীঘা,

বার-বার—আবার
তরুণ অপেরার ৫৫-৭১২১
হিটলার
মহাজাতি সদনে ৩রা জুন
সন্ধ্যা ৬ ॥ ঘটিকায়
আরো কয়েকটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা
"রামমোহন"
"লেনিন"
"নেপোলিয়ান"
যাত্রাজগৎ পড়ুন

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফার মধ্যে ১৫ দফায় একটি বিশেষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি হস্তক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এই দফায় বলা হয়েছেঃ "সমগ্র রাজ্যে ক্ষেতমজুরদের নিম্নতম বেতনের নিশ্চিতকরণের জন্য, তাদের অধিক কাজের জন্য এবং সরকারী কৃষিকার্যে ক্ষেতমজুরদের নিয়মিত শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।"

ক্ষেতমজুরদের সমস্যা বিরাট। আর্থিক সংকট যতই বাড়ছে—গ্রামীণ অর্থনীতিতে অনিবার্যরূপে যতই ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটছে ততই এই সমস্যার আকার ও তীব্রতা বাড়ছে। দেশে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। কর্মহীন কৃষক ঋণের দায়ে জোতজমি হারিয়ে প্রতিদিন ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে।

ক্ষেতমজুরদের কোন শক্তিশালী সংগঠন আজো না থাকার ফলে ক্ষেতমজুরদের জোতদার-জমিদারের শোষণ বাড়ছে। কল-কারখানার শ্রমিকদের উপর যে শোষণ চলে তার তুলনায় ক্ষেতমজুরদের উপর শোষণ তীব্রতর। তাই ক্ষেতমজুরদের নিম্নতম মজুরী লাভ করার অধিকার নেই। ক্ষেতমজুরদের নিম্নতম বেতন স্থির করার একটা লোক-দেখানো প্রচেষ্টা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ঘটেছে বটে। কিন্ত এ ব্যবস্থা কোথাও কার্যকরী করা হয় নি।

যুক্তফ্রন্ট এই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সমস্যা বিরাট জানা সত্ত্বেও গ্রামের লক্ষ লক্ষ শোষিত ও বঞ্চিত ক্ষেতমজুর অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছে, গত দুই মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার এই সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা, এই দিকে কোন হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করেন নি।

কোন্ কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অ ফ্রন্ট কমিটি ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা এখনো স্থির করেন নি। মধ্যবর্তী নির্বাচনকালে সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর পুরনো সমাজ-সম্পর্কের জের স্বরূপ জমিদার-জোতদারের যে প্রভাব তাদের উপর ছিল তাকে অস্বীকার করে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। ফ্রন্ট সরকার সেই প্রত্যাশা পূরণের পথে এখন পর্যন্ত কার্যকরী কিছু করেন নি। সমস্ত সমস্যাটির সমাধান দুরূহ, কিন্তু সরকারী ফার্মে নিযুক্ত ক্ষেতমজুরদের নিয়মিত শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে সরকার এই সমস্যার সঠিক সমাধানের আগ্রহী বলে নিজেদের পরিচিত করতে পারেন। সে পথে তাঁরা এখনো পা দেন নি। রাজ্যের আর্থিক শোচনীয় অবস্থার কথা সকলেরই জানা। তবু তো এই দুই মাসেই সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ঝুঁকি তো সরকার নিয়েছেন! অবিলম্বে যদি পনের দফার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সরকার অগ্রসর না হন তাহলে তাঁরা শুধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে অবশ্যই হবেন তা নয়, কৃষকদের আস্থা অর্জনের যে সুযোগ তাঁদের পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা তাঁরা হারাবেন। একদিকে সরকারী আইন প্রণয়ন আর অন্যদিকে ক্ষেতমজুরদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে বর্তমান গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যে পথ ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির কাছে উন্মুক্ত হয়েছে সেই পথ আবার অবরুদ্ধ হয়ে যাবে।

ফ্রন্ট-কর্মসূচীর ১৬ দফায় বলা হয়েছেঃ "শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। বেকার-ভাতা প্রচলনের জন্য যুক্তফ্রন্ট সচেষ্ট হবে।

"যুক্তফ্রন্ট সরকার বৃদ্ধদের জন্য ভাতাদানের নীতির প্রসার ঘটাবে এবং ভাতা বৃদ্ধি করবে।

"দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন এবং দুঃখবরণ করেছিলেন, তাঁদের বার্ধক্যে কিংবা পঙ্গু অবস্থায় সরকার উপযুক্ত নজর দেবে।"

গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কৃষক এবং অল্প জমির মালিক কৃষক বৎসরে সাত-আট মাস কর্মহীন অবস্থায় থাকে। তাদের অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হয়ে পড়ায় গ্রামের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন আদৌ ঘটানো যাচ্ছে না। গ্রামের বেকারদের কর্মসংস্থান করতে হলে শুধু জমির উপর নির্ভর করলে চলবে না। কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়তে হবে।

এ কাজ করতে সময় লাগবে। যুক্তফ্রন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে বেকার-ভাতা প্রচলনের জন্য চেষ্টা করা হবে।

রাজ্যের শোচনীয় আর্থিক অবস্থায় রাজ্য সরকারের পক্ষে বেকার-ভাতা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে চাপ দেওয়ার জন্য ফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে।

বার্ধক্য পেনসন-ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক

আলমপুর, মহারাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থান থেকে মাছ যোগান দেবার ব্যবস্থা করে থাকে। মৎস্যজীবীরা প্রায় পাঁচশত সমবায় সমিতি গঠন করেছেন।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে ভেড়ির সংখ্যা কত? বিল-এরই পরিমাণ কত?

উঃ পশ্চিমবঙ্গে ১৫৩টি ভেড়ি আছে। প্রায় এক লক্ষ একরের মত বিস্তৃত বিলে মৎস্য চাষ হয়ে থাকে।

প্রঃ মাছের যোগান বাড়াতে আপনার বিভাগ কি ধরণের কাজ করে থাকেন?

উঃ পুকুর সংস্কার করা, মৎস্যজীবীদের মাছের পোনা দিয়ে সাহায্য করা, আর্থিক সাহায্য করা প্রভৃতি ছাড়াও আমার দপ্তর মৎস্যজীবীদের মাছ চাষ সম্পর্কে নানারকম উপদেশও দিয়ে থাকে।

প্রঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের যোগান বৃদ্ধির জন্য কোনও পরিকল্পনা আছে কি?

উঃ কেন্দ্রীয় সরকারের একটা 'স্কীম' আছে। দিল্লী গিয়েছিলাম। এ সম্বন্ধেও কথাবার্তা হল। এই স্কীমটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। গভীর সমুদ্রে 'ট্রলার' দিয়ে মাছ ধরার পরিকল্পনা আছে। উপকূলভাগে যান্ত্রিক নৌকার সাহায্যে মাছ ধরার প্রস্তাব আছে। তাছাড়া সুন্দরবনের কিছু জায়গা নিয়ে 'ফিসারী' করার প্রস্তাবও আছে। রাজ্য সরকার ৫০টি যান্ত্রিক নৌকার সাহায্যে মাছ ধরার ব্যবস্থা করছেন। এই নৌকাগুলির খরচ কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন।

রাজ্য সরকার সুন্দরবনে 'ফিসারী'র বিশ হাজার একর জায়গা ছেড়ে দিতে চেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচশত একর জায়গায় বর্তমানে 'ফিসারী' করবেন।

এই সমগ্র পরিকল্পনাটি রূপায়িত করতে ব্যয় হবে সাত কোটি পনেরো লক্ষ টাকা।

এখন বার্ধক্য ভাতা পায়। এই সংখ্যার প্রসার করতে হবে।

ফ্রন্ট-কর্মসূচীতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এটি একটি জরুরী কর্তব্য।

অত্যন্ত বেদনার হলেও একথা সত্যি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেকের অবস্থাই এখন শোচনীয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় বর্বর অত্যাচারে অনেকেই পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। আবার এমন অনেকে আছেন যাঁদের ভারবহন করার কেউ নেই। আজ বার্ধক্যে পৌঁছে তাঁরা পরের করুণার উপর নির্ভর করেন। গত বিশ বৎসর ধরে এঁদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার প্রাথমিক কর্তব্য আমরা পালন করতে পারি নি। বড় বড় কথার জাল বুনে এইসব সংগ্রামীদের জন্য মঞ্চ-মণ্ডপ থেকে বৎসরে একবার করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা ছাড়া আর কিছু করা হয় নি। ইতিহাস যাঁরা রচনা করলেন তাঁদের প্রকৃতপক্ষে আমরা ভুলতে বসেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেককেই শেষ বয়সে অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে।

গত ২০ বৎসরে অতি স্বল্পসংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সামান্য পরিমাণ ভাতা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারেও দলীয় সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তাঁরা কার্যকরী করতে পারেন। এজন্য নিশ্চয়ই কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয় না।

ফ্রন্টের ২২ দফায় মেয়েদের বিশেষ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই দফায় বলা হয়েছে: "মেয়েদের বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকার উপযুক্ত দৃষ্টি দেবে। মেয়েদের শিক্ষা ও তাদের নানা ট্রেনিং-এর সুযোগ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হবে এবং মেয়েদের উপযুক্ত বিবিধ কর্মসংস্থানের উপায় সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা হবে।"

সম্প্রতি নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহিলাদের এক সম্মেলন থেকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখে এই সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। স্বল্পশিক্ষিত মহিলাদের কর্মসংস্থানের উপর মহিলা সঙ্ঘ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কয়েকটি বেসরকারী শিল্পসংস্থায় যাতে স্বল্পশিক্ষিতা মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প-শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা মেয়েদের ট্রেনিং দিয়ে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয়েছে। আমাদের দেশের স্বল্পশিক্ষিতা মহিলাদের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আদৌ দেওয়া হয় নি। আজকের আর্থিক সঙ্কট যেসব সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলেও এদিকে ফ্রন্ট সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে।

যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা, তপশিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন, কলকাতার বিশেষ সমস্যার সমাধান এবং পশ্চাৎপদ এলাকাগুলির উন্নয়ন, বাংলা ও নেপালী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করা প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

ফ্রন্টের কর্মসূচীর ৩১ দফায় বিধান পরিষদ লোপ করার জন্য ফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলা হয়েছে। এই একটি দফা সম্পর্কে ফ্রন্ট সরকার যা করণীয় তা তাঁরা করেছেন।

ফ্রন্টের সর্বশেষ দফাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দফায় বলা হয়েছে:

"৩২(ক) যুক্তফ্রন্টের নিম্নতম কর্মসূচী রূপায়ণের পক্ষে প্রতিবন্ধক ভারতীয় সংবিধানের যে ধারাগুলো রয়েছে, যুক্তফ্রন্ট সরকার সেগুলিকে সংশোধনের জন্য আন্দোলন করবে। সংবিধানের যেসব ধারায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়গুলি রয়েছে, রাজ্যসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে ঐসব ধারার সংশোধনের জন্য বিশেষভাবে আন্দোলন করা হবে।"

ফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর হয়েছে। বস্তুত রাজ্যের কোন মৌলিক সমস্যা সমাধান দূরের কথা, ছিটেফোঁটা সংস্কার করতে হলেও রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে অধিকতর অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার এই দাবি নিয়ে সোচ্চার। এমন কি কংগ্রেসী রাজ্যগুলিও এই দাবি আজ উত্থাপন না করে পারছে না। কারণ রাজ্যের হাতে ক্ষমতা এত সীমিত, তাদের অর্থসঙ্গতি এত কম যে বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকেই যেসব সংস্কার করা প্রয়োজন এত সীমিত সঙ্গতি নিয়ে তা করা সম্ভব নয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমগ্র রাজ্যের জনগণের মধ্যে এই সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রথম দিন থেকেই উদ্যোগী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিদিন যেসব নতুন নতুন চক্রান্ত সৃষ্টি করা হচ্ছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট সরকারকে টিকে থাকতে হলেও এই আন্দোলনের পথে যেতে হবেই।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, কেন্দ্রের উপর আবার সব বিষয়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের পক্ষে যেটুকু করণীয় সেদিকে দৃষ্টি না দেওয়ার ঝোঁক দেখা দেওয়ার বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে।

রাজ্যের জনসাধারণ ফ্রন্ট সরকারের কাছে অনেক প্রত্যাশা রাখে। সে প্রত্যাশা পূরণে প্রাথমিক পদক্ষেপ করতে না পারলে কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনেও সাধারণ মানুষকে টেনে আনা যাবে না।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ফ্রন্টের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে ফ্রন্টকে পূর্ণ স্থায়িত্বের সুযোগ জনসাধারণ দিয়েছে। শুধু তত্ত্বকথার আড়ালে থেকে এই সুযোগ কাজে লাগানোর ব্যাপারে ফ্রন্ট উদ্যোগ গ্রহণ না করলে বর্তমান সমাজ-কাঠামো পরিবর্তনের যে লক্ষ্য ফ্রন্টের দলগুলির আছে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে কোন কর্মপন্থা পেশ করে নি। অন্যদিকে ফ্রন্ট ৩২ দফা কর্মসূচী উপস্থাপিত করে মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। এই ৩২ দফার অধিকাংশই সংস্কারমূলক। সেগুলো পূরণ করতে কোন বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না। দৃঢ়তা, সৎ দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা এবং মানবিকবোধ প্রভৃতি কয়েকটি গুণ থাকলেই ৩২ দফার অনেকগুলো দফা কার্যকরী করা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের মানুষ সাগ্রহে লক্ষ্য করবে ফ্রন্ট সরকার কতটুকু অগ্রসর হতে পারে।

—শ্রীসর্বদর্শী

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

ন্যাশন্যাল ডিল্যুক্স

১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

বুদ্ধিজীবীদের সমস্যাঃ কয়েকটি নতুন প্রশ্ন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইতিপূর্বে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-তে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা নিয়ে কিছু লিখেছিলাম। সে সম্পর্কে কিছু চিঠিপত্র এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। পত্রলেখকেরা আমার বক্তব্যকে মোটামুটি সমর্থন করেছেন; কিন্তু এই সঙ্গে তাঁরা কয়েকটি প্রশ্নরও উত্থাপন করেছেন। আমার সাধ্যমত সে-সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

শ্রীঅনুপম মিত্র তাঁর সংক্ষিপ্ত পত্রে উত্তরসূরী'-সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু তিক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের সম্পর্কে আমার দুর্বলতার কারণ জানতে চেয়েছেন। উভয় কবি সম্পর্কেই তাঁর মন্তব্য কিন্তু সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। অরুণবাবু স্বাধীন সাহিত্যসমাজকে ধিক্কার জানিয়েই একদা 'উত্তরসূরী'-তে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, এবং এই পত্রিকায় যেসব কবি সাহিত্যিকদের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে তাঁদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা ঐ সমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। উত্তরসূরী' কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা গোষ্ঠীর মুখপত্র নয় এবং এই পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে আমরা কখনো এমন প্রত্যাশা বা দাবি করতে পারি না যে, লেখক নির্বাচনের সময় তিনি তাঁদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক মতবাদের দিকে দৃষ্টি রাখবেন। এই প্রত্যাশা আরো অর্থহীন হতো এই কারণেই যে, অরুণ ভট্টাচার্য কোনরূপ বামপন্থী রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি। কবি এবং মানুষ হিসেবে তাঁকে যতদূর জানি, তিনি মানবধর্মে বিশ্বাসী এবং যে-কোনরূপে অমানুষিকতার প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক। তিনি শুধু স্বাধীন সাহিত্যসমাজের বিরোধিতাই করেন নি; প্রফুল্ল সেনের রাজত্বকালে যখন ভুখমিছিলের ওপর পুলিশের গুলী বর্ষিত হয় এবং যে সময় পশ্চিমবঙ্গের কবিকণ্ঠ প্রায় নীরব থেকে গিয়েছিল, অরুণবাবু 'দৈনিক বসুমতী'-তে কবিতা দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর 'উত্তরসূরী' পত্রিকাতেও এ-সময়ে অপর কবির প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে; যেমন প্রকাশিত হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠের ধিক্কার।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অনুপমবাবু প্রতিক্রিয়াশীলদের গোলাম বলেছেন। এই উক্তি যেমন ভ্রান্ত, তেমনি পীড়াদায়ক। দীর্ঘকাল ধরে সুভাষ তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামী ঐতিহ্যকে লালন করে এসেছেন, কবি হিসেবে সেখান থেকে তিনি অনেক দূরে চলে গিয়েছেন, এমন কোনো ঘটনাই এখন পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নি। আমার প্রবন্ধে সুভাষের যে সমালোচনা করেছি, তার কারণ, তিনি সম্প্রতি সহাবস্থানে প্রচণ্ড বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন, যা ক্রমে তাঁকে সংগ্রামী সাহিত্য রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এখন পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে নি; তবে প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের প্রতি তাঁর এককালীন ধিক্কার এখন যে সহিষ্ণু মমতার রূপ নিচ্ছে, তার জন্য তাঁকে আমরা আত্মীয় হিসেবেই কিছুটা তিরস্কার করবো বই কি! তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক; যেমন বর্ষীয়ান কবি বিষ্ণু দে অথবা বিমলচন্দ্র ঘোষের কাছে। আজ সুভাষ মুক্তমেলায় গিয়ে কবিতা পড়ছেন বলে তাঁর সমস্ত অতীতটা মুছে যায় না এবং তাঁর মত কবির বর্তমান নিশ্চয় এই কারণেই আমাদের কাছে অস্পৃশ্য, দূষিত মনে হতে পারে না। কিছুদিন আগেও, প্রফুল্ল ঘোষের ফ্যাসিস্ট রাজত্বে, তিনিই তো পশ্চিমবাংলার প্রথম কবি, যিনি আইন ভেঙে কারাবরণ করেছিলেন এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সংগ্রামী কবিকে সময়ে রাস্তার মিছিলে নেমে আসতে হয়।

আসলে সুভাষ যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, সহাবস্থান নীতির প্রতি সেই মত বা আদর্শ নিজেদের আস্থা অনেকদিন ধরেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। এই আস্থা যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলই আজ আর নিজেদের মধ্যে গোপন রাখেন নি। অনুপমবাবু যদি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বা যুক্তফ্রন্টকেই প্রতিক্রিয়াশীলদের গোলাম বলতে চান, তাহলে সুভাষ সম্পর্কেও তিনি যা খুশি বলতে পারেন। আমার বক্তব্য একরকম নয়। ভারতের কংগ্রেস আর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আমার কাছে কখনোই একই চরিত্রের নয়; যেমন নয় বাজারের কেনা গোলাম আর আমাদের এককালীন সংগ্রামী জ্যেষ্ঠ সহোদরেরা, যাঁরা এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সুভাষ কিন্তু এখনো অনেক সময় এই জড়তা ভেঙে, রাস্তার মিছিলে নেমে আসেন। তাঁর সমালোচনা করার সময় একথা মনে রাখলে সম্ভবত আমরা সত্যিকারের ন্যায়বিচার ও শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবো। অনুপম মিত্র আমাকে 'কবি-যোদ্ধা' বলে অত্যন্ত লজ্জা দিয়েছেন। আমি তা নই। আমাদের মধ্যে যিনি এই নামের সত্যিকারের অধিকারী ছিলেন, তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জীবনের সুদীর্ঘকাল রাজনীতির কারণে তিনি কারাবাস করেছেন; এবং আরো দীর্ঘ সময় বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে। এসব অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, এবং কবি হিসেবেও আমরা এমন কিছু সংগ্রামী ঐতিহ্য রচনা করতে পারি নি যা নিয়ে অপরের সুখ্যাতি কুড়ানো যায়।

শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্তী স্রষ্টাদের বুদ্ধিজীবী বলাতে আপত্তি জানিয়েছেন এবং তাঁদের শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত করেছেন। এতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই; কেননা আমাদের সাহিত্যস্রষ্টা ও শ্রমিকশ্রেণী উভয়েই এখন পর্যন্ত একই রকম দুর্দান্ত।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনার অপরিহার্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

সুযোগসন্ধানীদের সঙ্গে যেসব সৎ সাহিত্যিক গলা জড়াজড়ি করে চলেন, তাঁদের চিনিয়ে দেবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন। এ কাজ তো আমাদের সকলকেই করতে হয়। এখনো সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় কোনরূপ 'পোলারাইজেশন' হয় নি, যা সম্প্রতি রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এর ফলে সকল সৎ সাহিত্যিককেই সুযোগসন্ধানীদের সঙ্গে এই পত্রিকায়, ওই পত্রিকায়, একত্রে পাতা পেতে বসে যেতে হয়। এমন কি, যেসব 'লিটল ম্যাগাজীন' বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ সামনে নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়, সেখানেও দেখা যায় বহু ছদ্মবেশী সুযোগসন্ধানীর ভিড়। এ'দের চিনে রাখতে পারলে হয়তো আমাদের উপকার হতো; কিন্তু সর্ষের মধ্যে এত বেশি ভূত যে এই ধরণের প্রচেষ্টায় অন্যত্র আমাদের হতাশাই বেড়ে যাবে। হয়তো অনুরূপ হতাশা থেকেই এক সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরা পরিচিত প্রগতিশীলদের গণ্ডী থেকে বাইরে চলে যেতে চান। কেননা অন্যত্র যত পাপ বা ভাঁড়ামীর দোষই আমাদের স্পর্শ করুক, প্রগতিশীলের মুখোস পরা ভণ্ডদের নষ্টামী সেখানে নেই।

তবু আমি বলবো, সৎ সাহিত্যিক আছেন এবং সুযোগসন্ধানীদের সঙ্গে তাঁরা একত্রে মিলেমিশেই আছেন যা আমাদের পশ্চিমবাংলার সাহিত্য বা সংস্কৃতির এখন পর্যন্ত নিয়তি। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল দাশগুপ্ত, সত্যপ্রিয় ঘোষ, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, রবি সেন অথবা অমলেন্দু চক্রবর্তী, এবং এ'দের মতই আরো কিছু কবি সাহিত্যিক দীর্ঘকাল পরীক্ষার মধ্য দিয়েই আজ সৎ ও প্রগতিশীল বলে প্রতিষ্ঠিত। বাজারের পত্র-পত্রিকায় এ'দের জন্য নিমন্ত্রণ নেই; কেউ কেউ সেই নিমন্ত্রণ পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আর সকলের মতই, এ'দেরও অসৎ সংসর্গ করতেই হয়। যতদিন পর্যন্ত সত্যিকারের সংগ্রামী পত্র-পত্রিকার সংখ্যা আঙুলে গোনা যাবে, এবং সেই সব পত্র-পত্রিকায় সৃষ্টিধর্মী কবি ও সাহিত্যিকদের মোটামুটি বর্জন করে চলা হবে, ততদিন প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সত্যিকারের সৎ ও একনিষ্ঠ শিল্পীদের কিছুতেই একত্রে জমায়েত করতে পারবেন না। অথচ এ ধরণের পত্র-পত্রিকার সংখ্যা যদি উল্লেখযোগ্য হতো, আমরা উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীদেরই শুধু নয়, আরো কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সৎ কবি সাহিত্যিকদেরও একত্র মেলাতে পারতাম, যাঁরা বাধ্য হয়ে, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই, শেষ পর্যন্ত বাজারের আশ্রয় খোঁজেন।

বীরেনবাবু তরুণ আদর্শবান লেখকদের সম্পর্কেও আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছেন। তরুণ বলতে, যদি সবে লিখছেন এমন লেখকদের নামের তালিকা দিতে হয়, তাহলে নানা অসুবিধার কারণ রয়েছে। আমি বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজীন'-এ এবং বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় ––ন কিছু তরুণ কবি ও কথাসাহিত্যিকদের কবিতা ও অন্যান্য রচনা পড়েছি, যাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনের মধ্যে অনেক কিছু আশা পোষণ করি। কিন্তু তাঁদের কবিতা, গল্প, নাটক বা প্রবন্ধে এখনই পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের হতাশা বা বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করার নেতৃত্ব এসেছে, এমন কথা স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারি না। 'ভিয়েতনাম' সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমি চারটি কবিতার সংকলন দেখেছি, যার দুটির সম্পাদনা করেছেন একেবারেই তরুণ কবিরা এবং কবিতা লিখেছেন তাঁরাই। তাঁরা কবিতা লিখতে চেষ্টা করছেন এই পর্যন্ত; ভিয়েতনাম এখনো অনেক দূরে। তবু, ইতিহাসের ইংগিত মনে রেখেই আমি এমন কথা এখনই স্পর্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে চাই যে, এইসব তরুণ লেখকদের মধ্যে থেকেই একদা আমাদের গল্পে, কবিতায়, নাটকে ও সাহিত্যের সমালোচনায় সত্যিকারের দিনবদলের সূচনা দেখা দেবে। তার প্রস্তুতি এ'দের সাহিত্যে এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়; কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক আকাশে আজ দশদিক থেকে যে পুঞ্জীভূত মেঘ ক্রমেই বড় থেকে আরো বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে, সেদিকে খোলা চোখ রাখলেই আমাদের সমস্ত জীবনটাই যে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, এবং এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখোমুখি পশ্চিমবাংলার কবিতা, সাহিত্য, সাহিত্যের সমালোচনাও যে অন্য দিকে বাঁক নিতে বাধ্য, সেই অনুভবকেও আর আড়াল করার উপায় থাকে না। আমরা চাই বা না চাই, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও, তরুণদের শস্ত্র হাতে হাত রেখেই বাংলাদেশের যাবতীয় কবি সাহিত্যিককে একদিন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যাঁরা দীর্ঘকালের অনভ্যাসবশত সেদিনও খুঁড়িয়ে হাঁটতে চেষ্টা করবেন, সেদিন তাঁদের নামও আর কেউ কবি বা সাহিত্যিক হিসেবে উচ্চারণ করবে না। তাঁরা অতীতে কে কি ভাল কথা লিখেছিলেন, শুধু সেই ইতিহাসটুকুই হবে তাঁদের সেদিনকার জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন।

শ্রীচোমং লামা তাঁর চিঠিতে ফ্যাসিবিরোধী ও প্রগতিশীল লেখকদের আন্দোলন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন ইতিপূর্বে আমিও রেখেছিলাম। যেহেতু আমাদের উভয়ের জিজ্ঞাসাই প্রায় এক রকম, এর উত্তর অপর কোনো যোগ্য পাঠক দেবেন। চোমং লামা আমার সমগ্র প্রবন্ধটিকেই আত্মসমালোচনা বলে মনে করেছেন; এজন্য তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। কোনো কোনো প্রগতিশীল বন্ধু মূল প্রবন্ধটিতে ততটা আত্মসমালোচনা দেখতে পান নি, যতটা পরনিন্দা দেখেছেন। আমিও যে তাঁদেরই একজন, একথা কি প্রবন্ধের নিচে ফুটনোট দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে?

২০, মূল্যবান রিস্টওয়াচ ও ৪টি বহুমূল্য উপহার। প্রত্যেক গ্রাহক টর্চ লাইট

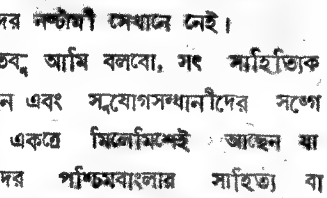

ব্যাটারী সহ, ফাউন্টেন পেন, সিগারেট লাইটার ও ১টি সুদৃশ্য মজবুত নিকেল কেস ডামি রিস্টওয়াচ (৩ বঃ গ্যাঃ) পাইবেন। ডাক মাশুল অতিরিক্ত।

ইস্টার্ণ ওয়াচ কোং (B.W.)
পোঃ বঃ ১২২২২, কলিকাতা—৫।

ত্রিভুবন

ননীমাধব চৌধুরী

ত্রিভুবন কথাটি পৌরাণিক সৃষ্টি প্রকরণের বর্ণনায় আছে, কথাবার্তার মধ্যেও আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি। ত্রিভুবন মানে তিনটি ভুবন, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল।

স্বর্গ দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য, পাতাল নাগরাজ বাসুকীর রাজ্য, আগে সারা মর্ত্যের একচ্ছত্র সম্রাট কেউ ছিলেন না, এখন চলছে ডেমোক্রেসীর একচ্ছত্র আধিপত্য।

পৌরাণিক মতে স্বর্গের অবস্থান মর্ত্যের ওপরে, শূন্যে। কতকটা ওপরে, পৃথিবীকে ঘিরে যে এ্যাটমসফিয়ার রয়েছে তার মধ্যে, না এ্যাটমসফিয়ারের সীমানা পেরিয়ে বাইরের স্পেসের মধ্যে, পুরাণকারগণ তা বলেন নি। নাগরাজের রাজ্য—পাতালের অবস্থান তাঁদের মতে ভূপৃষ্ঠের মর্ত্যের নিচে, কত কিলোমিটার নিচে জানা যায় না। তৃতীয় ভুবন মর্ত্যের অবস্থান সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা নেই, আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী মর্ত্য।

ত্রিভুবন কথাটির এই পৌরাণিক সংজ্ঞা আধুনিক যুগে অচল হয়েছে, স্বর্গ ও পাতালের অস্তিত্বে এ যুগের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্বাস করতে আনিচ্ছুক। সংজ্ঞা অচল হলেও কথাটি রয়ে গিয়েছে অভিধানের শব্দভাণ্ডারে রক্ষিত একটি মূল্যবান সেকেলে অলঙ্কারের মত। সেকেলে অলঙ্কার দামী জিনিস। কিছু বদল করে তাকে একেলে করা সম্ভব কি-না ভেবে দেখবার বিষয়।

সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।

ত্রিভুবন কথাটির আসল অর্থ তিনটি জগৎ। আমরা বলতে চাই তিনটি জগৎ ঠিকই রয়েছে, কিন্তু তাদের অবস্থান আলাদা জায়গাতে নয়, এক জায়গাতে। তিন ভুবনের একটি মর্ত্যের মধ্যে আর দুটি ভবন আমাদের চোখের অগোচরে রয়েছে।

প্রথমে মর্ত্যের বা পৃথিবীর কথা বলা যাক।

পৃথিবীর বয়সের হিসাব করলে মানুষের আবির্ভাব একেবারে হালের ব্যাপার। পৃথিবীর বস্তুময় রূপের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে। বস্তুজগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রবৃত্তির জন্ম অনেক পরের ব্যাপার। অনুসন্ধানের ফলে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়েছে, অজানা কথাও অনেক রয়ে গিয়েছে। অজানা কথা জানবার জন্য মানুষ পৃথিবীর বস্তুজগৎ ছেড়ে মহাশূন্যে সৌরজগতে উড়ছে। এ্যাটমসফেরিক বেল্ট পার হয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়েছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ পার হয়ে ২৩৮৮৫৭ মাইল দূরে অবস্থিত পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র প্রদক্ষিণ করা হল সেদিন, ভেনাস ও মার্সের আরও খবর নেবার চেষ্টা হচ্ছে।

আমাদের আসল বক্তব্যে ফেরা যাক। পৃথিবীর মধ্যে তিনটি আলাদা জগৎ আছে এই আমাদের বক্তব্য। এই তিনটি আলাদা জগৎ কি? এদের নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাক্রোস্কোপিক জগৎ, মাইক্রোস্কোপিক জগৎ, সাব-মাইক্রোস্কোপিক জগৎ।

ম্যাক্রোস্কোপিক জগৎ মানে যে জগতের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য মাইক্রোস্কোপ দরকার হয় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ বা sensory world.

পৃথিবীর যে বস্তুময় রূপের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সে রূপ হল ইন্দ্রিয়গোচর পৃথিবীর রূপ। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, নাসিকা ও জিহ্বা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। আমাদের জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন এই বস্তুজগৎ থেকে আমরা তা সংগ্রহ করি। আমাদের জন্ম, বৃদ্ধি, কাজকর্ম, ভোগ-বিলাস, সুখ-দুঃখ, ব্যাধি, মৃত্যু ইন্দ্রিয়গোচর জগতের এলাকায় পড়ে। এ ধরণীর যে বিচিত্র রূপ, রস, গন্ধে আমাদের মন মুগ্ধ হয়, বিস্ময় জাগ্রত হয় সবই ইন্দ্রিয়গোচর জগতের বিষয়।

এই জগতের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে গড়ে উঠেছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান ইত্যাদির মত প্রয়োজনীয় বহু বিজ্ঞান।

এরপর দ্বিতীয় জগতের কথা উঠছে। এ জগৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের ফলে।

মাইক্রোস্কোপ, যার কাজ চক্ষুর অগোচর ছোট জিনিসকে বড় করে দেখানো, (Malpighi, 1628-98)। টেলিস্কোপ, যা দূরের জিনিস কাছে দেখায়, এর আগে ১৬শ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের ফলে চক্ষুর অগোচরে যে প্রাণীজগৎ মিশে রয়েছে ইন্দ্রিয়গোচর জগতের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, বেসিলি, ভিরাস প্রভৃতি অদৃশ্য বীজাণুর সঙ্গে জগতের পরিচয়ের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল।

আবিষ্কারের পরে প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত মাইক্রোস্কোপ কাজে লাগানো হয় নি। তারপর পাস্তুর ও কোকের (Koch) হাতে এই যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পাস্তুর মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বাতাসে ভাসমান মাইক্রোবের রহস্য উদ্ভেদ করলেন। কোন বস্তুকে বীজাণুমুক্ত করার প্রণালী, যা তাঁর নাম থেকে পাস্তুরাইজেশন নামে পরিচিত, তাঁর উদ্ভাবিত। বীজাণু বা জার্ম থিওরীর প্রতিষ্ঠাতা পাস্তুরের গবেষণার ফলে ব্যাকটেরিয়োলজি, মাইক্রোবায়োলজি প্রভৃতি নতুন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং বায়োলজির নতুন শাখা বায়োকেমিস্ট্রির বিস্ময়কর প্রসার সম্ভব হয়েছে।

কয়েক বছর হল ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এবং আলট্রা-ভায়োলেট ও ইনফ্রা-রেড মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের ফলে চক্ষুর অগোচর জগতের প্রাণীদের সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এ জগতের অধিবাসীর সংখ্যা ইন্দ্রিয়গোচর পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি, পৃথিবীর সর্বত্র, মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু, পশু-পাক্ষী, কীট-পতঙ্গের মধ্যে, বাতাসে এরা ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কথাও শোনা যায় যে পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে মাইক্রোবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। নতুন বিজ্ঞান এস্ট্রো-বায়োলজির পণ্ডিতরা এ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন।

তৃতীয় জগৎ হচ্ছে সাব-মাইক্রোস্কোপিক জগৎ। এই জগতের আবিষ্কার

পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তকারী নবতম অধ্যায়। সাব-মাইক্রোস্কোপিক জগতের অন্য নাম world of elementary particles বা মৌলিক অণুসমূহের জগৎ।

পদার্থবিজ্ঞানে পদার্থসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কঠিন, তরল ও বায়বীয়। অণু এই তিনটি শ্রেণীর অতিরিক্ত একটি শ্রেণীর বস্তু। অণুকে এলিমেণ্টারী পার্টিক্‌ল্‌ বলা হয় কারণ এর বিভাজন হয় না।

বিরানব্বইটি মৌলিক ধাতুর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে রসায়নবিজ্ঞান অণুবাদে পৌঁছেছে। পদার্থবিজ্ঞানী পরমাণুবাদে পৌঁছেছেন। তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার ফলে। রসায়নবিজ্ঞানী বলেন বিরানব্বইটি মৌলিক ধাতু দুইটি মৌলিক উপাদান প্রোটন ও ইলেকট্রনে গঠিত। পদার্থবিজ্ঞানী বলেন সকল পদার্থ কতকগুলি পরমাণুর (atom) সমষ্টি এবং এই পরমাণু প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনে গঠিত।

যে সকল মৌলিক অণু নিয়ে এ্যাটম, মোলিকিউল এবং তা থেকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল পদার্থ গঠিত তাদের নাম প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন। এইগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি অণু আবিষ্কৃত হয়েছে, যথা, গ্রাভিটন, ফোটন মুওন, পি মেশন, ল্যামবাদা, সিগমা, এক্স-আই, এ্যান্টি-প্রোটন, পোজিট্রন, নিউট্রিনো ইত্যাদি। ভর অনুসারে এদের বেরিয়ন, মেশন ও লেপটন এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এ্যাটম বা পরমাণু গঠনে যাদের প্রয়োজন হয় না, যাদের কাজ কি জানা যায় নি এমন অণুও আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

কঠিন, তরল, বায়বীয় শ্রেণীর সকল পদার্থের, ইন্দ্রিয়গোচর ম্যাক্রোস্কোপিক জগতের এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর মাইক্রোস্কোপিক জগতের সব কিছু অণু দিয়ে গঠিত পরমাণুর সমষ্টি।

এই অণু এবং পরমাণুদের খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না, যদিও এরা অসীম শূন্যে, সৌরজগৎ, সমগ্র পৃথিবীর জল, স্থল, অন্তরীক্ষ ও ভূগর্ভ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এদের জগৎ, নিয়মকানুন, কাজকারবার সব আলাদা। চোখে যাদের দেখা যায় না সেই ইলেকট্রন ও প্রোটন নিয়ে গঠিত পরমাণুর শক্তি যে কি বিস্ময়কর পরমাণু ভাঙবার ফলে তা জানা গিয়েছে। এই বিস্ময়কর শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রতে (nucleus) নিহিত থাকে।

অণুগুলিকে খালি চোখে দেখা যায় না, মাইক্রোস্কোপেও দেখা যায় না বলা হয়েছে। একটা অণুর আয়তন ১০^১৩ অর্থাৎ ১০,০০০,০০০,০০০,০০০০ সেণ্টিমিটার। প্রতি সেকেণ্ডে ১০^২৩ সেণ্টিমিটার গতিতে ছোটে। এর জীবনকাল ১০^২৩ সেকেণ্ড।

যা বিশ্বব্যাপী, যার সংখ্যার সীমা নেই, যা মাইক্রোস্কোপে ধরা পড়ে না, যা অবিশ্বাস্য ক্ষুদ্র আয়তনের, সেই অণুর অস্তিত্ব ধরা পড়ল কি করে?

অণুর অস্তিত্ব জানবার কতকগুলি উপায় বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন।

একটি উপায় নিউক্লিয়ার ইমালশনের ব্যবহার। জিলেটিনে সিলভার ব্রোমাইড মিশিয়ে তৈরি এই বিশেষ ইমালশন ফটোগ্রাফের ফিল্মে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্যুৎকণাবাহী অণু এই ফিল্মের সামনে দিয়ে গেলে বিশেষ ইমালশনে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তা থেকে অণুর ফটোগ্রাফ তৈরি হয়। ক্লাউড চেম্বার, বাব্‌ল চেম্বার, স্কিণ্টিলেশন কাউণ্টার, গাইগার কাউণ্টার, কেরেনকভ কাউণ্টার, স্পার্ক চেম্বার ইত্যাদি অনেক রকম উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর অণুর গতিবিধি জানবার জন্য।

পৃথিবী, সৌরজগৎ, আকাশে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক, যে নীহারিকাপুঞ্জ চোখে দেখা যায় না, যারা খালি চোখে পড়ে না, টেলিস্কোপের সাহায্যে যাদের দেখতে হয়, সব এক উপাদানে গঠিত, মাত্র উপাদানের অবস্থাভেদে আলাদা বলে মনে হয়, অণু-পরমাণু জগতের যেসব খবর বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন তা থেকে জানা যায়।

অণুগুলির অবিরাম রূপান্তর ঘটছে এবং এক শ্রেণীর অণু অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তিত হচ্ছে। আপনা থেকে তাদের যে পরিবর্তন ঘটে তা ছাড়া মানুষ এক্সিলেটর বা তাপসঞ্চারী যন্ত্রের সাহায্যে এই পরিবর্তন ঘটাতে এবং নতুন নতুন অণু সৃষ্টি করতে পারে।

ফোটন (Photon) নাম দেওয়া হয়েছে এক শ্রেণীর অণুর। এটা তাপ বা আলোকবাহী। সূর্যের তাপ পৃথিবীর ওপরে বর্ষিত হচ্ছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মত এই আলোকবাহী ফোটনের দ্বারা। এই তাপ ফটো-সিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়ে উদ্ভিদের মধ্যে সঞ্চিত হয়। ফোটন শুধু সূর্যের তাপ বা শক্তি বহন করে পৃথিবীতে আনে না, অন্যান্য তারা, ছায়াপথ বা তারকামণ্ডলীর খবর বহন করে। ফোটন না থাকলে আমরা দেখতে পেতাম না এবং আমাদের অস্তিত্বও থাকত না, কারণ, পৃথিবীর সব শক্তির মূল সূর্য আর সূর্যের শক্তি ফোটন দ্বারা বাহিত হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছয়। পৃথিবী প্লাবিত করে মৌলিক অণুরা ছোটাছুটি করছে। তাছাড়া সূর্য থেকে, নীহারিকা থেকে, অন্য নক্ষত্ররাশি থেকে কোটি কোটি কজমিক অণু ভূপৃষ্ঠ থেকে শূন্যে সাত হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর ম্যাগনেটিক বেষ্টনীর মধ্যে ধরা পড়ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিভুবন কথাটির পৌরাণিক সংজ্ঞার বদলে চমৎকার নতুন সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে। তিনটি ভুবন ঠিকই রয়েছে কিন্তু তাদের অবস্থান আলাদা নয়, দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মর্ত্যের মধ্যে অদৃশ্য বীজাণুর জগৎ এবং অদৃশ্য অণু-পরমাণুর জগৎ মিশে রয়েছে।

ইষ্টার্ন রবার ওয়ার্কস
কলিকাতা-১৫

জ্বালা

সাবিন চট্টোপাধ্যায়

সুতরাং একটা সাংঘাতিক ঘটনা। লেবার অফিসার থেকে শুরু করে অনুগত কুলী-সর্দারও ক্রুদ্ধ ম্যানেজারের সাথে চ্যাঁচাতে লাগল, "কে করেছে?.. কার বুদ্ধি?...কার?...কা-র?" সমস্ত ঘরখানা গমগম করে উঠল। দেয়ালে লটকানো পেণ্ডুলামটার শীতল আওয়াজ এবং ম্যানেজারের ভারী বুটের অস্থির পায়চারিতে মনে হচ্ছিল কয়েকটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তের পর এঁদের মাথায় বুলেট চালান হবে। তা ছাড়া এ ভীষণ অপরাধের কোন সাজা নেই।

বাইরে জনাদশেক উদগ্রীব মজুর এবং ভিতরে ছ'টি অপরাধী। পাথরের মত নিশ্চুপভাবে দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিল। কেবল বেচন মাঝে মাঝে ঝাঁঝাল খিস্তি হজম করতে না পেরে রাগে রাগে গুমরে গুমরে উঠছিল। একবারে লেবার অফিসার হেঁকে উঠল, "কার বুদ্ধি?...শালা, শুয়োরের বাচ্চারা...।" বাধা দিল ম্যানেজার। "এভাবে হবে না"—শেষে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আই ওয়াণ্ট...আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জবাব চাই। কে?...কে এ কাণ্ড করিয়েছে?...এ লেখা কার?" শেষে আঙুল উঁচিয়ে ধমকে উঠল, "গেট আউট।" জবাবে ছ'জন কয়েকটা ভারী নিশ্বাস ফেলে নীরবে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত কারখানায় ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে উঠেছে। সেকসনে সেকসনে ঐ একই কথা। "হ্যাঁ সাহস বটে, অমনভাবে গাড়ি আটকান চাট্টিখানিক কথা নয়।" কিন্তু শেষটায় কি হবে—এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারছে না। এমন দোর্দণ্ড মালিক, ততোধিক দোর্দণ্ড ম্যানেজার—তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেয়ায় গর্দান নেবে, না চাকরি খাবে, না জেলে পাঠাবে বোঝা গেল না।

বেচনের মুখে একটিও কথা নেই। আস্তে বেরিয়ে সে আপনমনে সেকসনের দিকে হেঁটে আসছিল। অপেক্ষমাণ মজুরেরা বার বার তাকাচ্ছিল ওর দিকে। কিন্তু সেদিকে তার নজর নেই। যেন একাকী সে পথ হেঁটে যাচ্ছে। একবারে গাদা করা দুধের পিপেগুলোর সামনে আসতেই সে থমকে দাঁড়াল। গতকালের

জল ফেলে দেয়া হয়েছে, কিন্তু লেখাগুলোয় ওজন্য এতটুকু নষ্ট হয় নি। চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। মনে মনে ওগুলো পড়তেই বেচনের হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। সে কিছুটা আনন্দ অনুভব করে। সত্যিই কি মোক্ষম বুদ্ধিখানাই না এসেছিল! কিন্তু...। গম্ভীর মেজাজে ফিরে চলল তার সেকসনে। পঁচিশ মিনিট লেট। এক্ষুণি মেশিনে যোগ দেয়া দরকার।

সেকসনে আসতেই আর একটু হৈ-চৈ। মেশিন ছেড়ে কয়েকজন মজুর প্রায় কাছে ছুটে এল। চোখমুখে কেমন উৎকণ্ঠা আর কৌতূহলের ছাপ।

"কি বাত-চিত্ হল রে?...বাবুরা কি বলছে?"

দূরে থেকে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, "বেচন?...ও বেচন ভাই?"

যেন বেচনই এ ঘটনার নায়ক। অন্য পাঁচজনের কাছে কারও কোন প্রত্যাশা নেই, এমন কিছু জানতেও চায় না তারা। শুধু বেচন আর বেচন। শেষে তিষ্ঠোতে না পেরে বেচন খিঁচিয়ে উঠল, "ধুৎ, নিকুচি করেছে!...হবেটা কি আবার শালা! শোন না গিয়ে ওদের কাছে!"

সবাই একটু মিইয়ে যায়। এমন একটা মুখরোচক ঘটনা রসিয়ে রসিয়ে শুনবে না? কিন্তু ইতিমধ্যে সর্দাররা এসে পড়ায় যে যার মেশিনে ফিরে গেল। যেন সমস্ত কারখানায় একটা ঝড় বয়ে গেছে, ধরা পড়ে গেছে মজুর খ্যাপানোর গোপন ষড়যন্ত্র। তাই সর্দাররা কটমটিয়ে মেশিনের প্রতিটি মানুষকে পাহারা দেয়। কোন ফিস্‌ফিসানিও বরদাস্ত করা হবে না। শুধু যন্ত্রের আওয়াজ ওঠে ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্‌ঘড়্-ঘড়্-ঘড়্!

এই বেচন একটি অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। হাঁটা-চলা, কাজ করা, দোকানে বসা—সব সময় মনে হবে একটা চাপা জ্বালা তুষের আগুনের মত তার মনের মধ্যে ধিক্ ধিক্ করছে। সে আগুনে তার হাসি-মস্করা, সাধ-আহ্লাদ যেন দিনকে দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। লোকটা কথা বলে কম। একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এবড়ো-খেবড়ো ঝুলন্ত গোঁফ আর একজোড়া খুদে চোখ নিয়ে সে কেবলই সবাইকে এড়িয়ে চলতে চায়। তাই অনেকেই ওকে ঠাট্টা করে ডাকত বেচন সাধু। এহেন লোকটার পেটে পেটে যে এত বুদ্ধি কেউ আগে ভাবতেই পারে নি। তাই সবারই এত কৌতূহল আর বিস্ময়।

ছুটির পর গেটের বাইরে বেরোতেই চায়ের দোকান থেকে ডাক আসে। জনা তিনেক সমস্বরে কাছে আসতে অনুরোধ করছে। নিশ্চয়ই আজকের ঘটনা জানতে চায়। বেচন কান দেয় না, একমনে হন হন করে হাঁটে বস্তির দিকে। আজ আর কারও কথায় সে ভুলবে না, কোন অনুরোধ সে রক্ষা করবে না। সে কেবল হাঁটতেই থাকে। দোকান থেকে তখনও ডাক আসছে "বেচন...বেচন...ও বেচ্‌না।" শেষে মরিয়া হয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠল, "বেচ্‌না, খুব দেমাক...শালা!" বেচনের কানে আগুন জ্বলে, তবুও ফিরে না তাকিয়ে বস্তিতে নিজের লাইনের দিকে হাঁটে।

খানিকটা ঘোর-প্যাঁচে রাস্তা চলার পর একটা কাঠের পুল পেরিয়ে ওদের বস্তি। বিলকুল কাঁচা লাইনের। খোলার চালায় ঠাসা সার সার বারখানা লাইন। প্রতি লাইনে পঁচিশখানা ঘর এবং প্রতিটি ঘরের সামনে পাকা নর্দমা। যাবতীয় নোংরা এবং লাইনের মানুষদের বহির্গমনের পথ। সারাটি বছর এমনিভাবে চলে জীবাণুর সাথে জীবনের পাঞ্জা লড়াই। কিন্তু আশ্চর্য, মজুর মরে না।

কাঠের পুলটা পার হতে হতে বেচনের হঠাৎ গতকালের কথা মনে পড়তেই হাসি পেল। সত্যি কেমন করে যে ব্যাপারটা ঘটল, সে এখনও ভেবে কূল-কিনারা করতে পারে না। মাথাটার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছিল কয়েকদিন ধরে। সে আর সহ্য করতে পারছিল না। তাই খুব সকালে রাস্তার মোড়ে ছজনের লুকিয়ে থাকা, কোম্পানীর ছোট গাড়িটা চড়াও, দুধের পিপেগুলো নামিয়ে সরিয়ে ফেলা, তারপর কত দ্রুত যে ওগুলোতে জল ভরে ঐ লেখাটা লিখে দিয়েছিল—ভাবতেই সে মনে মনে হেসে উঠল। তার সর্বক্ষণের গুমরানো অশান্তিটা যেন একটু স্বস্তি পেয়েছে। সে হাঁটতে হাঁটতে নিজের ঘরে এসে ওঠে।

বারান্দার কোণে ওর বউ লক্ষ্মী রুটি সেঁকছিল। কোলে রুগ্ন বাচ্চাটা চেঁচিয়ে চলেছে একনাগাড়ে। একেবারে কান ফাটান চিৎকার। ঘরময় ছায়া ছায়া অন্ধকার একটা অসহ্য ভাপসা গরম এবং সেই বিকেল থেকে কি একটা বিশ্রী গন্ধে সমস্ত বাতাস থমথম করছে। বেচন ঘরে ঢুকে ভূতের মত খাটিয়াটার পর বসে রইল। যেন গুহার মধ্যে একটা জন্তু ফুঁসছে। চোখ দু'টো জ্বলছে, নাকটা কাঁপছে থরথর, এবং চিৎকার শুনতে শুনতে এককালে ভয়ানক খেপে উঠল সে।

"থামা, থামা শালার ট্যাকট্যাকানি...মরণ নাই!"

"কার মরণ?—সাঁঝের বেলা এমন অলুক্ষণে কথা?...কার মরণ?—লক্ষ্মীও চেঁচিয়ে ওঠে।

"তোর পিণ্ডির!...যত্তসব!"

"গিলে এসে যত রাগ ঘরে!"..

"হুঃ গেলা!...তোর বাপের দোকান ত?"

"বাপের দোকান হলে অমন মরদকে ঝাঁটা মারত।"

লক্ষ্মীর এ জবাবে বেচন আরও রেগে ওঠে। শেষে গালাগাল, দাপাদাপি, হাঁকাহাঁকি দু' তরফ থেকেই বাড়তে বাড়তে এককালে হাতাহাতি। পাড়ার মেয়ে-বউয়েরা ছুটে এসে ঠেকিয়ে দেয়। লক্ষ্মী চোখ মুছে, নাক ঝেড়ে রুটি সেঁকতে বসে, বেচন নীরব পাথরের মত হাঁটু গুঁজে বসে থাকে অন্ধকার ঘরটায়। ভাবে আহাম্মকের মত নিরীহ বউটাকে চড়চাপড় দিয়ে কি লাভ? নিজের পরই তার রাগ জন্মায়। কিন্তু কি করবে বেচন? কারখানায় ঐ ঘটনার পর মেজাজ তিরিক্ষি। শালার ম্যানেজার নির্ঘাৎ কাল চাকরি খাবে। লেবারবাবু বলেছে শুয়োরের বাচ্চা। সে সহ্য করতে পারে না। বেচনের কেবলই মনে হয় কারখানার নতুন খাটালটার গরুগুলোর মত কোম্পানী ওদেরকে 'গরু-ছাগল' মনে করে। তাদের থাকা খাওয়া, জীবনের নিরাপত্তার তুলনায়, বেচনরা যেন মাছি। কোন মূল্যই নেই। তাই কারখানার নতুন খাটালটা হওয়ার পর থেকে প্রায়ই বেচন ঘরে এসে অমন রাগে উথলে ওঠে। সারাদিনের তুষের আগুনের চাপা অশান্তিটা আর সে কোনক্রমে ধরে রাখতে পারে না।

মাসখানেক আগে তার সেকসনের সামনেই যখন পাকা একটা ব্যারাক উঠছিল, মজুরদের মধ্যে তখন নানান আলোচনা। কেউ বলে আপিস ঘর, কেউ বলে শ্রমিকদের জন্য পাকা পায়খানা, আবার কেউ কেউ বলে নতুন মেশিন বসবে। রীতিমত আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল এ ব্যাপারটা। আবার কেউ রসিকতা করে বলল 'বাবুরা মেয়েছেলে নিয়ে নাচবে ওখানে। নাচনেওয়ালীর ঘর ওটা।'

কিন্তু পরে দেখা গেল কারও কোন সিদ্ধান্ত খাটল না। মেঝে পাকা, ঝকঝকে তকতকে ব্যারাকটার কাজ শেষ হল। প্রচুর আলো-বাতাসের জন্য বড় বড় কাঁচের জানালা বসান হল, ঘরের কোণে কোণে দাঁড় করান ফ্যান, সাদা পাইপের আলো—যেন এক মস্ত সমারোহ। ওখানে গরু থাকবে। অর্থাৎ কোম্পানীর খাটাল। নধর গরু, তাদের সেবাশুশ্রূষার জন্য লোক, ভাল ভাল খাবার এবং নানান উপচার। বেচন তাজ্জব

যনে যায়। শালা! এ খাটাল না রাজ-প্রাসাদ! তারপর রোজ সকাল-বিকেলে দফেন টাটকা দুধ যখন পিপে ভর্তি যেত মালিকের বাড়ি কলকাতায়, তার ভেতরের চাপা জ্বালাটা গুমরে গুমরে ফুঁসে উঠত। সারাদিন সে থাকত মনমরা কিন্তু ছুটির পর বস্তিতে অন্ধকার ভাপসা নিজের গুহাটার মধ্যে ঢুকলেই সে যেন ফেটে পড়ত। শালা আমরা মানুষ না জানোয়ার! তার পরই চলত বউয়ের সাথে ঝগড়া, হাতাহাতি-মারামারি, শেষে পাথরটার মত নর্দমার সামনে বারান্দাটায় বসে থাকা। বেচনের হাসতেও যেন আর ভাল লাগে না।

পরদিন ডাক-বাঁশী বাজবার অনেক আগেই তার ঘুম ভেঙে গেল। বস্তির সব মানুষ তখন ওঠে নি, কেবল কিছু কিছু ছায়া দ্রুত এধার-ওধার চলাফেরা করছে আগাম পায়খানা দখলের আশায়। বেচন বাইরে এসে আকাশটার দিকে তাকাল। কোমল নীলচে রঙে ঢাকা ওটা, কয়েক টুকরো মেঘ থমকে আছে এখানে-সেখানে। জড় পৃথিবীটা খানিকবাদেই সজাগ হবে। দূরে হনুমান-মন্দিরের বটগাছটায় সবে কিছু পাখীর কিচিরমিচির শোনা গেল এবং সারা রাত মেশিন খোঁকার শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে।

বেচন একটা হাই তুলে মুখের সামনে তুড়ি দিল। মনটা আবার তার সেই অশান্ত, চাপা জ্বালায় ভরে উঠল। সারাদিন ওটা ভিতরটাকে কুরে কুরে খাবে। আজ নিশ্চয়ই তাদের ছ'জনের চাকরি খতম।

শালা ম্যানেজার ভয়ানক ক্ষেপে গেছে। দুধ লুটের ব্যাপারটা ভাবতে একটু হাসিও পেল তার। কিন্তু গতকাল কারখানার আবহাওয়ায় যা বুঝতে পেরেছে, তাতে দুধ লুটের চাইতেও অপরাধ ঐ লেখাটা, নইলে এই ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা নিছকই মাথা ঠিক রাখতে না পারা, খ্যাপামি ভেবে—গালাগাল বা কিছুটা শাসিয়েই ম্যানেজার ছেড়ে দিতে পারত। ঐ লেখাগুলোই বাবুদের তাতিয়েছে বেশি, মজুরে খ্যাপানোর আশংকায় শংকিত করে তুলেছে। সুতরাং কারখানা থেকে পত্র-পাঠ এদের গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া দরকার।

বেচন ভাবে সত্যিই সে খেপে গেছল। খাটালের গরুদের বাবুমহলে বিলাস-বাসন এবং প্রতিদিন ঐ টাটকা দুধ চোখের উপর দিয়ে মালিকের বাড়ি যাওয়া সে সহ্য করতে পারছিল না। তাই একদিন চাপা জ্বালাটা হু হু করে বেড়ে উঠতেই, ঐ ছটা মজুর চোরের মত রাস্তা থেকে আটকে দুধ ঢেলে জল ভরে পাঠিয়ে দিয়েছে। রুগ্ন ছেলেটার জন্য একটু দুধ! রোগা বউটার জন্য একটু শ্বেত অমৃত! তাছাড়া এ দুধে তাদেরও অধিকার আছে। কিন্তু কি যে হল তখন বেচনের মাথাটায়! হঠাৎ একটা ইটের টুকরো এনে পিপের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিল ঐ কথা ক'টি। 'এগুলো দুধ নয়, শ্রমিকের খুন। অনেকদিন আপনারা তা' চুষেছেন, আজ একটু জল খান।' খুব নাকি সাংঘাতিক কথা, ভয়ানক অন্যায় কথা। তাই ম্যানেজার বার বার জানতে চাইছে কে লিখেছে? কার বুদ্ধিতে লেখা হয়েছে।

কারখানায় ঢোকবার আগে গেটের সামনের দোকানটায় এক ভাঁড় চা চেয়ে নিল বেচন। এটা তার অভ্যাস। প্রতিদিন ঐ এক কাপ চা খেয়ে এগারটা পর্যন্ত খাটবে। শেষে বাড়ি গিয়ে রাঁধা ভাত।

মিঠাইলালও আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। সে এ কারখানার এক শ্রমিক এবং কম্যুনিস্ট। চোখ-মুখে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ছাপ। সে ত থাকে বেচনের সাথে এক বস্তিতে।

"কাল খুব দেমাক দেখিয়ে গেলি কি রে?"

বেচন ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে চলে।

"হাঁটছিস ত হাঁটছিসই...এ্যাঁ!...ঘাড় ফেরাবার নাম নেই।...কি রে?"

আস্তে বেচন জবাব দেয়, "কি বলবি বল, ট্যাকরট্যাকর করিস না।"

মিঠাইলাল রাগে না। আস্তে বলে, "হুম্...কি বলবি বল!...খুব ত লাট"

দাঁত, উজ্জ্বল, সুন্দর, সুদৃঢ় এবং মাঢ়ী সুস্থ নীরোগ রাখতে

ব্যবহার করুন

বেঙ্গল কেমিক্যালের

কার্বলিক টুথ পাউডার

কার্বলিক অ্যাসিড উপাদানে বিশেষ শক্তিশালী

বীজাণুনাশক, দুর্গন্ধ-নিবারক কার্বলিক অ্যাসিড থাকার দরুণ এই টুথ পাউডার ব্যবহার করলে আপনার দাঁত হবে উজ্জ্বল, সুদৃঢ় এবং মাঢ়ী সুস্থ নীরোগ থাকবে। প্রতিবার দাঁত মাজার পর আপনার মুখ আরো বেশি তাজা, পরিষ্কার, ঝরঝরে মনে হবে।

কস্‌মেটিকস্‌ ডিভিসন

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী • মাদ্রাজ

মুটু কাণ্ড বাধিয়েছ? বেচন তাকিয়ে আছে মিঠাইলালের মুখের দিকে।

"শালা! দেখছিস কি?...খবর্দার ম্যানেজারের কাছে কারও নাম বলবে না...চাকরি গেলে ছ'জনেরই যাবে। খুটমুট শুধু হাঙ্গামা।"

বেচন ভাঁড়টা রাস্তায় ছুড়ে দিয়ে উঠে যায়। কোন উত্তর দেয় না, তবে মনে মনে ভাবে কথাটা ঠিক। কেউ কারও নাম বলবে না। চাকরি গেলে যাবে ছ'জনেরই। সত্যিই খামোখা খুটমুট।

শুরু হল প্রথম সিফটের কাজ। ছ'টা থেকে এগারটা, ফের দুটো থেকে পাঁচটা। কিন্তু আজ আর কি এগারটার পর কাজ হবে? হয়ত খানিক বাদেই এ ছ'জনের ডাক পড়বে ম্যানেজারের কামরায়। কুলী-সর্দার, সুপারভাইজার এখন থেকেই রক্তচক্ষু মেলে তাকাচ্ছে। বেচন আপন মনে মেশিন চালায়। সকালে মিঠাইলাল যে কথাগুলো বলে দিয়েছে খুবই সত্যি। কেউ কারও নাম বলবে না। ক্ষতি হলে এক সাথেই হবে ছ'জনের।

ক্রমে সূর্য উঠতে লাগল আকাশ বেয়ে। বেলা বাড়বার সাথে সাথে বাতাসও তাততে শুরু করল। ওদের সেকসনে আজ এক রহস্যময় স্তব্ধতা। সবার চোখেমুখে কৌতূহল, কথাবার্তা বলার সাধ কিন্তু পাশের মেশিনের মজুরটির সাথে পাশেরটি কোন ইশারাও করতে পারবে না। যন্ত্রের সাথে পাল্লা দিয়ে যন্ত্র বনে যাবে।

এটা অবিশ্যি ম্যানেজারের কোন ফতোয়া নয় কিন্তু যেভাবে উপরওয়ালারা খুটিয়ে খুটিয়ে নজর রাখছে, বলা যায় না কার রোষ পড়ে কার ওপর। চাকরিটি স্রেফ নট। কিন্তু কাজে তেমন প্রাণ নেই, সবাই ভাবছে কখন ডাক আসে, কি জবাব দেওয়া হবে।

বেচন এককালে জল খেতে বাইরে আসে। তার আজ মোটেই ভাল লাগছিল না। গতকালের গালাগালগুলো এখনও তার মনের মধ্যে বাজছে। হঠাৎ আরও তিনজন মজুর জল খেতে এসে ওকে দেখতে পেয়েই ডাক দেয়, "বেচনা... বেচনা... ম্যানেজার ডেকেছিল?" উঃ একেবারে অসহ্য! শুধু বেচন আর বেচন! বেচন কি বলবে? যা না ব্যাটারা ম্যানেজারের কাছে? গিয়ে শুধো? বেচন ইচ্ছে করেই খানিকটা এগিয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

হঠাৎ খাটালটা তার নজরে এল। চোখে পড়ল নধর গরুগুলো। সে ঠিক থাকতে পারল না। তার ভেতরের চাপা আগুনটা হুহু করে উস্কে উঠল। আলো বাতাসযুক্ত পাকা চাতালটা দেখেই মনে পড়ল তার নিজের ঘরখানার কথা। স্যাঁতসেঁতে, ভাপসা অন্ধকার একখানা খুপরি যেন প্রেতপুরী। ওর বাবা মরেছে ঐ ঘরে অসহ্য যন্ত্রণায়, মা মরেছে ঐ অন্ধপুরীতে বিনা চিকিৎসায়, এক দাদা মরেছে দুদিনের জ্বরে ঐ ভাপসা চারদেয়ালের মধ্যে! তাদের যন্ত্রণা, সে এখনও শুনতে পায়। নিরালা সময়ে কানের কাছে তারা যেন কাঁদে 'বেচন... ও বেচন।' সে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত ফিরে আসতে চাইল কিন্তু নজর আটকাল গরুগুলোর চোখে। কেবল সজল, নির্বোধ চোখ মেলে বাইরের রোদ্দুরটাকে দেখছে। খাওয়াদাওয়ার পর এ এক পরম শান্তি। বেচনের মনে হল তার বউ লক্ষ্মীর শ্রান্ত চোখ। অভাবে, অনটনে, শোকেতাপে, বেচনের কাছে মার খেয়ে খেয়ে অসহায় লক্ষ্মী তাকিয়ে আছে। তার যেন কিচ্ছু নেই। বেচন আপনমনে ফুঁসে উঠল 'শালা! নিকুচি করেছে!" হঠাৎ এ সময়ে মালিকের বাড়ি দুধ পৌঁছে দিয়ে খালি গাড়িটা ফিরে এল। শব্দ উঠছে তার ঝর্ ঝর্। বেচনের মনে হল তার রুগ্ন শিশুর পাঁজরের হাড়গুলো মড় মড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কি ভয়ানক মূর্তি সে বাচ্চাটার! চোখ দুটো বসা, গালের হাড় ভাঙা, কান দুটো কুলোর মত। বাঁচবার জন্য সে কেবলই ট্যাঁ ট্যাঁ করে বস্তির ঐ ঘরখানা মাতিয়ে তুলেছে। তার একটু দুধ চাই, পুষ্টির দরকার—নইলে অকালমৃত্যুকে জয় করা যাবে না।

বেচন আর থাকতে পারল না। সে যেন পাগল হয়ে গেছে। কি চায় শালারা! সে ঠিক লিখেছে, আরও লিখবে। ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে সে প্রায় ছুটে ম্যানেজারের ঘরের মধ্যে হাজির হল।

ম্যানেজার মাথা নিচু করে কি যেন করছিল হঠাৎ মুখ তুলে আশ্চর্য হয়ে যায়।

"হোয়াট!...তুমি?...এখন এখানে?"

বেচন কোন জবাব দিল না। অস্থির চোখজোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন নিশিপাওয়া একটা মানুষ।

ম্যানেজার ভয় পেয়ে যায়। তবে কি ও খুন করতে এসেছে? আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে সে টেবিল থেকে আরও খানিকটা পিছিয়ে আসে। বেচন কিন্তু নড়ে না।

"কিছু বলবে?"—ম্যানেজার গলাটা শান্ত করার চেষ্টা করে।

বেচন এবার জবাব দিল। চোখজোড়া স্থির রেখে বলে, "আমার বুদ্ধি...আমি লুট করিয়েছি!"

"ইউ"...ম্যানেজার অবাক হয়। "লেখাটা?...ও লেখাটা কার?"

বেচনের এতটুক আটকায় না। সহজভাবে বলে, "আমার। আমি লিখেছি।"

"তুমি লিখেছ?"

"হ্যাঁ।"

ম্যানেজার এবার শক্ত হয়ে উঠল। সে এবার নিজের প্রতি আস্থা ফিরে পেয়েছে। আর যাই হোক বেচন তাকে খুন করতে আসে নি।

চশমাটা খুলে টেবিলে রাখতে রাখতে খানিকটা সে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়। এত সহজেই যে এর জবাব পাবে আশাই করতে পারে নি। এবার তার মুখটা ভয়ানক রাগে লাল হয়ে উঠল।

"কেন লিখেছে?...আই সে, কেন লিখেছ?"

"ওগুলো সত্য কথা।"

"মানে?"

"রক্ত ছাড়া আমাদের আর দাম নেই"—

"হোয়াট!" — ম্যানেজার চেঁচিয়ে উঠল।

"আমরা মাছির মত মরে...আপনাদের মুখে রক্ত তুলে দেই...পিয়াস মেটান আপনারা। এই তো!"

রাগে ম্যানেজারের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বেচন চুপ করল না। সে বলে গেল—

"গরুর দাম আমাদের চাইতে বেশি... তাদের আলো-বাতাস, দামী খাদ... আমরা শালা জানোয়ার!"

"কিন্তু আমাদের রক্তেই সব...হ্যাঁ, আমার বুদ্ধিতে লুট হয়েছে...আমার!" বলেই বেচন ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে সে সিমেণ্ট বাঁধান রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। একটু এগিয়েই খানিকটা ঘাস, যেখানে গতকালের জল ভরে পাঠিয়ে দেয়া দুধের পিপেগুলো পড়েছিল। বেচন কোন দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে থাকে।

পরে মিঠাইলাল জিজ্ঞেস করেছিল, "খামোখা খুটমুট...এটা কি?...লড়তে হয় ঠিক পথে লড়...অ না লুটফুট কি করে বসলি!

বেচন কোন জবাব দেয় না। সামনের রোদ্দুরটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"ওর কি হল?...কি ফয়দা এল?"—মিঠাইলাল বলেই যায়।

বেচনও ভাবে হুট করে এ ব্যাপারটা ঘটিয়ে তার কি লাভ হল? কিন্তু মনের সেই চাপা জ্বালাটা কখন যে ফেঁসে ফেলে কি করে বসে সে নিজেই বুঝতে পারে না। তাই মিঠাইলালের কথাগুলো শুনতে শুনতে এককালে অসহ্য ভাবে সে ডুকরে ওঠে, "বুঝি... কিন্তু পারি না!...শালাদের একদম সইতে পারি না আমি।"

দমকা বাতাস ধুলোর নাচন তুলল।

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ সতেরো ॥

নন্দকিশোরদের বাড়ি ছিল কলকাতায়। রাজবল্লভ সাহা লেনে। বহু পুরনো আমলের বাড়ি। তার বাবা ছিলেন ডাক্তার। বর্ধমানের দিকে কোথায় থাকতেন। মাঝে মাঝে আসতেন। দু'-একদিনের জন্য ঔষধপত্র কিনতে আসতেন। তাঁর নিজস্ব একটি ফার্মেসীও ছিল। আমি দেখি নি। শুনেছি। তবে অবস্থা যে খুব ভালো ছিল, তা বলা চলে না। মস্তবড় পুরনো আমলের বাড়িটা তাঁদের তিন-চার ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কারুর সঙ্গেই কারুর যোগাযোগ ছিল না। অন্তত আমার তো চোখে পড়ে নি।

ওঁদেরই নিচের তলার বাড়িটার তিন-চারটি কোঠায় আমরা কিছু কিছু ভাড়াটে থাকতাম। এক ভদ্রলোক অফিসে কাজ করতেন। ফর্সা টকটকে রঙ গায়ের। তিনি এক বিড়িওয়ালার সঙ্গে ভাগ করে থাকতেন একটি ঘরে। বিড়িওয়ালা মানে বিড়ির দু'-তিনটি কারখানা ছিল ভদ্রলোকের। বাড়ি বোধ করি ছিল বরিশালে। আজ আর ভালো মনেও নেই। তবে অফিস-করা ভদ্রলোকটিকে খুবই মনে আছে। তাঁর ছিল ভীষণ সঙ্গীতে সখ। বাল্যকালে দারিদ্র্যের জন্য গান শেখা হয় নি। চাকরিতে ঢুকে ইস্তক তিনি এই সখটাকে পুরোপুরি অভ্যাস মিলিয়ে নিতে কি যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন তা শুধু কাছে থেকে দেখেছি বলেই জানি। বিকেলে অফিস থেকে ফিরেই তিনি একটা চা-র দোকানে বসে একগ্লাস দুধ খেতেন। তারপর পোষাক পরিবর্তন করে বেরিয়ে পড়তেন ওস্তাদের উদ্দেশে। হাতে থাকত মস্ত এক এসরাজ। এসরাজ ও গান প্র্যাকটিস করতেন তিনি ওস্তাদের কাছে।

অন্য ভাড়াটেদের কথা জানি না। আমিও একটি ঘর নিয়ে থাকতাম। উদ্দেশ্য ছিল কিছু লেখা-পড়া করা। টুইশন ছিল গোটাকতক। নির্দিষ্ট আয়ের বাঁধা ছকে আমাকে চলতে হোত। বাড়তি উপায় ছিল না। কিন্তু ছিল না বলে মনে কোন অসন্তোষও ছিল না। নিজের অবস্থাকে আয়ের মধ্যে বেঁধে ফেলতে আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

সেই সময় পরিচয় নন্দকিশোরের সঙ্গে। নন্দকিশোর ছিল খুবই ভালো ছেলে। পড়াশুনোয় তার সুনাম ছিল চিরকাল। ইস্কুলের শেষ ক্লাশ পর্যন্ত সে দু'হাতে প্রাইজ কুড়িয়েছে। সহপাঠীদের কাছে ছিল সে ঈর্ষার পাত্র। সে-সব বই তার বাড়িতে একটা পুরনো কাঠের বাক্সে থরে-থরে সজ্জিত থাকতে দেখেছি। প্রাইজগুলোর প্রতি তার মমতা ছিল ভীষণ। শুধু একা মাঝে মাঝে সে আমাকে সেগুলো পড়তে দিত।

আমি বলতাম, মন দিয়ে পড়াশুনো করে যাও নন্দ। তোমার খুব উন্নতি হবে। প্রথম-প্রথম দেখতাম আমার কথায় তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। একটা লজ্জার আভা মুহূর্তে মুখে ছড়িয়ে দিয়েই মিলিয়ে যেত। নন্দকিশোর বলত, আমার খুবই বিদেশে যাবার ইচ্ছে, দাদা। যদি কোনদিন যেতে পাই—

বাকিটা সে ছেড়েই দিত। কথাটা শেষ আর করত না।

আমি বলতাম, ইচ্ছে থাকলেই জীবনে সবকিছু হয়।

হয়ত সে নিজেও মনে মনে বিশ্বাস করত। পাড়ার লাইব্রেরীতে যেত। দূরে তেমন যেতে দেখি নি। মাঝে মাঝে বলত, আমাদের এ-লাইব্রেরীতে তেমন বই নেই।

আমি তোমাকে দেখি দুটো-একটা ভালো বই দিতে পারি কি না।

আপনি আমাকে দেবেন কোথা থেকে? আপনারও যদি অনেক টাকা থাকত।

একটু থেমে বলত, তবে হ্যাঁ এক কাজ করতে পারেন অবশ্য আপনি। আপনার লাইব্রেরী থেকে মাঝে মাঝে দুটো-একটা বই এনে দিতে পারেন। আমি ভাবছি, ভাল করে ইংরাজিটা শিখব।

যখনকার কথা বলছি, তখন দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায় দশ বছর চলে গেছে। ভারতবর্ষের ক্ষমতায় আর ইংরাজের ঠাঁই নেই। পরিবর্তে ইংরাজ-শাসন তখন দেশের সর্বত্র ঘোরতরভাবে ধিক্কৃত। পথে-ঘাটে সর্বত্রই ইংরাজ শাসকদের সম্পর্কে নানা অশ্রদ্ধেয় উক্তি।

দেশের বারোটা বাজিয়ে গেছে ব্যাটারা।

দেশকে রসাতলে দিয়ে গেছে।

যাবার আগে আবার বাংলাকে দু' ভাগ করে দিয়ে গেল।

কবে যে কলকাতা থেকে দুশমনদের সবগুলি মূর্তি উঠিয়ে নেবে।

ভাগ্যিস, নেতাজী আসতে পারেন নি। তাহলে আর ভাগ করে দিয়ে যাবার সময় পেত না শালারা।

লালমুখ দেখলে ছেলেরা পথে-ঘাটে ঠাট্টা-টিপ্পনী ছুঁড়ত, কবে যে সবগুলোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে দেশ থেকে।

দেশের সেই অন্তহীন ধিক্কার বোধ-করি শাসকের গদিতে বসা নেতারা শুনতেও পেতেন না। তাই ইংরাজদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে বিনষ্ট হয় নি। অথবা সে ঘোরতর রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপার। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে মানুষ তা বুঝবে কেন? আন্তর্জাতিক ব্যাপার নিয়ে একটা কথা আছে তো।

তখনও আমাদের দেশ থেকে বিদেশে যাচ্ছে ছেলেরা। আর বিদেশ বলতে আমরা বুঝেছি ইংরাজের দেশ। বিলেত। বিলেত সম্পর্কে আমাদের মনোভাব চিরকালই উদার ও দরাজ। তাই বাংলার কবিকে বলতে হয়েছিল বিলেত দেশটা মাটির। কিন্তু কবি যাই বলুন, শাসকদের কথা ছেড়ে দিলে জাতি হিসেবেও ইংরাজের আছে নানা সদ্‌গুণ। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সে স্রষ্টা। আধুনিকতা তাদের স্বভাবে। মনে ও মেজাজে।

তাই আমাদের ছেলেদের—ভালো ছেলেদের এক আকর্ষণ চিরকাল ছিল বিদেশ।

ক্রমে ইংরাজের সে-ভূমিকা গেল। তার জায়গায় এগিয়ে এল রাশিয়া, জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

আমল থেকেই তাদের উত্থান ঘটতে দেখা গিয়েছিল। জার্মানী অবশ্য পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু এক অদ্ভুত প্রাণশক্তিতে সজীব এই জাতি ইতিহাস-পাঠকদের কাছে চিরকাল আগ্রহের বিষয়বস্তু। স্বল্প সময়ে আবার স্বস্থানে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠল ওরা। দেশ ভাঙল বটে, কিন্তু মানুষগুলির মেরুদণ্ড গেল না।

সেই যুগে কলকাতার এক কিশোর যুবক বিদেশ যাবার আগ্রহে ও আবেগে টনটন করতে লাগল। দিনের পর দিন আমি তাকে দেখেছি কঠোর নিষ্ঠা নিয়ে পরিশ্রম করতে। নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে।

তার এই আগ্রহের পশ্চাতে ছিল সেই চিরকেলে ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা, বিদেশ না গেলে বড়ো হওয়া যায় না। কিন্তু তার নিজেকে তৈরি করে তোলার আগ্রহ ও নিষ্ঠাকে আমি প্রশংসা না করে পারি নি।

আচ্ছা, তুমি এত গ্রামার নিয়ে মেতেছ কেন?

ভালো ইংরাজি না জানলে চলবে কেন? সরল উত্তর এসেছে নন্দকিশোরের দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে।

তুমি সেখানে গিয়ে কি করতে চাও?

পদার্থ নিয়ে পড়তে চাই।

তার জন্যে তো তোমাকে আরো কত পড়াশুনো করতে হবে।

ভাবছি বি-এসসিটা পর্যন্ত পড়ব এখানে। খুব ভালো করে পাশ করতে হবে। উৎফুল্ল মুখে বলেছে নন্দকিশোর। বলতে-বলতেই আবার কখন মুখ তার কালো হয়ে গেছে।

কি হল?

ভাবি কি জানেন, দাদা?

কি?

বাবার যা অবস্থা। বাবা কি আমাকে পড়াতে পারবেন? আমি টাকা কোথায় পাবো?

সেই আদ্দিকালের প্রশ্ন। অর্থ। যার নাম জীবন। যে সব শক্তির আধার। সব প্রেরণার প্রেরণা। তার অভাবে খাঁচা-টার মধ্যে দুর্বিষহ জীবনে বাঁচে মানুষ। প্রতিভা? প্রতিভা বলে কিছু আছে কি? হয়ত আছে। কিন্তু তা নিছক বিধাতার দান হিসাবে জন্মগত কিছু পাওয়া নয়। সব শিশুর মধ্যেই ঘুমন্ত কিছু আছে। শুধু অনুকূল পরিবেশেই তার মুক্তি ঘটতে পারে।

চোখের সামনে দেখলাম নন্দকিশোরের দুর্জয়পণ সাধনা। বাবা বুড়ো মানুষ। আরো কটি সন্তান আছে। দুটি মেয়ে। কলেজে পড়াবার খরচা জোগানই তাঁর পক্ষে কঠিন। কোথা থেকে দেবেন বই-পত্র কিনবার টাকা। ছেলে চাকরি করুক ইচ্ছে ছিল তাঁর। এখনো তাঁর চেনাশোনা কিছু কিছু আছে। চেষ্টা করলে [illegible] না-কোনোও ঢুকিয়ে দিতে পারবেন।

সব কথা ভাবল নন্দকিশোর। ইউনি-ভার্সিটিতে সে পেল স্কলারশিপ। আবার পেতে হল দুটি টুইশন। দিনরাত্রি সে খাটতে লাগল প্রাণপাত পরিশ্রমে। তারপর একদিন পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে পাশ করল বি-এসসি।

তারপরও বছরখানেক ছিলাম কল-কাতায়। দিনের পর দিন খেয়ে-না-খেয়ে সে ঘুরে বেড়িয়েছে বাংলাদেশের বড় বড় নেতাদের কাছে। সরকারী আমলাদের কাছে। ঘুরেছে হাইকমিশনগুলিতে। সে-গুলিতেও খুব ভিড়। দিল্লীতে লিখেছে চিঠি। সে চিঠির জবাব আসে নি পর্যন্ত।

এই চিঠি নিয়ে এক সরকারী বড় আমলা ঠাট্টা করে তাকে বলেছিলেন, যাও, দেখে এসো গিয়ে। দিল্লীর রাজপুরুষেরা তোমার চিঠি সোনার জলে লেখা বাঁধান খাতায় পার্চমেন্ট পেপারের মত যত্ন করে রেখে দিয়েছে।

কি বললেন? হোয়াট ডেভিল য়্যু আর। চিৎকার করে পাগলের মত তার টেবিলের ওপরে এক ঘুষি বসিয়ে দিয়ে-ছিল নন্দকিশোর। রাগে-দুঃখে-ঘৃণায় তার সারা শরীর ঠকঠকিয়ে কাঁপছিল, আপনি ঠাট্টা করছেন!

রাজপুরুষ সরকারী বড় আমলাটিও। তিনি শুধু ঠাট্টা করেন নি। এই কথাটা বুঝিয়ে দিতে তাঁর বেয়ারা-চাপরাশি-দারোয়ান একরাশ ছুটে ধরে ঢুকে ধাক্কা দিয়ে তাকে বার করে দিয়েছিল। চড়-চাপড় কিল-ঘুষিও যে দু-একটা পড়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই।

সে-সব কতদিনের কথা।

নন্দকিশোর বাসের কাছ থেকে ফিরে এসে আমাকে ডাকল হাসিমুখে। বলল, কী ভাগ্য যে আজ আপনাকে পেলাম!

ভাগ্য না বলো দুর্ভাগ্য।

সে যাই বলুন দাদা।

তোমার বিদেশে যাওয়া তাহলে হল না?

আবার হো-হো করে হেসে উঠে নন্দ-কিশোর বলল, আপনার সবই মনে আছে তাহলে? কিছুই ভোলেন নি দেখছি। চলুন দাদা, আজ একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কোথায়?

আমার বাসায়।

তুমি কি বাসাও করেছ নাকি এখানে?

থাকতে গেলে না করে উপায় কী। আসুন, আসুন আমার সঙ্গে। সবই জানবেন।

নিয়ে গেল।

সব শুনে আমি হতবাক।

নন্দকিশোরের কোয়ার্টারে বসে তার ইতিহাস শুনলাম। নতুনকালের ইতিহাস। পুরনোকালের নয়। মানুষের ভাঙাগড়ার আবর্তন-বিবর্তনের ইতিহাস।

বিদেশে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল নন্দকিশোর। একটির পর একটি সব ব্যর্থ হয়েছে। ইতিমধ্যে বাবার মৃত্যু হয়েছে। বোনদের একটির বিয়ে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। ছোট-টিকে দেওয়া আর সম্ভব হয় নি। দেবেই বা কে। এ-দুর্দিনে বিয়ে দেওয়া মানে এক পাহাড় টাকার ব্যবস্থা। সে-উপায় হবে কি করে?

মা বললেন; নন্দ, আর না বাবা। যা হবার হয়েছে। সংসারের চেহারাটা এক-বার দেখ। খুকুর লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বিয়েও আর দিতে পারলাম না। চেষ্টাই বা কে করে!

ছোট ভাইটা পালিয়েছিল বাড়ি থেকে। পরে জানা গেল সে বম্বে গিয়ে-ছিল চাকরির সন্ধানে। ক্লাশ টেনে ফেল করেছিল তিন-তিনবার। এই বিদ্যায় কী-ই বা হওয়া সম্ভব। কুলির কাজই কলকাতায় পাওয়া ভার হয়ে উঠেছে আজকাল।

অথচ ছোটখাট কাজে তার মনও নেই। সেই যাবার সময় মা-র যা সর্বশেষ সম্বল বাক্স-প্যাটরা ভেঙে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।

একটির পর একটি সাজানো স্বপ্ন ভেঙে পড়ছিল তার সামনে। চোখের সামনেই তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কলিগুলি শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকছিল। তবু পাগলের মত সে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে চলেছিল। মাকে বলেছিল, আর কটা দিন সময় দাও, মা। একটু চেষ্টা করে দেখি।

তোর চাকরির বয়সও যে পেরিয়ে যাচ্ছে বাবা।

তা যাচ্ছে।

নিরুপায় দেখে অবশেষে এক কাণ্ড করে বসল নন্দকিশোর। পাগলের মতই করল ব্যাপারটা। চোখ-মুখ বুজে কাগজের বিজ্ঞাপন-কলমে একটা সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিল। কোন তরুণী, তার যে-কোন জাত যে-কোন পরিচয়ই হোক না কেন, তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত সে। বিনিময়ে তার টাকা চাই। আর অনেক টাকা। সেই স্ত্রীর ওপর তার কোন অধিকার থাকবে না। কিন্তু তার যে-কোন নির্দেশ মানতে সে থাকবে প্রস্তুত। বিনিময়ে সে শুধু টাকা নিয়ে বিদেশে যেতে চায় কয়েক বছরের জন্য। নিচে নাম দিল না। পরিচয়ও থাকল গোপন। শুধু একটি গোপন ঠিকানা থাকল।

অবশেষে দুরু-দুরু বুকে প্রতীক্ষা। কেউ যে আসবে না সে জানত। কিন্ত

কান্নার ইস্পাত

[illegible]

মেহনতী মানুষের বুকের পলাশে
রাঙা হলো মাটি;
মদমত্ত দম্ভের বুলেট
কে জানতো কেড়ে নেবে রুটি—
শত শত মূল্যবান জীবনের অপচয়ে
হত্যার বিলাসে?

আসমুদ্র বঙ্গদেশ গর্জে ওঠে
দৃপ্ত প্রতিবাদে—
ঃ সর্বভৌম অধিকার চাই;
যুগে যুগে একই ইতিহাস
পারে নাই, পারিবে না
ইয়াহিয়া অথবা আয়ুব
ক্ষুব্ধ বঙ্গজনতার বিদ্রোহ দমাতে;
চোখে-মুখে রোষবহ্নি স্ফুলিঙ্গ সমান
রক্তরাগে এ মাটিতে রাঙা ফুল ফোটে।

তপস্যার অনাগত প্রান্তে
প্রাণে প্রাণে জেগে ওঠে রুদ্র-মহাকাল
সাক্ষী তার মুজিবর,—জনপথ আরক্ত পঙ্কিল,
নিষ্পেষিত জনতার কান্নার ইস্পাতে
ঘরে ঘরে গড়া হয় তাপসহ গ্রীল।

রিক্তজন হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে
বুকের হাপরে চাপা অব্যক্ত অনল
বঙ্গবন্ধু মুজিবর পেয়েছে উত্তাপ
হয়ে নজরুল নেহরুর মতোই প্রাণদ—
মনের আকাশ থেকে মাটির আকাশে
শুভ্র পুণ্য প্রত্যয়ের দুর্গ গড়া হয়।

শুনি আমি কণ্ঠে কণ্ঠে সে মন্ত্র সোচ্চার—
শহীদের আশিসরত্নে
শোকক্ষেপী নিধনের প্রতিজ্ঞা অটল,
শোষণের পরিখায় পঙ্ক
দম্ভের প্রাকার
কেঁপে ওঠে—ভেঙে পড়ে, নিষ্ঠুর কুশাসন।

শেষ বিচারের দিন নেই আর দূরে
নগর শহর গ্রাম
হাটে মাঠে গঞ্জে ও প্রান্তরে
পৌঁছে গেছে ডাক—
কাকভূশণ্ডির মাঠে নির্জিত কান্দুনো
জনজনার্দন হাতে রুদ্রের পিনাক।

না, তখনো তার ভাগ্যের অনেকটাই ছিল অপরিজ্ঞাত।

একদিন এলেন একজন।

তাঁর সারামুখ সাদা। হাত-পা। সমস্ত শরীরটাই। চোখের পাতাগুলি পর্যন্ত সাদা।

যেন নিজের ভাগ্যটাকেই দেখতে পেল নন্দ। সে ভদ্রমহিলার নিজের গাড়ি আছে। টাকা-পয়সা ধনসম্পত্তি বিস্তর। ভয়ে কিন্তু পিছিয়ে গেল নন্দ। আর সে কথা বলতেই পারল না। তার শরীর কাঁপতে লাগল ঠকঠকিয়ে। মহিলাও যেন তার পিছনে নিয়তির মত ফিরতে লাগলেন।

যখন-তখন গাড়ি করে এসে উপস্থিত হতেন বাড়িতে।

অবশেষে নিরুপায় নন্দের পলায়ন। ডুয়ার্সে।

নন্দ বলে, ভালোই আছি দাদা। আর বিদেশে যাবার ভাবনা নেই। বিয়ে-থা করে ফেলেছি এখানেই। রত্নবাহাদুর রাই-কে চেনেন তো? বিখ্যাত নেপালী কণ্ট্রাক্টর এ-অঞ্চলের। তারই শালীকে বিয়ে করে ফেলেছি। বলে সে জোরে জোরে হাসতে লাগল।

শুনে বিস্মিত হয়ে থাকি।

আর বলতে নেই, দাদা। এখানে এসে দু'-এক বছরেই কপাল আমার ফিরে গেছে। এখানে আমি কাঠের ব্যবসা করি। একটু পরিশ্রম-সাপেক্ষ অবশ্য। যেমন ধরুন প্রায় দিনরাত্রিই এর পেছনে ছুটোছুটি করা নিয়ে কেটে যায়। বিশ্রাম করার সময় আর পাই-ই না। তবু মনে কোনই দুঃখ নেই। বোনটার বিয়ে দিয়ে ফেলেছি। মাকে নিয়মিত টাকা পাঠাই।

বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

একটু আগে মূল্যবান প্লেয়ার্স সিগারেট নন্দকিশোর আমার সামনে খুলে দিয়েছে। তার আগ্রহাতিশয্যে একটি ধরাতেই হয়েছে। সামনে পোড়া-মাটির ছাইদান। দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নন্দকিশোরের নেপালী বৌ রত্না। পরনে একটি জামরঙা শাড়ি। নন্দের একটি মেয়ে হয়েছে। মেয়েটি বেতের দোলনায় ঘুমোচ্ছে। রত্না মাঝে মাঝেই দোলনাটা আস্তে দুলিয়ে দিচ্ছে।

এই বাড়িটাও গেল বছরে করেছি। নন্দ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলল।

রত্না বলল, তুমি যে খালি গল্পই করছ। দাদাকে আজ কিন্তু আমি কিছুতেই যেতে দিচ্ছি নে। একবার বাজার ঘুরে এসো।

একা ঘুরতে যাব না, দাদাকেও নিয়ে যাব।

রত্নার ঠোঁটে হাসি। বলছে, এমন সেলফিস্ যদি আর একটিও হয়, দাদা। জানেন, আমিও যে আজ এই প্রথম শ্বশুরবাড়ির লোক দেখছি।

আরে, আরে তাই ত'। আপনাকে শ্বশুরবাড়ির লোক ঠাউরেছে দাদা। তাহলে বসুন আপনি। জানো তো বাঙালীর ঘরে ভাসুরঠাকুরের দাম? তাহলে তোমাকে ঘোমটা দিয়ে বসতে হয় এক্ষুণি।

বলে সে এত জোরে হেসে উঠল যে, দোলনায় শিশুটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। [ক্রমশ]

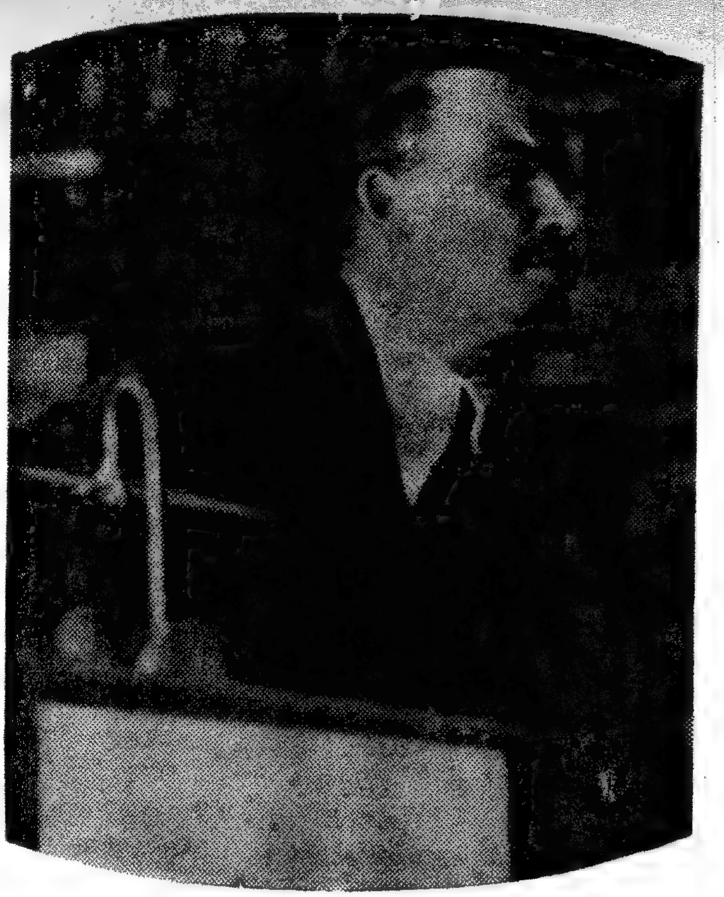

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক বসে দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক ঃ যৌবনে লেনিনের চরিত্রের উপর বিরাট প্রভাব পড়েছিল তাঁর বাবা-মা'র, প্রভাব পড়েছিল বিদ্রোহাত্মক গণ-সাহিত্যের—দরিদ্রদের দৈনন্দিন জীবন-ইতিহাসের। বড় ভাই আলেকজাণ্ডার ছিলেন তাঁর আদর্শ তাঁকেই সব বিষয়ে গুরু বলে মানতেন ভ্যাডিমার শৈশবকাল থেকে। এই আলেকজাণ্ডারই প্রথম ছোট ভাইয়ের সামনে তুলে ধরেছিলেন মার্কসিস্ট সাহিত্যের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, তাঁরই হাতে ভ্যাডিমার প্রথম দেখেন মার্কসের ক্যাপিটেল। ১৮৮৭'র ১লা মার্চ জার হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকাতে আলেকজাণ্ডারকে সেইণ্ট পিটার্সবার্গে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ বছরেরই মে মাসে ভ্যাডিমার মা এবং বোনেদের সঙ্গে বসে আলেকজাণ্ডার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন ঃ

[ব্ল্যাক আউট—কথক চলে যাবেন। আলো জ্বললে দেখা যাবে লেনিনের মা এবং বোনেরা কথাবার্তা বলছেন—]

আনা—আমার এবং আলেকজাণ্ডারের গ্রেপ্তারের খবর তোমরা বেশ তাড়াতাড়ি পেয়েছিলে?

মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা—দু'দিন বাদেই সেইণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে তোমাদের সেই পিসী নাটাশা অলগার স্কুল-টিচার কাস্‌কাডামোভাকে চিঠি লিখে জানান। কাস্‌কাডামোভা ভ্যাডিমারকে ডেকে সেই চিঠি দেখান।

আনা—তারপর?

লেনিন—তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন মাকে কিভাবে খবরটা দেওয়া যায়। আমি তাঁকে বলেছিলাম এটা একটা খুবই বড় দুঃসংবাদ—তবে আমার দাদা একটা মহৎ উদ্দেশ্যসাধন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন—এ খবরে মা বিচলিত হবেন বটে, তবে গৌরবও বোধ করবেন। চিঠিটা আমিই এনে মাকে দেখাই।

আনা—আমাদের দু'জনকেই একই দিনে গ্রেপ্তার করেছিল—তবে ঘরে কিছু পায় নি বলে আমাকে ছেড়ে দিল। আলেকজাণ্ডারের এক বন্ধুর ঘরে ওর লেখা একটা চিঠি পায় পুলিশের লোক—তাতে জারকে হত্যা করবার একটা পরিকল্পনা দেওয়া ছিল। সে চিঠিটা ছেলেটি পড়েই ছিঁড়ে ফেলবে ভেবেছিল—তারপর ঠিক করলো আর একবার পড়ে সেটাকে নষ্ট করে ফেলবে—চিঠিটা অবশ্য সেদিন সকালেই ওর কাছে এসেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত এর মধ্যেই পুলিশ এসে ওকে চিঠি সহ গ্রেপ্তার করলো—

আনা—আমি খবর পেয়েই সেইণ্ট পিটার্সবার্গ চলে গেলাম। ওর বিচারের সময় আদালতেও কিছুক্ষণ ছিলাম। আলেকজাণ্ডার যে এত সুন্দরভাবে সওয়াল করতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না। আত্মপক্ষ সমর্থনে ও-যে কি সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছিল......কিন্তু ওখানকার সমস্ত পরিবেশটা আমার অসহ্য লাগছিল—অল্পক্ষণ থেকেই আমি বেরিয়ে এলাম।

[বাইরে দরজা ধাক্কার শব্দ—লেনিন উঠে বাইরের দিকে যাবেন। অল্প পরে ঘরে ঢুকবেন—হাতে একটা টেলিগ্রাম—সমস্ত মুখে বেদনার কালোছায়া। টেলিগ্রামটা লেনিন আনার হাতে দেবেন—আনা সেটা পড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠবেন। মা পাগলের মত টলতে টলতে এসে আনার হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে দেখবেন। তাঁর সমস্ত মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে—]

মা—(অস্ফুটস্বরে) ওকে ফাঁসী দিয়ে দিল! (দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকবেন। লেনিন এগিয়ে এসে মা'র মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন। অন্যেরাও এবার কাঁদতে থাকবে—)

লেনিন—কেঁদো না মা, তোমার ছেলে বীরের মৃত্যু বরণ করে নিয়েছে। অত্যাচারী, নিষ্ঠুর শোষকদের প্রধান জারকে হত্যা করে সে দরিদ্র জনসাধারণকে মুক্তি দেবার জন্য নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করলো। তার মৃত্যুতে আমরা শোক করবো না—যে আদর্শের জন্য সে জীবন দিল তাকেই আমাদের প্রাণপণ সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে—আলেকজাণ্ডারের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেই, তার স্মৃতির প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা আমরা দেখাতে পারবো।

[লেনিন এগিয়ে এসে মাকে উঠিয়ে নিয়ে ভেতরের দিকে যাবেন। অন্যরাও অনুসরণ করবে। অল্প বাদে লেনিন একলা স্টেজে ঢুকবেন—]

লেনিন—(পকেট থেকে নোটবুক বের করে কিছুক্ষণ লিখবেন এবং তারপর সেটা পড়বেন) ১৮৮৭ সালের ৮-ই মে আমাদের প্রিয় ভাই—পরিবারের সব সেরা সন্তান—আলেকজাণ্ডার উলিয়ানভকে ফাঁসী দিয়ে মারলো অত্যাচারী জারের জহ্লাদের দল—বয়স হয়েছিল মাত্র একুশ বছর। বঞ্চিত, হতভাগ্য অত্যাচারিত রাশিয়ান জনসাধারণের মুক্তির জন্যই এভাবে সে আত্মাহুতি দিল। (পকেটবুকটা বন্ধ করে নিজের মনেই বলতে থাকবেন ঃ) আমাদের বিপ্লবীদের এগিয়ে যাবার পথ ঠিক কোন্‌দিকে? আলেকজাণ্ডার বেছে নিয়েছিল সন্ত্রাসবাদকে—আমি জানি ওপথে আমাদের আদর্শকে আয়ত্তের ভেতর আনতে পারবো না—পথ আমাদের বিভিন্ন—কিন্তু লক্ষ্য উভয়ক্ষেত্রেই এক। হে মহাবিপ্লবী! তোমাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি! তোমার পবিত্র স্মৃতি আমাদের বিপ্লবের সংগ্রামকে সমৃদ্ধতর করে তুলুক।

[আলো নিভে যাবে—লেনিনের প্রস্থান। আলো জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে কথক এসে দাঁড়াবেন এবং বলতে থাকবেন—]

কথক ঃ মেহনতী কৃষক, মজদুর, শ্রমিকদের মুক্তির জন্য ভ্লাডিমার উলিয়ানভ পথের সন্ধানে রত হলেন, বিপ্লবাত্মক কর্মপদ্ধতির জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করলেন গভীরভাবে। ১৮৮৭ সালের অগাস্ট মাসে, সোনার মেডেল সহ স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে, কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লেনিনের এই ছবিটি ১৮৯১ সালে তোলা

হলেন। ১৮৮৭-র ডিসেম্বরে গোপন ছাত্র-সভায় যোগাযোগ থাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হলেন বিতাড়িত। কাজানের গভর্নরের আদেশে তাকে করা হল গ্রেপ্তার, পাঠানো হল জেলে, কোকুশকিনো গ্রামের পথে পুলিশ প্রহরীর সঙ্গে এইভাবে কথা হোল—

[কথক একপাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন। অন্যদিক দিয়ে ঢুকবেন লেনিন ও পুলিশ প্রহরী]

পুলিশ—যুবক, এ ধরণের বিদ্রোহ করে লাভ কি? তোমার সামনে একটা পাকা গাঁথুনির দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ না?

লেনিন—দেয়াল আছে—কিন্তু সেটা ঘুণে ধরা—একটা ধাক্কা লাগলেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

[দুজনে চলে যাবেন। কথক আবার শুরু করবেন ঃ]

কথক—১৭ বছর বয়সে এই ভাবেই শুরু হল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লেনিনের বিপ্লববাদী লড়াই। নির্বাসিত অবস্থায় নানা বিষয়ের অধ্যয়নে সময় কাটে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংখ্যাতত্ত্ব, সবই মন দিয়ে পড়েন লেনিন, অনেক সময় সারা রাত বই পড়তেই কেটে যায়—

[পেছনের ব্ল্যাক কার্টেন উঠে যাবে—টেবিলের ওপর বাতিদানে মোমবাতি জ্বলছে—গভীর মনোনিবেশসহকারে লেনিন একটি চেয়ারে বসে অধ্যয়নরত—সামনে বইয়ের স্তূপ—মাঝে মাঝে লেনিন অন্যান্য বই থেকে কি সব রেফারেন্স টুকে নিচ্ছেন—লেখা রেখে আবার বইতে মনোনিবেশ করছেন। মাইক থেকে এবার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে—]

মাইকের কণ্ঠস্বর—কাজানের এই গ্রামে নির্জন নির্বাসনের সময় দিনরাত শুধু বই থেকে জ্ঞান আহরণ

করতেন লেনিন. ভবিষ্যতে ভ্ল্যাডিমার ইলিচ নিজেই বলেছেন—"জীবনে এত পড়াশ্লো আর কখনও করি নি, এমন কি সেইণ্ট পিটার্সবার্গে বন্দী অবস্থায়, বা—সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত থাকার সময়ও নয়।"

[ব্ল্যাক কার্টেন নেমে আসবে। কথক আবার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলবেন :]

কথক—এক বছর বাদে লেনিন অনুমতি পেলেন কাজানে ফেরবার, আবেদন করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য. আবেদন বাতিল হল, চাইলেন বিদেশে যেতে। জারিস্ট সরকারের অনুমতি মিললো না। তাদের মতে লেনিনের রাজনীতি চিন্তাধারা ছিল বিপজ্জনক। শুরু করলেন মন দিয়ে পড়তে মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনা।

ওঁরা বলেছেন—

ধনতন্ত্রবাদী এবং প্রলিতেরিয়েতদের
সংগ্রাম হয়ে উঠবে আসন্ন.
সামাজিক বিপ্লব হবে অবশ্যম্ভাবী.
মেহনতী মানুষরা ছিনিয়ে নেবে—
ধনিকদের সব শক্তি, উড্ডীন করবে
শ্রমিকদের বিজয়কেতন।

[কথক সরে যাবেন। পেছনের পর্দা উঠলে দেখা যাবে লেনিন ও বোন আনা গল্প করছেন :]

লেনিন—গাণিতিক সত্যের মত মার্কস প্রমাণ করে দিয়েছেন, ধনতন্ত্রের ভেতর নিজেরই ধ্বংসের বীজ রয়েছে...ধনতন্ত্রের মৃতদেহের উপর জন্ম নেবে সমাজতন্ত্রবাদ...

আনা—কিন্ত ধনীদের হাতেই অর্থ, তাদেরই সব ক্ষমতা...

লেনিন—মেহনতী শ্রমিক এবং কৃষক যদি জেগে ওঠে. সে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে এতটুকু সময় লাগবে না।

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল

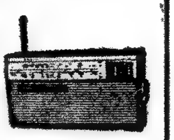

স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা হিন্দীতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B. C.) P.B. 2123, Delhi-7

আনা—তাদের জাগিয়ে তুলবে কে? কতদিন লাগবে তাদের জেগে উঠতে?

লেনিন—সংগ্রামের যারা নেতৃত্ব নেবে তারাই ওদের জাগিয়ে তুলবে—যত তাড়াতাড়ি পারে তাদের পরিচালিত করতে হবে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে।

[বাইরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ]

ওরা সব আসছে, পেপেল, মার্টিন, সালিকভ—আজ আমাদের আলোচনা হবে নারোডনিকস্‌দের সম্বন্ধে...

আনা—আমি ওদের দরজা খুলে ডেকে আনছি।

[চলে যাবেন—ওদের সঙ্গে নিয়ে ঢুকবেন।]

লেনিন—এস, এস পেপেল, তুমি ওই চেয়ারটায় বস মার্টিন—তারপর সালিমভ! কি খবর বল? আনা, চায়ের ব্যবস্থা কর। [আনা বেরিয়ে যাবে।]

সালিমভ—স্টাডি সার্কেলে আমাদের মাঝে মাঝে কতকগুলো প্রশ্ন করা হয়। এগুলো নিয়েই তোমার সঙ্গে আমরা আলোচনা করতে এসেছি ভ্ল্যাডিমার।

লেনিন—যেমন?

পেপেল—কেউ কেউ বলে রাশিয়াতে যে ক্যাপিটেলিজম দেখা দিয়েছে সেটা একটা আকস্মিক ব্যাপার—স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল নয় এটা। সুতরাং এদেশে সোস্যালিজম আনতে হবে কৃষকদের কমিউনকে জাগিয়ে তুলে। কল-কারখানার শ্রমিকদের সম্পর্কে অত মাথা না ঘামালেও চলবে।

লেনিন—(হেসে উঠে) এই ধরণের মতের মূলেই রয়েছে ভুল। আসলে এসব কথার প্রচার করছে নারোডনিকেরা। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তাদের সত্যিকার পরিচয়ই নেই। ইতিহাসকে তো অগ্রাহ্য করা যায় না। ১৮৬১ সালে দাসবৃত্তি অবলোপের পর থেকেই রাশিয়াতে ধনতন্ত্রবাদের বিষাক্ত প্রসার শুরু হয়েছে বিস্ততভাবে।

মার্টিন—একথা কি বাস্তব-সত্য হিসাবে প্রমাণ করা যায়?

লেনিন—নিশ্চয় যায়! স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে দেখ না। কারখানার পর কারখানা খোলা হয়েছে সেইণ্ট পিটার্সবার্গে, দক্ষিণ এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলের জায়গাগুলোতে, আর উরালসে। এই সব কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে এক বিরাট আকারের প্রলেতারিয়েত বাহিনী গড়ে উঠেছে। তাছাড়া সারা দেশটাকে এখন রেল লাইন দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর ফল তো বুঝতেই পারছ? দেশের সমস্ত শ্রমিকদের ভেতর এই রেলওয়ের সাহায্যে যোগাযোগ করা সহজ হয়ে এসেছে।

পেপেল—এই শ্রমিকদেরই আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে।

লেনিন—ঠিক তাই। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতীর দল এখন যে সংগ্রাম শুরু করেছে জমিদার, মালিক এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, সেটা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও সচেতন সংগ্রাম নয়। আমাদের প্রধান কাজ এখন এই প্রলেতারিয়েতদের জাগিয়ে তোলার জন্য সর্বরকমভাবে প্রচেষ্টা করা।

[আনা চা নিয়ে এসে সবাইকে দেবেন]

মার্টিন—প্লেখানভ এখন কোথায়?

লেনিন—ইউরোপের নানা জায়গায় উনি ঘুরে বেড়ান—কখন কোথায় থাকেন বলা মুস্কিল। তবে প্রচারপত্রগুলো পাঠিয়েছেন বার্লিন থেকে মার্কসিস্ট বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে উনি রাশিয়ার শোচনীয় অর্থনীতিক অবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন এই সব প্রচারপত্রে। আর কতকগুলোতে দেখিয়েছেন নারোডিজমের বিরুদ্ধে আমাদের কিভাবে সংগ্রাম করতে হবে।

[আনা এসে কতকগুলো প্রচারপত্র দেবেন।]

এগুলো ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে—তারপর সেগুলোকে বিলি করতে হবে শ্রমিক, কৃষক মজদুরদের ভেতর।

সালিমভ—নারোডনিকদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে কিন্তু সাধারণ লোকেরা পছন্দ করে না।

[লেনিন কথাটা শুনে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বেন। অল্প বাদে ধীরে ধীরে বলবেন :]

লেনিন—ভাবাবেগকে আমাদের জয় করতে হবে। ওদের প্রতি সাধারণ লোকেদের দুর্বলতা থাকাটাই তো স্বাভাবিক। একসময় ওরা ছিল সত্যিকার নির্ভীক বিপ্লবী। প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে ওরা জারের শাসকদের হত্যা করতো, ধরা পড়লে হাসতে হাসতে ফাঁসী যেত। তখন ওরা ছিল সত্যিকার দেশভক্ত। সেই সব দিনের কথাই সাধারণ লোকে আজও ভুলতে পারে নি। তাই তারা আজও নারোডনিকদের ভালবাসে, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে।

হয় না, হয় না

সনাতন কবিয়াল

ইতিহাসটাকে পেছন ফেরাতে
কারা ভোজবাজি খেলছে,
জাল রাজনীতি ভুয়ো রণনীতি
অদৃশ্য হাত মেলছে?
পদ্মার জল আঁকাবাঁকা ছোটে
তবু না পেছন ফেরে,
ব্রহ্মপুত্র আক্রোশে ফোঁসে
কারো কি ভাগ্য কেড়ে?

প্রকৃতি চলছে আপন নিয়মে,
মানুষ ভাঙছে নীতি পুরোদমে
নিজের ভাগ্য ফেরাতে;
সে-ভাঙা নিয়মে কে এলো কে গেলো
কে গেলো রাজ্য তেরাতে?

তোমরা সবাই সামনে চলো হে,
একটি নতুন নদী যে হলো হে,
ক্ষীরনদী নয়—রুধিরের নদী
মেটাতে জীবন-পিপাসা
কারা দিল প্রাণ? অগ্নি সমান
তাদের আশা ও ভাষা?

হয় না, হয় না, হতেই পারে না,
লোক মরে তবু জীবন হারে না।
হবেই জগৎ সকলের রাজধানী।
ইতিহাসটাকে পেছনে ফেরাতে
এখনো ধনের গর্ব ছড়াতে

জাঁহাপনা আর রাজা নেই থাক
গণপতি সেজে ধনসেবকের
কৌশলে কানাকানি।
চতুর বলেই চলে বেয়াদপি,
দরকার হয় কভু যদ্যপি
তুলে দেয় হেসে সামরিক হাতে ভার।
তবুও লোকেরা বশ তো মানে না
যতো মার খায় মুখে ওঠে ফেনা
সব চাকা হয় বন্ধ হঠাৎ
দমনীতিও করে কুপোকাৎ
মাঠে ও মেশিনে এক মুহূর্তে
সবাই যে সৈনিক,
এতোকাল তারা শোনে নি যে ডাক
অথবা বোঝে নি নিজের বিপাক
ক্ষুধায় ক্ষুধায় মরতে মরতে
অষ্ট প্রহর লড়তে লড়তে
দেখেছে তারাই তাদের বুকের
রক্ত কে শুষে খায়।
শাসনের নামে যে খবরদারী
এবং দুবেলা যে আইনজারী
তার কে শাস্তি পায়?

শোন, শোন, হও নিশ্চিত নির্ভর।
শত্রুর আজ শমন এসেছে
লক্ষ জনতা জেগেছে জেগেছে
যুগ-যুগান্ত যে-সংগ্রাম
মৃত্যুর মুখে সেখানেই হোক জয়।

সালিমভ—কিন্ত ওদের বিপ্লব সম্পূর্ণ ভুল পথ নিয়েছিল।

লেনিন—হ্যাঁ, ওদের পথটা ছিল সম্পূর্ণ ভুল পথ। জনগণের সঙ্গে ওদের বিপ্লবের কোন যোগ ছিল না। জারের দু'-চারজন জাঁদরেল অফিসারকে হত্যা করে বা জারকে মেরে তো স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটানো যায় না। তার দ্বারা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয় না। ফলে যখন যে অফিসারকে ওরা খুন করেছে, তার জায়গায় এসেছে আরও নিষ্ঠুর জাতের নতুন অফিসার। প্রতিশোধ নেবার জন্য জারের কর্মচারীরা অমানুষিক অত্যাচার করেছে ওদের ওপর—জেলে পাঠিয়েছে, ফাঁসি দিয়েছে, নির্বাসনে পাঠিয়েছে। এরা ছিল ১৮৭০ সালের নারোদনিক। কিন্তু ১৮৯০-এর নারোদনিকেরা কিন্তু অনেক ধাপ নেমে এসেছে—আজ ওদের চিন্তাধারায় বিপ্লবের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। স্বৈরাচারী সরকারকে বাধা দেবার মত সাহস ওরা হারিয়েছে, তাদের সঙ্গে ওরা আপোষ করেছে, আজকাল সর্বক্ষণ সরকারের পদলেহন করে বেড়াচ্ছে।

মার্টিন—এই সব কথাই আমাদের জনগণকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

লেনিন—(অন্যদের প্রতি) মার্টিন ঠিক কথাই বলেছে। পেপেল, সালিমভ, মার্টিন! এখন থেকে এই কাজেই আমাদের সবার আগে লাগতে হবে। বর্তমান নারোদনিকদের আসল রূপটা মেহনতী জাগণের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে।

[ব্ল্যাক আউট—পেছনের পর্দা নেমে যাবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে মঞ্চের সামনে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন।]

কথক—১৮৯১ সালে সেইন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে লেনিন অনার্স ডিগ্রী সহ আইন পরীক্ষায় পাশ করলেন। পরের বছর থেকে সামারা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তিনি ডিফেন্স কাউনসেল হিসাবে প্র্যাকটিস করতেন। তাঁর বিপ্লবাত্মক কর্মধারাকেই তিনি দিয়েছিলেন প্রাধান্য—আর তারই আবরণ হিসাবে ব্যবহার করতেন আইন ব্যবসায়কে। সামারাতেই ১৮৯২ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনাপাঠ এবং মার্কসিজমের প্রচারের জন্য সাংগঠনিক কাজ শুরু হল লেনিনের প্ররোচনায়। শুধু সামারাতেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে না থেকে, কাজান, সারাটোভ, সিজরান এবং ভলগার আশেপাশে সব শহরেই লেনিনের উদ্যমে মার্কসিজমের চর্চা এবং প্রচার শুরু হয়েছিল জোর কদমে। কিন্ত তবুও লেনিন মনে-প্রাণে শান্তি পাচ্ছিলেন না। কর্মক্ষেত্রকে আরও সুবৃহৎ, আরও বিরাট করা দরকার, তাই ১৮৯৩ সালের অগাস্টে চলে এলেন সেইন্ট পিটার্সবার্গে। এবার থেকে উঠেপড়ে লাগলেন মার্কসিজমের প্রচার এবং প্রলিতারিয়েতকে জাগিয়ে তোলার কাজে। [ক্রমশ]

যবনিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

দেখতে দেখতে জগৎ ডাক্তারের ডিস-পেনসারি হয়ে উঠল হাসপাতাল। ঘরে-বাইরে মাটিতে শোয়ানো আহত মানুষের দল—তার মধ্যে ভলান্টিয়ারই বেশি। গ্রামের চাষাভুষোও আছে কিছু, বাঁশ-বেড়িয়ার ঘটনায় আহত হওয়া। তাদের মধ্যে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে জগৎ ডাক্তার—নিপুণ হাত তার ক্ষত ধোয়াচ্ছে, স্টিচ করছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। সাহায্যের লোকের অভাব নেই। কম্পাউণ্ডার ছাড়াও গ্রামের মানুষ আছে, বিমল আছে, হিমাংশুও মাথায় নতুন ফেট্টি জড়িয়ে লেগে গেছে ডাক্তারের সাহায্যে।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর অধিকাংশই উঠে বসেছে—মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে শুধু জনা সাত-আষ্টেক। অসাড় অচেতন দেহ-গুলো সেবায় শুশ্রূষায় মোহাচ্ছন্নতা যতো কাটিয়ে উঠছে—ততো বাড়ছে কাৎরানি, গোঙানি. মাঝে মাঝে এক-একটা যন্ত্রণা-কাতর আর্তনাদ। কারুর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত—কারুর মাথা। দলা দলা রক্তের ছোপ জামায়—কাপড়ে। টিম টিমে একটা লণ্ঠন ঝুলছে ডিসপেনসারির চালায়। সেই অস্পষ্ট আলো আর বাইরের সাড়াহীন শব্দহীন গ্রাম্য অন্ধকারের রাজ্যে যন্ত্রণার জড়ানো অস্ফুট শব্দগুলো ঘরের ভেতর-টাকে কেমন বিষণ্ণ আর ভারী করে তুলেছে।

অস্থির হিমাংশু স্থির হয়ে ঝুঁকে আছে তারই বয়সী একটি ছেলের মুখের ওপরে। ব্যাণ্ডেজ তার কোথাও নেই—পড়ে আছে সংজ্ঞাহীন। নিশ্বাস পড়ছে—মাঝে মাঝে যেন ছটফটিয়ে উঠছে কিসের যন্ত্রণায়। বহুক্ষণ ধরে জলের ঝাপটা দিতে দিতে ছেলেটা এক সময় চোখ খুললো।

"দীপক!" ডাকল হিমাংশু।

ঘোলাটে চোখে তাকাল হিমাংশুর দিকে—বমি করলে। রক্ত।—আঁজলা পেতে ধরে নিলে হিমাংশু। ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে।

বাইরে চেয়ার পেতে বসেছিল জগৎ ডাক্তার।

হিমাংশু পাংশু মুখে বললে, "দীপক রক্তবমি করছে ডাক্তারবাবু।"

"রক্তবমি!" ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো।

দীপক আবার চোখ বুজেছে। ডাক্তার তার নাড়ী টিপে দেখতে লাগল।

হিমাংশু ওর মুখের ওপরে ঝুঁকে মৃদু গলায় ডাকল আবার, "দীপক!"

শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে। ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করে তার কম্পাউ-ণ্ডারকে ওষুধের কথা বলে বেরিয়ে এল বাইরে। হিমাংশু বসে রইল দীপকের মাথার কাছে। যেন ওর প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস ও গুনছে।

পাশে আর এক সঙ্গী কাৎরে উঠল।

ওই কোণে যন্ত্রণায় মাটিতে মুখ গুঁজে কাঁদছে আর এক সঙ্গী—স্কুলের ছেলে। নতুন এসেছিল। মুখে লেগেই ছিল নিঃশব্দ মৃদু একটু হাসি, চোখে ছিল তার অগাধ কল্পনা, স্বপ্ন। ষোল সতেরো বছরের উজ্জ্বল স্বপ্ন।...

কাৎরাচ্ছে—সবাই কাৎরে কাৎরে উঠছে মাঝে মাঝে। একটু বড়রা যন্ত্রণা চাপার ব্যর্থ চেষ্টায় গোঙিয়ে উঠছে—কেঁপে কেঁপে উঠছে সমস্ত শরীর।

সাড়া নেই, শব্দ নেই—অস্ফুট একটু কাতরানিও নেই শুধু ভিখনের। সেই একভাবে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে বুড়ো শরীরটা। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে। ওর মাথার কাছে চেয়ার টেনে বসে আছে ডাক্তার আর সানো চৌধুরী। পায়ের কাছে বসে আছে দুই নাতি।

বহুক্ষণ পরে কি যেন বিড় বিড় করে উঠল।

সানো চৌধুরী ওর মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল উৎকর্ণ হয়ে—মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলে, "কিছু বলছিস ভিখন?"

আর কোনো সাড়া নেই।

সানো চৌধুরী বললে, "ওকে আমি বাঁশবেড়িয়াতে পাঠাতে চাই নি ডাক্তার। গোঁ ধরে নিজেই গেল। রাতটুকু ছাড়া সারা দিন পড়ে থাকত। পনেরোটা দিন এই-ভাবে গেছে।" একটু থেমে সানো চৌধুরী আবার বলল, "সেদিন ওকে বকলাম। বুড়ো মানুষ—তা ছাড়া কি দরকার ওর থাকবার! ও হেসে বললে—খুব ভালো লাগে সানো কত্তা, মনে হয়—মোর সেই সেদিনগুলোন যেন ঘুরে এল গো! তাছাড়া একালের এই এরা,—এরা কি নুন করতে জানে মনে করো। পুড়িয়ে মুড়িয়ে কালি করে দেবে। হেই দেখ মোর নুন—একদম

লাহেব পছন্দ খাস পাঞ্জাব, এক নম্বর, শাদা ধব্ধব্ করছে দানা।"

শুনতে শুনতে ডাক্তার সচকিত হয়ে উঠল। ঠোঁট নড়ছে ভিখনের। খুব অল্প অল্প।

সানো চৌধুরী বলল, "জল দেবো একটু ডাক্তার?"

ডাক্তার বলল, "ঠোঁট ফাঁক করে দাও ফোঁটা ফোঁটা। হার্টের অবস্থা খুব খারাপ।" বলে ওর মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে ডাক্তার শুধোলে, "কিছু বলবি ভিখন?"

কোনো সাড়া এলো না। সানো চৌধুরী ফোঁটা ফোঁটা করে জল দিলে। জলটুকু খেল। জোরে একটা নিশ্বাস পড়ল। হয়তো দীর্ঘশ্বাস—ওর শতাব্দী পারের দীর্ঘশ্বাস। তার কথা ডাক্তারও জানে না, সানো চৌধুরীও জানে না। ওরা শুধু ওর নিঃশব্দ ঠোঁট নড়াটাই দেখতে পেলে। দেখতে পেলে—বন্ধ দুই চোখের পাতার আড়ালে চোখের মণি দুটো নড়ে নড়ে উঠছে মাত্র। সে চোখের তারায় কোন দূর অতীতের কি উজ্জ্বলতা ফিরে এলো আবার—সে ওরা বুঝতে পারল না। নিঃশব্দ ঠোঁটের মৃদু কম্পনে কম্পনে কোন

---

* হিজলীর বিখ্যাত নুন।

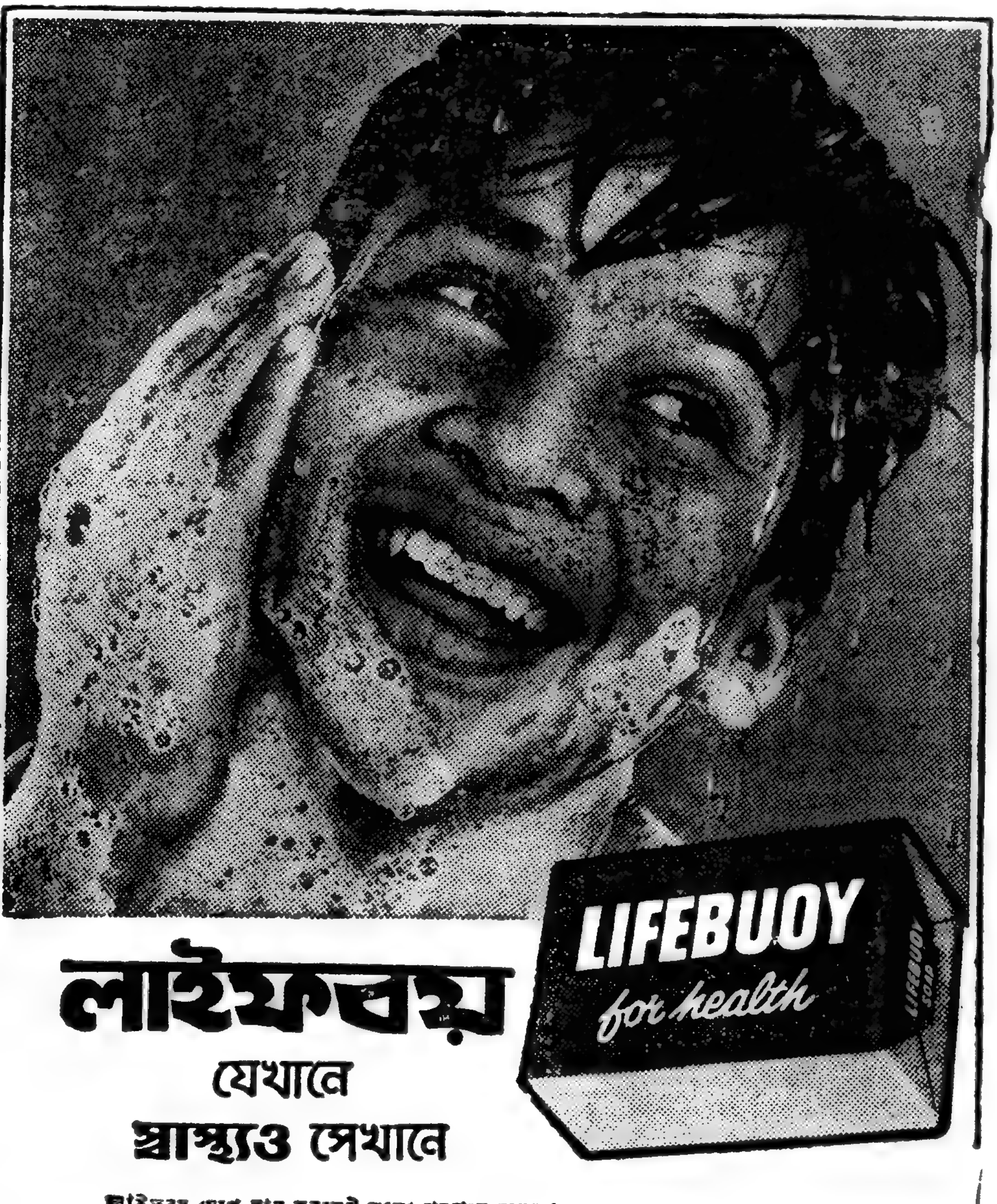

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন।
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু
গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে!

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

ক্লিন্টাস- L. 52-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

অশ্রুত ভাষা উচ্চারিত হলো—সে ওরা শুনতে পেল না।

ওরা দেখতে পেল না, কদম এসে দাঁড়িয়েছে। চরের অনন্ত অন্ধকারের যবনিকায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই বহুদিনের হারানো একটা মেয়ে—যৌবনের অজস্রতায় ভরাট একটা দেহ, মাথা ভরা এলো চুলের রাশি, স্নিগ্ধ কপালের ওপরে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি।

"কতদিন বাদে দেখতে পেলম কদম। দে—গায়ে মাথায় মোর একটু হাত বুলিয়ে দে।"

কদম কাছে আসে না—কেবলই দূরে থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ও বললে, "আমি যে উঠতে পারছি নি রে কদম। তুই আয়—কাছে আয়, মাথায় হাত দে। মাথায় বড় ব্যথা—সদাকালের ব্যথা। আঃ, কি আরাম কদম—কি ঠান্ডা তোর হাত। ব্যথা আর জুড়িয়ে গেল।"

কিন্তু মাথায় হাত দিয়ে কদম চমকে উঠল—ভয় তরাসে যেমন করে চিরকাল সে কেঁদে ফেলেছে—তেমনি করে কেঁদে ফেললে। বললে, "ইঃ, এ যে শুধু রক্ত—রক্ত। এত রক্ত কোথায় ছিল গো!"

ও বললে, "নিমকী গোমস্তা দুয়োরী ঘোষ খড়ম দিয়ে মারল।"

কদম বলল, "উ গুলোমের ব্যাটা নোন মারবে কেন!"

"দু-সের নুন গামছায় বেঁধে আনছিলম। পাইক ধরে নিয়ে গেল—বলে, নুন চুরি করেছি খালাড়ি থেকে।"

কদম বললে, "চুরি করলে কেন?"

"চুরি করবো কেন বৌ।" ও বলল, "দু' হপ্তায় দু-সের নুন মোর ঠাকুর্দা পেয়েছে, মোর বাপ পেয়েছে—আমি পাবো না কেন? ই তো সেই কালভার্ট সায়েবের নিয়ম।"

"তবে? তবে নুন দিবে নি কেন?"

"দুয়োরী ঘোষ বলে—তোর এক সের, মোর এক সের—না হলে এক চিমটি নুন পাবি নি শালা, যা।"

"ই মা গ!"

"আবার পাইক ভাওড় মণ্ডল বলে—মোকে আধ সের না দিবি তো শালা কয়েদ করে দেবো। তো বল—মোর কি থাকল!"

"আধ সের।"

"তাতে মোরা ঘরে খাব কি আর ব্যাপারী যে লুকিয়ে চুরিয়ে দাদন দিয়ে গেল—তাকে দিব কি! বল?"

কদম চোখ ডাগর করে বললে, "ই লুকানি-চুরানির ব্যবসা ছেড়ে দাও।"

"আমি তো করি নি কদম—শালা গাঁউলি ব্যাপারীই তো পথ দেখাল। দু' সের করে নুন আনতম—ঘরে খেতম, আর একটু একটু করে যা বাঁচতো—দু'এক মন হলে তাকে দিতম। এখন কি করে তার দাদন শোধ দিব? শালা মোর চাষের বলদ ধরে টানবে যে কদম!"

"তবে!"

"আছে—পথ আছে। তুই মোকে একটু সাহায্য কর—দেখে লেবো ওই দুয়োরী ঘোষকে। শালা তুই ছ্যাঁচড় তো মুই ছ্যাঁচড়।"

"কি করব বলো।"

"আয়—কাছে আয়, কানে কানে বলি।"

কান পেতে শুনে কদম খিল্ খিল্ করে হেসে বলল, "ধ্যাৎ। সে আমি পারব নি—কখ্খনো পারব নি। খালাড়িতে কেউ বউ নিয়ে যায়?"

"যায়। যার লোকের দরকার—তার যায়। বসে বসে তুই পাম্পায় জল ফুটাবি—আমি জালপাইতে যাব কাঠ কাটতে।"

"তা পারব। তবে পেটের উপরে ওই গাদা জড়িয়ে যেতে পারব নি। পেট উঁচু হয়ে থাকবে।"

"না হলে নুন লুকিয়ে আনবি কি করে কদম! ব্যাপারী এসে যে তোর চাঁদা বলদ ধরে টান দেবে!"

কদম বললে, "তবে যাব। কিন্তু পাইক গোমস্তা কি ধরতে পারবে নি?"

"কদম—মোর বউয়ের ছেলে হবে।"

"ই মা গ মা। সে আমি পারব নি।"

"কেন! তোর কি আর ব্যাটাবেটি হতে পারে নি!"

কিন্তু শেষ, ধরে ফেললে পাইক ভাওড় মণ্ডল দু-দশ দিন যেতে না যেতে। এই অত বড় উঁচু পেটটা নিয়ে বউটা খালাড়িতে আসে দিব্যি টুক্ টুক্ করে—আর যাওয়ার সময় কোমর টেনে যেন হাঁটতে পারে না।

ভাওড় বললে, "তাই মোর সন্দেহ হলো।"

দিনের কাজের শেষে, গোলায় নুন জমা দিতে এসে ধরা পড়ে গেল কদম।

একেবারে গোমস্তার সামনে হাজির করে দিয়ে হাত-পা নেড়ে ভাওড় বলতে লাগল, "হাই দ্যাখ ঘোষবাবু, পেটের কাপড়ের ভেতরে নুন বেঁধেছে কত। বলে—ছেলে হবে।"

দুয়োরী ঘোষ কেমন বিশ্রীভাবে কদমকে দেখতে দেখতে বললে, "ছেলে হওয়াচ্ছি। রাতের মত কয়েদ কর হারামজাদীকে।"

আর মেরে তাড়িয়ে দিলে তাকে।

"ভাগ শালা।"—

...নেই—চোখের সামনে আর কদম নেই। দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।...

কেঁদে এসে পড়ল চৌধুরী বাড়ির কাছারিতে, "বাঁচাও কত্তা, মোর কদমকে ওরা গোমস্তার ঘরে কয়েদ করে দিলে। উ জোচ্চোর পিশাচ। বাঁচাও হুজুর মোর।"

পুলিশ এল, দারোগা এল, সল্ট এজেন্টের আমিন এল, নিমকী দারোগা এল। চৌধুরী কত্তা ঢের করলে। কিন্তু যার জন্যে এত—শুধু তাকেই পাওয়া গেল না।

দুয়োরী ঘোষ বলল, "তাকে তো ওর সঙ্গেই ছেড়ে দিলাম হুজুর। নুন চুরি করেছিল—ভয়ে কোথাও হয়তো পালিয়েছে। পাইককে আমার জিজ্ঞেস করুন।"

পাইক ভাওড় মণ্ডল সাফাই দিলে।...

কদমের একটা চিহ্নমাত্র কেউ আর দেখতে পেল না।

...সে-ও পেল না। কতদিন তাকে দেখতে পেল না। আজ পেল—আবার কোথায় হারিয়ে গেল। এই তো চোখের সামনে সারা চর দেখতে পাচ্ছে সে—কত খালাড়ির পর খালাড়ি। কদম কোথাও নেই। প্রাণপণে ডাক দিল সে—ক-দ-ম!...

ওই দেখ, এসেছে সে। তেমনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে। আসছে—কাছে আসছে। আবার মাথার কাছটিতে এসে বসল।

"কোথায় ছিলি কদম?"

"ওই তো, চরের কাঁচা পলির মধ্যে। পাছে ওদের অত্যাচারের কথা বলে দিই—তাই মোর গলা টিপে ওই কাঁচা পলির মধ্যে রাতারাতি কবরে করে দিলে। কেন গো, খালের মুখে মাছ ধরতে যেয়ে আমার বাউটি বাজু পাও নি? আমার পৈঁচা চুড়ি পাও নি?"

"পেয়েছিলম কদম। সে ঢের দিন বাদে।"

কদম আবার তার মাথায় হাত দিলে। বললে, "আবার তোমার মাথা ফাটিয়ে দিল। ইস্—এত রক্ত—এত রক্ত।"

ও বলল, "মুখে কফেটা গড়িয়ে পড়েছিল—খুব লোনতা।—বুঝলি কদম, একেবারে কড়া পাক শাম্পা রস। হাঁড়ি ভরে নিয়ে চলে যা কলকাতা—বেচে আয় মাথায় করে: ও সওদাগর...ও বাবুরা... হিজলীর আসলি শাম্পা রস লিবে গো।"...

কদম কাঁদছে। ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "চলো মোরা পালাই এখান থেকে।"

ও বলল, "কোথায় যাবো কদম।"

"আমার কাছে।" কদম বলল, "অমন একলা একলা আর কতদিন থাকব গো!"

"একলা একলা আমারও তো কতদিন কেটে গেল কদম।"

"তবে এসো না—পালাই এ চর ছেড়ে।"

"পালাব!—কিন্ত কোম্পানীর দাদন? সেই তো আবার নিমকী দারোগার পাইক যেয়ে ধরে আনবে কদম।"

কদম চোখ ঘুরিয়ে বলল, "এমন

জেলায় ঢুকিয়ে রাখব—আর তোমাকে ধরতে পারবে নি। চলে এসো—"

বলতে বলতে কদম যেন মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। হারিয়ে যাচ্ছে।...

"কদম!—দাঁড়া, যাচ্ছি আমি—যাচ্ছি।"

চলে যাচ্ছে। কত খালাড়ির পর খালাড়ি পার হয়ে, হলুদ ফুলে ভরা বাবলাবনের সারি পেছনে ফেলে, কত চর কত গ্রাম পার হয়ে। একটা আদি অন্তহীন নিকষ অন্ধকার যেন ঘিরে আসছে চারিদিক থেকে

উদ্বিগ্ন হিমাংশু ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল দীপকের কথা বলতে। এসে থমকে দাঁড়াল। ডাক্তার তখন নাড়ী টিপে দেখছিল ভিখনের। থমথমে মুখে চোখের পাতা দুটো ফাঁক করে একবার দেখলে। তারপর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললে, "শেষ। এ চরের শেষ মজুরগী তোমার চলে গেল সানো কর্তা।"

সানো চৌধুরী কোনো কথা বললে না—বাইরে দিগন্ত জোড়া অন্ধকারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

হিমাংশু একটু অস্ফুট আর্তনাদ করে বললে, "নেই!" একটা চাপা আবেগ ওর তরুণ মুখে উত্তেজনার ছায়া ফেলে যায়। স্তব্ধ চোখে ঘরের ভেতরে তাকাল—দীপকও ওইরকম অসাড় বুড়ো দেহটার মতো পড়ে আছে চিৎ হয়ে। ভুলে গিয়েছিল—দীপকের কথা বলতে এসেছিল সে ডাক্তারের কাছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় নিজের দুটো হাত তুলে ধরলে চোখের সামনে—রক্ত, তাজা তরুণ রক্তে হাত দুটো রাঙা। আস্তে আস্তে বললে, "দীপক আবার বমি করেছে ডাক্তারবাবু—তেমনি... শুধু রক্ত।"

"আবার!"

উদ্বিগ্ন ডাক্তার ভেতরে উঠে গেল। ঝুঁকে দেখতে লাগল দীপককে। ছেলেটা যেন ঘুমোচ্ছে—নিরুদ্বেগে, শান্তিতে। নিশ্বাস পড়ছে ধীরে।

"ও বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?" চাপা উত্তেজনায় জিজ্ঞেস করলে হিমাংশু।

স্তব্ধ চোখে বিমল চেয়ে রইলো ডাক্তারের মুখের দিকে—সমস্ত স্নায়ু সজাগ করে যেন একটা উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

ডাক্তার শুধু বললে, "বাইরে এসো।"

ডাক্তার ফিরে তার চেয়ারে এসে বসল।

বিমল নীরবে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল। হিমাংশুর সে ধৈর্য নেই। উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, "আমি জানি—আমি জানি—" বলতে বলতে সে দাওয়া থেকে নেমে অন্ধকারে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার বললে, "আজ রাত্রেই যেমন করে হোক পাল্কী করে মহকুমা হাসপাতালে দীপককে পাঠাতে হবে সানো কর্তা।"

বিমল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সানো চৌধুরী। তারপর আস্তে আস্তে বললে, "এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ডাক্তার।"

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। হাজির হলো পাল্কী বেহারা। সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো একজন অল্প জখমী ভলান্টিয়ার। ডাক্তার চিঠি লিখে দিলে। সন্তর্পণে ধরাধরি করে দীপককে পাল্কীতে তুলে দিলে। পাল্কী রওয়ানা করে দিয়ে বিমল দাঁড়িয়েছিল স্তব্ধ হয়ে—দাঁড়িয়েছিল ডাক্তার, সানো চৌধুরী।

হঠাৎ কোথা থেকে সেই অন্ধকারে সামনে এসে দাঁড়াল হিমাংশু। হাতে একটা কাপড়ের টুকরোর মত কি—এগিয়ে দিলে বিমলের দিকে। বললে, "এটা নাও বিমলদা।"

"ওটা কি!"

"ভলান্টিয়ারের টুপী।"

"কি হবে?"

"দিয়েছিলে একদিন। ফেরৎ দিয়ে যাচ্ছি।"

"মানে!"

"ওটা মাথায় দিয়ে এ অত্যাচারের পাল্টা জবাব হয়তো জীবনে আর দিতে পারব না।"

"বাড়ি ফিরে যাচ্ছিস?" বিষণ্ণ গলায় বিমল জিজ্ঞেস করল।

হিমাংশু বললে, "না। সেখানে ফিরে গিয়ে দীপকের মাকে কি বলব? এসেছিলাম যে একসঙ্গে!"

"তবে?"

"জানি না বিমলদা।" তারপর দুটো মুঠো মেলে ধরলে বিমলের সামনে—বললে, "এই দেখ, দীপকের রক্ত—হাতে বমি করেছিল, আঁজলা আঁজলা করে ফেলেছি বাইরে। এ রক্তে মরছ আমি আর সহ্য করতে পারছি না—এ আমি আর বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করি না।"

বলতে বলতে হিমাংশু প্রায় পাগলের মত পাল্কী লক্ষ্য করে ছুটে এগিয়ে গেল।

যে খাপ্পা ঝড়ের ঝাটকায় হিমাংশু ছিটকে গেল তেমনি একটা ঝড় চর জুড়ে গ্রাম জুড়ে মারখাওয়া মানুষগুলোর বুকের গভীরে ফুঁসতে লাগল।

পরের দিন নন্দীগ্রামের হাট। মাইল তিনেক দূরে। পাশে স্থায়ী বাজারও আছে। এ অঞ্চলের জমাটি এক বাণিজ্য-কেন্দ্র। চরের মানুষ—গাঁয়ের মানুষ দল বেঁধে গেল হাটে নুন কিনতে। বিলেতী নুন।

ভিড় তো ভিড় নুনের দোকানে। বড় বড় তিন-চারটে গোলদারী দোকানের সামনে ভিড় জমাট। দু' সের পাঁচ সের করে পাল্লা থেকে ঢেলে নিচ্ছে গামছায়। কারুর আর তর সইছে না।

এমন কি দোকানের মালিকেরা তাজ্জব। এসব গাঁউলি লোক আবার নুন কিনতে আসে কবে? এলে আসে সেই বর্ষায়—যখন নিজেরা আর বানাতে পারে না, জলো হাওয়ায় নুন যায় জমে।

কে একজন জিজ্ঞেসও করলে, "অত নুন হবে কি হে!"

জবাব হলো: "আর মশয়, পুলিশে যত পেছনে লেগেছে।"

খদ্দেরের ভিড় দেখে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বড় বড় হালা।

দেখতে দেখতে গোলমাল পাকিয়ে উঠল এক দোকানে।

দোকানী বললে, "দাম?"

গাঁউলি ক্রেতা খেঁকরে উঠলে, "বলি পালাচ্ছি নাকি মশয়। বসে তো আছি। একে একে নুন নিচ্ছে। দিচ্ছি—

দোকানী ওদের গামছা চেপে ধরলে। বললে, "হিসাব ছুট্‌ হয়ে যাবে। যে যেমন নিচ্ছ—দাম ফেলে যাও।"

"ধুত্তোর—নুনের নিকুচি করেছে। মোরা কি চোর!, হেই লাও তোমার নুন। আরও ঢের দোকান আছে।" বলে গামছার বাঁধা নুন দোকানের সামনে মাটিতে ফেলে ছড়িয়ে দিলে।

ওজনদার তেড়ে এল। গদি থেকে মালিক এল ছুটে মার মার—ধর ধর করে। ওরাও দাঁড়াল রুখে। শুধু গামছার বাঁধা নুন নয়—উল্টে দিলে গোটা নুনের বস্তা। পা দিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রখান করে দিলে।

সমান ব্যাপার ঘটছে তখন অন্য ক'টা দোকানেও।

"তোর বিলাতী নুনের নিকুচি করেছে। ওব মেধো—ওরে হেবো—ই শালার নুনে পেচ্ছাব করে।"

নোংরায় কাদায় মলে-মুত্রে সব নুন ওরা নষ্ট করে দিয়ে চলে গেল।

রাণী ধূপ
কাকার প্রডাক্টস

বলতে বলতে গেল, "বিলাতী নুনে হারাম। ওতে গোরুর হাড়ের গুঁড়ো মেশানো আছে। না হলে মাটির নুন আবার অত শাদা হবে কি!"

কে একজন তখন হাটের একপাশে বুড়ো বটের তলায় খুলে বসেছে দেশী নুনের বস্তা।

দোকানদাররা ছুটে গেল থানায় খবর দিতে।

বারোয়ারি দুরন্ত বাহিনী তেড়ে এল বাজারের দিকে। হাটবাজার ফাঁকা করে দিয়ে পালাল সবাই। যে দলে আছে—সেও পালাল, যে দলে নেই—নিরীহ ক্রেতা, ভয়ে সে-ও পালাল। দেখতে দেখতে হাট বাজার ফাঁকা।

হিতে বিপরীত। একটা পয়সা বিক্রি নেই। ক্রেতা নেই—কিনবে কে!

হাটে বাজারে গঞ্জে এমনি চলতে লাগল বিলেতী নুনের তাণ্ডব। এক হপ্তা—দু হপ্তা দেখে বাজারীরা বিলাতী নুনের আমদানী বন্ধ করে দিলে। দু-এক বস্তা আছে যার গুদামে—ভয়ে সে আর সামনে বার করলে না।

আন্দোলন নতুন মোড় নিল।

[ক্রমশ]

রূপজগতে

যুদ্ধ শেষ

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র জগতে এক তুমুল লড়াই হয়ে গেল। পোস্টার, ইস্তাহার, সভা, মিছিল, শ্লোগান, পিকেটিং, অনশন, সংবাদপত্রে বিবৃতি, প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি রাজনৈতিক সংগ্রামে যা যা করা হয় সবই করা হয়েছে। সব কিছুর হিসাব করলে মনে হবে কি ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং ফিল্মের লোকেরা জাতি ও দেশের কল্যাণে বুঝি বিরাট কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করছে। শুধু গ্রেপ্তার, লাঠি, টিয়ারগ্যাস অর্থাৎ পুলিশের হস্তক্ষেপ যা বাকি আছে, তা হলে আন্দোলন পূর্ণ হত কর্মচারীদের উদ্দেশ্য-সাধনের পথে। এই ধারণা আমার হয়েছে সংরক্ষণ সমিতির অনেক সমর্থকের সঙ্গে আলোচনা করে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সব মিটমাট হবার পর রাত্রে সংরক্ষণ সমিতি মীমাংসা অস্বীকার করল কেন, কেনই বা ৭ই মে আবার পিকেটিং শুরু করল। তিনি বললেন, সরকারকে হস্তক্ষেপে বাধ্য করতে হবে, সরকারের নিরপেক্ষতার ভূমিকা চলবে না। এই উত্তরে অনুসন্ধান করা গেল, 'সংকট-এর মূল বড় গভীরে।' কাজেই মীমাংসা হলেও মীমাংসা হয় না।

এই আন্দোলন-নাটকের শেষ দৃশ্যটি বড় বেদনাদায়ক। যে উত্তম বিকাশকে দেখার জন্য কয়েকদিন আগে হাজার হাজার মানুষ জমেছিল, সেই জনতার মধ্য থেকেই শ্লোগান ওঠে উত্তম বিকাশকে ধিক্কার দিয়ে। জনতা বড় ভয়ঙ্কর। ইতিহাসে দেখা গেছে যে, জনতা দুদিন আগে যাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে—সেই জনতার হাতেই অভিনন্দনীয় ব্যক্তি মার খেয়েছেন। চিত্রতারকাদের যে জনপ্রিয়তা—সেটা কিছুটা হুজুগ, কিছুটা হীনতাবোধক চিন্তাপ্রসূত; তাতে শ্রদ্ধা নেই। একজন সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা বা বৈজ্ঞানিকের জনপ্রিয়তা এবং তাঁকে দেখার জন্য যে জনসমাবেশ, তার সঙ্গে চিত্রতারকাদের জন্য জন-সমাবেশ এক মানসিকতার ব্যাপার নয়। এই হিসাবের ভুলের জন্যই উত্তমকুমারকে ধিক্কার ধ্বনি শুনতে হয়েছে।

এত ব্যাপার ঘটেছে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' মিনার বিজলী ছবিঘরে মুক্তি পাবে কি অরোরার 'আরোগ্য নিকেতন' পাবে। শেষ পর্যন্ত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক পরিচালকের ছবির মুক্তির ব্যাপারে এত যে জল ঘোলা হল তাতে সারা ভারতে বাংলার সুনাম হল না, কিছুটা দুর্নাম হল মনে হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যেত, তা না করে এমন সোরগোল তোলার কারণ আমরা বুঝতে পারি নি। বরঞ্চ রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে মিছিল থেকে মীমাংসার অনর্থক দেরি করা এবং শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে পাওয়া মীমাংসাকে অস্বীকার করে একটা সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মধ্যে কিছু অদৃশ্য রহস্য রয়েছে মনে হয়েছে। গোড়াতেই ব্যাপারটা জটিল মনে হয়েছিল। কিছুসংখ্যক অভিনেতাকে ব্ল্যাক লিস্ট করা প্রিন্ট নিয়ে গোলমাল করা এবং স্টেটসম্যান ও আনন্দবাজার পত্রিকার ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য কয়েকজন শিল্পীকে নিন্দা করার ঘটনায়। অথচ দুদিকেই কয়েকজন ভাল লোক আছেন, তবে সংরক্ষণ সমিতির সদস্যরা যদি গোড়া থেকে শ্রমিকদের সঙ্গে এ কাজ করতেন তাহলে বোধ হয় এত বিভ্রান্তি, এত গোলমাল হত না। বরং সিনেমার কায়েমী স্বার্থের লোকেরা কোণঠাসা হত; মেহনতী শ্রমিক, কলাকুশলী, শিল্পী এবং প্রযোজকরা ঐক্যবদ্ধ হতেন। অন্যান্য সব শিল্পের মত সিনেমায়ও একমাত্র মেহনতী মানুষের স্বার্থে সংগ্রামী ঐক্যের পথেই সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব।

শেষ পর্যন্ত পিকেটিং প্রত্যাহার করে সংরক্ষণ সমিতি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। আর যুক্তফ্রণ্ট সরকার যেরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তাও প্রশংসনীয়। সরকার সর্বক্ষণ নিরপেক্ষ থেকে দুই পক্ষের আস্থাভাজন লোকদের নিয়ে মীমাংসার জন্য কমিটি গঠন করে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এই কমিটির সদস্যরা যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাঁরাও ধন্যবাদভাজন। এই ঘটনার পরে চলচ্চিত্র-শিল্পে মেহনতী শ্রমিক কারিগর এবং শিল্পীদের ঐক্যকে আরো দৃঢ় করা প্রয়োজন, বাংলা ছবির প্রযোজকদের এই ঐক্যে শরিক হতে হবে; নতুবা শিল্পের সামগ্রিক উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। —সুজন

চেনা অচেনায় সুস্মিতা সান্যাল

চিত্র আলোচনা

ভাই বহিন

বিক্রম প্রোডাকসন্সের হিন্দী ছবি 'ভাই বহিন' একটি পারিবারিক উপভোগ্য হিন্দী ছবি। রাজা বিক্রম প্রতাপের পুত্র সুরেন্দ্র ও তাঁর কন্যা রাণী এই ছবির প্রধান চরিত্র। সুরেন্দ্র তাঁর পিতার আশ্রয়ে পালিত, আর ভাগ্যবিড়ম্বনায় বোন রাণী জীবনযাপন করত রাস্তায় নাচ দেখিয়ে। একদিন সুরেন্দ্র রাণীর আসল পরিচয় জানতে পেরে তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। কিন্তু বিমাতার সংস্কারে বাধল তাকে গ্রহণ করতে। শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রের দৃঢ়তায় রাণী সংসার স্বীকৃতি লাভ করে।

ছবিটি গতানুগতিক কাহিনী-চিত্র হলেও হালের হলিউড অনুকরণ থেকে

দত্ত। অভিনয়ে আছেন অশোককুমার সুনীল দত্ত- নতুন, প্রাণ ও পদ্মিনী।

নাটকের কথা

বিদূষকের তিনটি নাটিকা

বিদূষকের প্রযোজনায় চতুর্থ রজনী অভিনয় হয়ে গেল বিড়লা একাডেমি অব আর্ট এ্যান্ড কালচার মঞ্চে। এই উপলক্ষে বিদূষক নাট্যসংস্থা তিনটি একাংক নাটক যথাক্রমে আজ বসন্ত, কু-ঝট-পট-ঝটিকা ও বাঁশী মঞ্চস্থ করেছেন। আজ বসন্ত কাব্য-নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীঅসীম সান্যাল, কু-ঝট-পট-ঝটিকা ও বাঁশী একাংক নাটক দুটি রচনা করেছেন শ্রীপ্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসমর দাস।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সর্বশ্রী সুখেন মুখার্জী, সুর্য মুখার্জী, এষা চক্রবর্তী, সমর দাস, গৌতম ব্যানার্জী, শাশ্বতী মুখার্জী, গুরুপদ দাস, রথীন সোম, অশোক ব্যানার্জী, গোপা মুখার্জী, পীযূষ চ্যাটার্জী, মণ্টু আলুকদার ও অধীর মুখার্জী।

আজ বসন্ত কাব্য-নাটকটি মুখ্যত জাঁ-পল সাত্রের অস্তিত্ববাদকে অবলম্বন করে লেখা। জীবন যে চিরন্তন চলার শপথ...এই ভাবটিই কাব্য-নাটকটির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। কু-ঝট-পট-ঝটিকা প্রধানত হাস্যরসাত্মক নাটক। নাট্যকার প্রবীর মুখোপাধ্যায় নাটকটির মধ্যে আঙ্গিকের নতুনত্ব দেখান। বাঁশী একটি অপরাধমূলক নাটক।

ইন্দর সেন পরিচালিত 'প্রথম কদমফুল' ছবিতে শুভেন্দু

চিলড্রেন নোভেল থিয়েটারে অনুষ্ঠান

প্রতি বছরের মতন এই বছরেও ১লা বৈশাখ বিশ্বরূপায় অনুষ্ঠিত হল "চিলড্রেন নোভেল থিয়েটারের" নবম বর্ষের অনুষ্ঠান। দীপালী দেবচৌধুরী পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের নূপুর ঝুমুর নাচের মধ্যে দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। পরবর্তী অনুষ্ঠানের মধ্যে আকর্ষণীয় হয় নাগা ও বর্মী নৃত্য। পরিচালনায় ছিলেন মানসী দেবচৌধুরী। উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্য দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

"হরবোলা" বেতার শিল্পী অমর গঙ্গোপাধ্যায় পর্দার অন্তরালে থেকে "চিলড্রেন নোভেল থিয়েটার"-এর "বাঘ", "সোনালী সিং" ও "নকল রাজা" এই তিন মুখোশ নাটকে মুখ দিয়ে জন্তুর ডাকের মাধ্যমে দৃশ্যের অবতারণা করে দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন, "তাপস চ্যাটার্জী", "সনৎ দাস", "অনিতা চক্রবর্তী", "দীপা চৌধুরী", "শুক্লা চক্রবর্তী", "রাজশ্রী দাশগুপ্ত", "সুপ্রিয়া গাঙ্গুলী", "কাকলি দাস", "দীপা সাহা", "টুম্পা চ্যাটার্জী", "আনন্দিতা সেন", "মিতা চ্যাটার্জী", "তিলক চ্যাটার্জী", "মালা সাহা" ও "রোশনারা"। নেপথ্য-সঙ্গীতে ছিলেন, তপতী দাস, গৌরী সেনগুপ্ত, সুপর্ণা রায়-গুপ্ত ও পিয়ানোয় ছিলেন "ভরত কারক"। নাটকগুলি রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন "সুশীলচন্দ্র দাস।"

দেবতার গ্রাস

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে উদয় ছোটদের সংসদের ভাই-বোনেরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতা অবলম্বনে রচিত নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে দর্শকদের মনে ছাপ রাখতে সমর্থ হয়। সর্বশ্রী প্রকাশ চৌধুরী, নান্টু চন্দ্র, দিলীপ দত্ত, ঝুমুর চক্রবর্তী, করবী চক্রবর্তী, কেতকী চক্রবর্তী, নীলু চক্রবর্তী, রীণা দাস, শিখা দাস, শিবশঙ্কর সেন প্রমুখ কিশোর শিল্পিবৃন্দ নৃত্য ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে।

তরুণ মুখার্জী পরিচালিত 'নববধূ' ছবির গান রেকর্ড করছেন নবাগতা মঞ্জিরা মুখোপাধ্যায়।

সাপ্তাহিক বসুমতী আয়োজিত গোপাল হালদার-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গান গাইছেন জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোক্ষদার ভূমিকায় শ্রীতনুজা সাহার ব্যঞ্জনা মনোগ্রাহী হয়। সংগীতাংশে শ্রীকাজল সেনগুপ্ত ও শ্রীপাপিয়া চক্রবর্তীর সুরেলা দরদীকণ্ঠ সকলকে মুগ্ধ করে। সমগ্র নৃত্যনাট্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন শ্রীপ্রশান্ত মৌলিক।

স্টুডিও খবর

অসমীয়া চিত্র

'ওপর মহলা'

চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রয়াস 'ওপর মহলার' চিত্রগ্রহণ শ্রীজীতেন শর্মার পরিচালনায় শুরু হয়েছে।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন শ্রীমতী জ্ঞানদা কাকতী, পবিত্র বরকাকতী, অনিল দাস, খগেন রায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার এবং বোম্বের মধুমতী।

"ওপর মহলার" প্রথম পর্যায়ের সুটিং সমাপ্তপ্রায়।

শিলং, কাজিরাঙ্গা, বরপানী, নওগাঁ, ধুলিয়াজান এবং আশেপাশের অঞ্চলে পরিচালক জীতেন শর্মা বহু দৃশ্য তোলেন।

সঙ্গীত-পরিচালক শ্যামল মিত্রের নির্দেশনায় ইতিমধ্যে ছবির চারখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে।

নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা মুখার্জী, কৃষ্ণা রায় ও শিপ্রা বসু।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এ সপ্তাহে ছবির শেষ পর্যায়ের সুটিং শুরু হবে।

ছবির পরিচালনা ও প্রযোজনার দায়িত্ব শ্রীজীতেন শর্মার।

নোঙ্গর

গত ২রা মে সন্ধ্যায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এম বি প্রোডাকসন্সের 'নোঙ্গর' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবির কাহিনী লিখেছেন রণজিৎ মিত্র, সঙ্গীত পরিচালনা করবেন অজয় দাস।

সাপ্তাহিক বসুমতীর অনুষ্ঠানে সমবেত সংগীতে অংশ গ্রহণ করেছেন: সুপ্রভা সরকার শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস, শ্রীউৎপলা সেনগুপ্ত, নন্দিতা বসু, রাখহরি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

[illegible]

আয়কর কর্মচারী ক্লাবের রজতজয়ন্তী উৎসব

'দি ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস এণ্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব'-এর ২৫ বছর কার্যকালের স্মারক রজতজয়ন্তী উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। গত ২৫শে এপ্রিল রবীন্দ্র সদনে উৎসব উদ্বোধন করলেন ক্লাবের প্রথম সাধারণ সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সুচিত্রা মিত্র, মায়া সেন, শক্তি নাগ, আরতি মজুমদার প্রমুখ।

বৈতানিক আয়োজিত নন্দিতা পুরস্কার

প্রথম বার্ষিক নন্দিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে প্রায় দুই শত প্রতিযোগিনী অংশ গ্রহণ করেন। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, গীতবিতান, দক্ষিণী, রবীতীর্থ, সুরঙ্গমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বহু ছাত্রী প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল বৈতানিক কার্যালয় ৪নং এলগিন রোডে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার, শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা, শ্রীনীহারবিন্দু সেন এবং শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায় বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন।

বেহালার কিশোর ভারতী (প্রাথমিক বিভাগ) পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তি উৎসবে 'সীতার বিয়ে' নাটিকা শেষে শিশু শিল্পিগণ।

বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রীসর্বাণী সেন ১ম, শ্রীউজ্জয়িনী সেন ২য় এবং শ্রীঅর্চনা বসু ৩য় স্থান অধিকার করেন।

বেহালা কিশোর ভারতী

বেহালা কিশোর ভারতীর পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তি এবং বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব ১৯শে এপ্রিল থেকে ২১শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের হস্তনির্মিত চারু ও কারুশিল্প প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মালবিকা নৃত্যনাট্য, অরুণ-বরুণ-কিরণমালা নৃত্যনাট্য, ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্যগীত ইত্যাদি সকলের প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী এবং রাজ্য সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কৃষ্টি আয়োজিত শিশু ও কিশোর-শিল্পী সম্মেলন উপলক্ষে সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধ প্রভৃতির প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ আবেদনপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ ও ঠিকানা ২০শে মে ১৯৬৯, সম্পাদক কৃষ্টি—২৮, অনন্তরাম মুখার্জী লেন, হাওড়া—১ (সন্ধ্যা ৬—৯টা)।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ১লা মে বিপ্লবতীর্থ মুরারিপুকুরের ছোটদের সংসদের ভাই-বোনেরা শ্রীশ্যামসুন্দর বসুর পরিচালনায় দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। সর্বশ্রী সবিতা বসু, পুরবী চট্টোপাধ্যায়, শেলী বসু, কৃষ্ণা শেঠ, চন্দনা চট্টোপাধ্যায়, কাবেরী শেঠ, শর্মিলা চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় ও সুলেখা ভট্টাচার্য সংগীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন।

চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব

১৬ই থেকে ২২শে মে জনতা সিনেমায় সিনে সেন্ট্রাল-ক্যালকাটার উদ্যোগে চেক জাতীয় দিবস উপলক্ষে সমকালীন সাতটি চেক ছবি দেখান হবে। ছবিগুলি : ভ্যালি অব দি বীজ, কিটেন্স নট ক্যারেট জনোসিক (২ ভাগ), স্টিলি ফার্স্ট পারফরমান্স, ডিটা স্যাক্স, ক্রাইম।

মুরারিপুকুর দিবসে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করছে শিশু শিল্পিদল

নজরুল আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত দ্বিতীয় বর্ষ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আগামী ১৭ই মে এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ১৮ই মে অনুষ্ঠিত হবে। মহাজাতি সদনের সেমিনার হলে উভয় দিন বেলা তিনটায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে।

ইতিহাসের পাতা থেকে
নতুন। বিষয়বস্তু: নতুন স্রষ্টা

॥ এগার ॥

ইয়েভগেনি চেরভায়াকভ ছিলেন আর একজন ফিল্ম ডিরেক্টর যিনি একই চিন্তাধারায় কাজ করেছেন। তাঁর ছবি গার্ল ফ্রম দি ফারএওয়ে রিভার' (১৯২৭) এবং 'মাই সান' (১৯২৮) তাঁর সময়ের গতি-প্রকৃতিকে সচেতনভাবে প্রকাশ করে; ব্যক্তির অদৃষ্টের মধ্য দিয়ে কালের বিশেষ প্রকৃতি এসব ছবিতে প্রকাশ হয়েছে।

"ফ্রম ফারএওয়ে রিভার"-এ এক তরুণীকে দেখা যায়; সে বহু দূরের এক প্রদেশের ছোট শহরে টেলিগ্রাফের কাজ করে। একঘেয়েমী থেকে বাঁচবার জন্যে এবং নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে সে রাজধানীতে আসে। কিন্তু সেখানে এসে সে এমন কিছু দেখে না যাতে সে নিজেকে সুখী বোধ করতে পারে; সে হতাশ হয়ে কোনরূপ আত্মিক শান্তি না পেয়ে বাড়ি ফিরে যায়। সেখানে এসে দেখে সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেখানে নদীর ওপর একটা পুল তৈরি হয়েছে, সে ছোট্ট শহরটা আর আগের মত পিছিয়ে নেই; পুলটা তৈরি হওয়ায় এই ছোট শহরটা দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। নায়িকা তার ব্যক্তিগত সুখ খুঁজতে এসে দেখল সকলের সুখে তার ব্যক্তিসত্তা সমষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে।

'মাই সান' একটি নতুন ধরণের ছবি। এক পরিবারে একটি অবৈধ সন্তান রয়েছে—সংকীর্ণমনা মানুষের এই ধরণের গুজব রটনার ফলে পরিবারে প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং পরিবারে দম্পতির মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পরিচালক নিজে মীমাংসা না করে মীমাংসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন দর্শকদের ওপর। স্বামী-স্ত্রীর ওপর পরিচালক নিজের বক্তব্য চাপিয়ে দেন নি, তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে তা হলে একটা পথ পাওয়া যায়। ভালবাসাই হল আসল কথা। এই ছবি দারুণ বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং নতুন সমাজব্যবস্থায় ও নতুন নৈতিক চেতনা বোধে সাহায্য করে।

অসমীয়া ছবি 'ওপরমহলা'র সংগীত গ্রহণ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা মুখার্জী, পরিচালক জীতেন শর্মা ও সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র।

পরিচালক আব্রাম রোহম সরাসরি নাট্যমঞ্চ থেকে সিনেমায় এসেছিলেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ছবিতে উপস্থিত করেন। তাঁর 'থার্ড মেশ্চানস্কায়া স্ট্রীট' (১৯২৭) বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, ছবিটি আজো লোকে স্মরণ করে। এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন ভিক্টর স্বক্লভস্কি। এই ছবিতে ত্রিমাত্রিক দ্বন্দ্ব এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছিল যা গতানুগতিক নয়। এক নারী তার প্রেমিকের জন্য স্বামীকে ছেড়ে যায়, কিন্তু পরে সে সেই প্রেমিককেও ত্যাগ করে। কারণ এ দুজনের কেউ তাকে নারীর মর্যাদা দেয় নি। নারীর মুক্তির বিষয়কে বিশেষ তাৎপর্য দিয়ে এখানে উপস্থিত করা হয়। বিশ দশকে সোভিয়েট সমাজে এটা ছিল খুবই আলোচনার বিষয়। কয়েকটি মাত্র চরিত্র এবং একটি সেটে ঘটনাকে নিবন্ধ করে আশ্চর্যভাবে ছবিকে গতিময় করে তোলা হয়। চরিত্র মাত্র তিনটি, আর অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে একটা ঘরে। ছবিটি নির্বাক।

'এ গোস্ট হুইচ্ ডাজ নট রিটার্ন' (১৯৩০) রোহমের শ্রেষ্ঠ নির্বাক ছবি। হেনরি বারবুসের উপন্যাস অবলম্বনে এই ছবিটি করা হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে সেন্ট্রাল আমেরিকান রিপাবলিকে। প্রধান চরিত্র একজন বিপ্লবীর, যাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাকে একদিনের ছুটি দেওয়া হয় জেল থেকে, পরিশেষে দেখা গেল পালাবার অভিযোগে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অভিনেতা বোরিস ফার্দিনান্দভ চমৎকার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এমন এক ব্যক্তির যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি। সেটিং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। একটি আধুনিক জেল—যেখানে মৃত্যুযন্ত্রের সব রকমের ব্যবস্থাদি রয়েছে। সূর্যতাপদগ্ধ এক মরুভূমির ওপর দিয়ে অভিযুক্ত চলেছে একজন পুলিশের সঙ্গে।

সের্গেই ইয়ুৎকেভিচ্ ফিল্ম আর্টিস্ট হিসাবে তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন রোহমের সহকারী। তাঁর প্রথম ছবি 'লেস' (১৯২৮)। ছবিটি কৌতূহলোদ্দীপক, কেবল এ কারণে নয় যে এক শান্ত স্বভাবের কিন্তু নির্ভীক তরুণী এক বিশৃঙ্খল স্বভাবের মানুষকে পোষ মানিয়েছে। এরূপ গতানুগতিক কাহিনীকে পরিচালনদক্ষতায় এবং জীবনের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলি তুলে ধরে তিনি কারখানার জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে তুলে ধরেন এবং নির্মল কৌতুক পরিবেশন করেন। ছবির সম্পাদনা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। ছবিতে জীবন, প্রকৃতি, ফ্যাক্টরী মেসিন, সবকিছুই নিখুঁত। চরিত্রের অনুভূতি ও মেজাজ প্রকাশিত হয়েছে অভিনয়ের মাধ্যমে এবং সেই অভিনয় হয়েছে মেসিনের ছন্দের সঙ্গে সমতা রেখে। শহরতলীর দৃশ্যাবলী অচিন্তনীয় রোমান্টিকতা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এ সময় বোরিস বার্নেট, ইয়ুলি রেইজম্যান এবং আইভান পিরাইয়েভ প্রমুখ চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে পরিচিত হন; বিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁরা সমসাময়িক বিষয়বস্তু নিয়ে এবং সে সময়ের নৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে ছবি করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁদের পরিচালনা-ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় নি।

—ক, ম, প

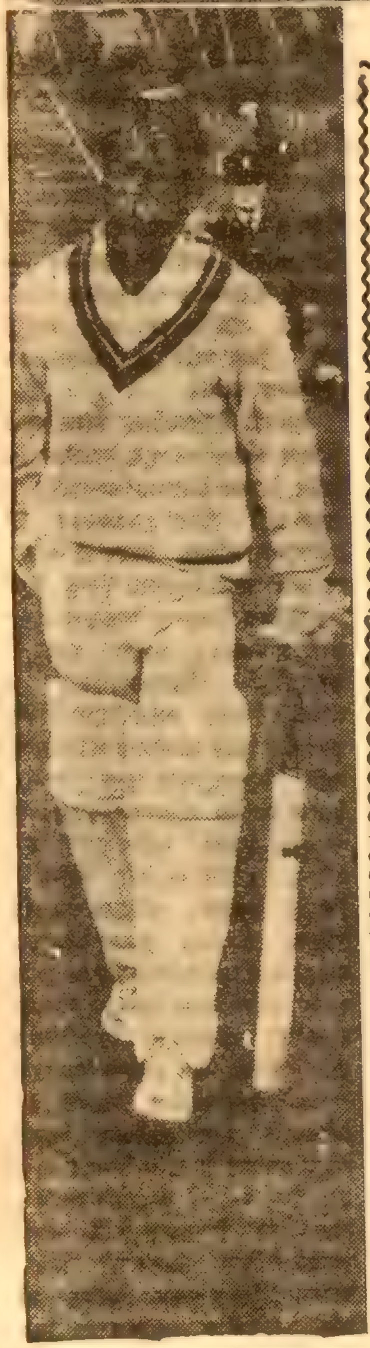

বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হঠাৎ যেন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সে জৌলুস বুঝি আর নেই, যেন আজ আর নেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের ব্যাটে-বলে লড়াই-এর সেই চোখ ঝলসানি। প্রতিভাদীপ্ত উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের বদলে আজ চোখে পড়ে তাদের অসহায় রূপ। এই তো কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড সফরের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের খেলার ধারা দেখে মনে হয়েছে তাঁরা যেন হারিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যেন ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না নিজেদের। অসহায়ের মতো ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে তাই সহ্য করতে হয়েছে পরাজয়ের জ্বালা। সে জ্বালায় আজো জ্বলছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কর্তৃপক্ষরা। আজ তাই তাদের সামনে বিরাট পরীক্ষা। ও লড়াই ওদের কাছে বাঁচার লড়াই, সে লড়াই জিততেই হবে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার ধারার ওপরই নির্ভর করছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সবকিছু। হারানো সম্মান ফিরে পেতে হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের ব্যাটে-বলের লড়াই-এ দিতে হবে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়। ছবিতে ইংলণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের কয়েকটি মুহূর্ত ধরে রাখা হয়েছে। ওপরের ছবিতে সোবার্স বোলিং করছেন প্রথম খেলায় আর বাঁ ও ডান দিকের ছবিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই ওপনিং ব্যাটসম্যান ক্যামাচো আর ফ্রেডারিকস চলেছেন ব্যাট করতে

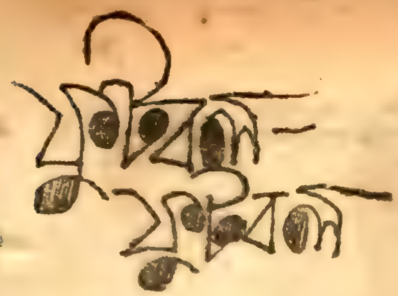

কলকাতা ময়দান জমজমাট।

এতোদিন শোনা যাচ্ছিল ফুটবলের পদধ্বনি। এখন সে পর্ব সমাপ্ত। বাংলা দেশের খেলার রাজা ফুটবল এখন পুরোদমে জাঁকিয়ে বসেছে ময়দানে। প্রায় এক সপ্তাহ হতে চললো লীগ ফুটবলের আসর বসেছে।

নামী দলগুলো দামী খেলোয়াড়দের নিয়ে একে একে নামছে মাঠে। সমবেত দর্শকদের কলতানে কলকাতা ময়দান আবার মুখর। আবার যেন সেখানে এসেছে আনন্দ-হাসি-গানের জোয়ার। কি এক যাদুবলে কলকাতা ময়দানের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে মুহূর্তের মধ্যে।

॥ স প্রসাদ ॥
মোহনবাগানের অধিনায়ক

কলকাতার ফুটবলকে নিয়ে গত দু'বছর ধরে চলেছে চরম অরাজকতা। লীগ শেষ হয় না, শীল্ডের খেলার ওপরও হঠাৎ মাঝপথে এসে গেলো ইতির দাঁড়ি। দলাদলি আর ব্যক্তিগত কোন্দল শেষ পর্যন্ত ময়দানের চত্বরে এনে হাজির করলো আইন-আদালতকে।

আজকাল যেন আর ঠিক আগেকার মতো আন্তরিকতার ছোঁয়া নেই কোন বিষয়েই। সব জায়গাতে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেবার ধান্দা!

বড় বড় ক্লাবগুলোর লক্ষ্য একমাত্র ট্রফিগুলোই। লীগ, শীল্ড, রোভার্স, ডুরান্ড প্রভৃতি ট্রফিগুলো পেলেই যেন তাঁদের সব পাওয়া হয়ে যায়। অন্য কোন দিকে নজর নেই তাঁদের। ছোট আর মাঝারি দলগুলোর একমাত্র লক্ষ্য হলো যে কোন উপায়েই হোক নিজের বিভাগে টিকে থাকা। আর আই-এফ-এ প্রভৃতি সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টা হলো নমো নমো করে ফুটবল মরশুম শেষ করা।

॥ থঙ্গরাজ ॥
ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক

ফলে আসল দিকটা থেকে যাচ্ছে একেবারেই উপেক্ষিত। খেলাধুলার উন্নতির দিকে নজর নেই কারো। কেউ যেন ফিরেও তাকাতে চান না সেদিকে। অথচ নাম-কা-ওয়াস্তে ট্রেনিং, কোচিং-

গল্প হলেও সত্যি

হ্যাট্-ট্রিক শব্দাটির উৎপত্তির সংগে বোধহয় 'হ্যাট' শব্দাটির একটা সম্পর্ক আছে। প্রাচীনকালের ক্রিকেট খেলার কয়েকটা ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সেই কথাই তো মনে হয়। ফুটবল খেলায় পর পর তিনজন খেলোয়াড়কে আউট করতে পারলে তবেই কোন খেলোয়াড় হ্যাট-ট্রিক করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ইংল্যান্ডে ১৮৫৮ সালে ক্রিকেট খেলায় এই রেওয়াজ ছিল যে, কোন বোলার যদি পর পর তিনটে উইকেট পান তাহলে তাঁকে নতুন টুপি উপহার দেওয়া হবে।

বোলিং-এ সাফল্যের জন্য টুপি উপহার দেওয়ার প্রচলন আরো আগে থেকে—সেই প্রাচীন হ্যাম্বলডন ক্রিকেট ক্লাবের যুগ থেকে। হ্যাম্বলডন ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিন নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও অনেকের মতে ১৭৫০ সালে কোন এক দিনে হ্যাম্বলডন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অধুনালুপ্ত হ্যাম্বলডন ক্লাব তাদের শেষ খেলা খেলেছেন ১৭৯১ সালে লর্ডস মাঠে।

এই হ্যাম্বলডন ক্রিকেট ক্লাবের বোলার ডেভিড হ্যারিস একবার বোলিং-এ অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। সেই জন্যে তিনি সোনার লেস দেওয়া একটা টুপি উপহার পেয়েছিলেন। তবে তিনি হ্যাট্-ট্রিক করেন নি। হ্যাট্-ট্রিকের সঙ্গে যে হ্যাট্ অর্থাৎ টুপির যে সম্পর্ক আছে তা একাধিক ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়।

(জলপাইগুড়ির বেলাকোবা থেকে এ ঘটনাটা লিখে পাঠিয়েছেন শ্রীপরিতোষ নাগ)

ক্যাম্প সবই চলছে—কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।

অথচ এক-একটা নামী ক্লাবের খরচের পরিমাণের দিকে তাকালে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। একটা মরশুমে শুধুমাত্র ফুটবল খেলার জন্যে তাঁরা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন—তা আমাদের চিন্তারও বাইরে। কিন্তু আখেরে তাতে কিছুই লাভ হচ্ছে না।

কলকাতার তথা বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান যেখানে ছিলো আজো আছে সেইখানেই। সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলা দেশ আজও শ্রেষ্ঠ। কলকাতার দলগুলোর স্থানও সবার ওপরে।

কিন্তু সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো যে, ক্রিকেটে যেমন বম্বের শ্রেষ্ঠত্ব আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, ফুটবলে বাংলার হালও ঠিক সেই রকমই। তবে সময় এখনো আছে। এখনো যদি পাকা মাঝির মতো হাল ধরা যায় তাহলে বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত হবেই।

টেবিল টেনিসে বিশ্ববিজয়ী সুইডেনের দুই প্রতিযোগী হ্যান্স এ্যালসার (বাঁ দিকে) ও খেল জোহানসন (ডান দিকে) ডাবলসের খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের পুরস্কার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ক্রিকেটের খবর

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রক ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিল-কে বেশ একহাত নিয়েছেন। মুখে নয়, কাজেই ওঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সব বিষয়েই স্পোর্টস কাউন্সিলের অতোটা বাড়াবাড়ি ঠিক নয়।

বেশ কিছুদিন ধরে স্পোর্টস কাউন্সিলের বাড়াবাড়িটা একটু যেন বেড়েই গিয়েছিল। সব বিষয়েই তাঁরা ঘোরাতে চাইছিলেন লাঠি। সেই সংগে ওঁদের একটা ধারণা জন্মেছিল যে, ওঁরা যা করছেন সেইটাই ঠিক, ওঁরা যা সিন্ধান্ত নেবেন সেইটাই চূড়ান্ত।

কথায় বলে মা'র চেয়ে মাসীর দরদ বেশি।

ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিলের হয়েছেও ঠিক তাই। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার টানাটানির কথা আজ আর কে না জানে। কিন্তু তাই বলে তো আর সব কিছু থেমে যায় নি। টেনে-টুনে সব কিছুই ঠিকমতো চলছে।

কিন্তু ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিলের ধারণা, বৈদেশিক মুদ্রার এই টানাটানির সময়ে বিদেশী দলগুলোকে ভারতে এনে খেলাধুলার জন্যে বেশি টাকা খরচ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই একের পর এক তাঁরা বাতিল করতে লাগলেন কিম্বা কেটে-ছেঁটে একাকার করতে লাগলেন পূর্ব-নির্ধারিত ভ্রমণসূচীগুলো।

এই বছরের অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সরকারী সফরও তাঁদের হাত থেকে রেহাই পেলো না। মিটিং করতে বসে ওঁরা গ্যারাণ্টি মানির পরিমাণ কমালেন, খেলার সংখ্যা কমালেন, কমালেন স্টেট ম্যাচের সংখ্যাও। ভাবখানা এই ভারত সরকারের জন্যে চিন্তায় যেন তাঁরা অস্থির। তাঁরা কারো কোন কথায়, কোন অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। এমন অবস্থা করে তুললেন যাতে অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত-ভ্রমণ বাতিল হয়ে যায়।

আর ঠিক তার পরেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো (অবশ্যই স্পোর্টস কাউন্সিলের কর্তাদের কাছে) কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের অস্ট্রেলিয়া দলের পূর্ণ ভারত সফর মঞ্জুর করার সিন্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হলো। শুধু তাই নয়, শিক্ষাদপ্তর অর্থমন্ত্রককে পূর্ণ সফরের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করার অনুরোধ করেছেন।

তাই মনে হচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো অস্ট্রেলিয়া দলের পূর্ণ ভারত সফরই হবে।

এর পরেও কি ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিল একটু সমঝে চলবেন না? মনে হয় না। কারণ ভারতের খেলাধুলার ওপর যে ওঁদের দরদ খুব...।

ইডেনে কম্পোজিট ষ্টেডিয়াম প্রসংগে

বাংলার সেরা ক্রীড়াবিদরা কি বলেন

সংগ্রাহক - অরুণ চট্টোপাধ্যায়

অমল দত্তের বক্তব্য

স্বনামধন্য ফুটবল-কোচ অমল দত্ত ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়ামের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এত অল্প জায়গায় কি করে কম্পোজিট স্টেডিয়াম হতে পারে তা তাঁর জানা নেই। কারণ, 'কম্পোজিট স্টেডিয়াম' কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেভাবে ইডেনে স্টেডিয়াম করতে হলে ফুটবল-ক্রিকেটের সংগে ইনডোর জিমন্যাশিয়াম, ট্রেনিং গ্রাউন্ড, সুইমিং পুল, ট্রাক এণ্ড ফিল্ডের ব্যবস্থা প্রভৃতি রাখতে হয়। তা কি ইডেনে সম্ভব?

তিনি বললেন, জনপ্রিয়তা ও চাহিদার দিক বিবেচনা করলে ফুটবলের স্টেডিয়াম খুবই দরকার, কিন্তু সে জন্য ইডেনের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস নষ্ট করা যায় না।

ফুটবলের অভিজ্ঞ কোচ জানালেন, ইডেনকে ক্রিকেটের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে, তাই সেখানে এঁটেল মাটির টার্ফ রয়েছে। এখানে ফুটবল একেবারেই সম্ভব নয়। শুকনো মাঠে দু'-একটি বড় ম্যাচ খেলা যেতে পারে, তবে মাঠ শুকনো অবস্থায় দারুণ ফাস্ট হবে, বল বাউন্স করবে খুবই। আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। পিচ্ছিল মাঠে দেহের ভারসাম্য রেখে খেলা কষ্টকর ব্যাপার।

পাশে বসেছিলেন মোহনবাগানের খেলোয়াড় অমল চক্রবর্তী, তিনি ইডেনে ফুটবল খেলেছেন। চট করে বলে উঠলেন, ইডেনে খেলতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয় গিয়েছিলাম। বল ধরতে ছুটবো কি, ভিজে মাঠে 'গ্রিপ' রাখতেই সকলে ব্যস্ত ছিলাম। বল পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছিল, অথচ অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না সেদিন।

অমল দত্ত বললেন, সুতরাং দেখছেন তো, মাটি না পাল্টালে ইডেনে ভালো ফুটবল খেলা কোন মতেই সম্ভব নয়। ইডেনের টার্ফ ফুটবল-উপযোগী করতে হলে অন্ততপক্ষে দেড় হাত মাটি খুঁড়ে ফেলে দিয়ে বালি মেশানো পুকুরের ঝুরো মাটি সেখানে ফেলতে হবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে ক্রিকেট পিচের কি অবস্থা হবে তা ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞরাই বলবেন। অনেকে অবশ্য বারবাটি স্টেডিয়ামের কথা বলেন, কিন্তু সেখানে তো টেস্ট ক্রিকেটের আসর বসে না বা তার ইডেনের ঐতিহ্যও নেই।

অভিজ্ঞ কোচ শ্রীদত্ত ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠে ঘাসের পার্থক্যের কথাও বললেন। ক্রিকেট মাঠে দূর্বা দরকার, যাতে ছোট, সরু ব্লেডের ঘাস ক্রিকেট-বলের গতি নিয়ন্ত্রিত না করতে পারে। বোলারের পাক-দেওয়া বলের পাক্ষে সহায় হতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই সরু ব্লেডের ঘাস দরকার। অন্যদিকে ফুটবলের আকার বড় হয় বলে মাঠে চওড়া ব্লেডের ঘাস থাকা দরকার, তা না হলে খেলতে অসুবিধে হয়। সুতরাং ইডেনে উন্নতমানের ফুটবল পেতে হলে দূর্বা ঘাস তুলে চওড়া ব্লেডের ঘাস তৈরি করতে হবে। এর অর্থ ক্রিকেটের শ্বাসরোধ করা।

সব শেষে অমল দত্ত আবার বললেন, এতগুলো 'প্রবলেম' নিয়ে কি করে যে কম্পোজিট স্টেডিয়াম ইডেনে হবে তা বলতে পারি না।

কমল ভট্টাচার্য বললেন

অতীত দিনের ক্রিকেটার, একালের ক্রীড়া-সমালোচক কমল ভট্টাচার্যর অভিমত জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন বাংলার বাইরে গিয়ে ভালো, সুন্দর স্টেডিয়াম দেখে বড় ব্যথা পাই। বেদনা হয় এই ভেবে যে, বাংলা ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র, এখানে ফুটবলের স্টেডিয়াম নেই। তাই খুবই আনন্দের কথা যে, সরকার বাংলা দেশে স্টেডিয়াম গঠনের সক্রিয় পরিকল্পনা নিয়েছেন, এবং তাঁরা বদ্ধপরিকরও। তবে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম করতে হলে নানা অসুবিধা দেখা দেবে। আশা করি সে বিষয়ে সরকার নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেবেন, বিশেষজ্ঞদের মতামত যাচাই করবেন। তা না করেই এতবড় একটা কাজে সরকার নেমেছেন বলে মনে হয় না।

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম হলে কি কি সমস্যা দেখা দেবে সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত সংক্ষেপে জানানো হল ঃ—

[১] বাংলা দেশে বর্ষাকালেই ফুটবল খেলা হয়। ইডেনের মাটি এঁটেল, বৃষ্টি হলে তা পিচ্ছিল হয়ে যায়। কিছুটা শুকনো থাকলেও মাটি আঠালো হয়ে বুটে জড়িয়ে যাবে। ভারী বুট নিয়ে পিচ্ছিল মাঠে সত্যিকারের ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। খেলার মেয়াদও এক ঘণ্টা থেকে আধ ঘণ্টায় নেমে আসবে। সুতরাং মাটি পাল্টাতেই হবে।

[২] ইডেন উদ্যানের জমি নিচু, আশেপাশে খাল ও নিকটেই গংগা

[শেষাংশ ৩০০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কমল ভট্টাচার্য

প্রশ্ন উত্তর

বিশ্বনাথ বকসী (জ্যোরান্টি টি জি, ম্যাটলী, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : প্রথম ডিভিসনের ফুটবল খেলায় (আই এফ এ শীল্ড বা লীগ) অথবা জাতীয় ফুটবল খেলায় কোন খেলোয়াড় কি হেড দিয়ে সেমসাইড গোল করেছেন?

উত্তর : হেড দিয়ে কেউ কি আর ইচ্ছে করে সেমসাইড গোল করেন, গোল হয়ে যায়। হ্যাঁ, সে রকম দু-একটা গোল হয়েছে বৈকি।

অনন্তকুমার মিত্র (গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন : আমার মনে হয় এ বছর ইস্টবেঙ্গল দলই সব চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে—আপনার মত কি?

উত্তর : আপনার সংগে আমিও একমত।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : পাতৌদির নবাব (বড়) ও রণজিৎ সিংজী ইংলন্ডের পক্ষে কতোগুলো টেস্ট খেলেছেন?

উত্তর : পাতৌদির নবাব ইংলন্ডের পক্ষে তিনটি টেস্ট খেলেছেন। ১৯৩৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১টা ও ১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২টি টেস্ট খেলেছেন।

রণজিৎ সিংজী খেলেছেন ইংলন্ডের পক্ষে ১৫টি টেস্ট ১৮৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২টি, ১৮৯৯ সালে ৫টি, ১৯০২ সালে ৩টি ও ১৮৯৭ সালে ৫টি টেস্ট খেলেছেন।

(নাম ঠিকানা নেই)

প্রশ্ন : বর্তমানে ভারতের কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় সর্বোচ্চ রান করেছেন (টেস্ট খেলায়)? তাঁর ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর : ভিনু মানকদ।

মানকাদ—৪৪টি টেস্ট, ৭২টি ইনিংস, ৫ বার নট আউট, মোট রান ২১০৯, সর্বোচ্চ ২৩১, সেঞ্চুরী ৫ বার, গড় ৩১·৪৭।

দীনেশ রায় ও নরেশ রায় (বাংলাপাড়া, বেংকান্দি, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনাদের সমালোচনামূলক চিঠিটি পড়লাম। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না যে এখনো পর্যন্ত 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগে কোন 'যাচ্ছে তাই' লেখা ছাপা হয়েছে কি না। আর "যাচ্ছে তাইভাবে কোন জিনিস প্রকাশ করা না হয়......।" বলে আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন তাও বুঝলাম না। ৭৩ বর্ষ ২৭ সংখ্যায় যে লেখাটি ছাপা হয়েছিল সেটিতে একটু ছাপার ভুল ছিল। পরের সংখ্যাতেই অবশ্য ভুল সংশোধন করে দেওয়া হয়। চিঠি পড়ে বুঝলাম সেটি আপনাদের চোখে পড়ে নি। আর ৪১ সংখ্যায় যেটি প্রকাশ করা হয়েছে সেই লেখাটা সামান্য 'এডিট' করে ছাপা হয়েছে। যাই হোক আপনাদের সমালোচনামূলক চিঠিটিই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে সাপ্তাহিক বসুমতী আপনাদের প্রিয় পত্রিকা। সেজন্যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

জগন্নাথ মজুমদার (বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ)

উত্তর : তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়েছি। আশা করি পেয়েছো। দু-এক দিনের মধ্যেই হয়তো এবারের বহিরাগত খেলোয়াড়দের নাম কাগজে দেখতে পাবে।

রমেশ ও লাল্টু (জামসেদপুর-১)

প্রশ্ন : ভারতে কি কোন দিন অলিম্পিক হবার সম্ভাবনা আছে?

উত্তর : আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কবে—সে কথা আজ কেউই বলতে পারবেন না। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসার সম্ভাবনা নেই।

নারায়ণ দত্ত (কালিনগর, রাণীরবাজার, ত্রিপুরা)

প্রশ্ন : বাঙালী টেস্ট খেলোয়াড়দের নাম জানতে চাই।

উত্তর : পঙ্কজ রায়, প্রবীর সেন, সুব্রত গুহ, সুঁটে ব্যানার্জী, পুটু চৌধুরী, এন চৌধুরী, এস সেনগুপ্ত, মন্টু ব্যানার্জী।

শ্যামল ঘোষ ও আশীষ ঘোষ (মালিগাঁও, গোহাটি)

প্রশ্ন : দর্শকদের ওপর কি (ফুটবল) খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে? না, খেলোয়াড়দের ওপর খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে? যদি খেলোয়াড়দের ওপর খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে তবে ১৯৬৮ সালে ডুরান্ডে ইস্টবেঙ্গল ও মোহন বাগান বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে হারলো কেন?

উত্তর : দুই—খেলোয়াড়দের ওপর করে আর দর্শকদের ওপরেও খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে। [illegible] যাবার দরকার নেই, এ বছরের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার কথাই একবার চিন্তা করুন না কেন?

অরুণ গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : হনুমন্ত সিং কি প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী করেছিলেন? তিনি কতো রান করেছিলেন এবং কোন সালে?

উত্তর : হ্যাঁ। ১৯৬৩—৬৪ সালের দিল্লী টেস্টে হনুমন্ত সিং প্রথম আবির্ভাবেই করেছিলেন ১০৫ রান।

[৩০০৭ পৃষ্ঠার পর]

থাকায় মাটি ভিজে থাকে। বর্ষাকালে যথেষ্ট জল পড়ায় মাটি শুকোতে দেরী হয়। ফুটবলের পর ক্রিকেটের মরশুম পর্যন্ত যে সময় পাওয়া যায় তাতে 'পিচ' সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

[৩] কম্পোজিট স্টেডিয়াম করতে হলে মাঠের চারদিক 'ব্লক' হয়ে যাবে। ফলে মাঠে হাওয়া চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। সে অবস্থায় স্যুইং বল সম্ভব হবে না।

[৪] যে বছর টেস্ট ক্রিকেটের আসর বসবে সে বছর বৃষ্টিতে ফুটবল খেলা হলে টেস্ট খেলা ইডেনের মাটিতে সম্ভব হবে না।

[চলবে]

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

ধনুর্বেদ :

কাশীরাজ পণ্ডিত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত। হু আয়াসে তাঞ্জোরের প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুথির সংগ্রহশালা, াশীর কুইন্স কলেজ লাইব্রেরী, কাশী মহারাজার বিশাল ন্থাগার হতে সংগৃহীত। মূল্য—২-০০ টাকা।

বেদান্তসার :

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত; ধর্মশাস্ত্র চার্য-ব্রতী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (সুবোধিনী- কা সহ)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক্ষবিদ)। দিব্যজ্যোতি: বিবস্থিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মানসোল্লাস :

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ :

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মুদ্রিত। (১ম নাই) চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি ও—৩-০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা:

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত খ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫-৫০ টাকা। য় খণ্ড ৪-০০ টাকা।

যোগকল্প :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, বন্ধসংহিতা, অষ্টাবক্র- হিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, রাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ ন্থের সমাবেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। ল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয় স্যন্দিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মূল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য—২-৫০ কা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্ :

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত—২-০০ টাকা।

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি :

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। সংবর্ধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহৃত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত আর্য সৎকর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থশাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, ব্রত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়- সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০ টাকা।

পবন-বিজয়-স্বরোদয়:

বায়ু জয়ই যোগের শ্রেষ্ঠ সাধনা। অলৌকিক সত্য নির্দেশক যোগক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিশারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান :

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর- নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পয়সা।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস :

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। ল্য—৩-০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যম্:

যোগীপ্রবর মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম্। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

Thursday, 15th May, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "BASUMATI" Phone : 34—7771, 72, 73, 74

22 MAY 1969

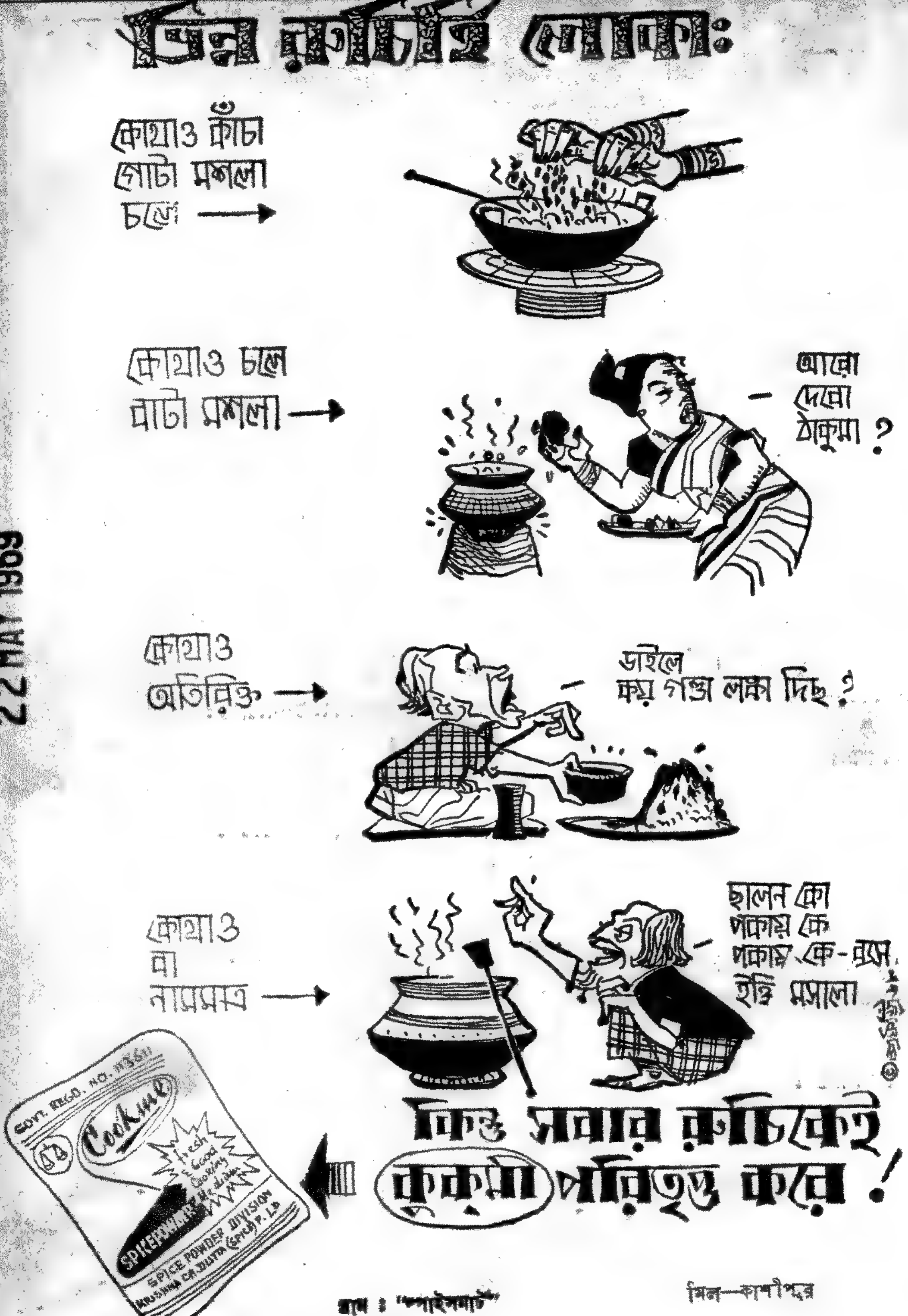

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুক্‌মী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২০৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

কবি নজরুল ইসলাম

সত্তরতম জন্মদিবসের প্রাক্কালে

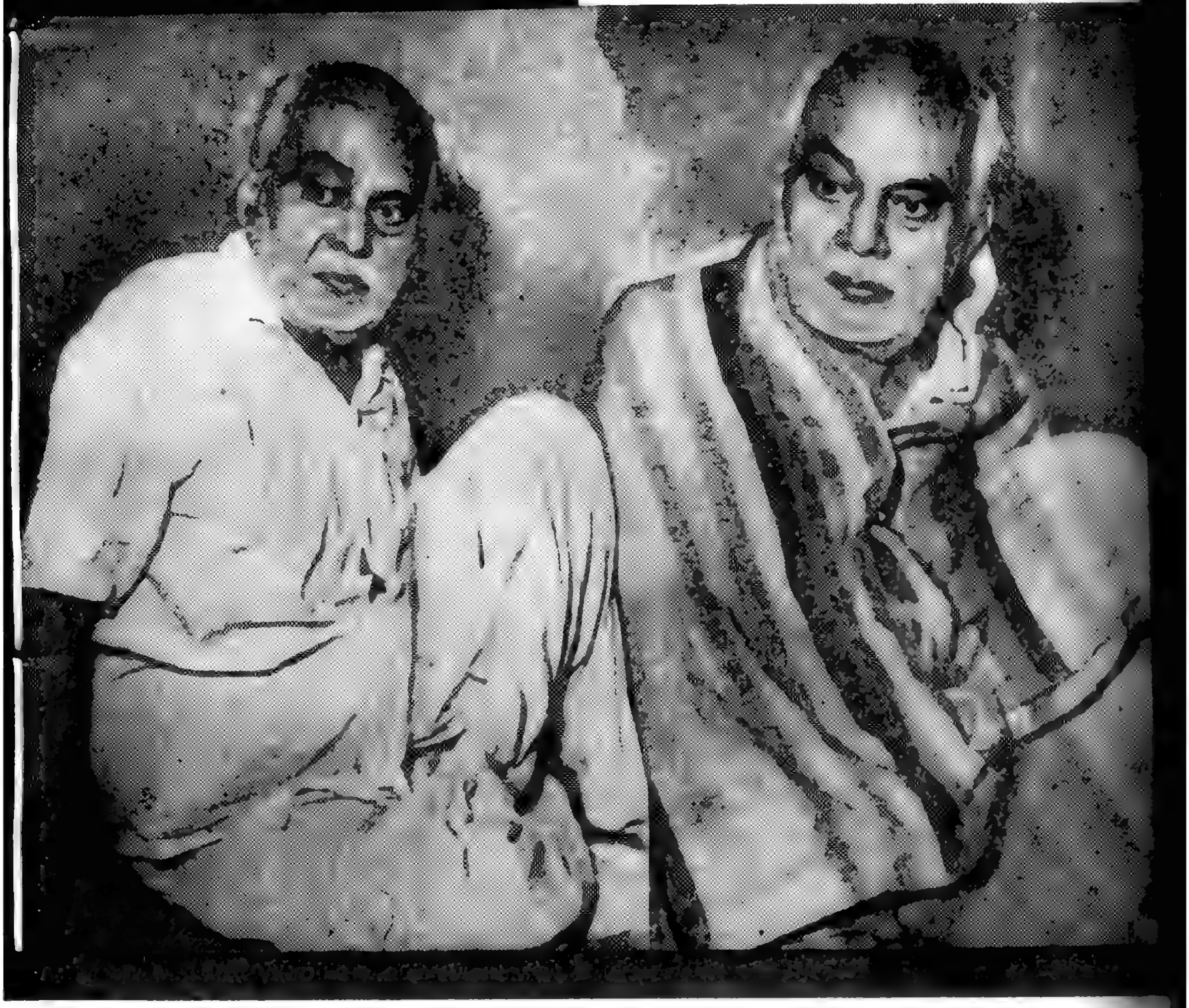

৭৩ বর্ষ ঃ ৪৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 Year, No. 48, 22nd May,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় ...	—	৩০১১
আজকের মানুষ ...	—	৩০১২
বঙ্গদর্শন	—	৩০১৩
কবি : জন্মভূমি : মানুষের দায়িত্ব (প্রবন্ধ)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩০১৭
নজরুল-প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ) ...	— অমলকুমার মিত্র	৩০২০
আরেক সূর্য কবি নজরুল (প্রবন্ধ)	— মনোরঞ্জন হাজরা	৩০২২
নজরুল ইসলাম : পাঠকের জবানবন্দি (প্রবন্ধ)	— জীবন চৌধুরী	৩০২৫
কথা শুধু প্রাণে কাঁদে...(কবিতা) ...	— দুর্গাদাস সরকার	৩০২৭
ভারতদর্শন ...	—	৩০২৮
আন্তর্জাতিক ...	—	৩০৩০
খাদ্যের ছড়াছড়ি...(প্রবন্ধ) ...	— রেণু ঘোষ	৩০৩২
পূর্ববঙ্গের কবিকুল ও বিদ্রোহী কবি নজরুল (প্রবন্ধ)	— অমিয়কুমার হাটি	৩০৩৪

যে কোন

গয়না

আর

আ স ল

গ্র হ র ত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব ছোট

এম. বি. সরকার

রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ফরিদাবাদ-কংগ্রেস যা বলেছে (প্রবন্ধ) ...	— তুষার চট্টোপাধ্যায়	৩০৩৬
সপ্তাহের বোঝা ...	— কৃত্তিবাস ওঝা	৩০৩৮
গ্রন্থমেলা ...	—	৩০৪০
নজরুল ইসলাম : উচ্চারণ পদ্ধতি ও বিষয় রেখা (প্রবন্ধ ...	— শান্তিব্রত ঘোষ	৩০৪১
তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স ...	— অগ্নিবর্ণ	৩০৪৭
প্রতিবন্যা (কবিতা) ...	— মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৩০৫০
আকাশ দেখাচ্ছে (কবিতা) ...	— রাণী দেবী	৩০৫০
গোলাম বাঁদীর গল্প (গল্প) ...	— অজিত মুখোপাধ্যায়	৩০৫২
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস) ..	— সুশীল জানা	৩০৫৭
মহানায়ক লেনিন (নাটক) ...	— অশোক সেন	৩০৬১
রঙ্গজগৎ ...	—	৩০৬৫
খেলাধুলা ...	— শান্তিপ্রিয়	৩০৬৮

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা; ব্যায়সা কা ত্যায়সা; জনা: দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মল্লিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও য ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৭৩ বর্ষ : ৪৮শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ সাপ্তাহিক পত্রিকা Thursday, 22nd May, 1969

জন্মোৎসবের আয়োজনের আগে প্রয়োজন

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের সানুরাগ শ্রদ্ধা অর্পণ করছি।

একালের যুবকদল নির্বাক ও নিরুত্তাপ কবিকে দর্শন করে যেটুকু উত্তাপ সংগ্রহ করছে, কবির কাব্য ও প্রবন্ধ পাঠ করে তারা কি পরিমাণ উত্তেজিত ও আনন্দিত হয়, সে প্রশ্ন আজ অবান্তর নয়। বস্তুত, স্বাধীনতা লাভের পর কবির অসুস্থতার কারণেই হয়তো কিছু-কালের জন্য কবি জনমানস থেকে বর্জিত হয়েছিলেন। আকস্মিকভাবে কবিকে তখন বর্জন করা হলেও, কবি সম্পর্কে নিস্পৃহ ভাবের কারণ, ইংরেজের সাম্রাজ্য শক্তির বিরুদ্ধে যে লড়াই, তা সার্থক হয়েছে, সুতরাং নজরুলের মতো একজন কবির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অবশ্য কবিকে দুই রাষ্ট্রের আর্থিক দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত করা হয় নি। এতদ্‌সত্ত্বেও নীরব কবি সম্বন্ধে একটা নীরব ভাব অত্যন্ত অস্বস্তিকর ছিল। আর সেই নীরবতার মধ্যে কেউ জানলো না—কোথায় গেল কবির অজস্র গানের স্বরলিপি, গানের রেকর্ড, বহু গান ও কবিতার স্বত্ব। সরকার যেন শুধু দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়েই খালাস, তার বেশি কিছু করতে অপারগ।

তারপর পাঁচ-ছ' বছর আগে নব-প্রতিষ্ঠিত একটি নজরুলানুরাগী সংস্থার উদ্যোগে নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এরপর কবির নাম হাওয়ায় হাওয়ায় আন্দোলিত হতে থাকে। এর মধ্যে সব-চেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার, কবির নাম ভাঁড়িয়ে ব্যবসায়ীমনস্ক এক শ্রেণীর ব্যক্তি অর্থের জাল বিস্তার করে বসে।

অথচ এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, কবির গানের পুরনো রেকর্ডগুলির সংরক্ষণ, স্বরলিপিগুলি সংগ্রহ করে গ্রন্থ-প্রকাশ, কবির কবিতা ক্ষণকালের গণ্ডি-ভুক্ত নয় এই পটভূমিকায় তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধগুলির ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থা করা।

নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহের যে বহিঃপ্রকাশ তাতে দেশের স্বাধীনতা লাভই একমাত্র কাম্য নয়, বাংলা সাহিত্যের ধারায় বিচার করলে দেখা যাবে নজরুলই বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণী-সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করেছেন। একালের মানুষ এখনো যা পায় নি, তা লাভ করার জন্য প্রেরণা সংগ্রহ করতে হলে নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

ইদানীং নজরুল সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া জেগেছে। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গে তাঁর সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হয়েছে। এবং বিদগ্ধমহল কবির কাব্য-জিজ্ঞাসায় নতুন আলোকপাত করছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে, পশ্চিমবঙ্গ বহু পশ্চাতে পড়ে আছে, একথা না বলে উপায় নেই। কবির কাব্য ও সংগীত প্রভৃতির সুলভ প্রচারের পরিবর্তে এতদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনসাধারণকে অন্য দিকে আকর্ষণ করেছেন। কবির বাড়ি হবে কি না বা কবি তাতে থাকবেন কি না কিংবা কবির জন্য কতো টাকা দেওয়া হচ্ছে বা হবে—সে সব ব্যাপার জানার ইচ্ছে আমাদের নেই। বরং কবির নামে সরকারী ব্যয়ে ভবন তৈরি হলে তাকে নজরুল-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান করাই যথার্থ কাজ। আর ঐ ধরণের ভবন কলকাতার কেন্দ্রস্থলে হওয়া উচিত আর সেই কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ থাকবে পশ্চিম-বঙ্গের সমস্ত জেলার পাঠাগারগুলির সঙ্গে—যাতে ঐ সব পাঠাগার ঐ ধরণের কাজে অগ্রসর হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, কেন্দ্রীয় সরকারেরও অনেক কিছু করার আছে। যেমন—প্রথমত, কবির সমস্ত লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশ এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা।

কবির সাহিত্য ও সংগীতের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সঙ্গে একথাও বলতে চাই জাতীয় কবিকে অপমান থেকে মুক্ত করা হোক। নির্বাক কবিকে অর্থ দিয়ে দাক্ষিণ্য দেখালেই সম্মান জানানো হয় না, পরিবর্তে কোনো স্যানিটোরিয়ামে সরকারী ব্যয়ে কবিকে রাখা হোক। প্রয়োজনবোধে কলকাতার মধ্যেই কোনো নার্সিং হোমেও কবিকে রাখা অসম্ভব নয়। এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রথম কবির জন্মদিবস পালনের আয়োজন করেছেন। আশা করি, এই আয়োজনের আগেই সরকার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সর্বাগ্রে বিবেচনা করবেন। তা নইলে ঢাকঢোল পিটিয়ে জন্মোৎসব পালন বৃথাই হবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

টুন আবদুল রেজ্জাক আবার সংবাদ-পত্রের শিরোনাম হলেন। দাঙ্গাবিধ্বস্ত মালয়েশিয়ার শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে যে জাতীয় অপারেশন কাউন্সিল গঠিত হয়েছে, টুন তার চেয়ারম্যান হয়েছেন। মালয়েশিয়া সরকারের প্রধানের পদে কিন্তু টুন ছিলেন না। ছিলেন টুংকু, কিন্তু তাঁকে ডিঙিয়ে তাঁর অধস্তনের হাতে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব দেবার অর্থ কি এই নয় যে, টুংকু আবদুল রহমানের নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে?

'লৌহমানব' হিসেবে টুন-এর খ্যাতি তর্কাতীত। রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কৌশল তাঁর নখদর্পণে। রাজনীতির দাবাখেলাটা ভালো বোঝেন, তাই টুন রাজনীতির আসরে কাকে কখন পাদ-প্রদীপের আলোয় আনতে হবে, কাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে হবে তার পরিষ্কার হিসেব জানেন।

অথচ রাজনীতির পাঁক গায়ে লাগাবার জন্যে টুনকে তাঁর বাবা-মা মানুষ করে তুলছিলেন না, টুন একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যারিস্টার হবেন—এই ছিল তাঁদের আশা। ভাল ছাত্র ছিলেন টুন। তাঁর ওপর আশাভরসা স্থাপন করাটাও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষে কোন অন্যায় হয় নি। সরকারী বৃত্তি নিয়ে তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারিই পড়তে, কিন্তু তরুণ টুন আইনজীবীর অনিশ্চয়তার পেছনে ঘুরতে রাজী হলেন না, তিনি গ্ল্যামারের সন্ধান করলেন। মালয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় সহজেই উত্তীর্ণ হলেন টুন, পেয়েও গেলেন পাহাঙের স্টেট সেক্রেটারীর সুখের চাকরিটি। সেখান থেকে অল্পদিনের মধ্যেই পাহাঙ অঙ্গরাজ্যের অস্থায়ী মন্ত্রীর পদে উন্নীত হলেন। একটা উপাধিও দেওয়া হল টুনকে—ওরাও আমা ইন্দ সহকদর—অর্থাৎ পাহাঙের প্রধান হলেন টুন।

অবশ্য জন্মসূত্রেই ঐ পদে টুন-এর অধিকার ছিল। টুন হলেন ঐ উপজাতির বংশোদ্ভূত। কাজেই প্রধানের পদ দখলে তাঁর বাধা কোথায়? তাছাড়া ইতিমধ্যে টুন রেজ্জাক তাঁর কর্মক্ষমতারও পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিলেন। বড় ঘরের ছেলের যদি অন্যান্য যোগ্যতাও থাকে, তবে ক্ষমতার গদি দখল তাঁর ঠেকায় কোন্

টুন আবদুল রেজ্জাক

মিঞা। তাই ১৯৫৫ সালে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে আবদুল রেজ্জাককে দেখা গেল পাহাঙের মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে। কিন্তু তবু ভরিল না চিত্ত, সিভিল সার্ভিসের বন্ধন কাটলেন রেজ্জাক, পুরোপুরি রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়লেন একই বছরে।

রাজনৈতিক দল বলতে তখন ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনই ছিল সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন। টুন আবদুল রেজ্জাক প্রথমে এ দলের যুবনেতা হলেন, কিছুকালের মধ্যেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট। চিন্তাধারার দিক থেকে রেজ্জাক গোঁড়া প্রাচীনপন্থী। কিন্তু একে বয়সে তরুণ তার ওপর অভিজাত বংশের ছেলে, কাজেই দলের উদারপন্থী নেতা উনবিন জাফর তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠলেন না। দলনেতার পদ দখল করে টুন আহবান জানালেন তাঁর পুরনো বন্ধু টুংকু আবদুল রহমানকে দেশের শাসনভার নেবার জন্যে। টুংকু প্রথমে দলের প্রধানের আসন গ্রহণ করলেন, পরে এ দল ভেঙে যখন কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দলের সম্মেলনে এ্যালায়েন্স পার্টির প্রতিষ্ঠা হল তখন সে-দলের চেয়ারম্যান হলেন। আর দলনেতার পদ থেকে সরকার-নেতার পদের দূরত্ব আর কতটুকু!

প্রধানমন্ত্রীর পদ পেয়ে টুংকু তাঁর উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুললেন না, টুনকে তিনি শিক্ষামন্ত্রী বানালেন।

কিন্তু উচ্চাভিলাষী টুন রেজ্জাকের পক্ষে শিক্ষার সীমিত দপ্তর অতি তুচ্ছ, তাঁর আরও, আরও চাই। পররাষ্ট্রদপ্তরটি পেয়ে তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটলো, সঙ্গে উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদটিও যে। মালয়েশিয়ার দু' নম্বর ব্যক্তি হলেন টুন আবদুল রেজ্জাক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে টুন তৎপরতা দেখিয়েছেন স্বীকার করতেই হবে। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যখন শান্তি বৈঠক বসে, তখন মালয়েশিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে টুন রেজ্জাকই মনোনীত হন এবং শক্ত মানুষ হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিকের সঙ্গে দর-কষাকষিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সেই কীর্তিমান পুরুষই আজ মালয়েশীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলেন। প্রধানমন্ত্রী আবদুল রহমান অপারেশন কাউন্সিলে কোনো ঠাঁই পান নি, ফলে অঢেল ক্ষমতা নিয়ে টুন আবদুল রেজ্জাকই মালয়েশিয়ায় কার্যত ডিক্টেটরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

পুত্রবধূ ও পৌত্রের সঙ্গে নজরুল

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যে রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে অনেকদূর এগিয়ে গেছে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনায় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রথমটি হচ্ছে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী কৃষ্ণ মেননের জয়লাভের ঘটনা। প্রগতিশীল শক্তির প্রবক্তা হিসাবেই মেনন নির্বাচিত হয়েছেন। এই নির্বাচন উপলক্ষে প্রবলতম প্রাদেশিকতা আমদানী করা হয়েছিল, বলা হয়েছিল শ্রীমেনন বাঙালী নন, কাজেই বাঙালীর স্বার্থে তাঁকে ভোট না দেওয়াই উচিত। বলা বাহুল্য এই যুক্তি ভোটদাতাদের মনে কোন দাগ কাটতে পারে নি। ভোটদাতারা সকল রকম আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। তাই মেননের জয়লাভকে তাঁর ব্যক্তিগত জয় বা যুক্তফ্রন্টের জয় বলার চেয়েও বাংলাদেশের মানুষের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নততর রাজনৈতিক চেতনার জয় বলাই সঙ্গত।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পর এই প্রথম কর্পোরেশন কংগ্রেসের হাতছাড়া হল। কর্পোরেশনের নির্বাচনেও ভোটদাতারা রাজনৈতিক বিবেচনাবোধের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। এখানেও পরিষ্কার পলিটিক্যাল ভোটিং হয়েছে এবং বলাই বাহুল্য এক্ষেত্রেও প্রগতিশীলতারই জয়লাভ ঘটেছে। এই দুটি ঘটনাই প্রমাণ করছে যে, আজকের পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনোভাবটা কি, তাঁরা কোন্ দিকে যেতে চান। এই দুটি ঘটনার পর নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রগতিশীলতা ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে, যদিও ভারতের অপরাপর অংশ সম্পর্কে জোর করে কিছু বলা যায় না।

এখন যুক্তফ্রন্ট ও বামপন্থী দলগুলির প্রতি আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁরা সত্যই কি জনসাধারণের এই আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের পথে অগ্রসর হচ্ছেন? একথা কথাই আমরা বরাবর এই বঙ্গদর্শনের পাতায় বলে এসেছি, ১৯৬৬ সালের সেই খাদ্য আন্দোলনের দিনগুলি থেকে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বামপন্থী দলগুলি ব্যর্থ হচ্ছেন। প্রথমবার যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থাপিত হয়েছিল জনসাধারণের আগ্রহে। তাঁরা ব্যালট বাক্স মারফৎ নিজেদের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু হাওয়ার গতি কোন্ দিকে তা অভিজ্ঞ নেতারা বুঝতে পারেন নি এবং নির্বাচনের পূর্বে নিজেদের মধ্যে কোন্দল করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাত্রাকে যথেষ্ট হ্রাস করেছিলেন। নির্বাচনের পরও তাঁদের হুঁস হয় নি, হিংস্র পশুর মত তাঁরা একে অপরকে আক্রমণ করেছেন এবং তার চরম মূল্যও তাঁদের শেষ পর্যন্ত দিতে হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণ পুনরায় তাঁদের সুযোগ করে দিয়েছেন, এখনো দিচ্ছেন, কিন্তু এই সুযোগের

সদ্ব্যবহার তাঁরা করতে পারবেন কি না সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

এই কথাগুলি বলার একটি বিশেষ কারণ আছে। বামপন্থী দলগুলির প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদে বিশ্বাসী বলেই একটু ইতিহাসের কথায় আসতে হয়। ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব কায়েম করার জন্য বুর্জোয়া চক্রান্তের চেয়েও বামপন্থী শক্তিগুলির দলাদলিই বেশি দায়ী। কাজেই দক্ষিণপন্থীরা আর যাই করুক হিসাবে বড় ভুল করে না। ভারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এখানে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি খুব দ্রুত জোট বাঁধছে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড় অংশই স্বতন্ত্র, জনসংঘ ইত্যাদি দলগুলির সঙ্গে জোট বাঁধতে একান্তই উদ্গ্রীব। এবং তলে তলে কাজও অগ্রসর হচ্ছে। দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি যত দ্রুত একে অপরের নিকটে আসছে, বামপন্থী শক্তিগুলি ততই একে অপরের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস, অসংযত ও অশালীন আক্রমণ ইত্যাদি বামপন্থী নেতাদের যেন মজ্জাগত হয়ে গেছে। এবং যে পথে তাঁরা চলছেন, তাতে আশংকা হয় যে, এভাবে চলতে থাকলে, তাঁরা জনসাধারণের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করা তো দূরের কথা, অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের বৃহত্তর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে তুলে দেবেন। কাজেই জনসাধারণ আজকে যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছেন, তাকে সঠিকপথে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে নিয়ে যাবার জন্য বামপন্থী শক্তিগুলির নিবিড় ঐক্য থাকা প্রয়োজন। আশা করি এদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রতিটি বামপন্থী দল কাজ করে যাবেন। বারান্তরে বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে।

এরা কোন্ শ্রেণীর সমাজবিরোধী?

যারা লুটপাট, খুনোখুনি, ছিনতাই, নারীর শ্লীলতাহানি ইত্যাদি করে এই জাতীয় কিছু কিছু মানুষকে সচরাচর সমাজবিরোধী আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এদের চেনা যায়, বোঝা যায়। কিন্তু গত বাইশ বছরের স্বাধীন ভারতে শুধু এই একটি শ্রেণীর সমাজবিরোধীরই সৃষ্টি হয় নি, পাশাপাশি আরও একটি ব্রান্ড গজিয়েছে, যারা শিক্ষিত, সম্পত্তিসম্পন্ন এবং যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে তারা এমন কাজ করে যা পেশাদার সমাজবিরোধীদেরও লজ্জা দিতে পারে। গলায় স্টেথিসকোপ ঝোলানো ব্যক্তিকে সমাজবিরোধী বলা হবে না, এমন কথা কোথাও লেখা নেই।

এই রকম একদল সমাজবিরোধীর পরিচয় পাওয়া গেছে মেডিক্যাল কলেজে। আমরা এখানে কিছু হাউস স্টাফ, কয়েকজন নার্স ও কিছু ছাত্রের কথা উল্লেখ করছি। ভাবতে বিস্ময় লাগে, এঁরাই পরবর্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হিসাবে সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হবেন। মেডিক্যাল কলেজে তাঁরা যে কাণ্ডটি সম্প্রতি ঘটিয়েছেন, তাতে যে কোন বিবেকবান ব্যক্তিরই আতঙ্কে শিউরে ওঠার কথা। তাঁরা চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র বলেই আর রেহাই পেতে পারেন না, কেন না তাঁরা যে আচরণটি করেছেন তা যে কোন পেশাদার সমাজবিরোধীর পক্ষেও করা সম্ভব নয়।

কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে এশিয়ার বৃহত্তম চিকিৎসা-কেন্দ্রকে দিনের পর দিন অচল করে রাখা হল? হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের আকস্মিক ধর্মঘট দৃশ্যতই বে-আইনী এবং তার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। সংবাদে যা জানা গেছে, তাতে চিকিৎসকদের সঙ্গে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের একটা রহস্যজনক গণ্ডগোল হয়েছে, যদিও তার জন্য কোন্ তরফ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী সেটা আজও জানা যায় নি। কেন না উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকেই দোষারোপ করছেন। এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা বলা হয় এবং সেই তদন্তের ফলে নিশ্চয়ই আসল ব্যাপারটা উদ্ঘাটিত হবে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে এটাই আশা করা গিয়েছিল যে, বিবদমান দুটি পক্ষের এর পর আর কিছুই করার নেই, তদন্ত কমিশনকে সহযোগিতা করা ভিন্ন, এবং সেটাই সঙ্গত ছিল।

কিন্তু ঘটনাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল তার দ্বারা শুধু যে আইনকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা হল তাই নয়, মেডিক্যাল কলেজের হাউস স্টাফ, নার্স ও ছাত্ররা এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন অমানবিকতার দিক থেকে যার তুলনা নেই। হাসপাতালের রোগীরা কি দোষ করেছিলেন? দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের এই প্রশ্ন করার অধিকার অবশ্যই আছে যে, মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের শিকার রোগীরা হবেন কেন? ইনডোর, আউটডোর তো বন্ধ করাই হয়েছে, এমন কি ইমার্জেন্সী বিভাগ যা কোন অবস্থাতেই বন্ধ হবার নয়, তাও করা হয়েছে। এ অধিকার তাঁদের কে দিয়েছে? সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত রোগীদের ওষুধ দেওয়া হয় নি, পথ্য দেওয়া হয় নি, এমন কি বাইরে থেকে সেবামূলক যে-সব প্রতিষ্ঠান এ-বিষয়ে কিছু করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদেরও নাকি বলপূর্বক বিতাড়ন করা হয়েছে। রান্নাঘরে প্রবেশ করে নাকি সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা হয়েছে, এক ভদ্রলোক তাঁর রোগীর জন্য দুধ নিয়ে এসেছিলেন তা কেড়ে নিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিছু হাউস স্টাফ ও ছাত্র এবং নার্স এককথায় মেডিক্যাল কলেজের অভ্যন্তরে একটি জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছেন। ইমার্জেন্সী বিভাগে কঠিন অ্যাকসিডেন্টের কেস এসেছে, কোন সহৃদয় চিকিৎসক তাঁকে অ্যাটেন্ড করতে চেয়েছেন, তা তাঁকে করতে দেওয়া হয় নি। জানি এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের নায়কদের বিবেক বলে কিছু নেই, আমাদের প্রদত্ত এই সংবাদগুলি যে সত্য নয়, তা প্রমাণ করার জন্য হয়তো তাঁরা লাঠি নিয়ে এখানে হামলাবাজি করতেও কুণ্ঠিত হবেন না।

এঁদের সমাজবিরোধী আখ্যা দেওয়াটা মোটেই অসংগত নয়, বিশেষ করে হাউস স্টাফদের অধিকাংশের বিগত কয়েক বছরে এত বেশি অধঃপতন হয়েছে যা কল্পনা করা যায় না। এঁদের মানবিকতা যে ইতরতার কোন্ পর্যায়ে নেমে এসেছে তার পরিচয় এঁদের সঙ্গে মোলাকাত করার সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিকর্তা পেয়েছেন। শিক্ষিত ও ভদ্র-পরিবারের এই সব সন্তানদের যে অশ্লীলতার খেউড় আমরা সাংবাদিক হিসাবে শুনেছি, তাতে এঁদের মানসিকতার যা প্রতিফলন ঘটছে তার ভিত্তিতে এঁদের সমাজবিরোধী ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এটা স্মরণ রাখা উচিত, যে-লোক সকলকে খুশি করতে চায় সে কাউকেই খুশি করতে পারে না, নিজেও শেষ পর্যন্ত অপদস্থ হয়। কাজেই এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কঠোরতা আমরা আশা করি। হাসপাতালে বস্তিতে বস্তিতে কি হল তার ফলে রোগীকে 'সাফার' করতে যারা বাধ্য করেছে তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না? স্বাস্থ্য অধিকর্তার নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, যাঁরা ডব্লিউ-বি-এইচ-এস-এ নিবদ্ধ, চতুর্থ

শ্রেণীর কর্মচারী, হাউস স্টাফ ও নার্সদের সংগে তাঁদের আকস্মিক কর্মবিরতি ঘটানোর অধিকার আছে কি না, যদি না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না কেন? মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা মেডিক্যাল কলেজের ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত ল এণ্ড অর্ডারের সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে কি না, এবং সেই হিসাবে গুণ্ডামীর অপরাধে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না কেন? দেশটা যে মগের মুল্লুক হয়ে যায় নি সেটা বুঝিয়ে দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য।

কয়েকজন দায়িত্বসম্পন্ন প্রত্যক্ষদর্শী মেডিক্যাল কলেজে ধর্মঘট সম্পর্কে আমাদের যে পত্র দিয়েছেন, তা পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো:

"যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত বিভিন্ন দিক থেকে আত্মপ্রকাশ করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দা এবং নাজেহাল করার যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে ইদানীংকালের বিভিন্ন হাসপাতালসমূহে আন্দোলনের নামে তীব্র সংকট সৃষ্টির মৌল প্রচেষ্টাও এর মধ্য বিবেচিত হবে কি না বিভিন্ন মহল থেকে এটাও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

গত ১৩ই মে এশিয়ার বৃহত্তম হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে যে ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান কমিটি বসেছে। সুতরাং স্বভাবতই বিভিন্ন দিক ওই কমিশন আলোচনা করবেন।

কিন্তু সেবাপ্রতিষ্ঠানের মৌল স্বার্থ এবং উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল তাতে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মচারী এবং ছাত্র সক্রিয়ভাবে স্বাভাবিক অবস্থা এবং সুনাম বজায় রাখার জন্য অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সে খবর বাইরের মানুষ জানতে পারেন নি। ঘটনা এই যে, এমার্জেন্সি বন্ধের ডাক থাকা সত্ত্বেও কতিপয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র তাঁদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে এবং সাধ্যমত অনুযায়ী কাজ চালিয়ে গেছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে জনস্বার্থের খাতিরে ছাত্রদের এ্যাকশন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে প্রচার অভিযান চালিয়ে গেছেন, তেমনি হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের সংগঠন এই অচলাবস্থা সৃষ্টির বিপক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করে এই প্রতিক্রিয়াশীল জোট ভাঙতে চেষ্টা করেছে, তাঁদের সঙ্গে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও একমত হয়েছেন বলেই এত সহজে এই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হয়েছে এটা মনে করা অস্বাভাবিক নয়। ছাত্র, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে ২নং গেটে যে সভা আহ্বান করেছিলেন—সেখানে প্রকাশ্যে তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন কোন অশুভ শক্তি এর পেছনে কার্যকর ছিল। তাঁরা বিশেষ করে দায়ী করেছেন নার্সিং বিভাগের জনৈকার ভূমিকাকে। এই মহিলা কিভাবে তাঁর প্রভাব সমস্ত নার্সদের মধ্যে বিস্তার করেন এবং কিসের জোরে ছাত্রদের সংগে নার্সরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবে—প্রকাশ্যে এ ঘোষণা রাখেন তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জানা না থাকলেও স্বাস্থ্য অধিকর্তার নিশ্চয়ই জানা আছে। এ-সম্পর্কেও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। নার্সদের পক্ষ থেকে যদি এভাবে প্ররোচনা সৃষ্টি করা না হত তা হলে অচলাবস্থার অবসান অনেক পূর্বেই সম্ভব হত। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির ভূমিকাও প্রশংসনীয় ছিল। ১৩ই মে জনৈক অধ্যাপক কর্তৃক ওয়ার্ডবয় প্রহৃত হবার ঘটনার পর হাসপাতাল অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে কিছু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিজনক ছিল। এ ব্যাপারে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের একটি ইউনিয়নের (সরকারী স্বীকৃত নয়) কর্মকর্তা স্থানীয় এক ব্যক্তির কার্যকলাপ সন্দেহজনক ছিল।"

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশতঃ এ সপ্তাহে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ' প্রকাশ করা গেল না—এর জন্য আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যায় প্রবন্ধটি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন

স্টেট গভর্নমেন্ট নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বুলেটিন আমাদের হস্তগত হয়েছে। দুঃখের সংগে লক্ষ্য করলাম যে, তাতে সাপ্তাহিক বসুমতী সম্পর্কে এমন একটি বক্রোক্তি আছে যার কিছুটা প্রতিবাদ করা আমাদের কর্তব্য। তাঁরা লিখেছেন, স্বাস্থ্য অধিকর্তা "নাকি এই স্বাস্থ্য-বিভাগ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, এবং সেই সঙ্গে এই সাপ্তাহিক বসুমতীও আদা নুন খেয়ে তাঁকে মদত যোগাচ্ছেন! শুধুমাত্র কল্যাণীর জওহরলাল হাসপাতাল থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্যবস্থা না করে সারা পশ্চিমবাংলার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে তাকালে আমরা বাধিত হব। কারণ তাঁরাই বলেছেন, স্বাস্থ্যবিভাগের সব দুর্নীতির খবর তাঁদের নখদর্পণে। কিন্তু ওই দুর্নীতি নিবারক ডাইরেক্টর নার্সদের প্রতি দুর্নীতি ও অন্যায়ের কোন প্রতিকারই করেন নি।"

যিনি বা যাঁরা এই বক্রোক্তি করেছেন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা নিয়মিত সাপ্তাহিক বসুমতী পড়েন না। সাপ্তাহিক বসুমতীর যে কোন পাঠকই নিশ্চয়ই আমাদের সংগে এই বিষয়ে একমত হবেন যে, শুধু কল্যাণী জওহরলাল হাসপাতালের কথাই এখানে বলা হয় না, পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই যার বিষয়ে আমরা কিছু বলি নি। শ্রীমতী শামা রায় একটু পরিশ্রম করে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি দেখলেই তা বুঝতে পারবেন। নার্সদের অধিকার ও দাবিদাওয়া নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতী দীর্ঘকাল ধরেই লিখে এসেছে, নার্সজীবনের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, এবং এক সময় এগুলি রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, এমনকি পত্রিকায় সেই রচনাগুলির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে, এবং কয়েকটি ইংরাজী অনুবাদও হয়েছে। এত কম জেনে যাঁরা এত সহজেই মন্তব্য করেন তাঁদের তা করা অনুচিত। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্য অধিকর্তা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের কাছ থেকে যতগুলি দুর্নীতির বিবরণ তাঁর কাছে গেছে, তার অধিকাংশের প্রতিকার হতে দেখেছি, কাজেই তাঁর কর্মদক্ষতার প্রতি আস্থা হারাবার কোন কারণ নেই।

স্টেট গভর্নমেন্ট নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে এগারোটি দাবি রাখা হয়েছে। যথা—নার্সিং সার্ভিসের গ্রেডেশনের পুনর্বিন্যাস, প্রত্যেক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্সদের সাপ্তাহিক এক দিন ছুটি, দৈনিক আট ঘণ্টার ডিউটি, বাড়তি কাজের জন্য ওভারটাইম, ছোট দুই বেডের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুজন ইনডোর নার্স এবং দশ বেডের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চারজন, থাকবার কোয়ার্টার, নার্সদের দিয়ে ডাক্তারের কাজ না করানো, নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইত্যাদি। দাবিগুলি যে সঙ্গত তাতে কোন সন্দেহ নেই

একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে, চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পেশার মধ্যে নার্সরাই সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত। যে কোন কারণেই হোক নার্সদের সংগঠন খুব জোরাল ছিল না, এবং তাঁদের চাকুরি ও নিরাপত্তা আজও বিভিন্ন ধরণের ওপরওয়ালার মর্জির ওপর নির্ভর করে। তা ছাড়া নার্সিং সার্ভিসে নিযুক্তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। মাইনে কাটা, ছুটির মাইনে না দেওয়া, বিল আটকে দেওয়া, সার্ভিস বুকে খারাপ রিপোর্ট লেখা, নানাভাবে নার্সদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়। এর প্রতিকারের কোন পথ নেই। স্বাস্থ্যদপ্তরে এ বিষয়ে যিনি ভারপ্রাপ্তা তাঁর সম্পর্কেও নানা অভিযোগ। এমন কি তাঁর নাকি বি, এস, সি (নার্সিং) ডিগ্রিও নেই, পেশায় নাকি সাধারণ নার্স ছিলেন, তারপর বিভিন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহে পুষ্ট হয়ে নাকি বর্তমান পদে আসীন হয়েছেন। তাঁর ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। শুধু নার্সদের সঙ্গেই নয়, তাঁদের অভিভাবকদের সঙ্গেও তিনি যেভাবে ও যে-ভাষায় কথাবার্তা বলেন, তা নাকি সকল ভদ্রতা ও শালীনতার সীমা ছাড়ানো। স্টেট গভর্নমেণ্ট নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী তাই খোলাখুলি বলেছেন যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সত্যই যদি নার্সদের প্রতি সহানুভূতি থাকে, তাহলে তার প্রথম পরিচয় দেওয়া উচিত ওই মহিলা অফিসারটিকে বিতাড়িত করে। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী —যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীরই দলের নেতা এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনিই যখন একথা বলেন, তখন বুঝতে হবে উক্ত ভদ্রমহিলার হাতে পড়ে নার্সিং বিভাগের কতখানি অবনতি হয়েছে।

আমরা বরাবরই বলে এসেছি স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে দুর্নীতি এবং অকর্মণ্যতার আধাআধি অবসান এই মুহূর্তেই ঘটানো যায় যদি স্বাস্থ্যদপ্তরের মাত্র গুটিকয়েক লোককে ক্ষমতার জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। জনৈক জয়েণ্ট ডিরেক্টরের উল্লেখ আমরা ইতিমধ্যে বহুবার করেছি, যিনি কার্যত সমগ্র চিকিৎসা বিভাগকেই নিজের মুঠোর মধ্যে রেখেছেন। নিয়োগ-বদলি সমস্ত কিছুরই মালিক তিনি এবং লুক্রেটিভ স্থানগুলিতে নিজের 'চোজেন ম্যান'দের বসিয়ে রেখে একটি বিষাক্ত চক্রের সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়জন এই ভদ্রমহিলা—যাঁর কথাও আমরা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করেছি।

কবি নজরুল প্রসঙ্গ

কবিকে বারবার অবাঞ্ছিত বিতর্কের মাঝখানে টেনে আনতে ইচ্ছা হয় না। অথচ কর্তব্যের খাতিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা তা করতে বাধ্য হই। কবি যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতেন, তাহলে কিছুই বলার ছিল না। কিন্তু যখন দেখি অসুস্থ ও স্মৃতিভ্রষ্ট কবিকে নিছক ব্যবসায়িক প্রসঙ্গে লাগিয়ে একটি বিশেষ মহল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে, তখন অপ্রিয় হলেও প্রতিবাদ না জানিয়ে পারা যায় না।

আমরা বারবার বলে এসেছি যে কবির ঘনিষ্ঠমহল নামে পরিচিত একটি গোষ্ঠী, যার মধ্যে কবির কিছু আত্মীয় ও সুহৃদ নামে পরিচিত ব্যক্তি আছেন, কবিকে নিয়ে ব্যবসায়ে নেমেছেন। কিছুদিন আগেও একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান—যার সঙ্গে কবির উক্ত ঘনিষ্ঠ মহলটি সম্পর্কিত, কবিকে সাহায্যের নাম করে অনুষ্ঠান করেছিল।

রাজ্যপাল ধরমবীরের আমলে কবিকে জমি ও অর্থ দেওয়াকে উপলক্ষ করে তথাকথিত নজরুল-সুহৃদদের চরিত্রের একটি পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার নজরুল ভবনের জন্য আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু কার্যকর কিছু করার আগেই ওই সরকারের পতন ঘটে এবং ওই পতনকে পাকাপাকি ধরে নিয়ে যুক্তফ্রন্টের আরব্ধ কার্যটি সম্পন্ন করানোর জন্য তাঁরা রাজ্যপালের ওখানে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দেন; শেষ পর্যন্ত কবিকে দশ কাঠা জমি লীজ দেওয়া হয় এবং গৃহনির্মাণের জন্য দশ হাজার টাকার একটি চেক দেওয়া হয়। এটুকু বদান্যতার জন্য তাঁরা রাজ্যপালকে সাড়ম্বরে ধন্যবাদ জানাতেও কার্পণ্য করেন নি। এ কাহিনী তো সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। ওই দান পাবার আগে শোনা যায়, তাঁরা না কি এই রকম একটা আণ্ডারটেকিং দিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা যুক্তফ্রন্টের সাহায্য হয় এমন কোন অনুষ্ঠান করবেন না।

ঘটনাচক্রে আবার যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই নজরুল-সুহৃদরা সকল চক্ষুলজ্জা মুছে ফেলে আবার ফ্রন্ট মন্ত্রীদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। যে রাজ্যপালের দানের গুণকীর্তনে তাঁরা একদা পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, সেই রাজ্যপালের দানটাই অকস্মাৎ তাঁদের কাছে কবির পক্ষে অসম্মানজনক বলে মনে হল, আগে কিন্তু হয় নি। যাঁদের এই উদ্দেশ্যে রাজভবনের গলিঘুঁজিতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত, তাঁদেরই একজনকে পুরোধা করে সেই দলিল ও চেক ফেরত দেওয়া হলো সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীর হাতে, এবং দাবির বহরটা দিলেন বাড়িয়ে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন রং বদল বড় একটা দেখা যায় না।

*

এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সত্তরতম জন্মজয়ন্তী পালন করছে। এই উপলক্ষে আগামী এগারোই জ্যৈষ্ঠ (পঁচিশে মে) রবীন্দ্রসদনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর স্বহস্তে গ্রহণ করায় কবির ঘনিষ্ঠ মহল বেজায় চটেছে এবং এদের একজন (এই ব্যক্তি নাকি সেক্রেটারী?) অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করে দেওয়া হবে বলে প্রকাশ্যেই হম্বিতম্বি করে বেড়াচ্ছে।

যুগান্তর, সাপ্তাহিক বসুমতী সহ কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় নজরুলের সরকারী পেনসন, নজরুল-ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় নজরুল-অনুরাগী জনসাধারণের মধ্যে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে ঘনিষ্ঠ মহল খুবই বিপন্ন ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। এদের একজন (যার হাতে লেখা একটি চিঠি আমাদের কাছে আছে—চিঠির বিষয়বস্তু, ভাষা ও মন্তব্য পড়লে পত্রলেখককে অবিলম্বে রাঁচী পাঠানোর জন্য যে কোন পাঠক সংশ্লিষ্ট মহলকে পরামর্শ দেবেন) টেলিফোনে সম্পাদিকা ও বঙ্গদর্শন লেখককে শাসিয়েছে। এই ব্যক্তি বালিগঞ্জে এক শিল্পীর বাড়ি গিয়ে বলে এসেছে—গুণ্ডা লাগিয়ে বঙ্গদর্শন লেখককে খুন করা হবে।

এ হুমকিতে আমরা আশ্চর্য হই নি—মৌন-নির্বাক কবিকে যারা ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগাতে চায় তাদের পক্ষে যে কোন সমাজবিরোধী কাজই করা সম্ভব, এ আমরা জানি। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

কবি: জন্মভূমি: মানুষের দায়িত্ব

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম আজ নির্বাক। আমরা কথা বলি, তিনি শ্রোতা, আমরা সভা করি, তিনি দেখেন। আমরা যখন তাঁর কবিতা পড়ি, তাঁর গানে কণ্ঠ মেলাই, তিনি তখন অনেক দূরে। 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'—কোনদিনই তা আর নীল আকাশের মত হবে না, যে আমরা ছুঁয়েই বলে দেবো, তিনি কি ভাবছেন।

তবু কবির জন্মদিনে আমরা তাঁকে ফুল দিয়ে সাজাই, তাঁর ললাটে চন্দন-টিপ এঁকে দিই। সজ্ঞানে থাকলে তিনি হয়তো বাধা দিতেন, কেন না, এখনো কবির ফুল-খেলার সময় আসে নি, এখনো জন্মভূমির দুঃখের রাত ভোর হয় নি। 'প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস/আমার রক্তে যেন লেখা হয় তাদের সবার সর্বনাশ!' —আজও সেইসব ভূরি-ভোজী, পরগাছারা পশ্চিমে এবং পূবে, নজরুলের স্বদেশে এবং বিদেশে, ভালই আছে। তাঁর অগ্নিবীণা আজ পরিত্যক্ত, ধুলোয় পড়ে; নইলে এমন দিনে যে সুরের আগুনে জ্বলে উঠতো, তাতে বাংলাদেশ অন্যভাবে কবির মুখ দেখতো।

কিন্ত তিনি যে আজ সজ্ঞানে নেই এই কথাটিই সবচেয়ে বড় সত্য। জনশ্রুতি, এখনো তাঁর প্রিয় গানগুলি তেমনভাবে কেউ গাইতে পারলে কবির মুখে হাসি ফোটে, তাঁর চোখের কুয়াশা যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যও কেটে যায়। কিন্তু সেই দুর্লভ মুহূর্তটি অতি দ্রুতই নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর, সভা যদি আরো চলতে থাকে, নজরুল তখন ক্লান্ত! রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যুতে তিনি একটি গান রচনা করেছিলেন, 'নীরব কেন কবি, ফুলের জলসায়......!' আজ বেঁচে থেকেও নজরুল নীরব; ফুলগুলি তাঁর হাতের মুঠো ছুঁয়ে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো বা তিনি বিরক্ত হন।

শুনেছি তিনি এখনো গাড়ি চড়তে ভালবাসেন; একটু খোলা হাওয়া পেলে খুশি হন। বাংলাদেশ কবিকে মনে রেখেছে; কিন্তু যাতে তিনি একটু ভাল থাকেন, যাতে তাঁর মুখের হাসি একটু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়, সেজন্য কারুর মনেই কোনো পরিকল্পনা আছে কি-না, আমাদের জানা নেই। হয়তো তাঁর ছেলেরা এ নিয়ে চিন্তা করছেন; তাঁরা তো এখন সাবালক এবং সক্ষম। হয়তো যাঁরা একদিন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা ভাবছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন খ্যাতিমান এবং বিত্তশালী। এঁরা ছাড়াও কবির অজস্র ভক্ত আছেন, যাঁরা প্রতিটি জন্মদিনে কবিকে প্রণাম জানান। হয়তো তাঁদের ভিতরেও এমন মানুষ রয়ে গেছেন যাঁরা কামনা করেন, সারা বছর ধরে কবি সাধ্য-মত ভাল থাকুন, সুখে থাকুন।

বাংলাদেশ চিরদিনই কবিদের বড় বেশি অবহেলা করে এসেছে। মাইকেল, হেম-চন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র দাস—'ও ভাই বঙ্গবাসী। আমি ম'লে তোমরা আমার চিতায় দিও মঠ'—বহু দুঃখ থেকেই যে কবি এমন অভিযোগের কবিতা লিখেছিলেন; তাঁদের একজনের প্রতিও আমাদের জ্যেষ্ঠ সহো-দরেরা উপযুক্ত সম্মান বা ভালবাসা দেখান নি। এমন কি মৃত্যুর পরেও তাঁদের আমরা অবহেলা করেছি। কবি নজরুলের প্রতি আমাদের ব্যবহার হয়তো একরকম নয়। তাঁর জন্য নানাদিক থেকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এখনো তিনি এমন একটি বাড়িতে বাস করেন, যেখানে হাওয়া প্রায় আসে না, যেখানে গান নেই; আর যদিও বা কেউ কখনো সময় করে কবিকে গান শোনাতে আসেন, বাতাসের অভাবে সে-গান বন্ধ ঘরের মধ্যেই গুমরে মরে।

কথা উঠেছে, কবির জন্য একটি উপযুক্ত বাড়ি তৈরি করে দিতে হবে। কথাটি আজ থেকে বাইশ বছর আগেই উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল। শুধু খোলা জায়গায় একটি স্বাস্থ্যকর বাসগৃহই নয়, কবি যদি সত্যিই বেড়াতে ভালবাসেন, তার ব্যবস্থাও আমাদের করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত সকলই আমাদের শুভেচ্ছা; নজরুল এতদিন যেমন ছিলেন, এখনও তেমনভাবেই আছেন।

পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতা শহর কবি বলতে এখনো শুধু একজনকেই চেনে। তিনি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসদন, রবীন্দ্র সরোবর, রবীন্দ্র সরণি, রবীন্দ্র পুরস্কার—কবির এই সম্মান আমাদের সবাইকেই গর্বিত করে। তাঁর সঙ্গে বাংলার অন্য কোনো কবিরই আমরা তুলনা করছি না; তবু কথা থাকে—মাইকেল, দ্বিজেন্দ্র-লাল বা নজরুলকেই বা আমরা সামান্য সম্মান দেবো না কেন?

কথা উঠতে পারে, নজরুল এখনো জীবিত; সুতরাং তাঁর স্বাস্থ্যকামনা ছাড়া, যাতে তিনি কিছুটা ভাল থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করা ছাড়া, কবির নামে আমরা এখনই আর কি করতে পারি? এ-কথার পরেও আমাদের মন বলে, অনেক কিছুই করা যায়, যদি কবিকে আমরা সত্যি ভালবাসি।

বাংলাদেশ আজ দ্বিখণ্ডিত। উভয় বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান এখনো পরস্পরের প্রতিবেশী, একে অপরের সহোদর নয়। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের যৌবন-কালেও চেষ্টা হয়েছিল, এই রাজ্যটিকে ভেঙে দু' টুকরো করে দিতে। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রাস্তায় নেমে এসেছিলেন এবং তাঁদেরই গান কণ্ঠে নিয়ে সমস্ত বাংলাদেশ সেদিন একটিই প্রতি-রোধের মিছিল হয়েছিল। বাংলাকে দু' টুকরো করার অশুভ প্রচেষ্টা ঐ মিছিলের মুখোমুখি এসেই থমকে গিয়েছিল; আর এগুতে পারে নি।

কিন্তু বিদেশী শাসকদের অপপ্র-চেষ্টাই শুধু নয়, ভাঙনের বীজ অন্যত্রও বাংলার মাটিতে লুকিয়েছিল। গ্রামের খোলা জল-হাওয়া তাকে পুষ্ট করে নি কিন্তু শহরের বদ্ধ পঙ্কিল জলাভূমিতে এই বিষবৃক্ষ ক্রমেই মাথা তুলতে লাগলো; এবং সময়ে বাংলার এবং তামাম ভারত-বর্ষের যাবতীয় সুস্থ, মানবিক চৈতন্যকে বিষাক্ত করে তুললো। তারই পরিণতি

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, প্রতিবেশী দুই সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ এবং শহুরে নেতাদের হিংসা, লোভ, লালসা। দ্বিতীয়বার বঙ্গ-ভঙ্গের চেষ্টাকে তাই আর কিছুতেই ঠেকানো গেল না। রবীন্দ্রনাথ মৃত, নজরুল বোবা এবং বধির। বাংলার কবিকণ্ঠ এতবড় একটা অমানুষিকতার প্রতিবাদ পর্যন্ত সেদিন করলো না; এ লজ্জা আজো আমাদের ঢাকবার কোনো জায়গা নেই।

যাতে এরকম ভয়াবহ ঘটনা না ঘটে, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল দিনের পর দিন লড়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা শুধু কবিতা বা গানই লেখেন নি, রাস্তায় মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম?—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?/কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।'—চেতনা থাকলে, নজরুল আরেকবার রাস্তায় নেমে এসে মিছিলের সামিল হতেন। তাঁকে সামনে নিয়েই বাংলার কবিরা সেদিন মিছিল করতো। অথবা তিনিই আমাদের এভাবে ম'রে না থাকার জন্য ডাক দিতেন।

শুধু যে একটি দেশ ভেঙে দু' টুকরো হলো, তাই নয়। সাম্প্রদায়িক বিষ এখন পর্যন্ত এই মাটিকে নরক করে; মাঝে-মধ্যেই আমরা সেই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হই এবং অসহায়ের মত আমাদের সমস্ত শুভবুদ্ধি তখন শূন্যে মাথা খোঁড়ে। পুনর্কথন হলেও, আরেকবার জোর দিয়ে বলা দরকার, নজরুল সজ্ঞানে থাকলে তাঁর কবিকণ্ঠ এই অসুন্দরকে বজ্র হানতো। যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা এবং সর্বপ্রকার হীনতার বিরুদ্ধে একজন কবির পক্ষে যতভাবে লড়াই করা সম্ভব, প্রাণপণ যুদ্ধ করে গেছেন। আজ আমাদেরও কাজ ছিল দুই বাংলার স্বাধীন মানুষদের মধ্যে একটি মিলনসূত্র খুঁজে বের করা; সাম্প্রদায়িকতাকে চিরদিনের মত কবর দেবার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বাংলার কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা এ-ধরণের কোনো বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে এখন পর্যন্ত একপা'ও অগ্রসর হন নি। এ নিয়ে নিয়মিত ইস্তাহার, বুলেটিন, কবিতা-সংকলন ইত্যাদিও তাঁরা প্রকাশ করতে পারতেন। আমরা কিছুই করছি না। সরকারী, বেসরকারী, নানা প্রতিষ্ঠান থেকে এদেশের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিককে নানা পুরস্কার দেওয়া হয়। আমরা যদি নজরুলের নামে এমনি একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে পারতাম, শুধুমাত্র সেইরকম রচনার জন্য যা সাম্প্রদায়িকতাকে ধিক্কার জানায়, যা দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের পরস্পরের কাছে টানে—আমার মনে হয়, এই কবির প্রতি সামান্য দায়িত্বও পালন করা হতো।

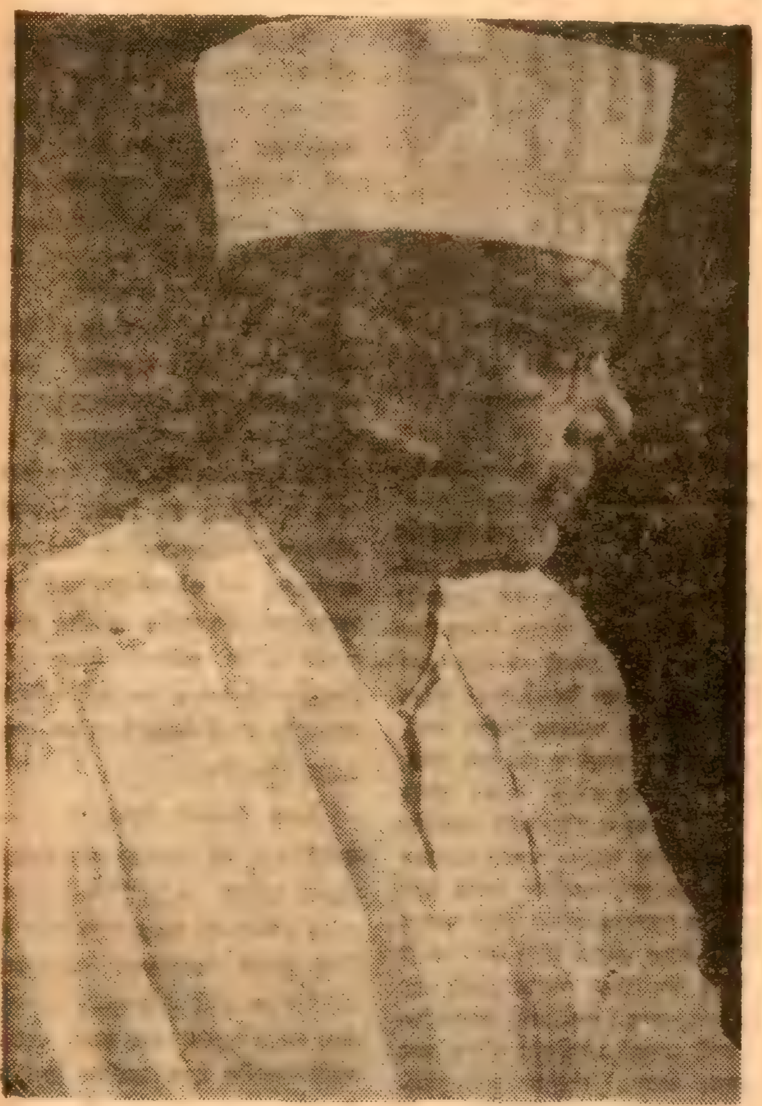

যতদূর জানি, একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান, 'পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমী', আমাদের জ্যেষ্ঠ কবির কথা সামান্যও মনে রেখেছেন; যাতে কবির সুখ ও শান্তির দিকে দেশের মানুষ সামান্যও নজর দেয়, সেজন্য কার্যকরী কিছু পরিকল্পনা তাঁরা পাঠক/শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। এ ছাড়া নজরুলের নামে আরো দু'-একটি প্রতিষ্ঠান, পাঠাগারের নাম মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ে। যাঁরা কবিকে সামান্যও মনে রাখছেন তাঁরা সবাই এ-দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার চেয়েও আরো অনেক বেশি, অনেক বড় কোনো কাজ নজরুলকে সামনে রেখে আমাদের করা দরকার। রবীন্দ্রনাথের মতই এবং কখনো বা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও অধিক অস্থিরতার সঙ্গে তিনি হিন্দু-মুসলমানকে মেলাতে চেয়েছিলেন, এবং আন্তর্জাতিক মানুষ বিশেষ করে দুনিয়ার সর্বহারা মানুষের জন্য কলম ধরেছিলেন। কবির নাম সামনে রেখে আমরা যদি এই দুটি সৎকার্যকেও কিছুটা হৃদয়ের উত্তাপ দিই, সমর্থন জানাই, কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করি, তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানের কিছুটাও অন্তত দেওয়া হবে।

এবং এতে করে আমরা নিজেদেরও মানুষের সম্মান দেবো।

নাম্বার টেন সিগারেটের পরম তৃপ্তি-দায়কতার মূলে
মাত্র একটি সমীচীন কারণ ঃ
নিবিড় স্বাদে ও গন্ধে পরিপূর্ণ নাম্বার টেন
ভারতের সমশ্রেণীয় সিগারেটের মধ্যে
সবচেয়ে বেশী মিঠে আমেজ জোগায়—মধুর আবেশ জাগায়!
তাই তো হওয়ার কথা—
নাম্বার টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া তামাক
—যা সংগ্রহ, পরিপক্ক এবং ব্লেণ্ড করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজ্ঞ তামাক বিশেষজ্ঞরা।
মিঠে আমেজের বিলাসে...
নাম্বার টেনের
পরিচয়
ধোঁয়ার ছটা... মূল্যের পূর্ণ মর্যাদা দেয়
NUMBER TEN
VIRGINIA
ACI/KTN-60B

নজরুল-প্রসঙ্গ

অমলকুমার মিত্র

কাজী নজরুল ইসলামের সপ্তাতত্তম জন্মদিবস উপলক্ষে কত কথা বলা হবে, লেখা হবে, কত গান গাওয়া হবে।

শুধু নজরুলই নীরব হয়ে থাকবেন।

কিন্তু অসহায় নীরব কবিকে হয়ত বিপুল জনতার সামনে দর্শন দিতে হবে, যতক্ষণ না অব্যক্ত যন্ত্রণা সীমা ছাড়িয়ে হাজার চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠবে ততক্ষণ মুক্তি নেই। অন্তত ইদানীং-কালে সেই রকমই ঘটছে। খ্যাতির কি করুণ বিড়ম্বনা!

কবি যদি আজ সুস্থ থাকতেন, তবে এই ব্যবস্থায় তাঁর নিজের কি মনোভাব হত সে কথা কল্পনা করতে ইচ্ছা করে। তাঁর নিজের লেখা থেকেই এর সূত্র সন্ধান করা যাক।

দীর্ঘ দিন আগে, ১৯২৮ সালের ৮ই মার্চ, কলকাতা থেকে নজরুল ঢাকাতে তাঁর প্রিয় বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ এ বিষয়ে কিছু ইংগিত দিতে পারবে। তিনি লিখেছিলেন—

"...বন্ধু আমি পেয়েছি—যার সংখ্যা আমি নিজেই করতে পারব না। এরা সবাই আমার হাসির বন্ধু, গানের বন্ধু। ফুলের সওদার খরিদ্দার এরা। এরা অনেকেই আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে, প্রিয় হয়ে ওঠেনি কেউ।

আমার চোখের জলের বাদলা রাতে কেউ এসে হাত ধরেনি। আমার চোখের জল! কথাটুকু শুনলে এরা হেসে লুটপাট হবে। ...কণ্ঠপ্রদাহ রোগে আমি ভুগছি ঢাকা থেকে এসে অবধি, রক্তও উঠছে মাঝে মাঝে—আর মনে হচ্ছে আমি যেন কীট্স। সে কোন্ ফ্যানির নিষ্করুণ নির্মমতার হয়ত বা আমারও বুকের চাপ-ধরা রক্ত তেমনি করে কোনদিন শেষ ঝলক উঠে আমার বিয়ের বরের মত করে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

তারপর হয়তবা বড় বড় সভা হবে। কত প্রশংসা—কত কবিতা বেরুবে হয়ত আমার নামে। দেশ-প্রেমিক, ত্যাগী, বীর বিদ্রোহী—বিশেষণের পরে বিশেষণ। টেবিল ভেঙে ফেলবে থাপ্পড় মেরে বক্তার পর বক্তা।

এই অসুন্দর শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রাদ্ধদিনে—বন্ধু! তুমি যেন যেয়ো-না। যদি পার চুপটি করে বসে আমার অলিখিত জীবনের কোন একটি কথা স্মরণ কোরো।......"

(সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত ও বাংলা সাহিত্য বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায়" পুস্তকে পুরো চিঠিটি পাওয়া যাবে।)

চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটির সম্বর্ধনার উত্তরে নজরুল বলেছিলেন—"...আমার জন্য যদি আসনই দাও তোমরা, তা যেন বুকের আসন হয় বন্ধু, সভার কোলাহলের নির্বাসন আমি চাই না।..."

বেগম শামসুন নাহারকে লেখা নজরুলের একটি চিঠিতে দেখতে পাই কবি লিখেছেন "...তোমরাও ঠিক ভালবাসো আমাকে নয়—আমার সুরকে, আমার কাব্যকে। সে তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন ভাই?..."

কবির সক্রিয় জীবনের শেষ অধ্যায়ে, অন্তরের বেদনা অভিমান উজাড় করে কবি দরবারী কানাড়া রাগে একটি গান রচনা করেন। গানটি আজও অপ্রকাশিত এবং শ্রীজগৎ ঘটক মহাশয়ের খাতায় প্রাপ্ত। গানটির কয়েক লাইন হল—

[illegible]
ধরিও না।

....

ভুল করেছিনু যেথা শুধু বিষ
অসুন্দরের ভিড়
সেই পৃথিবীতে কেঁদেছি খুঁজিয়া
প্রেম যমুনার তীর।
যার তরণী ভাসিল
বিরহের পারাবারে
পিছু ডেকে আর
ফিরাতে চেয়োনা তারে
আমারে পাষাণবিগ্রহ করে
আর মালা পরিও না।

কিন্তু জন্মদিন পালনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কবিকে বিগ্রহ সাজতে হবে, মালাও পরতে হবে, খ্যাতির যাবতীয় বিড়ম্বনা সইতে হবে অব্যক্ত প্রতিবাদে।

বাংলা দেশে কাব্য ও সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাত্র কুড়ি বছর সময় কাজী নজরুলের সক্রিয় অবস্থিতি। কিশোর বয়সে বা করাচী সেনানিবাসে থাকার সময় তিনি কিছু কিছু লিখলেও ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি সুখের উল্লাস। এই কুড়ি বছর সময়ের মধ্যে নজরুলের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ হল প্রথম পর্যায় ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ হল দ্বিতীয় পর্যায়। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভু অস্তিত্ব অতিক্রম করে বিদ্রোহের উপক্রমণিকায় নজরুলের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠাকে প্রথম পর্যায়ে চিহ্নিত করা যায়। এই পর্যায়ে নজরুল ঐহিক, বিদ্রোহী এবং উদ্দীপক। কিন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে নজরুল ক্রমশ অন্তর্মুখী, সংগীতমগ্ন এবং অধ্যাত্ম আশ্রয়ী। এই দুই পর্যায়ের সীমারেখা হল ১৯৩০ সালে কবির প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু। নজরুল-মানসের এই দুই পর্যায়ের বৈপরীত্য আশ্চর্য মনে হলেও অস্বাভাবিক নয়।

অসংখ্য মানুষের জীবনে, বিজ্ঞানের হাজার অগ্রগতি অনুসরণ করে বা সমাজবিজ্ঞান অনুশীলন করেও অবচেতন মনের সংস্কার বা প্রচলিত বিশ্বাসের অস্তিত্ব নির্মূল হয় না। এটা যদি খুব সহজেই ঘটত তবে সমাজমানসের বিবর্তন স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংগে পাল্লা দিয়ে সমান্তরালভাবে চলতে থাকত এবং এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে চিন্তার সকল বৈচিত্র্য, অতীতের সবকিছু যোগসূত্র ছিন্ন করে সাম্প্রতিক পথেই পরিক্রমণ করত।

নজরুলকে বিদগ্ধজন সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, নজরুল মানসিকতার কোন পরিণতি দেখা যায় না।

বলা বাহুল্য, নজরুলের দুই পর্যায়ের বৈপরীত্যই এ কথার স্বপক্ষে রায় দেবে। কিন্তু নজরুলের কাব্য ও সংগীতের অবদান চিনে নিতে হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে নজরুলের মানস-চরিত্র কোন্ পরিণতির দিকে চলেছিল, ইতিহাসের বিচারে সে কথা খুব একটা মূল্যবান নয়—কারণ সমাজ শুধু নজরুলকে নিয়েই নয়। সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে বাংলা দেশের সমাজমানস সামগ্রিকভাবে কোন অখন্ড পরিণতির দিকে প্রক্ষিপ্ত নয়। দেখা যাবে অসংখ্য বৈপরীত্য, বহু অসংলগ্ন চিন্তাধারা, ভিন্নমুখী আবর্ত সমাজমানসে ভিড় করে রয়েছে। শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজে, শিক্ষার হের-ফের, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশের ভিন্নতা এই সব মিলিয়ে সেটাই স্বাভাবিক। এই সময়ে কোন ব্যক্তিত্ব যদি কোন আদর্শের শিখরে উঠেন বা আপন প্রতিভায় বিকশিত হন তবে সে তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভ। নজরুলের মধ্যে এই ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভের কোন চেষ্টাই দেখা যায় না কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে, বিশেষ করে তাঁর সংগীতে প্রায় গোটা সমাজমানসই বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

নিজের অজ্ঞাতসারে নজরুল কাব্য ও সংগীতের মাধ্যমে সমাজমানসেরই সাংবাদিকতা করেছেন। নজরুলের সৃষ্টিতে তাঁর সচেতন মনের কর্তৃত্বের চেয়ে অবচেতন মনের প্রবণতাই অধিকতর সক্রিয়। তাই সমকালীন সমাজে যে সুরই ধ্বনিত হয়েছে গভীরতম আবেগে তাকেই নজরুল বিনা বিচারে প্রতিধ্বনিত করেছেন। বিদ্রোহের চেতনা যেমন সমাজের কোন এক উৎস থেকে আহরিত, তেমনি ভক্তিরসও আবার সমাজের অপর কোন উৎস থেকে সঞ্চারিত। বাংলা দেশের ইতিহাসে বিপ্লবী বারীন ঘোষেরাও যেমন সত্য, তেমনি সাধক রামপ্রসাদের গীতি প্রভাবও সত্য। যেমন বাংলার পথে পথে ছিলেন চারণকবি মুকুন্দদাস ও আরও কত গ্রাম্য কবিরা মুখরিত, তেমনি আবার অপরদিকে ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সৌরমন্ডল। শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনাও যেমন ছিল, গান্ধীজীর অহিংস নীতিও ছিল, আবার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মার্কসবাদী চেতনার ছিল পরিমিত ভূমিকা। এ সবই অল্প-বিস্তর সমাজমানসে ছায়া ফেলেছে। যেখানে যে স্পন্দনটুকু জেগেছে নজরুল সংগীতে তারই সুর ধ্বনিত হয়েছে। যেহেতু নজরুলের সৃষ্টি কোন মতবাদে পৃথক হয়ে কোন ঘটনাকেই অস্বীকৃতি জানায় নি, বিচার করে নি, সেইজন্যই নজরুলের অবদানের মধ্যে বিধৃত রয়েছে বাংলা দেশের সমাজ-মানসের ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথের কোন গান শুনলেই চেনা যায় রবীন্দ্রনাথের গান বলে। তেমনি দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গানও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গীতিকার বা সুরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু উদ্দীপনার এবং কিছু গজল গান বাদ দিলে নজরুলগীতি থেকে সহজে নজরুলকে সনাক্ত করা যায় না, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কোন পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের সমস্ত সুরই যেন নজরুলের মাধ্যমে ঝংকৃত হয়েছে। এমন কোন সুর বা ভাব নেই, যার চর্চা বাংলা দেশে হয়েছিল অথচ নজরুলের গানে তার রেশ নেই। মার্গ-সংগীতের বিশুদ্ধতা ভেঙে যখন লোকায়ত দর্শনের নানা গ্রন্থিতে নানান সহজীয়া সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাতেও নজরুল যেমন মেতেছেন তেমনি আবার সহজীয়া সংগীত ছেড়ে ফিরেছেন অল্প-পরিচিত ও অজ্ঞাত রাগ-রাগিণীর সন্ধানে। জ্বালাময়ী বিদ্রোহের গান আবার ভক্তিরসে পূর্ণ আত্মনিবেদনের গান, মোহ অন্তের গান, ভূত ভাগানো গান আবার মোহময় গীতি, কীর্তন ও কালীসাধনার গান আবার ঈদ রমজানের গান, পারস্যের গজল রীতি আর বাউল গান, দক্ষিণ ভারতীয় সুর আবার ছাদ পেটানো গান, পূর্ব বাংলা লোকগীতি—মাঝি-মাল্লার গান—সবই তিনি অকৃত্রিম অনুভূতির সংগে অবিকৃতভাবেই উপহার দিয়েছেন। একক সৃষ্টিতে এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের বিস্তৃতি, অজস্রতা, নিঃসন্দেহে ইতিহাসের উপাদান কেন না নজরুলের গান অনুসরণ করে সমাজ-মানসের কোন-না-কোন প্রাঙ্গণে, বংগ সংস্কৃতির কোন-না-কোন বৃত্তের মর্মস্থলে অনায়াসেই উপনীত হওয়া যায় যা অনেক সময় নানান বিজ্ঞ বিবরণেও দুরূহগম্য। অজস্র উদাহরণ দিয়ে একথা প্রমাণ করা যায়। তাই প্রয়োজন রয়েছে নজরুলের সমস্ত গান ঐতিহাসিক মর্যাদায় সংকলিত ও সংরক্ষিত করার। অগ্নিবীণার তারে শেষকালে ধূপের ধোঁয়া নিঃসৃত হয়েছে বলে আক্ষেপ করার কিছু প্রয়োজন নেই, বিদ্রোহের নিশানে তৎক্ষণে হাত বদল হয়ে গেছে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায়, বাংলা ও ইংরেজী ভাষা মিলিয়ে নজরুল সম্পর্কে প্রায় ত্রিশটি বই লেখা হয়েছে। কিন্তু নজরুল মোট কতগুলি গান রচনা করেছেন, কতগুলিতে নিজে সুর দিয়েছেন তা আমরা আজও জানি না। তিন হাজার থেকে চার হাজার সংখ্যা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে বটে কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য পরিক্রমায় এই অনুমানের সমর্থন নেই। অন্তত দেড় হাজার গান সংকলিত নেই কোথাও। এ বিষয় পশ্চিম বাংলার চেয়ে পূর্ব বাংলায় অধিকতর নিষ্ঠা আশা করা গিয়েছিল কারণ পূর্ববাংলায় যে আগ্রহে এবং অধ্যবসায়ে লুপ্তপ্রায় এবং স্মৃতিনির্ভর পাগলা কানাই, লালন ফকির প্রমুখের গান সংগ্রহ ও সংকলন দেখা গিয়েছিল ওখানকার সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা একাডেমি পত্রিকা ইত্যাদিতে তা পশ্চিম-বাংলায় দুর্লভ। কিন্তু নজরুল সম্পর্কিত পূর্ববাংলার অধিকাংশ পুস্তকেই অযথা মুগ্ধবোধ নিয়ে একই তথ্যের বিস্তার দেখে মনে হয় নজরুলের গান সংগ্রহে তাঁরা খুব কমই সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁদের 'নজরুল রচনা সম্ভার' প্রকাশ করার জন্য সাহায্য নিতে হয়েছে পশ্চিমবাংলার শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অধুনা দুষ্প্রাপ্য নজরুলের কয়েকটি রচনার জন্য। এমনি করেই তাঁদের এগোতে হচ্ছে, তাঁরা সহজে এদিকে আসতে পারেন না।

নজরুলকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার সংগে একটি সংস্কৃতিক বিনিময় গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে পারেন পশ্চিমবাংলার নজরুল একাডেমি। অন্তত হাতে লেখা অবস্থায় নজরুলের সমস্ত গান একত্র করে সংরক্ষণ করতে পারা যায় অনেকদিন।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস :

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ।) মূল্য—৩'০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম্ শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম্, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম্, শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম্, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম্। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ" মূল্য—৩'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

আরেক সূর্য কবি নজরুল

মনোরঞ্জন হাজরা

একই আকাশে দুই সূর্য। বলা বাহুল্য একজন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আরেকজন কে? যা হতে পারে না তা কল্পনা করা যায় কি করে? রবীন্দ্রনাথ বিরাট বটবৃক্ষ, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিচের কোন গাছ কি উঠতে পারে? সে কি কোনদিন পারে তার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে আড়াল করা আকাশের দিকে হাত বাড়াতে? বরং একথাই সত্যি যে, প্রাণধারার সঞ্জীবনীশক্তি হারিয়ে সে কুঁকড়ে কৃশ হয়ে যায়, আপন অস্তিত্বের লজ্জাকর পরিস্থিতিতে সে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। এইটাই প্রকৃতির শাশ্বত নিয়ম। তাই বটবৃক্ষ আর তার নিচে গাছের উপমায় আমার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ না রেখে আমি সোজাসুজি একই আকাশে দুই সূর্যের প্রসংগে আসতে চাইব। বটবৃক্ষরূপী রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় পরিব্যাপ্তির নিচে কাজী নজরুল ইসলাম কবি-পরিচিতি লাভ করেছেন সত্যি, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির নিয়মে তিনি তো কুঁকড়ে কৃশ হয়ে যান নি? তাহলে—তাহলে কি একথা বলা যায় না রবিকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন গগনে যখন রবীন্দ্রনাথের অবস্থান তখন আরেক সূর্য কবি নজরুলের আবির্ভাব ঘটেছিল সহযাত্রী হিসাবে? সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নেই; অনুকৃতির ব্যর্থ প্রয়াস নেই, নেই তাঁর বিরাট সৃষ্টির প্রতি কোন অশ্রদ্ধা—বরং একেবারে স্বকীয় প্রাণের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় উদ্ভাসিত এই দ্বিতীয় সূর্য বাংলার কাব্যজগতে এক গভীর বিস্ময়।

সেই বিস্ময় যে কতখানি তা কবির বিখ্যাত কবিতা, যে কবিতার নামকরণের মধ্যে দিয়ে কবি নজরুলের নামকরণ হয়েছে "বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল"—সেই কবিতা 'বিদ্রোহী'র এই ছত্রগুলিতে সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল :—

"...মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।
মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

একটা পদানত পরাধীন জাতির ওপর বলদর্পী সাম্রাজ্যবাদের সীমাহীন উৎপীড়ন, নিত্য অনুষ্ঠিত হাজারো অন্যায় ও অবিচার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়েপড়া সমাজের বহুবিধ কুসংস্কার, ভেদবুদ্ধিজনিত অভিশাপ মানুষের পদযাত্রায় যেভাবে রথের চাকাকে অচল করে দিয়েছিল সেদিন, তার ভয়াবহ প্রাণঘাতী স্মৃতি আজও সম্ভবত জাতির স্মৃতিপট থেকে মুছে যায় নি। সেই অন্ধকারময় দুর্দিনগুলিতে এমন করে যে কবি মানুষের মনে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বেলে দিতে পারেন আর সেই প্রজ্বলিত শিখা কত দূর-পথ অতিক্রম করবে তারও লক্ষ্য চিহ্নিত করে দিতে পারেন—সে কবির বাণী কি বিস্ময় সৃষ্টি না করে পারে? যেদিন "উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না", যেদিন "অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না"—মাত্র সেইদিনই এই মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত হবেন অর্থাৎ দূর হোক উৎপীড়ন, দূর হোক অবিচার-অত্যাচার এবং নেমে আসুক ন্যায় ও সাম্য-সাম্যের দিন। আর তাহলেই তাঁর হবে শান্তি। একটা গোটা জাতির প্রতি এই স্থিরলক্ষ্য উদাত্ত আহ্বান রবীন্দ্র-যুগের মধ্যে বসে স্বকীয় কাব্য-প্রতিভার মাধ্যমে দেওয়া যে কতখানি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে তা না বললেও চলে। কারণ রবীন্দ্রনাথও তো কম লেখেন নি। তিনি বলেছেন—"তার পর রক্তসিক্ত পদে উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশ্যে।" বিস্ময় কি ঠিক সেই জন্যেই নয়?

কবি কবে যুদ্ধে হাবিলদার হয়ে গিয়েছিলেন, কবে ফিরেছিলেন, রণাঙ্গনে বসে কি লিখেছিলেন কোথায় তা প্রকাশিত হয়েছিল, কবে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, কোথায় উঠেছিলেন আর সে সব দিনে কে তাঁর পরম সুহৃদ হিসাবে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলেন—সেদিন কিভাবে তিনি কাব্যসাধনা করেছিলেন, কারা তাঁকে সেদিন বারে বারে আঘাত করেছিলেন, কারা তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন "তুই করলি কাব্য/তাও আবার ছাপ্‌বি," সে সব কাহিনী অনেক পরিশ্রম করে সুন্দরভাবে লিখেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা মুজাফফর আহ্‌মদ। বাংলা ভাষায় এত তথ্যবহুল আর এতবড় প্রামাণিক নজরুল-জীবনী আর কেউ লেখেন নি। তাই আমি সেইসব তথ্যের মধ্যে না গিয়ে অর্থাৎ তার পুনরুক্তি না করে বলতে চাই, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমন একদিকে ছিলেন পরাধীন দেশের শেকল ছেঁড়ার কবি, তেমনি বহুবিচিত্র ধ্রুপদী শিল্পবিভাগেরও তিনি সার্থক শিল্পী।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিদ্রোহী কবির অবদান জাতি কখনও ভুলতে পারবে না। পরাধীন দেশের জাতীয় সংগ্রামের এই মহাচারণ তখন একের পর এক লিখে চলেছেন অজস্র কবিতা আর অসংখ্য গান। শৃঙ্খল জর্জরিত জীবনে কোটি কোটি ভারতবাসী যেখানে হতাশায় আর অন্ধকারে পথভ্রষ্ট তখন তিনি নতুন ঊষার আবির্ভাব হয়েছে মনে করে লিখেছেন—

"আজি রক্ত নিশি ভোরে
এ কি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দি শৃঙ্খলে।"

এর পরেই দুঃখের দুটি বেলা যখন পড়ে আসবে, নেমে আসবে পৃথিবীতে দুঃসহ অন্ধকার তখন কবি আশার হাতছানি দিয়ে বলছেন—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু
দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে
যাত্রীরা হুঁশিয়ার!"

এদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের দুঃখ-লাঞ্ছিত নিপীড়িত কৃষকের গভীর বেদনাকে উপলব্ধি করে তাদের মনে আশার ঝংকার তুলে দেওয়ার জন্যে বললেন—

"আমরা মাটির খাঁটি ছেলে
দূর্বাদল শ্যাম
মোদের মাঝেই লুকিয়ে আছেন
রাবণ অরি রাম।
মোদের হালের ফলায় শস্য উঠে
সীতা তারি নাম
আজ সেই সীতারে হরছে রাবণ
সেই মাঠের ফসল
ওঠরে চাষী ভারতবাসী
ধর কষে লাঙল
চাষী ধর কষে লাঙল।"

শ্রমিকদের ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন : "ধর হাতুড়ী তোল কাঁধে শাবল/ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল।" ছাত্রদের মনের কথা লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

"সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়
আমরা করি ভুল
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল।"

যুবকদের উদ্দেশ করে তিনি লিখেছেন :

"চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল
ঊষার দুয়ারে-হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।"

পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করার জন্য বহুবার কবিকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। সেই কারাবরণের দিনগুলিকে উপলক্ষ করে তিনি বেশ কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'কারার ঐ লৌহ কপাট/ ভেঙে ফ্যাল করেরে লোপাট' গানটি আজও জনপ্রিয় হয়ে আছে। তাছাড়াও তিনি লিখেছেন "শিকল পরাই ছল মোদের এ শিকল পরাই ছল/এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবরে বিকল।" এই গানগুলি সম্পর্কে দু-একটা কথা বললে বোধকরি তা অপ্রাসংগিক হবে না, বরং বলা যেতে পারে তা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাংলাদেশের মাঠে-ঘাটে সভা-সমিতিতে, মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে এ গানগুলি তৃতীয় দশকে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা কোনমতেই ভোলার নয়। সে সময়ে সারা বাংলাদেশকে যেন উন্মাদ করে দিয়েছিল স্বদেশপ্রেমের দুকূলপ্লাবী আবেগে। বলা যেতে পারে শুধু আইন অমান্যের ব্যাপারেই নয়—একটা সামগ্রিক জাতীয় চেতনার মধ্যে বিদ্রোহী যৌবনের আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিন এই গানগুলির বাণীতে আর সুরেতে।

গানের পাশাপাশি ছিল কবিতাগুলিও। আগেই "বিদ্রোহী" কবিতাটির কথা বলা হয়েছে। এই কবিতারই ভাষায় "শ্রাবণ-প্লাবন বন্যার" মত তাঁর কবিতার বান ডেকে গিয়েছিল এই একই সময়ে। কখনও তিনি লিখেছেন "সৃষ্টি সুখের উল্লাসে/টগবগিয়ে মোর খুন হাসে।" কখনও লিখেছেন "অমর কাব্য তোমরা লিখিও যাহারা আছো সুখে।" তাঁর সমস্ত কবিতাগুলিই দেশ, জাতি ও মানুষকে কেন্দ্র করেই, যেন একটা অবরুদ্ধ নদী হঠাৎ বাঁধভাঙা বন্যার মত দুরন্ত বেগে উধাও হয়ে ছুটতে চেয়েছে।

তাই কবিকে দেখি কোথাও তিনি আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন আবার নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন :

"আসে নাই ফিরে ভারত ভারতী
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর?
পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল ক্রন্দন
দেড় শত বছর!"

আবার আশায় উদ্বেল হয়ে তিনি বলছেন :

"কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে
অবিরত
আজ দেখি যারে কালের শীর্ষে
কাল তারে পদানত
আজি সম্রাট কালি সে বন্দী
কুটিরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী
কংস কারায় কংসহন্তা
জন্মিছে অনাগত
তারি বুকচিরে আসে নৃসিংহ
যারে করে পদাহত।"

ঐ একই কবিতার আরেক স্থরে এসে কবি সব দেখেশুনে যেন আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না, আকুল হয়ে ডাক দিচ্ছেন দেশের যুবশক্তিকে :

"অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই
দানব দৈত্য তবু মরে নাই
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই
বসে বসে কাল গুণি,
জাগোরে জোয়ান বাত ধরে গেল
মিথ্যার তাঁত বুনি।"

এই কবিতায় আবার লিখছেন : "আমি সাম্যের গান গাই/আমার চক্ষে নারী ও পুরুষে কোন ভেদাভেদ নাই।" সাম্যবাদী কবিতায় প্রকৃতই তিনি সাম্যবাদী দর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া তাঁর 'দারিদ্র্য' কবিতাটির যেন তুলনা হয় না। দারিদ্র্য তাঁকে মহান করেছে, তাঁকে খৃস্টের সম্মান দান করেছে। এ কথা তো শুধু কবির জীবনেই বাস্তব ঘটনা নয়, গোটা মানবসমাজের পক্ষেই এটি একটি বাস্তব কথা। এরই জন্য গোটা পৃথিবীর মানুষ আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে মহান আদর্শকে—মানব সভ্যতার অগ্রগতিই তার একান্ত নিদর্শন।

কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুসলমান ঘরে কিন্তু তিনি হয়ে গেলেন সকলের। এমন কি তিনি সৃষ্টিকেও রূপ দিলেন সেই রঙেই। ভারতবর্ষকে "ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল"-এর নীতিতে শাসন করতে চেয়েছিল ইংরেজ, সেজন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো ছিল তাদের হাতে একটি মহাস্ত্র। এজন্য তারা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাতে চক্রান্ত করে। তৃতীয় দশকের শেষদিকে কলকাতায় যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল সেই দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে নজরুল একটি অদ্ভুত কবিতা লিখেছিলেন। তার একটি লাইন এইরকম : "ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন তবে স্বর্ণলঙ্কা পোড়া।" মনে রাখতে হবে এই সময়ে দাঙ্গার প্রচণ্ডতা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যা কল্পনাতীত। কিন্তু সেই সময় আরও একটি ঘটনা ঘটে, সেটি হচ্ছে পুলিশবাহিনীর ব্যারাকে ব্যারাকে দাঙ্গার সূচনা, অর্থাৎ যে পুলিশবাহিনী ছিল ইংরেজ শাসনকে নিরাপদ রাখবার এক শক্তিশালী যন্ত্র তার মধ্যে দাঙ্গার বিস্তৃতি। ঠিক সেই সময়ে নজরুলের এই কথা 'ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন তবে স্বর্ণলঙ্কা পোড়া' কথার একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল। অর্থাৎ আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের আগুনে দেশকে যখন ওরা পুড়িয়ে মারতে চেয়েছে তখন ওদেরই শাসনযন্ত্রকে বিকল করে দেওয়ার জন্য ছড়িয়ে পড়ুক সে আগুন পুলিশের ব্যারাকে ব্যারাকে, থানায় থানায় আর ফাঁড়িতে। কিন্তু সেদিন চতুর ইংরেজ বুঝেছিল আর নয়—Thus far and no further করো। মাত্র তখনই দাঙ্গা বন্ধ করতে এগিয়ে এল ইংরেজ শাসকেরা। একথা বলছিলাম এই জন্য যে নজরুল হিন্দু-মুসলমানের কবি, সম্মিলিত বাংলার একান্ত ঘরোয়া কবি।

কবি শুধু যে দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান লিখেছিলেন তা নয়। অনেব ধ্রুপদী গুণেব তিনি প্রস্ফুটিত প্রতিভা। তাঁর ভাটিয়ালী, তাঁর শ্যামাসংগীত, আধুনিক ভালবাসার গান, তাঁর গজল, বাংলা সংগীত-জগতে নতুন নতুন সব দিগন্ত। তাছাড়া এসব বিষয়ে তিনি এত লিখেছেন যে, সংগ্রহ করলে বোধকরি পাঁচ-ছ' হাজারেরও বেশি হবে। তাঁর পল্লীগীতির স্পর্শমাখা ভাটিয়ালী গানে যে ঐশ্বর্য তিনি দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার যেন কোন তুলনা হয় না। যেমন তাঁর "আমি ভালবেসে গেলাম ভেসে হলাম দেশান্তরী" অথবা "নদীর জল শুকায় রে ভাই আবার সে জল ফিরে/মানুষ গেলে ফিরে নাকি দিলে মাথার কিরে" কিম্বা "আয়না আছে পড়িরে ভাই আয়নার মানুষ নাই" এই যে সব কথাব মালা গাঁথা, এর কি কোন পরিমাপ কবা যায়—পড়া বা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের অন্তস্তলে কোথায় গিয়ে কি এক অনুরণন সুরু করে দেয় তা যেন ধরাও যায় না। অন্যান্য সব বিভাগীয় সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে গজল-গানের দিকে দৃষ্টি দিলে, বলতে হয় বাংলা সঙ্গীত জগতে গজল একেবারে নজরুলের নিজস্ব আমদানী। এর আগে এমন করে বাংলার শ্যামল সরস মাটির শান্ত-প্রশান্ত মহিমার সঙ্গে মিলিয়ে কেউ গজলকে রচনা করেন নি। 'কে বিদেশী মন উদাসী/

বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে' গানখানি যে কতখানি জনপ্রিয় তা একদিন প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরাই জানবেন। এখনও সে কথা সেদিনকার মানুষ ভুলে যান নি। তাই রবীন্দ্রযুগের ভাস্বর সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত পরিমন্ডলে কাজী নজরুলের বৈশিষ্ট্যমুখী প্রতিভার তুলনা আর কোন কবির সঙ্গে হতে পারে না এবং এই জন্যেই বলতে হয় এই যুগে তিনিও আরেক সূর্য।

দুর্ভাগ্য আজ বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আর দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের। এই কবি আজ নীরব। হারিয়ে ফেলেছেন তিনি স্মৃতি ও সামর্থ্য। সমগ্র বাংলা সাহিত্য ও জাতি চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে গেছে তাঁর ঐশ্বর্যময় সৃষ্টির প্লাবন থেকে। কবি আমাদের অনেক দিয়েছেন, আমরা তাঁর কাছে ঋণী। তিনি আরও দিতে পারতেন সেজন্যে মনে আমাদের অপরিসীম যন্ত্রণা। তবু বলতে হবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে একটি নাম—সে নামের পরিপূর্ণ মর্যাদা আমরা দিতে পারি নি। বোধকরি এ অকৃতজ্ঞতারও কোন ক্ষমা নেই। সত্যি বটে ভারত সরকার, পাকিস্তান সরকার কিংবা পশ্চিমবংগের যুক্তফ্রন্ট সরকার কিছু টাকা দিয়েছেন কবির দিন যাপনের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেই কি সব হবে? নজরুলকে সামান্য রিলিফ দিয়ে একটা জাতি কি শুধু তার কর্তব্য পালন করবে?

হয়তো একথা আজ আমাকে লিখতে হত না, যদি নজরুল সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকতাম। নজরুলকে তো দেশবাসী ভুলতে বসেছিল। ধন্যবাদ জানাই আমি নজরুল একাডেমীকে। লক্ষ্য করেছি কয়েক বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁরা দেশের এক অংশকে অন্ততঃ সচেতন করতে পেরেছেন। এই একাডেমীর মধ্যে এমন একটি মানুষ আছেন যিনি নজরুলের একান্ত আপনজন, স্নেহ এবং গর্ব। সেই অশীতিপর বৃদ্ধ মুজাফফর আহমদ আজও নজরুলের প্রতিভাকে দেশের সামনে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষায় সমানভাবে সচেষ্ট ও সক্রিয়। বছর বছর এঁরা আয়োজন করেছেন নজরুলের জন্মোৎসব পালনের, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমগ্র জাতির। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে 'ব্যবসায়িক লাভালাভের' সুযোগ না থাকায় অনেকে সরে পড়েছেন এবং অনেকে আবার ভিড়তেও চান নি। এই একাডেমীই নজরুলের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা সর্বপ্রথম সরকারের কাছে উপস্থাপিত করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার তা করবেনও স্থির করেন এবং ইতিমধ্যে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের দেয় অর্থের ওপর তাঁরাও মাসিক একশো টাকা মঞ্জুর করেন কিন্তু তার পরেই সূচনা হয় বাংলাদেশে রাজ্যপাল ধরমবীরের সেই কলংকময় অধ্যায়ের এবং সব পরিকল্পনাই তখন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই সময়েই নজরুলকে নিয়ে যারা ব্যবসা করতে চায় তারা সবাই ধরমবীরের স্নেহচ্ছায়ায় এসে জোটে। তারা যুক্তফ্রন্টের ত্রিসীমানায় যাবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ধরমবীর যুক্তফ্রন্টের পরিকল্পনায় কাঁচি চালিয়ে দশ কাঠা জমির লীজ দেওয়া দলিল ও বাড়ি তৈরির একখানি চেক তাঁদের হাতে দেন। সৌভাগ্যবশত আবার যুক্তফ্রন্ট গভর্নমেন্ট হওয়ায় ধরমবীরের দলিল ও চেক অক্ষত রয়ে যায়—যদি কংগ্রেস ক্ষমতায় আসত তাহলে যা ধরমবীর দিয়েছেন তাই ভাল বলে, সে জমি ও চেকের ভাগ্যে কি ঘটতো তা অনুমান করা বোধহয় কঠিন নয় এবং এই টাকায় বাড়ি হয় না বলে আরও কতবার যে টাকা বাগানো হত তাও এই প্রসংগে ভাববার কথা। এখন লক্ষণীয় এই যে, যুক্তফ্রন্টের ত্রিসীমানায় যাব না বলে ধরমবীরের কাছ থেকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে যাঁরা হাত পেতে এই লীজ দেওয়া জমির দলিল আর চেক নিয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে তাঁরাই আবার ফেরত দিতে এলেন কেন? খুব আশ্চর্যের কথা সন্দেহ নেই। কেন আগেই ঐ দলিল ও চেক তাঁরা ফেরৎ দেন নি—একথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? সোজা কথায় ঐ ঘটনার পর কংগ্রেস গদিতে এলে সম্ভাবনাটা বোধকরি উজ্জ্বলই হত। নজরুলকে নিয়ে একদল ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এই নোংরা প্রচেষ্টা দেশবাসীর উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

অত্যন্ত আনন্দের কথা পশ্চিমবংগের যুক্তফ্রন্ট সরকার এবার সরকারীভাবে কবির জন্মোৎসব পালন করবেন পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমীকে সংগে নিয়ে। কিন্তু এই উৎসবকে উপলক্ষ করে যেসব ব্যক্তি সরকারের চারিদিকে এসে ভিড় করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে সরকারকে একটু অবহিত হতে হবে। প্রথমত একদিন নজরুল সম্বন্ধে যাঁদের কোন মমতাই ছিল না, যাঁরা সর্বত্র তাঁর বিরোধিতা করে বেড়িয়েছেন, তাঁরা আজ হঠাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পাশে এসে নজরুল-দরদী সেজে যাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে এক শ্রেণীর লোককে দেখা যাচ্ছে যারা নজরুলকে প্রদর্শনীর উপকরণ হিসাবে তুলে ধরে কিছু টাকা-পয়সা হস্তগত করতে চাইছেন। তৃতীয়ত তাঁরাও এর মধ্যে রয়েছেন—যাঁরা প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রাদ্ধ করেছেন, রবীন্দ্রোৎসব উপলক্ষে জ্যোতি বসুকে 'ফ্যাসিস্ট' বলে বক্তৃতা করেছেন এবং সে বক্তৃতা সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপাতে দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন লোককেও জানি, দীর্ঘ বিশ বছর ধরে সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে যিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করে দূরে ছিলেন এবং সাংস্কৃতিক জগতে যখন ভারতরক্ষা আইনের স্টীম রোলার চলেছিল তখন গায়ে আঁচটিও লাগতে দেন নি, তিনিও এসে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নজরুল জন্মোৎসবে মাতব্বরী করছেন। এরকম রিপভ্যান উইংকলকে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার নজরুলের কি মাহাত্ম্য প্রচার করবেন তা আমি জানি না। তবে বলতে হয় এই আনাড়ীপনা যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে শোভন নয়।

পরিশেষে যে কথাটি বলতে চাই তা হচ্ছে কবি নজরুলের জন্য একটা স্থায়ী এবং সুসংগত ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিছু টাকা তিনি পাচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু গত ২০।২১ বছরের কংগ্রেস শাসনে যে মনস্তত্ত্ব দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে সে হচ্ছে যেখানেই টাকা সেখানেই দুর্নীতি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে অতোগুলো টাকা পাওয়া সত্ত্বেও নজরুলের দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণার এতটুকুও বোধ করি লাঘব হয় না। তাই পরিষ্কার প্রস্তাব হচ্ছে, অবিলম্বে একটি স্যানাটোরিয়ামে বিশেষ ডাক্তার ও নার্স প্রভৃতি নিয়োগ করে কবির জীবনের বাকি দিনগুলিকে শান্তিময় করে তোলার ব্যবস্থা করা হোক। তার পর তাঁর রচনাবলীর কথা। সেগুলিকে সরকার গ্রহণ করুন। যদিও জানি এ বিষয়ে ভারত তথা আন্তর্জাতিক কপিরাইট বিধানের প্রশ্ন উঠবে কিন্তু সেগুলিকে ভারত সরকারের সংগে ব্যবস্থা করে—এমন কি প্রয়োজন হলে আমাদের সংবিধানকেও সংশোধন করে সে ব্যবস্থা এখনই করে ফেলা উচিত। কারণ কাজী নজরুল কোন কৃপার পাত্র একজন হতমান কবি-শিল্পী নন—রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন ভারত দেখে যেতে পারেন নি এবং সেই দিক থেকে নজরুল সৌভাগ্যবান। তাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বাধীন ভারতের প্রথম জীবিত সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর মর্যাদা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রশ্নাতীত মর্যাদা।

নাচে ঐ কাল বোশেখী,
কাটাবি কাল বসে কি?
দেরে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি!
লাথি মার ভাঙরে তালা!
যত সব বন্দী-শালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি·

পরীক্ষা করে দেখেছি, বাঙালী পাঠকের কথা তো বলাই বাহুল্য, বাংলা ভাষার সঙ্গে একটু-আধটু পরিচয় হয়েছে এমন অবাঙালী শ্রোতাও উদ্ধৃত কিংবা তদনুরূপ দু-তিনটি পঙক্তি শোনামাত্রই বিমুগ্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন: "কার কবিতা? নজরুলের?" এক অর্থে, এইটেই যে-কোনো কবির শেষ প্রত্যাশা। শেক্সপীয়র-সমালোচনার শেষ কথাটি অনেকটা এ-রকম: যে-কোনো নাটক থেকে পাত্র-পাত্রীর নাম মুছে ফ্যালো: যে-কোনো অংশ পড়ে দ্যাখো, বলে দিতে পারবে বক্তা হ্যামলেট না ম্যাকবেথ; ক্লিওপেট্রা না জুলিয়েট্। এখানে কোনো তুলনা করা হচ্ছে না। করা যায়ও না। কিন্তু যা-কিছু কবিতা নয় তার সঙ্গে কবিতার এবং যাঁরা শুধু পদ্যলিখিয়ে তাঁদের সঙ্গে কবির মৌল তফাৎ এখানেই ধরা পড়ে। জাত-কবির রক্ষাকবচ এইটেই। নজরুল এই অর্থে জাত কবি। জাত-কবি। তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর মুখশ্রী হয় তো একেবারে অনিন্দ্য নয়: তদুপরি ইনি প্রসাধনবিমুখ। কিন্তু এঁর প্রতি অঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সতেজ প্রাণের লাবণ্য, জীবনানন্দের উজ্জ্বল, উচ্ছল আভা। এই সতেজ সমারোহ, এই প্রাণ-বন্যারই অন্য নাম যৌবন। নজরুল এই যৌবনের কবি। চারণকবি। এইটেই তাঁর নিয়তি; জীবনে এবং কাব্যে।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আগমন তো আগমন নয়, সে যেন আবির্ভাব; কাল বোশেখীর মত, ধূমকেতুর মত, উল্কার মত। নানাজন নানাভাবে বর্ণনার চেষ্টা করেছেন; আমাদের মনে হয়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত। সারাটা দেশ তখন আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরণোন্মুখ। এই বিস্ফোরণ, এই উদ্গিরণের বিপুল বিপর্যয়ের আগুনকে যাঁরা অতন্দ্র সাধনায় অকম্প, দীপ্ত হোমানলের রূপ দিতে পারেন তাঁরা কোটিতে গোটিক; তাঁদের নাম রবীন্দ্র-নাথ ও গান্ধী। তাঁদের জীবনে ও রচনায় মহাকাব্যের ব্যঞ্জনা। আর ঐ আগুনকে দাবানলে পরিণত করার, সমকালের উত্তেজিত হৃদ্‌স্পন্দনের তালে দুলিয়ে এবং মিলিয়ে দেবার দায়িত্ব নির্যাতি যাঁদের দেন তাঁরা রক্তরাঙা ফুলঝুরি হয়ে আকাশ-মাটিকে দীপামান করে তোলেন বটে কিন্তু নিজেরাও জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যান। এঁদের রচনায় ফেনিলোচ্ছল জীবনোল্লাস, জীবনে ট্রাজেডির নিবিড় ছায়া। এই ট্রাজেডি ব্যক্তির নয়, যুগসন্ধির ক্রান্তি-কালের। ক্রান্তিকালের চারণকবির।

ক্রান্তিকালের মহাকবি বিগলিত, মিশ্রিত, উদ্গীর্ণ লাভাপ্রবাহ থেকে অগ্নি-শিখাটিকে স্বতন্ত্র করে নিতে জানেন এবং পারেন, আর ক্রান্তিকালের চারণ-কবি,—তাঁর সমগ্র জীবনটিই যেন সেই তপ্ত, মিশ্রিত, অশোধিত লাভাপ্রবাহ। জীবনানন্দ দাশের মত যাঁরা বলেন নজরুলের কাব্যে "শেষ রক্ষার কোনো সন্ধান নেই", পরিণতির কোনো ইতি-হাস নেই, প্রথম এবং শেষ রচনা একই ধরণের, তাঁরা, এক অর্থে, ঠিক-ই বলেন; আবার অন্য অর্থে বলেনও না। নজরু-লের কাব্যবিবর্তনের যুগপর্যায় নেই। ঠিক কথা। কি করে থাকবে? যুগের নয়, যুগপর্যায়ের নয়, যুগসন্ধির যন্ত্রণা এবং বিক্ষোভকেই তিনি ভাষা দিয়েছেন; যুগসন্ধির প্রচণ্ড তাপ এবং বিচিত্র চাপই তাঁর কাব্যে—এবং শুধু কাব্যে নয়, জীবনেও—ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। কবিগান, যাত্রা, লাটো, ঝুমুরের আসরে অশ্রান্ত বিচরণ, ময়মনসিংহ-মাথরুণ—শিয়াড়শোলে অস্থির শিক্ষাচর্চা, রণ-ক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রে ধূমকেতুর মত বিচরণ, রঙ-বেরঙের পোষাক, বেপরোয়া হাসি, বেহিসেবি চলাফেরা 'দে গরুর গা ধুইয়ে'—জাতীয় উদ্দাম দৃষ্টিভঙ্গি এবং শেষ পর্যন্ত যোগচর্চার ইতিহাস—সব, সবই ঐ একসূত্রে বাঁধা। একই ছকে ঢালা। সে ছক যুগসন্ধির ট্রাজেডি। যুগসন্ধি মাত্রই নিছক কালগত নয়, ভাবগত: এবং নজরুলই এর একমাত্র বলি নন। সাহিত্যে মাইকেল, মঞ্চে শিশিরকুমার, চলচ্চিত্রে প্রমথেশচন্দ্র—হাজারো পার্থক্য থাকলেও—এঁদের প্রতিভার বিস্ফোরণে এবং জীবনের পরিণামে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। এঁরা উল্কার মত জ্বলে ওঠেন: উল্কার মত নিভে যান। যুগকে এঁরা এগিয়ে দেন, কিন্তু

যুগান্তরের উষায় চলে যান পাদ-প্রদীপের আড়ালে।

• স্তব্ধকণ্ঠ, হৃতসঙ্গীত, লুপ্তবোধ যাঁরা শুধু শারীরিক অর্থেই মঞ্চের নেপথ্যে বেঁচে থাকেন—লৌকিক অর্থে সান্ত্বনাদায়ক হলেও—তাঁদের ট্র্যাজেডি বোধ হয় আরো নিদারুণ, নিষ্করুণ। তাই অচিন্ত্যকুমার যখন লেখেন :

জানি তুমি কথা কইবে না,
গান গাইবে না
মৌনভঙ্গ হবে না এখানে।
আরো জানি এ মৌন তোমার
ব্যাধি নয়,
এ তোমার যোগ—এ যোগসমাধি।
তুমি নিঃস্ব নও, হৃতসর্বস্ব নও,
এ তোমার অক্ষুব্ধ আত্মতত্ত্বে
অবস্থান।
এ শুধু দেহস্থিতি নয়, এ এক
নবতর সত্তার উন্মোচন।
এ সঙ্গীতের স্তব্ধতা নয়,
এ স্তব্ধতার সঙ্গীত।

(নজরুল ইসলাম : বসুমতী, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫)

তখন এই তথ্যবিরোধী আরোপিত অলৌকিকতায় লৌকিক সান্ত্বনাও মেলে না; বরং কেমন যেন নিষ্ঠুরতা বলেই মনে হয়। হতে পারে 'অক্ষুব্ধ আত্মতত্ত্ব' যোগীর পরম কামনার ধন; হতে পারে 'স্তব্ধতার সঙ্গীত' স্থান-কাল-দেশোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠতর কোনো বস্তু; কিন্তু অফুরন্ত জীবনতৃষ্ণা যে-কবির আবেগের উৎস; ধ্বনি-কল্লোলিত জীবনবন্দনা যাঁর কণ্ঠে উৎসারিত তাঁর পক্ষে এটা আদৌ কোনো সান্ত্বনা নয়। বরং এই ভয়ঙ্কর নিয়তির মুখোমুখি হয়েও কবিকেই স্মরণ করা ভাল :

...তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
বধুরা প্রদীপ তুলে ধর!
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার
ঐ আসে সুন্দর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

কিন্তু শুধু 'জয়ধ্বনি' করলেই কবিঋণ নিঃশেষে শোধ হয় না। বছরের বিশেষ একটি দিনে ফুলের মালা, সুভাষিত উক্তি আর অত্যুক্তির স্তূপ গড়ে তুললেই কবিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আধুনিক মননের ইতিহাসে তাঁর দান কি, স্থান কোথায়, আজ-ও তাঁর কাছ থেকে আমাদের নেবার কিছু রয়েছে কি না,—এই ক'টি জরুরী প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর আজও বোধ হয় আমরা দিই নি। অর্থাৎ, কবিকে প্রদর্শনীর প্রাণহীন অঙ্গ করে রেখেছি, সপ্রাণ ঐতিহ্যধারার অঙ্গীভূত করে নিই নি। অথচ কাজটি সময় এবং ধৈর্যসাপেক্ষ হলেও দুরূহ নয়। এখানে ক'টি ইঙ্গিত-মাত্র দেওয়া যেতে পারে।

এক : সংখ্যার দিক থেকে নজরুল বোধ হয় বাংলার সর্বাগ্রগণ্য গীতিকার। প্রকৃতি, প্রেম, সমাজ, রাজনীতি, কৃষ্ণ, কালী, মহম্মদ—সকলকে নিয়ে এবং প্রায় সব বিষয়েই তিনি অজস্র গান রচনা করেছেন। শোনা যায় স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথের চেয়েও বেশি। কিন্তু আজ পর্যন্ত গানগুলির কোনো সমগ্র তালিকা রচিত হয়েছে কি? সংগ্রহের পথেই বা আমরা কতদূর এগিয়েছি?

দুই : আধুনিক বাঙালী কবিরা ভাব এবং ভাষা উভয়ক্ষেত্রেই অন্তত একটি স্তরে নজরুলের কাছে ঋণী। যেমন :

আমি প্রজাপতি মিঠা
মাঠে মাঠে সোঁদাল
সর্ষেখেতে—রোদের সফরে
খুঁজি নাক' ঘর
বাঁধি নাক' বাসা,—কাঁপি থর থর
অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর
শুঁড়ির গেলাসে মেতে।

* * *

আমি গো লালিমা, গোধূলির সীমা
বাতাসের লালফুল
আমি খুশরোজী—আমি গো
খেয়ালী,
চঞ্চল,—বুলবুল।

* * *

[জীবনানন্দ দাশ : যে কামনা নিয়ে]

আধুনিক বাংলা কাব্যের এই স্তরটি আজ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে এবং নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয় নি।

তিন : জাতীয় আন্দোলনের একটি স্তরে নজরুলের রচনা পূর্বভারতের সব ক'টি সাহিত্যে—এবং সম্ভবত দক্ষিণ-ভারতীয় সাহিত্যেও—গভীর প্রেরণা সঞ্চার করেছে। উদাহরণস্বরূপ আসামের জননেতা এবং কবি নবীনচন্দ্র বরদলৈর একটি কবিতা উদ্ধৃত হল :

ডেকা গাভরুর দল।
বীর-বীরাঙ্গনা দল।
নতুন তেজেরে রাঙলী রূপহী
করছি ধরণীতল।

* * *

বল আগুয়াই বল।
(ডেকা গাভরুর দল)
(স্মরণীয় : চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল......)

এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় সাহিত্যে নজরুল-প্রেরণার রূপটি বিশ্লেষিত হওয়া উচিত।

চার : নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু মুজফ্ফর আহ্মদ বলেছেন : "দ্বন্দ্ব-মূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কোনো কোনো সূত্র সে মানত ঠিকই, কিন্তু এই দর্শনটি কখনও সে যে আয়ত্ত করে নি

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

'কথা শুধু প্রাণে কাঁদে, ব্যথা শুধু বুকে বেঁধে, মুখে ফোটে শুধু আকুলতা'—নজরুল

দুর্গাদাস সরকার

সমস্ত ঝড় দুখের মধ্যে থমকে আছে।
সাগর-চোখের মধ্যে চুপ।
ঘূর্ণিতে মন ঘুরছে...ঘুরছে...
কোন্ বেদুইন মতান্তরে
দুখের মধ্যে দিয়েছে কুলুপ।

উঠবে আবার তরঙ্গ।
উড়বে আবার ধুলো।
ওষ্ঠ কাঁপবে, উঠবে সুরের ফেনা।
ঘূর্ণিতে মন ঘুরতে ঘুরতে
এই চলন্ত পৃথিবীর
সবাই আজ অচেনা।

বজ্রমুখর নির্ভীক কোন্ শিশু
(যার নেই চালচুলো)...... ?
তার স্বাগত-ই তোমার মধ্যে ভয়ঙ্কর।
উড়বে আবার ধুলো।
ঝরবে আবার নীল দরিয়ার জল।
দুপুর জ্যৈষ্ঠে জ্বলছে বহ্নি ভয়ঙ্কর।

সমস্ত লোক রাজপথে চঞ্চল।

এ কথাও ঠিক।" কিন্তু এর চেয়েও ঠিক কথা হল—অবশ্যস্বীকার্য তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও—সমগ্র পূর্বভারতীয় সাহিত্যে নজরুলই প্রথম সাম্যবাদী কবি। জনতার কবি। মিছিলের কবি। পরবর্তীকালের সুভাষ এবং সুকান্ত যে ঐতিহ্যটিকে অংশত বহন করছেন তার আদি উৎস নজরুল। বাংলা তথা পূর্বভারতীয় সাহিত্যে নজরুলের এই ভূমিকাটি আজও যোগ্য বিশ্লেষকের অপেক্ষায় রয়েছে।

পাঁচ : আজ, ১৯৬৯ সালের বাংলা দেশে সংস্কৃতি বলে কোনো বস্তু বোধ হয় আর অবশিষ্ট নেই; যা আছে তার নাম অপ-সংস্কৃতি। নর্দমা প্যান্ট আর মিনি স্কার্ট, টুইস্ট আর রক্ এণ্ড্ রোল, এল-এস্-ডি আর মদ, হিপি আর ইপি, বীট আর হ্যাংরি, হিন্দী ছবি আর যৌনপত্রিকা, কালোবাজার আর রকবাজি—এবং আরো অনেক কিছু বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে যে অন্ধকার বিবর-এ ঠেলে দিয়েছে এবং দিচ্ছে তা আকস্মিক কিছু নয়, দীর্ঘ, বিভ্রান্তিকর শরানুকরণের ফলশ্রুতি। পশ্চিম ইয়োরোপের সাহিত্য থেকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে গ্রহণ করেছি মিথুনাসক্তির প্রজাপতি-রঙা রূপ আর ইদানীং নিচ্ছি হরেক রকমের সার্কাসের প্যাঁচ। তাই সাহিত্যে আজ ফুটে উঠেছে নীরক্ত, বিবর্ণ, নিশ্চিত অবক্ষয়ের গাঢ় কালিমা। আসলে আমরা ভুলে যাই যে, ইয়োরোপের সমাজবিবর্তনের ধাপগুলো আমাদের দেশের সঙ্গে হুবহু মেলে না। দীর্ঘদিন পূর্বেই নজরুল এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন: ভিন্নতর প্রেরণার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ১৩৩১ সালে রচিত 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে ১৮৫২ খৃস্টাব্দের '14th December' স্মরণ করে—রুশসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে নজরুল বলছেন : "এই দিনই নির্যাতনের কংস-কারায় জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লবী শিশু।" ১৩৩৪ সালের পৌষসংখ্যা 'সওগাত'-এ প্রকাশিত একটি পত্রে নজরুল মন্তব্য করছেন : "এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্য নতুন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েট্স্, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রূপ-স্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়,—পুশ্কিন, দস্তয়ভস্কি, হুইট্‌ম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে বসবার অধিকার তারা পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে, এই ত' আমাদের সাধনা।" আজকের সঙ্কটে নজরুলের এই ইঙ্গিতটি অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। উত্তরকালের সচেতন প্রয়াসে ইঙ্গিতটি ফলবান হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু সে দায়িত্ব নিতান্তই উত্তরকালের। কবি যা দিয়েছেন, যা পেয়েছি, তার জন্যেই আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। জীবনে মহাকাব্যের ব্যঞ্জনা নেই? ঠিক কথা। কিন্তু তিনি রচনা করেছেন জীবনমহাকাব্যের পটভূমি, অগ্নিগর্ভ জাতীয় আন্দোলনের পটভূমি। বিপুল সংখ্যক নিখুঁত, নিটোল কবিতা নির্মাণ করেন নি? তা-ও ঠিক। কিন্তু প্রেরণা দিয়েছেন বিপুলতর সংখ্যক কবিকে, উদ্দীপ্ত করেছেন সমস্ত জাতিকে। সাম্যবাদের তত্ত্ব জানতেন না? সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনিই ভারতের সাম্যবাদী কবিকুলের প্রেরণা: অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী কবি। কবিকে আসলে তাঁর জীবনচরিতে পুরোপুরি পাওয়া যায় না; তাঁকে সার্থকভাবে পাওয়া যায় পাঠকের, শ্রোতার জীবনচরিতে। কাব্যের বিচার অলঙ্কারের পুঁথি দিয়ে নয়, তত্ত্ব এবং নজিরের গজকাঠির মাপেও নয়। কাব্যের শেষ বিচার পাঠকের মনে, প্রেরণার ব্যাপকতায়, উদ্দীপনার গভীরতায়। সে বিচারে নজরুল সসম্মানে উত্তীর্ণ। কালের কণ্ঠে গানের মালা অবশ্যই তিনি পরিয়েছেন: তা মহাকাল কিনা জানি না, কিন্তু যৌবন নিত্যযৌবন, অচরিতার্থ যৌবন, অপরাভূত যৌবন।

নজরুল ইসলাম এই যৌবনের কবি। বাংলা তথা ভারতের চারণকবি।

ভারত দর্শন

বেকার বিতাড়ন

দেশে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে, কিন্তু কোনো কার্যকরী বেকার সংগঠন নেই; যেমন ছাত্র সংগঠন আছে, নেই কোনও অভিভাবকদের সংগঠিত শক্তিতে চালিত সংস্থা। তথাচ বেকার যুবকদের মিছিল দিল্লীর সংসদ ভবনের দিকে এগিয়ে গেছল, মাথায় পেতে নিয়েছিল কংগ্রেসী পুলিশের লাঠি। ব্যাপারটি দেশব্যাপী বেকার সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তুতি রূপেই আজ গণ্য করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, দেশের তাবৎ তরুণ বেকারসমাজ যে এতে উৎসাহিত বোধ করবেন ও করছেন তাতে সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে কেবলমাত্র বেকাররা একই উদ্দেশ্যে এভাবে একই মিছিলে সামিল হয়ে সকলের টনক নড়িয়ে দিতে সক্ষম হন নি। এ ঘটনা তাই গুরুত্বপূর্ণ এবং আশাব্যঞ্জক। বেকার তরুণসমাজকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে এসেছে ইংরেজ আমল থেকে। কিন্তু তাতে তাঁদের বিশিষ্ট সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। দেশে এক-একটি পরিকল্পনাকাল উত্তীর্ণ হয়েছে আর বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। এর অন্যতম কারণ অবশ্যই জনসংখ্যাবৃদ্ধি। কিন্তু বেকারত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষে সেটা কোনও যুক্তি নয়। দেশের যুবশক্তিকে এইভাবে দিনের পর দিন অবহেলা করে এসে এই সমস্যাকে বাড়ানই হয়েছে, সুষ্ঠু সমাধানের পথ খোঁজা হয় নি। ফলত এক-একটি সংসারের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ নেমে এসেছে, একের সামান্য রোজগারের ওপর নির্ভরশীল হয়েছে বহু আর এদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে শুধু যে অক্ষম হয়েছেন তাই নয়, নতুন করে হাজার হাজার বেকার সৃষ্টি করেছেন কর্মে নিযুক্ত মানুষের রুজি-রোজগার বন্ধ করে দিয়ে। দেশে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের দিকে এইভাবে সরকারী নীতিই ঠেলে দিয়েছে উৎপাদনক্ষম যুবশক্তিকে।

১৫ই মে দিল্লীতে এই বেকার যুবকদেরই একাংশ নিজেদের দুর্গতিপূর্ণ অবস্থা সরকারের গোচরে আনার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন। সংসদ ভবনের চতুর্দিকে ১৪৪ ধারার পরিখা রচনা করে সংসদ ভবনকে যে সরকার দুর্গবিশেষে পরিণত রাখতে অভ্যস্ত, সেই কেন্দ্রীয় সরকারের পরিখা-রক্ষাকারীরা তাই বেকার যুবকদের ওপর চড়াও হয়েছিলেন ১৪৪ ধারার মর্যাদা রক্ষা করতে। কাগুজে আইনের দৃষ্টিতে ১৪৪ ধারা অমান্য করা বেআইনী নিঃসন্দেহ, কিন্তু শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার প্রতি পুলিশী আচরণ নির্মম এবং নিষ্ঠুর না হলেও ১৪৪ ধারার মর্যাদা রক্ষা করা যেতে পারত। কিন্তু যে সরকার দেশবাসীর ওপর কেবলমাত্র লাঠিবাজীতেই অভ্যস্ত সেই কংগ্রেসী সরকারের কাছে নির্মম ও নিষ্ঠুর ব্যবহার ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। সে সরকারের পুলিশ তাই বিশ বছরের অভ্যাস অনুসারেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অথচ কিছু কংগ্রেস সদস্য সহ প্রায় সকল বিরোধী সংসদ সদস্যই এ-জাতীয় আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন। এমন কি স্বয়ং ডেপুটি স্পীকারও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, শোভাযাত্রীরা শান্তিপূর্ণ যতক্ষণ, ততক্ষণ তাঁদের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুমতি দান করা উচিত ছিল। তিনি বলেছেন, সরকারের এ বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত।

কংগ্রেসী সদস্য শ্রী কে এন তেওয়ারী বলেন, প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে সংসদ সদস্যদের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করার।

জনসঙ্ঘের শ্রীবলরাজ মাধোক ভয়াবহ বেকার সমস্যার উল্লেখ করে বলেছেন যে, নাগরিকদের সংসদ সদস্যগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কোন প্রতিবন্ধক রাখা অনুচিত। কম্যুনিস্ট সদস্যগণ উভয়কক্ষেই এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে মন্তব্য করেছেন যে, সংসদের কাজ চালাবার জন্য ঐ স্থানটিকে একটি বন্দীশিবিরে পরিণত করার কোনও অর্থ হয় না। পুলিশ নয়, সুষ্ঠু কর্মপরিচালনার অধিকারী অধ্যক্ষ। পুলিশ প্রত্যাহার করে নেওয়া দরকার।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন অবশ্যই পুলিশী হস্তক্ষেপের সাফাই গেয়েছেন। তাঁর মতে মিছিলকারীদের কেবলমাত্র গ্রেপ্তার করাই হয়েছে। মারধোর করা হয় নি।

কিন্তু প্রশ্ন শুধুমাত্র পুলিশের মারপিট সংক্রান্ত নয়, প্রশ্ন হল সংসদ ভবনকে ১৪৪ ধারার পরিখার আড়ালে রক্ষা করার বস্তুতই কোনও প্রয়োজন আছে কি না।

রাজ্যসভাও কি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান নেবে ?

রাজ্যসভাও বাতিল করার পক্ষে সম্প্রতি কয়েকটি কণ্ঠস্বর সোচ্চার হতে শোনা গেছে যখন লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এবং বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ (বিলোপ) বিলটি গৃহীত হয়। অর্থাৎ সেই শাশ্বত উক্তিরই পুনরাবৃত্তি শোনা গেছে : বাংলা আজ যা ভাবে সারা ভারত তাই ভাববে আগামীকাল। এক রকম তাই তো হয়ে গেল ১৬ই মে-র লোকসভার অধিবেশনে। পশ্চিমবঙ্গের ওপর আলোচনাকালে অনেক সদস্যই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণের পক্ষে মন্তব্য রেখেছেন। কেউ কেউ চেয়েছেন, রাজ্যসভাও বাতিল হোক। কেউ চান রাজ্যসভায় প্রতি রাজ্য থেকে থাক সমান প্রতিনিধিত্ব।

এ সকল প্রস্তাব উত্থাপনের জোরদার সুযোগ পশ্চিমবঙ্গই তৈরি করে দিল। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে বাঙালীর সর্বভারতীয় ভূমিকা খর্ব করার সুচতুর প্রয়াস কালপ্রবাহে সুফলপ্রসূ হবে না, এ বিশ্বাস জাতীয় গৌরবে বিশ্বাসী অনেকেরই থেকে থাকলেও, আবার অনেকেরই ছিল না বা নেই। তাঁরা চিরকালই হতাশার শিকার। আত্মহননেচ্ছু। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী দাপটের ভারে অবনত শীর্ণাকৃতি পশ্চিমবঙ্গ এতাবৎকাল ন্যুব্জ এবং দুর্বল হয়েছিল। তার কণ্ঠে ছিল না প্রত্যয়দৃঢ় বচন, চোখে ছিল না বিশ্বাসের দীপ্তি। কেন না ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃত্ব ছিলেন দিল্লীর হুকুম-দাস। আজ পশ্চিমবঙ্গের অকংগ্রেসী

সরকার যেমন প্রত্যয়দীপ্ত, পশ্চিমবঙ্গবাসীও তেমনি আশাবাদী চিন্তায় প্রবুদ্ধ হয়ে উঠছেন। আজ আর কেন্দ্রীয় কংগ্রেসরাজের দাসত্বের ভার পশ্চিমবঙ্গের কাঁধে উদোর বোঝার মতো চেপে বসে নেই। পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে স্বাধীনভাবে দিল্লী-নিরপেক্ষ চিন্তার সুযোগ। বর্তমান নেতৃত্ব এনে দিয়েছেন জনমনে মর্যাদাবোধ ও আত্মপ্রত্যয়। আজকের এই পশ্চিমবঙ্গের বত্রিশ দফার এক দফা তাই পঞ্চমুখে প্রশংসিত হয়ে রাজ্যের স্কন্ধদেশ থেকে বিধান পরিষদের বোঝা নামিয়ে দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছে। লোকসভায় একমাত্র স্বতন্ত্র সদস্যদের বিরূপতা ছাড়া কেউই ব্যয়বহুল দ্বিকক্ষীয় আইনসভার পক্ষপাতী নন বলে জানা গেছে। যদি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রতি স্বতন্ত্রসুলভ আকর্ষণ আর কারও না থাকে, তবে আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গের অনুসরণে অন্য দু-একটি রাজ্যেও এক কক্ষ আইনসভার দাবি উঠবে অতঃপর। রাজ্যসভা বাতিলের প্রশ্নটিও পুনরায় আলোচ্য হবে নিশ্চয়ই।

তবে বিলটির উত্থাপক কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী পি গোবিন্দ মেনন রাজ্যসভা বাতিলের বিপক্ষে। অবশ্য এই মত তাঁর ব্যক্তিগত। শ্রীমেননের অন্যদিকে ব্যক্তিগত মত আছে রাজ্যের বিধান পরিষদ বাতিলের পক্ষে।

বাংলা যা ভেবেছে ও করেছে তা অনুসরণযোগ্য। অন্যান্য রাজ্যেও দ্বিতীয় কক্ষের আড়ম্বর ও সেই হেতু তার জন্য সরকারী কোষের অর্থব্যয় প্রথা অচিরে অবলুপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যেও তা অভিনন্দিত হবে বলেই বিশ্বাস। সুতরাং শুভস্য শীঘ্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মিশনারীদের মিশন

মিশনারীদের ভারতবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও অভিযোগ শোনা গেছে। সম্প্রতি লোকসভায় পি এস পি সদস্য শ্রীহেম বড়ুয়া এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেছেন। তাঁর অভিযোগ, জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী না কি খৃস্টান মিশনারীদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পেয়ে থাকেন। উক্ত মন্ত্রী মহোদয় কী বাবদে টাকা পান, সংবাদে অবশ্য তার উল্লেখ নেই। তবে একথাও বলা হয়েছে যে, ঐ মিশনারী সংস্থাটি আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরায় সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। বলা বাহুল্য সীমান্ত অঞ্চলে মিশনারী পাদ্রীরা যে ভারতহিতকর কাজ না করে ভারতবিরোধী প্রচার চালাবার জন্যই তাঁবু গাড়ছেন, এ সংবাদ আজ কারও অবিদিত নেই। একদিন বণিকের ছদ্মবেশে বিদেশীরা এসেছিল, কেল্লা গড়েছিল, মিরজাফরের সৃষ্টি করেছিল। আজ তত-দূর না হলেও ভারতবিরোধী প্রচারকার্যই তাদের 'মিশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুন্নত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা চালাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচারকার্য।

এমন অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিশনারী সংস্থার সঙ্গে কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর যোগসাজস যদি অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হয়, তবে সেই ঘৃণিত কার্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করার মতো দেশবৈরিতার জন্য কঠোর শাস্তির আয়োজনে অন্যতর কোনও প্রশ্ন যেন না সেখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে সকল সদস্যেরই।

সুখের বিষয় অনিষ্টকারী বিদেশী মিশনারীদের অবাধ প্রচারের ও দুষ্কার্যের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি রাখছেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা জানিয়েছেন। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই মর্মে একটি বিলও বিবেচনাধীন আছে।

কিন্তু শুধু সরকারের 'অতি তৎপর' দপ্তরগুলির ওপর নির্ভর করলে অনিষ্টকারীদের টিট করা সম্ভব হবে না। এঁরা বস্তুতই 'মিশনারী'। বিদেশ থেকে ছুটে আসেন মানবমুক্তির মন্ত্রের মালা কোমরে ঝুলিয়ে। সুতরাং এঁদের কর্তব্যের টান কতখানি তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিদেশী সংস্থাগুলিও জলের মতো অর্থ ব্যয়ে কসুর করেন না এবং আমাদের এই দেশে বিভীষণরা হাটে-মাঠে-বাজারে এবং এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে গভীর চক্রান্তে সর্বদাই মশগুল আছেন।

এ সমস্তই সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকগণেরও লক্ষ্য করার বিষয়। সন্দেহজনক সংস্থাগুলির ওপর নজর রাখা এবং অন্যতর অসুবিধা বোধ করলে নিজের নিজের নির্বাচিত এম এল এ, এম পি-র অন্তত গোচরে আনা যাতে কাজ হয়। অনেক সময় পাহারাদারই থাকেন আসল ডাকু। সেক্ষেত্রে সংবাদ থাকলেও তা পরিবেশনে সাধারণ মানুষ ভয় পান। কিন্তু জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপ জেনেও চুপ করে দেখা একটা নাগরিক অপরাধ, দেশবৈরিতা। সুতরাং তাঁরাও সে সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংবাদ তাঁদের জনপ্রতিনিধির গোচরীভূত করে দেশদ্রোহীদের চিনিয়ে দিতে পারেন এবং সেটা তাঁদের কর্তব্যও।

একটা কথা সর্বদাই স্মরণে রাখা দরকার যে, বিদেশী অপপ্রচারকারী কখনো আমাদের স্বদেশীর মঙ্গলকামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচার অভিযান চালান না। তাঁদের নকল 'মিশনে'র আড়ালে থাকে অন্তর্বর্তী চক্রান্তের আসল মিশন। এঁদের কীর্তিকলাপকে অবহেলার চোখে দেখা মারাত্মক। তেমনি মারাত্মক এঁদের কাছে পয়সা খেয়ে যাঁরা বিভীষণ বনেন তাঁরা। তাঁদের অপরাধও ক্ষমার অযোগ্য।

মেনন-পাতিল

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একযোগে লোকসভায় চলে এলেন। মেনন পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর থেকে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে, পাতিল বনস্কণ্ঠ (গুজরাট) থেকে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে। দুজনেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী। মেনন-পাতিলকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একারণেই বলা হচ্ছে যে, পাতিলের সমর্থিত প্রার্থীর কাছেই তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। এ পরাজয় ছিল প্রতিক্রিয়াশীল বলপ্রয়োগের কাছে একজন গণতন্ত্রী নেহরুবাদীর পরাজয়। মেননের পরাজয়ের পেছনে সেদিন ছিল 'শিবসেনা'র উন্মত্ত ফ্যাসিস্ট ভীতি প্রদর্শন। মেদিনীপুরে মেননকে পরাজিত করার জন্য একই রকম আঞ্চলিকতাবাদী শ্লোগান সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্টের সমর্থন সেই সব নোংরা রাজনীতির হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে। পাতিল নির্বাচিত হওয়ার পর হৃষ্টচিত্তে ঘোষণা করেছেন, তাঁর জয় এটাই প্রমাণ করে যে, গুজরাটে কম্যুনিজমের স্থান নেই। কিন্তু বোম্বেতেই কি ছিল, যখন গত সাধারণ নির্বাচনে পাতিল সাহেব সেখানে ধরাশায়ী হয়েছিলেন? সেখানে বরং তাঁর প্রশ্রয়পুষ্ট 'শিবসেনা'র দাপট ছিল, যা বনস্কণ্ঠে অনুপস্থিত। সুতরাং কথাটা অন্যভাবে বলা উচিত; তা হল আকণ্ঠ কম্যুনিস্ট-বিরোধী অঞ্চল ব্যতিরেকে পাতিল সাহেব কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাহস পান নি। শুধু তাই নয়, বনস্কণ্ঠকে উপযুক্ত এলাকা বলে বাছাই করার মূলেও পাতিলের মনে এই ধারণাই ছিল যে, বোম্বের চাইতেও মানসিকভাবে অনগ্রসর এলাকা ছাড়া তাঁকে প্রতিনিধি হিসাবে অন্যতর কোনও অঞ্চল নির্বাচিত করবে না। বনস্কণ্ঠে তিনি যে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলেন সে আসনটি ছিল স্বতন্ত্র দলের দখলে এবং সেই আসনে পাতিলের প্রতিদ্বন্দ্বীও দাঁড়ালেন স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী। কিন্তু স্বতন্ত্র দলকে আসনটি পাতিলের কাছে হারাতে হল। এ জয় সুতরাং উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

(১৭।৫।৬৯)

নিকসন জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের দশ-দফা পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ভিয়েতনাম ঃ

প্যারিস শান্তি-আলোচনায় দীর্ঘকাল একটানা ভাটার পর সম্প্রতি কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

গত সপ্তাহে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের পক্ষ থেকে ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধানের জন্য-এক দশ-দফা পরিকল্পনা সম্মেলনে পেশ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন মুক্তিফ্রন্ট বা ভিয়েত কং-দের এই দশ-দফা পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান, এবং নিজের পক্ষ থেকে আর একটি আট-দফা পরিকল্পনা উপস্থিত করেন।

জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের পরিকল্পনার মূল বক্তব্য হল ঃ অবিলম্বে বিনাসর্তে ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য তাঁবেদার সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। তারপর মুক্তিফ্রন্ট এখন বলছে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতনামী সৈন্যের সমস্যা ভিয়েতনামের লোকেরাই মিটিয়ে নেবে। এই কথাতে মার্কিন কর্তৃপক্ষের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি মুক্তিফ্রন্ট (বা উত্তর ভিয়েতনাম) স্বীকার করছে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে প্রেরিত সৈন্য আছে এবং গেরিলাদের আড়ালে তারাই যুদ্ধ করছে?

তাছাড়া মুক্তিফ্রন্ট দুইটি স্তরে দক্ষিণ ভিয়েতনামে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছে। প্রথমে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনসমষ্টির বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশের লোক নিয়ে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হবে। যুদ্ধের অবসান ঘটানো হবে এই অস্থায়ী সরকারের প্রধান কাজ। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি জাতীয় যুনিয়ন সরকার 'বসানো' হবে। এই 'বসানো' (instal) কথাটিতে মার্কিন পক্ষ একটু চিন্তিত। কমিউনিস্টদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে সরকার গঠন করা হবে?

দুই ভিয়েতনামের মিলনের কথাও রয়েছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রস্তাবে।

উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে পরামর্শ করেই জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট এই প্রস্তাব করেছে। উত্তর ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর বিশিষ্ট সদস্য ও প্যারিস শান্তি-আলোচনায় উত্তর ভিয়েতনাম প্রতিনিধিদলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা লে ডুক থো হ্যানয়, পিকিং ও মস্কো ঘুরে আসার পরই; জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধিদলের শ্রীমতী নুয়েন থি বিন এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।

মার্কিন সরকার খুব সতর্কতার সঙ্গে মুক্তিফ্রন্টের এই দশ-দফা পরিকল্পনা বিবেচনা করে দেখেছে। রিচার্ড নিকসন পররাষ্ট্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হেনরী কিসিঞ্জারের সঙ্গে এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

অবশেষে ১৪ই মে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত টেলিভিশন ভাষণে নিকসন মুখ খুলেছেন। তিনি জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের দশ-দফা পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই সঙ্গে তিনি নিজে আর একটি আট-দফা পরিকল্পনা পেশ করেছেন।

নতুন নিকসন পরিকল্পনার মূল কথা হল ঃ

(১) আগামী বারো মাসের মধ্যে পারস্পরিক ভিত্তিতে উভয়পক্ষ দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করবে;

(২) বিদেশী সৈন্যের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে চলবে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে যুদ্ধবিরতির কাজ; এবং,

(৩) তারপর, সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবাধ ও ন্যায্য নির্বাচন হবে, এবং তাতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সকলের অংশগ্রহণের পূর্ণ সুযোগ থাকবে।

নিকসন নিঃসর্তভাবে একতরফা মার্কিন সৈন্য অপসারণের দাবি মানেন নি। আর অপর পক্ষের এটিই হল প্রধান দাবি।

স্বাভাবিকভাবেই উত্তর ভিয়েতনাম ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নিকসন পরিকল্পনাকে গ্রহণের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। প্যারিস বৈঠকে উত্তর ভিয়েতনাম প্রতিনিধিদলের নেতা জোয়ান থুই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, তাঁরা এই পরিকল্পনার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করবেন না। সেই পুরোনো কস্তাপচা কথা! উত্তর ভিয়েতনামের যে সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধ করছে, তাদেরও সরাতে হবে। উত্তর ভিয়েতনাম এ রকম কোন কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। সোভিয়েট যুনিয়নও নিকসন পরিকল্পনার নিন্দা করে বলেছে, বিনা সর্তে মার্কিন সৈন্য অপসারণের কোন কথা এই পরিকল্পনায় নেই।

মার্কিন কর্তারা কিন্তু এতে হাল ছাড়েন নি। ১৬ই মে প্যারিসে শান্তি-আলোচনায় যে ১৭তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসেছে, তাতে ভাষণ দিতে গিয়ে মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতা হেনরী ক্যাবট লজ বলেছেন, নিকসন পরিকল্পনায় কমিউনিস্টদের অনেক দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেই তাঁরা সব সৈন্য সরিয়ে নেবেন। রাজনৈতিক মীমাংসা বাদ দিয়ে কেবল সামরিক মীমাংসা সম্ভব নয়।

নিকসন 'পারস্পরিক ভিত্তিতে' সৈন্যাপসারণের প্রস্তাব করলেও বিভিন্ন

সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, উত্তর ভিয়েতনাম এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে রাজী না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবেই সৈন্য সরানো শুরু করবে। নিকসন বলেছেন, দক্ষিণ ভিয়েতনাম কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি ধীরে ধীরে মার্কিন সৈন্য অপসারণ করা হবে। মার্কিন সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামকে ত্যাগ করবে না, তবে যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামকেই গ্রহণ করতে হবে। কিভাবে এ কাজ সম্ভব, তা পরের কথা। তবে মার্কিন কর্তারা এখন এই কথা বলছেন। যেভাবেই হোক, মার্কিন সৈন্য দেশে ফিরিয়ে নেবার কাজ অচিরেই শুরু হবে।

আর এইটিই হল ভরসার কথা। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে মুক্তিফ্রন্টের দশ-দফা, আর নিকসনের আট-দফা, একেবারে বিপরীতমুখীন নাও হতে পারে। দুই-এর মধ্যে মিল খুঁজে বের করে একটা আপোষসূত্র সন্ধানের চেষ্টা ইতিমধ্যেই কূটনৈতিক মহলে শুরু হয়ে গেছে। লক্ষণীয়, দু' পক্ষের কেউ এবার খুব একটা গাল দেয় নি অপর পক্ষকে।

মালয়েশিয়া ঃ

গত সপ্তাহের নির্বাচনে মালয়েশিয়ার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জোট বা অ্যালায়েন্স খুব ভাল ফল করতে পারে নি। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে তাদের আসন সংখ্যা কমেছে। মোট ১৪৪টি আসনের মধ্যে যে ১১৩টি আসনের ফল প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে জোট পেয়েছে ৭৬টি, আর বিরোধীরা ৩৭টি। বোর্নিও ও সারাওয়াকের নির্বাচন এখনও বাকি। তাছাড়া ৪টি রাজ্যে সরকারী জোট পরাজিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান নির্বাচনের ফলাফল দেখে খুবই মুষড়ে পড়েছেন। এতদিন পার্লামেন্টে তাঁর জোটের দুই-তৃতীয়াংশের ওপর সংখ্যাধিক্য ছিল, এবং তিনি যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে। এবার তা হবে না। তাছাড়া টুংকুর নিজের দল 'য়ুনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের' ফলও ভাল হয় নি।

পার্লামেন্টে এবার প্রধান বিরোধী দল রূপে আবির্ভূত হয়েছে ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টি। লিম কিত সিয়াং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই দলটি চীনাদের নিয়ে গঠিত। এতদিন চীনাদের প্রধান দল ছিল মালয় চাইনিজ অ্যাসোসিয়েশন, এবং এই দল সরকারী জোটের অন্তর্ভুক্ত। এবার চীনাদের অধিকাংশ চাইনিজ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তে ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টিকে সমর্থন করেছেন। অ্যাসোসিয়েশনের দু'জন বিশিষ্ট নেতা টুংকু মন্ত্রিসভার সদস্য ডঃ পো ও ডঃ লিম অ্যাকশন পার্টির প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

আর একটি দল নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তা হল প্যান মালয়েশিয়া ইসলামিক পার্টি। মালয়ী মুসলমানদের দল এটি। টুংকুর ন্যাশনাল পার্টির সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে এই সাম্প্রদায়িক দল।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই

টুংকু আবদুল রহমান

অনেকেই ভাবছিলেন, দুটি সাম্প্রদায়িক শক্তির এই আবির্ভাবের ফল শেষ পর্যন্ত কি হবে। কিন্তু এত শীগগিরই যে এই পরিণতি দেখা দেবে, তা অনেকেই ভাবতে পারেন নি।

১২ই মে থেকে শুরু হয়েছে রাজধানী কুয়ালালামপুরে ও অন্যান্য শহরে মালয়ী ও চীনাদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা। পুলিশ দিয়ে দাঙ্গা থামানো যায় নি। সৈন্যদল ডাকতে হয়েছে। এক কুয়ালালামপুরেই দুশোর ওপর মারা গেছে, আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। ঘর-বাড়ি জ্বলেছে প্রচুর, ক্ষতির পরিমাণ বিরাট।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আয়ত্বের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হওয়ায় সমগ্র মালয়েশিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসন পর্যায়ে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে।

১৫ই মে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সকল সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যে সব নির্বাচন বাকি ছিল তা বন্ধ রাখা হয়েছে, নব-নির্বাচিত পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান বন্ধ করা হয়েছে এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছে একটি জাতীয় অপারেশন কাউন্সিলের হাতে। সহকারী প্রধানমন্ত্রী টুন আবদুল রেজ্জাক হয়েছেন এই কাউন্সিলের ডিরেক্টর। এখনও টুংকু আবদুল রহমান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং সেই হিসাবে টুন আবদুল রেজ্জাক তাঁর কাছে দায়ী। কিন্তু অপারেশন কাউন্সিলের ডিরেক্টর-রূপে টুন আবদুল রেজ্জাকই প্রকৃতপক্ষে এখন চরম ক্ষমতার অধিকারী।

টুন আবদুল রেজ্জাক ছাড়া আর যাঁরা জাতীয় অপারেশন কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন, তাঁরা হলেনঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ইসমাইল, অর্থমন্ত্রী তান সিউ সিন, পূর্তমন্ত্রী ভি টি সামবানথন, তথ্যমন্ত্রী সেনু এবং পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ও সেনাবাহিনীর তিন প্রধান।

এই দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে বিরোধী দলের বিশিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে পার্লামেন্টের নবনির্বাচিত কয়েকজন সদস্যও আছেন। টুংকু আবদুল রহমান প্রথমে দাঙ্গার সব দায়িত্ব কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদীদের ওপর চাপাতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করেছেন। এ নেহাৎই জাতি-বিদ্বেষপ্রসূত গোলযোগ। তবে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক ও রক্ষণশীল দলের উস্কানি রয়েছে এর পেছনে।

মালয়েশিয়া সরকার কঠোরভাবেই দাঙ্গা থামাবার চেষ্টা করছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বহু জাতি অধ্যুষিত এই ক্ষুদ্র দেশে যেভাবে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তাতে এখানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি হবে, তাই অনেকেই চিন্তিত বোধ করছেন।

আর প্রশ্ন দেখা দিয়েছেঃ টুংকু আবদুল রহমানের নেতৃত্ব কি অস্তাচল-গামী? শক্তির কেন্দ্রবিন্দু থেকে তিনি যেন সরে যাচ্ছেন।

(১৮-৫-৬৯)

খাদ্যের ছড়াছড়ি

কিন্তু পৃথিবীর অর্ধেক লোক খেতে পায় না

রেণু ঘোষ

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নির্মম অব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বাংলা দেশে লাখ পঞ্চাশেক লোকের পরমায়ুশেষ হয়েছিল। তারপর ২৬টা বছর কেটে গেছে। ইংরাজরা দেশ ভাগ করে বিদায় নিয়েছে। ভারতবর্ষে ভারতীয়দের শাসন কায়েম হয়েছে এবং দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্য তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজও গত ১লা এপ্রিল থেকে সুরু হয়ে গেছে। তাতে কাগজে-কলমে আমাদের জাতীয় সম্পদ, জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আরও বেড়েছে। তার চেয়ে ঢের বেশি বেড়েছে দেশের মুষ্টিমেয় বণিক সম্প্রদায়ের বিষয় সম্পদ। কিন্তু বড় বড় দু'টি মৌলিক সমস্যার কোন সমাধানই হয় নি। একটি খাদ্য অপরটি বেকার।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর থেকে ভারতে দুর্ভিক্ষের অবস্থা আর কাটতেই চাইছে না। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হিসাবে কাব্য ও সাহিত্যে বন্দিত ভারতবর্ষ বছরের পর বছর বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করে দেশের লোককে খাওয়াতে বাধ্য হচ্ছে। এমনও বছর গেছে, যখন জাহাজ থেকে খাদ্যশস্য সরাসরি গৃহস্থের রান্নাঘরে গিয়ে হাজির না হলে উপবাস ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এই আমদানী খাদ্যশস্য নামে 'সাহায্য' হলেও আসলে পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক লেন-দেন। হয় নগদ টাকায় বিদেশের বাজার থেকে এই খাদ্যশস্য ক্রয় করতে হচ্ছে, না হয় কঠোর ঋণের সর্তে এই খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে। নিঃসর্ত দান হিসাবে একদানা গম অথবা চালও বিদেশ থেকে ভারতে আসে নি। আমরা প্রভূত লোকসান দিয়ে বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করে বহু কষ্টে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি, তার একটা মোটা অংশ খাদ্যশস্য ক্রয় করতেই খরচ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কলকব্জা যন্ত্রপাতি কিনে ভারতে শিল্পবাণিজ্য প্রসারের কোন সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ সেটার জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তা আমাদের হাতে থাকছে না।

গত দু' বছর দেশে খাদ্যশস্য মোটামুটি খারাপ হয় নি। এ বছর উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টন হতে পারে। ৫৩ কোটি মানুষের জন্য ১০ কোটি টন খাদ্যশস্যকে যথেষ্ট আখ্যা দেওয়া যায় না। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ২৪/২৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘাটতির পুরোটা সরবরাহ করতে পারবেন না বলেই জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের অভাব এখনও ঘোচে নি এবং এখনও বেশ কিছুকাল আমাদের আমদানী খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করতে হবে।

ভারতে আমদানী খাদ্যশস্যের বেশিটাই আসে আমেরিকা থেকে। তার প্রধান কারণ আমেরিকা ছাড়া আর কোন দেশের পক্ষে ভারতের বিপুল খাদ্যশস্যের চাহিদা পূরণের ক্ষমতা নেই। মার্কিন গমের কিছুটা নগদ দাম দিয়ে কিনতে হয়, আর বেশির ভাগটা পাওয়া যায় পি-এল—৪৮০ (পাবলিক ল'—নং ৪৮০) চুক্তি অনুযায়ী ঋণ হিসাবে। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাস থেকে আজ পর্যন্ত ভারত আমেরিকা থেকে কৃষিজাত পণ্য আমদানীর জন্য ১০টি চুক্তির করে মোট ২২৪০ কোটি টাকার ঋণে জড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন গম বিক্রয়লব্ধ টাকাটা স্পেশাল সিকিউরিটি হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা থাকে। এই তহবিলের গড়ে ৮০ শতাংশ ঋণ এবং অনুদান হিসাবে ভারত সরকারকে প্রদান করা হয়। ৬ থেকে ৭ শতাংশ দেওয়া হয় বে-সরকারী শিল্প বাণিজ্যে "কুলি ঋণ" হিসাবে। বাকীটা আমেরিকা এদেশে এবং বর্মা আর নেপালে খরচ করে। সম্প্রতি এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গভর্নমেন্টকে সতর্ক করে জানিয়েছেন যে, পি-এল—৪৮০ তহবিল স্থায়িভাবে আটক করে না রাখা হলে এই টাকা সুদ সমেত পরিশোধের সময় দেশে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে এবং তার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হু-হু করে বাড়তে আরম্ভ করবে।

সুতরাং আমেরিকা যে খাদ্যশস্য আমাদের সরবরাহ করে সেটা দান নয়, ঋণ। সেই ঋণ সুদে আসলে উশুল দিতে হচ্ছে এবং হবে।

ভারতে মার্কিন গম আমদানী এক সময় এত বেড়ে গিয়েছিল যে, আমেরিকা সারা দুনিয়ায় রটিয়ে দিয়েছিল যে সে দেশের মোট উৎপন্ন গম সে ভারতবাসীকে খাওয়াবার জন্য ব্যয় করছে। কথাটা সত্য কিনা জানা যায় নি, তবে মার্কিন গম ঋণের সর্ত যে খুব উদার নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। মার্কিন গম মার্কিন জাহাজে ছাড়া অন্য কোন জাহাজে ভারতে আনা যায় না। আইনে বাধে। সুতরাং এই শত শত কোটি টাকার গম আনতে যে কয়েক কোটি ডলার জাহাজ ভাড়া লেগেছে, তার পুরোটাই মার্কিন জাহাজী ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র নীতি মার্কিন নীতি অনুসরণ করে চলে না। সেখানে যখনই কোন মতভেদ দেখা দেয়, তখনই সিনেটররা গম সরবরাহ বন্ধের হুমকী দিয়ে থাকেন। পাক-ভারত যুদ্ধের পর বেশ কিছুকাল মার্কিন গম সরবরাহের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছিল। পরে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনসন প্রস্তাব করেছিলেন, পশ্চিমী দেশগুলো ভারতকে যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে থাকে তার একটা অংশ মার্কিন গম ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে। পরে তাঁরা জানিয়ে দেন, গমের দাম ভারতীয় টাকার বদলে মার্কিন ডলারে শোধ করতে হবে। অর্থাৎ গ্রামের মহাজন গরীব চাষীকে ঋণ দিয়ে তাকে যেভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে, খাদ্যশস্য ঋণ দিয়ে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতের সঙ্গে আমেরিকা অনেকটা সেই রকম আচরণই করেছে। বিপন্ন ভারতের পক্ষে সেটা হজম করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে, এদেশে বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঋণ দিয়ে আমেরিকা ভারতের যা উপকার করেছে, তার চেয়ে নিজের উপকার করেছে অনেক বেশি। মুখে সে ভাব দেখিয়েছে, যেন মানবতার খাতিরে নিজেকে বঞ্চিত করে সে ভারতের মুখে অন্ন যুগিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, আমেরিকা যদি সে দেশের উদ্বৃত্ত গম এইভাবে কোটি কোটি অর্ধভুখ ভারতবাসীর মুখে পুরে দেবার সুযোগ না পেতো, তাহলে সেই দেশটা গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন না হয়ে পারত না। গত দু'বছর ভারত, পাকিস্তান এবং অন্যান্য কয়েকটি চিরাচরিত ঘাটতি এলাকায় খাদ্যশস্যের ফলন

দাম পাওয়ায় ঐ সমস্ত জায়গায় মার্কিন খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ কমে গেছে। তার ফলে ইতিমধ্যেই আমেরিকা এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য-রপ্তানিকারক-দেশগুলো তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য নিয়ে নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন।

গম উৎপাদক দেশগুলোর হাতে এখন ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন গম জমে গেছে। আগে প্রতি বছর এই ৫ কোটি টন গম বিশ্ব বাণিজ্যে রপ্তানির খাতায় জমা পড়ত। ইউরোপের কমন মার্কেটের দেশগুলোয় প্রাচুর্য বহুবিধ সমস্যার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। উদ্বৃত্ত চিনির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ টন। প্রতি বছর এটা আরও ৩ লক্ষ টন করে বাড়তে থাকবে। ইটালীতে ভূস্বামীরা তাদের ক্ষেতের শাক-সব্জী এবং বাগিচার ফলফুলারির মাঠেই ধ্বংস করে দিচ্ছে, কারণ সে সব জিনিষ কিনে খাবার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি ইটালীর কমলালেবুর বাগিচায় দেড় লক্ষ টন কমলালেবুতে পাক ধরেছে। সেই লেবু পাকতে সুরু করলে সেগুলো যে কি করা হবে, তাই নিয়ে ইটালীর কৃষি মন্ত্রণালয় মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। সম্ভবত খরিদ্দারের অভাবে এই দেড় লক্ষ টন লেবু সমুদ্রের জলেই বিসর্জন দিতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, এই দেড় লক্ষ টন লেবু ইটালীর বার্ষিক লেবু উৎপাদনের ১০ শতাংশ মাত্র।

কমন মার্কেটে মাখন মজুত হয়ে আছে ৩ লক্ষ টন। আগামী বসন্তকালের মধ্যে তার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মাখন মজুত করে রাখবার মত গুদোম আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কমন মার্কেটের কৃষিবিভাগ এখন মার্গারিনের বদলে মাখন দিয়ে রান্নাবান্না করবার জন্য ক্রেতাদের পীড়াপীড়ি করছে। যদি সত্যিই পশ্চিম ইউরোপের গৃহিণীরা মাখন দিয়ে রান্নাবান্না সুরু করেন, তাহলে আমেরিকার মহা বিপদ। মার্গারিন তৈরি করতে সয়াবিনের তেল দরকার হয়। আমেরিকা প্রতি বছর কমন মার্কেটের দেশগুলোয় ৫০ কোটি ডলারের সয়াবিন রপ্তানি করে। মার্গারিনের ব্যবহার উঠে গেলে সেই রপ্তানিটিও বন্ধ হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, মার্গারিনের ব্যবহার কমিয়ে দেবার জন্য কমন মার্কেট যখন ভোজ্য তেলের উপর টন প্রতি ৬০ ডলার করে ট্যাক্স ধার্যের প্রস্তাব করে, তখন আমেরিকা তো রেগেই আগুন। কমন মার্কেটকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, "তোমরা যদি সয়াবিন তেলের উপর ট্যাক্স বসাও, তাহলে আমরা মোটর গাড়ি আমদানীর (আমেরিকায়) উপর আমদানীশুল্ক বাড়িয়ে দেব। এই হুমকীর পর তেলের উপর আর ট্যাক্স বসে নি।

উন্নততর সার বীজ সেচ এবং চাষবাসের জন্য ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ভারতে এবং পাকিস্তানে গমের ফলন বেড়েছে ৪০ শতাংশ। তাই এখন আর বিশ্বের বাজারে গম কিনে খাবার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্বের পাঁচটি বৃহৎ গম রপ্তানিকারী দেশ (ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেণ্টিনা) খরিদ্দার বাগাবার জন্য নিজেদের মধ্যে মূল্য হ্রাসের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। ১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক শস্য চুক্তি অনুযায়ী গমের যে সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক কম দামেই তারা খরিদ্দারের ঘরে রাশি রাশি গম তুলে দিচ্ছে। ফ্রান্স কম্যুনিস্ট চীনের কাছে গম বেচবে বলে আলোচনা সুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা দাম অনেক কমিয়ে জার্মানী আর বৃটেনের কাছে গম বেচে দিচ্ছে। কানাডার গম বোর্ড আন্তর্জাতিক চুক্তি (মূল্য বিষয়ক) ভঙ্গ করতে চাইছিলেন না বলে সেখানকার কৃষক সম্প্রদায় দস্তুরমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। কারণ সেখানকার বাজারে গমের দাম হু হু করে পড়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের ভয়ে গম বোর্ড নীতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু কানাডার গম কিনবে কে? ১৯৬৬ সালে রাশিয়া কানাডার কাছে ১৫ কোটি বুশেল গমের অর্ডার দিয়েছিল। কিন্তু রাশিয়াও এখন গমে উদ্বৃত্ত। তারা আর এই গমটা নিতে চাইছে না।

গত মাসে গম রপ্তানিকারী বৃহৎ পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি গমের মূল্যের ক্রমহ্রাসমানতা প্রতিরোধের উপায় অনুসন্ধানের জন্য ওয়াশিংটনে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

আমেরিকার 'টাইম' পত্রিকা গত ৯ই মের সংখ্যায় লিখেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে পেটভরে খাওয়াবার মত যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য এখন পৃথিবীতে উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। ম্যালথাস বলেছিলেন, পৃথিবীতে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক বৃদ্ধির হারে আর জনসংখ্যা বাড়ে জিওমেট্রিক হারে। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার কোন সময়ই তাল রাখতে পারে না। এই তত্ত্বকে অভ্রান্ত ধরে নিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ্‌রা জন্ম নিয়ন্ত্রণকেই খাদ্যসমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলে বিধান দিচ্ছিলেন। মার্কসবাদীরা ম্যালথাসের তত্ত্বকে কোনদিনই আমল দেন নি। তাঁরা বলতেন, বিজ্ঞান এবং কারিগরীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাপিয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। পৃথিবীর বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি মার্কসবাদীদের সেই বক্তব্যের সঠিকতাই প্রমাণ করছে। সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণ হচ্ছে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ উৎপাদন সমস্যার সমাধান করতে পারলেও বণ্টন সমস্যার কোন সমাধান করতে পারছে না। তার ফলে একদিকে যেমন খাদ্যের অভাবে দেশে দেশে মানুষ অর্ধমৃত হয়ে জীবন কাটাচ্ছে, তখন অন্যান্য কয়েকটি সমৃদ্ধ দেশ বাজার দর উঁচু রাখবার জন্য হয় খাদ্যশস্য ধ্বংস করছে, না হয় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য নিয়ে সঙ্কট-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে বাধ্য হচ্ছে।

ভারত এবং পাকিস্তানে বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করছিল বলে আমেরিকা তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য এই দুই দেশে ধারে বিক্রী করে বিরাট মুনাফা অর্জন করেছে। অর্থাৎ ভারতের অন্ন সঙ্কট আমেরিকার সৌভাগ্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনায় ভারত পি-এল-৪৮০-র গম আমদানী বন্ধ করে দেবে শুনে আমেরিকা দস্তুরমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কেনবার লোক না পাওয়া গেলে মার্কিন কৃষিজীবীদের রোজগারের পথ সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে এবং তার ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পাবে। তখন অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের বাজারেও মন্দা দেখা দিতে বাধ্য। সেটা কি অর্থনৈতিক সঙ্কটের পথই প্রশস্ত করবে না?

পি-এল ৪৮০-র গম পেয়ে ভারতবাসী নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে কিন্তু আমেরিকা কি সেই ব্যবসায়ে আমাদের চেয়ে বেশি লাভবান হয় নি? সুতরাং আমেরিকার গম খেয়ে আমাদের হীনমন্যতায় ভুগবার তো কোন কারণই ঘটে নি বরং এই ভেবে আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পারি যে, আমেরিকার গম খেয়ে আমরা মার্কিন কৃষিজীবীদের বিলাসব্যসনে থাকবার পথ প্রশস্ত করেছি এবং উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের বিরাট সঙ্কটের হাত থেকে মার্কিন গভর্নমেণ্টকে রক্ষা করেছি। অতএব আমরা আমেরিকার প্রতি কতখানি কৃতজ্ঞতাবোধ করি, আমেরিকারও আমাদের সম্বন্ধে ততখানি কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা উচিত। এর মধ্যে দয়াদাক্ষিণ্যের কোন প্রশ্নই নেই। পি-এল ৪৮০ ষোল আনাই বাণিজ্যিক লেন-দেন এবং সেই লেন-দেনে ভারতের চেয়ে আমেরিকা অনেক বেশি লাভবান হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের কবিকুল ও বিদ্রোহী কবি নজরুল

অমিয়কুমার হাটি

নজরুল অর্থাৎ স্পর্শকাতর নাম—যেন যাদুমন্ত্র আছে, তাঁর নামে শিহরিত, রোমাঞ্চিত হয় না—এমন বাঙালী নেই। জীবন ও যৌবনের দৃপ্ত প্রতীক—মিথ্যা মোহ জড়তা কুসংস্কার অত্যাচার অনাচার শাসক শোষকের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের প্রাণপতাকা সদা উড্ডীন। নতুন সৃষ্টির বিপ্লবের বাণীবহ কবি তিনি।

রবীন্দ্রনাথ যেমন উভয় বঙ্গের বাঙালীর আত্মার আত্মীয়, নজরুলও তেমনি বাঙালীমাত্রেরই আত্মার সম্পদ। আজ কবিকণ্ঠ রুদ্ধ। কিন্তু ধ্যাননিমগ্ন হলেই কি তাপসের তপশ্চর্যা বন্ধ হয়? ধ্যাননিরত মৌনমুখর কবি নজরুল ইতিহাস হয়ে যেতে পারেন না। কোন কোন মানুষ ইতিহাস হন না। বিশেষত কবিরা। তাঁরা সর্বকালের। তাঁরা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। শুধু ইতিহাস নন।

স্পন্দিত-প্রাণ পূর্ববঙ্গের কবিকুলে ও জনমানসে স্বভাবতই নজরুল তাই স্মরণ্য এবং বরেণ্য। তিনিও জাতীয় কবি—উভয় বঙ্গেরই। রোগগ্রস্ত নজরুল আজ যেমন আমাদের মাথার মণি, সেই-রকম পূর্ববঙ্গেও তিনি সমধিক সমাদৃত। নজরুল সাহিত্যানুরাগী পূর্ববঙ্গবাসী বরং একধাপ এগিয়ে গেছেন। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যা সম্ভব হয় নি, তাঁরা তা সম্ভব করেছেন—কবির সমগ্র রচনা দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে। পূর্ববঙ্গের তিনটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী, নজরুল একাডেমী এবং বুলবুল ফাইন আর্টস একাডেমী। নজরুল একাডেমীর কাজ মূলত ও মুখ্যত সাহিত্যে গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সাধুজ্য। নজরুলের বিভিন্ন অভিভাষণ ও অপ্রকাশিত রচনার সংকলন "নজরুল রচনাসম্ভার" সম্পাদনা করেছেন কবি আব্দুল কাদের।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে নজরুলের সাদৃশ্য আছে। উভয়েই সাম্প্রদায়িকতার ঘোরতর বিরোধী। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি উভয়ের প্রাণের প্রার্থনা। উভয় কবিই চিরতরুণ মনের অধিকারী। উভয়েই জাতীয় কবি হয়েও আন্তর্জাতিকতার মূল্যায়ন চিত্রিত করেছেন তাঁদের কাব্যে। জনমানসের সঙ্গে এঁদের দুজনের কেউই কোনদিন বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন নি। উভয়েই চেয়েছেন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা—সাম্রাজ্যবাদীদের বিলুপ্তি ও মেহনতী মানুষের মুক্তি।

কবি আব্দুল কাদের ১৯৬৭ সালের ১৭ই আগস্ট আলমুল্লাহ মুসলিম হল কর্তৃক আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণোৎসব সভায় সভাপতির ভাষণ হিসাবে "রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক" শীর্ষক য তথ্যনিষ্ঠ মূল্যবান রচনা পাঠ করেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অনেক বিস্মৃত অধ্যায়ের ওপর নতুন করে আলোকপাত করেছেন। অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যার শিরেই মুদ্রিত ছিল রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণী—

'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু,
আয় চলে আয়রে ধূমকেতু/,
আঁধারে বাঁধরে অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন
অলক্ষণের তিলকরেখা/
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে/
আছে যারা অর্ধচেতন।'

কবিগুরু তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করেন নজরুলকে। তিনি ইতালি-কবি দ্য নুনজিও'র সঙ্গে তুলনা করেছেন নজরুলের। Gabrille d' Annunzio রচনা করেন নজরুলেরই মতো উদ্দীপনাময়ী কবিতা; তিনি ছিলেন নজরুলেরই মতো কর্মঠ মানুষ।

আজ একটা কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে—রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন এবং নজরুল যদি রুদ্ধবাক্ না হতেন, তাহলে এই দেশ-বিভাগকে তাঁরা কীভাবে নিতেন। আবার রাখীবন্ধনের সেই মন্ত্র তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকতো কি না! একথা বলা বাহুল্যমাত্র যে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল হচ্ছেন সেই অমূল্য প্রাণস্তম্ভ—যাঁদের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে আধুনিককালে উভয় বঙ্গের আধ্যাত্মিক সেতুটি। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল উভয়েই তাঁদের মাথার মণি, প্রেরণার উৎস, অথচ আশ্চর্য, উভয়েই পশ্চিমবঙ্গের সন্তান? সারস্বত ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ তফাৎ করা চলবে কেমন করে?

পূর্ববঙ্গের কবিদের সংগ্রামী ঐতিহ্য আমাদের ঈর্ষার বস্তু। ভাষার অধিকার নিয়ে কিম্বা দাঙ্গার বিরুদ্ধে কিম্বা শাসকের শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা আন্দোলন গড়েছেন, আন্দোলন করেছেন, সফল হয়েছেন। এক্ষেত্রে যাঁরা তাঁদের আদর্শ, যাঁরা তাঁদের পথপ্রদর্শক, কবি নজরুল নিশ্চয়ই তাঁদের অন্যতম। তিনি এই সঙ্কট-মুহূর্তে তাঁদের প্রেরণা জুগিয়েছেন, চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপিত করেছেন, ঐতিহ্য অনুসারী করে তুলেছেন, জীবন ও যৌবনের অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। তাই তো আবুল হোসেন জয়নুল আবেদীনের আঁকা নজরুলের ছবি দেখে বলেন,

'তুমি সেই বিদ্রোহের কবি।
সেকথা যখন ভাবি, কী চাঞ্চল্য জাগে
রক্তে বুকে।
বিমূঢ় বিস্ময়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি
এই ছবি।'

অথবা, আতাউর রহমান প্রলয়ের জন্মলগ্নে স্মরণ করেন সেই বিদ্রোহী কবিকে,—

'অবশেষে বায়ুকোণে উপেক্ষিত
আজন্মের বিদ্রোহী বিবেক
জন্ম দেয় প্রলয়ের—শুরু হল
নতুনের জন্ম অভিষেক।'

পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিতায় নজরুল কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছেন, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই বিচারে অগ্রসর হতে হবে। দাঙ্গাবিরোধী কিছু কিছু কবিতা পূর্ববঙ্গের কবিরাও লিখেছেন। বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁরা সামিল হয়েছেন, কবিতা রচনা করেছেন মিছিলে দাঁড়িয়ে, মিছিলের উদ্দেশ্যে। বিদ্রোহী কবির মনোভাব নিশ্চয়ই এঁদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, কিন্তু কাব্যগত প্রভাব সম্ভবত কোন আধুনিক কবির মধ্যে তিনি সঞ্চার করতে পারেন নি। অবশ্য তাঁর আদর্শগত প্রভাব সব সময়েই সেখানকার সংগ্রামী কবিদের মধ্যে সদা-জাগ্রত। এই প্রসঙ্গে মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান লিখিত "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি,—

"ইংরাজ কবি কিপলিং-এর সঙ্গে নজরুলের তুলনা। কিপলিং কাব্যক্ষেত্রে সাংবাদিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং অধিকাংশ মুহূর্তেই শিল্পায়ত্ত কবিতা লিখবার চেষ্টা করেন নি। ...নজরুলের সর্বপ্রধান বিশিষ্টতা হচ্ছে তাঁর সাময়িকতা।"

পূর্ববঙ্গের প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিদের অনেকেই নজরুলকে

নিয়ে কবিতা লিখেছেন। প্রতিটি কবিতায় রয়েছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, প্রাণের আবেগ এবং উত্তাপ। তাঁদের ভাবনা-ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক।

শামসুর রহমান শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সেই কবিকে, যিনি কাব্যের জোয়ারে অত্যাচার-অনাচার ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন চারণকবির সততায়,—

'কবিতায় বাগ্মিতার রোদ্দুর মিশিয়ে
পোড়াদেশে
এনেছিলে তীব্র দাহ;
অত্যাচার অনাচার তুমি
সমূলে ভাসিয়ে নিতে চেয়েছিলে
কাব্যের জোয়ারে—
নিশ্চিত জেনেছি আমি, চারণকবির
সততায়।'
(পোড়ো বাড়ী)

একটি অপূর্ব উপমা দিয়ে তাঁর শ্রদ্ধা ও যন্ত্রণা ব্যক্ত করছেন আবদুস সাত্তার,—

'এমন নিস্তব্ধ হতে হয়ত চেয়েছ
তুমি! দেশ
লাইর একটি কাঠি আলো জেনে
পড়ে আছে একা।'
(নজরুলের জন্যে)

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনী, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪.০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আহসান হাবীব ভুলতে পারেন না জাগ্রত যৌবনের চির নায়ককে,—

'তোমাকে ভুলতে গিয়ে পড়বে মনে
আমার কৈশোর আর সমগ্র যৌবন
ঘিরে—
তোমার নায়কমূর্তি
যে আমাকে নায়কের অহঙ্কার অর্জনের
স্বপ্ন দিয়েছিল।'
(নজরুলকে মনে করে)

প্রহর কাঁপানো নজরুলের কবিতা ও গানের মধ্যে দিয়ে সৈয়দ আলী আহসানের উত্তরণ,—

'এই তারা তোমার কবিতা,
তোমারে দেখিতে যেয়ে—
আমি এই তারারে দেখেছি
আমারে দেখিতে যেয়ে
ঘাসের সবুজে আমি আকাশের
নীলকে দেখেছি।'
(নজরুল ইসলামকে)

সানাউল হক তাঁর অপূর্ব ভাষায় বিমুগ্ধ-বিস্ময় নিয়ে অগ্নিবীণার কবিকে অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাচ্ছেন,—

'সুউচ্চ পাহাড় কি মানুষ?
কিন্তু সুর স্বর—
সঙ্গীত সাহস জনাশ্রয়ী এবং
শব্দের যোজনা—
আকস্মিক প্রশ্ন কোলাহল।
এও কি সম্ভব?
অগ্নিবীণা? কবিজন্ম
এদেশের একটি ঘটনা।'
(কবিকণ্ঠ)

তালিম হোসেন জানেন যে অমিত বীর্যশালী কবি তাঁর যুগের কাছে তীর্থ হয়ে আছেন। তিনি চিরজীবন্ত আগ্নেয়-গিরি,—

'তুমি আজ তীর্থ হয়ে আছ
তোমার যুগের কাছে: একি আনন্দ!
একি বেদনা!
আগ্নেয়গিরি নিভে যায়,
আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে ফের—'
(বহ্নিমান)

সা, ম, হেদায়েতুল্লার আক্ষেপ,—
'হায়, তাঁর কালোত্তীর্ণ রক্তে
জাগে না আর আদিম তরুণ
যুদ্ধের গাম্ভীর্যে তিনি আত্মমগ্ন
আজ ঈশ্বর ধ্যানে?
(কে জানে স্মৃতির বিজন পারে
সুরমুগ্ধ তিনি
হয়তো ভেসে যাবেন ফের
চেতনার লোহিত জোয়ারে।)'
(তিনি—কবি নজরুলকে)

মহিলা কবিরাও স্মরণমনন করেছেন কবি নজরুলের। বেগম সুফিয়া কামাল স্বীকার করতে চান নি যে কবি মূক। সত্যিই তো—

'তুমি মৌন মূক!
কে বলে। সহস্র মুখ
কোটি কোটি কণ্ঠে গান, কথা
ধ্বনিত হইয়া ফিরে। কত মুখরতা'
(তুমি—কবি নজরুলকে)

রওশন আরা জামান তাই জানেন,—
'তোমার দেহের মৃত্যু
মনের অমৃতে পূর্ণ হবে,
তোমার জীবন হতে
হৃদয়ের দুরন্ত আবেগ
আকাশের তারকায়
হবে নির্নিমেষ।'
(কবি নজরুলকে)

নজরুলের গান রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতোই একটি অপূর্ব সম্পদ। নজরুলের গানের সংখ্যা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যাবে। পূর্ব-বঙ্গের গণমানসে পশ্চিমবঙ্গের মতোই নজরুল-সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেখানে সঙ্গীত রচনায় নজরুলের প্রভাব এসে পড়া স্বাভাবিক। নজরুলের সাহিত্য-কীর্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। উভয় বঙ্গের সারস্বত সমাজের কাছে নিবেদন, তাঁর সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন। নজরুল-সঙ্গীত বাঙালী জাতির একটি গৌরবের বস্তু।

আমরা সাধারণ মানুষ। পূর্ববঙ্গের এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সাধারণ মানুষের মানসেও নজরুল সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন। এখনো নজরুলকে দেখে কত প্রাণবন্ত মনে হয়! এই মুহূর্তে যদি তিনি মুখর হয়ে উঠতে পারতেন, তাহলে হয়ত একটা অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে যেতে পারত উভয় বঙ্গে। আমরা আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, বিদ্বেষ, বিবাদ, বিভেদ ভুলে গিয়ে ভাইকে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারতাম অকৃত্রিম আবেগে। কবি নজরুল উভয় বঙ্গের মৈত্রীর মহত্তর সোপান। তাঁর ভূমিকা আজও অনন্য—হুঁশিয়ার করছেন কাণ্ডারীকে,—

'হিন্দু না ওরা মুসলিম,
ওই জিজ্ঞাসে কোন জন।
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ,
সন্তান মোরা মার।'

ফরিদাবাদ-কংগ্রেস যা বলেছে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

ফরিদাবাদ কংগ্রেসের আগেই কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন সম্পর্কে আমি রায় দিয়ে ফেলেছি আমার গত ১লা মে-র প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ফরিদাবাদ কংগ্রেসের আগেই, কাজেই ফরিদাবাদের ফলাফল এতে প্রতিফলিত হয় নি। কিন্তু রায়টা কি খুব ভুল কিছু হয়েছে? আমার তা মনে হয় না। ফরিদাবাদ কংগ্রেস দেখলে তাই সকলেরই মনে করা উচিত। এতদিন যা শুধু ইঙ্গিত মাত্র ছিল, ফরিদাবাদ কংগ্রেস থেকে তাই স্পষ্ট ঘোষণা আকারে জানান হয়েছে। দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার দিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব এগোচ্ছিল, ফরিদাবাদে এই নেতৃত্ব সদম্ভে ঘোষণা জানিয়েছেন যে, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার দিকে এগোবেন, তাতে যাই হোক না কেন। এর পর কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় না কি?

যে সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা আনুষ্ঠানিকভাবেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছিল ফরিদাবাদের আগে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই যেগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ফরিদাবাদ কংগ্রেসে হবে বলে লোকের ধারণা হয়েছিল, সেই সমস্ত বিষয় ফরিদাবাদ কংগ্রেস ধামা চাপা দিয়েছে তো বটেই, উপরন্তু বিনা-আলোচনায় একেবারে উল্টোমত ঘোষণা করা হয়েছে।

সব চেয়ে লক্ষণীয় এটাই যে, যে-দুটো প্রশ্নই ছিল কংগ্রেসের সামনে প্রধান প্রশ্ন, অর্থাৎ ১৯৭২-এ কেন্দ্রে কংগ্রেসের ক্ষমতা-প্রাধান্য লোপের সমস্যা ও কোয়ালিশনের সমস্যা, এ-দুটো সমস্যাকেই কথার তোড়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একেবারে অবাস্তব ও অবান্তর প্রশ্ন বলে। সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার ভাষণ ও চ্যবনের উপস্থাপিত রাজনৈতিক প্রস্তাব ও তাঁর বক্তৃতার যে সুর ও ভাষা, তাতে মনে হয় কংগ্রেসের সামনে সমস্যা কিছুই নেই, প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে কংগ্রেস এগুচ্ছে এবং যুদ্ধজয় স্বতঃসিদ্ধ। নিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন, কংগ্রেস মোটেই 'ডুবন্ত জাহাজ' নয় এবং ১৯৭২-এ কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকবে না মনে করা ভুল। রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস ভালই করেছে, এ-নির্বাচনে কংগ্রেস-নীতি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে মনে করা ভুল এবং ১৯৭২-এ কংগ্রেস আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়েই দেখা দেবে। এই প্রসঙ্গে সুব্রহ্মনিয়ম কর্তৃক ১৯৭২-এ কেন্দ্রে ডেডলকের আশঙ্কা-প্রকাশকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

মনে পড়ে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত অতুল্য ঘোষ পঃ বাংলার সম্বন্ধে এইরকম কথাই বলেছিলেন। তাঁর সে-দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু সেটা ছিল নির্বাচনের আগের কথা। চ্যবন-নিজলিঙ্গাপ্পা নির্বাচনটা হয়ে যাবার পরও সেই দম্ভ প্রকাশ করছেন। শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস কয়েকটা আসন বেশি পেয়েছে, আর সব জায়গায় পেয়েছে আগের চেয়ে কম এবং পঃ বাংলায় কোনরকমে বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতিটা রাখতে পেরেছে—এ সবের পরও যদি তাঁরা বলেন যে, কংগ্রেস বেশ ভালই করেছে মধ্যবর্তী নির্বাচনে, তাহলে বলতে হয়, তাঁদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েছে, আর না হয় তাঁরা মনে মনে পঃ বাংলায় অবশ্যই আশঙ্কা করেছিলেন অন্যান্য রাজ্যেও, সেটা না হওয়াতেই তাঁরা খুশি। কিন্তু ১৯৭২-এ একক শক্তিতে কেন্দ্রে ক্ষমতায় টিকে থাকার কথাটা একেবারে পাগলের মতো মনে হয় না কি?

আসলে, চ্যবন-নি জ লি ঙ্গা প্পা প্রমুখের এই মিথ্যা আস্ফালন কংগ্রেসকে দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যই। কংগ্রেসের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে, ১৯৭২-এ কংগ্রেসের ক্ষমতায় থাকা অনিশ্চিত, এ-কথা স্বীকার করলেই এটাও স্বীকার করতে হয় যে, কংগ্রেসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে পথ-পরিবর্তন করতে হবে, কংগ্রেস-পুনর্জীবনের যে সব প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে তা ভাল করে আলোচনা করা দরকার এবং বিরোধী সদস্যদের মতামতের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করে নতুনভাবে শুরু করা দরকার। এটা করতে গেলেই তো কংগ্রেস-নেতৃত্বের চরম একচেটিয়া পুঁজি-তোষণ চক্রান্ত আরো উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে, কায়েমী স্বার্থরক্ষার পথ কঠিন হয়ে পড়বে। সে-পথে কংগ্রেস-নেতৃত্ব যেতে পারে না। তাই দরকার হল হাওয়া একেবারে ঘুরিয়ে দেবার, সমস্যাগুলোকেই অস্বীকার করার এবং যাঁরা সমস্যার কথা বলছেন তাঁদের কঠোর অনুশাসন দিয়ে ভবিষ্যতের জন্যও স্তব্ধ করে রাখার। কিন্তু এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করলেই তো কংগ্রেস-ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না। এতে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ আরও বেড়ে যাবে, নেতৃত্ব আরো একলা পড়ে যাবে। তাই শেষ আশ্রয় হিসাবে নেতৃত্ব হাত বাড়াচ্ছেন দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার দিকে। এতদিন যে সব কথা আকারে-ইঙ্গিতে বলা হত, এখন সেই কথাই প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে। দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হবার জন্যই কংগ্রেস-নেতৃত্ব বিভিন্ন কমিটির প্রগতিশীল প্রস্তাবগুলো ধামা চাপা দিয়েছেন এবং একটা দম্ভপূর্ণ শক্তিমত্তার মুখোস পরেছেন।

সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার ভাষণটা হচ্ছে এতাবৎকালের কংগ্রেসী-নীতির বাহ্য আবরণটাও ছিন্ন করে একেবারে নগ্ন প্রতিক্রিয়ার আহ্বান। তিনি কি কি বলেছেন? প্রথমত তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান করেছেন পঃ বঙ্গ ও কেরালার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে জোর করে বরখাস্ত করতে। কেন? কারণ হিসাবে যদি শুধু কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের কথাই বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথাই তিনি বলতেন তা হলেও বোঝা যেত তিনি কংগ্রেসের অফিসিয়াল মনোভাব ব্যক্ত করছেন। তিনি সে-সব ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পঃ বঙ্গ ও কেরালার যুক্তফ্রন্ট সরকার 'বিদেশের স্বার্থে' কাজ করছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এটা পুরোদস্তুর স্বতন্ত্র পার্টি, জনসঙ্ঘের ধরণের কথা। তিনি বলেছেন, একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে এত হৈ-চৈ করা উচিত নয়। কন্ট্রোল, নিয়ন্ত্রণ-বর্জিতভাবে একচেটিয়া পুঁজির হাতেই শিল্প-ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া উচিত। স্বতন্ত্র

পার্টি ঠিক এই দাবিই বরাবর করে আসছে। তিনি ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করেছেন, যা জনসংঘ সম্মেলনেরও দাবি। এক সময়ে বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রশ্ন উঠেছিল একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই, যার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছিল। নিজলিঙ্গাপ্পা সেই পথেই দেশকে ফিরিয়ে আনতে চান।

কংগ্রেসের চিরাচরিত রীতি এই যে, কংগ্রেস-সভাপতিই হচ্ছেন কংগ্রেস-নীতির ব্যাখ্যাকার। কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে নিজলিঙ্গাপ্পার বক্তব্যকে তাই নিছক ব্যক্তিগত মত বলে মনে করে নেওয়া যায় না। কংগ্রেসের গতি কোনদিকে সেটাই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। এবং তিনিই আরও কয়েক বছরের জন্য কংগ্রেসের কর্ণধার হয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এবারের কংগ্রেসে নিজলিঙ্গাপ্পা-ঘেঁষা নেতারাই বেশি সোচ্চার। চ্যবন, মোরারজী প্রভৃতির কথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সাংগঠনিক কঠোরতা, অর্থাৎ ভিন্ন মত প্রকাশক নেতৃত্বের সমালোচনাকে বন্ধ করার জন্য এস কে পাতিলের যে সাংগঠনিক প্রস্তাব পূর্বে তৈরি হয়েছিল, তার সঙ্গে মিল রেখেই মোরারজী ও নিজলিঙ্গাপ্পা ভিন্ন মতাবলম্বীদের হুমকী দিয়েছেন। অর্থাৎ, সবদিক দিয়েই দক্ষিণী-মনোভাবের নেতৃত্বই কংগ্রেসের দিক-নির্ণয় করেছেন এই অধিবেশনে।

দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার দিকে কংগ্রেসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাটা যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, তা আরও ভাল করে বোঝা যায় কোয়ালিশন সম্বন্ধে এই অধিবেশনের মনোভাবে। কংগ্রেসের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় নি, একলাই কংগ্রেস ১৯৭২-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে—এ কথা যত স্পর্ধাভরেই বলা হোক না কেন, কোয়ালিশন সম্বন্ধে ঠিক কী বলা হয়েছে এই কংগ্রেসে? রাজনৈতিক প্রস্তাবে শুধুমাত্র বলা হয়েছে কোয়ালিশনকে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়, কোয়ালিশন-চেষ্টা যে একেবারে বাতিল হয়ে গেল, তা মোটেই বলা হয় নি। বরং সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা তাঁর অভিভাষণে স্পষ্ট বলেছেন যে, কোয়ালিশন যদি একান্ত দরকার হয়ে পড়ে, তা হলে উপযুক্ত সময়ে তা বিবেচনা করা হবে, কেন না কোন্ কোন্ সম-মনোভাবাপন্ন পার্টির সঙ্গে কংগ্রেস সহযোগিতা করতে পারে সেটা নির্ধারণ করা এখনই যায় না। এ কথার মানে কি? মানে পরিষ্কার। কোয়ালিশন সংক্রান্ত কমিটি যা বলেছে, অর্থাৎ স্বতন্ত্র, জনসংঘ প্রভৃতির সঙ্গে কোয়ালিশন হতে পারে না, সে-কথাটা নেতৃত্বের পছন্দ নয়। তাঁরা নতুন করে সম-মনোভাবাপন্ন পার্টি খুঁজে বার করতে চান এবং তাদের সঙ্গেই কোয়ালিশন করতে চান উপযুক্ত সময়ে। সেই সম-মনোভাবাপন্ন পার্টি যে কারা, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন নি কি নিজলিঙ্গাপ্পা? রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লাইন হিসাবে তিনি যে সব কথা বলেছেন তা সবই স্বতন্ত্র পার্টি, জনসঙ্ঘের কথা এবং বি-কে-ডি'র সর্বভারতীয় নেতৃত্বও আজকাল এই কথা বলছে। সুতরাং আগের প্রবন্ধে যেটা অনুমান করা হয়েছিল, ফরিদাবাদ কংগ্রেসে সেই অনুমানকেই সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছে।

'কোয়ালিশন যদি একান্ত দরকার হয়ে পড়ে'—নিজলিঙ্গাপ্পার এই কথাটাই তাঁদের ক্ষমতা-দম্ভের অসারতা প্রমাণ করে। রাজ্যের দিকে চেয়ে না হলেও, কেন্দ্রের দিকে চেয়ে কংগ্রেস-ক্ষমতা লোপের আশঙ্কায় তাঁরা অতিমাত্রায় আশঙ্কিত। এবং যেহেতু সেখানে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও আর দু-একটি নতুন মিত্রই তাদের সর্ববিষয়ে রক্ষাকর্তা, সেই হেতু তাদের সঙ্গে কোয়ালিশনের চেষ্টা না করে উপায় নেই। এইভাবেই যে নেতৃত্ব, অন্তত নেতৃত্বের নিজলিঙ্গাপ্পা - মোরারজী - চ্যবন - পাতিল গোষ্ঠী যে চিন্তা করছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন প্রবল, তাতে আজই এ-কথা ঘোষণা করলে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠবে। তাই একটু সময় নিয়ে, কংগ্রেস-সংগঠনকে আরো কর্তৃত্বপরায়ণ করে, বিরোধীদের আর একটু সায়েস্তা করে, তবে পাকাপাকিভাবে সেই পথ গ্রহণ করা হবে।

ফরিদাবাদ কংগ্রেসের এই দিক-নির্দেশ দেখে এ কথাই বলতে হয় যে, কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। চরম প্রতিক্রিয়ার পথে কংগ্রেসের দ্রুত পদক্ষেপ মানে একদিকে কংগ্রেসের ভাঙন বৃদ্ধি, অন্যদিকে কংগ্রেস-বিরোধিতার গণতান্ত্রিক শিবিরের আরো ঐক্যবদ্ধ হওয়া, আরও সংকল্পবদ্ধ হওয়া। ইতিহাস এমনি করেই এগোচ্ছে গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয়ের পথে।

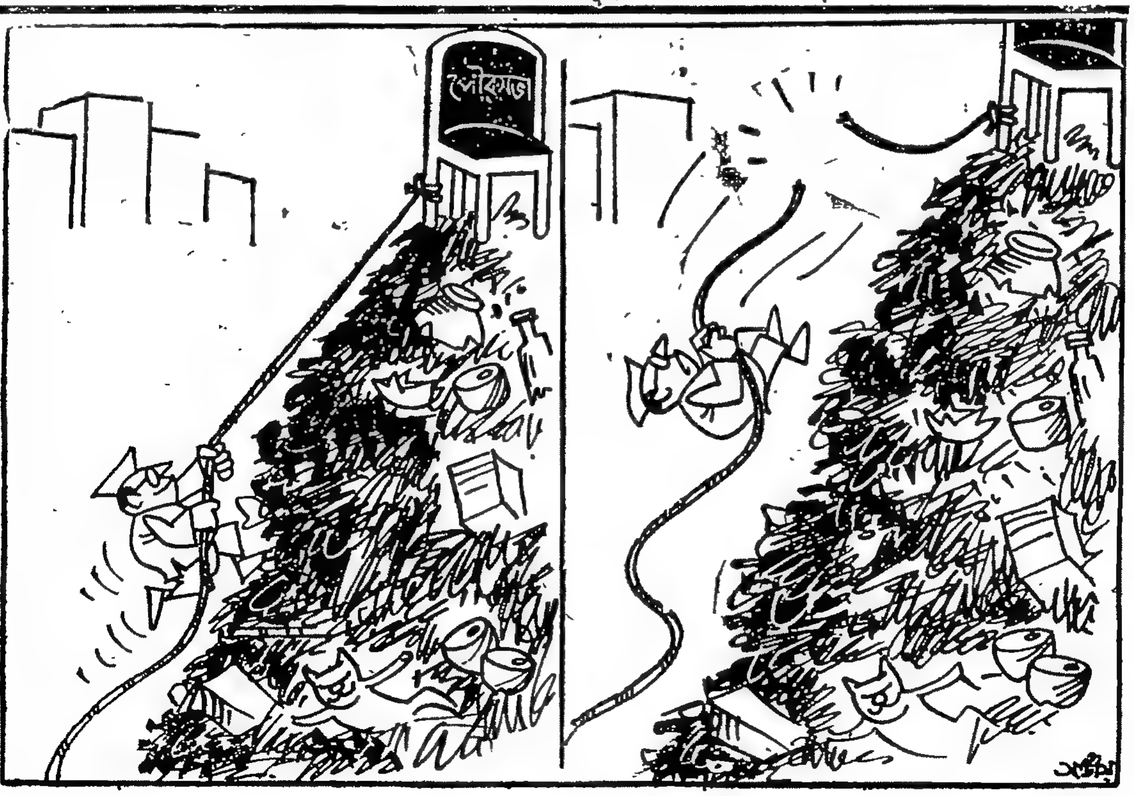

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

মেদিনীপুর লোকসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ের ঘটনাটি একজন প্রার্থীর পরাজয় বলে নয়—কংগ্রেস নীতির পরাজয় হিসাবে অথবা জাতীয় কংগ্রেসের ভাবমূর্তিকে কবর দেওয়ার ঘটনা হিসাবে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। এই উপনির্বাচনে রাজ্য কংগ্রেসের যে দীন ও অরাজনৈতিক রূপ ধরা পড়েছে, সেই ঘটনাও শ্রীকৃষ্ণমেননের কাছে শ্রীকৃষ্ণদাস রায়ের পরাজয় অপেক্ষা কম গুরুত্বের ঘটনা নয়। আমার চোখের 'পর সেই দৃশ্যগুলি কখনও মিলিয়ে যাবে না, যে দৃশ্য দিনের পর দিন দেখেছি মেদিনীপুরে এই সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচন উপলক্ষে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষকাল পূর্বে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস ভবনে একদিন সকালে গিয়ে চোখে পড়ল—জেলা কংগ্রেস ভবন শান্ত, শ্রীমতী আভা মাইতি বসে মুড়ি খাচ্ছেন সকালের জলযোগ হিসাবে আর নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণদাস রায় কিছু কাগজের মোড়ক বেঁধে চলেছেন বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাবার উদ্দেশ্যে। শ্রীমতী রেবা সেন কলকাতা থেকে কয়েকজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা নিয়ে এসেছেন—তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করছে নির্বাচনী প্রচারে যাবার জন্য। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস ভবন যারা না দেখেছে, তারা কল্পনা করতে পারবে না জেলা কংগ্রেস ভবনটি কি বিরাট—তিনতলা বাড়িতে কত ঘর আর এই বিরাট বাড়িতে এই মানুষগুলিকে কত কম মনে হচ্ছিল, কত কর্মহীন মনে হচ্ছিল। নির্বাচনের দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি নির্বাচনী কেন্দ্রের সর্বত্র, প্রথম একস্থানে জনৈক নির্বাচনী অফিসার চুপি চুপি বললেন—জানেন এখানে কংগ্রেস থেকে কোন পোলিং এজেন্ট আসে নি। বিস্মিত হলাম, সে কি কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট নেই? কিন্তু বিস্ময়ের বুঝি তখনও অবশিষ্ট ছিল। আরো কয়েকটি স্থানে খোঁজ করে জানলাম—অনেকগুলি নির্বাচনী কেন্দ্রেই কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট নেই। নির্বাচনে কংগ্রেস পোলিং এজেন্ট দেয় নি, এমন ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটেছে বলে কেউ শুনেছেন কি না জানি না। শুধু পোলিং এজেন্ট নয়, বহু স্থানেই দেখা গেল কংগ্রেস কোন বুথ অফিস করে নি আর বুথ অফিসের বেশির ভাগই বসে আছে জোড়া বলদের ব্যাজ পরে দু-একজন শিশু। কোথাও আবার এই শিশুরা বুকে কংগ্রেসী ব্যাজ নিয়ে যুক্তফ্রন্টের বুথ অফিসে বন্ধুদের সঙ্গে মিশে গেছে—কংগ্রেসের বুথ ফাঁকা পড়ে আছে। কম করে দু জায়গায় দেখেছি বুথ অফিসের নামে তৈরি ক্যাম্পে (চারটে খুঁটিতে একখানি চাদর টাঙানো) দুটো কুকুর বৈশাখের খরতাপ থেকে রক্ষা পেয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। খড়্গপুর থেকে তিন মাইলের মধ্যে কাঁথি রোডের ওপর কংগ্রেসের একটি বুথ অফিসে বেশ ভিড় দেখে সঙ্গের ফটোগ্রাফার শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় খুবই উৎসাহ পেল। কারণ সমস্ত দিন যুক্তফ্রন্ট শিবিরের নানা কর্মব্যস্ত অবস্থার ছবি সে তুলেছে, কিন্তু কংগ্রেসের শিবিরের ভিড়ের ছবি সে পায় নি। তাই সাংবাদিক-নিরপেক্ষতা রক্ষায় সে অতি উৎসাহে কংগ্রেস শিবিরের একখানি ছবি তুললো। ছবি তোলা শেষ হতেই ঘটনাস্থলে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া উপস্থিত হতেই দেখা গেল কংগ্রেসী চাদরের নিচে অবস্থানরত স্বেচ্ছাসেবকরা যুক্তফ্রন্টের জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ফটোগ্রাফার শ্রীমুখোপাধ্যায় খুবই বিস্মিত হলো—এ কি, কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকরা যুক্তফ্রন্টের জয়ধ্বনি দিচ্ছে কেন? তখন ধীরে ধীরে খোঁজ নিয়ে জানলো—ওরা সবাই যুক্তফ্রন্টের স্বেচ্ছাসেবক, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরূপে যে দু-একজন সকালে এসেছিল, বেলা বাড়তে তারা ক্যাম্প ফেলে চলে গেছে, তাই যুক্তফ্রন্ট স্বেচ্ছাসেবকরাই কংগ্রেসের ক্যাম্প দখল করে নিয়েছে। শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় হতাশ হলো, কারণ তার ছবি তোলাই ব্যর্থ হয়ে গেল, শুধু শুধু খরচ হল ফিল্ম আর ফ্লাস বাল্ব—কংগ্রেসী ভেবে যাদের ছবি তুলেছে, সেই ছবি কোন কাজেই লাগবে না।

এই সামান্য ঘটনাগুলি কোন মনে রাখবার মত বা ফলাও করে লেখবার মত ঘটনাই নয়—কিন্তু যাঁরা কংগ্রেস সংগঠনকে জানেন, বহুদিন ধরে কংগ্রেসের নির্বাচন পরিচালনা দেখে এসেছেন, তাঁদের কাছে কিন্তু ঘটনাগুলি কোনক্রমেই নগণ্য মনে হবে না। তাই প্রশ্ন আসে এমন কেন হল? মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রটি যে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত, সেই এলাকা কংগ্রেসের কোন দুর্বল ঘাঁটি নয়। কারণ মাত্র কয়েক মাস আগে এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেস প্রার্থীরা খুব জোর লড়াই করেছে। প্রায় সকলেই বিশ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছেন। সাতটির মধ্যে ছয়টি আসনে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু জয়ী আসনটি যে সে আসন নয়—কম্যুনিস্ট প্রার্থী নারায়ণ চৌবেকে পরাজিত করে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছে। কাজেই কংগ্রেস যদি সাতটি আসনে তার কয়েক মাস আগে পাওয়া ভোট লাভ করতো, তবে যুক্তফ্রন্ট থেকে কংগ্রেসের ভোটের তফাৎ হত মাত্র দশ হাজার; কিন্তু নির্বাচনে দেখা গেল ভোটের ফারাক হয়ে গেছে এক লক্ষের বেশি। অথচ কংগ্রেস এই নির্বাচনকে একটি রাজনৈতিক লড়াই ও জনমতের পরীক্ষা হিসাবে ব্যবহার করতে পারতো, যেমন করেছিল ১৯৬৮ সালে কৃষ্ণনগর লোকসভার উপনির্বাচনে। রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হল, কংগ্রেস-পি-ডি-এফ কোয়ালিশন সরকারের পতন হয়েছে—রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়েছে, এমনি সময়ে অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণনগর লোকসভার উপনির্বাচন। এখানে নিচের বিধানসভার আসনগুলি যুক্তফ্রন্টের দখলে ছিল। সেই নির্বাচনে শ্রীমতী ইলা

পালচৌধুরী বিপুল ভোটে জয়ী হলেন। এবং সেটা যে-সে আসন নয়—স্বর্গত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের আসন। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস কৃষ্ণনগর আসনে জয়ী হয়ে রীতিমত রাজ্য রাজনীতির একটা মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারলো। এই ক্ষেত্রে রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়ে কয়েক মাস শাসন চালিয়েছে, এই নির্বাচনেও [illegible] মতের পরীক্ষা হতে পারতো। [illegible] বলতে পারেন এটাই পরীক্ষা, ওই লক্ষ ভোটের ব্যবধানই হল জনগণের রাজনৈতিক রায়। নিশ্চয়ই এটাকে রাজনৈতিক রায় হিসাবে গ্রহণ করা যেত—যদি দেখা যেত কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে লড়াই করেছে, কিন্তু এখানে তো যুক্তফ্রন্ট ওয়াক ওভার- পেয়েছিল বলা যায়। কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে প্রচারযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র সেন। আর প্রতিটি বিধানসভা আসনে কাজের দায়িত্ব নিয়ে বসেছিলেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারা। যেমন—মালদার শ্রীসৌরীন্দ্র মিশ্র, মুর্শিদাবাদের শ্রীদুর্গা সিং, আবদুস সত্তার, আবদুলবারী বিশ্বাস, সামসুদ্দিন আমেদ, ২৪ পরগনার শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া, শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা, হাওড়ার শ্রীবিশ্বরতন গাঙ্গুলী, হুগলীর প্রভাত পালিত—এ ছাড়া শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীবিভা মিত্র, শ্রীমতী রেবা সেন, শ্রীসুহৃদ রুদ্র প্রমুখ তো ছিলেনই। শ্রীঅতুল্য ঘোষ নিয়মিত তদারক করেছেন নির্বাচন। কিন্তু মেদিনীপুরে কি হল। এইভাবে কোন কেন্দ্রে কেউ দায়িত্ব নিয়ে বসলেন না, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একদিন গেলেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ একেবারেই নয়, শ্রীসিদ্ধার্থ রায় ও শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র দু-তিন দিন একটু যাতায়াত করলেন। কিন্তু শুধু বাইরের নেতারা নয়। যে ডঃ ঘোষ কয়েকদিন আগে মেদিনীপুরে নির্বাচনে লড়েছেন এবং যিনি নির্বাচনের সময় মেদিনীপুরে ছিলেন বা শ্রীকুমার জানা, যাঁকে কয়েক মাস আগেও কংগ্রেস শ্রীঅজয় মুখার্জীর বিরুদ্ধে লড়িয়েছেন—তাঁরা পর্যন্ত একদিন নির্বাচনী এলাকায় পা দিলেন না। আবার কংগ্রেসের যে সাতজন প্রার্থী মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, সেই সাতজনের পাঁচজনকে নির্বাচনের সময় সম্ভবত খুঁজেই পাওয়া যায় নি। এই সাতজনের একজন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণদাস রায় আর একজন খড়্গপুর আসনে বিজয়ী শ্রীজ্ঞান সিং শুধু আসরে ছিলেন। মেদিনীপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীভোলা গিরি বা পটাশপুর কেন্দ্রের প্রার্থী প্রখ্যাত জনার্দন সাউ কাউকে দেখা গেল না যে তাঁরা নির্বাচনে কাজ করছেন।

অথচ এই নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে বলবার কথা ছিল অনেক এবং হাওয়া তাঁদের অনুকূলে তোলবার স্বপক্ষে যুক্তিও কম ছিল না, কারণ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণমেনন যত বড় লোকই হোন না কেন—তাঁর রাজনৈতিক জীবন বিতর্কের অতীত নয়—আর দ্বিতীয় কথা হল যুক্তফ্রন্ট যখন মেননকে প্রার্থী দিল, তখন কংগ্রেস একজন অনুরূপ সর্বভারতীয় নেতাকে দিতে পারতেন। কংগ্রেস একজন ভাল প্রার্থী জোগাড় করতে পারে না, বা কংগ্রেসের নামে কেউ নামডাকের লোক দাঁড়াতে চায় না এটা যদি সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে, কংগ্রেসের এই রকম শোচনীয় অবস্থায় প্রার্থী না দেওয়াই ভাল ছিল। সেই পথে না গিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে দিল—নারায়ণগড় কেন্দ্রে বিধানসভায় পরাজিত প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণদাস রায়কে। কিন্তু শ্রীরায় যদি শুধু একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতেন, তবে হয়ত কিছু বলার থাকতো না। কিন্তু মেনন সম্পর্কে যেমন জীপ কেলেঙ্কারীর অভিযোগ আছে, তেমনি শ্রীরায়ও কলঙ্কমুক্ত নন। কংগ্রেসের ভূয়া সদস্যকরণ মামলা—যা নিয়ে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস ভবনে স্বর্গত চারু মহান্তি ও শ্রীঅজয় মুখার্জীর মতান্তর, যাঁকে হাতে-নাতে ধরে বিরোধের সূত্রপাত ও পরে জেলা কংগ্রেসে ভাঙন ও বাংলা কংগ্রেস সৃষ্টি—তার মূলে নাকি ছিলেন শ্রীরায় বলে অভিযোগ আছে। এমনি আরো কয়েকটি অপপ্রচারের সুযোগও শ্রীরায় সম্পর্কে ছিল। মেনন সর্বভারতীয় নেতা, সারা ভারতে নামডাক—তাই তাঁর নামে প্রচারিত কেলেঙ্কারীও বিরাট। শ্রীরায় স্থানীয় একজন সামান্য মানুষ, তাই তাঁর নামের কেলেঙ্কারীগুলি ছোট। কিন্তু কংগ্রেস কি কলুষমুক্ত ব্যক্তিকে প্রার্থী করতে পারত না? শ্রীরায় যেন প্রার্থী হলেন নিতান্ত শহীদ হবার মনোভাব নিয়ে—শহীদ হবার মনোবল সকলের থাকে না, এই ক্ষেত্রে শ্রীরায় সেই মনোবল দেখালেন। অবশ্য দুষ্টু লোকের কথায় কান দিলে অন্য কথাও শোনা যায়, সেটা হল—শ্রীরায়ের বেশ কিছু দেনা হয়েছিল গত নির্বাচনে, তাই এই নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে তথা শহীদ হয়ে সেই দেনা-মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন।

কিন্তু এর চেয়ে বড় ঘটনা হল—কংগ্রেস শ্রীরায়কে প্রার্থী করে অন্য কোন কথা বলবার সুযোগ না নিয়ে সব শক্তি নিয়োগ করলো শ্রীমেনন সম্পর্কে নানা কথা বলে। নিজেদের সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা বা যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে রাজনৈতিক লড়াই, সেই সব কিছু নয—শুরু করলো বাঙালী-অবাঙালী প্রশ্ন নিয়ে সুড়সুড়ি দিতে।

কংগ্রেস-দলের আজ যত দৈন্য সৃষ্টি হোক না কেন, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক-সংকীর্ণতাবাদের পূজারী নয়, কিন্তু মেদিনীপুরে দেখা গেল কংগ্রেস বোম্বাই-এর শিবসেনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাদেশিকতার পূজারী হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের বক্তব্য হল এই যে, মেননকে ভোট দিও না—কারণ সে বাঙালী নয়, বাংলা জানে না। অর্থাৎ মেনন বাংলা জানলে বোধ হয় মেনন সম্পর্কে কিছু বলার থাকতো না। অথচ এই কংগ্রেসের প্রার্থীদের মধ্যে চিরকাল বাঙালী-অবাঙালী ভোট অনুপস্থিত থেকেছে। বাংলা দেশে কংগ্রেসের সর্বস্তরে অবাঙালী রয়েছেন—কেউ কোনদিন সেই প্রশ্ন তোলে নি। কি বিধানসভা, কি লোকসভা, কি কর্পোরেশন, কি রাজ্য কংগ্রেসের কর্মকর্তা, সর্বত্র অবাঙালী রয়েছেন চিরকাল। এই বাংলা দেশ থেকে কংগ্রেস ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, ডঃ আম্বেদকর, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে শুরু করে রামকুমার ভুয়ালকা, ডি, পি, হিম্মৎসিংকা পর্যন্ত কতজনকে প্রার্থী করে নির্বাচিত করেছেন। বীরভূমের একটি কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস চিরদিন নির্বাচিত করেছেন স্বর্গত বসন্তলাল মুরারকাকে, বড়বাজার থেকে শ্রীঈশ্বরদাস জালানকে, এমন কতজনকে। এমন কি যে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন, সেই কেন্দ্রের বিধানসভা কেন্দ্রের একটি আসনেই কংগ্রেস লাভ করেছে এবং সেই আসনটি জয়ী হয়েছেন একজন পাঞ্জাবী ডঃ জ্ঞান সিং। কংগ্রেসের এই অরাজনৈতিক প্রচারযুদ্ধ তার প্রতি বুমেরাং হয়ে দেখা দিল। এ ছাড়া লক্ষ্য করা গেল—শ্রীমেনন বাঙালী নন এই কথা বলতে যত মেদিনীপুরের মানুষ এগিয়ে এল, তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ এগিয়ে এল শ্রীমেননকে বাংলা দেশের সুহৃদ এই কথা প্রমাণ করতে। শ্রীকৃষ্ণদাস রায় ঘরের ছেলে এই কথা বলে আর শ্রীমেনন পরের ছেলে এই কথা বলে শুধু পোস্টার মারা হল, কিন্তু মেদিনীপুরের মানুষের সঠিক প্রতিনিধিরা কেউ এই কথা বলতে এগিয়ে এল না। এরই ফল ধরা পড়লো ভোটপত্রে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস শতকরা ৪১টি ভোট পেয়েছিল, আর এই নির্বাচনে পেল শতকরা ২৯টি। মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের তফাৎ ছিল ১০ হাজার, এই নির্বাচনে বৃদ্ধি পেয়ে হল এক লক্ষ ছয় হাজার। ভোটফল বিচার করলে দেখা যাবে সর্বত্র কংগ্রেসের ভোট প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে।

গ্রন্থমেলা

গান্ধী শতাব্দী প্রকাশনের কয়েকটি গ্রন্থ ঃ প্রকাশন উপসমিতির পক্ষে সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক মহাজাতি সদন, ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭, হইতে প্রকাশিত।

(১) গান্ধী-কথা ঃ শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য ঃ এক টাকা।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য কবি এবং চিত্রশিল্পী। গান্ধী-আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গান্ধীজীর জীবনকথা, কর্মকথা ও চিন্তাধারা সর্বসাধারণের উপযোগী করে কাব্যের ছন্দে তিনি যেভাবে রচনা করেছেন তা পাঠকমণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আমরা মনে করি। লেখক শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে গান্ধীজীর জীবনী চর্চা করেছেন বলেই তাঁর রচনাটি পড়তে ভাল লাগল।

(২) আর্থিক সমতা ঃ শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ঃ ০·৫০।

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'গান্ধী শতাব্দী পুস্তকমালার' এইটি দ্বিতীয় গ্রন্থ। ভবানীবাবু গান্ধী-আদর্শে উদ্বুদ্ধ একনিষ্ঠ কর্মী। প্রচলিত আর্থিক সাম্যের ধারণার সাথে গান্ধীজীর সাম্যবাদের পার্থক্য কোথায়, সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখক তা বিশ্লেষণ করেছেন। ইংরাজ মনীষী রাস্কিন এক শোষণহীন, সমতাযুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু কি করে সে সমাজ গঠিত হবে তার কোন ধারাবাহিক পরিকল্পনা তিনি করেন নি। গুজরাতি ভাষায় গান্ধীজী এই বিষয়ে যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তার নাম তিনি দিয়েছিলেন সর্বোদয়। তিনি বলেছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ সাধন করতে হবে। এই পরিকল্পনায় কাউকে বাদ দেওয়া চলবে না। তাই এর নাম সর্বোদয়। সর্বোদয়ের মূল সূত্রটি হল সমতা। আর এই সমতা কেবল আর্থিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাকে রূপায়িত করতে হবে। গান্ধীজীর সর্বোদয়ের ভিত্তি জড়বাদী নয়, তা সম্পূর্ণভাবে ধর্মনৈতিক।

(৩) অস্পৃশ্যতা বর্জন ঃ শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার। মূল্য ঃ ০·৫০।

শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত পল্লীসেবক। হরিজন-সমস্যা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অমূল্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা প্রথা নিষিদ্ধ হলেও ভারতীয় সমাজের এই জঘন্য কুসংস্কার জাতিগঠনে বিশেষভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। যুগ যুগ ধরে এদেশের মনীষীরা এ বিষয়ে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজী বলেছিলেন অস্পৃশ্যতার বিনাশ না হলে হিন্দুধর্ম ধ্বংস হবে। তিনি তথাকথিত নীচ জাতিকে এত ভালবাসতেন যে তাঁর সারা জীবনের সাধনায় অস্পৃশ্যতাকে পরিহার করে গেছেন। তিনি একদিন বলেছিলেন 'যদি আমাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে আমি যেন অস্পৃশ্যরূপে জন্মগ্রহণ করি। এইরূপে আমি তাহাদের দুঃখ-কষ্ট-অনাদর-অবজ্ঞার ভাগী হইতে পারিব ও তাহাদিগকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারিব।' গান্ধীজীর জীবনের নানা ঘটনার বিশ্লেষণ করে লেখক এই বিষয়ে তাঁর মতামত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

(৪) পল্লীস্বাস্থ্য ঃ শ্রীকানাইলাল দত্ত। মূল্য ঃ ০·৫০।

শ্রীকানাইলাল দত্ত গান্ধীজীর অন্যতম শিষ্য এবং উদীয়মান লেখক। সর্বোদয় সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। তাঁর রচনাটি পাঠ করে বোঝা যায় যে গ্রামের মানুষের সাথে তাঁর প্রাণের যোগ আছে। তাঁর রচনাটিতে পল্লীস্বাস্থ্যের সমস্যার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। গান্ধীজী বলতেন 'ভারতের গ্রাম যদি ধ্বংস হয়, ভারত ধ্বংস হইবে।' অবশ্য গ্রাম বলতে খানিকটা মাটি, কয়েকটি ক্ষেত-খামার গাছ-পালা সমন্বিত একটি ভৌগোলিক সীমানাকে বোঝায় না। ঐ সীমানার মধ্যে যে সব মানুষ বাস করে, তাদের আচার-আচরণ, সুখ-দুঃখ, ঐশ্বর্য-দারিদ্র্যের যোগফল ঐ গ্রাম। গান্ধীজী বলেছিলেন যে, গ্রামবাসীরা সৎ ও পরিশ্রমী হলে গ্রাম সমৃদ্ধ হবে, স্বাস্থ্যনীতি মেনে চললে গ্রাম হবে স্বাস্থ্যময় এবং শ্রীসম্পন্ন। লেখক গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

[সপ্তাহের বোঝা-র শেষাংশ]

কেন্দ্র	মধ্যবর্তী নির্বাচন		লোকসভা উপনির্বাচন
পটাশপুর—	যুক্তফ্রণ্ট	২৯১০৩	২৯২১১
	কংগ্রেস	২৭৬৬৩	১৫৮৪৪
পিংলা—	যুক্তফ্রণ্ট	৩০২৭০	৩০০৪৫
	কংগ্রেস	২৫২২৫	১৪২১৪
মেদিনীপুর—	যুক্তফ্রণ্ট	২৬৫৬৭	২৯১২২
	কংগ্রেস	২১৩৯১	৮৮০০
খড়গপুর—	যুক্তফ্রণ্ট	১৮৪৭৫	২১৭৩৩
	কংগ্রেস	২২২৩০	৮৩৭৫
খড়গপুর লোকাল—	যুক্তফ্রণ্ট	২২৮৫২	২৪২০৪
	কংগ্রেস	২১৪৫৩	৮৭২৪
নারায়ণগড়—	যুক্তফ্রণ্ট	২৬৩৩৬	২৫৯৭২
	কংগ্রেস	২৫৩৭৯	১৪৬৬১
দাঁতন—	যুক্তফ্রণ্ট	২৭৮৪৮	২৭৪১৭
	কংগ্রেস	২৫৮৭৪	১০৩৬২

এই ভোট ফল বিচার করলেই বোঝা যায় কংগ্রেসের অধঃপতন কোথায় নেমেছে। নারায়ণগড়—যেখানে কংগ্রেস প্রার্থীর নিজের বাড়ি ও নির্বাচন কেন্দ্র, সেখানে যেমন ভোট হ্রাস অর্ধেক হয়েছে, তেমনি খড়্গপুর—যেখানে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছিল, সেখানেও ভোট হ্রাস পেয়ে প্রায় তিন ভাগের একভাগে নেমে এসেছে। কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে রাজ্য কংগ্রেসকে যদি প্রাণ দিয়ে থাকে, তবে মেদিনীপুরে নির্বাচন কংগ্রেসের মৃত্যু পরোয়ানা টাঙিয়ে দিয়েছে বলা যায়।

নজরুল ইসলাম: উচ্চারণ পদ্ধতি ও বিষয়রেখা

শান্তিব্রত ঘোষ

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯) রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর এই প্রতিষ্ঠাকে, সমকালীন লোকপ্রিয়তামাত্র বলে দেখলে নির্মল বিবেচনার পরিচয় দেওয়া হবে না, কেন না কোন প্রতিষ্ঠাই ভূমিহীন বলে কল্পনা করা সম্ভব নয়। নজরুলের প্রতিষ্ঠার মূল সত্যটি কেবল সমকালের অনুকূলতা নয়; কোন কবি যে চিহ্নিত হয়ে যান তার কারণ তাঁর চারিত্র্য, তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। যে-কোন কবিকেই এই চারিত্র্য অর্জন করতে হয়, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়ে ওঠার শর্তটিকে পূরণ করতে হয়। আর কবির কণ্ঠস্বরের নিজস্ব ও তাঁর কবি-চরিত্র যে প্রায় সমার্থক, একথা বললে খুব ভুল হয় না।

টি এস এলিয়ট একবার জানিয়েছিলেন যে কবিতায় এজরা পাউন্ড কি বলছেন তার চেয়ে তিনি কিভাবে বলছেন তার প্রতি তাঁর মনোযোগ বেশি। বলা বাহুল্য, এই কথা বলে তিনি বিষয়-গৌরবকে ছোট করে দেখতে চান নি, তিনি বরং মনে করতেন যে বিষয়রিক্ততা প্রকাশকে কখনোই উজ্জ্বল করতে পারে না। বস্তুত প্রকাশরীতি বা উচ্চারণবিধি অনুসরণ করা এক অর্থে বিষয়পরিধিকেই অনুসন্ধান করা। নজরুলের কবিতার বিষয় সম্পর্কে আমাদের কতকগুলি পূর্ব-নির্দিষ্ট সংস্কার আছে এবং এই সংস্কারগুলি সাধারণভাবে প্রতারক। সমকালীন জাগ্রত জাতীয় চৈতন্যের দিনগুলি অবশ্যই তাঁর রচনার পটভূমিরূপে উপস্থিত ছিল, কিন্তু এর চেয়ে গুরুতর ভ্রান্তি আর কিছু হবে না যদি অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনকেই তাঁর কবিতার বিষয় বলে নিরূপণ করা হয়। অথচ এইরকম যে প্রায়ই করা হয়ে থাকে, তা-ও সত্য। এর কারণ সম্ভবত পূর্বাহ্নেই বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ছকে নিয়ে কবিতার বিচার নিষ্পন্ন করার পদ্ধতিকে ব্যবহার করা। তাঁর কবিতার উচ্চারণবিধি অনুসরণ করবার পদ্ধতিকে প্রথমেই গ্রহণ করলে নজরুল সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ লাভ করা যেতে পারে যা তাঁর চরিত্র উন্মোচনের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। বস্তুত কবিতার বিষয় বলে যদি কিছু থাকে তা-ও এই চরিত্র, অর্থাৎ তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। বর্তমান প্রস্তাবে নজরুলের সেই কণ্ঠস্বর, তিনি কিভাবে কথা বলছেন, তা সাধারণভাবে লক্ষ্য করে দেখা যেতে পারে।

১

নজরুলের উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে গেলে সবার আগে তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি কিভাবে কথা বলছেন, যে-কোন কবি সম্পর্কে বিবেচনার ক্ষেত্রে এই জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণ প্রায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আর এই ধরণের অনুসন্ধানে, অর্থাৎ তাঁর উচ্চারণ-রীতি বিশ্লেষণে সম্বোধিত পক্ষের প্রসঙ্গও অবশ্যই উত্থাপন করতে হয়। যে-কোন কবিতাই কোন-না-কোন রকমের সম্বোধন; সম্বোধন খুব প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকলেও কবিতা যে 'ওড'-কবিতার ধর্মে সমর্পিত হবেই, এমন কোন নির্দিষ্টতা নেই। কিন্তু কবিতায় কবিকে কথা বলতেই হয় যখন, তখন তিনি অবশ্যই কারো সঙ্গে কথা বলেন। তিনি প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, অথবা প্রেমের সঙ্গে বা অপ্রেমের সঙ্গে, এমন কি প্রকৃতি, ঈশ্বর বা প্রেরণার সঙ্গেও। এই সম্বোধনের সূত্রটি যে-মুহূর্তে গৃহীত হয়, সেই মুহূর্তে সম্বোধিতের প্রসঙ্গটিও গুরুতর হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সম্বোধিত প্রেম, অপ্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর বা প্রেরণা বস্তুত একের মধ্যে মূর্তিমান হয়ে ওঠে এবং সেই এক সাধারণভাবে পাঠক। কাব্য-নির্মাণে পাঠককুলের ভূমিকা ও অধিকার নিয়ে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় ঢের বিতর্ক-বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই অবশ্যম্ভাবী শক্তির স্বাধিকার তথাপি অপরাভূত থেকেছে। প্রকৃতপক্ষে, কবিতার উচ্চারণ বিচারে কবির সম্বোধন-রীতি ও কবিতার পাঠক প্রসঙ্গ বিবেচনার এক জরুরী অংশ হয়ে ওঠে।

নজরুলের সম্বোধন সরলভাবে অতিশয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। 'বল বীর/বল উন্নত মম শির।/শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!'—নজরুল এইভাবে যখন কথা বলেন, তখন একথা বুঝতে আমাদের কখনো কষ্ট হয় না যে তিনি কোন বীর ব্যক্তিকে আত্মঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করতে চান। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ১৬৯ পংক্তি-দীর্ঘ এই কবিতায় একই সঙ্গে সম্বোধক ও উদ্বোধক 'বল' শব্দ মাত্র ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে; অথচ 'আমি' শব্দ এখানে অন্তত ১৪৫টি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। এই শব্দ দুটির ব্যবহারে আনুপাতিক হেরফের এত বেশি যে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সম্বোধনের ক্ষেত্র সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। যাকে প্রাথমিকভাবে সম্বোধনের ক্ষেত্র বলে মনে হয়, কাব্যপাঠের পর আর সন্দেহ থাকে না যে ইতিমধ্যে তার ক্ষেত্র-পরিবর্তন ঘটে গেছে: কবি নিজেকেই এখানে সম্বোধন করছেন, আত্মশক্তির উপলব্ধি, উন্মোচন ও তার ঘোষণায় তিনি এখানে অস্থিরভাবে তৎপর। অথচ পাশাপাশি এই তথ্যটিও উপস্থিত যে, দ্বিতীয় কোন বীর ব্যক্তিকে সম্বোধন করার মত করে তিনি 'বল' শব্দটি অন্তত ৮ বার অতি অকপট ও বিশিষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন। এবং এই ব্যবহার আবেগবিদ্ধ হয়েও অসতর্ক নয়। একই কবিতায় সম্বোধনের ক্ষেত্র-পরিবর্তন সচরাচর শান্ত মার্জনায় উপেক্ষিত হয়, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রটি একটু আলাদা। এখানে নজরুল যে অহং-চর্চা করেছেন, তাতে অন্যতর কোন ব্যক্তিকে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন বলেই সম্বোধনের প্রাথমিক রূপটি এইরকম সরল প্রত্যক্ষতায় ব্যবহৃত রয়েছে। 'ব্যক্তি' অমিত শক্তিধর; 'ব্যক্তি'-কবি আত্মশক্তির চর্চা করেছেন এবং যে-কোন 'ব্যক্তি'-ই আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত হবেন: 'বিদ্রোহী' কবিতার সম্বোধনরীতিতে আপাত-বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বস্তুত কোন হানিকর অসতর্কতার পরিচয় নেই, পক্ষান্তরে তা কবির এই মনোভাবেরই প্রকাশ। 'বিদ্রোহী' কবিতার উচ্চারণ-রীতির এই কাঠামোটি অনুসরণ করলে একটি বিষয় অন্তত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে: কবি নিজে আত্মানুশীলনে ব্রতী এবং পাঠক কবির এই আত্ম-অভিজ্ঞানের শরিকানা লাভ করছে। কাব্যবিচারে কবি ও পাঠক, এই দুইটি পক্ষ কল্পনা করে নেওয়াতে সম্ভবত অনেকেই আপত্তি করবেন না: কিন্তু নজরুলের কথা বলার রীতি যে এখানে

অনেকখানি ঘোষণাধর্মী, তা নিয়ে হয়তো কোন প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি মনে রাখা দরকার যে, এই ঘোষণা একপাক্ষিক নয়, দুই পক্ষে বিধৃত, যার ফলে মোটামুটিভাবে এক ধরণের সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এই একই রীতিতে 'অগ্রপথিক' (জিঞ্জীর) কবিতার সম্বোধনে তিনি মিশ্ররূপ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

নজরুলের কবিতায় সম্বোধন-রীতিতে সর্বত্রই যে এই ধরণের মিশ্র চমৎকারিত্ব প্রতিশ্রুত হয়েছে, এমন নয়: বরং অনেকগুলি ক্ষেত্রেই সম্বোধনের সরল-প্রত্যক্ষতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন : 'ফরিয়াদ' (সর্বহারা) কবিতায় 'আদি-পিতা ভগবান'কে সম্বোধন। এইরকম আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত : 'দারিদ্র্য' (সিন্ধুহিল্লোল) কবিতায় 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোর করেছ মহান।' 'সিন্ধু' (সিন্ধুহিল্লোল) কবিতায়, 'হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর/হে মোর বিদ্রোহী।' 'মরণ-বরণ' (বিষের বাঁশী), কবিতায়, 'এস এস এস ওগো মরণ!' 'যৌবন' (প্রলয়শিখা) কবিতায়, 'ওরে ও জীর্ণা নদী,/দু তীরে নিরাশা বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি?' ইত্যাদি। নজরুলের কবিতার সম্বোধন-রীতিতে আরেকটি রূপ খুব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই সব ক্ষেত্রে সূচনার সম্বোধন সাধারণভাবে প্রতারক, যেমন : 'বারাঙ্গনা' (সাম্যবাদী) কবিতা। কবিতাটির আরম্ভ এই রকম : 'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গাবে?' এখানে সম্বোধন খুবই স্পষ্ট, কিন্তু বারাঙ্গনাকে সম্বোধন করে কবিতার সূচনা হলেও; বারাঙ্গনাই যে অপরের কাছে আপন অধিকারের কথা জ্ঞাপন করছে, তা কবিতার দ্বিতীয় স্তরকে এসেই প্রাঞ্জলভাবে ধরা পড়ে। 'পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?'—বারাঙ্গনা যখন এইভাবে আপন অধিকারের কথা প্রকাশ করে, তখনই সূচনার সম্বোধনের ওপর আর নির্ভরশীল থাকা সম্ভবপর হয় না। আপাতসম্বোধিতই এই কবিতায় সম্বোধকের স্থান অধিকার করে নেয়। 'কৃষাণের গান' (সর্বহারা) কবিতার আরম্ভটিও এই রকম : 'ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর্ কষে লাঙল'। অথবা 'শ্রমিকের গান' (সর্বহারা) কবিতার সূচনা : 'ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী-দল!/ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল'। কিন্তু অচিরাৎ-'কৃষাণের গান' কবিতার দ্বিতীয় পংক্তিতে, ও 'শ্রমিকের গান' কবিতার তৃতীয় পংক্তিতে পৌঁছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে সম্বোধিতই প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্বোধকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'কৃষাণের গান'-এর দ্বিতীয় পংক্তি : 'আমরা মরতে আছি—ভাল করেই মরব এবার চল্'। বা 'শ্রমিকের গান'-এর তৃতীয় পংক্তি থেকে এইরকম আছে : 'আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই/পায়ের সুখে ভাঙব চল্'। নজরুলের কবিতার সম্বোধন-রীতির কয়েকটি মাত্র বিশিষ্টতার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো। কিন্তু সাধারণভাবে প্রায় সব কবিতাতেই যে পাঠক অলিখিতভাবে সম্বোধিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য উল্লিখিত বিশিষ্ট কতকগুলি সম্বোধন-রীতি নজরুলের কবিতাকে কিভাবে ও কতখানি সমৃদ্ধ করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে; কিন্তু এই ধরণের বিশিষ্টতা যে অনেক সময় অতর্কিত চমক ও চমৎকারিত্ব দুই-ই সৃষ্টি করতে পারে, নজরুলের কাব্যপাঠে অন্তত সেইরকম অভিজ্ঞতা হয়; এবং এই সূত্রে কবিতার এক ধরণের নাট্যশক্তি যে কোন-না-কোন রকমভাবে অংশত সঞ্চারিত হয়ে যায়, তা-ও অনাস্বাদিত থাকে না।

এই প্রসঙ্গেই অবশ্য কবিতাবিচারে কবি ও পাঠকের পরস্পরতার কথাটি উল্লেখ করা চলে। যে কোন কবিতার সম্বোধন সাধারণভাবে পাঠকের উদ্দেশেই। সি· কে· স্টিড যে কবি, পাঠক ও কাব্যভাবের ত্রিকোণের কথা বলেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না। পাঠক বা তথাকথিত সম্বোধিতের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার কাব্য-বিবেচনায় সব সময়েই থেকে যায়, কেন না এই উপাদানটি প্রবলভাবেই কাব্য-প্রকরণের অংশীভূত। যখন কবি একটি মনোভাব উচ্চারণ করেন, সেই মনোভাব উচ্চারিত অবস্থায় কবির ব্যক্তিত্ব থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়: অর্থাৎ উচ্চারিত যে কোন অবস্থাই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। কবিতার এই নিরপেক্ষতা গুণটিই বিশ্বজনীনতার ভিত্তি, এবং এই সূত্রেই পাঠক-উপাদানটি কাব্যরচনার সংলগ্ন হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন : 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া/ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ'। বা: 'সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়।/ওরে আয়/ আমায় নিয়ে যাবি কে রে/ 'দিনের শেষে শেষ খেয়ায়।' (শেষ খেয়া/খেয়া), তখন এই অনুভূতি ও আর্তি দুই-ই যে কবির আমাদের তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না; কিন্তু পাশাপাশি একথাও তো সত্য যে রবীন্দ্রনাথের এই আর্তি অনুভূতি রচিত অবস্থায় অনেকখানিই তাঁর ব্যক্তিগততার নিশ্চয় থেকে বিচ্যুত, কেন না উচ্চারিত মুহূর্ত অনুভবের দ্বিতীয় অনুভবের মুহূর্ত। প্রথম অনুভবের মধ্যে ব্যক্তিগততা যত সমগ্র, নিশ্চয় ও অনিবারণীয়, দ্বিতীয় অনুভবের ক্ষেত্রে তা অংশত ফিকে হয়ে যেতে বাধ্য। বস্তুত যে কোন কাব্যসৃষ্টি তার রচিত অবস্থায় কবি-'ব্যক্তি' থেকে খানিকটা সরে আসে, কাব্যপ্রচেষ্টার মধ্যেই ব্যক্তির আত্মত্যাগের ইতিহাস সংরক্ষিত থাকে। কাজেই রচিত কবিতায় কবির 'ব্যক্তি' যতখানি উন্মীলিত, নৈর্ব্যক্তির উন্মোচনও আংশিকভাবে বা ঠিক ততখানি প্রতিশ্রুত; অর্থাৎ কবিতায় কবির 'ব্যক্তি' সংরক্ষিত ক্ষেত্রে উপস্থিত মাত্র। আবার এই কবিতা যখন পঠিত হয়, তখন সেই কবিতার অধিকার পাঠকে বর্তায়; এমন কি কবি স্বয়ং-ও যদি পাঠক হন, তখন তিনি পাঠকই মাত্র, কবি নন। এবং এইখানে এসে কবিতা সম্ভবত কবি-'ব্যক্তি' থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কবি যখন লেখেন : 'কেন খুঁজে ফেরা দেবতা ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?/হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।' (সাম্যবাদী/সাম্যবাদী), তখন কবি নজরুলই পংক্তি দুটির রচয়িতা সন্দেহ নেই; কিন্তু পংক্তি দুটি যখন নজরুল ইসলাম বা অন্য যে কোন পাঠক পড়ছেন, তখন তা তাঁরই উচ্চারণমাত্র। অথবা : 'আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,/আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'—যখন পাঠক পড়েন, তখন 'আমি' আর কবি নজরুল অপৃথক থাকে না, পাঠকই কবিতার 'আমি' হয়ে ওঠেন; পাঠক কখনো 'নজরুল বেদুঈন, নজরুল চেঙ্গিস' পড়বেন না বা ভাববেন না। কবির দিক থেকে এ এক অসহায়-অবস্থা; নিজের অনুভূতি, অথচ লিখতে গিয়ে নিজেকে হারাতে হয় কতকটা, আর লিখিত অবস্থায় তার ওপর নিজের অধিকার থাকে না। এমন করুণ অভিজ্ঞতায়ও যে কবির আনন্দে সামান্য ঘাটতি পড়ে না, তা পক্ষান্তরে প্রমাণ করে যে, কবিতার পাঠকেই কবির আনন্দ তথা কবিতার কৃতার্থতা। ফলে কাব্য-বিবেচনায় কবিতার পাঠকের অধিকার ও ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে এবং বলা যায়, পাঠকই কাব্য-প্রয়াসের চূড়ান্ত ফল। বস্তুত কবিতা যখন রচিত হয়ে যায়, এবং কোন পাঠক কবিতাটি স্পর্শ মাত্র করে না, কবিতার সেই অবস্থাটি সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থা, অনেকটা জড়বস্তুর মত, যা ব্যবহার ছাড়া ভারপিণ্ডমাত্র। লিখিত অবস্থায় একখানি নাটক, অর্থাৎ একখানা নাট্য-পুঁথি যেমন মঞ্চ-নিরপেক্ষ অবস্থায়

C I B A Cosmetics
হুস্!
বিনাকা
রকেট
এসে হাজির!
এবার মুক্তোর মত
ঝক্‌ঝকে দাঁত ঝলকে
উঠবে...
নতুন রকেট প্যাকে ভরা বিনাকা
জুনিয়র ডিলাক্স টুথব্রাশের
জন্য ছেলেমেয়েদের হুড়োহুড়ি
দেখার মত। তিনবছরের বড়
ছেলেমেয়েদের জন্যে বিশেষভাবে
তৈরি এই টুথব্রাশের নাইলনের
কুঁচির ডগা গোল কোরে ছাঁটা
ও মোলায়েম যাতে-ওদের
মাড়িতে না লাগে।
ছোটবড় সকলের জন্যেই মনেরমত
বিনাকা টুথব্রাশ।
বিনাকা স্ট্যাণ্ডার্ড, ডিলাক্স,
শর্টহেড, জুনিয়র ডিলাক্স,স্ট্যাণ্ডার্ড,
বেবী স্ট্যাণ্ডার্ড,
ডিলাক্স।
বিনাকা টুথব্রাশে গোল
কোরে ছাঁটা কুঁচি থাকায়
বাচ্চাদের কোমল মাড়ি
ছ'ড়ে যায়না।
ULKA-CTB-61 BM

নিরর্থ ও শ্রেণীচ্যুত, কবিতার এই অবস্থাও অনেকটা সে-রকম। পাঠকের স্পর্শেই কবিতার শিল্পমুক্তি সম্ভব।

এই পাঠক-উপাদানটি যখন কাব্য-নির্মাণে ও কাব্যবিচারে অনিবারণীয় বলে গ্রহণ করা হয়, তখনও কিন্তু পাঠকের সমস্যা মেটে না। প্রকৃতপক্ষে, কবিরা অথবা কবিতা-শিল্পের আপোষহীন সমর্থকরা পাঠকের সমস্যা নিয়ে বার বার তিক্ত হয়ে উঠেছেন, এই তিক্ততা থেকে কখনো কখনো ক্রোধও দেখা দিয়েছে। একে এক ধরণের অসহিষ্ণুতা বলে মাঝে মাঝে মনে হয় বটে, তথাপি একথা স্বীকার না করেও উপায় নেই যে, পাঠকে নিবেদিত হয়েও কবিতা পাঠকের কাছ থেকে সব সময় সুবিচার পায় নি; পাঠক-জগতে অনেক সময় দুঃখজনক প্রতিরোধ বা প্রত্যাখ্যান সূচিত হয়েছে। এই থেকেই পাঠক-সমস্যার উৎপত্তি। কবিতার সঞ্চারণ-শক্তি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কতকগুলি সংস্কার সচরাচর পাঠকদের মধ্যে থাকে, এই সমস্যার মূল উৎস সম্ভবত সেইখানে।

যে কোন কবিতারই উপস্থিত পাঠক থাকেন; কিছু থাকেন যাঁরা পরিশীলিত প্রস্তুত, কিছু থাকেন আভ্যাসিক এবং এই শেষোক্ত কুলই বড় অংশ। কবিতার ওপর প্রত্যক্ষ বা নেতি পথে এঁদের প্রভাবই সর্বাধিক। এই বড় শরিকের অভ্যাসের আঘাতেই কবিতার সংস্কারমুক্তি বা শিল্পমুক্তির বিচিত্র আন্দোলন কবিতার ইতিহাসে বার বার দেখা দিয়েছে। আর এই তথ্যও খুব কৌতূহলোদ্দীপক যে এক সময়ের প্রত্যাখ্যান অপর সময় অভ্যাসে পর্যবসিত হয়েছে। আবার এক ধরণের কবি ও কবিতার সমর্থক আছেন, যাঁরা অভ্যাসের অমর্যাদা করেন না। অনেক সময় এই ধরণের অভ্যস্ত রুচির কবিতা হর্ষিত হয়ে থাকে। বস্তুত পাঠকদের দুটো ভাগ আছে: অব্যবহিত পাঠক ও দূরবর্তী পাঠক। কোন কবিকে আবার কবিতা লেখার সঙ্গে পাঠক তৈরি কাজেও অধ্যবসায়ী হতে হয়, আবার কোন কোন কবি প্রস্তুত পাঠক পান। সাধারণ-ভাবে অবশ্যই মনে হবে যে, শেষোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবিদের অবদান কাব্যশিল্পে অনেক বেশি।

এই পর্যন্ত আলোচনায় অন্তত দুটো বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে: এক, কবিতায় পাঠক এক অপরিহার্য উপাদান; দুই কবিতার এই পাঠক-উপাদান বিষয়ে জীবন্ত সমস্যাও আছে। কাব্যবিবেচনার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গকে তাঁর কবিতায় নজরুল কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, অতঃপর তা লক্ষ্য করা দরকার; এই সূত্রে নজরুল সম্পর্কে অনেকগুলি অলস ধারণা উন্মোচিত হতে পারে।

পাঠক সম্পর্কে তাঁকে কখনো ভাবতে হয় নি: নজরুল সম্পর্কে যখন এই কথা বলা হয়, তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁকে পাঠক তৈরির কাজে নামতে হয় নি, তিনি প্রস্তুত পাঠক পেয়েছিলেন। অথবা: পাঠকের অভ্যাসকে তিনি আহত করেন নি, বরং কবিতায় তিনি অভ্যস্ত রুচি ও রীতিরই পরিপোষণা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই ধরণের কথা আপাতদৃষ্টিতে খুব সাধারণ ও অকপট বলে মনে হলেও, এই সরল নিরীহতার অন্তরালে এখানে কবির প্রতি ভর্ৎসনাই বরাদ্দ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে এই ধরণের আপোষধর্মী কবিরা জনপ্রিয় কবিতা রচনা করে তাৎক্ষণিক সাধুবাদ আত্মসাৎ করে নিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের কবিতায় শিল্প-সন্ধিৎসার প্রতি মনো-যোগের অভাব খুবই প্রকট; ফলে, কাব্যের ইতিহাসে তাঁদের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় না। এই রকম ধারণার প্রতিবাদ করবার কোন প্রয়োজন নেই, কেন না তা বালভাষণ না হয়েও অতিরেকস্পৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, যে-কোন কবি সম্পর্কে আলোচনায় সবচেয়ে আগে তাঁর কবিতার পরিপ্রেক্ষিতটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। নজরুল ইসলামের কবিতা যে পাঠক পেয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর কবিতার তথাকথিত 'বিষয়'; আবার পাশাপাশি এ-কথাও আমাদের মনে রাখা ভালো যে, এক অখ্যাত হাবিলদারের অকপট এক কবিতা যে মোহিতলালের সম্বর্ধনা লাভ করেছিল, তার কারণ: তাঁর কবিতার উচ্চারণ গৌরব। আরো মনে রাখা দরকার, 'বিদ্রোহী' মিথ্-এ বাংলাদেশ নজরুলকে তখন পর্যন্ত স্থাপন করে নি। নজরুলের কবিতার 'বিষয়' তাঁকে অনায়াস পাঠক দিয়েছিল সন্দেহ নেই, তাঁর উচ্চারণ-বিশিষ্টতার প্রসঙ্গকে সেইজন্য ছোট করে দেখবার কোন দরকার নেই। কখনো সহজেই একথা মনে হতে পারে যে, উচ্চারণের ক্ষেত্রে নজরুলের নিজস্ব রীতিই পাঠককে তাঁর কবিতার পক্ষে কোন সমস্যা হয়ে উঠতে দেয় নি।

কবিতায় পাঠকের সমস্যা দেখা দেয় কবি ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান ঠিক কতটা হবে সে-সম্পর্কে অনবধানতা থেকে। এই ব্যবধানটি নজরুল কিভাবে লক্ষ্য করেছেন তা দেখা যেতে পারে। যদৃচ্ছা কয়েকটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক:

১। বল বীর
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নত-শির
ওই শিখর হিমাদ্রির।
* * *

বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা— প্রলয়ের আমি নটরাজ,
আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
(বিদ্রোহী/অগ্নিবীণা)

২। রক্ত রুদ্র উল্লাসে মাতি রে।
ভগবান? সেত হাতের শিকার।—
মুখে ফেনা উঠে মরে।
ভয়ে কাঁপিছে কখন পড়ি গিয়া তার
আহত বুকের প'রে
অথবা যেন রে অসহায় এক শিশুরে
ঘিরিয়া
অজগর কাল-কেউটা সে কোন
ফিরিয়া ফিরিয়া
চায়, আর ফোঁসে শন্ শন্ শন্,
ভয়-বিহ্বল শিশু তার মাঝে কাঁপেরে
যেমন—
তেমনি করিয়া ভগবানে ঘিরে
ধূমকেতু-কালনাগ অভিশাপ ছুটে
চলেছি রে;
আর শাপে ঘেরা অসহায় শিশু সম
বিধাতা তোদের কাঁপিছে রুদ্র ঘূর্ণির
মাঝে মম।
(ধূমকেতু/অগ্নিবীণা)

৩। আমি ঝড়? ঝড় আমি?—না, না,
আমি বাদলের বায়।
বন্ধু। ঝড় নাই
কোথায়?
(ঝড়/বিষের বাঁশী)

৪। আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত
পীড়িতের মাখি খুন,
লালে লাল হ'য়ে উদিছে নবীন
প্রভাতের নবারুণ!
আজ হৃদয়ের জমা-ধরা যত কবাট
ভাঙিয়া দাও!
রং-করা ঐ চামড়ার মত আবরণ
খুলে নাও!
(কুলি-মজুর/সাম্যবাদী)

৫। প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায়
তাদের সর্বনাশ!
(আমার কৈফিয়ৎ/সর্বহারা)

৬। অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
(চল্ চল্ চল্/সন্ধ্যা)

৯। ঊর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের
শিখা অনির্বাণ।
(প্রলয়শিখা/প্রলয়শিখা)

প্রথম উদাহরণের উচ্চারণরীতির বিশিষ্টতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি আরেকবার বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে এই অংশে কবির আত্মশক্তির উদ্বোধনই মুখ্য হওয়া সত্ত্বেও পাঠকদের মধ্যেও তিনি আত্মশক্তি সম্পর্কে সত্য বোধ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন। বস্তুত, প্রত্যেকের মধ্যেই যে আমতশক্তির সঞ্চয় আছে, এই বোধের অংশ তিনি পাঠকদের দিয়েছেন পাঠককে কবিতার অংশীভূত করে নিয়ে। পাঠকদের কবিতার অভ্যন্তরে সংস্থান করে দেওয়ার আরেকটি উদাহরণ দুই সংখ্যক দৃষ্টান্ত। 'বিধাতা তোদের কাঁপিছে' বলে কবি পাঠককে কবিতার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। এখানে 'তোদের'—এই ইতরবাচক প্রয়োগে পাঠকদের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ না পেয়ে বরং বিধাতার প্রতি তাচ্ছিল্যই দেখানো হয়েছে। তিন সংখ্যক দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে কবি নিজের সম্পর্কে এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাঁর বাসনা ও তাঁর পরিচয়ের মধ্যে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলেই এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে বেদনা-প্রসূ। এই মনোভাবের উচ্চারণে প্রথম পংক্তির স্থিতি, এবং এখানেই কবির পক্ষে থেমে পড়া বোধহয় শোভন হতো, কিন্তু তিনি তারপরও দুটি ভাঙা পংক্তিতে তাঁর ধরা গলার স্বর উপহার দিয়েছেন। 'বন্ধু। অড় নাই/কোথায়?'—এই অংশে পাঠককে তাঁর ভগ্নবুকের ভিতর লোকটি উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন; অর্থাৎ, কবির আত্মকথনই যথেষ্ট নয়, তাঁর ভগ্নবুক পাঠক-দর্পণে সমর্পিত হয়ে আরো প্রত্যয়িত হয়েছে। এখানেও, অতি কারুনিপুণ উচ্চারণে পাঠক কবিতার অভিব্যক্তির সংলগ্ন হয়ে গেছে। চতুর্থ সংখ্যক দৃষ্টান্তে কবি সোজাসুজি পাঠকদের দীক্ষা দিচ্ছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকপট ভাষায়, অনুজ্ঞা ধরণের উক্তির মাধ্যমে। এখানে পাঠকই উদ্দিষ্ট, ফলে কবি ও পাঠকের মধ্যে একটি সরল ব্যবধান লক্ষণীয়। পাঠক কাব্যদেহে উদ্দিষ্ট হিসাবে গৃহীত এবং এই গ্রহণ প্রধানত বহিরঙ্গ; ফলে উচ্চারণের একটি ভঙ্গিমাত্র রূপেই তা গ্রাহ্য। কবি-পাঠক ব্যবধানটি এখানে অতি-নিরূপিত বলে হয়তো উৎকর্ষের দিক থেকে হানিকরও। কিন্তু পঞ্চম দৃষ্টান্তে কবি আর চতুর্থ দৃষ্টান্তের মত দীক্ষাগুরু নন, এখানে পাঠকের কাছে তাঁর 'প্রার্থনা' আছে। কবি-বাসনার কৃতার্থতার জন্য পাঠকের সহকামনা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। এখানেও পাঠক-কবির ব্যবধানটি সূচিত; তবে কবির কর্মযজ্ঞে পাঠকদের ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়ার দরুণ, অর্থাৎ কবি-বাসনার সমষ্টি-বাসনা রূপায়ণের মাধ্যমে তিনি পাঠকদের ভূমিকাকে বহিরঙ্গ থেকে অনেকখানি মুক্ত করতে পেরেছেন। ছয় সংখ্যক দৃষ্টান্তে আপাতদৃষ্টিতে সম্বোধিত 'তরুণ দল'-এর সঙ্গে দ্বিতীয় স্তবকে কবির অবিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসলে কবিতাটি একটি গান; কবিও কবিতা-পাঠের বা গানের নির্দেশ দিয়েছেন: 'কোরাস'। এই নির্দেশটিই যথেষ্ট: সমবেতের মধ্যে কবি-স্বাতন্ত্র্যের অতি-সচেতন অবলুপ্তির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এখানে কবি-পাঠকের মধ্যে যে কোনও রকমের দূরত্ব বা ব্যবধান সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে। এবং সপ্তম সংখ্যক দৃষ্টান্তেও কবির আত্ম-ঘোষণায় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-কণ্ঠ শোনা যায় না, সেখানেও বহুবচনাত্মক সর্বনাম প্রয়োগে কবি-ব্যক্তিত্বের বহুর মধ্যে সম্প্রসারণই লক্ষণীয়। পাঠক ও কবির ব্যবধানটি অতি-নিরূপিত আত্ম-সম্প্রসারণের মাধ্যমে কবি এখানে প্রায় পুরোপুরি মুছে ফেলতে পেরেছেন।

এই পর্যালোচনা থেকে সম্বোধিত তথা পাঠক ও কবির পরস্পরতার ব্যাপারটি নজরুল কিভাবে তাঁর কবিতায় নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন, তার একটি সাধারণ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সর্বত্রই প্রায় দেখা যাচ্ছে কবি ও পাঠকের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তিনি তার লোপ ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছেন। উভয়ের মধ্যে এই দূরত্বটির পরিমাপ ঠিক কি এবং তার নিষ্পত্তি কিভাবে ঠিক সম্ভব, তার কোন বিধিনির্দেশই নেই: তবে কবিতার ইতিহাসে এইরকম অভিজ্ঞতার অভাব নেই যেখানে ব্যবধানের অস্বীকার বা ব্যবধানের সম্প্রসারণ কবিতার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে দুই-ই চরম রীতি: কবি ও পাঠকের পরস্পরতার সমস্যা এই রকম ক্ষেত্রগুলির অস্তিত্ব আছে বলেই কখনো কখনো গুরুতর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা এখানে নজরুলের কবিতার সমালোচনায় আগ্রহী নই, তাঁর পাঠক-কবি পরস্পরতার নিষ্পত্তি-রীতি ভ্রমাত্মক কি না, সেই রকম কোন বিতর্কেও প্রবেশ করতে চাই না, নজরুলের কবিতার সাধারণ পরিচয় গ্রহণেই বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ। তথাপি একটি কথা এখানে সম্ভবত বলা যেতে পারে: কবি ও পাঠকের ব্যবধান নিষ্পত্তির যে রীতি নজরুল গ্রহণ করেছেন, তা তাঁর কাব্যভূমিকার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। নজরুলের কবিতার যে অধিষ্ঠান বাংলা কাব্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এই রীতিটি তাঁর পক্ষে বিশেষ জরুরি ছিল বলে মনে হয় এবং তার ব্যবহারকে কবিতায় তিনি যে সহজেই তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পেরেছেন, তাতেও কোন সন্দেহ থাকে না।

এই তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা উন্মুখ হয়ে উঠি যখন সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের প্রাসঙ্গিক আলোকে বিষয়টিকে আমরা লক্ষ্য করি। নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে বা আখ্যানমূলক কবিতায় সম্বোধনের প্রত্যক্ষ-রীতি যদিও সহজ স্বাভাবিকতায় গৃহীত, গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরণের প্রত্যক্ষ সম্বোধনকে কোন অনিবার্য নির্দিষ্টতা দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি দেখা যেতে পারে:

১। শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে
শস্যশালিনী করিব।
(সত্যানন্দের উক্তি: আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড, ৬ম পরিচ্ছেদ)

২। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ?
(বাসবের উক্তি: মেঘনাদবধ কাব্য দ্বিতীয় সর্গ)

ইষ্টার্ন রবার ওয়ার্কস
কলিকাতা-১৫

উদ্ধৃতাংশ দুটির একটি উপন্যাস ও একটি আখ্যানমূলক কাব্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রথম উদ্ধৃতিতে সত্যানন্দ মহাপুরুষের উদ্দেশে উক্তি করেছেন, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দেবরাজ ইন্দ্র দেবী কাত্যায়নীকে সম্বোধন করেছেন। সম্বোধনের এই প্রত্যক্ষরীতি উপন্যাস বা আখ্যানমূলক কাব্যে গ্রাহ্য, এখানে এক চরিত্র অপর চরিত্রকে সম্বোধন করে থাকেন। কিন্তু গীতিকবিতায় ঃ

১। প্রদীপখানি নিবে যাবে
মিথ্যা কেন জ্বাল ?
(চিরায়মানা/ক্ষণিকা)

২। গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে
আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
(অন্ধকার/বনলতা সেন)

এই রকম সম্বোধন যখন প্রায় প্রত্যক্ষরূপেই উপস্থিত, তখন কি কবি কোন ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করছেন বলে খুব অভ্রান্তভাবে বলা যায়? এখানে বক্তা কিংবা উদ্দিষ্ট কেউই তথাকথিত অর্থে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিচরিত্র নয়। তবু যে গীতিকবিতায় এ-ধরণের উচ্চারণ প্রায়ই শোনা যায়, তার কারণ ঃ গীতিকবিতায় এই পদ্ধতি প্রকরণমাত্র রূপে সচরাচর গৃহীত হয়, এই রকম উচ্চারণ গীতিকবিতায় মন্ময় নৈর্ব্যক্তিকতা সহজেই উপহার দিয়ে থাকে। সাধারণভাবে অবশ্যই মনে হতে পারে যে, এখানে কবি পাঠককে সম্বোধন করছেন (নজরুলের নির্বাচিত অংশবিশেষ আমরা এইভাবেই লক্ষ্য করতে চেয়েছি), কিন্তু গীতিকবিতার বা মন্ময় শিল্পের বিশ্বমুখীনতার কথা মনে রাখলে এইভাবে বিপদগ্রস্ত হতে হয় না। আর, তখন কবির এই মুহূর্তের উক্তির মধ্যে যে তাঁর তাৎক্ষণিক ভাব-ভাবনাই প্রকাশিত মাত্র, এই রকম প্রমাদও সহজে এড়ানো চলে। সুসেন ল্যাঙ্গারও মোটামুটি এই রকম দৃষ্টিতেই গীতিকবিতার সম্বোধনের ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করেছেন, এবং বলা বাহুল্য, তাঁর বিশ্লেষণ ভঙ্গিটি মনোজ্ঞ।

তথাপি নজরুল সম্পর্কে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতটি যে কিছু আলাদা, আমাদের তা মনে রাখা দরকার। এমন কি 'গীতিকবিতার প্রকরণ' কথাটিকে খুব নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করলেও এই কথাটিও মেনে নিতে হয় যে, সব কবির কবিতার সমান অনুশাসন চলে না; এমন কি, একই কবির কবিতারও পর্যায়ভেদে শাসনভেদ দাবি করে। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণই গ্রহণ করা যাক ঃ

১। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
(১নং/গীতাঞ্জলি)

২। রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-
অভিমান, (৩৭নং/বলাকা)

৩। দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না
জানো।
মুক্ত করো ভয়,
(১১নং/স্বদেশ বিষয়ক/গীতবিতান-১)

৪। ধনে জনে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তনিশীথ করিস যাপনা—
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার।
(১২নং/ঐ/ঐ)

এখানে প্রথম সংখ্যক উদ্ধৃতির সম্বোধিত অতি-নির্দিষ্ট ঃ কবির 'প্রভু', প্রায় একটি চরিত্রের মতোই উপস্থিত। কিন্তু অপর তিনটি উদ্ধৃতির সম্বোধন বোধহয় কোন নির্দিষ্টের প্রতি উদ্দিষ্ট হয়; অন্যথায় বলা যেতে পারে, এখানে পাঠকই সাধারণ লক্ষ্য। অথবা এই তিনটি ক্ষেত্রে কবি নিজেকেই সম্বোধন করছেন। মনে হয়, এক সঙ্গে দুই-ই। কবি ও পাঠকের ব্যবধানহীন এক অভিন্নভূমিতে সহাবস্থানের এগুলি অতি সুন্দর কাব্য-দৃষ্টান্ত। এখানে কবিকণ্ঠ বা ব্যক্তিকণ্ঠ এবং সমষ্টিকণ্ঠ সংলগ্ন ও পরস্পর। এবং এই রকম স্থলে যে কবিতার ব্যক্তিত্ব মুক্তি ঘটে যায়, এটাও সাধারণ অভিজ্ঞতা। একে গীতিকবিতার তথাকথিত 'মন্ময় নৈর্ব্যক্তিকতা' বলা সম্ভবত উচিত হবে না। তবে এইভাবেই দেখা যাবে যে সম্বোধন-রীতি ক্ষেত্রভেদে স্বতন্ত্র মনোযোগ ও বিবেচনা দাবি করে। কখনো কখনো তা কবিতার প্রকরণগত উপাদানমাত্র হয়েও যে পাঠকের প্রতি উদ্দিষ্ট হতে পারে, তার দৃষ্টান্তও খুব কম নয়।

কিন্তু এই রীতির স্পর্শে নজরুলের কবিতা যে উচ্চারণের দিক থেকে কখনো কখনো খুব বিশিষ্ট বলে মনে হয়, বা তাঁর কণ্ঠস্বর খুব স্বাধীন শোনায়, তার প্রধান কারণ সম্ভবত ব্যক্তিকে সমষ্টি অর্থে নৈর্ব্যক্তিতে সমর্পণ। এ এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিকরণ সন্দেহ নেই এবং এর পশ্চাদ্ভূমিতে জরুরি কালচৈতন্য খুব প্রখরভাবে উপস্থিত। আর, কালবিদ্ধ জীবনে সমষ্টিগত উপযোগিতার ভিত্তিটি সম্পর্কে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। এই নিশ্চয়তা কবিতার পক্ষে কতখানি হানিকর, সেটা আলাদা প্রসঙ্গ, কিন্তু এই রকম ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ঋজু ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, সময় সময় তারস্বর ঘোষণার মতও শোনায় হয় তো, তবু কবির অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সততা সম্পর্কে প্রশ্ন করা চলে না। এবং একথা তো খুবই সত্যি যে, এই উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি-তাৎপর্যেই যে কোনও শিল্পের অধিষ্ঠান। উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার অংশটিকে যদি বিষয়ের দিক বলা যায়, তাহলে তার স্মৃতি-ধারণকে শিল্প-রচনার অংশ বলে উল্লেখ করা চলে। এই শিল্প-রচনার অংশই বস্তুত অভিব্যক্তির অংশ ঃ বক্তব্য কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তা অভিব্যক্ত হচ্ছে। এই অভিব্যক্তির কৃতার্থতাই বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা সাধ্য। কাজেই অভিব্যক্তির ধারাই প্রধানভাবে লক্ষণীয়।

(আগামী সংখ্যায়)

১৯৬৯-তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ

● সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ : আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

॥ আঠারো ॥

নন্দকিশোর বৌকে বলছিল, ইস, দাদার সঙ্গে যে আর কোনদিন দেখা হবে ভাবিই নি। আমি তাদের নতুন বাংলোবাড়িটার বারান্দায় আধশোয়া হয়েছিলাম। আর আনমনা হয়ে বার বার অতীতের কথা ভাবছিলাম। আমার কাছে এ-সব কিছুই যেন এক আশ্চর্য যাদুর ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। কোথায় সেই কলকাতার দিনগুলি কোন স্বপ্নলোকে ডুবে হারিয়ে গিয়ে তবু এখনো যেন মনের মধ্যে জেগে আছে। এ-সব কিছুই যে নন্দকিশোরের সঙ্গে হঠাৎ ডুয়ার্সে দেখা হয়ে যাওয়ার ফল তা কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি। একদিন কলকাতার রুটিনে-টানা জীবনের জটিলতা থেকে হুস করে ডুব মারলাম। কে জানে হয়তো তলে তলে মনের মধ্যে ক্লান্তি জমে উঠেছিল। সেই ক্লান্তির জগদ্দল পাথরটা সরিয়ে আমি হয়ত মনে মনে মুক্তি খুঁজছিলাম। অবশ্য কোথায় যাব কি করব কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে একদিন ভোরবেলা উঠে সুটকেস্ বেডিং বেঁধে রওনা দিলাম উত্তরবাংলায়। নন্দকিশোরকেও বলা হয় নি। শিলিগুড়িতে আমার এক বন্ধু হরেন আছে। তাকে একটা তার পর্যন্ত করা হয় নি। সেখানে এসে উঠতে আমাকে দেখে তো তার বিস্ময়ের চরম অবস্থা। আমি বললাম: কি রে, চিনতেই পারলি না?

ভাবছি চেনাটা উচিত হবে কি না; সে মৃদু মৃদু একগাল হাসছিল। কিন্তু চেয়ার থেকে উঠছিল না।

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বৌদি তাকে বকে উঠলেন: আচ্ছা মানুষ তো তুমি! ওঠো, বেডিংটা ধরে ওঁকে একটু সাহায্য কর।

সাহায্যের অবশ্য দরকার ছিল না। রিক্সাওয়ালাই সেটা নামিয়ে রাখছিল। আমি পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছিলাম। হরেন বলল, দ্যাখ দিকি আজকের তিথিটা। কী নক্ষত্র লগ্নটাই বা কী!

আমি বললাম, অতিথির যে কোন তিথি থাকতে নেই সংসারী হয়ে থেকে সেটাও কি ভুলে গেছিস নাকি?

বাবা, কী ভাগ্য আমাদের! বৌদি ফোড়ন কাটছিলেন।

সে-সব দিনগুলি মনে পড়ে। তারপর দুপুরবেলা চান-খাওয়া সেরে নন্দকিশোরকে একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করে দিয়েছিলাম। কী লিখেছিলাম মনেও পড়ে না। তবে যতদূর মনে পড়ে কোন ঠিকানা-পত্র দিই নি। অতীতের পিছুটান রাখতে আর ইচ্ছে ছিল না। পাছে আবার কোন সূত্রে ফিরে যেতে হয়।

তবে কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক কাটানো মুশকিল। মাসে দু-একবার যেতেও হয়েছে। এই তো দিনকতক আগেও কর্মসূত্রে ঘুরে আসতে হয়েছে। তবে ইচ্ছে করেই পুরনো জায়গায় আর যাই নি। নন্দকিশোরেরও খোঁজ নেওয়া হয় নি।

আজ হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পথের মজাই যে এই, কখন কোথায় কার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না।

বসে বসে সেইসব কথা ভাবছিলাম। নন্দকিশোর যে এখানে আছে তাই বা কী করে আমি জানব। হঠাৎ কী আশ্চর্যভাবে যে দেখা হয়ে গেল। এসেছিলাম একটা দরকারী কাজে। কাজ শেষ করেই ফিরে যাব কথা ছিল। মাঝে থেকে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে দুপুরটা কাটল এখানেই। রাত্রিটাও এখানেই কাটাতে হবে। নন্দকিশোরকে যদিবা কাটানো যেত, তার বৌকে এড়াতে পারা গেল না।

দুপুরে ভাত খেতে দিয়ে একটা হাত-পাখা হাতে সে বসেছিল আমার পাশে। বলছিলাম, আরে, পাখা আবার কেন?

সে শুনছিল না। বলল, আপনি খান দিকি নি। এটুকু আমাকে করতে দিন। শ্বশুরবাড়ি বলুন যাই বলুন কিছুই তো পাই নি। আজ আপনাকে পেয়ে কী যে ভালো লাগছে।

ওঁরা কি কেউ আসেন নি এখানে? আসতে তুমি নিজে লিখেছিলে তো?

সে বলল, না। কি হয়েছে জানেন, বাংলাটা বলতে যদি বা জানি, লিখতে একেবারেই জানি না। ওকে কত বললাম লেখাটা শিখিয়ে দিতে, তা আজও পর্যন্ত সময়ই করতে পারল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয় বুঝি?

কন্ট্রাক্টরীর ওই মজা। ওকেই বা কী দোষ দেব! সারাদিন যা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়, সময় একেবারেই পায় না। সকালে উঠে বেরিয়ে যায়, কোন-কোনদিন ফেরে অনেক রাত করে। তখন কী যে ভয় করে!

আমি খেতে খেতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। একটা কথা আমি বুঝতে পারছিলাম এই সংসারটুকু এই চৌহদ্দিটুকুর মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতেই তাদের দুজনের এই ঘরকন্না। আর স্বামীর প্রতি ভালোবাসাতেও নন্দকিশোরের বৌ কারোর চাইতে কম যায় না। কে জানে হয়তো তার শাশুড়ীর মনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে এই নিয়ে। ছেলে নেপালী বৌ বিয়ে করেছে। তাই তিনি আসতে চান না। ছেলের টাকা নিতেই হয়, তাই কোনরকম মন্তব্য করতেও তিনি বিরত। এতে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই। থাকবার কথাও নয়। আমরা যে আসলে সংস্কারের বাইরে কিছুতেই যেতে পারি না। নন্দকিশোর নেপালী মেয়ে বিয়ে করেছে শুনে আমারই প্রথমটা কেমন খটকা লাগছিল। আর সে তো মায়ের মন! নিশ্চয়ই তিনি কতরকম ভেবেছেন এই নিয়ে।

তুমি নিজে গিয়ে একবার নিয়ে এসো না তোমার শাশুড়ীকে। তিনি হয়তো খুশিই হবেন।

পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে নন্দকিশোরের বৌ নিচু হয়ে কপালের চুল সরাবার ছলে হয়তো মুখ ঢাকছিল ইচ্ছে করেই। হয়তো তার মুখের ভাব সে আমাকে জানতে দিতে চাচ্ছিল না।

প্রসংগ ঘুরিয়ে দিতে আমি তারপর বললাম, তুমি তো বেশ বাঙালীর ঘরের বৌ-এর মত রান্না করতে শিখে গেছ।

তার মুখে তৃপ্তির ভাব খেলা করল। সে বলল, মোচার ঘন্ট দিই আরেকটু? আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না। আপনি আমার দাদার মত। এই ছোট বোনকে লজ্জা করবেন না কিন্তু। আরেকটু ঘন্ট দিই?

লাগলে আমি তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেবো ভাই। তুমি কিছু ভেবো না। নন্দকিশোরের বৌ তুমি। তুমি যে আমার কত স্নেহের পাত্রী।

ওঁর কাছে আপনার কথা কত শুনেছি। যখনই দুজনে কখনো বসি, আপনার কথা কত বলেন। আগে তো সব সময় বলতেন। শুনতে শুনতে আপনি আমার কত চেনা হয়ে গেছেন। আজ আপনাকে যখন নিয়ে এল, দেখার সংগেই, বিশ্বাস করবেন না আপনাকে চিনতে পারলাম।

আমি অত্যুক্তি করি নি। ডুয়ার্সের এই কর্মময় জীবনের মাঝখানটায় আজকের হঠাৎ একটি দিন এই ঘর-সংসারে, নির্জনে বসে খানিকটা কথাবার্তা কী ভালোই যে লাগছিল বলে বোঝাতে পারব না। আমি চিরদিন ইস্কুল-কলেজ পালানো ছেলে, রবীন্দ্রনাথ কোনদিন ভালো করে পড়ি নি, ভালো বুঝতেও পারি নি। আজ হঠাৎ কি করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দু-এক কলি আমার মনে গুনগুন করে উঠছিল,

দেশে দেশে মোর ঘর আছে,
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।

সেই ঘর বুঝি এইখানে, এমনি কত জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে, কত নিবিড় মমতায় গাঁথা, কে তার হিসেব করতে পারে।

নন্দকিশোরকে নিয়েলাম একবার বলছিলাম, ভারী লক্ষ্মী বৌ পেয়েছ তুমি। ভারী মিষ্টি আর লাজুক। আর যাই কর, ওর মনে যেন কখনো আঘাত দিও না। তোমার সংসার দেখে আজ খুব তৃপ্তি পেলাম।

নন্দকিশোর বলল, কিন্তু দাদা, আপনার নিজের কথাই যে এখনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়ে উঠলো না।

আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আমার আবার কী নিজের কথা থাকতে পারে!

হ্যাঁ সন্ন্যাসী মানুষই বটে। বলে নন্দকিশোর হাসল। তবে সে রাজ-সন্ন্যাসী আর কী। জীবনের প্রতি ভালোবাসা তো আপনার আমাদের কারোর চাইতে কম ছিল না। সে আর কেউ না-জানুক আমি তো জানি।

বললাম, অনেক সময় আমরা যতটা দেখি, তার আড়ালেও কিছু থাকে যা দেখা যায় না।

সে হয়তো কারুর চোখের দোষ। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আমার আর যে দোষই থাকুক চোখের দোষ কোনদিন ছিল না।

আমি তার কথার উত্তরে শুধু হাসলাম।

নন্দকিশোর বলল, দাদা, আপনি আজো কি বিয়ে-থা করেন নি? বিশ্বাসই করি না। কোথায় রেখেছেন বৌদিকে বলুন একবার গিয়ে দেখে আসি।

তাহলে আর তোমাকে খুশি করতে পারলাম না।

সে আমার চোখের দিকে অপলক স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, কী জানি, আপনি মিথ্যে কথাই বা কেন বলবেন! তবু কেন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

ইচ্ছে না-করে বিশ্বাস করো না।

আপনি তো বলেই খালাস। এতদিন পরে দেখা, মাঝের দিনগুলি বরং ছিল ভালো। দেখা হয় নি, ছিলেন হাজার মানুষের ভিড়ে, ছিলেন মনের মধ্যে।

দেখা হয়ে কি হল?

দেখি, সেই দূরে এখনো সেই দূরেই আছেন।

তাই নাকি?

একদিন কাউকে না বলে, আমাকে পর্যন্ত না-জানিয়ে পালালেন। কী যে হয়েছিল আজো জানি না। তারপর চিঠি যদি বা দিলেন, তাতেও ঠিকানা রইল না। জানি ইচ্ছে করেই করেছিলেন ব্যাপারটা। এই নিয়ে আমার অভিযোগ কম ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখন তো কেটে গেছে?

গেছে আর কই? নতুন আকারে আবার জেগে উঠছে।

তাহলে দাও, ঝোলাটা নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি।

পড়বেন বললেই যেন বেরিয়ে পড়তে পাচ্ছেন। আপনাকে দু-তিনদিন যদি এখানে আটকে রেখে না-দিই তো কি বলছি!

আরে বাসরে, ও-কাজও করো না। আমার কত যে কাজ তা জানো না তো?

সে খুব বুঝতে পেরেছি। মাথা নেড়ে নন্দকিশোর আমাকে বলল, আপনার ভাই-বৌয়ের হাত এড়িয়ে যদি পালাতে পারেন যাবেন। আমি কোনো আপত্তিই করব না।

ব্যাকুলভাবে বললাম, আর যাই কর দাদা, ওই কাজটি করো না। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাব। তোমাদের সংসারটা আমার ভালোই লেগেছে। ডুয়ার্সে যে আমার এ-রকম আস্তানা একটি জুটে গেল এটাকেই খুব ভাগ্য বলে মনে করছি।

ডুয়ার্স সম্পর্কে আগে খুব ভয় ছিল আমার।

আমারও ছিল। এর কারণ আর কিছু না। আমরা চিরকাল নিশ্চিন্ত একটি গন্ডীর মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত। কলকাতা শহরের ছোট্ট ঘেরাটোপটুকুর ভিতরে ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের আওতার মধ্যে বন্দী থাকব, পাঁজি-পুঁথি, শনি-মঙ্গলবারের শাসনে। তার বাইরে যে দেশ আছে তা আমরা ভাবতেই পারি না। তাই ডুয়ার্স নিয়েও আমাদের ভীতির আর অন্ত নেই।

আপনি কি প্রথমেই এখানে আসেন? আমার-বন্দুর মনে আছে, আপনার চিঠি পেয়ে ঠিকানা না-দেখে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পোস্ট আপিসের সীলটাও পড়তে পারি নি। নন্দকিশোরের ঠোঁটে ম্লান হাসি।

আমি তোমাকে চিঠি দিয়েছিলাম শিলিগুড়ি থেকে।

ডুয়ার্সে এসে এক হিসেবে ভালোই করেছি। এখন আমি দেখছি, বিদেশে যাবার দুর্বুদ্ধি আমার আরো আগেই কাটলে ভালো হত।

আসলে কি জানো, নন্দ, একটা কথা বলি তোমাকে—বিদেশে যাবার আকুলতা হয়তো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। কিন্তু ভাবতে ভুলে যাই যে, দেশকেই আমরা সকলে না-চিনে না-জেনে বিদেশ বানিয়ে বসে আছি।

সারা দুপুরের আকুলতা থিতিয়ে গেছে। এখন শান্ত সন্ধ্যা ডুয়ার্সের একটি বসন্তের। হ্যাঁ, বসন্তের সূচনা হয়ে গেছে বলা চলা। অন্তত দেয়াল-পঞ্জিকার নির্দেশকে যদি অভ্রান্ত জানতে চয়, তাহলে ফাল্গুনের সূচনা বেশ কিছুদিন। নন্দকিশোরের এই বাংলো ছেড়ে এক্ষুণি যদি বেরিয়ে পড়ি, বন্দরের চৌহদ্দিটুকু ছাড়াতে পাঁচ-সাত মিনিটও লাগবে না, তারপরেই চোখে পড়বে ডুয়ার্সের বসন্তের রূপ। কিন্তু থাক সে-কথা। ডুয়ার্সের বসন্তের কথা বলব অন্যত্র। তার আগে শীতের রূপের কথাও যে বলতে হবে।

নন্দকিশোরের বাংলোর বারান্দায় বসে আছি। জলঢাকার আলো এসে পৌঁচেছে এ-পর্যন্ত। জলঢাকা প্রজেক্টের কল্যাণে অন্ধকার উত্তরবাংলার অনেকটাই আজ আলোকে আলোকময়। এখান থেকে বসেই দেখছি, দূরে দূরে বন্দরের

আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। ওইখানে বাস ও ট্যাক্সিগুলি ছুটে ছুটে এসে দাঁড়াচ্ছে। চলমান গাড়ির আলো। স্টার্টারের শব্দ। যন্ত্রদানবের চাকাগুলি ছোটবার প্রেরণায় চঞ্চল ও গতিময় হয়ে উঠেছে। এক হিসেবে গতিই যে বর্তমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, সেই গতির উন্মাদনায় শুধু মাটিতে থরথর করে কাঁপছে না চাকা, কাঁপছে মানুষের বুকের মধ্যেকার হৃৎপিণ্ডও। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মানুষ আজ স্থির হয়ে বসতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। মানুষ যে গ্রহে-গ্রহান্তরে যাচ্ছে, স্পুটনিক ওড়াচ্ছে, চাঁদকে জয় করছে। চোখের আড়ালে রয়ে গেছে কত না অজানা নদী, কত মরুভূমি। কত সমুদ্র দেখা হয় নি, দেখা হয় নি তার মধ্যবর্তী অপরিচিত দ্বীপ। মানুষকে থামলে চলবে কেন?

মনে হয় এক অধ্যাপকের কথা। ক'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছিলেন ডুয়ার্সে। জলদাপাড়া সংরক্ষিত বন-কানন সরকারী অতিথিশালায় দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সে-ও প্রায় বছর-খানেকের কথা।

বৃদ্ধ অধ্যাপককে প্রশ্ন করেছিলাম, এই প্রথম আপনি উত্তরবাংলায় এলেন? ভদ্রলোক একটি চেয়ারে বসেছিলেন। গলাবন্ধ কোট। কোঁচানো ধুতির প্রান্ত মাটিতে লুটিয়ে। পাশে রেখে দেওয়া ছড়িখানি। পায়ে একজোড়া পাম-সু। পুরু পাথরের চশমা। কানের দুপাশে ঈষৎ রুপালী চুল চকচক করছিল। তিনি জবাব দিলেন না। জবাব এলো তাঁর স্ত্রী-র কাছ থেকে। ভদ্রলোকের স্ত্রী-ও ছিলেন সঙ্গে। বললেন, তা আর বলো না বাবা! তুমিই বলি তোমাকে। সারাজীবন তো শুধু বই আর বই আর ছাত্রদের নিয়ে কাটালেন। বই থেকে মুখ তুলে কোনদিন বাইরেও তাকিয়ে দেখেছেন কি না জিজ্ঞাসা করলেও জবাব পাবে না।

হাতের কাছে রক্ষিত একটি কৌটো থেকে খানিকটা জর্দা তুলে মুখে দিলেন। পান চিবচ্ছিলেন। চলতেই থাকল। বললেন, আমিই শেষ পর্যন্ত জোর করে তবে নিয়ে এলাম এদিকে। জামাই ডি এফ ও আমার এদিকে আছে অনেকদিন। যা করি আমাকেই করতে হয়। এইভাবেই সারা পশ্চিম ভারতও দেখা হয়ে গেছে।

তাহলে তো উনিও দেখেছেন।

ওকে দেখা বলে না বাবা। গৃহিণী উষ্মা প্রকাশ করলেন, রাজগীরে ব্রহ্মকুণ্ডের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমাকে বললেন, দ্যাখ সবই তো হ'ল, এবার চল একদিন রাজগীর দেখাতে নিয়ে যাবে বলেছিলে —শুনে আমি মরে যাই বাবা। রয়েছেনই তো সামনে। দ্যাখ না জিজ্ঞেস করে!

জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না, তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললাম, এদিকে এসে আপনার কি ভালো লাগল? মানে, চোখে পড়বার মত—

তিনি একটু সময় নীরব থেকে বললেন, দেখুন, একটা কথা বলি। এখানে আমি মেয়ে-জামাইয়ের কাছে এসেছি বটে, তবে কৌতূহল খুব ছিল। না-জানি ডুয়ার্সটা কি রকম দেখব। এখন দেখছি এখানেও সেই গতির চঞ্চলতা স্পর্শ করেছে মানুষকে। প্রকৃতির মধ্যেও মানুষের শান্তি নেই। অবশ্য আই মীন —আমার আগেই এটা ধারণা করা উচিত ছিল।

মানুষ কি তবে স্থির হয়ে থাকবে বলতে চান?

না, তা কেন? একটু লাল হলেন তিনি। ছড়িটা ধরলেন একবার ডান হাত দিয়ে। পরে বললেন, আই মীন, জীবনের গতিতত্ত্বে নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাসী। কিন্তু অহেতুক গতির উদ্ভ্রান্ত উন্মাদনার জন্যে আমরা কত দাম দিচ্ছি জানেন?

একটু থেমে বললেন, বর্তমান সভ্যতার কথা বলছি। আমি একান্তমনে যা বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাসের কথা। বর্তমান যুগে অহেতুক অজস্র অর্থব্যয় করে মানুষ যা করছে তার নাম ছুটোছুটি নয় ছোটাছুটিরও একটা লক্ষ্য থাকে, অভ্রান্ত স্থির একটি স্টেশান। কিন্তু এ-যুগে একে আমি লুকোচুরি খেলা বলব। সবারই চোখ বাঁধা। বুকে কোন আদর্শ নেই, বাহাদুরির কসরৎ ছাড়া। বুড়ি থাকলে সবাই কখনো-না-কখনো তাকে ছুঁতে পারত। কিন্তু আসলে এ-খেলায় যে কোন বুড়িই নেই, কাকে ছোঁবে।

প্রতিবন্যা

অশ্রুবাচরণ চট্টোপাধ্যায়

রুখতে যদি পারবেই—ওকে পালকিক বাঁধে বুক বেঁধে।
সময়ের চোখ গেলে আকাশজ্ঞায়ালে অন্ধ করে
অন্ধকার ঝরে বন্ধ্যা মত্ত দস্যু হাত দিকে দিকে
শোকস্তম্ভিতক্রোধকান্না-সবুজনীলের গলা টিপে
তাড়ায় তর্জনে আর হতবাক বিস্ময়কে তাড়ায়—
কেবল ঘড়ির ঘরকে বিঁধে রেখে যায় তিনটে রাত
তিনটে, কেবল রাতের চোখে সময়হীনতা...স্তব্ধ
চিৎকারের তুঙ্গ স্তব্ধ ছলছল টলটল ছল...

কে রোখে? যে রোখে সে-ও বিপরীত স্রোত প্রতিবন্যা
ক্রোধ জ্বালামুখ আর অনর্গল উত্তপ্ত হৃদয়
বাঁকানো আঙুল স্রোত ঘৃণার শাঁখিনী, বাঁকে-বাঁকে
ও-ইঃ হাঁক, করুণামমতাপ্রেম প্রসারিত সাড়া
ছড়ায় তাড়ায় বন্যা স্থিতাবস্থা প্লাবন-অনীহা—
একটিই জলপাইগুড়ি গড়তে ক্ষিপ্র শত শিলিগুড়ি।

আকাশ দেখালে

রাণী দেবী

(কাজী নজরুল ইসলাম-কে নিবেদিত)

বাংলার চোখের মণি
ছিলে তুমি;
কুয়াশায় আকাশ দেখালে।

আজ
চারদিক অন্ধকার;
তবু তোমার অগ্নিবীণা থেকে
গান আসে।

আগুন ছড়ালে তুমি;
কিন্তু আমরা হৃৎপিণ্ডের রক্তমাখা
অস্ত্রগুলি
রক্তপতাকার মতো তুলে ধরতে
জানি না।

শুধুই
আকাশ দেখালে তুমি,
কুয়াশায়।

নিচু গলায় বললেন, ডুয়ার্সেও তাই আরম্ভ হয়ে গেছে, এ আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

আমি প্রায়ই ওঁর কথাগুলি ভাবি। নির্জনে বসলেই ওঁর শান্ত স্থির চোখ দুটি স্নিগ্ধ গলা আমার কানে বাজে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে বসাই যে হয়ে ওঠে না। একটা বাস সামনের রাস্তাটা কাঁপিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল। এক বুড়ি ও তার নাতনী একটুর জন্যে বাঁচল।

নন্দকিশোরকে আমি বললাম, আচ্ছা তোমার কি মনে হয় পশ্চিমী সভ্যতা খুব দ্রুত এখানে পথ হাঁটছে? মানে, এই ডুয়ার্সের কথা বলছি—

নন্দকিশোর বেতের মোড়ায় বসেছিল। তার বৌ রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের ভিতরে হয়তো ধূপকাঠি পুড়ছিল একটা। তার মন্দ মন্দ গন্ধটা বারান্দা পর্যন্ত ছুটে ছুটে আসছিল। খুবই নিচু স্কেলে নন্দকিশোরের শোবার ঘরের খাটের পাশে ছোট টেবিলটায় রেডিওতে সেতার বাজছিল।

বাইরে ইতিমধ্যে আরো দুটি বাস চলে গেল রাস্তা দিয়ে। পিছনের বাসটার সামনে পড়েছে একটা মোষের গাড়ি। ড্রাইভার ঘনঘন হর্ন দিচ্ছে। একটু পরেই জানালা দিয়ে মুখ বার করে ধমকে উঠল, আরে হটো না শালা। বুদ্ধু কাঁহাকার।

এক অদ্ভুত ভাষা। নতুন যুগের ভাষা শুনে বুক উদ্বেলিত ও অন্তর রোমাঞ্চিত হয়। এই ভাষার মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যৎ ভারতের মিলিত সংস্কৃতির শুভ সংকেত। তারই ইঙ্গিত মিলছে ডুয়ার্সে।

হয়তো একদিন সত্যি-সত্যি মিলবে ভাষা। বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেরণা ও প্রবর্তনায়। বাংলা ও হিন্দীর মিলনের রূপটা কী দাঁড়াবে, গালাগালির মধ্যেই তার পূর্ব সূচনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু তাতে এলোই বা যায় কী। গালাগালিও তো গলাগলিরই আরেক পিঠ। অতএব, ক্ষুব্ধ হওয়ার নেই।

দাদা, চলুন ভিতরে গিয়ে বসি। নন্দকিশোরের গলা শুনলাম একটু পরেই, আপনিও তো অনেকদিন আছেন ডুয়ার্সে। নিশ্চয়ই সব জানেন। এ-অঞ্চলের আদিবাসীদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। আর প্রায় সকলেই এসেছে এখানে ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্যে। প্রয়োজনই তাদের লক্ষ্য। সওদাগরদের উদ্দেশ্য তো মন জানা নয়, মজা লোটা। আপনি গতির কথা বলছেন, ডুয়ার্স কি একালে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা? সারা দুনিয়াটাই ত' গতির নেশায় ছুটছে।

এই পর্যন্ত বলে সে উঠে পড়ল, হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ দিচ্ছে। চলুন ভিতরে গিয়ে বসি। আমার কাছে অতীত ডুয়ার্সের কিছু কিছু নোট্‌স আছে। আপনি যদি শোনেন ত' শোনাব আপনাকে। এখন পুরোপুরি সংসারী হয়ে গেছি তো—আর সংসারী লোকের পড়াশুনো করে হবেই বা কী!

এই পর্যন্ত বলতে বলতে নন্দকিশোরের চোখের দৃষ্টি যে এক পলকের জন্য তার বৌয়ের চোখে গিয়ে পড়েছিল, তা আমার চোখ এড়ায় নি। আমি বুঝতে পারছিলাম, বৌ-কে খোঁচা দিতেই ওর ওইটুকু বলা। সত্যিকার প্রেমের গভীরতা যেখানে সেখানে এক আধটু খোঁচাখুঁচি না-থাকলে চলবে কেন। প্রেম এক বোতল-ভরা রঙিন জলের মত। মাঝে মাঝে তা ঝাঁকিয়ে নিতে হবে বৈকি। নইলেই থিতিয়ে যাবে। রঙগুলি সব তলায় গিয়ে জমবে। শান্ত নিরুচ্ছ্বাস প্রেম বলে যদি কিছু থেকেথাকে তো সে না-দেখা তারার আলোর মত।

কিন্তু সে যাক। মনে মনে আমি নন্দকিশোরের মুখে কিছু শোনবার জন্য উন্মুখ হয়ে ভিতরে গিয়ে বসলাম। বই-এর সঙ্গে সম্ভাব পাতানোই প্রায় চিরকেলে স্বভাব ছিল, তাই আজ রাতে তার নোট্‌স থেকে এমন কিছু পাব আশা করি, যাতে ডুয়ার্স-সম্পর্কে অনেক নতুন কথা থাকবে।

নন্দকিশোর বলল, নোট্‌সগুলো খুঁজে নিচ্ছি আমি। আর সেইসঙ্গে আপনার ভাই-বৌ-কেও গরম-গরম ফুলুরি ভাজা আর চা ছাড়তে বললুন। ঠাণ্ডায় জমবে ভালো।

বলে সরল গলায় জোরে হো-হো করে হেসে উঠল।

[ক্রমশ]

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

এই ভর সন্ধ্যায়, গড়ের মাঠে একা দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? পকেটে তো শ'তিনেক টাকা আছে? এ টাকাটা তোমার বুড়ো বাপ মরার আগে কোন মাসেই রোজগার করতে পারে নি, এর আগে তুমিও এত টাকা কখনও হাতে পাও নি, তবুও কেন মুখ ভার? হায় মানুষের-মন; "সুখ নাই, সুখ নাই!" হাত ভরে পেলে, পেট ভরে খেলে, তবুও কেমন যেন "দুঃখু, দুঃখু ভাব!" আর তোমার তো দুঃখ হবেই। আদর্শবাদী ছিলে যে। পাঁচজন জানে, এখনও তাই আছ। "অনিন্দ্য আমাদের অনিন্দনীয়!" তোমার "দুঃখু"-টা আদর্শবাদের ভাঙা ঢোলে এখনও কাঠি দিচ্ছে, তাই এত ভাবনা, তাই না? তাছাড়া, দুঃখ তো হবেই। একে বিদগ্ধ, তায় জ্ঞানপাপী। অথবা বিদগ্ধ বলেই জ্ঞানপাপী; সুতরাং তোমার সুখের পিছনে একটা দুঃখের ল্যাজ থাকবেই থাকবে, কারণ বিদগ্ধ বলেই তো সোজা রাস্তায় সুখ রোজগার করতে মন চায় না, আর কেই বা না জানে যে সোজা রাস্তায় সুখ মেলে না?

এই শীতের সন্ধ্যায় আশ-পাশ কুয়াশায় ঢাকা। ঠাণ্ডাও বেশ। ধারে-কাছে একটা

কুকুর পর্যন্ত নেই। কেবল তুমি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্য চৌধুরীর মত আদর্শবাদ নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করছ। কর, মন্দ কি, কর। তবে দেখ, টাকাটা ফেরৎ দিও না যেন। কেন না, আদর্শবাদীই হও বা আন্দোলনই কর, বেঁচে থাকতে হবে তো? তুমি না বাঁচলে তোমার আদর্শ-বাদ, তোমার আন্দোলন, এসব হবে কি করে? অতএব.........।

মাত্র গেল পরশু। এখনও ঘটনার গন্ধ কাটে নি। গুটি গুটি "বসু মশায়ের" তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে অতি সন্তর্পণে, অতি বিনয়ে, অতি কুণ্ঠায়, টোকা দিয়েছিলে। —"কে?" (যেন গুহার ভেতর থেকে সিংহ বলল— "হা—লু—উ—ম?")

দরজাটা একটু ফাঁক করে,—"স্যর, আমি অনিন্দ্য, আপনি আসতে বলেছিলেন (হরিণছানা) প্রভু আমি আপনার ভোজ্য, আজ আমাকে খাবেন বলেছিলেন।"

—"ওহো! এস, এস"—(সিংহ—"হুম। এস। খাবার কথা মনেই ছিল না। কেন না, রাতদিনই তো খাচ্ছি।"

তুমি ভেতরে ঢুকলে কিন্তু বসলে না। বিরাট টেবিলটার এক কোণ ধরে খানিকটা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। মুখে জোর করে আনা হাসি, বুকের ভেতরে কেমন ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।

"সেই যে বিষয়টার ওপর লিখতে বলেছিলেন না? আমি—আমি লিখে এনেছি।"

"বেশ, বেশ।" বসু মহাশয় তোমার দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের মত হাসলেন, "তা' হলে শুচিবায়ু রোগটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছ?"

—"হেঃ, হেঃ, স্যর। আপনার কথাটাই ঠিক, ভেবে দেখলাম।"

—"বোস, বোস, একটু চা খাও।" গণেশ বসু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, সম্পাদক এবং একালের চরম প্রগতিপন্থী লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম মুখপাত্র, ঘন্টা বাজালেন,—"ক্রিং—ক্রিং, ক্রিং।"

ভেতরে ঢোকার আগে মনে হচ্ছিল সিংহ। আর এখন মনে হচ্ছে ঈশ্বর। চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে ঈশ্বরের সদা-হাস্যময় মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি ভাব-ছিলে, আর কিছুই করার নেই, আর কিছুই ভাবার নেই, এবার শুধু নিজেকে সঁপে নিতে হবে। ভারমুক্ত হওয়ার স্বাদটা কি রকম তা তুমি অনুভব করতে চাইছিলে। এমন সময় চা এল, বেশ মিষ্টি একটা গন্ধ আর বেশ সুন্দর স্বাদ। ভারমুক্তির স্বাদটা তুমি প্রতিটি চুমুকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলে।

—"কি ভাবছ অনিন্দ্য?"

খানিকটা চা ছলকে টেবিলের ওপর পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে মুছতে লাগলে—"আজ্ঞে না, কিছু ভাবছি না।"

"তোমার লেখার হাত আছে হে। শুচিবায়ু করে নিজেকে ডুবিয়ে দেবে কেন? সাহিত্য মানে সাহিত্য, বুঝেছ? যারা এখন উল্টো-পাল্টা কথা বলছে, তারা সব সেকেলে বিধবা। জীবনটাকে একাদশী আর আতপ চালের বাইরে ভাবতে জানে না। তারা প্রতিক্রিয়াশীল, সংস্কারাচ্ছন্ন বামুন। নোংরাটাকে ঢেকে রাখতে চায়, বোঝে না যে ওতে গন্ধ বাড়ে, রোগ ছড়ায়। যা আছে তাকে দেখাতেই হবে। তা' না হলে সাহিত্যিকদের দায়িত্ব পালন করা হয় না।"

ঈশ্বর চুপ করলেন। চুরুটের ধোঁয়ায় মুখটা যেন ভাসছে।

এবার তো তোমাকেও কিছু বলতে হয়।

—"আমি স্যর......।"

—"বল, থামলে কেন?"

—"একটা গল্প লিখে এনেছি। যদি অনুগ্রহ করে দেখেন?"

—"ওহো, বলেছিলে বটে, দেখি দাও।"

সাগ্রহে ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বার করে আনলে লেখাটা। ওর হাতে তুলে দিলে। ঠিক সেই মুহূর্তে, একবার খুব কম সময়ের জন্য, তোমার বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে সেখান থেকে কে যেন বলে উঠল—

"ওয়াক্, থুঃ!"

খানিকক্ষণ চুপচাপ। কেবল দেওয়াল-ঘড়িটা টক্ টক্ করছে। তুমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ...... "কি হবে......কি হবে?"

অবশেষে আবার দৈববাণী......।

"তোফ্‌ফা! তুমি যে দেখছি আরও এককাঠি সরেস—হে?" মাত্র ক'দিন আগে বন্যায় সব ভেসে গেছে, বাড়ি, ঘর, বাপ, মা, ভাই, বোন......সব। অথচ মেয়েটা কলকাতায় কাকার বাড়িতে এসে এত সব কান্ড করছে! ভয়ানক বেপরোয়া তো? জীবন সম্বন্ধে কি স্বচ্ছ ধারণা! চমৎকার!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর, আমার নিজের অভিজ্ঞতা এটা।"

প্রশংসা শুনে গদগদ হয়ে উঠলে তুমি। কাজের মত কাজ করেছ যে! স্বচক্ষে দেখা একটা ঘটনা, যে ঘটনায় তুমি একরকম নায়কই ছিলে, তাকে সম্পূর্ণ বদলে সাহিত্যে রূপ দেওয়া কি সোজা কথা? নিয়মিত এমনটি করতে পারলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার পকেটে অজস্রধারায় বর্ষিত হবে।

এই অন্ধকার মাঠে একা দাঁড়িয়ে তুমি অনিন্দ্য চৌধুরী, সম্প্রতি যে আদর্শ-বাদকে কবর দিয়েছ, আজ আবার তাকেই খুঁজে বার করতে চাইছ। কিন্তু কেন? কিছুই তো আর অবিকৃত নেই। গলে গেছে, পচে গেছে, হয়তো পোকা পড়ে থিক্ থিক্ করছে দেহটার ওপর। তবুও দেখবে? কি আছে দেখার আর?

জলপাইগুড়ি শহর ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে ঘটনাটা নজরে পড়েছিল। তখনও তুমি তোমার ভাষায় "খাঁটি ছেলে" ছিলে অথবা গণেশ বসুর ভাষায় তোমার শুচি-বায়ু ছিল। দেখলে, সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। পলিমাটির মধ্যে শুয়োর, গুরু, মানুষ সব একাকার। যেন একটা নরক। কয়েকটা শকুন নখ দিয়ে পলিমাটি সরাচ্ছে। একটা ছোট্ট মেয়ের দেহ বেরিয়ে এল। জামার খানিকটা আছে, খানিকটা নেই। ঊরুর মাঝামাঝি থেকে একটা পা কাটা। বোধ হয়, জল-ভাসী কোনও টিন বা ধারালো কিছুতে কেটে বেরিয়ে গেছে। শকুনগুলো কাটা জায়গাটা থেকে মাংস টেনে বার করতে লাগল। এমন সময় একটা ক্ষীণ চিৎকার। তুমি চমকে উঠলে। তবে কি জীবনের চিহ্ন এখনও আছে? তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা খাপে ভরে ছুটলে। খানিকটা যেতেই একটা হেলেপড়া বড় গাছ নজরে এল। গাছটার ওপাশে একটা উঁচু ডাঙা। সেখানে একটা মেয়ে শুয়ে আছে, প্রায় নগ্ন। তিনটে লোক তাকে চেপে ধরে রেখেছে এবং আরেকজন...ব্যাপারটা দেখে খুন চেপে গিয়েছিল মাথায়। ভুলেই গিয়ে-ছিলে, ওরা চারজন আর তুমি একা। সাথে ক্যামেরা আছে, দরকারী চিঠি আছে, পয়সাকড়িও আছে কিছু। তবুও,— "শুয়োরের বাচ্চা, বদমাইস?" বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে তুমি! আশ্চর্য,—লোকগুলো একটুও বাধা দিল না। কুকুরের মত, তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে একটার পা পলিতে বসে গেল। সে টানাটানি করতে লাগল। কিন্তু বাকী তিনটে তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

তুমি লোকটাকে তাড়া না করে মেয়েটার কাছে গেলে, কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না। সেও নয়। যেমনভাবে ছিল তেমনই পড়ে রইল। ওর ডান পাটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছে, ডান হাতের ওপর অজস্র আঁচড়ের দাগ। পালদুটো ভেতরে ঢুকে গেছে। কেবল জোরে জোরে শ্বাস টানছিল বলেই বুঝতে পারছিলে যে, ও বেঁচে আছে।

তোমার বুকটা মুচড়ে উঠছিল। যে

নারীদেহ তুমি ইতিপূর্বে এমনভাবে কখনই দেখতে পাও নি, তা তোমাকে উত্তেজিত না করে বরং দুঃখই দিচ্ছিল। তুমি মায়ের মত গভীর মমতায় মেয়েটার কপালে হাত বুলিয়েছিলে। শাড়িটাও ঠিক করে দিলে। তোমার লজ্জা করল না। এতটুকুও না। বরং ভালই লাগল। খুবই ভাল লাগল। মেয়েটাকে তোমার মনে হোল যেন খুউ-ব ছোট্ট একটা পাখির ছানা, ঝড়ে বাসা ভেঙে ছিটকে পড়েছে তোমারই কাছাকাছি। ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তুমি মুছিয়ে দিলে। তবুও জল বেরিয়ে এল। ভেজা চোখ দুটো তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রমশই বড় হয়ে উঠল। হঠাৎ তুমি বুঝতে পারলে তোমার চোখেও জল। মেয়েটা তাই অমন করছে। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লে তুমি একটুর জন্যে।

আরও কিছু সময় গেল।

তারপর তুমি বললে—"আপনার নাম?"

ক্ষীণ আওয়াজ বার হোল মেয়েটার গলা থেকে—

—"বন্দনা।"

—"বন্দনা?"

—"অচ্ছা। পদবীটা কি?"

—"সেন।"

—"এই গ্রামেই বাড়ি ছিল।

ঠোঁট দুটো কাঁপল একটু, বোঝালো —"হ্যাঁ ছিল।"

—"আর সবাই কোথায়?"

আবারও ইসারা করল,—জানে না।

—"কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে?"

ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে শব্দ উঠল। ঘাড় নাড়ল, বলল,—"হ্যাঁ। একটু জল।" জল নেই! জল কোথায় পাবে? সবই তো পলির তলায় চলে গেছে। পুকুরগুলোতেও নিশ্চয়ই মড়া ভাসছে। বাড়ি-ঘরগুলোর কাছে যাওয়া দায়। মড়া পচে গন্ধ ছাড়ছে। হঠাৎ খেয়াল হোল সাথে একটা জলের কৌটো আছে। গাছের ওপাশে, যেখান থেকে ছুটে এসেছিল, সেখানেই পড়ে আছে ওটা।

—"আসছি এক্ষুণি, ভাববেন না।"

আবার ছুটলে তুমি।

ফিরে এসে দেখলে, মেয়েটা বাঁ হাতে ভর দিয়ে উঠে বসেছে। আশ্চর্য, তোমায় দেখে হাসল ও। যেন কত পরিচিত তুমি, যেন কত নিকটের!

কাছে এসে দাঁড়াতেই কি ভীষণ আগ্রহে হাত বাড়িয়ে কৌটোটাকে আঁকড়ে ধরল আর জল খাওয়ার সময় গলার ভাঁজগুলো কেমন যেন থির-থির করে কাঁপছিল।

—"আপনার পরিচিত কেউ নেই এদিকে?"

—"আছে", মেয়েটা ঘাড় নাড়ল।

—"কোথায় থাকেন তারা?"

—"টাউনে, পৌঁছে দেবেন?"

ইচ্ছে হচ্ছিল, বল, "সেখানেও একই অবস্থা প্রায় সবই শেষ।" কিন্তু বললে,—"চলুন, হাঁটতে পারবেন কি?"

ও এবার কথা বলল না, কেবল ডান পাটার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরে ওঠবার চেষ্টা করল।

হাত ধরে উঠিয়ে দিলে তুমি। কিন্তু একটু এগিয়েই আবার এলিয়ে পড়ল। অগত্যা কাঁধেই তুলে নিতে হোল।

ওভাবে পথ চলতে ভীষণ হাসি পাচ্ছিল তোমার। মেয়েটা তো হাসছিলই। ওর ভয় কেটে গিয়েছিল। একবার তো বলেই বসল, "আপনি তো বেশ পালোয়ান!"

মাঝে মাঝে ওকে নামিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছিলে। বেশ খানিকটা যেতে হবে। এক-একবার মনে হচ্ছিল মুগুর-ভাঁজা আর কসরৎ করাটা একেবারে অর্থহীন হয় নি। সুবন্ধু সেন, দেবদাস বা নিখিলেশ হলে এভাবে এতটা পথ আসতে তিন দশে তিরিশবার খাবি খেত। "বোদলেয়ার" বা "সার্ত্রে" আউড়ে চার-চারটে বদমাশকে হটিয়ে দিতে পারত না। চোঙা প্যান্ট নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত আর তা না হলে ওদেরই দলে ভিড়ে গিয়ে বিনে পয়সায়, বিনে ঝঞ্ঝাটে যত ইচ্ছে মজা লুটে নিত। এই ছেলেগুলো সম্বন্ধে ধারণাটা একেবারে মিথ্যেও নয়। সুবন্ধু একবার ওর এক দুঃস্থ ছাত্রীর সঙ্গে যা এক কান্ড করেছিল। নেহাৎ খুঁটির জোর ছিল বলে বেঁচে গেছে। কিন্তু তাতে কি? ওর ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই হয় নি। এখন ও ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার এবং মেয়ে মহলে বহু আলোচিত "এস. এস।"

জলপাইগুড়ি পৌঁছে ভারত সেবাশ্রমের স্বামীজীদের সাথে দেখা করেছিলে তুমি। সহজেই খবর পাওয়া গিয়েছিল। বন্দনার কাকার বাড়িটা যে অঞ্চলে সেখানে তেমন কিছু হয় নি। সবাই বেঁচেবর্তেই ছিল।

পৌঁছে দিয়ে আসার পর কিন্তু খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বন্দনা কাঁদছিল, সবার সামনেই কাঁদছিল। অথচ মাত্র একদিন, একবেলা আগে, ও তোমাকে চিনত না, তুমিও ওকে চিনতে না। ওর কাকা, কাকীমা তোমার ঠিকানা চেয়ে রেখেছেন। চিঠিও দিয়েছেন দুটো। তুমি একটারও উত্তর দাও নি।

আজ সেই মেয়েটাকে তুমি তোমার গল্পে নামিয়ে আনলে। কিন্তু এমন বিকৃতভাবে আনলে কেন? যে যা নয়, তাকে তাই সাজালে কেন? ধর, যদি কাগজটা ওর হাতে যায়? ও তো বুঝতে পারবেই। তোমার নাম ও জানে। জানে তুমি লেখ। ওর জীবনের একটা দুর্ঘটনাকে তুমি এমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নোংরা করে তুলে ধরলে কেন? ওকে তুমি বেশ্যা বানিয়ে দিলে আর নিজে বেশ্যার দালাল সেজে কিছু পয়সা কামিয়ে নিলে! তোবা—তোবা! অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে তুমিই তোমার এক অধ্যাপককে লম্পট বলে তেড়ে গিয়েছিলে। ভাবতেও অবাক লাগে!

অনিমেষ রায় দেখতে ভাল, পড়ায় ভাল, বউও আছে, সেও দেখতে ভাল। কিন্তু এত ভালর মধ্যে অনিমেষ রায়ের পিলেটা একটু খারাপ। সুন্দরী এবং সেই সঙ্গে ছটফটে ছাত্রী দেখলে অনিমেষ তার পেছনে একটু-আধটু দৌড়ঝাঁপ করবেই করবে।

সেবার দলসুদ্ধ মথুরাপুরে গিয়েছিলে। অধ্যাপকরাও ছিলেন। অনিমেষ রায় দলপতি। রান্নাবান্নার তদারক করছে, জলখাবারের ব্যবস্থা করছে, বুড়ো মাস্টার, মাস্টারণীদের, বিশেষ করে জ্যোতিশঙ্কর গাঙ্গুলী (প্রধান অধ্যাপক)-কে বার বার—"স্যর এটা খান, স্যর ওটা খান, স্যর ওখানে বসুন"—ইত্যাদি উপায়ে তেল দিচ্ছে, আবার মেয়েদের দিকটায়, বিশেষ করে আভা, সুচন্দা, কবরী যেখানে বসে গল্পগুজব করছিল, সেখানে গিয়ে কারণে অকারণে ছোঁক-ছোঁক করছে। তুমি আর কয়েকজন নজরে রেখেছিলে ওকে। বেচারা কিছুতেই কায়দা করতে পারছিল না। শেষকালে ফেরার সময় মরিয়া হয়ে উঠেছিল। একে শীতের সন্ধ্যে,—তায় পাড়াগাঁ। কিছু ছাত্র-ছাত্রী স্টেশনের পথে রওনা হয়ে গেছে। বাদবাকীরা গোছগাছে ব্যস্ত।

হঠাৎ দেখা গেল কবরীকে নিয়ে অনিমেশ রায়, এম-এ, ডি-ফিল, চুপচাপ ঘাটের দিকে এগোচ্ছে। কবরীকে তোমরা ভালভাবেই জানতে। এর আগে যে কলেজে সে পড়ত, সেখানেও এক অধ্যাপকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বেশ মোটা নম্বর বাগিয়েছিল। কাজেই অনিমেশ রায়ও ফাঁদ পেতেছে।

তোমরা এগিয়ে গেলে।

—"স্যর, আপনি? এদিকে?"

অনিমেশ রায় আর কবরী দু'জনেই ভয়ানক অপ্রস্তুত।

—"এদিক দিয়েই তো স্টেশনে যাওয়া যায়, তাই—না?"

—"না স্যর। ওদিক দিয়ে। তাছাড়া এখনও তো সবাই তৈরি হয় নি?" তোমরা মুখ টিপে হাসছিলে।

—"হাসছ যে?" অনিমেশ রায়ের গলায় মাস্টারী-মাস্টারী ভাব।

—"বৌদিকে বলে দেব?"

—"কি বলছ এসব, এসবের মানে কি?"

তুমি এগিয়ে গিয়েছিলে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলে—

—"এটা স্যর ইউনিভার্সিটি নয় কাজেই হুমকী দেবেন না। আর, তাছাড়া আপনি কিছু ভাল কাজও করছেন না।"

—"ভদ্রভাবে কথা বল অনিন্দ্য।" অনিমেশ রায় গর্জে উঠেছিল।

তুমি হেসে উঠেছিলে—"রাগ করছেন কেন স্যর? ধরা পড়ে গিয়েছেন বলে? যান, এখান থেকে চলে যান।" তোমার শেষ কথাগুলোতে এমন একটা কিছু ছিল যে অনিমেশ রায় আর দাঁড়ায় নি। শুট্ করে সরে পড়েছিল।

তুমি তখন কবরীকে বলেছিলে, ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল,—"তুমি বুঝি এভাবেই নম্বর বাড়াও, বেশ, বেশ!" জিভের ডগায় একটা নোংরা গালি এসেই গিয়েছিল, কিন্তু সামলে নিয়েছিলে।

অনিমেশ রায়দের মত শিক্ষিত ভণ্ডদের ওপর তুমি কি খাপ্পাই না ছিলে! তোমাদেরই পাড়ায় আর এক অধ্যাপক থাকত। চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস। বৌ ছিল, গোটাতিনেক বাচ্চাও ছিল। ভদ্রলোক মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে যেত আবার মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে ফিরত। ওকে কোনদিনও মাথা তুলে হাঁটতে দেখে নি কেউ। এত শান্ত, এত ধীর যে, পাড়ার ছেলেরা নেহাৎই অনুকম্পার চোখে দেখত ওকে। কিন্তু একদিন সবাই চমকে উঠল। ও নাকি কম্যুনিস্ট। ওর ঘরভর্তি নাকি "গণশক্তি", "দেশব্রতী", "দেশহিতৈষী"র ফাইল। আলমারী ভর্তি নাকি মার্ক্স, এঙ্গেলসের বই। গোপনে গোপনে নাকি পার্টিকে সলাপরামর্শও দেন। এমন একটা লোক পাড়ায় আছে ভাবতেই বুক ভরে উঠেছিল ছেলেদের। একটু একটু করে সবাই যাতায়াত শুরু করেছিল ওর বাড়িতে। কি সাদর আহ্বান, কি অমায়িক কথাবার্তা! ওকে ছেলেরা বলত,—স্যর, আমাদের মার্ক্স বুঝিয়ে দেবেন? স্যর আমাকে এই বইটা একটু দেবেন? স্যর আপনি কি কাল ময়দানের মিটিং-এ যাবেন?"

তারপর আবার চমকে উঠল সবাই। ভোটের আগে একদিন সঞ্জীব আর কয়েকটা ছেলে এসে বলল, লোকটার শ্বশুর বেলেঘাটার ওদিক থেকে কংগ্রেসের হয়ে ভোটে নেমেছে, ও সেখানে শ্বশুরের জন্য ক্যানভাস করছে। পরদিন বিশু আর সঞ্জীব ভদ্রলোককে বাড়ি থেকে ডেকে এনে ওর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করেছিল আর থুতু ফেলেছিল। এরপরই ভদ্রলোক পাড়া থেকে উঠে গিয়েছিল।

গণেশ বসু পাঠমগ্ন। আর তুমি দু'চোখ ভরে বিশ্বরূপ দর্শন করছিলে। তোমার চোখে কৃতার্থের ভাব। যেন দেখে দেখে আশ মেটে না। খর্বাকৃতি, স্থূলদেহের ওপর গরদের পাঞ্জাবী। চওড়া কপালের নিচে রিমলেশ চশমা। দু'হাতে কম করেও গোটাপাঁচেক আংটি। আগে আগে এই লোকটাকে কত ঠাট্টা করতে তোমরা! আড়ালে, আবডালে বলতে,—"বেটা মদ্যপ, খচ্চর, সি আই-এর টাকা খায়, মেয়ে দেখলে আঁকুপাকু করে।" আর আজ ওরই "পেসাদের" জন্য গোনি বেড়াল হয়ে মুখোমুখি বসে আছ!

একটু পরেই গণেশ বসু চোখ তুললেন। বললেন,—"বেশ ঠাসবুনোনি লেখা। তবে, মেয়েটার স্বামীর প্রতি যেন একটু বেশি অনুকম্পা দেখিয়েছ মনে হচ্ছে। তার মানে, তোমার শুচিবায়ুটা একটু-আধটু আছে এখনও। আরে,—বাপ, মা, স্বামী এরা সব মরে গেছে এজন্যে কি একটা যুবতী মেয়েকে তুমি সারাজীবন আতপ চাল আর কাঁচকলা সেদ্ধ খাওয়াবে। বেশ তো একটা বেপরোয়া মেয়ের কথা লিখছিলে, লেখার মধ্যে বলিষ্ঠতা ছিল, সাহস ছিল, কিন্ত হঠাৎ এমন করে পিছিয়ে গেলে কেন?"

একটু থামলেন গণেশ বসু। তারপর গলা খাটো করে বললেন—"এটা থাকুক, প্রেসে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে আগামীবার থেকে একটু খেয়াল রেখ। আর পয়সাকড়ি খারাপ পাবে না। সমর দাশ, কিরণশঙ্কর মুখুজ্জে বা অধীর গাঙ্গুলীকে যা দিই তোমাকেও তাই দেব। তবে ওদের কিছু বলবে না। জানতে পারলে বলবে—আনন্দ্য ছোট, নতুন, তাকে এত দিচ্ছেন কেন?"

বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলে। মাথাটা ভারভার, কান দুটো জ্বলছে। বাথরুমে ঢুকে আঁজলা-আঁজলা জল চোখমুখে ছিটিয়ে দিতে লাগলে। আয়নায় মুখ দেখলে। মনে হোল এত পড়াশুনো, এত আদর্শ, কিছুর ছাপই মুখটায় নেই। খাঁটি সাধারণ, ভাবলেশহীন। হাটে-মাঠে দেখা রাম, শ্যাম, যদুদের মতই নগণ্য,—বোকা, বোকা!

একটা কথা কিন্তু তুমি গণেশ বসুকে বল নি। ইচ্ছে করেই চেপে গেছ। তোমার এ-ধরণের আরও কয়েকটি গল্প সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তবে বেনামীতে লেখা বলেই উনি কিছু বুঝতে পারেন নি। আর বুঝতে পারেন নি এজন্যেই প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,—"দেখেছ অনিন্দ্য, আজকাল কত নতুন লেখক এসেছে, কত শক্তি, কত সাহস, কত খোলা মন!"

মনে মনে বেজায় খুশি হলেও তুমি মুখে কিছুই বলতে পার নি। "হেঃ, হেঃ, স্যর। ওগুলো স্যর আমারই লেখা। আপনার ভাল লেগেছে স্যর? বেশ তো স্যর, আপনার কাগজের জন্যেও লিখব স্যর।"

বলতে পার নি এজন্যে যে, তাহলে গণেশ বসু ঠিক বলে বসতেন,—"আরে তুমি যে দেখছি একটি আস্ত ন্যাকা ছেলে! সবই করছ অথচ মুখে বলছ কিছুই করছ না? তুমি-ই না কিছুদিন আগে কিরণশঙ্কর মুখুজ্জেদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখে তোলপাড় করেছিলে? এ অধিকার তোমায় দিলে কে?"

কি বলতে তখন তুমি? গণশার ভুঁড়ি ঢুঁসিয়ে দিতে? ঢুঁসিয়ে দিতে শিং লাগে।

শিং কই তোমার? সে দুটো তো ইতিমধ্যেই খসে গেছে!

কিরণশঙ্কর, সমর দাশ, অধীর গাঙ্গুলী প্রমুখ দিক্‌পাল লেখকদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার কারণ অবশ্যই ছিল। বহুশ্রুত এবং শিক্ষিত বাঙালীকুলের আদর্শস্থানীয় এই কবি, সাহিত্যিকরা মাসকয়েক আগে এক সাহিত্যবাসরে সাংঘাতিক সব বৈপ্লবিক কথা বলেছিলেন। কিরণশঙ্কর (বক্তৃতা করতে গেলে যার প্রথমেই খানিকটা মদ না হলে চলে না) মুখুজ্জে বলেছিলেন,—"আমি যা লিখি তা আজকের সমাজে প্রতিনিয়তই ঘটছে। আমার লেখা পড়ে যারা ইস্ ইস্ করে তারা কাপুরুষ অথচ লোভী। গোপনে মদ, মেয়েমানুষ পেলে তারাও ছাড়বে না। আর সেক্সকে বাদ দিয়ে সাহিত্য কি করে হয়

তা তো বুঝতে পারি না। যা আজ সবাই করছে আমি তাই দেখাচ্ছি, এই দেখানোটাই সাহিত্যিক হিসেবে আমার দায়িত্ব।"

বুড়ো শিবদাস মজুমদার সভাপতিত্ব করছিলেন। কিরণশঙ্করের বক্তৃতার শেষে বকের মত গলাটা মাইকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—"আমি কিরণবাবুকে সাপোর্ট কচ্চি। তিনি একটা সামাজিক দায়িত্ব পালন কচ্চেন। নিন্দুকদের গালমন্দ তিনি গায়ে মাখবেন না, আমরাও মাখব না।"

তুমি সেখানেই ছিলে। তুমি আর বারাসতের স্কুলমাস্টার দিনেশ দাশ। দিনেশ লেখে ভাল. চোখা চোখা কথা বলে। তবে, ওর লেখা গণেশ বসুদের কাগজে চলে না, কেন না ওরও কিছু শুচিবায়ু আছে।

শিবদাস মজুমদারের কথা শুনে দিনেশ একরকম খেপেই উঠেছিল। তোমার গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলেছিল,—

—"ব্যাটা বুড়ো জীবনভোর যে কত রকমের নোংরামি করেছে তার হিসেব নেই।"

তুমি তাড়াতাড়ি দিনেশের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলে,—"চলুন, চলুন, বেরিয়ে যাই। আমাদের তো কেউ ডাকে নি। আমরা কেন এখানে বসে মজা দেখব?"

—"তাই বলে মিথ্যে কথা বলে যাবে?"

—"তবে কি ও চেঁচিয়ে বলবে যে আমি অমুক জায়গায় এই করেছি, তমুক জায়গায় ঐ করেছি।"

—"তা বলবে না, তবে এটাও ঠিক যে অপরকে জ্ঞান দিতে যাওয়া ওর অন্যায়।"

তুমি হেসেছিলে। দিনেশকে নিয়ে বাইরে এসে বলেছিলে,— "আমরা কি করব দিনেশবাবু, ওরা দলে ভারী। ওদের পেছনে বড় বড় কাগজ আছে, নামজাদা সম্পাদকরা আছেন। ওরা নিজেরাও এককালে কম লেখে-টেখে নি। ওদের তাই হটানো মুশকিল। শিবদাসের দুটো বই এখনও এই শহরেই সিনেমায় চলছে। মানুষজন ওদের ছেড়ে আমাদের কথা ভাববে কেন বলুন? তারা বলবে— গোলাপে কাঁটা থাকেই।"

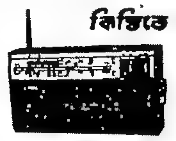

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
বিনাকা
৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার
GUARANTEED মাসিক ৫, টাকা কিস্তিতে।
প্রতি গ্রামে এবং শহরে পাওয়া যায়।
TATA SALES (59) KOLHAPUR ROAD, DELHI-7

দিনেশ দাস ফুঁসে উঠেছিল, বলেছিল, —"গোলাপ না ঘেঁটু?"

"আপনি বলুন তো অনিন্দ্যবাবু, ওদের গল্পে সেক্স ছাড়া আর কি আছে, আর তাও বিকৃতভাবে পরিবেশন করাই ওদের কাজ। ওরা কোনদিনও সুস্থ প্রেমের কথা লেখে না ওদের গল্পে স্ত্রীর কথা লেখে না, প্রিয়ার কথা লেখে না, সহগামিনীর কথা লেখে না।'

"আপনি বোঝার চেষ্টা করুন অনিন্দ্যবাবু, কেন ওরা এসব করে? ওরা বলে যে ওরা সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। তাই যদি হয় তবে শুধু নোংরা ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে কেন? সমাজে তো আরও কত বেশি জঘন্য অপরাধ ঘটছে? ওষুধে ভেজাল. খাবারে ভেজাল, বেকার সমস্যা, রাজনৈতিক ধাপ্পা! কই, এগুলোর দিকে তো একবারও নজর দেয় নি কিরণশঙ্কর, শিবদাস, অধীরবাবুর দল? ওরা কিছু জানে না বলতে চান? ওরা সব জানে. সব বোঝে। তবুও ওরা একপাল ভেড়ার মত একই দিকে ছুটেছে, যেদিকে খোঁয়াড় আছে। আমার মনে হয় ওদের পেছনে কোনও অদৃশ্য হাত কাজ করছে।"

আজ দিনেশ দাস যদি জানতে পারে তোমার কাণ্ড, তবে কি বলবে সে, কি ভাববে? ওর মুখটা মনে করে তোমার কপালটা কুঁচকে উঠছে কেন? বুঝি ভাবছ—পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলবে কি না? কিন্তু তা' হলেই বা কি হবে হে অনিন্দ্য চৌধুরী? তোমার গল্প, তা' স্বনামেই হোক আর বেনামেই হোক, ইতিমধ্যেই বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। গণেশ বসুকে দেওয়া গল্পটাও বোধ হয় এতক্ষণে কম্পোজড্ হয়ে গেছে। আর পালাবার পথ নেই! তুমি দাগী হয়ে গেছ। এখন শিবদাস, কিরণশঙ্করদের পেছন পেছনই যেতে হবে। কিন্তু ওদের পাশাপাশি চলতে পারবে না তুমি। ওরাই দেবে না পাশে চলতে। কেনই বা দেবে? তুমি তো ওদের থেকেও বেশি খারাপ, ওদের থেকেও বেশি ভণ্ড! তুমি বক্তৃতা করেছ, প্রবন্ধ লিখেছ, আবার দু'হাত ভরে নোংরাও ঘাটছ! কাজেই নিজের থুতুতে নিজেই ডুবে মর।

রাত বাড়ছে। বাড়ি চলে যাও। তোমার বুড়ি মা, রুগ্না বউ, সবাই একটু পরে ঘর-বার শুরু করে দেবে। তাছাড়া পকেটে শ'তিনেক টাকাও আছে। ঐ টাকাটা আজ সকালেই "আনন্দ" আর "সবুজ পাতা" কাগজ থেকে পেয়েছ। তোমার আত্মবিক্রয়ের মূল্য! সযত্নে ঘরে নিয়ে যাও। বার বার গুণে গুণে দেখ, কম দিয়েছে কি না, পড়ে গেছে কি না। এত টাকা এর আগে হাতে আসে নি তোমার। যখন '৬৮ সালের গোড়ার দিকে ডেপুটেশন ভেকেন্সীতে কলেজে পড়াতে, তখনও এত টাকা হাতে পাও নি। চলে যাও,—এক্ষুণি চলে যাও। জায়গাটা একদম ভাল নয়!

ওপারে মেট্রোর কাছ থেকে বহু কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছে। "ইনক্লাব জিন্দাবাদ". "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হও।" তোমার মনে পড়ে না কি অনিন্দ্য, '৬৭-র ভোটের সময়. ওদেরই মত ঝাণ্ডা নিয়ে. মুঠো করা হাত আকাশে তুলে, দীর্ঘ পদক্ষেপে তুমি হেঁটেছিলে, কতদিন, কতবার, কত লোকের সাথে? আজ আবার ধ্বনি দেবার দিন এসেছে, ধিক্কার দেবার দিন এসেছে. দেখ, হয়ত ওদের সাথে দিনেশও হাটছে। ঝাণ্ডা হাতে, শীতের কুয়াশাকে কেটে খান খান করছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর দিয়ে। বলছে, "ইন-কি-লাব— জি-ন্দা-বা-দ।" খুঁজে দেখলে হয়ত আরও কত পরিচিত মুখ মিলবে! ওরা হেরে যায় নি, কিছু হারায়ও নি, কিন্তু তুমি হেরে গেছ, তোমার সবকিছুই হারিয়ে গেছে। ওদের কাছ থেকে তুমি আজ অনেক দূরে সরে গেছ! দিনেশের সাথে বারাসতের এক ঘরোয়া মিটিং-এ তুমি বল নি এসব কথা?—"যারা বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোকে, বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে মেনে নেয় তারা সব গোলাম, বাঁদী, নফর।" কিন্তু আজ তুমিও কি বান্দা নও, গোলাম নও, নফর নও? আত্মবিক্রয় কি তুমিও কর নি?

অনিন্দ্য হে, তোমার ভেতরে আর একটা যে অনিন্দ্য আছে, সে তোমাকে কোনদিনও ছেড়ে কথা বলবে না। তার কাছে তোমার রেহাই নেই। তোমার মা বল, তোমার বউ বল, কেউ তোমার কথা ভাববে না। একটা নির্দিষ্ট ধাপ্ পর্যন্ত ওরা তোমার দুঃখের ভাগীদার হতে পারে কিন্তু তারপরে আর এগোবে না। তারপরে যে সীমাহীন অন্ধকার, যে কল্পনাতীত নিঃসঙ্গতা, তার মধ্যে তুমি একা মাথা কুটে মরবে, কেন না তুমি জ্ঞানপাপী। তুমি আর কোনদিন সূর্যের মুখ দেখতে পাবে না।

[পুনরাবৃত্তি]

ভলান্টিয়ার ক্যাম্প তছনছ—জেলা-বোর্ডের সড়কের ধারে তার আর চিহ্নমাত্র নেই। শেষবারের আক্রমণে ভলান্টিয়ারদের সকলেই প্রায় গুরুতর আহত, অসুস্থ—তারা ফিরে গেছে মহকুমা শহরে। বিমলের মতো আঙুলে গোণা কয়েকজন মাত্র পড়ে আছে মাটি কামড়ে—পরোয়ানা এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আছে তারা কোথায় না কোথায়।

বাঁশবেড়িয়ার গুপ্ত খালাড়ি—তারও শেষ দাগটুকু মুছে গেল ভিখন রাউতের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে। পোড়া বাঁশ, কাঠ-কুটো, হাঁড়ি-কলসী নিয়ে পড়ে আছে পরিত্যক্ত জনমানবহীন মহাশ্মশানের মত।

চোখের সামনে সব যেন ছিঁড়ে ছত্রখান হয়ে গেল।

কিন্তু গেল না শুধু নুন।

সে যেন কোন্ অদৃশ্য অফুরন্ত এক লালা থেকে বস্তার পর বস্তা বেরিয়ে আসছে তো আসছেই। যেন সমুদ্রজাতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। হাট-বাজারের আশ-পাশে গ্রাম-চরের চাষাভুষো জোয়ান ছোকরারা দিব্যি এসে বসে যায় বস্তা খুলে।

"হেই এসে গেল হিজলীর নুন।"......

পুলিশ যে খবর পায় না তা নয়—কিন্তু তাদের রাজকীয় কচকাওয়াজি গতির আগে আগে চলে গাঁউলি গোয়েন্দা বাহিনীর বার্তাবহ। সেপাই-সান্ত্রী এসে পৌঁছতে পৌঁছতে বস্তা, মানুষ, ক্রেতা-বিক্রেতা সব হাওয়া।

বর্ষাকালও একদিন ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ভেসে এল মৌসুমী মেঘের জল। সারা আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। এলিয়ে রসিয়ে উঠল লোনা মাটি—যেন কোল মেলে দিলে নতুন বীজ—নতুন শিশুর জন্যে। মাটির নুন ধুয়ে সাফ হয়ে গেল অঝোর বর্ষায়।

ভাটির দেশ। নামাল জমি। দেখতে দেখতে খানা-খন্দ মাঠ পুকুর জলে জলে একাকার হয়ে গেল। তার মাঝখানে ছেঁড়া ছেঁড়া চরের কিষাণবসতি আর গাছ-গাছালি ঘেরা গ্রামগুলো যেন কোনরকমে মাথা তুলে নিশ্বাস নিতে লাগল। মাটি ফুঁড়ে বিজ্‌বিজিয়ে উঠল কাঁকড়া, শামুক, জোঁক আর সাপ। তবু খেলো দেশ। হৈমন্তী ফসল প্রধান সম্বল। আপাতত তিনটে মাসের জন্যে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে চরের মানুষ। জলে কাদায় বলদে মানুষে একাকার।

তারই মধ্যে সপ্তাহে একদিন হাটবার—চরের মানুষের কেনা-কাটার দিন। সে দিন-গুলোয় গাঁয়ে হাটে সেই অদৃশ্য অফুরন্ত নুনের গোলাটার সরবরাহ কিন্তু এতটুকু বন্ধ হলো না। শুধু গাঁউলি হাট-বাজার নয়—সে নুন ছোট ছোট কাগজের প্যাকেটে চালান হয়ে গেল মহকুমা শহরে—জেলা শহরে, মায় খাস কলকাতা। প্যাকেটের ওপরে রবার স্ট্যাম্প মারা—"হিজলীর নুন। মূল্য দেশভক্তি।"

সেই ক্ষুদে ক্ষুদে প্যাকেটগুলো নিয়ে শহর-বাজারের রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে ঘটে গেল বিরাট কাণ্ডের মহড়া। লাঠি আর বেটনের দাপটে বয়ে গেল রক্ত-গঙ্গা। তবু তারই মধ্যে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের তরুণ বলিষ্ঠ বাহু—আঙুলে তাদের চেপেধরা ছোট ছোট সেই প্যাকেট। ঘোড় সওয়ারের পায়ে-দলা ভিড়ের ভেতর থেকে তাদের উচ্চকিত কণ্ঠ ফেটে পড়তে লাগল বারে বারেঃ

"হিজলীর নুন......অনেক রক্ত ঢেলে... অনেক জীবন বলি দিয়ে এর জন্ম ভাইসব ...এর মূল্য শুধু আপনার দেশভক্তি।"...

হতচেতন না হওয়া পর্যন্ত সে গলা থামে না—সে বাহু নিচে নামে না। ভিড়ের মাথায় ছড়িয়ে দেয় প্যাকেটগুলো। অসংখ্য নিচে নামানো হাত মাথার ওপরে উঁচু হয়ে ওঠে সেগুলোকে পাওয়ার জন্যে।

দলিত মথিত, রক্তস্নাত—আন্দোলিত আবর্তিত জনসমুদ্র ফেটে পড়ে ধ্বনিতেঃ

"বন্দেমাতরম্।"......

ওপরে দাঁত-চাপা ক্রোধ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ওই ক্ষুদে ক্ষুদে নুনের প্যাকেট-গুলো জনারণ্যের দাবানল। সুপ্তিতে যেন দেশলাই কাঠি। কড়া কৈফিয়ৎ তলব করতে ওপর থেকে হুড়মুড় করে নেমে এল আগে জেলায়—তারপর জেলা থেকে মহকুমা—মহকুমা থেকে গাঁউলি থানা। কোথায় সেই হিজলীর নুনের কারখানা? খুঁজে বার কর।

হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত আবার হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগল বড় দারোগা। "বোলাও শালা দফাদারকো—জল্‌দি বোলাও, অভি বোলাও।"

পাল্লা দিয়ে ছোট দুই দারোগা হাঁক-

হাঁক শুরু করে দিলে। জমাদার দীন-দয়াল সিং থানা কম্পাউণ্ডের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। সেপাই-সান্ত্রী কুচকাওয়াজের জন্যে সারি দিয়ে দাঁড়াল। জরুরী তলবে চৌকিদাররা মাথায় পাগড়ি বেঁধে, গায়ে নীল জামা চড়িয়ে কাঁধে লাঠি নিয়ে থানায় হাজির হলো।

ওদের দেখামাত্র বড় দারোগা খ্যাপা কুকুরের মত যেন কামড়াতে ছুটে এল। গর্জে উঠল, "শালা, হিজলীর নুনের কারখানার কথা কেন এতদিন বলিস নি বল।"

"কারখানা হুজুর!"—

চৌকিদাররা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"ন্যাকা সাজা হচ্ছে শালা কুত্তার বাচ্চা সব—কারখানা জানো না?" দারোগা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "শালা মাস মাস সরকারের তঙ্কা খাচ্ছ আর সরকারের সঙ্গেই নেমখারামী! খবর চেপে তোর গাঁয়ের বাপদের বাঁচাচ্ছিস! কোথায় খালাড়ি আছে বল।"

চৌকিদারদের মধ্যে পুরনো চাকরী কালু মাঝির। তা বয়সও পঞ্চাশ পার করে দিয়েছে। ছেলেও তার চৌকিদার। সঙ্গে আছে। বাকি যারা—তাদের অনেকেই তার ছেলের বয়সী, কেউ বা কিছু বড়। বড় দারোগার দাপটের সামনে সবাই তারা চুপ। কালুই সাহস করে কথা বললে।

"সেই বাঁশবেড়িয়ার খালাড়ির পর আর তো কোনো খালাড়ির খবর পাই নি হুজুর।"

"খবর পাস নি শুয়োরের বাচ্চা!" ঠাস করে মারলে এক চড়। দাঁতে দাঁত চেপে বড় দারোগা বললে, "কেন পাস নি? তবে কোথা থেকে চালান যাচ্ছে এত নুনের প্যাকেট?" তারপর গালাগাল। সেসব অলেখ্য।

চড়ের বহরে ঝাঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। বসে পড়ল। যতো হোক, বয়েস হয়েছে। কালু মাঝি মুখ নিচু করে রইল। তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল লজ্জায়—ক্ষোভে—অপমানে। ছেলের বয়সী সব সঙ্গীরা তার পেছনে জড়সড়।

বড় দারোগা বললে, "খুঁজে বার কর শালা। সরকারের নিমক খাচ্ছিস—খুঁজে তোকে বার করতেই হবে। না হলে সব শালাকে কয়েদ করে দেবো।"

এক পা এগিয়ে—এক পা পেছিয়ে, যেন দরকার পড়লেই ছুটে পালাবে; ভয়ে ভয়ে কালুর ছেলে ভোলা মাঝি বললে "গাঁয়ের যতো জঙ্গল আর বাঁশবাগান—সব মোদের নজরে আছে হুজুর। তবে আবার গিয়ে মোরা দেখব। যেমন করে হোক—খুঁজে মোরা বের করবো তিন দিনের মধ্যে।"

বড় দারোগা যেন একটু নরম হলো ভোলার কথার বহরে। বললে, "গ্রামে না পাস—চরের জালপাই জঙ্গল ঘেরাও করে দেখ।"

"ই ঘোর বর্ষার পর জালপাই জঙ্গল অগম হুজুর"—ভোলা বলল, "সেখানে এখন গাছে কুমীর চরে বেড়াচ্ছে—মানুষ যাবে কি! এমনিতেই গ্রাম চর—সব জলে জলে টইটম্বুর। তবু জানপ্রাণ দিয়ে মোরা খুঁজে বার করবো হুজুর।"

বড় দারোগা খুশি হলো। বললে, "দরকার হলে সঙ্গে সেপাই যাবে—সান্ত্রী যাবে।"

"আগে সন্ধান নিতে হবে হুজুর। তারপর বাঁশবেড়িয়ার মতো একেবারে ঘেরাও করে"—ভোলা মাঝি চোখের ইঙ্গিত করে বাকিটা বুঝিয়ে দিলে।

"ঠিক আছে—ঠিক আছে।" বড় দারোগা বলে উঠল, "সন্ধান বার কর—শুয়র কারখানার গুষ্টির পিণ্ডি চটকে দেবো।"

বড় দারোগা থানার ভেতরে চলে গেল। চৌকিদাররা সদলবলে সব ঘুরে দাঁড়াল। এবার যে যার চৌকিতে ফিরে যাবে।

কিন্তু কালু মাঝি তার লাঠিগাছটার ভর দিয়ে থানার বারান্দায় ঘাড় হেঁট করে বসে রইল তো রইলই।

ভোলা চাপা গলায় বললে, "চলো বাবা, আর বসে কি হবে?"

রাখাল পাইক ফিস্ ফিস করে বললে, "শালার পালাতে পারলে বাঁচি। দারোগা লয় তো বাঘ।"

কালু তেমনি বসে রইল।

ভোলা আবার বললে, "বাবা চলো।"

কালু মুখ তুলে তাকাল। ছোট ছোট চোখ দুটো তখনো ভেজা ভেজা। আস্তে আস্তে বললে, "তোরা যা। আমি কুর্তা তকমা জমা দিয়ে যাব। যা হয় হবে।"—

ভোলা ভয় পেয়ে গেল। বারান্দার এদিক-ওদিক উঁকিয়ে দেখলে—পাছে কোনো সেপাই জমাদার শুনে ফেলে।

রাখাল চাপা গলায় বললে, "এই বেলা ভালোয় ভালোয় পালাই চলো কালু জ্যাঠা—ফের শালা আবার কি অপমান করে দেবে।"

মাধব সাঁট বললে, "কয়েদ করার হুমকি তো দিয়ে গেল।"—

রাখাল আর ভোলা হাত ধরে টেনে তুললে কালু মাঝিকে, এবং সবাই মিলে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে থানা কম্পাউণ্ড পার হয়ে এল।

বাইরে এসে কালু মাঝি হাউ-মাউ করে উঠল, "তোরা বল—তোরা বল, ওদের জন্য কি না করেছি আমি। তোরা সব জানিস। সেই পুব চরে—সেই বাঁশ-বেড়িয়ায়—"

ভোলা বাপের মুখ চেপে ধরলে। বললে, "এখন মুখ বুজে ঘরে চলো। কে কোথায় শুনে ফেলবে।"

"হ্যাঁ—ই শালার বকমারি কাম। জলে কুমীর তো ডাঙায় বাঘ। একদিকে গাঁ—একদিকে থানা।" রাখাল বললে, "তবু তুই কথার ঘুরন দিয়ে আজ বাঁচিয়ে দিলি—না হলে আজ নির্ঘাৎ মোদের সকলকে ধরে মারত।"

"গাঁয়ের লোকের কাছে মোরা বেইমান হয়ে গেছি—আর দারোগাও বলে বেই-মান।" হঠাৎ আবার একটা আবেগের ধাক্কায় কালু মাঝি যেন অস্থির হয়ে উঠল। বললে, "মোকে ছেড়ে দে তোরা—আমি ফেলে দিয়ে আসি এই কুর্তা আর তকমা।"

মাধব সাঁট এতক্ষণ গুম হয়ে চুপচাপ শুনছিল—বলে উঠল, "ই শালার কাম ছেড়ে দেওয়াই ভালো। মাইনা তো পাঁচ টাকা—অথচ শালার এই মারধর—গালমন্দ। এর চেয়ে মোর ধোপার কাজ ভালো ছিল হে।"

ভোলা মাঝি খেঁকরে উঠল, "তা ধোপার কাজ তোকে ছাড়তে কে বলেছিল? তখন মোর বাপকে এসে দশবার ধরলি কেন চৌকিদারির জন্য।"

"কাপড় থাকলে তো কাচব!" মাধব বললে, "গেরামের লোক হাড় কঞ্জুস। বিয়ে-সাদি আর মড়া না বেরোলে শালারা কাপড় কাচাবে? না হলে জাতব্যবসা ছাড়ি?"

"তবে মুখ বুজে থাক।" ভোলা ধমকে দিলে।

চৌকস ছোকরা ভোলা—কাজেকর্মে, কথায়বার্তায়। তার ধমক খেয়ে মাধব সাঁট চুপ করে গেল।

রাখাল বললে, "কথা তো দিয়ে এলি ভোলা—নুনের কারখানা খুঁজে বের করে দিবি। তারপর?"

মাসিক ১০৲ টাকা কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
লউন

সর্বাধুনিক জাপান মডেল চিত্তাকর্ষক, গ্যারান্টিযুক্ত "ন্যাশানাল ৭০" অলওয়ার্ল্ড ৩ ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টার ডায়াল লাইট সহ। প্রতি গ্রামে ও শহরে পাঠান যায়। শীঘ্র করুন।

WRITE YOUR LETTER TODAY
MUSIC E SOUND (N)
P. BOX 1576, DELHI-6

"খুঁজে বার করতে হবে।" ভোলা বলল, "সবাই মিলে চোখ রাখি এস।"

রাখাল বলল, "এই সবে বর্ষা গেল—মাটির জল এখনও শুকোয় নি। এর মধ্যে নুন হবে কোথা থেকে? কি সব বলে দারোগা?"

"হয়তো কোথাও নুনের লুকোনো গোলা আছে।" ভোলা বললে, "সেইটা খুঁজে বার করতে হবে।"

"সেটা কোথায় আছে—তোর কি মনে হয়।"

ভোলা বললে, "চরে—ফাঁকা চরে, যেখানে মোদের চোখ পড়ে না সহজে। মানুষজনের যাতায়াত কম। এই তো মোর মনে হয়।"

রাখাল চুপ করে ভাবতে লাগল বোধ হয়।

ভোলা আবার বলল, "নুনের সরঞ্জামী* চর—ঘর ঘর তালাস করলে সে-সব বেরিয়ে পড়তে পারে।"

রাখাল বলল, "তাহলে তো চারদিকে সবাই খেপে যাবে গো!"

"সে থানা সামলাবে" ভোলা বলল, "না কি বল বাবা?"

কালু মাঝি শুধু বিড়বিড় করে বললে, "মোরা বেইমান—মোরা বেইমান। এতদিন মোরা চোর ধরেছি—খুন ধরেছি। এমন কাজ করি নি।"

পেছন থেকে মাধব সাঁট বললে, "এর চেয়ে চোর ধরা সহজ—খুন ধরা সহজ। সবাই তোমাকে সাহায্য করবে। আর এ শালা সবাই তোমার ওপর খেপে যাবে।"

কালু মাঝি তেমনি বিড়বিড় করে বললে, "মোরা বেইমান।"

ভোলা মাঝি চটে গেল—খেঁকরে উঠল, গোটা রাগটা গিয়ে পড়ল মাধবের ওপরে, "তবে যা—মোর বাপের সঙ্গে তক্‌মা কুর্তা জমা দিয়ে আয়।" বলে পেছনে সাধনের দিকে মুখ ফিরিয়েই চমকে উঠল। ওদের দলের পেছনে পেছনে অন্য আর একজন কে আসছে। ছোকরা মতো। চোখে চোখ পড়তে পায়ের গতি তার বেড়ে গেল। ওদের বাঁয়ে রেখে ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে চৌকিদারের দলটাকে অতিক্রম করে চলে গেল হন হন করে।

ভোলা ঠিক চিনতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "কে যায়?"

উত্তর এল, "হাটুরা।"

অর্থাৎ হাটের লোক।

ভোলার খটকা লাগল, নাম জিজ্ঞেস করল, "কি নাম গো?"

লোকটা উত্তর দেবে কি—গলা ছেড়ে গান ধরে দিলে: অভিমন্যু বধের গান—

দাদা অভি কোথা যাবি
সে ঘোর শ্মশানে।......

ভোলা মাঝি চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে বললে, "রাখাল, লোকটা কে বল দেখি?"

রাখাল বললে, "চিনতে পারলম নি।"

"বাবা, চিনতে পারলে?"

গলা শুনে হয়তো চিনেছে কালু মাঝি—তার বহুদিনের অভ্যস্ত কান। কিন্তু ছেলের কথার কোনো উত্তর দিল না।

ভোলা মাঝি বললে, "লোকটা মোদের সব কথা শুনে গেল।"...

সন্ধ্যে হতে না হতে গাঁউলি গোয়েন্দা-বাহিনী গ্রাম থেকে চরে—ঘর থেকে ঘরে সকলকে সজাগ করে দিয়ে এল।

"পাত্‌না ঢাকো মাসী।"

"পাত্‌না ঢাকো খুড়ি। ছুঁচো আসছে।"

সাগর খুড়ি ছুটে এল মহেশ মণ্ডলের কাছে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, "কথাটা সত্যি ছোট মণ্ডল?"

"হতে পারে খুড়ি।"

"জানতে পারল কি করে?"

"হরি মণ্ডল ছাড়া কি আর লোক নাই খুড়ি?"

"সে কে—কোন্ গোলামের ব্যাটা?"

মহেশ মণ্ডল বললে, "চৌকিদাররা তোমার গ্রামের লোক। ঘরের লোক। তারা জানতে পাবে।"

"হুঁ।" বলে সাগর খুড়ি কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা—ওরা কি নুন খায় নি?"

মহেশ বললে, "খায় বৈ কি?"

"বিলাতী নুন?"

"সে আর কোথায় পাবে খুড়ি।" মহেশ বলল, "গাঁ গাঁউলি হাট-বাজার থেকে এখন মোদের দেশী নুনই কিনতে হয়।"

"সে যদি মোরা কেউ না বেচি?"

"তাহলে খেতে পাবে না।" বলে মহেশ হাসল।

সাগর খুড়ি ফোঁস করে উঠে বললে, "হাসি লয় ছোট মণ্ডল। কাল সকালে যেয়ে আমি ওদের হুন্দায় হুন্দায় বলে আসব। দেখো।—"

"সে তো পরের কথা।" মহেশ বলল, "এখন নুন আর নুনের সরঞ্জামী খুঁজতে ঘরে এসে ঢুকে পড়ল যে খুড়ি। আগে সেটা সামলাও।"

"ঘরে ঢুকবে? ওই গোলামের ব্যাটা চৌকিদার?" সাগর খুড়ি ফের ফোঁস করে উঠল, "ঝাঁটায় যদি বিষ ঝেড়ে না দেই তো আমি মাধব দাসের ঝি লয়। এক-একটার—"

মহেশ বললে, "বাস্—তাতেই হবে। যতদূর খবর পেয়েছি—চৌকিদাররাই আগে খোঁজ-খবর করতে আসবে। আর পুলিশ যদি এসেই পড়ে—আগে থেকে বৌ-ঝি-গুলানকে সরিয়ে দিও।"

"সে আর মোকে বোঝাতে হবে নি ছোট মণ্ডল।" সাগর খুড়ি তখনি আস্ফালন সুরু করে দিলে, আয় গোলামের ব্যাটারা।"—

মহেশ হেসে বললে, "তুমি একলা আর কি করবে খুড়ি?"

"একলা? একলা কি গো?" সাগর খুড়ি বললে, "চরে মোর মত রাঁড়ি বুড়ি

* নুন তৈরির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা **রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা** বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৬

সম্পাদক ঃ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বিষয়সূচী । চিঠিপত্র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়), রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে? (জীবেন্দ্র সিংহরায়), জীবনদেবতা শ্রেণীর রবীন্দ্রকাব্য (ক্ষুদিরাম দাস), রবীন্দ্র-জীবনদেবতাবাদ (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), শরৎচন্দ্রের শৈল্পিক মতবাদ (অজিতকুমার ঘোষ), রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা (সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার), সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ (চিত্রিতা দেবী), ম্যাকসিম গোর্কীর ছোটগল্প (সরোজ-মোহন মিত্র), আনন্দময়ী মীরা দেবী (রমা চৌধুরী), আলোচনা (সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), গ্রন্থসমালোচনা (সুকুমার সেন ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য)।
চিত্রসূচী । রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনশালা পরিদর্শনরত মীরা দেবী।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন; কলিকাতা—৭

আধড়ের অভাব নাই। আর ঝাঁটারও অভাব হবে নি।"

বলতে বলতে সাগর খুড়ি চলে গেল টং হয়ে।

মরা নুনের রাজ্য যেন আবার বেঁচে উঠেছে। উত্তরে সুতাহাটা মহিষাদল থেকে দক্ষিণে সেই সাগরের ধার পিছাবনি। চরে চরে তার গুপ্ত খালাড়ি—ঘরে ঘরে তার ক্ষুদে কারখানা। সে একটা নয়—হাজারটা। বাঁশবেড়িয়ার একটা ভেঙে আক্রোশে যেন হাজারটা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নুনের সরঞ্জামী ঘরে ঘরে।

গাঁউলি গোয়েন্দার কথায় সব মাটির তলায় ঢাকা পড়ে গেল রাতারাতি। আর একটা নতুন সংঘাতের অপেক্ষা করতে লাগল চরের মানুষ—সে আজ একটা জায়গায় নয়, হাজার জায়গায় ছড়ানো।

এমন টালমাটালের দিনে—ছোকরার ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, গুপী দিশা নুনের পাতনা পেতে বসল। একেবারে নতুন হাঁড়ি।

দেখতে পেয়ে মহেশ মণ্ডল ছুটে এল হাঁ-হাঁ করে, "তোর মাথা খারাপ হলো? এটা হচ্ছে কি?"

গুপী নির্বিকারভাবে হেসে বললে, "কেন? নুনের পাতনা দিচ্ছি গো ছোট মণ্ডল।"

চোখ পাকিয়ে মহেশ বললে, "এই তার সময়!"

গুপী বললে, "মোর সম্বন্ধীরা আসবে শুনে পেতে রাখছি। তা আসতে আসতে হয়ে যাবে। মোর সাঙাৎরা আছে, আমি আছি।"—

ওর সাঙাৎ বন্ধু বলতে মুকুন্দ, যুগল, হাবু—এরা। চরের উঠতি জোয়ান ছোকরার দল। সব ক'টা দাঁড়িয়েছিল সেখানে। গুপীর কথায় হি-হি করে হাসতে লাগল।

মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০৲। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল

স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা হিন্দীতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B. C.) P.B. 2128, Delhi-7

ছোকরা-চ্যাংড়ার দল—কি মতলব ওদের কে জানে! মহেশ চোখ কুঁচকে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

গুপী বললে, "ভয় নাই, ছোট মণ্ডল।"

যুগল বললে, "তুমি তোমার কাজে যাও ছোট মণ্ডল। মোরা খারাপ কিছু করব নি।"

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না মহেশ। ওরাও ভাঙলে না। মহেশ বিড়-বিড় করতে করতে চলে গেল।

গুপী গলা নামিয়ে বললে, "খারাপ আর কি। মোর সম্বন্ধী আর বিদেশী বঁধুরা যদি আসে—এ চরের নুন-জলের একটু স্বাদ দিয়ে দিব। এই আর কি।"—

একদিন দু'দিন যেতে না যেতে চরের বাঁধের ওপরে দেখা গেল তকমা আঁটা নীল কুর্তার দল—কাঁধে লাঠি। জনাপাঁচেক হবে। সঙ্গে আসে নি শুধু কালু মাঝি। দলবল নিয়ে ভোলা মাঝি এগিয়ে এল কিষাণ বসতির দিকে।

ছাড়া ছাড়া কুঁড়ে। ঘুর-প্যাঁচের রাস্তা—কারুর সামনে দিয়ে, কারুর খিড়কী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। খানিকটা আসতে না আসতে মাধব সাঁটের নজরে পড়ে গেল নুনের হাঁড়ি। সে হাঁড়ির রং চেহারা আলাদা। সাপের হাঁচি বেদের চেনে।

মাধব সাঁট বললে, "হাই দেখ।"—

ভোলা বললে, "চোপ। মোরা শুধু দেখে যাব।"

খানিকটা এগিয়ে রাখাল বলে উঠল, "হোই ফের একটা। সব খিড়কীর দিকে পাতা।"

ভোলা মাঝি বললে, "বললম যে—শালার চর হলো নুনের ঘাঁটি।"

কিন্তু আর একটাও চোখে পড়ল না।

ভোলা বললে, "ঢুকে পড়ে দেখতে হবে। ঘর মেলা—পাঁচজন পাঁচদিকে ছড়িয়ে পড়।"

মাধব বললে, "ঢুকে তো পড়তে বললি—কি বলে ঢুকবো?"

"বলব—থানার হুকুম। মোরা হুকুমের চাকর—কি করব।"

ওরা ছড়িয়ে পড়ল।

ভোলা চলল একদিকে। সামনে যে কুঁড়েটা দেখা গেল তার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বাইরে লোকজন কাউকে দেখতে পেল না। হুট্ করে ঘরে ঢুকতে সাহস হলো না। ঘুরে খিড়কীর দিকে গেল। কে একটি বৌ পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে সাড়া দিয়ে ভোলা ডাকল, "কার বৌ গো!"—

সভয়ে বৌটি ঘুরে দাঁড়াল। হাউমাউ করে চেঁচাতে গিয়ে থমকে গেল। অথচ সাগর খুড়ির উপদেশ—চেঁচাতে হবে। কিন্তু চেঁচানোর ফুরসুৎ হলো না।

ভোলা মাঝি অবাক চোখে চেয়ে বলে উঠল, "নয়ন! নিমাই মাঝির ঝি?"

নয়ন কথা বললে না। তবে মুখে তার চৌকিদার দেখে ভয়ের ছায়াও নেই। বহু দিন পরে একটা চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে ভয় আর পায় কে।

ভোলা বলল, "শুনেছিলাম—চরে কোথায় তোমার শ্বশুর বাড়ি। সে এই ঘর!"

নতুন মাথা নেড়ে লাজুক গলায় বললে, "এই ঘর।"

"কতদিন পরে দেখা হলো নয়ন! মোর কথা মনে আছে?"

"তুমি মোর বাপের দেশের লোক। ভুলব কেন!"

ভোলা হেসে বললে, "তবে মোর কপাল ভালো।"

কিন্তু কপাল বোধ হয় খুব সুবিধের নয়। হঠাৎ কি হলো—সে বুঝতে পারল না—কাছেপিঠে কোথায় কতগুলো মেয়েলি গলা ফাটা কাঁসরের মত পাড়া জাগিয়ে তুললে। দেখতে দেখতে ভীষণ একটা সোরগোল পড়ে গেল। রাখাল, মাধব—তার অন্য সঙ্গীরা দুদ্দাড় ছুটে বেরিয়ে গেল।

চকিত গলায় নয়ন বললে, "পালাও!"—

কিন্তু পালাবার পথও তখন বন্ধ। সাগর খুড়ির ঝাঁটাবাহিনী তাড়া করে এসে পড়েছে মুকুন্দের ঘরের সামনে। দু-চারজনের হাতে বঁটিও আছে।

কে বললে, "মুকুন্দের খিড়কীর দিকে গেছে এক হারামজাদা। তখন দেখলম।"

সাগর খুড়ি বললে, "তা মুকুন্দের বৌ কোথা গেল—চেঁচাল নি। হ্যাঁ মুকুন্দের মা?"

মুকুন্দের মা বললে, "আমি তো তোমাদের সঙ্গে।"

[ক্রমশ]

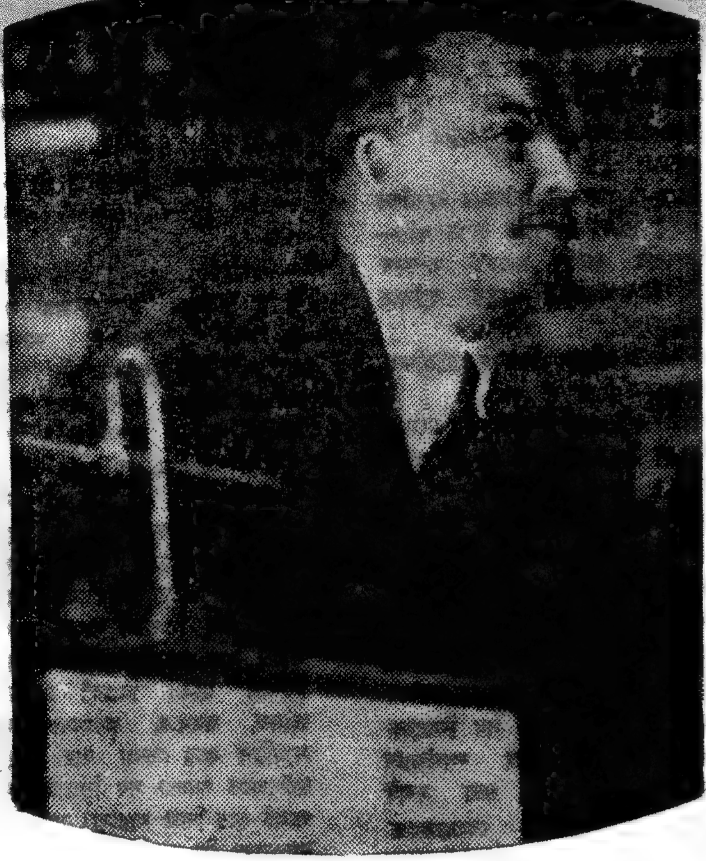

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[২]

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে কথক মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ঠিক পেছনেই আর একটি কার্টেন, সামনে অল্প খালি জায়গা। কথক বলতে শুরু করবেন :]

কথক : সেইন্ট পিটার্সবার্গে থাকবার সময় নিজনি নোভোগোরোড এবং মস্কোর মার্কসিস্টদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলেন লেনিন, উলিয়ানভ পরিবার এই সময় উঠে এলেন মস্কোতে। ডিমিত্রি ইলিচ ভর্তি হলেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে। শ্রমিকদের পড়বার সান্ধ্যস্কুলের শিক্ষিকা ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে আলাপ হল লেনিনের, একই দুর্গম বন্ধুর পথের সহযাত্রী—এ-নারীকে, সহকর্মীর পদ থেকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বরণ করলেন লেনিন।

[কথক চলে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পেছনের পর্দা উঠে যাবে। দেখা যাবে একটি টেবিলের তিনদিকে তিনটি চেয়ার এবং আর একপাশে কয়েকটি বেঞ্চি পাতা আছে। লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া কথা বলতে বলতে এসে ঢুকবেন এবং চেয়ারে বসবেন।]

ক্রুপস্কায়া—কমরেড লেনিন! সেদিন আমাদের কনফারেন্সে শেভালিয়াজিন যখন প্রস্তাব করলেন যে, নিরক্ষর সমিতির কাজে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার, আপনি হো হো করে হেসে উঠলেন...

লেনিন—আমি হাসাতে কি আপনি বিরক্ত বোধ করেছিলেন?

ক্রুপস্কায়া—না, সেকথা বলছি না। তারপর আপনি বললেন—যারা নিরক্ষর সমিতির কার্যক্রম অনুসরণ করে দেশোদ্ধার করতে চান—তাঁরা সে কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

লেনিন—আমার এ প্রস্তাবে কি আপনার কোন আপত্তি ছিল?

ক্রুপস্কায়া—(হেসে উঠে) আমার কেন আপত্তি থাকবে! কিন্তু আপনার বলবার ভঙ্গিতে যথেষ্ট বিদ্রূপ মেশানো ছিল—

লেনিন—তা ছিল বৈকি! আমি ওখানে এই উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলাম যে, শ্রমিকদের কিভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে? কিন্তু গিয়ে কি শুনলাম? [লেনিন উঠে কিছুক্ষণ বিরক্তভাবে পায়চারি করবেন—তারপর বলতে থাকবেন :] কমরেড ক্রুপস্কায়া ওদের মূল বক্তব্যটা সেদিন কি ছিল? ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম যে, ওরা বলতে চাইছে—আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ইস্তাহার ছাপিয়ে তা শ্রমিকদের ভেতর বিলি করতে হবে। দেখলাম এরা সংগ্রামী নয়, এরা হচ্ছে ভীতু উদারনীতিকের দল। [আবার অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পদচারণা করবার পর—] এরা কখনও বড় কাজের কথা ভাবতে পারে না। ছোট ছোট ব্যাপার নিয়েই মাথা ঘামাতে এরা ভালবাসে—সামান্য বিপদের সংকেত পেলে মুষড়িয়ে পড়ে!

ক্রুপস্কায়া—এদের ভীতু বলছেন কেন?

লেনিন—কমরেড ক্রুপস্কায়া, এ বিষয়ে আমার নিজের জীবনের একটা বেদনাভরা অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে বলছি—তাহলেই আমার বক্তব্য আপনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। [লেনিন কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে আত্মমগ্ন অবস্থায় পায়চারি করবেন। তারপর ধীরে ধীরে বলবেন :] কমরেড ক্রুপস্কায়া! আমার দাদা আলেকজান্ডার ইলিচের হত্যাকাণ্ডের পৈশাচিক কাহিনী আপনি নিশ্চয় শুনেছেন?

ক্রুপস্কায়া—দেশের সর্বহারা মেহনতী মানুষের জন্য তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক আত্মবিসর্জন আমাদের এই বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের পথে আসতে অনেকখানি প্রেরণা যুগিয়েছে

লেনিন—জার আলেকজাণ্ডার দি থার্ডের জীবননাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহে যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোল, এই উদারনীতিকের দল উলিয়ানভ পরিবারের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করেছিল জানেন?

ক্রুপস্কায়া—বলুন।

লেনিন—দাদার গ্রেপ্তারের খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তারা আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলো।

ক্রুপস্কায়া—বলেন কি!

লেনিন—একজন বয়স্ক শিক্ষক, প্রতিদিন যিনি আমাদের বাড়িতে দাবা খেলতে আসতেন—এর পর থেকে আর কখনও আমাদের বাড়িতে ঢোকেন নি।

ক্রুপস্কায়া—এদের কি কোনরকমের মানসিকতাবোধ ছিল না?

লেনিন—আমরা যেন সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে রইলাম। দাদার আদালতে বিচারের সময় মা ঘোড়ার-গাড়িতে করে সিজরানে এসে ট্রেন ধরবেন—কিন্তু মা'র সহযাত্রী হিসাবে যাবার জন্য একজন লোককেও রাজী করাতে পারলাম না। দেশভক্তির অপরাধে অভিযুক্ত সন্তানের জননীর সহযাত্রী হয়ে শেষে জার-সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়বে এই ভয়ে সবাই পেছিয়ে গেলেন। উদারনীতিক সমাজের লোকেদের আসল চেহারা সেইদিন থেকেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে কমরেড ক্রুপস্কায়া। (দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে) যাক্ সে কথা—(চেয়ারে এসে বসে) —আপনার স্কুলের কে কে আজ এখানে আসছেন?

ক্রুপস্কায়া — বাবুসকিন, বোরোভকভ, গ্রিবাকিন, আরমেনী এবং তার সহোদর ফিলিপ বোডরোভ আর জুকভ। এরা সবাই শ্রমিক—রবিবারের সান্ধ্য-বিদ্যালয়ে আমার কাছে পড়ে।

লেনিন—কি পড়ান?

ক্রুপস্কায়া—শ্রমিকদের জীবনের নানাদিক নিয়েই এদের বোঝাতে চেষ্টা করি—আপনার লেখা মার্কেট সম্বন্ধে প্রবন্ধটি সেদিন এদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম...

লেনিন—এদের মনের কিরকম প্রতিক্রিয়া দেখলেন?

ক্রুপস্কায়া—এরা বলছিল, আপনি যেরকম বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে মার্কেটের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন তাতে মার্কসিস্ট বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তাদের একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিতে কষ্ট হয় নি। আপনার রচনার সব থেকে বড় গুণ কি জানেন কমরেড লেনিন—তত্ত্বের কচকচানি দিয়ে আপনার লেখা ভরা থাকে না. বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে সব কিছুকে আপনি সহজ এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন। ওই ওরা সবাই আসছে—[বাবুসকিন, বোরোভকভ প্রমুখের প্রবেশ—লেনিন সবাইকে বেঞ্চিতে বসতে বলবেন।]

ক্রুপস্কায়া—কমরেডস! ভলগার মার্কসিস্ট পণ্ডিত ভ্ল্যাডিমার ইলিচের কথা তোমরা অনেকবার শুনেছ। উনি এখানে এসেছেন আমাদের নিয়ে কাজ করবার জন্য, আমাদের সংগঠিত করে তোলবার জন্য। কমরেড লেনিন, এঁরা আজ এখানে এসেছেন আপনার মুখ থেকে আমাদের সংগ্রাম—বিপ্লবাত্মক শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু শুনতে।

[সবাই লেনিনকে অভিনন্দন জানাবে এবং ক্রুপস্কায়ার উক্তির সমর্থন করে বলবে:]

শ্রমিকেরা—আমাদের শিক্ষিকার অনুরোধ আপনি নিশ্চয় রাখবেন কমরেড লেনিন!

লেনিন—কমরেডস, আপনাদের সবার কথা আমি কমরেড ক্রুপস্কায়ার মুখে অনেকবার শুনেছি। আপনারা প্রত্যেকেই বড় বড় ফ্যাক্টরীর প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক। আপনারা এখানে আমার নেতৃত্বে প্রলেটারিয়ান পার্টি গড়ে তুলতে চান, এর থেকে বড় কথা আর কি হতে পারে। আপনারা কমরেড ক্রুপস্কায়ার সানডে স্কুলে মার্কসের সাম্যবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা নিচ্ছেন—কিভাবে বিপ্লবীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে, কিভাবে তাদের সংগঠন করতে হবে সে বিষয়েও আপনাদের শিখতে হবে। বিপ্লবী মেহনতী শ্রমিক, মজদুর, কৃষকদের যদি সুগঠিত করে তোলা যায়, তাহলে রাশিয়াতে আমরা সব কিছুই ওলট-পালট করে দিতে পারবো। কমরেডস! আপনারা কি কখনও স্বপ্ন দেখে সময় কাটান?

শ্রমিকেরা—বলশেভিক এবং মার্কসিস্টের কি স্বপ্ন দেখবার অধিকার আছে?

লেনিন—নিশ্চয় আছে! অবশ্য তার স্বপ্নের বিষয়বস্তু হবে তার পার্টির শক্তিবৃদ্ধি বিষয়ক। তার স্বদেশবাসীর যাতে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন হয় এই নিয়েই তাকে আত্মহারা হয়ে স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে হবে। আর একটা কথা—নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখুন, জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার চেষ্টা করুন, ক্রমাগত মেহনত করে যান, প্রাণের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করুন নিজেদের সব স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে পরিণত করতে। এ ছাড়া আমাদের অন্য গতি নেই. আমরা যদি কোন সময়ে রাশ আলগা দিই, তাহলে শোষকের দল সুযোগ পাবে আমাদের পিষে ফেলতে, আমাদের ধ্বংস করতে, আমাদের সংগ্রামকে অঙ্কুরে বিনাশ করে ফেলতে...

[কিছু আগের থেকে আলো কমে আসতে আসতে লেনিনের শেষ কথার সঙ্গে অন্ধকার হয়ে যাবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে একদল শ্রমিক বসে রয়েছে এবং লেনিন তাদের কাছে বক্তৃতা করছেন—তাঁর পাশে আছেন ক্রুপস্কায়া।]

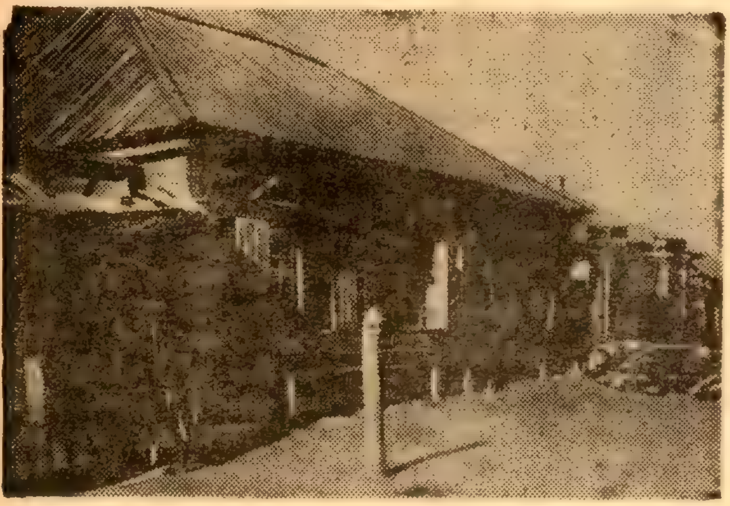

একটি ঐতিহাসিক ভবন। নির্বাসন কালে এখানেই লেনিন বাস করতেন।

মেহনতী মানুষের মুক্তিকামী সেণ্ট পিটার্সবার্গ লীগ অফ স্ট্রাগল-এর একদল সহকর্মীর সঙ্গে লেনিন। (ফটো: ১৮৯৭)

লেনিন—কমরেডস! কোন বড় জায়গায় সভা ডেকে আলোচনা করবার সুযোগ আমাদের নেই। পুলিশ আগে থেকে জানতে পারলেই এসে সবাইকে গ্রেপ্তার করবে। তাই এইভাবেই এক একদিন এক একজন কমরেডের বাড়িতেই আমাদের আলোচনা সভা বসাতে হবে। কমরেডস! গত শনিবার আমি আপনাদের বলেছিলুম, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন দেশেই সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বন্ধুগণ, আপনারা চোখের উপরই দেখতে পাচ্ছেন যে, ধনতন্ত্রবাদী সমাজে কয়েকজন মাত্র লোক বাড়িঘর, জমি, সম্পদ, কারখানা সব কিছুর মালিক হয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছে আর হাজার হাজার শ্রমিক দিনরাত তাদের জন্য খেটে দু'বেলা পেটভরে খেতেও পাচ্ছে না—তাদের নিজেদের কোন বাড়িঘরও নেই। বন্ধুগণ, আজ সারা রাশিয়া বড় বড় কারখানাতে ভরে গেছে—শুধু বড় বড় ফ্যাক্টরীগুলোতেই তিরিশ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। আপনারা সবাই শ্রমিক—গায়ের রক্ত জল করে বারো থেকে তেরো ঘণ্টা আপনারা মেহনত করছেন—কোন কোন শিল্পে শ্রমিকদের পনেরো, ষোল ঘন্টা করেও কাজ করতে হচ্ছে আর পারিশ্রমিক হিসাবে আপনাদের যা দেওয়া হচ্ছে তাতে একবেলাও পেটভরে খাওয়ার ব্যবস্থা হয় না। বাড়ির মেয়েদের এবং শিশুদেরও বাধ্য হয়ে কাজ করতে যেতে হচ্ছে—আর নামমাত্র সামান্য পারিশ্রমিক তাদের দেওয়া হচ্ছে। ক্যাপিটালিস্টরা সর্বদিক থেকে আপনাদের শোষণ করছে। যে কোন অজুহাতে শ্রমিকদের জরিমানা দিতে বাধ্য করে মালিকের দল—বাধ্য করে আপনাদের মালিকদের তৈরি দোকান থেকে বেশি দাম দিয়ে নিম্ন-শ্রেণীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে।

বন্ধুগণ! এই প্রসঙ্গে আমার ক্রাইলভের বিখ্যাত 'দি লায়নস্ শেয়ার' গল্পটি মনে আসছে। পশুরা মিলে শিকার করে নিয়ে এল—এবার সেই শিকারের বণ্টন করা হবে। সিংহ চারটি ভাগ করে বলল—প্রথম ভাগের উপর রয়েছে তার নিজের অধিকারের দাবি। দ্বিতীয় ভাগটি সে নিচ্ছে পশুদের রাজা হিসাবে। তৃতীয় ভাগটি হচ্ছে তাদের ভেতর

লেনিনের জীবনসঙ্গিনী ক্রুপস্কায়া (ফটো: ১৮৯৫)

সবচেয়ে যে শক্তিশালী তার জন্য—অর্থাৎ সেটিও তার। বাকী রইল চতুর্থ ভাগটি! সিংহ এবার বললে—যার সাহস থাকে সে এগিয়ে আসুক সেটি নিতে, কিন্তু সেরকম চেষ্টা করলে তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না এ কথাও পশুরাজ আগে থেকেই সাবধানবাণী হিসাবে জানিয়ে দিলেন। কমরেডস্! ক্যাপিটালিস্টরাও এই পশুরাজের ধারার অনুসরণ করেই উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন করে। এবং সেইজন্যই বলছি যে, আপনাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। নিজেদের স্বাভাবিক অধিকার আপনাদের জোর গলায় দাবি করতে হবে—বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে হবে সারা দেশে—একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে হবে—ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করে প্রলিটারিয়েটের ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

[আলো নিভে যাবে এবং পেছনের পর্দা নামবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন :]

কথক : প্রতি সন্ধ্যায় কাজকর্মের পর লেনিন এসে হাজির হতেন ক্রুপস্কায়ার বাড়িতে। সেখানে তাঁরা মা-মেয়ে থাকতেন, একসঙ্গে বসে লেনিন তাঁদের সঙ্গে চা খেতেন। মা ঘরের ভেতর দিকে গৃহস্থালীর কাজে চলে যেতেন। লেনিন অল্প সময় ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে গল্প করে কাটাতেন—দুজনে দুজনের কাজের কথা বলতেন, ভবিষ্যতের সাম্যবাদী রাশিয়ার কথা ভাবতেন—এক এক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত কথাও আলোচনা হত। এমন একদিনে :

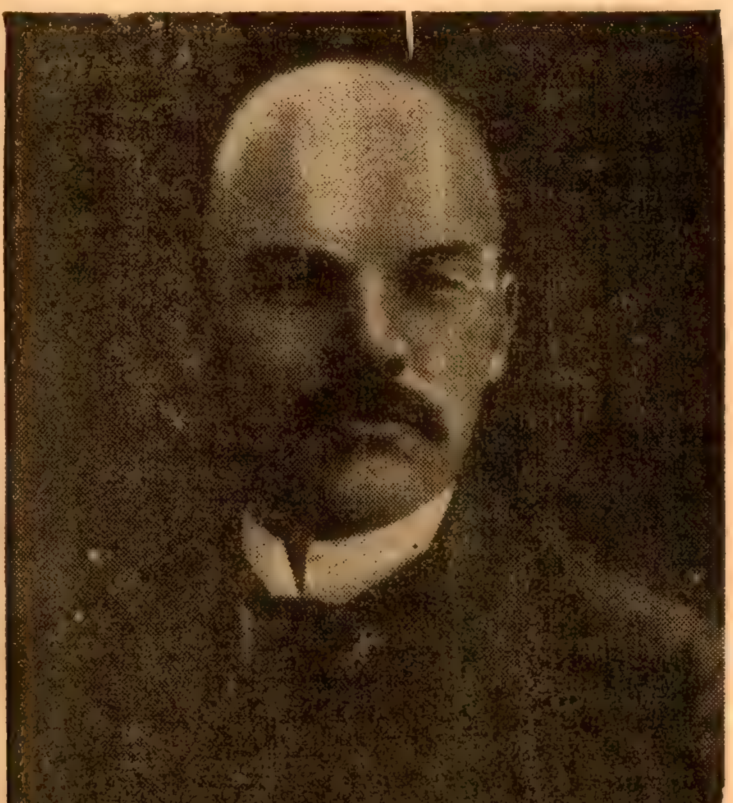

প্যারিসে লেনিন (ফটো: ১৯১০)

[কথক চলে যাবেন—পেছনের পর্দা উঠে যাবে—দেখা যাবে লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া বসে বসে গল্প করছেন।]

লেনিন—আপনার মা সবসময়েই ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকেন।

ক্রুপস্কায়া—(হেসে উঠে) না, মার কেমন একটা ধারণা হয়েছে যে, আপনি তাঁর মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছেন—তাই কাজ থেকে ফেরবার পথে প্রত্যহ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সেইজন্যই আমাদের একলা থাকবার সুযোগ দিয়ে যান (আবার হেসে উঠবেন এবং লেনিন সে হাসিতে যোগ দেবেন)।

লেনিন—আর আপনার নিজের কি মনে হয় কমরেড ক্রুপস্কায়া?

ক্রুপস্কায়া—(হেসে উঠে) আমি জানি আপনি আয়রনম্যান কমরেড লেনিন। অন্য সব লোকের দেহ রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া—আপনি লোহায় তৈরি। তাই আপনার মনে ভালবাসার প্রশ্ন উঠতে পারে বলে আমি তো ভাবতে পারি না কমরেড লেনিন।

লেনিন—ভুল কমরেড ক্রুপস্কায়া, আমার শরীরও রক্ত-মাংসে গড়া। সুতরাং আমারও মনে আর পাঁচজনের মত স্নেহ, দয়ামায়া, ভালবাসা, প্রেম সবকিছুই আছে। কাজের ব্যাপারে আমি আয়রনম্যান সেকথা সত্যি—কিন্তু তাই বলে নিজের মানবিক দিকগুলোকে অস্বীকার করবো কেন! (ক্রুপস্কায়ার একটি হাত নিজের দুই হাতের ভেতর নিয়ে) It's good to be in love, isn't it? A wonderful feeling?

ক্রুপস্কায়া—Yes, Vladimir Ilyich, wonderful.

লেনিন—কথাটা ক'দিন থেকেই তোমাকে বলবো বলবো ভাবছিলাম—কিন্তু কিরকম সঙ্কোচ হচ্ছিল। (একটু থেমে) তুমি কি আমাকে গ্রহণ করবে?

[ক্রুপস্কায়া লেনিনের বুকে মাথা রাখবেন—ব্ল্যাক আউট। পর্দা নেমে আসবে।]

[ক্রমশ]

রূপজগৎ

আবার বিরোধ

গত সপ্তাহে লিখেছিলাম—যুদ্ধ শেষ। কিন্তু শেষ হয়েও হয় নি। আবার নতুন করে বিরোধ প্রকাশ পেয়েছে: আবার তিনটি সিনেমার সামনে পিকেটিং সুরু হয়েছে, শ্লোগান উঠছে। 'এ লড়াই চলছে—চলবে' শ্লোগান শুনে মনে হয়েছিল, বুঝি কমিউনিস্টদের কোন ব্যাপার। কাছে গিয়ে দেখা গেল সংরক্ষণ সমিতির পক্ষে এই শ্লোগান ব্যবহার করা হচ্ছে।

ব্যাপার কি? মীমাংসা হয়েও হল না কেন? দু'-পক্ষের বিবৃতিতে পাঠকরা তা এতদিনে জেনে গেছেন। গত ৫ই মে যে মীমাংসা হয়েছিল তাতে তো কথা হয়েছিল সেন্সর সার্টিফিকেটের তারিখ অনুযায়ী ছবি মুক্তি পাবে। তবে হাউসের মালিকরা সেন্সর সার্টিফিকেট অনুযায়ী দুটি ছবি দেখিয়ে তৃতীয় ছবিটি নিজেদের পছন্দ মত দেখাতে পারবেন। এই চুক্তি সংরক্ষণ সমিতি ও সংরক্ষণ সমিতির বিরোধীরা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পনের দিন না যেতেই এই চুক্তি নস্যাৎ করা হল। এখন বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে 'তীরভূমি' ও 'শুকসারী' ছবি দুটি নিয়ে। এই দুটি ছবির প্রযোজক সংরক্ষণ সমিতির সদস্য। 'শুকসারী' ছবির প্রযোজক সংরক্ষণ সমিতির একজন বড় খুঁটি এবং উত্তমকুমার এতে প্রধান অভিনেতা। অথচ 'তীরভূমি'কে পেছনে ফেলে 'শুকসারী' আগে মুক্তি পেল। এতে দেখা যাচ্ছে বিরোধটা সংরক্ষণ সমিতি নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সমিতি নিজেদের মধ্যে শৃংখলা ও দায়িত্ববোধ জাগাতে পারেন নি, অথচ তারা বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান। ছবির মুক্তির প্রশ্ন এলেই তাঁদের ঐক্য ভেঙে যায়, কোন নীতি আর থাকে না। এই বিরোধ তারই প্রকাশ।

সেন্সর সার্টিফিকেট অনুযায়ী ছবির মুক্তি পাওয়ার সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবির পক্ষে হিতকর। এই ব্যবস্থার সমর্থন সকলের আছে। আমরা মনে করেছিলাম এই ব্যবস্থানুযায়ী ছবির মুক্তিতে আর কোন বাধা থাকল না, কারণ সংরক্ষণ সমিতি এই কথা তুলে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু আজ সেই সংরক্ষণ সমিতির একদল সেন্সর সার্টিফিকেটের তারিখ অনুযায়ী মুক্তির চুক্তি বাতিল করে নিজেদের ছবিকে আগে দেখাচ্ছেন কেন? এভাবে নিজ স্বার্থে চুক্তি ভঙ্গ করে এই প্রযোজকরা বাংলা ছবির সর্বনাশ করছেন। এই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে রোধ করার জন্য স্থায়িভাবে একটা সালিশী কমিটি থাকা দরকার। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' নিয়ে বিরোধের সময় সরকারী মধ্যস্থতায় যে সালিশী কমিটি গঠিত হয়েছিল এই কমিটিকে রেখে দেওয়া প্রয়োজন। যাতে কোন রকম বিরোধ উঠলে তা এই কমিটির মাধ্যমে মীমাংসা করা যায়। অবস্থা দেখে মনে হয় ছবির মুক্তি নিয়ে বিরোধের শেষ হবে না। কারণ সংরক্ষণ সমিতির মধ্যেও নানা স্বার্থের লোক রয়েছে এবং নিজের স্বার্থ অপেক্ষা বাংলা ছবির স্বার্থকে বড় করে দেখার মত সততা অনেকের নেই। ঘটনাক্রমে তা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং দু' পক্ষের আস্থাভাজন মধ্যস্থ একটা কমিটি থাকা প্রয়োজন।

—সুজন

চেকোস্লোভাক অভিনেত্রী ভেরা ক্রেসাদলোভা

চিত্র আলোচনা

গুপী গাইন বাঘা বাইন

সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' মুক্তি লাভ করেছে। গত এক বছর যাবৎ এই ছবিটি নিয়ে দারুণ বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি এই ছবিটির মুক্তির ব্যাপারে যে বাধা দিয়েছিল ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে তার যেমন নজির মেলে না তেমন ছবিটিও ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক অতুলনীয় সৃষ্টি। যে ছবির মুক্তি প্রায় অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল, আমি নিঃসন্দেহ যে, সেই ছবি দেশে-বিদেশে অনেক প্রশংসা ও সম্মান লাভ করবে।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মত ছবি আমাদের দেশে ইতিপূর্বে নির্মিত

হয় নি। মূলত শিশুপাঠ্য রূপক গল্প এই ছবির অবলম্বন হলেও এতে বড়দের আনন্দ ও কৌতূহল শিশুদের চেয়ে কম নয়! বরঞ্চ অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁদের কাছে বেশি পরিস্ফুট হবার জন্য তাঁরা আরো বেশি উপভোগ করবেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলার ছেলে-মেয়েদের জন্য অসংখ্য গল্প উপহার দিয়েছেন; আজো যে গল্পগুলির সরসতাকে কারো পক্ষে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। লোকগল্পের সহজ মেজাজ ও রীতি এই গল্পগুলিকে মনের গভীরে পৌঁছে দেয়। সত্যজিৎ রায় সেই ট্রাডিশনকে রক্ষা করে ছবিটি করেছেন। সহজ সরলভাবে লোককাহিনীর রীতিতে ছবিটি পর্দায় উপস্থিত হয়েছে। তাতে কাহিনী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছে তেমনি অন্তর্নিহিত যুদ্ধ-বিরোধিতার সুরটিও জোরালো হয়ে উঠেছে। এই যুদ্ধ-বিরোধী সুরটিকে স্পষ্ট করার জন্য সত্যজিৎ রায় মূল কাহিনীর কিছুটা সম্পাদনা করে গ্রহণ করেছেন। এতে ছবিটি যুগোপযোগী হয়েছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্লেষ এবং দুজন সরল মানুষের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' গল্প পড়েন নি এমন কোন শিক্ষিত বাঙালী আছেন বলে হয় না। ছেলেরাও গল্পটি পড়তে বসলে শেষ না করে উঠবেই না। গুপী আর বাঘা দুজনাকে রাজা দেশ থেকে বার করে দিয়েছিল। বনে গিয়ে ভূতের রাজার বর পেয়ে গুপীর কণ্ঠে সুর আর বাঘার ঢাক বাজাবার হাত হয়েছিল। আর ইচ্ছা হলেই খাবার এবং যেখানে খুশি যাবার বর পেয়েছিল। এই বরে তারা শুণ্ডির রাজার দরবারে গান গেয়ে নাম করে, আর পরে হাল্লাতে আসে সেখানে যুদ্ধ-প্রস্তুতি থামাবার জন্য। শয়তান মন্ত্রী ও যাদুকরের চক্রান্ত ব্যর্থ করে ওরা গান করে ও ঢাক বাজিয়ে আর আকাশ থেকে মিষ্টি ছড়িয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে। শুণ্ডি আর হাল্লার রাজার পুনর্মিলন হয় আর ওরা দুজনা দুই রাজকন্যাকে বিয়ে করে।

ক্যামেরার কাজ ও সম্পাদনার অসাধারণ বাহাদুরীতে ছবিটি বিস্ময় সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ভূতের নাচ এবং হাল্লা ও শুণ্ডির দৃশ্য এবং যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদিতে। রাজাদের মুখের সংলাপ এবং ভূতের রাজার কথা বলা ইত্যাদিতে শিশুমনের কৌতুক মেশানো মেজাজ পাওয়া যায়। যা শুনে দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ে। সঙ্গে গুপী ও বাঘাকে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তাদের মুখ দুটি দেখলেই তো হাসি আসে। এই দুটি চরিত্রে তপেন চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ বিশেষ প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। হাল্লা ও শুণ্ডির রাজা রূপে সন্তোষ দত্ত, হাল্লার মন্ত্রী জহর রায়, যাদুকর বরফি হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আমলকির রাজার চরিত্রে দুর্গাদাস ব্যানার্জী প্রমুখ যথাযথভাবে অভিনয় করেছেন। নেপথ্যে গান গেয়েছেন অনুপকুমার ঘোষাল ও জয়কৃষ্ণ সান্যাল।

এই ছবিটির চিত্রনাট্য, সাজসজ্জা কল্পনা, গান রচনা, আবহ-সঙ্গীত এবং পরিচালনা—সবই সত্যজিৎ রায় করেছেন। সম্পাদনা ও চিত্রগ্রহণ করেছেন দুলাল দত্ত এবং সৌমেন্দু রায়। একটি নতুন ধরণের ছবি এবং রূপক কাহিনীচিত্রে এক অভিনব সংযোজন। এই ছবিটি সকলেরই ভাল লাগবে।

নাটকের কথা

'সূর্যাচল' ও 'বিপ্লব'

বালি ঠৈতল পাড়া কিশোর নাট্য সঙ্ঘের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে শ্রীগোপীরাম সরিয়া, প্রধান অতিথিরূপে শ্রীপতিতপাবন পাঠক এম-এল-এ এবং বিশেষ অতিথিরূপে নাট্যকার শ্রীনীরেন সেন এবং শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন: কুমারী গৌরী চক্রবর্তী ও শ্রীচিত্ত বসু-মল্লিক। শ্রীনীরেন সেন রচিত নাটক 'সূর্যাচল' ও শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরীর 'বিপ্লব' নাটক দুটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নাট্য-পরিচালনা করেন শ্রীপ্রদ্যোৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে ছিলেন সর্বশ্রী শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত, পার্থ চ্যাটার্জী, অলক গাঙ্গুলী, প্রদীপ গাঙ্গুলী, তপন মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায়, সুভাষ দাস, চন্দন গাঙ্গুলী, সাধন হালদার ও কুমারী জয়ন্তী সেনগুপ্ত।

জনৈকের মৃত্যুর একটি বিশেষ অভিনয়

চতুর্মুখ নাট্য সংস্থা 'জনৈকের মৃত্যু'র একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন আগামী ২৪শে, শনিবার, ২॥ টায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে।

আর্থার মিলারের 'ডেথ্ অফ এ সেলসম্যান' অবলম্বনে সাধন মৈত্র নাটকটি বাঙ্গলায় রূপান্তরিত করেছেন। নির্দেশনার দায়িত্ব অসীম চক্রবর্তীর ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন অজিত মিত্র ও অলোক দে।

নজরুল জন্মজয়ন্তী

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ বছর জন্মোৎসব পালনের বিশেষ উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আগামী ২৫শে মে রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে সরকারিভাবে জন্মোৎসব পালন করা হবে। এই উৎসবে কিছুক্ষণের জন্য অসুস্থ কবি উপস্থিত থাকবেন।

রবীন্দ্র সদনের বহিঃপ্রাঙ্গণের এই জন্মজয়ন্তীতে সভাপতিত্ব করবেন শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ। উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং কবিকে সম্বর্ধনা জানাবেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়। এই উৎসব উপলক্ষে সরকারী উদ্যোগে একটি স্মারক পুস্তক প্রকাশ করা হবে। ২৫শে মে শহরের সিনেমাগুলিতে শ্রীমধু রায় পরিচালিত 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' ছবিটি দেখাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং মফস্বলে এক সপ্তাহব্যাপী এই ছবিটি দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সরকারী জন্মজয়ন্তীর কর্মসূচী গ্রহণের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির আহ্বায়ক নজরুল একাডেমির সাধারণ সম্পাদক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত।

২৫শে মের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করবেন বিখ্যাত শিল্পীরা। এই অনুষ্ঠানে নজরুল একাডেমি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছে।

নজরুল একাডেমির অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান হবে আগামী ৭ই জুন, মহাজাতি সদনে। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগীদের মধ্যে কৃতীদের পুরস্কার দান, গুণী সম্বর্ধনা এবং বিশিষ্ট শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করবেন। নজরুল একাডেমির পক্ষ থেকে এবার বিশিষ্ট নজরুল সংগীত-শিল্পী শ্রীঅনিল বাগচী এবং শ্রীনিতাই ঘটককে সম্বর্ধনা জানান হবে।

সুরঙ্গমার সমাবর্তন ও রবীন্দ্রজয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ সুরঙ্গমার সমাবর্তন এবং রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয় শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে। সমাবর্তন ভাষণ উপলক্ষে প্রধানা অতিথি শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরের রবীন্দ্রসংগীতের সুরের ব্যাপারে সম্প্রতি যেসব মতভেদ ও রূপভেদ দেখা দিয়েছে তার বিশদ আলোচনা করে তাঁর পিতা স্বর্গত অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট লিখিত কবির পত্র উদ্ধৃত করে বলেন যে, মৌখিক সাক্ষ্য এবং স্বরলিপির মধ্যে যদি গরমিল দেখা দেয় তাহলে স্বরলিপিই গ্রাহ্য হবে —এ-ই হল রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট নির্দেশ। গানের প্রকাশিত স্বরলিপিতে যে সব প্রভেদ দেখা যাচ্ছে প্রকাশন বিভাগের দৌলতে, সে সম্পর্কে শ্রীমতী ঠাকুর সে দিনের যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের অভিমত সমর্থন করেন। তথাকথিত সুরান্তর এবং ছন্দান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গানের লয়কে অনাবশ্যক দ্রুত করা সম্পর্কেও শ্রীমতী ঠাকুর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। গানকে জমাটি করার জন্য তার লয়কে বাড়ানো বা কমানো তিনি অন্যায় মনে করেন। লয় হওয়া উচিত গানের কাব্যাংশের ভাব এবং মেজাজ অনুযায়ী। রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখা-কালে কবি তাঁকে পরিশীলন সম্পর্কে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, শ্রীমতী ঠাকুর তা বর্ণনা করেন।

আজকাল পরিশীলন ব্যতিরেকে যে-রূপ আধ-খেঁচড়াভাবে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হচ্ছে, শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার তাঁর সভাপতির ভাষণে তার বিশ্লেষণ করে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডকে এর জন্য প্রধানত দায়ী করেন।

স্নাতকদের অভিজ্ঞানপত্র অর্পণ করেন শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর।

সুরঙ্গমার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অতঃপর কয়েকটি নির্বাচিত গান সংমেলক কণ্ঠে পরিবেশন করেন। শ্রীমতী কমলা বসুর (কী রাগিণী আজ বাজালে) এবং শ্রীমতী নমিতা চৌধুরীর (যা পেয়েছি) একক গান দুটি সুন্দর গীত হয়। একটি ছাত্রী এস্রাজে একটি গৎ বাজিয়ে শোনান। গানে অংশ গ্রহণ করেন বাসুদেব ভট্টাচার্য, সমীর পাল, প্রভাত বসু, যশঃপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত চৌধুরী, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, দীপান্বিত গুপ্ত, অলকা ঘোষ, কৃষ্ণা বসু, শিবানী সর্বাধিকারী প্রমুখ। সংগীতাংশের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের।

সুরবিতানের সমাবর্তন উৎসব

গত ২৭শে এপ্রিল মোমিনপুরে খিদিরপুর "সুরবিতান" এক উপভোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাবর্তন উৎসব উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রগীত শিল্পী শ্রীরবীন্দ্র বসুর প্রযোজনায় এক আকর্ষণীয় রবীন্দ্র-গীতি-বিচিত্রা পরিবেশিত হয়। শ্রীপ্রভাতভূষণের নেতৃত্বে চল্লিশজন সংস্থাশিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠান-শীর্ষমণি শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক সভায় মনোজ্ঞ ভাষণ দেন এবং সংস্কৃত সংগীত পরিবেশন করেন।

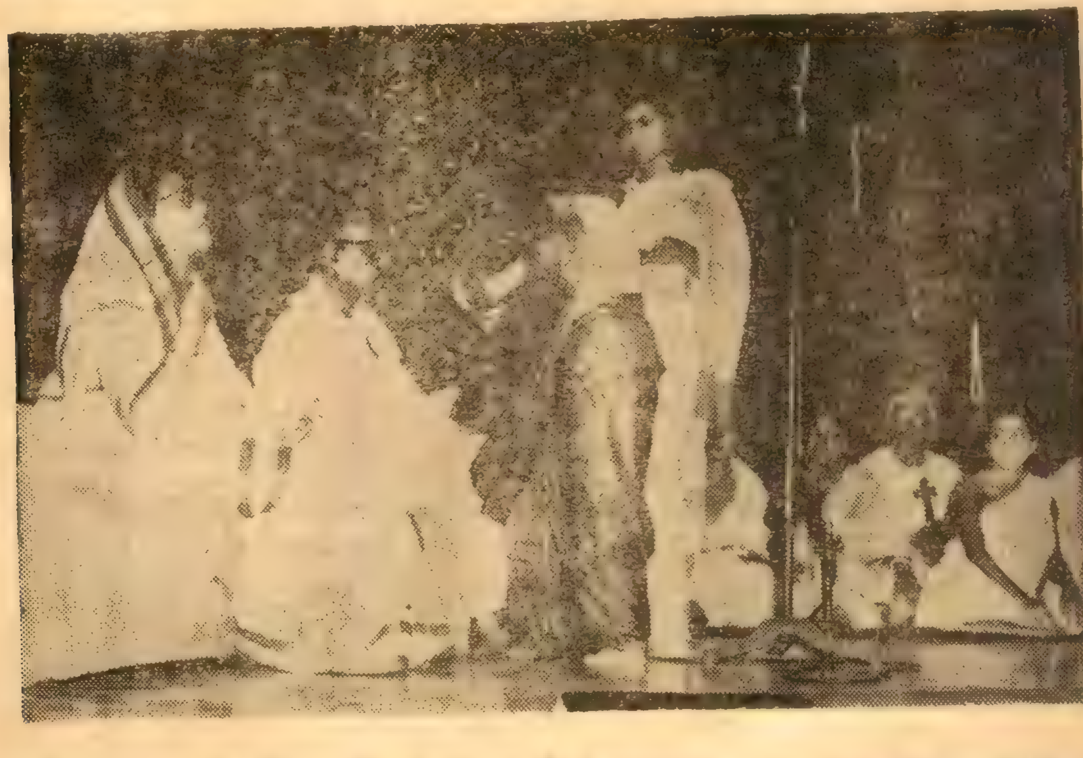

রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রজন্ম দিবসে সুরঙ্গমা স্নাতকদের অভিজ্ঞানপত্র অর্পণ করছেন শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর। সভাপতিত্ব করছেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

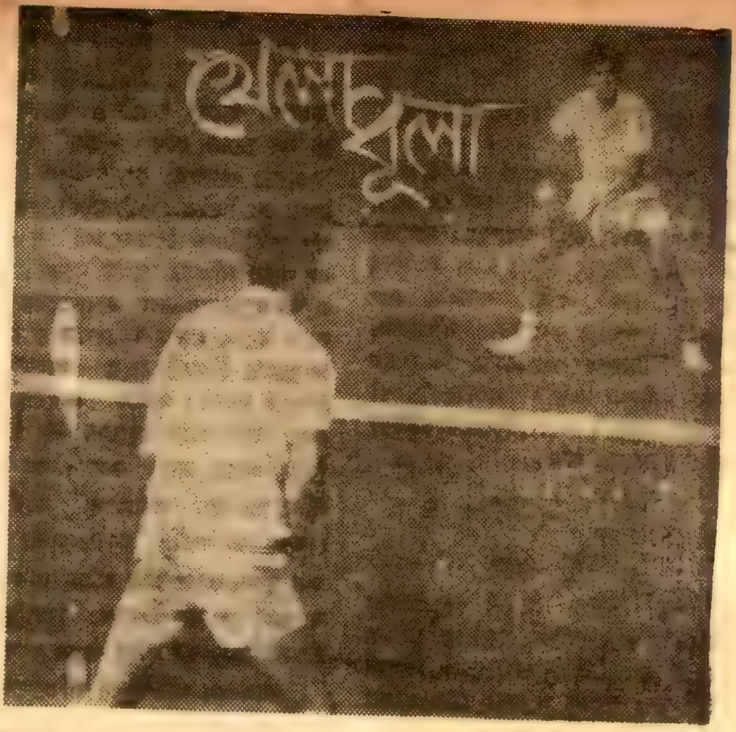

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের যেটুকু প্রতিষ্ঠা ছিলো তা ঐ হকিকে ঘিরেই। ক্রিকেট কিম্বা ফুটবলে ভারত কোনদিনই অভাবনীয় একটা কিছু করতে পারে নি। অদূর-ভবিষ্যতে পারবে বলেও মনে হয় না। হকিতে ভারতের অবস্থা আজ অনেকটা সেই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে হাল ভাঙা নাবিকের মতো—অসহায়। সেদিক দিয়ে অবশ্য টেনিস খেলায় ভারত কিন্তু বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে পেরেছে বলে মনে হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা বারবার দিয়েছেন উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়। সে পরিচয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও ক্ষতি নেই। কারণ ফুটবল, ক্রিকেট কিম্বা হকির মতো দলগত নয়, টেনিস খেলা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ওপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং কৃষ্ণান, জয়দীপ প্রেমজিৎ কিম্বা অন্য কারো সাফল্যই ভারতের সাফল্য। আর সেই সাফল্যের পরিচয়ই ভারত এবং ভারতের খেলোয়াড়রা সম্প্রতি দিয়েছেন ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব অঞ্চলের ফাইন্যালে জাপানের বিরুদ্ধে। জাপান একটা খেলাতেও জিততে পারে নি। প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলসে ভারত জিতলো, জিতলো দ্বিতীয় দিনের ডাবলস-এর খেলাটিতেও আর তৃতীয় দিনের রিভার্স সিঙ্গলস খেলা দুটিতেও জাপানের খেলোয়াড়রা পরাজিত হলেন ভারতের খেলোয়াড়দের কাছে। ফলে সরাসরি ৫—০ খেলায় ভারত জয়লাভ করলো। পরের খেলায় ভারতকে খেলতে হবে ইউরোপীয় অঞ্চলের বিজয়ী দলের সংগে। সে খেলাতেও ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা সম্ভবত দিতে পারবেন কৃতিত্বের পরিচয়। সেইটাই স্বাভাবিক, সেইটাই প্রত্যাশিত। কারণ ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা দল হিসেবে ভারত এর মধ্যেই তার স্থান পাকা করে নিয়েছে। তাই আশা করা যায় যে, এ বছরও ভারত ডেভিস কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। তবে ডেভিস কাপ জয় করতে পারবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এর আগেও কাপ জয়ের মুখোমুখি এসে পরাজিত হয়েছিল ভারত। এবারও হয়তো বা তাই-ই হবে। সে কথা যাক। একটা বিষয়ে আজ চিন্তা করবার সময় এসেছে, সময় এসেছে পুরনো বিষয়টা এসেছে পুরনো বিষয়টা আবার নতুন করে ভেবে দেখার। কৃষ্ণান, জয়দীপ, প্রেমজিতের পরে কারা নেবেন তাঁদের স্থান? কই দ্বিতীয় কৃষ্ণান, জয়দীপ কিম্বা দ্বিতীয় প্রেমজিত তো চোখে পড়ছে না। পড়বে যে না এ কথাও অবশ্য হলপ করে বলা যায় না। তবু আজ সব থেকে বেশি দরকার হলো ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের তৈরি করে নেবার। আজ যদি সেই দায়িত্ব টেনিস কর্তৃপক্ষ ঠিকভাবে নিতে না পারেন তাহলে ভারতীয় হকির মতো টেনিস খেলাও দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়বে। তাই আমরা সকলের কাছে আবেদন জানাই যে, জয়লাভের আনন্দে শুধু মাতলেই চলবে না—ভবিষ্যতেও যাতে আমাদের এই আনন্দ বজায় থাকে তার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি চালাতে হবে —শান্তিপ্রিয়

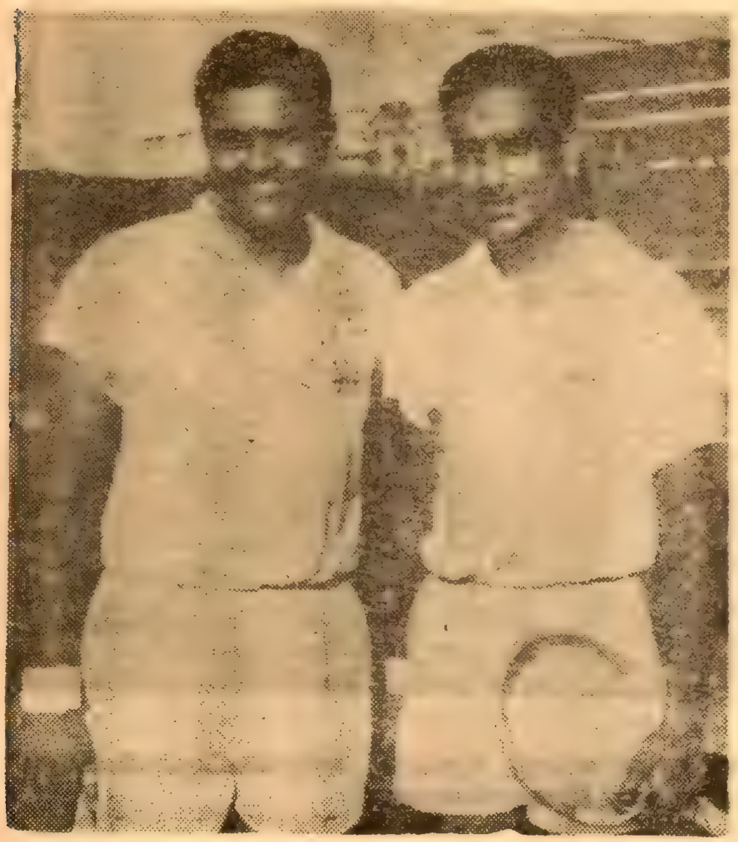

গোলাম আমেদের রিপোর্টের পেছনে একটা কিছু ব্যাপার আছে

হায় গোলাম আমেদ, এ কি করলে! এ শুধু ঐ গোলাম আমেদের রিপোর্টের ছ'জন আসামী—বোরদে, সারদেশাই, চন্দ্রশেখর, দেশাই, সাক্সেনা কিম্বা সুব্রহ্মনিয়মের কথাই নয়—এ প্রশ্ন আজ জেগেছে আমার, আপনার তো সাধারণ ক্রিকেট উৎসাহীদের মনেও। কারণ আমাদের সহজ বুদ্ধিতে গোলাম আমেদের রিপোর্টকে অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব বলেই মনে হয়েছে। এ কথা মনে হবার কারণগুলোও অবশ্য সহজ, সরল এবং সংগতও।

প্রথমে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, সেই কবে ভারত গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড ভ্রমণে—তারপর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমন কি বছরও কবেই ঘুরে গেছে—তবু এতো-দিন পরে কেন সেই পুরনো বিষয় টেনে আনা হলো? কেন গোলাম আমেদ সফর থেকে ফিরেই তাঁর রিপোর্ট দেন নি? আর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ যখন প্রায় পাকা হয়ে এলো ঠিক তখনই কেন গোলাম আমেদ

চন্দ্রশেখরের খেলোয়াড় জীবন এখন অনিশ্চয়তায় ভরা।

তাঁর রিপোর্টে ছ'জন খেলোয়াড়কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন? এর থেকে কি মনে হয় না যে, এর পেছনে একটা কিছু 'ব্যাপার' আছে?

আসামীর কাঠগড়ায় ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক বোরদে।

তা ছাড়া গোলাম আমেদের অভি-যোগগুলোও এমন কিছু আর জোরাল নয়। অন্তত ঐ ছ'জন 'খেলোয়াড় যে-অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে-ছেন এ কথা জোরাল যুক্তি দিয়ে গোলাম আমেদ প্রমাণ করতে পেরেছেন বলেও মনে হয় না। প্রথমেই ধরা যাক চন্দ্রশেখরের কথা। আঘাতের জন্যে চন্দ্রশেখরকে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের সময় থেকে বসে যেতে হয়। আহত হবার আগে চন্দ্রশেখর খুব ভালো বোলিং করেছিলেন। ফ্লিঙ্গিলটন স্বয়ং সে কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, মেলবোর্ন টেস্টে চন্দ্রশেখর খুব সুন্দর-ভাবে বোলিং করছিলেন এবং বসে যাবার আগে পর্যন্ত সিম্পসন আর লরীকে বার বার ফেলেছিলেন বিপদে। তবু চন্দ্রশেখর রেহাই পান নি। কারণ তাঁর আঘাত নাকি আগেই লাগা ছিল। কিন্তু সে দোষ তো চন্দ্রশেখরের নয়—সে দোষ ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের এবং পরীক্ষাকারী ডাক্তারের। কারণ বিদেশ ভ্রমণে যাবার আগে প্রত্যেকটি খেলো-য়াড়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে, তবেই ফিট সার্টিফিকেট দেবার নিয়ম।

বোরদের ব্যাপারে গোলাম আমেদ বলেছেন যে, বোরদে আর ঠিক মতো চোখে দেখতে পান না। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মোট সাতটা টেস্টে বোরদে করেছেন মাত্র ২৪২ রান। কোন খেলোয়াড় যদি ঠিকমতো খেলতে না

গোলাম আমেদের রিপোর্ট নয়, ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের ওপরই নির্ভর করছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সারদেশাই-এর খেলার সুযোগ পাওয়া।

পারেন তাহলে তাঁর মধ্যে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় কোথা থেকে যে ম্যানেজার মশাই পেলেন জানি না। বোরদে সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন যে, বোরদে দলের খেলোয়াড়দের ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারেন নি। দলের সহ-অধিনায়ক ও ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি দিয়েছেন চরম অক্ষমতার পরিচয়। সুতরাং......।

সারদেশাই-এর ব্যাপারটাও একই। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচগুলিতে তিনি একের পর এক দিয়েছেন ব্যর্থতার পরিচয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তবু কিছুটা খেলেছেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সূচনাকারী হিসেবে নয়, তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবেই সারদেশাই এখন ভালো খেলেন। কিন্তু গোলাম আমেদের কাছে সে দিকটা ভেবে দেখার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

দেশাই এর আগের ফর্ম না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দলভুক্ত করা নিশ্চয়ই দেশাই-এর নিজের দোষ নয়, কিম্বা পেস বোলারদের বিরুদ্ধে সুরক্ষানিয়মের ভয় পাওয়া নিশ্চয়ই দোষের, কিন্তু অখেলোয়াড়ী মনোভাবাপন্ন নয়! পলি উমরিগড় ট্রুম্যানের বোলিং-এর বিরুদ্ধে আর পঙ্কজ রায়ের হল ও গিলক্রীস্টের বোলিং-এর বিরুদ্ধে একই হাল হয়েছিল। কিন্তু সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে তাঁরা যে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। দাস্তেনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর খেলায় কিছু কিছু দোষ আছে। বিশ্রী ভাবে ব্যাট পেছনে তুলে 'ব্যাক লিফট' করার স্বভাব তাঁর এখনো বদলায় নি। কিন্তু তাঁর এ-দোষ শুধরে দেওয়াই উচিত—এই সামান্য বিষয়ের জন্যে আক্রমণ করে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার কি বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল গোলাম আমেদের?

জানি নে গোলাম আমেদের এই রিপোর্টের পেছনে কি 'ব্যাপার' আছে। তবে একটা কিছু যে আছে সে বিষয়ে আজ আর কারো সন্দেহই নেই। তবে আশার কথা গোলাম আমেদ এবার আর সিলেকশান কমিটিতে নেই। আর আমরাও আশা করবো যে, ভারতীয় দল নির্বাচকমণ্ডলী গোলাম আমেদের রিপোর্টকে বিশেষ কোন পাত্তা না দিয়ে যোগ্য খেলোয়াড়দের দলে নিয়ে ভারতীয় দল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবেন।

গল্প হলেও সত্যি

১৯০৭-১৯০৮ সালে মোহনবাগান সহজেই লাভ করলো ট্রেডস আর কুচবিহার কাপ। সেইবার ঠিক হলো যে পরের বছর মোহনবাগান ক্লাব আই· এফ· এ শীল্ডের খেলায় যোগদান করবে।

কিন্তু সেবার মোহনবাগানের আই· এফ· এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের খবরে কলকাতার অন্য দলগুলো টিট্‌কিরি দিতে শুরু করলো। শোভাবাজার মুখ বাঁকালো, টাউন ক্লাব হাসলো তাচ্ছিল্যের হাসি, চিনসুরা আর হেয়ার স্পোর্টিং পেছনে বললো, "বড় বাড় বেড়েছে।" ভারতীয় দলগুলোর মধ্যে এরা বার বার আই· এফ· এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে আর হেরে গেছে বিশ্রীভাবে। তবু এরা চট করে মুখে বিশেষ কিছু বললো না।

কিন্তু প্রথম রাউণ্ডে ওয়াই· এম· সি· এ'কে হারাবার পর দ্বিতীয় রাউণ্ডে মোহনবাগান যখন বৃষ্টির মধ্যে খেলে গর্ডন হাইলেণ্ডার্সের কাছে তিন গোলে হেরে গেল, তখন আর ওরা চুপ করে থাকলো না। মুখ খুললো। একবার ভেবেও দেখলো না যে, বৃষ্টি-ভেজা পিছল মাঠে বুট-পরা গোরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলা কতো কঠিন। মোহনবাগান ক্লাবের নামে তারা ছড়া কাটলো। হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে নিয়ে বিলি করতে লাগলো। তাতে লেখা ছিল—

"বামন হয়ে চাঁদ ধরবে—
এই তার কামনা রে,
এই তার কামনা।
মোহনবাগান শীল্ড নেবে—
এই তার বাসনা রে,
এই তার বাসনা॥"

এ ছড়া কাটার যোগ্য জবাব অবশ্য মোহনবাগান দিয়েছিল লক্ষ্মীবিলাস কাপের ফাইন্যালে সে-বছরই হাইলেণ্ডার্স দলকে হারিয়ে দিয়ে।

হকি মাঠ থেকে

কলকাতার হকি মরশুম এ-বছরের মতো শেষ হয়ে এলো। লীগের খেলার পালা কবেই চুকে গেছে। বেটন কাপের আসরও এতোদিনে শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু অনেক বাধা আর বিপত্তির জন্যে দেরি হয়ে গেলো—এর কারণ হিসেবে বলা যায় ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুর জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে থাকা আর ইস্টবেঙ্গল ও ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দলের খেলা দিনের পর দিন অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়া।

তবে এ-লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে ততদিনে হয়তো বেটন কাপের খেলার ওপর পড়বে ইতির দাঁড়ি। সেই সংগে শেষ হয়ে যাবে কলকাতার হকি মরশুমও।

ময়দানী ফুটবল এখন আসর জমিয়ে .... ফুটবল উৎসাহীদের সমবেত চীৎকারে কলকাতা ময়দান এখন সরগরম। তাই হকি খেলা এখন যেন ঠিক হালে পানি পাচ্ছে না। ভাগ্যিস মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল ছিল বেটন কাপের খেলার শেষের দিকে। তাই ক্লাবের নামে ক্লাব-সমর্থকরা তবু মাঠে আসতেন—তা না হলে আর দেখতে হতো না। এক রকম ফাঁকা মাঠেই অনুষ্ঠিত হতো বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার শেষ খেলাগুলো।

বেটন কাপের খেলায় মোহনবাগান এবার বেশ তরতরিয়ে ফ্যাইন্যালে উঠে গেছে। মোটামুটিভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হলেও, এবার ফ্যাইন্যালে উঠতে তাদের খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গলকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠতেই দিনের পর দিন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে হয়েছে এয়ার ফোর্স দলের বিরুদ্ধে।

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসংগে

বাংলার সেরা ক্রীড়াবিদরা কি বলেন

সংগ্রাহক-অরুণ চট্টোপাধ্যায়

[ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসংগে বাংলার সেরা ক্রীড়াবিদরা কি বলেন—এই পর্যায়ে আমরা এর আগে পুঁটু চৌধুরী, শম্ভু পান, চুনী গোস্বামী, পি. কে. ব্যানার্জী, কমল ভট্টাচার্য ও অমল দত্তর মতামত প্রকাশ করেছি। এঁদের প্রায় সকলেই ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি করার বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হচ্ছে সেরা বাঙালী টেস্ট ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের মতামত। গত সংখ্যায় শেষ মুহূর্তে ভুলের জন্যে অমল দত্তের ব্লকের স্থানে অন্য একটি ব্লক ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্যে আমরা লজ্জিত। —ক্রীড়া সম্পাদক]

পঙ্কজ রায়ের অভিমত

পঙ্কজ রায় বললেন, ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে বলতে পারি ইডেনের ঐতিহ্য নষ্ট করে ফুটবল খেলা উচিত নয়, আর ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে আমার মত হল ইডেনে ফুটবল চলতে পারে না।

পঙ্কজ রায় ফুটবলে আই এফ এ-র প্রতিনিধিত্ব করেছেন বার্মা দলের বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, ইডেনের মাটি যেভাবে তৈরি হয়েছে তাতে সেখানে ক্রিকেটই সম্ভব। এ'টেল মাটিতে জল পড়লে পিচ্ছিল হয়ে যায়, তাই সেখানে কোন রকম খেলা চলে না বর্ষাকালে। ফুটবল তো বৃষ্টির সময় খেলা হয়, তখন ইডেনের মাটি ভিজে এমন হয়ে থাকে যে খেলা তো দূরের কথা সেখানে দেহের ভারসাম্য রেখে 'মুভ' করাই অসাধ্য ব্যাপার। বুটে মাটি আটকে পা ভারী হয়ে যাবে। এ'টেল মাটিতে বুটের স্পাইক টেনে ধরে বারবার। এই অবস্থায় এত পিচ্ছিল মাঠে দৌড়ে খেলা কি সম্ভব?

ইডেনের মাঝখান উঁচু করা হয়েছে যাতে জল না দাঁড়াতে পারে। ফুটবল মাঠ তো 'ফ্লাট' হয়।

ইডেনে যদি ফুটবল খেলতে হয় তাহলে মাটি পাল্টাতে হবেই। এবং সে-ক্ষেত্রে ক্রিকেটের অসুবিধা হবে এটা নিশ্চিত।

ভারতের খ্যাতিমান ক্রিকেটার পঙ্কজ রায় এবার বললেন, অস্ট্রেলিয়ায় নাকি এ-ধরণের স্টেডিয়াম আছে যেখানে ফুটবল-ক্রিকেট একসংগে চলে সে সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই। তবে আমি পৃথিবীর অন্যান্য ক্রিকেট-প্রিয় দেশে গিয়েছি—ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পূর্ব আফ্রিকা, পাকিস্তান, সিংহল—কোথাও এ-ধরণের মাঠ আছে বলে আমার চোখে পড়ে নি। তাই ইডেনে ফুটবল ক্রিকেট আদর্শের পরিপন্থী।

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি করার সময় আরো সমস্যা দেখা দেবে। এখানে সর্বার্থসাধক স্টেডিয়াম গঠন সম্ভব নয়। বলা যায়, সেমি-কম্পোজিট স্টেডিয়াম হবে। অত জায়গা কোথায়? তাছাড়া দর্শকদের কথাও চিন্তা করতে হবে। 'পার্কিং'-এর সমস্যা রয়েছে।

ক্রিকেটার পঙ্কজ রায় আর একটি সমস্যার কথা বললেন, ক্রিকেট এক ঘণ্টার খেলা নয়, পাঁচ ঘণ্টার—অনেক সময় কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে খেলতে হয়। তাই বেশি

পঙ্কজ

দর্শকের স্থান সঙ্কুলান করতে গিয়ে স্টেডিয়াম উঁচু করে গড়লে হাওয়া ঢুকবে কি করে? বিদেশে উঁচু স্টেডিয়াম থাকলেও বাতাস ঢোকার জায়গা খালি রাখা হয়েছে। বাতাস না হলে 'স্পেস বোলিং'-এ যথেষ্ট অসুবিধে দেখা দেবে।

সবশেষে তিনি জানালেন, স্টেডিয়াম হবে আনন্দের কথা। ফুটবলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কথা তো ভুলে গেলে চলবে না। সেজন্য ফুটবলের আলাদা স্টেডিয়াম চাই-ই চাই। তবে ইডেনে সেমি-কম্পোজিট স্টেডিয়াম হলে সে উদ্দেশ্য ঠিক ঠিক কি সফল হবে? দু'দশটা বড় বড় ম্যাচ খেললে সব আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যাবে না। ভেবে চিন্তে সময় নিয়ে যথার্থ স্টেডিয়াম করলে ভালো হয়। আমাদের কোন খেলার মানই তেমন উন্নত নয়, ক্রিকেটে যা দক্ষতা। সেদিক দিয়ে শুধু বড় বড় ম্যাচ খেলার জন্য স্টেডিয়াম না করে যাতে মাঠের স্থায়ী ব্যবস্থা হয় তাই করলে খেলার উন্নতি করা যাবে। এজন্য তো সল্ট লেক বা এলেনবরা রেস কোর্স

এবারের অর্জুন

১৯৬৮ সালের অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী ক্রীড়াবিদদের তালিকায় এবার আর কোন ফুটবল খেলোয়াড়ের নাম নেই। আশ্চর্যের বিষয় বৈকি! যাই হোক এবারের অর্জুনদের নাম নিচে দেওয়া হলো—

এ্যাথলেটিকস—যোগীন্দার সিং ও মনোজিৎ ওয়ালিয়া
বাস্কেট বল—গুরুদয়াল সিং
বক্সিং—ডি. স্বামী
ক্রিকেট—প্রসন্ন
হকি—বলবীর সিং (সার্ভিসেসের)
সাঁতার—রাজকুমারী রাজশ্রী

রয়েছে! সেখানে ফুটবল, হকি, এ্যাথলেটিকস্ প্রভৃতি সবরকম খেলাধুলার ব্যবস্থা করলে খেলার মান উন্নত হবে। সেখানে তো অনুশীলনের ব্যবস্থাও থাকবে, এতে উৎসাহ বাড়বে, খেলার পরিবেশ গড়ে উঠবে। শুধু ম্যাচ দেখতে নয়, আমরা খেলাধুলার সার্বিক উন্নতি চাই।

[চলবে]

প্রশ্ন উত্তর

[illegible] ব্যানার্জী ([illegible])

উত্তর : কয়েক সংখ্যা আগে [illegible] রেকর্ড প্রকাশ করা হয়েছে। যদি না পান জানাবেন।

আপনিও নববর্ষে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন।

প্রবীরকুমার পাল (পাণ্ডু, গৌহাটি-১২)

উত্তর : ভারতের এক নম্বর গোলরক্ষক থঙ্গরাজ এবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক। সুতরাং তাঁর পালিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। এতোদিনে নিশ্চয়ই ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের নাম জেনে গেছেন।

সোমনাথ, সনৎ, নীতিশ, সমর পাণ্ডে ও বসন্ত (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী)

প্রশ্ন : বর্তমানে আপনার মতে ক্রিকেট জগতের সেরা ব্যাটসম্যান ও সেরা স্পিন বোলার কে কে?

উত্তর : আমার মতে পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান—সোবার্স ও স্পিন বোলার—ল্যান্স গিবস।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ডন ব্র্যাডম্যানের ২৯টি সেঞ্চুরীর হিসাব জানতে চাই?

উত্তর : অতো জায়গা কোথায় পাবো। তবে জানা রইলো। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে প্রকাশ করবো।

সুভাষরঞ্জন দত্ত (ট্রাঙ্গুলার কলোনী, পাণ্ডু, আসাম)

প্রশ্ন : পরিমল দে'র ফটো সহ জীবনী জানতে চাই।

উত্তর : আগে একবার প্রকাশ করা হয়েছে। সম্ভব হলে আবার হবে।

প্রাণশঙ্কর সাহা (শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা-৫)

উত্তর : হকির খবর নিশ্চয়ই দেখছেন এখন।

বিতানকুমার ঘোষ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনার প্রশ্নের উত্তর তো দু-চারটি সংখ্যা আগেই প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি দেখেছেন।

অজয় বর্মণ, বাপ্পা ও প্রদোষ (রেলওয়ে হাইস্কুল, গৌহাটি)

প্রশ্ন : লোকে বলে ফুটবল খেললে নাকি লেখাপড়া হয় না, এটা কি সত্যি? এ বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত মত জানতে চাই।

উত্তর : আবার শুধুমাত্র ঘরে বসে লেখাপড়া করলেই সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না। আমার মতে লেখাপড়ার সংগে সংগে খেলাধুলাও করা উচিত। তবে পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলাই বাঞ্ছনীয়।

বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে মোহনবাগান ও কোর অব সিগন্যাল দলের কোন পক্ষই কোন গোল দিতে পারে নি। ফলে অতিরিক্ত সময় খেলানো সত্ত্বেও খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। খেলাটি পুনরায় আগামী সোমবার, ১৯শে মে মোহনবাগান-কালকাটা মাঠেই অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

মনীষা সরকার (টেণ্ডু চা বাগান, নাগরাকাটা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনার চিঠি পেয়েছি। যে ঠিকানায় চিঠি দিয়েছেন ঐ ঠিকানায় চিঠি লিখলেই আমি পাবো। আপনি লেখা পাঠাতে পারেন।

অঞ্জন ব্যানার্জী (ব্যানার্জীপাড়া রোড, কলকাতা-৪১)

প্রশ্ন : সিম্পসন ও বেডসার ভ্রাতৃদ্বয় কি জীবিত আছেন?

উত্তর : আছেন।

অসিত চৌধুরী (খুবা, টাকী, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : এবার অর্জুন পুরস্কার কোন ফুটবল খেলোয়াড় পেলেন না জানি না, আমার মনে হয় পাঞ্জাবের ইন্দার সিং অথবা বাংলার নঈম এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কারণ দুজনই কৃতী খেলোয়াড়। আপনার মতামত জানাবেন।

উত্তর : আমিও তোমার সংগে একমত।

অসীমকুমার বসু (হাউসিং এস্টেট, বেহালা, কলকাতা)

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় ইউসোবিওর জীবনী জানতে চাই।

উত্তর : সুযোগ পেলেই প্রকাশ করা হবে।

হিমাদ্রীকান্ত ব্যানার্জী (আনন্দচন্দ্র কলেজ হস্টেল, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলার সময় যদি কোন ফিল্ডার টুপি দিয়ে বা জামা দিয়ে ক্যাচ ধরে, তবে সেক্ষেত্রে কি ব্যাটসম্যান আউট হবে?

উত্তর : না, ব্যাটসম্যান আউট তো হবেই না, বরঞ্চ আনফেয়ার খেলার জন্যে ফিল্ডারটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভবতোষ রায় (কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : দৈনিক পত্রিকায় এতোদিনে নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

তাপসকুমার চৌধুরী (টাংলা, ঝালুকবাড়ি, দরং, আসাম)

প্রশ্ন : সর্বপ্রথম বিশ্ব অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কোন সালে? সেবারকার ফুটবল বিজয়ী দলের নাম জানতে চাই।

উত্তর : গ্রীসে। সে তো খৃস্টপূর্বের ব্যাপার—তখন তো ফুটবল খেলার জন্মও হয় নি।

প্রসঙ্গই এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার—আর সত্যিকারের ভালো পেস বোলার ভারতে এখন নেই।

কবি দত্ত (নামবাড়ি রেলওয়ে কলোনী, গৌহাটী)

প্রশ্ন : আচ্ছা বলতে পারেন অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দল কি করতে যায়?

উত্তর : খেলতে, খেলা দেখতে আর বেড়াতে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

ীদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
ীদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
ীদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
কেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
কেল গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০
ম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—	১ম	৩-০০
,,	২য়	,,
,,	৩য়	,,
ম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)	১ম	৩-০০
,,	২য়	৩-০০
,,	৩য়	৩-০০
দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
,, ,,	২য়	৬-০০
,, ,,	৩য়	৮-০০
লাক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
ন্থু মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
মত্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
ক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
ক গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
াদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৩০
,, ,,	২য়	৪-০০
াদর গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৪-০০
চলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
চলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
চলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
গশ গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
গশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
রীলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
াল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
াসাদ সেন গ্রন্থাবলী—		৩-০০
সাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
হচন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০
দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:—		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী—	৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা: ১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:— ২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—	৪-০০
,, ,, ,, —২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—	৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ	৪-০০
,, —২য় ভাগ	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— ১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য় ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—২য়	৩-০০
,, ,, ,, —৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—	৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস —২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:—১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি—	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর—	৩-৫০
পরলোক—	৪-৫০
পরলোক রহস্য—	২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
ভারত প্রতিভা—	৫-০০
প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
নানার মা—	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ—	৩-০০
বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
বিসমার্ক—	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
মাধবী কঙ্কণ—	২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ— ১ম	৪-০০
যৌন-মনোদর্শন	
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী—২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

সুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলি-১২

22 MAY 1969

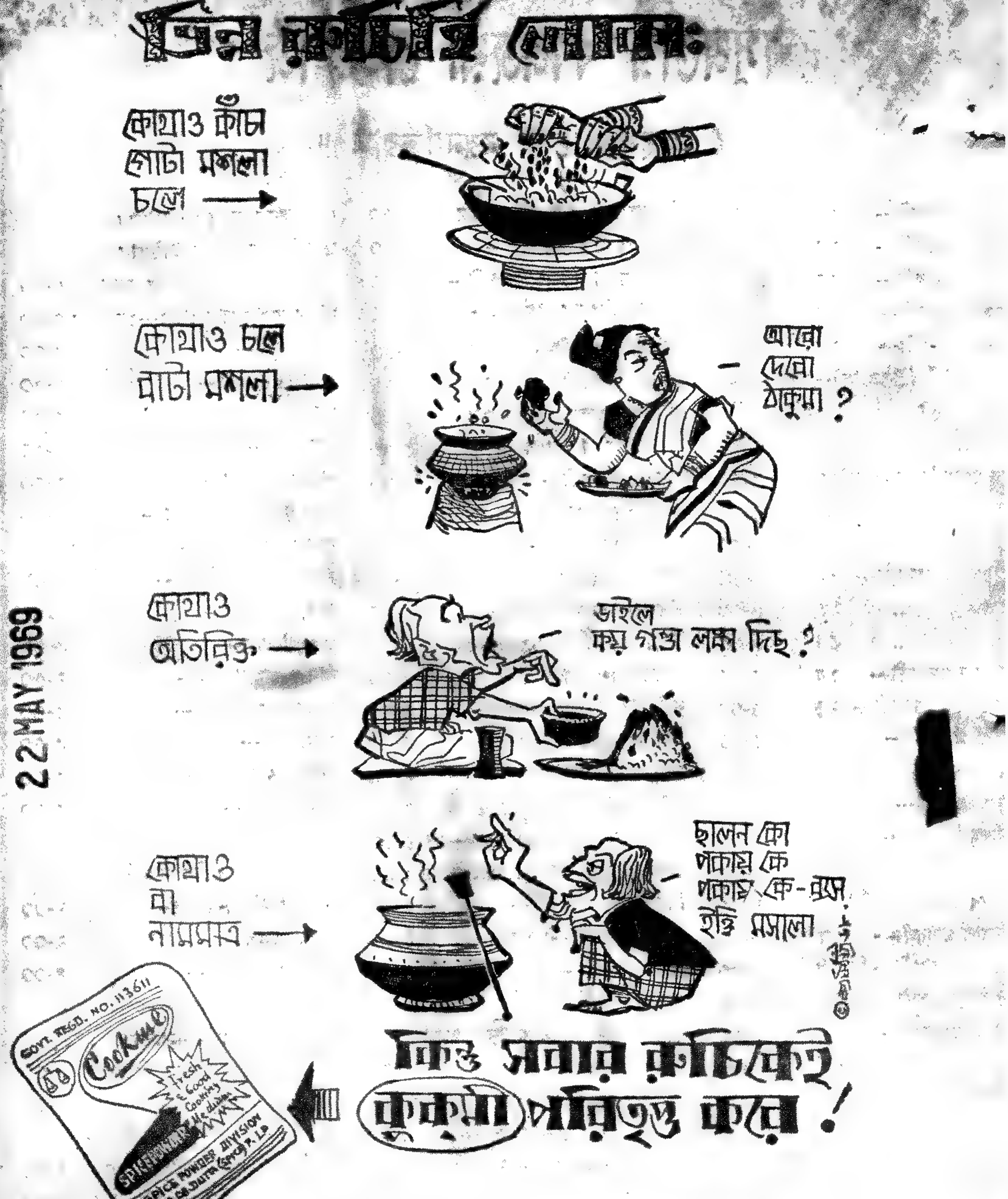

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুক্‌মী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২০৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

অ্যাপোলো-১০

চাঁদে পা দেবার আগে সফল মহড়া

৭৩ বর্ষঃ ৪৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 49, 29th May, 196

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩০৭৫
আজকের মানুষ		৩০৭৬
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৩০৭৭
[illegible]		৩০৮১
ভারতদর্শন		৩০৮৭
আন্তর্জাতিক		৩০৯০
মানুষের ধর্ম	ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩০৯৩
সপ্তাহের খেলা	কৃত্তিবাস ওঝা	৩০৯৪
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	৩০৯৬
গ্রন্থমেলা		৩০৯৮
চিত্রলেখা	শিলাদিত্য	৩১০০
পাঠকমন		৩১০২

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন : ৪৬-৬২৫৮

এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ত্রিদিব প্রান্ত তুষার	— অগ্নিবর্ণ	৩১০৫
ব্রজবুল ইসলাম : উচ্চারণ পদ্ধতি ও বিষয়রেখা (প্রবন্ধ)	— শক্তিব্রত ঘোষ	৩১০৮
আশ্রয় (গল্প)	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১১২
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	৩১১৫
লোকসংগীতের একাল না অকাল? (প্রবন্ধ)	— অরুণিমা	৩১২০
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	— অশোক সেন	৩১২৩
রঙ্গজগৎ	—	৩১২৭
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	৩১৩২

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে ॥—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। ---- এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়॥---- বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।...... নবীনবাবুর যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৮।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

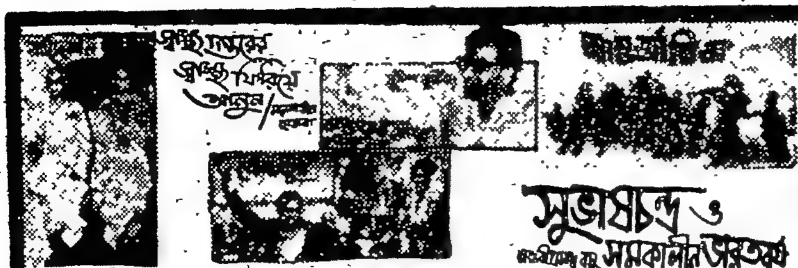

সাপ্তাহিক বসুমতী

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৭৩ বর্ষ : ৪৯শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ Thursday, 29th May, 1969

নজরুলের প্রতি আশু সরকারী কর্তব্য

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭০তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে কবির কবিতার আবৃত্তি ও আলোচনা এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে অসংখ্য সভানুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া গেল। এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবির জন্মদিনে রবীন্দ্র সদনে সরকারিভাবে জন্ম-জয়ন্তী পালনের যে আয়োজন করেছিলেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ সরকারী মর্যাদায় কোনো জীবিত কবির জন্মদিন ইতিপূর্বে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে কোথাও পালিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। স্বাধীন ভারতে নজরুলের প্রতি যতোই কৃতজ্ঞতা ও সানুরাগ শ্রদ্ধা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকুক না কেন—ইতিপূর্বে সরকারী মর্যাদায় তাঁর জন্মদিবস পালনের কোনো আয়োজনের কথা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় নি, এটা সত্যিই বেদনার ব্যাপার।

১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই কবির ব্যাধি প্রকট হয়ে ওঠে। কবির পরিচিত জগৎ ধীরে ধীরে কবির চোখে অপরিচিত হয়ে ওঠে। তারপর ১৯৪৭ সালে এই দেশ স্বাধীন হোল। আগের মতোই কবি মাসোহারা পেতে থাকলেন সাহিত্যিক বৃত্তি হিসেবে। তবে, তখন দান আসতে থাকলো—দুই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। কবির সাহিত্য ও সঙ্গীতের কি গতি হচ্ছে সে ব্যাপারে কেউ উচ্চবাচ্য করলেন না। দীর্ঘদিন পরে হুঁস হোল পূর্ববঙ্গ সরকারের—যখন সেই সরকার দেখলেন যে, কী নিষ্করুণভাবে নজরুলের কবিতা ও সঙ্গীতের বিকৃতি ঘটেছে। অনতিবিলম্বে পূর্ববঙ্গের "কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড" প্রকাশ করলেন নজরুল-সুহৃদ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় নজরুল-রচনাবলীর দুটি খণ্ড এবং ঐ কাজে এখনো তাঁরা এগিয়ে চলেছেন তড়িৎ-গতিতে।

দুর্ভাগ্যের কথা, নীরব কবির মতোই নীরবতা রক্ষা করেন তখনো কিন্তু প্রাক্তন রাজ্য সরকার। কবি নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব যে আরো কিছু বেশি—সে কথা উপলব্ধি করেন নি প্রাক্তন রাজ্য সরকার। এমন কি যথাসময়ে সরকারী প্রচেষ্টা থাকলে কবিকে কিছুটা রোগোন্মুক্ত করা সম্ভব হয়তো হোত—সে প্রচেষ্টাও হয় নি। রোগাক্রান্ত ও জীবন্মৃত কবি কী অবস্থায় রয়েছেন সে ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল সরকারের। উচিত ছিল, কবির কবিতা ও সঙ্গীতগুলিকে বিকৃতি থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা। যা হোক, এই সব উচিত কাজের কিছুই করা হয় নি, যদিও এ-ব্যাপারে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট সরকার এখন অগ্রণী হয়েছেন। এবং সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত নজরুলের জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কবি-সুহৃদ শ্রীমুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ কবির প্রতি সরকারের কয়েকটি আশু ও জরুরী কর্তব্য পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই কর্তব্য-কর্মের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—কবির জন্য অন্তত পাঁচ কামরার বাড়ির ব্যবস্থা করা, কবির জন্য দুইজন পরিচারক রাখা, বিশেষজ্ঞ সার্জন ও চিকিৎসকদের দিয়ে কবিকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করানো, কবির গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা। কবির রচনাবলীতে ধীরে ধীরে বিকৃতি ঘটছে এবং স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত আইনঘটিত প্রশ্ন আছে বলেই তিনি এ বিষয়ে সরকারকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় শ্রীআহমেদের প্রস্তাবগুলির প্রতি যুক্তফ্রন্টের সমর্থন জানিয়ে যথা করণীয় আশু করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সময়োচিত সিদ্ধান্তের জন্য আমরা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে পূর্বে বহুবার বললেও, আমরা পুনরায় বলতে চাই, কবির পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে আধুনিক ব্যবস্থা-সম্মত নার্সিং হোম বা কোনো স্যানাটোরিয়ামে কবিকে অবিলম্বে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। উভয় সরকার মাসিক মোট সাড়ে সাত শ' টাকা দেওয়া সত্ত্বেও কবিকে যখন আরামে রাখা সম্ভব হয় নি, তখন নার্সিং হোম বা স্যানাটোরিয়াম কি যথোপযুক্ত স্থান হবে না? অন্তত সেই স্থান কবিতীর্থরূপে পরিগণিত হবে বলে মনে করি।

সরকারী উদ্যোগে কবির বাসভবনের নির্মাণ সুরু করাও সত্বর দরকার। পরে সম্পূর্ণ সরকারী ব্যবস্থাপনায় সেখানে কবিকে রাখা যেতে পারে। কবির অবর্তমানে এই বাসভবনের মালিকানা একটি বোর্ড অব ট্রাস্টীজে বর্তাবে এবং তা নজরুল সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা, অনুশীলন ও প্রচারের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠবে এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। কবির তথাকথিত ঘনিষ্ঠ মহল কবির প্রতি সত্যিই যদি কোনো অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা পোষণ করে থাকেন, তাহলে তাঁরা ব্যবসায়িক স্বার্থে কবির নাম, তাঁর সৃষ্টি ও ভাবী বাসভবনটিকে কাজে লাগাতে দেবার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হলে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করতে হবে। যতদিন না সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন রাষ্ট্রপতির কাজ চালাবেন উপ-রাষ্ট্রপতি। এটা ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ। তদনুযায়ী ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উপ-রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে তাঁর শূন্য আসন কাকে দিয়ে পূর্ণ করা হবে, সেকথা সংবিধানে লেখা নেই। তাই পার্লামেন্টের বিগত অধিবেশনে একটা আইন পাশ করে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির কর্মে নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করবেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। এতে রাষ্ট্রপতির আসনের শূন্যতা নিয়ে সাংবিধানিক সঙ্কট সৃষ্টির সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে।

এবার নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পালা। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য বিভিন্ন বে-সরকারী মহল থেকে যাঁদের নাম করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ এবং লোকসভার প্রাক্তন স্পীকার শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার। জগজীবন রাম জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি রাষ্ট্রপতি হতে চান না। জয়প্রকাশ নারায়ণও রাষ্ট্রপতি হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কামরাজ এখনও মুখ খোলেন নি। তবে, তাঁর ভাবগতিক দেখে মনে হয় না যে, তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী হবেন। কিন্তু ডঃ গিরি এবং অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না।

শ্রীগিরি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যদি রাষ্ট্রপতি হতে না পারেন, তাহলে উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকেও বিদায় নেবেন। আর অনন্তশয়নম নিজেই বিবৃতি দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। কাজেই নতুন রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালে পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচনের পরও দু-আড়াই বছর নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। কিন্তু ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই বহু লোক মনে করেন, ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতিকে এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হতে পারে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকারী লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্যরা। সেখানে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বটে, তবে দলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ যে-রকম প্রকট হয়ে উঠেছে, তাতে সর্বজনগ্রাহ্য কাউকে মনোনয়ন না করতে পারলে গোপন ব্যালটে দলের ভোট ভাগাভাগি হয়ে

অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার

যাবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কংগ্রেস দল তাই প্রার্থী বাছাইয়ের প্রশ্নে বেশ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

পাতিল প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর বয়সের যে সীমারেখা (৬৫) টেনে দিয়েছেন, তাতে গিরি এবং আয়েঙ্গার কেউই কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াতে পারবেন না। ভারতীয় সংবিধানে কিন্তু রাষ্ট্রপতির কোন বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট নেই। আর কংগ্রেস দলও যে পাতিলের কথামত পরিচালিত হবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই গিরি এবং আয়েঙ্গারকে অনায়াসেই সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে গণ্য করা যায়। গিরি ঘনিষ্ঠ মহলে যাই বলুন না কেন, প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতি হবার বাসনা প্রকাশ করেন নি।

প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতি হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন একমাত্র অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার। ইতিমধ্যেই তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের বন্ধু-বান্ধবের কাছে চিঠি লিখে তিনি তাঁদের সমর্থন চেয়েছেন। ৭৮ বছর বয়স্ক আয়েঙ্গার এই বৃদ্ধ বয়সে এসে এতবড় গুরুদায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসছেন কেন, তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। তবে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ভদ্রলোকের রাজনীতির নেশা এখনও কাটে নি। দু' বছর আগে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁকে বিহারের রাজ্যপালের পদ ত্যাগ করে আসতে হয়েছিল। তাঁর আমলেই বিহারে প্রথম কংগ্রেসবিরোধী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় এবং সেই সরকারকে তিনি সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন। তাতে স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁকে বিহার থেকে বিদায় নিতে হয়। তিনি তাঁর বিদায়-ভাষণে বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্যই তাঁকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আয়েঙ্গারের অপসারণ যুক্তফ্রন্টের সমর্থকরা খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁরা আয়েঙ্গারের সততা এবং নিরপেক্ষতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর বিদায় উপলক্ষে বহু সভা-সমিতির আয়োজন হয়েছিল এবং কিছুকালের জন্য তিনি বিহারের পরম শ্রদ্ধেয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন।

কিন্তু রাজ্যপালের চেয়ে স্পীকার হিসাবেই আয়েঙ্গারের পরিচিতি অনেক বেশি। ৬ বছর স্পীকারের কাজ করে তিনি অনেক সুস্থ রীতি-নীতি চালু করে যান। তাঁর অনেক রুলিং পরবর্তী স্পীকারদের কর্তব্য পালনে অনেক সহায়তা করেছে। তাঁর রসজ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং কামাথের মত ঝানু পার্লামেন্টারিয়ানও তাঁকে কখনও চটাতে পারেন নি। স্পীকার হবার আগে তিনি মবলঙ্করের অধীনে ডেপুটি স্পীকার ছিলেন। তখন তিনি ধৈর্য ধারণের তালিম নেন। আয়েঙ্গারের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হাসি-ঠাট্টায় লোকসভার সদস্যরা হাস্যরোলে ফেটে পড়তেন। কিন্তু কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে সদস্যদের ধমক দিতেও তিনি বিন্দুমাত্র পিছু-পা হতেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিক আযৌবন জনসেবার কাজেই লিপ্ত ছিলেন। হরিজন উন্নয়নের জন্য তিনি যা করেছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের পার্লামেন্টারী জীবনে তাঁর অবদানও অবিস্মরণীয়।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন

হরিপুরায় সুভাষচন্দ্র কত মালা পেয়েছিলেন, কেমন রথে চড়েছিলেন, তাঁকে দেখতে এবং কংগ্রেস দেখতে কত লোক জুটেছিল, এসব কথা অনেক বলা হয়েছে। মুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেবার জন্য তিনি কিভাবে হেঁটে গিয়ে মঞ্চে উঠেছিলেন, তাও আমাদের উৎসাহী বর্ণনার উপাদান হয়েছে। কিন্তু বলা হয় নি—সুভাষচন্দ্র কী বলেছিলেন। হরিপুরার মেলা হারিয়ে গেছে অনেক দিন, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা ভাষণ হারিয়ে যাবার মত রচনা নয়। ভাষণটিকে যথাসম্ভব পূর্ব-বেক্ষণ করবার চেষ্টা আমরা করব—তবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে—তার আগে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সময়ে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ধারণার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাক।

ভারতের পূর্ণাঙ্গিক মুক্তি সুভাষচন্দ্রের সাধনার বস্তু। পূর্ণাঙ্গ মুক্তির গোড়ায় আছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, তারপরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। এই বিভিন্ন স্বাধীনতা'র প্রকৃতি কি, কিভাবে তাদের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব—এই সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন গড়ে উঠেছে।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের একেবারে প্রথম দিকের রচনা ও ভাষণাদির মধ্য থেকে সুপরিকল্পিত কোনো কর্মদর্শনের রূপ পাওয়া যায় না, যদিও সেখানে ধর্মদর্শন যথেষ্ট আছে। দর্শনের প্রতিভাবান ছাত্র পৃথিবীর নানা দার্শনিক মতের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস না করে, বা জীবনে বরণ না করে দার্শনিক বুলি আওড়ানো তাঁর স্বভাবে কোনোদিন ছিল না। একদিকে এই পর্বে তিনি দেশবন্ধুর রাজনৈতিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে আত্মগঠন করছেন। এই কালে এবং ঈষৎ পরবর্তীকালে আমরা মানুষ-গড়ার মন্ত্রে বিশ্বাসী, মানব-জীবনের অন্তর্নিহিত দেবত্বে আস্থাশীল, বাঁধনছেঁড়া যৌবনধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তার অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার যাতনার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, স্বাধীনতার জন্য 'পাগল হইবার উপক্রম' এক যুবকের সাক্ষাৎ পাই। সুভাষচন্দ্র অবশ্য সেইকালে বারবার ভারতের তিন সম্প্রদায়ের (নারী, শ্রমিক ও অনুন্নত) উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং স্বাধীনতা যে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ নেই, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও যে তার সঙ্গে যুক্ত, এ-কথাগুলিও জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন। তাছাড়া, ভারতের যুব-আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক বলে যুব-আন্দোলনের আদর্শ-প্রকৃতি কি, তাও তিনি নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই সকলের মধ্য থেকে আমরা একজন ভাবপ্রবণ কর্মীকে খুঁজে পাচ্ছি, যিনি প্রচলিত জীবনযাত্রা ও রাজনীতিতে সম্পূর্ণ তৃপ্ত নন, তাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে ব্যাকুল, অথচ তখনো ব্যাকুলতাই তাঁর সম্বল, আত্মোৎসর্গের অধিকারই তাঁর অধিকার, কিন্তু কিভাবে 'আধুনিকতা'র প্রতিষ্ঠা করা যাবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট পরি-কল্পনা গড়ে তুলতে পারেন নি।

কিন্তু একই সঙ্গে আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি ('নেতাজীর জাগরণ' ইত্যাদি অধ্যায়ে), সুভাষ-চন্দ্রের মনে গান্ধী-আন্দোলনের বিকল্প আন্দোলন সৃষ্টির বাসনা জাগরূক হয়েছে। অহিংসাকে বাইরে মেনে নিয়েও আধুনিক পন্থায় দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছেন। শুধু ভাবছেন নয়, তাকে কার্যে পরিণত করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনও করছেন সামরিক কায়দায়।

১৯৩৩ সালে ইউরোপে যাওয়ার পর থেকে ব্যাপক মনন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে পরিণতি লাভ করে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তাঁর রাজনৈতিক ধারণার তাত্ত্বিক দিকটির উপরেই বেশি মনোযোগ দেব, কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি কদাপি নিছক তত্ত্বগত চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন না—কোনো তত্ত্বই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না তা কর্মে প্রয়োগযোগ্য হয়। সুতরাং দেখতে পাব, সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে অবশ্যই দল সংগঠনের কথা বলেছেন—ঐ দুটি জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরাও তাই এই পর্যায়ে তাঁর প্রস্তাবিত দলের পরিকল্পনার দিকটি তুলে ধরব, কিন্তু, ঐ দল যখন তিনি সত্যই গঠন করেছিলেন, তখন তার কার্যসূচী কিভাবে উপস্থিত করেছিলেন, তা বর্তমানের জন্য স্থগিত রাখব, কারণ সেই প্রসঙ্গটি, অর্থাৎ ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন ব্যাপারটি তাঁর ক্রমবিকশিত জীবনের অংশ হিসাবে পরবর্তীকালে

যথেষ্ট ব্যাখ্যাত হবে। পাঠকদের এইসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখি, তাঁর পরিকল্পনার আর একটি সিদ্ধিরূপের প্রসঙ্গও আমাদের আলোচনার বহির্বর্তী—সুভাষচন্দ্রের নেতাজী জীবনের কীর্তিকলাপ। ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রই সর্বোচ্চ বিপ্লবী, এই কারণে যে, তিনি বিপ্লবের কথাতেই পরিসমাপ্ত ছিলেন না, তাকে কার্যকরী করবার জন্য বৈপ্লবিক বাহিনীও তৈরি করেছিলেন। বাইরে থেকে মনে হতে পারে, আজাদ হিন্দ বাহিনী নিছক স্বাধীনতা বাহিনী, সামাজিক ক্ষেত্রে তার বৈপ্লবিক কার্যক্রম যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না। সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আজাদ হিন্দ সরকার যে-সকল কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল, তার অনেকখানি অংশ সংস্কারমূলক, কিন্তু নির্দিষ্ট আশু উদ্দেশ্যে সংগঠিত বলে সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার দিকটি স্পষ্ট হয় নি—তাকে অধিক উগ্র করে তুললে সেই সময়ে সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু ভেতরে প্রস্তুতি চলছিলই এবং তার ভাবী কার্যক্রমের রূপটি এই বাহিনীর নেতাজীর মনে স্পষ্ট ছিলই। সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী মিশ্রিত হয়ে পরস্পরের গুণ গ্রহণ করে এবং সাময়িক প্রয়োজনের বিশেষ চারিত্র্যকে বর্জন করে স্বাধীনতা-উত্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে পারত—অন্তত সুভাষচন্দ্র তাই করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, একথা আজ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

পাঠকদের এইখানে সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিকের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে যা হয় নি, সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো আধুনিক এবং আরো প্রতিজ্ঞাকঠিন হয়েছিলেন। বয়স তাঁর চেহারায় রেখাপাত করলেও মনে করে নি। জহরলাল, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে তুলনা করলেই একথা বোঝা যাবে।

১৯৩৩ সালে ইউরোপে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর মনে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নতুন দল গঠনের কার্যকরী বাসনার উদয় হয়। নতুন দলের চিন্তা, আগেই বলেছি, তাঁর মনে ছিলই, একটি বিশেষ ঘটনার ধাক্কায় সেই পরিকল্পনার প্রকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। গান্ধীজী যখন ১৯৩৩ সালের মে মাসে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন, সেই উৎকট রাজনৈতিক ভ্রান্তি গান্ধী-নেতৃত্ব সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রকে একেবারে নিরাশ করে ফেলেছিল। গান্ধীকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হতেই হবে, এবং দেশ যাতে গান্ধীকে পরিহার করে এগোতে পারে তার জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে হবে নতুন দল গঠন করে—বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র তাই জানিয়েছিলেন। 'অসহযোগ' বাদ দেবার কথা উঠছে না, অসহযোগ অবশ্যই, তবে আরও সংগ্রামী ও সর্বাত্মকভাবে—ঐ বিবৃতিতে তাঁরা জানিয়েছিলেন।

নতুন দল সুভাষচন্দ্রের কাছে কথার কথা ছিল না। এর বিস্তৃত পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রস্তুত করেছিলেন। এবং এর আদর্শ ও কর্মপন্থাকে সর্বদেশীয় সর্বহারা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার অভিপ্রায়ে রাশিয়ার কাছে প্রস্তাবিত দলের নীতি-খসড়া পেশ করেছিলেন। সে খসড়া অনুমোদিত হয় নি। অনেকের অনুমান, রাশিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রহশালায় সে খসড়া এখনো পাওয়া যেতে পারে। খসড়া অনুমোদিত না হওয়ার কারণ, আমরা অনুমান করি, সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না; মার্ক্সবাদের প্রয়োজনীয় অংশে তাঁর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মার্ক্সবাদের কর্মপন্থতিকে স্বীকার করতে গিয়ে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তিনি কি করে গ্রহণ করবেন, যা তাঁর সমস্ত জীবনদর্শনের বিরোধী? তাছাড়া আত্মগঠনে ব্যস্ত রাশিয়া তখন ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে অনুকূল হস্তপ্রসারে আগ্রহী নয়, অথচ রাশিয়ার মুক্তিতে বিশ্বের শ্রমিকের মুক্তি, এই শ্লোগানের উপর সর্বস্ব সমর্পণ করতে তাঁর বাধা ছিল। ভারতের মুক্তি তাঁর আশু অত্যন্ত প্রয়োজন—যেটা রাশিয়ার কাছে কাল বা পরশুর ব্যাপার।

সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে নতুন বিপ্লবের অতি-নৈষ্ঠিকতায় আবদ্ধ রাশিয়া সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে না, বিশেষত সুভাষচন্দ্র যেখানে রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতের নতুন 'অবদানে' বিশ্বাসী। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করেছিলেন, আগামী ইতিহাসে ভারত নতুন ভূমিকা নেবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপারে ইংলণ্ড, অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা সাম্য সৌভ্রাত্রের ব্যাপারে ফ্রান্স, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কসীয় দর্শনের ব্যাপারে জার্মানী, বিংশ শতাব্দীতে সর্বহারা বিপ্লবের ব্যাপারে রাশিয়া—পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসকে এইসব দেশের ভূমিকা সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তী সম্পদ আসছে ভারতের ভূখণ্ড থেকে।১

---

১ "India will be called upon to play an important role in world-history in the near future. We all know that in the seventeenth century England made a remarkable contribution to world-civilization through her ideas of constitutional and democratic Government. Similarly, in the eighteenth century, France made the most wonderful contribution to the culture of the world through her ideas of liberty, equality and fraternity. During the nineteenth century Germany made the most remarkable gift through her Marxian philosophy. During the twentieth century Russia had enriched

রাশিয়ার পক্ষে এই ভাবী-ভারতীয় সম্পদকে মূল্যবান মনে করা তখনি সম্ভব ছিল না। রাজনীতির পণ্ডিতেরা দেখাতে পারেন, মার্ক্সবাদের প্রয়োগ ব্যাপারে রাশিয়া কতখানি সরে গিয়েছে—কিন্তু সেই সরে যাওয়াটিকে রাশিয়া একই সঙ্গে ভাষ্যযোগে মার্ক্স-বেদের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। রাশিয়ার মতে মার্ক্স-বেদকে বেদরূপে স্বীকার করার পরেই তবে সেখান থেকে সরে যাওয়ার স্বাধীনতা কারও আসতে পারে।

সুতরাং সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা গৃহীত হয় নি। রাশিয়ার অজ্ঞাত সংরক্ষণশালা থেকে সেই খসড়া পরিকল্পনা উদ্ধার না পেলেও সুভাষচন্দ্রের একটি ভাষণে এই দলের প্রস্তাবিত রূপ আমরা পেয়েছি। সেটি ছিল তৃতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ। ভাষণের স্থান, ফ্রায়ার হল,, লণ্ডন, কাল ১০ জুন, ১৯৩৩। ভাষণের পটভূমিকা ১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতা, যে ব্যর্থতার মূলে আছে, আমরা আগেই বলেছি, সুভাষচন্দ্রের মতে, নেতৃত্বের ভ্রান্তি এবং আন্দোলনের অবৈজ্ঞানিকতা। বীতশ্রদ্ধ অথচ আশাবাদে ও কর্মপ্রেরণায় অশ্রান্ত সুভাষচন্দ্র এই পরিস্থিতিতে নতুন দল গঠনের পরিকল্পনা করেছন।

দলের প্রস্তাবিত নাম—'সাম্যবাদী সঙ্ঘ।'২ দলের প্রয়োজন কেন? সুভাষচন্দ্র বলেছেন—ভারতের বিপুল জনজাগরণ সত্ত্বেও স্বাধীনতা এখনো ভবিষ্যতের বস্তু। তাই বৃহত্তর আকারে এবং তীব্রতর প্রকারে নতুন আন্দোলন শুরু করতে হবে। সে আন্দোলনের "বুদ্ধিগত এবং বস্তুগত প্রস্তুতিকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।" গান্ধী-নেতৃত্ব এই বৈজ্ঞানিকতা ও বস্তুভিত্তি দিতে অসমর্থ। তাই—

"আমাদের পরবর্তী প্রয়োজন হবে স্থিরপ্রতিজ্ঞ নরনারীর এমন একটি দলের, যে-দল সর্ববিধ অত্যাচারের মুখে, আত্মবলিদানের মূল্যে ভারতের মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারবে কি না, তা নির্ভর করছে তার প্রয়োজনীয় নেতৃত্বসৃষ্টির ক্ষমতার উপরে। ভারতের প্রাণশক্তির এবং স্বরাজের অধিকারের নিদর্শন হবে এই প্রয়োজনীয় নেতৃত্বসৃষ্টির সামর্থ্য।"

কাদের নিয়ে এই দল গঠিত হবে? সুভাষচন্দ্রের উত্তর—

"এটি হবে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় জনসাধারণের দল।" এটি হবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীন, সুসংবদ্ধ সর্বভারতীয় দল। এই দল সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, নিখিল ভারত

---

the culture and civilization of the world through her achievement in proletarian revolution, proletarian government and proletarian culture. The most remarkable contribution to the culture and civilization of the world, India will be called upon to make."

(লণ্ডনে ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে ভাষণ)

২ 'সোস্যালিস্ট দল' বা 'কমিউনিস্ট দল' বা ঐজাতীয় বিদেশী নামকে সুভাষচন্দ্র পছন্দ করতেন না। এ বিষয়ে তিনি জেনিভা থেকে ২০-২-৩৪ তারিখে মিসেস কিটি কুর্তিকে লেখেন—

"*Samya* means 'equality'; *Samyavadi* means 'one who believes in equality.' *Sangha* means Society or Association. The idea of *Samya* is a very old Indian conception—first popularised by the Buddhists 500 years before Christ. I therefore prefer this name to the modern names now popular in Europe." (Subhas Chandra Bose, *As I Knew Him*: Kitty Kurti)

সুভাষচন্দ্র যখন সত্যই নূতন দল গঠন করেছিলেন পরবর্তীকালে তখন বিদেশী নামকেই নিয়েছিলেন—ফরোয়ার্ড ব্লক। সাম্যবাদী সংঘের বদলে ফরোয়ার্ড ব্লক নাম নেওয়ার কারণও ছিল। প্রথমতঃ 'সাম্যবাদী সংঘ' নামটি যখন তিনি গ্রহণ করেছিলেন তখন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের উদ্ভব হয় নি। ঐ দলের উদয়ের পরে 'সাম্যবাদী সংঘ' নামটি কার্যতঃ 'সোস্যালিস্ট পার্টি' নামের অনুবাদ হয়ে দাঁড়াত। ফরোয়ার্ড ব্লক নাম দেবার অন্য বিশেষ কারণও ছিল। গোড়ায় ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টির নাম ছিল না—এটি ছিল কংগ্রেসের ভিতরকার সকল বামপন্থী দলের প্ল্যাটফর্ম। সাম্যবাদকে আবশ্যিক আদর্শ ধরে নিয়েও তখনকার সাক্ষাৎ প্রয়োজন—ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তিকেই সুভাষচন্দ্র এগিয়ে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'ফরোয়ার্ড ব্লক', বা প্রগতিশীল দল—এই শব্দ দুটির মধ্যেই সাম্যবাদ রয়ে গেছে, কারণ সাম্যবাদই শ্রেষ্ঠ প্রগতিধর্ম। তাছাড়া এই নাম নেবার সময়ে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার নামের অনুষঙ্গও সুভাষচন্দ্রের মনে সক্রিয় থাকতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষক প্রতিষ্ঠান, নারী প্রতিষ্ঠান, যুব প্রতিষ্ঠান, ছাত্র প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তর স্বার্থে যদি প্রয়োজন হয়, সাম্প্রদায়িক বা খণ্ড স্বার্থের প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে এই দলের প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবে।

"এই দল অনুরূপ লক্ষ্যে অংশতঃ বা পূর্ণতঃ চালিত অন্য দলসমূহের সহযোগিতা করবে।"

শ্রমিক স্বার্থে গঠিত এই দল স্বাধীনতার পূর্বে সংগ্রামকালে অন্য স্বার্থের সঙ্গে বিশেষ বিবাদ না করলেও স্বাধীনতা-উত্তরকালে ঐ দলের নেতৃত্বে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হবে। সংগ্রামের সেই দ্বিতীয় পর্যায়ে "সকল বিশেষ সুবিধা, অবস্থার পার্থক্য, কায়েমী স্বার্থের বিলোপ ঘটাতে হবে, যাতে দেশে পূর্ণ সাম্যের অবস্থা (রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক) প্রতিষ্ঠিত হয়।"

দেখা যাচ্ছে, সাম্যবাদী দলের কর্মবিধিকে সুভাষচন্দ্র দুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন—স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর। এই দল একদিকে জাতীয় সংগ্রামের সৈনিক ও সেনাপতি হবে, অন্যদিকে হবে নতুন ভারতের স্থপতি।

জাতীয় সংগ্রামের 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন' সৈনিক কিভাবে হওয়া যাবে, তার কিছু পথনির্দেশ করেছেন তিনি। দলের সদস্যদের জন্য চাই সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক শিক্ষা। ঐ শিক্ষার মধ্যে থাকবে (১) ভারতে বৃটিশ শাসনের সবল ও দুর্বল দিকের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, (২) ভারতীয় জনগণের দুর্বলতা ও সবলতার রূপ নির্ধারণ, (৩) পৃথিবীর অন্য অংশে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা এবং ঐসব ভূখণ্ডে স্বাধীনতা-ধারণার ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা। এই বুদ্ধিগত রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে এমন নৈতিকভাবে প্রস্তুত 'সর্বসময়ের কর্মী' নিয়ে দল গঠিত হবে, যারা 'স্বাধীনতার মদিরামত্ত সন্তানদল।'

এই 'রাজনৈতিক মিশনারীরা' কোন্ পর্যায়ে কিভাবে লড়াই শুরু করবে সে বিষয়ে ঐ ভাষণে কোনো বিস্তৃত পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র পেশ করেন নি। কেবল তখনি সম্ভব একটি বিষয়ের কথা বলেছেন—বৈদেশিক প্রোপাগ্যান্ডা। ভারতবর্ষ বহিঃপৃথিবীতে বৃটিশের প্রচারবলে কুৎসিত আকারে পরিচিত। অন্য দেশের, ইংলন্ডের শুভ-বুদ্ধিরও, সমর্থন পেতে হলে ভারতের পক্ষে বৈদেশিক প্রচারের আশু প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র ঐ ভাষণে তাঁর প্রস্তাবিত দলের কর্মবিধির মধ্যে এই প্রচারকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন।

'সাম্যবাদী সংঘের' পরিকল্পনার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য অংশ হল—স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই দলের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য। এই দল ভাগ্যের হাতে কিছুই ছেড়ে দেবে না—সংগ্রামোত্তর পুনর্গঠনকে তো নয়ই। যদি সংগ্রামোত্তর নেতৃত্ব পূর্ব থেকে যথাযথভাবে সংগঠিত না হয়ে থাকে, তাহলে ফরাসী বিপ্লবোত্তর বিশৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি ভারতেও ঘটতে পারে। তাই যুদ্ধকালের সেনাপতিদের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ করতে হবে, তাঁদের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ছিল না এবং যে উদ্দীপনা তাঁরা জাগিয়েছিলেন তাকে অপব্যয়িত হতে দিতে তাঁরা প্রস্তুত নন।

আগেই বলেছি স্বাধীনতা-উত্তর আন্দোলনকে সুভাষ-চন্দ্র "শ্রেণী সংগ্রাম" রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে "মুক্ত ভারত ধনতান্ত্রিক, জমিদার বা উচ্চবর্ণের ভারত হবে না; মুক্ত ভারত হবে রাজনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র।"৩ এই বিশেষ ধরণের গণতন্ত্র নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভবপর নয়। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ভারতের দারিদ্র্য দূর করতে সমর্থ হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তনও অসম্ভব। তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধী-নতার প্রশ্নটি জড়িত। এবং এই কারণেই সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস, বাধ্য না হলে ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না। ইংলন্ডের কেবল ধনিক শ্রেণীই ভারতের শোষণে উপকৃত নয়—শ্রমিক শ্রেণীও। তাই ইংলন্ডের শ্রমিক সরকারও ভারতের স্বাধীনতাকে বাধা দিয়েছে সর্বপ্রকারে। সেজন্য একদিকে, সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, অন্যদিকে মানসিকভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নবরূপায়ণ সম্বন্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে। সে ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া ইত্যাদি দেশের জাতীয় অর্থনীতির নতুন পদ্ধতি ইত্যাদি মূল্যবান আলোক দেবে।

এই হল মোটামুটি সাম্যবাদী দলের পরিকল্পনা।

[ক্রমশ]

৩ "The Indian movement will have two phases. In the first phase the fight will be a "national" fight against Great Britain—though the leadership will be in the hands of the 'party of the people' representing Indian labour and inter-class fight under the leadership of the same party, and during this phase of compaign—all privilages, distinctions and vested interests will have to be abolished, so that a reign of perfect equality (social, economic and political) may be established in our Country."

—(লন্ডনে ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে ভাষণ)

কণ্ঠ দর্শন

গত সপ্তাহের কণ্ঠদর্শনের প্রথম নিবন্ধে যে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল, বিগত কয়েকদিনের ঘটনাবলী সেই আশংকাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চলেছে। সেখানে লেখা হয়েছিল, "ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব কায়েম করার জন্য বুর্জোয়া চক্রান্তের চেয়েও বামপন্থী শক্তিগুলির দলাদলিই বেশি দায়ী। দক্ষিণপন্থীরা আর যাই করুক হিসাবে বড় ভুল করে না। ভারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এখানে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি খুব দ্রুত জোট বাঁধছে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড় অংশই স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ইত্যাদি দলগুলির সঙ্গে জোট বাঁধতে একান্তই উদগ্রীব। এবং তলে তলে কাজও অগ্রসর হচ্ছে। দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি যত দ্রুত একে অপরের নিকটে আসছে, বামপন্থী শক্তিগুলি ততই একে অপরের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস, অসংযত ও অশালীন আক্রমণ ইত্যাদি বামপন্থী নেতাদের যেন মজ্জাগত হয়ে গেছে। এবং যে পথে তাঁরা চলেছেন, তাতে আশংকা হয় যে, এভাবে চলতে থাকলে, তাঁরা জনসাধারণের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করা তো দূরের কথা, অদূর ভবিষ্যতে তাদের বৃহত্তর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে তুলে দেবেন। কাজেই জনসাধারণ আজকে যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছেন, তাকে সঠিকভাবে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে নিয়ে যাবার জন্য বামপন্থী শক্তিগুলির নিবিড় ঐক্য থাকা প্রয়োজন।"

কিন্তু আলিপুরদুয়ার ও অপরাপর স্থানের ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বামপন্থী দলগুলির পারস্পরিক শত্রুতা তাদের সাধারণ শত্রু কংগ্রেস বা স্বতন্ত্র বা জনসঙ্ঘের চেয়ে অনেক বেশি। একে অপরের প্রতি আচরণে তাঁরা যে হিংসাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটি বামপন্থী দল অপর একটি বামপন্থী দলকে যতখানি বিপজ্জনক ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন কংগ্রেসকে ততখানি করেন না। তথাকথিত মার্কসবাদে বিশ্বাসী দলগুলি নিজেরাই ভাল করে জানেন না তাঁরা কি চান, প্রত্যেকেরই নাকি মতবাদের কিছু বিশিষ্টতা আছে বলে সংশ্লিষ্ট দলগুলি মনে করেন; যদিও কোন দলেরই রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে সে বিশিষ্টতার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। যুদ্ধে ও প্রেমে অন্যায় বলে কিছু নেই—এই নীতি অনুসরণ করে নিজেদের ক্ষমতার পরিসর সকল ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি করতে চান, যার ফলে পারস্পরিক সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত প্রতিটি বামপন্থী দলেরই সংগঠনের শীর্ষে যাঁরা রয়েছেন, ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা কেউই তেমন আহামরি নন, কর্মে ও চিন্তাধারায় কেউই তাঁরা মৌলিকত্ব বা প্রেরণাদায়ক কোন কিছুর স্বাক্ষর রাখেন নি। এতগুলি বামপন্থী দল গড়ে ওঠার মূলে প্রেরণাই হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল, বোধ হয় আদর্শগত পার্থক্য নয়। বিশেষ করে মার্কসবাদে বিশ্বাসী পার্টিগুলির ক্যাডারদের মধ্যে বিগত কয়েক বছরে রাজনৈতিক শিক্ষাবিহীন স্থূলপ্রকৃতির মানুষদের অত্যন্ত সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, এবং পার্টির নেতারা বোধ হয় এই সব মানুষদের ওপরেই বেশি আস্থা রাখেন। ফলে অবস্থা হয়েছে এই যে, পেশাদার গুণ্ডা বদমায়েসও বামপন্থী নামাবলী গায়ে চড়াতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না এবং নেতারাও এদের যে সস্নেহ প্রশ্রয় দেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটি উদাহরণ দিলেই আজকের এই অবনতির সুস্পষ্ট চিত্রটি ধরা পড়বে। পরলোকগত অজয় ঘোষের আমলে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন ছিল না ঠিকই, কিন্তু তৎকালীন সংগঠন, ক্যাডারদের শিক্ষা এবং দৃঢ়চিত্ততার সুনাম ছিল।

দায়িত্বশীল এবং রাজনৈতিক শিক্ষায় সচেতন মানুষ যে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে নেই একথা বলছি না, তবে সংখ্যা বৃদ্ধির মোহে তাঁরা বোধ হয় আত্মবিস্মৃত হয়েছেন এবং ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে ক্ষমতার স্বার্থেই বিভিন্ন অসামাজিক এলিমেন্টের সঙ্গে আপোস করে চলছেন। এবিষয়ে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অমুক ব্যক্তিটি, যার কোন সামাজিক সুনাম নেই, আপনাদের দলে থাকেন কেন জনৈক আঞ্চলিক নেতাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেন যে, অমুক অমুক অসামাজিক ব্যক্তিরা কেন অমুক অমুক পার্টিতে রয়েছেন? এরকম লজিক মেনে চলাই যদি রীতি হয়ে ওঠে, বোধ হয় তা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ যে কি, সেটা চোখের সামনে দেখতে কোনই অসুবিধা নেই।

যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর সংশ্লিষ্ট দলগুলির প্রায় প্রত্যেকেরই এই মনোভাব এসেছে যে, যেন-তেন-প্রকারেণ পার্টির প্রভাবের পরিসর বাড়াতে হবে। কিন্তু কোন গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির পরিবর্তে সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেই তাঁরা ঝুঁকেছেন এবং এরই ফলে যখনই একে অপরের এলাকায় প্রবেশ করছেন, তখনই সংঘর্ষ বাধছে, রক্তপাত ঘটছে। দ্বিতীয়ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতাদের সঙ্গে সংগঠনের নেতাদের একটা প্রচ্ছন্ন বিরোধ সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদেশে থাকে। যাঁরা মন্ত্রিত্ব করছেন—পার্টি-নেতাদের চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে তাঁরাই অধিকতর উজ্জ্বল হিসাবে জনসাধারণের কাছে প্রতিভাত হন—যার ফলে, বোধ হয় মনস্তাত্ত্বিক কারণেই, সংগঠনের চালকেরা মাঝে মাঝে নিজেদের অস্তিত্বকে জানান দেন এবং এই কাজে তাঁরা ক্যাডারদের রুট অংশের সহায়তা পান। তাঁরা মাঝে মাঝে এমন সব স্লোগান তুলে ধরেন বা বিবৃতি প্রকাশ করেন, যাতে মন্ত্রিসভা রীতিমত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন এবং পার্টি-নেতাদের এইসব গরম গরম বুলি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ক্যাডারদের কাছে খুবই মুখরোচক হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সংগঠনের নেতাদেরও মর্যাদা বাড়ে।

টপ-র‍্যাঙ্কের নেতাদের মত জেলা ও মহকুমা স্তরের নেতাদেরও ঠিক একইভাবে ক্যাডারদের রুট অংশের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং কোন কোন স্থানীয় নেতার অপরিণামদর্শী নির্দেশে এইসব ক্যাডার বা অনুগামীরা এমনসব

কাণ্ড করে বসে যার পরিণাম অনেক সময়ই মারাত্মক হয়। সরকারিভাবে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব যে পুলিশের, তারা একটা নীতি বরাবরই মেনে চলে, যে যা যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের কাজে বাগড়া না দেওয়া। কংগ্রেসী আমলে কংগ্রেসের নাম করে যারা বে-আইনী কর্ম করেছে, পুলিশ তাদের দেখেও দেখে নি, অনুরূপ নীতি তারা যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারেও নিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা তখনই ঘোরালো হয়ে ওঠে, যখনই প্রভাবের পরিসর বৃদ্ধির লড়াইটা যুক্তফ্রন্টের এক শরিকের সঙ্গে অপর শরিকের লাগে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে যে চরম তিক্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যে-রকম মারামারি, খুনোখুনি কাণ্ড চলছে, তাতে আশঙ্কা হয় শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আজকে ভারতের রাজনীতি একটি যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁচেছে। প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের পার্থক্যটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ঠিকমতই সঙ্ঘবদ্ধ হতে চলেছে, অথচ প্রগতিশীল শক্তিগুলির আত্মকলহ দিনের পর দিন বাড়ছে। এর মূলে বামপন্থী দলগুলির সংগঠনের শীর্ষে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাই দায়ী। নিজেদের ব্যক্তিগত নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁরা ঐক্য-বিরোধী কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং এর জন্য সমর্থন পাচ্ছেন দলের ক্যাডারদের সবচেয়ে দুষ্ট অংশের কাছ থেকে।

বামপন্থী শক্তিগুলির এই অনৈক্য দূর না হলে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিক্রিয়ার যে জয় হবে, তা অবধারিত। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ক্ষমতার স্বার্থে যে পার্লামেন্টারীয় গণতন্ত্রকেই আশ্রয় করে থাকবে তা নয়, প্রয়োজনবোধে তারা সামরিক বা অন্য কোন ধরণের একনায়কত্বও চালাতে পারে। এবং সে অবস্থা হলে তার জন্য দায়ী হবেন আজকের এই বামপন্থী নেতারাই, ব্যক্তিগত নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য যাঁরা আজ আত্মকলহরূপ আত্মহননের নীতি অবলম্বন করেছেন।

বিধান পরিষদ ও আনুষঙ্গিক জল্পনা-কল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের অবলুপ্তির প্রস্তাব রাজ্য বিধানসভায় ও লোকসভায় গৃহীত হলেও তা রাজ্যসভায় এ পর্যন্ত গৃহীত হয় নি এবং তা না হবার দরুণ অনেকগুলি অবাঞ্ছিত জল্পনা-কল্পনার উদয় হয়েছে। এবিষয়ে কোন কোন সংবাদপত্রে এমন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, জনৈক বামপন্থী নেতার অনুরোধেই নাকি রাজ্যসভা চলতি অধিবেশনে বিলটির পাশ হওয়া স্থগিত রেখেছেন। পরে জানা গেল এ-সংবাদটি ঠিক নয়—কোন বামপন্থী নেতা এরকম অনুরোধ করেন নি। অথচ বিষয়টিকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন মহল থেকে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। এরকম বলা হচ্ছে যে, বিধান পরিষদ উঠে গেলে যে মন্ত্রীরা বেকার হবেন, তাঁদেরই পুনর্বাসনের মুখ চেয়ে বিশেষ তদ্বিরের ফলে বিধান পরিষদকে আরও কিছুকাল জীইয়ে রাখা হল। এইরকম ধারণার অবসান ঘটানোর বিশেষ প্রয়োজন।

এদিকে শ্রীসুধীন কুমারের প্রসঙ্গ নিয়েও একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আর-সি-পি-আই দলের যে দুজন বিধানসভার সদস্য আছেন, তাঁদের দল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, তাঁরা বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। এদিকে তাঁদের বক্তব্য হল যে, মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার অতি উৎসাহে সুধীনবাবু তাঁদের ওপর বে-আইনীভাবে চাপ দিয়েছেন ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। একটি দলের ঘরোয়া ব্যাপারে আমাদের বলার কিছু নেই, কিন্তু বিষয়টি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে সত্যই অস্বস্তিকর, কেন না, যে দুজন বিধানসভা সদস্য উক্ত দল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন তাঁদের বক্তব্য এই যে, তাঁদের দলনেতা তাঁদের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন, কিন্তু বিধানসভার সদস্য হিসাবে তাঁদের আনুগত্য তাঁরা যুক্তফ্রন্টের ওপরই রাখতে চান। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্টের শরিক কোন দল যদি তার কোন সদস্যকে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য দল থেকে বিতাড়িত করে, সেই বিতাড়িতদের কোল দিতে যাওয়াও আর এক সমস্যার সৃষ্টি করবে। যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যেও এই বিষয় নিয়ে মতভেদ হয়েছে। এক পক্ষ বলছেন যে, খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্যই সঠিক, আর পক্ষ বলছেন যে, বিতাড়িত সদস্যদ্বয়ের বক্তব্যই সঠিক।

উপরি উক্ত অনুচ্ছেদ দুটিতে বর্ণিত সমস্যা দুটি সমাধানের একটিমাত্র পথই আছে, সেই পথটি অবলম্বিত হলে কারো কিছু বলার থাকবে না এবং একটি সুস্থ নজীরেরও সৃষ্টি করা হবে, যা যুক্তফ্রন্টের ইমেজকে আরও উজ্জ্বল করবে। পথটি হল এই যে, যাঁরা বিধানসভার সদস্য নন, তাঁদের মন্ত্রী থাকা চলবে না। যাঁরা বিধানসভা বা বিধান পরিষদ কোনটির সদস্য নন, তাঁদের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হবে এবং যাঁরা বিধান পরিষদের সদস্য, বিধানসভার নন, তাঁদেরও পদত্যাগ করতে হবে। বিধানসভার কোন সদস্যকে পদত্যাগ করিয়ে তাঁর জায়গায় আর একজনকে নির্বাচিত করে নিয়ে আসার ঝামেলাও কম নয় এবং ছয়টি আসনে পুনর্নির্বাচন হলে সব কটিতে যে যুক্তফ্রন্ট জিতবে তারও কোন মানে নেই। অনাবশ্যক ঝুঁকি না নিয়ে এঁদের সকলকেই বসিয়ে দিয়ে বিধানসভার সদস্যদের থেকেই মন্ত্রীর শূন্য-পদগুলি পূর্ণ করা হোক। একটা কথাই মনে রাখতে হবে যে, কেউই অপরিহার্য নন, তা তিনি যত নামকরা লোকই হোন না কেন।

খাদ্য-প্রসঙ্গ

বাজারে চালের দাম হঠাৎ কিছুটা বেড়ে গেছে এবং সেই সুযোগে একটা গেল গেল রব তোলা হচ্ছে। অনেকে এই অবস্থাকে ১৯৬৭ বা তার পূর্বেকার বছরগুলির পূর্বাবস্থা মনে করেছেন এবং কোন কোন সংবাদপত্রের কৃপায় একটু আশঙ্কার ভাব গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ আশঙ্কার কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই। প্রথমত পর পর কয়েক বছরের তুলনায় গত বছরে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে খাদ্যের ফলন খুবই ভাল হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পশ্চিমবঙ্গের চাল বেশি দাম পাবে না, কাজেই যা কিছু ধান-চাল তা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই আছে। দ্বিতীয়ত গতবার যে সাড়ে চার লক্ষ টন সংগ্রহের কোটা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে, কাজেই সরকারী গুদামের অবস্থা খুব খারাপ নয়। ফলে এবারে মজুতদারী করে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করা খুব সহজ হবে না। বর্তমানে শহরাঞ্চলে যে চালের চোরাকারবার চলছে, তার জন্য একমাত্র দায়ী রেশনে প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতা। তবে সম্প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, চালের বরাদ্দ মাথাপিছু একশো গ্রাম করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই অবস্থায় যদি রেশনিং এলাকাভুক্ত মানুষেরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি খেয়ে, তাহলে শহরাঞ্চল থেকে চালের চোরাকারবার বহুলাংশে লোপ পাবে এবং চোরাপথে চাল আসা বন্ধ হবে এবং গ্রামাঞ্চলেও চালের মূল্য হ্রাস পাবে। কাজেই অনাবশ্যক আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। এ ছাড়া গমের

যোগান প্রচুর রয়েছে। জনসাধারণ যদি কালবাজার থেকে চাল কেনা বন্ধ করেন, তাহলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায় এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে রেশনে চালের কোটা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে একটু সদিচ্ছা থাকলে কাজটা একান্তই অসম্ভব নয়। এ ছাড়া সরকার এখনো অনেক চাল সংগ্রহ করতে পারবেন। কেন না, যদি একবার বুঝিয়ে দেওয়া যায় ১৯৬৯ এবং ১৯৬৭-র পার্থক্যটা কোথায়, যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, এবারে চালের মজুতদারী করতে গেলে বিশেষ সুবিধা হবে না, তখনই সরকারের কাছে চাল- বিক্রয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকার যদি আরও কিছুটা স্টক বাড়িয়ে ফেলতে পারেন, একটা বড় সমস্যার তাঁরা অনেকটাই সমাধান করবেন।

Progressive/SW-40 B

কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল প্রসঙ্গ

কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল সম্পর্কে আবার আমাদের লিখতে হচ্ছে। যদিও আমরা জানি এর ফলে স্বাস্থ্য অধিকারের (হেলথ ডিরেক্টরেট) বহু আলোচ্য সেই পদস্থ আমলা ক্ষেপে আগুন হবেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক ও নির্লজ্জ তৎপরতার সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কানভারি করার চেষ্টা করবেন, তবু আমরা লিখতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে, কল্যাণী হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট শ্রী এন সি সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ (যা এখন ভিজিল্যান্স কমিশনের বিবেচনাধীন) ধামাচাপা দেবার আবার চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তের শরিক হলেন আলোচ্য পদস্থ আমলা সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, দুজন ডেপুটি ডিরেক্টর, দুইজন এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, একজন ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ও কল্যাণী হাসপাতালের তিনজন ডাক্তার। কিভাবে, কখন ও কোথায় এঁদের কারসাজি ও শলাপরামর্শ চলছে তা আমাদের নখদর্পণে। প্রয়োজন হলে ছবি ও তথ্য সহ চক্রান্তের সব বিবরণ প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী এস আর দাস কল্যাণী হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্টের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফায় যে চার্জসীট দিয়েছেন, তার (চার্জসীটের) অবিকল বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করছি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DEPARTMENT OF HEALTH
Establishment Branch

No. Estt/ . . . dated Calcutta, the 22 March, 1969.

ORDER

In continuation of Govt. order No. Estt/ 3830/3A—144/68 dated the 16th December, 1968, the Governor is pleased to add the following charge to the charges framed against you under the said Order, namely :—

"III. that from the report submitted by Messrs. A. N. Sengupta and A. N. Bhattacharjee to the present Superintendent of the Hospital on 3.1.69, after physical verification of the stores of the Hospital, it appears, that in disregard of RR 100 to 108 of West Bengal Financial Rules several other materials, besides those referred to in paragraph (xiv) of the previous statement of allegations, were purchased without due economy and that the same were not duly entered in the Stock Book nor properly issued or verified which shows further lack of supervision and laxity in administration on your part in conducting the affairs of the Hospital."

The Governor is further pleased to require you to put in before Shri A. B. Syam, Commissioner for Departmental Enquiries, Vigilance Commission, West Bengal who has already been appointed Enquiring Officer to hold enquiry into the charges framed against you, additional written statement of your defence, if any, within 15 days from the date of this order or within such further time as may be allowed by the Enquiring Officer, and you shall have the same rights and privileges as stated in paragraph 3 of the said order.

A statement of allegations on which the additional charge is based is annexed herewith.

By order of the Gove
Sd/- S. R. Das.
SECY. TO THE GOVT. OF WEST BENGAL

To

Dr. N. G. Sengupta,
Medical Officer, I.D. Hospital
Beliaghata, Calcutta.

STATEMENT OF ALLEGATIONS ON WHICH THE ADDITIONAL CHARGE IS BASED

A huge quantity of article with high prices were purchased during the year 1966-67 in different dates when actually 50 beds were running out of 175 beds. The special beds are functioning from September, 1967.

Name of a few articles with quantities and price as far as practicable are given below :—

1. *Narrow cloth*—Purchased 12 reels of 45 metre each cost Rs. 101/-.

These 12 reels were issued to different units in different dates. It is detected in I. V. No. 136 dated 22.3.67 issued to Ex-14 bedded Hospital 4 reels. But 2 reels were shown in original voucher of the store. On verifying the duplicate copy of above voucher from ex-14 bedded hospital it is detected 4 reels were supplied to that unit and stock ledger of that hospital also shows entry of 4 reels. Still now 3 reels are found in the store of that unit. So from the vouchers it is seen that total purchase 12 reels but issued 14 reels.

2. *Sajimati*—purchased on 9.2.67 to 10.2.67 —2000 kg.

Issued to Ward Master total quantity on 6.3.67. Ward master neither gave any account of expenditure nor entered the same in the Stock Ledger.

3. *Jute*—Total quantity was purchased from 28.1.67 to 11.2.67—305 kg. within a month.

The cost of 250 kg. was Rs. 500/-.

The Ward master could not show any entry in the Stock Ledger for account of the expenditure of the same.

4. *Swab Stick*—Purchased on 4.2.67
70 packets
70 „
Total : 140 „

We verified the present stock in O. T. and Obst. & Gynæcology ward where issued. It consist of 100 × 30 cm. each made of bamboo like broom stick thick bundle consist of in a packet total cost of 70 pkts. 490/-

so 140 packets cost 960/-

140 packets seem to cost not more than Rs. 40-50/-

70 packets of each was issued to O. T. and Gynæcological ward. We have verified with the stock ledger of those units but have not seen in the Stock Ledger. Also issue voucher No. 47 dated 22.4.67 in which XN Swab stick was issued to O.T., Staff nurse could not produce at the time of verification.

The same Swab stick 10 packets were purchased at Rs. 35/- still now those are lying in the Store without any use. Price of the swab stick is compared with the articles seems to be too high.

5. *Iron wire netting for mitself*—Purchased on 12.2.67 40 sq. ft. at the rate of Rs. 10/- per sq. ft. total cost—400/. It is lying in the store without any use.

6. *Iron Wire*—purchased on 9.2.68—20 kg. at Rs. 100/- still lying in the store.

7. *Iron ring*—for doors—purchased from 2.7.67 to 6.12.67—total 700 hundred pieces of which 200 which were purchased on 6.12.67 as per order No. 2055 is Rs. 100/.

No entry in the stock ledger of 400 pieces which were purchased between 2.7.66 to 6.7.66.

8. *Wooden handle for spade*—purchased on 4.2.67—20 doz. against 26 spades purchased upto date. Balance in stock now 214 lying in the hospital without any use.

9. *Sewing Needle*—purchased on 4.2.67 hundred dozen.

10. *Dustbin*—70 litre capacity purchased on 6.12.67—12 cost of each is 40/- and total Rs. 480/-. The price of the article is too high. At present in the stock—2.

11. *Lock & Key*—Purchased total in 1966-67

from 19.8.66	137
from C.M.S.	30
Total :	167

24 Godrej Novatal lock were purchased locally at the rate of 14.50P per lock but on verification only three were found.

12. *Broom stick*—Purchased on 1.3.67—300 kg. at Rs. 450/- again purchased 26.1.67—200 kgs.

Total : 500 kg. at Rs. 750/-.

No account of these were maintained.

13. *Wick for Janata*—Purchased 50 sets on 9.2.67 at Rs. 100/- i.e. Rs. 2/- per set, when market price is 25P.

14. *Candle wax*—Purchased 16/10 gross at Rs. 300/-.

Actually 16 gross were ordered to be purchased but later on 10 gross were shown in the ledger when only 50 beds were running. Quantity purchased was much above the actual need.

15. *Brasso*—Purchased 14 doz. at Rs. 378 on 1.3.67.

16. *Paint Brass*—12 doz.

2 doz. at Rs. 110/-

& 10 doz. at Rs. 90/- on 9.2.67

Issued 1 doz. only on 13.3.67 as per I. V. No. 181 to Ward master. Rest are lying in the store without any use.

17. *Bar-soap*—Purchased upto 20.11.67.

1400 bars (243 gr.) each

Average bar of 100 cost Rs. 220 almost double of normal market price.

18. *Paint of different colour*—Purchased 42 litres.

19. *Walking Iron*—5 were purchased previously at Rs. 17/- to 18.00P. where as recently at Rs. 5/- each of same thing and same quality.

20. *Kuja (Earthen pot)*—total quantity purchased—175 from 1966 to 68. Fifty were purchased on Rs. 2 each.

25 Kujas were issued to nursing mess without any I. V. no. or date which is detected from the stock ledger of the store showing nil.

21. *Screw Iron*—4 gross at Rs. 200/-.

22. *Nut bolt*—purchased 5. kg. 24 pieces—5 kg. still in stock on verification 24 pieces storekeeper could not show any account of expenditure.

23. *Glass Chimney for Hariken*—purchased 120 on 4.2.67 use upto date 24 only, present in stock 96.

Matress Adult—Store-keeper received in 1966-67 as per R. V. No. from C.M.S.

R.V. No. 4 14.6.66	125
R.V. No. 5 15.6.66	5
R.V. No. 40 27.8.66	15
R.V. No. 41 30.8.66	15
R.V. No. 95 27.2.67	10
R.V. No. 122 21.3.67	15
Total received	185

Total Issued—

I. V. No. 223 23.8.66—Ward master	125
I. V. No. 142 24.2.68—Nurses mess	25
I. V. No. 39 19.4.67—Ward master	15
	165

Balance of 20 mattresses were not brought forward in the stock, ledger of 67-68. Accounts of the 20 mattresses is not seen in the hispital and not found in the store in excess. The I. V. No. 39 19.4.67 which was issued to ward master is not found entered in the stock ledger.

Bed-side Table Iron

As per I. V. No. 75 dated 24.12.66 two bed-side table (Iron) were issued to nurses mess but no entry was seen in the stock ledger there.

Only 11 bed-side table (iron) are found in stock in place of 13 total received.

Broad plate

As per I. V. No 75 dated 24.12.66 the following were supplied to Nurses mess ½ size plate—8, ¼ size plate—10, total—18 plates. No entry seen in stock ledger there.

BED

Blankets—As per I. V. No. EST/CD/11 67-68 dated 26.4.67 240 Blankets were supplied but in the stock ledger only 225 blankets are found to enter. These 15 blankets also found short in stock ledger of the store when we verify the stock.

Pillow case—480 pillow cases were supplied by the above I. V. only 469 pillow cases are found to enter in the stock. Thus 11 + 1 total = 12 found short in stock verification.

We have gone through the invoice of laboratory chemical supplied by M/s. Bose & Co. and the following irregularities were detected by us.

1. The original voucher quotations and tender could not be produced before us.

2. Order placed on 8.6.67 but the articles were supplied 6/12.6.67.

In one of the vouchers Superintendent signed on 7.6.67.

Various articles of different kinds were issued as per I. V., No. 47 dated 25.9.68 to General Ward as per requisition of Sister Hena Dev. The issue voucher was written by Store-keeper Sri Purnendu Ghosh before he was released. Store-keeper Sri Kundu issued to Sister Dev on the request of Sri Ghosh and he told him that those articles were taken long ago by her.

Sister Dev could not show those articles in her stock ledger which she maintained and during physical verification these were not produced.

Huge quantities of following articles were supplied to ward-master from stores, on requisition in different dates since 1.12.66 but no stock ledger is maintained by him. Name of articles are given below :—

Dettol, Bleaching Powder, Sajimati, Jute, Carbolic Soap, Phynyle, Acid etc.

Yours faithfully,
Sd/- A. N. Bhattacharjee

3rd January '69

Sd/- A. N. Sengupta,
Verifying Officer.

ভারত দর্শন

মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে

মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে ভারত তখন ক্ষমতা দখলের পাঁকে পড়ে খাবি খাচ্ছে। দুর্ভিক্ষে মুখ থুবড়ে মরছে হাজার হাজার পরিবার। খরায় পুড়ছে মাঠঘাট নদী প্রান্তর। লোভের দাহে জ্বলছে লালসা-জর্জর বৃদ্ধের অস্থি। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কুঠারের আঘাত দিচ্ছে এক ভাই আর এক ভায়ের বুকে ঃ চারিদিকে একটা গুছিয়ে নেওয়ার সোরগোল।

কিন্তু কি গুছোচ্ছি আমরা, বর্তমান না ভবিষ্যৎ?

অন্ধ কূপমণ্ডূক ঘাতকের কাছে এই প্রশ্নের জবাব জানা নেই। আমরা আঘাত করছি, মানে আমরাই নিহত হচ্ছি।

নেহরু পুরস্কার

আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর ভারত সরকার নেহরু পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। পুরস্কার মূল্য এক লক্ষ টাকা। ১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক সমঝোতা সৃষ্টির জন্য খান আবদুল গফুর খানের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ এবার তাঁকেই ঐ সম্মানে ভূষিত করা হল। ৮০ বছরের আমরণ সংগ্রামী পাখতুন নেতা শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শে বিশ্বাসী। ভারত-বন্ধু গফুর খান সীমান্ত গান্ধী রূপেই সমধিক পরিচিত।

বিজয়ী তিনজন

এ পর্যন্ত তিনজন নেহরু পুরস্কার পেলেন। উ থান্ট, ডঃ মার্টিন লুথার কিং এবং সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খান।

ঢের উস্কানী ও উত্তেজনার দ্বারা সীমান্ত গান্ধীকে আদর্শচ্যুত করানোর চেষ্টা কোন কোন মহল থেকে করা হয়েছে। ইংরেজ আমল থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত সীমান্ত গান্ধীকে নিয়ে হয়েছে টানাপোড়েন। কিন্তু বৃদ্ধ পাখতুন নেতাকে শান্তি ও মৈত্রীর বিরুদ্ধে এক ইঞ্চি নড়ানো যায় নি।

সংবাদ যেন ঘড়ির কাঁটার থেকেও দ্রুতভাবে তৈরি হচ্ছে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। আর সেই সংবাদ কোনও স্থিরলক্ষ্য জাতীয় জয়-যাত্রার সংবাদ নয়, সে সংবাদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের হিংসাজর্জর সংঘাতের সংবাদ। দলে দলে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙছে। এক দল থেকে আরেক দলের আদর্শগত উদ্দেশ্যগত তফাৎটুকু পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। যেটুকু পরিষ্কার তা হল এক দলের নেতা অমুক চন্দ্র অমুক অপর দলের তমুক চন্দ্র তমুক। অর্থাৎ ছাব্বিশ দল ছত্রিশ হচ্ছে মতাদর্শের গরমিলের ভিত্তিতে নয়, নেতৃত্বের ও ক্ষমতাদ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে। একটা পরি-বর্তন স্পষ্ট হয়ে এসে বিভ্রান্তি এমন

খান আবদুল গফুর খান

ভাবে বিস্ফোরিত হয়, তবে তাও ক্ষণ-স্থায়ী, এইটুকুই যা ভরসা।

আমাদের ফেলে আসা একুশ বছরের ইতিহাস এই সুযোগসন্ধানী নেতা-সর্বস্ব দলবাজীর দিকে দেশটাকে ঠেলে দিয়েছে। একুশ বছরের নেতৃত্ব জাতির জীবনে কোনও মহত্তর আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করতে পারে নি। জন্ম দিয়েছে হতাশার। নেতারা ক্ষমতা হাতড়েছেন, সাধারণে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর সেই বঞ্চনা তার প্রকাণ্ড হাঁ নিয়ে গ্রাস করেছে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনার অঙ্কুর-গুলিকে। সংক্রামক ব্যাধির মতো ক্ষমতার লোভ নেতা থেকে ক্যাডার পর্যন্ত এমনি উন্মুখ, যা আমাদের চরিত্রকে কলুষিত করে আমাদের হিংস্র এবং দূরদৃষ্টিহীন উন্মাদে পরিণত করছে। সংবাদপত্র জুড়ে সেই হিংসার দাপাদাপির চিত্র রোজদিন আমাদের আতঙ্কিত করছে।

অথচ এই যুগে ক্ষুদ্রতার মধ্যে প্রত্যা-বর্তন অস্বাভাবিক। মানুষের বিচরণের ক্ষেত্র প্রসার লাভ করছে, সেই তুলনায় মন হচ্ছে ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্তী—এ দুই পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্তম্ভিত করে। আমাদের যুবসমাজ প্রসারিত মন নিয়ে ব্যাপকতর উন্নতির চিন্তায় আগ্রহ বোধ করছেন না। শিক্ষা দেওয়ার জন্য তেমন নেতার আবির্ভাব ঘটছে না। জাতির জীবনে দুর্বিপাক আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলছে, ঠিক যখন পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে চলেছে অন্ধকারের আবরণ মোচনের জোর প্রচেষ্টা। এই সমস্ত লক্ষ্য করে হতাশ প্রশ্ন বিচলিত করে ঃ আমরা কবে আত্মহননের পথ ত্যাগ করে সামনে এগোনোর জন্য পা ফেলতে উদ্যোগী হব। লোভে-স্বার্থে-জর্জর নেতৃত্বকে সমগ্র শক্তি দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করব এবং একটি সুস্থ সমান অধিকার-প্রাপ্ত জনজীবনকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের উদ্দেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হব।

লোকসভায় বি কে ডি

উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর নির্বাচনী এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থীকে দু'শ পঁচাশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বি কে ডি প্রার্থী শ্রীপতি মিশ্র নির্বাচিত হলেন লোকসভায়। এই প্রথম বি কে ডি লোক-সভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন এবং জয়যুক্ত হলেন। লোকসভার বর্তমান দুই বি কে ডি সদস্য শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী এবং আনন্দনারায়ণ মুল্লা নির্দলরূপে

পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হন। পরে তাঁরা বি কে ডি'তে যোগদান করেন।

সুলতানপুরে বি কে ডি'র জয় দ্রুতহারে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাসের আর একটি সাম্প্রতিক চিত্র তুলে ধরল। এই আসনটি ১৯৫৭ সাল থেকে ছিল কংগ্রেসের একচেটিয়া দখলে। ১৯৬৭-র নির্বাচনেও জনসঙ্ঘপ্রার্থীকে ৪৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন কংগ্রেসপ্রার্থী।

সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলির মতই আর একটি বিশেষ লক্ষণ সুলতানপুরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল ভোটদানে নাগরিক অনাগ্রহ। বহুলভাবে প্রচার সত্ত্বেও ভোট-বাক্সে ভোট পড়েছে মাত্র বিশ শতাংশ।

যুক্তফ্রন্টের বত্রিশ দফা : কংগ্রেসের দশ দফা

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বত্রিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি ভোজবাজির মতো কেন দু' মাসের শাসন-কালেই রূপায়িত হচ্ছে না, এজন্য চতুর্দিকে ভয়ানক সোরগোল। অথচ দশ দফার লাইন ধরে যে দ্রুত কাজ এগোচ্ছে দৈনন্দিন খবরে চোখ দিলে তার কিছু না কিছু ধরা পড়েই। পরিষদ-বিলোপের প্রশ্নটি এক দফা। তা তো দিল্লীতে গিয়ে রাজ্য-সভার অনুমোদনের জন্য আটকে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে জোর বাকবিতণ্ডাও হয়ে গেল। ফলাও প্রচারের আয়োজনও হয়ে-ছিল। সংবাদপত্রে তাই নিয়ে পদ্য গদ্য হাস্যকৌতুক রসালো সম্পাদকীয় কিছুরই অভাব হয় নি। যেন, এইবার পাওয়া গেছে একটা রন্ধ্রপথ—এমনই উল্লাসে ফ্রন্ট-বিরোধী প্রচারকর্তারা ফেটে পড়েছিলেন। অথচ ব্যাপারটা ছিল কেবলমাত্র উড়ো খবরের ওপর নির্ভরশীল। জনৈক ফ্রন্ট মন্ত্রী বলে বসেছিলেন জনৈক নির্দল এম-পি'র মারফৎ, তাঁর কাছে মারাত্মক সংবাদ এসেছে এই মর্মে যে, জনৈক বাম-পন্থী এম-পি নাকি পরিষদ (বিলোপ) বিলটি যাতে রাজ্যসভার চলতি অধিবেশনে আলোচ্য না হয় তার জন্য কংগ্রেস দলের হুইপ শ্রীওম মেহতার জ্ঞাতসারে দিল্লীর ক্ষমতাসীন দলের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। কোন একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় রাজনৈতিক সংবাদ-দাতার (ধরে নেওয়া যেতে পারে পদাধিকার অনুসারে তিনি দায়িত্বশীল) হাওয়ার ওপর প্রাসাদ রচনাকারী যে সংবাদটি বিশেষ গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করা হয়, সেই সংবাদে এম-পি শ্রীভূপেশ গুপ্তের ওপর চক্রান্তের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ছিল। দুদিন ধরে সংবাদটিকে কেন্দ্র করে ঢের তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যশর নিক্ষিপ্ত হল। তৃতীয় দিনে দেখা গেল ঐ ভিত্তিহীন সংবাদটি স্বয়ং কংগ্রেস এম-পি ওম মেহতাই অস্বীকার করেছেন। এই সংবাদটি অবশ্য আগের মতো গুরুত্বসহকারে প্রকাশ না করে ছোট করে ছাপা হয়েছে।

যাই হোক এর দ্বারা এইটি প্রমাণিত হচ্ছে যে, বত্রিশ দফার কাজ চলছে এবং তার বিরুদ্ধে ফ্রন্ট-বিরোধীচক্রের আতঙ্কিত প্রচারও চলছে। রাজ্যসভায় আলোচিত হয়ে বিলটি গৃহীত হলে বত্রিশ দফার এক দফা প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হত। পরিষদে নতুন করে নির্বাচনের আয়োজন আর করতে হত না। কিন্তু রাজ্যসভায় আলোচনার সময় মেলে নি। এবং প্রচার যতদূরই গড়িয়ে থাক, ফ্রন্টের কোন শরিক দল যে বত্রিশ দফা রূপায়ণে বাগড়া দিয়েছেন এমন সত্য প্রমাণও এ পর্যন্ত কারও হাতের কাছে নেই। বত্রিশ দফা রূপায়ণের কাজ তাই চলছে চলবে।

কিন্তু দু' মাসের সরকার এবং পাঁচ-মিশেলি সরকার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যতদূর বা যেতে পেরেছেন, কংগ্রেস সদস্য শ্রীযুক্ত মোহন ধারিয়ার সাম্প্রতিক বিবৃতি পড়ে মনে হচ্ছে বহুদিন গত হওয়ার পরও কংগ্রেস তার প্রতিশ্রুত দশ দফার রূপায়ণে শুধু যে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, অদূর ভবিষ্যতে ঐ কার্যসূচী রূপায়ণে কিছু যে করা যাবে এমন ভরসাও নেই। কারণ পাঁচমিশেলি না হলেও কংগ্রেসেই পশ্চাদমুখী দলনেতাদের দাপট আছে। এঁরা কংগ্রেসের দশ দফার কেবলমাত্র দফা রফা করেই এসেছেন। ভবিষ্যতেও ঐ কর্মসূচী রূপায়ণের পথে কঠিন বাধার সৃষ্টি করবেন তাঁরা।

শ্রীধারিয়া বলেছেন, যে সব কংগ্রেস সদস্য ঐ দশ দফা কার্যকরী করার পক্ষে মুখ খুলছেন, অনেক কংগ্রেসী নেতা তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলছেন। এর চেয়ে লজ্জাকর, বিস্ময়কর আর কী থাকতে পারে।

কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণপন্থীদের দু তরফই যখন ছিলেন দশ দফা সমর্থনের কালে, তখন ক্যাবিনেটের উচিত যথাশীঘ্র (আর কতকাল?) এর রূপায়ণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু শ্রীধারিয়ার এই দাবি তাঁকে দলের মধ্যে শুধুই অপ্রিয় করে তুলছে। কারণ তাঁর দলে যাঁরা কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ তাঁরাই অধিক ক্ষমতাশালী। দশ দফার রূপায়ণ তাই সুদূরপরাহত। হারাধনের দশটি ছেলের মতো এই দশ দফাও কালক্রমে একে একে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে। দশ দফার এটাই ভবিষ্যৎ। মোহন ধারিয়া চন্দ্রশেখরদের দুর্ভাগ্য, দশ দফা রূপায়ণে যে কায়েমী স্বার্থ বাধা সৃষ্টি করছেন, জনদরদী বহুল প্রচারিত সংবাদ-পত্রগুলি তাঁদের নিয়ে তেমন করে পদ্য-গদ্যের ব্যঙ্গবিদ্রূপের হাট বসিয়ে দেন না। কারণ এইসব পত্রিকাও সাধারণের অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে সাধারণের স্বার্থেরই বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে যায়। এঁদের লক্ষ লক্ষ কপির কাগজ ছাপার কারখানাগুলি কায়েমী স্বার্থের নাটবল্টু দিয়ে এমনভাবে আঁটা আছে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে এঁরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো মিথ্যের দ্বারা সত্য গোপন করেন।

শ্রীধারিয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, এই চাতুরীর কাল অবসিত হতে চলেছে। তিনি বলেন, কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত সাধারণ মানুষ আর অধিককাল সহ্য করবেন না।

তিনি বলেন: দেশের সাত কোটি ছাত্রের মধ্যে প্রতি বছর অন্ততপক্ষে পনের লক্ষ ছাত্র হতাশার শিকার হচ্ছে। এদের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা না হলে এমন কোন শক্তিমান সরকার নেই যে সরকার এদের অসন্তোষকে অন্যভাবে রুখতে সমর্থ হবেন।

তিনি ঘোষণা করেছেন, তাঁরা অর্থাৎ কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীয় সদস্যরা চির-কাল চুপ করে বসে থাকবেন না। চন্দ্র-শেখর প্রমুখের ওপর ন্যায্যপথে বিচরণের জন্য যদি কোনও দণ্ড নেমে আসে, তবে তা সহ্য করা হবে না। কংগ্রেসে উৎসাহী বামপক্ষ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে জোট-বদ্ধ হচ্ছেন। দশ দফার রূপায়ণে যাঁরা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবেন তাঁদের বিরুদ্ধেই গ্রহণ করতে হবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

দু' মাসে বত্রিশ দফার কী হল এই নিয়ে যাঁরা সোচ্চার, মোহন ধারিয়াদের বিক্ষোভ এবং কংগ্রেসের দশ দফা নিয়ে তাঁরা কেন কাতর নন। সারা ভারতের চিত্রটি এই পরস্পর-বিরোধী কূট রাজ-নীতিরই চিত্র।

রাষ্ট্রপতি পদে অনীহা!

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি পদে কাকে বসানো হবে এ নিয়ে যখন গবেষণা চলছে, তখন উল্লিখিত দু'-একজন রাষ্ট্রপতি- পদ সম্পর্কে নিজেদের নিরাসক্তি জ্ঞাপন করতে শুরু করেছেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বোদয় আন্দোলনে মেতে থাকতেই, ইচ্ছুক, জগজ্জীবন রাম দরিদ্র এবং নির্জিত শ্রেণীর মধ্যে কাজ

করতেই সমধিক উৎসাহী। এঁদের নিরাসক্তি দেখে মনে হয় এঁরা যেন সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী। সম্প্রতি দেরাদুনে এক জনসভায় জগজীবন রামকে স্বাগত জানানর সময় তাঁকে সম্ভাব্য পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কেমন করে প্রকাশ্যে এমন প্রচার হতে পারে তা যতই বিস্ময়কর হোক, এ ঘটনা ঘটেছে। ফলে শ্রীরামকেও কিছু বলতে হয়েছে এ সম্পর্কে। তিনি বলেছেন, তিনি দরিদ্র ও নিচে-ঠেলে-দেওয়া মানুষদের মধ্যে কাজ করে যেতেই বেশি উৎসাহী।

এমনতর সব দরিদ্রবান্ধবদের কেন যে রাষ্ট্রপতির মতো দশ হাজারি পদে টানা-টানি হচ্ছে। দেশে দরিদ্রের জন্য কাজ করায় উৎসাহী আর কজন পাওয়া যায়। যদি এমন দু-একজন আত্মত্যাগী পুরুষের অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটে তবে তাঁদের আর না ঘাঁটানই ভাল।

গণৎকারের গবেষণা

দক্ষিণ ভারতের জনৈক গণৎকার আবার গুণে দেখেছেন রাষ্ট্রপতির পদটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীই অলঙ্কৃত করবেন আর মোরারজী দেশাই হবেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী।

কথাটা উড়িয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই অ-সারগর্ভ নয়। রাষ্ট্রপতির পদটি যেন প্রাইজ পোস্টে পরিণত হয়েছে। আর তাই পাল্টে পাল্টে ঐ পদে সম্প্রদায়, অঞ্চল, গোষ্ঠীর দাবি মানার একটা রেওয়াজ তৈরি হচ্ছে। একবার হিন্দু, তো আবেকবার মুসলমান, একবার দক্ষিণ তো অন্যবার উত্তর। একবার বর্ণহিন্দু হলে আরবার ঐ পদ দাও হরিজন প্রতি-নিধিকে। এরপর প্যানেল লিস্টে থাক শিখ বৌদ্ধ জৈন খৃস্টানের দাবি। পূব ভারত পশ্চিম ভারত নিয়ে চিন্তা—তা তাও হয়ত কোনকালে করা হবে। কিন্তু তিনবার পুরুষ যদি তবে চারবারে নারী হবেন না কেন ঐ পদের অধিকারিণী? গণক মশার এসব কথা ভেবে---শ্রীমতী গান্ধীর সম্ভাবনা উল্লেখ করেন নি বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা অঞ্চল ও গোষ্ঠী তোষণের জন্য রাষ্ট্রপতি পদটিকে ব্যবহারের পক্ষপাতী তাঁরা নারী সম্প্র-দায়ের দাবিটি বেবাক ভুলে বসে আছেন। শ্রীমতী গান্ধী যদি অদূর-ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল না থাকেন (তাঁর বিরুদ্ধে শক্তিশালী লবী সর্বদা ক্রিয়া-শীল) আর যদি নারীর দাবি রাষ্ট্রপতি পদে মানতেই হয় তবু শ্রীমতী গান্ধীকে ঐ পদে চিন্তা করাটা বিশেষ দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক। গণক যা গুণে বলছেন, রাজনৈতিক মহল তা হয়ত দুদিন পরে অনেক রফা বন্দোবস্ত ভাবভাবনার পর বলবেন। দুম করে গণক মশায়ের গণনাকে তাই ফুৎকারে উড়িয়ে দিতেও পারা যায় না।

দিল্লী স্কুলে হিন্দী

হিন্দীওয়ালারা হিন্দী চালু করার জন্য যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন তা বস্তুতই প্রশংসনীয়। সকলেই তাঁর স্ব স্ব মাতৃভাষাকে ভালোবাসেন (পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম। পূর্ববঙ্গে মাতৃভাষাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পূর্ব-বঙ্গবাসী বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সরকার বাংলা ভাষাকে চালু করতে চাইলেও বকলস আঁটা ইংরেজি অনভিজ্ঞ প্রশাসকগোষ্ঠী সেই 'আই এ্যাম ডায়রেকটেড'-এর মুখস্থ বিদ্যা আঁকড়ে আছেন। এঁরা না জানেন নিজের ভাষা, না শিখতে পেরেছেন ইংরেজি। ঘন্টবাবুরা তাই কন্ঠলিপ্সাট এঁটে জগাখিচুড়ি ইংরেজির শ্রাদ্ধ করছেন। বাংলাও চালু হচ্ছে সরকারী পর্যায়ে।) দিল্লী প্রশাসন দিল্লীর স্কুলগুলিতে ১৯৬৯-৭০ শিক্ষা-বর্ষ থেকে হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে চালু করছেন। শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভক্ত দর্শন বলেছেন, হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হলেও রাজধানীর মতো সর্বভাষাভাষী শহরে কোনও অসুবিধা হবে না। বর্তমানে ৪০০টি সরকারী বা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের মধ্যে মাত্র ২৬টিতে ইংরেজি বা হিন্দী ছাড়া অন্যান্য ভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে চালু আছে। এই স্কুলগুলি ইচ্ছে করলে বর্তমানে চালু শিক্ষার মাধ্যম বজায় রাখতে পারবে।

শুষ্ক মাটি ঃ জলোচ্ছ্বাস

পরস্পর-বিরোধী শোনালেও প্রকৃতির এই প্রচণ্ড কৌতুকে ভারতের একপ্রান্ত যখন পুড়ছে আর একপ্রান্তে তখন ঘূর্ণি-ঝড় প্রবল বর্ষণ ও বন্যার তাণ্ডব ডুবিয়ে ধ্বসিয়ে একাকার করছে।

দারুণ গ্রীষ্মে প্রান্তরে যখন ঘাস শুকিয়ে খড় হচ্ছে, মাটিতে চাক বাঁধা ফাটল ধরছে, ঠিক তখন অন্ধ্রপ্রদেশে প্রলয়ঙ্কর বন্যার প্রকোপে বিভীষিকার দিনরাত্রি নেমে এসেছে। নদীনালা প্রান্তর গ্রামগঞ্জ ভেসে গেছে, বহু এলাকা হয়েছে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগ স্থাপক ট্রেনের লাইন গেছে জলের তলায়। ক্ষেত-ভরা শস্য ডুবেছে, ডুবেছে শত শত নিরীহ প্রাণী।

এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চিরা-চরিতভাবে যা যা করণীয় লিখিতভাবে সে সবই করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী দিয়ে-ছেন ত্রাণ-ভান্ডার থেকে লাখ টাকা, রাজ্য সরকার দিচ্ছেন সমুচিত সাহায্য। হেলি-কপ্টার উড়ছে, অসামরিক বাহিনীর সঙ্গে সামরিক হাত মিলছে ত্রাণকার্যে। এ পর্যন্ত সরকারী গণনায় তিনশত অন্ধ্র-বাসীর প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গেছে। বেসরকারী রিপোর্ট বলছে ঐ সংখ্যা পাঁচ শতের কম নয়।

প্রকৃতির এই নিত্য কৌতুকের হাতে আমরা বেবাক অসহায়। এই কিছুকাল আগে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কত শিশু মায়ের কোল থেকে সর্বগ্রাসী বন্যার জটা-জালের আড়ালে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কত পরিবারে চিরকালের জন্য নেমে এসেছে বিষাদ ও হতাশা।

সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত স্মৃতি মুছে যাওয়ার আগেই আর এক বিভীষিকার আঘাত।

কৌতুকময়ী প্রকৃতির এই নিত্য আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যথাসম্ভব ব্যবস্থা আজও করে ওঠা সম্ভব হয় নি। ঘূর্ণি-ঝড়ের দাপট কিম্বা ভূমিকম্পের প্রতাপকে ঠেকানো সম্ভব না হলেও বন্যার আগ্রাসী ক্ষুধাকে শান্ত করার যে উপায় মানুষ আবিষ্কার করেছে, খরাতপ্ত বিশুষ্ক প্রান্তরের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যে সমুদয় উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে, আমরা বিশ শতকের শেষ পাদে এসেও তার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি নি প্রয়োজনানুগভাবে। আমাদের এই ব্যর্থতার সুযোগে প্রকৃতি তার কৌতুকক্রীড়া অবাধ ও প্রচণ্ড করে তোলার সুযোগ পেয়েছে। আমরা দর্শক-মাত্র। আমি সংবাদবাহকের প্রতিধ্বনি। আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কী বা করণীয় আছে এই মুহূর্তে।

(২৪।৫।৬৯)

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

Pt. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

আন্তর্জাতিক

সাংবাদিক সম্মেলনে টুংকু আবদুল রহমান

পশ্চিম এশিয়ার সংকট ও আমেরিকা

পশ্চিম এশিয়ার সংকট সম্বন্ধে আমেরিকা কি ভাবছে তা মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ উইলিয়াম রোজার্সের কাছ থেকে সঠিক জেনে নেবার জন্য প্রেসিডেন্ট নাসের ভারত গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কায়রোস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীআপ্পা পন্থ গত সপ্তাহে নাসেরের এই বার্তা নিয়ে দিল্লী আসেন। নাসের নাকি এইরকম আভাস দিয়েছেন যে, মিশর আমেরিকার সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতি কামনা করে এবং জর্ডানের রাজা হোসেন পশ্চিম এশিয়ার জন্য যে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তাতে তাঁর সমর্থন আছে। গত সপ্তাহে দিল্লীতে পশ্চিম এশিয়ার প্রশ্ন নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব রোজার্সের সঙ্গে ভারত গভর্নমেন্টের আলোচনা হয়েছে, তবে তার ফলাফল এখনও জানা যায় নি। আরব-ইসরাইল বিরোধ মীমাংসার প্রশ্ন নিয়ে বর্তমানে ওয়াশিংটনে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকার আলোচনা চলছে। সেই আলোচনার ফলাফল রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সদর দপ্তরে বৃহৎ চতুঃশক্তি আলোচনায় পেশ করা হবে। শোনা যাচ্ছে, বৃহৎ শক্তিদ্বয় নাকি এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, বাইরে থেকে কোন মীমাংসা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা যাতে স্বদেশে (বর্তমানে ইসরাইল নামে পরিচিত) ফিরে যাবার অধিকার লাভ করতে পারে, তারও ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং আরব-ইসরাইল যুদ্ধে জয়লাভ করে ইসরাইল আরবের যে সমস্ত এলাকা দখল করে রেখেছে, সেগুলোও ছেড়ে দেওয়া উচিত।

আমেরিকা এবং সোভিয়েটের মধ্যে এই মতৈক্য ইহুদীরা মোটেই ভাল চোখে দেখছে না। আমেরিকায় ইহুদী সম্প্রদায় দস্তুরমত শক্তিশালী। তারা গোড়া থেকেই মধ্য এশিয়ার ব্যাপারে সোভিয়েট-মার্কিন অথবা চতুঃশক্তি আলোচনার বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁরা চান আরবদের সঙ্গে সরাসরি শান্তি আলোচনা করতে। ইহুদীদের আপত্তি সত্ত্বেও নিকসন গভর্নমেন্ট সোভিয়েটের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দেন এবং সে আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন ইহুদীরা দাবি করছেন সোভিয়েটকে যেন কোন কনসেসন দেওয়া না হয়।

কয়েকদিন আগে ওয়াশিংটনস্থিত ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন যে, সোভিয়েটের সঙ্গে আমেরিকার মতের মিল হতে চলেছে। তাতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গোল্ডা মেয়ার ঘোষণা করেছেন যে, বৃহৎ দুই অথবা চতুঃশক্তি মীমাংসার যে প্রস্তাবই উত্থাপন করুক না কেন, ইসরাইল তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ইসরাইলের ধারণা, নিকসন গভর্নমেন্ট পশ্চিম এশিয়ায় কোন মীমাংসার প্রস্তাব চাপিয়ে দিতে চাইলে আমেরিকার জনমতই তার বিরুদ্ধতা করবে। মার্কিন সংবাদপত্র জগতের ওপর ইহুদীদের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা কারও অজানা নেই। সেই কারণে অতীতে কোন মার্কিন গভর্নমেন্ট ইসরাইলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন মীমাংসা চাপিয়ে দিতে ভরসা পান নি। আমেরিকার ইহুদীরা ইতিমধ্যেই আরব-ইসরাইল সরাসরি শান্তি আলোচনার দাবি-ভিত্তিক এক ইস্তাহারে শতকরা ৫০ জন সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন। এটা যে নিকসনের বর্তমান নীতির পরিপন্থী, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রেসিডেন্ট যে তা সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে মনে হয় তিনি তাঁর নিজের পথে মীমাংসার দিকে অগ্রসর হতে বদ্ধপরিকর।

মালয়েশিয়ার অবস্থা

গত সপ্তাহে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান বিভিন্ন জাতির সদস্য নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সহকারী প্রধানমন্ত্রী টুন আবদুল রেজ্জাক নেতৃত্বে যে জাতীয় অপারেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে, নতুন মন্ত্রিসভা সেই কাউন্সিলের সহযোগিতায় দেশ শাসন করবেন। কাউন্সিলের প্রধান কাজ হচ্ছে সামরিক এবং অসামরিক বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে দাঙ্গাহাঙ্গামা দমন করা। মালয়েশিয়ার সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২।

নতুন মন্ত্রিসভায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর চীনা সদস্যদেরও গ্রহণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে হেরে গিয়ে তাঁরা আর মন্ত্রিসভায় ঢুকবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেছেন বলেই মনে হয়। নতুন মন্ত্রিসভায় রেজ্জাক সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী তো থাকলেনই, উপরন্তু অর্থমন্ত্রীর পদটিও পেয়ে গেছেন। এতদিন অর্থমন্ত্রী ছিলেন মালয়েশীয় চীনা সঙ্ঘের সভাপতি টুন টান সিউ সিন। টুন টান জাতীয় অপারেশন কাউন্সিলের সদস্য আছেন।

মালয়েশিয়া তার সশস্ত্রবাহিনীকে সুসজ্জিত করবার জন্য ভারতের কাছে কিছু অস্ত্র সাহায্য চেয়েছে। ভারত সরকার আগে কিছু অস্ত্রশস্ত্র মালয়েশিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। এবারও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে

রাজী হয়েছেন। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার ব্যাটারি (মোটরগাড়ির) এবং বালির বস্তা ভারত থেকে মালয়েশিয়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। ভারত সরকারের মুখপাত্র বলেছেন, ছোট ছোট অস্ত্র চাইলে ভারত সরকার অবিলম্বেই তা মালয়েশিয়ায় পাঠিয়ে দিতে পারবেন। কুয়ালালামপুরে আবদুল রেজ্জাক বলেছেন যে, মালয়েশিয়ার পুলিশবাহিনীকে সুসজ্জিত করবার জন্য তাঁরা বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের কাছে অস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তার ফলাফল এখনও জানা যায় নি। মালয়েশিয়া নগদ টাকা দিয়ে এই সব অস্ত্রশস্ত্র কিনতে ইচ্ছুক। ভারত থেকে মালয়েশিয়া বেতার যন্ত্রপাতি এবং দাঙ্গা-প্রতিরোধক অস্ত্রশস্ত্র কিনতে চেয়েছে। আমেরিকা এবং পশ্চিম জার্মানীর কাছেও মালয়েশিয়া অস্ত্রসাহায্য প্রার্থনা করেছে। আপাতত মালয়েশিয়ায় দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ হয়েছে বটে, তবে থমথমে ভাবটা এখনও কাটে নি।

সংযুক্ত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কম্যুনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি রোধ করবার জন্য চার্চিল যে সংযুক্ত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব তুলেছিলেন, সেটা ইউরোপীয় কমন মার্কেট, ইউরোপীয় পার্লামেণ্ট ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও এখনও বেশি দূর এগোতে পারে নি। সেখানে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দ্য গলের দুর্দমনীয় ফরাসী জাতীয়তাবাদ। দ্য গলের এক-গুঁয়েমির ফলে গ্রেট বৃটেন আজও কমন মার্কেটেই ঢুকতে পারে নি। সম্প্রতি দ্য গল ফ্রান্সের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করায় পশ্চিম জার্মানী এবং গ্রেট বৃটেনের নেতারা আবার সংযুক্ত ইউ-রোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছেন। গত সপ্তাহে পশ্চিম জার্মানীর অর্থমন্ত্রী হের ফ্রাঞ্জ জোসেফ স্ট্রাউস (ইনিই পশ্চিম জার্মানীর পরবর্তী চ্যান্সেলর হবেন বলে সকলে অনুমান করছে) বলেছেন, "একমাত্র শক্তিশালী সংযুক্ত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রই আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম।" তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক সংযুক্তির আহবান জানিয়ে বলেছেন যে, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ইউরোপ নিজের উদ্যোগ এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছে যে, ভূমধ্য সাগর এবং পশ্চিম এশিয়ায় নিজেদের স্বার্থ জড়িত থাকা সত্ত্বেও সেখানকার ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে এসে মোড়লী করছে রাশিয়া আর আমেরিকা। হের স্ট্রাউস বলেছেন যে, সংযুক্ত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে পশ্চিম জার্মানী তার প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রদপ্তরের স্বাধীনতা বর্জন করতে রাজী আছে।

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর কিসিংগারও গত সপ্তাহে স্ট্রাউসের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, দ্য গলের বিদায় গ্রহণের পর সংযুক্ত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের একটা বড় বাধা অপসারিত হয়েছে।

পশ্চিম জার্মানী হঠাৎ সংযুক্ত ইউ-রোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এত ব্যাকুল হয়ে উঠল কেন, সে প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। পশ্চিম জার্মানীর আর্থিক সমৃদ্ধি ১৯৫০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে কলকারখানায় শ্রমবিরোধ খুবই কম আর সেখানকার শ্রমিকরা পশ্চিম ইউরোপের যে কোন দেশের চেয়ে বেশি রোজগার করে। কিন্তু এই বিপুল সমৃদ্ধি সত্ত্বেও সে ইউরোপে নেতৃত্ব করবার সুযোগ পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত সমৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় ইউ-রোপের কোন একটি দেশের পক্ষে যে আমেরিকা এবং রাশিয়ার সমকক্ষ হয়ে ওঠা আর সম্ভব হবে না, তাও সবাই বুঝতে পারছে। এমন কি এশিয়ার জাপানও ইউরোপের দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এ অবস্থায় সংযুক্ত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই জার্মানীর সামনে আশার আলোক তুলে ধরছে। আজ পশ্চিম ইউরোপে পশ্চিম জার্মানী সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জের হিসাবে এখনও সে বহু আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধের অধীন। সংযুক্ত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনরকমে বাস্তব রূপায়িত হয় তাহলে পশ্চিম জার্মানী সেই সব বিধি-নিষেধ মুক্ত হয়ে সেখানে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে।

কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর নায়কদের এই মনোবাসনা পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। দ্য গল বিদায় নিলেও ফ্রান্সের উগ্র জাতীয়তাবাদ নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে জার্মানীর নেতৃত্বাধীন ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে সম্মত হবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বৃটেন সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে। কাজেই শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের কল্পনা কল্পলোকেই আবদ্ধ থাকবে বলে মনে হয়।

সুদানে বামপন্থীদের ক্ষমতা দখল

২৫শে মে সুদানে প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ মাঘৌবের গভর্নমেণ্টকে হটিয়ে দিয়ে সেখানকার সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেছে। এই ক্ষমতা দখলের পেছনে বামপন্থীদের প্রেরণা আছে বলে মনে হচ্ছে। ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে নবগঠিত জাতীয় বিপ্লবী পর্ষদ দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন। পর্ষদের চেয়ারম্যান হয়েছেন কর্নেল জাফর মহম্মদ আল নৌমিরি। ইনিই নাকি ক্ষমতা দখলের প্রধান নায়ক। পর্ষদ ঘোষণা করেছেন যে, এখন থেকে সুদান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে গণ্য হবে। ক্ষমতা দখলের সময় দখলকারীরা বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন হয় নি বলেই মনে হয়।

নতুন শাসন কর্তৃপক্ষ বামপন্থী বলেই ধরে নেওয়া যায়। ২১ জন সদস্য নিয়ে যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে, তার নায়ক হচ্ছেন আবু বকর আবদাল্লা। ইনি আগে সুদানের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং বামপন্থী বলেই পরিচিত। সমস্ত রাজনৈতিক দল বে-আইনী ঘোষিত হলেও মন্ত্রিসভায় সকল দল এবং সকল মতের প্রতিনিধিই স্থান পেয়েছেন। আবদাল্লা (পররাষ্ট্র-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত) সরকারের নতুন নীতি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, নতুন গভর্নমেণ্ট সুদানকে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং প্রগতিশীল বিপ্লবী শক্তিগুলোর মধ্যে সুদানের মুখ্য ভূমিকা সুনিশ্চিত করবেন।

নতুন কর্তৃপক্ষ ১৯৬৪ সালের অন্ত-র্বর্তীকালীন সংবিধান বাতিল করেছেন, মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছেন, প্রেসিডেন্সী

গিরি-বিপিন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

১। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা বিভাগ হিসাবে দুইটি পৃথক বিভাগ থাকিবে।
২। প্রবন্ধের বিষয় :—"নজরুল সাহিত্যে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী"
৩। ফুলস্ক্যাপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে (লেখা এক পৃষ্ঠায় হওয়া চাই)।
৪। প্রতিটি বিভাগে পঞ্চাশ টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার এবং এক শত টাকা নগদ পুরস্কার থাকিবে।
৫। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২১শে জুন ১৯৬৯ সাল।
৬। সর্বসাধারণের জন্য।
৭। যোগাযোগের ঠিকানা :—হরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পত্রপুট', বিদ্যাসাগর সরণি, কলিকাতা-৮।

কাউন্সিলের উচ্ছেদ করেছেন এবং গণপরিষদ তুলে দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর উচ্চতর মহলেও ব্যাপক রদবদল হচ্ছে।

ক্ষমতা দখলের পর প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লা তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে বলেছেন যে, নতুন কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। যে এই গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করবে, তার প্রাণদণ্ড অনিবার্য। সুদানে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হয়েছে এবং সমস্ত ব্যাঙ্ক এবং সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৬৪ সালে সুদানে জেনারেল ইব্রাহিম আব্বাউদের জবরদস্ত শাসন উচ্ছেদের ব্যাপারে আবদাল্লা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। এবার তাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবার কথা ছিল।

সুদান আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ। সেখানকার লোকসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ। সে আরব লীগের সদস্য এবং তার কিছু সৈন্য মিশরের সুয়েজ খাল সীমান্তে মোতায়েন করা আছে।

সুদানে ভারতবর্ষের মত অসংখ্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল। নতুন গভর্নমেন্টের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্নেল মৌনিরি এক ঘোষণায় বলেছেন যে, অসংখ্য পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করায় সুদানের স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। বিশৃঙ্খলা আর দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গেড়ে বসেছিল। আর রাজনৈতিক দলগুলো সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহকের কাজ করছিল।

নতুন মন্ত্রিসভায় অন্যান্য বামপন্থী ছাড়াও নামকরা কম্যুনিস্টদেরও গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারত-রক্ষা!

ভবিষ্যতে ভারতও শত্রুর হাতে চলে যাবে। হিন্দু ধ্বংস হয়ে যাবে। (বৃটিশ প্লান) ভারত ও হিন্দু রক্ষার উপায় আমার বইগুলিতে লেখা আছে।

১। 'ভারতের ভবিষ্যৎ' ১৫ পঃ
২। 'সমস্যার সমাধান' ১০ পঃ
৩। আমার মনের কথা ১০ পঃ
৪। হিন্দুর ভবিষ্যৎ (গদ্য) ২৫ পঃ
৫। হিন্দুর কলঙ্ককাহিনী (পদ্য) ১০ পঃ
৬। হিন্দুর দুঃখের কাহিনী পদ্য ২০ পঃ
৭। হিন্দুর ভুল (পদ্য) ১০ পঃ
৮। হিন্দুর গান ১০ পঃ
৮। হিন্দুর লুপ্ত গৌরব (পদ্য) ১০ পঃ

১.৪৫ পঃ M. O. পাঠালে ৯ খানা বুকপোস্টে যায়।

ক্যাপ্টেন—জে, এল, বসাক।
৫বি, জগদীশনাথ রায় লেন, দর্জিপাড়া
বেথুন কলেজের উত্তর, কলিঃ-৬।

চন্দ্র-বিজয় আসন্ন

গত ১৮ই মে তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে আমেরিকার এ্যাপোলো-১০ চন্দ্রলোকে যাত্রা করে। এই মহাকাশযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, চাঁদের খুব কাছাকাছি মানুষ পাঠিয়ে সেখানে প্রথম মানুষের পদার্পণের উপযোগী একটা স্থান নির্বাচন করা। বিশ্ববাসীর পক্ষে পরম আনন্দের কথা যে, সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। এ্যাপোলো-১০ পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে তিনজন অভিযাত্রীবাহী একটি চন্দ্রযানকে চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে নামিয়ে দেয়। অভিযাত্রীরা চাঁদের ১০ মাইলের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাঁদকে দেখবার সুযোগ পান এবং চাঁদের অসংখ্য ফোটোগ্রাফ গ্রহণ করেন। অতঃপর সেই চন্দ্রযান আবার মূল মহাকাশযানের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে আবার মহাকাশযাত্রীরা পৃথিবীর কক্ষপথে এসে হাজির হন এবং সেখান থেকে তাঁরা দ্রুতগতিতে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে চাঁদে মানুষ পাঠাবার জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানীরা যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন, এ্যাপোলো-১০ তার পরিপূর্ণ সাফল্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যেদিন পৃথিবীর মহাকাশযান চাঁদে অবতীর্ণ হয়েছে, সেদিন চাঁদে মানুষ পাঠানো বিজ্ঞানীদের কাছে আর কোন সমস্যাই ছিল না। চাঁদে অবতীর্ণ মানুষকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাই ছিল তার প্রধান সমস্যা। এ্যাপোলো-১০ সেই সমস্যার সমাধান করেছে। তার চন্দ্রযানে মন্থর গতিতে চাঁদে নামবার এবং চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে আবার মহাকাশে ওঠবার যন্ত্রপাতি লাগানো ছিল। চন্দ্রযান চাঁদে নামে নি সত্য, কিন্তু চাঁদের কাছাকাছি গিয়ে হাজির হয়েছিল এবং সেখান থেকে নির্দিষ্ট সময়েই আবার সে রকেটের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মূল মহাকাশযানে এসে মিলিত হয়। অর্থাৎ তার যন্ত্রপাতি সঠিকভাবেই কাজ করেছে। মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসার পর সবকিছু পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা যদি বুঝতে পারেন যে, এ্যাপোলো-১০ নিখুঁতভাবে কাজ করেছে, তাহলে আগামী ২০শে জুলাই মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং এ্যাপোলো-১১ চেপে চাঁদে পদার্পণ করতে পারবেন।

বিজ্ঞান এবং কারিগরী সাধনা যে মানুষকে আজ বিরাট এবং দুর্জয় শক্তির আধার করে তুলেছে, এ্যাপোলো-১০ তার জ্বলন্ত নিদর্শন। মহাকাশ বিজয়ের অভিযানে এ্যাপোলো-১০ এক অবিস্মরণীয় পদক্ষেপ। যে বীরত্ব এবং যে নিরলস বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টা এই অভিযানকে সফল করে তুলেছে, তা অতুলনীয়, বিস্ময়কর এবং অভাবনীয়। যাঁরা এই বিরাট এবং মহান্ কর্মযজ্ঞের নায়ক তাঁরা আপন কৃতিত্বে নিজেদের গৌরব তো বাড়িয়েছেনই, সমগ্র মানবজাতির কণ্ঠেও বিজয়মাল্য দুলিয়ে দিয়েছেন। মানুষের অসাধ্য কোন কাজ নেই। বিজ্ঞানীরা নতুন করে আবার তার প্রমাণ দিয়ে দিলেন। যে চাঁদ ছিল শিশুর বিস্ময়ভরা আনন্দের উৎস, প্রশান্ত সৌন্দর্যের আধার, কাব্য-কল্পনার প্রেরণা এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সূচক, সেই চাঁদ আজ পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখের সক্রিয় অংশীদার হতে চলেছে। এ্যাপোলো-১০ যে মানব প্রতিভার পরিধিকে মহাকাশের কোন্ সুদূর দিগন্তে সম্প্রসারিত করেছে, তা ভাষায় বর্ণনার অতীত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানুষের সৃষ্টি নয়। সে বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র জীবমাত্র। কিন্তু সে স্রষ্টা। যেদিন সে তার সৃজনী প্রতিভার সন্ধান পেয়েছে, সেদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্ঘাটনে সে সর্বস্ব পণ করেছে। আদিম মানুষ থেকে বিংশ শতাব্দীর মানুষের কর্মসাধনার কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি আত্মপ্রত্যয়ে মহীয়ান। জ্ঞানের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। জীবনমৃত্যুকে সে পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করে অজানাকে জানবার দুঃসাধ্য ব্রত উদ্যাপন করেছে। বিশ্বপ্রকৃতি মানুষকে কোন কিছুই বিনা আয়াসে পেতে দেয় নি। মানুষের অগ্রগতির পথকে সে প্রতি মুহূর্তে দুর্গম করে তোলার চেষ্টা করেছে কিন্তু মানুষ অদম্য। তার কোন ইচ্ছাই সে অপূর্ণ রাখবে না। স্বর্গ-মর্ত-পাতালের সমস্ত রহস্যভেদ করতে না পারলে তার শান্তি নেই। বিনা প্রয়াসে সে-ও কিছু পেতে চায় না। সে তার বুদ্ধি দিয়ে অনুশীলনের দ্বারা জীবন মরণ পণ করে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেবে। মানুষের মহাকাশ বিজয়ের সঙ্কল্পও দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু সে বাধাকে সে গ্রাহ্য করে নি। বাধা অতিক্রমের সহস্র পন্থা আবিষ্কার করে সে আজ চাঁদে যাবার পথ সুগম করে তুলেছে। আগামীকাল সে শুক্রগ্রহে পৌঁছোবে এবং অদূর ভবিষ্যতে মহা অগ্নিগোলক সূর্যপৃষ্ঠে তার পদার্পণ ঘটলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

(মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সোভিয়েটের মহাকাশযান ১৩০ দিনে ২২ কোটি মাইল যাত্রা সমাপন শেষে শুক্রগ্রহের সন্ধান করে এসেছে। সেখানে সে চাঁদের আবহাওয়ায় যন্ত্রপাতিবাহী ক্যাপসুল নামিয়ে পৃথিবীর জন্য বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে।)

মানুষের ধর্ম

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহামারী আর প্রলয়ের মধ্যেও মানুষের বুকের মধ্যে কিছু থেকে যায়, যার দাম বাজারের যে-কোনো সওদার চেয়ে অনেক বেশি। তাকে কি নামে ডাকা যেতে পারে, সেটা দার্শনিক বা কবিরা ভেবে দেখবেন; আমি তাকে প্রেম, মনুষ্যত্ব, বিবেক অথবা কবিতা—যখন যে নামে ইচ্ছে হয় ডাকি। কিন্তু সমস্ত যৌবন ধরে আমি ডাকলেই সে যেমন সাড়া দিত, আজ যেন তেমনটি নেই। এখন, যখন আমরা শ্রেণীহীন মুক্ত মানব-সমাজের স্বপ্ন দেখছি; এবং আমাদের কাছে পৃথিবীর সমস্ত শোষিত, শৃঙ্খলিত মানুষ যখন সহোদরের মত; সেই সময়ে বুকের মধ্যের এই অবসাদ আমাকে শুধুই ক্লান্ত করছে না, ভাবিয়ে তুলেছে। কেবল ভাবছি, আর ভাবছিই। কখনো মনে হচ্ছে, অনেক দূরের এক ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে আমরা নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছি—সেই নক্ষত্রটি হলো শ্রেণীহীন মুক্ত মানব-সমাজের প্রতীক, যেখানে প্রতিটি মানুষ শুদ্ধ, সৎ এবং আমাদের প্রেমের উত্তাপে, আমাদের শুভকামনায় নির্মল। কিন্তু যাত্রাপথে আমাদের জন্য কোনো প্রেম নেই, এমন কি এক শৃঙ্খলিত মানুষের জন্য অন্য শৃঙ্খলিত মানুষের বুকের মধ্যে ভালবেসে রক্তাক্ত হওয়া নেই—শুধু আছে দলীয় ক্ষুদ্রতা, একের দ্বারা অপরকে নিহত করার প্রতিজ্ঞা, ঈর্ষা, দ্বেষ আর ষড়যন্ত্র। আমাদের শিশুকালে পরিশুদ্ধ মানবতার স্বপ্ন দেখতাম, কিন্তু সেখানে স্পষ্ট কোনো পথের নির্দেশ ছিল না। যৌবনে কার্ল মার্ক্স-এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, সেখানে বুদ্ধির দীপ্তি আছে এবং এই প্রথম যেন আমাদের শুদ্ধ বিবেকের সঙ্গে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের তিনিই মিলন ঘটালেন। কিন্তু তারপর, তাঁকে সামনে রেখে হাঁটতে হাঁটতে, মাঝে-মধ্যেই দু' চোখ কুয়াসায় অন্ধকার হয়ে আসছে। মাঝে-মধ্যেই 'এ-কোন্ অদ্ভুত ভূত' দেখছি আমরা! সমাজবিরোধী খুনীরা আমাদের চোখের সামনে বরেণ্য, দেবোপম বলে পূজিত হচ্ছে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের মানবীয় লড়াই তার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অন্যদিকে, সহোদরদের ঘরে আগুন লাগানোর জন্য, অথবা যে-হাতে তারা শক্ত মুঠিতে রক্তপতাকা তুলে ধরেছে, সে হাতগুলি কেটে ফেলার জন্য। যেন এভাবেই সর্বহারাদের শক্তিবৃদ্ধি হবে এবং আমাদের হাতের শিকলগুলি দলীয় কমরেডদের নেতা বানিয়ে এবং তাদের মন্ত্র দিয়ে একসময় আপনা থেকেই খসে পড়বে নিহত সহোদরদের মৃতদেহের ওপর, অথবা তাদের আগুনে পুড়তে থাকা খামারবাড়িগুলিতে।

ভবিষ্যতের একটিই উৎসবের দিন মনে রেখে যদি আমাদের প্রত্যহের মুহূর্তগুলিকে ক্ষুদ্রতার, গ্লানির, দলীয় উন্মত্ততার এবং ছদ্মবেশী কাপুরুষতার শরিক করতে হয়, সেক্ষেত্রে মার্ক্সীয় তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাববার সময় এসে গেছে। শুধু আমার দেশেই নয়, তামাম পৃথিবী জুড়ে আজ প্রগতিশীল, মার্ক্সবাদী মানুষদের মধ্যে একই রকম গৃহবিবাদ, সর্বত্রই ক্ষমতা দখলের লড়াই। এমন কি শ্রেণীহীন মুক্ত মানুষের সমাজ যেসব দেশে গড়ে উঠেছে, সেখান থেকেও নেতৃত্বের লড়াই, ক্ষুদ্র স্বার্থ আর মনুষ্যত্বের অবমাননা এখন পর্যন্ত ধুয়ে-মুছে যায় নি। আমাদের মনেও তাই প্রশ্ন জাগে; যেজন্য জীবনপাত করে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, সেই আদর্শকেও পুনরায় যাচাই করে নেওয়ার কারণ ঘটে।

মানুষের বুকের মধ্যে কিছু থেকে যায়, যার দাম পুঁথিপড়া যে-কোনো আদর্শের চেয়ে অনেক বেশি। সে আমাদের বিবেক, আমাদের কবিতাও হতে পারে। বইয়ে পড়া আদর্শবাদকে উত্তাপ দিতেও তার দরকার হয়। কার পাপে, কতখানি পাপে আজ আমাদের বিবেক ডাকলে সাড়া দিতে চায় না, সে প্রশ্নে আমি যাবো না। আমার প্রশ্ন শুধু মার্ক্সবাদী বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং সকল প্রগতিশীল মানুষদের কাছে—তাঁরা কোন্ পথে চলছেন, একবার ভেবে দেখুন। তাঁদের মনুষ্যত্ব কি শুধু কার্ল মার্ক্স-এর বইয়ের ভেতরে; অথবা তাঁরা আরো একধাপ এগিয়ে আসবেন? দল নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, যে-কোনো মার্ক্সবাদীর কাছে সবার আগে, সবার ঊর্ধ্বে মানুষ। তাঁদের প্রতিদিনের আচরণ আমাদের এই সত্যের দিকেই উদ্বুদ্ধ করুক। আমাদের এই সান্ত্বনা থাক, বুকের ভেতর যাকে সযত্নে লালন করেছি, আর বইয়ের পৃষ্ঠায় যাকে উজ্জ্বল ও অমল দেখেছি তাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা নেই। প্রেমের চেয়ে বড়, মনুষ্যত্বের চেয়ে আপন আর কিছুই নেই মানুষের!

আগামী সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর বিশেষ আকর্ষণ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভায় এম-ডি পরীক্ষা প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রভারতী প্রকাশনী

রবীন্দ্র-সুভাষিত ১২·০০
। রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার।
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২·০০ দি হাউস অফ দি টেগোরস। ডক্টর প্রভাসজীবন চৌধুরী ১০·০০ স্টাডিজ ইন্ এস্থেটিক্স। ৮·৫০ টেগোর অন্ লিটারেচার অ্যান্ড এস্থেটিক্স। ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫·০০ পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ। ডক্টর ননীলাল সেন ১৫·০০ এ ক্রিটিক অব দি থিওরিজ অফ বিপর্যয়। ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬·০০ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫·০০ স্টাডিজ ইন আর্টিস্টিক ক্রিয়েটিভিটি। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫·০০ সঙ্গীতচন্দ্রিকা। ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৬·৫০ রিফর্ম অ্যান্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল, ১৭৭৪—১৮২৩। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রিয়রঞ্জন সেন ও শ্রীনির্মলকুমার বসু ৩·০০ গান্ধীমানস। শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ২৫·০০ ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডান্সেস। ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ১৪·৫০ সোসিওলজি অফ্ প্ল্যানিং।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭
পরিবেশক । 'জিজ্ঞাসা'
১/এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১/৩৩এ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিঃ-২৯

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

মেহের আলিকে আমার বড় ভয় করে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের সেই মেহের আলি—যার "সব ঝুটা হ্যায়" আওয়াজে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের নায়ক চমকে উঠতেন। সেই মেহের আলি অতীতের গুর্জর রাজ্য ছেড়ে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শততম রজনী যত এগিয়ে আসছে বা শততম অতিক্রম করে দ্বিশততম বা তারও বেশি অভিনয় রজনীর রেকর্ড করতে এগিয়ে চলেছে, ততই মেহের আলির কন্ঠস্বর জোরদার হয়ে উঠছে—আরো বেশি উচ্চারিত হচ্ছে সব ঝুটা হ্যায়। মেহেরের কন্ঠস্বর শুধু আমি শুনতে পাচ্ছি বা মেহের আলিকে শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি, এটা মনে করবার কোন কারণ নেই—একটু কান পাতলে, একটু চোখ মেলে তাকালে সকলেই মেহের আলিকে দেখতে পাবেন। এই কথা শুনতে যত খারাপ লাগুক বা বললে যতই প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত বা বুর্জোয়া-প্রচার মনে হোক না কেন, রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক যুক্তফ্রন্ট সরকারের সদ্য উদিত সূর্য ক্রমেই মেঘে ঢাকা পড়ছে। এই মেঘ যদি আরো কালো, আরো গভীর হয়, তবে মধ্যাহ্নে অন্ধকার নেমে আসা অসম্ভব নয়। রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্র কংগ্রেসী আমলের সেই হার্ট অপারেশন রোগীর মতই বেঁচে আছে, নতুন জীবন সঞ্চার বা নতুন রক্তপ্রবাহে প্রশাসনযন্ত্র সবল হয় নি, শক্ত হয় নি, শান্তি-শৃঙ্খলা আজ কেতাবী কথায় পরিণত হয়েছে, কল-কারখানায় ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজার, লক-আউট পূর্ণ ও পূর্ব গৌরবে চলছে। চালের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার কর্ম-চাঞ্চল্য বেড়ে গিয়ে নিত্য-নতুন বিবৃতি আর সংখ্যাতত্ত্বের ধাঁধা জনগণের উদ্দেশ্যে উপহার দেওয়া সুরু হয়েছে। সমাজবাদ ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে বিশ্বাসী, এবং সহ-শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসীরা আপাত-কর্ম হিসাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে কর্দম নিক্ষেপের হোলি খেলাকেই গ্রহণ করেছেন আর পরিস্থিতিগুলির সম্মুখীন হয়ে রাজ্যের জনগণ যখন ওপরের যে কোন একটি সংকট-বিপদ অন্যায়-অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে বলি হতে এগিয়ে চলেছেন, তখনও মেহের আলি চিৎকার করে বলছেন—"ডরো মৎ, ঘাবড়াও মৎ—সব ঝুটা হ্যায়।"

রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির উপরোক্ত চিত্র হল এক সংক্ষিপ্ততম অধ্যায়। প্রকৃত অবস্থা হল—পরিস্থিতি ও চিত্রে রাজ্যের সাধারণ মানুষের যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে যে প্রত্যাশা সৃষ্ট হয়েছিল, যে আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে যুক্তফ্রন্টকে রাজ্যবাসী মনোরাজ্যে স্থাপন করেছিল—সেই ভাবমূর্তি ভাঙতে সুরু করেছে। এক কিলো চাল বেশি দিলে অথবা চারটে বেশি মিষ্টি কথা বললে অথবা অন্য কোন ত্রাণ কাজে কিছু বেশী টাকা খরচ করলে এই ভাঙা ভাবমূর্তির সংস্কার হবে না। এই কথা যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির তথা রাজ্যের ভাগ্য-নিয়ামকদের জানা আছে এবং না জানা থাকলে জানা দরকার—রাজ্যের মানুষ তাদের ক্ষমতা-যোগ্যতার অনেক মূল্য দিয়ে তাদের রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে। রাজ্যবাসী শুধুমাত্র মন্ত্রীবদলের খেলা করবার জন্য কংগ্রেসের শক্তিশালী দুর্গকে ভেঙে চুরমার করে দেয় নি, শুধুমাত্র কিছু বাণী শুনবার জন্য তারা আসুরিক শক্তির সংখ্যাধিক্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে সরকারে বসায় নি এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর প্রায় তিনমাস সময় দিয়ে সরকার পরিচালনার যথেষ্ট কোন মৌলিক পরিবর্তনের স্বাদ না পেয়েও মেদিনীপুর লোকসভা উপ-নির্বাচনেও কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতি তাদের দৃঢ় ও গভীর আস্থা যুক্তফ্রন্ট তার প্রতিদানে জনগণকে কি দিয়েছে বা দেবার চেষ্টা করেছে। যুক্তফ্রন্ট যদি মনে করে, মামুলি কোন আইন, মামুলি কোন সংস্কার ও পরিবর্তন অথবা দুই পয়সা ট্রাম ভাড়া হ্রাস জাতীয় কিছু রিলিফ দিয়ে জনগণের এই প্রত্যাশার মূল্য দেবে—তবে বুঝতে হবে যুক্তফ্রন্টের চিন্তায় চরম দৈন্য রয়েছে, তবে বুঝতে হবে রাজ্যের জনগণ সম্পর্কে তাদের ধারণা নিতান্তই স্থূল চিন্তার কারাগারে বন্দী। রাজ্যের জনগণ সবচেয়ে আগে যা চায়, সে হল—যুক্তফ্রন্টকে যুক্তফ্রন্টের রূপে দেখতে। পদ্মের শতদল পাপড়ির মত যুক্তফ্রন্টের দলগুলি একক ও বিচ্ছিন্ন হোক, কিন্তু আবদ্ধ থাক কোরকের বন্ধনে অথবা মালার ফুলের মত যুক্তফ্রন্ট এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফুল হয়ে ফুটে থাক কিন্তু গ্রথিত যেন থাকে এক সূত্রে। এর মধ্যে কোন ফাঁকি—এর মধ্যে কোন ভাবের ঘরে চুরির চেষ্টা কোনক্রমেই রাজ্যের জনগণ বরদাস্ত করবে না, মেনে নেবে না। খেয়োখেয়ি, হানাহানি, একের বিরুদ্ধে অপরের কুৎসা, পরস্পরের চরিত্র হনন, হেয় প্রতিপন্ন করার বিরতিহীন চক্রান্ত চলবে আর মাঝে মাঝে ভাল কথার প্রলেপ দিয়ে সব ঝুটা প্রমাণের চেষ্টা হবে—এই ম্যাজিক দেখতে জনগণ বরাবরের জন্য প্রস্তুত নয়।

কিন্তু জনগণ সবকিছু নির্বিবাদে

গলাধঃকরণ করতে রাজী নয় বা মেনে নিতে রাজী নয়—এর অর্থ এই নয় যে, জনগণ অবুঝ। সব সংকট ও সমস্যা সম্পর্কে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। জনগণ জানে ও বুঝতেও পারছে কত ধানে কত চাল তৈরি হয় অথবা কার কোন কাজের কতটা চালবাজী। বিশ বৎসরের কংগ্রেস শাসনের সুস্পষ্ট অবসান হবার সুস্পষ্ট সম্ভাবনায় রাজ্যে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে, সেই শূন্যস্থান কে দখল করবে, কে পূরণ করবে ? সংকট ও সমস্যা সৃষ্টির এটাই হল মূল প্রশ্ন। মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকের রহস্যটা সাদা কথায় যদি ব্যাখ্যা করা যায়, তবে সেটা হল এই যে, আকাশে বায়ুমন্ডলে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হলে সেই শূন্যস্থান পূরণে জলীয় বাষ্প দুইদিক থেকে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসে—তার সেই বাষ্পের সংঘর্ষে বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ গর্জন করে। রাজ্য রাজনীতিতে বর্তমানে যে সংঘর্ষ ঘটছে বা অনৈক্যের গর্জন শোনা যাচ্ছে—তার মূলেও আছে এই শূন্যস্থান পূরণের সমস্যা। ১৯৬৭ সালে দুই ফ্রন্টে লড়াই-এর পর ১৯৬৯ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক শক্তির বিভাজন হয়ে গেছে। অর্থাৎ রাজ্য রাজনীতিতে কার সম্পত্তি কতটা, কার জমিদারী কতটা, কার জমি কতটা—সেটা আসন ভাগের মধ্য দিয়ে হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে দল যেসব কেন্দ্রে লড়াই করেছিলেন বা যেসব কেন্দ্রে জয়ী বা পরাজিত হয়েছেন, সেই কেন্দ্রগুলি সেই দলের, সেই জমিতে অন্যের কোন অধিকার নেই—এটাই হল রাজনৈতিক বিভাজনের ফল। কিন্তু সম্পত্তি ভাগ করলেই গৃহবিবাদ মিটবে, সম্প্রসারণ লিপ্সা মিটবে এমন কথা নেই; সীমানাবিরোধ যেমন একটা চিরস্থায়ী সমস্যা, তেমনি অনুপ্রবেশও একটা চিরস্থায়ী প্রবণতা। তাই আজকের সংকট সৃষ্টি হয়েছে এই অনুপ্রবেশ কেন্দ্র করে, কেউ অনুপ্রবেশ করছেন, কেউ অনুপ্রবেশ রোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করছেন—সেইখানেই সৃষ্টি হচ্ছে সংঘর্ষের। সরকারী খাস জমি ভেস্টেড ল্যান্ড দখলের মধ্য দিয়ে এই অনুপ্রবেশ সুরু হয়—কোথাও বা ইউনিয়ন, বা গণ সংগঠন দখল বা পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলার মধ্যে এই সম্প্রসারণ ও অনুপ্রবেশ সুরু হয়। আর, যার পরিণতিতে রাজ্যব্যাপী সর্বস্তরে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অনুপ্রবেশ অথবা হানাদারী অথবা দখল যেটাই করা হোক না কেন, সেটা কখনই ডিসিপ্লিনড্ রাজনৈতিক ক্যাডার দিয়ে সব সময় হয় না—তার জন্য দরকার হয় কখনও গুন্ডাবাহিনীর, কখনও ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর, কখনও অসামাজিক বেসামরিক সেনাবাহিনীর। এই বাহিনীর যারা পান্ডা হয়, তারাও কিন্তু হাওয়ার গতি বুঝে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করে। অভাব, অশিক্ষা ও বেকারীর ঔরস ও গর্ভে জন্ম নিয়ে এই মস্তানরা ভিড়ে পড়ে রাজনৈতিক দলে। দল বিশেষের রুমাল গলায় বেঁধে তারা অনুরাগী-স্বেচ্ছাসেবক ও ধীরে ধীরে পার্টি ক্যাডারে পরিণত হয়। এদের দ্বারা কার্যোদ্ধার হওয়ায় বহু সময় রাজনৈতিক দলগুলিও এদের মায়ায় পড়ে। যাদের দেখলে প্রথমে ঘৃণা, পরে করুণা, ও সর্বশেষে অনুরাগ মিশ্রিত মায়া সৃষ্টি হয়। এই মায়াজাল একবার সৃষ্টি হলে সেটা ছিন্ন করা সহজ হয় না। গত বিশ বৎসরে এই প্রসেসে যে মস্তান বাহিনী, যে অসামাজিক—যে বেসরকারী স্বয়ম্ভু সেনাবাহিনী রাজ্যে গড়ে উঠেছে, তারা ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকে মায়াজালে আবদ্ধ করেছে। তাই বেলঘরিয়ার ইন্দু মিত্রের সমগোত্রীয় কোন ব্যক্তি কোথাও মারা গেলে চিৎকার উঠছে আমার দলের জঙ্গী কর্মী মারা গেলেন বলে। মস্তান গুন্ডা আজ জঙ্গী কর্মীর সার্টিফিকেট লাভ করছে। পাপের বেতন—মৃত্যু; পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট দলগুলি সেই পাপীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে তার বেতন লাভ করছেন।

এই হল রাজ্যের রাজনৈতিক সংকটের ভয়াবহ চিত্রের একটি দিক। কিন্তু এই শেষ নয়—আরো দিক আছে। বারান্তরে সেই দিকগুলির কথা বলব এবং আর ভাববাচ্যে নয়—সোজা কথাকে সোজা করেই বলব—যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির ভূমিকা ও আচরণ কোন পথে এগিয়ে চলেছে।

(চলবে)

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পন্ডিচেরি
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-১২

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের গত তিন মাসের কর্মধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা ৩২ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করার আগে নিজেদের যাত্রাপথকে নিষ্কণ্টক করার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন বেশি। সন্দেহ নেই যে তাঁদের পদক্ষেপগুলি অভীপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ফ্রণ্ট সরকার প্রথমেই হাত দিয়েছেন রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের মূল ঘাঁটিগুলোকে দুর্বল করার কাজে। গত বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যেও কংগ্রেস গণ-সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে নি। কংগ্রেস সংগঠন দাঁড়িয়েছিল ক্ষমতাকে ভিত্তি করে। ক্ষমতার উৎস প্রধানত রাজ্য সরকারকে দখলে রাখার মধ্যে নিহিত থাকলেও, আসলে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের শক্তি সঞ্চয়ের মূল কেন্দ্র আরো অনেকগুলি প্রভূত ক্ষমতাশালী সরকারী এবং আধা-সরকারী সংস্থা করায়ত্ত রাখার উপর নির্ভরশীল ছিল।

রাজ্যস্তরে পারমিট প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগকে কাজে লাগানো এবং মফস্বলে জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, স্কুল-বোর্ড, আর-টি-এ প্রভৃতির মাধ্যমে কায়েমী-স্বার্থকে মদৎ জুগিয়ে কংগ্রেস তার প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার অত্যন্ত সার্থকভাবে ক্ষমতার খুঁটিগুলিকে আঘাত করেছে। রাজ্যের ক্ষমতা তাদের করায়ত্ত। তাই রাইটার্স বিল্ডিংসকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস আর প্রসাদ বিতরণ করতে পারে না। জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে দিয়ে গ্রামের জোতদার-বড়লোকদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অন্যতম ঘাঁটি স্কুল বোর্ডকে ভেঙে দিয়ে এবং বাসের পারমিট দেওয়ার ক্ষমতা পুরনো আর-টি-এ'র হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকার কংগ্রেসের ক্ষমতা বিস্তারের পথকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। সমবায় সমিতি আর বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীতেও রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছেন।

অর্থাৎ যেসব শক্তিকে অবলম্বন করে কংগ্রেসের সংগঠন দাঁড়িয়েছিল সেই সব শক্তি থেকে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে। গণ-সংগঠনের দিকে গত ২০।২২ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস নজর দেয় নি—ফলে ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেসের সংগঠন তাসের ঘরের মত হুড়-হুড় করে ভেঙে পড়ছে।

এদিক থেকে যুক্তফ্রণ্ট সরকার নিজেদের পথ প্রশস্ত করার প্রাথমিক কাজে হাত দিয়েছেন সন্দেহ নেই। গত তিন মাসে যুক্তফ্রণ্ট সরকার এই 'নেগেটিভ' কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন।

কিন্তু আসল কাজে এখনো তাঁরা হাত দিতে পারেন নি। অর্থাৎ কায়েমী-স্বার্থের রাজনৈতিক আধিপত্য খর্ব করার জন্য কংগ্রেসের সংগঠনের বনিয়াদের উপর আঘাত হানার পর নতুন কোন ব্যবস্থা চালু করা হয় নি যা থেকে জনসাধারণের বৃহৎ অংশের কল্যাণ হতে পারে।

এইসব কল্যাণমূলক কাজে হাত দিতে সময় লাগতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই এমন সব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে যে, ফ্রণ্ট সরকার এখনই যদি সতর্ক না হন তাহলে কংগ্রেস আমলের সমস্ত দোষত্রুটি নতুন আমলে নতুনভাবে দেখা দিতে পারে।

রাইটার্স বিল্ডিংসের করিডরে, কয়েকজন মন্ত্রীর ঘরে এবং অফিসারদের ঘরে ঘরে খোঁজ নিলেই দেখা যাবে সেই পুরনো দিনের মত ঠিকাদারের এজেন্ট, পারমিট-লাইসেন্সের তদ্বিরকারক এবং তোষামুদের দলের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। কোন একটি কড়া সিদ্ধান্ত নিলেই তা থেকে বিরত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি হতে আরম্ভ হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় কোন একজন মন্ত্রী তাঁর নির্ধারিত নীতি অনুসারে কয়েকজন পদস্থ অফিসারকে বদলী করার নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত কমপক্ষে অন্যান্য দলের চারজন মন্ত্রী এবং প্রভাবশালী সদস্যের কাছ থেকে এই বদলী বন্ধ করার সুপারিশ এসেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে এই চাপের কাছে মাথা নত করতে হবে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

উক্ত মন্ত্রী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যেই নীতিগতভাবে এই বদলী করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কনসেসন দিলে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা। এসব জানা সত্ত্বেও চাপ সৃষ্টি হচ্ছে—যদিও এখন পর্যন্ত সেগুলো অনুরোধের আকারেই আসছে। এই ধরণের ঘটনা শুধু একটি মন্ত্রিদপ্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ভাবলে ভুল করা হবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল যে কংগ্রেসে থেকে আর কোন লাভ নেই মনে করে বিভিন্ন কায়েমীস্বার্থের লোকেরা ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের আশেপাশে জড়ো হচ্ছে। তেমনি আসছে মস্তানের দল। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের মধ্যে যে-সব সংঘর্ষ ঘটছে তার মূলে আছে এইসব কায়েমীস্বার্থের লোকদের কারসাজি।

কোথাও বা জোতদার কোন একটি দলের ছত্রচ্ছায়ায় এসে কৃষকদের সংগ্রামে বাধা দিচ্ছে, কোথাও বা মস্তানেরা এক বা একাধিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের পুরনো চাল-চলন কাজ-কারবার সব বজায় রাখছে।

অন্যদিকে কায়েমীস্বার্থকে আর সমাজবিরোধী মস্তান, চোরাকারবারী, মজুতদার প্রভৃতিকে রোখার জন্য নীচুতলা থেকে যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন সেদিকে কেউ নজর দিচ্ছেন না। যুক্ত কার্যক্রম কোথাও অনুসৃত হচ্ছে না। ১৯৪৭ সালের পর যেভাবে ইউনিয়ন-জ্যাক ওড়ানো লোকগুলি রায়সাহেব-খানসাহেবের দল কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছিল এখন ঠিক সেইভাবে যুক্তফ্রণ্টের তাঁরা পাণ্ডা হতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন এলাকায় দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির আশায় প্রায় সব দলই এই বেনো জলের প্রবাহকে স্বাগত জানাচ্ছেন—অন্তত প্রতিরোধ করার কোন চেষ্টা করছেন না।

যুক্তফ্রণ্টের মূল উদ্দেশ্যের দিকে বা যুক্তফ্রণ্ট বলতে কি বোঝায় সেদিকে নজর না দিয়ে দলীয় সংকীর্ণতার প্রভাবে পড়তে শুরু করেছেন বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ।

এই অবস্থাকে এখুনি প্রতিরোধ করতে না পারলে ফ্রণ্টের পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আসল ক্ষমতা যে পুঁজিপতিদের হাতে নেতৃবৃন্দ বক্তৃতায় সে কথা বললেও পুঁজিপতি-জমিদার-কায়েমী-স্বার্থকে রোখার জন্য যে মোর্চা গড়া প্রয়োজন সেদিকে নজর দিচ্ছেন না। আজো ফ্রণ্ট কমিটি আর গণকমিটি নিয়ে

বিতর্কের অবসান ঘটলো না। কোন একটি দল যদি মনে করে থাকেন সারা রাজ্য জুড়ে বা বিশেষ কোন এলাকা জুড়ে একমাত্র তাঁরাই থাকতে পারবেন এবং সমাজের পরগাছাদের মোকাবিলা করার শক্তি তাঁদের আয়ত্তে আসবে, তাহলে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

ঐক্যবদ্ধ মোর্চার প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বগতভাবে মেনে নিলেও তার তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পারছেন না। পশ্চিমবাংলার মানুষকে যাঁরা জানেন, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দলের সংগঠনশক্তি সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তাঁরাই বুঝবেন যে সমবেত শক্তিতে না লড়াই করলে কায়েমীস্বার্থকে আঘাত হানা সম্ভব হবে না, এমন কি বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীকে গণতন্ত্রসম্মতভাবে পুনর্গঠনের মত সামান্য পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথের বাধাকেও দূর করা সম্ভব নয়। ফ্রন্ট সরকার আর ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি যদি এখনো অবহিত না হন, তাহলে তাঁদের ইতিহাসের পথে আবার ধুলোয় মিশে যেতে হবে।

—শ্রীসর্বদর্শী

সানলাইটে

প্রতিবার

আপনার জামাকাপড়

আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

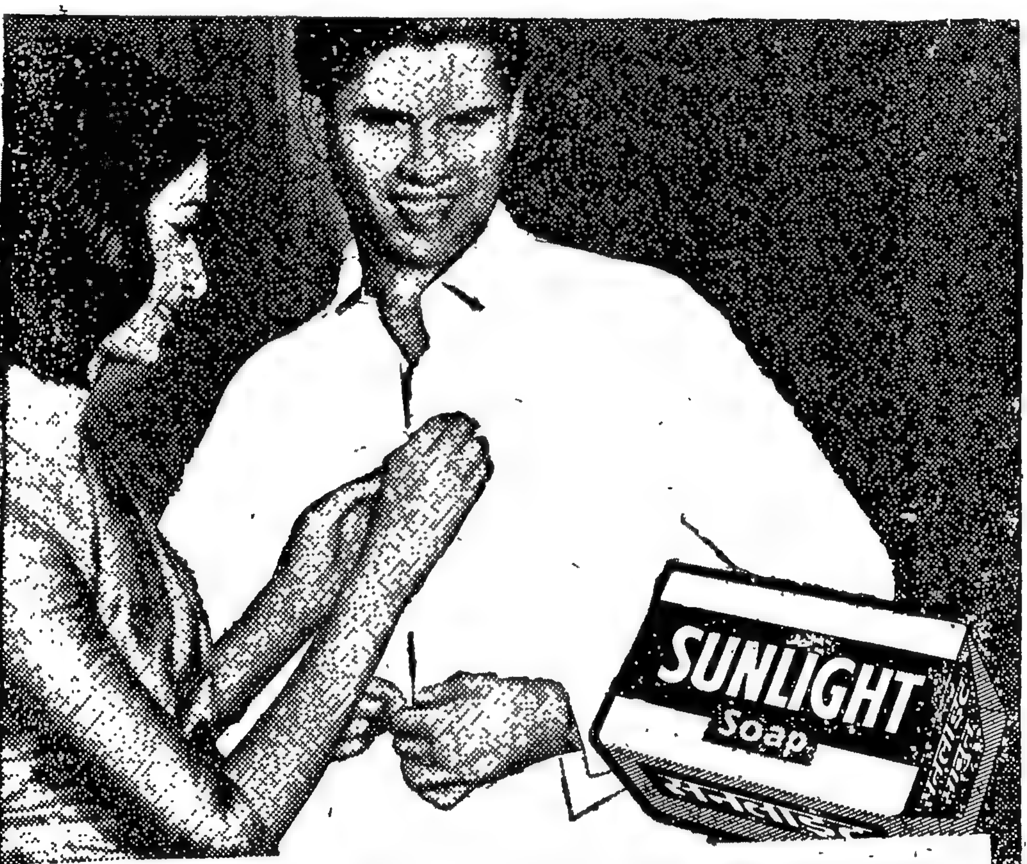

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন—কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার
প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

রিনটাস-এল. ৩-১৫০৯৫

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

গ্রন্থমেলা

ভারতের শিল্প ও আমার কথাঃ শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও, সি, গাঙ্গুলী) : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ : ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২। মূল্যঃ ১৫·০০ টাকা।

শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ এবং কর্মবহুল জীবনের সঙ্গে বাংলা এবং ভারতের শিল্পের ইতিহাস এবং প্রগতি সত্যিই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁর এই গ্রন্থটির ভূমিকায় জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে প্রবীণ চিত্রশিল্পী এবং শিল্পের ইতিহাসের রসজ্ঞ সন্ধানী হিসাবে সমগ্র বাংলা তথা ভারতীয় জাতির শ্রদ্ধার পাত্র অগ্রগণ্য পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

গল্পের ভঙ্গিতে রচিত এই গ্রন্থটিতে অর্ধেন্দ্রবাবুর ইতিহাস-সন্ধানী মন ও সাহিত্যিক চেতনার যে পরিচয় পাওয়া গেল তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর দীর্ঘ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে যে জীবনকাহিনী তিনি রচনা করেছেন তার সঙ্গে পেশাদারী ঐতিহাসিক বা গতানুগতিক আত্মজীবনীকারের রচনায় কোন মিল নেই। অনবদ্য এই রচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতের শিল্পকলার পুনরভ্যুত্থানের স্বরূপটি সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

অর্ধেন্দ্রকুমার কেবলমাত্র চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্যের কথাই বলেন নি। এই গ্রন্থটির মাধ্যমে প্রাচীন কলকাতা এবং সে যুগের বাঙালীসমাজের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্রও আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বিদ্যাসাগর এবং পরমহংসদেবকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছেন। মনোমোহন ঘোষ ও পার্সিভাল সাহেবের কাছে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠতম গুণিজন ছাড়াও অসংখ্য বিখ্যাত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। সুতরাং তাঁর স্মৃতির ঝুলি থেকে এমন অনেক লুপ্ত কথা বার করে তিনি আমাদের পরিবেশন করেছেন, যা আমাদের জানা ছিল না। লালচাঁদ বড়ালের অতুলনীয় গান এবং কুঞ্জবাবুর অভিনয় প্রতিভার কথা আজকের দিনের ক'জন জানেন? চিত্র-সমালোচনা প্রসঙ্গে বিনয় সরকারের সঙ্গে মতান্তর, উদয় শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রভৃতি কাহিনীগুলি যথার্থই অবিস্মরণীয়।

তবে একটি ব্যাপারে কিছুটা খটকা লাগল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, শিশিরকুমার ওদেশে তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। একথাটি ঠিক নয়। **The New York Sun**-এর মত বিখ্যাত পত্রিকায় শিশিরকুমার ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছিল—**'Their acting compares favourably with the acting of any foreign troupe ... the star, Mr. Bhaduri, who plays Rama, is an emotional actor of considerable power.'** চীন দেশের যে নাট্যসম্প্রদায় ভারতীয় অভিনেতাদের চেয়ে আমেরিকায় বেশি সমাদৃত হয়েছিল বলে অর্ধেন্দ্রকুমার উল্লেখ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে **The Daily News**-এ। **New York**-এর নাট্য সমালোচক লিখেছিলেন—**'As actors Bhaduri and his company are more easily understood than were the Chinese and Japanese last season.'**

পরিশেষে একথাই বলতে পারি অর্ধেন্দ্রবাবুর এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন। এমন একটি গ্রন্থের একটি নির্দেশিকা থাকা একান্ত আবশ্যক।

ব্রহ্মসূত্র (বেদান্ত-দর্শন) : শ্রীমদ্ভগবদ্-রামানুজ-বিরচিত শ্রীভাষ্য সমেত ১ম খণ্ড —চতুঃসূত্রী : অনুবাদক শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য। প্রকাশক—শ্রীবলরাম ধর্মসোপান; খড়দহ, ২৪ পরগনা। মূল্য : ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা অনেকেই করেছেন। এই সব ব্যাখ্যার মধ্যে শঙ্করাচার্যের 'শারীরক ভাষ্য' এবং রামানুজাচার্যের 'শ্রীভাষ্য' সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম 'শ্রীসম্প্রদায়'-এর আদি আচার্য 'শ্রীজী' বা মহালক্ষ্মীজী রামানুজকে নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলে স্বীকার করেছেন। এজন্যে রামানুজ বেদান্তদর্শনের যে ভাষ্য রচনা করেন তার নাম দেওয়া হয় 'শ্রীভাষ্য'।

এই শ্রীভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'কে সমর্থন করেছেন; শঙ্করভাষ্যকারের ন্যায় 'অদ্বৈতবাদ'কে সমর্থন করেন নি। এছাড়া শ্রীভাষ্যকার আচার্য রামানুজ তাঁর ভাষ্যে ব্রহ্ম, জীব এবং জগৎ এই তিনকেই সত্য বলে ধরেছেন এবং ব্রহ্মকে জীব ও জগৎবিশিষ্ট অদ্বৈত বস্তু বলে প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন। শ্রীভাষ্যে একদিকে তিনি বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ এবং অপরদিকে ন্যায় সাংখ্য বৈশেষিক ইত্যাদি মতবাদ সংশোধনের চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু প্রধানত শঙ্কর মতবাদ সংশোধনেই তাঁর চেষ্টা অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

আবার শ্রীভাষ্যের প্রাণকেন্দ্র হল ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারটি সূত্র। এই সূত্র চারটিরই ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে এখানে। অর্থাৎ, আমাদের আলোচিত ব্রহ্মসূত্রের এই প্রথম খণ্ডটি হল চতুঃসূত্রী।

এই চতুঃসূত্রী হচ্ছে শ্রীভাষ্যের শ্রেষ্ঠ অংশ। অন্যান্য মতবাদ খণ্ডন করে নিজ বিশিষ্টাদ্বৈতমতবাদকে যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্রবচনের মাধ্যমে এখানেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রীরামানুজ। অতএব এই বিরাট-বিপুল বিষয়টি সাধারণ পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সুখের কথা, এই দুর্বোধ্য বিষয়কে সাধারণের নিকট সহজবোধ্য করেছেন অনুবাদক শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য। প্রত্যেক সূত্রের পরেই সূত্রের পদচ্ছেদ, অন্বয় ও অন্বয়মুখে অর্থ দিয়েছেন তিনি; এবং তারপর সূত্রের একটি সংক্ষিপ্ত সরলার্থ দিয়েছেন। ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ মূলের সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রেখে করবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। এছাড়া দুর্বোধ্য অংশগুলোকে সহজবোধ্য করবার জন্য লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। কী তাৎপর্য-অর্থ-সন্নিবেশে, আবার কী পাদটীকায় বিস্তৃত আলোচনায় —সর্বত্রই অসাধারণ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন অনুবাদক।

'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য : ৩·০০ টাকা।

পরাধীন ভারতবর্ষে এমন কিছু মানুষ জন্মেছিলেন যাঁদের প্রতিভা শিল্প এবং বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরই ছিলেন সবচেয়ে সার্থক শিল্পী যাঁর মনের গঠনটি ছিল পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। বাংলা দেশে শিশুসাহিত্য রচনায় তাঁর স্থান যে সবার ওপরে একথা অনস্বীকার্য। আর কেবল বাংলা দেশ কেন, সারা বিশ্বে তাঁর মত শিশুসাহিত্য রচনা খুব কম লোকই করতে পেরেছেন। বর্তমান গ্রন্থটিতে গুপী গাইন ও বাঘা বাইন, জোলা আর সাত ভূত, টুনটুনি আর রাজার কথা, পাকা ফলার, রাবণ, ঘাঁঘাসুর, সাত মা'র পালোয়ান ও কাজির বিচার নামে আটটি

অবিস্মরণীয় কাহিনী রয়েছে। এইসব গল্প রচনা করে উপেন্দ্রকিশোর বাংলার শিশু ও কিশোর-সাহিত্যে এক নতুন যুগ এনে দিয়েছিলেন। এইগুলির সৌন্দর্য অথবা রস আজও অম্লান রয়েছে। তাই বিনা দ্বিধায় একথা বলা যায় যে বর্তমান যুগের কিশোর এবং শিশু পাঠকেরাও এই বই পড়ে খুবই আনন্দ লাভ করবে।

খ্যাতি যাদের জগৎ জোড়া—নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী: এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য: ৭.৫০ টাকা।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের সুবিধার জন্য কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, ক্রীড়াবিদ, অ্যাডভেঞ্চারার, দেশনায়ক ও সমাজ সংস্কারকের জীবনকাহিনী রচনা করেছেন শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী। সাম্প্রতিককালের শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞানের দৈন্য দূর করবার জন্য এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কিন্তু কিশোর এবং তরুণ পাঠকমনে আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য যে পরিমাণ তথ্য পরিবেশন করা প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক তা করে উঠতে পারেন নি। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষা অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে। কার্ল মার্ক্সের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি খাদ্য ও পণ্যের উৎপাদন এবং সমস্ত বিনিময়ের রীতিনীতির কথা উল্লেখ করেই থেমে গেছেন। অথচ এগুলি ঠিকমত ব্যাখ্যা না করলে কিশোর এবং তরুণ পাঠকদের পক্ষে মার্ক্সের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা একেবারেই অসম্ভব।

ছবি ছড়ার দেশ: শৈলশেখর মিত্র সম্পাদিত: এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী; এ ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। মূল্য: চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ছবি ছড়ার দেশে একটি ছড়ার সংকলন। এই ধরণের সংকলন সর্বাদিক থেকে সম্পূর্ণাঙ্গ করে তোলা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই গ্রন্থে যাঁদের লেখা আছে তাঁদের নামের তালিকাটি দেখলেই বোঝা যায় সংকলনটি অত্যন্ত যত্নের সাথে করা হয়েছে। বিগত যুগের রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায় ও কাজী নজরুল ইসলামের ছড়াগুলি উল্লেখযোগ্য। আজকের দিনের লেখকদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাশংকর ও পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন ছড়াকারদের রচনা দক্ষতার সাথে সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি ছড়ার সাথেই সুন্দর ছবি আছে। শিল্পীদের তালিকাতেও রবীন্দ্রনাথ এবং সুকুমার রায় আছেন। এছাড়া রথীন্দ্র মৈত্র, পরিতোষ সেন প্রমুখ কিছু আধুনিক শিল্পীদের ছবি গ্রন্থটিকে সুন্দর করে তুলেছে।

কস্তুরী-কৌশিক—শাশ্বত: ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস, ৪৪, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য: ৩.৫০ টাকা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে শাশ্বত নবাগত। কিন্তু তাঁর রচনার প্রসাদগুণে তা ঠিক ঠাহর করা যায় না। তিনি মনে করেন যে টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়েই মানুষ। তাই তাঁর এই উপন্যাসের নায়ক কৌশিককে টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়েই তিনি দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড ঘটনার সম্মিলনে যে অখণ্ড কাহিনী রচিত হয়েছে তাতে এক দুর্লভ আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গেল। বিখ্যাত চিত্রতারকা কৌশিকের অতীত ও বর্তমান জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-যুগের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে তাঁর সমাজ-সচেতন মনের পরিচয়ও পাওয়া গেল। এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটিতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

ইটু পাটুর কাহিনী—মনোজিৎ বসু: এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এ-১৩২ ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য: ৩.৫০ টাকা।

প্রাচীনকালের এক বুড়ো-বুড়ীর ঘরে ইটু আর পাটু নামে দুটি যমজ ভাই জন্মেছিল। ইট থেকে ইটু, আর পাটকল থেকে পাটু নাম রাখা হয়েছিল। চঞ্চল প্রকৃতির এই ছেলে দুটির গল্প ছোটদের ভাল লাগবে বলেই আমাদের মনে হয়। ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়ে অথবা অর্থপিশাচ মার্তণ্ড মণিকার এবং ছেলেধরা নরহরি শর্মার কবলিত হয়েও শেষ পর্যন্ত তারা কেমন করে নিজেদের রক্ষা করেছিল সে কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক।

বেকারের জর্নাল—(শিবরাত্রি, ১৩৭৫) হরি সিংহরায়। নব পত্র প্রকাশন। ৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম: দুই টাকা।

একটি বিতর্কমূলক কাব্যগ্রন্থ 'বেকারের জর্নাল।' ভূমিকাতে কবি লিখছেন...কবিতা বয়ন কি যে-সে কাজ। অতএব ওগুলোকে ফাউ হিসাবে ধরে নিয়ে, অধমকে নিজগুণে মার্জনা করে পাঠক যদি আমার ভূমিকার পটভূমিতে নিজের তৃতীয় নয়ন (ভুবনময়)-কে একটু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে খুঁচিয়ে তোলার প্রয়াসী হন, তবে বান্দা চিরজীবন তাঁর কেনা হয়ে থাকবে। অধম কবি নয়, কবিওয়ালা মাত্র'। কবি না কি সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রোত্তর কবিতার শব্দসম্ভার ইতস্তত ব্যবহার করেছেন। ভিয়েতনাম: ১৯৬৫, জুয়ারুরোম, প্রত্যাশা, গাঁয়ে ফেরা, প্রেমের কবিতা, মালা রায়, সবশেষ প্রভৃতি কবিতাগুলি একদিকে যেমন ভাল লাগবে, অন্যদিকে তেমনি ভাবনাও জাগাবে। সখী শব্দটির যত্রতত্র বহুল প্রয়োগ ক্লান্তিকর।

প্রতিফলিত গোলাপ—নীহার গুহ। ১৯।পি, অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী লেন, কলকাতা-১০। দাম ?

নীহার গুহ রচিত 'প্রতিফলিত গোলাপ' কাব্যগ্রন্থে ১৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবির প্রগতিবাদী মনের প্রতিফলন কবিতাগুলিতে সুস্পষ্ট। পাঠকের ভাল লাগবে। কাব্যগ্রন্থে কোন দাম-এর উল্লেখ নেই। সম্ভবত এটি অভিনব।

ভিয়েতনাম ও আমাদের কবিতা—(মহালয়া, ১৩৭৫) গোপাল মল্লিক সম্পাদিত নিউ ওয়েভ পাবলিশিং কোম্পানী, ২বি, সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলকাতা—১২। দাম: এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সতেরজন নবীন কবিকর্মী তাঁদের কবিতা সংকলন "ভিয়েতনাম ও আমাদের কবিতা"র মধ্যে দিয়ে ভিয়েতনামের অগণিত মুক্তিযোদ্ধাকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন। তরুণ কবিকর্মীদের এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করতেই হবে। সব কবিতাই যে কবিতা হয়েছে, এমন কথা বলব না। তবে, সরিৎ ঘোষ (মেকং তোমার গান আমি শুনি) নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য (ওরা আমায় জাগাল সকাল বেলায়) অনিলেশ হালদার (পেছনে জটিল রাত, ললাটে সূর্যের স্নেহ), সুজিতকুমার চৌধুরীর (আমি ভিয়েতনামের সৈনিক), দিবাকর ঘোষ (একহাতে চেপে ধরে বুলেটের ক্ষত), ভর্তৃহরি মিত্র (এখন সোনালী বিকেল), সুমিত ঘোষ (কোঁকড়ানো পৃথিবীটা এখনও কাঁদছে) প্রমুখ কবির কবিতাগুলি উল্লেখ্য। সংকলন পুস্তিকাটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

তরুণের অভিযান: (বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা)—৩য় বর্ষ, সংখ্যা ৫—৬: সম্পাদক—পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী ও সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়। মূল্য: ৭৫ পয়সা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একশো আট জন্মপূর্তি লগ্নে প্রকাশিত ১০৮টি কবিতা নিয়ে পত্রিকাটির রবীন্দ্র সংখ্যাটি গঠিত। মৌলিক রচনার মধ্যে সুজিতকুমার রাণার 'জায়গা নেই' কবিতাটি মনে রাখবার মত। সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়ের 'মাটি গাছ-মানুষ' কবিতাটি মানবিকতার রসসিক্ত। অনুবাদ বিভাগে আছে প্রাকৃত, পালি, অবহট্ঠ, কোংকনী, সংস্কৃত, গুজরাটি, নিগ্রো, আমেরিকান, চীনা, ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী, গ্রীক, রুশ ও স্পেনীয় কবিতা। শতাধিক নবীন কাব্য-শিল্পীর প্রাণের এই ফসল সত্যিই উপভোগ্য।

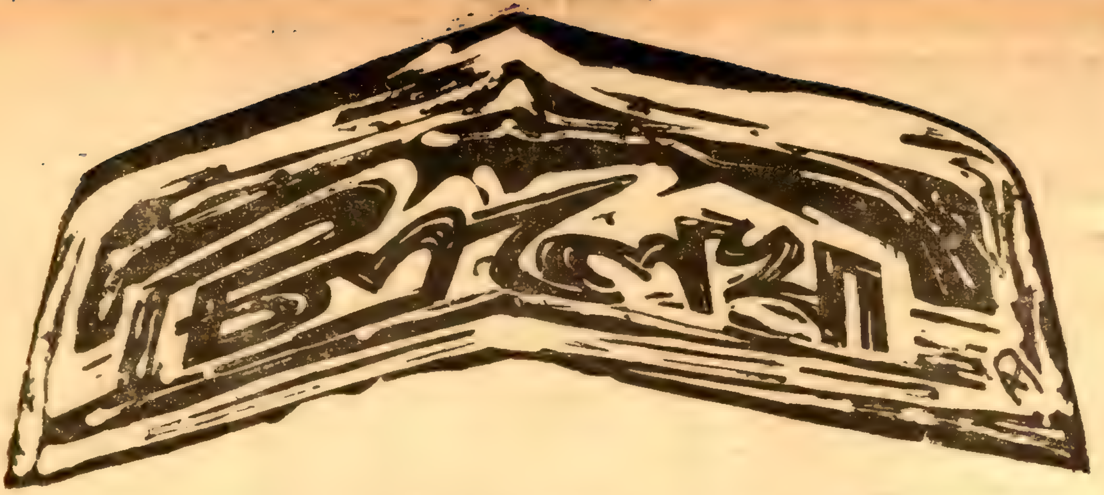

"মার্কিন শিল্পী বুস্সাবার্গের চিত্র প্রদর্শনী"

কলকাতার আকাদেমী অফ্ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনকক্ষে সম্প্রতি আমেরিকার মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-অধ্যাপক শ্রীবুস্সাবার্গের এক প্রদর্শনী হয়ে গেল গত ২রা থেকে ৮ই মে '৬৯ পর্যন্ত। জলরঙ, তেলরঙ, এ্যাক্রিলিক রঙ, অয়েল প্যাসটেল, পেন্সিল প্রভৃতিতে প্রদর্শিত চিত্রবস্তুর সংখ্যা ছিল মোট ৭৭টি, এ ছাড়া চীনেমাটির ও পোড়ামাটি প্রভৃতির ভাস্কর্য ছিল ৪৮টি।

অধ্যাপক বুস্সাবার্গের গত ৫০-এর দশকে আমেরিকার কারুশিল্পের বিখ্যাত পত্রিকা "ক্রাফ্‌ট্ হোরাইজেন"-এ ভারতীয় পোড়ামাটির কাজের এক প্রবন্ধ পড়ে ভারতীয় এই লোকশিল্পটির বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তখনই তিনি মনে মনে ঠিক করেন যে, প্রথম সুযোগেই তিনি ভারতবর্ষে আসবেন এই শিল্পকলাটির অনুধাবনের জন্য, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার পোড়ামাটির কাজ সম্বন্ধেই তাঁর উৎসাহ বেশি ছিল। তারপর ১৯৬১—৬২ সালে ফুলব্রাইট্ বৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলার কৃৎকৌশলী কুমোরদের সঙ্গে বসে গঙ্গামাটি দিয়ে তৈরি এদেশের পোড়ামাটির কাজ হাতে-কলমে শিক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, এই বিভাগে তিনি আবার নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করলেন কলকাতায় বসে।

সেদিন ভারত ভ্রমণে শ্রীবুস্সাবার্গের সংগৃহীত ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির কাজের আভাষচিত্র ও আলোকচিত্রগুলি সংযুক্ত করে মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার সহকারী সংরক্ষক শ্রীমতী বেট্টি দাসু রবিন্স "দি এভারিডে আর্ট অফ্ ইণ্ডিয়া" নামে একখানি বই প্রকাশ করেছেন। এই বইটিতে যেসব বিষয়ে আলোচিত ও চিত্রিত হয়েছে তার মধ্যে আছে মাটির কাজ, ধাতব কাজ, কাঠের কাজ, ছোবড়ার কাজ, পটাচিত্র এবং সেই সঙ্গে শিল্পীর তোলা ২৮২টি আলোকচিত্র আর ছিল ভারতীয় গণজীবন ও সুকুমার কলার আলোচনা।

গত '৬৮-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি আবার কলকাতায় রয়েছেন তাঁর অসমাপ্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ শেষ করতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় যেমন এবার তিনি কাজ করেছেন মাঝে মাঝে তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ঘুরে তিনি বহু বিচিত্র বস্তু দর্শন ও নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছেন, যেমন দিল্লী, আগ্রা, রাজস্থান, দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু জায়গা। সাম্প্রতিক এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কাজগুলি নবলব্ধ সে অভিজ্ঞতারই নিদর্শন।

এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত পোড়ামাটির কাজগুলির মধ্যে আকারে-প্রকারে যথেষ্টই ভারতীয়তার সন্ধান পাওয়া যায়, বিশেষ করে বাংলার কুমোরদের পরম্পরা প্রতিভাত হয়েছে শিল্পীর কিছু কাজের মধ্যে। বুস্সাবার্গের এই পোড়ামাটি ও চীনেমাটির কাজগুলি একদিকে যেমন দেশজ "কুমোরের চাক"-এর ব্যবহার হয়েছে অন্যদিকে তেমনি মিশ্র পদ্ধতিতে অর্থাৎ "চাকের" কাজ এবং সরাসরি মাটি দিয়ে রচিত অংশের সংযোজন মিলিয়ে-মিশিয়ে তৈরি করেছেন কয়েকটি শিল্প-বস্তু। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া গ্রামের প্রচলিত ফাঁপা পোড়ামাটির কাজের অনুকরণে শ্রীবুস্সাবার্গের তৈরি করেছেন কয়েকটি ভাস্কর্য। তবে দেশজ পোড়ামাটির কাজগুলি থেকে মার্কিন কুমোর শ্রীবুস্সাবার্গের নির্মিত এইসব বস্তুর ফারাক রয়েছে তার আকারে-প্রকারে ও উপকরণ ভেদের মধ্যে। পাশ্চাত্যে প্রচলিত চীনেমাটির কাজগুলির মত এ পোড়ামাটির কাজগুলিতেও তিনি প্রথমেই কাঁচা অবস্থায় শুকিয়ে নিয়েছেন। তারপর বৈদ্যুতিক চুল্লিতে পুড়িয়ে নিয়েছেন

'দুপুরের মজলিশ' (রাজস্থান—তেলরঙ)
শিল্পী: রবার্ট বুস্সাবার্গের

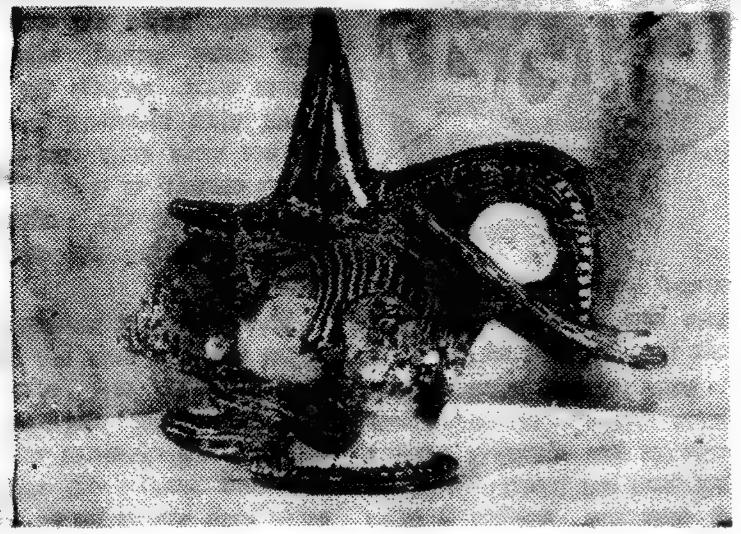

"একটি মাথা" (চীনেমাটির কাজ)
শিল্পী : রবার্ট বুস্সাবার্গের

দেবগুলিকে। এ পর্যন্ত এক বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবহার ছাড়া ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে কোন প্রভেদই নেই। তারপর পোড়ানো সেই বস্তুগুলির ওপর বুস্সাবার্গের দূরপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পর্যন্ত অনুসরণে ঔজ্জ্বল্যবর্ধক প্রলেপ দিয়ে অথবা অলংকরণ করে পরে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে আবার সেঁকে নিয়েছেন দেবগুলিকে।

বুস্সাবার্গের এইসব চীনেমাটি বা পোড়ামাটির কাজগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বাংলার ডোকরার কামারদের নির্মিত ধাতু প্রতিমা ও তৈজস বস্তুর আদল অনুকরণের চেষ্টা দেখা গেল। বাংলার কামারদের কাছ থেকে ধার করে আমেরিকার কুমোরের রচিত এ-সংশ্লেষণ প্রচেষ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে বিচিত্রতম।

চীনেমাটির ভাস্কর্যের মধ্যে "উপবিষ্ট দম্পতি" (৭৮) কাজটি ভাল। "সূর্য ও মানুষ" (৬৭) মূর্তিটি "মহিলার মাথা" (৯১) কাজটি সহজ, সরল উপস্থাপনায় মনোরম। "ঘোড়সোয়ার" (১০০) কাজটির ক্ষয়-বৃদ্ধির অসংযত ব্যবহার দৃষ্টিকটু।

বুস্সাবার্গের চিত্ররচনার প্রচেষ্টাগুলিও সমকালীন মার্কিন পরিপ্রেক্ষিতে বিচিত্র। ওদেশে প্রচলিত অন্তর্মুখী বিমূর্ততা, উৎকট অবক্ষয়, বুস্সাবার্গের এবারের প্রদর্শিত ছবির কোনটিতেই তা প্রকাশিত নয়; যদিও তার চীনেমাটি, পোড়ামাটির কাজে তেমন বীভৎসতা কোথাও কোথাও প্রকট ছিল। পেন্সিল, কাঠকয়লা, রঙিনচক, জলরঙ, তেলরঙ, এ্যাক্রিলিক প্রভৃতি দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকজন, নগর-প্রাসাদ, মন্দির-মসজিদ সঙ্গী-সাথীদের আভাসচিত্র বা মুখচিত্র নির্মাণের প্রয়াসী হয়েছেন শিল্পী।

মার্কিন চোখে জলন্ত কলকাতা ধরা দিয়েও ধরা দেয় নি বুঝি—তাই শিল্পীর জলরঙে আঁকা ৫নং চিত্র "ট্রাম"টিতে পরিবেশ বা বিষয়বস্তু কোনটি রচিত হয় নি যথাযথরূপে। দুর্বল বর্ণ প্রয়োগেই ছবিটি ব্যর্থ হয়েছে। এ্যাক্রিলিক বর্ণে রচিত "গ্রামের পথে" (১৯) অসংযত অবয়ব রচনাও বিরুদ্ধ বর্ণ সমাবেশে বিরসের সৃষ্টি করে। রাজস্থানী হ্রদে "প্রাসাদ স্তম্ভ" (২১) রঙিন খড়িতে (অয়েল-প্যাস্টেল) রচিত এ ছবিটি প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠতম কাজ। সুষম বর্ণ প্রয়োগ, সুন্দর অনুস্থাপনে হ্রদের জলের তরলতায় শিল্পীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। কলকাতার বাড়ির ছাদ থেকে আঁকা পশ্চিম সীমান্তের ৯ ও ২২নং চিত্রগুলি সরলীকরণের প্রচেষ্টায় বিষয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। "বাউল" (২৩) ছবিটি পোষাক-আসাক-এ শিল্পীর অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়।

চীনেমাটি বা পোড়ামাটির কাজে শিল্পীর যে সংশ্লেষণ প্রচেষ্টা প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখে ধারণা করা সম্ভব মার্কিন দেশে প্রচলিত অবক্ষয়ী সমকালীন শিল্পে যে চকিত চমক সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, তারই সন্ধানে বুঝি বুস্সাবার্গের ভারত অভিযান। ভারতীয় লোকশিল্প পরম্পরায় সহজ, সরল উপস্থাপনায় বা ঋজুরেখায় তীক্ষ্ম গঠন প্রভৃতি বিশিষ্টতাগুলি নিশ্চিন্তে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র স্মরণ, প্রকরণ ও উপকরণগুলি ব্যবহার করে এবং কুমোরের কাজের সঙ্গে কামারের কাজের সংমিশ্রণে তৈরি করে তার সঙ্গে মার্কিনী অবক্ষয়ী অনুপ্রাণ মিশ্রণ করে যে "পাঁচন"টি নির্মিত হয়েছে এবারের এ প্রদর্শনীতে, তা আর যাই হোক শিল্প-বস্তু হতে এখনও দেরি আছে। এ প্রদর্শনী দেখে মনে হয়েছে অন্তর্মুখী বিমূর্ততার অবক্ষয়ে প্লাবিত মার্কিন দেশ থেকে আগত বুস্সাবার্গের তাঁর চিত্রের মাধ্যমে অনেক সহজ হতে পেরেছেন। চিত্রকলার অনুধাবনে হয়তো সার্থকতা আসতো, যদি তিনি তাঁর পোড়ামাটির ও চীনেমাটির কাজে প্রযুক্ত সততাটুকু নিয়োগ করতেন চিত্র বিষয়ে।

"চেকোশ্লোভাকিয়ার রেখ-চিত্র"

চেক-ভারত সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় কলকাতায় আর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল এই তো সেদিন আঁকা গ্যালারিতে। প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল সমকালীন চেক গ্রাফিক আর্ট। (৬০।৬৫ জন শিল্পীর প্রায় ১৪০টি চিত্রবস্তু) এছাড়া সঙ্গে ছিল কচ ও ক্রিস্টালের কিছু ফুলদানি, ছাইদান, অলংকরণ পাত্র প্রভৃতি।

এই রেখ-চিত্র এবং ফলিত কলা-শিল্পের প্রদর্শনীতে এচিং, লিথো, উডকাট ইত্যাদির উৎকৃষ্ট নিদর্শন থাকলেও সমগ্র প্রদর্শনীটির বেশির ভাগ কাজই যেন জার্মান শিল্পী কেথে কোলভিৎসকে মনে করিয়ে দেয়। বিশেষত ৬৩নং ছবিটি, ফাঁসির মঞ্চের কাছে রোরুদ্যমান সদ্য বিধবার সন্তানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এ যেন কেথে কোলভিৎস-এর "মুক্তির পর দুই বিধবা" ছবিটিকে মনে করিয়ে দেয়। প্রদর্শনীর কিছু কাজ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষত ভাইসোচান ও উরবলিকের কাজগুলি।

প্রদর্শনীর প্রদর্শিত চিত্র তালিকা বা বিবরণাদি না পাওয়ায় সুষ্ঠুভাবে এ সমালোচনা করা গেল না। আশা করি ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রদর্শনীতে "পরিষদ" কর্তৃপক্ষ যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

—শিলাদিত্য

মাসিক ৫৲ টাকা কিস্তিতে

পার্কার ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার প্রতি গ্রামে এবং শহরে পাঠান যায়।

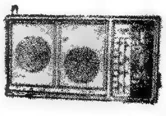

Japan Transistors (AK)
Kolhapur Road, Delhi—7.

পাঠক মন

কবি নজরুল প্রসঙ্গে

নজরুল একটি স্পর্শকাতর নাম। নজরুলের তথাকথিত বন্ধু ও সুবাদি সেজে কয়েকজন সাহিত্য-ব্যবসায়ী ভণ্ডামী সুরু করেছেন। রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে ২০ বছরের লীজ এগ্রিমেণ্টে সল্ট লেক-এ কবিকে জমি দেবার Deed তৈরি হয়। একটি অনুষ্ঠানে ১০,০০০ টাকার একটি চেকও অর্পণ করা হয়। যদিও এই অনুষ্ঠানে মুজাফ্ফর আহমদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নজরুলের প্রকৃত বন্ধুরা নিমন্ত্রিতই হন নি। এই সময়ে এমন সব প্রচার করা হয়, যুক্তফ্রণ্ট যেন কবির জন্যে কিছুই করেন নি! ধরমবীরের প্রশাসনে গগন বিদারিত হতে থাকে। এর পর ৫ মাস অতিবাহিত হয়েছে। যাঁরা সেদিন ঐ অনুষ্ঠানের শরিক এতদিন পরে হঠাৎ তাঁদের খেয়াল হয়েছে, ঐ চুক্তি অসম্মানজনক। তাঁরা দাবি জানাচ্ছেন ঐ চুক্তি প্রত্যাহারের। তাঁরা দাবি জানাবার কে? দেশবাসীর কাছে ওঁরা কি প্রস্তাব রেখেছিলেন, এটা নেওয়া উচিত কি উচিত না? এতদিন পরেই বা এসব মনে পড়ল কেন? এই ৫ মাস তাঁরা ঐ ডীড ও চেকটা বুকে ধরে রেখেছিলেন কেন? তাই এই সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক—ওরা কেউ নজরুলের সুহৃদ নয়—ওদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই এ সব করেছে। লেখকের বিনীত বক্তব্য—নজরুলের জন্যে যা করা হবে তা যেন তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর জন্যেই করা হয়—তাঁর আত্মীয়স্বজন বা ছদ্ম বন্ধুবান্ধবদের জন্যে নয়। একটা 'বোর্ড অফ ট্রাস্টি' গঠন করা যেতে পারে। যুক্তফ্রণ্ট সরকারই সর্বপ্রথম কবির সর্ববিধ যত্নের জন্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদন, এই সরকার যেন সুবিধাবাদীদের শিকার না হন।

—শ্রীমিলনকুসুম ভট্টাচার্য
আনন্দনগর
ইছাপুর

কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসে ঘুষের দৌরাত্ম্য: একটি প্রতিবাদ

আপনার পত্রিকায় (পয়লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) 'পাঠকমন' শিরোনামায় 'কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসে ঘুষের দৌরাত্ম্য' সম্পর্কে জনৈক ভুক্তভোগীর এক সুদীর্ঘ চিঠি বেরিয়েছে। আমি একজন ছোট ব্যবসায়ী এবং বিক্রয়কর বিভাগে আমার ফাইল রয়েছে। সুতরাং এই বিভাগে বিগত পনের বছর ধরে আমি অনেক অফিসার, কেরানী, ইন্সপেক্টর ও পিওনের সংস্পর্শে এসেছি। ভুক্তভোগীর চিঠিতে অনেক অসত্য ভাষণ রয়েছে যে সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলতে চাই।

প্রথমত আপনার পত্রিকা বিক্রয়কর বিভাগে গত দু বছর ধরে জুনিয়র কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারদের আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা লিখেছে। বস্তুতপক্ষে এই আন্দোলনকে সাপ্তাহিক ও দৈনিক বসুমতী সমস্ত সহানুভূতি নিয়ে সমর্থন করেছে। সে অবস্থায় এই ধরণের চিঠি কী করে ছাপা হল, তা ভেবেই আমি স্তম্ভিত।

ভুক্তভোগী তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন ১৩ই এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিকে কেন্দ্র করে। সেলস্ ট্যাক্স অফিসে প্র্যাকটিস করেন এরকম এক ভদ্রলোকের (?) কুৎসিত মন্তব্যকে উদ্ধৃত করে তিনি কিছুটা জান্তব আনন্দ উপভোগ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, সেলস্ ট্যাক্স অফিসে তাঁর পরিচিত এই ধরণের প্র্যাকটিস (না ম্যালপ্র্যাকটিস?) করা লোকদের দুর্নীতি ও ঘুষের কারবারে কতটুকু অংশ আছে তার সম্বন্ধে কিন্তু একটি কথাও বলা হয় নি! অথবা, কমিশনার, এ্যাডিশনাল কমিশনার এবং এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার এই তিন শ্রেণীর অফিসারদের সম্পর্কেও ভুক্তভোগী নীরব। তাহলে আমরা কি মনে করবো যে ওপরতলার ঐ তিন শ্রেণীর অফিসার ও আইডিয়ালিজম বিসর্জন দেওয়া কোন প্র্যাকটিসনার মিলে ভুক্তভোগী নামের অন্তরালে থেকে এই চিঠি লিখেছেন? তা হতেও পারে, নাও হতে পারে। এই প্র্যাকটিস করা লোকদের সম্পর্কে কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈল মুখার্জীর একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করলেই আশা করি পাঠকগণ এ'দের চিনতে পারবেন। কয়েকবছর আগে এ'দের সমিতি কলকাতার কোন এক বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে যখন নাটক করছিলেন শ্রীমুখার্জী সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসাবে। তাঁর ভাষণে তিনি আরও অনেক কথার সাথে বলেছিলেন "......সেলস্ ট্যাক্স ও ইনকাম ট্যাক্স-এ প্র্যাকটিস করতে নেমে দু'-এক বছরের মধ্যেই কলকাতায় গাড়ি বাড়ি হয় শুনতে পাই। সেটা কি ট্যাক্স ফাঁকি দিতে সাহায্য করার জন্য?......" সেদিন এই learned আইনজ্ঞদের সবাই মাথা নিচু করেছিলেন, একটিও কথা বলেন নি। আমি একজন ব্যবসায়ী, আমি তো বাজারের অনেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে শুনেছি তাঁদের উকিলবাবুরা অফিসারের নাম করে হাজার হাজার টাকা নিজেরা আত্মসাৎ করেছেন। তা না হলে বিলিতি জামা-কাপড়, কলম, ঘাড়ি, রেডিওগ্রাম, মদ ও গাড়ি-বাড়ি ঝট্ করে হয় কোত্থেকে?

বিক্রয়কর বিভাগে যে আন্দোলন হচ্ছে, সে তো আজ হঠাৎ গজায় নি? ভুক্তভোগী তার সম্পর্কে কোন খোঁজখবরই রাখেন না। বিশেষ করে জুনিয়র কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারদের আন্দোলন আজ অনেক দিনের। তাঁরা আন্দোলন করছেন একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তথাকথিত ভুক্তভোগী বলেছেন এসব অফিসারদের মাইনেটা হচ্ছে উপরি। তাই যদি হয় তবে কেন এ'রা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন সে প্রশ্নের জবাব কিন্তু তিনি দেন নি, কারণ তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে সে জবাব থাকার কথা নয়। তাছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবিগুলি যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে, কারণ গত কয়েকদিনে কর্তৃপক্ষ অনেক দাবি মেনে নিয়েছেন।

তথাকথিত ভুক্তভোগী হয়তো প্রশ্ন করবেন আমি এত খবর জানি কোত্থেকে? আমি জানি এবং জানি বলেই এই চিঠি লেখা প্রয়োজন মনে করেছি। বিক্রয়কর অফিসে আমাকেও যেতে হয় এবং সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের আলাপ-আলোচনা থেকে যে-কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেই বুঝতে পারবেন ঐ অফিসে কী ঘটছে। কিন্তু আমার খটকা লেগেছে অন্য জায়গায়। সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়ের বিভাগটিতে দীর্ঘদিন ধরে এরকম অচলাবস্থা চলতে দেওয়া হচ্ছে কেন? রাজ্য মন্ত্রিসভা কি এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন, না এই গভর্নমেণ্টকে লোকচক্ষে হেয় করার জন্য ক্ষমতালোলুপ আমলারা তাঁদের এসব কথা জানাচ্ছেনই না।

বিক্রয়কর আইন সম্পর্কে ভুক্তভোগীর জ্ঞানের বহর দেখে আমি হতবাক। তিনি বলছেন রেজিস্ট্রেশন হবার আগে ব্যবসায়ীকে ট্যাক্স দিয়ে মাল কিনতে হয়, অথচ বিক্রি করার সময় সে ট্যাক্স আদায় করতে পারে না। একমাত্র কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইন ছাড়া অন্য কোন আইনে এ-ধরণের কোন বিধিনিষেধ নেই। ভুক্তভোগী আইনকানুনগুলো ভালো করে না পড়ে অর্বাচীনের মত কথা বলতে গেলেন কেন?

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ উনিশ ॥

বলতে আরম্ভ করার আগেই নন্দকিশোর হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। আমি তার স্বভাবের ওই দিকটির সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। চিরকালই সে মনের ধর্মে ভয়ানক রকম সিরিয়াস। কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সে ভীষণরকম গম্ভীর হয়ে যায়।

আমি ঘরের মধ্যে ইজিচেয়ারে বসেছি। নন্দকিশোরের বৌ একটু আগে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

নন্দকিশোর বসেছে বিছানায়। জানালা বন্ধ। ঘরে আলো।

ঠিক মনে নেই, রবীন্দ্রনাথই যেন তাঁর কোন বইতে পাশ্চাত্য শক্তিমান জাতিগুলিকে বিশাল বটগাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন, নন্দকিশোরকে বলতে শুনলাম প্রথমে। তারপর সে নিজের মনে বলে যেতে লাগল, তাঁর মতে বটগাছের কোন ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনখানে বা পোকায় ছিদ্র করেছে, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ সবকিছু জড়িয়ে বনস্পতি তার দেহে জমিয়ে রেখেছে আপন বলিষ্ঠতা। মনে হয়, এই সত্যি কথাটা রবীন্দ্রনাথের মত আর এমন করে কেউ উপলব্ধি করেন নি।

এই শক্তিশালী পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে ইংরাজ আমাদের দেশে এসেছিল। প্রেম দিতে যে আসে নি, সে তো ইতিহাসের পাতাতেই দেখা গিয়েছে। অন্নপূর্ণার দেশে এসেছিল তারা বাণিজ্য করতে। বেনিয়া জাত। সাত সাগরের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে তাদের নৌকোগুলি দোলে। নানা দেশের ধনরত্ন মূল্যবান সম্পদ অঢেল কিন্তু তারা বহন করে নিয়ে যায় নিজের দেশে। কিন্তু বাণিজ্যের সওদায় এসে চোখ তাদের আটকে গেল এখানে। কেন্দ্রীয় শাসকশক্তি তখন দুর্বল, প্রদেশপালেরা অন্তঃসারশূন্য। নানা চক্রান্ত নানা বিদ্বেষ-বিষবাষ্পের যন্ত্রণা চারধারে। ষড়যন্ত্রের ফাটলের ভেতর দিয়ে গলে এল চতুর ইংরাজ। দেশের রাজা হয়ে বসল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শুনলাম, বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ডরূপে। কিন্তু সেইসূত্রে পশ্চিম থেকে চলে এল ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী বিদ্যা, জ্ঞান-গরিমা, সাহিত্য। এককথায় একটা গোটা নতুন যুগের সঙ্গে পরিচয় ঘটল আমাদের। মধ্যযুগ হারিয়ে গেল পিছু হটতে হটতে। একেবারেই নবজাগরণ যুগের বুকে পা পড়ল আমাদের।

ডুয়ার্সের দিকে তাকিয়ে আমি মাঝে মাঝে এই কথাগুলি ভাবি। ইংরাজ জাতি প্রধানত গঠনকর্মী। তাদের চরিত্রের অসাধারণত্বগুলি লক্ষ্য করবার মত। কনস্টিট্যুশনাল, সোবার, ইন্টেলিজেন্ট। এইসব মিলিয়ে যে জাতির রূপ ফুটে ওঠে, তাকে এককথায় Smart এই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। Smart-এর বাংলা কি বলব? অভিধানে অনেক বাংলা হতে পারে। কার্য-তৎপর, চালাক, উজ্জ্বল, সতেজ, তৎপর ইত্যাদি নানা অর্থ মনে আসে। যে-অর্থেই আসুক, ইংরাজ জাতির অদ্ভুত চিত্তশক্তি ও গঠনকর্ম-নিপুণতার প্রশংসা করতেই হবে। চারিত্রিক ভোগ-চাঞ্চল্য তার যতই থাকুক, শক্তিমান বটগাছের মতই তার দৃঢ়তাও অক্ষয় আশ্রয়।

অতীতের অন্ধকার ডুয়ার্সের দিকে তাকাই। অনাদৃত এক এলাকা। কল্পনায় দেখি, রাত্রিদিন হিংস্র জীবজন্তুর তাড়নায় অস্থির ও ঊর্ধ্বশ্বাস। বিষাক্ত জলবায়ু, বাসভূমির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মাটি ও জল এবং তার অনুদার আবহাওয়া। সভ্য পৃথিবী থেকে বহু দূরে, অযোগ্য মানুষ, জীবজন্তুর মত বাঁচা। রাত্রিদিন উদ্যত হয়ে রয়েছে স্বভাবদুর্বৃত্ত আদিম স্বভাবযুক্ত সীমান্তবর্তী অধিবাসীদের হামলা। কী ছিল তখন ডুয়ার্সে?

ডুয়ার্স নামই তো সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ডুয়ার্স মানে দরজা। সীমান্তের দুর্ধর্ষ পার্বত্য হামলাকারীদের আক্রমণ থেকে এ-অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকাকে নিরাপদ রাখতে ইংরাজকে এই দরজাগুলি রাখতে হয়েছিল। সেসব অঞ্চল থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত আক্রমণকারীদের প্রতি। আঘাতের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হত।

একালে কিছু কিছু সেসব নামই ফেরে লোকের মুখে-মুখে। আলিপুরদুয়ার, বক্সাদুয়ার, কুমারগ্রামদুয়ার। এমনি কত নাম। নতুন কালের আঙিনায় এদের ঠাঁই হয়ে গেছে। সকালের সংবাদপত্রের পাতায় কত সহজেই না এইসব নামগুলির সাথে পরিচয় ঘটে আমাদের। ঘটে রাস্তায় ঘাটে, নানাসূত্রে।

আলিপুরদুয়ারে বন্যার খবর দেখেছ? সিভিলিয়ানকর্তা মিসেসের উদ্দেশে বলেন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে।

জ্যাম-মাখান টোস্টে কামড় দিয়ে মিসেস বলছেন, ইজ ইট?

হ্যালো, লিলি কোথায় যাচ্ছিস? স্টেশনে বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হতে বান্ধবীটির গলা আনন্দে ঝলমল করছে।

যাচ্ছি আলিপুরদুয়ার। লিলি উত্তর করল। সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। একালের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

জানিস্ না বুঝি? লিলি হাসল, ও বদলী হয়ে গেছে। আয় তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি'।

আপনি? ঝকঝকে স্মার্ট তরুণটি বলছেন অন্য এক সুবেশ যুবককে। স্থান দিল্লী। নতুনকালের ইন্দ্রপ্রস্থ।

যাচ্ছি বক্সাদুয়ার। নর্থ বেঙ্গলে। আমি মেডিকেল-রিপ্রেজেন্টেটিভ।

ঘেঁটে দেখছি অতীতের কাগজপত্র। এ অঞ্চলের অনেক কথা লেখা আছে এইসব কাগজপত্রে। অতীতের ডুয়ার্স সম্পর্কে। নন্দকিশোর একটা খাতা খুলে ধরেছে চোখের সামনে। দেখে দেখে বলে যাচ্ছে। প্রচুর বর্ষণ হত ডুয়ার্সে। The average annual rainfall of the Duars is 135 inches. বক্সায়, আলিপুরে ও ফালাকাটায় বর্ষণের পরিমাণ গণনা করা হত। এই তিন জায়গায়। জলবায়ু সম্পর্কে লেখা হচ্ছে, The climate of the Duars during the winter months, say from December to February, is remarkably salubrious. The ex-

haltations from the soil after the rains, when the country is usually well inundated, render the latter part of the autumn less healthy than the summer and winter, and cause fever, dysentry, chest and respiratory affections, rheumatism, and some other diseases to be more prevalent then than at other seasons, and during a period of somewhat more or less than two months, commencing from about 15th February and lasting sometimes throughout April, strong easterly winds prevail often for three days together.

অন্য জায়গায়—"Cholera occasionally occurs in the Cold Weather and in the months of April and May; spleen and goitre are common diseases, and many people die annually from fever and bowl-complaints."

আজ অবস্থার অনেক উন্নতি হয়ে গেছে ডুয়ার্সের। নতুনকালের অঙ্গনে এসে গেছে ডুয়ার্স। কিন্তু পুরাতনকে ভোলা সম্ভব নয়। পুরনো থেকেই নতুনের সৃষ্টি। জীর্ণ নির্মোক খসিয়ে। ধরা যাক, কুমারগ্রামদুয়ার নামটির কথা। অতীত খুঁজলে দেখা যাবে, এর আসল নাম ছিল কোম্পারগাঁও। হংসদেও কোম্পার নামে এক বাসিন্দা ছিলেন এখানে আদিকালে। ভুটিয়ারা তাঁরই নাম থেকে এলাকাটিকে বলত কোম্পারগাঁও। এ থেকেই মুখে মুখে এসেছে কুমারগ্রাম শব্দটি। এমনি বহু নামের অতীত ইতিহাস পাওয়া যাবে।

কেউ কেউ বলেন, ইংরাজী Doors অর্থে দরজা থেকে এসেছে ডুয়ার্স শব্দ। আবার কেউ বা বলেন, সংস্কৃত দ্বার থেকে দুবাব হয়ে অপভ্রংশজাত দুয়ার কথাটির সৃষ্টি। এদেশীয় অধিবাসীরা বলত দুয়ার। সাহেবরা বলতে পারত না দুয়ার। বলত ডুয়ার। ডুয়ার্স।

ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল দেশ। বাঁশবনের বিস্তার ছিল যথাতথা। তিন-রকমের বাঁশ আজও দেখা যায় ডুয়ার্সে। বড় আকারের বাঁশ, মাকলা বাঁশ অপেক্ষাকৃত হাল্কা-পাতলা। আর ছিল জাওতা বাঁশ। বাঁশের ইংরাজি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা Bambusa Stricta. আরেক জাতীয় বাঁশও ছিল। প্রধানত পাহাড় এলাকায় প্রচুর জন্মায়। পরিভাষায় বলে Dendrocalamus Hamiltonu. হোগলা জাতীয় বন। প্রধানত বুনো হাতীর খাদ্য ছিল এই ঘাস। তা থেকেই বোধ হয় উদ্ভিদবিদ্যার ভাষায় নামটি এসেছে Typha Elephantina. হাতীর পিঠের গদিও বানান হত এই দিয়ে। এলুয়া নামে এক শ্রেণীর ঘাস ছিল। হিন্দুদের ধর্মীয় কার্যে ব্যবহৃত কাশিয়া-র বিস্তারও ছিল প্রচুর পরিমাণে। নিচু জলা জায়গায় এগুলি জন্মাত প্রচুর পরিমাণে। এইসব ঘাসের কচিপাতার লোভে বুনো হাতী ও মোষেরা চরত বনে বনে। পতিত জমিতে খস্‌খস্ জাতীয় ঘাসও দেখা যেত। উদ্ভিদবিদ্যার পরিভাষায় Andropogon Muricatum. নল জাতীয় ঘাসে গারো ও মেচ উপজাতিরা মাদুর তৈরি করতেন। ঘরের বেড়াও দিতেন অনেকে। এদের বলা হয় Amphadonax Karka. খাগড়া শ্রেণীর ঘাসের কথাও মনে হচ্ছে। Saccarum Sontanum বলা হয়েছে উদ্ভিদবিদ্যার বইতে।

বন একালেও আছে। চা-এর সঙ্গে সঙ্গেই বনের কাঠের নাম করতে হয়। গভীর অরণ্যভূমি ছিল ডুয়ার্স। কত বনাঞ্চলের কথা মনে আসছে। আফাল্‌-চাঁদ ফরেস্ট, আপার ও লোয়ার তন্ডু ফরেস্ট, ডায়না ফরেস্ট, মরাঘাট ফরেস্ট, দলগাঁও ফরেস্ট, ডুমচি ফরেস্ট, খয়ের-বাড়ি ফরেস্ট, শালবাড়ি ফরেস্ট, উত্তর বড়ঝাড় ফরেস্ট, দক্ষিণ বড়ঝাড়, বক্সা ফরেস্ট, ধুমপাড়া ফরেস্ট, রায়ডাক ফরেস্ট, ভলকা ফরেস্ট, শালকুমার ফরেস্ট।

ডুয়ার্সের রাস্তাঘাট প্রায় সবই ছিল কাঁচা। পাকা রাস্তা একটিও ছিল না বললেই চলে। সে-যুগে গাড়ি ছিল না একটিও। সাহেবরা চড়তেন ঘোড়ায়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে জোর হাঁকাতেন। খট্‌খট্ খটাখট্‌খট্ ধুলোর ঝড় উড়ত আকাশে। ঘোড়ার ছোটার তালে তালে দুলকিচালে দুলতেন সাহেবেরা। হাতীতেও সওয়ার হত। দূরদূরান্ত থেকে হাতীতে বয়ে আনা হত প্রয়োজনীয় মাল। নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে চলত মোষের গাড়ি। মোষেরা হিংস্র জীবজন্তুর ভয়ে-ভয়ে চলত বনের ভিতর দিয়ে। আদিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বহির্জগতের কোন সম্পর্ক ছিল না।

ইংরাজের হাতে এ-অঞ্চলের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সাহেবরা এ-সব অঞ্চলে উন্নতির প্রয়োজনে মনোনিবেশ করলেন। স্যান্ডার্স রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে এ-যুগে চুয়াল্লিশটি রাস্তার নাম। পাহাড়ি নদীগুলিতে স্থায়ী ও অস্থায়িভাবে পোল বা খেয়ানৌকোর ব্যবস্থা হত।

নন্দকিশোর ক'টা পাতা উল্টে গেল পর-পর।

আমি এইমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সংগ্রহ একদিনের নয়। নানা জায়গা থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ করেছে সে।

নন্দকিশোরকে বললাম সে-কথা। বললাম, এ যে বিস্তর কলেক্‌শন দেখছি। তোমার নেশা এখনও আছে।

নেশা আর কোথায়? সেই এককালে করেছিলাম। পাতা উল্টাতে উল্টাতেই নন্দকিশোর বলল। আলিপুর থেকে জলপাইগুড়ি যাবার রাস্তাটি তখন ছিল কি? নন্দকিশোরকে আমি প্রশ্নটি করলাম।

হ্যাঁ, ছিল। অনেক রাস্তাই ছিল। কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে এক জায়গায় সে থামল। বলল, এই যে দেখুন। আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটা হয়ে জলপাইগুড়ির দিকে যে-রাস্তাটির খবর দেখছি উনিশ শতকের শেষাশেষি, তা-ও ছিল কাঁচা। চুয়ান্ন মাইল প্রসারিত ছিল রাস্তাটি সরকারী হিসেবে। ফেরীঘাট ছিল এ-রাস্তায় সবসুদ্ধ দশটি। তার মধ্যে পাঁচটি ছিল স্থায়ী ফেরী। বাকি পাঁচটি শুধুমাত্র বর্ষাকালের জন্য। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই রাস্তা।

অনেক রাস্তার নাম রয়েছে এখানে। আগেই বলেছি চুয়াল্লিশটি রাস্তা ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও রাজকোষে অর্থাগমের জন্য সরকারের ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টি। স্যান্ডার্স রিপোর্টের এক জায়গায় দেখুন নতুন রাস্তার জন্যে সুপারিশ করে বলা হয়েছে—

"In connection with roads I would strongly urge the early opening of a road from Ghargaria market to Jaigaon. It would pass through a large block of wasteland in Alipur tahasil, which would be taken up if this road be opened. Its length would be about thirty miles, and the cost would not, I believe, exceed Rs. 15,000 or Rs. 20,000 including bridges. If this money be laidout, I am sure that Government would benefit immediately by the revenue which would be obtained from the land through which the road would pass."

ইতিমধ্যে হাওয়ায় হাওয়ায় সংবাদটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

হ্যাঁ, ডুয়ার্সের কথাই বলছি।

সারা পৃথিবীতে তখন বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কারগুলির দ্বার একটার পর একটা খুলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সেগুলি প্রভাব ফেলেছে মানুষের জীবনে। ঘরে-বাইরে আশ্চর্য জাত হিসেবে ইংরাজের খ্যাতি সুবিস্তৃত। শক্তিমান পাশ্চাত্য জাতিদের বিস্ময়কর—উদাহরণ। ডুয়ার্সে তারা উপনিবেশ স্থাপন করে ফেলেছে। শোনা যাচ্ছে সেখানকার মাটিতে-প্রান্তরে অফুরন্ত ঐশ্বর্য সম্ভাবনা।

সে যুগের বিলেতের পল্লীভবনে বসে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব পাইপে কামড় দিচ্ছেন ঘনঘন। বাইরে তুষার ঝরছে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে রাত্রিদিন আগুনের প্রজ্বলন্ত চুল্লি। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছেন বাড়ি, বাগান ও ব্যবসা। কিন্তু একমাত্র ছেলে রোনাল্ডের মন নেই এ-সব কিছুতে। ছোটবেলা থেকেই যেন কেমন-কেমন। ঘরে ভালো লাগে না। কফি হাউসে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গ দিচ্ছে না। কফি হাউসগুলি গড়ে উঠেছে কিছুদিন থেকে। নানা আনন্দ ও চঞ্চলতার অবাধ আয়োজন। উপনিবেশগুলি থেকে আসছে দেদার কফি। মহামান্যা রাণী এলিজাবেথের আমল থেকেই ইংরাজজাতির উচ্চ সম্ভাবনার চূড়া উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে ঝলমল করতে সুরু করেছে। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো এইখানেই, এইখানেই। কিন্তু কী হয়ে গেল ছেলের মতিগতি। বন্ধুদের আকর্ষণ না-থাকুক, তরুণী বান্ধবীদের সঙ্গও মন টানে না। সোনালি চুল আর ঈষৎ নীল চোখ মোহবিস্তার করতে পারছে না। সুন্দরী তরুণীর বাহুপাশে কি নেই মাদকতা? নিজেদের যৌবনের কথা ভাবছেন ম্যাকডোনাল্ড। কী উদ্দাম ছিল তখনকার সেই যৌবনজ্বালা-বিচ্ছুরিত- দিনগুলি। ভাবতে বুকের মধ্যে এখনো ধমনীতে-ধমনীতে সেদিনের গনগনে শিখাগুলির আঁচ যেন অনুভব করতে পারেন।

কিন্তু রোনাল্ড?

চিন্তার কুঞ্চিত চোখের পাতায় কাঁপন জেগেছে পিতার। রোনাল্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, সে যেতে চায় ভারতবর্ষে। ইণ্ডিয়া তো নয়, ইণ্ডিয়ারও পূর্ব প্রান্তের এক উপনিবেশে। তার কোন্ বন্ধু রয়েছে সেখানে। ভিতরে-ভিতরে সব ব্যবস্থা করেই ফেলেছে সে। এখন চলে যাবার জন্য দিন গুণছে।

ছেলেকে ঠেকাতে পারলেন না ম্যাকডোনাল্ড। রোনাল্ড স্পষ্ট বলল, আই ওয়ান্ট এ থ্রিল্ ইন্ লাইফ। আমাকে ছেড়ে দাও, পিতা। লেট্ মি হ্যাভ এ চান্স।

এখানে কি থ্রিল্ নেই?

আছে, আছে বাবা। তবু সেখানকার জীবনটা আমি একবার দেখতে চাই। আমার সাধ। ছেলেকে ছেড়ে দিতে হল ম্যাকডোনাল্ডের। জাহাজ ছাড়ল। জেটিতে দাঁড়িয়ে রইলেন পিতা। চোখ ঝাপ্‌সা হলেও রুমাল দিয়ে মুছতে ভুলে গেলেন।

কিন্তু কি ছিল সেখানে? তখনো অনিশ্চিত দিন ডুয়ার্সে। প্রতি পদে-পদে অসুবিধে। ইংলণ্ডের ঊনবিংশ শতাব্দীর সুখ-সুবিধাগুলি কোথায়? তাতে কিছু যায়-আসে না। জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই সব নয়। আরো কিছু আছে। নতুন উপনিবেশকে মনের মত গড়ে তোলার আনন্দ।

বক্সাদুয়ারে আবাস নিয়েছিল রোনাল্ড। তৎকালীন সিভিল অফিসারের অধীনে একটি অফিসারের পদে যোগ দিয়েছিল। আর সেকালে বক্সাদুয়ারের অবস্থা ছিল কী। ইংরাজের মুখ থেকেই শুনুন—

"Only articles for native consumption are procurable. Europeans have to obtain stores and provisions from Calcutta, as nothing is obtainable at Buxa."

আহারের জন্য হাঁস-মুরগী সংগ্রহ করা হত আলিপুর ও কুচবিহার থেকে। একদিক থেকে সুবিধে ছিল অবশ্য। টাকায় তিনটে-চারটে পর্যন্ত হাঁস-মুরগী মিলত সেকালের বাজারে।

ডুয়ার্সের আকর্ষণ পেয়ে বসেছিল ভারতবর্ষের মানুষদেরও। সেই ঘোর সূচনার লগ্নেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসতে সুরু করেছিল মানুষেরা। ডুয়ার্স যে এক আশ্চর্য জনপদ। অগাধ বাণিজ্যিক প্রতিশ্রুতি সেখানে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সমতল ভারতবর্ষের প্রতিটি সাধারণ মানুষের জীবনে সেদিন বাঁচবার জন্য যে সুতীব্র প্রতিযোগিতা করতে হত তার কিছুই ছিল না ডুয়ার্সে। জমিতে অঢেল সম্ভাবনা। সামান্য ইজারার বিনিময়েই মেলে। অন্যতর কষ্ট হয়তো আছে। কিন্তু আছে নিরাপদ ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা। কাড়াকাড়ি কামড়া-কামড়ি নেই। অন্যতর ঝুঁকি হয়ত আছে। কিন্তু খানিকটা ঝুঁকি নিতে না-পারলেই বা চলবে কেন? বিহারী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, রাজপুত, পাঠান প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তো এসেছিলই, পূর্ব বাংলার দুঃসাহসী যুবক-প্রৌঢ়দেরও সেখানে দেখা যাচ্ছিল দলে-দলে।

পিতা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। পেশা পুরোহিত-হিসাবে যাগ-যজ্ঞ পূজার্চনার আয়োজন। তস্যপুত্র নিবারণ, নধর তাঁদ গোলগাল। তৈল ঢালা চিক্কণ তনু। ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও আতিথ্য সেবা ইত্যাদি ভোগের উপচারে বেশ পৈতৃক দেহটি বাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তদুপরি নবযৌবনা ভার্যার উদার ভালোবাসায়-ভক্তিতে মাখান দিনগুলি নিবারণের বেশ কেটে যাচ্ছিল বন্ধুদের সঙ্গে গাছতলায় শুয়ে ও আড্ডা দিয়ে। গ্রামে যাত্রার দলও ছিল। শোনা যায় নিবারণ চক্রবর্তীর ভালো মেয়ের রোল করতে পারার ক্ষমতাও ছিল। কী থেকে যে কী হঠাৎ হল। একদিন দেখা গেল নিরুদ্দেশ হয়েছে নিবারণ। বিগ্রহমূর্তির সামনে কেঁদে ভেঙে পড়েছেন পিতা সুরেশবাবু, ঠাকুর, ঠাকুর, এতদিন তোমার পূজা করে কি শেষে এই? সুরেশবাবু আর কীই বা বলবেন। কবি হলে অশ্রুপ্লুত চক্ষে নিবেদন করতেন, প্রেমের পূজায় এই কি লভিনু ফল?

বৃদ্ধ পিতার ভাগ্যে না হোক, পুত্রের ললাটে যে চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি অপেক্ষা করছিল তা তিনি কি করে জানবেন?

প্রতিবেশী গ্রামের হারান্ সান্যালের নাতজামাই-এর সঙ্গে কুচবিহার চলে এসেছিলেন নিবারণ। কুচবিহার তখন শিক্ষায়-দীক্ষায়-জ্ঞানে-গরিমায় এক অসাধারণ নগরী। নিবারণ কুচবিহার থেকে চলে এলেন ডুয়ার্সে। অবশেষে জীবনে সত্য-সত্যই চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি ঘটল তাঁর। অর্থ, মাটি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা। তিনটি তো হল। অন্যটি? আছে, আছে। ভারতবর্ষীয়দের বিরুদ্ধে সাহেবদের সময়োচিত এটা-ওটা সংবাদাদির সাহায্য দান করে বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন রায়বাহাদুর খেতাবটি। ইংরাজ নেমকহারাম ছিল না।

নন্দকিশোরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই নিবারণবাবুর খবর তুমি কার কাছে পেলে? প্রত্যুত্তরে নন্দকিশোরের গলা শুনলাম, শুধু কি এই একা নিবারণবাবুর কথা বলছেন? এখনো হাওয়ায় কান পাতলে ডুয়ার্সের অনেক নিবারণবাবুদের কথাই শুনতে পাবেন। [ক্রমশ]

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা হিন্দীতে যোগাযোগ করুন।

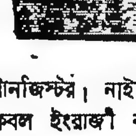

Allied Trading Agencies
(B. C.) P.B. 2123, Delhi–7

নজরুল ইসলাম : উচ্চারণ পদ্ধতি ও বিষয়রেখা

শক্তিব্রত ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

নজরুলের কবিতার অভিব্যক্তির স্পষ্টতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা তাঁর সম্বোধন-রীতি সম্পর্কে কতকগুলি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। সম্বোধনের প্রত্যক্ষতার কথা যখন উল্লেখ করা হয়, তখন তার অনুগামী প্রসঙ্গ হিসাবে তাঁর ভাষারীতির কথা জরুরি হয়ে ওঠে। সম্বোধন প্রত্যক্ষ হওয়া অর্থ, ভাষারীতিতে কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী অনুসরণ। কথ্যরীতিকে কোন ব্যাকরণের সংজ্ঞায় সমর্থন করা যায় না, এর ব্যাখ্যা প্রধানত লক্ষণ-মাত্রিক। কতকগুলি লক্ষণ মিলিয়েই অংশত তার ব্যাখ্যা করা চলে।

কথ্যরীতিতে সবচেয়ে প্রথম লক্ষণীয় সম্ভবত তার গদ্যানুষঙ্গ; এবং প্রবহমানতা। মানুষ কথা বলে গদ্যে, কাজেই কবিতায় যদি মানুষের কথা বলার রীতিকে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে গদ্যধর্মের অনুশীলন এক অপরিহার্য শর্ত হয়ে ওঠে: অর্থাৎ আঙ্গিক যেখানে মূলত পদ্য, সেখানেও গদ্যের অংশভাগ স্থির করে নিতে হয়। গদ্য-পদ্যের সহাবস্থানেই প্রকৃতপক্ষে কবিতায় কথ্যরীতির প্রাণস্ফূর্তি সম্ভব। গদ্যভাষা সচরাচর প্রত্যক্ষ, কাব্যভাষা তির্যক। এই প্রত্যক্ষতার ভাষা-উপকরণ যে শব্দ, গদ্যে তা অর্থ-নির্দিষ্ট, কবিতায় অর্থ-অতিক্রমী। কবিতায় কথ্যভাষার ব্যবহার সম্পর্কে নজরুলের কোন সচেতন মনোযোগ ছিল, অথবা ঐভাবে তিনি কবিতার উচ্চারণ-সমস্যা নিয়ে চিন্তাশীল ছিলেন, এই রকম কোন সমর্থনমূলক তথ্য আমাদের কাছে উপস্থিত নেই। তথাপি গদ্যভাষার মধ্যে যে প্রয়োজন-সাপেক্ষতা আছে, নজরুলের উচ্চারণের পক্ষে এই সূত্রটি বিশেষ উপযোগী ছিল বলেই হয়তো, তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ, প্রয়োজনীয়, অর্থবদ্ধ উক্তির এতখানি সমারোহ লক্ষ্য করা যায় :

১। জাগো রে জোয়ান! বাত ধরে গেল
মিথ্যার তাঁত বুনি।
(সব্যসাচী/ফণিমনসা)

২। জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে
মহাজন কয়,
(ফরিয়াদ/সর্বহারা)

৩। অগ্র-পথিক হে সেনাদল,
জোর কদম্ চল্ রে চল্।
(অগ্রপথিক/জিঞ্জীর)

৪। হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর,
নব চেতনায় জাগো, জাগো, ওঠ বীর!
(বিংশ শতাব্দী/প্রলয়শিখা)

উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে অত্যন্ত নগ্ন প্রত্যক্ষতা আছে; যা অর্থ, ঠিক তাই অর্থ; যা অর্থ, তা এই মুহূর্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গদ্যধর্মী এই রকম উক্তিমাত্র অনেক উদাহরণ নজরুলের কবিতায় খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এবং এইভাবে গদ্যের প্রয়োজন-সাপেক্ষতা গুণটি নজরুল তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তবে পাশাপাশি একথাও খুব স্পষ্ট যে গদ্যানুষঙ্গ কথ্যরীতির একটি প্রধান গুণ হলেও, কবিতায় তার ব্যবহার যে শিল্প-তাৎপর্যের তাগিদে, নজরুলের কবিতার বর্তমান লক্ষণে তা কোনদিক থেকেই বিশেষ সমর্থিত হয় না। কবিতায় গদ্যভাবনা কোন বিচ্ছিন্ন একটা প্রকরণ নয়, গদ্য ও পদ্যের মধ্যে প্রচলিত বিরোধ ধারণার নিষ্পত্তিই তার প্রধান বাসনা : গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনই বস্তুত প্রধান শিল্প-ভাবনা। নজরুলের কবিতায় এই রকম সচেতনতা যে প্রায় অনুপস্থিত, সে কথা মেনে নিলেও কিন্তু কবিকে কোন রকমেই ছোট করা হয় না। নজরুল তাঁর কবিতায় বাক্‌রীতি যে অনেকক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, এই তথ্যটি তো অবশ্যই থাকে। গদ্যের প্রয়োজন-সাপেক্ষতা গুণটি আত্মসাৎ করেই তিনি এই কাজটি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়।

আবার বাক্‌রীতি এক অর্থে বাক্‌-ভঙ্গিমাও বটে; নজরুল যে কথোপকথনের এই অতি স্বাভাবিক রীতি বা ভঙ্গিটিকে খুব অবলীলাক্রমে তাঁর কবিতায় প্রয়োগ করতে পেরেছেন, এই দৃষ্টান্তও যথেষ্ট উপস্থিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত অবলম্বনে বিষয়টি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

১। মসজিদে কাল শিরণী আছিল,
—অঢেল গোস্ত রুটী
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব
হেসে তাই কুটি কুটি, (মানুষ/সাম্যবাদী)

২। মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত
ধ্যানী মুনি ঋষি যোগী—
(পাপ/সাম্যবাদী)

৩। (তোরা) চিনলিনে তা চিনির
বলদ, সার হল তাই শাস্ত্র বওয়া।
(জাতের বজ্জাতি/বিষের বাঁশী)

৪। বন্ধু! তোমরা দিলেনাক দাম,
রাজ-সরকার রেখেছেন মান।
(আমার কৈফিয়ৎ/সর্বহারা)

কথোপকথনে সচরাচর যে ভঙ্গি আমরা ব্যবহার করি, তার অনেকখানিই যে কবি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন, এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে তাঁর সেই প্রয়াস আমাদের গোচরে আসে। প্রথম দৃষ্টান্তে 'হেসে...কুটি কুটি' এই শব্দবন্ধ ব্যবহারে যতটা না বাক্‌রীতির স্পর্শ, তার চেয়ে বেশি 'মোল্লা সাহেব' শব্দবন্ধ ব্যবহারের মধ্যে তার গুণটি ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। এমনি, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, 'ছেড়ে দাও' শব্দবন্ধে বাক্‌রীতি-নির্ভর উপাদান নিশ্চিতরূপে প্রয়োগ করে কবি যে অনেকখানি লাভবান হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'চিনির বলদ' প্রবচন ব্যবহার করে কথ্য-ভঙ্গির নিকটবর্তিতা যতটা সাধ্য হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লক্ষণীয় তাৎপর্যে 'সার হল' শব্দবন্ধের প্রয়োগ করা হয়েছে। এই শব্দবন্ধটি কথ্যধ্বনির পক্ষে এখানে বিশেষ অনুকূল হয়েছে। চতুর্থ দৃষ্টান্তে 'রাজ-সরকার রেখেছেন মান' লিখে বাক্‌-প্রতিমার ব্যবহার-জনিত উৎকর্ষেই যে তিনি উক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা নয়, বরং 'রেখেছেন' ক্রিয়াপদে তিনি যে সম্মানিত প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন, তাতেই উক্তি যথার্থ সিদ্ধ হয়েছে। অবশ্য একথা মনে হওয়াও খুব স্বাভাবিক যে 'মান রেখেছেন' বললে বাক্‌ধ্বনির প্রতিশ্রুতি অনেক বেশি ফলবান হতে পারত। নজরুলের কাব্য-পংক্তিতে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে অনেক সময়েই এই রকম স্থান-বিপর্যয় দেখা যায়, একে সুবিধাবাদী বিপর্যয়সাধন বললেও ক্ষতি হয় না; এবং

এই সব ক্ষেত্রে তিনি প্রথাগত কাব্য-প্রকরণ দ্বারাই অধিক অনুশাসিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। নজরুলের ধ্বনি-প্রকৃতি খুব নির্দিষ্টভাবে বাক্‌ধ্বনির অনুসরণ করে গড়ে ওঠে নি সম্ভবত, কিন্তু তাঁর কবি-ভূমিকাটি এমন স্বতন্ত্র যে, (সম্বোধনের প্রত্যক্ষতা তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হওয়ার দরুণ), কথ্যরীতি তাঁর কবিতার উচ্চারণের পক্ষে প্রায় একটা শর্তের মত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নজরুল যে এই শর্ত সম্পর্কে সচেতন ও মনোযোগী ছিলেন, একথা হয়তো সব সময় বলা যাবে না; কিন্তু এ-ও এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই : তাঁর এই স্বতন্ত্র কবি-ভূমিকা, খুব স্বাভাবিক বলেই হয়তো, কণ্ঠস্বরে কথ্যরীতির অগঠিত স্পন্দন সঞ্চারিত করে দিয়েছে।

কাব্যের প্রধানুগ উচ্চারণের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও অনেক সময় অতর্কিত চমকে কথানুগততা সঞ্চারিত হয়ে যায়। নজরুলের কবিতায় এই রকমের উদাহরণ অজস্র এবং সাধারণভাবে সুখকর। 'বিদ্রোহী' (অগ্নিবীণা) কবিতায়, 'মহা-বিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি' পংক্তিতে 'ফাড়ি' শব্দের প্রয়োগ এইদিক থেকে লক্ষণীয়। এখানে শব্দ ব্যবহারে ভারসাম্যের কথাও যদি তোলা হয়, ঐ কবিতারই অন্য অংশ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল কৃতিত্বের পরিচয় নিয়ে উপস্থিত থাকে : 'আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,/আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম,/ আমি ধন্যি।' এই অংশে শব্দের ধ্বনিগত ভারসাম্য সম্পর্কে বোধহয় কোন প্রশ্ন উঠবে না, আর 'আমি ধন্যি' যে কথ্যরীতির প্রসাদ লক্ষণাক্রান্ত, তা খুবই স্পষ্ট। এই রকম, 'মানুষ' (সাম্যবাদী) কবিতায়, 'স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,/দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়!'—অংশে 'রাজা-টাজা' শুধু লৌকিক শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত নয়, ঐ ব্যবহারে যে তির্যক আছে, কথ্যরীতির সংলগ্নতা তাতেই সাধ্য হয়েছে। একই দৃষ্টিকোণ থেকে 'পাপ' (সাম্যবাদী) কবিতায় : 'এ পাপ-মুলুকে পাপ করে নি ক' কে আছে পুরুষ-নারী?'—পংক্তিতে 'পাপ-মুলুক'; 'বারাঙ্গনা' (সাম্যবাদী) কবিতায় : 'সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত'—পংক্তিতে প্রথা-সিদ্ধ কাব্যোচ্চারণের মধ্যে 'সেরেফ'; 'অগ্রপথিক' (জিঞ্জীর) কবিতায় : 'জাগিব খাড়া পর্বতচূড়া অনিমেষে'—পংক্তিতে 'খাড়া'; 'জাতের বজ্জাতি' (বিষের বাঁশী) কবিতায় : 'এখন দেখিস ভারত-জোড়া/ পচে আছিস বাসি মড়া'—অংশে 'বাসি মড়া'; 'ঝড়' (বিষের বাঁশী) কবিতায় : 'লোকে লোকে পড়ে যায় প্রলয়ের ত্রস্ত কানাকানি!'—পংক্তিতে 'পড়ে যায়' প্রভৃতি প্রয়োগ লক্ষ্য করলে স্বভাবতই মনে হবে যে নজরুল অবলীলাক্রমে কবিতায় কথ্য-প্রকৃতির অধিষ্ঠান ঘটাতে পেরেছেন। তবে নজরুলের উচ্চারণে এই রকম অভিজ্ঞতা অপরিমাণ হওয়া সত্ত্বেও প্রধানত লক্ষণ হিসাবেই তা লক্ষণীয়, যে সচেতন মনস্কতা এই লক্ষণকে কবিতার চারিত্র্যে উত্তীর্ণ করতে পারে, তার অভাবও তাঁর কবিতায় কম নয়। আমাদের কাছে এইটেই বড় কথা যে, নজরুলের উচ্চারণে কথ্যরীতির লক্ষণ প্রায়ই উপস্থিত; এবং তা সচেতন শিল্প-মনোযোগের পরিণাম রূপে না হলেও তাঁর কবি-ভূমিকার অনিবারণীয় ভিতর-প্রেরণায় সম্ভব হয়েছে।

তথাপি কথ্যরীতির উপকরণ ব্যবহারে নজরুল যে অকৃপণ ছিলেন, এই তথ্য বাতিল হয়ে যায় না। লৌকিক শব্দ ব্যবহার ও প্রবাদ-প্রচলনাদির ব্যবহার মুখের ভাষার যে বৈশেষিক লক্ষণ, নজরুলের কবিতায় তার অবাধ উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। 'মশা মেরে' ঐ গরজে কামান' (সব্যসাচী/ফণিমনসা); 'ছেলের হাতের নয় ত মোয়া' (জাতের বজ্জাতি/ বিষের বাঁশী); 'খোদার উপর খোদকারী' (সত্যমন্ত্র/বিষের বাঁশী); 'নানান মুনির নানান মত' (ঐ); 'দিয়ে হাত মাথায়' (চাষার গান/প্রলয় শিখা); 'মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ' (ঐ); 'হাটে ভাঙি হাঁড়ি' (আমার কৈফিয়ৎ/সর্বহারা) ইত্যাদি বাংলায় প্রচলিত বিশিষ্টার্থক বাগধারা ব্যবহার করে নজরুল কাব্যভাষা কতখানি মুখের ভাষার সংলগ্ন হতে পারে, তার পরিচয় নিরূপণ করে দিয়েছেন।' তবে কবিতায় গ্রহণ করবার সময় তিনি যে অবিকৃতভাবে এগুলি সব সময় গ্রহণ করেন নি, উদ্ধৃতাংশগুলি থেকেই তা সুস্পষ্ট। শিল্পীর স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অধিকারের কথা যখন সাধারণভাবে স্বীকৃত, তখনও কবির সাধিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে কাব্যপ্রধানুবৃত্তিই অধিক প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। 'মশা মেরে ঐ-গরজে কামান' যখন কবি লেখেন, তখন 'গজে' লিখলেও ছন্দের দিক থেকে কোন ভুল হতো না; তথাপি স্বরভক্তির প্রতি তাঁর ভক্তি এখানেও যথেষ্ট প্রকট, এবং প্রয়োজনবোধ দ্বারা অনুশাসিত বলেও মনে করবার কারণ নেই। বস্তুত, স্বরভক্তিজাত শব্দের প্রতি নজরুলের কাব্য-সমর্থন অনেক সময় অসহায় ও প্রতিকার-হীন বলে মনে হয়। কবিতার ভাষাকে স্বরভক্তিজাত শব্দ এক ধরণের নমনীয়তা দান করে; এই ধরণের শব্দ যেহেতু উচ্চারণের অনায়াস প্রতিষ্ঠার কারণেই সিদ্ধ, সেই জন্য এতে লোকমুখের বিশিষ্ট এক প্রবণতাই অবশ্য ধরা পড়ে। তথাপি কবিতার ভাষায় নমনীয়তা সঞ্চার করার আগ্রহে বাংলা কবিতার ভাষায় এই সব শব্দের ব্যবহারের একটি প্রথা যে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। নজরুল স্বরভক্তিজাত শব্দ প্রয়োগে শব্দের প্রকৃতি খুব সচেতনভাবে অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয় না; প্রয়োজনে ও নিষ্প্রয়োজনে এই রকম শব্দের প্রতি তাঁর ঝোঁকটা প্রায়ই খুব বেশি, এবং এ কথা মনে করলে সম্ভবত ভুল হবে না যে এই রকম শব্দকে তিনি কবিতার শব্দ বলে অসহায়ভাবে নিরূপণ করেছিলেন। তা ছাড়া, শব্দের বিকৃতি ঘটানোর চেয়ে শব্দের স্থান-বিপর্যয় সাধনের ফলে প্রায়ই বাগ্‌ধারা ব্যবহারের পরিপূর্ণ ফললাভে বঞ্চিত হয়েছেন বলে মনে হয়। 'ছেলের হাতের নয়তো মোয়া', 'দিয়ে হাত মাথায়', বা 'মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ',—এই দৃষ্টান্ত-গুলি লক্ষ্য করলেই শব্দের যথাযথ স্থান কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, তা বোঝা যায়। আর এই বিপর্যয় যে / কবি কবিতার উচ্চারণ-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথাগত বদ্ধমূল ধারণার বশেই করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। নজরুলের কবিতা সম্পর্কে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা : তিনি কথ্যরীতি-সম্মত বহুতর উপকরণ

ইষ্টার্ন রবার ওয়ার্কস
কলিকাতা-১৫

তাঁর কবিতার ভাষায় সংশ্লিষ্ট করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ কবিতার প্রথাগত অভিব্যক্তির ধারা সম্পর্কে তাঁর কোন সংশয় ছিল না, বরং তাতে তাঁর বিশ্বাস ও সমর্থন সমর্পিত হয়েছিল। ফলে এক ধরণের বি-সম তাঁর কবিতার উচ্চারণে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়; কবিতার উচ্চারণপদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার অভাব ছিল বলেই সম্ভবত, নজরুলের কবিতার ভাষা-উপকরণে যথেষ্ট পরিমাণ আধুনিক মনোযোগের সূত্র নিবিষ্ট থাকলেও, তা বাংলা কাব্যভাষাচিন্তায় কখনোই গুরুতর প্রসঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। কথ্যরীতির উপকরণ যে তাঁর কবিতা-ভাষায় অবিরল, তার আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর কবিতায় মুখের ভাষা ব্যবহারের প্রাচুর্যে। লৌকিক শব্দ বা শব্দবন্ধ তিনি এমন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করে গেছেন যে কখনো কখনো সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। 'গালি পাড়িল', 'খোয়াসুনে মান', 'খোদ্ সহায়', 'বুক ঠুকে', 'ধানাই পানাই', 'রাজার সেপাই', 'থুয়ে', 'নাঙ্গা পা', 'ভুখা ফাকা', 'গো-ভাগাড়ে', 'ভড়ং', 'ট্রেডমার্কা', 'থুথু', 'দুধের বাচ্ছা', 'বাবু সা'ব', 'জাম-ধরা', 'হার্মবড়া', 'জাত মেরে', 'ভাত মেরে', 'হাফ্-নেতা', 'পস্তাবি', ইত্যাদি কতক-গুলি নির্বিচারে গৃহীত উদাহরণের প্রতি এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই সব লৌকিক শব্দ বা মুখের শব্দ যে নজরুলের কবিতায় আমরা প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখছি, তা অবশ্যই নয়। নজরুলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী রবীন্দ্রানু-সারী কবি বলে চিহ্নিত কবি পর্যায়ের মধ্যেও এই রকম ব্যবহারের প্রতি কিছু কিছু অনুরাগ দেখা গেছে। নিজেদের রোমান্টিক কবি-লক্ষণ সম্পর্কে এইসব কবিদের আত্মজ্ঞান প্রবক্তা ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের সনদের প্রতি হয়তো তাদের মনস্ক করে থাকবে, কিন্তু সর্বত্রই ভাষা-বিচারে এইসব শব্দের প্রযুক্তি-ভারসাম্য রক্ষার দিক থেকে যথাযথ হয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। এমন কি, দূর ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিহারীলালের কাব্য-ভাষায় লৌকিক শব্দের ব্যবহার যে অনেক সময় বিরক্তিকর হয়েছিল, তার দৃষ্টান্তও আছে। বস্তুত, বাংলায় তৎসম, তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দের সহাবস্থান ঠিক শ্রুতি ও ধ্বনির গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তার কোন নির্ধারিত ব্যাকরণ নেই; এই রকম বিচারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি সম্ভবত শ্রুতি। বলা বাহুল্য, বাঙালী কবিদের একটা বড় অংশ এই ক্ষেত্রে অনেক সময়েই অকৃতার্থ। এই সাক্ষ্য অবশ্যই নজরুলকে কোনভাবে উপকৃত করে নি; কিন্তু তাঁর কবি-ভূমিকাটি এমনই বিশিষ্ট যে এইসব শব্দ ব্যবহার অন্যতর অনিবার্যতায় তাঁর কবিতায় অধিষ্ঠান পেয়েছে। যে শব্দগুলি আমরা উদ্ধার করেছি, তার মধ্যে দুটি লক্ষণ অন্তত স্পষ্ট: এক, লোক-লক্ষণ; দুই, তির্যক-লক্ষণ। এইসব শব্দের মধ্যে অনেকগুলি কোন লোক-কবিতায় বা লোক-সঙ্গীতে শুনলে সঙ্গতি খুঁজে পেতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না, আবার এইসব শব্দই ব্যবহারের বিশিষ্ট-তায় শাণিত তির্যক সৃষ্টি করতে সক্ষম। নজরুলের কণ্ঠস্বরে লোক-কবিতার অপরোক্ষ ভঙ্গিটি অলক্ষ্যে থাকে না; আবার অপ্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের ঈপ্সিত ফল-লাভে তির্যক যে অভ্রান্ত প্রকরণ, তা তিনি স্বভাবতই বুঝতে পেরেছিলেন। বাক্-রীতিতে তির্যক যে এক অতি বিশিষ্ট ভঙ্গি, অতঃপর তা-ও আমাদের অজানা নয়। তবু নজরুল যে এই রকম মনোভাব থেকে লৌকিক শব্দের তির্যক ব্যবহারে প্রযত্ন করেছিলেন, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাণিত আঘাত ও তার অমোঘ ফললাভ তাঁর অব্যবহিত বাসনা ছিল। তথাপি এইসব শব্দগুলি যে তিনি ব্যব-হার করেছিলেন, তা তাঁর কবিতায় শব্দ-ব্যবহারে ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নকে গুরুতর করে তোলে নি, পক্ষান্তরে কথ্যধ্বনির সম্ভাবই অংশত প্রতিশ্রুত করতে পেরেছে। এবং এই সবই তাঁর স্বতন্ত্র কবি-ভূমিকার অনিবারণীয় বেগে সঞ্চারিত বলে মনে হয়।

আমরা যে ভাষায় কথা বলি, তার ছন্দ বলে যদি কিছু সনাক্ত করতে হয়, তবে প্রথমেই সম্ভবত তার প্রবহমানতার কথা উল্লেখ করা উচিত। মধুসূদন দত্তে বাংলা কবিতার মুক্তি ঘটেছিল এই প্রবহ-মানতার অঙ্গীকরণে। অতঃপর বাংলা কবিতায় প্রবহমানতা প্রায় এক সিদ্ধ প্রকরণের মত ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থকে যে শ্বাস-ক্ষমতার আয়তনের মধ্যেই প্রতীত হতে হবে, এই রকম পূর্ব-সংস্কার বর্জনের মধ্য দিয়েই প্রবহমানতার ধারাটি বাংলা কবিতায় অববাহিত হতে শুরু করে। এই রকম সংস্কারের পেছনে কথ্য-ভাষার রীতিকে আত্মস্থ করবার অতি অকপট আগ্রহই সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে বলে আমরা জানি। তবে মধুসূদন কতটা এইরকম মনোযোগ দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছিলেন, অবশ্যই সে-কথা তোলা যেতে পারে। কিন্তু কোন কবির নিজস্ব ব্যবহার-ক্ষমতা-অক্ষমতার ওপর বিষয়ের প্রকৃতি-গত সত্য বাতিল হয়ে যায় না। বস্তুত, এই প্রবহমানতা ব্যাপারটি বাংলা কবিতায় এক ধরণের কাব্য-প্রকরণ হিসাবেই প্রতি-ষ্ঠিত হয়ে গেছে; মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উদ্দেশ্যহীন অনর্গলতায় শিথিলতা, অতিকথন ও আবেগের অতি-রেকে সমর্পিত হয়ে এই রীতি অনেকাংশে কাব্য-প্রথামাত্রে পর্যবসিত। হয়তো এই বিষয়ে এমন কি রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বও খানিকটা ছিল। অথচ কথ্যরীতির ছন্দ-সিদ্ধিই তো প্রবহমানতা বিষয়ে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। নজরুলের কবিতায় প্রবহ-মানতার পরিচয় পেতে সাধারণভাবে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু তিনি সম্ভবত বিষয়টিকে প্রকৃতি-সত্য তথা শিল্পের দিক থেকে বিশেষভাবে বিবেচনা করেও দেখেন নি। তাঁর কবিতায় প্রবহমানতার বেগ সঞ্চারিত করবার চেষ্টা আছে প্রধানত দুই ভাবে: এক, সংলাপ রচনার সূত্রে; দুই, পংক্তির পর্বযোজনায় হ্রাস-বৃদ্ধি-ঘটিত কম্পন সৃষ্টির সূত্রে।

তাঁর কবিতায় পংক্তি যোজনা তথা পংক্তির পর্বযোজনার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত এক ধরণের মুক্তি সচরাচর লক্ষ্য করা যায়; অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'বিষের বাঁশী'র অন্তর্গত 'ঝড়' কবিতাটি বা 'সিন্ধু-হিন্দোল'-এর অন্তর্গত 'সিন্ধু' কবিতার বিভিন্ন তরঙ্গ এই রকমের উদাহরণ হিসাবে স্মরণ্য; তথাপি একথাও সত্য যে, এই সূত্রেও তাঁর কবিতায় এমন অনর্গল ও প্রচুর নয়, যার সাক্ষ্য থেকে তাঁর কবিতায় প্রবহমানতার পরোক্ষ সত্তায় সম্পর্কে প্রত্যয়িত হওয়া যায়। কখনো কখনো আবার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, যাকে শাদা চোখে প্রবহমান বলে মনে হয়, যেমন: 'কয়জন পিতামাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কাম ব্রতী/পুত্রকন্যা কামনা করিল?' (বারাঙ্গনা/সাম্যবাদী); 'তুমি কোনদিন কারো করোনি বিচার,/কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির/কূলে বসে কাঁদ মৌনা কন্যা ধরণীর/একাকিনী। যেন কোন্ পথ-ভুলে'-আসা/ভিন্-গাঁ'র ভীরু মেয়ে।' (মা-বিরজাসুন্দরী দেবীর শ্রীচরণারবিন্দে/সর্বহারা); 'ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের দ্বারে দ্বারে ঋষি/ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা! যাপিতেছে নিশি/সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন্/হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক', (দারিদ্র্য/সিন্ধুহিন্দোল); ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দৃষ্টান্তের একটা মৌলিক দিক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উন্মোচিত হয়ে যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক প্রকার প্রত্যক্ষ সম্বোধন আছে। এবং এই তথ্যটি নজ-রুলের কবিতা প্রসঙ্গে, বিশেষ জরুরি। প্রকৃতপক্ষে, নজরুলের কবিতায় তথাকথিত দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রবহমানতার দৃষ্টান্ত খুঁজে বার করা বিশেষ শ্রমসাধ্য; হয়তো বা তার প্রয়োজনও কম, কেন না তাঁর কবিতার ধ্বনিতে প্রবহমানতার বেগটি যেন অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়ে আছে, অন্তত শ্রবণে তা ধরা পড়ে। এবং একটু ধৈর্যশীল অনু-

সন্ধানীর কাছে অতঃপর আর গোপন থাকে না যে, তার প্রধান কারণ ঐ সম্বোধন-রীতি। ছেদ-যতি-চিহ্নপাতে কবি যে সব সময় খুব মনোযোগী ছিলেন, এমন নয়; তবু প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও আশ্চর্য-বোধক চিহ্নপাতে তিনি এত অনর্গল ছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট পংক্তির মধ্যেই তিনি পাঠককে থামিয়ে আবার চালিয়েছেন। এর ফলে পদ্যের নিশ্চিত বন্ধনদশা থেকে কবিতার ধ্বনি ও শ্রুতিকে তিনি প্রায়ই মুক্ত করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। নজরুলের কবিতায় প্রবহমানতা প্রায়ই দৃশ্যগ্রাহ্য ব্যাপার নয়, সর্বদাই তা শ্রুতিগ্রাহ্য; এবং যে কবি প্রথাগত পদ্য-বন্ধে অধিক আগ্রহী, তিনিও যে অনেক সময় আর প্রায় অনায়াসে প্রবহমানতা কবিতায় সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, এটি অভিজ্ঞতা হিসাবে সুখকর। এবং নজরুলের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়েছিল অবশ্যই তাঁর স্বতন্ত্র কবি-ভূমিকার জন্যে, সেখানে তাঁর সম্বোধন-রীতিটিই সবচেয়ে গুরুতর প্রসঙ্গ।

[আগামী সংখ্যায়]

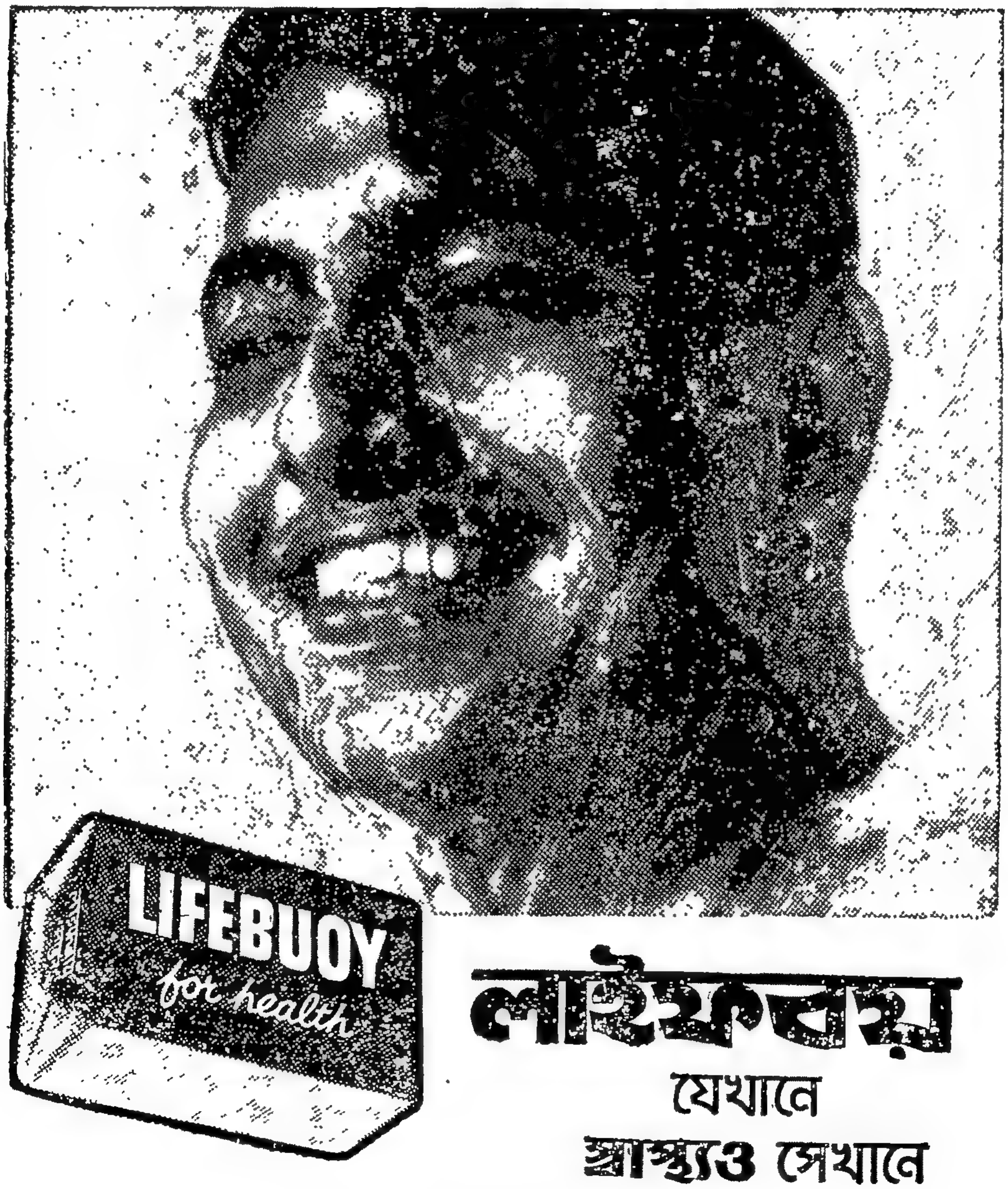

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন। এই
চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের
সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে।

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

লিনটাস-L. 51-140 60

বড় সোফাটার কোণে অসহায়ের মতো বসেছিলো লোকটা।

সীতা ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। পর্দার এ পাশ থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে। পর্দার ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে আনে সীতা। সরে যায় দরজার দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে পর্দার তলা দিয়ে ওর পা দেখা যাবে।

মনে মনে ঠিক করে ফেললো সীতা যে এবার বাইরের ঘরের পর্দাটা একেবারে মাটি অবধি নামিয়ে দেবে। মিছিমিছি আর ঐ ফুটখানেক ফাঁক রাখবে না। না হয় একটু বেশি কাপড়ই লাগবে, তা লাগুক। অনেক সুবিধে হবে একেবারে মাটি অবধি পর্দাটা ঝুলে থাকলে।

দরজা আর পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো সীতা।

কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে সীতার। বুকের কাছটায় ধড়পড় করছে। অদ্ভুত একটা অস্বস্তিকর উত্তেজনার জোয়ার বুকের তলা থেকে ওপরের দিকে উঠে আসতে চাইছে। পর্দাটা সরিয়ে ও ঘরে যেতে ঠিক যেন সাহস পাচ্ছে না সীতা।

লোকটা একইভাবে বসে আছে। কই সিগারেট খাচ্ছে না তো? আশ্চর্য! ছেড়ে দিয়েছে না কি! ভীষণ অবাক লাগে সীতার। অথচ আগে সিগারেট না হলে এক মুহূর্তও চলতো না বাবুর। একটার পর একটা। ঠোঁট দুটো মোটে ফাঁক পাওয়া যেতো না।

কথাটা মনে হতেই গরম হয়ে ওঠে সীতার কান দুটো। সীতা জানে ওর মুখটা এই মুহূর্তে লাল হয়ে উঠেছে। লজ্জা-লজ্জা লাগে সীতার। অদ্ভুত লাগে ভাবতে যে একদিন ঐ লোকটাই...

লজ্জা কাটিয়ে উঠতে কাপড়টা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেয় সীতা। ঘোমটা তুলে দেয় মাথায়। তারপর পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে আবার ফিরে আসে।

ওদের বিয়ের পরে তোলা ছবিটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সমীর। অতো কি দেখার আছে? পর্দার এ পাশে দাঁড়িয়ে সীতাও তাকায় ছবিটার দিকে।

আবার সেই লজ্জা-লজ্জা ভাবটা ফিরে আসে। এবার কিন্তু বেশ ভালো লাগে। কুনাল প্রায় ওকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সীতা বলেছিল ছবিটা শোবার ঘরে টাঙাতে। কুনাল রাজী হয় নি। ছবিটা ও সকলকে দেখাবেই। কুনালের যুক্তি ভারি অদ্ভুত। হাসি পায় সীতার। ঐ ছবি দেখে সকলে না-কি বুঝবে, ওদের দাম্পত্যজীবন কতো সুখের। হঠাৎ যেন ভালো লাগে সীতার। আবেশে চোখ দুটো ছোট্ট হয়ে আসে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে ভীষণভাবে চমকে উঠে পর্দার এ পাশে আরো খানিকটা সরে আসে সীতা। সেই ভালো লাগা ভাবটা কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

সমীর উঠে গিয়ে ছবিটার তলায় দাঁড়িয়েছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বোধ হয় দেখছে ছবিটা। সীতা জানে, সমীরের চোখ ওরই ছবির ওপর। ছবিতে সীতা হাসছে। কুনালের দু বাহুর গাঢ় আলিঙ্গনে নিজেকে স'পে দিয়ে হাসছে সীতা। দেখলেই বোঝা যায় সুখের আবেশে বিভোর সীতা।

কিন্তু সমীর কেন দেখছে ও ছবি? অতো কি দেখার আছে? স্বামী-স্ত্রী অমন ছবি তো তুলেই থাকে। ভীষণ খারাপ লাগে সীতার। ও বেশ বুঝতে পারে এই মুহূর্তে সমীরের মনের ভাব কি?

কিন্তু কি করতে পারে সীতা। সে তো আর জানে না ওর বিয়ের তিন বছর পরে হঠাৎ এই দুপুরে সমীর আসবে ওর সঙ্গে দেখা করতে। জানলে নিশ্চয়ই ঐ ছবিটা সীতা সরিয়ে রাখতো।

পর্দার এ পাশে দাঁড়িয়ে সীতা আবার চমকে ওঠে। সমীর পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো বলে তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছিলো। আশ্চর্য! সমীরের পাঞ্জাবীর কাঁধের কাছটায় অনেকখানি ছেঁড়া! ময়লাও হয়েছে খুব! পাঞ্জাবীর হালকা গেরুয়া রংটা ধুলো-বালির সঙ্গে মিলে মিশে অদ্ভুত রং ধরেছে। ধুতিটাও ছেঁড়া!

সীতা অবাক হয়। অবাক হবারই কথা। সমীরের গায়ে ছেঁড়া পাঞ্জাবী, ছেঁড়া ধুতি এ যে বিশ্বাসও করা যায় না। সীতার মনে পড়ে সেই কলেজের কথা।

গেরুয়া রং-এর পাঞ্জাবী আর ধুতি পরলে কি হবে, সমীর রোজ রোজ জামা-কাপড় বদলাতো। সীতা জানে জামা-কাপড় কোনদিনই ওর বেশি ছিলো না। তবু ভীষণ পরিষ্কার থাকতো সমীর।

সীতা তাই দেখে হাসতো। বলতো, "তুমি দেখছি আমাদের থেকেও টিপ-টপ থাকতে চাও!"

সমীর কিন্তু হাসতো না। গম্ভীর-ভাবে বলতো, "জামাকাপড় পরিষ্কার থাকলে, মনটা পরিষ্কার থাকে সীতা!"

হঠাৎ সীতার মনে হয় আজ কি তাহলে সমীরের মন পরিষ্কার নেই। অতো ময়লা জামাকাপড় সমীরের পরনে। চটিটাও কি ছেঁড়া? আবার উঁকি দেয় সীতা। কিন্তু দেখতে পায় না। সমীর তখনও পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখছে।

বিরক্ত হয় সীতা। বিরক্ত হয় সমীরের ওপরে, কুনালের ওপরে, নিজের ওপরেও! ভীষণ অসহায় মনে হয় নিজেকে। সীতা চাইছে না যে সমীর ঐভাবে ছবিটা দেখুক। সমীর যদি এখন সোফার ওপর এসে বসে তাহলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে সে। লজ্জা, অস্বাস্ত আর বিরক্তিতে বিব্রত হয়ে ওঠে সীতা।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন সীতার মনে চমক লাগায়। সমীর আজ এতোদিন পরে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা করতে এলো কেন? কি চায় সমীর?

ভাবতে চেষ্টা করে সীতা। কিন্তু কোন কূল-কিনারা পায় না। আবার সেই ভয়-ভয় ভাবটা ফিরে আসে। বুকের কাছটায় দুড় দুড় করতে থাকে।

সমীরের সঙ্গে সব সম্পর্কই তো তার চুকে গেছে। বড় তাড়াতাড়ি তার বিয়ের সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিলো। এতটুকুও অবসর পায় নি। তবু সে চেষ্টা করেছিলো সমীরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারে নি। নিজের ইউনিয়ন নিয়ে সমীর তখন এতো ব্যস্ত ছিলো যে এদিকে নজর দেবার মতো অবসর তার ছিলো না।

এতোদিন পরে তবে কি সমীরের সেই অবসর মিলেছে? সীতার মনের মধ্যে আবার সেই ভয়-ভয় ভাবটা ফিরে আসে।

না, আর সে ভাবতে পারে না। সমীরের মুখোমুখি যখন হতেই হবে, তখন আর দেরি করে লাভ কি, দেখাই যাক না, সমীর কি চায়? এতোদিন পরে আজ হঠাৎ সে কেন এসেছে সীতার সঙ্গে দেখা করতে।

আঁচলটা ঘুরিয়ে ভালো করে আবার গায়ে জড়িয়ে নিলো সীতা। ছোট্ট একটু ঘোমটা তুলে দিলো মাথায়। তারপর ডান হাতে পর্দাটা উঁচু করে ঢুকে পড়লো ঘরে।

সমীর তখন ফিরে এসে বসেছে সোফার কোণটায়।

সীতার পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকালো সমীর।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসে পড়লো সীতা। প্রাণপণে সে চেষ্টা করছে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে। তিন বছর পরে আবার সীতা সমীরের মুখোমুখি বসেছে।

সমীর দেখছিলো সীতাকে। আরো বুঝি সুন্দর দেখতে হয়েছে সীতা। সেই রোগাটে ভাবটা আর নেই। চোখের তলার তিলটার দিকে তাকিয়ে ছিলো সমীর। ঐ তিলটা ছিলো সমীরের ভীষণ প্রিয়।

সীতা মুখ নিচু করে ছিলো। কিন্তু ওরই ফাঁকে তার যা দেখার দেখে নিয়েছে। অনেক রোগা হয়ে গেছে সমীর। শুকিয়ে গেছে। কণ্ঠার হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়েছে। চোখের তলায় কালি। এলো-মেলো মাথার চুল। রুক্ষ। চান করে নি নাকি ক'দিন? মাথা নিচু করে সীতা দেখছিলো। যা ভেবেছে তাই। চটিটাও ছেঁড়া।

দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠেছিলো সীতা। এবার সমীরের ডাকে তাকায় তার দিকে।

"সীতা!"

সমীরের চোখে চোখ রাখে সীতা। তার মনে হয় সমীরের দু' চোখে বুঝি হাহাকার। কি বলবে ভেবে পায় না সমীর। চুপ করে থাকে। বিশ্রী সেই অস্বস্তিকর পরিবেশটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সীতা বলে,

"তুমি যে বড্ড রোগা হয়ে গেছো!"

সমীর উত্তর দেয় না। সীতার মনে হয় সমীর যেন কিছু বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু বলতে পারছে না। ততক্ষণে অনেক সহজ হয়ে গেছে সীতা। তাই নিজেই বলে,

"এতোদিন পরে হঠাৎ যে এলে?"

হঠাৎ সমীর এগিয়ে এসে সীতার হাতটা চেপে ধরে। তারপর উদ্ভ্রান্তের মতো বলে,

"সীতা, আমায় ক'দিন থাকতে দেবে তোমাদের কাছে?"

ঝট করে উঠে দাঁড়ায় সীতা। সমীরের ব্যবহারে বিরক্ত সে। সীতার হাত ছেড়ে দিয়ে সমীর সরে দাঁড়ায়। অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে সে সীতার দিকে।

সীতা নিজের মনে অস্ফুটস্বরে বলে, "সে কি করে হয়। কি বলে আমি তোমায় এখানে থাকতে দেবো।"

সোফার ওপরে বসে পড়ে সমীর। দু'হাতে মুখটা চেপে ধরে হাহাকার করে ওঠে সমীর,

"সীতা আমি খুন হয়ে যাবো, আমায় খুন করবে ওরা! যাদের জন্যে এতোকাল যুদ্ধ করেছি, আজ তারাই আমাকে মেরে ফেলবে।"

বাতাসে সমীরের গলার স্বর কাঁপতে থাকে। সীতার মনে হয়, সমীর যেন ঝড়-বৃষ্টিতে ভেজা অসহায় একটা কাক।

কিন্তু কি করবে সীতা। কি করতে পারে সে। কুনালকে তো সে চেনে। রাজ-নীতি পছন্দ করে না কুনাল। তার ওপর সমীরের দলের ওপর সে হাড়ে হাড়ে চটা। শুধু তাই নয়, কুনালের কাছে সমীরের কি পরিচয় দেবে সীতা।

রাণীধূপ
রূপকার প্রডাক্টস

না, এ হতে পারে না। এক সময় সীতা হয়তো সমীরের জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারতো। কিন্তু আজ তার কাছে কোন দাম নেই সমীরের। সমীর আজ তার কাছে মৃত।

নিজেকে সামলে নিয়ে সমীর তখন সীতার উত্তরের আশায় তাকিয়েছিলো তার দিকে।

আম্‌তা আম্‌তা করে সীতা। সমীরের মুখের ওপর না বলতে তার যেন বাধো বাধো ঠেকে। সমীর বুঝতে পারে সীতার মনের ভাব। বুঝতে পারে সীতার কাছে এইভাবে আশ্রয়ের আশায় আসা অন্যায় হয়েছে।

সমীরের মনে পড়ে বহু দিন আগের কথা। মনে পড়ে কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে সেই রঙীন দিনগুলোর কথা। মনে পড়ে সীতার কথা। সমীর বুঝি স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্ন মাখানো চোখ দুটি সে তুলে ধরে সীতার দিকে।

সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে সীতা। সমীরের ও দৃষ্টিকে ঠিক যেন সহ্য করতে পারে না সে। পালাতে ইচ্ছে করে তার সমীরের সামনে থেকে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় উঠে দাঁড়ায় সে,

"একটু বোস তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।"

চমকে ওঠে সমীর। সীতার কথায় আবার সে বাস্তবে ফিরে আসে। সীতার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে যে সীতা নেই। পর্দাটা দুলছে।

সীতা যেন যাবার আগে কি বলে গেলো। ভাবতে চেষ্টা করে সমীর, কিন্তু মনে করতে পারে না সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সমীরের মনের মধ্যে আর একটা ভাব জেগে ওঠে। হঠাৎ যেন সে বুঝতে পারে সীতার অবস্থাটা। মন-প্রাণ তার ছি-ছি করে ওঠে। এসে কি করছে। শেষকালে কি সীতার ঘর ভাঙবে সে। বিপদে পড়ে সে কি হারিয়ে ফেলেছে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকুও।

সমীরের মনে পড়ে ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে। আত্ম-গোপন করার আর কোন জায়গা না পেয়ে সে ছুটে এসেছিলো। তখন ভাবে নি কোন কিছু। ভাবে নি তাকে আশ্রয় দেওয়ায় সীতার অসুবিধার কথা।

আর সীতা। কতো বদলে গেছে সে। সমীর বুঝতে পেরেছে সীতার কাছে আজ আর তার কোন দাম নেই। অথচ একদিন ছিলো যখন এই সীতাই......

না সীতার ঘর সে ভাঙতে পারে না, পারে না সমীর সীতার শান্তির নীড়ে অশান্তির আগুন জ্বালাতে।

উঠে দাঁড়ায় সমীর। আর একবার এগিয়ে গিয়ে ছবিটাকে ভালো করে দেখে সে। সীতা আর কুনালের ছবি।

এবার কুনালের ছবিটাই দেখে সমীর। বুক চিরে বেরিয়ে আসা নিশ্বাসটাকে চেপে ঘুরে দাঁড়ায় সে। তারপর পরাজিত সম্রাটের মতো কোন দিকে না চেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

চায়ের জলটা যে ফুটে ফুটে শুকিয়ে এলো—সেদিকে কোন নজরই ছিলো না সীতার। কেটলি থেকে ফুটন্ত জলের বাষ্পগুলো দীর্ঘনিশ্বাসের মতো একটানা শব্দ করে বেরিয়ে আসছিলো। চোখ মেলেই ছিলো সীতা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলো না কিছুই। কেটলির ঐ শব্দটাকে তার মনে হচ্ছিলো সমীরের দীর্ঘশ্বাস।

সীতা ভাবছিলো, এই সমীর আর সেই সমীর। কতো তফাৎ। সেদিনের সমীর ছিলো তার কতো পরিচিত আর আজ যে লোকটা সমীর নাম নিয়ে বসে আছে বসার ঘরে, তাকে যেন চিনতেই পারে না সীতা।

সীতার মনে পড়ে ফেলে আসা দিন-গুলোর টুকরো-টুকরো ঘটনার কথা। মনে পড়ে কলেজজীবনে তার দিনগুলো। সমীরকে আশ্রয় করে কেমন যেন একটা আনন্দময় জগৎ সৃষ্টি করেছিলো।

আশ্রয়। চমকে ওঠে সীতা। আজ সমীর এসেছে তার কাছে আশ্রয় চাইতে। তাকে কি সীতা ফিরিয়ে দেবে?

না, তা পারবে না সীতা। সমীরকে সে আশ্রয়ই দেবে। কুনালকে সে চেনে। তার মন জানে। অবুঝ নয় কুনাল। সবই বুঝবে। আর আজকালকার দিনে স্কুল-কলেজে এমন ঘটনা তো ঘটেই থাকে। কে জানে হয়তো কুনালও......!

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি কেটলিটা নামায় সীতা। জলটা ফুটে ফুটে শুকিয়ে গেছে প্রায়। দু' কাপের মতন দিয়েছিলো। সমীরের জন্যে এক কাপ, আর এক কাপ ওর নিজের জন্যে। ঢাকনা খুলে সীতা জল দেখে। না, কাপখানেক হতে পারে। কিন্তু ও জলে চা করলে ভালো হবে না। তাই কফির কৌটোটা টেনে নেয় সীতা।

জলে গুলে চিনি আর দুধ মিশিয়ে তাড়াতাড়ি কফি তৈরি করে ও ঘরে চলে আসে সীতা।

ঘরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ায় সে। সমীর নেই। এদিক-ওদিক তাকায় সীতা। কাপটা টেবিলের ওপর রেখে বাইরে গিয়ে দেখে সে। না সমীর নেই। চলে গেছে।

ঘরে ফিরে এসে বড় সোফাটার কোণে স্তব্ধ হয়ে বসে পড়ে সীতা। একটু আগে সমীর বসেছিলো সেইখানে। সীতা ভাবে সমীরের কথা, বোঝে কেন সে চলে গেলো। অজান্তেই সীতার চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে ওঠে।

টেবিলের ওপর কফির পেয়ালা থেকে তখনো ধোঁয়া উড়ছে অল্প অল্প।

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ছয় ॥

নয়ন পালাতে বললে। কিন্তু ভলু মাঝির পালাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বরং এমনি নিরালায় দাঁড়িয়ে আরও দু-চারটে কথা বলে, পুরোনো কথা—তার নিজের সুখ-দুঃখের দুটো কথা জানায়, এমনি ইচ্ছে করে। এ শুধু তার হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া নয়—যেন হিয়ের হারিয়ে যাওয়া জিনিস হঠাৎ আবার খুঁজে পাওয়া। ভুলেই গেল সে নুন খুঁজতে এসেছে।

নয়ন মনে করিয়ে দিলে। বললে, "তুমি তো নুন খুঁজতে এসেছ। খুঁজে দেখ।"

ভলু মাঝির কানে শোনাল অন্য রকম। হেসে বললে, যদি বলি—নুন নয় নয়ন, ভের দিন ধরে যাকে খুঁজেছিলম—তাকেই খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছিলম। যদি বল—এতদিন ছিলে কোথা? —এতদিন এই ঘরটা জানতমনি নয়ন। জানই তো—এ তল্লাট মোর বাপের হুদ্দা। আসব কোন ছলে?"

ওর ভাব সাব দেখে নয়নের গলা শুকিয়ে গেল। বললে, "তোমার ভয় ডর নাই—ওরা যে এসে পড়ল!"

"ভয় ডর মোর কম—ই কথাটা কি নতুন জানলে নয়ন?"

ওর অনড় অটল ভঙ্গির মধ্যে সে কথাটা খুবই স্পষ্ট। মাথায় ছ' ফুটের ওপরে লম্বা, বাবরি চুল, বড় বড় জুলফি—লোকটা সেই একভাবে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে।

হাসতে হাসতে বললে, "মনে নাই সে রাতের কথা! তোমার মায়ের দরজাও ভেঙেছিলম, তোমাকে পাঁজকোলাও করেছিলেম।" একটু থেকে ভলু সখেদে বললে, "তোমার মায়ের ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাপ তোমার বড় নিষ্ঠুর নয়ন। পণের টাকা দিতে পারলমনি বলে জোর করে তোমার এই ঘরে বিয়ে দিল। কিন্তু বলো—হিয়ের টানের চেয়ে কি টাকাটাই বড়?"

লম্বা চওড়া এই জোয়ান লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে নয়নের সর্বাঙ্গ সহসা কন্টকিত হয়ে উঠল। এই বুঝি আবার তেমনি পাঁজকোলা করে তুলে নেয়! ঝট করে পেছন ফিরে নয়ন বললে, "আর নয়—আমি যাই।"

"একটা কথা শুধু বলে যাও।"—খপ করে একটা হাত চেপে ধরলে ভলু মাঝি।

"ছাড়—ছেড়ে দাও।" হাত ছাড়াতে চাইল নয়ন।

"যদি না ছাড়ি!"

"মোর মরদ ঘরে নাই। থাকলে এ কথার জবাব দিত।"

"দিত!"

"হ্যাঁ—দিত। একদিন মোর বাপ যেমন দিয়েছিল—আজ সে দিত।"

মুহূর্তে ভলু মাঝির হাসি হাসি মুখ কেমন ক্রূর আর কঠোর হয়ে উঠল ঝামাপোড়া ইটের মত। তার পৌরুষ আর প্রেমের বিহ্বলতা গর্ গর্ করে উঠল—যেন খোঁচা খাওয়া বাঘ। বললে, "তাই বুঝি সে মরদ চেকনচাকন নুতন বৌটাকে পুলিশ চৌকিদারের মুখে ঠেলে জঙ্গলে পালিয়েছে?"

নয়ন খেপে চাপা গলায় বললে, "তবে দাঁড়াও—তাকে ডেকে দিচ্ছি।" বলে ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নয়ন খিড়কী দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

"বেশ, দাঁড়িয়ে রইলম।" ভলু বললে, "আজ মোকাবিলা করে যাব।"

সশব্দে বাঁশের আগড়টা বন্ধ হতে না হতে সাগর খুড়ির দল ডাকতে ডাকতে হাজির, "নয়নবৌ—কোথা গেলি?"

"ওই তো ঘরে যেয়ে ঢুকলো তোমাদের নয়নবৌ গো।" ভলু মাঝি হাসি হাসি মুখে সেই মাত্র বন্ধ হওয়া দরজাটা দেখিয়ে বলল, "ভয় পেয়ে গেল—তোমাদেব হাঁক-ডাকে তরাসে ছুটে পালাল।"

হাতের ঝাঁটা হাতে রইল। সাগর খুড়ি হেন লোক ভলু মাঝির কথায় থত-মত খেয়ে গেল।

ভলু বললে, "আমি তার বাপের দেশের লোক মাসী—চৌকিদার হই আব যা হই। সেই ছোটটি থেকে তাকে জানি। এতক্ষণ তার বাপের ঘরের খবর-টবর শুনছিল—আর কি।" বলতে বলতে সাগর খুড়ির দলকে পাশ কাটিয়ে ভলু মাঝি গট গট করে নির্বিবাদে বাঁধ রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ এ রকম একটা পরিস্থিতির জন্য সাগর খুড়ি তৈরি ছিল না। হরি-দাসীর দিকে চেয়ে বললে, "ওকে চেন নাকি মুকুন্দের-মা?"

মুকুন্দের মা বললে, "আমি তো কখনো দেখি নি।"

'ডাক নয়নবৌকে।"

নয়নবৌ নিজেই বেরিয়ে এল ওদের সাড়া পেয়ে।

সাগর খুড়ি বললে, "কই বৌ চেঁচালি নি—মোদের ডাকলি নি?"

নয়নবৌ মুখ নিচু করে চুপ করে রইল।

সাগর খুড়ি জিজ্ঞেস করলে, "ও তোর বাপের দেশের লোক?"

নয়ন শুধু বললে, "হুঁ।"

"তাই চেঁচালি নি?" সাগর খুড়ি বললে, "আর সে মোদের চরে ঢুকে—ঘরে ঢুকে সব দেখে গেল! গুলামের ব্যাটা গুলাম চৌকিদার থানা থেকে এসেছিল সন্ধান নিতে—নিযে চলে গেল?"

নয়ন নীরস গলায় শুধু বললে, "সন্ধান সে কিছুই করে নি।"

"ভাল—না করলেই ভালো।" সাগর খুড়ি কিছুটা ক্ষুব্ধ কিছুটা বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেল।

জেরার মুখ থেকে পার পেয়ে হাঁফ ছাড়ার কথা নয়নের—কিন্তু হাঁফ ছাড়া দূরের কথা, বরং ভেতরে ভেতরে দম যেন তার বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আজকের কয়েক দণ্ডের একটা চাপা নাটক—চাপাই থেকে গেল। কিন্তু একটা অপরাধবোধের ভারে মনে মনে ছটফট করতে লাগল।

ধরপাকড় এড়াবার জন্যে পুরুষেরা আড়ালে সরে গিয়েছিল—মহেশের কথা মতো। আবার কাকে ধরবে—কে বলতে পারে। চৌকিদাররা চলে যাওয়ার পর একে একে ঘরে ফিরে এল সবাই।

মহেশ বললে, "সাগর খুড়ি বাপের বেটি—দেখিয়ে দিয়েছে।"

সাগর খুড়ি ক্ষোভে ফেটে পড়ল, "সবটা আর দেখাতে পারলম কই ছোট-মণ্ডল—মুকুন্দের বৌ শেষটায় ভেস্তে দিলে।"

"মুকুন্দের বৌ ভেস্তে দিল?"

ঘটনাটা বললে সাগর খুড়ি।

সকলের চোখ গিয়ে পড়ল মুকুন্দের দিকে। সকলের চোখে একই জিজ্ঞাসা।

মুকুন্দ বললে, "আমি বৌকে সাবধান করে দেব।"

ঘরে এসে নয়নকে জিজ্ঞেস করলে, "তুই চেঁচালি নি কেন বৌ? সকলে বলছে।"

এখন মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করছে নয়নের—সে চেঁচাতে পারল না কেন? কেন লোকটাকে সে আড়াল করতে গেল?

তার কেবলি ভয় করতে লাগল—দুঃসাহসী লোকটা আবার কোনো ছলে আসবে। একবার দেখে গেছে যখন—না এসে সে পারবে না।

মুকুন্দের বুকের কাছে ঘনিয়ে এসে নয়ন শুধু বললে, "তুমি আমায় মারো—পরাণ ভরে মারো। তোমার যতো খুশি। —কেন আমি চেঁচাতে পারলম নি, কেন মোর গলা দিয়ে রা ফুটল না, কেন আমি বাদ হয়ে গেলম!" বলতে বলতে সে মুকুন্দের চওড়া বুকের মধ্যে পাগলের মত মুখ ঘষতে লাগল।

তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। জেলা বোর্ডের সড়কের ওপরে ভলু মাঝির সঙ্গীরা অপেক্ষা করছিল। ভলু ফিরে এল সকলের শেষে। গিয়েছিল একটা পুরো জোয়ান মরদ—ফিরে এল আধখানা হয়ে। সবাই বুঝলে—গুরুতর একটা কিছু ঘটে গেছে।

তার থমথমে ভাবভঙ্গি দেখে মাধব সাঁট বলে উঠল, "মারল?"

ভলু তার দিকে কটমট করে শুধু তাকাল।

মাধব বলল, "আরি বাপরে বাপ—আর পিঠের ওপরে সপাং সপাং করে যে মারল দুটো ঝাঁটার বাড়ি! সেই বুড়ি পেত্নীটা। বলে—লোচ্চামি করতে ঘরে ঢুকেছি। খস্!—শাখ চুন্নিটার চেল্লান শুনে যত রাজ্যের ছুঁড়ি-বুড়ি ছিল—রে-রে করে তেড়ে এল ঝাঁটা উঁচিয়ে।"—বলে সে একটু থামল। আবার সক্ষোভে বললে, "বলো—মোরা হলম চৌকিদার—তো—মোরা লোচ্চামি করতে গেছি! বলো?"

ভলু মাঝি আবার কটমট করে তাকাল।

রাখাল বললে, "মোকে মারতে পারে নি। ই শালার ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে এক ফাঁকে গলে পড়লম।"

কচি শেখ বললে, "মোকে ঘিরে ফেলেছিল আর একটু হলে। তো এক লাফে খালো পার।"

রাখাল বললে, "আর সেই বুড়ি শাখ চুন্নিটার কি গালাগাল রে মশয়—মোর চোদ্দপুরুষ একবারে চটকে দিয়েছে।"

"ধুত্তোর।" মাধব তার একমাত্র সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে, "এর চেয়ে মোর খোপার কাম ভালো।"

ভলু মাঝি কিন্তু একটি কথাও বললে না। সড়কের ধারে তার সঙ্গীদের পাশে এসে যেমন গোমড়া মুখ করে বসে পড়েছিল—তেমনি বসে রইল।

রাখাল বললে, "আর বসে থেকে কি হবে। অন্ধকার হয়ে গেল। থানায় যাবি তো?"

"সে কাল যাব।" ভলু বলল, "কাল সকালে যেয়ে যা বলবার আমি বুঝিয়ে বলব।"

"সেই ভাল।" সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

মাধব বললে, "কি বলতে কি বলে বসবো মোরা। দারোগা খেপে যাবে ফের।"

ভলু একভাবে চুপচাপ গোঁ মেরে বসে রইল তো রইলই।

রাখাল বললে, "তো চল—ঘরে যাবি তো?

ভলু শুধু বললে, "তোরা চলে যা। আমি পরে যাবো। একটু ঘুরে যাব।"

ওর কথায় আর ভাবভঙ্গিতে মাধবের কৌতূহল আর সন্দেহ দুই-ই বেড়ে গেল। চোখ পিট পিট করে বললে, "তো তুই এখেনে কি করবি? এ্যা—অন্ধকারে আবার চরের ভেতরে ঢুকবি? বিপদ আছে কিন্তু।"

খেপে গেল—ভলু মাঝি খেপে একেবারে ফেটে পড়ল, "যা শালা তুই তোর খোপার পাটে—মোর কথায় তোর কাজ-কি!" বলে নিজেই সে ছিটকে ওদের দল ছেড়ে একদিকে এগিয়ে গেল।

"অর মেজাজ খারাপ!" রাখাল বললে, "চল মোরা যাই। অর মাথায় আজ পোকা কামড়েছে।"

ওরা চলে গেল। আর ভলু মাঝি সেই ঝিলমিলে অন্ধকারে এগিয়ে চলল।

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হল।
ভিয়েতনামের সংগ্রামী নেতা। সমগ্র পৃথিবীর বহুল আলোচিত রাষ্ট্রনায়কের রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী

হো চি মিন

বাদল চট্টোপাধ্যায়
দাম পাঁচ টাকা

সুন্দর মুদ্রণ। শোভন বাঁধাই। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ ও দুষ্প্রাপ্য আর্টপ্লেট
প্রকাশক। কিশোর সাহিত্য সংঘ। ৭৩ স্বামীজী সরণী। কলি: ৪৮
বরেণ্য রাষ্ট্রনায়কের ঊনআশীতম জন্মদিনে তরুণ প্রকাশকের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

আমাদের বই কলেজ স্ট্রীটের সব দোকানে পাওয়া যাবে।
সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার জন্য চিঠি লিখুন:—

খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সামনে চরে এ্যাকবার আর একটা ছোট রাস্তা—সড়ককে ছঁুয়ে এ'কেবে'কে চলে গেছে খালের ধারে। ওদিকে বসতি নেই বললেই হয়। সড়ক থেকে ওদিকে গাছ-গাছালির ভেতরে শুধু একটি মাত্র কুঁড়ে দেখা যায়। সেই কুঁড়েটার দিকে চেয়ে ভলু মাঝি থমকে দাঁড়াল। মনে হলো—চিনতে পেরেছে। একটা কুরিবাঁধা বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আরও ঘনতর অন্ধকারের অপেক্ষা করতে লাগল।

আকাশে শেষ আলোটুকুর পাট চুকিয়ে শরতের সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসছে। সড়কের কোলে সামান্য হাত-কয়েক নয়ানজুলি বাদ দিয়ে শুরু হয়েছে ধানক্ষেত। সারা চর জুড়ে ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাসে থৈ থৈ করা সবুজ সমুদ্র...মাঝ-খানে ছড়ানো ছোট ছোট কুঁড়ে...কোথাও দলা বাঁধা গাছ-গাছালি—আর দূরে পূব সীমান্তে সেই জালপাই জঙ্গল, অন্ধকারে ধীরে ধীরে সব একাকার হয়ে গেল। এখানে ওখানে জ্বলে উঠল এক-একটা টিমটিমে আলো মালচে ফুটকির মতো।

— সড়কের পুবে চর—পশ্চিমেও দিগন্ত-

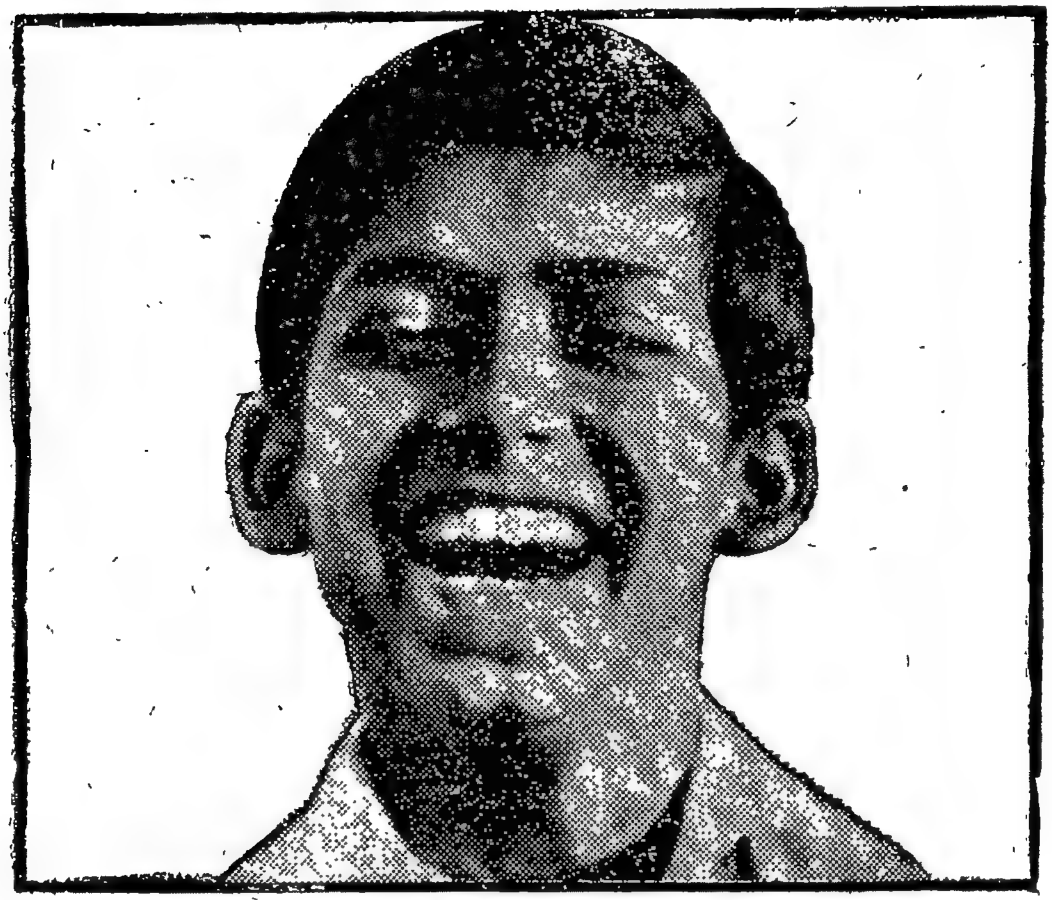

ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করলে

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত সুস্থ, সবল, সুন্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাকে। মুখ স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়।

সাধনা দশন

একটি আদর্শ দাঁতের মাজন

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র:
ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কোঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

৫০.২/৬৪

বিসারী আবাদ। তার পাশে পাশে ছোট ছোট গ্রাম। সেদিক থেকে একটি দুটি করে লোক সড়ক পার হয়ে চরের সেই সরু আঁকাবাঁকা রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে নেভানো লণ্ঠন। কেউ সড়কে উঠে চণ্ডমণ্ড করে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে সুড়ুৎ করে উঁচু সড়ক থেকে নেমে গেল চরের নামাল রাস্তায়।

ভলু মাঝি অনেকক্ষণ তাদের চেয়ে চেয়ে দেখলে। তারপর নিজেও সে সড়ক ছেড়ে সেই আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলল। দু' পাশে ধানক্ষেত—গাছ উঁচু হয়ে উঠেছে বুক পর্যন্ত। তারই মাঝখান দিয়ে নোনা মাটির সরু পথের রেখা আকাশের তারার আলোয় মিনমিন করছে। সেই পথ ধরে ঠাউরে ঠাউরে ভলু মাঝি এসে দাঁড়াল একটা কুঁড়ের সামনে।

লাউ কুমড়ো লতিয়ে উঠেছে খড়ের চালে, উঠোনে মাচায় লতানো ঝিঙে—সন্ধ্যের পরে ফুলে ফুলে ভরে গেছে। ওই লতাপাতার আড়াল দিয়ে দেখা যায়—দাওয়ায় টিমটিম করে আলো জ্বলছে একটা। নিস্প্রভ আলোয় ছায়া ছায়া ক'টি মানুষের মুখ।

ভলু মাঝি ডাকল, "যমুনা আছ—যমুনা!"

"কে!" একটি কর্কশ গলা সাড়া দিল, "যমুনাকে কে ডাকছ গো! যমুনা প্রবাহিনী মোদের ঘাটে এখনো আসে নি বাপ—মোরা সব তেষ্টায় হাঁ করে বসে আছি।"

মৃদু একটা হালকা খলবলে হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল।

তারপর সাড়া এল—সেই কর্কশ গলার জিজ্ঞাসা, "কে—ডাকে কে?"

"আমি চৌকিদার।"

"হাই মরেছে!" সেই কর্কশ গলাটার টিপ্পনী শোনা গেল, "ই তো যমুনার খালাড়ি নয় বাপ—কুঞ্জ, আখড়া। ভুল করেছ।"

বলতে বলতে মুখের ওপরে আলো নিভিয়ে দিলে।

সব চুপচাপ। সাড়াশব্দ আর কিছুই পাওয়া গেল না।

থতমত খেয়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইল ভলু। আবার ডেকে জিজ্ঞেস করলে, "যমুনা নাই?"

আলোও জ্বলল না—আর কেউ সাড়াও দিল না।

ভলুর ইচ্ছে হলো—ছুটে গিয়ে সব ক'টার গলা টিপে ধরে কিন্তু তাতে তার কাজের সুরাহা হবে না। অগত্যা মনের রাগ মনে চেপে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে যেমন চুপচাপ এসেছিল তেমনি ফিরে চলল হতাশ হয়ে।

ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল যমুনা বোষ্টমীর সঙ্গে। হাতে একতারা, কাঁধে ঝোলা—বেঁটেখাট মেয়েলোকটি, আঁটসাট শরীর। বছর চব্বিশ বয়স হয়ত হবে। কিন্তু খাটো মাথায় সে বয়সটুকুও মানায় না। সামনে এসে থমকে দাঁড়াল।

উজ্জ্বল চোখ ওর—বেড়ালের মতো শিকারসন্ধানী, তীক্ষ্ণ। চিনে ফেললে ঠিক। অবাক হয়ে বললে, "চৌকিদার!"

ভলু বললে, "এলম যমুনা।"

"বাপের হুন্দায় ব্যাটা?" যমুনা বলল, "ব্যাপার কি গো দাদা!"

ভলু বললে, "তোর আখড়ার দরজা থেকে ঘুরে এলম—কেউ বসতেও বলল নি। বরং ফস করে আলো নিভিয়ে দিল।"

"এ মা গ!" বলে যমুনা খিল খিল করে হাসতে হাসতে ভলুর প্রায় গায়ে টলে পড়ল। বলল, "ভয়ে গো দাদা—ভয়ে। বাউল বৈরাগী মানুষ মোরা—চৌকিদার শুনে ভয় পেয়ে গেছে বোধহয়। দিনকাল খারাপ তা।"

"তা চৌকিদার কি মানুষ নয় যমুনা?"

"সে বুড়া এ মানুষকে চিনবে কি!" চাপা গলা, চোখে বিদ্যুৎ—ভলু মাঝির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যমুনা বলল, "সে চিনি আমি!"

ভলুর চোখ জ্বলে উঠল—দেহকাণ্ডের আদি অন্তে যেন পৌরুষের আথালি-পাথালি। দুটো উন্মাদ বলিষ্ঠ বাহু যেন আপনি প্রসারিত হয়ে গেল।

ঝপ করে একটু পেছিয়ে গিয়ে যমুনা একটা হাত ধরে টানতে টানতে বললে, "এখন চল ভলুদাদা। আখড়ায় চল। মোর দুয়ার থেকে ঘুরে যাবে, সেটি হবে নি।"

"ঘুরে যেতে তো আসি নি যমুনা।" কেমন মরা মরা গলায় ভলু বলল, "ইদিকে এসে পড়েছিলম। মনটা ভাল নাই। ভাবলম—যাই যমুনার একটু গান শুনে।"

"ঠাট্টা করছ ভলুদাদা!"

"ঠাট্টা! হাটে বাজারে—গিরস্ত ঘরে সবাই যখন ডেকে তোর গান শোনে, তারা কি ঠাট্টা করে?"

তা করে না। যমুনা জানে। সবাই বলে—তার গলা বড় মিষ্টি।

যমুনা গাঢ় গলায় বলল, "সে মোর গুরুর দয়া। চল—আজ পরাণ ভরে তোমায় গান শোনাবো।"

ভলু বলল, "ভাঙের জলটল এক-আধটুকুন হবে তো? সেই কবে একবার খেয়ে গেছলম—আজও ভুলতে পারি নি।"

"সে মোর ভাণ্ডড় বৈরাগীর দয়ায় তোমার আশা মিটবে।" আড় চোখে চেয়ে যমুনা হাসল। চোখ ঘুরিয়ে, ভলুর আরও গা ঘেঁষে এসে বলল, "তার জন্যেই তো মোর আজ এত দেরি হয়ে গেল গো!"

ভলু মাঝি নীরবে ওর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। তার কোনো কৌতূহল ও বিষয়ে দেখা গেল না। গেলে একটু ভাঙের সরবৎ পাওয়া যাবে—এতেই সে খুশি।

কিন্তু যমুনা ভেবেচিন্তে কথাটা আবার তুললে। সহসা তার মনে হলো—এ লোকটাকে দিয়ে তার কাজ আদায় হবে। বললে, "বাজারে সেই কখন গেছি! আবগারী দোকানের সামনে বসে আছি তো বসে আছি। কেউ ঢুকতে পারছে না।"

"ঢুকতে পারছে না! কেন?"

"সে তুমি শোন নি?"

"কি শুনব?"

"বাজারে অবগারী দোকানে আজ বড্ড গোলমাল।"

"কিসের গোলমাল যমুনা!"

যমুনা বলল, "কোথা থেকে আজ সব কলেজ ইস্কুলের ছেলেরা এসে জুটে গেছে গো—আবগাবী দোকান ঘিরে ফেলেছে। বলে—কারুকে আর নেশাভাঙ করতে দিবে নি।"

"বটে!" ভলু মাঝি বলল, "ব্যাটারা নুন থেকে ভেগে এখন আবগারীতে গেল! কিন্তু অদের কেউ তো আব ছিল নি যমুনা!"

যমুনা বলল, "সব আবার নতুন দল এল।"

"ই শালা ফের জ্বালাবে।"

"তাই তো বলছিলম গো।" যমুনা বলল, "দোকানে ঠেলে ঠুলে ঢুকতে গেলম—তো সামনে সব লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।"

"তো ডিঙিয়ে চলে যাবি!"

"এ মা গ!" যমুনা ফের খিল খিল করে হেসে বললে, "আমি মেয়েমানুষ না! কোঁড়া কোঁড়া সব চ্যাংড়াগুলা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে—যাব কমনে?"

ভলু মাঝি কপাল কুঁচকে আবার বলল, "ই শালা ফের জ্বালাতন করে মারবে।"

যমুনা বলল, "কত করে হাতে পায়ে ধরে বললম—দেখ বাবু, নেশা একটু না পেলে বুড়া বাউল বৈরাগী মোর পেট ফুলে মরে যাবে। তো সে কথা কানেই তুললো

নি। তারপর অন্ধকার হল—দোকানি নিজে এক ফাঁকে বাইরে এসে জোলায় ফেলে দিয়ে গেল। চিনা লোক মোর কতদিনের—তাই পেলম।"

ভলু মাঝি বলল, "এ রকম করে আর কতদিন চলবে?"

"তাই তো তোমাকে বলছি ভলুদাদা।" যমুনা ওর হাত চেপে ধরে বলল, "এই মালটি পাওয়ার ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতে হবে। টাকা-পয়সার জন্যে তোমার ভয় নাই।"

ভলু মাঝি রাজী হয়ে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "দেখ যমুনা—যেমন করে পারি জোগাড় করে দেব। ভলু মাঝির অসাধ্য কিছু নাই।"

"দাদা গো দাদা।" যমুনা ডগমগিয়ে উঠে বলল, "আজ কি ভাগ্যগুণে তোমার সাথে দেখা গো। গুরু—গুরু—গুরু।"

আখড়ার সামনে এসে পড়ল ওরা। বাঁশের আগড় লাগানো। নিজের হাতে খুলে যমুনা হেসে বললে, "এস দাদা এস—তখন ঘাট হয়েছিল—অপরাধ নিও নি।"

যমুনার পেছনে পেছনে এগিয়ে গেল ভলু মাঝি।

দাওয়া তখনো অন্ধকার। বোধ করি ভরসা করে তখনো আলো জ্বালা হয় নি। চুপচাপ সব অন্ধকারে বসে ছিল।

যমুনা দাওয়ায় উঠে বলল, "বলি সব অমাবস্যের মশান চাগিয়ে বসে আছ নাকি। আলো জ্বাল না।"

সেই কর্কশ গলার-সুরেলা সাড়া উঠল, "যমুনে—এলি। আহা—

যমুনে এই কি তুমি
সেই যমুনার প্রবাহিনী,
ও যার বিশাল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্ত মণি!"

আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু লণ্ঠনের সেই মিনমিনে আলোতে যমুনার পেছনে যাকে সবাই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তাতে সকলের চোখ যেন ভয়ে ঠেলে বেরিয়ে এল। হাঁ করা মুখ দিয়ে কারুর আর সাড়াশব্দ বের হলো না। আশপাশের দু-একজন চোরের মত পালাবারও চেষ্টা করলে।

ওদের ভাবভঙ্গি দেখে যমুনা খিল খিল করে হেসে বললে, "মরণ সব—বলি ভয়ের কি আছে! এ মোর কতদিনের চৌকিদারদাদা।"

"ব্যস—আর বলতে হবে নি।", ভাণ্ডড় বাবাজী কর্কশ গলায় বলে উঠল, "মোর যমুনার ধারায় কি ভয়ের জিনিস ভেসে আসতে পারে গ!"

"তো তখন এসে মোকে ডাকল—আলো নিভিয়ে দিলি কেন বল্যা?" যমুনা ঝামটে উঠল।

"চিনতে পারি নি—অপরাধ নিও নি বাপ।" ভাণ্ডড় বাবাজী একটা পিঁড়ি সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, "বসো রাজা—বসো। দণ্ডবৎ।"—হাত জোড় করে গড় করলে। আবার বললে, "অপরাধ নিও নি রাজা।"

যমুনা হাসিতে উছলে পড়ে বললে, "মরণ। মোর চৌকিদারদাদাকে রাজা রাজা করছিস কেন!"

"যমুনে—তুই বুঝবি নি।" ভাণ্ডড় বাবাজী হাত জোড় করে বললে, "ওরে—রাজার কোন অঙ্গ ছোট আর কোন অঙ্গ বড়? তাঁর সব অঙ্গই যে রাজা!"

"আজ সাঁঝ পহরেই দেখি রঙে ধরেছে।" যমুনা চোখ পাকিয়ে বললে, "যেটুকু বেটে রেখে গেছলম—সবটুকু একলা গিলেছ বোধ করি?"

"গুরু—গুরু—গুরু। সবাইকে শুধো—পেসাদ পেয়েছে কিনা?"

"খেয়ে মরেছে।" যমুনা ভলুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, "একটু বসো দাদা—তোমার জন্যে আলাদা তৈরি করে দিচ্ছি।" বলে যমুনা ঘরে ঢুকে গেল।

ভাণ্ডড় বাবাজী চোখ বুজে ভর হয়ে বললে, "তোর ভাঁড়ার অক্ষয় হোক—দে, রাজাকে ভালো করে তৈরি করে দে। বুঝলে রাজা—যা চাও তাই পাবে। ও কন্যেটি হল সেই বশিষ্ঠমুনির দুধেল গাই—কামধেনু।" একটু থেমে আবার বললে, "যদি উড়ু উড়ু মনপাখিকে খাঁচায় ভরতে চাও তো ভাঙ খেতে পার। যদি সংসারের ঝঞ্ঝাট ভুলতে চাও—গ্যাঁজা খাও, কিছুই তোমার মনে থাকবে না। ছায়াবাজীর মত সব তোমার চোখের সামনে মিলিয়ে যাবে। আর যদি রসের সাগরে একেবারে তলিয়ে যেতে চাও রাজা—তবে গুলি খাও। মোদের কিস্টদাস একটি গান বেঁধেছে বড় ভালো। বলো না—ও কিস্টদাস?"

কিস্টদাস দেয়ালে ঠেস দিয়ে ভর হয়ে বসেছিল। আদেশ পাওয়া মাত্র গুন্ গুন্ করে উঠল। গাইলে—

গুরু নামে শোধন করে গুলি খাও
মন গুরু বলে।
কি ছার অনন্তশয্যা—শুয়ে রবে
সিন্ধু জলে॥

"হাই দেখ আটকুড়ির বেটি।" ভাণ্ডড় বাবাজী বলে উঠল।

"বাজার থেকে মোদের মাল কি এল—দিল নি। বলি—অ যমুনে!"

যমুনার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ভাণ্ডড় বাবাজী তার কর্কশ গলায় কি একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগল।

[ক্রমশ]

প্রকাশিত হল

পাপুর বই

এই বইটি হাতে পাবার জন্য পাঠক জগতে এত উৎসাহ সাম্প্রতিককালে আর দেখা যায় নি। সাড়ে-আট বছরের ছেলে পাপু আকস্মিকভাবে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে গেল। ছেলেটি আপন মনে ছবি আঁকত আর লিখত—সাহিত্যের দরবারে তার প্রবেশ ঘটেছিল অনায়াসে। পাপু-হীন পাপুর জন্মদিন উদ্‌যাপনের জন্যে ওর বাবা মা পাপুর আঁকা ও লেখার কিছু সংকলন করে একটি বই প্রকাশ করলেন 'পাপুর বই'; পাপুকে যারা ভালবাসত তাদের দিলেন, বইটা তাদের কাছে স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকুক। সাহিত্যের বড়দের কাছে সে বইটা এসে পৌঁছলে তাঁরা বুঝলেন এক অসামান্য প্রতিভাধরের স্বাক্ষর ছিল ছেলেটির মধ্যে। বইটা পাবার জন্যে অভূতপূর্ব চাহিদা এল পাপুর বাবা-মা'র কাছে। তারই ফলশ্রুতি পাপুর বই-এর এই নতুন সংস্করণ। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পাপুর বাবা-মা ঠিক করেছেন বইটির লভ্যাংশে নিজেদের আয়বৃদ্ধি না করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে অ ব্যয় করবেন।

বোর্ড বাধাই। বহু ছবি। রঙীন আর্টপ্লেট

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ৯ (৩৫-৭৬৬৯)

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

আজকের আলোচনা সুরু করার আগে গত ১লা মে সাপ্তাহিক বসুমতীতে জলপাইগুড়ির পত্রপ্রেরক শ্রীবাচ্চামোহন রায় যে প্রশ্ন করেছেন দু'কথায় তার উত্তর দিতে চাই। প্রথমেই শ্রীরায়কে তাঁর পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাই। তিনি যদি ১৭ই এপ্রিলের সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমার লেখাটি একটু মন দিয়ে পড়তেন তাহলে আমাকে ভুল বুঝতেন না। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতেন সেখানে "বাঙ্গাল" এবং 'বাহে' শব্দ দুটো কমাচিহ্নিত। কারণ ঐ কথা দুটি আমি তদানীন্তন গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তাদের মুখের কথা হিসাবেই ব্যবহার করেছি। ওটা আমার কথা নয়। আমি ভাষাতত্ত্ববিদ নই এবং এখানে রাজবংশী ভাষার উৎপত্তি নিয়ে আলোচনার প্রশ্নও ওঠে না। সে সময় কলকাতার ভদ্রসমাজে আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধে যে তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল তা বোঝাবার জন্যই আমি সে শব্দগুলি ব্যবহার করেছি। উত্তরবঙ্গে যেমন 'কতিপয় ভদ্রব্যক্তি' স্থানীয় অনুন্নত রাজবংশীদের তাচ্ছিল্যভরে বাহে বলতেন তেমনি রাজবংশীরাও সেই সব বহিরাগত ব্যক্তিদের তাচ্ছিল্যভরে "ভাটিয়া" বলতেন। 'বাহে' শব্দটা যেমন আপত্তিকর 'বাঙ্গাল' শব্দটাও তেমনি আপত্তিকর। এটা শুধু ভাষাতত্ত্বগত বিষয় নয়। সমাজবিবর্তনে বিশেষ সময়ে বিশেষ ব্যবহার বা অপব্যবহারের বিষয়ও বটে। বাংলাদেশের পশ্চিমে বাঙ্গাল শব্দটা সদর্থে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু পূর্বপ্রান্ত আসামে ব্যবহৃত হয় কদর্থে। আবার খোদ বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের লোক পূর্ববঙ্গের লোকদের লক্ষ্য করে কদর্থে তা ব্যবহার করেন। এটা ভাষাতত্ত্বের ব্যাপার নয়। আজ 'উড়ে' শব্দটা জাতিবিদ্বেষগন্ধী আপত্তিকর শব্দ, কিন্তু একসময় অতীতে সেটা জাতিগত পরিচিতি হিসাবেই ব্যবহৃত হতো—যদি তা জাতিগত তাচ্ছিল্যপ্রসূত হতো তবে জনপ্রিয় কবিয়াল গোপাল উড়েকে কেউ এ নামে সম্বোধন করতো না কিংবা রবীন্দ্রনাথ 'দুই বিঘা জমিতে 'ঝুঁটিবাঁধা উড়ে সপ্তমসুরে পাড়িতে লাগিল গালি' লিখতেন না। রবীন্দ্রনাথ জাতিবিদ্বেষমুক্ত ছিলেন।

যা হোক আমি যে 'বাহে' শব্দটা রাজবংশীভাষা ও জাতিদের প্রতি তাচ্ছিল্যভরে ব্যবহার করি নি এখানে তা পরিষ্কার। রাজবংশীজাতির আবহমান ঐতিহ্যের অনুপম সৃষ্টি ভাওয়াইয়া গান আবেগের তীব্র আকৃতিতে, রচনার জীবনঘনিষ্ঠতায় এবং সুরের প্রাণমাতানো আবেদনে বাংলা সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। চিরদিন তা মুরশিদের দিল-দরিয়ায় ঢেউ তুলে আসছে। তাছাড়া মুরশিদ মনে করেন কোনো জাতি বা উপজাতি ও তাদের ভাষা বা উপভাষা সম্পর্কে এতটুকু তাচ্ছিল্যের ভাব যার আছে—লোকসংগীত চর্চার কোনো অধিকার তার নেই।

লোকসঙ্গীতের রূপান্তরের রূপরেখা

পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে নাগরিক ব্যবসায়ী ভেজাল লোকসংগীতের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে বলেছিলাম—জাতীয় জীবনের এই ভাঙনটাই একমাত্র সত্য নয়। তার বিপরীত ধারা হিসাবে সংগ্রামী বৈপ্লবিক চেতনাও ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এবং এই নবচেতনাই নবসংস্কৃতির যেমন ভিত্তি রচনা করছে লোকসঙ্গীতেরও রূপান্তরের মাটি তৈরি করছে। এ বক্তব্যটাকে আজ একটু বিশ্লেষণ করবো।

লোকসংগীতের ঐতিহ্যের মধ্যেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দুটি অন্তর্লীন ধারা প্রবহমাণ। একটি ইহজাগতিক, জীবনমুখী, সমাজশাসক ও শোষকের প্রতি কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষ প্রতিবাদে অর্থবহ; আরেকটি ধারায় আছে জীবনবিমুখতা, সংসার-বৈরাগ্য, ধর্মীয় অনুশাসন ও ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ।

যুগের প্রভাবটা লোকসংগীতে বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয়। ভাবটা অটুট রেখে অনেক সময় শুধু রচনার পারিপাট্যে—উপমা ও রূপকে তা রূপ নেয়। 'মনতরীর ছয়জন মাল্লা', 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী', 'আটকুঠরি নয় দরজা' প্রভৃতি দেহতত্ত্বের ভাব প্রকাশক প্রচলিত শব্দে এলো জাহাজ, ইঞ্জিন, টেলিগ্রাফের তার, ইস্টিশান ইত্যাদি। যেমন :

গাড়ি চলছে আজব কলে-
দিয়ে মাটি পরিপাটি আগুন জল আর
হাওয়ার বলে॥
ইঞ্জিনের ঘরের ভিতর
মরি কি আজব লহর
তারেতে হচ্ছে খবর কি চমৎকার লীলে।
...ইত্যাদি

কিংবা :

আইলোরে চেতন্যের গাড়ি
সোনার নদীয়ায়,
রাইকোম্পানীর জংশন হইলো
শ্রীবাস আঙ্গিনায়॥
...ইত্যাদি।

কিন্তু রেলগাড়ির যুগ তো কবেই গেছে। এলো এ্যারোপ্লেনের যুগ। গ্রাম্য-কবিরা পয়সা দিয়ে চাপতে না পারলেও বিনাপয়সায় ভাবের এ্যারোপ্লেনে চড়বেন না কেন?

আমার মন যদি তুই
চড়বি এরোপ্লেনে
ছেড়ে ভ্রান্তি আর ভুল ভক্তিমাশুল
এবার দাখিল কর ইস্টিশনে।
এরোপ্লেন গুরুপদ
যদি চাও নিরাপদ
ছেড়ে বিষয়সম্পদ সে টিকেট কিনে
ইঞ্জিনের আগের চাকা ঘুরছে নিশিদিনে
হরিনাম মহাওষধি পেট্রোলেরই গুণে।
...ইত্যাদি

রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকেও দেহতত্ত্বের উপমা আহরণ করা হয়েছে।

মন তোর দেহরাজ্যের কাউন্সিলে
আইল নির্বাচন
সুমতি কুমতি তারা ভোটের প্রার্থী
হইল দুজন॥
...ইত্যাদি

কিন্তু এ পরিবর্তনটা শুধু অলঙ্কারের দিক থেকে—সুর ও ভাবটা অটুটই আছে।

লোকসংগীতের আরেক ধরনের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন গুরুবাদী তত্ত্বের মধ্যেই শ্রেণীসংঘাতের সত্য পরোক্ষভাবে ধ্বনিত হয়েছে। এ ধরনের অসংখ্য গানে আমাদের ঐতিহ্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ।

যেমন :

মুর্শিদও—কারোবা আছে দালান কুঠা
আমার আছে ভাঙা ডেরা—ও
ডেরায় মেঘ মানে তো—
তুফান মানে না—ও।
মুর্শিদ, আমার ভাবনার
কিন্তু দূর হইল না।

কিংবা :

তোমার শ্রীচরণে এ নালিশ আমার॥

... ...

দয়াল গুরু ও—
আমার সাতপুরুষের বসতখানা
আছে জমিদারের খাজনা দেনা
আমায় কখন জানি উচ্ছেদ করে
যমরাজা তহশিলদার॥

... ...

কিংবা :

পরের যাগা পরের জমিন
ঘর বানাইয়া আমি রই
আমি তো সেই ঘরের মালিক নই।
সেই ঘরখানা যার জমিদারী
আমি পাই না তার হুকুমজারি
আমি চলি যে তার মন যুগাইয়া
দাখিলা মিলে না সই॥
...ইত্যাদি

এ ক্ষেত্রেও পুরাতনরূপকে নতুন ভাবসম্পদের পরিচয় যদিও আমরা পাই, সুরের পুরনো ঠাটটি কিন্তু অটুট রয়েছে।

আমাদের দেশের পরাধীনতার গ্লানি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন পাই আমাদের লোকসঙ্গীতের একটি বলিষ্ঠ ধারায়।

কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে নবাব
হারালো পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
গুলী পড়ে রয়ে
একলা মীরমদন বল
কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি
লাল কুর্তি গায়
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর
মীরমদনের গায়।
কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে
উড়ে কোম্পানি নিশান।
...ইত্যাদি

হয়ত প্রথম বাংলা লোকসঙ্গীত এখানে স্বাধীনতা হারানোর বিচ্ছেদ-বেদনা প্রথম ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অসংখ্য গান ও ছড়া রচিত হয়েছে, যা বিক্ষিপ্ত এবং অর্ধলুপ্ত অবস্থায় দেশময় ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যেও দুটি ধারা দেখতে পাই। একটির মধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের—স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ ও বিদেশী বর্জন আন্দোলনের প্রভাব যেমন দেখতে পাই, অন্যদিকে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের এবং সামন্ত ভূমিব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রতিফলনও অনেক গানে দেখতে পাই।

লোকসঙ্গীত সংগ্রাহকদের অন্ধ গোঁড়ামীর জন্য লোকসঙ্গীতের এই বলিষ্ঠ রূপান্তরের ধারাটি নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নি। সিপাহী-বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উদযাপনের সময় শ্রী পি সি যোশী উত্তর ভারতের বিদ্রোহের সময়কার কিছু লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। ডব্লিউ, জি, আর্চার সাঁওতাল বিদ্রোহের কিছু গান সংগ্রহ করে সাঁওতাল বিদ্রোহের গান নামে ইংরেজীতে একটি বই বের করেছিলেন। সারা ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন কৃষকবিদ্রোহের রক্তাক্ত পলিমাটিতে একদিন লোকসঙ্গীতের ফসল ভরে উঠেছিল। অন্যদিকে শহরের শিক্ষিত বিপ্লবী যুবকশ্রেণীর—ক্ষুদিরাম থেকে ভগৎ সিং-এর প্রাণদানের প্রাণরসেও আমাদের লোকসঙ্গীত সঞ্জীবিত হয়েছে।

লোকসঙ্গীতের এই ধারাটিতেই এক নতুন গতিবেগ সৃষ্টি করে গণনাট্য আন্দোলন। মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ফ্যাসিস্ট আক্রমণ, আগস্টবিদ্রোহ, নাবিকবিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, হাজং কাকদ্বীপ বিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ লোক-সঙ্গীতে এক ব্যাপক জীবনচেতনা বয়ে আনে। গত ১৯৪০-৪২ ইংরেজীতে সারাভারতে কৃষক-কর্মী এবং প্রগতি-শিল্পিমহলে ভোজপুরী দেহাতী সুরে ও ভাষায় একটি গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল :

কেকবা, কেকরা নাম বাতা'উ
ইস জগমে যড়া লুটেরোয়া হো।
মালিক ঔর মহাজন লুটে,
লুটে ঘুষখোরোয়া হো
মিলওয়ালা লুটে, জমিদার লুটে,
মর গিয়া কিষাণ মজদুরোয়া
হো॥
.. ইত্যাদি

সেদিন শোষিত সাধারণ মানুষের জীবনের অংশীদার একদল লোককবি বের হয়ে এসেছিলেন। ময়মনসিংহের নিবারণ পণ্ডিত, চট্টগ্রামের রমেশ শীল, মালদহের বিশু পণ্ডিত, মেটিয়াবরুজের গুরুদাস পাল প্রমুখকে এমনিভাবে আমরা পেয়েছিলাম। গ্রাম্যজীবনে সেদিন কতগুলি নতুন ভয়ঙ্কর শব্দ এলো—'কালবাজার', 'কন্ট্রোল' ইত্যাদি। তারই ছবি পাই এই সব গ্রাম্য কবিদের গানে। ময়মনসিংহের ঘোষার সুরে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ করে রচনা করলেন :

আমার মাজুর মায়ে তো কন্ট্রোল
বুঝে না।
রান্ধ্‌তে গেলে, কান্দ্‌তে বসে
লবণছাড়া রান্ধে না।
ও আহারে—কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম
কত বাবুর পায়ে ধরলাম
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম
রে
ও আহারে—আমার ভাঙ্গাঘরে মেড়ার ছানি
মেঘ না হইতে পড়ে পানি
টেপ্‌টেপানি গেল না॥

... ...

সেদিন জারীগানেও শুনলাম :

দুধ চিনিয়া বিলি হইল
কন্ট্রোলের কুইনাইন
ট্যাক্স নাই যার কার্ড পাইতা না
শাহীদারের আইন
রিলিফের কাপড়ে হইল
বালিশের উসাব
(হায়রে বালিশের উসার)
কেউ পায় না ছিড়া তেনা
কেউ করে বাহার॥

কিন্তু কৃষকরা নীরবে তা সহ্য করে নি। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের চারদিকে কৃষকবিদ্রোহ দেখা দিল। হাজং বিদ্রোহের দীর্ঘ কাহিনী, ময়মন-সিংহের লৌকিক গাথার সুরে নিবারণ পণ্ডিত বিপ্লবী বৈতালিকের মত বর্ণনা করেন—একটি দীর্ঘ গানে।

......নব্বই তোলাতে সের, ধান দেই
টংকের, জানি সর্বদায়
এখন সের দিতে কয়
একশ তোলায়
এই দোষে হইয়াছি দোষী হে—
ছাড়ে না পেয়াদায়॥
আসিয়াছি কোন সকালে
ক্ষুধায় এখন পেট জ্বলে
পাই না বিদায়
বিকালে আসিবেন বাবু
বাহির আঙ্গিনায়
পেয়াদারা জানাইয়া গেল হে—
কর্কশ ভাষায়॥

... ...

তার পরে এক সভা হইলো,
নিয়ে হাজং কোচ ডালো
যতেক কিষাণ
গারো বানাই ছেলে মেয়ে
হিন্দু মুসলমান
সবাইরে চিনাইলো মণি—হে—
রক্তনিশান॥
...ইত্যাদি

জনসাধারণের সমষ্টিচেতনায় একই ভাবের আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারা—লোকসঙ্গীত বিচারের একটি অন্যতম মাপকাঠি। মুক্তিপিয়াসী নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ জনতার মনের প্রতিধ্বনি ছিল এই গানগুলি। লোকসঙ্গীতে গ্রাম্যগুরু, মুর্শিদ, সাঁই ও পীরের গানে এতোদিন ছিল যে আত্মমুখীন ভাবালুতা—জনজীবনের সংগ্রামী শ্রেণীসংঘাতের তরঙ্গে তাতে এলো এক নতুন জীবনবোধ।

বাংলাদেশের তরজাগায়করা যখন অতীত কবিয়ালদের ব্যর্থ অনুকরণ করে চলছিলেন সে সময় শ্রমিকশ্রেণীর কবি গুরুদাস পাল সেই তরজার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের শাণানো হাতিয়ার শাসক ও শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অব্যর্থ প্রয়োগ করলেন বহু গানে :

আহা রাম নামের কিবা মহিমা—
স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ
স্বাধীনভাবে থাকি
খিদের সময় পেটের ভেতোর
বালিশ গুঁজে রাখি।
আহা— কিবা মহিমা
এই না হলে স্বাধীন দেশ আর
সমাজতন্ত্রের ধাঁচা—
টের পেয়েছি প্রাণপাখীটা
যায় নি ছেড়ে খাঁচা—
আহা কিবা মহিমা...
বুকটা করে ঢিপিস্ ঢিপিস্
কাজেই বেঁচে আছি
ঠ্যাংটা আছে রাষ্ট্রগাড়ির
চাকার কাছাকাছি।
আহা কিবা মহিমা...
...............ইত্যাদি

কিংবা :

আমি কত্তা-ভজার দলে
বাইরে বোষ্টমী আমি,
ভেতরে দুনীতি চলে॥
আমি নাম ভাঙানোর গুরুমশাই
। চতুর্বর্গ জ্ঞানের গোঁসাই
বুদ্ধ শিষ্যের অস্থি ভাসাই
বারাণসীর জলে।
মাঝে মাঝে সন্ত্লোকের
কেলেংকারীর ফলে
যতো হাড়হাবাতের হুড়ো থামাতে,
খামখা গোচ্ছার গুলি চলে॥
..ইত্যাদি

আমাদের লৌকিক ঐতিহ্যের কোনো কোনো আঞ্চলিক গীতের ধারায় প্রাণই হ্যলো তার টপিক্যালিটী বা সমকালীনতা। সে হিসাবে গম্ভীরা বা টুসু অত্যন্ত জীবন্ত। কাজেই নতুন গণ-চেতনা অতি সহজেই এসব গান আত্মস্থ করে নিতে পেরেছে।

শুধু গ্রাম্যকবিরা নন, শহরের কবি-গীতিকরে গ্রামের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরাও অনেক লৌকিক সুর ও ভাষায় নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে এমন গান লিখেছিলেন যা লোকসঙ্গীতের ধারায় মিশে গিয়েছিল। যেমন পূর্ববঙ্গের সারিগানের সুরে এই গানটি বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল :

তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শাণ
কিষাণ ভাই ও,
ফসল কাটার সময় এলে
কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে
কাটবে তাহার জান রে॥
......ইত্যাদি

মুর্শিদের জানা-অজানা এমনি অসংখ্য গান দেশে ছড়িয়ে আছে। যা হোক, 'রূপান্তরের জমিন হল গ্রাম্যজীবনে শ্রেণীসংঘাতের নতুন চেতনা'—মুর্শিদের এই বক্তব্যের সমর্থনে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম। কাজেই বিকৃতির স্বরূপ ঢাকবার জন্য মুর্শিদকে যাঁরা গোঁড়া প্রমাণ করতে চান—মুর্শিদ যে মোটেই তা নন—পাঠকদের কাছে তা এ থেকেই প্রমাণিত হবে। একদল গোঁড়া শোষকশ্রেণীর আদর্শে প্রভাবান্বিত 'বিশুদ্ধ' সংগ্রাহকের দল এসব গানকে লোকসঙ্গীত বলেই মনে করেন না। এঁদের সংকলনে এসব গানের কোনো স্থান নেই।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হল—এসব গানের ভাবসম্পদে নতুন জীবন-চেতনা এলেও—সুরে ও বাক্যবিন্যাসে তার আঞ্চলিক ভঙ্গিটা রয়েছে অক্ষুন্ন। জারী, সারি, গম্ভীরা টুসু, তরজা প্রভৃতি সুরের ও গায়কী ঢঙটা অব্যাহত রয়েছে। রূপান্তরের মানে মূলত ভাবসম্পদের, সুরের নয়। সুর সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় না। অর্থাৎ সুরের রক্ষণশীলতা ও ভাবসম্পদের গতিশীলতাই লোকসঙ্গীতের রূপান্তরের প্রধান রূপরেখা। যদি সুরের মধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্যও করা যায় তা মূল আঞ্চলিক ঠাটের ও ভঙ্গীর সীমাকে কোথাও লঙ্ঘন করে নি এবং প্রক্রিয়া এতো বিলম্বিত ও জনসমাজে অন্তর্লীন যে তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো শহুরে রচয়িতা তাঁর সুরের "লেবরেটারী"তে বসে সেই প্রক্রিয়ার অংশীদার হবার কোনো অধিকার দাবি করতে পারে না।

আজকের একদল বিকৃতির উপাসক রূপান্তরের নামে প্রথমেই লৌকিক সুরকে নিয়ে অসুরের মত টানাটানি সুরু করেন—যদিও ভাবসম্পদে তাঁরা সেই 'কানু ও রাই'-এর যুগেই আছেন। মাঝে মাঝে কিষাণের কথা বললেও তাঁরা কিন্তু গ্রামের গোলাভরা সোনালী ধানেরই ছবি আঁকেন। সেখানে শ্রেণীচেতনার নামগন্ধও নেই।

কাজেই লোকসঙ্গীতের চর্চার সামনে আজ দু'দিক থেকে বিপদ এসেছে, একদিকে সনাতনী ধর্মীয় গবেষক দল যাদের কাছে লোকসঙ্গীত একটা শুধু অতীতচর্চার ব্যাপার। অন্যদিকে আজকের শহুরে সঙ্গীতের পণ্য উৎপাদনকারী কমার্শিয়াল গায়ক ও রচয়িতার দল যাঁরা প্রথমেই সুরের 'পাঞ্চিং' সুরু করেন গতিশীলতার নামে।

একদল শিবতলা, শীতলাতলা চণ্ডীতলার জন্য হা-হুতাশ করেন, আরেকদল সেই শিবতলা, চণ্ডীতলায় শঙ্খ ঘণ্টা ঢোল কাঁসরের সঙ্গে 'বঙ্গো', 'কঙ্গো' ও 'ম্যারাকাস্' যোগ দিয়ে রূপান্তর আনতে চান।

গণ-আন্দোলন, শ্রেণীসংঘাতের কথা বললে কিন্তু দু' দলই এক সুরে মুর্শিদকে রাজনীতি বা বিশেষ মতাদর্শের অনুরাগী বলে গালাগালি সুরু করেন। নিজেরা কোন 'রাজনীতি'তে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁদের চামড়ায় চিমটি কাটলেই দেখতে পাবেন ওঁরা ভিতরে ভিতরে প্রতিক্রিয়ার পরিপোষক। 'অরাজনৈতিক' হওয়াটা বৈষয়িক দিক দিয়াও সুবিধাজনক নীতি। রেডিও, রেকর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, সঙ্গীত নাটক একাডেমীর গ্রাণ্ট কত কিছু।

সঙ্গীতের দিক দিয়ে শেষোক্ত দলটিই প্রধান বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে, যারা সুরের আঞ্চলিকতা ভেঙে এক কসমোপোলিটান লোকগীতির চোলাই মদ বিক্রির ব্যবসায় নেমেছে এবং জীবননদীর নাম করে বিকৃত নর্দমার পচা মুর্শিদের গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারছেন।

আজ যদি কেউ সুদূরভবিষ্যতে যখন গ্রাম ও নগরের পার্থক্য ঘুচে যাবে অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম থাকবে না, তখন লোকসঙ্গীতের কি হবে বলে মুর্শিদের সঙ্গে আলোচনায় নামতে চান, তবে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' থেকে একটি উদ্ধৃতি উপহার দেব :

"চকোরী ফুকারি কাঁদে ওগো
পূর্ণচাঁদ
পণ্ডিতের কথা শুনি গণি পরমাদ,
তুমি নাকি একদিন রবে না হিদিবে
মহাপ্রলয়ের কালে যাবে নাকি নিবে।
হায় হায় সুধাকর, হায় নিশাপতি
তা হইলে আমাদের কী হইবে
গতি?
চাঁদ কহে পণ্ডিতের ঘরে যাও
প্রিয়া
তোমার কতটা আয়ু এসো
শুধাইয়া।"

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

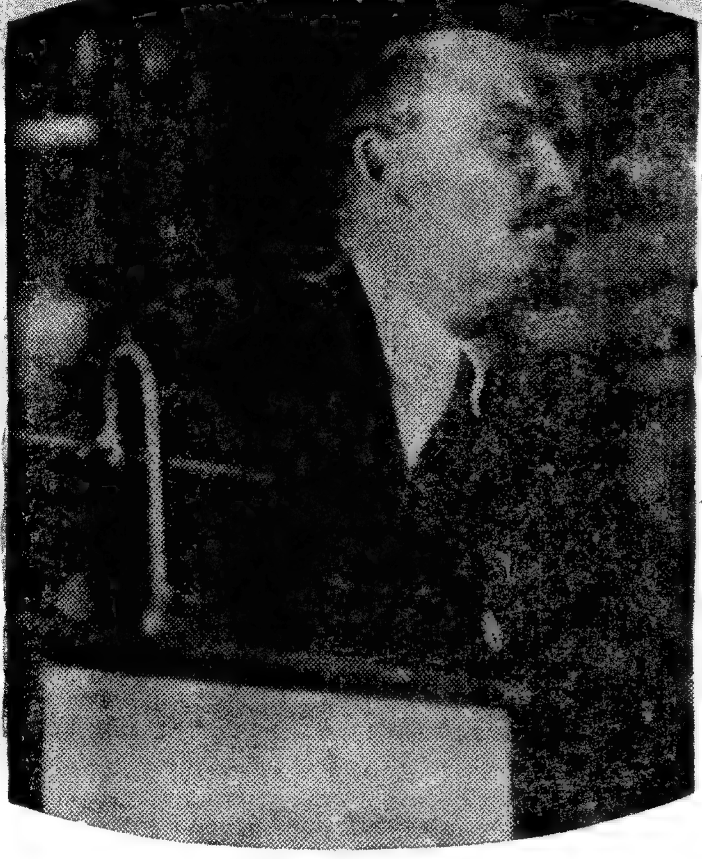

পূর্ব-প্রকাশিতের পর

[আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক ঃ ১৮৯৫ সালে লেনিন গেলেন পশ্চিম ইউরোপ পরিক্রমায়, উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক আন্দোলন এবং মুক্তিসংগ্রাম বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান আহরণ করা। প্রথমে সুইটজারল্যাণ্ডে প্লেখনাভ এবং এক্সেলরডের সঙ্গে দেখা এবং আলোচনা হল, তারপর প্যারিস এবং বার্লিনে গিয়ে, সেখানকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখলেন। প্যারিসে সাক্ষাৎ হল মার্কসের জামাতা বিখ্যাত শ্রমিকনেতা পল লাফার্গের সঙ্গে। খুবই ইচ্ছা হয়েছিল ফ্রেডারিক ইঙ্গেলসের সঙ্গে দেখা করবার। তিনি তখন লণ্ডনে—কিন্তু খুবই অসুস্থ, তাই দেখা হোল না। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে আবার ফিরে এলেন রাশিয়াতে। ১৮৯৫ সালের শরৎকালে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ সংগঠনের সৃষ্টি হল সেইণ্ট পিটার্সবার্গে। ওখানকার সব মার্কসিস্ট গোষ্ঠীগুলো লেনিনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করলো একটি রাজনীতিক সংগঠন—"লীগ অভ স্ট্রাগল" শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামকেই এরা নিয়েছিল ব্রত হিসাবে, এই লীগের ভেতর দিয়েই রূপায়িত হয়েছিল রাশিয়ার প্রলেতেরিয়ান পার্টির—আ দি ম স্বরূপে।

লীগের পরিচালনায় দেশের নানা জায়গায় শুরু হল রাজনীতিক শ্রমিক আন্দোলন, গণবিপ্লব শুরু হল কারখানার পর কারখানায় মেহনতী মজদুরদের ব্যাপক ধর্মঘটের আন্দোলন। ১৮৯৫-এর নভেম্বর—লীগ অভ্ স্ট্রাগলের নির্দেশে বয়ন-শিল্পীদের ধর্মঘট শুরু হল সেইণ্ট পিটার্সবার্গে। আটই ডিসেম্বর রাত্রে লেনিন এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে, জারের পুলিশবাহিনী গ্রেপ্তার করলো। জেলের ভেতরও লেনিন বিপ্লবের কাজ চালিয়ে গেলেন, গোপন চিঠির মারফৎ বাইরের কর্মীদের কাছে নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন--কিভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে।

[কথক চলে যান। পর্দা উঠলে দেখা যাবে ক্রুপস্কায়ার ঘরে কয়েকজন সহকর্মী এবং ক্রুপস্কায়া সমবেত হয়েছেন। একটি মোমবাতি জ্বলছে এবং ক্রুপস্কায়া একটি চিঠি নিয়ে মোমবাতির আগুনে সেঁকে নিচ্ছেন।]

নিনা—চিঠিটা ওইভাবে আগুনে সেঁকছ কেন?

ক্রুপস্কায়া—বলছি। (চিঠিটা নিয়ে এগিয়ে এসে) ভ্ল্যাডিমার ইলিচের লেখা গুপ্ত চিঠি। এমনি দেখলে মনে হবে কালিতে লেখা সাধারণ চিঠি। সেনসরও সে লেখার ভেতর আপত্তিজনক কিছু না দেখতে পেয়ে চিঠিটা আসতে দিয়েছে। কিন্তু লাইনের মাঝে মাঝে দুধ দিয়ে লিখে ভ্ল্যাডিমার তার আসল নির্দেশগুলো আমাদের জানিয়েছেন।

বাবুসকিন—দুধ দিয়ে লিখলে বুঝি পরে বোঝা যায় না?

ক্রুপস্কায়া—দুধের লেখাটা শুকিয়ে গেলে পরে মিলিয়ে যায়। আগুনে সেঁকে নিলেই আবার সে লেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভ্ল্যাডিমার কিছুদিন থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে—আমাকে তখনই একদিন বলেছিলেন এইভাবে গুপ্ত চিঠি পাঠাবেন আমাদের।

মার্টভ—আচ্ছা, চিঠিটা পড়।

ক্রুপস্কায়া—(চিঠি পড়তে থাকবেন) প্রিয় কমরেডস্! এই গুপ্ত চিঠি লেখবার জন্য দুধকে কালি হিসাবে ব্যবহার করি—আর ছোট ছোট দোয়াতদান তৈরি করি খাবার রুটি দিয়ে।

জেলাররা কাছাকাছি এলে দুধসুদ্ধ দোয়াতদানটা মুখে পুরে দিই—যাতে ওরা সন্দেহ না করতে পারে। আজ এই চিঠিটা শেষ করতে গিয়ে এইরকম ছ'টা দোয়াতদান খেয়ে ফেলতে হয়েছে। অন্যান্য বন্দী কমরেডস্‌দের সঙ্গে আমরা পরামর্শ করি অন্যভাবে। লাইব্রেরীর থেকে বই নিয়ে তার লেখাগুলোর তলায় দরকারমত ডট দিয়ে দিই পেন্সিল দিয়ে। ওই বই তাদের হাতে গেলেই তারা আমার নির্দেশ বুঝতে পারে [সবাই এবার হেসে উঠবে]। এখানে এখন একটি বড লেখা শুরু করেছি—The Development of Capitalism in Russia—এরজন্য কতকগুলো বই এবং পিরিওডিকল্‌-এর দরকার। একটা তালিকা পাঠাবো—সেই অনুসারে বই এবং অন্যান্য তথ্যসম্বলিত পুস্তিকাগুলো আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিতে পারলে খুব ভাল হয়। এবার কিছু কাজের কথা বলছি......

[কিছুক্ষণ আগে থেকেই আলো কমে আসবে এবং তারপর ব্ল্যাক আউট হয়ে যাবে। পেছনের পর্দা নেমে যাবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে মঞ্চের সামনে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন;]

কথক—চোদ্দ মাস কারাবরণের পর লেনিনকে জানানো হল ১৮৯৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে যেতে হবে নির্বাসনে, তিন বছরের জন্য পূর্ব সাইবেরিয়াতে। ব্যক্তিগত ব্যবস্থাদির জন্য তিনি তিনদিন রইলেন সেইন্ট পিটার্সবার্গে—সেখানে বিপ্লবাত্মক কাজের গঠন এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাসমিতি করে কাটালেন। এই সব ব্যাপারে দারুণ মতভেদ দেখা দিল পুরনো এবং নতুন সভ্যদের ভেতর। লেনিন। কারঝিঝানবস্কি, স্টারভক্‌, ভানেয়েভ প্রমুখ চাইছিলেন—সংগঠন হবে বিপ্লবাত্মক, মেহনতী শ্রমিকদের দেবে রাজনীতিক নেতৃত্ব। নতুন সভ্যদের ইচ্ছা সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নের কাজ নিয়ে থাকুক। দেখুক অর্থনীতিক সংগ্রামের দিকটা, রাজনীতিক সংগ্রামের পরিচালনভার ছেড়ে দিক উদারপন্থী বুর্জোয়াজীর ওপর। এইভাবে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ভেতর দেখা দিল দু'টি ধারা—বিপ্লবের সমর্থক পুরনোর দল, আর সুবিধাবাদী তরুণরা। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ সালে সেইন্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে লেনিন চললেন নির্বাসনে সাইবেরিয়ার পথে। মস্কোতে মায়ের সঙ্গে কাটালেন কয়েক দিন। আরও অনেক জায়গা ঘুরে ঐ বছরের মে মাসে কারঝিঝানবস্কি এবং স্টারকভ প্রমুখ সহকর্মীর সঙ্গে ইয়েনসাই গাবারনিয়ার মিনুসিন্সক্ক ডিস্ট্রিক্টের শুসেনস্কোয়ে গ্রামে সবাই পৌঁছুলেন। লেনিনের থাকবার জায়গা ঠিক হল একজন চাষীর কটেজে, চাষীটির নাম জিরিয়ানভ—ঘরটি ছিল ছোট, আসবাব বলতে একটি ছোট খাট, টেবিল এবং চারটি চেয়ার। সরকার মাসে আট রুবল্‌ দিত—কিন্তু তাইতেই সব খরচ চলে যেত, কারণ লেনিন ছিলেন অত্যন্ত হিসেবী মানুষ। শুসেনস্কোয়ে গ্রামটি ছিল রেললাইনের থেকে অনেক দূরে। সেন্ট্রাল রাশিয়া থেকে এখানে চিঠি পৌঁছতে লাগতো অন্তত দু' সপ্তাহ। প্রলেতেরিয়েতদের ভেতর কাজ করবার প্রত্যক্ষ সুযোগের অভাবে, খুবই খারাপ লাগছিল লেনিনের। তবু তিনি হতাশ বা নিরাশ হতেন না কখনও। কারণ চিরদিনই লেনিন ছিলেন আশাবাদী। ভগ্নী আনার সঙ্গে চিঠিপত্রের ভেতর দিয়ে সংযোগ রাখবার চেষ্টা করতেন রাশিয়ার শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে। এই সময় একদিন মস্কোতে উলিয়ানভদের বাড়িতে—

'প্রাভ্দা' পাঠরত লেনিন

[কথক সরে যাবেন—পেছনের পর্দা উঠলে দেখা যাবে আনা লেনিনের চিঠি পড়ে শোনাচ্ছেন ডিমিট্রিকে :]

আনা—ভ্যাডিমার প্রথমেই লিখছে : ডিয়ার মামীকে শরীরের যত্ন নিতে বলবে। আমার জন্য চিন্তা করে যেন মন খারাপ না করেন। আমি ভালই আছি—বেশির ভাগ সময় বই পড়ে কাটে। মাঝে মাঝে শিকার করতে যাই। তোমাদের যে সব বইগুলো পাঠাতে লিখেছিলাম, তার কি করলে?

ডিমিট্রি—তুমি ভ্যাডিমারকে লিখে দিও কাল মার্কসের The Poverty of Philosophy এবং The Critique of the Hegelian Philosophy of Right আমি আগেই পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। এঙ্গেলসের বইটা যোগাড় করে আসছে মাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।

আনা—আজই ভ্যাডিমারকে চিঠি লিখবো—তাতে জানিয়ে দেব। (আবার চিঠি নিয়ে পড়তে থাকবেন) আনা, তোমরা সব সময় মায়ের শরীরের প্রতি নজর রাখবে—এমন মা ক'জনের হয়? She has tremendous will-p o w e r. বাবার জীবিতকালে যদি আলেকজাণ্ডারের ফাঁসী হোত তাহলে তাঁকে আমরা কিভাবে সামলাতাম ভেবে পাই না। এ ব্যাপারে মা যা মনের জোর দেখিয়েছেন তার কোন তুলনা হয় না। আমার মনে হতাশা এলে মা'র কথা ভাবি—সঙ্গে সঙ্গে মনে বল পাই। এখানকার কৃষি এবং কৃষকদের জীবনের নানা সমস্যা

জানাবার জন্য চাষীদের সঙ্গে সময় পেলেই আলোচনা করি। (মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা বাইরে থেকে এসে ঢুকবেন) মা, মা, ভ্ল্যাডিমারের চিঠি এসেছে!

[মারিয়া চিঠিটা নেবেন এবং পড়বেন ঃ]

মারিয়া—(ডিমিট্রিকে) ভ্ল্যাডিমার যে বইগুলো চেয়েছে সেগুলো পাঠাবার ব্যবস্থা করেছ কি?

ডিমিট্রি—হাঁ, মা।

আনা—আজকে আবার পুলিশ ডিপার্ট-মেণ্ট থেকে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন মা?

মারিয়া—তোদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করছিল। সেই নাক লম্বা ডিরেক্টরটা কি বলছিল জানিস ডিমিট্রি?

ডিমিট্রি—কি মা?

মারিয়া—বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আমাকে বললে, কিগো রত্নগর্ভা মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা—বড় ছেলেটা তো ফাঁসিতে লট্‌কেছে, ভ্ল্যাডিমারটাও দড়ির দিকেই গলাটা উঁচিয়ে আছে। বাকী ক'টাকে একটু সামলাবার চেষ্টা করো। মহামান্য জার অত্যন্ত মহানুভব বলেই তোমার শয়তানের বাচ্চাগুলো এখন পর্যন্ত বদ-মায়েসি করে বেরাবার সুযোগ পাচ্ছে। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে সব ক'টাকে কুকুরের মত গুলী করে মারতাম। কিন্তু তুমি তো তোমার এই সব ছেলে-মেয়েদের বিষয় খুব গর্ববোধ কর নিশ্চয়।"

আনা—তুমি কি উত্তর দিলে মা?

মারিয়া—আমি শান্তভাবে বললাম ঃ

"কি করি বই কি ডিরেক্টার সাহেব। তোমার এরকম সন্তান থাকলে তুমিও করতে। আমার কথা শুনে দাঁত কড়মড় করতে করতে সে অন্যদিকে চলে গেল।

[ডিমিট্রি এবং আনা হো হো করে হেসে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক আউট। আলো জ্বললে দেখা যাবে পেছনের পর্দা নেমে গেছে এবং স্টেজের সামনে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন।]

কথক—সাইবেরিয়াতে নির্বাসনের সময় লেনিনকে গরীবদের হয়ে আইনজ্ঞের কাজ করতে হত। দণ্ডিত আসামী বলে আইন ব্যবসা করবার তাঁর অধিকার ছিল না। কিন্তু ওই জায়গাতে আর কোন আইনজ্ঞ না থাকাতে, লোকেরা তাঁর কাছে আসতো আইনের পরামর্শ নিতে। বড়লোক মালিক এবং সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার থেকে কিভাবে আইনের সাহায্যে রক্ষা পাওয়া যায় সে শিক্ষা তারা পেত ভ্ল্যাডিমার ইলিচের কাছ থেকে। বছরখানেক কাটবার পর এখানে একদিন এসে হাজির হলেন নির্বাসিত ক্রুপস্কায়া এবং তাঁর মা, ওঁরা এসে উঠলেন লেনিনেরই বাড়িতে, লেনিনের বাগদত্তা বলে ক্রুপস্কায়া অনুমতি পেয়েছিলেন ভাবী স্বামীর কাছে এসে থাকবার। এইখানেই পরে জুলাই মাসের দশ তারিখে তাঁদের বিয়ে হয়।

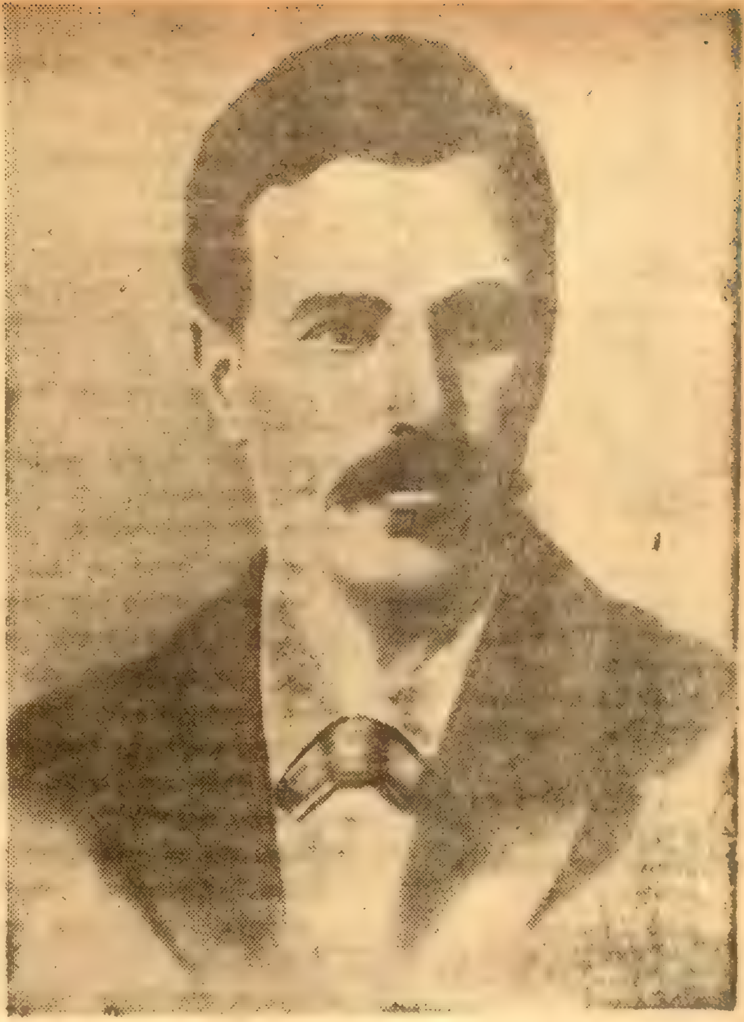

প্রখ্যাত বলশেভিক শ্রমিক নেতা আইভ্যান বাবুস্কীন

[ব্ল্যাক আউট। আলো জ্বললে দেখা যাবে পেছনের পর্দা উঠে গেছে—লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া টেবিলের সামনে বসে আছেন। লেনিনের হাতে টলস্টয়ের 'ওয়ার এ্যাণ্ড পিস্' বইটা।]

ক্রুপস্কায়া—সেইণ্ট পিটার্সবার্গে যখন তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ, স্টেপান র‍্যাডসেঙ্কো আমাকে বলেছিল "ভ্ল্যাডিমার সেরিয়াস বই ছাড়া কিছু পড়ে না। জীবনে সে কখনও কোন উপন্যাস ছোঁয় নি।" এখানে এসে দেখছি পুস্কিন, টলস্টয়, টুর্গেনেভ সবার লেখাই তুমি পড়।

লেনিন—(হেসে উঠে) শুধু একবার নয়—অনেকবার করেই পড়ি। রাশিয়ান ক্ল্যাসিকাল রাইটার্স আমার অত্যন্ত প্রিয়। যাক্ গে, তোমার এবং অস্কার এঙ্গেলবার্গের মার্কসিস্ট সাহিত্য পড়া কেমন চলছে?

ক্রুপস্কায়া—মোটামুটি। ক মি উ নি স্ট ম্যানিফেস্টোটা পড়ে ফেলেছি—এখন ক্যাপিটাল ধরেছি।

লেনিন—অস্কার কিরকম রি-এ্যাক্ট করছে?

ক্রুপস্কায়া—অনেক ধরণের বই ও পড়েছে—কিন্তু সোশ্যালিজম সম্বন্ধে ওর

ধারণা খুব অস্পষ্ট। প্রমিনস্কি পড়াশুনা বিশেষ করে নি—কিন্তু ও যেন এসব বিষয় বোঝে অনেক সহজে।

লেনিন—এরপর আমি কয়েকদিন অস্কারকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাপিটেল বইটা রি-রিড্ করবো। তবে মার্কস সম্বন্ধেও এ কথাগুলো ভুললে চলবে না—মার্কসিজম হচ্ছে অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং বিবর্তনশীল ডক্ট্রিন—এটা শুধু বইয়ের তত্ত্ব নয়, ব্যবহারিক জীবনেও এর প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের কাজ-এর বিস্তৃতি এবং ক্রমোন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করা। মার্কসের থিওরিকে সম্পূর্ণ এবং অলঙ্ঘ্যনীয় মনে করলে ভুল করা হবে—On the contrary, we are convinced that it has only laid the foundation stone of the science which socialists must develop in all directions of they wish to keep pace with life.

[গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকবেন প্রমিনস্কি।]

প্রমিনস্কি—(গাইতে থাকবেন) ঃ

এক মন এক প্রাণ,
হবে দূর অপমান,
আমরা হলাম ভাই ভাই।
ঝঞ্ঝায় সংগ্রামে
জানি রক্তের দামে
মোরা এক হয়েছি সবাই।
আছি মোরা তৈরি,
কে যে দেশবৈরী,
কে যে নিপীড়ক আছে জানা।
জননী জন্মভূমি
তার বুকে আমি তুমি
শত্রুকে দিই পরোয়ানা।
ঘৃণাভরা অন্তর,
মরণে মানাবে ডর
এমন শক্তি কারো নাই।

(ওপরের গানটি ইংরাজী থেকে অনুবাদ করেছেন কবি দুর্গাদাস সরকার।)

[গানের মাঝ থেকে লেনিনও গানে যোগ দেবেন।]

প্রমিনস্কি—তুমি এ গান জানলে কি করে ভ্যাডিমার?

লেনিন—এটি আমার বাবার খুব প্রিয় গান ছিল। ছেলেবেলায় আমাদের ভাই-বোনেদের নিয়ে তিনি অনেক সময়েই এ গানটি গাইতেন। তার-পর, আর সব খবর কি বল?

প্রমিনস্কি—কাল ১লা মে। অস্কারের বাড়িতে কাল সকালে আমরা ১লা মে'র উৎসব করবো—অন্যান্য কম-রেডরাও আসছেন।

ক্রুপস্কায়া—আর কে কে আসছেন?

প্রমিনস্কি—কিরাঝিঝানভস্কি, স্টারকভ, ভানেয়েভ, কুরনাটোভস্কি আর লেপেসিনস্কি।

লেনিন—বেশ কাল সকালে অস্কারের বাড়িতে যাওয়া যাবে। তুমি আগে তোমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমার এখানে চলে এস। একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সবাই রওনা হবো। কিন্তু আর একবার সেই গানটা শোনাও—বড় ভাল লাগলো এতদিন বাদে।

প্রমিনস্কি—তিনজনেই একসঙ্গে গাওয়া যাক্!

লেনিন—বেশ তো, ক্রুপস্কায়া তুমি শুরু কর ঃ

[প্রথমে ক্রুপস্কায়া গান ধরবেন, তারপর তিনজনে একসঙ্গে গাইতে থাকবেন ঃ]

গান ঃ

এক মন এক প্রাণ
হবে দূর অপমান
আমরা হলাম ভাই ভাই—ইত্যাদি

[গানের আরম্ভ থেকে ধীরে ধীরে আলো কমে আসতে থাকবে এবং শেষে অন্ধকার হয়ে যাবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে অস্কার ইংগবার্গের বাড়িতে সবাই বসে আছেন এবং পানাহার চলছে। লেনিন ক্রুপস্কায়া এবং তাঁর মা'ও আছেন। প্রমিনস্কি, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের দুটি সন্তান বসে চা-পান করছেন। এরপর সমবেতকণ্ঠে গান শুরু হবে ঃ]

গান ঃ

এলো মে মাসের আজ প্রথম তারিখ
ডগমগ তার প্রাণ,
ওর পথের সকল দুঃখগুলো
দূর করো সটান।

(কোরাস)

মত্ত হোক প্রাণ উদাত্তস্বরে
আনন্দে হরতাল সবাই করব রে
যদিও পুলিশ এসে করবে তাড়া
জেলে করবে লবেজান।

(কোরাস)

দূর ছাই পুলিশ
তারা সব 'ফুলিশ'
হর্ষমুখর এই মে-দিবস
আরো শক্তিমান।
হুররে হুররে হুররে
এই আনন্দ মে-দিবসের দান॥

(গানটি ইংরাজী থেকে অনুবাদ করেছেন কবি দুর্গাদাস সরকার।)

= যবনিকা =

এন ঝুকভের অঙ্কিত লেনিনের একটি স্কেচ

[ক্রমশ]

রঙ্গজগৎ

বিপ্লব-বাণী বিস্মৃত হয়ে কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সত্তর বছর পূর্তি এ বছর সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে। কলকাতায় ও জেলায় জেলায় অন্যান্য বছরের তুলনায় বহু সংখ্যক সংগঠন কবির জন্মদিবস পালন করছে। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সরকারিভাবে এ বছর কবির জন্মদিবস পালন। সরকারিভাবে জন্মদিবস পালন করার দাবি ছিল পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির। যুক্তফ্রন্ট সরকার কবির জন্মদিনকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বীকার করে জাতির কাছে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

কিন্তু আজকের নীরব কবিকে জাতি কিভাবে স্বীকার করে? কোন কোন অনুষ্ঠানে কাগজে-পত্রে লেখা হয় বিদ্রোহী কবি। কিন্তু গানের জলসায় একের পর এক গাওয়া হয় প্রেম, ভক্তি, পল্লীসংগীত; গজল, আধুনিক ও রাগসংগীত। বক্তারা আলোচনা করেন কবির সংগীতপ্রতিভা নিয়ে; রেডিও, গ্রামোফোন কোম্পানীর স্মৃতিচারণ করেন। এ সব আলোচনা ও গান শুনে মনে হবে কবি নজরুল প্রেম ও ভক্তিসংগীতের সার্থক স্রষ্টা মাত্র। খুব উদার প্রাণ এক শিল্পীমাত্র। তা হলে বিদ্রোহী কথাটা লেখার কারণ কি?

যাঁরা এত ধুমধাম করে নজরুল জন্মোৎসব পালন করেন আসলে তাঁদের অনেকে নজরুলের সত্যিকার পরিচয় জানেন না। অথবা জেনেও কাজী নজরুলকে কেবলমাত্র গ্রামোফোন কোম্পানীর সুরকার ও গীতিকারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চান। তাই অনুষ্ঠানগুলি বিশ দশকের কবিপ্রতিভার সার্থক পরিচয় 'শিকল ভাঙার' গানগুলি শোনা যায় না। আমি একাধিক অনুষ্ঠানের কথা জানি যেখানে চেষ্টা করেও 'দুর্গম গিরি', 'আমরা ছাত্র দল' এবং 'অন্তর ন্যাশনাল' গান গাওয়ার লোক পাওয়া যায় নি। আজকে যাঁরা নজরুলের সংগীতের উত্তরসাধক বলে দাবি করেন তাঁরা ক'জনে কয়টা দেশাত্মবোধক গান জানেন? 'অন্তর ন্যাশনাল ও রেড ফ্ল্যাগ'-এর মত আন্তর্জাতিক গানগুলির সুর কারো জানা নেই। কিন্তু সে কথা স্বীকার করার মত সরলতা কোন নজরুলসংগীতশিল্পীর নেই। সম্প্রতি তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল নজরুল একাডেমি আয়োজিত নজরুলসংগীত প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় ছোটদের ও বড়দের দুই বিভাগে দেশাত্মবোধক সংগীতে প্রতিযোগী ছিল ছোটদের বিভাগে দু-জন আর বড়দের বিভাগে মাত্র একজন। অথচ অন্যান্য বিভাগে ছিল ৮০ জনেরও অধিক। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় নজরুলের দেশাত্মবোধক সংগীত শেখবার মত লোক নেই। জেনেছি, নজরুল একাডেমি এই দুর্বলতার দিক লক্ষ্য করেই এবার প্রতিযোগিতায় দেশাত্মবোধক সংগীত বিভাগ যুক্ত করেছিলেন।

আসলে নজরুলকে নিয়ে যত হৈ-চৈ করা হোক না কেন, নজরুল-প্রতিভার আসল পরিচয় আমরা ভুলে গেছি। তাই বিশ দশকের নজরুলকে উপেক্ষা করে ত্রিশ দশকের নজরুলকে নিয়ে আমরা নাচানাচি করি। ত্রিশ দশকের নজরুল—বিশ দশক থেকে অনেক দূরে। সভা-অনুষ্ঠানে তাঁদেরই খুব বড় গলায় কথা বলতে দেখা যায় যাঁরা নজরুলের বিপ্লব-চিন্তার কথা জানেন না, জানেন কেবল বিপ্লবীজীবন থেকে দূরে, বহুদূরে সরে যাওয়া দিনগুলির কথা; যাঁরা তাঁর বিষাদ-জীবনের সাক্ষী। তাই প্রশ্ন আসে শুধুমাত্র বিশ দশকের সৃষ্টিকে নিয়ে এত মাতামাতি করলে তাঁকে নিয়ে এত ঘটা করার কারণ থাকে না।

কাজী নজরুলের জন্মদিনে আমরা বিদ্রোহী কবিকেই স্মরণ করতে চাই। যে কবির কবিতা যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছিল, যে গান গেয়ে বিপ্লবী ফাঁসির রশিকে বরণ করেছে, যে গানে সাম্যবাদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে—আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচার করা হয়েছে। —সুজন।

শুকসারী ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক

চিত্র আলোচনা

শুকসারী

আবার এক বিরোধের মধ্যে মুক্তিলাভ করল বি, কে, প্রোডাকসন্সের 'শুকসারী'। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানো সুর' গল্প এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন। পরিচালনা করেছেন প্রবীণ পরিচালক সুশীল মজুমদার।

'শুকসারী' গ্রামের পটভূমিতে রচিত কাহিনী। ননী আর গিরি কৃষকের সন্তান। কিশোর বয়সের সীমা শেষ না হতে তাদের বিয়ে হয়েছিল; কিন্তু বিয়ের আসরে দেনা-পাওনার

গণ্ডগোলে বরকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। সেই থেকে গিরি পড়ে আছে বাপের বাড়ি, আর ননী মেতে আছে বাঁশী আর গান নিয়ে। জমিজমা থাকলেও সে মাথা ঘামায় না।

পাড়া-প্রতিবেশীর কথায় একদিন সে গিরিকে আনতে গেল। তারপরে দুজনার উচ্ছ্বাস আর আনন্দে দিন কাটে। জীবন তাদের সুখে ভরে উঠেছে।

কিন্তু গিরির ইচ্ছা ননী গান আর সংসার—দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলুক। চাষবাস ফেলে শুধু বাইরে বাইরে ঘোরা ওর পছন্দ নয়। এই নিয়ে বাধল বিরোধ। সেই বিরোধে ননীর জীবনের গতি পরিবর্তন হয়ে গেল। সে তখন বাঁশী আর গান ভুলে কেবল চাষ, খামার নিয়ে একেবারে কৃষক হয়ে উঠল। এমন কি গিরির দিকে ফিরে তাকাবার সময় এবং ইচ্ছাও তার নেই। গিরিকে শাড়ি আর অলঙ্কারে ভরিয়ে দিয়ে মনে করে তার কর্তব্য করছে। তাদের জীবনে যখন বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে আর গিরির মন উতলা হয়ে উঠেছে আগের ননীকে পাবার জন্য, সে সময় একরাত্রে ননীর বাঁশী তাদের জীবন থেকে ভুল দূর করে দেয়। আবার তাদের জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে।

গ্রামের পটভূমিতে হলেও ছবিটিতে নিখুঁতভাবে গ্রামের মানুষকে অনুভব করা যায় না। আচারে ব্যবহারে চাষী-জীবনের পরিচয় এতে নেই। কৃত্রিম জীবনচিত্রে একটা কাহিনী প্রকাশ করা হয়েছে। এদিক থেকে উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক বা অন্য কেউ যথার্থভাবে কৃষক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। কাহিনীতে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য চিত্রনাট্যকার কড়িকে উপস্থিত করে গিরিকে প্রেম নিবেদনের যে দৃশ্য উপস্থিত করেছেন তা কাহিনীর মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না। বরঞ্চ তথাকথিত ভিলেনের ছকে ফেলে কাহিনীর মাধুর্য নষ্ট করেছে। সত্যিকার কৃষক ও গ্রামের জীবনের সঙ্গে পরিচয় না থাকার দুর্বলতা ছবির বহু দৃশ্যে রয়েছে। 'শুকসারী'র একমাত্র আকর্ষণ কথায় কথায় গান। আঠারটি গানে ছবিটি ঠাসা। গানগুলির রচনায় সাহিত্যমূল্য কম থাকলেও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গানগুলি উপভোগ্য এবং সুগীত।

'সাবজেক্ট ফর এ সর্ট স্টোরি' ছবিতে চেকভের ভূমিকায় নিকোলাই গ্রিঙ্কো এবং লিকা মিজিনোভার চরিত্রে মারিনা ভ্লাডি।

চেখভের জীবনের একটি দিন

মসফিল্ম স্টুডিও প্যারিসের তেলসিয়া ফিল্মের সহযোগে আন্তন চেকভের জীবনের একটি ঘটনা নিয়ে ছবি করছে। ছবির নাম 'সাবজেক্ট ফর এ সর্ট স্টোরি'। সোভিয়েট প্রযোজক সোভিয়েট ইউনিয়নের পিপলস্ আর্টিস্ট সের্গেই ইয়ুৎকেভিচ্ ছবির প্রযোজক। এই রঙিন ছবির ঘটনাকাল ১৮৯৬ সালের ১৭ই অক্টোবর। সেদিন আলেকজেন্দ্রিস্কি থিয়েটারে চেকভের 'সীগাল' নাটকের প্রথম রজনী অভিনয়। কিন্তু নাটকটি ব্যর্থ হয়। সেই ব্যর্থতার স্মৃতি আর কিভাবে নাটকটি লেখা হয়েছিল সে কথা বলা হয়েছে, শিক্ষিকা লিকা মিজিনোভার প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তার উদ্দেশ্যে তিনি গেলেন সাকালিন।

ছবিতে চেকভের ভূমিকায় অভিনয় করছেন নিকোলাই গ্রিঙ্কো—উক্রেনিয়ার অভিনেত্রী; এবং ফরাসী অভিনেত্রী মারিনা ভ্ল্যাডি অভিনয় করছেন শিক্ষিকা লিকা মিজিনোভার চরিত্রে। চেকভের 'থ্রি সিস্টার্স' নাটকে তিনি ইরিনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

নাটকের কথা

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

একটি অনাবিল আনন্দের নাটক ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ'। কিছু সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বিশেষ চরিত্রের সাহায্যে নাটকটি সার্থক হয়েছে। আঙ্গিক ও অভিনয় প্রশংসনীয়। বিশেষ করে গতি ও সময়কে দেখানোর কৌশল চমৎকার। সকলের অভিনয় উচ্চমানের, তার মধ্যে তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায়ের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্টুডিও খবর

মুক্তিপথে—"কৃষ্ণলীলা"

বাংলা ভক্তিমূলক ছবি বলাকা পিকচার্সের "কৃষ্ণলীলা" শীগ্গির শহর ও শহরতলীর একাধিক চিত্রগৃহে বলাকা পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তি-

লাভ করবে। সঙ্গীতবহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ এই ছবিতে আছে প্রচুর ট্রিকশট। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ পর্ব পর্যন্ত ছবিতে স্থান পেয়েছে। সংলাপ রচনা করেছেন মৃণাল ঘোষ, পরিচালনা করেছেন শ্রীধর ভট্টাচার্য, গীতরচনা করেছেন—সরল গুহ। সুর দিয়েছেন বীরেন ভট্টাচার্য ও অনিলকুমার দে। প্রতিমা ব্যানার্জী, ইলা বসু, শিপ্রা বসু, মানবেন্দ্র মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, অঞ্জলি ব্যানার্জী ও সুদাম ব্যানার্জী ছবির নেপথ্যে কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ছবিটি বাঙালী দর্শকদের মনে যে এক ভাবরসের সৃষ্টি করে সে বিষয়ে পরিচালক নিঃসন্দেহ।

অগ্নিযুগের কাহিনী

ইংরাজ শাসকের অত্যাচার চরমে উঠল, দেশের লোক বিব্রত। নিজের দেশকে ভালবাসার অধিকার তাদের নেই। চরম মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী এলেন—তাঁর অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে দেশবাসীর সামনে। আর চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরে একদল বাঙালী দীক্ষিত হল অগ্নিমন্ত্রে। যে কোন রকমে যে কোন মূল্যে দেশ থেকে বিদেশী ইংরাজদের তাড়াতেই হবে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দেশের যুবক-যুবতী আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগল—প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য।

শ্রীযুক্ত বীরেন রায় এম-পি লিখিত 'খেয়ালী' উপন্যাস অবলম্বনে নিউ এরা পিকচার্সের পতাকাতলে ভূপেন রায়ের পরিচালনায় তোলা "অগ্নিযুগের কাহিনী" নবযুগ চিত্র প্রতিষ্ঠানের পরিবেশনায় শীগ্‌গির শহর ও শহরতলীতে মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুর দিয়েছেন—গোপেন মল্লিক। মাধবী মুখার্জী, বিকাশ রায়, অজিতেশ ব্যানার্জী, দিলীপ রায়, জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য, সুলতা চৌধুরী, গীতা দে প্রমুখকে ছবির মূল চরিত্রে দেখা যাবে। নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী, মান্না দে, মঞ্জুশ্রী বসু ও অশোকতরু ব্যানার্জী।

মুক্তিপথে : "দো দুনি চার"

দুই যমজ মালিক আর তাদের দুই যমজ চাকর, এই চারটি প্রাণীকে নিয়ে যে কি ভীষণ হাসির হুল্লোড় সৃষ্টি হয়েছে—তা বিমল রায় পিকচার্সের "দো দুনি চার" ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন। সেক্সপিয়রের "কমেডি অব এরার" ছবির মূলকাহিনী। দেবু সেন ছবিখানি পরিচালনা করেছেন। হেমন্ত মুখার্জী ছবিতে সুর দিয়েছেন। কিশোরকুমার, অসিত সেন, তনুজা, সুধা

রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী পরিচালিত 'অন্য মাটি অন্য রঙ'-এর নায়িকা শিবানী বসু

শর্মা, সুরেখা পণ্ডিত, বিনোদ শর্মা, বেবী সোনিয়া প্রমুখকে ছবির প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে। কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন—কিশোরকুমার, মান্না দে, কৃষ্ণ কালে ও রাণু মুখার্জী প্রমুখ। লাইফ পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিখানি শীগ্‌গির শহর ও শহরতলীর একাধিক চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

সংবাদিকী

নজরুল একাডেমির আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা গত ১৭ই ও ১৮ই মে মহাজাতি সদনের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ : কিশোর বিভাগ : প্রথম—যূথিকা ঘোষ, দ্বিতীয়—দোলা ভট্টাচার্য, তৃতীয়—অভিজিৎ ব্যানার্জী। মহিলা বিভাগ : প্রথম—অনুরাধা ঘোষ, দ্বিতীয়—ঊর্মিলা দাশগুপ্ত। পুরুষ বিভাগ : প্রথম—সুমিত সেনগুপ্ত, দ্বিতীয়—সুভাষচন্দ্র বসু, তৃতীয়—সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ বিভাগ : প্রথম—জ্যোতির্ময়ী ব্যানার্জী, দ্বিতীয়—শকুন্তলা চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয়—অরুণাংশু বিশ্বাস।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন : কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি দুর্গাদাস সরকার, অধ্যাপক রজত রায়চৌধুরী, কবি প্রণব চট্টোপাধ্যায় এবং আবুল কাশেম রহিমুদ্দীন।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় নিম্নোক্ত প্রতিযোগিগণ যথাক্রমে ১ম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

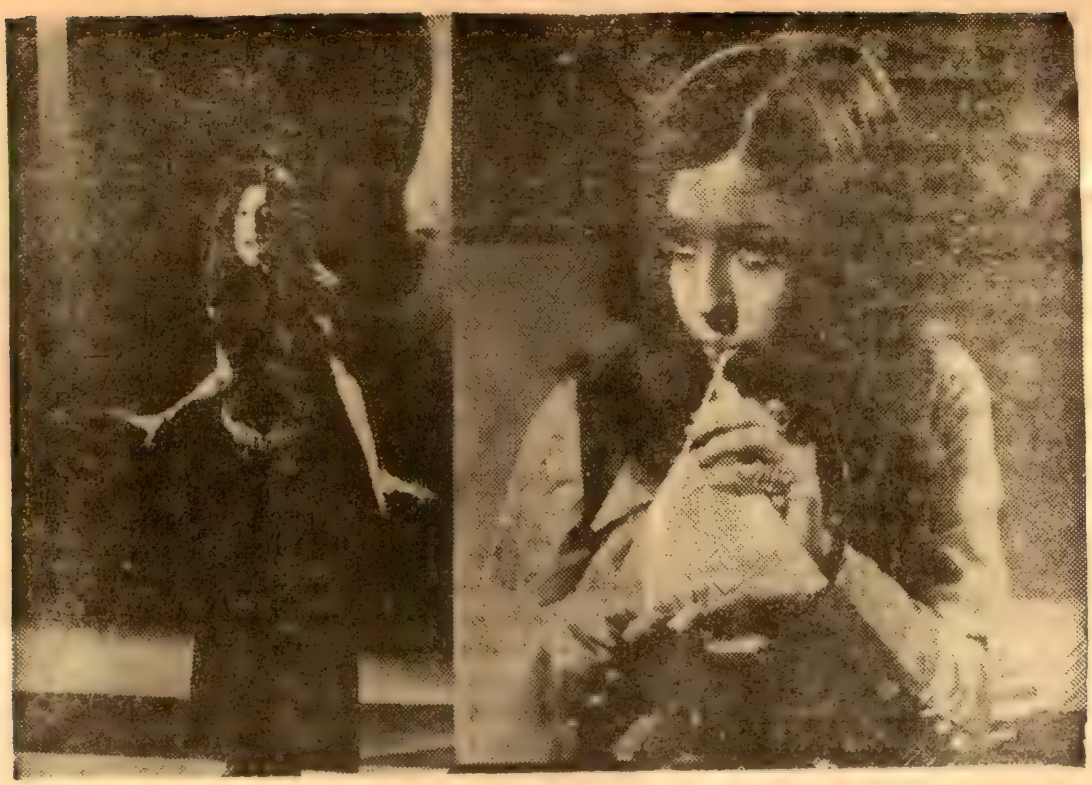

জার্মান প্রবাসী গ্রীক মেয়ে ভিকি 'লা আমুর এস্‌ট্‌ বলু' এই গান গেয়ে বিখ্যাত হয়েছে

'খ' বিভাগে (১২—১৬ বছর) রাগপ্রধান : ১। বাণী সমাদ্দার ২। নন্দা মুখার্জী ৩। নন্দিতা বোস। আধুনিক : ১। নন্দিতা বোস। ২। সীমা ঘোষ ৩। তনিমা ঘোষ। গজল : ১। নন্দিতা বোস ২। তনিমা ঘোষ ৩। সীমা ঘোষ। পল্লীসঙ্গীত : নন্দিতা বোস। ভক্তি-সঙ্গীত : ১। লীলা ঘোষ ২। বাণী সমাদ্দার ৩। নন্দিতা বোস। দেশাত্ম-বোধক : ১। নন্দিতা বোস। ২। কাবেরী দাস।

'ক' বিভাগে (১৬ বছরের ঊর্ধ্বে) প্রথম, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন; রাগপ্রধান : ১। চামেলী গুহদেব ২। মীনা মুখার্জী ৩। চন্দ্রলা দাস-চৌধুরী। আধুনিক : ১। চামেলী গুহদেব ২। পলি ভট্টাচার্য ৩। স্বপ্না বন্দ্যো-পাধ্যায় ও মীনা মুখার্জী। গজল : ১। ভূতনাথ বাগচী ২। চামেলী গুহদেব ৩। শৈলেন্দ্রনাথ দাস ও পলি ভট্টাচার্য। ভক্তিসঙ্গীত : ১। জ্যোৎস্না সাহা। ২। মলিনা মজুমদার ৩। ওয়ালিউর রহমান। পল্লীসঙ্গীত : ১। মলিনা মজুমদার ২। পলি ভট্টাচার্য ৩। শৈলেন্দ্র-নাথ দাস।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন : সর্বশ্রী অনিল বাগচী, জগৎ ঘটক, নিতাই ঘটক এবং সুপ্রভা সরকার।

আগামী ৭ই জুন সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে নজরুল একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীতে দুই কৃতী শ্রীঅনিল বাগচী ও শ্রীনিতাই ঘটককে গুণী সম্বর্ধনা জানান হবে এবং বিশিষ্ট শিল্পিগণ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

জেম সিনেমা

কলকাতা শহরে আর একটি নতুন সিনেমা হলের উদ্বোধন হয়েছে। এণ্টালী মার্কেটের পাশে নবনির্মিত এই সিনেমা হলের নাম 'জেম'। আনন্দম প্রাই-ভেট লিমিটেডের পক্ষে অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীজালান সাংবাদিকদের সিনেমাটি পরি-দর্শনের আমন্ত্রণ জানান। ১১৮৮টি আসনবিশিষ্ট এই সিনেমা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং যন্ত্রপাতির দিক থেকে সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন। সিনেমার শব্দ পরিবেশন ব্যবস্থা সন্তোষজনক এবং ৭০ মিঃ মিঃ পর্দায় ছবি দেখাবারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ত্রিসপ্তকের প্রতিষ্ঠাদিবস

আগামী ৩রা জুন ১নং ঝামাপুকুর লেনে, রাজবাড়ি মঞ্চে 'ত্রিসপ্তক' সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে গান-বাজনার আসর বসবে।

কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ : সর্বশ্রী অশোক-তরু বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দনা সিংহ, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্ক মৈত্র, ঋষিণ মিত্র, বিদ্যুৎ বসু, রণেন ঘোষ এবং অতিথি শিল্পী : স্বপন গুপ্ত ও তৎসহ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করবেন। প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষা শ্রীমতী পার্বতী মিত্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।

তরুণ অপেরার 'হিটলার'

আগামী ৩রা জুন মহাজাতি সদনে তরুণ অপেরার "হিটলার" যাত্রাভিনয় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় অনুষ্ঠিত হবে।

ইতিহাসের পাতা থেকে

বিশ দশকের প্রামাণিক ছবি

॥ বার ॥

সোভিয়েট সিনেমার সুরু হয়েছিল সংবাদ-চিত্রের মাধ্যমে। দেশে বিরাট এবং দ্রুত যে পরিবর্তন হচ্ছিল তাকে এই ছবিতে ধরে রাখা হয়েছিল। পরি-চালক এবং ক্যামেরাম্যানদের কাছে এই ছবিগুলি শিক্ষালয়ের কাজ করেছিল, এতে নতুন জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা ও জ্ঞান বাড়ছিল।

প্রথম সংবাদচিত্রটি ঘটনাকে ধরে

'পড়োসন' ছবি তে সায়রা বানু

রাখা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু গৃহযুদ্ধের শেষে তারা গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হল, এবার ঘটনাগুলির মধ্যে নিজেদের বিশ্লেষণ যুক্ত করল, নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করল। জন্ম নিল ভিসুয়াল জার্নালিজম। লেনিন এই দৃষ্টিগ্রাহ্য সাংবাদিকতার ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করলেন। তার ফলে প্রামাণিক ছবির ওপর পরিচালকদের বেশি মনোযোগ পড়ল। শক্তিশালী চলচ্চিত্র-প্রণেতারা এগিয়ে এলেন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে।

প্রামাণিকচিত্রের ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন ভিগা ভার্টব (ডেনিস কফম্যান ১৮৯৬-১৯৫৪)। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন মনস্তত্ত্বের ছাত্র এবং পড়েছিলেন বিখ্যাত রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভ্লাডিমির বেখতারেভের কাছে। ভার্টব মস্কো সিনেমা কমিটিতে কাজ সুরু করেছিলেন সেক্রেটারী হিসাবে; তারপরে ফিল্ম এডিটর এবং পরবর্তী সময়ে ফিল্ম-ফিচার 'ফিল্ম ট্রুথ'-এর প্রধান সম্পাদক হিসাবে।

'ফিল্ম ট্রুথ' কেবলমাত্র দৈনন্দিন ঘটনার ছবিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভার্টবের লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র, সিনে ক্যামেরার সহায়তায় প্রতিদিনের জীবন এবং সমাজের পরিবর্তনকে দেখা। ঐ ছবিগুলির অনেকগুলি একটা বিশেষ ভাবধারার ওপর নিবদ্ধ ছিল: 'লেনিনবাদী ফিল্ম ট্রুথ'—লেনিনের প্রতি, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য 'পাইওনিয়ার ফিল্ম ট্রুথ'। দু-বছরে (১৯২২-২৪) ২৩টি ছবি করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে এই ২৩টির মধ্যে ভার্টব আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি 'দি স্প্রিং স্মাইলস অব প্রলেটকাল্ট' সংযুক্ত করেছেন, এই ছবিটি 'দি সেজ' নাটকের জন্য করা হয়েছিল।

ভার্টবের ধ্যান-ধারণায় এ হচ্ছে সিনেমার প্রাথমিক অবস্থা। তিনি মনে করতেন ক্যামেরার ল্যান্স হচ্ছে 'সিনেমার চোখ'। মানুষের চোখের চেয়ে এই চোখ অনেক বেশি প্রখর এবং যা সাধারণত চোখে ধরা পড়ে না ক্যামেরার চোখে তা ধরা পড়ে। ভার্টব অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করেছিলেন। লুকানো ক্যামেরায়, মুভিং ক্যামেরায় অনেক কৌতূহলজনক ঘটনার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তুলেছিলেন। ধীরগতি এবং দ্রুতগতি ছবি তোলার ব্যাপারে পরীক্ষা করেছিলেন। চিত্র-সম্পাদনা সম্পর্কে তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তা আইজেনস্টাইনের সম্পাদনা বিষয়ে সাফল্যের পথ রচনা করে গেছে। তাঁর পরীক্ষামূলক ছবি 'ক্যামেরা আই (১৯২৪ সালে প্যারিস ইণ্টারন্যাশনাল ডেকোরেটিভ আর্টস প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পেয়েছে) এবং 'দি ম্যান উইথ দি ক্যামেরা' (১৯২৯) প্রামাণিক ছবির বিষয়ে বিভিন্ন উপায় ও ধারণাকে প্রকাশ করেছে। —ক· স· গ

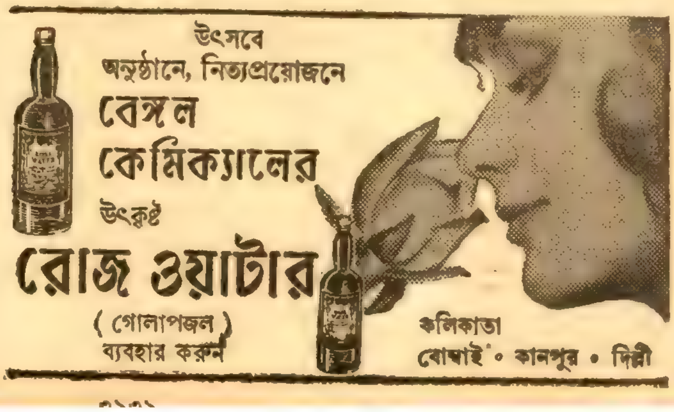

খেলাধুলো

আমাদের দাবী মানতে হবে

কলকাতা ময়দান এখন জমজমাট। ময়দানী আবহাওয়াই পাল্টে গেছে পুরোপুরি। আনন্দ-হাসি-গানে কলকাতা ময়দান এখন ভরে উঠেছে। বাংলাদেশের খেলার রাজা ফুটবল এসে গেছে—এসে গেছে সেই পাগল করা খেলা। বড়, মেজো, সেজো, ছোট সব দলই নেমে গেছে মাঠে। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা বড় খেলারও আসর বসেছিলো। তাই ময়দান এখন সরগরম। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এই ভাবটা সারা মরশুম বজায় থাকলে হয়। সকলের মুখেই আজ এই কথা। সকলেরই আজ এই একই চিন্তা। শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে ! গত দুটি মরশুমের স্মৃতি যে এখনো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। এখনো যে চোখের সামনে ভাসছে আইন-আদালতকে খেলার মাঠে টেনে আনার পেছনের সেই সব অভাবনীয় দৃশ্য ও কাহিনীর কথা। এবারও কি সেই একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হবে—কলকাতার ফুটবলের মান-সুনাম ডোবাতে এবারও কি মাঝপথে পড়বে ইতির দাঁড়ি? হবে কি হবে না—তা কে জানে—তবু এই আশঙ্কাতেই আজ ভরে উঠেছে সকলের মন। ফুটবল-রসিকরা ঠিক যেন সাদা মনে, ঠিক যেন সাধারণভাবে মেনে নিতে পারছেন না এই মরশুমী ফুটবলের আগমনকে। এবারের ফুটবল এসেছে—সবাই আনন্দে মাতোয়ারা তবু কেমন যেন একটা বাধো-বাধো ভাব কাঁটার মতো বিঁধছে মনের মধ্যে। বার বার মনে হচ্ছে, এবারও বোধহয় গত দু'বছরের মতো দশা হবে কলকাতার ফুটবল মরশুমের—এবারও বোধহয় ফুটবল খেলা নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলবে—চলবে সেই বিশ্রী ব্যাপার।

কিন্তু কেন এমন হয় ? কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে কেন চলে এই ধরণের অরাজকতা ? এর জন্যে দায়ী কে ? দায়ী যেই হোন না কেন—সে প্রশ্ন টেনে এনে এখনই ফুটবল আবহাওয়া তিক্ত করতে না চাওয়াই ভালো। আজ তাই আমরা আবেদন জানাই—আবেদন জানাই আই এফ এ কর্তৃপক্ষের কাছে, কলকাতার ছোট-বড় ক্লাবগুলোর কর্মকর্তাদের কাছে আর আবেদন জানাই ফুটবল-উৎসাহী দর্শকদের কাছে। বাংলাদেশের ফুটবল খেলার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে এ বছর অন্তত আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে আবার মাঝপথে খেলা বন্ধ হয়ে যায়, কলকাতার ফুটবল মাঠগুলোর ওপর নেমে আসে আশঙ্কার কালো মেঘ, আইন-আদালত আবার এসে হাজির হয় মাঠ-ময়দানে। খেলায় জয়-পরাজয় আছেই, খেলায় ভুলত্রুটি আছেই, কিন্তু তাই বলে ধৈর্যহারা হলে তো চলবে না—সব মিলেই তো খেলা। তাই খেলাধুলোর পবিত্র আদর্শেই ফুটবল খেলাকে গ্রহণ করার জন্যে আমরা আবেদন জানাই। আর যাই হোক ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতার ফুটবলকে সকলের চোখে বছরের পর বছর আমরা এইভাবে ছোট হতে দিতে পারি না। তাই আসুন কলকাতার ফুটবলের মান এবং ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্যে এবার আমরা, সাধারণ ক্রীড়ারসিকরাই এগিয়ে যাই। আসুন আমরা এক গলায় দাবি জানাই—আমাদের দাবি মানতে হবে, কলকাতার ফুটবলের মান বাঁচাতে হবে...বাঁচাতে হবে

—শান্তিপ্রিয়

ফুটবল-ফুটবল

কলকাতার ফুটবল লীগের খেলা জমে উঠেছে। তিন প্রধানের দুটি দল এর মধ্যেই একটা করে পয়েন্ট হারিয়ে বসে আছে। মহামেডান স্পোর্টিং দল প্রথম পয়েন্ট হারাতে ময়দান আবার সেই পুরোন রূপ ধরেছিলো। আবার সেই হৈ হট্টগোল, আবার সেই গোলমাল।

কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাই দেখলাম সেদিন ইস্টবেঙ্গল বনাম বি এন আর দলের খেলার শেষে। খেলায় কোন দলই গোল করতে পারে নি—না ইস্টবেঙ্গল, না বি এন আর। মরশুমের প্রথম দিকে পয়েন্ট নষ্টর জন্যে অন্য সময় হলে মাঠের চেহারাই হয়তো পাল্টে যেতো। কিন্তু এবার তা গেলো না। বরঞ্চ খেলার শেষে দেখলাম ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ক্লাব সমর্থকরা। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য।

অবশ্য হবে নাই না কেন! কারণ সকলেই জানেন যে এক পয়েন্ট কিম্বা দু পয়েন্টে কিছু যায় আসে না। সুপার লীগ আছেই আর সুপার লীগে খেলার জন্যে প্রয়োজনীয় পয়েন্ট সংগ্রহে কোন অসুবিধেই হবে না বড় ক্লাবগুলোর। তাই বি এন আরের বিরুদ্ধে একটা পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে, কিম্বা ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলতে পারে নি—সেইজন্যে মাথা গরম করলেন না কেউই।

করবেনই বা কেন. লীগ খেলার গুরুত্ব যে একদম কমে গেছে। বড় ক্লাবগুলোর কাছে লীগের খেলা এখন হলো অনেকটা সেই খেলতে হয় খেলা গোছের খেলা। তাঁদের আসল খেলা হবে সুপার লীগে।

কিন্তু একটা বিষয় আমাদের মাথায় ঢুকছে না যে, এই অভিনব পদ্ধতিতে খেলিয়ে বাংলাদেশের ফুটবল খেলার মান এতোটুকুও কি উন্নত করা সম্ভব হবে। জানি না, আমরা কিছু বুঝতেও পারি না। বড় বাবুদের বড় ব্যাপার।

অথচ আজ সবার আগে দরকার বাংলাদেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত করা। সবার আগে দেখা উচিত যে বাংলাদেশের ফুটবল খেলার হাল এখন কি হয়েছে আর ভাবে ফুটবল খেলা হচ্ছে তাতে বাংলাদেশের ফুটবল খেলার ভবিষ্যৎই বা কি?

কিন্তু সেদিকে নজর নেই কারো। ক্লাবগুলোর লক্ষ্য ট্রফির দিকে, আই এফ এ চাইছেন কোনরকমে ভালোয় ভালোয় ফুটবল মরশুমটা শেষ করে দিতে আর তার মধ্যে পড়ে বাংলাদেশের ফুটবল খেলার উঠছে নাভিশ্বাস। দর্শক এবং ফুটবলরসিকরা অসহায়—তাঁদের তো বিশেষ কিছু করার নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এইভাবে কতোদিন চলবে? এইভাবে আর কতোকাল বাংলাদেশের ফুটবল খেলার কবর আমরা নিজেরাই খুঁড়বো নিজেদের হাতে?

॥ অমল দত্ত ॥

মোহনবাগান দলের ফুটবল কোচ প্রাক্তন খেলোয়াড় অমল দত্তের মতে ফুটবল খেলার উন্নতি করতে হলে শুধুমাত্র ধরা-বাঁধা ছকের ওপর নির্ভর করলেই চলবে না—বুদ্ধি খাটিয়ে খেলতে হবে। বাংলাদেশের ফুটবল খেলার উন্নতি সম্বন্ধে তিনি আশাবাদী। তাঁর মতে বাংলার খেলোয়াড়রা যদি পরিশ্রম করেন, বুদ্ধি খাটিয়ে আর ঠিকমতো কোচিং-এর আওতায় আসতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের খেলার মান আরো উন্নত হবে।

গল্প হলেও সত্যি

ঘটনাটা ঘটেছিল গত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সময়। সেদিনের কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় মিলিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ড আর আর্জেন্টিনা। খেলা চলার সময় একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেফারী আর্জেন্টিনার অধিনায়ক র‍্যাট্টিনকে মাঠ থেকে বার করে দিলেন। আর যাবে কোথায়! 'আমাদের ক্যাপ্টেনকে বার করে দেওয়া হলো মাঠ থেকে? আমরাও খেলবো না।' এই বলে র‍্যাট্টিনের পেছনে পেছনে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রাও বেরিয়ে গেলেন মাঠ থেকে।

সে এক বিশ্রী কাণ্ড। হৈ হৈ ব্যাপার। সাত মিনিটের জন্যে খেলা বন্ধ থাকলো। আর খেলার শেষে পুলিশ পাহারায় রেফারীকে নিয়ে যেতে হলো মাঠ থেকে।

আর্জেন্টিনার ফুটবল ফেডারেশনের মতে, ব্যাপারটার পেছনে একটা ব্যাপার ছিলো। ল্যাটিন-আমেরিকান পরিচালকরা নাকি ঐরকম ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ওদিকে ফিফাও চুপ করে ছিল না। ঐ ঘটনার জন্যে ফিফা আর্জেন্টিনা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনকে এক হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক জরিমানা করেছিল।

১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও আর্জেন্টিনাকে যোগ দিতে দেওয়া হবে না বলা হয়েছিল। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়! বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসার সময় তো আবার হয়ে এলো।

সমাচারদর্পণ

এবারকার হকি মরশুমটা ছিলো মোহনবাগান ক্লাবের সাফল্যে ভরা। অপরাজিতভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার পর মোহনবাগান আবার লাভ করলো বেটন কাপও। তবে বেটন কাপটা এবার আর একা লাভ করতে পারে নি মোহনবাগান। যুগ্ম বিজয়ী হয়েছে। জলন্ধরের কোর অফ সিগনালস দলের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের খেলাও অমীমাংসিতভাবে শেষ করার পর দুটি দলকে একসঙ্গে এবারের যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, এই মরশুমের হকি খেলায় মোহনবাগান একবারও পরাজিত হয় নি।

* * *

মেয়েদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসেছে এবার কলকাতায়। ইডেন উদ্যানে চলেছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লীগ পর্যায়ে খেলার পালা শেষ হয়ে গেছে, এখন চলেছে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। শেষ পর্যন্ত কোন দল যে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করবে কে জানে। দেখা যাক কোন প্রদেশের গলায় এবার চ্যাম্পিয়ানশীপের মালা ঝোলে।

* * *

১৯৭০ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা যাতে বাংলাদেশ তথা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় তার জন্যে চেষ্টা চলছে। অনেক বছর বাংলাদেশে এই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার আসর বসে নি। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা দেখার জন্যে বাংলাদেশের দর্শকরাও উদগ্রীব। তাই ১৯৭০ সালে কলকাতায় সন্তোষ ট্রফির খেলা হবার সংবাদে সকলেই খুশি।

বেটন কাপ জয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত যুগ্ম-বিজয়ী মোহনবাগান ও জলন্ধরের কোর অফ সিগন্যালস দলের অধিনায়ক দ্বয়—গুরুবক্স সিং ও রামিন্দার সিং।

[৩১৩৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবস্থা রাখতে হয়। ইডেনে তা সম্ভব নয়।

শ্রীগুপ্ত বলেন, ইডেনের মাটি এমনভাবে তৈরি যাতে সেখানে ক্রিকেটই সারা বছর চলতে পারে। বর্ষাকালে ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। শীতকালে ২।১টি ফুটবল ম্যাচ হতে পারে।

অন্য কোন দেশে ফুটবল ও ক্রিকেট এক সঙ্গে খেলা হয় না। অস্ট্রেলিয়াতে ক্রিকেট এবং অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল একসঙ্গে হয়, কিন্তু সেখানকার মাটি অন্যরকম। তিনি বললেন, মেক্সিকোর প্রধান স্টেডিয়ামটিতে ফুটবল বা হকি খেলা হয় নি।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার বা সংশিলষ্ট কর্তৃপক্ষ ইডেনে যে কম্পোজিট স্টেডিয়াম গঠনের পরিকল্পনা করেছেন তাতে আমার মনে হয় যে, ফুটবল-প্রিয় দর্শকদের কেবলমাত্র ২।৩টি বড় ম্যাচ দেখার সুযোগ দানের জন্যই এই প্রচেষ্টা। এর ফলে খেলাধুলার উন্নতির জন্য দেশের বা রাজ্যের কোন উদ্দেশ্য সফল হবে না। 'শুধুমাত্র মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখবো'—এ ধরণের চিন্তা খেলাধুলার উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না। এ জন্য চাই বড়রকমের সার্থক উদ্যম যাতে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলের জন্য পৃথক স্টেডিয়াম গঠন করা যেতে পারে।

শ্রীগুপ্ত বললেন, কলকাতায় কম্পোজিট স্টেডিয়াম চাই। তবে, তা এমনভাবে করা উচিত যাতে দেশে স্থায়ী একটা কিছু হতে পারে। এশিয়ান গেমস বা কমনওয়েলথ্ গেমস্ অথবা জাতীয় ক্রীড়ার সর্বাত্মক আসর কলকাতায় বসতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা করতে হলে কম্পোজিট স্টেডিয়াম করতে হবে। এবং তা ইডেনে সম্ভব কি?

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, কানপুরে সাঁতারের পুল আছে। কলকাতায় সাঁতার জনপ্রিয় হলেও এখানে সুইমিং পুল নেই। কম্পোজিট স্টেডিয়াম হলে সেখানে এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কাঁচের প্ল্যাটফর্ম-এর ব্যবস্থা করলে সেখানে বক্সিং, কুস্তি, টেবিল টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল প্রভৃতি খেলা হতে পারে। ইডেনেও ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা করা হলেও তা উন্নতির অপেক্ষা রাখে।

ইডেনে ফুটবল খেলা হলে দর্শকদের অসুবিধা হবে, এত দূরে থেকে তারা খেলা দেখে আনন্দ পাবে না।

কোন কিছু করার আগে কর্তৃপক্ষ সকলের সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি এ-ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতার কথা জানান।

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসংগে

বাংলার সেরা ক্রীড়াবিদরা কি বলেন

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বললেন

ইডেন কম্পোজিট স্টেডিয়াম সম্পর্কে ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বললেন, ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট মাঠ বহু ঐতিহ্যের অধিকারী, একশো বছরের উপর এ মাঠে ক্রিকেট খেলা হয়ে আসছে। ইডেনের মাঠ শুধু ক্রিকেট খেলার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। তাই মাটিতে বালির ভাগ নেই, এ'টেল মাটিতে সম্পূর্ণ মাঠটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ইডেন গংগার কাছে, আশেপাশে খাল রয়েছে, তাই সারা বছর মাঠটি ভিজে থাকে। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। বৃষ্টির জল এবং খাল থেকে ঢুকে পড়া জল ইডেনের মাটি নরম করে রাখে। তাই সারা বছর প্রচুর পরিশ্রম করে মাঠটি ক্রিকেট-উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রতি বছর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করতে হয়। এ অবস্থায় বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলা হলে মাঠের অবস্থা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।

তিনি বললেন, অনেকে বলে থাকেন ... ইস্টবেংগল-মোহনবাগান মাঠে

তো ফুটবল, ক্রিকেট-হকি হয়ে থাকে, ইডেনে হবে না কেন? সে মাঠের মাটি অন্য রকম। তাছাড়া সেখানে এক দিন, দেড় দিনের ক্রিকেট হয়, আর ইডেনে তিন, চার ও পাঁচ দিনের খেলাই বেশি হয়। সেজন্য পীচও বিশেষভাবে তৈরি করতে হয়। ১৯৬৭-তে ইডেনে ফুটবল খেলায় আমরা আপত্তি করি নি, কারণ 'টিউব-ওয়েল'টি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গংগার জল ইডেনে ব্যবহার করায় মাঠের ভেতরে ভেতরে নোনা ধরে ইডেনের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। গত বছর অনেক টাকা খরচ করে বারো আনা কাজ শেষ হয়েছে। এবার বর্ষার আগে মাটি খুঁড়ে বাকী কাজ শেষ না করতে পারলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ খেলা ইডেনে হবে কিনা সন্দেহ।

শ্রীঘোষ আরো বলেন, অনেকে বলেন যে, বছরে পাঁচ দিনের একটা টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য ইডেনকে আটকে রাখার অর্থ হয় না। আজকাল বাংলায় ক্রিকেট জনপ্রিয় হয়েছে। খেলার উন্নতিও হচ্ছে। তাই রনজি ট্রফির সেমিফাইন্যাল, ফাইন্যাল, দলীপ ট্রফির খেলা এবং টেস্ট ম্যাচে খুবই ভিড় হচ্ছে। স্কুল ক্রিকেটে বাংলা দুটো জাতীয় ট্রফি দখল করেছে। বাংলার খেলোয়াড়পুষ্ট পূর্বাঞ্চল দল দলীপ ট্রফির সেমিফাইন্যালে হেরে যায়। এ বছর রনজিতে বোম্বের কাছে বাংলা ফাইন্যালে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে হেরে গেছে। সুতরাং বাংলার ক্রিকেট ক্রমাগত উন্নতির দিকে, এ অবস্থায় ক্রিকেটের মাঠে ফুটবল খেলা হলে অনুশীলনের ব্যাঘাত ঘটবে।

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে শ্রীঘোষ বলেন যে, বাংলাদেশে ফুটবলের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা স্টেডিয়াম হলে ভালোই হবে। দু' কোটি টাকা ব্যয় করে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম করে ফুটবল দর্শকদের কেবলমাত্র ৮।১০টি বড় ম্যাচ দেখার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। এতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে মনে হয় না।

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম হলে আরো কিছু অসুবিধায় পড়তে হবে। সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

[১] গোলাকার মাঠে ফুটবল খেলা দেখে দর্শকরা আনন্দ পাবেন না।

[২] বালি ও মাটির ভাগ সমান সমান হলেই ফুটবল সম্ভব। ইডেনে এ'টেল মাটি রয়েছে।

[৩] ফুটবলের জন্য হাওয়া দরকার হয় না। ক্রিকেটে বাতাস চাই, তা না হলে পেস বোলারদের অসুবিধা হবে।

[৪] ক্রিকেট শীতকালের খেলা। বিদেশ থেকে ফুটবল টিম শীতকালেই সফরে আসে। তখন কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে?

[৫] ইডেনে শীতকালে ফুটবল অনুশীলন করা সম্ভব নয়, তখন ক্রিকেট চলবে। আবার ফুটবলের ক্ষেত্রেও একই অসুবিধা দেখা দেবে।

[৬] দর্শক আসন বাড়ালে বেরুবার এবং প্রবেশের রাস্তা পাওয়া যাবে না। কাছেই বিধানসভা ভবন ও হাইকোর্ট থাকায় দর্শকদের ভিড় সেখানে গিয়ে পড়বে। গোলমাল বাধলে অবস্থা কি আকার ধারণ করতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার।

পরিশেষে শ্রীঘোষ বলেন, এলেনবরা কোর্সের জমি যদি সরকারের হাতে থেকে থাকে, তবে সেখানে কেন কম্পোজিট স্টেডিয়াম হবে না তা আমি বুঝতে পারছি না। ফ্রণ্ট সরকার বলেছেন যে, তাঁরা সকলের মতামত নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। আমার অনুরোধ তাঁরা যেন ইডেনকে ক্রিকেটের জন্য রেখে অগণিত ক্রিকেট-অনুরাগীর শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। শ্রীঘোষ জানান, সরকার যে সিদ্ধান্তই নিন না কেন, তাঁরা তা মেনে নিয়ে সহযোগিতা করবেন।

পঙ্কজ গুপ্তের অভিমত

ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত পৃথিবীর সব দেশের কম্পোজিট স্টেডিয়াম দেখেছেন। তিনি বললেন, কলকাতার

ইডেনে যে ধরণের স্টেডিয়াম হবে বলে শোনা যাচ্ছে তাকে কম্পোজিট স্টেডিয়াম বলা যায় না। এ ধরণের স্টেডিয়াম করতে হলে এক সঙ্গে হকি, ক্রিকেট, এ্যাথলেট, সাইক্লিং ও ইনডোর গেমস

[শেষাংশ ৩১৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন উত্তর

নির্মলেন্দু পাল (মেমোরিয়াল বহাল কলিয়ারী, আসানসোল)

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের সেরা ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় কে? তাঁদের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর : পেলে ও সোবার্স। ঠিকানা জানি না। তবে মনে হয় সোবার্সকে C/o. এম সি সি, লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউণ্ড, ইংলণ্ড এই ঠিকানায় চিঠি দিলে তিনি পাবেন।

আপনি লেখা পাঠাতে পারেন।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম অর্ধশত রান পূর্ণ করার রেকর্ড কার? কতো সালে?

উত্তর : ৩৫ মিনিটে জে এম গ্রেগরী, জোহানসবার্গে, অস্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ আফ্রিকার খেলায়—১৯২১-২২ সালে।

৩৫ মিনিটে সি জি ম্যাকারটনে, সিডনীতে, অস্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ আফ্রিকার খেলায় — ১৯১০-১১ সালে।

৩৫ মিনিটে জে এইচ সিনক্লেয়ার, কেপটাউনে, সাউথ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলায় — ১৯০২-৩ সালে।

স্বাস্থ্যগঠন সম্বন্ধে আপনার ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করতে চেষ্টা করবো। তবে কবে যে সম্ভব হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : কোন উইকেট কীপার এক সিরিজে সর্বাধিক আউট করার রেকর্ড করেছেন? এর মধ্যে ক'টি ক্যাচ ও ক'টি স্টাম্প ধরেছিলেন?

উত্তর : কেন্টের এল ই জি এমস ১৯২৯ সালে ১২৭টি উইকেট দখল করে এক মরশুমে সর্বাধিক উইকেট দখলের রেকর্ড স্থাপন করেন। এর মধ্যে তিনি ৭৯ জনকে ক্যাচ ধরে ও ৪৮ জনকে স্টাম্প করে আউট করেছিলেন।

কল্যাণকান্তি পাল (এম· বি কোলিয়ারী, আসানসোল)।

প্রশ্ন : সাপ্তাহিক বসুমতীর ৪৭শ সংখ্যা ১লা জ্যৈষ্ঠর খেলাধুলো বিভাগের 'গল্প হলেও সত্যি' লেখাটি পড়লাম। কিন্তু এক জায়গায় একটি লাইন আমার মনে হয় ভুল ছাপা আছে। কারণ ফুটবল খেলায় পর পর তিনজনকে আউট করা যায় না। আমার মনে হয় ফুটবলের জায়গায় ক্রিকেটই হবে।

উত্তর : ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ক্রিকেটই হবে! ছাপার ঐ ভুলটির জন্যে আমরা দুঃখিত।

সঞ্জীবচন্দ্র বসু, পরিতোষ ঘোষ ও প্রকাশ বসু (মগরা, হুগলী)।

উত্তর : এর আগে আপনাদের চিঠি পেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না। প্রশ্ন-উত্তর বিভাগে অনেক চিঠি জমে আছে। তাই উত্তর পেতে অনেক সময় দেরি হয়ে যায়। ফুটবল খেলোয়াড়দের সুনীল ভট্টাচার্যের জীবনীও সময় মতো ছাপা হবে।

অরিন্দম দাশগুপ্ত (ডাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী)।

উত্তর : বইটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি। আপনিও আমার ধন্যবাদ নিন।

অশোককুমার ভট্টাচার্য (ডাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী)।

উত্তর : আপনার চিঠি পড়ে খুব খুশি হয়েছি। আপনার মতো সকলেই যদি চিন্তা করতেন, তাহলে বাংলাদেশের ফুটবল খেলার মান অনেক উন্নত হতো। কিন্তু তা তো আর করেন না। যাই হোক ১৯৬৮ সালের খেলার ওপর আপনার লেখাটা মনে হয় খুব পুরোনো হয়ে গেছে। তাই বোধ হয় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তবু যদি পাঠিয়ে দেন তাহলে পড়ে দেখতে পারি।

আশা করি আপনার অন্য প্রশ্নটির উত্তর এতোদিনে পেয়ে গেছেন।

শুকদেব মুখোপাধ্যায় (মিরহাট)

উত্তর : আপনি বরং প্রভাবতী প্রকাশনীকে চিঠি লিখে 'ক্রিকেটের রাজপুত্র' এলেন বইটা সংগ্রহ করে নিন। উইসডেন ভিঃ পিঃ-তে পাঠান না। কেউ কলকাতায় এলে তাঁকে দিয়ে নিউ মার্কেটের কাছের দোকানগুলোয় খোঁজ নিয়ে বইটা কিনে নিতে বলবেন।

আপনি যে নাম লিখেছেন ঐ নামে কোন খেলোয়াড় আছে বলে আমি জানি না। তবে গোলাম গার্ড আর ইন্তিখাব আলমের কথা যদি জানতে চেয়ে থাকেন তাহলে আলাদা কথা।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচমুড়া কলেজ, বাঁকুড়া)।

উত্তর : পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের খেলাধুলোর ওপর আগ্রহের বিষয় নিয়ে দৈনিক বসুমতীতে লেখা হয়েছে। তাই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হবে বলে সাপ্তাহিক বসুমতীতে আর বিশেষ কিছু লেখা হয় নি।

শীতাংশু ও সব্যসাচী দেব (সুভাষগ্রাম, কোদালিয়া, ২৪ পরগনা)।

প্রশ্ন : বোলার বল করলো, ব্যাটসম্যান বলটি মারলো। বলটি এসে ননস্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের উইকেট ভেঙে দিল। ননস্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান তখন ক্রীজ ছেড়ে এসেছিল। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর : না হবে না। কারণ ননস্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের দিকের উইকেট ভেঙে দেবার আগে ফিল্ডিং পক্ষের যদি কেউ সেই চলতি বলটি ছুঁয়ে দিতে পারতেন তাহলেই ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যেতেন।

অমিত চক্রবর্তী, নির্মল দাশ, বিজয় দাশগুপ্ত ও সঞ্জিত দেবনাথ (শিলচর-১)।

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনারা কি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবল দল সম্বন্ধে জানতে চাইছেন? যাই হোক আপনাদের প্রশ্ন পরিষ্কার করে জানাবেন।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)।

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় সর্বনিম্ন রানসংখ্যা কত? কোন দেশের বিরুদ্ধে এবং কতো সালে হয়েছিল?

উত্তর : ২৬ রান। ১৯৫৪-৫৫ সালে নিউজিল্যাণ্ড বনাম ইংলণ্ডের অকল্যাণ্ড টেস্ট খেলায়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

বেদান্তসার :

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত; ধর্মশাস্ত্র ...ার-ব্রতী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (সুবোধিনী-...কা সমং)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ...বিদ্যার দিব্যজ্যোতিঃ বিবম্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মানসোল্লাস :

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ :

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ ...দিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম—৪-০০ এবং ২য়, ৩য় ও ... মূল্য—প্রতি খণ্ড—৩-০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ...খ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫-৫০ টাকা। ... খণ্ড ৪-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্র-...হিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, ...শ্বরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের ...বেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয় ...ান্দিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ...মূল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য—২-৫০ ...কা।

পবন-বিজয়-স্বরোদয় :

বায়ু জয়ই যোগের শ্রেষ্ঠ সাধনা। অলৌকিক সত্য ...দর্শক যোগক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি :

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। সংবর্ধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহৃত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত আর্য সৎকর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থশাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, ব্রত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়-সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিশারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান :

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পয়সা।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস :

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যম্ :

যোগীপ্রবর মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

...সুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর
শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

30 MAY 1969

সাপ্তাহিক বসুমতী

বিগত সপ্তাহের কলকাতার একটি চিত্ররূপ

৫০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 50, 5th June, 1969

সূচীপত্র

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	—		৩১৩৯
আজকের মানুষ	—		৩১৪০
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	—	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৩১৪১
বঙ্গদর্শন	—		৩১৪৫
ভারতদর্শন	—		৩১৪৮
আন্তর্জাতিক	—		৩১৫০
সপ্তাহের বোকা	—	কৃত্তিবাস ওঝা	৩১৫৪
কথার [illegible]	—	নিবারণ মুনশী	৩১৫৬
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	—	শ্রীসর্বদর্শী	৩১৫৮
মোকাসিনের মৃত্যু (গল্প)	—	রেবন্ত বসু	৩১৬০
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—	সুশীল জানা	৩১৬৪
তোমার আত্মার শান্তি হোক (প্রবন্ধ)	—	সুরেশচন্দ্র সাহা	৩১৬৯

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব ছোট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নজরুল ইসলাম : উচ্চারণ পদ্ধতি ও বিষয়রেখা (প্রবন্ধ)	— শান্তিব্রত ঘোষ	৩১৭০
সওদা (কবিতা)	— জয়ন্তী সেন	৩১৭৫
অবাধ্য বালক (কবিতা)	— শান্তনু দাস	৩১৭৫
তিমির প্রান্ত ছুঁয়ে	— অগ্নিবর্ণ	৩১৭৬
গ্রাম বাংলার কথা	— অসীম মুখোপাধ্যায়	৩১৭৯
পাঠকমন		৩১৮০
সংগীতানুশীলন	— নীহারবিন্দু চৌধুরী	৩১৮৪
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	— অশোক সেন	৩১৮৭
রঙ্গজগৎ		৩১৯১
খেলাধূলা	— শান্তিপ্রিয়	৩১৯৬

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

আবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

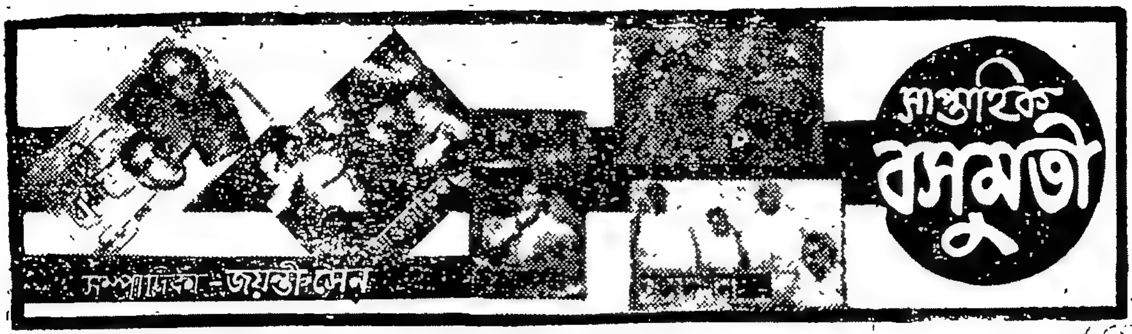

৭৩ বর্ষ : ৫০শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 5th June, 1969

পুলিশ ও জনসাধারণ

পরাধীন ভারত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে একটি জিনিসের পরিবর্তন ঘটে নি—আর তা হচ্ছে পুলিশী মনোভাব। পুলিশ সম্পর্কে জনসাধারণের তাই ধারণা, সেই tradition সমানে চলেছে, এর কোথাও পরিবর্তন নেই।

ইংরেজ আমলে লাল পাগড়ি ছিল ছোট-বড় সকলেরই ভীতিস্বরূপ। গোরা পল্টনের নাম শুনলে যেমন শঙ্কিত হত মন, তেমনি লাল পাগড়ি দেখলেই প্রাণ খাঁচাছাড়া হত। কারণ, আজও এই প্রবচন নিষ্ঠুর সত্যভাবে প্রচলিত: বাঘে ছুঁলে আঠারো, আর পুলিশে ছুঁলে...।

যাক সে কথা। আসলে পুলিশের কাজ কি হওয়া উচিত? নিঃসন্দেহে এককথায় এর উত্তর জনগণের সেবা। কিন্তু সেবা লাভের আশা তো কিছুই নেই, উপরন্তু আজ তারাই সেবা লাভে উদ্‌গ্রীব। চোখের সামনে চুরি, রাহাজানি, লুঠপাট হলেও পুলিশ নির্বিকার। এবং পুলিশ সম্বন্ধে জনমনে এমন ধারণা যে, তারা অসামাজিক ব্যক্তিদের চেয়েও তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তাই দেখা যায়, সমাজের একমাত্র সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তিদের কাছাকাছি পুলিশদের। জনসাধারণ ধরেই নিয়েছে—পুলিশের সাহায্য তাদের জন্য নয়, বরং সাহায্য চাইতে গেলে বা দুর্নীতি, দুষ্ক্রিয়ার সন্ধান দিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়।

এ ছাড়া পুলিশ বিভাগ যে কাজের জন্য মূলত রয়েছে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। ইংরেজ আমলে প্রভুকে খুশি করার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের ওপর তারা নিদারুণ উৎপীড়ন চালিয়েছে। দেশ স্বাধীন হলে পর যাঁরা প্রভু হলেন, তাঁদের খুশি করার জন্য পুলিশ বিভাগ আরও তৎপর হল। তখন দুর্নীতির নানা উৎসে বান ডেকেছে এবং পুলিশেরও মওকা। তাই দুর্নীতিগুলি নানা মুখ ধারণ করে অসহায় জনগণকে গ্রাস করতে লাগল। আর যারা প্রতিবাদ জানাল, তাদের জন্য সক্রিয় হল পুলিশের জুলুম, লাঠি, টিয়ার গ্যাস আর বন্দুকের গুলী। দেশ স্বাধীন হল, চারদিকে পরিবর্তনের হাওয়া; অথচ পুলিশ বিভাগের এ দশা হল কেন? এমন দশা হবার কারণ, পুলিশের বড় কর্তারা—ইংরেজ আমলে যারা ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর তারাই থাকল। এবং স্তুতিতে, তোষামোদে তারা এমনই দক্ষ ছিল যে, দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেদের সুবিধাবাদী স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে তাদের কোনরকম অসুবিধা হল না। এই অভ্যাস তাদের এমনই মজ্জাগত হয়ে উঠেছে যে, বর্তমান সময়ে জনগণের মনে পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে নিদারুণ বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা দেখেও তাদের চৈতন্যোদ্রেক হয় না। অথচ গণতন্ত্র বলে জনগণের শক্তিই বড় শক্তি। এই শক্তি অবিশ্বাস্যভাবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটাতে পারে—এ পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছি। তবু এই অবস্থা কি পুলিশ বিভাগের চোখে পড়ে না? আর সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করার ব্যাপার, বর্তমান সময়ে পুলিশ বিভাগ পূর্বের মতো লাঠি বা গুলী চালাবার হুকুম দিতে না পেরে এখন রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ। পশ্চিম দিনাজপুর পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবে ও মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের সভায় উচ্চারিত দাবিগুলি পড়লে মনে হয়, তারাই যেন পশ্চিমবঙ্গের হর্তাকর্তাবিধাতা হবার যোগ্য পাত্র। অবশ্য মেদিনীপুরের জনৈক পুলিশ কর্তার দাবির বিরুদ্ধে সভার জনৈক কনস্টেবল বলেন যে, "সরকার-বিরোধী উস্কানিতে বিভ্রান্ত না হয়ে সরকারের নির্দেশ অনুসারে জনগণের সেবা করাই পুলিশের উচিত।"

গোটা পুলিশ বিভাগের দুর্নাম থাকলেও কোন কোন পুলিশ অফিসার সৎ নন বা সাধারণ চাকুরীজীবী কনস্টেবলদের বিবেকবুদ্ধি নেই—এমন কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়া চোর যেমন সৎ হবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের কাছে কল্কে পায় না, তেমনি কোন পুলিশ অফিসার বা কনস্টেবল সৎ হলেও ঐ বিভাগের কীর্তিকলাপের জন্য সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। আদর্শবান ও সত্যনিষ্ঠ যুবকরা তাই ঐ বিভাগে চাকরি নিতে বাধ্য হলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে। এটাও ঠিক যে, পুলিশের অধস্তন বিভাগে যাঁরা চাকরি করেন—তাঁরা সৎপথে থাকলে তাঁদের যা মাইনে তাতে সুসঙ্গতভাবে সংসার চালানো একালে কঠিন। আমরা মনে করি, সে ব্যাপারেও সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, পুলিশ বিভাগকে সুনাম অর্জন করতে হবে। জনসাধারণের দুর্দিনের ও দুঃসময়ের সঙ্গী হতে হবে। চাইতে হবে জনগণের সহযোগিতা। আর জনগণের কোন কল্যাণ সাধিত না হলে পুলিশ বিভাগ রাখার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? সেক্ষেত্রে অন্যরকম ব্যবস্থা তো চালু করা যেতে পারে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আল-থাওয়ারা! আল-থাওয়ারা!!

ওম্‌দুরমান আর খার্টুম-এর প্রতিটি লোকের মুখে এখন ঐ এক কথা।

অর্থাৎ বিপ্লব! বিপ্লব!!

এবারের বিপ্লব আর গতবারের বিপ্লবে তফাৎ আছে বৈ কি। বলা যায়, আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেবার ১৯৬৪ সালে হঠাৎ ঘটেছিল এক গণ-অভ্যুত্থান। তেমন অভ্যুত্থান তো হামেশাই ঘটছে মধ্য-প্রাচ্যের উত্থান-পতনের মাধ্যমে। কিন্তু সেবারকার অভ্যুত্থানে ওম্‌দুরমান আর খার্টুমের রাজপথ রক্তে রঙিন হয়ে উঠেছিল। ইব্রাহিম আব্দুদের পতনে সম্মিলিত ফ্রন্টের হাতে পড়লো দেশ শাসনের ভার।

এই ফ্রন্টও টিকলো না। নানা দলের দলাদলিটাই ক্রমে বড় হয়ে উঠলো। ফ্রন্টের নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আহমদ মহ্‌বুব এই বিপর্যস্ত সময়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে একচ্ছত্র নায়কের মতো এক-একটি আত্মঘাতী কাজ করে যেতে লাগলেন। একদিকে তিনি বিরোধীদের ব্যূহ ভেদ করতে পদে পদে ব্যর্থ হলেন, অন্যদিকে বেসামাল অবস্থায় গণ-পরিষদ বাতিল করতে বাধ্য হন, পুরাতন মন্ত্রিমণ্ডলী ভেঙে গত জুন মাসে নতুন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন। তারপর এগারো মাসের মধ্যেই নেমে এল তাঁর কপালে দারুণ বিপর্যয়। আবার—

আল-থাওয়ারা! আল-থাওয়ারা!!

এবার রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে জন্ম হোল 'রিপাবলিক অব সুদান'-এর।

১৯৬৪ সালের অভ্যুত্থানের পরবর্তী-কালের প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে ক্ষমতা-চ্যুত—শ্রীমহম্মদ আহমদ মহ্‌বুব আপাতত স্বগৃহে কড়া পাহারায় নজরবন্দী। আর গত ২৫শে মে ১৯৬৯-এর রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের নায়ক—কর্নেল জাফর মহম্মদ নুমেরি। এটাও সামরিক অভ্যুত্থান। তবু উল্লেখযোগ্য, এবার সুদানের রাজনৈতিক আসরে যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন—তাঁরা সবাই বাম মার্গী। কিন্তু বর্তমান প্রজা-তান্ত্রিক সুদানের উদ্দেশ্য যে নিষ্কলঙ্ক আইনের শাসন চালু করা—তার প্রমাণ মেলে শ্রীআবু বক্‌র আবদাল্লাকে প্রধান-মন্ত্রী করা থেকেই। শ্রীআবদাল্লা একজন প্রাক্তন বিচারপতি হিসেবে স্বদেশবাসীর কাছে বরাবরই সর্বজনশ্রদ্ধেয় এবং সম্মানের উচ্চ আসনে থেকেও তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের কাছের লোক।

এই আবদাল্লা বিদেশেও খুব বেশি অজ্ঞাত নন্। কারণ ১৯৬৪ সালে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, তাতে শ্রীআবদাল্লাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছিল। তখন তা তিনি গ্রহণ করেন নি।

এক রকম দেশের স্বার্থেই এখন তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে দেশের কর্ণধার। তবে সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণের আগে যে নির্বাচন হবার কথা ছিল তাতে বিরোধী-পক্ষ তাঁকেই প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে

আবু বকর আবদাল্লা

প্রার্থীরূপে মনোনীত করেছিলেন। বর্তমানে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে—তার প্রায় সবাই বামপন্থী। মন্ত্রিসভার একুশ-জন সদস্যের মধ্যে বাঘা বাঘা কম্যুনিস্টরা তো স্থান পেয়েছেনই, উপরন্তু অন্যান্য দলের যাঁরা গোঁড়া উপনিবেশ-বিরোধী বলে পরিচিত তিনি তাঁদেরও মন্ত্রিপদ দিয়েছেন। আর মন্ত্রিসভার মাত্র একজন সদস্য সামরিক বাহিনীর অন্তর্গত—তিনি হচ্ছেন কর্নেল জাফর মহম্মদ নুমেরি। তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনিই ঘটিয়েছেন রক্তপাতহীন এবারের বিপ্লব।

এঁর কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে যে লোকটির এখন তিনি অধীন সেই আবদাল্লা এর আগে এমন এক কাজ করেছিলেন যা অন্য কারো পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি প্রধান বিচারপতি হিসেবে রায় দিয়েছিলেন—পার্লামেন্ট যে প্রস্তাবে কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে পার্লা-মেন্টের তের জন সদস্যকে অধিকারচ্যুত করেছে—তা অবৈধ। সেদিনই তিনি বিদগ্ধজন ও বুদ্ধিজীবীদের স্তুতিবাদে ধন্য ধন্য হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর রায় সরকার গ্রাহ্য করে নি। বাধ্য হয়েই তিনি প্রধান বিচারপতির দপ্তর থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশবাসীকে এই বলে সাবধান বাণী দান করেছিলেন—দেশে এখন ঔপনিবেশিক চক্রান্তে চরম একনায়কতন্ত্র চলছে। এরপর তিনি এক আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। পরে এটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, ১৯৬৪ সালে তিনি প্রধান-মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নি শুধু ক্ষমতাশীল সরকারের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তাঁর মনে আশা ছিল যে, বিচার বিভাগ অন্তত শাসন বিভাগকে দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত করে দিতে পারবে। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয় নি। ফলে তাঁকেই প্রধান বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল।

অবশ্য আজ তিনি দেশের সর্বেসর্বা, সর্বজনপ্রিয়। সর্বদা ফিটফাট, সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন দীর্ঘকায় শ্রীআবদাল্লার বয়স এখন সবে তিপ্পান্ন। খার্টুমের গর্ডন কলেজের স্নাতক তিনি। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি প্রায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁকে যেতে হয় লণ্ডনে। সেখান থেকে ফিরেই তিনি বিচার বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে সুদান স্বাধীন হলে পার্লামেন্টে তিনিই স্পীকার নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর সেই সময়ই সুদান আর ভারত হয়েছিল আরো কাছাকাছি। ভারতের তদানীন্তন মুখ্য নির্বাচক আহূত হয়েছিলেন সুদানের সাধারণ নির্বাচন পরিচালনায়। সুদানের সুকুমার শরণ আজো সে পরিচয় বহন করছে এমন কি সেখানের শাসনতন্ত্র প্রস্তুতির পরামর্শও ভারত সাগ্রহে দিয়েছিল। ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর শ্রীআবদাল্লা ফিরে যান বিচারালয়ে। তারপরই তিনি এসেছিলেন ভারত পরি-ভ্রমণে—উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিচার-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা।

সুদানের কর্ণধার শ্রীআবদাল্লার হাতেই আজ দেশ শাসনের ভার এবং আইনের নাড়ী-নক্ষত্রও তাঁর নখাগ্রে। সুতরাং তাঁর ব্যবস্থায় দেশে নির্দোষ শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে—এটাই এখন একমাত্র আশার কথা।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন—(২)

সাম্যবাদী দলের পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্রের থেকে স্বতন্ত্রভাবেই (স্বাভাবিক কারণে; কারণ সুভাষচন্দ্র তখন বিদেশে) এই দল ভারতবর্ষে গঠিত হয়ে দেখিয়ে দিল, নতুন দল গঠনের তাগিদ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। এই দলকে সুভাষচন্দ্র স্বভাবতই স্বাগত জানালেন; কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাবের প্রসারের বিরুদ্ধে এই দলের অভ্যুদয় অবশ্যই তাঁর অনুমোদন পেয়েছিল। গান্ধীনেতৃত্বের অচলাবস্থায় একদিন স্বরাজ্য দলের আবির্ভাব হয়েছিল আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে; তেমনি আর এক প্রয়োজনে সোস্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব। সোস্যালিস্ট পার্টির বিরাট ভবিষ্যৎ আছে ভারতবর্ষে, তিনি বললেন, যদি তারা ঠিক পথে চলে, আদর্শ ও নীতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি না দেখায়। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থের শেষভাগে এবং প্রায় সমকালে রচিত 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি' নামক এক রচনায় এই দলের সম্বন্ধে তাঁর আশা ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। আশার তুলনায় আশঙ্কাই বেশি প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রগতিশীল অংশের অনেকখানি এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এই ছিল আশার কারণ, কিন্তু আশঙ্কা তাতে যায় নি যেহেতু সোস্যালিস্ট দলের নীতি ও কর্মোদ্যমে বহুকিছু ভ্রান্ত ও অস্পষ্ট জিনিস দেখেছিলেন। এই ধরনের আদর্শ বা পদ্ধতিগত ভ্রান্তির মূলে ছিল পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর প্রভাব; যিনি মধ্যভিক্টোরীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে কমিউনিজমের বিচিত্র মিশ্রণ নিজ মস্তিষ্কে ঘটিয়ে ভারতীয় সোস্যালিস্ট নেতাদের কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র জহরলাল নেহরুকে জানতেন, সোস্যালিস্টদের উপর তাঁর প্রভাবের কথাও জানতেন, তাই ঐ দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা বোধ না করে পারেন নি।

'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি' প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র উক্ত পার্টির ধারণাগত দুর্বলতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 'সোস্যালিস্ট পার্টি' এই নামকরণেই তাঁর আপত্তি, কারণ সোশিয়ালিজমের বহু চরিত্র; ব্রিটিশ লেবার পার্টিও নিজেদের সোস্যালিস্ট বলে দাবি করে। সুভাষচন্দ্রের মতে, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি পঞ্চাশ বছরের পুরনো ফেবিয়ান সোস্যালিজমের বাতিল ধারণাকে গ্রহণ করেছে—পরবর্তীকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বহু নতুন পরীক্ষা ঘটে গেছে, তার কোনো হিসেবই এই দল নেয় নি।

কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লি বা গণপরিষদ সম্বন্ধে এই দলের লোলুপ ভালবাসাকেও সুভাষচন্দ্র তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করেছিলেন, এবং যেসব কথা এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন তা তাঁর অভ্রান্ত দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। গণপরিষদের প্রতি আগ্রহ বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচয় দেয় না; ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গণপরিষদ হয়েছিল; যে-রাষ্ট্রতন্ত্র তার দ্বারা তৈরি হয়েছিল তা যে সমাজতন্ত্রের অনুকূল নয় তা বলাই বাহুল্য। গণপরিষদের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে কেরেনস্কি গভর্নমেন্টের গণপরিষদ, বলশেভিকরা ক্ষমতা অধিকার করার পরেই যে গণপরিষদকে অবিলম্বে ভেঙে দিয়েছিল; কারণ ঐ গণপরিষদে তারা শোচনীয়ভাবে সংখ্যালঘু। যদি তারা গণপরিষদ অবলম্বন করে শাসনতন্ত্র রচনা করতে চাইত, তাহলে রাশিয়ায় কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা আর ঘটত না। সুভাষচন্দ্র বিপরীত ক্ষেত্রে স্পেনের দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন। স্পেনে সোস্যালিস্টরা ক্ষমতা পাবার পরে অতি উদারতা বশে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের সুযোগ দেয়, যার ফলে জনসাধারণ, বিশেষত নারীরা বিপুল সংখ্যায় রক্ষণশীল ও ক্যাথলিকদের নির্বাচিত করে, যারা অবিলম্বে সোস্যালিস্টদের দূর করে দেয়। 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি' (জহরলালের প্রভাবে) গণপরিষদের জন্য চীৎকার করছে; সুভাষচন্দ্র নির্মমভাবে জানিয়েছিলেন, আজ যদি ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হয়, তাহলে সোস্যালিস্টরা তাতে সংখ্যালঘু হবে নিশ্চিতভাবে, তখন কোথায় থাকবে ওদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন! এই ধরনের 'রাজনৈতিক হারিকিরি' কেউ স্বেচ্ছায় চাইতে পারে—সুভাষচন্দ্র সবিস্ময়ে ভেবেছেন।

ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণীতে কতখানি অভ্রান্ত ছিলেন। জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গণপরিষদ ভারতের জন্য যে শাসনতন্ত্র তৈরি করেছে তার মধ্যে রয়েছে 'সমাজতন্ত্র' শব্দের দড়ি গলায় বেঁধে সমাজতন্ত্রকে ফাঁসী দেবার সর্ববিধ আয়োজন।

গণপারষদের জন্য জহরলাল ও সোস্যালিস্টদের ধারাবাহিক আকুলতার বিষয়টি পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

তথাকথিত ঐক্যের জন্য সোস্যালিস্টদের উৎকণ্ঠাও সুভাষচন্দ্রের সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছে। ঐক্য শক্তির কারণ নয়, যদি মূল নীতি বা আদর্শের বিনিময়ে ঐক্য আনতে হয়। ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় সম্মেলনের ব্যর্থতার শোচনীয় স্মৃতি সুভাষচন্দ্রের মনে ছিল। সমাজতন্ত্র মানে যদি হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যের উৎসাদন, তাহলে অসাম্যের দ্বারা লাভবান মানুষেরা সমাজতন্ত্রকে সানন্দে আলিঙ্গন করবে, এমন আশা করা যায় না। সমাজতন্ত্র গ্রহণে দেশকে বাধ্য করতে হবে। সে কাজ সেই দলের পক্ষে করা সম্ভব যে-দল সমাজতন্ত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়ী হয়ে ক্ষমতা অধিকার করবে এবং নিজ নীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করে তাকে আরোপ করবে দেশের উপরে। এক্ষেত্রে স্পষ্টই দলগত একনায়কত্বের কথা ওঠে, এবং সুভাষচন্দ্র সে কথা ওঠালেন কোনো সংকোচ না রেখেই:

> "I am of opinion that any party that aspires to win freedom for India should be prepared to draw up the Constitution for India and after winning swaraj should be prepared to put into effect the whole programme of post-war reconstruction. There can be no question of giving up political power after the battle is won, there can be no question of dissolving the Congress after the Congress is victorious. Just as Gazi Mustafa Kamal Pasha (Kamal Ataturk as he is now called) and his party won freedom for Turkey and thereafter remained in power in order to put Turkey on her feet, and put into practice their programme of national reconstruction so also must we do in India. *'Dictatorship of the party both before and after swaraj is won'—that must be our slogan for the future.*"

এই সকল তথ্য থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, কংগ্রেস্ সোস্যালিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রের অভিপ্রেত পার্টি নয়। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থের *"A Glimpse of the future"* নামক শেষ অধ্যায়ে এই পরিকল্পিত দলের বিষয়ে যা বলেছিলেন তা উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে এক—

"ভারতের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে এমন একটি দলের উপরে যার পরিষ্কার নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা রয়েছে, যে-দল কেবল স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করবে না, একই সঙ্গে সংগ্রামোত্তর পুনর্গঠনের সমগ্র পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলবে, যে-দল বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বিশ্বসভায় ভারতকে স্থাপন করবে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, মানবতার ভাগ্যের সঙ্গে ভারতের ভাগ্যও অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত।"

১৯৩৩ সালের জুন মাসে লণ্ডনে 'তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে' প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে, ১৯৩৪ নভেম্বরের শেষে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলে, ১৯৩৫ ফেব্রুয়ারীতে জেনিভা থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে (*'Our Internal and External Policy'*) এবং পরের মাসে রচিত *'Congress Socialist Party'* প্রবন্ধে—সুভাষচন্দ্র এই নতুন দলের কথা (যার নাম দিতে চেয়েছিলেন, আগেই জেনেছি, 'সাম্যবাদী সংঘ') নানাভাবে বলেছেন, এবং তার মোটামুটি চেহারা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি। তবে লণ্ডন ভাষণের পরিকল্পনার সঙ্গে পরবর্তী রচনায় প্রকাশিত পরিকল্পনার মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্যও আছে। ব্যাপারটাকে পার্থক্য না বলে ব্যাখ্যাত্মক সংযোজন বলাই ভাল। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলের মধ্যে এই নতুন দলের কথা সুশৃঙ্খলভাবে বলেছেন বলে উদ্ধৃত করছি:

(ক) এই দল ফেডারেল গভর্নমেণ্টকে চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে, কিন্তু একই সঙ্গে কিছুকালের জন্য একনায়কের শক্তিসম্পন্ন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন অনুভব করে, যাতে ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে;

(খ) এই দল দেশের কৃষি ও শিল্পব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে;

(গ) এই দল জাতিভেদ ইত্যাদি বর্তমান সামাজিক ব্যবধানের বিলোপ সাধন করে নতুন সামাজিক কাঠামো নির্মাণে প্রয়াসী হবে; ঐ নতুন সামাজিক কাঠামো পূর্বতন গ্রাম-পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে গঠিত হবে;

(ঘ) এই দল মধ্য-ভিক্টোরীয় গণতন্ত্রের পোষকতা করবে না; অপরপক্ষে সামরিক শৃঙ্খলায় গঠিত শক্তিশালী পার্টির দ্বারা চালিত সরকারে বিশ্বাস করে, যে সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়ে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ ও অশান্তিমুক্ত রাখতে পারবে।

লণ্ডন বক্তৃতা থেকে ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলের এই বক্তব্যের মধ্যে নতুন কথা হল—সুভাষচন্দ্র ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর কথা বিশেষভাবে ভাবতে আরম্ভ করেছেন। এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তিনি কিছু সময়ের জন্য সামরিক শৃঙ্খলায় গঠিত দলীয় একনায়কত্বের কথা ভাবছেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলে, *'Congress Socialist Party'* এবং *Our Internal*

শেলাক ব্যতীত

এ সুন্দর
কেশ বিন্যাস
অতি দীর্ঘকাল
সুন্দর থাকবে
না – – –

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তেই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।
শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

and External Policy রচনা দুটিতে ঐ কথাই বলেছেন। এইকালে তিনি পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে একেবারেই বাতিল ব্যাপার বলে ধরেছিলেন। তবে কংগ্রেসকে বাতিল বলে মনে করেন নি, কমিউনিস্টরা যেমন করতেন। কংগ্রেস মূলে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান, পরিবর্তনের অযোগ্য, কমিউনিস্টদের এই মত তিনি মানতে চান নি। না মানবার কারণ, সুভাষচন্দ্র প্রথমত স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কমিউনিস্টরা স্বাধীনতা-সংগ্রাম তখন এড়িয়ে চলছিলেন। সুভাষচন্দ্র জানতেন স্বাধীনতা না এলে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম সবকিছুই সুদূরপরাহত ব্যাপার। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে জনগণের ব্যাপক ভাবাবেগের সম্পর্ক। সেই ভাবাবেগকে ব্যবহার করতে হবেই। যদি জনসাধারণের স্বাধীনতাস্পৃহাকে স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য প্রয়োগ করা যায়, তবেই অনতিবিলম্বে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব সম্ভব বলে তিনি মনে করেছিলেন। এবং এক্ষেত্রে তিনি অভ্রান্ত, কোনই সন্দেহ নেই। কমিউনিস্টরা স্বাধীনতা-পূর্বকালে জাতীয় অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে, স্বাধীনতার আবির্ভাব সময়ে বহুলাংশে ধিকৃত একটি গোষ্ঠী, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্বারা সমাজতন্ত্র আনার কুণ্ঠিত চেষ্টা যাদের করতে হয়েছে, এবং বহু বৎসরের চেষ্টার ফলে দু-একটি পকেট যখন তৈরি করতে পেরেছে (কেরালা বা বাংলায়) তখন ভারতবর্ষের অন্যত্র দক্ষিণপন্থার শিকড় নেমে গিয়েছে বহু নিচে।

তাই সুভাষচন্দ্র অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সঙ্গে কংগ্রেসেরই রূপান্তরের কথা গোড়ায় ভেবেছেন। আর সে রূপান্তর অসম্ভব হলে কংগ্রেসকে ছাড়তে অসুবিধা কোথায়? কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় চরিত্র বদলের বিষয়ে তিনি বলেছেন:

> "The immediate problem before this Party will be to transform the Indian National Congress into an organ of the masses of India. Bitter experience has taught us that it is futile to expect the Congress to adopt a radical programme until we can first alter the composition of that body. I disagree with the Communists when they allege that the Congress is essentially a bourgeois institution and is incapable of this transformation. To alter the present composition of the Congress however we shall have to bring into our fold the three radical groups in the country—youths, the workers and the peasants—and give them adequate representation. This will be possible only when the present Constitution of the Congress which is based on the British model, is radically changed. One of our immediate tasks, therefore, is to organise branches of the party all over the country and to agitate for a radical change of the present Congress Constitution. Only when this is done, will the Congress adopt a radical programme and plan of action on the lines that we contemplate." (*Our Internal and External Policy*).

১৯৩০ সালে সুভাষচন্দ্র যখন সাম্যবাদী সংঘের পরিকল্পনা করেছেন, তখন তিনি কমিউনিজমের খুব কাছাকাছি, স্পষ্টই দেখা যায়। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে রোলাঁ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে আলাপ-আলোচনার যে বিবরণ দিয়েছি, (যার বড় অংশ রোলাঁর ডায়েরীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল), তার থেকে দেখি, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে রোলাঁ লিখেছেন, 'বোস কমিউনিজমের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন।' রোলাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আলোচনার বিষয়বস্তু পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে, সুভাষচন্দ্র ধনতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীর আপোষকে নিন্দা করেছিলেন এবং অহিংসাকে মোটেই কার্যকরী পথ বলে মনে করেন নি, তবে গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পরিবর্তে সুসংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রামকেই বাঞ্ছনীয় ভেবেছিলেন।

তাহলেও সুভাষচন্দ্র কমিউনিস্ট হয়ে যান নি এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলের মধ্যে পরিষ্কার জানিয়েছেন, রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ অনুকরণ ভারতের পক্ষে শ্রেয় পথ নয়। ভারতকে তার নিজের রাজনৈতিক দর্শন তৈরি করতে হবে, সে দর্শন, সুভাষচন্দ্রের মতে, সমন্বয় দর্শন।

[ক্রমশ]

বঙ্গ দর্শন

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল, বিভিন্ন শরিকের রক্তাক্ত গৃহবিবাদে সেই ভাবমূর্তির বিনাশ ঘটতে চলেছে। গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে লেখা হয়েছিল যে, আলিপুরদুয়ার ও অপরাপর স্থানের ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বামপন্থী দলগুলির পারস্পরিক শত্রুতা তাঁদের সাধারণ শত্রু কংগ্রেস বা স্বতন্ত্র বা জনসংঘের চেয়ে অনেক বেশি। যুদ্ধে ও প্রেমে অন্যায় বলে কিছু নেই—এই নীতি অনুসরণ করে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতার পরিসর সকল ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি করতে চান, যার ফলে পারস্পরিক সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মার্কসবাদে বিশ্বাসী পার্টিগুলির ক্যাডারদের মধ্যে কিছুকাল ধরে রাজনৈতিক শিক্ষাবিহীন স্থূল প্রকৃতির মানুষদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, এবং পার্টির নেতারা বোধ হয় এই সব মানুষদের ওপরেই বেশি আস্থা রাখেন। ফলে অবস্থা হয়েছে এই যে, পেশাদার গুন্ডা-বদমায়েসও বামপন্থী নামাবলী গায়ে চড়াতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না এবং নেতারাও এদের যে প্রশ্রয় দেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সংখ্যাবৃদ্ধির মোহে নেতারা আত্মবিস্মৃত হয়েছেন এবং ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে ক্ষমতার স্বার্থেই বিভিন্ন অসামাজিক এলিমেন্টের সঙ্গে আপোস করে চলছেন। নেতারা ক্যাডারদের মূর্খ অংশের ওপরই নির্ভর করছেন।

সমস্যাটি সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট বা তার শরিক দলগুলি কতদূর ওয়াকিবহাল, তা বলা শক্ত। তবে তাঁদের মতিগতি দেখে মনে হয় যে, তাঁরা মোটেই বিষয়টি নিয়ে গুরুতরভাবে চিন্তা করছেন না, একপক্ষ অন্য পক্ষের ওপর দোষারোপ করেই কর্তব্য সম্পন্ন করছেন। খৃস্টের কথায় অপরের চোখের কুটো দেখতেই তাঁরা মগ্ন, নিজের চোখের মধ্যে যে একটি প্রকান্ড কড়িকাঠ রয়ে গেছে সে বিষয়ে তাঁরা উদাসীন। বস্তুত শরিক দলগুলির মোহান্ত মহারাজেরা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী ভূতের নৃত্য ঘটাচ্ছেন, যার ফলে এমনও ঘটনা ঘটছে যে, মন্ত্রীর গৃহেতেই বোমা মারা হচ্ছে। আমরা আগেও যে কথাটা বলেছি, ইতিহাস একথাই বলে যে, প্রগতিশীল শক্তির জয়যাত্রার গতিটাকে অবরুদ্ধ করার জন্য বামপন্থীরা নিজেরাই বহুলাংশে দায়ী, তাদের পারস্পরিক অনৈক্য ও বিবাদই আখেরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিজয়লাভ ঘটিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে বামপন্থী ঐক্য যে মোটেই দানা বাঁধতে পারছে না তার কারণ ওই দলীয় নেতারা—যাঁরা নেতৃত্ব বজায় রাখায় জন্যই অনৈক্যের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। নতুবা একই আদর্শে বিশ্বাসী এতগুলি মার্কসবাদী দলের অস্তিত্বকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? পশ্চিমবঙ্গে যে এতগুলি মার্কসবাদী দল রয়েছে, স্থূলভাবে (এবং এইটাই সত্য) বলতে গেলে তার কারণ আদর্শগত নয়, কেন না আদর্শের জন্য কে কত মূল্য দিয়েছেন সে জানতে কারোরই বাকি নেই, আসল কারণ নেতৃত্বের লড়াই। কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও, এ কথা সত্য যে, ভারতবর্ষে প্রথম শ্রেণীর নেতার উদ্ভব বড় একটা হয় নি। সকল দলের শীর্ষেই যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মিডিওকার টাইপ, বরং নিচে তবু কদাপি ওপরে নয়। দলটা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মেটাবার ক্ষেত্র, এবং দলীয় রাজনীতি খুব একটা অলাভজনক ব্যবসা নয়। এতগুলি দলের উদ্ভবের মূল কারণটা এখানেই।

তবু, শয়তানকে তার প্রাপ্য দিয়েও, এটুকু জিজ্ঞাস্য যে, যুক্তফ্রন্টের শরিক বামপন্থী দলগুলি যে রাস্তা নিয়েছেন, বরং অন্যভাবে বলতে গেলে নেতারা যেভাবে দলকে পরিচালনা করছেন, তাতে কি কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হবে? এ পথটা কি আত্মহননের পথ নয়? কংগ্রেস আজ অবলুপ্তির মুখে। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার অতি আগ্রহে বামপন্থী দলগুলি একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করার রাস্তা নিয়েছেন, এবং ফলে হবে এই যে, তাঁদের এককভাবে শূন্যস্থান অভিমুখে পৌঁছানোর পূর্বে স্থানটিকে কি অপরে দখল করে নেবে না?

এম-ডি পরীক্ষা ও অপরাপর দুর্নীতি প্রসঙ্গে

পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, আমরা এম-ডি পরীক্ষা প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছিলাম এবং তা যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, যদিও তাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। আমাদের বক্তব্য ছিল খুবই সরল, তা হচ্ছে এই যে চিকিৎসা বিভাগের এই সর্বোচ্চ পরীক্ষাটি একটি কায়েমীস্বার্থের কুক্ষিগত হয়েছে, যে কায়েমীস্বার্থকে নানাভাবে তুষ্ট করতে না পারলে ভাল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেও এম-ডি ডিগ্রী লাভ করা সম্ভবপর নয়। এ ছাড়াও সাপ্তাহিক ও দৈনিক বসুমতীতে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিনের আরও কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা প্রকাশিত হয়েছিল।

এতদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে এই আশঙ্কায় হয়তো তাঁরা নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেন, হয়তো ভেবেছিলেন, অশুভস্য কালহরণম নীতি অবলম্বন করলে শেষ পর্যন্ত লোকে বিষয়টি ভুলে যাবে এবং তারই ফলে তাঁরা একটা বিব্রত অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে পারবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের এই নীতি সাফল্যলাভ করল না। আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটি ঘটনা বিষয়টিকে আবার পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এল। আমাদের বক্তব্যের প্রতিবাদে যাঁরা একদা উঠে-পড়ে লেগেছিলেন, চিঠির পর চিঠি দিয়ে যাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে আমাদের বক্তব্য ভুল, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আজ মোহভঙ্গ ঘটেছে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাদের কাছে এসে স্বীকার করেছেন যে, আমাদের অভিযোগগুলি যথার্থই ছিল, কেউ কেউ সত্যকারের অবস্থা না জেনেই আমাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং কেউ কেউ তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন নানা

অবস্থার চাপে, কখনো বা ভাত প্রদর্শনের ফলে।

গত ২২শে মে তারিখের সিনেটের সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য এই সভাতে মূল বিষয়টির চেয়েও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেটারও দরকার আছে, কেন না কান ম্ন টানলে মাথা আসে না। ওই দিনের সভায় অধ্যাপক সন্তোষকুমার মিত্র নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডাক্তারী পরীক্ষায় কেন ৩৩ নম্বর গ্রেস দেওয়া হয় তা জানতে চান। তারপরই অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী ডীন অফ মেডিসিনের নামে নাকি একটি সুস্পষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ আনয়ন করেন। উক্ত ডীনের পুত্রকে এক বছরের পরিবর্তে ছয় মাত্র ক্লাস করিয়েই নাকি ডিপ্লোমা ইন বেসিক মেডিক্যাল সায়েন্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপর আবার একটি বিষয়ে (অ্যানাটমি) তার হাজিরা খাতায় উপযুক্ত উপস্থিতি না থাকায় সেখানে নাকি কারচুপি করা হয়েছে। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর অভিযোগ একাধিক ফরেনসিক ফটোগ্রাফ ও ফরেনসিক রিপোর্ট সহ প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে আরও জানান যে, তিন মাস আগে উপাচার্যের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করেও তিনি কোন ফল পান নি। অধ্যাপক সৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উপরি উক্ত অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর বলে অভিহিত করে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

এরপর অধ্যাপক নির্মল বসু মাসের পর মাস ধরে সাপ্তাহিক বসুমতীতে এম-ডি পরীক্ষা সম্বন্ধে যে গুরুতর অভিযোগসমূহ প্রকাশিত হয়েছে, তার তদন্তের দাবি জানান। এই সময় উপাচার্য মহাশয় নাকি জানান যে, এই বিষয়ে বসুমতীতে চিঠি দিয়ে তিনি কোন উত্তর পান নি। উপাচার্য মহাশয়ের বক্তব্য ঠিক নয়। সাপ্তাহিক বসুমতীতে তিনি কোন চিঠি আজও পর্যন্ত দেন নি (তিনি দৈনিক বসুমতীতে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, তবে তার বিষয়বস্তু এম-ডি পরীক্ষা নয়)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গত ২৯শে এপ্রিল কাউন্সিল অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ইন মেডিসিনের এক সভা হয়। সেখানে নাকি প্রকাশ করা হয় যে, এবারে এম-ডি-তে ৫৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন পাশ করেছেন। সদস্যেরা এম-ডি পরীক্ষার এই শোচনীয় ফলাফলের কারণ জানতে চাইলে মেডিসিন বিভাগের বর্তমান প্রধান ডাঃ শিশিরকুমার মুখার্জী নাকি উত্তর দেন যে, এবারে পরীক্ষার্থীদের মৌখিক প্রশ্ন এবং প্রাকটিক্যাল প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্বের মত আগেভাগে ওয়াকিবহাল করা হয় নি। সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেরই এতদিনে এই ধারণা হয়েছে যে, সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত এম-ডি পরীক্ষায় দুর্নীতির বিষয়টি সত্য এবং এবারের শোচনীয় ফলাফলের জন্য সেগুলিই দায়ী।

সিনেটের সভায় ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিনের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের বেশ কিছুটা অংশ ধরা পড়েছে এবং বিভিন্ন সদস্যদের কাছ থেকে তদন্তের জন্য দাবি উঠেছে। উপাচার্য মহাশয়ের মতানুসারে ঠিক হয় যে, উপাচার্য এবং দুজন সহকারী উপাচার্য এই বিষয়ে প্রাথমিক বিবেচনার পর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। যাতে এই তদন্তকার্যে যোগ্য ব্যক্তিদের গ্রহণ করা হয় এবং যাতে তদন্তের নামে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়া না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সিনেট সদস্যদের অবশ্য কর্তব্য।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি-এর স্ট্যান্ডার্ড (শুধু এম-ডি-ই নয় পোস্ট গ্রাজুয়েট যে কোন বিষয়েরই) ভারতের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক উচ্চ। ছাত্রদের স্বার্থেই এই পরীক্ষা কলুষমুক্ত হওয়া উচিত, যাঁরা সত্যই উত্তীর্ণ হবার যোগ্য তাঁদের যেন এ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল না হতে হয়। ব্যক্তিবিশেষকে হেয় করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এম-ডি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে গোষ্ঠীতন্ত্র ও কায়েমীস্বার্থের সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের জেহাদ তারই বিরুদ্ধে। আমরা এটুকু দেখে আনন্দিত যে, একটি ক্ষেত্রেও আমাদের তীর যথাস্থানে লক্ষ্যভেদ করেছে। বাকি কাজটুকুর দায়িত্ব ছাত্র-ছাত্রীদের এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অধ্যাপকদের।

পুলিশ বিভাগের নিচুতলা

পুলিশ অফিসারদের নেতৃত্বে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বের পরিবর্তন অথবা পাল্টা সংগঠন গড়ার জন্য বিভাগীয় নিচুতলার কর্মীরা, বিশেষ করে কনস্টেবলরা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। অধস্তন কর্মীদের ওপর অসদ্ব্যবহার, সংগঠনকে অফিসারদের স্বার্থে কাজে লাগানো প্রভৃতি পুরাতন অভিযোগের সঙ্গে বর্তমান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ এসেছে যে, তাঁরা নাকি বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানী দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনকে তাঁরা নাকি মনে করেন পুলিশের চাঁদায় মাসিক একবার ছোট ডিস এবং বার্ষিক একবার বড় ডিস খাওয়ার সমিতি। তাঁদের মতে এই সমিতির দ্বারা নিম্নতম কর্মচারীরা আজ পর্যন্ত কোন সুযোগই আদায় করতে পারেন নি। ১৯৫৪ সালে পুলিশ ধর্মঘটের সময় যাঁরা চাকুরীচ্যুত হয়েছিলেন তাঁদের পুনর্বহালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন কিছুই করেন নি। এ ছাড়া পুলিশ বিভাগের অনাবশ্যক বৈষম্য দূর করার কথাও কেউ চিন্তা করেন নি। একজন হাবিলদারের সঙ্গে একজন এ-এস আই-এর বেতনের প্রভেদ রাখা হয়েছে, অথচ একজন সুবাদারের সঙ্গে একজন এস আই-এর বেতনের কোন প্রভেদ নেই। নিম্নতম পুলিশ কর্মচারীদের বেতনের স্বল্পতা সুবিদিত, এবং তাঁদের প্রতি ওপরতলার ব্যক্তিদের আচরণ প্রাচীন যুগের ক্রীতদাস প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন পুলিশ কনস্টেবল বহু আবেদনান্তে মাসিক পাঁচ টাকা ঘরভাড়া পেলেই কৃতার্থ বোধ করেন, কারণ তা অল্পের ভাগ্যেই জোটে। কিন্তু এও তো একটা বিরাট প্রহসন, কেন না পশ্চিমবঙ্গের কোথাও পাঁচ টাকায় ঘরভাড়া পাওয়া যায় না, ওই মূল্যে গরু রাখার গোয়ালও পাওয়া যায় না। একজন দরিদ্র কনস্টেবল কঠোর পরিশ্রমান্তে কোথাও এসে একটু বিশ্রাম লাভ করবে তার সুযোগ নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন এ সব দিকে কোন চেষ্টাই করেন নি, নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের তাই ধারণা। এছাড়া উচ্চপদস্থদের খেয়ালখুশিতে অযথা সাসপেনসন ঘটে, হসপিটাল পে-লিভ পে ইত্যাদি প্রাপ্তির বিলম্ব ঘটে জি পি ফান্ড, এমিনিটি ফান্ডের ন্যায্য অর্থ প্রদত্ত হয় না, রেশনের নামে অখাদ্য বস্তু প্রদান, পোষাক পরিচ্ছদ প্রদানে কার্পণ্য, সব মিলিয়ে পুলিশ বিভাগে উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে অস্বস্তিকর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কাজেই নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে চলেছেন। এটা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম—কেন না দুটো কনফ্লিক্টিং ইন্টারেস্ট একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের বিভাজন তাই মনে হয় অবশ্যম্ভাবী।

২২শে মে'র ঘটনা

গত বাইশে মে তারিখের বঙ্গদর্শনের একটি নিবন্ধে আমরা মেডিক্যাল কলেজে ১৪ই মে তারিখে যে ধর্মঘট হয়েছিল তার নিন্দা করে মন্তব্য করেছিলাম যে, মেডিক্যাল কলেজ সেদিন একটি কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করেছিল এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও নির্মমতার যে নিদর্শন সেদিন বিশেষ করে হাউস স্টাফেরা দেখিয়েছিলেন, তাতে আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন উঠেছিল যে, 'এ'রা কোন শ্রেণীর সমাজবিরোধী?' আমাদের বক্তব্য ছিল—হাসপাতালে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে

বিরোধের ফলে রোগীদের দুর্ভোগ কেন ঘটবে? উক্ত নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর, মেডিক্যাল কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ছাপো প্যাডে লিখিত একটি চিঠিতে জনৈক পত্রলেখক আমাদের গালিগালাজ করেছেন। তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার আছে এটা বিবেচনা করে, গালিগালাজের অংশগুলি বাদ দিয়ে আমরা পত্রটি প্রকাশ করলাম।

পত্রলেখকের বক্তব্য, ধর্মঘটের সময় তাঁরা নাকি প্রত্যেকেই রোগীদের প্রতি যথাকর্তব্য পালন করেছিলেন। ইমার্জেন্সি বিভাগ বন্ধ করে দেবার মত নৃশংসতা যাঁরা করতে পারেন তাঁরা যে রোগীদের প্রতি কতদূর দায়িত্ববোধসম্পন্ন এটা বোধ হয় পৃথক করে প্রমাণ করার কোন দরকার পড়ে না।

আমাদের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ আমরা নাকি একপেশে খবর দিয়েছি। তাঁরা রোগীদের অ্যাটেন্ড করছিলেন, সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন, এমন কি রোগীদের নাকি তাঁরা স্বহস্তে খাইয়েছিলেন। আমাদের রিপোর্টার সব দেখে শুনে নাকি মিথ্যা খবর লিখেছেন। পত্রলেখক এই প্রসঙ্গে যদি রবীন্দ্রনাথকে কোট করতেন, "ঘটে যাহা তাহা সত্য নহে" তাহলে লেখাটি আরও মানাত। হেঁয়ালী থাক, আমাদের জিজ্ঞাস্য, গায়ের জোরে বললেই কি সব সত্য হয়ে যায়? তবে একথা ঠিক দেখতে আমাদের বড় ভুল হয় না, কেন না আমাদের চোখ কদাপি কোন স্বার্থে হলদে হয়ে নেই।

আমরা যে সংবাদ দিয়েছি তাতে আমাদের তরফ থেকে দ্বিধা বা সংশয়ের কোন কারণ নেই। চতুর্থ শ্রেণী বনাম প্রথম শ্রেণীর দ্বন্দ্বের দায়িত্ব কার তা নির্ধারণের জন্য তদন্ত কমিশন বসেছে। কিন্তু আমরা জোর গলায় বলতে পারি যে ১৪ই মে তারিখে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য কোন তদন্ত হলে আমাদের বক্তব্যই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে হাউস স্টাফ, নার্স ও চিকিৎসকদের মধ্যে যে দায়িত্বশীল ব্যক্তি নেই তা নয়, এবং তাঁরা নিজ দায়িত্বে সেদিন কিছু করেছিলেন, কিন্তু সার্বিকভাবে ১৪ই মে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকেরা যে কাণ্ড করেছেন, তার তুলনা মেলা ভার।

"হাউস স্টাফদের বিগত কয়েক বছরে এত বেশি অধঃপতন হয়েছে যা কল্পনা করা যায় না" এই কথাটির সরলার্থ হল এই যে, কয়েক বছর আগেও হাউস স্টাফেরা যেটুকু শালীনতা ও সংযমের পরিচয় দিতেন আজ তার কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। একটি দৈনিক সংবাপত্রে মেয়ে পুলিশ নিয়োগ করে ওই বিশেষ এলাকাগুলির ওপর নজর রাখার প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে—এগুলি কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুনাম বৃদ্ধি করে? দেওয়ালের অশ্লীল পোস্টারগুলি কারা লিখেছিলেন? ডাক্তার, নার্স ও ছাত্রদের মিলিত সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিকর্তার উপস্থিতিতে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ কারা করেছিলেন?

আমাদের বর্তমান পত্রলেখক মেডিক্যাল কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের "সংগ্রাম সমিতির" আহ্বায়ক। অবগতির জন্য জানাই যে, ওইদিন রাত্রে মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি এক বিবৃতিতে ওই আসুরিক কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে অজস্র চিঠি আমরা পেয়েছি যেগুলি আমরা অতঃপর প্রকাশ করে যাব এবং যেগুলি থেকে পরিস্কার বোঝা যাবে আসল ঘটনাটি কি ঘটেছিল। পত্রলেখক চিঠি দেওয়ার আগে নিজের পায়ের তলার মাটিটা পরখ করে দেখেছেন তো? চিঠিটি নিম্নে প্রকাশ করা হলো:

"আপনাদের প্রবন্ধে প্রকাশ 'হাসপাতালে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কি হোল তার ফলে রোগীকে সাফার করতে হয়েছে। কথাটা সত্য নয়। ১৪ই মে স্ট্রাইক শুরু হয়েছিল কিন্তু ওয়ার্ডে রোগীদের কঠিন অবস্থায় call book attend করেছিলেন স্ট্রাইকরত হাউস স্টাফরা। ১৫ই মে Emergency বন্ধ হওয়ার পরও রোগীরা তখনই ডাক্তারহীন অবস্থায় পড়েন নি। Emergency-তে Senior Officer on duty ও ওয়ার্ডে Health Service-এর ডাক্তাবেরা (যারা House Staff (W.B.H.S.), R.P. R.M.O, R.S, রেজিস্ট্রার, ক্লিনিকাল Tutor, ও ভিজিটিংরা যারা সংখ্যায় দশের ওপর) রোগীদের চর্চা করেছেন। W.B.H.S. সংশ্লিষ্ট ডাক্তাররা কখনই কর্মবিরতি করেন নি।

দ্বিতীয়ত ১৪ই মে সাধারণ স্ট্রাইক সকাল ৬টায় শুরু হবার পর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আকস্মিক কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন সকাল আটটায় তাঁদের কর্মবিরতি চলেছিল দুপুর দুটো অবধি, ফলত ডিসপেন্সারী থেকে ওষুধ আনা বা kitchen থেকে খাবার আনা থেমে গিয়েছিল অকস্মাৎ। রোগীদের সেই সময়কালীন Sufferance কি সাপ্তাহিক বসুমতী Reporter দেখেন নি? সেই ১৪ই মে সকালে ও দুপুরে রোগীদের জন্য ওষুধ ও অক্সিজেনের cylinder ডিসপেন্সারী থেকে ট্রলি করে টেনে এনেছেন ডাক্তাররা ও নার্সরা। যাঁদের মধ্যে ডাঃ মণিলাল বিশ্বাস, ডাঃ শ্যামাপদ খাটুয়া, ডাঃ অজিত মুখার্জী প্রমুখের মত প্রবীণ ডাক্তাররাও ছিলেন।

'রান্নাঘরে প্রবেশ করে নাকি সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা হয়েছে'—এই বিচিত্র সংবাদ কি অন্য কোনও প্ররোচনা প্রসূত? অথচ সত্য ঘটনা এই তথ্যের ঠিক বিপরীত। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা রোগীদের খাবার না নিয়ে যাওয়ায় যেদিন ছাত্ররা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে খাবার পরিবেশন করেছিলেন রোগীদের খাদ্যদ্রব্য সেদিন হয়ত নষ্ট হয়েছিল রোগীদের থালায়, যাঁরা অন্যান্য দিন প্রকৃত পরিমাণ খাদ্যের দর্শন পান না।

'হাউস স্টাফদের বিগত কয়েক বছরে এত বেশি অধঃপতন হয়েছে যা কল্পনা করা যায় না'—আপনাদের সাংবাদিকদের এই উক্তিই ধরিয়ে দিয়েছে তাঁর হাসপাতাল সম্পর্কিত অজ্ঞতা। আজকের যাঁরা হাউস স্টাফ তাঁদের অধিকাংশই এক বছর আগেও হাউস স্টাফ ছিলেন না। তবে হাউস স্টাফ শ্রেণীর ক্রমানুক্রমিক অধঃপতনের ধারাপাত লেখক সংগ্রহ করলেন কোথায়?

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, ডাক্তাররা রোগীর চিকিৎসা করেন কিন্তু তাঁরা যাদুকর নন। এশিয়ার বৃহত্তম হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা অপ্রতুল—এখানে ডিসপেন্সারীতে অধিকাংশ সময় অধিকাংশ প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না। এখানে এক শ্রেণীর কর্মচারীর অরাজকতায় রোগীরা নিয়ত অসুবিধাগ্রস্ত। এ বিষয়ে কংগ্রেস আমলে অভিযোগ করা হয়েছে। কোনও প্রতিকার হয় নি। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীর কাছে আবেদনপত্র পাঠান হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। এই অবস্থায় ডাক্তারবা কাজ করেন যাঁদের অধিকাংশই রাজনীতির সম্পর্কহীন, বিগত কয়েক বছর ধরেই কাজের ও physical security-এর অভাব যাঁরা সাড়ে ছ' বছর পড়ার ও ৬ মাস P.R.C.A-এর পর ভাতা পান ১৬৫·০০ ও পরে ২৪৫·০০ টাকা। দীর্ঘকালীন এই অবস্থার পর ১৩ই মে-র স্ফুলিঙ্গ ঘটনায় যখন ডাক্তাররা 'নীলচাঁদে একবার' কর্মবিরতি করে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করেন, তখন তাঁরা হয়ে যান সমাজবিরোধী।"

—ফটো বিউটি স্টুডিও—
সুন্দর ছবি তোলাতে হ'লে
ফটো বিউটিতে আসুন
৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কালী বাবুর বাজার (হাওড়া)
ফোন: ৬৭-৪৫২৬
(ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্কের নীচে)

ভারত দর্শন

মাও-চীনের ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

সি-পি-আই (এম) পলিট ব্যুরো এতোদিনে চোখ খুলে তাকালেন। তাদের মনে হল, কেবলমাত্র আলবানিয়া ছাড়া তামাম আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট পার্টিগুলিকে নস্যাৎ করে দিয়ে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি উপযুক্ত কাজ করেন নি। যে একাশিটি কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৬০-সালের মস্কো বিবৃতি সই করেছিলেন রাতারাতি সি সি পি-র (চীনা কম্যুঃ পার্টি) চোখে তাঁরা হয়ে গেছলেন শোধনবাদী। সি পি আই (এম) আজ বুঝতে পারছেন এইভাবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ওপর হস্তক্ষেপ চীন শুধু আপন স্বার্থেই করেছিল, কেন না চীনা পার্টির নেতা শ্রীযুত মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অক্ষম হলেই দুনিয়ার তাবৎ কম্যুনিস্টরা শোধনবাদী হন আর মাওবাদ শিরোধার্য হলেই সাচ্চা কম্যুনিস্ট বলা যায়। চীনের এহেন ডিক্টেটরী দুনিয়া জুড়ে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ওপর আঘাত তো হেনেইছে ভারতেও কম্যুনিস্ট আন্দোলন ইডিওলজির ঝগড়ায় ঘশগুল হয়ে পথে-বিপথে চালিত হচ্ছে।

আজ চীনা বিচারে দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় শ্রেণী বিভাগের রূপ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদী। সি পি আই (এম) এই উদ্ভট কল্পনায়ও বশংবদের মতো সায় দিতে অক্ষম।

ভারতের কম্যুনিস্টদের মধ্যে চীন সাচ্চা কম্যুনিস্ট বলে তাঁদেরই স্বীকৃতি-দানে উদ্‌গ্রীব যাঁরা আষ্টে-পৃষ্ঠে মাও-ব্যাজ ধারণ করেন এবং নিজেদের সাচ্চা কম্যুনিস্ট প্রতিপন্ন করার অন্যতম পথ হিসেবে বেছে নেন মাও-ময়তা। সভামঞ্চে মাও-এর কতকগুলি প্রতিকৃতি কিভাবে কতখানি গুরুত্বের সঙ্গে স্থাপনা করা হয়েছে, এও একটা ঘোষণার মুখ্য দিক বলে চিন্তা করেন তাঁরা। মাওকে এই-ভাবে সর্বাঙ্গে ধারণ না করলে চীনা রেডিওর পিঠ থাবড়ানি মেলে না. বরং চীনা ব্যাখ্যায় নয়াশোধনবাদী বলে চিহ্নিত হতে হয়।

সি-পি-আই (এম) বলেছেন : চীনা রেডিও 'গত দু' বছরকাল কম্যুনিস্ট নেতৃত্বকে "সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়' আর 'ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির দালাল' বলে প্রচার করে আসছে।

কেবলমাত্র পার্টির জাতিভেদই নয়, চীন একটা গোটা দেশকেই এক এক বাদের আওতায় নিয়ে গিয়ে ফেলছেন। সি-পি-আই (এম) পলিট ব্যুরো উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, চীনা পার্টি সমাজতন্ত্রী দেশের নেতৃত্বে শোধনবাদ লক্ষ্য করলেই গোটা দেশটাকেই সংশোধন-বাদী বলে চিহ্নিত করছেন। চীনের এহেন উদ্ভট কল্পনায়ও সি-পি-আই (এম) বিস্মিত। এ সম্পর্কে ভারতের বাম-কম্যুনিস্ট পি-বি'র ব্যাখ্যা হল : উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্র লক্ষ্য করেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

চীনা পার্টির নবম কংগ্রেসের গঠন-তন্ত্র লক্ষ্য করেও ভারতীয় বাম-কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে তীব্র হতাশা দেখা দিয়েছে। ক্ষুব্ধ পি-বি লক্ষ্য করেছেন যে, চীনা পার্টির গঠনতন্ত্রেই মাও সে-তুং-কে পাকাপাকিভাবে নেতৃত্বের গদি দেওয়ার লিখিত শর্ত রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কমরেড লিন পিয়াও-কে মাও-এর উত্তরাধিকারী (successor)-রূপে উল্লেখ ও ঘোষণা মার্ক্সবাদীদের বিস্মিত করেছে। পার্টির অভ্যন্তরে এইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথ রুদ্ধ হচ্ছে এবং মাও-পিয়াও-এর গদিকে করা হচ্ছে কায়েমী।

ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টির (মার্ক্স-বাদী) পলিট ব্যুরোর ঘোষণায় অতঃপর জোর রাজনৈতিক গবেষণা দেখা দেবে বলে আশা করা যায়। জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনগণ ভারতের প্রতি চীনাদের দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। তাঁরা বুঝতে পারেন না, কি করে মার্ক্সবাদী একটি রাষ্ট্র পাক-ভারত সংঘর্ষের কালে ভারতকে বিব্রত করার জন্য আলটিমেটাম দিয়ে বসে কেবলমাত্র জনপদে ঘোষে পদচ্যুত ডিক্টেটর আয়ুব খাঁকে মদত দেওয়ার জন্য। কি করেই বা সম্ভব হয় একটি ধর্মান্ধ রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে মিতেমিতিন সম্পর্ক পাতিয়ে আর একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নশীল অর্থ-নীতির ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে সে দেশের উন্নয়ন কাজে বাধা আরোপ করা। এ কোন্ উদ্ভট মার্ক্সীয় আইন। তাঁরা বুঝতে অক্ষম, মাও সাহেবের লক্ষ্য ভারত বিরোধিতায় মদত যোগানোর মধ্যে কেন, তার দ্বারা কোন মার্ক্সবাদী জয়যাত্রার লক্ষণ সুস্পষ্ট (!) তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাও নেতৃত্ব কায়েমের জন্য প্রয়োজন হলে জনরোষে উৎখাত আয়ুবদের সঙ্গেও হাত মেলাবে। সেলামবাদকে যে-কোন শক্তি মাও-নির্দেশ শিরোধার্য করলেই তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। চৈনিক ভূমিকার এই দিকটি বস্তুত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন্ লক্ষ্যে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে সে সম্পর্কে ঠিক যে সময় চতুর্দিকে বিভ্রান্তি প্রবল ও প্রকট, ভারতের মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সেই উপযুক্ত ক্ষণে সি-পি-সি-তে মাও-এর স্থান বিশ্লেষণে নেমে অনেকটা বিভ্রান্তি দূরীকরণে সহায়তা করলেন। এতকাল কেন তাঁরা নীরবে ঘটনাবলী লক্ষ্য কর-ছিলেন এ প্রশ্ন বাতুলতামাত্র। কেন না ঘটনায় গতিপ্রকৃতি গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না করেই তত্ত্বগত বিরোধে ঝাঁপ দেওয়া হঠকারিতা মাত্র। কোনও দায়িত্ব-শীল পার্টির কাছেই তা আশা করা অনুচিত। চীনা পার্টির নবম কংগ্রেসের বিবৃতির পরই তাই সযত্নে ঘটনাস্রোত লক্ষ্য করেছেন এবং এখন মুক্ত ঘোষণায় একদফা প্রকাশও করেছেন।

ভারত চীনের সঙ্গে প্রথমাবধি সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখার নিয়ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। ভারত-বিরোধী প্রচারে চীনের নেপথ্য ও প্রকাশ্য মদতের চেহারা ক্রমে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এই মুহূর্তে চৈনিক ভূমিকা ও পাশাপাশি চৈনিক মদতপ্রাপ্ত দেশীয় উগ্রপন্থী চিন্তার সম্যক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ভারতের রণতরী

ভারত মহাসাগরে নাকি ভারতের রণতরী বহর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হতে চলেছে রাশিয়ার কাছ থেকে প্রাপ্ত ও প্রাপ্য সাবমেরিনের বলে। এ খবর বৃটিশ সংবাদপত্রের। সংবাদে প্রকাশ, দুরপাল্লার সর্বাধুনিক তিনটি সাব-মেরিন সহ ভারত ইতিমধ্যেই রাশিয়ার কাছ থেকে চব্বিশটি রণতরী পেয়েছে। আরও নাকি তিনটি সাবমেরিন পাওয়া যাবে।

ঐ সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য হল : বিমানবাহী বৃটিশ জাহাজ, দুটি ক্রুজার, অন্যান্য তেন্দটি জাহাজ ও আটটি আধুনিক ফ্রিগেট ভারতকে ১৯৭১ সালে সুয়েজের পূর্বদিকে সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবহরের মালিক করছে। তবে ঐ সময়ের মধ্যে দূরপ্রাচ্যের বৃটিশ নৌবহর সরিয়ে নেওয়া হলেই ভারত এই শীর্ষস্থানে উপনীত হবে।

ভারতের এই রণতরী বহরের সংবাদ নিঃসন্দেহে ভারতবাসীকে আনন্দিত করবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্ভাবনাও জাগবে যে, বহির্দেশে ভারতের শক্তির অঙ্গুলিগণ্য সংবাদ পর্যন্ত কী করে পৌঁছে যায় এবং তা আদৌ পৌঁছনো উচিত কি না। গত পাক-ভারত সংঘর্ষকালেও দেখা গেছল ভারতের প্রতিরক্ষা আয়োজনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ প্রকাশিত হয় বিদেশী সংবাদপত্রে, ব্যাপারটা দুশ্চিন্তার বিষয় সন্দেহ নেই। এবং বলাই বাহুল্য যে, আমাদের অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন আছে। (৩১।৫।৬৯)

নামে অনেক কিছুই যায় আসে...

যে রাস্তায় আমাদের হেড অফিস, তার নাম আর ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট নেই, বদলে হয়েছে নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি।

এই নাম পরিবর্তন আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দের। নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৯১৪ সালে যে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের পত্তন করেছিলেন, পরে তা আরও তিনটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজকের ইউবিআই -তে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার নামের স্মৃতিজড়ানো রাস্তায় আমাদের ঠিকানা হওয়াটা আমাদের কাছে নিশ্চয়ই আনন্দের!

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি,
কলিকাতা-১

naa/UBI/8-69

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

আন্তর্জাতিক

মালয়েশিয়ায় দাঙ্গার প্রকোপ হ্রাস পেলেও হাঙ্গামা পুরোপুরি বন্ধ হয় নি।

মালয়েশিয়ার ভবিষ্যৎ

মালয়েশিয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকোপ হ্রাস পেলেও হাঙ্গামা পুরোপুরি বন্ধ হয় নি। এখানে-সেখানে এখনও মাঝে মাঝে খুন-জখম চলছে। এ-পি সংবাদ দিয়েছেন যে, বিগত দাঙ্গায় ৮৪০ জন হয় নিহত না হয় নিখোঁজ হয়েছেন। মালয়েশিয়া তার সেনাবাহিনীতে আরও তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়ান যুক্ত করার আয়োজন করছেন। এ ছাড়া ৫ হাজার লোক নিয়ে একটি আধা সামরিকবাহিনী গঠনের কাজও এগিয়ে চলেছে। সেনাবাহিনী সম্প্রসারণের জন্য ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং বৃটেনের কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য চাওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী রক্ষার জন্য একটি জাতীয় শুভেচ্ছা কমিটি গঠন করছেন। তার চেয়ারম্যান হবেন তিনি নিজেই।

মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাবের ফলে সে দেশের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত হয়ে উঠল। মালয়েশিয়ায় মালয়ীরা জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ মাত্র। বাকী অধিবাসীরা হচ্ছে চীনা, ভারতীয় এবং অন্যান্য বংশোদ্ভূত। তিনটি সাম্প্রদায়িক সংস্থা (ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানাইজেসন, মালয় চাইনিজ এসোসিয়েসন এবং মালয় ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস) মিলিতভাবে এতদিন মালয়েশিয়া শাসন করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান এবং তার সহকারী টুন (অপারেশন পর্ষদের কর্মকর্তা) এই এলায়েন্স পার্টির নেতা। কিন্তু এই তিনটি দলই পৃথক পৃথক তিনটি সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে সংগঠিত। মালয়েশিয়ায় সকল সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে দল গঠনের কোন চেষ্টা বর্তমান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিকগণের অভিমত

- 'খুবই আনন্দ পেলাম শৈলেশ দে-র 'আমি সুভাষ বলছি' বইটি পড়ে। পড়তে পড়তে আমার বহু বৎসরের জমানো স্মৃতি আলোড়িত হয়ে উঠলো।......সেই দীপ্তোজ্জ্বল সৌম্যমূর্তি, সেই অকুণ্ঠ পরিশ্রম, অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও নির্ভীক স্বাধীন চিন্তা আজো আমার হৃদয়ে অম্লান, অক্ষয় হয়ে আছে।......বইটি আমি সবাইকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।'

  —অধ্যাপক বি, এন, দাশগুপ্ত
  প্রাক্তন উপাচার্য : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

- 'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা আগুন-ঝরা এক জীবনালেখ্য 'আমি সুভাষ বলছি'। এ বই পড়তে পড়তে শহীদদের চলা রক্তরাঙা পথকে দেখতে পাই আমরা, ফাঁসির মঞ্চ থেকে ভেসে আসা জীবনের জয়গান শুনতে পাই।'

  —ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
  জয়পুরিয়া কলেজ।

- 'অনেকদিন ধরে প্রতীক্ষা করছিলাম বইটির জন্য। প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। এমন দীপ্ত ভাষায়, এমন নতুন আঙ্গিকে এ ধরণের বই এর আগে কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। সেদিক থেকে 'আমি সুভাষ বলছি' সত্যই একটি অমূল্য সম্পদ। আমি দেশের প্রতিটি তরুণ-তরুণীকে বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।'

  —ডঃ পি, কে, দে, এম এস-সি, পি এইচ ডি
  প্রাক্তন অধ্যক্ষ : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কলেজ অব এগ্রিকালচার।

- 'শ্রীশৈলেশ দে'র 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থখানি আমার মন হরণ করেছে, লেখক যেন লেখার যাদু জানেন। খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে তিনি এমন সুকৌশলে বেঁধেছেন, যা কেবল প্রথম সারির লেখকদের পক্ষে সম্ভব।'

  —অধ্যাপক পি, আচার্য
  হেরম্বচন্দ্র কলেজ।

দ্বিতীয় সংস্করণ

আমি সুভাষ বলছি

শৈলেশ দে — দাম : পনের টাকা

- 'বর্তমান শতাব্দীর মানুষের ইতিহাসে যে কয়জন মুষ্টিমেয় ক্ষণজন্মা পৃথিবীর সর্বদেশে এবং সর্বসমাজে অপরিসীম ঔৎসুক্য ও কৌতুহলের সঞ্চার করেছেন তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বোধহয় সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর রাজনীতিক জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে তাঁর সর্বশেষ আত্মবিলুপ্তির বিস্ময়কর নাটকীয় কাহিনী,—সমস্তটাই যেন অনবদ্য এক রূপকথার মতো চিত্তাকর্ষক। শ্রীযুক্ত শৈলেশ দে মহাশয় সম্ভবত এই কথাগুলিই স্মরণে রেখে এক কুশলী শিল্পীর মতো সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনটিকে এক বিশাল পটভূমির উপর চিত্রিত করেছেন। তাঁর চরিত্র বর্ণনার দক্ষতায় মৃত্যুঞ্জয়ী সুভাষচন্দ্র যেন নব নব অঙ্গসজ্জায় রূপায়িত হয়েছেন।'

  —প্রবোধকুমার সান্যাল

- 'আপনার বই 'আমি সুভাষ বলছি'......স্বাদ ও গুণের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এতে।......বইটা হাতে পেয়ে এক নিঃশ্বাসে তো পড়েছিই—তারপরও হাতছাড়া করতে পারি নি—পড়ার টেবিলের ঠিক পাশটিতে রেখে দিয়েছি, মধ্যে মধ্যেই যাতে উল্টে দেখতে পারি।......আপনি এই বইতে কেল্লা মেরে দিয়েছেন।'

  —গজেন্দ্রকুমার মিত্র

- 'আমি সুভাষ বলছি' পড়লুম। বেশ ভালো লাগলো, আপনাকে ধন্যবাদ দিই। এ কেবল একা সুভাষচন্দ্রের জীবনী নয়, তাঁর ভাবে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস।......ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়, সন্দেহ নেই।

  —মন্মথনাথ ঘোষ

মঃ দ্রঃ—১৫·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাইলে বিনা ডাক মাশুলে রেজিস্ট্রি ডাকে বইটি পাঠাইয়া থাকি।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ফোন : ৩৪—৮৩৫৬

নেতারা করেন নি। ইংরাজরা মালয়েশিয়ার ওপর যে শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিয়ে গেছে, তাতে সংখ্যালঘিষ্ঠতা সত্ত্বেও মালয়ীদের রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখা হয়েছে। পার্লামেণ্টে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মালয়ীদের আসন সংখ্যা অনেক বেশি। টুঙ্কু এবং টুন দুজনেই মালয়ী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁরা তার সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করছেন। মালয়েশিয়ার নাগরিকদের মধ্যে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সেখানে মালয়ীরা ছাড়া আর সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। টুঙ্কুর গভর্নমেণ্ট সেখানে যে 'ভূমিপুত্র' নীতি চালু করেছেন তাতে মালয়ী বংশোদ্ভূত ছাড়া আর কেউ ভূমিপুত্র বলে গণ্য হতে পারবেন না। পুরুষানুক্রমে মালয়েশিয়ায় বাস করলেও নয়। সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন চীনাদের প্রাধান্য রয়েছে, তেমনি সরকারী চাকরি-বাকরিতে রয়েছে ভূমিপুত্রদের প্রাধান্য। ভূমিপুত্রদের মধ্যে পুঁজিপতি শ্রেণী সৃষ্টির জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে ভূমিপুত্র কর্পোরেশন এবং ভূমিপুত্র ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। মালয়েশিয়ায় জাতীয় ভাষা হচ্ছে মালয়ী ভাষা। চীনা এবং তামিল ভাষা (ভারতীয়দের মধ্যে তামিল-ভাষীর সংখ্যাই বেশি) সেখানে সরকারী ভাষা হিসাবেও স্বীকৃতি লাভ করে নি। বোর্নিও এবং সারওয়াকে মালয়ীরা হল বহিরাগত। তা সত্ত্বেও সেখানকার সরকারী ভাষা হচ্ছে মালয়ী ভাষা। মালয়ীরাই হল সেখানকার ভূমিপুত্র। স্থানীয় অধিবাসীরাই সেখানে বহিরাগত বলে গণ্য হয়ে থাকেন।

মালয়েশিয়া বহু ভাষাভাষী এবং বহু জাতি ও ধর্মের দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামকেই সেখানকার রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কোরাণ প্রচার এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য সরকারী তহবিল থেকে সেখানে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়। রাজনীতিতে এই-ভাবে সাম্প্রদায়িকতা আমদানীর ফলে প্যান মালয়ান ইসলামিক পার্টি সেখানে ক্রমেই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। তাদের পার্টি সেখানে ক্রমেই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। তাদের পালের হাওয়া কেড়ে নেবার জন্য সম্প্রতি টুঙ্কু একটা মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। তার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক। টুঙ্কুর এই সমস্ত নীতির ফলেই সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ছে। চীনা এবং ভারতীয়দের মনে এই ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে যে, তাদের প্রতি এক বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে।

এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং হানাহানির হাত থেকে মালয়েশিয়াকে বাঁচাতে হলে সেখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ঘটানো দরকার, সেকথা বলাই বাহুল্য। টুঙ্কু এবং টুন যদি এখনও সেভাবে চিন্তা না করেন, তাহলে মালয়েশিয়ার ভবিষ্যৎ যে খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুদানের পরিস্থিতি

সুদান বামপন্থীদের ক্ষমতা দখলের পর সেখানে মুসলিম ব্রাদারহুড জাতীয় ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল দলের লোকদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে। কায়রোর আল আহ্‌রাম পত্রিকা বলেছেন যে, নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের দমন করার ভার দেওয়া হয়েছে সুদানের বিমানবাহিনীর ওপর। সম্ভাব্য নাশকতার বিরুদ্ধে তৈরি থাকবার জন্য উত্তরাঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীর একটা অংশকে রাজধানীতে এনে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নাশকতার অভিযোগে মুসলিম ব্রাদারহুডের পলিট ব্যুরোর সদস্যরা সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন। আসামীদের মধ্যে ব্রাদারহুডের সেক্রেটারী জেনারেল হাসান এল তোরবীও আছেন। রাস্তায় ইস্তাহার বিলি করার সময় তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচারে আসামীরা ১০ বছরের কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত পেতে পারেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল পার্টির নেতা সাদেক এল মাহ্‌দিও বিচারের সম্মুখীন। তবে আল গুমহুরিয়া পত্রিকা জানিয়েছেন যে, সাদেক নাকি নতুন গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ঘোষণা করবার পরই গা ঢাকা দিয়েছেন।

নতুন গভর্নমেণ্টের মুখপাত্র আবদাল্লা বলেছেন যে, দুই-একদিনের মধ্যেই নতুন গভর্নমেণ্ট তাঁদের নীতি ব্যাখ্যা করবেন।

সুদানের রাজনৈতিক গতিবিধির ওপর যাঁদের নজর আছে, তাঁরাই জানেন যে, আফ্রিকার এই বৃহত্তম দেশটি বছরের পর বছর কি নিদারুণ অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। সমাজের সকল স্তরে দুর্নীতি আর সুবিধাবাদ এমন প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ এক মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিস্থিতি পাল্টাবার সকল রকম প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ১৯৫৮ সালে সেখানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ভেঙে পড়ে এবং সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা এবং স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু জনগণ অসীম বীরত্বের সঙ্গে সামরিক শাসনের অবসান ঘটান। সেই সুযোগে ১৯৬৪ সালে সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন ধান্দাবাজ রাজনৈতিক নেতারা আবার এসে ক্ষমতা লাভ করেন। অল্পকালের মধ্যেই জনগণ বুঝতে পারে যে তারা আবার প্রতারিত হয়েছে। গত সপ্তাহে সেই প্রতারণার অবসান ঘটিয়ে সেনাবাহিনী আবার ক্ষমতা দখল করেছে এবং রাজনৈতিক ধান্দাবাজদের বিদায় দিয়ে "দুর্নীতিপরায়ণ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার" যবনিকা টেনে দিয়েছে।

মনে হয়, সুদান এবার সুস্থ পথে জয়যাত্রার দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। নতুন প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লা এবং বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান কর্নেল জাফর মহম্মদ আল নুমিরি চরিত্রবান ব্যক্তি হিসাবেই পরিচিত। তাঁরা দেশের মূল ব্যাধির কারণ সম্পর্কে সচেতন। সুদান দেশটা নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ মানসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন। অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ধর্মান্ধতায় দীক্ষাপ্রাপ্ত নেতারাই এতদিন সেখানকার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রেখেছিলেন। অতীতে যখনই যুবসম্প্রদায় তাঁদের প্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা করেছে, তখনই এই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকরা কঠোরহস্তে তাদের দমন করেছেন। নুমিরির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে এই আশার সঞ্চার হয়েছে যে, এবার তাদের অগ্রগতির সমস্ত বাধা অপসারিত হতে পারে।

যে ২১ জন সদস্য নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই দেশের জন্য আত্মত্যাগ করে ইতিমধ্যেই

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রথম পর্বের ফলাফল

গত রবিবার ফরাসী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রথম পর্বে প্রার্থীরা কে কত শতাংশ ভোট পেয়েছেন, তা নিচে দেওয়া হল :—

পম্পিদু (দ্য গলপন্থী)	৪৪·১৪%
পোহের (মধ্যপন্থী)	২৩·৩৮%
দুক্লো (কম্যুনিস্ট)	২১·৪৩%
ডেফারে (সোসালিস্ট)	৫·০৬%
রোকার্ড (র‍্যাডিকাল সোসালিস্ট)	৩·৬৫%
ক্রিভাইন (ট্রট্স্কীপন্থী)	১·০৬%
ডুকাটেল (নির্দলীয়)	১·২৮%

পম্পিদু ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেন নি। আগামী ১৫ই জুন দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে পম্পিদু যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট পান তাহলে তিনিই প্রেসিডেণ্ট পদে ব্রতী হবেন।

দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন বলেই সকলে আশা করে। আবদাল্লা আগে সুদানের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁর ন্যায়-বিচার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে কারও মনে কোন সংশয় নেই। সুদানের প্রথম পার্লামেন্টের স্পীকার হিসাবে আইনসভা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। জেনারেল ইব্রাহিম আব্বাউদের নেতৃত্বাধীন সামরিক জুন্টা সেই পার্লামেন্টের উচ্ছেদ ঘটায়। আবদাল্লা যখন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, সেই সময় পার্লামেন্ট কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে পার্লামেন্টের ১৩ জন কম্যুনিস্ট সদস্যকে উৎখাতের চেষ্টা করেন। আবদাল্লা পার্লামেন্টের সেই কাজকে অবৈধ ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সাদেক এল মাহ্‌দি আবদাল্লার সেই রায়কে অগ্রাহ্য করলে আবদাল্লা প্রধান বিচারপতির পদ ত্যাগ করেন। আবদাল্লা ১৯৬৪ সালে সামরিক শাসন উচ্ছেদের আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। সেই আন্দোলনের সাফল্যের পর যখন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব হয়, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি ধর্মান্ধ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন নেতাদের দ্বারা পরিচালিত গভর্নমেন্টের কর্ণধার হতে চান না।

নুমিরির কাহিনীও মোটামুটি একই রকমের। আগেও তিনি দেশকে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের হাত থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৬৬ সালে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহে সাদেক গভর্নমেন্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। প্রমাণাভাবে তাঁকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে যখন সামরিক জুন্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হয় তখন নুমিরি ছিলেন খার্তুমে একটি ব্যাটালিয়ানের সেনাপতি। তখন উচ্চপদাধিকারী অফিসাররা তাঁকে জনতার ওপর গুলীবর্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু নুমিরি সেই আদেশ অগ্রাহ্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তিনি বলেছিলেন, সেনাবাহিনীর কাজ হচ্ছে জনগণকে রক্ষা করা, তাদের হত্যা করা নয়। সামরিক আদালতে নুমিরির বিচার শুরু হবার আগেই জুন্টা শাসনের অবসান ঘটে এবং নুমিরি জনগণের কাছ থেকে বীরের সম্মান লাভ করেন।

নুমিরি এবং তাঁর সহকর্মীরা অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চান না বলেই সেনাবাহিনীর ভূমিকা এবং রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছেন। নতুন মন্ত্রিসভায় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি আছেন মাত্র দু'জন। এবারের মন্ত্রিসভায় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন আবদেল করিম মিরঘানি। ইনি এতদিন কায়রোয় সুদানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আব্বাউদ-উত্তর জনপ্রিয় সরকারে তিনি যখন মন্ত্রী নিযুক্ত হন, তখন তিনি নয়াদিল্লীতে সুদানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। আর যাঁদের মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়েছে তাঁরা হয় সত্যিকারের বামপন্থী না হয় সুপরিচিত কম্যুনিস্ট। বড় বড় কম্যুনিস্ট নেতাদের মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয় নি। তাঁদের ওপর নতুন গভর্নমেন্টের অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব পড়েছে। সুদানে কম্যুনিস্ট পার্টি খুব শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত। আরব দুনিয়ায় আর কোথাও কম্যুনিস্ট আন্দোলন এত শক্তিশালী নয়।

পশ্চিম জার্মানীর নীতি পরিবর্তন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গ স্থির করেছিলেন যে হিটলারের পরাজয়ের পর সমগ্র জার্মানীর দখল নেবে আমেরিকা, রুশিয়া, বৃটেন আর ফ্রান্স। জার্মানীর কোন্ এলাকা কোন্ শক্তির অধীনে থাকবে তাও স্থির হয়ে গিয়েছিল। জার্মানীর রাজধানী বার্লিন রুশ এলাকার মধ্যে পড়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও বার্লিনও চতুঃশক্তির অধীনে থাকবে বলে ঠিক হয়েছিল। কথা ছিল, পটসড্যাম চুক্তি অনুযায়ী জার্মান সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের পর দখলদারী শক্তিগুলো জার্মানী ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু যুদ্ধের পরই পূর্ব ও পশ্চিম শক্তিবর্গের মধ্যে গুরুতর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। তাতে পটসড্যাম চুক্তি কার্যত বানচাল হয়ে যায়। বৃটেন ফ্রান্স এবং আমেরিকা জার্মানীর যে অংশ দখল করেছিলেন, সেই অংশের জন্য পৃথক গভর্নমেন্ট গঠন করে তার কর্তৃত্বভার সেই গভর্নমেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং সেই অংশ পশ্চিমী নাটো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অধুনা সেই অংশ পশ্চিম জার্মানী নামেই পরিচিত। সোভিয়েটও তার অধিকৃত এলাকার শাসনভার স্থানীয় গভর্নমেন্টের হাতে তুলে দেন। সেই অংশের নাম পূর্ব জার্মানী। বলা বাহুল্য পূর্ব জার্মানী ওয়ারশ চুক্তির অংশীদার। অর্থাৎ জার্মানী এখন দুই ভাগে বিভক্ত। দুই জার্মানীর দুই পৃথক গভর্নমেন্ট সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে নিজ নিজ এলাকা শাসন করেছেন। পশ্চিম জার্মানী কিন্তু এতকাল পৃথক অস্তিত্বের কথা সরকারিভাবে স্বীকার করতে চাইতেন না। তাঁদের দাবি ছিল, পশ্চিম জার্মানীই সমগ্র জার্মানীর প্রতিভূ। তাঁরাই জার্মান রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যাচ্ছেন এবং তাঁরাই যুদ্ধপূর্বকালের জার্মানীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। পূর্ব জার্মানী হচ্ছে রুশ অধিকৃত এলাকা মাত্র। পশ্চিম জার্মানীর এই দাবি যে অবাস্তব তা দুনিয়ায় কারও অজানা থাকবার কথা নয়। কারণ পশ্চিম জার্মানীর মত পূর্ব জার্মানীও অন্যান্য বহু রাষ্ট্রের দ্বারা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবেই স্বীকৃত। আয়তনে এবং অর্থবলে পশ্চিম জার্মানীর সমকক্ষ না হলেও সে-ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এগিয়ে চলেছে এবং কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তার সমৃদ্ধির হার সব চেয়ে বেশি। যাই হোক, পশ্চিম জার্মানী এতদিন কোট ধরে বসেছিল যে, যে সব রাষ্ট্র পূর্ব জার্মানীকে স্বীকার করে নেবে, তাদের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানী কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ভারত পূর্ব এবং পশ্চিম দুই জার্মানীর সঙ্গেই সদ্ভাবে থাকতে চায়। স্বভাবতই পশ্চিম জার্মানীর জেদ পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীও তার এতদিনকার নীতি পাল্টে ঘোষণা করেছে যে, পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানী আর সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। পশ্চিম জার্মানীর মন্ত্রিসভা ৭ ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইরাক কম্বোডিয়া এবং সুদান পূর্ব জার্মানীকে স্বীকৃতিদানের পরই মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপরোক্ত তিনটি দেশের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় আছে। ভারতের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে নেই। কিছুকাল আগে ভারত গভর্নমেন্ট স্থির করেন যে পূর্ব বার্লিনস্থিত স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে ট্রেড মিশনে পরিণত করা হবে। কিন্তু ট্রেড মিশন কনসুলার মর্যাদা সম্পন্ন নয়—সে-কথা ভারত সরকারের মুখপাত্রই স্বীকার করেন। পশ্চিম জার্মানীর নতুন নীতি ঘোষিত হবার পর পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ভারতের পুরোদস্তুর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আর কোন বাধা থাকবে বলে মনে হয়। না। দেশের মধ্যে ইতিমধ্যেই সেই দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। দুই জার্মানীর মিলন নিশ্চয়ই খুব বাঞ্ছনীয় কিন্তু সেটা যখন বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে না, তখন দুই জার্মানীকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের উপায় কি?

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

এই কথা রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলির অজ্ঞাত থাকবার কথা নয় যে, তাদের শত্রু কারা এবং কোন্ পথে শত্রুর আগমন সম্ভব। অজ্ঞাত নয় আরও এই কারণে যে, ১৯৬৭ সালে সরকার গঠন করে, পরিচালনা করে তাঁরা এই শত্রুর কিছু কিছু গতিবিধি অনুভব করেছেন। শত্রুর আক্রমণ শুধু বাইরে থেকে আসতে পারে এমনও নয়, সঙ্কট সৃষ্টি হলে ভিতরের কেউ কেউ শত্রুর সঙ্গে হাত মেলায়—এটাও গতবারের অভিজ্ঞতা। নইলে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, যাঁকে রাজনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৭ সালে—তিনি কেন হাত মেলালেন কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকজনের নাম করা যায়। কিন্তু এঁদের এই অপমৃত্যু তথা পদস্খলন—এর জন্য কি শুধু এঁরাই দায়ী, কোন দায়িত্ব কি ছিল না অন্য কারও—যাঁরা প্রকৃতপক্ষে যুক্তফ্রন্টের স্টিয়ারিং ধরেছিলেন। দলত্যাগ নিশ্চয়ই অপরাধ, কিন্ত দলত্যাগ রোধ করতে না পারাও দল পরিচালকদের ব্যর্থতা। ১৯৬৭ সালের এই অভিজ্ঞতা কিন্তু ১৯৬৯ সালে মনে রাখা হল না। ১৯৬৭ সালে যে কাজগুলি না করার কারণে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী শত্রুর প্রবেশপথ সুগম হয়েছিল, ১৯৬৯ সালেও কিন্তু কারও কোন গরজ দেখা গেল না সেই পথগুলিতে পাহারা বসাতে। এই কথা যুক্তফ্রন্টের মার্ক্সবাদী বা সমাজবাদী কারও অজানা নয় যে, তাঁদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন গান্ধীবাদীও আছেন—বিপ্লবে বিশ্বাসীর সঙ্গে বেশ কিছু বিবর্তনে বিশ্বাসীও রয়েছেন; কাজেই চলতে হবে এমনভাবে পা ফেলে, যাতে মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে গান্ধীবাদীদের ঠোক্কর না লাগে, অথবা বিপ্লববাদীদের সঙ্গে বিবর্তনবাদীদের সঙ্ঘর্ষ না হয়। এই সঙ্ঘর্ষ রোধের পথ পাওয়া সহজ নয়, যা সব সময় এড়িয়ে চলতে চাইলেই সঙ্ঘর্ষ এড়ানো যায় এমনও নয়, কিন্তু মন যদি সচেতন থাকে, তবে হয়ত জটিল গ্রন্থিগুলি খোলা সহজ হয়। তবু নানা মত ও চিন্তার ব্যক্তিদের নিয়ে একসঙ্গে চলার একটা সহজ ও প্রশস্ততম পথ হল নির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলা। নির্দিষ্ট আচরণবিধি থাকবে, যে বিধিমত সকলে চলতে বাধ্য থাকবে—এই বিধি যাঁরা মানবেন না বা যাঁরা এই বিধির বিরোধী কাজ করবেন, তাঁদের অমিত্র হিসাবে গ্রহণ করা সহজ হয়। এইবার প্রশ্ন করি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছে, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে নির্বাচনী যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, নির্বাচনে জয়লাভ করার পর সরকার গঠিত হয়েছে এবং সেই সরকারের তিন মাস বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সঠিক কোন আচরণবিধি গঠন করা হয় নি কেন? অথচ গতবার এই আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছিল, অবশ্য গ্রহণ পর্যন্ত সরকার টিকে থাকে নি, কিন্তু এইবার এতদিনে কেন আচরণবিধি গ্রহণ করা হয় নি, তার জবাব কে দেবে? আচরণবিধি বলতে শুধু নিজেদের ঝগড়ার কথা কাগজে বলার আগে ফ্রন্টে বলব—এটাই নয়। সত্যকার আচরণবিধি বোঝাবে তাকেই, যে আচরণবিধি দিয়ে সরকার পরিচালনার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে উঠবে। এই আচরণবিধির মধ্যে শুধুমাত্র মন্ত্রীরা আবদ্ধ থাকবেন না, শুধু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীসুকুমার গুপ্ত, শ্রীসুকুমার রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ আবদ্ধ থাকবেনা না, এই আচরণবিধির মধ্যে আবদ্ধ হবেন রাজ্যের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন রাজনৈতিক দল ও তার শাখা; তার সর্বোচ্চ নেতা থেকে, সর্বনিম্নস্তরের কর্মী—এই কর্মী কিষাণ ফ্রন্টের হন, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের হন, আর যে ফ্রন্টেরই হন। আচরণবিধির অর্থ কাউকে হাত-পা বেঁধে রাখা নয়, কারও মুখ বন্ধ করে রাখা নয়, কারও গতি অচল করে দেওয়া নয়। শুধু একটা নীতি মেনে চলা যে—কতটুকু করা যাবে, কতটুকু এখন করা যাবে না, কোন দাবি আদায়ে আজই সংগ্রাম করা যাবে, কোন দাবি আদায়ের সংগ্রাম কিছু সময় দিয়ে করা হবে।

কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলা সরকার। ১৯৬৭ সালে রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর দেখা গেল রাজ্যব্যাপী দাবি আদায় আর ন্যায্য পাওনা আদায় এবং সব অবিচার-অত্যাচার রোধের মচ্ছব পড়ে গেল। রাইটার্স বিল্ডিংস আর হরিহর ছত্রের মেলা এক হয়ে গেল—রাইটার্সের সামনে লাল ফেস্টুন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একের পর এক দল আঁচল পেতে, ভাবখানা এই যে, রাইটার্স বিল্ডিংস হল আলাদিনের দপ্তর। সামনে এসে দাঁড়াবার পর দোতলা বা তিনতলা থেকে মন্ত্রীরা মিছিলকারীদের লক্ষ্য করে দাবি পূরণের ভাণ্ডটি ছুঁড়ে ফেলবেন আর তলায় দাঁড়িয়ে মিছিলকারীরা আঁচল পেতে সেইটা নিয়ে ঘরে ফিরে যাবেন—এর দ্বারা রাজ্যে শিল্প কারখানায় ছাঁটাই বন্ধ হবে, ক্লোজার, লে-অফ, লক-আউট হবে না, বেকাররা চাকরি পাবে, ভূমিহীনরা ভূমি পাবে, স্কুল-কলেজে দরকারমত পরীক্ষা না দিয়েও পাশ করা যাবে, নির্ধনরা ধন পাবে। দাবি থাকবে, দায়িত্ব থাকবে না, বেতন পাব, ভাতা পাব, কিন্তু কাজ করব না অর্থাৎ যা চাইব তাই পাব। ক'মাস পরে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার চলে গেল—এল পি ডি এফ বা কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকার, তখন দেখা গেল—সকলেই নিঃশব্দ হয়ে গেছেন, রাইটার্স বিল্ডিংসের কল্পতরুর বৃক্ষতলে আর কোন প্রার্থীর ভিড় নেই। রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হলে দেখা গেল, দাবি আদায়ের বাবুরা ডালহৌসির পথ ভুলে গেছেন, কিন্তু যেই আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করল, যেই আবার শ্রীঅজয় মুখার্জি, শ্রীজ্যোতি বসু রাইটার্সে এলেন, অমনি জুতো মেরে মন্ত্র আদায়কারীরা এসে জড়ো হলেন। যদি প্রশ্ন করা যায়—কেন এমন হয়, ধরে নিলাম বাইশ বৎসর কংগ্রেস শাসনে বড় কষ্ট হয়েছে, তাই......। কিন্তু যাঁরা বাইশ বৎসর কষ্ট করলেন, বড় কষ্ট পেলেন, আর কংগ্রেসকে হটাতে ভয়ানক সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করলেন, তাঁরা যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসিয়ে বাইশটা দিন একটু চুপ করে থাকতে পারলেন না। বাইশ মাস নয়—বাইশটা সপ্তাহ কি অপেক্ষা করতে পারলেন না? গতবারের অভিজ্ঞতায় তো বোঝা গেছিল যে, মন্ত্রীরা চেয়ারে বসে সরকার পরিচালনা, দপ্তর পরিচালনা—কোন কিছু বোঝবার আগেই তাঁদের এক কাঁধে দায়িত্বভার আর এক কাঁধে সঙ্কটের ভার চেপে ছিল, ফলে দুই ভার সহ্য করতে না পেরে অনেকেরই ঘাড় ভেঙে গেছিল। কিন্তু এইবার কেন একটা কথা ভাবা হল না যে, বেশ কিছু সময় দিয়ে মন্ত্রীরা কাজ বুঝে নেওয়ায়, প্রশাসন

মুখে-নেওয়া এবং সব কিছুর উপর মন্ত্রীদের প্রভাব না পড়া পর্যন্ত আমরা কোন কাজ করে সরকার বা মন্ত্রীদের বিব্রত করব না। যাঁদের মন্ত্রী করেছি, তাঁরা অবুঝ নন, তাঁরা ভুঁইফোড় বা পরগাছা নন, জনগণের চাহিদা ও সমস্যা তাঁরা বোঝেন ও জানেন—পূরণের প্রথম সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার তাঁরা করবেন। কিন্তু তা নয়, শপথ নেবার মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে গেল নৈ-নেত্য কাণ্ড। সেই ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাজভবনে প্লাবন সৃষ্টি করে নিশ্চয়ই অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল জনগণ—কিন্তু ডিসিপ্লিনড্ ক্যাডাররা কেন নির্দিষ্ট কর্মসূচীর বাইরে কাজ করবে? কোন নির্দেশ বা কথা তো ছিল না যে, রাজভবনে সকলে ঢুকে পড়বে। সেইদিন থেকেই শুরু হল কর্মসূচী, নির্দেশ ছাড়াই কাজ করার—আর আজ পর্যন্ত সেই ঢেউ চলেছে।

গতবার সরকার গঠিত হবার পর রাজ্যের রাজনৈতিক সঙ্কটের অন্যতম কারণ ছিল ঘেরাও। দাবি আদায়ে ঘেরাও ভাল কি মন্দ সেই কথা বলার কোন এক্তিয়ার আমার নেই, কিন্তু মানবতাবর্জিত কোন আন্দোলনই কোন পক্ষের মঙ্গলের হতে পারে না। সরকারের অন্যতম কাজ হল দুর্বলকে রক্ষা করা, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেওয়া, পীড়িতের পীড়ন বন্ধ করা। এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যদি হয় যে, শিল্পপতি ও মালিকরা অতি খারাপ—কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তার জন্য তো সরকার আছে, সরকারই শ্রমিক স্বার্থের নিরাপত্তা রক্ষা করবে আর সরকার যা পারে না বা পারবে না—সেটা কি শুধুমাত্র ঘেরাও করে বা অন্য প্রক্রিয়ায় পাওয়া সম্ভব। এই ক্ষেত্রে সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে যদি কেউ শাসনের ভার নিজের হাতে নিতে চান—তার ফল কখনই ভাল হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির অন্যতম কারণও সম্ভবত এটাই যে, সকলেই সরকারকে সাহায্যের নামে, সমর্থনের নামে সরকারের করণীয় কাজগুলি কিছু কিছু নিজেরা করতে চাইছেন। ঘেরাও তারই অন্যতম। আর ঘেরাও করা হচ্ছে কাদের—যাঁরা শ্রমিক-কর্মচারীদের মত একই বেতনভোগী. তবে হয়ত পদমর্যাদা ও অন্যান্য কারণে বেশি মাইনে আর সুবিধা পেয়ে থাকেন তাঁদের। আজ পর্যন্ত ঘেরাও কিন্তু তাঁরা কেউ হন নি—যাঁরা কারখানার মালিক ও প্রকৃত মুনাফা লুণ্ঠন ও শোষণকারী—তাঁরা বহাল তবিয়তে নিউ আলিপুর অথবা দক্ষিণ কলকাতার প্রাসাদে দিব্য সুন্দর দিন কাটান। আর ঘেরাও কি শুধু ঘেরাও—কলেজের অধ্যাপক বা অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে ছাত্ররা পায়খানা-প্রস্রাব বন্ধ করিয়ে কারও প্যান্ট নষ্ট করিয়ে ছাড়ছে, শ্রমিকরা শুধু পায়খানা-প্রস্রাব করিয়ে নয়—দেহে নির্মম আঘাতের চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে, হাত-পা ঠুঁটো জগন্নাথ করার চেষ্টা পর্যন্ত করছে। ঘেরাও-এর আর এক ভাই হল খাস জমি দখলের রাজনীতি। এই রাজনীতিতে একজন কম্যুনিস্ট নেতা—যাঁর একখানা হাত আগেই খোয়া গেছিল, তাঁর আর একখানা হাত কেটে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। জমি দখলের রোগটা কিন্তু ঘেরাও-এর চেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বলা যায়, কারণ রাজ্যে শ্রমিক অপেক্ষা কৃষকের সংখ্যা বেশি, তাদের সমস্যাও বেশি। ১৯৬৭ সালেও এই খাস জমি দখলের হিড়িক পড়েছিল, কিন্তু সরকার সংক্ষিপ্ত সময় থাকায় হিড়িকটা দানা বাঁধে নি। এইখানেও বলে রাখা দরকার—আজ যাঁরা জমি দখলের নামে অতি উচ্চ চিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন, তাঁরা কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসনকালে যা রাজ্যে বিশ বৎসর কংগ্রেস শাসনের কালে খাস জমি, পতিত জমি, অনাবাদী জমি খুবই কম দেখেছেন। অবশ্য এই দেখার মধ্যে খারাপ কিছু নেই—ভয়-ভীতিতে বহু সময় ইচ্ছা থাকলেও অনেক ভাল কাজ করা যায় না। কিন্তু সব ইচ্ছা ও স্বচ্ছ দৃষ্টি পাওয়া গেল নতুন সরকার হলে। সবচেয়ে মজার কথা হল—সব কাজ—যথা ঘেরাও, জমি দখল সবই করা হয় কিন্তু সরকারকে সাহায্যের নামে। আহা বেচারা আমাদের সরকার—তার অনেক কাজ. তাই আমরা একটু তাদের কাজ এগিয়ে দিচ্ছি—এমন ভাব নিয়ে সব করা হয়। কিন্তু দখলের হিড়িকে কোথাও কোন বাদ-বিচার নেই, সেই জমি মেছো ভেড়ি ধানী জমি হোক, বাগান হোক, মজা পুকুর হোক, বাস্তুভিটা হোক—ঝাণ্ডা ওড়াও, দখল কর, হোগলার ছাউনি বসাও। জমি দখল রাজ্যে এই প্রথম নয় বা নতুন কিছুও নয়—পশ্চিমবঙ্গে পরাক্রান্ত কংগ্রেস শাসনের যখন পূর্ণ গৌরবের কাল. পণ্ডিত নেহরু আর ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত ব্যক্তিরা যখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে, যখন পান থেকে চুন খসলে বজ্রপাত হত, সেই সময় রাজ্যে কয়েকশত স্থানে পতিত জমি দখল হল। গড়িয়া-যাদবপুর-টালিগঞ্জ থেকে শুরু করে গঙ্গার এপারে নৈহাটি-কাঁচড়াপাড়া, ওপারে শ্রীরামপুর-চুঁচুড়া—সর্বত্র জমি দখল হল আর সেই দখলের জমি পুনর্বাসন পেল হাজার হাজার উদ্বাস্তু। স্বর্গত অম্বিকা চক্রবর্তী ও সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় আর বর্ষীয়ান নেতা জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত বসু থেকে শুরু করে, আজ বিভিন্ন দলের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন যেমন—চিত্ত বসু, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকেশ গুহ, ননী কর, অনিল সিংহ, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ মজুমদার প্রভৃতি ব্যক্তিরা এই উদ্বাস্তু আন্দোলনেরই সৃষ্টি বলা যায়। কই সেইদিন হাজার হাজার মানুষের জমি দখলে তো আজকের মত অবস্থা সৃষ্টি হয় নি। এই বিরাট জমি দখল আন্দোলনের মধ্যে হয়ত একটা-দুটো নজিরও পাওয়া যাবে না, যেখানে গরিবের জমি দখল হয়েছে, দুর্বলের জমি দখল হয়েছে, কারও বসতবাড়ির জমি দখল হয়েছে। কিন্তু আজ—সেইদিন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রীর ঘরে এসে একজন বর্ষীয়ান আইনজীবী প্রায় কেঁদে ফেললেন—"সারা জীবনের সঞ্চয়ে একটু বাড়ি করব বলে ক্যানিং অঞ্চলে সামান্য একটু জমি কিনে রেখেছিলাম—আশা ছিল দুই-এক বৎসর পরে যেভাবে হোক একখানি কুঁড়ে তুলে একটু গ্রামের পরিবেশে শেষ জীবনটা কাটাব, একটু মাথা গুঁজবার ব্যবস্থা করে নিজের জমিতে শেষ নিশ্বাস ফেলব, কিন্তু হল না, ঝাণ্ডা উড়িয়ে সেই বসতভিটের কয়েক কাঠা জমিও নিয়ে নিল।" হা-হুতাশকারী ভদ্রলোক একজন আইনজীবী এবং তিনি তখনও থানায় যান নি কারণ থানায় ডায়েরী করতে গেলে যদি জমি...। যাক, আর বেশি বলতে চাই না, যা হোক পরিষদীয় মন্ত্রিমহাশয় তাঁকে অবশ্য খুবই উৎসাহ দিয়ে থানায় একটা ডায়েরী করাতে রাজী করালেন. আর জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা বলুন তো, আপনার জমিতে পোঁতা ঝাণ্ডাটা কেমন?"

আজ্ঞে—লাল।

আহা, লাল তো সবই, কিন্তু কি চিহ্ন আঁকা?

আজ্ঞে, কাস্তে-হাতুড়ী।

আহা কাস্তে-হাতুড়ীও তো প্রায় সব দলের ঝাণ্ডাতেই আছে। কোন্ দলের কাস্তে-হাতুড়ী?

আজ্ঞে, সেটা বলতে পারব না, রংটা লাল বুঝি আর কাস্তে-হাতুড়ীও বুঝি—তারপর আর বুঝি না।

পরিষদীয় মন্ত্রী নাচার হয়ে তাঁকে বললেন—একটু খোঁজ নিয়ে আমায় বলবেন, ওটা কোন্ দলের—দেখি সেই দলের মন্ত্রীকে একটু বলব।

এই হল একজন মন্ত্রী ও একজন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে সামান্য বাক্যালাপ—এর মধ্যেই ধরা পড়ে যেমন অসহায় নাগরিকের ছবি, তেমনি বিব্রত মন্ত্রীর ছবি: . কিন্তু এতেও শেষ নয়—বিব্রত আর অসহায় রূপের এই সমাপ্তি নয়, আসছে বার সেই কথা বলব। (চলবে)

কিছুদিন আগে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় একটি বড় বইয়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। কি ধরণের বাংলা বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়—এই নিয়ে দোকানের পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনার জন্যই যে ওখানে গিয়েছিলাম তা নয়, গিয়েছিলাম নির্ভেজাল আড্ডার জন্য। একথা সেকথার ফাঁকে কথায় কথায় আলোচনা গিয়ে পৌঁছল বাংলা বই ও পাঠক সম্পর্কে।

বড় গলায় আমি অনেকক্ষণ শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের উন্নত রুচির পক্ষ নিয়ে তর্ক করেছিলাম। তর্কের মাঝে মাঝে প্রকাশকদের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি আর বাজে বই ছাপার প্রবণতাকে গাল পাড়ছিলাম কারণ আমার মতে আজকের বাংলায় এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ও তাদের পৃষ্ঠপোষক একদল প্রকাশকই আমাদের মানসিক স্তরকে নিচে টেনে নামাতে চেষ্টা করছে এবং এদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করছে শুধু অর্ধশিক্ষিত ও একেবারে তরুণ পাঠকদের মনেই। শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের কাছে তার কোন আবেদন নেই।

অনেকক্ষণ আমার তীব্র আক্রমণের ধাপটা সহ্য করার পর প্রকাশক বন্ধুটি শেষ পর্যন্ত তার ড্রয়ার থেকে একটি ফাইল টেনে বের করে আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে বইয়ের যেসব অর্ডার আসে সেটা তারই ফাইল। অধিকাংশ অর্ডারই বাংলাদেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর বইয়ের। প্রায় আধঘন্টা ধরে পাতা উল্টে উল্টে আমি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সেই বইয়ের অর্ডার দেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ফাইলটি বন্ধ করে উঠে বললাম—"চলি আজ কাজ আছে।" মুচকি হেসে বন্ধুটি শুধু বললেন—"আর এক কাপ চা খেয়ে যাবে না?" সংক্ষিপ্ত একটি 'না' বলে দোকান থেকে সেদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিলাম।

রাস্তায় নেমে প্রথমেই মনে হল আমার এই প্রকাশক বন্ধুটি বড় বেশি ভদ্র। এতক্ষণ তুমুল আক্রমণে ওঁকে আমি যেভাবে আঘাত করছিলাম তার বদলা নিতে পারতেন উনি ওঁর ঐ মোক্ষম দলিল দেখিয়ে কিন্তু সম্ভবত করুণা করেই তা করলেন না। মনে মনে নিজেকে একটু ছোটই মনে হল।

বাংলাদেশের কয়েকটি বিদ্যালয়ের তরুণ মাস্টারমশাইরা তাঁদের স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য যেসব বইয়ের অর্ডার দিয়েছেন সে তালিকাগুলি যদি আমি শুধু এখানে উদ্ধৃত করে দিতাম তাহলেই আমার পাঠকেরা তা থেকে নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন। কিন্তু সে দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বইগুলি নিশ্চয়ই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের : জন্য নয়—শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিজেদের পড়ার জন্য। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবি বাজারে চালু নেহাৎ তৃতীয় শ্রেণীর কিছু চটুল উপন্যাস ও রসাল গল্পের বই কি করে এযুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের তৃষ্ণা মেটাতে পারে? রুচির প্রশ্ন না হয় চুলোয় যাক।

বইয়ের ব্যাপারে আমি অস্পৃশ্যতা মানি না। আমি মনে করি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে ভাল-মন্দ সমস্ত রকম বই পড়ার স্বাধীনতা ও ইচ্ছা থাকা দরকার। প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের কাছে নিষিদ্ধ বই বলে কোন কথা নেই। সব বই-ই পাঠ্য।

কিন্তু সেই অধিকারের দোহাই দিয়ে আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীরা যদি একমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস ও রসাল গল্পের চটচটে রসেই মজে থাকেন তাহলে সংস্কৃতির দুর্দিন সামুহিক সন্দেহ নেই। আরও দুর্দিন এই জন্যই যে, এদের রুচিই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের রুচিকে গড়বে।

দিনকয়েক আগে এক তরুণ সাহিত্যিক গর্ব করে বলছিলেন, বাংলাদেশের মত বুদ্ধিজীবী ভারতে আর নাকি কোথাও নেই। এই বক্তব্যের পক্ষে তাঁর সবচেয়ে বড় যুক্তি হল বাংলাদেশের মত এত পত্রিকা ও বই আর কোন রাজ্যে বেরোয় না।

এই পরিসংখ্যান ভুল কি ঠিক আমার জানা নেই। যদি ঠিকও হয় তাহলে আমার বলার কথা হচ্ছে এই যে, অপোগণ্ডের সংখ্যা যেমন সমাজকে শক্তিশালী করে না তেমনি পত্র-পত্রিকার সংখ্যাধিক্যও সংস্কৃতির মান উন্নয়নের পরিচয় দেয় না। সেই সব পত্র-পত্রিকা, সেই সব বইতে কি লেখা হচ্ছে তার গুণাগুণই প্রমাণ করে সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের।

বাংলাদেশে এখন যত সাহিত্য-পত্র ও কবিতা-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাদের চারভাগের তিনভাগকেই চোখ বুজে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়। কিছু অর্ধশিক্ষিত তরুণ কবিতা লেখা ও গল্প লেখার নাম করে যা উৎপাদন করে তা না হলে বাংলার সংস্কৃতি আদৌ দুর্বল হবে না। বরং জঞ্জালমুক্ত হতে পারে।

ভাল পত্রিকা যে এদেশে নেই তা নয়, ভাল গল্প, ভাল উপন্যাস, ভাল কবিতা যে লেখা হচ্ছে না তাও নয়। কিন্তু অক্ষম ও অসৎ সাহিত্যের চাপে তা আজ পাঠকের চোখের আড়ালে পড়ে গেছে।

সাহিত্য ও কাব্যের নামে এই ছিঁচকেমি ও ভেজালের বিরুদ্ধে চিরদিন সব দেশেই যাঁরা লড়াই করে এসেছেন তাঁরা সমাজের বুদ্ধিজীবীরা—শিক্ষক অধ্যাপকেরা। এঁরাই চিরকাল অসৎ সাহিত্যের জঞ্জালের স্তূপ থেকে খুঁজে বের করে সৎ সাহিত্যকে পরিচিত করিয়েছেন। কিন্তু আজ সেই সর্ষের মধ্যেও কি ভূত ঢুকে পড়েছে?

উপদেশ দেবার ইচ্ছা অথবা অধিকার কোনটাই আমার নেই। তাছাড়া বুদ্ধিজীবীদের কাছে কর্তব্য-অকর্তব্যের উপদেশ নিয়ে এসে দাঁড়াতে পারি এমন সাহসও আমার নেই। কিন্তু তামাম বাংলাদেশ জুড়ে আজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নামে যা চলছে সে সম্পর্কে কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক অথবা অধিকার বহির্ভূত বলে বিবেচিত হবে না।

ওপারে বাংলাদেশের কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহিত্য-রুচির একটি উদাহরণ দিলাম মাত্র। কিন্তু এখানেই যে শেষ তাও মনে হচ্ছে না। রবীন্দ্র সরোবরে 'অশোককুমার নাইটে' বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের সিনেমা তারকা দর্শনের লজ্জাকর উন্মাদনাকে আমরা নিন্দা করেছি, ধিক্কার দিয়েছি। পথেঘাটে এমন বেলেল্লাপনা দেখলে আজও

আমরা ধিক্কার দিই—সমাজে উঠতি মস্তানদের বিপদ সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করি, উদ্বিগ্ন হই। কিন্তু আমাদের এই ধিক্কার, শঙ্কা ও উদ্বেগ কোথায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে? আমার মনে হয় ধিক্কার ও উদ্বেগ দ্বিগুণাকার হয়ে বোধ হয় বার বার ফিরে আসছে আমাদেরই কাঁধে।

তা যদি না হয় তাহলে সেদিন মহাকরণে উত্তমকুমার দর্শনের জন্য উন্মাদ সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহারকে আমি কিভাবে সমর্থন করব পাঠক আমাকে বলে দিন। সমগ্র মহাকরণের সব কাজ বন্ধ করে চিত্রতারকাদের পিছনে পিছনে ছোটা, তাদের নিয়ে মাতামাতি, হুল্লোড় এসব যে-দেশে ঘটতে পারে সেই দেশে 'অশোককুমার নাইট' অথবা অনুরূপ অনুষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের হুল্লোড় ও মাতামাতিকে ধিক্কার জানাবার মুখ কোথায় আমাদের? অথচ আমি জানি ডালহৌসির এই কেরানিরাই আমাদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের অন্যতম শক্তি।

* * *

সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে, শোভন রুচির পক্ষে মনে হয় আজ বাংলাদেশে বলিষ্ঠ আন্দোলনের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ না হলে আমাদের এতদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত সবটুকু রাজনৈতিক সাফল্য একেবারেই ব্যর্থ, অর্থহীন হয়ে যাবে। শুধু মিছিলেই চলবে না, মিছিলের মুখগুলিকেও সুন্দর করে গড়তে হবে। তার চেষ্টা কোথায়? যাদের ওপর ভরসা সবচেয়ে বেশি তাদের দিকে তাকিয়েও যে আজ ভয় হচ্ছে!

সপ্তম সারা ভারত বেসিক সাহিত্য প্রতিযোগিতা, ১৯৬৯

ভারত সরকারের সপ্তম সারা ভারত বেসিক সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় গ্রন্থকারদের নিকট হইতে নিম্নোক্ত বিষয়াদির উপর পাণ্ডুলিপি/পুস্তক (নাটকসহ) আকারে প্রবেশ আহূত হইতেছে :—

(১) গান্ধীজীর ভাবাদর্শে পঞ্চায়েতী রাজের মাধ্যমে রাজনৈতিক গণতন্ত্র (২) গান্ধীজীর দৃষ্টিতে পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র (৩) পঞ্চায়েত ও পল্লী উন্নয়ন সূচীর মাধ্যমে গান্ধীজীর সামাজিক গণতন্ত্রের ধারণা (৪) পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নিম্ন হইতে পরিকল্পনা (৫) পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের অধীনে দ্বন্দ্ব ও মত (৬) পঞ্চায়েত ও স্থানীয় অব্যবহৃত শক্তির নিয়োগ (৭) দ্রুততর বিচারের জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত (৮) প্রস্তুতির পথে নেতৃবৃন্দ—কর্মরত পঞ্চায়েতী রাজ (৯) খাদ্য, পুষ্টি ও সমষ্টি (১০) সমষ্টি উন্নয়ন ও সহযোগিতার শক্তি বৃদ্ধির জন্য ছাত্রের যোগদান (১১) যুবক ও পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান (১২) পঞ্চায়েতী রাজের অধীনে নারী ও শিশুমঙ্গল (১৩) ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (১৪) সমবায় আন্দোলনে জাতীয় ফেডারেশনের ভূমিকা (১৫) পোল্ট্রী ও পোল্ট্রীর খাদ্য সমবায় (১৬) সেচ ও শক্তি সমবায় (১৭) কৃষিজ উৎপাদনের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের অর্থ (১৮) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কৃষিজ উৎপাদনের জন্য উৎপাদন সামগ্রী বণ্টনে সমবায়ের ভূমিকা (১৯) সমবায়ের জন্য পদমর্যাদা সৃষ্টি (২০) সমবায় কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (২১) মৎস্য সমবায়।

প্রতিটিতে ১০০০ টাকার ২১টি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। যে কোন বিষয়ে একাধিক পুরস্কার প্রদত্ত হইবে না।

ভাষা ও স্টাইল—প্রবেশ নিম্নোক্ত যে কোন একটি ভাষায় হইতে পারে :—

(১) অসমীয়া (২) বাংলা (৩) গুজরাটী (৪) গুরুমুখী (৫) হিন্দী (৬) কানাড়ী (৭) কাশ্মীরী (৮) মালয়ালাম (৯) মারাঠী (১০) ওড়িয়া (১১) সিন্ধী (১২) তামিল (১৩) তেলুগু (১৪) উর্দু।

মাপ—প্রবেশ সরল, প্রাঞ্জল স্টাইলে হইবে যাহাতে সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ ও সহযোগিতা সূচী সংশ্লিষ্ট কর্মীরা যাহাদের জন্য ইহা রচিত তাহাদের বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

পাণ্ডুলিপির দৈর্ঘ্য, মুদ্রিত হইলে অন্যূন ১৬-পয়েন্ট টাইপে ডেমিঅক্টেভ সাইজে আনুমানিক ১০০০০ কথা বা প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা হইবে। পুস্তক হইলে উহা যথেষ্ট পরিমাণে ছবি-সংযুক্ত হইবে।

কপিরাইট—পুরস্কার-বিজয়ী প্রবেশের কপিরাইট সকল দায়মুক্তভাবে ভারত সরকারকে হস্তান্তর করা হইবে। পারস্পরিক সম্মতি মত উপযুক্ত পরিমাণ টাকা কপিরাইটের জন্য প্রদত্ত হইবে।

প্রবেশ মূল্য—গ্রন্থাকারের জমা দেওয়া প্রতি প্রবেশের জন্য ৩্।

প্রবেশ গ্রহণের শেষ দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

প্রতিযোগিতার নিয়ম ও নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আবেদনক্রমে প্রাপ্তব্য

ডিরেক্টর (বেসিক সাহিত্য)

খাদ্য, কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও সহযোগিতা মন্ত্রক (সমষ্টি উন্নয়ন ও সহযোগিতা বিভাগ) কৃষি ভবন, নয়াদিল্লী

ডিএভিপি ৬৯/৭০

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রথম ও গুরুতর বিপদ দেখা দেয় রাজ্যে বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় ঘেরাও চালানোর ফলে মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের তীব্র প্রতি-ক্রিয়ার পরিণতিতে। এই প্রতিক্রিয়ায় সেই সালের দোসরা অক্টোবরের না-ঘটা দুর্ঘটনার পরিবেশ রচনা করতে সাহায্য করে।

অবশ্য আরো অনেক চক্র ও চক্রান্ত ছিল। আমলাতন্ত্র বহু জাল দলিলপত্রের সাহায্যে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটা ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের চেহারা তুলে ধরে। গান্ধীবাদী ধ্যান-ধারণার মধ্যে গঠিত শ্রীমুখোপাধ্যায় শঙ্কিত হয়ে তাঁর নিজেব ধারণানুসারে দেশের স্বার্থকে বড় করে তুলে বিশ্বাসঘাতকতার পথে পা বাড়াতে প্রস্তুত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে।

সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটার আশঙ্কা এবার নেই—কারণ সেদিনের পরিবেশ আজ বদলে গেছে। নানা কারণে যুক্তফ্রণ্টের ভাবমূর্তি যতই ভেঙে পড়ুক কংগ্রেসের আর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

তবু সেই পুরনো ইতিহাসের কথা আবার স্মরণ করা প্রয়োজন। এবার যুক্ত-ফ্রণ্ট গঠিত হওয়ার পর থেকে শিল্প-পতিরা ১৯৬৭ সালের মত গেল গেল আওয়াজ তোলেন নি। বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা আছে বলে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে এবার কারো মনে কোন প্রশ্ন নেই। তাই শিল্পপতিরা অবস্থা বুঝে গোড়া থেকেই মানিয়ে চলার মনো-ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে বারংবার বৈঠক করে শিল্পের পথ প্রশস্ত করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেছেন।

এসব সত্ত্বেও আবার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের অবস্থা এবার নেই। '১৯৬৭ সালে ফ্রণ্ট সরকারে মার্ক্স-বাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল অসন্তুষ্ট পক্ষ। তাঁদের যোগ্য স্থান তাঁরা পান নি বলে তাঁদের ধারণা ছিল। বস্তুত ১৯৬৭ সালের ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় মার্ক্সবাদী কম্যু-নিস্ট পার্টির গুরুত্ব ছিল কম। হীনমন্য-তার রোগে তাঁরা ভুগছিলেন বলে প্রথম থেকেই সরকারের মধ্যে থেকেও সরকারের "মুখোস" খুলে ধরা ছিল তাঁদের নীতি। তাই প্রথমদিন থেকেই নিজ দলের বাইরের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ার কোন সুযোগকেই তাঁরা বয়ে যেতে দেন নি।

এবারের অবস্থা একেবারে আলাদা। এবার সি-পি-এম-ই সর্বেসর্বা। সব বিষয়ে মুখ্য। মুখ্যমন্ত্রিত্ব না থাকলেও মুখ্যত্বেব অধিকার তাঁদের। তাই গোড়া থেকেই তাঁরা এবার স্বভাবতই ভিন্ন কৌশল নিয়েছেন। এবারের পুরো টার্ম তাঁরা মন্ত্রিত্ব করে যেতে চাইছেন। মন্ত্রি-সভায় থেকে মৌলিক কোন পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না ঘোষণা করলেও কিছু যে করা যায় তা তাঁরা জানেন। এই কিছু করেই যে জনসাধারণকে খুশি করা যাবে তাও তাঁদের অজানা নয়। আর যা করা যাবে না তার দায় কেন্দ্রীয় সরকার আর সংবিধানের ওপর চাপানো যাবে তাও তাঁরা ভালভাবেই জানেন বলে রাজনীতির দাবার ঘুঁটি সেভাবেই সাজিয়ে নিয়েছেন।

এই নীতির অংশ হিসাবেই সি-পি-এম-এর উপ-মুখ্যমন্ত্রী আর শ্রমমন্ত্রী শিল্পে শান্তি বজায় রাখতে চান। তাঁরা জানেন বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে থেকে জনসাধারণের কিছুটা কল্যাণ করতে হলেও শিল্পের প্রসারের পথকে উন্মুক্ত রাখতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সমা-লোচনা করা হলে সি-পি-এম সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে কি করা যায় তার একটা পরীক্ষা নিতে চান।

তাই মাঝে মাঝে শেষ লক্ষ্য জনগণ-তন্ত্রের কথা বললেও বর্তমান কাঠামোর মিশ্র অর্থনীতিকে তাঁরা বাতিল করতে চান না—আর জনগণতন্ত্রের তত্ত্বেও মিশ্র অর্থনীতিকে স্বীকৃতি দেওয়াই হয়েছে। শিল্পপতিদের অনেকখানি কনসেসনই তাঁরা দিতে চাইছেন—অবশ্য শ্রমিক শ্রেণীকে একেবারে বঞ্চিত যাতে না হতে হয় সে-সব কথাও বলছেন।

সি-পি-এম-এর এই নীতির কথাটা একবার ঝালিয়ে নিতে হোল সাম্প্রতিক কতকগুলি ঘটনার জন্য। এবার ফ্রণ্ট সরকার গড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘেরাওয়ের প্রশ্ন ওঠে নি কিন্তু সম্প্রতি আবার সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বাংলা কংগ্রেসের নেতা শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে নকশালপন্থীদেব দ্বারা ঘেরাও হওয়ার পরে এই প্রশ্নটি আবার বড় করে তুলেছেন। প্রশ্নটি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়-ও।

নীতি হিসাবে ঘেরাও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত আঙ্গিক। যুক্ত-ফ্রণ্টের কোন শরিকের পক্ষেই এখন আব এই সত্যকে অস্বীকাব করার উপায় নেই। ১৯৬৭ সালেই এই সত্য স্বীকৃত হয়েছে। তবু কিন্তু ফ্রণ্টের কোন দলই এবার বাড়াবাড়ি চান না। সি-পি-এম নেতৃত্ব তো এবার আদৌ কোন ঘেরাও না হলে সুখী। মূলত এবার বাংলা কংগ্রেস আর সি-পি-এম-এর মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য কম।

সি-পি-এম-এর নেতৃত্বেব বিরুদ্ধে শিল্পে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যত অভিযোগই বিভিন্ন মহল থেকে করা হোক না কেন, সি-পি-এম নেতৃত্ব কিন্তু শিল্পে শান্তি অব্যাহত রাখার-ই প্রয়াসী। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়েও তা পরিস্ফুট। ইঞ্জি-নীয়ারিং শিল্পে শ্রম-বিবোধ শেষ পর্যন্ত শক্তি পরীক্ষার স্তরে যাতে না গিয়ে পৌঁছয় তার জন্য "প্রগতিশীল" শিল্পপতি শ্রীঅভিজিৎ সেনকে কাজে লাগানো হচ্ছে। বাগিচা শিল্প আর পাট শিল্পের শ্রমিক-দের উপেক্ষিত দাবি আদায়ের জন্য তা না হলে ইতোপূর্বে আরো ব্যাপক আকারের বিরোধ দেখা দিত। বরং বলা যায় ফ্রণ্টের অন্যান্য কয়েকটি মার্ক্সবাদী দল সি-পি-এম-এর শ্রমনীতিকে মালিক-ঘেঁষা বলে মনে করছেন।

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ: আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে

পার্কার ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার প্রতি গ্রামে এবং শহরে পাঠান যায়।

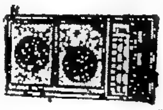

Japan Transistors (AK)
Kolhapur Road, Delhi—7.

কিন্তু মুস্কিল বেধেছে অন্যত্র। ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী আর শ্রমমন্ত্রী যে কথাই বলুন না কেন আর যে চেষ্টাই করুন না কেন; তলার দিকে কিন্তু তার প্রতিফলন কম। সি-পি-এম-এর নেতৃত্বে এবার বড় রকমের ঘেরাও না হলেও বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় এক ধরণের গা-জুয়ারী আন্দোলন চলছে। কোথাও বা গো-স্লো আর কোথাও বা অফিসারদের অপদস্থ করার মধ্য দিয়ে স্থানীয় ভিত্তিতে বহু দল সি-পি-এম-এর কর্মীরা বুহস্ক দেখাতে চাইছেন—আবার অনেকক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে কাজে লাগিয়েও উক্ত ধারণা বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এবার যে কয়েকটি কারখানা লক-আউট বা বন্ধ হয়েছে তার অধিকাংশই ঘটেছে উক্ত নীতির প্রতিফলনের ফলে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু কড়া বক্তৃতা দিয়েও নিচের তলার কর্মীদের সামলাতে পারছেন না।

ফলে একটা অদ্ভুত অবস্থা দেখা দিচ্ছে। বণিকসভাগুলির বৈঠকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী খুব হিসেব করে সব পক্ষকে খুশি রাখার মত বক্তৃতা করছেন। এখন পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টে পূর্ণাঙ্গ শ্রমনীতি গৃহীত না হলেও শ্রমমন্ত্রীর ঘোষণা আর বক্তৃতার মাধ্যমে শিল্পপতিদের বিব্রত না করার সুর ধ্বনিত হলেও; মাঠে-ময়দানে দেখা দিচ্ছে ভিন্ন চেহারা। কোথাও বা অন্য দলের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা দখল, কোথাও বা অফিসারদের কব্জায় আনা প্রভৃতির জন্য নতুন নতুন অশান্তি দেখা দিচ্ছে। শ্রীজ্যোতি বসুর কথা শিল্প-পতিরা এখন কিভাবে গ্রহণ করছেন জানি না; কিন্তু একটা নতুন শঙ্কা পশ্চিম বাংলার শিল্পক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে। কোন কোন মহল সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে দ্বিমুখী অভিযোগ অথবা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আন্তরিকতার অভাবের যে অভিযোগ আনছেন তার মূলে হয়তো কোন সত্য নেই। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যে জঙ্গী-পনা শেখানো হয়েছে, আর সবচেয়ে বড় হওয়ার মনোভাব যেভাবে কর্মিমহলে ছড়িয়ে পড়ছে, তাকে ঠিক খাতে প্রবাহিত করতে না পারলে এ-বিরোধ অপরিহার্য।

যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শরিক দলকে খুব শীগগিরই এই প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে—অন্য শরিকরাও চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না। —শ্রীসর্বদর্শী

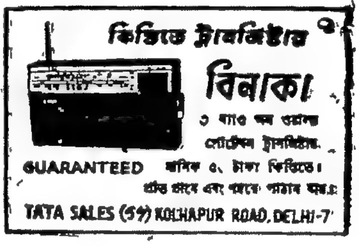

মোকাসিনের মৃত্যু

রেবন্ত বসু

পুজোর ছুটিতে একাদশীর দিন ট্রেনের ভিড় একটু কমলে অপরেশ সপরিবারে দেওঘরে হাওয়াবদল করতে গেল। 'গেল' বলাটা একটু অশোভন হলো, 'অপরেশ' বলাটাও তাই। পুজোর ছুটিতে ট্রেনের ভিড় একটু কমলে অপরেশবাবু সপরিবারে দেওঘরে হাওয়া-বদল করতে গেলেন—এটাই হবে যথার্থ ভদ্রতা। কারণ প্রথমত ভদ্রলোকের বয়স চুয়াল্লিশ পেরিয়েছে গেল বছর, তিনটি সন্তানের জনক তিনি, রগের চুলে সাদার ঝিলিক, কপালে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের ধুলি-রেখা ; দ্বিতীয়ত, তাঁর আপিসে তাঁর ওপরে যতজন আছেন নিচে আছেন তার দ্বিগুণ লোক, তিনি নিয়মিত ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেন, বাড়ি ভাড়া দেন, পাড়ার দুর্গাপুজোর চাঁদা দেন, ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাইনে দিতে দেরি করেন না, মাসে দু-বার বাড়িতে মাংস আনেন, শালীর বিয়েতে ভালো একটা রেডিও উপহার দিয়েছেন, বাড়ির ও প্রতিবেশীদের কারোর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর তিক্ত নয়। অতএব—এককথায় বলা চলে তিনি এক যথার্থ মধ্যবিত্ত বয়স্ক বাঙালী ভদ্রলোক—এ-হেন ব্যক্তিকে শুধু 'অপরেশ' বলা বা 'গেল' বলাটা নিশ্চয়ই অন্যায়!

যাই হোক, ভদ্রলোক তো খরচপত্র করে দেওঘরে কুণ্ডার কাছে বাড়ি ভাড়া করে দিন পনেরোর জন্যে হাওয়াবদল করতে এলেন—কিন্তু মনে তাঁর সুখ নেই। তার কারণ এখানে জলবায়ু যতই ভালো হোক না কেন, চারধার যতই খোলামেলা হোক না কেন—এখানকার চোরের জ্বালায় তিনি অস্থির। আর চোর মানে ভদ্র চোর নয়—নয়তো কত ভালো ভালো চোরকে তো তিনিও সারাজীবন খাতির করে আসছেন—এরা সব নিতান্তই ছিঁচকে চোর—জুতো চোর। ব্যাপারটা একটু খোলসা করা যাক। দেওঘরে আসার সময় তিনি একজোড়া পাম্পশু পায়ে দিয়ে এসেছিলেন—দুটো-একটা তালি তাতে পড়েছিল তবু এখনো অনেকদিন চলত। সেটা পরে একদিন বাজার করে ফিরছেন—অনেক ধুলোবালি লেগেছে—ঘরের বাইরে চাতালে জুতোটা খুলে রেখে মেয়েকে এসে বললেন, 'খুকু, জুতোটা ঝেড়ে ঘরে নিয়ে আয় তো।' মেয়ে তখন কি যেন সেলাই করছিল—সেটা শেষ করে গজেন্দ্রগমনে বাইরে গিয়ে দেখে—জুতো লোপাট। বয়স হলে বাঙালীদের প্রধানত দুটো শত্রু দেখা দেয়—ব্লাডপ্রেসার ও ডায়াবেটিস। সম্প্রতি অপরেশবাবু প্রথমটির দ্বারা আক্রান্ত ঃ মাথায় রক্ত উঠে গেল চনচন করে, খুব খানিকটা চোটপাট করলেন খুকুর ওপর, বললেন, 'যে রোজগার করে, যার রক্ত জল হয় সে-ই বোঝে টাকার মূল্য—দূর করে ফেলে দেব ওসব সেলাই-ফেলাই ছাইপাঁশ।' কিন্তু জুতো পাওয়া গেল না। খানিক বাদে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'এখানে খুব সুন্দর কাঁচের চুড়ি পাওয়া যায় রে—তোর জন্যে দেখে এসেছি আজ বাজারে।' কিন্তু জুতো পাওয়া গেল না। সে-না হয় না গেল, কিন্তু গিন্নি যে এমন বোকার মতো কাজ করবেন একথা কে ভেবেছিল! মাসতিনেক আগে শালীর বিয়ের সময় হঠাৎ কিছু-না-ভেবেই বেহিসাবী হয়ে অপরেশবাবু অনেক দাম দিয়ে একজোড়া মোকাসিন কিনে ফেলেছিলেন। সে জুতো তিনি কালেভদ্রে ব্যবহার করেছেন। জুতোজোড়া তাঁর বড়োই আদরের জিনিস ছিল—যেমন সুন্দর তা দেখতে, পরতেও তেমনি আরাম, তাছাড়া...আজকাল সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, সিনেমায় বিজ্ঞাপন, রেডিওয় বিজ্ঞাপন—শেষে গল্পেও জুতোর বিজ্ঞাপন চালাচ্ছি পাছে এই কথা কেউ ভেবে বসেন তাই জুতোর বর্ণনায় এইখানেই ইতি। যাই হোক, অপরেশবাবুর ধারণা ছিল তাঁর সেই প্রিয় জুতোজোড়া এখন তাঁর শোবার ঘরে খাটের তলায় বাক্সবন্দী হয়ে বিরাজ করছে—সেই জুতোজোড়াকে হঠাৎ গিন্নির করকমলে দেখে তিনি যেন ভূত দেখলেন। সরলা অমায়িক হেসে বললেন, 'হ্যাঁ গো, আমিই বুদ্ধি করে কাগজে মুড়ে নিয়ে এসেছি বেডিং-এর ভেতরে।' 'বুদ্ধি করে!' অপরেশবাবু কপালে হাত রাখলেন ঃ 'হায় রে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! এই দামী জুতো পরে আমি হাঁটব এই ধুলোভরা রাস্তায়? নাঃ, তোমরা কেউ দেখছি আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না। এখানে আসাটাই আমার ব্যর্থ করে দিলে। তুলে রাখো যত্ন করে, এক্ষুণি তুলে রাখো।'

বিকেলে তিনি সাইকেলরিক্সা করে সপরিবারে গেলেন বাজারে। সেখানে খুকুর কাঁচের চুড়ি কেনা হলো, গিন্নির লোহার কড়া আর খুন্তি, মন্টুর একশিশি গোলাপ-আতর আর বাবুরার টিনের একগাড়ি। আর তিনি নিজের জন্যে কিনলেন দেড় টাকা দিয়ে একজোড়া চটি। সেই চটি পরে পরদিন বিকেলে সকলকে নিয়ে তিনি গেলেন 'তপোবন' পাহাড়ে। ওপরে মন্দিরে ওঠার আগে নিচে একটা গোপন জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে জুতোজোড়া রাখলেন লুকিয়ে। কিন্তু মন্দির দেখে ফিরে এসে তাদের আর দেখতে পেলেন না। সারারাস্তা গজরাতে গজরাতে এলেন, ভর্ৎসনা করলেন সমস্ত দেওঘরের অধিবাসীকে, এমনকি সেখানকার ঠাকুর-দেবতা-সাধু-মহাপুরুষ কেউ তাঁর ক্রোধাগ্নি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারলেন না। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন ঃ 'আর আমি জুতো কিনবও না—পরবও না—খালি পায়ে কাটিয়ে দেব এই কটা দিন। কোনো মানে হয় এইসব ছ্যাঁচড়ামোর?' সরলা বললেন, 'তা কখনো হয়! বিদেশে এসে লোক হাসাবে? যার যাই অবস্থা হোক, এখানে এসে তা দেখাবে কেন? এখানে থাকবে ফিটফাট—নিজের ঠাটের উপর।' 'চমৎকার। এবার তাহলে বাবো-চোদ্দ টাকা দিয়ে একটা জুতো কিনি আর একঘণ্টা যেতে না যেতেই সেটা চুরি হয়ে যাক!' 'তা কেন! তুমি মোকাসিনটাই পরো—সাবধানে চলবে—পা থেকে খুলবে না।' 'এই না হলে আর লোকে বলে স্ত্রীবুদ্ধি...' অপরেশবাবু রাগের চোটে পরিচিত বিশেষণটিও ভুলে গেলেন।

কিন্তু রাত্রে তিনি ঠাণ্ডামাথায় ভেবে দেখলেন যে, সরলার কথাটা নেহাৎ ফেলে দেবার মতো নয়। গাঁটের পয়সা আর খরচ করা ঠিক নয়, ঐ মোকাসিনটাই পরে ঘোরা ভালো। সাবধানে থাকলে কোন্

ব্যাটা.াক করতে পারে—হ্যাঁ, সেটুকু আত্মবিশ্বাস তাঁর আছে, নয়তো যে অবস্থা থেকে আজ তিনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মান-ইজ্জৎ বজায় রেখে চলতে পারছেন তা কি সম্ভব হতো! অতএব, মোকাসিন জোড়াই পরদিন থেকে কাজে বহাল হলো। তাতে লোকের চোখে তাঁর সম্মান হয়তো বাড়ল কিন্তু তিনি নিজের মনের স্বস্তি হারিয়ে ফেললেন—সবসময় যেন একটা হারাই-হারাই ভাব তাঁকে পেয়ে বসল। খুকু সেদিন বলল, 'বাবা, ত্রিকূট পাহাড়ে নিয়ে চলো।' 'ত্রিকূট?' নিজের পায়ের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বললেন অপরেশবাবু: 'ঐ চোদ্দ মাইল দূরে? টাঙায় যেতে যে বড়ো কষ্ট হবে খুকু! তাছাড়া শুনেছি ওখানে বাঘ বেরোয়—দলবেঁধে না হলে ওখানে যাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া পাহাড়-টাহাড় দূর থেকে দেখতেই ভালো লাগে। দেখিস না, দূরের সব পাহাড়গুলো, এমনকি তোর ঐ ত্রিকূট পাহাড়ও দূর থেকে কি সুন্দর দেখায়!' 'না বাবা নিয়ে চলো।' 'ছিঃ খুকু, অমন একগুঁয়ে হতে নেই। তোকে আমি নন্দন পাহাড়ে নিয়ে যাব।'

অগত্যা খুকু কানা-মামাতেই রাজী হলো। পরদিন বিকেলে সবাই মিলে একটা টাঙায় চেপে নন্দন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। যাবার পথে 'যুগল-মন্দির', 'ধ্যান-কুটির', তারপর 'বিদ্যাপীঠ' ঘুরে নন্দন পাহাড়ের পাদ-দেশে এসে টাঙা থামল। খুশিতে উছলে উঠল খুকু-মন্টু-বাবুয়া, এমনকি সরলাও। বারোমাস গলির ভেতরের বাড়িতে থেকেই অভ্যস্ত—নিচের তলায় ভাড়াটে, তিনতলায় ভাড়াটে—তারা দোতলার ভাড়াটে। সেখানে আকাশ, রোদ, চাঁদ, তারা, হাওয়া সবেরই যেন র‍্যাশন—সব কিছুই বরাদ্দ-করা। আর এখানে সবই অফুরন্ত। পাহাড়ের মাথায় দেখ কত হাওয়া, ঐ দূরে সূর্য ডুবছে অথচ মজা দেখ—এরই মধ্যে একটা সাদা চাঁদও ফুটে উঠেছে আকাশে। উঁচু থেকে নিচের মানুষগুলোকে কি আশ্চর্য ছোট দেখাচ্ছে—খুকুরা যেন পৃথিবী থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছে। ছোটরা ছুটোছুটি শুরু করে দিল, খুকু আর তার খুশি-মা হাওয়ার কবল থেকে শাড়ি বাঁচাতে বাঁচাতে জুড়ে দিল খোসগল্প। কবে সেই পাঁচ বছর আগে তারা পুরী গিয়েছিল সবলার বাবা-মার সঙ্গে, সে স্মৃতি মন্টু-বাবুয়ার প্রায় মনেই নেই, খুকুরও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে একটু, আর সরলা—হ্যাঁ, তিনিও রান্নাঘরের গুমোট আব-হাওয়ায় থেকে থেকে প্রায় ভুলেই গেছেন সেই পাগল হাওয়ার নোনা-গন্ধ। সবাই খুশি, সবাই সুখী, শুধু অপরেশবাবুর মুখে গোমড়া কেন? না, ভালো তারও লাগছে একথা অনস্বীকার্য কিন্তু পাহাড়ে উঠতে দু-তিনবার যে তাঁর জুতোটা পাথরে ঠোক্কর খেয়েছে সে কথাটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। আর কেন কে জানে শুধু সেকথাই নয়—আরো মনে হচ্ছে যত সব বাজে কথা যা ভুলতে তিনি বিদেশে এসেছেন: সামনের মাস থেকে আরো কিছু বেশি টাকা দিতে হবে সংসারে, তাঁদের আপিসেও নাকি শীগগিরি ছাঁটাই শুরু হবে, আর তিনি যদি তা থেকে বাদও পড়েন—সুদূর ভবিষ্যতে রিটায়ার করার পর তাঁর চলবে কি করে, মেয়েটার ফার্স্ট ক্লাশ হলো—এই পাহাড়ের মতোই মাথায় ঢ্যাঙা হয়ে উঠছে, মন্টুর তো মোটে ক্লাশ সিক্স আর বাবুয়ার তো আরও চমৎকার—টু, এইসব কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কি তিনি পথে বসবেন? না, না, সেইসব ভেবেই তো তিনি ইনসিওর করেছেন, পঞ্চাশ বছর বয়সে টাকাটা তিনি পাবেন, তাছাড়া ব্যাঙ্কেও যা হোক কিছু আছে—আর হ্যাঁ, প্রভিডেন্ট ফন্ড—সেটা কে মারে? তাছাড়া ছেলে-রাও তো ততদিনে বড়ো হয়ে যাবে—অন্তত বড়ো ছেলেটা যদি যা হোক কিছু আনতে পারে তাহলে...এইভাবে অপরেশ-বাবু মনে মনে কেবলই যোগবিয়োগ করতে লাগলেন। এক একবার ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর-মন জুড়িয়ে যায়, আবার একটু পরেই নানান চিন্তা এসে বিরক্ত করে। অবশেষে 'দুত্তোর' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; সেই দেখে সরলা বল-লেন, 'এমন বেরসিক মানুষ দেখি নি বাবা—এমন সুন্দর জায়গায় এসে কিনা বলে "দুত্তোর"!' অপরেশবাবু বললেন, 'আমি টাঙায় গিয়ে বসছি—তুমি ছেলে-গুলোর ওপর একটু নজর রেখো—পড়ে না যায়।'

পরদিন বিকেলে বেদ্যনাথের মন্দির, 'সৎসঙ্গ' আর 'দেবসঙ্গ' দেখা হলো। বাড়ি ফিরে অপরেশবাবু বললেন, 'ব্যস্, আর কোনো সঙ্গ নয়—যে সাত-আট দিন আর আছি—নিঃসঙ্গে থাকতে চাই।' জুতোজোড়ার ওপর সত্যিই বড়ো ধকল যাচ্ছে, তাছাড়া এখানকার সাইকেলরিক্সা আর টাঙাগুলোর ভাড়া সত্যিই বড়ো বেশি। আর বিদেশী তো হয়েছে কি—সাইকেলরিক্সা তো রিক্সাই বাবা—ট্যাক্সি নয়, আর টাঙাওয়ালাদের ঘোড়াগুলো যে পক্ষীরাজ নয় তা রেসের মাঠে জীবনে না গিয়েও তিনি হলফ করে বলে দিতে পারেন। এর চেয়ে গুঁতোগুঁতি করে কিংবা গাড়ি-বারান্দার মতো ঝুলন্ত অবস্থায় বাসে-ট্রামে ঘোরা ঢের ভালো, দক্ষিণা মাত্র দশ কি পনের পয়সা—তাও আবার অনেকদিনই ফাঁকি দেয়া যায়। এসব কথা অবশ্য তিনি মুখে বললেন না, বললেন, 'আরে টো-টো করে যদি ঘুরেই বেড়াব তাহলে স্বাস্থ্য ফিরবে কি করে' তাছাড়া দেওঘরে দেখারই-বা আছে কি! এখানে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে—জিনিস-পত্রেরও যেমন দর, লোকগুলোও তেমনি ..দূর দূর!'

পরদিনটা সত্যিই তিনি আর বেরো-লেন না। সকালবেলা বাড়ির রকে বসেই দেশোয়ালীদের কাছ থেকে বাজার করে নিলেন, তারপর একটা শারদীয় পত্রিকায় মন দিলেন। বই পড়ার অভ্যেস তাঁর বলতে গেলে প্রায় নেই। সময় কোথায়? সকালে উঠে বাজারে ছোটো সমস্ত ফ্যামিলির বাজার করতে; তার-পরই দাড়ি কামিয়ে স্নানটান করে দুটো ভাত নাকে-মুখে গুঁজে ছোটো আপিসে; সেখানে হাড়ভাঙা খাটনি; তারপর বাসে-ট্রামে ঠেলাঠেলি করে বাড়ি আসতে আসতেই আটটা-সাড়ে আটটা। তখনও

নেতাজীর সহকর্মী শিশির দাশের—

'মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র'

গ্রন্থখানি নেতাজী সম্পর্কে ইদানীংকালে রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অনবদ্য ভূমিকা ও তাঁর রাষ্ট্রদর্শন, চিন্তাধারা, এবং তেজোদ্দীপ্ত জীবন-ইতিহাস অত্যন্ত বিশদভাবে ও প্রেরণাসঞ্চারী ভাষায় লিপিবদ্ধ। গ্রন্থখানি প্রতিগৃহে ও গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হবার যোগ্য।

প্রথম খণ্ড—মূল্য: ১২·৫০ পয়সা

—প্রাপ্তিস্থান—

(১) এস, আর, দাশ
৩৩নং আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫

(২) শ্রীসুবোধ ঘোষ (গোবর্ধন প্রেস)
২০১বি, বিধান সরণি, কলি-৬

বিশিষ্ট পুস্তকালয়সমূহেও পাওয়া যায়।

কি স্নেহাই আছে—চা-টা খেয়ে একটু কাগজে চোখ বোলাবেন—খুকু এসে বলবে, বাবা, এই ইংরেজিটা একটু বলে দেবে?' সরলা বাচ্চা দুটোকে পড়ায় কিন্তু খুকু তার জ্ঞানের সীমার বাইরে চলে গেছে। এছাড়া মার কাশি হচ্ছে—রিপোর্ট করো ডাক্তারের কাছে, ভাগ্নীটা হঠাৎ বেড়াতে এসেছে—তার খাবার আনতে ছোটো, ফ্যাচাং-এর কি অভাব আছে...বড়োছেলে হওয়ার অনেক জ্বালা। তিনি কি আর বোঝেন না যে শুধু তাঁর ওপরই নয়—বড়োবৌ বলে সরলার ওপরও যা আর মেজবৌমা তার অ্যাডভানটেজ নয়—ছোটোবাবুরও তো বিয়ে হবে গিগাগিরি—নিচু জাতের এক মেয়ের সঙ্গে লাভ ম্যারেজ—নাঃ, মাঝে মাঝে মনে হয় আলাদা হয়ে গেলে ভালো হয়। কিন্তু চক্ষুলজ্জা—তারই জ্বালায় সব মুখ বুজে সহ্য করো, তারই জন্যে মোকাসিন জুতো পরে ঠোক্কর খেতে খেতে পাহাড়ে গড়া, ধুলোবালি ভরা রাস্তায় টো-টো করে ঘোরো। —অপরেশবাবু আবার জোর করে পত্রিকার পাতায় চোখ রাখেন।

একটা দিন কাটল। পরদিন সকাল পার দুপুরটাও কোনোরকমে কাটল। কিন্তু বিকেলবেলা বসে বসেই যেন হাঁপিয়ে উঠলেন অপরেশবাবু। ওরা সবাই বাড়িতে থেকেও কেমন নিজেদের ব্যস্ত রেখেছে—সরলা রান্নাঘরে মনদুখের পায়েস রাঁধছে, খুকুটা পাশের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে তাদের বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছে, ছেলেদুটো রবারের বল নিয়ে বাড়ির সামনে দাপাদাপি করছে। কত অল্পেই-না ওরা সন্তুষ্ট হতে পারে! ঘরের মধ্যে যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল অপরেশবাবুর। বইটা সরিয়ে রেখে গায়ে জামা গলিয়ে মোকাসিন পরেই অপরেশবাবু বাড়ির বার হলেন।

চারিদিক ছায়া-ছায়া হয়ে এসেছে, বাতাসে ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব। অপরেশবাবু লক্ষ্যহীনভাবে পা বাড়ালেন। দুধারে বড়ো বড়ো গাছের সারি, সবুজের সমারোহ, য়ুক্যালিপটাস্, লেবুফুল আর শিউলির মিলিত গন্ধে চারিধার যেন ভারাক্রান্ত। ধীর পায়ে এগোতে লাগলেন তিনি। বেশ লাগছে হাঁটতে—কলকাতার মতোই সুন্দর পিচ-ঢালা রাস্তা—বরং তার চেয়েও ঢের ভালো। তাঁর জুতো নিশ্চিন্তে এগোতে লাগল। কতদিন যে তিনি ছুটি উপভোগ করেন নি তার হিসেব তিনি নিজেই ভুলে গেছেন—কলকাতার রবিবারগুলো বা অন্যান্য ছুটির দিনগুলো যাচ্ছে বাড়তি কাজ করার জন্য, স্ত্রীকে মেয়েকে সিনেমা নিয়ে যাবার জন্যে, মাকে বেলুড় ঘোরানোর জন্যে, বাচ্চাদের চিড়িয়াখানা দেখাবার জন্যে। এছাড়া মা-বাপ-মরা ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দেখাশুনো করো, মেজবৌমার বাবা সেদিন এসেছিলেন—সেখানে লৌকিকতা করেগে যাও, নতুন ভায়রাভাইকে নেমন্তন্ন করো ...ইত্যাদি ইত্যাদি। কতদিন যে তিনি নিজের জন্যে কিছু করেন নি তার ঠিক নেই। বেশ লাগছে একা একা বেড়াতে এই গন্ধভরা সন্ধ্যায়। চারিদিক প্রায় নির্জন, বড়ো বড়ো গাছ, মাথার ওপর মস্ত নরম আকাশ: এমনি সন্ধ্যা তার গন্ধ—স্পন্দ-রূপে মানুষের মনেরও যেন রূপান্তর ঘটাতে পারে। সন্ধ্যা নেমে এলো, বাড়িতে ভাবতে পারে, তবু সেসব কথা ভাবলেন না অপরেশবাবু—এগিয়েই চললেন বাড়ির সবাইকে পিছনে ফেলে রেখে। মনে তাঁর কোনো ভাবনাই নেই, কোনো দুশ্চিন্তাই নেই, তাঁর মতো সে-ও যেন সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে। হঠাৎ তাঁর কর্ণগোচর হলো সন্ধ্যারতির সুস্নিগ্ধ ধ্বনি—সেই ধ্বনি অনুসরণ করে তিনি পাশের এক আশ্রমে প্রবেশ করলেন। সেই আশ্রমের একটি মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছিল। কয়েকটি সিঁড়ি উঠে তবে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। কতিপয় ভ্রাম্যমাণ নরনারী সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে অন্দরে প্রবেশ করলেন। অপরেশবাবুর খুব ইচ্ছে হলো যান কিন্তু জুতোটা তো তাহলে নিচে খুলে যেতে হবে। একটু ইতস্তত করতে লাগলেন তিনি নিচে দাঁড়িয়ে। হাতজোড় করে আরো একদল নরনারীকে তিনি ওপরে উঠতে দেখলেন। সবাই তো জুতো খুলে যাচ্ছে, নাই-বা হলো দামী, তবু জুতো তো। ওদের যদি না হারায় তবে আমারও হারাবে না, আর ওদের যদি হারায় তবে আমারও হারাক—এই ভেবে একটি অন্ধকার কোণে মোকাসিন জোড়া খুলে রেখে তিনি নগ্নপায়ে মন্দিরে গিয়ে উঠলেন। জটাধারী এক ব্রহ্মচারী দেবী-মায়ের আরতি করছেন। পাশাপাশি দুটি প্রকোষ্ঠ—একটিতে দেবী-মা, অন্যটিতে বোধহয় ঐ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা জটাজুটধারী কৌপীন পরিহিত এক সৌম্য ব্রহ্মচারীর মর্মর মূর্তি। সমস্ত ঘরের দেয়ালে নানান সাধু মহাপুরুষের সব বাণী ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে, প্রস্তর-নির্মিত মেঝের মাঝখানটায় একটি নিভন্ত যজ্ঞকুণ্ড। জন পনের দর্শক ব্যতীত সমস্ত ঘরটিতে আরো জনদশেক ব্রহ্মচারী ও আশ্রমবালক রয়েছেন। কেউ বাজাচ্ছেন কাঁসর, কেউ দড়ি দিয়ে দোলাচ্ছেন ঝুলন্ত ঘণ্টাটি, কেউ দিচ্ছেন শাঁখে ফুঁ। অপরেশবাবু শুনেছিলেন, শাঁখের শব্দে নাকি লক্ষ লক্ষ জীবাণু বিনষ্ট হয়, এখন তাঁর মনে হলো শুধু তাই নয়—যত অশান্তি আর পাপও যেন ধূলিসাৎ হয় ঐ শঙ্খধ্বনিতে। শাঁখ কাঁসর আর ঘণ্টার মিলিত শব্দ যে এত সুমধুর হয় তা তিনি আগে জানতেন না।...ঐ দেখ, নিচে ঐ শিউলিগাছটি ফুলে ফুলে মাতোয়ারা—ওরই তলায় তাঁর জুতো—যদি কেউ...দেখ, সাদা সাদা ফুলগুলির ওপর দিয়ে কি চমৎকার বাতাস বইছে—ঐ-যে লোকটি তলা দিয়ে যাচ্ছে ও যদি তাঁর জুতোটা...আর ঐ প্রকাণ্ড বটগাছটার ডালগুলোর দিকে দেখ, শত শত পাখি সারাদিন পেটের ধান্ধায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এখন প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। আপনা-থেকেই হাত জোড় হয়ে গেল অপরেশবাবুর, কাঁসর-ঘণ্টা জোরে জোরে ঘা দিতে লাগল তাঁর চেতনার ওপরে। কি পবিত্র এই ধূপের গন্ধ, কি পবিত্র এই ব্রহ্মচারীদের গৈরিক বসন, কি পবিত্র এইসব অপাপবিদ্ধ বাণীগুলি! পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র। এখানে এসে উপলব্ধি হয় জগতে এখনো শান্তি আছে, আছে স্নিগ্ধতা, পবিত্রতা, ধর্ম।...আরতি সমাপ্ত হলো কিন্তু সান্ধ্য-অনুষ্ঠানের এখনো নিশ্চয় কিছু বাকি আছে তাই কয়েকজন নিচে নেমে গেলেও কয়েকটি ভক্ত মেঝের ওপর বাবু হয়ে বসলেন। অপরেশবাবুও তাই করলেন—ঘরের একটি কোণে তিনিও বাবু হয়ে বসে পড়লেন প্রায় নিজেরই অজ্ঞাতে। হঠাৎ তাঁর আবার মনে হলো: তাই তো, জুতোটা যে পড়ে রইল নিচে: পরক্ষণেই তিনি নিজেই নিজেকে ধমকে উঠলেন: থাকগে পড়ে, সারাজীবন ঐ সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভেবে এলাম—দেখ, কৌপীন পরেও মানুষের মুখে কি প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠতে পারে! অতএব তিনি আরো সচেতনভাবে ভালো করে গুছিয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে কোথা থেকে একটি হারমোনিয়াম আনা হয়েছে ঘরে, জনৈক ব্রহ্মচারী হলেন বাদক ও প্রধান গায়ক, অপর ব্রহ্মচারিগণ ও আশ্রমবালকেরা হলেন তাঁরই সহ-শিল্পী। উৎকর্ণ হলেন অপরেশবাবু, শুরু হলো সমবেত বন্দনা:

"ভবসাগর-তারণ-কারণ হে
রবিনন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে
গুরুদেব, দয়া করো দীন জনে।"

সেই পবিত্র শব্দাবলী, অপূর্ব সুর-লহরী অপরেশবাবুকে ধীরে ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে চলল কোন্ এক অজ্ঞাত সুরদেশে, মধুর অথচ প্রলয়ঙ্কর তার শক্তি, অপরেশবাবু মাটি ছোঁবার আশায় আঁকুপাঁকু করতে লাগলেন, কিন্তু কোথায় স্থল, কোথায় ঠাঁই, কোথায় ভরসা! শুধু স্রোতের টানে ভেসে চলতে হবে অকূলে

পারাবারে, নেই তরণী, নেই কাণ্ডারী। সারাজীবনের পাপগুলো বড়ো বড়ো ঢেউ হয়ে এসে তাঁর মাথার ওপর আছড়ে পড়ল, জীবনের সমস্ত গোপনীয় লজ্জা, বেদনা আর ব্যর্থতা সেই মহাসমুদ্রের সমস্ত অন্দর কন্দর তিক্ত লবণাক্ত করে তুলল। আর এলো এক ক্ষুব্ধ ঝটিকা—মহাকাল এসে তার অফুরন্ত জটা দুলিয়ে তাণ্ডবনৃত্য করে তাঁকে বারংবার বলতে লাগল: তুই তুচ্ছ, তুই ব্যর্থ, তুই তৃণের থেকেও অধম, তুই অর্থহীন, তুই সৃষ্টিকর্তার উজ্জ্বল শক্তির মাঝে একমাত্র মসীলিপ্ত কলঙ্কবিন্দু।

'কল-কুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে
হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে
মম মানস চঞ্চল রাত্র-দিনে
গুরুদেব, দয়া করো দীন জনে।'

সমস্ত আকাশে গর্জে উঠল বজ্র, শ্রুত হলো মেঘনাদ, চমকে উঠল বিদ্যুন্মালা। ঘনঘটায় নেমে এলো বারিধারা, সহস্র উল্কার হলো পতন, জ্যোতিষ্কে-জ্যোতিষ্কে গ্রহে-গ্রহে কত যে সংঘর্ষ হলো তার সীমা নেই—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ঝরে পড়তে লাগল তাঁর সর্বাঙ্গে—নিঃশব্দে হাহাকার করে উঠলেন অপরেশবাবু: আমি দীন, অতি দীন, আমায় দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো। হে ব্রহ্মচারিগণ, তোমাদের জীবন তো নিষ্পাপ, তোমরা কিসের জন্যে দয়া ভিক্ষা করছ! দয়ার যদি কারোর প্রয়োজন হয় তবে তা আমার। আমি পাপী, মহাপাপী। কিন্তু কার কাছে দয়া ভিক্ষা করব! তোমাদের গুরু আছেন, জীবিত হলে আছেন, মৃত হলেও আছেন—তোমাদের বিশ্বাসে তিনি বেঁচে আছেন, কিন্তু আমি তো তেমন কাউকে জানি না! আমি অধার্মিক নই—কিন্তু ধর্ম কাকে বলে তা জানতাম না। আমি আপিস যাবার আগে মা কালীর পটে মাথা ঠেকাই এই বলে যেন বাস-ট্রামের ধাক্কায় প্রাণটা না যায়—ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারি, যেন ওপরওয়ালারা আমার ওপর চিরদিন সন্তুষ্ট থাকেন; আমি বেলুড় মঠে গিয়ে ঠাকুরের মূর্তির সামনে গড় করে বলি, হে পরমহংসদেব, তুমি আমাকে ধন দাও, আয়ু দাও, সম্মান দাও। ঈশ্বরের সঙ্গে আমার দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক, আমি পাঁচসিকে পয়সা প্রণামী দিই পাঁচশ' টাকা পাবার প্রত্যাশায়—আমি মূঢ়, আমি পাপী, আমায় দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো। কিন্তু কাকে আমি বলব আমার সকল গোপন কাহিনী, কে আমার সমস্ত অপকর্মের কথা কৃপা করে শুনে আমায় বিশুদ্ধ করবে?

ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে গীত-লহরী, আরম্ভ হয়েছে দেবভাষায় স্তোত্রপাঠ:

'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।'

আমার গুরু নেই, কোনো গুরু নেই—আবার শুরু হলো অপরেশবাবুর আক্ষেপ: না, ছিলেন আমার গুরু, আমি নিজেই তাঁকে অক্ষম করেছি, তিনি আজ থেকেও নেই। শিশুকালে ঐসব আশ্রমবাসীদের মতোই নিষ্কলঙ্ক নির্লোভ ছিল আমার আত্মা, সে-ই হতে পারত আমার গুরু, আমার পথপ্রদর্শক—আজ যদি তাকে আমি পাপের ভারে নত না করতাম তাহলে আজ সে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে দিত সমস্ত অন্ধকারের ওপারে আলো হয়ে পরম-মঙ্গলময় যে চিরসত্য বিরাজমান তার স্বরূপটি। কিন্তু আমিই ভ্রষ্ট করেছি তাকে, আমি কলুষ-তমিস্রা দিয়ে মসী-লিপ্ত করেছি তার শুভ্র অবয়ব। আমি বিজয়াকে করেছি প্রতারণা, দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষে স্বেচ্ছায় পাণিগ্রহণ করেছি সরলার, শুধু সামান্য কিছু যৌতুকের আকর্ষণে; বিজয়ার মা আমার প্রায় পায়ে পড়েছিলেন, বলেছিলেন, 'গরীব বিধবার এমন করে সর্বনাশ তুমি করো না বাবা—পাড়ার সবাই তোমাদের ব্যাপারটা জানে—ওর আর কোথাও বিয়ে দিতে পারব না আমি।' আমি শুনেও শুনি নি, অর্থের আহবানে প্রেম, এমন কি সহানুভূতিকেও বধির করে দিয়েছি। আমার দিদি মারা যাবার মাস কয়েক আগে আমার কাছে হাজার দুয়েক টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন, বলেছিলেন, 'অভাবের সংসার—ওর জমানো এই টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলেও খরচ করে ফেলবে—তোর কাছে রাখ্—আমি মরলে ছেলে-মেয়েগুলোকে দিস।' আমি তা দিই নি, নিজের চোখে দেখেছি মা-বাপ-মরা ভাগ্নীটা প্রাইমারী ইস্কুলে চাকরি করে ভাইদের একবেলা খেতে দিচ্ছে, আমি পাঁচশ' টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে তাকে আর আমার বিবেককে সান্ত্বনা দিয়েছি। বাবা যখন দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন তখন কতদিন যে ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ কেনার সময় তাঁর মৃত্যুকামনা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। ছোট ভাইটা ভালোবেসে নিচু-জাতের মেয়েকে বিয়ে করছে শুনে পরিবারের আভিজাত্য আর কৌলীন্য বজায় রাখবার জন্যে জঘন্য সব অপবাদ দিয়ে বেনামী চিঠি পাঠিয়েছি তার বাগ্দত্তাকে। ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, কুচিন্তা, শঠতা—এই নিয়েই গঠিত হয়েছে আমার গুপ্তজীবন। সারাজীবন তুচ্ছ কাজে ও চিন্তায় নিজেকে লিপ্ত রেখেছি যাতে এদের দংশনে আমার বিবেক না ক্ষত-বিক্ষত হয়। আজ আমি নগ্ন হয়ে গেছি, কোনো আবরণ নেই, এদের বৃশ্চিকদংশন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি বলি, হে আমার চিন্ময় আত্মা, তুমি তো অমর, অজেয়, অনন্ত—তুমি এই সব কলুষ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঋজু হয়ে দাঁড়াও, তুমি আমার গুরু, তুমি আমায় দয়া করো, দয়া করো, আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করো। এছাড়া আমার কোনো নিষ্কৃতি নেই, চিরদিন সহজে বাজিমাৎ করতে চেয়েছি, শক্ত জিনিসকে ভয় পেয়েছি, পৃথিবীতে জন্মে পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্যকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছি, তুচ্ছ বস্তু নিয়ে কাল যাপন করে অমূল্য রতন হারিয়ে ফেলেছি—তুমি সমস্ত অন্ধকার দূর করে আমায় একবার দয়া করে সেই দিব্য-দ্যুতিকে অথবা তোমার প্রকৃত স্বরূপকে দু'চোখ মেলে দেখতে দাও।

সাড়ে ন'টার সময় যখন বিভ্রান্তের মতো অবস্থায় অপরেশবাবু বাড়ি ফিরলেন তখন চিন্তিতা সরলা প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে গো? আমি তো ভেবে মরি! বিদেশ-বিভুঁই—না বলে-কয়ে লোকটা গেল কোথায়—এখন আমি করি কি!...এ কি, কি হয়েছে তোমার...যেন চিনতেই পারছ না আমায়...পায়ে জুতো নেই...বলো না কোথায় গিয়েছিলে—তোমার মোকাসিন কোথায় গেল?'

অপরেশবাবু নিজের পায়ের দিকে একবার তাকালেন, তারপর বললেন, 'সেটা ভুলে ফেলে এসেছি মন্দিরের তলায়।'

'ভুলে ফেলে এলে? মোকাসিন? কোন্ মন্দিরে গো?' সরলা ভবিষ্যদ্বাণী করেন: 'দেখো, এ জুতোজোড়াও তোমার নিশ্চয় হারাবে।'

অপরেশবাবু বললেন, 'বাঁচা যাবে।'

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাবাজীর বয়স হবে বোধ করি যমুনার ডবল। রোগা পাকাটে চেহারা—মুখভরা দাড়ি। মাথায় রুক্ষ লম্বা চুল ঘাড়ের নিচ পর্যন্ত এসে কুণ্ডলী পাকানো। কোটরগত ছোট ছোট চোখ দুটি অসম্ভব চঞ্চল ও দ্যুতিময়। পরণে ময়লা গেরুয়া। সর্বাঙ্গে ভুর ভুর করছে আফিংয়ের তিত্‌কুটে একটা চাপা গন্ধ।

গত বছর দুই যাবৎ ইনি যমুনার আখড়ায় অধিষ্ঠান করছেন। সেই বছর দুই আগে কি একটা পার্বণ উপলক্ষে ওইরকম আরও কয়েকজন সাধু বৈরাগী এসে জুটেছিল—সঙ্গে সঙ্গিনীও ছিল। ইনি এসেছিলেন একা। সময়টা ছিল বোধ করি সাগরমেলার। তারপর বানের জল এসে ডোবার জল ঠেলে নিয়ে গেল—বানের জল আটকে গেল ডোবায়। ভাণ্ডড়দাস বাবাজীর আগে যিনি আখড়া জাগিয়ে অবস্থান করছিলেন—তিনি চলে গেলেন সেই দলের সঙ্গে; আর ফেরেন নি।

যমুনা বলে, "তীথে গেছে। সে কি সহজ গ!"

সেই থেকে ইনি আছেন। ভাণ্ডড় বাবাজী নামে চরে-গ্রামে এঁর পরিচয়। খুশি হলে হাতে একতারাটি নিয়ে বেরোন মাধুকরীতে—না হলে নয়। কিন্তু সেই একটা দিনেই বাবাজীর ঝুলি ভরে উপচে পড়ে। হাটেবাজারে গাউলি মেলায় মানুষের ভিড় জমে যায়। নেশায় না ভাবে—সে বাবাজীই জানে, ওই কসাই-গেঁজেলের কর্কশ গলা যেন কোন যাদুমন্ত্র স্পর্শে বুককাটা শানাইয়ের মতো অন্য কোনো এক লোক থেকে আর্তনাদ করে ওঠে। ভাবের গান—দেহতত্ত্বের গান—বৈষ্ণব শাক্ত—সব গানই গায়।

কোন সম্প্রদায় এরা—কে জানে! বোধ করি সব সম্প্রদায় মিশিয়ে ইতিহাস-বর্জিত এ গ্রাম-চর অঞ্চলের সৃষ্টিছাড়া এক সম্প্রদায়। চৈত্র চড়কের দিনে শিবের গান গায়, শরৎকাল থেকে সারা হেমন্ত কালটা আগমনী বিজয়ার গান শোনায়, ফাল্গুনে দোল উৎসবে গায় রাধা-কৃষ্ণের মান বিরহ মিলন; চাষার ঘরে ধান ওঠার দিনে গায় লক্ষ্মীর পাঁচালি।

চরের একান্তে বড় তরফ চৌধুরীদের অনুমতি নিয়ে প্রায় খালের ধার ঘেঁষে, যমুনার কুঁড়ে।

ভাণ্ডড়দাস বাবাজী বলে, "কুঞ্জ—যমুনার কুঞ্জ। সে কুঞ্জে মোরা সব ভমরা।"

এ সব ভমরা হলো চর-গ্রামের চ্যাংড়া আধবুড়ো নেশাড়ীর দল—কারুর দুরন্ত যৌবনের নেশা, কারুর শুধুই নেশা। যমুনার কুঞ্জে কোনোটারই অভাব নেই। সন্ধ্যের পর অন্ধকারের আড়ালে একে একে এসে জড়ো হয়। গান গায়, নেশা ভাঙ করে। আনুষঙ্গিক হয়ত আরও অনেক কিছু আছে। সে সম্পর্কে গ্রাম ও চরের মানুষের চেতনা যে নেই তা নয়—তবে একটা নীরব নিরুপদ্রব সহনশীলতা চলে এসেছে এতদিন। অভিযোগও আছে—মুষ্টিভিক্ষাও দেয়; নিন্দেও করে; আবার পালে-পার্বণে বুড়োবুড়ীরা ডেকে গানও শোনে।

বিশেষ করে যমুনা;—চাষীগৃহস্থ বাড়িতে তার গতি অবাধ। ভলু মাঝি সেটা ভাল করেই জানে। তাই আজ তার আগমন। হা-পিত্যেশ করে বসে আছে সেই কখন থেকে।

যমুনা কালো পাথরের বাটির এক বাটি ভাঙের সরবৎ আর একমুঠো গুড়-মাখানো ভেজানো ছোলা পরিপাটি করে বসিয়ে দিলে ভলুর সামনে। একটু হেসে বললে, "খাও ভলু দাদা—গরীব মানুষ, আর কি দিব।"

সতৃষ্ণ নয়নে সেই ভরা বাটির দিকে চেয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাণ্ডড়দাস বললে, "মোদের মাল দে—বানাই!"

কাগজে মোড়া দুটি মোড়ক এগিয়ে দিয়ে যমুনা বললে, "এই শেষ—যে কদিন পারো চালাও। এবার নিজেরা কেনে আনবে—মোকে আর বলো নি।"

ভাণ্ডড়দাস মোড়ক দুটো পেয়ে বিগলিত হয়ে হাসতে হাসতে বললে, "কেন রাগ করিস যমুনে।"

"রাগের কথা লয়—সে বড় গোলমাল।" ভলান্টিয়ারদের দৌরাত্ম্যের বর্ণনা দিয়ে যমুনা বললে, "তার মধ্যে আমি মেয়্যামানুষ, তোমাদের গাঁজা ভাঙ আফিং আনি কি করে বল।"

"রাজরাজেশ্বর দাদা তোর যমুনে—গুরুর ইচ্ছায় সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" ভাণ্ডড়দাস ভলু মাঝির দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বলল, "বল রাজা! দয়া করে ভরসা দাও।"

"বলেছি তো।" এক চুমুকে সরবতের বাটি সাবাড় করে দিয়ে ভজু বললে, "যোগাড় করে দিব।"

"বাস্ !" ভাণ্ডড়দাস দুটি মোড়ক খুলে কিছুটা আফিং আর কিছুটা গাঁজা দুই চ্যালার হাতে চালান করে দিলে। বললে, "বানা।"

চ্যালারা এতক্ষণ মুখিয়ে ছিল—তারা প্রায় বস্তু দুটো ভাণ্ডড়দাসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে এবং ছিলিম প্রস্তুতিতে একেবারে অভিনিবিষ্ট হয়ে পড়লো। গুলির খোলায় আগুন গন্‌গনিয়ে উঠলো। ছোট্ট একটা খুরির মত বাটিতে আফিং-গালানো জল ফুটতে লাগল। ভাঙা একটা কড়াইয়ে শুকানো পেয়ারাপাতা ভেজে গুড়িয়ে একজন এগিয়ে দিলে ভাণ্ডড়দাসের দিকে।

গুরুজী অনেকক্ষণ ধরে চোখ বুজে, চোখ চেয়ে সূক্ষ্ম ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নেড়েচেড়ে পরখ করে অবশেষে বলে উঠল, "হয়েছে। এবার কালাচাঁদকে এগিয়ে দে বাবা।"

কালাচাঁদ এগিয়ে এল। গালানো ঘন আফিং। তার সঙ্গে গুঁড়ো পেয়ারাপাতা মিশিয়ে গুলির তামাক স্বয়ং স্বহস্তে তৈরি করতে লাগল গুরুজী। ভজু মাঝির দিকে চোখ ঠেরে বললে, "বুঝলে রাজা, এ নেশা হলো রাজার রাজা—দেখ এর তরিবৎ কত!"

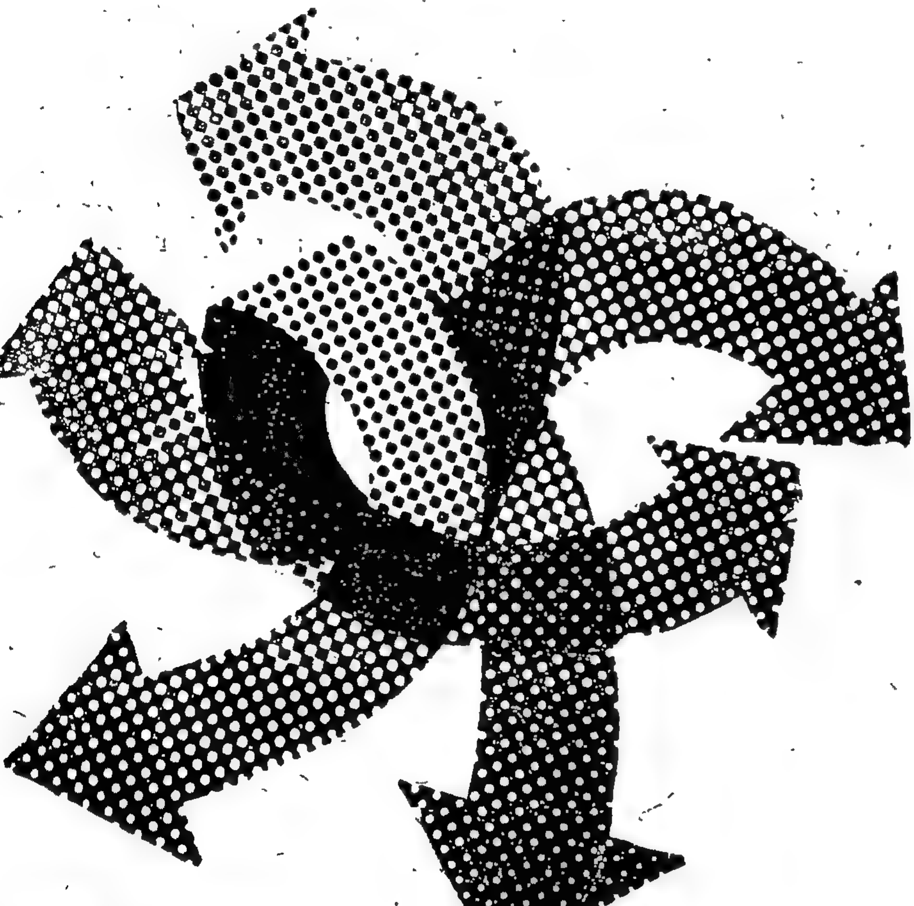

'আমি কি হবো ?'

…ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক……?

আপনি যখন বড় হবেন, যা কিছু আপনি হতে চান না কেন, সাফল্যের সুযোগ অনেক রয়েছে। আপনাকে শুধু কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

বছর বছর ছাত্রদের জন্যে বেশী বেশী সুযোগের সুবিধে করে দেওয়া হচ্ছে। টাকার অভাব আপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। মনে করুন, যদি আপনি আপনার পড়াশুনায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন, তবে জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা প্রকল্পের মাধ্যমে আপনি কলেজে ফার্স্ট ইয়ার বি. এস. সি. থেকে শুরু করে পি. এইচ. ডি. পর্যন্ত পড়বার জন্যে বেশ ভালো রকমের জলপানি পেতে পারেন। অসংখ্য বৃত্তি—প্রকল্পের মাধ্যমে, সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ছাত্রদের ভারতে ও ভারতের বাইরে পড়বার সমান ধরণের সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছর হাই স্কুল ও কলেজগুলিতে ছাত্রদের ৩০ কোটি টাকার বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

পরিকল্পনা মানেই অগ্রগতি

davp 68/605

অন্যদিকে হাতে হাতে তখন গাঁজার টিপুনি চলছে।

যমুনা বললে, "চৌকিদার দাদা মোদের গান শুনতে এসোছিল।"—

"কত গান শুনবে রাজা। গানে গানে আজ ছয়লাপ করে দিব।" ভাণ্ডড়দাস বললে, "আগে ভিত্ বেঁধে ফেলি। তারপর তোর রাজরাজ্যেশ্বর দাদার সামনে আজ গুরুর দেওয়া সব বিদ্যে ঝুলি ঝেড়ে নিবেদন করে দিব রে যমুনে। একটু সবুর কর রাজা।"

ভাঙের ভিত্ আগে বাঁধাই ছিল। তারপর এগিয়ে এল গাঁজার কলকে। ভাণ্ডড়দাস আগে কলকেটা এগিয়ে দিলে ভলু মাঝির দিকে—সবিনয়ে বললে, "পেসাদ করে দাও রাজা।"

ইতিমধ্যে একটু একটু করে ভাঙের নেশা ধরেছে—সহাস্যে রাজা তার রাজকীয় গৌরবে গাঁজার কলকেটি মুখের কাছে ধরে একটা লম্বা টান দিয়ে এগিয়ে দিলে ভাণ্ডড়দাসের দিকে। এবং পরিতৃপ্তির একটা আরামদায়ক শব্দ করে একগাল উৎকট ধোঁয়া ছেড়ে দিলে ভাণ্ডড়দাসের মুখের ওপরে।

ভাণ্ডড়দাস প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "হায় হায়—কি করলে রাজা—কি করলে। ধোঁয়া ছেড়ে দিলে? ব্যোম শঙ্কর বলে দম চেপে চালান করে দাও দশ ইন্দ্রিয়ে—তবে তো। হেই দেখ।"—

বলতে বলতে ভাণ্ডড়দাস প্রায় পাঞ্জা কষার মতো ছোট কলকেটাকে আঁকড়ে ধরে চোখ বুজে সুদীর্ঘ একটা টান মারলে। কলকের মাথায় আগুন দপ্ করে উঠল। সে টানের যেন আর শেষ নেই। ওই রোগা সিঁটকে মারা লোকটার হাড়জিরজিরে বুকের খাঁচাটা হাপরের মতো ফুলে উঠল। এবং প্রাণপণ টানের শেষ বিন্দুতে এসে তার অবশিষ্ট প্রাণস্পন্দনটুকু যেন অর্ধমৃত দেহকাঠামোয় দোল খেতে লাগল। মাথা গোঁজ করে দম আটকে বোধ করি ভিতরের প্রাণপুরুষের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দশ ইন্দ্রিয়ের দিকে দিকে আত্মবিস্মৃতির সেই উৎকট নেশাটাকে চালান করে দিতে লাগল।

ভাণ্ডড়দাস নিস্পন্দ। প্রসাদপ্রয়াসী ভক্তগণ সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে তার পাঞ্জা কষা কলকের দিকে।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে নাক-মুখ দিয়ে গল্‌গল্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, "জেগেছে—আত্মারাম জেগেছে।"

কলকে এগিয়ে দিলে চ্যালাদের দিকে।

গাঁজার দফা শেষ করে সুরু হলো গুলি। সাজিয়ে-গুছিয়ে জোড় হাতে প্রথম নিবেদন করলে ভাণ্ডড়দাস ভলু মাঝির সামনে।

ভলু বললে, "ইটি তো কখনো খাই নি বাবাজী।"

"তা হোক।" ভাণ্ডড়দাস বললে, "তুমি থাকতে আগে খায় কোন্ শালা।"

ভলু মাঝি খেলো না। যমুনার সঙ্গে তার এখনো ঢের কথা বাকি। এমনিতে ভাঙ এবং গাঁজার পর মাথাটা যেন কেমন কেমন লাগছে। যতো কথা মনে আসছে—সব কেমন ভুলে ভুলে যাচ্ছে। ভলু বলল, "আর একদিন এসে খাব। তোমরা আজ খাও বাবাজী।"

"তবে থাক। কিন্তু মনে বড় দুঃখ পেলম রাজা—তুমি শুধুমুখে বসে থাকবে!" তারপর ভাণ্ডড়দাস যমুনাকে চোখ ঠেরে বললে, "বরং রাজাকে আর এক বাটি ভাঙ এনে দে যমুনে।"

"সেই ভালো। আনি।" যমুনা উঠল।

"আরে না না—আর দরকার নাই। হেই দেখ—"

আর নেশা চড়াবার ইচ্ছে নেই ভলু মাঝির। কিন্তু কে কার কথা শোনে। আজ তার আপ্যায়নের অবধি নেই। সংকটের দিনে যে লোক নেশার যোগান দিতে পারবে—তাকে সব রকম আপ্যায়নের জন্যে যমুনা বা ভাণ্ডড়দাস, কারুর আগ্রহ কম নয়। যমুনা আবার একবাটি ভাঙ এনে সামনে ধরে দিলে।

ভলু মাঝি উসখুস করতে লাগল।

যমুনা বললে, "খাও!"

ভলু চাপা গলায় বলল, "তোর অর্ধেক—মোর অর্ধেক। অর্ধেকটা তুই খা যমুনা।"

"তোমার বাটিতে!" যমুনা খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল। চাপা গলায় বলল, "অরা সব দেখবে নি!"

ওরা বলতে ভাণ্ডড়দাস আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ। তারা তখন গুলির নেশায় বুঁদ।

মাঝখানে আগুনের খোলা রেখে ঘিরে বসেছে তারা দাওয়ার একপাশে। মুখে একটু টুঁ শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু টানের ফাঁকে ফাঁকে গুলির ছিটার শব্দ হচ্ছে ঠুস্ ঠুস্ করে। তারপর নাক-মুখ-চোখ বন্ধ করে একেবারে ঝিম্। কালিপড়া লণ্ঠনের মিনমিনে আলোয় দাওয়াটুকু প্রায় অন্ধকার।

ভলু ওদের থেকে আরও একটু তফাতে সরে বসল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, "অদের কি আর চোখ চেয়ে দেখার অবস্থা আছে, যমুনা—হাই দেখ, ঝিমাচ্ছে।"

যমুনাও সরে বসে মুখ টিপে হাসল। চোখের কোণে চেয়ে বলল, "তুমি আগে খেয়ে লও না গো—বাকীটা মোকে দিবে।"

ভলু মাঝি আর কথা না বাড়িয়ে দু-এক ঢোক খেয়ে বাটিসুদ্ধ তুলে দিলে যমুনার হাতে। চোখে সেই বিদ্যুতের ঝিলিক—ঠোঁটে বিভ্রান্ত করা চাপা হাসি—যমুনা ভলুর হাত থেকে পাথরের বাটিটা নিয়ে একটু পেছন ফিরে বাকি-টুকু নিঃশেষ করে ফেললে। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে মিটিমিটি হেসে চাপা গলায় বললে, "আজ তুমি মোর লাজ-সরম সব নিলে। বুঝলে?"

ভলু ঠাণ্ডা গলায় বলল, "কেন যমুনা, ভাঙ কি তুই আর কখনো খাস নি?"

"অতগুলোন অচিন লোকের সামনে? ই মা গ!"

"অচিন কেন হবে—অরা তো রোজ আসে।"

"তবু অচিন অরা।" যমুনা বলল, "এ তুমি শুধু হাতে তুলে দিলে বলে খেলম। বুঝলে?"

"মোর তবে কপাল ভাল।"

"তা যদি বল—সে মোর কপাল।" যমুনা বলল, "কতদিন পরে পথ ভুলে মোর ঘরে এসে পড়লে।"

ভলু হেসে বলল, "বলেছি তো—ই মোর বাপের হুন্দা, আসি কেমন করে।" একটু থেমে আবার বললে—"কিন্তু গান হবে কখন।"

যমুনা ফিরে একবার নেশাড়ীদের দিকে তাকালে। ইতিমধ্যে গুলির পাট শেষ করে সব ক'জন ঝিম্ মেরে বসে আছে। যমুনা বললে, "অদের শেষ হয়েছে—এবার হবে। মোর ভাণ্ডড় বাবাজীকে আর একবাটি ভাঙ দিতে হবে। তা হলেই দেখবে—গানের ফোয়ারা ছুটবে।"

"আবার!"

"তবে আর তোমাকে বলেছি কেন।" যমুনা বলল, "এই নেশা-ভাঙ যোগাড় করতে মোর ককমারির শেষ নাই।" বলে যমুনা ঘরের ভেতরে উঠে গেল

খানিক বাদে ফিরে এল সরবৎ নয়—নির্জলা একদলা সিদ্ধিবাটা নিয়ে। ভাণ্ডড়দাসের হাতে দলাটা দিয়ে বললে, "চৌকিদার দাদা বসে আছে গান শুনবে বলে।"

সিদ্ধির দলাটা টপ্ করে মুখে পুরে দিয়ে ভাণ্ডড়দাস বললে, "দে মোর এক-তারাটা। রাজা আজ অতিথি—রাজার মান্যি গান গাইব আজ যমুনে।"

দেয়ালে ঝোলানো একতারাটা এনে যমুনা ভাণ্ডড়দাসের হাতে তুলে দিলে। তারপর ফিরে গিয়ে বসল ভলু মাঝির পাশে।

একতারায় খানিকক্ষণ টুং-টাং করে গলা ছেড়ে গান ধরলে ভাণ্ডড়দাস-

আমি নীল যমুনায় ডুবে যে মরি।
ভোলা মন উপায় কি করি?

"হাই দেখ! ই গান লয়—ই গান লয়।" যমুনা চেঁচামেচি শুরু করে দিলে, "চৌকিদার দাদাকে তুমি ই গান কখখনো শোনাতে পারবে নি বলে দিলম।"

একতারায় সুরের তরঙ্গ তুলে ভাণ্ডড়দাস মুচকে মুচকে হাসতে লাগল।

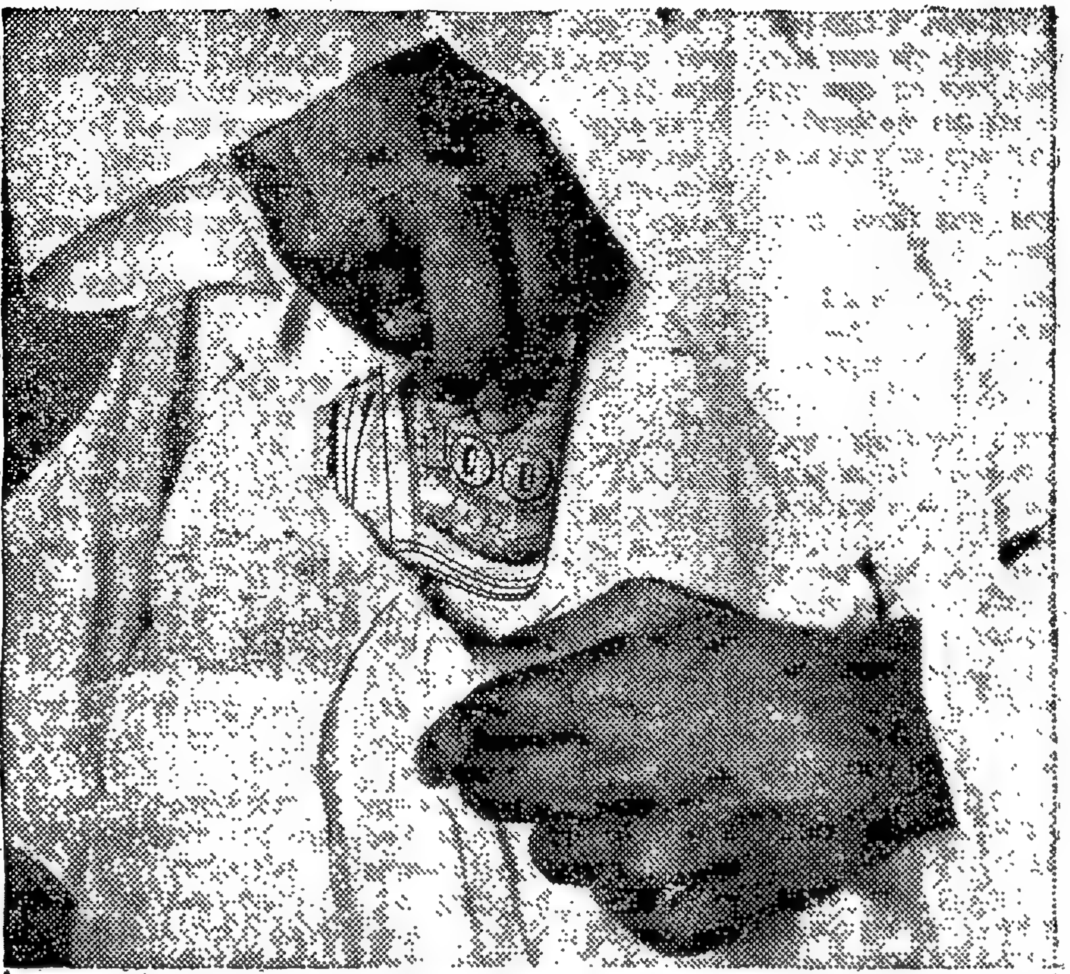

থামুন!

টাকা সঙ্গে নেবার আরও নিরাপদ উপায় হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্কের ট্র্যাভেলার্স চেক

আপনি চটপট ওগুলির বদলে নগদ টাকা পেয়ে যাবেন—এমনকি ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও। ওগুলি দস্তুরমত নিরাপদ। অন্য কেউ ওগুলি ভাঙাতে পারবে না। ওগুলি যদি হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়—আপনি আপনার টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবেন। ওগুলি কমিশন ছাড়াই দেওয়া হয়। এবং ৫০টাকা ও ১০০টাকার হিসেবে পাওয়া যায়। এর পর যখন ঘোরাফেরা করবেন—সঙ্গে স্টেট ব্যাঙ্কের ট্র্যাভেলার্স চেক রাখবেন।

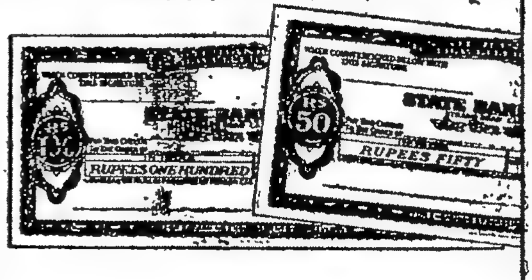

স্টেট ব্যাঙ্ক ট্র্যাভেলার্স চেক
—টাকা সঙ্গে নেবার আরও নিরাপদ উপায়

সকলের সেবায় স্টেট ব্যাঙ্ক

ভলু বললে, "হোক না যমুনা।"

"না—কথখনো না।" যমুনা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, "ই মোকে নিয়ে গান বেঁধেছে বাবাজী। তুমি জানো না।"

ভলু বলল, "তবে তো মোকে ভাল করে শুনতে হবে গো। গাও বাবাজী।"

"ই মা গ!" যমুনা তেমনি মুখ ঢেকে রইল।

ভাণ্ডড়দাসের গলায় সুরের তরঙ্গ আছড়ে পড়ল—

বুকে তার উথাল পাথাল ঢেউ,
বাঁচাবার সঙ্গী নাই হে কেউ,—
হায় নীল যমুনায়—
কালাচাঁদ দাও চরণতরী॥

ভাণ্ডড়দাসের চ্যালাচামুণ্ডার মধ্যে থেকে হঠাৎ কে একজন ফুঁপিয়ে উঠল। প্রায় অন্ধকার দাওযা—ভালো করে তাকে দেখা যায় না। বসেছিল সবার পিছনে। লোকটা সেখান থেকে সমানে ফোঁপাতে লাগল এবং অন্ধকারে কি যেন খুঁজতে লাগল হাতড়ে হাতড়ে।

ভাণ্ডড়দাস জিজ্ঞেস করলে, "কে ফোঁপাচ্ছ বাবা?"

কিষ্টদাস বলল, "গোলক।"

"নেশাটা কি বড্ড বেশি হয়েছে বাবা? খানিক শুয়ে পড়।"

গোলক ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "মোর গেলাস একটা।"

মুহূর্তে ভাণ্ডড়দাস আর যমুনার চোখে চোখে কি যেন কথা হয়ে গেল।

যমুনা বললে, "যাবে কোথায়—ওই-খানে আছে। এখন গান হবে—চুপ করে বসো না গ।"

"এনেছিলম গেলাসটা—হেই এখেনে চেপে বসেছিলম। নেশার মধ্যে কে হাতিয়ে নিলে।"

ভাণ্ডড়দাস তাকে থামাবার জন্যে বললে, "আছে বাবা আছে—স্থির হও।" একতারায় ঝংকার তুললে বাবাজী।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। লোকটা সমানে ফোঁপাতে লাগল, "খাঁটি কাঁসা—আধ সের হবে। হেই চেপে বসেছিলম—চৌকিদার এসে পড়ল।"—ক্ষতির দুঃখে এবং নেশায় লোকটার মুখে আর বাঁধন রইল না।

নেশাড়ীদের মধ্যে এ আড্ডায় এরকম প্রায়ই ঘটে। গেরস্তের ঘটি-বাটি, চাষার কোদাল, মাছধরার জাল—এমন দু-একটা চুরি-চামারি হয়ে চলে আসে যমুনার কুঞ্জে। যমুনাই তাকে পাচার করে দেয় ভিন্ গ্রামের হাটে-বাজারে। তার যাতায়াত দূর-দূরান্তরে।

ভাণ্ডড়দাসের একতারা বৃথাই টুং-টাং করতে লাগল—গোলকের ফোঁপানী কিছুতেই আর থামল না।

ভলু মাঝি উঠল। বলল, "আজ আমি চলি।"

যমুনা বলল, "হেই দেখ দিকিন কাণ্ড। ভালো করে দুটো গান শোনাতে পারলম নি।"

"আর একদিন আসব যমুনা।"

ভাণ্ডড়দাস বলল, "ই গোলক ব্যাটা সব গোলমাল করে দিল রাজা। কিছু মনে করো নি।"

ভলু বললে, "মনে আবার কি করবো গো! বরং আর একদিন এসে তোমার গান শুনে যাব বাবাজী।" তারপর চাপা গলায় যমুনাকে বললে, "তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে যমুনা—একটু বাইরে এসো।"

যমুনা ভলু মাঝির পেছনে পেছনে বাইরে বেরিয়ে এল।

অন্ধকার রাত। নিরালায় এসে মুখো-মুখি দাঁড়াল ওরা। ওদের ঘিরে পুবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে—নিরবচ্ছিন্ন আবাদ। শুধু আকাশভরা তারার একটা মিনমিনে আলো এসে পড়েছে ওদের দু'জনের মুখে-চোখে—সর্বাঙ্গে। হাসি হাসি মুখ করে যমুনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল ভলু মাঝিকে—যেমন করে শিকারী তার ফাঁদে আটকানো শিকারকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

ভলু মাঝিও চেয়ে রইল চোখে চোখ দিয়ে। সাপের মত পলকহীন স্থির অন্তর্ভেদী দু'জোড়া চোখ। না—কারুর দৃষ্টিতে উত্তাপ নেই—বিহ্বলতা নেই, রঙিন নেশা নেই।

তবু যমুনা বলল, "তুমি আবার আসবে?"

"আসব যমুনা।" ভলু বলল, "এই-খানেই মোকে আসতে হবে—এর চেয়ে আর ভালো জায়গা নাই।"

ওর কথার ঢঙে যমুনা চমকে উঠল। বলল, "কেন?"

গলাটা বোধ করি উত্তেজনায় একটু জোরেই হয়ে গেল যমুনার। ভলু মাঝি নেশাড়ীদের দিকে একপলক চেয়ে বলল, "আস্তে।"

যমুনা গলা নামিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "কি মতলব তোমার? কি চাও?"

ভলু মাঝি কিভাবে কথাটা পাড়বে—বোধহয় ভাবতে লাগল।

যমুনা থাকতে না পেরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, "মেদের ফ্যাসাদে ফেলতে চাও?"

"না।"

"তবে? নুনের সন্ধান?"

"না।" ভলু মাঝি বললে, "মুকুন্দ পাইককে জান?"

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে যমুনা বলল, "জানি।"

"তার অবস্থা কি রকম?"

"চরের চাষী—চাষী গিরস্ত।" যমুনা বলল, "আগে যেত সুন্দরবনে চাষ করতে। এ বছর চাষের আগে ওর বাপকে তোমাদের পুলিশ ধরেছে—তাই ও চরেই আছে। কেন—ওকেও ধরবে নাকি?"

"দরকার হলে থানা কি ছাড়বে?"

ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করে যমুনা চুপ করে রইল। সে নিশ্চিন্ত—আপাতত তার নিজের দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু ভলু মাঝি থামল না। জিজ্ঞেস করলে, "তার বৌকে জান?"

"জানি।" বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যমুনা ভলু মাঝির মুখের দিকে তাকাল।

ভলু মাঝি বলল, "ভাব-সাব আছে?"

"কেন বল দিকিনি?" ভলুর মরা মরা মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এতক্ষণে আসল রহস্যটা যেন একটু একটু ধরতে পারল যমুনা। বলল, "লজ্বর লাগল নাকি?"

"সে কি আজকের কথা যমুনা।" ভলু মাঝি বিষণ্ণ গলায় বললে, "ও মোর বৌ হতে পারত।"

যমুনা খিল্ খিল্ করে হেসে বলল, "তা হয় নি তো দেখছি। এখন কি করতে চাও?"

"ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভাব-সাব করে তোর এখানে আনতে পারবি?"

"যদি পারি।"

"তোর আড্ডার যত নেশাভাঙ—সব যোগাব আমি।"

"রাজী। কিন্তু ওর মরদটা একদম জংলী বরা।"

"তার ভার আমার।" ভলু মাঝি দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "মোর থানা আছে। জংলী বরাকে এখন শায়েস্তা করা সহজ।"

"ধরিয়ে দিবে?"

"দেখি।" একটু চুপ করে থেকে ভলু বললে, "তা হলে কথা দিলি?"

যমুনা আবার খিল্ খিল্ করে হেসে বললে, "মা গ মা, তোমার যে তর সইছে না ভলুদাদা। থামো—আগে ভাব-সাব করি।"

"কালকেই যা একবার।"

"আর তুমি আবকারী দোকানে কবে যাবে?"

"যবে বলবি—যবে দরকার হবে।"

"ঠিক আছে।"—

"দেখি—আমিও থানায় বসে-কয়ে হুদ্দা বদলাবো।"

"বাপের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

"তবে তো রোজ দেখা হবে গো!" যমুনা আবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। [ক্রমশ]

তোমার আত্মার শান্তি হোক

সুরেশচন্দ্র সাহা

আমেরিকার নির্বাচনে রিচার্ড নিক্সনের জয়লাভে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুগবদল ঘটে গেছে। সুতীক্ষ্ম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টির। অথচ সেনেটার রবার্ট কেনেডির ওপর আশা কারও কম ছিল না—ডেমোক্র্যাটদের জয়ধ্বজা হাতে তুলে জাতির কর্ণধার হবার শক্তি যেন তাঁর ছিল অজেয়। হোয়াইট হাউসের অন্দরমহলে রিপাবলিকানদের পদচারণের দিনে সেনেটার রবার্ট কেনেডির কথা মনে না পড়ে যায় না।

প্রেসিডেন্ট জনসন ছিলেন রবার্ট কেনেডির সবচাইতে বড় অস্ত্র। নির্বাচনের আসরে আসরে তাঁর বিরুদ্ধে ঘন ঘন বিষোদ্গার করে রবার্ট কেনেডি বলতেন—জনসন আমেরিকার সর্বনাশ করেছেন। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ, নিগ্রো-শ্বেতাঙ্গে লড়াই, দেশের দারিদ্র্য তাঁরই আমলে আমেরিকাকে পথে বসিয়েছে ইত্যাদি। মার্চের শেষে লিন্ডন জনসন যখন জাতির কাছে ঘোষণা করে বললেন পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবার সঙ্কল্প তাঁর নেই, তখন সারা পৃথিবী বিস্মিত হল; ইউজিন ম্যাকার্থী, হিউবার্ট হামফ্রি, রিচার্ড নিক্সন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন—আর সেনেটার রবার্ট কেনেডি ওরফে ববি কেনেডি রীতিমত বিব্রতবোধ করলেন। নানা পত্রপত্রিকা ববিকে খোঁচা দিতে লাগল, বিরুদ্ধবাদীরা টিপ্পনী কেটে বলল—এখন কোন্ মূলধন ভাঙিয়ে খাবে বাছা! এতদিন ত' বলেছ, জনসনের চাইতে আমি ভাল কাজ দেখাতে পারি। এবার বরং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বল, ভালটা তোমার কোথায়।

ববি বুদ্ধিমান। তিনি ভোল পাল্টালেন, বক্তৃতার ধারা বদলিয়ে ফেললেন; ঘরের সমস্যা, দারিদ্র্য, বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদির ওপর আন্তরিকতার আবেগ এমন করে ছড়ালেন, ভোটাররা মুগ্ধ হল—ভক্তের দল বাড়ল, আর সেই সঙ্গে শত্রুর দলও। আগে লোকে বলত, ববি প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির নাম ভাঙিয়ে নির্বাচনে বাজীমাৎ করবার ফিকির করছেন—জনের মত তেমনি বলার ঢং, গলার স্বর—কথায় কথায় তেমনি সাহিত্যরসের ছড়া। ববি সাবধান হলেন, দাদার প্রেতচ্ছায়াকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তারপর আপন শক্তির অসামান্যে দুর্লভ যৌবনতেজে দৃপ্ত হয়ে দেখা দিলেন জনতার আসরে। একে একে ওয়াশিংটন ডি-সি, ইন্ডিয়ানা, নেব্রাস্কার প্রাইমারীতে বিপুলভাবে জয়ী হলেন। শেষ পর্যন্ত ঘনিয়ে এলো ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাইমারী নির্বাচনের দিন। সারা আমেরিকার নজর পড়ল লস এঞ্জেলসে, সারা বিশ্বের নজর আমেরিকায়। কেনেডি জয়ী হলে তাঁর ওয়াশিংটনলক্ষিত পথের কুটিল আবর্তরেখাগুলি কেটে যাবে। এমন সময় বজ্রাঘাত এলো লস এঞ্জেলেসে, ১৯৬৮ সালের ৪ঠা জুন, রাত ১২টা বেজে ১৫ মিনিটে। তখন নিউইয়র্কে রাত ৩-১৫, কলকাতায় ৫ই জুনের রাত ১-০৫, অর্থাৎ ইংরেজী ক্যালেন্ডারে ৬ তারিখ শুরু হয়ে গেছে।

হিউস্টনের সকালে ছ'টায় উঠে হতবাক হয়ে টেলিভিশনের সামনে বসেই শুনতে পেলাম ছোট একটি ভাষণ—আমি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ সারাটি দিনে যে ধকল তোমাদের ওপর দিয়ে গেছে আমি তা বেশ অনুমান করতে পারি—কারণ আমিও একদিন ইলেকশন-ম্যানেজার ছিলাম। অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন লম্বা বক্তৃতা দিয়ে তোমাদের আর ধরে রাখব না।...সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় একটি কণ্ঠে শোনা গেল ভীষণ ভীতচকিত উচ্ছ্বাস—এও কি সম্ভব, এ কেমন করে সম্ভব, সেনেটার কেনেডি গুলীবিদ্ধ হয়েছেন। হায় ভগবান! সত্যি সবই সম্ভব! তাঁকে গুলী করা হয়েছে, তিনি পড়ে গেছেন। জানি না সেনেটার এখনও বেঁচে আছেন কিনা।...ইত্যাদি। কিন্তু তখনও খুনীর হাতে গুলী চলছে, ক্লিক ক্লিক শব্দ হচ্ছে, আর ঐ একই সন্ত্রস্ত কণ্ঠ সজোরে বলছে—এবার আমার দিকে বন্দুক তাক করেছে। কেড়ে নাও, বন্দুক কেড়ে নাও। মেরো না, পুলিশে দাও। আমরা আর একটি অসওয়াল্ড ঘটতে দেব না।

প্রথম কণ্ঠ সেনেটার রবার্ট কেনেডির। স্থান লস এঞ্জেলসের অ্যামবেসেডর হোটেল, সময় মধ্যরাত। ক্যালিফোর্নিয়া নির্বাচনে জয়লাভের পর কেনেডি সদ্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। এমন সময় সিরহ্যান বিসারা সিরহ্যান গুলী ছুঁড়তে শুরু করল। কেনেডি পড়ে গেলেন। হোটেলের মেঝে রক্তে ভেসে গেল। দ্বিতীয় কণ্ঠ এক সাংবাদিকের। নির্বাচনের শুরু থেকে রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের লোকেরা ক্যামেরা টেপরেকর্ডার নিয়ে আগাগোড়া তৈরি ছিলেন। ববির বক্তৃতা, গুলীর আওয়াজ, সাংবাদিকের বিলাপ রেকর্ডে চিত্রে ন্যূনতম সময়ে পরিবেশিত হল। সেদিন আমেরিকার সংবাদ প্রতিষ্ঠান জগতের এক বিস্ময়কর কৃতিত্বের দিন; একটি অভাবনীয় মূঢ়তার দিন সারা আমেরিকার।

টেলিভিশনে দেখতে পেলাম, হোটেলের মেঝেতে ববি কেনেডি পড়ে আছেন—চোখ বিস্ফারিত, নির্বাক মুখে নিটোল প্রশান্তি। বিজয় আনন্দের তৃপ্তি মুখ থেকে তখনও নষ্ট হয়ে যায় নি। দু'-দুটো গুলী কানের কাছ দিয়ে মস্তিষ্ক ভেদ করেছে। জনকয়েক কেনেডি-কর্মীও গুলীবিদ্ধ হয়েছেন। চারিদিকে একটি চরম বেসামাল অবস্থা—যেন প্রলয়ের পরে জীবিতরা মৃত্যুর আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

হানাহানি মারামারি রক্তারক্তি আজ আমেরিকায় মোটেই দুর্ঘট ব্যাপার নয়। কিন্তু স্মরণীয় কালের মধ্যে তিনটি বিশেষ খুন সারা বিশ্বে আলোড়ন এনেছে—

প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি, ডঃ মার্টিন লুথার কিং, সেনেটার রবার্ট কেনেডি; এবার সেই সঙ্গে এনেছে একটি প্রশ্ন—কোন্ কেনেডি? ৪ঠা জুনের কালরাত্রির পর আমেরিকার ভদ্রসাধারণ এই কথা ভেবে বিরতবোধ করেছেন যে, সারা দুনিয়া আমেরিকাকে খুনীর দেশ, বিকারগ্রস্তের দেশ ছাড়া হয়ত আর কিছুই ভাবতে পারছে না। চব্বিশ বছর বয়সের আততায়ী সিরহ্যানের জন্মভূমি জর্ডনে। আজ এগার বছর যাবৎ সিরহ্যান পরিবার লস-এঞ্জেলসবাসী। আরব-শত্রু ইসরাইলের প্রতি কেনেডির স্নেহের আভাস ছিল তাঁরই অল্পদিন আগের এক ভাষণে। আর সেই-দিনই নাকি আরবীয় সিরহ্যান আমেরিকান কেনেডিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।—লস-এঞ্জেলসের পর অন্ততঃ এমন একটি কথাই সেদিনের আমেরিকায় শোনা গেল। অনেকের মনঃপূত হল না, বেশির ভাগই বিশ্বাস করল না। রাশিয়া তো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন — ভিয়েৎনামে শান্তিপ্রয়াসী কেনেডিকে একটি সুকৌশল নেপথ্যলীলার বলি হতে হল।

গুলীবিদ্ধ হবার পঁচিশ ঘণ্টা পর ববির যখন মৃত্যু হল, তাঁর কাছে তখন স্ত্রী এথেল কেনেডি, বৌদি জ্যাকেলিন কেনেডি, কনিষ্ঠ সহোদর এডোয়ার্ড ওরফে টেডি কেনেডি। ববির প্রাণরক্ষায় অনেক প্রার্থনা হয়েছিল, চারঘণ্টার অস্ত্রোপচারে মস্তিষ্কভেদী বুলেটও অপসৃত হয়েছিল, আর সারাদিন ঘন ঘন প্রচারিত হয়েছিল বুলেটিন। রেডিও টেলিভিশনে অন্য কোন সংবাদ নেই, ববি ছাড়া আর কোন কথা নেই। বাঁচলেও বাঁচতে পারেন—এমন একটি সংবাদও শোনা গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হল ভীষণ সংকটের মধ্যে ববি মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছেন।

মাত্র আঠারো ঘণ্টা আগেও সেনেটার কেনেডি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সংগ্রাম করছিলেন, পনেরো ঘণ্টা আগে বলেছিলেন—আমার মনে হয় আমেরিকার অভ্যন্তরে যে বিভেদ আছে, হিংসার যে উৎক্ষেপ দিনের পর দিন আত্মপ্রকাশ করছে আমরা তার অবসান ঘটাতে পারি।

লস এঞ্জেলসের গুড স্যামারিটান হাসপাতালে ববির যখন মৃত্যু হল, তখন ৭৬ বছরের বৃদ্ধা মাতা রোজ কেনেডি, ৮১ বছরের পিতা যোসেফ কেনেডি ম্যাসাচুসেটসের দেশ-বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকাল ৬টায় মাকে জাগিয়ে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া হল। তিনি নির্বাক হয়ে রইলেন; তারপর সাতটার সময় চলে গেলেন গীর্জায়। যোসেফ কেনেডিকে জানান হল আরও পরে। তিনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টগিরি কণ্টক-মুকুটভারের মত দুঃসহ। দুর্যোগের দিনে নিন্দা-চর্চা-শেলষে হোয়াইট হাউসের আসন টলমল করে। তবু তার জন্য কাড়াকাড়ির অন্ত নেই। প্রেসিডেন্ট জনসনের সমালোচনাও লোকে কম করে নি, বিদ্বেষের আক্রমণও তাঁর প্রতি কম হয় নি। এমন কি চিরদিনের মত যখন তিনি সরে দাঁড়াবার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন, তখনও যেন লোকে তাঁকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না—যেন এটা কি এক মস্ত রাজনৈতিক চক্র। শুধু কন্যা লুসির মনে তখন দুঃখের অন্ত ছিল না—তাঁর আপন ভোটটি প্রিয় ড্যাডিকে দেওয়ার সুযোগ আর যে কখনও হবে না।

রবার্ট কেনেডি সব জেনেশুনেও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছিলেন, অশেষ ক্লেশ সহ্য করছিলেন, কাজের চাপে আহারনিদ্রা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। সকাল সাতটা থেকে রাত তিনটা পর্যন্ত তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। বিয়াল্লিশ বছরের যুবা পুরুষ। পাতলা মত গড়ন। মাথায় একরাশ লম্বা চুলের ঢেউ। চটপটে স্বভাব। বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রসন্ন একটি ললাট। সব মিলিয়ে দুর্জয় তারুণ্যের প্রতীক। তাঁর দীর্ঘ রাতজাগা, একুশ ঘণ্টা কাজ করা ক্লান্তি এবং চুলে চেহারায় আগোছাল ভাব দেখে মাতৃস্বভাবের মহিলারা সস্নেহে বলতেন—বাছার ভাল ভাল খাবার আর বেশ কিছুদিন একটানা বিশ্রামের বড় দরকার।—সদ্যবিগত-যৌবনারা টিপ্পনী কাটতেন—ঢং দেখ। যুবতী নারীরা ভাল-লাগার হাসি হেসে বলতেন—সুন্দর, কি সুন্দর।

শুধু দৈহিক শ্রমই নয়, ববি কেনেডি অর্থও খরচ করেছিলেন অনেক। ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত তাঁর নির্বাচনী খরচ দাঁড়িয়েছিল সাড়ে তিন কোটি টাকা—আর তখন ইউজিন ম্যাকার্থীর মাত্র তেইশ লক্ষ, হিউবার্ট হামফ্রির মাত্র পনেরো লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, কেনেডির অর্থ বেশির ভাগই পারিবারিক দৌলৎ, ম্যাকার্থীদের চাঁদা-তোলা টাকা—ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, নয়ত মতলবী পত্রপত্রিকার অর্থভাণ্ডারের অকৃপণ দাক্ষিণ্য।

কেনেডির এত শ্রম, এত অর্থ, আহার-নিদ্রা ভুলে-যাওয়া এমন সংগ্রাম হয়ত শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হত না। তাঁর ক্রমশ-বাড়তি জনপ্রিয়তা সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যুবসমাজে ববির জনপ্রিয়তা ছিল অনেকটা ফিল্ম-স্টারের মত। তাঁর দেহের সামান্য একটু স্পর্শের জন্য বক্তৃতামঞ্চের পাশে ভিড় জমত, কাড়াকাড়ি পড়ত। বার্নার্ড-শয়ের উদ্ধৃতি করে ববি বলতেন—যেখানে যেমনটি আছে তেমনটি দেখে কেউ, কেউ প্রশ্ন করে—এমনটি কেন? জনতা উদ্বেল হয়ে উঠত, ববি যখন পর পরই বলতেন—যা কখনই ছিল না, আমি কিন্তু তারই স্বপ্ন দেখি, আর প্রশ্ন করি—কেন নয় তাঁর জনতা-জড়-করা ব্যক্তিত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসমাজে তাঁর একাত্ম হয়ে যাবার ক্ষমতা দেখে সবাই বিস্মিত হত। আশ্চর্য নয়, যুবনারীসমাজ এমন কি পঞ্চসন্তানের জননী পর্যন্ত জনসভায় তাঁর অঙ্গুলী-অগ্রভাগের একটু দূরস্পর্শ পেলে মনে করতেন—জীবনে আজ অনেক পেলাম। অবশ্য একজন মহিলা ববির কিছু বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁর প্রেসিডেন্ট-পদপ্রার্থী হবার ঘোষণা শুনে—আমেরিকান ঐতিহাসিক বারবারা টাকম্যান কাগজে লিখেছিলেন—মাথার স্কু ঢিল, সুবিধা-বাদী, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করবার মনোভাব নেই, দাদার জনপ্রিয়তা কাজে লাগায় ইত্যাদি। পরম সন্তোষের কথা ভদ্রমহিলার মতামতে তেমন কেউ কান দেয় নি।

শুধু নারী আর যুবাই নয়, সকলের স্নেহে ধন্য হয়েছিলেন ববি। ভোটদাতাদের বয়স বিচারে আছে তার প্রমাণ। বর্তমান আমেরিকার অর্ধেক লোকের বয়সই ২৭ বছরের নিচে—আর এই হিসেবে শতকরা মাত্র ৩৬.৪ যুব-ভোট তিনি পেয়েছিলেন। হিসেবটি বিশেষজ্ঞদের। ওদিকে শতকরা ২০টি ভোট বেশি পেয়ে সাউথ ড্যাকোটায় যে রাঘববোয়ালকে ববি ঘায়েল করেন, তাঁর নাম হিউবার্ট হোরেশিও হামফ্রি, হোয়াইট হাউসে যাঁর তখন দ্বিতীয় স্থান এবং কেনেডিহীন নিরাপদ দিনে অদ্বিতীয়ের স্বপ্ন দেখা যাঁর শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাউথ ড্যাকোটায় হামফ্রির আপন ঘর।

জুনের সাত তারিখের শুক্রবার। ১৯৬৮ সাল। নিউইয়র্কের সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথিড্র্যালে ববির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় একটি বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন হয়েছে। গীর্জার অভ্যন্তর কেন্দ্রে শবাধার স্থাপিত। কেনেডি পরিবারের সবাই এসে একে একে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন। সেদিন প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি—উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জনসন ও পত্নী লেডি বার্ড। টেডি কেনেডি তাঁর অগ্রজের স্মৃতিতর্পণে বললেন—ববি জীবনকে পূর্ণরূপে ভালবেসেছিলেন এবং তারই অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যে ছিল তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক দিনের বিকাশ। বলতে বলতে টেডির কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো, চোখ জলে ভরে উঠল। ওপাশে তখন শোকঘন মূর্তির মত ছলছল চোখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে টেডির স্মৃতিপ্রশস্তি শুনছিলেন বৈধব্যবেশিনী এথেল কেনেডি, ববির আঠারো বছরের জীবনসঙ্গিনী।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

আর ঠিক একই সময়ে সেই সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথিড্র্যালে উপস্থিত ছিলেন একই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা আরও দুইজন যুবতী বিধবা—জ্যাকেলিন কেনেডি এবং কোরেটা কিং।

জর্জিয়ার আটলান্টা শহরে ৪ঠা জুনের রাত্রি অবসানে কোরেটা কিং যখন কেনেডি ট্র্যাজেডির খবর পেলেন, তখনই লস এঞ্জেলসে উড়ে যাবার সিদ্ধান্ত করে এথেল কেনেডিকে জানালেন—আমার বিপদের সময় আপনার স্বামী এবং আপনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ আমি যদি আপনার সামান্য সান্ত্বনারও কারণ হই, তবে কৃতার্থ হব। ৪ঠা এপ্রিলের মেমফিসে কিং হত্যার পর আটলান্টায় তাঁর শববহনের জন্য রবার্ট কেনেডি একটি বিমান ভাড়া করেও দিয়েছিলেন।

ববি একদিন রহস্য করে বলেছিলেন—আমার ঘরে আমি পুরো একটি ফুটবল টিম তৈরি করব। এথেল কেনেডি এখন দশটি সন্তানের জননী; কাঁদছেন না, কথাও বলছেন না, মৌন গাম্ভীর্যে স্বামীর শেষ-কৃত্যগুলি সম্পাদন করছেন। একটি ছেলে কেঁদে উঠলে এথেল বলেছিলেন—এখন চুপ কর ত' বাছা। পরে প্রাণভরে কাঁদবার অবসর আমরা পাব। কিন্তু কেনেডি সন্তানরা চুপ করে থাকতে পারে নি—শবাধারের পাশে গিয়ে কেঁদে উঠেছিল। সেন্ট প্যাট্রিকে সেদিন দশ সন্তানের সবাই উপস্থিত নেই—আর একাদশ সন্তান তখন দু' মাসের জননীজঠরে।

রবার্ট কেনেডি একদিন বলেছিলেন—পরে কোথায় গিয়ে ঠেকব, সে চিন্তার কোন মূল্য নেই—সেখানে শেষ পর্যন্ত হয়ত নাও পৌঁছতে পারি। সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উপায়, সর্বসময়ে সর্বোত্তম কাজ করা। জুনের আট তারিখে ববির শবাধার নিয়ে স্পেশাল ট্রেন নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন রওনা হল। তখন উদ্বেলিত জনতার আচরণে মনে হল, দেশবাসী তাঁর সর্বোত্তম কাজের মর্ম বোঝে।

এই শবানুগমনের দিনে বিশেষ একটি খবর এলো—ডঃ মার্টিন লুথার কিংয়ের হত্যাকারীকে ঐদিন লণ্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিং পত্নী কোরেটাকে সে খবর দেওয়া হল। তিনি কোন মন্তব্য না করে চুপ করে রইলেন। মন তখন ওয়াশিংটনে।

জীবনে ট্রেনযাত্রা ছিল ববির অতিপ্রিয়—ট্রেন পেলে পারতপক্ষে অন্য যানবাহন গ্রহণ করতেন না। তাই আজ ববির শব চলেছে ট্রেনে। ইণ্ডিয়ানা, নেব্রাস্কা, কালিফোর্নিয়ায় পাত্রমিত্রসহ নির্বাচনী সফরে যেতে ববি সর্বমোট ট্রেনভাড়া দিয়েছিলেন সত্তর হাজার টাকা। আজ আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব, নেতা-অভিনেতা, ক্রীড়াবিদ, কূটনৈতিক মিলে সাতশ'জন যাত্রী ববির শেষ ট্রেনযাত্রার সঙ্গী হয়েছেন। কাউকে কোন ভাড়া দিতে হয় নি। এক বেসরকারী ট্রেন কোম্পানী স্বেচ্ছায় ব্যবস্থা করেছেন এই স্পেশাল ট্রেনের।

দীর্ঘ ২২৪ মাইলের যাত্রায় রেল সড়কের দু'ধারে স্টেশনের চত্বরে চত্বরে শোকবিহ্বল জনতা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ব্যূহ ভেদ করে ট্রেন চলতে পারছে না। সংশ্লিষ্ট বড়-কর্তাদের তখন ভেবে দেখবার দরকার হল শুধু স্টেশনে স্টেশনে ট্রেন থামবে, অথবা লোক দাঁড়ানো প্রতি পথের ধারে ধারে। জনতা উৎসুক অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে শবাধারটি হাতে একটু স্পর্শ করবার জন্য। হাঁটু গেড়ে ববিকে শেষ সম্মান জানাবার জন্য। কি ঘটে গেছে তা আর যেন বড় সমস্যা নয়, কি করে জনতা নিয়ন্ত্রণ করা হবে সেইটে আজ বড় সমস্যা। রেলের আজ সত্যি সমস্যার দিন। ফিলাডেলফিয়া স্টেশনে অগণিত শিশু, যুবা এবং বৃদ্ধ বয়সের নরনারী অশ্রুভারানত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আর তাদের হাতের বড় বড় বোর্ডে লেখা ছিল একটি মর্মস্পর্শী কথা—উই উইল মিস ইউ, ববি!

এথেল কেনেডি, টেডি কেনেডি, যত-সব আত্মীয়-বান্ধব রাস্তার দৃশ্য দেখে ট্রেনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে একটু করে হাত নাড়ছিলেন। তখনও এথেলের চোখে জল নেই। টেলিভিশনের টিকাকাররা এই সময় বলেছিলেন—কেনেডি মহিলাদের অন্য সবার চাইতে অনেক সুখ, অনেক বেশি দুঃখের সঙ্গে পরিচয় আছে। তাঁরা আমাদের দিয়েছেন রাজোচিত মহনীয়তা, যে গুণ আমেরিকানদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ঘাটতি।

আশ্চর্যের কথা, এই সময়েই টেলি-ভিশনে একটি রাজনৈতিক কানাঘুষার আলোচনা হল; শোনা গেল, টেডি কেনেডি নাকি ভাইস প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী হবেন এবং চিত্রাভিনেতার মত সুদর্শন, চাণক্যের মত বিচক্ষণ টেডি হয়ত নিরাপদে নির্বাচিতও হবেন। পরদিন এ বিষয়ে একজন বৃদ্ধ আমেরিকানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সাধারণ লোক। তিনি বললেন—আমার ছেলে হলে বলতাম, ওসব প্রেসিডেন্টগিরির দরকার নেই বাছা। ঘরের ছেলে ঘর আলো করে বসে থাক।

আজ হারাধনের একটি ছেলের মত রোজ কেনেডি আর যোসেফ কেনেডির শেষ পুত্রসন্তান টেডি কেনেডি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁদের একপুত্র বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন, অপর দুই পুত্র প্রেসিডেন্ট জন এবং সেনেটার রবার্ট আততায়ীর গুলীতে। টেডিও বিমান দুর্ঘটনা থেকে কোনমতে বেঁচে গেছেন।

সন্ধ্যা ৮টা ৩২ মিনিটে ৮ই জুনের সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। নির্ধারিত সময়ের দু' ঘণ্টা বাদে শবাধার নিয়ে গাড়ি যখন রাত ৯টায় ওয়াশিংটন স্টেশনে পৌঁছল, তার অনেক আগে ভিড়ের ধাক্কায় দুজন লোক ট্রেনকাটা পড়ে মারা গেছে; ছজন জখম হয়েছে।

ববির মৃত্যুর পর মিনিসোটা থেকে টেকসাস, ভার্জিনিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সারা আমেরিকায় দিনে রাতের সর্ব সময় লোকে মোটরগাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে রেখে পথ চলেছে। কালো পোশাক পরার মত এ হচ্ছে আমেরিকার আধুনিকতম শোক-ফ্যাসান।

সাড়ে চার বছর আগে ড্যালাস থেকে প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃতদেহ বহন করে একটি বিশেষ বিমান এসেছিল ওয়াশিংটনে। আর্লিংটনের জাতীয় সমাধিক্ষেত্র প্রেসিডেন্টের সমাধিতে আজ চির অনির্বাণ শিখা জ্বলছে। তারই দু'শ' ফুট দূরে ববিরও অনন্ত শয়নের ব্যবস্থা হল। মাত্র ৪২ বছরের জীবনের সমাধি। আলেক-জাণ্ডারের ৩২ বছরের জীবন, ভগবান যীশুর জীবন ৩৩ বছরের; স্বামী বিবেকানন্দের ৩৯, ডঃ মার্টিন লুথার কিংয়ের ৪০, প্রেসিডেন্ট কেনেডির ৪৬, শ্রীচৈতন্যদেবের ৪৭, সুভাষচন্দ্রের ৪৯ বছরের জীবন। কতদিন তাঁরা জীবিত ছিলেন, সেটি এমন বিশেষ কথা নয়—সেই স্বল্প জীবনের অবকাশে কি তাঁরা করেছেন, শুধু তাই শ্রদ্ধায় স্মরণীয়।

গুলীবিদ্ধ হওয়ার আগে রবার্ট কেনেডি বলেছিলেন—এই আমাদের মহান্ দেশ, হৃদয়বান দেশ, সবার চেয়ে সেরা দেশ—এই আমাদের আমেরিকা। তারও আগে বলেছিলেন—দেশের অবস্থা আজ এখন দাঁড়িয়েছে, পরিকল্পনামত কোন কাজে আর হতে দেবার উপায় নেই। কেউ জানে না, আগামী জুলাইয়ের মধ্যে আমার ভাগ্যে কি আছে, কি ভাগ্যে আছে ১৯৭২ সালে। মৃত্যুর আগের সন্ধ্যায় ডঃ মার্টিন লুথার কিংও বলেছিলেন—আজ মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত। আজ মৃত্যুভয় আমি জয় করেছি—কাউকে আজ আর আমি ডরাই না। ডঃ কিংয়ের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল ওয়াশিংটনে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নিগ্রোপল্লী রেজারেকশন সিটিতে শান্তি-অভিযান। কেনেডির অকালমৃত্যুর সদ্য আশঙ্কা চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে আর্লিংটনের জাতীয় সমাধিতে। সেখান থেকে রেজারেকশন সিটি দূরে নয়, তাঁর অ্যাটর্নী জেনারেলের কাজ করা কক্ষের অলিন্দটিও দূরে নয়—দূরে নয় হোয়াইট হাউস, যা ছিল তাঁর চরম লক্ষ্য।

নাটকের পটপরিবর্তনের মত একের পর একটি দৃশ্য—সেই জীবন, সেই সংগ্রাম, সেই মৃত্যু, সেই সমাধি—তারপর বহু কণ্ঠের মিলিত একটি প্রার্থনা—তোমার আত্মার শান্তি হোক!

নজরুল ইসলাম: উচ্চারণ পদ্ধতি ও বিষয়রেখা

শক্তিব্রত ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

নজরুল যখন হুগলি জেলে অনশন-ব্রত, রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে এক তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন অনশন ভাঙবার জন্যে অনুরোধ করে; এবং বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তাঁর প্রয়োজন কতখানি জরুরি, ঐ তারে কবির এই উপলব্ধিটুকু অনুচ্চারিত থাকে নি। একে রবীন্দ্রনাথের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বলা উচিত হবে না, বরং এক আবশ্যিক উপলব্ধিরূপেই তাঁর উদ্বেগ আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে মনে হয়; বস্তুত, নজরুলের গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যে একটু বিশেষ ধরণের। আজকাল দুঃখের সঙ্গেই কখনো কখনো লক্ষ্য করি যে, নজরুল বাংলাদেশের এক বিশেষ মুহূর্তের বিশেষ প্রয়োজনের ফাঁপা-কবি, এইরকম ধারণার বশবর্তী হবার প্রবণতা একই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ও মারাত্মক; তবে আমরা জানি যে ভ্রান্তিও উজ্জ্বল হয়।

মানুষ বেঁচে থাকে দেশে কালে, এবং দেশ ও কালের মানুষই কবিতার বড় প্রসঙ্গ। নজরুলের কবিতার বিষয়বস্তু রূপে যদি কিছু নির্দেশ করতে হয়, তাহলেও বোধ হয় খুব সহজেই বলা যায় যে তাঁর বিষয় মানুষ: প্রেমে-অপ্রেমে, প্রসারে-সংকীর্ণতায় উপস্থিত-অস্তিত্ব বলেই যার অপর নাম জীবন। নজরুলের কবিতায় বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবীক্ষা আছে কিনা, বা থাকলেও তার পরিমাণ ও পরিভাষা কিভাবে রচিত হওয়া উচিত, তা আলাদা প্রসঙ্গ; কিন্তু তাঁর কবিতা পাঠে মানুষই যে তাঁর সর্বময় মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, সে-সম্পর্কে অন্তত কোন দ্বিধা থাকে না। আর মানুষ মানেই তো জীবন: 'বেঁচে আছি' ও 'বাঁচা' কথার মধ্যে সমর্পণ ও উদ্যমের যে তারতম্যটি নিহিত আছে, তাঁর 'জীবন'-সত্য অনুসরণে এই ভেদ-সংকেতটি স্মরণযোগ্য।

নজরুলকে বাংলাদেশ 'বিদ্রোহী-কবি' বলে চিহ্নিত করেছে। কবিতায় বিদ্রোহ ও বিপ্লব শব্দ দুটিকে তিনি বার বার ব্যবহার করেছেন তো বটেই, 'ধূমকেতু'র ফাইল ঘাটলেও দেখা যাবে বিদ্রোহকে তিনি প্রায় আত্মপরিচয়মূলক শব্দ হিসাবেই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। বস্তুত, বিদ্রোহের আলোকে না দেখলে তাঁর পরিচয় ও উন্মীলন বোধ হয় কখনোই যথার্থ হয় না। 'আমি চির-বিদ্রোহী বীর' বলে তিনি আত্মঘোষণা করেছিলেন বলেই তিনি বিদ্রোহী নন, বিদ্রোহ তাঁর সচেতনা; এবং বিদ্রোহমাত্রই যেহেতু উদ্যম, সেই জন্য নজরুলের সচেতনা ও উদ্যম সমার্থক প্রায়। বিদ্রোহের ব্যাখ্যা নজরুল এইভাবে করেছেন: "বিদ্রোহ মানে কাউকে না মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না সেটাকে মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা"। মসজিদ-মন্দিরে, যেখানে 'মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী', তার অর্থ কি বোঝা যায়? মন্দির পূজারীর না দেবতার? 'কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক / জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব' নিয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে 'দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?'—এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর কি? ঈশ্বর অনুসন্ধানে কেন শাস্ত্রবিদ্‌রাই শরণ্য? তাঁরা কি "খোদার খোদ 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'?" পাপই যদি ঈশ্বরের পথ, পাপী বলে এ-সংসারে কি কাউকে সনাক্ত করা যায়? তথাকথিত বারাঙ্গনার কি শুধুই প্রাপ্য? 'সাদা র'বে সবাকার টুঁটি টিপে'? 'সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়'—কেন? 'সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই'—কিন্তু সত্যি কি তা সম্ভব? এইরকম অজস্র জিজ্ঞাসা। মানুষের সহজ বোধ যেখানে মেলাতে পারে না, সেখানেই সে প্রশ্ন করে। এই প্রশ্ন অবশ্যই শিশুর চাঁদ বিষয়ক প্রশ্ন নয়। নজরুলের অনুসরণেই বলা যায়, এ শুধু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা চিহ্নের লাঞ্ছনা নয়, 'বুঝি না' কথাটাকে আত্ম-প্রতারণা না করে ঘোষণা করা। অভাব-বোধের অস্পষ্ট অনুভূতিমাত্র নয়, প্রখর বোধের অনুশাসনে উদ্যত উচ্চারণ।

অভাববোধ কথাটি কিন্তু নজরুলের কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি প্রসঙ্গ। জীবনে সঙ্গতির অভাবে ক্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির ওপরই যেন তাঁর চোখ সবার আগে গিয়ে পড়ে, এবং অচিরাৎ তা তাঁর ভাবনার বিষয় হয়ে যায়। আবার তাঁর ভাবনা কখনোই শান্ত ও নিষ্ক্রিয় নয়; মনে হয় সোজা মসৃণ পথে কোথাও গহ্বর বা ঢিবিগুলি যে শুধুই বাধা, এই বোধে তিনি জাগ্রত। পথ চলতি এই সব সামঞ্জস্যহীন অসঙ্গতির মুখ বড় বেশি আততায়ীর মত দেখায়, ফলে পথ হয়ে ওঠে সংকুল ও দুর্গম, আর রক্তের অভিজ্ঞতা অপ্রতিরোধ্যরূপে উপস্থিত হয়। নজরুলও, রোমান্টিক কবির স্বভাবে, রক্তাক্ত হয়েছিলেন। জীবনের কাঁটার ধার বড় বেশি, কিন্তু এ কি চিৎ-বিশ্বের অভিজ্ঞতামাত্র? নজরুল তো বাইরের দিকেই তাকিয়েছিলেন; এই বহির্জগৎহীন অন্তর্জগৎ কি সাধ্য? এই প্রশ্নের নিরসন তিনি বোধ হয় সহজ-ভাবেই করে নিতে পেরেছিলেন, এবং তথা-কথিত বাস্তবজীবনের সঙ্গতিহীনতাকেই তিনি প্রধান ও প্রথম অসুখ বলে নিরূপণ করেছিলেন; তাঁর সমস্ত অশান্তি ও রক্তক্ষরণ ওই অসুখের আক্রমণজাত।

এই পর্যন্ত ছকে ফেলে তাঁকে অনুসরণ করা যায়; কিন্তু এরপরই বস্তুত তাঁর স্বকীয়তার আত্মপ্রকাশ। আক্রমণশায়ী আর্তি, মেলাতে না পারার জন্যে বিষাদ-বোধ, কোনটাই তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নয়, কিন্তু কখনোই প্রগাঢ়রূপে তার অধিষ্ঠান ঘটতে পারে নি। বেঁচে আছি, দুঃখে বেঁচে আছি, আর্তিতে বেঁচে আছি, বিষাদে বেঁচে আছি,—নজরুল সম্ভবত এই শোচনীয় সমর্পণে অস্তিত্বের সত্যমূল্য খুঁজে পান নি। অসুখকে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছিলেন তিনি, অসুখকে পরাভূত করে, অর্থাৎ অসুখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আক্রমণকে প্রতি-আক্রমণে পরীক্ষা করে। শক্তিসাধনা ফলত তাঁর কবি-চারিত্র্য। কিন্তু এই শক্তির রূপটি তাঁর মধ্যে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, প্রসঙ্গত তাও লক্ষণীয়। তিনি কি আত্মশক্তির উদ্বোধন চেয়েছিলেন, না কি সমষ্টিশক্তির? প্রকৃত-পক্ষে, আমরা যেমন দেশে কালে বাঁচি, তেমনি শুধু একা একা বাঁচি না, সমষ্টি-গত হয়েও বাঁচি। বা, বলা যায়, একাও বাঁচি, একত্রেও বাঁচি। ফলে এই শক্তিকে নজরুল উভয় দিক থেকেই লক্ষ্য করে-ছিলেন: সমষ্টিশক্তি ও আত্মশক্তি দুই-ই তাঁর কাছে বিশেষ জরুরি।

নজরুলের কবিতা পাঠে তাঁর কবি-চারিত্র্যের কয়েকটি সূত্র আমাদের কাছে খুব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি সূত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক, কবির উজ্জ্বল

প্রত্যাশাঘন কণ্ঠস্বর, যা প্রায় প্রেরণার মত অপ্রতিরোধ্য; দুই, কবির অতন্দ্র ব্যক্তি-সাধনা; তিন, অসুন্দর ও অসম্পূর্ণ জীবনে সম্পূর্ণতা ও সুন্দরের জন্য উদ্যমশীলতা, যার পরিণামে নিশ্চিত শুভ প্রতিশ্রুত বলে কবি বিশ্বাস করেন। এখানে প্রথম সূত্রের প্রত্যাশাঘন কণ্ঠস্বর, ও তৃতীয় সূত্রের শেষাংশে যে পরিণামী 'শুভ'-র কথা বলা হয়েছে, এই দুই মোটা-মুটিভাবে এক : কবির অপরিমাণ আশা-বাদ, বা বলা যায়, আদর্শবাদ। এবং এই আদর্শই কবির উদ্দিষ্ট। অপর যে দুই অংশ, অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্র, ও তৃতীয় সূত্রে কথিত উদ্যমশীলতা,—তা ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে অপরিহার্য উপকরণ।

উদ্দেশ্যরূপী আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে উপকরণ, নজরুলের কবিতায় এই দুই সূত্র অতি স্পষ্টভাবেই নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু সূত্রাশ্রয়ী আন্দোলনহীন প্রতিবেদনে কবিতার মর্ম-লোক বোধ হয় উদ্ভাসিত হয় না; আন্দোলন-বিক্ষোভ-মুখরতা, এক অর্থে কম্পনঘন স্পন্দমান উপলব্ধির উচ্চারণেই কবিতার প্রাণস্ফূর্তি সম্ভব। নজরুলের কবিতায় যে এই কম্পন প্রতিশ্রুত, একথা নূতন করে বলবার দরকার নেই। এই কম্পন যে তাঁর কবিতায় সঞ্চারিত হতে পেরেছে তার কারণ সম্ভবত উদ্দেশ্য-অর্জনের পথে উপস্থিত বিঘ্নসমূহ সম্পর্কে কবির সচেতনতা। পর পর নজরুলের তিনটি উক্তি প্রাসঙ্গিক কারণে এখানে উদ্ধার করা চলে :

১। 'ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না।'

২। 'দেবতা তার ঝড় জল নিয়ে, প্রকৃতি তার রোগ মহামারী নিয়ে তোকে পিষে ফেলতে ব্যস্ত। আচার তার জগদ্দল পাথর তোর বুকে বসিয়ে দিয়েছে—সমাজ তোর কণ্ঠরোধ করে ফেলেছে। ধনীর অট্টহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনী ঢেকেছে।'

৩। 'আমি' হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী।'

এই উক্তিগুলি তাঁর বিঘ্ন-সচেতনতার সমর্থক। সাধারণভাবে দেখলে এই বিঘ্ন-গুলি তাঁর চেতনায় এই : (ক) পরাধীনতা : তার আনুষঙ্গিক বিকার সহ; (খ) সামাজিক কুসংস্কার : অসাম্য ও অন্যায়ের বিচিত্ররূপ; (গ) সাম্প্রদায়িকতা।

তাঁর পরাধীনতার বোধ যে খুবই প্রখর ছিল, তার সমর্থনে নির্বিচারে কিছু উদ্ধৃতি সংকলন করা যেতে পারে : 'সাদা রবে সবাকার টুঁটি টিপে' (ফরিয়াদ) : 'নির্যাতনের যষ্টি দিয়া শত্রু আঘাত হানে' বা, 'ফাঁসির রশ্মি ধরি'/আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা' (অন্ধ স্বদেশ-দেবতা); 'সপ্ত সিন্ধু তের নদী পার/দ্বীপান্তরের আন্দামান,/...সেথান হতে কি বেতার-সেতারে/এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর ?' (দ্বীপান্তরের বন্দিনী); 'ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে!' (আমি গাই তারি গান); 'অধীন দেশের বাঁধন বেদন/কে এলো রে করতে ছেদন ?' (পাগল পথিক); ইত্যাদি। লক্ষণীয় : এই সব উদ্ধৃতিতে শুধু পরাধীনতার বোধ নয়, একটা বরফ যে অন্তত বিশ্বাসের উত্তাপে তরল হচ্ছে, তার মর্মরও শোনা যায়। 'দ্বীপান্তরের আন্দামান' বলে পরাধীনতার কর্কশ বাস্তবিকতা প্রতিষ্ঠিত করবার পর 'বেতার-সেতার' প্রয়োগ করে কবি সুর-মর্মর ধ্বনিত করতে পারেন নি, এমন কি 'সুর' শব্দও তার নগ্ন শাব্দিকতাকে অতিক্রম করতে পারে নি ঠিক, কিন্তু ওই 'মুক্ত-বন্ধ' শব্দবন্ধের প্রয়োগ এত উদ্যত যে, তার দ্বারাই সমানশক্তি প্রতিরোধের সাম্যে উচ্চারণকে প্রতিষ্ঠাদানে তিনি সক্ষম হয়েছেন। অথবা যখন তিনি বলেন, 'পরাধীনা অনাথিনী জননী আমার', বা দেশের অধীনতাকে 'বাঁধন বেদন' রূপে লক্ষ্য করেন, তখন তাঁর অনুভূতি এক নম্র-মৃদু খাদে নেমে আসে বটে, তবু উদ্যম-হীন অনুভূতিচর্চাতেই তিনি যে অবসিত হতে চান নি, উদ্ধৃত পংক্তি-গুলির মধ্যেই তার পরিচয় আছে। 'ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত', 'কে এলোরে করতে ছেদন' ইত্যাদি অংশে অনুভূতিকে উদ্যত করে লালন করেছেন তিনি, এবং 'শাসতে জুলুম নাশতে জোর/খদ্দর বাস বর্ম তোর রে' (চরকার গান), 'সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই' (সব্যসাচী) ইত্যাদি অংশে সেই উদ্যমশীলতাকে শাণিত করে তুলতেই তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। এই দুইটি অংশে যে আপাতবিরোধ আছে, তা পথসন্ধানের অস্থিরতারই দ্যোতক, ফলে এই তথাকথিত বিরোধ পক্ষান্তরে তাঁর অনুভূতির উদ্যমী শক্তিকেই প্রত্যায়িত করে তোলে।

এইরকমভাবেই দেখা যাবে, বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার ও আনুষঙ্গিক বিচিত্ররূপ অন্যায় ও অসাম্যকে তিনি যে বিঘ্নস্বরূপতায় দেখেছেন, তার কারণ উদ্দেশ্য তথা আদর্শ অর্জনের পক্ষে তা প্রতিবন্ধক; এই বাধা তাঁর অনুভূতিকে যখন আঘাত করে তখন তা উদ্যত হয়ে ওঠে, উদ্যমহীন নিশ্চয়তার আস্ফালনে কবি কখনোই অনুভূতিকে নিষ্ফল হয়ে যেতে দেন না। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই-খানেই নজরুল সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ভুল করে থাকি, উদ্যমশীলতা বা অনুস্পন্দিত ক্রিয়াশীলতার সূত্রটির দিক থেকে লক্ষ্য না করলে এইরকম প্রমাদ ঘটবেই। খুব কম কবির মধ্যেই অনুভূতিকে উদ্যোগীমার্গে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়, নজরুলের কবিতা এই দিক থেকে বাংলা কবিতায় যে খুবই বিশিষ্ট, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিচিত্ররূপ সামাজিক কুসংস্কার, সাম্য ও ন্যায়নীতির বিপর্যয় কবির চৈতন্যে সহজেই ধরা পড়েছে। 'সব্যসাচী' কবিতায় বিবেকহীন ধর্মাচরণের নিষ্ফলতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বললেন, 'পূজা করে শুধু পেয়েছি কদলী'; কিন্তু আমাদের জীবন যে কতগুলি সংস্কারগণ্ডীর মধ্যেই চৈতন্যহীনভাবে আবদ্ধ, এই বাস্তবিকতার বোধটি তিনি আড়াল করেন নি : 'মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি/টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি'। তবু 'এইরকম বদ্ধতা যে কখনো কখনো জাগ্রত চৈতন্যেও ধরা পড়ে, 'আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার/মূল সর্বনাশের', (অন্তর ন্যাশনাল-সঙ্গীত) ইত্যাদি উক্তিই তার পরিচায়ক। যেখানে আচারবদ্ধতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়, অর্থাৎ তার মধ্যেই সর্বনাশের মূল যখন দেখা যায়, তখন চৈতন্যের উচ্চারণ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক; 'এরে ভাঙিব এবার'—এই ঘোষণা এখানে ফলত সঙ্গতিপূর্ণ লাগে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সনাক্তকরণ নয়, বাসনার প্রত্যক্ষ ঘোষণাও নয়, অসঙ্গতির মধ্যে জীবনধারণের যে অসহায়তা, ন্যায়-নীতি-স্বাভাবিকত্বের পরাজয়ে সততার যে বেদনা, নজরুল প্রধানত সেই 'আহত অনুভূতির চর্চার মাধ্যমেই অনুভূতির শক্তিকে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত/ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত কাড়ছে থালার ভাত/মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই ক' আমার হাত'। (কৃষাণের গান); 'দারিদ্র্য অসহ/পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ/আমার দুয়ার ধরি!' (দারিদ্র্য); 'ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি/আমরা মুটে কল্ খালাসী!' (শ্রমিকের গান); 'এক সমাজকে মানলে করবে/আরেক সমাজ নির্বাসন', (সত্য-মন্ত্র); ইত্যাদি পংক্তিতে আহত অনুভূতির অসহায়তা খুবই প্রকাশ্য। এই আহত অনুভূতিই ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তখন তা অনায়াসে বলতে পারে, 'মাটীতে যাদের ঠেকে না চরণ/মাটীর মালিক তাঁহারাই হন—/যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান'; (ফরিয়াদ)। 'ভণ্ড', 'ধড়িবাজ'—এই শব্দগুলির প্রয়োগেই ক্ষোভের কণ্ঠস্বর এখানে ধ্বনিত : এই লগ্ন নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে অনুভূতির মুক্তির উষাকাল। এই ক্ষোভই অচিরাৎ প্রশ্ন তোলে : 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া/ছুঁলেই তোর জাত যাবে?' (জাতের বজ্জাতি) : প্রথম

সওদা

জয়ন্তী সেন

সকাল থেকে ফেরিওয়ালার শব্দ শুনতে পাই—
সুখের ঝুড়ি দুঃখের ঝাঁপি বয়ে আমার ঘরের সামনে
ওরা দিনরাত ডেকে যায়। রঙচঙে মোড়কে ঢাকা
সেই সুখ-দুঃখকে সাধ করে ঘরে তোলবার সময়
দাম মেটানোর প্রশ্ন মনেও পড়ে নি।
সুখকে বুকে রাখার যন্ত্রণায়
যন্ত্রণাকে বুকে রাখার সুখে
আমি দিনরাত তাদের দু' মুঠিতে আঁকড়ে ধরে থেকে
তারপর চমকে দেখি
আমার হৃদয়কে কখন ওরা উপড়ে নিয়ে গেছে।
অথচ যাকে যে অর্থে চিনেছিলাম
মোড়ক খুলে খুলে হিসাব মিলিয়ে দেখি আমি কিছুই
পাই নি।

সকাল থেকে ফেরিওয়ালা হেঁকে যায়
রোদ্দুর ছায়া, আশা নিরাশার, সত্যি মিথ্যার সওদা নিয়ে
নতুনত্বের মোড়ক দেখে লোভীর মত হাত বাড়াই,
তারপর বুকের ভেতরটা খালি করে নিঃস্ব করে
সারা জীবনের ভুলের বোঝা ব্যর্থতার জমিয়ে তুলি।

হৃদয়ের অভাবে সুখ দুঃখ বুকেও বাজে না।

অবাধ্য বালক

শান্তনু দাস

তাঁর ঘৃণা যত ছোঁড় মুখের আদলে
থুথু কিংবা পাহাড়প্রমাণ অভিশাপ
জঞ্জাল জড়ো হলে মুখে
মনে হয়... মনে হয়
ততই পবিত্র হচ্ছি প্রতিদিন, দুপুর গড়িয়ে কোন সন্ধ্যার আকাশে
ঃ প্রতিদিন সূর্য সাক্ষী রাখি
হে অথর্ব জানু,
তোমাকে বিদ্রূপ করলে বুকে শব্দ হয় ঃ

হে অথর্ব জানু,
মৃদঙ্গ বেজেই চলে, চওড়া বুকে শব্দ ওঠে ক্রমঃ।
পণ্ডিতপ্রবর, যতই চাবুক নাড়ো মেঘে মেঘে বেলা বয়ে যায়
শাণিত দু চোখ ভেঙে অবাধ্য শোণিত
সিঁড়ি থেকে সিঁড়ি ভেঙে রক্তে গিয়ে মেশে ঃ

যতই চাবুক তোল রক্তে রক্তে সর্বনাশা ঝড়
যতই চাবুক তোল ঘৃণাগুলি ফুল হয়ে ফোটে
যতই চাবুক তোল দুরন্ত রাত্রির বুকে
শব্দ তোলে অবাধ্য বালক ঃ

পংক্তির তীব্র ক্ষোভ দ্বিতীয় পংক্তিতে অবিশ্বাসের প্রশ্নে উত্তীর্ণ। এখন আর অসহায়তার কোন বেদনা নয়, এখন স্থির-বুদ্ধি ঠিক করে নিতে পারে, 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।' (আমার কৈফিয়ৎ); অথবা, 'শ্রমণের চেয়ে পূজ্য ভেবেছি শ্রমে।' (বিংশ শতাব্দী)। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটির মধ্যে অনুভূতি নিষ্ক্রিয়তার আড়াল থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে জীবিত ও উদ্যত হয়ে উঠছে, তার উন্মীলীয়মানতাই বিশেষ লক্ষণীয়। এবং এই ক্রমানুসরণে বিপত্তি ঘটলে, 'ভাঙি মন্দির, ভাঙি মস্‌জিদ,/ ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত—/এক মানবের একই রক্ত মেশা',—তারস্বর ঘোষণামাত্র বলে মনে হতে পারে; অথবা, 'যাহাদের নিঃশ্বাসে/জীর্ণ পুঁথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।/যারা ভেঙে চলে অপ-দেবতার মন্দির আস্তানা,/বক্-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়ি-খানা।/যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,/সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।' (আমি গাই তারি গান),—তাদের গান তথা বন্দনা আবেগের আকস্মিক অশ্রুৎপাত বলে ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়।

'হিন্দু-মুসলিম-যুদ্ধ' কবিতায় সম্প্রদায় সমন্বয়ের ভাষ্য রচনা করে কবি সাম্প্রদায়িকতার বিষয় সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?' (কাণ্ডারী হুশিয়ার), এই প্রশ্নের ভয়াবহ বিভ্রান্তপতাকে তিনি অতিক্রম করবার প্রয়াস পেয়েছেন বিশ্বাসের শক্তিতে, যেখানে 'হিন্দু মুসলিম দুই সোদর' (চরকার গান)—এই অনুভূতির প্রত্যয়ে তিনি সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। এবং বলা বাহুল্য, বিশ্বাস ও প্রত্যয় যে কোন জড়-খণ্ডমাত্র নয়, বরং তার দৃঢ়মূল বোধ, যা উত্তীর্ণ করে দেয়, তার মধ্যে যে-কোন না কোন রকমে ক্রিয়াশীলতা বর্তমান থাকে, নজরুল অন্তত তার পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

এই সব অতি-নিরূপিত বিষয় সম্পর্কে কবির সচেতনতা সর্বত্রই খুব প্রখররূপে উপস্থিত সন্দেহ নেই, কিন্তু কখনো কখনো এই সব যে প্রতিকারহীনভাবে প্রতিভাত হয়, নজরুলের কাব্য-পংক্তি অনুসরণে ইতিমধ্যে তা আমাদের গোচরে এসেছে। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে অতঃপর অনিবার্যরূপে উপস্থিত হয় ঃ আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতনতার দাবি। আত্মশক্তির অপরিমাণ, অফুরান উন্মীলনেই উপস্থিত বিষয়সমূহকে অতিক্রম করে যাওয়া যায়, অসহায়ভাবে আর তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় না। কাজেই নজরুলের কবিতায় তাঁর উদ্দেশ্য অর্জনের উপকরণ মোটামুটি দুইরকমের দেখা যায় ঃ এক, বিষয়-সচেতনতা; দুই, আত্মশক্তির উপলব্ধি ও উদ্বোধন।

কবি-চেতনা এক অর্থে সমাজ-চৈতন্যেরই প্রতিরূপ বটে, কিন্তু কবি-ভূমিকার আলংকারিক সামাজিক অবস্থান ব্যাপারটাকে নজরুল সম্ভবত খুব নিরাপদ বলে মনে করেন নি। কাজেই কবি-চৈতন্য বা এক অর্থে ব্যষ্টি-চেতনাকে সমাজ-চৈতন্য বা সমষ্টি-চৈতন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত বা উদ্বোধিত দেখতেই তিনি চেয়েছিলেন; এবং এই কাজটা তাঁর কাছে খুব জরুরি ছিল। এই জরুরি-বোধ কবিতায় কতখানি কৃতার্থ হতে পারে, বা এ থেকে কবিতার কতটা উপকার হতে পারে, এই প্রশ্ন হয়তো অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত হবে না, তথাপি নজরুলের ক্ষেত্রে এই তথ্যটি খুব বিশিষ্টভাবে উপস্থিত, তা-ও সংশয়াতীত। কবির উদ্বোধিত চৈতন্য সমষ্টি-চৈতন্য-স্বরূপে স্থিতি চেয়েছে। এবং এখানেই কবির উদ্যমশীলতা। সমষ্টির মধ্যে চৈতন্যের উন্মেষ অর্থে সমষ্টির মুক্তিই তাঁর কৃত্য। সাধারণভাবে একে রাজনীতির ক্ষেত্র বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নৈতিকতাবোধেরই ক্ষেত্র মাত্র। এবং কোন কবিই বোধ হয় নীতিবোধের অবশ্যম্ভাবী বলয় থেকে মুক্ত নয়; নজরুলও, কবি বলেই, জাগ্রত ছিলেন নৈতিক-চৈতন্যে। ফলে, দেখা যায়, নজরুল যখন কথা বলেন, তখন তা একদিকে তাঁর নিজের কথা বটে, অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তি-কণ্ঠই সেখানে উচ্চারিত অবশ্য, তথাপি তা একই সঙ্গে সমষ্টিকণ্ঠও আবার। নজরুলের কবিতার উচ্চারণরীতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা যে আলোচনা করেছি, তার বিশিষ্টতা যে তাঁর এই মনোভাব, অর্থাৎ কবি-চৈতন্যের এই সত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সংশ্লিষ্ট এবং অন্বিত, অতঃপর তা আর আড়ালে থাকে না।

(শেষাংশ)

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ দুই ॥

অনেক রাত্রি পর্যন্ত নন্দকিশোরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ডুয়ার্স নিয়ে।

আজকের ডুয়ার্স দেখে অবাক হতে- হয়।

যেন অনেকদিনের আশ্চর্য যাদুদণ্ড-স্পর্শে রাতারাতি বদলে গেছে সব। অতীতের ডুয়ার্স দুঃস্বপ্ন। অন্ধকার যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। একটা নাটক অভিনীত হচ্ছে মঞ্চে। নতুন নাটক। তাতে সম্পূর্ণ নতুন নতুন মুখ। নতুন সব শিল্পীরা পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে আসছেন। নানা অ্যাঙ্গেল্ থেকে স্পট্ লাইট ফোকাস্ মুখে নিচ্ছে তারা।

অভিনয় আরম্ভের আগে পর্যন্ত কোথায় ছিলেন দর্শকরা? নিশ্চয়ই এদিক-ওদিক ছিলেন। আড়ালে-আব্‌ডালে। এখন যে-যার জায়গা আলো করে বসেছেন। দর্শকের সারিতে অসংখ্য মানুষ।

এক কথায় রূপান্তর।

ইতিহাস-বিধাতা যেন মস্ত বড় এক বায়স্কোপওয়ালা। হাসি-হাসি মুখে ভেল্‌কি দেখাচ্ছেন। নতুন যুগ। নতুন কাল। নতুন মানুষ। নতুন নতুন রাস্তাঘাট।

চিরকাল এই মানুষের ইতিহাস। পুরান পাল্টায়। জীর্ণ নির্মোক খসে। পুরান পাতা ঝরে পড়ে মাটিতে। সেই মাটিতে জমে পচে সার হয়। তার মধ্যে আবার নতুনকালের শিশুচারার অংকুর উঁকি দেয়। আজ যেখানে অরণ্য, কাল বিধাতার অব্যর্থ নিয়মে সেখানে গড়ে ওঠে বিশাল নগরী। যা-ছিল এককালের বিস্ময়, তা হারিয়ে চাপা পড়ে যায় মাটির অজানা তলায়।

বেবিলনের নাম একালে অতীতের ইতিহাস। বেবিলন হারিয়ে গেছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে শক্তিমান এথেন্সের বীরদর্প। স্পার্টার অতি উচ্চ বিজয়-ধ্বজা একালে আর চোখে পড়ে না। ট্রয় নগরীর কথা কিংবদন্তী। অতীত উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে আজ কবি-কল্পনার আলোকে ধীরে ধীরে পথ চলতে হয়। প্রাচ্যের একদা বিস্ময় তাম্রলিপ্তের বন্দরে-বন্দরে একালে আর নেই দেশ-বিদেশের বণিকশ্রেষ্ঠদের আনাগোনা।

অনগ্রসর অনাদৃত অন্ধকার ডুয়ার্সেও পালাবদল ঘটেছে।

তীব্রস্বরে রেডিও বেজে উঠল হঠাৎ। রাত্রির অন্ধকার ফুঁড়ে। একটা অর্কেস্ট্রার সুর ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাসকে ভেঙে খান-খান করে দিচ্ছে।

নন্দকিশোর উঠল। বলল, পাশের বাড়িতে। দাঁড়ান জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। জানালা খোলা ছিল। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি।

কী যে রুচি হচ্ছে মানুষের। ফিরতে ফিরতে নন্দকিশোর মন্তব্য করছে স্বগতোক্তির মত। আমার কানে এল। দিনকাল ক্রমেই দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

কি পাল্টে যাচ্ছে?

নন্দকিশোর সামনে এল। বলল, দেখুন না, এত রাত্রে ভাবনা-চিন্তা কিছু নেই, রেডিওর ভল্যুম চড়িয়ে দিয়েছে।

তুমি রেগেছ!

কাঁহাতক না-রেগে থাকি বলুন তো!

সামনে এসে বেতের চেয়ারটায় বসতে বসতে বলল, মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা সব এত দ্রুত লোপ পাচ্ছে যে, ভয় হয়।

এক সেকেণ্ড থামল, আসলে কি জানেন, মানুষের সহানুভূতি বস্তুটা কর্পূরের মত উড়তে উড়তে একেবারে শূন্যে এসে গেছে। মানুষের মনুষ্যত্বই যদি না-থাকে, তো এত সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এত চিন্তা-দর্শনের মানেই বা কী! আমরা চাঁদে লোক পাঠাচ্ছি বটে, কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকবার এই জায়গাটা পৃথিবীটাই যে আগাগোড়া এক অর্থহীন রাজ্য হয়ে গেছে।

নন্দকিশোরের কথা আমি স্বীকার করি। বললাম, এ-সব ভাবনা যত কম করা যায় ততই মঙ্গল।

নন্দকিশোর বলল, না-ভেবে থাকব কি করে! সব সময়েই ভাবনা হয়। আমাদের ছোটবেলায় তবু ভালো ছিল। তখন একটা সমাজ ছিল। সকলের কথা সকলে এক-আধটু ভাবত। নগর সভ্যতার যত বিস্তার হচ্ছে, মানুষ তত প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে! কলকাতা শহরের কথা মনে না-আনাই ভালো। এ-বাড়িতে লোক মারা যাচ্ছে, পাশের ফ্ল্যাটে উৎসব হচ্ছে। আইন করে এ-সব জিনিষ সংশোধন করা যায় না।

নন্দকিশোরকে বললাম, পাশের বাড়িতে কে থাকেন?

তিনিও আমারই মত কন্ট্রাক্টর। দিনের বেলা দেখেন নি বুঝি? মস্ত বড় তেতলা বাড়ি। টাকা রোজগার করে ভদ্রলোক যেন ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। এখানকার সবকিছুতে খবরদারী করছেন। স্কুলের গভর্নিং বডিতেও আছেন।

নন্দকিশোর বাকিটা শেষ করল ম্লান একটু হাসির সঙ্গে, বলা চলে একজন সেল্‌ফ্‌মেড সমাজপতি।

তার কথাটা আমি ভাবলাম। সেল্‌ফ্‌-মেড্‌দেরই যে রাজত্ব একালে। প্রায় সকলেই নিজে নেতা হন। সেকালে নেতৃত্ব ছিল সকলের শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আন্তরিক-ভাবে সকলের সেবার মাধ্যমেই তিনি সকলের সামনে আসতেন। বিপদে-আপদে মানুষ ছুটত তাঁর কাছে। বিশ্বাস ছিল, তাঁর কাছে গেলে সাধ্যমত তিনি পাশে দাঁড়াবেন।

এ-যুগে রাতারাতি অনেক টাকার দৌলতে একেকজন মানব-দরদী হন। মানবতাবাদী হন। অনেক সময় তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-প্রবৃত্তি কিছুই থাকে না। যতকাল বেঁচে থাকেন ভণ্ডামি করে চলেন। পাড়ার ছেলেদের ডেকে মিষ্টি খাওয়ান।

লাইব্রেরী করছ না কেন তোমরা?

খুবই জ্ঞানীর মত বলেন। চশমার আড়ালে চোখ পিট্‌পিট্‌ করে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। করছ না কেন? মোসাহেবরাও তৎপর হন সঙ্গে-সঙ্গে। বলেন, দাদা নিজে যেখানে রয়েছেন সেখানে তোমাদের ভাবনা কী।

ছেলেরা শ্রদ্ধা-গদগদ হয়।

এই তোমাদের বয়স। তোমরাই পাড়ার প্রাণ। বাকিটুকুও তিনি যোগ করেন গম্ভীর মুখে। বলেন, টাকাই না-হয় রোজগার করেছি কিছু। মানুষের মত মানুষ আর হতে পারলাম কোথায়? তাই যারা এখনো ছোট, যাদের ভবিষ্যৎ আছে তাদের জন্য ভাবতে হয় বৈকি।

কথা শেষ করে এক্সিকিউটিভ্‌ চেয়ারে নড়েচড়ে বসেন তিনি।

মোসাহেবদের কেউ বলেন, যাও, যাও। দাদাকে প্রেসিডেন্ট করে আজই শুরু করে দাও গিয়ে।

নামটাও তাহলে আপনি দেন, দাদা। ছেলেরা অনুরোধ করে।

নামটা যেন মুখের সামনেই ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দেন, বিদ্যাসাগরের নামটা দাও না? ক্লাবের সঙ্গে লাইব্রেরী থাকবে। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী অ্যান্ড ক্লাব।

গ্র্যান্ড্‌! মোসাহেব উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বলা বাহুল্য, টেবিলের ওপর রক্ষিত হাত দুটি তিনি তখন প্রাণপণে কচলে চলেছেন।

সমাজপতি দাদা কিন্তু তখনো শেষ করেন নি, বিদ্যাসাগরের মত এতবড় মহাপুরুষ আর কে জন্মেছেন আমাদের দেশে! সব দিকেই তিনি জাতির নমস্য। লেখাপড়াই না-হয় করি নি, সময়ই পাই নি। তাবলে বিদ্যাসাগরের প্রতিভা তো জানি।

ডুয়ার্সেও এমন কর্মবীর সমাজনেতা এ-যুগে শতেক আছেন জানি। আচার-আচরণে মহাত্মা গান্ধীর একেকজন খাঁটি চেলা। বাড়ির ড্রইংরুমে বা খাস চেম্বারের দেয়ালে মহাত্মাজীর তৈলচিত্র বাঁধিয়ে রাখেন। তাতে কিন্তু বিস্তর মাকড়সার জাল জমেছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখবারও সময় পান না। জাতির পিতার তৈলচিত্রের সামনেই প্রতিদিন নানা ভূমিকার অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের বই বাঁধান থাকে দেয়াল-আলমারীতে। এ'দের একজনকে জানি, যাঁকে একদা একজন মোসাহেব স্তুতি-ছলে বলেছিলেন দাদা, আপনার নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতেও অগাধ পান্ডিত্য?

সমাজপতির ললাটে ক'টি কুঞ্চন-চিহ্ন পড়ল। তিনি বললেন, সেটি কি?

আজ্ঞে, রবীন্দ্রসঙ্গীত। সমাজনেতার বিস্মৃত ভক্তটি যথারীতি হাত কচলাচ্ছেন।

বলছি তো, জিনিষটা কি? আগে সেটা শুনি।

আজ্ঞে সঙ্গীত, মানে গান! রবীন্দ্রনাথের গান।

কেমন করে বলেছিলেন জানি না। নিশ্চয় থতিয়ে-থতিয়ে। গলা কাঁপছিল। অনুমান করতে পারি।

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। বাইরে প্রতীক্ষারত পাত্র-মিত্র আর্দালি বয়-চাপরাশী যে যেখানে ছিল—চমকে উঠল। সমাজপতির মুখখানা রাঙা-আলুর মত টক্‌টক্‌ করছিল। চিৎকার করে উঠলেন তিনি টেবিলে ঘুষি দিয়ে ব্লাডি সোয়াইন! ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাও নি? বেরোও। গেট আউট ফ্রম মাই রুম। গেট্‌ আউট।

নন্দকিশোরের পাশের বাড়ির সেলফ্‌মেড্‌ ম্যান্‌টির গল্প শুনলাম। প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় আসেন ভদ্রলোক এখানে। জলপাইগুড়িতে থাকতেন। শোনা যায় নাম ভাঁড়িয়ে ছিলেন ওখানকার এক হোটেলে। পরে শোনা গেল, তিনি নাকি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। জ্যোতিষতত্ত্বের কিছু জানতেন কি না আমি জানি না। আমার সঙ্গে কোন পূর্বপরিচয়ও ছিল না। তবে কাজেকর্মে প্রায়ই জলপাইগুড়ি গেছি, শুনেছি ভদ্রলোকের অসাধারণ যোগবল মাহাত্ম্যের কথা। তিনি প্রায় সারা রাত্রি চোখ বুজে ধ্যানে কাটান। সকালে শীর্ষাসনে থাকেন এক ঘন্টা। তারপর এক ঘন্টার জন্য বাইরে আসেন। দেখতে নিতান্ত সাধারণ। সকালে ওই এক ঘন্টা সময় তিনি খুব পীড়াপীড়িতে এক-আধজনের হাত দেখে দেন। এবং আশ্চর্য এই যে, সে ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ফলবেই ফলবে। দৃষ্টি পড়ল চা-ম্যাগনেটদের তাঁর প্রতি। সেই কল্যাণে তিনি তখন তাঁদের দামী গাড়িতে যাতায়াত করছেন।

অবশেষে টাকা-পয়সা কিছু কামিয়ে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ। কেউ বলল, শিলিগুড়িতেও নাকি ছিলেন কিছুদিন। কেউ দেখে নি অবশ্য। পরে জানা গেল, জ্যোতিষী তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। এখন করছেন কর্মের সাধনা! চলে গিয়েছেন ভুটানের দিকে।

ইতিমধ্যে বয়স চাল্লিশ গড়িয়ে গিয়েছে। কোথা দিয়ে চলে গেছে যৌবন। কিন্তু চেহারায় এসেছে জেল্লা। সিল্কের মূল্যবান পাঞ্জাবী। পরনে পাজামা। দুই হাতের আঙুলে ছটা আংটি। নীলা, গোমেদ, প্রবাল, চুনি এবং পান্না ছাড়াও শংখের আংটি একটা।

এই অবস্থায় তাঁকে দেখা যেত ডুয়ার্সে। মাঝে মাঝে এখানকার হোটেলেও নাকি অতীতে দু'-একদিন কাটিয়ে গেছেন।

অবশেষে নতুন উদ্যমে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ রথীন্দ্রকান্ত চৌধুরীর। ও হো নাম ভুলেই গেছি— বলতে। আর নাম দিয়েই বা হবে কী। একালের রথের যিনি একজন রথী, তাঁর নাম রথীন্দ্রকান্ত না হয়ে অন্য কিছু হলেই বা এসে যেত কী। নামের পরিচয় যে-কালে ছিল, সে-কাল লোপ পেয়েছে। এখনকার পরিচয় বাড়ি গাড়ি ও নারীতে। সুন্দর একখানি বাড়ি চাই। তার সামনে থাকবে লেটেস্ট মডেলের গাড়ি। বছর বছরই পাল্টাতে হবে। নইলে মডেল লেটেস্ট হবে কি করে।

ভদ্রলোক কি বিয়েও করেছেন? কৌতূহলী হয়ে আমি শুধিয়েছিলাম।

হাঁ, ওইখানেই ভদ্রলোক সবকিছুকে টেক্কা দিয়েছেন। বলতে গেলে সত্যি-কার আধুনিক হয়ে উঠেছেন। শোনা যায়, উনি কার বৌকে নাকি বিয়ে করেছেন। সে-বিবাহ

ইষ্টার্ন রবার ওয়ার্কস
কলিকাতা-১৫

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গান্ধর্ব-রাক্ষস অথবা পৈশাচ—কোন শ্রেণীর জানি না। শুধু এইটুকু জানি ভদ্রমহিলা কখনো বাড়ি থেকে বার হন না। আমি এই পাশের বাড়িতে থেকেও তাঁকে কোনদিন দেখি নি। এত বড় একটা প্রাসাদোপম বাড়ির ভিতর সারাদিন কিভাবে তাঁর কাটে জানি না। তবে এইটুকু জানি, ভদ্রলোকের বাড়ি দেখা-শোনা করতে সর্বক্ষণের জন্য একজন থাকে। সে হারামজাদা আবার এক নম্বরের মস্তান্।

রাত্রে আহারের পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি এইসব কথা। মস্ত খাটে গদিওয়ালা বিছানার ওপর জোড়া-বালিশ। বালিশে ফুলতোলা ঢাকনি। নতুন নেটের মশারি টাঙিয়ে গুঁজে দিয়ে গেছে নন্দকিশোরের বৌ। তেপায়ার এক গ্লাস জল। রাত্রে ঘুমোবার আগে এক গ্লাস জল খাওয়ার নিয়ম চিরকাল।

ওদের বললাম, যাও, এবার তোমাদের ছুটি।

নন্দকিশোর দাঁড়িয়েছিল কাছে, বলে, হ্যাঁ ছুটি বলে ছুটি! এইবেলা খুকুর জেগে ওঠবার সময় হল। আর বলবেন না, সারারাত জাগিয়ে রাখবে ওর মা-কে।

মায়ের মুখ দেখি না। নন্দকিশোরের কথায় নিশ্চয় ওর মুখে এক-ঝলক লজ্জার আভা দেখা দিয়েছে। না-দেখেই বলি, মা-কে তো কষ্ট করতেই হবে।

কাচের চুড়ির শব্দ শুনি ওর হাতে। বলে, দাদা—কিন্তু লজ্জা করবেন না। দরকার হলে কলিং বেল্ টিপবেন। ওই যে দরজার ওপর।

ওরা চলে গেল। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। ঘুমের দোষই বা কী! সারাদিন আজ কম উত্তেজনা গেল! বাস্‌স্ট্যান্ডে নন্দকিশোরের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার পর থেকে যেন একটা নতুন পরিবেশে এসে উপস্থিত হয়েছি।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

ন্যাশন্যাল ডিল্যাক্স"

১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন :

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

রাস্তার ওপর ভারী ট্রাক-লরিগুলির ছুটন্ত চাকার শব্দ। কাঠের বাংলো ধরণের বাড়ি। ঘরখানা তাদের দাপটে কেঁপে কেঁপে উঠছে। অবশ্য প্রথম রাত বলে আমি উপলব্ধি করছি এটা। দু'দিন থাকলেই জানি সহ্য হয়ে যাবে। মনে মনে ভাবি, আজ আমি এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক দশকে নিশ্চিন্ত-মনে ঘরের মধ্যে পরিপাটি বিছানায় বালিশে শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছি, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ-আহ্লাদ কিছুরই অভাব নেই, কী ছিল সেই যুগে? আজ থেকে বেশি দূরে না, কম করে ত্রিশ-চল্লিশ বছর পেছনে তাকালেই দেখব, এখানে ছিল জলা-জংলার আদি বাসভূমি। বিষাক্ত সাপ-খোপ বাঘ-ভালুকের রাজত্ব।

ঊনিশ শতকের শেষদিক থেকেই ডুয়ার্সের উন্নতি হতে সুরু হয়। নতুন উপনিবেশের বুক জুড়ে তখন ইংরাজি শাসন ও সভ্যতা বেশ খানিকটা পথ হাঁটছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা নয়। বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সহজ সাবলীল হাঁটা। ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। চা-বাগান। বন কেটে বসতই শুধু নয়, শাসনতান্ত্রিক সুশৃংখলাও। এই রাত্রে রাস্তাগুলি কাঁপিয়ে ছুটে-চলা মাল-বোঝাই গাড়িগুলি দেখলে কে মনে করবে সেই দিনগুলিকে, যেদিন প্রথম এই রাস্তাগুলি তৈরি হয়েছিল?

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই ধীরে ধীরে রাস্তাগুলির সময়োচিত পুনর্গঠন ও সংস্কারে মন দেওয়া হয়। তখন ছিল না টাক-লরি, ছিল না ক্রেন্। যন্ত্র-দানবের এত সহযোগিতা। মনের মধ্যে একটা ছবি ভেসে উঠছে আচম্বিতে আজ রাত্রে। ধুলোমাখা প্যান্ট-সার্ট পরনে দাঁড়িয়ে আছেন ইঞ্জিনীয়াররা। রৌদ্র-জল-বৃষ্টিতে চলেছে একটানা কাজ। রাত্রে জ্বলছে অগুন্তি আলো। আগুন জ্বলছে। পাথরের টুকরো আনা হয়েছে মোষের গাড়িতে। দিনের বেলা ফেলে রেখে গেছে গাড়িগুলি। ইতিমধ্যে জঙ্গল উৎসন্ন করে মাপজোকা হয়েছে রাস্তা। তারপর নামল বোল্ডার রাশি রাশি। সাহেবরা মাঝে-মাঝে দেখাশোনা করতে আসছেন। মাঝে-মাঝে হাতী-ঘোড়াকেও কাজে লাগানো হচ্ছে।

এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ আমলে রাস্তাঘাটের উন্নতি আরো বেশি। যুদ্ধ ঘনিয়ে এল ঘরের কাছাকাছি। বার্মায় ইম্ফলে-মণিপুরে, নাগা ফ্রন্টে। নানা দিকে। প্রস্তুত রাখতে হচ্ছে সেজন্যে। খাদ্য চাই ঔষধ চাই, অস্ত্র চাই, গোলা-বারুদ চাই। এই জোগানকে ত্বরান্বিত করবার জন্যে অনেক রাস্তার [illegible] দিতে হয়েছিল ইংরেজকে। সুদূর ব্রহ্মদেশকেও তখন যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে স্বদেশ-রক্ষার জন্য। স্বদেশের চাইতে সাম্রাজ্য কম নয়। তাই এখানেও প্রস্তুতি চাই।

তারপর চলে গেল ইংরাজ। আসামের সাথে যোগাযোগের প্রধান লাইনটি গেল হারিয়ে। পূর্ব ভারতকে তো রক্ষা করতে হবে। ঘরের পাশেই নানা শত্রু। রাস্তাঘাট চাই নতুন করে। ডুয়ার্সে তখন এসে পড়েছে বাস্তুচ্যুত মানুষের দল। হাজারে হাজারে। শাসন তখন ডুয়ার্সে সুপ্রতিষ্ঠিত। অতীত সম্পূর্ণ বিগত। ইতিমধ্যে চীনা-হামলা সীমান্তে। পাশে পাকিস্তানেও আয়ুব-শাহী চক্রান্তের নানা মূর্তি। উনিশ শ' তেষট্টিতে চীনা হাঙ্গামার কালে আবার নতুন করে গড়ে উঠল ডুয়ার্স। শত্রুকে মুখোমুখি রোখবার প্রেরণায় দুর্জয় দায়িত্বে রাস্তাগুলি সুদৃঢ় ও প্রসারিত করা যেমন হল, তেমনি নতুন নতুন ব্রীজগুলিও গড়ে উঠল। ডিমা নদীর ব্রীজ, জলঢাকা ব্রীজ। সব চাইতে মনে আসে তিস্তা ব্রীজের কথা। জলপাই-গুড়ি-শহর-সন্নিকটস্থ এই ব্রীজটি চীনা-আক্রমণের মোকাবিলার প্রয়োজন ছাড়া এত দ্রুত গড়েই উঠত কি না সন্দেহ। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তাই রসিকতাচ্ছলে জলপাই-গুড়িতে সত্যি কথাই বলেছিলেন, এই ব্রীজ গড়বার জন্যে যদি কাউকে ধন্যবাদ দিতে হয়তো চীনাদেরই দিতে হয়।

শেভকের পাহাড়-কাটা রাস্তায় খাদ্য-বস্ত্র নানা পণ্যদ্রব্য বোঝাই গাড়ি-গুলি আর ঘুরে ঘুরে আসে না একালে ডুয়ার্সে। সোজা ময়নাগুড়ি দিয়ে ডুয়ার্সে প্রবেশ করছে। ফলে বেঁচে গিয়েছে অনেক সময়, অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়।

দিবারাত্রি আর গাড়ি চলার তাই বিরাম নেই ডুয়ার্সে। গাড়ির চাকায়-চাকায় শুধু রাজপথেরই পাথর কাঁপে না। মনে হয় যেন নতুনকালের ইতিহাস-বিধাতারও রথ চলে।

বিছানা থেকে নেমে চুপি-চুপি জানালার পর্দা তুলে তাকাই। অগ্নি-জ্বলা নক্ষত্রগুলি কি জ্বলে অবিনশ্বর-কাল? তারাদের আলোর কি শেষ নেই? অথবা তারা অনন্তকালের প্রহর জপে। কী আছে ডুয়ার্সের ভাগ্যে কে জানে!

[ক্রমশঃ]

ফুলদোলের মেলা—দোকান বসেছে

ফুলদোলের মেলায়

সুধা মামার হাত ধরে গুটিগুটি হাঁটছি। সুধা তার জিরাফ মার্কা দেহটি নিয়ে দিব্যি আশপাশের ব্যাপার-স্যাপার দেখছে আর মর্জি হলে রিলে করে শোনাচ্ছে আমাকে, "ঐ, ঐ হোতা সঙের নাচ হচ্ছে, বাহারে! বাঃ বাঃ! কি সাজান সেজেছে!" কিংবা "পকেটমার, পকেটমার। মুখাৰ্জীদা, পকেটমার ধরিছে একটা। লাগা, শালোরে মার লাগা!" শুনোই ঘুষি ছোঁড়ে সুধা। আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হাজার লোকের ঘেমো-গায়ের গন্ধ পাচ্ছি কেবল। পাচ্ছি বললে ভুল বলা হয়। পেতে হচ্ছে। মাথাটা আমার অধিকাংশ লোকের বগল অবধি পেঁাচেছে। হরেকরকম ঘামের গন্ধে দিশেহারা হয়ে খ্যাপা গরুর মত আত্মাটা থেকে থেকে বুকের ভেতর ঢুঁ মারছে। দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল বুঝি! মনে মনে সুধা মামার মুণ্ডুপাত করছি। মুখ ফুটে কিছু বলছি না। কিন্তু বলতেই হল শেষ পর্যন্ত। বেশ খানিকটা এগোতেই পেছন থেকে এক বুড়ী বলে বসল, "কাদের বাড়ির খোকা এডা? গুড়গুড় করি হাঁটে! সর্ সর্, রাস্তা দে।"

ব্যস্, মুখ খুলে গেল। বেশ জোরেই বললে—"অ্যাই সুধা?"

হকচকিয়ে সুধা বলল, "কি?"

—"আমাকে তুমি খুন করবে?"

—"কেন কি হয়েছে?"

—"কি হয়েছে? ভিড়ের চাপে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে আর উনি বলছেন কি হয়েছে। হয় আমায় একা এগোতে দাও, নয় ভিড়ের বাইরে চল. উঃ, বাপস!"

সুধার মুখে বিচিত্র এক হাসি।

—"ঠিক আছে, ফাঁকা জায়গায় নে যাচ্ছি আপনারে।"

দু'-একটা প্রচণ্ড ধাক্কা আর হেঁচকা টান খেয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। কে বলবে এটা বৈশাখের দুপুর!

সুধা মামা দাঁত বার করে সাধু শব্দ প্রয়োগ করল—

"উঃ. ই যে একেবারে জনতার স্রোত।"

মানসিংপুরের ফুলদোলের মেলা। আজই তার শুরু। আজই তার শেষ।

অসীম মুখোপাধ্যায়

চারদিকের গাঁ থেকে লোক আসছে অসংখ্য। হাঁটাল, মাজু, সেকরাহাটি, পাতিহাল, জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, আমতা, সব জায়গার সবাই আসছে বুঝি! কাছেপিঠের যারা, তাদের মজাই বেশি। গাড়ির সেরা পা-গাড়িতে দম দিলেই হল। বাদবাকীরা কেউ থোকা রেলে,—কেউ বাসে, কেউ বা টেম্পোতে। কোলে যে চড়ে, সে-ও এসেছে। আবার কাঁধে যে চাপবে দু'দিন বাদেই—সে-ও দিব্যি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগোচ্ছে দেখছি। কত লোক হবে? হাজার পাঁচেক? "ও সুধা?"

—"বলে ফ্যালুন"—স্মিত মুখে সুধা তাকাল আমার দিকে।

—"কত লোক হয়েছে এবার বলতে পার?"

—"হাজার ছ'য়েক তো হবেই। গত-বারের চেয়ে ঢের বেশি!"

—"বল কি?"

—"ঠিকই বলিলাম গো দাদা. আমার গেরামের খবর আমার থিকে বেশি দিবে কে?"

—"বটেই তো?"

কথাটা শুনে সুধা বোধ হয় বেশ খুশি হল, বলল—"আসুন দাদা, আপনারে সঙ-নাচ দেখাইয়ে আনি।"

—"আবার ভিড়ে ঠেলতে হবে যে"—আমার বুক দুরদুর করে।

—"আরে না। ও-পাশ ঘুরে যাব'খনে।" কানের কাছে মুখ নামাল সুধা—"আমার খুড়-শ্বশুর সঙ সেজিছেন ইবারে. ভারি মজা!"

—"কি সাংঘাতিক! জামাই-এর সাথে চোখাচুখি হলে যে লজ্জার একশেষ হবে? থাকে গে. অন্য জায়গায় চল।"

—"চলুন না আপনি. আড়ালে থাকি দেখিব তারে।" সুধার কণ্ঠে অভয়।

—"মাথাটি কি কেটে পকেটে পুরে রাখবে?"

ফিসফিস করে বলল সুধা—"মানিজ করি নিব।"

বেশ কিছু লোক গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। সঙে নাচ হচ্ছে। নাচিয়েরা জন-পাঁচ-সাত হবে। একজনের গায়ে মিলিটারী পোষাক। কি সেজেছে?

হিট্‌লার না কি? আরেকজনকে তো বোঝাই যাচ্ছে স্পষ্ট; কোনও মহাভারতীয় বীর হবেন নিশ্চয়। হামাগুড়ি দিয়ে সন্দেশ চাইছে বেজায় লম্বাচওড়া একটি লোক। তার রকম-সকম দেখে বৌ-ঝিরা হেসেই খুন।

একটি ছোট্ট মেয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, "বুড়ো খোকা, ও বুড়ো খোকা।"

দৃশ্যটা উপভোগ্যই বটে! ষাট বছরের বৃদ্ধশিশু আধো গলায় আব্দার করছে, "থন্দেশ, থন্দেশ।" সুধা কোথায় গেল, সুধা? ঘাড় ফেরাতেই দেখি সুধা মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে। আমার চোখে ইসারা—"কই হে, তোমার খুড়-শ্বশুর কই?"

আবার কানের কাছে মুখ নামাল সুধা—"এই তো।"

—"কে? এই বুড়ো খোকা?"

—"হ্যাঁ গো।"

আমার চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে! সুধার খুড়-শ্বশুর ঘুরে ঘুরে সন্দেশ চাইছে। পরনে লালরঙা ইজের, পায়ে ঘুঙুর, গলায় কারে বাঁধা মাদুলী। এক হাতে একটা লোলা, আর এক হাতে প্লাস্টিকের ঝুমঝুমি। কে যেন সত্যি সত্যি একটা সন্দেশ দিল খেতে। "আলও থাব, আবাল থাব"—কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়বে বুঝি সবাই। পয়সাও পড়ছে বেশ। নিজেই একটা সিকি বার করে দিতে যাচ্ছিলুম। কি ভেবে পাশের লোকটিকে বললুম—"এটা ও'কে দিন তো দাদা।" তারপর বেরিয়ে এলুম।

—"তোমায় দেখে নি তো"—সুধাকে বলি।

—"আরে না। তিনি এখন সন্দেশ খাচ্ছেন।" সুধা বিড়ি ধরাল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শ'খানেক দোকান বসেছে। তেলেভাজা, ময়রা, কুমোর আর মনিহারী দোকানই সংখ্যায় বেশি। কাপড়-চোপড়ের দোকানও দেখছি ক'টা। এক-পাশে কয়েকটা লোক বাঁশ, বেতের ধামা, কুলো নিয়ে হাঁক-ডাক করছে। হাঁস-মুরগীর চেঁচেমেচিও কানে আসছে। আমাদের পাশ দিয়ে একঝাঁক টিয়ে ঝাঁকায় চড়ে কিচিরমিচির করতে করতে যাচ্ছে, পেছনে একদল ছোট ছেলেমেয়ে। দূরে কয়েকটা তাঁবু খাটানো হয়েছে, সেখানেও বেশ ভিড়। খুব সম্ভব আশ্চর্য যাদু দেখছে সবাই। "মৎস্য-কন্যা", "জলপরী", "চার শিং-ওয়ালা ঘোড়া" বা "পাঁচমাথা-মানুষ"। মাচায় চড়ে চোঙায় মুখ লাগিয়ে টিকিটবাবু হাঁকছে—"মাত্র পনেরো পয়সা, মাত্র পনেরো পয়সা, এমন সুযোগ ছাড়বেন না, চলে আসুন, চলে আসুন।"

—"হুই দিকে একবারটি যাবেন না কি দাদা?"

—"কেন কি আছে ওদিকে?" সুধার দিকে তাকালুম আমি।

—"খাতা বই-এর দোকান বসেছে ক'টা। বড় ছাওয়ালটার জন্যি একখানা ফাস্ট বুক নিব।"

—"ইংরেজী বই?"

সুধা হাসে, "হ্যাঁ।"

—"চল।"

এ-দিকটায় ভিড় একটু কম। খান-চারেক বই-খাতার ছোট-ছোট স্টল বসেছে। সস্তা ছবি আর ক্যালেন্ডারের দোকানও আছে দুটো। একটা স্টলের কাছে এসে দাঁড়াই দুজনে। "আপুনি দেখে দিন দাদা। বছর দশেকের ছাওয়াল, তারে যেমন মানায় তেমন একখানা বই দেখে দিন।" সুধা অনুরোধ করল। আমি বই বাছাই করছি এমন সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

আমরা আসার আগেই একটি ছোট্ট ছেলে, বছর সাত-আটের হবে বড়জোর,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি দেখছিল। বাচ্চা ছেলে। ছবি দেখছে, দেখুক। দোকানী তাই গা করে নি মোটে। সেই ছেলেটিই হঠাৎ একটি বই নিয়ে চোঁচা দৌড়।

—"ধর, ধর, চুরি করে পালাচ্ছে, বই নিয়ে পালাচ্ছে"—

দোকানী তড়াক করে খাট থেকে নেমে চেঁচাতে শুরু করল। দু-এক-জন ছুটল ছেলেটাকে পাকড়াও করতে। ছেলেটা নাগালের বাইরে চলেই যেত হয়ত, কিন্তু তা আর হল না। একটি ঝালমুড়িওলার সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল। মাটি থেকে উঠতে না উঠতেই হাতেনাতে গ্রেফতার। কিল-চড় পড়তে লাগল বেশ। দোকানের সামনে নিয়ে আসা হল ওকে। দোকানীর রাগটাই বেশি। বিরাশিসিক্কার একখানা চড় উঠিয়েছিল সে—ঘাড়ে পড়লে আর রক্ষে ছিল না বাচ্চাটার।

বাধা দিলুম আমি—"থামুন, আগে জানতে হবে তো কেন ও বই চুরি করল? চুরি যে ওর পেশা নয় বোঝাই যাচ্ছে তা। তেমন হলে কি আর মেলার এত জিনিস ছেড়ে বই-এর দোকানে আসে?"

—"কি নাম রে তোর?"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উত্তর দেয় ছেলেটা—"গুণময়।"

—"এঃ, মরে যাই আর কি! গুণময়! গুণ আর ধরে না!" দোকানী টিটকারী মারে। তার কথার ঢঙ দেখে আশপাশের মানুষজন হাসে।

—"বাপের নাম কি তোর, থাকিস কোথায়?"

—"হরিনাথ মণ্ডল। মাজুতে থাকি।" আবার ফুঁপিয়ে কাঁদে ছেলেটা। গালের ওপর পাঁচ আঙুলের ছাপ লাল হয়ে ফুটে উঠেছে। ডান কানের পাশে রক্ত জমেছে বোঝা যাচ্ছে। দেখে ভারি কষ্ট হল! এত ছোট একটা ছেলেকে এমনভাবে মারে! কেমনতরো বীরপুঙ্গব এরা?

—"তা তুই বই নিয়ে পালাচ্ছিলি কেন?"

চোখ দুটো বড় করে গুণময় পাল্টা প্রশ্ন করে—"মোর বাপ পয়সা দেয় নি কেন?"

—"বেড়ে কথা বলিছে তো ছোঁড়া? বাপে পয়সা দেয় নি বলে তিনি চুরি

কুলদোলের মেলায়—মানুষের ভিড়ে

করিবেন!"—ভিড়ের মধ্যে কার গলা শোনা গেল।

—"তোর বাপ কোথায়?"

—"উইদিকে তাস খেলতিছে।"

ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে বেশ। গুণময়ের পিতাঠাকুর মেলায় এসে জুয়ো খেলতে বসে গেছেন। এদিকে ছোট ছেলেটার হাতে দুটো পয়সা দেওয়ার সামান্য কর্তব্যটুকুও মনে নেই তাঁর।

—"তুই বই নিলি কেন রে?"

—"আমি পড়ব। পড়তে মোর ভাল লাগে।" গুণময় একটু সহজ হয়ে উঠেছে। বুঝেছে, আমি মারব না ওকে।

সুধাকে বলি,—"বোঝ ব্যাপারটা। কার ঘরে কে জন্মেছে। বাপ খেলে জুয়ো আর ছেলে চায় পড়তে।"

মারধোর আর হবে না বুঝে বীরপুরুষরা সরে পড়তে লাগল। দোকানীকে বললুম—"দিন তো দুটো বই।"

সুধার চোখে প্রশ্ন—"দুটো বই দিয়ে কি হবে?"

—"কেন একটা তোমার ছেলের, আর একটা ওর।" আঙুল দিয়ে গুণময়কে দেখাই।

কান্নাভেজা চোখে খুশির হাসি উপচে পড়ছে গুণময়ের। ফুলদোলের মেলা এবার সত্যি জমল!

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বিকেল সাড়ে পাঁচটা। সুধাকে ডাকি,—"সুধা?"

—"বলুন দাদা।"

—"এস, এবার একটু বসি। পায়ে খিল ধরে যাবার জোগাড় হয়েছে যে।"

যাত্রাগানের আসরের পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে টলটলে এক পুকুর। নারকেলগাছের পাতায় সূর্যিঠাকুর রুপো ছড়াচ্ছে। ঘাটলায় পা ছড়িয়ে বসলুম দু'জনে। সুধা পকেট থেকে ঢাউস এক ঠোঙা বার করল।—"তেলেভাজা, এখনও গরম আছে।"

—"তোফা", সশব্দে পিঠ চাপড়ে দিলুম ওর।

—"কিন্তু চা না হলে জমবে কি করে ভাই?" ঘাড় নাড়ল সুধা—"বলে এসেছি"।

—"সে কি? কখন?"

—"সেই ছ্যালেটার সাথে আপুনি যখন কতা বলতিছিলেন, তখন। ঐতো আসিছে।"

সত্যি সত্যি চা নিয়ে আসছে একটি লোক।

—"মুখাজ্জীদা"—সুধা ডাকছে।

মুখ তুলে বলি—"কি, বল?"

—"আমার শ্বশুরমোশাইরে দেখিলেন তো?"

—"কেমন লাগিল?" সুধার গলাটা বড় গম্ভীর শোনাচ্ছে।

—"ভালই সেজেছে, অভিনয়ে জড়তা নেই মোটে।"

—"ঠিক কতা বলিছেন মুখাজ্জীদা, তিনি অভিনয়ই করিছেন সেথা। পাক্কা অভিনেতা।"

—"তার মানে?" ওর কথা শুনে আমি একটু অবাক হই।

—"মানে?" সুধা শেষবারের মত চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা পুকুরের জলে ছুঁড়ে দিল—"আগামী অঘ্রাণে মোর শালীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তুক শ্বশুরমোশাইয়ের তো একেবারে হাঁড়ির হাল। বরাবর ভাগে চাষ করি খান। এবার সে উপায়টাও গেছে। চারিপাশে ধার-দেনা, বন্ধক, যাদের জমি চষতো তাদিগের কাছেও মেলাই ঋণ। তাই, ভাগ-জমি আর পায় নি এবার।"

—"তারপর?"

—"তাপরে বিপদের উপ্রে বিপদ তো আছেই গো দাদা। শাউড়ী ঠাকরেন ক' মাস ধরি পক্ষাঘাতে একেবারে ধরাশায়ী। এরতার বাড়ি সে মানুষটাও খেটে-খুটে দুটো পয়সা পেত। সে পথও বন্ধ হয়েছে।"

—"তা ছেলেরা কি করে তার?"

—ছেলে যে একটাও নাই দাদা! একটা ছেলে ছিল, সেটা বছর দশেক আগেই গেছে। বাধ্য হয়ে সঙ সেজেছেন শ্বশুরমোশাই! মেয়ের বিয়ে দিতি হবে তো!"

—"কিন্তু সঙ সাজা? সে তো মাত্র একদিনের বেশি চলবে না?" আমি প্রশ্ন করি সুধাকে।

—"বাকি সময়টা ক্ষেতমজুরী বা কুলীগিরি করিবে। মাঝে মাঝে আমিও

একটু-আধটু দেওয়া-থোয়া করি। তবে মোর অবস্থাও তো বুঝিছেন!”

সুধাকে বড় বিষন্ন দেখায়। বলি—“চল, বিশ্রাম তো হয়েছে অনেক, এবার ওদিকটায় যাই।”

দু'জনে আবার হাঁটিতে শুরু করি। কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছে সবকিছু! সুধার খুড়শ্বশুরের হামা-গুড়ি দেওয়া ছবিটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কাস্তে ছেড়ে, সবুজ মাঠ ছেড়ে, রঙ মেখে সঙ সাজতে হয়েছে যাকে, তার চোখের জল এত লোকের মধ্যে একজনও কি দেখতে পাবে? তারকেশ্বরের মেলায় শোনা ক্ষ্যাপা সাধুর সেই গানটা মনে পড়ছে বড়।

“বিধি মোরে সঙ সাজালে
হাজার লোকের মিছিলে
আমি চিনব কবে মোর আত্মারে
হেই বিধি,—চিনব কবে মোর
আত্মারে।”*

* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

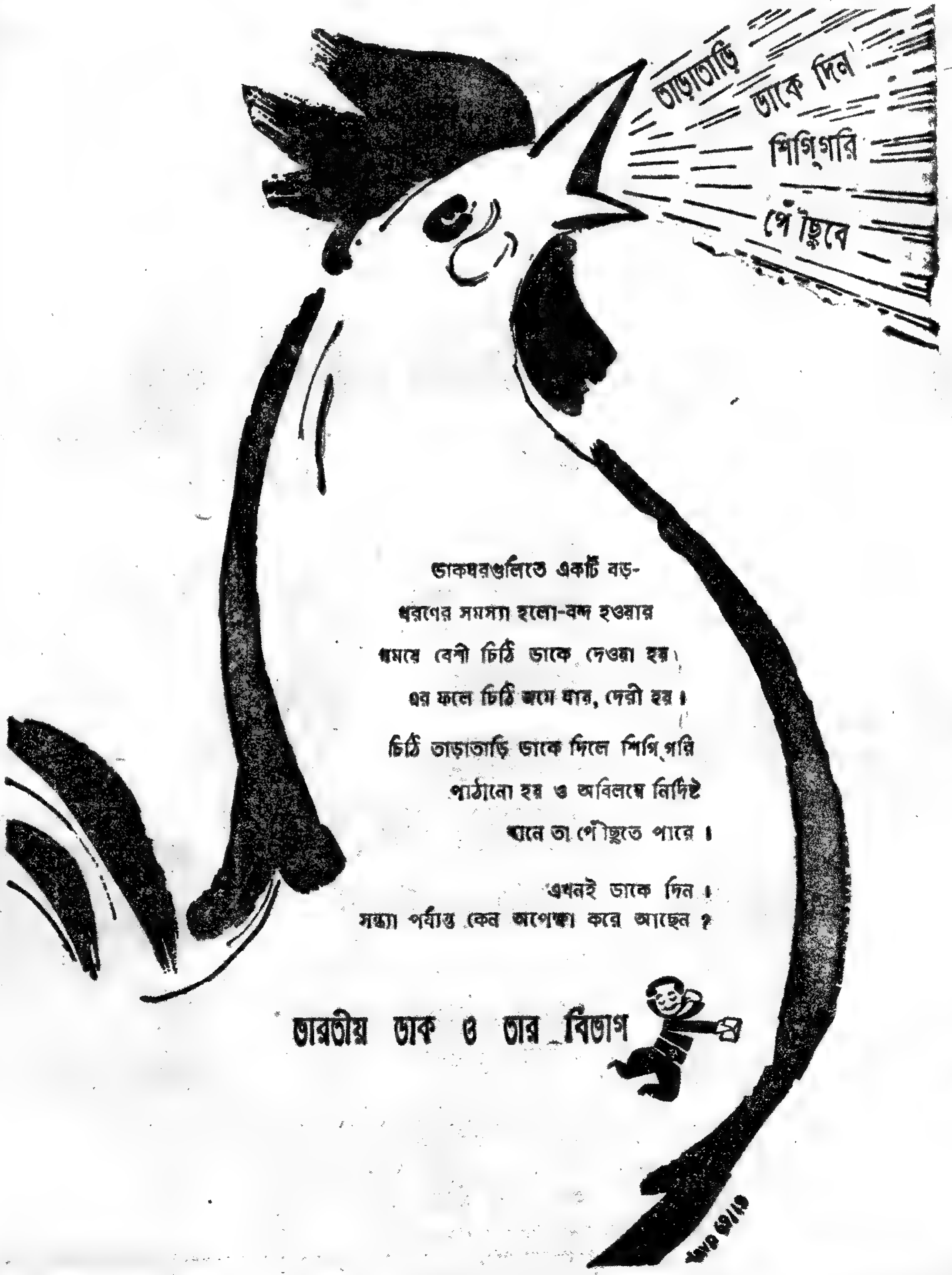

পাঠক মন

কিষাণসভা-সম্পর্কে সুভাষ বসুর মতামত

১লা মে সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে কিষাণ-আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস-নেতৃত্বের যে মনোভাবের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি ফাঁক আমার চোখে পড়েছে। ফাঁকটি হল কিষাণ-আন্দোলন সম্পর্কে সুভাষ বসুর মতামত। পট্টভি সীতারামিয়ার বইতে সম্ভবত এ বিষয়টি নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ-সম্পর্কে কিছু জানি বলেই কথাটার উল্লেখ করছি।

দেশে কিষাণ-সভা ও কিষাণ-আন্দোলন ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠার পর থেকে কংগ্রেস-নেতৃত্বের গোঁড়া অংশ ছাড়াও, জহরলাল নেহরুও কিষাণ-সভাকে খুব ভাল চোখে দেখেন নি। উক্ত প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে পট্টভি সীতারামিয়ার বই থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তা থেকে সুভাষ বসুর মতামত বোঝা যায় না। কিষাণ-সভা সম্পর্কে সুভাষ বসুর মতামত যে কংগ্রেস-নেতৃত্বের ঐ অংশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, তা জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে কথাটাই এই পত্রে জানাতে চাই।

দেশের বামপন্থী শক্তি, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন শক্তি, যাঁরা শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেছেন, তাঁরাও কিন্তু তখন কংগ্রেসের বাইরে নয়। জাতীয়-আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে তাঁরা সকলেই কংগ্রেসের মধ্যেও অংশ গ্রহণ করছেন এবং তাঁদের অনেকে কোনো কোনো স্তরে কংগ্রেসের কমিটিতেও স্থান পেয়েছেন। তাঁরা কংগ্রেসের কর্মসূচীও অনুসরণ করেন, আবার কিষাণ-সভার কর্মসূচী অনুসরণ করেন। এই প্রসঙ্গেই কংগ্রেস-নেতৃত্বের গোঁড়া অংশের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে যে, দুই কাজ একসঙ্গে চলতে পারে না। অর্থাৎ, কংগ্রেস-নেতৃত্বের গোঁড়া অংশ কিষাণ-সভার কর্মসূচীকে কংগ্রেস-কর্মসূচীর বিরোধী ভাবতে আরম্ভ করেন। কিষাণ-সভা ও কিষাণ-আন্দোলনকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করবার এই প্রবণতাকে দূর করার জন্য তখন বামপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব ওঠে যে কিষাণ-সভাকে কংগ্রেসের মধ্যে 'কালেক্টিভ অ্যাফিলিয়েশন' দেওয়া হোক, তা হলে আর ওরকম সন্দেহ হতে পারবে না এবং কিষাণ-সভার কাজের সঙ্গে কংগ্রেস-কর্মসূচীর সামঞ্জস্য-বিধানও সহজ হবে। এই প্রশ্নটি নিয়ে তখন কংগ্রেসের মধ্যে বেশ তর্ক ওঠে। এবং সর্বভারতীয় স্তর থেকে আরম্ভ করে অনেক জায়গাতেই কংগ্রেস-নেতৃত্ব 'কালেকটিভ এ্যাফিলিয়েশনের' প্রশ্নের বিরোধিতা তো করেনই, উপরন্তু কিষাণ-সভার কর্মীদের কংগ্রেস-কার্যকরী কমিটিতেও থাকতে দিতে আপত্তি করেন। বাংলাদেশেও কোনো কোনো জেলাতে এ-প্রশ্ন দেখা দেয়। হুগলী জেলার কংগ্রেস-নেতা অতুল্য ঘোষ অত্যন্ত প্রবলভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেন যে, কিষাণ-সভা ও কংগ্রেস দুইয়ের কাজ করা চলবে না, একটা ছাড়তে হবে। অন্যদের সঙ্গে আমিও এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি, কেন না আমি তখন হুগলী জেলার কিষাণ-সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

সুভাষ বসু তখন কংগ্রেস-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। সেটা হরিপুরা কংগ্রেসেরই প্রস্তুতির সময়কাল বলে মনে হয়। সুভাষ বসু অসুস্থ থাকায় কিছুদিন পাঞ্জাবের ড্যালহৌসিতে আছেন। তখনও কিষাণ-সভা নিয়ে এই তর্ক চলছে, কোনো সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। এই সময় হুগলী জেলায় এই সমস্যা দেখা দেওয়ায় আমি কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে সুভাষ বসুর স্পষ্ট মতামত জানতে চেয়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখি। সেই চিঠির জবাবে তিনি ড্যালহৌসি থেকে লেখেন যে, তাঁর মতে কিষাণ-সভার কাজ করায় কংগ্রেসের কর্মসূচীর কোনো ক্ষতি হয় না এবং কিষাণ-আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে 'কালেকটিভ এ্যাফিলিয়েশনের' পদ্ধতিটাও অসঙ্গত নয়। অবশ্য এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত হিসাবেই তিনি জানিয়েছিলেন, কংগ্রেসের 'অফিসিয়াল' মত হিসাবে নয়। কেন না, এ-সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত কংগ্রেসে তখনও হয় নি। তবু সুভাষ বসুর এই মতটাই আমাদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের 'অফিসিয়াল' মত ঠিক হয়ে যায় যে, 'কালেকটিভ এ্যাফিলিয়েশন' চলতে পারে না।

সুভাষ বসুর এই চিঠি আমি কিছুদিনের মধ্যেই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করি। তা থেকে সকলেই সুভাষ বসুর মতটা জানতে পারেন। আমার মনে আছে, বাংলাদেশের কোনো কোনো গোঁড়া কংগ্রেস-নেতা তারপর এই বলে সমালোচনা করছিলেন যে, সুভাষ বসুর এই ব্যক্তিগত মতামতকে আমি অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছি। যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটার একটা পরিণতি হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ কিষাণ-সভা কর্মীদের অনেককে বাধ্য হয়ে সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস-কমিটির কর্মকর্তাপদ ত্যাগ করতে হয়েছে। অবশ্য কংগ্রেস-সভ্য থাকা বন্ধ করা পর্যন্ত অতদূর কংগ্রেস-নেতৃত্ব যান নি।

এটা ত্রিশ বছরেরও বেশি আগেকার কথা। কিন্তু তবু ঘটনাটি আমার মনে আছে একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত বলে। দুঃখের বিষয় সুভাষ বসুর সে-পত্রখানি আজ আর নেই। ইংরাজ-আমলে বহুবার বাড়িতে পুলিশ-সার্চ হওয়ায় সে-পত্র কবে যে পুলিশ হস্তগত করে নিয়েছে তা আমার ঠিক মনে নেই।

—তুষার চট্টোপাধ্যায়

লেখকের বক্তব্য

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখককে ধন্যবাদ। তিনি যা বলেছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। তবে আমার রচনা চলছে। ক্রমে কিষাণ ও শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য বহুভাবে তুলে ধরব। 'কালেকটিভ অ্যাফিলিয়েশন' প্রশ্নটি হরিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্র তুলেছিলেন, তার আগেও সে বিষয়ে বলেছেন। হরিপুরা ভাষণের আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করব। তারপরে, স্বামী সহজানন্দের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের কথাও আসবে। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৩ সালেই এ বিষয়ে কি মনোভাব পোষণ করতেন, তা গত সংখ্যায় (২৯শে) 'সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন' অধ্যায়ে কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে।

—শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ভারত-রক্ষা!

ভবিষ্যতে ভারতও শত্রুর হাতে চলে যাবে। হিন্দু ধ্বংস হয়ে যাবে। (বৃটিশ প্ল্যান) ভারত ও হিন্দু রক্ষার উপায় আমার বইগুলিতে লেখা আছে।

১। 'ভারতের ভবিষ্যৎ'	১৫ পঃ
২। 'সমস্যার সমাধান'	১০ পঃ
৩। আমার মনের কথা	১০ পঃ
৪। হিন্দুর ভবিষ্যৎ (গদ্য)	২৫ পঃ
৫। হিন্দুর কলঙ্ককাহিনী (পদ্য)	১০ পঃ
৬। হিন্দুর দুঃখের কাহিনী পদ্য	২০ পঃ
৭। হিন্দুর ভুল (পদ্য)	১০ পঃ
৮। হিন্দুর গান	১০ পঃ
৮। হিন্দুর নষ্ট গৌরব (পদ্য)	১০ পঃ

১৺৪৫ পঃ M. O. পাঠালে ৯ খানা বুকপোস্টে যায়।

ক্যাপ্টেন—জে, এল, বসাক।

৫বি, জগদীশনাথ রায় লেন, দর্জিপাড়া

বেথুন কলেজের উত্তর, কলিঃ-৬।

সঙ্গীতানুশীলন

নীহারবিন্দু চৌধুরী

সম্প্রতি আমাদের দেশে সংগীতচর্চার প্রসার আশাতীতরূপে ঘটেছে। সমাজের প্রতি স্তরের লোকের মধ্যেই সংগীত শেখার স্পৃহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কলকাতায় এবং বাংলার সর্বত্র অসংখ্য সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সুদূর পল্লী অঞ্চলেও সংগীতশিক্ষায়তনের অভাব নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতের উচ্চতম কোর্স শেখার সুব্যবস্থা হয়েছে। তা' ছাড়া কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও সংগীতের ফ্যাকাল্‌টি প্রবর্তিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে সংগীত-নাটক আকাদেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতি বিষয় শিক্ষার ন্যায় সংগীতশিক্ষারও কতকগুলি বিধিবন্ধ বা প্রণালীবদ্ধ শিক্ষাক্রম থাকা বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় আজকাল কোনো কোনো সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যক্রমানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয় না; ফলে বেশ কয়েক বৎসর শিক্ষা লাভান্তেও বহু ছাত্রছাত্রী সংগীতে আশানুরূপ ফললাভ করতে পারে না। উপযুক্ত শিক্ষক ও সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবেই যে এটা হয়—তা' সহজেই অনুমেয়।

আধুনিক যুগের তরুণ-তরুণীরাও সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না বা চায় না। সংগীতের মতো দুরূহ বিদ্যা শেখার যে ধৈর্য—তা' বর্তমানে খুব কম শিক্ষার্থীর মধ্যেই দেখা যায়। অধিকাংশই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ না করে এলোমেলো শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহশীল। ফলে সমাজে প্রকৃত সংগীতশিল্পীর আবির্ভাব হচ্ছে না; যদিও সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে গায়ক-বাদকের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় ঢের বেড়েছে। পরিমাণগত উৎকর্ষের চাইতে গুণগত উৎকর্ষ সবসময়ই কাম্য।

আজকাল শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরাও সংগীতানুশীলনে পরিশ্রম তথা সাধনার গুরুত্ব অনুভব করতে পারে না। বহু শিক্ষার্থীই আজকাল শিক্ষকের নির্দেশ মতো না চলে নিজেদের খেয়াল-খুশি-মতো সংগীতাভ্যাস করে থাকে। ফলে বেশ কিছুদিন সংগীতশিক্ষা করেও তাতে সফলকাম হতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এরূপ সংগীত শেখার পদ্ধতি দেখা যায় না। সেখানে প্রণালীবদ্ধভাবে বিজ্ঞানানুগ সংগীতশিক্ষা বাধ্যতামূলক। শৃঙ্খলাবিহীন শিক্ষাপদ্ধতি ওদেশে অচল।

আমাদের দেশে অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় বলে সেখানে শিক্ষার মান খুবই নিম্নগামী। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বিদ্যায়তনকে মুনাফার কেন্দ্র করে তুলতে চান; এতে ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, সংগীতের উৎকর্ষসাধন অপেক্ষা আর্থিক উৎকর্ষের দিকেই যেন তাঁরা অধিকতর মনোনিবেশ করেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন অনেক ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়—সেইরূপ শিক্ষকবৃন্দের মধ্যেও অনেকানেক ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত সংগীতশিক্ষকও বর্তমান যুগে বিরল। এর পরিণাম এই হচ্ছে যে, আমাদের সংগীতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হচ্ছে না।

আমাদের দেশের সরকার সংগীতের অগ্রগতির জন্য কিছুটা মনোযোগী হলেও সরকার পরিচালিত সংগীত-প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাতে পারছে না। এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে আরো অধিকতর যত্ন নেওয়া উচিত। শোনা যায় বিদেশে সংগীতশিক্ষার প্রসারে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি খুবই তৎপর। শুধু সংগীত শেখার ব্যাপারেই নয়—যে কোন শিক্ষার ব্যাপারেই পাশ্চাত্য দেশগুলি প্রণালীবদ্ধ শিক্ষাদানের বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি বিরল বললেই চলে। অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় সংগীতশিক্ষার ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলাবিহীন পদ্ধতিই বর্তমান।

আজকের দিনে বিধিবদ্ধ এবং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ না করলে কোনো বিষয়ে উপযুক্ত ফল পাবার আশা করা যায় না। সংগীতের ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

যখন কোনো সার্থক শিল্পী যথা রবিশঙ্কর, বিলায়েৎ খাঁ, নিখিল ব্যানার্জী, লতা মঙ্গেশকার, সন্ধ্যা মুখার্জী প্রমুখ তাঁদের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন—তখন সংগীতশিক্ষার্থীরা তা' বেশ উপভোগ করেন ও শিল্পীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন; কিন্তু শিক্ষার্থীরা একবারও তলিয়ে দেখতে চান না যে, উক্ত শিল্প পরিবেশনার পশ্চাতে শিল্পীদের কী বিরাট-কঠোর সাধনার ইতিহাস রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দজী বলেছেন: "চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য করা যায় না।" যে কোনো সাধনার পক্ষেই—বিশেষ করে সংগীতসাধনার ক্ষেত্রে এই মহাপুরুষের বাণী ফলপ্রসূ ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

প্রাচীনকালে সংগীতবিদ্যার্থীরা গুরুগৃহে বাস করে সংগীতবিদ্যা লাভ করতেন। সেখানে তাঁরা সংগীতের কর্তব্য ও ঔপপত্তিক জ্ঞান লাভ করতেন। গুরুগৃহে তাঁদের কঠোর শ্রমদান করতে হত। বর্তমান যুগের ন্যায় তদানীন্তনকালে স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলন ছিল না; গুরুর মুখ থেকে শিষ্যদের সংগীতের পাঠ গ্রহণ করতে হত। এই কারণে সংগীতবিদ্যার অপর নামকরণ হয়েছে শ্রুতিবিদ্যা। অবশ্য প্রাচীনকালে বেদ-বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতিও শ্রুতির সাহায্যে শিক্ষা করতে হত। তাই অতি সংগত কারণেই সংগীত শাস্ত্রকে 'পঞ্চম বেদ' নামে অভিহিত করা হয়; এবং গুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে শিখতে হত বলে সংগীতেরও অপর নাম 'গুরুমুখী' বিদ্যা।

সেকালে আধুনিক যুগের ন্যায় কোনো বিদ্যার্জনের জন্য স্কুল-কলেজ (আজকালকার ধরণের) ছিল না। সংগীতাধ্যয়ন করার জন্যও বর্তমানের ন্যায় কোনো স্কুল-কলেজ ছিল না; গুরুপরম্পরায় সংগীতবিদ্যা অধীত হত। সাধকতপস্বী সংগীতাচার্যগণের কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে কঠোর অধ্যবসায়ের দ্বারা সংগীতবিদ্যা আয়ত্ত করতে হত।

বর্তমানকালে এই প্রথা আর প্রচলিত নেই। কালক্রমে যুগের প্রয়োজনে সব কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় সংগীতবিদ্যাও স্কুল-কলেজে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সংগীতশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমানে সর্বস্তরের শিক্ষার ব্যাপারে যেমন গলদ ঢুকেছে; তেমনি অধিকাংশ সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও গলদ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত নয়; সুতরাং পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাবার অবাস্তব পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে নতুন ব্যবস্থাকেই কলুষমুক্ত করতে হবে। তা হলেই হয়তো সংগীতজগতের অগ্রগতি সাধিত হবে। সংগীতশিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করতে হলে যুগোপযোগী ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হবে।

আর একটি বিষয়ে আমরা জ্ঞানী-গুণীদের ও সমাজহিতৈষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—সেটি হল সংগীতের

কথা শুধু দাঁতের

দাঁত দাঁতই নয় যদি না সেটা পুরোপুরি ভাবে সুস্থ থাকে। কিন্তু আপনার দাঁতের উপর উপর্য্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে এসিড-গুলি। ফলে দাঁতের এনামেল নষ্ট হচ্ছে, ক্ষয়-গহ্বরের মধ্য দিয়ে গোটা দাঁতটাই হয়ে উঠছে বীজাণু-দুষ্ট।

আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে সব থেকে ফলপ্রসূ ফ্লোরাইড্ মিশ্রণ সোডিয়াম্-মোনো-ফ্লোরো-ফস্‌ফেট্ (এস্-এম্-এফ-পি) যেটা পাবেন বিনাকা ফ্লোরাইডের মধ্যে-দাঁতের এনামেলের সাথে যোগ দিয়ে তাকে সুদৃঢ় করে ও ক্ষয়শক্তির বিরুদ্ধে তাকে ত্রিবিধ প্রতিরোধ শক্তি দেয়। বর্ণে হিম-নীল, স্বাদে মিন্ট-স্বাদ। বিনাকা ফ্লোরাইড শুধুমাত্র একটা টুথপেষ্ট নয়, এ ভার নেয় দাঁতের পূর্ণ পরিচর্য্যার।

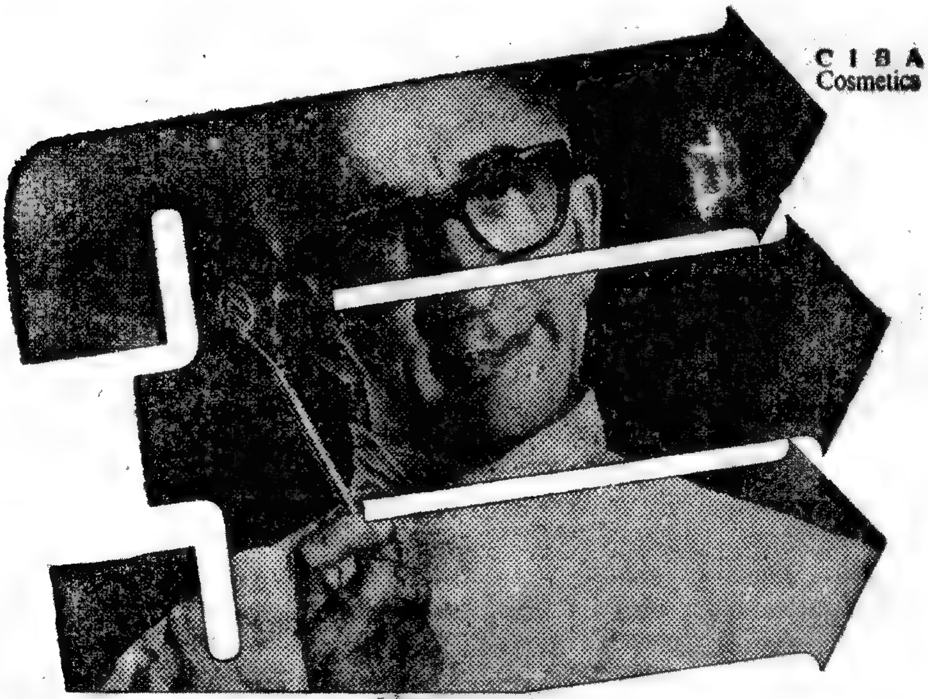

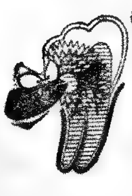

দাঁতের ক্ষয়ের শুরু তখনই যখন এসিডগুলি দাঁতের এনামেলকে ধ্বংস করে ও দাঁতের জীবিত তন্তুকে বীজাণুর কাছে উন্মুক্ত করে বেদনাদায়ক ক্ষয়-গহ্বর গড়ে তোলে

বিনাকা ফ্লোরাইডের এস্-এম্-এফ-পি দাঁতের এনামেলের সঙ্গী হয়ে তাকে এসিডের আক্রমণ প্রতিরোধে শক্তি দেয়।

বিনাকা ফ্লোরাইডের এস্-এম্-এফ-পি দাঁতের এনামেল-ধ্বংসকারী এসিডের পত্তন রোধ করে।

বিনাকা ফ্লোরাইডের এস্-এম্-এফ-পি দাঁতের এনামেলকে তার প্রারম্ভিক ক্ষয়ের গ্রাস থেকে সেরে উঠতে সাহায্য করে।

দন্তক্ষয় ও বেদনাদায়ক ক্ষয় গহ্বরের অবসানে ত্রিবিধ প্রতিরোধক

CIBA/CF-22 BEN

পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। কালের প্রয়োজনে জ্ঞানার্জনের অপরাপর শাখার ন্যায় সংগীতজগতেও পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষান্তে উপাধি বিতরণের প্রথা প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু অন্যত্রের ন্যায় এখানেও সুফলের তুলনায় কুফল অধিক পরিমাণে ফলতে দেখা যাচ্ছে। বহু পাশ করা সংগীতজ্ঞ এমন কি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী-ডিপ্লোমাধারী সংগীতবিশারদদের সংগীতের ব্যবহারিক দিক অবহেলিত হয়ে আছে—অর্থাৎ সাদা কথায় উপাধির বোঝা মাথায় নিয়ে বা স্নাতকোত্তর হয়েও শুধু গান গাইবার মতো তুচ্ছ বিষয়টি ছাড়া তাঁরা সব কিছুই করতে পারছেন। সংগীত-জগতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সহৃদয় ব্যক্তিদের আমরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভাবতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।

কলগেট ব্যবহার করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন ও সারাদিন দন্তক্ষয় রোধ করুন!

কারণঃ একবার মাত্র কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই মুখের দুর্গন্ধ ও ক্ষয়ের জন্য দায়ী বীজাণুর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং কলগেট প্রক্রিয়ায় খাওয়ার ঠিক পরেই দাঁত ব্রাশ করলে বেশির ভাগ লোকের দন্তক্ষয় রোধ করা যায়—দাঁত পরিষ্কার দন্ত-চিকিৎসার ইতিহাসে যেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি! আর একমাত্র কলগেট-এর সেই প্রমাণ আছে।

কী সুন্দর এর পিপারমেন্টের স্বাদ—তাই ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালবাসে!

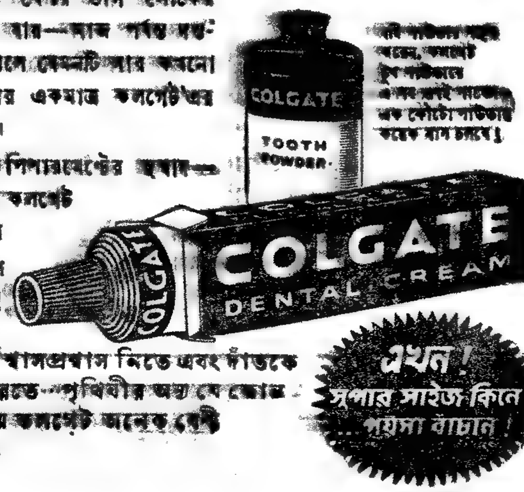

পরিচ্ছন্ন নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে এবং দাঁতকে উজ্জ্বল সাদা করতে—পৃথিবীর অন্য যে কোন টুথপেস্টের চেয়ে কলগেট অনেক বেশী লোক কেনেন।

এখন! সুপার সাইজ কিনে পয়সা বাঁচান!

DC-

পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে এই দীন লেখকের তিক্তকর্ণে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত (বা দুর্ভাগ্য-বশত) অনেক, মহারথী গায়ক-বাদক এবং সাধারণ পরীক্ষার্থীদের ফাইন্যাল পরীক্ষা নেবার সুযোগ ঘটেছে; কিন্তু সে অভিজ্ঞতা আশাব্যঞ্জক তো নয়ই—বরং তাকে হতাশা-ব্যঞ্জকই বলা চলে।

শাস্ত্রীয় জ্ঞানে মুখস্থ করে কোনো কোনো পরীক্ষার্থী ভাল ফল লাভ করলেও ব্যবহারিক জ্ঞানে (practical demonstration) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্যতম প্রত্যাশাও তারা পূরণ করতে পারে না। এটা তাদের দোষ, এমন একপেশে অপবাদ আমরা তরুণ নবীন গায়ক-গায়িকাদের দিচ্ছি না। এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোথাও বিরাট ফাঁক বা ফাঁকি রয়েছে। সংগীত শিক্ষাদান ব্যবস্থাই মূলত এর জন্য দায়ী—তাছাড়া শিক্ষার্থীদের শ্রমবিমুখতা ও সাধনাহীনতা তো রয়েছেই। আজকাল যেন কেউ শ্রমার্জিত বিদ্যালাভে সম্যক উৎসাহ প্রদর্শন করছেন না। শুধু পৃষ্ঠপোষকতা ও দলগতিতে সংগীতমহলে বাজীমাৎ করতে চাইছেন। গভীরভাবে সংগীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে আজকাল যেন যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভূত অনীহা প্রকাশ পাচ্ছে।

সংগীত তা কণ্ঠসংগীতই হোক বা যন্ত্রসংগীতই হোক—একে আয়ত্তাধীন করতে হলে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তার প্রকৃত অনুশীলন করতে হবে। শুধু রেডিও, জলসা বা ফাংশানে গান গাওয়া বা বাজানোই সংগীতশিল্পীর লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

বিশুদ্ধ সংগীত শিক্ষা করে ভারতীয় সংগীতের আত্মস্থকরণ করাই প্রত্যেক সংগীতশিক্ষার্থীর আদর্শ হওয়া বিধেয়। মনে রাখতে হবে ভারতীয় সংগীত বিশ্ব সংস্কৃতির দরবারে বিশেষ মর্যাদান্বিত শিল্পসম্ভার।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও উচ্চ আদর্শে বিশ্বাসী এবং অনুপ্রাণিত হয়েই সংগীতানুশীলন করা প্রতিটি সংগী-তার্থীর কর্তব্য। সংগীত শুধু বিলাসের উপকরণ নয়, সৎ সংগীতাভ্যাস দ্বারা অনাবিল আনন্দ লাভ করা যায়—এবং অপরকেও বিমল আনন্দদানে মোহিত করা যায়। ভারতীয় সংগীত আত্মিক উন্নতির সহায়ক ও আধ্যাত্মিক জীবনের দীপশিখাও বটে।

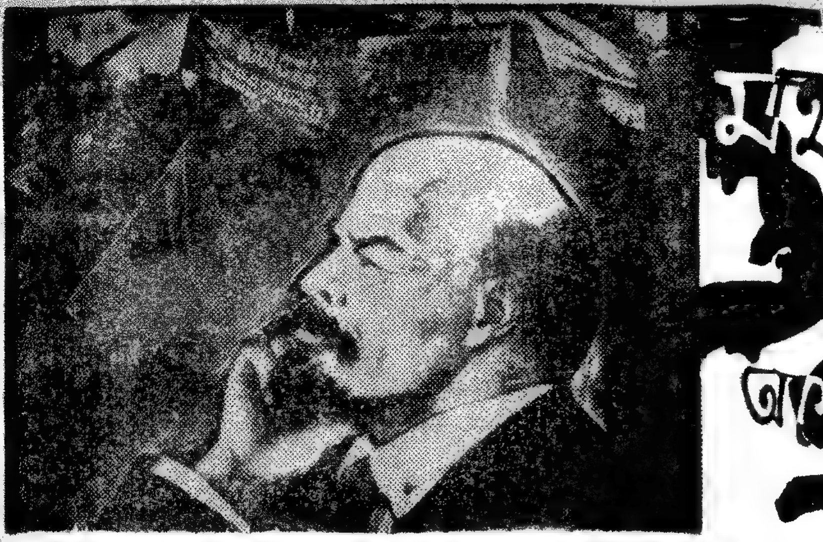

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তিন ॥

[কার্টেন উঠলে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলতে শুরু করবেন ঃ]

কথক—অবশেষে এল সেই দীর্ঘ প্রতিক্ষীত মুক্তির দিন—১৯০০ সালের ২৯শে জানুয়ারীর সকালে, সবাই মিলে শুষেনস্কোয়ে পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত—বাড়ির সামনে স্লেজ দাঁড়িয়ে রয়েছে—দীর্ঘ পথ এতেই যেতে হবে। বিদায় দিতে এসেছেন অস্কার, প্রমিনস্কি, স্টারকভ প্রমুখ বন্ধুর দল—আর কৃষকেরা। সবার চোখে জল—

[স্টেজের পেছন দিকে একটা স্লেজ দাঁড় করানো থাকবে। লেনিনরা সবাই ওখানকার বন্ধু-বান্ধবদের থেকে বিদায় নিয়ে স্লেজে উঠবেন এবং সেটি চলতে চলতে ডান দিকের উইংস দিয়ে বেরিয়ে যাবে। অথবা পেছনে একটি স্ক্রিনের উপর এই দৃশ্যটি সিনেমাটোগ্রাফীর সাহায্যেও প্রজেক্ট করে দেখানো যেতে পারে।]

কথক—ক্রুপস্কায়ার নির্বাসন শেষ হতে তখনও এক বছর বাকী, উফা গাবার নিয়াতে তাঁকে থাকতে হবে—ঠিক হল তাঁর মা তাঁর সঙ্গে থাকবেন। লেনিন এবার যাবেন ইওরোপের নানা দেশে—তা না করলে, নিশ্চয় আবার হবে কারাদণ্ড—কিন্তু তার আগে নানা শহরের স্পেশাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা দরকার—দরকার তাদের সাহায্যের—দরকার প্রচুর অর্থ তহবিলের। কারণ ভ্ল্যাডিমার ইলিচ ঠিক করে ফেলেছেন একটি বিপ্লবাত্মক সংবাদপত্র প্রকাশ করা দরকার, তার সাহায্যে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে। উফাতে প্রথম দিন এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—এ সিউরুপা, ভি· ক্রোঘমল এবং এ· ভিডারস্কির সঙ্গে, এঁরা সবাই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট—এ সময় নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছিলেন উফাতে।

[পেছনের পর্দা উঠে যাবে—লেনিন এবং উপরি-উক্ত কমরেডরা আলোচনারত ঃ]

সিউরুপা—আমরা ছ'টা হোটেলে গিয়ে আপনাদের খোঁজ করেছি।

ভিডারস্কি—তারপর ভাবলাম কোন গোলমালে আপনারা পথে আটকা পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত একজন খবর দিল আপনারা এসে গেছেন এবং এখানে উঠেছেন।

ক্রোঘমল—পথে আসবার সময় কোন অসুবিধা তো হয় নি কমরেড লেনিন ?

লেনিন—কড়ারকমের ঠাণ্ডা ছিল। সারা পথ বরফে ঢাকা। কিন্তু আবার কাজ করতে পারবো এই চিন্তাতেই আনন্দ বিভোর হয়ে ছিলাম—অসুবিধার কথা মনেই আসে নি।

ভিডারস্কি—ক'দিন এখানে থাকবেন?

লেনিন—আমার পক্ষে দু' দিনের বেশি থাকা সম্ভব হবে না। ক্রুপস্কায়াকে এখানেই রেখে গেলাম—ওঁর মা ওঁর সঙ্গে থাকবেন। আপনারা ওঁদের একটু দেখাশোনা করবেন।

সিউরুপা প্রমুখ—নিশ্চয় নিশ্চয়! ওঁদের সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন কমরেড লেনিন।

লেনিন—যে কথা আপনাদের আগেই বলছিলাম ঃ ইস্ক্রা প্রকাশ করতে হবে রাশিয়ার বাইরে গিয়ে। তা না হলে সব ভেঙ্গে দেবে জারিস্ট সরকার। আপনারা দেখতে পাবেন কমরেডস, এই ইস্ক্রার হল্কা একদিন সারা রাশিয়ার কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষদের ভেতর বিরাট বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলবে। সে আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে জারের স্বৈরতন্ত্র এবং স্বার্থপর অত্যাচারী পুঁজিবাদীর দল।

ভিডারস্কি—কমরেড লেনিন, আমাদের কাছে খবর এসেছে যে, শ্রমিকদের নেতৃত্বে বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। ফ্যাক্টরীগুলোতে ক্রমাগত ধর্মঘট হওয়াতে কাজকর্ম প্রায় অচল, কৃষকেরা জমিদারদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছাত্রদের ভেতরও দারুণ অসন্তোষ—

লেনিন—এই সময়েই সব থেকে বেশি দরকার একটি শক্তিশালী মার্কসিস্ট পার্টির সংগঠন। এই সংগঠনই কৃষক-শ্রমিক-আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে পারবে—তাদের বিপ্লবাত্মক সংগ্রামকে বিজয়ীর জয়মাল্য এনে দেবে। এই মার্কসিস্ট পার্টির সংগঠনের জন্যই ইস্ক্রার মাধ্যমে আমাদের কাজ করতে হবে কমরেড্স।

[আলো নিভে যাবে এবং পেছনের পর্দা নেমে আসবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক—পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে লেনিন গেলেন মস্কো। সেখানে দেখা হোল পরিবারের সবার সঙ্গে। আলোচনা করলেন কমরেডদের সঙ্গে ইস্ক্রার প্রকাশ এবং প্রচার বিষয়ে। মস্কো থেকে গোপনে গেলেন সেইন্ট পিটার্সবার্গ। তারপর, এলেন স্কোভে, সেখান থেকে রিগা, সবজায়গাতেই আলোচনা করলেন পত্রিকার সংগঠন সম্বন্ধে সহযোগীদের সঙ্গে। এরপর ফিরে এলেন স্কোভে

ওখানকার বিপ্লবী এবং সংগ্রামী ইণ্টালেকচুয়ালরা মিলিত হলেন লেনিনের সঙ্গে আলোচনাসভায়। এ, স্টোপানী, আই, রাডশেঙ্কো, এন, লোকোভ প্রভৃতি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট সহযোগীর দল দায়িত্ব নিলেন স্কোভে ইস্ক্রার প্রচার এবং প্রসারের ঃ এইভাবেই তৈরি হল ইস্ক্রা সহায়কগোষ্ঠী। সেইণ্ট পিটার্সবার্গের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট-দের সঙ্গে বিদেশ থেকে কিভাবে সংযোগ রাখবেন, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্বিতীয়বার প্রবেশ করলেন সেখানে লেনিন। এই সময় একদিন পথে—

[কথক ডানদিকের উইংসের কাছে সরে যাবেন। পেছনের পর্দা উঠে যাবে —লেনিন বাঁদিক থেকে কি চিন্তা করতে করতে এগিয়ে আসবেন। পেছন থেকে দুজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে দুদিক থেকে তাঁর দুটি হাত নিজেদের হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবেন—তারপর লেনিনের পকেট সার্চ করে সব জিনিষ-পত্র বের করে নিয়ে নিজেদের পকেটে রাখবেন।]

একজন পুলিশ অফিসার—ভ্ল্যাডিমার ইলিচ্! মহামান্য জারের আদেশ, বিনা অনুমতিতে সেইণ্ট পিটার্সবার্গে প্রবেশ করবার জন্য তোমাকে গ্রেফতার করা হল।

দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার—তুমি ভেবেছিলে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাবে?

লেনিন—সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি তোমরা এত কর্ম-তৎপর। কিন্তু বিশ্বাস করো আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

প্রথম অফিসার—ওকথা আমাদের কাছে বলে কোন লাভ নেই।

[ওরা এবার লেনিনের হাত ছেড়ে দেবে।]

দ্বিতীয় অফিসার—আমাদের বড়-কর্তার কাছে গিয়ে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ কোরো। কিন্তু এ শহরে এসেছিলে কেন বলো তো?

লেনিন—একটা চাকরী যদি পাওয়া যায় এই আশায়।

প্রথম অফিসার—সে কি! বিপ্লব ছেড়ে চাকরী?

লেনিন—বিশ্বাস করো ভাই। বিপ্লব করবার বদখেয়াল আমার মন থেকে উবে গেছে। সাইবেরিয়াতে নির্বাসন যে কি ব্যাপার সে তোমরা বুঝবে না—ওখান থেকে মুক্তি পাবার পর প্রতিজ্ঞা করেছি, আর ভুলেও কখন ওসব পথে যাব না।

[পুলিশ অফিসার দুজন হো হো করে হেসে উঠবে।]

প্রথম অফিসার—তাহলে তোমার বদ্‌রোগ ছেড়ে গেছে বল?

লেনিন—বদ্‌রোগ বলে বদ্‌রোগ—কিন্তু সরকারের ওষুধও পড়েছিল তেমনি কড়া রকমের। একেবারে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে—এখন আমি গোঁড়া জারভক্ত প্রজা। তা তোমরা ভাই তোমাদের বড় সাহেবকে বলে আমাকে একটা পুলিশের চাকরি করে দাও না?

দ্বিতীয় অফিসার—উঁহু, অতোটা আশা কোরো না। ইচ্ছে করলেও কর্তা তোমার মত দাগী আসামীকে পুলিশের চাকরী দিতে পারবেন না। তবে, তাঁকে বোঝাতে পারলে তিনি তোমাকে মুক্তি দিতে পারেন।

লেনিন—চল তাহলে তাঁর কাছে যাওয়া যাক্।

প্রথম অফিসার—ওইদিকে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—এগিয়ে চল।

[যেদিক থেকে এসেছিল পুলিশ অফিসাররা লেনিনকে নিয়ে সেইদিকেই চলে যাবেন। পেছনের পর্দা নেমে আসবে। কথক এগিয়ে এসে বলতে থাকবেন ঃ]

কথক—সেইণ্ট পিটার্সবার্গের পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে, লেনিন চলে এলেন পোডালস্ক্-এ, নানা শহর থেকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট কমরেডরা এসে হাজির হলেন দেখা করতে। এঁদের ভেতর ছিলেন পি, লেপেশিনস্কি ও সোফিয়া, ছিলেন সারগে শেস্টারনিন্—আলোচনা হল লেনিন প্রবাসে থাকার সময় কিভাবে সাঙ্কেতিক লিপির আদান-প্রদান হবে। কমরেডরা কথা দিলেন তাঁরা লেখা পাঠাবেন ইসক্রার জন্য, সাহায্য করবেন কাগজটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বরকমে। জুন মাসে মা এবং বড় বোন আনাকে নিয়ে লেনিন চলে এলেন উফাতে ক্রুপস্কায়ার কাছে, পথে নিজ্‌নি নভগোরোডে সভা ডাকলেন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের—তাঁরা রাজী হলেন ইসক্রার প্রকাশনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে।

[কথক সরে যাবেন। পেছনের পর্দা উঠবে—দেখা যাবে উফাতে বসবার ঘরে লেনিন, ক্রুপস্কায়া, আনা এবং মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা আলাপরত ঃ]

লেনিন—যে কথা বলছিলাম। সেইণ্ট পিটার্সবার্গে ওই একজোড়া বোকা পুলিশ অফিসার তো আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আমার পকেট থেকে সব কিছু ওরা তুলে

তুর্কমান শিল্পীদের তৈরি লেনিনের কার্পেট পোর্ট্রেট

নিয়েছিল। তার ভেতর একটা বিলে অদৃশ্য কালি দিয়ে কয়েকটা গোপন খবর লেখা ছিল। ইওরোপে কার কার সঙ্গে গিয়ে সংযোগ স্থাপন করবো বিপ্লবের কাজে—এটা ছিল তারই তালিকা। দশদিন আমাকে জেলে থাকতে হয়েছিল—সব সময়েই ভয়ে ভয়ে ছিলাম পাছে গুপ্ত তালিকার কথা ওরা জানতে পারে—কারণ তাহলেই আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভেস্তে যেতো।

আনা—ধরা পড়লে আবার তোমাকে নির্বাসনে পাঠাতো ওরা।

লেনিন—যাক্ গে, বেঁচে গিয়েছি।

মারিয়া—তোমার বিদেশে যাবার পাশপোর্টটা ঠিক আছে তো ভ্লাডিমার?

লেনিন—হ্যাঁ, মা। পোডোলস্ক-এ একজন পুলিশ অফিসার এবার ওটা বাজেয়াপ্ত করতে চেয়েছিল। আমি তাকে দারুণ হুমকি দিয়ে বললাম—খোদ পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে আমি নালিশ জানাবো—অফিসারটা ছিল বোকা, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে তখুনি পাসপোর্টটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে দিল।

[সবাই হেসে উঠবে।]

ক্রুপস্কায়া—এখানে এবার কতদিন থাকবে?

লেনিন—সপ্তাহ দুয়েক তো বটেই—কিছু বেশিও হতে পারে। স্থানীয় কমরেডদের সঙ্গে ইসক্রার ব্যাপার নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করতে হবে। এই কাজেই সামারাতেও একবার যাব, তারপর সিজরান্। কাগজটার সংগঠনের ব্যাপারে ইভান বাবুশকিনের যথেষ্ট সাহায্য পাব। ও এখন আছে স্মলেনস্কে—ওখানে গিয়ে ওর সঙ্গে কিছু পরামর্শের দরকার। আশা করছি এখানকার সব কাজ সেরে জুলাই মাসে ইওরোপ রওনা হতে পারবো।

[ব্ল্যাক আউট—পর্দা নেমে আসবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন :]

কথক : ১৯০০ সালের জুলাই মাসে, লেনিন চলে এলেন সুইট্জারল্যাণ্ডে। এখানে তখন রাশিয়ার ইমান্সিপেশন অভ্ লেবার গ্রুপের সভ্যরা থাকতেন। জুরিখে গিয়ে লেনিন দেখা করলেন পি, এ্যাক্সেলরডের সঙ্গে। জেনিভাতে গিয়ে জি, প্লেখানভের সঙ্গে পত্রিকার বিষয় আলোচনা হল। আপত্তি তুললেন প্লেখানভ অনেকরকমের। তাঁর ইচ্ছা কাগজের উপর তাঁরই প্রাধান্য থাকবে কিন্ত লেনিন চিরকাল সমবেত প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী। এই নিয়েই মনান্তর হল প্লেখানভের সঙ্গে—লেনিন হলেন মর্মাহত। আগে থেকেই ঠিক ছিল ইসক্রা প্রকাশিত হবে জার্মানী থেকে, কিন্তু প্লেখানভ এবং এ্যাক্সেলরড্রা চান সুইটজারল্যাণ্ডে তাঁদের কর্তৃত্বে কাগজ প্রকাশ করা হোক। লেনিন রাজী হলেন না—কারণ ওখানে কাগজ ছাপা হলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। তাছাড়া জারিস্ট সরকার সুইটজারল্যাণ্ডের এই রাশিয়ান গ্রুপটির অবস্থানের কথা আগে থেকেই জানতেন, সুতরাং এখান থেকে কাগজ বের হলে কোন কথাই গোপন থাকবে না—এই ছিল লেনিনের মত। সুইটজারল্যাণ্ড থেকে লেনিন এলেন মিউনিখে ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে। মুক্তি পেয়ে ক্রুপস্কায়া এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন—এই সময় একদিন বাড়িতে বসে লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া আলোচনা করছিলেন।

[কথক সরে যাবেন। পেছনের পর্দা উঠে গেলে দেখা যাবে লেনিন ও ক্রুপস্কায়া আলোচনারত :]

লেনিন—আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি যে, তুমি এসেই ইস্ক্রার পরিচালনার ব্যাপারে সেক্রেটারীর কাজ করবে।

ক্রুপস্কায়া—এটা কি ঠিক হল? লোকে ব্যাপারটার অন্যরকম অর্থ করতে পারে—

লেনিন—হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু হলেও এছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

ক্রুপস্কায়া—কেন বলো তো?

লেনিন—ইস্ক্রা সংক্রান্ত সবকিছুই আমি অত্যন্ত গোপন রাখতে চাই। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ

কিভাবে সংযোগ হচ্ছে সেটাও যাতে কেউ বুঝতে বা জানতে না পারে এবং এসব ব্যাপার আমার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে পারে—এই হচ্ছে আমার আসল উদ্দেশ্য। অবশ্য সেক্রেটারী পদের জন্য প্লেখানভরা কোন প্রতিনিধিও পাঠান নি।

ক্রুপস্কায়া—ইসক্রা প্রকাশের ব্যাপারটায় ওঁরা বোধহয় তাহলে বিশেষ আগ্রাহান্বিত নন?

লেনিন—ইসক্রার ব্যাপারটা যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্লেখানভরা বুঝতে পারছেন না মোটেই। থিওরিস্ট হিসাবে প্লেখানভকে আমি শ্রদ্ধা করি ক্রুপস্কায়া। কিন্তু আমাদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য কৃষক, মজদুর এবং শ্রমিকশ্রেণীকে তৈরি করতে হবে—ডিক্টেটরশিপ অভ্ দি প্রলিটেরিয়াটের প্রতিষ্ঠা করতে ইসক্রার মত একটি পত্রিকা যে আমাদের পক্ষে অপরিহার্য একথা প্লেখানভ বুঝতেই পারছেন না।

ক্রুপস্কায়া—ওঁর মত লোক এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

লেনিন—বাস্তব জীবনের থেকে উনি অনেকটাই দূরে সরে এসেছেন। আর এতদিন রাশিয়ার বাইরে থাকার ফলে শ্রমিকদের জীবনের বাস্তব দিকটার সঙ্গে উনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। **The broad mass movement of the workers started after Plekhanov had gone abroad.** ওঁর পক্ষে রাশিয়ার মেহনতী মানুষদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করাটাও এখন আর সম্ভব হবে না।

ক্রুপস্কায়া—ইসক্রা কবে থেকে প্রকাশ করতে পারবে বলে মনে হয়?

লেনিন—এই বছরের (অর্থাৎ ১৯০০ খৃস্টাব্দ) ডিসেম্বরেই প্রথম সংখ্যা বের হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নানা বাধাবিপত্তি দেখা দিয়েছে পদে পদে। ছাপাখানা পাওয়া, রাশিয়ান টাইপ যোগাড় করা—এ সব কি কম মুস্কিলের ব্যাপার! ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে তো রাশিয়ান মুদ্রাক্ষর পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ক্রুপস্কায়া—শেষ পর্যন্ত পেলে কি করে?

লেনিন—জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের নেতা এবং জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ক্লারা জেট্‌কিন আমাকে এই ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেছেন। জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাট এ্যাডলফ্ ব্রন-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল মিউনিখে আসবার পথে ন্যুরেম-বার্গে—তিনিও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইস্‌ক্রার সাংগঠনিক এবং টেকনিক্যাল ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। কিছুদিন আগে পোলিশ বিপ্লবী জুলিয়ান মার্চোলিউস্কির সঙ্গেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল—উনি এখন মিউনিখেই আছেন। ওঁর ওখানে একদল ছাপাখানার লোকের সঙ্গেও কথাবার্তা হয়—তারাই আমাদের রাশিয়ান টাইপস্ যোগাড় করে দিয়েছে।

ক্রুপস্কায়া—উফাতে থাকতে খবর পেয়ে-ছিলাম যে রাশিয়ার সব বড় শহর-গুলোতে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে?

লেনিন—সাইবেরিয়া থেকে কয়েকটি রচনায় এ বিষয় আমি আগেই দেশ-বাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

ক্রুপস্কায়া—সে তো আমি জানি।

লেনিন—ক্যাপিটেলিস্ট সিস্টেমে বুমের পরই দেখা দেয় ক্রাইসিস্। ক্যাপি-টেলিস্ট প্রডাকসন্ বা লিপ্‌স্ এণ্ড বাউণ্ডস্ ডেভেলপ করে—**two steps forward and one step (and sometimes two) back**—আর এমনটা ক্রমা-গত হতে থাকবে, যতদিন না শ্রমিকশ্রেণী এসে প্রডাকসনের ক্ষেত্র থেকে ক্যাপিটেলিস্ট এবং প্রাইভেট প্রপার্টির মালিকদের অপসারিত করে।

ক্রুপস্কায়া—দেশের সাধারণ লোক এই ভয়াবহ আর্থিক সংকটের ভেতর পড়ে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। শ্রমিক-নেতারা তোমার কাছ থেকে সঠিক নির্দেশ পাবার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

লেনিন—ইস্‌ক্রার মাধ্যমেই সেই সব নির্দেশ তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেব। ডিক্টেটরশিপ্ অভ্ দি প্রলিটেরিয়েটের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এ ধরণের সমস্যার সমাধান হওয়াটা যে অসম্ভব, এই কথাটাই মেহনতী মানুষদের প্রথম থেকে বোঝা দরকার। সেইজন্যই তাদের সব দিক দিয়ে তৈরি হতে হবে—শ্রমিক সংগঠনকে দৃঢ় করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—তার পর আঘাত হানতে হবে ক্যাপিটেলিস্ট সিস্টেমের উপর। এমন আঘাত হওয়া চাই যার ফলে ধনতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়—ভবিষ্যতে আর কখনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

[আলো নিভে যাবে। পেছনের পর্দা নেমে আসবে।]

[ক্রমশ]

সদ্য প্রকাশিত হইল!

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত

বেদান্ত-গ্রন্থ

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ

বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ

অনুবাদক

পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ

মূল্য চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

রঙ্গজগৎ

গতানুগতিক গল্পের ছবি চাই না

বাংলা সাহিত্য গত কয়েকবছর একজায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কলেবরে বিরাট হচ্ছে কিন্তু বিষয়বস্তুতে হারেম বাঁদী আর যৌনতাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব রক্ষা করছে। বাংলা ছবি বাংলা উপন্যাসের চিত্ররূপ। সেই কবে যে উপন্যাসকে অবলম্বন করে বাংলা ছবির যাত্রা শুরু হয়েছিল আজো একই গতিতে সেই যাত্রা অব্যাহত। উপন্যাসের চিত্র অনুবাদ দেখে দেখে আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে। সাহিত্যে যেমন একদল ঔপন্যাসিকের আধিপত্য, ছবিতেও তাঁদেরই অস্তিত্ব। এই সাহিত্যিকের দল এককালে প্রগতির পতাকা ধারণ করে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। কালক্রমে বাজারী সাহিত্যে আত্মবিক্রয় করে বাড়ি-গাড়ির তপস্যায় রয়েছেন। এঁদের কাছে নতুন কিছু পাবার আশা করা যায় না। সুতরাং বাংলা ছবিতেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে নতুনত্ব নেই। পরিচালকরা একই ছকেবাঁধা গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের চিন্তা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় খুব কম ছবিতেই মেলে। তার মধ্যে ব্যতিক্রম আছে। যাঁরা ব্যতিক্রম তাঁরা আঙ্গিক সৌন্দর্যে ছবিকে ভরিয়ে তোলেন—বিষয়বস্তুতে সীমানা ডিঙোতে বড় বেশি চান না। কারণ তাতে আর্থিক দিকটার নিশ্চয়তা সম্পর্কে আশঙ্কা থাকে। প্রযোজকরা টাকা দিতে চায় না।

একারণেই বাংলা ছবিতে সমসাময়িকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। একটা বিশেষ কাল, তার সমস্যা ও বক্তব্য ছবিতে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে তপন সিংহের 'আপনজন' এবং আরো দু-একটি ছবি ব্যতিক্রম মাত্র। যদিও 'আপনজন'-এর বক্তব্য প্রগতিশীল নয়, তথাপি উপন্যাসের গন্ডি অতিক্রম করে ছবিটি সমসাময়িক মূল্যে উল্লেখযোগ্য। এদিক থেকে বাংলা নাটক অনেক এগিয়ে আছে। বাংলা নাটকে নতুন নতুন লেখকের চিন্তায় বর্তমান সমাজ ও তার সমস্যা এবং যন্ত্রণাকে অনুভব করা যায়। ছবির ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার গন্ডি অতিক্রম করতে পারতেন তাঁরা, যাঁরা দেশ-বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছেন সার্থক চলচ্চিত্রস্রষ্টা হিসাবে। তাঁরাই পারতেন বাজারী ঔপন্যাসিকদের বন্ধ্যা চিন্তাধারা থেকে ছবিকে নতুন চিন্তায় আলোকিত করতে। আশ্চর্যের কথা, তাঁরাও তাঁদের গল্পকেই অবলম্বন করে ছবি করেন, যাঁদের গল্পে সত্যিকার সমাজের প্রতিফলন নেই।

এঁদের সাহসের অভাবে নতুন গল্প লেখকদের প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। ছবিতে নতুন চিন্তা প্রকাশ পায় না। উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়, কিন্তু আমাদের দেশে সত্যিকার চিত্রনাট্যকারের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। উপন্যাসের ছকের বাইরে থেকে চিত্রনাট্য রচনা করার মত সুযোগ যদি না থাকে তবে ছবির বিকাশ ঘটতে পারে না। সাহিত্য, ইতিহাস লোককথা এবং জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করে তারই অভিজ্ঞতায় চিত্রনাট্য রচিত হওয়া উচিত। তবে সেই ছবি হবে জাতির জাতীয় ছবি, জাতীয় ভাবধারার প্রকাশ।

দেশী ছবি অপেক্ষা দর্শকরা বেদেশী ছবিতে বেশি উৎসাহবোধ করেন। তার অন্যতম কারণ বিদেশী ছবিগুলি গতানুগতিক উপন্যাসের চিত্ররূপ নয়। বিদেশী ছবি অর্থে আমি এমন ছবির কথা মনে করছি যেগুলি নিছক 'ঔপনিবেশিক ছবি' নয়। হলিউড এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে আজকাল যে ছবি আসে তার অধিকাংশ ছবিই 'ঔপনিবেশিক ছবি' অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে ব্যবসা করে টাকা এবং অপসংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যেই এ সব ছবি নির্মিত হয়। লজ্জার কথা আমাদের দেশে সে সব ছবিকে অনুকরণ করে দেশীয় ছবি করা হয়। অথচ নতুন চিন্তা, নতুন লেখক, নতুন চিত্রনাট্যকারের অনুসন্ধান করা হয় না।

গত কয়েক বছরে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক পুরাতন চিন্তা ও রীতির ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। বিরাট বিরাট আন্দোলন হয়েছে। তার অভিজ্ঞতায় লেখকের জন্ম হয়েছে। এই লেখকদের সন্ধান বাজারী কাগজগুলিতে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে ছোট ছোট পত্রিকায়। ছবির প্রযোজক এবং পরিচালকেরা নজর রাখলে এরকম লেখকের সন্ধান অনেক পাবেন। যাঁদের লেখা বিষয়বস্তু এবং চিন্তা বাংলা ছবিকে সমসাময়িকতা ও ইতিহাসের মূল্যে অনেক বেশি উপভোগ্য করে তুলতে পারে। —সুজন।

'ওয়েট আনটিল ডার্ক' ছবিতে অড্রে হেপবার্ন।

স্টুডিও খবর

বনজ্যোৎস্না

কয়েকদিন স্টুডিও স্যুটিং-এর পর পরিচালক দীনেন গুপ্ত সদলে বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য ভূটান সীমান্তে গেছেন। তাঁর 'বনজ্যোৎস্না'র কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভূটান সীমান্তে পাহাড়ী অঞ্চলের পটভূমিতে দৃশ্যগুলি তোলা হবে। এই বহির্দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করছেন কাজল গুপ্ত, সমিত ভঞ্জ, কামু মুখার্জী, উমানাথ ভট্টাচার্য, দিলীপ ভট্টাচার্য, নির্মল ঘোষ, নিরঞ্জন রায় এবং নবাগতা মীনাক্ষী দত্ত। সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। সংগীত পরিচালনা করছেন নীহার রায়। ছবিতে গান গেয়েছেন শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখার্জী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃণাল চক্রবর্তী।

হরবোলা

সিনোগ্রাফিক-এর উদ্যোগে সুবোধ ঘোষের 'পুষ্পকীট' অবলম্বনে 'হরবোলা' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করবেন হাসু ব্যানার্জী, নন্দিতা বসু, নিভাননী দেবী, মহুয়া ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখার্জী, সমিত ভঞ্জ, চিন্ময় রায়, সন্তু মজুমদার, শুভেন্দু চ্যাটার্জী,

বঙ্কিম ঘোষ, অরুণ রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী এবং 'হরবোলা'র ভূমিকায় জয়দীপ ঘোষ।

"বালক গদাধর"

পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলাকে কেন্দ্র করে পরিচালক হিরণ্ময় সেন 'বালক গদাধর'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ সমাপ্ত করে বর্তমানে সম্পাদনায় ব্যস্ত রয়েছেন। 'বালক গদাধর'-এর চিত্রনাট্য রচনাও করেছেন পরিচালক হিরণ্ময় সেন নিজেই। সংগীত পরিচালনায় অহীন ঘোষ, চিত্রগ্রহণে বিভূতি চক্রবর্তী এবং সম্পাদনায় রয়েছেন শিব ভট্টাচার্য।

অভিনয়ে—মাঃ সৌমিত্র, কুমারী চুমকী, ছায়া দেবী, গীতা দে, স্বপনকুমার, নৃপতি চ্যাটার্জী, বঙ্কিম চৌধুরী, ধীরেন চ্যাটার্জী অমরেশ দাস প্রমুখ।

চিত্রে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'

শ্রীরঞ্জিৎমল কাংকারিয়ার প্রযোজনায় এবং বীরেশ্বর বসুর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ এন টি (২ নম্বর) স্টুডিওতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 'বিসর্জন'-এর মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন উৎপল দত্ত (রঘুপতি)।

চিত্র দুখানির পরিবেশনায় রয়েছেন শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স।

সংবাদিকী

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি চেক চলচ্চিত্র উৎসব

৮ই জুন এবং ১৫ই জুন সকাল সাড়ে ন'টায় ছায়া সিনেমায় যথাক্রমে 'জোনাসিক' 'দি ক্রাইম' এবং ১০ ও ১১ই জুন সন্ধ্যায়/রাত্রে প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে যথাক্রমে "ডিটা স্যাক্স" ও "দি ভ্যালী অফ বীস" ছবিখানি প্রদর্শিত হবে।

'জীনে কি রাহ' ছবিতে তনুজা

পুনর্মিলন উৎসব

২৫শে মে রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দেন ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।...সকলকে সাদর সম্বর্ধনা জানান ডাঃ অমলেন্দু বসু এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী। উক্ত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিভিন্ন সভ্যবৃন্দ। সবশেষে একটি নৈশভোজের পর প্রথমদিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২৬শে মে সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় সঙ্গীতকলামন্দিরে দ্বিতীয় দিনের বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রীস্বপন গুপ্ত। এর পর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা রসরাজ অমৃতলাল বসুর "ব্যাপিকাবিদায়" মঞ্চস্থ করেন।

নজরুল জয়ন্তী

গত ২৫শে মে '৬৯ রবিবার সন্ধ্যায় ৮০, বৈষ্ণবপাড়া লেন, হাওড়া-১ "অভিনব অগ্রণী" কিশোর মাসিক পত্রিকার কার্যালয়ে অভিনব অগ্রণী সাহিত্যিকগোষ্ঠী ও অগ্রণী ছোটদের সংসদের উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৭০তম জন্মদিবসে শ্রীদিলীপকুমার বাগের সভাপতিত্বে অনাড়ম্বর পরিবেশে সংগীত-কবিতা পাঠ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবাগ সহ ত্রিদিব মিত্র, মধুসূদন গাঙ্গুলী, অসীমা বাগ, তপনকুমার ঘোষ, অণিতা বাগ, পঞ্চানন রায়-চৌধুরী, অপূর্ব কুণ্ডু, ময়নরঞ্জন বিশ্বাস অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বি. এফ. জে-র পুরস্কারদান অনুষ্ঠানে তপন সিংহ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রিয়া দেবী, বিমল মুখার্জী ও প্রনাথ মিত্র

'আনন্দযুগের কাহিনী' চিত্রে মাধবী মুখার্জী

বি, এফ, জে-র পুরস্কার

গত ২৮শে মে রবীন্দ্র সদনে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলীদের পুরস্কার দান করা হয়েছে। এই সংগঠনের বিচারে যাঁরা ১৯৬৮ সালের শ্রেষ্ঠ প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রধারক, সম্পাদক ইত্যাদি তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রচার ও তথ্য-মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ। সমাগত শিল্পী এবং অতিথিদের স্বাগত জানান আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক সরকার এবং ধন্যবাদ জানান অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুষ্ঠানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কোন সদস্যকে দেখা যায় নি।

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান

আগামী ৭ই জুন বিকেল ৬টায় মহাজাতি সদনে নজরুল একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিচারপতি শ্রীশঙ্কর-প্রসাদ মিত্র। শ্রীমুজাফ্ফর আহমদ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযতীন চক্রবর্তী, শ্রীমতী কনক মুখার্জী প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানে নজরুলসংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কৃতীদের পুরস্কার দান এবং শ্রীনিতাই ঘটক ও শ্রীঅনিল বাগচীকে গুণী সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। নজরুল-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতিগণ এবং বিখ্যাত শিল্পিগণ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান

গত ১৮ই মে রবিবার সন্ধ্যায় সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে খিদিরপুর শিল্পী-গোষ্ঠীর বাৎসরিক মিলনোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হল। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সুধীজন সমাবেশে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রীতি উপহার সহ মানপত্র দান করেন। শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করার পর তারাশঙ্কর বর্তমান সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এক সুবিস্তৃত আলোচনা করেন। শিল্পীগোষ্ঠীর তরফ থেকে প্রতি বৎসর কৃতী শিল্পীদের যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, তাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ করেন। সাহিত্যবাসর ও গুণিজন সম্বর্ধনা আসরের পরে সর্বশ্রী সন্তোষ-কুমার সাহা ও শঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনায় সংস্থার পক্ষ থেকে কবিগুরুর চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। সঙ্গীত, নৃত্য ও গ্রন্থনায় অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী সুমিত্রা দে, রীতা চক্রবর্তী, মৃগাঙ্ক কুমার, মঞ্জুশ্রী মণ্ডল, সমিৎ বসু, দেবব্রত সাহা, বনানী গোস্বামী, সর্বাণী গোস্বামী, অসীম সাহা, প্রণতি মজুমদার, বাণী সাহা ও আরও অনেকে।

শোক-সংবাদ

প্রবীণা মঞ্চশিল্পীর জীবনাবসান

প্রবীণা মঞ্চশিল্পী শ্রীমতী আঙ্গুর-বালা দেবী সম্প্রতি জাপুর হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গত এক মাস যাবৎ তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা-ধীন ছিলেন। এই প্রবীণা শিল্পী শেষের দিকে মহিলা শিল্পিমহলের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বাস্তবিকপক্ষে আত্মীয়হীনা ও নিঃসম্বল ছিলেন। মহিলা শিল্পী-মহল দুস্থা শিল্পীদের আশ্রয়-দানের জন্য গত কয়েক বছর থেকে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছেন। শ্রীমতী আঙ্গুরবালার মত কয়েকজন শিল্পীর শেষ সময়ের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে এই সংস্থা। আঙ্গুরবালা দেবীর শেষ সময়ে উপস্থিত ছিলেন কানন দেবী, নীলিমা দাস, সরযূ দেবী, সাধনা রায়-চৌধুরী এবং মহিলা শিল্পীমহলের আরো অন্যান্য সদস্যা

সুর-মঞ্জিরের অনুষ্ঠানে 'নূরজাহান' নাটকের একটি দৃশ্য

ইতিহাসের পাতা থেকে

বিশ দশকের প্রামাণ্যচিত্র

॥ তের ॥

ভার্টভের পূর্ণদীর্ঘ প্রমাণ্যচিত্র 'মার্চ অন সোভিয়েত !' এবং 'বিশ্বের এক ষষ্টাংশ' নির্বাক যুগের প্রধান সাফল্য।

'মার্চ অন সোভিয়েত !' (১৯২৬) ছবিটি গঠিত হয়েছিল সংরক্ষণাগারের মালমশলা নিয়ে এবং বিশেষ বিশেষ দৃশ্য যুক্ত করে। এই ছবিতে দেখান হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের মধ্য থেকে কিভাবে মস্কো এবং রাশিয়ার অন্যান্য অংশ উঠে দাঁড়িয়েছে, কিভাবে শিল্প এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার সহযোগী ব্যবস্থাসমূহ যথারীতি চালু হয়েছে। এই ছবিতে বিপরীতধর্মী দৃশ্য চমৎকারভাবে সাজান হয়েছে, একদিকে দেখান হয়েছে ধ্বংস ও ক্ষুধা, আর একদিকে দেখান হয়েছে জনগণের আগ্রহ ও শ্রমে গঠিত স্বাভাবিক অবস্থা, যা তখন চলছিল।

'ওয়ানসিক্সথ অব দি ওয়ার্ল্ড' (১৯২৬) এক কাব্যিক ছবি। এতে সোভিয়েত ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিভিন্ন ধারায় জনগণের জীবনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

আরেকজন প্রধান প্রামাণিকচিত্র নির্মাতা এসফির সাব, (১৮৯৪—১৯৫৯)। পুরনো নিউজ রীল থেকে এই মহিলা ছবি করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবের পরে শিক্ষাসংক্রান্ত পিপলস কমিসারিয়েতের থিয়েটার বিভাগে তিনি কাজ করতেন। সেখানে তিনি শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক কৃতী লোকের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পান। ১৯২২ সালে তিনি চিত্র-সম্পাদক হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন; তাঁর কাজ ছিল সোভিয়েতে যেসব বিদেশী ছবি মুক্তি পেত সেগুলিকে

খিদিরপুর শিল্পীগোষ্ঠীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

সম্পাদনা করা। তিনিই আইজেনস্টাইনকে ছবির ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। আইজেনস্টাইন তখন মঞ্চ-পরিচালক ছিলেন। এস্‌ফির সাবের ফিল্ম কাটিং-এ আইজেনস্টাইন এত উৎসাহবোধ করেন যে, নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। ফ্রিৎজ লাঙ-এর 'ডাঃ মাবুজে' দুই খণ্ড ছবিকে কেটে তিনি এমনভাবে একখণ্ডে সম্পাদনা করেন যে, কাহিনী ও মূল চরিত্রগুলির ভিন্ন অর্থ হয়ে যায়।

এস্‌ফির সাব এবং আইজেনস্টাইন, দু'জনার ক্ষেত্রেই কাটিং-এর কাজ বিরাট শিক্ষার বিষয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে এসফির সাব প্রামাণিকচিত্রের খাতিরে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি কবি মায়াকভস্কির কথায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। মায়াকভস্কি সোচ্চারে বলতেন যে, শিল্পের কাজ হল আসল ঘটনাকে প্রকাশ করা, শিল্পগত কল্পকাহিনীতে ডুবে থাকা নয়।

এসফির সাব পুরনো নিউজ রীলের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাঁর প্রথম ছবি 'দি ফল অব রোমানভ' এভাবেই নির্মিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৯১৭) দশম বার্ষিক দিবস উপলক্ষে। ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে যথেষ্ট চাতুর্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে তিনি তাতে নতুন অর্থ যোগ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী ছবি 'দি গ্রেট পাথ' (১৯২৭) সোভিয়েত রাষ্ট্রের দশম বার্ষিক দিবস উপলক্ষে উৎসর্গ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক মূলসম্পন্ন ঘটনাবলীকে এই ছবির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু ঘটনার সময় এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমান সামঞ্জস্য দুর্বল ছিল। 'দি ফল অব রোমানভ'-এর মত চেতনা এখানে ছিল না, এবং ফিল্মটি ছিল ঘটনার রেকর্ডিং মাত্র।

সম্পাদনায় এসফির সাবের পরম উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল তাঁর তৃতীয় ছবি 'রাশিয়া অব নিকোলাই সেকেণ্ড এণ্ড লিও টলস্টয়' (১৯২৮) ছবিতে। টলস্টয়ের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ছবিটি মুক্তিলাভ করে। টলস্টয়ের চমৎকার ছবি, বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার দিগন্তবিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য ছবিটিতে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।

বিশ দশকের একটি উল্লেখযোগ্য ছবি 'টার্কসিব' (দি তার্কেস্তান—সাইবেরিয়ান রেলওয়ে; ১৯২৯)। এই ছবির নির্মাতা ভিক্টর তুরিন।

তুরিন ছিলেন রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগীর ছেলে। তাঁরা দেশত্যাগ করেছিলেন ১৯১২ সালে। তুরিন ১৮৯৫—১৯৪৫) ফিল্মে কাজ আরম্ভ করেছিলেন হলিউডে চিত্রনাট্য লেখক এবং অভিনেতা হিসাবে। ১৯২২ সালে তিনি রাশিয়ায় ফিরে আসেন এবং কয়েকটি কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেন। সেই ছবিগুলি তখনকার দিনে ভাল ছবি, কিন্তু তাঁর খ্যাতি হয় একমাত্র প্রামাণ্যচিত্র থেকে।

পশ্চিম জার্মানীতে ফটো মডেলদের এক টা স্কুল হয়েছে। ছবিতে এই স্কুলের কয়েকজন ছাত্রীকে দেখা যাচ্ছে।

তুরিন কৌতূহলজনক ঘটনা বেছে নিতেন এবং দর্শকের এবং দক্ষ শিল্পীর চোখে তা পরিবেশন করতেন। তার্কেস্তান থেকে সাইবেরিয়া রেলপথ নির্মাণের কাহিনী—যা তখনকার দিনে অ.ধা-মরু-ভূমি কাজাগ তৃণভূমি ইত্যাদিতে ভয়ঙ্কর ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প-রূপান্তরের অদম্য সংকল্পের একটা প্রতীকচিত্র। ছবিতে আধুনিক যন্ত্র আর কাজাক স্তেপভূমির পিতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থার পরস্পর-বিরোধী চিত্র, রেল-পথের পাশে উটের সারি ইত্যাদিতে প্রকাশ পেয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রূপান্তর করার পথে কিভাবে সারা দেশ কাজে লেগেছে।

ছবি শেষ হয়েছে প্রথম ট্রেনটি মরু এবং স্তেপভূমি অতিক্রম করে যাবার মধ্যে, যাতে প্রকাশ পেয়েছে জনগণ তাদের জীবনকে নতুন করে গড়ার দিকে এবং প্রকৃতিকে বশ মানাবার দিকে চলেছে।

'তার্কসিব' বিশ দশকের সকল প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল কাজের একটি বিশেষ নিদর্শন; সেই সঙ্গে এই ছবিটি নতুন আবিস্কার, সাফল্য ও চিন্তার পথ খুলে দিয়েছে।

—ক, ন, গু

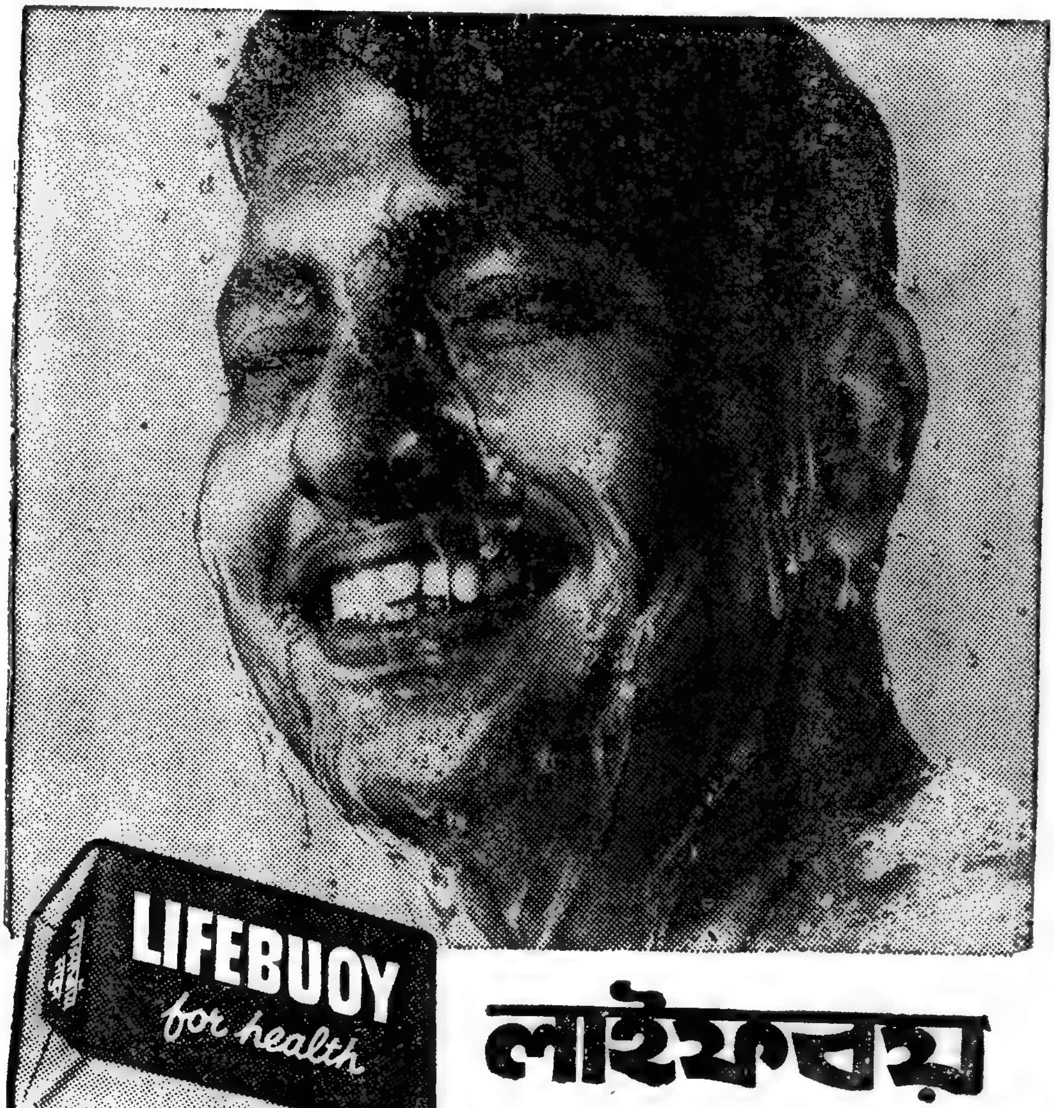

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন। এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে।

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

[illegible]

খেলা ধুলো

শিক্ষা

কথায় বলে, কেউ দেখে শেখে আর কেউ ঠেকে। এই প্রবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ডেভিস কাপের খেলায় মেক্সিকোর কাছে অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক পরাজয়। মেক্সিকোর হাতে ৩—২ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় রীতিমতো বিস্ময়কর। শুধুমাত্র বিস্ময়কর বললেই হয়তো সবটা বলা হবে না, বলতে হবে যে, অস্ট্রেলিয়ার এই পরাজয় অকল্পনীয়। অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের কথা বোধহয় মেক্সিকোর অতিবড় উৎসাহীও কল্পনা করতে পারেন নি। পারবেনই বা কি করে? টেনিস জগতে কোথায় আমেরিকার স্থান আর কোথায়ই বা মেক্সিকোর। দুটি দেশের মধ্যে শক্তির তুলনা হয় না এতটুকুও। তাই সকলেই ভেবেছিলেন যে, আমেরিকা অঞ্চলের ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া তুড়ি মেরে জিতে যাবে। মেক্সিকো হালে পানি পাবে না। কেউ বা আবার আরো এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে ভেবেছিলেন যে, হয়তো বা পাঁচটা খেলাতেই অস্ট্রেলিয়া জিতে যাবে। মেক্সিকোর এই জয়লাভের পেছনে আছে তাদের প্রবীণ ও খ্যাতনামা খেলোয়াড় র‍্যাফেল ওসুনার অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য। রিভার্স সিঙ্গলসের প্রথমটিতে অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসন হারিয়ে দিলেন মেক্সি-কোর জে গোয়োমায়োকে। খেলার উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। দুটি দেশই জিতেছে দুটি করে খেলায়। শেষ খেলায় মেক্সিকোর র‍্যাফেল ওসুনা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অস্ট্রেলিয়ার বিল বাউরিকে পরাজিত করলে মেক্সিকো লাভ করলো জয়লাভের সম্মান।

অস্ট্রেলিয়ার এই পরাজয় বিস্ময়কর। তাই এই পরাজয়ের কারণ জানার জন্যে সকলের মনেই আজ গভীর আগ্রহ। সকলেই জানতে চান, কেন এই পরাজয়? অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দল কেন হেরে গেলো মেক্সিকোর কাছে? আমাদের মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার এই পরাজয়ের পেছনে আছে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে শক্তিহীন ভাবা— ইংরেজীতে যাকে বলে আন্ডার এস্টিমেট করা। মেক্সিকোকে দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেই অস্ট্রেলিয়া নেমেছিলো খেলায়। ফলে যা হবার তাই হলো। যুদ্ধোত্তরকালের পনের বার ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া হেরে ভূত হয়ে গেলো মেক্সিকোর কাছে। বছরের প্রথম খেলায় অস্ট্রেলিয়ার এই পরাজয় থেকে যদি আমরা কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তাহলে কাজের মতো কাজই হবে। খেলাধুলার একটা মৌল বিষয় হলো যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দল যতোই দুর্বল হোক না কেন—তাকে কখনই দুর্বল ভাবতে নেই। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে হয়। এই প্রসংগে কলকাতার ফুটবলের কথা টেনে আনা যায়। কারণ বছরের পর বছর আমরা দেখেছি যে, নাম করা দলগুলো অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন দলকে ঠিকমতো পাত্তা দেয় না। ফলে গুরুত্বহীন খেলায় ঠিকমত মন না দিয়ে খেলে তারা অস্বাভাবিক ফলাফল করে বসে। ফলে মাঠের মধ্যে বেধে যায় গোলমাল। অনেক সময় এই গোলমাল যে কোথায় গিয়ে ঠেকে সে কথা বোধহয় না লিখলেও চলে। তাই কোন দলকে কোন সময়ই আন্ডার এস্টিমেট করা বা শক্তিহীন ভাবা ঠিক নয়। আশা করি ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া বনাম মেক্সিকোর খেলার ফলাফল আমাদের সেই শিক্ষাই দেবে।

ফুটবল-ফুটবল

লীগ ফুটবলের আসর জমে উঠেছে। সেই সংগে তাল দিয়ে সেই পুরনো দৃশ্যগুলো নতুনভাবে এসে উপস্থিত হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। আবার সেই হৈ-হট্টগোল। অথচ এই গোলমালের কোন সংগত কারণ নেই। কারণ লীগের খেলার সংগৃহীত পয়েন্টের ওপর এখন আর নির্ভর করে না এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া কিম্বা না হওয়া।

লীগ তালিকার ওপরের কয়েকটি দল লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের জন্যে অবতীর্ণ হবে সুপার লীগের খেলায়। তাই কলকাতা ময়দানের ভেরি ইম্-পর্টেন্ট ক্লাবগুলোর আসল শক্তিপরীক্ষা হবে সেখানে। এখন তো তাঁরা খেলছেন অনেকটা সেই খেলতে হয় খেলা গোছের খেলা। তাই লীগের খেলার এক-একটা পয়েন্টের দিকে ঠিক যেন তেমন-ভাবে নজর দিচ্ছেন না কেউ। দেবেনই বা কেন? দেবার তো প্রয়োজন নেই এতোটুকুও।

এদিক দিয়ে মহামেডান স্পোর্টিং একটু যেন অন্যরকম। মহামেডান স্পোর্টিং দলের সমর্থকরা কি ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারছেন না এবারের লীগের খেলায় এক-আধটা পয়েন্টের তেমন কিছু দাম নেই। মনে হয় না—পারলে আর যাই হোক খেলার মাঠে ঐ ধরণের গোলমাল তাঁরা প্রায়ই শুরু করতেন না।

সেদিন মহামেডান স্পোর্টিং বনাম হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলায় যা কাণ্ড হলো তার বোধহয় তুলনা মেলা ভার। হাওড়া ইউনিয়ন একটা গোল দিয়েছিলো কিন্তু জাল ছেঁড়া থাকায় বলটা বাইরে চলে যায়। বল বাইরে দেখে রেফারী ভেবেছিলেন বুঝি গোল নয়। তাই গোল কিকের নির্দেশ দিলেন। তখন হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলোয়াড়রা প্রতিবাদ জানালে তিনি লাইন্সম্যানের সংগে আলোচনা করে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলে দিলেন গোলের নির্দেশ।

সংগে সংগে আরম্ভ হয়ে গেলো গোলমাল। আর তার দাপটে খেলার ওপর অকালেই পড়লো ইতির দাঁড়ি। অথচ এমনটি তো হবার কথা নয়। ফুট-বল খেলার আইনকানুনে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, প্রয়োজনবোধে রেফারী তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবেন। তাছাড়া হাওড়া ইউনিয়ন গোলটা করে-ছিলো খেলার প্রথম অর্ধের একেবারে প্রথম দিকে। বাকী সময়ের মধ্যে কি আর মহামেডান স্পোর্টিং-এর মতো শক্তিশালী দল গোল শোধ করতে পারতো না?

যাই হোক অন্য দলগুলো মোটামুটি-ভাবে খেলে চলেছে। তবে বড় দলগুলোর তুলনায় ছোটরা এবার পয়েন্ট সংগ্রহ করার দিকে বেশি মনোযোগী। মনোযোগ না দিয়েও এবার অবশ্য উপায় নেই। কারণ লীগ ফুটবলে আবার যে চালু হয়েছে ওঠা-নামার পালা।

কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানই এবার প্রথম থেকে শুরু করেছে পয়েন্ট নষ্ট করতে। হয়তো বা এক-আধ পয়েন্টের বিশেষ কোন গুরুত্ব এবার নেই বলেই তারা খেলছে না খুব একটা গা দিয়ে। কারণ সুপার লীগের খেলাগুলোই তাদের কাছে আসল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এই মরশুমের একটি অমীমাংসিত খেলার উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য। মোহনবাগান—উয়াড়ীর বিরুদ্ধে গোল করতে পারে নি—উয়াড়ীও পারে নি গোল করতে। ছবিতে মোহনবাগানের পি মজুমদারের গোল করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছেন উয়াড়ীর গোলরক্ষক কে· মুখার্জী।

ইডেন উদ্যানে মেয়েদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা কলকাতার দর্শকদের খুব একটা আকর্ষণ করতে পারে নি। ধরতে গেলে ফাঁকা মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়েছে খেলাগুলো। ফাইন্যালে উঠেছিলো গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব। পাঞ্জাব এ-পর্যন্ত মোট পাঁচবার ও পর পর তিনবার ফাইন্যালে ওঠার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ফাইন্যালে তারা সম্মুখীন হয়েছিল গত বছরের রানার্স আপ মহারাষ্ট্র দলের।

সমাচার দর্পণ

ভারতের পাতৌদি যদি একটা চোখ নিয়ে খেলতে পারে—তাহলে আমিই বা পারবো না কেন?—একথা বলেছেন ইংলণ্ডের টেস্ট খেলোয়াড় কলিন মিলবার্ন। সম্প্রতি এক মোটর দুর্ঘটনায় মিলবার্ন একটা চোখ হারিয়েছেন। সকলে যখন ভাবছিলেন যে ইংলণ্ডের এই মোটা-সোটা ব্যাটসম্যান আর খেলতে পারলেন না, তখনই মিলবার্ন বলে উঠলেন, সে কি কথা—কেন খেলতে পারবেন না, তখনই মিলবার্ন চোখ নিয়ে ব্যাটিং-এ কেমন ভেল্কি দেখাচ্ছে...!

* * *

ইডেনের ফাঁকা মাঠে মেয়েদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা এখন শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। ইডেনের বিকেলগুলো এখন আনন্দ-হাসি-গানে ভরা। মেয়েদের হকি খেলার কলতানে মুখর, কিন্তু কলকাতার দর্শকরা এই আনন্দের ভাগ ঠিক যেন নিলেন না। তাই অধিকাংশ খেলাই অনুষ্ঠিত হলো ফাঁকা মাঠে।

* * *

এবারের জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বোম্বাই ও পাঞ্জাব যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। টসে জেতায় বোম্বাই ট্রফিটি নিজেদের কাছে প্রথম ছ'মাস রাখার অধিকার অর্জন করেছে।

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে

বাংলার সেরা ক্রীড়াবিদরা কি বলেন

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

[ইডেন উদ্যানে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে বাংলার সেরা ক্রীড়াবিদরা কি বলেন—এই পর্যায়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে পঙ্কজ রায়, পঙ্কজ গুপ্ত, গুরুবক্স সিং, চুনী গোস্বামী, পি. কে. ব্যানার্জী, অরুণ দত্ত, কমল ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র ঘোষ, পল্টু, আধুরী প্রমুখের মতো ক্রীড়াবিদদের মতামত প্রকাশ করেছি। এঁরা কেউই ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির প্রজেক্টকে সমর্থন করেন নি। মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছিলেন যে কিছু করার আগে তাঁরা বাংলার ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখবেন। আশা রাখি সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত এই মতামতগুলোকে তাঁরা একেবারেই ঠেলে ফেলে দেবেন না—একটু বিবেচনা করে দেখবেন। কারণ বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ইডেন উদ্যান শুধু মাত্র বাংলার নয় সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরবের জিনিষ। —ক্রীড়া সম্পাদক]

গুরুবক্স সিং বললেন

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম গঠন প্রসঙ্গে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের যুগ্ম-অধিনায়ক গুরুবক্স সিংকে প্রশ্ন করলে তিনি জানালেন, 'কম্পোজিট স্টেডিয়াম হতে পারে, অতে কোনই অসুবিধা হবে না। হকি-ক্রিকেট খেলার এত সুন্দর মাঠ কলকাতায় নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, 'না, না, ইডেনে ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। সেখানে ফুটবল চলতে পারে না। বাংলাদেশে ফুটবল খেলা বর্ষা-কালেই হয়ে থাকে। সেজন্য বৃষ্টিতে ফুটবল খেলা হলে মাঠের অবস্থা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। এত কাদায় পিচ্ছিল মাঠে কি ফুটবল খেলা সম্ভব? ইডেনের মাটি 'ব্ল্যাক সয়েল' দিয়ে তৈরি, সেখানে বৃষ্টিতে ফুটবল খেলা হলে মাঠের অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তা সহজেই বোঝা যায়।

অভিজ্ঞ হকি খেলোয়াড় আরো জানালেন, ইডেনের সবুজ ঘাসে, সমতল মাটিতে হকি খেলা খুবই চমৎকার হয়। এখন তো জাতীয় মহিলা হকি খেলা ইডেনেই হচ্ছে। হকি খেলার জন্য এ ধরণের মাঠ খুবই উপযোগী। ক্রিকেটের তো কথাই নেই। ইডেন তো ক্রিকেটের জন্যই বিশেষভাবে তৈরি।

এ প্রসঙ্গে গুরুবক্স বললেন, বৃষ্টিতে ফুটবল খেলার পর মাঠের অবস্থা এমন আকার ধারণ করবে যে, তারপর তাকে ক্রিকেট বা হকির উপযোগী করে গড়ে তোলা খুবই কষ্টসাধ্য হবে। অল্প সময়ে তা সম্ভবও হবে না। তিনি বললেন, অনেকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল মাঠের কথা উল্লেখ করে অভিমত প্রকাশ করেন যে, সেখানে তো পুরোদমে হকি, ফুটবল, ক্রিকেট চলছে, তাহলে ইডেনে সম্ভব হবে না কেন? তার কারণ ইডেন আর মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠের মাটির পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠ ইডেনের তুলনায় অনেক ছোট। ইডেনে একসঙ্গে পাশাপাশি দুটো হকি মাঠ তৈরি করে তো এখন জাতীয় মহিলা হকির ম্যাচ চলছে। তাই অতবড় মাঠ জলে-কাদায় একাকার হয়ে গেলে তাকে ঠিকমত তৈরি করতে অনেক মেহনত করতে হবে, তাতেও সে মাঠ পূর্ব চেহারা ফিরে পাবে কি-না সন্দেহ।

দর্শকদের কথা বিবেচনা করে তিনি জানালেন, ফুটবলের বড় জায়গা চাই যাতে অনেক দর্শক একসঙ্গে খেলা দেখতে পান। ইডেনের ক্রিকেট মাঠ এমনভাবে তৈরি যে, সেখানে দর্শকরা ফুটবল খেলা দেখে বিশেষ আনন্দ পাবেন বলে মনে হয় না।

ইডেনে হকি ও এ্যাথলেট ক্রিকেটের সঙ্গে চলতে পারে অনায়াসেই। তিনি অবশেষে জানালেন, 'জোকিন, হকি, ফুট-বল, ক্রিকেট একসাথে কিছু নেহি চলে গা।'

গল্প হলেও সত্যি

১৯২৫ সাল।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সেবার প্রথম বিভাগে খেলার সুযোগ পেলো। লীগের প্রথম বছরই ইস্টবেঙ্গল মোটামুটি ভালোই খেলেছিলো। ষোলটা খেলার মধ্যে আটটায় জিতে ইস্টবেঙ্গল প্রথম বিভাগের প্রথম বছরই লাভ করলো চতুর্থ স্থান।

পরের দু'বছরও ইস্টবেঙ্গল খুব একটা সুবিধে করতে পারলো না। তবু টিকে থাকলো প্রথম বিভাগে। কিন্তু চরম দুর্দিন এলো ১৯২৮ সালে। সেবার লীগের এগারোটা খেলায় হারলো ইস্টবেঙ্গল আর গোল খেলো ৪২টা। সংগৃহীত পয়েন্টের সংখ্যা হলো মাত্র ৯। ফলে ইস্টবেঙ্গলকে নেমে যেতে হলো দ্বিতীয় বিভাগে।

দ্বিতীয় বিভাগে নেমে গিয়েও কিন্তু হাল ছাড়লো না ইস্টবেঙ্গল। আবার প্রথম বিভাগে ওঠার জন্যে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করলো। সেবার সামান্যের জন্যে তারা হারালো সেই সুযোগ। ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় বিভাগের রানার্স আপ হলো ইস্টবেঙ্গল। পরের বছরও তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হলো না। হলো তার পরের বছর—১৯৩১ সালে। সে বছর ২২টা খেলায় ৩৭ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ান দল ইস্ট-বেঙ্গল উঠে এলো প্রথম বিভাগে।

প্রশ্ন উত্তর

[illegible]কুমার গাঙ্গুলী (ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলকাতা-৬০)।

উত্তর : আপনার আগের প্রশ্নটা তো আমার মনে নেই। আর উত্তর দেবার পর সে চিঠিটাও নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। নঈম ও হাবিবকে কেঃ অঃ মোহনবাগান টেন্ট, কলকাতা ময়দান, কলকাতা-২১—এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন। আর শ্রীঅমল দত্তকে আমার নাম করে চিঠি লিখতে পারেন।

গৌতমকুমার সিনহা (কালিয়াগঞ্জ) ও **সুখময় কুণ্ডু** (দরং, আসাম)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নের উত্তর এতোদিনে নিশ্চয়ই সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় দেখেছেন।

প্রদীপকুমার বিশ্বাস (গুলমা চা-বাগান, গুলমা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট খেলোয়াড় উইকস, ওয়ালকট ও কনস্ট্যানস্টাইনের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	শত রান	গড়
উইকস	৪৮	৮১	৫	৪৪৫৫	২০৭	১৫	৫৮·৬১
ওয়ালকট	৪৪	৭৪	৭	৩৭৯৮	২২০	১৫	৫৬·৬৮

অজয় বর্মণ, অমিতাভ সেনগুপ্ত, (রেলওয়ে কলোনী, গৌহাটী)

প্রশ্ন : এবারের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান দল কোনটি ? মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে যতোবার খেলা হয়েছে তার মধ্যে কোন দল কতোবার জিতেছে ?

উত্তর : মোহনবাগান !
ইস্টবেঙ্গল—২৫ বার ও মোহনবাগান—২৪ বার।

দীপক চৌধুরী (হিলা চা বাগান, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : ক্রিকেট ও হকিতে 'ডাবল' লাভ করার জন্যে মোহনবাগানের খেলোয়াড়বৃন্দ ও কর্মকর্তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন।

উত্তর : জানানো হলো।

চন্দ্রশেখর ভড় (লোয়ার চিৎপুর রোড, বড়বাজার, কলকাতা)

উত্তর : তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি এক কাজ করো না ভাই, এখন তো ছুটি—অফুরন্ত অবসর—ভালো বই সংগ্রহ করে পড়ো। গল্পের বই পড়ার দাম অনেক। ছোটদের ও কিশোরদের জন্যে লেখা উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, এ্যাডভেঞ্চার, বিপ্লবীকাহিনী, খেলার বই প্রভৃতি পড়তে শুরু করলে দেখবে যে, সময় কোথা দিয়ে কেটে যায়। তাছাড়া ইচ্ছে করলে লিখতে পারো। যা খুশি তাই লেখো।

সুখময় কুণ্ডু ও সমর দাস (দেশবন্ধু ক্লাব, হাসপাতাল রোড, টাংলা, আসাম)

উত্তর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অধিনায়ক সহ ভারতীয় দলের নাম এখনই কি করে জানানো সম্ভব তা তো বুঝতে পারছি না। তবে পাতৌদির নবাবের ওপর এবারও বোধহয় পড়বে দল পরিচালনার ভার। আর দু-একটি নতুন মুখ বোধহয় দেখা যাবে। তিনটি নয়, অস্ট্রেলিয়া এবার ভারতের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে পাঁচটি টেস্ট খেলায়।

হিরণ্ময় কর্মকার (জেলিয়াপাড়া রোড, বদরতলা, কলকাতা-৪৪)

প্রশ্ন : ১৯৬৪, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭ সালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সাক্ষাৎকারের ফলাফল জানতে চাই। মোহনবাগান কতোবার লীগ জয় করেছে ?

উত্তর :

১৯৬৪ —	ইস্টবেঙ্গল	(০)	: মোহনবাগান	(০)
	মোহনবাগান	(৩)	: ইস্টবেঙ্গল	(১)
১৯৬৫ —	ইস্টবেঙ্গল	(০)	: মোহনবাগান	(০)
	ইস্টবেঙ্গল	(০)	: মোহনবাগান	(০)
১৯৬৬ —	ইস্টবেঙ্গল	(১)	: মোহনবাগান	(১)
	ইস্টবেঙ্গল	(১)	: মোহনবাগান	(০)
১৯৬৭ —	ইস্টবেঙ্গল	(২)	: মোহনবাগান	(১)
	মোহনবাগান	(১)	: ইস্টবেঙ্গল	(০)

মোহনবাগান ১৩ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

অনেক সময় প্রশ্ন না দিয়েও উত্তর ছাপা হয়। তবে সাধারণত সেই উত্তরগুলো সহজেই সকলে বুঝতে পারেন। আশা করি এখন বুঝতে পারলেন যে ঐ প্রশ্নটা কেন অমনভাবে ছাপা হয়েছে।

সুশান্ত, বাপি, রিংকু, বাবু ও বুচি (নোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : কোন্ দলের খেলোয়াড় পর পর দুটি গোল করার পর একটা আত্মঘাতী গোল করলো। এক্ষেত্রে সে কি হ্যাট্রিক করেছে বলা চলবে ?

উত্তর : কি মনে হয় ?
স্বপন চক্রবর্তীর জীবনী যদি সম্ভব হয় প্রকাশ করা হবে।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

উত্তর : কম্পোজিট স্টেডিয়ামের বিষয়ে আমরাও আপনার সংগে একমত। ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি না হওয়াই মঙ্গল।
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের নাম নিশ্চয়ই এতোদিনে জেনে গেছেন।

দিলীপকুমার অধিকারী (তমলুক হরির বাজার, মেদিনীপুর)

উত্তর : নঈমকে আপনি C/o. মোহনবাগান ক্লাব টেন্ট কলকাতা ময়দান, কলকাতা—২১ এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।
আপনার পায়ের শর্টের ব্যাপারে আপনি কোচ শ্রীঅমল দত্তর সংগে মোহনবাগান ক্লাবের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কাজলকুমার পান (দিগপাড়, বাঁকুড়া)

উত্তর : আপনার চিঠি পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে শীঘ্র উত্তর দিচ্ছি।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

।। গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ।।

কালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—	১ম	৩-০০
" "	২য়	"
" "	৩য়	"
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)	১ম	৩-০০
" "	২য়	৩-০০
" "	৩য়	৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
" "	২য়	৬-০০
" "	৩য়	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৩০
" "	২য়	৪-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী—		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
স্কট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:—		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী—	৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:— ২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—	৪-০০
" " " —২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—	৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ	৪-০০
" —২য়	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— ১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য় ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—২য়	৩-০০
" " " —৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—	৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস —২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:—১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি—	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর—	৩-৫০
পরলোক—	৪-৫০
পরলোক রহস্য—	২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
ভারত প্রতিভা—	৫-০০
প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
নানার মা—	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ—	৩-০০
বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
বিসমার্ক—	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী—	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
মাধবীকঙ্কণ—	২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ— ১ম	৪-০০
যৌন-মনোদর্পণ	
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী—২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলি ১২

Thursday, 5th June, 1969 SAPTAHIK BASUMATI REGD. No. C 71
PRICE : 30 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34—7771, 72, 73, 74

9 JUN 1969

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
... কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

কলকাতায়

- কলেজ স্ট্রীটে উগ্রপন্থীদের বিক্ষোভ : ট্রাম পুড়ে ছাই
- লালবাজারে পুলিশ কর্মীদের সমাবেশে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু
- রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম পরিদর্শনে বিচারপতি শ্রীশম্ভু ঘোষ
- বেকার বিরোধী বিক্ষোভ-মিছিল

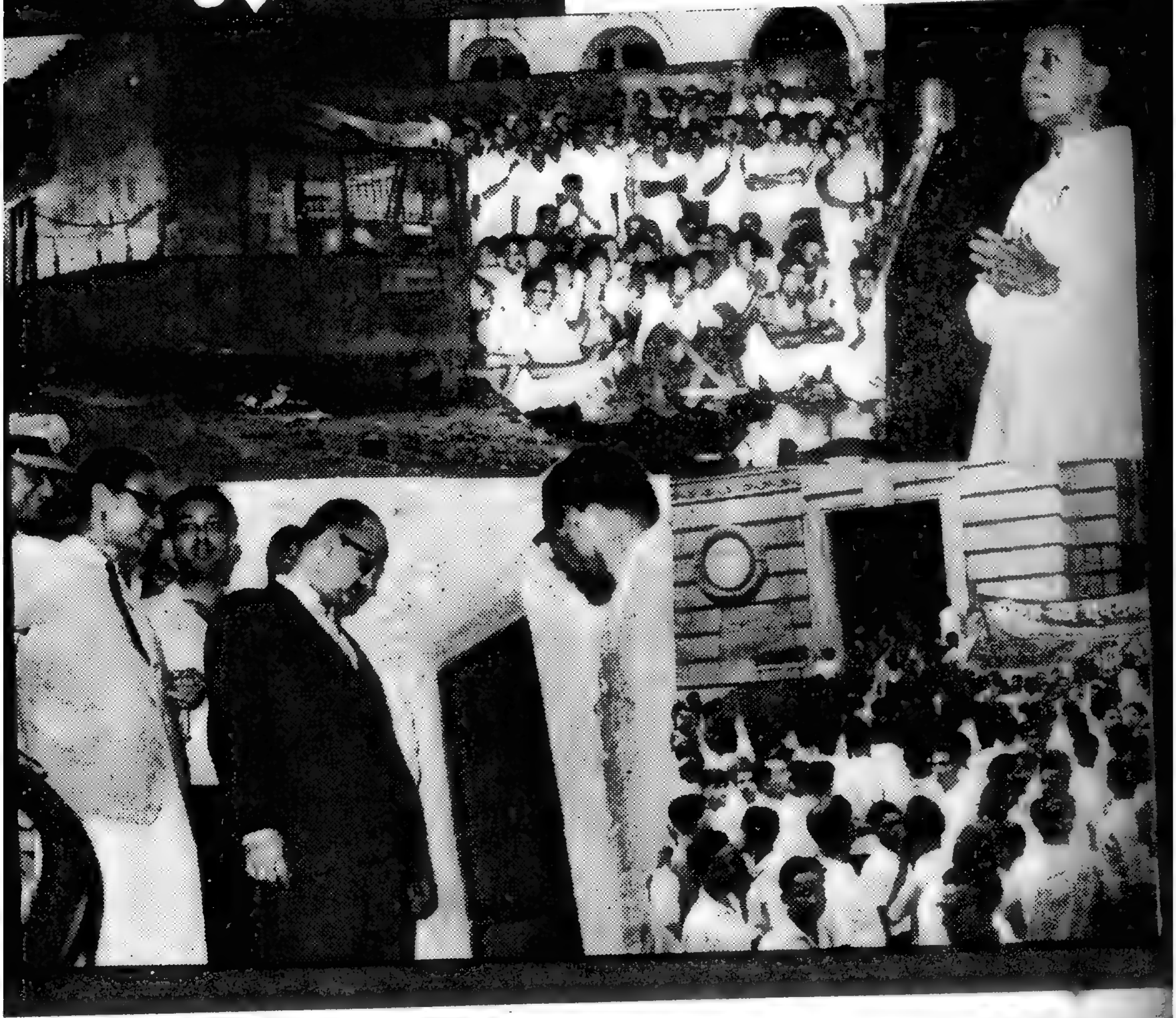

৭৩ বর্ষ ঃ ৫১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 51, 12th June,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩২০৩
আজকের মানুষ		৩২০৪
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৩২০৬
বন নদী সমুদ্র বন্দরে (কবিতা)	জয়ন্ত সাহা	৩২১১
বই-ব.হাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	৩২১২
বঙ্গদর্শন		৩২১৫
ভারতদর্শন		৩২১৯
আন্তর্জাতিক		৩২২১

যে কোন
গয়না
আর
আ স ল
গ্র হ র ত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন্স অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সপ্তাহের বোম্বে	— কৃত্তিবাস ওঝা	৩২২৪
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৩২২৬
চাঁদের মায়ায় (প্রবন্ধ)	— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৩২২৯
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	৩২৩৪
জীবন জয়ের গল্প (গল্প)	— সমীর মুখোপাধ্যায়	৩২৩৯
মহানায়ক সেলিম (নাটিকা)	— অশোক সেন	৩২৫১
রঙ্গজগৎ		৩২৫৫
পাঠকমন		৩২৫৯
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	৩২৬০

সদ্য বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ ॥ নামমাত্র মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ ঃ নীলদর্পণ ॥ জামাই বারিক । বিয়ে পাগলা বুড়ো । নবীন তপস্বিনী । কমলে কামিনী ॥ ২য় ভাগ ঃ সধবার একাদশী । যমালয়ে জীবন্ত মানুষ । পোড়া মহেশ্বর ॥ কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ ॥ লীলাবতী । সুরধুনী কাব্য । দ্বাদশ কবিতা ॥ পদ্য সংগ্রহ । তৎসহ লেখকের জীবনী ও ভূমিকা ।

(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)

মূল্য প্রতি ভাগ চার টাকা ।

বিদ্যারণ্য মুনি রচিত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ
মূল্য চার টাকা

স্তবকবচমালা
মূল্য আট টাকা

যোগশাস্ত্র
মূল্য পাঁচ টাকা

শিবায়ন
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

CALCUT

৭৩ বর্ষ : ৫১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ Thursday, 12th June, 1969

পৃথকীকরণের দাবিকে উৎসাহদান অনুচিত

১৯৫৬ সালে যে তেলেঙ্গানা অন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, ১৯৬৮ সালে সেই তেলেঙ্গানাই পৃথক হবার দাবি জানিয়েছে। তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের অধিবাসীরা একই ভাষাভাষী। এক ভাষাভাষী হয়েও তেলেঙ্গানা পৃথক হতে চায় বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক কারণে।

অন্ধ্রের সঙ্গে তেলেঙ্গানার সংযুক্তির সময় একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তিতে তেলেঙ্গানার স্বার্থ বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের মতে, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নি এবং চাকরির ও অন্যান্য ব্যাপারে তেলেঙ্গানার অধিবাসীরা সুযোগ পায় নি। সুতরাং পৃথক তেলেঙ্গানা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা কংগ্রেসী আর অন্ধ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও কংগ্রেসী। কিন্তু ভাগ-বাটোয়ারার ক্ষেত্রে, বোধ হয়, এক দলের নেতা হয়েও বিবাদে বাধা নেই। এই বিবাদ মারমুখী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ঐ আন্দোলন এখন দৈনিক কাগজগুলির পাঠকের কাছে রীতিমতো দুঃসংবাদ। কার্ফু, পুলিশ, সৈন্য মোতায়েন ও বহু মৃত্যুর পর এখন ঐ অঞ্চল দু-একদিন কিছুটা শান্ত। শান্ত থাকার কারণ—দিন কয়েক পূর্বে প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ সেখানে গিয়ে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছেন। তারপর সেখানে গেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন। শ্রীচ্যবন এখন উপলব্ধি করেছেন যে, পৃথক তেলেঙ্গানার দাবি একেবারেই অসার নয়।

অথচ আন্দোলনের পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পৃথক তেলেঙ্গানার দাবির বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত পোষণ করে আসছিলেন। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডিও আন্দোলনকারীদের জব্দ করার জন্য সৈন্য ডেকেছেন, প্রয়োজনীয় অর্ডিনান্স জারী করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সরেজমিনে আন্দোলনের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হবার ক্ষেত্রেও বাধা দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরকও 'ল অ্যান্ড অর্ডার'-এর প্রশ্ন তুলে অকংগ্রেসী রাজ্যগুলিকে যেমন হুঁশিয়ার করে দেন, অন্ধ্র রাজ্যে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক কাজ এবং দিনের পর দিন প্রাণহানি ঘটলেও সেরূপ হুঁশিয়ারী দেন নি।

অবস্থা যে সময় প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার উপক্রম হয়েছে, সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর পর এবং সম্ভবত তাঁরি নির্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্ধ্রে গিয়ে নরম সুরে কথা বলতে সুরু করেছেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা বর্তমানে আরেকটি দাবিতে এখন অনড় বলা চলে। সেটি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরেড্ডির পদত্যাগের দাবি। অবশ্য শ্রীরেড্ডি বলেছেন, অন্ধ্র রাজ্যের অখণ্ডতার দাবিতেই তিনি পদত্যাগে রাজী হতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে বর্তমানে দুটি সমস্যা। প্রথম সমস্যা হচ্ছে এই, আন্দোলনকারীরা শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডির পদত্যাগের যে দাবি জানিয়েছেন, তা মেনে নেওয়া সম্ভব না হলে আন্দোলন থামানো সম্ভব কি না? আর আন্দোলন থামানো সম্ভব হতে পারে পৃথক তেলেঙ্গানার দাবি মেনে নিলেই। কিন্তু শ্রীরেড্ডি এখনো পর্যন্ত পৃথক তেলেঙ্গানার দাবির বিরুদ্ধে অটল বলা চলে। আর কেন্দ্রীয় সরকার পৃথক তেলেঙ্গানার দাবি মেনে নিলে তেলেঙ্গানা-বিযুক্ত-অন্ধ্র রাজ্য নিয়ে শ্রীব্রহ্মানন্দকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন থাকতে হবে। এতে আন্দোলনকারীরা বাধা দেবে কি না বোঝা মুস্কিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলনকারীদের খুশি করতে পারবেন এবং শ্রীব্রহ্মানন্দও 'অর্থং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' এই বাক্য স্মরণ করে বাকি অংশে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বহাল তবিয়তে থাকতে পারবেন। পৃথক তেলেঙ্গানা সৃষ্টি হলে, উপরন্তু লাভ হবে সেই সব নেতাদের যাঁরা আন্দোলনের পুরোভাগে পুনরায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এমন কি, ডঃ চেন্না রেড্ডি—যিনি আদালতের রায়ে ছ'বছর কোনো নির্বাচনে দাঁড়াবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, কিন্তু আন্দোলনে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তিনিও রাজনীতিতে পুনঃপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হবেন।

এতদ্ সত্ত্বেও এ কথাটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা আজ দরকার যে, বারো বছর ধরে তেলেঙ্গানার অধিবাসীরা নানারকম অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলেই তারা পৃথক তেলেঙ্গানার দাবিতে সোচ্চার আর এক রাজ্যের মধ্যে এক এক অঞ্চল এক এক রকম সুযোগ লাভ করলে দাবি একদিন মুখর হবেই। আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের কথা মুখে বললেও কার্যকালে দেখা যায়, তাঁরাই সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিপরীত কাজ করে বসেন—যার ফলে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা বিপজ্জনক আকার ধারণ করছে। নেতাদের অন্যতম দুর্বলতা হচ্ছে—'নিজেরা দাবির কারণ হয়ে দাবি মেনে নেওয়া'। সেজন্য পাঞ্জাব পৃথক হয়েছে। কিন্তু এভাবে পৃথকীকরণ দেশে আর কতোদিন চলবে? এখন পৃথক তেলেঙ্গানার দাবি স্বীকৃত হলে, পরে অন্যত্র ঐ জাতীয় দাবি উঠবে না—তাই বা কে বলতে পারে? অতএব পৃথক হবার দাবির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে জনসাধারণের বৈষম্য দূরীকরণে এগিয়ে আসা উচিত। তেলেঙ্গানার ক্ষেত্রে ঐ রকম হলে পৃথক হবার দাবি উঠতো না এবং এখনো পর্যন্ত সেই চেষ্টাই করা উচিত—যাতে পৃথক হবার দাবি থেকে নিবৃত্ত হয়ে তেলেঙ্গানার অধিবাসীরা তাদের যাবতীয় অর্থনৈতিক সুযোগগুলি পাকাপাকিভাবে পেয়ে শান্ত হতে পারে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আজকের গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় রাজতন্ত্র বোধ হয় অচল। পৃথিবীর ক'টা দেশেই বা রাজতন্ত্র চলছে? দেশে দেশে গণতন্ত্রের সাফল্যের একটা ফল হয়েছে এই যে, রাজতন্ত্রকেও নিছক সিংহাসন বাঁচাবার তাগিদে আজ গণতন্ত্রের সঙ্গে ককটেল করে নিতে হয়েছে। আফগানিস্তানের রাজা জহীর শাহও তাঁর রাজতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক ভিত্তি দিয়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

রাজা জহীরকে যদি আধুনিক আফগানিস্তানের জনক বলা হয়, তবে কিছুই অত্যুক্তি করা হবে না। রাজা হয়েও জহীরের রাজ্যসীমা বাড়ানোতে কোনো আগ্রহ নেই। যুদ্ধে যেতেও তাঁর মন সায় দেয় না, তিনি চান প্রজাপুঞ্জের শান্তি ও সুখ, বিশ্বের কল্যাণ। জহীর প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইতিহাসের ছাত্র, তাই তাঁর মনও তৈরি হয়েছে সংস্কারমুক্ত।

মুশ্লিম নারীদের অন্দরমহলে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখার তিনি ঘোর বিরোধী। আফগান মহিলাদের বোরখা-শৃঙ্খল তিনিই ঘুচিয়েছেন এবং দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাঁরই মহিষীকে দিয়ে। প্রায় ১০ বছর আগে ১৯৫৬ সালে বোরখা-মুক্ত রাণী হুমিয়েরাকে প্রকাশ্যে হাজির করে রাজা জহীর সকলকে চমকিত করে দিয়েছিলেন। গোঁড়া মুসলমান মোল্লারা স্বভাবতই এতে রাজার ওপর চটেছিলেন, কিন্তু জহীর তাতে পিছু হটেন নি। বরং আহবান জানিয়েছিলেন শিক্ষিত মুশ্লিম তরুণীদের কাছে—তাঁরাও যেন বোরখার বোঝা পরিত্যাগ করেন।

১৯৩৩ সালে রাজা জহীর শাহ যখন সিংহাসন লাভ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১ বছর। কিন্তু তার আগেই রাজকার্য চালানোর মত অভিজ্ঞতা এবং কর্মদক্ষতা তাঁর করায়ত্ত হয়ে গিয়েছে। পিতা বিখ্যাত রাজা নাদির শাহর রাজত্বে জহীর ছিলেন তাঁর মন্ত্রিসভায় প্রথমে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পরে শিক্ষামন্ত্রী। জহীর

জহীর শাহ

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছিলেন ফরাসী পরিচালিত স্কুলে, উচ্চতর শিক্ষা মন্টপেলিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাবুলের ইনফ্যান্ট্রি একাডেমিতে সামরিক শিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন তারপরে।

শুধু সমাজসংস্কারের দিক থেকেই নয়, রাজা জহীরের খ্যাতি প্রশাসনিক এবং যুগোপযোগী রাজনৈতিক পরিবর্তনসাধনের কারণেও। ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে তিনি লাখ লাখ প্রজার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি নতুন সংবিধান রচনা করে রাজপরিবারভুক্ত কারো পক্ষে দেশের রাজনীতি ও সরকারের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দিলেন। এ-নিয়ম চালু করতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁর খুড়তুতো ভাই ডঃ দাউদকে অপসারণ করতেও দ্বিধা করেন নি। রাজ-পরিবারের কোনো লোক ক্ষমতার আসনে বসলে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণকে প্রশ্রয় দিতে পারেন—এ ধারণায় বশবর্তী হয়েই রাজা জহীর সংবিধান সংশোধন করে দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন।

রাজা জহীর শাহ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাই তিনি বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। এখানকার রাজনৈতিক আকাশেও মেঘ কখনো খুব একটা ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করতে পারে না, কারণ রাজা দক্ষিণ ও বামপন্থী সকল মতের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করেন। সংবাদপত্রেরও স্বাধীনতা দিয়েছেন জহীর।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাজা জহীর জোট-নিরপেক্ষতায় আস্থাশীল। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম দুনিয়া থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পেতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি।

রাজা জহীর শাহের কোনো আড়ম্বর নেই। প্রায়ই তাঁকে তাঁর স্পোর্টিং মোটরে করে কাবুলের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মাঝে-মধ্যে চলে যান গ্রামাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে এবং সেখানে তাদের সঙ্গে কাটিয়ে দিয়ে আসেন কয়েক-দিন যেমন কাটাতেন তাঁর বাবাও।

ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকেই। রাজা জহীরের আমন্ত্রণ তাই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উপেক্ষা করতে পারেন নি। প্রধানমন্ত্রীর আফগান সফরের ফলে দু' দেশের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর হবে, সন্দেহ নেই।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন—(৩)

সুভাষচন্দ্রের এই রাজনৈতিক সমন্বয়বাদ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে একথা বলে নেওয়া চলে, এই সমন্বয়বাদ তিনি তাঁর বাল্যশিক্ষা থেকে পেয়েছিলেন। আবার সেই বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ। সুভাষচন্দ্রকে অনেকে রাজনৈতিক বিবেকানন্দ বলেছেন। যাঁরা বলেছেন তাঁদের মনে ছিল, সুভাষচন্দ্রের বিবেকানন্দানুরূপ মানবপ্রেমের কথা। শুধু মানবপ্রেমেই নয়—জীবনদর্শনেও সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দ-শিষ্য। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক সমন্বয়বাদ তার একটি দৃষ্টান্ত।

বিচিত্র কথা এই, সমন্বয়ী সুভাষচন্দ্র কিন্তু আপোষ-বিরোধী ছিলেন। সেটা আবার প্রমাণ করছে, সমন্বয়বাদ আপোষবাদ নয়, অথচ ঐ ধরণের ধারণাগত ভ্রান্তি অনেক বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও দেখা যায়।

কিন্তু 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এর শেষ অংশে কথিত রাজনৈতিক সমন্বয় তত্ত্বের জন্য সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে এক সময়ে স্বীকার করতেও হয়েছিল তিনি তত্ত্বটি প্রকাশ করবার সময়ে শব্দ বা নাম ব্যবহারে যথেষ্ট সাবধান হন নি।

সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক সমন্বয় চেয়েছিলেন কমিউনিজম ও নাজীজমের মধ্যে।

নাজীজমের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপক ঘৃণা। ভারতবর্ষে এই ঘৃণা প্রচারে ইংরেজ সন্দেহাতীত সাফল্য দেখিয়েছিল, যার ফলে নাজীদের নীল রক্তের তুলনায় অনেকে ইমপিরিয়ালিস্টদের রীতিমত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখতে শুরু করেছিল।

দেখা যাক সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য কি ছিল?

সুভাষচন্দ্র জহরলালের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করবার পরে জহরলাল (১৯৩৩, ১৮ই ডিসেম্বর) বলেছিলেন,—পৃথিবীর সামনে খোলা আছে দুটি পথ—ফ্যাসিজম ও কমিউনিজম। এর একটিকে বেছে নিতে হবে। জহরলাল জানালেন, আমি কমিউনিজমের পক্ষে; তার মূলে দর্শন ও ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমি বিশ্বাস করি।

সুভাষচন্দ্র বললেন, জহরলালের প্রথম কথাটা মূলে ভুল। কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে যে-কোনো একটিকে বেছে নিতেই হবে—এ কথাটা তখনি সত্য হতে পারে যখন মেনে-নেওয়া যাবে যে, ইতিহাসের গতি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ইতিহাস যদি সৃষ্টিশীল থাকে তাহলে কমিউনিজম, ফ্যাসিজমের কোনটিতেই শেষ কথা থাকবে না। সুভাষচন্দ্রের মতে, কমিউনিজম বা ফ্যাসিজমের সমন্বয় হল ইতিহাসের পরবর্তী বক্তব্য (কিন্তু নিশ্চয়ই সর্বশেষ বক্তব্য নয়)। ইতিহাসের ঐ পরবর্তী বক্তব্য হবে রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতের বিশেষ দান।

এই নতুন দানের যোগ্যতা ভারতবর্ষের আছে, কারণ ভারতবর্ষ তার প্রাচীন ইতিহাসের বর্তমান সন্তানরূপে বেঁচে আছে। ভারতবর্ষ পরাধীন অবস্থাতেও তার প্রাণশক্তির প্রমাণ দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ ভারতের উদ্ভাবনী প্রতিভার এক বিশেষ প্রমাণ—সুভাষচন্দ্র জানিয়েছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠানো যায়, সুভাষচন্দ্র কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে সমন্বয় চাইলেন—গান্ধীবাদের সঙ্গে সমন্বয় চাইলেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেছেন, গান্ধীবাদ ও কমিউনিজমের উদ্দেশ্য পৃথক। গান্ধীজী দিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন পথ—অহিংস সত্যাগ্রহ, কমিউনিজমের মত সামাজিক পুনর্গঠনের কোনো নতুন কার্যসূচী দেন নি,৪ দিলেই তা কমিউনিজমের বিকল্প মতবাদ হতে পারত। তাছাড়া, গান্ধীবাদকে গ্রহণ না করার অন্যান্য কারণ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র জানিয়েছেন—গান্ধীজী যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী, কুটিরশিল্পের পুরাতন জগতে প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতী; স্বরাজের তত্ত্বব্যাখ্যার সময়ে তিনি মধ্য ভিক্টোরীয় গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলেন এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন না, শিল্পপতিরা সেই কারণেই তাঁর অনুগত; বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ পরিবর্তনের পক্ষপাতী তিনি নন, কারণ মূলে তিনি সংস্কারবাদী, বিপ্লববাদী নন। ক্ষমতা পেলে তিনি বর্তমান ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার কাঠামোর

৪ এখন অনেকে সর্বোদয় দর্শনের মধ্যে গান্ধীজীর সামাজিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা দেখতে চাইছেন।

পরিবর্তন না করে দেশে যন্ত্রশিল্পের সর্বাত্মক বিস্তারে অনাস্থা করবেন।

এখন দেখা যাক সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়বাদের মূল কথা কি? তাঁর কথাই উদ্ধৃত করছি—

> "কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে ঐক্য আছে। কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম উভয়েই ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্রের আধিপত্যে বিশ্বাস করে। উভয়েই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে। উভয়েই পার্টি-শাসনে, পার্টির একনায়কত্বে, এবং মতবাদের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের কঠোর দমনে বিশ্বাস করে। উভয়েই পরিকল্পনানুযায়ী যন্ত্রশিল্পের পুনর্গঠনে আস্থাশীল। এইসব সাধারণ গুণ উক্ত নূতন সমন্বয়ের ভিত্তিভূমি হবে। এই সমন্বয়কে আমি একটি পুরাতন ভারতীয় শব্দে চিহ্নিত করতে চাই—'সাম্যবাদ'। এই সমন্বয়কে কার্যকরী করা ভারতের দায়িত্ব।"

এরপরে সুভাষচন্দ্র কমিউনিজম কেন গ্রহণযোগ্য নয়, তার বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণের শেষে তিনি জানিয়েছেন, রাশিয়া আমেরিকা ইত্যাদি দেশ থেকে ভারত চিন্তা ও পরিকল্পনাগত প্রভাব গ্রহণ করলেও 'সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন সংস্করণ হয়ে উঠবে না।'

ভারতে কমিউনিজমের প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের যুক্তির আলোচনা স্থগিত রেখে এখানে বলা যায়, 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এর শেষাংশে তাঁর পরিকল্পিত সমন্বয়ী সাম্যবাদ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র যা বলেছেন, তার বিরুদ্ধে সমালোচনার বিশেষ অবকাশ আছে। প্রথম কথা, এ-ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের রচনা অপ্রচুর। তিনি কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে যে-সব সাধারণ গুণ দেখিয়েছেন, যার উপর তাঁর সমন্বয় নির্ভরশীল, সে গুণগুলি তো কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম উভয়ের যে-কোনো একটির মধ্যেই আছে। সে ক্ষেত্রে সমন্বয়ের কথা ওঠে কোথায়? বললেই চলত, আমি কমিউনিজম বা ফ্যাসিজমের এই গুণগুলিকে গ্রহণ করেছি। কতকগুলি সাধারণ—গুণের নির্বাচন মানেই সমন্বয় নয়। সমন্বয়ের মধ্যে সাধারণ গুণের নির্বাচন, আপত্তিকর 'গুণের' প্রত্যাখ্যান এবং নিজস্ব গুণের সংযোজন—এই তিনটি বস্তু থাকা চাই। সুভাষচন্দ্র, দুঃখের বিষয়, ঐ রচনায় কমিউনিজমের দোষ দেখিয়েছেন, কিন্তু ফ্যাসিজমের দোষ দেখান নি, এবং বলেন নি তাঁর এই নতুন সমন্বয়ে ভারতের নিজস্ব দান কোন্ জিনিস হবে।

এরকম ঘটল কেন? তাড়াহুড়োয় গ্রন্থ সমাপ্ত করার জন্যই এমন ঘটেছে অথবা সুভাষচন্দ্রের মনে সেইকালে নাজীজমের সম্পর্কে পক্ষপাত প্রবল হয়েছিল? সুভাষচন্দ্রের রচনার এই অংশ যে বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছিল, তা না বললেও চলবে। এমন লেখার কারণ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র কিছু কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এবং কিছু মত পরিবর্তনের কথাও পরে জানিয়েছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থ রচনার তিন বৎসর পরে ইংলণ্ডে ইংরেজ-কমিউনিস্ট রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয় 'ডেইলি ওয়ার্কারে', ২৪ জানুয়ারী ১৯৩৮। তার অংশবিশেষ—

> "প্রশ্ন: আপনার 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থের শেষের দিকে ফ্যাসিজম সম্বন্ধে বক্তব্যের বিষয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে, ফ্যাসিজম সম্বন্ধে আপনার মত জানাবার কষ্ট স্বীকার করবেন কি?
>
> "কমিউনিজম সম্বন্ধে আপনার সমালোচনাও একই মহলে বহু প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়েও আপনার মত জানাবেন কি?
>
> "উত্তর: তিন বছর আগে রচিত গ্রন্থের পরে আমার রাজনৈতিক ধারণার আরও বিকাশ ঘটেছে।
>
> "আমি আসলে যা বলতে চেয়েছিলুম তা হল, আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা চাই; এবং স্বাধীনতা অর্জনের পরে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের অভিপ্রায়। এই কথাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যখন আমি কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের সমন্বয়ের কথা বলেছিলাম। হয়ত আমার ভাষা-ব্যবহার সুষ্ঠু হয় নি। কিন্তু একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই,—আমি যখন গ্রন্থটি লিখছিলাম, ফ্যাসিজম তখন তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান আরম্ভ করে নি এবং তখন ফ্যাসিজমকে ন্যাশনালিজমের উগ্র রূপ বলে মনে হয়েছিল।
>
> "আমি আরও বলতে চাই, ভারতে যারা কমিউনিজমকে অবলম্বন করেছে, তাদের অনেককে জাতীয়তা-বিরোধী মনে হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে তাদের কিছু অংশের শত্রুভাব থেকে ঐ ধারণা জোরদার হয়েছে। অবশ্য অবস্থা আজকে পুরোপুরি বদলে গেছে।
>
> "আমি আরও যোগ করে দিতে চাই, মার্কস ও লেনিনের রচনায় এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের নীতি-বিবৃতিসমূহে কমিউনিজমের যে মত প্রকাশিত হয়েছে, সে মত যে, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং তাকে নিজেদের বিশ্ব-নীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিশ্বাস করে—এ বিষয়টিকে আমি সর্বসময়ে উপলব্ধি করেছি এবং তা আমাকে গভীর সন্তোষ দিয়েছে।
>
> "আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় সংগঠিত হবে এবং তার দুটি উদ্দেশ্য থাকবে—রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন।"

দেখা গেল, সুভাষচন্দ্র নিজের রাজনৈতিক মতের আংশিক পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন এবং ফ্যাসিজমের যথার্থ চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কিছু বিচারভ্রান্তি ঘটেছিল তাও মেনে নিয়েছেন। রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ-বিবরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি ফ্যাসিজম থেকে উগ্র জাতীয়তার অংশটুকু নিতে চেয়েছিলেন, যে-জাতীয়তা

কমিউনিজম তাঁকে সরবরাহ করে নি। সুভাষচন্দ্র আরও স্বীকার করেছেন—কমিউনিজমের জাতীয়তা-বিরোধী চরিত্র সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাঁর এমন স্বীকারোক্তির কারণ কি—জাতীয় সংগ্রামে কম্যুনিস্টদের সেইকালে কংগ্রেসকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি?

যাই হোক, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে লিখিত আপত্তির চেহারা দেখা যাক। সুভাষচন্দ্র পাঁচটি আপত্তি তুলেছেন:

(১) আজ কমিউনিজমের কোনোপ্রকার জাতীয়তার প্রতি সহানুভূতি নেই, অপরদিকে ভারতের আন্দোলন জাতীয়তার আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য।

(২) রাশিয়া এখন আত্মস্বার্থে গুটিয়ে আছে; বিশ্ববিপ্লবের চেষ্টা সে ত্যাগ করেছে। যদিও কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের দ্বারা বাইরে মুখ রক্ষার চেষ্টা করছে (যে-চেষ্টাও সে পরে ত্যাগ করবে); রাশিয়া ও অন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সাম্প্রতিক চুক্তি এবং লীগ অব নেশন্স-এ তার অংশ গ্রহণ (যা ইংরেজ-ফরাসীর কুক্ষিগত) রাশিয়ার বৈপ্লবিক ভূমিকা যথেষ্ট সঙ্কুচিত করেছে। অধিকন্তু রাশিয়া তার আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক পুনর্গঠনে, জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষায়, এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বরক্ষায় এতই ব্যাপৃত যে, ভারতের মত দেশের ব্যাপারে সে কোনো সক্রিয় আগ্রহ দেখাতে প্রস্তুত নয়।

(৩) ভারতের কাছে কমিউনিজমের কতকগুলি অর্থনৈতিক ধারণার বিশেষ আকর্ষণ থাকলেও কতকগুলি ধারণা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় সুসংগঠিত চার্চ ও স্টেটের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে কমিউনিজম ধর্ম-বিরোধী ও নাস্তিক হয়ে উঠেছে, অপরপক্ষে ভারতে সুসংগঠিত ধর্ম না থাকায়, ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে আবশ্যিক সংযোগ না থাকায়, রাশিয়ার অনুরূপ ধর্মবিদ্বেষ ভারতে নেই। উপরন্তু ভারতের জাতীয় জাগরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে ঘটেছে।

(৪) কমিউনিজমের মূল তত্ত্ব ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল; ভারতবর্ষে এ বস্তু সম্পূর্ণ সমর্থন পাবে না, এমন কি যারা অর্থনীতির ব্যাপারে কমিউনিজমকে মানতে চায় তাদের সকলের মধ্যেও নয়।

(৫) রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় কমিউনিজমের অর্থনীতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করলেও অন্যক্ষেত্রে গতানুগতিক অর্থ-তত্ত্বকে বজায় রেখেছে। সাধারণভাবে বিশ্বের মুদ্রানীতি ত্রুটিপূর্ণ, কমিউনিজমেরও।

কমিউনিজমের এই বিরোধী সমালোচনার ভিতর থেকে কিছু তত্ত্ব আহরণ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথম কথা; পুরাতন প্রশ্নটি উত্থাপন করছি; সুভাষচন্দ্র কমিউনিজমের সমালোচনা করলেন, অথচ ফ্যাসিজমের সমালোচনা করলেন না কেন? আমার বিশ্বাস কারণটা রাজনৈতিক। পূর্বেই বলেছি, ভারতের জন্য সুভাষচন্দ্র সাম্যবাদী সংঘের থিসিস প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি সেই থিসিস কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালে দাখিলও করেছিলেন। কিন্তু অভিপ্রেত ফল পান নি। রাশিয়া রাজী হয় নি তাঁর বস্তুবাদহীন (কিন্তু বস্তুহীন নয়) সাম্যতত্ত্ব গ্রহণ করতে কিংবা ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্য করতে। কমিউনিজম সম্বন্ধে না হলেও কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে সন্দেহ তাঁর মনে আরও প্রবল হয়েছিল যখন তিনি দেখেছিলেন, ১৯৩০ সালের আন্দোলনকে প্রতি-বিপ্লবাত্মক বলে কমিউনিস্টরা তার থেকে সরে থেকেছিল। সেক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈদেশিক সাহায্যের কি হবে? সুভাষচন্দ্র তাই বোধ হয় জার্মানী বা ইতালীর কাছ থেকে সাহায্য আশা করছিলেন, যে জার্মানী বা ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় তখনো পূর্ণ প্রকটিত হয় নি এবং জার্মানী 'হয়ত' ইংরেজ তার শত্রু, সেই কারণে ভারতকে স্বাধীনতার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। তাই জার্মানীর সমালোচনা করে তিনি অযথা বিরোধিতার সৃষ্টি করতে চান নি।[৫]

---

৫ সুভাষচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশিত হলে বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি কলরব তোলে যথারীতি। তাঁকে কমিউনিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট, উভয় আখ্যাই দেওয়া হয়। ১৯৩৫, ফেব্রুয়ারীতে জেনিভা থেকে বিবৃতিযোগে (*'Our Internal and External Policy'*) তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থা পরিষ্কার করতে চান। তিনি বলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো মূলগত পরিবর্তন হয় নি। "ভারতকে তার অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী পথ কেটে চলতে হবে।" তাঁর মতে, দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার জন্য ভারতের পক্ষে সকল মতবাদকে একই সঙ্গে সহানুভূতি ও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তিনি পরিষ্কার জানালেন, তাঁর পক্ষে সর্বাংশে মার্কসিস্ট হওয়া সম্ভব নয়, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক থিয়োরীর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সত্য কিছু থাকতে পারে না, সবই ইতিহাস, পারিপার্শ্বিক ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে রচিত নয়, সুতরাং তা কালপ্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য, বুদ্ধিবৃত্তিকে কোনো একটি মতের কাছে বন্ধক রাখতে তিনি গররাজি ("The standpoint or socio-political theories and institutions of the modern nations are the product of their history, environment and needs. They are liable to change and development just as human life is. Moreover, it should be remembered that some of the most interesting institutions of the present day are still experiments. Time must

এক্ষেত্রে প্রশ্ন, যদি ফ্যাসিজমের সমালোচনা না করলেন, কমিউনিজমের সমালোচনা করলেন কেন? তার উত্তর দেবার আগে একটি কথা বলে নিই, ১৯৩৮ সালে রজনী পাম-দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে সুভাষচন্দ্র যে, 'সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায়সম্পন্ন' বলে জার্মানীর নিন্দা করেছেন, এবং কমিউনিজম সম্বন্ধে নিজ মত কিছু সংশোধন করেছেন, তার কারণও রাজনৈতিক। ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে, জার্মানী ইংরেজের সঙ্গে মিতালীতে আগ্রহী, অপরপক্ষে জার্মানী ও ইংলণ্ড রাশিয়াকে পয়লানম্বর শত্রু বলে মনে করছে। রাশিয়ার সেই সংকট অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্টরা ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতি সমর্থন করছে, যে-ব্যাপারটিকে পরম সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেছেন সুভাষচন্দ্র তাঁর হরিপুরা ভাষণে। সুভাষচন্দ্রের কাছে ঐ কালে ভারতের স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় কথা। তাই পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি নিজের মত পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন। ঐ কালে জার্মানীর চেয়ে ইংরেজের বড় শত্রু রাশিয়া তাঁর অধিকতর মানসিক মিত্র হয়েছে।

'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এর শেষে কমিউনিজমের সমালোচনার কারণরূপে বলা যায়—এখানেই সুভাষচন্দ্রের সমন্বয় তত্ত্বের মূল কথা আছে। সুভাষচন্দ্র ভারতের পক্ষে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণে অনিচ্ছুক। ভারতের সাধনা ও ইতিহাসের ধারার সঙ্গে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ সংযোগ নেই। ভারতের জাতীয় জাগরণ মূলত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জাগরণ। স্বয়ং সুভাষচন্দ্রও যে-জাগরণের সৃষ্টি, তারও মূলে আছে ভারতীয় ধর্মান্দোলনের প্রভাব। সুতরাং ইতিহাসের এই ধর্মমুখিতাকে তিনি অস্বীকার করেন কিভাবে? সুভাষচন্দ্র যে, রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাপারে সমন্বয়-তত্ত্বের কথা বলেছেন তার কারণ, ভারতের ইতিহাস-সাধনের সঙ্গে এই সমন্বয়-ধারণার ঐক্য আছে। যদি তিনি বলতেন; তিনি সংশোধিত আকারে কমিউনিজমের প্রবর্তন চান, তাহলে সেটা সংশোধিত কমিউনিজমই হত, কোনো ভারতীয় বস্তু হয়ে উঠত না; বিদেশের প্রভাব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থেকেও অনুভূতিযোগে ভারতের প্রাণের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোনো মত প্রচারে তিনি উৎসুক ছিলেন না।৬

এই সমন্বয় দর্শনের ব্যাপারটি সুভাষচন্দ্র শেষবারের মত ব্যাখ্যা করেন ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে। দশ বছর আগে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে এ-বিষয়ে যা বলেছিলেন, তার কয়েকটি বিষয়কে এখানে আরও পরিষ্কার করে তোলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনের এইটেই সর্বশেষ রূপ—এ পর্যন্ত যা পাচ্ছি।

ইম্পিরিয়ালিস্ট জাপানের 'ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটি'তে দাঁড়িয়ে অস্থায়ী ভারত সরকারের সভাপতি ও সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, ভারতের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। স্বাধীন ভারতের সামনে তিনটে সমস্যা বড় হয়ে দাঁড়াবে—দেশরক্ষার ব্যবস্থা, দারিদ্র্য নিরসন এবং শিক্ষাবিস্তার। এই সমস্যাগুলির সমাধানের দায়িত্ব তিনি

---

elapse before they could be declared to be successful and in the meantime, we should not mortgage our intellect anywhere.") নাজীমত বা নাজীদল সম্বন্ধে বৃটিশ শঙ্কা ও তার অনুগত ভারতীয় শিহরণ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে থিয়োরী আওড়ানোয় কোনো কাজ হবে না; ভারতের সামাজিক বা অর্থনৈতিক ধারণা যাই হোক না কেন, পরের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ধারণার বিরুদ্ধে তার মাতামাতির কারণ নেই, বিশেষতঃ যদি সেসব দেশ থেকে সাহায্য পাবার সম্ভাবনা থাকে। সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ট ইতালীর সঙ্গে কমিউনিস্ট রাশিয়ার প্যাক্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে মনে রাখতে হবে, তিনি সর্বদা নিজেকে চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীন মানুষ বলে মনে করতেন, বৃটেনের পরাধীনতা যদি তিনি সহ্য না করেন, রাশিয়া, জার্মানী ইতালী কারো পরাধীনতাই সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ("In the domain of our external policy, our own socio-political views or predilections should not prejudice us against people or nations holding different views, whose sympathy we may nevertheless be able to acquire. This is a universal cardinal principle in external policy and it is because of this principle that to-day in Europe a pact between Soviet Russia and fascist Italy is not only a possibility but an accomplished fact.")

৬ সাম্যবাদ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের আগ্রহ মূলত মানবপ্রেমের সৃষ্টি। সেই মানবিকতা তিনি ভারতবর্ষের মহান্ পুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। রাশিয়া থেকে তিনি নিতে চেয়েছিলেন তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের যৌবনের রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য—

The Socialism did not drive its birth from the books of Karl Marx. It has its origin in the thought and culture of India. The Gospel of Democracy that was presented by Swami Vivekananda has manifested itself fully with writings and achievements of Deshbandhu Das, who said that 'Narayana' lives amongst those who till the land, prepare our bread by the sweat of their brow, those who in the midst of grinding poverty have kept the torch of our civilisation, culture and religion burning"..

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
চেতন আধুনিকারা তাই
প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ।
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

ব্যক্তি-প্রয়াসের উপর অর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ এই সমস্যাগুলি মূলত অর্থনৈতিক-সমস্যা। রাষ্ট্র ছাড়া আর কারো পক্ষে এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। "দেশের শিল্পায়ন বা কৃষির যান্ত্রিক পদ্ধতি, যে বিষয়েই হোক না কেন, আমরা চাই রাষ্ট্র এগিয়ে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করুক এবং অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করুক, যাতে করে অবিলম্বে ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে।"

নেতাজীর পরবর্তী বক্তব্য, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি সমাজতান্ত্রিক করাই লক্ষ্য হয়, তাহলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সে লক্ষ্য সিদ্ধ করা যাবে না। তিনি বললেন, "আমাদের সিদ্ধান্ত, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা স্বাধীন ভারতের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। ভারতের প্রগতিশীল আধুনিক ভাবধারা সর্বাঙ্গীণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষপাতী, যা জনগণের মুখপাত্ররূপে, যথার্থ বলতে গেলে ভৃত্যরূপে, কাজ করবে, মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ধনিকের স্বার্থে কাজ করবে না।"

প্রথম অধ্যায়ে সাম্যবাদী সংঘের যে পরিকল্পনা দেখেছি তাতে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ছিল না, শুধু পূর্ণ সমাজতন্ত্রকে আদর্শ বলে ঘোষণা করা ছিল। দ্বিতীয় পর্বায়ে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এর [প্রথম খণ্ডে] মধ্যে রাষ্ট্রগঠনের প্রকৃতির কথা আছে ঃ স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠনের জন্য কিছুকাল সামরিক শৃঙ্খলায় গঠিত এক-নায়কত্ব প্রয়োজন, একথা বলা হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়ে এই টোকিও বক্তৃতায় দেখলাম, তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, সমাজতন্ত্রকে সফল করতে হলে জনগণের স্বার্থে গঠিত কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নিতান্ত বিরোধী। তাঁর গণতন্ত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের চেয়ে বেশি কিছু।

এবার আবার প্রত্যাবর্তন করা যাক রাজনৈতিক সমন্বয়বাদের পুরাতন প্রশ্নে। কমিউনিজমের সঙ্গে ন্যাশনাল সোসিয়ালিজমের সমন্বয়ের কথা তিনি এখানেও বলেছেন।

এই প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সমন্বয়ে ভারতের ইতিহাসের প্রবর্তনার কথা সুভাষচন্দ্র টোকিও ভাষণে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন ঃ ভারতের ইতিহাস অন্তত তিন হাজার বছরের পুরনো। যেখানে ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া বা গ্রীসের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা ঐসব দেশের বর্তমান জীবনে স্তব্ধ হয়ে গেছে, সেখানে ভারতবর্ষ এখনো তার পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে জীবন্ত। "দু হাজার, তিন হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে জীবনাদর্শ, ভাবনা, এবং অনুভূতির মধ্যে বাস করতেন, আমরা ভারতীয়রা, আজও মূলগতভাবে সেই একই আদর্শ, ভাবনা ও অনুভূতির মধ্যে বাস করছি। অর্থাৎ সেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে আসছে একই ইতিহাসের ও সংস্কৃতির ধারা। ইতিহাসে এটা খুব বিরল বস্তু।"

এই ইতিহাসের উপরে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রনীতির নমুনাকে আমন্ত্রণ করেছেন এবং সমন্বয় করতে চেয়েছেন। নাজীজমের নিরপেক্ষ সদগুণ তিনি দেখলেন জাতীয় সংহতি বৃদ্ধিতে ও সাধারণের অবস্থার উন্নয়নে। কমিউনিজমের বিশেষ সদ্‌গুণ তার সুপরিকল্পিত অর্থনীতিতে ও দ্রুত শিল্পায়নে। সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানেও কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সাফল্য স্বীকৃতিযোগ্য। এই ভাষণে নেতাজী ন্যাশনাল সোসিয়ালিজমের একটি বিশেষ দোষের কথা বলেছেন, [যা 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ (১ম) বলেন নি] যাইরে ধনতান্ত্রিকতা-বিরোধী হলেও এই রাষ্ট্রনীতি "ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত সংস্কারে সমর্থ হয়নি।"

কমিউনিজম সম্বন্ধে নেতাজী যেসব আপত্তি উঠিয়েছেন, তার একটি আপত্তি পুরাতন,—কমিউনিজম জাতীয় সেণ্টিমেণ্টের সম্মান করে না। তাছাড়া আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি আছে। প্রথমত, তাঁর মতে, ভারতে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হবেও না, যদি স্বাধীন ভারতের সরকার জনসাধারণের মুখপাত্র ও সেবকরূপে কাজ করতে থাকে। করবে বলেই নেতাজীর বিশ্বাস।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়ায় শ্রমিক সমস্যার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভারতে ঐ অধিক গুরুত্বের দরকার নেই, কারণ ভারত মূলত কৃষিজীবী।

তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদে মানবজীবনের অর্থনৈতিক ভূমিকার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া আছে, অর্থনীতির বিশেষ প্রভাবের কথা মেনে নিয়েও অতখানি গুরুত্বের পক্ষপাতী নেতাজী নন।

এইখানে এবার আমরা কিছু মন্তব্য করতে-পারি। আমরা প্রথমেই সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারায় একটি লক্ষণীয় পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাম্যবাদী সংঘের পরিকল্পনায় নেতাজী মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছিলেন সর্বশেষ ভাষণে; তার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা অগ্রাহ্য করলেন।৭ এখন মত পরিবর্তনের কারণ, আমরা

---

৭ "There are few points in which India does not follow Soviet Russia, firstly, Class-conflict is something that is quite unnecessary in India. If the Government of free India begins to work as the organ of the masses, then there is no need for class-conflict. We can solve our problems by making the State the servant of the masses." (টোকিও বক্তৃতা)

স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র যদি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ না করে, তাহলে ভারতেও চীনের কুওমিংটাং ও কমিউনিস্ট পার্টির বিভেদের মত অবস্থা ঘটতে পারে বলে-উক্ত বক্তৃতায় সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

"If the nationalists in India did not have the interests of the masses at heart then you would have seen the same phenomenon as you see in China to-day."

বন নদী সমুদ্র বন্দরে

জয়ন্ত

জটায়ুর মত এক পাখী
অন্তরঙ্গ পাখা মেলে সুদূরে আকাশে
আমাদের বয়ে নিয়ে উড়ে এলো বায়ুবেগে।
পিছনে নগর স্ত্রৈণ চক্ষু মেলে উচ্ছল কলকাতা
জং ধরা বনিয়াদী সভ্যতার পটে রঙ ছোপ ছোপ
আধুনিকতায়।

নিম্নভূমি সমতল মাঠ
সবুজ সুন্দরবন, নদী।

আরো উর্ধ্বে উড়ে এলো পাখী
মুহূর্তে অদৃশ্য হলো বন নদী সমুদ্র বন্দর
ইউরোপ আমেরিকা এশিয়া আফ্রিকা।

জটায়ু পাখীতে ভর করে চোখে পড়ে
পৃথিবীর চতুর্বর্গ বিস্তীর্ণ সীমায়
শুধু একটি স্রোত
আকাশে পাতালে মর্তে ব্যাপ্ত চরাচরে।
আদি অন্ত দুর্জ্ঞেয় প্রজ্ঞায়।
শুধু জিগীষায়
আহ্নিক গতির চেয়ে দ্রুত—
বার্ষিক গতির চেয়ে দ্রুত—
শব্দ-ভেদী-বেগে
প্রবাহিত বন নদী সমুদ্র বন্দরে।

বন নদী সমুদ্র বন্দরে
আমার অস্তিত্ব নিরলস
অজানিত বন্ধুদের সাথে।

যতদূর অনুমান করতে পারি, সুভাষচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল, ভারতের মুক্তি গান্ধীবাদীরা আনতে পারবে না—আনবে 'শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থে গঠিত চরমপন্থী দল'। এই বিশ্বাস তিনি নানা জায়গায় প্রকাশ করেছেন এবং সেই বিশ্বাসের বলেই জানিয়েছেন, জনসাধারণের স্বার্থে ও সেবায় গঠিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী দল রাষ্ট্রক্ষমতা পেলে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য হয় নি, কিংবা তাঁর এই ধারণা মিথ্যা হয়ে আর একটি ধারণা সত্য হয়েছে। সুভাষচন্দ্র এও বলেছিলেন, ইংরেজ দেশবিভাগ করে দক্ষিণপন্থীদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের চেষ্টা করবে, তাই করেছে, এবং বামপন্থীরা অন্তঃকলহে লিপ্ত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের কালে কোনো ভূমিকাই নিতে পারে নি।

৭বার কমিউনিজম ও ন্যাশনাল সোসিয়ালিজমের মধ্যে সমন্বয়বাসনা সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি উত্থাপন করতে পারি সুভাষচন্দ্র সহজেই বলতে পারতেন, তিনি 'ন্যাশনালিজম' ও 'কমিউনিজমে'র মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চান, এবং সেই কথাই তিনি উক্ত টোকিও ভাষণে বলেছেনও।৮ তিনি 'ন্যাশনাল সোসিয়ালিজমের' যে বিশেষ গুণের কথা বলেছেন—জাতীয় সংহতি বৃদ্ধিতে তার সাফল্য—সে সাফল্য ন্যাশনালিজমও দিতে পারত।৯ আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বলবার সুযোগ হলে সুভাষচন্দ্র তাই বলতেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর টোকিও ভাষণে বাহ্যত মৃদুভাবে করলেও বাস্তবত নাজীজমের একটি বিশেষ দিকের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নাজীবাদ ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে পারে নি। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে 'ন্যাশনাল সোসিয়ালিজমে'র মধ্যে সমর্থনের আর কি রইল তার ন্যাশনালিজম ছাড়া, যা ধনতান্ত্রিক দেশেও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। টোকিও ভাষণে সুভাষচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনই তাঁর মূল লক্ষ্য, সেই মূল লক্ষ্যের পূরণ যেখানে নেই, সে বস্তুর সঙ্গে সমন্বয়ের কথা ওঠে কেন?

কেন ওঠে, কোন্ রাজনৈতিক প্রয়োজনে, তার ইতিহাস পূর্বে বিস্তারিত বলেছি; এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব—জার্মানীর মিত্র সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গী জাপানে বসে নেতাজী কিভাবে জার্মানীর অর্থব্যবস্থার ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সমালোচনা করলেন এবং নিজের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে তুলে ধরলেন। টোকিও ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা যদি নির্বোধ না হয় তাহলে বুঝবে যে, সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় জাপান-জার্মানীর শত্রু রাশিয়ার আদর্শকেই মূলত নিজের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

সর্বশেষ বক্তব্য, নেতাজী কমিউনিজমের জাতীয় সেন্টিমেন্টের বিরোধিতার কথা বলেছেন। কথাটা বোধ হয় সর্বাংশে সত্য নয়। আধুনিক ইতিহাস প্রমাণ করেছে, যেখানে কমিউনিস্টদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা গিয়েছে, সেখানে জাতীয়তার ব্যাপারে তারা অন্ধ জাতীয়তাবাদী, ক্ষেত্রবিশেষে অন্ধতম। অন্ধতার আড়ালে বিপ্লবের আত্মরক্ষা। তবে যেখানে কমিউনিস্টরা সংখ্যালঘু সেখানে তারা কিছু 'দূর'-দৃষ্টিসম্পন্ন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে হয়ত কিছু আলোচনার প্রয়োজন হবে।

[ক্রমশ]

৮ জার্মানী তার শৃঙ্খ রক্তের আওয়াজ তুলে জাতীয় গর্ব ও সংহতি বাড়িয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কি জাতীয় সংহতি-বৃদ্ধির জন্য ভারতের ঐতিহ্যের মহিমার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কথা ভেবেছিলেন? দেশপ্রেম বৃদ্ধির জন্য তিনি হিন্দু এবং মুসলমান সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দিকগুলি সম্বন্ধে ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার সর্বশেষ সংগ্রাম-জীবনে, তা আমরা জানি।

৯ "In other words, it will be a synthesis of Nationalism and Socialism. This is something which has not been achieved by the National Socialists in Germany to-day."
(The Fundamental Problems of India)

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

পূর্ব কথা

আনন্দ বলেছিল—বই পড়ি নানান তাগিদে, কখনো পরীক্ষার চাপে—বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে,—কখনো পরীক্ষা নেই বলে। প্রথম কারণটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—দুর্বহ বোঝা মাত্র, দ্বিতীয়টাই অকৃত্রিম আনন্দের। কিন্তু বাংলা বইয়ের প্রসঙ্গে প্রথমটার দাবি কতো-টুকুই বা? বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার রকম শাস্ত্রচর্চার জন্যে বাংলায় লেখা উপযুক্ত বই কি আজও তৈরি হয়েছে?

তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেল। দেশ স্বাধীন হোলো এবং ভাগ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল থেকে ইতিমধ্যে প্রায় তিরিশ বছর যায় যায়। বাঙালীর জীবন-পরিবেশ ইদানীং খুবই তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। শুধু বাঙালীরই নয়, এ পরিবর্তন সারা দুনিয়ার তামাম মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত। অখণ্ড অবসর ক্রমেই দুর্লভ হয়ে এলো। তাই সব ব্যাপারেই বাছাইয়ের প্রয়োজন বেড়েছে।

আমি বলেছিলুম,—উপদেশও নয়, অভিযোগও নয়—আমরা শুধু নিজের নিজের আনন্দের কথাই লিখে রাখবো। কোন্ বাংলা বই পড়ে কবে আমরা সুখী হয়েছিলুম,—ভবিষ্যতের স্মৃতিচারণার জন্যেই সে-সব অভিজ্ঞতা লিখে রাখা ভাল।

এ কথার উত্তরে আনন্দের সমালোচনা আমার আজও মনে আছে। সে বলেছিল—পারবে কি?—কতো কাজ তোমার। —তাছাড়া এসব খবরের জন্যে তো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বই বিরল নয়। রামগতি ন্যায়রত্ন, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন ইত্যাদি অনেকেই তো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন,—এঁদের পরে আরো কতো লেখক লিখছেন,—লিখবেন। তুমি আর নতুন কোন্ কথাই বা লিখতে চাও?

আমি বলেছিলুম—না, না, আমি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখবো কেন? আমি কি ভভ্যাক্তের যাবতীয় বাংলা বই পড়তে পারি? অতো ধৈর্য কোথায়? অতো ফুরসৎ নেই আমার। আর একথাও মানতে আপত্তি নেই যে আমি ইস্কুল-কলেজের পরীক্ষার দিকে চোখ রেখে এ প্রস্তাব করি নি।

—তাহলে তুমি কি নিজে যা যা পড়েছো, সে রকম সব বাংলা বইয়ের কথাই লিখে রাখতে চাও?—সমস্ত বইয়ের কথা?

—না, না কখনোই তা নয়। কতো যে বাজে বই পড়েছি। সে-সব স্মৃতি নিজের পক্ষেই যথেষ্ট, অন্যকে কষ্ট দেবার জন্যে সেগুলোর বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে কুকর্মে আমিও নেই, তোমাকেও লিপ্ত হতে দেবো না।

আনন্দ বললে—আমার জন্যে ভেবো না, আমার চরিত্র নির্লিপ্ত; আমি কিছুতেই লিপ্ত হতে চাই না, আমার দ্বারা এই মেহনতের কাজ হবেও না,—কিন্তু আমি ভাবছি তোমার এই লেখার পরিকল্পনাটা কী রকম হবে। —এ কি তোমার বন্ধুদের লেখার প্রশস্তি ছাপাবার ভূমিকা—আর তোমাকে যারা দেখতে পারে না বা তুমি যাদের দেখতে পারো না সেই সব লেখকদের সম্বন্ধে তোমার উদাসীনতা রক্ষার কৌশল?

আমি বলেছিলুম—ব্যক্তিগত রুচির সীমা অস্বীকার করি না, কিন্তু সে রুচি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব যাতে না ঘটায় সেইজন্যেই তো তুমি আছ।

সে বললে—আমার স্বভাব সাত্ত্বিক,—আমি লেখক নই, —বড়োজোর পাঠক,—কিন্তু লেখাপড়ার রাজসিক ক্ষেত্রেই লেখকের অবস্থান। সেখান থেকে তামসিকতাও কিন্তু বেশি দূর নয়। সে-বিষয়ে সাবধানে থেকো।

আমি বললুম—তার মানে?

—তার মানে বঙ্কিমচন্দ্রই দেখিয়ে গেছেন—তাঁর লোক-রহস্যের 'রামায়ণের সমালোচনা' প্রবন্ধটি মনে পড়ে।

এইটুকু বলেই আনন্দ আমার টেবিল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী তুলে নিয়ে প্রথম কয়েক ছত্র পড়ে শুনিয়েছিল—

'রামায়ণের সমালোচনা—কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত—

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। অনেক সময়ে রচনা প্রায় নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয় কবিদিগের তুল্য। হিন্দু কবির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। গ্রন্থকার যে আর কিছুদিন যত্ন করিলে একজন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য, বানরদিগের মাহাত্ম্যবর্ণন। বানরেরা বোধ হয়, আধুনিক Bonerwal নামা হিমাচল প্রদেশবাসী অনার্য জাতি-গণের পূর্বপুরুষ। অনার্য বানরগণ কর্তৃক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। তখন আর্যেরা অসভ্য ও অনার্যেরা সভ্য ছিল।

হো হো করে হেসে উঠেছিলুম আমরা।

আনন্দ বলেছিল—ভাই, হেসো না—শোনো আরো সব ভয়ের কথা। বিলাতী সমালোচক প্রণীত বঙ্কিম-প্রদর্শিত এই তামসিকতাই শুধু নয়,—দেশের আপন মনের নিজস্ব

তামসিকতাও মনে রেখো। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তাগিদের পড়ার কথা বলছিলুম—স্বাধীনতার আগে ভদ্রজনের ভাগ্যনিয়ন্তা হিসেবে এই পরীক্ষা-তাড়িত লেখাপড়ার ব্যবস্থা ঘুচবে বলে মনে হয় না।

আমি বলেছিলুম—স্বাধীনতার পরেও ভরসা নেই। স্বাধীনতা এলেই কি এ মেঘ কাটবে?

মেঘ যে কাটে নি, সে-আমরা সবাই জানি। তবে একেবারে নিরুদ্যম হয়ে বসে পড়ার মতো নৈরাশ্যও ঘটে নি। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাগুলির চর্চা বেড়েছে। বাংলা সাহিত্যেও বছরে বছরে বেশ কিছু পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, ছোটো গল্পে তো বটেই—এমন কি প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও পরিশ্রমের অন্ত নেই। অবিশ্যি সকলের পরিশ্রম উপযুক্ত মনন-সমর্থিত নয়। প্রেরণাও কারো মাইনে-করা সেবাদাসী নয়। ভাল সৃষ্টির,—মহতী সৃষ্টির বিশেষ লগ্ন আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। সে লগ্ন মহাকাশের কোন্ গ্রহ-নক্ষত্রের কী রকম সমাবেশের ফল, তা হয়তো জ্যোতিষীরা বলতে পারেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে একালের ভারতীয় সাহিত্যের চর্চায় স্বাধীনতার চেয়ে শক্তিমান যে আনুকূল্যের কথা আমার মনে আসে, সে হোলো রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় এবং প্রতিষ্ঠা। তাঁর আগে মধুসূদন ছিলেন, বঙ্কিম ছিলেন,—এঁরা প্রত্যেকেই পরমাশ্চর্য শক্তি সন্দেহ নেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ না এলে আমরা পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুরাগী প্রাদেশিক রসিক মাত্র থেকে যেতুম। রবীন্দ্রনাথই বিশ্বের সাহিত্য-আসরে আমাদের বাংলা সাহিত্যের জায়গা করে দিয়ে গেছেন—এবং অতঃপর ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্যেই সৃষ্টির উৎসাহ বেড়েছে।

আনন্দ বলতো—রবীন্দ্রনাথের আগের সিঁড়িতে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রথম প্রবেশের কাল নজরে রেখে—তবেই আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের বিস্ময়ের মননকে উপযুক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পারি।

আমি তাকে জিগেস করেছিলুম—বিস্ময়ের মনন কী ব্যাপার? অভিধানে লেখা আছে 'মনন' মানে চিন্তন, অনুভব, সংকল্প, ধারণা। বিস্ময় কোনো চিন্তাসম্পর্কহীন ব্যাপার নয়,—সহজিয়া বোধ মাত্র নয়,—তুমি কি এক্ষেত্রে এই কথাই বলতে চাও?

সে বলেছিল—কতকটা তাই-ই। যথার্থ ঐতিহাসিক ধারা না মনে রাখলে আস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না। যেমন দেখো—আমাদের কবিতার ধারায় 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার আমলে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ, ছত্রাংশ, উপমা ইত্যাদি কতো যে নকল হয়েছে। যদি কোনো পাঠক রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত থেকে শুধু সেই নকলনবীশদের লেখাই পড়ে থাকেন, তাহলে তিনি কি একেবারেই বিস্ময়ের সুযোগ পান নি? কিন্তু সে ভালো-লাগা ধর্তব্য নয়। অজ্ঞানে যা আংশিক জ্ঞানেই বিস্ময় ঘটায়—পূর্ণ জ্ঞানে বিস্ময় নেই—বই-বাছাইয়ের কাজে এ ধারণা আমি মানতে নারাজ। ... তুমি যদি আমাদের মোটামুটি গত শ' দেড়েক বছরের বাংলা সাহিত্য-গ্রন্থগুলির বাছাইয়ের কাজে নামতে চাও, তাহলে অন্তত একটা সময়ানুক্রম মেনে নিয়ে বইয়ের তালিকা সাজাতে হবে। পারবে তুমি তা?

আনন্দ যা বলেছিল, মনে মনে আমিও তা মানি। কিন্তু তার ব্যবহারিক অসুবিধার দিকটাও স্বীকার্য। তাকে বলেছিলুম—আমি তো শুধু ছাত্রপাঠ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে চাই না। সময়ানুক্রম ধরে সাজিয়ে গেলে কেমন যেন পরীক্ষার বিষয়বুদ্ধির এলাকায় গিয়ে পড়তে হয়—সে বড়ো বাঁধাবাঁধি ব্যাপার। ভাল হবার পরিকল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু ভালবাসা কি পরিকল্পনা-নিয়ন্ত্রিত ব্যাপার?

আনন্দ অন্য সময়ে তর্ক করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু কাজের কথায় কর্মীর সামর্থ্যকে সে বাধা দেয় না। তাই ভালবাসার পরিকল্পনাতত্ত্ব নিয়ে সে আর কথা বাড়ায় নি—রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই লাইনগুলি পাঠ করেছিল—

> "পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওয়ালি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। 'বঙ্গদর্শন' যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির"। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্যনাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

আনন্দ যখন থামলো তখন ঘরের হাওয়ায় কেমন যেন চিরকালের প্রণামের ভাব লেগেছে বলে মনে হোলো—যে ভাব খুব ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে পুরোনো কোনো কোনো মন্দিরে গিয়ে আমি অনুভব করেছি। সাধু রীতিতে বাংলা গদ্যে অন্তরের বন্দনা যে কী আশ্চর্য আন্তরিকতাময় হতে পারে, আমি সেই কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু কাজের সময়ে ভাবাবেশ-কে সময় দিতে সে যে নারাজ, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

সে বললে—শোনো ভাই, এতৎসত্ত্বেও আধুনিক কালে পুরো বাঙালী-সমাজটি অকস্মাৎ সাহিত্যমনস্ক হন নি। বঙ্কিমের আমলে অনেক ভদ্রঘরের মেয়েরা তো পড়তেই পেতেন না—অনেকেরই বর্ণজ্ঞান ছিল না। কলকাতার বড়োমানুষদের ঘরেই নতুন কালের সরস্বতী প্রথম প্রবেশের সুযোগ পান। বড়োমানুষরাও তাঁকে অকস্মাৎ বরণ করেন নি। দেখো—'দুর্গেশনন্দিনী' বেরোয় ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে—আর দীন-

বন্ধুর 'লীলাবতী' তার দু' বছর পরে ১৮৬৭ তে। সেই 'লীলাবতী'-তে হেমচাঁদ-নদের চাঁদ তো জমিদারের ভাগনে। হেমচাঁদের স্ত্রী শারদাসুন্দরী একটু লেখাপড়া জানতেন বলে কী দুর্ভোগই ভদ্রমহিলাকে ভুগতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি মেয়েমানুষ বলেই যে লেখাপড়াটা তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা ছিল এবং বড়োমানুষদের ছেলেরা সবাই যে ভারি বিদ্যানুরাগী ছিলেন, সে-কথা ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুই-ই ছিল। রীতিমতো মার্জিত ভদ্রলোক ললিতমোহন ছিলেন, সিদ্ধেশ্বর ছিলেন—আবার অপদার্থ হেমচাঁদ-নদের চাঁদও ছিল। নদের চাঁদের সঙ্গে বিদুষী সুন্দরী লীলাবতীর ঘটকালির খবর শুনে ললিত-মোহন বলেন—

উচ্চৈ লুম্পতি রম্ভা বম্ভা
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা।

নদের চাঁদের ভাল লেগেছিল সে-কথা।—ভাই, একান্তে বলে নিই—একেই বলে সহজিয়া খুশির ভাব! যাই হোক সে কিন্তু 'নিতম্ব' শব্দটির মানে জানতো না—অন্য শব্দ-গুলিও তার জানা ছিল বলে আমার মনে হয় না। সিদ্ধেশ্বরকে মানে জিগেস করে ফেলে। সিদ্ধেশ্বর মজা করবার জন্যেই চেপে যান। মূর্খ হেম বলে—'নিতম্ব' মানে 'স্তন'। এই ব্যুৎপত্তির জন্যে হেমচাঁদকে প্রশংসা করে ললিতমোহন জিগেস করেন—আপনি নতুন বই কি পড়লেন? হেমচাঁদ বলে—তিলোত্তমাসম্ভাবনা পড়েছি।

নামে অনবধান, বিষয়ে বিমুখতা, অর্থ-সন্ধানে বিরাগ—সেকালে বিত্তশালী পুরুষ-সমাজেও বইয়ের ব্যাপারে এ অবস্থাটা কোনো কোনো অংশে বেশ বিদ্যমান ছিল। আর মেয়েদের অদৃষ্টও ছিল অনুরূপ। শারদাসুন্দরীকে তাঁর স্বামী হেমচাঁদ সাফ কথা শুনিয়ে দিয়েছিল—'কেন মিছে জ্বালাতন কর মেয়েমানুষের পড়াশুনোর কাজ কি?—রাঁদো বাড়ো খাও ব্যস্।'

আনন্দ বলেছিল—দেখো, ও-সব আংশিক সত্য। দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' বইয়ে তখনকার সমাজের স্ত্রী-পুরুষের যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে, সেটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কৌলীন্যপ্রথার পীড়ন, বিধবাদের যন্ত্রণা, প্রতাপমত্ত বড়োলোকের লোভ, লাম্পট্য, তামসিকতা—এসব ছিল বটে, কিন্তু তখনকার ভাবপ্রকৃতির মূলে যে বৈশিষ্ট্য, তাকে বলা যায় একই শুভবুদ্ধির নানামুখী উদ্দীপনা। নদের চাঁদ, হেমচাঁদ,—নিমে দত্ত, অটলবিহারী,—সমাজের এ-দিকটা যেমন বাস্তব,—কেনারাম ঘটিরাম-ডেপুটি যেমন বাস্তব,—সেকালের শুভবুদ্ধি শুধু সেইরকমই নয়,—আরো বেশি সত্য। কাজেকাজেই সমাজে তখন বিড়ম্বনা ছিল বটে, কিন্তু বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধারের রাস্তাও ছিল। আর 'বিড়ম্বনা'র হেতু তো মাতাল নিমে দত্ত নিজেই অল্প কথায় অটলের কাকা রামধন রায়কে বুঝিয়ে দিয়েছিল—'সধবার একাদশী'র তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে আছে—"সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়।"—'বিদ্যা' আর 'অভাব'—এই দুটির সন্ধিযোগে ঐ 'বিদ্যাভাব' শব্দটার জন্ম।

ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নব-বাবুবিলাস' (১৮২৫), 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১), 'দূতী-বিলাস' (১৮২৫),—রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক (১৮৫৪),—কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' (১৮৫৪) উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক (১৮৫৬), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ নাটক' (১৮৫৬),—মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০),—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯),—তাঁর 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০),—বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫),—হরিশ্চন্দ্র মিত্রের প্রহসন 'ম্যাও ধরবে কে' (১৮৬২), 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে' (১৮৭৫),—কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' (১৮৬২-৬৩)—এবং তার জবাবে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩) ইত্যাদি বইগুলির সঙ্গে একই ধারায় দীনবন্ধু-অমৃতলালের রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাসের আয়োজনটা লক্ষণীয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইত্যাদি লেখকদের কথাও এইসূত্রে মনে আসা স্বাভাবিক। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গও এ-চিন্তায় অবান্তর নয়। শোনা যায়, অমৃতলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই ভাবশিষ্য হিসেবে তাঁর প্রহসন এবং লঘু কৌতুকময় নাটকগুলি লিখে গেছেন—এবং একথা বললে অন্যায় হবে না যে দীনবন্ধু এঁদের উভয়েরই প্রিয় ছিলেন। কিন্তু একযোগে দেখলে কতো লেখক, কতো বই-ই না এই একটিমাত্র প্রসঙ্গসূত্রেই মনে আসে!! এইসব আলাদা বইয়ের এবং লেখকের বাছাই চাই বটে,—তবে লেখকরা যেমন দলচর, বইও তেমনি। বই তো কেবল অদ্বিতীয় স্বাতন্ত্র্যের উদাহরণ নয়,—বই একলাও আসে, আবার ঝাঁকে ঝাঁকেও দেখা দেয়। 'এক' থেকেই 'ঝাঁক' দেখা দেয়। অতএব তোমাকে 'এক'-ও দেখতে হবে, 'ঝাঁক'ও দেখতে হবে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—কোনটা আগে—আগে এক না আগে ঝাঁক?

সে বলেছিল—বোধ হয়, 'এক'ই আগে। সেই একক অগ্রগামী যে সবসময়ে পূর্ণ সাহিত্যিক দীপ্তিতেই দেখা দিয়ে থাকেন, তা নয়, তবে ঝাঁক আগে নয়,—নেতাই আগে আসেন,—তিনিই অগ্রণী। তিনি না এলে রাত ফুরোয় না, কিছুতেই ভোর হয় না।

আমি বলেছিলুম—আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গত শ-দেড়েক বছরের ধারা মনে রেখে কথাটা একটু বুঝিয়ে বলো। আমাদের এই আধুনিক সাহিত্যের নেতা কারা?

সে বলেছিল—যেমন, রামমোহন ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ।

আমি বলেছিলুম—রামমোহন তো সাহিত্যিক ছিলেন না,—বিদ্যাসাগর তো প্রধানত সংস্কারক,—রামনারায়ণ

এঁদের মধ্যে গণ্য হবার মতো সাহিত্যিক কীর্তি রেখে গেছেন বলে মনে করো নাকি? আর, রবীন্দ্রনাথের পরেই চুপ করলে কেন?

সে বলেছিল—চুপ নয়,—আমাকে তুমি উদাহরণযোগে নেতৃত্বের তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে বলেছিলে। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিলুম। বাকিগুলি তুমি নিজেই ভেবে দেখতে পারো। ইচ্ছে করলে এইসব নামের রদবদলও ঘটাতে

আমি এই হেঁয়ালিতে বিরক্ত হয়েছিলুম। সোজাসুজি জবাব পাই নি। আধুনিকতার মানে খুঁজেছিল মন।

আনন্দ বলেছিল—লেখকদের কালানুক্রমিক তালিকা সাজিয়ে দেওয়া শক্ত নয়, কিন্তু বই-বাছাই শক্ত কাজ। সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে সাহিত্যের ইতিহাস লিখছেন আজকাল অনেকেই। কিন্তু বই-বাছাই করতে গেলে বই পড়তে হয়। এবং এক পাঠকের উপলব্ধি অন্য পাঠকের সঙ্গে মেলতেও পারে,—নাও মিলতে পারে। [ক্রমশ]

লিপটনের
হিমালয়ান
গোল্ডেন ডাস্ট
গুঁড়ো চা

হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট গুঁড়ো চা যে খেয়েছে সেই মজেছে। যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি স্বাদে গন্ধে ভরপুর। চা হবে কাপের পর কাপ। খেয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি।
অন্য সব গুঁড়ো চা-কে টেক্কা দেয় হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট।

LIPTON
লিপটন বলতেই ভালো চা

LHGC-5 BEN

বঙ্গ দর্শন

দুর্গাপুরে সম্প্রতি যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তার গুরুত্বটা কোনক্রমেই লঘু করে দেখলে চলবে না। বিষয়টির তাৎপর্য স্বাভাবিক নিয়মেই সুদূরপ্রসারী। ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ আজকাল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে উভয়পক্ষেরই কিছু বক্তব্য থাকে। দুর্গাপুরের বর্তমান ঘটনার মত ব্যাপারও ঘটে। যেমন পি. ডি এফ আমলে উত্তরপাড়া কলেজে ঘটেছিল। কিন্তু সেখানে পুলিশ যা করেছে তা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, কিন্তু দুর্গাপুরে এবার যা ঘটেছে সেখানে পুলিশ নিজের দাবিতে মারমুখী হয়েছে। এককথায় পুলিশ কর্তৃপক্ষের আদেশের তোয়াক্কা না রেখেই নিজের হাতে আইন নিয়েছে এবং খোলাখুলিভাবেই নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকারের সীমা লংঘন করেছে। দুর্গাপুরে যা ঘটেছে তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে, একজন কনস্টেবল ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন. কেন না ছাত্রদের মতে তিনি কর্তব্যচ্যুতি না ঘটালে একটা বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। তৎপূর্বে একটি মোটর দুর্ঘটনা হয়েছিল এবং ছাত্রদের ধারণা উক্ত দুর্ঘটনাজনিত প্রাণহানির জন্য উক্ত ট্রাফিক পুলিশ মহোদয়ের কর্তব্যহীনতাই দায়ী। উর্দি-পরা পুলিশ কর্মচারীকে নিগৃহীত করা বে-আইনী। কিন্তু ওই রকম পরিস্থিতির মধ্যে ওটা হয়ত অনৈতিক নয়। যা হোক ব্যাপারটির অন্যরকম ফয়সালা হওয়া সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে দুর্গাপুর-পুলিশ নিজ নিরাপত্তার দাবিতে এক আজব আন্দোলন শুরু করে দিল এবং শেষ পর্যন্ত তা কলেজ প্রাঙ্গণে নিছক পুলিশী হামলাবাজিতে পরিণত হল। একজন ছাত্র গুলীর আঘাতে প্রাণ হারাল. কয়েকজন জখম হল কলেজের অভ্যন্তরে ব্যাপক গুলী বর্ষিত হল, কলেজের আসবাবপত্র নষ্ট করা হল. শিক্ষকদের নিগৃহীত করা হল। সোজা কথায় একটা উন্মত্ত প্রতিশোধস্পৃহায় নাদিরশাহী কাণ্ড ঘটানো হল। কিন্তু উন্মত্ত প্রতিশোধস্পৃহা বললেও বোধ হয় বিষয়টির প্রতি সুবিচার করা হয় না। কেন না দেখা যাচ্ছে যে, এর পিছনেও একটি মেথড কাজ করেছে। এটি একটি উপলক্ষ মাত্র। দুর্গাপুরের বর্তমান ঘটনাটাকে উপলক্ষ করে একটি পুলিশী বিদ্রোহের পটভূমি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিল। কেন না ঘটনার পরদিনই পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের জনৈক কর্তাব্যক্তি নিজের এলাকা ছেড়ে অকস্মাৎ দুর্গাপুরে হাজির হয়ে পুলিশ কর্মচারীদের নাকি উস্কানি দিয়েছিলেন। সংবাদপত্রে এই ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল যে, উক্ত ব্যক্তির প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ নাকি এমন কি দুর্গাপুরের পুলিশ বিভাগের বড়-কর্তারা পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত বরদাস্ত করতে রাজী হন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই মেদিনীপুরে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই কারণেই এইগুলীকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার হবার পর থেকে পুলিশ বিভাগে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। পূর্ববর্তী আমলে পুলিশ বিভাগের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের অনেকেই একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরোধিতা করছেন, প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে। নেপথ্যে প্ররোচনামূলক উস্কানি দিচ্ছেন। সরকারী নির্দেশগুলিকে বিকৃতভাবে কাজে লাগাচ্ছেন; আর একটি শ্রেণী অন্য রাস্তা নিয়েছেন, যেভাবে তাঁরা কংগ্রেসকে সেবা করে নিজেদের আখের গুছিয়েছেন, যুক্তফ্রণ্টকে ঠিক সেই একইভাবে সেবা করে যাচ্ছেন; আরও একটি শ্রেণী সত্যই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চান. কিন্তু তাঁরা এখনো পর্যন্ত সংখ্যালঘু। নিম্নতর পর্যায়গুলিতেও এই বিষয়ে সুবিধাভোগীরাই অধিকতর তৎপর। পুলিশীবাহিনীকে যুগোপযোগী করে নেওয়ার জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকারের তৎপর হওয়া উচিত। সর্বস্তরে ব্যাপক রদবদলের দ্বারাই এটা সম্ভব. শুধু বর্ধমান ডিভিসন থেকে প্রেসিডেন্সী ডিভিসনে বদলি করলেই সমস্যা মিটবে না। এ সকল বিষয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকার যে খুব সিরীয়াস তা মনে হচ্ছে না। কোনক্ষেত্রেই যুক্তফ্রণ্ট সরকার সত্যিকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না, কংগ্রেসী আমলের জোড়াতালি দেওয়া নীতিই তাঁরা অনুসরণ করে যাচ্ছেন।

শরিকী দ্বন্দ্ব

সাপ্তাহিক বসুমতীর পূর্ববর্তী কয়েকটি সংখ্যার বঙ্গদর্শনে বার বার বলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলি নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জন্য যেভাবে পারস্পরিক হানাহানি শুরু করেছেন, তাতে যুক্তফ্রণ্টের ইমেজ বেশ নষ্ট হয়ে গেছে এবং যেভাবে তাঁরা চলছেন সেভাবে চললে ভবিষ্যতে তাঁদের স্বখাত সলিলেই সমাধি লাভ করতে হবে। যাদবপুরের কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরীর ইউনিয়নের দখল নিয়ে যে কাণ্ডটা ঘটানো হয়েছে তা শুধু যে লজ্জাকর তাই নয়, পক্ষান্তরে তা আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের এবং তাঁদের রাজনৈতিক গুরুদের নির্বোধ ও নীতিহীন চেহারাটাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। এদেশের শ্রমিক আন্দোলন যে অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতাদের হাতে পড়ে শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী হয়ে উঠছে, কৃষ্ণা গ্লাসের লক-আউটই তার সাক্ষ্য দেয়। সর্বক্ষেত্রে মালিকের ওপর দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। আর কৃষ্ণা গ্লাসের লক-আউট তো কোন শ্রমবিরোধের পরিণতি নয়। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, কৃষ্ণা গ্লাস শ্রমিক ইউনিয়ন যুক্তফ্রণ্টের একটি শরিক দলের কবলিত ছিল, আর একটি শরিক দল সেখানে নিজেদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে গেছে, তারই পরিণামে সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত কারখানা লক-আউট, সহস্রাধিক শ্রমিক বেকার। কৃষ্ণা গ্লাসের মালিকপক্ষ লক-আউটের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে, বিবদমান দুটি গ্রুপ কারখানার পরিচালনা অসম্ভব করে তুলেছিল, কাজেই বন্ধ না করে দিয়ে উপায় নেই। তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন—হয় সরকার কারখানাটির দায়িত্ব গ্রহণ করুন, নতুবা শ্রমিকেরা নিজেরাই করুন, তাঁরা যতদূর পারবেন সহযোগিতা করবেন। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষ কোন অন্যায় করেছেন বলে আমাদের মনে হয় না। এ কথা বলার জন্য হয়ত বিভিন্ন

মহল থেকে দালাল আখ্যা পেতে পারি, কেন না গালি দেওয়ার চেয়ে বেশি বৈপ্লবিক কর্ম আমাদের অধিকাংশ বামপন্থী নেতারা বোধ হয় করেন নি। শ্রমিক নেতাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য, আপনারা নিজেদের কার্য-কলাপগুলিকে নিজেরা বিচার করুন। শ্রমিককে মূলধন করে নির্লজ্জ পার্টিবাজী শুধু শ্রমিক স্বার্থেরই পরিপন্থী নয়, এদেশের বামপন্থী আন্দোলনেরও তা সর্বনাশ ডেকে আনবে।

এদের শায়েস্তা করা দরকার

দুর্গাপুরের রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলী চালনার ঘটনা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটা বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে কলকাতার নকশালপন্থী ছাত্ররা ট্রামে আগুন দিয়ে, দোকানপাট লুঠ করে যে সমাজবিরোধী আচরণের প্রকাশ ঘটিয়েছে, তাকে বৈপ্লবিক বলে অভিনন্দিত করার মত একটা মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না: অবশ্য রাজনীতির নামে যারা গুণ্ডাবাজি করে তারা ছাড়া। দুর্গাপুরের গুলী চালনায় রাইটার্স বিল্ডিং-এর হাত ছিল,

প্রতিবার

সানলাইটে আপনার জামাকাপড় আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন···কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়।- দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

লিনটাস-S. 62.140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

এমন প্রমাণ নিশ্চয়ই নকশালপন্থীরা দিতে পারবে না, এমন কি এ বিষয়ে নকশালপন্থীদের সুস্পষ্ট অভিযোগটা কি, কেনই বা তারা এই বর্বরতা প্রদর্শন করল, তার কারণ তারা নিজেরাও স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারে নি এবং কোন সুস্পষ্ট অভিযোগও তাদের নেই। একমাত্র অশান্তি সৃষ্টি করা ও যুক্তফ্রন্টকে বেকাদায় ফেলার জন্যই তাদের এই গুন্ডামী। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এই সমাজবিরোধীদের রাজনৈতিক মোকাবিলা করার যে মতলবের কথা যুক্তফ্রন্ট পূর্বাহ্নে ঘোষণা করেছিলেন, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে সব মতলব ত্যাগ করে যুক্তফ্রন্টের কর্তব্য এদের সমাজবিরোধী বলে সোজাসুজি থানায় চালান দেওয়া। বলপ্রয়োগের দ্বারাই এই নকশালী আপদকে দূর করতে হবে, ঠান্ডা ঘরই একমাত্র এই শৌখিন বিপ্লবীয়ানাকে ঠান্ডা করতে পারে এবং সেই ধাক্কা সহ্য করার পরও যদি দু-চারজনের বৈপ্লবিক ইনস্টিংক্টের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তখন না হয় তাদের আমরা সাচ্চা বিপ্লবী বলে অভিহিত করব। কংগ্রেসী আমলে যাদের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যেত না, তখন পুলিশের গুঁতোর জোর বেশি ছিল, যুক্তফ্রন্টের ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বিপ্লবের বিলাসটাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা প্রয়োজন। আশা করি যুক্তফ্রন্ট বিষয়টি গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করবেন।

পঞ্চপ্রধান বৈঠক

একটা এমন দিন ছিল যখন কোন সমস্যার সমাধান করতে না পারলে তার ওপর একটি ঈশ্বরকে আরোপ করে দেওয়া হত। সম্প্রতি বোধ হয় ঈশ্বরের জায়গায় সি আই এ-র আমদানী হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির পারস্পরিক হানাহানি বন্ধ করার জন্য যে পঞ্চপ্রধান বৈঠক হয়েছিল তাতে কোন কোন শরিক দল ঘটনাগুলির পিছনে সি আই এ-র অদৃশ্য হস্ত দেখতে পেয়েছিলেন। ভাবতেই লজ্জা করে যে, এই রকম বুদ্ধি নিয়ে এঁরা দলের নেতৃত্ব করেন। শরিকী হানাহানির কারণ তো একটি—তা হচ্ছে নিজের দলের এলাকার সীমানার সম্প্রসারণ, সরকার হাতে পাবার পর থেকে যা প্রতিটি শরিক দলেরই ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রমোদবাবুই বলুন, বিশ্বনাথবাবুই বলুন সবাই-কারই তো লক্ষ্য ওই একই—কিভাবে নিজের দলের অধিকারের সীমা বাড়ানো যায়। বিরোধ কেন হয়? একটি জমি দখল করা হয়েছে, তা কোন্ দলের মারফৎ বিলি হবে এবং তা কারা, অর্থাৎ কোন্ দলের অনুগামীরা পাবে? কারখানার ইউনিয়ন কোন দলের কব্জায় আসবে? প্রত্যেকটি দলই এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হচ্ছে এবং তার ফলে সংঘর্ষ হচ্ছে। ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে একটুকরো জমির বিলিব্যবস্থা হবে, সেটা হাসিম শেখেরা পাবে না রামা কৈবর্তরা পাবে, উভয়-পক্ষেরই পশ্চাতে ফ্রন্টের দুই শরিকের দুই লাল পতাকা আছে। কাজেই সংঘর্ষ অনিবার্য। এখন যদি এদের পিছনে সি আই এ-র হাত থাকে, সেই সি আই এ-র লোক কারা? হাসিম শেখেরা, না রামা কৈবর্তেরা, না তাদের পিছনে যে দলগুলি মদত দিচ্ছে তারা? তাহলে কি স্বীকার করতে হবে প্রমোদবাবু বা মাখনবাবু, বা বিশ্বনাথবাবু, এঁদের মধ্যে কেউ একজন সি আই এ-র লোক, নাকি সকলেই এক-সঙ্গে?

উদ্দেশ্য পণ্ড

উল্টাডাঙ্গা স্টেশনের সন্নিকটস্থ এলাকায় অনেকগুলি সরকারী ফ্ল্যাটবাড়ির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলিতে মানুষ বাস করছে, অনেকগুলি এখনও নির্মিত হচ্ছে, কয়েকটি সমাপ্তির মুখে। এগুলির মধ্যে আবার নিম্নতম আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। উল্টাডাঙ্গা স্টেশনের ঠিক গায়েতেই এই রকম কয়েকটি বিল্ডিং আছে এবং কাছাকাছি অঞ্চলে আরও কয়েকটি আছে। এগুলিতে ভাড়ার হার রীতিমত কম, ফ্ল্যাট পিছু বোধ হয় সাড়ে পঁচিশ টাকা, অর্থাৎ বস্তিবাসীদের সামর্থ্যের উপযোগী করেই এই ভাড়ার হার নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে অল্প আয়ের লোকেরা বাস করতে পারেন এবং এই রকম ফ্ল্যাটবাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করে শহরের বুক থেকে বস্তিগুলি অপসারণেরও একটা পরিকল্পনা বরাবরই সরকারী স্তরে রয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য এই স্বল্প ভাড়ার ফ্ল্যাটগুলি তৈরি করা হয়েছে বা হচ্ছে তারা কি সত্যই এখানে বসবাস করছে? একটা মামুলি ধরণের তদন্ত করলেই দেখা যাবে ওখানে যারা বসবাস করে তারা কেউই নিচুতলার অধিবাসী নয় এবং স্বল্পবিত্তের মানুষও নয়। এই ফ্ল্যাটগুলিকে কেন্দ্র করে একটা দুর্নীতির ব্যবসা চলছে। যার নামে ফ্ল্যাটটা ইস্যু হল সে একটা মোটা টাকা সেলামীর বিনিময়ে একটি সঙ্গতিসম্পন্ন লোককে ছেড়ে দিল, সে পুনরায় বস্তিতে ফিরে গেল মাঝখান থেকে একটা দাঁও মেরে। এই সেলামী তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে। ওই রকম ফ্ল্যাট কলকাতা শহরের অন্যত্র পৌনে দুশ টাকার কমে পাওয়া যায় না, কাজেই দু' বছর বাস করলেই সেলামীর টাকাটা উঠে আসে। সেলামীর বিনিময়ে যে ফ্ল্যাটটি হস্তান্তরিত করে সেলামীর সব টাকাটাই সে পায় না, তার অনেকটা অংশই দালালে মেরে নেয়। এই দালালরা তদ্বির করে বস্তিবাসীদের নামে ফ্ল্যাট সংগ্রহ করে এবং এরাই আবার সেলামী দেবার মত খদ্দেরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিষয়টিকে লঘুভাবে দেখলে চলবে না। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় যদি একবার মাত্র ওই এলাকায় টহল দিয়ে আসেন তাহলে অবস্থাটা আরও ভালভাবে বুঝবেন।

স্বাস্থ্যদপ্তরে সন্দেশ

ইহা কি সত্য, মাত্র কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্যদপ্তরে দুজন করনিক, যাঁরা গেজেটেড ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, হেলথ এ্যাসিসট্যান্ট প্রভৃতিদের নিয়োগ-বদলী, প্রমোশন অর্থাৎ এস্টাবলিশমেন্ট সংক্রান্ত ফাইলগুলি দেখাশোনা করেন—সরকারী জীপ গাড়ি চেপে বৌবাজার স্ট্রীটের একটি বিখ্যাত সন্দেশের দোকানে এসেছিলেন এবং সেখান থেকে বাক্সভর্তি মিষ্টি ক্রয় করে নিয়ে গিয়েছিলেন, যা দিয়ে স্বাস্থ্য অধিকারের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের—বাছাই করা অফিসার থেকে করনিক পর্যন্ত প্রায় ভূরিভোজ হয়েছিল?

ইহা কি সত্য যে উক্ত মিষ্টিমুখের কারণ হচ্ছে এই যে, বর্তমান স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডঃ কনক সর্বাধিকারী গুরুতরভাবে পীড়িত হয়েছেন এবং তিনি আর কাজে যোগদান করতে পারবেন না এই আনন্দের কল্পনাতেই স্বাস্থ্যদপ্তরের সুহৃদচক্রটি এই খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন?

ইহা কি সত্য যে, উক্ত চক্রের মধ্যমণি—যাঁকে সরালে স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতির বারো আনা বিদূরিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় অভিমত, যিনি সর্বাধিকারীর আমলে রীতিমত কোণঠাসা হয়েছিলেন এবং যিনি বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নানাভাবে খুশি করে রাখতে চেষ্টা করছেন, যিনি সব সময় হাবভাবে বলে বেড়ান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর কথায় ওঠা-বসা করেন—সেই মধ্যমণি কি প্রকাশ্যেই বলছেন যে, এইবার তাঁর দিন আসছে, তিনি স্বাস্থ্য অধিকর্তা হচ্ছেন এবং তিনি অতঃপর সকলকে টাইট দেবেন?

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি দয়া করে এটুকু খোঁজ নেবেন যে, এক ব্যক্তির অসুস্থতার সময় তাঁর চরম অমঙ্গল কামনায় খোদ স্বাস্থ্যদপ্তরেই যে অমানুষিক ও পৈশাচিক আনন্দোৎসব ঘটানো হয়েছে তার জন্য দায়ী কে বা কারা?

ভারত দর্শন

ঐতিহাসিক ছাত্র সম্মেলন

এই প্রথম ভারতের সত্তরটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাতাত্তরটি ছাত্র নেতার উপস্থিতিতে এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের যুক্ত উদ্যোগে আয়োজিত রাজধানীতে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, গৃহীত হল ছাত্র সমস্যার ওপর বিভিন্ন প্রস্তাব।

ভারতের আইনসভাগুলিতেও যে শৃঙ্খলা ইদানীং প্রায়। দেখাই যায় না, আশ্চর্যের বিষয় উচ্ছৃঙ্খল বলে কথিত ভারতের ছাত্র প্রতিনিধিগণ সে তুলনায় অপূর্ব শৃঙ্খলা প্রদর্শন করলেন তিনদিনব্যাপী এই ছাত্র সম্মেলনে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ভি, কে, আর, ভি, রাও এবং ইউ, জি, সি চেয়ারম্যান ডঃ ডি, এস, কোঠারী। ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও সমন্বয় ব্যুরোর উপদেষ্টা ডঃ নায়েক।

বস্তুতপক্ষে এই সম্মেলনের জন্মদাতা বলতে গেলে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রাও স্বয়ং। শিক্ষাদপ্তর হাতে নেওয়ার পরই তিনি ছাত্র-অশান্তি নিবারণে সারা ভারত উপাচার্য এবং কলেজ অধ্যক্ষদের সম্মেলন করেছেন। ছাত্রদের নিয়েও আলোচনা বৈঠকের প্রস্তাব তিনিই রেখেছিলেন।

এই অভূতপূর্ব ছাত্র সম্মেলনে শিক্ষা এবং শিক্ষায়তন সম্পর্কিত সমস্যাগুলির ওপরেও চিন্তাগর্ভ আলোচনা হয়েছে, যেমন হয়েছে ছাত্র-সমস্যা, পরীক্ষা-সমস্যা এবং পরীক্ষাদি উত্তীর্ণকালের বেকার সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত আলোচনা। আলোচনার পর কতকগুলি সম্মিলিত সিদ্ধান্তও ঐ সম্মেলনে গুরুত্বসহকারে গৃহীত হয়।

চালু শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার এই সম্মেলনের পর কতদূর গুরুত্ব পাবে তা অবশ্য এখনই বলা যায় না। আর সে কারণেই সম্মেলন-ফেরত ছাত্র প্রতিনিধিরাও খুব উৎসাহিত বোধ করবার কোনও কারণ ঠিক এই মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছেন না। বেশ কিছু ছাত্রনেতা এখনও অবিশ্বাসী। এই অবিশ্বাসও অমূলক নয়। ভারতবর্ষে কমিটি আর সম্মেলন প্রায় বারোয়ারী পুজোর মতো হুট বলতেই প্যাণ্ডেল বেঁধে বসে পড়ে। বারোয়ারীতলায় যেমন পুজোর নামে এক-গোষ্ঠী যুবকের উল্লাসটাই প্রধান, সরকারী বে-সরকারী সম্মেলনগুলিতেও তেমনি মুখ্য উদ্দেশ্য একই তিমিরে থেকে যায়, প্রাধান্য পায় বৈঠকের জাঁকজমক এবং বক্তৃতারাজি। এই নিয়ে সংবাদপত্রে পাবলিসিটি ও দু'-চার কলম সম্পাদকীয় সোরগোল থাকে। তারপর কমিটিগুলি শুধুমাত্র পরবর্তী আলোচনাকালে রেফারেন্সের তালিকা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তা এই অভূতপূর্ব সম্মেলনের অবস্থাও অনুরূপ হলে কোনপক্ষই বিস্মিত হবেন না। কারণ চিরাচরিত প্রথার ব্যতিরেক বড় সহজে ঘটে না।

তথাপি এই সম্মেলনের গুরুত্ব কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নয়, অন্যতর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যেও এর গুরুত্ব সমধিক, যাকে হেলা-ফেলায় তুচ্ছ করা যায় না।

স্বীকৃতি—এ তা ব ৎ কা ল ছাত্ররা আন্দোলনই করে এসেছেন। আন্দোলনের মোকাবিলা করেছে পুলিশ একশ' চুয়াল্লিশের পরিধার বাইরে, শিক্ষায়তনের প্রাঙ্গণে। এই প্রথম তাঁরা সরকারী স্বীকৃতি পেলেন বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসবার। বলা বাহুল্য এই স্বীকৃতি আদায় করতে বহু ছাত্র শহীদ হয়েছেন, বহু আন্দোলনের স্তর-পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। আজ তাঁরা মুখোমুখি আলোচনায় বসছেন তাঁদের সঙ্গে, যাঁদের কাছে কেবলমাত্র স্মারকলিপি পৌঁছে দিতে গেলে প্রিজন-ভ্যান পুলিশের লাঠি ও গুলীই তাঁদের অভ্যর্থনা জানাত। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, শুধু ছাত্র আন্দোলনই আজ তাঁদের এই বিশেষ সম্মান আদায় করে নি, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনও সমতুল ভূমিকা পালন করেছে। তবু সেই রাজনৈতিক দাম্ভিকতার পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দেওয়ার জন্যও ছাত্রদের অবদান প্রথমেই স্মর্তব্য। তাঁরাই থাকেন সব রকম আন্দোলনের পুরোভাগে যথার্থ সেনানীমণ্ডলীর মতো। তাই আজকের এই স্বীকৃতি প্রধানত ছাত্র আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি।

এই ছাত্র সম্মেলন মূলত আহূত হয়েছিল ছাত্র-অশান্তি নিরোধের জন্য ছাত্রদের প্রতি কিছুটা তোষণমূলক মনোভাব প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু দেশের ছাত্রসমাজকে আজ আর ছিটে-ফোঁটা আশ্বাস ও পিঠ থাবড়ানি দিয়ে যে শান্ত করা যাবে না, তাদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা যে আপোষহীন, এই সম্মেলনে তারও পরিচয় নথিবদ্ধ হল। তাঁরা অনমনীয়ভাবে ছাত্রজীবনকেন্দ্রিক সব ক'টি সমস্যার সমাধান দাবি করলেন। আর দাবি পূরণ না হলে ছাত্র-সংগ্রাম যে চলবে, তাও সরাসরি জানিয়ে এলেন। প্রসঙ্গত উত্তর প্রদেশের অন্যতম ছাত্রনেতা সত্যপাল মালিকের সতর্কবাণী উল্লেখ করব। শ্রীমালিক মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সোজা শিক্ষামন্ত্রীকে বলে এলেন: উত্তর প্রদেশ সরকার ছাত্র-মাহিনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে যদি রদ-বদল না করেন, তবে ঘেরাও চলবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এ বিষয়ে তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার অনুকূলে চেষ্টা করবেন। তবে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সমস্যার ওপর তাঁর কোন হাত নেই। তিনি সেদিক থেকে অসহায়।

আলোচ্য বিষয়—এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলির আওতায় এসেছিল ছাত্র-অশান্তির উৎসস্বরূপ প্রায় সকল সমস্যাগুলিই। যেমন, চাকরিভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি, স্নাতক শ্রেণীর প্রথম স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবর্তনা, সারা দেশের জন্য একই রকম পাঠক্রম, বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন, ছাত্র-সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত শিক্ষায়তনের সকল রকম প্রশাসনিক ব্যাপারে ছাত্রদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ। এ ছাড়া কৃষি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের গ্রামে গিয়ে কাজ করার বিষয়টিকে আবশ্যিক করা ও বেকারভাতা প্রবর্তনের মত বিষয়ও আলোচ্য হয়ে ওঠে।

কর্মসংস্থান ও তদ্বিষয়ক সমস্যা পর্যালোচনা কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার

তীব্র সমালোচনা করেন এবং অধিকাংশ অংশ গ্রহণকারী প্রতিনিধিই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বেকার সমস্যা সমাধানের অনুকূলে মতামত প্রকাশ করেন। এই কমিটি মনে করেন, সকল উদ্যোগকেই পাবলিক সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। দেশীয় বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, চাকুরী প্রাপ্তির অধিকারকে সংবিধানে প্রদত্ত ফান্ডামেন্টাল রাইটস-এর অন্তর্ভুক্ত করা, বেকারদের মধ্যে জমি বিলি ও জমির ওপর সিলিং, চাকুরীভিত্তিক শিক্ষা, অটোমেশন নিষিদ্ধকরণ, মানবিক-শক্তির ব্যবহার, বেকারভাতা, মার্কিন শান্তি মিশনকে তাদের নিজের দেশে ফিরিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় সোস্যাল সার্ভিস সংস্থা চালু করা, সমবায় চাষ ও রাজন্যভাতা বন্ধের দাবিগুলি এই কমিটির প্রতিবেদনে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করে উত্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষায়তনে এবং পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ বিষয়ক কমিটি পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রতিনিধিত্বের ও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আবেদন উত্থাপন করেছেন। একটি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব আছে। এই কমিটির মধ্যে আধা-আধি প্রতিনিধিত্বের দাবি রাখা হয়েছে। শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকর্মীদের সঙ্গে শতকরা পঞ্চাশভাগ নির্বাচিত ছাত্ররা মিলে শিক্ষায়তন প্রাঙ্গণের শৃঙ্খলা রক্ষা সমস্যার হাল ধরবেন। প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য এই রকম। দেশের আর্থ-সমাজনৈতিক সমস্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেশব্যাপী একই রকম পাঠক্রম প্রবর্তনের বিষয়টিও এই কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি। পরীক্ষার বিষয় কমিটি একটি বাৎসরিক পরীক্ষা অপেক্ষা সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাধ্যতামূলকভাবে ক্লাসে উপস্থিতির বিপক্ষেই এই কমিটির অভিমত। এই কমিটি চান না, দেশে একটিও প্রাইভেট কলেজের অস্তিত্ব থাকুক।

ভাষা নিয়ে হিন্দীপ্রেমীর উষ্মা—যদিও ছাত্ররা সব সমস্যাকেই ঐক্যবদ্ধ একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় আনতে চেয়েছেন; শিক্ষায়তনের নামের আগে হিন্দু-মুসলিম শব্দ বর্জন করতে চেয়েছেন এবং আঞ্চলিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভেদের অবসান কামনা করেছেন, কিন্তু সমাপ্তি অধিবেশনে হিন্দীপ্রেমী ছাত্ররা সভাগৃহে উষ্ণতা সৃষ্টিতে পিছপাও হন নি। খসড়া প্রস্তাব কেন হিন্দীতে লেখা হয় নি (বক্তৃতার সুযোগ ছিল ইংরেজি ও হিন্দীতে এবং উপেক্ষিত হয়েছিল সংবিধানসম্মত অন্যান্য ভাষাগুলি এবং তাতে কেউ আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন বলে কোন সংবাদ নেই) এজন্য হিন্দীপ্রেমীরা চীৎকার শুরু করে। বলা বাহুল্য হিন্দীওয়ালা অসহিষ্ণুতার স্পর্শ সুতরাং অন্যান্যদেরও ছুঁয়ে যায়। অহিন্দীভাষাভাষীরাও সঙ্গে সঙ্গে দাবি তোলেন, সংবিধানসম্মত অপর ভাষাগুলিতেও খসড়া প্রস্তাব তাহলে একই সঙ্গে অনুবাদ করে রাখতে হবে। অতি কষ্টে এই উত্তপ্ত আবহাওয়া ঠাণ্ডা করেন সভাপতি ডঃ ডি, এস, কোঠারী।

এন সি ইউ এস আই—উত্তপ্ত বিতণ্ডার সূত্রপাত হয় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইউনিভার্সিটি স্টুডেণ্টস অব ইণ্ডিয়াকে শিক্ষামন্ত্রক প্রদত্ত ছয় লক্ষ টাকার সাহায্য প্রদানের বিষয়টি যখন উত্থাপন করেন কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি শ্রীপৃথ্বী সিং। উপরোক্ত কাউন্সিলের একটি প্রচার পুস্তিকা থেকে তিনি একাংশ পড়ে শোনান। ছাত্রপ্রতিনিধিরা তখন তুমুল উত্তেজিত। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি শ্রী পি, এন, সিংহ (এঁকেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ, সি, যোশী সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অপরাধে রাস্টিকেট করেছিলেন) সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেনঃ এন সি ইউ এস আই সি আই-এর অর্থে পুষ্ট। এমন একটি সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে শিক্ষামন্ত্রক সমগ্র জাতিকে অবমানিত করেছেন। ছাত্রপ্রতিনিধিরা এই সময় দাবি তোলেন, শিক্ষামন্ত্রী ও-বিষয়ে জবাব দিন, ব্যাখ্যা দিন।

ডঃ রাও তখন বিশেষ উত্তেজিত। বলেনঃ ব্যাপারটা অর্থহীন। আমাকে অল্পকাল শিক্ষামন্ত্রীর পদে বসান হয়েছে। আমি কি করে জানব আমার দপ্তর কাকে কত সাহায্য প্রদান করেছেন কোন্ খাতে।

বাকবিতণ্ডায় উঠে দাঁড়ান এই সময় পঁচিশ বছরের তরুণ ছাত্রনেতা অমিয় সাহা (পঃ বঃ ছাত্র ফেডারেশন), ইনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতিরূপে সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন।

উত্তেজনা প্রশমনে তখন ডঃ কোঠারীকে এগিয়ে আসতে হয়।

ফলশ্রুতি—তিনটি কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ ও প্রস্তাবই সম্মেলন সাধারণভাবে অনুমোদন করেছেন।

অতঃপর কাজ এগোলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা যে হবেই এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ছাত্রনেতারা কোন ডিবেটিং ক্লাশ করে ফেরেন নি, গুরুত্বপূর্ণ বাঞ্ছনীয় প্রস্তাবই রেখে এসেছেন। ইতিপূর্বে কোঠারী কমিশনের সাধারণ বক্তব্যের মধ্যেও এই জাতীয় প্রস্তাবাবলীর পূর্বাভাষ ছিল। ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য ছিলঃ শিক্ষিত তরুণ-সমাজের সামনে যে অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যবোধ বিরাজমান, দায়িত্বহীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মূলত সেটাই উৎস। এ ছাড়া মান্ধাতা আমলের অসংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রম, শিক্ষায়তনে পড়াশোনা গবেষণা ইত্যাদি সুযোগের অভাব, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সহৃদয় সম্পর্কের অবনতি প্রভৃতিও আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করেছে।

কোঠারী কমিশন যে মূল সমস্যার উল্লেখ করেছেন, ছাত্র সম্মেলন তারই সমাধান খুঁজেছেন ভারতীয় নেতৃপর্যায়ের বৈঠকের মতো কেবলমাত্র ফাঁকা বুলির মধ্যে নয়, সম্ভাবনাপূর্ণ প্রস্তাবাবলী হাজির করে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আছে। তিনি নিজেও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। তাঁর পক্ষে এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ এবং সেইমত কাজ করার আগ্রহ পোষণ করাও স্বাভাবিক। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি কি তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সহায়তা করবেন। বস্তুত যদি দেশব্যাপী ছাত্র-অশান্তি ও ক্ষয়ক্ষতি রোধ করতেই হয়, তবে সম্মেলনে উত্থাপিত প্রতিটি প্রস্তাবের ওপর উপযুক্ত জোর দিয়ে এখনই কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে এগিয়ে আসা দরকার। ভারত সরকারের গজরাজ বড় নিড়বিড়ে, তাকে এবার একটু সচল হতে হবে। বিদেশে ছাত্ররা যে গুরুত্ব ও মর্যাদা পেয়েছেন, এদেশের ছাত্রদের ক্ষেত্রে তেমন কোন গুরুত্বই স্বীকার করা হয় নি। অথচ ছাত্রদের স্কন্ধে ভর করেই নেতারা গদিনসীন। ছাত্ররা আজ আপন ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে আস্থাশীল। তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা এবং দেশ গঠনে তাঁদের বিশেষ ভূমিকাকে আজও অস্বীকার করতে যাওয়া বাস্তব অবস্থাকে জোর করে অস্বীকার করা মাত্র। ছাত্র সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সাহায্য তাই একান্ত কাম্য।

তেলেঙ্গানার অশান্তিঃ উদ্বেগ

ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে আর পশ্চিমবঙ্গ নয়, কেন্দ্রের উদ্বেগ তেলেঙ্গানাকে নিয়ে। কারণ তেলেঙ্গানার প্রজা সমিতির চেয়ারম্যান ডঃ চেন্না রেড্ডি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীই আসুন, চাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই পাঠানো হোক, স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার দাবি না মানলে অশান্তি চলছে, চলবেও।

কাবুল গমনের প্রাক্কালে রাত্রি তিন প্রহর পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধী ঢের চেষ্টা

করে গেছেন। ফল হয় নি। শ্রীমতী গান্ধী যে আলোচনার জন্য শান্ত আবহাওয়ার আবেদন করেছিলেন, তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য কুসুমাস্তীর্ণ পথ তৈরি করে যেতে চেয়েছিলেন, তাতে পাথর গলে নি। পৃথক তেলেঙ্গানার দাবিদারগণ প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছেন, অন্ততপক্ষে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করে মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিকে ক্ষমতাচ্যুত করা না হলে আবহাওয়া নরম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে রাজ্যের পরিস্থিতিকে ল' এণ্ড অর্ডারের পর্যায়ে ফেলতে চেয়েছেন, আন্দোলনের পথকে বলেছেন অবৈধ পন্থা আর শক্ত নীতি অবলম্বনের হুমকী দিয়ে সেই অবৈধ পন্থাকে নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণা রেখেছেন তাতে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়েছে মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মানন্দকে বহাল রেখে কোন ফয়সালা হওয়ার লক্ষণ আদৌ দেখা যাচ্ছে না। কার্ফ্যু সত্ত্বেও হাঙ্গামা অব্যাহত আছে, পুলিশের গুলী, সৈন্যের টহলদারি, নাগরিক জীবনের বিপর্যস্ত অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিপর্যয় বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রপতির শাসনেরই যেন ডাক দিয়েছে। অন্যদিকে রাজ্য কংগ্রেসে জোর ভাঙাগড়া চলছে, তা সে মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ যতই আশাবাদী কথাবার্তা বলুন না কেন, কংগ্রেস সেখানে ভাঙছে। অনেকের অবশ্য ধারণা যে, যে সমুদয় কংগ্রেসী নেতা গরম আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাইছেন, আসলে তাঁরা নজর রেখেছেন আপনাপন নেতৃত্ব বজায় রাখার দিকেই, চাইছেন এই পরিস্থিতির সুযোগে অন্যান্যদের দলে-ঠেলে নিজে এগিয়ে যেতে।

প্রধানমন্ত্রী একটা সেন্টিমেন্টাল এ্যাপ্রোচও রাখতে চেয়েছিলেন। বলেছেন, ঘূর্ণি ঝড়ের তাণ্ডবে যখন অন্ধ্র প্রদেশ আঁধিযায় অন্ধ. ঠিক তখন সে-কারণেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন জাতীয় স্বার্থে। কিন্তু তাতেও কাজ হয় নি।

তেলেঙ্গানার অবস্থা আসলে এটাই প্রমাণ করতে চাইছে যে. দীর্ঘকাল ধরে একে অপরকে শোষণ করলে তার পরিণাম কোনক্ষেত্রেই শুভ হয় না। তেলেঙ্গানা আজ পৃথক রাজ্যের দাবি করছে ভাষা বা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য নয়, একাদিক্রমে শোষণের বিরুদ্ধে; অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে; তেলেঙ্গানার জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলিকে অবহেলার ও অবমাননার বিরুদ্ধে।

ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি চাবন সাহেবের কর্মপন্থা গ্রহণ করে রাজ্যের একাংশের জনপ্রিয় দাবিকে ঠেকাবেন এই ভাবনাকে সুতরাং অনেকেই মারাত্মক বলে প্রকাশ্যে বর্ণনা করেছেন। আর প্রধানমন্ত্রী নিজেও পৃথক রাজ্যের যতই বিরোধী হন, ব্রহ্মানন্দের পথ যে হাঙ্গামার মোকাবিলায় উপযুক্ত নয় তা উপলব্ধি করেছেন। বস্তুত, চ্যবন সাহেবদের লৌহকাঠিন্য তিনি সব সময় মেনে নিতে পারেন না মনেপ্রাণে। তবে দল রাখতে অনেক কিছুই করতে হয়। রাজনীতিতে নিজস্ব নীতি সব সময় কাজ করে না; শ্রীমতী গান্ধী তাই নাচার হয়ে 'ওঁ শান্তি' বাণী আওড়াচ্ছেন। বলা বাহুল্য, তেলেঙ্গানার উত্তপ্ত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সেই শান্তির বাণী কারও কানে পৌঁছবে না।

বিচ্ছিন্নতাকামীদের দাবি যে সমর্থনযোগ্য নয় জাতীয়তাবাদী মাত্রেই সে কথা বলবেন। কিন্তু এই বক্তব্যের অর্থ নিশ্চয় এমন হওয়াও উচিত নয় যে, ঐক্যের শ্লোগান দিয়ে দেশের একাংশ অপরাংশের প্রতি নির্মম হবেন। ঐক্যের ঢালের আড়ালে আর তাই মেনেও নিতে হবে।

কবি বলেছেন :

দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগর
তীরে॥

সেই মহামিলনের গান তো শুধু একা গাওয়া যায় না। "গাইতে হবে দুইজনে"। কিন্তু এই মনোভাব সর্বত্র বজায় থাকে না। তাই আসামে পর্বতীয়া সমস্যা। অন্ধ্রে তেলেঙ্গানা। হাতের মুঠি থেকে যতক্ষণ না কিছু ফস্কে যায় তত্বধি মুঠি শক্ত করে রাখার নীতি তাই বদলাতে হবে। না হলে যাঁরা লড়তে জানেন তাঁরা দাবি আদায় করে ছাড়বেন, যাঁরা জীবন্মৃত তাঁরা নির্জিত হবেন।

সংহতি ও ঐক্যের জন্য যে সহনশীলতা প্রথম শর্ত তা দুই পক্ষে থাকা চাই না হলে বড় আদর্শ কেবলমাত্র কাগজী উপদেশের তালিকাবৃদ্ধি করে।

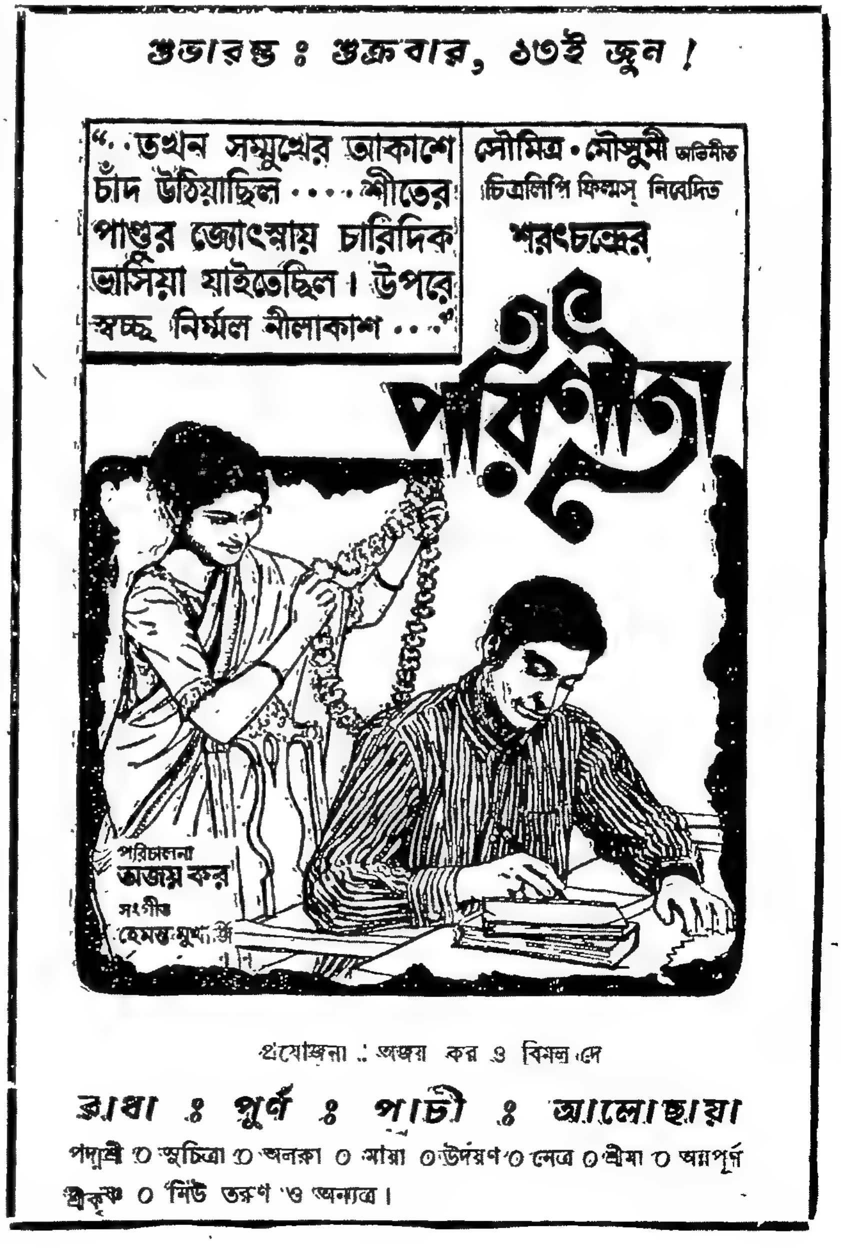

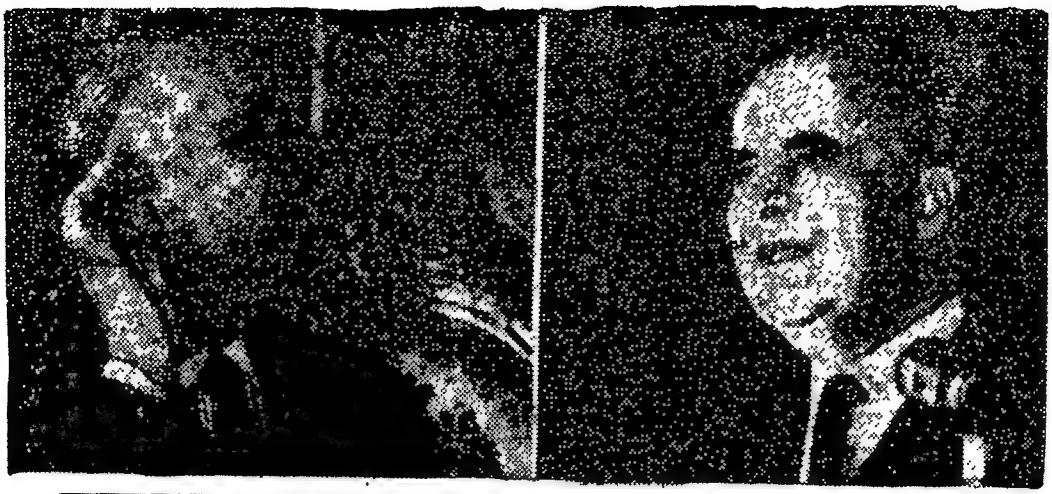

আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পোম্পিদু (বামে) ও পোহার

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে দ্য গলপন্থী পম্পিদু প্রদত্ত ভোটের ৪৪ শতাংশ লাভ করে প্রার্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন বটে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট হতে পারেন নি। কারণ নির্বাচনবিধি অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের ওপর একটি ভোট না পেলে কেউ প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না। তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ছাড়া আর কেউ দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচনপ্রার্থী হবার সুযোগ পান না। পোহার প্রথম নির্বাচনে শতকরা ২৩ ভাগ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। কাজেই ১৫ই জুনের নির্বাচনে দ্য গলপন্থী পম্পিদু আর মধ্যপন্থী পোহার ছাড়া আর কোন প্রার্থী থাকছেন না। প্রথম নির্বাচনের পর পম্পিদু পোহারকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পোহার সরে দাঁড়ালে দ্বিতীয় নির্বাচনের প্রয়োজন হত না। পম্পিদু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হত। কিন্তু পোহার পম্পিদুর অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হন নি। সুতরাং এবার পম্পিদু আর পোহার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। কম্যুনিস্ট প্রার্থী দুক্লো ২২ শতাংশ (পোহারের চেয়ে মাত্র এক শতাংশ কম) ভোট পেয়ে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে তিনি প্রার্থী থাকতে পারছেন না। কিন্তু তাঁকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁরা দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করবেন। কম্যুনিস্টদের এই ভোটটা পেয়ে গেলে পোহারের পক্ষে পম্পিদুর সঙ্গে লড়াই করা সহজ হয়ে উঠত। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন, প্রার্থী হিসাবে পম্পিদুর সঙ্গে পোহারের কোন তফাৎ নেই। হামজবর আর স্কার্লেট ফিভারের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, পোহারের সঙ্গে পম্পিদুর পার্থক্য সেইটুকু মাত্র। একজন জ্বলন্ত উনোন আর অপরজন তপ্ত কড়াই। এই দুয়ের মধ্যে কম্যুনিস্টদের বেছে নেবার কিছু নেই।

পম্পিদু আর পোহার দুজনেই তাঁদের নির্বাচনী প্রচারে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতে সত্যিই কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তাতে ফ্রান্সের সব শ্রেণীর লোকেদের জন্য কিছু কিছু সুবিধাদানের কথা আছে।

প্রথম নির্বাচনে কম্যুনিস্ট প্রার্থী ৭২ বছর বয়স্ক দুক্লো ২২ শতাংশ ভোট লাভ করায় ওয়াকিবহাল মহল দস্তুরমত অবাক হয়ে গেছেন। অ-কম্যুনিস্টরা অনুমান করেছিলেন যে, দুক্লো বড় জোর ১০।১২ শতাংশ ভোট পেতে পারেন। কিন্তু তিনি ২২ শতাংশ ভোট পেয়ে বামপন্থী মহলে দস্তুরমত হতাশা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা এখন বুঝতে পারছেন যে, নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে একাধিক প্রার্থী না দাঁড়িয়ে বামপন্থীদের তরফ থেকে একজন মাত্র প্রার্থী দাঁড় করালে তাঁর সাফল্যের পথ প্রশস্ত হতে পারত।

কম্যুনিস্টরা দ্বিতীয় নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এখন পম্পিদুর জয়লাভ প্রায় সুনিশ্চিতই বলা চলে। কারণ কম্যুনিস্টদের ভোট না পেলে পোহার যে কোনমতেই পম্পিদুর কাছাকাছি পৌঁছতে পারবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সিঙ্গাপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষ

গত দুই-তিন সপ্তাহ ধরে মালয়েশিয়ায় চীনা, ভারতীয় এবং মালয়ীদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে, তার ঢেউ গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুরেও গিয়ে পৌঁচেছে। সিঙ্গাপুরেও উপরোক্ত তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়ে গেছে। তাতে বেশ কিছু লোক ইতিমধ্যেই মারা গেছেন এবং বহু সম্পত্তিও বিনষ্ট হয়েছে। সিঙ্গাপুরের ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। একজন শিখ এবং একজন সিংহলী পুলিশ অফিসারও টহল দেবার সময় আততায়ীর গুলীবর্ষণে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। নিরাপত্তাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং মহল্লায় মহল্লায় সশস্ত্রবাহিনী টহল দিচ্ছে। তার মধ্যেও খুচখাচ ছুরি-ছোরা ও লুটপাট চলছে। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউ স্বীকার করেছেন যে, সিঙ্গাপুরের সাম্প্রদায়িক সমস্যা অতি বেদনাদায়ক পর্যায়ে উপনীত

হয়েছে। আগে কখনও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির এত অবনতি লক্ষ্য করা যায় নি।

মালয়েশিয়ার দাঙ্গার পেছনে প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান এবং রজ্জকের প্রশ্রয় আছে বলে যে আভাষ আগের সপ্তাহে দেওয়া হয়েছিল, তা একেবারে অমূলক নয় বলেই এখন প্রমাণ হচ্ছে। মালয়েশিয়া থেকে ভারতীয় সাংবাদিকরা যে-সমস্ত তথ্য প্রেরণ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, টুংকুর ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বিগত সাধারণ নির্বাচনে প্যান মালয়ান ইসলামী পার্টির কাছে বহু আসন হারিয়ে বেশ বে-সামাল হয়ে পড়ে। অপর দিকে ভারতীয় এবং চীনাদের ভোটও বিরোধী দলগুলোকে আরও শক্তিশালী করে। তাতে রজ্জক এবং অন্যান্য নেতাদের ধারণা হয় যে, ভারতীয় এবং চীনারা তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ১৯৫৭ সালের শাসনতন্ত্রে মালয়ীদের যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন সেগুলো বজায় রাখতে ইচ্ছুক। ভারতীয় এবং চীনারা যদি তাতে আপত্তি করে, তাহলে মালয়েশিয়ার নাগরিক অধিকার হারাবার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। মালয়ীদের যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তাতে কিন্তু গ্রামের মালয়ীদের কোন লাভ হয় নি। চীনারা শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। তাঁদের অবস্থা ক্রমশই ভাল হচ্ছে। প্যান মালয়ান ইসলামী পার্টি প্রচার করছে যে, এই চীনাদের জন্যই মালয়ীদের কোন উন্নতি হচ্ছে না। গ্রামের মালয়ীরা সে কথা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। তাই ইসলামী পার্টির জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। তাতে টুংকুর দলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সেটা তাঁরা কোনমতেই বরদাস্ত করতে রাজী নন। তাই ১৩ই মে যখন গ্রামের মালয়ীরা ছুরি-ছোরা নিয়ে বাস বোঝাই হয়ে কুয়ালালামপুরে দাঙ্গা করতে এল, তখন সরকারী কর্তারা স্রেফ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে এক ঢিলে দুই পাখী মারবার মতলব আঁটলেন। তাঁরা মালয়ীদের কাছে প্রমাণ করতে চাইলেন যে যেভাবেই হোক সরকারী কর্তৃত্ব মালয়ীদের হাতেই বজায় রাখা হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চীনা এবং ভারতীয়দের একটু "শিক্ষা" দেবার লোভও ত্যাগ করতে পারলেন না। দাঙ্গাকারীরা চীনা ও ভারতীয়দের খুন-জখম, লুটপাট করে যখন অবস্থা বেশ ঘোরালো করে তুলল, তখন চীনা ও ভারতীয়রাও পাল্টা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সরকারী কর্তারা তখন সেনাবাহিনী নামালেন। তারা মালয়ীদের কিছু না বলে চীনা এবং ভারতীয়দের ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করতে লাগল। সৈনিকদের যথেচ্ছ গুলীবর্ষণে চীনা আর ভারতীয়রাই মারা গেলেন বেশি। নিহতদের মধ্যে ঝুলবারান্দায় দণ্ডায়মান একটি শিখ দম্পতিও আছেন। এই হল দাঙ্গার আসল কাহিনী। টুন রজ্জক আগে মনে করতেন, মালয়েশিয়া বহু জাতির দেশ হিসাবে গড়ে উঠলেই দেশের মঙ্গল হবে। এখন তাঁর মত নাকি পাল্টে গেছে। তিনি এখন মালয়েশিয়ার ওপর মালয়ীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। মালয়ীরা মালয়ের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ মাত্র। সুতরাং সেখানে মালয়ীদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে গণতন্ত্র বর্জন করা যে অনিবার্য হয়ে উঠবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই পথে পদক্ষেপ করা ছাড়া রাষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধার টুন রজ্জকের (অপারেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান) অন্য কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। মালয়েশিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে গেছে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী। ইংরাজের ফাঁদে পা দিয়ে সেখানকার নেতারা সম্প্রদায়ভিত্তিক পার্টি গঠন করে যে ভুল পদক্ষেপ করেছেন, তার পরিণাম এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এর হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে সেখানে অ-সাম্প্রদায়িক দল গঠন করে সেই-ভাবে অগ্রসর হতে হবে। নইলে এই আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধের প্রধান বলি হবে গণতন্ত্র।

(৮ই জুন, ১৯৬৮)

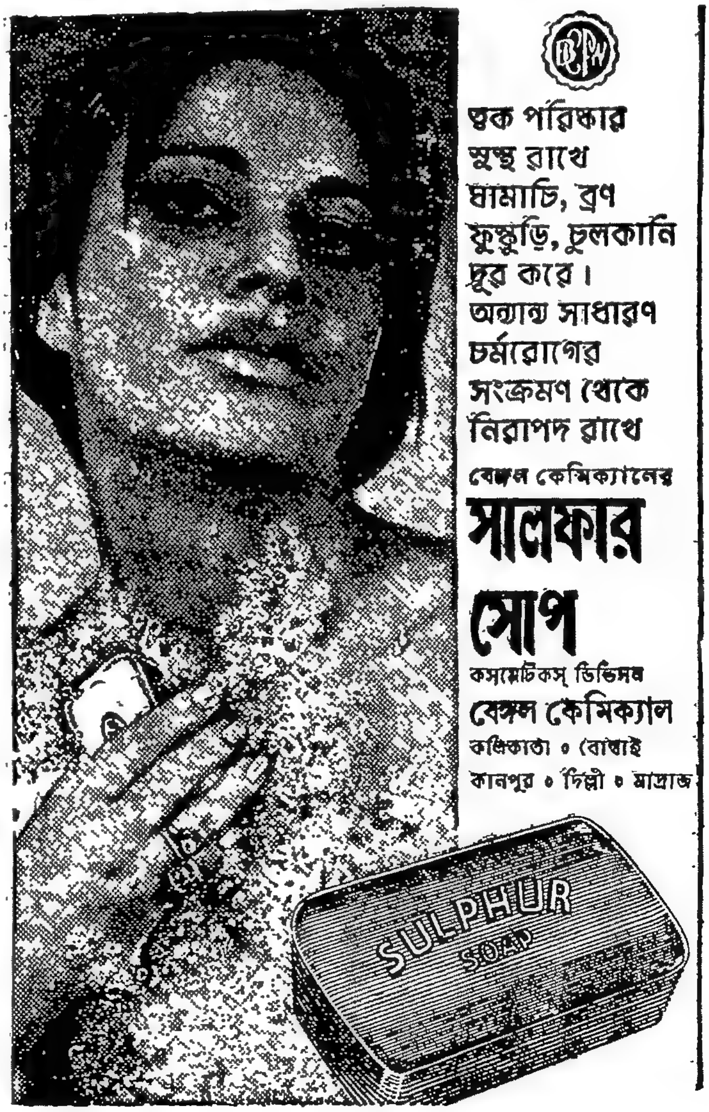

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

পিছনে শত্রু রেখে যুদ্ধযাত্রা যুদ্ধনীতিতে ভুল পথ। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে এই পিছনের শত্রু সম্পর্কে হুঁসিয়ার করেছিলেন নবাবের অন্যতম প্রধান সুহৃদ গোলাম হোসেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা গোলাম হোসেনের সেই পিছনের শত্রু সম্পর্কে চেতাবনী ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেন নি বা পিছনে শত্রু রেখেই পলাশীর যুদ্ধে যাত্রা করেছিলেন। ফল হয়েছিল এই যে, যুদ্ধে শুধু নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হল তা নয়, সারা ভারতের স্বাধীনতা অস্তে চলে গেল। শুধুমাত্র শুভেচ্ছা আর শুভবুদ্ধিতে সব শুভ কাজ সম্পন্ন হয় না—তাই শুভেচ্ছার সঙ্গে চাই উপযুক্ত কর্মোদ্যোগ, উপযুক্ত পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল অনেক শুভেচ্ছা নিয়ে, শুভবুদ্ধি নিয়ে—কিন্তু সেই ইচ্ছা ও বুদ্ধির সঙ্গে উপযুক্ত কর্মোদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল না। সেই সঙ্গে যে সতর্কতার প্রয়োজন ছিল—সেটাও রয়ে গেল অনুপস্থিত। আজ রাজ্যব্যাপী যে ঘটনাগুলি ঘটছে এবং প্রতিদিন যেভাবে সরকারের ভাবমূর্তি ভাঙছে, সেটা শুধুমাত্র উদ্বেগের কারণই নয়, পরম দুশ্চিন্তার কারণও বটে। অনেকের মনে একটা ধারণা আছে, সেটা হল সংখ্যাগত ধারণা। এই ব্যক্তিরা মনে করেন বিধানসভায় সংখ্যাধিক্য থাকলেই সরকার চলবে এবং এই ক্ষেত্রে যখন রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারের যথেষ্ট সংখ্যাধিক্য রয়েছে, তখন সরকারের কোন ভয় নেই। কিন্তু শুধু সংখ্যাধিক্য দিয়ে সরকার বেঁচে থাকবে এই চিন্তা ভয়ানক স্থবির চিন্তা—আর এই চিন্তা একবার পেয়ে বসলে সর্বনাশ। সংখ্যার জোরে সরকার টিকে থাকা নির্ভর করলে কংগ্রেস তো অনেক বছর সংখ্যা নিয়ে বেঁচেছিল—১৯৬৭ সালের পর সেই সংখ্যা রাতারাতি লোপাট হয়ে গেল। কেউ রুখতে পারলো না। সংখ্যার জোর তো কেরলের সরকারেরও আছে অন্ধ্র সরকারেরও আছে—সেখানকার সরকার কি ঠিকমত চলছে। দেহে যেমন শুধুমাত্র মেদবৃদ্ধি পেলে মানুষ স্বাস্থ্যবান হয় না, এই ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যার জোর থাকলেই সরকার ঠিকমত চলে না। আর তা ছাড়া পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরে বেঁচে থাকবে—এটা নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে বর্তমান এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে কিভাবে আর পিছনের শত্রুকে নিধন করাই বা যাবে কিভাবে। শত্রুকে নিধন করতে হলে শত্রুকে চেনা দরকার, তার গতিবিধি জানা দরকার। যুক্তফ্রন্ট সরকার তার প্রাথমিক ভুল করলো এই শত্রু সম্পর্কে উপযুক্ত সতর্কতা গ্রহণ না করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্ভবত প্রাথমিক ভুল করলো একটা কথা ধরে নিয়ে যে, সরকার চলবে তার নিজের গতিতে আর সরকারের শরিক দলগুলি শুধু সরকারকে দোহন করে যাবে আর দোহন করে দলীয় শক্তিবৃদ্ধি করবে। সরকারের শরিক দলগুলি রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হবার পর—এই সরকারকে স্বচ্ছন্দে চলবার পথে সহায়তা না করে সকলে মিলে প্রথম দিন থেকে দোহন শুরু করলো। দলের মন্ত্রীদের ঘরগুলি দোহনের কেন্দ্র। এই দোহন কিন্তু শুধুমাত্র কোন লেন-দেনের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয় বা এমন কথা বলছি না যে, সরকার গঠিত হবার পর দলগুলি মন্ত্রীদের ভাঙিয়ে লুটেপুটে খাচ্ছিল। এই ক্ষেত্রে দোহনের পথটা হল অন্য ফরম-এর। যেমন দেখা যায়—রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হবার পর জমি দখলের হিড়িক পড়ে গেল, তেমনি দেখা গেল রাজ্যের সর্বত্র শ্রমিক সংগঠনে পাল্টা ইউনিয়ন গঠনের বন্যা। যদি হিসেব করা যায়, তবে দেখা যাবে গত তিন মাসে কম করে তিন হাজার পাল্টা ইউনিয়ন রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে। জমি দখলে যেমন পাল্টা আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ চলেছে, তেমন ইউনিয়ন দখল ও গঠনও একই প্রক্রিয়া চলেছে। জমি দখল নিয়ে যেমন দলগুলির মধ্যে রেষারেষি, খুনোখুনি বেড়েছে, তেমনি পাল্টা ইউনিয়ন গঠনেও একই প্রকার রেষারেষি বেড়েছে। রাজ্যের শ্রমিক ও কৃষক ফ্রন্টে যদি যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেন, তবে সরকার সুস্থভাবে চলবে কাকে নিয়ে? রাজ্যে বাকি থাকে স্কুল মাস্টার আর সরকারী কর্মচারীরা। এই দুই সম্প্রদায় সম্পর্কে এককথায় বলা যায় তাঁরা হলেন রাজ্যের সবচেয়ে বড় খিচনেওয়ালা পার্টি—তাঁদের দাবি অনেক চাহিদা অসংখ্য—সেই দাবি পূরণ না হলে মুর্দাবাদ ধ্বনি তুলতে তাঁরা সবচেয়ে পটু, কিন্তু সরকার চালনায় তাঁদের কোন সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। তাঁদের দাবি আছে, দাবি আদায়ের নানা চেষ্টা আছে, সেই শুধু দায়িত্ব। তাই তাঁদের কথা বলা অর্থহীন এবং সত্য কথা বলতে টাকা পয়সা ছাড়া অন্য কারো কোন প্রভাব এই দুই সম্প্রদায়ের উপর কারো নেই। কিন্তু সত্যকার প্রভাব যাদের উপর রাজনৈতিক দলগুলির আছে, তাদের নিয়ে শরিক দলগুলি সরকার পরিচালনায় সহযোগিতার পথে না এসে তাদেরই মাথা খারাপ করে দেওয়া হল সবচেয়ে আগে। যদি বলি কেন? যে কাজগুলি করা হচ্ছে সেই কাজগুলি অসঙ্গত বা অন্যায় বলার সাহস বা স্পর্ধা আমার নেই, কিন্তু এই কাজগুলি কি একটু রয়েসয়ে করা যেত না? আর এই করতে গিয়ে ফল কি হল? শত্রুকে একটা চলার পথ করে দেওয়া হল। যে শত্রু চুপ করে ছিল, জোরে নিশ্বাস নেবার সাহস পাচ্ছিল না, তাকে সরব হবার সাহস ও সুযোগ করে দেওয়া হল।

কিন্তু এই সব ঘটনার পরও কি অবস্থা আয়ত্তে রাখা যেত না বা যায় না? আমি বলবো—নিশ্চয়ই যায় এবং এক রাত্রে যায়। একটা সোজা প্রশ্ন যদি আজ করা যায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যে—তার জবাব কি হবে। বলা হতে পারে অন্য সকলকে ছেড়ে প্রশ্নটা মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে কেন? এর জবাব হল—প্রশ্নটা যুক্তফ্রন্টের সব শরিক দলের উদ্দেশ্যেই করা চলে এবং করছিও, তবে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বলছি এই কারণে যে—তারাই হল রাজ্যের সর্ববৃহৎ দল, রাজ্যে রাজনৈতিক সংগঠন তাদেরই সবচেয়ে বড়, মন্ত্রিসভাতেও তাদের প্রাধান্য সর্বাধিক। আর প্রশ্ন করবো না-ই বা কেন? রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার সময় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বলেছিল—রাজ্যে তাঁরা নির্বাচনে সর্বাধিক আসন পেয়েছেন। জনগণ তাঁদের উপরই সর্বাধিক আস্থা স্থাপন করেছে এবং জনগণের সেই আস্থাকে প্রতিফলিত করার

জন্য মন্ত্রিসভায় উপযুক্ত আসন চাই। তাই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রিত্ব চাইলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব চাইলেন, চাইলেন খাদ্য, শিক্ষা, শ্রম, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সহ আরো অনেক দপ্তর। যাহোক সেই সময় কোন-ক্রমে মুখ্যমন্ত্রিত্ব পদটি ঠুঁটো জগন্নাথ করে স্বরাষ্ট্র ও প্রশাসন ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসনের চাবিকাঠি সি-পি-এম কে দেওয়া হল। দেশের মানুষ এই ব্যবস্থায় অখুশি হয় নি এবং সকলেরই ধারণা শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি, যাঁর দূরদৃষ্টি, মেধা, চিন্তা—সব কিছুর 'পর মানুষ নির্ভর করতে পারে। তাই আজ যদি কেউ প্রশ্ন করেন—জনগণের সবচেয়ে বেশি আস্থা লাভ করে সেই আস্থাকে প্রতিফলনের দায়িত্ব নিয়ে সি-পি-এম দল রাজ্য প্রশাসন পরিচালনায় কতটুকু সহায়তা করেছেন। আমি কোন মন্ত্রীর কথা বলছি না, আমি বলছি সংগঠন শক্তির কথা। সি-পি-এম দলের দলীয় সদস্য সংখ্যা, সমর্থক সংখ্যা—কৃষক, ছাত্র, উদ্বাস্তু, শিক্ষক, শ্রমিক সব উইং মিলিয়ে যে শক্তি আছে, সেটা হল রাজ্যের প্রতি সাত থেকে দশজনের একজন সি-পি-এম দলের আওতায় আছে, রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগের বেশি অঞ্চল সি-পি-এম দলের প্রভাবে ও নিয়ন্ত্রণে আছে, রাজ্য মন্ত্রিসভার তিন ভাগের এক ভাগ সি-পি-এম সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে আছে। এর পর যদি জিজ্ঞাসা করা যায় —রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে সি-পি-এম দলের উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে, তবে সেটা কি ভুল বা অন্যায় হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটা কথাও আছে। সেই কথাটা হল রাজ্যে যে সব হানাহানি, সংঘর্ষ ঘটেছে, তারও তিন ভাগের প্রায় এক ভাগের বেশি হয়েছে সি-পি-এম দলের সঙ্গে অন্য দলের। তাহলে এই কথা বলা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে সি-পি-এম দল যদি সরকারের পিছনে তার সব সংগঠন শক্তি শান্তি-শৃংখলা, হানাহানি রোধে নিয়োগ করতো, তবে নিশ্চয়ই বহুক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়ানো যেতো। এর বিপরীত কথা হল হয়ত সি-পি-এম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি যা সি-পি-এম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত হয়েছে—কাজেই আক্রান্ত হয়ে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব নয়। এই কথা মানলে বুঝতে হবে আক্রান্ত দুর্বলই হয়, অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ দুর্বলই হয়—তবে কি সি-পি-এম দুর্বল; কিন্তু সেই কথা মেনে নিলে জনগণের বেশি আস্থা প্রতিফলনের দায়িত্ব চাওয়া যায় না। ওই সব বাদ দিয়ে হয়ত আর একটা কথা বলা যায়। সেটা হল—এই সব কথা কোনটাই সত্য নয়, যা কিছু হয়েছে সি-পি-এম দলের অভিপ্রায় মতই হয়েছে, কিন্তু সেই কথাও নিশ্চয়ই স্বীকার করে নেবেন না সি-পি-এম। পূর্বেই বলেছি সি-পি-এম দলের উল্লেখ করে বলছি বলে সি-পি-এমই শুধু এই বক্তব্যের লক্ষ্য নয়—একইভাবে এই বক্তব্য সি-পি-আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি, এস-ইউ-সি, বাংলা কংগ্রেস —সকলের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে যদি দলীয় শক্তিগুলি সহযোগিতা করতো, তবে এই অবস্থা কখনই সৃষ্টি হত না—এই কথাটাই বলতে চাই; কারণ শুধু পুলিশ, শুধু সরকারী আমলা দিয়ে এই সরকার চলবে এমন কথা ছিল না, কথা ছিল—প্রশাসন চলবে নিজের গতিতে আর সেই প্রশাসনের বাস্তব রূপায়ণ ঘটবে লক্ষ লক্ষ যুক্তফ্রন্ট কর্মী, সমর্থকদের উদ্যোগে। প্রশাসনযন্ত্রের সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে এই সরকারের জনকল্যাণ-নীতি রূপায়ণের দায়িত্ব আটক রাখা হবে না, লক্ষ লক্ষ যুক্তফ্রন্ট কর্মী হবে সরকারী নীতি রূপায়ণের রূপকার। কিন্তু বাস্তবে কি হল? যাঁরা সরকারী নীতিকে রূপ দেবে, তাঁরাই হাতুড়ী নিয়ে সরকারী নীতির ভাবমূর্তি ভাঙতে সুরু করলেন। এই অবস্থার পরিণতিই হল—দলে দলে হানাহানি, এরই পরিণতি হল নকশালপন্থীদের গ্রাম পোড়ানো বিপ্লব, এরই পরিণতি হল রাজ্যের পুলিশের এক অংশ সরকারী নীতি অমান্য করতে সাহস করছে দুর্গাপুরে। কিন্তু দুর্গাপুর কি কোন একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা? কখনই নয়। দুর্গাপুর সৃষ্টি হয়েছে অনেকগুলি ধাপ পেরিয়ে। আসছে বার সেই কথাই বলবো। (চলবে)

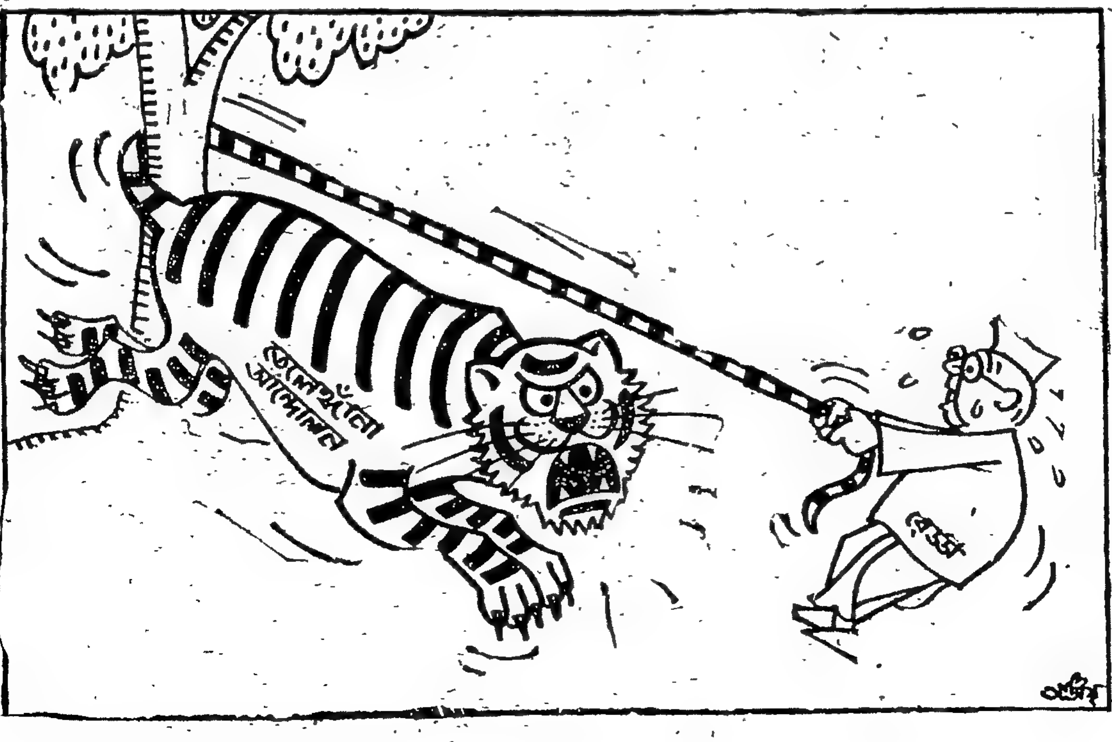

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[প্রায় আড়াই বছর ধরে সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমি "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়" লিখে আসছি। বাংলা তথা ভারতের বহুস্থান হতে ও বিদেশে প্রবাসী বহু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এবং বিপ্লবী বাংলার অগণিত ভাই-বোনেদের কাছ থেকে যে অকুণ্ঠ সমর্থন ও অজস্র প্রশংসা ক্রমাগত পেয়ে এসেছি তা আমার জীবনের পরম সম্পদ। বাস্তব সত্য স্বীকারে আমার কোন কুণ্ঠা নেই—এঁদের কাছ থেকে এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎসাহ না পেলে আমার দ্বারা এই লেখা কখনও সম্ভব হোত না। এঁদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমার এই সুদীর্ঘকালের লেখা মুদ্রিত হয়ে নিম্নলিখিত তিনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে—

(১) অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম।

(২) চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ (১ম খণ্ড)।

(৩) চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ (২য় খণ্ড)।

প্রশংসা পেয়েছি প্রচুর। প্রশংসা পেতে কার না ভালো লাগে! আমারও খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোপন মনে প্রশ্ন জেগেছে—এত প্রশংসা পাবার যোগ্যতা আমার আছে কি? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে বিপ্লবী ভাই-বোনেরা আমার ওপর যে-বিশ্বাস ও নির্ভরতা ন্যস্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, সেই গুরুদায়িত্ব বহন করবার মত আমার স্কন্ধ বলিষ্ঠ কি? চরম স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত, জ্ঞানের অহমিকা বর্জিত ভয়শূন্য মনই হয়ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে সঠিক মত, পথ ও পার্টি নির্ণয়ে সমর্থ হয়। এই বিরাট ভারতবর্ষে সত্যিকার সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে মৃত্যুভয়, স্বার্থ ও অহমিকা ত্যাগ করে জনগণের সত্যিকার স্বার্থে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হবে। এই আদর্শ যদি নিষ্ঠা, সততা ও একাগ্রতার সঙ্গে আমি পালন করতে পারি তবেই হয়ত আমার বিপ্লবী ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্য পালনে সক্ষম হবো—প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি; তবে তাঁদের মূল প্রশ্নের উত্তর আমি এইভাবে দিলাম। এতে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

প্রায় একটি বছর অতিবাহিত হতে চললো আমি শারীরিক অসুস্থতা ও দৃষ্টিহীনতায় পাঠকবর্গের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। দৃষ্টিশক্তি যদিও এখনও আগেকারমত সম্পূর্ণ ফিরে পাই নি তবু আর দেরি করা চলছে না। সবার ইচ্ছা মাস্টারদার ফাঁসি পর্যন্ত বাকি দু'টি বছরের ঐতিহাসিক বর্ণনা সম্বলিত ঘটনাগুলির পরিবেশন যত শীঘ্র সম্ভব সুরু করা হোক। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী—ফাঁসিমঞ্চে এই মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী মহানায়কের মরণ-দৃপ্ত কণ্ঠ উদাত্ত আহ্বানে বিপ্লবী বাংলার প্রতিটি তরুণ-তরুণীর মনকে আলোড়িত করে চির নীরব হোল—এই অধ্যায়টুকু পর্যন্ত সেই অমর কাহিনী যেন যথাযথভাবে বিবৃত করে যেতে পারি তার জন্য আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা কামনা করি।]

আলিপুর জেলের "বম্ব-ইয়ার্ড"

ট্রাইব্যুনালের বিচারে সাজা হওয়ার পর স্পেশ্যাল স্টীমারযোগে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে চতুর্থ দিনে সরকার আমাদের চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে এলেন। পূর্ব-নির্ধারিত গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরস্পর আলাদা করে রাখবার উদ্দেশ্যে ঠিক পরের দিনেই আবার আমাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে বাংলার বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থানুযায়ী সুরক্ষিত আলিপুর নতুন সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী হলাম—রণধীর দাশগুপ্ত, সুবোধ চৌধুরী, আমার দাদা (নন্দলাল সিংহ) ও আমি।

আলিপুর জেলের "বম্ব-ইয়ার্ডে" দেখি আমাদের বিপ্লবী সাথী কালী চক্রবর্তী আকুল আগ্রহে আমাদের স্বাগত জানাতে প্রতীক্ষা করছে। সেই ইয়ার্ডে আরও দীর্ঘকাল দণ্ডপ্রাপ্ত অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরাও অনেকে ছিলেন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল অভ্যুত্থা

নাম্বার টেন সিগারেটের পরম তৃপ্তি-দায়কতার মূলে
মাত্র একটি সমীচীন কারণ ঃ
নিবিড় স্বাদে ও গন্ধে পরিপূর্ণ মাত্রায় টেন
ভারতের সমশ্রেণীর সিগারেটের মধ্যে
সবচেয়ে বেশী মিঠে আমেজ জোগায়—মধুর আবেশ জাগায়।
তাই তো হওয়ার কথা—
নাম্বার টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া তামাক
—যা সংগ্রহ, পরিপক্ক এবং ব্লেণ্ড করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজ্ঞ তামাক বিশেষজ্ঞরা।
মিঠে আমেজের বিলাসে…
নাম্বার টেনের
পরিচয়
NUMBER
TEN
VIRGINIA

শেষ রাত্রে ও জালালাবাদ যুদ্ধে বিপ্লবী যুবক কালী চক্রবর্তী সাহসিকতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারপর মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই সে আবার শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে চাঁদপুর স্টেশনে ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল মিঃ ক্রেগকে হত্যার ভার নেয়। কিন্তু শীতের রাতে কুয়াশা-ঘন অন্ধকারে ভ্রমক্রমে তারা মিঃ ক্রেগের পরিবর্তে তাঁর পার্শ্বচর তারিণী মুখার্জীকে আক্রমণ করে ও তিনি নিহত হন। পরে ঘটনাস্থল হতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে কালী চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বন্দী হয়। বিচারে রামকৃষ্ণের ফাঁসির হুকুম ও কালী চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

আমাদের বিচার চলাকালীন এই সমস্ত খবরই আমরা নিয়মিত পাচ্ছিলাম। আমাদের দণ্ডাদেশের কয়েকমাস পূর্বে আলিপুর জেলেই রামকৃষ্ণের ফাঁসি হয়। কালী চক্রবর্তী যে আলিপুর জেলেই আছে তা জানতাম, কিন্তু তাকে 'বন্ব-ইয়ার্ডে' রাখবে ও তার সাথে আমাদের দেখা হবে—এতটা ভাবতে পারি নি।

অভাবনীয় এই মিলন। এই সুদীর্ঘ দিনে প্রত্যেকের জীবনের ওপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপ্টা বয়ে গেছে। সমুদ্রে যাদের বাস শিশিরবিন্দুতে ভয় পেলে বা বিচলিত হলে তাদের চলবে কেন? দুঃখের দিনেও আনন্দ পেয়েছি। ভাড়াটে সৈন্য ও বিপ্লবীদের মধ্যে এখানেই পার্থক্য—এই পার্থক্য আছে বলেই স্বদেশপ্রেমিক ভিয়েতকংরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তথাকথিত দুর্জয় শক্তির বিরুদ্ধেও নিরবচ্ছিন্নভাবে অসম সাহস ও অমিতবিক্রমের সঙ্গে নিত্যনতুন অভিনব উপায়ে যুদ্ধ করে চলেছে।

কালী চক্রবর্তীও সেই একই জাতের বিপ্লবী॥ আমরণ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়েই বেড়িয়েছে সে—স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও তার দ্বিধা নেই। বিপ্লবী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—বিপ্লবীদিগের একটু সংস্পর্শে এসে বা একটি পিস্তলের একটুখানি সক্রিয় অনুভূতি উপভোগ করে, বা কোনপ্রকার ব্যক্তিগত বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে বা উন্মাদনা বশে কোন একটি সাহসিকতাপূর্ণ অ্যাক্‌শনে "একটু নাম" অর্জন করে বহু সহস্র তথাকথিত বিপ্লবীরা বিপদ-সংকুল পথ চিরতরে পরিহার করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তবেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব যে কালী চক্রবর্তী কিরূপ বৈপ্লবিক চরিত্রে গঠিত। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে বৃটিশের পেটি-টাউন চট্টগ্রামের বুকের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বয়ে গেল—পুলিশ ও মিলিটারী ঘাঁটি বিপ্লবীরা দখল করলো; টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন ও রেল-লাইন এবং টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ ধ্বংস হোল, রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চারিদিকে গুলীর শব্দ চীৎকার চেঁচামেচি—শত্রুর সঙ্গে নিশীথ রাত্রে খণ্ডযুদ্ধ, চারিপাশে মৃত্যু-বিভীষিকা। —মরণ যেন স্বাগত জানাতেই অপেক্ষা করে আছে। মৃত্যুর করালছায়া কালী চক্রবর্তীকে সেই রাতেও ভীত করতে পারে নি—নির্ভীক কালীর কাছে মৃত্যু পরাজয় স্বীকার করে বিদায় নিয়েছে। এরই চারদিন পরে জালালাবাদের পর্বতযুদ্ধে—যেখানে শত্রুর সঙ্গে হাজারে হাজার গুলী বিনিময় হয়েছে—যেখানে আমরা বারোজন সাথীকে হারিয়েছি—যেখানে ভয়াবহ মৃত্যু বিপ্লবী সৈনিকদের গ্রাস করতে ছুটে আসছিল—সেই ঘনঘটার ঘোর পরিস্থিতিতেও কালীর হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে—"ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" আবার কয়েকমাসের মধ্যেই এই বিপ্লবী বন্ধুর চলার পথে এলো কর্তব্যের ডাক। কালীর মনে সাড়া জাগলো—

"The unfinished work which they, who faught here, have thus far so nobly advanced.... that from these honoured dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion . . ." —Abraham Lincoln.

বিপ্লবীরা যে মহৎ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছেন, তার অগ্রগতি অবশ্য স্বীকার্য। ......সেই মহান আদর্শে মহিমা-মণ্ডিত বীর শহীদদের কাছ থেকে আমরা আরও অনেক প্রেরণা গ্রহণ করবো, যাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে চরম নিষ্ঠার নিদর্শন রেখে গেছেন।

কালী চক্রবর্তীর মনে জালালাবাদ যুদ্ধের সেই বারোজন বিপ্লবী শহীদের স্মৃতি আজও অম্লান। শহীদদের কাছ থেকে পাওয়া বিপ্লবী প্রেরণায় কালীর হৃদয় দীপ্ত—দৃঢ়পদে বিপ্লবের বন্ধুর পথে সে এগিয়ে চলেছে। —যদিও আরও অনেক বিপ্লবীরই অ-বৈপ্লবিক কাপুরুষতার বহু নিদর্শন আমাদের প্রত্যেকেরই জানা আছে।

কালী চক্রবর্তী তাই রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আবার অ্যাক্‌শনে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নি। এই অ্যাক্‌শনেই সে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড নিয়ে 'বম্ব-ইয়ার্ডে' আমাদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিল। রণধীর কালীদার সামনে—কী এক অপূর্ব দৃশ্য!

কালী চক্রবর্তী স্বয়ং মাস্টারদার হাতে গড়া বিপ্লবী সৈনিক। কালী চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে এসেছিল রণধীর দাশগুপ্ত। সেই যুগে কালী চক্রবর্তী ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল রণধীর দাশগুপ্তকে॥

রণধীর সুবিখ্যাত কবিরাজ জয়ন্ত দাশগুপ্তের পুত্র—অল্প বয়স, স্কুলে পড়ে। আমাদের মধ্যে রণধীরই সবার চাইতে বিত্তশালী পরিবারের ছেলে। এই অল্প বয়সেই সে প্রচুর ঐশ্বর্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—আত্মীয়-স্বজনদের অনাবিল স্নেহ-মমতার সহস্র বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখায় যোগ দেয়।

রণধীরের তখনও ষোল বছর পূর্ণ হয় নি। ১৮ই এপ্রিলের মাত্র কিছুদিন আগে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। অল্প বয়সের বিপ্লবী সৈনিক সমাবেশই সূর্য সেনের নেতৃত্বের secrecy of success.

যে বয়সে ক্ষুদিরামের মত ছেলে হাসতে হাসতে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে—যে বয়সে প্রলোভন মনকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম স্পর্শ করতে পারে—যে বয়সের বৈপ্লবিক প্রেরণাকে রোধ করার জন্য ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ও পরিবেশের প্রাচীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল—রণধীর ছিল সেই বয়সের নির্ভীক সৈনিক। তবে কেবলমাত্র অল্প বয়সই যে বিপ্লবী সৈনিক বাছাই করার উপযোগী criteria তা' মনে করার কোন কারণ নেই। না হলে অল্প বয়সের ছেলেরাও স্বীকারোক্তি করে বা রাজসাক্ষী হয় কেন? মানব-চরিত্রের মূল গুণ—স্বার্থত্যাগ, সাহসিকতা, অহঙ্কারশূন্যতা প্রভৃতি জীবনের প্রথম থেকেই কারো থাকে বা কারো থাকে না। রণধীরের বৈপ্লবিক চরিত্রের মূল গুণগুলি প্রথমেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। তারপর সেই লোহাকে আগুনে পুড়িয়ে ইস্পাতে পরিণত করেছিল কালী চক্রবর্তী ও স্বয়ং মাস্টারদা। রণধীর ১৮ই এপ্রিল রাত্রে তার দাদার দোনলা বন্দুকটি নিয়ে যুব-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ইতিহাসে আমাদের অজান্তে যে একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল তার পরিসমাপ্তি হোত অন্তত আমাদের পাঁচজনের ফাঁসিমঞ্চে জীবনাবসানের পর। এই ঘটনার তথ্য পরিবেশনের মধ্যে রণধীরকে বিশেষ ভূমিকায় দেখতে পাবো। ট্রাইবুন্যালের রায়ে প্রাণদণ্ড না হওয়াতে আমাদের ফাঁসি দেবার জন্য সরকার সুনিশ্চিতভাবে এক জঘন্য চক্রান্ত করেছিলেন। সেই চক্রান্তকে ব্যর্থ করেছিল রণধীর। এই ঘটনার নায়ক রণধীর। তাই তার বৈপ্লবিক চরিত্রের ও পরিবেশের পরিচিতির একান্ত প্রয়োজন।

(ক্রমশ)

চাঁদের মায়ায়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আমরা চাঁদে চললাম। আমাদের অ্যাপোলো—১০ এই সেদিন মাত্র ১০ মাইল দূরে থেকে চাঁদকে সেলাম জানিয়ে ফিরে এলো।

সেলাম জানাই আমরাও। চাঁদকে জানাই। অ্যাপোলো—১০কে জানাই। জানাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে।

ওই যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি জায়গা ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট স্যাটার্ন সি-ফাইভ-এর হেড্‌কোয়ার্টার।

ওখানে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে সারি সারি মঞ্চ। রকেট-উৎক্ষেপণ মঞ্চ ওগুলো। ওদেরই একটি ৩৯বি থেকে অভূতপূর্ব এক নাটকের অভিনয় সুরু হল সেদিন। স্যাটার্ন সি—ফাইভ্ অ্যাপোলো—১০কে নিয়ে আকাশে উঠলো।

একটা দৈত্য উঠলো যেন। ৩,১০০ টন ওজনের ৩৬৩ ফুট উঁচু একটা রাক্ষস উঠলো।

রাক্ষসটার ঘাড়ের কাছে বসে আছেন তিনজন অভিজ্ঞ মহাকাশচারী,—টমাস স্ট্যাফোর্ড, জন ইয়ং এবং ইউজিন সারনান।

স্ট্যাফোর্ডকে ঘিরে এর আগেও অনেক স্বপ্ন দেখেছে মানুষ। কারণ, তিনি ছিলেন ১৯৬৬ সালের এক বিস্ময় জেমিনি—৯ মহাকাশযানের চালক।

জেমিনি—৯-এর কীর্তি কী? না পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী চালকবিহীন একটি নিঃসঙ্গ মহাকাশযানের সঙ্গে মিলন।

এই মিলন ঘটিয়েছিলেন স্ট্যাফোর্ড। জেমিনি—৯-কে তিন-তিনবার তিনি ওই চালকবিহীন মহাকাশযানের খুব কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। অথবা বলা যায়, মিলন ঘটিয়েছিলেন তার সঙ্গে।

পৃথিবীর মানুষরা সেদিন খুব জোর হাততালি দিয়েছিল। অনেকেই বলেছিল,—হ্যাঁ, স্ট্যাফোর্ডের পক্ষেই এটা সম্ভব। মহাকাশে উড়তে উড়তে ঠিক এমনিতরো কীর্তি তিনি এর আগেও তো একবার স্থাপন করেছিলেন। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে জেমিনি—৬-কে তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন জেমিনি—৭-এর ১ ফুট মাত্র দূরে।

মহাশূন্যের বুকে ভেল্‌কিবাজিতে জন ইয়ংও অবিশ্যি কম যান না।

মহাকাশচারী হবার আগে থেকেই ভেল্‌কি দেখাতে সুরু করেন তিনি। একবার নৌবাহিনীর বিমানে চেপে ২৫,০০০ মিটার উঁচুতে উঠে রেকর্ড করেন।

কিন্তু এ-রেকর্ডটিও নেহাৎই খেলো হয়ে গেল দেখতে দেখতে। হল ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে, ইয়ং-এরই দৌলতে।

ইয়ং সেদিন নতুন এক ইতিহাস স্থাপন করেছিলেন। ভার্জিল আই গ্রীসম-এর সহায়তায় জেমিনি—৩ মহাকাশযানটিকে তিনি এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এছাড়া এই ইয়ংই ছিলেন জেমিনি—১০ মহাকাশযানের চালক। জেমিনি—১০-কে চালকহীন একটি মহাকাশযানের দিকে চালিয়ে নিয়ে যান তিনি এবং তারপর সেই যানটিকে ছাড়িয়ে গিয়ে অন্য একটি যানের সঙ্গে মিলিত হন। এই মিলন-মুহূর্তে পৃথিবী থেকে ৪৭৫ মাইল উঁচুতে ছিলেন ইয়ং। অর্থাৎ, উঁচুতে-ওঠার রেকর্ড-দুরস্তে ছিলেন।

মহাকাশচারণার ক্ষেত্রে কিছু রেকর্ড সারনানেরও আছে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে জেমিনি—৯ মহাকাশযানে তিনি ছিলেন স্ট্যাফোর্ডের সহকারী। তিনি জেমিনি—৯ থেকে বেরিয়ে এসে ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট মহাকাশে পদচারণা করেছিলেন। এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর এই অভিনব পদচারণা আজও অবধি রেকর্ড হিসেবে গণ্য।

কিন্তু অ্যাপোলো—১০-এর উৎক্ষেপণের মুহূর্তে এ-রেকর্ডটিকে একেবারেই তুচ্ছ মনে হয় যেন সারনান-এর। সেই মুহূর্তে বারবার যেন তাঁর মনে হয়, দুজন সহযাত্রীকে নিয়ে নতুন যে রেকর্ড এবারে তিনি করতে চলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা' বুঝি অতুলনীয়।

সহযাত্রীরা পাশেই বসে আছেন তাঁর। দলের নেতা স্ট্যাফোর্ড বসে আছেন। আর বসে আছেন সহকারী পরিচালক ইয়ং। স্থির হয়েছে, স্ট্যাফোর্ড ও সারনান মূল মহাকাশযানটি থেকে নেমে এসে ছোট আর একটি মহাকাশযানে চেপে চাঁদের ১০ মাইলেরও কম দূরে পৌঁছে যাবেন।

—কিন্তু সত্যি কি পৌঁছুবেন ওঁরা?—ফ্লোরিডার কেপ কেনেডিতে ১৮ই মে রবিবার এই একই প্রশ্ন সকলের মুখে। সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন ৪৭ টন ওজনের অ্যাপোলো—১০-এর দিকে।

দু-একজন আবার তাকাতে গিয়ে অন্যমনস্ক হন যেন একটু। ওঁদের মনে পড়ে যায় ২৭শে এপ্রিলের দুর্ঘটনার কথা। মনে পড়ে, ওই দিনটিতেই হাজার হাজার গ্যালন কেরোসিন ওই বিশেষ রকেটটি থেকে জ্বালানি-দুর্ঘটনার দরুণ পড়ে গিয়েছিল।

—সর্বনাশ! এমন দুর্ঘটনা আবার ঘটে যদি?—অনেকেই ভাবলেন ঠিক সেই মুহূর্তে।

কিন্তু বেশি কিছু ভাবনার আর সময় কোথায়! মূর্তিমান দানব স্যাটার্ন সি—ফাইভ্ অগ্নি-উদ্‌গিরণ সুরু করেছে এরই মধ্যে। প্রচণ্ড গর্জন সুরু করেছে।

এই গর্জন স্তব্ধ হয়ে আসে দেখতে দেখতে। কেপ কেনেডিতে অদ্ভুত এক নীরবতা ঘনিয়ে আসে। মাত্র ১৫০ সেকেণ্ডের মধ্যে প্রথম স্তরের রকেট মহাকাশযানটিকে ঘণ্টায় ৬ হাজার মাইল গতিসম্পন্ন করে ৩৮ মাইল উঁচুতে ঠেলে দেয়। প্রতি সেকেণ্ডে তখন রকেটটিতে ৩,৪০০ গ্যালন করে জ্বালানি খরচ হয় এবং ওই জ্বালানি থেকে ধাক্কার সৃষ্টি হয়, তা' হল ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সমান।

সারনান চিৎকার করে ওঠেন,—চমৎকার! চমৎকার এই উড়ে-চলা!

পরিচালক স্ট্যাফোর্ড বলেন—আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

ওদিকে এগোবার কাজে দ্বিতীয় স্তরের রকেট কাজে লাগে এবার। ৬

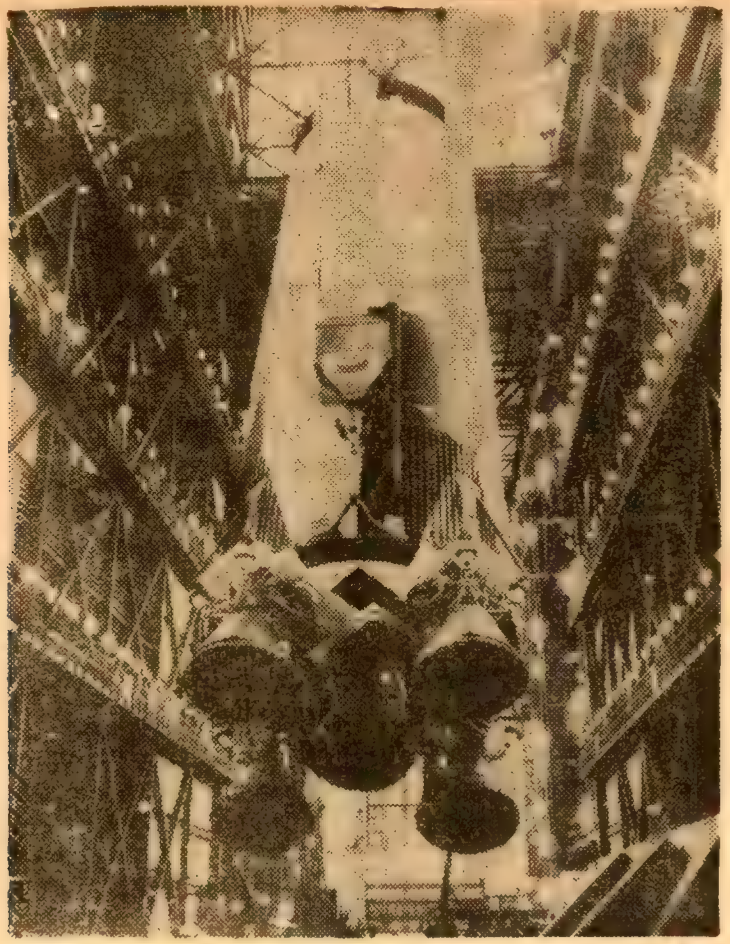

অ্যাপোলো—১০এর বাহক স্যাটার্ন—৫ রকেটের প্রথম স্তরটিকে 'ক্রেন'-এ করে ওঠানো হচ্ছে।

মিনিটের মধ্যে প্রায় ৫০০ টন তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেন পুড়িয়ে মহাকাশযানটিকে সে ঘণ্টায় ১৪ হাজার মাইল গতিতে ১১৪ মাইল উঁচুতে ঠেলে দেয়।

এইবার ঠেলবার পালা তৃতীয় স্তরের রকেটের। মহাকাশযানটির গতি বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১৭,৫০০ মাইল করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির যোগান এই বিশেষ স্তরটিকেই দিতে হয়।

যোগানের কাজ চলে ঠিক পূর্ব-পরিকল্পনা মাফিক। ফলে, অ্যাপোলো—১০কে নিয়ে স্যাটার্ন—৫ রকেট প্রায় ১১৫ মাইল উঁচুতে পৃথিবীর প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রবেশ করে।

কক্ষপথে প্রবেশের পরেও তৃতীয় স্তরের রকেটটিকে ত্যাগ করা হয় না। পুনরায় ব্যবহারের কথা ভেবে তাকে মূল মহাকাশযানের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা হয়।

এদিকে তৃতীয় স্তরের রকেটকে আবার ব্যবহার-করার মাহেন্দ্র-লগ্ন অল্প-ক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ে। মহাকাশচারীরা উৎক্ষেপণের দু ঘণ্টা পরে তার ইঞ্জিনটি চালু করেন আবার; এবং আবার রকেটটি জ্বলে ওঠে। এইবার সাড়ে পাঁচ মিনিটের জন্যে জ্বলে রকেট; আর তাতেই মহাকাশযান ও রকেটের গতিবেগ বেড়ে গিয়ে ঘণ্টায় ২৪,৪০০ মাইলে দাঁড়ায়।

এই শেষোক্ত গতিবেগটা পৃথিবী থেকে ছুটি নেবার গতি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার গতি।

অ্যাপোলো—১০ এই গতিতেই প্রায় নিখুঁতভাবে চাঁদের দিকে ছুটে চলে। শুধুমাত্র দুটি ছোটো অভিযোগ আসে মহাকাশচারীদের কাছ থেকে। মাঝে মাঝে সামান্য ধপ্ ধপ্ শব্দে তাঁদের রাত্রের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, আর জলের ক্লোরিনে তাঁদের মুখ পুড়ে যায়।

ক্লোরিন সম্বন্ধে সতর্ক হলেন মহাকাশচারীরা। কিন্তু শব্দটা? শব্দ ওঁদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালো বারবার। এবং শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল, মহাকাশ-যানটিকে ধীরে ধীরে ঘোরায় যে রকেট-গুলো, তারাই এই শব্দ করছে।

—এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই,—পৃথিবীর 'কন্ট্রোল রুম'-এ বসে বিজ্ঞানীরা আশ্বস্ত করতে চাইলেন অভিযাত্রীদের।

আর ওদিকে অভিযাত্রীদের নেতা স্ট্যাফোর্ড বললেন, ভাবছি না মোটেই। আমরা তিনজনই নিজেদের বিরাট মনে করছি।

—বিরাট তো বটেই,—পৃথিবীর 'কণ্ট্রোল রুম' থেকে বার বার গুঞ্জরিত হয়। আর টেলিভিশনে দূর মহাকাশ থেকে ভেসে আসে পৃথিবীর রঙিন সব ছবি।

দূর মহাকাশ থেকে পৃথিবীর রঙিন ছবি পাঠাবার আয়োজন এই প্রথম।

এই প্রথম টেলিভিশন ক্যামেরার সুইচ টিপে এ-ধরণের অদ্ভুত ছবি পাঠান মহাকাশচারীরা।

হ্যাঁ, ছবিগুলো অদ্ভুত সত্যি। সত্যি, ওগুলোর দিকে তাকালে পৃথিবী-টাকে নিথর নিঃসীম কালো পটভূমিতে একটা বলের মতো মনে হয়। আর মনে হয়, বলটার গায়ে নীল, সবুজ, সাদা আর বাদামী কিছু রেখা দিয়ে কে যেন আঁকিবুকি করেছে।

এই আঁকিবুকি দেখেই একবার চিৎকার করে ওঠেন সারনান। বলেন,—এই, শোনো! আমার কাছে পৃথিবীটাকে বাসোপযোগী খুব সুন্দর একটা জায়গা বলে মনে হচ্ছে।

—মনে হচ্ছে আরও কত কী! আরও কত কী যে দেখছি আমরা!—মহাকাশ-যানটির ভিতরে একটি মনিটর পর্দার সাহায্যে মহাকাশচারীরা পৃথিবীকে তাঁদের ক্যামেরার মধ্যে ধরেন এবং তাঁদের যাত্রার একটি ধারা-বিবরণী দেন।

এদিকে দেখতে দেখতে যাত্রাপথের অনেক দূর পেরিয়ে আসেন ওঁরা। ১৯শে মে ভারতীয় সময় রাত ন'টায় ওঁরা আসেন পৃথিবী থেকে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৮০০ মাইল দূরে। মহাকাশযান তখন ঘণ্টায় ৬,৭১০ মাইল বেগে ছুটছে।

এই গতিবেগটা কমে আসে ক্রমেই। আর ক্রমেই মহাকাশচারীরা পৃথিবী থেকে দূরে, আরও দূরে গিয়ে পৌঁছুল। এবার পৃথিবী থেকে তাঁদের দূরত্ব দাঁড়ায় ২ লক্ষ ১ হাজার ২৫০ মাইল। মহাকাশযানটি তখন ঘণ্টায় মাত্র ২,১০০ মাইল বেগে চলতে থাকে। বেগ এতটা কমে যাবার কারণ, উপরের দিকে উঠে পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাবার সময় অন্য সব পদার্থের মতোই মহাকাশ-যানটির উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাব ক্রমশ কমে গিয়েছিল।

কিন্তু চিরাচরিত মাধ্যাকর্ষণ কমলে কী হবে! ক্রমশ প্রতিবেশী উপগ্রহটির কাছাকাছি এগিয়ে যাবার ফলে মহাকাশ-যানটির উপর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব

বেড়ে চলে ক্রমেই; এবং ক্রমেই মহাকাশযানটির গতিবেগও আবার বাড়তে থাকে।

২১শে মে ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ১০ মিনিটে মহাকাশচারীরা চাঁদের অভিকর্ষের মধ্যে প্রবেশ করেন।

এবার খানিকক্ষণ নিশ্চিন্ত। মহাকাশচারীরা খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলেন এবার।

ঘুম থেকে জেগে উঠে স্ট্যাফোর্ড কথা বললেন প্রথম। ভূপৃষ্ঠের নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রকে তিনি জানালেন, অ্যাপোলো-১০ মোটামুটি সুন্দরভাবেই কাজ করছে। তবে দুটো মাত্র ছোটো অসুবিধে দেখা দিয়েছে। কম্যান্ড আর লুনার মডিউল-এর মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী টানেলটির ভিতরে কিছু 'ইনস্যুলেটেড' জিনিসপত্র ঢিলে হয়ে পড়েছে; আর খাবার জলে কিছু কিছু বুদ্‌বুদ্‌ দেখা দিয়েছে। ওদের পেটব্যথা করছে সামান্য।

এই খবর শুনে ভূপৃষ্ঠের নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র থেকে এই অভিযানের প্রধান চিকিৎসক ডঃ চার্লস বেরী জানালেন,—মহাকাশচারীরা যে জল খেয়েছেন, তা থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস দূর করতে না পারার জন্যে এই পেটব্যথা। লোমাটিল নামক পিল খেয়ে এই ব্যথা ওরা সারিয়ে ফেলুন।

ব্যথা সারানো হল অচিরেই। কিন্তু পেটের ভিতর থেকে হাইড্রোজেন বের করতে বেশ বেগ পেতে হল।

এদিকে উৎক্ষেপণের সময় থেকে প্রায় তিন দিন পেরিয়ে গেছে। মহাকাশযানটি চাঁদ থেকে মাত্র ৫,৬০০ মাইল দূরে এখন। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণশক্তির দৌলতে মহাকাশযানের গতি বেড়ে গিয়ে ঘণ্টায় ৫,৭০০ মাইলে দাঁড়িয়েছে।

মহাকাশচারীরা একটি যন্ত্রের সাহায্যে এই গতি হ্রাস করলেন এইবার। এবং এইবার ঘণ্টায় ৩,৭২০ মাইল বেগে যানটি ছুটতে লাগল।

এই গতিবেগই চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করল মহাকাশযান। কক্ষ-পরিক্রমায় চাঁদ থেকে তার সর্বোচ্চ দূরত্ব দাঁড়াল ১১৬ মাইল, আর সর্বনিম্ন দূরত্ব ৭০ মাইল। দুবার এইভাবে কক্ষ-পরিক্রমার পর প্রধান ইঞ্জিনটিতে আবার অগ্নিসংযোগ করা হল এবং এর ফলে চাঁদের চারপাশে বৃত্তাকার একটি পথ ধরে পরিক্রমা শুরু করল অ্যাপোলো-১০। চাঁদ থেকে মাত্র ৭০ মাইল দূরে এই পথ-পরিক্রমা শুরু হল।

এবার মূল মহাকাশযান থেকে চান্দ্রযানটিকে বিচ্ছিন্ন করার পালা। চূড়ান্ত পর্যায়ের অভিযান শুরু করার পালা।

কিন্তু শুরুতেই এক বিপদ। দেখা গেল, চান্দ্রযান তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তিন ডিগ্রী সরে গেছে। ফলে, উৎক্ষেপণ-... থেকে নির্দেশ দেওয়া হল: চান্দ্র-... যেন বিচ্ছিন্ন না করা হয়।

ফ্লোরিডার কেপ-কেনেডিতে অ্যাপোলো—১০ মহাকাশযানটিকে স্যাটার্ন—৫ রকেটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে।

ওদিকে সারনান জানালেন,—ভয় নেই। ঠিক হয়ে গেছে সব। ঠিক সময়েই ইঞ্জিনটি চালু করা হয়। কল্পিত কক্ষ-পথের খুব কাছাকাছি পথ ধরেই আমরা ঘুরছি।

ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীতে চাঁদের ছবিও পাঠালেন ওঁরা। রঙিন সব ছবি।

ওই ছবিগুলো টেলিভিশনে জীবন্ত হয়ে উঠল। চাঁদের গহবর ও পাহাড়-পর্বতগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ল ওখানে। একটি ছবিতে চোখে পড়ল চাঁদের দেশের কোনো এক পাহাড়ের চূড়া।

কিন্তু এর পরেই টেলিভিশন স্তব্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। হঠাৎ শুরু হয় চাঁদের আকাশের নতুন খেলা। সারনান মূল মহাকাশযানটির সঙ্গে সংযুক্ত চান্দ্রযানটিতে পৌঁছবার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেন। এই সুড়ঙ্গ-পথটির ব্যাস ৩২ ইঞ্চি। অতএব, এতে প্রবেশ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না সারনানকে।

কিন্তু সারনান চান্দ্রযানে প্রবেশ করার পর উৎক্ষেপণযানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রথমত বিচ্ছিন্ন হয়। এই সময় উৎক্ষেপণ-যানটি থেকে বার বার আহবান আসে, সারনান! কথা বুঝতে পারছ কি আমাদের?

কথা প্রথমটায় বুঝতে পারেন না সারনান। এবং অনেক চেষ্টার পর যোগা-যোগব্যবস্থা তিনি পুনরুদ্ধার করেন।

ওদিকে স্ট্যাফোর্ড তাঁর আধ ঘণ্টা পরে চান্দ্রযানে প্রবেশ করেন। আর নিয়ন্ত্রণযানের চালক ইয়ং মূল মহাকাশ-যানটিতে থেকে যান।

স্ট্যাফোর্ড ও সারনান চান্দ্রযানটিকে মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন

এতক্ষণে। এতক্ষণে মানুষ নিয়ে দুটি মহাকাশযান স্বতন্ত্রভাবে চাঁদের কক্ষপথ-পরিক্রমা শুরু করেছে। এই পরিক্রমার পথে মহাকাশচারীরা যখন দ্বিতীয়বার চাঁদের নিম্নতম দূরত্বে পৌঁছুলেন, তখন তাঁরা চান্দ্রযানের নিম্নবর্তী অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তাঁরা নিজেরা তখন চান্দ্রযানের উচ্চতর অংশে চলে এলেন। চান্দ্রযানে এই স্থান পরিবর্তনের কারণ, আগামী দিনের চাঁদ-অভিযানে এই উচ্চতর অংশটির সাহায্যেই মহাকাশচারী-দের চাঁদের জমি থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

এদিকে দেখতে দেখতে লক্ষ্যের দিকে নেমে আসে চান্দ্রযান। চাঁদের মাত্র ৯·৩ মাইল উপর দিয়ে প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরে প্রতি-বেশী উপগ্রহকে সে প্রদক্ষিণ করে।

দুই নভশ্চর স্ট্যাফোর্ড ও সারনান যতই এগিয়ে আসেন চাঁদের দিকে, ততই তাঁরা আবেগভরা কণ্ঠে তাঁদের দেখা দৃশ্যা-বলীর ধারাবিবরণী পাঠাতে থাকেন।

এক সময় চান্দ্রযান 'স্নুপি' থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। নভশ্চর-দের একজন বলে ওঠেন, আমরা খুব নিচে নেমে আসছি এখন। চাঁদের খুব কাছে এসে গেছি। এখন আশ্চর্য সব দৃশ্য চোখে পড়ছে আমাদের। কখনও চোখে পড়ছে চন্দ্রপৃষ্ঠের খুব মসৃণ একটা জায়গা, আবার কখনও পড়ছে বড় বড় পাথরের চাঙড় এবং আগ্নেয়গিরির জ্বালা-মুখ। এ ছাড়া বড় বড় পরিখা বা খাদও দেখতে পাচ্ছি আমরা। দেখছি, কোনো কোনো খাদ শ দুয়েক ফুট গভীর যেন; আর যেন খুব মসৃণ। ওরা দেখতে অনেকটা নিউ মেক্সিকো বা আরিজোনার শুকনো মরুভূমির মতো।

একবার স্ট্যাফোর্ড বলে ওঠেন, অনেক রকম বিমান ও মহাকাশযান চালিয়েছি আমি। কিন্তু এই 'স্নুপি'র দোসর আর একটিও দেখি নি। বড় বেশি শব্দ আর গোলমাল করে সে। তার পাখা, পাম্প ও থার্স্টারগুলো সারাক্ষণই ভীষণ আওয়াজ করে।

অবিশ্যি এই আওয়াজের মধ্যেই নিজের কাজ করে যান স্ট্যাফোর্ড। পৃথিবীতে রিপোর্ট পাঠান,—সারনান ও আমি যেসব সাদা ও কালো পাথরের চাঙড় দেখেছি, তাদের কোনো কোনোটার ব্যাস প্রায় একশো ফুট হবে।

ওদিকে 'কণ্ট্রোল রুম'-এর বিশেষজ্ঞরা তখন এই একশো বা দুশোর মারপ্যাঁচ নিয়ে ভাবছেন না। ওঁরা ভাবছেন নভশ্চর-দের নিরাপত্তার কথা। ভাবছেন, পর পর কয়েকটি বিপদের মুখোমুখি হল এই 'স্নুপি'। নতুন আরও কোনো বিপদ ওৎ পেতে বসে নেই তো?

বিপদ দুটি যানের বিচ্ছেদের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই দেখা দিয়েছিল একবার: এবং তখন দুটি যানেরই অক্সিজেন হ্রাস করতে হয়েছিল। কেন না, অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকলে অতিরিক্ত চাপে বিপদ ঘটার আশঙ্কা।

হাউস্টনের মাস্টার—কম্পিউটার সুড়ঙ্গ-পথের অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দেশ দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করে। এছাড়া চান্দ্রযান 'স্নুপি'র সঙ্গে মূলযান 'চার্লি ব্রাউন'-এর বেতার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয় বার বার। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন না কি 'স্নুপি' হঠাৎ খুব জোরে লাটিমের মতো ঘুরতে শুরু করে।

ওই সময় সারনান-এর ওপর ছিল 'স্নুপি'কে নিয়ন্ত্রণের ভার। তিনি চীৎকার করে ওঠেন, নিশ্চয়ই 'স্নুপি' চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে যাচ্ছে।

—কিন্তু না! নামছে না সে!—কয়েক মুহূর্ত পরেই সারনান কণ্ট্রোল রুমকে আশ্বস্ত করেন। তাঁকে উত্তেজিতকণ্ঠে বলতে শোনা যায়,—'স্নুপি' নামছে না। আবার উঠে পড়ছে। ওফ! কী জংলী এই চান্দ্রযান!

এদিকে ওই জংলীতে বসেই ছবি নেওয়া হচ্ছে। চাঁদের বিধ্বস্ত ভূমি ও রুক্ষ প্রান্তরগুলির ছবি।

অক্ষত থাকলে এই সব ছবি ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আগামী জুলাই মাসে চাঁদে অবতরণভূমিটি বেছে নেওয়া হবে এদের থেকেই।

এছাড়া এই চান্দ্রযান খুব বড় রকমের একটি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করল। এর চাঁদ-পরিক্রমা থেকে প্রমাণিত হল যে, চাঁদের পরিবেশে এ যান সচল থাকবে এবং চাঁদে অবতরণের যান হিসেবে এটিকে ব্যবহার করা যাবে।

মূল মহাকাশযান 'চার্লি ব্রাউন'-এর সঙ্গে এর সংযুক্তিও নির্বিঘ্নে হয়। ভারতীয় সময় ২৩শে মের সকালে হয় এই সংযুক্তি। খবর আসে, সংযুক্তির আগে অ্যাপোলো-১০-এর চান্দ্রযান মূল মহাক যানের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে চন্দ্রপ

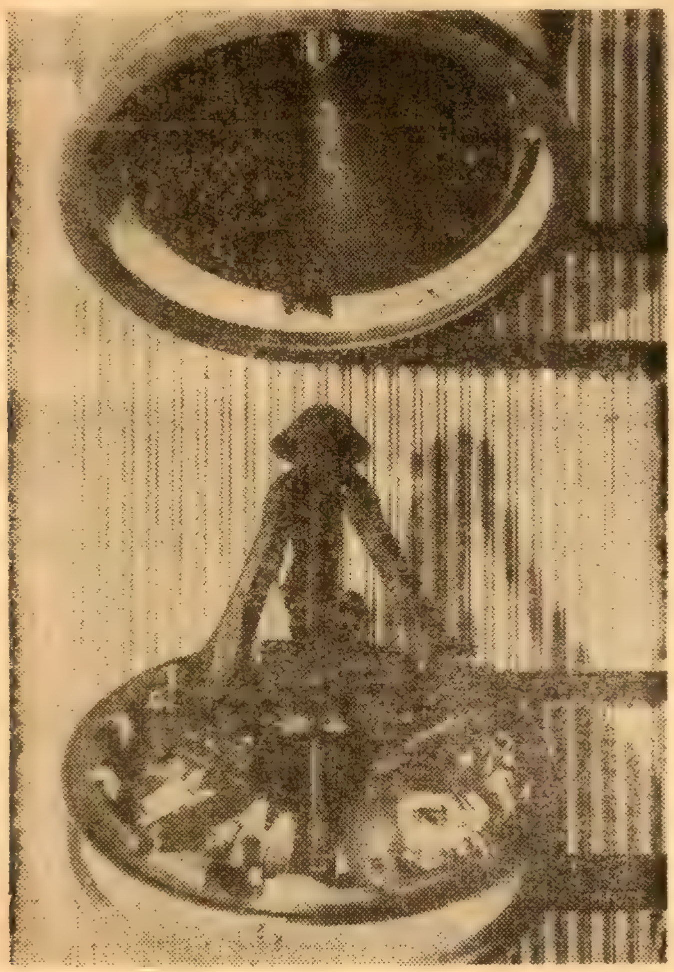

নিচের অংশটি অ্যাপোলো—১০-এর অংশবিশেষ। আর ওপরের অংশটি হল সেই 'টানেল' বা সুড়ঙ্গ-পথ, যা ধরে স্ট্যাফোর্ড ও সারনান চান্দ্রযানে যাতায়াত করেন।

করে। এবং তারপর কক্ষপথে দুই যানের মিলন সম্পূর্ণ হলে নভশ্চররা বেতার মারফত পৃথিবীতে এক সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠান। বলেন, 'স্নুপি' ও 'চার্লি ব্রাউন' এখন পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

দলনায়ক স্ট্যাফোর্ড একবার বলে ওঠেন,—সুন্দর! অভিনব এই আয়োজন।

সত্যি, আয়োজনটা অভিনবই বটে। কেন না, চাঁদের কক্ষপথেই মহাকাশচারীরা চান্দ্রযানটিকে মূল যানের সঙ্গে যুক্ত করেন। স্ট্যাফোর্ড ও সারনান সুড়ঙ্গ-পথ ধরে এগিয়ে আসেন মূল মহাকাশযানের দিকে; এবং তারপর দুটি যানের মধ্যে সংযোগকারী পথটিকে একেবারে রুদ্ধ করে দেন। চান্দ্রযানটিতে তখন আর কেউ নেই। তাকে তখন বিচ্ছিন্ন করে চাঁদের কক্ষপথে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ওদিকে মূল মহাকাশযানটি চাঁদ-পরিক্রমা শুরু করে আবার। ৩০ ঘণ্টায় আরও ১৫ বাব সে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে।

মোট আড়াই দিন ধরে ৩১ বার চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার পর অ্যাপোলো-১০-এর মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসার উদ্যোগ করেন। ২৪শে মে ভারতীয় সময় রাত ৩টা ৫৫ মিনিটে চাঁদের অভিকর্ষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে মহাকাশযানের মূল ইঞ্জিনটি চালু করেন ওঁরা। চালু করতে পূর্ব-নির্দিষ্ট ২ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড সময়ই লাগে।

স্ট্যাফোর্ড জানান, এই চালু-করাটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছে এবং আমরা চাঁদের এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখেছি। এখন পৃথিবীতে ফিরছি আমরা।

ওদের ফেরার খবর একটু দেরিতে পৌঁছয় আমাদের কাছে। কারণ অ্যাপোলো-১০-এর ইঞ্জিনটি যখন চালু হয়, সে তখন চাঁদের পিছন দিকে ছিল। তখন পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না তার।

যানটি চাঁদের সামনের দিকে এসে বেতারসংকেত না পাঠানো পর্যন্ত পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের বন্ধুদের ৯ মিনিট সময় অসীম উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়।

ওদিকে ইঞ্জিনটি চালু হবার কিছুক্ষণ পরেই মহাকাশচারীরা বেশি গরম হয়ে যাওয়া একটি জ্বালানির সেল বিচ্ছিন্ন করে দেন। তারপব ওঁরা ক্রমশ দূরে সরে-যাওয়া চাঁদের ছবি পাঠাতে থাকেন পৃথিবীতে। ওঁরা ও'দের টেলিভিশন ক্যামেরাটি মহাকাশযানের জানালার দিকে তাক করে পৃথিবীবাসীদেরও চাঁদের দৃশ্য দেখান।

পৃথিবীর অনেকেই দেখে, চাঁদের দেশের হাজার হাজার এবড়ো-খেবড়ো আগ্নেয়গিরির মুখ। স্ট্যাফোর্ডকে বলতে শোনা যায়,—আমাদের কাছে চাঁদকে তামাটে বাদামী দেখাচ্ছে। আমরা এখন সেকেন্ডে ৬,৩৪০ ফুট গতিবেগে পৃথিবীর দিকে এগোচ্ছি।

হ্যাঁ, এগোচ্ছেন। দ্রুত এগোচ্ছেন নভশ্চররা। পৃথিবীর অভিকর্ষের আওতায় এসে মহাকাশযানটির গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে।

সেই মুহূর্তে নভশ্চররা একবার জানান, 'গ্লাস-ফাইবার'-এর টুকরোয় এখনও ওঁদের গা হাত পা চুলকাচ্ছে। স্ট্যাফোর্ডের গায়ে চুলকানির মতো কী সব বেরিয়েছে।

কিন্তু স্ট্যাফোর্ডের ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। তাঁর মন তখন ঘরে-ফেরার আনন্দে মশগুল।

ওদিকে ঘর বড়ো থেকে বড়ো হচ্ছে ক্রমেই। ক্রমেই চেনা পৃথিবীটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। রকেটের গতিবেগ বাড়তে বাড়তে ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইলে এসে ঠেকেছে।

এই গতিবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা হল অচিরেই; এবং অচিরেই সংবাদ পাওয়া গেল, অ্যাপোলো-১০ কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষেপণের ১৯২° ঘণ্টা ৩ মিনিট পরে ২৬শে মে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ২২ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরের যথানির্দিষ্ট স্থানেই অবতরণ করেছে।

এই অবতরণ এবং অ্যাপোলো-১০-এর এই সাফল্যমণ্ডিত অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন গবেষণাকেন্দ্রের অফিসার মহল বলেছেন,—এ প্রয়াস মানুষের চাঁদে পা দেবার পথকে প্রশস্ত করেছে। কিন্তু ঠিক কোন্ দিন মানুষ চাঁদে পা দেবে, তা' তারা এখনই সঠিকভাবে বলতে পারছেন না।

এদিকে চাঁদ অভিযানকে ঘিরে নতুন একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের বায়ো-মেডিক্যাল শাখার প্রধান ডাঃ ওয়াল্টার কামেরার বলেছেন, অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানের যাত্রীরা চাঁদ থেকে ফিরে আসার সময় এমন বিপজ্জনক সব রোগজীবাণু সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেন যে, সে সব রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা না হলে পৃথিবীর সমস্ত জীবনই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর পরিবেশ ও আবহাওয়াতেই চলে-ফিরে অভ্যস্ত। চাঁদের পরিবেশ ও আবহাওয়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। তাই চাঁদ থেকে কোনো রোগজীবাণু অবতরণকারী মহাকাশচারীর দেহে প্রবেশ করলে, সহজেই তাঁরা কাবু হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এবং সে রোগ আবার ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা সারা পৃথিবীতে।

তবে চাঁদে এ ধরণের কোনো রোগ-জীবাণু আছে কিনা, তা' এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না। চাঁদের পরিবেশ, তাপমাত্রা, আলো এবং ব্যবহারযোগ্য জলের অভাব দেখে বরং মনে হয়, সেখানে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু তবু সাবধান হতে দোষ কি। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চাঁদে যাঁরা যাবেন, ফিরে আসার পর বেশ কয়েক সপ্তাহ তাঁদের আলাদা করে রাখা হবে, নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রথমে জীবাণুমুক্ত করা হবে তাঁদের। অর্থাৎ, কোনো দিক দিয়েই আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। অর্থাৎ, সত্যি আমরা চাঁদে চললাম, আমাদের সেলাম জানিয়ে রাখলাম চাঁদযাত্রীদের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু সেলাম জানাতে গিয়েও বাধা আসে যেন। কাদের যেন কান্না ভেসে আসে।

শুধোই, কে গা তোমরা? কাঁদছ কেন?

জবাব পাই, আমরা পৃথিবীর ২০০ কোটি বুভুক্ষু। খেতে পাই নি কি না। তাই কাঁদছি।

—কিন্তু কাঁদবে তাই বলে?—ওদের বোঝাবার চেষ্টা করি,—খানার চেয়ে কি জানা বড় নয়? অজানাকে জানবো বলে আমরা যে চাঁদে চললাম গো!

ওরা বলে, তা' যাও। কিন্তু আমরা যে অভাবে-অভিযোগে নরকে চললাম। চাঁদের বাজেট থেকে বাঁচিয়ে দু'-চার পয়সা—

ওদের থামিয়ে দিয়ে বলি, তোমাদের দেয়ার কথা বলছ তো?—দিলেও লাভ হত না কিছু। পৃথিবীর বোঝা ওতে বাড়তো বই কমতো না।

—কী বললে? পৃথিবীর বোঝা আমরা? —পৃথিবীর রুগ্ন ও বুভুক্ষুরা হাহাকার করে ওঠে একসঙ্গে। একসঙ্গে ওরা কত কী কথা বলতে চায় যেন।

কিন্তু ওদের কথায় কান দিলে চলে কি? পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার কি ওতে সম্পূর্ণ হয়? তাই কথা শেষ হবার আগেই 'টা টা' করে উঠি আমরা। পর্বত-প্রমাণ দর্প আর সমুদ্রপ্রমাণ খুশি বুকে নিয়ে বলি, আমরা চাঁদে চললাম।

মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে

পার্কার ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার প্রতি গ্রামে এবং শহরে পাঠান যায়।

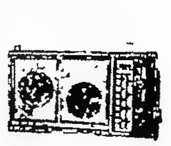

Japan Transistors (AK)
Kolhapur Road, Delhi—7.

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ সাত ॥

ভল্দ মাঝি তার কথা রাখলে। দিন সাতেক পার হতে না হতে থানায় নুনের খবর এনে হাজির করল। সঙ্গে অশান্ত পাঁচ হুদ্দার চৌকিদার। দলকে পেছনে রেখে সামনে আজ বাপ কালু মাঝি নয়—বেটা ভল্দ মাঝি।

বাপকে সে বুঝিয়ে এনেছে, "তুমি মুখ বুজে থাকবে—বাস্। বুড়ো লোক তুমি—অদের সঙ্গে পারবে নি। যা বলবার সে আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলব।"

থানার বারান্দায় উঠে ভল্দ দেখলে—আরও পাঁচ-সাত হুদ্দার চৌকিদাররা সব লাঠি ঠুকে বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে। নতুন নেতা তাদের গ্রাহ্যই করলে না। গট্ গট্ করে গিয়ে ঢুকলো বড় দারোগার ঘরে। লম্বা সেলাম দিয়ে একগাল হেসে বললে, "নুনের খবর এনেছি হুজুর।"

কিন্তু ওপক্ষ থেকে যতোটা উৎসাহ উত্তেজনা আশা করেছিল সে—তা দেখতে পেলে না। দমে গেল।

বড় দারোগার হাঁড়ির মত মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত থম্‌থমে। সামনের টেবিলে মেলা থানার বড় মানচিত্র। বড় দারোগার হাতে লাল পেন্সিল। দু' পাশে দু'জন সাব ইন্সপেক্টার অধিকতর মুখ গোমড়া করে ঝুঁকে আছে মানচিত্রের ওপরে। একজনের হাতে একটা লিস্ট। লিস্ট দেখে সে পড়ছে—মানচিত্রে মিলিয়ে লাল পেন্সিলের ফোঁটা দিচ্ছে বড় দারোগা।

"কেকস্পখিরা।"

ফোঁটা পড়ল।

"নন্দীগ্রাম।"

আবার ফোঁটা।

"রাজার হাট।"

"ক লা গা হি গী ...কামারদা...খেজুরী।"...

ফোঁটা...ফোঁটা...ফোঁটা। সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যখন আসে—তখন লাল পেন্সিলে দাগা হয়েছিল মোটা করে—এদিকের অশান্ত অঞ্চল। সে দাগের বাইরে আজ ফোঁটা পড়ছে একের পর এক। অশান্ত অঞ্চল আজ বেড়ে চলেছে। মানচিত্রের অর্ধেক প্রায় লাল ফোঁটায় ভরে গেল।

বড় দারোগা ফোঁস করে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলে, "সব আবগারী?"

"শুধু একটা ছাড়া।" সাব ইনস্‌পেকটার বললে, "নেত্রকোণায় দেশী তাঁতীরা খেপে বিলেতী কাপড় পোড়াতে গিয়ে একটা গোটা দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে স্যার। আর তাছাড়া সব আবগারী গণ্ডগোল।"

ভল্দ মাঝি বুঝলে ব্যাপারটা—ক'দিন আগেই সে যমুনার কাছে এ ঘটনা শুনেছে। লাল ফোঁটা ভরা মানচিত্রটার দিকে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"অসম্ভব।" বলে বড় দারোগা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। কোমরের বেল্টটা ঢিলে করে দিলে। খাকী পোষাকের ভেতর থেকে ভুঁড়িটা ঠেলে বেরিয়ে এল।

ভল্দ বললে, "আমি একটা নুনের খবর এনেছি হুজুর।"

"কোথায়?"

"চরে।"

"অসম্ভব।" বড় দারোগা চেয়ার ছেড়ে উঠে ঢিলে বেল্ট ভুঁড়ির ওপর আবার কষে বাঁধলে। বললে, "আমাদের আরও সেপাই চাই। ছিল শুধু নুন—এখন আবার আবগারী, বিলেতী কাপড়... অসম্ভব।"

ভল্দ বললে, "চরের বুনো জংলী দুজনাকে আমি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি হুজুর। অদের জনা দুইকে ধরে কদিন হাজতে রেখে জেরা করলে ঢের কথা বেরিয়ে পড়বে।"

"কে তারা?"

"একজন অদের বাড়ুয়া—মহেশ মণ্ডল। আর একজন হলো মুকুন্দ পাইক—সেই গোবিন্দ পাইকের ব্যাটা, যাকে হুজুর ডাকাতি কেসে আসামী করে পাঠিয়েছেন।"

একজন সাব ইন্সপেক্টারকে দেখিয়ে বড় দারোগা বললে, "ছোটবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক কর।"

আবার একটা লম্বা সেলাম করে ভল্দ মাঝি বললে, "মোর আর একটা আর্জি ছিল হুজুর।"

"কি?"

"চর মোর বাপের হুদ্দায় পড়ে।" ভল্দ মাঝি মাথা চুলকে বললে, "বাপ মোর বুড়ো হয়ে গেল হুজুর—চর শায়েস্তা করা তার কম্ম নয়। অরা সব ধরনে জাঁহাবাজ হুজুর। তাই বলছিলাম, চরের হুদ্দা মোকে দেওয়া হোক।"

"ছোটবাবু ঠিক করে দেবে।

পনেরো আনা কাজ ফতে। ভলু মাঝির বুকের ভেতরটা আনন্দে ধড়াস ক'রে উঠল। বাকি এক আনা ছোট-বাবুর সঙ্গে ধর-পাকড়ের শলা-পরামর্শ আর যমুনার দুতিয়ালী।

শলা-পরামর্শের জন্য একজন সাব ইন্সপেক্টার তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে কি কথা হলো কেউ জানলো না।

ভলু মাঝি বেরিয়ে আসতে মাধব সাঁট আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কি হল—এ্যাঁ? খুব চোট-পাট করল?"

ভলু মাঝি ধমকে উঠল, "চোপ্!"

রাখাল জিজ্ঞেস করল, "মোদের এখন কি করতে হবে?"

"ঠিক সময়ে তলব পড়বে হে—এখন চুপ কর। চল যাই।"

ভলু আর কোনো কথা ভাঙলে না।

কিন্তু চরের মানুষও চুপ করে নেই। এর মধ্যে সাগরখুড়ি একদিন কোথা থেকে খবর নিয়ে এসে হাজির হলো মহেশ মণ্ডলের কাছে। বললে, "অরা মোদের চরের বাড়ুয়ার নাম খোঁজ করছে ছোট মণ্ডল।"

"হবে।" মহেশ বললে, "আমিও দেখছি ক'দিন একটা চৌকিদারকে—হোই যমুনার টঙের দিকে চলে যায়। কিন্তু চোখ দুটো থাকে এই দিকে।"

"কি হবে ছোট মণ্ডল?"

"হবে—কিছু একটা হবে।" মহেশ হেসে বলল, "অতগুলান চৌকিদারকে ঝাঁটা দিয়ে তাড়া করলে, আর কিছু হবে নি?"

"বাড়ুয়ার খোঁজ করে কেন?"

"অরা আর একটা হরি মণ্ডল চায়। তা হলে কাজের বড় সুবিধা হয়।" মহেশ একমনে কিছুক্ষণ তামাক টানতে টানতে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলে উঠল, "ভাল। আর একটা হরি- মণ্ডল হয়ে যাই—না কি বলো সাগরখুড়ি?"

"ছোট মণ্ডল!" বলে সাগর খুড়ি একদৃষ্টে চেয়ে রইল মহেশের দিকে।

মহেশ হাসল। বললে, "ভয় নাই খুড়ি—এ চরে থেকে তার মত আমি মরতেও পারব নি। সকলে ঘেন্না করে কেউ তোমরা মোর মড়াটাও ছুঁবে নি।"

সাগরখুড়ি চুপ করে চেয়ে রইল।

মহেশ বলল, "কিন্তু চরের সকলকে একটি কাজ করতে হবে খুড়ি।"

"বলো।"

"যতদূর মনে হচ্ছে—মোকে থানায় টানাটানি করবে।" মহেশ কপাল কুঁচকে বলল, "সেদিন যেন কেউ মোকে বাড়ুয়া বলে স্বীকার না করে। বলবে—হরি মণ্ডলের পর বাড়ুয়া মোদের কেউ নাই।"

"তা আমি এক্ষুণি যেয়ে সকলকে বলে দিব।" সাগরখুড়ি বললে, "কিন্তু অরা কি বিশ্বাস করবে? সবাই যে মোরা তোমাকে মানি-গণি ছোট মণ্ডল। এ কে না জানে?"

এ মান্ধাতার আমলের প্রথা। মাতব্বর তো একজন থাকবেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাড়ুয়ারা পেত স্বয়ং কালেক্টারের নিয়োগপত্র—এমন কি মাস মাস তন্‌খা। সে প্রথা বিলুপ্ত। এখন তন্‌খা নেই—আছে জবরদস্তি কাজ আদায়। আনুগত্য মুচড়ে আদায় করা।

মহেশ মণ্ডল বলল, "চরের মানুষের সঙ্গে মোর যে সম্পর্ক খুড়ি—সে মোর চরেই থাক। কথাটা থানায় গেলে মোর জীবন যাবে। গোবিন্দ গেছে, পবন গেছে—হয়তো মোকেও যেতে হবে। এ চরের মানুষের সঙ্গে, সানো চৌধুরীর সঙ্গে, জগৎ ডাক্তারের সঙ্গে বেইমানী আমি করতে পারব নি।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল—যেন কারুর মুখে আর কোনো কথা জোগাল না।

খানিকবাদে সাগরখুড়ি বললে, "তুমি তা হলে আবার চৌকিদার ঘোরা-ঘুরি করতে দেখেছ ছোট মণ্ডল।"

"দেখেছি। একজনকে।" মহেশ বললে, "চরের ইদিকে লম্ব—হোই তফাৎ দিয়ে চলে যায় যমুনার টঙের দিকে। মনে হচ্ছে—ওটাই হয়েছে এখন অদের চোরাই-ঘাটি। যত ভাণ্ডড় গুলিখোরের

আস্তা। ওদের কাছে খবর-টবর পাওয়ায় সুবিধা।”

“সকলকে যেয়ে তবে সাবধান হতে বলি।”

“বলো।”

সাগর খুড়ি চলে যাচ্ছিল—মহেশ ডেকে আবার বললে, “আর একটা কথা খুড়ি। সেপাই-সান্ত্রী এলে গোলমাল করো নি—সরে যাবে।”

থমথমে মুখে সাগরখুড়ি নীরবে শুধু মাথা নাড়লে।

কিন্তু সাবধান সতর্কতা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হলো না। একদিন শেষ রাতের দিকে দুজন সাব-ইন্সপেক্টারের নেতৃত্বে সেপাই-সান্ত্রী আর চৌকিদার বাহিনী এসে একসঙ্গে বাছাই কটা ঘর ঘিরে ফেলল। চরের মেয়ে-পুরুষ ঘুম ভাঙা চোখ রগড়াতে রগড়াতে হকচকিয়ে দেখলে—সেপাইদের একটা ছোট দল তাদের মহেশ মণ্ডল আর মুকুন্দ পাইককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বড় দল তখনো চরে—টেনে বার করছে গুপী দিন্ডাকে। হাবু দাস একফাঁকে সটকে পড়েছে। ওদের খিড়কীর দিকে নুনের ফিল্টার হাঁড়ি পাতা।

সাব-ইন্সপেক্টার কানে ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনলে গুপী দিন্ডাকে, “নুন—শালা চোরাই নুন!”

“ও নুন লয় হুজুর।”

“নুন লয়! উঁ”—কানে ধরে ঝাঁকানি।

একজন সেপাই গিয়ে হাঁড়ির মুখে ঝুঁকে পড়ল। তখনো মুখ আঁধারি আছে—ভালো করে দেখা যায় না। টর্চ ফেললে—আলোয় সোনালী জল ঝিকিয়ে উঠল।

“ইয়ে জরুর নুন জল হোবে সাহাব।”

“আমি বলছি—নুনের হাঁড়ি লয়।”

“তবু বলবি—নয়।”

“না—লয়। বলছি লয়।”

চড়, রদ্দা, কানমোলা খেতে খেতে গুপীর সেই এক কথা।

সাব-ইন্সপেক্টার খেপে গেল। প্যাঁচে পড়ে গেল। হাঁড়ির পাশে দাঁড়ানো সেপাইকে হুকুম করলে, “অ্যাই—চেখে দ্যাখ।”

সেপাই আঙুল ডুবিয়ে জিভে দিলে।

“ইয়ে রাম রাম রাম...থু থু থু...ইয়ে সিরেফ পিসাব হুজুর...থু থু থু...।” বলে লাঠির এক বাড়ি। হাঁড়ি ভেঙে দুর্গন্ধ জল গড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

“হায় হায়—মোর চোনার হাঁড়ি, মোর সারের হাঁড়ি”—

কপাল চাপড়ে গুপী তার হাঁড়ির দিকে ছুটে গেল, কঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “দিলে মোর অত কষ্টের সারের হাঁড়িটা ভেঙে দিলে গো। মোর গরুর চোনার হাঁড়ি”—

সেপাইটা দাঁত কড়মড় করে সাব-ইন্সপেক্টারকে বললে, “কভি নেহি। গরুর চোনা নয় সাহাব—ইয়ে সিরেফ আদমির পিসাব। থু থু”—

লোকটা মুখ ধোয়ার জন্য এদিক-ওদিক জল খুঁজতে লাগল।

সাব-ইন্সপেক্টার তেড়ে গেল গুপীর দিকে।

গুপী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল ফাঁক বুঝে।

দ্বিতীয় হাঁড়ি হাবু দাসের।

সাব-ইন্সপেক্টার বললে, “মার শালা লাঠির বাড়ি। ওতেও পেচ্ছাব—না চোনা—না ওর গুষ্ঠীর পিণ্ডি।”

বেইজ্জৎ চৌকিদাররা। বেইজ্জৎ ভলু মাঝি। রাগে গর্ গর্ করতে করতে ভলু মারলে এক লাঠির বাড়ি। হাঁড়ি ভেঙে গলগল করে ছড়িয়ে পড়ল সেই সোনালী দুর্গন্ধ জল।

সাব-ইন্সপেক্টার দাঁতে দাঁত চেপে নাকে হাত চেপে বললে “শালা জঙ্গল মহালের চাষী না জানোয়ার! একদম জানোয়ার।”

একজন সেপাই বললে, “উধার আউর ভি একঠো হাঁড়ি আসে।”

“আউর একঠো।” ভলু অবাক হয়ে তাকাল তার মুখের দিকে, “কাঁহা!”

সেদিন সে মাত্র দুটোই দেখে গেছে।

সেপাই আঙুল তুলে দেখাল। মুকুন্দের বাড়ি।

সাব-ইন্সপেক্টার বললে, “হবে শালা জঙ্গলীদের ওই পেচ্ছাবের হাঁড়ি। আর দেখে কি হবে।”

কিন্তু একটা মেয়ের মুখ ভেসে ওঠে যে ভলু মাঝির চোখের সামনে! মুকুন্দকে ধরতে সে সামনে যায় নি—ওঁৎ পেতে ছিল। ঘরের পেছন দিকে ধানক্ষেতের মধ্যে ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে ছিল—যদি মুকুন্দ পালাবার চেষ্টা করে, মোকাবিলা করবে। যাক—ভালয় ভালয় সে ধরা পড়েছে। এখন নয়নকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে। বিজয়দর্পে চোখের সামনে দিয়ে একবার ঘুরে আসতে ইচ্ছে করে।

ভলু মাঝি বললে, “বলা যায় না হুজুর। একটু ঘুরে চলুন।”

দল এগোলো মুকুন্দের বাড়ির দিকে।

হাঁড়ি একেবারে সামনেই পাতা—অথচ সেদিন চোখেই পড়ে নি ভলুর—এ হতে পারে না। হয়তো পরে পেতেছে। ভলু ভাবলে।

উপড়ে করা কয়েকটা ধানসেদ্ধকরা হাঁড়ি এদিক-ওদিক—তার পাশেই নুনের হাঁড়ি, আর একটা হাঁড়ি দিয়ে ঢাকা একপলক চোখ ঘুরিয়ে দেখল ভলু—নয়ন বসে আছে দরজার কাছে। শূন্য চোখে চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে নির্বোধ দ্রষ্টার মতো—আর সব কি যেন ঘটে যাচ্ছে একে একে, তার বুদ্ধির অগম্য। হরিদাসী কাঁদছে—ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে ঘরের ভেতরে কোথায়। ভালো করে ভোর তখনো হয় নি।

ভলু মাঝি তার লম্বা লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে গেল রাগে গর্‌গর্ করতে করতে সেই হাঁড়িটার দিকে। প্রতিশোধে ক্রুর ওর চোখ-মুখ—দাঁতে দাঁত চাপা, গলার মধ্যে ভেতরের কি একটা বুনো জানোয়ার যেন শুধু গোঁ গোঁ করছে, ছটফট করছে বুকের মধ্যে। শুধু হাঁড়ি নয়—নয়নকে দেখে সেটা যেন হঠাৎ খেপে আত্মহারা। সেপাইয়ের দলকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেল ভলু—গিয়ে পড়েছে হাঁড়িটার সামনে।

নয়নের শূন্য চোখে হঠাৎ একটা ভয় দেখা দিল। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চোখ দুটো ভয়ে বিস্ফারিত। লোকটা লাঠি তুলেছে—সেই ছ' ফুট লম্বা জোয়ান একরোখা লোকটা একেবারে হাঁড়ির কাছাকাছি। নয়ন জানে—ও হাঁড়ির ভেতরে নুন নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যু! ওদের জন্যেই সাজিয়ে-গুছিয়ে পেতে রেখেছিল মুকুন্দ।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে নয়ন চেঁচিয়ে উঠল, “যেয়ো নি—ভেঙো নি”—

ততক্ষণে দুম্ করে পড়েছে বাড়ি।

ভাঙা হাঁড়ির ভেতর থেকে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বেরিয়ে এল এক তেঁতুলে খরিস। বেরিয়েই হাত দেড়েক উঁচুতে মাথা তুলে চওড়া ফণাটা দোলাতে লাগল।

নয়ন চিৎকার করে চোখ বুজলো।

স্বল্পমূল্যে উপহার
প্রতি প্রান্তের সুন্দরীদের পছন্দ। সর্বোচ্চ ফ্যাশান—অপরূপ আধুনিক ডিজাইনের কাশ্মীরী ও বাঙ্গালোর শাড়ী রুমালী সুন্দর অত্যন্ত সাধ্যমত মূল্যে কেবল আমাদের এখানে পাওয়া যায়। একখানি স্পেশাল ডিজাইন শাড়ী ১৩/৫০, দুটি শাড়ী ২৩/-, তিনটি শাড়ী ৩৭/৫০, চারটি শাড়ী ৪৭/-, ছটি বা অধিক শাড়ী প্রতি কিনায়ত্যে একটি ব্লাউস পিস ভি. পি. পি. তে পাঠাবো। দ্রুত অত্যধিক চাহিদা অল্প মাল আজই খরিদ করুন।
KOHINOOR SAREE AGENCY
KALYAN PURA, DELHI-6

ভালকান
ক্যাজুয়াল ৮.৫০
ভালকান
প্যাটেন্টেড ক্যাজুয়াল ৯.৫০
ভালকান
নিউকাট ৬.৭৫
ভালকান
স্কোয়ার ক্যাজুয়াল
১০.২৫
ভালকান
গোব ক্যাজুয়াল
১০.২৫
ভালকান
লেসিং ৮.৫০
জলে, কাদায়, দুর্যোগে
নিশ্চিন্ত সহায়
বাটা ভালকান
বৃষ্টি-বাদলের দিনে অথবা দুর্যোগে, নিশ্চিন্তে
পথ চলার সহায় বাটা ভালকান। অসামান্য জুতো
এই ভালকান, নকশায়-উপাদানে একেবারে নতুন।
বাছাই রবারের মজবুত ছিমছাম আপার, সব ধকলই
সামলাতে পারে; কাউণ্টার সংযোজনে সুদৃঢ়,
ফলে অটুট জুতোর গড়ন; আর পি ভি সি
শুকতলি যখন ইচ্ছে ধোয়া যায়।
যেমন সুঠাম গড়ন, তেমনি নমনীয়—পায়ের
আরাম ষোল আনা। তাছাড়া শোভাযাত্রায়
আশ্চর্য উজ্জ্বল, জলে ভিজুক, কাদা লাগুক—
সাফ করতে ঝামেলা নেই।
ভেজা কাপড়ে মুছে নিলেই নিমেষে নতুন।
সুকুমারি রঙে আর মনোহর নকশায়, বাটা ভালকান
জুতো বরষার পথে নিশ্চিন্ত ভরসা।
বাটা ভালকান চকচকে, ঝকঝকে, ছিমছাম।
Bata
VULCAN
দুর্যোগের দিনে
মুশকিল আসান
বাটা ভালকান
Bata
VULCAN

পলকে দু' পা পেছিয়ে এল ভলু মাঝি।

'হাই বাপ্! সাপ রেখেছ নিমাই মাঝির ঝি! এ কী!"

দু' হাতে মুখ ঢেকেছে নয়ন।

"সরে যাও—সরে যাও, ঘরে ঢুকে পড়"—ভলু চাপা গলায় বললে, "দরজা বন্ধ করো। এই দিকে মুখ। পালাও।"

ওদিক থেকে সেপাই চৌকিদাররা চেঁচামেচি করছে, "মার বাড়ি।"...

সাহস করে জনাকয়েক চৌকিদার এগিয়ে এল লাঠি তুলে।

ভলু হেঁকে উঠল, "হুঁশিয়ার। বিগড়ে দিয়ো নি। মেয়েছেলে আছে। একটু রসো।"

সাপটার দিকে চোখ রেখে পেছোতে পেছোতে ভলু নয়নকে আড়াল করে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। আড়ষ্ট নয়নকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে একহাত। দরজা টেনে দিলে।

এক সান্ত্রী রাইফেল তাক করেছিল—নামিয়ে নিলে। উল্টো দিকে ভলু মাঝি।

ভলু হেঁকে বললে, "খবর্দার, গুলী করবে নি।"

জলপাই জঙ্গল মহালের চৌকিদার—সাপের সঙ্গে সহাবস্থান। ফণা দুলিয়ে সাপটা তখনো চেয়ে আছে ভলুর দিকে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভলু নিজের মাথার পাগড়িটা খুলে চট্ করে ফেলে দিলে সামনে। ছোঁট পড়ল। সেই মুখে ভলু তাক্ করে লাঠি মারলে একেবারে মাথায়। ওদিক থেকে সেপাইরা হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। সাপটা আর মাথা তুলতে পারল না—শুধু বিরাট লেজটা তার লট্পট্ করতে লাগল।

সাব-ইন্সপেক্টার এগিয়ে এল। সভয়ে বলে উঠল, "বাপ্—এই এত বড় একটা জাত সাপ, নুনের হাঁড়ি সাজিয়ে তার মধ্যে ভরে রেখে দিয়েছে। এরা মানুষ নয়—পিশাচ। সব পারে—সব পারে। লোকটা কোথায়? পাকড়ো শালাকো।"

ভলু বললে, "তাকে আগেই ধরা হয়েছে হুজুর। ও সেই গোবিন্দের ব্যাটা মুকুন্দ।"

"ঠিক আছে—চল থানায়। শালার সঙ্গে মোকাবিলা হবে।"

যাওয়ার আগে একবার পেছন ফিরে তাকাল ভলু। না—নয়নকে আর দেখা গেল না। নিজেই সে তাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজা টেনে দিয়েছে। অতগুলো লোকের সামনে সে দরজা আর ঠেলে খুলতে হাত উঠল না।

মরা সাপটার পাশে তার পাগড়িটা পড়েছিল—তুলে নিলে। খুলে ধুলো ঝাড়ল। রক্তে আর গরলে ভিজে গেছে জায়গায় জায়গায়। এইরকম রক্তে আর গরলে ছোপানো একটা মন নিয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল দলের পেছনে পেছনে।

একেবারে শূন্য পড়ে রইল কয়েক মুহূর্ত আগের ছোট্ট রঙ্গভূমিটুকু—প্রেমে প্রতিহিংসায়, জয়ে পরাজয়ে, ক্রোধে আর করুণায় উত্তপ্ত। নাঃ, একটা দরজা খুলে কেউ একবার মুহূর্তের জন্য উঁকি মেরেও দেখল না।

থানায় ফিরে ভলু একেবারে হাউ-মাউ করে উঠল বড় দারোগার কাছে, "আজ একদম মরে যেতাম হুজুর। যমের মুখ থেকে ঘুরোৎ এসেছি। নুনের হাঁড়ির মধ্যে ইয়া বড় এক তেঁতুলে খরিস সাপ লুকিয়ে রেখেছিল—উই ব্যাটা পিশাচ।"

থানার বারান্দায় হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল মুকুন্দ, পাশে মহেশ মণ্ডল। ভলু মুকুন্দকে দেখিয়ে দিলে।

সাব-ইন্সপেক্টার দাঁত কড়মড় করে ছুটে গেল মুকুন্দের দিকে—তার চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনলে বড় দারোগার সামনে। বললে, "এক নম্বর শয়তানের বাচ্চা স্যার। ছোট খেলে যে কেউ একটা মরত আজ নির্ঘাৎ।"

"বটে!" বড় দারোগা চোখ পিট্ পিট্ করে মহেশের দিকে চেয়ে বললে, "আর উটি বুঝি সেই বাড়ুয়া?"

"হ্যাঁ স্যার!"

বড় দারোগা ডাকল, "ওহে বাড়ুয়া!"

মহেশ মণ্ডল যেমন বসেছিল—তেমনি বসে রইল। ডাক যেন শুনতেই পেল না।

আবার ডাক।

মহেশ নির্বিকার।

"লোকটা কালা নাকি!" বড় দারোগা তাকাল সাব-ইন্সপেক্টারের দিকে।

সাব-ইন্সপেক্টার গিয়ে ধরে নিয়ে এল মহেশকে—বললে, "বড়বাবু তোমাকে বাড়ুয়া বাড়ুয়া বলে ডাকছেন, আর তুমি সাড়া দিচ্ছ না! রুলের গুঁতোয় ঠ্যাঁটামি তোমার ভেঙে দেবো একেবারে।"

মহেশ এগিয়ে এসে দাঁড়াল বড় দারোগার সামনে।

বড় দারোগা কটমট করে চেয়ে বললে, "তুমি বাড়ুয়া হয়ে এইসব অনাচারের কথা কেন জানাও নি থানায়? এতদিন চোরাই নুনেরই বা খবর দাও নি কেন? বাড়ুয়ার কর্তব্য কি?"

হাত জোড় করে মহেশ বললে, "আমার নাম মহেশ মণ্ডল বড়বাবু। আপনার ডাক আমি বুঝতে পারি নি। আমি চরের বাড়ুয়া লয়।"

যে সাব-ইন্সপেক্টার বিজয়গর্বে তাকে ধরে এনেছিল—সে কেমন থতমত খেয়ে গেল। ভলু মাঝি ঘাবড়ে গেল।

বড়বাবু এ-মুখ ও-মুখ চেয়ে বিরক্তিতে জ্বলে উঠল এবং হুংকার দিয়ে উঠল, "তবে কে বাড়ুয়া!"

"আজ্ঞে হরি মণ্ডল বাড়ুয়া ছিল—মরে গেছে।"

"তার পর?"

"কেউ লয় হুজুর।" মহেশ অকম্পিত গলায় বললে, "ওই তো মোদের চরের আরও একজনকে ধরে এনেছেন—ওকে জিজ্ঞেস করুন।"

"এ্যাই—মিছে কথা বলবি তো শালা জিভ কেটে ফেলব।" মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করলে বড় দারোগা, "মহেশ তোদের বাড়ুয়া নয়?"

মুকুন্দ ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যভরে বললে, "কে শালা বাড়ুয়া। মোর বাপ অকে এনে বসিয়েছিল চরে। জিজ্ঞেস করো না ওকে। হুঃ, শালার বাড়ুয়া হওয়া সহজ কথা! ওকে মানে কে?"

[ক্রমশ]

বিশ্বাস করুন আপনার ওপর কোন রাগ থেকে নয়, কেন না রাগের কথা উঠতেই পারে না। যদিও আপনার সহৃদয় মুখ, আপনার সুন্দরী স্ত্রী, যিনি সর্বদা জাপানী কিমানো পরে থাকেন, যাঁকে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন নাটকীয়ভাবে 'একটি জাপানী রূপকথা'। তাঁর চিত্রিত মুখ, আর আপনার সেই বিখ্যাত, সুশিক্ষিত কুকুর, যে নিঃশব্দে আমার নোটেশন উপভোগ করেছে। তার প্রভুভক্ত মুখ, এ সবই আপনার ঘরে বসে লক্ষ্য করেছিলাম কিন্তু আমার তখন মানে আপনার বাড়িতে, হয়েছিল কি, আমি সব মুখ দেখতে পেলেও সুরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। না, না, আপনি বিচলিত হবেন না, একটা উটকো লোককে যতোখানি ভদ্রতা দেখানো সম্ভব ততোখানিই. আপনি দেখিয়েছেন। আরে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে নাকি? আপনি আমাকে রোদ থেকে ধরে এনে আপনার

এয়ার কন্ডিশান ঘরে ডানলোপিলোর গদিতে বসতে দিয়েছেন। ঠান্ডা আইসক্রীম সন্দেশ খাইয়েছেন পেটপুরে। ফালতু কে খাওয়ায় মশাই? এমন কি আপনার ট্রেইনড কুকুর মাথার দু'পাশে দু'টো মস্ত কান ঝুলিয়ে আমার নোটেশন শুনেছে। আমার সুর টেপ ক'রে নিয়েছেন কতো যত্ন ক'রে, শেষকালে যা অচিন্তনীয়, প'চিশটা টাকা হাতে তুলে দিয়েছেন আপনি। কতো ভদ্র আপনি। চলে আসবার সময়েও বলেছেন, মস্ত বড়ো ফার্ম আমার। একাই সব দেখাশুনো করতে হয়। আমি বাড়িতে থাকি বা না থাকি আপনার যখন দরকার তখনই চলে আসবেন। উনি ত' রইলেন, মানে আমার মিসেস, সমাদরের কোন ত্রুটি হবে না।' কে বলে মশাই এই বাজারে? যদিও বলেছি উত্তরে, 'আসবো, তবু বিশ্বাস করুন, আমি আর আপনার ওখানে যাচ্ছি না, আবার বলছি কোন রাগ করে নয়। অবশ্য আপনারও হাতটা যদিও আমার ম্যানেজার বা খোদ মালিকের মতই দেখতে, অবিকল সেই রকমই মসৃণ, নীলাভ, শিরা-ওঠা ফর্সা হাত, সুচারুভাবে নখগুলি কাটা, আর ওদেরই মত আপনার রক্তাভ তালু যেখানে সম্ভবত ছুরি লুকোনো আছে। যেটা চালালে রক্তপাত অনিবার্য, তবু বলছি সে সব কিছু নয়, তুড়ি মারুন ওসবে। ঐ যে গোড়াতেই বলেছি সব মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম, কেবল সুরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, ঐ কথাটাই আসল, কিন্তু ওখানে পৌঁছতে হলে আমার সংগে আসবেন নাকি একটু ঘুরে, না, না, খুব দূরে কোথাও নয়, এই আমার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতে, আসবেন নাকি, খুব সংক্ষেপেই সারবো, আরে আমারও ওসব ধানাই-পানাই ভালো লাগে নাকি, তা'ছাড়া এখুনি ঝুলিটা কাঁধে নিয়ে, স্ট্যান্ডটা হাতে ঝুলিয়ে, সুরের গুরু সাঁই-এর নাম নিয়ে যন্ত্রটি চামড়ার খোলে পুরে বেরোবার সময় হল, আমারও বেশি সময় নেই হাতে, ঐ দু'টো বাচ্চাকে একটু নিজের হাতে খাইয়ে, ওদের স্কুলে পাঠিয়ে,- হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আসুন, আসুন...

প্রথম যেদিন চটকলের ফটকে ভিড়লাম সেদিনই ও সরু মতন কাটা দরজাটা গলে পার হতে গিয়েই ঠকাস করে মাথাটা ঠুকে গেল। বুঝলাম গর্দান খাড়া রেখে চললে এর সংগে আমার পোট খাবে না। কুঁজো হয়ে ঢুকলে মাথা ঠোকার ভয় নেই। বাইস ঘরের মস্ত মিস্তিরি বলতো, 'রোজ কুঁজো হয়ে ঢুকতে ঢুকতে খালি মাইরি মনে হয় আজই একটু একটু করে কুঁজো হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একটা সুবিধে, মাথা ঠোকে না।'

আমি বলতাম, 'আমি যে কুঁজো হতে পারি না।'

'দেখিস কপালটা তোর ধাক্কা খেতে খেতে তোরঙ্গের মত হয়ে যাবে।'

না, রসিকতা না। প্রথম থেকেই আমার ধাক্কা লেগেছিলো, হ্যাঁ, কপালেই, চটকলের ভাষায় যাকে বলে 'এক নম্বর,' খোদ মালিকের সংগে। অবশ্য তোরংগের মত ফুলে জয়ঢাক হয়েছিলো অনেক পরে।

মালিক আসতো কলকাতা থেকে বি· টি· রোড ধরে গাড়িতে চেপে। ফটকের সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই সর্দার রামলক্ষ্মণ ফোনে বড়বাবুকে জানিয়ে দিতো, 'হুজুর, এক নম্বর আ গে'। বড়বাবু মিলে মিলে সংগে সংগে সেটা রটিয়ে দিতো।

তখন আমি কাজ করি মেজারে 'সোনার দোয়াত-কলমে।' সোনার দোয়াত-কলমই বটে। হরি বাঙাল, যে আমাকে কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিলো, সে ওরকম বলতো। আমাকে ফ্যা ফ্যা করে এখানে-ওখানে ঘুরতে দেখে একদিন বলেছিলো, 'কাজ করবি সোনার দোয়াত-কলমে?'

রাজী হয়েছিলাম। সোনারই হোক আর রং-চটা পেতলেরই হোক যে কোন 'দোয়াত-কলমে' আমি তখন কাজ করতে রাজী।

ঢুকে ত' তাজ্জব। আমার কাজ হচ্ছে একটা লম্বা বেত প্রকাণ্ড বড়ো দোয়াতে ডুবিয়ে কালি মাখিয়ে বস্তায় মার্কা মারা। একেই ঠাট্টা করে হরি বাঙাল নাম দিয়েছে সোনার দোয়াত-কলম।

হরি বাঙাল বলতো 'ওরে আসছে। বড়বাবুর খবর। বাবারা একটু সামলে-সুমলে।'

মালিক এ-মিল ও-মিল ঘুরে আমাদের মেজার ডিপার্টমেন্ট-এ ঢুকলেই আমি সোজা দাঁড়িয়ে দু'হাত জড়ো করে যেমন করে গুরুজনকে নমস্কার করা উচিত ঠিক তেমনি করে নমস্কার করতাম।

লক্ষ্য করতাম মালিক প্রত্যেকবারই কপালে একটা পেনসিল ঠেকিয়ে আমার নমস্কারের একটা সংক্ষিপ্ত জবাব দিতো। আমার ভদ্দরলোকের ঠান্ডা, বাসি রক্তও হঠাৎ পাটের ফেঁসোর মত দপ করে জ্বলে উঠতো।

এমনি দু'-চারদিন যেতে না যেতে ফের একদিন যখন আমার দু'হাত তুলে নমস্কারের জবাবে উনি কপালে রোগা আর লম্বা পেনসিলটা ঠেকিয়ে অসভ্যের মত কাজ সারলেন তখন আমি বোমার মত ফেটে পড়লাম।

'আপনি কি করে ভদ্দরলোককে নমস্কার করতে হয় জানেন না? আমি আপনাকে হাত জোড় করে...আর আপনি কপালে একটা পেনসিল ঠেকিয়ে......

এতো রাগ আমার কোথায় ছিলো জান না। আমি চুল্লীর ভেতরকার আগুনের মত খাঁটি রাগে টগবগ করে ফুটতে লাগলাম।

'হাঁ!' মালিক সুরজ গোয়েংকার মোটা আর জাঁকালো অহংকারী ভ্রূ দুটো প্রথম চোটে কুঁচকে গেল, তারপর উনি যেন একটা আজব চিড়িয়া দেখছেন তেমনি করে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন।

সংগে সংগে আমার সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে, জামাটা খুলে ফেলে, বুকের ওপর বিছানো মোটা, সাদা, ধবধবে পৈতেটা ছুঁয়ে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমার গলায় যতো জোর ছিলো সমস্ত জোর এক করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'আপনি আমায় দুঃখী লোক বলে অপমান করছেন। কিন্তু ভগবান আপনাকে কখনো ক্ষমা করবেন না, কখনো না, কখনো না।'

এর পর সংস্কৃতে কি সব শ্লোক-টোক বলেছিলাম মনে নেই। কিন্তু আমার ঐ সাদা, মোটা ধবধবে পৈতে আর সেই পৈতে ছুঁয়ে অভিসম্পাতে কাজ হয়েছিলো। মালিক খুব ভারি আদমী হলেও স্পষ্টই ঘাবড়ে গিয়েছিলো। মুহূর্তে হেসে আমার কাছে এসে পিঠ চাপড়ে আমাকে শান্ত করতে করতে বলেছিলো, 'হাঁ, হাঁ। আপ ত' পুত অগ্নি।'

তারপর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে, বড়ো করে নিশ্বাস নিয়ে, দুর্বল ফুসফুস ভরিয়ে, ভারি আর গম্ভীর গলায় বলেছিলো, 'এইস্যা আদমিই হাম মাংগতা হ্যায়। ডরপুক আদমি কো হাম...ঠিক হ্যায়। কেয়া নাম আপ্‌কো জী?'

ওপার থেকে আমরা আসতাম গংগা পেরিয়ে 'চটকলিয়া' বাবুরা। ঐরকমই নাম ছিলো আমাদের প্রত্যেকের। এপারের লোকেরা ঠাট্টা করে আজো যারা মিলে একটু-আধটু লেখাপড়ার কাজ করে তাদের 'চটকলিয়া বাবু' বলে।

এ এক অদ্ভুত জগৎ। আমাদের ওপারের জীবনের সংগে এর কোন মিল নেই। ছাইগাদায় আমাদের মিলের নৌকো পৌঁছতে না পৌঁছতে একটা দুর্বোধ্য গোঁ গোঁ শব্দ কানে এসে লাগতো। সেই থেকে শব্দটা আমাদের

পেছনে লেগে থাকতো। আমরা চলেছি। শব্দটা আগে আগে চলছে। আমরা যতো আগে আগে যাচ্ছি ততো শব্দটার শক্তি বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। সামনেই কাগজের কলের বিরাট উঁচু পাঁচিল দেওয়া বাঁশের পাহাড়ের গুদোমঘর। তারপরই মিলের ব্যাকডোর দিয়ে চলে যাওয়া রেল লাইন। লাইনের ওপর ভূতগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে এধারে-ওধারে দু'-একটা ওয়াগন কখনো কখনো। ওটা পার হয়ে কাঁচা সড়ক। এ সড়কটাও অদ্ভুত। মাটিরই বটে কিন্তু কয়লার গুঁড়ো আর ধুলো আর চিমনীর ধোঁয়া পড়ে পড়ে এটার একটা মরচেধরা চেহারা। রাস্তার মাঝ-খানেই মাদারিওয়ালা তার কিম্ভূত ডুগডুগি বাজিয়ে লোক জড়ো করে ফেলেছে, দু'টো খোকড়াপরা হনুকে রোজ রোজই শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছে।

সাপ-আঁকা দাবাখানা, টালি ছাওয়া চা-খানা এসব পেরিয়ে পাকা সড়ক বি টি রোড লম্বালম্বি অজগরের মত

ইউবিআই গিফ্‌ট চেক

শুভ পরিণয়, জন্মদিন, নববর্ষ, শারদীয়া পূজা, দেওয়ালি, বড়দিন, ঈদ কি অন্য যে কোনো উপলক্ষে প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন ইউবিআই গিফ্‌ট চেক। দেখতে ভারি সুন্দর—চেক ও চেকের ফোল্ডার দুটিই নজর কেড়ে নেবে।

ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকলেও চেকে আপনি সই করতে পারবেন।

এবার থেকে উপহার দিন ইউবিআই গিফ্‌ট চেক।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : ৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি, কলিকাতা-১
(৫, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট)

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

এইবার অতিকায় চুরুটের মত চিমনীটা নজরে আসবে। এটা ধোঁয়া ছাড়ছে।

যতে মিস্তিরি বিচ্ছিরি মুখ খারাপ করে বলতো, 'এ শালা ধোঁয়ার আর শেষ নেই'......

বাইস ঘরের ক্ষণে বলতো, 'সেই সৃষ্টির আদি থেকে, ভগবানের লীলা'... আদিমকালের একটা নর্দমা, সামনে কালিঝুলি মাখা আবর্জনাস্তূপের মত বস্তি, তার পাশেই খেলুড়েদের খেলার আসর, কোমরে ঘুনসি-পরা, ন্যাংটো হতভাগা একটা ছেলে, বুকের পাঁজরা তার টান, সে বলছে, 'এইসা মাফিক সাথী, এইসা মাফিক উরহ খাড়া হুয়া। আউর উন্‌কে মুহসে ঝলক্ কর আগ নিক্‌লা। হাঁ, ময় আপ্‌না আঁখো সে'......

'আরে বাউরে!' অন্য ছেলেগুলো, কপালে বিস্ময়ের উল্কি, ওরা বলছে, 'মুহ সে আগ জ্বল রহি হায়, আরে বাউরে!'

অস্পষ্টতার কিছু ছিলো না। বুঝলাম আমার সেদিনের সেই ব্যাপারটা গল্পের আয়তন পেয়েছে। ডিউটির সময় যখন এক নম্বর, দু' নম্বর মিলে যেতাম তখন অনেকেই সম্ভ্রমের সংগে বলতো, 'গোর লাগি বাবা, গোর লাগি সাধুজী।' লম্বা পৈতে আর দাড়ির মহিমায় 'সাধুজী'।

টিফিনের সময় কোন চা-খানায় ঢুকলে সেখানকার তুমুল হৈ-চৈ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যেত। যখন নিঃশব্দে চা খেয়ে বেরিয়ে আসতাম তখন পেছনে একটা গুঞ্জন উঠতো, বলা বাহুল্য, সেটা আমাকে নিয়েই।

যে হিন্দুস্থানী আয়া বড় সাহেবের 'কোঠি' আর অন্য 'অপসর'-দের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নৌকো করে ব্যাণ্ডেল চার্চের ফিরিংগীদের স্কুলে যেত আসতো, তাকে একদিন দেখলাম কাঠের সেই ঘেরাটোপটার মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে পাঞ্জাবী দারোয়ানের পাশে বসে পেয়ারা খাচ্ছে। সেটা কথা নয়। আমাকে দেখামাত্র আয়াটাকে সরিয়ে পাঞ্জাবী দারোয়ানটা কাঁচুমাচু হয়ে সটান দাঁড়িয়ে কড়া এক স্যালুট করে দিলো। আয়াটা লজ্জায় এতোটুকু হয়ে চোখ নত করে বিড়বিড় করে বললে, 'গোর লাগি বাবা!'

বুঝলাম সেদিনের সেই ব্যাপারটা আমি যে অর্থে নিয়েছিলাম এরা ঠিক সে অর্থে নেয় নি। সম্পূর্ণ নতুন আরেক অর্থ এরা খুঁড়ে বার করছে, তাতে এনেছে অন্য ধরণের তাৎপর্য, ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত গতিতে ওদের জীবনের ধারাটাই যেন বদলে যেতে চাইছে।

আই বাপ, খোদ মালিক কে না যে এই এ্যাতোবড়ো কারখানা, ঐ ধোঁয়াচ্ছন্ন অতিকায় চিমনী, বিরাট বিরাট মেসিন, কারখানার পেছনে গংগার ধারে জেটির গায়ে লাগানো প্রকাণ্ড ক্রেন এ সবের মালিক। কারখানার হাজার হাজার সফেদ পিরানপরা বাবুলোগ তাকে দেখামাত্র সম্ভ্রমের সংগে দাঁড়িয়ে ওঠে। একেবারে খাঁটি বুলডগ লালমুখো আংরেজলোক সেলাম বাজায়। যেন এক আজব ভেল্‌কীওয়ালা যে চতুরাই সে বাঁড় দৌলত বানিয়েছে। নাটা, সাদা-সিধে দেখতে এক শুক্‌নো বুড্‌ঢা, গাল-তোবড়ানো, যার দিনের শেষে বস্তির ধারে মুখে গুল টিপে চুপচাপ বসে থাকা উচিত, অথবা খৈনী ডলতে ডলতে খাটিয়ায় পা দোলালে যাকে অনায়াসে মানায়, কিন্তু তার বদলে শালালোগ তোবড়ানো গালে খালি চুষে বেড়ায়. চেহারাটা দিনকে দিন যতো শুকিয়ে আমসি হচ্ছে ততোই চুষে বেড়ানোটা বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে, এক আজব চুষনেওয়ালা হাজার হাজার লোককে সিরিফ চুষে ছিবড়ে করে দিচ্ছে।

সেই আমীর মালিকের বিরুধে লোকটা শুধু খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো না, তাজ্জব কি বাত, রুখে দাঁড়ালো, তার চোখ থেকে ছড়িয়ে পড়লো ফার্নেসের আগুন, শালা মালিকের সাইকেলের ভালটিউব আল্‌গা করে দিলো, এ কি কম কথা! ওদের সারা জীবনে এমন একটা ব্যাপার এরা তখনো দেখে নি। কারখানার দুঃখী মানুষেরা ক্রমে ক্রমে আমার কাছে জুটতে লাগলো।

বহুদিনের বহু অন্যায় যা জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে, সেই সব বুক খালি করে বলতে বলতে ওরা হু হু করে কেঁদে ফেলতো। চোখ দুটো কিসের আশায় পাটের ফেঁসোর মত দপ করে জ্বলে উঠতো মাঝে মাঝে।

'আভি দেখিয়ে কই শুনাই নাহি হোতা হ্যায়। সব বাবুলোগ, অপসর, সব জালিম। মেরা ইজ্জত ভি'...

কেউ কেউ বলতো, 'ঐ শালা পরমানন্দ ঝা, হাম্‌কো শয়তান কাম দেলাসেকে লিয়ে দু'শো রোপেয়া......দেখিয়ে'......

'কব আয়েগা উস দিন', ওরা বলতো আর হু হু করে কাঁদতো, 'জিস দিনোমে ভূখা মজদুরকো কুছ খানেকো মিলি, বেগার ইলাজ মে কেউ মরবে না, মা, বাহিন পেটকে লিয়ে আপ্‌না ইজ্জত বিক্রি করবে না, কবে সে সব হবে, কবে, কবে'...

আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি এসব কিছুই জানতাম না। আমি ওদেরই মত এখানে একটা কাজ করতে এসেছিলাম। হঠাৎ কেমন করে যেন ওদের সংগে জড়িয়ে গেলাম, আমি নাড়ু পুরুতের ছেলে, হুগলীর এঁদোগলিতে বসে হঠাৎ একটা বড় জীবনের ডাক শুনতে পেলাম।

ওদিকে যখন কারখানায় আমাকে ঘিরে লড়াই-এর নতুন ছক তৈরি হচ্ছে তারও অনেক আগে থেকে, বিয়ের দু'-তিন মাস পরই, আমার ঘরেও চলেছে এক নিঃশব্দ যুদ্ধ, দ্বিধাহীন, কুটিল সেই ভয়ংকর যুদ্ধে আমরা ক্রমশ পরস্পরের কাছে নির্লজ্জ হয়ে যাচ্ছি। চটকল থেকে যে নতুন শক্তি ফুসফুস ভরে নিয়ে আসতাম, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সেই শক্তি শূন্য হয়ে যেত। সে সময় এমন একটা দিনও আমি হারাই নি যেদিন যুদ্ধ না করে কেটেছে। আর আমি তিলে তিলে শেষ হয়ে গেছি।

ওপার থেকে মাথায় পাটের ফেঁসো জড়িয়ে, আমরা, চটকলিয়া বাবুরা যখন গংগা পার হয়ে আমাদের এপারে এসে পৌঁছতাম তখন থেকেই আমার সমস্ত প্রিয় জিনিষের শত্রুদের আমি দেখতে পেতাম।

শেষ বিকেলে গলির ভেতর এক-একটা ধাপিতে পর পর তিনজন বুদ্ধকে রোজ দেখতাম। বুদ্ধরা যেমন দেখতে হয় তেমন ওরা ছিলো না।

ওরা চুপচাপ রাস্তার ধারে বসে থাকতো খালি গায়ে। ঘোলা চোখে এক অদ্ভুত নিঃসংগতা। মুখের প্রত্যেক ভাঁজে যেন মৃত্যু তার শিল্প ছড়িয়ে দিয়েছে। ওরা যেন অনেক দূর থেকে আসতে আসতে এই শেষ বিকেলে এসে হঠাৎ নিশ্চিতভাবে শূন্য হয়ে গেছে।

আর দেখতাম রাস্তার কুকুর। ওরাও সংখ্যায় তিনজন। একটার ল্যাজ মাটিতে পড়ে থাকতো। একটার গোটানো আর একটার খাড়া। ল্যাজের দিকে যতোই অমিল থাক মুখের দিকে সকলেরই এক আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করতাম। প্রত্যেকটা মুখই হিংস্র। প্রত্যেকটা মুখই যেন কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। ওদের তীব্র ঠোঁটে স্পষ্ট ছিলো রক্ত।

ভিজে, স্যাঁৎস্যাঁতে দু'পাশের ময়লা, চুন-বালি খসা বড় বড় বাড়ি পেরিয়ে সেই গলির এক প্রান্তে নিজের ঘরে এসে উঠতাম। কিসের এক আতংকে আমার নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে কষ্ট হত।

কেন না আমি জানতাম এ দিনটাও ফাঁক যাবে না। ইঁট পাতা উঠোনটা পেরিয়ে এলেই বুকচাপা সেই ঘর। তখন

সেই সময় যখন বিকেলটা ফুরোতে গিয়েও ফুরিয়ে যায় নি একবারে। আকাশের বোঁটায় তখনো কোনরকমে একটু লেগে আছে। জানলার মরচেপড়া লোহার গরাদ দিয়ে ঢুকে পড়েছে ম্লান, বেলা শেষের চোরাই আলো। আর সে আছে শুয়ে স্তূপাকার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে। তার পিঠের কাপড় খুলে গেছে। মুখ দেখা যায় না। সমস্ত ভংগিতে এক শান্ত অসন্তোষ।

ঘরে ঢুকতেই, 'লজ্জা করে না তোমার?' তার মুখে এই শব্দ। সে মুখ দেখেই আমার মনে হত এ আমি ভুল করে কোন হিংস্র জংগলে ঢুকে পড়লাম। গলির সেই কুকুরগুলোর মুখও মনে পড়তো বোধহয়। চুপ করে থাকতাম। অস্ত্রহীন আমি কোনদিক থেকে আক্রমণ আসবে বুঝতে পারতাম না।

'একদিনও কি হাতে করে কিছু একটা আনতে নেই? অন্তত সিনেমার দুটো টিকিট?'

কেন আমি কিছুই আনতে পারি না, সিনেমার দুটো টিকিটও না, তা' কতোবার আমি বলবো? সুতরাং চুপ-চাপ থাকি।

'তুমি যদি আমার না নিয়ে যাও সিনেমায়, তবে আমি একাই চলে যাবো এবার থেকে।'

'বেশ যেও।' আমার কাঁধের পাশ থেকে ক্লান্ত হাত দুটো ঝুলে পড়তো তখন।

'যাবো ত'? তখন কিছু কিন্তু বলতে পারবে না।' যেন যুদ্ধে জিতে একটা সাংঘাতিক কিছু সুবিধে পেয়ে গেছে এমনি ছিল ওর ভাব, যেন এরই জন্যে স্তূপাকার চুলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ওর তীব্র; অসন্তুষ্ট প্রতীক্ষা।

'ছেলে দুটোকে দেখছি না।'

'ওরা ওপাশের বাড়ির পরেশবাবুর কাছে গেছে।'

আমার মুখের ওপর কালসিটের দাগটা তখন আরো গভীর হ'ত।

সংগে সংগে ও রাক্ষুসীর মত হেসে উঠতো, 'আমি যখনই জানলায় দাঁড়াই তখন ও আমাকে একদৃষ্টে দেখে।'

আর আমি না ভেবে পারতাম না একদিন ও ছিল পাতায় ঢাকা, ছায়াচ্ছন্ন। তখন ওর ফুল ধরবার কাল। ওকে হুগলীর আর এক গলিতে আবিষ্কার করেছিলাম। বারান্দায় দাঁড়ানো সেই মেয়ে একদিন বিকেলের পড়ন্ত আলোয় আমায় নেশা ধরিয়ে দিলে। সেদিন ও ছিলো আর আমি ছিলাম। মাঝ-খানে ছিলো না আজকের মত বিষণ্ণ দিনগুলি। সেদিনো কুকুরগুলো আমার নজরে পড়তো। কিন্তু আজকের মত আগ্রহ নিয়ে কুকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁত খুঁজতাম না

'একদিন লাথি মেরে তোমার সংসারে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো।'

আমি ওর দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতাম, ওরই দিকে, সিঁদুর মাথানো পবিত্র ঠোঁটের দিকে, অমন সুন্দর মুখটা যার বেঁকে-চুরে গেছে, মুখ দিয়ে যার খালি বয়ে যাচ্ছে অনর্গল নর্দমার জল, যেখানে বিষাক্ত পোকা উড়ছে।

মন উদাস হ'লে এক-একদিন গান গাইতো পরেশবাবু। আমি জানলা বন্ধ করতে যেতাম।

'জানলা বন্ধ কোরো না।'

'কেন?'

'লোকটা বুক খালি করে গাইছে।'

'বুক খালি করে?'

'হ্যাঁ। আমার মত।'

'তুমি ত' গান গাও না।'

'গাই। আমার কপাল। তুমি শুনতে পাও না।'

...ঢোলডগরে ঘা পড়েছে। হঠাৎ যেন সর্বনাশের আগুন লেগে আকাশ লাল হয়ে উঠলো। কারখানার মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠলো অসংখ্য নামগোত্রহীন মানুষ। ক্ষিপ্রগতিতে ওরা ইতিহাসের মঞ্চ দখল করতে চলেছে।

ম্যানেজার এক নম্বর মিলের দশ-জন স্পীনারের হাতে চার্জসীটের কাগজ পাঠালো। ওরা হাত দিয়ে ছুঁলো মাত্র। চোখে তাকিয়ে দেখলেও না। হো হো করে হেসে সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে বেকুব করে দিয়ে এগুলো সব ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফুঁ দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলো। তার ঠিক পরের দিন স্পীনাররা এসে দেখলে মেসিনের গায়ে চার্জসীটের নোটিশ লটকানো। সেদিন ওরা আর হাসলে না। গম্ভীরভাবে নিজেদের মধ্যে গুজুর গুজুর করলো। কিন্তু ডিউটির বেলায় ঠিক করে গেল। ম্যানেজার তার পরের দিন বেগতিক দেখে মোটর বন্ধ করে দিলে। স্যাফট্ আর ঘোরে না। মাকু আর চলে না। গোঁ গোঁ করা অদ্ভুত সেই শব্দটা আর শোনা যায় না। কারখানার ভেতর অন্য মিলের মজুররা একদিন মিল গেটে সভা করে এদের মদত দিলে, য'তে মিস্তিরির মাথার ওপর হাতুড়ি তুলে বললে, 'মালিক শালার বড় দাপ। শালাকে আমকাঠে তুলতে হবে।'

ওরা পালা করে এক এক দল মেসিন দখল নিয়ে বসে রইলো। অন্য দল চলে যায় বস্তীতে, হোটেলে খানা-পিনা করতো। সে এক আশ্চর্য কাহিনী। আমার জীবনে এর আগে এ সব দেখি নি।

আমার সেদিনের অবস্থা কাকে বোঝাবো? একটা বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে ঘাড়ের ওপর, এমন দায়িত্ব যে যার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিলো না। এরকম গোলমালে মানুষ কখনো পড়ে কি না জানি না। গালে হাত ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে বসে ভাববার সময় নেই। কারখানার মজুররা সব তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। উড়ছি এখানে ওখানে ছেঁড়া পাতার মতন। কখনো ছুটছি বস্তীর দিকে। সবাইকে জিতে যাবার আশ্চর্য গল্প বলছি। কখনো যাচ্ছি মিলের ভেতর যেখানে মজুররা মেসিনের সামনে বসে রয়েছে সিমেন্ট কামড়ে। কখনো আশপাশে মিটিং করছি। গলা ফাটিয়ে বলছি, 'চটকলে গোলামগিরি চিরকালই কি মজুর ভাইরা করে যাবে? এই চটকল একদিন দখল নিতে হবে। কিন্তু তার আগে... রুশ মে যো ইনকিলাব হুয়া আউর দুসরে ইনকিলাব যো চীন মে হুয়া .... সর্বহারা কি হুকুমৎ ... হামনে নাড়া লেখা ..... হুঁশিয়ার মজদুর .....।'

গংগা পেরিয়ে বাড়ি আসছি ঠিকই। তবে কোন নির্দিষ্ট সময় নেই তখন। যতোই অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি ঘরে ঢুকলেই একটা পোড়া গন্ধ পেতাম। বুঝতাম তলে তলে কিছু একটা পুড়ছে। কিন্তু সেদিন আমার ত' কিছুই করার ছিলো না। আমি প্রাণপণে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। সেদিন কারখানার লড়াই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো।

ও আমাকে পারতপক্ষে কিছু বলে না। ছেলে দুটোকেও সব সময় দেখি না। ওরা যেন কোথায় টো-টো করে ঘোরে। মাঝে মাঝে ওর চোখ দুটোকে জ্বলতে দেখি। ও এক একবার কাছে আসে। কিছু যেন বলতে চায়। কিন্তু আমার কোন হুঁশ নেই দেখে খাপরার আগুন খাপরাতেই থাকে। ছিটকে গায়ে এসে লাগে না।

এক অনিশ্চিত রাত্রে গংগা পেরিয়ে বাড়ি ঢুকে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে না। লেবুফুলের গাছে জোনাকি আর ঘরে আমার সেই দুটি ছেলে। বড়দের হাবভাব দেখে ওরা বরাবরই চুপচাপ। এখন এতো বেশি চুপ যে, বুঝলাম যা হবার তা হয়ে গেছে। আলো জ্বাললাম। একজনের চোখ দেখলাম খুব জ্বলজ্বলে। আর একজনের চোখ, যেন নির্জন পথ, চুপি চুপি সেখানে বৃষ্টি হচ্ছে।

ও পালিয়েছে। পরেশবাবুরই সংগে যে বুক খালি করে গান গায়। আমি কি ওকে ভালোবাসতাম? জানি না। পৃথিবীতে কি আমি শুধু হাতে এসেছি? কিছুই

কি সঞ্চয় করি নি? শরীরের একটা জায়গায় ক্ষতমুখ হয়েছে। সেখানে বিঁধেছে তীক্ষ্ণ তীর। রক্ত ঝরছে। চোখের জলে সে রক্ত ধুয়ে দেবার কেউ কি নেই? জগৎ-সংসার শান্ত সেদিন। আমাদের এই গলি স্তব্ধ, নিশ্চুপ। আকাশে কয়েকটি তারা একা একা জ্বলছে।

মনে পড়লো একনম্বর বস্তীর মোতিয়ার কথা যাকে আমি নানী বলে ডাকি। আর এক মুহূর্ত এখানে না। সেই রাত্রেই গংগা পার হবে আমার দুটি ছেলেকে মোতিয়ার আস্তানায় রেখে দিলাম। ব্যস্। এইবার আমি মুক্ত। আর কোন ঝঞ্ঝাট নেই। এতোদিন লড়েছি একজন হয়ে। এবার লড়বো দু'জন হয়ে। এতোদিন একচোখে ছিলো আক্রোশ। এই-বার অন্য চোখে এলো বিতৃষ্ণা। যেটুকু ভদ্রলোকের গুঁড়ো গায়ে লেগেছিলো এবার সেটুকুও গেল। আমি এইবার পুরোপুরি মজুর বস্তীতে ডেরাডাণ্ডা পেতে, ওদেরি বস্তীতে ছেলে দুটিকে মানুষ হতে দিয়ে, ওদের গায়ে গা দিয়ে সোজাসুজি লড়াই-এ নেমে এলাম। এখন আমায় পায় কে। এখন আর মজুররা আমাকে 'গোর লাগি বাবা, সাধুজী, গোর লাগি', বলে না। এখন রামকিষণ অক্লেশে কাঁধে হাত দিয়ে বলে, 'ম্যয় শোচ্‌তা হুঁ কি......'; ছবিলাল অনায়াসে আমাকে বলে 'দোস্ত'। আমিও বেঁচেছি। ওদের চোখে সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যে অযথা কতকগুলো বখেরা জুটিয়ে নিয়ে জীবনটাকে জটিল করে তুলেছিলাম। জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে এইবার জীবনের খোলা হাওয়ায় পাল তুলে দিলাম।

যতোদিন লড়াই চলছিলো ততোদিন কিছু বুঝতে পারি নি। কিন্তু কোন-কিছুই অনির্দিষ্টকাল চলে না। তেমনি লড়াইও চলল না। একদিন সেটা থামলো। জিতলাম আমরা। আশ্চর্য, তখন মনে পড়লো ঘর। যে ঘর ওপারে গংগা পেরিয়ে। যেখানে আমি তালা ঝুলিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম যেখানে আর কোন দিন ঢুকবো না।

অনেকে আমাকে অনেক বোঝালে। আমার বুকের মধ্যে তখন কান্না। আমি কি বুঝবো? ঘরে ঢুকেই তাই প্রথমেই চোখে পড়লো বেহালাটা যেটা বিয়ের দু'-তিন মাস পর থেকে আর বাজানো হয় নি। ধুলো ঝাড়লাম। আদর করে কোলে এনে বসালাম। গাটা কেঁপে উঠলো। এ আমি কাকে ছুঁলাম? একদিন যে বিকেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার ফুল ফোটবার দিনে আমাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলো আর তারপর সারাজীবন যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, এই কি সেই? আমার চারপাশের অন্ধকারকে কাঁদাবার জন্যে আমি ছড়েতে টান দিলাম। তারপর প্রতিদিন বাজাতাম। লোকে নাকি বলতো, 'লোকটা বাজনা বাজায় না। লোকটা কাঁদে।'

...ম্যানেজার একদিন আমাকে ডেকে পাঠালো। গিয়ে দেখি মালিক সুরয গোয়েঙ্কা সেখানে বসে আছে। আমি যেতেই মালিক কলরব করে উঠলো। আমি জানি সেদিন আর নেই আমার। আমার পেছনে আছে সমস্ত কারখানা। গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মালিক আমাকে বার দু'-এক বসতে বলায় বসে পড়লাম।

ম্যানেজার বললেন, 'সুরযবাবু দিল্লীতে দু'-চারদিন ছিলেন। সেখানকার পার্লামেণ্টে আমাদের জুটমিলের খুব বদনাম শুনে এসেছেন। পার্লামেণ্টের মেম্বররা নাকি বলেছেন, তোমার মিলে রেশন ডিপার্টে ঘুষের রাজত্ব। সেই শুনে উনি খুব মুসড়ে পড়েছেন।'

'তা আমাকে কি করতে হবে?'

মালিক তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, 'আপনি খুব ইমানদার লোক। যদিও লক-আউট নিয়ে আপনার সংগে আমাদের একটা, সে যাক, কিন্তু আপনি সাচ্চা লোক, সুরয উলট্ যায়গা লেকিন আপ ঘুষখোর নহি হো শক্তা।'

এ কথার কি উত্তর দোব? একটু ভালোও লাগলো। শত্রুও তাহলে প্রশংসা করছে? হায়, তখন ত' জানতাম না এ ভালো লাগাটাই আমার কাল! তখন ত' জানতাম না এরপর যেখানেই পা রাখবো সেটাই কেউটের গর্ত।

'তাই আমরা ঠিক করেছি আপনি একটু রেশন ডিপার্টটা মেহেরবাণী করে দেখুন। ঘুষখোরিটা একদম বন্ধ করে দিন। এও ত' দেশের কাজ। বদমাস অফিসাররা মজুর ভাইদের রক্ত চুষে নিচ্ছে।'

'সে ত' ঠিক।' আমি বললাম, 'কিন্তু সেই সব অফিসার কি আমাকে ছেড়ে দেবে? এসব ব্যাপারে একটা 'চেন' কাজ করে। আমার জীবনের সিকিউরিটিরও ব্যাপার আছে।'

'হাঁ হাঁ। উ ত' ঠিক বলিয়েছেন।' মালিক গোঁফে তা' দিয়ে বললেন, 'আপনার যখন যা' লাগবে তখনি তা' পাবেন। ম্যানিজার সাহাব—'

ম্যানেজার সংগে সংগে বললেন, 'খুব ভালো হল। জানতাম আপনি রাজী হবেন। আপনার মত সচ্চরিত্র লোকেরই দরকার। কোন ভয় নেই। আপনি সরা-সরি আমার চেম্বারে চলে আসবেন বিনা এত্তেলায়। আমার রেসিডেনসিয়াল কোয়া-র্টারের ফোন নম্বরটা টুকে রাখুন।'

রামবিলাস, ছবিলাল সব শুনে বললে, 'লেকিন দোস্ত, তোমাকে মানা করছি না, কিন্তু এর মধ্যে একটা গোলমাল—'

আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম ওদের গোলমেলে চিন্তা। ওরা কিছু বলল না। হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রেশন ডিপার্টমেণ্টের কাজকর্ম দেখি। ঘন ঘন ফাইল নিয়ে বিভিন্ন অফিসারের কাছে যেতে হয়। অফি-সাররাও আমাকে খুব খাতির করে। ম্যানেজারের কাছে যাই। ম্যানেজার খুব উৎসাহ দেয়। মালিক ত' একদিন পিঠ চাপড়েই দিলো, 'হামি ত' জানি আপনি খুব এলেমদার ছোকরা।'

কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি না ছবিলাল, রামবিলাসদের কাণ্ডকারখানা। ওরা আর আমার সংগে হেসে কথা বলে না আগের মত। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে মিল গেটের সামনে খাটিয়ায় বসে। কিংবা মিলের মধ্যে 'গরম পুকুর'-এর ধারে, আমি গেলেই স্পষ্ট বুঝতে পারি, ওরা কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। আমি আর থাকতে না পেরে রামবিলাসের কাঁধে একটা থাপড় মারলাম, 'কি হয়েছে?'

রামবিলাস ওর রূঢ় দেহাতি উচ্চারণে কর্কশ গলায় এমনভাবে 'কুছ নহি' বলল যে আমি অবাক হয়ে ওর চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। ওর চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে উঠলো। বেশিক্ষণ তাকাতে পারলাম না। অপরাধটাকে খুঁজে না পেলেও নিতান্ত অপরাধীর মত মাথা নিচু করে চলে এলাম। অবশেষে একদিন প্রাণান্তকর চেষ্টার পর কতকগুলো 'কেস' ধরা পড়লো। ম্যানেজারকে দেখালাম। ম্যানেজার সব দেখেশুনে বললেন, 'সবই ত' বুঝলাম কিন্তু এগুলো যে জেনুইন তা' কেমন করে জানবো?'

'পরমানন্দ ঝা কি রকম লোক তা' ত' আপনি জানেন।'

ম্যানেজার হাসলেন, বললেন, 'কিন্তু প্রমাণটা কোথায়?'

'কেন, এসব।' বলে বিরক্ত হয়ে কতক-গুলো কাগজপত্র আগিয়ে দিলাম। ম্যানে-জার চোখেও দেখলেন না। হাসলেন। হেসে বললেন, 'আরো ভালো করে খুঁজুন। ওতে হয় না মশাই।'

রেশন ডিপার্টমেণ্টের অফিসাররা আমাকে মুখে খুব খাতির করলেও যে একটা পিঁপড়ের সামিলও মনে করে না সেটা পর পর কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনায় বুঝলাম। ম্যানেজারকে গিয়ে বলাতে ম্যানেজার সেদিনের মতই সুন্দর হাসলেন, সব দাঁতের সংগে তাঁর বাঁধানো ঝকঝকে সোনার দাঁতটিও প্রতিদিনের মত চোখে পড়লো।

বললেন, 'কি আর করা যায়। টেক্টফুলি সব ম্যানেজ করুন। এসব ছোটোখাটো জিনিস মাথে রাখবেন না।'

মায়েরা !

যেকোন
মামুলী ট্যাল্ক আপনার শিশুর
পক্ষে ভালো এই যদি আপনার ধারণা হয়...

তাহলে
ব্রাডোসল
সম্বন্ধে আপনার
জানা দরকার

বিনাকা
বেবী পাউডার

একটি সিবা উৎপাদন

মাঝারি সাইজের দাম (১০০ গ্রাম) টা. ৩·৫৫. স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

INTERPUB/CBP/

'কিন্তু আমার ডিকটেশন যে অগ্রাহ্য করছে।'

'তাই নাকি!' ম্যানেজার খুব যেন মুসড়ে পড়লেন, বিমর্ষভাবে বললেন, 'তাহলে কি করা যায় বলুন ত'? আপনিই একটা উপায় বাৎলান।' আমি খুব বোকা নই। বুঝলাম জালে পড়েছি। ওদিকে রামবিলাস আর ছবিলালেরা আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে আর এদিকে এরা আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিচ্ছে। ভাববার সময় ছিলো না। ইতিমধ্যে, ঠিক সেই সময়, বিহারে খরা। বিহার থেকে হাজার দু'-এক লোক এসে জুটলো জুটমিলে। ওরা বদলি খাটবে। এমনি সময় অনেকেই হোটেলেই খায়। কিন্তু চালের দর চার টাকায় চলে যাওয়ায় হোটেলের চার্জও বেড়ে গেছে। অতএব ওদের প্রত্যেকেরই 'কার্ড' চাই। ওরা লেবর অফিসারকে গিয়ে ধরলো। লেবর অফিসার ম্যানেজারের কাছে যেতে বলল। ম্যানেজার দেখিয়ে দিলেন আমাকে। আমি কি করি।

ম্যানেজারকে বললাম, 'দু' হাজার লোকের কার্ড এক অসম্ভব ব্যাপার। কি করে হবে?' ম্যানেজার সহাস্যে বললেন, 'দেখুন না চেষ্টা করে। আপনি ত' অসাধ্য সাধন করতে পারেন মশাই!'

বিহার গ্রুপ বুঝলো না। ওরা আমাকে যেখানেই পায় সেখানেই চেপে ধরে। ওদের কেমন ধারণা হল এই লোকটাকে যদি গলা টিপে ধরা যায় তবে ও একদিনে একশোটা ডিম দেবে। ক্রমশই বুঝতে পারছিলাম একটা চরম পরিণতি এগিয়ে আসছে। মালিক আর আগের মত পিঠ চাপড়ে দেয় না আদর করে। ম্যানেজার চতুর হেসে চলে যায়। অফিসাররা মজা দেখে। বুঝতে পারছিলাম। সবই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু যে জালে সাধ করে পড়েছি সেটা ছাড়াবার তখন আর কোন রাস্তা নেই। পিঠের দিকে রামবিলাস আর ছবিলালদের যে দেয়ালটা ছিলো সেটা কখন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

একদিন অফিসে বসে কাজ করছি এমন সময় পরমানন্দ ঝা বিহার গ্রুপের সেই দু'-চারজন লোক-কে সঙ্গে নিয়ে 'আমি নাকি বলেছি ও মদ খায় অফিসে বসে বসে' এ কথা বলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রোজই ম্যানেজার নির্দিষ্ট সময়ে আসেন। সেদিন তখনো আসেন নি। যখন এলেন তখন এক দলা রক্ত মেখে কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আমি বসে আছি। ম্যানেজার এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমার জন্যে। আমাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে চাইলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম, 'আমাকে হাসপাতালে পাঠাবার আগে ঐ লোকটা, ঐ পরমানন্দ ঝাকে মিল থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করুন। ও মিলের চালু নিয়ম ভেঙেছে। অফিসের ভেতর ঢুকে আমাকে মেরেছে।'

'তা' কি করে হয়। ওর একটু-আধটু দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু ও মিলের পক্ষে অপরিহার্য।' ম্যানেজারকে এই প্রথম দেখলাম না হাসতে। ওর মুখ কঠিন, অবিচলিত ছিল।

'লোকটা মজুরদের চুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে, একথা একদিন আপনি বলে-ছিলেন!'

'বলেছিলাম? তা হবে। ঠিক ঐ কথাটাই এখন মজুররা আপনার সম্বন্ধে ভাবে।' ম্যানেজার চলে যেতে যেতে বললেন, 'খোঁজ নেবেন।'

না। খোঁজ নেবার কিছু নেই। অতোটা না হোক মজুররা যে আজ আর আমাকে বিশ্বাস করে না তা' আমি দিনের পর দিন টের পাচ্ছি। ঘন ঘন অফিসার, মালিক, ম্যানেজারের ঘরে যাওয়া, তাদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস, অফিসারদের সঙ্গে খানাপিনা ওরা সহজ মনে নেয় নি। তাছাড়া আসল লড়াই থেকে আমি দূরে চলে গিয়েছিলাম ঘুষ বন্ধ করার অদ্ভুত জট পাকানো অন্য লড়াইয়ের জন্যে। রাগে আমার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছিলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেললাম দীর্ঘ একটা রেজিগনেশন লেটার। আর সেটা নিয়ে ম্যানেজারের সুইংডোর ঠেলে ঘরে গিয়ে কম্পিত হাতে সাবমিট করলাম। ওখানে তখন মালিক ও অন্য অফিসাররাও ছিলো।

প্রত্যেকে তাকালো টেবিলে রাখা আমার দরখাস্তের দিকে। প্রত্যেকে এক একবার করে পড়ে ফের আবার টেবিলে পেপারওয়েট দিয়ে রেখে দিলো। কেউ কোন কথা বলছে না। অসম্ভব চুপচাপ সবাই। সকলের নীরব দৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে দরখাস্তটা যেন অসম্ভব ভারি হয়ে উঠেছে। ওদের প্রত্যেকের যেটা দেখবার ছিলো সেটা হচ্ছে হাত। মসৃণ, ফর্সা, নীল শিরা ওঠা হাত। আঙুল। আঙুলের নখগুলি সুচারুভাবে কাটা। হাতের সমস্ত শরীর থেকে একটা রক্তাভ আভা ফুটে বেরুচ্ছে। আর আমি যেন ওদের প্রত্যেকের সেই রক্তাভ হাতের তালুর নিচে যে লুকোনো ছুরি আছে সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলাম। ম্যানেজার অকস্মাৎ বললেন, 'তাহলে'... অফিস সুপার বললেন, 'আপনি ত' আর এখানে কাজ করতে পারবেন নাই মনে হয়'. মালিক মুখে একটা অদ্ভুত বিদ্রূপ মেশানো শব্দ করে বললেন, 'আপনার মত এলেমদার লোক কোথায় এখন পাবো বলুন ত'। আপনাকে হারিয়ে আমাদের খুব তকলিফ—না কি ম্যানিজার সাহাব'......

এরপর আমার আর কিছুই করার ছিলো না। বুঝলাম এদের চক্রান্ত সফল হয়েছে। প্রথমে এরা গোটা মজুর শ্রেণীর কাছ থেকে অত্যন্ত কৌশলে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তারপর বিহার গ্রুপকে দিয়ে অসন্তোষ ছড়িয়েছে। তারপর পরমানন্দ ঝাকে দিয়ে উপযুক্ত সময় বুকে কোপ মেরেছে। আমি পথে এসে দাঁড়ালাম।

...কি অদ্ভুত এই জীবন! যতোই তাকিয়ে দেখি ততোই যেন বিস্ময়ের আর কূল পাই না। ওদের চকচকে ষড়যন্ত্র যেদিন আমাকে ঘাড় ধরে একা একা পথে বার করে দিলো সেদিন ভেবেছিলাম আমার জীবনের এইখানেই শেষ। সামনে দুস্তর গাঙ আর আমি দাঁড় বইতে পারি না। দুটি বাচ্চাকে আমি ডানায় মুড়ে সকাল সন্ধ্যে অস্পষ্ট গোঙানির মত কেবল ভায়োলিন বাজিয়ে চলি। আশেপাশের লোকেরা বলে, 'লোকটা বাজায় না। লোকটা কাঁদে।' কেন যে আমি কাঁদি? আমার বৌ আমাকে ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেল। নিজের ছানা দুটিও তাকে ধরে রাখতে পারলো না সে স্রোতের এমনি টান! যাদের জন্যে চট-কলে অনেক লড়াই করেছি শেষ সময় তারা আমায় ভুল বুঝলে। এখন আমি পথে নেমে এলাম। কানাকড়িও সম্বল নেই। কিন্ত বোঝা অনেক। ঐ দুটি হতভাগা ছেলে আর এই পোড়া পেট; এ আমি কেমন করে ভরাব? কে আমায় অন্ন দেবে? কোথায় এ দুর্দিনে এই বয়সে চাকরি পাব? এমন করে সকল দিক দিয়ে আর কে নিঃস্ব হয়? কেন যে আমি কাঁদি? কেন আমার এই যন্ত্রটি কাঁদে? সকাল সন্ধ্যে এই গম্ভীর কাঁদায়? সত্যিই কি অদ্ভুত এই জীবন! আবার আমি সব ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখলাম সামনে জোর তুফান আর ঐ দুটি বাচ্ছা। যতদূর দৃষ্টি যায় ওদের ততদূরই নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আবার লড়াই। তবে এ লড়াইটার ধরণ ভিন্ন। এখানেও ফেনা। এখানেও স্রোত। এ জীবন এক অসাধারণ জঙ্গী কাব্য। প্রথম প্রথম কি যে ঠিক করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একবার মনে হ'ল যা' আছে খুদকুঁড়ো তাই নিয়ে ব্যবসা করি। কিন্ত শীগগিরই বুঝলাম এ আমি পারবো না। এখানে অনেক ছলচাতুরি করতে হয়। একদিন উদভ্রান্তের মত ভবানীপুর থেকে বাসে করে আসছি। মনের অবস্থা সাংঘাতিক। কোথাও কোনো উপায় করতে পারছি না। একজন কথা দিয়েছিলো। সে কথা রাখলো না। এই রকম কলার খোলার মত ভাসতে ভাসতে আর কতদূর যাবো?

ট্র্যাফিক সিগন্যালের কাছে গাড়িটা দাঁড়াতে দোতলা থেকে হঠাৎ চোখে পড়লো ওদিকের ফুটপাথে একজন অন্ধ অ্যাংলো ব্যাঞ্জো বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে, আসছে। বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে বেজে উঠলো। সময় আর দুঃখ ভুলতে একদিন আমি ভায়োলিন ছুঁয়েছিলাম। তারপর ওর সঙ্গে ঘর বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব শেষ হয়ে যায়। মাঝে আবার ধরলাম। দেখলাম, মানুষ বেইমানি করলেও সুর কখনো বেইমানি করে না। আমি চাইলে সে এখনো আসে।' যে সুর অশ্রুত, অন্ধকার আমি তার কতোটুকু জানি। কিন্তু আমার সুরের ভেতরও কখনো থাকে হতাশা। কখনো রক্তমাখা স্বর। আমি যে নিজেকে বাজাই। তান, লয় তেমন কিছুই জানি না। কিন্তু এক সময় দিনে পনেরো ঘণ্টা রেওয়াজ করেছি। সুতরাং ভরসায় বুক বাঁধলাম।

যন্ত্রটি চামড়ার খোলে পুরে একদিন ব্যান্ডেল লোকালে চেপে বসলাম। প্ল্যাটফর্ম ছাড়বার কিছু আগে থেকেই কামরা ভরে গেল।

'কি, কোথাও ফাংশান আছে না কি?' 'তারপর, চলেছো কোথায়?' 'তুমিও ডেলি প্যাসেঞ্জার, কবে থেকে?' উৎপাতের আর শেষ নেই। সবই পরিচিত মুখ। সকলেই ভেতরের খবর জানতে চায়। জানতাম না এতো লোক আমাকে চেনে। জানতাম না সকলেরই আমাকে ঘিরে এতো প্রশ্ন আছে। সে সব প্রশ্নের মধ্যে আমার যন্ত্রটিও পড়ে। কিছুই তেমন বলতে পারি না। তা' না না করে সেরে দিই। চামড়ার থলের মধ্যেই যন্ত্রটা থাকে। ওটা আর বার করতে পারি না। এতো পরিচিত মানুষের মাঝখানে বাজাব কি করে? যদি বা বাজাতে পারি পয়সা চাইবো কেমন করে? এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? দু'-চারদিন যাবার পর বুঝলাম, এরকম করে ত' চলবে না। দিনের পর দিন আমি খালি আসা-যাওয়ার ভাড়া জুগিয়ে যাবো?

আমি ত' আরাম-জিরেন চাই নি। আমি ত' ক্ষীরখণ্ড চাই নি। চাইছি দু'বেলা দুটি ভাত। তাও কি তাহলে জোটাতে পারবো না? কিছু একটা উপায় বার করতেই হবে। একদিন মনে মনে ঠিক করে সন্ধ্যের দিকে হাওড়ায় গেলাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মাথায় পাঞ্জাবীদের মত পাগড়ি বেঁধে ফেললাম। চোখে দিলাম কালো চশমা। দাড়ি আগেই ছিল। আয়নায় দেখে নিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, এবার আমাকে কেউ চিনতে পারবে না। মনে আছে, প্রথম শুরু করি বাজাতে বিডন স্ট্রীটের একটা অন্ধ গলিতে। তখন অন্ধকার বেশ জাঁকালো হয়ে নেমেছে। দু' পাশে নোনাধরা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলো-জ্বলা বাড়ি। ছেলেমেয়েরা সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়াশুনা করছে। দূরের একটা মন্দির থেকে কাঁসরঘণ্টার অস্পষ্ট শব্দ আসছে। অফিস ফেরত বাড়ির কর্তারা নর্দমার ধারে রোয়াকের ওপর কাপড়ের খুঁটটা জড়িয়ে আদুড় গায়ে বসে মাথার ওপর টাঙানো মরচে-ধরা আকাশের তারা দেখছে। ছোট ছোট পায়রার খোপের মত ঘরে যারা থাকে তাদের বৌ-ঝিরা তোলা উনুন রাস্তায় বার করে এনেছে। ওখানে ধোঁয়ার বড়ো জাঁক। আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে যার কাছে নাড়া বেঁধেছিলাম অনেক দিন আগের সেই সুরের গুরুর নামটি মনে নিয়ে বাজনাটা আরম্ভ করলাম। হাত আর সরে না। বাজাতে বাজাতে মাঝে মাঝে থেমে যায়। গলা শুকিয়ে ওঠে। আঠায় জিভ আটকায়। কুল কুল করে ঘাম দেখা দেয়। কিন্তু বাজিয়েই চলি। থামি না। বাজাতে বাজাতে তন্ময় হয়ে যাই। বুঝতে পারি না আশেপাশে কতো মানুষ জুটেছে। চোখ বুজে বাজাচ্ছিলাম। চোখ খুলি। হঠাৎ দেখি একদল লোকের মাঝে আমি। ওখানে সবাই আছে। ছেলে, বুড়ো, বৌ সকলে। সকলে অবাক হয়ে দেখছে আমাকে। সকলে জিজ্ঞেস করছে। সেই প্রথম আমি মুখ খুললাম, কোনো রকমে বললাম, 'ওরা আমায় কারখানা থেকে বার করে দিল। ওরা দু'-চারজন লোক। কিন্তু এখানে আমি এতো লোক পেলাম।' বাস। আর বলতে পারলাম না। অনেকটা বলে ফেলেছি যেন। দম নিতে লাগলাম। 'আবার আসবেন।' ওরা বলল। কোন রকমে ঢোক গিলে বললাম, 'আসব'। তারপর সেই অন্ধ গলিটার বাইরে এসে কপাল চাপড়ালাম। অনেক দিন পর যদিও বাজাতে পারলাম আজ কিন্তু যে কথাটি না বললে অন্ন জুটবে না সেটা বলতে পারলাম কৈ?

একদিন, যখন চটকলে কাজ করতাম, তখন ধারণা হয়েছিলো আমার মধ্যে ভদ্রলোকের আর কিছুই নেই। আমি খাঁটি মজুর হয়ে গেছি। ঐ অহংকার মনে অনেকদিন ছিলো। আর আমি কাউকে গ্রাহ্য করি না। লড়াই-এর আগুন আমার সমস্ত আমিকে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে। কিন্তু জীবনের এই নতুন লড়াইয়ে নেমে দেখলাম, আমার ভদ্রতা যতোই গুঁড়ো গুঁড়ো হোক চারদিকের চাপে, কিন্তু এখনো সে একেবারে মরে নি, বিন্দু হয়েও বেঁচে আছে, এ ত' ঠিক ভিক্ষে নয়। আমি বাজাচ্ছি। তোমরা শুনছো। অবশ্য পয়সা আমি চাইছি। সেটা আমার দরকার। কিন্তু এমনি এমনি ত' চাইছি না। সুর শুনিয়ে চাচ্ছি। একে কি ভিক্ষে বলা যায়? তবু এই সরল, সাদা, সত্য কথাটি বলি বলি করতে গিয়েও এতো ঢোক গেলা কেন? কেন কেঁচোর মত গুটিয়ে গেলাম? জীবনের এ কি রঙ্গ। একটা লড়াইয়ের ভেতর কতো ছোট ছোট লড়াই। ছোট হলেও কতো তার শক্তি। আমার অস্তিত্বের শেকড় পর্যন্ত উপড়ে যেতে বসেছে। তবু আমি নির্বাক থাকছি। কিছুতেই মুখ খুলতে পারছি না। অথচ এ লড়াইয়ে আমাকে জিততেই হবে।

...তারপর কবে থেকে ঠিক আমার মুখ খুলে গেল বলতে পারি না।

এক এক সময় মনে হয় এ যেন জন্মা-বধিই করে চলেছি। কখনো অফিস-পাড়ায় গিয়ে দাঁড়াই। কখনো দাঁড়াই ইউনিভার্সিটির সামনে। আবার কোন সময় সন্ধ্যের দিকে হোস্টেলের সামনে। যারা আমাকে আজও দেখে নি আর দুদিন পরে তারাও আমাকে দেখবে। একটা স্ট্যান্ড করেছি। ওটা সামনে রেখে ওতেই আমার ঝুলিটা টাঙিয়ে দিই। কখনো বাজাবার আগে বলি। কখনো বাজনা মাঝপথে থামিয়ে বলি। কোন সময় কিছুই বলি না। স্ট্যান্ডের সামনে বড়ো বড়ো অক্ষরে পিচ-বোর্ডের ওপর লেখা থাকে আমার কথা। যার মন চায় সে আমার ঝুলিতে ফেলে দিয়ে যায়। স্ট্যান্ডে নোটেশন টাঙিয়ে আমি শুধু বাজিয়ে যাই। এ রকম বাজিয়েও তেমন চলে না। সুতরাং ট্রেনে বাজাতে হয়। এক একদিন আমার বাজনা শুনে আমাকে এখানে ওখানে লোকে নিয়ে যায়। একদিন মহামায়া হাই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস ফিরতি ট্রেনে আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন ওঁর স্কুলে। সেদিন মেয়ে-দের ক্লাস আর হলো না। মাইকের বন্দোবস্ত হল। সকলে সামনে এসে বসলো। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল গাছে একটা কোকিল ডাকছে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। আমি তন্ময় হয়ে রবীন্দ্র নোটেশন বাজাচ্ছি। ওরা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। যাবার সময় আমার সামনেই মেয়েদের কাছ থেকে জোগাড় করে আমার হাতে টাকা তুলে দিলেন। ফুলের কুঁড়ির মতন মেয়েদের দান আমি মাথা পেতে নিলাম। মনে হল, এ জীবন ধন্য হল। মানুষ আমাকে এতো ভালবাসে? আমি কি এ সবের যোগ্য?

এমনও দেখেছি কলেজ স্ট্রীটের সামনে বাজাচ্ছি। মানুষজনের বেশ ভিড়ও হয়েছে। কিন্তু আমার দুঃখের ঝুলি আর ভরে না। একজন ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন। হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। তাড়াতাড়ি বললাম, 'এ কি করছেন আপনি?'

'কিছু না। আমি সুরকে নমস্কার করলাম।'

বলে সেই অদ্ভুত ভদ্রমহিলা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু দুঃখের

সঙ্গে লক্ষ্য না করে পারলাম না উনি কিছু দিয়ে গেলেন না।

ঠিক সেই দিনই আর এক জায়গায় বাজাচ্ছি, একজন বললেন, 'আপনি কি কিছু নেন? কিছু কি আপনাকে দেওয়া যাবে?'

আমি হাসলাম। 'হ্যাঁ সেই জন্যেই ত' পথে নেবেছি।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি এমনি বাজাচ্ছেন।'

তিনি মোটা রকম কিছু দিয়ে গেলেন। কিন্তু বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন ক্ষত। পয়সার জন্যে রাস্তায় না নেবে যদি নিজের জন্যে এরকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজাতে পারতাম। আমার রেওয়াজী এই হাতখানাকে আমি চিনি। আমি তান-কর্তব্যের গোলকধাঁধার এতো হিসেব রাখি না বটে তবে বাজিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করবার ক্ষমতা যে আমার আছে পথে নেবে আমি তা টের পেয়েছি।

যদি আমি এমনি বাজাতে পারতাম, তাহলে কতোদূর আমি যেতে পারতাম! ...এ জীবনেও চটক আছে। মন্দ লাগে না। শেয়ালদা স্টেশনের বাইরে বাজাচ্ছি। হঠাৎ বেশ ভিড় হয়ে গেছে। হঠাৎ মুখে আলোর একটা ঝলক এসে লাগলো।

বুঝলাম কিছু একটা হল। হাসতে হাসতে সামনে ক্যামেরা নিয়ে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, পরিচয় দিলেন কোন বিখ্যাত কাগজের ফটোগ্রাফার বলে।

'ফটো তুললেন কেন?' জিজ্ঞেস করলাম মৃদু হেসে।

উনি সসংকোচে বললেন, 'কিছুই ত' পারি না আমরা। ফটো তুললাম যদি একটু পাবলিসিটি হয়।'

'ভিখিরি বলে?'

'না, না।' ভদ্রলোক প্রবল প্রতিবাদ করে উঠলেন।

'এই হতভাগা দেশ বলে...অন্য কোন দেশ হলে...আপনাকে চাইতে হত না কিছু ...আপনার যে রকম প্রতিভা'...

'ছবি টবিতে আমার কিছু হবে না। আমায় একটা ব্যবস্থা করে দিন না। আপনারা কতোবড়ো লোক। কতো লোকের সঙ্গে আপনাদের চেনাজানা। একটু ভাতকাপড়ের জোগাড় যদি করে দিতে পারেন, এই ধরুন রেডিওতে বা আপনার অফিসেই কাজ দিন না, বাঁধা মাইনে, যে কোন কাজ, মেসিনে কাজ করতেও আমার আপত্তি নেই, তাহলে বাকি সময়টা আমি বাজাতে পারি'...

ভদ্রলোক 'দেখি, কি হয়।' বলে ওঁর কার্ডটা দিয়ে গেলেন। দু'-একবার ফোন করেছি অফিসে। কোনদিন ওনাকে পাই নি তারপর।

এই রকম আরেকজন, মনে পড়ছে। তিনিও বেশ বড় মানুষ। আমার চেহারাটা আমার সামনে নানা ভঙ্গিতে এঁকে উনি তিন চারখানা ছবি সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে কিছু টাকা তুলে আমার সামনে এনে দিয়েছেন। আমি ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছি। কিন্তু ওনাকেও বলেছি, 'আপনি ত' আমাকে সাহায্য করতে চান। কিন্তু এরকম করে ত' হবে না। দিন না একটা বাঁধা মাইনের কোন কাজ জোগাড় করে, তাহলে বাকি সময়টা আমি রেওয়াজ করতে পারি।'

উনি বলেছেন, 'আচ্ছা', তারপর ওনার সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

একদিনে পারি নি। ঘা খেয়ে খেয়ে ক্রমে ক্রমে এ অবস্থাটাকে মেনে নিয়েছি। আপনি একদিন মোটরে যেতে যেতে হঠাৎ মোটর থামিয়ে ফুটপাথে আমাকে বাজাতে দেখে নেবে পড়েছিলেন, খানিকক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনে বলেছিলেন, 'অপূর্ব।' তারপর একটু থেমে বলেছিলেন, 'অদ্ভুত রোমাণ্টিক আপনার জীবন।' 'রোমাণ্টিক' কথাটার মানে আমি জানতাম না। ট্রেনে, একজন কলেজের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে তবে জেনেছি। অদ্ভুত রোমাণ্টিক লাগছে আপনার এই জীবন, তাই না? দূরে থেকে তাই মনে হয়। এই রোমান্সের একটা ফোঁটাও আপনার যদি পেটে যেত তাহলে কাটা পাঁঠার মত আপনি ছটফট করতেন।

কিন্তু যে কথা আমি বলছিলাম। মাঝে মাঝে সাংঘাতিক কষ্ট হ'লেও এ জীবনের মধ্যেও আমি রস পাচ্ছিলাম বৈকি। না হলে, এ ত' সত্যি, আমি বাজাতেই পারতাম না দিনের পর দিন। মনে মনে একটা ক্ষোভ থাকলেও অদ্ভুত একটা টান আমি টের পেতাম। বিশেষ করে মানুষের ভিড়ে। আমার চারপাশে ওদের পায়ের শব্দ। ওদের ঘামে-ভেজা মুখ। কোনরকমে একটু দাঁড়াতে পেরেছি।

আমি বাজাতেই ওদের শূন্য চোখ-গুলোতে সংগে সংগে এসে গেল চকচকে রোদ। এবার আপনার কথাই বলি, মিঃ, কি যেন নাম আপনার, অতিশয় ভদ্রলোক, কার্ডটা দিয়েছিলেন, ওটা আছে কোথাও, হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছিলেন, আমার জীবন সত্যিই রোমাণ্টিক। আমি তখন ভুল বলছিলাম। অবশ্য আপনি যে অর্থে রোমাণ্টিক বলেছেন আমি সে অর্থে বলছি না।

...আপনি সেদিন পথ থেকে একরকম ধরেই নিয়ে গেলেন আপনার বাড়ি। যে বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন সেসব বাড়ির ভেতরে কখনো এর আগে যাই নি। যেসব সামগ্রী আমাকে দেখালেন সেসব চক্ষেও কখনো দেখি নি। শেষকালে যে সামগ্রী দেখালেন সে এক বিস্ময়। সে আপনার স্ত্রী। বাড়ির মধ্যেও যে সব সময় ওরকম পটের বিবির মত কেউ সেজে-গুজে থাকে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমি আমার মা, মাসি-পিসির কথা কিংবা আমার বোনের কথাই বলছি, ওরা এক সিনেমা দেখতে গেলেই একটু সাজ-গোজ... যাক্‌গে, যাক্‌গে, আপনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি জাপানী রূপকথা।' উনিও হাঁটু মুড়ে, বোধ হয় জাপানী কায়দায়, ঠিক জানি না, আমাকে আপ্যায়িত করলেন। অদ্ভুত ঠাণ্ডা সেই ঘর, নীল আলো জ্বালা। ঠাণ্ডা আইসক্রীমের সন্দেশে হাত দিতেই কেমন রোমাঞ্চ হল। তারপর আপনি বললেন, 'বাজান'। তাকিয়ে দেখি ইতিমধ্যেই আপনার স্ত্রী সেই 'জাপানী রূপকথা' তাঁকে বাদ দিয়েও আর একজন শ্রোতা জুটেছে আমার, আপনার সেই প্রকাণ্ড কান-ঝোলা সুশিক্ষিত কুকুরটির কথা বলছি, সে পাশে এসে বসলো ডানলোপিলোর গদিতে। আমি বাজাচ্ছি আর আপনি 'টেপ' করে চলেছেন, এই ঠাণ্ডা ঘর, একটু আগের খাওয়া ঠাণ্ডা আইস-ক্রীম,—ঘরের নীল আলো, আপনার সুন্দরী স্ত্রী, চমৎকার ডানলোপিলোর গদি, কিন্তু কি যে হল আমার, ঠিক যেন মন বসাতে

ইষ্টার্ন রবার ওয়ার্কস
কলিকাতা-১৫

পারছি না, কোথায় যেন আটকাচ্ছে, জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীর খারাপ নাকি?' আপনার স্ত্রী ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'এ্যানাসিন? মাথা ধরেছে?' আমি আবার বাজাতে চাইলাম। বাজাতে পারছি না। ভীষণ লজ্জা করছে আমার। এরকম ত' কখনো হয় না। বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থেমে গেলাম। আপনি মৃদু হেসে বললেন, 'থাক, থাক। আপনার বোধহয় 'মুড' নেই আজ।' মুড নেই? আমি বেঁচে গেলাম। সংগে সংগে কিসের টানে সটান উঠে দাঁড়ালাম। আপনারা কি রকম অবাক হয়ে গেলেন। কুকুরটা পর্যন্ত। ও-ও গা' ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আপনি হাতে নিয়েই বোধহয় বসেছিলেন। হাতে গুঁজে দিলেন পঁচিশটা টাকা। আমার পাঁচ-ছ' দিনের উপার্জন। যাবার সময় বললেন, 'খুব আনন্দ পেলাম। যখন দরকার বুঝবেন তখনই চলে আসবেন। আমি না থাকি আমার স্ত্রী থাকবেন। উনি গান-বাজনার একজন সমঝদার।' 'আসবো' বলে টপ-টপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

অতোগুলো টাকা হাতে পেয়েছি একসংগে। আমার চার-পাঁচদিনের উপার্জন। চার-পাঁচদিনের দুশ্চিন্তা ত' কমলো। এটা কম শান্তির কথা নয়। তাছাড়া ট্রেনে আজ না বাজালেও চলবে। একদিন একটু বিশ্রাম যদি আমি না চাইতেই পাই তবে কেন নোবো না? সারাদিন পথে-ঘাটে বাজানোর পর, আবার দিনের শেষ ট্রেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজানো যে কি অসীম যন্ত্রণা, তা' আমি ছাড়া কে আর জানে!

মনে মনে খুশি হবার চেষ্টা করলাম। খুশিও হলাম। কিন্তু কি এক অভাব, কিসের একটা অভাব, বুকের মধ্যে কিসের একটা ফাঁক, কিছু যেন খোয়া গেছে আমার......

এরকম ত' কখনো হয় না। টার্মিনাস থেকে বাস ধরে চলেছি। এ ভাবটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আমি এর নাম জানি না। বুকের ভেতরে একটা অবুঝ কষ্ট। অথচ টাকা ত' পেয়েছি আশাতীত, কি যে হল.....

সেই কষ্টটা নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মত চলেছি বাসে। হাওয়ায় উড়ছে চুল। কাঁচা-পাকা দাড়ি। অন্য অন্য দিন দশ-বারো ঘণ্টা এখানে-সেখানে বাজাতে হয়। আজ মাত্র আধঘণ্টা আপনার ঘরে বাজিয়েছি। খুব মন দিয়েই ত' বাজাতে চেয়েছি। তবু ঠিক সুরটি বাজলো না কেন আমার হাতে? কেন এই অবুঝ কষ্টটা, কিসের একটা ফাঁক বুকের মধ্যে, যেন কিছু খোয়া গেছে আমার!

বাস এসে থামলো স্টেশনে। প্রকাণ্ড স্টেশন। গমগম করছে। তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলাম। হ্যাণ্ডেল লোকালটা সামনে দাঁড়িয়ে। আজ সবই ভালো। উপার্জন ভালো। পেটপুরে কে খাওয়ায়? সেই খাওয়া জুটলো। সে খাওয়া ভালো। বেশিক্ষণ বাজাতে হল না। সেও ভালো। এমন কি 'ভালো'-টাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে লোকালটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে যা' কোনদিন থাকে না।

ভালো, সবই ভালো, খুশি হলে যেমন করতাম ছেলেবেলায়, তেমনি হঠাৎ হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠলাম, 'হায়রে মুনিয়া মাঝি, তোর গাঙার নৌকা পাহাড় দিয়া যায়......'

কিন্তু কানে কি রকম খট্ করে লাগলো। আরম্ভ করেই ছেড়ে দিলাম। এ ভাবটা নতুন। এমন ত' কখনো হয় না। কি যেন হয়েছে আমার। আমি তার নাম জানি না।

অথচ আপনার ত' কোন ত্রুটি নেই। আপনি ত' অন্তত একবেলার জন্যেও অসহ্য সুখ আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।

ট্রেনে উঠেছি। হ্যাঁ। সকলেই আছে। যে কামরাতেই উঠি, যখন যে গাড়িতে চার-পাঁচজন চেনা লোক মিলবেই। তাছাড়া যারা চেনা নয় তারাই বা এমন কি অচেনা?

'এই দিকে দাদা, এই কোণে।' ভিড়ের মধ্যে পথ তৈরি হয়ে গেল।

'এইখানে বসুন। এই ওঠো ত'। বসতে দাও। বসুন ভাই।'

রোজই যেমন বলতে হয়, তেমনি-ভাবে বললাম, 'না, না। আপনি বসুন। অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে। সে কি হয়?'

কিন্তু লোকটা শুনলে না। আমাকে জোর করে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিলে।

'এমনি এমনি বসালাম না দাদা। স্বার্থ আছে তাই।' বলে প্রাণখোলা হাসতে লাগলো। ঐ হাসি দেখেই চিনলাম। নামটা মনে করতে আর পারছি না। বললাম, 'আপনার মেয়েটি কেমন আছে ভাই?'

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'থাক। ও প্রসংগ থাক।'

না বুঝে লোকটার ব্যথার জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছি। কিন্ত অবাক হয়ে দেখলাম কেমন করে ভাঙাপড়া মুখ লোকটার বিষাদে সুন্দর হয়ে উঠছে। জায়গায় বসে যন্ত্রটি সন্তর্পণে রেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চারিদিকে তাকাই। সব ঠিক আছে। উঠেছেন বনমালীবাবু, ইউনিয়ন ব্যাংকের ক্লার্ক, ছাতার বাঁটে হাত দুখানা আড়া-আড়ি রেখে ঢুলছেন, যেন মনে হচ্ছে বেঞ্চায় ঘুমোচ্ছেন, না মশাই সেটি উনি করছেন না, পাশের লোকটি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে যা' বলছে উনি তার শেষ রসটুকু পান করছেন ঘুমোবার ভান করে, তারপর ওদেরই কথার মাঝখানে ভুস করে মাথা তুলে নির্বিকারভাবে একটা বিড়ি ধরাবেন আর তার সুতোটুকুতে পর্যন্ত সুখটান দেবেন।

ঐ যে ঐ কোণে ভবতোষ মিত্তির, হাত তুলে 'আমি আছি' জানালেন, মিছিলে সব থেকে আগে আগে ঝাণ্ডা নিয়ে দৌড়োন, চায়ের দোকানে সবচেয়ে জোরে গলা ফাটান, কিন্তু নিজের ছেলের জন্যে যে কলেজে পলিটিকসের চর্চা কম সেই কলেজ খোঁজেন, একদিন আমার কাছেও খোঁজ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আপনি ত' সব জায়গায় বাজান। এমন একটা কলেজের নাম করুন না মশাই যেখানে...', সেই ভবতোষ মিত্তির এখন একমনে হাঁটু চুলকে চলেছেন।

ঐ যে, ঐ, সুলেখা সান্যাল না কি যেন, বেশ চোখা দেখতে মেয়েটি, মুখে বেশ জল আছে, সব কথা শোনার পর যার শিস্ টেনে 'ইস' বলা চাই-ই, রুটিন-মাফিক একখানা মোটা ইংরেজী বই খুলে বসে বিদ্যে জাহির করছে যদিও এক অক্ষরও পড়ছে না। ওপাশের ঐ রাজকুমার, ইউনিভার্সিটির পাণ্ডা, মুখে দাড়ি, কাঁধে হ্যাণ্ডলুমের একটি আধ-ময়লা ব্যাগ, চন্দননগর না কোথা থেকে যেন ওঠে। এমনি ঝিম মেরে থাকে, মেয়ে দেখলেই তুমুল রাজনীতির আলোচনা আরম্ভ করে দেয় পাশের লোকজনের সংগে। সুলেখার আঙুলে জড়ানো রুমালের ফুল দেখতে এখন বেচারী খুবই ব্যস্ত।

'একটা বিড়ি খাবা, বাজনদার?' বুনো ঘাস আর মাথা ছাড়ানো হোগলা অঞ্চলের খাঁটি, জংলা মানুষ, আঁকাড়া জোয়ানমদ্দ মুকুন্দ কপালে সেই কাটা দাগটা নিয়ে পাঁচ বছরের শিশুর মত সরল হেসে উঠলো। নিলাম বিড়িটি।

'সেলাম ওয়ালেকম।'

'আরে, আপ! ওয়ালেকম সেলাম।'

পাশেই বসেছিলো হিন্দ মোটরের মজদুর ইরসাদ। এতোক্ষণ নজরে পড়ে নি। ছিঃ। পাশেই বসে আছে, অথচ......

ইরসাদ, বড় গম্ভীর মানুষটি। সব কথার শেষ নিষ্পত্তি করে দেয় একটা মোক্ষম 'ঝুট্' কিংবা অবিশ্বাসের রেখা কপালে তুলে চোখ বড় বড় করে শুধু বলে, 'সচ্'। ধীরে ধীরে কামরা ভরে উঠছে। স্টেশন ছাড়বার ভোঁ বাজছে। ছাড়বার আগে ইঞ্জিনটা দম নিচ্ছে। চাকায় চাকায় উঠছে গর্জন। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসা মানুষের মুখ জানলার পাশে জেগে উঠে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে কিন্ত অভ্রান্তভাবে কামরা ভরে উঠছে সমস্ত চেনামুখে। সমস্ত মুখই চেনা।

এমন কি যাদের কখনো দেখি নি তারাও। তাই নয় কি? সে চেনাও আবার কতো-রকমের, কতো ভাবের, তার কি কোন হিসেব আছে?

যে মুখ দুশ্চিন্তায় জমাট সেই মুখ, যে ভাঁজপড়া কপালে শান্ত হয়ে আছে দীর্ঘশ্বাস, সেই কপাল, সেই কোটরগত চোখ যেখানে আগুনের ফুলকি ছোটে; সেই দু'খানা হাত যা' কেবলই ঘা খায় তারপর ঘা খেয়ে-খেয়ে একদিন কামারশালায় ইস্পাত হয়ে বেরিয়ে আসে সেই হাত...... সব সব, সব আমার চেনা, শহর, গ্রাম মফস্বল, সব একসুতোয় বেঁধেছি, বেঁধেছি সুরের সুতোয়, এই যন্ত্রটির গুণে, সুরের গুরু, ও সাঁই, সাঁই হে। যন্ত্রটি মাথায় ঠেকালাম।

'কি, বাজাবেন না?' ঘামে-ভেজা একটা মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো।

আশেপাশে তাকালাম। যারা মাথার ওপর হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে, যারা সীটে বসবার জায়গা পেয়েছে, যারা সীটের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে, সকলেই অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কথা সকলের যেন থেমে গেল, সকলেই যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। তাকিয়ে দেখলাম, মনে হল সকলেই যেন বলছে, 'কি, বাজাবেন না?'

বাজাবোনাই ভেবেছিলাম। টাকার জন্যেই বাজানো। সে টাকা ত' আশাতীত-ভাবে পেয়েছি। আর দরকার কি। কিন্তু ঐ যে সুলেখা মোটা বইটা মুড়ে ফেলল, আমার দিকে তাকিয়ে ওর চোখের তরুণ তারা দুটি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রুমালের ফুল দেখতে ব্যস্ত রাজকুমার ঐ যে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে।

বুড়ো বনমালীবাবু এতোক্ষণের ঝিমোনো মাথাটা তুলে হঠাৎ বললেন, 'কি হে, চুপ করে রইলে যে, তোমার জন্যে একটা ট্রেন ফেল করলাম। ঘরে ফেরার সময় জানো ত' হে, ইচ্ছে করে একটা ট্রেন ফেল করার মানে কি?'

ঝাঁকাড়া জোয়ানমদ্দ মুকুন্দ হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, 'মশাই, বাজান না আপনার যন্তরটা!'

এতো মানুষ আমাকে চাইছে? এতো মানুষ আমাকে চায়? আর ছিঃ ছিঃ আমি যন্ত্র গুটিয়ে বসে আছি? ছিঃ। মুহূর্তে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভায়োলিনটি বার করলাম। কাঁধে নিয়ে ছড় চালাবার আগে রোজই যেমন বলি তেমনি বললাম, 'দেখুন, আপনারা শ্রান্ত; ক্লান্ত। আমি কোন বক্তৃতা দোবো না। সামান্য দু-একটা কথা। ওরা আমায় চাইলো না। কারখানার মালিক, ম্যানেজার, এমনি দু'-চারজন লোক। আমাকে ছাঁটাই করলো আমি সত্যি কথা বলেছিলাম বলে। ওরা দু'-চারজন আমাকে চাইলো না। না চাক। তার বদলে আমি পেলাম এই আপনাদের মত লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিছু আমাকে দেবেন, অবশ্য এমনি এমনি নয়। আমি ভায়োলিন বাজাবো। তবে ওস্তাদি সুর না। এখানে জমবে না। আমি বাজাবো রবীন্দ্র নোটেশন। ফিল্মী হিন্দী গান আমাকে কেউ অনুরোধ করবেন না।'

তারপর আরম্ভ করলাম।

ট্রেন দুর্বোধ্য গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে উল্কার মত ছুটেছে। মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে এখানে-সেখানে অনেকগুলো ফ্যান। আলোকোজ্জ্বল প্ল্যাটফর্মগুলি মাঝে মাঝে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে। শত শত লোকের ভিড়ে গম গম করছে কামরাখানা।

আর এর মধ্যে কোনরকমে একটু কোণের দিকে দাঁড়িয়ে আমি তন্ময় হয়ে রবীন্দ্র নোটেশন বাজাচ্ছি।

আর বলতে হয় না। ঐ একবারই যা' বলেছিলাম। ওরা সব জানে। যারা শুনতে পায় নি তারাও। প্রথমে দিলো ছিন্ন মোটরের মজদুর ইরসাদ। না দেখেই বুঝলাম ও আমার ডান পকেটে একটা দশ পয়সা ফেলে দিচ্ছে। কোন কথা বলল না পাছে আমার বাজানোর মত মণ্ডা হয়ে যায়। তারপর দিলেন ভবতোষ মিত্তির। অত্যন্ত সন্তর্পণে আমার পকেটের কাছে এসে একবার বিড়বিড় করে বললেন, 'সামান্য, অতি সামান্য, আপনার উপযুক্ত নয়'. বুঝলাম একটা টাকা গুঁজে দিলেন বুক পকেটে।

কিন্তু বলতে হয় নি। ইউনিভার্সিটির সেই ছাত্রটি, রাজকুমার, সকলের কাছে যাচ্ছে আমারই জন্য, সামনে হাত পেতে দাঁড়াচ্ছে, যে যা দিচ্ছে সেটা জড়ো করে একসময় নিঃশব্দে আমার পকেটে ফেলে দেবে।

আর একজন এগিয়ে এলেন ভিড় কাটিয়ে, মৃদুস্বরে বললেন, 'বেশি দিতে পারলাম না। এই রইলো।' দুটো দশ পয়সা পকেটে ফেলে দিলেন।

এসব একরকম রোজই হয়। নিত্য-দিনের ব্যাপার। তবু এইসব তেলচিটে, ঘামেভেজা মানুষগুলোর সংগে আজ যেন নতুন করে পরিচয় হল। আমি, কি বলবো, অভিভূত হয়ে গেছি। সুরের গুরু, ও সাঁই, সাঁই হে, আমি আনপথে গিয়েছিলাম, হাল ছেড়ে বেহাল পথে, তাই ঠিক সুরটি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এইবার সুরের নিজস্ব ঘরে যাবো। এতো মানুষ আমায় ভালোবাসে? এতো কষ্ট করে এরা আমার বাজনা শুনতে চায়? কি এমন আমি বাজাই? আমি ত' জানি কিছুই শিখি নি আমি। এই ভিড়, দম-বন্ধ অবস্থা, ঠেলাঠেলি, বসবারও জায়গা পায় নি সবাই, কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে, এমন বাজনা শোনাবার উপযুক্ত সময় আর জায়গা সারা পৃথিবী ঘুরেও কি আমি পেতাম? এইসব অফিস, কলেজ, স্কুল, কারখানা ফেরৎ শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষ, এমন শ্রোতা এ আমি কোথাও পাবো? আমার এতো ভাগ্য যে এ অবস্থাতেও এরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছে।

অথচ এদেরই আমি আজ ঠিক করছিলাম ফাঁকি দোব? বাজাবো না আজ? ওরা কোণের দিকে কোনরকমে একটু জায়গা করে দিয়েছে। আমার শরীরের একটা দিক ভিড়ের চাপে বেঁকে গেছে, আমার সে সবে কোন হুঁশ নেই, আমি তন্ময় হয়ে বাজিয়ে চলেছি। বেশ বুঝতে পারছি সেটা আর নেই, সেই অবুঝ কষ্ট যা' শুরু হয়েছিলো আপনার ওখানেই, সারাক্ষণ ছিলো নতুন করে যন্ত্রে হাত দেবার আগে পর্যন্ত, কি যেন একটা অভাব, একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব কিছু যেন খোয়া গেছে আমার, কিছু যেন...... আপনার বাড়ি থেকে যখন উঠেছিলাম তখন আপনিও যেমন বুঝতে পারেন নি কেন হঠাৎ উঠে পড়লাম, আমিও ঠিক বুঝতে পারি নি। আপনার ঘরে বাজাতে বাজাতে সেই কষ্টটা ..., কিন্তু কি যেন নাম আপনার, নামটা মনে পড়ছে না, মরুগ্যে ছাই, এই ঘামেভেজা, ভিড়েঠাসা, লক্ষ মানুষের মেলায় আমি ঠিক মাটিটি ফিরে পেয়েছি, আপনি দয়া করে এই কামরায় উঠে দেখে যান আমি ঠিক সুরের কাছে আসতে পেরেছি কি-না। যন্ত্র আবার আমার হাতে কথা বলছে।

না মশাই, আপনার কাছে আর আমি ফিরতে চাই না, আমি বরং কিছু কম পাবো, সেও ভালো, তবু....... এতো মানুষ, এদের ভালোবাসা, এ যে কি টান...'

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে

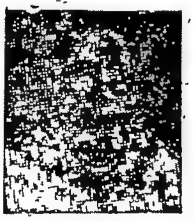

আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ: আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে মঞ্চের সামনে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন :]

কথক—ইসক্রার প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল লাইপজিগে, জানুয়ারীর আগে কাগজ প্রকাশ করা সম্ভব হোলো না, প্রত্যেক সংখ্যায় রাজনীতি, অর্থনীতি, শ্রমিকদের কর্তব্য—এইসব বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থাকতো। অর্থনীতিক সংকট সম্বন্ধে লেনিন তাদের যে সব কথা আগেই বলেছিলেন—তারই ভয়াবহ বাস্তব রূপায়ণ ঘটতে লাগল চোখের সামনে। ইকনমিক ক্রাইসিসের ফলে কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অসংখ্য শ্রমিক এবং মজদুরেরা চাকরী থেকে বরখাস্ত হল —ঐ বছর শস্য উৎপাদনও হোলো না মোটেই—ফলে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী করালরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অসন্তুষ্ট জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখার জন্য জার সরকার পুলিশী অত্যাচার বাড়িয়ে দিল শতগুণ। মেহনতী মানুষেরা রাগে, ক্ষোভে, ঘৃণায় ক্ষেপে উঠল—ইসক্রা পড়তে পড়তে তারা বুঝতে শিখেছিল যে, তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের হামলায় স্বৈরাচারী সরকার অতি সহজেই একদিন ভেঙে পড়বে। রাশিয়ার বড় বড় শহরগুলোতে প্রতিদিন বিপ্লবী জন-মিছিল বের হচ্ছিল। তাদের একমাত্র স্লোগান ছিল—"স্বৈরাচারী জারিস্ট-সরকার নিপাত যাক. প্রলিতেরিয়েতই এখন থেকে হবে দেশের সত্যিকার শাসক এবং পরিচালক!"

[আলো নিভে যাবে। তারপর সিনেমাটোগ্রাফীর সাহায্যে পেছনের পর্দায় কয়েকটি গণ-বিক্ষোভের, ছাত্রমিছিলের দৃশ্য দেখানো হবে—দেখানো হবে কারখানার দরজার সামনে এবং ভেতরে শ্রমিকদলের উপর সশস্ত্র পুলিশের অত্যাচার এবং গুলীবর্ষণ। মিছিলগুলোর উপরও সৈন্যদের গুলী চলছে দেখা যাবে। বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, নারী গুলীর আঘাতে মাটিতে ছিটকে পড়তে থাকবে। স্বৈরাচারী জারের সশস্ত্র বাহিনী মেহনতী শ্রমিকদের আন্দোলনকে বন্দুক এবং ডাণ্ডাবাজীর সাহায্যে ঠাণ্ডা করে দেবে ভেবেছিল—কিন্তু তা কোনদিন সম্ভব হয় না, হতে পারে না। অন্ধকারের ভেতর থেকে সমবেত কণ্ঠস্বর ভেসে উঠবে—"স্বৈরাচারী সরকার নিপাত যাক! কৃষক, মজদুর, শ্রমিকের সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক!" আলো জ্বললে আবার কথক এসে বলতে থাকবেন :]

কথক—এই সময় রাশিয়ার সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল আর তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছিল বিদেশ থেকে প্রকাশিত

নাদেজদা ক্রুপস্কায়া

ইসক্রা। এবার বেশ ভালভাবেই বোঝা যাচ্ছিল যে অবিলম্বে একটি শক্তিশালী পার্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এই পার্টিই আসন্ন বিপ্লবের সময় নেবে সর্বময় নেতৃত্ব। প্রথম থেকেই এই পার্টির সংগঠনের জন্য ইসক্রা নেমেছিল বিরাট সংগ্রামে—এই কারণেই শ্রমিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা লাভ করেছিল পত্রিকাটি। ধনতন্ত্রবাদ যখন রাশিয়াতে একেবারে তার চরম পর্যায়, অর্থাৎ ইম্পিরিয়ালিজমে রূপান্তরিত হয়েছে—ঠিক তখনই বিপ্লবাত্মক মার্কসিস্ট পার্টি গড়ে উঠল রাশিয়াতে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে এবার একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে যেকোনদিন, সমাজের দুষ্টক্ষত জমিদার এবং পুঁজিবাদীর দল সমূলে উৎপাটিত হবে সমাজের বুক থেকে তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে প্রলিতেরিয়েতের একনায়কত্ব, দেশে ফিরে আসবে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সবার সমান অধিকার—

[কথক সরে যাবেন। পেছনের পর্দা উঠবে এবং দেখা যাবে লেনিন ক্রুপস্কায়াকে বলছেন:]

লেনিন—আমাদের আদর্শ এবং মতবাদের প্রচারের জন্য ইসক্রার সব থেকে বেশি প্রয়োজন! এই জন্যই কাগজটার পেছনে এত খাটছি।

ক্রুপস্কায়া—তা তো চোখের উপরই দেখছি—আজকাল তোমার বেশির ভাগ সময় ইসক্রার প্রবন্ধ লিখতেই চলে যায়।

লেনিন—আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল একটি সুগঠিত, শক্তিশালী মার্কসিস্ট পার্টি গড়ে তোলা। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে এই পার্টিকে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকতে হবে। এই জাতীয় পার্টি পেছনে না থাকলে শ্রমিকশ্রেণী কোনদিনই তাদের ঐতিহাসিক মিশনকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে না। রাশিয়ার জনগণের রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক দাসত্বও কোনকালেই অপসারিত হবে না।

ক্রুপস্কায়া—আমার শুধু এই ভেবে আশ্চর্য লাগে ভ্ল্যাডিমার ইলিচ, ধনতন্ত্রবাদী শোষকশ্রেণীর লোকেরা কি করে দিনের পর দিন মেহনতী মানুষের শ্রমলব্ধ ধনকে অনায়াসে নিজেরা আত্মসাৎ করে চলেছে—ওদের কি বিবেক বলেও কিছু নেই? আর শোষিতের দলই বা কি করে এতদিন ধরে অত্যাচার সহ্য করে চলেছে?

লেনিন—বিবেক বা ন্যায়-অন্যায় বোধ যখন মানুষের ভেতর স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠবে তখন আর সমাজে শ্রেণীবিভাগ থাকবে না ক্রুপস্কায়া। মার্কস সেই পথেই পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর রচনায়। আর তিনি যা থিওরী হিসাবে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তাকেই বস্তুতে রূপায়িত করবার জন্য আমাদের এই সংগ্রাম। তোমার আর একটা প্রশ্ন হল শোষিতের দল এতকাল ধরে এ অনাচার সহ্য করছে কেন? যুগ যুগ ধরে ধনতন্ত্রবাদী সমাজগুরুরা তাদের বুঝিয়ে এসেছে যে, দারিদ্র্যের একটা নিজস্ব মাহাত্ম্য আছে। এ জন্মে তাদের যে কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে তা তাদের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। ধর্মের আফিং সেবন করিয়ে তাদের স্বাভাবিক বিচার-শক্তিকে পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমরা চাই এই জড়তা থেকে তাদের জাগিয়ে তুলতে, তাদের ধর্মের নেশার ঘোর ভেঙে দিতে, কার্যকারণের প্রয়োগে যাতে তারা সব কিছুর বিচার করতে পারে—সেই শিক্ষা দিতে।

[দরজায় ধাক্কার আওয়াজ। ক্রুপস্কায়া এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেবেন। পিয়ন কতকগুলো চিঠি দেবে—সেগুলো নিয়ে ক্রুপস্কায়া দরজা বন্ধ করে ফিরে আসবেন এবং লেনিনকে চিঠিগুলো দেবেন। লেনিন একটি ছুরি দিয়ে এক-একটি চিঠির খাম কেটে ফেলে প্রত্যেকটি চিঠি পড়বেন। ক্রমশ তাঁর মুখে একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠবে। তারপর ক্রুপস্কায়াকে বলবেন:]

লেনিন—চিঠিগুলো রাশিয়ার নানা জায়গার কমরেডদের কাছ থেকে এসেছে। মোটামুটি বড় খবরগুলো সব তোমাকে বলছি। মস্কো থেকে একজন কমরেড লিখেছেন আমার ইসক্রাতে লেখা

ক্রুপস্কায়ার মা এলিজাভেটা ভ্যাসিলিয়েভ্না—সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের সময় লেনিনদের সঙ্গে ছিলেন।

'Where To Begin' প্রবন্ধটি প্যামফ্লেট আকারে ওরা, অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্রাট সংগঠনগুলো পুনর্মুদ্রিত করেছেন। সাইবেরিয়াতে এই রচনার পাঁচ হাজার কপি ছাপিয়ে কৃষক, মজদুর, শ্রমিকশ্রেণীর ভেতর বিলি করা হয়েছে। রেজহেভ-এও প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। এ রচনাটি নাকি সারটভ, টমস্ক, নিজনিনোভোগোরোড, উফা প্রভৃতি শহরে শ্রমিক এবং কর্মীরা মনোযোগ সহকারে পড়েছে—সবারই লেখাটা ভাল লেগেছে।

[লেনিন একটি চিঠি ক্রুপস্কায়ার হাতে এগিয়ে দেবেন এবং ক্রুপস্কায়া সেটি একটি ফাইলে ভরবেন।]

ক্রুপস্কায়া—যাদের জন্য লেখা তারা যদি পড়ে তাহলেই তোমার পরিশ্রম সার্থক হয়।

লেনিন—বৃত্তিতে তাঁতি, এমন আর একজন কমরেড লিখেছেন: "ইসক্রার কপিটা আমি আরও অনেক কমরেডকে পড়িয়েছি। হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে আমার কাগজের কপিটা প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের মত মেহনতী মানুষদের জীবনের সমস্যা নিয়ে নানা ধরণের প্রবন্ধ থাকে বলেই ইসক্রা আমাদের এত প্রিয়। পয়সা দিয়ে এ কাগজের সত্যিকার মূল্যায়ন হয় না। কাগজটি পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায় পুলিশ এবং সরকারের গোয়েন্দারা শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের বিদগ্ধ নেতাদের এত ভয় পায় কেন। রাশিয়ার সর্বত্রই একটা স্তিমিত আগুনের উত্তাপ অনুভব করা যাচ্ছে—বাইরে থেকে একটা হল্কা এসে পড়লেই দাউ দাউ করে চারদিকে আগুন জ্বলে উঠবে। ইসক্রা প্রকাশের জন্য আপনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন। এখানে আমরা প্রতি নতুন সংখ্যা ইসক্রা পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি।" এই চিঠিটাও ফাইলে রেখে দাও—

[ক্রুপস্কায়া চিঠিটা ফাইল করবেন।]

ক্রুপস্কায়া—বাবুসকিনের কোন চিঠি আসে নি?

লেনিন—হ্যাঁ, এসেছে। [চিঠির গাদা থেকে বাবুসকিনের পত্রটি বের করে পড়বেন:] আরখোভো—জুয়েভো থেকে বাবুসকিন লিখছে: "এখানে সবাই খুব আগ্রহের সঙ্গে ইসক্রা পড়ে। সমস্ত কপিগুলোই ব্যাপক-ভাবে সারকুলেট করা হয়। [চিঠিটা ক্রুপস্কায়ার হাতে দেবেন—তিনি বাকী অংশটা নিজে মনে মনে পড়তে থাকবেন। লেনিন অন্য চিঠিতে মন দেবেন। আলো নিভে যাবে এবং আবার একটু বাদে জ্বলবে। দেখা যাবে লেনিন দুজন কমরেডের সঙ্গে বসে গল্প করছেন—এমন সময় ক্রুপস্কায়া এসে একটি সুটকেস মাটিতে নামিয়ে রাখবেন। তাঁর অন্য হাতে একটি ভেস্ট বা ওয়েস্টকোট ঝুলতে থাকবে। ছুঁচসুতো দিয়ে ওয়েস্ট কোটের লাইনিং-এর একটা দিক সেলাই করতে থাকবেন ক্রুপস্কায়া—]

লেনিন—আপনারা রাশিয়া যাচ্ছেন দুজনে দুজনের ওপর দুটি কাজের ভার দেব।

১ম কমরেড—এ তো আমাদেরও কাজ কমরেড লেনিন!

লেনিন—হাঁ তা তো বটেই! এই যে সুটকেসটা দেখছেন এটি হচ্ছে double bottomed—সুটকেসের মাঝের খালি জায়গাটায় পঞ্চাশ কপি ইসক্রা ভরে দিয়েছি—সুটকেস সার্চ করলেও পুলিশের লোক সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাবে না। আর ক্রুপস্কায়া যে ভেস্টটার লাইনিংটা সেলাই করে দিচ্ছে, তার ভেতরেও দশ কপি ইসক্রা ভরে দিয়েছে। রাশিয়া পৌঁছেই আমাদের অফিসে ওগুলো জমা দেবেন—সেখান থেকে নানা জায়গায় ওগুলো বিলি করা হবে।

[দ্রষ্টব্য: ঐ সময় রাশিয়ার পুলিশের অনুসন্ধান পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত ইম্পারফেক্ট। সুটকেসের দুটি বটম-এর মাঝে কাগজ থাকতে পারে বা ভেস্টের লাইনিং-এর ভেতর কাগজ লুকিয়ে রাখা যায় এ তাদের মাথায় আসতো না। তেমনি দুধকে অদৃশ্য-কালি হিসাবে ব্যবহার করে গুপ্ত চিঠি লেখা যায় এ কথাও তারা জানতো না। ছাপা বইয়ের অক্ষরের তলায় ডট দিয়ে জেলের ভেতর বিপ্লবীরা চিঠির আদান-প্রদান করতেন—কিন্তু জেলের কর্মচারীরা তাও ধরতে পারতো না। ভারতের বিপ্লববাদের যুগে বৃটিশ পুলিশ কিন্তু এসব বিষয়ে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ছিল।]

১ম কমরেড—ইসক্রার কপিগুলো এত পাতলা কাগজে ছাপা হয় বলেই এত সহজে চালান দেওয়া যায়।

২য় কমরেড—পাতলা হলেও কাগজটা কিন্তু শক্ত—সহজে ছিঁড়ে যায় না।

লেনিন—লণ্ডন, স্টকহলম, জেনিভা, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি জায়গাতেও

সদ্য প্রকাশিত

কালিকট থেকে পলাশী

শ্রীসতীশপ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযান-কাহিনী; এতে সবিস্তারে ইংরেজ কর্তৃক ভারতের বাণিজ্য-অধিকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দশটি মূল্যবান মানচিত্র সন্নিবিষ্ট। [৬·৫০]

বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে [১ম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস একত্রে টা ১২·৫০] দ্বিতীয় খণ্ডটির পুনর্মুদ্রণ বাহির হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু পত্রাবলী ও শেষ উইল এবং একটি অসম্পূর্ণ নাটক এই মুদ্রণে সংযোজিত হইল। [১৭·৫০]

বঙ্কিম রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র ইংরেজি রচনা একত্রে একটি খণ্ডে এই প্রথম আমরা প্রকাশ করিলাম। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। [১৫·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলি—৯

লেনিন ও ক্যালিনিন (ফটো : ১৯২০)

আমাদের এজেন্ট আছে। তাদের কাছেও অনেক কপি করে ইসক্রা পাঠানো হয়—ওখান থেকেই ঐ কাগজগুলো রাশিয়াতে গোপনে পাচার করা হয়। কমরেড পি স্মিডোভিচ বিশেষভাবে এই কাজের জন্যই মার্সাইতে রয়েছেন—জাহাজের খালাসীদের মারফৎ তিনি আমাদের কাগজ বাটুমে পাঠিয়ে দেন। ইয়েকাটেরিনোশ্লাভ এবং বাকুতে ইসক্রা রিপ্রিণ্ট করবার জন্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছাপাখানা করা হয়েছে। সে যাই হোক, কমরেডস ! আপনারা আপনাদের জিনিসগুলো নিয়ে নিন।

[একজন গিয়ে সুটকেসটা হাতে তুলে নেবেন। অন্যজন গায়ের কোট খুলে রেখে ক্রুপস্কায়ার হাত থেকে ভেস্টেটা পরতে থাকবেন—এই সময় ব্ল্যাক আউট হবে। পর্দা নেমে যাবে—আলো জ্বললে কথক এসে মঞ্চের সামনে দাঁড়াবেন :]

কথক—১৯০২ সালের প্রথম দিকে গোয়েন্দা-পুলিশ আবিষ্কার করে ফেললো, ইসক্রা কোথা থেকে কিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলী ব্যবস্থা করলেন যে এবার থেকে পত্রিকাটি ছাপা হবে লণ্ডন থেকে. সেই সূত্রে লেনিন-দম্পতি চলে এলেন লণ্ডনে। ইংলণ্ডের শ্রমিক-আন্দোলনকে এবার কাছ থেকে জানবার সুযোগ পেলেন ভ্লাডিমার ইলিচ। বৃটিশ-মিউজিয়ামেও পড়াশুনায় কাটতো অনেকটা সময়, ১৯০৩ সালের বসন্তকালে লেনিনরা চলে গেলেন জেনিভা, এরপর এখানেই ইসক্রা পত্রিকা ছাপাবার ব্যবস্থা হল। রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের শুভ উদ্বোধন হল ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে। প্রথম কয়েকটি অধিবেশন হয়েছিল ব্রাসেলসে, কিন্তু বেলজিয়ান পুলিশের গোলমালে অধিবেশনের স্থান বদলিয়ে করা হোল লণ্ডনে। এই কংগ্রেসের সংগঠনে ছিল নানা দলের লোক—তাই মতের ঐক্যের ছিল যথেষ্ট অভাব। ইসক্রাপন্থীরা ছাড়াও ছিল সুযোগবাদী ও সংশয়বাদীরা। ইসক্রার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ—কিন্তু সবাই তারা সমান দৃঢ় নয় : কেউ কেউ নরম ধাতের —এ সত্ত্বেও লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লববাদীরাই জয়যুক্ত হল। ইসক্রার লোকেরা প্রলিতেরিয়েতের ডিক্টেটরশিপের প্রতিষ্ঠা এবং কৃষক-শ্রমিকদের যুক্ত সংগ্রামের প্রোগ্রাম গ্রহণ করলেন আলোচনা সভায় : সুবিধাবাদীরা বাধা দিল, কিন্তু সে বাধা টিকলো না। কংগ্রেসের শেষের অধিবেশনগুলোতে দেখা গেল—লেনিনের সমর্থকরাই দলে ভারি। এর কারণ—কয়েকজন সুবিধাবাদী এই সময় কংগ্রেস ছেড়ে চলে গিয়েছিল। লেনিনের সহযোগীরাই সেণ্ট্রাল কমিটির নির্বাচনে বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করলো। এই সময় থেকেই দুটি বিপরীত দলের সৃষ্টি হল—লেনিন এবং তাঁর দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য বলা হতে লাগলো বলশেভিক পার্টি—আর সংখ্যালঘিষ্ঠ সুবিধাবাদীদের নামকরণ করা হল মেনশেভিকস। এর পরের ইতিহাস : বলশেভিকস এবং মেনশেভিকসদের সংগ্রাম। বহু বছর ধরে চললো লড়াই, ফলে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের অগ্রগতিতে পড়লো বাধা—কিন্তু লেনিন রইলেন অটল এবং দৃঢ়। এরপর মেনশেভিকসরা ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগলো পার্টিকে ভুল পথে টেনে নিয়ে যেতে। নিজেদের সুযোগ-সুবিধার চরিতার্থতার জন্য। তারা দলের প্রধান হাতিয়ার ইসক্রাকে নিজেদের আয়ত্তে এনে ফেললো এবং তারপর থেকে এই পত্রিকায় লেনিন, বলশেভিক পার্টি এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে, ক্রমাগত আক্রমণ শুরু হল। বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে মেনশেভিকদের সঙ্গে একটা চরম বোঝাপড়া হওয়া দরকার। মেনশেভিজম দলীয় স্বার্থের প্রতি এবং বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের পক্ষে কতোটা মারাত্মক। সে কথা লেনিন পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন ১৯০৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড, টু স্টেপস ব্যাক' বইটিতে। রাশিয়াতে তখন সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ধিকিধিকিভাবে জ্বলছিল, বেশ বোঝা যাচ্ছিল সামান্য ইন্ধনেই একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে, লেনিন এবং বলশেভিকরা তখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন তৃতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম ঠিক করবার জন্য। সমস্ত দলীয় কাগজগুলো এসে বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিল। প্রফেশ্যনাল রেভোল্যুশনারীর দলও স্বীকার করে নিলেন লেনিনের আনুগত্য। পার্টির বেশির ভাগ সভ্য। তাদের নায়ক লেনিনের পেছনে এসে দাঁড়ালেন. তাঁর সাহায্যের জন্য।

[ব্ল্যাক আউট। অন্ধকারের ভেতর লেনিন এসে স্টেজের উপর দাঁড়াবেন। একটা স্পট লাইট তাঁর মুখের উপর এসে পড়বে। লেনিন বলতে থাকবেন :]

লেনিন—আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য ডিক্টেটরশিপ অভ দি প্রলিতেরিয়েতের প্রতিষ্ঠা করা—সোশ্যালিস্ট রেভোল্যুশনকে জয়যুক্ত করা এবং রাষ্ট্রে সাম্যবাদের প্রবর্তন করা।

[ব্ল্যাক আউট]

যবনিকা

[ক্রমশ]

রঙ্গজগৎ

ছবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সম্প্রতি এক সংবাদে দেখা গেল বর্ধমানে একদল ছাত্র ও যুবক একটি সিনেমার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে 'সতরঞ্জ' নামক ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করার দাবি করেছে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মতে এই ছবিটি জনগণের স্বার্থ ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বিরোধী। ছবির বিরুদ্ধে এরূপ ইতিপূর্বেও হয়েছে। এরূপ বিক্ষোভের পেছনে জনসমর্থন রয়েছে। সমাজের সৎ নাগরিক মাত্রই এরূপ বিক্ষোভকে যুবক ও ছাত্রসমাজের প্রাণশক্তির লক্ষণ মনে করবে।

আফ্রিকানদের, ভিয়েতনামীদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে হেয় করে, মধ্য এশিয়ার ঘটনাবলীর অপব্যাখ্যা করে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে চাতুর্যপূর্ণ প্রচারমূলক ছবি আমাদের দেশে হামেশা মুক্তিলাভ করছে। বিদেশী ছবি বলতে আজকাল স্পাই সিরিজের ছবি প্রধান। এসব ছবিতে একটা গোয়েন্দা কাহিনীকে উগ্র যৌনতার রসে সিক্ত করে সুকৌশলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়ে থাকে। এক সময় নাইট ক্লাবের বিভিন্ন দৃশ্যাদি দেখিয়ে ছবি দেখান হত। এই ছবিগুলি যদিও অশ্লীলচিত্রের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু সেন্সার বোর্ড যে কোন রহস্যজনক কারণে ছবিগুলিকে ছাড়পত্র দিতে দ্বিধা করে নি। অবশেষে এরূপ ছবির বিরুদ্ধে জনমতের অভিব্যক্তি ঘটলে সরকার ছবিগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। তার পরে এসেছে জেমস বণ্ড সিরিজের ছবি। আয়ান ফ্লেমিংসের মূল কাহিনীকে কিছুটা বিকৃত করে ছবিগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সুচতুরভাবে মিশ্রিত করা হয়ে থাকে। এই ছবিগুলির অনুকরণে আরো ছবি আমদানী হচ্ছে যেগুলি নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শনী, নর-নারীর যৌন মিলন ইত্যাদির সংগে বিদেশী কোন গোয়েন্দা এজেন্সীর গোয়েন্দাদের প্রায় অমর ও বাহাদুর করে দেখান হয়। আসলে এসব ছবির বক্তব্য হল—মার্কিন গোয়েন্দারা যা করছে তা জগতের ভালোর জন্য করছে। হলিউডের এসব উদ্দেশ্যমূলক ছবির অনুকরণ করে আমাদের দেশেও ছবি নির্মাণ সুরু হয়েছে। বিশেষভাবে বোম্বাই এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছে। একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এসব ছবিতে বিদেশী টাকা লগ্নী হয়েছে। ভারতীয় ও বিদেশীদের যুক্ত টাকা এসব ছবির পেছনে খাটছে। বিদেশী গোয়েন্দা ছবির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হচ্ছে দেখে ওরা কৌশল পরিবর্তন করতে ব্যগ্র।

কলকাতায় ছাত্র ফেডারেশন তপন সিংহের 'সাগিনা মাহাতো' ছবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এক্ষেত্রে অন্য বক্তব্য। গৌর ঘোষের লেখা 'সাগিনা মাহাতো' বইটি সম্পর্কে কারো কারো কঠোর সমালোচনা রয়েছে। সমালোচকরা মনে করেন 'সাগিনা মাহাতো' ছবিতে শ্রমিক-আন্দোলনকে হেয় করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেও এতে ইঙ্গিত রয়েছে। তপন সিংহ হঠাৎ এই বইটিকে ছবি করার জন্য কেন উদ্যোগী হলেন তা অনেকের কাছে রহস্যজনক মনে হচ্ছে। 'আপনজন'-এর পরে 'সাগিনা মাহাতো'কে চিত্ররূপ দেওয়ায় তপন সিংহের মনে বিশেষ ধরণের রাজনীতি-বিরোধিতা রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। কারণ ব্যক্তিগত বিচারে যতই দোষ-ত্রুটি থাকুক শ্রমিক-আন্দোলন দেশে গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতির সহায়ক। কোন সাহিত্যিক বা চিত্রনির্মাতা যদি এই অগ্রগতিকে লক্ষ্য না করেন তবে সেটা তাঁর দুর্বলতা। দেশের প্রগতিশীল অংশ আশা করবে 'সাগিনা মাহাতো' যদি শেষ পর্যন্ত চিত্ররূপ লাভ করেও থাকে, তবে শ্রমিক-আন্দোলন বিরোধী অংশগুলি তা থেকে যেন বাদ দেওয়া হয়। —সুজন।

'মাণুর প্রথম ভাগ' ছবিতে কণিকা মজুমদার

সংবাদকণা

'শীলা' ছবিতে সাবিত্রী চ্যাটার্জী ও শুভেন্দু চ্যাটার্জী

দুই ঘটনা

হলিউডের ছবি 'গ্রীন বেরেটস' যখন ব্রুসেলস্-এ মুক্তিলাভ করে তখন এমন এক কাণ্ড ঘটেছিল যাতে 'ন্যাটো'র কর্তাদের চক্ষুস্থির! ব্রুসলস হচ্ছে 'ন্যাটো'র প্রধান কেন্দ্র। সেখানে এলডোরেডো সিনেমায় ছবির মুক্তির দিন রক্তারক্তি ব্যাপার। পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ।

ছবিটির কিছু অংশ দেখার পর দর্শকরা দাবি জানায় অবিলম্বে ছবি প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে। তারপরে সুরু হয় পর্দা ছেঁড়া, কাঁচ-ভাঙা ইত্যাদি। পঞ্চাশেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। বহু লোক আহত হয়। এই বিক্ষোভের কারণ—এই ছবিতে দেখান হয়েছে আমেরিকান প্যারাট্রুপার্সরা মানবিক উদ্দেশ্য নিয়ে ভিয়েৎনামের মাটিতে নামছে, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য। এই মিথ্যা প্রচারে দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। 'গ্রীন বেরেটস' সব দেশে এভাবে বাধা পেয়েছে।

এই ঘটনার বিপরীত দৃশ্য দেখা গেছে ফ্রান্সের তৌলোতে। এখানে ডাচ পরিচালক জোরিস ইভানস-এর 'দি সেভেনটিনথ প্যারালেল' দেখান হয়। এই ছবিতে দেখান হয়েছে ভিয়েৎনামে মার্কিনরা কিভাবে অত্যাচার করছে এবং জোর করে পুতুল সরকারকে জিইয়ে রেখেছে। ছবি চলার সময় প্রতিক্রিয়াশীলরা হলের মধ্যে বোমা ফেলে। দর্শকরা স্থিরভাবে হল থেকে বেরিয়ে আসে। হল পরিষ্কার করে—ধোঁয়া ও বারুদের গন্ধ সরে গেলে আবার হলে এসে ছবি দেখে।

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত

বিকাশ মুখার্জীর প্রযোজনায় বিশিষ্ট মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত ১৭ই ও ১৮ই জুন বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ মঞ্চ বিড়লা মাতুশ্রী হলে ২০ ও ২১শে জুন আমেদাবাদে, তাঁর মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন। তাঁর এই সফরে তিনি এবার কয়েকটি নতুন ফিচার পরিবেশন করবেন। শ্রীদত্তের এই সফরে মঞ্চ, আলো, রূপন, পোষাক, সঙ্গীতের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে সুরেশ দত্ত, তাপস সেন, অনন্ত দাশ, খালেদ চৌধুরী ও হিমাংশু বিশ্বাস।

'অনোখী রাত' ছবিতে অজয় সাহনী ও জাহিদা

ইতিহাসের পাতা থেকে

বহুজাতিক চলচ্চিত্রের জন্ম
॥ চোদ্দ ॥

জারের রাশিয়ায় কেবলমাত্র রাশিয়ান ছবি তৈরি করা হত, আর সে-ছবি অন্য জাতির লোকেদের দেখতে হত। বিপ্লবের পরে অন্যতম প্রধান কাজ হল প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা; জাতীয় রিপাবলিকসমূহে ছবি নির্মাণ করা সুরু হল।

উক্রাইন এবং জর্জিয়ায় চলচ্চিত্র দারুণ উৎকর্ষ লাভ করল এবং বিশ দশকে সেই ছবি সারা রাশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করল। সে সময় আজারবাইজান, বাইলোরুশিয়া এবং উজবেকিস্তানে ছবি তেমন বিকাশ লাভ করতে পারে নি ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং অন্য কয়েকটি কারণে। প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন সৃষ্ট সিনেমাকে পুরনো রীতির সাহিত্য, থিয়েটার, চিত্র থেকে মালমশলা সংগ্রহ করতে হয়েছে। উক্রাইনে আলেকজাণ্ডার ডবঝেঙ্কো এবং ইভান কাভালেরিজ পরিচালক হিসাবে উপস্থিত হলেন চারুকলার জগৎ থেকে, আর লেসকুর্বাস এলেন থিয়েটার থেকে। জর্জিয়ার প্রধান পরিচালক ছিলেন কেটে মার্জানিস্ভিলি, কবি নিকোলাই সেঙ্গেলায়া এবং অভিনেতা ও ভাস্কর মিখেইল চিয়াওরেলি। আর্মেনিয়ার সবচেয়ে ভাল নির্বাক ছবিগুলি তৈরি হয়েছে জাতীয় সাহিত্য অবলম্বন করে. তাতে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বিখ্যাত মঞ্চশিল্পীরা।

বিভিন্ন রিপাবলিকের ছবির বিকাশে সোভিয়েত রাশিয়ান ছবি যথেষ্ট সাহায্য

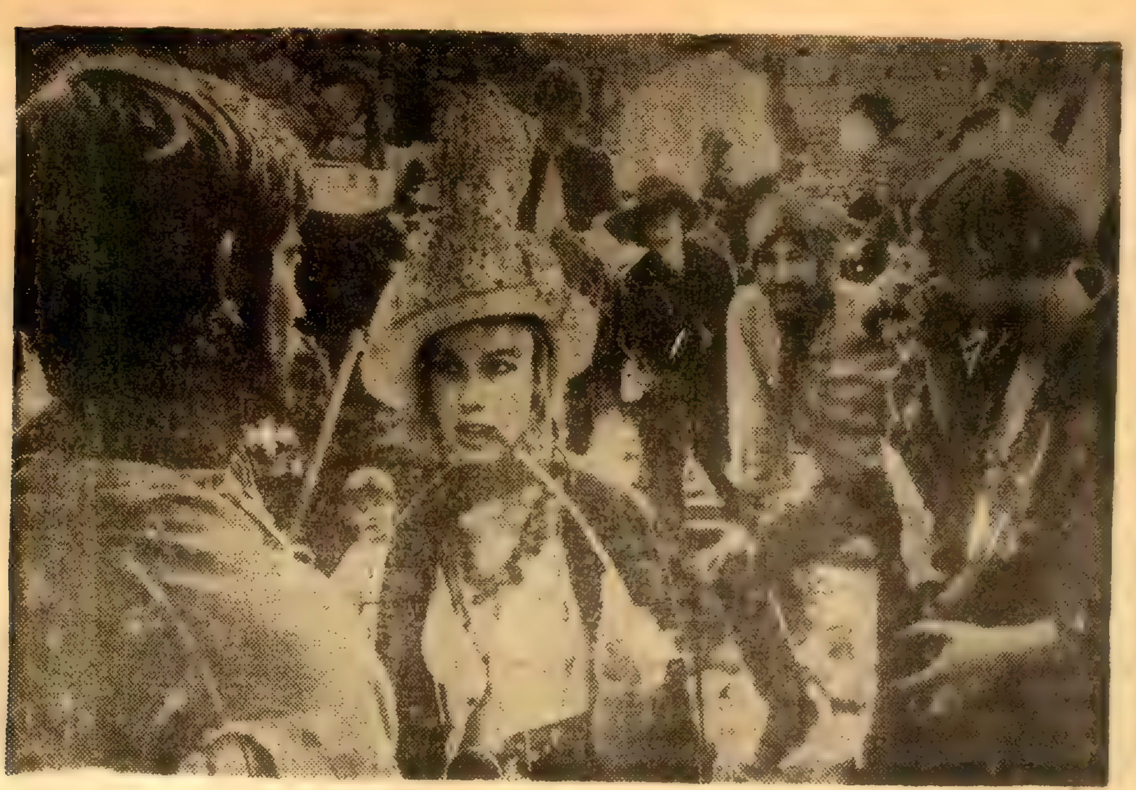

পশ্চিম জার্মানীর ছবি 'মিকেইল কহলহাস দি রেবেল'-এর একটি দৃশ্য। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার, আনা কারিনা, এনিটা পালেনবার্গ। কানস উৎসবে ছবিটি দেখান হবে।

করেছে। আগামী দিনের পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, ক্যামেরাম্যান এবং অভিনেতা তৈরি করার জন্য বিভিন্ন রিপাবলিক থেকে এনে মস্কো এবং লেনিনগ্রাদের স্টেট ফিল্ম স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ফিল্ম স্টুডিওতে রাশিয়ান পরিচালকরা যাঁরা আঞ্চলিকভাবে কাজ করছেন তাঁদের সংগে মিলিতভাবে ছবি করেছেন। উক্রেনিয়ার খ্যাতিমান পুরনো পরিচালকরা কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করেন পরিচালক পাবেল চার্ডিনিন, ক্যামেরাম্যান নিকোলাই কজলোভস্কিকে।

Excitement is her wish and Mayurfil is promise

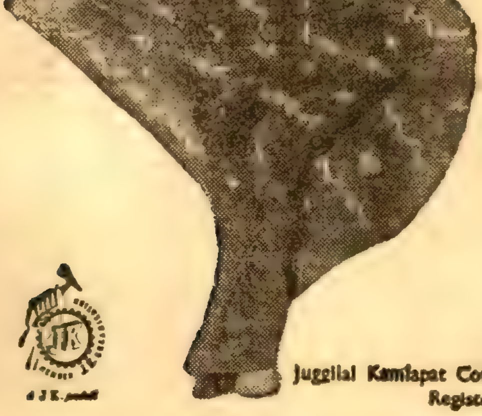

Want to charm people? Mayurfil spun sarees will do it for you. Mayurfil fibre with wonderful lustre and silk like softness will create excitement around you. Be alluring, charm people with 15 different colours offered by Mayurfil. Fast colours and retention of lustre even after repeat washing make Mayurfil the best bargain. Mayurfil is silk in quality but cheaper in price.

Mayurfil yarn is manufactured by J. K. RAYON.

J.K. RAYON

Proprietors
Juggilal Kamlapat Cotton Spinning and Weaving Mills Co., Ltd.
Registered Office – Kamla Tower, Kanpur (India)

REGIONAL DISTRIBUTORS:
M/s. Raghunath Prasad Jhajharia, 114A, Madan Mohan Burman Street, Calcutta-12

যদিও তাঁদের ছবি উক্রেনিয়ার ছবির শৈল্পিক বিকাশে তেমন প্রভাব বিস্তার করে নি, কিন্তু তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে নবাগতদের এগিয়ে আসাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। উক্রেনিয়ার সিনেমায় অভিনয়-রীতিতে চার্ডিনিন এবং পুরনো দিনের আর একজন গার্ডিন চলচ্চিত্রে দারুণ সম্ভাবনার দিকটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং এর জন্য সম্ভব হয়েছে 'টু ডেজ' ছবিতে ইভান জামিচকভস্কির অসাধারণ অভিনয় (পরিচালনা জর্জি স্টাবভই) এবং 'দি নাইট ক্যাবে' ছবিতে (পরিচালক জর্জ তাসিন) আম্রোসি বুচমার অভিনয় দক্ষতা। অভিনয় উৎকর্ষে এই ছবি দুটি সাফল্য লাভ করে।

বিপ্লবের পরে রুশীয় মঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতা ইভান পেরেসতিয়ানি জর্জিয়ায় চলে আসেন এবং সেখানে অন্যতম চলচ্চিত্র পুরোধারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। সেখানে দারুণ জনপ্রিয় বিপ্লবী এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী-চিত্র 'দি লিটল রেড ডেভিল' তিনি পরিচালনা করেন এবং জর্জিয়ার অনেকগুলি চিরায়ত সাহিত্যিকের চলচ্চিত্ররূপ দেন। সারা জীবন তিনি জর্জিয়ার চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যথার্থভাবে চিত্রজগতের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে গণ্য করা হয়।

'রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট' ছবিতে অলিভিয়া হাসে এবং লিওনার্ড হোয়াইটিং

আর্মেনিয়ার ফিল্ম আর্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমো বেক-নাজা-রভ। যদিও তিনি আর্মেনিয়ার মানুষ কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে রুশীয় ছবিতে তিনি নাম করেছিলেন। বিপ্লবের পরে তিনি জর্জিয়ায় চলে আসেন, তারপরে যান ইয়েরেভানে ; সেখানে তিনি ১৯২৬ সালে 'নামুস' ছবিটি করেন জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতাদের নিয়ে। এই ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছিল আলেকজান্ডার শিরভানজাদের উপন্যাস অবলম্বনে। এই ছবিতে তিনি নিজেকে একজন বাস্তববাদী হিসাবে প্রমাণ করেন।

বাইলোরুশিয়ার ছবির প্রথম সাফল্য ইউরি তারিচ এবং ভ্ল্যাডিমির কর্শ সাবলিন-এর নামের সঙ্গে যুক্ত। এঁরা দু-জনেই প্রথমে রাশিয়ান ছবিতে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁরা অনেক বাইলোরুশিয়ান লেখক ও অভিনেতাকে চলচ্চিত্র শিল্পে নিয়ে আসেন। তারিচের 'স্টোরি অব দি ফরেস্ট' মিথাস চারোট-এর চিত্রনাট্য অবলম্বনে নির্মিত। কর্শ সাবলিনের 'বর্ন ইন দি ফ্রেমস্' বাইলোরুশিয়া আর্টের জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

গার্ডিন-এর ছবি 'কাস্টুস কালিনোস্কি' জনবিদ্রোহের এক জনপ্রিয় নায়কের সম্পর্কে, যিনি বাইলোরুশিয়ান এবং লিথুয়ানিয়ানদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এই ছবিটি সারা সোভিয়েতে সমাদৃত হয়েছিল।

আজারবাইজানের এবং উজবেকিস্তানের চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রথমযুগে অনেক কিছুর মিল ছিল। পূর্বাঞ্চলের নারীদের মুক্তি-সংগ্রাম, নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তাদের যে সংগ্রাম করতে হয়েছে—এ সকল বিষয় নিয়ে ছবিগুলি নির্মিত হয়েছে। উজবেকিস্তানে ছবি পরিচালিত হয়েছে রাশিয়ানদের দ্বারা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওলেগ ফ্রেলিচ্ (দি কভার্ড ওয়াগন), মিখেইল ভোরানিন (সেকেণ্ড ওয়াইফ) এবং উজবেক সিনেমার পরবর্তী চালক নবি গানিয়েভ, কামিল ইয়ারথাটোভ এবং সুলেইমান খোদজায়েভ এঁদের কাছে হাতেকলমে শিক্ষা গ্রহণ করেন। আজারবাইজানে নির্বাক ছবি তৈরি করেছিলেন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা। এ বিষয়ে আব্বাস মির্জা শারিফভ ('ইন দি নেম অব গড, গাজীকারা'), বেক-নাজারভের 'হাউস অন এ ভলকানো' এবং 'সেভিল' উল্লেখযোগ্য।

বিশ দশক ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুজাতিক শিল্প বিকাশের সাংগঠনিক কাল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রত্যেক রিপাবলিককে চলচ্চিত্র-শিল্প গঠনের সহায়ক হয়। জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন এই ছবিগুলির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে।

—ক. স. গ

সংবাদপত্র এবং জনসাধারণ মেহমুদের পড়োসনকে অভিনন্দিত কোরেছে :—
সকল বাংলা ছবি "পাশের বাড়ি" হইতে ইহার গল্পাংশ গৃহীত হইয়াছে, মেহমুদ প্রোডাকসনের 'পড়োসন' বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে কৌতুক উন্মাদনায় সমুজ্জ্বল, তাহার সহিত বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালকের ভগবান দত্ত ক্ষমতার অধিকারী তরুণ পুত্র রাহুলদেব বর্মণের মন মাতানো অপূর্ব সঙ্গীত লহরী।

—অমৃতবাজার পত্রিকা

হাসির তুফান। নাটকের বিস্তার সঙ্গীতে এবং সঙ্গীতের বিস্তার নাটকে।

—সিনে এ্যাডভান্স

পড়োসন

(ইস্টম্যান কলার)

যতই দেখিবেন ততই মেহমুদের পড়োসন ভাল লাগিবে।

প্রত্যহ ৩, ৬, ৯টা দর্পণা ও মেনকায় ২-৩০, ৫-৪৫, এবং ৯টা

সোসাইটী-দর্পণা-মেনকা

(তিনটিই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল চিত্রগৃহ)

মুনলাইট—ছায়া

(এয়ার কুলড্)

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

গত ১৫-২-৭৬ বঙ্গাব্দের সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রখানি পড়ে বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম।

সত্য কখনও স্তুতি-নিন্দার মুখাপেক্ষী নয়—সে আপন গৌরবেই চলে। সাপ্তাহিক বসুমতীর লক্ষ্য যতক্ষণ ধ্রুবের দিকে, পথ যতক্ষণ সত্যাশ্রয়ী, ততক্ষণ আমাদের মত দু-পাঁচজন পাঠকের কামলারোগগ্রস্ত দৃষ্টিতে তার মূর্তি কোন রূপে প্রতিভাত হোল সে তোয়াক্কা না রাখলেও চলে। কিন্তু অহেতুক আমাদের এই প্রিয় পত্রিকার চরিত্রে কেউ কাদা ছুড়লে দর্শক হিসেবে আমাদের নীরব থাকা কঠিন। তাই উক্ত পত্রখানির প্রতিবাদ না করে পারছি না।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মত 'উৎসাহী' (কিংবা অত্যুৎসাহী বলাই ভাল) পাঠক বোধহয় আমি নই;—কারণ, তাহলে আপনার পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী কি লিখলেন, কেমন লিখলেন এসব বাদ দিয়ে তাঁদের বংশপরিচয় কি, তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে কনফিডেন-শিয়াল রিপোর্ট কি, এই সব অনুসন্ধান করতে যত্নবান হতুম। অতি নগণ্য একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমি পত্রিকাটির রচনাগুলি পড়ি, তাদের মূল্য-মানের নিরিখে পড়ার চেষ্টা করি; রচয়িতা-দের পরিচয় বা গাত্রগন্ধ বিচার করে কদাচ নয়। তবে আমি বিশেষরূপে জানি হাজার হাজার সাধারণ পাঠক আমার মত করেই পত্রিকাখানি পড়েন এবং এর গৌরব-ময় স্বকীয়তার জন্য একে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সমীহ করেন। তাঁরা জানেন, সংবাদ-সাহিত্য পত্রিকারূপে এই পত্রিকা-খানি এক দিকে যেমন নতুন পথের দিশারী, অপর দিকে তেমনি সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে, মানবকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে সংবাদ বিশ্লেষণ এর অনবদ্য। তাঁরা জানেন সাপ্তাহিক বসুমতী কোন রাজ-নৈতিক মতাদর্শের মুখপত্র নয়; তাঁদেরই বুকের অস্ফুট বাণীর মুখপত্র। এ যুক্তফ্রণ্ট, কি কোন ফ্রণ্টেরই প্রচারপত্র নয়; শাশ্বত মানবতার প্রচারপত্র। খোলা চোখে দেখলে, আমার বিশ্বাস, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ও এ সত্য দেখতে পেতেন।

একথা অবশ্য আমি বলতে চাচ্ছি নে যে, যা কিছু এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা সকলই ত্রুটিলেশহীন, সকলই প্রথম শ্রেণীর—ইহজাগতিক কোন কিছুই তা হয় না, হতে পারে না—এ জগতে absolute বলে তো কিছু নেই। এরও ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে। কিন্তু সে প্রশ্ন এককভাবে রচনাদির গুণগত বা মান-গত বিচারের প্রশ্ন, সামগ্রিকভাবে পত্রিকা-টির চরিত্রবিচারের প্রশ্ন নয়।

যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক স্পষ্টই দেখতে পাবেন—"জোর করে যেন বানান হয়েছে কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের দিকে তাকিয়ে"—এ মন্তব্য সাপ্তাহিক বসুমতীর লেখাগুলির চেয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রখানি সম্পর্কেই অধিক প্রযোজ্য।

মোক্ষম প্রমাণ হিসেবে তিনি সাগর বিশ্বাসের 'নির্বাচনের পরে' পর্যায়ে লিখিত প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করেছেন—তাতে নাকি বেশির ভাগ সি পি এম বিধান-সভা সদস্যদের জন্যে প্রচার চালান হয়েছে। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৩ই মার্চের সংখ্যা থেকে ১লা মে-র সংখ্যা পর্যন্ত সবশুদ্ধ ২৩ জনের মত এম-এল-এ-দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয় এই পর্যায়ের রচনায় তুলে ধরা হয়েছে—এর মধ্যে ৮ জন সি পি এম, ৬ জন সি পি আই, ৪ জন বাংলা কংগ্রেস, ৪ জন ফর-ওয়ার্ড ব্লক ও ১ জন আর এস পি। পাঠকেরা বিচার করুন সি পি এম-এর সংখ্যা কত বেশি, তাঁদের আসন সংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশি কি? কিন্তু সংখ্যার প্রশ্ন নয়, দেখতে হবে আদৌ এটা তাঁর অভিযোগ মত 'মুষ্টিমেয়ের প্রচারের ব্যবস্থা' কি না। সাপ্তাহিক বসুমতী মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তৎপূর্ববর্তী পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের চিন্তাধারা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যে কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করেছিলেন—সে কি সেই সব বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের প্রচারের জন্য? কোন্ অর্বাচীন সে প্রশ্ন তুলবে? ঠিক তেমনি চৌদ্দ দলের ফ্রণ্টের নীতিতে প্রতিটি সদস্যের আস্থা বা সক্রিয় সহযোগিতা আশা করা যাবে কি না তারই নমুনা যাচাই হিসেবে এই এম-এল-এ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গের অবতারণা। এক দলের সরকার থাকাকালীন সরকার পক্ষের সাধারণ সদস্যদের শুধু উপস্থিতি ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব ছিলো না, কিন্তু চৌদ্দ দলের সরকারের ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রশ্নও অবান্তর।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখাগুলির মধ্যে পত্রলেখক কতকগুলি গালাগাল ছাড়া কিছু পান নি; তার মধ্যে বক্তব্য বা প্রতি-পাদ্য কিছু দেখতে পান নি—ওগুলি "গাল দিতে হবে বলেই লেখা"। এ মন্তব্যের জন্যে পত্রলেখকের প্রতি করুণা হয়। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলির সমালোচনা অনেকভাবে হতে পারে; হয়েছেও, আমার যতদূর মনে পড়ে। কিন্তু এই জাতীয় মন্তব্য চিন্তাশক্তির পঙ্গুতারই পরিচয় বহন করে।

২৪শে এপ্রিলের সম্পাদকীয় স্তম্ভে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা সম্বন্ধে "বক্রোক্তি" যে পত্রলেখক কোথায় দেখলেন, আমাদের মত সাধারণ পাঠকের তা বুদ্ধির অগম্য। ওই স্বল্পপরিসর। নিবন্ধের মধ্যে এত সুন্দর অথচ বাস্তবানুগভাবে রবীন্দ্র সরোবরের উচ্ছৃঙ্খল ঘটনার causative factorsগুলি বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে, যা রীতিমত প্রশংসার দাবি রাখে। বিচারবিভাগীয় তদন্তের অধীন বিষয় সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা চলে না।

পরিশেষে বলি, যুগ যুগ ধরে রাজ-তন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ইত্যাদির মিশ্র চাপে আমরা একপ্রকার আলোক-অসহিষ্ণু জীবে পরিণত হয়েছি। তার ওপর পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের ক্লান্তিহীন প্রচারে আমাদের কমিউনিস্ট-ফোবিয়া ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে—আজ পুঁজিবাদতন্ত্র দেশের সমস্ত প্রচারযন্ত্র কুক্ষিগত করে সেই ফোবিয়া শতগুণ বাড়িয়ে তুলতে তৎপর। কাজেই আপনাদের মশাল জ্বালার চেষ্টা আমাদের সহ্য হবে কেন? লক্ষ লক্ষ বেণু বন্দ্যোপাধ্যায় আনাচে-কানাচে ঘুরছেন, তাঁরা আলো দেখলেই কম্যুনিস্ট-ফোবিয়ায় চীৎকার করে ওঠেন। এঁদের চীৎকার যেন আপনাদের সাধনা বিঘ্নিত না করে। সত্যের জয় হোক, মানুষের জয় হোক।

গৌরীশঙ্কর চন্দ্র
ব্যারাকপুর

সেলট্যাক্স অফিসে দুর্নীতি প্রসঙ্গে

গত ১৫ই মে/১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'জনৈক ভুক্তভোগী' সেলট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার অনেকাংশের সহিত একমত হইলেও ভুক্তভোগীর সকল অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নহে। একথা সত্য যে সেল-ট্যাক্স অফিসে দুর্নীতি আছে যেমন আর সর্বত্র আছে। কিন্তু তিনি যেভাবে ঝাড়ে কোপ লাগাইয়াছেন তাহা নির্মম। বর্তমান জনসংযোগ কর্তা শ্রী এন্, বি, মিত্র একজন অতি সজ্জন বলিয়া জানি। তিনি একাধিক প্রশ্নের জবাব দিতে বিরক্ত হন অথবা উকীলের ঠিকানা সাপ্লাই করেন ইত্যাদি অভিযোগ বিদ্বেষপ্রসূত মনে হয়।

—পরিতোষ ঠাকুর
সচিব
Calcutta Kirana (Spices)
Merchants Association

খেলাধুলা

ইডেনের হাল

এবার মেয়েদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসেছিলো কলকাতার ইডেন উদ্যানে। ভারতের প্রতি প্রান্ত থেকে আগত ললনাদের কলতানে ইডেন উদ্যান যেন কল কল করছিলো। তবে সেই স্বর্গীয় শোভা কলকাতার দর্শকরা দু'চোখ ভরে দেখলেন না, এই যা দুঃখ। যাক গে, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ নেই। গতস্য শোচনা নাস্তি। তার চেয়ে বরং একবার না হয় ইডেন উদ্যানে ঘুরে আসা যাক—অবশ্য আপনি যদি সত্যিকারের ক্রিকেট প্রেমিক হন আর কোন ব্যাপারে দুঃখ করতে চান, তাহলেই চলুন। যা দেখবেন তাতে অবাক হবেন। আরো অবাক হবেন যখন আপনার মনে পড়বে যে, এই ইডেন উদ্যানে ফুটবল খেলাবার জন্যে অনেকেই উঠে পড়ে লেগেছেন। আপনার হয়তো মাথায়ই ঢুকবে না যে এই মাঠে কি করে ফুটবল খেলা সম্ভব। এটুকু অন্তত বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, ফুটবল আর ক্রিকেট এক সংগে ইডেন উদ্যানে অচল। শুধু অচল বললেই চলবে না, বলতে হবে অসম্ভব। কারণ মেয়েদের এই সামান্য হকি খেলাতেই মাঠের যা রূপ খুলেছে তা আর কহতব্য নয়। একে হকি খেলা তাও আবার মেয়েদের, তাতেই যখন মাঠের অবস্থা অমনই সঙ্গীন তখন কি করে ফুটবলের মতো ভারী খেলার দাপট সহ্য করবে ইডেন উদ্যান? ভেবে দেখার বিষয়ই বটে। তবে যাঁদের ভাবার দরকার সবার আগে তাঁরা আদপেও ভাববেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সন্দেহ অবশ্য থাকারই কথা। কারণ ভেবে-চিন্তে কিছু করা আমাদের স্বভাব নয়।

আর তা নয় বলেই আজো ইডেন উদ্যানে ছোটদের স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চলছে পুরোদমে। কিন্তু কি করে যে চলছে সেইটাই ভেবে দেখার দরকার সবার আগে। মাঠের যা অবস্থা তাতে যে কোন মুহূর্তে একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। ঘটছে যে না এ কথাও বলা যায় না। এই তো ক'দিন আগে হকি খেলার স্মৃতি একটি ক্ষত-চিহ্নের ওপর বলটা পড়ে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে আর গিয়ে লাগে একজন ছাত্র খেলোয়াড়ের কপালে। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। মাঠে প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থাও ঠিকমতো নেই। ফলে শুধুমাত্র ইডেন উদ্যানই নয়, স্কুলের ছেলেদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার হালও আজ হয়েছে একেবারেই শোচনীয়। ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ উদাসীন। মাঠের দুরবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সাফ বলে দেন রাজ্য সরকারের মাঠ রাজ্য সরকার দিয়েছেন হকি খেলার জন্যে, সুতরাং মাঠের এই অবস্থার বিষয়ে কথাবার্তা তাঁদের সংগেই বলা উচিত। অবশ্য শুধুমাত্র এই কথা বললেই তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ ছাত্রদের স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যখন ইডেন উদ্যানে চলছে তখন সেই খেলাগুলোর এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সুখ-সুবিধের দিকে যে নজর দেওয়া তাঁদেরই কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এ কথা তাঁরা বেমালুম ভুলে গেছেন। কিন্তু আজ যদি এই স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে তার জন্যে দায়ী হবেন কে? যাক সে কথা! কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন এই যে, ইডেনে যদি স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চালাতেই হয় তাহলে তাঁরা যেন আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রাখেন আর এবারের বাকী খেলাগুলো যাতে ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেদিকে শুধুমাত্র নজর দিলেই চলবে না, যত্নবানও হতে হবে। জানি না আমাদের এ আবেদন শুধুমাত্র অরণ্যে রোদন কি না...! —শান্তিপ্রিয়।

ক্রিকেটের খবর

ক্রিকেট এখন জমিয়ে বসেছে সাগরপারের দেশ খোদ ইংলণ্ডে। কাউণ্টি লীগের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম,

॥ সোবার্স ॥
সোবার্সের ওপরই নির্ভর করছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ভালো খেলা না খেলা।

ও তো ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার আসর ওদেশে এখন টেস্ট ক্রিকেটের আসরই আসল। টেস্ট লড়াই-এ ইংলণ্ড এবার সম্মুখীন হবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শোচনীয় ফলাফলের পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এখন যেন একটু পিছিয়ে পড়েছে। সেই অঘোষিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান দলের সম্মান এখন আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দাবি করতে পারে না। তাদের খেলার মান এখন যেন একটু নিম্নমুখী, হাল যেন কিছুটা কাহিল।

তবে তুলনামূলকভাবে দুদলের শক্তি কোন অংশেই কম নয়। ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য যে তারা প্রথম টেস্টে কলিন কাউড্রে ও কলিন মিলবার্নের সাহায্য পাবে না। কাউড্রে খেলার সময় পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন আর মটর দুর্ঘটনায় মিলবার্ন হারিয়েছেন একটা চোখ। শুধু তাই নয়, এম সি সি বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলার সময় জিয়ফ বয়কটও হাতে আঘাত পেয়েছেন। তবু প্রথম টেস্টে তাঁর অংশ গ্রহণ করার সম্ভাবনাই বেশি।

ওদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে এবার অনেক নতুন মুখ। নামী খেলোয়াড়দের বেশ কয়েকজন দল থেকে বাদ পড়েছেন। তবে তারুণ্যের শক্তি সাংঘাতিক। হয়কে নয় করে দিতে পারে তারা খুব সহজে। তবু এ কথা আজ বোধহয় আর কেউই অস্বীকার করবেন না যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলার সব কিছু নির্ভর করছে অধিনায়ক সোবার্সের সাফল্যের ওপর। এক কথায় বলা যায় যে সোবার্সকে কেন্দ্র করেই দাঁড়িয়ে আছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলটা। তাই সোবার্সের ব্যক্তিগত সাফল্যের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ভালো খেলা কিম্বা না খেলা।

যাই হোক প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড দল পরিচালনার ভার পড়েছে বর্ষীয়ান খেলোয়াড় রে ইলিংওয়ার্থের ওপর। লিসটারশায়ার দলের অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থের বয়েস এখন ৩৬। কাউণ্টি দল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। দেখা যাক ইংলণ্ডের অধিনায়ক হিসেবে তিনি সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেন কি না!

ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার ফলাফল যে কি হবে তা বোধহয় আগে-ভাগে কেউই বলতে পারবেন না। তবে

॥ কাউড্রে ॥
খেলার সময় পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন কাউড্রে। তাই এবার তাঁর জায়গায় ইংলণ্ড দল পরিচালনা করছেন ইলিংওয়ার্থ।

এ কথা ঠিক টসে জেতার ওপর যেমন খেলার অনেক কিছু নির্ভর করে তেমনি ইংলণ্ডের খাম-খেয়ালী আবহাওয়াও খেলার ধারা হয়তো পাল্টে দিতে পারে অনেকাংশে। তবে মনে হচ্ছে যে, ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই এবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। যে কোন দলই লাভ করতে পারে জয়লাভের সম্মান।

খেলি ফুটবল

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বল চাই, বল চাই,
চাই মোরা বল!
তাই খেলি ফুটবল,
খেলি ফুট্‌বল্!

ক্রীড়ারসে ফুলে' যাক
অমাদের ছাতি!
ফুট্‌বলে ভীমবলে
লাগাও রে লাথি!

বল্ তোলো ঊর্ধ্বতে;
হেড্ করো মূর্ধেতে;
ক্রীড়ামদে যাও মেতে,
যাও এবে মাতি'!
ফুট্‌বলে ভীমবলে
লাগাও রে লাথি!

ধাও বেগে, ধাও বেগে,
ভীমবেগে ধাও!
বল্ লয়ে বল ক'রে
যাও তেড়ে', যাও!

ওরা চায় এই দিকে
ঠেলে দিতে বল্‌টিকে;
তোমরাও সেইটিকে
ঐ দিকে নাও।

গোল বলে গোল্ দিয়ে,
জয়-গান গাও।—
গোল বলে গোল্ দিয়ে,
জয়-গান গাও!

॥ বয়কট ॥
হাতে আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও প্রথম টেস্টে খেলার সম্ভাবনা আছে।

হকি প্রতিযোগিতায় মেয়েরা

সন্তোষকুমার শীল

মেয়েদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর মনোরম পরিবেশের মধ্যে ইডেন উদ্যানে শেষ হয়ে গেলো গত ১লা জুন। বাংলার মহিলা হকি এসোসিয়েশন অনুষ্ঠানটির ভার নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতাগুলি পরিচালনা করেন। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই বছরেই বাংলার মহিলা এসোসিয়েশনের ৪০ বছর পূর্ণ হলো। বাংলা হকি এসোসিয়েশন ভারতের সবচেয়ে পুরনো মহিলা প্রতিষ্ঠান। অনেকের মতে বাংলা দেশই মেয়েদের হকি খেলার পথ প্রদর্শক।

দীর্ঘ তেরো দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ৯৯টি প্রদেশ অংশ গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত মেয়েদের এই প্রতিযোগিতা সকলকে সৌহার্দ্য ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে।

গত বছর চন্ডীগড়ে মেয়েদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। ফাইন্যালে উঠেছিল এবারের মতো পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্র দলই। ফাইন্যালে মহারাষ্ট্রকে এক গোলে হারিয়ে পাঞ্জাব লাভ করেছিল বিজয়ীর সম্মান। এ বছর বাংলা দেশে মহারাষ্ট্র নিলো তার পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ। মহারাষ্ট্রের এই জয়লাভ ছিলো অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত। কারণ তাঁরা এর আগে দু' দু' বার ফাইন্যালে উঠেও একবারও লাভ করতে পারে নি চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্মান

পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, পেপসু, রেলওয়ে, বাংলা, চন্ডীগড়, বোম্বাই প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে দিয়েছেন অভাবনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়। মেয়েদের হকি খেলা দেখে বারবার আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে, এ'রা পুরুষ হকি দলের খেলোয়াড়দের তুলনায় কোন অংশেই কম নন।

১৯টি প্রদেশের মধ্যে ১৩টি রাজ্য তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লীগ প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। এরপর তিনটি গ্রুপ থেকে ৬টি দল সরাসরি নক আউট প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বোম্বাই, পেপসু, বাংলা, মহাকোশল, মহীশূর, দিল্লী, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র সরাসরি কোয়ার্টার ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পায়।

বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যে সব মেয়েরা হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে, তারা বেশির ভাগই স্কুল ও কলেজের ছাত্রী। অনেক সময় দল হেরে যাওয়ায় অনেককেই কাঁদতে দেখা গেছে। এটা নিশ্চয়ই কিশোর মনে পরাজয়ের দুঃখের জন্যই। আবার অনেক সময়ে মেয়ে খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতিও করেছেন। কেরালা বনাম চন্ডীগড়ের এবং বোম্বাই বনাম চন্ডীগড়ের খেলায় মেয়েদের মারামারি ও হাতাহাতির দৃশ্য মাঠে উপস্থিত সকলেই দেখেছেন।

ভারতবর্ষের জাতীয় ক্রীড়া হচ্ছে হকি। জাতীয় বলছি এই জন্য যে, এই বিষয়ে ভারতের কৃতিত্বের কথা সর্বজনবিদিত। আগে আমরা ভাবতাম, ভারতবর্ষে কোন মেয়ে কোনদিনও পুরুষদের সাথে খেলাধুলায় বোধহয় পেরে উঠবে না। কিন্তু এখন মেয়েদের হকি খেলা দেখে সে ভুল ভেঙেছে। পুরুষদের মতো অতো শক্তিশালী না হলেও তারাও যে উন্নত হকি খেলার কলাকৌশল প্রদর্শন করতে পারে তা আমি সেদিন ইডেন উদ্যানে প্রত্যক্ষ করলাম। বিশেষ করে পাঞ্জাবের মেয়েদের খেলা সকলকে মুগ্ধ করেছে। তারা তাদের আশ্চর্যজনক চোখ, তৎপরতা, স্বার্থহীনতা, ক্ষিপ্রতা, দলগতসংহতি এবং বিজ্ঞানসম্মত ক্রীড়াভঙ্গি দেখিয়ে উপস্থিত দর্শকদের হৃদয় জয় করেছে। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বাংলা দেশের পুরুষদের দু'-একটি দল ছাড়া, তারা যে কোন দলকে পরাস্ত করতে পারে।

বাংলা দল কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠে পেপসুর কাছে হেরে যায় দ্বিতীয় দিনের খেলার অতিরিক্ত সময়ে। বাংলা দেশের মেয়েরা অন্যান্য দেশের মেয়েদের তুলনায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নন। তা ছাড়া, দু'-একটি মিশনারী কলেজ ও স্কুল ছাড়া আর কোন জায়গায় খেলবার ব্যবস্থাও নেই। ফলে ঠিক মতন [illegible]ং-

তিন প্রধানের খেলা

১১ই জুন—মহামেডান স্পোর্টিং বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন
১৩ই জুন—ইস্টবেঙ্গল বনাম রাজস্থান
১৪ই জুন—মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং
১৬ই জুন—মহামেডান স্পোর্টিং বনাম খিদিরপুর
১৭ই জুন—মোহনবাগান বনাম পোর্ট কমিশনার্স
১৮ই জুন—ইস্টবেঙ্গল বনাম কালীঘাট
মহামেডান স্পোর্টিং বনাম উয়াড়ী

এর সুযোগ তারা পায় না। এই কারণে, তারা যে কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠেছে, এটাই সৌভাগ্যের কথা। আর একটা জিনিষ যেটা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে তা হলো বাংলা দেশে জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতা হচ্ছে অথচ বাঙালী মহিলা দর্শক একটিও নেই। যা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। স্কুল ও কলেজের ছাত্রী-দের তো পাত্তাই পাওয়া যায় নি। কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাই দেখা গেছে পাঞ্জাব প্রদেশের যে কোন দলের খেলা থাকলেই। কলকাতায় যতো পাঞ্জাবী পরিবার আছে তারা সকলেই মাঠে হাজির হতেন এবং নিজ দলকে জয়ী হবার জন্য উৎসাহিত করতেন। কিন্তু বাংলার মহিলা হকি দলের অবস্থা কি? না আছে দর্শক, না আছে ঠিক মতন ট্রেনিং ব্যবস্থা, না আছে উপযুক্ত কোচ। এ সত্ত্বেও বাংলা দল যে কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠেছে এটাই বাংলা মহিলা দলের সব-চেয়ে বড় কৃতিত্ব।

২৩তম মহিলাদের জাতীয় হকির ফাইন্যালে গতবারের রানার্স আপ মহারাষ্ট্র ১—০ গোলে গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব দলকে পরাজিত করে মহিলা হকির বিজয়ীর পুরস্কার লেডি রতন টাটা ট্রফি প্রথম লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব দলের আধিপত্য বজায় থাকা সত্ত্বেও তারা মহারাষ্ট্রের কাছে নিতান্ত দুর্ভাগ্য-বশত পরাজয় বরণ করে। বিজয়ী দলের অধিনায়ক অ্যানি নরোনা জয়সূচক গোলটি দেয়।

আমার মতে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়-গণকে এই বৎসরের মহিলা হকি প্রতি-যোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রূপে অভিহিত করা যায়—

গোল—মারগারেট মিত্র (বাংলা)

ব্যাক্—প্রমীলা কুমারী (পাঞ্জাব), সুরেনিত ধীলন (পেপসু), এলিজাবেথ ক্লক (বাংলা) ও জুলি ভান (বোম্বাই)

হাফ ব্যাক্—ও ম্যাসকারিনাস (মহা-রাষ্ট্র), মেরিলিন-পেরেরা (রেলওয়ে)

সেন্টার হাফ—জোয়ান পারল (রেল-ওয়ে), অ্যানি সামসন (মহারাষ্ট্র) ও ওম কুমারী (পাঞ্জাব)

ফরোয়ার্ড—চার্ল ডিসুজা (বোম্বাই), গুরুচরণ (পেপসু), পারমিন্দার শেখন (পাঞ্জাব), অ্যানি নরোনা (মহারাষ্ট্র), প্রেমা সাইনি (পাঞ্জাব), মালবিন্দার ধীলন (পেপসু), পামি কালকট (পেপসু), চরণজিত (পেপসু) ও ক্যারল (বোম্বাই)

ফুটবল ফুটবল

ময়দানী ফুটবলকে কেন্দ্র করে আবার যথারীতি শুরু হয়ে গেছে গোলমাল, হৈ হট্টগোল, পয়েন্ট হারাবার দুঃখে মুহ্যমান দর্শকদের তাণ্ডব। অথচ এ বছর এরই মধ্যে ঠিক এমনটি হবার কথা ছিল না, হয়তো ছিল না কোন সংগত কারণও। কারণ, আমরা আগেই লিখেছি যে, সুপার লীগের খেলা থাকার জন্যে এ বছর বড় দলগুলোর কাছে এক-আধ পয়েন্টের খুব একটা গুরুত্ব নেই।

তবু মাঠে গোলমাল হচ্ছে, হচ্ছে খণ্ডযুদ্ধ, মাঠে পড়ছে ইঁট আহত হচ্ছেন লাইনসম্যানরা। তবে এবারের সব গণ্ড-গোল, এখনো পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা হয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং দলকে কেন্দ্র করেই। তবে এ কথাও ঠিক যে মহা-মেডান স্পোর্টিং এ বছর এখনো পর্যন্ত খুব একটা ভালো খেলতে পারছে না। তাই পয়েন্টও হারাচ্ছে তারা।

পয়েন্ট অবশ্য মোহনবাগান হারি-য়েছে, হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গলও। তবু তারা এই পয়েন্ট হারানোকে সাংঘাতিক একটা কিছু এইভাবে নেয় নি। কারণ তারা জানে যে এক-আধ পয়েন্ট হারালেও তাদের সুপার লীগে ওঠা কেউ আটকাতে পারবে না। সুতরাং মিছিমিছি গোল-মাল করে তো আর লাভ নেই।

তবে এ কথা ঠিক যে এই সুপার লীগ প্রথা চালু হবার পর লীগ ফুটবলের আকর্ষণ অনেক কমে গেছে। আগে কখনো মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার দিন মাঠ ফাঁকা থাকতো না। দৈনিক টিকিট কিনতে হলে আগে-ভাগে এসে লাইন লাগাতে হতো। আজকালকার অবস্থা কিন্তু ঠিক সেই রকম নয়। প্রায় দিনই দেখি মাঠের অনেকাংশ ফাঁকা পড়ে আছে।

যাক ও কথা। ময়দানী ফুটবলে বড় দলগুলোর চেয়ে এবার কিন্তু ছোট দলগুলোই ভালো খেলছে। হয়তো বা নেমে যাবার ভয়ে। তবু এ কথা ঠিক যে কোন নির্ধারিত মান নেই কলকাতার ফুটবল দলগুলোর। যেমন একটা ছোট দল হয়তো একটা শক্তিশালী দলকে হারিয়ে দিলো কিম্বা খেলা শেষ করলো অমীমাংসিতভাবে আর তার পরেই তাদের চেয়েও দুর্বল দলের কাছে হেরে গেলো বিশ্রীভাবে।

তবু ছোট দলগুলোর মধ্যে এবার বোধহয় কালীঘাটই সব থেকে ভালো খেলছে। বাটা, পোর্ট কমিশনার্স প্রভৃতি দলগুলো মাঝে মাঝে তাক লাগালেও আখেরে খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না। প্রথম বিভাগের নতুন দু'টি দল পোর্ট আর পুলিশের মধ্যে পুলিশের অবস্থা এবার একেবারেই শোচনীয়। দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাবে কি না কে জানে। সে চিন্তার অবশ্য এখনো অনেক দেরি...।

গল্প হলেও সত্যি

একটি তেরো বছরের কিশোরের কি করে এত ধৈর্য ও একাগ্রতা থাকতে পারে? এই ছেলেটির নাম ছিল এ, ই, জে কলিন্স। এই অসাধারণ প্রতিভার ছেলেটি জন্ম-গ্রহণ করেছিল ভারতবর্ষে। তার জন্ম তারিখ ১৮।১০।১৮৮৫। ছেলেটির বাবা ছিলেন আই-সি-এস অফিসার। ছেলেটির যখন বারো বছর বয়েস তখন তার বাবা মারা যায়। সে পড়তো ক্লার্কস্ হাউস বিদ্যালয়ে।। সেবার ক্লার্কস্ হাউস ও নর্থ টাউন জুনিয়র বিদ্যালয়-এর মধ্যে একটি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো। কলিন্স ছিল তার বিদ্যা-লয়ের প্রারম্ভিক ব্যাটস্‌ম্যান। নর্থ টাউন জুনিয়র বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে এসে সে সংগ্রহ করেছিল অপরাজিতভাবে ৬২৮ রান। তার দলের মোট রান হয়েছিল ৮৩৩।

কলিন্স ব্যাট করেছিল মোট ৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ধরে। ভাবতে অবাক লাগে যে, তেরো বছরের একটি ছেলে অতো ধৈর্য ধরে কি করে অতোক্ষণ ব্যাটিং করেছিল।

—পরিতোষ নাগ
জলপাইগুড়ি
বেলাকোবা

সোমনাথ, মুরারি, মদন ও বিশ্বনাথ কর্মকার (বদরতলা, কলকাতা—৪৪)

প্রশ্ন : ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে কে কে ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন জানতে চাই।

উত্তর : পতৌদির নবাব (ছোট)—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ২০৩* রান দিল্লী টেস্টে।

ভিনু মানকাদ—নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে—২৩১ রান মাদ্রাজ টেস্টে।

ভিনু মানকাদ—নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বম্বে টেস্টে ২২৩ রান।

পলি উমরিগড়—নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদ টেস্টে ২২৩ রান।

অরুণ গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : বহু ঐতিহ্যপূর্ণ বাংলার ফুটবল খেলা আজ যে অবনতির পথে চলেছে তার জন্যে কি খেলোয়াড়রা না কর্মকর্তারা দায়ী।

উত্তর : সকলেই দায়ী।

দিলীপ ব্যানার্জী (রেল কোয়ার্টার, নৈহাটী, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার কে? তাঁর জীবনী যদি কোথাও প্রকাশিত হয়ে থাকে জানাবেন।

উত্তর : আমাদের মতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যান্স গিবস। গিবসের জীবনী তো সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশ করা হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

মঞ্জরেকার তো অবসর গ্রহণ করেছেন।

সুখময় কুণ্ডু (হাসপাতাল রোড, টাংলা, দরং, আসাম)

প্রশ্ন : ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগে ভারতের ক'টি টেস্ট খেলা হয়? এর মধ্যে ক'টিতে ভারত জিতেছিলো?

উত্তর : সেবারের মোট ৫টি টেস্টের মধ্যে ৪টি টেস্ট শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে। বাকী একটি

প্রশ্ন উত্তর

জিতেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ভারত কোন টেস্টেই জেতে নি।

প্রদীপকুমার বিশ্বাস (গুলমা চা-বাগান, গুলমা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রাজা মুখার্জী কি আগামী টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলে স্থান লাভ করবেন?

উত্তর : সে রকম তো মনে হয় না।

আপনি 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগের জন্যে আর একটা লেখা পাঠাবেন।

কাজল ভট্টাচার্য ও পলক খান (সংচাষীপাড়া, কাশীপুর)

উত্তর : রাশিয়ার খেলোয়াড়দের জার্সিতে ইউ. এস. এস. আর কথাটাই ঐভাবে লেখা থাকে।

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সরোজিনী পল্লী, বারাসাত)

উত্তর : আপনার চিঠিটি আমাদের অবাক করেছে। আশা করি এতোদিনে আপনার ভুল ভেঙেছে।

রণজিৎকুমার সিংহ ও অনাদিকুমার কদমা (গোদাপিয়াশাল, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : গত ৪৯শ সংখ্যার একটি প্রশ্নের উত্তর টেস্ট খেলায় দ্রুত অর্ধশত রানকারীদের কয়েকটি নাম প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সেলিম দুরানীর নাম দেন নি। কিন্তু একটি বইতে দেখলাম যে দুরানী ১৯৬৪ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্টে ২৯ মিনিটে অর্ধশত রান করেন এবং ৩৪ মিনিটে ৫টি বাউণ্ডারী, ৩টি ওভার বাউণ্ডারী, ১টি তিন, ৭টি দুই এবং ৬টি একের সাহায্যে ৬১ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন।

উত্তর : ধন্যবাদ।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : তোমার চিঠি পেয়েছি। শীঘ্রই উত্তর পাবে।

বিকাশ চৌধুরী (দীপালীনগর, বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর)

প্রশ্ন : ...দুরানী ছাড়া...১৯৬৯ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বুস টেলর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৩১ মিনিটে ৫০ রান করেন।

উত্তর : দুরানীর হাফ সেঞ্চুরীর কথা আগের প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে।

আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।

প্রবীরকুমার ঘোষ (বসিরহাট, ২৪ পরগনা)

উত্তর : তোমার চিঠি পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে উত্তর কিছুদিনের মধ্যেই পাবে।

কাজলনাথ চক্রবর্তী ও অভেদানন্দ ভট্টাচার্য (খগড়াবাড়ি কুচবিহার)

প্রশ্ন : কলকাতার কুচবিহার ট্রফি নামক যে ফুটবল প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় তার সংগে কি কুচবিহারের কোন সংযোগ আছে?

উত্তর : নিশ্চয়ই।

ফুটবল খেলার প্রথম যুগে বাঙালী দলগুলোর খেলার অসুবিধা এবং গোরা ও সাহেব কর্মকর্তাদের এক চোখোমির জন্যেই কুচবিহারের মহারাজা 'কুচবিহার কাপ' ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং কুচবিহার কাপের সংগে কুচবিহারের সম্পর্ক আছে বৈকি!

অনিলকুমার বর্মণ (ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনি যা প্রশ্ন করেছেন ঐ ধরণের প্রশ্নের উত্তর তো আমরা দিই না।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর রাস, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠক, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চুলকা, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদনারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, শাট্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

।। পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ।।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবরস্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য—প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্।

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, স্ত্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(সর্ব দেবদেবীর মন্ত্রকোষ ও শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা-সম্বলিত)

মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, পাদটীকা-সমন্বিত বৃহদায়তন দুর্লভ গ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্রের সার। পঞ্চমকার সাধনার নিগূঢ় মর্ম, তন্ত্রসাধনার গুহ্যতত্ত্ব উদ্ঘাটিত। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ।। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

Thursday, 12th June, 1969 SAPTAHIK BASUMATI REGD. No. C 71
PRICE : 30 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34—7771, 72, 73, 74

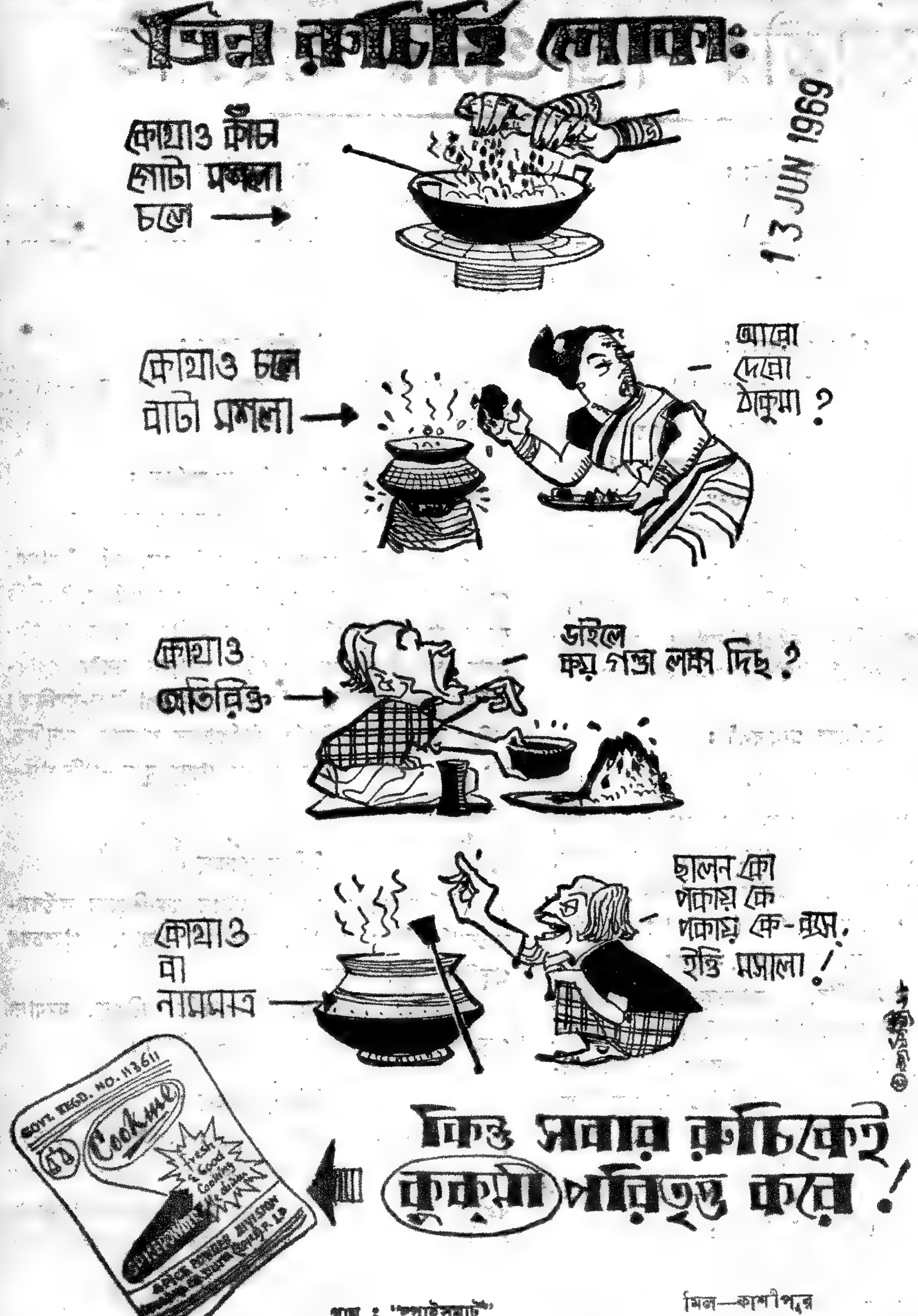

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

পুলিশের কার্যকলাপ যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তিকে নিশ্চয়ই ম্লান করছে

এ ব্যাপারে সরকার স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতায় কারাগারেই কি বন্দী হয়ে থাকবেন?

৭৩ বর্ষ : ৫২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [73 year, No. 52, 19th June, 1969

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩২৬৭
আজকের মানুষ		৩২৬৮
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৩২৬৯
বই-বই হাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	৩২৭৫
বঙ্গদর্শন		৩২৭৮
ভারতদর্শন		৩২৮০
আন্তর্জাতিক		৩২৮২
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	৩২৮৪
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৩২৮৬
গ্রন্থমেলা		৩২৯১
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	৩২৯২
পাঠকমন		৩২৯৪
পূর্ববঙ্গ : সংস্কৃতি ও কবিমানস	অমিয়কুমার হাটি	৩২৯৬

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার
এণ্ড সন্স
রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাগর সঙ্গমে-(ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	— সুশীল জানা	৩২৯৯
অন্দর (কবিতা) ...	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৩০২
সুজন (গল্প) ...	— খায়রুল বাসার	৩৩০৩
গ্রাম বাংলার কথা ...	— অসীম মুখোপাধ্যায়	৩৩০৮
তিমির প্রান্তে ভূস্বর্গ ...	— অগ্নিবর্ণ	৩৩১১
মহানায়ক লেনিন (নাটক) ...	— অশোক সেন	৩৩১৪
খবর বলছি ...	... ...	৩৩১৮
রূপজগৎ ...	... ...	৩৩১৯
খেলাধূলা ...	— শান্তিপ্রিয়	৩৩২৪

লটারীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

লটারীর নাম	প্রতি টিকিটের মূল্য	প্রথম পুরস্কার	মোট পুরস্কার	খেলার তারিখ	পাইকারী দাম
১। হরিয়ানা স্টেট লটারী	১	২,২০,০০০	৮০৯	২।৭।৬৯	পাইকারী বিক্রয় বন্ধ
২। কেরালা স্টেট লটারী	১	১,০০,০০০ (৩টি)	১০১৪	১৩।৭।৬৯	১০০ টিকিট ৮৫
৩। পঃ বঙ্গ স্টেট লটারী	২	২,০০,০০০	১১৩	১১।৭।৬৯	১০০ টিকিট ১৭০
৪। পাঞ্জাব স্টেট লটারী	১	২,৬৫,০০০	৫১১	২০।৭।৬৯	১০০ টিকিট ৭৬
৫। ইউ পি স্টেট লটারী	১	৫,০০,০০০	৬৪৫	১০।৮।৬৯	১০০ টিকিট ৮৬
৬। রাজস্থান স্টেট লটারী	১	২,৫০,০০০	৮১৫	১০।৮।৬৯	১০০ টিকিট ৮৬
৭। বি, বি, চ্যারিটিজ ফান্ড	১	১,০০,০০০	১০৪	৩০।৬।৬৯	৭২ টিকিট ৪৮
৮। এইচ, বি, চ্যারিটিজ ফান্ড	১	১,০০,০০০	৭৯৭	১০।৮।৬৯	৭২ টিকিট ৪৮
৯। রেড ক্রস হসপিটাল সুইপ	১	—	৬০	২৭।৭।৬৯	৬০ টিকিট ৩৬
১০। কলিকাতা রেঞ্জার্স ক্লাব	১	১,০০,০০০	—	২০।৮।৬৯	—
১১। ডি, বি, চ্যারিটিজ ফান্ড	১	১,০০,০০০	২৭৩	৩০।৮।৬৯	৬০ টিকিট ৩৬
১২। বি, এস, চ্যারিটিজ ফান্ড	১	১,২৫,০০০	২০৫	২৮।৯।৬৯	১০০ টিকিট ৭৫
১৩। লেপ্রোসি রিলিফ র‍্যাফল	৫০ পঃ	৫০,০০০	৩৫০	২৯।৬।৬৯	২৪ টিকিট ১০
১৪। সি, এইচ, চ্যারিটিজ ফান্ড	৩০ পঃ	২৫,০০০	২৬৯	২৯।৬।৬৯	২৬ টিকিট ৬

খুচরা টিকিটের জন্য টিকিটের মূল্যসহ অতিরিক্ত ১৫ পয়সা পাঠাইলে রেজিস্ট্রি ডাকে টিকিট পাঠান হইবে। একত্রে ৫০ বা ততোধিক টিকিটের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২ টাকা ডাক খরচ দিতে হইবে।

টাকা পোস্টাল অর্ডার অথবা ব্যাংক ড্রাফটযোগে প্রেরণ করিবেন। মনি অর্ডারে টাকা পাঠাইলে এম-ও কুপনে পুরা নাম ঠিকানা লিখিতে ভুলিবেন না।

বিঃ দ্রঃ—কিছু গ্রাহক আমাদের কাছে স্টেট লটারীর ফরম চাহিয়া পাঠাইতেছেন। কোন স্টেট লটারীর ফরম হয় না। স্টেট লটারীর টিকিট প্রিপেড হয়। কোন কিছু জানিবার জন্য চিঠির উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড পাঠাইতে হইবে। আমাদের কাউন্টারে টিকিট পাইবার সময় সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮টা।

(পাইকারীর বিশেষ ব্যবস্থা)

সরকারী অনুমোদিত এজেন্ট : পি, চক্রবর্তী

কেঃ ওয়াই, ও, স্টোর্স, ১৭১।২এ রাসবিহারী এভিঃ, কলিঃ ১৯ ফোন : ৪৬-১১৪৮

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৭৩ বর্ষ : ৫২শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 19th June, 1969

ভেদবুদ্ধি

নানা দিক দিয়ে দেশের মধ্যে ভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। পরাধীনতার কালে ভেদবুদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তিকে দায়ী করা হয়েছে, তা অন্যায়ভাবে করা হয় নি এবং ব্রিটিশ রাজশক্তি আপন সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদেই ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ রাজশক্তি বিদায় নিলেও সেই ভেদবুদ্ধি এখন একশ্রেণীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের মস্তিষ্কে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই যে এ ধরণের ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয়, তা বলাই বাহুল্য। আর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ যে-দেশে নিরক্ষর, আর বাকি অংশের এক সংখ্যালঘু ভাগ স্বার্থপ্রণোদিত এবং দেশের প্রায়-হর্তাকর্তাবিধাতা তাদের কাছে একটা নতুন কথা-শুনিয়ে যেমন বাহবা পান তেমনি তাঁরা মনে মনে আশা পোষণ করেন ঐভাবে তাঁদের পদোন্নতিও ঘটতে পারে। এর বহু প্রমাণ আছে।

আমাদের দেশে সমগ্র জাতিকে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আমাদের সকলের ঋণ অপরিশোধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে জাতীয় জাগরণের জন্য স্মরণীয় তা-ই নয়, বর্তমানকালে বঙ্কিম-সাহিত্যচর্চা আরো বৃদ্ধি পাওয়াই উচিত। বিড়াল, সাম্য প্রভৃতি নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ ও রাষ্ট্রপদ্ধতির যে পরিবর্তনের ইংগিত করেছেন তা একালে গ্রহণীয় হওয়াই উচিত। কিন্তু ভারত যেহেতু স্বাধীন এবং স্বাধীন ভারতে খবরদারী করার লোকের অভাব নেই—তাই ভারতের রাজধানী খাস দিল্লীমুলুকে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিদায় দেবার পালা সুরু হয়েছে। এই পালায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন দিল্লীর মিউনিসিপ্যাল শাসন কর্তৃপক্ষ। তাঁরা হিন্দীতে অনূদিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্রূপ অতিশয়োক্তিতে সঞ্জাত লোকরহস্যের অন্তর্গত "রামায়ণের সমালোচনা—কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত" নিবন্ধটি বাজেয়াপ্ত করেছেন। ঐ অনূদিত নিবন্ধটি হিন্দী দৈনিক পত্রিকা "হিন্দুস্থানে" গত ২রা মার্চ প্রকাশিত হয়েছিল। দেশের এক শ্রেণীর অক্ষম পণ্ডিত ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম-লিখিত একটি নিবন্ধকে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে এক কলমের খোঁচায় বাতিল করে দিলেন। এঁরা এদেশেরই রাজনৈতিক পণ্ডিত। এঁদের সুবুদ্ধির উদয় হবার আশা সুদূরপরাহত। দীর্ঘ পঁচানব্বই বছর ধরে যে প্রবন্ধের সরস রসগ্রহণে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় নি, দেশের মানুষের এমনই পোড়াকপাল যে, একালের ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের হাতে পড়ে লোকরহস্যের 'রামায়ণের সমালোচনা' এখন হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হোল।

এখানেই শেষ নয়। বঙ্কিমের পর সুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। আর এই জেহাদ ঘোষণা করেছেন কিছুকাল আগে স্বয়ং জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য। তাঁর পাণ্ডিত্যজ্ঞান এই কথায় প্রকাশ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের অনুপযুক্ত। কারণ সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রশস্তিসূচক ঐ জনগণমন সঙ্গীত।

একটু লেখাপড়া বা খোঁজখবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাও জানেন যে, ঐ সঙ্গীত সম্পর্কে উপরি উক্ত কথা কবির জীবিতকালেই উঠেছিল। তার সদুত্তর কবি দিয়েছিলেন, এমন কি শব্দ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, জনগণমন সঙ্গীতটিকে যাঁরা পঞ্চম জর্জের প্রশস্তির জন্য রচিত বলে মনে করেন, ঈশ্বর তাঁদের রক্ষা করুন। সম্ভবত জগদ্‌গুরু সে সব খবর রাখেন না কিংবা রাখলেও হঠাৎ নিজের বিদ্যা জাহির করার উদ্দেশ্যেও ভক্ত শিষ্যদের কাছে নিজের প্রতাপ দেখাতে স্বাধীন ভারতে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবমাননা দেখাতে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

এরপর যিনি জাতীয় সঙ্গীত-এর বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছেন—তিনি সর্বজনবিদিত স্বয়ং এস কে পাতিল। কোনো প্রদেশ বা রাজ্যের নাম থাকবে বা থাকবে না, তা নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্কের পরই জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছিল। এখন শ্রীপাতিল রাজনীতিতে নতুন ঠাঁই পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করার মতো প্রশ্ন তুলেছেন ঐ সঙ্গীতে 'সিন্ধু' শব্দটি থাকায় তা বাইশ বছর ধরে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা ক্ষুন্ন করছে কিনা। উপরন্তু তিনি ভারতে নবগঠিত নতুন রাজ্যগুলিকে জাতীয় সঙ্গীতে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

শ্রীপাতিলের মতো উপযুক্ত ব্যক্তির পরামর্শে ভারতের রাজ্যগুলিকে জাতীয় সঙ্গীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হলে, পরে আবো উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি যে নেতাদের নাম ঢুকিয়ে দেবার পরামর্শ দেবেন না তাই বা কে বলতে পারেন?

কিন্তু এইসব পরামর্শ ভেদবুদ্ধির নামান্তর ছাড়া আর কি? জাতীয় সঙ্গীতে সমগ্র দেশ ও সমগ্র জাতির আদর্শ প্রকাশই বড় কথা এবং 'জনগণমন'-র চেয়ে অন্য এমন কোনো সঙ্গীত নেই যা তাকে স্থানচ্যুত করতে পারে। আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞেস করি বাইশ বছরের শাসনে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কি সম্ভব হয়েছে?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

মার্সিয়ে জর্জ পম্পিদ্যু সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের ১৯তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট অ্যালেন পোহেরকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। সাত বছরের জন্যে ফ্রান্সের সমস্ত দায়িত্বভার লাভ করলেন প্রবীণ রাজনীতিক পম্পিদ্যু।

ফ্রান্সের রাজনীতিতে বিশিস্ট স্থান দখল করে রয়েছেন পম্পিদ্যু আজ প্রায় বিশ-বাইশ বছর ধরে। প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেই তো তাঁর জীবনের একটা অংশ গেল কেটে। জেনারেল দ্য গলের তিনি একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ, তাই যখনই দ্য গল দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেয়েছেন, তখনই পম্পিদ্যুকে দেখা গিয়েছে স-ক্ষমতার ভাগ পেতে। দ্য গলোত্তর ফ্রান্সের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখলের জন্যে পম্পিদ্যু ছিলেন দ্য গলেরই মনোনীত উত্তরাধিকারী।

রাজনীতিতে পম্পিদ্যুর হাতে-খড়ি হয় চার্লস দ্য গলেরই কল্যাণ-আশীর্বাদে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্য গল তাঁকে প্রথমবারে মন্ত্রিসভায় স্থান দেন বয়স যখন তাঁর ৩১ বছর। দু' বছর বাদে '৪৬ সনে পম্পিদ্যু সরকারের ট্যুরিজম দপ্তরের কমিশনার জেনারেলের পদ লাভ করেন। আর কয়েক মাসের মধ্যেই স্টেট কাউন্সিলের আবেদন দপ্তরের প্রধানের দায়িত্ব পেলেন এবং এ-পদে তিনি রইলেন আট বছর। এই সময়ে তিনি জেনারেল দ্য গলের সহযোগী হিসেবেও কাজ করতে থাকেন।

ধনী- ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর কন্যা ক্লড কাহুরকে বিয়ে করার কারণে পম্পিদ্যু ব্যাঙ্ক ব্যবসার দিকেও আগ্রহী হন। ১৯৫৪ সালে তিনি সরকারী দপ্তর ছেড়ে শ্বশুরের দৌলতে রথস্‌চাইল্ড ব্যাঙ্কে যোগদান করেন এবং অচিরেই তার অন্যতম ডিরেক্টর হন। কিন্তু চার বছর পরে জেনারেল চার্লস দ্য গল যখন দীর্ঘদিনের আত্মনির্বাসনের পর ফরাসী রাজনীতিতে ফিরে এলেন তার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে, তখন পম্পিদ্যুর ভাগ্যেরও মোড় যেন পরিবর্তিত হল। ডানদিকে হাতের কাছে পম্পিদ্যুকে না দেখলে প্রেসিডেন্ট দ্য গল যেন সরকার পরিচালনায় সাহস ও মনোবল ফিরে পান না। তাই ১৯৫৮ সালে দ্য গল দক্ষিণহস্ত জর্জ পম্পিদ্যুকে করলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আট মাস বাদে দ্য গল যখন নিজেকে ফ্রান্সের পঞ্চম রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করলেন তখন প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে পম্পিদ্যু আবার ফিরে গেলেন প্রাইভেট সেক্টরে—তাঁর ব্যাঙ্কে।

পরের বছর পম্পিদ্যু দেশের কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত

পম্পিদ্যু

হলেন ন'বছরের মেয়াদে। কিন্তু ১৯৬২ সালে যখন গুরুর কাছ থেকে আবার ডাক এল তখন আবার ফিরে গেলেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার নিতে। সেই থেকে একটানা তিনি প্রেসিডেন্ট দ্য গলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। গুরু যখন ফরাসী রাজনীতি থেকে প্রায় স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন, তখন শিষ্যই তো রাজত্ব চালাবার হকদার হবেন!

কিন্তু রাজনীতিতে পম্পিদ্যুর অনুপ্রবেশ আকস্মিক। অধ্যাপনাই ছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক বৃত্তি। তাঁর বাবা লিঁও পম্পিদ্যু ছিলেন স্প্যানিশ ভাষার অধ্যাপক, পম্পিদ্যুও ছাত্র হিসেবে গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। অভিজাত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ত্বরণে পম্পিদ্যু প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও তিনি বিশেষ ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন। বস্তুত পম্পিদ্যু তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন শিক্ষকতার কাজ নিয়েই। প্রথমে তিনি মার্সাই এবং পরে প্যারিসের চতুর্থ হেনরি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পদাতিক-বাহিনীতে পম্পিদ্যু লেফটেনান্টের পদ পেয়েছিলেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে ৫৭ - বৎসর বয়স্ক জর্জ পম্পিদ্যু একজন কট্টর গলিস্ট হিসেবে পরিচিত। গত বছর মে-জুন মাসে ফ্রান্সে যখন ছাত্র ও গণ-আন্দোলনের তোড়ে দ্য গলের প্রেসিডেন্টের আসন বার বার কেঁপে ওঠে, তখন প্রধানমন্ত্রী পম্পিদ্যুকেও তার ধকল পোয়াতে হয়েছিল। পম্পিদ্যু শক্তহাতে সে-আন্দোলন দাবিয়ে দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে সাধারণ লোকের কাছে জনপ্রিয়তাও তাঁকে হারাতে হয়েছিল। সাম্প্রতিক রেফারেন্ডামের রায় দ্য গলের বিরুদ্ধে যাবার একটা প্রত্যক্ষ কারণ গত বছরের সরকার-বিরোধী আন্দোলন সন্দেহ নেই, তবে এবার প্রেসিডেন্ট-পদে পম্পিদ্যুর জয়লাভের প্রধান কারণও বামপন্থীদের অনৈক্য।

প্রেসিডেন্ট দ্য গল আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনকে তিনি যেভাবে নাকাল করেছেন তা কেবল দ্য গলের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বস্তুত নেপোলিয়নের পর দ্য গলের মত বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক ফরাসী রাজনীতিতে আর দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দ্য গলের তুলনায় পম্পিদ্যু শিশু। তবে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের নবলব্ধ মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে দ্য গল-অনুসৃত পথেই চলতে হবে, যদিও এখানে-সেখানে প্রয়োজনের খাতিরে সে-নীতির কিছু কিছু অদলবদলও করতে হবে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নতুন প্রেসিডেন্টকে বহু পুরনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তবে যিনি ফরাসী রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত রয়েছেন তিনি সমস্যা সমাধানের রাস্তাও চিনে নিয়েছেন, এটাই সকলে আশা করবেন। তা যদি তিনি না পারেন, তবে ফ্রান্সের জাগ্রত জনমত কি '৬৮-র মে-জুন মাসের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করতে উৎসাহিত হবে না? আর জর্জ পম্পিদ্যু যদি শক্তহাতে হাল ধরতে না পারেন, তবে দ্য গল ফ্রান্সকে যে বহু-বাঞ্ছিত স্থায়ী সরকার উপহার দিয়েছিলেন তা আর টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। অর্থাৎ ফরাসী রাজনীতিতে আবার সরকারের ঘন ঘন উত্থান-পতন দেখা যাবে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হরিপুরা ভাষণ : মূল্যবান দলিল

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা-ভাষণের গুরুত্ব অবশ্য-স্বীকার্য। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের রূপ আমরা দেখে এসেছি—তাকেই তিনি ভারতের তৎকালীন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রয়োগযোগ্য রূপ দিতে চেয়েছিলেন এই ভাষণের মধ্যে। কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে হয়ত তাঁকে খুবই সংযতভাবে কথা বলতে হয়েছিল, তাঁর সবটুকু পরিকল্পনা খুলে ধরা সম্ভব হয় নি, কিন্তু যতখানি বলেছিলেন; তার থেকেই বোঝা গিয়েছিল গান্ধীর আশীর্বাদ এবং প্যাটেলের আতিথ্য তাঁর বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত এবং দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। সেই একই সুভাষচন্দ্র, যাঁর সুমিষ্ট হাসির মধ্যেও হাহাধ্বনি, শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যেও রণসংকেত।

হরিপুরা-ভাষণ দেওয়ার সময়ে কর্মী ও নেতা সুভাষচন্দ্র ঋষি হয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ তার গোটা রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে ধরা দিয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন প্রেমের অন্তর্দৃষ্টিতে, যা একই সঙ্গে বুদ্ধির দ্বারা শাসিত এবং কর্মপ্রতিজ্ঞায় উদ্দীপিত। সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা-ভাষণ ভারতীয় রাজনীতির অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত। ওই ভাষণ সাহিত্যের নয়, জীবনের সৃষ্টি, বিয়াল্লিশ বছরের প্রেমের প্রতিভার অভিজ্ঞতার মহাদান। তাকে না পড়ে যাঁরা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়বেন, তাঁরা দ্বারের দীপ না দেখেই প্রবেশ করবেন ঘরে।

হরিপুরা-ভাষণে দেখা গেল, সুভাষচন্দ্র এমন একজন রাজনীতিক যিনি স্বাধীনতার পূর্বে ও স্বাধীনতার পরে—এই দুই কাল-ভূখণ্ডে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর কাছে 'যুদ্ধপরিষদ' এবং 'ছায়া মন্ত্রিসভা'—দুই-ই। ভারতবর্ষের মহানায়কের কণ্ঠে বেজেছিল বিরাটের গান—"আমরা ভারতবর্ষের জন্যই সংগ্রাম করছি না, মানবতার জন্যও আমাদের সংগ্রাম। ভারতের মুক্তি—মানবতার ত্রাণ।"

ভারতের মুক্তিতে মানবতার উদ্ধার কিভাবে, সে কথাটা রাষ্ট্রপতি কিছু অংশে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর অন্য সকল সাম্রাজ্যবাদের চাবিকাঠি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু অপর সাম্রাজ্যের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করে দেবে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, বৃটেন সমাজতান্ত্রিক না হলে শক্তি থাকতে স্বেচ্ছায় কখনো ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না। ভারত যদি স্বাধীনতা আদায় করে নিতে পারে তাহলে সাম্রাজ্যবিহীন বৃটেন অর্থনৈতিক কারণে সমাজতন্ত্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। স্বাধীন ভারত বৃটিশ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সহায়ক হবে এইভাবে।

বৃটেন যদি স্বেচ্ছায় ভারতকে স্বাধীনতা দেয় সেটা হবে ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় কিছু দেবে না—সুভাষচন্দ্র কালের অঙ্গুলি তুলে দেখালেন শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপকে—বৃটেনকেও ঐ ভাঙা ইতিহাসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। "জার সাম্রাজ্য ১৯১৭ সালে ধ্বসে পড়েছিল, কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে উঠে এসেছিল সোভিয়েট রিপাবলিক।" রাশিয়ার ইতিহাসের একটি পাতা বৃটেনও তুলে নিতে পারে, কিন্তু নেবে কি ?—সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের ভাষণকে দুটি মূল অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে, ভারতের স্বাধীনতালাভের সমস্যা, দ্বিতীয়ভাগে স্বাধীনতাকে সার্থক করার পন্থা।

ভারত তখনও স্বাধীন হয় নি, কিন্তু স্বাধীনতার দ্বারে সে,—সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছিলেন। স্বাধনীতার বিরোধিতা করবার জন্য যৎপরোনাস্তি করছে বৃটেন। বিভাগের দ্বারা শাসন করার ব্যাপারে পৃথিবীতে ইংরেজের চেয়ে সাফল্য আর কোনো দেশ দেখাতে পারে নি।১ তার চক্রান্তের

---

১ "It is a wellknown truism that every empire is based on the policy of divide and rule. But I doublt if any empire in that world has practised this policy so skillfully, systematically and ruthlessly as Great Britain." (হরিপুরা-ভাষণ)

বৃটেনের বিভেদনীতির দৃষ্টান্তরূপে তিনি আয়ারল্যান্ডের বিভাগ ও প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনার কথা তুলেছিলেন।

একটা রূপ ফেডারেশন, অন্যটি পাকিস্তান। দুটোরই উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে বৃটিশ স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা।

—" An internal partition is necessary in order to neutralise the transference of power....I have no doubt that British ingenuity will seek some other (other than Federal scheme) constitutional device for partitioning. India and thereby neutralising the transference of power to the Indian people." একেবারে দৈববাণী।

বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে, কিন্তু বিচ্ছেদের রক্তনদী প্রবাহিত হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। পাকিস্তান পরিকল্পনার পূর্বে বৃটিশ সরকার জোর দিয়েছিল ফেডারেল পরিকল্পনায়। এতদিন দেশীয় রাজারা নিজ রাজ্যে স্বৈরাচার চালাচ্ছিল, ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সমগ্র ভারতে বৃটিশ স্বৈরাচারের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের অধিকার লাভ করল। ফেডারেশন পরিকল্পনা ১৯৩৫ সালের কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সভাপতির ভাষণে। ফেডারেশনের দুষ্টরূপ তিনি বিস্তৃতভাবে খুলে ধরেছিলেন, যে-বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করব,—সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ফেডারেশনকে রোখার জন্য প্রয়োজন হলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে হবে। সে সত্যাগ্রহের মধ্যে থাকবে সর্বাত্মক আইন-অমান্য, অহিংস হলেও তাকে কোনো মতে বলা চলবে না নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—তা সক্রিয় প্রতিরোধ। এই সত্যাগ্রহ একদিকে স্বাধীনতার প্রয়োজনে, অন্যদিকে ফেডারেশনের প্রতিরোধে। কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব স্বীকার করেছে। এর ফল ভাল হয়েছে, মন্দ ততোধিক। ব্যুরোক্রাসির গঠন ও চরিত্র এই নিয়মতান্ত্রিক পথে বদলানো সম্ভব নয়। তবু সুভাষচন্দ্র বলেছেন, কংগ্রেস নিশ্চয় নিয়মতান্ত্রিকতার প্রলোভন ত্যাগ করবে সংগ্রামের প্রয়োজনে, বিশেষত সেই পুরাতন সর্বশক্তিশালী বৃটেন যখন আর নেই। একদিকে যুদ্ধকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে জলপথ ও স্থলপথ থেকে আকাশপথে, অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে প্রভূত অশান্তি। বাইরে নবজাগ্রত বিস্তারলোভী জাতিসমূহের কোলাহল; বিশেষত সর্বনাশের মত সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থিতি, "যার অস্তিত্বের চিন্তা বৃটেনের শাসক-সম্প্রদায়ের বুকে আতঙ্কের শিহরণ এনে দেয়।" বৃটেনের মাটিতে বিরোধী শক্তির উৎপাত, এবং বৃটেনের আকাশ খুলে আছে মৃত্যুবাহী বিমানের কাছে। "বিশালকায় সাম্রাজ্য-দৈত্যের মাটির পা এখন যেভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে আছে, এমন আর কখনও হয় নি।"২

তবু সাম্রাজ্যবাদ পথ দেয় না সহজে, পথ দেয় নি সহজে। লড়াই করতেই হবে। তার জন্য শৃঙ্খলার দরকার, দরকার সম-উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার। ট্রেড ইউনিয়ন, কিষাণসভা ইত্যাদিকে আকর্ষণ করে আনতে হবে জাতীয় আন্দোলনে। এই পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য।

এরপর আমি হরিপুরা-ভাষণে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় বা পরিকল্পনা যে-সব জায়গায় উপস্থাপিত করা হয়েছিল, সেগুলির উল্লেখ করব। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালেও এর কোনো-কোনটির প্রয়োজনীয়তা ছিল।

কংগ্রেস পার্টি গঠন

কংগ্রেস দল হিসাবে অনেকটা সংঘবদ্ধ হলেও আধুনিক রাজনৈতিক দলের পূর্ণাঙ্গ সংগঠন অর্জন করতে পারে নি। দেশে বিপুল উন্মাদনা দেখা দিয়েছে। তাকে নিয়ন্ত্রিত এবং চালিত করতে গেলে সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবকদলের প্রয়োজন। সেই স্বেচ্ছাসেবকদলে— কর্মী এবং পরিচালক দুই-ই থাকবে। তাদের জন্য রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে এ-ব্যাপারে শিক্ষা নেওয়া দরকার। যদি এই সংগঠন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবেই ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক নেতার সৃষ্টি করা যাবে।

সুভাষচন্দ্র জোরের সঙ্গে বললেন, স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়ার কোনো কথাই ওঠে না। যারা স্বাধীনতা আনবে তারাই স্বাধীনতার পরে পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেবে। না দিলে শুরু হবে বিশৃঙ্খলা। শক্তি যে অর্জন করে নি, সে যথাযথভাবে শক্তিকে ব্যবহার করতেও অসমর্থ। স্বাধীনতা অর্জনকারী দল যেখানে পরবর্তীকালে কর্তৃত্ব করছে, সেখানেই উন্নতি অব্যাহত থেকেছে।

সংগ্রামজয়ী পার্টির রাষ্ট্রক্ষমতায় অবস্থানের বিপদ

"In accordance with this policy, before power was handed over to the Irish people Ulster was separated from the rest of Ire land. Similarly, before any power is handed over to the Palestinians, the Jews will be seperated from the Arabs."

২ "...Despite all anti-aircraft defences, London lies at the mercy of any bombing squadron from a continental centre. In short air force has revolutionised modern warfare, destroyed the insularity of Great Bri tain and rudely disturbed the balance of power in world politics. The clay of a gig antic empire now stand exposed as there have never been before." (হরিপুরা-ভাষণ)

হলে—তাতে দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়—কর্তৃত্ববাদী এক-পার্টিশাসন এসে যায়। সুভাষচন্দ্র আশ্বাস দিয়ে বলেছেন ভারতে তেমন হবে না, কারণ, প্রথমত অন্য পার্টি নিষিদ্ধ হবে না; দ্বিতীয়ত কংগ্রেস নাজী দলের মত নেতা-নির্ভর দল নয়, কংগ্রেস পার্টির আভ্যন্তরীণ গঠন গণতান্ত্রিক। এই দলে উপর থেকে নেতাকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না, জনতাই তলা থেকে তার নেতাদের নির্বাচন করে।৩

পার্টির সংগঠনও বজায় থাকা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যে কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিকতা? কংগ্রেসের অগণতান্ত্রিক চেহারা যখন প্রকাশ পাবে, তখন তিক্ত আত্মপরিহাসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁর এই বক্তব্যের আয়রনি উপভোগ করবেন। কংগ্রেসের গণতান্ত্রিকতার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে প্রচার।

কংগ্রেসের মধ্যে সোস্যালিস্ট পার্টির অস্তিত্বের বিষয়ে তিনি কিছু বলেছিলেন। সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও তিনি তার বিরোধী নন, বরং সমর্থক, কারণ বামপন্থীদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন আছে এবং বামপন্থীরা সোসিয়ালিস্ট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র এইরকম দলের বিরোধী নয়। স্বাধীনতার পূর্বে সমাজতন্ত্র যদিও আশু-প্রশ্ন নয়, তবু পরবর্তী সমাজতন্ত্রকে সফল করতে হলে সমাজতান্ত্রিক প্রচারণার প্রয়োজন আছে। সোস্যালিস্ট পার্টি সেই সমাজতন্ত্রের প্রচার ও বামপন্থী সংগঠনের উভয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। সুভাষচন্দ্রের মতে ভারতের সাধারণ মানুষ have-nots-এর দলে, havs-দের মূল্যে তাদের উন্নতিবিধান করতে হবে।৪

কংগ্রেস নিজের ভিতরে সোস্যালিস্ট পার্টিকে গঠনতন্ত্রানুযায়ী গড়ে উঠতে দিয়েছে। কিন্তু বাইরে যে-সব দল গড়ে উঠেছে, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা কিষাণ সভা, কংগ্রেস তাদের নিজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেবে কিনা? এই collective offiliation-এর প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র অনুমোদন দেওয়ার পক্ষপাতী যদিও অনেকে তার আয় বিরোধী। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, এরা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছে, আমাদের অনিচ্ছার সম্মান রাখতে এরা বিদায় নেবে না এবং এরা প্রগতিশীল শক্তি। সুতরাং কংগ্রেস যদি এদের স্বীকার করে, যদি নিজের ক্ষেত্রে এদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের অধিকারকে মেনে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এদের সহযোগিতাকে গ্রহণ করে, তবে বিশেষ মঙ্গল হবে, যে-মঙ্গল হয়েছিল রাশিয়ার ক্ষেত্রে যখন সোভিয়েট শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের যুক্তফ্রন্ট অক্টোবর বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের কর্তব্য সুভাচন্দ্রের মতে, যতদূর সম্ভব ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা।

এখানে দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র খুব নম্রভাবে মারাত্মক কথা বলতে পারেন। কংগ্রেসের আহ্বানে যে আপামর জনসাধারণ সমবেত হয়েছে, তারা হয়েছে স্বাধীনতার প্রেরণায়, নিশ্চয়, সেই স্বাধীনতা কিন্তু ধনিকের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটুও বেশি নয়। জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে মালিকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অবশ্যই মূলগত পার্থক্য আছে। সুভাষচন্দ্র চাইছেন, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী প্রগতিপন্থী শক্তির প্রতিষ্ঠা—তার জন্য তাঁর সোস্যালিস্ট পার্টির অবস্থিতির সমর্থন; তারই জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা কিষাণ সভার সহযোগ মজুরের পক্ষে ওকালতি।

স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠন

এখানেই আছে সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে মূল্যবান বক্তব্য।

স্বাধীন ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক হবে—সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গণতান্ত্রিক হবে কি? প্রশ্নটি তিনি কার্যত এড়িয়ে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে বুঝতে পারি, বৃটিশ পার্লামেন্টারী ডেমোক্র্যাসির গণতন্ত্র তা হবে না।৫

৩ সন্দেহ নেই, এখানে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য খুবই অস্পষ্ট। তাঁর দোষ নেই, এ হল নিরুপায়ের অস্পষ্টতা। স্পষ্ট করে বলবেন কি করে, যখন সে বক্তব্য গান্ধীবাদের একেবারেই বিরোধী। সুভাষচন্দ্রের যন্ত্রণা, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের খাতিরে তাঁকে গান্ধীনীতির গোরুর গাড়িকে যন্ত্ররথ ভাবতে হয়েছিল, ভাবছিলেন, মোটরচালিত গোরুর গাড়ি হয় না—মিলের খদ্দরের মত? 'রাজনৈতিক দর্শন' অধ্যায়ে দেখে এসেছি, তিনি স্পষ্টই এক-পার্টি-শাসনের কথা বলেছেন, হরিপুরা-ভাষণেও তাই বললেন; কিন্তু কথাটাকে নরম করবার জন্য জানালেন, অন্য পার্টিও থাকবে স্বাধীন ভারতে। কিভাবে থাকবে—কংগ্রেসের অভ্যন্তরে, না বাইরে? বাইরে যদি পার্টি থাকে, রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার অধিকার না থাকলে সে করবে কি? সুভাষচন্দ্র উত্তর দেন নি, কারণ জানতেন, দেবার মত উত্তর নেই। পার্টি ডিক্টেটরশিপের ক্ষেত্রে অন্য পার্টির অস্তিত্ব অবান্তর—এই সোজা কথাটা বাঁকা ইঙ্গিতের সাহায্যে বলতে হয়েছিল—এমনই ভারতীয় রাজনীতির বিচিত্র চরিত্র।

৪ "Moreover, if after the capture of political power, national reconstruction takes place on socialistic lines—as I have no doubt it will—it is the "have-nots" who will benefit at the expense of the "havs", and the Indian masses have to be classified among the "have-nots"." (হরিপুরা—ভাষণ)

৫ ইংরেজ-প্রবর্তিত পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চলতে পারে না, সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি হরিপুরা-ভাষণে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকার করার পরে কিভাবে ব্যুরোক্রাসির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বা

স্বাধীন ভারতের সামনে কতকগুলি সমস্যা প্রধান হয়ে দাঁড়াবে। একদিকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ব্যাধি, অন্যদিকে সংখ্যালঘু সমস্যাসহ আভ্যন্তরীণ বিভেদ। এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য তিনি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুই জাতীয় পরিকল্পনার কথা বলেছেন।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বাস্তববুদ্ধির একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার ব্যাপারে। এই অবিলম্ব-পরিকল্পনা তিনটি বিষয় সম্পাদন করবার চেষ্টা করবে, তা দেশকে প্রস্তুত করবে (১) আত্মত্যাগে, (২) ভারতের ঐক্যবোধে, (৩) স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে। সুভাষচন্দ্রের মতে, প্রথমেই ঐ তিনটি বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ তৎপরতা দেখাতে হবে, কারণ "বিদেশী শাসন আমাদের নীতি-মান এবং সংহতিবোধকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে।"

ভারতের এই সংহতি-চেষ্টা যে, বিশেষ প্রয়োজনী তা না বললেও চলবে। হরিপুরা কংগ্রেসে অহিংস গান্ধীনীতির প্রতি দায়বদ্ধ সুভাষচন্দ্র দেশরক্ষার ব্যাপারে সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা তুলবার স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি নিরুপায়ে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন—অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা আসবে এবং যে-অহিংসা ইংরেজকে তাড়াবে সেই অহিংসার সামনে হিংসা হারিয়ে ফেলবে সকল হিংসা। সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরে ভারতের আত্মরক্ষার উপায় একমাত্র ঐক্যবোধে। সুভাষচন্দ্র তাই ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। কারণ তিনি অধিকন্তু জানতেন, জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাহলে সে মুষ্টি-ওঠানো বা মুষ্টি-নামানো যে-কোনো প্রতিরোধকেই সফল করতে পারবে।

এইখানে একটি কথা বলা চলে, জাতীয় নেতৃবৃন্দ—সুভাষচন্দ্রও তার অন্তর্ভুক্ত—ভারতের অনৈক্যের জন্য ইংরেজকে দায়ী করে যে প্রচার চালিয়ে এসেছেন, তাতে মনে হয়েছে, ইংরেজ সরে গেলেই আমরা 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'—সে ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির জন্য সুভাষচন্দ্রের উদ্বেগ কেন?

এইখানে আবার সেই বাস্তব রাজনীতিককে দেখতে পাচ্ছি। ইংরেজ ভারতের অনৈক্যের হেতু সত্য, কিন্তু বাঘের কামড় কি বাঘ পালিয়ে যাওয়া মাত্র সেরে যায়? ইংরেজ অনৈক্যের হেতু, এই কথার অর্থ, ইংরেজ থাকলে কোনভাবেই সম্পূর্ণ ঐক্য আনা সম্ভব হবে না। আর ইংরেজ চলে গেলে ঐক্য আসবে, তার মানে, সেই ঐক্য 'সম্ভবপর'—সত্যই সম্ভবপর, যদি তার জন্য আমরা সচেষ্ট হই। প্রথম ক্ষেত্রে চেষ্টা সত্ত্বেও ঐক্য অসম্ভব; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐক্য চেষ্টায় সম্ভব। সুভাষচন্দ্র সেই চেষ্টার প্রয়োজনের দিক তুলে ধরেছেন।

এবং সেইটাই হবে প্রাথমিক প্রয়াস—ভারতের ঐ সংহতি। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী নেতাদের মানসিক পার্থক্য এখানে। সুভাষচন্দ্র বুঝতেন কি ঘটবে—কি ঘটা স্বাভাবিক—এবং তার জন্য দেহে মনে প্রস্তুত থাকতেন, কিন্তু অন্যান্যরা পাকে বাধ পড়লে তবে প্রস্তুতি শুরু করেন। ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চদশ বার্ষিকী পালিত হবার পরে তবে নয়াদিল্লীতে 'সুশৃঙ্খল সংহতি' সম্মেলনের বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল সংবাদপত্রে।

একটু অপ্রাসঙ্গিক তবু বলা ভালো, স্বাধীনতা পাবার পরেই জনৈক দেশপ্রাণ ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন,—বড় বড় পরিকল্পনা হোক ক্ষতি নেই; কিন্তু এখনি প্রয়োজন, দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিদিন জাতীয় পতাকা ওঠানো—প্রতিটি ছেলেকে পতাকাকে নমস্কার করতে বাধ্য করা। তিনি বলেছিলেন মনে আছে, এর ফলে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে জাতীয় পতাকা কাপড়ের টুকরো থেকে জাতীয় সম্মানচিহ্ন হয়ে উঠবে। সেদিন তাঁর কথার গুরুত্ব বুঝি নি, আজ বুঝছি, যখন দেখছি আর পাঁচটা বস্তুর মত জাতীয় পতাকা অর্থাৎ জাতির উত্তোলিত আন্দোলিত

মোহগ্রস্ত হয়েছিল, তা তিনি কয়েকমাসের অভিজ্ঞতাতেই দেখেছিলেন। আমলাতন্ত্রকে বাদ দিয়ে শাসন চলে না, অথচ অধিকাংশক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের প্রতিরোধে প্রগতিকর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে তিনি পার্টির উপরে পার্টির পার্লামেন্টারী শাখার প্রাধান্যের সম্ভাবনাও দেখেছিলেন। তাই হরিপুরা-ভাষণে একদিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিই যে মন্ত্রিসভার মূল নীতি নির্ধারণ করবে, তা জানালেন, অন্যদিকে ব্যুরোক্র্যাসির হাতবদলের প্রয়োজনীয়তার কথাও বললেন।

ব্যুরোক্র্যাসি সম্বন্ধে—

"The first thing to do is to change the composition and character of the bureaucracy. If this is not done, the Congress Party may come to grief. In every country, the Ministers come and go, but the steel frame of the parmanent services remains. If that is not altered in composition and character the governmental party and its cabinet are likely to prove ineffective in putting their principles and practice."

সুভাষচন্দ্র দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন, এই ব্যুরোক্র্যাসি প্রথম মহা-যুদ্ধোত্তরকালে জার্মানীতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে এবং ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে লেবার পার্টিকে কোনো প্রগতিশীল কাজ করতে দেয় নি। ভারতবর্ষেও বৃটিশ ছাঁচে গঠিত আমলাতন্ত্র মন্ত্রিসভাকে কোনো জনকল্যাণের কাজ করতে দেবে না, কেন না তাদের দৃষ্টিভঙ্গি 'ভারতীয়ও নয়, জাতীয়ও নয়।'

চেতনার প্রতীক আমাদের কাছে উৎসবের আর পাঁচটা দর্শনীয় বস্তুর মত হয়ে গিয়েছে।

সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অথচ তখনও নিরন্ন, অশিক্ষিত ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের ভিতরকার চেতনা-শক্তিকে আহবান করতে, ভারতের ঐক্যে উদ্বুদ্ধ করতে, তাদের মধ্যে সচেতন দেশপ্রেমকে অচেতন সংস্কারে রূপান্তরিত করতে। সুভাষচন্দ্র তাই চেয়েছিলেন, কারণ ভারতীয় আদর্শবাদীদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক আদর্শবাদী হয়েও চরম বাস্তববাদী ছিলেন।

স্বাধীন ভারতের অ-বিলম্ব পরিকল্পনার প্রথমে তিনি রেখেছেন ত্যাগের জন্য আহবান, তারপর ঐক্যচেষ্টা এবং সেই ঐক্যকে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি দেবার জন্য স্থানীয় সংস্কৃতির স্বাধীনতা ঘোষণা। এখানে মনে পড়বে, পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধকালে সুভাষচন্দ্রের ঐক্য-বিশ্বাস-বলিদানের আহবানের কথা। সমগ্র জাতির আশু প্রয়োজনকে ঐ তিনটি শব্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে ছিল তাঁর নেতৃত্ব-প্রতিভা। ঐক্যচেষ্টা কিভাবে করা হবে তারও কিছু ইঙ্গিত তিনি হরিপুরা-ভাষণে দিয়েছিলেন। যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম, বিমান ইত্যাদির সাহায্যে ভারতবর্ষকে নিকটতর করতে হবে; যেমন, রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানীকে সমগ্র ভারতবর্ষে চালু করতে হবে; যেমন, সমগ্র ভারতে প্রবর্তন করতে হবে একই শিক্ষানীতি।

এই সকলই অ-বিলম্ব পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে। এই ব্যাপারগুলিকে অ-বিলম্ব পরিকল্পনারূপে ঘোষণা করা—পাঠক আমার পুনরুক্তি ক্ষমা করবেন—সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই প্রমাণ, সেই রাজনীতি অবশ্য বৈপ্লবিক।

শিক্ষার মত ব্যাপারকে পরবর্তী ব্যাপার করতে সুভাষচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না—বিশেষত শিক্ষার ঐক্য-বিষয়ক অংশটিকে। দেশের সামনে দারিদ্র্য একটা মস্ত বড় সমস্যা, কিন্তু দারিদ্র্য দূর করতে হলে উৎপাদনের ও বণ্টনের ব্যবস্থায় যে উন্নতি প্রয়োজন তাকে অগ্রাধিকার দিতে তিনি রাজী নন। সেটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ব্যাপার এবং রাতারাতি জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন সম্ভবপর নয়, সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাসের প্রমাণ তাঁর ত্যাগের আহবানের মধ্যে রয়ে গেছে। সর্বভারতের জন্য সাধারণ শিক্ষানীতির সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিকেও সামনে এগিয়ে এনেছেন। রাষ্ট্রভাষাকে অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে—অসুবিধা সত্ত্বেও। রাষ্ট্রভাষার ক্রমিক প্রবর্তন সম্ভব নয়। অন্তত সে চেষ্টা অন্য ভাষাভাষী জনসাধারণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবেই, যদি প্রথম স্বাধীনতালাভের উন্মাদনাকে স্তিমিত হতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা না হলে রাষ্ট্র চলে না, অথচ হিন্দী বা হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রভাষা হলে তার দ্বারা খণ্ডস্বার্থের পোষকতা ঘটবে এই আশংকা আছে। সংখ্যাগুরুত্বের কারণে সুভাষচন্দ্র যেমন হিন্দুস্থানীর পক্ষপাতী তেমনি তিনি এর দ্বারা অন্য ভাষাভাষীদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর প্রস্তাব, একদিকে-আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা হোক; অন্যদিকে হিন্দীভাষীদের আত্মাভিমান ও স্বার্থলোভকে শাসনে রাখার জন্য, সর্বভারতের সুবিধার জন্যও বটে,—নাগরী লিপির বদলে প্রবর্তিত হোক রোমক লিপি।৬ নাগরী-লিপিহীন হিন্দী,—হিন্দীর আঞ্চলিক অভিমানকে সংযত রাখবে এবং ঐ ভাষাকে মাত্র সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ ভাবপ্রকাশের বাহন করবে; অন্যদিকে ঐ রোমকলিপি পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার পথে প্রথম পদক্ষেপ—যে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে ছিল—(১) জনসংখ্যা সমস্যা, (২) ভূমিব্যবস্থা, (৩) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প।

জনসংখ্যার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। ভারতবর্ষে জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটবে কিনা এই

৬ রোমান লিপির ব্যাপারে তিনি কামাল পাশার তুরস্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথা হরিপুরা-ভাষণে জানিয়েছেন। ১৯৩৪ সালে তুরস্ক ভ্রমণের সময়েই এ-বিষয়ে মনস্থির করেছিলেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমান লিপির প্রবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট প্রচারকার্য করেছেন। সুভাষচন্দ্রের উপরে লিখিত এক রচনায় (*Subhas Chandra Bose : Personal reminiscences*) তিনি বলেছেন, সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে তাঁরও ভূমিকা ছিল। ১৯৩৫ সালে ভিয়েনায় সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে, তিনি তাঁর রচিত *'A Roman Alphabet for India'* পুস্তিকাটি পড়তে দিয়েছিলেন।—"I also broached to Subhas my idea of adopting the Roman script for all the languages of India, and thus furnishing a Pan-Indian bond of union through the script, apart from the special merits of the Roman system of writing. Subhas was interested, and asked me to send him a copy of my pamphlet to this subject. This I did, and Subhas, I think, read the pamphlet carefully ; and one evening, till late at night, he and I had a long talk on this matter in a cafe in Vienna, and I think I was able to convince him of the value of the Roman Script." এখানে আমরা এইটুকু বলতে পারি, সুভাষ আগে থেকেই 'convinced' হয়ে ছিলেন, ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তিকা পড়ে ও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সেই বিশ্বাসের পক্ষে ভারতীয় সমর্থন কিছু পরিমাণেও আছে জেনে আনন্দিত হয়েছিলেন।

গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র (হরিপুরা কংগ্রেস)

অর্থনৈতিক তর্কের মধ্যে না গিয়েও তিনি বলেছেন ভারতের বর্তমান আর্থনৈতিক অবস্থায় দারিদ্র্য দূর করতে হলে কোনো-না-কোনোভাবে জনসংখ্যার স্ফীতি রোধ করতে হবে।

ভূমিব্যবস্থা এবং শিল্পব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি তাঁর পুরাতন আদর্শের কথা জানিয়েছেন—"সমাজতান্ত্রিক ধারায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টন।" ভূমি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত সংস্কারের পক্ষপাতী। তার মধ্যে পড়ে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকদের পুরাতন ঋণ মকুব, কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা, সমবায়ের প্রসার, এবং চাষের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন। শিল্পায়নের ব্যাপারে—দেশে নতুন শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, কারণ বৃটিশ-শিল্পের বিপুল যান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এবং বিদেশী সরকারের অত্যাচারে দেশীয় শিল্প নষ্ট হয়ে গেছে। প্ল্যানিং কমিশনকে বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হবে।—কোন্ কোন্ কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবন সত্যই সম্ভবপর।' সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের যতই নিন্দা করা যাক না কেন, তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দেশ শিল্পবিপ্লবের পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। সুতরাং পথ হল—বৃহৎ যন্ত্রের মন্দের অংশ সংযত রাখবার চেষ্টা করে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটিয়ে যাওয়া। এই মন্দাংশ কমবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়। তাছাড়া ভারতবর্ষের মত দেশে কুটীর-শিল্পের সুযোগ সব সময় থাকবে এবং কুটীরশিল্পের সুপরিকল্পিত বিকাশ যন্ত্রসভ্যতার গ্লানি নাশ করবে অনেকাংশে।

হরিপুরাভাষণে আরো বহু প্রয়োজনীয় বিষয় আছে; যেমন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বৈদেশিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি। রাষ্ট্রগঠনের যুগের অপর রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিমাণে অবহিত থেকে দেশের উন্নতির প্রয়োজনে বিশ্ব-পরিস্থিতির সুযোগ ব্যবহার করেও, সুভাষচন্দ্রের মত হল, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গঠনব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বেশি মাথা ঘামানো উচিত হবে না। তাঁর কাছে এ ব্যাপারে আদর্শ রাষ্ট্র রাশিয়া, যে রাশিয়া ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোকুলে জন্ম নিয়েও নিজের প্রয়োজনে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে নানাবিধ চুক্তি করেছে। এক্ষেত্রে রাশিয়ার চেয়ে অধিক বিপ্লবী হতে সুভাষচন্দ্রের বাসনা ছিল না। বৈদেশিক প্রচার সম্বন্ধেও ঐ ভাষণে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য ছিল।৭ দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের পয়সায় ভারতের নিন্দা ছেপে ইংরেজ বিশ্ব-জগতে বিলি করেছে। তার ফলে বিশ্বের কাছে ভারত-বর্ষ একটা আজব চিড়িয়াখানা, ভারতবর্ষীয় জীবগুলিকে খাঁচার মধ্যে পুরে ইংরেজ পৃথিবীকে বিনামূল্যে দেখিয়েছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের সত্য পরিচয় তুলে ধরা একটা বিপুল কাজ। সুভাষচন্দ্র জানতেন, পৃথিবীর অন্য জাতিরা ভারতবর্ষের রোমান্টিক প্রণয়ী নয় যে, রাগ করে অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে থাকলে তারা মুখ দেখাবার জন্য সাধা-সাধি করবে। ভারতবর্ষকে নিজের সুন্দর সাজে দাঁড়াতে হবে। যা প্রকাশযোগ্য নয়। অন্তত লজ্জায় খাতিরে তাকে না উদ্ঘাটিত করে যেখানে ভারত গরীয়ান, বা অ হতে সচেষ্ট—তার বিষয়ে প্রচার চালাতে হবে। প্রচার—'প্রোপাগান্ডা' নয়—সুভাষচন্দ্র বলেছেন, কারণ প্রোপাগান্ডার মধ্যে মিথ্যার ভাব আছে।

[ক্রমশ]

---

৭ বৈদেশিক প্রচার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের একটি মূল্যবান রচনা (১৯৩৫ সালের শেষের দিকে লিখিত) আছে। ঐ প্রবন্ধে তিনি (১) ভারতের বিরুদ্ধে বৃটিশের প্রচারের চেহারা (২) অন্যান্য স্বাধীন বা পরাধীন জাতির প্রচারের প্রয়াস (৩) এবং বৈদেশিক প্রচারের গুণাগুণ ও ভারতের পক্ষে উপযুক্ত প্রচারের পথনির্দেশ করেছেন। তৎকালীন প্রচারক-দের মধ্যে তিনি বিঠলভাই প্যাটেলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। পূর্বকালের প্রচারকদের মধ্যে নামোল্লেখ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর। (*Speeches and Writings of Subhas Bose*—J. S. Bright.)

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

পাঠকে-পাঠকে মতভেদ ঘটা স্বাভাবিক। সে-বিষয়ে বেশি উদ্বেগ বাহুল্য। বই-বাছাইয়ের কাজে মতান্তরের সম্ভাবনা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কিন্তু প্রধান সমস্যা হোলো পরিকল্পনা স্থির করা। উপযুক্ত পরিকল্পনা ব্যতিরেকে এ-কাজে এগুলে নাকাল হতে হবে।

আনন্দ বলেছিল—'বই-বাছাই' একটি অস্পষ্ট নাম,—ও-নামে ঠিক উদ্দেশ্যটা বোধগম্য হয় না। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী এই প্রায় পৌনে দু'শ' বছরের প্রবাহে যেসব বাংলা বই বেরিয়েছে, সেই গ্রন্থস্তূপের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে বিদ্যমান থাকা কোনো একটিমাত্র পাঠকের একক রুচির পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব যে বিশেষ পাঠক তাঁর নিজস্ব রুচি অনুসারে এই আধুনিক কালের বাংলা বই সম্বন্ধে—অর্থাৎ বইগুলির বিষয়বস্তু, রচনা-রীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চান, তাঁর নিজের রুচির প্রকৃতি কী রকম, সে-কথা আগে থেকে একটু ব্যাখ্যা করে নেওয়া ভাল।

আমি বলেছিলুম—ঠিক, ঠিক। এ-ক্ষেত্রে সে-রুচি নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক রুচি।

—অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি যাবতীয় সাহিত্যগ্রন্থই এ আলোচনার বিষয়?

—হাঁ, এবং সেই সঙ্গে সেই সব প্রভাব, প্রেরণা, উপাদান এবং পরিবেশের কথাও এতে দেখা দিতে পারে,—যাদের সমাবেশগুণে আমাদের এই আধুনিক কালের বাঙালী মন ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে।

—অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের বইয়ের কথাসূত্রেই বিচিত্র প্রকৃতির লেখকদের প্রসঙ্গ উঠবে।

—শুধু লেখকদের কথাই কি যথেষ্ট? ভাবের সঙ্গে, চিন্তার সঙ্গে, রচনার সঙ্গে জড়িত কতো বিভিন্ন ধরনের মনই তো স্মরণীয়।

—কী রকম?

—যেমন, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী (১৭৬২—১৮৩২),—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫—১৮৪৬),—মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭—৫৮) এবং এই রকম অন্যান্য মানুষ—যাঁরা এই আলোচ্য সময়ের মধ্যেই বিদ্যমান ছিলেন,—যাঁরা খুব স্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন যে, তা নয়,—কিন্তু যাঁরা আধুনিক পর্বের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব বা চিন্তাধারার সঙ্গে জড়িত। হরিহরানন্দ ছিলেন রামমোহনের তন্ত্রচর্চার গুরু,—রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'তেও তিনি উপস্থিত থেকেছেন,—'মহানির্বাণ তন্ত্রের' তিনি একজন টীকাকার। জয়গোপালের নাম বোধ হয় আরো বেশি পরিচিত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক চরিত-মালা'-র গুণে এ'দের কীর্তিকলাপের খবর এখন সাধারণ অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেরই অধিগম্য। সংস্কৃত- কলেজ যখন উঠিয়ে দেবার চেষ্টা চলে, সেই সময়ে কলেজের কর্মকর্তাদের অন্যতম হরেস হেম্যান উইলসন সাহেবকে একটি সংস্কৃত কবিতায় জয়গোপাল যা জানিয়েছিলেন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গ—১ম পর্যায়' থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ সেই কথাগুলিই তাঁর আলোচনায় স্মরণ করেছেন—

> "এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য; ইহাতে যে-সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্তি চিরস্থায়ী হইবে।"

জয়গোপাল যে সংস্কৃত সাহিত্যের একজন দরদী অধ্যাপক ছিলেন, সে-কথাও সুপরিচিত। শ্রীরামপুরে ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণের এবং কাশীরামের মহাভারতের 'সংশোধিত' সংস্করণের তিনি ছিলেন সংশোধনকর্তা। তাছাড়া তাঁর বাংলা অভিধান 'বঙ্গাভিধান' এবং—'পারসীক অভিধান' দু'খানিই বেরোয় ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে। এসব বই ছাড়া অন্যান্য বইও তিনি রেখে গেছেন। বাংলা বইয়ের মেলায় তাঁর এসব বই অবান্তর নয় বটে,—কিন্তু আনন্দকে আমি বলেছিলুম যে, প্রসঙ্গতঃ এ'দের নাম এ-আলোচনায় যদিও বা উল্লেখ করতে হয়,—এইসব বইয়ের বিশদ বিবরণ লিখে রাখা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়।

আনন্দ বলেছিল,—এ পর্যন্ত যা বললে তা থেকে তোমার মনের গতি যে 'নেতি নেতি' করে পথ খুঁজছে, সেটা বোঝা গেল। কিন্তু 'ইতি ইতি' করে ভাবতে হবে। তা না-হলে এ লেখা পাঠকরা পছন্দ করবেন না।

আমি বলেছিলুম—পাঠকের অনুমোদন ব্যতিরেকে তো এ পথে একপা-ও এগুনো সম্ভব নয়। আর, যা আমার মনে আছে,—এ পর্যন্ত সে-বিষয়ে যা বলা হোলো,—তা কি এতদধিক স্পষ্ট করে বলা সম্ভব?

আনন্দ বলেছিল—এই মুহূর্তে হয়তো সম্ভব নয়—অতএব আরো কিছুদিন ভাবো এ-কথাটা।

হঠকারিতার রাশ টেনে ধরে যে শান্তি, তারই নাম 'সম্মতি'। সেই সম্মতিও বোধ হয়, আনন্দের মত সাত্ত্বিক। সে চুপ করে থাকাই পছন্দ করে। কিন্তু লেখায় দোষ-গুণ যা-ই ঘটুক, লেখকদের মতিগতি অনুসরণ করা একটি সামাজিক দায়িত্ব। বাংলা সাহিত্যের এই শতাধিক বছরের বহতা ধারা অনুসরণ করবার আগ্রহী পাঠকমনকে সে-কাজে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নি। সে-মনে ক্রমেই নানাবিধ চিন্তা পুঞ্জিত হতে থাকে। সেই চিন্তাগুলি পাঠককে জানিয়ে রাখা দরকার।

প্রথম চিন্তা—এই পৌনে দুশ' বছরের বাঙালী-জীবনের—তথা বাঙালী মনের চেহারাটা কী রকম? তাতে যুক্তিনিষ্ঠা কতোটা,—আবেগপ্রবণতাই বা কী রকম?

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতি, সংস্কৃতি সাহিত্য' প্রথম বই হয়ে বেরোয় ১৩৪৫ সালে,—দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৩৫৮-এর কার্তিকে,—সেও স্বাধীনতার আগের ঘটনা। সে-আলোচনায় তিনি বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন—

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা-ভাষী জনসমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি'।

বইখানির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে—

এখন পাঁচ কোটির অধিক লোক বাঙ্গালা-ভাষা বলে। ......গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী—ইহাদের প্রত্যেকের অধিবাসিগণের চেয়ে বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালাভাষী জনগণের সংখ্যা অধিক। ..... হিন্দুস্থানী বাঙ্গালার তিনগুণের কাছাকাছি লোকের মধ্যে প্রচলিত এবং আরও অনেকে ইহা বলিতে পারে; কিন্তু হিন্দুস্থানী উত্তর-ভারতের অর্থাৎ আর্য-ভাষী ভারতের চৌদ্দ কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, ইহা (অর্থাৎ হিন্দি-উর্দু সমেত পশ্চিমা-হিন্দি উপভাষাগুলি) মাত্র সাড়ে চার কোটি লোকের মাতৃভাষা।

পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে ১৩৪৫ সালে বাংলার স্থান যে সপ্তম ছিল,—সে-বইয়ে একথাও বলা হয়েছে। অতঃপর আধুনিক বাঙালী মনের প্রবণতা সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি—

বাঙ্গালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতেও হয়তো চার আনা ইউরোপীয়,—তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে,—এবং আট আনা ভারতীয়; বাকি চার আনায় সে বাঙ্গালী, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের বাঙ্গালা বিকারমাত্র—বাকিটুকু খাঁটি বাঙ্গালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জাতির এক অংশে আবার ইসলামের প্রভাব আছে।.....

বই-বাহাদুরের লক্ষ্যবোধ এইরকম আনুষঙ্গিক ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। স্বাধীনতার পরে বিভাগের ফলে এইসব পরিসংখ্যান নিশ্চয় কিছু বদলে গেছে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার এলাকা। সুনীতিবাবুর এতৎপ্রাসঙ্গিক উপদেশে গুলি বরং এখানে উল্লেখ করা চলে। তিনি এই সংস্কৃতি রক্ষার পথ হিসেবে সেই ১৩৪৫—৪ জানান—

যত প্রকার শক্তি আছে তাহার প্রয়োগ অর্থনৈতিক দিকে অত্যন্ত সংকীর্ণমনা, প্র বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, আমাদের আত্মরক্ষা হইবে।......

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সংস্কৃতির প্রা এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ও প্রাচীন ভারতে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যোগ আছে সেই অস্বীকার করিলে চলিবে না।

অর্থাৎ—তিনি সে-সময়ে এই পরামর্শই দিয়েছি 'আমরা—'অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করিব',—কিন্ ভারতবর্ষের সঙ্গে—'সাংস্কৃতিক যোগ ভুলিব না।'

সুনীতিবাবু বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন যে, দী সেন সীতা-সাবিত্রীকে 'ঘাঘরা-পরা বিদেশিনী' বলে করে গেছেন। সে-মন্তব্যের প্রতিবাদসূত্রে তিনি ে

বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুয়া, মদিনা ও চরিত্র লইয়া আমরা গর্ব করিবই—এই অপূর্ব চরিত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীজীবনের কিন্তু উমা সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌর না; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা সীতা বাঙ্গালার বিশেষকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালার নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

অর্থাৎ কতকটা সারা-ভারতের নিগূঢ় অখন্ডতায় কতকটা নিজেদের নিকটকালের আঞ্চলিকতায় এবং কতকটা ইউরোপের ভাব-ভঙ্গির প্রভাব—এ উপাদানের মিশ্রণ আছে এই আধুনিক বাঙালী সুনীতিবাবু এই ইঙ্গিতই জানিয়েছেন।

ইংরেজ এসে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে অথবা তার কিছুদিনের মধ্যেই—আমাদের বহুকালের এবং সংস্কার—শ্রদ্ধা এবং ঐতিহ্যবোধ বিসর্জন দিয়ে যে একটি নতুন জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছি,—কোনো মহলে এরকম ধারণা যদিই-বা প্রচলিত থাকে, তাহ প্রমাদ বলেই গ্রাহ্য—এবং তা বর্জনীয়।

আবার একথাও স্বীকার্য যে, ইংরেজ আসার কালের মধ্যেই আমরা মনের দিক থেকে নবজন্ম লাভ

আনন্দ বলেছিল—'নবজন্ম' এক লহমার ঘট অনেকটা সময় লাগে সেজন্যে—অন্তত আমাদের এই জীবনের আধুনিকবোধে পৌঁছতে সেই রকমই সম হয়েছে।

আমি বললুম—তবে যে রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-বন্দনায় দেখা গেল—

> পূর্বে কি ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম।......

সে বললে—সেই 'এক মুহূর্ত' প্রায় একশ' বছরের পরিণতিবিন্দু। দেশী ভাবের সঙ্গে নতুন ভঙ্গির মিলনেই তা সম্ভব হয়েছিল। ভাষার গতি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। এই মিলন ঘটতে সময় লাগে—

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' থেকে কয়েকছত্র কবিতা শুনিয়েছিল সেদিন—

> কহিলাম, বোঝ নি কি তোমার পরশে
> হৃদয় ভরেছে মোর রসে।
> কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
> হে মোর বিদেশী।'

আনন্দ সেদিন আমাকে সুনীতিবাবুর সেই 'জাতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য' বইয়ের দুটি শব্দের প্রয়োগ মনে করিয়ে দেয়। বিশেষভাবে সে বলে—সুনীতিবাবু 'ডিসিপ্লিন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'বিনয়-পরিপাটি' এবং 'ইনটেলেকচুয়ালিজম'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'আধিমানসিকতা' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। আমরা সাধারণতঃ 'ডিসিপ্লিন' বোঝাতে 'নিয়মানুবর্তিতা' এবং 'ইনটেলেকচুয়ালিজম' বোঝাতে 'বুদ্ধিনির্ভরতা' বা ঐ রকম সব শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু সুনীতিবাবুর উদ্ভাবিত ঐ দুটি শব্দ সত্যিই বড়ো দরকারী। আমাদের এই আলোচনার পক্ষেও শব্দ দুটি খুবই চমৎকার। এইসূত্রে আজ আবার বিশেষভাবে মনে পড়েছে। কারণ, 'ডিসিপ্লিন' যে ধরনের যুক্তিশাসন—সে তো শুধু নিয়ম-রক্ষা নয়। এদেশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা হয়েছে,—অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত দেখা দিয়েছেন,—কিন্তু সাহিত্যের ধারায়—আমাদের এই আধুনিককালের আগে যতো ভাবের ঢেউ খেলে গেছে, মন সে-পরিমাণে যুক্তিবাদী ছিল না। আমাদের সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রামমোহনের আমল থেকেই নতুন করে এই যুক্তির দৃষ্টি দেখা দেয়। ভাষায়, ভাবে উত্তরোত্তর সেই প্রবণতার ওপর আমাদের নির্ভর বেড়েছে।

—মানি, কিন্তু সেও আংশিক সত্য। —কারণ, এলোমেলো ভাবনা এবং অব্যবস্থিত প্রকাশ এই আধুনিক কালেও কিছু কম ঘটে নি।

—অর্থাৎ 'আধিমানসিকতা' আর 'বিনয় পরিপাটি'-র সঙ্গে কিছু রাখালী-কল্পনাও মিশে ছিল বৈ কি!

আমি বললুম—রাখালী-ভাবটা কী ব্যাপার?

সে বললে—সে আমাদের এই আধুনিককালের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে তাঁরই সমকালীন মধুসূদনের মন্তব্য—

> আছিলে রাখাল-রাজা কাব্য ব্রজধামে
> জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
> যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
> সবে কি ভুলিল তোমা?

সংক্ষেপে, এই হোলো প্রথম চিন্তা। দ্বিতীয় চিন্তা,—কালানুক্রম মেনে, এই আধুনিককালের বাংলা সাহিত্য-কর্মের প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছরের গদ্য সম্বন্ধে যেমন, এই সময়ের পদ্য-রচনা সম্বন্ধেও তেমনি আড়ষ্টতা আর বিশৃঙ্খলার পরিমাণ তুচ্ছ নয়। সে-সব কি সাধারণ সাহিত্যরসপিপাসু পাঠকের ভাল লাগবে? পদ্যের ক্ষেত্রে রাখালীয়া ভাবে আমরা কতকটা অভ্যস্ত আছি, কিন্তু 'গদ্যের আড়ষ্টতা' বড়োই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা।

এই দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি ভাবতে-ভাবতে সেই আমাদের আদিপর্বের গদ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য মনে এলো—

> 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়ে নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া যাতকর্তার ফরমাশে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।
>
> যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত বাংলা উঠিতে উঠিতে প্রয়োজন মতো সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।
>
> কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্য ঠিক তার উল্টা পথে চলিল। গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা, কেবল তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ এক রকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।
>
> ......এই গদ্য যতই বাঙালির ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তনের গতি কোন্‌দিকে? প্রাকৃত বাংলার দিকে। আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য সংস্কৃত ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুঝিয়া আসিতেছে।'১

[ক্রমশ]

১।—ভাষার কথা। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের পরিশিষ্ট। রবীন্দ্র-রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ২০৫।

বর্ণ দর্শন

কংগ্রেসের একুশ বছরের অপশাসনের প্রতিকার যুক্তফ্রন্টের কাছ থেকে নিশ্চয়ই রাতারাতি আশা করা যায় না, অন্তত একুশ মাসও সময় এর জন্য প্রয়োজন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের একুশ সপ্তাহও পার হয় নি। তথাপি প্রভাত যেমন দিনের সূচনা করে, তেমনি আমরাও আশা করেছিলাম যে, এমন কয়েকটি ক্ষেত্র আছে যেখানে যুক্তফ্রন্ট সরকার কিছুটা শুভ সূচনা করতে পারবেন, সকল কাজেই তো আর কেন্দ্রীয় অর্থবরাদ্দ লাগে না! এটাও আশা করা গিয়েছিল যে, গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা কিছু শিক্ষালাভ করবেন। তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট সরকার একান্তই শক্তিহীন নয়, তার পিছনে বিপুল জনসমর্থন আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার যা করতে পারতেন তা করেন নি এবং তাঁরা যে পথে চলছেন তাতে যুক্তফ্রন্টের সুনাম বৃদ্ধি হচ্ছে না।

আশা করা গিয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার আমলাতন্ত্রকে বাতিল করতে না পারলেও আমলাতন্ত্রের প্রগতিশীল অংশকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসনকে অধিকতর সচল ও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবেন। কিন্তু কার্যত ঘটেছে তার বিপরীত। কংগ্রেসী আমলে যে-সব কুখ্যাত অফিসারেরা ক্রমাগত জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করে গেছে, যারা দুর্নীতির আকর হিসাবে সুপরিচিত, এমন কি কংগ্রেসী আমলে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলিই যাদের কুকীর্তির মুখোস খুলে দিয়েছে, ঘটনাচক্রে যুক্তফ্রন্টই আজ তাদের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছে। ফলে প্রশাসনিক ব্যাপারে কোন উন্নতি হবার পরিবর্তে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। কংগ্রেসী আমলের সেই উদ্ধত আমলাতন্ত্র আজও দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করছে। ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এদের মনে কিছুটা ভয় ঢুকেছিল বটে, কিন্তু আজ এরা সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক, কেন না কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মত যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরাও এদের ওপর ব্যক্তিত্ব প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছেন।

সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি হয় নি। আজও একটা চিঠি দিলে তার জবাব পাওয়া যায় না। কোন কাজ পেতে হলে হাঁটাহাঁটি করে জুতোর গোড়ালি ক্ষয় করা ভিন্ন উপায় নেই। দুর্নীতির রাজত্ব অবাধে চলছে। ঘুষ ভিন্ন কোন কাজই হয় না। কংগ্রেসী আমলের ট্রাডিশন সমানে চলছে। তদুপরি আবার সরকারী কর্মচারীরা এখন "লাল" হয়ে গেছেন। ওপরওয়ালাদের কাছে অভিযোগ করেও কোন লাভ হয় না, কেন না কর্তব্যে অবহেলার দরুণ যদি ওপরওয়ালা কারো কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চান, সেটা তাঁর পক্ষে "প্রতিক্রিয়াশীল" আচরণ বলে গণ্য হবে। দলবদ্ধভাবে তাঁর ওপর বৈপ্লবিক হামলা চালানো হবে। খুব দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে যতটা সচেতন, তার শতাংশের একাংশও নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে নন। অথচ—এঁরাই নাকি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় খুঁটি! এই খুঁটির ওপর নির্ভর করে যদি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে চলতে হয়, তা হলে যুক্তফ্রন্টের ইমেজ যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কল্পনা করতেই মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যে সকল ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের কাছ থেকে কঠোরতা আশা করা গিয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অসহায়ের মত আচরণ করছেন। যুক্তফ্রন্টকে পুনরায় উৎখাতের জন্য বিভিন্ন মহলে চক্রান্ত চলছে, এমন কি, দুর্গাপুরের ঘটনায় যা দেখা গেল, পুলিশবাহিনী প্রকাশ্য বিদ্রোহেরই সূচনা করেছিল, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার এ-বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোন তৎপরতা দেখাতে পারেন নি, এক বাণী দেওয়া ছাড়া। পুলিশমহলে প্রগতিশীল অফিসার অনেক আছেন, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার সেই পুরনো পাপীদের ওপর নির্ভর করছেন, অথচ এদের মধ্যে অনেকেই ভেতরে ভেতরে যুক্তফ্রন্টকে সাবোটাজ করার তালে রয়েছে। এ ছাড়া ফ্রন্ট আমলে পুলিশের কর্মদক্ষতার বিশেষ হানি হয়েছে।

আসলে কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করতে যুক্তফ্রন্ট এখনও পর্যন্ত সক্ষম হয় নি। খাদ্যনীতিই বলুন, শ্রমনীতিই বলুন, শিক্ষানীতিই বলুন প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোনগতিকে-চালিয়ে-যাবার নীতি বলবৎ রয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শরিকী কোন্দল বর্তমান থাকার দরুণ কোন নীতি সার্থকভাবে অনুসরণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না, জোড়াতালি দিয়ে কাজ চলছে। গতবারের চেয়ে এবারে একটি বিষয়েই মাত্র উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে, গতবারে ফ্রন্টের মন্ত্রীরা একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেন, এবার তার মাত্রা অনেক কম। কিন্তু মন্ত্রীপর্যায়ের ঐক্য থাকলেও শরিক দলগুলির মধ্যে বিন্দুমাত্র ঐক্য নেই এবং বিভিন্ন দলের ক্যাডারদের মধ্যে তো মার-মার কাট-কাট অবস্থা বিরাজ করছে। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে ফ্রন্ট শক্তি ক্ষয় করছে, শরিক দলগুলি হাতে সরকার থাকার দৌলতে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা করছে, আর সেই অবসরে চতুর আমলাতন্ত্র আপন মনে নিজের স্বার্থ হাসিল করছে। যুক্তফ্রন্টের কাছ থেকে জনসাধারণ বিশেষ কিছু আশা করে নি, একটু পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ছাড়া। কিন্তু সে প্রত্যাশা যে অচিরে পূর্ণ হবে তার কোন ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে না।

পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিম্নতম পুলিশমহল যে এবার শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়াতে চলেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন, তা দেখে স্বস্তিবোধ করছি। কনস্টেবলরাই হলেন পুলিশবাহিনীর মেরুদণ্ড, অথচ আজ পর্যন্ত তাঁদের মত অবহেলিত কোন শ্রেণী আছেন কি না সন্দেহ। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের যে এ্যাসোসিয়েশন আছে, ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সকল শ্রেণীর পুলিশই যার সভ্য, নিম্ন পর্যায়ের পুলিশ কর্মচারীরা সেই এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব অস্বীকার করতে চলেছেন। এঁদের বক্তব্য হল অ্যাসোসিয়েশন

কনস্টেবলদের মানসিক, আর্থিক ও পারিবারিক সুবিধার জন্য বা তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য এ পর্যন্ত কিছু করেন নি।

ডিসিপ্লিনের নামে যে নীতি পরিচালিত হয়, তা নিছক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। ওপর মহল কোন ডিসিপ্লিন মানেন না। এদিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। ওপর মহল যখন সরকারী গাড়িতে চেপে সরকারী কাজে মফস্বলে যান, অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা থাকেন সাদা পোষাকে, অথচ ড্রাইভার ও আর্দালিদের পুরো পোষাকে থাকতে হয়। ওপর মহল যদি পোষাক না পরে কেস তদন্ত বা থানা ইন্‌স্পেকশন করতে পারেন, তবে তাঁর ড্রাইভার বা আর্দালিকে পুরো পোষাক পরতে হবে কেন? নিম্নতম কর্মচারী বলেই কি? মফস্বলে কাঁচা রাস্তায় বুট পরে না যেতে পারলে তার কোন বিকল্প ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত হয় নি, যেতে না পারলে ডিসিপ্লিন ভঙ্গকারী বলে আখ্যা দেওয়া হবে; কিন্তু ওপরতলার বেলা অন্য কথা। তাঁদের ইচ্ছাই ডিসিপ্লিন। আসলে এগুলি নিছক নিপীড়নমূলক মনোভাবেরই প্রতিফলন। বড়কর্তাদের ব্যক্তিগত বেগার খাটা, তাঁদের পারিবারিক কাজকর্ম করে দেওয়া, বড়সাহেবদের মেমসাহেবদের খাস বেয়ারা-বাবুর্চির কাজ করা, সমস্তই এদের করতে বাধ্য করা হয়। প্রতিবাদের কোন উপায় নেই, ওপরওয়ালাদের অন্যায় আদেশ প্রতিপালন না করার ফল বড় ভয়ানক। ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন এর জন্য কি মূল্য দিতে হয়। পুরাকালে ক্রীতদাসের মালিকেরা তাদের অধীনস্থ দাসদের হত্যাও করতে পারত। এ আমলের বড়সাহেবরা অধীনস্থ কনস্টেবলদের অবস্থা তারচেয়েও শোচনীয় করে তুলতে পারেন।

প্রকাশ, কনস্টেবলদের অনেকে এ্যাসোসিয়েশনের নামকরণ করেছেন নাকি বছরে একবার বড় ডিশ ও একবার ছোট ডিশ খাবার সংস্থা বলে। এ সংস্থা কোনদিনই কনস্টেবলদের অভাব-অভিযোগ, মান-অপমান নিয়ে নাকি মাথা ঘামায় না। তাদের চাকরিগত অবস্থার সামান্যতম উন্নতি করতেও এই সংস্থা নাকি অপারগ হয়েছে। কনস্টেবলদের বক্তব্য, তারা এভাবে আর মুখ বুজে মার খাবে না, হয় এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব বদল করতে হবে, না হয় পৃথক সংস্থা গঠন করতে হবে। প্রথমটি সম্ভব নয়, কাজেই কনস্টেবলরা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিতে চলেছে।

খাদ্য প্রসঙ্গ

আগামী কয়েক মাসে রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সকল অধিবাসীকে রেশনিং-এর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ এই রাজ্যের ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক সকলেই রেশন পাবেন। এই রেশনিং ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বিধিবদ্ধ রেশনিং, ক্রিজ রেশনিং এবং আংশিক রেশনিং। এর আগে কখন ভারতের অন্য কোন রাজ্যে তামাম অধিবাসীকে রেশনিং-এর আওতায় আনা হয় নি।

খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন, এখন পর্যন্ত চার লক্ষ টনের কিছু বেশি চাল সংগ্রহ করা হয়েছে, এর ওপর কেন্দ্রীয় সরকার এ বছরের জন্য দেড় লক্ষ টন চাল দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘাটতি মেটানোর জন্য উড়িষ্যা ও নেপাল থেকে চাল আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চালের ঘাটতি দেখা দিলেও গম বাজারে পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে। অবিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় খোলাবাজারে গম বিক্রি হচ্ছে। বাইরের গম আনার জন্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী খাদ্য ও রিলিফ কমিটির সদস্যদের অবিলম্বে ব্যাপক মজুতবিরোধী অভিযান শুরু করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সদস্যরা যেন লক্ষ্য রাখেন যে, বাইরে থেকে চোরাপথে যেন চাল বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় না আসে।

কিন্তু সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থাটা বিপরীতমুখী সাক্ষ্য দেয়। চালের দর বেড়ে চলছে। মডিফায়েড রেশনিং এলাকাগুলিতে চাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। সরকারী আশ্বাস সত্ত্বেও অবস্থা কিছুটা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। খাদ্যনীতি নিয়ে যুক্তফ্রন্টকেও খুব সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে না। এমন একটি ব্যক্তিকে খাদ্যমন্ত্রীর পদে বসানো হয়েছে, বিধানসভার মধ্যে যাঁর কোন দলগত ফলোয়িং নেই। এই দপ্তরটি কোন বৃহৎ দলের হাতে রাখা উচিত ছিল। এই ধন্যবাদহীন দপ্তরটি বেছে বেছে সুধীনবাবুর হাতে দেবার পেছনে কি বৃহৎ দলগুলির দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার মনোভাব কাজ করেছে?

যুক্তফ্রন্ট সরকারের শতদিন

৫ই জুন তারিখে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শততম রজনী অতিক্রান্ত হয়েছে। গতবারে শততম দিবসে যুক্তফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল যাতে ফ্রন্ট সরকারের ক্রিয়াকলাপের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছিল। এবারে সরকারের তরফ থেকে তেমন কোন প্রচেষ্টা হয় নি।

এবারেও গোড়া থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অনেকগুলি বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, বিভিন্ন শরিকের দ্বন্দ্ব, বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির অপপ্রচার প্রভৃতির ভেতর দিয়ে সরকারকে চলতে হচ্ছে। এ-ছাড়া এই রাজ্যের বিপুল সমস্যা, ঘরে ও বাইরে সঙ্কট, কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাব সব কিছু মিলিয়ে সুশৃঙ্খলে কাজ করার পক্ষে অনেক বাধা আছে। তবে এরই মধ্যে যুক্তফ্রন্ট কিছু কিছু কাজ করেছেন, সমালোচক হিসাবে শুধু অন্ধকারময় দিকগুলি দেখলেই আমাদের চলবে না, আলোর দিকও আছে।

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অধীনে ২৪৮,০০০ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ২০৭,০০০ একর জমি জোতদারগণ কর্তৃক বে-আইনীভাবে রক্ষিত রয়েছে এ তথ্য সরকারের হাতে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনের জটিলতার জন্য সরকারকে দোটানায় পড়তে হচ্ছে। এদিকে বাংলার গ্রামে গ্রামে ভূমিহীনদের ভূমিদান অভিযান শুরু হয়েছে। চব্বিশ পরগনাতেই জোতদারদের কাছ থেকে ৭০,০০০ একর জমি দখল করা হয়েছে এবং এই কাজ মালদহ, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়ায় শুরু হয়েছে। চব্বিশ পরগনায় এই উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির একটি যুক্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এই বিষয়কে উপলক্ষ করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। অর্থনৈতিক দাবির সংগ্রাম রাজনৈতিক সচেতনতার স্তরে উন্নীত হতে চলেছে।

কংগ্রেসী আমলে গ্রামসভা ও জেলা পরিষদগুলি দুর্নীতির আকর ছিল। এইগুলির নির্বাচনও ছিল পরোক্ষ। এই গুলি বাতিল করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা এই সংস্থাগুলিকে পূর্ণ করা হবে। জেলা স্কুল বোর্ডগুলিকেও বাতিল করা হয়েছে।

তবে গত ১০০ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, এই সরকার কৃষির ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং কৃষকদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রথম কৃষকদের সহজ সর্তে একর প্রতি ৩৫০৲ করে ঋণ দেওয়া হয়েছে।। সেচের অভাবে যাতে চাষ মার না খায় তার জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হয়েছে। এবার বহু জেলাতেই দু'বার করে ধান চাষ হচ্ছে, বিশেষ করে মেদিনীপুরে। গমের ফলন বৃদ্ধির জন্যও যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রভূত চেষ্টা করছেন।

ভারত দর্শন

কেন্দ্রের কবলে শিল্প রক্ষীবাহিনীর রসদ জোগাবে কে?

সীমান্তরক্ষীবাহিনী, রেল-রক্ষীবাহিনী ইত্যাদির পর এবার আসছে শিল্প-রক্ষীবাহিনী। প্রথম পোস্টিং দুর্গাপুরে।

ভারত একটি য়ুনিটারি গভর্নমেন্ট। তার একটাই আইন সর্বত্র চালু। সম্পত্তির ক্ষেত্রেও তাই ভারত সরকারই পুঁজিপতি। সব রাজ্য থেকে নজরানা তুলে কেন্দ্রীয় রাজস্বের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ঘটে। আর তাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প সংস্থাদির সম্পত্তির আর্থিকমূল্য প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল সম্পত্তি পাহারাব জন্য কাজে-কাজেই কেন্দ্রীয় পাইক বরকন্দাজবাহিনীর স্বতন্ত্রীকরণ প্রয়োজন; সংসদে রচিত আইনে স্বীকার করা হয়েছে। গঠিত হচ্ছে শিল্প-নিরাপত্তাবাহিনী, যার বুটভার প্রথমে দুর্গাপুরের বুকে শব্দিত হবে।

এই বাহিনী প্রয়োজনে এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করতে সপল্টন এগিয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, এরা নাকি কারখানার বাইরে কোথাও কোন হস্তক্ষেপ করবে না; হস্তক্ষেপ করবে না ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপরও।

শিল্প-নিরাপত্তাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় ইস্পাত-মন্ত্রী শ্রী সি এম পুনাচা বলেছেন: দুর্গাপুর ঘুরে দেখে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, সেখানের মূল সমস্যা আইন-শৃঙ্খলা ঘটিত। শ্রমিকরা ভদ্রলোক। তাঁরা তো কাজ করতেই চান, কিন্তু কতিপয় ফন্দীবাজ তাঁদের সেই কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। তাঁদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে উদ্বুদ্ধ করছেন। আর সেটা করা সহজ হয়ে উঠেছে একজাতীয় মনোভাবের দরুণ। তা হল, শ্রমিকদের ধারণা হয়েছে, প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেই সব দাবি আদায় হয়ে যায়।

মন্ত্রিমহোদয় কেন, অনেকেরই এমন একটা ধারণা ক্রমেই গড়ে উঠছে যে, কল-কারখানার প্রশাসন খুবই অসহায়। শ্রমিক আন্দোলনের চাপে তাঁরা কেবলই সাধ্যাতিরিক্ত ছাড় দিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তাতেও শ্রমিকদের খাঁই মিটছে না। বলা বাহুল্য, মালিকশ্রেণী ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রতি এহেন সন্দেহী মনোভাব বজায় রাখার অনুকূলে কিন্তু কোনও প্রকৃত আবহাওয়া এখনও তৈরি হয় নি। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় আছে এমন মানুষ নিশ্চয় একথা স্বীকার করবেন। শ্রমিকরা কিছু চাইলেই মালিক ও কর্তৃপক্ষের যদি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, বলবার কিছু নেই; কিন্তু সেই কম্পন অনুভব করা মাত্র মালিক ও কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মিটিয়ে দিচ্ছেন আর শ্রমিকরা মেদবৃদ্ধি করে আরও আরও চাইছেন, এমন একটা কল্পনাকেলিতে আপত্তি আছে।

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন সংগঠিত করা তো আর পররাজ্যগ্রাসীদের মিষ্টিমুখ করিয়ে পথিমধ্যে স্ট্যাচু বানাবার মতো একটা সহজ ভৌতিক গুপী গাইন বাঘা বাইন-কৃতিত্ব নয়; তেমন ধারণা শুধুই বিভ্রান্তিকর। তাছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর এতোবড় জয় ঘটে গেছে, এ যদি স্বীকার করতে হয়, তবে হাজারটা শিল্প-রক্ষীবাহিনীও কি বস্তুত কোন কাজে আসবে! আসলে সমস্যাটি অত সহজ নয়। যেহেতু শ্রমিকের দাবি আদায়ের পথগুলি নানা বাধাবিপত্তির দেওয়ালের মুখে অবরুদ্ধ, তাই তাঁদের আন্দোলন কখনও কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু তার মানেও নিশ্চয় এই নয় যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই শ্রম-আন্দোলনের লক্ষ্য। বিশৃঙ্খলা রাজনৈতিক কূট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন্ কোন ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা যে না হয়, এমন কথাও কেউ বলছে না, কিন্তু শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই উদ্দেশ্য হলে শ্রমিকশ্রেণী তা কি অনন্তকাল সহ্য করে আসতেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে মদত দেওয়ার জন্য সমগ্র পরিবারের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলনে সামিল হতেন? ব্যাপারটা অত সরল নয়। জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐ ধরনের রাজনীতি-প্রীতি কারও কারও পেশা ও নেশা হলেও, হাজার হাজার শ্রমিককে নিশ্চয় একই ভাঁওতার মধ্যে বছরের পর বছর ধরে রাখা সম্ভবপর নয়। সুতরাং শ্রমিক আন্দোলনগুলির পেছনে একটা বাঁচার তাগিদ থাকেই। যেজন্য মালিক ও কর্তৃপক্ষের শত শাসানি সত্ত্বেও তাঁদের আন্দোলনে না নেমে উপায় থাকে না। আমার বক্তব্য, এই আন্দোলন কি শিল্প-রক্ষীবাহিনীর দ্বারা অবদমিত করা সম্ভব। নাকি সেই যুগ এখনও আছে? কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির পাহারাদারদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থাটাও তো দেশের লোককেই করতে হবে। রাজ্যবাসীর রক্তস্বেদ থেকে অর্জিত রাজস্বেরই একাংশ তো ঐ বরকন্দাজবাহিনীর পরিপোষণায় যাবে। কিন্তু কেন্দ্র যখন ঠিকই করে ফেলেছেন, তাঁদের বাহিনী চাইই, তখন টহলদার বসবেই। প্রতিশ্রুতি যাই থাক, কথায় কথায় সংঘর্ষের সৃষ্টিও হবে। শ্রমিক মেরে রক্ষী পোষা চলবে না, এমন শ্লোগানও শোনা যাবে। তাই ভাবনা হচ্ছে, রক্ষীবাহিনীগুলির পালাপালই শেষে দেশের সম্পদের বৃহদংশ না ফুঁকে দিয়ে যায়, সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ দয়া করে সেদিকে কথঞ্চিৎ নজর দেবেন। আশ মিটিয়ে যত্র ইচ্ছা রক্ষী পোষা যখন রোখা যাবে না, দরদী নেতারা অনুগ্রহ করে দেশবাসীর নাভিশ্বাসে যাতে টান না পড়ে, সেদিকেও একটু দৃষ্টি দেবেন, এই দুর্বল আবেদনটিই থাক।

শ্রীযুত পুনাচা বলেছেন, দুর্গাপুরের সমস্যা আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা এবং রাজ্য উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও নাকি সমস্যাবলী সম্যক উপলব্ধি করেছেন। এমত বিশ্বাস অবশ্য শ্রীপুনাচার নিজস্ব। ঐ সংবাদের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর কোনও বক্তব্য পরিষ্কার তুলে ধরা হয় নি। শ্রীপুনাচা একই সঙ্গে বলেছেন, বিভিন্ন কলে-কারখানায় শ্রমিকরা যে জোর করে দাবি আদায়ের পথ নিয়েছে, তা এক দণ্ডও চলতে দেওয়া উচিত নয়। দুর্গাপুরের উল্লেখে তিনি হিসেব দিয়েছেন যে, সেখানে চার মাসে ৬৬টি ঘেরাও হয়েছে। ফলে লোকসান হয়েছে

আড়াই কোটি টাকা। এ সম্পর্কেও নাকি জ্যোতিবাবু আশ্বাস দিয়েছেন যে, অবস্থার উন্নতি হবে। অর্থাৎ? অর্থাৎ ঘেরাও হবে না? না হলেই ভাল, আর হলেও ঘেরাও টিকবে না, কেন না পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে, না হলে পুলিশই হাজতবাস করবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, অবস্থার 'উন্নতি'র সব ক'টি লক্ষণই বর্তমান। এবং যদি তাই-ই হয়, তবে আর মোটা টাকার রক্ষীবাহিনী পোষা কেন?—এই প্রশ্ন নিশ্চয় সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করবে।

পারদ থেকে সোনা

আর স্বর্ণখনি নয়, ভারতীয় আয়ুর্বেদ অতঃপর স্বর্ণপ্রসবিনীর স্থানাধিকার করতে চলেছে। আমেদাবাদের জনৈক আয়ুর্বেদ চিকিৎসক শ্রী এ পি আচার্য হাতে-কলমে পারদ থেকে সোনা তৈরি করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তিনি পাঁচশ ছ'টি শাস্ত্রীয় শ্লোকের ভিত্তিতে গবেষণা করে অতি স্বল্পকালের মধ্যেই সাফল্যপূর্ণে স্বর্ণ উৎপাদন করেছেন। এর পরেও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান যাঁরা না হতে পারবেন, তাঁরা নিতান্তই হতভাগ্য। তবে কথা হল, পারদও বড় মহার্ঘ বস্তু। পারদ থেকে তাল তাল স্বর্ণোৎপাদনের তাই সম্ভাবনা খুব সমুজ্জ্বল এমন আশা কম। সেজন্যই হয়ত এ লাইনে সোনা কামাবার চেষ্টা তেমন করে কখনও হয় নি।

আমার জনৈক বন্ধু সংবাদ পাঠের পর গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, ওহে, বাড়িতে থার্মোমিটার না থাকলে এই বেলা সংগ্রহ করে রেখ, শীগ্‌গিরই ওগুলো কালোবাজারে চলে যাবে, নেহাৎ কম পারদ নেই ওতে।

শুনে স্তম্ভিত হয়েছিঃ কে বলে বাঙালীর ব্যবসায়বুদ্ধি নেই!

অন্ধ্রে চ্যবন-সফর এবং নয়া সমস্যা

প্রধানমন্ত্রী পথ পরিষ্কার করে এসেছিলেন; চ্যবন সাহেব খানিকটা কাজ হাসিল করে ফিরেছেন। তেলেঙ্গানা বিক্ষোভের আঁচ কিছুটা স্তিমিত, যদিও ফয়সালা কোন সুনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করে নি।

চ্যবন সাহেব এবার নতুন আপোষী শ্লোগান নিয়ে গেছলেন। তেলেঙ্গানা দাবি আলোচনায় কেন্দ্র প্রস্তুত, আর সেই আলোচনায় তেলেঙ্গানার স্বাতন্ত্র্যও বিবেচ্য হতে পারে। এই স্বাতন্ত্র্যের দাবিটিকে গুরুত্ব দান একটা নয়া এ্যাপ্রোচ সন্দেহ নেই।

তবে এর মধ্যে আবার কয়েকটা ফ্যাকড়াও দেখা দিয়েছে যা স্বাতন্ত্র্যের অনুকূলে রায় দিতে অক্ষম। চ্যবন-মিশনে যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা বক্তব্য রেখেছেন, তাঁদের অনেকেই স্বাতন্ত্র্যের দাবি অস্বীকার করেন।

খাম্পান জেলাবাসীরা তেলেঙ্গানা পৃথক হলে অন্ধ্রেই থাকতে চান। নিজামাবাদবাসীরা আবার মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক। স্বাতন্ত্র্য নয়, তেলেঙ্গানার আঞ্চলিক ক্ষমতাবৃদ্ধিই যথেষ্ট,—ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র প্রতিনিধির অভিমত। সবচেয়ে তাজ্জব দাবি হায়দ্রাবাদের মুশ্লিম প্রতিনিধিদের। এঁরা স্বসম্প্রদায়ের সুব্যবস্থার জন্য দাবি করেছেন যে, হায়দ্রাবাদকে কেন্দ্রীয় শাসনে নিয়ে যাওয়া হোক। অর্থাৎ হায়দ্রাবাদটা যেন একটা মুশ্লিম ছিটমহল। এঁদের এই সাম্প্রদায়িক দাবি কেবলমাত্র চমৎকৃতই করে।

শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি

ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তনে দিল্লী সরগরম। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডির ডাক পড়েছে, টেলিফোনে বাক্যালাপও চলছে। পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় হয়ত অন্ধ্র বিভক্তকরণ প্রশ্নটিকে জব্দ করা হবে তেলেঙ্গানার জন্য, কিছু ছাড়-সুবিধের ব্যবস্থা করে। তবে সেই সঙ্গে শ্রীরেড্ডিকেও হয়ত গদি ছাড়তে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার বিক্ষোভটা কেন্দ্রীয় নেতাদের মনে একটা কিছু করার চিন্তাকে জাগরূক করেছে। চেন্না রেড্ডি, তেলেঙ্গানা আন্দোলনের নেতা, এখনও শ্রীরেড্ডিকে অপসারণের দাবি জোরদার করে চলেছেন।

প্রজা সমিতির বক্তব্য

প্রজা সমিতির সভাপতি শ্রীচেন্না রেড্ডি দাবি করছেন, তেলেঙ্গানার দুই-তৃতীয়াংশই পৃথক তেলেঙ্গানা চান না, এমন সংবাদ তিনি বিশ্বাসই করেন না। ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্য গণভোট গ্রহণ করা হোক, তাহলেই আসল সত্য প্রকাশ পাবে।

ওদিকে তেলেঙ্গানা অনেকটা শান্ত হয়ে এলেও ধর্মঘট চলছে, সত্যাগ্রহ এবং গ্রেপ্তার বরণ বন্ধ নেই। যানবাহনও দু-একটি পুড়ছে, প্রশাসনিক কাজকর্ম যানচাল করে দেওয়ার প্রস্তুতি হচ্ছে পুরোদমে।

মাসের শেষদিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে যে সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তার মধ্যে তেলেঙ্গানাও অন্যতম আলোচ্য। তেলেঙ্গানার বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের দাবি এক পিঠে রেখে প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্যকে অন্য পিঠে বিচার করা হবে। আর সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দের বিতর্কিত নেতৃত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কেও একটা মীমাংসাসূত্র এর মধ্যেই হয়ে যাবে।

কংগ্রেস ও ফ্রন্ট : ভ্রান্ত আলোচনায় এন জি গোরে

মস্তবড় এক দাবি করে বসেছেন পি এস পি-র চেয়ারম্যান শ্রীগোরে। পার্টির দশম বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি বলেনঃ অতীত রাজনৈতিক ইতিহাস বলবে সঙ্কটকালে সাধারণকে সতর্ক করেছে তাঁর প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি।

পি এস পি নেতার এতো বড় ঘোষণায় জনসাধারণের তাক লাগারই কথা, এমন কি সাধারণের এখন আত্ম-সমালোচনায় বসা উচিত। কেন না এই দলের এমন গণহিতৈষী ভূমিকা সত্ত্বেও ভারতের মানচিত্রে এই দলের ক্রমবিলীয়মান রূপ ফুটে উঠছে।

এই দল সাধারণের দাবি-দাওয়া নিয়ে বড় একটা পথে নামেন না। কাগজে বক্তৃতায় এ দলের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। তা ভাল। দু-একটি দল যদি সাধারণের সচেতক হিসেবেই শুধু কাজ করে যান, তবে সেটাও নিশ্চয় এক ধরণের জনসেবা। কিন্তু পি এস পি-র সতর্কীকরণের স্বরূপটা কোন্ জাতের?

বর্তমান অধিবেশনেই তার একটি নমুনা রাখা হয়েছে। যেমন এঁদের বিচারের কষ্টিপাথরে কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট একই পর্যায়ভুক্ত বলে পরিগণিত। চেয়ারম্যান গোরেকে কংগ্রেস ও ফ্রন্টের মৌলিক চারিত্রিক তফাৎ সম্পর্কে একটুও চিন্তা না করে বার্ষিক অধিবেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম থেকে ঘোষণা করতে শোনা গেলঃ কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট উভয়েই বহুমতে বিভক্ত। উভয় দলভুক্ত নেতারাই ক্ষমতা দখলে অধিকতর আগ্রহী।

গোরে একজন রাজনীতিবিদ্। তবু আশ্চর্য, ইনি কংগ্রেসের সঙ্গে ফ্রন্টকে তুলনা করলেন একই লাইনে, যদিও এ দুই-এ মৌলিক তফাৎ ঢের।

—১৪।৬।৬৯

আন্তর্জাতিক

বিশ্ব কম্যুনিস্ট সম্মেলন

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দুই গভর্নমেন্ট

গত ৯ই জুন প্রশান্ত মহাসাগরের মিডওয়ে দ্বীপে প্রেসিডেন্ট নিকসন দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নেগুয়েন ভ্যান থিউয়ের সঙ্গে এক শীর্ষ বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে নিকসন ঘোষণা করেন যে, আগস্টের শেষাশেষি ভিয়েতনাম থেকে ২৫ হাজার মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হবে। পরে সময় এবং সুযোগমত আরও সৈন্য সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হতে পারে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিঃ লায়ার্ড বলেছেন যে, যোগানদার সৈনিকের চেয়ে সংগ্রামী সৈনিকই অধিকতর সংখ্যায় অপসারিত হবেন। কারণ মার্কিন সৈন্যের শূন্যস্থানে যে দঃ ভিয়েতনামী সৈন্য নিয়োগ করা হবে, তাদের সর্বপ্রকার যোগানদারীর কাজ মার্কিনবাহিনীকেই করতে হবে। তাতে বোঝা যাবে মার্কিন সৈন্য অপসারিত হলেও দঃ ভিয়েতনামে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পাবে না। মার্কিন সৈন্যের যায়গায় দঃ ভিয়েতনামী সৈন্য যুক্ত হবে মাত্র। মার্কিন সৈন্য অপসারণের এই সিদ্ধান্তকে উত্তর ভিয়েতনাম ভাঁড়ামী বলে অভিহিত করেছে। উত্তর ভিয়েতনামের সরকারী মুখপাত্র বলেছেন যে, আমেরিকার জনমতকে ধোঁকা দেবার জন্য এই প্রহসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেস সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্তে সাধারণভাবে সন্তোষ প্রকাশ করলেও কয়েকজন সমালোচক আরও বেশি সংখ্যক সৈন্য অপসারণ দাবি করেছেন।

থিউ-নিকসন বৈঠকে আরও স্থির হয়েছে যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের ওপর কোন কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট চাপানো হবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে দঃ ভিয়েতনামী জনগণ যে রায় দেবেন, তা তাঁরা মেনে নেবেন। বৈঠকের পর সাইগনে ফিরে এসে থিউ বলেছেন, "কোন কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট হবে না, আপোষ-মীমাংসার ভিত্তিতেও কোন গভর্নমেন্ট হবে না এবং কোন অস্থায়ী স্থায়ী মন্ত্রিসভাও গঠন করা হবে না।"

অপর দিকে গত ১০ই জুন দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট এক অস্থায়ী দক্ষিণ ভিয়েতনামী গভর্নমেন্ট গঠন করেছেন। ফ্রন্টের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল হুই তান ফাট এই গভর্নমেন্টের কর্ণধার হয়েছেন বটে, তবে বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নায়কদের এই গভর্নমেন্টে গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

এই গভর্নমেন্টে বিভিন্ন ভিয়েতনামী সংগঠনের প্রতিনিধিরাই স্থান পেয়েছেন বেশি। নতুন গভর্নমেন্টে উত্তর ভিয়েতনামের লাও ডং (কম্যুনিস্ট) পার্টি থেকে উদ্ভূত পিপলস রিভলিউশনারী পার্টির কোন প্রতিনিধি নেই। নতুন গভর্নমেন্টের লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করে ভিয়েতকং মুক্তি বেতারে বলা হয়েছে যে, নতুন গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা হিসাবে ১৩ জনকে নিয়ে একটা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। সেই পর্ষদের চেয়ারম্যান হয়েছেন জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের চেয়ারম্যান এনগুয়েন হু থো। ভিয়েতনাম অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করাই হবে নতুন গভর্নমেন্টের কাজ। প্যারিস শান্তি আলোচনায় জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধি দল এই গভর্নমেন্টের নির্দেশে পরিচালিত হবেন। প্যারিস কম্যুনিস্ট প্রতিনিধি দলের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন যে, এখন থেকে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের প্রতিনিধির বদলে নতুন গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরা শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন।

মার্কিন সরকারী মহল দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে "কম্যুনিস্টদের কারসাজি" বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, নতুন গভর্নমেন্ট গঠিত হওয়ার ফলে প্যারিস শান্তি আলোচনায় কোন হেরফের হবে না। আমেরিকা চিরকাল জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টকে "অপর পক্ষ" বলে অভিহিত করেছে। এখনও তাই করবে। প্রেসিডেণ্ট থিউ এই গভর্নমেণ্টকে আমেরিকার মতই 'কারসাজি' বলে উল্লেখ করেছেন। দঃ ভিয়েতনামী মুখপাত্র বলেছেন যে, এই অস্থায়ী গভর্নমেন্ট গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোয়ালিশনের পথ প্রশস্ত করা। নতুন অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট কিন্তু ইতিমধ্যেই

বিশ্বের ১১টি দেশ দঃ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। সেই দেশগুলি হচ্ছে, সোভিয়েট রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া, কিউবা, সিরিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, পূর্ব জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া এবং কঙ্গো (ব্রাজিভিলে)।

কিন্তু নতুন গভর্নমেণ্ট গঠিত হওয়ার ফলে প্যারিস শান্তি আলোচনায় জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের দর কষাকষির ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। ১২ই জুন শান্তি আলোচনা আবার সুরু হলে নতুন গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাদাম এনগুয়েন থি বিন নতুন গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের বর্তমান প্রতিনিধি ট্রান বু কিয়েমকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নতুন গভর্নমেণ্টকে আমেরিকা যে চোখেই দেখুক না কেন, প্যারিসের পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা সাইগন গভর্নমেণ্ট এবং রাজনৈতিক আসরে জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট এবং উত্তর ভিয়েতনামের দ্বারা অধিকতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হবেন।

৪২ বৎসর-বয়স্কা বিপ্লবী নায়িকা মাদাম বিন শান্তি সম্মেলনে বলেছেন যে, নতুন গভর্নমেণ্ট থিউয়ের তথাকথিত "আইনসম্মত এবং সংবিধান-সম্মত" তাঁবেদার প্রশাসন কর্তৃপক্ষের স্বরূপ ফাঁস করে দিয়েছে। সাইগন গভর্নমেণ্ট আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ উচ্ছেদের সম্মুখীন। একমাস আগে জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট যে ১০ দফা শান্তি-প্রস্তাব রেখেছিল, তারই ভিত্তিতে নতুন অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধান করতে চান। তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন ফৌজের সম্পূর্ণ অপসারণ দাবি করেন।

উত্তর ভিয়েতনামের প্রেসিডেণ্ট হো চি মিন নতুন অস্থায়ী বৈপ্লবিক গভর্নমেণ্ট গঠনকে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের নতুন গভর্নমেণ্ট বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতিলাভ করে জাঁকিয়ে বসার ফলে ভিয়েতনামে কোয়ালিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। দুই গভর্নমেণ্টের পক্ষে এক সঙ্গে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না। একটি যৌথ সংস্থা না গঠন করে উপায় থাকবে না। সে ক্ষেত্রে দুই গভর্নমেণ্টের কোয়ালিশন সেই যৌথ সংস্থার কাজ করতে পারবে।

মস্কোয় বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সম্মেলন

গত ৫ই জুন মস্কোর গ্র্যাণ্ড ক্রেমলিন প্যালেসের জর্জিয়েভস্কি হলে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট পার্টি সম্মেলন সুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের মোট ৭৫টি কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

আগে কমিনটার্ন (কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল) বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ তদারক করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি স্ট্যালিনের নেতৃত্বে কমিনটার্নের অবসান ঘটানো হয়। তৃতীয় ইণ্টারন্যাশানালের প্রথম সেক্রেটারী নিনোভিয়েভ থিসিস দিয়েছিলেন, পৃথিবীতে একটিমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি থাকবে। দেশে দেশে তার শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ থিসিস এখন অচল। কারণ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশে কম্যুনিস্টরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে এবং বাকী দেশগুলোয় সকলের সমস্যা এক রকমের নয়। তাই কমিনটার্নের বদলে মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্টরা নানা বিষয়ে মতামত বিনিময় করে থাকেন। আগে সারা দুনিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলন মোটামুটি এক সুরেই বাঁধা থাকত। কিছুকাল যাবৎ সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। চীন এবং সোভিয়েটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলন তো দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেই, এমন কি দুই প্রধান শিবিরের মধ্যেও নানা বিষয় নিয়ে মতদ্বৈধতা খুব প্রকট।

মস্কোয় কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর প্রতিনিধিদের সম্মেলনেও সেই মতভেদ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এবারের সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আশু কর্তব্য এবং কম্যুনিস্ট ও সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিগুলির কর্মের ঐক্যবিধান।" এই কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের পার্টির যে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য থাকতে পারে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কর্মের ঐক্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

এবারের সম্মেলনে সোভিয়েট দেশের পার্টি সেক্রেটারী ব্রেজনেভ সহ অন্যান্য অনেক দেশের প্রতিনিধিরা চীনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুখে অনেক কড়া কড়া কথা বলেন বটে, কিন্তু গোপনে গোপনে আমেরিকা এবং পশ্চিম জার্মানীর মত বড় বড় পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে গোপনে গোপনে একটা বোঝা-পড়া করে নিয়েছেন। চীনের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ কিন্তু রুমানিয়ার প্রতিনিধি পছন্দ করেন নি। তিনি প্রকাশ্যেই সে কথা ঘোষণা করেছেন। সম্মেলনে চীন-বিরোধী এই মনোভাবের ফলে চীন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন থেকে বহিষ্কৃত হবে কি-না, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কারণ সম্মেলন শেষ হতে এখনও দেরি আছে।

অপর দিকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ওয়ারশ্ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও বহু প্রতিনিধি তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। সেখানে রাশিয়ার ক্রিয়াকলাপও তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তবে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি কিন্তু সম্মেলনে পরোক্ষে ওয়ারশ্ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোর কাজ সমর্থন করেছেন।

আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সম্মেলনে প্রতিনিধিদের পরস্পর বিরোধী মতামত ব্যক্ত হতে দেখে অ-কম্যুনিস্ট বিশ্বের নায়করা এটাকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ভাঙনের লক্ষণ বলে মনে করছেন। সে ধারণা কতদূর সত্য তা বিবেচনার বিষয়। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টিগুলো যে এক সুরে কথা না বলে নিজ নিজ বক্তব্য জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করছেন, সেটা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ। কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় আপন আপন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই বলে কম্যুনিস্ট-বিরোধীরা যে প্রচারকার্য চালিয়ে থাকে, সেটা যে ভিত্তিহীন মস্কোর আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সম্মেলনে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। পৃথিবীর মোট ৮৮টি দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি কাজ করছে। তাদের মোট সদস্য সংখ্যা ৪ কোটি ৫২ লক্ষ। মস্কো সম্মেলনে যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হোক না কেন, সারা দুনিয়ার পার্টি সদস্যদের ওপর তার প্রভাব পড়বে। কাজেই মস্কোর এই আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সম্মেলনকে কোনক্রমেই ছোট করে দেখবার উপায় নেই।

ফ্রান্সের নতুন প্রেসিডেণ্ট জর্জেস পম্পিদু

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্য গলপন্থী পম্পিদু প্রায় ৫৮ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্যপন্থী পোহার প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজয় স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ পম্পিদু পোহারের চেয়ে প্রায় ১৬ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন। ১৯৬৫ সালে দ্য গল তার প্রতিদ্বন্দ্বী সোসালিস্ট মিটারাণ্ডের চেয়ে মাত্র ১০ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছিলেন।

তবে এবার রেজিস্টার্ড ভোটারের শতকরা প্রায় ৩৩ জন ভোট দিতে আসেন নি এবং অনেকে ফাঁকা ব্যালট পেপার বাক্সে ফেলে গে

—১৫।৬।৬৯

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

প্রিজনার অফ ইনডিসিশন। চার সপ্তাহ আগে রাজ্যের বর্তমান সংকট ও পরস্পর হানাহানিজনিত পরিস্থিতি নিয়ে যে কথা বলতে সুরু করি, মাস শেষে তার সমাপ্তি টানছি একটি শব্দ উচ্চারণ করে, প্রিজনার অফ ইনডিসিশন। রাজ্যের বর্তমান হর্তা-কর্তা-বিধাতা যুক্তফ্রন্ট-নায়ক ও প্রশাসকদের সম্পর্কে এই কথাটি ব্যবহার করলাম অতি দুঃখের সঙ্গে। দুঃখ অন্য কোন কারণে নয়—কারো সফলতা ও বিফলতার কারণে আমার মাথা ব্যথার কারণ থাকতে পারে না, ব্যথার কারণ হল সাধারণ মানুষের কথা ভেবে। সাধারণ মানুষ, যাদের অনেক আশা ও প্রত্যাশা গড়ে উঠেছে রাজ্যের বর্তমান নিয়ামকদের কেন্দ্র করে, সেই মানুষদের প্রত্যাশার বুকে ছুরিকাঘাত করলে ব্যথা পেতে হয়। আমাদের বর্তমান সরকারের নীতি-নিয়ামকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতার কারাগারে বন্দী হয়েছেন। কিভাবে এই কারাগারে বন্দী হলেন, সে কথা ইতিমধ্যে গত তিন সংখ্যায় বলেছি। এইবার সেই কথাগুলির সীমারেখা টানতে চাই। রাজ্যে বর্তমান হানাহানি কেন হচ্ছে—সে কথা বলেছি, কিন্তু আজ সে কথার সীমারেখা টানতে গিয়ে বলতে হয় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারাগার থেকে মুক্তি পেলেই কিন্তু দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়। বিভিন্ন দলের মধ্যে হানাহানি সুরু হয়ে যখন এই হানাহানি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, রাণাঘাটের, ঘটনায় পেকে উঠল অর্থাৎ চূড়ায় উঠলো, তখন দেখা গেল রাজ্যের প্রধান পাঁচটি বামপন্থী দল এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হলেন। এই শীর্ষ সম্মেলনের একটা অধিবেশনে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীমাখন পাল, শ্রীসুকুমার রায়, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এমন কোন ছুঃ মন্তর ছড়িয়ে দেন নি যে, তার দ্বারা সব হানাহানি বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু এই বসা এবং আরো বসে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা ও সর্বোপরি হানাহানি রোধে আন্তরিক চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশেই দেখা গেল রাজ্যে হানাহানি অনেক কমে গেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতার কারাগার থেকে মুক্তি পেলেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই নজিরটা আগে দিয়ে রাখলাম এই কারণে যে, এর পরে যে ঘটনাগুলি উল্লেখ করছি, সে ক্ষেত্রেও এই পথ ও নীতির প্রয়োগ হলে অবস্থা আয়ত্তে আসতো। অবস্থা কিরকম ভাবুন—পরিষদের বিলোপ হবে, তাই শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী, শ্রীসুধীন কুমার, শ্রীবরদা মুকুটমণি মন্ত্রী থাকতে পারবেন না—এটা স্বতঃসিদ্ধ; অথচ দিল্লীতে একটা আধা-খেঁচড়া পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় এই মন্ত্রীরা প্রায় ঠিক করেছেন যে, তাঁরা আইনের ফাঁকে শেষ দিন পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব দখল করে থাকবেন। কেন? শুধু ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত মন্ত্রী থাকা যায় বলেই কি তিনজন মন্ত্রী শেষদিন পর্যন্ত চেয়ার দখল করে থাকবেন? এই সুবিধাবাদী নীতি নিশ্চয়ই যুক্তফ্রন্টের কাছে আশা করা উচিত নয়। কিন্তু এই নীতি গ্রহণ কোন একক বা একটি দলের ইচ্ছায় হয় নি, প্রায় সকলেই এই নীতি মেনে নিয়েছেন। তার কারণ হল—যুক্তফ্রন্ট তার ৩২ দফা কর্মসূচীর শেষের আগের দফা অর্থাৎ ৩১ দফার কর্মসূচী রূপায়ণেই সবচেয়ে আগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই ক্ষেত্রেও কি হ'ল? মুখে এক কথা আর মনে রইল এক কথা। একদিকে পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী তাঁর দায়িত্ব পালনে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। কিন্তু অনেকেই আবার শ্রীচক্রবর্তীর দৌড়-ঝাঁপ দেখে অসন্তুষ্ট হতে সুরু করলেন। তারই পরিণতি ঘটল—লোকসভায় বিধান পরিষদ বিলোপ বিল পাশ হ'ল, কিন্তু রাজ্যসভায় হল না—কারণ সেখানে যুক্তফ্রন্টেরই কেউ কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছা টেনে ধরলেন—ভাবখানা এই যে, মুখের কথাই শুনেছ দেবতা বোঝ নাই হৃদয়ের কথা।

আমাদের হৃদয়ের কথা হল—পরিষদটা আর কিছুকাল থাক, নইলে আমাদের ক'জন মন্ত্রী যে বেকার হবেন। তাই রাজ্যসভায় পরিষদ বিলোপ বিল উঠল না, তিনজন মন্ত্রী কিছুদিনের জন্য আয়ু পেলেন। শেষ এইখানেই নয়—আগামী বিধান পরিষদে নির্বাচন হবে কি না সেটা নিয়েও কিন্তু যুক্তফ্রন্ট বলতে পারলো না—'যে পাতে খাব না সেই পাত কুত্তায় চাটুক', "পরিষদ নির্বাচন হোক বা না হোক, আমাদের কাছে ওর কোন মূল্য নেই—আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবো না।" সেইখানে একটা ভাবে সপ্তমী প্রস্তাব নিয়ে বলা হল—আমরা আগ্রহী নই, নির্বাচন কমিশন যা করার করুন। বলা হল না যে, আমরা নির্বাচন চাই না, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন মুলতুবি রাখুন। এর ফল হল কি—নির্বাচন কমিশন একটি পথ গ্রহণ করলেন, যেটা তাঁর এক্তিয়ারে কি না সেটা ভেবে দেখবার আর নির্বাচন কমিশনের সেই কাজ যেটার ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে মেনে নেওয়া হল অর্থাৎ নির্বাচন কমিশম নির্বাচন কবে হবে ঠিক করার মালিক অর্থাৎ সময় এগিয়ে বা পিছিয়ে দিতে পারেন—মুলতুবি রাখতে পারেন কিন্তু নির্বাচন বন্ধ রাখতে পারেন কি না—সেটা ভেবে দেখবার কথা। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করানো—নির্বাচন বন্ধ করা বা হওয়া-না-হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কমিশনের কি করে থাকতে পারে? কারণ নির্বাচন ও সেই নির্বাচনে ভোট প্রধান হল কনস্টিটিউশনাল রাইটের প্রশ্ন, সেই রাইট বা অধিকার হরণ করবার এক্তিয়ার কারো নেই। কাজেই নির্বাচন কমিশন যখন ঘোষণা করেন—নির্বাচন বন্ধ করা হল, তখন কারো-না-কারো ভোট দেবার অধিকার হরণ করা হয়। যুক্তফ্রন্ট কি মেনে নিতে পারতেন, যদি সেইরকম একটা ক্রুশিয়াল উপনির্বাচন বা নির্বাচন নির্বাচন কমিশন বন্ধ করে দিতেন? মেনে নিতে পারতেন নির্বাচন কমিশনের এই অধিকার হরণের কাজে সহায়ক হতে? কখনই পারতেন না, কিন্তু এই ক্ষেত্রে রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট পারলেন। নির্বাচন বন্ধ মেনে নিতে পারলেন কিন্তু সেই সঙ্গে মেনে নিতে পারলেন না কয়েকজন মন্ত্রীর পদত্যাগ, যেটা নীতিগতভাবে সমীচীন ছিল। যে মন্ত্রীরা জানেন—তাঁরা মন্ত্রী থাকতে পারবেন না, এখন পারছেন শুধু আইনের ফাঁকে, তাঁরা কেন সাহসের সঙ্গে পদত্যাগ করবেন না। তাঁরা শুধু যে পদত্যাগ করলেন না তাই নয়, তাঁরা বাজেট রচনা থেকে সুরু করে সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী কাজগুলি করে চলেছেন এবং এই কথা জেনেই করছেন যে তাঁরা

আসনে আগামী দিনে নতুন কেউ আসছেন, যিনি তাঁর চিন্তা ও মতে এক সাও হতে পারেন। এই যে স্ব-বিরোধিতার পরিস্থিতি—এর একমাত্র কারণ হল সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতার কারাগারে বন্দী হওয়ার ফল।

এই কারাগারের সবচেয়ে বেশি বন্দী হবার নজির সৃষ্টি করেছেন, সম্ভবত রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পুলিশমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। এই ক্ষেত্রে একটি কথা আগেই বলে নেওয়া ভাল, শ্রীজ্যোতি বসু বলতে শ্রীবসুকে একক ব্যক্তিকে ধরার কোন কারণ নেই—শ্রীবসু রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেও কোন কাজই তিনি একক চিন্তা ও দায়িত্বে করেন না, বিশেষ করে নীতিগত প্রশ্নগুলি। তবে টাইম-টু-টাইম সিদ্ধান্তগুলি মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করেন সত্য। কাজেই যেখানে নীতির প্রশ্ন, সেখানে শ্রীবসু স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী বলতে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র নীতিই বোঝাবে। কাজেই বন্দী হিসাবে শ্রীবসুর কথা বললে এই কথা বোঝাবে না যে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কোন মন্ত্র পুরুষ অথবা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় কোন স্বাধীন পথের বিচরণকারী—বন্দী বলতে সরকারের সকলকেই বোঝায়। শ্রীবসু সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতার কারাগারে বন্দী হয়েছেন এটা সবচেয়ে বড় করে নজরে পড়ছে—তার কারণ রাজ্যের সবচেয়ে সেনসেটিভ ও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর তাঁর হাতে। অন্য মন্ত্রীদের কার কি নীতি সেটা বিশেষ বিশেষ এ্যাকশনে বোঝা যায়, কিন্তু স্বরাষ্ট্র তথা পুলিশ-মন্ত্রীর নীতি ঘোষণা করতে হয় নিত্য-নতুন পরিস্থিতিতে, ঘটনার কারণে। রাজ্যের বনমন্ত্রী শ্রীভবতোষ সরেন কি করছেন, তিনি হরিণ বনে হরিণ পুষতে কোন নীতি নিয়েছেন সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপ জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কারণ এই স্বরাষ্ট্রদপ্তরের মাধ্যমেই সরকারী নীতি সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী এস বি রায় থেকে সুরু করে রাজ্যের অতি দূরান্তে একটি নগণ্য গ্রামের দফাদার বা চৌকিদারের মাধ্যমে সরকারী নীতি জনমনে প্রতিফলিত হয়। সরকার ভাল কি মন্দ তার প্রথম পরীক্ষা হয় এই দফাদার চৌকিদার থেকে সুরু করে থানার দারোগাবাবু সহ রাইটার্স বিল্ডিংসের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাজের মধ্য দিয়ে। আর এই কারণেই তো শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত অথবা শ্রীসুধীর দাসকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর না দিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্রীজ্যোতি বসুকে। যিনি দৈনন্দিন কাজে মুখ্যমন্ত্রী অপেক্ষা শক্তিশালী ভূমিকা পালনের অধিকারী। আর তাছাড়া রাজ্যের প্রশাসনের ভাল-মন্দ—সবই প্রায় নির্ভর করে পুলিশদপ্তরের কাজের ওপর। এই অতি জবরদস্ত দপ্তরটি শ্রীজ্যোতি বসুর হাতে দেওয়া হয়েছে—তার কারণও এই যে, রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কেই মানুষ সবচেয়ে বেশি আস্থাশীল। পরিষদীয় রাজনীতিতে গভীর জ্ঞান, দীর্ঘদিনের পরিষদীয় জীবনের অভিজ্ঞতা, বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানে অনেকের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখতে পারেন—তাই তো তাঁর হাতে সবচেয়ে কঠিন দপ্তরটি দিয়ে মানুষ স্বস্তি ও সুখ অনুভব করেছিল। কারণ সকলেই আশা করেছিলেন শ্রীবসু এইবার কাজের মত কাজ করতে পারবেন। তার আর একটা কারণও ছিল, সেটা হল এই ঃ মাত্র কয়েক মাস আগে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য এক পুলিশী চক্রান্ত, পি. ডি. এফ সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের জনতা তথা যুক্তফ্রন্টের প্রতি আক্রমণ-মুখী ভূমিকা, এমনি অনেক দুর্বল অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়েছে এবং এই সঙ্গে বিশ বছর কংগ্রেস শাসনে পুলিশের ভূমিকার কথা তো জানাই আছে। তাই সকলেই ধরে নিলেন আর বিলম্ব নয়, রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকার কোন বিলম্ব না করে শাদীর পয়লা রাতেই এবার বিড়াল বধ করবেন—কারণ, গতবার এই বিড়াল বধে দেরি করায় কোন ফল হয় নি —জরু তো বাগে আসে নি আর বিড়ালও যথারীতি বুঝতে পেরে মটকায় উঠে বসেছিল। কিন্তু এইবার? যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতায় আসবার আগে মানুষ কেউ কিন্তু ভাবে নি এই সরকার রাতারাতি একটা কিছু অঘটন ঘটিয়ে দেবেন, কোন নাটকীয় ও চাঞ্চল্যকর কিছু করে বাহবা নেবেন, সেটা কেউ চায় নি; কিন্তু একটা আশা ছিল যে, এই সরকার আর কিছু করুন বা না করুন, ব্যুরোক্রেসীর চক্রটা ভাঙবার চেষ্টা করবেন। কারণ সরকার তার সীমিত সাধ্যে ভাল কিছু করতে চাইলেও এই ব্যুরোক্রেসী সরকারের পদে পদে বাধা হবে। ব্যুরোক্রেসী দাঁড়িয়ে আছে দুইখানি পায়ে—একখানা পা পুলিশ আর একখানা প্রশাসনদপ্তর। কাজেই মানুষের আশা ছিল নতুন সরকার এই দুইখানি পা-কে নীতিমত চলতে বাধ্য করাবে—তার জন্য সেই পায়ে যে জুতো পরানো দরকার, যে মোজা, যে এ্যাংক্লেট, যে হোর্স, যে সিং গার্ড, যে গাইড লাগবে তা পরানো হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সরকারের শত দিন অতিক্রম হওয়ার পরও কি দেখা গেল? বৈপ্লবিক বা ডায়নামিক কেন কিছু করার দিকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর এগিয়ে যাচ্ছে না। বাধার কথা আগেই বলেছি এবং এই কথাও সত্য ব্যুরোক্রেসীর চক্র ভাঙা সরকার দখল অপেক্ষা কম কঠিন কাজ নয়—এমন কি এই চক্র ভাঙতে গিয়ে প্রত্যাঘাতে বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনাও আছে আর এইগুলি আছে বলেই তো সকলে চাইলেন শ্রীজ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোন—ভাল মানুষ বা গান্ধীবাদী শ্রীঅজয় মুখার্জীকে দিয়ে হয়ত অনেক বড় অনেক ভাল কাজ হতে পারে, কিন্তু সব চক্র-চক্রান্ত ও নাটের গুরু ব্যুরোক্রেসীর চক্র ভাঙতে শ্রীজ্যোতি-বসু যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু এই একশত দিনের অভিজ্ঞতায় এই কথা বলা যায়, শ্রীজ্যোতি বসু বর্তমান পথে চললে বড় জোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে স্বর্গত কিরণশঙ্কর রায় বা তার চেয়ে বেশি হলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন —তার বেশি নয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শ্রীজ্যোতি বসুকে খুব ভালবাসতেন—শ্রীজ্যোতি বসুর প্রতি ডাঃ রায়ের এই স্নেহ ও ভালবাসা একদা অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে শ্রীজ্যোতি বসু শেষ পর্যন্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হবেন এটা নিশ্চয়ই সকলের কাম্য নয়। কিন্তু বাস্তবে সেই বিয়োগান্ত পরিস্থিতি ঘটতে চলেছে, শ্রীবসুর মধ্যে নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ছে—তিনি কম্যুনিস্ট, কিন্তু দীক্ষা নিয়েছেন বিলাতে। তিনি ব্যুরোক্রেসীর শত্রু কিন্তু সেই ভাঙবার অস্ত্র নিতে চান অ্যারিস্টোক্রেসীর পথে। তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অ্যারিস্টোক্রেটিভ পথে কি ব্যুরোক্রেসী ভাঙা যায়? হয়ত যায়— কিন্তু সেই পথ পরীক্ষিত নয়। এই ক্ষেত্রে যদি শ্রীবসুর সঙ্গে তাঁর দলেরই অন্যতম মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের ভূমিকা তুলনা করি, তবে কি ধরা পড়বে না—কালনার ছেলে হরেকেষ্টবাবু কম্যুনিস্ট হয়েছেন আন্দামানে—বিলেতে নয়। এই বিলেত আর আন্দামানের দীক্ষার তফাৎ কি, সেটাও কি ধরা পড়ে নি একই দলের দুই মন্ত্রীর কাজের মাধ্যমে। আজ এই কথা বললে কি অন্যায় হবে যে, ব্যুরোক্রেসী—সেই ব্যুরোক্রেসী আই-পি-এস-দের হোক, আর আই-এ-এসদের হোক ভাঙতে গিয়ে শ্রীবসু নিজেই বন্দী হয়ে পড়ছেন ব্যুরোক্রেসীর কাছে এবং যার একমাত্র পরিণতি হল প্রিজনার অফ ইন-ডিসিশন। শ্রীবসু এবং তাঁর মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রদপ্তর যে এই প্রিজনার অফ ইন-ডিসিশন—সেই কথা বারান্তরে আরো খোলাখুলি বলব, অবশ্য আমার সীমিত জ্ঞান, অল্প বুদ্ধি ও সাধারণ মানুষের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ফাঁসির ছিন্ন রজ্জুর গুপ্ত রহস্য

ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারে আমাদের প্রাণদণ্ড না হওয়াতে—আর অন্য কি উপায়ে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করা যায়—বৃটিশ সরকারের এই ক্রুর চক্রান্ত বা হীনতম প্রচেষ্টা রণধীর দাশগুপ্তের দ্বারাই ব্যর্থ হয়েছিল। প্রামাণ্য দলিলপত্র দ্বারাই এই সরকারী চক্রান্ত উদ্ঘাটিত হবে। পটভূমিকার প্রয়োজনে তার আগে একটু বলি—

B-C-L-A-Act-এর ধারা অনুযায়ী আইনের নামে সরকার ট্রাইব্যুনাল আদালত গঠন করে। এই বিশেষ আদালতে জুরীদের বিচারের সুযোগ-সুবিধার কোন বালাই থাকে না।

একজন রায়বাহাদুর, একজন খাঁবাহাদুর ও একজন ইংরেজকে নিয়ে আমাদের বিচারের জন্যও ট্রাইব্যুনাল আদালতে গঠিত হয়েছিল। এই আদালতের বিচারে ন্যায় বিচারের আশা দুরাশা মাত্র! কাজেই আমাদের প্রাণদণ্ড সুনিশ্চিত! কিন্তু দেশবাসী সকলেই অবাক-বিস্ময়ে দেখলো যে, আমাদের কারোরই ফাঁসির হুকুম হলো না! আত্মীয়-স্বজনেরা ট্রাইব্যুনালের কমিশনারদের কত না অন্তরের আশীর্বাদ জানালেন—তাঁদের জন্য কত না মঙ্গল কামনা করলেন! বৃটিশ সরকারের মহানুভবতার তুলনা নেই! আমাদের পক্ষসমর্থনকারী আইনজ্ঞেরা মনে করলেন—তাঁদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

সহৃদয়, মহানুভব, ন্যায়বান প্রভৃতি সংজ্ঞায় পরিভূষিত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতি সেদিন অনেকের শ্রদ্ধা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী চক্র মরেও মরে না। বৃটিশের শত শত বছরের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল—অসত্য, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ছলনা ও নিষ্পেষণ নীতির উপর। কিন্তু আজও যখন দেখি ইংরেজের প্রতি কারো কারো এই মোহমুক্তি ঘটে নি তখন মনে হয় রবার্ট ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতির খলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ছলনা প্রভৃতির ইতিহাস আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

এই সম্প্রতিকালেও সাপ্তাহিক পত্রিকা "বসুমতী"-তে আমার লেখা "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল—তখনও আমাকে ইংরেজ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা ও তাদের নিরপেক্ষ ও স্বাধীন- জাজমেণ্টের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা মুখ বুজে শুনতে হয়েছে। যাঁদের অতি বিচক্ষণ বলে মনে করেছি তাঁরাও কেউ কেউ বলেছেন—"আরে রাখুন মশায়! ট্রাইব্যুনাল আদালত ও ইংরেজ সরকারের সমালোচনা আর করবেন না। আপনাদের সমালোচনা মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ইংরেজ আমল ছিল বলেই আপনারা এতখানি সুবিধা পেয়েছিলেন—দীর্ঘকাল ধরে আদালতে নিজেরা মামলা defend (আত্মপক্ষ সমর্থন) করার নামে সরকারকে প্রাণভরে গালিগালাজ করার সুযোগ নিয়েছিলেন। আজও আপনারা যে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন ইংরেজ সরকারের মহানুভবতায়ই তা সম্ভব হয়েছে!"

সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে—সরকারকে কেমন করে আমাদের শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল—ও আমাদের কারোরই প্রাণদণ্ড দেবে না বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয়েছিল, আমার লেখার মাধ্যমে তখনও তা প্রকাশিত হয় নি! নয়তো এইরূপ একই ধরণের ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারের মাধ্যমেই ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেও, প্রদ্যোৎ, দীনেশ, রামকৃষ্ণ প্রমুখকে প্রাণদণ্ড দিতে সরকারকে এতটুকু কুণ্ঠিত বা বিচলিত হতে দেখা যায় নি! মাস্টারদা, তারকেশ্বরদের গলায় ফাঁসির রজ্জু পরিয়ে দিতেও তারা এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি! তবে এইরূপ মহানুভব ইংরেজ সরকার আমাদের ফাঁসি দিল না কেন?

আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে সরকার ট্রাইব্যুনালের বিচারে আমাদের প্রাণদণ্ড দেয় নি এইটুকু ইতিহাসই সেদিন আমরা জেনেছিলাম।

বহু বছর অতীত হয়েছে। দিল্লীর National Archive থেকে এই সম্বন্ধে বিস্ময়কর গোপন তথ্যপূর্ণ নথিপত্র হস্তগত করা যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব না হতো—তবে কি উপায়ে আপোষ-মীমাংসার গোপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমাদের আবার ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো যায় বৃটিশ সরকারের এই হীনতম চক্রান্তের কথা হয়ত দেশবাসীর কাছে জানাবার সুযোগ পেতাম না।

আমাদের ফাঁসি হলো না! বহাল তবিয়তে আমরা জেলখানায় আছি। মনে মনে বিশ্বাস স্বাধীনতা-সংগ্রাম তীব্র গতিতে এগিয়ে যাবে এবং যাবজ্জীবন

কারাবাসের আগেই মুক্ত হয়ে আমরা দেশবাসীর সঙ্গে মিলিত হবো। কে জানতো বৃটিশ সরকার আমাদের সেই স্বপ্নকে ধুলিসাৎ করবার জন্য এক ঘোর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে? যদিও অবিশ্বাস্য তবু যা' লিখছি তা' অকাট্য সত্য ঘটনা।

ভারতে পারবেন Secretary for State—India Govt. বিলেত থেকে ভারত সরকারকে লিখছেন ও টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন জানতে চেয়ে যে, কেন আমাদের ফাঁসি হোল না এবং কি করে হাইকোর্টে আবার মামলা তুলে আমাদের ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করা যায়! বিলেতের শাসকরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারত সরকারের ও বাংলা সরকারের মধ্যে আমাদের ফাঁসির ব্যবস্থা করবার জন্য যেসব মত-বিনিময় হয়েছে সেই সব দলিল আজ আমি এখানে প্রকাশ করবো। সরকারী নথিপত্র যা' আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে সংগ্রহ করেছি সেগুলি নিচে উদ্ধৃত করলাম। দলিলগুলি ইংরেজীতে লেখা। সেগুলি পুরোপুরি অনুবাদ করে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। তবে সবার বোঝবার সুবিধের জন্য প্রত্যেকটি টেলিগ্রামের মূল বিষয়বস্তুটি আমি সংক্ষেপে বাংলায় লিখে যাচ্ছি।

এই তথ্য সংক্রান্ত সরকারী দলিলের হুবহু নকল নিচে উদ্ধৃত করলাম :—

[হোম ডিপার্টমেন্ট পলিটিক্যাল টেলিগ্রাম মারফৎ জানতে চাইছেন আমাদের ফাঁসি দেবার অভিপ্রায়ে হাইকোর্টে আবার মামলা রুজু করা সরকারের পক্ষে সম্ভব কি-না।]

"Govt. of India, Home Dept. Poll., 1932 File No. 7/4/1932 Political.

Subject (of the file): Judgement of the Special Tribunal in C-A-Raid Case No. 1 of 1930.

Questions whether Government can move the High-Court to enhance the sentences passed by the Tribunal and whether the High-Court can exercise these revisional powers in respect of sentences under the B-C-L-A-Act."

[চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় কার কত সাজা হয়েছে এবং সাজার পরে কোন গোলযোগ হয় নি ও নির্বিঘ্নে মধ্যাহ্নের পূর্বেই সকলকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হচ্ছে।

"Sl. No. 1.

Of file

Telegram R from the G-O-B No. 8378 P dt. 1.3.32.

Commissioner of Chi—

March First regarding Special Tribunals Judgement in Armoury Raid Case Begins. Judgement delivered this morning fourteen convicted twelve sentenced transportation for life one to two years rigorous imprisonment one to three years borstal. Sixteen acquitted re-arrested under Amendment Act. All left midday Calcutta no disturbance so far letter follows. Ends. Copies Judgement will follow."

[উপরের টেলিগ্রামেরই পুনরাবৃত্তি করে Home-Department Political বিলেতে Secretary for State—India-কে পাঠাচ্ছে]—

"Sl. No. 2.

(1) Above repeated by H D to S/S for India vide telegram No. D2279|32 Poll. dt. 1-3-32."

[Secretary of State লিখছেন প্রথম টেলিগ্রামের ভিত্তিতে পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছে—যে বারো জনের যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড হয়েছে তারা প্রত্যেকেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিল কি-না]—

"Sl. No. 3.

From S|S No. 708 dt. 4-3-32 to 901 H D.

Your telegram of 1st instant D 2279 Political Chittagong. Question in the Parliament for Monday asks whether twelve accused sentenced to transportation for life actually took part in the armoury raid. What are the facts?

Sl. 4. [G-O-B furnished with copy of Sl. No. 3]."

[পার্লামেন্টে যে প্রশ্ন হয়েছে তার উত্তরে বাংলা সরকার জানাচ্ছেন—দশজন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে ও একজন রেল-লাইন ধ্বংসে অংশ গ্রহণ করেছে এবং অপর একজন প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না করলেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

তিনজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, দণ্ডাদেশে এইরূপ শৈথিল্য ব্যাখ্যা করা শক্ত।]

"Sl. No. 5. Telegram R from G-O-B No. 31 dated the 6-3-32.

Reference Home Dept. telegram dt. March 5th. 713. Out of 12 sentenced to transportation for life C-A-R-Case evidence shows that ten participated in armoury raid, one in wrecking railway line, one took no part in raid but was a conspirator.

[Note on the file under Sl. No. 5.]

For information S D. I. B. may see.

E.R. 7-3-32.

Secretary should see. If this is the case, the sentences passed are all the more difficult to explain. D.I.B. should see

S. N. Roy.
7-3-32.

H. W. Emerson.
8-3-32.

J. C. [rerar]
8-3-32.

Director, Intelligence Bureau.

[উচ্চপদস্থ দুজন সরকারী কর্মচারী তাঁদের অন্তরের বিক্ষোভ প্রকাশ করে লিখছেন—বিচার বিভাগ বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি যেভাবে নম্রতা প্রদর্শন করে চলেছেন, তাতে শাসন বিভাগ ক্রমেই তাঁদের মনোবল হারাচ্ছেন এবং জানা যাচ্ছে অনেকে আগে থেকেই পেনসনের জন্য দরখাস্ত করেছেন।]—

"It is unfair to make deductions from press abstracts of Judgements but what I have seen indicates that the judges hunted for and had great difficulty in finding reasons for their deplorable leniency. Their decision not to hang anyone in this case in which 7 murders were committed, coupled with sentences passed recently in other terrorist cases, has made people vehement in declaring that in Bengal of today there is no justice, only a mass of bad

law. The mass in the street blames the Government and refuses to recognise the difference between the judiciary and executive. The executive has been badly hampered by the judiciary in its dealing with terrorism for a member of years; if the deterioration in the judiciary continues the executive shall be emasculated. I understand that there is a steady trickle of applications for proportionate pensions from executive officers in the province.

Sd. H. Williamson.
11.3.32

Seen.

S. N. Roy.
11.3.32"

[পরিত্যক্ত।]—

"Sl. 6. (Omitted. DP DM)"

[বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে S. N. Roy অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার জাজমেন্টের ৪টি নকল পাঠিয়েছেন।]

"Sl. No. 7. Letter from G-O-B No. 1080 SP dated the 7th April 1932.

Subject : C-A-R-Case Judgement.

I am directed to forward herewith for information of the Government of India four copies of the Judgement in the C-A-R-case."

[S. N. Roy ৭ নম্বরের নিচে টীকা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, হাইকোর্টে আবার এই মামলা রুজু করা যায় কি না সেই সম্বন্ধে তিনি বিচার করে দেখবার সুযোগ পান নি। তাঁর মতে এই বিষয়ে Legislative Department-এর উপদেশ নেওয়াই সঙ্গত।]

"[Noting below 7.]

..I have not examined the Qu.—whether a reference to the H.C. for enhancement of sentence would lie in this case. It may worthwhile asking Legislative Department to look into this aspect of the case and to advise.—

S. N. Roy.
14.4.32."

[H. W. Emerson সাহেব Honourable member-কে লিখছেন জাজমেন্টের ২০৩ ও ২০৪ পৃষ্ঠা দুটি যেন পড়ে দেখেন। এখানে ট্রাইব্যুনাল ফাঁসি না দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। হাইকোর্টের Revisional Power আছে কি না তা' যাচাই করে দেখার নজীর এখন পর্যন্তও নেই। তবে র‍্যানকিন ক্রেরার ও আমার মধ্যে এ বিষয়ে যা' আলোচনা হয়েছে তাতে র‍্যানকিনের অভিমত হচ্ছে হাইকোর্টে মামলা রুজু করার প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে না; বরং Legislative Department-কে এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হোক।]

"H. M. should read the arguments at pp. 203 and 204 of the Judgement, by which Tribunal justified the non-imposition of death sentences. We may obtain the views of Legislative Dept. on the line taken by the Tribu—

. . . .

So far as I know the Qu. —as to whether the H-C-of-Cal.-has revisional powers has not actually been put to the test, but from a conversation between Sir George Rankin, Sir James Crerar and myself I gained the definite impression that Sir G-R-took the view that a revisional application was likely to fail on the ground of jurisdiction. The Legislative D—might be asked to advise on this point.

H. W. Emerson.
16.4.32."

[H. W. H. সাহেব লিখছেন, তাঁর খুব অবাক লাগছে কি করে ষড়যন্ত্রকারীদের নেতারা তাদের সমস্ত অপরাধ থেকে অব্যাহতি পেলেন? তিনি আরও বলছেন যে, এর বিহিতের আর কোন উপায় নেই এবং তিনিও মনে করেন এই ব্যাপারে Legislative Department-এর অভিমত নেওয়াই উচিত।]

"The arguments by which the Commissioners have persuaded themselves that in the case at any rate of the leaders of the conspiracy it was not necessary to carry out the natural consequences of their findings seem to me astounding. It looks however, as if there is no remedy. I agree that we should ask the views of L-D-on-the two points raised in Secretary's note.

H. W. H. [sig]
17.4.32."

[Legislative Department থেকে Honourable Member-কে লেখা হচ্ছে যে, তাঁরাও অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন কিকরে ট্রাইব্যুনালের কমিশনারেরা এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। আইনের কোন্ ধারার অজুহাতে আসামীদের প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত হয়েছে সেটি নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন।]

"Legislative Dept.

On the merits of the decision by the Commissionary that no death sentences should be imposed I respectfully agree with Honourable the Home Member. The grounds assigned for this decision appear to me with respect to be nothing less than fantastic. The Comm.—convicted the accused of an offence punishable under sub-section (1) of section 120B read with sections 302 and 109. It is doubtless then as observed by the Comm.—that the activities of the accused constituted also an offence punishable under section 121 A. But these can plainly be no concievable justification for the argument of the Commissioners that because acts done by the accused constituted two different offences one of which judged by the provision of its punishment was graver than the other, the sentences to be passed for the graver offence should be influenced by the fact that maximum and minimum punishments which would have been awardable on conviction of less grave offence were less severe than the maximum and minimum punishments provided for the graver offence

ঐ সুন্দর
কেশ বিন্যাস
অতি দীর্ঘকাল
সুন্দর থাকবে
না - - -

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ ফ্রেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিন, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

In other wards, the sentences to be awarded for the graver offence should have been determind in the light only of the activities of the accused as constituting a graver offence."

[গ্রেহাম সাহেব লিখছেন, ট্রাইব্যুনালের মামলায় রায়ের বিরুদ্ধে সাজা বৃদ্ধির প্রার্থনা করার ক্ষমতা সরকারের আছে কি না তা' তিনি ঠিক জানেন না। তিনি লিখছেন, সমস্ত আইন পর্যালোচনা করার পর একটি সুন্দর point তাঁর মনে এসেছে—১৯২৫ সালের B-C-L-A Act অনুযায়ী যে কোর্ট বসানো হয়েছে তার ক্ষমতা কি বর্তমান ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা হতে নিকৃষ্ট ছিল ? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য গ্রেহাম সাহেব বাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেলের মত গ্রহণের সুপারিশ করেন এবং তাঁর কাছ হতে আরও জেনে নেবার অনুরোধ জানান যে, এই মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে হাইকোর্টে সাজা বৃদ্ধির দরখাস্ত সরকার করতে পারে কি না। কমিশনারদের রায় পড়ে স্বতই মনে হয় প্রাণদণ্ড না দেওয়ার জন্য তাঁরা বাজে অজুহাত খুঁজে বেড়িয়েছেন। এই Department এখনও বিবেচনা করে দেখে নি যদি সাজা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করতে হয় তবে কোন্ কোন্ আসামীর বিরুদ্ধে তা' করা হবে। যদি সে রকম দরখাস্ত করতে হয় তবে এ্যাডভোকেট জেনারেলকে কেবল জাজমেণ্টটা পড়ে দেখলেই চলবে না; সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ—যা' কিছু ট্রাইব্যুনাল লিপিবদ্ধ করেছে, সবগুলিই পড়ে দেখতে হবে।]

"[In para 2 of the note L. Graham discussed various provisions of the Code, and then concluded—that he was not quite sure whether Cal. H-C-had the power to enhance the sentences. The concluding portions of this note said:]

....

All then that I am prepared to say now is that it is a nice point as to whether the court set up under the B-C-L-A-Act 1925, is an inferior Criminal Court within the meaning of 435 of the Code. The matter is one of considerable importance and I would suggest that the opinion of the Advocate General, Bengal, may be taken on this point. At the sametime, the A-G-Bn-might be asked to advise whether on merits this is a case for applying for enhancement of the sentence. All that has been said in the first part of this note is that the Commissioners appear to have gone out of their way to find reasons which on the face of them appear to be entirely inadequate, for avoiding giving capital sentences. The question in respect of which prisoner, if any, application for enhancement of punishment should be made has not been examined by this Department. It would involve a complete and detailed examination not only of the Judgement but also of the evidence recorded by the Commissioners and it is submitted that this falls properly within the scope of A.G.

L. Graham.
22.4.32."

[BLM's minute থেকে জানতে পারছি এ্যাডভোকেট জেনারেল অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সাজা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করবার অধিকার সরকারের নেই। হাইকোর্টে পুনর্বিচারের জন্য দরখাস্ত করবার অধিকার আছে কেবলমাত্র দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের।

হাইকোর্টের Revisional Power অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট নিজস্ব অধিকারে মামলা পুনর্বিচারের জন্য দাবি করতে পারে না—এটাও এ্যাডভোকেট জেনারেলের অভিমত।]—

"[BLM's minute]

Can the Government go to the H-C-to alter the nature of or enhance the sentences in the Chittagong case ? The answer in my opinion, is in the negative. No right of appeal or application for revision has been given to the Government, by any law, in the case of trial under B-C-L-A-A, section 3 of the B-C-L. (supplimentary) Act 1925, gives the right of appeal to a convicted person only.

2. Can the H-C-of its own motion exercise revisional powers under chapter XXXII of the Cr.-P-C-in such a Case? In my opinion, the answer is also in the negetive. The H-C-derives its powers over a Tribunal set-up by the Bengal Act, under the supplimentary Act 1925, and not under the Cr.-P-C. That Act confers powers contained in chapter XXXI and chapter XXVII of the Cr.-P-C. Upon the maximum expressio unius exclusio alterius, powers under chapter XXXII are excluded."

[ক্রমশ]

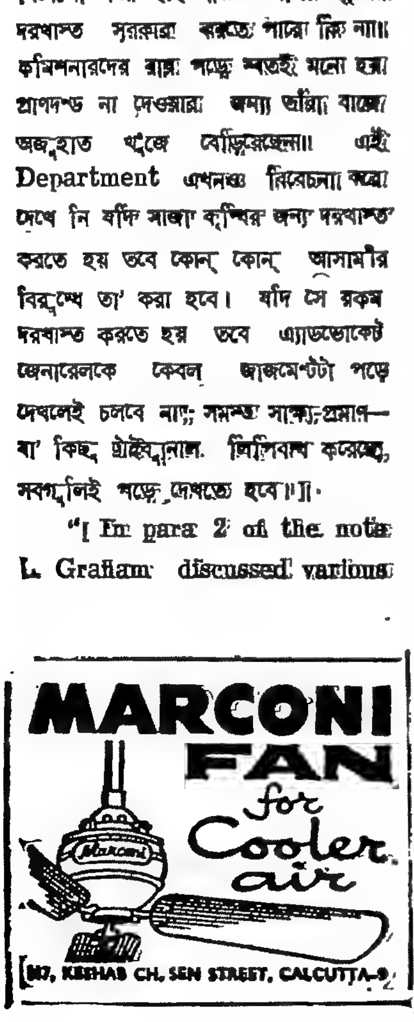

গ্রন্থমেলা

আবাদ—মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল। নবজাতক প্রকাশন, ৬, এ্যান্টনী বাগান লেন, কলকাতা—৯ থেকে মজহারুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত। পরিবেশক ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২। মূল্য ঃ বারো টাকা।

মামুলি ধরণের কোনো উপন্যাস নয়, মহাকাব্যের উচ্চাদর্শমণ্ডিত উত্তরণোন্মুখ সংগ্রামী গণজীবনের কাহিনী ৩৫৩ পৃষ্ঠার "আবাদ"। অবশ্য এটি উপন্যাসই, তবে এরকম উপন্যাস লেখার জন্য যে ধরণের বাস্তব অভিজ্ঞতা, শিক্ষা-দীক্ষা ও নতুন পৃথিবী রচনার জন্য বোধ ও বোধায়ন থাকা দরকার তা বাংলা দেশের সাধারণ ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রে বিরল বলা যায়। তাই 'আবাদ' সৃষ্টির জন্য ঔপন্যাসিক শ্রীরসুলকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

আবাদের কাহিনীর সুরু বলা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। অবশ্য সাধারণ মানুষের যে দুঃখ-দুর্দশা বেদনার ঘটনা উদ্ঘাটন করেছেন—তার সুরু বহু আগে থেকেই। তবে যে চরম অত্যাচার তদানীন্তন ইংরেজ সরকার করেছিল—তারই বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রাম কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ—যা হয়তো খ্যাতিমান ঐতিহাসিকেরা কোনোদিন জানার চেষ্টা করেন নি বা করবেন না। কারণ তাঁরা সাধারণ খ্যাতিহীন জনগণের সংগ্রাম অপেক্ষা ব্যক্তির শৌর্য-বীর্যকেই বড় করে প্রচার করেন। অবশ্য 'আবাদে'র নায়ক রহীম। ঔপন্যাসিকের এক অপূর্ব সৃষ্টি এই রহীম। এই অজানা লোকটির সঙ্গে পাঠকদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয় রোস্তম। রহীমের শৌর্য-বীর্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য লেখক লেখনী ধারণ করেন নি। রহীম দলের নির্দেশে কীভাবে সহস্র সহস্র সংগ্রামী মানুষ সৃষ্টি করেছে সেটাই বড় কথা। এই সংগ্রামী মানুষের দল নেমেছে আন্দোলনের কাজে। একের পর এক আন্দোলন। হাট-আন্দোলন, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি। স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম তো আছেই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর কৃষক আন্দোলনের দ্বারা শত শত কৃষিজীবী মানুষের চাই মুক্তি। জোতদার জমিদারদের হাত থেকে মুক্তি। তাই উপন্যাসটিতে মুখ্য ঃ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়া সেই আন্দোলনের কাহিনী।

যে আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলনে নেমে এসেছে ডাল-ভাত খেকো সাধারণ হিন্দু-মুসলমান। অবশ্য বংশী এক পঙক্তিতে বসতে পারে নি, নেহাৎ বোষ্টম বলে, এখনো সে সংস্কারমুক্ত নয়, কিন্তু বংশী আন্দোলনের বড়ো অংশীদার। সে বিস্মিত হয়, যখন রহীমের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শোনে চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক। একদিন বংশী প্রাণ দিল, প্রাণ দিল দাউদ, বাশু। পুরুষদের সঙ্গে গ্রামের মহিলারাও প্রাণবন্ত, সংগ্রামের সঙ্গী। এরই মধ্যে চমৎকার চরিত্র মল্লিকার। মল্লিকা কীভাবে পুলিশ অফিসারের কান কেটে দেয় তাও স্মরণীয়। তবে মল্লিকার চরিত্রের পরিবর্তন হঠাৎ হয় নি। সে অতি সাধারণ, তবু বীরাঙ্গনা হতে পেরেছে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণের ফলেই। গ্রামের মানুষগুলি হাতে-নাতে শিক্ষা পেয়েছে রহীমের কাছে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছে জাহান আরাকে। তাকে রহীম সম্পূর্ণ নারীরূপেই গড়ে তুলেছে। জাহান আর স্বামীর কর্মের প্রেরণা, স্বয়ং কর্মে উদ্দীপ্ত এবং সেই সঙ্গে বিবেচনাময়ী এক সুগৃহিণী। নূর জাহান বেদনাবিদ্ধ। অন্য দিকে তার স্বামী লোকমান বড়ই অসুখী। রহীম ও লোকমান—দুজনেই একদা জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। প্রেস করে লোকমান ক্রমশ অর্থলোভী হয়ে রহীমের খ্যাতিতে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। অবশ্য রহীম ও লোকমান তাদের শ্বশুর-শাশুড়ী এবং স্ত্রী প্রভৃতির সংসার কাহিনীর মাধ্যমে আমরা মুসলমান সমাজের সুন্দর পরিচয় পাই—যদিও লেখক অত্যাচারমুক্ত বিশাল গণ-সমাজের সুখের সংসারের পথ দেখাতেই প্রতিশ্রুত। তাই শুধু আবাদ নয় একে একে জেগে উঠেছে আমতলী থেকে সুরু করে (দাউদনগর দাশুখালি বংশী-পুর) সারা বাংলা ও ভারতের সমস্ত গ্রাম। উপন্যাসটিতে বহু চরিত্রের ভিড়। তথাপি কোনো চরিত্রই অবহেলিত নয়, সবাই পাঠকের আগ্রহ ও আকর্ষণ ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছে। মোটকথা, বলিষ্ঠ এই উপন্যাসটি রাজনৈতিক, তবু ভিন্ন ধাতের, ভিন্ন চরিত্রের; বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন জাতের। 'আবাদে'র প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী।

পাপুর বই—সুব্রত সরকার। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। দাম ঃ পাঁচ টাকা।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রকাশক হিসেবে রিস্ক নিতে জানে, সত্যিকারের প্রতিভার মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সুব্রত সরকার, যার ডাকনাম পাপু, সাড়ে আট বছর বয়সে যে শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করেছে—তার লেখা এবং রেখায় সাজানো অপূর্ব ও অপরূপ গ্রন্থ পাপুর বই। এই শিশু যেন আগেভাগেই জানতে পেরেছিল কী বিষাদময় তার জীবন। তাই—

"সময়ের বড় অভাব ভাই,
একটুকু খেলার সময় না পাই।"

কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ সবকিছু লেখাতেই ছিল পাপুর নেশা, কোনোটা সমাপ্ত, কোনোটা বা অসমাপ্ত। কতো সুন্দর সুন্দর ছড়া ও কাহিনী। একটি শিশুমনের সংযমের ছাপ আর লেখার রীতিবিন্যাস দেখে বিস্ময় মানতে হয়। ছবিগুলিও কতো বিচিত্র রকমের। স্কেচ, রঙিন ছবি আরো কতো কী—শিশুমনের খেয়ালে 'অবাস্তব হয়ে ওঠে নি' 'ক্লাস ঘ' 'সিনেমা হলের সামনে', 'হে মা কালী', 'যাত্রী' এবং অন্যান্য সব হাতে আঁকা ছবি।

বইটি এক নিশ্বাসে শেষ করে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতে হয় এই ভেবে যে, আমরা না জানি কতো বড় একটি প্রতিভাকে অঙ্কুরেই হারালাম। বোর্ড বাইন্ডিং, আর্ট পেপারে ছাপা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫। বইটি শিশুদের ভালো লাগবে, বড়রা তো অবাক্ হবেই।

মেম বাঈজী ঃ এককড়ি ভট্টাচার্য ঃ পরিবেশক—সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। মূল্য—তিন টাকা।

কলকাতার ইংরাজিভাষী একটি সম্প্রদায়ের কিছু তরুণীর জীবনের কয়েকটি কাহিনী অবলম্বনে এই ছোট্ট উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এরা কেউ টাইপিস্ট, কেউ স্টেনো, কেউ ক্লার্ক, কেউ রিসেপসনিস্ট। এদের সুখ-দুঃখ এবং স্বপ্নের এই কাহিনীগুলি লেখক সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রণ্ট সরকার বিধান পরিষদের শূন্য আসনে নির্বাচন নিয়ে যে ফ্যাসাদ পড়েছিলেন, তা থেকে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা তাঁদের মুক্ত করেছেন। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নিঃসন্দেহে ফ্রন্টের ওপর টেক্কা দিয়েছেন।

রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রথম সুযোগেই নির্বাচন না করানোর দাবি তুলে ফ্রন্টকে বেকায়দায় ফেলেছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে ফ্রন্টের শরিকরা জল ঘোলা করেছেন অনেক। ফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে কোন কোন শরিকের মধ্যে তো প্রায় হাতাহাতি বাধার উপক্রম ঘটেছিল।

বিধান পরিষদ বিলুপ্তির বিল নিয়ে ফ্রন্টের বড় শরিকদের আচরণ নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। এমন কি এই বিল নিয়ে তাড়াহুড়ো করার দায়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী অভিযুক্তও হয়েছিলেন। দিল্লী থেকে যে সব খবর এসেছে তাতে ঐ সব প্রশ্ন যাঁরা তুলেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কেই উল্টো ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রিসভার সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে বিধানসভায় প্রস্তাব এল। বিধানসভা আর বিধান পরিষদে সব পক্ষ একমত হয়েই প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পর বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে শ্রীযতীন চক্রবর্তীর তো তাড়াহুড়ো করাই স্বাভাবিক।

লোকসভায় বিলটি পাশ হওয়ার পরই এই অধিবেশনে যাতে রাজ্যসভায় বিলটি গৃহীত না হয়, সেজন্য যুক্তফ্রন্টের শরিক দলভুক্ত কোন কোন নেতা যে দিল্লীতে লবী তৈরি করতে চেষ্টা করেন, তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের কোন কোন নেতার কাছে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণও আছে। পরিষদীয় মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের ঘাড়ে দায় চাপাতে চেষ্টা করে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যদি আন্তরিকতা থাকত, তাহলে তাঁরাই তো রাজ্যসভায় বিলটি আনতে পারতেন। ফ্রন্টের কোন নেতা সত্যই যদি বাধা দিয়ে থাকে, তাহলে রাজ্যসভার অধিবেশনেই তো তার প্রমাণ মিলবে।

কারও বুঝতে সন্দেহ হয় না যে, যুক্তফ্রন্টের নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্যই শ্রীচক্রবর্তী এই উক্তি করেছিলেন। কিন্তু এটা কি অনেকটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা নয়।

শেষ মুহূর্তে বিলটি যাতে পাশ না হয়, তার জন্য দিল্লীতে তদ্বির-তদারকির অনেক খবরই এখানে এসে পৌঁছেছে। সে সব খবরের মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু অতিরঞ্জনকে বাদ দিয়ে যেটুকু সত্য আছে, তাও কম মারাত্মক নয়।

নয়াদিল্লীর বামপন্থী মহল থেকে সুস্পষ্ট অভিযোগ এসেছে যে, সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে রাজ্যসভার অধিবেশনের দিন এই বিলটি কিছুতেই না ওঠানো হয়। কংগ্রেস নেতারা জানতেন, বিলটি পাশ না হলে যুক্তফ্রন্ট তাঁদের ঘাড়েই দোষ চাপাবেন। তাই তাঁরা এ বিলটি আনতে চেয়েছিলেন। তা না হলে লোকসভায় বিলটি আসত না।

নয়াদিল্লীর খবরাখবর যাঁরা রাখেন তাঁদের কাছ থেকেই পশ্চিম বাংলায় খবর এসেছে যে, কোন কোন প্রভাবশালী সংসদ সদস্য নাকি কেন্দ্রীয় সরকারকে শেষ পর্যন্ত শাসিয়েছিলেন যে, তাঁরা যদি এই অধিবেশনে বিলটি আনেন, তা হলে শেষ দিনে তাঁদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় "রাষ্ট্রপতি উত্তরাধিকার বিলটি" পাশ করতে দেওয়া হবে না। শেষদিনে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে দীর্ঘসময় বক্তৃতা চালিয়েই এটা করা সম্ভব। অথচ এই বিলটি সরকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন অস্থায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি কেউ নেই। তাই হঠাৎ যদি শ্রীগিরির মৃত্যু ঘটে, তাহলে কি হবে? সেজন্যই এই বিলে অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতিকে উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতী সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি এখানে ঘরোয়াভাবে দুই-তিন জন যুক্তফ্রন্ট নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন। শ্রীহাতী কার কাছে কি বলেছেন, কোন নেতাই কিন্তু তা প্রকাশ করেন নি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফ্রন্ট কমিটি এবং ফ্রন্ট সরকার মান বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা কলুষমুক্ত হতে পারেন নি।

অথচ এ নিয়ে এত জল ঘোলা করার কোন কারণ ছিল না। যুক্তফ্রন্টের সব শরিকই নীতিগতভাবে বিধান পরিষদ টিকিয়ে রাখার বিরোধী। ৩২-দফা কর্মসূচীতেও বিধান পরিষদ বিলোপের কথা আছে। তা সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা গঠনের সময় তাঁরা পরিষদ সদস্যদের মন্ত্রী করলেন কেন? শুধু তাই নয়, তিন জন সদস্যকে মন্ত্রী করা হল, যাঁরা কোন কক্ষেরই সদস্য নন। অর্থাৎ একদিকে তাঁরা পরিষদের বিলুপ্তির দাবিতে সোচ্চার, আর অন্যদিকে পরিষদকে তাঁরা পুরোপুরি নিজেদের কাজে লাগাতে চাইছেন। গোড়া থেকেই ফ্রন্ট নীতিহীনতার দায়ে অভিযুক্ত।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

অতীতে বিধান পরিষদের সদস্যকে কংগ্রেস যখনই মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেছেন, তখনই বামপন্থীরা পিছনের দরজা দিয়ে মন্ত্রী করানোর অভিযোগ তুলে তুমুল কলরব করতেন। কিন্তু নিজেদের বেলায় তাঁরা সে সব ভুলে গেলেন। এ ব্যাপারে যুক্তফ্রন্টরা গায়ে কাদা লাগানোর দায় থেকে প্রধান দুই শরিক দুই কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছোট দুই শরিক আর-এস-পি এবং বলশেভিক পার্টি মুক্ত হতে পারছেন না।

যাই হোক, অনেক জল ঘোলা করার পর বিধান পরিষদের অবলুপ্তি নিশ্চিত হয়ে গেল। আপাতত তিনজন মন্ত্রীর পদত্যাগ না করে উপায় নেই। বিধানসভার আসন শূন্য করে উপনির্বাচনের মাধ্যমে বিধানসভার সদস্য হওয়া এখনই সম্ভব হবে না। বর্ষাকালে নির্বাচন হবে না।

বর্ষার পরে নির্বাচন করা নিশ্চয়ই সম্ভব। তখন সমস্যা তিনজনকে নিয়ে নয়—ছয়জনকে নিয়ে। এখানে আর একটি নীতির প্রশ্ন তোলা কি অন্যায় হবে?

বিধানসভায় যুক্তফ্রন্টের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যেই যোগ্য ব্যক্তির অভাব নেই। তা সত্ত্বেও পদত্যাগের মাধ্যমে আসন শূন্য করে উপনির্বাচন করানোটা কি যুক্তিসঙ্গত। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে শ্রীসত্যপ্রিয় রায় আর রসুল সাহেবের এবং কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি ও শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর স্থান পূরণের মত কি আর লোক নেই?

আর-সি-পি আর বলশেভিক পার্টি থেকে এখন মন্ত্রী নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। শ্রীঅনাদি দাস ও শ্রীমোকসেদ আলির দল ছেড়ে যাওয়ার পর আর-সি-পি'র কোন সদস্যের মন্ত্রী হওয়ার অধিকার আছে কি? একই প্রশ্ন বলশেভিক পার্টি সম্পর্কেও। তাদের জন্য কেউ আসন ছেড়ে দেবেন কি-না সে প্রশ্ন অবান্তর।

মন্ত্রী করানোর জন্য বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করানো কি নীতিসংগত? উপনির্বাচনের খরচ রাজ্যের জনসাধারণের উপর কেন চাপানো হবে?

যুক্তফ্রন্টের বিশেষ অবস্থায় নিজ দলের মন্ত্রী মনোনয়নের অধিকার সংশ্লিষ্ট দলের। তা হলেও যুক্তফ্রন্ট দায়মুক্ত হতে পারেন না। পশ্চিম বাংলার মানুষ সাগ্রহে লক্ষ্য করবে বিধান পরিষদের সদস্য এবং কোন কক্ষের সদস্য নয়, এমন সদস্যকে মন্ত্রী করে যে নীতিহীনতার পাপ বিভিন্ন দল তথা ফ্রন্ট করেছেন, আগামী দিনেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটে কি-না!?

দল বদল প্রভৃতি নীতিগত কারণ ছাড়া পদত্যাগ করার নীতি সম্পর্কেই আজ প্রশ্ন উঠেছে। যুক্তফ্রন্টের কাছে জনসাধারণ একটা সুষ্ঠু নীতি প্রবর্তনের আশা রাখে—যুক্তফ্রন্ট তার কতটুকু মর্যাদা দেবে তা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে।

—শ্রীসর্বদর্শী

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আক্ষেপ-পত্র পত্রিকার ৪৯শ সংখ্যা—৭৩ বর্ষে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দেখছি সাপ্তাহিক বসুমতীর চরিত্ররক্ষার জন্য দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর অভিমত : "সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রগতিশীলতার নামে জোর করে একটি বিশেষ দলীয় নীতিকেই যেন কৌশলে প্রচার করা হচ্ছে।" কিন্তু, কোন্ দলের নীতি প্রচার করা হচ্ছে, কেমন করে, তা অবশ্যই তিনি প্রমাণসহ উপস্থিত করতে ভুলে গেছেন। অভিযোগ কার বিরুদ্ধে একথা স্পষ্ট করে উনি না লিখলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তিনি বাম কম্যুনিস্ট মতাদর্শের কথাই বলেছেন। কেন না, "উপরন্তু কেবলমাত্র যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের......(তাও আবার সি· পি· এম·-ই বেশি!)" উক্তির আলোকেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়।

আমাদের বিশ্বাস, বাজারে চলতি সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকার মানদণ্ডের বিচারে সাপ্তাহিক বসুমতীর উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য আছে। স্বাতন্ত্র্য এর রচনামালায়, স্বাতন্ত্র্য এর পরিকল্পনায়। অনেকের হাস্যকর দুঃখ সাপ্তাহিক বসুমতী কেন তথাকথিত সাহিত্য-সাপ্তাহিকগুলির মতো সত্যি সত্যি বাজারে হযে যাচ্ছে না! তার কারণ উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয়, বসুমতীর নেপথ্যে এক দীর্ঘতম সংগ্রামশীলতার ঐতিহ্য রয়েছে। রাতারাতি, বিক্রি বেশি হবে বলে, চটকা জাতীয় খেউড় সাহিত্য পরিবেশন সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষে সম্ভব নয়। এই ধরণের অভিযোগ কোন্ দলের নেপথ্য ক্রিয়াকলাপকে ইংগিত করে?

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রোশ কেন যে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর বুঝতে পারলাম না। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা চিরকাল স্পষ্টবক্তা বলে জানি। জানি অদম্য উৎসাহে উৎসাহী একজন মানুষ, যিনি কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি। অবশ্য এর ফল তাঁকে ভুগতে হচ্ছে। যখন দেশের সমস্ত বুদ্ধিজীবী কবি-সাহিত্যিকরা নিজের নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত, তখন একমাত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রতিবেশী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দেখি। সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন মানুষের দাবি... মনুষ্যত্বের দাবি। গত কয়েক সংখ্যায় শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলায় বুদ্ধিজীবীদের সংকট নিয়ে কিছু স্পষ্ট এবং সময়োপযোগী বক্তব্য রেখেছেন। এ কথাগুলো তো আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যহ বলতে চাই। বলতে ইচ্ছে করি। কেন না, অনুভবের ভিতর এসব স্মৃতি নিদারুণ ঘটনা হয়ে আছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের দোষ কি তিনি আমাদের সেই কথাগুলোই ঘোষণা করেছেন বলে? সংকীর্ণতাবাদী সুবিধাবাদীদের অপদার্থতার ওপর আলোকপাত করেছেন বলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যদি বসুমতী সাপ্তাহিকের মৌলিক চরিত্রভ্রষ্টতার প্রশ্নে ভীত হন—তাহলে কি তাঁর নিজস্ব চরিত্রটিও দর্পণে বিম্বিত হচ্ছে না?

তৃতীয় প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই সৌজন্যের কথা আসে। ভদ্রতাবোধের প্রশ্ন আসে। শ্রীযুক্তা সম্পাদিকা রবীন্দ্র সরোবর সম্পর্কে কোন বিতর্কিত মন্তব্য তুলেছেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্র সরোবর সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি হবার জন্য কমিশন বসেছে। তাঁরা তদন্ত করবেন। আমরা এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে অক্ষম। তবে এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সম্পাদিকা যা বলেছেন—একজন মহিলা হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো উচিত। তা ছাড়া, সম্পাদিকা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব তিনি নিশ্চয়ই ভালো জানেন। এ ধরণের প্রশ্ন তুলে কারো ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপের যে অগণতান্ত্রিক মনোভাব তাকে গোপন করা যায় কি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—৪৯শ সংখ্যা ৭৩ বর্ষ সংখ্যাতেই শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মানুষের ধর্ম" রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাটি এবং কৃত্তিবাস ওঝা ও সর্বদর্শী প্রমুখের লেখাগুলি (যা নিয়মিত বসুমতীতেই ছাপা হচ্ছে) একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বার জন্য শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। সাপ্তাহিক বসুমতী যে বিশেষ কোনো দলের মুখপত্র নয়—এ ধারণা তাঁর স্পষ্ট হবে। স্পষ্ট হবে—সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রতিটি উচ্চারণ মানবতার পক্ষে—সুস্থতার পক্ষে—সুন্দরের পক্ষে বলে।

—সাগর চক্রবর্তী
শহীদনগর, ঢাকুরিয়া

গত ২৯শে মে তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর "পাঠকমন"-এ শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পড়লাম। চিঠিতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপত্র বলে অভিযোগ করেছেন এবং এই অভিযোগ করতে গিয়ে তিনি লেখক সাগর বিশ্বাসের প্রতি দলীয় রাজনীতি প্রচারের অভিযোগ করেছেন। অবশ্য তাঁর অভিযোগের ভোঁতা আঘাত থেকে শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এমন কি আপনিও বাদ পড়েন নি। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক বসুমতীর আরো অনেক পাঠক-বন্ধুর সঙ্গে আমিও একমত যে, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগগুলি সূক্ষ্ম চিন্তার ধোপে টিকবে না।

শ্রীসাগর বিশ্বাসের "আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত" পর্যায়ের প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষাগুলি যেমন আমরা কৌতূহলের সংগে পড়েছি, তেমনি "নির্বাচনের পরে"—এই পর্যায়ের নির্বাচনোত্তর লেখাগুলিও আমাদের বেশ আনন্দ দিয়েছে। এই লেখাগুলিকে নিছক সাক্ষাৎকার বলে আমাদের মনে হয় নি। "নির্বাচনের পরে" প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় ১৩ই মার্চ। লেখক সেখানে এই লেখার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। সে কথা আশা করি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় জানেন। শেষ-লেখাতেও এই উদ্দেশ্যের পুনরাবৃত্তি আছে। এ সব জেনেও (শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নাকি সাঃ বসুমতীর পাঠক) যদি তিনি না জানার ভান করেন, তবে তিনি জ্ঞানপাপী ছাড়া আর কি? মন্ত্রীরা সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করলেও বিধানসভার সদস্যদের মুখ তালাবন্ধ থাকবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করলে বিধানসভার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা ভালো। একটা উদাহরণ দিই। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পরেই শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেছিলেন। আমরা দেখেছি—বিধানসভার শিক্ষক—এম, এল, এ-রা কেউই এটা সমর্থন করেন নি ('নির্বাচনের পরে' দ্রষ্টব্য)। বরং দশম শ্রেণীকেই সমর্থন করেছেন। এই জানার মূল্য কোন অজুহাতেই অস্বীকার করা যায় না। আর আজ কি দেখছি? দেখছি রাজ্যে সেই দশম শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থাই চালু হতে চলেছে।

প্রাক্ নির্বাচনকালের নিরপেক্ষ সমীক্ষার সত্যতার কথা নিশ্চয়ই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করবেন। আর "নির্বাচনের পরে"-র মধ্যে সি-পি-এম সদস্যদের প্রাধান্য দেবার যে অভিযোগ, সে সম্পর্কে একটা কথা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে রাখা দরকার যে, সি-পি-এম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তবুও মোট ২৩ জন এম, এল, এ-র সাক্ষাৎকারের মধ্যে ৮ জন

সি-পি-এম সদস্য। এমন কি সংখ্যাধিক্য ঘটলো যে, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ভীত অথবা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন?

সাপ্তাহিক বসুমতীর লেখকেরা সব বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোক এ অভিযোগও বিশ্বাস করতে পারলাম না। আশা করি উপযুক্ত তথ্য সহকারে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে আলোকপাত করবেন। তবে শুধুমাত্র চিঠি লেখার জন্য চিঠি লিখে যেন বিভ্রান্তি ও জটিলতার সৃষ্টি করা না হয়।

—খে.কনচন্দ্র মালাকর
ডিঙামাণিক, ২৪ পরগনা

সপ্তাহের বোঝা : একটি প্রতিবাদ

আপনার বহুল প্রচারিত "সাপ্তাহিক বসুমতী"তে (৭৩ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা, ১২ই জুন) প্রকাশিত "সপ্তাহের বোঝা" শীর্ষক ফিচারের লেখক কৃত্তিবাস ওঝার নিম্নোক্ত লেখার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তিনি লিখেছেন—

"রাজ্যের শ্রমিক ও কৃষক ফ্রণ্টে যদি যুক্তফ্রণ্ট শরিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেন; তবে সরকার সুস্থভাবে চলবে কাকে নিয়ে? রাজ্যে বাকি থাকে স্কুল মাস্টার আর সরকারী কর্মচারী। এই দুই সম্প্রদায় সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় তাঁরা হলেন—রাজ্যের সবচেয়ে খিঁচনে-ওয়ালা পার্টি—তাঁদের দাবি পূরণ না হলে মুর্দাবাদ ধ্বনি তুলতে তাঁরা সবচেয়ে পটু কিন্তু সরকার তাঁদের কোন সহযোগিতা পাবে না। তাঁদের দাবি আছে, নেই শুধু দায়িত্ব। তাই তাঁদের কথা বলা অর্থহীন এবং সত্য কথা বলতে টাকা পয়সা ছাড়া কারো কোনো প্রভাব এই দুই সম্প্রদায়ের উপর নেই।" —ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

শিক্ষকমণ্ডলী সম্বন্ধে এই ধরণের ন্যক্কারজনক উক্তি কৃত্তিবাস ওঝা কোন্ যুক্তিতে করলেন? তিনি সুকৌশলে এই প্রবন্ধে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলকে লোকচক্ষে হেয় ও অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যুক্তফ্রণ্টের সুহৃদ হিসাবে তিনি নিজেকে পরিচিত করে কৌশলে সূক্ষ্মভাবে পূর্বে ছিল—এখন নগ্ন ও স্থূলভাবে যুক্তফ্রণ্টের, বিশেষ করে মার্ক্সবাদীদের বিরোধিতা করছেন। তাঁর এই উক্তি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাই। শিক্ষক সম্প্রদায়ের আন্দোলনের ঐতিহ্য ও যুক্তফ্রণ্ট অনুগ মনোভাব দেশবাসী বিস্মৃত হন নি। একজন মার্ক্সবাদী তথা শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

—হিতাংশু চট্টোপাধ্যায়
এম এ (ডবল), বি টি, (প্রধান শিক্ষক),
থানা রোড, অণ্ডাল

বঙ্গদর্শন : একটি প্রতিবাদ

৫১ সংখ্যা "সাপ্তাহিক বসুমতী"তে বঙ্গদর্শনে 'এদের শায়েস্তা করা দরকার' শীর্ষক কলমে যা লেখা হয়েছে আমি তার প্রতিবাদ করছি। প্রথমত দুর্গাপুরে যা ঘটেছে, সেই ঘটনাকে কেবলমাত্র যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এ কথার কি উদ্দেশ্য? কলেজের ভিতরে ঢুকে পরীক্ষারত ছাত্রদের উপরে লাঠি, গুলী চালানো হলে তার প্রতিবাদ করাটা কি গুণ্ডামীর পরিচয়? ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলের উপলক্ষ করে পেশাদারী গুণ্ডারা গ্রামে আগুন দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দোকানপাট লুঠ করে নি, এই নিশ্চয়তা আপনি দিতে পারেন? অথবা নকশালপন্থীরা গ্রামে আগুন দিয়েছে বা দোকান লুঠ করেছে এমন প্রমাণ দিতে পারেন?

দ্বিতীয়ত লিখেছেন—"অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এই সব সমাজবিরোধীদের রাজনৈতিক মোকাবিলা করার কথা যুক্তফ্রণ্ট পূর্বাহ্ণে ঘোষণা করেছিলেন, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে মতলব ত্যাগ করে সোজা সমাজবিরোধী বলে থানায় চালান দেওয়া কর্তব্য।" লেখাটায় ভুল আছে, সমাজবিরোধী হলে তার সঙ্গে রাজনৈতিক মোকাবিলার প্রশ্নই আসে না, আর রাজনৈতিক দল বলে স্বীকার করে নিলে সে আবার সমাজবিরোধী হয় কি করে? এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা যে কোন মতবাদকে শেষ করে দেওয়া যায় না, সাংবাদিক হিসাবে আপনিই তার অনেক ইতিহাস জানেন।

তৃতীয়ত, "কংগ্রেসী আমলে নকশালীদের দেখা যায় নি"—কথাটায় কিঞ্চিৎ বিকৃতি আছে, যেমন—মতপার্থক্যহেতু ১৯৬৭ সালে নকশালীদের জন্ম। স্বভাবতই জন্মের আগে কাজ করা সম্ভব নয় বলেই কংগ্রেস আমলের কথা ওঠে না। বর্তমানে বসুমতী এবং অন্যান্য পত্রিকা মারফত জানতে পারছি যে, ভারতবর্ষের সাতটি প্রদেশে নকশালপন্থীদের কাজ চলছে। কেরল ও বাংলা বাদে বাকী প্রদেশগুলি কাদের তত্ত্বাবধানে আছে জানাবেন কি?

—দেবু বণিক
৭/২ই, আসগর মিস্ত্রী লেন
কলকাতা-৪৬

'বাহে ভাষা' প্রসঙ্গে

শ্রীবাঞ্ছামোহন রায়-এর চিঠির পর আশা করেছিলাম বাহে ভাষা প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টানা হয়েছে, কিন্তু নতুনদিল্লী থেকে শ্রীপ্রশান্ত লাহিড়ীর চিঠিতে বিষয়টি পুনর্বার ভ্রান্তভাবে উত্থাপিত হওয়ায় প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি।

উত্তরবঙ্গের মানুষ হিসাবে দাবি করে শ্রীলাহিড়ী 'বাহে' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা ঠিক নয়। বাহে শব্দের অর্থ "ও ভাই" নয়—বাহে শব্দের অর্থ হল 'বাপু হে'। মতান্তরে "বাউ হে।" অর্থ যাই হোক—'বাহে' শব্দটি অবজ্ঞাসূচক এবং অপমানজনক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে দীর্ঘদিন—যখন থেকে দক্ষিণবঙ্গের লোক উত্তরবঙ্গে এসে ব্যাপকভাবে বাস করতে সুরু করেন—তখন থেকেই। রাজবংশীদের সম্বোধনসূচক 'বাহে' শব্দটিকে দক্ষিণবঙ্গের লোকেরা (রাজবংশীদের মতে 'ভাটিয়া') রাজবংশীদের বোঝাতেই ব্যবহার করতে থাকার ফলেই এই শব্দ ব্যবহার করার ফলেই এই শব্দ থেকে রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ঘটতে সুরু করে এবং বর্তমানে রাজবংশী বাঙালীদের মধ্যে এক উন্নতশ্রেণীর সম্প্রদায়। কাজেই 'বাহে' শব্দটিকে বর্তমানের শিক্ষিত রাজবংশী সম্প্রদায় জাতি হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে নারাজ।

বাহে নামে কোন জাতির অস্তিত্ব নেই—বা বাহে ভাষা নামে কোনও ভাষা নেই। বাঙালী সম্প্রদায়েরই এক অংশ হল 'রাজবংশী' এবং তাদের ব্যবহৃত ভাষা বাংলাই—বাহে ভাষা নয়। চট্টগ্রাম বা ঢাকার অধিবাসীদের কথ্যভাষার সঙ্গে যেমন রাঢ় বঙ্গের কথ্যভাষার অমিল রয়েছে—তেমনি উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের কথ্যভাষার সঙ্গেও আমাদের প্রচলিত ভাষার পার্থক্য। রাজবংশীরা যখন কিছু লেখেন—তখন পরিষ্কার বাংলাই লেখেন। এইখানেই মুরশেদের বিভ্রান্তি ঘটেছে।

আমি 'বাহে' (রাজবংশী যাদের একমাত্র পরিচয়) নই—ভাটিয়া। অত্যন্ত বেদনার কথা আমরা বাঙালী বলে যতই গর্ববোধ করি না কেন—আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ জাতি পরিচয় আজও জানি না। নচেৎ বাঙালী জাতিরই এক অংশকে 'বাহে জাতি' 'বাহে ভাষা' প্রভৃতি কতকগুলি অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করে জটিল করে তোলা হত না।

—চোমলোমা
শিলিগুড়ি

পূর্ববঙ্গ : সংস্কৃতি ও কবিমানস

অমিয়কুমার হাটি

জাতির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। বাঙালী নিজস্ব সংস্কৃতির জন্যে গর্ববোধ করে। বাংলাদেশ আজ দ্বিখণ্ডিত। দেশ ভাগ না হলে পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন থাকত না। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে দেশ বিভক্ত হলেই এবং ২।১টি যুগ কেটে গেলেই কি সংস্কৃতির সাংঘাতিক রকম কোন পরিবর্তন ঘটে? ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হলেই কি রক্তের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়? ভাগ করা হয়েছে বলেই কি আবহমানকালের বাংলা ও বাঙালীর কৃষ্টি সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে? মুখ্যত সেখানকার কবিমানসের আলোকে পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক।

বাঙালী জাতির বিশিষ্টতা তার সংগ্রামী ঐতিহ্যে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনো সে মাথা নত করে নি। পূর্ববঙ্গে আমরা কি দেখেছি? সংগ্রামী ঐতিহ্য হতে পূর্ববঙ্গ কখনো বিচ্যুত হয় নি। পীড়ন, প্রলোভন কোন কিছুই দমন করতে পারে নি জনগণের আন্দোলনকে। এই আন্দোলন এসেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের রূপ ধরে। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্যে, ঢাকায় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের তাৎপর্য পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী। ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, সংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ২১শে স্মরণে 'বক্ষে বাজে বাঁশি' পুস্তিকাটিতে জসীমউদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর, শামসুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ এনামুল হক, দিলওয়ার প্রমুখ ১৭ জন কবির অগ্নিগর্ভ কবিতা রয়েছে। একুশের সংকলন হিলালউদ্দিন প্রকাশিত "নিনাদ" (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯)-এ আনিসুজ্জামান 'একুশে ফেব্রুয়ারী' প্রবন্ধে দিনটির অপরিসীম তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন: 'বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার কর্মসূচী ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারীর একমাত্র লক্ষ্য। এমন কর্মসূচীভিত্তিক একটি দিন একটি জাতির ইতিহাসে যুগান্তরের কাল বলে বিবেচিত হল কেন? তার কারণ এই যে, ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত ছিল কতকগুলি মূল নীতির প্রশ্ন। সেই মূল নীতিগুলোই আমাদের জাতীয় জীবনে তরঙ্গ তুলছে বার বার, প্রশ্ন তুলেছে, সমাধান খুঁজেছে, মীমাংসা পেয়েছে।...... ২১শে ফেব্রুয়ারী একই সঙ্গে সংস্কৃতি চেতনার প্রকাশ ও বিকাশের দিন। তাই ১৯৫২ সালের পর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে-কোন চক্রান্তই ব্যর্থ হয়েছে। ......অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে দেশবাসী সচেতন হয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে এই সদাজাগ্রত মনোভাবই রবীন্দ্র-বিরোধী সকল কর্মকৌশলকে পর্যুদস্ত করেছে। ...এ জন্যেই মনে হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী শুধু কর্মসূচীভিত্তিক আন্দোলনের দিন নয়, তা' আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার দিন, আত্মসাক্ষাৎকারের দিন, আত্মবিশ্বাসের দিন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শুভ সূচনার দিন, জনশক্তির বিজয় যাত্রার দিন। ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত দিন।'

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের ভূমিকা আজ প্রগতিশীল, জনগণ প্রাগ্রসর। সব থেকে বড় কথা, পূর্ববঙ্গ ঐতিহ্য অনুসারী। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাহিত্যে ও আদর্শের আলোকে পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি উজ্জীবিত, উদ্ভাসিত।

বস্তুত পূর্ববঙ্গের কবি সাহিত্যিক মনীষীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের যে নিত্যনতুন মূল্যায়ন, তা' চমকপ্রদ ও আশ্চর্যজনক যদিও নয়, তাহলেও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথকে অন্তজ করার, দূরে সরিয়ে রাখার, বাঙালী সংস্কৃতিতে ভেদাভেদ আনার কম প্রচেষ্টা হয় নি। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দুই বাংলার আকাশেই একই সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল। অবিনশ্বর তাঁর দীপ্তি। কিছুদিন আগে পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ওপর—৩১ জন সাহিত্যিকের রচনা সম্বলিত—আনিসুজ্জামান সম্পাদিত একটি সফল পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ শহীদুল্লাহ রবীন্দ্রনাথকে সূফী কবিদের সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছেন জসীমউদ্দিন। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের দিকটি দেখিয়েছেন রফিকুল ইসলাম। শিলাইদহের কুঠিবাড়ি—রবীন্দ্রনাথ প্রথম পদার্পণ করেছিলেন ১৮৯০ সালে, শেষ পরিদর্শন করেন ১৯৩৭ সালে। তাঁর মতে, শিলাইদহ তো তীর্থস্বরূপ। বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আব্দুল হাই বলেছেন যে, কবি তাঁর প্রতিভাবলে ভাষাতত্ত্বের বিশেষ শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বাংলা ভাষার যথার্থ চরিত্র উপস্থাপনা করেছেন তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়' ও 'শব্দতত্ত্ব' পুস্তকে। মানজিদা খাতুন তাঁর প্রবন্ধে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরুত্ব যেমন নিরূপণ করতে গিয়েছেন, তেমনি সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারে কিছুদিন অসুবিধার কথাও আলোচনা করেছেন। শামসুর রহমান বাঙালীর শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলা ভাষার উৎকর্ষসাধনে তাঁর অবদান স্মরণ করেছেন। আনিসুজ্জমান রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মনোভাবের ওপর জোর দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় 'যুগশিক্ষা' আয়োজিত এক সভায় সভাপতির অভিভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেন—'শ্রেণীবিশেষের সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞতাই রবীন্দ্রসাহিত্য বিরোধিতার মূল কারণ।' দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের প্রতি বরং পক্ষপাতিত্ব করেছেন। মুসলিম জাগৃতির পিছনে রবীন্দ্রনাথের কোন অবদান নেই। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক জ্ঞানের পরিচায়ক।

কবি বেনজীর আহমদ বলেন যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্য তিনজনের নিকট গভীরভাবে ঋণী, এই তিনজন রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র। এঁদের মধ্যে রবি ঠাকুরের অবদান অপরিসীম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হলে এবং

এই ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রীতিবোধ থাকলে এই তিনজনের যে-কোন একজনকে অস্বীকার বা বর্জন করা গর্হিত হবে।

রোকেয়া হলে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আব্দুল হাই বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে হাজির করে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছেন।

ডঃ আনিসুজ্জামান 'চির নূতনেরে দিল ডাক—পঁচিশে বৈশাখ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ শুধু মহাকবিই নন তিনি মহাসাধক, মহান্ বিশ্বপ্রেমিক, মানবতার মহান পূজারী। তিনি জাতি-ধর্ম ও দেশকালের ঊর্ধ্বে উঠে এক অখণ্ড-রূপে বিশ্বকে দেখেছিলেন। তাই বাংলার কবি হয়েও তিনি বিশ্ব কবি। স্রষ্টা ও সৃষ্টির অখণ্ড সত্তা তাঁর হৃদয়বীণায় এক অপূর্ব সুরলহরীর সৃষ্টি করেছিল। সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

১৯৬৯-র মে মাসে 'চারণিক'-এর অনুষ্ঠানে দশজন সাহিত্যিক ও শিল্পীকে রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার জন্যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সাহিত্যে সম্বর্ধিত হন—আব্দুল হাসিম, ডঃ এনামুল হক ও বেগম সুফিয়া কামাল। সঙ্গীতে—আব্দুল আহাদ, ওয়াহিদুল হক, সানজিদা খাতুন, বিলকিস নাসি-রুদ্দিন, জাহেদুল রহিম, ফাহমিদা খাতুন ও আতিকুল ইসলাম। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ। এনামুল হক বলেন,—'রবীন্দ্র-নাথকে নিয়ে আমি যখন ভাবি, তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আমি আমার জীবনকে খুঁজে পাই, আমি আমার অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাই। তাই রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা মানেই জীবনের চর্চা।

আব্দুল হাসিম বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নন। রবীন্দ্র-নাথ আবহমান বাঙালী সমাজ ও বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বাড়িয়ে-ছেন। তাই রবীন্দ্রসাহিত্য সংরক্ষণ আর আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে সংরক্ষণ একই সূত্রে গাঁথা। একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সভাপতি অজিতকুমার গুহ বলেন,—'বাঙালী মানস রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোকে চির উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী মানসের চিরকালীন ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা মানেই একটি জাতির ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা।'

'বৈপ্লবিক সত্তায় রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক সফিউদ্দীন আহমদ বলছেন,—'রবীন্দ্রনাথ মানবতার কবি, দার্শনিক কবি, ঋষি কবি ও শান্তির কবি। যুদ্ধ, রক্তপাত ও হিংসার কুটিলচক্র এবং আণবিক বোমার হুঙ্কারেরও ঊর্ধ্বে উঠে জগৎকে মুগ্ধ করেছে, চকিত করেছে তাঁর শান্তির বাণী। প্রেমপ্রীতি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব দিয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়ে-ছিলেন এক রাষ্ট্র ও এক মানবসমাজ।... বাঙালী জাতি ভাষা ও সাহিত্য এবং সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রকাব্য তথা রবীন্দ্র-সাহিত্যই এক মস্ত বড় বিপ্লব।'

সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে সম্প্রতি যে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল, তাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করে-ছিলেন মুহম্মদ শামসুল হোসেন। আলো-চনায় অংশ গ্রহণ করেন সবিউল আলম ও শফিকউদ্দীন।

'শিলাইদহে সন্ধ্যা' কবিতায় কবি মজহারুল ইসলাম বলেছেন, 'মনে হয় এ শিলাইদহে/বিশ্বমানবের ভীড় দুই হাত তুলে আগ্রহে/জানাবে প্রার্থনা/'শান্তি দাও আমাদের, আমরা শান্তির ছায়াকামী,/ আমরা শান্তির ছায়াকামী/হিংসার বহ্নি-শিখা এ মাটিতে আর জ্বালব না।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বভাবতই আসে নজরুলের কথা। বৈশাখের পরে জ্যৈষ্ঠ। গত রবিবার ১১ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে সাড়ম্বরে বিদ্রোহী কবির জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়েছে। কবির জন্মদিনে এমন কি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও বাণী প্রেরণ করে বলেন যে, নজরুলের বাণী আঞ্চলিক এবং জাতীয় গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। ঢাকা নজরুল একাডেমির তরফ থেকে যে উৎসব আয়োজন হয়, তাতে আলোচনা সভা ও কাব্যপাঠে অংশ গ্রহণ করেছিলেন মুজীবর রহমান খাঁ, ডঃ হাসান জামাল, ডঃ মোহব আলী, মহিমুদা খাতুন সিদ্দিকা, বেগম সুফিয়া কামাল, জাহা-নারা আরজু, আব্দুর রশীদ খান, ফতেহ লোহানী ও আলী মনসুর। নজরুল গীতির পরিচালনায় ছিলেন শেখ লুৎফর রহমান, বেদারউদ্দীন আহমদ ও সোহরাব হোসেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুলগীতি বিশেষজ্ঞা ফিরোজা বেগম এখন পূর্ববঙ্গ-বাসী।

বাংলা একাডেমির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান বেনজীর আমেদ, আব্দুর রশীদ খান, ফজল শাহাবুদ্দীন, সৈয়দ শামসুল হক ও জাহানারা আরজু।

ঢাকা বুলবুল একাডেমিতে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে-ছিল। এছাড়া নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন করেন 'জাগো আর্ট সেন্টার', পাকিস্তান কাউন্সিল, 'ভক্তবৃন্দ মজলিশ' প্রভৃতি। পাকিস্তান কাউন্সিল-এর সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শেখ লুৎফর রহমান, বেদারউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আব্দুল হাদী, ইসমত আরা, রওশন আরা চৌধুরী, সন্ধ্যা চক্রবর্তী প্রমুখ।

মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে" জীবনানন্দের সুন্দর মূল্যায়ন করেছেন : "জীবনানন্দ প্রধানত প্রকৃতির কবি। তিনি যে জগৎ নির্মাণ করেছেন, সে জগৎ তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডলের নয়। তাঁর স্বপ্নের পৃথিবী হচ্ছে কুহেলিকার, ছায়ার, হেমন্তের জলস্রোতের, ইঁদুরের, প্যাঁচা আর বাদুড়ের এবং ছায়া ও আলোতে যে হরিণ খেলা করছে, তার।...ফরাসী চিত্রকার রুশোর মতো তিনি পরিচিত পৃথিবী থেকে অন্তরাল খুঁজেছেন। রুশোর ছবিতে সাপ আছে, হাঁস আছে, অপরিচিত লতা ফুল ফল আছে এবং তার সঙ্গে অনৈসর্গিক হয়ে বসেছে মানুষ। রুশোর ছবির প্রধান রঙ হচ্ছে ঘন সবুজ এবং নীল। জীবনা-নন্দে প্রকৃতির রঙ ধূসর। তাঁর কাব্য চিত্ররূপময়।

ইষ্টার্ন রবার ওয়ার্কস
কলিকাতা-১৫

অন্যত্র বলছেন.....'বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এঁরা কাব্যসেবায় রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সে সঙ্গে অবশ্য যথেষ্ট বাচালতা এবং অনুপলব্ধ যৌন ভাবাবেগের বাহুল্য ছিল।' আবার—'নজরুল যে সমাজ-বোধের পরিচয় এনেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি দেখি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' কাব্য গ্রন্থে।'

জীবনানন্দ সম্পর্কে করুণাময় গোস্বামী বলছেন, 'রূপসী বাংলা'কে বলা যেতে পারে চিরন্তন বাংলার একটি অপূর্ব কাব্য, যার রচনাকাল ১৯৩২ এবং যা আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনের যুগের হয়েও সেকালের লক্ষণাক্রান্ত নয়।'

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পূর্ব-বঙ্গে। জাতি যে ঘুমিয়ে নেই, এর থেকেই তা' বোঝা যায়। কয়েকটি অনুষ্ঠান উল্লেখের দাবি রাখে।

৩১শে ভাদ্র, ১৩৭৫ 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত : চাঁদপুরে সুসাহিত্যিক ও পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব শহীদুল্লা কায়সার চাঁদপুর কলেজে একটি বক্তৃতা দেন—'পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্যের ধারা'। তিনি বলেন যে, সাহিত্য জীবনের দর্পণ এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান সাহিত্যই টিকে থাকে। সাহিত্য কখনো পশ্চাদমুখী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সাহিত্যকে সমাজ অগ্রগতির হাতিয়ার রূপে গড়ে তুলতে হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

গত ৪ঠা জুলাই চট্টগ্রামে জুবিলি রোড-এ 'সাহিত্য নিকেতন' 'সপ্তকে'র উদ্যোগে প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবুল ফজলের ৬৬তম জন্মতিথি সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ আলী আহসান ছিলেন সভাপতি। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, দিলওয়ার হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব শহীদুল্লাহ।

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে 'পূর্ব পাকিস্তান নীহারিকা সংসদ' আয়োজিত সভায় সভাপতি ছিলেন পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত। প্রধান অতিথি ছিলেন জসীমউদ্দীন। এ-ছাড়া এই উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেন্ট্রাল ল কলেজ, চান্দাইকোনা, শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ), লাঙ্গলবন্ধ (নারায়ণ-গঞ্জ মহকুমা), ঢাকার সাভার-এ, নরসিংদী মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে।

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, উভয় বঙ্গের গণমানস পরস্পরের সান্নিধ্য চায়। তাই ওখানকার লেখক কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন পশ্চিম-বঙ্গ নজরুল একাডেমির কথা। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম মুর্শিদাবাদ থেকে প্রতি বছর প্রতিজ্ঞা-সফলদিনটিতে ঢাকা যান। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সাহিত্যের জন্যে পূর্ববঙ্গেরও আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। শিল্পে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বিভেদ ও বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখার মত মূর্খতা আর কি থাকতে পারে? যবনিকা আজ কম্পমান। সাংস্কৃতিক লেনদেন অব্যাহত রাখবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন, এগিয়ে আসছেন দুই বাংলার বুদ্ধিজীবীরা। 'পূর্ববঙ্গ' বা 'পূর্ব পাকিস্তান' বলার চেয়ে গোটা 'বাংলা' শব্দটাই—সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা বেশি ব্যবহার করেন।

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা আইনুন নাহার, রওশন ইজদানী প্রমুখ কবি তাঁদের কবিতায় ব্যবহার করছেন। কাব্যগত বিচার এতে বেড়েছে কিনা, তার বিচার না করেও বলা যেতে পারে, আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার এ একটা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

একটি দিক কিন্তু পীড়াদায়ক। এদেশেরই মতোই পূর্ববঙ্গেও নগর ভিত্তিক সভ্যতার জয়গান। গ্রামবাংলাকে সেখানকার কাব্য সাহিত্যে কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হয়। হয়ত আধুনিকতার শিকার হতে চলেছি আমরা সবাই। সাহিত্য ও সংস্কৃতিও তাই হয়ত গ্রাম ভিত্তিক হতে পারবে না আর।

পরিশীলিত মন এবং প্রগতিশীল মনোভাব সেখানকার অধিকাংশ কবির। যুগের এবং জীবনের দাবি আদায়ের জন্যে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকরা সৎ সাহিত্যের সৃষ্টি করছেন তাঁদের সাধ্যানুযায়ী। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। শক্তিশালী কোন কোন কবির কবিতায় উৎকট বিদেশী সভ্যতার গন্ধ সুস্পষ্ট। কেউ কেউ যৌনতা-দোষে রীতিমত দুষ্ট। সাংস্কৃতিক সংকট তো সবদেশেই বুদ্ধিজীবী মহলে এসেছে। কেউ কেউ বা অজ্ঞান্তেই তার শিকার হয়ে পড়েছেন বা পড়ছেন। হায়াৎ মামুদ, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন প্রমুখ। শক্তিশালী কবিদের কবিতায় তাই যখন উগ্র যৌনচিত্র চিত্রণের উৎসাহ দেখি, তখন মনে করি, পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে এসব কবিতার তেমন কোন আত্মিক যোগ একেবারেই নেই। অবশ্য এর পাশেই আছেন প্রচণ্ড আশাবাদী জীবন-নির্ভর কবি দিলওয়ার, প্রসন্ন হৃদয়ে যিনি ঘোষণা করেন,—

"যতদিন বেঁচে আছো
তুতদিন মুক্ত হয়ে বাঁচো
আকাশ মাটির কণ্ঠে শুনি যেন
তুমি বেঁচে আছো।"

সিনেমা এখনকার সংস্কৃতির বাহন। হয়ত সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটকের মত প্রয়োজক পরিচালক দুর্লভ পূর্ববঙ্গে এখনও, তবু সিনেমার ক্ষেত্রেও পূর্ববঙ্গের রুচিশীল মানুষ চান সংসৃষ্টি। 'সংবাদ' ২০শে চৈত্র, ১৩৭৫ —হারুণুর রশীদ খান, মিঃ আন্দ্রেইয়েভ-এর মন্তব্য তুলে ধরেছেন,—'জেমসবন্ড' মার্কা সিরিজের এই অতি গোয়েন্দা মার্কা ছবিগুলোতে শুধু যে মানুষের জীবনকে বলি দেওয়া হয়, তা নয়, সুরুচি ও সুস্থ মানবিক নীতিবোধ সমূহও এসব ছবির বলি। এসব ছবিতে যৌন জীবনকে অত্যন্ত প্রকট করে উপস্থিত করা হয়, অনেকক্ষেত্রে তা উৎকট, বিকৃত—যা মানুষের স্বাভাবিক রুচিবোধের বিরুদ্ধে। সর্বোপরি এসব ছবির মূল বাণী হল শক্তিশালী অতি মানুষ পৃথিবী শাসন করবে এবং এরূপ অতি মানুষ হবার জন্য যে কোন অপরাধ আচরণ করা যায়, দুর্বলের ওপর যে কোন অন্যায় বা পীড়ন করা যায়। এককথায় মানবকল্যাণ-বিরোধী যা কিছু সে সবই জেমসবন্ড সিরিজের ছবিগুলোতে প্রকটভাবে উপস্থিত। তাই মিঃ আন্দ্রেইয়েভ-এর মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলব, শুধু সোভিয়েট দেশেই নয়, আমাদের দেশেও এসব ছবি সহজভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত পৃথিবীর কোন শান্তিকামী মানুষই মানবকল্যাণ আদর্শের পরিপন্থী বর্ণ-বিদ্বেষ ও হিংসা, অপরাধমূলক ছবিকে সাদরে গ্রহণ করতে পারবে না।'

রোম্যান্টিক কবিমানস বাঙালীর মজ্জাগত। পূর্ববঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক কবিই এই রোম্যান্টিক মানসের অধিকারী। উদাহরণ স্বরূপ সিকানদার আবু জাফর-এর নাম করা যেতে পারে। বাঙালী সংস্কৃতির সবথেকে বড় ঐতিহ্যকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব—তাও পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকদের সাহিত্যে রূপ পেয়েছে, রূপ পাচ্ছে। দুই বঙ্গের সারস্বত প্রাণ নিত্য বহমান। স্রোতধারা ভিন্নমুখী বলতে কোন মতেই ভরসা পাই না। জীবন্ত হৃৎপিণ্ড অনবরত দুটি ধ্বনি তোলে—লাবডুপ... লাবডুপ...লাবডুপ...। দুই বাংলার যেন একটিই হৃদয়—আমরা—পশ্চিমবাংলা এবং পূর্ববাংলা আমাদের সাংস্কৃতিক হৃদয় বাঁচিয়ে রাখতে শব্দ তুলছি—লাবডুপ... লাবডুপ...লাবডুপ...

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভলু মাঝি হাত-পা নেড়ে মুকুন্দকে দেখিয়ে বললে, "অর কথা বিশ্বাস করবেন নি বড়বাবু—শালা হাঁড়ির মধ্যে সেপাই মারা কল করে রেখেছিল। আমি চরের যমুনা বোষ্টমীর কাছে খবর জেনেছি—সেখানে আরও পাঁচজনের কাছে খবর জেনেছি। বাড়ুয়া ওই মহেশ মন্ডল। ও চোরাই নুনের সব খবর জানে—এতদিন ছিপিয়ে আছে।"

ম্লানমুখেও মহেশের হাসি পেল। হেসে বললে, "বুঝেছি বড়বাবু, কে কোথা থেকে আপনাকে ভুল খবর দিয়েছে। ভিখারী বোষ্টম আর যত ভাঙড় নেশাড়ি মোকে বাড়ুয়া ঠাউরেছে। যার বিচার-বিবেচনা আছে—সে কি কখনো তাদের কথায় বিশ্বাস করে হুজুর!"

"বটে! বড় বড় কথা!" বড় কথা বড় বেশি বলতে পারে না বড় দারোগা—তাই হাত চলে জল্‌দি। উঠে খাঁই করে বসিয়ে দিলে মহেশের গালে এক চড়। মহেশ দু'পা পেছিয়ে গেল। ভলু আর একজন সাব-ইন্সপেক্টার আবার তাকে ঠেলে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে।

"শালা তুমি বাড়ুয়া হও কি না হও—চরের চাষা, আলবাৎ জানো তুমি চোরাই নুনের কারখানা।" বড় দারোগা গর্জে উঠল।

"মোকে মারতে চান মারুন বড়-বাবু।" অবিচলিতকণ্ঠে মহেশ বললে, "চর খুঁড়ে ফেললেও সেখানে নুনের কারখানা পাবেন না। মোরা গরীব চাষী—চাষ করি, খাই। নুনের খবর মোরা কি জানি!"

না, কোনো কথা আদায়-হলো না।

এবার মুকুন্দের পালা। গায়ে পর-নের কাপড়টার অর্ধেক জড়ানো, কাঁধে গামছা—বসে ছিল মাটিতে। তাকে এবার ধরে এগিয়ে দিলে ভলু আর সাব-ইন্সপেক্টার। শক্ত-কঠিন-ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছে সে—যেন প্রস্তুত। একাগ্র দৃষ্টিতে শুধু লক্ষ্য রেখেছে বড় দারোগার হাতের দিকে। দেখলে—মোটা মোটা আঙুলগুলো যেন পরস্পরকে চেপে পিষে ফেলতে চাইছে আস্তে আস্তে—মুঠো কঠিন হয়ে উঠল।

"শালা সাপ রেখেছ!" ঘুষি ছুঁড়লো মুখ লক্ষ্য করে।

মুকুন্দ মাথা নামিয়ে ঘুষি বাঁচালে। পেছনে—পাশে সরে যেতে চাইল।—ভলু আর সাব-ইন্সপেক্টার ঠেলে রাখলে।

মুকুন্দ দম নিয়ে বলে উঠল, "মোরা সাপ গোসাপ ধরে রাখি হুজুর—বাদিয়া কাকমারারা এসে চামড়া কিনে লিয়ে যায়। মোদের দোষ কি!"

অমন ঘুষি একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বড় দারোগা ক্ষেপে ছিল—কথা শুনে রাগের আর মাত্রাজ্ঞান রইল না। মুকুন্দের গায়ের কাপড় আর কাঁধের গামছা সব সুদ্ধ গলায় জড়িয়ে মারলে ঝটকা—যেন পায়ের তলার শানে আছড়ে থেঁতো করে দেবে একবারে।

হলো না—এবারও ফসকালো। দু' পাশে দুই খুঁটি—ভলু আর সাব-ইন্সপেক্টার, তার ওপরে ওই ছাতি-চওড়া কোঁড়া জোয়ান ছোকরা, টলবে কেন। মাঝখান থেকে ঝোঁক সামলাতে না পেরে বড় দারোগা নিজেই কাৎ হয়ে পড়তে পড়তে টেবিল ধরে রক্ষা পেয়ে গেল।

"কি করলি শালা—ফেলে দিলি বড়বাবুকে—এ্যাঁ, ধাক্কা দিলি!" বলতে বলতে ভলু মাঝি মুকুন্দের গলায় জড়ানো সেই গামছা আর কাপড় চেপে ধরলে শক্ত মুঠোয়। দাঁতে দাঁত চেপে পাক দিতে লাগল। আস্তে আস্তে চেপে বসতে লাগল সব সুদ্ধ। কপালের শিরা ফুলে উঠতে লাগল মুকুন্দের—চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল। হাঁ-করা মুখ থেকে জিভ বেরিয়ে এল। আকুলি-ব্যাকুলি দুটো হাত নিজেকে রক্ষা করবার শুধু ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

না, কেউ তাকে রক্ষা করতে এল না। সামনে দাঁড়িয়ে বড় দারোগা তাকে দেখছে। অদ্ভুত ঠান্ডা নিরীহ দুটো চোখ।

ছুটে এল মহেশ মন্ডল। ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল।

"মরে যাবে—মরে যাবে লোকটা। বিচার করুন হুজুর—দন্ড দিন।"

"মেরে ফেলাব শালা—আজ শেষ করে দেবো তোকে"—

একটা অন্ধ ক্ষেপা জানোয়ারের আক্রোশ যেন ঠিকরে বেরুতে লাগল ভলু মাঝির চোখে—হিংস্রতায় ভয়াবহ হয়ে উঠেছে দাঁত চাপা মুখ। বুকের

ভেতরে কুরে কুরে খাওয়া বহুদিনের একটা আক্রোশ সুযোগ বুঝে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তার খবর দারোগা জানে না, মহেশ জানে না—মুকুন্দও জানে না।

তিনজনের ধস্তাধস্তির মাঝখানে হঠাৎ কি হলো কে জানে—আচমকা মুকুন্দের গলার গামছা ছেড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় দম বন্ধ করে ছটফট করতে লাগল ভলু। আর তার ওপরে ধপ করে পড়ে গেল মুকুন্দ। এত হাওয়া—বুক ভরে সহসা এত হাওয়া পেয়ে সমস্ত চেতনা যেন তার মুহূর্তে কেমন ঝিম মেরে এল। তাদের বড় গাঙের টাঁকার সেই ঘূর্ণির মত সারা দুনিয়াটা ঘুরতে ঘুরতে মধ্য-বিন্দুতে এসে কোন অন্ধকার অতলে যেন তলিয়ে গেল।

সাব-ইন্সপেক্টার ঝুঁকে পড়ল ভলুর ওপরে. "এ্যাই—কি হলো তোর!—এ্যাই!"

কথা বলার অবস্থা তখন নেই ভলুর। কথা বললে মহেশ মণ্ডল, "খানে-অখানে কি রকম লেগে গেছে বোধহয় ছোটবাবু—যা করছে।"

কিন্তু সেই দমবন্ধ ছটফটানির মধ্যেই কি যেন বলতে চেয়ে ভলু একবার শুধু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে মহেশ মণ্ডলকে।

তেরছা চোখে চেয়ে বড় দারোগা বললে, "হাজতে রাখ দুব্যাটাকেই। বিকেলে আবার দেখা যাবে।"

॥ আট ॥

রাত অন্ধকার। ভালো দেখা যায় না। কে একটা লোক খানক্ষেতে নেমে, [illegible] ছে থমকে থমকে।

চৌকিদার ভলু মাঝি হেঁকে তুললে, "কে—কে ওখানে?"

"আমি কিস্ট দাস। তুমি কেডা।"

"চৌকিদার ভলু মাঝি।" ভলু বললে, "ওখানে কি কর?"

কিস্ট দাস বলল, "রাস্তা খুঁজছি।"

"রাস্তা খুঁজছ খানবনে নেমে।" ভলু হেসে বলল, "নেশাটা আজ বেশ জমাটি মনে হচ্ছে কিস্টদাস!"

কিস্টদাস বলল, "নেশার দোষ দিও নি চৌকিদার—ই শালার রাস্তাটাই খারাপ। হেই ছিল ঠিক—এতটা চলে এলম গড় গড় করে—তো দেখ, শালার রাস্তা হেই ঢুকে গেল খানবনে। সেই তখন থেকে খুঁজছি।"

"আর খুঁজতে হবে নি—উঠে পড় বাঁধে।" ভলু মাঝি ওকে হাত দিয়ে তুলে নিলে বাঁধের ওপর। বলল, "সাপ-খোপ কত কি থাকতে পারে—মরবে কোনদিন অপঘাতে। তোমার সঙ্গে তো লণ্ঠন থাকে—সে আজ গেল কোথায়?"

"আর মশয়।" কিস্টদাস ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "হারামজাদীর বেটি কেড়ে রেখে"

"যমুনা?"

"হ্যাঁ গো—তবে বলছি কি!"

"কেন?"

"নেশার দাম। আগের একদিন ক গণ্ডি পয়সা বাকি ছিল—আর আজ ক গণ্ডি।" কিস্টদাস সঙ্কোচে বলল, "তা বলে আবাগীর বেটি মোর লণ্ঠন কেড়ে লিবি? বলে, বাকি মেটাও—তবে লণ্ঠন পাবে। বুঝলে—এক নম্বর চামার।"

লোকটার অভিযোগ হাজারটা। এক-ভাবে সে বকবক করে চললো। ভলু মাঝির সেদিকে না আছে মন—না আছে কান। কোনো রকমে তাকে সোজা বাঁধ রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে সে ঘুরে চললো যমুনার কুঁড়ের দিকে।

রাত হয়েছে বেশ। নেশার আড্ডা ভেঙে গেছে। একা ভাগুড়দাস ঝিমোচ্ছে এক কোণে বসে বসে।

ভলুকে দেখে যমুনা খিলখিল করে হেসে উঠল। চোখ ঘুরিয়ে বলল, "আসবে—এ ঠিক জানতাম। ভার-ছিলাম—দেরি হয় কেন।"

"দেরি করেই এলম যমুনা।" ভলু গলা নামিয়ে বলল, "পাঁচজনের সামনে সব কথা কি হয় যমুনা!" তারপর চোখ খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "বাবাজী ঘুমিয়েছে?"

সুযোগ বুঝে যমুনা বললে, "তার কথা আর বলো নি চৌকিদার। আজ সব মাল চেটেপুটে ফাঁক করে ওই হোথায় নেশায় টইটম্বুর হয়ে ঝিমোচ্ছে। এখন বলো—কাল আমি কি জোগান দিব! বলে—তোর চৌকিদারদাদা আছে, ভয় কি যমুনে।"

"হাই দেখ—আজ বিকালে ছোট দারোগা সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের আবগারী দোকান থেকে ঘুরে এলম।" ভলু বললে, "একটা খদ্দের নাই গো। ভলান্টিয়াররা বসে রইল তো মোরাও সেপাই-চৌকিদার কজন বসে রইলম। শেষমেস সরকারবাবু বিরক্ত হয়ে বলল, 'ধুত্তোর—চল।' কেষ্ট মাল কিনতে আসবে—তবে তো মোকাবিলা হবে।"

যমুনা বলল, "ভয়-ডরে কেউ ঘেঁষছে না গো—কি গোলমাল বেধে যাবে তার ঠিক কি!"

"সেই কথা তো আমি বললম সরকারবাবুকে। তা সরকারবাবু বলল—তুই লোক জোগাড় করে আন, দেখে নি ব্যাটাদের।" ভলু বলল, "কাল তুই চল মোর সঙ্গে—যাতো আজ চাস, ব্যবস্থা করে দিব।"

"আরি বাপরে—মোকে দিয়ে আর হবে নি দাদা, ও চ্যাংড়াদের ঠেলে আমি যেতে পারব নি।" যমুনা ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল। বলল, "সেদিন কে মোর হাতে ধরে, কে মোর পায়ে ধরে। কে মোকে দিদি বলে—কে বলে মা জননী। ওর মধ্যে আমি পারব নি। ও তোমাকে করতে হবে দাদা।"

ভলু একটু ভেবে বলল, "তবে এক কাজ কর। তোর আড্ডার নেশাড়ীরা তো আছে—কিস্টদাস আছে, গোলক আছে, জিতু আছে—আরও তো সব কে কে আছে, ওদের মোর সঙ্গে দে।"

"সে পারব।"

"তবে আর কি!" ভলু বললে, "ছোট দারোগাবাবু থাকবে—মোরা থাকব। ভয় নাই। তুই শুধু লোক-গুলানকে এক জোট করে মোর সঙ্গে দে।" তারপর গলা নামিয়ে আস্ফালন করে বলল, "ভলু মাঝির অসাধ্য কিছু নাই। বলি দেখলি তো—হুজুর দুজনকে কেমন হাজতে ঢুকিয়ে দিলম।"

"তা দেখলম। ছোট মণ্ডলের ব্যাটারা তো ক্ষেপে ফোঁস ফোঁস করছে—চক্রের চ্যাংড়াদের নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে।" একটু থেমে যমুনা হেসে বললে, "আর লখন তোমার কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।"

"কাঁদছে না?"

"সে তো মুকুন্দের মা।" যমুনা বললে, "তার চেল্লানি গাঙ পেরিয়ে সোঁদরবন কাঁপিয়ে দিচ্ছে।"

"তো মোর কাজ কতদূর কি করলি?" ভলু বলল, "ঢুকিয়ে দিয়েছি হাজতে—এই সুযোগ।"

যমুনা মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললে, "হবে। মোর কাজে ফাঁকি নাই।

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
মান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সুজন

খায়রুল বাসার

গাড়িটা প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ানোমাত্র কিছুটা সামনের টানে বাকিটা পিছনের ঠ্যালায় এবং কারও ঘাড়ের পাশ দিয়ে কারও বগল গলে, মোটমাট খুব জটিল অথচ খুবই সংক্ষিপ্ত এক প্রক্রিয়ায় শ্যাম-সুন্দর কামরার মধ্যে এসে পেঁছে গেলেন। কিছুই তাঁকে করতে হয় নি। টানায় ঠ্যালায় যেন সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে তাঁকে প্লাটফর্ম থেকে গাড়ির কামরার মধ্যে তুলে ফেলা হয়েছে। নিজের কিছু বলতে শুধুমাত্র গাড়িটা ধরার ভয়ঙ্কর তাগিদ। তবু তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

কামরার ভিতরে আরও গুচ্ছের লোক আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, যার মানে বসার ঠাঁই আর একটুকুও পড়ে নেই, দেখে তাঁর মেজাজ খিঁচড়ে গেল। গাড়ি নড়ে-চড়ে উঠতে কেবলমাত্র হাঁপানোর ঝামেলা চুকিয়ে ফেলার জন্যেই তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। রাস্তাঘাটে লোকজন এত বেড়ে গেছে আজকাল, পথে বেরোনোই দায়। সর্বত্র লোকে গিস্‌গিস্ করছে। আর যত লোকের কাজই যেন শুধু শহর কলকাতায়। আর সব কটা গাড়িই যেন অফিসে যাওয়ার গাড়ি। রেল-ওয়ে অথরিটিও হয়েছে অপদার্থ, ক্যালাস—আরে, হয় গাড় আরও বাড়াও, নয় কামরা আরও বাড়াও। কিছু একটা তো করতে হয় বাপু! লোক যে-হু-হু করে বেড়ে চলেছে তা তো আর রাতারাতি নয়। ধীরে ধীরে বাড়ছে, দিনের পর দিন, দিনের পর—।

পিছন থেকে তাঁর পাঞ্জাবীতে টান পড়ল। চরম অসভ্যতা! বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকালেন শ্যামসুন্দর। ছোকরা একটা, পিছনের সীট থেকে আধো-ওঠা ভঙ্গিতে বলছে—এই যে, আপনি বসবেন? আসুন না।

মন মুহূর্তের মধ্যে খুশিতে ভরে উঠল। কিন্তু জায়গাই বা আর কোথায়! একটি মাত্র সম্ভাবনা, যা আপাত পরাহত, ছেলেটা স্বার্থত্যাগ করবে। শ্যামসুন্দর ম্লান হেসে বললেন, থাক, থাক, বসবার জায়গাই বা কোথায়।

ছোকরা চটপট উত্তর দিল, আসুন, আসুন, জায়গা ঠিক হয়ে যাবে। এই যে দাদা, একটু পা নামিয়ে বসুন তো। দাদা, সামান্য একটুখানি সরে। দেখছেন তো, বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ব্যস ব্যস, আসুন বসুন।

আশ্চর্য! সত্যি সত্যি কোনমতে তাঁর বসবার মত একচিলতে জায়গা বেরিয়ে পড়ল। শ্যামসুন্দর ঝুপ করে বসে পড়লেন। দিব্যি করিৎকর্মা এবং ভদ্র ছোকরা। কতই আর বয়স হবে। তাঁর সুজনেরই মত—ছাব্বিশ-সাতাশ। এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এতগুলি দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষের ভিতর থেকে তাঁকেই বেছে নিয়ে এই দুর্লভ জায়গাটুকু পাইয়ে দেওয়ার জন্য ছেলেটা তাঁর ধন্যবাদার্হ বৈকি। একদিক দিয়ে স্পষ্টতই তিনি এই সুযোগ পাওয়ার যোগ্যতম প্রার্থী। কেন না তাঁর চেয়ে প্রবীণতর আর কাউকেই চোখে পড়ছে না। অন্য একদিক থেকেও তো তিনি যোগ্যতম। কিন্তু সে-কথা কেই বা মনে রাখে! তাঁর সুজনই কি রেখেছে? কী অবান্তর চিন্তা! রীতিমত হাস্যকরও। ট্রেনের কামরায় এই অচেনা-অজানা মানুষদের ভিড়ে কি করেই বা তিনি আশা করেন, লোকে তাঁকে গোপালনগর হাই-স্কুলের ইদানীং অবসর-প্রাপ্ত স্বনামধন্য হেডমাস্টার বলে সম্মান দেখাবে! শ্যামসুন্দর আড়চোখে ছেলেটির দিকে তাকালেন। প্যাণ্ট-সার্ট পরা সপ্রতিভ তরুণ। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। তাঁকে চেনে এমন কোন লক্ষণ পরিস্ফুট নয়।

সুজনটা তাঁর মানুষ হল না। সুজন একেবারে বয়ে গেছে। সহজ হয়ে বসার জন্যে শ্যামসুন্দর একবার গা নড়ালেন। সুজন তাঁর পরোয়াই করে না। সুজন পাড়ার লোকের নিন্দে-মন্দ কুড়োচ্ছে। তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর নাম ডোবাতে বসেছে। এখন আর কোন কিছুই তাঁর আয়ত্তের মধ্যে নেই। কিছুকাল আগেও সুজনকে সামনে পেলে তাঁর মধ্যে যে পুরুষ অভি-ভাবকত্ব চাড়া দিয়ে উঠত, এখন তা অনুপস্থিত। তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তিনি দর্শকমাত্র। নির্লিপ্ত নির্বি-কার? বলা কঠিন। দর্শকও হেসে ওঠে, হাহাকার করে। সুজনের ব্যাপারে তাঁর হেসে ওঠার কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে কি, হাহাকারও তিনি ঠিক করছেন না। এই যে এখন তিনি অনুপম চৌধুরীর কাছে এত হাঙ্গামা পুইয়ে ছুটে চলেছেন, কই তাঁর অন্তর কি হাহাকার করছে? করছে হাহাকার? আসলে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন নিজের মধ্যে। শামুকের

মৃত? হতেও পারে। মৃত শামুককেও কখন তিনি প্রসারিত অবস্থায় দেখেছেন কি-না মনে করতে পারছেন না। খুব সম্ভব শামুকের মৃত্যুও তার খোলার মধ্যে গুটিয়ে-সুটিয়ে।

নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিচ্ছেন। অনেককাল ধরে অনেক কাজ তিনি করেছেন। সুবোধ মিত্তির, আই-এ-এস—কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি, তাঁর ছাত্র। রমেশ চক্রবর্তী হাইকোর্টের নামকরা এ্যাডভোকেট, তাঁর ছাত্র। সিটি কলেজের কৃতী অধ্যাপক তরুণ ঘোষ, তাঁর ছাত্র, আর যে অনুপম চৌধুরীর কাছে তিনি ছুটে চলেছেন, সরকারের অন্যতম চীফ ইঞ্জিনীয়ার, অনেক বিরাট বিরাট কিছু যে এখন গড়ছে—সেই অনুপমের ভিতই তাঁর হাতে গড়া। তাঁর কৃতী সফল ছাত্রদের তালিকা দীর্ঘই বলতে হবে। তাদের সবাকার ভিত তিনি গড়ে দিয়েছেন। সুজনকেই তিনি গড়তে পারলেন না। সুজন তাঁর আর পরোয়াই করে না। সুজন তাঁর আয়ত্তের মধ্যে নেই। সুজন বয়ে গেছে। সুজন বোস মানে এক বেয়াড়া বখাটে বয়ে-যাওয়া ছোকরা, যার কোন ভবিষ্যৎ নেই, সমাজে যার কোন স্থানই নেই। থাকা সঙ্গত বলে তিনি অন্তত মনে করেন না। কখন সে বাড়ি থেকে বেরোয়, কখন সে ফেরে, তার কোন সময়-অসময় নেই। সে বিড়ি-সিগ্রেট খায়। ভগবানই জানেন আরও কিছু খায় কি না। হৈ-হল্লা, জুয়া, জুয়াচুরি এসব নিয়েই পড়ে আছে। সে ম্যাট্রিকটুকুও পাশ করে নি।

বিস্বাদ শ্বাস-প্রশ্বাসকে উড়িয়ে দেবেন বলে শ্যামসুন্দর একটা হাই তুললেন। তাঁর আর বেঁচে থাকা কী জন্যে! সঙ্গে সঙ্গে নড়ে-চড়ে বসলেন তিনি। এ কি বদচিন্তা! সোজাসুজি না হলেও কথাটা নিজের সম্পর্কে ইদানীং প্রায়ই বলে থাকে হেমাঙ্গিনী। এবং তা তার মুখেই শোভা পায়, শুনলে তিনি করুণার হাসিই হাসবেন। এবং কথাটা কি এই নয় যে, হেমাঙ্গিনীর প্রতি অগাধ করুণাবশতই তিনি এত হাঙ্গামা পুইয়ে আজকে অনুপম চৌধুরীর কাছে ছুটে চলেছেন। অনুপমের পিসতুতো বোনের কোন এক সুবাদের আত্মীয়ার সন্ধান কিভাবে যেন হেমাঙ্গিনী পেয়ে গেছল। সেই থেকেই চলেছে ঘ্যানর-ঘ্যানর, যাও না একবার অনুপমের কাছে। গিয়েই দেখ না। কত লোককেই তো হামেশা চাকরি দিচ্ছে অনুপম। সুজনকে আর পারবে না!

আগাগোড়া করুণার যোগ্য ব্যাপার! অনুপমের পিসতুতো বোন, তার আবার কোন্ এক সুবাদের আত্মীয়া! আরে, অনুপমের ভাবৎ সংবাদই না তাঁর নখদর্পণে। কবে সে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হল, কবে সে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার হল এবং কবে থেকেই বা চীফ ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে। অনুপম তাঁর সাফল্যের মণিমালায় সেরা হীরের টুকরোটি নয়! অনুপম চীফ ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে, অনুপমের কাছে এর বেশি আর কী তিনি চাইতে পারেন! অবশ্য একেবারেই কিছু চাইবার ছিল না, তা নয়। অনেকদিন ধরেই খুব মনে মনে তিনি চাইছিলেন। পদমর্যাদার শিখরে আরোহণ করতে করতে মাঝে মাঝে অনুপম তাঁর কাছে একবার একবার আসবে, তাঁকে প্রণাম করবে, অন্তত তাঁর খোঁজ-খবর নেবে। অন্তর সেই দিক থেকে বুভুক্ষু। কালক্রমে তিনি অনুপমকে সহজভাবে ক্ষমা করতে চেয়েছেন। অনুপম আজ ব্যস্ত-সমস্ত দায়িত্বশীল এক বিরাট ইঞ্জিনীয়ার নয়!

খুব নিঃসংশয় হতে পারেন নি অবশ্য। তাঁর কৃতী স্বনামধন্য ছাত্ররা কেউই তাঁর খোঁজ নেয় না। তাঁর নিজের দিক থেকে তিনি শুধু খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের ক্রমারোহণের ধাপগুলো মুখস্থ করে রাখেন। ভেবে দেখতে গেলে, এবং এভাবে অনেকবারই তিনি ভেবে দেখেছেন, এইটুকুই যথেষ্ট নয়। তিনিও তো পারতেন তাদের এক-একজনের কাছে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাণী পাঠাতে। পারতেন তো, অন্তর অবারিত করে তাঁর উল্লাসের ধ্বনিটুকু তাদের কানে পৌঁছে দিতে! এক্ষেত্রে অধিকারভেদের প্রশ্ন ওঠে কিভাবে এবং সে-প্রশ্ন কি সত্যিই তিনি নিজের কাছে কখনও তুলেছেন! এই পনেরো বছরে সুজন তাঁর ধাপে ধাপে নিচের দিকে নেমেছে আর তিনি, কোন সন্দেহ নেই, অহেতুক, অনর্থক অথচ অনিবার্যভাবে—

দুত্তোর ছাই! এ-ছোকরা তো মহা জ্বালাতন করছে। মুখে ধরিয়েছে একটা সিগ্রেট আর ভস্ ভস্ করে ধোঁয়া ছাড়ছে তাঁরই নাকের সামনেটায়। কি বিশ্রী গন্ধ। তিনি আড়চোখে তাকালেন ছোকরার দিকে। দিব্যি ভদ্র চেহারা। আচরণও ভদ্র মনে হয়েছিল বৈকি—উদ্যোগ-আয়োজন করে তাঁর বসবার জায়গা করে দিয়েছে। সেই মানুষই এখন যেভাবে স্বচ্ছন্দে সিগ্রেট টেনে চলেছে তাঁর পাশে বসে বসে, তাতে মনে করা অসম্ভব যে, তাঁর অসুবিধা, তাঁর সম্ভ্রমের প্রতি বিন্দুমাত্র তার কোন চৈতন্য আছে। ক্লান্তভাবে ভাবলেন শ্যামসুন্দর, এখন এবং কিছু আগেও তিনি কি ছিলেন শুধুই করুণার পাত্র? জড়ানো পাকানো জটিল এক বিরক্তিতে তিনি উল্টোদিকে মুখ ফেরালেন। আজকালকার ছোকরাগুলোই এমনি চ্যাটা। গোটা জাতটাই একত্রে গোল্লায় চলেছে—দুর্দান্ত, নিষ্ঠুর, সম্ভ্রমহীন, সহানুভূতিহীন, জান্তব—না, ঠিক জান্তব বলা যায় না, যান্ত্রিক এক গতিতে। ভয়ঙ্কর শ্রুতিকটু এক শব্দে তাঁর ভাবনা আহত হল। শ্যামসুন্দর গোটা শরীরে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। ভুরু কুঁচকে তিনি দেখলেন গাড়িটা থেমেছে। অকারণে তাঁর হাসি পেল।

হাওড়ায় নেমে অগাধ ভিড়ের মধ্যে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন শ্যামসুন্দর। প্রতিটি মানুষ ব্যস্ত। যে করেই হোক শুধু এগিয়ে যেতে চায়। ধাক্কা মেরে বা ধাক্কা খেয়ে কিছুতেই হুঁশ নেই। অথচ সর্বসাকুল্যে গতি মন্থরই বলতে হবে। ভেবেছিলেন ট্যাক্সি করবেন। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে জড়িয়ে-মড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বেরিয়ে এলেন অন্যপথে, যেখান থেকে ট্রাম-বাসগুলোই সামনে পড়ে। মানুষ এখানটায় ছড়িয়ে পড়ছে। বিশৃঙ্খ এককভাবে নয়, পারস্পরিক সম্প্রবহীন ছোট ছোট দলে। হাওড়ার পোলের যেটুকু দেখা যায়, চলমান মানুষে ঠাসা। গাড়ি-ঘোড়ার হুড়োহুড়িকেও যেন ছাপিয়ে যাচ্ছে। বিশাল যান্ত্রিক গতিবিধি। ক্লান্তিকর। অথচ শ্যামসুন্দরের এই মুহূর্তে জেদ চেপে গেল, বাসেই উঠবেন। এক ধরণের যান্ত্রিক ঔদাস্যে নিজেকে আড়াল করে নিয়ে, বলা চলে যথেষ্ট সাবলীল ভঙ্গিতে, তিনি দুখানা রুখে-দাঁড়ানো ট্যাক্সির মাঝের হাতখানেক ফাঁক দিয়ে গলে, একখানা দোতলা বাসকে আচমকা রুখে যেতে বাধ্য করে, একে ঠ্যালা মেরে, ওকে গুঁতো মেরে, স্ট্যাণ্ডে গোত্তাতে থাকা একখানা বাসের দরজার মুখে এসে বীভৎস জটলার মধ্যে মিশে গেলেন। একেবারে একাকার হয়ে। সাফল্যের আনন্দের মত এক ধরণের আনন্দের মাঝে ভাসতে ভাসতে তিনি ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। যদিও তাঁর লক্ষ্যে পড়ছিল, তাঁদের সবাকার আনন্দের তোড়ে ও কলরোলে বৃদ্ধ একজন বাস থেকে নামতে নামতে যেন তলিয়ে যাচ্ছিলেন। কখনও তাঁর মাথার ধপধপে সাদা চুল, কখনও তাঁর রেখায় কুটিল মুখের অংশ বিশেষ, কখনও ডুবন্ত মানুষের হাতের মত উঁচিয়ে থাকা তাঁর হাতের কাকুতি টুকরো টুকরোভাবে তাঁর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাসের ভিতরে যেখানটায় এসে তিনি দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন, সেখানে একটি মহিলা-আসনে একজনমাত্র তরুণী বসে আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন পিছন থেকে তাঁর বগল গলে এক ছোকরা সুট করে এসে সেটিতে বসে পড়ল। তিনি ভ্রূক্ষেপই করতে চাইলেন না, যদিও লক্ষ্য করলেন, ছোকরা এইভাবে বসতে পেয়ে বেশ পরিতৃপ্ত।

অনুপম চৌধুরীর বসবার কামরায়

বুক রীতিমত গুর-গুর করতে শুরু করে দিয়েছে। উপলক্ষ? না, তিনি আর দু'-চার মুহূর্তের মধ্যে অনুপম চৌধুরী, মানে কথা তাঁর সাফল্যের মণিমালার উজ্জ্বলতম রত্নটির মুখোমুখি বসবেন। তার কাছে আর্জির মত কোন একটা বক্তব্য পেশ করবেন। আর্দালীটা এসে খবর দিল, সাহেব আপনাকে একটু পরে ডাকবেন। বসুন এখানে। এবারও শ্যাম-সুন্দর ম্যাড় ম্যাড়ে এক ধরণের স্বস্তিই মাত্র পেলেন। মন্দের ভাল। কুশন চেয়ারে তিনি একটু আলগো হয়ে বসলেন।

অনুপম শ্লিপ দেখে তাঁকে চিনতে অবশ্যই পেরেছে। না পারলেই বা তাঁর কী করার ছিল। অনুপম মানুষের মত মানুষ হয়েছে। কোন একটা গুরুতর বিষয়ে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে তার ভাবনা। তার কামরা, যার দরজাটা বেয়াড়া লম্বাটে নক্সাকাটা কাঁচের, তার বিরাট ভাবনার সূতিকাগার শান্ত, স্তব্ধ, প্রাণ, মানে কথা, প্রাণের কুৎসিত কোলাহল বর্জিত। অনুপমের বসার আসন অবশ্যই উঁচু। অনুপমের বেতন......। স্থূল চিন্তার গতিটা শ্যামসুন্দর বিরক্ত হয়ে রুখে দিলেন। সুজন এতক্ষণে কোথায়! অসভ্য অমানুষ জানোয়ারটা হয়তো এতক্ষণে জগৎ সংসারের তাবৎ গতি থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন এক চায়ের দোকানে আড্ডা মারছে। যদিও এখন ভর দুপুর। বাড়িতে গেলবাব জন্যে, শুধুই পেটটা ভরাবাব তাগিদে, উদ্দেশ্যে ও অধিকাবে, সচরাচর তার ফেরার সময় হল বেলা দেড়টা থেকে দুটো। এরপর সে ঘুমোবে, জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের কাল ভবিষ্যতের অনন্ত তমিস্রায আত্মবিসর্জন দিয়ে।

দরজাটা খাপছাড়া মত লম্বা, তাই মনে হল শ্যামসুন্দরের, নক্সাকাটা কাঁচের যা দিয়ে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। দরজার সামনে দু'জন আর্দালী। আশে-পাশে কোন কোলাহল নেই। ভেবে দেখলেন শ্যামসুন্দর, ট্রেনে ওঠা থেকে শুরু করে অনুপমের অফিসের বারান্দা পর্যন্ত যত কোলাহলের সম্মুখীন তিনি হয়েছেন, অনুপমের কামরার সামনে এসে তা যেন হঠাৎ থমকে গেছে। এখানকার অর্থাৎ এই দরজার সামনের দু'-তিন হাতের মধ্যে, আর্দালী দু'জনের হাবেভাবে, বেখাপ্পা লম্বাটে নক্সাকাটা কাঁচের দরজাটায় একটা জমাট সমীহের ভাব ভয়ঙ্কর প্রকট। দরজা ঠেলে আপন ইচ্ছায় ঢুকে পড়ার যে উপায় নেই এটা তিনি বুঝতে পারলেন মাত্র। আর্দালীদের একজন যখন জিজ্ঞেস করল, কি চান. তিনি স্বস্তি পেলেন। বললেন, অনুপম আছে?

আর্দালীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল দেখতে পেলেন। অন্যজন সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, সাহেব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে ইয়ে, চৌধুরী সাহেব। তিনি দেখলেন, ওদের একজন যন্ত্রের মত হাত বাড়িয়ে দরজার মাঝ-বরাবর ঝুলতে-থাকা শ্লিপের গুচ্ছ থেকে একখানা শ্লিপ ছিঁড়ে নিয়ে তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরল। বলল, পাশের কামরায় বসে লিখুন।

নীল রং-এর একফালি পর্দা ঠেলে শ্যামসুন্দর দেখতে পেলেন ছোট্ট একটা ঘর। তিনি আরও স্বস্তি পেলেন। গদি-আঁটা আসনে টুপ্ করে বসে পড়ে ঘাড় কাত করে শ্লিপে নামধাম লিখলেন। তারপর আরও যা লেখার, কী উদ্দেশ্যে তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান, তা তাঁকে ভেবে দেখতে হল। ভাবতে শুরু করেছিলেন, এ-সময় আর্দালীটা এসে তাগাদা দিয়ে শ্লিপটাকে আধলেখা অবস্থায়ই আদায় করে নিতে তিনি আবার স্বস্তি পেলেন। অথচ তিনি সেই সঙ্গেই বুঝতে পারলেন, তাঁর শরীরের যেন কোন ভার নেই। মনেরও নেই। তাঁর গোটা সত্তারই নেই। মরিয়া হয়ে মনটাকে তিনি কোন কিছুর ভাবনাতে ভরিয়ে ফেলবেন ভাবলেন। ভব্যতা যেন আজকাল উঠেই গেছে দুনিয়া থেকে। বাসে ওঠার মুখে পাওয়া বৃদ্ধা মহিলাটির কথা ভাব-বার চেষ্টা করলেন। তিনি নামতে চাই-ছিলেন বাস থেকে অথচ বীভৎস ঠেলা-ঠেলির মধ্যে যেন তলিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর ঠোঁট সমানে নড়ছিল, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। কানে কিছু শুনতে পান নি। কী বলতে চাইছিলেন মহিলাটি? দুর ছাই! তিনি তাঁর ভার ফিরে পাচ্ছেন না কেন! এবং কী লজ্জার কথা, তাঁর

দাঁত, উজ্জ্বল, সুন্দর, সুদৃঢ় এবং
মাঢ়ী সুস্থ নীরোগ রাখতে
ব্যবহার করুন
বেঙ্গল কেমিক্যালের
কার্বলিক টুথ পাউডার
কার্বলিক অ্যাসিড উপাদানে বিশেষ শক্তিশালী

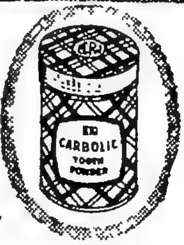

বীজাণুনাশক, দুর্গন্ধ-নিবারক কার্বলিক অ্যাসিড থাকার দরুণ এই টুথ পাউডার ব্যবহার করলে আপনার দাঁত হবে উজ্জ্বল, সুদৃঢ় এবং মাঢী সুস্থ নীরোগ থাকবে। প্রতিবার দাঁত মাজার পর আপনার মুখ আরো বেশি তাজা, পরিষ্কার, ঝরঝরে মনে হবে।

কস্‌মেটিকস্ ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী • মাদ্রাজ

অথচ এই বিপুল অবক্ষয় হেমাঙ্গিনীর মনে রেখাপাত করে না। শতবার তিনি দেখেছেন, হেমাঙ্গিনী ঘুমন্ত সুজনের বালিশ সিধে করে দিচ্ছে। তার অর্থাৎ কি না সাতাশ বছরের এক অধঃপতিত অকালকুষ্মাণ্ড ধেড়ে খোকার বেঁকে-যাওয়া ঘাড় সস্নেহে সোজা করে দিচ্ছে, তার গায়ের চাদর টেনে দিচ্ছে। বাৎসল্যের উদ্ভট আধিক্য, যা তিনি কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারেন নি। তিনি চেয়েছেন, এমন কি সুবোধ তখনও আজকের সুবোধ হয় নি বা রমেশ বা তরুণ বা অনুপম কেউই আজকের মত পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠে নি, সুজন হোক সুবোধের মত বা রমেশের মত বা অনুপমের মত, মানে কথা, কৃতী ছাত্র কীর্তিমান সফল মানুষের মত মানুষ। আর হেমাঙ্গিনী চেয়েছে, বারবার একই-ভাবে একই মাত্রায় একই ছন্দে, তাকে পর পর পাঁচটি কন্যার পর একমাত্র পুত্র হিসাবে দেখতে। কৈফিয়ৎ সুস্পষ্ট।

—অনেক ছেলেকে তো নিজের ছেলে মনে করে মানুষ করলে, নাই বা একটা মানুষ হল। ওর আমার মানুষ হয়ে দরকার নেই, বেঁচে থাকলেই হল। ঠাকুর সেটুকু প্রার্থনা মঞ্জুর করলেই তরে যাই।

ঠাকুর হেমাঙ্গিনীর প্রার্থনা আন্তরিকভাবে মঞ্জুর করেছেন বলা যায়। সুজন যখনও হয় নি, তিনি বলতেন, হেমাঙ্গিনীর আক্ষেপের মুখোমুখি হয়ে, ওতে আর দুঃখের কী আছে? কেন মেয়েরা কি আমার সন্তান নয়? আর কত ছেলেকে তো নিজের হাতে গড়ছি—তারাও তো আমার ছেলেরই মত। অন্তত আমি তো তাই ভাবি।

সুজন জন্মাবার আগে তাঁর এসব কথায় হেমাঙ্গিনী কোনদিনও শান্তি পেয়েছে লক্ষ্যে পড়ে নি। তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুজন জন্মাল। হেমাঙ্গিনীর মন কানায় কানায় ভরে উঠল। আর আশ্চর্য। সুজন কালে কালে কলায় কলায় ষোলআনা গোল্লায় যাওয়ার পরও হেমাঙ্গিনীর অন্তর তেমনিই কানায় কানায় পরিপূর্ণ। যা তাঁর বেলায় কিছুতেই ঘটে উঠল না। তিনি রিক্ত। তিনি পরাজিত। সুজনের কাছে তো বটেই, তার চেয়েও ভয়ঙ্করভাবে হেমাঙ্গিনীর কাছে। হয়তো কাউকে ক্ষমা করতে পারলে ভাল হত। কাকে? সুজনকে? হেমাঙ্গিনীকে? নিজেকে?

ক্লান্তভাবে তিনি সাব্যস্ত করলেন, বরং অনুপমকে বলা যেতে পারে; হ্যাঁ এসেছিলাম এদিকে একটা কাজে। ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই। অনেকদিন তো দেখা হয় নি [আর কদিনই বা আছি!]। যাক্ গে, শোন ইয়ে [দূর ছাই, এত ইতস্তত করার কিছু নেই], তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, অনুপম। একটা কাজ মানে চাকরির ব্যবস্থা করে দাও দেখি। সুজনের জন্যে। সুজন, মানে আমার ছেলে [হা ভগবান] ও হতভাগাটা তো মানুষ হল না। একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। ম্যাট্রিক পাশও করে নি। একবার পরীক্ষা দিয়ে ফেল করল। তারপর আর পরীক্ষাই দিল না। চুলোয় যাক। আমার একটা কর্তব্য আছে তো, সেটুকুই করা। হতভাগাটা কেন ভিক্ষে করে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরবে, তাই একটা গতি করে যাওয়া। যে-কোন কাজ। এমন কি কেরানী হবারও তো ক্যালিভার নেই ওর। পিওন, কুলি, মজুর যা হয় একটা কিছু দেখে দিলেই হবে। মানে, আমি তো পারশোন্যালি মনে করি, হতভাগাটার ওর চেয়ে বেশি কিছু পাওনা নেই। মরুক গে......।

আর্দালীটা এসে খবর দিল, সাহেব আপনাকে ডেকেছেন। শ্যামসুন্দর যেন প্রবল এক অদৃশ্য ধাক্কায় কেঁপে উঠলেন। নড়বড়ে পায়ে, আর আশ্চর্য, তিনি যেন ইতিমধ্যে জগদ্দল পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছেন; আর্দালীটার পিছু পিছু শ্যামসুন্দর এগোতে লাগলেন। বেয়াড়া লম্বাটে নক্সাকাটা কাঁচের দরজাটা সামান্য ফাঁক হল। তিনি ঘরে ঢুকে দেখলেন, অনেকটা দূরে বিশাল এক টেবিলের ওপারে অনুপম বসে আছে। একা নেই। সামনে অন্য একজনও আছে। অনুপম মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল। একটু হাসল। বলল, আসুন মাস্টার মশাই, বসুন। ও কিন্তু উঠে দাঁড়াল না; শ্যামসুন্দর লক্ষ্য করলেন। এগিয়ে এসে বসলেন একসারি চেয়ারের একখানা দখল করে। অনুপম অন্য মানুষটির উদ্দেশে বলল, তা হলে আসুন নবকাকা, আমার অন্য কাজ আছে।

নবকাকা; শ্যামসুন্দর বোঝবার চেষ্টা করলেন; অর্থাৎ ভদ্রলোক তাহলে অনুপমের আত্মীয়স্থানীয়। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি কিছুটা ঘরোয়ামত স্বস্তির নাগাল পেলেন।

নবকাকা বললেন, কিন্তু বাবা—

চরম বিরক্তির ভাব মুখে ফুটিয়ে অনুপম প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, কিন্তুটা আবার কিসের, এ্যাঁ? এতক্ষণ ধরে আমার সময় নষ্ট করলেন। কী ভেবেছেন আপনি? আমার সময়ের দাম নেই? হরিবল্। বুঝলেন মাস্টার মশাই, উনি আমার গ্রামের লোক। ছেলের একটা চাকরি করে দিতে হবে। আরে, দিতে হবে বললেই হবে! তার

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানের ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েল পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি. পি. (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

প্রসিডিওর আছে, ফর্মালিটিজ্ আছে। তাছাড়া দেশে এখন কী ভয়ঙ্কর অবস্থাটা যাচ্ছে। নিউ রিক্রুটমেণ্ট টোট্যালি স্টপ্। সারপ্লাস পারসোনেল-দের প্রোভাইড করতে করতেই আমাদের হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। তবু ওনার ছেলেকে চাকরি করে দিতেই হবে, সিম্পলি বিকজ, উনি আমার গ্রামের লোক। আরে মশাই, আপনার ছেলে তো মাত্র হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ। জানেন? খবর রাখেন? হাজার হাজার ইঞ্জিনীয়ার চাকরির জন্যে ধর্ণা দিয়ে দিয়ে হন্দ হয়ে যাচ্ছে! যাক গে, দয়া করে আমাকে এবার রেহাই দিন। আর তাছাড়া এটা আপনাদের জানা উচিত, আসবার আগে চিঠি দিয়ে টাইম এ্যাপয়েণ্ট করে আসতে হয়। আনুনেসেসারি একটা সেকেণ্ডও আমার খরচ করার উপায় নেই। তারপর মাস্টার মশাই, আপনার খবর বলুন। ভাল আছেন? বাড়ির খবর সব ভাল?

প্রচণ্ড এক স্বস্তিতে শ্যামসুন্দর আকণ্ঠ ভরে উঠেছিলেন। অনুপমের কথার জবাব দিতে বাধল। অনুপম বলল, ডিস্‌গ্যাস্টেড হয়ে উঠেছি মাস্টার মশাই। পারটিকুলারলি এই চাকরি-বাকরির খোঁজ-খবরের ঠ্যালায়। এমপ্লয়-মেণ্ট অপারচুনিটি ক্রিজ করছে লোকে বুঝেও বোঝে না। দিনরাত তাগাদা তদ্বির।

হঠাৎ হাতঘড়িতে সময় দেখল অনুপম। ভুরু কোঁচকালো আঁৎকে উঠে বলল, এঃ, তারপর চটকরে টেলিফোনের রিসি-ভারটা কানে তুলে বোতাম টিপে বলল, ঘোষাল, আমি এখুনি বেরোচ্ছি। ড্রাইভারকে নিচে নেমে গাড়ি রেডি করতে বল।

চরম ব্যস্ততার ভাব ফুটিয়ে অনুপম তখনই উঠে দাঁড়াল। আক্ষেপ করে বলল, মাস্টার মশাই-এর সঙ্গে কোন কথাই বলা হল না, আজ আবার আমার একটা খুব জরুরী মিটিং আছে, সেণ্ট্রাল থেকে মিনিস্টার আসছেন। তা, বাড়ির খবর-টবর সব ভাল মাস্টার মশাই? অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। [ড্রয়ারে চাবি লাগাতে লাগাতে] আস-বেন একদিন। নতুন বাড়ি করেছি বালীগঞ্জ সাইডে। একবার পায়ের ধুলো দেবেন। [চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে] কলকাতায় কোন কাজে এসেছেন বুঝি?

শ্যামসুন্দর অপরিমেয় স্বস্তিতে অনুপমের নিরাসক্ত ভাবটা লক্ষ্য কর-ছিলেন এবং বোঝবার চেষ্টা করছিলেন ঐ কয়েকটা কথা বলার জন্যেই তাকে কী ভয়ঙ্কর হাতড়াহাতড়ি করতে হচ্ছে।

—তাহলে আসুন মাস্টার মশাই। অনুপম কিন্তু সেই সঙ্গে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে সবার আগেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল, শ্যামসুন্দর থ' হয়ে গেলেন।

কোন কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পার-ছিলেন না শ্যামসুন্দর। প্রথম প্রথম তাঁর মনে হচ্ছিল অনুপম তাঁকে রেহাই দিয়েছে। যদিও সমস্যার অপরাধিকটা হল, হেমাঙ্গিনীকে কী তিনি বলবেন? ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এই নয়, তিনি বুঝতে চাইছিলেন যে, অনুপম তার শক্ত শক্ত কথাগুলো তাঁরই উদ্দেশে বলেছে। হয়তো নবকাকা নামধেয় লোকটি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই অনুপমকে উত্যক্ত করে তুলছিল যার ফলেই অনুপমকে ফেটে পড়তে হয়েছিল। এবং তাঁর উপস্থিতি নিতান্তই কাকতালীয়। তবু তবু—কোন কিছু অনুসন্ধানের প্রয়াসে তাঁর মন ভয়ঙ্কর অস্থির হয়ে উঠল। অথচ উল্টো-পাল্টা এলোমেলো ভাবনার সুতোগুলো কেবলই জটিলতর হয়ে উঠছে মাত্র। তিনি হাঁপিয়ে গেলেন।

ফেরার গাড়িতেও ভিড়, তবে শ্যাম-সুন্দর বসার জায়গা পেয়ে গেলেন। সারি সারি ঠাসাঠাসি বসা মানুষগুলোর মধ্যে তিনি নিজেকে পৃথক ভাবতে পারলেন না। এবং কী আশ্চর্য, একটা বিশ্রী যন্ত্রণা, যা আপাতত অনির্দেশ্য অপরিস্ফুট, তাঁর চেতনাকে যেন তাড়া করে আসছে মনে হল। বহুকাল আগে, তাঁর মনে পড়ল, যৌবনকালে একবার কপাটি খেলতে খেলতে তিনি ভয়ঙ্কর চোট খেয়েছিলেন। তাঁর দেহ কয়েক পাক গড়িয়ে মাটিতে স্থির হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ধরে কোন কিছুই তিনি অনুভব করতে পারেন নি। তারপরই এল যন্ত্রণা, বাড়তে বাড়তে সে যন্ত্রণা এত বিশাল হয়ে উঠেছিল, তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। শ্যামসুন্দর শিউরে উঠলেন সে কথা মনে করে। তিনি চোখ বুজলেন। মনের যন্ত্রণা তাঁর বেড়ে চলেছে। তিনি কি আজও আবার জ্ঞান হারাবেন?

সুজনের কাছে তিনি পরাজিত। হেমাঙ্গিনীর কাছে তিনি পরাজিত। তিনি পরাজিত অনুপম চৌধুরীর কাছেও, যে-অনুপম তাঁর সাফল্যের মণি-মালার উজ্জ্বলতম রত্নখণ্ড। সুজনকে আজকাল আর তিনি বকাবকি করেন না। সুজন তাঁকে এড়িয়ে যায়। সুজন তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না এবং দাঁড়াতে পারুক তাও তিনি চান না। অনুপম তাঁকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল না পর্যন্ত। অনুপম তাঁকে তুড়ি মেরে সরিয়ে দিল। সুজন অনুপম, অনুপম সুজন। সুজন অনুপম। একটি তীব্র আর্তনাদ তাঁর সমস্ত বোধকে স্পর্ধিত পায়ে চুরমার করে দিয়ে যাচ্ছে। অকারণে শ্যামসুন্দর বসার আসনকে চেপে ধরতে চাইলেন।

—কমলালেবু নেবেন, লেবু। টাটকা দার্জিলিং—চোখ খুললেন শ্যাম-সুন্দর। পিছন থেকে তাঁর ঘাড়ের পাশ দিয়ে বাড়ানো একটা হাতে গোটা দুই কমলালেবু। বেশ বড় সড় সাইজের। হেমাঙ্গিনীর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তিনি প্রবল শক্তিতে নড়ে-চড়ে বসলেন। দরদস্তুর করে দুটাকার লেবুর অর্ডার দিলেন। অনাবশ্যক, তবু তিনি বাছা-বাছি করতে লাগলেন ঝুড়ির ওপরে ঝুঁকে পড়ে। হেমাঙ্গিনী আসলে তপস্বিনী। বরাবরই রোগাপটকা মানুষ, ভোগে চরম বিমুখ। অথচ তাঁদের, অর্থাৎ তাঁর আর ছেলেমেয়েদের মায় মেয়েদের ছেলে-মেয়েদেরও ভোগের বিষয়ে বিস্তর মনো-যোগ। হেমাঙ্গিনী নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে। লেবুগুলোই কি তার ভোগে লাগবে! হাসি পেল শ্যাম-সুন্দরের, আঃ কী মহার্ঘ হাসি, তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন, সবকটিকেই হয়তো দফায় দফায় হেমাঙ্গিনী তাঁকে আর সুজনকে নিবেদন করে ছাড়বে। সুজনকে অবশ্যই লুকিয়ে লুকিয়ে। সুজনের বস্ত্র-আত্তি বিষয়ে ইদানীং হেমাঙ্গিনী যে অপরাধবোধে ক্লিষ্ট তা শ্যামসুন্দর লক্ষ্য করেছেন। চাউশ্‌মত ঠোঙায় মোড়া লেবুগুলোর গায়ে শ্যাম-সুন্দর হাত বুলোতে লাগলেন। হয়তো হাত তার এমনিই কাঁপছিল। তিনি তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। কেউ তাঁর ক্ষমার অপেক্ষায় নেই, তবু তাঁর মনে হল, হেমাঙ্গিনীকে তিনি ক্ষমা করবেন, যদিও কেন, তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

রাণী ধূপ
কাকাত্ত প্রডাক্টস

গ্রাম বাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

কত ফুল্লরা!

ভাঙা পাল্কীটা কাঠ-কুটোতে ঠাসা, মাথার ওপর ছেঁড়া-খোড়া জাল। এক-কালে সবুজ রং ছিল পাল্কীটার। এখন রং চটে টিন বেরিয়ে আছে। হাত যে কেউ দেয় না তা দেখেই বোঝা যায়। তবুও বলি—"বাঃ ভারি সুন্দর পাল্কী তো! দিব্যি মজবুত আছে।" মোতিবালা খুশি হয়। মাটিতে চাটাই পেতে ডাকে —"ও ছাওয়াল বস, বেলা পড়লি বেওখন। রোদ্দুরে তো চতুর্দিক ঝা ঝা করিছে।" বটের ছাওয়ায় বসি দুজনে। মোতিবালাই কথা বলে, আমি কেবল শুনি।

—"অনেকদিনের জিনিষ গো এই পাল্কী, মোর শ্বশুর বয়েচে, সোয়ামী বয়েচে, জামাইও বয়েচে দিনকতক। আর আজ কেউ আসে না ডাকতি! রিক্সা চড়ে সবাই! কম খরচায়, কম সময়ে বেশি আরামে যায়। মোর শ্বশুরের আমলে রোজগারের ঝক্কি ছেল না তেমন। পথঘাটও খারাপ ছেল ঢের, সি জন্যি রিক্সার চেয়ে পাল্কীই চলত বেশি, পয়সাও জুটত বেশ। মোর শাউড়ীরে এখনও মনে পড়ে গো! তিন কুড়ি বয়েসেও তার গতর ভরা ছেল। মাথার কেশে ত্যাল চিক চিক করত! তারই বউ গো আমি, মোকে দেকে কেউ বুঝিবে সি কতা? একফোটা জমি নাই গো ছাওয়াল, একফোটা নাই। সব চলি গেচে। সোয়ামী এক্ষণে মাটি কাটে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি। জামাই মুনিষ হ্যোয়েছে। জাতি ব্যবসা গেচে জন্যি শোক করি না গো। শোক হয় পেঁড়া পেটের তরে, কচু-ঘেঁচুতে তার কানি-ডাও ভরে না! ই ভাবে বাঁচতি মন চায় না একিবারে!"

"ঠাকমা। মোদের বোঝা দুটো নামায়ে দাও।" কচি গলার ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকাই। একটি ছোট্ট ছেলে, একেবারেই নগ্ন, হাঁটু অবধি কাদায় মাখামাখি। মাথায় জলকচুর বোঝা। তার পাশে আরও ছোট একটি মেয়ে, কোমরে গামছার টুকরো জড়ানো। মাথার ওপর একরাশ শুকনো তালপাতা আর ভাঙাডাল। উঠে গিয়ে বোঝা দুটো নামিয়ে দি। কথা বলে না কউ, দৌড়ে গিয়ে বুড়ির আঁচল ধরে দাঁড়ায়। মোতি-বালা বলে—"মোর ছাওয়ালের সন্তান। বাপও গেচে, মায়েও গেচে কিন্তুক এ শত্তুর দুডো যায় নি। কাঁদাতি আর কাঁদাতি রয়ে গেচে।"

"ঠাকমা মোরা গাব এনিচি, খাব?" মেয়েটি প্রশ্ন করে।

মোতিবালা বলে—"খাবে, তা খাও। কিন্তুক আগে পুকুর থিকে হাত পা ধুয়ে আস।" ওরা ধীরপায়ে চলে যায়। আমি বলি—ঠাকুমা, এত কচু দিয়ে কি হবে গো? কথা শুনে বুড়ির চোখে জল আসে। মাথাটা মাটির দিকে নামিয়ে বলে—"সেদ্ধ করি খাব, ভাত যে জুটে নারে ছাওয়াল! ধানের ক্ষেতের পাশেই মোদের ঘর। কিন্তুক ক'টা ধান ঘরে আসে বল্? তাই কচু, বুনো শাক, গাব, তাল, যখন যা পাই সবই মোরা খাই। মোদের পেট মহাশয় হোয়ে গেচে রে, তারে যে দব্যাই দি, সে তাই হজম করি ফেলে।"

—"তোমার স্বামী আর জামাই কেমন রোজগার করে?"

—"যেমন দেখিছ, তেমন। পুবের ঘরটা মোর। আর উত্তরের ঐ ঘরটা, ক্ষেড়া তালগাচের নিচেয়, সেডা জামাই-এর। জোর বাতাস দিলি পর ইদিক-সিদিক দুলে, মাতার ছাউনী গেচে খসে। এখন তবু যাহোক করি থাকি, কিন্তুক জলের দিন এলিপর ভিজে একশা হব। দুডো পুরুষমানুষ আচে দুঘরে, তবুও মোরা হাত কামড়াই। আষাঢ় থিকে শাবন আর অঘ্ঘান থিকে পৌষ, এ চারটে মাসেই মানুষ দুডো যা কিছু পায়—বাদবাকী সময় হয় মাটি কাটে, নয় বসি থাকে।"

—"পাল্কী চড়ে না কেউ?"

—"সি কতা তো আগেই বলিচি। অনেকদিনের জিনিষ, নড়বড়ে হোয়ে গেচে। আর ঠিক থাকলেই বা কি? চড়ে ক'জনায়? যাও বা বচ্ছরে দু'দশ-বার ডাক আসে, রোজগার যা হয় তাতে গায়ের ঘাম মরে না। পাঁচ ট্যাকা, সাত ট্যাকা চারজনার মধ্যি বণ্টন করি নিলে কার ভাগে কডা থাকে বল?" শুনে চুপ করে থাকি।

মোতিবালা বলে যায়—"দু-চার বছর আগে আমিও কাজ কত্তুম রে। গাঁয়ের বাবুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান ভেনে দিতুম, কাপড় কেচে দিতুম আর যাদিগের নাক উঁচু নয় তাদিগের ঘরে ভাতও রাঁধতুম। এক্ষণে আর পারি না। বড় বড় হাঁড়ি নামাতি গেলে বুকটা কেমন করে ওটে। মোর ম্যায়েটা ক'বাড়ির কাজ নেচে। সকালে উটে চলি যায়, মাঝবেলায় একবার আসে আবার চলি যায়, ফেরে সেই বিকেলে। এত খাটা-খাটনি করি মাসের শেষে পায় সাত্তর দশটি ট্যাকা। ছাওয়াল গো, বড় কষ্ট মোদের, বড় কষ্ট! মোরা নেকাপড়া জানি নে, ভাল কতা কইতে জানি নে, তবু কষ্টটা মোদের কম নয়। কিন্তুক বুঝে না যে কেউ! মোর ম্যায়ে আসি সেদিন বলেছাল, এক বাড়ির বাবু তার গায়ে হাত দেছে, প্রিতিবাদ করিবে কে বল? শুদু মোর ম্যায়েই নয় গো আরও অনেক বউ-ঝিরাও বাবুদের বাড়ি কাজ করে। তারাও বলে দুঃখের কতা। বাবুরা তুই-তোকারি করে কতা কয়, তাদিগের গিন্নীরা যখন তখন গাল পাড়ে আর নোংরা লোকের ইসারা তো আচেই।

—"তোমাদের পুরুষরা কিছু বলে না?"

আমার কথা শুনে বুড়ি মাথা নাড়ে, বলে—"তারাও তো কাজ করে সি সব বাবুদেরই মাঠে। মোরা পুরুষ, ম্যায়ে সবই তো এক হাড়কাটে মাতা রেখেচি গো। মোদের নিস্তার আচে?" বিদায় নিয়ে হাটতে শুরু করি। ভাবি,

মোতিবালার পাল্কী

মোতিবালা পিলসুজ ছাড়া আর কিছু কি?

ফতেপুরের ঘাট পেরিয়ে যাব। কে যেন কেঁদে উঠল। ফিরে দেখি বছর কুড়ি-বাইশের একটি বউ খেয়াঘাটের বাবুর পা ধরে কাঁদছে—"মোর পয়সা নেই, অ বাবুগো মোর পয়সা নেই, মোকে ছেড়ে দাও।" ঘাটের বাবু লাফাচ্ছে—"প-য়-সা নেই। এঃ। পয়সা নেই তো এলি কেন? ঘাটপার হোতে গেলে পয়সা দিতেই হবে। তা যদি না পার তবে জলে নেমে যাও নয় ত' কাপড় ছেড়ে যাও।" বাবু মেয়েটির বুকের দিকে তাকায়। মন্তব্যটা শুনে খারাপ লাগারই কথা। এগিয়ে এসে বলি—"আপনি কেমন ভদ্রলোক? ওকে কাপড় ছাড়তে বলছেন। এই ফাঁকা জায়গায়, এত লোকের সামনে কাপড় ছেড়ে ও জলে নেমে যাবে? আপনার বাড়িত মা-বোন নেই?"

—"খবরদার", ঘাটের বাবু ফুঁসে উঠলেন, "আমার বাড়ির মেয়েদের কথা তুলবেন না, তারা সবাই সতী।"

যুক্তি শুনে হেসে ফেলি—"আর এই মেয়েটি সতী নয় বুঝি? তাছাড়া সতীত্বের প্রশ্ন তো উঠছে না এখানে?"

—"সে যাই হোক, ওকে পয়সা দিতেই হবে। নইলে ওপারে যেতে দেব না!"—বাবু ঘাড় নাড়েন।

—"ওর যা অবস্থা দেখছি, সাথে একটা পয়সাও আছে কি না সন্দেহ।"

ঘাটবাবুর দাঁতগুলো দেখা গেল—"বড় যে দরদ, আপনি দেবেন ওর পয়সাটা?"

"নিশ্চয়ই।" পয়সা বার করে ঘাটবাবুকে দিলুম। আবার দাঁত দেখালেন তিনি—"ক'জনকে দেবেন পয়সা?"

—"যে ক'জনকে পারি।"

—"মাথা খারাপ আপনার। হাজার হাজার লোক আছে ওর মত। সবাইকে দিতে গেলে বা ছাড়তে গেলে আপনি, আমি দুজনেই দেউলে হোয়ে যাব।"

—"তবুও ওদের শোষণ করা ঠিক নয়?"

মুহূর্তেই ঘাটবাবুর মুখটা মৃগী-রোগীর মত দেখাল।—"আহা কি মধুমাখা কথা, শোষণ করবেন না! বড় বড় বুলি কপচাবেন না মশাই। বিজনেস ইজ্ বিজনেস।" কথা না বাড়িয়ে পার হয়ে আসি। পেছনে সেই মেয়েটি। কোলে একটা বাচ্চা। খানিকটা গিয়ে ডাকি—"শোন, এদিকে এস। তোমার স্বামী কি করে।" —মুখ নিচু করে থাকে মেয়েটি, কথা বলে না, আবার বলি—"কি করে স্বামী বল?" খুব আস্তে বলে,—"কিছু করে না। শুয়ে থাকে। ডান অঙ্গ অবশ।"

—"তুমি কিছু কর?"

—"বাবুদের বাড়ি ধান ভানি, ফাই-ফরমাশ খাটি।"

—"তাতে পেট চলে?"

—"নাঃ।"

—"তবে আর কি কর?"

এবার কেঁদে ফেলে মেয়েটি, বলে—"ভিক্ষে করি, তাতেও কুলোয় না।"

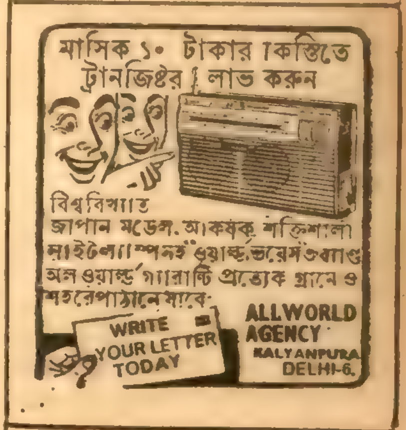

"অ, তা নাও ফটোক।" বিরাট এক ঘোমটা টেনে গিরিজা আবার ঝাঁট দিতে থাকে।

মিনসেগুলো লোভ দেখায়, রাত্তিরে ঘরে যেতি বলে। আমি কি যে করি বাবু! এ জীবনটা কবে যাবে বল? এত চোখের জল ঝরে তবু দেবতা কাছে টানে না।" দুটো টাকা হাতে গুঁজে দি। আমার মা কাঁদছে!

বাঁশবনে বিড় বিড় করে বকে গিরিজা —"ফটোক, ফটোক নিতে এসিচেন বাবু! হেঃ। আমার চোদ্দপুরুষ মরে হেজে গেল, না এল বদ্যি না জুটল পথ্যি, তখন কোথায় ছিলে তুমি? এয়েছিলে সি সময়? এক্ষণ ফটোক, ফটোক করিচ। যাও চলি যাও দিবনি ফটোক নিতে।" কি যে করি! এতটা পথ এসে ফিরে যেতে হবে? অবস্থটা টের পায় হারু। ইসারায় বলে,—"ভয় পাবেন না, ঠিক করে দিব সব।" গিরিজাকে ডাকে হারু —"ও মাসী ই লোক সি লোক নয়। ইনি বই লিখেন, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি বেড়ান। তুমি যাদিগের কতা বলিচ তেনারা গর-মেন্টের লোক।"

গিরিজা ঝাঁটা হাতে এগিয়ে আসে। গলায় সন্দেহের আভাষ—"ফটোক নিতি চায় কেন?"

হারু অভয় দেয়,—"বই করবে বলে।"

"অ, তা নাও ফটোক।" বিরাট এক ঘোমটা টেনে গিরিজা আবার ঝাঁট দিতে থাকে। মুখটা্র দেখা যাচ্ছে না, বিব্রত হয়ে হারুর দিকে তাকাই। বুদ্ধিমান ছেলে, চট করে বুঝে নেয়। ফের হাঁক: ডাক করে,—"মাসীগো মুখটা দেখাও। ফটোক উঠবে ইবারে।" মাসী আরও বেশি করে ঘোমটা টানে। হার মানতেই হোল।

দহের পাড়ে দু'জনে বসে আছি। হারুর হাতে ছিপ, তবে মাছ ধরার থেকে গল্প করার ইচ্ছেটাই তার বেশি। মনের মত শ্রোতা পেয়ে হাজার খবর দিচ্ছে। এক-সময় থামিয়ে দি, বলি—"তোর মাসীর আর কেউ নেই?" ছোট্ট মাথাটি ডাইনে-বাঁয়ে দোলায় হারু—"নাঃ, কেউ নেই আর। ভাগ্যি নেই। তা হলি কি আর মাসী মোরে এত ভালবাসত?"

—"জমি-জমা নেই তোদের?" প্রশ্ন করি ওকে।

—"ছেল। সি সব নিবারণ মণ্ডল নে গেচে। এক্ষণে ঐ বাঁশবাড়িটাই শুদু আচে।"

—"নিবারণ মণ্ডল কে? সে কোথায় থাকে?"

—"ই গাঁয়েরই লোক। খুব ধনী। আনেক ট্যাকা আচে তার, জায়গা-জমিও মেলাই।"

—"কেমন করে নিল সে তোদের জমি?"

—"মেসো ট্যাকা ধার নিচিল। শুদতে পারে নি তাই জমি কেড়ে নেচে।"

—"পাড়াপড়শীরা কিছু করলে না তাকে?"

—"হেঃ", হারু জলের গায়ে ছিপের বাড়ি দেয়, "নিবারণ মণ্ডলরে দেখলি পর সবার গায়ে জ্বর আসে, কাঁপাত থাকে সবে। তারে কে কি করিবে?"

—"কেমন করে দিন চলে তা হলে?"

হারু একইরকম নির্লিপ্ত। বলে—"মাসী লোকের বাড়ি কাজ করে, মুদী দোকানের ঠোঙা বানায় আর আমি ঘুড়ি বুনি।"

—"পড়িস না তুই।"

হারু উত্তর দেয়—"নাঃ। মাসী বলেচে পড়ে কাজ নাই তোর,—বেশি পড়লে নিবারণ মণ্ডল হোয়ে যাবি।"

সারাদিন খালের কাদায় পা ডুবিয়ে মাছ ধরে শশীবালা। পাঁকাল মাছের সাথে চোরপুলিশ খেলে। কোলের ছেলেটা পাড়ে বসে দেখে, কখনও হাত-তালি দেয়, কখনও হাসে, কখনও বা উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। মাঝেমধ্যে এক-আধবার বিশ্রাম নেয় শশীবালা, মুড়ি ভিজিয়ে খায়, ছেলেকে মাই দেয়, আর দূরে মাঠের পাড়ে তালবন-ঘেঁষা কুঁড়েটার দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যায়। বোধহয় খোকার বাপের কথা ভাবে। রুগ্ন, অশক্ত মানুষটা কেমন করে দিনের পর দিন একই জায়গায় বসে থাকে! ওর ভাঙা মাজাটা জোড়া লাগবে কবে? আবার কবে উঠে দাঁড়াবে ও? শশীবালা যে এখনও স্বপ্ন দেখে, এখনও রঙীন ডুরে শাড়ি ভালবাসে, এখনও পলাশ ফোটার ঋতুতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আকাশের গায়ে উত্তর ফোটে না তবু!

সেইসব বাবুরাই বা কোথায়, যারা ভোটের দিন জলজ্যান্ত মানুষটাকে এক-রকম ধরেবেঁধে নিয়ে গিয়েছিল? তারা না বলেছিল ওদের আর অভাব থাকবে না! নতুন ঘর উঠবে, ধানের জমি মিলবে, নতুন শাড়ি, নতুন জামা, সবকিছুই নতুন হবে ওদের? কিন্তু আসলে কি তাই হোল? খোকার বাপ বাড়ি ফিরল প্রায় একমাস পরে, মাজাটা ভাঙা, চেহারাটাও তেমনি। দুদলের টানাটানিতে শেষ হয়ে গেল পঁচিশ বছরের জোয়ান লোকটা। খালের জলে আবার নামে শশীবালা। সেই বিরাট শোল মাছটা খলবল করে ওঠে। মাছটাকে ধরে না ও কোনদিন। আপন মনে বলে—"পালা, পালা, মাজা ভেঙে যাবে।"*

---

* আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক গৃহীত

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ একুশ ॥

আকাশের গায় পিঠ দিয়ে পাহাড়।

ভুটান পাহাড়।

যেন নীল আকাশের পটভূমিকায় অপেক্ষাকৃত গাঢ় নীলের তুলিতে কেউ ইচ্ছেমত কিছু টান টেনে দিয়েছে। ছবি আঁকা হয় নি। শেষ হবার আগেই উঠে গিয়েছে। আঁকতে আঁকতে উঠে যাওয়া। যেন পাশের ঘরেই রয়েছে শিল্পী। খানিক বিশ্রাম নিতে গেছে। এসেই আবার তুলি ধরবে।

ছেলেবেলায় ভুটান পাহাড়ের কথা বইতে পড়া ছিল। কতদূরে সেই ভুটিয়ারা সমতল মৃত্তিকা থেকে অনেক ওপরে উত্তরের পাহাড়ে থাকে যারা? কঠোর পর্বত-কন্দরে পাহাড়ে-প্রান্তে কঠিন কষ্ট-ক্লিষ্ট জীবন যাদের।

সমতল পৃথিবী থেকে বহু ঊর্ধে। ঢেউ-খেলান পাহাড়ের দেশ। ঢেউয়ের পর ঢেউ।

এখন শীত জেঁকে বসেছে অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে। পাহাড়ের পাদদেশে। প্রচণ্ড শীত। শীতের প্রচণ্ডতায় কাজ-কর্মে ভাটা পড়েছে। সমস্ত উত্তেজনা থিতিয়েছে। অবশ্য এখন ফাল্গুন চলে এল। বসন্ত-সূচনা বলা যায়। কিন্তু একালে সব ঋতুই পাল্টাচ্ছে। পাঁজির মতে ধরে আর আসছে না আগের মত ঋতুগুলি। তাই ফাল্গুনের হাওয়াতেও নতুন কালের ডুয়ার্সে বসে আর শরীর-মন পুলকিত হয়ে উঠছে না। শুধু অকারণ পুলকে রোমাঞ্চ জাগছে না। বাসন্তী হাওয়ায় নেই মাদকতার বিন্দুমাত্র মোহাবেশ, বরঞ্চ শীতের জোরালো হাওয়ায় পাঁজরগুলি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। প্রেমাস্পদ-সন্ধানে অভিসার-সম্ভাবনার কথা তো কল্পনামাত্রেও পাপ। রূপবান প্রেমিকের বাঞ্ছিত দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলতায় ঘরের দ্বার অনাবৃত করছে না কোন দয়িতা। দয়িতের বাহু-বন্ধনে নিবিড় প্রেমালিঙ্গনের পরিবর্তে শীতার্ত এই বসন্তে পশমি কম্বল, লেপ প্রভৃতির স্পর্শলাভের জন্যই সারা অন্তর লালায়িত।

একালের বিজ্ঞান তাকে অবশ্য নানা সুযোগ দিয়েছে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে অঢেল আরামের ব্যবস্থা। ঘরের মধ্যে থাকুন। হিটারে জল গরম হচ্ছে। চা-কফি-কোকো। বুক বন্ড কোম্পানীর কফির বিজ্ঞাপন মনে আসছে। ইন্সট্যান্ট কফি। মানে কি তার?

অনেক অর্থ হতে পারে। তৎপর, দ্রুত, আসন্ন, শীঘ্র, সদ্য, বর্তমান, উপস্থিত, তৎক্ষণাৎ। নানা অর্থ মনে আসে। কীর্তিত এই শব্দটা ব্যবহার করতে চাই। এক নিমেষে যা করা সম্ভব।

It is so easy to make use on teaspoonful per cup more or less according to taste. Add hot water or hot milk and stir.

কফি ফ্লাস্কেও রেখে দিতে পারেন। টোটিফ্লাস্কও আছে। সুদৃশ্য নানা রকমারী ফ্লাস্ক। কোথাও হাওয়া ঢোকবার ভয় নেই।

প্রেশার কুকারে মাংস রান্না হচ্ছে। ঘরের ভিতরেই সব সম্ভব। দিলম ফিলারের গিন্নী। তরুণী তন্বী আর কী। শাস্ত্রে যাকে বলেছে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। দামী পশমি উলের ব্লাউজ। হোক না শীত, পরনে মুর্শিদাবাদও চলতে পারে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বাকিটা কিসের? অবসর সময় রেডিও শুনুন। রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, টেপরেকর্ডার ক্ষতি কী। ইডেনে ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী শুনুন। মেলবোর্নের খবর দিচ্ছে রেডিও।

আর শুধু কি ঘরেরই মধ্যে? কে না জানে মোটরে, দূরপাল্লার ট্রেনে আপনি টাকা খরচ করলেই অবাধে আরামে ভ্রমণ করতে পারেন। সিনেমা হলও এয়ার কন্ডিশনড। যুগটা যে বিজ্ঞানের যুগ। তাবৎ পৃথিবী আপনার মুঠোর মধ্যে। শীত তো তুচ্ছ। সাধারণ মানুষের কাছে অবশ্য সব আলাদারকমের।

আমাদের ভুবনবাবু ভেবে-ভেবে শরৎ, শীত ও বসন্তের জন্য তিনটে সিম্বল বার করেছেন। হঠাৎ মনে পড়ল। তিনি বলেন, শরৎ-এ সর্দিতারল্য। শারদীয় সর্দিতারল্য আর কী। শীতে কম্বলার ও বসন্তের জন্য গোবীজের টিকা।

সুগোপনবোধী ও বাস্তব চিন্তাধারার জন্য প্রশংসা করতেই হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং হেমন্তের জন্য কিছু বার করতে পারলেন কি? ভুবনবাবুকে শুধিয়েছিলাম।

তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, না, এখনো ভাবতে ব্যস্ত আছি। তবে সর্ব ঋতুর জন্য কি জানেন তো?

দেখেন নি বুঝি বিজ্ঞাপন? সরল ঘড়ঘড়ে গলায় একটু কেশে তিনি বললেন, সর্ব ঋতুর জন্যে চ্যবনপ্রাশ।

শ্রোতাগণ সকলেই এক সঙ্গে হেসে উঠেছিলাম। ভুবনবাবুও আমাদের হাসিতে যোগ দিয়েছিলেন।

সকালবেলা। বোধ করি নটা-দশটা হয়েছে।

বসে বসে ভুটান পাহাড়ের দৃশ্য দেখছি।

একটা বেতের চেয়ারে কাত হয়ে বসেছি। বেশ খোলা প্রশস্ত একটি মাঠের ঠিক মাঝখানে। চারদিকে মাঠ। অফুরন্ত সবুজের দাক্ষিণ্য। অল্প-অল্প হাওয়া। রৌদ্রের নরম ওমটুকু সর্বাঙ্গে মাখতে-মাখতে ভুটানের কথাই ভাবছিলাম। আজ যেখানে বসে আছি, একদিন তার সবটাই ছিল ভুটানের এলাকা। ডুয়ার্স বলে তার কোন পরিচয় সেদিনও হয় নি। তারপর পায়-পায় পিছিয়ে গেল অরণ্য। সমতলবাসী মানুষদের জন্য সবটা জায়গাই ছেড়ে দিতে পিছিয়ে গিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে ভুটান। এখন সভ্য সুউন্নত জনপদের আঙিনায় বসে বসে দূরে দেখি আমরা ভুটানের দিগন্ত-বিসারী পর্বতমালা। আর ভাবি ভুটানের কথা। ওই তো ভুটান। সত্যিই কি আছে ওখানে ভুটান বলে কোনো দেশ? ওই মেঘের মালা পেরিয়ে ওখানে গিয়ে পৌঁছনো যায় সত্যি-সত্যি?

মিঃ হপ্‌কিন্সের কথা মনে আসছিল। আমার ভুটানের পরিচয় তাঁরই কাছ থেকে। হপ্‌কিন্সের পরিচয় জাতিতে স্কচ্। দুর্ধর্ষ শক্তিমান মানুষ। ইয়া লম্বা-চওড়া শক্ত পেশল শরীর। বৃটিশ আমলে যে-সব শক্তিমান সাহেবকে ডুয়ার্সে নানা-সূত্রে ঘুরতে দেখা যেত, মিঃ হপ্‌কিন্স তাদেরই দলের প্রতিনিধি। একদা বৃটিশ শাসনের শক্তিমান খুঁটি ছিল যে-সব সিভিলিয়ন সাহেবরা, তারাও হপকিন্স্‌কে আলাদা মূল্য দিত। সম্মান করত। তাদের উপরে ছিল তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি।

ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজের রাজত্ব গেল তারপর। প্রায় দু'শ বছরের সাম্রাজ্য ভেঙে তাসের ঘরের মত ছিটিয়ে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেই তাদের অস্তিত্বের গোড়ায় লেগেছিল নাড়া। সাম্রাজ্যের আসন টলে উঠেছিল। বাইরে-ভিতরে তখন ইংরাজের নানা শত্রু। একদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও তাদের সংগ্রামী ভূমিকা ইংরাজের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, অন্যদিকে মহাযুদ্ধের পরোক্ষ আঘাতজনিত দুর্বলতর পীড়িত স্নায়ুগুলিকে গুটিয়ে নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়াই তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল।

দলে দলে ইংরাজেরা তখন ঘরমুখো। হপ্‌কিন্সও তাদের মধ্যে ছিলেন। জাহাজ চালল সমুদ্রে। দিনের পর দিন। ইংরাজ জল ভালোবাসে। প্রকৃতপক্ষে জলের উপর দিয়েই তার বিশ্বজয়। তার দেশও জল-প্রধান এক ক্ষুদ্র দ্বীপ। জাহাজের রেলিং ধরে ক্রমবিলীয়মান ইন্ডিয়ার উপকূলের দিকে তাকিয়ে সকলের অলক্ষ্যে সেদিন তাঁর কেন যে চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠে-ছিল কে জানে। স্বদেশীয়দের মনে হয়ত অজ্ঞাতেই Rule Britania rule thy waves মনে আসছিল। কিন্তু মিঃ হপ্‌কিন্স সত্যি-সত্যি ভালোবেসে-ছিলেন এই দেশকে। ডুয়ার্সের নদী আকাশ-বাতাস জল-আলো-হাওয়া ঝিল-ঝোরা তাঁকে যে ডাকে হাতছানি দিয়ে। দেশে ফিরে গিয়েও তাই তাঁর ভালো লাগে নি। বার বার চঞ্চল হয়ে উঠছেন বন-বনান্তরের আহ্বানে।

থেকে থেকেই চিঠিপত্র লিখতেন এ-দেশীয় বন্ধুদের কাছে। বিশেষভাবে রায়-বাহাদুর জানকীনাথ চৌধুরী তো মাসে মাসেই একখানা চিঠি পেতেন। সেই সুদূর স্কটল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে থেকেও ডুয়ার্সের নানা ছোট-বড় ঘটনার উল্লেখ থাকত তাঁর চিঠিতে। হয়ত এখন বর্ষার মেঘ কৃষ্ণপুঞ্জছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নেমেছে ভুটানের নিম্নতলবর্তী ডুয়ার্সের আকাশে। সিঙ্গলা গিরিমালার অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠছে বর্ষণব্যাকুল রাত্রে। রাজাভাতখাওয়া বা লাটাগুড়ির সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নিভৃতে হরিণেরা শিং ঘষছে প্রকাণ্ড শিমুলগাছের কাণ্ডে। জ্যোৎস্নাবিধৌত রাত্রে বুনো মোষ দাঁড়িয়ে আছে টাইফাস ঘাসের সমুদ্রে।

Oh, Dear Choudhoory! How do I feel like going there! In March and April the orchids bloom, and frequently make the trunks of trees a bouquet of flowers. The trees appear taller, their leaves more fresh and green; the underwood less dense.

ডুয়ার্সের চিত্র যেন স্পষ্ট ফুটে উঠছে তাঁর কলমে:

Move further northward and gradually the scene changes. The leafy crowns of the trees are now far away above you. You see the red Jungle fowl feeding on whatever it can find on the open ground, while, during the months of April to September, butterflies, with gorgeous colours, float all over the road and forest and round about you.

অবশেষে আবার ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা। এবার আর জলপথ নয়, আকাশ-পথে। অনেক অল্প সময়ে। লণ্ডনের এয়ারপোর্ট থেকে নিরাপদ আরামে বিমানের টিকিট কেটে বসা ও দমদমে এসে যাত্রাবিরতি। স্বাধীন ভারতবর্ষের মৃত্তিকায়। প্রায় দেড় যুগ পরে। ইতি-মধ্যে বয়স বেড়েছে। চামড়ার চেকনাইতে টান ধরেছে। কিন্তু রক্তে ভাটা পড়ে নি উদ্দাম অমিতযৌবনের। এখনো শক্ত সমর্থ হপ্‌কিন্স।

ক'দিন কাটালেন কলকাতা।

ঘুরে ঘুরে দেখলেন নতুন কালের কলকাতা। এককালের বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। মহিমান্বিত কল-কাতা। সমস্ত ইতিহাসটাই ভাসে চোখের সামনে। তাঁর দেশীয়রাই এককালে বাণিজ্যের উদ্দেশে এর পত্তন করেছিলেন। জব চার্নক। নামটা মনে পড়ে। ১৫৯৯ খৃীস্টাব্দের বাইশে সেপ্টেম্বর ২১৮ জন ইংলণ্ডবাসী বণিকদের মিলিত ইচ্ছায় ৭০ হাজার পাউণ্ড মূলধন নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা। ১৬০০ খৃীস্টাব্দের একত্রিশে ডিসেম্বর কোম্পানী কর্তৃক রাণী এলিজাবেথের সনদপ্রাপ্তি।

চোখের সামনে ভাসে তার নব্বুই বৎসর পরের এক চিত্র। ১৬৯০ খৃীস্টাব্দ। ইংরাজকুঠীসমূহের অধ্যক্ষ জব চার্নক। পাল্কীতে চলেছেন জব চার্নক। শিয়াল-দহের ঘন অরণ্যে বিশ্রামের জন্য পাল্কী নামিয়েছে বাহকেরা। কেউ কেউ অবশ্য নিমতলার নিম্ববনের কথাও বলে থাকেন। বনের সবুজ দৃশ্যে দেখে মোহিত হলেন জব চার্নক। কুঠী নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা জাগল সেখানে।

ইতিহাস বলে ১৬৯০ খৃীস্টাব্দের চব্বিশে আগস্ট ইংলণ্ডের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-দের অনুমতিক্রমে গোবিন্দপুর মৌজায় কুঠী নির্মাণ করলেন চার্নক। বর্তমান জেনারেল পোস্ট্ আপিসের কাছেই ছিল কুঠী। বর্তমান হাইকোর্টের কাছে ছিল চার্নকের বাসা। তারপর শ্মশানে সহমরণ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত এক সুন্দরী হিন্দু যুবতীকে বিবাহ করলেন চার্নক।

কত ইতিহাস ভাসে চোখের সামনে। হপ্‌কিন্স আজীবন ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাসকে ভুলতে পারেন না তিনি।

আজ আবার নতুন কালের ইতিহাস।

কলকাতার পরিবর্তন হয়েছে। সেই কলকাতা। কত পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ, মানুষ! কত দ্রুত ছড়িয়ে গেছে নগরী। মিথ্যা কথা। কোন মানুষ গড়তে পারে না এ-নগরী। পত্তন হয়ত কোনদিন কারুর হাতে হয়েছিল। মূলের কৃতিত্ব ইতিহাসের। ইতিহাস এক অক্লান্ত বিধাতা। তার ললাটে জেগে আছে বহু হাজার হাজার বর্ষ রাত্রি জাগরণ ও অভিযানের স্বাক্ষর। ব্রোঞ্জের মূর্তির মত কঠিন মুখখানার ভিতরে জ্বলে ক্রান্তি-দর্শী স্বপ্নোজ্জ্বল নির্ভীক দুটি চক্ষু। ক্লান্তিহীন। পুরনোকে ভাঙে, নতুনকে গড়ে। পুরনো থেকেই নতুন। মেলানোই তার সাধনা।

ইংরাজের যুগ শেষ হয়ে গেছে। শুধু কি ইংরাজ? অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন মিঃ হপ্‌কিন্স। যুগে-যুগে এই ভারতবর্ষের মাটিতে এসেছে কত না মানুষ। কত শক্তিমান জাতি। মোগল, পাঠান, হিন্দু, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসীরা। তারপর এল ইংরাজেরা। ইংরাজদেরও যেতে হল। ঐতিহাসিক লালকেল্লায় নতুন কালের পতাকা উড়ল। কামানের নির্ঘোষে ঘুম ভেঙে পাশ ফিরল নতুন যুগ। এবার আর কোন বিশেষ জাতি বা শ্রেণী নয়। ভারতবাসী। Common feeling. কী করে সৃষ্টি হল এই সর্ববন্ধনমুক্ত সম্মিলিত জাতীয়-তার। চিনতে ভুল করেন নি তিনি।

Common Suffering থেকেই এর সৃষ্টি।

শুধু সাগরপারে তাঁর দেশে রাজতন্ত্র এখনো আছে। দেশকাল পাল্টাচ্ছে। কিন্তু ইংরাজ জাতি আজও নিয়মতান্ত্রিক।

কলকাতায় দু'টি দিন কাটিয়ে বাগডোগরার পথে বিমানে উড়লেন হপকিন্স। না, দার্জিলিং নয়। দার্জিলিং অবশ্যই একবার যাবেন। তার আগে ডুয়ার্স। রক্তের স্পন্দনে ফেরে ডুয়ার্সের নাম। ডুয়ার্সের আকর্ষণেই বলতে গেলে ঘর ছেড়েছেন তিনি। সেখানেও কি ইতিমধ্যে এসেছে পরিবর্তনের বহমান স্রোতোধারা? কে জানে! কেমন দেখতে পাবেন ডুয়ার্সকে। নতুন কাল নিশ্চয় সেখানেও পদার্পণ করেছে।

ডুয়ার্সের এক সাহেববাগানের গেস্ট হাউসে বসে আলাপ হয়েছিল মিঃ হপকিন্সের সঙ্গে।

বাগানের এক ডিরেক্টর তাঁর আশৈশব বন্ধু। সেই বন্ধুর নির্দেশেই বাগানে এসে উঠেছিলেন। গেস্ট হাউসের দ্বার খুলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন সাহেববাগানের ইংরাজ ম্যানেজার।

হপকিন্সের সাথে পরিচয় ছিল না আমার। থাকবার কথাও নয়। পরিচয় ছিল ম্যানেজার মিঃ বার্নের সঙ্গে।

বার্ন বলছিলেন, তুমি ডুয়ার্সের ভুটানীদের সম্পর্কে উৎসাহী। তাহলে তুমি দেখা কর না কেন মিঃ হপকিন্সের সঙ্গে।

হপকিন্স? আমি তখনো তাঁর নাম জানতাম না। অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কে মিঃ হপকিন্স?

বার্ন বলেছিলেন, সে এক অসাধারণ লোক। প্রায় গোটা যৌবনকালটাই তিনি বৃটিশ আমলে কাটিয়ে গেছেন এই ডুয়ার্সে। মাঝে দেশে গিয়েছিলেন। দিনকতক হল আবার এসেছেন। ডুয়ার্স কেন, ভুটানেরও অনেক ইতিহাসই তিনি জানেন।

আগ্রহব্যাকুল গলায় আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, প্লীজ, লেট মি হ্যাভ্ এ চান্স টু মীট্ হিম্। আই স্যাল্ রিমেইন এভার-গ্রেট্‌ফুল টু ইউ।

বার্ন হাসছিলেন। কথা হচ্ছিল তাঁর বারান্দায় বসে। পাইপটা ক…ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি শুধু বললেন, সো গুড্ আই। অ্যাট্‌লিস্ট্ আই ফীল লাইক দ্যাট। ওয়েল ব্রাদার, আমি তোমার কৃতজ্ঞতার লোভে নয়—এটা আমার কর্তব্য অনুভব করছি।

পরে বাকিটা শেষ করলেন, তিনি উপস্থিত আমার এখানেই আছেন। অল রাইট, আমি গেস্ট হাউসে আগে তাঁকে একটা ফোন করে নিতে চাই।

আমি বুকের ভিতরে প্রবল আবেগ অনুভব করছিলাম।

অতীতের এই গোটা এলাকাটাতেই একদিন ছিল ভুটানের অগাধ আধিপত্য। ভুটানীরা এখনো অজস্র ছড়িয়ে আছে এইখানে। বলতে গেলে, সারা ডুয়ার্সেই তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

পাশের ঘরে ফোনের আলাপ কানে আসছিল। মিঃ। বার্ন-এর গলা শোনা যাচ্ছিল। তবে কথাগুলি স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল না।

আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

[ক্রমশ]

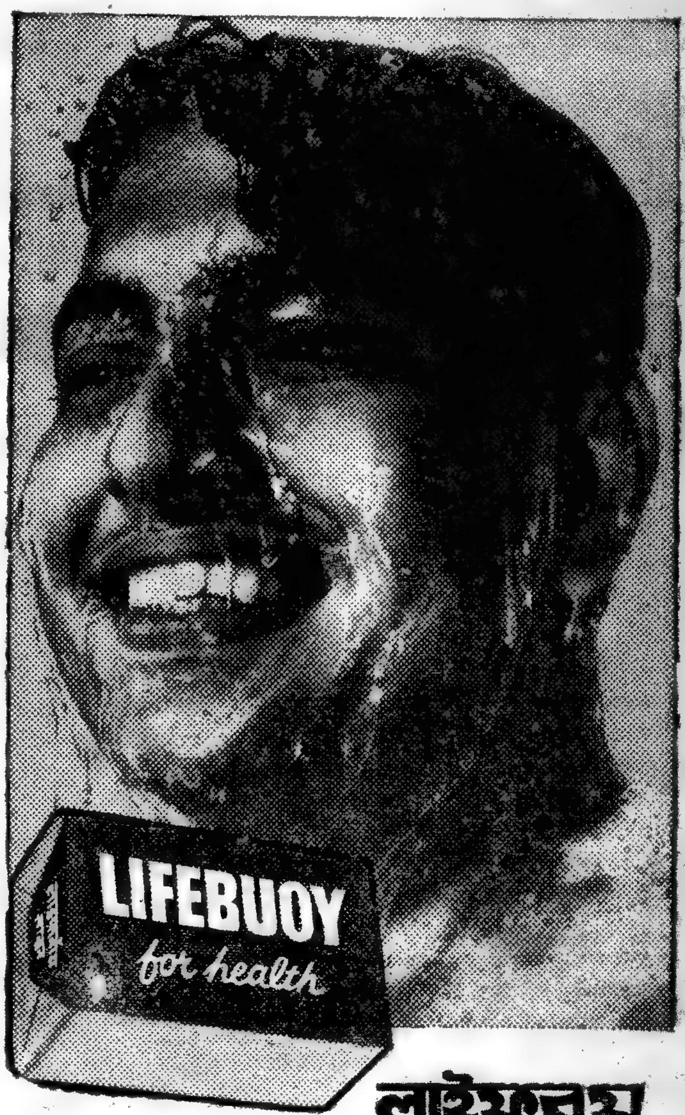

লাইফবয়

যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন।
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল
সাবানের সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে,
তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে।

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

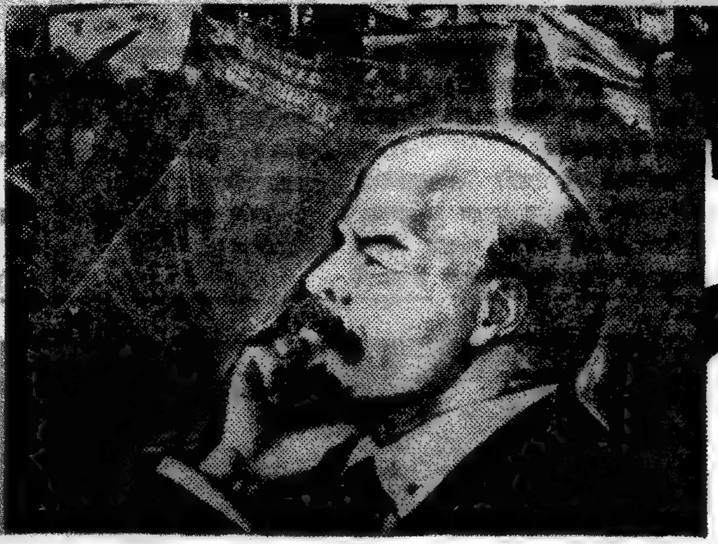

যুগনায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ দৃশ্য ॥

[কার্টেন উঠলে দেখা যাবে কথক দর্শকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন :]

কথক : স্বৈরাচারী জারিস্ট সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রথম বিস্ফোরণ হল ১৯০৫ সালে। লেনিন পরে বলেছিলেন—"১৯০৫ সালের ড্রেস রিহার্সাল না হলে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব কিছুতেই সাফল্যের সঙ্গে সংঘটিত হতে পারতো না। একদিকে স্বদেশের জনগণের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার করা, আর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জঘন্য ধরনের অপমান বরণ করে নেওয়া—এই ছিল স্বেচ্ছাচারী অপদার্থ জারিস্ট সরকারের সেই সময়কার আসল চেহারা—রাশিয়ার ১৯০৫ সালের গণ-আন্দোলনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে, সেই সময়ের রাশিয়ার রাজনীতিক পটভূমিকাটা, আমাদের জানা দরকার। জার চাইছিলেন পশ্চিমের দিকে রাশিয়ার রাজ্য বিস্তৃতি করতে—এবং সেই উদ্দেশ্যেই প্যাসিফিকের উপকূলে প্রতিষ্ঠা করলেন ভ্যাডিভস্টক বন্দর। এবার কোরিয়ার দিকে দৃষ্টি পড়লো জারের। এর ফলে জাপান হল শঙ্কিত, কারণ কোরিয়ার সঙ্গে রয়েছে তার ভৌগোলিক নৈকট্য। বক্সারের গোলমালের সুযোগ নিয়ে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে বসলো। এবার জারের লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল কোরিয়ার প্রতি। জাপান এর পর প্রথম চেষ্টা করলো আলাপ-আলোচনা করে জারকে শান্ত করতে—কিন্তু জার জাপানের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন বাধ্য হয়ে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। পোর্ট আর্থারের দশ মাস অবরুদ্ধ থাকবার পর রাশিয়ানরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে ওখানকার রাজধানী মুকডেনের কাছে রাশিয়ানবাহিনীকে পরাস্ত করলো। টুশিমা প্রণালীতে রাশিয়ান নৌবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হল জাপানীদের কাছে। চারদিকে পরাজিত হয়ে রাশিয়ানরা এবার শান্তিপ্রস্তাব পাঠালো। পোর্টসমাউথে শান্তিচুক্তি হল এই সব শর্তে—

(১) কোরিয়ায় জাপানের যে বিশেষ স্বার্থ আছে সে কথা রাশিয়াকে সব সময় মেনে চলতে হবে।

(২) পোর্ট আর্থার নিয়ে থাকবে জাপানীদের হাতে।

(৩) মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে রুশদের।

(৪) তা ছাড়া শাকলীন দ্বীপের অর্ধেকটা থাকবে জাপানীদের আয়ত্তাধীনে।

এই যুদ্ধে স্বৈরাচারী শাসনের অযোগ্যতা এবং অপদার্থতা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো রাশিয়ার জনসাধারণের কাছে। ১৯০৫ সালের ৩রা জানুয়ারী সেইণ্ট পিটার্সবার্গের পুটিলভ ফ্যাক্টরীতে বার হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করলো—এদের সঙ্গে সহযোগিতা করলো ওখানকার অন্যান্য ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা। ৭ই জানুয়ারী সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট ঘোষিত হল। এই আন্দোলনকে বিধ্বস্ত করার জন্য জারিস্ট সরকারের পুলিশ এবং সৈন্যদল যেন ক্ষেপে উঠলো—শুরু হল অমানুষিক অত্যাচার, রক্তপাত এবং নির্যাতন। সেইণ্ট পিটার্সবার্গের নানা ফ্যাক্টরীর প্রায় ন' হাজার শ্রমিক একত্রিত হল জারিস্ট সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। তাদের নেতৃত্বের ভার পড়েছিল গেপন নামে একজন যাজকের ওপর। এই সব শ্রমিকদের গেপন বোঝালে—

[আলো নিভে যাবে। অন্ধকারের ভেতর মাইকের ভেতর দিয়ে গেপনের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে :]

গেপন—বন্ধুগণ ! আমাকে নেতৃত্ব করবার দায়িত্ব দিয়ে তোমরা আমাকে যে সম্মান দিয়েছ, তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি অনেক চিন্তা করে ঠিক করেছি প্রথমেই আমরা সশস্ত্র অভিযানের পথ গ্রহণ করবো না। আমি জানি আমাদের জার নিজে লোক খারাপ নন। শ্রমিকদের ওপর যা কিছু অত্যাচার হচ্ছে, তা করছে জারের নামে তাঁর কতকগুলো শয়তান প্রকৃতির আমলা-কর্মচারী। এ-সম্পর্কে কোন খবরই জারের কানে পৌঁছয় না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, জার যদি একবার জানতে পারেন তাঁর প্রজারা রাশিয়ান শ্রমিকের দল—কি দুঃখ-দুর্দশা এবং অত্যাচারের ভেতর দিন কাটাচ্ছে, তাহলে অবিলম্বে তিনি এর বিহিত করবেন। তাই আমি প্রস্তাব করছি—আমরা একটা শোকমিছিল করে, উইণ্টার প্যালেসে গিয়ে জারের হাতে আমাদের একটা আবেদনপত্র

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

দাখিল করবো—তাতে আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা লেখা থাকবে—লেখা থাকবে কি ধরণের প্রতিকার আমরা চাই। আগামী ৯ই জানুয়ারী রবিবার সকাল-বেলায় এই মিছিল বের করা হবে—তোমরা সমস্ত শ্রমিকের দল সেই মিছিলে অংশ নেবে—সঙ্গে করে নিয়ে যাবে নিজেদের পরিবারের সবাইকে—বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু, মহিলা কেউ বাদ যাবে না। ভয়ের বা বিপদের কোন কারণ নেই—আমরা যাব নিরস্ত্র অবস্থায়, শান্তিপূর্ণভাবে—অন্তরের সমস্ত বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে।

[কণ্ঠস্বর থেমে যাবে এবং আলো জ্বলে উঠলে দেখা যাবে কথক স্টেজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক—অবশেষে এল সেই রক্তাক্ত ৯ই জানুয়ারীর সকাল।

[কথক সরে যাবেন। বাঁদিক থেকে শ্রমিকদের মিছিল সহ গেপন এগিয়ে আসতে থাকবে। এই মিছিলে শ্রমিক, বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু সবাইকেই দেখা যাবে—তারা স্টেজের মাঝামাঝি আসতেই জারের পুলিশ এবং মিলিটারীর দল স্টেজের ডান দিক থেকে বন্দুক উঁচিয়ে এসে হাজির হবে। শ্রমিকের দল শ্লোগান দেবে—"স্বৈরাচারী সরকার নিপাত যাক!"—"খুনের বদলে চাই মুক্তি!" দপ করে আলো নিভে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলীর আওয়াজ, নর-নারীর চিৎকার, শিশুদের কাতর কান্নার শব্দে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠবে। গুলীর আওয়াজ বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে অসংখ্য নর-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুর মৃতদেহ স্টেজের ওপর পড়ে আছে। স্টেজের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসবে—মাইকের ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে উঠবে ঃ]

মাইক ভয়েস—চিরকাল কিন্তু সাধারণ সৈনিক এবং সাধারণ পুলিশের দল এভাবে তাদের বর্বর অফিসারদের অন্যায় আদেশ পালন করতে গিয়ে নির্দোষ নর-নারীকে হত্যা করে না। কারণ তারাও তো মানুষ, তাদের ভেতরও আছে মানবিকতাবোধ। কর্তাব্যক্তিদের নিষ্ঠুর আদেশের বিরুদ্ধে তারাও একদিন ঘোষণা করে বিদ্রোহ—গিয়ে যোগ দেয় জনগণের স্বপক্ষে—বন্দুকের মুখ ফিরিয়ে উঁচিয়ে ধরে অত্যাচারী শোষকশ্রেণীর প্রতিভূদের মাথার দিকে তাগ্ করে। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের সময়।

[আলো জ্বললে দেখা যাবে—মৃতদেহগুলো আগের মতই স্টেজের ওপর পড়ে রয়েছে। ডানদিকের উইংস থেকে দু'জন মিলিটারী অফিসার এবং দু'জন পুলিশের কর্মকর্তা গেপন সহ বেরিয়ে আসবে।]

প্রথম মিলিটারী অফিসার—বহুত আচ্ছা গেপন! এই গুলীবাজির কথা বহুদিন ব্যাটাদের স্মরণ থাকবে।

প্রথম পুলিশ অফিসার—আমাদের যথেষ্ট ভয় ছিল শ্রমিকগুলো শেষ পর্যন্ত তোমার আসল পরিচয় পেয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার—এ ব্যাপারটার কথা যতই ভাবছি ততই আমার হাসি পাচ্ছে। আমাদের এজেন্ট গেপন কি না শ্রমিক দলের নেতা! বিক্ষোভ মিছিলের নায়ক সেজে বসেছে গেপন!

(হোঃ হোঃ করে হেসে উঠবে। গেপন বাদে সবাই এ হাসিতে যোগ দেবে।)

গেপন—(বিমর্ষভাবে) কিন্তু এতগুলো লোককে তোমরা গুলী করে মারবে সে কথা আমাকে আগে বলা হয় নি। আমাকে পুলিশের কর্তারা বলেছিল শ্রমিকদের পায়ের দিকেই গুলী করা হবে। তাহলেই আহত হয়ে সবাই পালিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় মিলিটারী অফিসার—(গেপনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে) আরে ভাই তুমি যাজক মানুষ, গোলাগুলী দেখতে তুমি অভ্যস্ত নও বলেই এই কুকুরগুলোকে মরতে দেখে মনমরা হয়ে গেছ। চল আমাদের সঙ্গে—এক বোতল ভড্‌কা পান করলেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

[গেপনকে সঙ্গে নিয়ে ওরা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই চলে যাবে। ব্ল্যাক আউট—আলো জ্বললে দেখা যাবে স্টেজে আর কোন মৃতদেহ নেই। কথক এসে ঢুকে বলতে থাকবেন ঃ]

কথক—বর্বর জারিস্ট সরকার ভেবেছিল যে, রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে এবং পৈশাচিক অত্যাচার করে শ্রমিকদের আন্দোলনকে চিরকাল দাবিয়ে রাখবে। ভেবেছিল—এর পর থেকে তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পাবে না—হয়ে যাবে ভেড়ার মত নম্র, কুকুরের মত প্রভুভক্ত। কিন্তু তাদের এই বিশ্লেষণটা ছিল আগাগোড়াই ভুলে ভরা। নিরস্ত্র শান্তিমিছিলের অসহায় শ্রমিকদের নির্মমভাবে হত্যা করাতে সাদাসিধে সাধারণ লোকেদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে গেল, জারের অন্তরে দয়া, মায়া, করুণার, মানবিকতার লেশমাত্র নেই। বিপ্লব-বিরোধী শ্রমিকেরা পর্যন্ত বুঝলো, আবেদন-নিবেদনে কোন কাজ হবে না। বুঝতে শিখলো যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া তাদের অসহনীয় দারিদ্র্যের অবসান হবে না—হবে না গোলামীর থেকে মুক্তি। ৯ই জানুয়ারীর সন্ধ্যার আগে থেকেই সেইণ্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে মেহনতী মানুষেরা চারদিকে ব্যারিকেড তৈরি করে জারিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হল।

[ব্ল্যাক আউট। পেছনের পর্দায় সিনেমাটোগ্রাফীর সাহায্যে এই জাতীয় কিছু ছবি প্রজেক্ট করা হবে। আলো জ্বললে আবার কথক এসে বলতে থাকবেন ঃ]

কথক—৯ই জানুয়ারীর সেইণ্ট পিটার্স-বার্গের শ্রমিক বিপ্লবের খবর লেনিনরা জানতে পারলেন পরের দিন সকালে। ওখানকার বলশেভিকরা সেদিন জড় হয়েছিলেন লেপেসিনস্কির রেস্তোরাঁতে। সবাই একত্রিত হলেন—কিন্তু কারোর মুখে কথা নেই। প্রত্যেকেই বুঝতে পারছিলেন বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, জারের দাসত্ব শৃঙ্খলকে শ্রমিকরা ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত, সময় হয়েছে আসন্ন স্বৈরাচারী জারের পতনের। জনগণ এতকালের আলস্য-নিদ্রা ত্যাগ করে রুখে দাঁড়িয়েছে বিরাট শক্তি এবং সামর্থ্য নিয়ে মুক্তি-সংগ্রামের জন্য—আর তাদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না কোনো পাশবিক শক্তির।

এর পরের দৃশ্য জেনিভায় লেনিনের বাড়িতে ঃ

[কথক সরে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের পর্দা উঠে যাবে। এ দৃশ্যের শুরু হবে এইভাবে—জেনিভায় লেনিনের বাড়িতে লেনিন এবং এম্‌· এন্‌· লিয়াডভ দু'টি চেয়ারে বসে গল্প করছেন। আর টেবিলে এঁদের দু'জনের জন্য কাপে চা ঢালছেন ক্রুপস্কায়া। কথা বলতে বলতে এঁরা চা পান করবেন।]

লিয়াডভ—ভ্যাডিমার ইলিচ! রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত এমনই ক্ষেপে গেছে যে, তাদের এখন শান্ত করা জারিস্ট সরকারের পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যেক

বড় শহরে ধর্মঘট শুরু করেছে কারখানার শ্রমিকের দল।

লেনিন—কমরেড লিয়াডভ, বিপ্লবের আগুন ক্রমশ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ঘটতে শুরু হয়েছে রাশিয়াতে। প্রলেতারিয়েত জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর এ কথাও জানবেন, সরকার ইচ্ছা করেই শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলনকে ব্যাপক আকার নিতে দিয়েছে। কারণ তাহলেই তাদের তরফ থেকে মিলিটারী ফোর্সের ব্যবহারে কোন বাধা থাকবে না।

ক্রুপস্কায়া—৯ই জানুয়ারীর ব্লাডি-সানডেতে হতাহতের সংখ্যা কত হয়েছিল কমরেড লিয়াডভ?

লিয়াডভ—একশো চল্লিশ হাজার শ্রমিক তাদের আবেদনপত্র নিয়ে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে যাচ্ছিল উইন্টার প্যালেসে জারের কাছে দাবি জানাতে। এদের ভেতর ছিল বহুসংখ্যক নর-নারী, অকর্মণ্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী এবং শিশুর দল। এরা ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—সবার মুখেই হাসি, সবার মনেই আশা। তারা ভেবেছিল মহানুভব জার তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা জানতে পারলে, ভবিষ্যতে আর কোন সংগ্রামের কথা ভাবতেই হবে না। জার তাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগের সুরাহা করে দেবেন। কিন্তু মিছিল কিছুটা এগোনোর পরই অস্ত্রধারী মিলিটারীর দল এসে গুলীবর্ষণ শুরু করলো।

ক্রুপস্কায়া—আমাদের কাছে খবর এসেছে কয়েক হাজার লোক হতাহত হয়েছে।

লিয়াডভ—হাজারের ওপর লোক নিহত হয়েছে। আর প্রায় পাঁচ হাজার লোক আহত। গ্র্যান্ড ডিউক ভ্লাডিমির এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা গর্বভরে সেদিন থেকে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে যে শ্রমিকগুলোকে এবার একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

লেনিন—উচিত শিক্ষাই বটে! জানেন কমরেড লিয়াডভ, ভবিষ্যতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে যে, ১905 সালের ৯ই জানুয়ারী, একদিনে রাশিয়ার শ্রমিক, মজদুর, মেহনতী শ্রেণীর লোকেরা সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ এবং বিপ্লব বিষয়ে যে শিক্ষা অর্জন করেছে, তার ফলে প্রলেতারিয়েত তাদের লক্ষ্য এবং আদর্শের পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসেছে অনেকটা পথ। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি সহ্য করে—আদর্শকে লাভ করা বা লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। একথা আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি যে, ৯ই জানুয়ারী জারের জল্লাদের দল যে বীরের রক্তস্রোতের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিল সারা সেইন্ট পিটার্সবার্গে, তা কখনও বৃথা যাবে না। নারীঘাতী, শিশুঘাতী, কুৎসিত, বীভৎস, স্বৈরাচারী জার সরকার নিজেদের অবলুপ্তির পথকে নিজেরাই উন্মুক্ত করেছে ঐ ব্লাডি সানডেতে! যাই হোক—কমরেড লিয়াডভ! আপনি ফিরে গিয়ে রাশিয়ার সব বড় শহরগুলোতে সফর করে প্রত্যেক জায়গার শ্রমিক-বিক্ষোভ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন।

লেনিন (ফটো : ১১২০)

লিয়াডভ—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কমরেড লেনিন। আমি ফিরে গিয়েই এ-কাজে লাগবো।

লেনিন—আর সুবিধামত মাঝে মাঝে জেনিভাতে এসে আমাকে সব জানাবেন। আমিও আমার সমস্ত নির্দেশ এবং উপদেশ আপনার মারফতেই বিউরো অভ্ মেজরিটি কমিটির কমরেডদের কাছে পাঠাবো।

লিয়াডভ—আজ উঠি কমরেড লেনিন। আপনি আমাকে যেসব কথা বললেন সেইন্ট পিটার্সবার্গে যথাস্থানে তা পেশ করবো। ধন্যবাদ কমরেড ক্রুপস্কায়া—এত সুস্বাদু চা আপনি ছাড়া আর কেউ তৈরি করতে পারেন বলে মনে হয় না।

ক্রুপস্কায়া—ভ্ল্যাডিমির ইলিচ কিন্তু বলে আমি বড় কড়া চা করে ফেলি।

[লেনিন এবং লিয়াডভ হেসে উঠবেন। লেনিন লিয়াডভকে এগিয়ে দিতে যাবেন। ক্রুপস্কায়া নিজের জন্য একপেয়ালা চা তৈরি করে পান করতে থাকবেন। লেনিন ফিরে আসবেন।]

লেনিন—আমি তোমাকে বলছি ক্রুপস্কায়া, সেইন্ট পিটার্সবার্গে আজ যে আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে জারের পুলিশ আর মিলিটারীর দল, দুদিনেই সে আগুন বিরাট আকারে ছড়িয়ে পড়বে রাশিয়ার সব বড় বড় শহর আর শহরতলীতে। তারপর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ঐ স্বৈরাচারী সরকারকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মরাশিতে পরিণত করবে আমাদের এই কৃষক-শ্রমিক বিপ্লব।

ক্রুপস্কায়া—(এতক্ষণ যেন স্বপ্নমগ্নের মত লেনিনের কথা শুনছিলেন—সেই স্বপ্নাহত অবস্থাতেই বলতে থাকবেন:) আর সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে ডিক্টেটরশিপ অভ্ দি প্রলেতারিয়েত!

লেনিন—সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে কৃষক, মজদুর, শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষের শাসনতন্ত্র! মার্কস এবং এঙ্গেলসের স্বপ্ন প্রথম বাস্তবে রূপান্তরিত হবে আমাদের স্বদেশভূমি রাশিয়ায়!

[দপ্ করে আলো নিভে যাবে।]

[ক্রমশ]

খবর বলছি

সংবাদ বিচিত্রা/বিচিত্রা/নিউজ রীল

আকাশবাণী কলকাতার বার্তা বিভাগের যতো বিচিত্র ব্যাপার সংবাদ বিচিত্রা ও বিচিত্রার সঙ্গেই জড়িত।

অথচ রেডিও যাঁর আছে, তাঁর পক্ষে সংবাদ বিচিত্রা ও বিচিত্রা না শুনে উপায় নেই। কারণ সংবাদ বিচিত্রা/বিচিত্রা/নিউজ রীলের পুনরাবৃত্তিতে অত্যন্ত ধৈর্যবান শ্রোতার পর্যন্ত কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে।

বিচিত্রা, সংবাদ বিচিত্রা বা নিউজ রীলে আসলে কি পরিবেশন করা হয়? বিচিত্রা নামের গুণে জগাখিচুড়ি হতে পারে—তাতে সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ হলেও কে কার কথা শোনে? কিন্তু সংবাদ বিচিত্রা বা নিউজ রীলে খেয়ালখুশি মাফিক যা ইচ্ছে তাই পরিবেশন করা যায় বলে আমরা মনে করি না। অন্তত তাতে যা পরিবেশিত হবে তাতে কিছুটা সংবাদের ভ্যালু থাকা দরকার। উপরন্তু একথাও স্মরণীয়, যা ঘটে তার সবই সংবাদ নয়। আবার সত্যসত্যই সংবাদের ভ্যালু বহন করছে এমন যদি কিছু পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হয়—তাতে যদৃচ্ছা কাঁচি চালাবার অধিকার আকাশবাণীর বার্তা-বিভাগের থাকা কোনোমতেই উচিত নয়। খবর আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়, এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে—যা শ্রোতাদের কাছে ভীষণরকম বিরক্তিকর এবং পীড়াদায়ক। অথচ পুনরাবৃত্তিতে তা-ই যখন আবার শুনতে হয়, তখন কী অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা অভিজ্ঞ শ্রোতারাই জানেন।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

সংবাদ বিচিত্রায় যা গ্রথিত ও পরিবেশিত হয়, তা সব সময়ই ঠিক নয়। কিছুদিন আগে তো একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনায় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। বার্তা বিভাগ যদি মনে করেন আমাদের অভিযোগ অসত্য, তাহলে লিখিতভাবে ঐ বিভাগের প্রতিবাদপত্র পেলেই আমরা পরবর্তী সংখ্যায় আসল ঘটনা নিবেদন করবো।

সর্বঘটে কাঁঠালীকলা

বস্তত আকাশবাণীর এক শ্রেণীর কর্মচারী বিচিত্রা, সংবাদ বিচিত্রা বা নিউজ রীলে বহু ক্ষেত্রে তাঁদেরই ঠাঁই দেন, যাঁদের না দিলে দিল্লীতে কড়া 'নোট' পৌঁছতে পারে এবং এইভাবে ওপর-মহলকে সন্তুষ্ট রেখে তাঁরা বহু ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির অনুষ্ঠানের প্রচার করেন। এতে নাকি আঁতাতের ব্যাপার আছে, এমন ধারণা কেউ কেউ পোষণ করেন। সরকারী ব্যয়ে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানগুলি প্রচারের মূলে কি কারণ থাকতে পারে, তা ভেবে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। আবার আকাশবাণী কলকাতার কোনো কোনো কর্মচারী আছেন, যাঁরা একটি বিভাগে কর্মরত থেকেও সর্বঘটে কাঁঠালীকলা। ব্যবসায়ী অনুষ্ঠানগুলির স্যুভেনির-এ তাঁদের নাম পাবেন। তাঁরা যদি থাকেন, তা তো আনন্দের। কিন্তু যে অনুষ্ঠানে তাঁদের পদার্পণ করার কথা, সেই অনুষ্ঠানের 'প্রচার' শুনতে পাবেন সংবাদ বিচিত্রায়। এ কথা অকাট্য বলা যায়।

পরিবেশনযোগ্যতা

সংবাদ বিচিত্রা বা নিউজ রীলে পরিবেশনযোগ্য বিষয়গুলি কোনো ব্যবসায়ী-অনুষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা উচিত কিনা সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত থাকা উচিত মনে করি। কারণ ব্যবসায়ী অনুষ্ঠানগুলি অর্থের জোরে বলশালী হতে পারেন, প্রচুর ব্যয়ে নামজাদাদের আনতে পারেন—কিন্তু আকাশবাণীর মতো প্রতিষ্ঠান তার জন্য অর্থ ব্যয় করবে কেন? উপরন্তু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি মনোহরণ বা ক্ষুধাহরণ করতে পারেন বলেই কি আকাশবাণীর দায়িত্বশীল কর্মীরা সেদিকে আকৃষ্ট হবেন? প্রলুব্ধ হবেন?

অথচ বহু সৌখিন প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশে আছে—তাঁরা নানারকম অনুষ্ঠান করছেন—ঐ সব প্রতিষ্ঠান থেকেই গড়ে উঠবে আগামীকালের বহু গুণী শিল্পী বা নামী বক্তা—ঐ সব অনুষ্ঠানের দারিদ্র্যদশার জন্য প্রয়োজন ছাড়া, সংবাদ বিচিত্রা বোধ হয় নীরব। এছাড়া আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, শুধু অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিই কি সংবাদ বিচিত্রা বা নিউজ রীলের সব কিছু। অনেক সময় সংবাদ বিচিত্রায় ধরা পড়েছে খনিতে আটকে পড়া শ্রমিকদের কিংবা দমদমের কাছেই দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত এরোপ্লেনের বেঁচে যাওয়া মানুষের কণ্ঠ—কিন্তু সারা বাংলা দেশের গ্রামের মানুষের কণ্ঠস্বর কি সংবাদ বিচিত্রার বিষয়বস্তু হতে পারে না? আমাদের ধারণা কলকাতা বা তার উপকণ্ঠের চেয়ে দূর পল্লীর ছোট্ট ছোট্ট অনুষ্ঠানগুলিকে যদি সংবাদ বিচিত্রা কোনো দিন তুলে ধরতে পারেন—তার মূল্য হবে সবচেয়ে বেশি। কারণ ঐ ঘটনা বাংলা দেশের সুপ্ত মানুষগুলির কাছে হবে প্রেরণাস্বরূপ, তাঁরা উৎসাহিত হবেন। অর্থাৎ এক কানে শুনে আর এক কানে বের করে দেওয়ার ব্যাপার হবে না।

ক্ষমাহীন ধৃষ্টতা

অবশ্য কলকাতার মধ্যে সব অনুষ্ঠানেই আকাশবাণীর বার্তা বিভাগের কর্মীদের দর্শন পাওয়া যায় না—হয়তো তা সম্ভবও নয়। কিন্তু এমন অনুষ্ঠান তো থাকতে পারে, আহ্বানের অপেক্ষা না করে যেখানে বার্তা বিভাগ নিজেরাই 'টেপ' করার জন্য লোক পাঠাতে পারেন। তা করেন কিনা জানি না। তবে যেখানে যাওয়া অবশ্যই উচিত, সেখানে শত ডাকেও তাঁরা যান না। আমরা একথা বলছি, কারণ আমাদের কাছে ঐ ব্যাপারে অনুষ্ঠানের ছবিসহ একটি অভিযোগ এসেছে। অভিযোগে মোটামুটি বলা হয়েছে: মহাজাতি সদনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বার্তা বিভাগকে আমন্ত্রণ জানানো হলে, তাঁরা তো যোগ দেনই নি; উপরন্তু ঐ অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন এবং বহুদিন পর একাধিক সংগীত পরিবেশন করবেন বলে জানানো হলেও ঐ বিভাগের কর্মকর্তা নাকি বক্রোক্তি ও নাসিকাকুঞ্চন করেন; হয়তো ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁদের সংবাদ বিচিত্রার অযোগ্য! কিন্তু শ্রোতাদের মুখ চেয়ে সংবাদ বিচিত্রায় এই গুরুস্থানীয় শিল্পীর কণ্ঠস্বর নতুন করে প্রচার করতে পারলে কি সংবাদ বিচিত্রার গৌরব বাড়তো না, এবং সেটাই কি হোত না সত্যিকারের সংবাদ?

মাসিক ৫্ টাকা কিস্তিতে
পার্কার ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার প্রতি গ্রামে এবং শহরে পাঠান যায়।
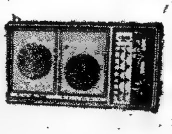
Japan Transistors (AK)
Kolhapur Road, Delhi—7.

রঙ্গজগৎ

সিনেমায় প্রতীক ধর্মঘট

আগামী ২০শে জুন কলকাতার স্টুডিও, ল্যাবরেটরি, পরিবেশন অফিস সহ চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতিটি স্তরে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট হবে। একথা ঘোষিত হয়েছে গত ৬ই জুন। সেদিন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনের (মালিকদের সংস্থা) অফিসের সামনে সিনেমার প্রতিটি বিভাগের কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সংগঠন করেছিল বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সিনে টেকনিশিয়ান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং অভিনেতৃ সঙ্ঘ। কর্মীরা বলেছেন সিনেমা শিল্পের ছাঁটাই-কর্মচারী বিরোধ মীমাংসা না হলে, স্টুডিও ল্যাবরেটরির কর্মচারীদের শ্রমবিরোধ এবং ন্যূনতম বেতন না মিটলে এবং নতুন বেতনের স্কেল ও মহার্ঘভাতার দাবি পূরণ না হলে ২০শে জুন এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট করা হবে। শ্রমিক-কর্মচারী ও টেকনিশিয়ানরা আরো জানিয়ে দিয়েছেন, যদি মালিকদের মনোভাব উদ্ধত হয় তা হলে প্রয়োজনবোধে তাঁরা লাগাতার ধর্মঘটের পথে যাবেন।

এক সভায় শিল্পী-শ্রমিকদের পক্ষে এই বক্তব্যগুলি রাখেন অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ সাঈদ এবং অজিত লাহিড়ী প্রমুখ আরো অনেকে। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর শিল্পী, টেকনিশিয়ান শ্রমিকরা মিছিল করে গণেশ টকিজে যান। সেখানে কর্মচারী ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সারাদিন অবস্থান ধর্মঘট চলে। অভিনেতা দিলীপ রায় অবস্থানকারী শ্রমিকদের সমর্থন করে বক্তৃতা করেন।

সিনেমা শিল্পের সমস্যা কোন দিক থেকেই মীমাংসা হচ্ছে না। মালিকদের প্রতিনিধির বক্তব্যে বোঝা গেছে শ্রমিক ছাঁটাই ব্যাপারে তাঁরা পুনর্বিবেচনা করবেন না। যদি তা না করেন তা হলে ফলাফল যে ভালর দিকে যাবে না সে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কেন মালিকপক্ষ ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালে আপত্তি করছেন আমরা বুঝতে পারছি না। ইতিপূর্বে সিনেমাগুলিতে যে ধর্মঘট হয়েছিল তা অনুমানের বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তাতে সিনেমা-মালিকদের কোন লাভ হয় নি: শ্রমিকরাও অসুবিধা ভোগ করেছে, সরকারেরও আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেছিল মালিকদের অনমনীয়তার দরুণই সেই ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা সিনেমার মালিকরা বেশি একগুঁয়েমি দেখান—একথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। এবার মালিকপক্ষ যে উত্তর দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে তাঁরা সহজে শ্রমিকদের সঙ্গে মীমাংসা করবেন না। সিনেমা-মালিকদের টাকার জোর বেশি; সুতরাং কয়েক মাস সিনেমা বন্ধ রেখে শ্রমিকদের ভোগাতে তাঁদের বিবেকে না বাধতে পারে, কিন্তু তাতে সামগ্রিকভাবে সিনেমা শিল্পের ক্ষতি হয়। এতে স্টুডিওতে প্রোডাকসন কমে যায়, ছবিগুলি মুক্তি না পেলে নিয়োজিত টাকা আটক থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ছোট প্রযোজকরা মার খেয়ে পথে বসে। কর্মচারীদেরও দুর্দশার সীমা থাকে না। সরকারী তহবিলের প্রমোদকর বাবদ আয় আসে না। সম্ভবত মালিকপক্ষ শেষোক্ত কথাটা চিন্তা করে বেশি উৎসাহ পাচ্ছে। সরকারী তহবিলে প্রমোদকরের আয়টা না হলে সরকারকে কিছুটা অসুবিধায় ফেলতে সুবিধা হয়।

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন এবং বিশেষ করে সিনেমা মালিকদের আজ ভেবে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবির কথা। একটার পর একটা আঘাত আসছে বাংলা ছবির জগতে। গত দু' বছর পর্যন্ত ধর্মঘট, বিক্ষোভ, পিকেটিং ইত্যাদির ফলে বাংলার সঙ্কীর্ণ ছবির জগতে বিপদের শেষ নেই। আবার যদি শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে যেতে বাধা করা হয় তবে বাংলা ছবি দাঁড়াবে কিভাবে? সিনেমা-মালিকদের একথা ভেবে দেখতে হবে। —সুজন

জহর গাঙ্গুলী

জহর গাঙ্গুলীর জীবনাবসান

গত ৭ই জুন শনিবার পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীজহর গাঙ্গুলীর জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেদিন কলকাতার সমস্ত থিয়েটার বন্ধ রাখা হয়েছিল। শ্রীজহর গাঙ্গুলী মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে যেমন পেশাগতভাবে যুক্ত ছিলেন, তেমন ব্যক্তিগত জীবনে মোহনবাগান ক্লাব এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পর্ক রাখতেন।

২৪ পরগনা জেলার সেতপুর গ্রামে তাঁর জন্ম ১৯০৩ সালে। বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজে তিনি লেখাপড়া শেখেন। কলেজ ছাড়ার পরে তিনি প্রথম যাত্রায় অভিনয় করেন; মঞ্চে অভিনয় করেন শ্রীদুর্গার আলফ্রেড থিয়েটারে। তার দু' বছর পরে অপরেশচন্দ্র মুখার্জীর সহায়তায় আর্ট থিয়েটারে 'শাঁখের করাত' নাটকে অভিনয় করেন। এখানে তিনি বছর পাঁচেক অভিনয় করেন। তারপরে ১৯৩৪ সালে কুমার মিত্রের সহায়তায় চলচ্চিত্র-শিল্পে আসেন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র অভিনয় নির্বাক গীতা: প্রথম সবাক চিত্রাভিনয় চাঁদসদাগর-এ।

যে সকল নাটকে তিনি সুখ্যাতি লাভ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র, মানময়ী গার্লস স্কুল, বড় বৌ, বাঙলার মেয়ে, পথের সাথী তটিনীর বিচার, পরিণীতা, দেবদাস, দুই পুরুষ, রামের সুমতি, মাটির ঘর, শ্যামলী, গিরিশচন্দ্র, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত, এন্টনী কবিয়াল, এবং শেষ নাটক নটি বিনোদিনী।

তিনি শতাধিক ছবিতে অভিনয়

করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে তুলসীদাস, দেনাপাওনা, কণ্ঠহার, মানময়ী গার্লস স্কুল, প্রফুল্ল, পথের শেষে, বিষবৃক্ষ, মহানিশা, প্রতিশ্রুতি, সাত নম্বর বাড়ি, সমাপিকা, যখের ধন, শহর থেকে দূরে, মানে না মানা, যোগাযোগ, পরিশোধ, নিষ্কৃতি, ছদ্মবেশী, হাসপাতাল, বাবলা, সাগরিকা, হে মহামানব, শ্রীমা, চিরকুমার সভা, জজ সাহেবের নাতনী, প্রিয়বান্ধবী, পাপের পথে, মাটির ঘর, দুই পুরুষ, পথ বেঁধে দিল, পথের সাথী, মেজদিদি, দত্তা, শ্যামলী, চিড়িয়াখানা, সাহেব বিবি গোলাম, পিতাপুত্র, হংসমিথুন।

বহুরূপী প্রযোজিত 'বর্বর বাঁশী' নাটকে শিখা মুখার্জী, শিবশঙ্কর মুখার্জী ও তারাপদ মুখার্জী।

নাটকের কথা

বর্বর বাঁশী

বহুরূপীর নতুন নাটক 'বর্বর বাঁশী'। মীতীশ সেনের লেখা এই নাটকটি নামেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নামের মধ্যে শ্লেষ যুক্ত হয়েছে; নাট্যকার সমাজের বর্তমান অবস্থার একটা চিত্র উপস্থিত করে দর্শকদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, এই অবস্থা থেকে সমাজের পরিত্রাণের উপায় কি ?

এক সংসারে তিন ছেলে; তাদের বাবা এবং স্বামীগৃহে বাস করতে অনিচ্ছুক বোনকে নিয়ে এই সংসার আর তাদের আত্মীয়-পরিবারকে কেন্দ্র করে বর্তমান সমাজের একটা চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। একদিন এই পরিবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিল। এখন বৃদ্ধ পিতা, যিনি একসময় টাকার লোভ সামলাতে না পেরে চাকরী খুইয়ে ছেলেদের ওপর নির্ভর করে আছেন। অপদার্থ স্বামীর অত্যাচারে বোন বাপের বাড়িতে থাকা ছাড়া উপায় দেখছে না। এক ভাই মোটর ড্রাইভার হয়েছে—হঠাৎ একটা দাঁও মেরে নিজের ট্যাক্সি করার স্বপ্ন দেখছে। ছোট ভাই হয়েছে ভদ্রতর মুখোস পরা দুর্নীতিকারীদের টাউট। আর এদেরই পাশে রয়েছে পিসেমশায়ের সংসার, যে সংসারে অথর্ব ছেলেকে অবতার সাজিয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে একমাত্র মানুষ—বড়ছেলে পরিচয়। সে মেকানিক। পরিচয় লোভ ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে—একটি স্থির মানুষ। কিন্তু একে একে তার সঙ্গে সংঘাত শুরু হল সকলের—তখন দেখা গেল সে একা। সুবিধাবাদী, ভীরু ও টাউটরা নিজের নিজের পথ করে বেরিয়ে গেল, সকলের পাপের ফল ভোগ করল পরিচয় গুণ্ডার হাতে মার খেয়ে। সে চেয়েছিল সংসারে সকলের ভাল করতে, নতুন করে সংসারকে গড়তে কিন্তু চারদিকের দুর্নীতির কাছে সে হল পরাজিত।

নাটকটি তিন অঙ্কের। প্রথম দু' অঙ্ক সংলাপগুণে এবং গতিবেগের জন্য দর্শকদের খুবই আকৃষ্ট করে রাখে। তৃতীয় অঙ্ক তুলনামূলকভাবে দুর্বল। সংলাপ রচনা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অল্প কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের পঙ্কিল চিত্র এবং মানুষের অসহায়ত্ব দেখা যায়। নাট্যকার রিপোর্টারের মত এই চিত্র উপস্থিত করেছেন; সমস্যার গভীরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেন নি, এই ভঙ্গুর চিত্রটির মূলে কি রয়েছে সেদিকে না গিয়ে সে প্রশ্নটা তিনি দর্শকদের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। নাটকের একমাত্র পজিটিভ চরিত্র পরিচয়। শেষ পর্যন্ত পরিচয়ও মার খেয়ে অসহায়ভাবে প্রশ্ন করলো—এই অবস্থা থেকে কি বাঁচার পথ নেই ? নাট্যকারের দর্পণে সমাজের একটা চেহারা প্রকাশ হয়েছে সত্যি, কিন্তু এখানেই ত' শেষ নয়। এই অন্ধ ও দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত মানুষ লড়ছে; লড়ছে বলেই আজো সমাজে ভাল কথা সাহস করে বলার মত লোক আছে, অন্যায় ও দুর্নীতির প্রতিবাদ হয়। এই পজিটিভ চরিত্রের মানুষগুলিকে ঠিকভাবে দেখাতে পারলেই আশা জাগে, সাহস আসে।

নাটকে যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন তাঁরা কেউ নামী শিল্পী নন। বহুরূপীর পরিচিত শিল্পী তালিকায় এঁদের নাম দেখা যায় না। অথচ 'বর্বর বাঁশী'-তে এঁরা যে অভিনয় করেছেন তা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর চেয়ে কম নয়। দলগত কাজ আর ব্যক্তিগত নৈপুণ্য মিলে নাটকটিকে উপভোগ্য করেছে এবং এজন্য সার্থক নির্দেশনার সঙ্গে শিল্পীরা প্রশংসনীয়। অনসূয়ার চরিত্রে অঞ্জলি সেন, পরিচয়রূপে কালীপ্রসাদ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয়ের ভূমিকায় শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং প্রতিমার চরিত্রে শিখা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় কৃতিত্বপূর্ণ। নাটকের নির্দেশনা শম্ভু মিত্রের। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চপরিকল্পনা যথেষ্ট শিল্পবোধে সুন্দর এবং তাৎপর্যময়।

নজরুল একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৭ই জুন মহাজাতি সদনে পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। উদ্বোধন করেছেন সাহিত্যিক ও অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দান করেন পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। নজরুলের কাব্য আলোচনা করেন মহিলা

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
ন্যাশন্যাল ডিল্যুক্স"
১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

পঃ বঃ নজরুল একাডেমি আয়োজিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীমুজফ্ফর আহমদ, বিচারপতি শ্রী এস. এ, মাসুদ, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র ও পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী।

পত্রিকা 'একসাথে'-র সম্পাদিকা অধ্যাপিকা শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে নজরুল-সুহৃদ শ্রীমুজাফ্ফর আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে নজরুল একাডেমি গুণী সম্বর্ধনা জানান সুরস্রষ্টা শ্রীঅনিল বাগচী ও শ্রীনিতাই ঘটককে। একাডেমি আয়োজিত সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়।

তারপরে সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সুপ্রভা সরকার, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখার্জী, সুমিত্রা সেন, পূরবী দত্ত, নির্মলা মিশ্র, ধীরেন বসু, সবিতাব্রত দত্ত, অধীর বাগচী, রামকমল চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত, তৃপ্তি চক্রবর্তী, দীপ্তি চক্রবর্তী, নন্দিতা বসু, চামেলী গুহদেব এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। আবৃত্তি করেন অনুরাধা ঘোষ, জ্যোতির্ময়ী ব্যানার্জী ও আবুলকাশেম রহিমুদ্দিন।

ঐকতান-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

ট্যাংরা অঞ্চলের পটারী রোডস্থিত ঐকতান ক্লাবের তৃতীয় প্রীতি-সম্মেলন সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই জুন। এই তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিশোধ, প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, অন্ধ কারা নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতাবলম্বনে নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়েছে। ক্লাবের সদস্যদের ড্রিল ও ক্রীড়া প্রদর্শনী, বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদি তিনদিনের অনুষ্ঠান পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল।

স্টুডিও খবর

মুক্তিস্নান

কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ ছবি শক্তিপদ রাজগুরু রচিত কাহিনী অবলম্বনে "মুক্তিস্নান"-এর চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে চলেছে পরিচালক অজিত গঙ্গুলীর পরিচালনাধীনে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। গীত রচনা করেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর দিচ্ছেন—রাজেন সরকার। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন—সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, কালী ব্যানার্জী, হরিধন, গঙ্গাপদ বসু, শ্যামল ঘোষাল, জহর রায়, সমরকুমার, মিন্টু, মৃণাল, অমর বিশ্বাস, ছায়া দেবী, শোভা সেন, গীতা দে, প্রমুখ। কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন—হেমন্ত মুখার্জী, মান্না দে, শ্যামল মিত্র ও আরতি মুখার্জী। প্রায় প্রতিদিনই ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ চলছে। প্রযোজকের মতে জুনের মাঝামাঝি ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবে। নর্মদা চিত্র ছবিটির পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন।

সাবিত্রী

শ্রীসুজাতা মুভিজের 'সাবিত্রী সত্যবান'-এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ছবিটির পরিচালনায় রয়েছেন দ্বিজু ভাওয়াল। সংলাপ রচনা করেছেন অরুণ রায়। গান রচনা করেছেন শ্যামল গুপ্ত ও শ্যামল ঘোষ। নেপথ্যে গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখার্জী, প্রদীপ দাশগুপ্ত, গীতা দাস এবং নির্মলা মিশ্র।

নজরুল একাডেমির সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কুমারী কাবেরী দাস।

মহাজাতি সদনে নজরুল একাডেমির পক্ষে বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র সরকার শ্রীঅনিল বাগচীকে গুণী সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।

সংবাদকণী

মস্কোয় ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

আগামী ৭ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত মস্কোয় ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই এই উৎসবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে।

"মানবতাবাদী সিনেমা আর্টের পক্ষে; জাতিতে জাতিতে শান্তি ও মৈত্রীর পক্ষে"; —এই আদর্শে অনুষ্ঠিত এই আসন্ন উৎসব মস্কোয় একটি ব্যাপক ও প্রতিনিধিত্বমূলক ফিল্ম ফোরামে রূপে পরিগ্রহ করবে।

মস্কোয় আসন্ন এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান এ কেমারোভ সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, বিশ্বের সমস্ত দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে এই উৎসবে। প্রত্যেক দেশ উৎসবে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি, একটি শর্টরিল ফিচার, ডকুমেণ্টারি কিংবা বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় ছবি পাঠাতে এবং তিনজনের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে পারবে।

বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধিদল ছাড়াও উৎসব কমিটি বিভিন্ন দেশের বহু খ্যাতনামা চিত্র নির্মাতাকে এ উৎসবে অতিথিরূপে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবিগুলি ক্রেমলিনের কংগ্রেস প্রাসাদে এবং শর্টরিল ছবিগুলি কেন্দ্রীয় ফিল্ম ক্লাবে দেখান হবে। পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবিগুলির জন্য তিনটি স্বর্ণ নির্মিত পুরস্কার, তিনটি রৌপ্য পুরস্কার এবং মেয়েদের ভূমিকায় অভিনীত সর্বোৎকৃষ্ট অভিনয়ের জন্য দুটি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। অপরপক্ষে শর্টরিল ফিল্মের ক্ষেত্রে রয়েছে : সর্বাপেক্ষা ভাল অভিনয়ের জন্য পুরস্কার; সর্বাপেক্ষা ভাল ডকুমেণ্টারি ছবি ও জনপ্রিয় বিজ্ঞানভিত্তিক ছবির জন্য আলাদা আলাদা পুরস্কার। উৎসবে সমাগত অতিথিবৃন্দকে এই সময়ে লেনিন হিলে শিশু চলচ্চিত্র উৎসবেও আমন্ত্রণ জানান হবে।

আগামী ১৯৭০ সালে ভি আই লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রাক্কালে মস্কোয় এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সঙ্গে স্মরণীয় যে, এ বছর অগাস্ট মাসে লেনিন কর্তৃক সোভিয়েত সিনেমাটোগ্রাফির প্রথম ডিক্রি স্বাক্ষরের ৫০ বছর পূর্ণ হবে। এই দুই স্মরণীয় দিনের সম্মানার্থে আসন্ন উৎসবে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিন সম্পর্কিত চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য কিছু বাছাই করা ভাল সোভিয়েত চলচ্চিত্রও অতিথিদের দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

উৎসবের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের আমন্ত্রণে অতিথিদের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতন্ত্রের ফিল্ম স্টুডিও পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মস্কোর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এ বছর তার দশ বছর পূর্ণ করে এগার বছরে পা দিল।

মাধবী হিন্দী ছবিতে দীপা

সুখেন্দর সেন পরিচালিত 'প্রথম কদম ফুল'- এর একটি দৃশ্যে সৌমিত্র ও অনুভা

বিবেকানন্দ ক্লাবের রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ২৭শে বৈশাখ কোতরং বিবেকানন্দ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান করেন। গান, আবৃত্তি এবং আবহসংগীতের সমন্বয়ে "কবি মানস" গীতি-আলেখ্য জনসমক্ষে ধরেন দীপক দত্ত। কবিজীবনের চিন্তা-ধারা এই গীতি-আলেখ্যে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কবিগুরুর বিশ্ববন্দিত কবিতা "দুই বিঘা জমি" মঞ্চস্থ করেন পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অন্তরালে "দুই বিঘা জমি"র আবৃত্তি এবং আবহসংগীতের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রশংসা অর্জন করেন—ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (চাষী), অসীম চৌধুরী (বাবু), উদ্ধব দত্ত (উপেন)।

রবীন্দ্রজয়ন্তী-অনুষ্ঠান

গত ৩০শে মে, ৬০, গোপীমোহন দত্ত লেনে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিশ্বকবির জন্মদিবস পালন করা হল। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শতাব্দী রায় ও টুমকি। সঙ্গীতে শ্রীমতী গোপা বিশ্বাস, কুমকুম নিয়োগী, শক্তি মুখোপাধ্যায়, মহাদেব মুখোপাধ্যায় ও সনৎ নাগচৌধুরী অংশ গ্রহণ করেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা" নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। এতে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তার মধ্যে ভাস্বতী সেন, বীথি গঙ্গোপাধ্যায়, শিখা চট্টোপাধ্যায় ও গৌরী সুর প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী স্মৃতি গঙ্গোপাধ্যায়।

সঙ্গীতকথা

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন

সুরসাগর হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের দশম বার্ষিক নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা বালিগঞ্জস্থিত তীর্থপতি ইনস্টিটিউশানে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক প্রতিযোগী এ বছর প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করেছেন।

'ক' বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী অম্বিকা ব্যানার্জী। 'খ' বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী অনুরাধা সেনগুপ্ত। 'গ' বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী—কেয়া রায়। 'ঘ' বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী ইরা মুখার্জী। কণ্ঠ-সংগীতে সর্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী অম্বিকা ব্যানার্জী।

৪র্থ আনন্দোজ্জ্বল সপ্তাহ
সংবাদপত্র ও জনসাধারণের
অভিনন্দন ধন্য
মেহমুদের
পড়োসন
(ইষ্টম্যানকালার)
Saira Banu, Sunil Dutt, Mahmood, Agha, Mukri, Sunder, Kishore Kumar & Om Prakash.
Direction—Jyoti Swaroop

Music—Rahul Dev Burman
Lyrics—Rajinder Krishan
When there is a girl opposite a young man's window Love must ensue
—*The Statesman*

নায়িকা সায়রাবানুর অভিনয় বেশ সপ্রাণ। নাটুকে দলের ওস্তাদের ভূমিকায় কিশোর কুমার সুন্দর অভিনয় করেছেন এবং মেহমুদের রূপসজ্জায় চাল-চলনে বাচনভঙ্গীতে যেন ষোল আনাই তামিল গায়ক। হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটক রীতির মিশ্রণে এবং সমগ্রভাবে সুর রচনায় রাহুল দেব বর্মণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।
—আনন্দবাজার পত্রিকা

রাহুল দেব বর্মণের সুর দেওয়া গানগুলি "পড়োসনের" এক বিশেষ আকর্ষণ বলে গণ্য হবে
—যুগান্তর

রবিবার প্রাতঃকালীন শোঃ ১০-৩০টায়
মুনলাইটে
প্রত্যহ ৩, ৬, ৯ ও ২-৩০, ৫-৪৫, ৯
দর্পণা ও মেনকায়
সোসাইটী - দর্পণা - মেনকা
(সকল তাপ-নিয়: বিলাসবহুল থিয়েটার)
মুনলাইট (এয়ারকুল্ড)

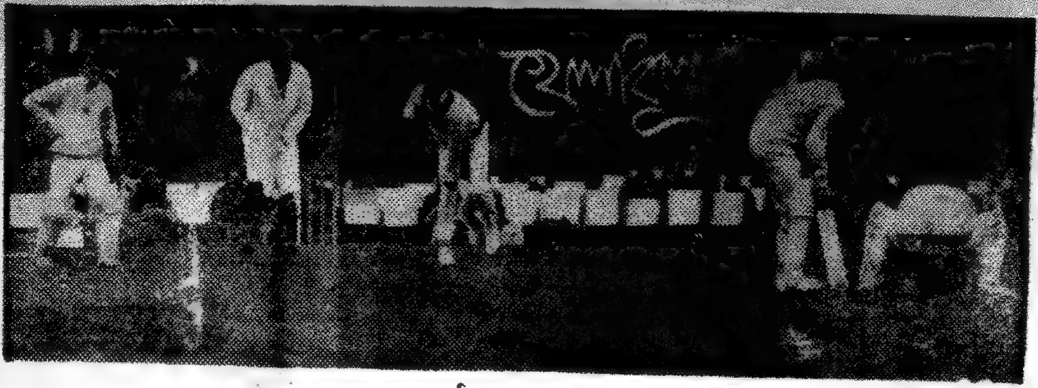

॥ বিশৃংখলা ॥

বাংলাদেশের খেলাধূলোর জগৎটা এখন বিশৃংখলায় ভরা। অরাজক ক্রীড়াঙ্গনের হাল আজ তাই শোচনীয়। ওপরমহলের কর্তাদের থেকে আরম্ভ করে নিচতলার বাসিন্দারা পর্যন্ত আত্মকলহে ব্যস্ত। কেউ চাইছেন নিজের ক্ষমতার বহর জাহির করতে আবার কেউ চাইছেন অন্যায়ভাবে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে। অবশ্য ন্যায়-অন্যায় বলে একটা জিনিষ কলকাতা ময়দানে হয়তো একসময় ছিলো, এখন তার অস্তিত্বের আর ছিটে-ফোঁটাও নেই। যাঁরা যতো বেশি বেপরোয়া তাঁরা ময়দানী ক্রীড়াঙ্গনে ততো বেশি ক্ষমতাশালী —তাঁরা সব সময়ই থাকেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আর যাঁরা ন্যায়-অন্যায়কে মেনে নিয়ে একটু ভালভাবে, একটু শোভনভাবে চলতে চেয়েছেন—তা সে ক্লাব পরিচালনা, দল পরিচালনা কিম্বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, তাঁদের মানে মানে সরে পড়তে হয়েছে। অন্যায়, অবিচার আর বিশৃংখলার সংগে ঠিক যেন তাঁরা পাল্লা দিয়ে চলতে পারেন নি। কলকাতা ময়দানের ইতিহাসে এমন গাদা গাদা ঘটছে—অতীতে ঘটেছে, বর্তমানে ঘটছে আর ভবিষ্যতেও যে ঘটবে সে বিষয়েও বোধহয় বাংলাদেশের ক্রীড়ারসিকরা নিঃসন্দেহ। কায়েমী স্বার্থ কায়েম হয়ে পাথরের মতো চেপে বসেছে কলকাতা ময়দানের বুকে। সে পাথর সরিয়ে ফেলা যে কতো কঠিন তার প্রমাণ আমরা বারবার পেয়েছি। হয়তো ব্যাপারটা একরকম অসম্ভবই। কারণ মুখে বড় বড় কথা বলা এক কথা আর কাজের বেলায় করে দেখিয়ে দেওয়া আর এক কথা।

কংগ্রেসের দীর্ঘ রাজত্বে আমাদের যে স্বপ্ন কোনদিন কার্যে পরিণত হয়নি, বাংলাদেশের ক্রীড়ারসিকদের অনেক আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বপ্ন বারবার তদানীন্তন সরকারের কৃপায় আলেয়ার মতো শুধু আমাদের হাতছানি দিয়ে ডেকেই গেছে। কাজে পরিণত হয় নি কখনো। এ বছর যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর খেলাধূলোকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করলেন ক্রীড়ামন্ত্রীর পদও। মন্ত্রীর দায়িত্ব হাতে নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীও অনেক কথা বললেন। বললেন, কংগ্রেস বিশ বছরে যা পারে নি বিশ মাসে তিনি তাই করবেন। আর সেই সংগে কলকাতা ময়দান তিনি বাস্তুঘুঘু মুক্ত করবেন। বাংলাদেশ আবার নতুন স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করলো, আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করলো সকলের মনে। কিন্তু তারপর? তারপর ইডেন উদ্যানে ফুটবলের জন্যে, নামে কম্পোজিট হলেও আসলে, কম্বাইন্ড স্টেডিয়াম তৈরির কথা যখন অনেকখানি এগিয়ে গেলো তখন একদল হলেন খুশি আর একদলের মনে নেমে এলো সংশয়ের কালো মেঘ। কারণ মাটি প্রভৃতির জন্যে ইডেনে ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। ইডেনে যদি নিয়মিতভাবে ফুটবল খেলা হয়, তাহলে শুধু বাংলার নয়, বিশ্ব-ক্রিকেটের দরবারে ভারতের সব থেকে বেশি গর্বের বস্তু ইডেন উদ্যান হারিয়ে ফেলবে তার এতোকালের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠের সম্মান। কারণ আজো লর্ডস মাঠের পরেই শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে ইডেনের স্থান। তাই সরকারী সিদ্ধান্তে সকলেই আজ চিন্তিত। এর পর যদি আমরা আসি কলকাতার ফুটবলের প্রসংগে তাহলেই দেখবো, এ বছরও চলেছে সেই একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি। সেই গোলমাল, সেই খেয়োখেয়ি, সেই মারামারি। কোথাও নেই এতোটুকুও পরিবর্তনের ছোঁয়া। আর সব শেষে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর সংগে রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের যে ব্যাপারটা হয়ে গেলো এবং যার জের কয়েকদিন ধরে চলেছিল তার তুলনা মেলা ভার। বিশৃংখলার চরম নিদর্শন এটি। কিন্তু রাজ্য সরকার এবং সরকারের ক্রীড়াদপ্তরের কাছে আমরা কি এই প্রত্যাশাই করেছিলাম...?

ক্রিকেটের খবর

ইংলন্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে। আর লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে ততদিনে প্রথম টেস্ট ম্যাচ শেষও হয়ে যাবে। টসে জিতে ইংলন্ড লাভ করেছেন প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ, আর সে সুযোগও তারা কাজে লাগিয়েছিল পুরোপুরিভাবে।

আমরা আগেই লিখেছিলাম যে, এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং-এর ধার অনেক কম। হল কিম্বা গ্রিফিথের মতো বোলারের আজো একান্তই অভাব। হল-গ্রিফিথের বোলিং-এর সেই ধার আজ আর নেই। শুধু হল ও গ্রিফিথকে বাদ দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যে সত্যিই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেলো। তাই মনে হয় গিবসই আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের আক্রমণের প্রধান স্তম্ভ। সোবার্সের কথা না লিখলেও চলে। কারণ পেস এবং স্পিন বোলিং আর ব্যাটিং-এ সোবার্সই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের একমাত্র নির্ভরস্থল।

ইংলন্ড দলে এবার কাউড্রে নেই, মিলবার্নও নেই। আর বয়কটও খেলতে পারবেন কি না সে বিষয়ে ছিল যথেষ্ট সন্দেহ। কারণ আগের খেলায় বয়কট হাতে আঘাত পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বয়কট শুধু খেললেনই না, ইংলন্ডের ইনিংস শুরু করতে এসে লাভ করলেন শতরান করার সম্মান।

যাই হোক আগামী সংখ্যায় ইংলন্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। তার চেয়ে এখন বরং ফিরে আসা যাক ভারতীয় ক্রিকেট প্রসংগে।

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড দলের ভারত ভ্রমণ শুধুমাত্র পাকা হয়েই যায় নি ভ্রমণসূচীও প্রস্তুত হয়ে গেছে। নিচে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড দলের ভারত সফরের সম্পূর্ণ খতিয়ান দেওয়া হলো ঃ

॥ বয়কট ॥

প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার ভ্রমণসূচী

পশ্চিমাঞ্চলের সংগে—পুনায়, ৩১শে অক্টোবর, ১লা ও ২রা নভেম্বর।

প্রথম টেস্ট ম্যাচ—বোম্বাই-এ ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯ই নভেম্বর।

মধ্যাঞ্চলের সংগে—জয়পুরে ১১, ১২ ও ১৩ই নভেম্বর।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ—কানপুরে ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০শে নভেম্বর।

উত্তরাঞ্চলের সংগে—অমৃতসর কিম্বা জলন্ধরে ২২, ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ—দিল্লীতে ২৮, ২৯, ৩০শে নভেম্বর ও ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর।

পূর্বাঞ্চলের সংগে—গৌহাটিতে ৬, ৭ ও ৮ই ডিসেম্বর।

চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ—কলকাতায় ১২, ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭ই ডিসেম্বর।

দক্ষিণাঞ্চলের সংগে—ব্যাঙ্গালোরে ২০, ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর।

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ—মাদ্রাজে ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর।

নিউজিল্যান্ডের ভ্রমণসূচী

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে—ইন্দোরে ১৯, ২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর।

প্রথম টেস্ট ম্যাচ—আমেদাবাদে ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ ও ২৯শে সেপ্টেম্বর।

ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির দলের সংগে—কটকে ৩, ৪ ও ৫ই অক্টোবর।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ—নাগপুরে ৭, ৮, ১০, ১১ ও ১২ই অক্টোবর।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ—হায়দ্রাবাদে ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০শে অক্টোবর।

পরিচয়তে

নঈম যেন নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন না

মোহনবাগান দলের আক্রমণভাগের প্রধান স্তম্ভ নঈম এ বছর যেন নিজেকে ঠিক সেই রকমভাবে খুঁজে পাচ্ছেন না। দর্শকরাও খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথায় নঈমের সেই নয়নাভিরাম ক্রীড়াধারা, কোথায় সেই মনভোলানো রূপ। তবে কি নঈম হারিয়ে গেছেন? না কি হারিয়ে ফেলছেন তাঁর সেই দর্শনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য।

না নঈম হারিয়ে যান নি, হারিয়েও ফেলেন নি তাঁর খেলা। নঈমের এখনকার এই খেলতে না পারার কারণ হলো তাঁর সাময়িক অবসাদ। এ বাধা কাটিয়ে উঠবেন তিনি খুব তাড়াতাড়ি। নিজেকে যে পুরোপুরিভাবে তাঁকে ফিরে পেতেই হবে। নঈম যে এখনো ভারতীয় ফুটবল দলের এক নম্বর স্টপার।

মাত্র কয়েক বছর হলো নঈম কলকাতায় এসে ফুটবল খেলছেন। অবশ্য কলকাতায় আসার আগেই নঈম নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন ভালোভাবেই। তখনো একডাকে সকলেই নঈমকে চিনতেন, তখনো ভারতীয় দলে নঈমের স্থান ছিলো পাকা। তবু সেদিনের নঈমের সঙ্গে আজকের সেরা স্টপারের তফাৎ অনেক। আজ যে নঈমের খেলোয়াড়জীবন ফলে ফুলে ছেয়ে গেছে। রহিম সাহেবের হাতে তৈরি খেলোয়াড় নঈম আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

নঈম কিন্তু চিরকাল রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ছিলেন না। আগে খেলতেন ইনসাইড ফরোয়ার্ডে। তারপর দেখতে দেখতে একদিন আক্রমণভাগ ছেড়ে নঈম চলে এলেন রক্ষণভাগে। ব্যাক হিসেবে খেলতে শুরু করলেন তিনি। আর রক্ষণভাগের খেলোয়াড় হিসেবেই নঈম লাভ করলেন অভাবনীয় সাফল্য। লাভ করলেন অকল্পনীয় প্রতিষ্ঠা। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৬৩ সালে নঈম হলেন ভারতীয় যুব ফুটবল দলের অধিনায়ক। সে বছর পেনাঙের মাঠে তরুণ খেলোয়াড় নঈমের খেলা সকলকে অবাক করে দিয়েছিলো।

সেই বছরই অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে নঈম প্রাক অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পেলেন। সেবার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আমরা নঈমকে দেখেছি ইরানের বিরুদ্ধে খেলতে। তার আগে ও পরে আই এফ এ শীল্ড থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আসরে আমরা দেখেছি নঈমের খেলা। ততোদিনে নঈম আবার স্থান পরিবর্তন করেছেন। শুরু করেছেন স্টপারে খেলতে।

তারপর একদিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ডাক পেয়ে নঈম কলকাতায় এলেন ইস্টবেঙ্গল দলের স্টপারের দায়িত্ব নেবার জন্যে। নঈম এলেন, নঈম খেললেন, নঈম জয় করলেন। খেলা দিয়ে নঈম কিনে নিলেন কলকাতার ফুটবল রসিকদের মন। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নঈম লাভ করলেন কলকাতা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ স্টপারের সম্মান।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে গত বছর নঈম চলে এসেছেন মোহনবাগানে। নঈম আজ মোহনবাগান দলের রক্ষণভাগের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তবে এ বছর নঈমের খেলায় এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কেমন যেন একটু ঢিলে ভাব।

নঈমের খেলার আর এক দুর্বলতা হলো—তাঁর ধীরে খেলা। অর্থাৎ নঈম একটু শ্লো। নঈম যদি আর একটু ফাস্ট হতেন তাহলে তাঁর তুলনা মেলা ভার হতো। তবে নঈমের ধীর এবং ঠাণ্ডা মাথায় খেলার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর ফুটবল খেলা সম্বন্ধে তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির বিষয়টি। কথাবার্তায় মিষ্টি এবং খেলাধুলায় শান্ত মেজাজী নঈম আজ অতুলনীয়।

তাই বুঝি নঈম কলকাতা ময়দানে এসে খেলার প্রথম বছরেই লাভ করেছিলেন বছরের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান।

ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসংগে বাংলার ক্রীড়াবিদ... কি বলেন

—অরুণ চট্টোপা...

নির্মল চ্যাটার্জী জানালেন

অতীতদিনের খ্যাতনামা বাঙা...
ক্রিকেটার নির্মল চ্যাটার্জী বল...
ইডেনে ফুটবলের অনুপ্রবেশ ঘট...
ক্রিকেটের সুষ্ঠু অবস্থান সম্ভব
সেখানে।

ইডেনে ফুটবল খেলা হলে কি অব...
হবে সে-কথা বাংলার ক্রীড়ামোদীর ...
আছে নিশ্চয়ই। ১৯৬৭ সালে ইডে...
যে সীমিতসংখ্যক ফুটবল ম্যাচ হ...
তাতেই মাঠের অবস্থা জলে-বুটে-কা...
একাকার। তিনি বললেন, ইডে...
মাটি নরম, 'ব্ল্যাক সয়েলে' সারা ...
আচ্ছাদিত। আমাদের দেশে বর্ষাক...
ফুটবল খেলা হয়, তাই বৃষ্টি-ভেজা পি...
মাঠে ফুটবল খেলা সম্ভব কি না...
ফুটবল-বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন। ...
একথা বলতে পারি যে, ফুটবলের
ইডেনে ক্রিকেট খেলার খুবই অসু...
হবে। পিচ তৈরি করতে অসুবিধা হ...

ও যা তৈরি করা গেল, কিন্তু
ন্ড' ঠিকমত তৈরি করা সম্ভব
তে অল্প সময়ে অতবড় মাঠ ঠিক
ম মেহনত সহ্য করতে হবে না।
ঠের সবুজ চেহারা তো নষ্ট
সে চেহারা ফিরিয়ে আনা
।

কেটার শ্রীচ্যাটার্জী জানালেন,
বলছেন ইডেনে খেলতে হলে
পাল্টানো হবে।. অতবড় মাঠের
ক করে পাল্টানো হবে? অবশ্য
পাল্টালে 'পিচ' তৈরি করা কঠিন
, কিন্তু তা স্থায়ী হবে কি না
বলা কষ্টকর।

টবলের তুঙ্গে-ওঠা জনপ্রিয়তার
ক্ষ্য করে তিনি মন্তব্য করলেন,
দেশ তথা ভারতের জাতীয় খেলা
আজ ফুটবল তার স্থান করে
। ফুটবলের স্টেডিয়াম কলকাতায়
কথা ভাবা যায় না। 'কালেভদ্রে
টেস্ট ম্যাচের জন্য ইডেনকে আটকে
য জনপ্রিয় ফুটবলের স্থান সেখানে
ওয়া উচিত'—একথা অনেকে মনে
সে মত মেনে নিলে ইডেনের
প্রয়োজনের কাছে নতি স্বীকার
তবে একথা ঠিক, ফুটবল
ফুটবলে ক্রিকেট 'পালাই পালাই'

শেষে তিনি জানালেন, ইডেনে
টো ফুটবল মাঠ পাশাপাশি হতে
তাই গোলাকার মাঠে ফুটবলের
হলে গ্যালারী এবং মাঠের দূরত্ব
শি হবে যে, দর্শকরা খেলা দেখে
পাবেন বলে মনে হয় না। বেশি
স্থান সংকুলানের জন্যই ইডেনে
খেলার কথা ভাবা হচ্ছে, কিন্তু
খেলা দেখে আনন্দ পাবেন কি
ক নজর রাখাও তো দরকার...।

সপ্তাহে তিন প্রধানের খেলা

ন—ইস্টবেঙ্গল : কালীঘাট
মহামেডান : উয়াড়ী
ন—মহামেডান : বি· এন· আর
ন—মোহনবাগান : ইস্টবেঙ্গল
ন—মোহনবাগান : কালীঘাট
ন—ইস্টবেঙ্গল : হাঃ ইউনিয়ন
মহামেডান : পোর্ট কমিঃ
ন—মোহনবাগান : এরিয়ান্স

গল্প হলেও সত্যি

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের জীবনে এক-একটা সময় আসে যখন তাঁরা কিছুতেই আর নিজেদের খুঁজে পান না। ভালোভাবে ব্যাটিং করতে পারেন না, ঝটপট আউট হয়ে যান। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ক্রিকেট খেলোয়াড়রা তখন এক বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়েন। ইংলন্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডেনিস কম্পটনকেও একবার এমনই এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

যুদ্ধের জন্যে ছ'বছর ক্রিকেট খেলতে পারেন নি কম্পটন। ১৯৪৬ সালে খেলা শুরু করে কম্পটন একের পর এক খেলায় দিতে লাগলেন শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়। দু'টি কাউন্টি আর একটি টেস্ট ম্যাচের সাতটি ইনিংসে করলেন মাত্র ২৬ রান। ঐ ২৬ রানের হিসেব হলো—১০, ০, ৭, ০, ৮, ০ ও ১।

কম্পটনের মানসিক অবস্থা তখন শোচনীয়। কিছুতেই যেন নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। এক-একবার আউট হয়ে ফিরে আসেন আর তাঁর মন ভরে ওঠে ব্যর্থতায়। নিজেকে হারিয়ে আবার নতুন করে খুঁজতে শুরু করলেন কম্পটন। তাই চললো একটানা অনুশীলন। মনে হলো যেন তিনি আবার ফিরে পেয়েছেন তাঁর পুরনো খেলা। তখনই তিনি খেলার সুযোগ পেলেন ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে। লর্ডস মাঠে কম্পটন যখন ব্যাটিং করতে নামলেন আশা-নিরাশার দোলায় তখন তাঁর মন দুলছে। প্যাভেলিয়ন থেকে ধীর পায়ে হেঁটে এসে আম্পায়ারের কাছ থেকে গার্ড নিয়ে দাঁড়ালেন কম্পটন। ফিল্ডাররা কে কোথায় আছে দেখে নেবার পর মাথার কার্উন্টটা ঠিক করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। অমরনাথ আসছেন বল করতে। অমরনাথ বল হাতে নিয়ে ছুটে এলেন, বল করলেন। কম্পটনের মনে হলো মুহূর্তের জন্যে তিনি যেন বলটা দেখতে পেলেন। তারপরেই কানে এলো অমরনাথের সংগে তাল দিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের উল্লাসধ্বনি—হাউজ দ্যাট... আর দর্শকদের আপসোস...। পেছনে ফিরে দেখলেন তাঁর উইকেট ভেঙে গেছে। কম্পটন আবার শূন্য রানে আউট হলেন। অমরনাথের বলে বোল্ড।

হতাশায় ভেঙে পড়লেন কম্পটন। আর কি তিনি খেলতে পারবেন না? ক্রিকেট খেলা কি তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে? আবার খেলতে নামলেন কম্পটন। লর্ডস মাঠে ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে। এরিক হোলিসের প্রথম বলে সজোরে ব্যাট চালালেন কম্পটন। কম্পটন ভাবলেন বলটা বোধহয় বাউন্ডারীর দিকে ছুটে চলেছে। কিন্তু ওকি? পেছনে তাকিয়ে কম্পটন থ। বলটা রেকে দা লেগে লেগেছে ব্যাটের কানায়, তারপর গড়িয়ে চলেছে উইকেটের দিকে। কম্পটনের অন্তর কেঁপে উঠলো। হতাশায় ভরে উঠলো মন প্রাণ। কম্পটন চেয়ে চেয়ে দেখলেন, বলটা গড়িয়ে গিয়ে উইকেটে লাগলো ...আস্তে খুব আস্তে...কিন্তু উইকেট থেকে বেলটা পড়লো না মাটিতে।

নতুন আশায় ভরে উঠলো কম্পটনের মন প্রাণ। আবার ব্যাট নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন কম্পটন। অভাবনীয়ভাবে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন তিনি। ওয়ারউইকশায়ারের খেলোয়াড়রা দুঃখে মাথা চাপড়ালেন। হোলিস আবার এলেন বোলিং করতে। হোলিসের বল ব্যাটের আওতায় পেয়ে প্রচন্ড জোরে মারলেন কম্পটন—বলটা শূন্য দিয়ে যেন উড়ে গেলো। ছয় মেরেছেন কম্পটন—ওভার বাউন্ডারী। হঠাৎ যেন নিজেকে ফিরে পেলেন কম্পটন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কম্পটন আবার শুরু করলেন তাঁর সেই নয়নাভিরাম খেলা। সেই ইনিংসে কম্পটন করেছিলেন ১২২ রান।

দীপঙ্কর রায় (হরিশচন্দ্রপুর, মালদা)

উত্তর : সুভাষ মহলানবীশ সম্বন্ধে কোন খবর আমরা জানি না। পেলের জীবনী কয়েক সংখ্যা আগে প্রকাশিত হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

মনোজকুমার সরকার (টোন্ডু চা-বাগান, নাগরাকাটা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনার অনুমান ঠিক।

লীগ খেলাকে বানচাল করে দেওয়ার চক্রান্তের কোন খবর তো আমরা এখনো পাই নি। তবে কখন যে কি হবে তা কেউই বলতে পারেন না—আর যাই হোক কলকাতার ফুটবল খেলা তো!

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : বিমান দুর্ঘটনায় ওসুনার মৃত্যু সত্যিই বড় দুঃখের। তোমার লেখা গল্প হলেও সত্যি গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে, দেখেছো নিশ্চয়ই। ব্যক্তিগতভাবেও উত্তর পাবে। পরিমল দে তো এখন খেলছেন। ট্রুম্যান সম্বন্ধে মাস তিনেক আগে লেখা হয়েছিল—সেখানেই তো ট্রুম্যানের ব্যাটিং এবং বোলিং এ্যাভারেজ দেওয়া হয়েছে। তুমি একটু দেখে নিও।

আশিষ দাশগুপ্ত (হাতিগড় চা-বাগান, দরং, আসাম)

উত্তর : শর্মিলা নয় পাতৌদির নবাবের বিষয়ে প্রশ্ন করুন...।

সন্ধ্যা, দীপা, শুক্লা, আশা ও মিনতি (পঞ্চাননতলা, কলকাতা-৪৪)

উত্তর : ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসংগে একটা বিশেষ প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে।

আমার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় হলেন পেলে এবং গোলরক্ষক ইয়াসিন।

অজয় বর্মণ ও বাপ্পা (টি-৪৪ রেলওয়ে কলোনী, গৌহাটি)

প্রশ্ন : লোকে বলে মাথা দিয়ে হেড দিলে মাথা নষ্ট হয়ে যায়—এ কথা কি সত্যি? আমি একজন খেলোয়াড় হতে চাই—আমায় কি করতে হবে?

উত্তর : হেড দিলেই কি আর মাথা খারাপ হয়—তাহলে তো যাঁরা ফুটবল খেলেন তাঁদের সকলেরই মাথা খারাপ। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

ভালো খেলোয়াড় হতে হলে খুব খেলতে হবে আর যাঁরা ভালো খেলেন তাঁদের কাছ থেকে খেলার কায়দা শিখতে হবে।

প্রদীপকুমার বিশ্বাস (গুদমা, চা-বাগান, দার্জিলিং)

উত্তর : আগেই আমরা জানিয়েছি যে,

প্রশ্ন উত্তর

ভারতের দুরানীই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি অর্ধশত রান পূর্ণ করেছেন। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।

নিশীথকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুবীরকুমার সান্যাল (আড়িয়াদহ, কলকাতা-৫৭)

প্রশ্ন : ভারতের ফুটবলের প্রবর্তক কে?

এ বছর কোন্ কোন্ বিদেশী দল ভারতে ক্রিকেট খেলতে আসছে? তারা ক'টি করে টেস্ট খেলবে?

উত্তর : নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীকেই ভারতীয় ফুটবলের প্রবর্তক বলা হয়।

অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড এই বছর ও আসছে বছরের প্রথম দিকে ভারত ভ্রমণে আসছে। অস্ট্রেলিয়া ৫টি ও নিউজিল্যাণ্ড ৩টি করে টেস্ট খেলবে ভারতের বিরুদ্ধে।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : ফুটবল খেলার পেনাল্টি কিকের সময় কি কি নিয়ম পালন করতে হয় জানাবেন।

উত্তর : পেনাল্টি স্পটে বল বসিয়ে কিক করতে হয়। কিকের সময় কিককারী খেলোয়াড় ও গোলরক্ষক ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় বক্সের মধ্যে থাকতে পারবে না। গোলরক্ষককে গোল-লাইনের ওপর নিশ্চল অবস্থায় থাকতে হবে—শরীরের কোন অংশই নড়বে না। পেনাল্টি কিক সব সময় সামনের দিকে করতে হয়।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচমুড়া কলেজ, বাঁকুড়া)

উত্তর : ইন্টার স্টেট ট্রান্সফারের নতুন নিয়ম একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। পাপ্পানা মহামেডান স্পোর্টিং-এই আছেন।

সজলকুমার গুহ (জুলিয়া চা-বাগান, ঢেকিয়াজুটি, দরং, আসাম)

প্রশ্ন : খেলার মাঠে খেলোয়াড়ে-খেলোয়াড়ে ধাক্কাধাক্কি, এমন কি রেফারীকেও ধাক্কা দেওয়ার মধ্যে খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় কি?

উত্তর : না—অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় এ সব। এর জন্যে রেফারী খেলোয়াড়দের সতর্ক কং দরকার হলে মাঠ থেকে দিতে পারেন।

উত্তম সরকার (ধূপগুড়ি, গুড়ি)

প্রশ্ন : বর্তমানে ভারতীয় ফুটব গোলরক্ষক কে এবং তা জানতে চাই।

উত্তর : থঙ্গরাজ ও বলাই দে। থঙ্গরাজকে C/o. ইস্টবেঙ্গ টেন্ট ও বলাই দেকে মোহনবাগান ক্লাব টেন্ট, ক ময়দান ময়দান, কলকাতা-২ ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারে

মনু, লাল্টু ও রমেশ (দুয়ারী, সাকচী, জামসেদপুর)

প্রশ্ন : আগম অস্ট্রেলিয়া কিংবা জিল্যাণ্ড দলের ভারত সফরের বাংলা দেশের কোন খেলে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলতে যাবে কি? আমার মনে হয় রায় ও সুব্রত গুহকে খেলার দেওয়া উচিত।

উত্তর : বাংলার দু-একজন খে ভারতীয় দলের পক্ষে সুযোগ পেতেও পারেন। সুব্র দু-একটা টেস্টে বোধ হ পাবেন। অম্বরের যে কি কেউই বলতে পারেন না। বাংলার দিলীপ দোস বছরও ভালো খেলতে তাহলে তাঁর কথাও বোধ হ করা হবে।

ছোটখোকা, পবিত্র, গৌতম, পুলিন ও বড়দা (উত্তরচড়া, মেদিনীপুর)

উত্তর : থঙ্গরাজকে ইস্টবেঙ্গলে নঈমকে মোহনবাগানের ঠিকানায় দিন। উত্তর পাবেন কিনা সে আমরা কিছুই বলতে পারবে

সুজিত দত্তচৌধুরী (অম পত্রিকা রোড, লাবান, শিলং-৪)

উত্তর : দুরানীর অর্ধশত রানে আমরা আগেই লিখেছি। অ দেখেছেন।

আপনার সহযোগিতার জন্যে

নীলকমল সরকার, বিধান তৃপ্তি সরকার (মুনসেফডাঙা, পু

প্রশ্ন : কোন ফুটবল খেলায় খেলোয়াড় থ্রো করলো। বল স্পর্শ না করে বিপক্ষ দলের মধ্যে ঢুকে গেলো—গোল হ কি করতে হবে তখন?

উত্তর : না হবে না। গোল কি হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসদকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

।। গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ।।

…গ্রাবলী—	১ম	৬-০০
…গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
…গ্রাবলী—	৩য়	৮-০০
…গাবলী—	১ম	৪-৫০
…গ্রাবলী—	২য়	৩-৫০
…লী (উপন্যাস)—	১ম	৩-০০
	২য়	”
	৩য়	”
…লী (সাহিত্য)	১ম	৩-০০
	২য়	৩-০০
	৩য়	৩-০০
…গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
”	২য়	৬-০০
”	৩য়	৮-০০
…াবলী—	১ম	৩-০০
…গ্রাবলী—	২য়	৪-০০
…ী—		৩-৫০
…ী—	১ম	৩-০০
…ী—	২য়	৩-০০
…বলী—	১ম	৩-৩০
	২য়	৪-০০
…বলী—	৪র্থ	৪-০০
…গ্রাবলী—	১ম	৩-০০
…াবলী—	২য়	৪-০০
…বলী—	৩য়	৪-০০
…ী—	১ম	৩-০০
…ী—	২য়	৩-০০
…গ্রাবলী—		৩-০০
…ী—		৩-০০
…পাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
…গ্রন্থাবলী—		৩-০০
…গ্রন্থাবলী—		৫-০০
…লী—		৩-৫০
	২য়	৩-০০
	৩য়	৩-০০
…পাধ্যায়ের গ্রন্থা:—		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী—	৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:— ২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—	৪-০০
” ” ” —২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—	৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ	৪-০০
” —২য়	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— ১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য় ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—২য়	৩-০০
” ” ” —৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—	৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস —২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:—১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি—	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর—	৩-৫০
পরলোক—	৪-৫০
পরলোক রহস্য—	২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
ভারত প্রতিভা—	৫-০০
প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
নানার মা—	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ—	৩-০০
বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
বিসমার্ক—	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী—	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
মাধবীকঙ্কণ—	২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিবরণ প্রশ্নের সংগ্রহ— ১ম	৪-০০
যৌন-মনোদর্শন	
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী—২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

…তী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলি-১২

20 JUN 1969

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল—কাশীপুর

শিশুর খাদ্যে ও রুগীর পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়
'কুক্‌মী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭